প্রবাসী—১৩৩৬, কার্ত্তিক হইতে চৈত্র

২৯শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়-সূচী

ত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ । ২য় খণ্ড । কার্ত্তিক, ১৩৩৬ । ১ম সংখ্যা

শিবাজীর দক্ষিণ-বিজয়

স্যর যদুনাথ সরকার, সি-আই-ই

এক সময়ে বিখ্যাত বিজয়নগর-সাম্রাজ্য কৃষ্ণা নদীর পরপারে সারা দাক্ষিণাত্য জুড়িয়া পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সাগর,—অর্থাৎ মাদ্রাজ হইতে গোয়া—পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণের মুসলমান সুলতানেরা একজোট হইয়া বিজয়নগরের সম্রাটকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাজধানী লুঠ করিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ রাজধানী একস্থান হইতে অপর স্থানে সরাইতে লাগিল, কিন্তু ঐ যুদ্ধের পর হইতে সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল; কতক প্রদেশ মুসলমানেরা কাড়িয়া লইল, আর কতক প্রদেশ স্বাধীন হইল। বিজয়নগরের শেষ সম্রাট (শ্রীরঙ্গ রায়ল) সর্ব্বস্ব হারাইয়া তাঁহার সামন্ত শ্রীরঙ্গপটনের রাজার দ্বারে আশ্রয় মাগিলেন (১৬৫৬)।

ইতিমধ্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরা বিজয়নগরের করদ-রাজাদিগের হাত হইতে বর্ত্তমান মহীশূর দেশ ও মাদ্রাজ উপকূলের প্রায় সমস্তটাই কাড়িয়া লইলেন। পূর্ব্বের একছত্র সম্রাটের হারাইয়া, নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের অভিমানে অন্ধ স্বার্থপর প্রাদেশিক হিন্দুরাজারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিল না। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক লড়িয়া সহজেই মুসলমানের কাছে রাজ্য হারাইল অথবা বশ মানিল। এইরূপে ১৬৩৭ হইতে ১৬৫৬ সালের মধ্যে কুতুব শাহ গোলকুণ্ডার দক্ষিণ-পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া কাড়াপা এবং উত্তর-আর্কট জেলা (পালার নদীর উত্তরের অংশ) এবং মাদ্রাজের সমুদ্রকূল অঞ্চলে শ্রিকাকোল হইতে সাদ্রাজ বন্দর (মাদ্রাজের প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণ) পর্য্যন্ত দখল করিলেন। ইহার নাম হইল "হায়দরাবাদী কর্ণাটক।" ঠিক ইহার দক্ষিণে,—পালার হইতে কাবেরী নদী পর্য্যন্ত সমভূমি এবং প্রায় সমস্ত মহীশূর জুড়িয়া আদিল শাহ রাজ্য বিস্তার করিলেন। তাহার নাম হইল "বিজাপুরী কর্ণাটক।"

অর্থ শস্য ও লোক-সংখ্যায় এই কর্ণাটক দেশ ভারতে ... ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা; স্থানীয়

লোকেরা খুব পরিশ্রমী ও শিল্পকার্য্যে দক্ষ; অনেক মণি-মাণিক্যের খনি ও হাতীতে পূর্ণ বন-জঙ্গল হইতে রাজার অগাধ লাভ হইত। এই সব কারণে দেশের আয় দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই আয়ের অতি কম অংশই খরচ হইত, কারণ প্রজারা খুব মিতব্যয়ী, কোন প্রকার বিলাসিতা জানিত না; পান্তাভাত ও তেঁতুলের জল, নুন লঙ্কা মিশাইয়া খাইয়া এবং লেংটী পরিয়া বারো মাস কাটাইত। এইরূপে বৎসর বৎসর কর্ণাটকে অগাধ ধন উদ্বৃত্ত থাকিত; তাহার কতক অংশ বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণে ব্যয় হইত; বাকী টাকা মাটির তলে পোঁতা থাকিত। এইজন্য সোনার দেশ বলিয়া যুগে যুগে কর্ণাটক প্রদেশের খ্যাতি ছিল। যুগে যুগে বিদেশী রাজা ও সেনা-সামন্তরা এই দেশের অগাধ ধনরত্ন লুঠিয়া লইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। এবার শিবাজীরও দৃষ্টি কর্ণাটকের উপর পড়িল।

এই সময়ে (অর্থাৎ ১৬৭৬ সালে) বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের প্রায় সমস্তটাই বিজাপুরের অধীনে অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত ছিল; তাহার কতকগুলি ওমরাদের জাগীর, আর কতকগুলি করদ-হিন্দুরাজাদের রাজ্য। ইহাকে "কর্ণাটক বালাঘাট" (অর্থাৎ উঁচু জমি) বলা হইত। আর, মহীশূরের পূর্ব্বদিকে বঙ্গ উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে সমভূমি, অর্থাৎ মান্দ্রাজের আর্কট প্রভৃতি জেলাগুলি, তাহার নাম ছিল কর্ণাটক পাইনঘাট (অর্থাৎ নীচু দেশ)। মহীশূরের পাহাড় বাহিয়া এই সমভূমিতে নামিলে উত্তর হইতে দক্ষিণ মুখে যাইবার পথে ক্রমে ক্রমে তিনটি বিজাপুরী ওমরাদের জাগীর পড়ে;—প্রথমে বিখ্যাত জিঞ্জি-দুর্গের অধীনস্থ প্রদেশ (ইহার শাসনকর্ত্তা নাসির মহম্মদ খাঁ, মৃত উজীর খাওয়াস খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা); তাহার পর বলি-কণ্ড-পুরম (যেখানে বানর রাজ বলী রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেন; ইহার শাসনকর্ত্তা শের খাঁ লোদী, আফঘান উজীর বহলোলের জাতভাই); এবং শেষে কাবেরী পার হইয়া তাঞ্জোর (শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভাই ব্যঙ্কাজী, ওরফে একোজী, ১৬৭৫ সালে ইহা দখল করেন)। আরও দক্ষিণে স্বাধীন মাদুরা-রাজ্য। ইহা ভিন্ন বেলুর, আরণি প্রভৃতি বিখ্যাত দুর্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীর হাতে ছিল।

এই সব বিজাপুরী ওমরাদের মধ্যে স্বার্থ লইয়া সর্ব্বদাই যুদ্ধ ও রাজ্য কাড়াকাড়ি চলিতেছিল; কেহই উপরিতন সুলতানকে মানিয়া চলিত না, কারণ সুলতান তখন নাবালক এবং উজীরের হাতে পুতুল মাত্র। হিন্দু-করদ রাজারাও তেমনি স্বার্থপর ও একতাহীন। শের খাঁ ফন্দি করিলেন যে তাঁহার মিত্র—ফরাসী কোম্পানীর পণ্ডিচেরীর কুঠী হইতে গোরা এবং সাহেবদের হাতে শিক্ষিত দেশী সিপাহী লইয়া জিঞ্জি অধিকার করিবেন; তাহার পর ক্রমে রাজ্য ও বল বৃদ্ধি করিয়া মাদুরা ও তাঞ্জোরের অগাধ ধনদৌলৎ লুঠিবেন, এবং শেষে সেই অর্থের জোরে সৈন্য-সংখ্যা বাড়াইয়া গোলকুণ্ডা-রাজ্য জয় করিবেন!

শের খাঁ ১৬৭৬ সালে জিঞ্জি প্রদেশ আক্রমণ করিয়া তাহার অনেক অংশ কাড়িয়া লইলেন। জিঞ্জির অধিকারী নাসির মহম্মদ নিরুপায় হইয়া গোলকুণ্ডার সাহায্য চাহিলেন। এই সময় কুতুব শাহের মন্ত্রী মাদন্না নামক ব্রাহ্মণই ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা; তাঁহাদের বংশ পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত হিন্দু। মাদন্নার প্রাণের বাসনা ছিল মুসলমানের (অর্থাৎ বিজাপুরের) হাত হইতে কর্ণাটক উদ্ধার করিয়া, ১৬৪৮ সালের পূর্ব্বের মত আবার হিন্দুর শাসনে রাখিবেন। শিবাজীর মত ভুবনবিজয়ী বীর ও ভক্ত হিন্দু ছাড়া আর কাহারও দ্বারা এই মহাকার্য্য সফল হওয়া সম্ভব নহে। সুলতান প্রিয়মন্ত্রীর পরামর্শে রাজি হইলেন। এই শর্ত্তে সন্ধি হইল যে শিবাজী মারাঠা-সৈন্যের সাহায্যে বিজাপুরী কর্ণাটক জয় করিয়া কুতুব শাহকে দিবেন, আর নিজে তথাকার রাজকোষে মজুত ও লুঠের টাকা এবং মহীশূরের কতক মহাল লইবেন। এই অভিযানের সমস্ত ব্যয় কুতুব শাহর, এ ছাড়া কামান ও গোলা এবং পাঁচ হাজার সৈন্য দিয়া তিনি শিবাজীকে সাহায্য করিবেন। শিবাজীর চতুর দূত প্রহ্লাদ নিরাজী মাদন্নার সহিত আলোচনা করিয়া এই বন্দোবস্ত পাকা করিলেন।

শিবাজী দেখিলেন, কর্ণাটক জয় করা যেরূপ কঠিন কাজ তাহাতে নিজে বাহির না হইলে শুধু সেনাপতি পাঠাইয়া কোনই ফল হইবে না, আর ইহাতে অন্ততঃ এক বৎসর

সময় লাগিবে। অথচ, এই দীর্ঘকাল স্বদেশ ছাড়িয়া সুদূর কর্ণাটকে থাকিলে, শত্রুরা সেই সুযোগে তাঁহার রাজ্যে মহা অনিষ্ট ঘটাইতে পারে। এই কারণে শিবাজী মুঘল-সরকারের সহিত ভাব করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ১৬৭৬ সালের শেষভাগে মুঘল ও বিজাপুরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে শিবাজীর খুব সুবিধা হইল। বিজাপুরে নূতন উজীর বহলোল খাঁর আফঘান দল এবং তাঁহার শত্রু দক্ষিণী ও হাবশী ওমরাদের মধ্যে খুনোখুনী বিবাদ বাধিয়া গিয়াছিল। মুঘল সুবাদার বাহাদুর খাঁ বহলোলের উপর চটা ছিলেন; তিনি এই সুযোগে দক্ষিণীদের পক্ষ লইয়া বিজাপুর আক্রমণ করিলেন (৩১ মে, ১৬৭৬) এবং এই যুদ্ধে এক বৎসরেরও অধিক কাল ব্যাপৃত রহিলেন। সে সময়ে কেহই শিবাজীর দিকে তাকাইবার অবসর পাইল না।

বাহাদুর দেখিলেন, বিজাপুর আক্রমণের পূর্ব্বে শিবাজীকে হাত করিতে না পারিলে, তাঁহার নিজের শাসনাধীন প্রদেশ অরক্ষিত অবস্থায় থাকিবে। আর, শিবাজীও দেখিলেন যে যখন তিনি কর্ণাটক লইয়া জড়াইয়া পড়িবেন তখন মুঘল সুবাদার শত্রুতা করিলে মহারাষ্ট্র দেশের খুবই অনিষ্ট হইবে। অতএব "তুমি আমাকে জ্বালাইও না, আমিও তোমাকে ছুঁইব না" এই শর্ত্তে দুই পক্ষ বন্ধুত্ব করিলেন। শিবাজীর দূত নিরাজী রাবজী পণ্ডিত গোপনে বাহাদুর খাঁকে অনেক টাকা ঘুষ এবং প্রকাশ্যে বাদশাহের জন্য কিছু টাকা কর বা উপহার দিয়া সন্ধির লেখাপড়া শেষ করিলেন।

ভাগ্য চিরদিনই উদ্যোগী পুরুষসিংহের উপর প্রসন্ন। শিবাজীর কর্ণাটক-জয়ের পক্ষে এক মহা সহায় জুটিল। রঘুনাথ নারায়ণ হনুমন্তে নামক একজন সুদক্ষ অভিজ্ঞ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ শাহজীর সময় হইতে ব্যঙ্কাজীর অভিভাবক এবং উজীর হইয়া কর্ণাটক-রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ফলতঃ রঘুনাথ ও তাঁহার ভ্রাতা জনার্দনকে লোকে ঐ দেশের রাজার মতই জ্ঞান করিত। ব্যঙ্কাজী বড় হইয়া নিজহাতে শাসনভার লইলেন এবং রঘুনাথের নিকট হইতে রাজস্বের হিসাব তলব করিলেন। রঘুনাথ এত বৎসরে প্রভুর অগাধ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; ঈর্ষাবশে অন্যান্য মন্ত্রীরা সে কথা প্রকাশ করিয়া দিল। এতদিন একাধিপত্য করিবার পর, হিসাব দিতে বা হুকুমে চলিতে রঘুনাথ অপমান বোধ করিলেন। তিনি উজীরীতে ইস্তফা দিয়া কাশী যাত্রা করিবার ভাণে তাঞ্জোর হইতে সপরিবারে চলিয়া আসিলেন। এই সংবাদ পাইয়া শিবাজী তাঁহাকে অতি সমাদরে আহ্বান করিলেন এবং নিজ রাজ্যে চাকরি দিলেন। রঘুনাথ তাঁহাকে কর্ণাটকের জায়গা-জমি ও কর্ম্মচারীদের নাড়ীনক্ষত্র সব বলিয়া দিলেন, এবং নিজ বংশের এতদিনকার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি দিয়া শিবাজীর কর্ণাটক-আক্রমণে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

পেশোয়াকে নিজ প্রতিনিধি করিয়া বসাইয়া, কোঁকন-প্রদেশের শাসনভার অন্নাজী দত্ত (সুরণীস্)কে দিয়া, এবং উভয়ের অধীনে এক একটি বড় সৈন্যদল রাখিয়া,—১৬৭৭ সালের জানুয়ারির প্রথমে শিবাজী রায়গড় হইতে রওনা হইলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার দূত প্রহ্লাদ নিরাজী গোলকুণ্ডারাজ কুতুব শাহকে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজি করাইয়াছিলেন। প্রথমে সুলতানের ভয় হইয়াছিল পাছে আফজল বা শায়েস্তা খাঁর মত তাঁহার দশা ঘটে! কিন্তু প্রহ্লাদ নানা প্রকার ধর্ম্মশপথ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন যে শিবাজী কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আর, মাদন্নাও সেই মত সমর্থন করিলেন এবং রাজাকে দেখাইয়া দিলেন যে শিবাজীকে কাছে আনিয়া বন্ধুত্ব পাকা করিতে পারিলে ভবিষ্যতে মুঘল-আক্রমণ হইতে গোলকুণ্ডা রক্ষা করার নিশ্চিত উপায় হইবে।

নিজ চোখে চোখে সৈন্যদের শৃঙ্খলার সহিত চালাইয়া, প্রত্যহ নিয়মিত কুচ করিয়া শিবাজী এক মাসে হায়দরাবাদ শহরে আসিয়া পৌছিলেন (ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ)। তিনি কড়া হুকুম জারি করিয়াছিলেন যেন তাঁহার সৈন্য বা চাকর-বাকরদের কেহ পথে কোন গ্রামবাসীর জিনিষে হাত না দেয় বা স্ত্রীলোকের মানহানি না করে। প্রথমে দু-চারজন মারাঠা এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অপরাধীদের ফাঁসী অথবা হাত পা কাটিয়া সাজা দেওয়ায় এমন ভয়ের সঞ্চার হইল যে এই

পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র লোক এক মাস ধরিয়া অতি শান্ত ও সাধুভাবে বিদেশ পার হইয়া চলিল, কাহারও একগাছি তৃণ বা এক দানা শস্যে হাত দিল না। ইহাতে চারিদিকে শিবাজীর সুনাম ছড়াইয়া পড়িল।

কুতুব শাহ প্রস্তাব করেন যে তিনি রাজধানী হইতে কয়েক ক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া শিবাজীকে অভ্যর্থনা করিবেন। কিন্তু শিবাজী নম্রভাবে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন; বলিলেন, "আপনি আমার জ্যেষ্ঠ; এতটা পথ আগুয়ান হইয়া কনিষ্ঠকে সম্মান করা গুরুজনের পক্ষে অনুচিত।" সুতরাং শুধু মাদন্না, তাঁহার ভ্রাতা আকন্না এবং হায়দরাবাদের সব বড় বড় লোকেরা শহর হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ বাহিরে আসিয়া শিবাজীকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজধানীতে আনিলেন।

শিবাজীর অভ্যর্থনার জন্য রাজধানী হায়দরাবাদ আজ অতি সুন্দর বেশ ধারণ করিয়াছে। রাস্তা ও গলিগুলি কুঙ্কুম ও জাফরানে লালে লাল। স্থানে স্থানে ফুল পাতা ও নিশানে সজ্জিত খিলান ও ধ্বজদণ্ড তৈয়ারি করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ নাগরিকেরা ভাল ভাল পোষাক পরিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া, আর বারান্দাগুলি সাজগোছ করা মহিলায় ভরা।

শিবাজীও তাঁহার সৈন্যগণকে এই দিনের জন্য চমৎকার বেশভূষা পরাইয়াছেন। জমকাল পোষাক ও অস্ত্রে তাঁহার সেনানীগণকে ধনী ওমরাদের মত দেখাইতেছিল। বাছা বাছা সিপাহীর পাগড়ীতে মোতির ঝালর ('তোড়া'), হাতে সোনার কড়া, গায়ে উজ্জ্বল বর্ম্ম ও জরির পোষাক।

দুই রাজার মিলনের জন্য নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে সেই পঞ্চাশ হাজার মারাঠা-সৈন্য হায়দরাবাদে ঢুকিল। তাহাদের বীরত্বের কাহিনী এতদিন দাক্ষিণাত্যে লোকমুখে প্রচারিত, কত গাথায় (ব্যালাডে) গীত হইয়া আসিতেছিল। আজ লোকে অবাক হইয়া সেই সব বিখ্যাত বীর নেতা ও সিপাহীদের দিকে তাকাইতে লাগিল; এতদিন তাহাদের নাম শুনিয়া আসিতেছিল, আজ তাহাদের চেহারা দেখিল।

সকলের চোখ পড়িল সেনাপতি মন্ত্রী ও রক্ষীদের মধ্যস্থলে বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর প্রতি। তাঁহার শরীর মাঝারি রকমের লম্বা এবং পাতলা। গত বৎসরের অসুখে এবং এই এক মাস ধরিয়া নিত্য কুচ করার ফলে তাঁহাকে আরও পাতলা দেখাইতেছিল। কিন্তু তাঁহার গৌরবর্ণ মুখে সদাই হাসি লাগিয়া আছে, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোক দুটি ও চোখাল নাক এদিকে ওদিকে ফিরিতেছে। নগরবাসীরা আনন্দে "জয় শিব ছত্রপতির জয়" ধ্বনি করিতে লাগিল। মহিলারা বারান্দা হইতে সোনা-রূপার ফুল বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অথবা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চারিদিকে প্রদীপ ঘুরাইয়া আরতি করিলেন, অভ্যর্থনার শ্লোক ও আশীর্ব্বাদ-বাণী উচ্চারণ করিলেন। শিবাজীও দু-পাশের জনতার মধ্যে মোহর ও টাকা ছড়াইতে লাগিলেন, এবং প্রত্যেক পাড়ার প্রধান নাগরিকগণকে খেলাৎ ও অলঙ্কার উপহার দিলেন।

এইরূপে শোভাযাত্রা কুতুব শাহের বিচার-প্রাসাদ—দাদ-মহলের সামনে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে আর সকলে শান্ত সংযত ভাবে রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল; শুধু শিবাজী পাঁচজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সিঁড়ি বাহিয়া দরবার-গৃহে উঠিলেন। সেখানে কুতুব শাহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তিনি দরজা পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিয়া শিবাজীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া গদীর উপর নিজ পাশে বসাইলেন। মন্ত্রী মাদন্নাকে ফরাসে বসিতে অনুমতি দেওয়া হইল; আর সকলে দাঁড়াইয়া রহিল। অন্তঃপুরে বেগমেরা দুই পাশের পাথরের জাফরিকাটা জানালার ফাঁক দিয়া মহা কুতূহলে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

কুতুব শাহ তিন ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন, এবং শিবাজীর মুখে তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনা ও বীর কীর্ত্তিগুলির বিস্তারিত বিবরণ মুগ্ধ হইয়া শুনিলেন। পরে তিনি স্বহস্তে শিবাজীকে পান আতর দিয়া, এবং মারাঠা মন্ত্রী ও সেনাপতিদের খেলাৎ অলঙ্কার হাতী ঘোড়া উপহার দিয়া বিদায় করিলেন; স্বয়ং শিবাজীর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নীচ তলা পর্য্যন্ত গেলেন। সেখান হইতে পথে টাকা ছড়াইতে ছড়াইতে শিবাজী বাসাবাড়ীতে পৌঁছিলেন।

উজীর মাদন্না পণ্ডিত পরদিন শিবাজী ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন; তাঁহার মাতা স্বহস্তে অতিথিদের জন্য রান্না করিলেন। ভোজশেষে নানা উপহার পাইয়া মারাঠারা বাসায় ফিরিল।

তাহার পর কাজের কথা আরম্ভ হইল। অনেক আলোচনার পর শিবাজীর সহিত এই শর্ত্তে সন্ধি হইল:— কুতুব শাহ দৈনিক পনের হাজার টাকা এবং নিজ সেনাপতি মীরজা মহম্মদ আমিনের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য, কতকগুলি তোপ এবং গোলা বারুদ দিয়া শিবাজীকে কর্ণাটক-জয়ে সাহায্য করিবেন। শিবাজী প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ণাটকের যে-যে অংশ তাঁহার পিতা শাহজীর ছিল তাহা বাদে জয় করা সমস্ত দেশ কুতুব শাহকে দিবেন। এ ছাড়া তিনি কুতুব শাহের সম্মুখে ধর্ম্ম-শপথ করিয়া বলিলেন যে মুঘলেরা আক্রমণ করিলেই তিনি গোলকুণ্ডা-রাজ্য রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিবেন। তজ্জন্য কুতুব শাহ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি-মত বার্ষিক কর পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়মিতভাবে দিতে থাকিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

গোপনে এই সব মন্ত্রণা ও বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল, আর বাহিরে আমোদ-প্রমোদ তামাশা ও ভোজে মারাঠা এবং নগরবাসীদের সময় সুখে কাটিতে লাগিল। শিবাজী দ্বিতীয়বার কুতুব শাহের সহিত দেখা করিলেন; দুই রাজা প্রাসাদের বারান্দায় পাশাপাশি বসিলেন, আর সমস্ত মারাঠা-সৈন্য কুচ করিয়া তাঁহাদের সামনে দিয়া চলিল; গোলকুণ্ডার সুলতান তাহাদের নানা উপহার দিলেন। শিবাজীর ঘোড়াকে পর্য্যন্ত একটি মণি ও হীরার মালা গলায় পরাইয়া দেওয়া হইল, কারণ সে-ও তাঁহার যুদ্ধজয়ে সঙ্গী ছিল!

আর একদিন কুতুব শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কয় শত হাতী আছে?" শিবাজী তাঁহার হাজার হাজার মাব্‌লে পদাতিক সৈন্য দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইহারাই আমার হাতী।" তখন সুলতানের একটি প্রকাণ্ড মত্ত হস্তীর সহিত মাব্‌লে সেনাপতি যেসাজী কঙ্ক তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিলেন, এবং উহাকে কিছুক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিয়া শেষে এককোপে উহার শুঁড় কাটিয়া ফেলিলেন। হাতী পরাস্ত হইয়া পলাইয়া গেল।

এইরূপে এক মাস কাটাইবার পর টাকা ও মালপত্র লইয়া শিবাজী মার্চ মাসের প্রথমে হায়দরাবাদ ত্যাগ করিলেন। দক্ষিণ দিকে গিয়া কৃষ্ণা নদীর তীরে "নিবৃত্তি-সঙ্গমে" (ভবনাশী নদীর সহিত মিলন ক্ষেত্রে) তীর্থস্নান ও পূজা দানাদি করিয়া, সৈন্যদের অনন্তপুরে পাঠাইয়া দিলেন, এবং নিজে অল্প রক্ষী ও কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে শ্রীশৈল দর্শনে চলিলেন।

এই স্থান কর্ণূল নগর হইতে ৭০ মাইল পূর্ব্বদিকে। এখানে কৃষ্ণা নদী হইতে হাজার ফীট উঁচু এক অধিত্যকার জনহীন বনের মধ্যে মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির,—ইহা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি লিঙ্গ। মন্দিরটি পঁচিশ ছাব্বিশ ফীট উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা; ইহার চারিদিকে অতি বিস্তৃত আঙ্গিনা। বড় বড় সমচতুষ্কোণ পাথর দিয়া এই দেওয়াল গাঁথা, আর তাহার গায়ে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, শিকারী, যোদ্ধা, যোগী, এবং রামায়ণ ও পুরাণের দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে খোদাই করা। শিবমন্দিরটিও সমচতুষ্কোণ। বিজয়নগরের দিগ্বিজয়ী সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়ের অর্থে মন্দিরের চারিদিকের দেওয়াল ও ছাদ আগাগোড়া সোনার হলকরা পিতলের চাদরে মোড়া (১৫১৩)। ঐ বংশের এক সম্রাজ্ঞী উপর হইতে নীচে কৃষ্ণার জলধারা পর্য্যন্ত হাজার ফীটেরও বেশী দীর্ঘপথ, পাথরের শান্ বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার নীচের ঘাটের নাম "পাতাল গঙ্গা"; আর কিছু ভাটাতে "নীলগঙ্গা" নামে পার-ঘাট; দুইটিই বিখ্যাত স্নানের তীর্থ। শিবমন্দিরের কাছে একটি ছোট দুর্গা-মন্দির।

শিবাজী শ্রীশৈলে উঠিয়া পূজা স্নান দান লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি কার্য্যে এখানে নবরাত্রি (অর্থাৎ চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রথম নয় দিবস, ২৪ মার্চ্চ—১ এপ্রিল, ১৬৭৭) যাপন করিলেন। এই তীর্থস্থানের শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, রম্য নির্জনতা, এবং ধর্ম্মভাব জাগাইবার স্বাভাবিক শক্তি দেখিয়া তিনি আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এটা যেন তাঁহার নিকট দ্বিতীয় কৈলাস বা শিবের স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল। মরিবার এমন উপযুক্ত স্থান এবং

সময় আর মিলিবে না ভাবিয়া শিবাজী স্থির করিলেন, তিনি দেবী-প্রতিমার চরণে নিজমাথা কাটিয়া দিয়া দেহ ত্যাগ করিবেন। প্রবাদ আছে, ভগবতী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া, শিবাজীর উদ্যত তরবারি ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে থামাইলেন এবং বলিলেন, "বৎস! এই উপায়ে তোমার মোক্ষ হইবে না। একাজ করিও না। তোমার হাতে এখনও অনেক বড় বড় কর্ত্তব্যভার রহিয়াছে।" তাহার পর দেবী অদৃশ্য হইলেন, শিবাজীও ক্ষান্ত হইলেন।

এপ্রিল মাসের ৪ঠা-৫ই অনন্তপুরে ফিরিয়া শিবাজী সসৈন্য মাদ্রাজ প্রদেশের দিকে দ্রুত চলিলেন। ভারত-বিখ্যাত তিরুপতি পর্ব্বতের মন্দির দেখিয়া পূর্ব্ব-কূলের সমভূমিতে নামিলেন, এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজ শহরের সাত মাইল পশ্চিমে পেড্ডাপোলম্ নগরে পৌঁছিলেন। এখান হইতে তাঁহার অগ্রগামী সৈন্য—পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, দ্রুত জিঞ্জি-দুর্গে উপস্থিত হইল। তাহার মালিক নাসির মহম্মদ খাঁ বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের জাগীর এবং কিছু নগদ টাকা পাইবার প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ এই অজেয় দুর্গ মারাঠাদের হাতে ছাড়িয়া দিল (১৩ই মে)। শিবাজী শীঘ্রই সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং জিঞ্জি নিজ দখলে রাখিয়া উহার দেওয়াল পরিখা বুরুজ প্রভৃতি এত দৃঢ় করিলেন যে "ইউরোপীয়গণও তাহা করিলে গর্ব্ব অনুভব করিত।"

সেখান হইতে রওনা হইয়া শিবাজী ২৩এ মে বেলুর দুর্গ অবরোধ করিলেন। ইহাও জিঞ্জির মত দুর্জ্জয় গড়। ইহার শাসনকর্ত্তা হাবশী আবদুল্লা খাঁ আদিল শাহর বিশ্বাসী কর্ম্মচারী; সে মারাঠাদের সব গোলাবাজী ও আক্রমণ তুচ্ছ করিয়া মহাবিক্রমের সহিত চোদ্দ মাস লড়িল। শেষে যখন দেখিল যে প্রভুর নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিবে না, আর তাহার দুর্গ রক্ষী সৈন্যদের মধ্যে পদাতিকের সংখ্যা ১৮০০ হইতে দুইশত, এবং অশ্বারোহীর সংখ্যা ৫০০ হইতে এক শততে দাঁড়াইয়াছে,—তখন আবদুল্লা শিবাজীকে দুর্গ ছাড়িয়া দিল (২১ আগষ্ট ১৬৭৮)। এজন্য তাহাকে দেড় লক্ষ টাকা নগদ এবং বার্ষিক সেই পরিমাণ আয়ের জাগীর দিবার শর্ত্ত হইল।

শিবাজীর সৈন্যদল দ্রুতবেগে কুচ করিয়া বন্যার মত মাদ্রাজ প্রদেশের সমভূমি ছাইয়া ফেলিল। চারিদিকে যাহা পাইল গ্রাস করিল; কেহই তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহসী হইল না। শুধু গোটা-কয়েক দুর্গ জলবেষ্টিত দ্বীপের মত কিছুদিনের জন্য স্বাধীনভাবে খাড়া রহিল। প্রথমে এক হাজার মারাঠা অশ্বারোহী দুই দিনের পথ আগে আগে চলিল; তাহার পিছনে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া শিবাজী স্বয়ং আসিলেন; আর সর্ব্বপশ্চাতে চাকর-বাকর এবং সিংহের পিছু পিছু শৃগালের পালের মত লুটের লোভে আগত স্থানীয় ছোট জমিদার, ডাকাতের সর্দ্দার, এবং জঙ্গলী জাতের দলপতি ("পলিগর") ঘুরিতে লাগিল। টাকা আদায়ের জন্য শিবাজীর কঠোর পীড়ন এবং তাঁহার সৈন্যদের বিক্রম ও নিষ্ঠুরতার সংবাদ আগে আগে চলিল। পথ হইতে বড়লোকেরা যে যেখানে পারিল পলাইল, কেহ বনে কেহ বা সাহেবদের সুরক্ষিত বন্দরে স্ত্রীপুত্র ও ধনরত্ন সহ আশ্রয় লইল।

এদিকে শিবাজীর টাকার বড় দরকার। তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, কুতুবশাহী সরকারকে জিঞ্জি না দিয়া নিজ দখলে রাখায়, গোলকুণ্ডা-রাজের নিকট হইতে দৈনিক ১৫ হাজার টাকার সাহায্য বন্ধ হইয়া গেল। তখন শিবাজী ঐ অঞ্চলের সব বড় বড় শহরে চিঠি পাঠাইয়া দশ লক্ষ টাকা ঋণ চাহিলেন; অবশ্য এই ঋণ পরিশোধের আশা ছিল না, আর তাহা চাহিবার মত দুঃসাহসই বা কাহার? শিবাজী তখন ঐ দেশের ধনী লোকদের নামধাম ও তাঁহাদের ধনদৌলতের একটা তালিকা করিলেন। তাঁহার চৌথ আদায়ের তহসিলদারগণ দেশ ছাইয়া ফেলিল। "বিশ হাজার ব্রাহ্মণ এই-সব চাকরির আশায় তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহারা অতি নির্লজ্জভাবে লোকদের শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইল—ন্যায়বিচার দয়া-মায়ার ধার ধারিল না।" (ফ্রাঁসোয়া মার্ত্তাঁর ডায়েরি)। ইংরাজ ফরাসী ও ডচ্ কুঠীর বণিকেরা বার-বার দূত ও উপহার পাঠাইয়া শিবাজীকে তুষ্ট রাখিলেন।

জিঞ্জি প্রদেশের দক্ষিণে শের খাঁ লোদীর প্রকাণ্ড

জাগীর, কাবেরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনি যুদ্ধে একেবারেই অপারক; চতুর দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের পরামর্শে সব কাজ চালাইতেন। ইহারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে শিবাজীর সৈন্যবল কিছুই না, কিন্তু তাঁহার বন্ধু ও সহায়ক পণ্ডিচেরীর শাসনকর্ত্তা ফ্রাঁসোয়া মার্ত্তাঁ সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে এ শত্রু বড় ভীষণ। শের খাঁ নিজ সৈন্য (চারি হাজার অশ্বারোহী ও তিন-চার হাজার পেয়াদা ধরণের ভীরু অকেজো পদাতিক) লইয়া ১০ই জুন হইতে তিরুবাড়ীতে (কাডালোরের ১৩ মাইল পশ্চিমে) মারাঠাদের পথ রোধ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। ২৩এ মে শিবাজী জিঞ্জি হইতে বেলুরে পৌঁছিয়া, তথায় এক মাস থাকিয়া ঐ দুর্গ অবরোধের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ছয় হাজার অশ্বারোহীসহ ২৬এ জুন তিরুবাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শের খাঁ নিজ সৈন্যদল সাজাইয়া আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মারাঠারা নিজ স্থানে স্থির নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া শের খাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; তিনি দেখিলেন বড়ই বিপদ। অমনি নিজ সেনাদের ফিরিতে হুকুম দিলেন! তাহারা ইহাতে আরও ভীত এবং বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ঠিক সেই সুযোগে শিবাজী ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া তাহাদের উপর পড়িলেন; সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

শের খাঁ তিরুবাড়ীর ছোট দুর্গে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কাডালোরে আশ্রয় লইবার ইচ্ছায় রাত্রে তিনি সেখান হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু মারাঠারা টের পাইয়া তাড়া করিয়া তাঁহাকে অকাল-নায়কের জঙ্গলে তাড়াইয়া দিল। চন্দ্র অস্ত গেলে অন্ধকারের আড়ালে বন হইতে বাহির হইয়া শের খাঁ একশত মাত্র সওয়ার লইয়া (২৭এ জুন) বাইশ মাইল দূরে বোনগির-পটন নামক একটি ছোট দুর্গে (ভেলার নদীর উত্তর তীরে) ঢুকিলেন। কিন্তু তাঁহার পাঁচশত ঘোড়া, দুইটি হাতী, বিশটা উট এবং তাঁবু ঢাক পতাকা ও মালের বলদ মারাঠারা কাড়িয়া লইল। ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যেই শের খাঁর রাজ্যের অনেক শহর ও দুর্গ শিবাজী অবাধে দখল করিলেন। অবশেষে ৫ই জুলাই খাঁ সন্ধি করিয়া শিবাজীকে নিজের সমস্ত দেশ ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজের মুক্তির জন্য এক লক্ষ টাকা দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত নিজপুত্র ইব্রাহিম খাঁকে জামিন-স্বরূপ শিবাজীর হাতে রাখিলেন। শিবাজী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে শের খাঁকে পরিবারসহ অবাধে ঐ দুর্গ হইতে বাহির হইতে এবং কাডালোরে রক্ষিত তাঁহার সম্পত্তি লইয়া যাইতে দিবেন। *

শিবাজী এখান হইতে আরও দক্ষিণে কুচ করিয়া কোলেরুণ নদী (অর্থাৎ কাবেরীর মুখের কাছে সর্ব্ব-উত্তর শাখা)র তীরে তিরুমল-বাড়ী নামক স্থানে ২ই জুলাই পৌঁছিয়া বর্ষা কাটাইবার জন্য সৈন্যদের শিবির গাড়িলেন। ব্যঙ্কাজীর রাজধানী তাঞ্জোর শহর এখান হইতে দশ মাইল মাত্র দক্ষিণে, মধ্যে শুধু কোলেরুণ নদী। এখানে বসিয়া মাদুরার রাজার নিকট হইতে কর আদায়ের চেষ্টা হইতে লাগিল, এক কোটি টাকা চাওয়া হইল, কিন্তু শেষে ত্রিশ লক্ষে রফা হইল। স্থির হইল, এই টাকা পাইলে শিবাজী আর মাদুরা আক্রমণ করিবেন না।

ইতিমধ্যে শিবাজী তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্যঙ্কাজীকে দেখা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার অনুরোধে প্রথমে ব্যঙ্কাজীর মন্ত্রীরা শিবাজীর সহিত আলোচনা করিতে আসিল, এবং শিবাজীর তিনজন মন্ত্রী ও নিমন্ত্রণপত্র লইয়া তাহারা নিজ প্রভুর কাছে ফিরিয়া গেল। শিবাজীর অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া ব্যঙ্কাজী দুই হাজার অশ্বারোহীর সহিত জুলাই মাসের মাঝামাঝি তিরুমল-বাড়ীতে পৌঁছিলেন। শিবাজী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং কয়েক দিন ধরিয়া ভোজ ও উপহার বিনিময় চলিল।

তাহার পর কাজের কথা উঠিল। শাহজী মৃত্যুকালে যে-সব ধনসম্পত্তি এবং কর্ণাটকে জাগীর রাখিয়া যান তাহার সমস্তই ব্যঙ্কাজীর হাতে পড়িয়াছিল; পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে, শিবাজী এখন তাহার বারো আনা দাবি করিলেন। ব্যঙ্কাজী সিকিমাত্র লইয়া সন্তুষ্ট

* অবশেষে ১৬৭৮ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যহীন নিঃসম্বল শের খাঁ মাদুরারাজের দ্বারে আশ্রয় লইলেন।

থাকিতে অস্বীকার করিলেন; তখন শিবাজী রাগিয়া তাঁহাকে খুব ধমকাইলেন এবং নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। ব্যঙ্কাজী দেখিলেন, ধন-সম্পত্তি সব সঁপিয়া না দিলে মুক্তি পাওয়া দুরূহ। কিন্তু তিনি শিবাজীরই ভাই বটে; গোপনে জোগাড়যন্ত্র ঠিক করিয়া এক রাত্রে শৌচের ভাণ করিয়া নদীতীরে এক নির্জ্জন স্থানে গেলেন। সেখানে তাঁহার পাঁচজন অনুচর একটি ভেলা লইয়া প্রস্তুত ছিল। ব্যঙ্কাজী তাহাতে লাফাইয়া উঠিয়া নদী পার হইয়া নিজ রাজ্যে পৌঁছিলেন (২৩ জুলাই)।

পরদিন প্রাতে এই সংবাদ পাইয়া শিবাজী মহা চটিয়া বলিলেন, "ও পলাইল কেন? আমি কি উহাকে ধরিতে যাইতেছিলাম?*** পলাইবার কথা নয়। আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, দিবার ইচ্ছা না থাকিলে বলিলেই পারিত। অতি কনিষ্ঠ ত কনিষ্ঠ, বুদ্ধিও ছেলেমানুষের মত দেখাইল!" ব্যঙ্কাজীর মন্ত্রীগণ প্রভুর খবর পাইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল, তাহাদের ধরিয়া শিবাজীর কাছে আনা হইল। কয়েকদিন আটক থাকিবার পর তিনি তাহাদের খালাস করিয়া খেলাৎ ও উপহার দিয়া তাঞ্জোরে পাঠাইয়া দিলেন; নচেৎ এই নিষ্ফল নির্য্যাতনে তাঁহার দুর্নাম ভিন্ন কোনই লাভ হইত না। শিবাজী কোলেরুণের উত্তরে শাহজীর সমস্ত জাগীর নিজে দখল করিলেন।

ফরাসী-দূত জারমঁ্যা সাহেব তিরুমলবাড়ীতে শিবাজীর শিবির দেখিয়া এই বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন:—

"তাঁহার শিবিরে কোন রকম ধূমধাম নাই, ভারী মালপত্র বা স্ত্রীলোকের ঝঞ্ঝাট নাই। সমস্ত শিবিরে দুটি মাত্র তাম্বু, তাহাও আকারে ছোট এবং মোটা সাধারণ কাপড়ে তৈয়ারি; একটায় থাকেন শিবাজী, অপরটায় তাঁহার পেশোয়া। মারাঠা অশ্বারোহীদের মাসিক বেতন দশ টাকা করিয়া, এবং তাহাদের ঘোড়া ও সইস্ রাজাই দেন। প্রতি দুইজন সৈন্যের জন্য তিনটি করিয়া ঘোড়া রাখা হয়, এইজন্য তাহারা খুব দ্রুত চলিতে পারে। শিবাজী গুপ্তচরদের মুক্তহস্তে টাকা দেন, আর তাহারা তাঁহাকে সত্য খবর দিয়া দেশজয়ে বিশেষ সহায়তা করে।"

ব্যঙ্কাজীকে ফিরাইয়া আনিবার আশা নাই দেখিয়া শিবাজী ২৭এ জুলাই তিরুমলবাড়ী ছাড়িয়া আবার উত্তরে আসিলেন। পথে বলি-কণ্ড-পুরম্ চিদাম্বরম্ ও বৃদ্ধাচলম (বিখ্যাত তীর্থ দুটি) দর্শন করিয়া ক্রমে ৩রা অক্টোবর মাদ্রাজ হইতে দুই দিনের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে আরণি প্রভৃতি অনেক দুর্গ তাঁহার হাতে পড়িল।

এখন তিনি খবর পাইলেন যে একমাস আগে আওরংজীবের হুকুমে মুঘল সুবাদার বিজাপুর-রাজের সহিত জোট করিয়া গোলকুণ্ডা-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন, কারণ কুতুব শাহ শিবাজীর মত বিদ্রোহীর সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। এদিকে শিবাজী ও দশমাস হইল নিজ রাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছেন, সেখানে কাজকর্ম্ম তত ভাল চলিতেছে না। সুতরাং তাঁহার দেশে ফেরাই স্থির হইল।

নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চারি হাজার অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া তিনি কর্ণাটকের সমভূমি ছাড়িয়া মহীশূরের অধিত্যকায় চড়িলেন, এবং সেখানে পিতার জাগীরের মহালগুলি দখল করিবার পর মহারাষ্ট্রে ফিরিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই আপাততঃ কর্ণাটকে রহিল, কারণ সেই অঞ্চলে তিনি যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহা অতীব বিস্তীর্ণ ও ধনশালী। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮০ মাইল, প্রস্থে ১২০ মাইল, এবং ইহার মধ্যে ৮৬টা দুর্গ ছিল। বার্ষিক খাজনা ৪৩ লক্ষ টাকার অধিক। এই নূতন রাজ্য জিঞ্জি ও বেলুরের জেলাগুলি লইয়া গঠিত। ইহার সদর অফিস জিঞ্জি-দুর্গে। শাহজীর দাসীপুত্র শান্তাজীকে ইহার শাসনকর্ত্তা, রঘুনাথ হনুমন্তেকে দেওয়ান এবং হাম্বির রাও মোহিতেকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া শিবাজী চলিয়া গেলেন। রঙ্গো নারায়ণ মহীশূরের অধিত্যকা বিজিত মহালগুলির শাসনকর্ত্তা হইলেন।

ইতিমধ্যে ব্যঙ্কাজী কর্ণাটকে পিতার জাগীর উদ্ধার করিবার জন্য চারিদিকে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৬ই নবেম্বর ১৬৭৭ তিনি কোলেরুণ পার হইয়া চৌদ্দ হাজার সৈন্যসহ শান্তাজীর বারো হাজার সেনাকে আক্রমণ করিলেন। সারাদিন যুদ্ধের পর শান্তাজী হার

মানিয়া এক ক্রোশ পশ্চাতে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু রাত্রে যখন ব্যঙ্কাজীর বিজয়ী সেনাগণ ক্লান্ত হইয়া নিজ শিবিরে ফিরিয়া, ঘোড়ার জীন খুলিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন শান্তাজী নিজ ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের আবার একত্র করিয়া, তাহাদের নূতন উৎসাহে মাতাইয়া সুস্থ ঘোড়ায় চড়াইয়া, এক ঘোরা পথ দিয়া আসিয়া হঠাৎ ব্যঙ্কাজীর শিবিরের উপর পড়িলেন। ব্যঙ্কাজীর দল আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, অনেকে মারা গেল, বাকী সকলে নদী পার হইয়া তাঞ্জোরে পলাইল। তিনজন প্রধান সেনানী বন্দী হইল। শত্রুপক্ষের এক হাজার ঘোড়া তাঁবু ও মালপত্র শান্তাজীর হাতে পড়িল।

দুই ভাইএর মধ্যে আরও কিছুদিন ধরিয়া ছোটখাট যুদ্ধ এবং লুটপাট চলিল; দেশের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে শিবাজী দেখিলেন, তাঁহার অত সৈন্য এবং বড় বড় সেনাপতিদের কর্ণাটকে আর বেশী দিন আটকাইয়া রাখিলে মহারাষ্ট্র দেশ রক্ষা করা কঠিন হইবে। তিনি তখন ব্যঙ্কাজীর সহিত সন্ধি করিলেন। ব্যঙ্কাজী তাঁহাকে নগদ ছয়লক্ষ টাকা দিলেন, তাহার বদলে শিবাজী কর্ণাটকের উত্তরাংশে জিঞ্জি ও বেলুর প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখিয়া, বাকী সব দেশ (অর্থাৎ কোলেরুণের উত্তরে কয়েকটি মহাল এবং তাহার দক্ষিণে সমস্ত তাঞ্জোর-রাজ্য) ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদিন পরে মহীশূরের জাগীরগুলিও ব্যঙ্কাজী ফিরিয়া পাইলেন। এইরূপে শান্তি স্থাপিত হওয়ায়, হাম্বির রাও শিবাজীর অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন; কর্ণাটক রক্ষার জন্য রঘুনাথ হনুমন্তে দশ হাজার স্থানীয় ফৌজ নিযুক্ত করিলেন।

কর্ণাটক হইতে যে ধনরত্ন লাভ হইল তাহা কল্পনার অতীত।

শিবাজীর জীবনের শেষ অঙ্ক

পূর্ব্ব-কর্ণাটক বিজয়ের পর শিবাজী মহীশূর পার হইয়া ১৬৭৮ সালের গোড়ায় পশ্চিম কানাড়া বালাঘাট—অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণে বর্ত্তমান ধারোয়ার জেলায়, পৌঁছিলেন। এই অঞ্চলের লক্ষ্মীশ্বর প্রভৃতি নগরে লুঠ ও চৌথ আদায় করিয়া তিনি উহার উত্তরে বেলগাঁও জেলায় ঢুকিলেন। বেলগাঁও দুর্গের ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বেলবাড়ী নামক গ্রামের পাশ দিয়া যাইবার সময় ঐ গ্রামের পাটেলনী (অর্থাৎ জমিদারণী)—সাবিত্রী বাঈ নামক কায়স্থ বিধবার অনুচরগণ মারাঠা-সৈন্যদের কতকগুলি মালের বলদ কাড়িয়া লইল। ইহাতে শিবাজী রাগিয়া বেলবাড়ীর দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী বাঈ সেই মহা বিজয়ী বীর ও তাঁহার অগণিত সৈন্যের বিরুদ্ধে অদম্য সাহসে যুঝিয়া ২৭ দিন পর্য্যন্ত নিজের ছোট মাটির গড়টি রক্ষা করিলেন। শেষে তাঁহার খাদ্য ও বারুদ ফুরাইয়া গেল, মারাঠারা বেলবাড়ী দখল করিল, বীর নারী বন্দী হইলেন। এমন এক ক্ষুদ্র স্থানে এত দীর্ঘকাল বাধা পাওয়ায় শিবাজীর বড় দুর্নাম রটিল। ইংরাজ-কুঠীর সাহেব লিখিতেছেন (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৬৭৮),—"তাঁহার নিজের লোকেরাই ওখান হইতে আসিয়া বলিতেছে যে বেলবাড়ীতে তাঁহার যত বেশী নাকাল হইয়াছে, অতটা নাকাল তিনি মুঘল বা বিজাপুর সুলতানের হাতেও হন নাই। যিনি এত রাজ্য জয় করিয়াছেন, তিনি কিনা শেষে এক স্ত্রীলোক দেশাইকে হারাইতে পারিতেছেন না।"

ইতিমধ্যে শিবাজী ঘুষ দিয়া বিজাপুর-দুর্গ লাভ করিবার এক ফন্দি আঁটিয়াছিলেন। ঘটনাটা এই,—উজীর বহলোল খাঁর মৃত্যু (২৩ ডিসেম্বর ১৬৭৭)র পর তাঁহার ক্রীতদাস জমশেদ খাঁ ঐ দুর্গ ও বালক রাজা সিকন্দর আদিল শাহের ভার পাইয়াছিল; কিন্তু সে দেখিল উহা রক্ষা করিবার মত বল তাহার নাই। তখন ত্রিশ লক্ষ টাকার বদলে রাজা ও রাজধানীকে শিবাজীর হাতে সঁপিয়া দিতে সম্মত হইল। এই সংবাদ পাইয়া আদোনীর নবাব সিদ্দি মাসুদ (মৃত সিদ্দি জোহরের জামাতা) গোপনে থাকিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে তাঁহার কঠিন অসুখ, শেষে তাঁহার মৃত্যু সংবাদও রটিল। এমন কি একখানা পালকীতে করিয়া যেন তাঁহারই মৃতদেহ বাক্সে পুরিয়া কয়েক হাজার রক্ষী-সহ কবর দিবার জন্য আদোনী পাঠান হইল! তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যদল—চার হাজার অশ্বারোহী,—বিজাপুরে

থাকিতে অস্বীকার করিলেন; তখন শিবাজী রাগিয়া তাঁহাকে খুব ধমকাইলেন এবং নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। ব্যঙ্কাজী দেখিলেন, ধন-সম্পত্তি সব সঁপিয়া না দিলে মুক্তি পাওয়া দুরূহ। কিন্তু তিনি শিবাজীরই ভাই বটে; গোপনে জোগাড়যন্ত্র ঠিক করিয়া এক রাত্রে শৌচের ভাণ করিয়া নদীতীরে এক নির্জ্জন স্থানে গেলেন। সেখানে তাঁহার পাঁচজন অনুচর একটি ভেলা লইয়া প্রস্তুত ছিল। ব্যঙ্কাজী তাহাতে লাফাইয়া উঠিয়া নদী পার হইয়া নিজ রাজ্যে পৌঁছিলেন (২৩ জুলাই)।

পরদিন প্রাতে এই সংবাদ পাইয়া শিবাজী মহা চটিয়া বলিলেন, "ও পলাইল কেন? আমি কি উহাকে ধরিতে যাইতেছিলাম?*** পলাইবার কথা নয়। আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, দিবার ইচ্ছা না থাকিলে বলিলেই পারিত। অতি কনিষ্ঠ ত কনিষ্ঠ, বুদ্ধিও ছেলেমানুষের মত দেখাইল।" ব্যঙ্কাজীর মন্ত্রীগণ প্রভুর খবর পাইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল, তাহাদের ধরিয়া শিবাজীর কাছে আনা হইল। কয়েকদিন আটক থাকিবার পর তিনি তাহাদের খালাস করিয়া খেলাৎ ও উপহার দিয়া তাঞ্জোরে পাঠাইয়া দিলেন; নচেৎ এই নিষ্ফল নির্যাতনে তাঁহার দুর্নাম ভিন্ন কোনই লাভ হইত না। শিবাজী কোলেরুণের উত্তরে শাহজীর সমস্ত জাগীর নিজে দখল করিলেন।

ফরাসী-দূত জারমাঁ সাহেব তিরুমলবাড়ীতে শিবাজীর শিবির দেখিয়া এই বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন:—

"তাঁহার শিবিরে কোন রকম ধূমধাম নাই, ভারী মালপত্র বা স্ত্রীলোকের ঝঞ্ঝাট নাই। সমস্ত শিবিরে দুটি মাত্র তাম্বু, তাঁহাও আকারে ছোট এবং মোটা সাধারণ কাপড়ে তৈয়ারি; একটায় থাকেন শিবাজী, অপরটায় তাঁহার পেশোয়া। মারাঠা অশ্বারোহীদের মাসিক বেতন দশ টাকা করিয়া, এবং তাহাদের ঘোড়া ও সইস্ রাজাই দেন। প্রতি দুইজন সৈন্যের জন্য তিনটি করিয়া ঘোড়া রাখা হয়, এইজন্য তাহারা খুব দ্রুত চলিতে পারে। শিবাজী গুপ্তচরদের মুক্তহস্তে টাকা দেন, আর তাহারা তাঁহাকে সত্য খবর দিয়া দেশজয়ে বিশেষ সহায়তা করে।"

ব্যঙ্কাজীকে ফিরাইয়া আনিবার আশা নাই দেখিয়া শিবাজী ২৭এ জুলাই তিরুমলবাড়ী ছাড়িয়া আবার উত্তরে আসিলেন। পথে বলি-কণ্ড-পুরম্ চিদাম্বরম্ ও বৃদ্ধাচলম (বিখ্যাত তীর্থ দুটি) দর্শন করিয়া ক্রমে ৩রা অক্টোবর মাদ্রাজ হইতে দুই দিনের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে আরণি প্রভৃতি অনেক দুর্গ তাঁহার হাতে পড়িল।

এখন তিনি খবর পাইলেন যে একমাস আগে আওরংজীবের হুকুমে মুঘল সুবাদার বিজাপুর-রাজের সহিত জোট করিয়া গোলকুণ্ডা-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন, কারণ কুতুব শাহ শিবাজীর মত বিদ্রোহীর সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। এদিকে শিবাজী ও দশমাস হইল নিজ রাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছেন, সেখানে কাজকর্ম্ম তত ভাল চলিতেছে না। সুতরাং তাঁহার দেশে ফেরাই স্থির হইল।

নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চারি হাজার অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া তিনি কর্ণাটকের সমভূমি ছাড়িয়া মহীশূরের অধিত্যকায় চড়িলেন, এবং সেখানে পিতার জাগীরের মহালগুলি দখল করিবার পর মহারাষ্ট্রে ফিরিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই আপাততঃ কর্ণাটকে রহিল, কারণ সেই অঞ্চলে তিনি যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহা অতীব বিস্তীর্ণ ও ধনশালী। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮০ মাইল, প্রস্থে ১২০ মাইল, এবং ইহার মধ্যে ৮৬টা দুর্গ ছিল। বার্ষিক খাজনা ৪৬ লক্ষ টাকার অধিক। এই নূতন রাজ্য জিঞ্জি ও বেলুরের জেলাগুলি লইয়া গঠিত। ইহার সদর অফিস জিঞ্জি-দুর্গে। শাহজীর দাসীপুত্র শান্তাজীকে ইহার শাসনকর্ত্তা, রঘুনাথ হনুমন্তেকে দেওয়ান এবং হাম্বির রাও মোহিতেকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া শিবাজী চলিয়া গেলেন। রঙ্গো নারায়ণ মহীশূরের অধিত্যকায় বিজিত মহালগুলির শাসনকর্ত্তা হইলেন।

ইতিমধ্যে ব্যঙ্কাজী কর্ণাটকে পিতার জাগীর উদ্ধার করিবার জন্য চারিদিকে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৬ই নবেম্বর ১৬৭৭ তিনি কোলেরুণ পার হইয়া চৌদ্দ হাজার সৈন্যসহ শান্তাজীর বারো হাজার সেনাকে আক্রমণ করিলেন। সারাদিন যুদ্ধের পর শান্তাজী হার

মানিয়া এক ক্রোশ পশ্চাতে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু রাত্রে যখন ব্যঙ্কাজীর বিজয়ী সেনাগণ ক্লান্ত হইয়া নিজ শিবিরে ফিরিয়া, ঘোড়ার জীন খুলিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন শান্তাজী নিজ ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের আবার একত্র করিয়া, তাহাদের নূতন উৎসাহে মাতাইয়া সুস্থ ঘোড়ায় চড়াইয়া, এক ঘোরা পথ দিয়া আসিয়া হঠাৎ ব্যঙ্কাজীর শিবিরের উপর পড়িলেন। ব্যঙ্কাজীর দল আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, অনেকে মারা গেল, বাকী সকলে নদী পার হইয়া তাঞ্জোরে পলাইল। তিনজন প্রধান সেনানী বন্দী হইল। শত্রুপক্ষের এক হাজার ঘোড়া তাঁবু ও মালপত্র শান্তাজীর হাতে পড়িল।

দুই ভাইএর মধ্যে আরও কিছুদিন ধরিয়া ছোটখাট যুদ্ধ এবং লুটপাট চলিল; দেশের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে শিবাজী দেখিলেন, তাঁহার অত সৈন্য এবং বড় বড় সেনাপতিদের কর্ণাটকে আর বেশী দিন আটকাইয়া রাখিলে মহারাষ্ট্র দেশ রক্ষা করা কঠিন হইবে। তিনি তখন ব্যঙ্কাজীর সহিত সন্ধি করিলেন। ব্যঙ্কাজী তাঁহাকে নগদ ছয়লক্ষ টাকা দিলেন, তাহার বদলে শিবাজী কর্ণাটকের উত্তরাংশে জিঞ্জি ও বেলুর প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখিয়া, বাকী সব দেশ (অর্থাৎ কোলেরুণের উত্তরে কয়েকটি মহাল এবং তাহার দক্ষিণে সমস্ত তাঞ্জোর-রাজ্য) ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদিন পরে মহীশূরের জাগীরগুলিও ব্যঙ্কাজী ফিরিয়া পাইলেন। এইরূপে শান্তি স্থাপিত হওয়ায়, হাম্বির রাও শিবাজীর অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন; কর্ণাটক রক্ষার জন্য রঘুনাথ হনুমন্তে দশ হাজার স্থানীয় ফৌজ নিযুক্ত করিলেন।

কর্ণাটক হইতে যে ধনরত্ন লাভ হইল তাহা কল্পনার অতীত।

শিবাজীর জীবনের শেষ অঙ্ক

পূর্ব্ব-কর্ণাটক বিজয়ের পর শিবাজী মহীশূর পার হইয়া ১৬৭৮ সালের গোড়ায় পশ্চিম কানাড়া বালাঘাট—অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের দক্ষিণে বর্ত্তমান ধারোয়ার জেলায়, পৌঁছিলেন। এই অঞ্চলের লক্ষ্মীশ্বর প্রভৃতি নগরে লুঠ ও চৌথ আদায় করিয়া তিনি উহার উত্তরে বেলগাঁও জেলায় ঢুকিলেন। বেলগাঁও দুর্গের ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বেলবাড়ী নামক গ্রামের পাশ দিয়া যাইবার সময় ঐ গ্রামের পাটেলনী (অর্থাৎ জমিদারণী)—সাবিত্রী বাঈ নামক কায়স্থ বিধবার অনুচরগণ মারাঠা-সৈন্যদের কতকগুলি মালের বলদ কাড়িয়া লইল। ইহাতে শিবাজী রাগিয়া বেলবাড়ীর দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী বাঈ সেই মহা বিজয়ী বীর ও তাঁহার অগণিত সৈন্যের বিরুদ্ধে অদম্য সাহসে যুঝিয়া ২৭ দিন পর্য্যন্ত নিজের ছোট মাটির গড়টি রক্ষা করিলেন। শেষে তাঁহার খাদ্য ও বারুদ ফুরাইয়া গেল, মারাঠারা বেলবাড়ী দখল করিল, বীর নারী বন্দী হইলেন। এমন এক ক্ষুদ্র স্থানে এত দীর্ঘকাল বাধা পাওয়ায় শিবাজীর বড় দুর্নাম রটিল। ইংরাজ-কুঠীর সাহেব লিখিতেছেন (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৬৭৮),—"তাঁহার নিজের লোকেরাই ওখান হইতে আসিয়া বলিতেছে যে বেলবাড়ীতে তাঁহার যত বেশী নাকাল হইয়াছে, অতটা নাকাল তিনি মুঘল বা বিজাপুর সুলতানের হাতেও হন নাই। যিনি এত রাজ্য জয় করিয়াছেন, তিনি কিনা শেষে এক স্ত্রীলোক দেশাইকে হারাইতে পারিতেছেন না।"

ইতিমধ্যে শিবাজী ঘুষ দিয়া বিজাপুর-দুর্গ লাভ করিবার এক ফন্দি আঁটিয়াছিলেন। ঘটনাটা এই,—উজীর বহলোল খাঁর মৃত্যু (২৩ ডিসেম্বর ১৬৭৭)র পর তাঁহার ক্রীতদাস জমশেদ খাঁ ঐ দুর্গ ও বালক রাজা সিকন্দর আদিল শাহের ভার পাইয়াছিল; কিন্তু সে দেখিল উহা রক্ষা করিবার মত বল তাহার নাই। তখন ত্রিশ লক্ষ টাকার বদলে রাজা ও রাজধানীকে শিবাজীর হাতে সঁপিয়া দিতে সম্মত হইল। এই সংবাদ পাইয়া আদোনীর নবাব সিদ্দি মাসুদ (মৃত সিদ্দি জৌহরের জামাতা) গোপনে থাকিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে তাঁহার কঠিন অসুখ, শেষে তাঁহার মৃত্যু সংবাদও রটিল। এমন কি একখানা পালকীতে করিয়া যেন তাঁহারই মৃতদেহ বাক্সে পুরিয়া কয়েক হাজার রক্ষী-সহ কবর দিবার জন্য আদোনী পাঠান হইল! তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যদল—চার হাজার অশ্বারোহী,—বিজাপুরে

গিয়া জমশেদকে জানাইল, "আমাদের প্রভু মারা যাওয়ায় আমাদের অন্ন জুটিতেছে না; তোমার চাকরিতে আমাদের লও।" সেও তাহাদের ভর্ত্তি করিয়া দুর্গের মধ্যে স্থান দিল। আর, তাহারা দুই দিন পরে জমশেদকে বন্দী করিয়া বিজাপুরের ফটক খুলিয়া দিয়া সিদ্দি মাসুদকে ভিতরে আনিল। মাসুদ উজীর হইলেন (২১ ফেব্রুয়ারি)। শিবাজী এই চরম লাভের আশায় বিফল হইয়া পশ্চিমদিকে বাঁকিয়া নিজদেশে পনহালায় প্রবেশ করিলেন (বোধ হয় ৪ঠা এপ্রিল, ১৬৭৮)।

শিবাজী কর্ণাটক-অভিযানে যে পনের মাস নিজদেশ হইতে অনুপস্থিত ছিলেন সেই সময় তাঁহার সৈন্যগণ গোয়া ও দামনের অধীন পোর্তুগীজদের মহাল আক্রমণ করে, কিন্তু ইহাতে কোনই ফল হয় নাই! সুরত এবং নাসিক জেলায় পেশোয়া এবং পশ্চিম-কানাড়ায় দত্তাজী কিছুদিন ধরিয়া লুঠ করেন, কিন্তু ইহাতে দেশজয় হয় নাই।

১৬৭৮ সালের এপ্রিলের প্রথমভাগে দেশে ফিরিয়া শিবাজী কোপল অঞ্চল—অর্থাৎ বিজয়নগর শহরের উত্তরে তুঙ্গভদ্রা নদীর অপর তীর—এবং তাহার পশ্চিমে গদগ মহাল জয় করিতে সৈন্য পাঠাইলেন। হুসেন খাঁ এবং কাসিম খাঁ মিয়ানা দুই ভাই বহলোল খাঁর স্বজাতি। কোপল প্রদেশ এই দুই আফঘান ওমরার অধীনে ছিল। শিবাজী ১৬৭৮ সালে গদগ, এবং পর বৎসর মার্চ্চ মাসে কোপল অধিকার করিলেন। "কোপল দক্ষিণ দেশের প্রবেশ-দ্বার," এখান হইতে তুঙ্গভদ্রা নদী পার হইয়া উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়া সহজেই মহীশূরে যাওয়া যায়। এই পথে প্রবেশ করিয়া মারাঠারা ঐ নদীর দক্ষিণে বেলারী ও চিতলদুর্গ জেলার অনেক স্থান অধিকার করিল, পলিগরদের বশে আনিল। এই অঞ্চলের বিজিত দেশগুলি একত্র করিয়া শিবাজীর রাজ্যের একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইল; উহার শাসনকর্ত্তা হইলেন—জনার্দন নারায়ণ হনুমন্তে।

শিবাজী দেশে ফিরিবার একমাস পরেই তাঁহার সৈন্যরা আবার শিবনের দুর্গ রাত্রে আক্রমণ করিল। কিন্তু বাদশাহী কিলাদার আবদুল আজিজ খাঁ সজাগ ছিল—সে আক্রমণকারীদের আবার মারিয়া তাড়াইয়া দিল, এবং বন্দী শত্রুদের মুক্তি দিয়া তাহাদের দ্বারা শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইল, "যতদিন আমি কিলাদার আছি, ততদিন এ দুর্গ অধিকার করা তোমার কাজ নয়।"

এদিকে বিজাপুরের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িল। উজীর সিদ্দি মাসুদই সর্ব্বেসর্ব্বা - বালক সুলতান তাঁহার হাতে পুতুলমাত্র। চারিদিকে নানা শত্রুর উৎপাতে উজীর অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। মৃত বহলোল খাঁর আফঘানদল তাঁহাকে নিত্য অপমান করে ও ভয় দেখায়; শিবাজী রাজ্যের সর্ব্বত্র অবাধে লুঠ করেন ও মহাল দখল করেন, রাজকোষে টাকা নাই; দলাদলির ফলে রাজশক্তি নির্জ্জীব। আর, অল্পদিন আগে যে-সব শর্ত্তে মুঘল সেনাপতির সহিত কুলবর্গায় তাঁহার সন্ধি হয়, তাহা বিজাপুর-রাজবংশের পক্ষে অত্যন্ত অপমান ও ক্ষতিজনক ছিল বলিয়া সকলে মাসুদকে ধিক্কার দিতে থাকে। চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া হতভম্ব মাসুদ শিবাজীর নিকট সাহায্য চাহিলেন, বলিলেন যে শিবাজীও এই আদিলশাহী বংশের নূন খাইয়াছেন এবং একদেশবাসী; মুঘলেরা তাঁহাদের দুজনেরই শত্রু, দুজনে মিলিত হইয়া মুঘলদের দমন করা উচিত। এই সন্ধির কথাবার্ত্তার সংবাদ পাইয়া দিলির খাঁ রাগিয়া বিজাপুর আক্রমণ করিলেন (১৬৭৮ সালের শেষে)।

শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী যেন পিতার পাপের ফল হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এই একুশ বৎসর বয়সেই তিনি উদ্ধত খামখেয়ালি, নেশাখোর এবং লম্পট হইয়া পড়িয়াছিলেন। একজন সধবা ব্রাহ্মণীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবার ফলে ন্যায়পরায়ণ পিতার আদেশে তাঁহাকে পনহালা দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। সেখান হইতে শম্ভুজী নিজ স্ত্রী যেসু বাঈকে সঙ্গে লইয়া গোপনে পলাইয়া গিয়া দিলির খাঁর সহিত যোগ দিলেন! (১৩ই ডিসেম্বর, ১৬৭৮) শম্ভুজীকে পাইয়া দিলির খাঁর আহ্লাদ ধরে না। "তিনি যেন ইতিমধ্যে সমস্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছেন এরূপ উল্লাস করিতে লাগিলেন এবং বাদশাহকে এই পরম সুখবর দিলেন।" আওরংজীবের পক্ষ হইতে শম্ভুজীকে সাত হাজারী মনসব্, রাজা উপাধি এবং একটি হাতী দেওয়া হইল। তাহার পর দুজনে একসঙ্গে বিজাপুর দখল করিতে চলিলেন।

এই বিপদে সিদ্দি মাসুদ শিবাজীর শরণ লইলেন। শিবাজী অমনি ছয় সাত হাজার ভাল অশ্বারোহী বিজাপুর-রক্ষার জন্য পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া রাজধানীর বাহিরে খানাপুরা ও খুসরুপুরা গ্রামে আড্ডা করিল এবং বলিয়া পাঠাইল যে বিজাপুর-দুর্গের একটা দরজা এবং একটা বুরুজ তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। মাসুদ তাহাদের বিশ্বাস করিলেন না। তখন মারাঠারা বিজাপুর দখল করার এক ফন্দি পাকাইল :—কতকগুলি অস্ত্র চাউলের বস্তায় লুকাইয়া, বস্তাগুলি বলদের পিঠে বোঝাই করিয়া, নিজেদের কতকগুলি সৈন্যকে বলদ-চালকের ছদ্মবেশে বাজারে পাঠাইবার ভাণ করিয়া, দুর্গের মধ্যে ঢুকিতে চেষ্টা করিল! কিন্তু ধরা পড়িয়া তাহারা তাড়িত হইল। তাহার পর মারাঠারা এই বন্ধুর গ্রাম লুঠিতে আরম্ভ করিল। মাসুদ বিরক্ত হইয়া দিলির খাঁর সঙ্গে মিটমাট করিয়া ফেলিলেন; বিজাপুরে মুঘল-সৈন্য ডাকিয়া আনিলেন, আর মারাঠাদের তাড়াইয়া দিলেন।

তাহার পর শম্ভুজীকে সঙ্গে লইয়া দিলির খাঁ শিবাজীর ভূপালগড় তোপের জোরে কাড়িয়া লইলেন, এবং এখানে প্রচুর শস্য, ধন, মালপত্র, এবং অনেক লোককে ধরিলেন। এই-সব বন্দীদের কতকগুলির এক হাত কাটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, অবশিষ্ট সকলকে দাস করিয়া বিক্রয় করা হইল (২রা এপ্রিল, ১৬৭৯)। ঐ দুর্গের দেওয়াল ও বুরুজগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর ছোট-খাট যুদ্ধ এবং বিজাপুরের দরবারে অশেষ দলাদলি ও ষড়যন্ত্র কয়েক মাস ধরিয়া চলিল; কোনই কিছু নিষ্পত্তি হইল না।

২রা এপ্রিল ১৬৭৯ সালে আওরংজীব হুকুম প্রচার করিলেন যে তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বত্র হিন্দুদের মানুষ গণিয়া প্রত্যেকের জন্য বৎসর বৎসর তিন শ্রেণীর আয় অনুসারে ১৩৷৷০—৬৷৵০ বা ৩৶০ "জজিয়া কর" লওয়া হইবে। বাদশাহর এই নূতন ও অন্যায় প্রজাপীড়নের সংবাদে শিবাজী তাঁহাকে নিম্নের সুন্দর পত্রখানি লেখিলেন। ইহা সুললিত ফারসী ভাষায় নীল প্রভুর দ্বারা রচিত হয়।

জজিয়া করের বিরুদ্ধে আওরংজীবের নামে শিবাজীর পত্র

"বাদশাহ আলমগীর, সালাম! আমি আপনার দৃঢ় এবং চিরহিতৈষী শিবাজী। ঈশ্বরের দয়া এবং বাদশাহের সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিয়া নিবেদন করিতেছি যে :—

যদিও এই শুভাকাঙ্ক্ষী দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার মহিমা-মণ্ডিত সন্নিধি হইতে অনুমতি না লইয়াই আসিতে বাধ্য হয়, তথাপি আমি, যতদূর সম্ভব ও উচিত, ভৃত্যের কর্ত্তব্য ও কৃতজ্ঞতার দাবি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে সদাই প্রস্তুত আছি। * * *

এখন শুনিতেছি যে আমার সহিত যুদ্ধের ফলে আপনার ধন ও রাজকোষ শূন্য হইয়াছে, এবং এই কারণে আপনি হুকুম দিয়াছেন যে জজিয়া নামক কর হিন্দুদের নিকট আদায় করা হইবে, এবং তাহা আপনার অভাব পূরণ করিতে লাগিবে।

বাদশাহ, সালাম! এই সাম্রাজ্য-সৌধের নির্ম্মাতা আকবর বাদশাহ পূর্ণগৌরবে ৫২ [চান্দ্র] বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়—যেমন, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান, দাদুপন্থী, নক্ষত্রবাদী [ফলকিয়া—গগন-পূজক ?], পরী-পূজক [মালাকিয়া], বিষয়বাদী [আনসরিয়া], নাস্তিক, ব্রাহ্মণ ও শ্বেতাম্বরদিগের প্রতি—সার্ব্বজনীন মৈত্রী [সুলহ্-ই-কুল = সকলের সহিত শান্তি]-র সুনীতি অবলম্বন করেন। তাঁহার উদার হৃদয়ের উদ্দেশ্য ছিল সকল লোককে রক্ষা ও পোষণ করা। এইজন্যই তিনি "জগৎ গুরু" নামে অমর খ্যাতিলাভ করেন।

তাহার পর বাদশাহ জহাঙ্গীর ২২ বৎসর ধরিয়া তাঁহার দয়ার ছায়া জগৎ ও জগৎবাসীর মস্তকের উপর বিস্তার করিলেন। তাঁহার হৃদয় বন্ধুদিগকে এবং হস্ত কার্য্যেতে দিলেন, এবং এইরূপে মনের বাসনাগুলি পূর্ণ করিলেন। বাদশাহ শাহজহানও ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া সুখী পার্থিব জীবনের ফল-স্বরূপ অমরতা—অর্থাৎ সজ্জনতা এবং সুনাম, অর্জ্জন করেন। (পদ্য)

যে জন জীবনে সুনাম অর্জ্জন করে সে অক্ষয় ধন পায়,
কারণ, মৃত্যুর পর তাহার পুণ্য চরিত্রের কথা তাহার
নাম জীবিত রাখে।

আকবরের মহতী প্রবৃত্তির এমনি পুণ্য প্রভাব ছিল যে তিনি যেদিকে চাহিতেন, সে দিকেই বিজয় ও সফলতা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিত। তাঁহার রাজত্ব-কালে অনেক অনেক দেশ ও দুর্গ জয় হয়। এই সব পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটদের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য ইহা হইতেই অতি সহজে বুঝা যায় যে আলমগীর বাদশাহ তাঁহাদের রাজনীতি অনুসরণ মাত্র করিতে গিয়া বিফল এবং বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদেরও জজিয়া ধার্য্য করিবার শক্তি ছিল। কিন্তু তাঁহারা গোঁড়ামীকে হৃদয়ে স্থান দেন নাই, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে উচ্চ নীচ সব মনুষ্যকে ঈশ্বর নানা বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাস ও প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতি তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্নরূপে অনন্তকালের ইতিহাসে লিখিত রহিবে, এবং এই তিন পবিত্র-আত্মা [সম্রাটের] জন্য প্রশংসা ও শুভপ্রার্থনা চিরদিন ছোটবড় সমস্ত মানব-জাতির কণ্ঠে ও হৃদয়ে বাস করিবে। লোকের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার ফলেই সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য আসে। অতএব, তাঁহাদের ধনসম্পদ দিন দিন বাড়িয়াছিল, ঈশ্বরের জীবগুলি তাঁহাদের সুশাসনগুণে শান্তিতে ও নিরাপদের শয্যায় বিরাম করিতে লাগিল এবং তাঁহাদের সর্ব্ব কর্ম্মই সফল হইল।

আর আপনার রাজত্বে? অনেক দুর্গ ও প্রদেশ আপনার হাতছাড়া হইয়াছে; এবং বাকীগুলিও শীঘ্রই হইবে, কারণ তাহাদের ধ্বংস ও ছিন্নভিন্ন করিতে আমার পক্ষে চেষ্টার অভাব হইবে না। আপনার রাজ্যে প্রজারা পদদলিত হইতেছে, প্রত্যেক গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য কমিয়াছে,—এক লাখের স্থানে এক হাজার, হাজারের স্থানে দশ টাকা মাত্র আদায় হয়; আর তাহাও মহা কষ্টে। বাদশাহ ও রাজপুত্রদের প্রাসাদে আজ দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তি স্থায়ী আবাস করিয়াছে; ওমরা ও আমলাদের অবস্থা ত সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। আপনার রাজত্বকালে সৈন্যগণ অস্থির, বণিকেরা অত্যাচার-পীড়িত, মুসলমানেরা কাঁদিতেছে, হিন্দুরা জ্বলিতেছে, প্রায় সকল প্রজারই রাত্রে রুটি জোটে না এবং দিনে মনস্তাপে করাঘাত করায় গাল রক্তবর্ণ হয়।

এই দুর্দ্দশার মধ্যে প্রজাদের উপর জজিয়ার ভার চাপাইয়া দিতে কি করিয়া আপনার রাজ-হৃদয় আপনাকে প্রণোদিত করিয়াছে? অতি শীঘ্রই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে এই অপযশ ছড়াইয়া পড়িবে যে হিন্দুস্থানের বাদশাহ ভিক্ষুকের থলিয়ার প্রতি লুব্ধ-দৃষ্টি ফেলিয়া, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, জৈন যতী, যোগী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, দেউলিয়া, ভিখারী, সর্ব্বস্বহীন ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের নিকট হইতে জজিয়া লইতেছেন! ভিক্ষার ঝুলি লইয়া কাড়া-কাড়িতে আপনার বিক্রম প্রকাশ পাইতেছে! আপনি তাইমুর-বংশের সুনাম ও মান ভূমিসাৎ করিয়াছেন!

বাদশাহ, সালাম! যদি আপনি খোদার কেতাব (অর্থাৎ কুরাণ)-এ বিশ্বাস করেন, তবে দেখিবেন সেখানে লেখা আছে যে ঈশ্বর সর্ব্বজনের প্রভু (রব্-উল্-আলমীন্), শুধু মুসলমানের প্রভু (রব্-উল্-মুসলমীন্) নহেন। বস্তুতঃ, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্ম দুইটি পার্থক্যব্যঞ্জক শব্দ মাত্র; যেন দুইটি ভিন্ন রং—যাহা দিয়া স্বর্গবাসী চিত্রকর রং ফলাইয়া মানবজাতির [নানাবর্ণে রঙীন] চিত্রপট পূর্ণ করিয়াছেন।

মসজিদে তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্যই আজান্ উচ্চারিত হয়। মন্দিরে তাঁহার অন্বেষণে হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবার জন্যই ঘণ্টা বাজান হয়। অতএব, নিজের ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য গোঁড়ামী করা ঈশ্বরের গ্রন্থের কথা বদল করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিত্রের উপর নূতন রেখা টানিলে আমরা দেখাই যে চিত্রকর ভুল আঁকিয়াছিল!

প্রকৃত ধর্ম্ম অনুসারে জজিয়া কোনমতেই ন্যায্য নহে। রাজনীতির দিক হইতে দেখিলে, জজিয়া শুধু সেই যুগেই ন্যায্য হইতে পারে যখন সুন্দরী স্ত্রীলোক স্বর্ণ অলঙ্কার পরিয়া এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে নির্ভয়ে নিরাপদে যাইতে পারে। কিন্তু, আজকাল আপনার বড় বড় নগর লুঠ হইতেছে, গ্রামের ত কথাই নাই। জজিয়া ত ন্যায়বিরুদ্ধ, তাহা ছাড়া ইহা ভারতে এক নূতন অত্যাচার ও ক্ষতি-কারক।

যদি আপনি মনে করেন যে প্রজাদের পীড়ন ও ভয়ে হিন্দুদের দমাইয়া রাখিলে আপনার ধার্ম্মিকতা প্রমাণিত

হইবে, তবে প্রথমে হিন্দুদের শীর্ষস্থানীয় মহারাণা রাজসিংহের নিকট হইতে জজিয়া আদায় করুন। তাহার পর আমার নিকট আদায় করা তত কঠিন হইবে না, কারণ আমি ত আপনার সেবার জন্য সদাই প্রস্তুত আছি। কিন্তু মাছি ও পিপীলিকাকে পীড়ন করা পৌরুষ নহে।

বুঝিতে পারি না কেন আপনার কর্ম্মচারীরা এমন অদ্ভুত প্রভুভক্ত যে তাহারা আপনাকে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানায় না, কিন্তু জ্বলন্ত আগুনকে খড় চাপা দিয়া লুকাইতে চায়।

আপনার রাজসূর্য্য গৌরবের গগনে দীপ্তি বিকীর্ণ করিতে থাকুক !"*

শিবাজীর শেষ যুদ্ধযাত্রা

১৮ই আগষ্ট ১৬৭৯, দিলির খাঁ ভীমা নদী পার হইয়া বিজাপুর-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মাসুদ নিরুপায় হইয়া শিবাজীর নিকট হিন্দুরাও নামক দূতের হাত দিয়া এই করুণ নিবেদন পাঠাইলেন :—"এই রাজসংসারের অবস্থা আপনার নিকট গোপন নহে। আমাদের সৈন্য নাই, টাকা নাই, খাদ্য নাই, দুর্গরক্ষার জন্য কোন সহায় নাই। শত্রু মুঘল প্রবল এবং সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে চায়। আপনি এই বংশের দুই পুরুষের চাকর, এই রাজাদের হাতে গৌরব সম্মান লাভ করিয়াছেন। অতএব, এই রাজবংশের জন্য অন্যের অপেক্ষা আপনার বেশী দুঃখ দরদ হওয়া উচিত। আপনার সাহায্য বিনা আমরা এই দেশ ও দুর্গ রক্ষা করিতে পারিব না। নিমকের সম্মান রাখুন; আমাদের দিকে আসুন; যাহা চান তাহাই দিব।"

ইহার উত্তরে শিবাজী বিজাপুর-রক্ষার ভার লইলেন; মাসুদের সাহায্যে দশ হাজার অশ্বারোহী ও দুই হাজার বলদ-বোঝাই রসদ তথায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং নিজ প্রজাদের হুকুম দিলেন, যে যত পারে খাদ্য দ্রব্য বস্ত্র প্রভৃতি বিজাপুরে বিক্রয় করুক। তাঁহার দূত বিসাজী নীলকণ্ঠ আসিয়া মাসুদকে সাহস দিয়া বলিলেন, "আপনি দুর্গ রক্ষা করুন, আমার প্রভু গিয়া দিলিরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন।"

১৫ই সেপ্টেম্বর ভীমার দক্ষিণ তীরে ধূলখেড় গ্রাম হইতে রওনা হইয়া দিলির খাঁ ৭ই অক্টোবর বিজাপুরের ছয় মাইল উত্তরে পৌছিলেন। ঐ মাসের শেষে শিবাজী নিজে দশ হাজার সৈন্য লইয়া বিজাপুরের প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে সেলগুড় নামক স্থানে পৌছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার যে দশ হাজার অশ্বারোহী বিজাপুরের কাছে আসিয়াছিল, তাহারা এখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইল। সেলগুড় হইতে শিবাজী নিজে আট হাজার সওয়ার লইয়া সোজা উত্তর দিকে, এবং তাঁহার দ্বিতীয় সেনাপতি আনন্দ রাও দশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মুঘলরাজ্য লুঠ ও ভস্ম করিয়া দিবার জন্য ছুটিলেন। তিনি ভাবিলেন যে দিলির নিজ প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্রই বিজাপুর-রাজ্য ছাড়িয়া ভীমা পার হইয়া উত্তরে ফিরিবেন। কিন্তু বিজাপুরী রাজধানী ও রাজাকে দখল করিবার লোভে দিলির নিজ প্রভুর রাজ্যের দুর্দ্দশার দিকে তাকাইলেন না।

বিজাপুরের মত প্রবল এবং বৃহৎ দুর্গ জয় করা দিলিরের কাজ নহে; স্বয়ং জয়সিংহও এখানে বিফল হইয়াছিলেন। একমাস সময় নষ্ট করিয়া ১৫ই নবেম্বর দিলির বিজাপুর শহর হইতে সরিয়া গিয়া তাহার পশ্চিমের ধনশালী নগর ও গ্রামগুলি লুঠিতে আরম্ভ করিলেন। এই অঞ্চল যে মুঘলেরা আক্রমণ করিবে তাহা কেহই ভাবে নাই, কারণ মুঘলদিগের পশ্চাতে রাজধানী তখনও অপরাজিত ছিল। সুতরাং এই দিক হইতে লোকে পলায় নাই, স্ত্রী পুত্র ধন নিরাপদ স্থানে সরায় নাই। এই অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুর হাতে পড়িয়া তাহাদের কঠোর দুর্দ্দশা হইল। "হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রীলোকগণ সন্তান বুকে ধরিয়া বাড়ীর কুয়ায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সতীত্ব রক্ষা করিল। গ্রামকে গ্রাম লুঠে উজাড় হইল। একটি বড় গ্রামে তিন হাজার হিন্দু মুসলমান (অনেকে নিকটবর্ত্তী ছোট গ্রামগুলির পলাতক আশ্রয়প্রার্থী)-দের দাসরূপে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল।

এই মত অনেক স্থান ধ্বংস করিবার পর দিলির

---

* লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ফারসী হস্তলিপির অনুবাদ।

বিজাপুরের ৪৩ মাইল পশ্চিমে আথ্‌নতে পৌঁছিলেন। তিনি এই প্রকাণ্ড ধনজনপূর্ণ বাজার লুঠ করিয়া পুড়াইয়া দিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের ক্রীতদাস করিতে চাহিলেন (২০ নবেম্বর)। তাহারা সকলেই হিন্দু; শম্ভুজী এই অত্যাচারে বাধা দিলেন; দিলির তাঁহার নিষেধ শুনিলেন না। সেই রাত্রে শম্ভুজী নিজ স্ত্রীকে পুরুষের বেশ পরাইয়া দুজনে ঘোড়ায় চড়িয়া শুধু দশজন সওয়ারের সঙ্গে দিলির খাঁর শিবির হইতে গোপনে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং পরদিন বিজাপুর পৌঁছিয়া মাসুদের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানে থাকা নিরাপদ নয় বুঝিয়া আবার পলাইলেন, এবং পথে পিতার কতকগুলি সৈন্যের দেখা পাইয়া তাহাদের আশ্রয়ে পনহালা পৌঁছিলেন (৪ঠা ডিসেম্বর ১৬৭৯)।

ইতিমধ্যে শিবাজী ৪ঠা নবেম্বর সেলগুড় হইতে বাহির হইয়া মুঘল-রাজ্যে ঢুকিলেন; দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া পথের দুধারে লুঠিয়া পুড়াইয়া দিয়া ছারখার করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রায় ১৫ই তিনি জাল্‌না শহর (আওরঙ্গাবাদের ৪০ মাইল পূর্ব্বে) লুঠ করিলেন। কিন্তু এই জনপূর্ণ বাণিজ্যের কেন্দ্রে তেমন ধন পাওয়া গেল না। তখন জানিতে পারিলেন যে জাল্‌নার মহাজনেরা নিজ নিজ টাকাকড়ি শহরের বাহিরে সৈয়দ জান্ মহম্মদ্ নামক মুসলমান সাধুর আশ্রমে লুকাইয়া রাখিয়াছে, কারণ সকলেই জানিত যে শিবাজী মন্দির ও মসজিদ, মঠ ও পীরের আস্তানা মান্য করিয়া চলিতেন, তাহাতে হাত দিতেন না। তখন মারাঠা সৈন্যগণ ঐ আশ্রমে ঢুকিয়া পলাতকদের টাকা কাড়িয়া লইল, কাহাকেও কাহাকেও জখম করিল। সাধু তাহাদের আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ করিতে নিষেধ করায় তাহারা তাঁহাকে গালি দিল ও মারিতে উদ্যত হইল। তখন ক্রোধে সেই মহাশক্তিবান পুণ্যাত্মা পুরুষ শিবাজীকে অভিসম্পাত করিলেন। ইহার পাঁচমাস পরে শিবাজীর অকাল মৃত্যু হইল; সকলেই বলিল যে পীরের ক্রোধের ফলেই এরূপ ঘটিয়াছে।

মারাঠা-সৈন্য চারিদিন ধরিয়া জাল্‌না নগর এবং তাহার শহরতলীর গ্রাম ও বাগান লুঠ করিয়া দেশের দিকে—অর্থাৎ পশ্চিমে, ফিরিল। সঙ্গে অগণিত লুঠের টাকা, মণি, অলঙ্কার, বস্ত্র হাতী ঘোড়া ও উট; সেজন্য তাহারা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। রণমস্ত খাঁ নামে একজন চটপটে সাহসী মুঘল ফৌজদার এই সময় মারাঠা-সৈন্যদের পশ্চাতে আসিয়া আক্রমণ করিলেন। শিধোজী নিম্বলকর পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া বাধা দিল; তিন দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল, শিধোজী ও তাহার দুই হাজার সৈন্য মারা পড়িল। আর, ইতিমধ্যে মুঘল-দাক্ষিণাত্যের রাজধানী আওরঙ্গাবাদ হইতে অনেক সৈন্য রণমস্ত খাঁর দলপুষ্টি করিবার জন্য আসিতেছিল। তৃতীয় দিন তাহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে ৬ মাইল দূরে পৌঁছিয়া রাত্রির জন্য থামিল। শিবাজী চারিদিকে ঘেরা হইয়া ধরা পড়েন আর কি। কিন্তু ঐ নূতন সৈন্যগণের সর্দ্দার কেশরী সিংহ গোপনে সেই রাত্রে শিবাজীকে পরামর্শ দিয়া পাঠাইল যে সামনের পথ বন্ধ হইবার আগেই তিনি যেন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে দেশে পলাইয়া যান। অবস্থা প্রকৃতই খুব সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, শিবাজী লুঠের মাল, নিজের দু-হাজার ঘোড়া ইত্যাদি সব সেখানে ফেলিয়া, মাত্র পাঁচশত বাছাবাছা ঘোড়সওয়ার সঙ্গে লইয়া স্বদেশের দিকে রওনা হইলেন। তাঁহার সুদক্ষ প্রধান চর বহিরজী একটি অজানা পথ দেখাইয়া দিয়া তিনদিন তিন রাত্রি ধরিয়া তাঁহাকে অবিরাম কুচ করাইয়া নিরাপদ স্থানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিল। শিবাজীর প্রাণ রক্ষা হইল; কিন্তু এই যুদ্ধে ও পলায়নে তাঁহার চারি হাজার সৈন্য মারা পড়ে, সেনাপতি হাম্বীর রাও আহত হন, এবং অনেক সৈন্য মুঘলদের হাতে বন্দী হয়।

লুঠের জিনিষ সমস্ত ফেলিয়া দিয়া মাত্র পাঁচশত রক্ষীর সহিত, শিবাজী অবসন্নদেহে পাট্টা দুর্গে পৌঁছিলেন (২২ নবেম্বর)। ইহা নাসিক শহরের ২০ মাইল দক্ষিণে এবং তলঘাট ষ্টেশনের ২০ মাইল পূর্ব্বে। এখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিবার পর আবার তিনি চলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইলেন; এজন্য পাট্টাকে "বিশ্রামগড়" নাম দিলেন।

ইহার পর ডিসেম্বর মাসের প্রথমে তিনি রায়গড়ে

গিয়া সেখানে তিন সপ্তাহ কাটাইলেন। এই সময় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পনহালাতে আরও ৭০টি কামান আনিয়া বসাইয়া তাহাকে দুর্ভেদ্য আশ্রয়স্থলে পরিণত করিলেন। শম্ভুজী পনহালাতে ফিরিয়া আসায় (৪ঠা ডিসেম্বর), শিবাজী স্বয়ং সেই দুর্গে জানুয়ারির প্রথমে গেলেন। নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে একদল মারাঠা সৈন্য খান্দেশে ঢুকিয়া ধরণগাঁও, চোপ্‌ড়া প্রভৃতি বড় বড় বাজার লুঠিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠপুত্রের চরিত্র ও বুদ্ধির কথা ভাবিয়া শিবাজী নিজ রাজ্য ও বংশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইলেন। তাঁহার নানা উপদেশ ও মিষ্ট কথায় কোন ফল হইল না। শিবাজী পুত্রকে নিজের বিশাল রাজ্যের সমস্ত মহাল দুর্গ ধনভাণ্ডার অশ্ব গজ ও সৈন্যদলের তালিকা দেখাইলেন এবং সৎ ও উচ্চমনা রাজা হইবার জন্য কত উপদেশ দিলেন। শম্ভুজী পিতার কথা শুধু চুপ করিয়া শুনিয়া উত্তর দিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।" শিবাজী স্পষ্টই বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর শম্ভুজীর হাতে মহারাষ্ট্র রাজ্যের কি দশা হইবে। এই দুর্ভাবনা ও হতাশা তাঁহার আয়ু হ্রাস করিল। শম্ভুজীকে আবার পনহালা-দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইল, এবং শিবাজী রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৬৮০)। তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে বুঝিয়া, শিবাজী তাড়াতাড়ি কনিষ্ঠ পুত্র (দশ বৎসরের বালক) রাজারামের উপবীত ও বিবাহ দিলেন (৭ই ও ১৫ই মার্চ্চ)।

২৩এ মার্চ্চ শিবাজীর জ্বর ও রক্ত-আমাশয় দেখা দিল। বারো দিন পর্য্যন্ত পীড়ার কোন উপশম হইল না। ক্রমে সব আশা ফুরাইল। তিনিও নিজ দশা বুঝিয়া কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া শেষ উপদেশ দিলেন; ক্রন্দনশীল আত্মীয়স্বজন, প্রজা ও সেবকদের বলিলেন, "জীবাত্মা অবিনশ্বর; আমি যুগে যুগে আবার ধরায় আসিব।" তাহার পর চিরযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া অন্তিমের সকল ক্রিয়া কর্ম্ম করাইলেন।

অবশেষে চৈত্র পূর্ণিমার দিন (রবিবার, ৪ঠা এপ্রিল ১৬৮০) সকালে তাঁহার জ্ঞান লোপ হইল, তিনি যে ঘুমাইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরে তাহা অনন্ত নিদ্রায় পরিণত হইল। মারাঠা জাতির নবজীবন-দাতা কর্ম্মক্ষেত্র শূন্য করিয়া বীরদের আকাঙ্ক্ষিত অমরধামে চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসরের ছয় ... কম ছিল।

সমস্ত দেশ স্তম্ভিত, বজ্রাহত হইল। হিন্দুর শেষ আশা ডুবিল।

আসার আশে

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

তোরা, বলতে পারিস আজকে সাঁঝে
বন্ধু কি মোর আসবে না রে;
বিদায়-পথের পথিক কি গো
ফিরবে একা অস্তপারে!
উর্দ্ধে আকাশ, মধ্যে আলো,
তার নীচে বন কালোয় কালো
ভুবনে কি রং ছড়াল
কে আজিকে দেখবে তারে।
বিদায়-পথের পথিক কি গো
ফিরবে একা অস্তপারে।

ও পারেতে ধানের ক্ষেতে
মুঠি মুঠি দুলিয়ে আলো
কোন্ অলকার সোণার মেয়ে
সাঁঝের গোঠে ঘুম ছড়ালো!
ও পার আলো এ পার ছায়া
মধ্যে সাঁঝের সোণার মায়া
মিলিয়ে দিল কায়ায় কায়া
দিন রজনীর খেয়ার পারে।
বন্ধু কি মোর আসবে না রে?

ব্রজনাথের বিবাহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভোরের বেলা উঠিয়া ব্রজনাথ হরেরাম সর্দ্দারের বাসায় গেল। হরেরাম রাত্রেই গদার মুখে সব খবর পাইয়াছিল। ব্রজনাথকে দেখিয়া হরেরাম বলিল,—ছোটবাবু, আমি যে এখনি তোমার কাছে যাচ্ছিলুম্।

—এখানেই আমাদের কথাবার্ত্তা ভাল হবে।

ব্রজনাথ হরেরামের হাতে ত্রিশটি টাকা দিল। যে [illegible] টাকা সে বাড়ীতে দিয়াছিল তাহা ছাড়া ব্রজনা[illegible] কাছে আরও কিছু টাকা ছিল।

হ[illegible]াম বলিল—ছোটবাবু, এখন ত তোমার টাকার [illegible], আর আমি ত চিরকালই তোমাদের খাচ্ছি, [illegible]র মুখে যা শুন্‌লাম তাতে আমার বড় আহ্লাদ [illegible] ডাকাতের পোদের মেয়ে তুমি ভূত ভাগিয়ে [illegible]।

—[illegible]দ তোমার কাছে শিখেছিলাম বলে'। সে সব কথ[illegible]ক্, আমি তোমাকে যা বলে' গিয়েছিলাম তার [illegible]?

[illegible]রাম ব্রজনাথকে সকল কথা বলিল। বিবাহের [illegible] শ্বশুরের যে নাম শুনিয়াছিল ব্রজনাথের তাহাই মনে [illegible], এখন শুনিল লোকে তাঁহাকে ভোলাবাবু বলিয়াই [illegible], ভাল নাম অনেকে জানে না।

ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল—এখনো কি তাঁর ডাকাতের দল আছে?

—তা আমি ঠিক বলতে পারিনে। সোমড়া এখান থেকে অনেক দূর, সেখানকার সব খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এখন কোম্পানির লোকদের নজর পড়েচে, ডাকাতী তেমন বেশী শুন্‌তে পাওয়া যায় না। হয়ত ভোলাবাবুও ছেড়ে দিয়ে থাক্‌বে।

—অনেক জমিদার ডাকাত আছে, আবার ডাকাতী না করেও কত জমিদার কত রকম জুলুম করে। আর বাপ দুষ্ট লোক হলে সে ত আর মেয়ের দোষ নয়।

—তাও কি কখনো হয়?

বাড়ীতে ফিরিয়া ব্রজনাথ পিতার নিকট গেল। নায়েবের পত্র পড়িয়া অমরনাথ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ব্রজনাথ বালক বলিলেই হয়, অসামান্য প্রতিভা না হইলে এমন করিয়া এত লোকের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে? শুধু অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষমতা নয়—যদিও এত অল্প সময়ের মধ্যে অমরনাথ নিজে কখনও এত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই,—লোকের সঙ্গে ব্যবহারের ও লোক বশীভূত করিবার ব্রজনাথের অদ্ভুত কৌশল। নায়েব ব্রজনাথের চরিত্রবল সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। যেমন তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধি তেমনি মনের দৃঢ়তা। নায়েব কিছু বাড়াইয়া লিখিলেও অমরনাথের ধারণা হইল যে, তাঁহার পুত্র অসাধারণ ক্ষমতাবান। যে পিতার এমন পুত্র হয় তিনি ভাগ্যবান। ব্রজনাথকে দেখিয়া বলিলেন—এস ব্রজনাথ, বস। সকালে বেড়াতে গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হাঁ, একটু ঘুরে এলাম।

—তোমার মায়ের মুখে শুন্‌লাম তুমি নাকি কল্‌কাতায় কারবার কর্‌বে!

—আমার ত সেই রকম ইচ্ছে, যদি আপনি অনুমতি দেন।

—তুমি যা ভাল বিবেচনা কর্‌বে তাতেই আমার অনুমতি আছে। এখন থেকে সব ভার তোমার উপর। তুমি যে টাকা এনেচ সে তোমার। তাই নিয়ে তুমি কারবার কর।

—অত টাকায় দরকার নেই, অর্দ্ধেক হলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু এখন টাকা জমা করে দিন, মিছিমিছি সুদটা মারা যায় কেন?

—তাই করো, কিন্তু সমস্ত তুমি দেখ্‌বে শুন্‌বে, তোমার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

—যে আজ্ঞে, তাই হবে। আমি আপনাকে আর একটা কথা বল্‌তে এসেচি।

—কি বল্‌বে, বল।

ব্রজনাথ সঙ্কোচের সহিত বলিল,—এই আমার বিয়ের কথা।

অমরনাথ কিছু বিস্মিত হইয়া ব্রজনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। ছেলে হাজার বুদ্ধিমান হইলেও বাপের সাক্ষাতে নিজের বিবাহের কথা পাড়ে না। অমরনাথ কহিলেন,—তোমার বিয়ের সম্বন্ধ অনেক জায়গা থেকে আস্‌চে। ভাল পাত্রী পেলেই তোমার বিয়ে দেব।

—আজ্ঞে, সে কথা নয়। আমার বিয়ে হয়ে গিয়েচে সেই কথা বল্‌তে এসেচি।

—বল কি? আমরা কেউ কিছু জানিনে আর তোমার বিয়ে হয়ে গেল! এ কথার মানে কি?

ব্রজনাথ ধীরে ধীরে সকল কথা বলিল। সকল কথা নয়, কেন-না বিবাহের রাত্রে বরদাকান্তের রূঢ় ব্যবহার, বাসর-ঘর হইতে ব্রজনাথের রাতারাতি পলায়ন, এ সকল কথা চাপিতে হইল।

অমরনাথ ত অবাক্! কহিলেন, এ যে ঠিক রূপকথার মত শুন্‌তে। কোথাও কিছু নেই, নৌকা থেকে তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে?

—তা না হলে কন্যার বাপের জাত যায়। যে পাত্রের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়েছিল সে আস্‌তে পারেনি।

—কেন?

—ঠিক জানিনে, বোধ হয় হঠাৎ কোনো শক্ত ব্যারাম হয়ে থাক্‌বে।

—কোনো গরিব-দুঃখীর মেয়ে হবে বুঝি?

—আজ্ঞে না, তারা বেশ ধনী, খুব বড় চকমিলানো বাড়ী।

—মেয়ের বাপের কি নাম বল্‌লে?

—বরদাকান্ত ঘোষ।

—কই, নাম শুনেচি বলে' ত মনে পড়চে না। গাঁয়ের নাম কি?

—তখন আমি জান্‌তাম না, তার পর জেনেচি সোমড়া।

—সোমড়া ত বেশ বড় গ্রাম। কিন্তু এ কথা তুমি এতদিন বলনি কেন?

—আমাকে এসেই হিজলী যেতে হ'ল আর এতদিন আমি গ্রামের নাম জান্‌তাম না।

—কখন জান্‌লে?

—এইমাত্র জেনে এসেচি। হরেরাম সর্দ্দারকে খোঁজ নিতে বলে গিয়েছিলাম, যে পুরুত বিয়ের সময় উপস্থিত ছিল তার কাছে সে সব জেনেচে।

অমরনাথ ভাবিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ কোন মতলব আঁটিয়া থাকিবে নহিলে গোপনে লোক লাগাইয়া এত সন্ধান লইতে যাইবে কেন? বিবেচনা করিয়া অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার মাকে বলেচ?

—আজ্ঞে না, তিনি রাগের মাথায় কি বলে [illegible] ভেবে তাঁকে বলিনি। আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌[illegible]

অমরনাথ বুঝিলেন যে, বিবাহ যেমন করিয়াই হই[illegible] থাকুক সহজে সে কথা নড়চড় হইবে না। ব্রজনাথে[illegible] ভাব জানিবার জন্য বলিলেন,—তুমি যেন কথাটা [illegible] রেখেছিলে, কিন্তু মেয়ের বাপও ত আমাদের কোন [illegible] পাঠায়নি।

—তাঁরা হয়ত আমার অপেক্ষা করচেন, আ[illegible] কোনো কথা স্বীকার না করি তা হলে তাঁদের [illegible] দাবি থাকে না।

—সেই ত ভাল কথা! এমন তরো বিয়ে তু[illegible] বা স্বীকার করলে? কেউ কিছু জানে না, অ[illegible] আহ্লাদ কিছু হল না, চুপি চুপি এ বিয়ে কি রকম?

—যাই হোক্, আমি আর বিয়ে করব না।

ব্রজনাথ এই বলিয়া উঠিয়া গেল। অমরনাথ মহা ভাবনায় পড়িলেন। ব্রজনাথের সঙ্কল্প যে টলিবে না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, অথচ তাহার অদ্ভুত বিবাহের কথা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়, ব্রজনাথের মাতাকে কেমন করিয়া বুঝানো যায়, পুত্রবধূকেই বা কেমন করিয়া ঘরে আনা যায়, এই রকম নানা চিন্তা উপস্থিত হইল। গৃহিণীকে কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বে অমরনাথ

হরেরাম সর্দ্দারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ব্রজনাথ তাহাকে কি বলিয়াছিল জানা আবশ্যক।

হরেরাম আসিল। অমরনাথ তাহাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া বলিলেন,—বস, হরেরাম। তোমার সঙ্গে গোটা-কতক কথা আছে।

হরেরাম ঘরের মেঝের উপর বসিল। অমরনাথ বলিলেন,—ব্রজনাথের যে বিয়ে হয়েচে এ কথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে?

—আজ্ঞে না, ছোটবাবু বল্‌তে বারণ করেচেন।

—তুমি কি করে' সন্ধান পেলে কাদের বাড়ী বিয়ে হয়েচে?

হরেরাম কেমন করিয়া শিবু মাঝিকে নিয়োগ করিয়া বরদা ঘোষের নিবাস স্থান জানিয়াছিল তাহা বলিল।

[illegible]মরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বরদা ঘোষ লোকটা কে[illegible]

—আজ্ঞে, ভোলাবাবু।

—বটে? নামজাদা লোক। মেয়ের বিয়েও এক [illegible] ডাকাতী করে' দিয়েচে।

হ[illegible]রামের ফোক্‌লা দাঁত বাহির হইল। কহিল—[illegible] করে বটে। আসলটা বিপদে পড়ে। সেই লগ্নে [illegible] বিয়ে না হলে যে জাত যায়। আর ভোলাবাবুর [illegible] ত আরও অনেক লোক আছে, তাদের কি সমাজে [illegible] রাখে, না তাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে আট্‌কায়?

—সে-কথা আমি ভাব্‌চিনে, কিন্তু পথের মাঝখানে [illegible] হঠাৎ বিয়ে কর্‌তে রাজি হল কেন?

[illegible]বোধ হয় তারা হাতে পায়ে ধরে অনেক করে [illegible]কবে। তাদের বিপদ দেখে ছোটবাবুর দয়া হয়ে থাক্‌বে। ছোটবাবুর বড় দয়ার শরীর।

—তাই হবে, কিন্তু ওরকম বিয়ে কোনো কাজের নয়। এখন মুস্কিল হচ্চে যে ব্রজনাথ আর বিয়ে কর্‌তে চাইচে না।

—সে-কথা আমাকে আগেই বলেচেন। আবার বিয়ে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি কর্‌লে হয়ত ছোটবাবু বিবাগী হয়ে যাবে। মেয়ে কেমন দেখ্‌তে আপনি ছোট-বাবুকে জিগ্‌গেস্ করেছিলেন?

—আমি সে কথা কেমন করে জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

—মেয়ে পরমাসুন্দরী, ছোটবাবু আমাকে নিজে বলেচেন আর তাদের পুরুত রাধানাথ-ঠাকুরের মুখেও শুনেছি।

অমরনাথ অল্প হাসিয়া বলিলেন,—সে এক কারণ হতে পারে। পুরুত আর কি বল্‌লে?

—সে আবার আস্‌বে বলে গিয়েচে। আমি তাকে বলেছিলাম ছোটবাবু ফিরে এলে কথা হবে।

—আমরা একটা পরামর্শ স্থির করি, সে পর্য্যন্ত তুমি কোনো কথা প্রকাশ করো না।

—আজ্ঞে, তা আমি বুঝি। ছোটবাবু আপনাকে না বল্‌লে আমার কাছ থেকে আপনিও কোনো কথা পেতেন না।

—সেইজন্য তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি। রাধানাথ-ঠাকুরকে খবর তুমি দেবে?

—যেমন হুকুম করেন।

হরেরাম চলিয়া গেলে অমরনাথ অনেকক্ষণ একা বসিয়া ভাবিলেন। দিনমানে ভবসুন্দরীর সাক্ষাতে কোনো কথার উল্লেখ করিলেন না। রাত্রে শয়নকালে ভবসুন্দরী বলিলেন—তোমার মুখ কেমন ভার ভার দেখাচ্চে, যেন একটা কিসের ভাবনা হয়েচে। কি হয়েচে?

—কি হয়েচে তোমাকে বল্‌চি, কিন্তু তুমি স্থির হয়ে আমার কথা শোন, তুমি চঞ্চল হলে কিংবা আর কারুর কানে এ কথা এখন উঠ্‌লে গোল হবে।

—কথাটাই কি শুনি।

অমরনাথ সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন—এ কোন্ দেশী বিয়ে? ছেলে যদি কোথাও গিয়ে একটা বিয়ে করে বসে তা হলে কি সেই বউ ঘরে নিয়ে আস্‌তে হবে?

—তা ছাড়া আর উপায় কি আছে? ছেলে কি রকম দেখেছ ত।

—তোমার ছেলে না হয় অনেক টাকা রোজগার করে এনেচে। তাই বলে কি যেখানে যাকে খুসী বিয়ে কর্‌বে?

—তা ত করেনি, উপরোধে পড়ে তাদের বিপদ

দেখে বিয়ে করেচে। আর তুমি যেমন বউ চাও সেই রকম বউ হয়েচে। মেয়ে খুব সুন্দরী, বাপের টাকা আছে, গহনাগাঁটি, বরাভরণ, জিনিষপত্র অনেক দেবে। আর সব চেয়ে বড় কথা ব্রজনাথ আর বিয়ে করবে না। যদি তুমি আর একটা বিয়ে দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি কর তা হ'লে হয়ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে। ছেলেকে ত তুমি আর ফেল্‌তে পার্‌বে না।

—মেয়ে সুন্দরী তুমি কেমন করে জান্‌লে? ব্রজ তোমাকে বলেচে? যে ছেলে বাপ-মাকে লুকিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো বিয়ে করে সে সব পারে।

—আমাকে বলেনি, হরেরামকে বলেচে। আর ছেলের তুমি বিনা কারণে দোষ দিচ্চ। সে ইচ্ছে করে লুকিয়ে বিয়ে করেনি।

—বড় ছেলের বিয়ে, কোনো রকম ঘটা নেই, লোকে শুনেই বা বল্‌বে কি?

—তার সহজ উপায় আছে। বউ এলে তুমি খুব ঘটা করে' বউভাত দিও।

ভবসুন্দরী কি করেন, স্বামীর কথায় সম্মত হইলেন। অমরনাথ বলিলেন,—এখন কাউকে কিছু বলো না, তবে ব্রজনাথকে একা ডেকে বুঝিয়ে দিও যে, বউমাকে এইবার আমরা নিয়ে আস্‌ব। ফাগুন মাস ত এল, এই মাসেই আন্‌ব।

পর দিবস ভোলানাথ পাঠশালে গিয়াছে, ব্রজনাথ আহার করিয়া নিজের ঘরে যাইতেছে এমন সময় ভবসুন্দরী কহিলেন,—ব্রজ, একটা কথা শুনে যা।

ব্রজনাথ মাতার সঙ্গে তাঁহার ঘরে গেল। ব্রজসুন্দরী খাটে বসিয়া ছেলেকে পাশে বসাইলেন, বলিলেন,—আমি তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেচি।

—আমি বিয়ে কর্‌ব না।

—তা হ'লে আর কি হবে? সোমড়ায় বলে' পাঠাব যে আমাদের ছেলে বিয়ে কর্‌বে না।

—সোমড়ায়? কাদের বাড়ী?

—বরদা ঘোষের মেয়ে। তা আমরা ত আর জোর ক'রে তোর বিয়ে দিতে পারি নে।

ব্রজনাথ অত্যন্ত লজ্জিত হইল, কহিল,—তুমি সব জেনে আমার সঙ্গে তামাসা কর্‌চ।

—সব কথা আমাকে না বলে' আগে ওঁকে বল্‌তে গেলি কেন?

—তুমি যদি হঠাৎ রেগেমেগে একটা গোল কর সেই ভয়ে।

—আমি ত রাগী মানুষ, তা তোর বউ এলে ত তাকে যন্ত্রণা দেব। তখন কি আবার বউ নিয়ে আলাদা হবি না কি?

—হ্যাঁ, বউ নিয়ে আর বউয়ের শাশুড়ীকে নিয়ে।

ভবসুন্দরী হাসিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—বউ না কি খুব সুন্দর হয়েচে?

—তুমি দেখে এস না কেন?

—তোর চোখে সুন্দর হলেই হ'ল।

মাতার প্রশ্নের উত্তরে ব্রজনাথ অকপটে সকল [illegible] বলিল, তবে পিতার নিকট হইতে যাহা গোপন [illegible] ছিল মাতাকেও তাহা বলিতে পারিল না।

শেষে ভবসুন্দরী বলিলেন,—উনি এই ফাগুন [illegible] বউমাকে নিয়ে আস্‌বেন।

—সে তোমাদের ইচ্ছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বরদা ঘোষের উপর কোম্পানীর লোকের [illegible] পড়িয়াছে কি না রাধানাথ-ঠাকুর সেই সন্ধানে [illegible] হইল। অনেক গ্রামে, অনেক স্থানে তাহার যাওয়া [illegible] পুরুষানুক্রমে পৌরহিত্য কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনেকে তাহাকে সম্মান করিত। রাধানাথ যে সংবাদ জানিতে চায় তাহার জন্য কৌশলের প্রয়োজন, কেন-না কাহাকেও স্পষ্ট কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না। প্রথমে সে গ্রামের দারোগার নিকট গেল।

দারোগা একা বসিয়া আপিসের চিঠি পড়িতেছিলেন। রাধানাথকে দেখিয়া, উঠিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন,—এই যে ঠাকুর-মশায়! আসুন, আসুন। এদিকে আজ কি মনে করে?

—পাশের গ্রামে যজমান-বাড়ী যাব তাই মনে কর্লাম একবার দেখা করে যাই।

—আপনার যজমান ত দেশসুদ্ধ লোক। আমার হাতে এই চিঠিখানা দেখ্চেন?

—তা ত দেখ্চি।

—আপনার কাছে লুকোবার কথা এতে কিছু নেই। আমাকে জিগ্গেস করেচে এ গ্রামে ডাকাতের আড্ডা আছে কি না আর ডাকাতের কোনো সর্দ্দার আছে কি না। বড় আপিসে তাদের ত কাজকর্ম্ম নেই, রোজ রোজ একটা-না-একটা ফ্যাচাং বের করে।

—আমরা ত এত পুরুষ ধরে এখানে বাস কর্চি, ডাকাতের উপদ্রব ত কখনো শুনিনি।

-কোন্ কালে কি হ'ত এখন সে কথায় কাজ কি? ... তামহ ডাকাত ছিল বলে' কি পৌত্রকে ফাঁসী দিতে ... এমনতর লোক থাকৃতে পারে যারা আগে ডাকাতী ..., কিন্তু এখন সে পেশা ছেড়ে দিয়েচে। তাদের ... । কি হবে?

-দারোগাবাবু, আপনার মত বিচক্ষণ লোক পুলিশে ... পুলিশের এত বদনাম হত না।

- আমাদের বুদ্ধিতে কি হবে? উপরওয়ালাদের ... ল কেঁচোকেই সাপ বলে' খুঁড়ে বের কর্তে হবে। সেইজন্য ত অনেক নির্দ্দোষী লোক ধরা পড়ে।

... তর চিঠিখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, চোখ টিপিয়া ... বলিলেন,—ভোলাবাবুর পুকুরের মাছ বড় ... উনি ত আপনার একজন বড় যজমান।

—আমাদের ঘর ওঁদের কুলপুরোহিত। আর আপনি যে মাছের কথা বল্লেন তার চেয়েও দামী জিনিষ জালে ওঠে।

—কার জাল?

—সে কথা জান্বার দরকার কি? বাবুকে খুসী রাখ্লে আপনার অনেক দিকে লাভ।

—সে কথা বেশ বুঝি। তবে আপনাদের বাবুর নামে যে-সব কথা শোনা যায় সে বিষয়ে আমি কি লিখ্ব?

—এই আপনি বল্লেন আগেকার কথা খুঁচিয়ে বের করে কোনো ফল নেই। ভোলাবাবুর বাপ পিতামহ কি কর্ত তা জেনে কি হবে?

—তাদের কথা ত নয়, ভোলাবাবুর নিজের কথা।

—আগেকার কথায় কাজ নেই, কিন্তু এখন যদি তাঁর নামে কেউ কিছু বলে ত মিথ্যা কথা। আমি ব্রাহ্মণ, আমার কথা বিশ্বাস করুন।

দারোগা আস্তে আস্তে বলিলেন,—এ চিঠির উত্তর দেবার আগে ভোলাবাবুর সঙ্গে আমার একবার দেখা হয় না?

—কেন হবে না? আপনি আজ রাত্রে আস্বেন।

রাধানাথ গিয়া বরদাকান্তকে দারোগার কথা জানাইল। সে রাত্রে দারোগা যখন বাড়ী ফিরিলেন তখন মাঝে মাঝে পকেটের উপর হাত পড়িতেছিল। পকেট বেশ ভরা।

দারোগা চিঠির উত্তরে লিখিলেন, তাঁহার এলাকায় অনেক কাল ডাকাতী হয় নাই এবং ভোলাবাবুর নামে যদি কোনো কথা উঠিয়া থাকে ত সর্ব্বৈব মিথ্যা। জমিদারী রক্ষা করিবার জন্য লাঠিয়াল রাখিলেই কাহাকেও ডাকাতের সর্দ্দার বলা যায় না।

তাহার পর রাধানাথ-ঠাকুর কলিকাতায় গেল। সেখানে পুলিশের বড় আপিসে তাহার পরিচিত লোক ছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, বরদা ঘোষের বিরুদ্ধে কোনো পাকা খবর পুলিশে আসে নাই এবং হালে কোনো ডাকাতীর সংবাদ না আসিলে কাহাকেও ধরা হইতেছে না। ভোলাবাবুর নামে কোনো রিপোর্ট আসে নাই। রাধানাথ আশ্বস্ত হইয়া গ্রামে ফিরিল।

পথের মধ্যে ব্রজনাথের সঙ্গে দেখা হইল। ব্রজনাথ কলিকাতায় বাড়ী দেখিবার জন্য আসিয়াছিল ও সেই সুযোগে কয়েকজন বড় দোকানদারের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া রাধানাথ বলিয়া উঠিল—এই যে জামাইবাবু! হিজলী থেকে কবে ফির্লে?

—এই দিন-কতক হ'ল ফিরেচি। এখানে একটা বাড়ী দেখ্তে এসেছিলাম।

—কেন, দেশ ছেড়ে কি এখানে বাস কর্বে না কি?

—না, সে জন্য নয়, এখানে কারবার করব তাই একটা বাড়ী দেখ্‌চি। এর পর জমি কিনে বাড়ী তৈরী করব।

—হিজলীতে কারবারে লাভ কেমন হল?

—তা মন্দ হয়নি। আমি এক লক্ষ টাকা হাতে ক'রে ফিরেচি। পথে ডাকাতে কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল, তাদের কিছু শিক্ষা দিয়েচি।

বিস্ময়ে রাধানাথের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। মাস-দুয়ের মধ্যে এত টাকা লাভ করিতে কয়জন পারে? রাধানাথ বলিল,—এ কথা শুনে তোমার শ্বশুরবাড়ীতে সকলের খুব আহ্লাদ হবে।

—কার? যিনি বলেছিলেন আমাদের চালচুলো নেই?

—সে-সব কথা এখন ভুলে যাও। তুমি যে টাকা রোজগার করেচ তোমার শ্বশুরেরও তত নেই।

ব্রজনাথ রাধানাথের মুখের দিকে চাহিয়া, মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। কহিল,—কেন, তাঁর ত জমিদারী ছাড়া অন্য ব্যবসাও আছে। ভোলাবাবুর নাম অনেকে জানে।

—ও সব কথাও তুমি মনে রেখো না। কবে কি হ'য়ে-বয়ে' গেছে, সে-সব কথায় কাজ কি? আমি ত ভোলাবাবুর বাড়ীর পুরুত, সব খবর রাখি। তুমি যা শুনেচ এখন সে-সব কিছু নেই। আরও একটা কথা আছে।

—কি?

—ভোলাবাবু যেমন লোক হোক্ তার মেয়ের ত কোনো অপরাধ নেই।

—আমি কি সে কথা বলেচি? একে ত ঐ রকম তড়িঘড়ি বিয়ে, তারপর পাছে আমার অপমান হয় বলে' আপনি আমাকে রাতারাতি দেশে পাঠিয়ে দিলেন। এখন আমায় কি কর্‌তে বলেন?

—হরেরাম সর্দ্দার আমাকে বলেছিল তুমি বিয়ের কথা বাড়ীতে বলনি। এখন বলেচ?

—বলেচি।

—তাঁদের কি মত?

—বিয়ে যখন হয়ে গিয়েচে তখন আর মতামত কি?

—তবে ঘরের বউ ঘরে আন্‌তে আপত্তি কি?

—আমার বাপ-মা কি সেধে নিয়ে আস্‌বেন? আমাদের কেউ লোক গেলে হয়ত হাঁকিয়ে দেবে।

—জামাইবাবু, তোমার রাগ এখনো পড়েনি। তোমার শাশুড়ী যে কি মনের কষ্টে আছেন তা বল্‌তে পারিনে, আর ইন্দু এত ভয়ে ভয়ে থাকে যেন সে একটা দুষ্কর্ম্ম করেচে। তোমার শ্বশুর যথেষ্ট লজ্জা পেয়েচেন। যা হবার তা হয়ে গিয়েচে, তুমি মনে কোনো কথা রেখো না। যাকে বিয়ে করেচ তাকে ত ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না।

—সে কথা ত হচ্চে না। আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো লোকের বাবার সঙ্গে দেখা করা উচিত।

—এতদিন তোমার বারণ ছিল। এখন চল, তোমার সঙ্গে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌চি।

—চলুন না, সে ত বেশ ভাল কথা।

গৃহে উপনীত হইয়া ব্রজনাথ পিতাকে বলিল,—ইনি রাধানাথ-ঠাকুর, সোমড়া থেকে এসেচেন।

অমরনাথ প্রণাম করিয়া রাধানাথ-ঠাকুরকে বসিতে বলিলেন। ব্রজনাথ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রজনাথের সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা হল?

—কলকেতায়। আমি একটা কাজে গিয়েছিলাম, ফের্‌বার পথে ওঁর সঙ্গে দেখা।

—বিয়ের সময় আপনি কি পুরুত ছিলেন?

—আজ্ঞে, হাঁ। নৌকা থেকে আমি ওঁকে ডেকে নিয়ে যাই।

—বিয়েতে আমাদের মত হবে কি না, না জেনেই আপনারা বিয়ে দিলেন?

—তার সময় কোথায় বলুন? বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেলে মেয়ের বাপের জাত যায়। সৎ পাত্র পেয়ে শুভ কর্ম্মে বিলম্ব করা উচিত নয়।

—সে ত আপনাদের পক্ষ থেকে। আমাদের দেখ্‌তে হবে ছেলের সৎ পাত্রী জুট্‌ল কি না।

—কেন, মেয়ের নামে কোনো কথা শুনেচেন ?

—মেয়ের কথা নয়, মেয়ের বাপ কি সৎ লোক ? ঘর কি রকম তা ত দেখ্‌তে হবে।

—সে বিষয়েও আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন। মেয়ের বাপের বিরুদ্ধে এখন আর কোনো অভিযোগ নেই।

—যাক্, সে-সব কথায় কোনো ফল নেই। বিয়ে যখন হয়ে গিয়েচে আর কোনো কথা নেই। আপনারা মেয়ে পাঠাবেন কবে ?

—যেদিন আপনারা নিয়ে আসবেন। যদি দিন স্থির করে থাকেন তা হলে আমি গিয়ে তাঁদের জানাব।

—আমি পাঁজি দেখেছি, ২০শে ফাল্গুন বেশ ভাল [illegible]। [illegible]জনাথ লোকজন নিয়ে তার আগের দিন যাবে। [illegible] দেখতে কেমন ?

—[illegible]দি আমার কথা বিশ্বাস করেন ত এমন রূপবতী [illegible] মেয়ে খুঁজে পাওয়া ভার। আমি একটা কথা [illegible] করব কি ?

—[illegible] স্বচ্ছন্দে।

—[illegible]জামাইবাবু না কি হিজলী থেকে এক লক্ষ টাকা [illegible] এনেচেন ?

—[illegible], সে টাকা আমার হাতে দিয়েচে। এইবার [illegible]য় কারবার করবে, সেখানে বাড়ী দেখ্‌তে [illegible]।

—[illegible] জানি। আপনার যেমন গুণের ছেলে তেমনি [illegible] বউ পেয়েচেন।

—আশীর্ব্বাদ করুন দুজনে যেন জন্মে জন্মে সুখে থাকে। এখন একবার বাড়ীর ভিতর চলুন, একটু মিষ্টি মুখ করবেন।

মুখ হাত পা ধুইয়া রাধানাথ-ঠাকুর বাড়ীর ভিতর গিয়া একটা ঘরে পুরু গালিচার আসনে বসিল। সম্মুখে অমরনাথ আর একখানা আসনে বসিলেন।

ভবসুন্দরী থালা সাজাইয়া ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিলেন। তিনি প্রৌঢ়া গৃহিণী, রাধানাথ পুরোহিত ব্রাহ্মণ, লজ্জা করিবার কোনো কারণ নাই। গণ্ডূষ করিয়া রাধানাথ ফল ও সন্দেশ খাইতে আরম্ভ করিল। ভবসুন্দরী দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আহারান্তে গৃহিণী রাধানাথকে বলিলেন,—এত দিন তো আমরা ছেলে ধরার উপদ্রব শুনতুম। এখন জামাই ধরাও আরম্ভ হয়েচে।

—সে অপরাধ আমার। যা শাস্তি হবার আমার হোক্।

—ব্রাহ্মণের আবার সাজা কি ? বামুনের সাত খুন মাপ। আর ছেলেকে ত ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া হয়নি। পথে পাওয়া বউ হলেও আমাদের সাত আদরের সামগ্রী। তা আদর করব কোত্থেকে, আমি ত এখনো বউয়ের মুখ দেখিনি।

অমরনাথ বলিলেন,—২০শে ফাল্গুন বেশ ভাল দিন, সেইদিন বউমাকে আনা হবে।

ভবসুন্দরী বলিলেন,—তার আগে বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে কেউ আস্‌বে না ?

রাধানাথ বলিল,—আসবে বই কি। আমি গিয়ে খবর দিলেই আস্‌বে।

অমরনাথ রাধানাথ-ঠাকুরকে গরদের জোড় ও দশটি টাকা পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রাবলী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালীদের মধ্যে তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ ইংরেজী লেখক। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রসিদ্ধ সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিনি শিষ্য। কৃষ্ণদাস পাল যখন 'পেট্রিয়টে'র কর্ণধার শম্ভুচন্দ্র তখন সেই পত্রের নিয়মিত লেখক। সম্পাদকীয় কাজও তিনি কিছু কিছু করিতেন। পুস্তকাদি সমালোচনার ভার তাঁহার উপরই ছিল। এই রসজ্ঞ ইংরেজী লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার একজন প্রকৃত সমঝদার। এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন ইঁহার উজ্জ্বল এবং সরস ইংরেজী রচনার ভক্ত। ১৮৬১ সালে শম্ভুচন্দ্র প্রথম পর্য্যায় 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন' বাহির করেন। পাঁচ সংখ্যা মাত্র বাহির হয়, তাহার পর বন্ধ হইয়া যায়। এই পাঁচমাসেই কিন্তু ইহা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ১৮৭২ সালে তিনি 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন' পুনর্জ্জীবিত করিবার সঙ্কল্প করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এই সময় 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিবার আয়োজনে ব্যস্ত। নিম্নলিখিত পত্রাবলী এই সময়ের লেখা।

দু'জনেই দু'জনের লেখার অনুরাগী, কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় বিশেষ কিছু নাই। শম্ভুচন্দ্র তাঁহার ম্যাগাজিনের জন্য বঙ্কিমের কাছে সাহিত্যিক সহযোগিতার প্রার্থী। বঙ্কিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, তাহার উপর নামজাদা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বিদেশী ভাষায় বেশী না লিখিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী লেখার খ্যাতি ছিল। শোনা যায় তাঁহার প্রথম উপন্যাস ইংরেজীতে রচিত হইয়াছিল। অতএব সেই বিখ্যাত বাংলা লেখকের কাছে 'ম্যাগাজিন সম্পাদক' যে ইংরেজী লেখা চাহিয়া পাঠাইবেন,তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। বঙ্গ-দর্শন প্রকাশ করিবার উদ্যোগে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতে রাজী হইলেন। 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিনে' তাঁহার দুটি লেখা বাহির হয়। প্রথমটির নাম, 'The Confessions of a Young Bengal', দ্বিতীয়টি এক দার্শনিক প্রবন্ধ, 'The Study of Hindu Philosopy'. প্রথমটি হাল্‌কা লেখা—সরস; দ্বিতীয়টি গুরু, তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। পত্রাবলী হইতে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ছাড়াও সাংখ্য সম্বন্ধে 'Calcutta Review' পত্রে এক প্রবন্ধ লেখেন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক বাংলার সে যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী-নবীশের কাছে পত্র লিখিতেছেন। উভয়েই এক রসের রসিক। পত্রের মধ্য দিয়া দুইটি সাহিত্যরসজ্ঞ হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বন্ধুত্বসূত্রে গ্রথিত হইতেছে। দুইজনেই পরস্পরকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উন্মুখ। ইংরেজী হউক বাংলা হউক, লেখা চিনিতে দু'জনেই জেনদৃষ্টি। বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রথম বৎসর। উৎসাহের আর অন্ত নাই। বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি সেই সময়ের উপর কিছু আলোক সম্পাত করিবে।

'Bengal Past and Present' (1914. Vol. VIII) এ Secretary's Notes এর মধ্যে শম্ভুচন্দ্রের উদ্দেশে ইংরেজীতে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই পত্রাবলী দেখিতে পাই। বন্ধুবর ঐতিহাসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিম্নে অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

বহরমপুর
১৪ই মার্চ্চ [১৮৭২]

প্রিয় মহাশয়,

১১ই তারিখে লিখিত আপনার পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতে বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি। আমাকে একেবারে অপরিচিত ভাবিলে ভুল হইবে। আপনার সহিত পূর্ব্ব পরিচয়ের দাবি রাখি। একাধিক বার উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে।

আমার সম্বন্ধে অনুগ্রহ করিয়া যে-সব প্রীতিকর মিষ্ট কথা বলিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাকে কেমন করি ধন্যবাদ জানাইব, তাহা ত জানি না। তবে জানি এই অনুগ্রহের দেনা বহুদিনের, তাই এত দেরী ধন্যবাদ পাঠাইয়া সেই ঋণভারের গুরুত্ব আর কমাইতে চাই না।

আমি আপনার সঙ্কল্পের সাফল্য কামনা কা আমি নিজে একখানি বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ করি কল্পনা করিয়াছি। উদ্দেশ্য উহার দ্বারা শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে সহানুভূতি ও সংযোগ স্থাপনের অব ঘটিবে। আপনি যে কথা বলেন তাহা সত্য। ভা জন্যই হোক মন্দর জন্যই হোক, ইংরেজী আমাদের স্ব ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই হেতু উচ্চ ও নিম্ন মধ্যে ব্যবধানও দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহ ঠিক নয়। আমি মনে করি অন্তত কতকটা ইংরেজীয়ানা পরিহার করিয়া সর্ব্ববোধ্য ভাষায় জনসাধারণকে সম্বোধন করা আমাদের দরকার। তাই একখানি বাংলা সাময়িক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। কিন্তু আমাদের যাহা করিবার আছে ইহা তাহার অর্দ্ধেক মাত্র। কেবল দেশীয় ভাষায় লিখিত কোন পত্রিকাই বর্ত্তমান বঙ্গীয় সংস্কৃতির সম্পূর্ণ সমাচার দিতে পারে না। নিজের জাতি ও দেশের জনসাধারণকে সম্বোধন করা যেমন প্রয়োজন, ভারতীয় অপর জাতিসমূহের এবং শাসক-সম্প্রদায়ের নিকটও

আমাদের কথা বোধগম্য হওয়া তেমনই দরকার। বাঙালী ও পাঞ্জাবী যে-পর্য্যন্ত পরস্পরকে বুঝিতে ও প্রভাবিত করিতে না পারিবে, এবং উভয়ের মিলিত প্রভাব ইংরেজের উপর প্রয়োগ করিতে যতদিন না সমর্থ হইবে, ততদিন আর ভারতবর্ষের আশা নাই। ইহা শুধু ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই সম্ভব। তাই আপনার কল্পিত পত্রকে সাদরাভিনন্দন জানাইতেছি। ইঙ্গ-বঙ্গ সাহিত্যপত্র সম্বন্ধে আমার মনোভাব এত বিস্তার করিয়া আপনার কাছে খুলিয়া বলা দরকার মনে করিতেছি, কেন জানেন? হয়ত অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখিবেন আমি ভিন্ন সুরে গাহিতে সুরু করিয়াছি। তার কারণ আর কিছু নয়, শুধু এই,—লোকপ্রিয় কোন মতের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইলে, অত্যুজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে প্রশ্নের প্রতি দিকটি সুস্পষ্ট [illegible] দেখানো চাই।

আপনার সহিত সহযোগিতা করিবার ইচ্ছার অভাব [illegible] আমার নাই, এর পর বোধ হয় সে কথা আর খুলিয়া বলিতে হইবে না। যদি সত্যই আমার সাহিত্যিক [illegible] আপনার কোন কাজে লাগিবে বলিয়া [illegible] হয়, তাহা হইলে তাহা আপনার প্রয়োজনেই নিয়োজিত হইবে। সাহিত্য সম্পর্কে নয়, স্থানীয় [illegible]সের কর্ম্মচারী কমাইয়া দেওয়াতে, আমার খাটুনী কিছু বেশী পড়িয়াছে বটে, তৎসত্ত্বেও আপনার ও আমার [illegible] কাগজের জন্যই সময় করিয়া লইব। যদি আমার নাম আপনার পত্রের লেখকশ্রেণীভুক্ত করা আবশ্যক বোধ [illegible], তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আশা করি [illegible] আছেন।

একান্ত আপনার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
মার্চ্চ ২৭,—৭২

প্রিয় মহাশয়,

আমার মাসিকপত্রখানির সম্পর্কে আপনি যে সহায়তা করিতে চাহিয়াছেন, তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ। আপনার মত সহকর্ম্মী পাওয়া পরম লাভ। আর এ সম্বন্ধে যদি আপনার মত লোকের কোন আগ্রহ বা অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আমি যে সাফল্য-লাভ করিব তাহাতে সন্দেহ নাই।

আপনার ইংরেজী পত্রে গল্প উপন্যাস নক্সা ও বিদ্রূপাত্মক রচনা যোগাইবার ভার গ্রহণ করিতে রাজী আছি। ভাগ্যদেবীর কোপে আমাকে সব রকম জিনিষেরই ব্যাপারী সাজিতে হইয়াছে, তাই অতীন্দ্রিয় দর্শন হইতে পদ্য-রচনা পর্য্যন্ত অনেক কাজই করিতে পারি। অবশ্য সেগুলি খুব উঁচুদরের জিনিষ হইবে বলিয়া আশা করিতে পারেন না। তবে সাধ্যে যাহা কুলায় আপনার জন্য তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার কাছে নভেল-লেখা সব চেয়ে শক্ত কাজ, কারণ—মূলভাবটির অনুগত করিয়া চরিত্র ও ঘটনা-পরম্পরা সাজানো এবং পরিকল্পনার পুষ্টিসাধন করা একান্ত অভিনিবেশ ও অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ।

পত্রখানিকে ত্রৈমাসিক করিবার জন্য তারাপ্রসাদ যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহা আমি অনুমোদন করি না। আমি মাসিক প্রকাশ পছন্দ করি।

বর্ষা না আসা অবধি, অন্ততপক্ষে যতদিন না কিছু ঠাণ্ডা পড়ে এবং রেলভ্রমণ সম্ভবপর হয় ততদিন পর্য্যন্ত, কলিকাতায় যাইব বলিয়া মনে করি না। যখন যাইব, তখন নিশ্চয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আশা করি কুশলে আছেন।

একান্ত আপনার

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
মে ১৩, ১৮৭২

প্রিয় শম্ভু,

পরস্পরকে 'বাবু' ডাকিবার প্রয়োজন দেখি না। অতএব, দোহাই তোমার, ভবিষ্যতে আমাকে সাদাসিধে 'বঙ্কিম' বলিয়া ডাকিও।

আমার মাসিকপত্র সম্বন্ধে তোমার সহৃদয় অভিমতের জন্য ধন্যবাদ, প্রকাশককে অনুরোধ করিয়াছিলাম. সম্পাদকদের মধ্যে শুধু তোমাকেই যেন উপহার সংখ্যা প্রেরণ করে; তাই 'পেট্রিয়টে' কোন সমালোচনা ন

দেখিয়া কিছু হতাশ হইলাম। দেখিতেছি প্রকাশক আমার নির্দ্দেশ-অনুযায়ী কাজ করেন নাই।

আমার পুস্তক-সমালোচনা সম্পর্কে অন্যান্য বারের মত এবারও সেই নাদা পেটা সমালোচকটি [সোমপ্রকাশ সম্পাদক ?] বে-নামা সংবাদ-দাতার ছদ্মরূপে স্বপ্রকাশ। যাহা হউক এবার লেখকটির পক্ষে আসল খবরের কাগজের সংবাদদাতা হওয়াই খুব সম্ভব, কেন-না সমালোচনাটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কোন নাবালকের লেখার ধরণেই রচিত। জানি—পেট্রিয়টের স্তম্ভে উত্তর দিবার যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পার ইহা এমন কিছু নয়, তবুও তোমার কাছে কাগজখানা পাঠাইতে প্রকাশককে বলিয়াছি শুধু এই কারণে যে, সাময়িক সাহিত্যের পক্ষে কলঙ্কর প্রেরিত সংবাদ পত্রস্থ করা কতখানি যে অনুচিত সে সম্বন্ধে তুমি সম্পাদককে বেশ একটু শিক্ষা দিতে পারিবে।

ইংরেজীয়ানার বিরুদ্ধে লেখা প্রবন্ধটি লইয়া তুমি সহজে আমাকে অপরাধী করিতে পারিবে না। তোমার অনুরূপ যুক্তি যাহারা প্রয়োগ করে, বুদ্ধিমানের মত তাহাদিগকে ব্যতিক্রম-স্থল করিয়াছি। সারা ভারত ও শাসক-সম্প্রদায়কে যাহারা কথা শোনায় এবং যাহারা নিজের জাতিটিকে মাত্র সম্বোধন করে, সযত্নে এই উভয় পক্ষের প্রভেদ করিয়াছি। আর তোমার মনে আছে বোধ হয়, আমি বলিয়াছিলাম, আমাকে অন্যত্র অন্য সুরে গাহিতে দেখিবে এই হেতু যে, প্ররোচিত করিতে যে চায়, তাহাকে তদ্বিষয়ে নিজের দিকটা উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেই হইবে।

বঙ্গদর্শনের সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য কর্ম্মাধ্যক্ষকে জানাইয়াছি। তাহাকে এ বিষয়ে উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। আমাদের বেশভূষা বিষয়ক ক্ষীণ-প্রাণ প্রবন্ধটির জন্ত বেচারা দীনবন্ধু দায়ী নয়। ও আর একটি প্যাণ্টমানের লেখা ; তাহাকে তুষ্ট রাখিতে বাধ্য হইয়াছি।

তোমার প্রথম সংখ্যা কবে বাহির করিতেছ ? অনুষ্ঠান-পত্র আমি পাইয়াছি। আমার লেখকেরা আন্তরিক আগ্রহ সহকারে কাজে লাগিয়াছেন বুঝিতে পারিলেই, আমি তোমার পত্রে একটি গল্প-লেখা সুরু করিব বলিয়া মনে করিয়াছি। আশা করি দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখিতে পারিব। যে সব যুবকের উপর যথেষ্ট আশা রাখিতে পারা যায়, হাইকোর্টের উকিল রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেই-সব উদীয়মানদের মধ্যে অন্যতম। তাহাকে লেখকশ্রেণীভুক্ত করিতে চেষ্টা করিও। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুচরণ দাস তোমার কাজে লাগিতে পারে, যদি তাহাকে লিখিতে বল। আর লিখিবার জায়গা নাই।

একান্ত তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
জুলাই ২২,-১৮৭২

প্রিয় শম্ভু,

অবশেষে তুমি বাহির হইয়াছ। প্রথমেই তোমার পত্রিকার সজ্জা-পারিপাট্যের প্রশংসা করি। [illegible] এখনও পড়ি নাই, তবে সবগুলির উপর এক [illegible] বুলাইয়া গিয়াছি। যেটুকু পড়িয়াছি [illegible] নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছি, পত্রিকাখানি সাফল্য লা[illegible] আমার পরলোকগত বন্ধু গিরিশের [হিন্দু [illegible] বেঙ্গলী-প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ] উদ্দেশে [illegible] সহকৃত স্নেহমধুর শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছ [illegible] বিশেষ আনন্দিত। রাসবিহারীর [রাসবি[illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, যশোহর] বানান লজ্জাস্ক[illegible] Jasoharএর স্থানে Jasahar, Pratap [illegible] Protap ইত্যাদি। কতকগুলি হাস্যকর ভুল [illegible] 'বেতাল পঁচিশী'র স্থলে 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ন[illegible] করা হইয়াছে। "বৈদ্যনাথ" অতি সুলিখিত প্র[illegible] Travels of a Hindu প্রণেতা ভোলানাথচন্দ্রে[illegible] Infant Marriages (শিশু-বিবাহ) রেভারেণ্ড কে-এম-ব্যানার্জ্জির কলমের যোগ্য নয়। 'লবে'র উপর প্রবন্ধটি [Mr. Lobb on the Calcutta University] বোধ হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের [প্রথম রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার] লেখা, নয় কি ? যতটা পড়িয়াছি, রচনাটি সুনিপুণ বলিয়া মনে হইল। সংস্কৃত হইতে একটি মাত্র

epigram—'Epigrams' বলিয়া অভিহিত হইল কেন? উদ্ভটটি মোটেই উদ্ভট বলিয়া বোধ হইল না। তবে এটি এক জীবন্ত রাজার [মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর] রচনা। উপাধিটি বদান্যতার মত বহু দুষ্কৃতি ঢাকা দিতে পারে। অবশ্য রাজেন্দ্রের (রাজেন্দ্রলাল মিত্র) প্রবন্ধ অতুলনীয়। সে যদি আরো খানিক লিখিত! 'তামাকু'র সম্বন্ধে তোমার রঙ্গ-রচনাটিও চমৎকার। যেমন আরম্ভ করিয়াছ, সেইভাবেই চালাইও।

বোধ হয়, তুমি আমার 'বঙ্গদর্শন' পাইতেছ। যদি তাই হয়, তবে তোমার কাগজের বিনিময়ে আর এক কপি করিয়া তোমাকে পাঠাইবার সম্ভবত প্রয়োজন নাই।

তোমার পত্রিকায় আমার সামান্য সামর্থ্যানুযায়ী লেখা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহা ভুলি নাই।

আশা করি শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছ।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৭২

প্রি[illegible] [illegible]ভু,

[illegible]র দিবার দীর্ঘ বিলম্ব ক্ষমা করিও। প্রথমে এটা [illegible] [illegible]রিয়া লেখা ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। তারপর [illegible] দীর্ঘস্থায়ী দারুণ পীড়া। সম্প্রতি মাত্র সারিয়া [illegible]।

[illegible]খ না হইলে এতদিনে তোমার পত্রিকায় আমার [illegible]ক্তি-অনুযায়ী লেখা পাঠাইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা [illegible]। বর্ত্তমানে কোনরূপ মাথার কাজ নিষিদ্ধ, [illegible] আমার নিজের পত্র সাময়িকভাবে এক বন্ধুর হাতে দিয়াছি।

ভাল কথা, তোমার দ্বিতীয় সংখ্যা কি বাহির হইয়াছে? বোধ হয়—নয়। যদি তাই হয়, তাহা হইলে দেখিতেছি তোমার সময়নিষ্ঠার একান্ত অভাব। অবশ্য, যথাসময়ে কাগজ বাহির করিবে কখনো এমন অঙ্গীকার তুমি কর নাই। তবু পিছাইয়া আছ।

সহায়োৎসুক নাগরিকতা বিষয়ে তোমার প্রশংসা পাইবার যোগ্য সত্যই আমি নই, অন্তত বহুদিন সে যোগ্যতা হারাইয়াছি। দেখিতেছি অপরাধ ক্ষমা কর নাই। তবুও আশা করি—করিবে। *Observer* তোমার প্রতি বিরূপ। যে হেতু *Observer*এর বিরুদ্ধে অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা তোমার আছে, সে হেতু আমার বিবেচনায় ও বিষয়ে বেশী কিছু লিখিয়া শক্তিক্ষয় করিবার প্রয়োজন নাই। আমি *Bengal Times* কখনো পড়ি না। সে কি বলিয়াছে?

আশা করি সকলই কুশল।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
সেপ্টেম্বর ২[illegible], ১৮৭২

প্রিয় শম্ভু,

তোমার পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার-পত্র লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সংখ্যাখানি সত্যই চমৎকার। প্রায় সব প্রবন্ধই আমার ভাল লাগিয়াছে, বিশেষতঃ নদীয়া-শীর্ষক [পণ্ডিত মাধবচন্দ্র শর্ম্মা লিখিত] প্রবন্ধটি। Oviparous Genesis স্পষ্টই রাজেন্দ্রের লেখা, এটিও প্রথমশ্রেণীর রচনা। আমি পুনরায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যথাপরিমাণ কাজ করিতে এখনো অক্ষম। ছুটির সময় শহরে থাকিবে কি?

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
২৮এ ডিসেম্বর [১৮৭২]

প্রিয় শম্ভু,

সত্যই যে তুমি আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া তুলিলে! আমার কাছে তুমি ঋণী না কি? এ বড় শুভ আবিষ্কার! ভাবিয়াছিলাম, চিঠি-পত্র লেখার বিষয়ে আমিই বুঝি পিছাইয়া পড়িয়াছি। যখন স্বীকার করিয়া লইতেছ, [illegible] তোমারই অন্যায়, তখন মনে করি, তোমায় একটি উপদেশ-

পূর্ণ বক্তৃতা দিবার অধিকার আমার আছে। এই মানসিক কসরৎটি ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিলাম।

'চুয়া'র আশু আমার মানহানি করিতেছে। প্রথমত, আমার স্বাস্থ্য ভাল নাই, যদিও চুয়ায় প্রস্তুত সন্দেশ ও অন্যবিধ অখাদ্যগুলির প্রতি সর্ব্বদাই সুবিচার করিয়া আসিয়াছি। দ্বিতীয়ত, রাজকোষ পূর্ণ করিবার চেষ্টায় প্রকৃত রাজভক্তের মত রাষ্ট্র-সেবা করিতেছি, যাহাতে সরকার বাহাদুর করদাতা জনসাধারণের উন্নতি বিধান-কল্পে জাগুর ব্যারাক পুনর্গঠন ও অন্যান্য নানাবিধ জমকাল ধরণের কৌতুকামোদে সময় কাটাইবার অবসর পান। হতভাগা দেশীয় লোকের টাকার দরকার কি? সরকারী তহবিলে তাহারা সর্ব্বস্ব প্রদান করুক। তাহা হইলেই বাসের অযোগ্য ব্যারাক প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং জাঞ্জিবারে দাসত্ব প্রথা নিবারণ করিয়া সরকার তাহাদের অসীম উপকার সাধন করিবেন। দেখিতেছ ত আমার কাজ খাঁটি লোক-হিতৈষণা। এই যে বিলাস-সামগ্রী, এ ত প্রজাদের নিজেদের হিতার্থেই। বাহিরের লোক তোমরা ইহার যথোচিত গুণগ্রহণ করিতে পারিতেছ না।

'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন্' এমনই জাঁকজমকে চলিতেছে যে, আমি ভাবিলাম বুঝি আমার সামান্য সাহায্যের আর দরকার নাই। কিন্তু তোমার যখন ইচ্ছা যে, তোমার ঐ নন্দনে মন্দার এবং পারিজাতের পার্শ্বে (কবিত্ব ক্ষমা কর) কর্কশ এবং নির্গন্ধ ধুতুরাও ফুটিবে, তখন তোমার সে ইচ্ছা কেন-না চরিতার্থ হইবে। কি লিখি বল দেখি? গল্প? দেখিতেছি ও-বস্তু তোমার প্রচুর আছে। "ভুবনেশ্বরী"র মত ধারাবাহিক একটি গল্প [রাসবিহারী বসু লিখিত] একখানি সাময়িক পত্রের পক্ষে যথেষ্ট। সমালোচনা লিখিব না কি? রাজনীতিতে হাত দিব না। দিলে 'মুখার্জ্জি'র বিরুদ্ধে এংলো-স্যাক্সনীয় ক্রোধ যে উদ্দীপিত করিয়া তুলিব, তাহা নিশ্চয়। তাই বঙ্গদর্শনে রাজনীতির আলোচনা এত অল্প। এ-ও নয় ও-ও নয় এমন হাল্কা নক্সার মত জিনিষ পাঠাইব কি? অর্থহীন রচনা কিছু চাও কি? ঐ ধরণের বহুমূল্য মাল যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারি।

চিঠিতে যেরূপ দীর্ঘ ক্ষমাপ্রার্থনা জুড়িয়া দিয়াছ, দেখিলে মনে হয় পূর্ব্বে বুঝি বা নরহত্যা, চৌর্য্য ও সতীত্বাপহরণের মিথ্যা অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করিয়া আসিতেছিলে। তুমি বিজ্ঞজনোচিত কথাই বলিয়াছিলে, আর সেগুলি ভাল কথা। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না।

তোমার পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যা কবে বাহির করিতেছ? জানুয়ারীর শেষে বোধ হয়। এই চিঠি তোমাকে যথারীতি পোস্‌মেজাজী দেখিবে আশা করি।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
৫ই জানুয়ারী ·•

প্রিয় শম্ভু,

তোমার ও তোমার পত্রিকার 'শুভ নব[illegible] করি। আমি তোমার জন্য কিছু লিখিতে ব[illegible] বাস্তবিকই লেখা প্রস্তুত। পূর্ব্বেই তোমার [illegible] যাইত। দু'একখানি বই মিলাইয়া দেখা দ[illegible] অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

জানুয়ারীর মধ্যভাগে যদি পরের সংখ্যা [illegible], তবে তৎপরবর্ত্তী সংখ্যার জন্য আমাকে অপেক্ষা [illegible] থাকিতে হইবে।

Confessionটুকু [বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত The [illegible]fessions of a Young Bengal], ইহা যেন [illegible] বসাইয়া দিও না। ক্যাম্পবেল (ছোটলাট) আ[illegible] (সেক্রেটারী) আমার সম্বন্ধে এতটাই জানে যে, উঃ[illegible] এই অনুতাপীটিকে টপ করিয়া চিনিয়া লইতে কষ্ট হইবে না। চিনিলে আমাকে যে ফাঁসী দিবে' তা নয়, তবে তাহা বেশ উপাদেয় হইবে না।

'ভুবনেশ্বরী' যতদিন না পথ ছাড়িয়া দেয়, 'মুখার্জ্জি'র জন্য অভিপ্রেত আমার গল্পটি ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুক; 'ভুবনেশ্বরী'র সেই পরিসমাপ্তি আমি অবশ্য কামনা করি না। আশা করি শান্তিতে আছ।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
১৯ জানুয়ারী [১৮৭৩]

প্রিয় শম্ভু,

বহরমপুরে তিনটি ভাল লাইব্রেরী আছে। যে বইগুলি চাহিতে ছিলাম, সেগুলি পাইয়াছি। কিন্তু সময়াভাবে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পারি নাই। ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শন' লিখিতে ব্যস্ত আছি। সেই হেতু 'মুখার্জ্জি'র জন্য অভিপ্রেত প্রবন্ধটি শেষ করিতে পারি নাই। যাহা হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না, শেষ করিতে গেলে উহা তোমার পত্রিকার পক্ষে বেজায় বড় হইয়া উঠিত। তাই প্রবন্ধটি যেমনকার তেমনি পাঠাইতেছি। কিছু অসম্পূর্ণ হইলেও রচনাটি পাঠযোগ্য-আকারের। আশা করি গ্রহণ করিবে। যদি গ্রহণ কর, আর এক কিস্তী [illegible] আমার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা [illegible]।

[illegible] অসংস্কৃত খসড়াটিই তোমাকে পাঠাইতে বাধ্য [illegible] মুদ্রাকরের পক্ষে এক কঠিন কাজ বটে, কেন না [illegible] মধ্যে আমার হাতের লেখা সব চেয়ে খারাপ। [illegible] নোনীত হইলে একটি প্রুফ পাঠাইতে অনুরোধ [illegible]।

[illegible] প্রবন্ধটি যত্নে সংশোধন করিতেও পারি নাই। অতএব যদি সময় পাও ত রচনার ব্যাকরণটুকু ভাল করিয়া দেখিও। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমি যে খুব সতর্ক [illegible] পারি না। কোন-কোন ক্ষুদে সমালোচক ([illegible] অবশ্য) তোমার পত্রিকার ব্যাকরণের খুঁত [illegible]।

[illegible] পুস্তিকাখানি পাইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া আমার কাছে যে পাঠাইয়াছ তজ্জন্য ধন্যবাদ। অবশ্য "The Prince in India" [The Duke of Edinburgh's Visit to India] আমার কাছে নূতন নয়, যদিও সবটা পড়িবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে পাই নাই। এখন পড়িতেছি। পরের সংখ্যা কবে বাহির করিতেছ? আশা করি শান্তিতে আছ।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
ফেব্রুয়ারী ৩, [১৮৭৩]

প্রিয় শম্ভু,

আমি যে তোমায় নিরাশ করিয়াছি, তজ্জন্য দুঃখিত। লঘু সাহিত্য বলিয়া যাহা চলে, তাহার চেয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখা এতই সোজা যে, কঠিন পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত আমার মত গরিব বেচারার পক্ষে প্রলোভন প্রবল হইয়া উঠিল। যে প্রবন্ধটি পাঠাইয়াছি, পছন্দ না হইলে সেটি জঞ্জালের ঝোড়ায় সমর্পণ করিও। যত শীঘ্র পারি তোমার মনের মত আরো কিছু পাঠাইব। তবে সেই যত-শীঘ্রের সম্ভাবনা খুব শীঘ্র না হইতে পারে।

লর্ড নর্থব্রুকের সারল্য ও বিশাল সহানুভূতি যাহার আছে এমনধারা প্রত্যেক ইয়োরোপীয়ানই, 'মুখার্জ্জি' সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, সেই কথারই পুনরুক্তি করিবে। একশ্রেণীর সমালোচক আছে, বাঙ্গালীকৃত কোন কিছু ভাল যাহারা সহিতে পারে না। আমি যাহাদের কথা বলিয়াছি, তাহারা এই শ্রেণীর। আর ব্যাকরণের যাহা বিতর্ক-স্থল, ইহাদের সমালোচনা তাহার গণ্ডী পার হইয়া যায় না। এ তুমি ইংরেজী সাপ্তাহিকগুলিতে দেখিতেছ। তুমি এ-সব সমালোচকদের অনায়াসে তুচ্ছ করিতে পার। আমি কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতা জানি বলিয়াই সাবধান হই।

এখনকার মত এত কাজ বুঝি আমার হাতে কখনও ছিল না। আশা করি এই বিনীত সহযোগীর অপেক্ষা জীবনটা উপভোগ করিবার স্বাধীনতর অবসর তোমার আছে।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
১৩ই মার্চ্চ [১৮৭৩]

প্রিয় শম্ভু,

আমি প্রুফের শেষ অর্দ্ধেকটা মাত্র পাইয়াছি। তা-ও পাইয়াছি কাল সন্ধ্যাবেলা। অপরার্দ্ধ এখনও পাই নাই।

ডাকঘর আমার বেলা বড় নিয়ম-মাফিক কাজ করে, অতএব ডাকঘরকে গালি পাড়িও না। প্রুফের সমস্তটা যখনই পাইব, তখনই তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব। আমার সুকুমার হস্তাক্ষর লইয়া মুদ্রাকর দেখিতেছি অদ্ভুত কর্ম্মনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে। আমাকে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে বলা—বাতাসের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার সমান, বৃথা শক্তির অপব্যয়।

আর যাহা লিখিবার আছে, এর পর লিখিব। এখন আমি কিছু অস্থির হইয়া পড়িয়াছি।

একান্ত তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গদর্শন, সম্পাদকের আপিস,
বহরমপুর [১৮৭৩]

বন্ধু মির্জ্জা শম্ভুচন্দ্র,

আমার পীড়ার গল্প সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। যে ভদ্রলোকেরা খবরের কাগজে এ কথা প্রকাশ করেন, তাঁহারাই কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে আমার মৃত্যুসংবাদ পাঠান। আত্মীয়দের নিকট প্রেরিত মৃত্যুসংবাদে বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশে পূর্ব্বেই 'হালিসহর পত্রিকা'য় আমার পীড়ার কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। সাহিত্য-সম্পর্কিত মতামতের জন্য কোনো লোককে দণ্ডিত করিবার ইহা সহজ উপায়, এই কথাটা বোধ হয় ভাবিয়া লওয়া হইয়াছিল।

তুমি নিজে তোমার অসুখের যে খবর দিয়াছ, তাহা যদি এই পরিমাণে সত্য হইত! তোমার ত ঐরূপ সত্যনিষ্ঠা নাই, অতএব এ বিষয় আর আলোচনা করিব না।

Shawkari Jawlpawn (সখের জলপান)—আমি কি বানান ঠিক লিখিয়াছি—চমৎকার লোক ['What he should not be' by Shaukare Jaulpwan 'মুখার্জ্জি' জুন, ৭৩] শুধু বানান নয় আমি ওর বিপুল কাণ্ডজ্ঞান আর অপূর্ব্ব ইংরেজীর যদি অনুকরণ করিতে পারিতাম। তোমার এবং কালা পণ্ডিতটির (রাজেন্দ্রলালের) সঙ্গে একই প্যারায় বেচারা বঙ্কিমের জায়গা যে দিয়াছ, তজ্জন্য আমি ঐ দুইটির কাছে কৃতজ্ঞ। এই বানান-বীরের ছায়া কখনও খর্ব্ব না হোক।

এতক্ষণ বলা উচিত ছিল, তোমার পত্রিকার বিগত যুগ্মসংখ্যাখানি [৯ম ও ১০ম সংখ্যা, জুন ৭৩] অন্য সকল গুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যতদূর জানি যে-কোন সম্পাদক ভারতবর্ষের যে-কোন পত্রিকার যত সংখ্যা বাহির করিয়াছে, ইহা তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সব লেখাগুলিই ভাল। 'The Bride of Shambhudas' [কবিতা, রামশর্ম্মা অর্থাৎ নবগোপাল ঘোষ] চমৎকার। Commerce উপর প্রবন্ধটি আমি সাগ্রহে পাঠ করিলাম। ভোলানাথ চন্দ্র লেখক না কি? 'অবতার'-এর [A modern Avatar ছোট লাট সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেলের বিদ্রূপাত্মক চিত্র।] পরিকল্পনাটিও সুকল্পিত। তবে সহজেই বোঝা যায়, তোমার খোদাইকার প্রথম শ্রেণীর নয়।

মিঃ দে [Bengal Magazineএ রেভারেণ্ড লালবিহারী দে] কৃত সমালোচনাটি ক্ষীণ প্রশংসা-ঢাকা ভদ্র অবজ্ঞার ভঙ্গীতে লেখা। সমালোচক যে সম্পাদক নিজেই, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Calcutta Reviewএ লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, এখন নির্লজ্জভাবে তাহারই বিপরীত কথা বলিতেছেন। রমেশ দত্ত আমাকে লিখিয়াছেন, তিনি 'পেট্রিয়টে' এই বইখানি সমালোচনা করিতে চান। মহাত্মা সম্পাদক স্বয়ং 'মুখার্জ্জিস ম্যাগাজিনে' আমার মস্তক চর্ব্বণ করিতে রাজী আছেন কি?

সোমপ্রকাশের এক অপরূপ সমালোচক—যতটা মনে হয় নাদা-পেটা নিজেই—বলিতেছে, বইখানি অপাঠ্য এবং লেখক আকাট-মূর্খ। এ ত উচ্চ প্রশংসা। ও দিকের সুখ্যাতি বইখানাকে জাহান্নমে পাঠাইত।

হিন্দুদর্শনের অঙ্গীকৃত দ্বিতীয় অধ্যায় আমার নিজেরই মানবী-সৃষ্টি, ও দেখিতেছি আমাকে না মারিয়া ছাড়িবে না। লেখাটিকে তোমার কাগজের যোগ্য করিবার জন্য পড়িতে হইবে বিপুল পরিমাণের এমন-সব জিনিষ, যার মধ্যে দন্তস্ফুট করা দুরূহ। আমার মত সংস্কৃতানভিজ্ঞ শ্রমপিষ্ট লোকের পক্ষে সত্যই তাহা ভয়ানক। তা ছাড়া Calcutta Reviewএ লিখিত একটি নিবন্ধে এবং বঙ্গদর্শনে কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধে সাংখ্য-সম্বন্ধে যা কিছু বলিবার ছিল তা বলিয়া শেষ করিয়াছি। আর দর্শনগুলির মধ্যে একমাত্র সাংখ্যদর্শনই কিছু পড়িবার মত পড়িয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দু চিন্তাধারার উপর শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তোমাকে দিবার ইচ্ছা আছে। চাও ত দিতে পারি। কিন্তু ইহার জন্যও সময় দিতে হইবে। তবে যদি একটা নক্সা—কি ছোট বিদ্রূপাত্মক রচনা তোমার অগ্রহণীয় না হয়, তাহা হইলে ইতিমধ্যে ঐ রকম দু'একটা লেখা ছুটির পর তোমায় পাঠাইতে পারি। ছুটির মধ্যে বোধ করি আমার মিষ্ট মুখখানি দেখাইয়া তোমার তৃষিত চক্ষুর তৃপ্তিবিধান করা সম্ভবপর হইবে না। আমাকে আর এক প্রেমিকের সেবা করিতে হইবে, তিনি হইতেছেন মগ্নমহিমান্বিত রোড-সেস্। ওকে আমি এতই ভালবাসি যে, একপক্ষকালও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, বিশেষত ওর এই দীর্ঘস্থায়ী বার্দ্ধক্যে। কিন্তু এ দেখিতেছি গল্পকে ক্রমাগত টানিয়া বাড়ানো হইতেছে। অতএব শেষ করি।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
২৭এ নবেম্বর [১৮৭৩]

প্রিয় শম্ভু,

'এমেচার হোমিওপ্যাথ'কে ধন্যবাদ দিবার জন্যই দু'এক লাইন লিখিতেছি ['মুখার্জ্জিস ম্যাগাজিনে'র ১৮৭৩, অক্টোবর সংখ্যায় Amateur Homeopath ছদ্মনামে শম্ভুচন্দ্র স্বয়ং বিষবৃক্ষ সমালোচনাচ্ছলে বঙ্কিমচন্দ্রের আক্রমণকারীদের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন]। 'সখের হোমিওপ্যাথ' সম্পাদক ছাড়া আর কেউ নয়, তা জানি। ভাল কথা, আমাদের সেই প্রকাণ্ড প্রতিভা—'সখের জলপানে'র আর দেখা পাই না কেন? এবার তোমার প্রচ্ছদপটের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমি সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেলের ভক্ত নই। কিন্তু আমার মনে হয়, 'জর্জ্জি বাবা,' কিম্বা 'জর্জ্জ পীর' সম্বোধনে নামা তোমার উচিত হয় নাই। 'জর্জ্জ নাতু'তে আমার আপত্তি নাই। বয়স এবং খ্যাতি দুয়েতেই আমি তোমার ছোট। রুচি সম্বন্ধে তোমায় কিছু শিখাইতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা। তবে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি 'Georgy Baba' প্রভৃতির মত ব্যঙ্গচিত্র বন্ধু 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র পক্ষে শোভন হইলেও, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকার উপযোগী নয়। তবে প্রচারকার্য্যে এখন ক্ষান্তি দেওয়া যাক। 'কেরাণী' [রায়বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্ত লিখিত] আমার বড় প্রিয় হইয়া উঠিতেছে। তাঁর রেখাচিত্র ও নক্সাগুলি চমৎকার।

আশা করি এই উপভোগ্য ঋতুতে পূর্ণ উপভোগের আনন্দে ভাসিতেছ।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

উষ্ণপ্রস্রবণ, মানসসরোবর,—
প্রত্যাবর্ত্তনের পথে,—"নির্ব্বানিকা সড়ক"

প্রায় চারিটি মাইল চলিবার পর, বেলা একটা নাগাদ মাঠের মধ্যে একস্থানে সকলে বসিল। আমিও জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহন হইতে ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া গেলাম। প্রখর রৌদ্রে যাত্রার প্রারম্ভেই আমার জ্বর আসিয়াছিল, সেটা পথে আর কাহাকেও বলি নাই। সেইদিন সেইখানেই থাকা হইল। তাহার কারণ, যে মুরুব্বির সঙ্গে আমরা পুরাং হইতে আসিয়াছি সেই মানসিংএর বিশেষ প্রয়োজন—তিনি দুইটি চমরী খরিদ করিবেন। তাঁর এতটা বিশেষ দরকার যখন, তখন তাঁবু সেইখানেই গাড়িতে হইল। জ্বরের ধমকে ঝাব্বুর উপর থাকিতে পারিতেছিলাম না, এবারে পুঁটুলিটির উপর মাথা রাখিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া বাঁচিলাম।

লামা যখন ঝাড়িয়া ফুঁকিয়া গিয়াছে তখন আমি নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিয়াছি এই ভাবিয়া রুমা বেশ নিশ্চিন্তমনে হাঁটিয়া আসিতেছিল, এখন আবার আমায় জ্বরে বিপন্ন দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে সঙ্গী-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল,"ক্যা হোগা, পণ্ডিতজী?" সঙ্গী-মহাশয়ের এক বাঁধা ঔষধ, "দুধ, অউর কিসমিস থোড়া,—অদ্রক কা রস অউর থোড়া মিসরীকা সাথ গরম করকে পিলানা।" কিন্তু এখানে এই বিজন প্রান্তরে দুধ কোথায় পাওয়া যাইবে, এটা ত কোনো গ্রাম নয়। রুমার ভগ্নী রুমতি বলিল, "প্রায় মাইল খানেক দূরে একটা পশুপালকের আড্ডা আছে, সেইখানে পাওয়া যাইতে পারে।" "আমি এখনই যাইতেছি" বলিয়া রুমা তাহার ভগ্নীর উপর আমার শুশ্রূষার ভার দিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে এক পাত্র দুধ লইয়া আসিল।

সে রাত্রি এক প্রকারে কাটিল। পরদিন প্রাতে জ্বর ছিল না, মানসিংএর চমরী কেনা হইলে আমরা যাত্রা করিলাম। সমস্ত দিনের পর বৈকালে আন্দাজ পনেরো মাইল আসিয়া আমরা মানসসরোবরের নিকটে উষ্ণপ্রস্রবণ পাইলাম, যাহার নাম "মে-চু-তাগাং"। এখানে একটি কুণ্ড আছে। ভূগর্ভ হইতে অবিরাম গন্ধক-মিশ্রিত অত্যুষ্ণ জল উঠিয়া কুণ্ড পূর্ণ হইতেছে এবং বেশী জলটুকু তাহারই পার্শ্বে অপর একটি কুণ্ডে গিয়া পড়িতেছে, আবার তথা হইতে ধারা হইয়া বাহিরের বিশাল ভূমিতে চলিয়া যাইতেছে।

আমাদের বাংলা দেশে বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বর নামে একটি পীঠস্থান আছে, তাহা অনেকেই জানেন। সেখানেও ঐরূপ পাঁচ-ছয়টি কুণ্ড আছে কিছুদিন পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। এখানেও অবিকল সেইরূপ। তাঁবু গাড়িবার পূর্ব্বেই, মোটঘাট নামানো হইবামাত্র আমরা গামছা লইয়া সেই দিকে গেলাম।

সঙ্গী-মহাশয় অগ্রেই স্নান করিলেন, বলিলেন, "আঃ, শরীর নীরোগ হইয়া গেল। চল, মানসসরোবরটুকু শেষ করিয়া যত সত্বর পারা যায় দেশের দিকে যাওয়া যাক্, এখানে আর নয়। কি ভয়ানক climate! আমরা হিন্দু, তায় বাঙালী, ভেজিটেবল্ না খাইয়া থাকিতে পারি না! এখানে ত কিছুই পাওয়া যায় না। সেই ভয়ানক

রুটি ও ছাতু, ইহাতে কি শরীর থাকে ?" বাস্তবিক, কি ভয়ানক স্থানেই আমরা আনন্দ লাভের আশায় আসিয়াছি।

সঙ্গী-মহাশয়ের পর আমি সেই কুণ্ডের জলে বড় আরামে সর্ব্বশরীর মার্জ্জন করিয়া, অল্পে অল্পে তাহাতে গা ডুবাইয়া স্নান করিলাম। তাহার পর শুষ্ক বস্ত্র জামা প্রভৃতি পরিয়া তাঁবুর মধ্যে বসিলাম। বাস্তবিকই সেই স্নানে শরীর নীরোগ হইয়া গেল, আর যেন কোনও গ্লানি রহিল না, এরূপ স্বচ্ছন্দ বোধ হইল। সেই দিনে সেইক্ষণ হইতেই জ্বর একেবারেই ত্যাগ হইয়া গেল।

এই উষ্ণপ্রস্রবণ একটি মরুর মধ্যে, মানস-সরোবরের পার্শ্বেই ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। একটি পান্থ-নিবাস এবং একটি মঠও এখানে আছে। মঠের নাম "জু"গোম্বা। আমরা এখানে আর মঠে যাই নাই। নিকটেই একটি ক্ষীণ জলধারা মানস-সরোবর হইতে বাহির হইয়া রাক্ষস তালের দিকে চলিয়া গিয়াছে। জল তত ভাল নয়, তবে আর অন্য জল না থাকায় সকলকে পান করিতে হইল।

উষ্ণপ্রস্রবণের জলটি শৈবালাকীর্ণ। এত উষ্ণ জলে এত শৈবালের রাশি কোথা হইতে আসিল তাহা ভাবিবার বিষয়। খাঁটি দুধের যেমন পুরু সর পড়ে এ জলেও সেইরূপ সবুজবর্ণ সর ভাসিতেছে। জলে পচা পচা একটা গন্ধ, তাহা গন্ধক হইতেই উদ্ভূত বোধ হইল।

উষ্ণপ্রস্রবণের ধারে

আমাদের পর স্ত্রী-যাত্রিগণ স্নানাদি সমাপন করিয়া লইলে রুমা রুটি পাকাইল, আমরা আহারাদি সারিয়া সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই মুড়ি দিলাম। যখন যাত্রার জন্য উঠিলাম তখনও চন্দ্রের ম্লান জ্যোতি একেবারেই মিলাইয়া যায় নাই। ঠিক ভোরেই আমরা মানসসরোবরের দিকে যাত্রা করিলাম। প্রাণে আনন্দ, শরীরে বল, ও সাফল্যের আশা, আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

এই কৈলাস ও মানস-সরোবর দর্শন, ভাগ্যের কতটা যোগাযোগ, এবং কতটা পুরুষার্থের সহায়ে ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই যে অজ্ঞাতনামা, সম্পূর্ণ অপরিচিত হিমালয়ের অধিবাসী ভোটিয়া বন্ধুবর্গ, ভাগ্যরূপে ইহারাই আমাদের পুরুষার্থকে সফল করিয়া দিলেন, এটা স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। মনের মধ্যে এই সকল তোলাপাড়া করিতে করিতে দলের সঙ্গে গুটি গুটি চলিয়াছি, ক্রমে তখন অরুণোদয় হইয়াছে, সম্মুখে মরুভূমির মত বিস্তীর্ণ অসমতল কায়া তখনও মানস-সরোবরকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছে। হঠাৎ সম্মুখে বহু দূরে একটি ঘনরেখা দেখা গেল, দেখিতে দেখিতে ক্রমে সেটি কিছু নিকটবর্ত্তী হইলে একদল অশ্বারোহী বলিয়া বোধ হইল। সারি সারি প্রায় পঞ্চাশটি রক্তবস্ত্রধারী তিব্বতীয় অশ্বারোহী ধীর গতিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। রামা বলিল, "পিতাজী দেখিয়ে বো ক্যা হৈ।" আমি বলিলাম, "ডাকাতের দল নাকি?"—রামা বলিল "নহী ও চল্লিশ মাওয়াসা।"

মওয়াসা বলিতে গৃহস্থ পরিবার বা সংসার বুঝায়। চল্লিশটি সংসার একত্র দলবদ্ধ হইয়া তীর্থে যাইতেছে। উহারা এইরূপেই তীর্থ করে। এখন কৈলাস যাইতেছে, পরে কৈলাস প্রদক্ষিণাদি শেষ করিয়া মানস সরোবর পরিক্রমণ করিবে।

উষ্ণপ্রস্রবণ

ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল, সেই মওয়াসার দলটিও আমাদের ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। তাহার কিছুক্ষণ পর আবার একটি ছোট দল দেখা দিল। নিকটে আসিলে দেখা গেল প্রায় আট জন তিব্বতী পুরুষ—সঙ্গে নানা-প্রকার মাল, মেওয়া ফল প্রভৃতি লইয়া বিক্রয়ার্থ যাইতেছে। তাহাদের সঙ্গে ছোট ছোট ঝুড়িতে ফল, বড় বড় গোবানী, পীচ, আখরোট, বাদাম খেজুর প্রভৃতি আমাদের দলের সকলকে দেখাইতে লাগিল। আমাদের ভোটিয়া মুরুব্বি দুইজন বেশী দাম দিয়া কিছু কিছু

চল্লিশ মওয়াসা

খরিদ করিল। তাহারা চলিয়া গেলে রামা বলিল, "ইহারা ডাকাত, সুবিধা পাইলেই ছুরি বসায় এবং লুটপাটও করে।"

এইবার আমরা অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই মানস-সরোবরের জল দেখিতে পাইলাম। মরি মরি, কি সুন্দর স্নিগ্ধ দৃশ্য,—এই শীতল প্রভাতের সঙ্গে সেই তরল নীলিমার কি মধুর মিলন ঘটাইয়াছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় একাগ্র হইয়া সেই রমণীয় দৃশ্যের মধ্যে ডুবিয়া গেল। তবে সে অবস্থা অল্পক্ষণের জন্যই, কারণ স্থূল শরীর গতিবিশিষ্ট।

চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতমালা। বন বৃক্ষলতা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ হরিদ্বর্ণের সম্পর্কশূন্য মরুভূমির মধ্যে যেমন পর্ব্বতাকার বালির স্তূপ থাকে, এই নীলাভ মানস-সরোবরের চারিদিকেই সেইরূপ। বালির স্তূপের বর্ণ লোহিতাভ ধূসর বলিয়া জলের বর্ণ সর্ব্বদাই নীল। বেশী রৌদ্র উঠিলে ঘোর নীল দেখায়। হ্রদটির পরিধি কেহ বলে পঞ্চাশ, কাহারও মতে আশী, আবার অন্য মতে একশত মাইল। কোন বিশিষ্ট ইউরোপীয় পর্য্যটকের মতে বর্ত্তমানে ইহা আশী মাইল। সরোবরের চারিদিকে উচ্চপর্ব্বতগাত্রে কয়েকটি মঠ আছে। যথা, লামছলাং, সারলাং, কোশল বা গোসল, নিকুর "জু" গোম্বা প্রভৃতি। "জু" গোম্বাটি উষ্ণপ্রস্রবণের ধারে—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আমরা হ্রদের পশ্চিম তীর দিয়া চলিতেছিলাম। সরোবরের শোভা এই প্রাতঃকালে কি মনোহর হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। সূর্য্যোদয় অনেকক্ষণ হইয়াছে, জলে এখন সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে। এখানে রাজহংস নাই, পদ্ম নাই, পত্র নাই, মনোরম বলিয়া কাব্য বা পুরাণ বলিয়া যাহা কিছু ইহার আনুষঙ্গিক উপাদান বর্ণিত, সে সকল কিছুই নাই। দুই চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল হাঁস—সাধারণতঃ যাহাকে বালিহাঁস বলে—কখনও হ্রদের তীরে কখনও জলে আনাগোনা করিতেছে। আর নিকটে দুই একটি মাছধরা পাখী জলের উপর ইতস্ততঃ দ্রুতগতিতে আহার-অন্বেষণে উড়িতেছে। জল অতীব স্বচ্ছ। প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণ হিল্লোলে হ্রদের মধ্যে তর তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছে, নাচিতেছে, তাহার মধ্যে রজতশুভ্র সূর্য্য কিরণ—বিদ্যুতের মত তাহার ঝলকিত গতি। আমরা এই সকল দেখিতে দেখিতে আনন্দে দুরন্থ গোম্বার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাক্ষস-তাল ও মানস-সরোবরের মধ্যে কোথাও এক, কোথাও বা দেড়-দুই মাইলের পর্ব্বতাকার উচ্চভূমির ব্যবধান। অপর দিকেও পর্ব্বতমালা, দূরত্বহেতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং ধূসর বর্ণ। চারিদিকেই ফাঁকা।

এতবড় ফাঁকার রাজত্ব দোষ নাই। ইহার শোভা ও গাম্ভীর্য্য সাধারণ নহে। আমাদের দেশের সহরবাসিগণ যাঁহারা এরূপ স্থানের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁহাদের পক্ষে বৃক্ষলতাশূন্য, এমন কি সবুজ বর্ণের আভাসশূন্য, পর্ব্বতবেষ্টিত বিশাল জলাশয়ের কল্পনা সম্ভব নয়। এরূপ দৃশ্য কল্পনা করিতে অনেকেই হয়ত ইহা শোভাসৌন্দর্য্যহীন ধারণা করিয়া বসিবেন। কিন্তু তাহাতে ভুল হইবে। যেমন কুঞ্চিত অথবা অ-কুঞ্চিত সরল কেশাচ্ছাদিত মস্তকের বা মুখমণ্ডলের একটি শোভা আছে তেমনি মুণ্ডিত মস্তকেরও একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে। এ যেন ঠিক কোনও যতিবরের মুণ্ডিত মস্তকের মূর্ত্তি—ইহাতে বাহ্য নয়ন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির উপাদান বড় কিছু নাই, কিন্তু অন্তরের দিকে দেখিলে একটি গাঢ় আনন্দদায়ক সৌন্দর্য্যের আভাস পাওয়া যায়। তাহাতে চিত্তকে অতৃপ্তির পথে লইয়া যায় না বরং স্থির এবং সমাহিত করিয়া দেয়। সাধারণ রূপপিপাসুগণের চক্ষে এ দৃশ্য সুখকর নহে। সরোবরের নীলাভ জলটুকু ব্যতীত চারিদিকের সকল দৃশ্যই নয়নের অরুচিকর। কিন্তু একটু স্থির হইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, চারিধারের বিষমবর্ণ দৃশ্যের সন্ধিস্থলে জলরাশির ঐ নীলটুকুই উভয় দৃশ্যের সম্পর্ক ঘনীভূত, সুসম্বদ্ধ এবং সার্থক করিয়াছে। তাহাতেই এখানকার দিঙ্‌মণ্ডল শোভাময় হইয়াছে, আর সেইজন্যই এ ক্ষেত্রের সবটুকুই মধুময়।

যদি পবিত্র তীর্থের সংস্কারটি এবং প্রচলিত কিংবদন্তী বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে সাধারণ তীর্থযাত্রীর শুধু এই বিষম দৃশ্যসমষ্টির মধ্যে প্রাণ ভরিবার কিছুই নাই। কাজেই একথা বলিলে ভুল হয় না যে, স্থূল অথবা বাহ্য রূপের নেশা এবং তরল বাস্তব উপভোগের ঘোর যাহাদের না কাটিয়াছে, তাহাদের এত কষ্ট সহ্য করিয়া কৈলাস এবং মানস-সরোবরে আসিয়া তৃপ্ত হইবার কিছুই নাই, সুতরাং ফলও নাই। ইহার শোভা আর এক শ্রেণীর জীবের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনচরিতে মানস-সরোবরের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম তাহার সর্ব্বাংশেই মিল রহিয়াছে, কেবল আধ্যাত্মিক ভাবগুলি ছাড়া। আর, অধ্যাত্ম কোনো বিষয়ের প্রতিষ্ঠা সাধারণভাবে মানব-যুক্তির বহির্ভূত বলিয়া তাহার আলোচনা এক্ষেত্রে

মানস-সরোবরের তটপথ

না করাই ভাল। তবে একথা বলিলে দোষ হয় না যে, অন্তর্নিহিত ভাবের তারতম্যে যাহা ব্যক্তিগত বলিয়া ধরা যায় তাহার সহিত সমষ্টিগত সাধারণের ভাবের মিল নাও হইতে পারে। ভাবরাজ্যের সকল ব্যাপারই যুক্তিরাজ্যের বাহিরে—ইহা আমরা মানি। অন্তরের মধ্যে ভাবের তরঙ্গ উপস্থিত হইলে, সেই অবস্থায় দৃশ্যবস্তু সকল আপন অন্তরের বিশিষ্ট ধ্যান ও ধারণা অনুযায়ী মূর্ত্তিমান হইয়া দৃষ্টিকে সার্থক করে। আমাদের ভারতবাসী হিন্দুর মনে বুদ্ধ ও শিব দুইয়েরই প্রভাব প্রাচীন ও সংস্কারগত, উহা অল্প দিনের নহে। আবার হিন্দুমনের মধ্যে বুদ্ধ মহা-নির্ব্বাণী-প্রমাযোগী এবং শিবও মৃত্যুঞ্জয় যোগীশ্বর। দুইয়ের মধ্যেই যোগৈশ্বর্য্যের পূর্ণতা বা পরাকাষ্ঠা পুরাণ অথবা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এবং লোকপরম্পরাগত। এমন অবস্থায় আন্তরিক ভক্তি এবং ভাবের প্রভাবে যদি কেহ বুদ্ধের মূর্ত্তিকে শিবের মূর্ত্তি দেখে, তবে তাহাতে ঐতিহাসিকের হিসাবে কিছু ভুল বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ উহা নির্ভুলই হয় এবং সেই দর্শনেই জীবনকে অনেকাংশে সফল করিয়া তুলে।

অনেকেই বলেন যে, ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথিতে মানস সরোবরের জলরাশি আলোড়িত হইয়া মধ্যস্থানে একটি রথের স্বর্ণচূড়া দেখা যায়, ঐ দৃশ্য যে দেখিতে পায় তাহারই যাত্রা সফল বুঝিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, আমরা ফাল্গুনের পূর্ণিমায় যাই নাই আর সে কারণ সেই দৃশ্যেও বঞ্চিত রহিলাম। তবে স্থানীয় কাহাকেও কাহাকেও একথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ গম্ভীরভাবেই ইহা অস্বীকার করিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 'হইতে পারে, এ ত দেবতাদের লীলারই স্থান,—মানুষেরা এসকল দেখিতে পায় না।'

আমরা প্রায় চারি মাইল তটভূমি অতিক্রম করিয়া গোশল বা কোশল গোম্বা নামক মঠের তলে, এবং জলের অতি নিকটেই বোঝা নামাইলাম। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর দলস্থ অপর যাত্রিগণ উপরের মঠে চলিয়া গেল। তাহারা মঠের লামাদের নিকট পূজা দিবে এবং ঐখানেই আহারাদির জোগাড় করিবে। রুমা এবং আমরা তিনজন গেলাম না। মানস-সরোবরের তীরে আসিয়া আর কোথাও যাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। প্রাণের মধ্যে যেন অনন্তকাল ধরিয়া এই দৃশ্য দেখিবার, এই দৃশ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার বাসনাই জাগ্রত হইয়া উঠিল। আর গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। জীবনের সঙ্গে এই দৃশ্যের যেন কখনও বিচ্ছেদ না ঘটে! কিন্তু হায়, দেশ কাল ও পাত্রের অধীন জীবন, প্রকৃত স্বাধীনতার বিপরীতমার্গেই যাহার গতি, জীবনের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে যাহা পরের সাহায্যের যোগাযোগ অপেক্ষা করে,—তাহার পক্ষে এরূপ ইচ্ছা, ইচ্ছা মাত্রেই থাকিয়া যায়, কার্য্যকরী হইবার পথ পায় না।

সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, "আর স্নান করিবার প্রয়োজন নাই, শীর্ষ এবং সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনেই কাজ হইবে।" তিনি সেই মতই করিলেন। আমি ভাবিলাম এত দূর হইতে এই মহাতীর্থে আসিয়া যদি অবগাহন স্নান না করিলাম, তবে আসিবার সার্থকতা কি? কেবল দেখিয়া চলিয়া যাওয়া! নাথজী এবং আমি দুইজন আবক্ষ জলে নামিলাম,—তখন নাথজী বলিল,—"যহ শরীর ছুটে যা রহে কুছ বাত নহীং, ইস তীরথমে তীন গোঁতে তো জরুর লাগাউঙ্গা।" আমরা দুই তিনটি করিয়া ডুব দিলাম। যখন শেষ ডুব দিয়া মাথা তুলিলাম তখন সর্ব্বাঙ্গ যেন চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল। প্রবল শীতে হৃৎপিণ্ডের কাজও বুঝি কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রহিল। এ জল এত শীতল এবং এত তরল যে তাহার সহিত আমাদের দেশের জলের তুলনাই হয় না। স্নান করিয়া মনে হইল আমি নীরোগ হইলাম, নিষ্পাপ হইলাম।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে একরাত্রির মধ্যে এই সরোবরের জল তুষারপাতে জমিয়া একখণ্ড হইয়া যায়, এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রে ইহা আবার একরাত্রিতেই গলিয়া যায়।

রুমা কিছুদূরে জলের অতি নিকটে বসিয়া গাত্র মার্জ্জন করিয়া লইল। আমরা দুই তিনটি বোতল পূর্ণ করিয়া সরোবরের পবিত্র জল লইলাম। রুমার স্নানাদি হইয়া গেলে সে উপরের মঠে গেল এবং আমাদের জন্য রুটি ও ছাতুর হালুয়া করিয়া পাঠাইল। আমরা তাহাই অল্প পরিমাণ খাইলাম এবং সরোবরের জল পান করিলাম। সঙ্গী-মহাশয় একটু মিছরি খাইলেন এবং সরোবরের জল পান করিলেন। বলিলেন, "এই পবিত্র জল পান করিয়াই আজ কাটাইব, অন্য কিছুই খাইব না।" সে-দিনের এবং রাত্রির মত আমাদের তাহাই আহার হইয়াছিল, কারণ পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমাদের আর কোনও আহার জোগাড় হয় নাই।

এইবার একটি দুঃখের কথা লিখিতে হইবে, সেটি না লিখিলে নয়। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম যে, মানস-সরোবরে অন্ততঃ কৈলাসের মত, তিন চারি রাত্রি থাকা হইবে। কিন্তু যে মুরুব্বির সঙ্গে আমরা আসিয়াছিলাম তিনি উপরের মঠ হইতে নামিয়াই মালপত্র গুছাইয়া এখান হইতে তাকলাখার ফিরিতে হুকুম করিলেন। শুনিয়াই আমি প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলাম। নাথজীও বিরক্ত হইল। আমি রুমাকে বলিলাম, আমাদের মুরুব্বি নিজের গরু কিনিবেন বলিয়া তাহা একরাত্রি পথে কাটাইলেন আর এখানে একরাত্রি থাকিতে পারিলেন না। রুমা বলিল, উহার ছেলের অসুখ, স্ত্রীর শরীরও ভাল নাই। উহাদের মনে সুখ নাই, সেইজন্য দ্রুত ফিরিয়া যাইতে কৃতসংকল্প।

আমাদের একটি দিন মাত্র এই পবিত্র মানস-সরোবরের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। বিদ্রোহী মন এই দলের সহায়তায় এতটা তীর্থভ্রমণের সুযোগ পাইয়াও এই দলবদ্ধ হইয়া থাকার বিরুদ্ধে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। যদি একা আসিতাম। যাহা হউক, সেইদিনই আমাদের ফিরিতে হইল। সরোবর-প্রদক্ষিণ আমাদের হইল না, এই বিষাদ মনের মধ্যে গুরুভার হইয়া চাপিয়া রহিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যেমন কৈলাস প্রদক্ষিণ করিতে হয় এই মানস-সরোবরেরও সেইরূপ পরিক্রমণের ব্যবস্থা আছে। প্রদক্ষিণের পথও সুন্দর, কোনও প্রকার কঠোরতা সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু তিতিক্ষাসম্পন্ন সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য আশ্রমীর পক্ষে বড় অসুবিধা। কারণ, সরোবরের চতুর্দ্দিকে এই চার-পাঁচটি মঠ বা গোম্বা ব্যতীত আর অন্য আশ্রয় নাই। প্রবাসী গৃহস্থ লোকের মঠে থাকার অসুবিধা অনেক, কারণ এই সকল লামারা দয়াপরবশ হইয়া যদি আশ্রয় দিলেন ত ভাল, না দিলেও দিতে পারেন। কোনও কথা বলিবার নাই। তখন একেবারেই নিরাশ্রয়।

সেইজন্যই সাধারণ গৃহস্থযাত্রিগণের দলবদ্ধ হইয়া হাতিয়ার, তাঁবু প্রভৃতি এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বস্তুটি সঙ্গে লইয়া তিব্বতের মধ্যে ঐ সকল তীর্থে যাইবার ব্যবস্থা।

এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়াই একটি কথা বলিয়া রাখি। আমাদের দেশের সন্ন্যাসী অথবা গৃহী যাঁহারা হিমালয়ে এবং তাহার পারে এই সকল তীর্থ-পর্য্যটনে আসেন, তাঁহারা নিজ পল্লী বা দেশের শীতের ধারণা অনুযায়ী সামান্য গরম কাপড়চোপড় লইয়াই আসেন। কিন্তু এই সকল স্থানে আসিয়া, অথবা পথিমধ্যেই ভীষণ শীতে, ঠাণ্ডায় এবং রুক্ষ বায়ুতে যে কষ্ট পাইতে হয়, যে-ভাবে পীড়িত হইয়া ফিরিতে অথবা পরের গলগ্রহ হইতে হয়, সেটা অবস্থায় না পড়িলে জ্ঞান হয় না। আর যদিও-বা অতিরিক্ত কঠোরতা সহ্য করিয়া এ সকল তীর্থে উপস্থিত হইবার মত শরীরের অবস্থা থাকে, তবে ফিরিবার সময় স্বাস্থ্যটি একেবারে ভাঙিয়া যায়, অথবা একটা বড় গ্লানি অনেক দিন অবধি শরীরের মধ্যে থাকিয়া যায়। এইভাবে অনেকের প্রাণহানির দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আমার বিশ্বাস এই কারণেই ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে মানস-সরোবরের অর্দ্ধপথ হইতেই নিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। হিমালয়ের উচ্চতম স্তরে, তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন গিরিসঙ্কটের ভীষণ রুক্ষ বায়ুর সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেই ভাগ্যক্রমে তিনি সাবধান হইবার সুযোগ অথবা আদেশ পাইয়াছিলেন।

তবে যদি কেহ বিশেষ সাবধানে থাকিয়া উপযুক্ত সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া আসিয়া একবার তিব্বতীয় জলবায়ু হজম

তিব্বতী

করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারেন, তিনি স্বাস্থ্যরূপ অমূল্য সম্পদটি সঙ্গে লইয়া যাইবেন। তিনি বহুকাল সুস্থ এবং সবল শরীরে কর্ম্মে অটুট থাকিবেন।

এখন ফিরিবার কথা—সমস্ত দিন আমরা মানস-সরোবরের তীরস্থ পথ ধরিয়া চলিলাম। প্রায় তৃতীয় প্রহরের শেষে আমরা দক্ষিণে ফিরিলাম। আর সেই ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই মানস-সরোবর আমাদের নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইল। আর সেই সঙ্গে মনের অগোচরে অন্তরের মধ্যে একটি বেদনাও বাজিতে সুরু করিল, তখন অতটা টের পাই নাই। যাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম

তাঁহাকে না পাইয়া যেন বিফল হইয়া ফিরিতেছি। ইহাই সেই বেদনার ভাষা!

যখন দেশ হইতে কৈলাস, মানস-সরোবর প্রভৃতি দেখিবার জন্য যাত্রা করি তখন দুইটি বিষয়ে আমার বন্ধুবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি করিব এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলাম। প্রথমটি এই, সিদ্ধ মহাপুরুষ বা উচ্চশ্রেণীর মুক্ত যোগীপুরুষ ওখানে যাঁহারা আছেন যদি দেখাশুনা ঘটে তাহার বিবরণ; আর দ্বিতীয় বিষয়, তিব্বতের গার্হস্থ্যজীবন এবং বিবাহ-প্রণালী, এবং তাহার সহিত আমাদের হিন্দুসমাজের কোন বিষয়ে মিল আছে কিনা। এই দুইটির কিছু কিছু অন্য প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন বিশেষভাবে যেটুকু জানিয়াছি তাহা বলিয়াই প্রত্যাবর্ত্তনের কথা আরম্ভ করিব।

তিব্বতে ধর্ম্মজীবন বহুবিস্তৃত এবং সাধারণ। কারণ যে দেশে গৃহস্থের তুলনায় সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা বেশী, সে দেশে ধর্ম্মব্যাপার সাধারণ হইয়াই থাকে। কিন্তু এই যে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ধর্ম্মজীবন, ইহার বিস্তৃতি অধিক হইলেও তত গভীর নহে। বহুসংখ্যক সাধুসন্ন্যাসী বা লামা দেশময় ব্যাপ্ত বলিয়া ধর্ম্মমন্দিরের ভিতরে এবং বাহিরে ব্যভিচারেরও সীমা নাই। ভারতীয় সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে আমরা কামিনী ও কাঞ্চনঘটিত যে-সকল ব্যাপার পরিত্যাজ্য বলিয়া জানি এবং যে-সকল অনুষ্ঠান ব্যভিচার সংজ্ঞার মধ্যে ধরিয়া থাকি, এখানে ইহা অনেকটা দেশাচার এবং জাতীয় ধর্ম্মজীবনে স্বাভাবিক। সঙ্ঘের একজন লামা যদি কামিনীঘটিত কোন অসংযমের কর্ম্ম করিয়া ফেলেন, তাহা প্রায়ই প্রকাশ পায় না। এসকল ব্যাপার পুনঃ পুনঃ ঘটিলেও সেটি লইয়া আলোচনা, বা এ সকল ব্যাপার সম্বন্ধে অন্যের অনুসন্ধিৎসু হইবার রীতি নাই। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই একজনের ব্যক্তিগত দোষ বা অসংযমের কর্ম্ম এদেশে অপরের উপেক্ষারই বিষয়। যিনি অসংযত হইবেন বা কুপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবেন তাঁহার কর্ম্ম তাঁহারই ব্যক্তিগত চিন্তা বা বিচারের বিষয়, অপরের ইহাতে অধিকার নাই, পরন্তু সঙ্ঘনীতির বিরুদ্ধ। প্রথম হইতেই ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনেই আত্যন্তিক নিষ্ঠা বিধিবদ্ধ থাকায় এই সকল অসংযমের ব্যাপার সর্ব্বধর্ম্ম-সঙ্ঘের মধ্যেই প্রসারিত হইয়াছে। শুনিয়াছি এখানে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বা সঙ্ঘজীবনের সংযম পালন প্রভৃতি নিয়ম আমাদের ভারতীয় বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজের শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য নীতির মতই অতীব কঠিন। আবার এই কঠিন শাস্ত্রের অনুশাসন সত্বেও এখনকার দিনে প্রাকৃতিক নিয়মে হিন্দু-সমাজের যে নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে এদেশেও ঠিক সেই ব্যাপার। যেখানে যত নিয়মের বাঁধাবাঁধি,—সেখানে সকল ক্ষেত্রেই বন্ধন ততই শিথিল।

এখানে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীর সাধু বা লামা দেখা যায়। প্রথম,—মঠাশ্রয়ী লামা অর্থাৎ যাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মঠাশ্রয় করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় তাঁহাদিগকে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লামা বা সাধু নিরন্তর পর্য্যটন করিয়া থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীর লামা,—তাঁহারা কোনও সঙ্ঘের মধ্যে নয়, "আপা-পন্থী।" কোনও সঙ্ঘের নিয়মাদি তাঁহাদের মানিবার প্রয়োজন নাই। যথার্থ সাধু, ত্যাগী, তপস্বী, যোগী বা মুক্ত মহাপুরুষ এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই পাওয়া যায়, আর ব্যভিচারও এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই বেশী। প্রথমে যে মঠাশ্রয়ী লামার কথা বলা হইল ইহারাই তিব্বতের রাজ-ধর্ম্মাশ্রিত। প্রত্যেক মঠের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত সম্পত্তি এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত বিশেষ ভাবেই আছে। ইহাদের মধ্যে আভিজাত্য বা সম্প্রদায়ের কৌলীন্যগৌরব দেশবাসীর নিকট স্বীকৃত। লাসায় দলাই লামাই তিব্বতের ধর্ম্মবিধাতা। তাঁহারই অনুজ্ঞায় যেখানে যত বিখ্যাত মঠ আছে সেখানকার প্রধান লামা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বের সংখ্যায় যে মহাপ্রাণ যোগিনীর কথা বলিয়াছি, যদিও আমরা তাঁহাকে দেখি নাই তথাপি যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস করিয়াছি বলিয়াই লিখিয়াছি। এখন এই শ্রেণীর সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী বা যোগিনী কখনও কোনও মঠাশ্রয় করেন না। মুক্ত স্বভাব এবং জনকোলাহল হইতে দূরে থাকেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি জনসমাজ বেশী আকৃষ্ট হয়। এখন এই মানস-সরোবরের তীরে এক

মহাপুরুষের বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছি সংক্ষেপে তাহা লিখিয়া তিব্বতী লামার কাহিনী শেষ করিব। ইনি ছম্‌-চপুকাম্‌ প্রথমাবস্থায় গৃহী ছিলেন, স্ত্রী লইয়া ঘর করিতেন কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি লামা হইয়া পর্যটনে বাহির হন। তিনি তিব্বতের সকল তীর্থ ও প্রসিদ্ধ স্থানগুলি ঘুরিয়া ভারতে আসিয়া বুদ্ধগয়া, কাশী প্রভৃতি নানাস্থান দেখিয়াছিলেন। পরে দেশে ফিরিয়া মানস-সরোবরের তীরে একটি নিভৃত গুহায় নিজ আসন পাতিয়া বসিলেন, কোনও মঠে যান নাই। এইরূপে পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল তিনি এইখানেই থাকেন। এখানে তাঁহার অনেকগুলি ভক্তও হইয়াছিল। তিনি নির্ব্বাক অর্থাৎ মৌনী ছিলেন।

একদিন তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে জানাইলেন যে, তিনি আগামী পরশ্ব দেহত্যাগ করিবেন। সে-কথা শীঘ্রই প্রচারিত হইয়া গেল। তখন তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যেও কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিল "এখন আপনার কিছুতেই দেহত্যাগ করা হইবে না। আমরা জানি আপনার যোগৈশ্বর্য্য আছে, আপনি ইচ্ছা করিলেই দেহ রাখিতে পারেন। আপনি এখন শরীর ত্যাগ করিলে আমরাও মরিব।" এইরূপে অনেকে তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদাকাটা করিলেও তিনি কিছুতেই দ্বিতীয় মত প্রকাশ করিলেন না। পরে যখন সকলে দেখিল যে, তিনি কোনক্রমেই মানিবেন না, তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল যে, যদি একান্তই শরীর ত্যাগ করিবেন তবে অন্ততঃ আর এক বৎসর থাকুন, আমরা এই সময়টুকু প্রাণ ভরিয়া সেবা করিব এবং পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিব।

তখন দয়াপরবশ হইয়া তিনি রাজি হইলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা তপস্যাপরায়ণ একটি মাত্র ভক্তকে তিনি নিজের কাছে রাখিলেন এবং বলিলেন, "এই কেবল আমার কাছে থাকিবে, আর তোমরা সকলে ইহার নিকট হইতেই জ্ঞান পাইবে।" তারপর বলিলেন, "তোমরা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে একবার করিয়া আমার কাছে আসিবে, তখন আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব।" তখন সকলে আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল; "তল্‌ চিবু", সেই মনোনীত ভক্তটি—কেবল তাঁহার নিকটে রহিল। ঠিক এক বৎসর পরে একদিন তিনি জানাইলেন, আগামী কল্য দ্বিপ্রহরে দেহত্যাগ করিব। এই ত্যক্ত শরীর লইয়া তোমরা কোনস্থানে সমাধি দিবে না বা তাহার উপর কোনও প্রকার মঠ স্থাপন করিবে না। এই শরীর হইতে সমস্ত মাংস পশুপক্ষিদের খাওয়াইবে এবং অস্থিগুলি শুকাইয়া, পরে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কৈলাসের চারিধারে ছড়াইয়া দিও। এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরদিন প্রথম প্রহরের শেষে সকলে দেখিল তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় নিজ আসনের উপর লীন হইয়াছেন।

যেখানে যতটা ভাল আবার সেখানে ততটা মন্দও তাহার অপর দিকে আছে। এ হিসাবে আমাদের ভারতের সঙ্গে তিব্বতের অল্পই প্রভেদ। যথার্থ সাধু যাচাই করিবার কষ্টিপাথর আমাদের ভারতেই আছে। বুদ্ধ আমাদের ভারতেরই লোক। তিনি যে মহান্‌ আদর্শ এবং মানব-ধর্ম্মের চরম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মানব-সমাজের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন,—দেশ, কাল, পাত্র অথবা অধিকারী-ভেদে তাহার উপর যতই মানব-মনের আবর্জ্জনা পড়ুক, এক এক শক্তিপ্রবাহ যথাসময়ে আসিয়া উহা উড়াইয়া উজ্জ্বল করিয়া দেয়, তখন আবার অনেক কাল অনেকে সেই চৈতন্যের আলোকে পথ স্থির করিয়া লয়। এইরূপ চিরকালই চলিতেছে ও চলিবে। এই গেল তিব্বতে সাধু লামার কথা। এখন তিব্বতের উদ্বাহ-সংস্কারের কথা সংক্ষেপেই বলিব।

এখানে প্রদেশভেদে বিবাহ নানা প্রকার, তবে অল্প-বিস্তর যেটা সাধারণ সেই বিচিত্র বিবাহ পদ্ধতিটির কথাই বলিব। কন্যাপ্রার্থী বর পূর্ব্ব হইতে কোন গৃহস্থের কন্যাকে মনোনীত করিলে প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে একবার কন্যার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা পাকাইয়া রাখেন। পরে একদিন সদলবলে অথবা সবান্ধবে সেই কন্যার গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হন। উঁহাদের দেখিয়া গৃহকর্ত্তা বা কর্ত্রী দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, পাত্রপক্ষকে চলিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু পাত্রপক্ষ এ-সব কথায় টলেন না। এ সকল অনুগ্রহ জ্ঞান করিয়া তাঁহারা ডাকিয়া

বসেন। যদি কেহ পাত্রীর গৃহ হইতে বাহির হয় তবে বর-পক্ষীয়গণ মাথার টুপী খুলিয়া তাঁহাদের সম্মান দেখাইয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট অভীষ্টপূরণের জন্য প্রার্থনা করেন।

যদি কন্যাপক্ষের মত হয়, অর্থাৎ যদি বর পছন্দ হয় এবং ঐ পাত্রের হাতে কন্যা দিলে সুখে থাকিবে এরূপ ধারণা হয় এবং পাত্র কন্যাকে বেশ মনোমত যৌতুক দিতে পারিবে এরূপ অবস্থা থাকে তবে তাঁহারা তিন চারিদিন পরে দ্বার খুলিয়া পাত্রপক্ষকে ভিতরে আহ্বান করেন। আর যদি বরের দুরদৃষ্টক্রমে আগত পাত্রে পাত্রীপক্ষের কন্যা দান করিতে অনিচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে গালি-গালাজ, প্রস্তর ও শুষ্ক গোময় বর্ষণ ইত্যাদি সহ্য করিয়া তিন চারিদিন পর বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। তবে গালাগালি বা পাথর ছোঁড়া প্রভৃতি কর্ম্মগুলি উপেক্ষিত এবং মনোনীত দুইয়েরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে! ওটা স্ত্রী-আচারের মধ্যেই গণ্য, উহাতে অনেক সময় ধৈর্য্যের পরীক্ষা হয়। যদি বর মনোনীত হয় তাহা হইলে তৃতীয় দিনে দ্বার খুলিয়া বরকে সবান্ধবে গৃহাভ্যন্তরে আহ্বান করা হয়। তারপর আদর-যত্নের ধূম পড়িয়া যায়। শেষে এক নির্দ্ধারিত শুভদিনে শুভকার্য্য সমাধা হয়। দরিদ্র গৃহস্থের বিবাহের পণ তেরটি টাকা, বরকে উহা কন্যাকর্ত্তার হাতে দিয়া কন্যাকে আনিতে হয়। তাহার পর কন্যাকে স্বগৃহে আনিয়া বরকে ভোজের আয়োজন করিতে হয়। তখন মদ ও মাংসের সপিণ্ডীকরণ হইয়া থাকে।

এদেশে জ্যেষ্ঠের বিবাহেই কনিষ্ঠেরাও বিবাহিত হন এবং সেই এক স্ত্রীই সকলের পত্নী ও সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া থাকেন। তবে এইভাবে স্ত্রীজাতির একাধিক স্বামী থাকা হেতু একাধিক ভ্রাতাবিশিষ্ট সংসারে অশান্তি ও কলহের সীমা থাকে না। সেই কারণে আজকাল কন্যাপক্ষ বেশী ভাইয়ের সংসারে কন্যা দান করিতে প্রায়ই নারাজ হন। প্রাপ্তবয়স্ক পাত্রের সহিত প্রাপ্তবয়স্ক পাত্রীর বিবাহই এদেশে প্রচলিত আছে।

সিগাট্সী, গিয়াং সিসি, লাসা প্রভৃতি বড় বড় সহর, রাজধানী অথবা সভ্যসমাজের কেন্দ্রগুলিতে বিবাহ আসলে এই প্রকারই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে সেখানে গালাগালি বা ইটপাটকেল উপহারের ব্যবস্থা নাই। তাহা ছাড়া সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে কোথাও কোথাও কন্যার পিতামাতাই মনোমত পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন শুনা যায়। কিন্তু আসলে পূর্ব্বোক্ত রূপ বিবাহই তিব্বতের প্রায় সকল প্রদেশে সাধারণ-ভাবে প্রচলিত।

এই অদ্ভুত বিবাহ-পদ্ধতির দুইটি কারণ ইহারা দেখায়। প্রথমতঃ অনেকগুলি ভাইয়ের এক স্ত্রী হইলে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের বা গৃহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না। সংসার এক কর্ত্রীর কর্ত্তৃত্বেই চলে, বিশৃঙ্খল হয় না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, ভারতের আর্য্য চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডবদের প্রভাব এ সমাজে অধিক। ইহারা পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভীমকেই অধিক শ্রদ্ধা করে, মানে এবং পূজা করে। সেই পঞ্চপাণ্ডবের যেমন লক্ষ্মীরূপা এক স্ত্রী দ্রৌপদী থাকায় তাহাদের আমরণ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হয় নাই, ইহারা সেই প্রাচীন পৌরাণিক আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া নিজ দেশের সংসার ও সমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা অবাধ। একাধিক পতি যাহার, তাহার যে-কোন পতি অমনোনীত হইলে তদ্দত্ত অলঙ্কারটি মাথা হইতে উন্মোচন করিলেই তাহার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইল। ইহাই এখানকার ডাইভোর্স এবং রাজবিধি। পুরুষের ইচ্ছামাত্রেই স্ত্রী ত্যাগ করিবার বিধি নাই। একমাত্র লামা হইয়া মঠে প্রবেশ করাই স্ত্রী ত্যাগের অন্য উপায়।

আমাদের বাংলা দেশে কোন গৃহস্থের পুত্র হইলে শঙ্খধ্বনি হয়, তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হয়, কিন্তু কন্যা হইলে হাহাকার পড়িয়া যায়, মুখ মলিন হয়! কিন্তু তিব্বতে তাহার বিপরীত। বাংলায় পুত্র হইলে যাহা হয়, তিব্বতে কন্যা হইলে তাহাই হয়। কন্যাই গৃহস্থাশ্রমী পিতামাতার প্রার্থনীয়। অতিপ্রয়োজনীয় ভোগ্য বস্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে তার অভাবই তার গুরুত্ব বাড়াইয়া দেয়, এখানেও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা কম হওয়ায় নারীর কদর এত বেশী। স্বভাবতঃই

এখানকার নারী পুরুষগণের অত্যধিক আকাঙ্ক্ষার এবং অতিশয় যত্নের বস্তু। এখানে সর্ব্বত্র সকল সংসারেই নারী যে শুধু কর্ত্রীই তাহা নহে। বাস্তবিক সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম এক নারীকেই সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া পুরুষ অপেক্ষা নারীর পরিশ্রমের ভাগ খুবই বেশী। জল আনা, আহার প্রস্তুত করা, কাপড় কাচা, কাঠকুটা, শুষ্ক গোময় ইন্ধনার্থ সংগ্রহ করা, গৃহমার্জ্জন, গালিচা, নিজ নিজ পরিবারের বস্ত্রসকল বয়ন, এক কৃষি ক্ষেত্রে হল-চালনা ব্যতীত সকল কাজই এই নারীই সম্পূর্ণরূপে করিয়া থাকে। এখানকার নরনারীর মধ্যে শ্রমবিভাগ অত্যন্ত বিষম। এখানকার পুরুষেরা স্ত্রীপরায়ণ, প্রায়ই মূঢ়চিত্ত, অলস ও মদ্যপায়ী। স্ত্রীকে তাহারা বলে 'আঁনে'। নারী বা স্ত্রীই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং শ্রদ্ধার বস্তু। অতিশয় প্রেম ও শ্রদ্ধাপরতন্ত্র হইয়া ইহারা বিবাহিত স্ত্রীকে কখন কখনও মাতৃসম্বোধনও করিয়া থাকে।

এখন প্রত্যাবর্ত্তনের কথা। ফিরিবার সময় প্রথম রাত্রি ফাঁকা মাঠে, খাটানোর পরিবর্ত্তে তাঁবু পাতিয়া রাত্রি-যাপন করিতে হইয়াছিল। ইহার কারণ আমাদের মুরুব্বি মানসিংএর মরজী। সমস্তদিন পথ চলিয়া তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছিল,—কোথায় জল, কোথায় জল। জল যে কোথায় কেহ জানে না, গোঁ ভরে একেবারে সন্ধ্যা অবধি চলিয়া হঠাৎ একটা জায়গায় আড্ডা করা হইয়াছিল। নিকটে জল আছে কিনা দেখা হয় নাই। পাক-সাকের জন্যও জলের প্রয়োজন হয় নাই, যেহেতু মুরুব্বির ইচ্ছানুসারে সকলকে ছাতু গিলিয়া সেই রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পীড়িত সন্তানটিকে লইয়া যত শীঘ্র পারেন তাকলাখারে ফিরিবার চেষ্টা অবিরাম করিতেছেন, কিন্তু হাত দিয়াই কি হাতী ঠেলা যায়? পৌঁছাইতে সেই দুইটি রাত্রি ও তিনটি দিন লাগিয়াই গেল। এদেশে রাত্রিতেও পথ চলিবার প্রথা আছে। অনেকেই দিনমানের তাপ এড়াইবার জন্য রাত্রেই দূর দূরান্তরে যাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন। লামা বা সাধুরা জপ করিতে করিতে তাহার তালে তালে পথ চলেন, এ পথে তাহাও দেখিয়াছি।

যাহা হউক আমরা মানস-সরোবর হইতে যাত্রা করিয়া তৃতীয় দিনেই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাকলাখারে ফিরিয়া লালসিং পাতিয়ালের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, রংদার এক তিব্বতী বহুরূপী গান করিতে করিতে আনন্দেই নাচিতেছে, আর লোক সারি দিয়া জড় হইয়া

বহুরূপী

দেখিতেছে। গানের কি সুর, কি গিটকিরি, কিবা গমক, আমাদের কাণে সে এক অপূর্ব্ব বস্তু। তিব্বতের গান শোনা ভাগ্যে ঘটিয়া গেল। ফিরিবার পথে আমরা তাকলাখারে মাত্র একরাত্রি ও একটি দিন ছিলাম।

আবার লিপুধুরা পার হইলাম। শরীর দুর্ব্বল ছিল—হাঁটিয়া যাইতে পারি নাই। ঘোড়া লইতে হইয়াছিল। যাইবার সময় যেগুলি চড়াই ছিল, ফিরিবার পথে সেগুলি উৎরাই হইয়া গিয়াছে, আর যে পথগুলি উৎরাই ছিল তাহা এখন চড়াই হইয়াছে। আমরা চারিজন তাকলাখার হইতে ফিরিতেছিলাম,—সঙ্গী-মহাশয়, নাথজী, আমি এবং রমাদেবী। রমার কৈলাসযাত্রার উদ্দেশ্য আমাদের সেবা ও আমাদেরই সুবিধার। এখন আমাদের যাত্রা সকল

হইয়া গেল, সে আর তাকলাখারে বসিয়া কি করিবে? তাহা ছাড়া আমাদের এখনও তাহার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। আমাদের মালপত্র লইয়া যাইবার বাহক গারবেয়াং হইতে সেই ত করিয়া দিবে, না হইলে আমরা কোথায় লোক পাইব, সেখানে ত এজেন্সি নাই। রুমার অসাধারণ প্রতিপত্তিই আমাদের সহায় ছিল, কাজেই কোনও বস্তুর অভাব আমাদের হয় নাই। কালাপানিতে রাত্রি কাটাইয়া প্রাতেই আমরা গারবেয়াং চলিলাম। এইবার পথে বৃক্ষলতাদি দেখিয়া নয়ন যেন চরিতার্থ হইল,—এতদিন পর হরিৎ বর্ণের শোভা চক্ষে কি মধুর লাগিল তাহা বলিবার নহে। আমরা নয়নানন্দ বনপথ দিয়াই আসিতেছিলাম। নানাপ্রকার বৃক্ষলতার সঙ্গে বন্য গোলাপের গাছও আশেপাশে অনেকই দেখা যাইতেছিল। রুমা আগে আগে ঘোড়ায় যাইতেছিল আর নিজ আসনে বসিয়াই বনগোলাপের ফল পাড়িয়া খাইতেছিল। গোলাপ-গাছে কাঁটা নাই, পাতায়ও কাঁটা নাই, ফুলের গৌরব নাই, তাহার পরিবর্ত্তে হিমালয়ের উপর আসিয়া গোলাপের এখানে ফলের গৌরব ধরিয়াছে। ছোট ছোট বেগুনি রংয়ের ছোট-বড় কুলের মত "গোলাপ ফল" খাইতে খাইতে গারবেয়াং আসিলাম। দুইটি দিন রুমার আশ্রয়ে কাটাইয়া তৃতীয় দিনে যাত্রা। রুমা বাহক ঠিক করিয়া দিল। গারবেয়াং হইতে বিদায় লইবার কালে রুমা এক প্রিয়তমা সঙ্গিনীর সহিত বুদির উপর পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের বিদায় দিল। এতদিন রুমার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার সেবা লইয়া একটি বিষম মমতা অন্তরে চাপা ছিল, এখন ছাড়িবার সময় চক্ষের জলের সঙ্গে তাহা জানাইয়া দিল। হায়, গারবেয়াংএর রুমা দেবী আমাদের কৈলাস যাত্রার কাহিনীতে তোমার স্থান যে কোথায় তা অন্তর্য্যামীই জানেন। এইবার কঠিন "নির্প্পানিকা" সড়কের কথা।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, আসিবার সময় দুইটি পুলের কথা বলিয়াছিলাম যাহা টুটিলে পাঁচ মাইলের ফেরে পড়িতে হইত। তখন ছিল আষাঢ়ের প্রথম, গ্রীষ্মের শেষ। আর এখন শ্রাবণের শেষ, ঘোর বর্ষা, সুতরাং সে পথও নাই আর পথের সে মূর্ত্তিও নাই।

সেই জলপ্রপাতের অনেক উচ্চে, প্রায় দুইশত ফুট উপর দিয়া পথ-মালপা হইতে পথটি আগাগোড়া "পাকডাণ্ডি" বা বনপথ। প্রথম কতকটা ছিল সরের বন, তাহার পর কখনও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের মধ্য কখনও উপর দিয়াই রাস্তা, তারপর ঘন বনলতার জঙ্গল। যেখানে চড়াই সেখানে বিপদ, যেখানে উৎরাই সেখানট আরও বিপদসঙ্কুল। পথ কোথাও এক বা দেড় হাতের বেশী প্রশস্ত নহে। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই হইবে যে, এরূপ ভয়ঙ্কর পথের কল্পনা কখনও করি নাই। এমন কোন স্থান পথের মধ্যে নাই যেখানে দক্ষিণে বা বামে অতলস্পর্শ খড় নাই, শেষের দিকটা উৎরাই খাড়া প্রস্তরসমষ্টি। তাহার উপর গুচ্ছ গুচ্ছ লম্বা ঘাসের চাপ, উহাকে অবলম্বন করিয়াই নামিতে হয়, আর পথও নাই, অবলম্বনও নাই। এই যে সঙ্কটাপন্ন পথ, ইহার বিস্তৃত বর্ণনা এক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়; কেবল এইটুকু বলিলেই হইবে যে, আমরা প্রাণ লইয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলাম কেবলমাত্র ভগবানের কৃপায়, এবং তাহার কথা মনে হইলে আজও প্রাণে আতঙ্ক আসে। নির্প্পানিকা সড়কের মধ্যে পাঁচ মাইলে কোথাও জল নাই, সবটুকুই দুর্গম। আমরা বহু কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া সাংখোলায় সন্ধ্যার সময় পৌঁছাইলাম। পরে শোঁসা, পাঙ্গু, খেলা, ধারচুলা, বালুয়াকোট ছয় দিনে অতিক্রম করিয়া সপ্তম দিনে আসকোট পৌঁছাইলাম।

রাজওয়াড়ার যত্নে একরাত্রি সেখানেই ছিলাম, আদর-আপ্যায়নের চূড়ান্ত হইয়াছিল। রাত্রিতে খাতির করিয়া কুমারগণ গীতবাদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন; ওখানকার নর্ত্তকীর গান আমাদের শুনাইলেন। দুই তিন-খানি গান তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে "গঙ্গা জটাধারী, শিব রমত রাম শঙ্কর হর," আর "বংশীধুনা সো বাজায়ে"—এই দুইখানি বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। কুমার-সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের গান আসে কি?" শুনিয়া একটু মুচকি হাসিয়া ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে সঙ্গী-মহাশয় আমার দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই বাবুকো গীত আতা হায়।" কাজেই আমায় গাহিতে হইল। একটা গান এই যাত্রার প্রথম হইতেই প্রাণের মধ্যে উঠিতেছিল, কারণ এযাত্রায় সেই গানের সার্থকতা

জীবন্তভাবেই অনুভব করিয়াছিলাম। "কত অজানারে জানাইলে তুমি, কতঘরে দিলে ঠাঁই।" কুমার-সাহেবরা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সঙ্গী-মহাশয় হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। আরও দুই-একখানি গান হইল। পরে মজলিস ভাঙিয়া গেল।

এই আসকোট হইতেই নূতন পথে আমরা মায়াবতী হইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। এবারে এই নূতন পথের কথাই বলিব।

(ক্রমশঃ)

অর্ঘ্য

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

ম্যাকিনটশ ম্যাকফার্সন এণ্ড কোম্পানীর সওদাগরী আপিসে রমেন এই চার বৎসর কাজ ক'রে আসছে, এবং এখন তার মাইনে এসে পৌছেছে ষাটে।

পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত এবং অভিনবত্বহীন। বোধ করি বাঙালী কেরাণী-জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে মোটামুটি দাঁড়ায় এই রকমই। চার বৎসর আগে বি-এ ফেল করার পরই পিতৃবিয়োগ, তার পর চতুর্দ্দিক অন্ধকার, ঘরে স্ত্রী এবং এক পুত্র, ব্যাঙ্ক এবং সেভিংস-ব্যাঙ্কের খাতার হিসাব প্রায় শূন্য, সুতরাং সুদ্ধ-মাত্র বেঁচে থাকা এবং নিজের এবং পোষ্যের মুখে দুটো অন্ন দেবার জন্যে দিবারাত্র ছুটোছুটি, এবং সামনে যে দরজা খোলা পাওয়া যায়, তা নরকেরই হ'ক বা ম্যাকিনটশ ম্যাকফার্সনেরই হ'ক তার ভেতরে দ্রুত প্রবেশ,—কোনও রকম ক'রে আত্মা এবং দেহ একসঙ্গে বজায় রাখবার জন্যে।

অথচ বাংলার রহস্যময়ী ভাগ্য-লক্ষ্মীর বরহস্তচ্যুত জয়-মাল্য অবিরত পড়ছে দূর মরুপ্রান্তবাসী ভাগ্যান্বেষীর গলায়!

এই চার বৎসরে রমেনের মাইনে পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাটে এসেছে, এবং সন্তানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনটি। এক রকমে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী-লাভ বলতে হবে বৈ কি!

জীবন-যাত্রা চলে যাচ্ছিল, সহজ, সাধারণভাবে, যেমন আর পাঁচজন কেরাণীর চলে। অত্যাসক্ত আনন্দ পাবার মত কিছু নেই, দুঃখ করবার কারণও এখনও ঘটেনি। আকাঙ্ক্ষা যেখানে তীব্র, সেখানে সুখ ও দুঃখ বোঝবার মত ক'রে বোঝা যায়, কিন্তু যেখানে জীবনের প্রবাহ একেবারে শেষ-সীমায় পৌছেছে, কোনও রকমে প্রাণের গতিটুকু মাত্র বজায় আছে, সেখানে সুখ ও দুঃখের চিরচঞ্চল প্রাণোন্মাদিনী শক্তির সমস্ত মোহ, সমস্ত নেশা লুপ্ত।

আগুন যখন জলে তখন সে জলার জোরেই আকাশ বাতাস থেকে তার প্রাণ-শক্তি আহরণ করে, কিন্তু যখন তার জলা শেষ হ'য়ে এলো, যখন তার অবশেষ দু'একটা অঙ্গার সূক্ষ্মমাত্র ছাই হয়ে যাবার পরিণতির অপেক্ষায় পড়ে থাকে, তখন কে দেবে তাকে শক্তি, কে দেবে উন্মাদনা?

রমেনের জীবনও আর পাঁচজনেরই মত একেবারে জলার শেষ-সীমায় এসে পৌছেছিল, কোনও এক শুভ বা অশুভ-ক্ষণে ছাই হ'য়ে যাবার প্রতীক্ষা ক'রে, এবং হ'তও নিশ্চয়ই তাই, যদি না মাঝে থেকে একটা আকস্মিক নাড়া পেয়ে, তার জীবনের গতি যেত বদলে!

সে নাড়া এল তার আপিসের ম্যাকিনটশ এবং ম্যাকফার্সন, দুই সাহেবেরই যুগ্ম হাত থেকে।

ম্যাকিনটশ ছিল বড় এবং ম্যাকফার্সন ছোট সাহেব। ছোট-সাহেব ম্যাকফার্সন যখন বিলেত থেকে এই

কোম্পানীতে আসে, তখন তার গোঁফের সবে মাত্র রেখা দিয়েছিল। তার খুড়ো, বুড়ো ম্যাকফার্সন এই কোম্পানীর অংশীদার;—সুযোগ্য ভাইপোর অদৃষ্টে বিলেতের মাটিতে যখন দানাপানি মিললো না, তখন তাকে, বন্ধু ম্যাকিনটশের ওপর ভার দিয়ে সে পাঠিয়ে দিলে বাংলার চির-উর্ব্বর ক্ষেত্রে। সেখানে গোঁফের রেখারই মূল্য হ'ল পাঁচশো টাকা।

আজ ছয় বৎসরে সে-রেখা যে শুধু পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তা নয়, ছু কূল ছাপাবার মত করেছে। মূল্যও বেড়ে পৌঁছেছে আটশ'য়।

গোঁফের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তার মালিকের কতকগুলি এমনি অভ্যাস সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, যার দাম মোটেই কম নয়, এবং যা ঐ আটশ' টাকার ভেতর সব সময় কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হ'ত না। সুতরাং সেবার যখন ম্যাকফার্সনের হাত-দিয়ে কোম্পানীর মোটা একটা চা রপ্তানী হ'ল আর সেই সুযোগে বহু টাকার চলাচল হ'ল, তখন তার বিরাট হিসাবের মধ্যে এক হাজার টাকার মিল আর কিছুতেই করা গেল না।

রমেন সেই কথা জানিয়ে বড়-সাহেবকে রিপোর্ট দিলে। বড়-সাহেব ছোট-সাহেবের কাছ থেকে তার কৈফিয়ৎ তলব ক'রে পাঠালে।

. সেদিন আপিসে যেতেই ছোট-সাহেবের কাছ থেকে জরুরি তলব এলো। রমেন গিয়ে ছোট-সাহেবের মুখের যে ভাব দেখলে, তাকে কিছুতেই প্রসন্ন বলা চলে না।

তীব্রকণ্ঠে ছোট-সাহেব বললে,—এ রিপোর্ট তুমি বড়-সাহেবকে দিলে কেন?

রমেন বললে,—আমার ডিউটি যে স্যর। হাজার টাকার গরমিল, রিপোর্ট না দিয়ে উপায় কি?

—আমাকে দেখালে না কেন?

—আপনাকে দেখান ত নিয়ম নয়।

—নিয়ম নয়—নিয়ম নয়, ভারি নিয়ম-মান্‌নে-ওয়ালা এসেছেন—বলে ছোট-সাহেব তাকে অত্যন্ত অকথ্য গালি দিলে।

রমেন তার দিকে সোজা চেয়ে বললে,—চাকরি করতে এসেছি, সাহেব, গালাগালি খেতে নয়। ও আমি বরদাস্ত করব না বলে দিচ্ছি—

—করবে না? বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল এক মুষ্ট্যাঘাত এসে রমেনের চোখের পাশে প'ড়ে জায়গাটা একেবারে কালো করে দিলে।

ভেবে দেখলে বোধ করি রমেন কিছুতেই এ কাজ করতে পারতো না, কিন্তু সেই অত্যন্ত আকস্মিক ও প্রবল উত্তেজনার মুহূর্ত্তে, সে নিজেকে সামলাতে না পেরে প্রত্যুত্তরে যে আঘাত করলে তাতে সাহেবের নাক দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে রক্ত পড়তে লাগলো।

আপিসের ভেতর এমনি কাণ্ড; বড়-সাহেবের কাছে খবর পৌঁছতে দেরী হ'ল না। তিনি এসে ব্যাপার দেখে বোধ করি স্তম্ভিতই হলেন।

সকল কথা শুনে রমেনকে বললেন,—তোমার যে দোষ নেই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কিন্তু তোমার এ আপিসে আর থাকা চলবে না বাবু—

রমেন বিস্মিত হয়ে বললে,—দোষ নেই, তবুও?

—তবুও। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে মিঃ ম্যাক্‌ফার্সন আর তোমার এক আপিসে থাকা অতঃপর অসম্ভব। মিঃ ম্যাকফার্সনকে ছাড়া চলবে না, কেন-না সে আমার অংশীদারের লোক। সুতরাং যেতে হবে তোমাকেই। দুঃখের কথা কিন্তু খুব স্পষ্ট—বোঝার কোন গোল হ'তে পারে না। দোষ নেই ব'লেই বরং একমাসের দরমাহ বোনাস্ পাবে, কিন্তু কাল আর তুমি এসো না, আজ চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে যাবে।

২

চোখের কাছে প্রকাণ্ড কালশিরার দাগ নিয়ে রমেন শুষ্ক মুখে বাড়ী ফিরতেই সুষমা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, বললে, —এ কি কাণ্ড, কি হ'য়েছে তোমার?

রমেন ম্লান-মুখে উত্তর দিলে,—কাণ্ড একেবারে চূড়ান্ত, ওটা ছোট-সাহেবের ঘুষির চিহ্ন।

ততক্ষণে একটা জল-ন্যাকড়া এনে লাগাতে লাগাতে সুষমা বললে,—এমন ত কখনও শুনিনি—একেবারে মেরে ফেলেছিল আর কি!

রমেন বললে,—কিন্তু এখনও আসল কথাটাইত শোননি, চাকরিও গেছে সুষমা!

সুষমা রমেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে,—সে মুখ দেখে কারুরই বুঝতে দেরী হয় না যে এই অল্পক্ষণেই কতবড় একটা মর্ম্মন্তুদ বেদনা আর হতাশা, সেখানে তাদের গভীর চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে। এ যে একটা কত কঠিন দুঃসংবাদ তা অনুভব করতে সুষমারও তিলমাত্র বিলম্ব হ'ল না, তবু সে কোন উত্তেজনা প্রকাশ না করে সহজ সুরেই বললে,—চাকরিও গেছে? কেন কি হয়েছিল?

রমেন তাকে সকল কথাই বললে। শুনে সুষমা বললে,—মারবে আবার চাকরিও নেবে? এ কি-রকম বিচার হ'ল?

রমেন বললে,—বিচার ত' বলে একেই! ক্ষমতা যে ওদের হাতে।

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,—চাকরি ত' গেল, এখন উপায়?

পশ্চিমের জানলা দিয়ে অস্তমান সূর্য্যের এক ঝলক রৌদ্র এসে ঘরে প'ড়ে সমস্তটা হঠাৎ আলো করে দিলে। তারই দিকে চেয়ে চেয়ে সুষমা বললে,—উপায় করবেন তিনি। মানুষ না খেয়ে থাকবে না। চাকরি গেছে খুব দুঃখের, কিন্তু এমন মানুষ-মারা বাঘ-ভাল্লুকদের কাছে চাকরি করতেই বা কেমন করে?

খানিকটা চুপ করে থেকে স্বামীর দুটি হাত ধ'রে বললে,—ভেবো না তুমি, উপায় তাঁর হাতে!

রমেন হাসবার মত করে বললে,—তাই যদি হয়, ত' উপস্থিত এত বড় বিপদে ফেলার যে কি অর্থ তা ত' বুঝলাম না, সুষমা!

বড় বড় দুই চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলে সুষমা বললে,—বুঝতে কি আমরা সব পারি? তা হ'লে ভাবনা কি? তবু আমি বিশ্বাস করি সৎপথে থাকলে তিনি কোনও দিনই কাউকে ছাড়তে পারেন না!

তারপর মাস-তিনেক কেটেছে। সামান্য যা সঞ্চয় ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে সুষমার গহনা-বিক্রী চলছে। এক একটা গহনা যেন তার এক একটা বুকের পাঁজর, কিন্তু স্বামী আর সন্তানদের মুখ চেয়ে সে তাদেরও একে একে বিসর্জ্জন করে চলেছে।

চাকরির চেষ্টায় রমেন এ কয়মাস আর হাঁটাহাটির অন্ত রাখেনি, কোনও সওদাগরী আপিস, কোন হৌস জানতঃ বাদ দেয়নি। অথচ দিনশেষে সব জায়গা থেকেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছে ম্লান-মুখে, ঘরের মধ্যে আরও একখানি ম্লানতর মুখ দেখবার জন্যে।

ভাগ্য যখন বঞ্চিত করে তখন এমনি নিঃশেষেই করে।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ মেঘ গর্জ্জন করে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল প্রবল ধারায়। তাদের বর্ত্তমান অবস্থারই মত, ছাদের উপর যে অসংখ্য ফাটল ধ'রেছিল, তারই অবকাশে সেই ধারার বোধ করি আধখানা পৌঁছল ঘরের ভেতর। শোবার পর্য্যন্ত যথেষ্ট স্থান নেই, ছেলে তিনটিকে কোনও রকম ক'রে আশ্রয় দিয়ে, রমেন আর সুষমা জেগে বসে রইল চুপচাপ ক'রে, আর বাইরে চলতে লাগলো প্রকৃতির উন্মাদ নৃত্য!

মানুষের দুর্ভাগ্য যখন এমনি উৎকট নগ্নতার সঙ্গে তার সামনে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, তখন মুখের কথা যায় হারিয়ে, এবং বুকের স্পন্দন আসে থেমে।

সকালের দিকে বৃষ্টি যখন থেমে এল, তখন রমেন ঘুমোবার অবকাশ পেলে। তার সেই ঘুম ভাঙল তখন, যখন সুষমা তাকে খাবার জন্যে তাগিদ করতে এলো।

সমস্ত রাত্রি জাগরণে এবং বোধ করি দুশ্চিন্তাতেও তার চেহারা হয়েছিল অপরূপ। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, চোখ দুটো লাল, আর মুখ পাণ্ডুর, যেন বহুদিনের রোগ-ক্লান্ত।

সুষমা বললে,—বেলা হ'ল, নেয়ে নিয়ে চারটি খাবে চল।

রমেন মাথা নেড়ে বললে,—খাব না।

সুষমা তার মুখের দিকে চেয়ে চিন্তিত হ'ল। মুখ দেখলে মনে হয় না, কথাটা সে একেবারেই মিথ্যা বলেছে।

সুষমা খানিক চুপ করে থেকে বললে,—কেন, খাবে না কেন?

রমেন কঠিন দৃষ্টিতে সুষমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—খাব কি, খাবার আর রইল কোথায়? এমনি ক'রে সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে, সমস্ত দিন না খেয়ে দেখতে চাই, কোথায় এর পরিণতি আছে, শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়!

সুষমা কোমল কণ্ঠে বললে,—রাগ করছ কার ওপর? না খেলে বাঁচবে কি ক'রে?

রমেন উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল,—বাঁচতেই ত আর চাইনে, সুষমা, আর চাইলেই বা বাঁচায় কে? এই না-খেতে-পাওয়ার অবস্থা, এ ত' আসবেই ছুদিন কি চারদিন পরে, ততদিন একে খানিকটা মক্স করে রাখাই ভাল। রাগ কার ওপর করতে যাব সুষমা? শুধু বাহাদুরি দি সেই আশ্চর্য্য বিধানকে, যে বিনা অপরাধে আমাকে এই অবস্থায় আনলে।

সুষমা স্বামীর কাছে বসে পড়ে তার ডান হাতটা আপনার হাতের ভিতর নিয়ে বললে—এমন দিন থাকে না কারুরই—আমাদেরও থাকবে না। ততদিন সহ্য করতে হবে যে!

রমেন বললে—জানিনা। আশ্চর্য্য সুষমা, এত বড় আবাল্য বন্ধু সুরেশ, সেও একবার এই দুর্দ্দিনে খবর নিলে না? লক্ষপতি সে, সে কি কিছুই করতে পারত না? ঘেন্না ধরে গেছে এই দুনিয়ার ওপর।

সুষমা বললে,—দেখো এই দুর্দ্দিনেও আমাদের এই কথাটা ভুললে চলবে না যে, প্রত্যাশা কারুর কাছেই করতে নেই, করলেই দুঃখ পেতে হবে। তোমার এই বন্ধুটি যদি আমাদের এই দুর্দ্দিনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে না চান্, ত আমাদের অনুযোগ করবার ত কিছুই নেই!

রমেন কঠিন হাসি হেসে বললে,—আর জানো, আমার এই বন্ধুটি এখনও আমার পাঁচ টাকা ধারেন, সেদিন ট্রামে হঠাৎ দরকার পড়ায় টাকাটা দি। তার এই ব্যবহার!

সুষমা বিস্মিত দৃষ্টিতে রমেনের মুখের দিকে চেয়ে বললে,—সে কথা তিনি ভুলে গিয়েছেন নিশ্চয়ই। না, দুঃখে পড়েও মানুষকে তুমি এত ছোট করে ভাবতে পাবে না। চল খেতে যাবে।

৩

সেই দিন সন্ধ্যার পর বাইরে জনকতক লোক এসে রমেনকে ডাকাডাকি করতে লাগলো।

রমেন বিস্মিত হ'য়ে বাইরে এসে দেখলে জন-চারেক লোক, তার মধ্যে ব্রজেশ ছাড়া সে কাউকেই চেনে না। ব্রজেশ তাদের পাড়ার একজন নামজাদা উকীলের মুহুরি।

রমেন আশ্চর্য্য হয়ে ব্রজেশের মুখের দিকে তাকাতেই, ব্রজেশ তাকে সঙ্কেত করে কাছে ডেকে নিয়ে এসে বললে,—রমেন ভারি দরকার তোমার সঙ্গে। তুমি তোমার বন্ধু সুরেশবাবুর দস্তখত নাকি হুবহু নকল করতে পার?

রমেন বললে,—পারি, বাজী রেখে তার সামনে বসে তার দস্তখত করে দিয়েছি, সে নিজেই চিনতে পারেনি। কিন্তু তাতে কি?

ব্রজেশের মুখে চোখে আনন্দের দীপ্তি খেলতে লাগল, সে খুসী হয়ে বললে,—তাইতেই সব। ওই দলিলটায় তার একটা দস্তখত চাই—একেবারে তার মত। বড় দরকার। ব্যস, এইটুকু মাত্র, এরি দাম ওঁরা তোমাকে দেবেন দুশো টাকা। বলে সে সানন্দে রমেনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে, পাগড়ী-পরা আগন্তুকদের দিকে চাইতেই, তাদের মধ্যে মোটা সোনার চেন গলায় যে অগ্রণী, সে তার মাথা নেড়ে, একটু হেসে সম্মতি জ্ঞাপন করলে।

রমেন চুপ করে রইল। খানিকটা ভেবে বললে,—কিন্তু সুরেশের দস্তখত আমি করব কেন? তারই ত করা উচিত ছিল।

ব্রজেশ একটুখানি হেসে, রমেনকে একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে বললে,—শোন কথা। কিছুই যেন বোঝ না! আরে, সে করলে তোমার কাছে ওঁরা কষ্ট করে আসবেনই বা কেন, আর দু-দুশো টাকাই বা দিতে যাবেন কেন? ও সব বিজনেসের ব্যাপার—তোমার মাথায় ঢুকবে কেন?—নাও, এসো—

রমেন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর মাথা নেড়ে জানালে, না।

পাগড়ী-বাঁধা অগ্রণীটি মনে করলে বোধ হয় টাকায় মিলছে না। সে হেঁকে বললে,—তিনশো বাবুজী—।

ব্রজেশ তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললে,—শোন রমেন, তিনশো বলচেন। কাগজে এক লাইন আঁচড় কেটে দিয়ে তিন তিনশো টাকা রোজগার। এটা কি একটা সোজা কথা! ভেবে দেখ তোমার অবস্থা, কি কষ্টে তোমার দিন যাচ্ছে জানি ত'—এই তিনশো টাকায়—

রমেন বল্লে,—কোথায় সে দলিল দেখি।

দলিল নিয়ে সে নাড়াচাড়া করলে, কিছুই বুঝতে পারলে না, বোঝবার শক্তিও ছিল না।

তার আবাল্য সুহৃদ সুরেশ, কত দীর্ঘকাল ধরে —

দলিলখানা ফিরিয়ে দিয়ে রমেন বললে,—না হবে না ব্রজেশবাবু।

সেই মাথায়-পাগড়ী লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—হোবে না বাবুজী? আচ্ছা চারশো—পানশো—হোবে? বলে পাঁচশো টাকার নোট বার করে টেবলের ওপর রেখে দিলে।

ব্রজেশ বললে,—ছেলেমানষী করোনা রমেন। মনে ক'রে দেখো এই পাঁচশো টাকা একদিকে, আর তোমার ছেলেপুলেরা না খেতে পেয়ে মরা, আর একদিকে! ভেবে দেখো ভাল ক'রে—।

ওই পাঁচশো টাকা! তার ছাদের ফাটল দিয়ে সমস্ত রাত জল পড়েছে অবিরত, তারা সবাই অর্দ্ধভুক্ত, ভাল ক'রে দু-মুঠো অন্নও জোটে না, এত বড় দরিদ্র, এতখানি রিক্ত! তার সামনে ঐ পাঁচশো টাকা তার আশ্চর্য্য মোহ নিয়ে উপস্থিত হ'ল, পাঁচ পাঁচ-শো টাকার সুমধুর নিক্কন বাজতে লাগলো তার কানে! এক মুহূর্ত্তে ঐ টাকাটা সমস্ত দুঃখ বিলুপ্ত করে দেবে, বহুদিনের মত।

চুপ করে বসে আবোল-তাবোল কত কথা ভাবতে লাগল রমেন। উত্তেজনায় তার কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল। তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বললে,—দেখি দলিল। তার সামনে পাঁচশো টাকার নোট যেন পাঁচটা আঙরার মত গন্ গন্ করতে লাগল।

আবাল্য-সুহৃদ্ সেই, যে এতবড় দুঃখের দিনে একবার খবর পর্য্যন্ত নেয় না! দুনিয়া এমনি যে তার মত দুর্ব্বলকে শুধু দুই পায়ে পিষেই দিতে চায়, তা সে মরুক আর বাঁচুক। চোখের কাছে সেই কাল্‌শিরার জায়গাটা যেন নতুন ক'রে টন্‌টন্ করতে লাগল।

কলমটা নিয়ে কালিতে ডুবতে যাবে, এমন সময় সেই মাথায়-পাগড়ী লোকটি হাঁ—হাঁ করে এগিয়ে এসে বললে, হামার কালি, হামার কলম আছে বাবুজী,—ওইতেই লিখতে হোবে—বলে সে তার কলম আর দোয়াত এগিয়ে দিলে।

তারপর হেসে বল্লে,—লিখাটা ঠিক এক কালি কলমের হোয়া চাই কি না!

তার কদর্য্য মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল যেন সে সদ্য নরক-কুণ্ড থেকে উঠে আসছে। কিন্তু ঐ পাঁচশো টাকা!

দোয়াতের ভেতর কলম দিয়ে রমেন বৃথাই কলমটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কালিটাকে ঘুলিয়ে তুললে। হাত যেন ভারী হ'য়ে গেছে, তবু জোর করে কলমটাকে তুলে— .

এমন সময় ছুটতে ছুটতে তার মেজ ছেলে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে,—বাবা, মার বড্ড অসুখ করেছে, তোমাকে ডাকচেন, এখ্‌খুনি—এখ্‌খুনি—।

রমেন চমকে উঠে বললে—সে কি রে, কি অসুখ? বলে কলমটা ফেলে ছুটলো বাড়ীর ভেতরে।

বেশী দূর যেতে হ'ল না, পাশেই পূজোর ঘরের দোর-গোড়াটিতে দাঁড়িয়েছিল সুষমা, ঠিক যেন পাথরের মূর্ত্তি, দুই চোখ যেন অশ্রুতে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে।

রমেন এসে দাঁড়াতেই তার দুই হাত শক্ত ক'রে ধ'রে সুষমা বললে,—কেন এমন কাজ করছিলে তুমি?

রমেন আম্‌তা আম্‌তা করে বললে,—পাঁচশো টাকা।

সুষমা তার পায়ের কাছে বসে পড়ে দুই হাতে তার পা ধরে বললে,—কি করে এমন বুদ্ধি হ'ল তোমার, কে দিলে তোমাকে এ সর্ব্বনেশে প্রবৃত্তি! পাঁচশো টাকার বদলে যে তুমি কোটি কোটি টাকার চেয়ে অমূল্য ধর্ম্ম হারাতে বসেছ, এ কথা তোমার একবারও মনে হ'ল না! তাকে হারিয়ে কি নিয়ে বাঁচব আমরা, কার জোরে সোজা হ'য়ে দাঁড়াব?

বলে সে রমেনের দুই পায়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রমেন আস্তে আস্তে বসে পড়ল সেইখানে, মুখে একটিও কথা ফুটল না। ধীরে ধীরে সুষমার দেহ আপনার কোলের ওপর টেনে নিয়ে, সে চুপচাপ ক'রে বসে রইল, আর দুই চোখ দিয়ে কাল রাত্রের বারিধারারই মত অবিরল অশ্রু-ধারা ব'য়ে যেতে লাগল।

সুষমা কাঁদতে কাঁদতে বললে,—আমাদের এই দুঃখ আজ আমাকে প্রথম সত্যিকার ব্যথা দিলে এই ভেবে যে, তুমি কোথায় নেবে যাচ্ছিলে! তুমি—তুমি, যাকে দেখে আর সবাই শিখবে, আর সবাই জোর পাবে!

রমেন কথা কইতে পারলে না, আস্তে আস্তে সুষমার মাথা চাপড়াতে লাগলো।

মনের ভেতর তার কশাহত অন্তঃকরণের যে বিপুল কান্নার বিপ্লব উঠেছিল, তাকে সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না, মনে হচ্ছিল হা হা করে চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে, কিন্তু কিছুই করলে না, শুধু সুষমার ডান হাতটাকে কখনও আপনার বুকের ওপর, কখনও মুখের ওপর বুলিয়ে নিজেকে সংযত করতে লাগলো। মনে মনে বললে, সুষমা, তোমার ভেতরকার যে উজ্জ্বল সত্য আমার মিথ্যাকে এমনি করে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিলে, তাকে কোটি কোটি প্রণাম!

মনে মনে বললে, নারি, আশ্চর্য্য অখণ্ড নারি, তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম!

তার পর বললে,—সুষমা ওদের বিদেয় করে দিয়ে আসি।

সুষমা তার চোখের দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—যাও।

কলম আর দোয়াত ব্রজেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে, দলিলখানা তার গায়েই একরকম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, রমেন বললে,—হবে না ব্রজেশবাবু।

ব্রজেশ বললে,—তার মানে?

রমেন চেঁচিয়ে উঠল—মানে-টানে নেই, হবে না বলে দিলাম, বিরক্ত করো না।

কাগজ-পত্র গোটাতে গোটাতে ব্রজেশ বললে,—বউএর কথায় বুঝি—কিন্তু রমেনের চোখের দিকে চেয়ে সে সহসা থেমে গেল। দেখলে দুই চোখ দিয়ে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হ'চ্ছে।

রমেন দরজার দিকে দেখিয়ে বললে,—খবরদার যাও বলচি—

৪

দিন-পনর পরের কথা। দুঃখের তীব্রতা কমেনি, কিন্তু সেইদিন থেকে এই দুই নর-নারীর সহনশীলতা যেন কতকটা বেড়েছিল।

বিকাল বেলা রমেন কাজের ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে এইমাত্র ফিরেছে।

এমন সময় বাইরের ঘরে পরিচিত স্বরে কে তার নাম ডাকলে শুনে রমেন চমকে উঠল,—সুরেশ না?

সুষমা বললে,—গলা ত তাঁরই মতন, বোধ করি সুরেশবাবুই হবেন।

রমেন বাইরে গিয়ে দেখলে সুরেশই বটে। বললে,—বহুদিন পরে মনে পড়ল যে হে, কি খবর? তার চোখের ভর্ৎসনা-দৃষ্টি রমেন একেবারে লুকুতে পারলে না।

সুরেশ প্রসন্ন হেসে বললে,—খবর কিছু আছে বৈ কি। খবর ভালই। ব'লে পকেট থেকে একতাড়া নোট বার ক'রে রমেনের সামনে রেখে দিলে।

চলার পথে সাপ দেখলে লোকে যেমন চম্‌কে ওঠে, তেমনি চম্‌কে উঠল রমেন।

সুরেশ হাসলে, বললে,—পাঁচহাজার টাকা।

রমেন মুখ কালি করে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সুরেশ বললে,—ওটা নিতে হবে তোমাকে।

রমেন জিজ্ঞাসা করলে,—কেন?

সুরেশ হেসেই বলতে লাগলো,—ট্রামের সেই পাঁচ টাকা ধারের কথা মনে আছে? চম্‌কালে যে, মনে নেই বুঝি! তোমার সেই টাকাটা নিয়ে এবার অদৃষ্ট-দেবীকে ভারি ফাঁকি দিয়েছি। রেসে কতবার কত টাকাই না দিয়েছি, কিন্তু কপালের কোন জায়গায় মস্ত বড় একটা ফুটো আছে, সব-গুলোই বেরিয়ে গেছে। এবার ভাবলাম তোমার আমার অদৃষ্ট মিলিয়ে দেখা যাক্। তোমার পাঁচ টাকার সঙ্গে

আমার পাঁচ টাকা দিয়ে, দশ-টাকার টিকিট কিনলাম আমার এক সাহেব বন্ধুর নামে। অদৃষ্ট-নদীতে ঘুরিয়ে ফেলে দিলাম জাল। গুটোবার সময় দেখি ভারি ভারি ঠেকে যে! এবার ফাঁকি ত নয়ই, নেহাৎ মন্দও নয়, দশ-দশ হাজার টাকা। তার অর্দ্ধেক তোমার, অর্দ্ধেক আমার। এই তোমার সেই টাকাটা!

রমেন কিছুই বলতে পারলে না, স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল সুরেশের মুখের পানে।

সুরেশ হেসে উঠে বললে,—চেয়ে রইলে যে। নাও তোলো।

রমেন বসে বসে ভাবতে লাগল, এই এত বড় বন্ধুকে সে কত ছোট করেই না দেখেছিল। নিজের ওপর তীব্র ধিক্কারে তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল;—এই কথা মনে করে সে শিউরে উঠল যে সেদিন যে-টাকাটার লোভে সে এত বড় বন্ধুর সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল, আজ সেই বন্ধুই এসে অবহেলায় এবং সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে দিয়ে গেল তার দশ গুণ!

রমেনের চোখে জল এল, আবেগের ভরে সে হঠাৎ সুরেশের হাত চেপে ধ'রে বললে,—সুরেশ তুমি কত বড়, কত মহৎ!

সুরেশ আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে,—এতে মহত্বের কি দেখলে? বরং ধন্যবাদ দাও তোমার অদৃষ্টকে।

রমেন বললে,—তুমি ইচ্ছে করলে ত ওটা নাও দিতে পারতে, সুরেশ।

সুরেশ হাসলে,—পারতাম? না পারতাম না, রমেন, তাই ত আসতে হ'ল! যাক্ ও-সব কথা, আমি বলি তুমি ঐ টাকাটা নিয়ে ব্যবসা সুরু করে দাও। চিনির দর শীঘ্রই চড়ে যাবে এ আন্দাজ পাওয়া গেছে, সেইজন্য কালই আমি সস্তা দরের চিনির একটা প্রকাণ্ড অর্ডার পাঠাচ্ছি। তুমিও দেখ না কিছু টাকা ফেলে। চট্ পট্ কাজে লেগে যাও, দেরী করে আর লাভ কি? আচ্ছা, আসি এখন রমেন।

৫

তারপর পাঁচ বৎসর কেটেছে।

বড়বাজারের মোড়ে মেসার্স মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স-এর চিনি, ঘি, ময়দার প্রকাণ্ড দোকান দেখে কে অনুমান করতে পারবে যে, এরই ঐশ্বর্য্যশালী স্বত্বাধিকারীকে পাঁচ বৎসর আগে একদিন সাহেবের ঘুষি খেয়ে ষাট টাকা মাইনের চাকরি হারিয়ে, তারই অভাবে উপবাস এবং অর্দ্ধোপবাস ক'রে কাটাতে হয়েছিল? চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপা আজ রমেনের ওপর অচঞ্চল হয়েছে, তাই তার ছাদ-ফুটা জীর্ণ কুটীরের জায়গায় আজ প্রকাণ্ড ত্রিতল হর্ম্ম্য উঠল, এবং তার জীর্ণ শূন্য কাঠের বাক্সর পরিবর্ত্তে আজ লোহার সিন্দুক টাকায় টাকায় ভ'রে গেল।

সুরেশের সেই পাঁচ হাজার টাকা সে অনেক দিন আগেই ফিরিয়ে দেবে মনে করেছিল, কিন্তু কেমন সঙ্কোচ হয় তাই পেরে ওঠেনি। সেই পাঁচ হাজার টাকাই তার এই আশ্চর্য্য ভাগ্য পরিবর্ত্তনের মূল, সেই টাকাটা যে বন্ধু দুঃখের দিনে অনায়াসে তাকে দিয়ে গেল, আজ ঐশ্বর্য্যের দিনে তাকে ফিরিয়ে দিতে গেলে সেই বন্ধু যদি মনে করে এ তার অহমিকা!

অথচ না দিলেও ত' নয়, কেমন ক'রে আর সে টাকাটা রাখা যায়! এ দানের মহত্বের তুলনা পাওয়া ভার, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দান-ই ত'!

অবশেষে সে একদিন সুরেশের কাছে সেই টাকাটা নিয়ে উপস্থিত হ'ল। খানিকটা ইতস্ততঃ করে বললে,—তোমার সেই টাকাটা ভাই।

সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে,—কোন্ টাকা?

পাঁচ বৎসর আগে আমার গভীরতম দুঃখের দিনে, তোমার সেই আশ্চর্য্য দানের টাকাটা ভাই।

সুরেশ বিস্মিত হয়ে বললে,—দান? তার মানে?

রমেনের মুখে হাসি দেখা দিল, বললে,—দান-ই ত', আশ্চর্য্য অপরূপ দান! আমি বিস্তর অনুসন্ধান করে জেনেছি, যে তুমি সে বৎসর কোন রেসে-ই টাকা পাওনি। কেমন সত্যি নয়?

সুরেশ বললে,—সত্যি।

রমেন আবেগের স্বরে বলতে লাগল,—কত বড় তোমার

মহত্ত্ব, কতখানি ঔদার্য্য। আমি এই কথাটাই বার বার মনে করে তোমার গুণে মুগ্ধ হয়েছি, যে পাছে আমি তোমার সোজাসুজি দানের টাকাটা না নিই, এই ভেবে তোমাকে কত না মজার একটা গল্প তৈরী করতে হয়েছিল।

সুরেশ হাসলে, বললে,—গল্প বানাতে হয়েছিল সত্যি, রমেন, কিন্তু সে তোমার জন্যে নয়, কারণ তোমার সম্বন্ধে আমার ও রকম আশঙ্কা কিছুই ছিল না।

রমেন আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে,—তবে?

সুরেশ বললে,—তোমার স্ত্রীর জন্যে, কারণ তাঁর সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা নয়, নিশ্চিত জ্ঞান ছিল, যে, তিনি কিছুতেই সোজাসুজি ও-টাকা নেবেন না,—কিছুতেই নয়। তাই ওই গল্পের সৃষ্টি।

রমেন বিস্মিত হয়ে বললে,—আমার স্ত্রী?

সুরেশ চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসে বললে,—হাঁ, তোমার স্ত্রী রমেন, যিনি তাঁর আশ্চর্য্য সত্য-নিষ্ঠা দ্বারা তোমাকে দীর্ঘ কারাবাসের যন্ত্রণা থেকে এবং আমাকে বন্ধু-কারা-প্রেরণের গভীর দুঃখ থেকে একসঙ্গে বাঁচিয়েছেন। তোমার সেই অদ্ভুত ধর্ম্মশীলা, সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, স্বামীর মঙ্গলে উৎসর্গীকৃত-প্রাণা স্ত্রী, রমেন। আমিও সব জানি, দশ-দিনের মধ্যেই ব্রজেশ সব কথাই আমাকে বলে। তুমি যদি আমার সই জাল করতে, ত সে যে ভয়ঙ্কর অনর্থের সৃজন করত, তা আমাকে কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকতে দিত না, কারণ লাখ টাকার ঝুঁকি আমি কোন-মতেই মাথা পেতে নিতাম না। তা হ'লে আমার কোনও ঔদার্য্য কোন মহত্ত্বই তোমাকে জেলের দরজা থেকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারত না রমেন। পাঁচশো টাকা ত' তুচ্ছ, কোনও কিছুর জন্যই যে ব্যক্তি বন্ধুর নাম জাল করতে স্বীকার পায়, তার জন্যে যে মহতের অন্তঃকরণ স্নেহোচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, সে লোক আমি নই। ও ছিল আমার অতি দীন ভক্তি-অর্ঘ্য সেই আশ্চর্য্য নারীত্বের চরণে, দুঃখ যাকে মলিন করতে পারেনি, স্নেহে যে সুন্দর, সংযমে যে মহৎ, সত্যে যে অটল, ধর্ম্মে যে সুরক্ষিত, এবং প্রলোভন যার মহিমাকে উজ্জ্বল করলে কোটি গুণ। ওতে তোমার কোনও অধিকার নেই রমেন,—না নেবার, না ফিরিয়ে দেবার। অধিকার আমারও নেই ফিরিয়ে নেবার, সেই শ্রদ্ধার অঞ্জলি যা আমারই হাত থেকে পড়ল একদিন সেই মহীয়সীর চরণে। এর সকল অধিকার যাঁর হাতে তাঁকেই আমার এই নিবেদন জানিও, রমেন।
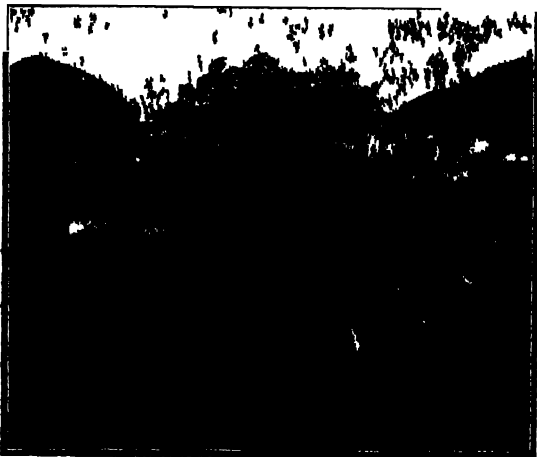
যুগগুরু রামমোহন

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বাল্যকালে দেখিতাম কাশীর সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে বদ্ধ প্রাণ গঙ্গার মুক্ত তীরে আসিয়া মুক্তির আনন্দ অনুভব করে। গঙ্গা যে মুক্তিদায়িনী তাহা কাশীর গলিতে বদ্ধ প্রাণী অনায়াসেই অনুভব করে। সনাতন হিন্দুসমাজের অগণিত বিধিব্যবস্থার আচারে বিচারে নিয়ন্ত্রিত হৃদয় মন প্রাণ তেমনি ভারতীয় সাধক ও ভক্তগণের মুক্তি-দায়িনী সাধনাধারায় ও সাধনবাণীর মুক্তি ক্ষেত্রে আসিয়া অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তির অমৃতকে আস্বাদন করে। হৃদয় মনের এই মুক্তিগঙ্গা যদি ভারতে প্রবহমানা না থাকিত তবে ভারতের চিত্ত এতদিনে শুকাইয়া মরিয়া যাইত।

সৌভাগ্যক্রমে ভারতের মধ্যযুগের সাধক ও ভক্তেরা সবাই প্রেমের ও মিলনের মুক্তিবাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। আচার-বিচারের শৃঙ্খলের জয়গান কেহই করেন নাই, করা সম্ভবও নয়। কারণ, ইঁহাদের অনেকেই অতি নীচ, এমন কি অস্পৃশ্য অন্ত্যজ কুলে জন্মিয়াছেন, এবং দীন হীন মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন ভক্তের সংখ্যাও কম নহে। তারপরে ইঁহাদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর, কাজেই শাস্ত্রের, বেদের ও সনাতন আচার নিয়মের যশোগান করার সম্ভাবনা ইঁহাদের নাই।

অথচ ইঁহাদের অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও জ্ঞান যে কত গভীর ও মধুর তাহা শুধু কথার দ্বারা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। আকাশ হইতে যখন বৃষ্টি হয় তখন তাহার অল্প অংশই ভূমির উপরিস্থিত নদী-নালায় ধারারূপে বহিয়া যায় বা হ্রদসরোবরের জলাশয়ে বদ্ধ হইয়া থাকে। বৃষ্টির অধিকাংশই ভূমির নীচে অদৃশ্য গভীরতার মধ্যে নামিয়া গিয়া গোপনে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই জলের জন্যই তৃষিত পাদপ বনস্পতি তাহাদের মূলকে গভীরে প্রেরণ করে, সন্ধানী মানব কূপ বালি খুঁড়িয়া সেই জলেই তৃষ্ণা নিবারণ ও কৃষিকর্ম করে ও এই অদৃশ্য ধারাই নিদাঘের দুর্দ্দিনে নদনদীর ধারাকে কোনমতে জিয়াইয়া রাখে। ঠিক তেমনি মানব-সমাজে যে জ্ঞানের ধারার বৃষ্টি হয় তাহার অল্প অংশই উচ্চতলের মানবের মধ্যে দৃশ্যভাবে থাকে—তাহাই শাস্ত্র বেদপুরাণে ও দর্শনাদির নানা বড় বড় শব্দাবলীর মধ্যে আপনাকে নানাভাবে প্রকটিত করে। কিন্তু সেই জ্ঞানের অধিকাংশই মানবের 'গভীর-চেতন' লোকে (subconscious) নামিয়া যায় এবং সেখানে থাকিয়া মানব-সমাজের প্রাণ নানাভাবে রক্ষা করে। যদি কেহ সন্ধান করিয়া সেই গভীরতায় নামিতে পারে তবে সেই জলের মাধুর্য্যে ও প্রাণপ্রদ প্রাচুর্য্যে সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়ে।

যখন আমার বয়স অতি অল্প তখন একান্ত সৌভাগ্যবশে এবং দুই-একটি ভক্তজনের সঙ্গগুণে আমি এই ভক্ত ও সাধকদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। ভারতের মধ্যযুগকে অনেকে না জানিয়া একটি অন্ধযুগ মনে করেন। কিন্তু ভক্তসাধকদের বাণীর সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, এই যুগের ঐশ্বর্য্য অপরিমেয়। তখন উত্তর-ভারতে রামানন্দ ও তাঁর পরবর্তী সন্তগণ ভারতের সাধনার আকাশকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সন্তদের বাণী হইতেই আজ আমি কিছু আলোচনা করিব। তাহা ছাড়া পঞ্জাবে, সিন্ধে তখন হিন্দু ও মুসলমান সুফীদের সাধনায়, বাঙলায় বাউল ও বৈষ্ণবদের সাধনায়, দক্ষিণে শৈব ও বৈষ্ণব ও অসাম্প্রদায়িক নানা ভক্তজনের সাধনায় ভারত সেই সময় ঐশ্বর্য্যময়!

বৌদ্ধ ও জৈন সাধনা যখন ভারতে দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে, যখন জীবন্ত ধর্ম্ম কেবল দার্শনিক চুলচেরা তর্কে-বিতর্কে দাঁড়াইয়াছে, তখন ভারতের হৃদয়ের ধর্ম্মতৃষ্ণা মিটিয়াছে এই-সব কুলমানহীন সাধকদের

সাধনায় ও বাণীতে। পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যে সব অসাধ্য সাধনা করিতে সাহসী হন নাই ইঁহারা তাহাতেও ভীত হন নাই। তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন, সাধনার সঙ্গে সাধনার মিলন, সকল পন্থ ও ধর্ম্মসাধনার মৈত্রীর চেষ্টা অসাধ্য সাধন হইলেও সে-সব কথা বলিতে ইঁহারা একটুও সঙ্কুচিত হন নাই।

সন্ত সাধকদের মধ্যে কথিত আছে যে, উত্তর-ভারতে মধ্যযুগে ভক্তিভাব নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় দ্রবিড় দেশে উত্তর হইতে কোনো কালে সমানীত ভক্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সেই ভক্তি রামানন্দ আবার উত্তরে ফিরাইয়া আনিলেন, কিন্তু তাহা সকলদিকে ছড়াইয়া দিলেন ভক্ত কবীর। ভক্তদের মধ্যে প্রথিত সেই বাণীতে

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ,
প্রগট কিয়ো কবীর নে সাতদ্বীপ নৌ খণ্ড॥

কাশীর আচার-বিচার এবং প্রাচীন সাম্প্রদায়িকতাবদ্ধ জীবনে আমার পক্ষে এই ভক্ত বাণীগুলিই ছিল যথার্থ মুক্তির ক্ষেত্র। বড় হওয়ার পর যখন রাজা রামমোহন রায়ের নানা ক্ষেত্রের লেখার সঙ্গে পরিচিত হইলাম, তখন তাহার ভিতরের ভাবটা আমার একান্ত পরিচিত মনে হইল। সেই-সব সন্ত-সাধকদের ভাবের সঙ্গে রাজার ভাবের কোন বিরোধ দেখিলাম না—মনে হইল রাজার মধ্যে তাঁর বর্ত্তমান যুগের মনীষিজনোচিত দৃষ্টির মধ্যে যেন ভারতের প্রাচীন মধ্যযুগের চমৎকার সুসঙ্গত সার্থকতা (fulfilment).

ভারতে যোগই হইল বড় কথা। পাণ্ডিত্য জানে নানাবিধ বস্তুকে ও তাদের ভিন্নতাকে। তাহাকেই মধ্যযুগের কোন কোন ভক্ত 'সংখ্যা' বুঝিয়াছেন। অনেকবিধ তত্ত্বের অনেকধা স্বরূপলক্ষণ পরিচয়ই এই সংখ্যা বা সাংখ্য। সেই অনেককে একের মধ্যে সুসঙ্গত করিয়া দেখাই হইল যোগ। সংখ্যা হইতে যোগ ইঁহাদের মতে অনেক গভীর কথা। তাই ভক্ত রজ্জব (আকবরের সমসাময়িক রাজপুতানার সাধক) বলেন—

সংখ্যা জানে সয়াণ সো জানূঁ।
জোগী জুক্তা উর অধিক মানূঁ॥
ভেদ বিভেদ মিলৈ জই কোঈ।
পরম পুনীত তীরথ তহঁ হোঈ॥

যে সংখ্যা জানে তাহাকে সেয়ানা বলিয়া জানি। যে যোগে সব যুক্ত বলিয়া জানে তাহাকে আরও বেশী মানি। ভেদবিভেদ যেখানে মিলিতে পারিয়াছে সেখানেই তো পরম পবিত্র তীর্থভূমি।

এই দেশে নদীর সঙ্গে যেখানে নদীর মিলন সেখানে এক একটি পবিত্র তীর্থ। নদীর সঙ্গে যেখানে সাগরের মিলন সে সঙ্গম একটি মুক্তির তীর্থ। যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সাধনাকে প্রেমে ও মৈত্রীতে সুসঙ্গত করিতে পারিয়াছেন, ভারতে তাঁহারাই মহাপুরুষ। মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যেও এই সত্যটি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায়।

তখনকার দিনে ভারতে অনৈক্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া। তাই তখন মহাপুরুষদের প্রধান সমস্যাই ছিল কি করিয়া এই দুই সাধনাকে প্রেমে মৈত্রীতে সুসঙ্গত করা যায়। আজ হিন্দু-মুসলমানের মিলন বলিতে যাহা বুঝা যায়, তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের মিলন বলিতে তাহা বুঝাইত না। আজ হিন্দু মুসলমান উভয়ে এক দুঃখে এক দুর্দ্দশায় পীড়িত, এখন রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেও নিতান্ত সহজেই একথা বলা চলে। এ কথা এখন রাজনৈতিক নিতান্ত সাধারণ জরুরী (expediency) কথা মাত্র। আজ পাশ্চাত্য সাধনাকে বা ইংরাজের সাধনাকে আমাদের সাধনার সঙ্গে সুসঙ্গত করিতে যে চায়, তার পক্ষে যেমন কঠিন প্রতিকূলতা, তখনকার দিনে প্রবলপরাক্রান্ত শাসক মুসলমানের সাধনাকে শাসিত হিন্দুসাধনার সঙ্গে মিলিত করিতে যাঁহারা চাহিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধেও প্রতিকূলতা তেমনি কঠিন ছিল। তাই ভক্ত রজ্জব বলিয়াছেন—

হাথ জোড়ু গুরু দু দৌ মিলৈঁ হিন্দু মুসলমান।
সাধনা মাঁ হৈ জোগ নহীঁ ক্যা সাধন পরমান॥

সেই পরম গুরুর কাছে হাতজোড় করিয়া বলিতেছি হিন্দু-মুসলমান যেন সাধনায় মিলিতে পারে। সাধনাতে যদি যোগই না রহিল তবে সাধনার সত্যতার আর প্রমাণ কি রহিল?

এ কাজ ত সহজ কাজ নহে। রামমোহন এই কঠিন কাজে যদি হাত না দিতেন, তবে তিনি ভারতের ক্ষুদ্রদৃষ্টি জনসাধারণের কাছে একজন অতি বড় মহাপুরুষ অতি সহজেই হইতে পারিতেন। কিন্তু ভারতের পরম সৌভাগ্য যে, তিনি সস্তা মহাপুরুষ হইবার সহজ পন্থা খোঁজেন নাই। আর এইজন্য তাঁর আপন বিশিষ্টতাটি এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

তখনকার দিনে এই কাজে যাঁহারা হাত দিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা যে কত প্রবল তাহা এখন বুঝা কঠিন। তাঁরা উভয়দলেরই শত্রু। এই বিষয়ে কবীরের সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে :—

কবীর যখন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলিতেছিলেন তখন তাহার উপর মুসলমান মুল্লারা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সমানভাবে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। মুল্লারা বলেন হিন্দুয়ানীর সঙ্গে মিলাইতে গিয়া কবীর মুসলমান ধর্ম্মকে মারিল। হিন্দুরা বলেন যবনের মুখে সাধনার কথায় ভগবানের নামে হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল। এমন সময় বাদশাহ সেকন্দর শাহ লোদী কাশীর কাছে সফরে আসিলেন। মুল্লা ও পণ্ডিত উভয়ে বাদশাহের কাছে কবীরের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করিলেন। বাদশাহের লোক আসিয়া কবীরকে দরবারে লইয়া গেল। তখনকার দিনে অভিযুক্তদের একটি স্থান, অভিযোগকারীদের একটি ঘেরা স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। একই ঘেরা জায়গায় মুল্লা ও পণ্ডিতদের একত্র অবস্থান দেখিয়া কবীর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। বাদশাহ এরূপ অসঙ্গত ব্যবহারে একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরূপ আচরণের অর্থ কি?" কবীর বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা করিবেন কিন্তু আজ আমার একটু ভরসা হইয়াছে। আমি যাহা এতকাল চাহিয়া আসিতেছি আজ তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে দেখিলাম। ঠিকানার একটু ভুল হইয়াছে—

"ঠিকানমেঁ থোড়ী গলতি হো গঈ"।

বাদশাহ বলিলেন—"কথাটা খুলিয়া বল।" কবীর কহিলেন—"আমি চাহিয়াছিলাম হিন্দু ও মুসলমানকে প্রেমে ও মৈত্রীতে ভগবানের চরণতলে মিলান যায় কি না। সকলেই বলিলেন তাহা অসম্ভব। আজ দেখিলাম তাহা সম্ভব হইয়াছে। অপ্রেমেই যদি তাহারা আজ এখানে মিলিতে পারিয়া থাকে, তবে প্রেমে মিলিতে পারা আরো সহজ। আর তোমার সিংহাসনের নীচেই যদি তাদের মিলন সম্ভব হয়, তবে বিশ্বপতির সিংহাসনের নীচে কি আরও প্রশস্ত স্থান মিলিবে না? আজ অসম্ভবকে সম্ভব দেখিয়া আমার ভরসা হইয়াছে, মনে মনে যাহা চাহিয়া আসিয়াছি, তাহাই আজ প্রত্যক্ষ দেখিলাম—তবে তাঁর সিংহাসনতলে না হইয়া তোমার নীচে এই মিলন ঘটিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—সবই ঠিক হইয়াছে কেবল ঠিকানার একটু ভুল হইয়া গিয়াছে।"

বাদশাহ কথাটা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কবীরকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন।

মধ্যযুগে নানাবিধ সাধনার সুসঙ্গতিকে মনে প্রাণে কামনা করিয়াছেন এমন দুই শতের অধিক মহাপুরুষ সাধকদের বাণী পাইয়াছি। সম্ভব হইলে, দেখাইতে পারিতাম তাঁহাদের প্রত্যেকের অন্তরের সাধনাটি পরিপূর্ণ হইয়াছে রামমোহনের সাধনাতে। তেমন সময় ও সুযোগ এখন নাই। তাই প্রধানতঃ কবীরজী, দাদূজী ও রজ্জবজীর বাণী হইতেই আজ কিছু কিছু দেখাইতে চেষ্টা করিব। ভক্ত নামকজীর হিন্দু-মুসলমানকে মিলাইবার চেষ্টা সর্ব্ব-জনবিদিত—বিশেষতঃ য়ুরোপীয় পণ্ডিতরাও তাহা উত্তমরূপে লিখিয়াছেন।

কবীর বলিতেছেন—

কত বা পায়ে ধরিয়া বুঝাইলাম কত বা কাঁদিয়া বুঝাইলাম হিন্দু দেবদেবীই পূজে আর মুসলমানও কারও আপন হইতে চায় না।

কি তনো মনায়ো পাবঁ পরি কি তনো মনায়ো রোয়।
হিংদূ পূজৈ দেব্‌তা তুর্ক ন কাহু হোয়॥

খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন তবে আর সব মুলুক কাহার? তীর্থ-মূর্ত্তিতেই যদি রাম নিবাস করেন তবে বাহিরের জগৎকে দেখে কে?

জো খোদায় মসজিদ বসতু হৈ ঔর মুলুক কেহি কেরা।
তীরথ মূরত রামনিবাসী বাহর করে কো হেরা॥

হিন্দুর হিন্দুয়ানী দেখিলাম, মুসলমানের মুসলমানী দেখিলাম, হায়, ইহারা কেহই পথ পায় নাই।

অরে ইনদুহু রাহ ন পাঈ।
হিন্দুকী হিংদুবাঈ দেখি তুর্কন কী তুরকাঈ॥

সবাই বিধিব্যবস্থার বেড়া (creed) রচিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়কে নিরাপদ করিতে চায়, শেষে সেই সঙ্কীর্ণতাতেই ধর্ম্ম মারা যায়। তাই কবীর বলেন—

ক্ষেতে দিলাম বেড়া শেষে দেখি বেড়াটাই ক্ষেতকে খায়। তিন লোক সংশয়ের মধ্যে রহিল পড়িয়া আমি কাহাকে কি বুঝাইব?

বেড়া দীন্‌হী খেত কো বেড়াহী খেত খায়।
তীনলোক সংশয় পাড়ী মৈঁ কাহি কহো সমুঝায়॥

এই প্রত্যেকটি কথা আমরা রামমোহনের মধ্যে পাই, রামমোহনের মতই কবীর তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া দেখিলেন; সত্যকে পাইলেন না। শাস্ত্রের জ্ঞান কবীরের ছিল না তবু শাস্ত্রের বন্ধনটা যে কত কঠিন তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন।

তাই কবীর বলেন—

তীর্থে তো কেবল জল, তাহাতে কিছুই হয় না; সে আমি স্নান করিয়া দেখিয়াছি। প্রতিমাগুলি তো জড়, কোন কথাই বলে না, সে আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি। পুরাণ কুরান তো কেবল কথা সে আমি ঘটের পর্দ্দা সরাইয়া দেখিয়াছি। কবীর কহে শুধু প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা, আর সব যে মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য তাহা বেশ দেখিয়াছি।

তীরথ মেঁ তো সব পানীহৈ হোবৈনহী কছু অন্হায় দেখা।
প্রতিমা সকল তো জড় হৈ বোলে নহিঁ বোলায় দেখা॥
পুরাণ কুরান সব বাত হৈ য়া ঘটকা পরদা খোল দেখা।
অনুভব কী বাত কবীর কহৈ যহ সব হৈ ঝুঠী পোল দেখা॥

বেদের পুত্রী আসিলেন স্মৃতি তিনি বাঁধিলেন এমন বাঁধন যে কিছুতেই যায় না ছাড়ান।

বেদকী পুত্রী দ্রুতি আহী
বংধবত ধংধ ছোড়ি ন জাই ॥

রামমোহন সংস্কৃত ছাড়িয়া বাংলাতেই তাঁর বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। এমন করিয়াই তিনি বাংলা গদ্যকে গড়িয়া তুলিলেন। কবীর তো মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছু জানিতেনই না। তবু সংস্কৃত হইতে ভাষার শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তাঁর বাণী কি চমৎকার।

হে কবীর সংস্কৃত হইল কূপ জল আর ভাষা হইল প্রবাহমানা জলধারা। যখন চাও তখনি ডুব দাও, শরীর জুড়াইয়া যাইবে।

সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহতা নীর।
জব চাহে তবাহি ডুবো শান্ত হোয় শরীর ॥

সংস্কৃত ভাষা পড়িলেই লোক মনে করে আমি জ্ঞানী, আমাকে সবাই জ্ঞানী বলুক!

সংসকিরিত ভাষা পরি লীন্‌হা জ্ঞানী লোগ কহোরী ॥

কোনো বিশেষ জাতির, সম্প্রদায়ের বা দেশেরই যে কেবল সাধনার অধিকার আছে একথা কবীর মানিতেন না, তাই বলিয়াছেন সাধুদের জাতি জিজ্ঞাসা করা বৃথা। সাধনাতে ছত্রিশ কৌম (Nationality) আছে, তাই এই প্রশ্নটাই অদ্ভুত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সাধক হইয়াছেন, ইহার মধ্যে কি কিছু বিচার করা চলে?

সন্তন জাত ন পুছো নিরগুণিয়াঁ।
সাধন মাঁ ছত্রিশা কৌম হৈ টেঢ়ী তোর পুছনিয়াঁ।
হিন্দু তুর্ক দুই দীন বনে হৈঁ কছু নহী পহচনিয়াঁ ॥

অন্তর বাহির দুইকে নিরন্তর করিয়া আছেন তিনি। চেতন-অচেতন দুই তাঁর পাদ-পীঠ। যদি বলি তিনি কেবল অন্তরে, তবে বহির্জগৎ লজ্জায় মরে, যদি বলি তিনি বাহিরে তবে কথাটা হয় মিথ্যা।

ভিতর কহুঁ তো জগময় লাজৈ বাহর কহুঁ তো ঝুটা লো।
বাহর ভিতর সকল নিরন্তর চেত অচেত দউপীঠা লো ॥

লোকেরা ভুল করিয়াই সংসার ছাড়িয়া বনে যায়। তাই কবীর বলেন—

আত্মকে যে ঘরে ফিরাইয়া আনে সেই তো আমার প্রিয়। ঘরেই যোগ, ঘরেই মুক্তি, যদি অলখ গুরু তাহা দেখাইয়া দেন।

অবধূ ভুলেকো ঘর লাবে সো জন হমকো ভাবৈ।
ঘরমেঁ জুক্ত মুক্ত ঘরহী মেঁ জো গুরু অলখ লখাবৈ

দেহতাড়নকে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়াই কবীর বলিলেন—

চক্ষুও বুজিব না কানও রুধিব না, কায়াকষ্টও করিব না, নয়ন খুলিয়া হাসিতে হাসিতে আমি দেখিব, সুন্দরের রূপই সর্ব্বত্র দেখিব

আঁখ না মুদুঁ কান না রুধুঁ কায়া কষ্ট ধারূঁ।
খুলে নয়ন মৈঁ হঁস হঁস দেখুঁ সুন্দর রূপ নিহারূঁ ॥

কবীরের মত যে নীরস বৈরাগীর মত ছিল না, তাহা বুঝাই যায়, রামমোহনের সঙ্গে এসব বিষয়ে তাঁর চমৎকার ঐক্য।

বুদ্ধের মত তিনিও বলিয়াছেন, এই দেহ একটি তন্ত্রী-বাদ্যের মত। ইহার তার টানিয়া খুঁটি মোচড়াইয়া প্রভূত রাগিণী বাহির হয়।

সাধো য়হ তন ঠাট তং বুরে কা।
ঐঁচত তার মরোড়ত খুঁটী নিকসত রাগ হজুরে কা ॥

প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় প্রভূত সুরটি বাহির করিতে পারিলে তবে তার জীবনের কাজ সিদ্ধ হইল। তারপর সকলের সাধনা, সকল মানবের সাধনা লইয়া নানা-বিধ সুরের সমবায়ে এক সাধনসুরের মহাসঙ্গতি চলিয়াছে। প্রত্যেক পথের সাধনাই তার একটি একটি সুর। এইজন্য কোন একটি সাধনাকে নষ্ট করা অর্থই সেই মহা-সঙ্গতিকে ক্ষুণ্ণ করা। এই সুর অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করে।

পঞ্চবীণা সত রাগ উচারৈ যো বেধত হিয়ে মঁঝারা হো ॥

কবীরের এইসব অনুভব তাঁর ব্যক্তিগত। অবশ্য তাঁর ধর্ম্ম-বন্ধু-বান্ধবও অনেক ছিলেন। তখনকার অনেক ভক্তসাধকজনের সঙ্গে তিনি মিশিতেন, কিন্তু সম্প্রদায় হইয়া উঠিবে ভয়ে একটি সাধকসমাজ গড়িয়া তোলেন নাই। তাঁর পুত্র কমালও সম্প্রদায় গড়িলেন না। তাঁর শিষ্য দাদূ (কোনো কোনো মতে তাঁর পরম্পরাক্রমে শিষ্য) অনুভব করিলেন যে, এমন একটি সাধকমণ্ডলী গড়িয়া তোলা দরকার যেখানে সর্ব্ববিধ সাধনা সামঞ্জস্য পাইতে পারে।

দাদূর সঙ্গে এসব বিষয়ে আকবরের চল্লিশ দিন ব্যাপী আলাপ হয়। আকবরও দাদূর এই সাধকসমাজের আনন্দ আস্বাদ করিয়াছিলেন। তাঁর মণ্ডলীর নাম প্রথম রাখেন "অলখ দরীবা" অর্থাৎ যেখানে ভগবানের অনুভবের বিনিময় পরস্পরের মধ্যে হইতে পারে। তারপর নাম রাখিলেন "চৌগান" অর্থাৎ মুক্ত ময়দান যেখানে সকলেই স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের জন্য যায়। এই সাধন-মণ্ডলীতেও সকলে যাইবেন, নিজ নিজ সম্প্রদায়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিজেদের অধ্যাত্ম স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য। অম্বরের রাজা ভগবান দাস (মানসিংহের পিতা) দাদূকে

এইরকম সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা কি জিজ্ঞাসা করিলে দাদূ বলিলেন,—"তোমার নগরে কেন মাঝে মাঝে উদ্যান ও ময়দান রাখিয়াছ?" তারপর ইহারা পরব্রহ্মের উপাসক বলিয়া এই মণ্ডলীর নাম সকলে দিলেন ব্রহ্ম-সম্প্রদায়। মাধ্বীদের মধ্যে পূর্ব্বেই একটি ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ছিল বলিয়া দাদূ নামটি পরিবর্ত্তিত করিয়া নাম দিলেন—"পরব্রহ্ম সম্প্রদায়"। (এই বিষয়ে বিশ্বভারতী জর্ণালে আমার লিখিত দাদূর ব্রহ্ম-সম্প্রদায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

দাদূর শিষ্য জনগোপাল তাঁর "জীবনপরচী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—দাদূ মুসলমান বংশোচিত সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি ছাড়িয়া দিলেন অথচ হিন্দুদের সঙ্কীর্ণ বিধি-আচরণাদি হইতেও দূরে রহিলেন।

> তুর্ককী রাহ খোজ সব ছাড়ী
> হিন্দুন কে করণীতে পুন ন্যারী॥

দাদূ ষড়্দর্শনের পথ ছাড়িয়া ভগবদ্রঙ্গে নিশিদিন রঙ্গিয়া রহিলেন। তিনি বাহ্য সাজসজ্জা ভেখ ও সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি না মানিয়া পূর্ণব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া জানিলেন। দেবদেবী পূজা-পদ্ধতি তীর্থ ব্রত সেবা জাতি কিছুই মানিলেন না।

> ষট্ দর্শন সে নাহি সংগা।
> নিশ দিন রহে রামকে রংগা॥
> ত্যাগে ভেখ পন্থপংথ ন মানী।
> পূরণ ব্রহ্ম সত্যকরি জানী॥
> দেবী দেব ন পূজা পাতী
> তীরথ, বরত ন সেবা জাতী (জনগোপালকৃত জীবনপরচী)।

ইহাতে বাহ্যপ্রতীক লিঙ্গমূর্ত্তি আদি পূজার স্থান নাই বলিয়া এই সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম-সম্প্রদায় বলিত (সুন্দরসার ১৩ পৃঃ, পুরোহিত হরিনারায়ণ কৃত)। ইহাতে বিস্তর হিন্দুসাধক ছিলেন, মুসলমান সাধকদের সংখ্যাও কম নহে। কাজী কাদমজী, সেখ ফরিদজী, কাজী মহম্মদজী, সেখ বহাংদজী, বখনাজী, রজ্জবজী প্রভৃতি মুসলমান এই দলে ছিলেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে দাদূ বিবাহিত হইয়া এই মণ্ডলী গঠনে হাত দেন। কবীরের মত তাঁরও আদর্শ ছিল সাধকরা সব বিবাহিত গৃহী হইবেন। দাদূর দুই পুত্র গরীবদাস ও মসকীণ দাস। তাঁর দুই কন্যা নানী বাঈ ও মাতা বাঈ। পারিবারিক জীবনেও দাদূ খুব স্বাধীনতা দেওয়া ভাল মনে করিতেন। দাদূর ইচ্ছা ছিল তাঁহার কন্যারা বিবাহিত হইয়া ধর্ম্মসাধনা করেন। কন্যারা ব্রহ্মচারিণী থাকিতে চাহিলেন। দাদূ বুঝাইলেন, কিন্তু বাধা দিলেন না। এই দুইটি যুবতী কন্যাকে অবিবাহিতা দেখিয়া রাজা ভগবানদাস একটু অসন্তোষ জানান। দাদূ তাই জয়পুর রাজ্য ছাড়িয়া গেলেন।

দাদূর আকাঙ্ক্ষা ছিল—

> ইহাতে জ্ঞানী অজ্ঞান উচ্চ নীচ সকলেরই অনুকূল ধর্ম্মের একটি সরল ও মহৎ আদর্শ সকলেরই কাছে স্থাপিত হউক। ইহাতে উপাসনারীতি প্রবর্ত্তিত হইল সরল ও উচ্চ ধরণের, যাহাতে অতি সহজেই মানুষ পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। এই সাধনমণ্ডলে প্রত্যেক নরনারীর জ্ঞানে ও সাধনায় সমান অধিকার ছিল।
>
> (চন্দ্রিকাপ্রসাদ ত্রিপাঠী কৃত দাদূ পন্থী সাহিত্য ৪র্থ পৃষ্ঠা)

এই সাধনামণ্ডলীস্থাপনে সকল লোকই দাদূর উপর চটিয়া গেলেন। দাদূ বলিয়াছেন—

> আমি যখন হইতে সাম্প্রদায়িকতা ছাড়িলাম তখন হইতে সকল লোক চটিয়া গেলেন। তবে সদ্গুরুর প্রসাদে আমার না আছে কোনো হর্ষ না আছে কোন শোক।
>
> দাদূ জবথৈঁ হম নির্পখ ভয়ে সবৈ রিসানে লোক।
> সত গুরুকে পরসাদথৈঁ মেরে হরখ ন শোক॥

বিশ্বাসে সাঁচ্চা ও ভাবে গভীর সাধনার্থীর সবারই জন্য এই মণ্ডলীর দ্বার মুক্ত রহিল। উচ্চনীচ জাতি বলিয়া কোন বাধা রহিল না। পুরুষ ও নারী, ধনী ও দরিদ্রের কোন ভেদ ইহারা মানিলেন না। ইহাদের মধ্যে, কেহই ধন মান পদমর্য্যাদার জোরে নেতৃত্ব লাভ করেন নাই। সত্যের, ভাবের ও সাধনার দাবীই ছিল সব চেয়ে বড় দাবী।

> এই সাধনা ছিল সর্ব্বমানবের মধ্যে প্রেম ও মমতা প্রচার করিতে। এই ধর্ম কাহাকেও আঘাত করে না এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের অপ্রেম ঘটিতে দেয় না। এই ধর্ম জগতের সকল মানবকে এক পরম পিতার সন্তান বলিয়া জানে, কাজেই সকলকে এক পরিবার ভুক্ত মনে করিয়া সর্ব্বত্র ভ্রাতৃভাব ও ভগ্নীভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। বিচ্ছিন্ন মানবজাতিকে পরস্পরের প্রেমে মিলিত করিয়া এই ধর্ম সকলকে নব উদ্যমে নব নব কল্যাণের নিমিত্ত অগ্রসর করিতে চায়। (দাদূ পন্থী সাহিত্য ৪র্থ পৃষ্ঠা)

> ইহাতে একমাত্র নির্ম্মল ব্রহ্মের উপাসনাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। নিরঞ্জন নিরাকার অদ্বৈত ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি, প্রেমের সহিত ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রহ্ম ধ্যান ও ব্রহ্ম সমাহিত হইয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহারা জাতি পংক্তির রীতি মানেন না। বাহ্যপূজার পদ্ধতিকে ইহারা সম্মান করেন না। অন্তরের মধ্যে পূজাই মুখ্য ও শ্রেষ্ঠ পূজা। (ঐ ৪র্থ পৃষ্ঠা)

দাদূর শিষ্য সুন্দরদাস দাদূর পরিচয়ে লিখিয়াছেন—

যিনি জাতি, কুল, আর বর্ণাশ্রমকে মিথ্যা নাম বলিয়াছেন, সেই দাদূ দয়াল আমার প্রসিদ্ধ সদ্‌গুরু, তাঁহাকে আমার প্রণাম।

জিনি জাতি কুল অরু বর্ণ আশ্রম কহে মিথ্যা নাম হৈ
দাদূ দয়াল প্রসিদ্ধ সদ্‌গুরু তাহি মোর প্রণাম হৈ ॥

(সুন্দরদাস, গুরু উপদেশ অষ্টক)

সাধারণ লোকের বিরুদ্ধতার ভয়ে বীরের মত তিনি বর্ণাশ্রম প্রভৃতির উপর আঘাত করিতে ভীত হন নাই।

যখন হিন্দু মুসলমান দুইপক্ষ ঝগড়া করিয়া মরিতেছিল তখন দাদূ দয়ালের উপদেশ দশদিক উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হইল। সুন্দর বলেন, এই পন্থই পরব্রহ্মের সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

দাদূ দয়াল মহাদিশি প্রকট ঝগড়ি ঝগড়ি মৈ পথ থকি।
কহি সুন্দর পংথ প্রসিদ্ধ য়হ সম্প্রদায় পরব্রহ্মকী ॥ (ঐ)

দাদূ গেরুয়া পরিতেন না। বিভূতি লাগাইতেন না। তিলক মালা ধারণ করিতেন না। মুসলমানী পদ্ধতি ত্যাগ করিলেন, হিন্দুর সঙ্কীর্ণতাও গ্রাহ্য করিতেন না।

ভগবাজী ভাবৈ নহিঁ, বিভূতি লগাবৈ নহিঁ
টীকা মালা মানৈঁ নহিঁ।
তুরকৌ তো খোদি গাড়ী হিন্দুনকী হদ্দছাড়ী…

(রজ্জবজী কৃত দাদূ দয়াল ভেটসবৈয়া)

ইহার একশত বৎসর পরে দাসজীকৃত পন্থপ্রখ্যা গ্রন্থেও দেখি এই মণ্ডলী খুব বিশুদ্ধ ছিল, আজও ইহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত হইতে পারে নাই। ইহাদের উত্তরাধী নামে শাখা অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে একটু-আধটু মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহে, কিন্তু বিরক্ত, নাগা প্রভৃতি দলের শাখা পাওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও রজ্জবজীর শাখাতে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে যিনি সবচেয়ে বড় সাধক হন তিনি সকলের নেতৃপদে নির্ব্বাচিত হন।

কবীরের ছিল যাহা আপন জীবনের সাধনা এবং যাহা কবীর কেবল বন্ধু-বান্ধব কয়েকজনকে লইয়া সাধনা করিতেন দাদূ তাহাই লইয়া একটি সাধনার মণ্ডলী তৈয়ার করিলেন এবং কয়টি শতাব্দী ধরিয়া সেই আদর্শ যে নির্ম্মলভাবে আজও চলিয়া আসিতেছে সে-কথা আজ রামমোহনের মণ্ডলীগত সাধনার শতবার্ষিকীর দিনে স্মরণীয়। ইহারাও জাতি-পংক্তি, দেবদেবী, ব্যর্থ আচার নিয়ম, বাহ্য চিহ্ন, ব্রতউপবাসাদি, পুরুষ ও নারীর অধিকার পার্থক্য, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য প্রভৃতি মানিতেন না।

দাদূর শিষ্য রজ্জবের সময় এই আদর্শটি আরও ভাব ও সাধনার ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া উঠিল। রজ্জব ছিলেন ভক্ত ও ভাবুক সাধক, শুষ্ক বৈরাগ্য তাঁর পথ নয়। তাই দেহকে বৃথা বহু দুঃখ দিয়া জীবনকে শুষ্ক করিয়া যে সাধনা তাহা তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। রজ্জব বলিলেন—

মনের মধ্যে রহিল অপরাধ, তাহার নাগাল না পাইয়া হাতের কাছে বেচারী দেহকে পাইয়া তাহার উপর ঝালঝাড়া কেন? পল্লী-মাতা পরের সঙ্গে ঝগড়ায় হারিয়া নিজের অসহায় ছেলেকে ধরিয়া ঠেঙায়, এও যেন তাই। বেচারা কেবল মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবে 'হইল কি?' গর্ত্তের মধ্যে রহিল ভয়াল সাপ, তার নাগাল না পাইয়া গর্ত্তের উপরে কেবল আঘাত করিয়া লাভ কি? দেহকে কসিয়া তেমনি নিষ্ফল সাধনা। হে রজ্জব, কেন এমন কর? ভগবান অসহায় দেহখানিকে তোমার সাধনার সহায় করিয়া যে তোমার হাতে দিয়াছেন তার উপর অকারণ উৎপীড়ন না করিয়া তাহাকে প্রেমের সহিত প্রতিপালন কর।

কসি দেহে ন মারি সকে বাবী বীচ সর্প ভয়াল।
সো রজ্জব কতুঁ করহিতো প্রাণকুঁ প্রেমপ্রতিপাল ॥

সাধনার জন্ম পূর্ণভাবে আমাদের ভিতরকার সব শক্তি ও সব সম্ভাবনাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল রজ্জবের মত। এক অংশের পোষণের নিমিত্ত অন্য অংশকে শুকাইয়া নষ্ট করা কখনো সাধনা নহে। তাই রজ্জব কহিলেন—

দয়া জিনিষটা ভাল তবু তাহা পোষণ করিতে গিয়া যদি কেহ পৌরুষকে বধ করিল তাহাও ত দয়া হইল না তাহা হত্যা করা হইল, ইহা কিছু ধর্ম্ম নহে। এ যেন ভাইকে মারিয়া ভাইকে পোষণ করা, এই কথাটা বুঝিয়া দেখিলে আমরা এরূপ করিতে অত্যন্ত দুঃখবোধ করিতাম। বাঘ বিড়ালাদি জন্তু দুই-একটি বাচ্চাকে শক্তিশালী করিতে অন্য বাচ্চাগুলিকে মারিয়া খাওয়ায়—তেমনি জীবনের কতক-গুলি ভাবকে মারিয়া দুই-একটি বিশেষ ভাবকে শক্তিশালী করার যে সাধনা—বলিহারী যাই সেই সাধনাকে।

দয়া লাগি নরপণ বধৈ ঘাতক ধরম ন কোয়।
ভাই কূঁ হতি ভাই কূঁ পোখে সমঝে বহু দুখ হোয় ॥
বচ্চ মরি বচ্চ খিলাবৈ জৈসে বাঘ বিলাড়ী।
ভাব মারি ভাবকূঁ সাধৈ সাধনকী বলিহারী ॥

সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ ছাড়িয়া মৈত্রীতে সব সাধনা সুসঙ্গত করিয়া বৈচিত্র্যের দ্বারা পরিপূর্ণতার সাধনায় ভগবানকে ভজনা করিলে কি সুন্দরই না হইত। কিন্তু এ যে দেখিতেছি "হিন্দুয়ানীর মধ্যেই হিন্দু খুশী, মুসলমানীর মধ্যেই মুসলমান খুশী, ওরে রজ্জব সেই প্রেমময় যে এক, তাঁর তো এই দুয়ের মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি নাই।

হিন্দুগতি হিন্দুখুসী তুরক তুরকী মাহিঁ।
রজ্জব আশিক এক হৈ তিনকে দুন্দ্ব নাহিঁ ॥

তখন রজ্জবকে সকলে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি তবে সাধনার নানা ভাব নষ্ট করিয়া পৃথিবীতে কেবল একটিমাত্র পথ রাখিতে চাও?" রজ্জব কহিলেন—"তবে তো বাঘবিড়ালের পদ্ধতিই

হইল। সব বাচ্চা মারিয়া একটি বাচ্চা পুষিলাম মাত্র। পৃথিবীতে যত মানুষ তত ধর্ম। সকলের বিভিন্নতাকে মৈত্রী ও সুসঙ্গতি দ্বারা এক করিয়া একটি পরিপূর্ণ সাধনার বিচিত্র সৌন্দর্য্যে সুন্দর ঐক্যকে গড়িয়া তোলা।

জগতে চৌরাশী লক্ষ লোক (জন সংখ্যার জ্ঞান তাঁর এইরকমই ছিল)—এই চৌরাশী লক্ষ সম্প্রদায় রচনা করিয়া সেই বিশ্বম্ভর জগতে বৈচিত্র্য রচনা করিলেন। জনের জনের বিচিত্রতা দ্বারা নিখিল মানবের সাধনা বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইল।

চৌরাসী লক্ষ সম্প্রদা করি বিসম্ভর সোয়।
রজ্জব বৈচিত্র রচিয়া জনজন বৈচিত্র হোয়॥

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলের সব সাধনা লইয়া এই বিশ্বময় একটি মহাপ্রণতি এক ব্রহ্মের চরণের দিকে চলিয়াছে। নানাজনের সাধনার বিন্দু বিন্দু লইয়া সাধন রসের সিন্ধু হইয়াছে। এই বিন্দুগুলি না মিলিলে প্রত্যেকে শুকাইয়া জগৎময় একটি বিরাট মরুভূমি হইত মাত্র।

এঁকৈ বন্দগী বিশ্বমে এঁকৈ ব্রহ্ম মিলি জায়।
বুংদ বুংদ মিলি রস সিন্ধু হৈ জুদা জুদা মর জায়॥

কিন্তু চারিদিকে তখন ঘোর অজ্ঞান বিরুদ্ধতা, তার মধ্যে এই সত্য কয়জন বুঝিবে? তবু রজ্জবের ভয় নাই। তিনি বলিলেন—যুগে যুগে বারবার সত্যই মিথ্যাকে আঘাত করিয়া জয়ী হইয়াছে। হে রজ্জব, ত্রাস করিও না। এই মহাসত্যের ব্যতিক্রম কখনও হইবার নহে।

সাচ সজা দে ঝমু ঠকুঁ জুগি জুগি বারংবার।
রজ্জব ত্রাস ন কীজিয়ে তামে ফের ন ফার॥

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ আশ্রয়ে না লুকাইয়া যাহারা সত্যের উন্মুক্ত সমরক্ষেত্রে নির্ভয়প্রাণে আসে তাহারাই বীর। এই জগত তাহাদের সাধনার সমরভূমি, এখানে প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহারা মনে করে যে প্রভুর জন্য তারা লড়িতেছে তাই সদাই প্রভুর সাথে সাথে আছে।

ভেখ পখ ভাবৈ নহী সত্য নিরন্তর প্রাণ।
রজ্জব রহে সনাথ ঘর সূরা জঙ্গ মৈদান॥

এই বীরেরাই নূতন জগৎকে সৃষ্টি করিবে। বীর বিনা এই সাধনার জগৎ রচিত হইয়াই উঠিতে পারে না। হে রজ্জব কোটি কাপুরুষ মিলিলেও তাহারা তাহাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া এক পা বাহিরে যাইতে সাহস করে না।

সূরা বিনা সংসার কুঁ বিরচ্যা কধী ন জায়।
রজ্জব কায়র কোটি মিলি বাহর ধরে ন পায়॥

যে সত্যের জন্য বীরেরা প্রাণ দিতে পারে সে সত্য কখনো ক্ষুদ্র হইলে চলে না। তাই রজ্জবের সত্যও ছিল বিশাল। "সব সত্যের সঙ্গে যদি মেলে তবেই তাহা সত্য নহিলে তাহা মিথ্যা। রজ্জব এই সত্য কথাটা বলিয়া দিল। এখন চাই তুষ্ট হও চাই রুষ্ট হও।"

সব সাচ মিলে সো সাচ হৈ না মিলে সো ঝূট।
জন রজ্জব সাচী কহী ভাবৈ রিঝি ভাবৈ রূঠ॥

কুরাণ পুরাণ বেদশাস্ত্র রজ্জব মানিতেন না, তিনি বলিলেন—

হে রজ্জব, বসুধাই সব বেদ আর অখিল সৃষ্টিই কুরাণ। পণ্ডিত ও কাজীরা কতকগুলি কাগজপত্র দপ্তরকেই অখিল জগৎ মনে করিয়া ব্যর্থ হইতেছেন ও ব্যর্থ করিতেছেন। বিশ্বসৃষ্টি হইল শাস্ত্র। ওরে রজ্জব শুষ্ক কাগজ কি পড়িবি সেখানে চাহিয়া দেখ নিত্যই তাজা জ্ঞান।

রজ্জব বসুধা বেদ সব কুল আলম কুরাণ।
পণ্ডিত কাজী বৈখড়ে দফতর ভুলিয়া জান॥
সৃষ্টি শাস্তর হৈ সহী বেত্তা করে বখান।
রজ্জব কাগজ ক্যা পঢৈ নিতহি তাজা জ্ঞান॥

সাধকের অন্তরের কাগজে প্রাণের অক্ষরে লেখা যে শাস্ত্র তাহা তো কেহ পড়ে না। মরমের সঙ্গীত ইহারা শুনিতেই পায় না।

সাধন হার কী অংতর কাগজ প্রাণ অক্ষর মাহিঁ,
মহ পুস্তক কোউ বিরলা বাঁচে মর্ম শব্দ ন সুনাহিঁ॥

কোটি মানব মিলিয়া যে বিরাট মানব জগৎ (ব্রহ্মাণ্ড) তাহাতে বিরাট অনন্ত বেদ ঝলমল করিতেছে। বাহিরের বাহ্য আলো নিভাইয়া দিলে মরমী তার মরম পায়।

প্রাণ কোটি ব্রহ্মাণ্ড মে ঝলকে অনন্ত বেদ।
বাহরা জোত বুঝায়কে ভেদী পাবৈ ভেদ॥

হে হিন্দু, হে মুসলমান সেই জীবন্ত শাস্ত্র পড়িয়া দেখ। বিশ্বনিখিলে এক মহাবিদ্যাই পাইবে, পড়িলেই জীবন্ত জ্ঞানে পণ্ডিতপ্রাণ হইয়া উঠিবে। শুষ্ক মৃত কাগজে মৃত অক্ষরে যে শাস্ত্র তাহার পাঠক মিলে অনেক। ঘটে ঘটে যে প্রাণময় বেদ, হে রজ্জব তাহা দেখ পড়িয়া।

প্রাণ পুস্তক দেখহু হিন্দু মুসলমান।
সবমে বিদ্যা একহি পঢ়ে সু পণ্ডিতপ্রাণ॥
কাগজ মৃত্যু অক্ষরই পাঠক মিলে অনেক।
বেদ ঘট ঘট প্রাণমই রজ্জব বাঁচকে দেখ॥

এই মহাসত্য যাঁহাদের হৃদয়ে আসিয়াছে তাঁহাদের সকলে যদি সাধনার ভ্রাতৃত্বে মিলিতে না পারেন, তবে সকলেরই সাধনা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাই তাঁহারাও তখন নানা মতের নানা সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এই এক ভাবের ভাবুকদের লইয়া একটি সত্যসাধনার মণ্ডলী রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন।

একেলা কাহারও হৃদয়ে যদি এই প্রেম আসিয়া থাকে তবে তাহা শুধু ব্যর্থই হইবে। কারণ প্রত্যেকটি বিন্দুর মধ্যে যে সিন্ধুর ডাক আসিয়াছে। সেই বিরহী বিন্দুগুলি যদি একা একা সিন্ধুর দিকে চলে, তবে কি তাহারা প্রত্যেকেই ব্যর্থ হইবে না? তাই সিন্ধুবিরহী একটি বিন্দু অপর সকল বিন্দুকে ডাকে কারণ সব বিন্দু একত্র হইতে পারিলেই সংযোগে একটি ধারার গতি মিলিতে পারে। একেলা কোন বিন্দু পৌঁছিতেই পারে না। মাঝের ব্যবধান ও পথই তার সব শক্তি সব জীবনটুকু শুকাইয়া মারিবে। আবার সব বিন্দু যদি একত্র হইতে পারে তবে সেই ব্যবধানকে, সেই পথকে নিজেদের পরিপূর্ণতায় প্লাবিত করিয়া দিতে পারে। হে প্রভু তোমার দয়াতেই তোমার দরশ মেলে—বিন্দু বিন্দু সাধনা মিলিয়া আজ হরিসাগরে চলিয়াছে। এই সাধনার জীবন্ত ধারাই তো জীবন্ত গঙ্গা। এই গঙ্গায় স্নান না করিয়া মৃত গঙ্গায় স্নান করিলে লাভ কি?

প্রীতি অকেলী ব্যর্থ মহাসিংধবিরহী বিন্দ হোয়।
বুংদ পুকারৈ বুংদ কো গতি মিলৈ সংজোয়॥
অকেল বুংদ পহুঁচৈ নহী হুবৈ পংথ জিং জোয়।
পংথ ভর ভরে এক হোয় দরস দয়া প্রভু তোয়॥
বুংদ বুংদ সাধন মিল হরি সাগর জাহিঁ।
প্রাণ গংগা না পহুঁচা মুরদ গংগ সমাহিঁ॥

এই যে সাধকদের সৎসঙ্গ ইহাই তো সত্য তীর্থ। এখানে স্থান এবং কাল অতিক্রম করিয়া সব ধারা আসিয়া মিলিত হইতে পারে। যুগযুগের ধারা এখানে মিলিয়া অন্তহীন পথে সদা বহিয়া চলিয়াছে।

সত্য তীরথ্‌ সৎসঙ্গ হৈ স্থান কাল লংঘি জায়।
জুগ জুগকে ধারা মিলে অংতহীন পদ ধায়॥

তাঁদের সময়ে দেশদেশান্তরের, যুগযুগান্তরের সব ধারা মাত্র কল্পনার কথা ছিল। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত পৃথিবীতে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দুদের চিন্তার ধারা নানাযুগের মধ্য দিয়া তার বিশিষ্টতা লইয়া চলিয়া আসিতেছিল, শক হূণ প্রভৃতি জাতি ভিন্ন ধারা আনিলেও তাহারা তেমন বিরুদ্ধভাব লইয়া আসে নাই কাজেই হয় তারা চলিয়া গিয়াছে নয় তারা অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা যখন আসিল তখন হিন্দু তার জীবনী শক্তি হারাইয়াছে। তখন ভারতের খণ্ড খণ্ড জাতি, খণ্ড খণ্ড ধর্ম্ম, খণ্ড খণ্ড রাজ্যকে প্রাণযোগে এক করিবার শক্তি আর তার নাই। তখন তার সৃষ্টির শক্তি নাই, তখন সে কেবল আচার-বিচারের জঞ্জালকে নিত্য বাড়াইতেছে। এমন সময় বিরুদ্ধ শক্তি ও ভাব লইয়া মুসলমান আসিল, স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দু পরাভূত হইল। ভারতের এই নূতন জাতির সমাগম এখন আর কেবলমাত্র এমন একটি স্বতন্ত্র শক্তির সমাগম নয় যে কোনো রকমে ইহাতে পরিপাক করা চলিতে পারে। এ একেবারে বিরুদ্ধ-শক্তির সমাগম। তাই উভয়দিকে অনেক দুঃখ চলিল। এই দুঃখে একদল প্রাকৃতিক নিয়মে অপরকে পরাভূত করিয়া নিজেদের আদর্শ আত্মশক্তিতে জয়ী করিতে চাহিল। মধ্যযুগে যেমন কবীর, নানক, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি সাধকেরা যোগের কথা ভাবিতেছিলেন, তেমনি আবার স্বাভাবিক নিয়মবশেই হিন্দু-মুসলমান উভয়দলে কতক কতক ধর্ম্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান লোকও অপর পক্ষকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া নিজেদের আদর্শকেই জয়ী করিতে চাহিয়াছেন। সমর্থ রামদাস স্বামী, ভূষণ কবি প্রভৃতি শিবাজী ছত্রশাল প্রভৃতিকে লইয়া হিন্দুদের দিক হইতে সে চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমানের দিক হইতেও সে চেষ্টা কিছু কম হয় নাই। আওরংজেব তাঁদের আদর্শ। কিন্তু একে মারিয়া অন্যের জয়ী হওয়া ভারতের পন্থা নহে —তাই উভয় শক্তিই নিজেদের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য বাহির হইতে আগত অপর এক শক্তির নিকট হারাইল। স্বভাবের নিয়মে যাঁহারা সে যুগে নিজেদের শক্তিকেই কেবল জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারাও সামান্য শ্রেণীর লোক নন। তাঁহারা সকলেই গভীরভাবে নিজেদের সাধনাকে সত্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের পন্থা হইল যোগের পন্থা। সে পথ তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়া সত্যকে অগ্রসর করিতে পারিলেন না। যদিও তাঁহারা স্বাভাবিক মনুষ্য স্বভাব নিয়োজিত হইয়াই এই পথ ধরিয়াছিলেন।

যাঁহারা আরও গভীর সাধক তাঁহারা নিজেদের দলের জয়ই বড় করিয়া না দেখিয়া উভয় সত্যকে যোগে বড় করিয়া দেখিতে চাহিলেন। তাঁহারাই ভারতের যোগ-দৃষ্টির মনীষী। সকল দলের একটু একটু বাহ্য চিহ্ন মাত্র লইয়া নানাদলের বাহ্য চিহ্নের একটা খিচুড়ী পাকান মাত্র তাঁহারা করেন নাই। আকবরের ইচ্ছা ছিল অতি সৎ, অথচ কবীর প্রভৃতি সাধকদের মত গভীর দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। তাই তিনি দাদূ প্রভৃতি সাধকদের সঙ্গে মিশিয়া খানিকটা দৃষ্টি লাভ করিতে চাহিয়াছেন এবং খানিকটা নানা সম্প্রদায়ের বাহ্য চিহ্ন ও পদ্ধতিকে জোড়াতাড়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দারা শুকো আরও গভীর লোকে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের বাহ্য প্রতীকগুলি লইয়া ধর্ম্মের একটা অর্থহীন কিম্ভূতকিমাকার একাকার মাত্র তিনি করিতে যান নাই। তাঁহার সভা সাহিত্য কাব্য ও ধর্ম্মালোচনায় সদাই ভরপুর থাকিত। একদিকে ভামিনীবিলাস রসগঙ্গাধর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের কবি জগন্নাথ মিশ্র, অন্যদিকে ভাষা কবি শম্ভুনাথ সিংহ, সরস্বতী শর্ম্মা, বেদাঙ্গ রায় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। তাঁহারই প্রভাবে আওরংজেবের সময়েও হিন্দী সাহিত্য একেবারে মরিয়া যায় নাই ও আরংজেবের পুত্র আজম শাহ বিহারী কবির এক সংগ্রহ সম্পাদন করেন। তুলসী কবির সংগৃহীত পঁচাত্তরটি কবির কাব্যসংগ্রহ "কবিমালা", তিনি যত্নপূর্ব্বক আগাগোড়া পড়িয়াছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে দাদূপন্থী কবিরপন্থী সাধুদের সঙ্গে তাঁর গভীর আলাপ চলিত। ভক্তবীর ভান, লাল দাস প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনায় দারার দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন।

পঞ্জাবের ভক্তসাধক বাবালাল সর্ব্বদাই দারার সঙ্গে

ধর্মালোচনার জন্ম যাইতেন। হিন্দু মুসলমান সাধনার যোগসম্বন্ধে তাঁর সুন্দর ও গভীর সব স্বপ্ন ছিল। মৃত্যুতে সবই অপূর্ণ রহিয়া গেল।

যে সব মনীষীরা তাঁহাদের সাধনালব্ধ গভীর দৃষ্টির দ্বারা ভারতের সত্য যোগের পন্থা বাহির করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায় হইতে আরও অনেক বড় এমন একটি মহান্ সত্যকে আদর্শ রূপে ধরিয়াছেন যাহা সাধন করিতে নিজেদের অনেক ক্ষুদ্র পরিচয় ছাড়িতে হয়। এইখানেই সমসাময়িক এমন অনেক ক্ষুদ্র লোকের বিরুদ্ধতা ও প্রতিকূলতা তাঁহারা পাইয়াছেন যাঁহারা ভারতের যথার্থ সমস্যাকে কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। তবু তাঁহারা এইসব ক্ষুদ্রাত্মাদের কাছে সস্তা মহাপুরুষ না হইয়াই যথার্থ সত্যপালনের কঠিন দুষ্কর ব্রত দিনরাত্রি ধারণ করিয়া নিন্দা বিরুদ্ধতার শত শত আঘাত নিত্য সহিয়া নিজেদের তপস্যাকে অগ্রসর করিয়া চলিয়াছেন। রামমোহনের তপস্যাও ছিল এই রকমের। তাই তাঁহার সমসাময়িক, এমন কি তাঁহার কালের অনেক পরে আজিও অনেকে তাঁহার যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই।

সমসাময়িক কালে বার বার অসম্মান অপমানের ভূষণে ভূষিত হওয়াই মহাপুরুষের লক্ষণ। এই লক্ষণ সকল যুগের মহাপুরুষদের সম্বন্ধেই খাটে। মহাপুরুষের লক্ষণ বুঝাইতে গিয়া ভক্ত রজ্জবজী বলিয়াছেন—

মহাপুরুষেরা সকল বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া অন্ধকারকে আলোকময় করিয়া দেন। অমূল্য মানুষ জনমে তাঁহারা প্রেম ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের সাধনায় সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়, দৈন্য সংশয় দূরে পলায়ন করে। প্রেমে ও ভাবে সকল চিত্ত ভরিয়া উঠে, হৃদয়ে পরমানন্দ জাগিয়া উঠে।

মহাপুরুষ নিহবন্ধ করে তিমির করে প্রকাশ।
অমোল মানুষ জন্মমেঁ থাপৈ প্রেম বিশ্বাস ।।
মুক্ত হোয় বন্ধ সব দৈন্য সংসৈ ভাগে।
প্রেম ভাব সব চিত্ত ভরে পরমানন্দ উর জাগে

সকলের হৃদয়ের মধ্যে সুপ্ত প্রেমকে মহাপুরুষেরা আপন হৃদয়ের প্রেম দিয়া জাগাইয়া তোলেন, জাগাইবার আর উপায় ত নাই।

প্রেম বিনা প্রেম জাগে না। অগ্নিই অগ্নিকে জাগাইতে পারে। বীরই বীর্য্যকে জাগায়, ত্যাগীই ত্যাগকে জাগায়, হৃদয় হইতে হৃদয়ের ভাব সঞ্চারিত হয়। সাধনাই সাধনাকে জাগায়। সতী ও যতীকে দেখিয়াই প্রেম ও আরাধনা জাগিয়া উঠে।

প্রেম ন জাগে প্রেম বিন আগ জগাবৈ আগ।
শূরা শূরপন জগাবৈ ত্যাগী জগাবৈ ত্যাগ ॥
উরসে ভাব উর সংচরে সাধন জগাবে সাধ।
সতী জতীকো দেখিকে জাগে প্রেম আরাধ ॥

মানবের সকল বন্ধন খুলিয়া ফেলিয়া সেই বন্ধন-পাশ জ্বালাইয়া (bonfire) মহাপুরুষেরা অখিল ভরিয়া যে মহোৎসব করেন দুষ্ট ও নীচেরা তাহাতে দগ্ধ হইয়া মরে এই সৌভাগ্য তাহারা যেন সহিতেই পারে না।

মহোৎসব অখিল ভর ভয়ো বন্ধ পাশ জলাই।
দুষ্ট কমীনা দহি মরে সৌভাগ্য সহা ন জাই ॥

যুগে যুগে মহাপুরুষেরা এই দুঃখ পাইয়াছেন।

এই সব নীচ কুকুরেরা গোরখ দাদূ সকলের বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়াছে। কুত্তার সব ভাবই এই। কবীর, রবিদাস ও সকল সাধকের বিরুদ্ধেই এই চীৎকার চলিয়াছে। নীচের প্রাণই নীচ।

ভোঁকি হঁ গোরখ দাদূকুঁ কুত্তোকী য়হ বান।
কবীর রৈদাস ঔর সব সন্তকুঁ ওছকা ওছ প্রাণ ॥

তবে এই চীৎকারে একটা লাভ আছে বটে, যখন সবেই নিদ্রিত তখন কোনো মানুষ আসিলে লোকে টের পায় কুকুরের চীৎকার শুনিয়া। তেমনি অন্ধকার নিদ্রিত যুগে অনেক সময় মহাপুরুষদের আগমন লোকে টেরই পাইত না যদি এই-সব নীচরা বিরুদ্ধতার চীৎকার করিয়া সকলকে জাগাইয়া না দিত।

কখন যে মহাপুরুষদের উদয় হয় অনেক সময় নিদ্রায় অন্ধ নয়ন তাহা দেখিতেই পায় না। নীচ ও অধমদের এই বিরুদ্ধতার চীৎকার শুনিয়াই অচেতন মানব সচেতন হইয়া মানবের আগমন অনুভব করে।

মহাপুরুষ উদয় কদি অংধ নৈন নহিঁ জোয়।
নীচ ওছকা শোর সুনি অচেত সুচেত হোয় ॥

মহাপুরুষ সত্য কি না বুঝিতে হইলে রজ্জবের প্রথম প্রশ্নই হইল এই সমসাময়িক কুকুরেরা তাহার বিরুদ্ধে সমবেত চীৎকার করিয়াছিল কি না।

কিন্তু এত বিরুদ্ধতাতেও মহাপুরুষদের আনীত মহাসত্য পরাভূত হয় না। তাঁহাদের সাধনার সত্য বিরুদ্ধতার বিপুল পরিমাণকে বিন্দুমাত্র ভস্ম করে না।

সমুদ্রের তলে সাগরপ্রমাণ জলের সকল বিরুদ্ধতা জয় করিয়া বাড়বানল জ্বলে। মহাগিরির উচ্চ শিখরে নিম্নগামী জল উঠিয়া সেখান হইতে ঝরিয়া পড়ে। ভাব ও প্রীতি কিছুতেই মরে না।

সিন্ধু বারি বড়বানল জলে বারি বিরোধ জীতি।
মহাগিরি শির নিঝর ঝরে মরে ন ভাব প্রীতি।

এই সবগুলি লক্ষণই রামমোহনের সম্বন্ধে খাটে। তাঁর সাধনা তাঁর সত্য মরিবার নহে। বিরুদ্ধতা তিনি যথেষ্ট পাইয়াছেন এবং এই বিরুদ্ধতাই আমাদের অচেতন মনকে সচেতন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে যে, মহাপুরুষ

আসিয়াছেন। আজও তাঁর সত্য তাঁর সাধনা কাজ করিয়া চলিয়াছে কারণ এখনো বিরুদ্ধতা চলিয়াছে।

বিরুদ্ধতাকে তিনি ভয় করেন নাই তবু সাধনা সাধনাকে খোঁজে। সাধনা সদাই দৃঢ় ও গভীরভাবে কাজ করিবার জন্য সাধনাকে খোঁজে।

বারির সঙ্গে বারি মিলে, বলিয়াই সাগরে সব নদী চলিয়াছে। হে রজ্জব! পূর্ণ পূর্ণকে চায়, তার ভাবের অনুসারী।

নদী নাথ আব হি নদী বারি ভার তই বারি
রজ্জব পূর্ণ পূর্ণ কুঁ মিলে ভাব ভাব উনহারী॥

সিন্ধুর দিকে যেমন নদী চলে তেমনি সাধক ও ভাবের ধারা চলিয়াছে। সকল বন্ধন ও মান ত্যাগ করিয়া সেখানে আপনাকে মিলাও। যুগযুগগামী সাধনা চলিয়াছে, লোকলোকের সাধক চলিয়াছেন। ভাব ও ভক্তির এই বিষধারা ধরিয়া ভগবানের সহিত গিয়া মিলিত হও।

সংত ভাবকী ধারা চলে সিংধ মে নদী সমান।
ওই মিলাবো আপকুঁ তজি সব বন্ধন মান॥
জুগ জুগগামী সাধন চলে লোক লোক কা সংত।
ভাব ভক্তি ধারা ধরি জায় মিলো ভগবংত॥

রামমোহনের ব্যক্তিত্বে ও সাধনার মণ্ডলে রজ্জবের মহাপুরুষ ও সাধনার মণ্ডলের পূর্ণ পরিচয়ই পাই।

প্রত্যেক যুগেরই একটি বিশেষ বিশেষ দান আছে। সেই যুগ তখনকার দিনের সর্ব্বমানবের শ্রেষ্ঠ উপহার লইয়া এক দেশের দ্বারে দাঁড়ায়। যথার্থভাবে এই দান গ্রহণ করার সামর্থ্য দ্বারা সেই সেই দেশ তাহার জীবনের সাত্ত্বিকতা ও সাধনার পরিচয় দেয়। জড়প্রাণ তামসিক মৃতপ্রায় দেশ এই দান গ্রহণ করিতে পারে না। কখনো দম্ভে কখনো অভিমানে ক্ষুদ্রজন উপাসিত কোন মনোহর সংকীর্ণতা বিশেষের নাম লইয়া যুগের এই মহাদান প্রত্যাখ্যান করিয়া বিধাতার অভিশপ্ত দেশ যুগধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়। কাজেই যে সব মহাপুরুষ সমগ্র জাতির হইয়া এই মহাদান সত্যভাবে গ্রহণ করিয়া যুগধর্ম্মকে রক্ষা করেন তাঁহাদের কাজ যেমন মহৎ তেমনি কঠিন। এমন মহাপুরুষ পাইবার সৌভাগ্য যে জাতির নাই তাহারা সেই মহাসম্পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দিন দিন তামসিকতাগ্রস্ত হইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। দেশের সব ক্ষুদ্রাশয় অন্ধলোকেরা এই মৃত্যুমুখে যাত্রাকেই জয়যাত্রা মনে করিয়া তাহাকে নানা উপচারে অলঙ্কৃত করিয়া নিজেদের আসন্ন বিনষ্টিকে সকলের চেতনায় ও দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখে।

মুসলমান যখন ভারতে আসিল সে তখন তার মরুভূমিতে প্রাপ্তজন্ম ধর্ম্মের মধ্যে ভারতের জন্য কোন কোন মহাদান আনিয়াছিল। তাহাদের কঠোর সরল একনিষ্ঠা, তাহাদের দৃঢ় বাহুল্যবর্জ্জিত সাধনা তখনকার রসভারাক্রান্ত আচারবিচারবাহুল্য ভারাক্রান্ত ভারতের পক্ষে অতি আবশ্যক ছিল। ভারত তখন তাহার জীবনের কেন্দ্র হারাইয়া, সৃষ্টিশক্তি হারাইয়া নিজেদের আচার-বিচারের জঞ্জালই দিন দিন বাড়াইয়া তুলিতেছিল। অথবা মলিন রসের পঙ্কে ডুবিতেছিল। ভারত হয় তো এই মহৎ দান গ্রহণ করিতেই পারিত না যদি ভারতের হইয়া কবীর, নানক প্রভৃতি উত্তর-ভারতের সাধকেরা, বাংলার বাউলেরা ও অন্যান্য প্রদেশের তৎকালিক গভীর সাধকেরা তাহা গ্রহণ করিতে না পারিতেন।

গঙ্গা যখন স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন তখন সাধকবর মহাদেব স্বীয় জটাজালে সেই মন্দাকিনীধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুগে যখন পশ্চিম তাহার বিস্তৃত ও বহুধাবিচিত্র সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য লইয়া উপস্থিত হইল তখন ভাগ্যে ভারতের লজ্জা রক্ষা করিবার জন্য রামমোহন আপন সাধনার মধ্যে সেই দান গ্রহণ করিলেন। তখনকার দিনে কেমন করিয়া নিজের দেশের বিশিষ্টতা না হারাইয়া এমন শ্রদ্ধার সহিত সেই দান গ্রহণ করিলেন যে তাহা চিন্তা করিলেও মন শ্রদ্ধায় নত না হইয়া যায় না। আজিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত কত বিদ্যাভিমানী সংস্কারমুক্ত হইয়া যে মহাদান শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে বা সেই গ্রহণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম, রামমোহন সেই শিক্ষাবিরল দিনে কেমন করিয়া সেই মহাদান শ্রদ্ধায় অথচ এমন অভিজাত শালীনতার সহিত যথার্থ বীর সাধকের মত গ্রহণ করিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

এই সব অংশে ভারতের মধ্যযুগের এই সব সাধকদের সঙ্গে রামমোহনের মিল থাকিলেও অনেক দিকে প্রভেদও আছে। মধ্যযুগে সমস্যা ছিল প্রধানতঃ ধর্ম্মগত ভেদকে মিলাইবার। তাই কবীর, নানক, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি সাধকেরা তাঁহাদের সকল শক্তি, সকল সাধনা ঢালিয়া দিয়াছেন ধর্ম্মসাধনার উপরে। হয়ত ধর্ম্মভাবের

গভীরতায় ও ধর্ম্মের ধ্যানে সাধনায় রামমোহন ইঁহাদের কাছে হার মানিতেও পারেন, কিন্তু তাঁহার সময় সমস্যা যে সবদিক লইয়া। মধ্যযুগে এই সব সাধকেরা হিন্দু বা মুসলমান জ্ঞান ও শাস্ত্রাদি সামঞ্জস্য সাধনার চেষ্টা মাত্র করেন নাই। কারণ উভয় দলের জ্ঞানই তখন অনেক পরিমাণে নিজেদের দলের ক্ষুদ্র সত্তোই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু য়ুরোপ যখন এই যুগের প্রারম্ভে ভৌগোলিক সব ব্যবধান ভাঙিয়া ভারতে উপস্থিত হইল তখন তাহারা যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আনিল তাহা আর উপেক্ষণীয় নহে। তাহা পরাবিদ্যা না হইতে পারে, কিন্তু অপরা হইলেও তাহা সত্যই বিদ্যা। এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যার মধ্যে যোগ স্থাপন করা, প্রাচ্য প্রতীচ্যের এই বিরাট সংঘাতে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ও উভয়দিকের নানাবিধ বিশিষ্টতার সমন্বয় করা সেই যুগে রামমোহন ছাড়া আর যে কেহ এমন অসাধারণরূপে করিতে পারিতেন, তাহা ত বুঝি না। এই যুগের সেই উষায় যখন আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিলেই হয় সেই সময় তাঁহার মত এমন কে ছিলেন যিনি এমন গভীর ভারতীয় ও প্রাচ্য শিক্ষাদীক্ষার দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এমনিভাবে গ্রহণ করিয়া সেই কঠিন সমস্যা এমন করিয়া সমাধান করিতে পারিতেন। তিনি কোন-মতেই সেই যুগের মাপে তৈয়ারী মানুষ ছিলেন না। আজ পর্য্যন্ত অনেকে তাঁহাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার অর্থ তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে তাঁহার কালের অনেক পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিলেন।

যে-সব সমস্যা আজিকার সাধকদের সমক্ষে উপস্থিত, যে সব আকাঙ্ক্ষার সব আকাঙ্ক্ষা এই সব সমস্যাকে লইয়া এই যুগকে উদ্বোধন করিয়াছেন মহা সাধক মহাপুরুষ রামমোহন। এই সব আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যা কতক পরিমাণে যদিও ভারতের মধ্যযুগের মহাপুরুষদের মনে আসিয়াছিল তবু তখন সমস্যা আজিকার মত এত জটিল হয় নাই। অবশ্য তাঁহাদের চারিদিকে প্রতিকূলতাও ছিল অপরিমেয়। রামমোহনের জন্ম হইল এমন এক বৈজ্ঞানিক যুগের উষাকালে যখন দেশে-বিদেশে ভৌগোলিক সব ব্যবধান দূর হইয়া গিয়াছে, যখন অগণিত জাতি সম্প্রদায় তাহাদের বিচিত্র শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা লইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে, যখন দুর্ব্বল জাতিদের দুর্ব্বলতা প্রবল জাতিদের সর্ব্ববিধ ক্ষুধাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে, যখন শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা উৎকর্ষের নানা বিচিত্র ঘাত-সংঘাত প্রতিঘাত চলিয়াছে। রামমোহনও যুগারম্ভের এত বড় বিরাট রচনার যোগ্য মনীষা ও সাধনা লইয়া কেবল হিন্দু মুসলমান নহে জগতের সকল সাধনার মিলনের মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, নূতন যুগের উদ্বোধন করিলেন। তখন রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রে তাঁহাকে সমানভাবে বীরের মত আসিয়া নব নব সৃষ্টিতে হাত দিতে হইল এবং সবই তিনি অসাধারণ বীরত্বের সহিত সম্পন্ন করিলেন। কোনো মহাপুরুষকেই একসঙ্গে এতগুলি কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। তাঁহার এক একটি কাজে তাঁহার সমকক্ষ সাধক মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু জাতীয় জীবনের জাগরণের জন্য একসঙ্গে এতগুলি কাজে হস্তক্ষেপ করার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। তাঁর বহুমুখী সাধনার নানা অংশ নানা-ভাবে পূর্ব্বকালে সাধিত হইলেও কখনো একত্র সাধিত হয় নাই। তাই তিনি এই মহাযুগের আদিলগ্নের শুভ মুহূর্ত্তে জাতীয় জীবনকে উদ্বোধিত করিতে বিধাতার প্রেরিত মহাগুরু।

এক কথায় বলিতে হইবে রামমোহন ভারতে একটি আকস্মিক সাধনার উপদ্রব নহেন—তাঁহার পূর্ব্বে যুগে যুগে যুগধর্ম্মের মন্ত্রে দীক্ষিত মহাপুরুষরা ভারতের সাধনাকাশে উদিত হইয়াছেন। সর্ব্বতোভাবে বিচিত্র এই মহাযুগের 'প্রারম্ভে এত বড় বিরাট ও সমস্যাবহুল যুগের উদ্বোধক প্রবর্ত্তক ও যুগধর্ম্ম সাধনার মহাগুরু রামমোহনের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সাধনাগুরু সকল মহাপুরুষেরই সার্থকতা, তাঁহাতেই সকল পূর্ব্বগুরুর পরিপূর্ণতা।

শ্রীমোহিত দাশগুপ্ত

১

বিবাহ দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি সম্ভবে কিনা—ঘুঁতুদার ইহাই ছিল বিচার্য্য। প্যাথলজিক্যাল নজিরগুলা একে একে শেষ করিয়া সে সর্ব্বাপেক্ষা সারবান যুক্তিটির অবতারণা করিয়াছিল।

এই প্রকৃষ্ট কারণটি ম্যাট্রিলজিক্যাল; বহু সতী স্ত্রীর পাণিপীড়নে পুরুষ আপনার মরণকে অবৈধব্য যোগ দ্বারা সরাইয়া সরাইয়া ইচ্ছামত পিছনে লইয়া যাইতে পারে।

কবিতার শেষ কয় লাইন গাঁথিয়া তুলিতে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেও শম্ভুচরণের শ্রুতি ঘুঁতুর বাক্যেই ছিল। জ্যোতিষ ও বিবাহ এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে তাহার মনোযোগ বরাবরই রহিয়াছে।

কাঁচ আটিবার পুটিং তৈয়ারী নিরত শ্যামাদাসের মনে কিন্তু দাড়ি-গোঁফের জঞ্জালমুক্ত ফিট্‌ফাটত্বের স্বপ্ন জাগিতেছিল; এ'ছাড়া ডক্টর রুটি চিবাইতেছিল, শ্রীপতি সাংসারিক বিবাহের জিনিষ কেনার ফর্দ্দের মধ্যে ডুবিয়াছিল। জলেশ বাঁধুনী-ফাঁসা বেতের ঈজিচেয়ারটায় কাৎ হইয়া একসঙ্গে 'বোদা' চুরুটে ধূমোদ্গীরণ, ভৃঙ্গবৎ বর্ষস্মৃতির আঁচল-খসা মেয়েটির রূপমধুপান ও ভুল করিয়া একটি বিলাতী গানের চরণ—

'নিকক্লাক্ প্যাডিব্যানি—গিভে—ডগ্—এ—বো—ও—ন্...' গাহিতেছিল।

ঘুঁতুদার বাক্যস্রোতের বিরতি নাই।

শ্রীপতির হিসাব চলিয়াছেই—

শ্যামাদাস ডক্টরের ভ্যালেট পাইবার আশায় নিরাশ হইয়া থমথমে মুখে পুরাণো বাট্‌লারকেই আচ্ছা করিয়া শানাইয়া তুলিতেছে।

রুটিচর্ব্বণ সমাপণ করিয়া ডক্টর ধোপার এ্যাকাউণ্টে মনোনিবেশ করিয়াছে। বিষুবদন্তে প্রোভিজারের পূর্ব্বাভাস সম্প্রতি বেতের বাক্সে স্থান পাওয়ায়—কয়েক দিবস সকলের স্বস্তিতে কাটিতেছিল।

বাহিরে কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পর্য্যন্ত অরুণালোক ঝিকি-মিকি করিয়া উঠিতেছিল, জানালা দিয়া তাহাই দেখিতে দেখিতে হলঘরের অন্যতম মালেক রাজকুমার কি প্রকারে দীর্ঘ কর্ম্মহীন প্রহরগুলা কাটাইয়া উঠিবে ভাবিয়া পাইতে-ছিল না।

অবকাশ কাটাইবার কোনরূপ অবলম্বন নাই অথচ ভবিষ্যের পথে যে অতল গহ্বর হাঁ করিয়া আছে তাহারই বিভীষিকা বাষ্পের মত মগজে ঢুকিয়া উহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল।

ইদানীং অর্থকষ্টে তাহার দুর্দ্দশার একশেষ। রাস্তায় বাহির হইয়া 'গণপতি হোমের' চা'ওয়ালা বন্ধুকে এড়াইবার জন্ম তাহাকে মিছামিছি বেশীপথ ভাঙিতে হয়, পানচুরুটের দোকানী শাসাইয়া রাখিয়াছে এ মাসের মধ্যে ভদ্রভাবে টাকা না দিলে বাধ্য হইয়া সে টাকা-আদায়ের অভদ্র পন্থাই ধরিবে; ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া এতদিন কিছু বলে নাই·· ইত্যাদি।

শ্যামাদাস ফিট্‌ফাট্ হইয়া কখন বাহির হইয়া গিয়াছে। মার্কেটগামী শ্রীপতির ট্যাক্সি তখন হয়ত ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সাম্‌নে, জলেশ গিয়াছে আপিসে, ডক্টর দিদির উদ্দেশে বেলগাছীর হাঁসপাতালে। ইতিমধ্যে শম্ভু কখনই বা দেড়ঘণ্টাব্যাপী স্নানের পালা শেষ করিয়া, খাইয়া, পান চিবাইয়া আধখানা গোল্ডফ্লেক সিগারেট পোড়াইয়া ঘরে ঢুকিল, আর কখনই বা চুলের কসরৎ চুকাইয়া, পপ্‌লিনের সার্টটি ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া গায়ে চড়াইল, চিন্তান্বিত রাজু তাহা জানিতে পারিল না, লাইওনেল এড্‌ওয়ার্ডস্ কোম্পানীতে একবার খোঁজ লইবে কিনা ভাবিয়া বাহির পথে তাকাইতে দেখে

হাতঘড়িটির পানে দৃষ্টি হানিতে হানিতে শম্ভুচরণ পুনরায় ঘরে ঢুকিয়াছে।

পকেট হইতে কবিতার কাগজ বাহির করিয়া সে কহিল,—আচ্ছা শোন ত হে এখানটা কেমন লাগ্‌ছে··· গাড়ীর ঢের দেরি এখনও।

বর্ম্মার চুনী, তুরাণের ইন্দ্রনীল, পারস্য উপসাগরের মুক্তা সমস্ত গাঁথিয়া সে যেন একগাছি মালা; যেমনি লম্বা ভারীও তেমনি, তা' ছাড়া তাহাতে মিলনের মদ্য ও বিরহের বিষের ক্ষরণ আছে।

সামান্য যাহা কর্ণে প্রবেশ করিল তাহারও অর্থবোধ হইল না অথচ শম্ভুর মত নাছোড় লোকের পাল্লায় পড়িয়া কিছু উত্তর দিতে হইবেই ইহাই হইতেছে সমস্যা। কাজেই রাজকুমার কণ্ঠকে একটু গদগদ করিয়া কহিল, "অরিজিন্যালিটি আছে, দেখ্‌চি।" অন্য সময় হইলে তাহার বাছা বাছা বিদ্রূপ-শরের আঘাতে শম্ভুর প্রাণ লইয়া টানাটানি বাধিয়া যাইত।

শম্ভুর হাতে অর্থ আছে, কিন্তু তাহার কার্পণ্যও অনন্য-সাধারণ—তবুও তাহার নিকট হইতে ধার পাইবার আশা রাজকুমারের হইতেছিল। এ কারণ শম্ভুর জটিল জল্পনায় যথেষ্ট পীড়া পাইলেও কৃত্রিম আগ্রহ প্রকাশে সে কুণ্ঠিত হইতেছিল না। রাজকুমারের ন্যায় সমঝদারের সার্টিফিকেট্ পাইয়া শম্ভু দ্বিগুণ উৎসাহে পাঠ সুরু করিতেই, বাহির হইতে রাসবিহারীর জমাট গলার আওয়াজ আসিল, 'আছো দস্তোর'—

আইভি লতায় ছাওয়া পাহাড়ের স্লোপ, সাইকামোর গুল্মের ছায়ায় শুইয়া সুনীল সমুদ্রের জল দেখিবার স্বপ্ন, পর্ব্বতের উপত্যকায় মেষবালকের প্রণয়-গীতির করুণতা যেন এক হইয়া বাক্যের রূপে বাহির হইতে গিয়া পরক্ষণেই বাধা পাওয়া কচ্ছপের শুঁড়ের মত স্তব্ধতার খোলার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া ঢুকিয়া পড়িল।

ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল একতাড়া ছেঁড়া কাগজ বগলে রাসবিহারী সান্যাল এবং অপরিচিত আর একজন। যেমনি বাঁকাচোরা কদর্য্য তেমনি রুক্ষমুখ, রংটা ছিল ঘোর কাল এখনো ধবলের প্রলেপে তাহা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে নাই। একখানা পা অস্বাভাবিক স্ফীত, কাল, লাল, ছোট, বড় মাঝারি, দ্বিশির, ত্রিশির, পঞ্চশির, বোধ হ হাজারখানেক রুদ্রাক্ষ ইহার গাত্র হইতে আবিষ্কার কর যাইতে পারে।

ফিজিয়োনমী ষ্টাডি অথবা মনস্তত্ত্ব-অনুশীলনে রাজ-কুমারের এককালে বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইহার জন্য সে নাকি একবার চীনা পল্লীতে বিশেষ আহতও হয়। আঘাতের কথা সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ রহিলেও সে যে নূতন লোক পাইলেই বিপুল উৎসাহে 'প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে মনে যাহা জাগে, না ঢাকিয়া' তাহা বলিবার অনুরোধ করিয়া বসিত—ইহা তাহার অন্তরঙ্গ মহলে সকলের জানা ছিল।

'পাঁপিয়া, আঙুর, হাঙ্গর, বর্ণবোধ, উৎকণ্ঠা···' এইরূপ একটা প্রশ্নের তালিকার সাহায্যে সে কিছুদিন পূর্ব্বে শম্ভুর সম্বন্ধে একটা রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হইয়াছিল। ব্যাপার, শম্ভু প্রতি শনিবারে চুঁচুড়ায় যে কবিতা লইয়া যাইত তাহা বৌদির পিস্‌তুত বোনকেই শোনাইবার জন্য,—সাহিত্য-সম্মেলনের উপলক্ষ্যটা বাজে।

লোকটার উপর নজর পড়িতেই রাজকুমার বুঝিল ষ্টাডিটা ইনটারেষ্টিং সন্দেহ নাই। এ হয় ভূত-প্রেতের ওঝা, নয় নাগা সন্ন্যাসী গোছ কিছু। তবে লোকটা যে ক্ষমতাপন্ন তাহাও মনে হইতে লাগিল। এককালে স্পিরিচুয়ালিজম্, মন্ত্রতন্ত্রের উপর তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, আফ্রিকায় কোন্ জঙ্গলে কোন্ ডাইনীর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া কোন্ সাহেব কোথাকার কোন কাগজে কি লিখিলেন—এরূপ জিনিষ খুঁজিলে বোধ হয় তাহার পুরাণো খাতা হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি বাহির হইয়া পড়িবে। মাদুলী কবচ তাহার যত ছিল অত বোধ হয় একটা দোকানে পাওয়াও দুষ্কর। কিন্তু আজকাল ইহাদের গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে সে পারে না।

পামিষ্ট্রি পড়িয়া সে দেখিয়াছিল তাহার হাতে যে-সমুদয় চিহ্ন বর্ত্তমান তাহাতে সে রাজা না হইয়া যায় না। বহুদিন পূর্ব্বে মাতুলালয়ে একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষীও তাহাকে একথা বলিয়াছিলেন—তার পর দিল্লীতে একজন ফকির—সি, পিতে কোন্ এক বেদিনী ওই কথারই

প্রতিধ্বনি করিয়াছে—রাজা না হোক অন্তত প্রভূত বিত্তযশের অধিকারী সে হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বাইশ বৎসরে পা দিয়াই নাকি এই সুযোগ!

কিন্তু পঁচিশ পার হইতে চলিল। লক্ষ্মীর হংস হইতেছেনা—কেবলি দুঃখের লবণোদধিতে নাকানি-চোবানি খাইয়া মরিতেছে।

দুত্তোর! রাজকুমার কিছুদিন পূর্ব্বে রাগ করিয়া রাক্ষসী-তন্ত্রম্, কাকচরিত্র, আমেরিকান পামিষ্ট্রি, মাদুলী, কবচ একত্রে জড় করিয়া আগুন ধরাইয়া দিল।

তুক্‌তাক্ দিয়া ফাঁড়া কাটান, নবগ্রহ কবচ দিয়া শনির কোপ মুক্ত হওয়া প্রভৃতি নিছক বুজরুকি; এসমস্ত করিয়া করিয়া সে হয়রান হইয়া গিয়াছে।

তাহার ধারণা হইল এগুলা শয়তানী বিদ্যা, খারাপ ইহাতে যথেষ্ট করা যায়, কিন্তু শুভ করায় একমাত্র ভগবান ছাড়া অন্য কেহ নাই।

লোকটা যে একজন ঠক, অনিষ্টকারী ইহা সে বুঝিয়া ফেলিল এবং তাহার মনের কোণে উষ্মা জমা হইতে লাগিল।

কি জানি যদি হিংস্র চাউনি দিয়া—তাহার দেহকে পঙ্গু করিয়া দেয় অথবা অজ্ঞান করিয়া কাঁচি বাহির করিয়া ব্রহ্মতালু হইতে গোছাখানেক চুল কাটিয়া লয় তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ।

এবং প্রাচীন ধর্ম্মগাথা সংগ্রহ করিয়া বেড়ান, আজ রাতের ট্রেনেই কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছেন।

অতঃপর রাসবিহারী মিনিট-পনের ধরিয়া ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে আপশোষ প্রকাশ করিল। সে এত কষ্ট করিয়া এমন একজন গুণীকে বন্ধুর দরজায় আনিয়া হাজির করিয়াছে আর বন্ধু কিনা দিব্য বাহির হইয়া বসিয়া আছেন ইত্যাদি।

বিস্ময়ের পর বিস্ময় চড়াইয়া রাসবিহারী আরও জানাইল যে, লোকটি একজন পাকা জহরী এবং বহুৎ টাকার মালিক।

ম্যাড্রাসে সালেমে এঁর নিজের একটা লোহার খনি আছে, আহমদাবাদে দুটো সুতার কল, বর্ম্মায় মস্ত সেগুন কাঠের কারবার, বোম্বাই সহরে ভাড়াটে ব্যারাক, তা ছাড়া দারুচিনি, গোলমরিচ, পিঁপুল ও কাফি চাষের জমি—সেও প্রায় পাঁচশ' একারের কাছাকাছি।

এতদ্ব্যতীত ফলিতজ্যোতিষেও নাকি ইঁহার জ্ঞান আছে।

১৮৯০ হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় দশটা বড় এগজিবিশনে এঁর ছবি প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে। ইঁহার টেক্‌নিকে নাকি অদ্ভুতত্ব আছে, তবে ছবি ইনি কম আঁকেন।

অথচ স্কুলে এই রাসবিহারীই জাঁহাগীরের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনায় শূন্য নম্বর পাইয়াছিল।

কিন্তু রাসবিহারীর পরিচয়ে জানা গেল লোকটা নিতান্ত নিরীহ অর্থাৎ তাহার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে ভূগর্ভের অন্ধকার হইতে কিম্ভূতকিমাকার শুঁড়, লেজ বা শিংওয়ালা জিন, দানার হৈ হৈ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিবার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নাই। আর কৃকলাসের পিত্ত, কাল বিড়ালের লেজের ডগার সাতগাছি লোম, পূষা নক্ষত্রে শ্মশানের নৈঋত কোণের নগ্রোধ গাছের আটা, মূল বীজ একত্রে বাটিয়া অসাধ্য সাধনের সঙ্কল্প ইহার মনে ভুলিয়াও কোনদিন উদিত হয় নাই।

ইনি উঁচুদরের চিত্রকর, ত্রিবাঙ্কোরের রাজার বন্ধুলোক

ঘাড়টাকে ঈষৎ হেলাইয়া চুরুটের উপরকার সোনালী লেখাটা পড়িয়া লোকটার উপর সম্ভ্রমে শম্ভুর চক্ষু দুইটি চক্ চক্ করিয়া উঠিল এবং কিছু আগের উস্‌খুসানি এক্ষণে বড়ই ঘনীভূত হইয়া উঠিল। বেচারীর বড় ইচ্ছা ভাগ্যের কথা কিছু জানিয়া লয়, কিন্তু লোকটার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বেশ একটু সঙ্কোচ ও ভীতি অনুভব করিতেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে হেদোর পশ্চিমে পশ্চিমা গণকটি তাহার স্ত্রী-ভাগ্য সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। সে বিষয়ে পাকাপাকি নিশ্চিন্ত হইতে সে বিশেষ ব্যাকুলতা বোধ করিতেছিল।

তাহার মাথার মধ্যে শাড়ীর পাড়, চুড়ির শব্দ এবং তাহারই কথার 'আপেল কপোল', আঙুর আঙুল তদ্ব্যতীত রিউইক গাড়ী, কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্কের ব্যালান্স বন্ বন্ করিয়া ওলট্-পালট্ খাইতে সুরু করিয়া দিয়াছিল।

হঠাৎ রাজুর পানে চোখ পড়াতে লোকটা যেন একটু চমকিয়া উঠিল, সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'ওয়ন-ডর-ফুল'।

'লেট মি সি ইওর পাম'

বাক্যব্যয় না করিয়া রাজকুমার দক্ষিণহস্তের তালু প্রসারিত করিয়া দিল—বহুক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টমনে হাতখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া লোকটা যাহা জানাইল তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

এই হাতখানি যেন বিধাতা আপনার খুস্ খেয়ালে রচিয়াছেন, অর্থাৎ যেখানে যতটুকু সুলক্ষণ থাকিতে পারে সকলি ইহাতে যথাযথ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুস্পষ্ট উর্দ্ধরেখা, মধ্যস্থলে ধ্বজচিহ্ন, বজ্র, অঙ্কুশ, শঙ্খ, তুলা সমস্ত সঙ্কেতই নির্দ্দিষ্ট স্থানে জল জল জলিতেছে।

এইরূপ লক্ষণের অধিকারী পৃথিবীতে এক বই অন্য আছে কিনা সন্দেহ। লোকটার চক্ষু যেন রাজুকে আঘাত করিতেছিল।

'হা—ও—ওয়ন্—ডর—ফু—উল !!!'

সময় এখন খারাপ্ যাইতেছে সত্য, কিন্তু নাতিদূরের সুদিনের জোয়ারের গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। আর সপ্তাহ-তিনেক; তারপর সুখ, সুবিধা, সুনামের জলোচ্ছ্বাস কলোল্লাসে ভাগ্যের মরা গাঙে ঢুকিয়া পড়িবে—

ঈর্ষা ও বিস্ময়ে শম্ভুর চক্ষের সিলিয়রী পেশীগুলিতে বোধ হয় তখন ম্যাক্‌সিমাম টান পড়িয়াছে।

রাজকুমার কি ভাবিতেছিল সেই জানে।

অকস্মাৎ বারুদের মত জলিয়া উঠিল—

"নান্ অব ইওর লাক্‌স; তোমার বজ্রাঙ্কুশ ধুয়ে তুমি জল খাও গিয়ে, টাকা দিতে পারবে—হার্ড এ্যাণ্ড রাউণ্ড কইনস্—শাইনিং লিট্‌ল ডারলিংস্'

মন খারাপ থাকিলে রাজু এইরূপ মাঝে মাঝে উত্তেজনা প্রদর্শন করিত। বছর-দুই পূর্ব্বে সুদিনের সময় একবার যখন তাহার পঞ্চাশটা টাকা চুরি যায়—সেদিন রাত্রে ভাত দিতে দেরি হইবার অছিলায় [illegible] ঠাকুরের পিঠে মৈমনসিংহের শ্রীনিবাসের আড়া[illegible] টাকার হুঁকাটা এবং রোহিণী বড়ালের সাধে[illegible] রিমলেস চশমাটা ভাঙিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়[illegible] ফেলিয়াছিল, ইহা ছাড়া আই-এ পরীক্ষার সময় টুলের ভাঙা পায়া ছুঁড়িয়া মারিবার অপরাধে সে এক বৎসরের জন্য রাষ্টিকেটও হইয়াছিল।

আল্‌না হইতে কাহার একখানি চাদর গায়ে জড়াইতে জড়াইতে সে উর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইয়া গেল।

শম্ভু ও রাসবিহারী উভয়েরই ধারণা হইল, ছেলেটার বোধ হয় একদম মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে। এত বড় একটা শক্, হইবে না!

ডার্‌বীর মোটা বাজী জিতিয়া কত ভালমানুষই না পাগল হইয়া যায়! রাসবিহারীর জীবনে আপশোষ করিবার সুযোগ যথেষ্টই আসে,—

এইরূপ কিছু করা বিধেয় ছিল যাহাতে লোকটা [illegible] ধাক্কাটা সামলাইয়া লইতে পারিত, জোর [illegible] ঘুমের ওষুধ গেলাইতে পারিলে বেশ হই[illegible]।

এক সাহেব নাকি স্বীয় আর্দ্দালীকে [illegible] পেটা করিয়া—বাজী জিতিবার খবর [illegible] নাকি বুকের স্পন্দন বাড়িয়া তাহার মৃত্যু বা [illegible]পের আধিক্যে উন্মাদ হইবার আশঙ্কা ঘটে নাই।

২

রৌদ্রতপ্ত—ক্রোশ দুয়েক পথ বাহি[illegible] রাজকুমা[illegible] কখন গঙ্গার ধারে আসিয়া পড়িয়াছে জানিল [illegible]।

জলে তখন সন্ধ্যার স্বর্ণালোক আসিয়া পড়ি[illegible]ছে।

ওপারের কারখানার চিম্‌নীগুলা আ[illegible]কের শত শত কৌতূহল চক্ষু—[illegible]লের নৌকার ভিড়, দূর[illegible] বি[illegible] কোলাহল,—তাহার চিন্তা এ সকল ছাপাই[illegible] বহু [illegible] উঠিয়া গিয়াছিল—

সেখানে মনের নয়নে ছবির পর ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে।

…যেন দীর্ঘ পাইন গাছের শাখায় বাতাস লাগিয়াছে—

উপকূলের তালীবনচ্ছায়ায় হলদে বালুর চর।

দূরে একটি সাগর-বিহঙ্গম সাদা পাখনা মেলিয়া পশ্চিম দিগন্তের নীল পাহাড়ের পানে চলিয়াছে।

সহসা সমুদ্র দুইদিকে সরিয়া যায়;—থরে থরে সাদা পাথরের সিঁড়ি পাতালের পানে নামিয়াছে।

তারপর চোখের সম্মুখে জাগে শঙ্খধবল সৌধ মহলার পর মহলা পার হইয়া চলিয়াছে—

...নিথর সাড়া নাই, কবে যে বাতাসের শেষ ঝলকটুকুও এখান হইতে বিদায় লইয়াছে তাহার কোন উদ্দেশ মিলে না।

তার পর দেখে গাছে প্রবালের লতা, মরকতের পল্লব, পান্নার প্রসূন তাহারি ফাঁকে নীলার পাখী চক্ষু বুজিয়া ঝিমাইতেছে।

হঠাৎ পাখীর কণ্ঠে গান জাগিল।

হাজার বৎসরের—জমাট স্তব্ধতা চঞ্চল হইয়া ওঠে।

রাজা সিংহাসনের উপর চক্ষু মেলিলেন, নাজীর জাগিল, ...মিত্র জাগিল—সিপাহীশাস্ত্রীরা গোঁফ চুমড়াইয়া লইল, নফর ছুটিল, অশ্বশালায় খুরের ধ্বনি উঠিল।...

সাত মহলার শেষে যে কোঠা সেখানে গজদন্তের পালঙ্কে শায়িতা রাজবালার নয়নে নিথর ঘুম।

...রকন্নীর আঁচল দুলিতেছে। গজমোতির মাল্য ...তে মুক্তা খসিয়া ভূমিতে লুটাইতেছে, কনক প্রদীপ ...ভিয়া যায় যায়—শুধু সিঁথিতে সাত রাজ্যের আকাঙ্ক্ষিত ...িক দোলে,—সেথা হইতে অবিরল আলো ঝরিয়া ...তেছে।

রাজপুত্রের হাতের স্পর্শে কন্যা জাগিয়া উঠিল—

...ী—হাজার বছরের গাঢ় সুপ্তি ভাঙিয়া নয়ন ...লেন।

দীর্ঘ ঘন পল্লবের পিছে ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাতের কঙ্কণ যেন প্রবাস বুকে টানিবার অছিলায় বলিতেছে, 'প্রতীক্ষার অন্ত তবে হইল কি, পরদেশী ঘুমভাঙানিয়া?'

তারপর আনন্দ কলরোল।

অচিন দেশের রাজপুত্র জাগরণ আনিয়াছে—পাখীর গলায় গান বাজিয়াছে। এত আলোক, হাসি, এত মুক্তা, জহরৎ; গোটা রাজকন্যা ও আধেক রাজত্ব! রাজকুমার আর ভাবিতে পারে না!

তারপর সমস্ত যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমুদ্রের সলিলতলে লীন হইয়া যায়। চাহিয়া দেখিল সম্মুখে অভিশপ্ত নগরীর পথ, সওদাগরী আপিসের অভ্রংলিহ প্রাসাদ কাঁপাইয়া রথ চলিতেছে।

হয়ত বেগে ব্যস্ততায় যন্ত্রের ক্রন্দন চাপা পড়িয়া যায়।

নিত্যকার পরিচিত গলি—ধূলা, ধূম, আবর্জ্জনা—

অস্বাস্থ্য, কদর্য্যতা, দুস্থতা!

পথ চলিতে মনে হয় পরশমাণিক কুড়াইয়া পায় বুঝি।

তারপর সব হিরণের হাসিতে ভরিয়া উঠিবে।

বুভুক্ষা, ক্লান্তি, অসোয়াস্তি সব কোথায়—?বৈশাখীর ঘূর্ণীপাকে শুষ্কপত্রের ন্যায় উড়িয়া যাইবে।

ওদিকটায় ল্যাম্প-পোষ্টটার নীচে কি দেখা যায় ওটা!

ভাবে, নিশ্চয় কাহারো পকেট হইতে টাকার ব্যাগটা পড়িয়া গিয়াছে। উহাতে আছে দিস্তা দিস্তা আসল নোটের তাড়া!

'নাঃ, কার একটা জুতার সুকতলা'

পোড়াকপাল!

আচ্ছা ঐ বাড়ীটার মধ্যে খুঁজিয়া দেখিলে হয় না, কয়েক কলসী মোহর বরাতে জুটিয়া যাইতেও পারে হয়ত।

হয়ত বা গুপ্ত ধনাগারের সিঁড়ি; থাকে থাকে মোহর মুক্তামণিতে ঠাসা ঘরটিতে নামিয়া গিয়াছে।

সকালে সেই অদ্ভুত লোকটার টানা কথাগুলি—

'হা-ও-ওয়ন্-ডর-ফু-উল!'

'হো-আট্-এ-লক্'—কেবলি কানে বাজিতেছিল।

মেসে ফিরিয়া দেখিল সকলে জটলা করিয়া তাহারই বিষয় বলাবলি করিতেছে।

সুস্থভাবে আসিতে দেখিয়া সকলে আশ্বস্ত হইয়া সমস্বরে অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল।

জয়েশ গান ধরিয়া ফেলিল—

"অয় কাম্‌স গ্রীফ্‌ গোস্‌ উই নো নট হাউ,
এভ্রি থিং ইজ স্প্রাইটলী নাউ—"

তাহাদের ভাব—

তুমি ত বানরের ছাল গায়ে রাজপুত্র, আজ ধরা পড়েচ—।

কেহ আসিয়া বলে "রাজু একসঙ্গে কাটালুম, তুলিস্‌ না একেবারে।"

শ্রীপতি আসিয়া ধরিল, 'পঞ্চাশ হাজার কি এক লাখ টাকার কম নয়,—ইন্‌সিওর তখন না করিয়ে ছাড়চি নে।' শ্যামাদাস বলিয়া রাখিল, "কি বাড়ী কি গাড়ী যাহাই কেনা হোক না, তাহাকে যেন দয়া করিয়া স্মরণ রাখা হয়।"

রাত্রে শুইয়া রাজকুমার অনেক কথাই ভাবিল—ব্যবসা, লটারী, শেয়ার্‌ বাজার, দালালী।

একবার মনে হইল যদি সুদূর মহাসাগরের কোন একটা দ্বীপে গিয়া সে ওঠে, তাহা হইলে সেখানকার অধিবাসীরা স্বর্গ হইতে আগত দেবতা ভাবিয়া তাহাকে বরণ করিয়া তুলিবে।

তারপর পাহাড়ের গুহায় তাহারা যে পদ্মরাগ, নীলা, ক্রাইসোলাইট, পায়রার ডিমের মত বড় জোলো সবুজ রঙের মুক্তা কুড়াইয়া পাইয়াছে—এতদিন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল; আজ মুঠা মুঠা তাহার হাতে তুলিয়া দিবে।

মুক্তা এক একটার জন্য হয়ত ইউরোপ বা আমেরিকার জহরীরা হাজার হাজার পাউণ্ড ডলার দিয়া সাধাসাধি করিবে। উপকূলের পাহাড়ে এইরূপ মুক্তা আরও অগণ্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

তারপর স্বাধীন রাজত্বের স্বপ্ন!

হল, পার্ক, ফ্যাক্টরী, ইউনিভারসিটি—

বন্দরে দৈত্যাকৃতি জাহাজের ভিড়, সব-চেয়ে বড় পাওয়ার হাউস হইবে তাহার দ্বীপে—

এ দেশের শিল্পী, বৈজ্ঞানিকেরা সাগরপারের জয়মুকুট কাড়িয়া আনিবে। কামান গর্জ্জিয়া দূর তটভূমি প্রকম্পিত করিবে।

সে আপনি হইবে এসবের নির্ম্মাতা—একটা জাতি একটা সভ্যতার। নিজে হইবে এঞ্জিনিয়ার—নি[illegible] করিবে সেনানীত্ব; শিক্ষক, শাসক, ধর্ম্মগুরু সবই [illegible] আপনিই।...

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আঁকেই থাকিয়া যায়। না ওড়ে যশে[illegible] ধ্বজা, না পাইল ক্ষমতার বজ্র হাতে, অথবা অর্থে[illegible] অঙ্কুশ—

মায় হইতে ভদ্রাসন, জমিটুকু, আর মায়ের গায়ের সোনাদানা যাহা ছিল গেল শেয়ার আর লটারীর টিকিটের জন্য।

গ্রামের সেনদের ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলাকীর্ণ দালান খুঁড়িয়া পাতি পাতি খুঁজিয়া ফিরিল। পাইল একটি সবুজরঙ-ধরা পিত্তলের পিলসুজ, মাটির কানাভাঙা বৈয়াম একটি, কাঠের খড়মের জীর্ণ বৌলা, খানকতক হাড়গোড়, আর একটা সিঁদুর-মাখান [illegible] পাথরের নুড়ি।

লটারীর একটিও কপালে লাগিল না—

একজন ব্রেজিলের রবার বাগানের [illegible] [illegible]ইয়াছে ফার্ষ্ট প্রাইজ—চেকো-স্লোভাকিয়ার কি একটা এ্যাসো[illegible]সিয়েশন পাইয়াছে...যাক্‌—

আসামের জঙ্গলে, নেপালের পাহা[illegible] ঘুরিয়া বেড়াই[illegible] সার হইল। পেট্রোলিয়াম হেমিটাইট [illegible], নকল সি[illegible] কাইবার কিছুরই সন্ধান মিলিল না।

ভাবে হয়ত বা বড় একটা কিছু- [illegible]টিনামের খনি, রুবি মাইন টাইন হয়ত কপালে আছে

কিন্তু বন্ধু জমিদার-তনয়ের ধৈর্য্য [illegible]।

চীনা মাটির আবিষ্কারের গল্প শো[illegible]ইয়া [illegible] কিছুই দর্শিত হইল না।

মাঝে কিছুকাল কৃত্রিম হিমোগ্লোবিন, বাগভেরেণ্ডার রসে রবার তৈয়ারীর উদ্যমে কাটিল।

রবার জমিল না, হিমোগ্লোবিন বাতাসে বিবর্ণ নষ্ট হইয়া গেল।

একদিন স্বপ্নযোগে স্বর্ণপ্রস্তুতের ফরমূলা পাইল—

এক দিব্যজ্যোতি পুরুষ দেওয়ালে আঙুল দিয়া লিখিয়া গেলেন। ঘুম ভাঙিয়া তাড়াতাড়ি খাতায় লিখিয়া ফেলিল, প্রত্যেকটি অক্ষর তাহার মনে জ্বলিতেছিল; চক্ষের গতি অতি দ্রুততালে।

হামিস, রোজার বেকন, প্যারাসেলসাস্ যে স্বপ্নে অধীর হইয়া কত বিনিদ্র রাত্রি কাটাইলেন তাহাই তাহাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিল।

ডায়ালিসিস, কোয়াগুলেশন—কতশত প্রক্রিয়া—দিবস রাত্রি ধরিয়া—

কিন্তু আশা-বৃন্তবিহীন, আকাশে ফুল ফুটিবার মত বৃথাই হইল।

ইহার পর আসিল নৈরাশ্য।

শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত আপনার খেয়ালে খোয়াইয়া রাজকুমার মরিয়া হইয়া উঠিল। কাহারও নিকট এক [illegible] পাইবার জো'টি নাই অথচ মনে হইল কূলে [illegible] বান্‌চাল হইয়া গেল।

আপশোষে তাহার চক্ষে কালি পড়িল,—চুলে পাক [illegible]তে সুরু করিল।

অস্বাচ্ছন্দ্য তখন ধৈর্য্য ও যত্নের পাথর ভাঙিয়া শতমুখে বাহির হইয়া আসিল—পেটের দায়ে হাঁটিয়া [illegible] হয়রান হইয়া পড়ে।

ভগবানের রাজ্য এমনি কঠিন—সেখানে ক্ষুধার সামগ্রী প্রচুর ফলে, কিন্তু প্রতি মুঠার জন্ম মূল্য চাই!

দারিদ্র্য আসুক কিন্তু ঐ লুব্ধিকা কল্পনা যে কিছুতেই [illegible]ড়িতেছে না—উহা নিষ্করুণ দুর্ব্বিষহ, মস্তিষ্কের প্রতি [illegible] ছিঁড়িয়া পড়িতে চায়···।

পেটে [illegible] কোনদিন কিছু জোটে, কোনদিন শুধু জল ও বাতাস—কোমরে কাপড় কসিয়া সে জোয়ারের বেঞ্চে পড়িয়া দিন কাটাইয়া দেয়। তাবে লিখিলে হয়ত তাহাকে সকলে বাংলার হামসুন বলিয়া বিদ্রূপ করিবে। হয়ত বা সাহিত্যের বাসরে তাহাকে লইয়া লোফালুফি চলিবে। কিন্তু মগজ হইতে কিছু বাহির হয় না—সরস্বতী বড় নিদয়া।

(৩)

বড় কঠিন আশার প্রাণ।

তাই দুঃখের কটাহে চাপিয়াও সে মরে না।

এই দুঃখের পরিসমাপ্তি যে প্রচুর সুখৈশ্বর্য্যের জয়-গাথায় নয় কে বলিল!...

ভাঙা লাল বাড়ীটার এধারে যাহারা আছে তাহাদের একটি মেয়েকে প্রায়ই রেলিঙে ভর দিয়া—রাস্তার পানে তাকাইয়া থাকিতে দেখে, কি বলিষ্ঠ শ্রী, ললাটে, চিবুকে, চিকুরে জড়াইয়া।

সম্মুখের ঘেরা ঘাসের জমিটাতে পড়িয়াই দিন কাটায়, আকাশপাতাল ভাবিতে থাকে; কখনও উত্তেজনায় গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া ওঠে।

একদিন একজন সুবেশা নারীকে মুখ ভ্যাঙাইয়াছে।

শুইয়া পড়িয়া দেখে কোনদিন মেয়েটা ছাদে ভিজা কাপড় টাঙাইয়া দিতেছে।

কখনও একটি কণ্ঠের রেশ, কচিৎ চকিত দেহশ্রীর ঝলক—

তারপর একদিন পরিচয়ের সুযোগ মিলিয়া গেল।

দুই-এক পয়সার যাহা কিছু পেটে পুরিবার আশায় পাশের গলির দোকানটায় চলিয়াছিল, গলিতে ঢুকিয়াই দেখে মেয়েটি বাড়ীর পাঁচিলের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া—চোখের সুদীর্ঘ পল্লবের তলে স্বপ্নলোকের বার্ত্তা বহিয়া যেন তাহারই প্রতীক্ষমানা অন্তরলক্ষ্মী—

তাহারই লঘু সুলোহিত চরণক্ষেপে গৃহ তাহার ধান্যে, ধনে, আলোকে ভরিয়া উঠিবে।

মুদীর দোকানটার কাছাকাছি আসিয়া রাজু কি ভাবিয়া ফিরিতেই দেখিল—সে তেমনি দাঁড়াইয়া তাহারই পানে তাকাইয়া আছে।

সাহস করিয়া আগাইয়া রাজকুমার জানাইল, আজ তিন দিবস ধরিয়া সে উপবাসী, কিছু খাবার এখানে পাইবে কি?

এমনি একটি নিশ্চিন্ততার সুর তাহার কণ্ঠে ফুটিল যাহা অন্নময়ীর ভজনে নিরন্ন শঙ্করের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

চলায় ছন্দ জাগাইয়া মেয়েটি গেল।
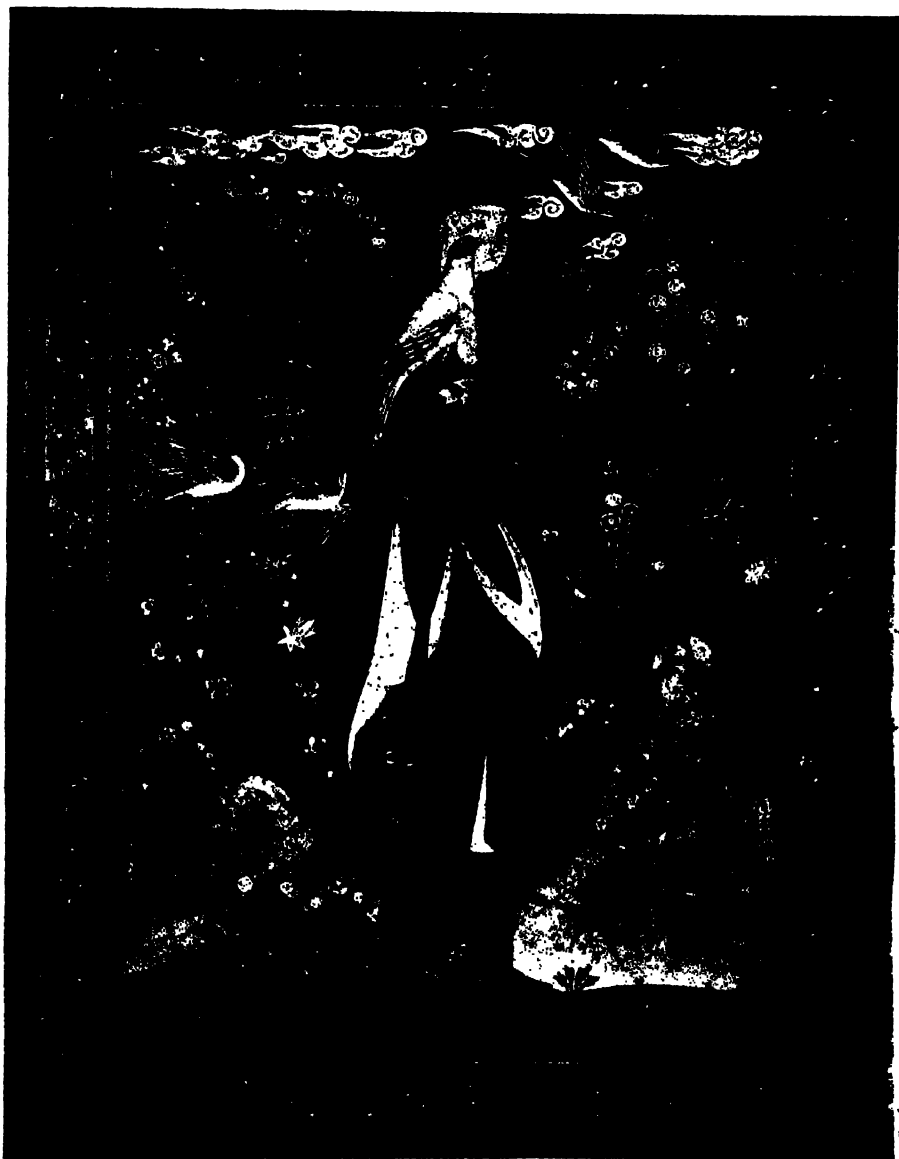
এক সৌম্যা বর্ষীয়সীকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

গৃহহারা অন্নহীনকে যাহারা সস্নেহে ডাকিয়া লয় তাহাদেরই আগ্রহ ইহাদের দুজনের মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বড়মানুষ পিসির বাড়ী রাজকুমার মানুষ এবং বহুদিন যাবৎ একরূপ বিলাসেই কাটাইয়াছে, কিন্তু এইরূপ যত্ন ও আন্তরিক সেবা তাহার জীবনে কখনও মিলে নাই।

আবেগে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল।

সঙ্গতিপন্ন ইহাদের বলা চলে না।

সম্বলের মধ্যে এই বাড়ীটুকু, তাহারই এই গলির দিকে গোটাকতক ঘর লইয়া ইহারা আছেন, ওধারটায় ভাড়াটেরা থাকে।

ভাড়া পাইয়া এক রকম সংসার চলিতেছে; তিনজনের পেট, মা ও দুই মেয়ে।

গীতা বড়জন, মায়ের কাছে থাকে, ছোট মেয়ে গায়ত্রী ইস্কুলে যায়।

পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই।

বাপ বহুদিন মারা গিয়াছেন, এখানে মাতুলালয়ে এরা আছে।

বছর-চৌদ্দ হইল মামাও নিরুদ্দেশ, গায়ত্রী তখন মাস-দুয়েকের।

এখন নাকি মান্দ্রাজের ওধারে তিনি আছেন, মেলা বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছেন শোনা যায়; তবে আর যে ফিরিবেন এরূপ বোধ হয় না।

রাজকুমার এখানে সাদর নিমন্ত্রণ পাইয়া গেল ইহাদের মধ্যে বাস করিবার।

ইহা সে গ্রহণ করিল।

গায়ত্রীকে সে ইস্কুল ছাড়াইয়া নিজেই পড়াইতে লাগিল।

মাঝে মাঝে গীতাও তার কাছে এটা-ওটা শেখে।

তাহার পানে চাহিয়া রাজু যেন সব ভুলিয়া যায়,—পরক্ষণে লজ্জিত হইয়া তাহার ট্রান্‌স্লেশন দেখিতে বসিয়া যায়।

কেন জানি রাজুর জামার বুক-পকেটটা প্রায়ই ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল।

গীতাও নির্জ্জনে তাহাকে কৃত্রিম কোপে জানায়, 'বারে বারে সেলাই করে পেরে উঠিনে বাপু।'

মাসীমাকে শঙ্কর দর্শন বুঝাইতে বুঝাইতে রাত্রি নিশীথ হইয়া পড়ে। তখন তিনি উঠিয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেন, "বাবা ভোলানাথ এসেছেন ছেলে সেজে, রাত্তির জাগা, না খাওয়া কিছুই বাবাটিকে কাবু করতে পারে না,—পাগ্‌লা ছেলে, রাত ঢের হয়েচে একটু ঘুমিয়ে নাওগে।"

* * *

রাত্রে বিছানায় শুইয়া রাজু ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের পথ খুঁজিয়া পাইল।

মনের গহনে যেথায় ঝড় উঠিয়াছে সেখানে তাহারই অলক উড়িবে প্রণয়ের পতাকার রূপে, নয়নের প্রগাঢ় কুহেলী চিরিয়া হাসির বজ্রালোক ঝলকিয়া উঠিবে, শুচিতার অঙ্কুশ তাহাকে পথভ্রান্ত হইতে দিবে না।

তাহার প্রেম শক্তিতে, দীপ্তিতে অনুপম হইয়া উঠিবে।

সাধারণ কুমারীর আবরণের অন্তরালে গীতার বৈধব্যের কথা যেদিন সে শুনিয়াছিল সেদিন শয্যায় পড়িয়া অশ্রু-কম্পিত নেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিল—।

বহুদূরে মহাকাশে অগণিত তারকা, নেবিউলা, গ্রহের দল বিরামহীন ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে—সেখানে [illegible] বন্ধনীতে আলোক যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। তারকার চক্ষে তাহারই মত বাষ্পবিজড়িত দৃষ্টি; বেদনা [illegible] ব্যোম নিরন্তর চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

অণুতে অণুতে অস্থিরতার দোলা লাগিতেছে—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অবিরাম এই ব্যথার মহাগীতি অনাদি কাল হইতে স্পন্দমান।

কিন্তু যতি ও ছন্দের সমাবেশে এই দুঃখ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

অণুগুলা ছুটিয়া পৃথ্বীকে ভাঙিয়া, নক্ষত্রেরা কক্ষ ফেলিয়া ছুটাছুটি করিয়া বিশৃঙ্খলা লাগাইয়া দিক্‌না।

দূরের প্রেমের এই একটা চিরন্তন সত্তার অনুভূতি তাহাকে ধূলা মাটির ধরণীর বহু ঊর্দ্ধে আনিয়া ফেলিল…।

সকালে গায়ত্রী কলরব করিয়া ডাকে, 'দাদা ওঠো, রোদ্দুরে যে উঠোন ভরে গেছে'—তারপর গায়ত্রীর সঙ্গে খুনসুড়ি ওর ভারী মিষ্টি লাগে।

ওরা দুইজন একসঙ্গে খায়, মাসীর হাতে।

গীতা পাশে বসিয়া থাকে।

রাজকুমার ঠিকই বোঝে তাহার উচ্ছিষ্ট খাইতে উহার কি গোপন আগ্রহ! গৃহকর্ম্মের ফাঁকে যতবার উহার চক্ষে তাকাইয়াছে, প্রত্যেক সময়ে গভীর কালো জলে পদ্মের মত ওর ঘনকৃষ্ণ আঁখিতারায় ভীরু প্রেমের আলোক ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পাইত।

কাজ একটা পাইয়াছে—ছুটী হইলে বাটী ফিরিয়া আসিলে ইহাদের সস্নেহ অভ্যর্থনা আনন্দোল্লাস শ্রান্তিটুকু নিঃশেষে মুছিয়া লয়!

একা সুখ!

মার বুকভরা স্নেহ, ভগিনীর অশেষ ভালবাসা আর সকলের উপর প্রিয়ার জাগর আঁখির সন্তর্পণ তত্ত্ব রাজকুমারকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

রাত্রে তাই তারকার সাথে সে কথা বলে, তাহাদের ভাষাও যেন বুঝিয়া ফেলিয়াছে। দূরের সমুদ্রে তরঙ্গে তরঙ্গে দোলা খাইতে পারে।

এই পরিতৃপ্তিই তাহাকে হাওয়ায় ভাসিয়া গন্ধরেণুর স... বনে ছুটিয়া চলিতে সক্ষম করিয়া তুলিয়াছে।

নব নব আলোকে অভিযাত্রাপথে সে আজ ...রের ডাক শুনিতে পায়।

...র খনি, লটারীর জিৎ, ব্যবসায় লাভ, দ্বীপের সাম্রাজ্য—সেগুলি যেন খেলার পুতুলের দেশের জিনিষ, নিতান্ত ছোট তুচ্ছ।

অথচ ইহার পিছনে সে কি নিদারুণ তৃষ্ণা লইয়াই না ছুটিয়াছিল।

মাসের শেষে উপার্জ্জনের টাকা দিয়া মাসীর একটা তসরের কাপড় আনে, গায়ত্রীর জন্য আনে একটা এমব্রয়ডারির প্যাটার্ণ—

মাসীর মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠে, আনন্দে গায়ত্রী দাদাকে জড়াইয়া ধরে।

গীতার জন্য কিছুই আসে না—তাহাকে দেওয়ার বাকি কি আছে!

বোধ হয় এ-রহস্য সে জানে; তাই চোখাচোখি হইতে ওঠে দুইজনারই হাসি ফুটিয়া ওঠে। রাজু ভাবে এই হাসির অলক্ষ্যে যে মাণিক্য ঝরিল তাহা কয়টা রাজার ভাগ্যে জোটে! পাণিতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন আঁকিয়া বিধাতা তাহাকে শুধুই বিদ্রূপ করেন নাই।

ইহার পর মাসীমা একদিন জানাইয়া বসিলেন গায়ত্রীর সহিত রাজকুমারের বিবাহ দিয়া তিনি বড় মেয়েটিকে লইয়া কাশী বাস করিবেন স্থির করিয়াছেন। মেয়ের বয়স হইল, একটা কিনারা চাই ত!

তা'ছাড়া রাজুকে তাঁহার বড় পছন্দ—।

এখন না হয় সেরূপ সুবিধা হইতেছে না, কিন্তু কালে বড় হইবে—টাকাকড়ি দাসদাসী বিস্তর জুটিবে।

কেন হইবে না, বিদ্বান, সৎ ছেলে, তারপর তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ কি একেবারে বিফল যাইবে! বহুদিন পূর্ব্বে এই আশঙ্কা রাজুর হইয়াছিল।

ক্রমে পীড়াপীড়ি বাড়িতে লাগিল; অবশেষে গীতাও আসিয়া ধরিল।

রাজু নিঃশব্দে কার্য্যে বাহির হইয়া যায়।

মুখে বলে, 'দেখিত'—

হঠাৎ একদিন একটা দোকানের বারান্দায় শম্ভুর সহিত দেখা হইয়া গেল। সোল্লাসে কুশল প্রশ্নে শম্ভুচরণ তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

ব্যবসা করিতেছে কি, কোথায় কত টাকা মজুত করিল, না জমিদারী? তাহার উদ্দেশে বাদুড়বাগান মেসের শ্যামাদাস নাকি শহরময় খুঁজিয়া ফিরিতেছে, একখানি গাড়ী গছাইবার জন্য ইত্যাদি।

রাজকুমার আরও শুনিল, শম্ভু মামার ধুদিয়া কাষ্টমে চাকরী পাইয়াছে এবং চুঁচুড়ার মোহ নাকি তাহার কাটিয়া গিয়াছে। কোনো একজন মুন্সেফের সঙ্গে তাহার সেই বৌদির বোনটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সখেদে শম্ভু কথাটা বলিল।

রাজকুমারের মনে একটা মতলব জাগিল।

'হ্যারে তোরা চাটুয্যে না, কোথাকার ?'

'কেন রাজুদা, বিয়ের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ হাতে আছে নাকি ? থাকে ত একটা জুটিয়ে দাওনা ভাই, আর কাঁহাতক একা একা ঘুরে মরি।'

'আমার এক বোন আছে, বিয়ে করবি তাকে, সুন্দরীতে হাজারে একটা মেলে সত্যি, আর লেখাপড়া, সেলাই, গান সবই চমৎকার জানে, ইংরাজীতে যাকে বলে, হপরি ··হার্ডির কবিতার অনুবাদ কচ্ছে।'

শম্ভুকে সে বরাবরই স্নেহ করিত, ছেলেটি সুচরিত, মযায়িক, দোষের মধ্যে একটু সেন্টিমেন্টাল, তা, সে নিজেও ·।

'আচ্ছা আসছে রবিবারের দিন আমার ওখানে যাস কন্তু, থারটিন-সি—স্কোয়ার। এখন তাড়াতাড়ি, চল্লুম—

শম্ভু ভাবিতে থাকে।

বোধ হয় রাজুদার আত্মীয়, হয়ত বা শালীই, দাদার ষ্টটা চিরকালই ভাল, তাহলে মেয়েটি সুন্দরী সন্দেহ াই···হয়ত মোটা কিছু মিলিয়াও যাইবে···হার্ডির বিতা !···

৪

বাড়ীতে পৌছিয়াই রাজকুমার একটা ভীষণ নীরবতা াধ করিল।

অকস্মাৎ যদি সমগ্র সৌরমণ্ডল পক্ষাঘাতে অচল য়া পড়ে তাহা হইলে আকাশে যেরূপ স্তব্ধতা জাগে—।

এতদিনের অভ্যস্ত গুঞ্জন ; প্রহরের পর প্রহর ধরিয়া অবিশ্রাম নব নব তরঙ্গের জন্ম—যদি পলকে থামিয়া া, তাহা হইলে মহাশূন্যে যে অস্বাভাবিক অস্বাচ্ছন্দ্য খমে হইয়া উঠে সেইরূপ এক নিঝুম মৌনতার পাষাণ র রাজকুমার বক্ষে অনুভব করিল।

মাসীমা কথা কহেন না, উদাস দৃষ্টিতে উর্দ্ধে তাকাইয়া ছেন।

গায়ত্রী পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, মুখে কৃষ্ণা তিথির াশের কালিমা। কিছুই বুঝিয়া ওঠে না।

ডাকিল "গীতা !"···

মাসীমা ফুকারিয়া উঠিলেন।

গায়ত্রীর বুক যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার কণ্ঠ ভাঙিয়া গিয়াছে। ছোট্ট মেয়েটির মত ফুঁপাইতে থাকে,—দিদি, দিদি, আমার সোনার দি দি—ই—ই।

রাজকুমার নীরবে শুনিয়া গেল।

তাহার আপিসে যাইবার কিছু পরে দেওয়ালের ফাটাল হইতে এক সাপ বাহির হইয়া গীতাকে কামড়াইয়াছে। তাহা সে নিজেই নাকি খুলিয়া ফেলে। তাই ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিছু পূর্ব্বে তাহার শব গঙ্গায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ধরণীর শ্বাসে তখন যেন আগুন ছুটিতেছিল—

সমস্ত দিন ধরিয়া সে যে প্রখর রৌদ্র-বিষ পান করিয়াছে এ যেন তাহারই জ্বালাময় উদ্গার। উদভ্রান্ত রাজকুমার ছুটিয়া চলিল,—কোথা দিয়া যাইতেছে জানিবার অবকাশ পর্য্যন্ত নাই। চলা যেন শেষ হইতে চায় না।

দীর্ঘপথের গ্রীষ্ম ও ধূলিতে কাতর রাজ··· দেখে ভিন্ন পথ বাহিয়া বহুদূরে আসিয়া প··· ফিরিবার সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত দেহে অবশিষ্ট না·

একটি বাড়ীর বারান্দায় সে চুপ ক··· পড়িল—

অনল বর্ষণের বিরাম নাই।

রাজুর মনে হইল গীতার দেহের ··· আকাশ বাতাস ছাইয়াছে।···

ক্রমে আগুন ফুরাইয়া গেল।

দক্ষিণ হইতে এক ঝলক বাতাসে শীর্ণ··· পাতায় পাতায় করতালি বাজাইয়া দিল।··· ফটকের ধারের ঝোপের হাসনাহানার গন্ধে ··· সুরভিত হইয়া ওঠে।

পশ্চিমাচলে বিদায়ের পালা মৃদু ···—গগনে··· গৈরিকের, সেখানে হৃদয়ের তপ্ত শোণিতো··· নাই, করুণতা যেন শান্ত মাধুর্য্যের অবলেপের নীচে ডুবিয়াছে। এ যেন অপ্রত্যাশিত !

স্ফোটমান বেদনা কি এক মন্ত্রবলে নিমেষে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ব্যথার লেশমাত্র থাকে না, ভাবিয়াছিল যাহা

'আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত' শঙ্কিত সচকিত করিয়া ঝঞ্ঝার মূর্ত্তিতে ফাটিয়া পড়িবে—সে আজ এত সহজ ক্ষোভ-পরিতাপ-ক্রোধহীন ভিক্ষুর প্রশান্ত বেশে উপস্থিত হইল কিরূপে?

একটু দূরেই গঙ্গার ঘাট। ইহারই ক্রোশখানেক উজানে হয়ত প্রিয়ার সুকোমল দেহ গগনে পবনে মিশিয়া গিয়াছে। হয়ত বা ভস্মাবশেষ দুমুঠা ছাই জলে ফেলা হইয়াছিল।

নীচের এই যে অন্ধকার সলিল-প্রবাহ, খানিক আলোর স্পর্শে দৃশ্যমান হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই সহিত ভাসিয়া চলিয়াছে হয়ত সেই ছাইয়ের কয়েকটি কণিকা।

হয়ত তাহারই সিতোপল ললাটের, তাহারই কালো নয়নের স্মারক হইয়া এই জল কোনো সুদূর মেরুর দেশের শুভ্র তুষারে জমাট বাঁধিয়া উঠিবে—কখনও বা নিবিড় মেঘচ্ছায়ার নীচে নিথর কালো হইয়া উঠিবে।

শম্ভুর সহিত গায়ত্রীর পরিণয় চুকিয়া গেল। বরও ধন পাইয়া খুশী, মাসীমাও মহা আহ্লাদিত, গায়ত্রী যে লক্ষ্মীছাড়া হাঘরে ও ভাগচুলাহীনের হাতে পড়ে নাই ইহা পরম সন্তোষের বিষয়।

তিনি জামাতার হস্তে বাড়ীর চাবি দিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাশীবাসের যোগাড় করিতে লাগিলেন।

রাজুর মহাদেবত্ব ঘুচিয়া ভূতনাথের ভূতে আসিয়া ঠেকিয়াছে, চাকরী সে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

শম্ভুও জানিল লোকটা ভবঘুরের সর্দ্দার।

মাসীমারও মেয়ে জামাইয়ের স্কন্ধে চাপিয়া একজন বসিয়া খাইবে, সহ্য না হওয়ায় অলক্ষ্যে দুই একটি বিরক্তির কথা জানাইলেন।

ভাব বুঝিয়া রাজকুমার বিশেষ আঘাত পাইল।

ভাবিয়াছিল বাকী দু-একদিন নিশ্চিন্তে কাটাইয়া দিবে। জীবনধারণের নিমিত্ত ছটাছুটি আর ভাল লাগে না, কিন্তু অন্যের বিরক্তি উৎপাদনের হেতু সে হয়, ইহাও সে কোনদিন সহ্য করিতে পারিত না।

তাই যদিও গায়ত্রীর অন্তরে তাহার জন্য যথেষ্ট করুণা জমা রহিয়াছে—জানিয়াও সে শম্ভুর অনিচ্ছার উপর সেই ভরসায় দিন কাটানয় সম্মত হইতে পারিল না, তাই এক দিন রিক্তহস্তে পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল—ক্ষুধাতৃষ্ণায় সে পাগলের মত হইয়া পড়িল।

স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনার রঙীন তুলিকা শুষ্ক হইয়াছে, রঙের ছিঁটে-ফোঁটাও তাহাতে নাই। সত্য অন্ন, ক্ষুধার গ্রাসগ্রী; সত্য অর্থ নিরুপায়ের ভরসা।

যে প্রশান্তিকে সে বুকে পাইয়াছিল, প্রচণ্ড বাত্যার প্রকোপে তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পুরাতন দিবসগুলি আরও বিরস কঠোর হইয়া নিষ্করুণ অট্টহাস্যে তাহার সম্মুখে নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে—চারিদিক হইতে ছুটিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এবার আর রক্ষা নাই, রক্ত, মজ্জা, মাংস সমস্তই শুষিয়া গিলিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে।

চলিতে চলিতে দেখে বড় বাড়ীটার বাগানে অসংখ্য গোলাপ ফুটিয়া আছে। মনে হইল, ফুল, হাসি, প্রেম সমস্তই সৌন্দর্য্যের খাপে ঢাকা শোভনের ফসল, বুভুক্ষু পীড়িত কুৎসিত ভিখারী শীতে মর মর হইয়া যাহার দরজায় মৃত্যুর কাতরতায় আর্ত্তনাদ করিতেছে তাহারই প্রশস্ত উত্তপ্ত কক্ষ আলোয় আলোয় জল জল, সুবেশা তরুণীর কলহাস্যমুখর—

শতগ্রন্থি দুর্গন্ধ রক্তমাখা কাপড়ের টুকরা; ডাষ্টবিনের পরিত্যক্ত অন্ন যাহার ভরসা তাহার কাছে ঐ পুষ্পের হাসি একটা নির্ম্মম বিদ্রূপ বই কি।

প্রণয়ীর চিক্কণ চুলে গোলাপের মাল্য দোলাইয়া প্রশংস-দৃষ্টিতে যাহার কণ্ঠে প্রেমের জয়গীতি উঠিতেছে তাহার পাশে ইহাকে ভাবিতে গেলে ইচ্ছা করে দৌড়াইয়া গিয়া পুষ্পের হার ছিঁড়িয়া দ্রাক্ষাকুঞ্জে অগ্নি জ্বালাইয়া দেয়, বিলাসিনীর বিলোল আঁখি অন্ধ করিয়া ফেলে।

গীতাকে যে একদিন সে ভালবাসিয়াছিল ভাবিতেও নিজের উপর নিদারুণ রাগ হইতেছিল।

গঙ্গার জলকল্লোলে এতদিন সে প্রিয়ার সান্ত্বনার যে আভাস পাইয়াছে, আজ সে নিত্যকার মত গঙ্গার ধারে বসিয়া শুনিতে পাইল জল সুর বদলাইয়াছে। এইটি যেন সনাতন সুর, নিত্যকার যেন ইহা বিরাট্ নিষ্ফল আক্রোশের বাণী বহন করিতেছে। পূর্ব্বে যে মধু ক্ষরিয়াছে, যে গন্ধ, গান জাগিল তাহা যেন বুদ্বুদেরই মত ক্ষণিক ফুটিয়া নিভিয়া গিয়াছে—তারপর আবার

অথণ্ড দুঃখপারাবার ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে, দুলিয়া দুলিয়া সারা হইতেছে।

সেদিনের সুখশান্তি ক্ষুদ্র কারুকরা পাত্রে ভরা জল।

পাত্র চূর্ণ হইয়াছে, সতৃষ্ণ মাটি নিঃশেষে জল শুষিয়া লইয়াছে। হয়ত উহা স্বচ্ছ শীতল ছিল, কিন্তু আজ ধরার শুষ্ক মলিন জিহ্বার উপর উহা নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর; কোনোকালে উহা যে ছিল তাহাও ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অরতপ্ত পৃথিবীর নিঃশ্বাসের আঘাতে স্বপ্নজাল ছিঁড়িয়া যায়।

হাতের তালুর উপর দৃষ্টি পড়িতে রাজু দেখিল সেথায় ধ্বজবজ্রচিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে,—একটুও আবছায়া হইয়া যায় নাই।

সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, রাস্তার কঠিন কঙ্করের উপর সজোরে হাত ঘসিতে লাগিল, ছাল উঠিয়া রক্ত ঝরিতে থাকে, তবুও—জালা অসহ্য হইয়া ওঠে; রাজকুমার ঠোঁঠ চাপিয়া পথ চলিতে লাগিল—পথের একপাশে দেখে একটা মোটা লাঠি পড়িয়া, তাহা কুড়াইয়া লইল। কখনও বাঁধান রাস্তার উপর, কখনও দেওয়ালে, প্রাচীরে সজোরে আঘাত করিতে থাকে, গাছের ডাল নাগাল পাইলে পাতাগুলি ছিঁড়িয়া কুটিকুটি ছড়াইয়া একাকার করে।

আবার গঙ্গার ঘাটে আসিয়া পড়িল—নির্জ্জন ঘাট, রাত্রি অনেক হইয়াছে—

রাজকুমার একদৃষ্টে জলের পানে তাকাইয়া ভাবিতেছিল। মনে হইতেছিল, হয়ত সুদিন আসিতে পারে,—এখনও আসিতে পারে… ।

হয়ত ভাগ্যদেবী অঞ্জলি পূরিয়া তাহারই তরে সঞ্চিত দান লইয়া একান্ত নিকটে অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়া এই পাগলামী দেখিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন। হয়ত বা ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মত কখন সে উহা লইয়া অলক্ষিতে অতল সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছে—

ভাবিতে ভাবিতে মস্তিষ্ক টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

রাজকুমার খানিকটা খোলা হাওয়া নিঃশ্বাসে টানিয়া লইল।

হঠাৎ তামাকের সুবাস নাকে প্রবেশ করিল।

চাহিয়া দেখে, দুইটি হিংস্র চোখ তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া—মনে পড়িয়া গেল—একখানি বিশ্রী বাঁকা-চোরা মুখ, গলায়, হাতে, গায়ে অগুনতি রুদ্রাক্ষ, তারপর সেই টানা ভাঙা স্বর—

'হো—ষা—ট—এ—লক্ !'

সমস্ত শরীরে রাজকুমার একটা অধীরতা বোধ করিল, মনে হইল এ তাহার বিরাট সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে,—

শুষ্ক অধরে নৃশংসের মত সুপেয় জলের পাত্র তুলিয়া ধরিয়া পরক্ষণে তাহা সরাইয়া অনন্ত দ্রবাগ্নি গলার মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছে যে অদৃষ্ট, এ যেন তাহারই চর; এই নির্ম্মম খেলার পুতুল স্বরূপে সে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া সর্ব্বনাশী ভাগ্যলক্ষ্মীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে।

যে প্রখর বহ্নি ধিকি ধিকি জলিয়া তাহার হৃদয়কে অসহ দহন যন্ত্রণায় পীড়িত, প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছে—সেই অনল যেন ও মশালে করিয়া বহিয়া আনিল।

লোকটার দিকে তাকাইতে সমস্ত অঙ্গ ঝিম্‌ঝিম করিয়া আসিতেছিল। সুউচ্চ শৈলপ্রাকারে গাঢ় প্রচ্ছায়া ফেলিয়া এযেন গ্রীহাভুক্ শকুনি—এই ছোঁ মারিয়া খানিকটা মাংস ছিঁড়িয়া লয় বা।…

রাজকুমার মরিয়া হইয়া সমস্ত শক্তিতে লোকটার মাথায় লাঠির আঘাত বসাইল।

আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বে জলে পড়িয়া [illegible] মিলাইয়া গেল। শুধু কয়েকটি বৃত্তাকার ঢেউ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

বিমূঢ় রাজু খানিকক্ষণ জলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তারপর দিগ্বিদিক ভুলিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মনে হইতেছিল কালো জলরাশির মধ্য হইতে [illegible] প্রেত ওই বুঝি তাহার পিছনে তাড়া করিয়া [illegible]।

বহুক্ষণ ছুটিয়া একটি জনবিরল গলির [illegible] পড়িয়া হাতের পানে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিল। সেখানে রক্ত জমাট হইয়া আছে, আরও নূতন রক্ত ক্ষত হইতে ঝরিয়া ছিন্ন পরিধেয়কেও আর্দ্র করিয়া তুলিয়াছে—।

অবসন্ন হইয়া সে একটা প্রাচীর-পাশে হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। মুখ হইতে একটি ক্লান্তি ও স্বস্তির অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল—।

৫

ইহারই কয়েক দিবস পরে মধ্যরাত্রে সুমাত্রা জাহাজখানা আরব-সাগর দিয়া চলিয়াছিল। একটি যুবক রেলিংএ ভর দিয়া অনিমেষ চোখে দূর দিগন্তে বিলীয়মান নক্ষত্রটির পানে চাহিয়া ছিল—

সে রাজকুমার।

বহুকষ্টে লায়েনেল কোম্পানীর এই জাহাজে সে চাকুরী পাইয়াছে। সীমাহীন জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে, চাঁদের দেখা নাই। শুধু অসংখ্য তারকা হীরার মত কালো আকাশের গায়ে হীরার কুচির মত জলিয়া জলিয়া উঠিতেছিল।

রাজকুমার নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে—

অতীতে সে কি করিয়াছে-না-করিয়াছে কিছুই স্মরণে আসিতেছিল না, তাহার নিজের যে দুঃখ, অশান্তি বা সুখ বলিয়া কোনো পদার্থ আছে তাহাও মনে হইতেছিল না। একমাত্র হৃতপুত্র ফিরিয়া পাইলে জননীর যেরূপ আনন্দ হয় সেরূপ এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সে আপনার প্রতি ইন্দ্রিয় দিয়া পান করিয়া লইতেছিল।

বিছানায় পড়িয়া ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া সে যে আকাশ দেখিয়াছে তাহার সহিত ইহার কত তফাৎ—

কোথায় বেদনা, বিরহ, অন্তরীক্ষে আক্রোশের মহা [illegible]ই বা কোথায়? পক্ষের স্পন্দন থামিয়াছে; যেন [illegible] বিরাট পুরুষ ধ্যানে রহিয়াছেন, তাঁহারই প্রাণে [illegible] আনন্দের শিখা যেন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে—

কোন্ সে শুভ নিমেষ, যখন সেই উদ্দাম শিখা [illegible] প্রতি তৃণে, সমুদ্রের প্রতি ঢেউয়ের শিখরে, [illegible] প্রোজ্জল আলো জালাইয়া দিবে; সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা, সূর্য্য সেই বিপুল অগ্নিতে আসিয়া ঝাঁপ দিবে কাল প্রবাহ হারাইবে, সমস্ত কলকোলাহল সঙ্গীত একসুরে পুনরায় আদিম ওঙ্কারে উচ্চকিত হইয়া উঠিবে।

রাত্রে কেবিনে ফিরিয়া রাজকুমারের ঘুম আসিতেছিল না—এককোণে কতকগুলা পুরাণো দেশী খবরের কাগজ জমা ছিল, তাহারই একগোছা টানিয়া পড়িতে সুরু করিল।

প্রথমেই নজরে পড়িল, লেখা আছে—

অক্ষরগুলি মোটা মোটা, মফস্বলবাসী এ সুযোগ হারাইবেন না। ভূতপূর্ব্ব জম্মুরাজের সভা-জ্যোতিষী শ্রীধর মিশ্র জ্যোতির্বিদ্যাবারিধি, প্রাচ্যমহাবিদ্যার্ণব সম্প্রতি কলিকাতায়—নং বুধুওস্তাগর লেনে আপিস খুলিয়াছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যথাযথ গণিয়া দেওয়া হয়, প্রতিপ্রশ্ন পাঁচ টাকা, স্বস্ত্যয়নের খরচা পৃথক। ছাত্রদের কন্‌শেসন দেওয়া হয়, সত্বর সন্ধান লউন।...

কেবিনের রুদ্ধ বাতাস হঠাৎ যেন রাজকুমারের কাছে অসহ্য বোধ হইল—চোখ বুজিয়া—কাগজ নাড়িয়া খানিকটা বাতাস খাইল।

মনের মাঝে আশার অঙ্কুর এখনও যে গজাইয়া ওঠে!

সত্যই বধিরা লক্ষ্মী কি তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন?

রাজকুমারের কিরূপ নেশার মত লাগিতেছিল...

কিছু পূর্ব্বে উন্মুক্ত আকাশের তলায় তাহার মনে যে প্রশান্তি, কল্যাণের স্বপ্ন জাগিয়াছিল,—যেখানে লোভ নাই, কামনা নাই, হতাশা নাই; যেন এই ক্ষুদ্র কোঠরে আসিয়া কোথা দিয়া উঠিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে বিস্মৃত দিনগুলির কথা স্রোতের মত মনের আনাচে-কানাচে উঁকি মারিয়া ফিরিতেছে, কি জালা!

আবার কাগজ খুলিয়া বসিল—

এবার দেখিল, সর্পদংশনের মহৌষধ—

মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল;—সে কবে কোন্ যুগে তাহারই সহিত প্রথম পরিচয়; স্বপ্নের সমুদ্র হইতে সদ্যোজাতা সুষমা সবে উঠিয়া যেন তাহার বিস্তৃত নয়নে বাসা বাঁধিয়াছে, হাসিতে মুক্তা ঝরিয়া পড়ে—কবে প্রশান্ত নির্ঝরের মধ্যে তাহারই সহিত চেনা হইল? ..

কাহার অশরীরী ছায়া কোণের অন্ধকার হইতে আগাইয়া আসিল।

চক্ষে সেই স্বপ্নাতুর শ্রী, নিটোল কপোলের আধখানা

সর্পিল কেশে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বঙ্কিম ভ্রূলতা, তাহারই উপরে ললাটের সুবক্র ঢৌল, সমস্ত পেলবতা যেন চিবুকে আসিয়া শেষ হইয়াছে—

অধরে হাসি—

ইহা কি অনুরাগ অথবা অভিমান? বিদ্রূপ কি?…

রাজকুমার ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করিয়া সম্মুখের অন্ধকার হইতে আপনার চক্ষুর আলোকে তাহাকে খুঁজিয়া, টানিয়া আনিতে চাহিল!

কিন্তু কেহ কোথাও নাই—ইলেকট্রিক আলোটিকে ঘেরিয়া দু-চারিটি পোকা উড়িয়া ফিরিতেছিল, পেগে তাহারই মোটা কোটটি ঝুলিতেছে, জাহাজের মার্কা মারা।

মনকে জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিতে সে কাগজ পড়িতে সুরু করিল—দেখিল একস্থানে লেখা আছে '…পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছুদিন পূর্ব্বে গঙ্গার ঘাটে একটি অদ্ভুত শব পাওয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের পুলিশ তদন্তে জানা গিয়াছে মৃত ব্যক্তি—সহরের বিখ্যাত ধনী ও প্রসিদ্ধ চিত্রকর—…'

রাজকুমার নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া চলিল—

"ইহার কাগজপত্র হইতে জানা গিয়াছে ইনি বাংলার লোক। ইনি বিপত্নীক, দেশে ইহার ভগিনী ও দুই ভাগিনেয়ী আছেন। তাঁহারা ইহার কলিকাতা থার্‌টিন, সি—স্কোয়ারে পৈতৃক বাটীতে বাস করিতেন। ইহার উইল অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি ভাগিনেয়ীদ্বয়কে সমবিভাগ করিয়া দিতে অনুদেশ করিয়াছেন…। প্রকাশ যে বড়টির কিছুদিন পূর্ব্বে মৃত্যু হওয়ায় সমস্ত সম্পত্তি কনিষ্ঠা শ্রীমতী গায়ত্রী দেবীরই উত্তরাধিকারে আসিয়াছে। সম্প্রতি শম্ভুচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন যুবকের সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে…সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ত্রিশ কোটী টাকা…

বিস্ময়ে উত্তেজনায় রাজকুমার কাঁপিতে লাগিল।

এ সমস্তই তাহারই হইতে পারিত। নিজের সমস্তই ত সে আগ্রহে শম্ভুর হাতে তুলিয়া দিয়াছে। কানের পাশে সহস্র বাজখাই গলার বিদ্রূপ চীৎকারে কর্ণপটাহ যেন ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল,…"হোয়াট—এ—লক,—হাউ ওয়াণ্ডরফুল!"

হাতের পানে চাহিয়া দেখে সেখানে চিরস্থায়ী কালো দাগ; কিছুই তাহার মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আকাশ মেঘে ছাইয়াছে, উত্তর দিগন্ত হইতে একটি উদ্দাম বাতাস উন্মাদের মত হা হা করিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া একটি [illegible] শাবক পাহের উত্যাক্ত ঋজু শৃঙ্গের উপর [illegible] চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

অনাহূত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পুঁতেছিলাম লতা একটি ঘরের কোণে,
অযতনে;
ভেবেছিলাম, হয়ত তখন, অকারণে,
মনে মনে—
আপনা হ'তে যদিই তা'তে ফুলটি ধরে,
দুদিন পরে,
কে আর আছে—দেব' তুলে' সমাদরে—
কাহার করে?
আপন বোঁটায় আপ্‌না হ'তে ক্ষণিক হেসে,
দিনের শেষে,
মিলিয়ে যাবে এক নিমেষে, হাওয়ায় ভেসে—
ঝরার দেশে!

আজকে দেখি, অনাদরের কৌতূহলে,
রৌদ্রে জলে,
সেই লতাটিই ঘরটি ছেয়ে লতিয়ে চলে
ফুলে-ফলে!
মৌমাছিরা কাছ ছাড়ে না মধুর আশে,
ফুলের বাসে;
টুনটুনিরা বাঁধ্‌ছে বাসা পাতার পাশে
লতার ফাঁসে;
ঘর জুড়ে' আজ যাওয়া-আসা, প্রণয়-ভাষা
চল্‌ছে খাসা!
ভাঙা বুকে জুট্‌ল এ কোন্ সর্ব্বনাশা—
ভালোবাসা!

জ্ঞানেন্দ্রিয়

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মনুষ্যের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। ইন্দ্রিয়গণকে শরীরের দ্বার-স্বরূপ বলা হয়, অর্থাৎ বহির্জগতের সমস্ত ব্যাপারের সংবাদ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া মনে আসিয়া প্রবেশ করে এবং মন পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্জগতে নিজ প্রভাব বিস্তার করে। এই-সকল কথা আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া এতই অভ্যস্ত হইয়াছি যে, বিনা বিচারে সত্য বলিয়া মানিয়া লই। সাধারণ লোকে সকলেই বলিবে পাঁচটি মাত্রই কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি মাত্রই জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। পাঁচটির অধিক সংখ্যা কেন গণনা করা হয় না তাহা সাধারণতঃ কেহই ভাবিয়া দেখেন না। বৈজ্ঞানিক কিন্তু [illegible]র কিছুই মানিতে প্রস্তুত নহেন। সমস্ত প্রাচীন [illegible] কবাক্যে কোন কথা বলিলেও তাহা যুক্তি ও [illegible] উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিজ্ঞান স্বীকার [illegible]। ইহাই বিজ্ঞানের বিশেষত্ব।

[illegible]দের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা গণনা ও ইন্দ্রিয়ের বিভাগ [illegible] জ্ঞানসম্মত তাহা দেখা যাক। আধুনিক মনো[illegible] মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি লইয়া গবেষণা করে, কাজেই এখনকার মনোবিদগণ এ বিষয়ে কি বলেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ইত্যাদিকে আধুনিক বিজ্ঞানে ইন্দ্রিয়স্থান (sense organs) বলা হয়। ইন্দ্রিয়স্থান বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক (stimulus) দ্বারা উত্তেজিত (excited) হইলে বিশেষ বিশেষ সংবেদন (sensation) উৎপন্ন হয়; এই সকল সংবেদন হইতেই বহির্জগতের প্রত্যক্ষ (perception) জ্ঞান জন্মে। উদাহরণ যথা:—চক্ষুতে বহির্জগত হইতে আলোকরশ্মি আসিয়া উদ্দীপকের কাজ করিল, ফলে চক্ষু-গোলকের অভ্যন্তরস্থিত স্নায়ু (optic nerve) উত্তেজিত হইল; এই উত্তেজনা মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া 'আলোকের সংবেদন' উৎপন্ন করিল। এই সংবেদন হইতে 'বাহিরে আলোক রহিয়াছে' এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিল। মনে রাখিতে হইবে, বাহিরের 'আলোক' ও 'আলোকের সংবেদন' এক বস্তু নহে। 'আলোক' জড়বস্তু মাত্র। পদার্থবিৎ (physicist) তাহার গুণাগুণ বিচার করেন। অপর পক্ষে 'আলোকের সংবেদনে' সাধারণ জড়পদার্থের কোন গুণ নাই—তাহা মানসিক অনুভূতি মাত্র। মনোবিদের (psychologist) ইহা গবেষণার বিষয়। সেইরূপ পদার্থবিদের কাছে 'শব্দ' বিশেষ প্রকারের কম্পন মাত্র; মনোবিদের কাছে তাহা একটি বিশিষ্ট অনুভূতি। যে অন্ধ বা বধির, সে 'আলোক' বা 'শব্দের' অস্তিত্ব বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারে; কিন্তু 'আলোক' বা 'শব্দের সংবেদন' বুঝিবার তাহার কোনই উপায় নাই। আমরা অনেক সময় এই দুই বিভিন্ন অর্থে 'আলোক' কথাটা ব্যবহার করি; কখন 'আলোক' কথায় 'পদার্থবিদের আলোক,' কখনও-বা 'মনোবিদের আলোক' বুঝি। এই পার্থক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ মানসিক ব্যাপারের আলোচনায় বিশেষ গোলমালে পড়িবার সম্ভাবনা। পদার্থবিদের কাছে 'অন্ধকার' বা 'শৈত্যে'র অস্তিত্ব নাই—এই দুইটি 'আলোক' ও 'তাপের' অভাব মাত্র; কিন্তু মনোবিদের কাছে 'অন্ধকার' ও 'শৈত্য' উভয়ই বাস্তব পদার্থ, তাহাদের বিশেষ অনুভূতি আছে। পদার্থবিদের 'তাপমান' যন্ত্রে কোন বস্তুর তাপ মাপা যাইতে পারে ও তাহা বাড়িতেছে কি কমিতেছে তাহাও বলা যায়। একটি গ্লাসে গরম জল রাখিয়া তাহাতে হাত ডুবাইলে 'গরম' লাগিবে, কিন্তু তদপেক্ষা গরম জলে পূর্ব্বে হাত ডুবাইয়া পরে গ্লাসের জলে হাত ডুবাইলে তাহা 'ঠাণ্ডা' লাগিবে। একই জল অবস্থা-বিশেষে 'ঠাণ্ডা' বা 'গরম' লাগিতে পারে,—যদিও 'তাপমান' যন্ত্র বলিবে 'তাপ'

একই রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে পদার্থবিৎ হয়ত বলিলেন "তোমার প্রত্যক্ষ ভুল।" মনোবিদের মতে অনুভূতির ব্যাপারে পদার্থবিদের মত অনধিকার চর্চ্চা। 'গরম' বা 'শৈত্য' অনুভূতিতে কোন ভুল নাই। যখনই এই অনুভূতির সাহায্যে বাহিরের বস্তুর 'তাপ' নির্ণয় করিতে যাই তখনই ভুলের সম্ভাবনা, অর্থাৎ যখন মনোরাজ্যের ব্যাপারকে বাহিরের ব্যাপারের মাপকাটি করি, অর্থাৎ পদার্থবিদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করি, তখনই ভুলের সম্ভাবনা দেখা দেয়। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সর্ব্বদা এইরূপ ভুল পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিতে হইলে আমাদেরও এই ভুল এড়াইয়া চলিতে হইবে।

প্রথমতঃ আধুনিক মনোবিদ্যার দিক্ হইতে বিভিন্ন 'সংবেদন' (sensation)-গুলির বিচার করা যাক্। চক্ষুর সাহায্যে আমাদের আলোকের সংবেদন জন্মে ও কর্ণের সাহায্যে শব্দের সংবেদন হয়। এই দুই সংবেদনের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই। তাহারা বিভিন্ন বর্গের। চক্ষুর দ্বারা শব্দ শোনা অসম্ভব। সাধারণতঃ এক 'ইন্দ্রিয়ের' কাজ অপর ইন্দ্রিয় করিতে পারে না। এইজন্য আলোক ও শব্দকে পৃথক সংবেদন বলিয়া ধরা হয় এবং চক্ষু ও কর্ণকে দুইটি পৃথক ইন্দ্রিয়স্থান বলা হয়। চক্ষুর দ্বারা যে-সকল 'সংবেদনের' অনুভূতি হয়, তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। লাল আলো ও সবুজ আলো এক নহে। বিভিন্ন রং এর প্রভেদ চক্ষুর সাহায্যে ধরা পড়ে। এই প্রভেদ সত্ত্বেও চক্ষুগ্রাহ্য সমস্ত সংবেদনের মধ্যে একটা জাতিগত ঐক্য আছে। লাল ও সবুজ আলোর যে পার্থক্য, শব্দ ও আলোর মধ্যে পার্থক্য তদপেক্ষা অনেক গুরুতর। বিভিন্ন রং-এর আলোক একই বর্গের, কিন্তু আলোক ও শব্দ বিভিন্ন বর্গের। একই ইন্দ্রিয়স্থান হইলে এক বর্গের বিভিন্ন সংবেদন সত্ত্বেও 'ইন্দ্রিয়ের' সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না।

পাশ্চাত্য মনোবিদ্গণ চক্ষু-কর্ণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়স্থান (sense organ) ব্যতীত আরও কতকগুলি ইন্দ্রিয়স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়স্থানের এক একটি বিভিন্ন সংবেদন আছে। দার্শন, শ্রাবণ, স্পার্শন, রাসন ও ঘ্রাণজ সংবেদনের সহিত সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত আছেন। ইহাদের মধ্যে স্পার্শন সংবেদন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। অনেকে ত্বগিন্দ্রিয়কে একটি ইন্দ্রিয় বলিতে প্রস্তুত নহেন। ত্বকের সাহায্যে আমরা যে-সকল সংবেদন জানিতে পারি, তাহাদের এক বর্গের বলা চলে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গাত্র স্পর্শ করিলে যে 'ছোঁয়া' বা 'প্রৈষ-বেদন' (pressure sensation) জন্মে, তাহার সহিত উষ্ণ দ্রব্য স্পর্শে যে 'ঊষ্মা-বেদন' হয় (temperature sensation)—এ দুইকে এক জাতীয় বলা শক্ত। তদ্রূপ 'শৈত্য' ও 'ঊষ্মাকে' বিভিন্ন জাতীয় মনে হওয়া সম্ভব। কিন্তু মনঃসংযোগের সহিত অন্তর্দর্শনের দ্বারা (introspection) এই-সকল সংবেদনের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রৈষ-বোধের সহিত ঊষ্মার যে পার্থক্য, প্রৈষ-বোধের সহিত শব্দের পার্থক্য তদপেক্ষা অনেক অধিক। শৈত্য ও ঊষ্মাকেও এক বর্গে ফেলা নিতান্ত অন্যায় হয় না। ব্যাবহারিক জীবনেও ত্বগিন্দ্রিয়জাত সকল সংবেদনকেই আমরা একই বর্গে ফেলি ও অনেক সময় একসঙ্গেই তাহাদের অনুভব করি। কোন জিনিষ ছুঁইলে তাহার স্পর্শবোধের মধ্যেই তাহার উষ্ণতা ইত্যাদি অনুভূত হয়। ছুঁচ ফুটাইলে যে 'ব্যথা' হয় (sensation of pain), তাহাও এই বর্গের। ত্বকের সহিত চারি প্রকারের সংবেদন জড়িত রহিয়াছে; যথা—প্রৈষ, ঊষ্মা, শৈত্য ও ব্যথা। ত্বকের মধ্যেই ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন বোধযন্ত্র পাওয়া যায়। এই-সকল ইন্দ্রিয়স্থান অতি ক্ষুদ্র ও ত্বক-মধ্যেই অবস্থিত। কেবল অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের দেখা যায়। চুলকানি, সুড়সুড়ি, ইত্যাদি নানা-প্রকার বোধ উপরিউক্ত বিভিন্ন সংবেদনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। তাহাদের পৃথক ইন্দ্রিয়স্থান নাই।

ত্বক-সংক্রান্ত সমস্ত সংবেদনকে এক বর্গের মানিয়া লইয়া এ পর্য্যন্ত পাঁচ প্রকারের সংবেদন পাওয়া গেল। এখন আরও কতকগুলি সংবেদনের কথা বলিব, যাহাদের অস্তিত্ব সাধারণে অবগত নহেন। কাহারও হাতে সন্দেশ দিয়া যদি তাহাকে বলা যায়, 'চোখ বন্ধ করিয়া তুমি ইহা মুখে দাও', তবে সে বিনা আয়াসেই ইহা পারিবে। চোখে না দেখিয়াও কি উপায়ে হাত ঠিক মুখে পৌঁছায় তাহা ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। হাত বাড়াইয়া কোন জিনিষ ছুঁইয়া পরে চোখ বুজিয়া

আবার তাহা সহজেই ছোঁয়া যায়। কতখানি হাত বাড়াইতে হইবে, কোন্ দিকে বাড়াইতে হইবে, ইহা আমরা একপ্রকার বিশেষ অনুভূতির দ্বারা স্থির করি। অবশ্য হাত বাড়াইবার একটা চাক্ষুষ প্রতিরূপও (image) মনে ভাসিয়া ওঠে। কিন্তু এই প্রতিরূপ মানস প্রতিরূপ বলিয়া, দ্রব্যটি কোথায় আছে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। হস্তের অনুভূতির দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি— উপযুক্ত পরিমাণ হাত বাড়ানো হইতেছে কিনা। পরীক্ষা করিলে পাঠক দেখিবেন, এই অনুভূতি হাতের বাহিরের ত্বকের অনুভূতি নহে, হাতের ভিতরকার পেশী, কব্জি, কনুই ও স্কন্ধের সন্ধিস্থল হইতে এই অনুভূতি আসিতেছে। ইহা একপ্রকার বিশেষ সংবেদন। চক্ষু বন্ধ থাকিলে স্নায়ু, পেশী ও সন্ধিস্থল-জাত সংবেদন হইতে আমরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান অনুভব করি। হাত উঁচু বা নীচু হইয়া আছে, পা বাঁকিয়া আছে বা সোজাভাবে আছে, সমস্তই এই প্রকারের সংবেদন হইতে বুঝিতে পারা যায়। কোন জিনিষ ঠেলিলে বা টানিলে, হাত-পা টিপিলে এই-সকল সংবেদন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কোন কোন রোগে পেশীয় (muscular) স্নাবীয় (tendinous) ও সন্ধি-গত (articular) সংবেদনের বৈলক্ষণ্য ঘটে। তখন রোগীকে চোখ বন্ধ করিয়া সন্দেশ খাইতে দিলে সে তাহা ঠিক মুখে দিতে পারে না। চোখ বন্ধ অবস্থায় তাহার হাত-পা নাড়িয়া দিলে তাহাদের সংস্থানও সে বুঝিতে পারে না।

কাহাকেও যদি পিঁড়ির উপর বসাইয়া শূন্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, পরে তাহাকে চোখ বন্ধ করিয়া ঘুরাইয়া দিলে সে বলিতে পারে কোন দিকে ঘুরিতেছে। এরূপ অবস্থায় তাহার শরীরের কোন অঙ্গই নড়িতেছে না, অথচ সে যে ঘুরিতেছে তাহা বুঝিতে পারে। একপ্রকার বিশেষ সংবেদনের উপর এই জ্ঞান নির্ভর করে। এই সংবেদনের ইন্দ্রিয়স্থান কর্ণের মধ্যে অবস্থিত। ইহাকে (ampullar sensation) বা দিক্‌বেদন বলা হয়। কর্ণের মধ্যে আরও একটি যন্ত্র আছে, তাহার নাম vestibule। এই vestibule হইতে যে সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের মাথা উপরে আছে কি নীচে আছে, গাড়ীতে চড়িয়া আমরা সামনে যাইতেছি কি পিছনে যাইতেছি। ইহাকে 'কায়স্থিতি-বেদন' বলা যাইতে পারে। কারণ ইহার দ্বারা সমস্ত শরীরের অবস্থান বোঝা যায়। কোন-কোন মূক-বধিরের vestibule বিকল থাকে। তাহারা জলে ডুব দিলে বুঝিতে পারে না, কোন্ দিক উপর, কোন দিক নীচু, এইজন্য সহজেই ডুবিয়া যায়। এই যন্ত্রের সামান্যমাত্রও দোষ থাকিলে বিমানপোত (aeroplane) চালনা অসম্ভব। কারণ কুয়াশায় বা অন্ধকারে চালক বুঝিতে পারে না, উপরে উঠিতেছে কি নীচে নামিতেছে, এরোপ্লেন উল্টাইয়া চলিতেছে কি সোজা চলিতেছে, তাহার মাথা নীচের দিকে আছে কি সোজা আছে।

স্পার্শন, শ্রাবণ ইত্যাদি পাঁচ প্রকার সংবেদন ব্যতীত যে-সকল সংবেদনের কথা বলা হইল, তাহাদের একটা সাধারণ বিশেষত্ব এই যে, তাহারা বিভিন্ন প্রকার গতির বোধ নির্দ্দেশ করে। এইজন্য এই সমস্ত সংবেদনের সাধারণ নাম দেওয়া হয়. কর্ণাস্থা (kinaesthesis)। ইহা ছাড়া শরীরাভ্যন্তরস্থ পাকাশয় অন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রাদি হইতেও একপ্রকার সংবেদন পাওয়া যায়, যাহার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। অতিমাত্রায় এই সংবেদন হইলে পেট কামড়ানি ইত্যাদি বোঝা যায়। এই-সকল সংবেদনের উপর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি সংবেদন মিশ্র-সংবেদন। এইজন্য তাহাদের পৃথক আলোচনা অনাবশ্যক।

দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্য মনোবিদ্যা পাঁচটির অধিক ইন্দ্রিয়স্থান বা sense organ স্বীকার করিতেছেন। কোন কোন মনোবিৎ পেশীয়, স্নাবীয় ও সন্ধিগত সংবেদনকে ত্বকজাত সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। তাঁহারা বলেন, ইহাদের সহিত দৈহ-সংবেদনের সাদৃশ্য আছে ও ইহাদের ইন্দ্রিয়স্থানগুলিও ত্বকের নীচেই অবস্থিত। এই মত স্বীকার করিলেও পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ইন্দ্রিয়-সংখ্যা-গণনা মিলে না। কারণ দিক্‌বেদন ও কায়স্থিতি-বেদনকে ত্বকজাত বলা যায় না। মনোবিদ্‌গণের ইন্দ্রিয়-সংখ্যা-গণনা সমীক্ষা (observation) ও পরীক্ষার (experiment) উপর প্রতিষ্ঠিত। যে-কেহ ইহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারেন। বলা যাইতে পারে, শাস্ত্রকারগণ এই

সকল পরীক্ষাসিদ্ধ সংবেদনগুলির অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না, সেজন্য তাহাদের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহাদের যে সূক্ষ্ম অন্তর্দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় না যে এই সংবেদনগুলি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। কেন যে তাঁহারা পাঁচটির অধিক জ্ঞানেন্দ্রিয় মানেন নাই আমার বুদ্ধি-মত তাহার আলোচনা করিতেছি।

আধুনিক মনোবিদ্যায় sense organ বলিতে যাহা বোঝায়, 'ইন্দ্রিয়' ঠিক তাহা নহে। Sense organকে ইন্দ্রিয়স্থান বলা উচিত। চক্ষু ও চক্ষুরিন্দ্রিয় এক পদার্থ নহে। যে সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যে চক্ষুর দ্বারা দর্শন সম্ভব হয় তাহার আশ্রয় চক্ষুরিন্দ্রিয়। এই আশ্রয়-স্থান কাল্পনিক (hypothetical) এবং তাহা চক্ষুর মধ্যেই স্থিত ধরা হয়। এই শক্তির অধিষ্ঠান বা ইন্দ্রিয় দর্শনগ্রাহ্য নহে। ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন,—এই ন্যায়ে দর্শন-শক্তিকে দর্শনেন্দ্রিয় করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। যে কয়টি বিশেষ শক্তি থাকার জন্য মন বহির্জগতের বিশেষ বিশেষ সংবাদ অবগত হইতে পারে, সেইগুলিকেই জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। এক শক্তি এক জাতীয় সংবাদই জানিতে পারে। বিভিন্ন শক্তি না থাকিলে বিভিন্ন সংবাদ জানা যাইত না। শাস্ত্রকারেরা দেখিলেন, মাত্র পাঁচটি শক্তির সাহায্যেই মানুষ বহির্জগতের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান লাভ করে। এই কথা পরে আরও বিশদ করিতেছি।

'আত্মানাত্ম বিবেকে' ইন্দ্রিয় কাহাকে বলে তাহার বিচার আছে, নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।—

"জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি। শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্তকর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্নবতোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি। ত্বগেন্দ্রিয়ং নাম ত্বগ্‌ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়মাপাদতলমস্তকব্যাপিশীতোষ্ণাদিস্পর্শগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়মিতি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তি রূপগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি। জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি রসগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়মিতি। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তি গন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি।"

"জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কি? শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম। ত্বক্ শিরাদি আকৃতি বিশিষ্ট কর্ণ হইতে ভিন্ন কর্ণবিবরমধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দ গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম শ্রোত্রেন্দ্রিয়। ত্বক্ ভিন্ন অথচ ত্বগাশ্রিত চরণাবধি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপনশীল শীত-গ্রীষ্মাদিস্পর্শ গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের নাম ত্বগিন্দ্রিয় গোলাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন অথচ গোলকাশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ তারকার অগ্রবর্ত্তী রূপ গ্রহণ শক্তি যুক্ত ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়। জিহ্বা ভিন্ন অথচ জিহ্বাশ্রয় জিহ্বার অগ্রবর্ত্তী মধুরাদি রস গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম জিহ্বেন্দ্রিয়। নাসিকা হইতে ভিন্ন অথচ নাসিকাশ্রয় নাসিকার অগ্রবর্ত্তী গন্ধ গ্রহণ শক্তিশালী যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয়।"—রামমোহন রায় কৃত অনুবাদ।

এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শাস্ত্রকারের ইন্দ্রিয় বলিতে সূক্ষ্ম পদার্থ বুঝিতেন। ত্বগিন্দ্রিয় সমস্ত শরীরব্যাপী হইলেও ও শীতগ্রীষ্মাদি বিভিন্ন বোধ-সমন্বিত হইলেও, তাহা একই ইন্দ্রিয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। চক্ষু কর্ণ ও নাসারন্ধ্র দুইটি দুইটি হইলেও দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় একটি করিয়াই ধরা হয়। যদি চক্ষু ব্যতিরেকেও অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা দেখা সম্ভব হইত, তাহা হইলেও দর্শনশক্তি একই বলিয়া দর্শনেন্দ্রিয় একটিই—গণনা করা হইত। অতএব বোঝা যাইতেছে, শক্তির পার্থক্য না থাকিলে ইন্দ্রিয়স্থান বহু হইলেও ইন্দ্রিয় একই ধরা হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কণ্ডাস্থা সংবেদনগুলির (kinaesthetic sensation) সাধারণ গুণ এই যে, তাহাদের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের গতি-বোধ হইয়া থাকে। এই গতি-বোধ কেবল কণ্ডাস্থারই নিজস্ব নহে,—দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যেও আমাদের গতি-জ্ঞান জন্মে। অতএব গতি-জ্ঞাপক সংবেদনগুলির জন্য পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়-কল্পনা নিরর্থক, যদিও ইন্দ্রিয়স্থানের গণনাকালে এই সকলগুলিরই সংখ্যা-নির্দ্দেশ কর্ত্তব্য। দেখা যাইতেছে, শাস্ত্রকারগণ ও পাশ্চাত্য মনোবিৎ—উভয়ের কথাই ঠিক। পাঁচটির বেশী ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়স্থান অনেকগুলি।

কোন নূতন প্রকার সংবেদনের সাহায্যে যদি অপর ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আবার নূতন করিয়া পাওয়া যায়, তবে ইন্দ্রিয়-সংখ্যা বেশী ধরা হইবে না। বর্ত্তমান কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যদি কোন নূতন জ্ঞানও জন্মে তত্রাচ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সমানই থাকিবে। উদাহরণ

দ্বারা গতি-জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা বাড়ে না, কারণ দর্শনের দ্বারাও গতি জানা যায়। ত্বক কিংবা চক্ষুর সাহায্যে বিদ্যুতের অস্তিত্ব জানিলেও ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সমানই রহিল। যদি কখনও কোন নূতন রকমের সংবেদে-র সাহায্যে কোন নূতন বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় তবে ইন্দ্রিয়-সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। ইন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইলে পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়স্থান, পৃথক সংবেদন ও তদনুরূপ পৃথক বস্তু থাকা চাই।

নব্যচীন ও বাঙ্গালা*

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

আজ চোখের উপর দেখিতেছি চীনে নবজাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা এখন ছাত্র তাঁহাদের জন্মের পূর্ব্বেই চীনে এই নূতন প্রেরণা আসিয়াছে। ১৮৯৪ সালে নবমন্ত্রে দীক্ষিত জাপান অশিক্ষিত চীনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। জাপানের পক্ষে কলঙ্কময় সে ইতিহাসের বিস্তৃত উল্লেখ করিতে চাহি না; মোহাভিভূত চীনের সিংহাসনে তখন মাঞ্চুবংশীয় সম্রাট ক্রীড়াপুত্তলিকার মত নামে মাত্র অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাহিরে যে একটা বৃহত্তর জগৎ আছে, চীনজাতির সে ধারণা একেবারেই ছিল না। আবহমান কাল ধরিয়া যে-সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রীতি চিরাচরিত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, চীনজাতি তাহার পরিবর্ত্তনের কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। তাই অহিফেনের নেশায় বিভোর বিরাট চীনজাতি যখন মুষ্টিমেয় সুশিক্ষিত জাপানী সৈন্যের সম্মুখে ফুৎকারের মত উড়িয়া গেল, সামান্য একটি ওজর বাহির করিয়া যুদ্ধ ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন জাপানের নৌবহর চীনের পুরাতন জীর্ণ রণপোতগুলি চীন সমুদ্রের তলে ডুবাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল, চীনের পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষ যখন জাপানের মাত্র পাঁচকোটি লোকের সম্মুখে মাথা নত করিল, তখন পরাজিত ও বিধ্বস্ত চীনজাতির মধ্যেও একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

তখন বিখ্যাত রাজনীতিক লি হান্ চাং জীবিত। তিনিই চীনসম্রাট ও তাঁহার পারিষদবর্গকে প্রথম বুঝাইলেন যে, শুধু জনসংখ্যার আধিক্যেই জাতির বল সূচিত হয় না, আধুনিক যুগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইলে চীনকে বর্ত্তমানের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। লি হান্ চাং বলিলেন, "যাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাপান আজ প্রথম শ্রেণীর শক্তিবর্গের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাহিতেছে, আমাদিগকেও তাহার মার্গ গ্রহণ করিতে হইবে।" চীনজাতির পক্ষে এক হিসাবে সে পরাজয় আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ হইল; কারণ সেই পরাজয়ের ধিক্কারেই জাপানের শিক্ষাগুরু য়ুরোপ ও আমেরিকার দ্বারে শিক্ষার্থী বেশে নবীন চীন ধন্না দিয়া পড়িল। লি হান্ চাং প্রচার করিলেন, "শুধু য়ুরোপ ও আমেরিকা নহে আমরা এখন আমাদের শত্রু বিজয়ী জাপানের পদপ্রান্তেও শিক্ষালাভ করিব।" এই নবজাগরণের ফলে ১৯০৬।৭ খৃষ্টাব্দে বিশ হাজার চীনাছাত্র শিক্ষার্থীরূপে জাপানে উপস্থিত হইল—দলে দলে চীনাছাত্র য়ুরোপ ও আমেরিকায় ছাইয়া পড়িল। কি করিয়া জন্মভূমির দুর্দ্দশা ঘুচিবে, কি-ভাবে নবীন চীন সভ্যজগতে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করিবে সকলেই এই এক মহান্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। জাপান প্রথমে চীনাছাত্রের এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, বিশ হাজার বৈদেশিক ছাত্রকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা বড় সহজ কথা নহে। ফলে

---

*ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার M. Sc. কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

জাপানকে প্রধানতঃ চীনাছাত্রদিগের জন্ম আধুনিক প্রণালীতে গঠিত কয়েকটি কলেজ খুলিতে হইল। এই বিশ হাজার ছাত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই অতি দরিদ্র, সারাদিন কুলীগিরি করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিত তাহার সাহায্যেই ইহারা নিজেদের খরচ চালাইত ও সন্ধ্যার পর নৈশবিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিত। ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা মেধাবী এমন শত শত চীনাছাত্র গভর্মেণ্টের খরচে য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হইল। মোটের উপর নবীন চীন বুঝিতে পারিল যে, শিক্ষা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, তাই নিজেদের কূপমণ্ডূকত্ব ঘুচাইবার জন্ম দলে দলে বাহিরে আলোর সন্ধানে ছুটিয়া চলিল।

চীনের এই নব অভ্যুত্থানের পরিচয় আমি বিদেশীর লিখিত গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি, গত দশ বৎসরের মধ্যে চীন সম্বন্ধে অসংখ্য পুস্তক য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় পাশ্চাত্য লেখকদের লিখিত হইলেও এই-সকল পুস্তকে "পীতাতঙ্কের" চিহ্নমাত্র নাই, সকলেই সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া চীনের এই নব অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যান করিয়াছেন।

আমি অনেক সময়ে ভাবিয়া থাকি কেমন করিয়া বিরাট চীনজাতি যুগযুগান্তের সঞ্চিত কুসংস্কারের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল। প্রথমেই চোখে পড়ে চীন জাতির ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সার্ব্বভৌমিকতা—ভারতবর্ষের অন্ত প্রদেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেও, যতই গর্ব্ব করি না কেন, আমরা এখনও অস্পৃশ্যতার পাপ এড়াইতে পারি নাই। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে দৈনিক পত্রে প্রকাশিত, তথাকথিত এক অস্পৃশ্যের করুণ কাহিনী আমার নজরে পড়িয়াছে। এক নমঃশূদ্র ভদ্রলোক আপিসের বাবুদের মেসে থাকেন, এইজন্ম পদে পদে তাঁহাকে নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়; এমন কি মেসের চাকর পর্য্যন্ত তাঁহার থালা মাজিতে কুণ্ঠিত হয়। সম্প্রতি আজমীরের শিক্ষাবিভাগের বার্ষিক বিবরণী হইতে জানিতে পারিলাম যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বালকগণকে বর্ণনির্ব্বিচারে একাসনে বসিতে দেওয়া হয় বলিয়া শিক্ষক বেচারাদের সাধারণের চক্ষে হেয় হইতে হয়। মাদ্রাজ ও করদ রাজ্যসমূহে অস্পৃশ্যতার ফলাফল আরও ভীষণ; সে সকল দেশে স্পর্শদোষ এতদূর সংক্রামক যে নীচজাতির সঙ্গে এক কাষ্ঠাসনে বসিলেও উচ্চজাতির জাতিপাত অবশ্যম্ভাবী। আর ভারতবর্ষের এই অচলায়তনের সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে চীনদেশের বিশ্বজনীন উদারতার তুলনা করুন, দেখিবেন ধর্ম্মের নামে, সাম্প্রদায়িকতার মোহে চীনজাতি কখনও ভেদবুদ্ধির নাগপাশে নিজেদের আবদ্ধ করে নাই। তিন হাজার বৎসর যাবৎ চীনজাতি অস্পৃশ্যতা বলিয়া কোন পদার্থ জানে নাই, জাতির পক্ষে এ বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। জাতিভেদ না থাকার দরুণ চীনদেশে উচ্চনীচের পার্থক্য কোনকালেই বিশেষভাবে ছিল না, রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক উচ্চপদগুলি কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় বা জাতি একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত করিতে পারে নাই। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া চীনদেশে রাষ্ট্রের উচ্চপদগুলি কঠোর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলানুসারে উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে প্রতিভাশালী অধিবাসিগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া আসিতেছে। সমাজের যে কোন স্তরের লোক হউক না কেন, প্রতিভা ও অধ্যবসায় থাকিলে তাঁহার পক্ষে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার (Mandarin) পদ পর্য্যন্ত পাওয়া অসম্ভব নহে। গ্রামের কোন যুবক প্রতিভার পরিচয় দিলে সকলে মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকে। জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে এই সামাজিক উদারতা কতদূর প্রয়োজন তাহা আমরা নিজেদের বিপরীত দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মবিষয়ে চীনজাতি চিরকালই অতি উদার। বহুকাল পূর্ব্বে চীনজাতি বুঝিতে পারিয়াছে যে, ধর্ম্ম মানুষের অন্তরের বস্তু, নৈতিক ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বরের সঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ। তাই প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাসস্থান হইলেও ধর্ম্মের নামে সেখানে কখনও রক্তারক্তি হয় নাই। সুসভ্য য়ুরোপও এবিষয়ে চীনের সমকক্ষ নহে; মধ্যযুগে, এমন কি দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও ধর্ম্মের নামে য়ুরোপ যে পাশবিকতার প্রশ্রয় দিয়াছে তাহার

তুলনা চীনদেশের কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের অন্ধকারময় যুগেও মিলে না। একই ধর্ম্মের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোককে জীবন্ত পুড়াইয়া অশেষ পুণ্য অর্জ্জন করিবার স্পৃহা প্রাচ্যদেশে কখনও ছিল না; "ডাইনী" দেখিলেই দগ্ধ করিতে হইবে এ নীতি শুধু প্রতীচ্য দেশেই সম্ভব। য়ুরোপের ইতিহাসে ধর্ম্মান্ধতার এই কলঙ্কময় যুগ শত শত ক্র্যান্‌মার, ল্যাটিমার, রিড্‌লী, হাস্, জোয়ান অফ আর্ক প্রভৃতি নিরপরাধ স্ত্রী-পুরুষের রক্তে রঞ্জিত হইয়া আছে। ধর্ম্মের নামে ফ্রান্সে Massacre of St. Bartholmew প্রভৃতি কি বীভৎস কাণ্ডই না অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু চীনদেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যে এই-প্রকার সাম্প্রদায়িক কলহ সম্ভবপর হয় নাই তাহার কারণ দেশের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌমিক উদারতা। চীনের ধর্ম্মমত চিরকালই নীতিমূলক. নৈষ্ঠিক আচারের কঠোরতা ও তজ্জনীন সঙ্কীর্ণতা তাহাতে কোনও কালেই ছিল না। খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে দুইজন চৈনিক দার্শনিক, কনফুচে ও লাওট্‌সি, যে নীতিমূলক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তাহার উদারতা পরবর্ত্তীকালে প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা আনিতে পারে নাই। সকল ধর্ম্মই কতকগুলি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; মিথ্যা-কথা বলিও না, পরস্বাপহরণ করিও না, অসৎ পথে জীবন যাপন করিও না—এই-প্রকার কতকগুলি অবিসংবাদিত নীতি সকল ধর্ম্মের সার। কনফুচের নীতিসূত্র ও লাওট্‌সি প্রবর্ত্তিত "টাওইসম্" এই শ্রেণীর বিদ্বেষবিহীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এই প্রকার আবহাওয়ার মধ্যে পুষ্ট হইয়া চীনজাতির মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদারতা মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিত্যনূতন কলহ এবং একই সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ নীচের ব্যবধান আলোচনা করিলে আমাদের আধ্যাত্মিক অনুদারতা সহজেই ধরা পড়ে।

অথচ চীনদেশে সকল লোকই একধর্ম্মাবলম্বী এমন নহে; বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, কনফুচে ও লাওট্‌সির অনুগামী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের লোক চীনা সমাজে আছেন; কনফুচে ও লাওট্‌সি তাঁহাদের নীতিমূলক ধর্ম্মমত চীনদেশে প্রচার করেন খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে। বুদ্ধের বাণী তখনও চীনদেশে প্রচারিত হয় নাই। কয়েক শতাব্দী পরে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের ঢেউ চীনদেশ প্লাবিত করিল তখন অধিকাংশ লোকেই বুদ্ধকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইল, কিন্তু ইহাতে পূর্ব্বাভ্যস্ত নীতিমূলক ধর্ম্মে তাহাদের কোনরূপ অনাস্থা আসে নাই। কালক্রমে চীনদেশে মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মও প্রচারিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমান ও খৃষ্টানের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে, সমগ্র চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় চার কোটি। কিন্তু চীনদেশে ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, এমন কি সামাজিক আদান-প্রদানেও ধর্ম্মমতের বৈষম্য কোন-প্রকার ব্যাঘাত জন্মায় না। শুধু চীন দেশে নহে, জাপানেও এই প্রকার সাম্প্রদায়িক উদারতা দেখিতে পাওয়া যায়, একই পরিবারে বাপ হয়ত খৃষ্টপন্থী, মা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং সন্তান শিন্টো সম্প্রদায়ভুক্ত; কিন্তু পতি, পত্নী ও পুত্রের ধর্ম্মের বৈষম্য পরিবার মধ্যে কোনপ্রকার অশান্তির কারণ হয় না।

চীনদেশের এই উদারতার সঙ্গে যখন আমাদের সংকীর্ণতার তুলনা করি তখন একটি বিষয় চোখে পড়ে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের সামাজিক জীবনের দুইটি রূপ দেখিতে পাই; যবনিকার অন্তরালে আমরা যে জীবনযাপন করি, বাহিরের জীবনের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য নাই। বিলাতী শিক্ষার ফলে আমরা কতকগুলি বিষয়কে অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখিয়াছি এবং সভাসমিতি ও মাসিকপত্রে এই সকলের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক ও পারিবারিক অশান্তি হইতে রক্ষা পাইবার আশায় মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করিয়া শান্তি ক্রয় করিতেছি। বহু শিক্ষিত যুবক আমার নিকট বড়াই করিয়া থাকে যে, তাহারা জাত মানে না, এমন কি হোটেলে বিধর্ম্মীর স্পৃষ্ট অন্নভোজন করিতে তাহাদের বাধে না। উত্তরে আমি তাহাদের বলিয়া থাকি যে, ইহাও তাহাদের ভণ্ডামির আর এক উদাহরণ; কারণ যে নৈকষ্য কুলীন সন্তান বাহবা লইবার আশায়

আজ আমার নিকট হোটেলে খানা খাইবার কথা বলিয়া গেল কালই হয়ত সে নিজগ্রামে সামাজিক ভোজনের সময় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে উপবেশন করিতে রাজী হইবে না। জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়া ত মস্ত বড় কথা, আজ পর্য্যন্ত রাঢ়ী বারেন্দ্রে কয়টি বিবাহ হইয়াছে? আবার শুধু বিভিন্ন শ্রেণীতে থাকিয়াই রক্ষা নাই, একশ্রেণীর মধ্যেই যে কত প্রকার ছোটখাট বিভাগ আছে তাহার ইয়ত্তা কে করে? 'কাপের' কন্যা কুলীন বিবাহ করিলে, সে কুলীনের আর নিস্তার নাই, অধস্তন ও উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের রৌরব নরকবাস সুনিশ্চিত।

চীনের এই নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে এই উন্নতি রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে সাধিত হইয়াছে। এই যে, হাজার হাজার ছাত্র দেশের উন্নতির পথপরিষ্কারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহারা রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলতায় উদ্যমহীন হ'ন নাই। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে নিরক্ষরতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে চীনদেশে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমিতির উদ্যোক্তারা গভর্মেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া হা-হুতাশ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। যে দেশে নিত্য নূতন গভর্মেণ্ট ও নূতন নূতন শাসনকর্ত্তা, সেখানে গভর্মেণ্টের লোকশিক্ষায় মনোযোগ দিবার অবসর কোথায়? নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে না করিতেই একএকজন রাষ্ট্রনেতার পতন হইতেছে সুতরাং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনহিতকর বিষয়ের বিস্তার গত বিশ বৎসরের মধ্যে চীনদেশে যাহা হইয়াছে তাহা গভর্মেণ্টের সাহায্যে অতি অল্পই হইয়াছে। ১৯১১ সালে চীনদেশে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হইয়া নামেমাত্র প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এখনপর্য্যন্ত সমগ্র চীনদেশ ব্যাপিয়া ঘোরতর অন্তর্ব্বিপ্লব চলিতেছে, উত্তর-চীনের সঙ্গে দক্ষিণ-চীনের সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। আজ একজন সমরসচিব রাষ্ট্রের ভার লইতেছেন, কাল তাঁহার পতন হইতেছে, সুতরাং এই শ্রেণীর গভর্মেণ্টের সমগ্র শক্তি প্রতিপক্ষগণকে দমন করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইতেছে। কিন্তু চীনগভর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগ নাই বলিয়াই যে শিক্ষাবিস্তারের বাধা হইতেছে তাহা নহে, চীনের জনসাধারণ রাজনীতিকগণের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরাই শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতেছে।

চীনের যুবকেরাই সর্ব্বপ্রথম এই নূতন আন্দোলনের অগ্রণী হয়। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যুবকেরা বৃদ্ধদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। "আপৎকালে বৃদ্ধের বচন গ্রহণীয়," ইহা আমাদের শাস্ত্রেরও বিধান, কিন্তু চীনের যুবকেরা বিপরীত বুঝিয়া বসিল। তাহারা বলিল এতকাল বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিয়াই বিদেশীর নিকট পদানত ও পরাস্ত চীনের আজ এ দুর্দ্দশা উপস্থিত; সকল দেশের বৃদ্ধদের ন্যায় চীনদেশের বৃদ্ধেরাও কথায় কথায় শাস্ত্রবচন আওড়াইতেন, কনফুচে এই বলেন, লাওট্সির মত এই, মেন্সিয়াস্ এইরূপ বিধান দিতেছেন, ইত্যাদি। নবীন চীন বৃদ্ধদের মুখের উপর বলিয়া দিল, "কনফুচে মহান্ সন্দেহ নাই কিন্তু সত্য মহত্তর।" আমাদের মধ্যেও যাঁহারা পুরাতনপন্থী তাঁহারাও ঠিক এইরূপ মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির প্রামাণিক বচন উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং চিন্তাশক্তিরূপ অনাবশ্যক মানসিক বৃত্তিকে নিরোধ করিয়া সংহিতাকারগণের শরণ লইলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিয়া থাকেন। চীনের যুবকেরা পণ করিয়া বসিল গভর্মেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া দেশকে উন্নত করিতে হইবে, গভর্মেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দিলে, পঁয়তাল্লিশ কোটি লোক কস্মিনকালেও মানুষ হইবে না।

লোকশিক্ষা বিস্তারে চীনের যুবকেরা যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, অবকাশ সময়ে তাহারা নিরক্ষর গ্রামবাসীদিগের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশে সহস্র সহস্র ছাত্র সমস্ত চীনদেশে ছড়াইয়া পড়িল, ছাত্রদিগের অনেকেই অতি দরিদ্র, অনেকেই দিনের বেলা ছোটখাট জিনিষ ফিরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত তাহার সাহায্যেই নিজেদের খরচ চালাইয়া লইত এবং রাত্রিতে পল্লীতে পল্লীতে নৈশ-বিদ্যালয়ে অশিক্ষিত গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা দিত। মাঝে মাঝে গ্রামের সমস্ত বয়স্ক লোককে একত্র করিয়া তাহারা

সাধারণের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিত। প্রায়শঃ গ্রামের মন্দির অথবা ভজনালয়েই এইভাবের প্রচারকার্য্য ও শিক্ষাদান চলিত। গ্রীষ্মাবকাশের পর ইহারা যখন গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল তখন তাহাদের স্থাপিত নৈশবিদ্যালয়গুলি চালাইবার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকের অভাব হইল না, তাহাদের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া স্থানীয় শিক্ষিত লোকেরা সাগ্রহে এই জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইল। এইভাবে চীনের ছাত্রগণ অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তার ও শিক্ষাদানের অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছে।

নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যুবকছাত্রগণ অতঃপর গ্রাম্যভাষায় লিখিত সহজপাঠ্য পুস্তক রচনায় মন দিল। চীনের লেখ্যভাষা এত কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য যে, তাহা শুধু সুশিক্ষিত লোকের মধ্যেই আবদ্ধ, জনসাধারণের সঙ্গে সে ভাষার কোন যোগাযোগ নাই। কনফুচে, লাওট্‌সি, মেন্‌সিয়াস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দার্শনিক চিন্তারাশি যে ভাষায় গ্রথিত হইয়াছিল তাহা সুপণ্ডিত ভিন্ন অন্য কাহারও বোধগম্য নহে। লেখ্যভাষার সহিত জনসাধারণের এই অলঙ্ঘ্য ব্যবধানই চীনের লোকসাধারণের অজ্ঞতার অন্যতম কারণ। আধুনিক বাঙ্গালাভাষা প্রবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাদের দেশেও কতকটা এইরূপ অবস্থা ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে টেকচাঁদের মূল্য সাহিত্য হিসাবে যত না হউক, পণ্ডিতী সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যুগোপযোগী সরলভাষার প্রবর্ত্তক হিসাবে খুব বেশী। চীনের নব্যযুবকেরা দেখিল যে, দেশের অমূল্য গ্রন্থরাজি অবোধ্য ভাষায় লিখিত হইয়া সাধারণের সকল স্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। অবিলম্বে শত শত শিক্ষিত যুবক চীনদেশের অমূল্য সম্পদ পুরাতন নীতিগ্রন্থগুলিকে সাধারণ বোধগম্য সরলভাষায় গ্রথিত করিতে লাগিল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এইভাবে অসংখ্য সরল পুস্তক রচিত হইয়া বিস্তৃত লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়াছে।

অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুবকগণের এই অভিযান শুধু নৈশবিদ্যালয়-স্থাপন, সাময়িক বক্তৃতাপ্রদান ও সরল পুস্তক প্রণয়নেই পর্য্যবসিত হয় নাই, দেশের দুর্দ্দশা যাহাতে আপামর জনসাধারণের উপলব্ধিগত হয়, লোকের মধ্যে উন্নতির তীব্র স্পৃহা জাগরিত হয়, তাহার চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। একবার ভাবুন, অবকাশ সময়ে দলে দলে ছাত্র চীনের পল্লীতে পল্লীতে পতাকাহস্তে দেখা দিয়াছে, এই সকল পতাকার কোনটিতে হয়ত লিখিত আছে, "অশিক্ষিত মানুষ অন্ধ অপেক্ষাও অধম," কোনটিতে হয়ত লেখা রহিয়াছে, "চীন জাগো, জাপান যে অসাধ্যসাধন করিয়াছে তাহা তুমি পারিবে না কেন?"

চীনের এই যুব-আন্দোলন সজাগ করিয়া রাখিয়াছে প্রায় চারিশত সাময়িক পত্রিকা। এইসকল পত্রিকা রাজনীতি বা ধর্ম্মের ধার ধারে না, শুধু কিভাবে দেশের সাধারণ অবস্থা উন্নত হইবে, জাতির অজ্ঞতা দূর হইবে এইসকল বিষয়ই আলোচনা করে। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমান সময়ে সাময়িক পত্রের অভাব আছে এ দুর্নাম কেহ দিতে পারিবেন না। বর্ষার আগাছার মত নিত্য নূতন পত্রিকা গজাইতেছে, রাজনীতি তরুণ-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় লইয়াই এই-সকল পত্রিকা ব্যস্ত, অন্যবিষয় আলোচনা করিবার অবসর ইহাদের নাই। আর ইহার সঙ্গে চীনদেশের শুধু গঠনমূলক কার্য্যবিষয়ক চারিশত পত্রিকার তুলনা করুন।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল নব্যচীন সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ, ইনি কিছুকাল পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেই সম্পর্কে বহুসংখ্যক শিক্ষিত চীনবাসীর সংস্পর্শে আসিয়াছেন। রাসেল বলিতেছেন, পেকিং সহরে দশলক্ষ লোকের বাস, অধিবাসিগণের অধিকাংশই অতি দরিদ্র, অনেকেরই দুইবেলা এক মুঠা খাইবার সংস্থান নাই, কিন্তু শুধু যুবকছাত্রগণের চেষ্টায় পেকিং সহরে যে অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৯২৩ সালে পেকিং সহরের ছাত্রবৃন্দ জাতীয় অজ্ঞতার বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান পরিচালিত করে। যুগোপযোগী পুস্তিকা প্রচার, সাধারণের বোধগম্য বক্তৃতার আয়োজন, অবৈতনিক বিদ্যালয়-স্থাপন এই-সকল জনহিতকর কার্য্যে পেকিংএর ছাত্রসমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল। ছাত্রগণের এই অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া রাসেল

লিখিয়াছেন যে, ইহাদের সাধু প্রচেষ্টার স্তুতিবাদ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। এক পেকিং সহরে ছাত্রগণের এই অমানুষিক চেষ্টায় পঞ্চাশ হাজার অশিক্ষিত লোক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেছে।

পেকিং সহরের ছাত্রবৃন্দের এই সাধু প্রচেষ্টার সঙ্গে কলিকাতা সহরের ছাত্রগণের মনোভাব তুলনা করা যা'ক। কলিকাতার জনসংখ্যা পেকিং অপেক্ষা কিছু অধিক এবং সেই অনুপাতে শিক্ষিত যুবক ও ছাত্রের সংখ্যাও অধিক। কলিকাতা ও সহরতলিতে সর্ব্বসমেত ৭৫টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, গড়ে প্রত্যেকটিতে ৫০০ করিয়া ছাত্র আছে। কলিকাতার এই সাঁইত্রিশ হাজার স্কুল-ছাত্রের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর অল্পবয়স্ক ছাত্র বাদ দিলে মোটামুটি যে আঠার হাজার উচ্চশ্রেণীর ছাত্র থাকে তাহারা অনায়াসে পল্লীর অশিক্ষিত বালকগণের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে। তাহার পর সমগ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে; ইহার মধ্যে আবার প্রায় অর্দ্ধেক কলিকাতায় ছাত্রাবস্থা যাপন করে। এখন ভাবুন, যদি বাঙ্গালীছাত্র চীন যুবকের মত পণ করিয়া বসে যে, যে করিয়াই হউক দেশের অজ্ঞানান্ধতা দূর করিতে হইবে, তাহা হইলে শুধু কলিকাতা সহরেই কি অসাধ্যসাধনই না হইতে পারে। কলিকাতার বাহিরে প্রধান সহর-গুলিতেও ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে, ঢাকায় এগারটি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় চলিতেছে। এই প্রকার অবৈতনিক কাজের জন্য যে শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন অন্য উপায়ে ব্যয়িত শক্তি ও সময়ের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। প্রতি সপ্তাহে যদি প্রত্যেক ছাত্রের মাত্র একদিন করিয়া এক ঘণ্টার জন্য পালা পড়ে তাহাতে তাহার মূল্য-বান সময়ের বিশেষ হানি হইবে না নিশ্চিত, কিন্তু সকলের এইরূপ সমবেত চেষ্টায় যে অমূল্য ফল ফলিবে তাহা জাতির উন্নতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত থাকিবে।

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিসাব করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রগণ বৎসরে পাঁচমাস কাল অধ্যয়ন করিয়া হাঁপাইয়া উঠে, অবশিষ্ট সাতমাস কাল অধীত বিদ্যা পরিপাক করিয়া থাকে। সাধারণ কলেজগুলিতে ছাত্রেরা কিছু অধিক সময় পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ আই-এ, আই-এস্সি এবং বি-এ, বি-এস্সি ক্লাসের ছাত্রেরা দয়া করিয়া বৎসরে ছয় মাস কাল পড়িয়া থাকে; বাকি ছয়মাস সময় তাহারা কিভাবে কাটাইয়া থাক তাহার মোটামুটি একটা হিসাব দিতেছি। কলিকাতার প্রাসাদোপম হোষ্টেল, মেস হইতে বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশাস্থল শ্রীমানেরা যখন অবকাশসময়ে গ্রাম্য আবাসে ফিরিয়া যায় তখন প্রথমটা তাহাদের বৃদ্ধ পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনকে কায়িক পরিশ্রম করিতে দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হয়। কলিকাতা প্রবাস ও উচ্চশিক্ষার ফলে তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হইয়াছে, তাহারা স্থির বুঝিয়াছে যে, সাধারণ লোকের মত কায়িক পরিশ্রম করিলে জাতিপাত অবশ্যম্ভাবী; তাই পারৎপক্ষে তাহারা কাজকর্ম্মের মধ্যে ধরা-ছোঁয়া দিতে চায় না। আর অশিক্ষিত আত্মীয়-স্বজনেরাও এমন স্পর্দ্ধা রাখে না যাহাতে বংশের দুলালকে এই প্রকার "নীচকার্য্যে" প্রবৃত্ত করাইতে পারেন। সুতরাং শ্রীমানেরা মধ্যাহ্নভোজনের পর কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দেয়, নিদ্রান্তে গ্রামের অকর্ম্মাগণের মজলিশে পরচর্চ্চা, পরনিন্দা প্রভৃতি অতিপ্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য সমাপনান্তে তাস দাবা পাশা প্রভৃতির সাহায্যে রাত্রির কয়েকঘণ্টা কাটাইয়া দিয়া নৈশ-ভোজনের পর শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাই হইল "ভাল ছেলের" দৈনন্দিন কার্য্যতালিকা, আর যাহাদের এ প্রকার মৃদু নেশায় মন উঠে না তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। সেদিন আমি স্কটীশ চার্চ্চ কলেজের ওয়ান্ হষ্টেলের একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাপু, ছুটির দিন তোমরা ক'টাও কি করিয়া।" উত্তর পাইলাম, "কেন, বেলা বারটা হইতে লম্বা ঘুম দি, চারিটার পর খাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হই।" হষ্টেল, মেসগুলিতে রাত্রিতে ফিরিয়া আসিবার একটি বাঁধাধরা নিয়ম আছে, হাজিরা বহিতে হয়ত সে সময়ে সকলের নামেই উপস্থিতি-চিহ্ন দেখা যাইবে কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে অনেকেরই ভৌতিক দেহ থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি প্রমোদালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

আমাদের দেশে প্রতিবৎসর যে ১৫।১৬ হাজার ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে, পরীক্ষা শেষ ও পরীক্ষার ফল বাহির হইবার মধ্যে যে তিন চারি মাস অবকাশ ইহারা পাইয়া থাকে, তাহা কি ভাবে ইহারা কাটাইয়া থাকে? অন্যসময়ে পরীক্ষার আতঙ্ক ছাত্রগণের মনে মাঝে মাঝে জাগিয়া থাকে এবং তাহার ফলে পরীক্ষা পাশ করিবার "আদি ও অকৃত্রিম" আনুষঙ্গিক উপায়গুলি অল্পবিস্তর অভ্যাস করিতে হয়, অর্থাৎ তাহারা মাঝে মাঝে দুস্তর পরীক্ষাসাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী নোট বহি কিংবা অর্থপুস্তকের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু পরীক্ষা অন্তে এ সকল বালাই থাকে না, তখন তাহারা বেপরোয়া-ভাবে আলস্য, শৈথিল্য, পরচর্চ্চা ও ব্যসনে গা ভাসাইয়া দিয়া পরম আনন্দে সময় কাটাইয়া থাকে। এই অবকাশ সময়ে যুবকেরা যদি নিজেদের গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া অজ্ঞ গ্রামবাসীর নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে ফল যে আশাতীত হইতে পারে তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে চীনদেশের যুবক ছাত্রেরা। কিন্তু আমাদের দেশের যুবকগণের এদিকে উৎসাহ কোথায়? কিছুদিন পূর্ব্বে চেফু সহরে যে সম্মিলনী হইয়াছে তাহাতে স্থির হয় যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একটি সহরে বর্ণজ্ঞানবিহীন অধিবাসিগণের শতকরা একশত জনকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে।

শুনিতে পাই যে, গভর্মেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এই প্রকার সার্ব্বজনীন লোকশিক্ষা সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ আইন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করিলে দেশের লোকের অজ্ঞতা দূর হইবার নহে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় আইনের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে দরিদ্র প্রজাগণকে নিষ্পেষিত করিয়া আর এক কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হইতেছে। যে প্রজার অঙ্গে লজ্জানিবারণের চীরবাস নাই, প্রত্যহ দুই-মুঠা পেট ভরিয়া খাইবার যাহার সংস্থান নাই, শুনিতেছি তাহার উপর টাকায় এক আনা করিয়া অতিরিক্ত কর ধার্য্য হইবে এবং সম্ভবতঃ জমিদারের অবস্থা ততোধিক খারাপ বলিয়া তাহাকে এক পয়সাতেই রেহাই দেওয়া হইবে। যাহা হউক মনে করুন বিলও পাশ হইল এবং এক কোটি টাকা রাজস্বও আদায় হইল, এখন এই এক কোটি টাকার কত অংশ প্রকৃত লোকশিক্ষায় ব্যয়িত হইবে? এক কোটির মধ্যে কম করিয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শক, কর্ম্মচারীর মাহিনা, ভাতা ও সফরের খরচে ব্যয় হইবে, বাকি রহিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এই পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় বাঙ্গালা দেশের পাঁচ কোটি লোকের অজ্ঞতা কিভাবে দূর হইবে? আমি অবশ্য বলিতেছি না লোকশিক্ষায় গভর্মেণ্টের দায়িত্ব নাই, আমি শুধু বলিতে চাই যে, দায়িত্ববিহীন আমলাতন্ত্র গভর্মেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে দশবৎসর কেন একশত বৎসরেও বাঙ্গালা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হইবে না। চীনের যুবকগণ এ বিষয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে, গভর্মেণ্টের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহারা অসাধ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইয়াছে, আর ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য প্রদেশ, গোখ্‌লের প্রশংসার পাত্র বাঙ্গালা দেশ কি শুধু হা-হুতাশ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিবে?

আর-একটি কথা এই সম্পর্কে আমার মনে আসিতেছে, বাঙ্গালার চাষীরা কি এখনই শিক্ষার জন্য চাঁদা দিতেছে না? শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র-পিছু গড়ে ব্যয় হয় ৭৫৫৲, ইহার মধ্যে গভর্মেণ্টকে দিতে হয় ৩০০৲, ঢাকায় ছাত্র-পিছু গভর্মেণ্টের ব্যয় ৩৪৩৲। ইস্‌লামিয়া কলেজে ১৫০৲। এই টাকা আসে কোথা হইতে? আমরা মধ্যবিত্ত লোক টাকার "সৃষ্টি" করি না, "অর্থকরী" ব্যবসায় বাণিজ্যে শিক্ষিত সমাজ একেবারে পরাঙ্মুখ, ধনী জমিদার, ব্যারিষ্টার, দালাল প্রভৃতি সকলেই প্রজার রক্তে পুষ্ট, দেশের টাকা সৃষ্টি করে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র চাষীরা। শ্রাবণ মাসে জলকাদার মধ্যে হাঁটুজলে দাঁড়াইয়া ইহারাই দেশের বিত্ত সৃষ্টি করে আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারা এই টাকার সাহায্যে কলিকাতায় মোটর বিহার করেন। উকিল, ব্যারিষ্টার, কেরাণী, অধ্যাপক, ব্যবসায়ের দালাল, ইস্তক হাইকোর্টের জজকে

পর্য্যন্ত আমি "পরগাছার" সামিলে ফেলিয়া থাকি, কারণ ইহারা সকলেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কৃষককে পিষিয়া উদর পূর্ত্তি করিতেছেন। এই যে প্রেসিডেন্সী কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্র-পিছু গভর্মেণ্ট মাসে ২৫৲ টাকা করিয়া খরচ করিতেছে, এই টাকা বিলাতের কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে আসিতেছে না নিশ্চিত, ইহাও কৃষকের টাকা; সুতরাং এখনই যে শিক্ষার জন্য কৃষক টাকা দিতেছে না তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? দরিদ্র কৃষক আধপেটা খাইয়া উপবাস করিয়া যে টাকা জোগাইতেছে তাহার সাহায্যে আমরা শিক্ষাবিভাগেও আভিজাত্যের সৃষ্টি করিতেছি। সুতরাং চীন ও বাঙ্গালা দেশের প্রভেদ এইখানে, চীনদেশে যুবকেরা লোকশিক্ষার জন্য নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ করিতেছে, আর আমরা শিক্ষা-বিস্তার করা দূরে থাকুক, উল্টা নিজেদের শিক্ষার জন্য তাহাদের অর্থশোষণ করিতেছি।

চীনযুবকগণের শিক্ষাপ্রচার কার্য্য সম্বন্ধে একজন আমেরিকান সাহিত্যিক বলিতেছেন, "১৯২১ সালে আমি যখন সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলি পরিদর্শন করি, এমন একটিও বিদ্যালয় আমার নজরে আসে নাই যাহার অধীনে অন্ততঃ একটি করিয়া প্রাথমিক শিক্ষালয় শিক্ষক ও ছাত্রগণের সমবেত চেষ্টায় চলিতেছিল না।"* এই যে শিক্ষাদান ইহা তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিলেও চলে, আমি নিজে যেটুকু আলোক পাইয়াছি তাহার অন্ততঃ কিয়দংশও আমার অজ্ঞানান্ধ ভাই ভগিনীকে দান করিব, ইহা হইল তাহাদের ধর্ম্মের কথা।

আমাদের দেশের আর এক দুর্ভাগ্য যে, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশের প্রকৃত অধিবাসীর অন্তরের যোগ নাই। পূর্ব্বে জনসাধারণের সঙ্গে মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত লোকের এরূপ অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল না, সভ্যতা-বিস্তৃতির সঙ্গে এ পার্থক্য যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। পুরাতনকালের মত গ্রামের চাষীর সঙ্গে ভদ্রলোকের "ভাই" "চাচা" প্রভৃতি সম্বন্ধ ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে, এখন সহরবাসী শিক্ষিতের মধ্যে অনেকেরই পাড়াগাঁয়ের নামে মূর্চ্ছা হয়। লর্ড রোণাল্ডসে তাঁহার Heart of Aryabarta নামক পুস্তকে মন্তব্য করিয়াছেন, "শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণ হইতে সংযোগ সম্বন্ধ হারাইয়া সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।" সুতরাং যখনই আমরা উচ্চকণ্ঠে নিরক্ষর চাষীর প্রতিনিধিত্বের দাবি করি, বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দৃষ্টি থাকে তাহার যৎকিঞ্চিৎ অর্থের উপর। তাহা হইলেই দাঁড়াইল এই যে—গভর্মেণ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায় উভয়েই দরিদ্র প্রজাকে শোষণ করিতে উদগ্রীব, শুধু শোষণের মাত্রা কমবেশী, বিদেশী গভর্মেণ্ট হয়ত একটু বেশী এবং স্বজাতি মধ্যবিত্ত লোক একটু কম করিয়া অপহরণ করেন, কিন্তু আসলে উভয়েই পরস্বাপহারক। শুধু গভর্মেণ্টকে দোষ দিলে চলিবে কেন, আমাদের এ দুর্দ্দশার জন্য গভর্মেণ্ট অপেক্ষা আমরা নিজেরাই অধিক পরিমাণে দায়ী। মহামতি গোখলে ত একরূপ নিরাশার আঘাতে মারা গেলেন, তাঁহার বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্ত্তনের বিপক্ষে তিনি যে গভর্মেণ্ট অপেক্ষা শিক্ষিত সাধারণের নিকট অধিক বাধা পাইয়াছিলেন একথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আমি গভর্মেণ্টের পক্ষ সমর্থক হিসাবে একথা বলিতেছি না, এ বিষয়ে আমার মত সুপরিজ্ঞাত, বিদেশী গভর্মেণ্টের নিকট বেশী কিছু আশা করা বৃথা; এ-বিষয়ে জনসাধারণ অবহিত না হইলে শুধু আইনের জোরে শতবৎসরেও দেশের অবস্থার উন্নতি হইবে না।

চীনদেশের যুব-আন্দোলন আলোচনা করিয়া আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি, আমাদের দেশের মত চীনদেশেও যাঁহারা একটু "বেশী" শিক্ষিত, তাঁহাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়াছে। বিলাতের সাময়িক ইতিহাস হইতে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিব। যিনি বর্ত্তমানে বিলাতের শ্রমিক গভর্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী, সেই র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড স্কটলাণ্ডে মৎস্য-জীবীর গ্রামে এক অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শীতপ্রধান দেশে এক পেয়ালা চা না হইলে চলে না, কিন্তু বালক ম্যাকডোনাল্ড যখন প্রথম লণ্ডন সহরে উপস্থিত হ'ন তখন দারিদ্র্য তাঁহার এত অধিক যে সকাল-সন্ধ্যা এক পেয়ালা চা কিনিবার সামর্থ্য

* China: A Nation in Evolution by Monroe, p. 284.

তাঁহার ছিল না, অগত্যা এক পেয়ালা গরম জলে তাঁহাকে চায়ের স্বাদ মিটাইতে হইত। ম্যাকডোনাল্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়িয়া "পণ্ডিত" হইবার বড় সাধ ছিল, দারুণ অর্থাভাবে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এখনকার কালে অবশ্য প্রতিভাশালী ছাত্রের পক্ষে অর্থাভাবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার বাধা হয় না, কারণ ধনকুবের এণ্ড্রু কার্ণেগী দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহুলক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের সময় এই-সকল সুবিধা ছিল না, ফলে পরীক্ষায় পাশ করিয়া ডিগ্রী লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডই এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিতে পারা তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনকই হইয়াছিল, কারণ তাঁহার বিশ্বাস যে পরবর্ত্তী জীবনের সাফল্য প্রথমজীবনের এই সকল বাধাবিপত্তির জন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল। আমি একাধিকবার বলিয়াছি যে, বাঙ্গালার গৌরব স্যার রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি যদি B. E. পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেন তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এক মহা দুর্ভাগ্যের বিষয় হইত, হয়ত এতদিনে বড়জোর তিনি মোটা মাহিনায় গভর্মেণ্টের পূর্ত্তবিভাগে বড় সাহেবের পদ লাভ করিতেন।

এদেশের মত চীনদেশেও উচ্চশিক্ষিত লোকের দ্বারা দেশের উন্নতি আশানুরূপ হইতেছে না। একজন লেখক বলিতেছেন, "এই নবঅভ্যুত্থানে উচ্চশিক্ষিত চীনবাসীর দান অতীব অকিঞ্চিৎকর, কারণ এই-সকল যুবক কায়িক পরিশ্রমে নাসিকা কুঞ্চিত করে।" অন্যত্র এই লেখক বলিতেছেন, "তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত, বিশেষতঃ বিদেশ-প্রত্যাগত, কোন যুবক দ্বারা বিশেষ কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই।" * আমি বিলাত-ফেরত "ইঙ্গবঙ্গ"গণকে দেশের শত্রু নামে অভিহিত করিয়া থাকি, অবশ্য একথা বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, বিলাত-ফেরত মাত্রেই দেশদ্রোহী, বিলাতপ্রত্যাগত লোকের দ্বারা দেশের ও সমাজের যে উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা আমি বিস্মৃত হইতেছি না। আমি শুধু বিলাত-ফেরতের দাম্ভিক মনোভাব ও বিলাতের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে আক্রমণ করিতেছি। বিলাসিতার পিছনে ও বিলাতি হাবভাব অনুকরণ করিবার জন্য বিলাত-ফেরতগণ যে অর্থ অপব্যয় করেন তাহা গরীব দেশের পক্ষে জোগান অসম্ভব। আর সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যাঁহারা স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্যের আবহাওয়ার মধ্যে কিছুকাল কাটাইয়াছেন তাঁহারাই যখন দেশে ফিরিয়া আসেন তখন জনসাধারণ হইতে তাঁহাদের ব্যবধান যেন আরও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য কোন সমাজ অথবা ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আমি এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না।

চীনবাসিগণের মধ্যেও উচ্চশিক্ষিতের এইরূপ মনোভাব বিরল নহে। লোকসংখ্যার আধিক্য হেতু চীনবাসীকে চারিদিকে উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইয়াছে, মলয় উপদ্বীপ, পিনাঙ্, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে বহুসংখ্যক ঔপনিবেশিক চীনা-পরিবার এইভাবে বসবাস করিতেছেন। এই-সকল দেশে বৃহৎ বৃহৎ রবারের বাগান আছে; বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতার প্রধান এক উপকরণ রবার। একশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত জার্ম্মান রাসায়নিক লিবিগ্ বলিয়াছিলেন যে, জাতির উন্নতি, দেশে উৎপন্ন গন্ধকদ্রাবক ও সাবানের পরিমাণ হইতে অনুমিত হইতে পারে। অবশ্য এই নিয়ম অনুসারে আমরা খুবই সভ্য হইয়া পড়িয়াছি কারণ উৎপাদন করিতে না পারিলেও আমরা সকলেই সাবানের ব্যবহার ভালরূপই শিখিয়াছি। এখন দেখিতেছি যে লিবিগের সভ্যতা-পরিমাপক সূত্রের মধ্যে রবারকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। যাহা হউক উপদ্বীপ প্রদেশ সমূহে প্রথমে যে বাগানগুলি খোলা হয় তাহার সবগুলি ছিল বিদেশীর, কিন্তু এখন বহুসংখ্যক বাগান ঔপনিবেশিক চীনবাসীর হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই-সকল বাগানের যাঁহারা বর্ত্তমান মালিক তাঁহারা উচ্চ-শিক্ষিত অথবা বিদেশ-প্রত্যাগত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রথমে সামান্য শ্রমজীবী অথবা কুলী হইয়া এইসকল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এই-সকল

* Baker: "Explaining China," p. 182.

লোকের মধ্যে এমন কোন গুণ ছিল যাহার জন্ত তাঁহারা সামান্ত কুলী হইতে ক্রোড়পতিতে পরিণত হইতে পারিয়াছেন।* এই-সকল শ্রমজীবীর সর্দ্দার প্রথমে অল্পস্বল্প মাল সরবরাহ করিবার ঠিকা হইতেন। ইহাতে কিছু পয়সা হইলে নামমাত্র সেলামিতে জঙ্গল কাটিবার অনুমতি লইতেন। এইভাবে ছোটখাট ব্যবসায়ের পত্তন হইতে থাকে। কালক্রমে এইসকল প্রতিষ্ঠান পুষ্ট হইয়া বিদেশী বাগানগুলির সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। এইভাবে সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্ ও মলয় উপদ্বীপের অনেক স্থানে রবারের ব্যবসায় চীনারা প্রায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু এইসকল ব্যবসায়ের মালিক "অশিক্ষিত" হইলেও মাতৃভূমির উন্নতির খুঁটিনাটি খবর রাখিয়া থাকেন এবং দেশহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। আপনারা অনেকেই চীনের স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্ সুন্ ইয়াট সেনের নাম শুনিয়াছেন, দেশকে স্বাধীন করিবার চেষ্টার শাস্তিস্বরূপ ইঁহাকে প্রায় বিশ বৎসর কাল রাজনৈতিক পলাতক হিসাবে য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। এই ইচ্ছাবিরুদ্ধ প্রবাসজীবন সুন্ ইয়াট সেন বিলাসব্যসনে কাটান নাই, নির্ব্বাসিত জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত, স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রচারকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু এইভাবে কাজ করিবার জন্ত যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাহা সুন ইয়াট সেন চীনদেশের অধিবাসিগণের নিকট হইতে আশানুরূপ পা'ন নাই। কারণ হংকং, শ্যাংহাই, এময় প্রভৃতি বন্দরে য়ুরোপীয় বিদেশী জাতিসমূহ চীনের অন্তর ও বহির্ব্বাণিজ্য কৌশলে হস্তগত করিয়া লইয়াছে; আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের অধিকাংশই য়ুরোপীয় জাতিগণ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতেছে তাই চীনের অধিবাসিগণের দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না। কিন্তু সুন ইয়াট্ সেনের যখনই অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই চীনের বাহিরের ব্যবসায়ী ক্রোড়পতিগণ বিনাবাক্যব্যয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অজস্র অর্থ তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং অশিক্ষিত হইলেও এই সকল ব্যবসায়ী শিক্ষিত চীনবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আবার, এখন ঐসকল দেশে দরিদ্র চীনদেশবাসী কেহ কুলীগিরি করিতে গেলে, এই-সকল ব্যবসায়ী সকলে মিলিয়া মূলধন জোগাইয়া তাহাকে স্বাধীন ব্যবসায় করিতে উৎসাহিত করেন।

আমি এখন বাঙ্গালী যুবকের শিক্ষার জন্ত বিলাত যাওয়া পছন্দ করি না, কারণ চীনদেশের মত এখানেও যাহারা "কালাপানি" পার হইয়া একটু বেশী শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা দেশের লোককে কৃপার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃত কাজ ত তাঁহাদের দ্বারা কিছুই হয় না বরং বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিলাসিতা ও দুর্নীতি প্রচারের সহায়ক হ'ন। অবশ্য সকল বিষয়েই "সম্মানিত ব্যতিক্রম্" আছে এবং আমি বাঙ্গালী যুবকের বিলাত-যাত্রা সম্পূর্ণভাবে রদ করিতে চাহি না, আমি শুধু বলিতে চাই, বিলাত-প্রত্যাগত যুবকদিগের মধ্যে আমরা যে মানসিক প্রসার ও দেশ-প্রেমিকতা আশা করিতে পারি তাহা দেখিতে পাই না।

চীনজাতির শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের আর একটি উদাহরণ দিব; অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীনদেশে নরমূত্র, বিষ্ঠা প্রভৃতি পদার্থ নষ্ট হইতে দেওয়া হয় না, এই সকল পদার্থ বাহির হইতে দেখিতে হেয় মনে হইলেও জমির সার হিসাবে ইহাদের মূল্য খুব বেশী। কৃষিপ্রধান দেশে এই সকল সারের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। রথাম ষ্টেডের বিখ্যাত কৃষিপরীক্ষাগারের তত্ত্বাবধায়ক (Director, Rothamsted Experimental Station) সম্প্রতি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে বিলাতে লোক-পিছু বৎসরে প্রায় ৬৲ টাকা করিয়া এইভাবে লোকসান হয়। চীনদেশে শ্রমের অসম্মান নাই, ধাঙ্গড় মেথর মুর্দ্দাফরাস বলিয়া সেখানে কোন শ্রেণী নাই, সুতরাং দরিদ্র অধিবাসীরা দ্বারে দ্বারে বিষ্ঠা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় বা অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে। অশিক্ষিত চীনের এই দৃষ্টান্ত সুসভ্য য়ুরোপ ও আমেরিকা এখন অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—Activated Sludge Process প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে এইসকল 'ঘৃণিত' পদার্থ হইতে মূল্যবান্ সার বাহির করিবার চেষ্টা ঐসকল

* Baker: "Explaining China," p. 180.

দেশে চলিতেছে। আমাদের দেশে ও ব্যাঙ্গালোর, কানপুর প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষাগারে এ বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণা হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সভ্যজগতের পথ-প্রদর্শক "অসভ্য" চীনজাতি।

আমি বাঙ্গালা দেশে ব্যবসাক্ষেত্রে অবাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাঙ্গালীর পরাভব কোনও কালেই প্রীতির চক্ষে দেখি নাই এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ জ্ঞানবিশ্বাস অনুসারে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া অনেক দেশবাসীর নিকট বিদ্রূপ লাভ করিয়াছি। সুতরাং আমি যদি এই কলিকাতা সহরেই চীনাব্যবসায়ীর সাফল্যের কথা উল্লেখ করি, অনুগ্রহ করিয়া কেহ ভাবিবেন না আমি স্বজাতিদ্রোহিতা করিতেছি। আমি শুধু অশিক্ষিত চীনবাসী ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর ব্যবসাবুদ্ধির প্রভেদ বুঝাইবার জন্ম এ বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। চীনা মুচি যখন প্রথম এদেশে আসে তখন সে একপ্রকার কপর্দ্দকহীন, এ দেশের ভাষা জানে না, হাবভাবে ক্রেতার সঙ্গে ব্যবসায় চালায়। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে এই-সকল চীনা মুচি কলিকাতায় জুতার ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি কসাইটোলা, বালাখানা প্রভৃতি অঞ্চলে এই সকল চীনা মুচি বৎসরে অন্ততঃ এক কোটি টাকা রোজগার করে; ইহা কেবল আমার খামখেয়ালী গণনা নহে, সম্প্রতি দেখিলাম একজন বিশেষজ্ঞও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সুখের বিষয় কয়েকজন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক জুতার ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শুধু জুতার ব্যবসায় কেন, ছুতার মিস্ত্রির কাজে চীনা কারিগর কেমন করিয়া ধীরে ধীরে বাঙ্গালীকে হটাইয়া দিতেছে। ইহার মধ্যে কোনওরূপ জুয়াচুরী নাই, চীনা কারিগর বাঙ্গালী কারিগর হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লোকে বেশী মজুরি দিয়াও চীনা মিস্ত্রি খাটাইয়া থাকে, কারণ তাহাতে অধিক এবং ভাল কাজ পাওয়া যায়, তাহারা ফাঁকি দিতে জানে না। এখন চারিদিকে বাসের ছড়াছড়ি, এইসকল বাসের উপরের 'কাঠামো' তৈয়ারী Canton Carpentry Works প্রভৃতি বড় বড় চীনা কারখানাই করিয়াছে। প্রথমে দেখিতাম চীনা ছুতার মিস্ত্রির কারখানা কলিকাতার অংশ-বিশেষেই আবদ্ধ ছিল এখন দেখিতেছি ইহারা ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন কি জেলার ভিতরও চীনা মিস্ত্রি দেখা দিয়াছে। কিন্তু রাগ করিবার উপায় নাই কারণ ভীষণ প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠাই সংসারের নিয়ম।

সম্প্রতি আর এক নূতন খবর জানিতে পারিয়াছি, এতদিন জুতা ও কাঠের কাজ লইয়াই চীনারা সন্তুষ্ট ছিল, এখন শুনিতেছি চীনারা ইংরাজের অনুকরণে আধুনিক হোটেল খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং Canton Restaurant প্রভৃতি চীনা হোটেলে পান-ভোজন করা বিলাত-ফেরৎ ও উন্নতিশীল বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের মধ্যে রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, শিক্ষিত চীনবাসীর ত কথাই নাই, অশিক্ষিত চীনারাও অনেকাংশে শক্তি, উৎসাহ ও উদ্যমে ভারতবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সম্প্রতি আবার চীনা থিয়েটারও কলিকাতা সহরে দেখা দিয়াছে।

চীনের নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমি দেখিতেছি যে, চীনের যুব-অভ্যুত্থানের মধ্যে আমাদের তথাকথিত যুব-আন্দোলনের মত শুধু ফাঁকা আওয়াজ নাই। আজ চারিদিকেই শুনিতেছি দেশে যুবশক্তি উদ্বোধন হইয়াছে। যুবকেরা জাগিয়াছে, দেশের উন্নতির আর দেরী নাই। যুব-সম্মিলনের গৃহীত প্রস্তাবের জালায় কান ঝালাপালা হইয়া গেল, কিছু আসল গঠনমূলক কার্য্যের কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না। বিলাস-ব্যসনের পাপে দেশের যুবকসমাজ আজ নিমজ্জিত। যেদিকেই চাই ডাইং ক্লিনিং, হেয়ার কাটিং, সিনেমা ও রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি। যুব-সমাজই এইগুলির প্রধান মক্কেল ও পৃষ্ঠপোষক। ট্রাম বাস না হইলে এক পা অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই; শিক্ষাবস্থায় মাসিক ৪০।৫০ টাকা না হইলে খরচ চলে না, অথচ শিক্ষা অন্তে এই পরিমাণ অর্থ রোজগার করিতে চক্ষুস্থির হয়!

আমি আজীবন গঠনমূলক কার্য্যে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, শুধু প্রস্তাব পাশ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিবার আমি ঘোর বিরোধী। দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল

বাঙ্গালার যুবকসমাজকে সম্বোধন করিয়া আমি আজ বলিতেছি, "নব্যচীনের ছাত্র-সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চীন-যুবকের মত অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।" আমার আজীবন প্রিয় দেশের ছাত্রবৃন্দের প্রতি আজ জীবন-সায়াহ্নে আমার এই একান্ত কাতর অনুরোধ।

শ্রীসুবোধ বসু

বিকালবেলায় অজিত বেশভূষা সারিয়া বাহিরে যাইবার জোগাড় করিতেছিল হঠাৎ তিনচারজন সহ-বাসী বোর্ডার ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—বাঃ মজার ছেলে, কোথা যাচ্ছিস্; প্রভাতের দাম্পত্য-করেস্পণ্ডেন্স্ ফাঁস্ করতে হবে না?

অজিত কহিল,—চিঠিটা আজ ভোরবেলায় প্রভাতকে দিয়ে দিয়েচি।

সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল,—তার মানে?

—ভারী অন্যায় হচ্ছিল, তাই শেষে দিয়ে দিলুম।

—উঃ, কী দরদীরে!

অজিত কথা কহিল না। একজন বলিল,—তোমার দিয়ে দেবার কোন অথরিটি ছিল না, তোমার কাছে চিঠি জমা মাত্র ছিল।

অজিত কহিল,—মেয়েটির ওপর দয়া ক'রেও তা দিয়ে দেওয়া উচিত।

সকলে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল,—ওহো হো!

ছেলেদের দলের একজন কবিত্ব করিয়া কহিল,—কিন্তু পত্রখানি ফাঁস্ করতে পারলে প্রভাতের মুখে যে নবারুণচ্ছটা দেখ্‌তে পেতুম তার কি হবে? তার জন্য তুমি কি পেনাল্টি পাবে?

অজিত কহিল,—না ঠাট্টা নয়; ওর স্ত্রীর প্রেমের গোপন কথা যদি ওরই সামনে দশজনকে চেঁচিয়ে পড়িয়ে শোনাতে তাতে খুব একটা বড় কাজ করা হ'তো কি?

—বি-এ পাশ না ক'রেই বিয়ে করাটা যে বড় কাজ নয় অন্ততঃ সেটা বোঝান হতো। অজিত কোন জবাব দিল না।

দলের অপর একজন চলিল,—কিন্তু অজিতচন্দ্র, চারদিন আগে যখন চিঠিটা গাপ্‌ করা হয় তখন তোমার এ দরদ ছিল কোথায়?

—তখন ছিল না।

—কদিন বাদেই হঠাৎ গজিয়ে উঠ্‌ল?

—হাঁ।

—ভোজবাজী?

একজন ফোড়ন্ দিয়া বলিল,—যৌবনের ইন্দ্রজাল।

একটু পরে অজিত কহিল,—আমার একটু দরকার আছে, বেরুতে হবে।

সকলে কহিল,—এক্সপ্ল্যানেশন্ চাই।

অজিত কহিল,—ফাজ্‌লামি নয়, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

চতুর্থ আগন্তুক এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে একটু পেট্রনাইজিং ভাবে বলিল,—এ তোমার অন্যায় অজিত; সবাই মিলে যখন একটা কাজ করচে তখন তোমার একার সব কিছু নষ্ট করে দেবার অধিকার ছিল না—তা কাজটাকে তুমি ভালই বোঝ আর খারাপই বোঝ।

অজিত একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল—কিন্তু যা ব্যাপার ঘটেচে তার পর আপনি হলেও না দিয়ে পারতেন না, বন্ধুদা।

—যথা?

—থাক্ তার দরকার নেই।

—না, না, না বল্‌লে চল্‌বে না ; বলে ফেল।

—শুন্‌লে বিশ্বেস তো কর্‌বেনই না, শুধু আমাকে নিয়েও হাসাহাসি কর্‌বেন।

—না হে, এ না বল্‌লেও তো ছাড়্‌ব না। আমরাও ঘর থেকে বেরুবো না, তোমারও এন্‌গেজমেণ্ট রাখা হবে না।

—কিন্তু আমাকে যে এক্ষুনি বেরুতে হবে।

—চট্‌পট্ ব'লে ফেল তারপরই ছুটি, আর না হ'লে সারা-সন্ধ্যা আটক।

অজিত তবু একটু ইতস্ততঃ করিল। কিন্তু শেষে যখন দেখিল না বলিয়া নিষ্কৃতি নাই তখন কহিল,—কিন্তু বল্‌ব র সময় কেউ হেসে উড়িয়ে দিতে পার্‌বে না।

রহস্যের যে একটা ছাপ প্রসঙ্গটার মধ্যে পড়িয়াছিল তাহাতে সকলেই শুনিতে উৎসুক। তাহারা কহিল,—বেশ, রাজী।

তখন অজিত বলিয়া গেল :—

প্রথম যেদিন মেয়েলী হরফের 'পরমপূজনীয়' লেখা দেখে' প্রভাতের চিঠিটা গোপন করা হ'লো সেদিন এর নিষ্ঠুরতা মনের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে হয়তো ওঠেনি কিন্তু সেটা যত মৃদু হয়েই হোক না কেন মনের এক গোপন-কোণে অচেতনভাবে বাজ্‌ছিল। সে-রাতে যখন ঘুমলুম মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি-ভাব টের পাচ্ছিলুম। যেন কি একটা কাজ করেচি, যা না করাই উচিত ছিল।

ভোরবেলায় উঠে ভাব্‌লুম রাতটা মানুষকে ভারি দুর্ব্বল করে আর কবিত্বের ভূত এসে তখনই ঘাড়ে চাপে। সে দুর্ব্বলতাকে নিশ্চিন্ত ক'রে ঝেড়ে ফেলে ভোরের সঙ্গে প্রভাতকে অপ্রস্তুত কর্‌বার মতলব আঁট্‌লুম। কল্পনা করলুম চিঠিটা যখন প্রকাশ্যে পড়া হবে তখন বেচারীর মুখখানা কেমন লুডিক্রাস্ দেখ্‌তে হবে। কিন্তু রাত যখন ফের এলো তখন শেল্‌ফের বই নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে ছুটো বইয়ের ভাঁজে চিঠিটাকে দেখে মনটা কেমন অপরাধীর মতো হয়ে উঠ্‌ল। একবার মনে পর্য্যন্ত হলো, না অন্যায় করা হচ্ছে। কিন্তু এ নিষ্ঠুর-আনন্দের উন্মাদনা তো আমাকেও লেগেছিল, তারপর ছিল তোমাদের কড়াশাসন, অতএব ইচ্ছাটাকে পত্রপাঠ দিলুম বিদায়। সে রাতে স্বপ্ন দেখ্‌লুম, মনে হলো কি যেন কল্পনার বেগেতে ছুটে আস্‌তে চাচ্ছে, বন-বাদাড় খাল-নালা-নদী সব ডিঙিয়ে, কিন্তু তার যা বাহন সে আস্‌চে রুটিন-করা নিয়মে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। দেখ্‌লুম যে আস্‌চে সে বারবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌চে, বারবার নিজেকে প্রবোধ দিয়ে রাখ্‌চে—তার সমস্ত চেতনার ভেতর একটা অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষার চাঞ্চল্য। তারপর উদ্দেশ্যের দ্বারে সে যখন এসে পৌঁছল তখন কোন্ এক দৈত্য জগদ্দল পাষাণ তার বুকে চাপিয়ে দিয়ে তার গতিকে নিঃশেষ করে দিলে। পাষাণ চাপা হয়ে সে আর্ত্তনাদ কর্‌তে লাগ্‌ল। কি মর্ম্মান্তিক সে আর্ত্তনাদ!

ভোরে উঠে ভাবলুম, মাথামুণ্ডু কি ছাইপাঁশ সব স্বপ্নে দেখেচি। পরে অবিশ্যি বুঝেচি, এস্বপ্ন একেবারে ছাইপাঁশ ছিল না। কিন্তু সে পরে বল্‌চি।

পরের সন্ধ্যায় সুনিদ্রার জন্য বেশী করে একসারসাইজ করলুম। রাতে আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিকা উপেক্ষা করে তাড়াতাড়ি গেলুম শুতে, ভাল ঘুম না হ'লে অসুখ-বিসুখ হয়ে যেতে পারে এই ভয় ছিল। ঘুম যে গভীর হ'য়েই এসেছিল সেটা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই। কিন্তু অনেক রাতে হঠাৎ কি করে ঘুম ভেঙে গেল। সারা হোষ্টেলটা তখন নিথর নিস্তব্ধ, আলো সব নিবে গেছে, তন্দ্রালস রাতের শুধু একটা একটানা ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পাশ ফিরে ফের ঘুমোতে যাচ্ছি, হঠাৎ ডাক বাক্সে চিঠি ফেল্‌লে যেম্‌নি একটি শব্দ হয় তেম্‌নি সুরে কে বল্লে -শোন না—

চম্‌কে ফিরে দেখ্‌লুম জান্‌লা দিয়ে ম্লান জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকেছে। তারই আড়ালে দূরে দাঁড়িয়ে আবছা একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি। রঘুবংশের শ্লোকটা চকিতে মনে এসেছিল, কারণ দরজাও তো বন্ধ কিন্তু পুরলক্ষ্মীর আমার কাছে আস্‌বার কোন হেতু খুঁজে পেলুম না।

পাশ ফিরতে দেখে ছায়-মূর্ত্তিটি বল্লে,—আমার মিনতিটা শুনে শেষে ঘুমোও। আমুবিন্ আভামের মতোই

কৌতূহলে সাহসের মাত্রাটা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। বল্লুম,—কি চাও?

বল্লে,—মুক্তি ভিক্ষা চাচ্ছি—

ভেবে পেলুম না, কি এ বলে আর কিই বা এর মানে।

খানিকটা ভেবে শুধালুম,—তুমি কে?

কাগজের খস্‌খস্‌ শব্দের মতো জবাব এলো—আমি দূতী।

—দূতী! কিসের দূতী?

—প্রেমের।

বিস্ময়ের আমার অন্ত রইল না। বল্লুম,—দেখ প্রেম করবার আমার সময় নেই। এগজামিনের তাড়ায় বেজায় ব্যস্ত আছি। তুমি যদি এগজামিনের পরে আস্‌তে পার তবে বিবেচনা করে দেখা যাবে।

জবাব হ'লো—তোমার কাছে আমি আসিনি—

বল্লুম,—তার মানে? আমার কাছেই তো এসেচ দেখ্‌চি—ঘুমটা পর্য্যন্ত মাটি ক'রে ছাড়্‌লে।

খস্‌-খস্‌ সুরে উত্তর এলো—আমি তোমার ঘুমের ব্যাঘাতের জন্য দুঃখিত, কিন্তু এর জন্য তুমিই তো দায়ী!

বল্লুম,—আমি?

—হাঁ।

—কি করে?

—তুমি আমাকে বন্দী ক'রে রেখেচ।

—বন্দী করে রেখেচি আমি! তুমি বোধ হয় লোক ভুল করচ, আমি তো শাহান্‌-শা বাদশা নই, বন্দী করবার কোন অধিকারই তো আমার নেই।

জবাব এলো,—কিন্তু তুমিই তো আমায় চেপে রেখে দিয়েচ—

—চেপে রেখে দিয়েচি! কি দিয়ে?

—কঠিন মলাট দেওয়া বিজাতী ভাষার ভারী ভারী পুঁথি দিয়ে।

আমি তো ভেবেই আকুল, এ বলে কি? বই দিয়ে কারাগার ক'রে আমার রাজত্বে বন্দী করবার ব্যবস্থা! চোখ-দুটোকে বার-দুই বিস্ফারিত ক'রে মগজে হাওয়া চালাবার চেষ্টা করলুম।

করুণ সুরে সে বল্লে,—আমায় মুক্তি দাও না দয়া করে। এ নিষ্ঠুর খেলায় তোমার কি লাভ হচ্চে? কিন্তু দুজনার ব্যথা আশঙ্কার যে আর সীমা নেই।

কি জবাব দেব কিছুই বুঝচি না। চুপ ক'রে রইলুম।

সে বল্‌তে লাগ্‌ল,—দেখ আমি কত দূর থেকে পাগলের মত ছুটে এসেচি, অসহিষ্ণু আকাঙ্ক্ষার আবেগে আমার সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপ্‌চে, তুমি আমাকে এমন করে আট্‌কে রেখো না! মিনতি করচি আমাকে ছেড়ে দাও।

আমিতো অবাক্‌!

সে একটু চুপ থেকে হতাশার সুরে বল্লে,—ছাড়বে না? তুমি এতই নিষ্ঠুর হবে?

এ এক দারুণ রহস্য। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কিন্তু ভারী কৌতূহল হলো। বল্লুম,—আচ্ছা প্রেমের দূতী, কালিদাসের যক্ষ মেঘ-দূতকে দিয়ে যে প্রেমের কথা কইয়েছিল তার সব খবরই তো আমরা জানি, কিন্তু তোমার খবরটা শুন্‌তেও কম সাধ হচ্চে না।

জবাব হলো,—আমারটা অমন মন্দাক্রান্তা ছন্দে গাঁথা নয়, এর মধ্যে তার ছন্দের দোলা নেই, কল্পনার ইন্দ্রজাল নেই, তার ভাবসম্ভার কিচ্ছু নেই।

—না থাক্‌, তবু শুন্‌ব।

—এ তোমার ভাল লাগ্‌বেনা বল্‌চি। আমার কথা গাঁয়ের একটি মেয়ের দ্বারা গাঁথা, এর না আছে কল্পনার দৌড়, না আছে ভাষার ঐশ্বর্য্য, একেবারে সাদাসিধে; এর রসের স্বাদ তোমার কাছে ধরা পড়্‌বে না।

—তুমি জানো আমি একজন কাব্য-রসিক, গেঁয়ো গানের মধ্যে পর্য্যন্ত রস আবিষ্কার করি?

—তা হবে; কিন্তু এ অতিসাধারণ। দুজন ছাড়া এর রস আর কেউ পাবে না, পেতে পারে না—এমনি তার ধরণ।

—তবু তুমি বল আমি শুন্‌ব।

—কিন্তু এ যার কথা, দশজনের কাছে সব জানা হ'লে সে যে লজ্জায় মরে যাবে—

—কেন?

—সে যে গাঁয়ের মেয়ে, তার ওপর নব-বধূ।

কিন্তু সে-খবর শোনার দারুণ লোভ হচ্ছিল। সরম-কুণ্ঠিতা কোন গাঁয়ের মেয়ের জন্য দরদের চেয়ে তা

প্রবলতর। বল্লুম,—বেশ, আমাকে না জানালে তোমাকে আমি ছাড়্‌চি না।

সে যেন একটু আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল। তারপর বল্লে, —কিন্তু সব বল্‌তে পার্‌ব না, মোটামুটি খবরটা শুধু দেব।

বল্লুম,—বেশ।

ঘরের সম্মুখে সজ্‌নে ডালে ফুল ধরেচে সে-খবরই মেয়েটি আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

—ধরেচে তাতে কি হয়েচে ?

—তা জানিনে, আমি শুধু বাহন।

—আর ?

—আর এখন জ্যোৎস্নাপক্ষ, শোবার ঘরের জান্‌লা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে কামিনীফুলের মত ঘরে লোটায়। মুকুলের গন্ধ আসে, বাঁশগাছের পাতা ঝিরঝির করে। কি মিষ্টি হাওয়া দিচ্চে !

—মেয়েটি বুঝি রবিবাবুর কবিতা খুব বেশী পড়ে ?

—গাঁয়ের মেয়ে, কৃত্তিবাস ছাড়া কোন কাব্য সে পড়েনি।

—আচ্ছা বেশ, তারপর ?

—রুমালে সে রেশম দিয়ে ফুল তুল্‌চে আর দিন গুণচে।

—বেশ ব'লে যাও—

—মোটামুটি সবই তো বলা হ'লো।

—কিন্তু এতে এমন কি আছে যা না জানালেই হতো না ?

—তোমাকে তো আগেই বলেচি তুমি এ বুঝ্‌বে না। সবটা বল্লে হয়তো কিছু বুঝ্‌তে পারতে কিন্তু সে বল্‌ব না—মেয়েটি ভারী লজ্জা পাবে।

—কি বলে শেষ করেচে ?

—তা বলব না। একটা কিছু জিনিষ পাঠিয়েচে—সে যদি কেউ দেখে ফেলে তো সে লজ্জায় একেবারে মরে যাবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা থাক্। আমারও শুন্‌তে ভাল লাগ্‌চে না।

—তাতো আমি আগেই বলেছিলাম। এ তো কালিদাসের কাব্য নয় যে সবারই ভাল লাগ্‌বে। এ-কাব্য মাত্র দুজনার জন্ত।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। একটু পরে সে মিনতির সুরে বলে উঠ্‌লে,—সব তো বলা হ'লো, এবার ছেড়ে দাও।

বল্লুম,—কিন্তু তুমি যে কে, আর কোথায় যে তোমায় আট্‌কে রেখেচি তাই তো জানিনে। কার কাছে যাবে সে নামও আমার অজ্ঞাত।

জবাব এলো,—বাঃ রে, না জেনেই ফাঁকি দিয়ে সব শুনে নিলে। না না জবাব না পেয়ে সে আমার ওপর চটচে আর কাঁদচে,—আমায় আর আট্‌কে রেখ না। ছেড়ে দাও—

বল্লুম,—তোমার কথা না শুনলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বেশ, বল তুমি কে আর কোথায় আছ, আমার সাধ্য থাকে তো ছেড়ে দেব।

সে বল্লে,—আচ্ছা চেয়ে দেখ্‌তো আমায় চিন্‌তে পার কিনা ?

তাকিয়ে রইলুম। সে ধীরে ধীরে বইয়ের শেল্‌ফের ধারে এগিয়ে চল্‌ল। জ্যোৎস্নাতে সে যখন এসেচে তখন অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে দেখলুম তার পরার শাড়ী প্রভাতের চিঠির খামটার মতই নীল। চোখ রগড়ে ভাল করে দেখতে যাচ্চি হঠাৎ শেল্‌ফের ভেতর কোথায় সে মিলিয়ে গেল।—তারপর হয়তো আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। হঠাৎ ধড়মড় করে দরজা ধাক্কার শব্দে জেগে উঠে দেখ্‌লুম অনেকক্ষণ ভোর হয়ে গেছে। জান্‌লা দিয়ে প্রচুর রোদ এসে ঘরের ভেতর লুটিয়ে পড়চে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখ্‌লুম ডাক-হরকরা। চিঠি দিয়ে গেল। প্রভাত ওর দরজা খুলে জিজ্ঞেস কর্‌লে চিঠি আছে কিনা। পিয়ন বল্লে, নেই। আমার মনে হ'লো প্রভাতের সমস্ত মুখের ওপর একটা ব্যর্থতার ছাপ গাঢ় হয়ে উঠ্‌ল। তার চোখ দুটো মনে হ'লো একটু ছলছলিয়ে উঠেছে। সে জোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কাল রাতের ঘটনাটি,—স্বপ্ন ?—হ্যাঁ স্বপ্নই,—আর আজ সকাল বেলার প্রভাতের মুখে এই ব্যথার চিহ্ন দেখে মনটা কেমন অপ্রতিভ হয়ে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি গিয়ে বুক-কেসের বইয়ের চাপ থেকে সেই চিঠিটা বের ক'রে আনলুম। নীল রঙের খামটার ওপর পরমপূজনীয়

প্রভাত রায় মেয়েলী হরফে যেন জলজল করচে। মনে হ'লো প্রতিটি অক্ষর যেন প্রেমের তীব্রতায় ক্ষুর-ধার। একটা কোন বইয়ের চাপে বেঁকে আছে। খামের মুখের ধারে মেয়েলী প্রথায় কি লিখে মালিক ছাড়া আর কেউ যেন না খোলে তারই অনুরোধ জানান হয়েচে।

এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলুম। তারপর প্রভাতের ঘরের কাছে গিয়ে চিঠিটা বাইরে থেকে ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে চলে এলুম। অসহিষ্ণুভাবে চেয়ার থেকে ওঠার শব্দ কানে এল।

অজিত চুপ করিল।

তখন অকস্মাৎ অতগুলি ছেলে মিলিয়া ব্যঙ্গ ও অবিশ্বাসের রুদ্ধ হাসিকে এক মুহূর্ত্তে প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

একজন বলিল,—বাঃ ভাই, রবীন্দ্রনাথ গদীচ্যুত হবেন। তোমার যা কল্পনার দৌড়! আর একজন তেমনি ব্যঙ্গ-স্বরে বলিল,—ক্ষুধিত পাষাণের আপ-টু-ডেট্ সংস্করণ।

'আমার আর দেরী কর্‌বার জো নেই, বলিয়া অজিত গায়ের চাদরটা তুলিয়া লইল।

স্বরালাপ.

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II { রা -া রপা মপমা । ম্জা -া রসা রা I রা -মা ম্-জা -া । -া -া রা সা I
চি ০ ত্ত আ মা র্ হা রা লো ০ ০ ০ ০ ০ হা' রা

I সরা -া সা -া । (মা -া পা -া I মপা পা-মণা -ধণা ণপা । মজা -া -রসা -রা) } I
লো ০ আ জ মে ০ ঘে র্ ৲মা ০ ঝ খা নে ০ ০০ ০

I -া -া -া -া I মা -া পা পা । -া -া পা পা I পমা -ণা ণা -ধা I
০ ০ ০ ০ কো ০ থা য় ০ ০ ছু টে চ ০ লে ০

। ধণা -ধণা ধপা -মা I পা -র্সা র্সা -া । -ণা -পামা মণা ণধা I মজা -া -রসা -রা ।
ছে ০০ সে ০ কো ০ থা ০ ০ য় কে জা নে ০ ০০ ০

। -া -া -া -া II
০ ০ ০ ০

-া -া -া -া II { না না না -া । না -া না -র্সা I ধনা -া র্সা -না ।
০ ০ ০ ০ বি জু লী ০ তা র্ বী ০ পা র্ তা ০

। র্সা -া র্সা -র্রা I নর্সা -া পা পা । না -া র্সা -র্রা I নর্সা -া -া ণধা ।
রে ০ আ ০ ঘা ০ ত্ ক রে ০ বা ০ রে ০ ০ বা

। ণা -া -া (-না) } IধাI ণা -া -া ধা । ণা -া ণা ধা I ধণা -া ধণা পা I
রে ০ ০ বু কে ০ র্ মা ঝে ০ ব ০ জ্র ০ ০০ বা

। পা -া পা -া I -পা -মা -পা -ধা । -ণা -র্সা র্সা -া I ধা -র্সা -া ণধা ।
জে ০ বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জে ০ কি ০ ০ য়

। পা -পা মপা -ধপা I মজ্ঞা -া রসা রা I রা -মা জ্ঞা -া । -া -া রা সা I
হা ০ ভা ০০ নে ০ হা রা লো ০ ০ ০ ০ ০ হা রা

I সরা -া সা -া । মা -া পা -া I পমপা -মপা -া পপা । মজ্ঞা -া রসা -রা II
লো ০ আ জ মে ০ ঘে র্ মা ০০ ব খা নে ০ ০০ ০

-া -া -া -া II ন্া -া -া ন্া । ন্া -া -া ন্া I সা -া সা -া
০ ০ ০ ০ পু ন্ ০ জ পু ন্ ০ জ ভা ০ রে ০

। রসা -ন্া সা -া I ন্া সা রা -া । রা -া -া রা I রা -জ্ঞা -া I জ্ঞা ।
ভা ০ রে ০ নি বি ড় ০ নী ০ ০ ল অ ন্ ০ ধ

। জ্ঞা -া জ্ঞা -মা I মা পা পা -া । পা -া -া -া I পমা -পা -া পা ।
কা ০ রে ০ জ ড়া লো ০ রে ০ ০ ০ অ ঙ্ ০ গ

। পধা পা পপা ধা I মা পা পা -া । -া -া -া -া I পা র্সা পা ধা ।
আ ০ মা র্ জ ড়া লো ০ ০ ০ ০ ০ ছ ড়া লো প্রা

: পা -া -া -ধপা I মা পা পা -া । -া -া -া -া I{ না না -া না ।
ণে ০ ০ ০ জ ড়া লো ০ ০ ০ ০ ০ পা গ ল হাও

। না -া -র্সর্রর্সা -না I -র্সা -া -া -া । -া -া -া -া I র্সা -া -া র্রা ।
য়া ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নৃ ০ ০ ত্যে

। র্রর্সা -া র্রা -া I র্রর্সা -া পা -া । ধা -া পা -া I ধা -া পা ধা ।
মা ০ তি ০ হ ০ ল ০ আ ০ মা র্ সা ০ থে র

। ধপা -ধপা পা -া I র্সা -া র্রা র্রা । র্রা -া -র্সা -র্রা I -র্জ্ঞা -া -া -া ।
সা ০০ থী ০ অ ০ ট্ট হা সে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

। -া -া -া -া I র্জ্ঞর্রা -া র্রা র্সা । র্সর্রা -া -র্সা -না I -সা -া -া -া ।
০ ০ ০ ০ ধা য় কো থা সে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

। -া -া -া -া I র্সা -না র্রা রা । র্রর্সা -া পা -ধা I ধপা -া রসা রা ।
০ ০ ০ ০ বা ০ র ণ না ০ মা ০ নে ০ হা রা

। রা -মা মজ্ঞা -া I -া -া রা সা । রা -া সা -া I মা -া পা -া ।
লো ০ ০ ০ ০ ০ হা রা লো ০ আ জ মে ০ ঘে র্

। পমপা মপা -া পপা I মজ্ঞা -া -রসা -রা । -া -া -া -া II II
মা ০ ব খা নে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

চিত্রকর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ময়মনসিংহ ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস ক'রে আমাদের গোবিন্দ এলো ক'লকাতায়। বিধবা মায়ের অল্প কিছু সম্বল ছিল। কিন্তু সবচেয়ে তা'র বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সঙ্কল্পের মধ্যে। সে ঠিক ক'রেছিলো "পয়সা" ক'রবোই, সমস্ত জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়ে। সর্ব্বদাই তা'র ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ ক'রতো "পয়সা" ব'লে, অর্থাৎ তা'র মনে খুব একটা দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণের যোগ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল, তা'র মধ্যে বড়ো নামের মোহ ছিল না, অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে-ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে-যাওয়া, মলিন-হ'য়ে-যাওয়া পয়সা, তাম্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বরূপ, যা রূপোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পঙ্কে আবিল হ'তে হ'তে আজ গোবিন্দ তা'র পয়সা-প্রবাহিনীর প্রশস্তধারার পাকা বাঁধানো ঘাটে এসে পৌঁছেচে। গানিব্যাগওয়ালা বড়ো সাহেব ম্যাকৃডুগালের বড়োবাবুর আসনে তার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা। সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাকৃদুলাল।

গোবিন্দর পৈতৃব্য ভাই মুকুন্দ যখন উকীল-লীলা সম্বরণ ক'রলেন তখন একটি বিধবা স্ত্রী, একটি চার বছরের ছেলে, ক'লকাতায় একটি বাড়ি, কিছু জমা টাকা রেখে তিনি গেলেন লোকান্তরে। সম্পত্তির সঙ্গে কিছু ঋণও ছিল, সুতরাং তাঁর পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নির্ভর ক'রতো। এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় সেগুলি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মুকুন্দদাদার উইল অনুসারে এই পরিবারের সম্পূর্ণ ভার প'ড়েছিলো গোবিন্দর 'পরে। গোবিন্দ শিশুকাল থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রের কানে মন্ত্র দিলে—পয়সা করো।

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তাঁর মা সত্যবতী। স্পষ্ট কথায় তিনি কিছু বলেন নি, বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহারে। শিশুকাল থেকেই তাঁর বাতিক ছিল শিল্পকাজে। ফুল ফল পাতা নিয়ে, খাবারের জিনিষ নিয়ে, কাগজ কেটে, কাপড় কেটে, মাটি দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস, ফলসার রস, জবার রস, শিউলি বোঁটার রস দিয়ে নানা অভূতপূর্ব্ব অনাবশ্যক জিনিষ রচনায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এতে তাঁকে দুঃখও পেতে হ'য়েচে। কেন না যা অদরকারী, যা অকারণ, তা'র বেগ আষাঢ়ের

আকস্মিক বন্যাধারার মতো—সচলতা অত্যন্ত বেশী, কিন্তু দরকারী কাজের খেয়া বাইবার পক্ষে অচল। মাঝে মাঝে এমনও হ'য়েচে, জ্ঞাতিবাড়িতে নিমন্ত্রণ, সত্যবতী ভুলেই গেচেন, শোবার ঘরে দরজা বন্ধ, এক তাল মাটি চট্‌কে বেলা কাটচে। জ্ঞাতিরা বল্‌লে, বড়ো অহঙ্কার। সন্তোষজনক জবাব দেবার জো নেই। এসব কাজেও ভালো-মন্দর যে মূল্যবিচার চলে সেটা বই-পড়া বিদ্যার যোগেই মুকুন্দ জানতেন। আর্ট শব্দটার মাহাত্ম্যে শরীর রোমাঞ্চিত হ'তো। কিন্তু তাঁর আপন গৃহিণীর হাতের কাজেও-যে এই শব্দটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে ক'রতেই পারতেন না। এই মানুষটির স্বভাবটিতে কোথাও কাঁটাখোঁচা ছিল না। তাঁর স্ত্রী অনাবশ্যক খেয়ালে অযথা সময় নষ্ট করেন এটা দেখে তাঁর হাসি পেতো, সে হাসি স্নেহরসে ভরা। এ নিয়ে সংসারের লোক কেউ যদি কটাক্ষ ক'রতো তিনি তখনি তা'র প্রতিবাদ ক'রতেন। মুকুন্দর স্বভাবে অদ্ভুত একটা আত্মবিরোধ ছিল,—ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বুদ্ধি ছিল না ব'ল্‌লেই হয়। পয়সা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট বইতো, কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়তো না। সেইজন্য মনটা ছিল মুক্ত; অনুগত লোকদের 'পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জন্যে কখনো দৌরাত্ম্য ক'রতে পারতেন না। জীবনযাত্রার অভ্যাস ছিল খুব সাদাসিধা, নিজের স্বার্থ বা সেবা নিয়ে পরিজনদের 'পরে কোনোদিন অযথা দাবী করেন নি। সংসারের লোকে সত্যবতীর কাজে শৈথিল্য নিয়ে কটাক্ষ ক'রলে মুকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রঙ, কিছু রঙীন রেশম, রঙের পেন্সিল কিনে এনে সত্যবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শোবার ঘরে কাঠের সিন্ধুকটার 'পরে সাজিয়ে রেখে আস্‌তেন। কোনোদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে নিয়ে বলতেন—বা, এ তো বড়ো সুন্দর হ'য়েচে। একদিন একটা মানুষের ছবিকে উল্‌টিয়ে ধ'রে তা'র পা দুটোকে পাখীর মুণ্ড ব'লে স্থির ক'রলেন, ব'ল্‌লেন, "সতু, এটা কিন্তু বাঁধিয়ে রাখা চাই—বকের ছবি যা হ'য়েচে চমৎকার!" মুকুন্দ তাঁর স্ত্রীর চিত্ররচনায় ছেলেমানুষী কল্পনা ক'রে মনে-মনে যে-রসটুকু পেতেন, স্ত্রীও তাঁর স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ ক'রতেন সেই একই রস। সত্যবতী মনে নিশ্চিত জান্‌তেন বাংলা দেশের আর কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য্য এত প্রশ্রয় আশা ক'রতে পারতেন না, শিল্পসাধনায় তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিত না। এইজন্যে যেদিন তাঁর স্বামী তাঁর কোনো রচনা নিয়ে অদ্ভুত অত্যুক্তি ক'রতেন সেদিন সত্যবতী যেন চোখের জল সাম্‌লাতে পারতেন না।

এমন দুর্লভ সৌভাগ্যকেও সত্যবতী একদিন হারালেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর স্বামী একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বুঝেছিলেন যে, তাঁর ঋণজড়িত সম্পত্তির ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওয়া দরকার যাঁর চালনার কৌশলে ফুটো নৌকোও পার হয়ে যাবে। এই উপলক্ষ্যে সত্যবতী এবং তাঁর ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে গিয়ে প'ড়লেন গোবিন্দর হাতে; গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জানিয়ে দিলেন, সর্ব্বাগ্রে এবং সকলের উপরে পয়সা। গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা সুগভীর হীনতা ছিল, যে, সত্যবতী লজ্জায় কুণ্ঠিত হ'তো।

তবু নানা আকারে আহারে ব্যবহারে পয়সার সাধনা চল্‌লো। তা নিয়ে কথায় কথায় আলোচনা না ক'রে তা'র উপরে যদি একটা আব্রু থাকতো তাহ'লে ক্ষতি ছিল না। সত্যবতী মনে মনে জানতেন এতে তাঁর ছেলের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করা হয়, কিন্তু সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না—কেন না

যে-চিত্তভাব সুকুমার, যার মধ্যে একটি অসামান্ত মর্য্যাদা আছে সে-ই সব চেয়ে অরক্ষিত, তাকে আঘাত করা বিদ্রূপ করা সাধারণ রূঢ়স্বভাব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

শিল্পচর্চ্চার জন্তে কিছু কিছু উপকরণ আবশ্তক। এত কাল সত্যবতী তা না চাইতেই পেয়েচেন, সেজন্তে কোনোদিন তাঁকে কুণ্ঠিত হ'তে হয় নি। সংসারযাত্রার পক্ষে এই সমস্ত অনাবশ্তক সামগ্রী, ব্যয়ের ফর্দ্দে ধ'রে দিতে আজ যেন তাঁর মাথা কাটা যায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিল্পের সরঞ্জাম কিনিয়ে আনাতেন। যা-কিছু কাজ ক'রতেন, সেও গোপনে দরজা বন্ধ ক'রে। ভর্ৎসনার ভয়ে নয়, অরসিকের দৃষ্টিপাতের সঙ্কোচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিল্পরচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী। এই কাজে ক্রমে ত'ার সহযোগিতাও ফুটে উঠ্‌লো। তাকে লাগলো বিষম নেশা। শিশুর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগুলো অতিক্রম ক'রে দেয়ালের গায়ে পর্য্যন্ত প্রকাশ হ'তে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতায় কলঙ্ক ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রদেব শিশুর চিত্তকেও প্রলুব্ধ ক'রতে ছাড়েন না। খুড়োর হাতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হ'লো।

একদিকে শাসন যতই বাড়তে চ'ল্‌লো আর একদিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগ্‌লেন। আপিসের বড়ো সাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাবুকে নিয়ে আপন কাজে মফস্বলে যেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমানুষীর একশেষ! যে সব জন্তুর মূর্ত্তি হ'তো বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেন নি- বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেতো মিলে, এমন কি মাছের সঙ্গে পাখীর প্রভেদ ধরা কঠিন হ'তো। এই সমস্ত সৃষ্টিকার্য্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না—বড়োবাবু ফিরে আসবার পূর্ব্বেই এদের চিহ্ন লোপ ক'রতে হ'তো। এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন—মাঝখানে বিষ্ণুর আগমন হ'লো না।

শিল্পরচনাবায়ুর প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণস্বরূপে সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগ্‌নে রঙ্গলাল চিত্রবিদ্যায় হঠাৎ নামজাদা হ'য়ে উঠলেন। অর্থাৎ দেশের রসিক লোক তাঁর রচনার অদ্ভুতত্ব নিয়ে খুব অট্টহাস্ত জমালে। তা'রা যেরকম কল্পনা করে তা'র সঙ্গে তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গুণপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা হ'লো। আশ্চর্য্য এই, যে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রূপের আবহাওয়ায় তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। যারা তার যতই নকল করে ত'ারাই উঠে প'ড়ে লাগ্‌লো প্রমাণ ক'রতে, যে, লোকটা আর্টিষ্ট হিসাবে ফাঁকি—এমন কি, তা'র টেক্‌নিকে সুস্পষ্ট গলদ্‌। এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আপিসের বড়োবাবুর অবর্ত্তমানে এলেন তাঁর মাসির বাড়িতে। দ্বারে ধাক্কা মেরে মেরে ঘরে যখন প্রবেশলাভ ক'রলেন দেখলেন মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই! ব্যাপারখানা ধরা প'ড়লো। রঙ্গলাল ব'ল্‌লেন, এতদিন পরে দেখা গেল, গুণীর প্রাণের ভিতর থেকে সৃষ্টি মূর্ত্তি তাজা বেরিয়েচে, এর মধ্যে দাগা বুলোনোর তো কোনো লক্ষণ নেই, যে-বিধাতা রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর বয়সের সঙ্গে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগুলো বের ক'রে আমাকে দেখাও!

কোথা থেকে বের ক'রবে? যে-গুণী রঙে রঙে ছায়ায় আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন তিনি তাঁর কুহেলিকা মরীচিকাগুলি যেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীর্ত্তিগুলোও সেইখানেই গেচে। রঙ্গলাল মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর মাসিকে ব'ল্‌লেন, এবার থেকে তোমরা যা-কিছু রচনা ক'রবে আমি এসে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাবো।

বড়োবাবু এখনো আসেন নি। সকাল থেকে শ্রাবণের ছায়ায় আকাশ ধ্যানমগ্ন—বৃষ্টি প'ড়চে—বেলা ঘড়ির কাঁটায় কোন্ সঙ্কেতের কাছে তা'র ঠিকানা নেই—তা'র খোঁজ ক'রতেও মন যায় না। আজ

চুনিবাবু নৌকো ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেচেন। নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল, হাঁ ক'রে নৌকোটাকে গিল্‌তে চ'লেচে এম্‌নিতরো ভাব—আকাশের মেঘগুলোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্চে ব'লে বোধ হ'চ্চে—কিন্তু মকরগুলো সর্ব্বসাধারণের মকর নয় আর মেঘগুলোকে ধূম-জ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিবেশঃ ব'ল্‌লে অত্যুক্তি করা হবে। একথাও সত্যের অনুরোধে বলা উচিত, যে, এই রকমের নৌকো যদি গড়া হয় তাহ'লে ইন্‌সিয়োরেন্স্‌ আপিস কিছুতেই তা'র দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না। চল্‌লো রচনা, আকাশের চিত্রীও যা খুসি তাই ক'রচেন আর ঘরের মধ্যে ঐ মস্ত চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ। এদের খেয়াল ছিল না, যে, দরজা খোলা। বড়োবাবু এলেন। গর্জ্জন ক'রে উঠলেন—কী হ'চ্চে রে! ছেলেটার বুক কেঁপে উঠ্‌লো, মুখ হ'লো ফ্যাকাসে। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন পরীক্ষায় চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভুল হ'চ্চে তা'র কারণটা কোথায়। ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তা'র জামার মধ্যে লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরো প্রকাশমান হ'য়ে উঠ্‌লো। টেনে নিয়ে গোবিন্দ যা দেখ্‌লেন তাতে তিনি আরো অবাক্‌—এটা ব্যাপারখানা কী! এর চেয়ে-যে ইতিহাসের তারিখ ভুলও ভালো। ছবিটা কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লেন। চুনিলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো।

সত্যবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরঘরেই কাটাতেন। সেইখান থেকে ছেলের কান্না শুনে ছুটে এলেন। ছবির ছিন্ন খণ্ডগুলো মেঝের উপর লুটচে আর মেঝের উপর লুটচে চুনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসে তারিখ ভুলের আদি কারণগুলো সংগ্রহ ক'রছিলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সত্যবতী এতদিন কখনো গোবিন্দর কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেন নি। এঁরই 'পরে তাঁর স্বামী নির্ভর স্থাপন ক'রেচেন এই স্মরণ ক'রেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য ক'রেচেন। আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে ব'ল্‌লেন, কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেল্‌লে।

গোবিন্দ ব'ল্‌লেন, পড়াশুনো ক'রবে না? আখেরে ওর হবে কী!

সত্যবতী ব'ল্‌লেন, আখেরে ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয়; ভগবান ওকে যে-সম্পদ দিয়েচেন তারি গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্ব্বের চেয়ে বেশি হয় এই ওর প্রতি আমার মায়ের আশীর্ব্বাদ।

গোবিন্দ বল্‌লেন, আমার দায়িত্ব আমি ছাড়তে পারবো না, এ চ'ল্‌বে না কিছুতেই। আমি কালই ওকে বোর্ডিঙ্‌ স্কুলে পাঠিয়ে দেবো—নইলে তুমি ওর সর্ব্বনাশ ক'রবে।

বড়োবাবু আপিসে গেলেন। ঘনবৃষ্টি নাম্‌লো, রাস্তা জলে ভেসে যাচ্চে।

সত্যবতী চুনির হাত ধ'রে ব'ললেন—চল্‌ বাপ।

চুনি ব'ল্‌লে, কোথায় যাবে, মা?

এখান থেকে বেরিয়ে যাই।

ব্রজলালের দরজায় একহাঁটু জল। সত্যবতী চুনিলালকে নিয়ে তা'র ঘরে ঢুক্‌লেন—বল্‌লেন, বাবা, তুমি নাও এর ভার! বাঁচাও এ'কে পয়সার সাধনা থেকে!
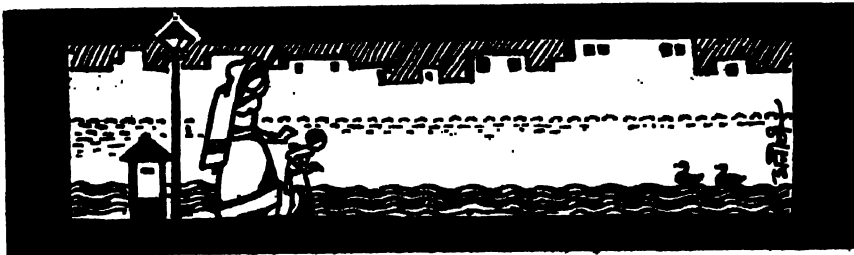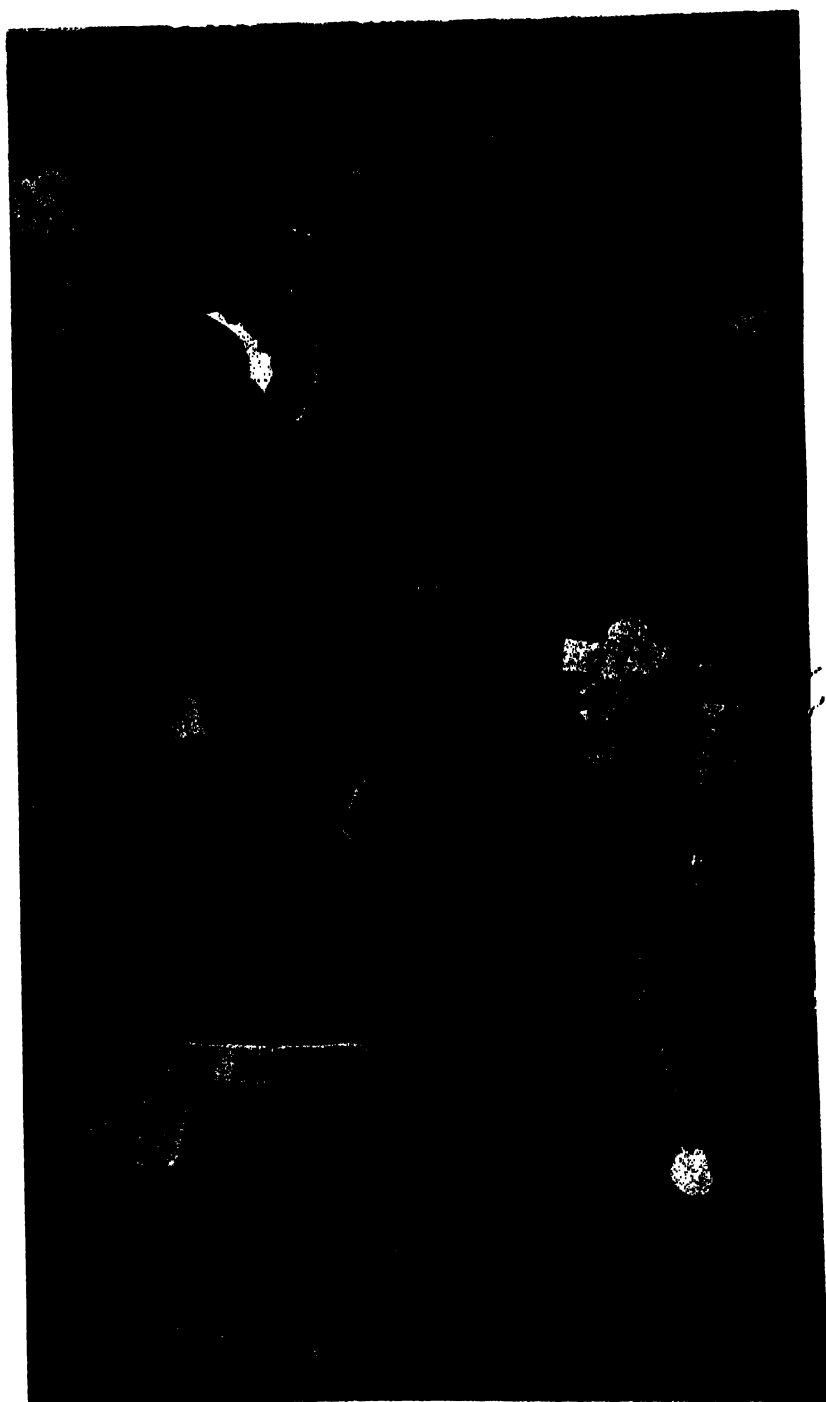
অন্ধ্র বালিকাবৃন্দ

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শিল্প ও শিল্পীর জাতবিচার

আমরা শাস্ত্র অনুযায়ী চলি তাই শাস্ত্রের শস্ত্র আমাদের শিল্পকলাকেও জাতিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ করে টুক্‌রো টুক্‌রো করেছিল। পটুয়া যারা তারা শূদ্র, কাঠের কাজ যে করে সে সূত্রধর, ধাতু যারা যাঁরা বস্তু নির্ম্মাণ করেন তাঁরা হলেন লোহার, স্বর্ণকার, কাঁসারি প্রভৃতি, আর মাটি দিয়ে যাঁরা গড়েন তাঁরা কুমার এইরূপ ভাবে।... আমাদের এই জাতিবিচারের ফলে এখনও বিশেষ করে রাজওয়াড়া মুলুকে দেখা যায় যে, শিল্পকলা এক এক জাতির লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ, তার আর গতি-বৃদ্ধি বা প্রসার নেই। এমন কি এক-একটি অমূল্য কারুকলা ভারতবর্ষ থেকে সেই সব জাতির সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেতে বসেছে। এখন তাই আর Artizans অর্থাৎ শিল্পী পরিবারের লোক ছাড়া অন্য কারু শিল্পকলা শেখবার প্রয়োজন নেই একথা বল্লে চলে না।

শিল্পকলা বা Fine Art সেটি কেবলি পটচিত্রে আবদ্ধ নয়। রূপ রঙ ঢঙ এই তিন নিয়ে শিল্প। সেটা কাগজের উপরই হোক, মাটি লোহা পিতল কাঠ যারই উপর তৈরী হোক। তাই যদি শিল্প,—কারু ও চারু (Crafts & Art) দুইভাবে চর্চ্চা করতে হ'লে যার যেটি সহজেই আসে তার সেটির চর্চ্চা করতে হবে। শিল্পকলা ভাবকে রূপ দেয়। যা আমাদের এই জীবনের আনন্দকে আত্মসুখের ও আহার-বিহারের অনিত্যতার উপরে যুগে যুগে সবাইকার কাছে পৌঁছে দিতে পারে, সেই হ'ল শিল্পসৃষ্টি।

এই শিল্পসৃষ্টির শক্তি নিয়ে মানুষ জন্মেছে; এখন একে জাতের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করে রাখলে চলবে কেন? আমরা এখন "শিল্পী" বলে নিজেদের গৌরব করতে চাই, আমরা কেবল ধনীর পণ্যতার তৈরী করবার জন্যে মামুলি ধরণের কারিগর হয়ে এবং জাতিবিচার ক'রে দেশের শিল্পকলার অগৌরব আর বাড়াবো না। আমাদের শিল্পপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-জীবনের উপর শ্রদ্ধা বাড়াবার চেষ্টা করব। খেটে খাওয়াতে আমাদের গৌরব বাড়বে বই কমবে না। চাকুরির দাসত্বের অসত্য আমাদের আর ঘিরে থাকবে না। নিজেদের দেশের সব কাজে এবং সব জিনিষের ভিতর দেশী শিল্পের বিশেষ একটি ছাঁদ ও হাত থাকবে—তা' পিতলের উপরেই হোক, লোহার উপরেই হোক, আর যে কোনো ধাতুর উপরেই হোক।...

সরস্বতীর বর যিনিই লাভ করেছেন তিনিই শিল্পী হ'তে পারেন তা' যে কোনোই জাতের লোক তিনি হোন্ না কেন। অবশ্য আমাদের দেশে কতকগুলি কারুশিল্প বংশানুক্রমে চলে আসার কারণ এই যে তাতে ক'রে শিল্পী-পরিবারের ছেলে মেয়ে বুড়ো সকলেই শিল্পীকে সহায়তা করতে পারায় শিল্প-সম্ভার বেশী পরিমাণে তৈরী হ'তে পারে এবং সম্ভার ভূরি ভূরি বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। এই অর্থনীতির দিক থেকে এর উপকারিতা থাকলেও এতে শিল্পকলার নব নব উন্মেষলাভ এ উপায়ে ঘটে না; বরং একই ধাঁচের জিনিষ বংশানুক্রমে শিল্পীরা তৈরী করে চলেন। এ কতকটা একঘেয়ে একসুরের দেহাতি গাওনার মত অসহ্য হয়ে ওঠে। যেন অভিনব জিনিষ রচনার ভার তাঁদের পূর্ব্বপুরুষরাই নিয়ে চুকেচেন তার অধিক আর এঁদের কিছুই করবার নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কখন জিনিষটির পরিকল্পনা ও রূপ একঘেয়ে হলেও তার তৈরী করবার কৌশলের তারিফ না ক'রে থাকা যায় না। যেমন মুরাদাবাদি বাসনের উপর কারুকার্য্য, বাঙলা দেশের কালিঘাটের পট প্রভৃতি।... আমাদের এখন দেখা দরকার যে, কেবল একটির পর একটি পরিকল্পনার নকল আবহমানকাল থেকে শিল্পীরা করবেন, না নূতন নূতন চিন্তার দুয়ার উদ্‌ঘাটিত করবেন। যদি শিল্পকলাকে আমরা বাজারের পণ্যকলা (Commercial Art) মাত্র ক'রে রেখে নিশ্চিন্ত না হই তবে আর জাতিবিচার ক'রে হাত গুটিয়ে থাকলে চলবে না।...

অনেকে প্রাচীনকালের দোহাই দেন। কিন্তু বহু পুরাকালে শিল্পশিক্ষা সকল শিক্ষারই অন্তর্গত ছিল এবং রাজন্যবর্গকে বিশেষভাবে শিখতে হ'ত। এর প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়। জাতিবিচার বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী কোনো কালে কখন ভারতবর্ষে যে হয়েছিল তার খবর বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন। শিল্পকলায় শিল্পীদের ছুঁত-ছুঁত ছাড়াও মেয়েদের গান শেখানো ও ছবি শেখানোতেও আমাদের মধ্যে অনেকেরই আপত্তি আছে দেখা যায়। অথচ মেয়েদের এই চারু ও কারুশিল্প থেকে বঞ্চিত করে তাদের শুষ্ক সংসারের নিগড়ে বদ্ধ করে দেশের যে আমরা কত ক্ষতি করি তা' আমাদের বুদ্ধির অগোচর। মাতৃজাতির কল্পনার উন্মেষ শিল্পকলায় না হলে সন্তানদের ভিতর সেভাব কখনও সঞ্চারিত হতে পারে না। কতকগুলি কারুশিল্প স্ত্রীজাতির বিশেষত্ব—যথা সূচিকার্য্য, বয়ন, চিত্রণ ইত্যাদি। বাঙলার মেয়েরা আলপনার মধ্যে তাঁদের কলালক্ষ্মীর পূজা সম্পাদন করে থাকেন। ছুঁচের কাজ পশ্চিম অঞ্চলে মেয়েদের একটি সখের ও খুব সৌখীন কাজ। লেখক লক্ষ্ণৌয়ের চিকণের লেসের সূক্ষ্মকাজ মেয়েদের হাতের তৈরী যা' দেখেছেন সেরূপ কাজ অতি সূক্ষ্মকলের সাহায্যেও তৈরী করা সম্ভবপর নয়। একটি লক্ষ্ণৌয়ের ছোট্ট দোপাল্লি টুপিতে এইরূপ কাজ তৈরী করাতে ২০০৲। ৩০০৲ টাকা ব্যয় হয়। এখন ক্রমশঃ কলের তৈরী লেসের প্রচলন হওয়ায় এই কাজ লোপ পেতে বসেচে।

আধুনিক যুগের শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং স্ত্রীশিক্ষার কদর হওয়ায় আশা করা যায় যে, দেশের মেয়েদের জন্যে শিল্পকলাচর্চ্চার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র হবে—তাতে কোনো জাতিবিচার থাকবে না। অতীত ভারতকে আধুনিক ভারতে জীবন্ত করার উপায় ছুঁত-ছুঁতে নয়, তার এই শিকল কেটে দিয়ে তাকে সব বিষয়ে মুক্তি দেওয়ায়। আসল কথা মানুষের মনে—সে যে জাতেরই মানুষ হোক না কেন—যদি সুর রংএর আনন্দ সহসা রূপ পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে তখন আর কিছুরই বাধা থাকে না। ঠিক যেভাবে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে সব ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এও কতকটা সেইরূপ। যার ভিতর সেই বড় শিল্পীর ডাক পৌঁছেচে তাকে তারই কাছে ছুটে যেতে হবেই হবে।...

আমাদের দেশের শিল্পের দুর্গতি আর এক বিশেষ কারণে হচ্ছে।

পরস্পর পরস্পরকে না শেখানোর দরুণ। এমন কি নিজের ছেলেকেও কখন কখন উচ্চশ্রেণীর কারিগরেরা তাদের বিদ্যা ভাল করে শেখাতে চায় না। এইভাবে ভারতের অনেক শিল্পকলা একেবারে লোপ পেতে বসেচে—তার আর পুনরুদ্ধারের আশা নেই। শিল্পবিদ্যাকে কেবল অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত করায় এই দোষ বিশেষ ভাবে জন্মায়। পরস্পর পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারাতে চায় এবং তাদের নিজের নিজের কাজের বিশেষত্বটি অপরের কাছে প্রকাশ করতে চায় না। শুধু শিল্পকলায় কেন, ভারতের ভাল ভাল ওষুধপত্রও এই একই কারণে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেছে।

গভর্ণমেণ্টের হাতে শিল্পকলা শেখানোর ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে চাই। কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারি না যে, শিল্পকলার উন্নতির প্রকৃত-পথের সন্ধান সরকারী লোকদের লেফাফাদুরস্ত কাজের বাঁধা নিয়মের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। বে-সরকারী বে পরওয়া উদার-চেতা সাধারণের মধ্যেই- গুণগ্রাহী রসগ্রাহী মানুষদের মধ্যেই সে-পথের সন্ধান দেওয়া দরকার। সরকারী শিল্পবিদ্যালয় শিল্পশিক্ষা দেওয়ার চেয়ে পরীক্ষা নেবার পন্থা, বাঁধা নিয়মের শাসনে চলবার উপায় এবং সার্টিফিকেটের ধ্বজাপতাকার ছাপ দিয়ে বিদায় করবার সহজ রাস্তা ব'লে দিতে পারে। সরকারী শিল্পী কর্ম্মচারীটি নানান বাঁধা নিয়মশাসনের অস্ত্রশস্ত্র শাণাতেই ব্যস্ত, শিল্পকলার ছাত্রদের মন ধরা দিলে কি না দিলে তা দেখবার তাঁর ফুরসৎই নেই। এইভাবে দেশের শিল্পশিক্ষায় জাতিবিচার শিল্পকলায় উঠে যাচ্ছে বটে, কিন্তু জাতিগত-কুসংস্কার যে একেবারে যাচ্ছে বলে ত আমাদের মনে হয় না। বাঙ্গালা দেশে বেসরকারী শিল্পবিদ্যালয় দুটি-তিনটি আছে। এখন সেগুলির কিরূপ অবস্থা আমাদের তা জানা নেই। সেগুলিকে ভাল করে কোনো ভাল শিল্পীর হাতে চালাবার ভার দেওয়া এবং তার উন্নতির চেষ্টা করা সর্ব্বসাধারণের দরকার। এখনকার কালে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অপেক্ষা বাঙালীরা শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যত অগ্রসর হবেন ততই দেশের আর্থিক উন্নতি হবে, নচেৎ আর্টের চর্চ্চাটাও মাড়োয়ারীর নিকট গচ্ছিত বাঙলার ধন-ঐশ্বর্য্যের মতই স্থগিত থেকে যাবে।

(বঙ্গলক্ষ্মী—ভাদ্র, ১৩৩৬) শ্রীঅসিতকুমার হালদার

—

ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব

এই পৃথিবীতে যে-সমস্ত জন্তুর সহিত আমরা পরিচিত তাহাদের মধ্যে মানুষ বয়ঃকনিষ্ঠ। এই মানুষ ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে কতদিন হইল বাস করিতেছে সে-সম্বন্ধে এক অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রাচীন যুগের মানবের অস্তিত্ব নানা প্রকার আয়ুধ, প্রোথিত-মৃতদেহ-স্থান সূচক নানাপ্রকার প্রস্তর ও তাহার কঙ্কালাবশেষ প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। নৃতত্ত্ব আলোচনার প্রথম ভাগে য়ুরোপের নানা স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত নিদর্শনাদি সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু এখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ হইতেই এইরূপ নিদর্শন আবিষ্কারের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত নিদর্শনের সাহায্যে মানুষের অস্তিত্ব ব্যতীত প্রাচীন যুগে বিভিন্ন স্থানবাসী জাতিদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান এবং জাতিবিশেষের চলাফেরা সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। আমার এই কথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বে আয়ুধের কথা বলা হইয়াছে, প্রস্তর সেই আয়ুধের অন্যতম উপাদান। প্রধানতঃ দুই প্রকারের প্রস্তরায়ুধ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদিগকে প্রত্ন ও নবপ্রস্তরায়ুধ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। নবপ্রস্তরায়ুধের যুগে মানুষ নিজের ব্যবহারের উপযোগী অস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য প্রস্তর ঘষিতে শিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্নপ্রস্তরায়ুধের যুগে মানুষের সে শিক্ষা হয় নাই। বহুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের মিঃ থিওবলড ব্রহ্মদেশে একপ্রকার নবপ্রস্তরায়ুধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহাদিগকে দ্বি-স্কন্ধ প্রস্তরায়ুধ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই ধরণের প্রস্তরায়ুধ ব্রহ্মদেশ বতীত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোন কোনও স্থানে—সিংভূমে ময়ূরভঞ্জে এবং ইণ্ডো চীন প্রভৃতি স্থানে—প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং এই সমস্ত প্রাপ্তির স্থানসমূহ যে কোনও প্রাগৈতিহাসিক জাতির গতিবিধির পথ-প্রদর্শক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ভূতত্ত্ব-বিভাগের ডাঃ কগিন ব্রাউন আসাম প্রদেশে প্রাপ্ত এরূপ কতিপয় প্রস্তরায়ুধের বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে-গুলির মধ্যদেশে কোমরবন্ধের ন্যায় এক বেষ্টনী বিদ্যমান। এইরূপ প্রস্তরায়ুধ ভারতবর্ষের কোনও স্থানে চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে সামান্য, কিন্তু উত্তর-আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ সমূহে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এইরূপ বিশিষ্ট গঠনের প্রস্তরায়ুধ বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল, না একদেশের মানুষ অপর দেশের মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া সেই দেশের মানুষের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা গবেষণার বিষয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।...

নবজীবক যুগের শেষভাগে মানুষের অস্তিত্বের নিদর্শন নিঃসন্দেহ ভাবে পাওয়া যায়। নবজীবক যুগের যে অংশে মানুষের চিহ্ন আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ কোন প্রকার বাদ-বিসংবাদের অবতারণা না করিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই অংশের নাম অত্যাধুনিক। এই অত্যাধুনিক যুগাংশ নৃতত্ত্ব-হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগাংশ বলিয় অভিহিত হইয়া থাকে।...

হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে দেরাদুনের নিকট শিবালিক পর্ব্বত বিদ্যমান। এই পর্ব্বতে অনেক বৃহদায়তন জীবজন্তুর দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, এবং অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এইরূপ জীবাশ্ম-বাহীস্তর-পুঞ্জ ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিম্ন-হিমালয়ের প্রায় সমগ্র পাদদেশ জুড়িয়া বিস্তৃত। এই স্তরা-বলির মধ্যে একপ্রকার জীবের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে যাহাকে Sivapithecus আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। Sivapithecus-আবিষ্কারক ডাঃ পিলগ্রিম্ ইহাকে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও তাঁহার মতে এই জীব সরাসরিভাবে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাসের একপার্শ্বে ইহার স্থান আছে। আমেরিকার সুবিখ্যাত প্রত্নজীববিদ্যাবিদ্ ডাঃ গ্রেগোরী এই Sivapithecusকে Dryopithecus নামক লাঙ্গুলহীন বানরের তুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম:—

It thus appears that *Sivapithecus indicus* combines in its mandible the human and the Simian aspect in a very remarkable way and we may preferably look upon it, at present, as belonging to the Homosimiidae the name being derived from Homosimius the supposed semi-human ancestor of the eoliths according to de Mortillet.

এই Sivapithecus সম্বন্ধে দুই বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ পিলগ্রিম্‌ অপর একটি সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে দেখা যাইতেছে যে তিনি অনেকটা আমার এই পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থন করিতেছেন। কারণ তিনি বলিয়াছেন যে :—

If I am correct in deriving the chimpanzee also from some species of Sivapithecus, then its affinities to man...will accord with my suggestion that another species of Sivapithecus gave rise to the Hominidae. সুতরাং দেখা যাইতেছে যে Sivapithecusএর প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক না কেন, ইহা যে মনুষ্য পর্য্যায়ভুক্ত নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভূবিদ্যাবিদ্‌গণের মতে ইহা মধ্যাধুনিক সময়ান্তর্গত। সুতরাং ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে মধ্যাধুনিক সময়ের মানুষের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সেই সময়ে এমন এক জীব হিমালয়ের পাদদেশে বাস করিত যাহার সহিত মানুষের বংশপরম্পরাগত কোনও সম্পর্ক ছিল বলিয়া আমরা মানিয়া লইতে পারি।

মধ্যাধুনিকের পর বহ্বাধুনিক সময়ের আবির্ভাব। এই সময়ে মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখা যায় এবং সংক্ষেপে সেই বিষয়ের অবতারণা করা হইতেছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ভূতত্ত্ব-বিভাগের ডাঃ নোট্‌লিজ ব্রহ্মদেশে কতকগুলি প্রস্তু-প্রস্তরায়ুধ ও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট একটি লুপ্ত জলহস্তীর এক জানু-অস্থি আবিষ্কার করেন ও এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু যে স্তরে এই সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল সেইগুলি বহ্বাধুনিক সময়ের অন্তর্গত, সেই হেতু এই সমস্ত নিদর্শন দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, বহ্বাধুনিক যুগে ব্রহ্মদেশে মানুষ বিদ্যমান ছিল। বলা বাহুল্য যে এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে।... পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরায়ুধের কৃত্রিমতা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই এবং...এই সমস্ত প্রস্তরায়ুধের মধ্যে একটি প্রস্তরায়ুধ প্রত্ন-প্রস্তরায়ুধের পূর্ব্ব সময়ান্তর্গত না হইলেও ইহা যে প্রত্ন প্রস্তরায়ুধ সময়ের সর্ব্বপ্রথম সময়-সূচক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে স্তর হইতে এই সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, সে স্তরের বয়স সম্বন্ধেও কোন মতভেদ নাই। কিন্তু গোল হইতেছে একটি বিষয় লইয়া—সেটি এই যে, এই সমস্ত প্রত্ন প্রস্তরায়ুধ প্রথম হইতেই এই স্তরবিশেষে বিদ্যমান ছিল, অথবা এগুলি যেস্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহার উপর যে ছোট সমতলভূমি বিদ্যমান আছে সেই স্থান হইতে এগুলি গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছিল।...

বহ্বাধুনিক সময়ে ব্রহ্মদেশে যে মানবের অস্তিত্ব ছিল তাহাতে আস্থা স্থাপন করার যথেষ্ট কারণ আছে যদিও এই বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন না।

এখন অত্যাধুনিক সময়ের পালা। এই সময়ান্তর্গত অনেকগুলি পলি আমাদের দেশে পাওয়া যায় এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নর্ম্মদা ও গোদাবরীর প্রাচীন পলিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই পালতে অধুনালুপ্ত জীবের কঙ্কালাবশেষের সহিত প্রত্ন-প্রস্তরায়ুধ পাওয়া গিয়াছে—সুতরাং পৃথিবীর বয়স হিসাবে এই প্রস্তরায়ুধের বয়স নির্ণয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই দুই পলির স্তর যে অত্যাধুনিক যুগের অন্তর্গত তাহাতে কোনও মতভেদ নাই। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিন ভাগে অত্যাধুনিক সময় বিভক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এই জীবকঙ্কাল ও প্রস্তরায়ুধ-বাহী স্তর দুইটি অত্যাধুনিক সময়ের কোন্‌ ভাগে অবস্থিত। জীবাশ্মের আলোচনাতে দেখা যায় যে, এই দুইটি পলি সমসাময়িক এবং নর্ম্মদার পলিতে প্রাপ্ত জীবাশ্মের সংখ্যা গোদাবরীতে প্রাপ্ত জীবাশ্মের সংখ্যা হইতে অনেক বেশী, সুতরাং নর্ম্মদার পলির বয়ঃক্রম স্থির করিলেই গোদাবরীর পলির বয়স স্থির হইবে।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব-বিভাগের মিঃ মেডলিকট্‌ মনে করিতেন যে, এই দুই পলি উচ্চ-অত্যাধুনিক সময় অপেক্ষা প্রাচীন নহে ও পক্ষান্তরে ডাঃ পিলগ্রিম সর্ব্বপ্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, এই পলি নিম্ন-অত্যাধুনিকের পূর্ব্বসময়বর্ত্তী নহে। ইঁহারা যে উপায়ে এই পলির বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহার সাহায্য না লইয়া অপর উপায়ে এই পলির বয়স অধিকতর নিশ্চিতভাবে স্থির করা যাইতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে জলহস্তী আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু বহু প্রাচীন যুগে এই জলহস্তী এসিয়া ও য়ুরোপে বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে চারি জাতির জলহস্তীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে দুইটি নর্ম্মদার পলিতে ও এই দুইটির মধ্যে একটি গোদাবরীর পলিতে পাওয়া গিয়াছে। এই জলহস্তীর দন্তবিন্যাসের আলোচনা দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যব দ্বীপে প্রাপ্ত Pithecanthropusবাহী স্তর নর্ম্মদার প্রাচীন পলি অপেক্ষা প্রাচীনতর ও জীব-কঙ্কালাবশেষ-বাহী যমুনা ও গঙ্গার প্রাচীন পলি নর্ম্মদার প্রাচীন পলি অপেক্ষা নবীন। সমস্ত প্রকার প্রমাণ আলোচনা করিলে মনে হয় যে Pithecanthropus-বাহী স্তর ও গঙ্গা যমুনার প্রাচীন পলি যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চ অত্যাধুনিক সময়ের এবং নর্ম্মদা ও গোদাবরীর প্রাচীন পলি মধ্য-অত্যাধুনিক সময়ের অন্তর্গত বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি এবং তাহা হইলেই মধ্য-অত্যাধুনিক সময়ে যে ভারতে মানুষ ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতে মানুষের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে স্পষ্টভাবেই আমি বলিয়াছিলাম :—

"Thus the unmistakable evidence about the existence of man in India can be traced down to the middle Pleistocene."

গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়াছিল সেই অধিবেশনে ভূতত্ত্ব-বিভাগের সভাপতিরূপে ডাঃ পিলগ্রিম ভারতে প্রাপ্ত স্তন্যপায়ী জীবাশ্মের চালাকেরা সম্বন্ধে এক অভিভাষণ পাঠ করেন এবং সেই অভিভাষণে তিনি ভারতীয় স্তন্যপায়ী-জীবাশ্মবাহী স্তর সমূহের বয়ঃক্রমের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে নর্ম্মদার প্রাচীন পলির বয়স সম্বন্ধে তিনি আমার মতের অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বহ্বাধুনিক যুগে ব্রহ্মদেশে মানুষ ছিল কিনা তাহাতে মতভেদ আছে, কিন্তু অত্যাধুনিক যুগের মধ্যভাগে যে ভারতবর্ষে মানুষ বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন, ১৩৩৬) শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র

ভারতে মৌর্য্যবংশ যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া বিপুল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাও যে ভারতরাজ্য হয় নাই—তাহার কারণ কি? বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই, ভারতে আদর্শবাদ লইয়া যে সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহার মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা না হওয়াই ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। খৃষ্টপূর্ব্ব ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও দেখা যায়, পৌরাণিক যুগের মত ভারতে দেবাসুর সংগ্রাম চলিতেছে। পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূলে জৈনের 'চতুর্যম' ধর্ম্ম মাথা তুলিবার তুমুল আন্দোলন করিতেছে। শাক্য-

সিংহের অসাধারণ তপস্যায় এই বৈদিক ধর্ম্ম যখন মাথা নীচু করিল, তখন মৌর্য্যবংশের প্রতাপ মধ্যাহ্ন-ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিশালী। ইহার পূর্ব্বে, আজ যেমন ইংরাজ জাতির সহিত ভারতবাসীর ব্যবহারগত নিদারুণ বৈষম্যে আমরা ম্রিয়মাণ সেদিন ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণেতর জাতির ততোধিক পার্থক্য ছিল,—আমরা মূলের এই কথাটা ভুলিয়া বালুর উপর গৃহ-নির্ম্মাণে উদ্যত হইয়াছি। ব্রাহ্মণ নরহত্যা করিলেও তাহার দণ্ডবিধানের সাধ্য রাজশক্তির ছিল না, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য রক্ষার জন্য রাজবিধি ছিল, ধর্ম্মাধিকরণে ব্রাহ্মণকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত; ব্রাহ্মণের বিচার ব্রাহ্মণই করিত, অতিবড় গর্হিত কর্ম্ম করিলে, কেবল শিখা কর্ত্তন অথবা বিত্তনাশ করাই চূড়ান্ত শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। অশোক বৌদ্ধ প্রভাবে জাতিগত এই নিদারুণ বৈষম্য দূর করিয়া ভারতে অখণ্ড জাতিপ্রতিষ্ঠার বিধি প্রবর্ত্তন করেন। রাজা অশোকের "ব্যবহার-সমতা" নীতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা দ্বারা ঘৃণিত, অস্পৃশ্য, অনার্য্য, শূদ্র সকল জাতির সহিত ব্রাহ্মণেরও তুল্য বিচারের ব্যবস্থা হয়। মৌর্য্যবংশ পতনের ইহাই কারণ। ভেদনীতির উপর ভারতের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ইংরাজেরই রুচিগত নহে, ইহা আমাদের অদৃষ্টগত ফল। ২৩৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বৌদ্ধদ্বেষী পুষ্পমিত্র ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রে মৌর্য্যবংশের প্রভুত্ব চূর্ণ করিয়া শুঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্‌লাম-ধর্ম্মী কালাপাহাড়ের নাম শুনিয়া আমরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করি; কিন্তু মহামতি অশোকের ৮৪০০০ হাজার 'ধর্ম্মরাজিকা' ধ্বংস করিয়া বৌদ্ধযুগের দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণ অগ্নিস্তূপে নিক্ষেপ করিয়া বৌদ্ধমহিমার মূলোচ্ছেদে ভারতের ইতিহাস নিশ্চিহ্ন করিল কাহারা, তাহা কি আজ ভাবিবার বিষয় নহে। বিভিন্ন ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া নাগার্জ্জুন "মহাযান" ধর্ম্ম প্রচার করেন; কিন্তু জাতি-বৈষম্যে তাহা নিষ্ফল হইল। রাজ্যের পর রাজ্য পরিবর্ত্তনের মূলে এই ভেদেই আমরা হীনবীর্য্য হইলাম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্ব্বত্য জাতি অবহেলে আমাদের জয় করিয়া লইল। আমরা সেদিন বৌদ্ধ নরপতি অশোকের "ব্যবহার-সমতা" সহি নাই, কিন্তু আজ ইংরাজের তুলাদণ্ডে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের শিক্ষা, সাধনা, শাসনের সমান ব্যবস্থা মাথা পাতিয়া বহিতেছি। আমাদের পরাধীনতার মূলে এই যে স্বজাতিবিদ্বেষ, তাহা মৌর্য্য, শুঙ্গ, কণ্ব, অন্ধ্র, গুপ্তবংশ স্বাধীন হইয়াও দূর করিতে পারে নাই।...

সহস্র বৎসর সে অবকাশ আমরা ব্যর্থ করিয়াছি। অশোকের "ব্যবহার-সমতার" বিধি যেদিন শূদ্রের সহিত অপরাধী ব্রাহ্মণের সমানভাবে শূলারোহণ ও কারাবাসের ব্যবস্থা করিল, সেদিন প্রতি-বিধিৎসায় ভারতের ব্রহ্মণ্যবীর্য্য আত্মঘাতী হইতেও কুণ্ঠা করে নাই। প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! ইংরাজ-রাজদণ্ডে নন্দকুমারের ফাঁসী সেই সমতার জয় দুই হাজার বৎসর পরে আবার জ্ঞাপন করিল—হায় জাতি মর্য্যাদা!...

বৌদ্ধ প্রভাব ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ বন্ধ করিয়াছিল; ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম আত্মপ্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও জ্ঞানের তীর্থ দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িয়াছিল। এই কুরুক্ষেত্র মামুদের সোমনাথ চূর্ণ করার অপেক্ষা কম বীভৎস ব্যাপার নহে। দেশে এই যে অস্পৃশ্য জাতির সংখ্যা, ইহা তাহাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল নহে, অন্ততঃ ইতিহাস তাহা বলিবে না। বগুড়ার কৈবর্ত্ত নরপতি ভীম বৌদ্ধসম্রাটের আদেশে রাজধর্ম্ম গ্রহণে অধিকারী নহে—এই অনু-শাসনে নূতন সাম্রাজ্য গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মানুষের রক্ত ভগবান ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদে স্বতন্ত্র বর্ণের করেন নাই; তাঁর বিধান ভারত যেভাবে অস্বীকার করিয়াছে, এমন পৃথিবীর কোন জাতি করে নাই। নতুবা ত্রিশকোটি নরনারীর প্রভু হওয়ার অধিকার, আজ জলধিগর্ভে ক্ষুদ্র পল্লব আশ্রয় করিয়া যে মগণ্য জাতি সতত আত্মরক্ষায় উদ্যত, তাহাদের উপর নির্ভর করে কেন?

(প্রবর্ত্তক—ভাদ্র, ১৩৩৬)

—

সভ্যতার সূচনায় প্রাচ্যে ধর্ম্ম-প্রণালী ও উপাসনা-পদ্ধতি

চীনা ঐতিহাসিকগণের মতে বর্ত্তমান চীনের উত্তর-পূর্ব্ব অংশই চীন-সভ্যতার মূল কেন্দ্র। বিদেশ হইতে চীনাদিগের আগমনের কথা চীনাভাষায় লিখিত কোন ইতিহাস-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। Hirthএর মতে এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু না বলাই ঠিক (De Lacouperieর মতে, কিন্তু, ব্যাবিলনিয়া হইতে 'Bak' জাতির অধীশ্বর Nakhunte নামক রাজা তাঁহার অধীন জাতিগুলি লইয়া চীনে উপনিবেশ স্থাপন করেন)। চীনা উপকথায় পড়া যায় যে, P'an-ku নামক এক অদ্ভুত জীব হইতে মনুষ্য-বংশের উদ্ভব হয়।...P'ankuর পর দশটি বিভিন্ন যুগ শেষ হইলে পর তবে Fu-hiর জন্ম। এই বিস্তীর্ণ সময়ভাগে "স্বর্গীয় রাজন্যবর্গ" "পার্থিব রাজন্যবর্গ", "পক্ষ ড্রাগন", "কুলায়-নির্ম্মাতৃগণ" প্রভৃতি লীলাখেলা করিয়া গিয়াছেন। এসময়কার মনুষ্যগণ নিরামিষ আহার করিত ও জীবমণ্ডলী পরস্পরকে হিংসা করিত না। সে এক সত্যযুগ-বিশেষ ছিল। এই সত্যযুগের অবসানে মানুষ খাদ্যের জন্য জীব-জন্তু ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। বোধ হয় মাংস সিদ্ধ করিবার জন্য Suijon নামক এক রাজা অগ্নির আবিষ্কার করিলেন। দুইখানি কাষ্ঠখণ্ড ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, ইহা Suijonএর প্রধান আবিষ্কার। Suijon এক প্রকার লিখন-প্রণালীরও সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার নাম "Knot Writing." Suijonএর পরেই Fu-hi রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ চীনাভাষাবিদ্ ঐতিহাসিক Hirth বলেন, P'an-ku হইতে Fu-hi পর্য্যন্ত সময়ব্যাপী কালকে, কতকটা জোর করিয়া, কতকগুলি সংস্কৃতি-মূলক উন্নতির যুগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই সময় চীনাগণের ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল? Boulger এ প্রশ্নের উত্তর দুই একটি কথায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "The earliest religion of the Chinese consisted in the worship of a Supreme Being, who was the sovereign both of the Heaven and of the Earth ..... Originally, and in its essence, the religion of the Chinese was as far removed from materialism as can be conceived." ইহার উপর তিনি মাত্র আর একটি কথা বলিয়াছেন। কথাটি এই—চীনের প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালী হিব্রুদিগের একেশ্বরবাদের অনেকটা অনুরূপ ছিল ও যীশুখৃষ্ট জন্মাইবার সাত শত বৎসর পূর্ব্বেও চীনাগণ তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের অনেক তথ্য জ্ঞাত ছিলেন।...

*Shu-King*এ লিখিত বিবরণ হইতে অবশ্য জানা যায় যে, প্রাচীন চীনাগণ একেশ্বরবাদী ছিলেন। Shang-ti অর্থাৎ "শাসক-শ্রেষ্ঠ" যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের সহিত এই ধর্ম্মের কতকটা মিল দেখা যায়। Shang-ti ছাড়া অন্য দেবদেবীর উপাসনা প্রাচীন চীনে বড়-একটা প্রচলিত ছিল না। ধর্ম্মের পরিচালনা পুরোহিত-সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত ছিল না। প্রতি পরিবারে গৃহকর্ত্তা স্বয়ং পুরোহিতের কার্য্য করিতেন এবং সম্রাট্ সমগ্র দেশের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে রাজারা রাজত্ব করেন, ঈশ্বরের হাতেই পুরস্কার তিরস্কার নির্ভর করে, এই

বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়াই প্রাচীন কালের রাজারা ধর্ম্ম বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে কার্পণ্য করিতেন না। সাধারণ লোকের ভগবান্‌কে ডাকা তাঁহাকে সম্মান করা ও তাঁহার বিধানানুসারে কার্য্য করা নিজ নিজ কর্ত্তব্য হইলেও একপ্রকার বিরাট্‌ ও জাতীয় উপাসনা আছে যাহা সম্রাট্‌ ভিন্ন অপর কেহ করিতে পারে না—ইহা Shang-বংশীয় রাজাদিগের (১৭৬৬—১১২২ খৃঃ পূঃ) বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারাও অবশ্য ইহা বিশ্বাস করিতেন, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের পূর্ব্বেও এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি ছিল ইহা মানিয়া লওয়া যায়। ভগবানের কোন মূর্ত্তিকল্পনা করিয়া উপাসনা করা প্রাচীন চীনে প্রচলিত ছিল না। প্রার্থনা ও যজ্ঞ করিয়া তাঁহার তুষ্টিসাধন করিতে হইত। (বৈদিক যুগে ভারতবর্ষেও মূর্ত্তি-পূজা ছিল না কিন্তু যজ্ঞীয় প্রথার বহুল প্রচলন ছিল)। Hirthএর মতে Shang-ti বা "বিশ্বপতি" ছাড়া অনেকগুলি উপদেবতার উপাসনাও প্রাচীন চীনে প্রচলিত ছিল, ইহা *Shu-King* গ্রন্থ হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। "জনগণ সম্মানিত" ব্যক্তি বিশেষ ভাবে পূজিত হইতেন। পিতৃ-পুরুষের পূজা ও পরলোকগত বন্ধুবর্গের পূজাও প্রত্যেক পরিবারে নিয়মিতরূপে হইত। কিন্তু চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, "পঞ্চপূত পর্ব্বত" প্রভৃতি সমাদৃত এবং পূজিত হইলেও তাঁহারা যে Shang-tiর অনেক নীচে তাহা চীনাগণ ভাল রকমেই জানিতেন। Leggeর মতে প্রাচীন চীনাগণের স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল কিন্তু নরকের কোন ধারণা ছিল না।...

পুরাকালে চীনাগণ বিশ্বাস করিতেন যে, পাপপুণ্যের বিচার এই জন্মেই হয়...(চীনাদিগের এই বিশ্বাসের সহিত মিশরবাসিগণের ও বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্য্যগণের ধারণার পার্থক্য পাঠক লক্ষ্য করিবেন)। পরলোকে সুখ ও ঐশ্বর্য্যের কোনও কল্পনাই চীনাগণের ছিল না। (ঋগ্বেদের যুগে কিন্তু ভারতীয়গণের পরলোক সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল ও সমসাময়িক মিশরবাসিগণেরও এসম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল।) প্রাচীন চীনাদিগের কল্পনায় মনুষ্যের কাম্য "পঞ্চপ্রকার সুখের" মধ্যে প্রথমটি হইতেছে দীর্ঘজীবন, দ্বিতীয়টি ধন, তৃতীয়টি দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, চতুর্থটি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও পঞ্চমটি ভগবানের ইচ্ছা প্রতিপালন করিবার প্রবৃত্তি। পরলোকে পুরস্কারের কল্পনা প্রাচীন চীনাদিগের ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ধার্ম্মিক লোকেরা পার্থিব জীবনে কষ্ট পাইয়া থাকেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মের ফল তাঁহাদের বংশধরগণ পাইবেন। কিন্তু যদি কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তির সন্তান সন্ততি না হয়? এবিষয়ে কোন স্পষ্ট উত্তর নাই। (যেমন মনুর বিধানমতে, স্ত্রীলোকের পক্ষে কন্যাকালে পিতার, বিবাহিত জীবনে স্বামীর ও স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের অধীনে থাকিতে হইবে। কিন্তু কোন বিধবার পুত্র না থাকিলে? ইহার উত্তরে মনু কোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই, পরবর্ত্তী স্মৃতিকারগণ কিছু কিছু লিখিয়াছেন বটে।) Shang-বংশীয় রাজাদের ধর্ম্ম-পদ্ধতির আলোচনা-কালে Hirth মন্তব্য করিয়াছেন,—পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেই হউক, উপদেবতাদের উদ্দেশ্যেই হউক বা মৃতপুরুষগণের উদ্দেশ্যেই হউক, এই প্রকার যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা (মনুর "পঞ্চযজ্ঞ" তুলনীয়) চীনাগণ হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই সব যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। ("ব্রাহ্মণ" ও "আরণ্যক" গুলিতে যেরূপ বৈদিক যুগের ভারতীয় যজ্ঞাবলির বিস্তারিত বিবরণ দৃষ্ট হয় সেইরূপ চীনাগণের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে, যথা *Shu-King* বা "Book of Odes", এইরূপ প্রথা লিপিবদ্ধ আছে।)

কিন্তু শুধু ভগবানের আরাধনা করিয়াই চীনাগণ ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহারা জানিতেন যে মানুষের সুখদুঃখ অনেকটা নিজের পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। *Shu-King* গ্রন্থের একস্থলে আমরা পড়ি যে, মানুষের সুখ দুঃখ, জীবন-মরণের অর্দ্ধেক মানুষের নিজের হাতে নির্ভর করে; মানুষের শাস্তি মানুষ নিজেই ডেকে আনে। আর এক অংশে আমরা পড়ি যে, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অনেকটা এইরূপ বলিয়াছেন—"ভগবান্‌কে বিশ্বাস নাই। কিন্তু রাজা যদি ধর্ম্ম পালন করেন তাহা হইলে তাহার ফল ফলিবেই। ভগবান্‌কে ডাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে ও পূর্ব্বপুরুষগণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি করিলে অনেক সময় বেশী কাজ পাওয়া যায়।"...

পরিশেষে বক্তব্য, প্রাচীনযুগের চীনাগণের মতে ভগবান্‌ তাঁহার বাণী কোন ঋষিমুখে প্রচার করেন নাই। চীনে ঋগ্বেদোক্ত আরাধনা-মূলক গুলির বা বাইবেলের "Ten Commandments" এর অনুরূপ কোন আপ্তবাক্য প্রচলিত ছিল না।...

চীনের এই প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্ম্ম-প্রণালী কালক্রমে কিরূপে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, K'ung Fu-tzi এবং Confucius খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে কিরূপে আবার 'ধর্ম্ম'ও সমাজ-সংস্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন সে কথা অতি উপাদেয় ও শিক্ষণীয় বিষয় হইলেও প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

(পঞ্চপুষ্প, ভাদ্র, ১৩৩৬) শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা

বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ যুগে প্রাচীন কাব্য বলিতে শূন্যপুরাণ, মাণিকচাঁদের গান, নাথগীতিকা, কথা সাহিত্য এবং ডাক ও খনার বচনের পরিচয় পাওয়া যায়। শূন্যপুরাণের রচয়িতার নাম রমাই পণ্ডিত। ইনি মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইহার পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাণিকচাঁদের গান, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান প্রভৃতি বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতেছিল। সে সময় বৌদ্ধ যুগের প্রভাব বাঙ্গলা দেশে বিদ্যমান।...বৌদ্ধধর্ম্মের মত-বিবৃতিই যেন সে সময়ের সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।...ডাক ও খনার বচন সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-যুগের বিশেষ প্রাদুর্ভাবের সময়েই বিরচিত হইয়াছিল।...

ইহার পর হিন্দুধর্ম্মের উত্থানে গৌড়েশ্বরগণ বাঙ্গলা ভাষার উৎসাহ প্রদানার্থ যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহার ফলে "শিবায়ন", "মনসামঙ্গল", "চণ্ডী" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ বিরচিত হইল। কৃষ্ণরাম প্রণীত "রায় মঙ্গল"ও এই সময়ের গ্রন্থ। হামিদুল্লা-প্রমুখ দুই একজন মুসলমান-কবিও এই সময় বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে হামিদুল্লার "গুলে-বকাওলী"(?) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চট্টগ্রাম হইতে এই সময় 'মৃগলুব্ধ' নামক শৈবধর্ম্ম-মূলক একখানি পুঁথি লিখিত হয়।...

সেকালের যত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, বার মাসের প্রাকৃতিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া 'বারমাস্যা' অনেকগুলিতেই লিখিত। একই 'চণ্ডী' কাব্য সেকালে অনেকেই লিখিয়াছিলেন, মঙ্গলচণ্ডীর গীতি—

চৈতন্যভাগবতকারের তুলিকায় বাহির হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিজ জনার্দ্দন নামক এক ব্যক্তির 'চণ্ডী' নামে একখানি কাব্য আছে। মাধবাচার্য্য নামক এক ব্যক্তিরও 'চণ্ডী' কাব্যের পুঁথি বাহির হইয়াছে। শেষে মুকুন্দরাম 'চণ্ডী' বাহির করিয়া জয়মাল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।...

সকল লেখকেরই 'চণ্ডী' কাব্যে 'বারমাস্যা'র পরিচয় প্রকটিত। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে পদ্মাবতীর বারমাস্যা, পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'বারমাস্যা', বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার বারমাস্যা, মুরারি গুপ্তার নাতি শ্রীধরের গ্রন্থে রাধিকার বারমাস্যা– এইরূপ সেকালের অনেক গ্রন্থেই বারমাস্যার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্তরে হিন্দু বাহিরে মুসলমান কবিও সেকালে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া কাব্য রচনা করিতেন। সেই-সকল কাব্যের মধ্যে সৈয়দ আলওয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর বারমাস্যা, সেখ করমালি নামক একজন কবির গ্রন্থে শ্রীরাধিকার বারমাস্যার পরিচয় পাওয়া যায়।...

গৌড়াধিপতি নসীর খাঁর আদেশে একজন কবি মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণও এই সময় রাজা গণেশের আদেশে বিরচিত হয়। এই সময় মালাধর বসু নামক কুলিনগ্রাম-নিবাসী একব্যক্তি গৌড়েশ্বরের আদেশে ভাগবতের অনুবাদ করিয়া "গুণরাজ খাঁ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।...

কৃত্তিবাসের পর "অনন্ত" নামক একজন কবি 'অনন্ত রামায়ণ' নাম দিয়া রামায়ণের আর একখানি অনুবাদ রচনা করেন। এই রামায়ণখানি বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রচিত। ইহা ভিন্ন 'অনন্ত রামায়ণে' অধ্যাত্ম রামায়ণের ছায়াও বিজড়িত।...

কাশীরাম দাস ভিন্ন আরও অনেক মহাভারতের অনুবাদকের প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।...

ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুর নাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" বা "গোবিন্দ বিজয়।"...

ইহার পরে কানা হরি দত্ত, ক্ষেমানন্দ, কেতকী দাস, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন কবি শিবের ছড়া, চাঁদ সওদাগর ও বেহুলার উপাখ্যানে লৌকিক ধর্ম্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেন। মনসাদেবীর গীত সর্ব্বপ্রথম এই কানা হরি দত্তই রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর বিজয় গুপ্ত ঐ গানই অন্য ভাবে রচনা করেন। এই বিজয় গুপ্তের পর নারায়ণ দেব নামক এক ব্যক্তি পদ্মপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ অপেক্ষা তাহা দুর্ব্বোধ্য।...

ইহার পর শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, সূর্য্যের পাঁচালী প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল। শীতলামঙ্গল প্রণয়নে কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ, শঙ্করাচার্য্য ও রঘুনাথ দত্ত; 'কমলামঙ্গলে' শিবানন্দ কর, মাধবাচার্য্য, পরশুরাম এবং জগমোহন; গঙ্গামঙ্গলে মাধবাচার্য্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত প্রভৃতি, এবং সূর্য্যের পাঁচালী প্রণয়নে, দ্বিজ কালিদাস ও রামজীবন বিদ্যাভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহার পর বৈষ্ণব সাহিত্যের যুগ। এই যুগের আদি কবি চণ্ডীদাস.. বাঙ্গালীর প্রাণে যে মধু ঢালিয়া দিয়াছেন, বাঙ্গালী সে মধু পান করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।...

তারপর গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস নামক আরও কয়েকজন কবি বাঙ্গালা সাহিত্যের অর্চ্চনা করিলেন।...

ইহার পর শ্রীশ্রীচৈতন্য যুগে যে-সকল পার্ষদ মহাপ্রভুর সঙ্গসুখ লাভ করিবার জন্য জনসমাজে প্রকাশ পাইলেন তাঁহাদের পদামৃত-পানে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিল। আমরা যে ইতিপূর্ব্বে গোবিন্দদাস ও বলরাম দাসের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা এই সময়ের কবি।...

কবি প্রেমদাস ধুয়া ধরিলেন।...চক্রবর্ত্তী বংশের নরহরি কবি পঞ্চাদশ তরঙ্গে "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থ গাহিলেন।...রাজা নৃসিংহদেব তান তুলিলেন।...অমনি জগদানন্দ গাহিলেন—"মঞ্জু বিকচ কুসুম পঞ্জ মধুপ শব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।...

প্রকৃত পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সে সময় বঙ্গদেশে যেরূপ ভক্তির বন্যা প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেইরূপ ভক্ত কবিও বহুসংখ্যক জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সকলের পরিচয় দেওয়া অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভবপর নহে।...

বৃন্দাবন দাসের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত বৈষ্ণব মাত্রেরই পরম আদরের ধন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বহু রস ঢালিয়া দিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত অল্প শিক্ষিত ভক্তহৃদয়ে সহজে চৈতন্য বীজ অঙ্কুরিত করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কবিরাজ গোস্বামী আখ্যায় অভিহিত।...

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী বিরচিত "ভক্তমাল" নামক একখানি গ্রন্থের এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই গ্রন্থ আগর দাসের শিষ্য নাভাজী হিন্দী ভাষায় প্রথম রচনা করেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী তাহারই গদ্য অনুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে বহু বৈষ্ণব মহাজনের জীবন-কাহিনী বর্ণিত আছে।...

বৈষ্ণব-কবির পদ-কীর্ত্তন এইরূপ ভাবে যে-সময় সমগ্র গৌড়ভূমি শুনিয়া ধন্য হইতেছিল, ঠিক সেই সময় রাজা জয়নারাণ ঘোষাল নামক একজন শৈব-কবি কাশীখণ্ডের অনুবাদ করেন। তাঁহার এই কাশীখণ্ডের অনুবাদ ব্যতীত শঙ্করী সঙ্গীত ব্রাহ্মণার্চ্চন চন্দ্রিকা, জয়নারাণ কল্পদ্রুম, করুণানিধান বিলাস নামক আরও কয়েকখানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।...

নবদ্বীপের বিদ্যোৎসাহী মহারাজার যুগে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহারই আস্বাদ সম্যক প্রকারে লাভ করিয়া এখনকার দিনে কত শত ব্যক্তি কবি আখ্যা লাভ করিতেছেন। এই কৃষ্ণচন্দ্রের যুগের সর্ব্বপ্রধান কবি ভারতচন্দ্র।...

সাধক কবি রামপ্রসাদ এই সময় জগন্মাতার গানে বাঙ্গালা দেশকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সাধক সঙ্গীত ব্যতীত "বিদ্যা-সুন্দর" রচনারও পরিচয় পাওয়া যায়।...রামপ্রসাদের গানের প্রত্যুত্তর দিবার জন্য এই সময় আজু গোঁসাই নামক একজন কবি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।...

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে একদিকে যেমন সাধক ও ভক্ত কবির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেইরূপ যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা অনেক কবিও বাঙ্গালা দেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। দাশরথি রায়ের পাঁচালি, দাওয়ান রঘুনাথ রায়ের খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতি ব্রহ্মগীতি, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, রাধামোহন সেন, শ্রীধর কথক, মধুসূদন কিন্নর, রসিকচন্দ্র রায়, হরুবাবু, নিতাই দাস, রামবাবু, সাতুবাবু, ভোলা ময়রা, অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি এই সময় বাঙ্গালা কবিতা ও গানের পুষ্টি সাধন করিতেছিলেন।

(অর্চ্চনা, আশ্বিন, ১৩৩৬) শ্রীইন্দুভূষণ সেন

১০০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বের প্রাণী—

আমাদের এই পৃথিবীতে প্রায় ১০০,০০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে ডাইনোসর নামক অতিকায় প্রাণী বাস করিত। ইহারা বহুযুগ পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছে। মঙ্গোলিয়া এবং অন্যান্য বহু স্থানে ইহাদের কঙ্কালাবশেষ পাওয়া যাইতেছে। এক একটি হাড় দেখিয়া ইহাদের আকার কি প্রকাণ্ড এবং ভীষণ ছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে—অন্যান্য নানা প্রাণী ইহাদের ডিম ভাঙিয়া দিত বলিয়াই ইহাদের বংশ ক্রমশ লোপ

টিরানোসরাস ও ট্রাইসেরাটপ্‌সের যুদ্ধ

ব্রণ্টসর ডিপ্লোডোকাস

মোসাসর ও প্টেরো ড্যাক্টিল

পাইয়াছে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তিনটি অতিকায় জীবের ছবি দেওয়া হইল। ১ম ছবিতে টিরানোসরাস নামক জন্তু ট্রাইসেরাটপস্ নামক অতিকায় জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। ২য় ছবিতে ব্রন্টসর নামক অতিকায় স্তন্যপায়ী জন্তু দেখানো হইয়াছে। ৩য় ছবিতে মোসাসর নামক জলবিহারী ২৫ ফুট লম্বা ডাইনোসর এবং এক ঝাঁক pterodactyls নামক খেচর সরীসৃপ অঙ্কিত হইয়াছে। এই চিত্রগুলি বৈজ্ঞানিক চিত্রকর চার্লস আর নাইট কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

প্রস্তর ফলক—একজন সুমেরীয় রাজা শত্রুকে পদদলিত করিতেছে।

অভিনব যুদ্ধ-জাহাজ—

সম্প্রতি জাপানের নৌবহরের জন্ত দুইটি অতি প্রকাণ্ড বাঁকান চোঙাযুক্ত (ফানেল) যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। জাহাজ দুইটির নাম কাগি এবং আকাগি। এরোপ্লেন বহন করিবার জন্তই ইহাদের বিশেষভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। "কাগির" ধোঁয়া বাহির করিবার চোঙা বা ফানেল সোজা খাড়াভাবে না বসাইয়া বাঁকাইয়া জাহাজের দক্ষিণ পার্শ্বে বসান হইয়াছে। ইহাতে ইঞ্জিনের ধোঁয়া একেবারে জাহাজের একপাশ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। ধোঁয়ার স্তর দরকারমত এত ঘন করা যায় যে, তাহার ভিতর দিয়া শত্রু দৃষ্টিভেদ করিয়া গোলা ছুড়িয়া জাহাজ বা এরোপ্লেন নষ্ট করিবার কোনো সুবিধাই পাইবে না। আকাগির দুইটি চোঙা জাহাজের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বাঁকাইয়া আনিয়া একটি খাড়া-ভাবে আর একটি বাঁকাইয়া নীচু-মুখী করিয়া বসান হইয়াছে। ৯১,০০০ হর্স-পাওয়ার যুক্ত কাগি জাহাজ ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে ৬০টি এরোপ্লেন বহন করিতে পারে। আকাগি জাহাজ কাগি অপেক্ষা লম্বায় সামান্ত বেশী এবং চওড়াতে সামান্ত কম।

জাপানের এরোপ্লেনবাহী রণপোত

—
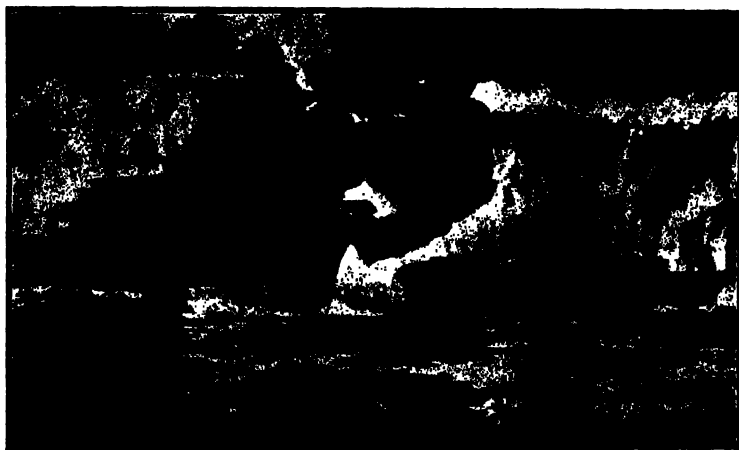
সুমেরিয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ—

বাইবেলে বর্ণিত বন্যার পর বোধ হয় মেসোপটেমিয়ার কিস নামক শহর প্রথম নির্ম্মিত হয়। এই শহরে পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সভ্যতার বহুপ্রকার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই স্থান খনন করিয়া প্রাপ্ত নানাপ্রকার প্রস্তরলিপি উদ্ধার করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাইবেলে উল্লিখিত বন্যা প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২০০ এ হয়। ইহার ৬০০ বৎসর পূর্ব্বের আর একটি বন্যার নানা প্রকার প্রমাণও পাওয়া যায়। বন্যার চিহ্নাদি কিস শহর যে উচ্চ ভূমির উপর নির্ম্মিত

হয় তাহার ৪৫ হইতে ৫৫ ফুট নীচে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন যে এই স্থানে খননের ফলে এমন সকল চিহ্নপ্রমাণাদি

কিস নগরের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য

পাওয়া যাইবে—যাহার ফলে মানুষের একটি প্রাচীনতম সভ্যতার বিষয় অনেক অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার হইবে।

—

পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন দণ্ডগৃহ (Torture chambers)—

সিসিলির উপকূলে সমুদ্রের সন্নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ে এখনও একটি প্রাচীন দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গের ভিতর মানুষকে শাস্তি দিবার যে সকল যন্ত্রপাতি রক্ষিত আছে তাহার বিবরণ উপন্যাস অপেক্ষাও ভয়াবহ ও রোমাঞ্চকর। সিসিলির কৃষকদের নিকট এই তলফি দুর্গের নাম করিলে এখনও তাহারা ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া থাকে। এই ধরণের দণ্ডগৃহের ব্যবহার খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে খুব বেশী ছিল। ইটালিতে তখন ঘোরতর গৃহ বিবাদ চলিতেছে। তলফি দুর্গ যাঁহার অধিকারে ছিল তাঁহার নিযুক্ত নির্ব্বাক-পাইকের দল বন্দাবস্থায় প্রভুর বিরাগভাজন হতভাগ্যদের এখানে লইয়া আসিয়া প্রথমে পাহাড়ের বুক-কাটিয়া-নির্ম্মিত অন্ধকার নির্জ্জন কারাকক্ষে নিক্ষেপ করিত। এই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি লোহার খাঁচা থাকিত।
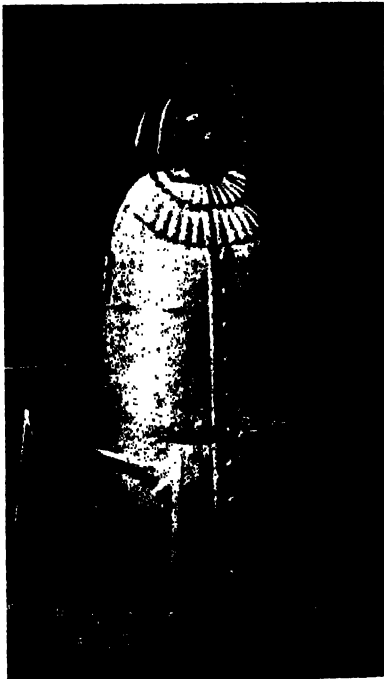
"লৌহ-কুমারী" বন্ধ অবস্থায়

লৌহ-কুমারী" খোলা অবস্থায়

দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার ডাইনীকে চুবাইবার কল

সেই খাঁচায় বন্দীকে পুরিয়া বাহির হইতে দৃঢ়ভাবে তালা বন্ধ করা হইত। বন্দী খাঁচায় প্রবেশ করিয়া দেখিত যে, তাহার চারিদিকে সুদৃঢ় লৌহ-দেওয়াল। মধ্যে মধ্যে জানালা থাকিলেও সেগুলি খোলা যাইত না। খড়-বিছান একটি লোহার খাটিয়া এক কোণে বন্দীর রাত্রিবাসের জন্য থাকিত। প্রত্যেক দিনের ঘুমের পর বন্দী অনুভব করিত যে খাঁচাটি ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে এবং জানালার সংখ্যাও কমিয়া আসিতেছে। অথচ আশেপাশে সে কখনও মানুষের পায়ের শব্দ শুনিতে পাইত না। সে অবাক হইয়া এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু প্রতিদিন খাঁচাটি ক্ষুদ্রতর হইয়াছে ইহা দেখা ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারিত না। এইভাবে কয়েকদিন পরে বন্দী খাঁচার দেওয়ালের চাপে প্রাণ হারাইত।

ভেনিসের বিখ্যাত 'ডোজে'র প্রাসাদেও মানুষকে দণ্ডিত করিবার ভীষণ যন্ত্রাদি রক্ষিত আছে। একটি কক্ষে সুবিখ্যাত বোকা-দি-লিয়নে বা সিংহ মুখ যন্ত্রটি বর্ত্তমান। অপরাধীকে এই সিংহমুখে নিক্ষেপ করিলে মুখটি আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং তাহার পর তাহার আর কোনো চিহ্নই থাকিত না।

"পিলরী"

প্রাচীন সেভিলের কারাকক্ষসমূহেও এই প্রকার ভয়াবহ যন্ত্রপাতি রাখা হইত। প্রথমে অপরাধীকে এই সকল যন্ত্র দেখাইয়া অপরাধ স্বীকার করিতে বলা হইত। যদি ইহাতে সে অপরাধ স্বীকার না করিত তাহা হইলে বন্দীকে একটি দড়িতে বাঁধিয়া কড়িকাঠে লটকান পুলির সাহায্যে তাহাকে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত তুলিয়া অতর্কিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বারকয়েক এই প্রকার করা সত্ত্বেও যদি সে অপরাধ স্বীকার না করিত তাহা হইলে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া অন্য ভীষণতর যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে অপরাধ স্বীকার করান হইত।

ব্রুন্‌সবেরির ডিউক একবার লণ্ডনে এইরূপ শাস্তি-দিবার ভীষণ যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী খোলেন। তিনি ঐ সকল যন্ত্রপাতি জার্ম্মাণীর

মুকুন্দবার্গ দুর্গ হইতে সংগ্রহ করেন। এই যন্ত্রপাতির মধ্যে ভয়াবহ 'আয়রণ মেডেন' বা লৌহ-কুমারীটি ছিল। এই যন্ত্রটির বহির্দ্দেশে একটি কিস্ নুএর মুখ। যন্ত্রের ভিতরে ঢুকিবার দুইটি দরজা ছিল, এবং ভিতরে অসংখ্য বর্শাফলকের মত তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা চারিপাশে সজ্জিত থাকিত। দরজা খুলিয়া অপরাধীকে ভিতরে পাঠাইবার সময় এই লৌহশলাকাগুলি দেখা যাইত না। কিন্তু দরজা বন্ধ করিবামাত্রই চারিদিক হইতে শলাকাগুলি বন্দীর দেহে বিদ্ধ হইত।

মধ্যযুগে ইউরোপের সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও ইটালিতে এইরূপ বহুকার ভয়াবহ দণ্ডগৃহের ব্যবহার ছিল। তাহার নানা পরিচয় পাওয়া যায়। দণ্ডের ভয়ে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিও অকৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া ফেলিত।

চীনদেশের কবরীবন্ধন (২)—

গত মাসের প্রবাসীতে চীনদেশের কবরীবন্ধন সম্বন্ধে কিছু বিবরণ এবং চিত্রে নমুনা দেওয়া হইয়াছে। এই সংখ্যায় আরো কতকগুলি নমুনা দেওয়া হইল।

১। সুয়াং-সি-সিয়াও-পিয়েন দুই সিংওয়ালা পরচুলার বেণী। এই বেণীর আর একটি নাম Kuei-chien-ch'uan. এই কবরীর দুইটি বেণীকে কখনও যুক্ত করিয়া বাঁধা হয় না। কারণ তাহা হইলে কোনো ভূত হয়ত তাহাতে কাঠি গুঁজিয়া দিয়া শিশুর পরমায়ু কমাইয়া দিবে—অথবা তাহাকে পীড়িত করিবে।

২। মু-সু-পেই—এই কবরী দেখিতে চিরুণীর উল্টা দিকের মত।

৩। ওয়াই-মাও—মাথার একপাশে একটি গুচ্ছের মত থাকে।
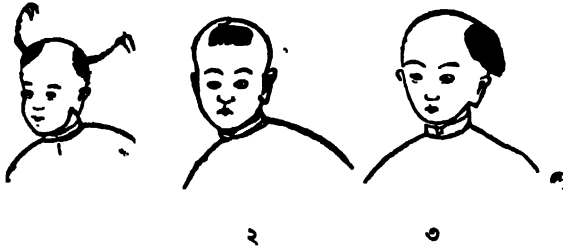
২ ৩

৪। Las-t'ich-yin-erh—লোহার ছাঁকার দাগের মত। মাথার সমস্ত চুল কামাইয়া কেবল মাত্র সামান্য একটু রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহা দেখিতে গরম লোহার ছাঁকার দাগের মত দেখিতে হয়।

৫। Kou-la-ch'e—এই কবরীকে 'কুকুরে গাড়ীটানা' কবরী বলা হয়।

৬। সুয়াং-সুয়া-সি—মাথার ওপরে দুইপাশে দুইটি বিনুনীর গিট থাকে। বড় মেয়েরা লম্বা চুলে এই প্রকার কবরী বাঁধে।

৭। নিয়েন-নিয়েন-সাও—'বাৎসরিক ফসল'। মুকডেনের রমণীরা এই প্রকার কবরী বাঁধে। চুলের কাঁটাটি দেখিবার জিনিষ।

৮। কাও-পা-টু—'উচু হাতল বেণী'। ওই কবরী ৭নং কবরীর মতই, তবে আকারে ছোট।

৯। ৮নং কবরীর পশ্চিমদিকের চিত্র।

১০। Hsi-ch'uch-i or wei—"হাঁড়ীচাচা পাখীর লেজ"। এই প্রকার কবরীবন্ধন প্রথা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাতার রমণীরা এই প্রকার কবরী বন্ধন করে না।

১১। টা-লা-সু—ঝুলন্ত টোপ।

১২। কুউয়ান-টাও—"গোল মাথা"।

১৩। সুয়াং-সুয়া-সি—"জোড়া ওপর-খিট। কুমারীরা ছাড়া অপর কেহ এই কবরী বাঁধে না।

১৪। সি-লিয়াও-টাও—"উইচিমড়ের মাথা"। ৫০ বৎসর বা তদূর্দ্ধবয়স্কা চীনের মুসলমান নারীদের কবরী।

১৫। সুই (৫৮১-৬১৮ খৃঃ অঃ) এবং টাং (৬১৮—৯০৫ খৃঃ অঃ) রাজত্বের সময়ের নারীদের কবরীবন্ধন।

১৬। যুবতীদের হালফ্যাসানের কবরী।

১৭। তাং রাজত্বের সময়ের সরকারী কর্ম্মচারীদের স্ত্রীদের মস্তকাভরণ।

১৮। 'সাও-সুন টাও' নামক মস্তক বন্ধনী। খৃঃ পূঃ ৪৮ সালের হান্ উয়ান্ টির হারেমের বিখ্যাত সুন্দরী সাওহুনের নামে ইহার নাম হইয়াছে।

১৯। ওয়েন-সি—বিখ্যাত পণ্ডিত চেং কাং চেং এর এক চাকরাণীর এই নাম ছিল।

২০। Feng-chi'ih chi—"আমরদেশের অমরবিহঙ্গের ডানা। ইহার অপর নাম Ts'a o's কবরী।

২১ হাই-টাং-সি—"বেগোনিয়া গুচ্ছ"

২২ সুয়াং-ইউন-চি—"জোড়া মেঘ কুণ্ডলী।"

২৩ সুয়াং-লো-চি—জোড়া ঘূর্ণী।

২৪ যুয়ান-ইয়াং-চি—ম্যাণ্ডারিন হংস।

২৫ সুচাও টাও—সুচাও ফ্যাসানের কবরী। এই কবরীর সহিত ১৮নং মস্তকবন্ধনী ব্যবহার করা হয়।

২৬। Liang-pa-t'ou—জোড়া-হাতল মস্তকাভরণ। মাঞ্চু-নারীরা ব্যবহার করে।

৩০। মা-হুয়া-হুয়া-চি—পাকান-চুল। গ্রাম্য মেয়েদের চুল বাঁধার ফ্যাসান।
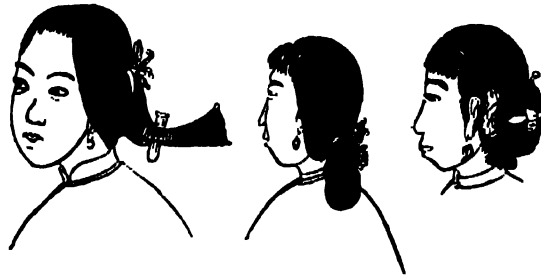
১০ ১১ ১২

১৩ ১৪ ১৫

১৬ ১৭ ১৮

২৭। ২৬নং মস্তকাভরণের পশ্চাৎ দিক্।

২৮। শীতকালে ব্যবহার্য্য তাতার-নারীদের বিশেষ টুপী। জরিওয়ালা সাটিনের তৈরী।

২৯। Hsiao-tsuan—Small bandbound. হান্ বংশের নারীদের কবরীর ফ্যাসান।

৩১। Yen-ch'ih-chi—বন্য হংসের ডানা য়ুয়ান রাজত্ব-কালের রাজসভার নারীদের কবরীবন্ধন।

৩২। ফেং-টই-চি—অমরপক্ষীর ল্যাজ।

৩৩। য়ু-লাং-হুয়ান - ঘুমন্ত ড্রাগনের নোক

৩৪। য়িন-টিং—রৌপ্য-পিণ্ড

৩৫। পান লাং-সি—ড্রাগনের পাকান চুল

৩৬। Chih-nu-chi—১৫ বৎসরের মেয়ের খোঁপা

৩৭। ললাটের সম্মুখভাগের চুল সোজা কাটা—কিন্তু পিছনের চুলে কবরী বন্ধন।

৩৮। Yuan-pao-tsuan—'সহিসের জুতা'। জুতার সাহ সাদৃশ্য থাকায় এই নাম।

৩৯। chin-kuo—মধ্য মঙ্গোলিয়া এবং কেণ্টিয়েনের মুসলমা রমণীরা এই প্রকার শিরোভূষণ ব্যবহার করে।

২৮ ২৯

৩১ ৩২

৩৪ ৩৫ ৩৬

৪০। যুবতী মঙ্গোল নারীদের কবরীবন্ধন। খোঁপাতে নানা-প্রকার সস্তা পাথর বসান হয়।

৪১। বিবাহিতা মঙ্গোল নারীদের কবরীবন্ধন।

৪২। যুয়াং-কেং-হুয়ান—কোনো এক মাঞ্চু রাজকুমারের কন্তাদের বিশেষ কবরীবন্ধন।

৪৩। Kuei-hsiu-chi—কুমারী কবরী।

৪৪। কুমারীর কবরীর পিছন দিক্।

৪৫। Ma-wei or (·) tsuan—ঘোড়ার লেজ কবরী ঘোড়ার লেজের চুল দিয়া বেণী বাঁধা হয় বলিয়া এই নাম।

৩৭
৩৮
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫

পরিচ্ছদের ইতিহাস আলোচনা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরিধেয় এবং অলঙ্কার মানুষের বাহ্য সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। মানুষের সভ্যতার অন্তর্জগৎ অর্থাৎ তাহার ভাবের জগৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া চলিতে পারে না, প্রতি পুরুষেই তাহার কিছু-না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। মানুষের সভ্যতার বহির্জগৎ অর্থাৎ তাহার সভ্যতার বাহ্যআশ্রয় বা প্রকাশ বা উপকরণ সম্বন্ধে এই পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম আরও প্রবল। জাতি যে যে অবস্থার মধ্য দিয়া যায়, সেই সেই অবস্থার প্রভাব তাহার ঘর-বাড়ী যন্ত্র-পাতি তৈজস-পত্র গহনা-গাঁঠা কাপড়-চোপড়ের উপরেও পড়িয়া থাকে এবং তাহাদের ঢঙ বদলাইয়া দেয়। মোটামুটী ঠাটটা বজায় থাকিলেও, খুঁটানাটী বদলাইতে দেরী লাগে না। একই ব্যক্তির জীবনে এই-সব বিষয়ে কিছু-না-কিছু পরিবর্ত্তন আসিয়া যায়, তাহা যত প্রাচীন-পন্থী এবং স্ব-সংস্কৃতি-নিষ্ঠ সমাজেই হউক না কেন। এবং যে সমস্ত সমাজে বাহিরের জাতির প্রভাব অল্প বা অধিক ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, বা যেখানে জাতি নিজ আভ্যন্তরীণ প্রাণধর্ম্মের স্ফূর্ত্তির ফলে নব নব দিকে নিজ শক্তির উন্মেষ খুঁজিতেছে, সেখানে এই সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তন আরও অধিক করিয়া ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কোনও জাতির সভ্যতার ইতিহাস বা ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইলে, সেই জাতির মধ্যে তাহার জীবনের বিভিন্ন যুগে ব্যবহৃত পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। Historical sense বা ঐতিহাসিক ক্রমের বোধ হইতেছে আধুনিক ইউরোপের একটী বড় আবিষ্কার। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিস ভারতে আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এই বোধটিকে এখনও আমরা সর্ব্বত্র আমাদের সাধারণ উচ্চ-শিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারি নাই। অথচ এই জিনিসটী শিক্ষার একটী প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মানব-সমাজ কেমন করিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক সমাজে দাঁড়াইয়াছে; বিভিন্ন যুগে মানব-সমাজের বাহ্য রূপটী কি রকম ছিল; ইহা ধারণা করিবার এবং মনশ্চক্ষে ইহার চিত্র কল্পনা করিবার শক্তি, ইতিহাস সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানের প্রথম সোপান। আমরা সকলেই চিত্র দর্শন করিতে ভাল-বাসি। জীবনেও মানুষ তাহার চলা-ফেরা পোষাক-পরিচ্ছদ লইয়া বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে যে চিত্রপট আমাদের চক্ষের সমক্ষে প্রসারিত করে, তাহার প্রতি স্বাভাবিক কৌতূহল দ্বারাই আমরা আকৃষ্ট হই। শিক্ষার কর্ত্তব্য, এই স্বাভাবিক কৌতূহলকে সচেতন করিয়া তাহাকে ঐতিহাসিক-বোধ-প্রসূত জিজ্ঞাসাতে উন্নীত করা—যাহাকে sense of the picturesque in life অর্থাৎ সামাজিক জীবনে যাহা চিত্র-দর্শন-জনিত রস-ভাবকে জাগায় তৎসম্বন্ধে সচেতন ধারণা, বলা যায়, তাহাকে সত্যকার ঐতিহাসিক বোধে পরিবর্ত্তিত করা।

পরিধেয় ও অলঙ্কারাদির আলোচনা এখন ঐতিহাসিক গবেষণার একটি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনও চিত্র বা ভাস্কর্য্যের কাল-নির্ণয়ে যুক্তি-অনুমোদিত রীতিতে এই আলোচনা আমাদিগকে সত্যের সন্ধান বলিয়া দেয়। ইউরোপে এই বিষয়ে এখন বিধি-মত চর্চ্চা হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু মধ্য-যুগের বা প্রাচীন ইউরোপে লোকে এ বিষয়ে চিন্তা করিত না। চীন ও জাপান এই সম্বন্ধে বরাবরই সচেতন; ভারতবর্ষে ও পারস্যে কিন্তু লোকে এ বিষয়ে কখনও অবহিত হয় নাই। ইতিহাসের দিক হইতে পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের চর্চ্চা সম্প্রতি মাত্র একটু-একটু ভারতে আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় অলঙ্কার সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার অনেক রহস্য অনেক অজ্ঞাত তথ্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়। তিনি প্রাচীন-ভারত-

একশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী সরকার
ফানি পার্কস্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত একটি ছবি হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

একশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী মেয়ে
ফানি পার্কস্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত একটি ছবি হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
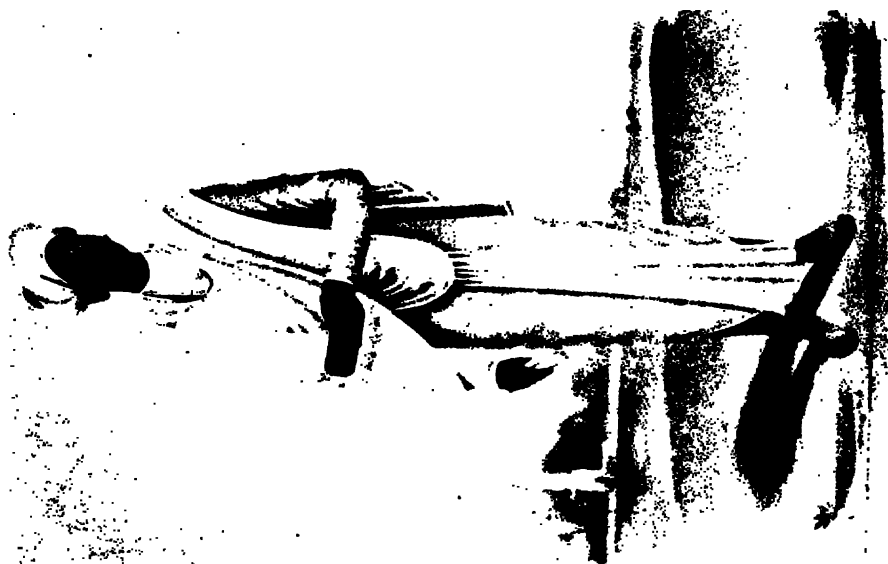
বিদ্যার একটি অত্যাবশ্যকীয় দিকে অতি যোগ্যতার সহিত প্রথম হাত দিয়াছেন।

প্রাচীন কালের ঘর-বাড়ী তৈজস-পত্র গহনা-কাপড় সম্বন্ধে সত্য অবস্থাটীর সঙ্গে পরিচয় লাভ করা, এক হিসাবে ইতিহাসের জ্ঞান অর্জ্জন করাও বটে। রাজা-রাজড়াদের সন-তারিখ, যুদ্ধবিগ্রহ বা বড় বড় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের কথা—কেবল ইহা লইয়া ইতিহাস নহে, ইহা ইতিহাসের কঙ্কাল মাত্র। জাতির মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতি, ইহা আলোচিত না হইলে ইতিহাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু ইতিহাসের রক্তমাংস যোজন করিতে হইলে, ইহাকে চাক্ষুষ করিবার উপায় করা চাই। একমাত্র প্রাচীন বা আলোচ্য যুগের চিত্র যে যে বিষয়ে যতটা পাওয়া যায় তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই যুগের বাহিরের রূপ এবং আভ্যন্তর রূপ সম্বন্ধে আমরা একটু প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারি, ইতিহাস তখন আর সন-তারিখ রাজাদের নাম যুদ্ধ দেশজয় অন্তর্বিবাদ রূপ অস্থি-নিচয় পূর্ণ কঙ্কাল মাত্র থাকে না, আলোচ্য যুগ যেন একেবারে তাহার স্বকীয় রূপে রক্তমাংসে গঠিত মানুষের আকার ধরিয়া মূর্ত্ত হইয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই আজকাল ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া দেখাইবার জন্য প্রাচীন কালের মানুষের কথা যথাসম্ভব তাহাদেরই হাতের কাজ দেখাইয়া, তাহাদের আঁকা (বা তাহাদের আঁকার নকলে আঁকা) নিজেদের ঘর-বাড়ী চেহারা পোষাক গহনা ইত্যাদি সমস্তর ছবি বইয়ে ছাপাইয়া কৌতূহল উদ্রেক করা হয়, জিজ্ঞাসার স্পৃহা বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়।

ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিই। আমাদের নিজেদের দেশের প্রাচীন কথা, চাল-চলন, রীতিনীতি বাস্তুশিল্প বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত লোকেরই ধারণা অনেক সময়েই কত ভুল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রথে চলিয়াছেন—রথ বলিতে আমরা বুঝি, চার চাকার বা দুই চাকার এক-রকম গাড়ী, কেবল তাহার মাথার ছাতটী একটা মুসলমান যুগের ছত্রীর মত, সাধারণতঃ ছবিতে এই রূপই আঁকা হয়। সেদিন পর্য্যন্ত, হিন্দু আমলের রাজা-রাজড়ার পোষাক যাহা বাঙ্গালী চিত্রকরে আঁকিত এবং যাহা যাত্রা ও থিয়েটারে চলিত, তাহা ছিল নানা রঙের মখমলের এক কিম্ভূতকিমাকার সৃষ্টি—পরণে পেণ্টুলেন বা হাফ-প্যাণ্ট (হাফ-প্যাণ্ট হইলে বিলাতী মোজাও থাকিত), চাপকান, কোট এবং পাঠান ওয়েষ্টকোট এই তিনের এক খিচুড়ী, এবং পিঠে একটা শ্রীকৃষ্ণের

বাঙ্গালী বরকন্দাজ

ধড়ার মত পিঠ-বস্ত্র, ও মাথায় সাদা পালক দেওয়া টুপী বা পাগড়ী, মোগল-যুগের রাজপুত রাজার পোষাকের উপর, ইংরেজী থিয়েটারে ব্যবহৃত ইউরোপীয় মধ্য-যুগের পাত্রদের নানা রঙীন জামা-পাজামা-পিঠবস্ত্রর সমাবেশ করিয়া, থিয়েটারের বেশ-কারীরা বাঙ্গালী জন-সাধারণকে হিন্দু রাজার পোষাক বলিয়া এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি উপহার দিয়াছিল, এবং বিনা প্রতিবাদে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজও তাহা গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল। যখন ইস্কুলে পড়ি, ফোর্থ ক্লাস কি থার্ড ক্লাসে, তখন স্কটের আইভানহো-খানি পড়িয়া ও তাহার ছবি দেখিয়া ইউরোপের মধ্যযুগে যে বর্ম্ম ব্যবহার

হইত তৎসম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান পাই, এবং এই সম্বন্ধে কৌতূহলও খুব হয়; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিবার ইচ্ছা হয় আমাদের দেশে বর্ম্ম ছিল কিনা, এবং কি-রকম ছিল। ওয়াই-এম্-সী-এ বালক-বিভাগের সদস্য ছিলাম, পাদ্রি আর্থার লি-ফেভ্র্ সাহেব তখন ছিলেন তাহার পরিচালক, এ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, "হাঁ, ছিল বৈ কি—লোহার জিঞ্জির বা শিকলের বর্ম্ম এদেশে পরিত, আবার তাহার উপরে লোহার পাতের বর্ম্ম পরারও রেওয়াজ ছিল—মিউজিয়মে গেলে দেখিতে পাইবে।" তাঁহার কথায় মিউজিয়মে গিয়া যখন সত্য-সত্যই জিঞ্জিরের সাঁজোয়া দেখিয়া আসিলাম—তখন কত না আনন্দ হইল! চোখের সামনে কত হলদীঘাটের, ফতেপুর সিক্রীর, পানিপথের যুদ্ধের ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, মিউজিয়মের আলমারীর ভিতরের বর্ম্ম পরিয়া কত রাজপুত আর মোগল সওয়ারের ঘোড়া ছুটাইয়া গমন চোখের সামনে যেন ফুটিতে লাগিল—সোনা-রূপার কাজ করা লোহার শিকলের সানা বা বর্ম্মের ঝন্‌ঝন্ শব্দ ঘোড়ার টপকের ধ্বনির সহিত মিশিয়া যেন কানে বাজিতে লাগিল। এক আইভানহো বইয়ের ছবি, বর্ম্ম-সম্বন্ধে এই কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছিল।

ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তিকে সজীব করিয়া ধরিতে পারে ছবি এবং নাটক। যাঁহারা ছবি আঁকেন বা নাটকের সজ্জা করেন, এ বিষয়ে জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য আছে। ঐতিহাসিক ছবির বা নাটকের পাত্র-পাত্রীর পোষাক ও অলঙ্কার আদি এবং তাহাদের গৃহসজ্জা প্রভৃতি দেশ ও কালের অনুরূপ হওয়া উচিত। এই রূপটী হইলেই, সাধারণ ছবি ও নাটক ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিক বিষয়ে লোক-শিক্ষার সাধন হইয়া উঠে। বাঙ্গালী চিত্রকরদের অনেকেই এ বিষয়ে এখন একটু অবহিত হইয়াছেন, বঙ্গীয় নাট্যশালায়ও লোকের মনোভাব কিছু কিছু এ সম্বন্ধে বদলাইতেছে। কিন্তু ছবিতে ও নাটকে এখনও অনেক হাস্যকর ভুল দেখা যায়। এক মফস্বল শহরে ডি-এল-রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয়ে দেখিয়াছিলাম, সেলেউকাস-কন্যা হেলেন আসিলেন, গাউন পরা, পায়ে চাপ্‌লি জুতা (গ্রীক বলিয়া!), নাকে টিপ-কলে-আঁটা চশমা, হাতে বাজু-ঘড়ী—শিক্ষিতা ইউরোপীয় মেয়ে কিনা! "সিরাজুদ্দৌলা" নাটকে ক্লাইব আসিলেন, হাল ফ্যাশানের ইংরেজী পোষাক পরিয়া; প্রতাপাদিত্য নাটকে রডা ফিরিঙ্গী দেখা দিল, খাকীর হাফপ্যাণ্ট পরা। অত দূরের কথায় গিয়া কাজ নাই, ঘরের খবরই আমাদের এত কম জানা আছে, আমাদের নিজেদেরই দূর বা নিকট পূর্ব্বপুরুষদের পোষাক-পরিচ্ছদ ধরণ-ধারণ আমরা এতটা কম জানি যে, অনেক সময়ে যে সব সাজ-সজ্জায় তাঁহাদের আমরা ভূষিত করি তাহা দেখিয়া আমাদের অজ্ঞতায় লজ্জিত হওয়া উচিত। আধুনিক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ধুতী পাঞ্জাবীতে আমরা অম্লান-বদনে শ্রীমন্ত সদাগরকে ভূষিত করি, যে-যুগের বাঙ্গালীর পরিধেয় সম্বন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালী কবি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে তিন খণ্ড বস্ত্রে ভদ্র পরিচ্ছদ হইত—"এক খান কাছিয়া পিন্ধে, আর খান মাথায় বান্ধে, আর খান দিল সর্ব্ব গায়।" গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটকের রমেশকে আমরা টিপ-কলে নাকে-আঁটা চশমা আর তার সঙ্গে মোটা কালো ফিতা পরাই। লোকে যে এ সব জিনিস সহিয়া যায়, কিছু তাহাদের চোখে বাধে না, ইহার জন্য যে হাস্যরসের উদ্রেক হয় না—কেবল অসম্পূর্ণ শিক্ষাই ইহার মূল।

আমাদের ভারতবর্ষের বা কেবল এই বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন পোষাকও বিভিন্ন যুগে কি ছিল, ইহা একটী অতি আবশ্যকীয় মৌলিক গবেষণার বিষয়—বাঙ্গালা অক্ষরের পরিণতি কি করিয়া হইল, বা বাঙ্গালা দেশের বাস্তু-শিল্প, বা ভাস্কর্য্য, বা চিত্রাঙ্কনের উৎপত্তি ও বিকাশ কেমন ভাবে হইল, এইরূপ বিষয় অপেক্ষা এই পরিধেয়-সম্বন্ধে গবেষণা কোনও অংশে লঘু নহে। বাঙ্গালা ও অন্য প্রাচীন সাহিত্য এবং প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন, এই দুইটী বিষয় এই কার্য্যের জন্য মুখ্য উপজীব্য হইবে। এতদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষে আগত বিদেশী লোকেদের লেখা বর্ণনায় বা যেখানে পাওয়া যায় তাঁহাদের আঁকা ছবিতে এ সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাইবে। এই বিষয়ে যতটুকু জানিতে পারিবার ততটুকু জানিতে পারিলে, প্রাচীন বা আধুনিক যুগের সাহিত্য ও সাধারণ সংস্কৃতিকে

বুঝিবার পথে একটা বড় সহায় লাভ হইবে। কারণ পোষাককে অবলম্বন করিয়া জীবনের পারিপার্শ্বিক একটা দিক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে।

মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালায় স্ত্রী-পুরুষের পোষাক কি রকম ছিল, সে সম্বন্ধে সে যুগের একমাত্র ললিত শিল্পের নিদর্শন যে ভাস্কর্য্য ও দুই একখানি তালপাতায় লেখা বৌদ্ধ-পুঁথির ঠাকুর-দেবতার ছবি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে যথারীতি আলোচনা করিয়া কিছু তথ্য বাহির করিতে পারা যায়। সম্প্রতি ঢাকা মিউজিয়ম হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে যে বিরাট মৌলিক গবেষণার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পুস্তকের মধ্যে নিহিত প্রাচীন ভাস্কর্য্যের চিত্রাবলীর দ্বারায় এবং লেখকের গভীর ও ব্যাপক পাণ্ডিত্যের দ্বারায় প্রাচীন তথা আধুনিক উভয় যুগের বঙ্গদেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। এই পুস্তকে এই সকল প্রাচীন প্রস্তর ও তাম্রমূর্ত্তি এবং চিত্র অবলম্বন করিয়া প্রাচীন হিন্দু আমলের বাঙালীর পোষাক সম্বন্ধে ভট্টশালী মহাশয় কিছু তথ্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমান যুগের জন্য আলোচনা করা যায়, মাত্র খান কতক পুঁথির পাটায় আঁকা ঠাকুর-দেবতার ছবি; তাহাও আবার ঠাকুর-দেবতার ছবি বলিয়া এবং প্রাচীন হিন্দুযুগের রীতি অনুসরণ করে বলিয়া, যে কালে সেই ছবি আঁকা হইয়াছিল সর্ব্বত্র সেই কালের বাঙ্গালা দেশের অংশ-বিশেষের পরিচ্ছদের নিদর্শন-রূপে গ্রহণ করা যায় না—এ বিষয়ে যথেষ্ট বিচার ও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। তার পর আসে ইংরেজী আমল। অষ্টাদশ শতকের শেষ হইতেই আমাদের যুগ পর্য্যন্ত বহু ইংরেজ চিত্রকর, এদেশের অনেক ব্যাপার—এদেশের যাত্রা-উৎসব, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচার-অনুষ্ঠান, জন-সাধারণের পোষাক-পরিচ্ছদ, এদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি প্রভৃতি জিজ্ঞাসু-ভাবে "বৈজ্ঞানিক কৌতূহল"-বশবর্ত্তী হইয়া আঁকিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সকল ছবি কোথাও রঙ্গীন করিয়া কোথাও বা খালি কালো রঙ্গে ছাপাও হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, তাঁহারা বহু বর্ণনাও দিয়া গিয়াছেন। এই সকল চিত্র সম্পূর্ণ বস্তু-পরতন্ত্রতার সহিত এত যত্ন করিয়া আঁকা, যে, ফোটোগ্রাফের কাজ করে। এই সকল ছবির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা পটুয়াদের আঁকা ছবি ঊনবিংশ শতকের প্রথম, মধ্য ও শেষ ভাগের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও অনেক নিখুঁত ও সত্য খবর দেয়। বাঙ্গালীর সমাজের এক স্থায়ী ও চাক্ষুষ পরিচয় এই সকল ছবি হইতে পাওয়া যাইবে—এ সকল ছবি বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন অবলম্বন করিয়া বিগত শতকে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে—কবিওয়ালাদের সময় হইতে বঙ্কিমযুগের শেষ পর্য্যন্ত,—তাহার একটি চিত্রময় টীকা-স্বরূপে বিদ্যমান থাকিবে। আমাদের সেই সকল ছবি নানাস্থান হইতে—ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় বই হইতে এবং বাঙ্গালা বই, পটুয়ার আঁকা সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি—সংগ্রহ করিয়া লইলে, বিগত শতাব্দীর বাঙ্গালার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের একটি চিত্রশালা হইয়া দাঁড়াইবে।

এই মাসের "প্রবাসী"তে একখানি ইংরেজী বই হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী কেরাণীর, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ও একজন বাঙ্গালী বরকন্দাজের ছবি দেওয়া হইল। ফ্যানী পার্ক্‌স্ (Fanny Parkes) নামে এক ইংরেজ মহিলা ১৮২২ সালে স্বামীর সহিত ভারতবর্ষে আসেন। এদেশে কয়েক বৎসর তিনি ছিলেন। তিনি ছবি আঁকিতেন, তাঁহার হাতের আঁকা ও অন্য ছবি দিয়া নিজ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করেন ১৮৫০ সালে (Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque)। ছবি তিনখানি ঐ বই হইতে উদ্ধৃত। ছবির পোষাক সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার বিশেষ কিছু নাই। বাঙ্গালী মেয়ে ও পুরুষের পোষাক আজকাল বেশ কিছু কিছু বদলাইতেছে। ফ্যানী পার্ক্‌সের আঁকা ছবির স্ত্রীমূর্ত্তিটার গহনাগুলি এখন অনেকাংশে অপ্রচল হইয়া আসিতেছে। পুরুষমূর্ত্তিটার পাগড়ী বাঙ্গালীর পোষাক হইতে এখন অন্তর্হিত হইয়াছে; পায়ের নাগরা জুতা, ভারতীয় শিল্পকলার আলোচনার প্রভাবে, আগরা হইতে সৌখীন আকারে আনীত হইয়া বহুদিনের অব্যবহারের পরে কিছুকাল

হইল আবার ভদ্রলোকের পায়ে স্থান পাইয়াছে (উপস্থিত বুঝি বা মাদ্রাজী চাপলি তাহাকে আবার স্থানচ্যুত করে!); গায়ের বেনিয়ানও তদ্রূপ নূতন করিয়া কচিৎ দেখা দিয়াও থাকে। আরও বছর কতক পরে এই ছবি দুইটার ঐতিহাসিক মূল্য বাড়িয়া যাইবে। বরকন্দাজের ছবিটা এখনই যে ঐতিহাসিক আলোচনার উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। বরকন্দাজের চাপরাশটা ইংরেজী আমলের; কিন্তু মাথার পাগড়ী, গায়ের কোর্ত্তা ও হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত মালকোচা করিয়া পরা কাপড়, নবাবী আমলের বাঙ্গালী পাইকের বা লাঠিয়ালের সজ্জার ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপ; এই হিসাবে, অন্যত্র নবাবী যুগের পাইক বা সিপাহীর ছবি দুর্লভ বলিয়া, এই ছবিখানির মূল্য। বরকন্দাজের মাথার পাগড়ীটী মূল ছবিতে লাল-রঙের করিয়া দেখানো হইয়াছে (বোধ হয় সালুর); জামাটি নীল, জামার মুড়ি লাল ফিকা রঙের, কোমরে-জড়ানো কাপড় পাঁশুটিয়া ও পরণের ধুতী লাল-পাড় ও হলদিয়া রঙের। বাঙ্গালা দেশের চৌকীদারের লাল পাগড়ী ও নীল কাপড়ের কোর্ত্তার উর্দ্দী, এই শত বৎসর পূর্ব্বেকার বরকন্দাজের পোষাকের আধুনিক পরিণতি; এবং খুব সম্ভব এই উর্দ্দী, নবাবী আমলের পাইক-আহদী-বরকন্দাজ-সিপাহীর উর্দ্দী সাজের আধারের উপরে স্থাপিত।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

১৩

সকাল হইতে বাড়ীতে জিনিষ গোছান, বিছানা বাঁধার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। আজ নিরঞ্জনের বর্ম্মা যাত্রার দিন। তাঁহার নিজের জিনিষপত্র বেশী নয়। কিন্তু মায়া এবং ইন্দুর জিনিষেই ঘর ভরিয়া উঠিবার জোগাড় করিয়াছিল। টাকার টানাটানি ছিল না, সুতরাং বড় বৌ এবং তাঁহার মেয়ে সখ মিটাইয়া মায়ার জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়াছেন। ইন্দুর পোষাকের উৎপাত বেশী ছিল না, কিন্তু খুঁটিনাটি জুটিয়া গিয়াছিল ঢের। বিদেশে বিভূঁয়ে কি পাওয়া যাইবে, কি না পাওয়া যাইবে, তাহার ঠিকানা নাই। অতএব সে নিজের যাহা কিছু প্রয়োজন ঘটা সম্ভব, সমস্তই গুছাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। পিতলের ঘড়ায় দু ঘড়া গঙ্গাজল চলিয়াছে। ষ্টীমারের জল সে খাইবে না, এবং ওখানে পূজা-পালিতেও ব্যবহার করিবে। কলিকাতার নিউ মার্কেট ঘুরিয়া যত রকম যত ফল পাওয়া গিয়াছে, সবই কিছু কিছু কিনিয়া আনা হইয়াছে। দুইটি বেশ বড় বড় বেতের ঝুড়ি বোঝাই হইয়া উঠিয়াছে, এবং চটের থলিতে একথলি কচি ডাব এবং ঝুনা নারিকেল বাঁধা হইয়াছে। নিরঞ্জন জাহাজের খাবারই খাইবেন, তাঁহার জন্য খাবার গোছাইবার ভাবনা নাই। মায়া কি খাইবে, তাহা লইয়াই গোলমাল বাধিয়াছে। নিরঞ্জনের ইচ্ছা নয় যে তিন চার দিন সে একরকম উপবাস করিয়া কাটায়। সঙ্গে চাল, ডাল, তরি তরকারি, ঘি প্রভৃতি লইয়া গেলে, জাহাজে রান্না করাইয়া লওয়া যায়। হিন্দু পাচক আছে। মায়া কিন্তু একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছে। মায়ের শ্রাদ্ধ হইয়া যাওয়ার আগে সে যার তার হাতে খাইতে চায় না। জাহাজে আচার বাঁচাইয়া চলিবার কোনোই সম্ভাবনা নাই, সব ছোঁয়াছুঁই হইয়া একাকার হইবে। ইহার পর পিতার মতে চলিতেই হইবে তাহাকে, কিন্তু মায়ের শ্রাদ্ধটা অন্ততঃ হইয়া যাক। না হইলে স্বর্গে গিয়াও সাবিত্রী শান্তি পাইবেন না। মায়াকে এখনি জেদ করিয়া নিজের মতের বিরুদ্ধে চালাইতে নিরঞ্জনের ইচ্ছা হইল না। ইহার পর অনেক বিষয়েই সম্ভবতঃ জোর করিতে হইবে, এ কটা দিন থাক না হয়। বেতের

একটি টিফিন বাস্কেটে চাল, ডাল, তরকারি প্রভৃতি কিছু কিছু গুছাইয়া দিতে তিনি বড় বৌকে বলিয়া রাখিলেন ; মায়ার যদি ইচ্ছা না হয় সে খাইবে না।

রেঙ্গুনযাত্রী জাহাজগুলির এক একটি কেবিনে তিনজন করিয়া যাত্রীর স্থান। নিরঞ্জন নিজের জন্য অন্য কেবিনে স্থান জোগাড় করিয়াছিলেন, কারণ তিনি সঙ্গে থাকিলে মায়া এবং ইন্দুর খুবই অসুবিধা হইবে, কিন্তু লজ্জায় তাহারা কিছুই বলিতে পারিবে না। তিনি জুতা পরিয়া বেড়াইবেন, অখাদ্য খাইবেন, ছত্রিশ জাতের সঙ্গে মেলামেশা করিবেন। তিনটি টিকিট কিনিয়া তিনি একটি কেবিন কন্যা এবং ভগিনীর জন্য রিজার্ভ করিয়া লইলেন। কারণ মুসলমানী বা খ্রীষ্টানী সহযাত্রিনী জুটিলে ত আর রক্ষা থাকিবে না।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় আরো এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। মায়া চুল আঁচড়াইবে না, জুতা মোজা কিছুই পরিবে না। রুক্ষ চুল, শুষ্ক মুখ, মলিন বেশ, তাহাকে ঠিক পাগলের মত দেখাইতেছিল। এই অবস্থায় কি করিয়া তাহাকে লইয়া যাওয়া যায় ?

ইন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দে। এই রকম করে কি মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় ?"

ইন্দু বিব্রত হইয়া বলিল, "কিছুতেই কথা শুনছে না, মেজদা। যা বলি তাতেই কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তবে আর কি করা যাবে। ওকে বেশী কাঁদাতে চাই না। একটু বুঝিয়ে বল্ না ? জুতো মোজা নাই পরল, নিতান্ত যখন অমত ; কিন্তু চুলগুলো আঁচড়াক, আর পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরুক।"

ইন্দু অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেল। মায়া তখন খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, বাকি জিনিষপত্র নূতন কেনা স্যুটকেসে ভরিতেছিল। ইন্দু বলিল, "মেজদা যে বিরক্ত হচ্ছে রে। বলে এরকম পাগ্‌লী সেজে গেলে চল্‌বে না।"

জয়ন্তী মায়ার কাছে বসিয়াছিল। সেও বলিয়া উঠিল, "আমিও ত তাই বল্‌ছিলাম পিসীমা। ষ্টীমারে সব যা সেজেগুজে ওঠে, যদি দেখ। সেদিন বেলীর মাসীরা সব রেঙ্গুন গেল, আমরা গিয়েছিলাম তাদের তুলে দিতে। এক একজন যা সেজেছে। যেন নূতন কনে! কেউ পরেছে বেনারসী, কেউ ক্রেপের শাড়ী, কেউ বা বালুচরী।"

মায়া বলিল, "আমার কি এখন সাজবার সময় ?"

জয়ন্তী কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না, তা বল্‌ছি না। সাজবে আর কি করে, তবে একটু পরিষ্কার হওয়া ত দরকার ? এস তোমার চুলটা বেঁধে দি। শাদা কাপড়ই পর, একটু গুছিয়ে গাছিয়ে। নইলে জাহাজে উঠবার সময় সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকবে।"

মায়া চুপ করিয়া রহিল। নিরঞ্জন বাহির হইতে একবার তাড়া দিয়া গেলেন। "আর বেশী সময় নেই, শীগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও।"

জয়ন্তী তাড়াতাড়ি মায়ার চুলটা এলো খোঁপা করিয়া বাঁধিয়া দিল। ইন্দু যেরকম গরদের চাদর গায়ে দিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, মায়াও সেইরূপ চাদর মুড়ি দিয়া বসিল, কেবল মাথাটা তাহার খোলা রহিল।

তাহার পর বিদায়ের পালা। সকলকে প্রণাম করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে মায়া নীচে মোটরে গিয়া বসিল। ইন্দু সকলের কাছে বিদায় লইয়া, জিনিষপত্রের তত্ত্বাবধান করিতে করিতে নামিতে লাগিল। বড় বৌ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে আসিতে বলিলেন, "এবার তোমরা যাচ্ছ, আমরাও গিয়ে একবার বেড়িয়ে আসব। ঠাকুরপো যেতে বলেছেন অনেকবার, তা এত দিন আর হয়ে ওঠেনি। ওঁর ছুটি নেই, এ নেই, ও নেই। এখন আর ওঁর ভরসায় থাকব না, কাউকে নিয়ে গিয়ে উঠ্‌তে পারলেই হল।"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ ভাই, যেও এক বার। না হলে একলা একলা দিন কাটান দায় হবে।"

মায়াকে জয়ন্তী বলিল, "আমার তোমার উপর ভয়ানক হিংসা হচ্ছে ভাই। কত নূতন জায়গা দেখবে, নূতন মানুষ, সবই নূতন। আমি ত জন্মে অবধি কলকাতায়, মরবও বোধ হয় এখানেই। এর বাইরে আর আমায় যেতে হবে না।"

মায়ার চোখ মুখ তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, "আমি না যেতে পারলে বেঁচে

যেতাম। আমার নূতন দেশ দেখতে একটুও ইচ্ছে করছে না।"

জয়ন্তী বলিল, "এখন বল্‌ছ বটে, একথা। পরে হয়ত ও দেশ ছেড়ে আর আসতেই চাইবে না।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই উট্রাম ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে সর্ব্বদাই দারুণ ভীড়। ভারতবর্ষের সকল জাতির লোকই মোট-ঘাট বাঁধিয়া চলিয়াছে। ইউরোপীয় এবং ফিরিঙ্গীরও অভাব নাই। মায়া আরো বিচলিত হইয়া উঠিল। সবলে ইন্দুর হাত চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা, এই সব মুসলমান, সাহেব মেম, এদেরই সঙ্গে আমাদের যেতে হবে নাকি? মাগো, কি করে পারব?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "না রে পাগলি, ওদের সঙ্গে যাব কেন? আমাদের জন্যে আলাদা ঘর নেওয়া হয়েছে না?"

ডেকের যাত্রীরা তখনও কাঠগড়ায় বন্দী অবস্থায় ঠেলাঠেলি করিতেছে। ডাক্তার তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যাইবার অনুমতি দিলে পর তাহারা জাহাজে উঠিতে পাইবে। সম্প্রতি প্রত্যেকেই পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া রেলিংএর সামনের স্থানটি দখল করিবার জন্য যুঝিতেছে। খোলা পাইলেই দৌড়িয়া ডেকে উঠিয়া ভাল জায়গা দখল করিয়া বসিতে পাইবে।

একজন ফিরিঙ্গী মেম অগ্রসর হইয়া নিরঞ্জনকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "এই মহিলারা কি রেঙ্গুন যাইতেছেন?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "হাঁ।" মেম প্রথমে ইন্দুর হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিল। এক সেকেণ্ডও লাগিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায়?"

ইন্দু হাসিয়া ইসারায় জানাইল, তাহার তবিয়ৎ আচ্ছাই বটে। হিন্দী বুঝিতে পারিলেও, বলিতে তাহার বাধ বাধ লাগিত।

মেম মায়ার হাত ধরিতে যাইবামাত্র সে একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিল। বলিল, "ও পিসীমা, ছুঁয়ে দিচ্ছে যে? আবার ত নাইতে হবে। জাহাজে ভাল জল কোথা পাব?"

নিরঞ্জন একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "জাহাজে গঙ্গার জল যত চাও, তত পাবে, ভাবনা নেই। ছোট খাট জিনিষ নিয়ে অত গোলমাল কোরো না।"

মায়া ভয়ে চুপ করিয়া গেল। লেডী ডাক্তার তখন অন্য যাত্রিনীদের পরীক্ষা করিতে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে জাহাজে উঠিবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। হুড়াহুড়ি গোলমালের মধ্যে নিরঞ্জন কোনো প্রকারে ভগিনী এবং কন্যাকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন; এবং বয়দের সাহায্যে কেবিন খুঁজিয়া লইয়া তাহাদের বসাইয়া আসিলেন। তাহার পর একটু নিশ্চিন্ত হইয়া জিনিষ-পত্রের তত্ত্বাবধান, নিজের জায়গার সন্ধান প্রভৃতি করিতে গেলেন।

মায়া কেবিনে ঢুকিয়াই বলিল, "ও পিসীমা, কতটুকু ঘর, মা গো। এর ভিতর তিন দিন থাকতে হবে? কই স্নান টান করবার ত কোনো জায়গা নেই?"

জাহাজের কাণ্ডকারখানা ইন্দুরও জানা ছিল না। সে বলিল, "দাঁড়া, মেজদা আসুক, সব জেনে নেব। আমার জিনিষপত্রগুলো এখনও ত দিয়ে গেল না। ঘড়ার জলটলগুলো না ফেলে দিলে বাঁচি।"

জিনিষপত্র শীঘ্রই নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "সব দেখে শুনে নে রে। সব ঠিক আছে ত? জাহাজ ছাড়তে আর বেশী দেরি নেই।"

ইন্দু এবং মায়া সব জিনিষপত্র মিলাইয়া লইল। তখন নিরঞ্জন বলিলেন, "দাদা, জয়ন্তী ওরা সব এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ডেকে গিয়ে একবার দেখবি নাকি?"

মায়ার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ইন্দু রাজী হওয়াতে সেও অগত্যা সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ডেকের উপর তখন বিষম ভীড়। সকলেই দাঁড়াইয়া নিজের নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিদায় লইতেছে। কত ভাষায় কত কথা যে শুনা যাইতেছে তাহার ঠিকানাই নাই।

মনোরঞ্জন তখনও ছেলেমেয়েদের লইয়া ঘাটের উপর তলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। কথা বলিবার চেষ্টা করা বৃথা, কিছুই প্রায় শোনা যায় না। তবু ভগিনীর দিকে তাকাইয়া, হাসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জাহাজ ছাড়িতে আর বেশী দেরি ছিল না। ডাক্তার

লোক সব হুড়াহুড়ি করিয়া নামিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। কুলিরা মজুরী এবং বখ্‌শিষ পাইবার জন্ম চেঁচামেচি জুড়িয়া দিল। ডেকযাত্রীরা ডাঙার লোকের সহিত কথাবার্ত্তা চুকাইয়া, বিছানা মাদুর পাতিয়া নিজের নিজের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া গুছাইয়া বসিতে আরম্ভ করিল।

আর দেরি নাই। খালাসীরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া সিঁড়ি তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। মনোরঞ্জন হাসিয়া ছেলেমেয়েদের লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যাইবার আগে জয়ন্তী খুব ঘটা করিয়া রুমাল উড়াইয়া গেল, যদিও জাহাজ হইতে উত্তরে রুমাল উড়াইবার মত কেহ ছিল না।

নিরঞ্জন বলিলেন, "চল এখন ভিতরে। নিজেদের সব ব্যবস্থা ঠিক করে নিতে হবে ত? কি কি দরকার বল।"

ইন্দু বলিল, "চল, কিন্তু ঘরটায় যা গরম! এখানে বেশ হাওয়া। ঐ ত দেখ কত মেয়েমানুষ যাচ্ছে, বাঙালীও রয়েছে। এরা বেশ যাবে।"

তাহার মেজদা হাসিয়া বলিলেন, "কেবিনে ইলেকট্রিক ফ্যান্ আছে, খুলে দিলেই বেশ হাওয়া পাবে। এখানে এত লোকের মাঝে দিনরাত তোমরা থাকতে পারবে না।"

কেবিনের ভিতর ঢুকিয়াই মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, স্নানের ঘর কোথায়?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "চল দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দিনে পঁচিশ বার স্নান করে যেন অসুখ বাধিয়ে বোসো না।"

স্নানের ঘরে গিয়াও মায়ার বিস্ময়ের অন্ত থাকিল না। এ কি রকম ব্যাপার? কোথায় কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাবা তাহাকে রাখিয়া ত দিব্য চলিয়া গেলেন। এখন তাহার ফিরিয়া যাইতেও যে ভয় করিতেছে? বাহির হইয়া সে যদি হারাইয়া যায়? তাহার প্রায় চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হইল।

সৌভাগ্যক্রমে তখনি আর একটি যাত্রিনী আসিয়া জুটিলেন। বাঙালী বটে, তবে মায়ার যে শ্রেণীর বাঙালী মেয়ে দেখা অভ্যস্ত, ঠিক সেরকম নয়। রেশমের মোজা, সোনালী রংএর জুতা পরা, তাহার গোড়ালীগুলা অসম্ভব উঁচু। পরণে সোনালী রংএরই শাড়ী, জামা, নাকে সোনার চশমা, গলায় একটা মুক্তার মালা।

মায়া তাঁহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, তিনি বলিলেন, "কি খুকি, এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

বাংলা ভাষা শুনিয়া মায়ার একটু সাহস হইল। সে বলিল, "কি করে কল খুলব?"

মহিলাটি একটু হাসিয়া, ভিতরে ঢুকিয়া কল খোলা, টব ভর্ত্তি করা, টবের জল ছাড়িয়া দেওয়া প্রভৃতি সব তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও রেঙ্গুন যাচ্ছেন?"

ভদ্রমহিলা বলিলেন "হ্যা। তোমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক যাচ্ছেন, তাঁকে আমরা চিনি। উনি তোমার কে হন?"

মায়া বলিল, "আমার বাবা।" তাহার সঙ্গিনী একটু যেন বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই প্রথম তোমরা যাচ্ছ নাকি? তোমার মা কোথায়?"

মায়ার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমার মা আজ ক'দিন হল মারা গিয়েছেন। তাই বাবা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।"

এমন সময় মায়ার সন্ধানে ইন্দুও আসিয়া উপস্থিত হইল। দেরি দেখিয়া নিরঞ্জন তাহাকেও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে আসিয়া কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, কাঁদছিস্ কেন?"

মায়া উত্তর দিবার আগেই সেই ভদ্রমহিলা বলিলেন, "আমি ওকে মায়ের কথা জিগ্‌গেষ করায় কাঁদছে। নিরঞ্জন বাবুকে আমরা চিনি। কিন্তু এ দুর্ঘটনার কথা ত শুনিনি?"

ইন্দু বলিল, "কোথা থেকে আর শুনবেন বলুন? এই ক'দিন হল সবে। তা মেজদা ত চোখের দেখাও দেখলেন না। মারা যাবার পরে এসে পৌঁচেছেন।"

দুজনে শীঘ্রই আলাপ জমিয়া গেল। মায়া ইত্যবসরে কোনমতে স্নান সারিয়া লইল।

বাহির হইবার সময় ভদ্রমহিলা বলিলেন, "আমি এই

যে সামনের ঐ কেবিনে। ভালই হল আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে। আপনার দাদা আমাদের বেশ চেনেন। মধ্যে মধ্যে আসবেন। আমিও যাব। এবারে বাঙালী আর কেউ নেই বিশেষ। ডেকে দেখছিলাম বটে, দুটি মেয়ে যাচ্ছে।"

তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। মায়া এবং ইন্দুও অনেক কষ্টে নিজেদের কুঠরী খুঁজিয়া বাহির করিয়া, ঢুকিয়া পড়িল।

মায়া তোয়ালে দিয়া চুল মুছিতে মুছিতে বলিল "পিসীমা, ঐ গিন্নীটি কথাবার্ত্তা ত ঠিক আমাদের মতই বলেন।"

ইন্দু বলিল,"ওমা, তা কি ইংরিজী বলবে, না ফারসী? বাঙালীর মেয়ে বাংলাই ত বলবে।"

মায়া বলিল, "পোষাক-টোষাক কেমন এক রকম যেন। কৈ জ্যাঠাইমাও ত কলকাতায় থাকে, এরকম করে কাপড় পরে না ত?"

ইন্দু বলিল, "তুই জ্যাঠাইমাকেই বুঝি মস্ত বড় মেম ঠাউরেছিস্? তাকে মেম হতে দিলে কে রে? তার আষ্টেপিষ্ঠে ত গোঁড়া হিন্দু আত্মীয়স্বজন। দেখিস্ এখন জয়ন্তীরা কেমন হয়। মেয়েটিকে মন্দ লাগল না। মেজদা এলে জিগ্‌গেষ করতাম কে।"

মায়া হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "মাগো! সামনের ঘরেই কত মুসলমান দেখছ! যদি এঘরে ঢুকে আসে! তুমি বাবাকে বলো পিসীমা, আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে।"

ইন্দুরও একটু ভয় হইয়াছিল, কিন্তু ভাইঝিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, "যা যা! তোর যত অনাছিষ্টি ভয়! কেন, আমাদের ঘরে ঢুকবে কেন? ওদের বুঝি প্রাণের ভয় নেই? আচ্ছ', মেজদা আসুক, আমি বলব এখন।" "তবু সাবধানের বিনাশ নাই" ভাবিয়া, দরজাটা সে ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

সুইট্‌জ্যরল্যাণ্ডে গিরি-অভিযান

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

মানুষের প্রকৃতিতে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রবৃত্তি আবহমান-কাল পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া আসিতেছে; এক প্রবৃত্তি প্রকৃতিকে, পারিপার্শ্বিক জগতকে জয় করিবার অর্থাৎ সকল প্রকার বিপদকে স্বেচ্ছায় বরণ করিবার প্রবৃত্তি, দুই—আত্ম-রক্ষা করিবার, অর্থাৎ বিপদকে এড়াইয়া চলিবার প্রবৃত্তি। প্রথম প্রবৃত্তি মানুষকে বিঘ্নবিপদহীন সুখের মধ্যেও চঞ্চল করিয়া সর্ব্বনাশের পথে বাহির করে, নিশ্চিন্ত গৃহীকে স্থল ও জলপথে নব নব দেশ আবিষ্কারে প্রেরণা দেয়, অতল সমুদ্রগর্ভে রহস্য সন্ধানে প্ররোচিত করে, ইংলণ্ডের যুবাকে আফ্রিকার জঙ্গলে ভয়াবহ গরিলার কবলে লইয়া যায়, মরু-অভিযানে টানিয়া লইয়া নিরাশ্রয় করিয়া ক্ষুধার তাড়নায় নরমাংস আহার করাইয়া ছাড়ে, উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে তুষারস্রোতে অকালে তাহার জীবন্ত সমাধি ঘটায়, আরও কত কি করে—মানুষের সভ্যতার ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। দ্বিতীয় প্রবৃত্তি তাহাকে গৃহী করিয়াছে, কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, নগর পত্তন করিয়া এবং সুখে থাকার নব নব উপায় উদ্ভাবন করিয়া মানুষ এই প্রবৃত্তির সেবা করিয়াছে।

প্রথম প্রবৃত্তি মানুষকে অদম্য প্রেরণা দেয়, তাহার মন্ত্রে মৃত্যুকে জয় করিবার, উপেক্ষা করিবার উৎসাহ সঞ্চার করে—তাহাকে বেপরোয়া করিয়া তোলে। সহজ মানুষ জীবনযাত্রার দৈনন্দিন কাজের চাপে প্রত্যহ মরু-অভিযানে, সাগর-বিজয়ে বা গিরিশিখরে যাইতে পারে না বলিয়াই নানা ক্রীড়াকৌশলের মধ্য দিয়া এই প্রবৃত্তিকে

ম্যের ছ গ্লাস

সার্থক করিতে চায়। তাই পাশ্চাত্য স্বাধীন জাতিদের মধ্যে আমরা খেলাধূলার এত আয়োজন দেখি। বহুদিনের পরাধীনতার চাপে আমাদের দেশের মানুষের মনে এই প্রবৃত্তি প্রায় মরিয়া আসিয়াছে, খেলাধূলাতেও আমাদের তেমন উৎসাহ নাই।

কিন্তু ইউরোপের যুবকেরা ফুটবল ক্রীকেট, রাগবি, হকি খেলিয়াই সন্তুষ্ট নহে, মোটরে ঘণ্টায় আড়াই শত মাইল ছুটিয়াও তাহারা ক্লান্ত হয় না, ইংলিশ-চ্যানেল সাঁতরাইয়া পার হইয়া তাহারা আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হইতে চায়, বিমান পথে একটানা কতদূর যাইতে পারে তাহার পরীক্ষায় মৃত্যুকে উপেক্ষা করে। শুধু পুরুষেরা নহে, সেদেশের মেয়েরাও এই কাজে পুরুষের সহিত সমানে পাল্লা দিয়া চলে; ফুটবলের মাঠ হইতে তাহাদের খেলাধূলা তুষারাচ্ছন্ন মেরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। মেরু-অভিযানও তাহাদের খেলা—স্পোর্ট্‌স্।

উন্মাদনা ও বিপদের সম্ভাবনার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইয়োরোপের ক্রীড়া-কৌতুক বা স্পোর্ট্‌স্-গুলির মধ্যে মেরু-অভিযানের পরেই গিরি-অভিযানের স্থান। প্রতি বৎসর পাশ্চাত্য দেশসমূহের অদম্য শক্তিমান 'ডান্‌পিটে' যুবকেরা পর্ব্বতাধিরোহণের যাবতীয় সরঞ্জাম পিঠে বাঁধিয়া রুকস্যাকে (Rucksack) ভরিয়া পাহাড়ে চড়ার উপযোগী তলায় কাঁটা-ওয়ালা (spiked) বুট পায়ে তুষার-পাদুকা, দড়ি ও গিরি-অভিযানের অপরিহার্য্য সঙ্গী লৌহযষ্টি বা 'পিক' (pick) সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করে। এই অপূর্ব্ব কষ্টসাধ্য খেলা শুধু পুরুষদের একচেটিয়া নহে। আল্পস্‌ পর্ব্বতের বিপুলকায় কঠিন তুষারপ্রবাহ এবং তুষারমণ্ডিত শিখরসমূহ নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট কলকাকলীতেও মুখর হইয়া উঠে। পল্লবিনী লতার মত নমনীয়, ক্রীড়াশীল তরুণীরা তাহাদের পিতা ভ্রাতা স্বামী বা বন্ধুর পাশে পাশে সমান ক্ষিপ্রতার সহিত

উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করে অথবা তুষার-স্রোতের ভয়াবহ গভীর ফাটলের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া যায়। অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গকে শ্রদ্ধা এবং পূজা নিবেদনে নারী ও পুরুষের সমান উৎসাহ। আল্‌প্‌স পর্ব্বতমালা ইউরোপের যে যে প্রদেশে অবস্থিত সেই সেই প্রদেশের

মাটেরহর্ণ

প্রসিদ্ধ গিরিশৃঙ্গসমূহের পাদদেশে যখন দলে দলে অগণিত স্ত্রীপুরুষ পর্ব্বতারোহণের উপযোগী সরঞ্জামপূর্ণ 'কিট' বা থলি পিঠে বাঁধিয়া অভিযানের জন্য যাত্রা করে তখন উত্তেজনায় মন ভরিয়া যায়।

মঁ ব্লাঁর (Mont Blanc) পাদদেশে শামনী (Chamonix) নামক স্থানে ইংরেজদের একটি গীর্জ্জা আছে। এই গীর্জ্জার প্রাঙ্গণের একটি নিভৃত কোণে অক্সফোর্ড বেলিওল কলেজের একজন ইংরেজ শিক্ষকের একটি আড়ম্বরহীন সমাধি বর্ত্তমান। ইনি গত শতাব্দীর ষষ্ঠদশকে মঁ ব্লাঁ জয় করিবার জন্য যাত্রা করেন। পর্ব্বতাধিরোহণ কালে একটি বিপদসঙ্কুল স্থানে তাঁহার পদস্খলন হয় এবং তিনি সুগভীর তুষার-গহ্বরে কোথায় তলাইয়া যান! এই তুষার-গহ্বর শিখরদেশ হইতে নিম্নে শামনী অধিত্যকা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পরে, কঠিন তুষার-প্রবাহ যেখানে গলিয়া প্রচণ্ড গতিশীল জলধারায় পরিণত হইতেছে সেখানে তাঁহার মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তুষার-প্রবাহ বৎসরে খুব অল্পই অবতরণ করে, এই কারণে অক্সফোর্ডের এই হতভাগ্য শিক্ষকের মৃৎদেহ লোকচক্ষুগোচর হইতে এত বৎসর সময় লাগিয়াছিল। যাঁহারা তুষার-প্রবাহের গতিবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহারা হিসাব করিয়া এই মৃতদেহ নামিয়া আসিবার দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা শামনীতে ইঁহার যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টি-সৎকারের জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। মৃত্যুবরণ করিবার একত্রিশ বৎসর পরে এই বাণীসেবকের সমাধি হয়।

এইরূপ অদ্ভুতভাবে যে এই একটিবার মাত্র মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। আর একব্যক্তির ইতিহাস আছে, যিনি মঁ ব্লাঁ শিখরের আরো কিছু উর্দ্ধে উঠিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। মৃত্যুর সাতষট্টি বৎসর পরে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হইবার জন্য মানুষের দৃষ্টিপথে নামিয়া আসিয়াছিল। পিতামহের মৃতদেহের জন্য পৌত্র বিগলিত তুষার-স্রোতের সম্মুখে প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। এ গণনানুযায়ী ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে অবিকৃত মৃতদেহটি নামিয়া আসিতে দেখা যায়। তাঁহার স্বর্ণমণ্ডিত যষ্টিটি সম্ভবতঃ একটু স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি বেশী বলিয়া প্রভুর আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে একবৎসর পূর্ব্বে উপনীত হয়।

সুইট্‌জ্যরল্যাণ্ড ও আল্‌প্‌স অধিকৃত ফ্রান্সই পর্ব্বতারোহণের জনপ্রিয় রঙ্গভূমি। আমার পত্নী ও আমি যে-সকল প্রসিদ্ধ স্থান হইতে লোকে গিরি-শিখরে উঠিতে আরম্ভ করে সেই স্থানগুলির সবকয়েকটি দেখিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। যে কয়েক স্থানে গিয়াছিলাম তন্মধ্যে শামনীর নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা

মোর দ্য গ্লাস

আইগ্যোর গ্লাসিয়ার

ফরাসী-রাজ্যের এলাকাভুক্ত এবং ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ গিরিশিখর 'মঁ ব্লাঁ' অভিযান এখান হইতেই আরম্ভ করিতে হয়।

শামনী হইতে মঁ ব্লাঁর যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাহা অপূর্ব্ব ও অবর্ণনীয়। 'মোর দ্য গ্লাস' বা 'তুষার-সমুদ্র' নামক তুষার-প্রবাহের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে তুষার-গহ্বর ও ফাটলের যে দৃশ্য দেখা যায় তাহাও বিস্ময়কর। 'গাইড' বা পথ-প্রদর্শকের সাহায্যে অল্প প্রস্তরীভূত তুষারের মাঝে মাঝে যে ফাঁকগুলি দেখা যাইতেছে সেগুলির প্রত্যেকটি অত্যন্ত চওড়া এবং স্থানে স্থানে পঞ্চাশ ষাট ফুট গভীর। এই সকল গহ্বর মুখব্যাদান করিয়া নিরন্তর পথিকদের আহ্বান

আয়াসে 'মোর দ্য গ্লাসে' যাওয়া যায়। পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রে 'মোর দ্য গ্লাসে'র একটি গহ্বরের দৃশ্য দেওয়া হইয়াছে—আলোকচিত্রটি খুব কাছ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

করিতেছে, পথিকেরা যে এই আহ্বান সব সময় উপেক্ষা করে, তাহা নহে। তারপর? তুষারাবৃত মানব-দেহ

মঁ ব্লাঁর নিকটবর্ত্তী খাড়া পাহাড়

পর্ব্বতের উচ্চতানুযায়ী পঞ্চাশ বা ততোধিক বর্ষ পরে মৃত্তিকায় সমাধিস্থ হইবার জন্ত অবতরণ করে।

পর্ব্বতারোহণ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল বলিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট দর্শকমাত্রকেই মঁ ব্লাঁ শিখরে উঠিতে দেয় না। পর্ব্বতে উঠিবার অনুমতি পাওয়ার পূর্ব্বে অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শকদের নিকট অন্ততঃ দশ-পনের দিন পর্ব্বতারোহণ বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। এতদসত্ত্বেও শিখরে উঠিবার সময় প্রদর্শক ও পর্ব্বতে উঠিবার সকল সরঞ্জাম সঙ্গে লইতে হয়। শামনী মঁ ব্লাঁ

গিরি-বিজয়াভিলাষীদের শিক্ষাক্ষেত্র। ইহারা এখানে প্রত্যহ দুরারোহ স্থানসমূহে অধিরোহণের কৌশল হাতেকলমে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে ডিপ্লোমা ও সঙ্গে সঙ্গে "মঁ ব্লাঁর স্বাধীনতা" ("Freedon of Mont Blanc") প্রাপ্ত হন।

স্থইট্‌জারল্যাণ্ডের ব্যেরন্তের ওবেরলাণ্ড (Berner Oberland) প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র গিরিযাত্রীদের চঞ্চল পদপাতে মুখর হইয়া উঠে। আমি আমার পত্নী সমভিব্যাহারে খুব কাছ হইতে ব্যেরন্তের ওবেরলাণ্ডের তিনটি প্রসিদ্ধ শৃঙ্গ—আইগোর, মঞ্চ ও ইউঙ্গফ্রাউ (Eiger, Monch and Iungfrau)—দেখিতে গিয়াছিলাম। রজ্জুবাহিত (funicular) রেলগাড়ীর সাহায্যে গিরিশৃঙ্গের খুব কাছ পর্য্যন্ত উঠিতে পারা যায়। এই রজ্জুবাহিত রেলগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি অপেক্ষা কম বিস্ময়কর বস্তু নহে।

গ্রীণ্ডেলভাল্ড (Grindelvald) অথবা লাউটারব্রুনেন (Lauterbrunnen) হইতে ক্লাইনে শাইডেগে (Kleine Scheidegg) যাওয়া যায়। এখান হইতেই 'দি ইউঙ্গফ্রাউ রেলওয়ে' বা ইউঙ্গফ্রাউবান আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীণ্ডেলভাল্‌ড্ গ্রীষ্ম ও শীত বিহারের জন্ত প্রসিদ্ধ এবং এখান হইতে চতুর্দ্দিকের যে দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা চমৎকার। লাউটারব্রুনেনের ট্রুমেলবাথ (Trum-

ইয়ুঙ্গফ্রাউ

melbach) গিরিবর্ত্ম প্রসিদ্ধ, এই পথে প্রপাতমুখে লক্ষ লক্ষ মণ তুষার জলস্রোত নিয়ে ইণ্টেরলাকেন (Inter-laken) উপত্যকা অভিমুখে প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে।

আমরা গ্রীণ্ডেলভাল্ড্ হইতে রওয়ানা হইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ক্লাইনে শাইডেগ পৌঁছিলাম। সেখান হইতে ইউঙ্গফ্রাউবেন অর্থাৎ রজ্জু-চালিত রেলের সহায়তায় তুষারমণ্ডিত শিখরগুলির একেবারে পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। মাইলখানেক হাঁটিয়া আমরা কঠিন তুষার-প্রবাহের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম এবং আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য জুতা জামা পরিয়াই তাহা অতিক্রম করিতে লাগিলাম। নিদারুণ শীতে এই কার্য্য করিতে আমাদিগকে কিছু বেগ পাইতে হইতেছিল। আমরা তুষারের গোলা নির্ম্মাণ ক'রয়া তাহা ইতস্ততঃ ছুঁড়িতে লা'গলাম, বরফের উপর লাথি মারিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম নীচের পাথর দেখা যায় কি না। কিন্তু একজন 'গাইড' আমাদিগকে জানাইল যে, বৃথা চেষ্টা—পাহাড়ের উপর তুষার আবরণ কয়েক শত ফুট মাত্র পুরু, এমন কি, বরফের ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া গেলেও সহজে পর্ব্বতগাত্রে পৌছান যাইবে না। আমরা আইগ্যেরগ্লেচেরে (Eiger-gletcher) অর্থাৎ আইগ্যের তুষার প্রবাহের মধ্যস্থলে গিয়া দেখিলাম, স্থানীয় গিরি-যাত্রীরা একশত গজ কিংবা ততোধিক গভীর একটি সুড়ঙ্গ কাটিয়াছে—সামান্য কিছু দর্শনী দিলেই তাহার মধ্য দিয়া যাত্রীদের যাইতে দেওয়া হয়। সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে একেবারে তলদেশে একটি গোলাকার কুঠরি নির্ম্মিত হইয়াছে, কুঠরির ঠিক মধ্যস্থলে একটি তুষার-বৃক্ষ। তুষার-সুড়ঙ্গ ও তুষার-কক্ষটি দেখিলে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকভাবে শরীর মন ছম ছম করিতে থাকে। ছেলেবেলায় ভূগোল বৃত্তান্তে এস্কিমোদের তুষার-গৃহের কথাও মনে পড়িল। এখানে কিছুকাল থাকিয়াই আমাদের হাত পা ঠাণ্ডায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, আমরা অবিলম্বে উপরে উঠিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের উত্তপ্ততর আবহাওয়ার মধ্যে
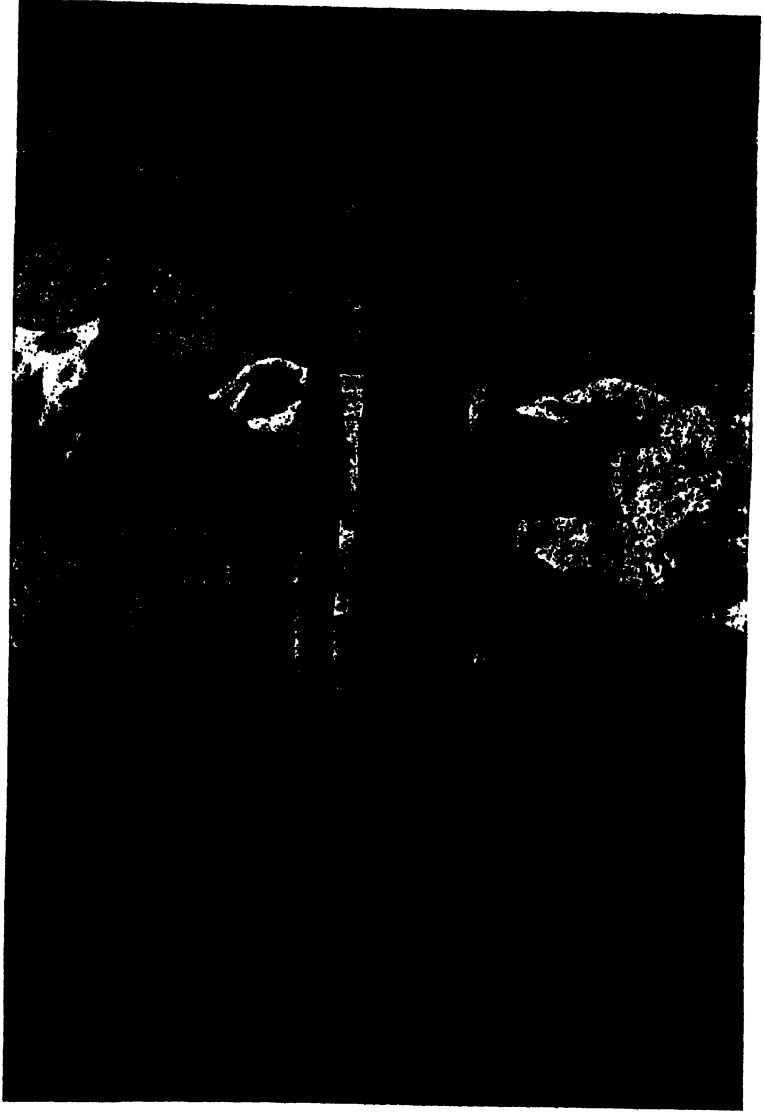
মাটেরহর্ণের নিকটবর্ত্তী পাহাড়

উপস্থিত হইলাম। পরে উপযুক্ত বেশভূষা ও পাদুকা পরিয়া আবার সেখানে গিয়া কিছুকাল থাকিবার ইচ্ছা আছে।

ৎসের মাট (Zermatt)-এই সুবিখ্যাত মাট্টেরহর্ণ (Matterhorn) শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গ চুম্বকের মত অধিক দুঃসাহসী পর্ব্বতারোহিগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। মাট্টেরহর্ণ শৃঙ্গে আরোহণ করা অতীব দুরূহ এবং প্রতি বৎসর এই শৃঙ্গের মারাত্মক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া দু দশজন যাত্রী প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিয়া যায়। আমরা এখানে যে অল্প কয়েক সপ্তাহ আছি ইহার মধ্যেই মাট্টেরহর্ণ শৃঙ্গে দুইজন যাত্রী মৃত্যু বরণ করিয়াছে, কিন্তু তবুও অন্যান্য যাত্রীরা এই সর্ব্বনাশা শৃঙ্গের শীতল আলিঙ্গনের লোভে যাত্রা করিতে ছাড়ে না।

ভারতবর্ষ হইতে যদি কয়েকজন বলবীর্য্যশালী কর্ম্মঠ যুবক সুইট্জ্যারল্যাণ্ডে গিয়া কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিয়া পর্ব্বতাধিরোহণের কৌশলগুলি আয়ত্ত করিয়া আসে তাহা হইলে মন্দ হয় না। যথাযোগ্য শিক্ষালাভ করিলে তাহারা কালে হিমালয়েরও সুদুর্গম ও অজ্ঞাত শৃঙ্গসমূহে অভিযান করিতে পারিবে। কাঞ্চনজঙ্ঘা-শৃঙ্গ বিজয়ে জার্ম্মান অভিযানের কথা সংবাদপত্রে পড়িতেছি। আশা করি তাঁহারা এই কার্য্যে সফল হইবেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর (এই শৃঙ্গ এভারেষ্ট নামেও পরিচিত) বিজয়ের গৌরব যেন ভারতবাসীরাই পায়, ভারতবাসীদের সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। ভাল করিয়া পর্ব্বতাধিরোহণ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে সুইট্জ্যারল্যাণ্ডে এক বৎসরের অধিককাল থাকিতে হইবে না, এবং সকল প্রকার ব্যয় ধরিলেও উহাতে পাঁচ ছয় হাজারের বেশী খরচ লাগিবে না। পাঁচজনে মিলিয়া একটি দল গঠন করিয়া যদি যুবকেরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে মোটমাট ত্রিশ হাজার টাকার বেশী খরচ পড়িবে না। আমার বিশ্বাস এই ত্রিশ হাজার টাকা ভারতবর্ষ দিতে পারে। ফুটবল, মুষ্টিযুদ্ধ ও জনপ্রিয় নাটকের অভিনয়ের দ্বারা এই টাকা সহজেই উঠিতে পারে।

জেনীভা
১৫. ৮. ২৯

আনন্দম—রূপমমৃতম

(সুরতি মূরতি লোক পসারা— ইত্যাদি। কবীর)

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

প্রেম-রূপে তাঁর মূর্ত্তি-জগৎ
ফুটেছে গানের মত,—
সব রূপ পুরি' অপরূপ হ'য়ে
আছেন অরূপ স্বামী;
"সত্য পুরুষ"—তাঁরি প্রেম-ঘন
আনন্দে দিবাযামি
নবরূপ-ধারা বহিয়া চলেছে
পথে পথে অবিরত।

"পংথ বীণাতে" বাজিছে যে তাঁর
"সত্য রাগিণী" সদা,—
চির জনমের অমৃত ঝরে সে
সুরের ফোয়ারা হ'তে;
সে গভীর রাগে বুকে মোর জাগে
পরম প্রেমের ব্যথা—
ভেসে' যাই কোথা আনন্দ-রূপ
অমৃত-রসের স্রোতে।

সাহিত্য-বিচার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র পরিষৎ সভায় "সাহিত্য-বিচার" সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, সেইটি লিখে দেবার জন্তে আমার পরে অনুরোধ আছে। মুখে-বলা-কথা লিখে বলায় নূতন আকার ধারণ করে। তা ছাড়া আমার মতো অসাধারণ বিস্মৃতিশক্তিশালী লোক এক দিনের কথিত বাণীকে অন্য দিনে যথাযথরূপে অনুলেখনে অক্ষম। অতএব সেদিনকার বাক্যের ইতিহাস অনুধাবনের বৃথা চেষ্টা না করে বক্তব্য বিষয়টার প্রতিই লক্ষ্য করব।

প্রথমে বলে রাখি, যাকে সাধারণত আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি সাহিত্য-বিচার শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। আলোচনা অর্থে বুঝি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে বেড়ানো, আর বিচারটি হ'ল, পরিচয়—তাকে যাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্য-বিচারের লক্ষ্য। কিন্তু পরিচয় তো অনেক রকম আছে। আমরা প্রায়ই ভুল করি, এক-পরিচয়ের জায়গায় আর এক পরিচয় দাখিল করি; যেখানে এক গ্লাস জল আনা আবশ্যক সেখানে "তাড়াতাড়ি এনে দিই আধখানা বেল।" জলের চেয়ে বেলে ভার আছে, সার আছে, সেই কারণে বাজারে তার দামও বেশি, কিন্তু যে তৃষার্ত্ত মানুষ জল চায় সে মাথায় হাত দিয়ে পড়ে।

সাহিত্য-বিচারে পরিচয়টি সাহিত্যিক পরিচয় হওয়া চাই একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে বাহুল্য নয়। কল্পনা করা যাক্ আমাদের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় সাহিত্যের বিষয়। পরিচয় দেবার উপলক্ষ্যে বিচারক হয়তো গর্ব্ব করে বলে উঠবেন, জাতিতে উনি বৈদ্য। জিজ্ঞাসু বল্‌বেন, "এহ বাহ্য।" তখন বিচারক আবার গর্ব্ব করে বলতে পারেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি অধ্যাপনা করেন তার পদগৌরব এবং অর্থগৌরব প্রচুর।" জিজ্ঞাসু আবার বল্‌বেন, "এহ বাহ্য।" তখন বিচারক সুর আরো চড়িয়ে বল্‌বেন, "উনি তত্ত্বশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত।" হায়রে, এও সেই আধখানা বেল। ঐতিহাসিক সাহিত্যে এসব তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করা চাই, কিন্তু রস-সাহিত্যে এগুলিকে সযত্নেই বর্জ্জন করতে হবে। উৎসাহী হোমিওপ্যাথ বাল্মীকিকে প্রশ্ন করে যে, বনবাসকালে নিঃসন্দেহ মাঝে মাঝে রামচন্দ্রের ম্যালেরিয়া হয়েচে, তখন তিনি নিজের কী রকম চিকিৎসা করতেন? বাল্মীকি তাঁর জটাশ্মশ্রু নিয়ে চুপ করে থাকেন, কোনো উত্তর দেন না। ঐতিহাসিক রাম-চরিতে রামচন্দ্রের সমর্থিত চিকিৎসা-পদ্ধতি মূল্যবান তথ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যিক রামচরিতে ওকে স্থানে দেওয়া অসম্ভব। এমনতরো বহুসহস্র অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই রামায়ণ সম্ভবপর হয়েচে, তথাপি সেটা সপ্তকাণ্ডর কম হল না।

আমি যে কথাটি বল্‌তে গিয়েচি, সে হচ্চে এই যে, সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত; শ্রেণীগত নয়। এখানে "ব্যক্তি" শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে, তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।

ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউবা সুস্পষ্ট, কেউ বা অস্পষ্ট। অন্তত, যে মানুষ উপলব্ধি করে তার পক্ষে। সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি, জীবজন্তু গাছপালা নদী পর্ব্বত সমুদ্র ভালো জিনিষ মন্দ জিনিষ বস্তুর জিনিষ ভাবের জিনিষ সমস্তই ব্যক্তি,—নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হ'ল, তা হলে সাহিত্যে সে লজ্জিত।

যে গুণে এরা সাহিত্যে সেই পরিমাণে ব্যক্ত হয়ে

ওঠে যাতে আমাদের চিত্ত তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই গুণটি দুর্লভ—সেই গুণটিই সাহিত্য-রচয়িতার। তা রজোগুণও নয়, তমোগুণও নয়, তা কল্পনাশক্তির ও রচনাশক্তির গুণ।

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষকে অসংখ্য জিনিষকে আমরা পুরোপুরি দেখ্‌তে পাইনে। প্রয়োজন হিসাবে বা সাংসারিক প্রভাব হিসাবে তারা পুলীস্‌ ইন্‌স্পেক্টর বা ডিষ্ট্রিক্‌ট ম্যাজিষ্ট্রেটের মতোই অত্যন্ত পরিদৃষ্ট এবং পরিস্পৃষ্ট হতে পারে কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তারা হাজার হাজার পুলীস ইন্‌স্পেক্টর এবং ডিষ্ট্রিক্‌ট ম্যাজিষ্ট্রেটের মতোই অকিঞ্চিৎকর, এমন কি, যাদের প্রতি তারা কর্ত্তৃত্ব করে তাদের অনেকের চেয়ে। সুতরাং তারা অচিরকালীন বর্ত্তমান অবস্থার বাহিরে মানুষের অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশমান নয়।

কিন্তু সাহিত্য-রচয়িতা আপন সৃষ্টিশক্তির গুণে তাদেরও চিরকালীন রূপে ব্যক্ত করে দাঁড় করাতে পারে। তখন তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ডবিধাতারূপে কোনো শ্রেণী বা পদের প্রতিনিধিরূপে নয়, কেবলমাত্র আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যে মূল্যবান। ধনী বলে নয়, মানী বলে নয়, জ্ঞানী বলে নয়, সৎ বলে নয় সত্ব রজ বা তমোগুণান্বিত বলে নয়, তারা স্পষ্ট ব্যক্ত হতে পেরেছে বলেই সমাদৃত। এই ব্যক্ত রূপের সাহিত্যমূল্যটি নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এই জন্যেই সাহিত্য-বিচারে অনেকেই ব্যক্তিপরিচয়ের দুরূহ কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিয়ে শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সহজ পন্থাকে সাধারণত আমাদের দেশের পাঠকেরা অশ্রদ্ধা করেন না বোধ করি তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশ জাত-মানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়ো লোক বলি যার বড়ো পদ, বড়ো মানুষ বলি যার অনেক টাকা। আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেচি, ব্যক্তিগত মানুষ পংক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সঙ্কুচিত। বাঁধারীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই। এই কারণেই যে সাধু-সাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল, তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লারশোভিত সরোবর, যথীজাতি-মল্লিকামালতীবিকশিত বসন্ত ঋতু, তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃত্তি আমাদের চলে গেছে তা বল্‌তে পারিনে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য রচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্চে প্রকাশ।

সেই জন্যেই দেখি আমাদের দেশের সাহিত্য-বিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়। তৃষ্ণার্ত্তের জন্যে আধখানা বেলের প্রভূত আয়োজন।

সাহিত্যে ভালো লাগা মন্দ লাগা হোলো শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচারই শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপিল আছে প্রমাণে। কিন্তু ভালো মন্দ লাগাটা রুচি নিয়ে, এর উপরে আর কোনো আপিল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে। এই কারণে জগতে সকলের চেয়ে অরক্ষিত অসহায় জীব হল সাহিত্য-রচয়িতা। মৃদুস্বভাব হরিণ পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু কবি ধরা পড়ে ছাপার অক্ষরের কালো জালটায়। এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই, নিজের অনিবার্য্য কর্ম্মফলের উপরে জোর খাটে না।

রুচির মার যখন খাই তখন চুপ করে সহ্য করাই ভালো, কেননা সাহিত্য-রচয়িতার ভাগ্যচক্রের মধ্যেই রুচির কুগ্রহ-সুগ্রহের চিরনির্দ্দিষ্ট স্থান। কিন্তু বাইরে থেকে যখন আসে উল্কাবৃষ্টি, সম্মার্জ্জনী হাতে আসে ধূমকেতু, আসে উপগ্রহের উপসর্গ, তখন মাথা চাপ্‌ড়ে বলি এ যে মারের উপ্‌রি পাওনা। বাংলা সাহিত্যের অন্তঃপুরে শ্রেণীর যাচনদার বাহির হ'তে ঢুকে পড়েচে, কেউ তাদের দ্বাররোধ করবার নেই। বাউল কবি দুঃখ করে বলেচে, ফুলের বনে জহুরী ঢুকেচে, সে পদ্মফুলকে নিকষে ঘষে ঘষে বেড়ায়, ফুলকে দেয় লজ্জা।

কথা যখন উঠ্‌ল, নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা বল্‌লে আশা করি কেউ দোষ নেবেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে সংবাদ পাওয়া গেল, আমার কবিতায় সত্ত্ব, রজঃ এবং তম, এই তিন গুণের মধ্যে রজোগুণটাই সাহিত্যিক ল্যাবরেটরিতে অধিক পরিমাণে ধরা পড়েচে। এরকম তাত্ত্বিক কাকুক্তি প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু অস্পষ্ট বলেই সেটা শুনতে হয় খুব মস্ত। এসব কথা ভারী ওজনের কথা। আমাদের শাস্ত্র-মানা দেশে এতে করে লোকেও স্তম্ভিত হয়। আমার আপত্তি এই যে, সাহিত্য-বিচারে এসব শব্দের কোনো স্থান নেই। তবু যদি গুণের কথা উঠ্‌লই, তাহলে একথা মান্‌তেই হবে আমি ত্রিগুণাতীত নই, দ্বিগুণাতীতও নই, সম্ভবত সাধারণ মানুষের মতো আমার মধ্যে তিনগুণেরই স্থান আছে। নিশ্চয়ই আমার লেখার কোথাও দেখা দেয়, তম, কোথাও বা রজ, কোথাও বা সত্ত্ব। পরিমাণে রজটাই সব চেয়ে বেশি, একথা প্রমাণ করতে যাঁরা কোমর বাঁধেন তাঁরা এ-লেখা ও-লেখা, এ-লাইন ও-লাইন থেকে তার প্রমাণ ছেঁটে কেটে আনতে পারেন। আবার যিনি আমার কাব্যকে সাত্ত্বিক বলে প্রমাণ করতে চান তিনিও বেছে বেছে সাত্ত্বিক লাইনের সাক্ষী সারবন্দী করে দাঁড় করাতে যদি চান মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাবার দরকার হবে না। কিন্তু সাহিত্যের তরফে এ তর্কে লাভ কী? উপাদান নিয়ে সাহিত্য নয়, রসময় ভাষা-রূপ নিয়েই সাহিত্য। ম্যাকবেথ নাটকে তমোগুণ বেশি কিম্বা রজোগুণ বেশি কিম্বা সাংখ্যদর্শনের সবগুণেরই তাতে আবির্ভাব কিম্বা অভাব, একথা উত্থাপন করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাত্ত্বিক যে কোনো গুণই তাতে থাক বা না থাক্, সব সুদ্ধ মিলে ঐ রচনা একটি পরিপূর্ণ নাটক হয়ে উঠেচে। প্রতিভার কোন্ মন্ত্রবলে তা হোলো তা কেউ বল্‌তে পারে না। সৃষ্টি আপনাকে আপনিই প্রমাণ করে, উপাদান বিশ্লেষণ দ্বারা নয়, নিজের সমগ্র সম্পূর্ণ রূপটি প্রকাশ ক'রে। রজোগুণের চেয়ে সত্ত্বগুণ ভালো, এ নিয়ে মুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে সাহিত্যিক ভালো ছাড়া অন্য কোনো ভালো নেই।

কাঁটা গাছে গোলাপ ফোটে, এটাতে বোধ করি রজোগুণের প্রমাণ হয়। গোলাপ গাছের প্রকৃতিটা অস্ত্রধারী, জগতে শত্রু আছে একথা সে ভুল্‌তে পারে না। এই সন্দেহচঞ্চল ভাবটা সাত্ত্বিক শান্তির বিরোধী, তবুও গোলাপকে ফুল হিসাবে নিন্দা করা যায় না; 'নিষ্কণ্টক অতিশুভ্র ব্যাঙের ছাতার চেয়ে সে যে রমণীয়তায় হেয়, একথা তত্ত্বজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ বলবে না। ভুঁইচাঁপা ওঠে মাটি ফুঁড়ে, থাকে মাটির কাছে, কিন্তু ফুলের সমজদার এই রজো বা তমোগুণের লক্ষণটা স্মরণ করিয়ে তাকে সাংখ্যতত্ত্বের শ্রেণীভুক্ত করবার চেষ্টা করে না।

আমার কাব্য সম্বন্ধে উপরিলিখিত বিশেষ তর্কটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় যে দোষটা সর্ব্বদা দেখতে পাওয়া যায় এটা তারি একটা নিদর্শন। আমরা সহজেই ভুলি যে জাতিনির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, সেখানে আর সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে হবে। অমুক কুলীন ব্রাহ্মণ, এই পরিচয়েই অতি অযোগ্য মানুষও ঘরে ঘরে বরমাল্য লুটে বেড়াতে পারে, কিন্তু তাতে ব্যক্তি হিসাবে তার যোগ্যতা সপ্রমাণ হয় না। লোকটা কুলীন কিনা কুলপঞ্জিকা দেখলেই সকলেই সেটা বলতে পারে, অথচ ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্ণয় করতে যে সমজ্‌দারের প্রয়োজন তাঁকে খুঁজে মেলা ভার। এই জন্যে সমাজে সাধারণত শ্রেণীর কাঠামোতেই মানুষকে বিভক্ত করে; জাতিকুলের মর্য্যাদা দেওয়া, ধনের মর্য্যাদা দেওয়া সহজ। সেই বিচারেই ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বদাই সমাজে অবিচার ঘটে, শ্রেণীর বেড়ার বাইরে যোগ্য-ব্যক্তির স্থান অযোগ্যব্যক্তির পংক্তির নীচে পড়ে। কিন্তু সাহিত্যে জগন্নাথের ক্ষেত্র, এখানে জাতির খাতিরে ব্যক্তির অপমান চল্‌বে না। এমন কি, এখানে বর্ণসঙ্কর দোষও দোষ নয়; মহাভারতের মতোই উদারতা,—কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে এখানে কেউ তাঁর সম্মান অপহরণ করে না, তিনি তাঁর নিজের মহিমাতেই মহীয়ান্। অথচ আমাদের দেশে দেবমন্দির প্রবেশেও যেমন জাতিবিচারকে কেউ নাস্তিকতা মনে করে না,

তেমনি সাহিত্যের সরস্বতীর মন্দিরের পাণ্ডারা দ্বারের কাছে কুলের বিচার করতে সঙ্কোচ করে না। হয়তো বলে বসে, এ লেখাটার চাল কিম্বা স্বভাব বিশুদ্ধ ভারতীয় নয়, এর কুলে যবনস্পর্শ দোষ আছে। দেবী ভারতী স্বয়ং এরকমের মেল-বন্ধন মানেন না, কিন্তু পাণ্ডারা এই নিয়ে তুমুল তর্ক তোলে। চৈন চিত্র বিশ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেচে, কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিস্বটি দেখো, যদি রূপ-ব্যক্ততায় কোনো দোষ না থাকে তাহলে সেইখানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল। মানুষের মনে মানুষের প্রভাব চারিদিক থেকেই এসে থাকে। যদি অযোগ্য প্রভাব না হয় তবে তাকে স্বীকার করবার ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকাই লজ্জার বিষয়—তাতে চিত্তের নির্জ্জীবতা প্রমাণ হয়। নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে, তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভৎর্সনা না করেন,—যদি সে না নাচ্‌ত তবেই বুঝ্‌তুম ময়ূরটা মরেচে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার ক'রে আপন সীমানা থেকে বের করে দিয়েচে। সে মরু থাক্ আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে, তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেচেন সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাঙলা দেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েচে, সে দাশু রায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক।

এটা অন্ধ অভিমানের কথা। এই অভিমানে একদিন শ্রীমতী বলেছিলেন, "কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী।" অবস্থাবৈগুণ্যে এরকম মনের ভাব ঘটে সে কথা স্বীকার করা যাক্,—ওটা হোলো খণ্ডিতা নারীর মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানী এসে বলেন, সাত্ত্বিকতা হোলো ভারতীয়ত্ব, রাজসিকতা হোলো য়ুরোপীয়ত্ব; এই বলে সাহিত্যে খানাতল্লাসী করতে থাকেন, লাইন চুনে চুনে রাজসিকতার প্রমাণ বের ক'রে কাব্যের উপরে এক-ঘ'রে করবার দাগা দিয়ে দেন, কাউকে জাতে রাখেন কাউকে জাতে ঠেলেন তখন একেবারে হতাশ হতে হয়।

এক সময় ভারতীয় প্রভাব যখন প্রাণপূর্ণ ছিল তখন মধ্য এবং পূর্ব্ব এসিয়া তার নিকট সংস্পর্শে এসে দেখতে দেখতে প্রভূত শিল্পসম্পদে আশ্চর্য্যরূপে চরিতার্থ হয়েছিল। তাতে এসিয়ায় এনেছিল নব জাগরণ। এজন্য ভারতের বহির্বর্ত্তী এসিয়ার কোনো অংশ যেন কিছু-মাত্র লজ্জিত না হয়। কারণ, যে কোনো দানের মধ্যে শাশ্বত সত্য আছে তাকে যে কোনো লোক যদি যথার্থভাবে আপন করে স্বীকার করতে পারে, তবে সে দান সত্যই তার আপনার হয়। অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণ শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেচে।

বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপ সর্ব্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ব্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। সেই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। য়ুরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়—তাকে স্বকীয় করে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশা-নুভূতি, আমাদের সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলা দেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতাল পঞ্চবিংশতি, হাতেম তাই, গোলেবকাওলি অথবা কাদম্বরী বাসবদত্তার মতো যে হয়নি, হয়েচে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে করে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না, তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে-প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্ব্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত,—যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়,—এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয়, এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি, সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী

প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসঙ্করতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।

আরো একটা শ্রেণীবিচারের কথা এই উপলক্ষ্যে আমার মনে পড়ল। মনে পড়বার কারণ এই যে কিছুদিন পূর্ব্বেই আমার যোগাযোগ নাটকের কুমুর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কোনো লেখিকা আমাকে পত্র লিখেচেন। তাতে বুঝতে পারা গেল, সাহিত্যে নারীকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দেখবার একটা উত্তেজনা সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেচে। যেমন আজকাল তরুণবয়স্কের দল হঠাৎ ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে দলপতিদের চাটুক্তির চোটে বিনামূল্যে একটা অত্যন্ত উচ্চ এবং বিশেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, নারীদেরও সেই দশা। সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কি না, এই তর্কটা সাহিত্য-বিচারে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করচে। এরই ফলে কুমু ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ কুমু কিনা এই সাহিত্যসঙ্গত প্রশ্নটা কারো কারো লেখনীতে বদ্‌লে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কুমু মানব সমাজে নারী নামক জাতির প্রতিনিধির পদ নিতে পেরেচে কিনা—অর্থাৎ তাকে নিয়ে সমস্ত নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েচে কিনা। মানব প্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ্য মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তিবিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য নারীকে আঁক্‌তে গিয়ে তাকে অ-নারী ক'রে আঁকা পাগলামী। বস্তুত সেকথা আলোচনা করাই অনাবশ্যক। সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু বলেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি বলে নয়।

কথা উঠেচে সাহিত্য-বিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্ব্বে আলোচ্য এই —কী সংগ্রহ করার জন্যে বিশ্লেষণ? আলোচ্য-সাহিত্যের উপাদান অংশগুলি? আমি বলি সেটা অত্যাবশ্যক নয়, কারণ, উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বেশিটুকু পরিমাণগত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সেটা হ'ল রূপরহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটাই হ'ল অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। সে স-কল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে খণ্ডিত করলেই সে থাকে না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-এনালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, কাম ক্রোধ অহঙ্কার ইত্যাদি। ছিন্ন করে দেখলে যে বস্তু-পরিচয় পাওয়া যায়, সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূঢ় অস্তিত্বদ্বারা নয় সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্যকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ লঙ্ঘন করবার উপক্রম করচে। বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে কাম প্রবৃত্তিও ছিল, তাঁর যৌবনের ইতিহাস থেকে সেটা প্রমাণ করা সহজ।—যেটা থাকে সেটা যায় না, গেলে তাতে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ঘটে। চরিত্রের পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষ ঘটে বর্জ্জনের দ্বারা নয় যোগের দ্বারা। সেই যোগের দ্বারা যে পরিচয় সমগ্রভাবে প্রকাশমান সেইটেই হল বুদ্ধদেবের চরিত্রগত সত্য। প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে তাঁর সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্ব্বন আছে নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে একশ্রেণীতে ফেলতে হয় কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর করে বল্‌তে হবে যে সন্দেশ পচামাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেননা উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বল্‌বে প্রকাশটা চাতুরী, তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী।

তা হোক্, তবু রসভোগকে বিশ্লেষণ করা চলে।

মনে করা যাক্ আম। যে ভাবে সেটা ভোগ্য সেভাবে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সে অতীত। ভোগ সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষ্যে বলা চলে যে, এই ফলে সব প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্চে ওর প্রাণের লাবণ্য; এইখানে সন্দেশের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী, তা জীববিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেশে জাফরাণ দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পারে—কিন্তু সেটা জড় পদার্থে বর্ণযোজন, প্রাণ পদার্থের বর্ণ উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য্য, সৌরভের সৌজন্য। তার পরে তার আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অকৃপণতা। এইরূপে আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রস-বিচার। এইখানে স্বাদেশিক এসে পরিচয়পত্রে বল্‌তে পারেন, আম প্রকৃত ভারতবর্ষীয়, সেটা ওর প্রচুর ত্যাগের দাক্ষিণ্যমূলক সাত্ত্বিকতায় প্রমাণ হয়,—আর র‍্যাস্পবেরি গুস্‌বেরি বিলাতী, কেননা তার রসের ভাগ তার বীজের ভাগের চেয়ে বেশি নয়। পরের তৃপ্তির চেয়ে ওরা আপন প্রয়োজনকেই বড়ো করেছে, অতএব ওরা রাজসিক। এই কথাটা দেশাত্মবোধের অনুকূল কথা হতে পারে, কিন্তু এইরকমের অমূলক কি সমূলক তত্ত্বালোচনা রসশাস্ত্রে সম্পূর্ণই অসঙ্গত।

সংক্ষেপে আমার কথাটা দাঁড়ালো এই—সাহিত্যের বিচার হচ্চে, সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।

"দীপ ও ধূপ"*

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

অনেক হাকিমের সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। তাঁহারা আদালতের সাধারণ নিয়ম অনুসারে বাদী প্রতিবাদীর জবানবন্দি জেরা প্রভৃতি বিস্তারিত না লিখিয়া সংক্ষেপে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। ডিক্রী বা ডিস্‌মিস্ কেন করিলেন, আসামীকে কেন শাস্তি বা খালাস দিলেন, তাহাদের রায়ে তা লেখা নাও থাকিতে পারে। তাঁহাদের রায় যে সব সময় ভুলই হয়, এমনও নয়। কিন্তু রায়ের কারণটা জানিতে না পারিলে লোকে সন্তুষ্ট হয় না।

কোন পুস্তক ভাল লাগিয়াছে বা মন্দ লাগিয়াছে বলা এক রকম সরাসরি বিচার। কোন বহিকে ভাল, কোন বহিকে মন্দ বলা হয় ত স্থলবিশেষে ঠিকই। কিন্তু লোকে জানিতে চায়, কেন একটি বহি বিচারকের ভাল লাগিয়াছে, আর একটি কেন ভাল লাগে নাই।

আমার বিপদ এই খানে। সাহিত্যের বিচার করিবার অভ্যাস আমার নাই। তাহা করিবার কোন শক্তি আমার কোন কালে ছিল কিনা, জানি না। কিন্তু তাহা কোন সময়ে থাকিলেও, এখন নাই। এখন কেবল ভাল লাগিয়াছে, বা ভাল লাগে নাই, এইটুকুই বলিতে পারি। কোন কাব্যগ্রন্থের রূপ ও রস অপরকে বুঝাইতে হইলে প্রথমত বিচারকের সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি চাই, এবং দ্বিতীয়ত সূক্ষ্ম অনুভূতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা চাই। এই দুইটিরই অভাব বোধ করিতেছি। অনেক বৎসর ধরিয়া কেবল রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ের স্থূল তথ্য ও যুক্তির আলোচনা করায় সাহিত্যিক রূপ ও রসের সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি ও সূক্ষ্ম অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, কখনও সামান্য পরিমাণে থাকিলেও, এখন তাহা লোপ পাইয়াছে বা চাপা পড়িয়াছে।

কিন্তু "দীপ ও ধূপ" নামক কবিতাপুস্তকটি সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ভার আমি লইয়াছি। সুতরাং বিচারকের আসনে বসিবার যোগ্যতা না থাকিলেও আমাকে কিছু বলিতে হইবে। সময়ের এবং পত্রিকাতে স্থানের সংকীর্ণতাবশতঃ অল্প কথাই বলা হইবে।

আমার বিবেচনায় ইহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ। ইহা আমার ভাল লাগিয়াছে।

ইহার মলাটের উপরকার ছবিটির উল্লেখ করিতেছি এজন্য নহে, যে, ইহাতে রঙের ঘটা আছে—তাহা ইহাতে নাই—কিন্তু এই জন্য, যে, ইহা পুস্তকখানির প্রথম কবিতাটির মানসচিত্রের কতকটা প্রতিলিপি। কিসের প্রেরণায় কবি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহারও আভাস এই কবিতাটি হইতে পাওয়া যায়।

দীপ ও ধূপ

সন্ধ্যা নামে, ওগো কুটীরবাসিনি,
  ত্বরায় তোমার প্রদীপ জ্বালো,
তব সদনের সম্মুখের পথে
  পড়ুক তা' হতে একটু আলো।
ধুনাচি তোমার আগুনে ভরিয়া
  খোলা দরজার আড়ালে রেখে
ঢালো তাহে ধূপ, দিক তার ধূঁয়া
  বাহিরে বায়ুরে সুবাস মেখে।
কখনো পথিক আঁধার নিশায়
  সোজা পথ ছাড়ি বেড়ায় ঘুরে,
লোকালয় খুঁজি না পেয়ে নিশানা
  কাছ হতে যায় ক্রমশঃ দূরে।
ক্ষীণ প্রদীপের এ আলো তোমার
  যদি দৈবগুণে নিশানা হয়,
তোমার ধূপের সুবাসে চমকি
  যদি ক্ষণতরে দাঁড়ায়ে রয়,
যদি ধীরে ধীরে তোমার দুয়ারে
  পথের ঠিকানা সুধাতে আসে—
ঈষৎ আড়ালে রাখ ধূপ-দান,
  খোলা কপাটের ডাহিন পাশে।
হোক ক্ষীণ আলো, তেলে সলিতায়
  ভরে রাখ তবু প্রদীপ খানি,
অন্ধকার রাতে কে যে পথ চলে,
  কোথা গিয়ে পড়ে কেমনে জানি ?

এই বহিখানি পড়িয়া কবির মানস-দীপের আলোকে জীবনপথের অনেক পথিক সোজা পথ দেখিতে পাইবেন, অনেকে তাঁহার হৃদয় ধূপের সুবাসে আনন্দিত হইবেন। আর, "কুটিরবাসিনী" যে সংসারের ধনী দরিদ্র, সাধু 'পতিত", জ্ঞানী, কর্মী, শ্রমিক, সকলকে আত্মীয় ভাবিয়া সকলের জন্যই দীপ ও ধূপের আয়োজন করিয়াছেন, পাঠকেরা তাহাও বুঝিতে পারিবেন।

কেহ লেখে, কেহ খোদে, প্রাসাদ নির্মায়,
খাটে কেহ ঘাটে বাটে, মোট বহি যায়,
কুম্ভকার, সূত্রধর, কামার, চামার,
মাঝি মাল্লা, তাঁতি জোলা, সবাই আমার
নমস্য—সবাই মোরে কিছু করে দান,
সুখ দেয়, দুঃখ হতে করে পরিত্রাণ।
সবারে চিনিনা, তবু দানের বন্ধনে
বাঁধা আছি নানা দিকে সকলের সনে।
আমি এই ধনধান্যময়ী পৃথিবীতে
আজন্ম ভিখারী রব ভিক্ষা কুড়াইতে ?

---

* দীপ ও ধূপ। 'আলো ও ছায়া'-প্রণেত্রী প্রণীত। ১৩২৯। মূল্য দুই টাকা। প্রকাশক শ্রীনির্মলেন্দু রায়, বি-এ, ৩২।এ হাজরা রোড, কলিকাতা।

এ বিশ্বের ঐশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্যের মাঝে
বেড়াব আলস্যসুখে, লাগিব না কাজে ?
অতি দূর অতীতের চিন্তা চেষ্টা শ্রম,
জ্ঞানালোক, মানবের সভ্যতা সম্ভ্রম
সকলের ভাগ লব, দিব না কো কিছু,
ছুটিব কি চিরদিন আপনার পিছু ?
অবিচার, অত্যাচার, দারিদ্র্য যথায়
অজ্ঞান, অধর্ম্ম করে দাসত্ব প্রথায়
কঠিন শৃঙ্খলে দৃঢ়, মনুষ্যত্ব মোর
জাগিবে না ভাঙিতে সে দাসত্ব কঠোর
বজ্র হস্তে ? দেহে রক্ত ছুটিবে না বেগে—
মেলি আঁখি চিত্রমূর্ত্তি শুধু রব চেয়ে ?
কিম্বা বৃথাবিষ্টসম কহিব প্রলাপ,
অদৃষ্টেরে, বিধাতারে বরষিব শাপ,
তার পর ধীরে ধীরে করিব শয়ন
কোমল শয্যায় সুখে ? মুদ্রিত-নয়ন
দেখিব না চারিদিকে দৃশ্য দুঃখময়—
কে যে ব্যথা সহি দেয়, কে যে সুখে লয়
অন্ন বস্ত্র, জ্ঞানালোক, দেহের আরাম,
চলে মনুষ্যত্বগর্ব্বে পূর্ণ সর্ব্বকাম ?
যুগে যুগে দুঃখ সহি এ নরসমাজ
লভিয়াছে যে সৌভাগ্য, যেই শক্তি, আজ
আমি বাড়াইব তারে। এই বর্ত্তমানে
আছে প্রেমী, সাধু, কর্ম্মী, শিল্পী যে যেখানে,
আছে শ্রমী, শুধু শির নহে ভিক্ষানত,
তাহাদের সহকর্ম্মী, বিশ্বসেবারত,
আমি দাঁড়াইব গিয়া তাহাদের পাশে।
আসুক না অপমান, তাই যদি আসে
প্রেমের, সেবার দণ্ড।

হে আমার প্রভু,
হে আমার প্রেরয়িতা, আসি নাই কভু
শুধু বহিবারে ঋণ। ওহে বিশ্বরাজ,
তব কর্ম্মচারী আমি, আছে মোর কাজ
তোমার বিপুল রাজ্যে। সুখ দুঃখ দিয়া
দিয়া জরা মৃত্যু শোক, পাঠালে বরিয়া
সেনাপতি, দুঃখ জয় করিবারে জয় ;
পলায়নে লজ্জা, দুঃখে মরণেতে নয়।
দুঃখ দেহ, মৃত্যু দেহ, দোঁহে করি রথ
চলিব আলোকে নিত্য অমৃতের পথ।

এই সকল কথা—তাঁহার কোন কবিতার কোন কথাই, তিনি দর্পের সহিত লেখেন নাই। তাঁহার ভয় সঙ্কোচ বিনয় অনেক কবিতাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বে ছোট বড় সকলেরই স্থান আছে, সকলেরই কর্ত্তব্য আছে ; সেই জন্য তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে :—

আমারে গড়েছ নিজ হাতে,
আশীষ বরষি মোর মাথে।
যত কিছু তুমি গড়
ভিন্ন মাপে, ছোট বড়,
বিচিত্র হয়েছে বিশ্ব তা'তে।
এ বিপুল বিচিত্র সংসারে
সার্থক করিব আপনারে।
আসি নাই এ জগতে
আর কারো মত হতে
এ কথা স্মরিব বারে বারে।
ক্ষুদ্র হই, লজ্জা কি তাহাতে ?
নদী, সিন্ধু, হ্রদে ও প্রপাতে
যে পার্থক্য, তার মাঝে
যে মঙ্গল বিধি রাজে,
নিশা, সন্ধ্যা, দিবা ও প্রভাতে,
সে শুভ বিধানে তব
আমি ক্ষুদ্ররূপে রব
অগম্য নগণ্য জন সাথে।
ব্যক্ত আমি রব আপনাতে,
অলক্ষিত, তব দৃষ্টিপাতে।

গত কয়েক বৎসর এবং বর্ত্তমানে যে সব সমস্যা, প্রচেষ্টা, ঘটনা, ধুয়া অনেককে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন, আশস্ত, উত্তেজিত বা পথভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহার অনেকগুলি সম্বন্ধে কবি কবিতা লিখিয়াছেন। সেগুলি সত্যসত্যই কবিতা, বক্তৃতা নহে। যেমন "যুগ প্রভাত," "নব জাগরণ," "ওরে তোরা ভবিষ্যের দল," "মা জননি, ও ছেলেটি তোমার একার নয়," "মুক্ত বন্দী," "সত্যাগ্রহী," "এরা যদি জানে," 'সেবা ধর্ম্ম,' "তারকেশ্বরীয়," "অসহযোগ প্রচারকের প্রতি," "সহযোগ," "বিপথ," "নারী-নিগ্রহ," "নারীর দাবী," "নারী-জাগরণ," "ঠাকুরমার চিঠি," "নাতিনীর জবাব," "নাত-বৌয়ের জবাব," ইত্যাদি।

আজকাল 'অস্পৃশ্যতা' ও 'অনাচরণীয়তা' দূর করিবার জন্য যাঁহারা অন্তরের সহিত চেষ্টিত, তাঁহারা "এরা যদি জানে" পড়িয়া তৃপ্ত হইবেন।

এদেরেও গড়েছেন নিজে ভগবান,
নররূপে দিয়াছেন চেতনা ও প্রাণ ;
সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে স্নেহে প্রেমে গৃহ বাঁধে
বিঁধে শল্য সম হৃদে ঘৃণা অপমান,
জীবন্ত মানুষ এরা মায়ের সন্তান।
এরা যদি আপনারে শেখে সম্মানিতে,
এরা দেশ-ভক্তরূপে জন্মভূমি হিতে
মরণে মানিবে ধর্ম্ম, বাক্য নহে—দিবে কর্ম্ম,
আলস্য বিলাস আজো ইহাদেরচিতে
পারেনি বাঁধিতে বাসা, পথ ভুলাইতে।

এরা হতে পারে দ্বিজ—যদি এরা জানে,
এরা কি সভয়ে সরি রহে ব্যবধানে ?
এরা হতে পারে বীর, এরা দিতে পারে শির
জননীর, ভগিনীর, পত্নীর সম্মানে ;
ভবিষ্যের মঙ্গলের স্বপনে ও ধ্যানে—
যদি এরা জানে।
উচ্চ কুলে জন্ম বলে কত দিন আর
ভাই বিপ্র, রবে তব এই অহঙ্কার ?
কৃতান্ত সে কুলীনের রাখে না তো মান,
তার কাছে দ্বিজ শূদ্র সাধিয়া সমান।

যার স্পর্শে যেই দিন   পঞ্চভূতে দেহ লীন,
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে রহে কত ব্যবধান ?

প্রাচীনাদের আদর্শ ও নবীনাদের আদর্শ উভয়েই সত্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে, রস আছে; উভয়েরই হিতকারিতা ও প্রয়োজন আছে। এই উভয় আদর্শের ছবি করিয়ে ঠাকুরমা ও নাত্নীর চিঠি ছুটিতে আছে। সেগুলি দীর্ঘ বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না। কিন্তু নাত্‌বৌয়ের পরিহাসোজ্জ্বল উপভোগ্য জবাবটি দীর্ঘ হইলেও নীচে ছাপিতেছি।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

ঠাকু'মা, লিখেছ চিঠি নাতিনীর কাছে,
ভুলে গেছ মূর্খ এক নাত-বৌ আছে;
বিদ্যা বেশী নাই তার, কলেজে পড়েনি,
জীবনের বড় কোন আদর্শ গড়েনি,
তোমার পৌত্রীর মত; কিন্তু গৃহকাজে
চিরকাল ছিল দক্ষ। এবে মাঝে মাঝে
'ফ্যাশানের ব্যসনেতে' ঢালি আপনারে
খুঁজিছে নূতন পথ, খুসী করিবারে
পৌত্রে তব। নিজ হাতে রন্ধনশালায়
সেকালের মত নাহি উনান জ্বালায়;
বিজলির বাতি আর গ্যাস-রেঞ্জ জ্বলে
বিনা কাঠ সলিতায়। পাখা যদি চলে,
কেদারায় বসে রাঁধা সে বড় আরাম,
চোখেতে লাগে না ধোঁয়া, মুখে নাই ঘাম।
তবু যবনের রাঁধা ইংরাজের খানা
স্বামী সঙ্গে খায় সবে; করিবে কি মানা ?
"যে না খায়, স্বামীসহ সর্ব্বত্র না যায়,
খেলেনা টেনিস, ব্রিজ, সে তো মাথা খায়
আপনারি—স্বামী তার হবে হাত ছাড়া"—
শুনে ভয়ে ভয়ে মরে; কাণ রাখে খাড়া
শিখিতে ইংরাজী বুলি মেয়েদের সুরে,
রাখে সাবধান দৃষ্টি নিকটে ও দূরে,
বেশ, ভঙ্গী, হাব ভাব, বস্তুর সকল,
শ্লীলতা ও অশ্লীলতা করিতে নকল।
বধূর সলজ্জ দৃষ্টি, মুখ বুজে থাকা,
তাই লজ্জাকর এবে; কথা পাকা পাকা,
তুরন্ত্ জবাব দিতে পারে সেই নারী,
তাহারি সুখ্যাতি আর সমাদর ভারী।
ঠাকুরমা গো, আগেকার মত দেশকাল
কিছু নাই। দাস দাসী থাকে এক পাল,
তারা দেখে শিশুদের; শিক্ষয়িত্রী আছে
এ ছাড়া; তবেই বল, মা বোনের কাছে
বেশী কি শিখিবে ? আর সময় বা কত
মার কিম্বা ভগিনীর ? দিন যায় যত
ঘরের বাহিরে বাড়ে কর্ত্তব্য-তালিকা,
ব্যস্ত থাকে পিতামাতা, বালকবালিকা।
আছে সভা, সম্মিলন, খদ্দর প্রচার,
শান্তিসংঘ, নীতিপীঠ; আছে থিয়েটার,
বায়স্কোপ, বন্দেশীর;—জীবনটা সেহাত
নহে নিরানন্দ পূজা—চাহি যাতায়াত
ইংরাজ দোকানে। পরি উপরের শাড়ী
মোটা খদ্দরের ব'দলে, হাথ্ওয়ের বাড়ী
যেতে নাই, ভেবনা তা। নতুন ফ্যাশানে
ব্লাউস বানাব, তাতে দোষ কোন্ খানে ?
আশ্চর্য্য ফ্যাশান বস্তু! সে যে বহুরূপী
অখণ্ড, অভিন্ন সত্য। আসে চুপি চুপি
বিস্মৃত অতীত বেশে। তোমাদের আগে
যা ছিল এ বাঙ্গালায়, আজ অনুরাগে
তাহাই শোভন বলে য়ুরোপীয়া নারী—
(আমরাও বলি তাই—নিত্য অনুকারী)
চোখঝলসান, অতি উজ্জ্বল বরণ,
স্বল্প আবরণ আর বহু আভরণ।
'কালচার' (কুল চুর ?) চলেছে বাড়িয়া,
'আর্টের' উৎকর্ষ-পদে দিয়াছি ছাড়িয়া
পূর্ব্ব সংস্কারের যত 'ভাল' 'মন্দ' বুলি—
যে না পারে তাকাইতে চোখে দিক্ ঠুলি।
ঠাকু'মা বলিতে গেলে কথা চলে বেড়ে,
খোসা ফেলে দানা ক'টি লও তুমি বেছে।
আসল কথাটি এই—পুরুষে যা চায়
নারী তাই হতে পারে, তাই হয়ে যায়।
তারপর সেই হওয়া চালায় তাহারে
স্বর্গে কি পাতালে, গতি রোধিতে সে নারে।
"নিজ লক্ষ্য স্থির রাখি চলুক না নারী
স্বাধীনা সঙ্গিনী ?"—তাতে প্রশ্ন ভারী ভারী
এসে পড়ে; এ বিদ্যায় কুলায় না তার
সুমীমাংসা—চিঠি সাঙ্গ হোক এইবার।

প্রণতা সেবিকা নাত্‌বৌ

পুনশ্চ।

আমার এ চিঠি থেকে যদি বুঝে থাক,
দুষিয়াছি পৌত্রে তব, হবে শুনে রাখ,
শিবসম স্বামী মম, স্নেহময় অতি,
অমল উদার প্রাণ। আমি ভাগ্যবতী।

নাত্‌বৌ

পুনঃ পুনশ্চ—
ঠাকুরমা,

চিঠি লিখিছেন দেখি, চুপি চুপি এসে
পিছে থেকে পড়ে নিয়ে মরিতেছি হেসে।
যে সার্টিফিকেট খানি বধু, বুদ্ধিমতী,
দেছেন পুনশ্চ জুড়ি, মূল্যবান্ অতি।
পৌত্রস্নেহবশে তুমি পাছে কর রোষ,
তাই এই স্তবটুকু, আগে দিয়া দোষ।
ঠাকু'মা একথা গুলি বুঝাও তো তারে—
কে কি চায়, কি যে পায়, কে চালায় কারে।

তোমার স্নেহের পৌত্র

দীর্ঘ হইলেও একটি মর্ম্মস্পর্শী করুণ কবিতাও আমাকে উদ্ধৃত করিতে হইবে

দীঘির পাঁকে

শোন্ দাদু, শোন্।
আমি তোর মায়ের পেটের বোন ;
একই মায়ের বুকের দুধ পড়েছে দুই মুখে,
একই কোলে হেসে খেলে বেড়েছিলাম সুখে,
মায়ের হাতের মাখা ভাত খেয়েছি এক থালে,
দোল খেয়েছি দুজন ব'সে হিজলের এক ডালে,
একই সাথে ফুল তুলেছি, গেয়েছি এক গান,
আজ হে দাদা, তোমার ঘরে নাইক আমার স্থান !
পরের ঝি সে আপন হয়, হোক না, তাতে কি ?
আমি খাই সিদ্ধ পোড়া, সে খাক পাতে ঘি,
থাকুক তার শাঁখা সিঁদুর, বাজু বালা হাতে,
কোলের ছেলে বাড়ুক তার নিত্য দুধে ভাতে,
আমার তাতে আনন্দ বই দুঃখ কিছু নাই ;—
দুঃখ এই, যে, তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই
আজও আমায় চিনলে নাকো। তোমার মায়ের ঝি,
আমি দিব কুলে কালী ? ছি !—ছি !—ছি !
মায়ের পেটের সাথী তোমার, চিরদিনের জানা,
তারে শেষটা চিনলে নাকো এত বড় কাণা !
পরের মেয়ের সন্দেহেতে বিশ্বাস হ'ল বেশী—
এ কুলের যে কেউ নয় সে, নিতান্ত বিদেশী।
আমার নামে নিন্দা হলে, তোমার বংশে লাগে,
সে কথাটা বারেক কি তার অন্তরেতে জাগে ?
তোমার লজ্জায় যে তার লজ্জা, তোমার মানে মান,
আমার মারতে গিয়ে যে তার গেছে সেটুক্ জ্ঞান।
সত্যি হলেও রাখত চেপে, তোমার মুখ চেয়ে,
একটু যদি বাসতো ভাল কঠিন পরের মেয়ে।
তুমি ছাড়া আপন বলতে আমার কেউ নাই,
তোমার ছেলে কোলে করে মানুষ করি তাই।
তোমার যত্নে কিসের দাবী ?—খোকার স্নেহে ভাগ
কেন বসাই ? ব'লে তার আমার উপর রাগ।
বলি আমি সকল কথা, শোন স্থির হয়ে,
গিছলাম আমি দীঘির পাড়ে খোকায় কাঁখে লয়ে।
কাজের সময় কাঁদলে খোকা বউ যে বেজায় মারে,
ভুলিয়ে তাই নিয়ে গেলাম দীঘির পুব ধারে।
দীঘির জলে বড় বড় পদ্ম ফুটে আছে,
মনে হয় ধরা যায়—পাড়ের খুবই কাছে।
ছেলে তোমার ফুল চাইছে, ভাবছি যে কি করি,
এমন সময় দেখি আসছে ওপাড়ার শ্রীহরি।
ডেকে তাকে বললাম, "ভাই, এদিক হ'য়ে যাও,
ফুলের তরে কাঁদছে খোকা, একটি তুলে দাও।
কাছে বেটা নাই ওখানে হাঁটুর বেশী জল,—"
"হলেই বেশী কষ্টটা কি ?—" হায়রে অমঙ্গল !
যেমন নামা, পাঁকের মাঝে ডুবল সারা দেহ,
উঠতে নারে। ডাকি কারে ? কাছে তো নাই কেহ।
পরের ছেলে পাঁকের তলে তলিয়ে মরে যায়,
ভাবতে আমার সর্ব্ব অঙ্গ ভরল যে কাঁটায়।
"থাক খোকা চুপটি করে, আমি ফুলটি আনি—"
বলে আমি সাঁতার দিয়ে তুলতে গেলাম টানি।
কতক্ষণ সে সাঁতার ডুব, টানাটানি কত,
আমার কোন হিসাব নাইকো। পাগল মেয়ের মত
তুলে নাকি হেসেছিলাম, দিয়ে গড়াগড়ি,
শ্রীহরির কাদামাখা পা দু'খানি ধ'রি।
বউ যে কখন বাঁধা ঘাটে তুলতে এল জল,
খ্যাল করিনি, দেখলাম পরে মস্ত মেয়ের দল।
আনন্দ তো হয়েই ছিল, ঘুচে মহা ত্রাস ;
বিধবার ঐ একটি ছেলে, কি যে সর্ব্বনাশ
আমা হ'তে হ'ত তার, তুলতে গিয়ে ফুল,
ভাব দেখি ? হাঁটু জল ? আমারি তো ভুল।
পরের ছেলে মারিনিতো, যা হবার তাই হোক্।
বউ বলেন অনেক কিছু, শোনে অন্ত লোক।
প্রেমকাহিনী তৈরী হয়ে বাড়ছে মুখে মুখে।

* * * *

ভেবেছিলাম দুঃখের জনম, যাক না কেন দুঃখে,
আর তো কা'রও ক্ষতি নাইকো, নাইকো পরিতাপ—
শেষটা একি হ'ল কিন্তু ? কার এ অভিশাপ ?
বিনা দোষে লোকনিন্দা কলঙ্ক-রটন,
তোমার ঘৃণা আমার ওপর—একি অঘটন।
ছেলেবেলা দুই দেহেতে ছিল একই প্রাণ,
আজ হে দাদু, দুই মনেতে এতই ব্যবধান ?
এক ভিটাতে, এক মাটিতে, জনম একই ঘরে
তোমার আমার—দণ্ড খানেক আগে আর পরে :
সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই সবই আছে,
তেমনি দেখ ঝুলছে ফুল বাঁকা হিজল গাছে,
বকুলতলা ভরে আছে বড়া ফুলের রাশে,
খালের জলে চালতা ফুলের সাদা পাঁপড়ি ভাসে—
হ্যাঁ ভাই দাদু, খসে পড়া চালতা ফুলের মত
আমি যাব ভেসে ভেসে ?...দুদিন হলে গত
ভাসব না আর, ঠেকব কোথাও। বাপের ভিটায় বটে
জন্মে মেয়ে, মরণতো তার অন্যত্রই ঘটে।
বাবার আগে চরণ ছুঁয়ে বলছি বারে বারে,
মায়ের পেটের সাথী তোমার, ভুল বুঝ না তারে।
থাকতে আমি চাই না হেথা, স্থানের ভাবনা নাই,
কোথাও না হয়, দীঘির পাঁকে হবে নাকি ঠাঁই ?

গরীবদুঃখীদের জীবনের কথা লইয়া তিনি যে সব কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা আন্তরিকতাপূর্ণ। "গাজ্ যে মোরে বোলায়" এইরূপ একটি কবিতা। বিপৎসঙ্কুল জীবনের আহ্বান কেমন করিয়া মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে, ইহা তাহার ছবি।

কন্যা জায়া ও মাতারূপে কবি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"শোন, বাছা, আদরিণী কন্যারূপে স্নেহ
যা পেয়েছ মাবাপের, এ জগতে কেহ
জেনো পারিবে না দিতে।"

ভাত ডাল তরকারীর চেয়ে চাট চানাচুর অনেকের কখন কখন ভাল লাগে। কিন্তু সুস্থ ব্যক্তিদের নিত্যভোজ্য দ্রব্যের যে স্বাদ, তাহাই শ্রেষ্ঠ। তুলনাটা স্থূল হইলেও বলি, তেমনি আধুনিক ইউরোপীয় উৎকটসামাজিকসমস্যাবহুল উপন্যাস ও তাহার অনুকারী বাঙালী তরুণদের উপন্যাসের ঝাঁঝাল রসের চেয়ে মানুষের সমাজে ও পরিবারে নানা সাধারণ সম্বন্ধের মধ্যে, সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে,

কর্ম্মাবসানে

শিল্পী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

যে রস আছে, তাহাতেই সুস্থ প্রকৃতির লোকে স্থায়ী তুষ্টি লাভ করে। তাহা তাহাদের কাছে পুরাতন হয় না, তাহাতে তাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মে না। এইরূপ কারণে, উৎকটকৃত্রিমসমস্তাবহুল কাব্য উপন্যাস যখন বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যাইবে, তখনও রামায়ণ বাঁচিয়া থাকিয়া সর্ব্বসাধারণকে আনন্দ দিবে।

কবির "দীপ ও ধূপের" অনেক কবিতার "আটপৌরে" রস আপাততঃ অনেকের মুখরোচক না হইতে পারে। কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রসুলভতা এবং সাধারণত্বই হয়ত তাহাকে চিরআনন্দদায়ক করিবে। যেমন, ঘাসের শোভা।

কবিত্বও একপ্রকার শিল্প। ইহা সবাই জানেন যে, নিপুণ শিল্পী তুচ্ছ মৃৎপিণ্ডকেও নিজের শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা এমন রূপ দিতে পারেন, যাহার গুণে মাটিও মূল্যবান্ ও আদরণীয় হইয়া যায়। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এমন কোন জিনিষকে রূপ দিয়া রসের উৎস করিতে চান, যাহা উচ্চতম শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশের উপযোগী এবং যাহার স্থায়িত্ব আছে। ধাতুশিল্পী সীসা দস্তার চেয়ে লোহা সোনা রূপা শুধু শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশের উপযোগিতার দিক দিয়াই পছন্দ করিতে পারেন। কাষ্ঠশিল্পী সেই কারণে সজিনার বা আমড়ার কাঠ অপেক্ষা চন্দন সেগুন মেহগনী পছন্দ করিতে পারেন। যেলো উপাদানে উৎকৃষ্টতম কারিগরী সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, নিকৃষ্ট কারিকর উৎকৃষ্ট উপকরণ লইয়াও উৎকৃষ্ট শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারে না। সুতরাং কোন কাব্যে "সাত্ত্বিক" জিনিষ খুব বেশী থাকিলেও তাহা কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ না হইতে পারে।

এই প্রকার কারণে, কবি চরিত্রসৃষ্টির দ্বারা, বিচিত্র ঘটনা উদ্ভাবন দ্বারা, দুষ্ট আদর্শ গুণ অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনার দ্বারা, কোনও মানস কল্পনা বা বস্তুকে রূপ দান দ্বারা, যখন নানা রসের আনন্দ মানব সমাজকে দিতে চান, তখন কুৎসিৎ যেলো তুচ্ছ লঘু ক্ষণস্থায়ী ক্ষণবিধ্বংসী যাহা তাহাকে উপাদান বা অবলম্বন না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সুন্দর ভীষণ মহৎ শাশ্বত সর্ব্বত্রলভ্য ভূমা যাহা তাহাই বাছিয়া লইতে পারেন।

কবিরা নিজ নিজ সহজ-প্রবণতা, আশৈশব শিক্ষা ও সংসর্গ প্রভৃতি কারণে অজ্ঞাতসারে বিষয় ও উপকরণ নির্ব্বাচন করেন এবং তৎ-সমুদয়কে এমন একটি অখণ্ড নূতন রূপ দেন, যে, তাহাকে নূতন সৃষ্টি বলা চলে। বাহির হইতে অকবি আমাদের এই রকমই বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারটি কেমন করিয়া ঘটে, তাহা রবীন্দ্র পরিষৎ সভায় রবীন্দ্রনাথের গত বক্তৃতার ভাষায়, একটি ট্রেড্ সীক্রেট অর্থাৎ কাব্য-ব্যবসায়ের গোপন মন্ত্র; কবিরা ইচ্ছা করিলেও তাহা অপরকে শিখাইতে পারেন না। "দীপ ও ধূপের" কবি নিজের অজ্ঞাতসারে নিজ স্বভাব শিক্ষা সংসর্গ অনুযায়ী অনবদ্য উপকরণ নির্ব্বাচন করিয়া তাহাকে যে রূপ দিয়াছেন, এবং তাহাতে যে রস সঞ্চার করিয়াছেন, সাহিত্যরসিকেরা তাহা হইতে আনন্দ লাভ করিবেন।

আলোচনা

চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চিয়, না আশ্চর্য্য চর্য্যাচর্য্য ?

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধ গান ও দোহার মধ্যে যে চারিখানি পুস্তক আছে তাহাদের প্রথমখানির নাম দেওয়া হইয়াছে চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়। শাস্ত্রী মহাশয় এই নামটি কোথায় পাইলেন তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। মূল পুস্তকে বা তাহার টীকায় কোনো স্থানে এই নামটি পাওয়া যায় না। আলোচ্য বিষয়েরও সহিত ইহার কোন যোগ দেখা যায় না, এবং সেই জন্যই ইহাকে নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় বলিলেই বুঝা যায় যে এই পুস্তকে কি অনুষ্ঠেয় ('চর্য্য') এবং কি অনুষ্ঠেয় নহে ('অচর্য্য'), তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোন নির্ণয় ('নিশ্চয়') করা হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে তাহার কিছুই করা হয় নাই। অতএব এই নামটি একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাই সন্দেহ উপস্থিত হয় সত্যই কি পুস্তকখানির নাম চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় ?

ইহার মুদ্রিত টীকাখানির প্রথম শ্লোকটিই আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করে। ইহার শেষ পঙ্‌ক্তি দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> "শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেঽপ্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে
> সদ্বর্ত্মাবগমায় নির্ম্মলগিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটম্ ॥"

এখানে পুস্তকখানির নাম যে, আশ্চর্য্য চর্য্যাচয় তাহা স্পষ্টই পাওয়া গেল। প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে প্রকাশ করে বলিয়া ইহার সার্থকতাও দেখা যায়। 'চর্য্যা' শব্দে আচরণ বা অনুষ্ঠান বুঝায় (যেমন, 'যোগচর্য্যা' যোগানুষ্ঠান)। এই সম্বন্ধে যে সমস্ত গান বা শ্লোকাদি রচনা করা হয় তাহাদেরও নাম 'চর্য্যা'; যেমন, 'উপনিষদ্' শব্দের মূল অর্থ রহস্য বিদ্যা, আবার যে গ্রন্থে তাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাকেও 'উপনিষদ্' বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত অর্থে যে 'চর্য্যা' শব্দের প্রয়োগ হয় তাহা বহু স্থানে পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক ; চর্য্যাদোহাকোশগীতিকা (Cordier : *Catalogue du Fonds Tibetain*, Vol II, p. 231), 'চর্য্যাগীতি (p. 87), দোহাচর্য্যাগীতিকাদৃষ্টি (p. 234) ইত্যাদি। এই সমস্ত পুস্তক ও আশ্চর্য্য চর্য্যাচয় একই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাই পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলিতে যখন 'চর্য্যা' দেখা যাইতেছে, তখন শেষোক্ত খানিতেও তাহাই হইবার কথা। 'চর্য্যাগীতি' অর্থে চর্য্যা বিষয়ক গীতি, 'চর্য্যা দোহা' অর্থে চর্য্যা বিষয়ক দোহা-ছন্দে রচিত রচনা। অন্যত্রও এই প্রকার। এইরূপে 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' শব্দের অর্থ হয় আশ্চর্য্যচর্য্যাসমূহের সংগ্রহ। 'আশ্চর্য্য' বিশেষণটি কেন দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে কিরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে। সন্ধ্যা* ভাষায় এই গানগুলি রচিত হওয়ায় সেগুলিকে 'আশ্চর্য্য' বলিতে পারা যায়, অথবা বর্ণনীয় বিষয়টিকে অদ্ভুতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়াও এখানে 'আশ্চর্য্য' শব্দটি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মনে হয় চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় নামে একখানি পুস্তক পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল ; যে পুঁথিখানি হইতে শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ গান ও দোহার প্রথম পুস্তকখানির সংস্করণ করিয়াছেন তাহার লেখক ঐ নামের সহিত পরিচিত ছিলেন, এবং ভ্রম বশতঃ ঐ পুঁথিখানির কোনো স্থানে আশ্চর্য্য চর্য্যাচয় নামের পরিবর্ত্তে চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় ইহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

---

* সন্ধ্যা নহে। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পূর্ব্বে এই প্রবাসীতেই (১৩৩৫, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ২০৩-৩৯) করিয়াছি।

স্যর গুরুদাস প্রসঙ্গ—শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র।

সাধু, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও কর্ম্মী স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব। তাঁহার জীবন-কাহিনী সকলেরই আলোচনার যোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাঁহার উপযুক্ত জীবনচরিত একখানিও প্রকাশিত হইল না। দুই তিনখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে সেই মহাপুরুষের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে স্যর গুরুদাসের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন হইল তাঁহার পত্র, রচনাবলী, ও স্মৃতিকথা প্রভৃতি একটি বৃহদায়তন পুস্তকে প্রকাশিত করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনী-লেখকের জন্য প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে স্যর গুরুদাসের বহু শিক্ষাপ্রদ জীবন-চরিত্রের কিছু কিছু উপাদান আছে বলিয়া মূল্যবান্। ইহাতে প্রকাশিত পত্রাবলীতে এবং লেখকের স্মৃতিকথায় স্যর গুরুদাসের চরিত্রের কতকগুলি অসাধারণ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তাবগুলি পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে গ্রন্থকার সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়া সদ্বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কাহারও সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা লিখিতে গেলে আপনার কথা আসিয়া পড়ে, এজন্য অনেকেই ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা প্রকাশিত করিতে কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ করেন। কিন্তু এই সকল স্মৃতিকথায় জীবনচরিতের যে সমস্ত উপাদান পাওয়া যায় তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার মহাশয় যে এই সঙ্কোচ পরিহার-পূর্ব্বক তাঁহার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা ও তাঁহাকে লিখিত স্যর গুরুদাসের পত্রগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

ছোটদের চিড়িয়াখানা—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। ডবল ফুলস্কেপ্ সাইজ—৯৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা। পাইবার ঠিকানা—সিটি বুক সোসাইটি, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বইখানিতে জন্তু-জানোয়ারদের সম্বন্ধে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প আছে। অধিকাংশ গল্পই হাস্যকৌতুকে সমুজ্জ্বল এবং অনুরূপ চিত্রে খচিত। লেখকের নিজের লেখার সঙ্গে ৺রামব্রহ্ম সান্যাল, ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ও ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর জানোয়ার-ঘটিত অভিজ্ঞতার কয়েকটি বিবরণও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। যে-যে জানোয়ারের কথা লইয়া গল্পগুলি রচিত, সূচনায় তাহাদের বংশ কি, বাড়ীঘর কোথায়, স্বভাবচরিত্র এবং আকার-প্রকার কিরূপ তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ হাল্কাভাবে অল্প কথায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাহাতে শিশুচিত্ত গল্পের প্রতি বিমুখ না হইয়া উন্মুখই হইয়া উঠে। আমোদের সঙ্গে শিক্ষাদানের জন্য এরূপ পুস্তকের প্রয়োজন যে খুব বেশী তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীনিশিকান্ত সেন

চণ্ডীদাস—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত এবং ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এরিয়ান লাইব্রেরী হইতে শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২৭৬ পৃষ্ঠা। সিল্কের প্যাডে বাঁধা রাজসংস্করণ —দেড় টাকা।

পদাবলী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। সম্পাদক সত্যই বলিয়াছেন, চণ্ডীদাসের পদাবলী অমৃতের নির্ঝর। 'যে জন শুনিল, সে জন ভুলিল।' পাশ্চাত্য দেশ হইলে আজ চণ্ডীদাসের সুলভ অথবা বহুমূল্য নানারূপ সুদৃশ্য সংস্করণে পুস্তকালয়গুলি ছাইয়া যাইত। বিগত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে চণ্ডীদাসের দুই চারিখানি ভাল সংস্করণ যে প্রকাশিত হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু সেগুলির একখানিও আজ বাজারে মিলে না। সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস' বহুদিন ফুরাইয়া গিয়াছে, আজও ছাপা হইল না। এরিয়ান লাইব্রেরী এই পুস্তকখানি বাহির করিয়া, চণ্ডীদাসের একখানি সু-সংস্করণের অভাব দূর করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অধিকাংশ পদই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, শুধু চণ্ডীদাস প্রভৃতির বিভেদ না করায় ভালই হইয়াছে। করিলে রসহানি হইত। গোড়ায় সম্পাদকের একটি সুলিখিত ভূমিকা আছে। পুস্তকে একখানি ত্রিবর্ণ চিত্রও আছে। ছবিখানি না থাকিলেই ভাল হইত। ছাপা কাগজ, বাঁধাই সুন্দর।

সোনার পাহাড়—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত এবং ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে আর-এইচ্-শ্রীমানী এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

এক শ্রেণীর পাঠক আছে, তাহারা অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ গল্প পড়িতে ভালবাসে। যাহাতে নানারূপ দুঃসাহসিক কাজের বর্ণনা না থাকে, সে উপন্যাস তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয় না। অনেক মানুষ বিপদে পড়িতে এবং বিচিত্র উপায়ে বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিতে চায়। আশ্চর্য্য বস্তু দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের পীড়িত করে। শৈশবে এই প্রবৃত্তি প্রবল। ডিটেক্টিভ উপন্যাস, অ্যাড্‌ভেঞ্চার নভেল প্রভৃতির পাঠক এই ধরণের কামনার কাল্পনিক চরিতার্থতা লাভ করে। 'সোনার পাহাড়' একখানি সুবৃহৎ অ্যাড্‌ভেঞ্চার নভেল, বিলাতী উপন্যাসের অনুবাদ। অনুবাদে দীনেন্দ্রকুমার সিদ্ধহস্ত। সে হিসাবে বইখানি ভালই হইয়াছে। পড়িতে কোথাও বাধে না। ঘটনার পর ঘটনা চলিয়াছে। 'বিদেশের আমদানী' স্বীকৃত হইলেও, ইহা কোন্ পুস্তকের অনুবাদ তাহা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। 'পল্লীচিত্রে'র শিল্পীকেও বিলাতী 'অ্যাডভেঞ্চার নভেল'-এর অনুবাদ করিতে হয়। হায়, বাঙ্গালী পাঠক! বইখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

যমের মুখে—ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়ভূষণ সরকার প্রণীত, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। এণ্টিক কাগজের ১২০ পৃষ্ঠার বই—ছবি আটখানি, মূল্য বারো আনা।

বইখানি ছেলেমেয়েদের জন্ত লেখা, তবে খুব ছোটদের জন্ত নয়। তিনটি গল্পে বইখানি সম্পূর্ণ। বাঘের মুখে পড়িয়া প্রাণরক্ষা, বাঘের সুমুখে সাইকেল চালাইয়া পলায়ন ও হইলে বাঘ ধরিয়া বাঘের সঙ্গে খেলার বিপজ্জনক কাহিনী—এই তিনটি গল্পে স্থান পাইয়াছে। ভাষা সতেজ ও সুস্পষ্ট—হাস্তকৌতুকে সরস বর্ণনায় মধুর ও সমুজ্জল। গল্পের প্রবাহ অতি সহজে মনকে সমাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। অধ্যাপক সরকার মহাশয় ছোটদের সাহিত্য রচনাকেই সাহিত্য-সেবার একমাত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, 'যমের মুখে' তাঁহার সেই ব্রতের অন্যতম ফল। ফল তাঁহার ভাগ্যে যাহাই হউক, ছেলেমেয়েদের পক্ষে যে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই

সরকার মহাশয় বইখানির সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, এই কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, মা মাসীদের মুখে জুজুর কথা শুনিয়া, পুস্তকে সুবোধ বালকের গল্প পড়িয়া এবং চাণক্য পণ্ডিতের উপদেশ পাইয়া বাঙালীর ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত 'ভাল ছেলে' বনিয়া গিয়াছে। তাহারা যাহাতে 'একটু কম ভাল ছেলে হয়' এবং গায়ে তাহাদের একটু 'ডানপিটের বাতাস লাগে' এই জন্তই তিনি বইখানি লিখিয়াছেন। এই কৈফিয়ৎ শুনিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, যমের মুখে বুঝিবা সত্যসত্যই ডানপিটের দুঃসাহস ও অসাধ্য সাধনের কাহিনী। গল্পগুলি পড়িলে কিন্তু সে ধারণা পদে পদেই ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে।

শর্ব্বরীভূষণ বর্ম্মা

শ্রীশ্রীদুর্গা—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। অন্নদা গ্রন্থপ্রকাশ কার্য্যালয়, ৩১।১ ঘোষের লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।

পুস্তিকাখানিতে দুর্গাপূজা-তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

তটিনী—প্রতিভা দেবী প্রণীত (উপন্তাস) ডি-এম লাইব্রেরী কলিকাতা।

অমল দুর্দান্ত ছেলে। বিমাতা এবং দাদার কঠোর শাসনের মধ্যে বৌদি রমলার স্নেহে পালিত। অমল তাঁর সন্তানের মত। পাগলা অবুঝ ছেলেটির তিনিই একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী। তটিনী চিরশিশু; তার মাকে, অমলদা'কে আর কুকুর টাইগারকে ছাড়া সে আর সংসারের কিছু জানে না। অমল তটিনীর খেলার সাথী, জীবনের সাথীও হইত যদি বিমাতা না বাধা দিতেন। সলিল তটিনীর স্বামী। সে নব্য, শিক্ষিত এবং ধনী যুবক, Governess রাখিয়া তটিনীকে শিক্ষা দেয়। তটিনী তার সকল সুখ-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী হইল কিন্তু তাতে তটিনীর স্পৃহা নাই। সে অমলদা, অমলদা করিয়া পাগল। সলিল হতাশ হইয়া Governessকেই বিবাহ করিতে প্রস্তুত হয়। বিদায়ের দিনে তটিনীকে দেখিয়া তার মনের পরিবর্ত্তন হয়; সে Governessকে ত্যাগ করে।

এদিকে অমল বিমাতার চক্রান্তে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। তার মাথায় দেশোদ্ধারের চিন্তা। ঘটনাক্রমে তটিনীদের সঙ্গে তার দেখা। তটিনীর ভালবাসা তাকে পীড়া দেয়; তটিনীকে সে দাম্পত্যজীবনে সুখী দেখিতে চায়। সলিল যেদিন তটিনীকে তাহার কাছেই সমর্পণ করিতে চাহিল সেদিন সে স্তম্ভিত বিমূঢ়ের মত থাকিয়া বিনাবাক্যে সলিলের গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল।

ইহাই নবীনা লেখিকার উপন্তাসখানির গল্পাংশ। একটু কাঁচা হইলেও প্রথম রচনা হিসাবে প্রশংসনীয়। বইখানির ছাপা বাঁধাই ভাল।

চ

পথের বাঁশী—গান ও স্বরলিপি, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত। ২০ দুর্গা পিথুরী লেন, বহুবাজার হইতে শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বড়াল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

'পথের বাঁশী' 'ভোরের পাখীর' কবির সম্মান রাখিয়াছে। নির্ম্মলবাবুর গানগুলি এমন মধুর ও আড়ম্বরহীন যে অতি সহজেই গানের কথা ও সুর মনকে স্পর্শ করে। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ এই ধরণের গান রচনায় সাফল্যলাভ করেন নাই। নির্ম্মলবাবু রবীন্দ্রনাথের ভাবে ভাবিত হইলেও তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গী ও সুর আছে, নিজের মোহও তিনি শ্রোতার মনে সঞ্চার করিতে সক্ষম। স্বরলিপি দেখিয়া যাঁহারা গান অভ্যাস করেন, তাঁহাদের নিকট 'পথের বাঁশী' আদৃত হইবে।

রঙ্গলাল (জীবনী)—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম-এ, এফ-আর-ই-এস বিরচিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য চারি টাকা। ৫০০ পৃষ্ঠা।

আমাদের দেশ অনৈতিহাসিকের দেশ। জাতি ও রাষ্ট্রের ইতিহাসই এদেশে কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে না; সাহিত্যের ইতিহাস তো নয়ই। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যও আমাদের নিকট প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি সাহিত্যিকদের জীবনী সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানিবার মত মাল-মশলাও কেহ সংগ্রহ করিয়া রাখে নাই।

সুখের বিষয়, দুই একজন স্বার্থত্যাগী অধ্যবসায়ী মনীষী বিগত শতাব্দীর বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের লুপ্ত অধ্যায়গুলির পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মন্মথ বাবু ইঁহাদের একজন। যে অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত ইনি কার্য্য করিতেছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সকল সম্ভব অসম্ভব স্থান হইতে ইনি উপাদান সংগ্রহ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালী সম্বন্ধে যে সকল গবেষণাপূর্ণ পুস্তক লিখিতেছেন সেগুলি তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়া রাখিবে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি এই পুস্তকগুলির অন্যতম।

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজ আমরা এক প্রকার বিস্মৃত হইলেও জীবিতকালে তিনি মাইকেল অপেক্ষাও অধিক সম্মান পাইয়াছেন। কালের কষ্টিপাথরে আজ মাইকেলের পাশে তিনি ম্লান হইয়াছেন সত্য তবু বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান অক্ষয় হইয়া থাকিবে। এই কারণে রঙ্গলালের জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। রঙ্গলালের জীবনের সহিত বাংলার সাহিত্য ও সমাজ জীবনের ইতিহাসও জড়িত আছে। মন্মথ-বাবুর লিখিত এই জীবনীতে সে সকল আলোচিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যসেবীর পক্ষে এই বইখানি অপরিহার্য্য হইবে।

পরাজিত—উপন্যাস—শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ডি এম লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০

এই উপন্যাসখানি আমাদের ভাল লাগিল। গ্রন্থকারের লিপিভঙ্গি প্রশংসনীয়। উপন্যাস প্লাবিত বঙ্গদেশে উপন্যাস পড়ে সুস্থ কল্পনা-বিলাস বেশী দেখিতে পাই না। 'পরাজিত' উপন্যাসের লেখক সবল ও সুস্থ মনের পরিচয় দিয়াছেন

জাহানারা—উপন্যাস—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ। এল সিংহ—১২।১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অতি সাধারণ পাঠক-সমাজের নিকট সুরেন্দ্রবাবুর দার্শনিক উপন্যাসগুলির আদর আছে। এই উপন্যাসখানিও দার্শনিক উপন্যাস পর্য্যায়ভুক্ত। উপন্যাসটি যে জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছে চারিটি সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

সতী—উপন্যাস—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন প্রণীত। প্রকাশক আর এইচ শ্রীমানী এণ্ড সন্স—২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা

বইখানির আখ্যান-ভাগ মন্দ লাগিল না। তবে তাহা স্থানে স্থানে আড়ষ্ট। নরেশবাবুর অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় এটি সুখ-পাঠ্য। সুরমার চরিত্রাঙ্কণে নরেশবাবু দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

জমাখরচ—গল্পের বই—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরাধেশ রায়, পি, ১৫৯ রসা রোড কালীঘাট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য দেড় টাকা।

বর্ত্তমানে গল্প লিখিয়া যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন অসমঞ্জ-বাবু তাঁহাদের একজন। তাঁহার সহজ বর্ণনাভঙ্গী পাঠককে অল্পেই মুগ্ধ করে। 'জমাখরচ' ও 'গুরুচরণের মুক্তি গল্প দুইটি ভাল লাগিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক—১২-১৪ খণ্ড। চরিতাভিধান—শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। বীরভূম রতন লাইব্রেরী হইতে শ্রীগৌরীহর মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸০।

এই গ্রন্থখানি শিবরতনবাবুর বহুদিনের বহু সাধনার ফল। আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকদের জীবনী ও তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনার পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় শিবরতনবাবুর সাধনার ফলগুলি এখন তেমন সুপরিচিত হইয়া উঠে নাই। বর্ত্তমান খণ্ডে ভারতচন্দ্র (ভ) পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তিনি যেন শীঘ্র শীঘ্র পুস্তকটির মুদ্রণ-কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। বাংলা ভাষার ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহাদের পক্ষে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক' একান্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক হইবে।

—ভা

ভারতীয় স্মৃতি-কথা ও চিত্র—শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা। পুরী,গয়া,শাহাবাদ ও এলাহাবাদ এই কয়টি জেলার অন্তর্গত দ্রষ্টব্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনেক স্থলের বিবরণ সম্বলিত পুস্তক। লেখক আলোক-চিত্র গ্রহণে সিদ্ধহস্ত বলিয়া খ্যাতনামা, এবং এই পুস্তকের বহুসংখ্যক চিত্রে সে খ্যাতির লাঘব হইবে না। উপরন্তু তিনি পুস্তকে লিখিত দ্রষ্টব্যস্থলগুলির যেরূপ সুন্দর ও মনোগ্রাহী বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার লেখনীরও খ্যাতি বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়। আজকাল অনেকেই দেশভ্রমণ করেন ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন, তাঁহারা লেখকের পথ অনুসরণ করিয়া ইতিহাস, কাহিনী ও দেশ-বর্ণনের সহিত আলোকচিত্র সংযুক্ত করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। পুস্তকটির ছাপা বাঁধাইও উৎকৃষ্ট।

ক. চ

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

১। জল-বিদ্যুৎ—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

২। ভারতীয় স্মৃতি—কথা ও চিত্র—শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা
৩। আগ্রার চিঠি—শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা
৪। ত্রিপুরার স্মৃতি— —ঐ—
৫। রবীন্দ্র সাধনা—শ্রীশিবকৃষ্ণ দত্ত
৬। একালের দৈত্য ও পরী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ
ম্যাকমিলান এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা
৭। ক্যাপটেন কুক—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত। —ঐ—
৮। কলাম্বস— —ঐ— —ঐ—
৯। মার্কো পোলো— —ঐ— —ঐ—
১০। জোয়ার-ভাঁটা—শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ —ঐ—
১১। পরিণয়—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
১২ প্রতারক—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
১৩ প্রজাপতি— —ঐ—
১৪ দার্জ্জিলিং সাথী—শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার, এম, এস-সি
১৫ অশ্বিনীকুমার—শ্রীতীর্থরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
১৬ শ্রীরামচরিত—পণ্ডিত শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী মৃণাল দাশ-গুপ্তা এই বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষায় 'সংস্কৃত ও বাংলা' শাখায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পিতার একান্তিক ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা পরলোকগত ৺রায় কমলানাথ দাশ-গুপ্ত বাহাদুর নারী-শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ও উৎসাহী ছিলেন। শ্রীমতী মৃণাল দাশ-গুপ্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে গবেষণা করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মৃণাল দাশ-গুপ্তা

শ্রীমতী শান্তা বাসুদেব সুখটঙ্কর
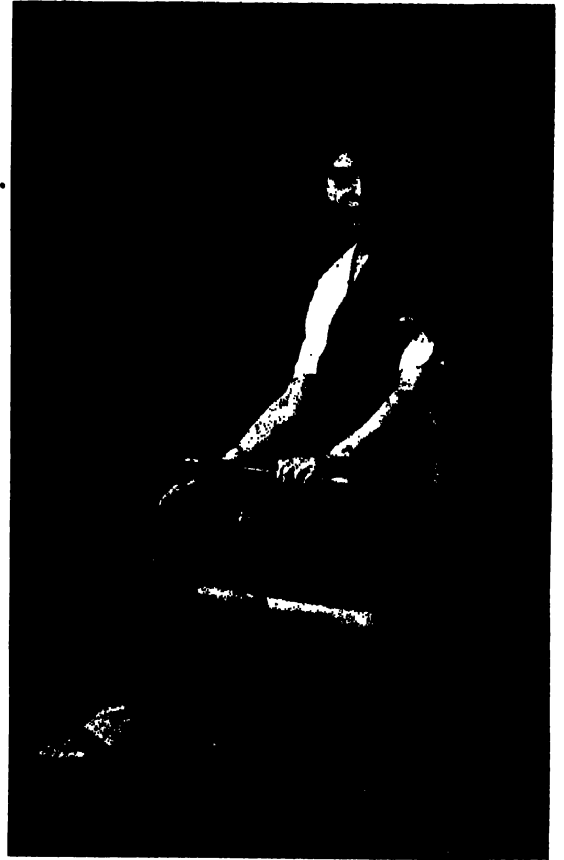
শ্রীমতী শান্তা বাসুদেব সুখটঙ্কর—ইনি ইন্দোরের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ ভি-এ সুখটঙ্কর পি-এইচ-ডির কন্যা, এই বৎসর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে অনার্স লইয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং 'জোন্স্ মিউনিসিপাল মেডেল' পাইয়াছেন। ইনি ইন্দোরের চন্দ্রাবতী মহিলা বিদ্যালয় হইতে সংস্কৃতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তারপর লক্ষ্ণৌএর ইসাবেলা থবার্ণ কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষা পাশ করেন।

গণেশ

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

'সিদ্ধিদাতা গণেশ'—একথায় হিন্দু মাত্রেরই প্রগাঢ় আস্থা। সকল বিপদ-আপদে গণেশের নাম লইলে বিপত্তি নাশ হইয়া যায়। কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার সময়, পুস্তক লিখিবার সময়, গৃহনির্ম্মাণ-কালে, সকল কাজের সূচনায় গণেশ নাম লইতে হয়। হিন্দু যাত্রা করিবে গণেশকে নমস্কার করিয়া। কারবারী তার কর্ম্মস্থলে সিন্দুর দিয়া লিখিবে "সিদ্ধিদাতা গণেশ"—"গণেশায় নমঃ"। ওঁকার ও অথকারের ন্তায় আরব্ধ কার্য্যে কোন বিপত্তি না হয় তজ্জন্ত বিঘ্নবিনাশন গণপতির আরাধনা একান্ত আবশ্যক বুঝিয়া সকল হিন্দুই গণেশের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকেন। গণেশের নামে সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য; কাজেই সিন্দুর-লিপ্ত গণেশের মূর্ত্তি ভারতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। দাহকার্য্য ব্যতীত সকল অনুষ্ঠানেই গণেশকে ডাকা হইয়া থাকে। পঞ্চদেবতার পূজায় প্রথমেই গণেশের পূজা করিতে হয়। শ্রীবৈষ্ণব ছাড়া সকল সম্প্রদায়ই গণেশকে মানিয়া চলে। আমাদের দেশে অন্যান্ত পূজার ন্তায় গণেশপূজা প্রসারলাভ না করিলেও সমস্ত দেবতার পূজার পূর্ব্বে গণেশের পূজার প্রয়োজন। পুরাণ-কারও একথা বলিতে ছাড়েন নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আমাদের প্রধান দেবতা। শিবপুরাণ (জ্ঞান-সংহিতা, ৩৪ অধ্যায়) এই তিন দেবের মুখ দিয়া গণেশপূজা উপলক্ষ্য করিয়া বলাইয়াছেন—"এতৎপূজাং পুরঃকৃত্বা পশ্চাৎ পূজ্যা বয়ং নরৈঃ।" সর্ব্বাগ্রে গণেশ-বন্দনা চাই। গণেশের বর্ণ লোহিত, আর সিন্দুরও লোহিত বর্ণের, কাজেই সিন্দুর দিয়াই তাঁহার পূজা করিতে হয়।

'তস্মাৎ ত্বং পূজনীয়োসি সিন্দুরেণ সদা নরৈঃ"

গণেশের অনেক নাম। সারদাতিলকে একান্ন রকম গণেশের মূর্ত্তির আলোচনা আছে। মুদ্গলপুরাণে বত্রিশ রকম গণপতির রূপ বিবৃত আছে। এই সমস্ত গণপতির গুণও অনেক প্রকারের। আপাততঃ দিগ্‌দর্শন হিসাবে উদাহরণ-স্বরূপ দুইটী গণেশ-মূর্ত্তির বিবরণ চিত্রসহ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

কেবল-গণেশ—কেবল-গণেশের হস্তে পাশা-ঙ্কুশাদি দেখিতে পাওয়া যায়। আর একরূপ গণেশ-মূর্ত্তি আছে। উহার হস্তেও পাশাঙ্কুশাদি থাকে। তিনি হইলেন 'নৃত্ত-গণেশ'। কেবল-গণেশের প্রাচীন মূর্ত্তি
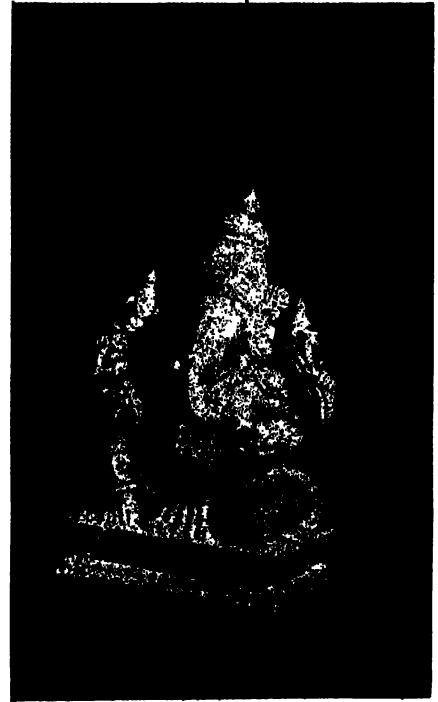
কেবল গণেশ

নাই। যে মূর্ত্তিটি দেওয়া হইল উহা গজদন্ত-নির্ম্মিত। গোপীনাথ রাওএর গ্রন্থে এই গণেশের চিত্র আছে। ইহার ধ্যান কিন্তু পাওয়া যায় না।

উচ্ছিষ্ট-গণেশ—উচ্ছিষ্ট-গণেশের মূর্ত্তি পদ্মাসনে সমাসীন। ক্রিয়াক্রমদ্যোতির বচনানুসারে এই মূর্ত্তির হস্তে

—পদ্ম,দাড়িম্ব,বীণা,ধান্য ও অক্ষমালা থাকিবে, মন্ত্র-মহার্ণব-মতে এই গণেশের হস্তে বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ থাকিবে। মূর্ত্তিটার বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ। উচ্ছিষ্ট-গণেশ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ; সুতরাং বহুবিধ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অনেকে এই গণেশের
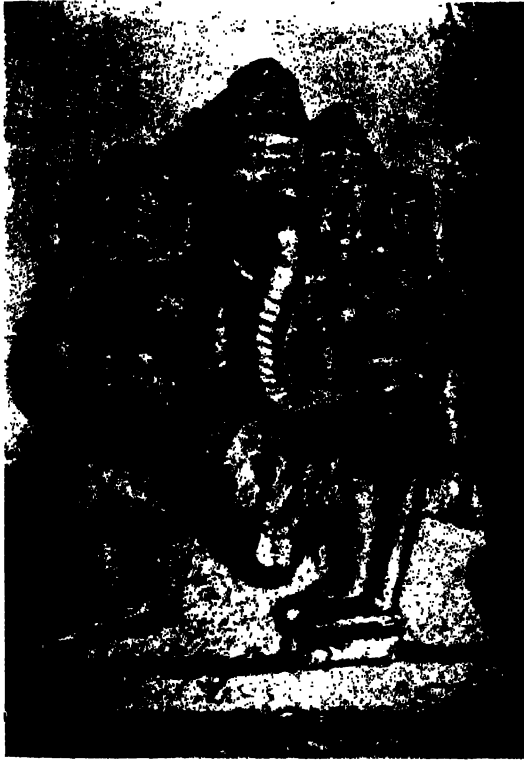
উচ্ছিষ্ট-গণেশ

পূজা করিয়া থাকে। এই গণেশের অঙ্কে দেবীমূর্ত্তি। দেবীমূর্ত্তির নাম বিঘ্নেশ্বরী। বিঘ্নেশ্বরী সর্ব্বাভরণভূষিতা, নগ্না, দ্বিভুজা। উত্তরকামিকাগমে উচ্ছিষ্ট-গণেশমূর্ত্তির যথাযথ বর্ণনা আছে। ইহার মতে মূর্ত্তিটি সমাসীন অবস্থায় থাকিবে, ইহা চতুর্ভুজ। তিন হস্তে পাশ, অঙ্কুশ ও ইক্ষুদণ্ড, অপর হস্তে নগ্নাদেবীকে ধারণ করিয়া আছে। মূর্ত্তি—কৃষ্ণ ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট। এই মূর্ত্তি মস্তকে মুকুট ধারণ করিবে। গ্রন্থে উচ্ছিষ্ট-গণেশের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার সহিত ক্ষোদিত মূর্ত্তির বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্ছিষ্ট-গণেশের যতগুলি মূর্ত্তি আছে তাহাদের প্রত্যেক গণেশেরই অঙ্কে নগ্না দেবী-মূর্ত্তি—গণেশের দুইহস্তে পাশ ও অঙ্কুশ—একহস্তে লড্ডুক এবং আর একহস্তে তিনি দেবীর কটিদেশ ধারণ করিয়া আছেন। দেবীর হস্তে পদ্ম। ধ্যান যথা—

লীলাব্জং দাড়িমং বীণাশালী পুচ্ছাক্ষসূত্রকম্।
দধদুচ্ছিষ্টনামানং গণেশং বীরমেব চ॥

(ক্রিয়াক্রমদ্যোতি)

শরং ধনুঃ পাশসৃণী স্বহস্তৈর্দধানমারক্তসরোরুহস্থং।
বিবস্ত্রপত্ন্যা সুরতপ্রবৃত্তমুচ্ছিষ্টমম্বাসুতমাশ্রয়েঽহং॥
চতুর্ভুজং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং পাশাঙ্কুশৌ মোদকপাত্রদন্তৌ।
করৈর্দধানাং সরসীরুহস্থমুন্মত্তমুচ্ছিষ্টগণেশমীড়ে॥ *

(মন্ত্র-মহার্ণব)

পুরাণকারেরা গণেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা-রকমের বিবরণ দিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ এবং দক্ষিণ-ভারতের সুপ্রভেদাগম গণেশের বহু কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তন্ত্রেও গণেশের অনেক কথা আছে। এসমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, বিনায়ক সূর্য্যমন্দিরে পূজিত হইতেন। নেপাল রাজ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই অদ্যাপি সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভের জন্য কার্য্যের প্রারম্ভে বিনায়কের আরাধনা করিয়া থাকে। নেপালীরা বৌদ্ধধর্ম্ম একরকম মানিয়া লইয়াছে। তাহারা নাগ-পূজা করে, বৌদ্ধদেবতা ও মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের পূজা করে। হিন্দুদেবতা গণেশ ও কৃষ্ণের খাতিরও তাহাদের নিকট খুব বেশী। বিনায়ক নাম অবলম্বন করিয়া জাপানীরা গণেশের নাম দিয়াছে—'বিনয়কিয়'। শ্যামদেশের মন্দিরে গণেশ-মূর্ত্তি আছে। চম্পায় স্কন্দ ও গণেশ-মূর্ত্তি বিরল। নাত্রঙ্ (Nhatrang) নামক স্থানে গণেশের (শ্রীবিনায়কের) একটি মন্দির ছিল। এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বোরোবোদর হইতে অতি অল্প দূরে বনোন নামক স্থান। এখানে শৈবমন্দির আছে। কলসনের নিকটে প্রম্বনম্ নামক স্থানে শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে আটটি মন্দির আছে। সেগুলির মধ্যে চারিটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও নন্দির। শিবের মন্দিরটিই

* Gopinath Rao লিখিত 'Elements of Hindu Iconography Vol. I. হইতে উদ্ধৃত।

সকলের চেয়ে বড় এবং সকলের চেয়ে ভাল কারুকরা। এই মন্দিরের সংলগ্ন হইয়া চারিটি মন্দির আছে। চারিটি মন্দিরে চারিটি মূর্ত্তি—মহাদেবের মূর্ত্তি, গুরুমূর্ত্তি, গণেশমূর্ত্তি ও দুর্গামূর্ত্তি।

সিঙ্গসরি মন্দিরের একদিকে প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী, তারা, অপরদিকে গণেশ, গুরু, নন্দীশ্বর, মহাকাল প্রভৃতি মূর্ত্তিতে শিব, দুর্গা ও ব্রহ্মা।

বলিদ্বীপবাসীরা বলে তাহাদের সঙ্গে মজপহিত (Madjapahit) ও হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। তাহাদের শিল্পেও হিন্দুদেবতাদের নাম আছে। গণেশ, ইন্দ্র, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, সূর্য্য, গরুড়, শিব—এই সমস্ত দেবতার নাম তাহাদের নিকট বিশেষ পরিচিত। কিন্তু তাহারা শিব (লিঙ্গ) ও দুর্গা ব্যতীত কোন দেবতার পূজা করে না। ভারতবর্ষে যত গণেশমন্দির আছে তাহাদের মধ্যে পুনা এবং মহাবলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী ওয়া-ই- (Wa-i) নামক স্থানে গণেশমন্দির সকলের চেয়ে বড়। এই মন্দিরে গণেশের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। যে সে আসিয়া এই গণেশের পায়ে জল ছোয়াইয়া যায়। কোন বাধা নাই। ত্রিচিনপল্লীর পাহাড়ের উপর আর একটি বড় গণেশমন্দির আছে।

শুধু গণেশের পূজা করে এমন সম্প্রদায় বড় একটা দেখা যায় না। পূর্ব্বে গাণপত্যেরা ছয়টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। শঙ্করবিজয়ে পাওয়া যায় তাহারা ছয় রকম গণেশের পূজা করিত। ছয় সম্প্রদায় মহাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্ট বা হেরম্ব-গণপতি, স্বর্ণগণপতি এবং সন্তান-গণপতি এই ছয় গণপতির পূজা করিত। বারাণসীধামে এক গণেশ আছেন, তাঁহাকে লোকে ঢুণ্ডিরাজ বলে। যে কেহ বারাণসীর পঞ্চক্রোশীতে মন্দির দর্শন করিতে যান তাঁহাকে সাক্ষী-বিনায়ক দেখিয়া আসিতে হয়। সাক্ষী-বিনায়ক ঢুণ্ডিরাজের অপর রূপ।

কাহারও কাহারও ধারণা গণেশপূজা অতি আধুনিক। তাঁহারা বলিয়া থাকেন রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে শিবের একটি স্তোত্র আছে। এই স্তোত্রে শিবকেই গণেশ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এ গণেশ শিব ছাড়া আর কেহ নন। কেননা, শিবের অনুচরদের 'গণ' বলা হয়। রামায়ণে পৃথক্‌ভাবে কোন দেবতার উল্লেখ নাই। পঞ্চতন্ত্র খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গ্রন্থ। ইহাতে সিদ্ধিদাতা দেবতাদের প্রণাম আছে; কিন্তু সেই দেবতাদের মধ্যে গণেশের নাম নাই। বৎস, ভট্টি, কালিদাস, ভারবি—ইঁহাদের গ্রন্থেও গণেশের নাম নাই। ইঁহাদের সময়ের কোন শিলালিপিতেও গণেশের নাম নাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গভূমির শুভ-কামনায় অনেক দেবতার পূজার ব্যবস্থা আছে। দেবতাদের ফিরিস্তিও খুব লম্বা, কিন্তু তাহাতেও গণেশের নাম নাই।

উত্তরপ্রদেশের কবি বাণভট্টের কাদম্বরীতে পাওয়া যায়—"অবকীর্ণভস্মসূচিত-মগ্নোত্থিত-গণবৃন্দোদ্ধূলনম্ অব-গাহাবতীর্ণ-গণপতি-গণ্ডস্থলগলিত-মদপ্রস্রবণ-সিক্তম্।"

এখানে 'গণ'দের অধিপতি ও সহচর গণপতির উল্লেখ করা হইয়াছে। গন্ধর্ব্ব, কিন্নরদের কথাপ্রসঙ্গে গণপতির নামকরণ হইয়াছে। এই সমস্ত অজুহাতে শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় (বঙ্গদর্শন, ১৩১০, পৃঃ ৩৮৯) গণেশকে আধুনিক দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু গণেশ যে আধুনিক দেবতা নন অতি প্রাচীন সাহিত্যে ও মূর্ত্তিতত্ত্বে তাহার প্রমাণ আছে। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। 'গণ'দিগের অধিপতি বলিয়া গণপতি, গণেশ এই নাম। 'গণ' বলিলে আমরা কি বুঝি?—গণ বলিলে বোঝায় রুদ্রের গণ, প্রমথ। মরুৎ যাহারা তাহারাও রুদ্রগণ। ইহাদের আকৃতির বর্ণনা কিছু উদ্ভট রকমের। ইহাদের অনেকেরই মুণ্ড কোন-না-কোন জন্তুর। গণপতি শব্দ খুব প্রাচীন। ঋগ্বেদে দুইবার গণপতি শব্দের প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মণ্ডলে (২৩,১)—

> গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে
> কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
> জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত
> আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্॥

বেদে আমরা গণদিগকে যেমন পাই, গণপতিকেও সেইরূপ পাই। ঋগ্বেদের এই গণপতি কিন্তু গণদিগের অধীশ্বর ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ), ব্রহ্মণস্পতি, বৃহস্পতি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১ পঞ্চিকা, ৪খণ্ড, ৩ অঃ, ১ পটল)। ইহার পর আমরা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গণপতিকে পাই।

এ গণপতি কিন্তু আমাদের গণেশ না হইয়া যায় না। তিনি সেখানে "বক্রতুণ্ড ও দন্তি" ;—সুতরাং আমাদের গণেশ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্র এইরূপ—

পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ ॥
তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি।
তন্নঃ ষন্মুখঃ প্রচোদয়াৎ ॥
কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারী ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

এই মন্ত্রগুলিতে মহাদেব, গণেশ, নন্দি ও দুর্গার স্তুতি াছে। এই গ্রন্থকে যতই এদিকে টানিয়া আনা হউক া কেন, আড়াই হাজার বছরের পরে কিছুতেই ফেলিতে ারা যাইবে না।

গণেশ বোধ হয় প্রথম প্রথম বিঘ্নেরই দেবতা ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই বিঘ্নদেবের বেশ একটু পরিচয় আছে। গায়কোয়াড় হইতে সাধনমালা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ াধনমালায় দেখিতে পাওয়া যায় 'গণেশ', 'বিঘ্ন'নামে াখ্যাত হইয়াছেন। বিঘ্নের মূর্ত্তি ও আমাদের গণেশের র্ত্তিতে কিছুই পার্থক্য নাই। এই বিঘ্ন স্বীয় গণসহ বচরণ করে একথাও সাধনমালা হইতে বুঝিতে পারা ায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা এক বিঘ্নান্তক দেবের কল্পনা রিয়াছেন। তাঁহারা বিঘ্নবিনাশনকারী কল্যাণদাতা ঘ্নান্তক দেবের দ্বারা বিঘ্ন বা গণেশের দুর্দ্দশার চূড়ান্ত রিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বিঘ্নান্তকের একটি র্ত্তি রক্ষিত আছে। ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য-কৃত বৌদ্ধমূর্ত্তিতত্ত্বেও গণেশের অবমাননার এই চিত্রটি প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে 'গণেশহৃদয়া' নামে গণেশের অঙ্ক-শায়ীরও একটি চিত্র আছে। ধর্ম্মকোষসংগ্রহে বিঘ্নান্তকের ণেশ-শাসনের একটি আখ্যায়িকা আছে। নেপালেও এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একসময়ে একজন ওড়িয়ান বজ্রাচার্য্য সিদ্ধিলাভের জন্য কাঠমাণ্ডুর নিকটে বাগমতী-নদীতটে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া করিতেছিলেন। গণেশের স্বভাব বিঘ্ন উৎপাদন করা। এক্ষেত্রেও তিনি তাই করিলেন। ওড়িয়ান পণ্ডিত নিরুপায় দেখিয়া বিঘ্নান্তকের স্তুতি করিতে লাগিলেন। বিঘ্নান্তক তন্মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইয়া গণেশকে পদদলিত করিলেন। গণেশ কোনরকমে পলাইয়া বাঁচিলেন। ধর্ম্মকোষসংগ্রহের কাহিনী একটু অন্যরূপ। নিম্নে বিঘ্নান্তকের চিত্র প্রদত্ত হইল।

বিঘ্নান্তক দেব

কলিকাতার প্রত্নশালায় পর্ণশবরীর একটি ভগ্নমূর্ত্তি আছে। ইঁহার তিন মুখ, ছয় হাত। ইনিই গণেশকে নির্য্যাতিত করিয়াছেন। পর্ণশবরীর ধ্যান এইরূপ—

"ভগবতীং পীতবর্ণাং ত্রিমুখাং ত্রিনেত্রাং ষড়্‌ভুজাং প্রথমমুখং পীতং, দক্ষিণাং সিতং, বামং রক্তং, ললিতহাসিনীং সর্বালঙ্কারধরাং পর্ণপিচ্ছিকাবসানাং নবযৌবনোদ্ধতাং পীনাং, দক্ষিণভুজৈঃ বজ্রপরশুশরধারিণীং, বামভুজৈঃ সতর্জনীকাপাশপর্ণপিচ্ছিকা ধনুর্ধারিণীং পুষ্পাববদ্ধজটা-

বিদেশ
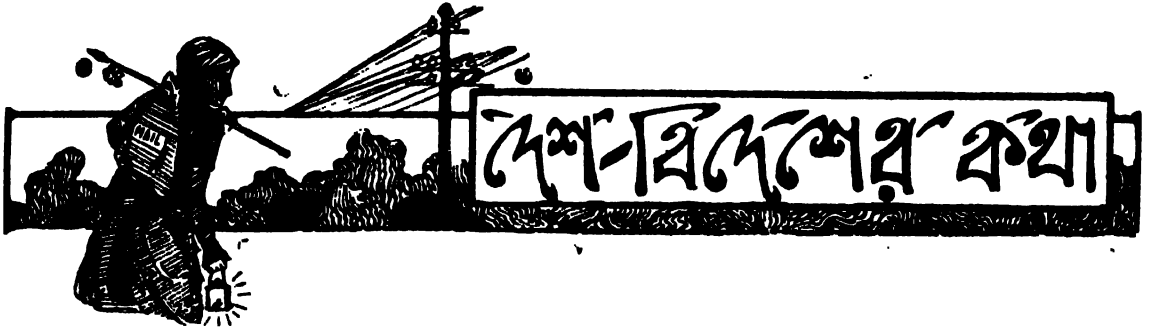
আফগানিস্থানে নাদির খাঁর জয়—

বাচ্চা-ই-সাকাউ ওরফে আমীর হবিবুল্লা নিজেকে কাবুলের আধিপত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেও সমস্ত আফগানিস্থান তাহার আধিপত্য স্বীকার করে নাই। পশ্চিমে দুররাণী, পূর্ব্বে মঙ্গাল্

বাচ্চা-ই-সাকাউ ওরফে আমীর হবিবুল্লা

প্রভৃতি জাতি তাহার অধীনতা স্বীকার করে নাই। গার্দ্দেজে জেনারেল নাদির খাঁ সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া হবিবুল্লাকে রাজচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত অর্থ ও লোকের অভাবে তাঁহার চেষ্টার কোনও ফল হয় নাই। সম্প্রতি চারিদিকেই আবার আমীর হবিবুল্লার পরাজয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমে দুররাণীগণ কান্দাহার অধিকার করিয়াছে, পূর্ব্বে নাদির খাঁ কাবুল আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে হবিবুল্লা নাদির খাঁ গার্দ্দেজ আক্রমণ করিবে আশঙ্কা করিয়া সাতশত সৈন্য ও অনেক গোলাগুলি সেদিকে পাঠাইয়াছিল। নাদির খাঁ ইহাদিগকে পরাজিত সমুদয় গোলাগুলি দখল করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যথাসম্ভব শীঘ্র কাবুল আক্রমণ করা।

এদিকে নাদির খাঁর জয়ের সংবাদ শুনিয়া ব্রিটিশ সীমান্তে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যস্থিত ওয়াজির প্রভৃতি জাতি নাদির খাঁর সহিত যোগ দিতে চাহিতেছে। সেইজন্য সীমান্তের কমিশনার প্রভৃতি রাজনৈতিক কর্ম্মচারীদিগকে অতিশয় সতর্ক থাকিতে হইতেছে। পেশোয়ারেও হবিবুল্লা নিহত হইয়াছে এই সংবাদে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

—

ভারতবর্ষ

হরবিলাস শারদার বিবাহবিষয়ক আইন—

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রায়সাহেব হরবিলাস শারদার বিবাহ ও সম্মতি বিষয়ক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। ভোটের সময়ে ৬৭ জন সদস্য উহার পক্ষে ও ১৪ জন উহার বিপক্ষে ভোট দেন। যাঁহারা বিপক্ষে ভোট দেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, ডাঃ শ্রীযুক্ত বি-এস্ মুঞ্জে, শ্রীযুক্ত এন্ সি কেলকার। কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটও এই বিলটি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইঁহাদের এবং অন্যান্য যাঁহারা এই আইনটির বিরোধী—তাঁহাদের কার্য্য একেবারে অযৌক্তিক অথবা কপটতাপ্রসূত একথা বলিবার অধিকার কাহারও নাই। বিবাহের বয়স সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া অসম্ভব নয় এবং বহুযুগব্যাপী সংস্কার শুধু একটি আইন পাশ হইলেই দূর হইয়া যাইবে না। তবুও একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রেই এই আইনটির সমর্থন করিবেন। স্ত্রীশিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অকালবৈধব্যের দিক হইতে এই আইনটি পাশ হওয়ার ফলে অনেক উপকার হইবে।

—

বাংলা

যতীন্দ্রনাথ দাসের শেষ যাত্রা—

যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মবলিদানের ফলে দেশে যে আবেগচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে তাহাকে সাফল্য দান করিবার জন্য এবং তাহার স্মৃতিকে

যতীন্দ্রনাথ দাসের শেষযাত্রা হাওড়া পুলের দৃশ্য

চিরস্থায়ী করিবার জন্য "যতীন্দ্রনাথ স্মৃতিভাণ্ডার" নামে একটি ভাণ্ডার খোলা স্থির হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী এই প্রস্তাব কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। নী.চ তাঁহার আবেদনটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মাতৃভূমির বেদীমূলে যতীন্দ্রনাথ দাসের মহান আত্মাবদানের ফলে ভারতের সর্বত্র একটা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসী আজ মনে করিতেছেন যে, আত্ম-দাতা বীরের পবিত্র স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত অবিলম্বে তাঁহার যথাযোগ্য স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এতদুদ্দেশ্যে 'নিখিল ভারত যতীন্দ্রনাথ স্মৃতিভাণ্ডার' নামে একটি ভাণ্ডার খোলা স্থির হইয়াছে এবং এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রতিনিধি-মূলক একটি নিখিল ভারতীয় কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হইবে স্থির হইয়াছে :—

(১) শ্মশানঘাটে—যেখানে যতীন্দ্রনাথের শব সৎকার হইয়াছে, তথায় একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ।

(২) কলিকাতার কোন একটি বড় পার্কে যতীন্দ্রনাথের অর্দ্ধাবয়ব অথবা পূর্ণাবয়ব মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

(৩) লাহোরে একটি স্মৃতিমন্দির গঠন।

(৪) পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ লইয়া এরূপ একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা, যে সমিতি কতকগুলি কর্ম্মীকে শিক্ষিত করিবেন এবং প্রতিপালন করিবেন। এই সব কর্ম্মী বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া মাতৃভূমির সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবেন। সকল দিক হইতে ভারতের জন-গণকে স্বরিতগতিতে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যে এই সমিতির কর্ম্ম তৎপরতা প্রযুক্ত হইবে। দেশ সেবার জন্য নারী কর্ম্মীদিগকে শিক্ষিত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইবে। এইরূপ ধরণের একটি সমিতির আবশ্যকতা ভারতে, বিশেষভাবে বাঙ্গালাদেশে অত্যন্তই অধিক। বাঙ্গালাদেশে আজ পর্য্যন্তও পুনার সার্ভেন্টস্-অব-ইণ্ডিয়া সোসাইটি অথবা লাহোরের সার্ভেন্টস্-অব-দি-পিপল সোসাইটির মত কোন সমিতির গর্ব্ব করিতে করিতে পারে না। এই স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য অন্ততঃ দুই লক্ষ টাকা আবশ্যক হইবে। ঐ টাকার ভিতর হইতে আন্দাজ ১৫ হাজার টাকা প্রথম তিনটি বিষয়ের জন্য ব্যয় করা হইবে, বক্রী টাকা চতুর্থ বিষয়টির জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করা হইবে।

নিখিল ভারত যতীন্দ্রনাথ দাস স্মৃতিভাণ্ডারে উদার হস্তে অর্থ-সাহায্য করিয়া কার্য্যকরভাবে মহান্ আত্মদাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত আমরা আমাদের দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

(স্বাক্ষর) বাসন্তী দেবী
প্রেসিডেণ্ট এবং কোষাধ্যক্ষ
'নিখিল ভারত যতীন্দ্রনাথ দাস স্মৃতি ভাণ্ডার'
আফিস— ১১৩নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

এতদ্ব্যতীত গত ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার একটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে যতীন্দ্রনাথ

দাসের স্মৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নলিখিত কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় :—

"যতীন্দ্রনাথ দাসের যথাযোগ্য স্মৃতি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা যাইতেছে। এই কমিটি বিভিন্ন প্রদেশে অর্থ সংগ্রহ করিবেন এবং অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত ও হিসাবপত্র রাখিবার জন্য যদি আবশ্যক হয়, এই কমিটি বেতন ভোগী একদল কর্ম্মচারী এবং একজন অডিটর নিয়োগ করিতে অধিকারী হইবেন।"

শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি—

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চতুঃপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎচন্দ্র সমিতি শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার জন্য ফিজিক্স হলে এক সভার আয়োজন করিয়াছেলেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহু অধ্যাপক, ছাত্র এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ছাত্রগণের অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র যাহা বলেন তাহাতে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক যথার্থ কথা ছিল। আমরা তাহার কিয়দংশ 'নবশক্তিতে' প্রকাশিত বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"অনেক দিন পূর্ব্বে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান সাহিত্যের ভাবধারা সম্বন্ধে একটু কঠোর ভাবেতেই তাঁহার মতামত প্রকাশ করেন। তদুত্তরে আমি মাসিক "বঙ্গবাণী"তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। ইহাতে আমি রবীন্দ্রনাথের ঠিক প্রতিবাদ করি নাই, বরং সবিনয়ে তাঁহাকে জানাই—তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যতটা বলেছেন ঠিক ততটাই সত্যি কি না ?

কিন্তু তাতে অনেকে বল্লেন, আমি যতটা বলেছি, ততটা বলা ঠিক হয় নি। যাক্ তারপর বিভিন্ন মাসিকে বহু সাহিত্য রচনা প্রকাশিত হয়েচে। সে সব আমি পড়েছি। তাই আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এ জিনিষটা অত্যন্ত গ্লানির বস্তু হয়ে উঠচে।

আমি ছেলেদের ভালবাসি, এবং আমার বিশ্বাস ছেলেরাও আমাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে। কিন্তু একথা অস্বীকার করতে পারছি না যে, তারা বর্ত্তমানে যে সাহিত্য গড়ে তুলচে, তাতে রস থাকে না, গ্লানি থাকে।

অবশ্য যৌবনে যা ভাল লাগে বার্দ্ধক্যে তা লাগে না, যৌবনের ধর্ম্ম আলাদা, চিন্তা আলাদা, কর্ম্ম আলাদা, কিন্তু এ ধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করতে হলেও মন-শুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে চাই। তাই ভেবেছিলাম, তরুণগণ শুদ্ধ মন নিয়ে আন্তরিক ভাবে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হবে।

কিন্তু আজ এক বৎসর পরে আমার পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তিত হয়েচে; মন তিক্ত হয়ে উঠেচে। আজ চোখ মেলে চাইলেই দেখা যায় মানুষের যত বৃত্তি আছে, তার মাত্র একটিরই বার বার আবৃত্তি এঁরা করেচেন। আমি এ বিষয়ে তরুণ সাহিত্যিকদের কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাতে তাঁরা বলেছিলেন, "আমাদের অন্য কোন scope নেই অন্য কোন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র আমরা পাই না।"

আর তার প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম—এ সমাজে অনেক দুঃখক্রটী আছে সত্য, কিন্তু এ জীবনে আরও বেদনা আছে। তা কি তোমরা দেখতে পাও না ? আমাদের পরাধীনতা, অজ্ঞতা বা দারিদ্র্যের বেদনা কি তোমাদের প্রাণে লাগে না ? আর সমাজেও ত অন্ত-বিধগ্লানি আছে, তারও ত কৈ আলোচনা হয় না ? তোমাদের সাহস আছে মানি, কিন্তু যেখানে সাহস প্রকাশে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেদিকে যেন তোমরা সমস্তই অস্বীকার করে চল।

তার উত্তরে তাঁরা বল্লেন—ওসব দিক্ সাহিত্যের নয়, তাছাড়া আমরা ওসব পড়ি না।

আমাকেও তাঁরা বলেছিলেন যে, আমি অন্য কাজে যাওয়ায় নাকি সাহিত্যের ক্ষতি হচ্ছে। অবশ্য কিছু ক্ষতি হয়ত হয়েছে। কিন্তু আমার দিনও শেষ হয়ে গেছে। তোমরা তরুণ, তোমরা এদিকে অগ্রসর হও। কেন ? আমার ত অন্য দেশের সাহিত্য কিছু কিছু পড়া আছে তাতেও দেখতে পাই, শুধু একটা দুঃখ বা একটা সমস্যা নয় সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন দিকের, বিবিধ সমস্যার আলোচনা তাঁরা তো বেশ প্রাণস্পর্শী ভাবেই করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ যত কড়া ক'রে এ কথা বলেছিলেন, তত কড়া করে বল্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। তা থাকলে সেরূপ ভাবেই আমি তার নিন্দা করতাম।

মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি—

মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনজন ভারতীয় ছাত্রকে বৃত্তি দিয়াছেন। এবৎসর তিনজন বাঙ্গালী এই বৃত্তি পাইয়াছেন; তাঁহাদের নাম—(১) ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইনি ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন; (২) শ্রীযুক্ত কালিপদ বসু (ঢাকা বিশ্ব-

শ্রীত্রিগুণাচরণ সেন

বিদ্যালয়) পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন, (৩) ইঞ্জিনীয়ারীং সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য যে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে সেইটি পাইয়াছেন বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অফ এঞ্জিনিয়ারীংএর (যাদবপুর) ছাত্র শ্রীযুক্ত ত্রিগুণাচরণ সেন। ইনি মিউনিকের 'টেকনিশে হখ্‌শুলেতে অধ্যয়ন করিবেন।

"রাজধর্ম্ম"

রবীন্দ্রনাথের নূতন প্রকাশিত "পরিত্রাণ" নাটকে মহারাজা প্রতাপাদিত্য একস্থানে বলিতেছেন –

"রাজ্য-রক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী। অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হ'লে তা'র পরে দণ্ড দেওয়াই-যে রাজার কর্ত্তব্য তা আমি মনে করি নে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিংবা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।"

এই "রাজধর্ম্ম" বর্ত্তমান খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতেও এদেশে আচরিত হইয়া থাকে। বঙ্গের অনেক কর্ম্মীকে সন্দেহে, কিংবা পরে তাহাদের দ্বারা অপরাধ হইতে পারে মনে করিয়া, বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাতে কাহারও কাহারও প্রাণহানি বা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির দ্বারা স্বাস্থ্যনাশ ও আয়ুহ্রাস হইয়াছে, কিন্তু "রাজধর্ম্ম" ত সুরক্ষিত আছে?

অন্যত্র প্রতাপাদিত্য বলিতেছেন—

"অন্যায়ের দ্বারা অবিচারের দ্বারাও রাজাকে রাজধর্ম্ম পালন ক'রতে হয়।"

তিনি পুনর্ব্বার বলিতেছেন—

"যারা মুখের ভাব দেখে, আর হায় হায় আহা উহু ক'রতে ক'রতে রাজ্যশাসন করে, তা'রা রাজা হবার যোগ্য নয়।"

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে, যে, আমাদের দেশটা সেকালে বড়ই সেকেলে ছিল—অন্ততঃ রাজনীতি বিষয়ে। কিন্তু দেখা যাইতেছে প্রতাপাদিত্যের রাজধর্ম্ম বিংশ শতাব্দীতেও খুব আপ্-টু-ডেট্ ও নব্য বিবেচিত হয়। একালেও মুমূর্ষু যতীন্দ্রনাথ দাস ও ভিক্ষু বিজয় ও মৃতপ্রায় অন্য প্রায়োপবেশকদের অবস্থা দেখিয়া রাজপুরুষেরা "হায় হায় আহা উহু" করিতে করিতে রাজ্য শাসন করেন নাই, করিতেছেন না।

—

"হয় না যেটা সেটাও হবে"

প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের মাধবপুরের প্রজাদিগকে বৈরাগী ধনঞ্জয় খাজনা দিতে বারণ করেন। তাহাতে প্রতাপ বলেন—

"দেখো বৈরাগী, তোমার চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেল্‌তে চাচ্চো? (প্রজাদের প্রতি) দেখ্ বেটারা, আমি বল্‌চি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে!" তাহাতে বৈরাগী গান ধরিলেন—

"রইলো ব'লে রাখ্‌লে কারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
(তোমার) টানাটানি টিকবে না ভাই
র'বার যেটা সেটাই র'বে
যা-খুসি তাই ক'রতে পারো—
গায়ের জোরে রাখো মারো—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা স'ন সেটাই সবে!
অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবচো হবে তুমিই যা চাও
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখ্‌বে হঠাৎ নয়ন খুলে,
হয় না যেটা সেটাও হবে!"

পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে প্রবলপরাক্রান্ত অনেক

ব্যক্তির ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়াছিল। তাহাতেও বিংশ শতাব্দীর প্রবলপরাক্রান্ত অনেকের চোখ ফুটে নাই। ইউরোপের অধিকাংশ এরূপ লোকের গত মহাযুদ্ধের সময় বা পরে দশান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এখনও কিন্তু কত দেশের রাজশক্তি ভাবিতেছে, তাহারা যা চায় তাহাই হইবে, তাহারাই জগৎটাকে নাচায়। কিন্তু "হয় না যেটা সেটাও হবে।"

—

কারাগার ও আশ্রম

ইংরাজীতে এই মর্ম্মের একটি কবিতা আছে, "পাষাণ-প্রাচীরের বেড় কারাগার নহে, শান্ত ও নিরপরাধ চিত্ত তাহাকে তপোবন মনে করে।"

লাহোরের কারাগারে যতীন্দ্রনাথ দাস যে-ভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া উপবাসের দীর্ঘ দিনগুলি কাটাইয়াছিলেন, তাহাতে কবির ঐ কথাগুলি মনে পড়ে। লাজপৎ রায় প্রতিষ্ঠিত লাহোরের "পীপ্‌ল" নামক সাপ্তাহিকে লিখিত হইয়াছে :—

Few things in recent years have stirred the popular imagination even half as much as has the martyrdom of Jatin Das. His lofty character, his stern resolve, his youthful years, his immense suffering and more immense cheerfulness with which he bore it, his calmness in the face of death, his serenity in circumstances in which those of maturer years would become ruffled, his dignified—but unobtrusive—attitude that bewitched all that came in contact with him, all these combined have given the world a noble albeit a tragic romance that deserves to form for a considerable time to come the subject of song and story.

রবীন্দ্রনাথের "পরিত্রাণ" নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীও কারাগারে বাস সম্বন্ধে গাহিয়াছেন—

"ওরে শিকল, তোমার অঙ্গে ধ'রে
দিয়েছি ঝঙ্কার!
(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা
সুখে দুঃখে কাট্‌লো বেলা
অঙ্গ বেড়ি' দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার।
তোমার পরে করিনে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার!"

—

ভয় ভাঙা

চূড়ান্ত বিপদে মানুষ যেমন অভিভূত হইতে পারে, জাতিও তেমনি অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু ইহার আর একটা দিক্ আছে, যাহা ধীরচিত্ত সাহসী লোকেরা দেখিতে পান, সেই দিক্‌টির কথা "পরিত্রাণ" নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর একটি গানের শেষে পাওয়া যায়।

"সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থাকি
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি
দুঃখে যে-সুখ থাকে বাকি
কেই-বা সে সুখ নাড়বে?
যে পড়েচে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েচে তলায় এসে,
ভয় মিটেচে, বেঁচেচে সে,
তা'রে কে আর পাড়্‌বে।"

—

শক্তি-পূজা

"প্রবাসী" সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের এবং নানাবিধ পূজাপদ্ধতির আলোচনার কাগজ নহে। কিন্তু কখন কখন সেরূপ আলোচনা হইয়া থাকে। সম্পাদকীয় ভাবে আমরা তাহা না করিতে চেষ্টা করি। অন্য লোকে তাহা করিলে কখন কখন আমরা সেরূপ আলোচনা ছাপিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী দুর্গাপূজায় বলিদানের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় মত সমেত একটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন। আমরা এখন অন্য রকমের একটি-কথা বলিতে যাইতেছি

দুর্গাপূজা প্রধানতঃ বাংলা দেশেই মহাসমারোহে

সম্পন্ন হয়। এই সময়ে নানাস্থান হইতে একপরিবারভুক্ত লোকদের একত্র সমাগম হয়। তাহাতে সকলে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করেন। এখন অনেকে পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যের অন্বেষণে, দেশভ্রমণের জন্য, বা আমোদ-প্রমোদের জন্য নিজ নিজ গ্রামে না গিয়া অন্যত্র গিয়া থাকেন। তাহা হইলেও, এখনও শারদীয় অবকাশে আত্মীয়-বন্ধুগণের মিলন হইয়া থাকে।

ইহা সুখকর ও হিতকর হইলেও ইহা দুর্গাপূজার গৌণফল। মুখ্যত: ইহাকে শক্তিপূজা বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা এই পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এখন আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্মপরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে হইবে, যে, তাঁহারা বাস্তবিকই শক্তির পূজা করেন, না আমোদ-প্রমোদ করেন? যদি তাঁহারা মনে করেন, যে, শক্তির পূজাই তাঁহারা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, তাঁহারা দুর্ব্বল কেন, জাতি দুর্ব্বল কেন, জাতীয় দুর্ব্বলতার জন্য দেশ পরাধীন কেন, সমাজ নিজের দোষত্রুটি বুঝিয়াও স্বয়ং তাহার সংশোধন কেন করিতে পারেন না, দেশে সমুদয় নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের উপকরণ থাকিতে সেই সব জিনিষ আমাদিগকে কেন বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এই-সব প্রশ্ন সমস্ত ভারতবর্ষের প্রশ্ন। বাংলা দেশকে তাহার উপর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এই দেশের বড় ও ছোট অধিকাংশ ব্যবসাবাণিজ্য ও শ্রমিকের কাজ কেন বাঙালীর হাতছাড়া হইয়া অন্য লোকদের হাতে গিয়াছে, বাঙালী কেন শ্রম ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরাস্ত হইয়াছে। ইহার প্রতিকার হইতে পারে না, এমন নয়। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার উচ্ছেদ করিয়া কত দেশ কত যুগে যখন স্বাধীন হইতে পারিয়াছে, তখন বাণিজ্যিক ও শ্রমিক পরাধীনতারও উচ্ছেদ সাধন করা অসম্ভব নহে। তাহার জন্য উপায়-নির্ণয় এবং উপায় অবলম্বনের নিমিত্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

ব্যাকরণ অনুসারে শক্তি নারী এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসারেও শক্তি দেবী। দেবী রূপেই তিনি বঙ্গে ও হিন্দু ভারতবর্ষের অন্যত্র পূজিত হন। অথচ যাঁহারা শক্তির পূজা করেন, তাঁহারা দেখিতেছেন, বঙ্গের এমন জেলা নাই যেখানে নারীর চূড়ান্ত অবমাননা এবং নারীর উপর অতি জঘন্য অত্যাচার না হইতেছে এবং এই অত্যাচার ও অবমাননা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে। এই নিগ্রহ হইতে পুরুষেরা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, নারীরাও আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

পরিতাপের সহিত, লজ্জার সহিত মাথা হেঁট করিয়া বলিতে হইতেছে এরূপ অবস্থা শক্তি-পূজার পরিচায়ক নহে। সকলে গভীর ভাবে চিন্তা করুন, কেমন করিয়া বাস্তবিক শক্তির পূজা করা যায় এবং তাহার দ্বারা শক্তি অর্জ্জন করা যায়।

—

পূজার ছুটি

পূজার ছুটিতে অনেক প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত লোক এবং অনেক ছাত্র নিজের নিজের গ্রামে যাইবেন। গ্রামের কথা বলিতেছি এইজন্য, যে, বাংলা দেশে শহরের সংখ্যা খুব কম, বাংলা গ্রামবহুল দেশ। গ্রামে গিয়া তাঁহারা যদি গ্রামের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অবস্থা উন্নত করিবার কিছু চেষ্টা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাঁহারা সামাজিক ঋণ কিছু শোধ করিতে পারিবেন।

আর একটি দিকে তাঁহাদের নজর পড়ে, এই অভিলাষ আছে।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেও দেশে কতক লোক নিরক্ষর ছিল এবং কতক লোকের লিখিবার পড়িবার ক্ষমতা ছিল। এইজন্য তখনও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য ছিল। এবং তখন খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসা প্রভৃতি বিষয়ে জাতিভেদের বন্ধন এখনকার চেয়ে বেশী ছিল, ইহাও স্বীকার করা যায়। কিন্তু অন্য দিকে তখন সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এমন একটি সামাজিক ঘনিষ্ঠতা ছিল, যাহা এখন খুব কমিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ সবাই জানেন। তখন কেহ বা নিরক্ষর, কেহ বা লিখন পঠনক্ষম ছিলেন বটে; কিন্তু চিন্তার ধারা সকলের মূলতঃ একই রকম ছিল, ধার্ম্মিক ও সামাজিক মত ও

আচরণ একই রকমের ছিল। এই কারণে তখন এমন অবস্থা ছিল না, যেন নিরক্ষরেরা এক রকমের জীব এবং লিখনপঠনক্ষমেরা আর এক রকমের প্রাণী। তখনকার আমোদ-আহ্লাদ উৎসবে যাত্রাগানে সবাই যোগ দিত। তখনকার চিন্তার ধারা, মত ও আচরণ সবটাই ভাল ছিল কি মন্দ ছিল, তাহার বিচার হইতেছে না; সকলের মধ্যে তাহা এক ধরণের ছিল এবং তজ্জন্য সকলের পক্ষে হৃদ্যতার সহিত মিলামিশা ও ঘনিষ্ঠতা করা সহজসাধ্য ছিল ইহাই বলা হইতেছে।

এখন ইংরেজী শিক্ষিতেরা ভাবেন চিন্তেন বিশ্বাস করেন ব্যবহার করেন এক রকম, নিরক্ষর বা কেবলমাত্র বাংলানবীসরা করেন অন্য রকম। ইহাতেই ত একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহার উপর ইংরেজীশিক্ষিতদের একটা অহঙ্কার আছে, যে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ জীব। সেইজন্য তাঁহারা গ্রাম্য লোকদিগকে তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কতকটা সহৃদয় তাঁহারা পাড়াগেঁয়ে লোকদিগকে কৃপা করেন।

আমাদের দেশে ধর্ম্ম জাতি ভাষা প্রভৃতির বিভিন্নতার জন্য একতা সংঘটন কঠিন। তাহার উপর এই ইংরেজীশিক্ষিত এবং বাংলানবীস ও নিরক্ষরদের মধ্যে প্রভেদ আন্তরিক একতা-সম্পাদন আরও কঠিন করিয়া তুলিতেছে। ইহার প্রতিকারস্বরূপ আমরা বলিতেছি না, যে, সবাই নিরক্ষর হইয়া যান বা সবাই পাশ্চাত্য আধুনিক জ্ঞান ত্যাগ করুন। আমাদের নিবেদন প্রধানতঃ দুটি।

ইংরেজীশিক্ষিত লোকেরা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, যে, সমাজরক্ষার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার হিসাবে গ্রাম্য চাষাভূষা লোকদের গৌরব তাঁদের চেয়ে কম নয়। তাহারা অন্ন উৎপাদন করে, আমরা খাই। তাহারা খাজনা দেয়, আমরা তাহার দৌলতে ইংরেজী শিখিয়া শ্রেষ্ঠতার অহঙ্কার ও উপার্জ্জনের ক্ষমতা লাভ করি। বিপদের সম্মুখীন হইবার সাহস, দুঃখসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, তাহাদের আমাদের চেয়ে কম নয়। তাহাদের দিবার ক্ষমতা কম, কিন্তু তাহাদের দয়াদাক্ষিণ্য স্নেহ মমতা আমাদের চেয়ে কম নয়। মানবশক্তি, উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান তাহাদের নাই এমন নয়। ইংরেজীনবীসদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকের প্রতিভাও আধ্যাত্মিকতার গৌরবে আমরা সবাই আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি। নিরক্ষর বাংলানবীসদের মধ্যে অনেক অজ্ঞাতনামা অপ্রসিদ্ধ বাউলের রচিত গান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিরও প্রশংসালাভ করিয়াছে এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদিগকে দেশের অপর সব লোকদের চেয়ে সকল বিষয়েই বা মোটের উপর শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারিবেন না।

ইংরেজীশিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সহিত অপর সব লোকদের যে প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য কাহাকেও আমরা আধুনিক জ্ঞান বর্জ্জন করিতে বলিতেছি না; ইংরাজী শিক্ষাও ত্যাগ করিতে বলিতেছি না। আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানে যাহা ভাল, তাহা অবশ্যই গ্রহণ ও রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর সব দোষত্রুটি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা ইংরেজী শিক্ষা হইতে যে উপকার পাইয়াছি, নিরক্ষর ও ইংরেজী না জানা লোকদিগকে পূর্ণমাত্রায় তাহার ফলভাগী করিতে হইবে। ইহা বাংলাভাষার সাহায্যে যথাসাধ্য করিতে হইবে। দেশের সব লোককে ইংরেজী শিখাইয়া তাহাদিগকে জ্ঞান দান কার্য্যতঃ অসম্ভব। এইজন্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সান্ধ্য বক্তৃতার ও নৈশবিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। বালক-বালিকাদের জন্য প্রত্যেক বড় গ্রামে এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রগ্রামসমষ্টিতে বিদ্যালয় খুলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিজ নিজ গ্রামে বৎসরে ন্যূনকল্পে অন্ততঃ দশজন নিরক্ষর লোককে লিখিতে পড়িতে শিখাইতে পারেন।

এই সকল কাজ যাঁহারা করিতে পারিবেন, তাঁহারা ধন্য। কিন্তু যাঁহারা পূজার ছুটিতে গ্রামে যাইবেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে গ্রাম্য সকল শ্রেণীর শ্রমজীবী ও অন্য দরিদ্র ও নিরক্ষর লোকদের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলে জাতীয় একতার ভিত্তি কতকটা স্থাপিত হইতে পারিবে।

যাঁহারা ছুটির সময় স্বাস্থ্যের জন্ত বাংলা দেশের বাহিরে যাইবেন, তাঁহারা নিজ নিজ অসুস্থতার প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইবেন। সাধারণ ভাবে তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যাঁহারা দেশভ্রমণে যাইবেন, তাঁহাদের সময়ে ও টাকায় কুলাইলে তাঁহারা যেন বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোন কোন স্থানে যান। মহিলারা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে আরও ভাল। ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধের অধিকাংশ স্থানে সামাজিক একটি প্রথা প্রচলিত থাকায় বাঙালীদের একটা ধারণা জন্মিয়াছে, যে, যেন ঐ প্রথা ব্যতিরেকে সমাজরক্ষা হয় না—অন্ততঃ হিন্দুত্ব রক্ষা হয় না। ঐ প্রথাটি নারীদের অবরোধ-প্রথা। হিন্দু বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা যদি মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র, কেরল প্রভৃতি অঞ্চলে দুএকদিন করিয়াও বেড়াইয়া আসেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, সেখানে সকল শ্রেণীর হিন্দু মহিলারা কেমন স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র অবাধে বিচরণ করেন। ইহা এই-সব অঞ্চলের চিরাগত প্রথা। ইহা বিলাত হইতে আমদানী নহে। সেইজন্য তাঁহারা বঙ্গের মহিলাদের সহিত ঐ-সব অঞ্চলের মহিলাদের আরও একটি প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। বঙ্গে যে-সব ভদ্রমহিলা এযাবৎ অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া অন্তঃপুরের বাহিরে চলাফিরা করিবার অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবে করিয়াছেন। এইজন্ত তাঁহাদের সাড়ী ছাড়া পরিচ্ছদের অন্তান্য অংশে পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষিত হইবে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে যে-সব অঞ্চলে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত, সেখানে সাধারণতঃ পরিচ্ছদের কোন অংশে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদের অনুকরণ দৃষ্ট হইবে না। যাহা হউক ইহা তত গুরুতর ব্যাপার নহে। দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুদের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত থাকায় বঙ্গের সহিত অন্য যে দুটি বিষয়ে পার্থক্য জন্মিতেছে, তাহাই বেশী করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অবরোধ-প্রথা যে দেশে থাকে, সেখানেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিরাগ, এমন কি উহার বিরুদ্ধাচরণ দেখা যায়। তাহা যদি নাও থাকে, তাহা হইলেও তথায় স্ত্রীশিক্ষার ব্যয় অত্যন্ত বেশী হয়। কারণ, নিতান্ত অল্পবয়স্ক এবং বিদ্যালয়ের সমীপস্থ গৃহস্থদের বাড়ীর বালিকারা ছাড়া আর সব ছাত্রীকে গাড়ী করিয়া বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহাতে তাহাদের শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়। তদ্ভিন্ন, তাহাতে সময়ও যায় অনেক বেশী। তাছাড়া, পর্দ্দার দেশে বালিকাদের বয়স একটু বাড়িলেই তাহাদিগকে আর বিদ্যালয়ে পাঠান হয় না, এই কারণে, আমরা লক্ষ্য করিতেছি, যে, যাহাকে উচ্চ-শিক্ষা বলা হয় তাহা অন্য অনেক প্রদেশে নারীদের মধ্যে বাংলা দেশের চেয়ে বেশী বিস্তৃত হইতেছে এবং বঙ্গ-মহিলা অপেক্ষা ভারতীয় অন্য মহিলারা অধিক সংখ্যায় শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে যাইতেছেন।

আর একদিকে প্রভেদ এই হইতেছে, যে, জন-হিতকর কাজে মহারাষ্ট্র গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের মহিলারা বঙ্গমহিলাদের চেয়ে বেশী সংখ্যায় প্রবৃত্ত ও সফলপ্রযত্ন হইতেছেন।

বঙ্গের সহিত এই-সব প্রভেদ স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবার জন্য দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণ আবশ্যক।

—

বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে স্ত্রীশিক্ষা

বাংলা দেশের অনেকের এখনও এই ধারণা আছে, যে, স্ত্রীশিক্ষায় বঙ্গদেশ আগে অগ্রণী ছিল ও এখনও অগ্রণী আছে। আগে কে অগ্রণী ছিল তাহার আলোচনা করিয়া লাভ নাই। এখন কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা নীচে ১৯২৪-২৫, ১৯২৫-২৬ ও ১৯২৬-২৭ এই তিন বৎসরে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাব এই পাঁচটি প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান পরীক্ষায় কতগুলি ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার তালিকা দিতেছি। ১৯২৬-২৭ সালের পরের সংখ্যাসমূহ এখনও একত্র প্রকাশিত হয় নাই।

প্রবেশিকা ও স্কুল-ফাইন্যাল

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬ ২৭
মাদ্রাজ	৩৩৮	৩৮৪	৩৮৩
বোম্বাই	১৮২	১২১	১৭৫
বাংলা	১৪৩	১৩১	১৫৭
আগ্রা-অযোধ্যা	৬১	৫২	৮২
পঞ্জাব	৬৮	৯৫	৬০
		আই-এ	
মাদ্রাজ	১২৩	৮২	১১০
বোম্বাই	৪৪	৫০	৩৫
বাংলা	৫১	৬৭	৭৯
আগ্রা-অযোধ্যা	১৭	২৫	৪৩
পঞ্জাব	২৬	২৩	১৯
		আই-এসসি	
বোম্বাই	১৬	১২	১২
বাংলা	-	৮	১০
আগ্রা-অযোধ্যা	৫	৪	০
পঞ্জাব	১৮	১৫	১৩

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
বি-এ (সসম্মান)			
মান্দ্রাজ	৩	৫	৮
বোম্বাই	১২	২৮	৩৪
বাংলা	৮	১৫	১৫
আগ্রা-অযোধ্যা	০	১	০
পঞ্জাব	২	২	৩
বি-এ (সাধারণ)			
মান্দ্রাজ	৬৬	৪৬	৫৪
বোম্বাই	৫	৩	১৭
বাংলা	৩৪	৪০	২৮
আগ্রা-অযোধ্যা	১৪	১৭	১১
পঞ্জাব	১৪	১০	৯
বি-এসসি (সাধারণ)			
বোম্বাই	২	১	৩
বাংলা	০	১	১
আগ্রা-অযোধ্যা	১	৬	০
এম-এ			
মান্দ্রাজ	১	৪	৪
বোম্বাই	৩	৪	৫
বাংলা	০	৩	৪
আগ্রা-অযোধ্যা	৪	৬	৭
পঞ্জাব	৩	০	১
এম-এসসি			
বোম্বাই	০	০	২
আগ্রা-অযোধ্যা	১	০	২
বি-এল			
বোম্বাই	০	০	২
আগ্রা-অযোধ্যা	১	১	১
এম-বি			
মান্দ্রাজ	০	০	১
বোম্বাই	১২	৯	১৩
বাংলা	১	০	১
পঞ্জাব	৬	০	৩
ডি-টি-এম			
বাংলা	১	২	৩
লাইসেন্শিয়েট-ইন-মেডিসিন			
মান্দ্রাজ	২	০	১
বিটি, এল্-টি, বি-ই			
মান্দ্রাজ	৩৫	৩৩	৩৬
বোম্বাই	৩	৩	৭
বাংলা	১০	১৪	১৫
আগ্রা-অযোধ্যা	০	২	০
পঞ্জাব	০	২	৪

লাইসেন্স, ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট-ইন-টিচিং

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
মান্দ্রাজ	১১৭	১০৮	১৪২
বোম্বাই	১৫	১০	১৯
বাংলা	৫	৬	৫
আগ্রা-অযোধ্যা	৩৭	৮	৪১
পঞ্জাব	২১	১৭	১১

—

চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটীর কার্য্য

চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটীর সভাপতি মৌলবী নূর আহম্মদ এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের নিকট হইতে উহার ১৯২৮-২৯ সালের কার্য্যবিবরণের এক খণ্ড পাইয়াছি। তাহাতে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা পাইয়া উক্ত মিউনিসিপালিটীর কাজ ঐ বৎসর সন্তোষজনক হইয়াছিল মনে হইতেছে। সকল বিষয়ের উল্লেখ করিবার স্থান নাই। কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। আমরা যতদূর অবগত আছি চট্টগ্রাম সহরেই প্রথমে ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে বালকদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। তদনুসারে এখন ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে ঐ সহরে যত প্রাথমিক শিক্ষালাভের বয়সের বালক ছিল, সকলে শিক্ষা পাইতেছে। অল্পসংখ্যক বালক হয়ত পাইতেছে না, কারণ ১৯২১ সালের পর লোকসংখ্যা ও বালকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বালকদের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বালিকাদের শিক্ষারও বিস্তৃতি হইয়াছে, ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে এই সহরে ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সের বালিকার সংখ্যা ছিল ১৪০০। এখন ১৩৩২টি বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। পূর্ব্ব বৎসর ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ১০৫২।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটী একটি বিনিপয়সায় ব্যবহার্য্য সাধারণ লাইব্রেরী, একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং কয়েকটি শ্রমিক ও অনগ্রসর শ্রেণীর লোকদের জন্য বিদ্যালয় চালান এবং তিনটি সংস্কৃত বিদ্যালয়, দুটি মাদ্রাসা, একটি শ্রমিক বিদ্যালয়, একটি চিকিৎসা বিদ্যালয়, একটি ইউরোপীয় কন্‌ভেণ্ট স্কুল এবং একটি বধিরমূক বিদ্যালয়কে সাহায্য দেন।

বিশেষ করিয়া গরীব প্রসূতিদিগকে বিনিপয়সায় সাহায্য দিবার জন্য এই মিউনিসিপালিটী একজন শিক্ষিতা ধাত্রী রাখিয়াছেন; তা ছাড়া দশটি সাধারণ ধাইকে এই বৎসর শিক্ষা দিয়াছেন।

—

ময়মনসিংহ স্বর্ণময়ী মহিলা বয়ন বিদ্যালয়

ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বয়ন শিক্ষা দিবার ক্লাশ আছে। ইহা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বসু এবং রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়াছেন। ইহাতে ঐ বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্রী শিক্ষা পাইয়া থাকে।

কিন্তু এই ক্লাসটি একমাত্র বিদ্যাময়ী স্কুলের বালিকাদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত এবং সহরস্থ অন্যান্য মহিলাগণের পক্ষে উপযোগী নয় বিবেচনা করিয়া ময়মনসিংহ সহরে মহিলাদিগের (অবিবাহিতা, বিবাহিতা ও বিধবাদের) মধ্যে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উন্নতিকল্পে ও তাহার প্রচার উদ্দেশ্যে এবং দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের জীবিকা অর্জ্জনের একটি উত্তম পথ প্রদর্শন করিবার সঙ্কল্প লইয়া "স্বর্ণময়ী মহিলা বয়ন বিদ্যালয়" নামে মহিলাদের ও বালিকাদের বয়ন শিল্প শিক্ষার জন্য কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মহিলাকে লইয়া ভিন্ন একটি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে মণিপুরী ফ্লাইসাটল প্রভৃতি তাঁত দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তোয়ালে, গামছা, জামার কাপড়, চাদর, ধুতি, মুগার কাপড় ইত্যাদি বয়ন করা হয়। সূতা কাটা ও বয়নের জন্য সূতা প্রস্তুত এবং সূতায় রং দেওয়া ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে ক্রমশঃ উন্নত প্রণালীতে রং-এর কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

আপাততঃ এই বিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রী ভর্ত্তি করা হইবে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বসু এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। অত্যন্ত গরীব মহিলাদের সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিবেচনা করিবেন এবং আবশ্যক মত তাঁহাদের অর্দ্ধেক বেতনে বা বিনা বেতনে বয়ন শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন।

এই বিদ্যালয় একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সহরস্থ দশজন শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা এই কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার, এম-এ, বি-এল, মহাশয় ও শ্রীযুক্তা প্রতিভা নাগ, বি-এ সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহার সভাপতি ও সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বয়ন ক্লাশের সহিত মহিলাদিগের জন্য শীঘ্রই আরও দুইটি ক্লাশ খোলা হইবে। একটি মহিলাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য। ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস বা ভূগোল যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই শিক্ষা করিতে পারিবেন। অপরটি তাঁহাদিগের সীবন কার্য্য ও কুটীর শিল্প (মাটির পুতুল ও খেলনা প্রস্তুত, নেকড়ার পুতুল, বাঁশের ও বেতের বুনন কার্য্য ইত্যাদি) শিক্ষার জন্য। এই শেষোক্ত শিক্ষাদ্বারা যাহাতে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের উপায় হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। মহিলাদের সঙ্গে শিক্ষোপযুক্ত বালকবালিকা থাকিলে তাহাদের জন্য ভিন্ন আর একটি ক্লাশ খোলা হইবে। এই তিনটি ক্লাশের জন্যই তিনজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইবেন। শ্রীযুক্তা প্রতিভা নাগ স্বয়ং ইহার পরিচালন কার্য্য করিবেন। এই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের জন্য শীঘ্রই বহু অর্থের প্রয়োজন।

দেশের সর্ব্বত্র এইরূপ হিতকর বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। ময়মনসিংহে স্থাপিত বিদ্যালয়টির দাবী সর্ব্বপ্রথমে ময়মনসিংহের লোকদের উপর। ঐ সহরে ও জেলায় অনেক ধনী ও বদান্য জমিদার ও অন্য ভদ্রলোক আছেন। ময়মনসিংহে জন্ম এবং অন্যত্র রোজগার করেন এরূপ লোকের সংখ্যাও কম নহে। তাঁহারা সকলে সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রতিভা নাগকে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করিলে বিদ্যালয়টি স্থায়ী হইতে পারিবে।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন

আমরা নারীশিক্ষা সমিতি কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত বিদ্যাসাগর বাণীভবন এবং দৈনিক বিদ্যালয়টি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। উভয় বিদ্যালয়েই নানাবিধ কুটীর শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণ লেখা-পড়া শিখাইবার বন্দোবস্তও আছে। বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনে যে-সকল মহিলা শিক্ষা পান, তাঁহারা ঐ বাটীতেই বাস করেন। দৈনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বেলা বারটার মধ্যে নিজ নিজ গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া বিদ্যালয়ে আসেন, শিক্ষালাভান্তে আবার অপরাহ্নে বাড়ী চলিয়া যান। বিদ্যাসাগর বাণীভবনে নানা জেলা হইতে মহিলা বিদ্যার্থিনীরা আসিয়াছেন। সুতরাং সমুদয় বঙ্গদেশের লোকদের ইহার সাহায্য করা উচিত।

ভারতীয়ের জন্য ভারত

ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীন। তাহারা ইহার সব চাকরী পাইতে ও অন্য সব বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে, ইহা তাহাদের কৃত ভারতীয় আইন ও তাহাদের প্রবর্ত্তিত ভারতীয় রীতি। যেরূপ রোজগারে তাহাদের পোষায় তাহারা অবশ্য সেইরূপ চাকরীই করে ও সেইরূপ অন্য বৃত্তিই অবলম্বন করে। তাহার পর দেশী লোকদের কথা। কতকগুলি চাকরী আছে সেগুলিকে ইণ্ডিয়ান বা সমগ্র ভারতীয় বলা হয়। এই-সব চাকরী যাঁহারা করেন, তাঁহারা ইউরোপীয় ও দেশী দুরকমই আছেন, দেশীরাও যে-কোন প্রদেশে বদলী হইলে তথায় চাকরী করিতে পারেন। প্রাদেশিক চাকরীর বেলায় ঠিক্ আইনের বাধা না থাকিলেও, বিহার উড়িষ্যা বিহারী উৎকলীয়ের জন্য, আগ্রা-অযোধ্যা তাহার অধিবাসীদের জন্য, পঞ্জাব পঞ্জাবীদের জন্য, ইত্যাকার রীতি ও রব প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলা দেশ বাঙালীর জন্য এরূপ রীতি ও রব বাংলা গবর্মেণ্ট প্রচলন উত্থাপন বা সমর্থন করেন নাই; বাঙালীরাও এবিষয়ে কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু করে নাই। ফলে বঙ্গের সরকারী আফিস, মিউনিসিপ্যাল আফিস, সওদাগরী আফিস, রেলওয়ে আফিস, ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে যত অ-বাঙালী চাকর্য়ে আছে এবং বঙ্গের বড় ও ছোট কারবার–

বাণিজ্যে নিযুক্ত কারবারী অ-বাঙালী, কলকারখানা রেলওয়ে জাহাজঘাটা প্রভৃতিতে নিযুক্ত শ্রমিক অ-বাঙালী যত আছে, বঙ্গের বাহিরে সমগ্র ভারতবর্ষে তত রোজগারী বাঙালী নাই। বাংলা ভারতবর্ষের একটি অংশ। দেশের সব অংশের মধ্যে সুযোগ, দক্ষতা ও ক্ষমতা অনুসারে কর্ম্মীর এবং উপার্জ্জকের আদান প্রদান হইবেই। ইহা নিবারণের জন্ত আইন করা যায় না, উচিতও নহে। প্রাদেশিক সকল কার্য্যক্ষেত্রের এবং রোজগারের সুযোগের উপর সতত সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া যোগ্যতা দ্বারা প্রত্যেক প্রদেশের লোককে যথাসম্ভব সেই প্রদেশের সব কাজ নিজেদের হাতে রাখিতে হইবে।

ইউরোপীয়রা অশ্বেত সব জাতিদের চেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা যেখানে যেখানে নিজেদের স্বার্থের জন্ত দরকার ও সম্ভব সেই সব দেশেই করিয়া রাখিয়াছে। অথচ এখন তাহারা একটা রব তুলিয়াছে ও দাবী করিতেছে, যে, ভারতবর্ষের জন্ত যে নূতন শাসনব্যবস্থা সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পরে হইবে, তাহাতে যেন এই একটা বিধি থাকে, যে, এ দেশে কোন চাকরী বা অন্ত রোজগারের উপায় হইতে ইংরেজদিগকে আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা যায়, এমন আইন ভবিষ্যৎ ভারত গবর্ন্মেণ্ট করিতে পারিবেন না। ইংরেজদের ভয় হইয়াছে, তাহারা ও অন্ত শ্বেতজাতিরা পৃথিবীর নানাদেশ ও মহাদেশে অশ্বেতদিগকে অন্যায় করিয়া যে-সব অসুবিধায় ফেলিয়াছে, ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইবার পর পাছে ন্যায্যভাবেও তাহাদিগকে সেইরূপ অসুবিধায় ফেলে! কিন্তু ভারতীয়দিগকে তাহাদের স্বাভাবিক যে-সব সুযোগ ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, কেন তাহারা সেই সমস্ত সম্পূর্ণ দখল করিবার চেষ্টা করিবে না, তাহার কোনই ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। এরূপ চেষ্টা করিবার ক্ষমতা ভারতের কখনও হইবে কি না জানি না। অন্যত্র এইরূপ চেষ্টা একটি স্বাধীন এশিয়াজাত জাতির মধ্যে হইতেছে। তুর্করা সেই জাতি।

—

তুর্কের জন্য তুরস্ক

আমেরিকার লিটারারী ডাইজেষ্ট পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে—

"No foreigners need apply" is apparently the slogan of the Turkish Government, which is said to be restricting professional and commercial opportunities for foreigners living in Turkey more and more. A new bill is ready for discussion, we are told, and under it a whole list of professions and trades in which many foreigners are at present employed will be cut away from them. Those who are now practising such professions and trades, it seems, will have to give up and get out within six months of the publication of the law. Some of the occupations forbidden to foreigners, we learn from the Constantinople correspondent of the *Manchester Guardian*, are medicine, dentistry, pharmacy, and midwifery, and we are further informed:

"The bill, after vetoing the professions of merchant, navy captain, advocate, and newspaper director, goes on to enumerate some twenty occupations of a minor type, such as those of *concierge* of a flat, shoeblack, coachman, guide, interpreter, porter, pedler, as well as such skilled occupations as those of chauffeur, stockbroker, and organizer of exhibitions. Behind some of these apparently unnecessary vetoes there is no doubt that the main influence is suspicion of the foreigner. A *concierge* of a flat, for example, can easily become an instrument for protecting secret meetings of plotters. Guides and interpreters have for so long been accustomed to show off Constantinople from the Greek Byzantine angle, with all sorts of derogatory remarks about the Turks, that it is very natural that the Turks should now wish to tell tourists their side of the story of their country."

তাৎপর্য্য।

"কোনো বিদেশীয়ের দরখাস্ত করিবার প্রয়োজন নাই"—কর্ম্মচারী-নিয়োগে ইহাই তুর্ক গবর্ন্মেণ্টের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। তুরস্কের নূতন গবর্ন্মেণ্ট চাকরীতে এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদেশীয় লোকদের সুযোগ সুবিধা ক্রমেই কমাইয়া দিতেছেন। যাহাতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে বিদেশীয়েরা আর নিযুক্ত হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। এই আইন পাশ হইলে যে সকল বিদেশীয় এখন নানা কাজে তুরস্কে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে ছয়মাসের মধ্যে নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করিতে হইবে। নিষিদ্ধ কাজগুলির কয়েকটি এই,—ডাক্তারী, ধাত্রীর কাজ, দন্তচিকিৎসা, ঔষধপ্রস্তুত-করণ, দোকানদারী, ওকালতী, সংবাদপত্র-পরিচালন, মোটর চালক, বাড়ীর দরোয়ান এবং ঐতিহাসিক স্থান-প্রদর্শকের কাজ। তুর্করা বিদেশীদিগকে অবিশ্বাস করে। বাড়ীর দরোয়ান ইচ্ছা করিলেই কোনো বাড়ীতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারীদিগকে স্থান দিতে পারে, এইজন্ত বিদেশীয়ের পক্ষে দরোয়ানের কাজ নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রদর্শক এবং দোভাষীর কাজ নিষিদ্ধ হইবারও বিশেষ কারণ আছে। কন্ষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি স্থানে বিদেশীয় প্রদর্শকেরা শুধু প্রাচীন গ্রীকদের কীর্ত্তিকলাপ দেখাইয়া তুরস্ক এবং তুর্কসভ্যতার নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। এইজন্য তুর্কসভ্যতার কথাও যাহাতে বলা হয় এই উদ্দেশ্যে তুর্ক গবর্ন্মেণ্ট বিদেশীয়দিগকে প্রদর্শকের কাজ হইতে চ্যুত করিতে চাহেন।

ভারতবর্ষেও ঐতিহাসিক স্থান-সমূহের প্রদর্শকেরা এইরূপ করিয়া থাকে। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেনের কন্‌ষ্টান্টিনোপলস্থ এই সংবাদদাতা আরো লিখিয়াছেন—

"The other occupations which are enumerated by the bill have apparently been selected because the number of foreigners already engaged in them is considered to be excessive and to be thrusting Turks out of a legitimate livelihood. This applies to the occupation of chauffeur, which in Constan-

tinople, for example, is largely manned by Russian refugees, though Turks are particularly good chauffeurs. The idea of the bill is that not only this kind of skilled trade but all small trades in which the honest poor earn a living should be kept in Turkish hand. It is a nationalist logic, and it has a great deal to be said for it."

তাৎপর্য্য—

অন্যান্য যে-সকল কাজ বিদেশীর পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে সেগুলিতে তুর্ক গবর্মেণ্টের মতে বিদেশীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে এবং তুর্করা যে-সকল কাজ উত্তমরূপে করিতে পারে বিদেশীরা তাহা হইতে তুর্কদিগকে বঞ্চিত করিয়েছে। মোটরগাড়ীর চালকদের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এই কথাগুলি খাটে। এখন কনষ্টাণ্টিনোপলে যে সকল মোটরচালক আছে তাহারা প্রায়ই নির্ব্বাসিত রুশিয়ান। অথচ তুর্করা খুব সুদক্ষ মোটরচালক। যাহাতে শুধু দক্ষতাসাপেক্ষ শিল্প-বাণিজ্য নয়, সাধারণ ব্যবসা—যাহাদ্বারা সাধারণ দরিদ্রলোকের জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা হয়, সেইরূপ সকল প্রকার কাজই তুর্কদের হাতে থাকে, এই উদ্দেশ্যেই এই আইনটি প্রস্তুত হইতেছে। ইহাকে অন্যায় বা অযৌক্তিক বলা চলে না।

অতঃপর লিটারারী ডাইজেষ্ট বলিতেছেন—

In addition to the purging process the new law is to carry out, it is further related, the Turkish government inspectors are going round all the foreign organizations and commercial houses to see whether the permitted quota of foreigners is being strictly kept, and especially whether the Turkish employees are being paid on a less generous scale or are being given only menial employment. This Constantinople correspondent continues:

"The plums are not allowed only to go into foreign mouths now, and whenever the Turks in any foreign institution complain that they are not being treated as well as the former foreign staff, the government inspectors come down heavily and set the inequalities right. One of the main complaints is that the Turkish employees are kept out of the posts of specialists to which they often consider themselves adapted."

তাৎপর্য্য—

এই নূতন আইনের দ্বারা অনেক ব্যবসায় বাণিজ্যে বিদেশীর প্রভাব কমিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত তুরকের গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শকেরা বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত দোকান কারখানা ইত্যাদিতে যাহাতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বিদেশীর অপেক্ষা অধিক লোক নিযুক্ত না হয় তাহার প্রতিও বিশেষ সতর্কদৃষ্টি রাখিতেছে, এবং যাহাতে বিদেশীয় বণিকেরা তুর্কদিগকে তাহাদের নিজেদের দেশীয় কর্ম্মচারী অপেক্ষা কম বেতন না দিতে পারে এবং কেবলমাত্র নিম্নতম কাজেই নিযুক্ত না করে তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছে। যখনই তাহাদিগকে বিদেশী কোম্পানীতে নিযুক্ত কোনো তুর্ক অভিযোগ করে যে, সে পূর্ব্বতন বিদেশী কর্ম্মচারীর মত ব্যবহার পাইতেছে না, তখনই গবর্মেণ্ট ইন্‌স্পেক্টররা আসিয়া তাহার অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার করিয়া থাকে। এই সকল কোম্পানীতে তুর্করা এখন বিশেষজ্ঞের পদে নিযুক্ত হইবার জন্য দাবী করিতেছে।

আত্মহত্যা

আয়ার্ল্যাণ্ডে ম্যাক্‌সুইনী যখন কারাগারে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেন, তখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল, এরূপ মৃত্যু আত্মহত্যা কিনা। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও এরূপ তর্ক উঠিয়াছে। যাঁহারা ইহাকে আত্মহত্যা মনে করেন, তাঁহাদের যুক্তি প্রদর্শনে আমরা বাধা দিতে অনিচ্ছুক, বাধা দেওয়া অনুচিত ও গর্হিত। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সকলেরই থাকা উচিত।

আমাদের মতে এরূপ মৃত্যু আত্মহত্যা নহে। রোগ-যন্ত্রণা বা অন্যবিধ দৈহিক যন্ত্রণা, মানসিক দুঃখ, লোকলজ্জা অপকর্ম্ম করিবার পর শাস্তির ভয় নৈরাশ্য ইত্যাদি ব্যক্তিগত কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে।

যুদ্ধের সময় মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও যাহারা শত্রুর সম্মুখীন হয়; অবরুদ্ধ নগর দখল করিবার জন্য যাহারা মৃত্যু নিঃসংশয় জানিয়াও, প্রথমে দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে আত্মঘাতী বলা হয় না; প্রাণদণ্ড হইবে জানিয়াও যাঁহারা স্বীয় ধর্ম্মমত ধর্ম্মাচরণ ত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে আত্মঘাতী বলা হয় না। যতীন্দ্রনাথ এইরূপ শ্রেণীর লোক।

—

ভিক্ষু বিজয়

ব্রহ্মদেশের ভিক্ষু বিজয় একবার রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতার জন্য দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাহার পর সেই অপরাধে আবার তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া হাজতে রাখা হয়। জেলে তাঁহাকে প্রয়োজনমত বৌদ্ধধর্ম্মানু-মোদিত পীত বসন পরিতে ও উপবাস দিতে না দেওয়ায় তিনি প্রায়োপবেশন করেন। জেলে সেই অবস্থায় থাকিবার সময় তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহার বেআইনী বিচার করিয়া তাঁহাকে আবার দীর্ঘ কারাবাস দণ্ড দেওয়া হয়। পূর্ব্বোক্ত কারণে তিনি প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করেন নাই। পাঁচমাসেরও অধিক উপবাসের পর সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার জন্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

—

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন পটুয়াখালিতে অসাধারণ অধ্যবসায় ধৈর্য্য সাহস ও শান্ততার সহিত সরকারী রাস্তায় গীতবাদ্যসহ মিছিল লইয়া যাইবার স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কয়েকমাস ধরিয়া সত্যাগ্রহ

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন

চালাইয়াছেন, এবং তিনি ও তাঁহার অনেক সহকর্ম্মী বার-বার জেলে গিয়াছিলেন। পরে সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে আপোষে এই অধিকার স্বীকৃত হয় এবং জেলার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষও এই নিষ্পত্তিতে সায় দেন। সতীন্দ্রবাবু প্রভৃতির নামে সব মোকদ্দমা প্রত্যাহৃত হয়। তাহার পর নানা ওজুহাতে আবার তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে। অসংকর্ম্মজীবী লোকদের নামে যে ১১০ ধারা প্রযুক্ত হয়, তাঁহার নামে তাহাও প্রযুক্ত হইয়াছে। জামীন খালাস পাইতে হইলে ৪০,০০০ টাকার জামীন দিতে হইবে বলা হয়! সংক্ষেপে তাঁহার প্রায়োপবেশনের ইহাই কারণ। তাঁহার মোকদ্দমা হাইকোর্ট কলিকাতায় লইয়া আসিবার হুকুম দিয়াছেন। জামীনও কমাইয়া ৫০০ টাকার করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সতীন্দ্রবাবু বেকসুর খালাস ভিন্ন উপবাস ভঙ্গ করিতে বা জেলের বাহিরে আসিতে নারাজ। কারণ তাঁহার বিশ্বাস এবং তাঁহার স্বদেশবাসী অগণিত লোকের বিশ্বাস, যে, বরিশালের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার নামে পুনরায় মোকদ্দমা করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন।

তিনি চরিত্রবান্, সর্ব্বসাধারণের হিতৈষী, শ্রদ্ধেয় পুরুষ। তাঁহাকে নির্য্যাতন করা হইতেছে বলিয়া আমাদেরও ধারণা। তাঁহার মত বীরের সাহস ও দৃঢ়তা টলিবে না। এইজন্য ভারতবর্ষ তাঁহাকেও হারাইতে পারে, মনে এই আশঙ্কার উদ্রেক হইতেছে।

—

পরলোকগত শশিভূষণ নিয়োগী

অল্প বয়সে রেঙ্গুনের একটি সওদাগরী আফিসে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নিয়োগী সামান্য চাকরীতে নিযুক্ত হন। তাঁহার

পর তিনি নিজের একটি দোকান খুলেন। বুদ্ধিমত্তা, সততা ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়া চালের কল, তেলের কল, ময়দার কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও ব্রহ্মদেশে তাঁহার ময়দার কলই বৃহত্তম। তিনি নানা রকম লোকহিতকর কাজে বহু লক্ষ টাকা জীবিত-

শশিভূষণ নিয়োগী

কালেই দান করেন। কলিকাতায় তাঁহার বাসগৃহ তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত করিবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। রেঙ্গুনের বৃহৎ একটি বাংলা জনহিতকর কার্য্যের জন্য দিয়া গিয়াছেন। রেঙ্গুনে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য দুই বিদ্যালয়ে অনেক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বালকদের জন্য নির্ম্মিত বেঙ্গল একাডেমী বিদ্যালয়ের হলের নামকরণ তাঁহার নামে করা হইয়াছে। রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশন, দুর্গাবাড়ী, হনুমান মন্দির, কোন কোন মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছিল। তিনি সাদাসিধা মানুষ ছিলেন। সরকারী খেতাব বা জনতার বাহবার ভিখারী ছিলেন না। গরীবকে গরীব বলিয়াই তিনি দয়া করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। এই কারণে যে ট্রাষ্টডীড্, যদ্বারা তিনি দরিদ্র বিধবাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন, এটর্নীকৃত তাহার মুসাবিদায় "হিন্দু বিধবা" কথাদ্বয়ের হিন্দু শব্দটি তিনি কাটিয়া দিয়াছিলেন।

—

সন্তরণদক্ষতা ও সন্তরণশ্রমসহিষ্ণুতা

সমগ্র ভারতের ত্রিশ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র মল্লিক প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি হুগলীর জুবিলি সেতু হইতে কলিকাতার কুমারটুলি ঘাট পর্য্যন্ত চারি ঘণ্টা দুই মিনিটে সাঁতার দিয়া আসেন।
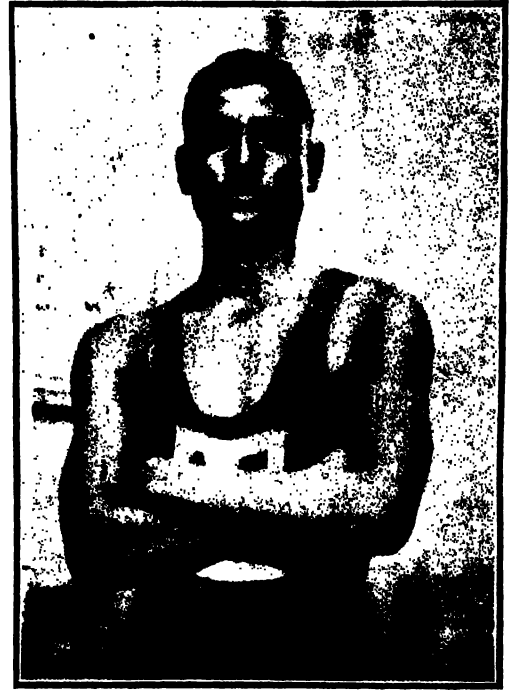
শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র মল্লিক

গত সেপ্টেম্বর মাসে দুজন ভারতীয় যুবক কত দীর্ঘ-কাল ক্রমাগত সাঁতার দিতে পারেন, তাহার প্রমাণ দেন। ঐ মাসের গোড়ায় ওয়েলেস্‌লী স্কোয়্যারের পুকুরে মিঃ শাফী আহমদ অবিরাম ২৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সাঁতার দেন। ইহা খুব শক্ত কাজ।

ইহার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে হেদুয়া দীঘিতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ ক্রমাগত আটাশ ঘণ্টা সাঁতার দেন। থামিবার সময় তাঁহাকে বেশী ক্লান্ত মনে হয় নাই। এই ২৮ ঘণ্টায় তিনি ২৫ মাইল ৪৮০ গজ সাঁতার দিয়াছিলেন।

তিনি বলেন অবিরত ৫০ ঘণ্টা তিনি সাঁতার দিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা বেশী সময় সাঁতার দিবার প্রতি-

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ

যোগিতায় তিনি ভারতবর্ষের সন্তরকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

—

বাল্যবিবাহ নিষেধক আইন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত হরবিলাস শারদা মহাশয়ের বাল্যবিবাহ নিষেধক বিল পাস হইয়াছে। ইহার দ্বারা বালিকাদের ন্যূনতম বিবাহের বয়স চৌদ্দ করা হইয়াছে। আঠার কিংবা ষোল হইলে আরও ভাল হইত। সুশ্রুতের মতে বালিকাদের পূর্ণ ষোল বৎসর বয়সের আগে মাতৃত্ব প্রসূতি ও সন্তানের পক্ষে অনিষ্টকর। বাল্যমাতৃত্ব নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় বাল্যবিবাহ নিবারণ।

এখনও কৌন্সিল অব্ ষ্টেটে বিলটি পাস হওয়া দরকার। তাহার পর বড়লাটের মঞ্জুরী চাই। দুই-ই নির্ব্বিঘ্নে হইয়া যাইবে, মনে হইতেছে। তাহার পর গবর্মেণ্টকে এই আইনের তাৎপর্য্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র নিরক্ষর ও লিখনপঠনক্ষম লোকদিগকে জানাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ভদ্র ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে আজকাল অনেকস্থলেই বালিকাদের বিবাহ ১৪।১৫।১৬ এবং তার চেয়েও বেশী বয়সে হয়। বঙ্গে অশিক্ষিত দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বেশী প্রচলিত। তাহাদের মধ্যেও বালিকাদের বিবাহের বয়স বাড়িলে উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-কোন হিত আমরা চাই, তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। এক্ষেত্রে তাহার মূল্য দিতে হইবে সকল বালিকার দৈহিক মানসিক ও নৈতিক সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া এবং তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিবার জন্য পৌরুষ অর্জ্জন করিয়া। এই মূল্য সকল সম্প্রদায়ের সকল লোককেই দিতে হইবে।

ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ "কার্য্যতঃ অসম্ভব"

বিলাতের সাণ্ডে টাইম্‌স্ লিখিয়াছে, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট উহার সকল সভ্যের অনুমোদিত হইবে এবং উহাতে ইহা সূচিত হইবে, যে, ভারতবর্ষের পক্ষে ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ "কার্য্যতঃ অসম্ভব," ঐ কাগজটি ঠিক্ খবর পাইয়াছে বা ছাপিয়াছে কিনা, তাহা লইয়া তর্কবিতর্কও হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ জাতির যেরূপ মতিগতি তাহাতে ওরূপ রিপোর্ট অসম্ভব নহে, অপ্রত্যাশিতও নহে।

"কার্য্যতঃ" যাহা "অসম্ভব", বর্ত্তমান ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী জেম্‌স্ র‍্যামজি ম্যাক্‌ডোনাল্ড মন্ত্রী হইবার কিছু কাল আগে শ্রমিক দলের এক সভায় ১৯২৮ সালের ৯ই জুলাই তাহা কার্য্যতঃ সম্ভব মনে করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সভায় বলিয়াছিলেন

"I hope that within the period of a few months rather than years, there will be a new Dominion added to the Commonwealth of our nations, a Dominion of another race, a Dominion that will find self-respect as an equal within the Commonwealth."

তিনি তখন প্রধান মন্ত্রী হন নাই বলিয়া অনেকে তাঁহার এই কথাটা উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু ১৯২১ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ভারতের বড়লাটকে যে সংশোধিত উপদেশপত্র (Revised Instrument of Instructions) দান করেন, তাহা উড়াইয়া দিবার জো নাই। তাহার অষ্টম দফায় আছে :—

"(8) For above all things, it is Our will and pleasure that the plans laid by Our Parliament for the progressive realization of Responsible Government in British India as an integral part of Our Empire may come to fruition to the end that British India may attain its due place among our Dominions."

ডোমীনিয়ন শব্দটির মানে লইয়াও গোলমাল করিবার জো নাই। ইংরেজী অভিধানে তাহা পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে।

—

যতীন্দ্রনাথ দাস

যতীন্দ্রনাথ দাস ৬৩ দিন স্বেচ্ছাকৃত উপবাসের পর দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যাহার জন্য এই মরণান্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা জীবনের মূল্য দিয়া পাইবার যোগ্য বস্তু কিনা, এবং প্রায়োপবেশন তাহা পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় কিনা, সে বিষয়ে তর্ক উঠিয়াছে এবং উঠিতে পারে। সে বিষয়ে আমাদের মত আমাদের ইংরেজী মাসিকে ব্যক্ত করিয়াছি, এখানেও করিব।

যতীন্দ্রনাথ দাস

দণ্ডিত বা বিচারাধীন রাজনৈতিক অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জেলে বর্ত্তমানে যেরূপ ব্যবহার পায়, তার চেয়ে ভাল ব্যবহার পাইবার দাবী এই প্রায়োপবেশনের সাক্ষাৎ উপলক্ষ্য বটে। কিন্তু যখন দেখা যায়, বর্ত্তমান জেলবিধি অনুসারে ইউরোপীয় নামধারী ও পরিচ্ছদ পরিহিত অতি জঘন্য অপরাধে দণ্ডিত শিক্ষিত অশিক্ষিত যে-কোন অবস্থার ও চরিত্রের লোকও ভাল ব্যবহার পায়, তখন বুঝিতে বাকী থাকে না, শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র সম্ভ্রান্ত ভারতীয় লোকেরাও কোন কারণে অভিযুক্ত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ ভাল ব্যবহার পাইবার তাহাদের অধিকার জেল-বিধি তাহাদিগকে কেন দেয় নাই। কারণ, আর কিছু নয়—ভারতবর্ষ পরাধীন, আমরা পরাধীন। এই পরাধীনতা বশতঃ ভারতীয়দের প্রতি যেখানে যে অবস্থায় মন্দ ব্যবহার করা হয়, সেই মন্দ ব্যবহারের প্রতিকারের প্রাণপণ চেষ্টা পরোক্ষভাবে পরাধীনতার প্রতিকারেরই চেষ্টা। তা ছাড়া, মানুষ যখন কোন একটা জাতীয় অপমানে ব্যথা পায়, তখন তাহা ছোট অপমান কি বড় অপমান সে তাহা শক্তির ওজনে পরিমাপ না-ও করিতে পারে। সংক্ষেপে, এবম্বিধ কারণে আমরাও মনে করি, যতীন্দ্রনাথ মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ও সম্মানরক্ষার জন্য প্রাণ দিয়াছেন। যাঁহারা সেরূপ মনে না করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহারা বিবেচক ও সহৃদয় তাঁহারা তাঁহার আদর্শনিষ্ঠা ও সাহসের জন্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বজাতীয়েরা তাঁহাকে কিরূপ সম্মান দেখাইয়াছেন, তাহা লাহোর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাঁহার নশ্বর দেহের প্রতি অগণিত জনমণ্ডলীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনেই ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সভায় ও মিছিলে তাঁহার গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রাণ দেওয়া সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতেই কঠিন। কিন্তু রণোন্মাদে বা অন্য কোন উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্যের দ্বারা নিহত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। জনতার করতালি ও উৎসাহপ্রদ প্রশংসাধ্বনির মধ্যে অগণিত প্রশংসমান চক্ষুর সম্মুখে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুবরণ সে শ্রেণীর ঘটনা নহে। তিনি ধীর শান্ত ভাবে কারাকক্ষের নির্জ্জনতার মধ্যে লোকচক্ষুর অনধিগম্য স্থানে প্রায়োপবেশনের ব্রত গ্রহণ করেন। তেমনই অবিচলিত চিত্তে শান্ত দৃঢ়তার সহিত ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছেন। মৃত্যু সাধারণতঃ মানুষের কল্পনায় যেমন ভয়ঙ্কর প্রতীয়মান হয়, সেই ভয়াবহ রূপ মনে উদিত হইবার আগেই প্রাণনাশ অনেক

বীরের ও সাধারণ মানুষের হয়। যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু সেরূপ নয়। তেষট্টি দিন ধরিয়া তিনি মৃত্যুকে ধীর পদক্ষেপে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়াছেন, কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও ভীত বিচলিত হন নাই। ধন্য তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহস।

যুদ্ধে ও অন্য অনেক স্থলে অন্যের প্রাণবধ করিতে গিয়া যে-সব সাহসী ব্যক্তি নিহত হন, তাঁহাদের শৌর্য্যের সহিত হিংসা দ্বেষের সংমিশ্রণ থাকে। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুবরণে হিংসা দ্বেষ ছিল না, তিনি কাহারও প্রাণ নাশ ত দূরের কথা, লেশমাত্র অনিষ্ট করিতেও ইচ্ছা করেন নাই।

যতীন্দ্রনাথ দাসের শবানুগমন—হ্যারিসন রোড

তিনি নিজের কোন ব্যক্তিগত লাভের ও সুখের জন্য প্রাণ দেন নাই;—লাভের লোভ ও সুখের লালসা থাকিলে ত তিনি মৃত্যুর বহু পূর্ব্বেই জামীনে খালাস লইয়া এখনও সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন। তিনি সকলের নিমিত্ত সুবিধি সুনিয়ম ও স্বাধীনতার আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়াছেন।

সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত, চরিত্রবান, কার্য্যক্ষম, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহভাজন এই যুবকের সম্মুখে দীর্ঘ সকল সুখের জীবন পড়িয়া ছিল। কিন্তু তাহার মোহিনী মায়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। তিনি মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্যের আহ্বানে, স্বাধীনতার তূর্য্যনাদ শুনিয়া অনন্তপ্রয়াণ করিলেন।

ক্ষুধা মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে অনেক কাজ করায়, অকাজও করায়। কত চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যা, দিগ্বিজয় ও শৌর্য্যের ছদ্মনামে পরিচিত কত রক্তপ্লাবন, বস্তুতঃ ক্ষুধার তাড়নায় ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষে জাহাজডুবিতে এবং আরও অনেক সঙ্কট অবস্থায় ক্ষুধা মানুষকে রাক্ষস করিয়াছে। মানুষের এমন যে একটি দুর্জ্জয় আদিম আকাঙ্ক্ষা, যতীন্দ্রনাথ তাহাকেও জয় করিয়াছিলেন। দীর্ঘ উপবাসের যন্ত্রণা, উপবাসজাত নানা পীড়া তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই।

তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহার স্বগাতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তাঁহার মত দৃঢ়চিত্ত হইলে তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ সফল হইবে।

—

পূজার ছুটি

আগামী ২০শে আশ্বিন ৬ই অক্টোবর হইতে ৩রা কার্ত্তিক ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রবাসী-কার্য্যালয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বন্ধ থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত চিঠি-পত্রাদি অনুসারে কাজ ৪ঠা কার্ত্তিক হইতে হইবে।

—

আমাদের কার্য্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্ত্তন

আগামী ১লা কার্ত্তিক ১৮ই অক্টোবর হইতে আমাদের কার্য্যালয় ও প্রবাসী প্রেসের ঠিকানা হইবে ১২০।২ নম্বর আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যার ১২৭ পৃষ্ঠার ১ম কলমের লাইন তিনটি, অর্থাৎ "আয়াসে...হইয়াছে।" ২য় কলমের ১২ লাইনের 'অন্ন' কথাটির পরে বসিবে।

প্রবাসী প্রেস, ৯১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তীর্থযাত্রী

ভি-এস্, মাসোজী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
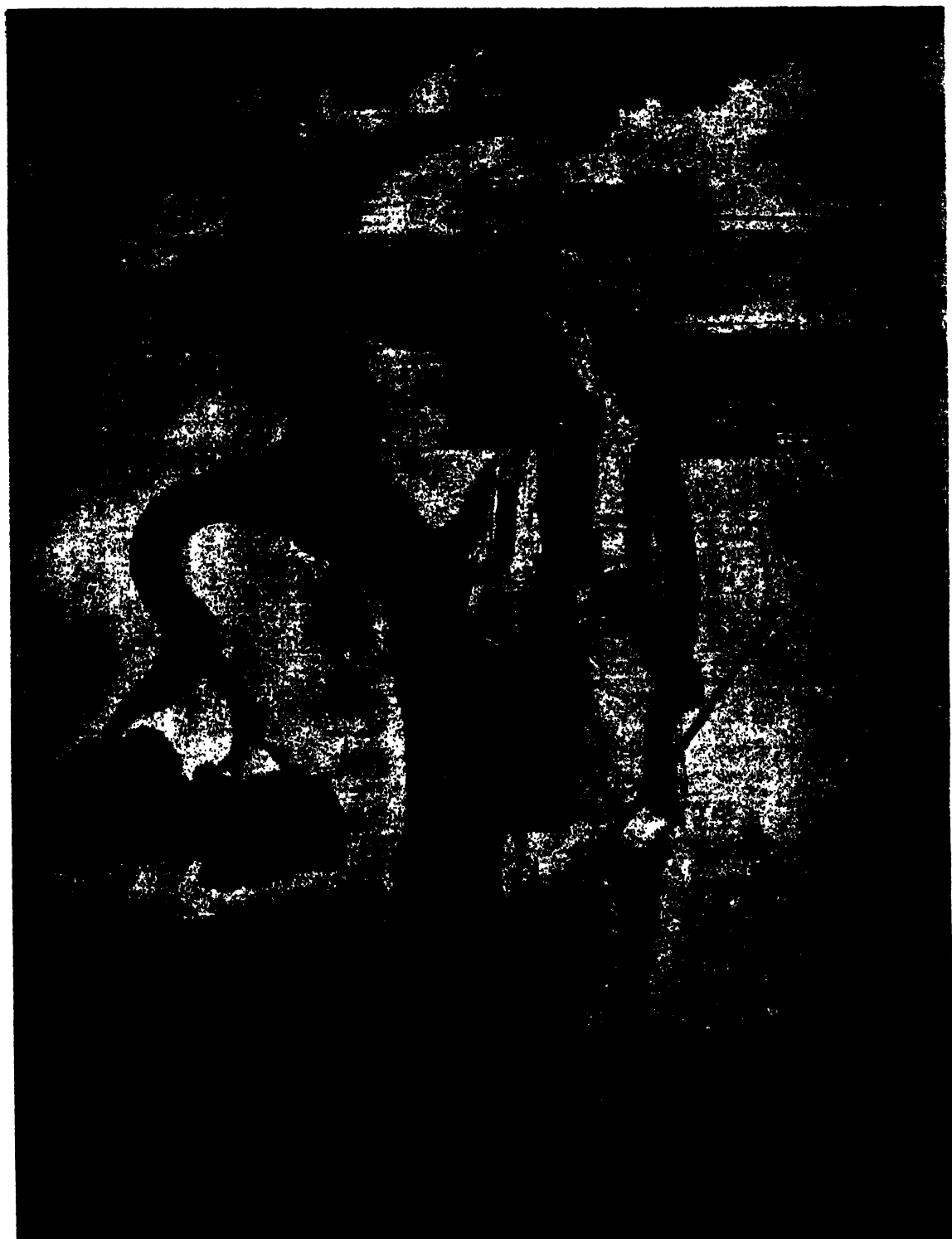
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

২৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

২য় সংখ্যা

পিতাপুত্রে

স্যর যদুনাথ সরকার, সি-আই-ই

অভিসম্পাত

বাদশাহ শাহজহান মহাসমৃদ্ধির সহিত ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বয়স এখন (জানুয়ারি ১৬৫৭) ৬৭ চান্দ্র বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। সুতরাং যখন ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তাহার অসুখ দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তখন পরে কে বাদশাহ হইবে ইহা লইয়া দেশময় আন্দোলন ও গোলমাল বাধিয়া গেল। বাদশাহের চারি পুত্র; সকলেই বয়স্থ এবং প্রদেশ-শাসন ও সৈন্য-চালনে অভ্যস্ত। তাঁহারা প্রত্যেকেই যে সিংহাসন-দখলের জন্য প্রাণপণ লড়িবেন, ইহা নিশ্চিত; আর এই চারি তরফা মহাযুদ্ধে দেশের লোকের যে কি দশা হইবে তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়।

১৬৫৮ সাল ধরিয়া ভাইদের মধ্যে যুদ্ধ চলিল। তৃতীয় কুমার আওরংজীব নিজ বিপক্ষ দারা ও শুজাকে পরাস্ত বিতাড়িত এবং সঙ্গী মুরাদকে ভোজের নিমন্ত্রণে বন্দী করিয়া একেশ্বর হইয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ পিতা শাহজহান আগ্রা-দুর্গে আশ্রয় লইয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, কিছুতেই সেই দুর্গ এবং তাহার অগণিত ধনরত্ন আওরংজীবের হাতে দিবেন না। আওরংজীব দেখিলেন যুদ্ধ করিয়া অমন সুদৃঢ় দুর্গ দখল করিতে হইলে অনেক বৎসর লাগিবে এবং অসংখ্য সৈন্যনাশ হইবে। তখন তাঁহার হুকুমে তাঁহার লোকেরা বাহির হইতে আগ্রা-দুর্গের উত্তর দিকে যমুনায় যাইবার দরজা তাড়াতাড়ি দখল করিয়া বসিয়া রহিল। দুর্গের রক্ষিগণ মহা মুস্কিলে পড়িল; তাহারা দ্বার খুলিতে পারে না, বাহিরে আসিতে সাহস পায় না, পাছে সেই অবসরে শত্রু ভিতরে ঢুকিয়া সব অধিকার করিয়া ফেলে।

তখন দুর্গ-মধ্যস্থ হাজার হাজার লোকের মহা জলকষ্ট উপস্থিত হইল। তৃষ্ণা-নিবারণের একমাত্র উপায় বহুদিনের অব্যবহৃত কয়েকটি পুরাতন কুয়ার ভীষণ কষা তিক্ত জল। বাদশাহ এতদিন যমুনার বিশুদ্ধ জল—"গলিত তুষার"—পান করিয়া আসিয়াছেন; এমন কি যখন তিনি

রাজধানী ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতেন, তাঁহার জন্য গঙ্গাজল সঙ্গে বহিয়া লইয়া যাওয়া হইত। তাঁহার পক্ষে এই-সব কুয়ার কটু জল পান করা অসহ্য।

অবশেষে পিপাসা-কাতর দিল্লীশ্বর হার মানিয়া দুর্গ-অবরোধের দ্বিতীয় দিন আওরংজীবকে এক পত্র লিখিলেন; পত্রখানি এইরূপ :—

"বাবা আমার! বাহাদুর আমার! কাল আমি নয় লক্ষ সওয়ারের প্রভু ছিলাম, আর আজ আমার একজন মাত্র জল দিবার চাকর নাই!—

আফ্রিন্ বর্ হনুদ্ দর্ হর্ বাব্,
মুর্দারা মিদেহন্দ্ দায়েম্ আব্।
আয়্ পেসর্ তু আজব্ মুসলমান্ ঈ
জিন্দা জানম্ বা আব্ নারসানী॥

"হিন্দুদের সব বিষয়েই বাহবা দিই, (কারণ) তাহারা মৃত (মাতা পিতা)কে চিরকাল জলদান করে। আর, তুমি পুত্র (এমন) অদ্ভুত মুসলমান হইয়াছ যে আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার (পানীয়) জল বন্ধ করিয়া দিয়াছ!"

কিন্তু—

রাজধর্ম্মে পিতৃধর্ম্ম ভ্রাতৃধর্ম্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম্ম আছে।

আওরংজীবের মন গলিল না; তিনি ঐ পত্রের পিঠে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" (কর্দা-এ-পেশ্ আয়েদ্ পেশ্)।

তার পর অবসন্ন হতাশ শাহজহান দুর্গ সমর্পন করিয়া বিজয়ী পুত্রের হস্তে বন্দী হইয়া আগ্রা-দুর্গে জীবনের শেষ কয় বৎসর কাটাইলেন।

বন্দীশালা হইতে রাজ্যহীন বাদশাহ পুত্রকে উপদেশ দিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কয়েকখানি পত্র লেখেন। তাহার মধ্যে ছিল—"তুমি পিতার সহিত এরূপ ব্যবহার করিলে, দেখিও তোমার পুত্রেরা তোমাকে কেমন করে।" তাহাতে আওরংজীব পিতার হৃদয়ে সূচ ফুটাইয়া উত্তর দিলেন,—"আমার গুরুজনেরাও ঐ মত ব্যবহার করিয়াছিলেন," অর্থাৎ শাহজহান স্বয়ং নিজ পিতা জহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।

অভিসম্পাতের ফল

কিন্তু শাহজহান সত্যই বলিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। আওরংজীব তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিনজন (সুলতান মহম্মদ, শাহ আলম ও কামবখশ)কে বন্দী করিতে বাধ্য হন; একজন, মহম্মদ আজম, পিতার কোন পত্র পাইলেই ভয়ে কাঁপিতেন,—বুঝি বা তাহাতে বন্দী করার হুকুম আছে! অবশিষ্ট, আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ করিয়া দেশত্যাগী হন; তিনি আজীবন পিতার ক্ষমা লাভ করেন নাই, পারস্যে দেহত্যাগ করেন।

অথচ, এই কুমার আকবরকে আওরংজীব এবং রাজপরিবারের সকলেই বেশী ভালবাসিতেন, কারণ এই পুত্রটির জন্মের এক মাসের মধ্যেই তাঁহার মাতা দিল্‌রস্ বানু বেগম মারা যান। [ইহার সুন্দর গোরস্থান, তাজমহলের অনুকরণে, দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গাবাদ শহরের বাহিরে নির্ম্মিত হয়।]

মা-মরা ছেলেকে সকলেই অত্যন্ত স্নেহ করে। আওরংজীব এক পত্রে আকবরকে লেখেন,—"খোদা সাক্ষী! আমি তোমাকে আমার অপর সব পুত্র অপেক্ষা ভালবাসিয়াছি।"

কুমার আকবর দুই-এক প্রদেশের সুবাদারি করিয়া, অবশেষে ১৬৭৯-৮০ সালে বাদশাহের সহিত রাজপুতানায় গিয়া মেবারপতি মহারাণা রাজসিংহ এবং রাঠোর-নেতা দুর্গাদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার কর্ম্মচারী তাহাউর্ খাঁ এবং হসন আলী খাঁর দক্ষতায় দু-চারিটি যুদ্ধে তাঁহার জয় হইল। কিন্তু, যখন তিনি চিতোর জেলা রক্ষার ভার পাইলেন, তখন তাঁহার কয়েক-বার ভীষণ পরাজয় হইল, রাজসিংহের অতর্কিত আক্রমণে মুঘল-কুমার অনেক সৈন্য ধন ও রসদ হারাইলেন; তাঁহার সৈন্যগণ ভয়ে রাজপুতদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে চাহে না। কুমারের অসাবধানতার ফলে এরূপ ঘটিয়াছে—বলিয়া বাদশাহ তাঁহাকে খুব তিরস্কার করিলেন; উত্তরে আকবর বিনীত মিনতি করিলেন, "অনভিজ্ঞতা এবং মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার ফলে এই-সব ভুলচুক

হইয়াছে। আমি কাজকর্ম্মের 'ক খ' পড়িতেছি মাত্র। আমায় ক্ষমা করুন।"

চিতোর জেলায় হারিয়া বাদশাহী কাজ পণ্ড করিবার ফলে, আকবরকে দেবসুরী গিরিসঙ্কট দিয়া পশ্চিম দিক হইতে সসৈন্য মেবারে ঢুকিবার জন্য মাড়োয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব্বে গোদোয়ার জেলায় পাঠান হইল (জুন ১৬৮০)। এখানে ছয় মাস কাল কাটাইয়া আকবর কিছুই করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে রাজপুত-পক্ষের দূত আসিয়া তাঁহাকে পিতৃসিংহাসন কাড়িয়া লইবার কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। একে ত আকবর মেবারে মহারাণার হাতে নাকাল হইবার ফলে বাদশাহের গালি খাইয়া রাগে গর্‌গর্‌ করিতেছিলেন, তাহার পর মাড়োয়ারে আসিয়া সুফল লাভ না করায় বুঝিলেন বরাতে আবার বাদশাহের তীব্র তিরস্কার আছে! কুমারের যখন এইরূপ মানসিক অবস্থা, সেই সময় রাঠোর পক্ষের দুর্গাদাস এবং শিশোদিয়া পক্ষের মহারাণা রাজসিংহ লোক পাঠাইয়া আকবরকে জানাইলেন, "আওরংজীব আমাদের শত্রু, তিনি আমাদের উপর জজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের স্বাধীন রাজ্য কাড়িয়া লইতে চান। আপনি আমাদের রক্ষা করুন; আমরা এই দুই প্রবল রাজপুত জাতি—শিশোদিয়া ও রাঠোর—আপনাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইব।"

তরুণ আকবর এই ষড়যন্ত্রে সম্মতি দিলেন। এই-সব মন্ত্রণার মধ্যস্থ হইল তাঁহার প্রধান সেনানী তাহাউব্বর্‌খাঁ; তিনি বাদশাহ হইলে সে উজীর হইবে! কয়েক মাস ধরিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। ২২ অক্টোবর ১৬৮০ রাজসিংহ মারা গেলেন; অশৌচের জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারী জয়সিংহের একমাস বিলম্ব হইল। পরে নূতন মহারাণার সহিত চুক্তি পাকা করা হইল, তিনি নিজ পুত্র বা ভ্রাতা (ভীম সিংহ)-এর সহিত মেবার-সেনার অর্দ্ধেক আকবরকে সাহায্য করিবার জন্য পাঠাইবেন। স্থির হইল, ২রা জানুয়ারি ১৬৮১ সকলে আওরংজীবকে বন্দী করিবার জন্য আজমীর-অভিমুখে রওনা হইবেন।

(ক্রমশঃ)

"রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন খবর পাই রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ মত কি তা আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করচেন, তখন নিশ্চিত জানি আমার মতের সঙ্গে তাঁর নিজের মত মিশ্রিত হবে। দলিলের বাক্যের সঙ্গে উকীলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে জিনিষটা দাঁড়ায় সেটাকে প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না। কেননা অন্য পক্ষের উকীলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন, তার কারণ, বাছাই-করা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই।

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমার মত আলোচনা ক'রে সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় একখানি বই লেখা হয়েছে।* ব্যক্তিগত দিক থেকে আমি লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ;—তিনি আমার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন নি, শ্রদ্ধা করেই লিখেচেন। আমার প্রতি তাঁর মনের অনুকূল ভাব থাকাতেই আমার মতকে অনেক অংশে প্রচলিত মতের অনুকূল করে সাজিয়ে আমাকে সাধারণের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেচেন।

বইখানি আমাকে পড়তে হোলো। কেননা আমার রাষ্ট্রনৈতিক মত কোনো পাঠকের কাছে কি রকম

* *Political Philosophy of Rabindranath*: By Sachindranath Sen.

প্রতীত হয়েছে তা জানবার কৌতূহল সামলাতে পারিনি। আমি জানি আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেচি এবং কাজও করেচি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেই জন্যে যখন যা মনে এসেচে তখনি তা প্রকাশ করেচি। রচনা-কালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখ্‌লে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেচে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত। যেমন এ কথা বলা চলে না যে, ব্রাহ্মণ আদি চারিবর্ণ সৃষ্টির আদিকালেই ব্রহ্মার মুখ থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন স্বীকার করতেই হবে আর্য্যজাতির সমাজে বর্ণভেদের প্রথা কালে কালে নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পরিণত, তেমনি করেই অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই, যে, রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেচে। সেই সমস্ত পরিবর্ত্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।

বইখানি পড়ে আমি নিজের মতের ঠিক চেহারাটা পেলুম না। মন বাধা পেল। বাধা পাবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা কারণ এই যে, এর মধ্যে অনেক তর্জ্জমা আছে যার ভাষা আমার নয়, অথচ আমার যে নয় তার নিদর্শন নেই। ভাষার ইঙ্গিত অনেকখানি কথা কয়। সেটা যখন বাদ পড়ে তখন কথার অর্থ পাওয়া যায় কিন্তু তার ব্যঞ্জনা মারা পড়ে। আর যাই হোক নিজের ভাষার দায়িত্ব নিজেকে নিতেই হয় কিন্তু অন্যের ভাষার দায়িত্ব নেওয়া চলে না।

তবু এই ত্রুটিকেও উপেক্ষা করা চলে—কিন্তু একথা বলতেই হোলো যে নানা লেখা থেকে বাক্য চয়ন করে আমার মতের যে একটা মূর্ত্তি দেওয়া হয়েচে, তাতে অংশত হয় তো সব কথাই আছে কিন্তু সমগ্রত মোট কথাটা প্রকাশ পায় নি। এরকম হওয়াটা বোধ করি অবশ্যম্ভাবী। কোন্ কথাটার গুরুত্ব বেশী কোনটার কম, লেখক সেটা স্বভাবত নিজের অভিমত ও রুচির দ্বারা স্থির করেন এবং সেই ভাবেই সমস্তটাকে গড়ে তোলেন।

এই উপলক্ষ্যে আমার সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রের উপর নিজেকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতে হোলো। রাষ্ট্রীক সমস্যা সম্বন্ধে আমি কি ভেবেছি কি বলতে চেয়েছি তা নিজেই কুড়িয়ে এনে সংক্ষেপে আঁটি বাঁধবার চেষ্টা করা ভালো মনে করি। এ জন্যে দলিল ঘাঁটব না, নিজের স্মৃতির উপরিতলে স্পষ্ট হয়ে যা জেগে আছে তারি অনুসরণ করব।

বালককালের অনেক প্রভাব জীবন পথে শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়! আমাদের ব্রাহ্ম-পরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচার-বিচার ক্রিয়া-কর্ম্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব বশতই ভারতবর্ষের সর্ব্বজনীন সর্ব্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই গৌরববোধ সেদিন নানা আকারে আমাদের বাড়ির অন্তঃপ্রকৃতি ও বাইরের ব্যবহারকে অধিকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যাঁদের আস্থা বিচলিত হ'ত তাঁদের মনকে, হয়, য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ ছাঁদের নাস্তিকতা, অথবা খৃষ্টান-ধর্ম্মপ্রবণতা পেয়ে বসত। কিন্তু একথা সকলের জানা, যে, সেকালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্ম্ম সংস্কার করবার উৎসাহ সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল।

বলা বাহুল্য বাল্যকালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষভাবে দীক্ষিত করেচে।

সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ বিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাব সীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিষের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি। যখন আমরা বাইরের কিছুতে মুগ্ধ হই তখন লুব্ধ মন অনুকরণের মরীচিকা বিস্তারের দ্বারা তাকে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়। অনুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছয়, তাতে রঙ চড়াই বেশি, তার আওয়াজ হয় প্রবল, তার আস্ফালন হয় অত্যুগ্র, অত্যন্ত জোর করে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি জিনিষটা আমারই, অথচ নানা দিক থেকে তার ভঙ্গুরতা তার আত্মবিরোধ প্রকাশ পেতে থাকে। বাইরের জিনিষকে যখন আপন অন্তরের করি তখন তার ভাবটা বজায় থাকতে পারে তবু তার প্রকাশটা হয় নিজের মতো। কিন্তু যতক্ষণ সেটা আমাদের বাইরে জোড়া থাকে ভিতরে মিলে না যায়, ততক্ষণ সেটা হয় মোটা কলমে দাগা-বোলানো অক্ষরের মতো, মূলের চেয়ে আকারে বড়ো, কিন্তু একেবারে তা'র গায়ে গায় সংলগ্ন। তা'র থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে সে-অক্ষর লেখকের আপন বাক্যে লেখকের আপন চিন্তিত ভাবকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় বাইরে থেকে, ইস্কুলে পড়ার বই থেকে, আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের প্রাণে সর্ব্বাঙ্গীন হয়ে ওঠেনি ব'লেই, অনেক সময় তা'র বাইরের ছাঁদটাকেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেখায় রেখায় মেলাবার গলদ্ঘর্ম্ম চেষ্টা করি—এবং সেই মিলটুকু ঘটিয়েই মনে করি যা পাবার তা পেয়েছি, যা করবার তা করা হোলো।

"সাধনা" পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা সুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার পরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা, ও গলা মোটা ক'রে গবর্মেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য ক'রতেম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনা ক'রতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্‌সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলী সভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসঙ্গত ব'লে মনে ক'রতেই পারতেন না। রাজসাহী সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলা ভাষা প্রবর্ত্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ ক'রেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্ম্মেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এক্ষেত্রেও তা'র অন্যথা হয় নি। পর বৎসরে রুগ্নশরীর নিয়ে ঢাকা কন্‌ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হ'তে হ'য়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই ব'লেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্যোগ করেছি। বাঙালীর ছেলের পক্ষে যে গালি সব চেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানিনে। এত বড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি, দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্রলেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হ'ত।

ইতিমধ্যে কার্জ্জন লাটের হুকুমে দিল্লীর দরবারের উদ্যোগ হোলো। তখন রাজশাসনের তর্জ্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকেরা প'ড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায় আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিষটা প্রাচ্য,—পাশ্চাত্য কর্ত্তৃপক্ষ

যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে? সে হচ্চে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ স্বীকার করা। তরবারীর জোরে প্রতাপের যে-সম্বন্ধ সে হোলো বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে-সম্বন্ধ, সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য্য প্রকাশ করবার উপলক্ষ্য পেতেন—সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সঙ্কীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রেশস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত, তার উপরে এই দরবারের ব্যয় বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই 'পরে। কেবলমাত্র নতমস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করাবার জন্যেই এই দরবার। উৎসবের সমারোহ দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত অপমানকেই আড়ম্বর করে বাইরে প্রকাশ করা হয়। এই কৃত্রিম হৃদয়হীন আড়ম্বরে প্রাচ্য হৃদয় অভিভূত হতে পারে এমন কথা চিন্তা করার মধ্যেও অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য এবং প্রজার প্রতি অপমান। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তার শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে কিন্তু সেইটেকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্রই নেই।

বরঞ্চ এই রকম কৃত্রিম উৎসবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হয় যে ভারতবর্ষে ইংরেজ খুব কঠিন হয়ে আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মানব-সম্বন্ধ নেই, যান্ত্রিক সম্বন্ধ। এ দেশের সঙ্গে তার লাভের যোগ আছে, ব্যবহারের যোগ আছে, হৃদয়ের যোগ নেই। কর্ত্তব্যের জালে দেশ আবৃত, সেই কর্ত্তব্যের নৈপুণ্য এবং উপকারিতা স্বীকার করলেও আমাদের মানব প্রকৃতি স্বভাবতই সেই প্রাণহীন শাসনতন্ত্রে পীড়া বোধ করে।

এই বেদনাই মনে নিয়ে আমার লেখায় আমি বিশেষ করে এবং বার বার করে বলেচি যে ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকল প্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয় তাহলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক্ তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকার বাহাদুর নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব নিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই এই রকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে,এদেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে-দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র, সেই দেশকে সেবার দ্বারা ত্যাগের দ্বারা তপস্যা দ্বারা জানার দ্বারা বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি, এ'কে অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে প্রাণ দিয়ে প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি, তারি 'পরে অন্যায় আমরা ম'রে গেলেও সহ্য করতে পারিনে। কেউ কেউ বলেন আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কথা শোনবার যোগ্য নয়। সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে স্বতই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা পেলে তার উদ্যম বাড়ে বই কমে না। আমরা কন্‌গ্রেস করেচি তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্ম্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিদ্যার দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্যোগ করি নি। কেবলি নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্ত্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্ম্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ৎ রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্ব্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।

আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারো নেই। দেশের 'পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে

পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্তে তাকে অধিকার করেচে। এই চিন্তা করেই একদিন আমি স্বদেশী সমাজ নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম। তার মর্মকথাটা আর একবার সংক্ষেপে বলবার প্রয়োজন আছে।

চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেচে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেচে, তৃষিতকে জল দিয়েচে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা; গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত, এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেচে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন কাড়াকাড়ি করতে লাগল —লুঠপাট অত্যাচারও কম হোলো না—কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েচে; যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেচে, তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্ম্মস্থান;—সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েচে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেচে—তার কারণ সর্ব্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েচে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দীঘিতে গেল জল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরে, শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশথ গাছ, জাল-জালিয়াতি মিথ্যা-মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না, রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্ম্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।

সকলের চেয়ে বিপদ হল এই যে, দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পায় না। জল-দান অন্ন-দান বিদ্যা-দান সমস্তই সরকার বাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েচে। দেশের লোকের সঙ্গে দেশ যথার্থভাবে সেবার সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত, সেইখানেই ঘটেচে মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ। আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে থাকবে এ কথা বলাও যা আর আগে ধন লাভ হলে তার পরে ছেলে মাকে স্বীকার করবে এ কথা বলাও তাই। দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলা উচিত, —বস্তুত সেই অবস্থায় সম্বন্ধের দাবী বাড়ে বই কমে না। "স্বদেশী সমাজে" তাই আমি বলেছিলুম ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না করে সেবার দ্বারা ত্যাগের দ্বারা নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধি-শক্তি ও কর্ম্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে স্বদেশী সমাজে আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম। খদ্দর-পরা দেশই যে সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ আদর্শ এ কথা আমি কোনো মতেই মানতে পারি নে;-যখন দেশের আত্মা সজাগ ছিল তখন সে যে কেবলমাত্র আপন তাঁতে-বোনা কাপড় আপনি পরেছে তা নয়—তখন তার সমাজে তার বহুধাশক্তি বিচিত্র সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করেচে। আজ সমগ্রত'বেই সেই শক্তির দৈন্য ঘটেচে, কেবলমাত্র চরকার সুতো কাটবার শক্তির দৈন্য নয়।

আজ আমাদের দেশে চরকা-লাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সঙ্কীর্ণ জড়-শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা, এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে-আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহ্যপ্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, সে কি এই চরকা চালনায়? চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক

পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্ম্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি? আমাদের দেশের সব চেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাইনে, বিদ্যা চাইনে, প্রীতি চাইনে, পৌরুষ চাইনে, অন্তর প্রকৃতির মুক্তি চাইনে, সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই চোখ বুজে মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারি অনুবর্ত্তন করে? স্বরাজ সাধন যাত্রায় এই হোলো রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না?

বস্তুত যখন সমগ্রভাবে দেশের বুদ্ধিশক্তি কর্ম্মশক্তি উদ্যত থাকে তখন অন্যদেশ থেকে কাপড় কিনে পরলেও স্বরাজের মূলে আঘাত লাগে না। গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না, যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাণান্ত থাকলে ভাবনা নেই। পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের আমদানী জিনিষ বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকেও সার্থক করচে—কেবল একদিকে নয়, কেবল বণিকের মত পণ্য উৎপাদনে নয়, বিদ্যা অর্জ্জনে, বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্পসাহিত্য সৃষ্টিতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে। সেদিকে যদি আমাদের দেশে অভাব থাকে তবে নিজের হাত দুটোকে মনোবিহীন কল আকারে পরিণত করে আমরা যতই সুতো কাটি আর কাপড় বুনি আমাদের লজ্জা যাবে না, আমরা স্বরাজ পাব না।

আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারবার বলেছি, যে-কাজ নিজে করতে পারি সে-কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই, অহরহ কর্ম্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য বলে মনে করিনে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তি হ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্ব্বাহ করতে পারব তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন তবে বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে। আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি। যে মানুষ বলে আগে ফাউণ্টেন পেন্ পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব বুঝতে হবে তার লোভ ফাউণ্টেন পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব তার লোভ পতাকা-ওড়ানো, উর্দ্দি-পরা স্বরাজের রং-করা কাঠামোটার 'পরেই। একজন আর্টিস্টকে জানি তিনি অনেকদিন থেকে বলে এসেছিলেন রীতিমত ষ্টুডিয়ো আমার অধিকারে না পেলে আমি হাতের কাজ দেখাতে পারব না। তাঁর ষ্টুডিয়ো জুটল, কিন্তু হাতের কাজ আজও এগোয় না। যতদিন ষ্টুডিয়ো ছিল না ততদিন ভাগ্যকে ও অন্য সকলকে কৃপণ বলে দোষ দেবার সুযোগ তাঁর ছিল, ষ্টুডিয়ো পাবার পর থেকে তাঁর হাতও চলে না মুখও চলে না। স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও তেমনিই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।

"মেদিনীপুর-ইতিহাস"

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

"মেদিনীপুর-ইতিহাস"-প্রণেতা শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ পাল পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ নিমিত্ত মুখবন্ধ লিখিতে আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। এই ইতিহাস চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড ইং ১৮৮৮ সালে, চতুর্থ খণ্ড ১৮৯৭ সালে। অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই ইতিহাসের আরম্ভ হইয়াছিল। বোধ হয়, ইহার পঁচিশ বৎসর পূর্বে "সেতিহাস বগুড়ার বৃত্তান্ত" প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন সে পুস্তক দুর্লভ হইয়াছে। ইদানীং অপর কয়েকটি জেলার ও জেলার অংশের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। মেদিনীপুরের ও তমোলুকের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও কৃতবিদ্যগণের দৃষ্টি স্ব স্ব দেশের পুরাবৃত্তের প্রতি পতিত হয় নাই। সকল পুরাবৃত্ত যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, লেখকের কামনায় কোথাও কল্পিত হইবে না, তাহা আশা করিতে পারা যায় না। তথাপি সমুদয় খণ্ড একত্র হইলে পরস্পর মিলাইয়া বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস রচিত হইতে পারিবে।

রাজদণ্ড দ্বারা রাজ্য শাসিত হয়। এই কারণে কে রাজা কে মন্ত্রী, কে বাদশাহ কে উজীর, কে নবাব কে নায়েব, কে বড় লাট কে ছোট লাট, ইত্যাদি বিবরণে অধিকাংশ ইতিহাস পূর্ণ থাকে। কিন্তু ইঁহারা প্রজা হইতে বহু দূরে বহু উচ্চে থাকেন। ইঁহাদের প্রণীত শাসনে দেশ চলে বটে, কিন্তু সে শাসন প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীর ব্যবহার দ্বারা প্রত্যক্ষ করি। ইং ১৭৫৭ সালে পলাশী-যুদ্ধের পর এদেশ ইংরেজ অধিকারে আসিয়াছে। বর্তমানে ইংরেজ-রাজ আমাদের জীবনের তুচ্ছ বিষয়েরও সন্ধান রাখিয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন। কিন্তু ইহার পূর্বে পাঁচ ছয় শত বৎসরের মুসলমান অধিকারের সময়ে এবং তৎপূর্বে হিন্দুরাজত্বের সময়ে এক সার্বভৌম রাজচক্রবর্তীর সর্বময় কর্তৃত্বে সমগ্রদেশ শাসিত হইত না। গঙ্গার পশ্চিম পারে পশ্চিম-বঙ্গে একথা আরও সত্য ছিল। বর্তমানে প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িলে বুঝি সে ইতিহাস গঙ্গার পূর্বপারস্থিত দেশের ইতিহাস। তাহাতে রাঢ়ের ইতিহাস অল্পই আছে। এই ভূভাগ কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যে, কদাচিৎ সামন্ত রাজ্যে, বিভক্ত ছিল। বনবিষ্ণুপুরের মল্লরাজ্য সহস্রাধিক বর্ষ স্বাধীন ছিল। এই সকল রাজ্যের রাজা, প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। এই তথ্য "মেদিনীপুর-ইতিহাসে"র নারায়ণ-গড়, কর্ণগড় প্রভৃতির কাহিনীতে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত না হইলে পশ্চিম-বঙ্গে এত গড় ও গড়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতাম না। যে যে গ্রামের নামে গড় যুক্ত আছে, কেবল সে সব নাম গণিলে পঞ্চাশ ষাটি হইবে। গড়ের চিহ্ন আছে, কিন্তু গ্রামের নামে গড়-নাম যুক্ত হয় নাই, এমন গ্রামও অনেক আছে। যত গড়, তত রাজ্য ধরা যাইতে পারে। সকল রাজ্য বৃহৎ ছিল না। কোন রাজ্য একখানি পরগণায়, কোন রাজ্য দুই তিন খানি পরগণায়। সংস্কৃত 'প্রগণ' শব্দ হইতে পরগণা। অতএব মুসলমান-শাসনের পূর্বে দেশটি প্রগণে প্রগণে বিভক্ত ছিল, এবং এক এক প্রগণ এক এক রাজার রাজ্য ছিল। সকল রাজ্য একসময়ে ছিল না, সমকাল-স্থায়ীও হয় নাই। "মেদিনীপুর-ইতিহাসে" এই সত্য উপলব্ধ হইবে।

গড়ের সংস্কৃত নাম দুর্গ। দুর্গম বলিয়া দুর্গ নাম। শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত রাজারা দুর্গে বাস করিতেন। স্থান-ভেদে নানাবিধ দুর্গ নির্মাণ করিতেন। গিরি-বেষ্টিত হইলে গিরি-দুর্গ, মরু-বেষ্টিত হইলে মরু-দুর্গ, নদী কিম্বা জলা-বেষ্টিত হইলে জল-দুর্গ, বন-বেষ্টিত হইলে বন-দুর্গ, মৃৎ-প্রাকার-বেষ্টিত হইলে মহী-দুর্গ, এবং সৈন্ত-বেষ্টিত হইলে নৃ-দুর্গ নাম হইত। এ সকলের মধ্যে গিরি-দুর্গ উৎকৃষ্ট এবং নৃ-দুর্গ নিকৃষ্ট। যুদ্ধযাত্রার পথে নৃ-দুর্গ করিয়া যাইতে হয় এই ষড়্‌বিধ দুর্গের দুই

তিনটি একত্র করিয়া মিশ্র-দুর্গ নির্মিত হইত। বঙ্গদেশে গিরি-দুর্গ ও মরু-দুর্গ হইতে পারে না। পশ্চিম-বঙ্গে বার মাস জলপূর্ণ নদীও নাই। ইহার পশ্চিম ভাগে নিবিড় অরণ্য ছিল, সেখানে বন-দুর্গ রচিত হইত। তথাপি কৃত্রিম বন-নদী-গিরি নির্মাণ করিয়া দুর্গকে দুর্গম করা হইত। বেউড় বাঁশ নিরাট ও তীক্ষ্ণ কণ্টকময়। গড়ের চতুর্দিকে এই বাঁশের বন করিয়া গড়কে দুষ্প্রবেশ্য করা হইত। ইহার ভিতর দিয়া মানুষের যাতায়াত অসাধ্য, তীর ও গুলী ব্যর্থ। এই বনের ভিতর চারি-পাশে পরিখা (খাই) কাটা হইত, তাহার মাটিতে উচ্চ প্রাকার, বা বপ্র (মুর্চা) উত্তোলিত হইত। রাজা ধনবান্ হইলে পরিখা ও বপ্র ইট কিংবা পাথরে বাঁধা হইত। বপ্রের উপরে নানাবিধ ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত থাকিত, স্থানে স্থানে অট্ট নির্মিত হইত। অট্টের ছিদ্রপথে শত্রুর গতিবিধি এবং শত্রু নিকটস্থ হইলে তীর এবং বন্দুক প্রচলনের পর গুলী নিক্ষিপ্ত হইত। চতুর্দিকে বপ্র থাকাতে মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ড গর্ত্তের ন্যায় দেখায়। এই হেতু সংস্কৃত 'গর্ত্ত' শব্দ হইতে 'গড়' নামের উৎপত্তি। কোন কোন গড়ে পর পর অনেক পরিখা ও বপ্র থাকিত। তখন ভিতর গড়, বাহির গড়, কিংবা অন্য নামে সে সবের পরিচয় হইত। "মেদিনীপুর-ইতিহাসে" নারায়ণগড়ের বর্ণনা হইতে বুঝিতেছি, ইহা প্রধানতঃ বন-দুর্গ ছিল। কাঁসাই নদীর উত্তরস্থিত ভূভাগ এবং দক্ষিণেও খড়্গপুর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অরণ্যময় ছিল। ইহার দক্ষিণে কালীনদী বা কেলে-ঘাই পূর্বকালে প্রবল ছিল। তখন আরও উত্তরে বহিত। পশ্চিমে কাঁসাই নদীর এবং পূর্বে কালী নদীর শাখা থাকিয়া গড়কে নদী-দুর্গও করিয়াছিল।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, নারায়ণ রাজবংশের আরম্ভ বাং ৬৭১ সালে (=ইং ১২৬৪) হইয়াছিল। সে আজি ৬৬৫ বৎসরের কথা। তখন শক্তি-উপাসনার কালও বটে। তখন রুদ্রাণী ব্যতীত ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, ভদ্রাণী দেবীও প্রতিষ্ঠিতা হইতেন। পরে এসব দেবীর পূজা আর দেখিতে পাই না। অতএব ইঁহারা নারায়ণগড় রাজবংশের প্রাচীনতার সাক্ষী-স্বরূপা হইয়া আছেন।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসে দেখি, ইং একাদশ শতাব্দে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ভাগ দণ্ডভুক্তি নামে খ্যাত ছিল। ইং ১০২৩ সালে রাজেন্দ্রচোলগঙ্গের বিজয়কালে দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্ম্মপাল ছিলেন। তখন দণ্ডভুক্তি "মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্যান-বিশিষ্ট" ছিল। গৌড়ের রামপালের রাজত্বকালে দণ্ডভুক্তির রাজা, জয়সিংহ ছিলেন। তিনি উৎকলরাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে নানাস্থানে নানা সামন্ত রাজ রাজ্য করিতেছিলেন। দণ্ড নামক জাতির, বর্ত্তমানে দণ্ডমাঝির, দেশ বলিয়া দণ্ডভুক্তি, অর্থাৎ দণ্ডপ্রদেশ নাম হওয়া অসম্ভব নহে। উক্ত রাজা ধর্মপাল ও রাজ জয়সিংহের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল, কি তাঁহাদেরই বংশের কেহ নারায়ণগড়ের পালবংশের ও খড়্গপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানের রাজেশ্বর সিংহ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কিনা, তাহ অজ্ঞাত। গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের ওড়িষ্যা অধিকার কালে মেদিনীপুর ওড়িষ্যার অধীন হয়, এবং পা বহুকাল যাবৎ ওড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল।

রাজবংশ লুপ্ত হইলেও গড়ের অবশেষ বহুদি থাকে। বহুকাল গত না হইলে দীঘিও শস্যক্ষেত্রে পরিণ হয় না। দেব-দেবীর মন্দির দেব-দেবীই রক্ষা করেন প্রাচীনকালের এই তিন সাক্ষী বহুস্থানে বিদ্যমান আছে কিন্তু স্মৃতি লুপ্ত হওয়াতে মূকভাব ধারণ করিয়াছে

দেব-দেবীর নাম হইতে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার না পাই না; গড়ের, দীঘির ও সায়রের নামে অধিস্বামীর না কদাচিৎ জড়িত থাকে। কিন্তু মানবমন শূন্য থাকিতে পারে না, অসাধারণ দেখিলে অদ্ভুত আখ্যায়িকা সৃ করে। বেত্রগড় (গড়বেতা) হয়ত কণ্টকময় বে পরিবেষ্টিত ছিল। পূর্বকালে সে অঞ্চলের নাম বকদ্বী ছিল। বকদ্বীপ নামের অপভ্রংশ বগড়ী, ক্রমে বগ পরগণা হইয়াছে। কুতূহলী মানবমন সেখানে বকাসুরে বাস দেখিতে পাইল, এবং প্রমাণ-স্বরূপ প্রস্তরীভূ বৃক্ষ-কাণ্ডে বকাসুরের হাড় দেখাইয়া দিল। অসুরে মৃত্যু কালবশে হইতে পারে না, অসুর বধ করিতে পাণ্ড বর্জিত দেশে ভীমকে আসিতে হইয়াছিল।

কেহ যশস্বী ও কীর্তিমান না হইলে অন্যে তাহার স্

পরিচয় জানিতে চায় না। কুল-গৌরব পুরাতন কাল হইতে না থাকিলে বংশধরেরও গৌরবহানি হয়। পূর্বপুরুষ থাকেই থাকে। কিন্তু নগণ্য পূর্বপুরুষের গণ্যমান্য বংশধরের আবির্ভাবে প্রকৃতি দেবীর বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়ে। তখন আদিপুরুষের দৈবী-শক্তি কল্পিত হয়। রাজবংশ হইলে আদিপুরুষকে ব্রাহ্মণের রাখাল হইতে, বনে গোরু চরাইতে চরাইতে অপরাহ্নে নিদ্রিত হইতে হয়, তখন ফণীকে আসিয়া রাখালের মস্তকের উপরে ফণা বিস্তার করিয়া রবিকিরণ নিবারণ করিতে হয়। অথবা আদিপুরুষকে গর্ভবতী নারীসহ পুরীতীর্থ যাত্রা করিতে হয়. পথিমধ্যে বিজন বনে আদিপুরুষের জন্ম হয়। আদিপুরুষের আবির্ভাবে অলৌকিক কিছু না থাকিলে কাহিনী হইতে পারে না, কালকেতু ব্যাধকে অভয়া স্বর্ণগোধিকা-রূপে দর্শন না দিলে তাহার সাত ঘড়া ধন-প্রাপ্তি ও গুজরাট নগরে রাজ্যপ্রাপ্তি সম্ভব হইত না। উপকথায়, রাজসিংহাসন শূন্য হয়, রাজহস্তী বহির্গত হইয়া বিদেশী অজ্ঞাতকুলশীল রাজপুত্রকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সিংহাসনে স্থাপন করে। কিন্তু সেটা উপকথা, শিশুকে ভুলাইতে পারে, বয়স্থকে পারে না। বয়স্থ উপকথায় ভোলে না, কথা চায়। ভবিষ্যতে কোন্ বংশ প্রসিদ্ধ হইবে, তাহা জানিতে পারিলে কাহিনীর প্রয়োজন হইত না।

পূর্বকালে যাবতীয় প্রসিদ্ধ বংশের কুল-পঞ্জী থাকিত। সব সময় কাগজে কলমে লেখা থাকিত না, মুখে মুখে থাকিত। আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি, শারদীয়া পূজার সময় আমাদের বাড়ীতে বার্ষিক বৃত্তি লইতে ভাটেরা আসিতেন, বংশানুক্রম ছড়ার আকারে আবৃত্তি করিতেন। কোন পুরুষের মহদ্ গুণ কিংবা দোষ থাকিলে নির্ভয়ে তাহা উল্লেখ করিয়া যাইতেন। কারণ সুকীর্তি হউক, দুষ্কীর্তি হউক, কীর্তির্যস্য সঃ জীবতি। কিন্তু মনে আছে, তাহাঁরা সন তারিখের ধার ধারিতেন না। এক এক পুরুষের জন্মমৃত্যুকাল জানিবার প্রয়োজনও ছিল না। মেলেরিয়ার পর হইতে ভাটকুল ক্রমে ক্রমে নির্মূল হইয়াছে, কুলপঞ্জীও লুপ্ত হইয়াছে। আমাদের সামান্য বংশেরও ভাট থাকাতে বুঝি যাবতীয় প্রসিদ্ধ বংশানুচরিত রক্ষা করিবার লোক ছিল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসুজ কুলপঞ্জী সংগ্রহ করিয়া "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নামক বিপুল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণজাতির বিবাহ সম্বন্ধে নানাদিক দেখিতে হয়, ঘটকেরা প্রসিদ্ধ বংশের কুলপরিচয় লিখিয়া রাখিতেন। এই সকল কুলপঞ্জীতে ভুল অবশ্য থাকিবে, কোন্ ইতিহাসের সব উক্তি সত্য? কিন্তু এই সকল কুলপঞ্জী বহুমূল্যজ্ঞানে রক্ষা করা উচিত। আসামের "বুরুঞ্জী" বা পুরা-পঞ্জী হইতে আহম রাজবংশের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে, পুরীর মন্দিরের "মাদলা পাঁজি"র পূর্বাংশ কাহিনী হইলেও পরাংশ ইতিহাস। রাজপুতানার চারণ-দিগের নিকট শুনিয়া টড সাহেব রাজস্থান লিখিয়াছেন, মরাঠী "বাখর" মহারাষ্ট্র দেশের কাহিনীর বিপুল আকর।

আমাদের সংস্কৃত পুরাণগুলিই বা কি? পুরাণের পঞ্চলক্ষণ; তন্মধ্যে বংশ ও বংশানুচরিত, দুইটি। সকল পুরাণে এই দুই লক্ষণ নাই বটে, কিন্তু যে যে পুরাণে আছে, সে সে পুরাণের বংশ-বর্ণনার সমুদয় কল্পিত নয়। এখন ঐতিহাসিকেরা পুরাণ হইতে নানা বংশ, নানা তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন, পর্য্যটকেরা আফ্রিকা দেশের নীল-নদের উৎপত্তি আবিষ্কার পুরাণের সাহায্যে করিয়াছেন। তথাপি বলিতে হইবে, সাময়িক ঘটনার বিবরণ-রক্ষার প্রয়োজন আমাদের দেশে অনুভূত হয় নাই। কাল নিরবধি বলিয়াই হউক, ঐহিক সুখ-সৌভাগ্য ক্ষণিক বলিয়াই হউক, প্রাচীনেরা ইতিহাস রক্ষায় উদাসীন ছিলেন।

কিন্তু রাজবংশ ও বংশানুচরিত ব্যতীত আরও বহু বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইতিহাস পুরাকাল হইতে পঞ্চম বেদ গণ্য হইয়া আসিয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখি, পুরাণ ইতিবৃত্ত আখ্যায়িকা উদাহরণ ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, এসব ইতিহাস। ঐতিহ্য লইয়া ইতিহাস, পারম্পর্য উপদেশের নাম ঐতিহ্য। অতএব কৌটিল্যের সংজ্ঞানির্দেশ ঠিক হইয়াছে। মহাভারতে উক্ত সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এই কারণে মহাভারত, ইতিহাস ও পঞ্চম বেদ। কারণ, রাজার চরিত আর প্রজার চরিত এক নয়। যাবতীয় চরিত্রের মূলে মন বিদ্যমান;

মন একদিকে ধাবিত হয় না, অর্থ ব্যতীত ধর্মচিন্তাও করে। পুরাণে ধর্মশাস্ত্র, দানধর্ম, পুণ্যকর্মের ব্যাখ্যা প্রচুর আছে। কালে কালে এ সকল বিষয়েরও কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, পুরাণ-পাঠে জানিতে পারি। "মেদিনীপুর-ইতিহাসে" মানবমনের সে দিক্‌টাও মনোহর ভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

এককালে মেদিনীপুরের অধিকাংশ বনাকীর্ণ ছিল। মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বে শুধু মেদিনীপুর নয়, পশ্চিম-বঙ্গের পশ্চিম অর্দ্ধাংশ কোথাও নিবিড় কোথাও বিরল বনে আচ্ছন্ন ছিল। বোধ হয়, কাঁসাই নদী ও দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর ও পশ্চিম সমুদয় ভূভাগ প্রাচীন কাল হইতে অরণ্যময় ছিল। ভূ-পৃষ্ঠ নিরীক্ষণ করিলেই বুঝি বহু বহু পূর্বকালে এই প্রদেশের উৎপত্তি হইয়াছিল। তদবধি কৃষিকর্মের অযোগ্য থাকিয়া নিবিড় বনে আচ্ছন্ন ছিল। তাহার চিহ্ন এখনও প্রচুর বিদ্যমান। ইং ১৭৫৭ সালে পলাশী-যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানী মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলীর কিয়দংশ, ও চট্টগ্রাম, এই কয়েক জেলার দেওয়ানি প্রাপ্ত হন। দুই এক বৎসরের মধ্যে বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র বঙ্গের দেওয়ানি ও রাজস্ব তাঁহাদের হাতে আসিবে। জমিদারি হউক, আর রাজ্যই হউক, ভূমির পরিমাণ ও প্রকৃতি, দেশের জনপদ ও পথঘাট প্রথমে জানা আবশ্যক হয়। ইং ১৭৬৪ সালে বিলাতে কয়েকজন দক্ষ আমীন নিযুক্ত হইয়া আসিয়া রেনেল সাহেবের অধ্যক্ষতায় বঙ্গদেশ জরিপ করিতে আরম্ভ করেন। ইং ১৭৮১ সালে রেনেল সাহেবের কৃত বঙ্গদেশের মাপ-চিত্র প্রকাশিত হয়। সে আজি দেড়শত বৎসর পূর্বের কথা। তাহাতে দেখি, মেদিনীপুরের উত্তরে এমন নিবিড় বন ছিল যে, আমীনেরা তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, লিখিয়াছেন, "পথ নাই, জরিপ হইতে পারিল না।" অন্যস্থানে, বনবেষ্টিত ছোট ছোট জনপদ, এবং সেই বন-ভূমির মাঝে মাঝে গড়।

"মেদিনীপুর-ইতিহাসে" জঙ্গল মহালের বিবরণ আছে। আর আছে, খয়রা, মাঝি, চুয়াড় জাতির সহিত গড়ের রাজাদিগের যুদ্ধের বিবরণ। দেশটি তাহাদের ছিল; কোথা হইতে কে আসিয়া তাহাদের অধিকার হানি করিলে তাহারা কেমনে সহিয়া থাকিবে? "জোর যার মুলুক তার"—এই নীতি সভ্য অসভ্য সকল মানবজাতি, এমন কি পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, আদিকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। ইহাতে ন্যায়-অন্যায় বিবেচনার কিছুই নাই, জীবের ধর্মই এই। বেদের আর্য্যগণ পরের দেশ, সপ্তসিন্ধুদেশ, অধিকার করিলেন; পর হইল দস্যু, তাঁহারা সাধু! ক্রমে ক্রমে আর্য্যবংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর্য্যবংশীয়েরা গঙ্গা ধরিয়া পূর্বদিকে আর্য্যাবর্তে বসতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে দেশের অধিবাসী স্বদেশ ত্যাগ করে নাই। একদল গঙ্গার পশ্চিম পারে রাঢ়ে আসিয়া অজয় ও দামোদরের মধ্যবর্তী গাঙ্গেয় প্রদেশের উত্তম জলবায়ু, উর্ব্বরা মৃত্তিকা, মৃগয়োপযোগী বন, দেখিয়া বসতি স্থাপন করিলেন। পুরাতন অধিবাসীরা প্রথমে নবাগতদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই, কিংবা বিস্তীর্ণ দেশের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে কষ্ট বোধ করে নাই। করে নাই বটে, কিন্তু শত্রুতা করিতেও ছাড়ে নাই। অনেকবার অনেকস্থানে যুদ্ধ হইয়াছে, কেহ সে যুদ্ধ লিখিয়া রাখিয়া না গেলেও আমরা অক্লেশে অনুমান করিতে পারি। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, চতুর্বিধ রাজনীতি অনুসৃত হইয়া থাকিবে। কতক শত্রু পর রহিল না, আপনার হইয়া গেল; আর্য্যজাতি দস্যু-কন্যা বিবাহও করিতে লাগিল, এবং ক্রমে অমিশ্র ও মিশ্র জাতি রাঢ়ের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আদিম জাতিরা বিপন্ন হইয়া পড়িল, যুদ্ধও করিতে লাগিল। বনভূমি তাহাদের প্রধান জীবিকা-ক্ষেত্র। বন কাটাইয়া শস্য ক্ষেত্র করিলে তাহারা শস্যের ভাগ পাইত না। তাহাদেরও প্রজাবৃদ্ধি হইত, নবাগতদিগের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া যতদূর পারিল, রাঢ়ের ও কলিঙ্গের অদূরবর্তী রাঙ্গামাটি ও জলা, কাঁকর্যা পাথর্যা বনভূমিতে পলায়ন করিল। মৎস্যজীবী জলাদেশে, পশুপক্ষি মাংসজীবী বনদেশে আশ্রয় লইল। কৃষিকর্মের গুণ এই, অল্পভূমির শস্যে বহুজনের জীবন ধারণ হয় কিন্তু আদিম জাতি কৃষিকর্ম ভালবাসিত না, কৃষিকর্মের যোগ্য ভূমিও পাইল না। এদিকে "বনকাটি" নামে

বহু গ্রাম উত্থিত হইতে লাগিল। সাধুসজ্জনেরা দেখিল না, ভাবিল না, বনচরদিগেরও প্রাণ আছে। তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় দস্যুতা করিবে, আশ্চর্য্য কি? সেই দস্যুতা "মেদিনীপুর-ইতিহাসে" পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে।

বেদের কালে এই দস্যুতার আরম্ভ। আর্যেরা সজাতি ভিন্ন অন্য জাতিকে, বিশেষতঃ কৃষ্ণবর্ণ জাতিকে অন্-আর্য, অর্থাৎ আর্য নয়, বলিতেন। তাঁহারা অন্-আর্যদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং তাহাদের অবজ্ঞাসূচক নাম রাখিয়াছিলেন। খাদ্যা-খাদ্য বিচার করে না দেখিয়া কোন জাতির 'কোল' অর্থাৎ শূকর নাম রাখিলেন। 'বরাভূম,' বাস্তবিক বরাহ-ভূম বা কোলভূম। এক জাতি তৎকালে জাত বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে বাস করিত। তাহারা সমস্ত অর্থাৎ প্রান্ত-বাসী বলিয়া তাহাদের নাম সমন্তাল রাখিলেন। সমন্তাল শব্দ অপভ্রংশে সাম্‌তাল হইয়াছে। কাহারও নাম বর্বর অর্থাৎ বাউরী হইল। কাহারও ভূমিজ কাহারও মৃত্তিজ নামের উৎপত্তি সংস্কৃতজ্ঞ বিদেশীর ইচ্ছায় হইয়াছিল। আমাদের 'হিন্দু' নামও এইরূপ পরের দেওয়া নাম; এমন পর যে 'সিন্ধু' শব্দ 'হিন্দু' করিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা এখন এই বিজাতীয় 'হিন্দু' নামে গৌরব করিতেছি, আদিম অধিবাসীরাও তাহাদের প্রাপ্ত নামে করে। গ্রামের মুখ্য, মণ্ডল বলিলে ইহারা প্রীত হয়। মুখ্যেরা মধ্যস্থ হইয়া থাকেন। 'মধ্যস্থ' শব্দ হইতে 'মাঝি' উপাধির উৎপত্তি। নৌকা-চালক মাঝী, নৌকার মধ্যস্থ; দণ্ডী (দাঁড়ী) দাঁড় টানে। জালিক (ধীবর), কৈবর্ত্ত, বাগ্‌দী, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে 'মাঝি' উপাধি আছে। নামটি 'মুণ্ডা' নামের তুল্য। এখন 'মুণ্ডা', ছোটনাগপুরের এক জাতির নাম হইয়াছে। কিন্তু 'মুণ্ড', মাথা হইতে মুণ্ডা নাম।

ভূমিজ নামেই প্রকাশ, এই জাতি দেশজ,বিদেশ হইতে আসে নাই। ইহাদের প্রধান দেশ মান-ভূম জেলা। কিন্তু বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও ওড়িষ্যার জঙ্গল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সকলে কৃষ্ণবর্ণ নয়। ওড়িষ্যার কেঁওঝোর রাজ্যের ভূমিজ মলিন গৌর বা কটা বর্ণ, খর্ব ও মাংসল। ভূমিজেরা বলে, তাহারা নিজের দেশেই বাস করিতেছে। তাহারা যাহাকে রাজা করিবে, সে-ই রাজা হইবে। কেঁওঝোরে রাজাভিষেকের সময় ভূমিজ বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া নূতন রাজার কপালে টিকা দেয়। পরে রাজার পায়ের কাছে খাঁড়া রাখিয়া দণ্ডবৎ শুইয়া পড়ে। বলিতে চায়, 'তোমাকে রাজা করিয়াছি, তুমি আমাদের শিরশ্ছেদ করিতে পার।' যাহাদের দেশভক্তি ও রাজনিষ্ঠা এত প্রবল, তাহাদের রাজ্যে অন্যের কর্তৃত্ব বিপদের কারণ। তার পর, কুচক্রী ক্ষেপাইয়া দিলে দেশ অরাজক হইয়া পড়ে। কেঁওঝোরে রাজ্যের উত্তরাধিকারী লইয়া প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। ইং ১৭৯৫ সালে পঞ্চকোট রাজ্য রাজস্বের দায়ে নিলাম হইয়া গেলে ভূমিজেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল। ইং ১৮৩২ সালে বরাভূমের রাজ্যাধিকার লইয়া কেঁওঝোরের অবস্থা করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ, "গঙ্গানারায়ণী-হাঙ্গামা" নামে খ্যাত। বস্তুতঃ পঞ্চকোট, বরাভূম, ধলভূম, এবং ওড়িষ্যার দুই-একটা রাজ্য ভূমিজের রাজ্য বলা চলে। এই সকল রাজ্য সহজে ইংরেজ-শাসনে আসে নাই। স্বদেশে ভূমিজ্ কৃষকের ও সৈনিকের কর্ম করে। কিন্তু বঙ্গদেশে বহুকালাবধি 'চুয়াড়' নামে খ্যাত আছে। চৌর্য্যকর্মে দক্ষ, এই অর্থে চোয়াড় বা চুয়াড়। কিন্তু ইহারা তস্কর নয়, দস্যু ডাকাত।

"মেদিনীপুর-ইতিহাসে" এক খয়রা জাতীয় রাজা সুরৎসিংহের কথা আছে। রাজা উৎপত্তিতে অনার্য হইলেও আর্যভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সিংহবাহিনীর পূজা করিতেন, পাত্রমিত্র সহিত রাজকার্য চিন্তা করিতেন। ছোটনাগপুর প্রভৃতি বহু পার্বত্য ও জঙ্গল দেশের রাজ-বংশ এখন ক্ষত্রিয় কিংবা রাজপুত নামে পরিচিত হইলেও মূলে দেশজ ছিল। বাঁকুড়া জেলায় খয়রা জাতি আছে, পদবী 'রায়' আছে; কিন্তু বাগ্‌দী অপেক্ষা হীন। খয়রা নাম বৃত্তিবাচক। এককালে এই জাতির লোক খদির বৃক্ষ হইতে নির্যাস, খয়ের, বাহির করিত। 'খয়র' শব্দ হইতে খয়রা। সকলেই খয়র করিত না, কিন্তু খয়র করিবার জাতি নিশ্চয় ছিল। এককালে বীরভূম হইতে মেদিনীপুরের জঙ্গলে খদির বৃক্ষ বিস্তর ছিল। ওড়িষ্যার

জঙ্গলে এখনও অনেক আছে। কেহ কেহ মনে করেন, খয়রা জাতি প্রথমতঃ কোড়া জাতির অন্তর্গত ছিল, বৃত্তি-ভেদে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। "কোড়া" নাম বৃহদ্ধর্ম পুরাণে 'কুড়ব'। ইহাদের একভাগের নাম "শেখর", এই পুরাণে আছে। বাউরীদের মধ্যেও "শেখরিয়া" ভাগ আছে। পরেশনাথ পাহাড়ের নাম, শেখর; এবং তৎ-সন্নিহিত প্রদেশ শেখরভূম। বোধ হয়, একদা কোড়া ও বাউরী এক জাতি ছিল, কোড়ারা মাটিকাটা বৃত্তি ধরিয়া পৃথক হইয়া আছে।

মৃত্তিজ শব্দেরও অর্থ ভূমিজ। এই জাতির চলিত নাম মাটিয়া বা মেট্যা। মাটিকাটার সহিত এই নামের সম্বন্ধ নাই, বস্তুতঃ মাটিকাটা ইহাদের বৃত্তি নয়। বাঁকুড়া জেলায় ইহারা মেট্যা নামে খ্যাত, হুগলী জেলায় মেট্যা-বাগ্‌দী। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজার আদিপুরুষ এই জাতি হইতে উদ্ভূত। এই কারণে সেখানকার মেট্যারা রাজার জাতি, মল্লমেট্যা বলিয়া গৌরব করে। মেট্যারা বাগ্‌দীর এক শ্রেণী, জাতিবৃত্তি মাছ-ধরা। পশ্চিম-বঙ্গে জালিক বা জেল্যা, কৈবর্ত বা কেঅট এবং মেট্যা বা বাগ্‌দী, এই তিন জাতির বৃত্তি মাছ-ধরা। যেখানে জেল্যা নাই, সেখানে কেঅট; যেখানে কেঅট নাই, সেখানে বাগ্‌দী ও মেট্যার প্রধান বৃত্তি এই। জেল্যা ও কেঅট আদিতে একই ছিল, উভয়েই কৈবর্ত, উভয়ের মাছ-ধরার পদ্ধতি একই। ইহারা গভীর জলের ভাসা মাছ ধরে। মাথাঘুরণী ক্ষেপণী (খেয়া) জাল, ইহাদের প্রধান জাল। মেট্যা ও বাগ্‌দী অল্পজলের, কাদাজলের পাঁকের মাছ ধরে। আরও বিশেষ এই, কৈবর্তনারী মাছ ধরে না, বাগ্‌দী-নারী ধরে। "শিবায়ন"গ্রন্থে বাগ্‌দিনী ক্ষেতের জল সিচিয়া মাছ ধরিয়া জাতিবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছে। বাগ্‌দী-বালিকা চালনীর আকারের 'চাটনী' জাল দিয়া জল ছাঁকিয়া ঘুসা, ছোট ছোট পুঠী ইত্যাদি চুনা মাছ ধরে। বাগ্‌দী-বউও তাই করে, কিন্তু জাল বড়, ও ত্রিকোণ। সর্প-ফটাকার বলিয়া এই জালের নাম 'ফেটা-জাল'। বাগ্‌দীর জাল বড় চালনী। কিন্তু ইহাদারা মাছ না ছাঁকিয়া, কাদায় চাপিয়া ধরা হয়। এই হেতু এই জালের নাম চাবি-জাল। অতএব জাল দেখিলেও কৈবর্ত ও বাগদীর প্রভেদ করিতে পারা যায়। এই এই লক্ষণ ও জালের নাম আরামবাগ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এখন কোথাও কোথাও বাগ্‌দীরা খেয়া-জালও ধরিয়াছে। মেদিনীপুরে তীবর বা তীঅর জাতি সমুদ্রের মাছ ধরে। ভারতের পূর্ব-সমুদ্রকূল ধরিয়া এই জাতির বাস।

বাগ্‌দী নামের ব্যুৎপত্তি লইয়া কেহ কেহ গবেষণা করিয়াছেন। ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক, দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। (১) বাগ্‌দী জাতি জলা ও বিল দেশের জাতি; (২) গঙ্গার পশ্চিম মুর্শিদাবাদ হইতে মেদিনীপুর, সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের জাতি। এই হেতু আর্য ও মিশ্র আর্যের সহিত বহুকালের আলাপ বলিয়া আচার-ব্যবহারে অনেকটা উন্নত হইয়াছে। "মেদিনীপুর-ইতিহাসে" এক মাঝি রাজার উল্লেখ আছে। এই মাঝি, মাঝি-বাগ্‌দী, অর্থাৎ বাগ্‌দীর মধ্যে প্রধান জাতি। তেঁতুল্যা বাগ্‌দীও আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ইহাদের মধ্যে "রায়" পদবী আছে। এককালে যে ইহারা রাজা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘাটাল সব্‌ডিভিজনের পূর্বদিকে বড়্‌-দা নামে এক বিস্তীর্ণ জলা আছে। এখানে সুলতানপুর নামে এক গ্রাম আছে। বহুকাল পূর্বে, আমার শৈশবকালে এক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সে গ্রামে এক অপূর্ব ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। শ্রাদ্ধের পূর্বে গ্রামের মুখ্যদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ ও সম্মতি-গ্রহণ চিরন্তন রীতি আছে। দেখি, তদনুসারে শিরোমণি, চূড়ামণি বসিয়াছেন, উচ্চজাতীয় 'ভদ্র' বসিয়াছেন, নিম্ন-আসনে দুই একজন বাগ্‌দীও বসিয়াছে। সে গ্রামে তখন চারিশত ঘর বাগ্‌দীর বাস ছিল, একদা তাহারা রাজা ছিল। তদবধি তাহারা রাজসম্মান পাইয়া আসিতেছিল। শ্রাদ্ধকর্মে বাগ্‌দীর অনুমতি লইতে হয়, আমার শৈশবেও এত নূতন ঠেকিয়াছিল যে, অদ্যাবধি তাহা স্মরণ আছে।

আমার বিশ্বাস বাগ্‌দী নামে বক শব্দের সম্বন্ধ আছে। হয়ত বক-দ্বীপী বলিয়া ব-গ-দী, বাগ্‌দী। বাগ্‌দীর এক ভাগের নাম কুশ-মাটিয়া; হয়ত কুশ-দ্বীপের মৃত্তিজ। আর এক ভাগের নাম, কাঁসাই-কুলিয়া, অর্থাৎ মেদিনীপুরের কাঁসাইনদী-কূল বাসী। তেঁতুলিয়া নামও এইরূপ তেঁতুল নামক স্থান হইতে আসিয়া থাকিবে।

এই সকল নাম দেখিলে মনে হয়, বকদ্বীপ নাম হইতে বাগ্‌দী নাম অসম্ভব নয়। জলা ও বিলে বক চরে, বকদ্বীপ বগ্‌ড়ী ছাড়াও বকাকীর্ণ দেশকে বকদ্বীপ বলা যাইতে পারে। গঙ্গার পশ্চিমে বর্দ্ধমান জেলায় অনেক জলা ও বিল ছিল, এখনও তাহাদের চিহ্ন আছে। সেই অঞ্চলে আর্যের সহিত বাগ্‌দীর প্রথম পরিচয় হইয়াছিল।

কিন্তু প্রকৃত নামটি কি? বাঁকুড়ায় বলে 'বাগতী'। কোথাও কোথাও নাকি 'বাগতীত' বলে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে (ব্রহ্মখণ্ডে) 'বাগতীত' নাম আছে। লিখিত আছে, "ইহারা মহাদস্যু বলবান্ ধনুর্দ্ধর; ক্ষত্রিয়ের (রাজার) দ্বারাও বারিত হইলে 'বাক্ অতীত', আজ্ঞা মানে না, এই হেতু নাম 'বাগতীত'।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বর্ত্তমান সংস্করণ চারিশত বৎসরের পূর্বের নয়। নানা প্রমাণে মনে হইয়াছে, পুরাণখানি কাটোয়া অঞ্চলে লিখিত। অতএব দেখা যাইতেছে, 'বাগতীত' নাম বর্ত্তমানে কল্পিত নয়। নামের উৎপত্তিও কাল্পনিক না হইতে পারে। কারণ বড় বড় জাতির নামগুলি সংস্কৃত-মূলক। বাগ্‌দীর এক শাখার নাম 'লেট'; লেট বাগ্‌দী এখন কেবল মুর্শীদাবাদ জেলায় আছে। এই পুরাণে লেটকেও দস্যু বলা হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণও বঙ্গদেশে, বোধ হয়, কাটোয়ার দক্ষিণে রচিত। পুরাণখানি ছয় সাত শত বৎসর পূর্বে রচিত। ইহাতে 'বাগতীত' নাম নাই, কিন্তু 'মত্ত' নামক জাতির উল্লেখ আছে। উৎপত্তি, ধীবর ও শূদ্রা হইতে। বোধ হয়, এই নাম 'মৃত্তি' হইবে, এবং মেট্যা জাতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আরও জানিতেছি, দোলা-বাহী দোলিয়া বা দুল্যা জাতি পূর্ব্বকালেই বাগ্‌দী হইতে পৃথক্ হইয়াছে। আশ্চর্য এই, এখনও দুল্যা-বাগ্‌দী একত্র বলিয়া উভয়ের একত্ব স্বীকার করিতেছি।

বাগ্‌দী নাম সম্বন্ধে আরও এক কথা মনে পড়িতেছে। অনার্য জাতিদিগের মধ্যে গোত্র আছে। কিন্তু সে গোত্র ঋষি না হইয়া মূর্ত্তিমান্ জন্তু ও বৃক্ষ। যে জাতির যে গোত্র, সে জাতি সে জন্তু বা বৃক্ষকে ভক্তি করে। কাহারও কচ্ছপ গোত্র; সে কচ্ছপ বধ করা দূরে থাক, আদর করিয়া জলে ছাড়িয়া দিবে। কাহারও গোত্র সর্প; সে কিছুতেই সর্প বধ করিবে না। ইত্যাদি। মনে হইতেছে এক শ্রেণী বাগ্‌দীর গোত্র, বক। বাগ্‌দী নানাবিধ পক্ষী-মাংস খায়, কিন্তু বকের মাংস খায় না। ঘৃণাবাচক বক-গোত্রী নাম হইতে বকত্রী, বগতী, বাগতী হইয়া থাকিতে পারে। *

সাধারণ নাম বাগ্‌দী হইলেও ইহাদের মধ্যে জাতি-বিভাগ আছে। তেঁতুল্যা, মেট্যা, কুশ-মেট্যা, মল্লমেট্যা, কাঁসাই-কুল্যা, ইত্যাদি এক এক জাতি ধরা চলে। মাঝি, দণ্ডমাঝি, আর দুই জাতি। বাঁকুড়ায় গুলীমাঝি নামে এক শ্রেণী আছে। বোধ হয়, এই গুলীমাঝিই হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায় মাঝি নামে আখ্যাত হইয়াছে। মাল-বাগ্‌দী সাপ ধরে, লোহার-বাগ্‌দী পূর্ব্বকালে লোহার আকর হইতে লৌহ নিষ্কাশন করিত। কিন্তু লোহার জাতি এখন বাগ্‌দীর উপরে উঠিয়াছে, বাগ্‌দী বলিলে রুষ্ট হয়। ঝিনুক, শামুকের খোলা পোড়াইয়া চুনারি-বাগ্‌দী নাম হইয়াছে।

বাগ্‌দীর সকল জাতি ডাকাতি করিত না। আরাম-বাগ (পূর্ব্বনাম জাহানাবাদ) এখন মেলেরিয়ার জন্য যেমন বিশ্রুত, মেলেরিয়ার পূর্ব্বে ডাকাত ও ঠেঙ্গাড়্যের জন্য তেমন কুখ্যাত ছিল। পথিক-হন্তা দস্যুর নাম ঠেঙ্গাড়্যে; ঠেঙ্গা, লাঠি চালাইতে দক্ষ বলিয়া ঠেঙ্গাড়িয়া, ঠেঙ্গাড়্যে। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া পথ, দুই একটা বড় গাছ কিম্বা আশুৎ গাছ,ও নদী, দীঘি বা অন্য জলাশয় আছে; যেখানে এই তিন বিদ্যমান, সেখানে ঠেঙ্গাড়্যের ওৎ করিবার স্থান ছিল। গাছের আড়ালে, কদাচিৎ গাছের ডালে বসিয়া তাহারা পথিক প্রতীক্ষা করিত। রাত্রে কোন পথিক দুই দশজন মিলিয়াও সে সব পথে চলিত না। অপরাহ্ণেও না, প্রখর মধ্যাহ্নেও না। গোরুর গাড়ী দুই একখানা হইলেও না। ঠেঙ্গাড়্যে প্রায়ই একাকী, ঘাটি বিশেষে দুই তিন জন মিলিয়া পথিকের প্রাণবধ করিয়া পরিধেয় পর্য্যন্ত লুঠিয়া লইয়া জলের ধারে পাঁকে পুতিয়া ফেলিত। পথিকের কাছেও যাইতে হইত না, দূর হইতে

* শুনিলাম হাওড়ার মেট্যা বকমাংস খায়। বাগদী ও মেট্যা বহুকাল পূর্বে পৃথক হইয়া দুই জাতি হইয়াছে।

হাতখানেক লম্বা গেঁঠ্যে বাঁশের 'আড়্-কাব্‌ড়া' আড়দিকে বেগে ছুঁড়িয়া পথিকের হাঁটু ও পায়ে মারিত, তাহাতেই সে ধরাশায়ী হইত। পথিক তৃষ্ণার্ত হইয়া জলাশয়ে জল পান করিতে আসিয়াছে, দেখে নাই কে জলের ধারে মাছ ধরিবার ছলে চাবি-জাল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; সে জালে সে-ই চাবা হইয়া প্রাণ হারাইত। ঠেঙ্গাড়্যের পক্ষে এইরূপে 'কাতলা' মারায় সুবিধা ছিল। পথিকের আর্তনাদ উঠিত না, রক্তচিহ্ন থাকিত না, আর যদি বা একদল পথিক আসিয়া পড়ে, মনে করিবে জলে মাছ ধরিতেছে। আমরা বাল্যকালে জ্যেষ্ঠদের নিকট শিক্ষিত হইতাম, দূরে ঠেঙ্গাড়্যে দেখিলে কিম্বা ঠেঙ্গাড়্যের আশঙ্কা করিলে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হইবে "আমি অমুক গ্রামের, অমুকদের।" পলায়ন-চেষ্টা বৃথা, কাতরোক্তি বৃথা। ঠেঙ্গাড়্যে তাহার জানা গ্রামের লোক মারিত না। বরং এমনও শুনিয়াছি, ঠেঙ্গাড়্যের ভয়ে কম্পিত এরূপ লোককে তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্ত ভর্ৎসনা করিয়া গ্রামে পহুঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ত্রিপ্রান্তর মাঠ যে কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প হয়। ইহার পূর্বে যে কি অবস্থা ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। এখনও সে ভয় সম্পূর্ণ যায় নাই।

দেশের ডাকাতের কথা বলিতে গেলে পুথী বাড়িয়া যাইবে। ডাকাতেরা বীরপুরুষ, যুদ্ধসাজে আসিয়া গৃহস্থের ও গ্রামবাসীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বাড়ী লুঠিতে আসিত। তখন ছিঁচকা চোর ও সিঁধাল চোর ছিল না। গোপনে আসিয়া পুকুরঘাটের বাসন-কোশন চুরি, কাঁকে বাড়ী হইতে দূরের মরাই হইতে ধান চুরি, প্রভৃতি তস্করতা কখনও শুনি নাই। ঘর-শত্রু জ্ঞাতি-শত্রু কিম্বা গ্রাম-শত্রু না থাকিলে ডাকাতির ভয় থাকিত না। অ-জানা ঘরে ডাকাত পড়িত না, শত্রুচর না ডাকিলে পড়িত না, যাহার নুন খাইয়াছে, তাহারও বাড়ীতে পড়িত না। শেষোক্ত গুণ এত প্রবল ছিল যে, বাড়ীর দরওয়ান পিতা ডাকাতের দলের কুবুদ্ধি পুত্রের বুকে শূল বসাইয়া দিয়াছে। স্বগ্রামে ডাকাতি করিত না। এই কারণে ডাকাত জানিয়াও গ্রামবাসী পুলিশে ধরাইয়া দিত না। কোন বাড়ীতে ডাকাতি করিবার পূর্বে চরের সঙ্গে দুই একজন লোক আসিয়া বাড়ী দেখিয়া যাইত; গৃহস্থের ঘুমাইবার সময়, বাহির হইবার পথ, রক্ষণের ব্যবস্থা, ইত্যাদি সহ জানিয়া যাইত। তার পর দিন স্থির করিয়া দল জোটাইয়া দস্যু কর্মে যাত্রা করিত। পথে নির্জন স্থানে গ্রাম হইতে দূরে কালীপূজা ও অল্প মদ্যপান করিত, মুখে তেল-কালী, স্থানে স্থানে চুণ ও সর্বাঙ্গে তেল মাখিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও মশাল লইয়া বাড়ীর উদ্দেশে যথাসময়ে চলিয়া আসিত। রাত্রি একটার পর ডাকাতি হইতে পারিত না, বাড়ীর কেহ জাগিয়া আছে টের পাইলেও ডাকাত পড়িত না। এই কারণে সেকালে বিত্তশালীরা রাত্রি বারটা একটা পর্যন্ত কাছারি করিত। সেকালে বিলাতী দিয়াশলাই ছিল না, খড়ের বিনানা 'বেনা'য় আগুন লইয়া আসিত। দলে পঁচিশ-ত্রিশজন থাকিলেও মাত্র দুই তিনজন যোদ্ধা থাকিত, অন্তেরা গোলা মুনিষ মাত্র। যোদ্ধাদের কোমরে ঘুন্সুর, হাতে লাঠি ও তলোয়ার, কদাচিৎ বাখারীর যোনা ঢাল থাকিত। বাড়ীতে আসিয়া ইহারা বাহির হইবার পথ, ঘাটি, আগলাইত, বেনার আগুনে মশাল ধরাইত, এবং গোলারা শাবল, কাটারী, কুড়াল প্রভৃতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিত। একবার ভিতরে ঢুকিলে গৃহস্থের আর রক্ষা নাই। ভিতরে ঢুকিতে দ্বার ভাঙ্গিতে প্রায় হইত না, বরং যাহাতে ভাঙ্গিতে না হয়, সে চেষ্টা করিত। সেকালে নির্মিত পাকাবাড়ীর দ্বার ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ দুঃসাধ্য ছিল। আমাদের নিজের বাড়ী বলি। নীচে তলার বাহির দিকে একটিও জানালা নাই, পর পর দুইটি দ্বার না ভাঙ্গিলে উপরে শয়ন-ঘরে প্রবেশ অসাধ্য। এই দুয়ের মধ্যে উপর দালানের মুখে প্রথমে কাঠের কপাট, পরে লোহার মোটা মোটা গরাদের টানা কপাট। প্রত্যেক দ্বার গাঁথিবার সময় পাশের দেওয়ালে নালী ও তন্মধ্যে কাঠের অর্গল রাখিয়া গাঁথা হইয়াছে। দেওয়াল ভাঙ্গিতে না পারিলে দ্বার খুলিবে না। উপরে উঠিবার সিঁড়ি এত ঘুরানা যে লম্বা কাঠ উঠিবে না। ডাকাতেরা হাল্‌কা ঢেঁকির প্রহারে কপাট ভাঙ্গিত, কিন্তু উপর দালানে উঠিবার মুখের সিঁড়িতে এত স্থান নাই যে ঢেঁকি

চালাইতে পারে। বাড়ীকে গড়ে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে পূর্বকালে চক-মিলানা করা হইত। চক-মিলানা না হইলে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া পড়া, সাধারণ কাজ। লাঠিতে ভর দিয়া পাঁচ ছয় হাত উচ্চ প্রাচীর যে-সে টপ্কাইতে পারিত। কাঁধের উপরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দু-তলার ছাদে ওঠাও কঠিন কর্ম ছিল না। দোড়ীর মাথায় বাঁশের কিম্বা লোহার অঙ্কুশ বাঁধিয়া নীচে হইতে, ছাদের উপরে ছুঁড়িয়া আলিশায় আটকাইয়া দোড়ী বাহিয়া ওঠাও সহজ বুদ্ধি। লুঠ করিবার সময় ডাকাতেরা নারীর গায়ে হাত তুলিত না, হাতের বালা চুড়ী, কানের মাকড়ী, গলার হার দেখাইয়া দিত। এই সকল "ছোট লোক" ডাকাত দিনের বেলায় অভ্যাস হেতুও ভদ্রঘরের নারীর গাত্র স্পর্শ করিতে সাহসী হইত না। নারী, কালী-মায়ের জাতি। শুনিয়াছি, এক বাড়ীর গৃহিণী কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন, তিনি রক্ষার উপায় না দেখিয়া মাথার চুল এলো করিয়া জিব বাহির করিয়া কাতান হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ডাকাতেরা এই মূর্তি দেখিয়া হুড়্ হুড়্ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। ডাকাতেরা বিনা কারণে খুন করিত না। কিন্তু প্রতিরোধ আশঙ্কা করিলে রণমূর্তি ধরিত। লাঠিয়াল সর্দারের রণবেশ, রে রে গর্জন, বেগে উল্লম্ফন, ঘুঙ্ঘুরের ঝম্ ঝম্, রাত্রিকালে মশালের আলোকে ভীষণ হইয়া উঠিত। প্রতিবেশী ও গ্রামবাসী এসময় নীরব নিশ্চেষ্ট থাকিত। যখন ডাকাতেরা লুঠ লইয়া চলিয়া যাইত, সে সময়ে তাহাদের একজনকেও আহত করিতে পশ্চাৎ ধাবিত হইত। লুন্ঠিত টাকাকড়ি ডাকাতেরা ভাগ মত ভাগ করিয়া লইত, সোনা-রূপার অলঙ্কার 'ভাঁড়ারী'র ঘরে উঠিত। ভাঁড়ারী অলঙ্কারের বিনিময়ে যে অল্প টাকা দিত, সে টাকা সর্দারের প্রাপ্য ছিল। ভাঁড়ারী দিনে সাধু, তেজারতি মহাজনি করেন, রাত্রে অপহৃত স্বর্ণ-রৌপ্য গলাইয়া আত্মসাৎ করিতেন। কেহ কেহ অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া লোককে টাকা ধার দিত। ইহারা গোপনে; রাত্রে ভাঁড়ারী হইয়া নির্ভয়ে লুণ্ঠিত অলঙ্কার ভাঁড়ারে রাখিয়া দিত। ডাকাৎ পুষিয়া ভাঁড়ারী ধনবান্ হইত, জমিদারি কিনিত, ডাকাতের ভাগ্যে দুই চারি মাসের সম্বল জুটিত কিনা সন্দেহ। তখন আবার ডাকাতি না করিলে তাহাদের দিন চলিত না। কৈবর্ত্য ও মাঝি বাগ্দী হইতে, কদাচিৎ হাড়ি, ডোম হইতে ডাকাতের দল পুষ্ট হইত। মুসলমানও দল বাঁধিত। এইরূপ কোথাও খয়রা, কোথাও ভূমিজ, ডাকাতের জাতি ছিল। কিন্তু এত ডাকাতের দেশে লোকে ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিত না। তখনকার লোকের সাহস ছিল, গায়ে বল ছিল, পাড়ায় পাড়ায় আখড়ায় লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, তীর ধাটুল ছোড়া, ইতর ভদ্র সকলেই শিখিত। ষাটি সত্তরি বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি। হুগলী, মুর্শীদাবাদ, এই দুই জেলা এবং বীরভূমও ডাকাতির জেলা ছিল।* বোধ হয়, ইং ১৮৫৬ সালের সময়ে ডাকাত-দমনের নিমিত্ত পুলিশের ডাকাত-বিভাগ খোলা হইয়াছিল। গ্রামে গ্রামে দারোগা ঘুরিয়া ডাকাত জাতির মধ্যে যাহাকে বলিষ্ঠ ও ডাকাত-আকৃতি দেখিতে পাইল, তাহাকেই ধরিয়া লইয়া দ্বীপান্তরে পাঠাইতে লাগিল। এখন গ্রামবাসীর সাহস হইয়াছিল, ডাকাত ধরাইয়াও দিতে লাগিল। অনেক ডাকাত ও সর্দার এই সঙ্কট সময়ে ধনবানের দরওয়ান হইয়া নিষ্কৃতি পাইল। সে দ্বীপান্তর হইতে নিস্তার পাইল বটে কিন্তু গৃহস্বামী তাহার সংব্যবহারের নিমিত্ত দায়ী হইয়া রহিলেন। ইহার বছর-দশেক পরে, দেশে ভীষণ মেলেরিয়া আরম্ভ হইল, গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইতে লাগিল, ডাকাতের বংশও হ্রাস পাইতে লাগিল। কিন্তু সে সময়েও ডাকাতি চলিয়াছিল। এখন সে সব ইতিহাস, উপকথা মনে হয়।

দেশী ডাকাতের উপদ্রবে কেহ কেহ সর্বস্বান্ত হইত বটে, কিন্ত তাহাতে অশান্তি জন্মে নাই। বিদেশী

---

* এই তিন জেলার ডাকাতির সংখ্যা

	ইং ১৮৫৬	১৮৫৭	১৮৫৮	১৮৫৯
হুগলী	৪১	৩০	২৭	২৫
মুর্শীদাবাদ	৬৫	৫০	২৯	২৫
বীরভূম	৩১	১৯	৫১	৩০

ইং ১৮৫৬ সালে যশোরে ৩২টি হইয়াছিল। মধ্যবঙ্গেও ডাকাতি হইত বটে, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের তুলনায় নগণ্য।

(Annals of Indian Administration. 1859-60. Pages 148-150.)

মারহাট্টা বর্গী* দিনে ডাকাতি করিত, গ্রাম, নগর লুঠ করিত, গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দিত। এক বৎসর নয়, এগার বৎসর (ইং ১৭৪০-৫১) এই ব্যাপার এমন চলিয়াছিল যে, পশ্চিমবঙ্গ ছারখার হইয়াছিল, এখনও লোকে ভুলিতে পারে নাই। আমি বাল্যকালে বৃদ্ধাদের মুখে শুনিয়াছি, যে সময়ে নারীর সতীত্বরক্ষা দুষ্কর হইয়াছিল, নরপিশাচদিগের লোলদৃষ্টি যুবতীর উপর পতিত হইত। গ্রামে বর্গী পড়িলে কোন নারী লেপের ভিতর লুকাইত, কেহ নিবিড় বনে পলায়ন করিত, কেহ হাঁড়ীর ভিতর মাথা লুকাইয়া আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া থাকিত। বর্গীরা আশানুরূপ টাকাকড়ি না পাইলে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। আমি যখন শুনিয়াছি, তখন একশত বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু তখনও স্মৃতি-পরম্পরা লুপ্ত হয় নাই। তৎকালে আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব। কিন্তু নবাবের সৈন্য বর্গীদের চাতুরী বুঝিতে পারিত না, কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িবে, কোথায় লুকাইবে, নিশ্চয় করিতে পারিত না। তৎকালের গঙ্গারাম চৌধুরী নামে এক কবি "মহারাষ্ট্র পুরাণে" বর্গীর রোমহর্ষণ অত্যাচার লিখিয়া গিয়াছেন। কবি মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে চাকরি করিতেন। পুরাণখানি বাং ১১৫৮, ইং ১৭৫১ সালে, অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামার শেষ বৎসরে লিখিত। বাং ১৩১৩ সালের "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা"র মহারাষ্ট্র পুরাণের এক অধ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। কবির নিবাস, মৈমনসিং জেলায় ছিল, পুরাণের ভাষায় তাঁহার জন্মস্থানের ও রাঢ়ের ভাষা মিশিয়া গিয়াছে। বর্গীরা কোন্ কোন্ গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল, কবি তাহাদের এক তালিকা দিয়াছেন,

চন্দ্রকোনা মেদিনীপুর আর দিগর নগর।
খিরপাই পোড়ায় আর বর্দ্ধমান সহর।

ইত্যাদি। বর্গীরা কেবল বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

বাঙ্গলা চৌআরি যত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোটবড় ঘর আদি পোড়াইল সব।
কাহুকে বাঁধে বরশি দিআ পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া।
রূপি দেহ ২ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইলে তবে নাকে জল ভরে।

* * * *

কারু হাত কাটে কারু নাককান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ।
ভাল ২ স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুঠে দড়ি বাঁধি দেয় তাহার গলায়।

ইত্যাদি।

টাকা না পাইলে হাত-কাটা, মাথা-কাটা, ঘর-জ্বালান, বীর শিবাজীও অনুমোদন করিতেন, নিরীহ হিন্দু ভাবিয়া ধর্ম্মহানির ভয় করিতেন না। যুদ্ধক্ষেত্র নয়, প্রতিযোদ্ধা নয়, শত্রু নয়, তথাপি গ্রাম পোড়াইয়া দিলে বর্ব্বরতাই দেখিতে পাই। তিনি পরনারীকে মাতৃজ্ঞান করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মারহাট্টা বর্গীর সে ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না। তৎকালের মুসলমান ঐতিহাসিক বর্গীর হাঙ্গামার যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা গঙ্গারামের পুরাণের অনুরূপ। ইং ১৭৫১ সালে বাংলার নবাবের কৌশলে বর্গী-সেনাপতি ভাস্কর রাও পণ্ডিত নিহত হয়। নবাব সাহেব মারাঠাদিগকে ওড়িষ্যা দেশ ছাড়িয়া দিয়া এবং বাংলার রাজস্বের চৌথ অর্থাৎ চতুর্থাংশ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা কর স্বীকার করিয়া দেশকে বর্গীমুক্ত করেন।

পশ্চিমবঙ্গ বর্গীমুক্ত হইয়া অল্প অল্পে পূর্ব্বের অবস্থায় আসিতে লাগিল। কিন্তু বেশীদিন সুখ-শান্তি ভোগ করিতে হইল না। বাং ১১৭৬ সালের দারুণ দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সে আকালের করুণ কাহিনী পড়িলে প্রাণ আকুলিত হইয়া ওঠে। অধিক কি, জঠর-জ্বালায় মানুষে মানুষ খাইয়াছিল। তখন দেশটি দুই রাজার অধীনে; মুসলমান ও ইংরেজ। দুই রাজাই কেবল রাজস্ব চিন্তা করিতেন; প্রজাপালন যে রাজধর্ম্ম, এক রাজাও চিন্তা করিতেন

* বর্গী নাম মারাঠী ভাষার বার্গীর। বারগীর, অশ্বারোহী রাজদত্ত অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিক। অস্ত্রের মধ্যে বন্দুকও থাকিত। শতটি বার্গী, অর্দ্ধ বন্দুকধারী।

না। যাহা হইবার, তাহা নির্বিঘ্নে হইয়া গেল, নবাবের নায়েবের হুকুমে কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব আদায় হইল; প্রজা বাঁচিল কি মরিল, সে চিন্তা প্রজার রহিল। দেশের কি দুর্দৈব, ইহার একশত বৎসর পরে, যখন ব্রিটিশ সিংহ দেশের একচ্ছত্র রাজা, সন ১২৭২ সালে আবার মন্বন্তর। এটি ইং ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ নামে ইতিহাসে লিখিত হইলেও হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় করাল মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। তখন আমার বয়স ছয় সাত বৎসর; মনে পড়ে সে সময়ে (কার্তিক মাসে) আমাদের বাড়ীতে এক শ্রাদ্ধক্রিয়া সমারোহে হইয়াছিল, আর অগণ্য কাঙ্গালী বাড়ীর চারিদিক এমন আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে যাতায়াতের পথ পাওয়া যাইত না। কেন এত নারী, কেন এতকাল ঘেরিয়া বসিয়া আছে, বুঝিতাম না। আকাল পড়িয়াছে, এইরূপই হয়। পরে শুনিয়াছি, আমড়া গাছ, তেঁতুল গাছে পাতা ছিল না, পাতের উচ্ছিষ্ট দুই এক কণা অন্নের তরে মানুষে কুকুরে সংগ্রাম হইত, ছেলের গালে চড় মারিয়া কাঙ্গালিনী নারী, অন্ন নয়, চালের কুঁড়া গো-গ্রাসে গিলিয়া খাইত, পাছে আর কেহ আসিয়া খাইয়া ফেলে। উড়িষ্যায় নাকি দশলক্ষ নরনারী অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, ধনবান্ গৃহস্থ সোনা-রূপার বিনিময়েও সমান ওজনে চাউল পাইত না। টাকা বড় কি অন্ন বড়, কাহারও বুঝিতে সময় লাগে নাই।

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে যাহারা বাঁচিবার বাঁচিল; বুঝিল, মরাইএ ধান থাকিলে অনাহারে অপমৃত্যু ঘটিবে না। দেশে ডাকাত ছিল, কিন্তু তাহারা ধান চুরি করিত না। কিন্তু তিন চারি বৎসর যাইতে না যাইতে শোনা গেল, বর্দ্ধমান হইতে এক মহামারী গ্রামে গ্রামে ছাউনি করিতে করিতে যেন তালে তালে দক্ষিণ দিকে আসিতেছে। এই মেলেরিয়া-রাক্ষসী. অদ্যাপি তিল তিল করিয়া লোকের রক্ত শোষণ করিতেছে। কিন্তু প্রথম আক্রমণের সময় এমন শিষ্ট মূর্তি ছিল না। আমার মনে পড়ে, ছয় মাসের মধ্যে আমাদের গ্রামের দশ আনা প্রাণী লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। কাঁদিবার মানুষ ছিল না, মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইত না, শ্মশান-ভূমিতে গৃধ্র শৃগাল কুকুরের মাতামাতি চলিয়াছিল। এখন আর চুয়াড়-বাগ্‌দীর বাস নাই, চাপে চাপ বসতি নাই। এবিষয়ে বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুরে প্রভেদ নাই, "মেদিনীপুর-ইতিহাসে" একই ইতিহাস শুনিতেছি।

নিষ্কণ্টক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১

খরস্রোত প্রবাহিনীর তীরে মনোহর উদ্যান, উদ্যানের মধ্যে মীরমঞ্জিল নামক প্রাসাদ। বাগানে চামেলী, জুঁই, মল্লিকা, গন্ধরাজ, চাঁপা, নাগকেশর ফুলের গাছ, পুষ্করিণীতে জল তক্ তক্ করিতেছে, তাহার পাশ দিয়া বড় বড় ঝাউ গাছের সারি। এক দিকে ফলের গাছ, আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল।

বাড়ীর বাহিরে সিংহদরজার মত ফটক, সেখান হইতে দুই দিক দিয়া বাড়ীর সদর দরজার পথ আসিয়াছে, দরজার সম্মুখে গাড়ীবারান্দা। বাগানবাড়ী, দোতালা, সব-শুদ্ধ দশ-বারটা বড় বড় ঘর আছে। একটু দূরে মোটর ও গাড়ী রাখিবার ঘর, চাকরবাকরদিগের থাকিবার ঘর।

বাড়ীতে লোকজন অধিক ছিল না। মসীর খাঁ নামক একজন ধনী মুসলমান যুবক সে-গৃহে বাস করিতেন। দুইজন ভৃত্য, একজন বাবর্চি ও একজন মোটরচালক ছিল। বাড়ীর নীচে নদীর ধারে একটা নৌকার ঘর ছিল। তাহাতে তালা বন্ধ করা একটি

ছোট বোট, বোটের জন্য একজন মাঝি। নসীর খাঁ কখন মোটরবোটে, কখন মোটরে বেড়াইতে যাইতেন, কখন সঙ্গে লোক থাকিত, কখন একা যাইতেন।

অল্পদিন হইল এ বাড়ীতে তিনি আসিয়াছেন। কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত না, তিনিও কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না। খুব কাছাকাছি না হইলেও অল্প দূরে আরও বাড়ী ছিল, পথে যাইতে সময় সময় নৃত্যগীতের শব্দ শোনা যাইত, কিন্তু মীর-মনজিল স্তব্ধ, মনুষ্যকণ্ঠও শুনিতে পাওয়া যাইত না। সে-পথে গাড়ী ঘোড়া কি মোটর অধিক চলিত না, সুতরাং নসীর খাঁর মোটরও প্রায় নিঃশব্দে আসা-যাওয়া করিত, হর্ণের শব্দ বড়-একটা শোনা যাইত না। তিনি কখন বাড়ী থাকিতেন, কখন বাহিরে যাইতেন তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। ভৃত্যেরা কলের মত কাজ করিত, বাহিরে কোথাও বেড়াইতে যাওয়া বা অন্য বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে গল্পগুজব করা তাহাদের ছিল না। দুই-একবার অপর লোকেরা তাহাদের সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা অল্পভাষী দেখিয়া সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

নসীর খাঁকে দেখিলে তাঁহার এরূপ একা বাস করিবার কারণ কিছুই বুঝা যাইত না। নবীন যুবাপুরুষ, উন্নতকায়, দীর্ঘমূর্ত্তি, সুশ্রী সতেজ মুখ, অল্প শ্মশ্রু, আয়ত বক্ষ, ক্ষীণ কটি। বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান আকৃতি। অর্থের অপ্রতুল মনে হয় না, মোটর গাড়ী আর মোটর নৌকা ধনী না হইলে রাখিতে পারে না, আর এই বয়সে যৌবনের উত্তেজনা, কত রকম আমোদ-প্রমোদে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। নসীর খাঁর পরিচ্ছদ, আহার ইত্যাদি ধনীর মত, কিন্তু কোন রকম সখ তাঁহার দেখিতে পাওয়া যাইত না। ঘরে ঘরে বিনা তারের, রেডিও, তাঁহার তাহা ছিল না। বাড়ীতে একটা গ্রামোফোন পর্য্যন্ত নাই। সখের মধ্যে মোটর, স্থলপথে ও জলপথে। কোথায় বেড়াইতে যাইতেন তাহাও বড়-একটা কেহ জানিত না।

-২-

একদিন বৈকাল বেলা নসীর খাঁ মোটরে করিয়া একটা বড় সহরে উপস্থিত হইলেন। সহর তাঁহার বাড়ী হইতে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ। সহরের বড় রাস্তার উপর একটা বড় বাড়ীর সম্মুখে মোটর দাঁড়াইল। মোটর-চালককে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া নসীর খাঁ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

বসতবাড়ী নয়, একজন বড় মহাজনের কুঠি। দোতালায় উঠিয়া নসীর খাঁ দেখিলেন একটা বড় ঘরে মেঝের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি বসিয়া আছে, মাথায় পাগড়ী, কপালে ফোঁটা। ইনি গদিওয়ালা মহাজন বংশীলাল আগরওয়ালা। সামনে একটা কাঠের বড় বাক্স, পাশে হিসাবের খাতাপত্র। নসীর খাঁকে দেখিয়া বলিলেন, আসুন খাঁ-সাহেব, বসুন।

নসীর খাঁ বলিলেন, শেঠ-সাহেব, মিজাজ ভাল ত?

বংশীলাল বলিলেন, আপনার অনুগ্রহ।

নসীর খাঁ জুতা খুলিয়া বসিলেন। মহাজন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হুকুম?

—একটা হুণ্ডী আছে।

—কই, দেখি, বলিয়া বংশীলাল হাত বাড়াইলেন।

শেরওয়ানীর পকেট হইতে নসীর খাঁ হুণ্ডী বাহির করিয়া দিলেন। বংশীলাল চক্ষে চসমা দিয়া হুণ্ডী ভাল করিয়া দেখিলেন। কহিলেন, ৫০০৲ টাকা। নোট না রোক দিব?

—ছোট নোট হইলেই চলিবে।

বংশীলাল বাক্স খুলিয়া ১০০৲ টাকা করিয়া ১০৲ টাকার নোটের পাঁচখানি তাড়া বাহির করিয়া গণিয়া দিলেন। নসীর খাঁ শেরওয়ানীর নীচে মেরজাইয়ের পকেটে নোটের তাড়া পূরিলেন।

বংশীলাল একবার এদিক ওদিক দেখিলেন, ঘরে বা সম্মুখে আর কোন লোক ছিল না। গলা নীচু করিয়া কহিলেন, আপনার নামে একখানা চিঠি আছে।

বড় বাক্সের ভিতর আর একটি ছোট ইস্পাতের ক্যাশ-বাক্স ছিল। বংশীলাল কোমরের খুন্সী হইতে একটি ছোট চাবি লইয়া বাক্স খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে, শিলমোহর করা একখানি চিঠি নসীর খাঁর হাতে দিলেন। চিঠি খুলিয়া পড়িয়া নসীর খাঁ

কহিলেন, ইনি কয়দিন আসিয়াছেন? আমাকে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছেন। কোন্ বাড়ীতে তাঁহার দেখা পাইব?

—দুই দিন হইল আসিয়াছেন। আপনাকে প্রকাশ্য ভাবে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। আপনার মোটর আছে?

—আছে।

—মোটর এখানেই থাকুক। আমরা হাঁটিয়া যাইব।

—বেশ, চলুন।

বংশীলাল নসীর খাঁকে সঙ্গে করিয়া একটা ছোট ঘরে লইয়া গেলেন। সে ঘরে কাপড়চোপড় থাকিত। নসীর খাঁকে বসাইয়া বংশীলাল বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, মেহেতা জী!

মেহেতা জী নিজের ঘর হইতে হিসাবপত্র রাখিয়া দিয়া উঠিয়া আসিলেন। বংশীলাল কহিলেন, আমি একবার বাহিরে যাইতেছি। আপনি আমার বাক্স ও খাতাপত্র তুলিয়া রাখুন।

—যে আজ্ঞা।

নসীর খাঁ যে ঘরে বসিয়াছিলেন বংশীলাল সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কহিলেন, আমাদিগকে অত্যন্ত সাবধানে যাইতে হইবে বুঝিতেই পারিতেছেন?

—হাঁ, বুঝিতে পারিতেছি।

—আমরা যতই গোপনে যাই না কেন আমাদের পিছনে লোক লাগিবেই।

—তাহাও বুঝিতেছি, কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে যাইতেছেন কেন? আপনারও বিপদ হইতে পারে।

বংশীলাল অল্প হাসিলেন, কহিলেন, আপনার ও আমার একই অবস্থা। আপনার আশঙ্কা অধিক, কেন না আমার লোকবল আছে, আপনি একা।

এবার নসীর খাঁ হাসিলেন, কহিলেন, একা যেটুকু পারি সাবধান থাকিব।

বংশীলাল একটি ছোট দরজা খুলিয়া নসীর খাঁর সঙ্গে বাড়ীর পিছনের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। সেখানে দরজা খুলিতেই একটা গলি। গলির মোড়ে দুইজন বলবান পুরুষ লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বংশীলাল সঙ্কেত করিবামাত্রই তাহারা দুইজন তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

৩

বংশীলাল বরাবর গলির ভিতর দিয়া চলিলেন, কোথাও বড় রাস্তা পড়িলে পাশ কাটাইয়া অন্য একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর এইরূপে গিয়া তাঁহারা একটা রাস্তার উপর একটা বড় বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ, সম্মুখের অপর দরজা জানালাও বন্ধ। বংশীলাল দরজায় করাঘাত করাতে ভিতর হইতে একজন দরজা অল্প খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

—বংশীলাল আগরওয়ালা।

ভিতর হইতে আর একজন বলিল, দরজা খুলিয়া দাও।

দরজা খুলিতে বংশীলাল ও নসীর খাঁ দেখিলেন চারজন লোক সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, একজনের হাতে ভরা পিস্তল আর এক জনের হাতে খোলা তলওয়ার। তাহাদের পাশে আর একজন নিরস্ত্র ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, সে-ই দরজা খুলিতে বলিয়াছিল। বংশীলাল, নসীর খাঁ ও তাঁহাদের সঙ্গের দুইজন লোক ভিতরে প্রবেশ করিতেই একজন দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

নিরস্ত্র ব্যক্তি বংশীলাল ও নসীর খাঁকে বলিল, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

দোতালার উপরে কয়েকটা ঘর পার হইয়া তাঁহারা একটা ঘরের দরজায় উপস্থিত হইলেন। সেখানেও একজন প্রহরী। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সে পথ ছাড়িয়া দিল।

ঘরের ভিতর একটা টেবিলের সম্মুখে দুইজন লোক বসিয়া। একজনের বয়স পঞ্চাশ হইবে আর একজন তরুণ বয়স, কুড়ি বাইশ বৎসরের অধিক নয়। দুই জনকে দেখিলেই মনে হয় যে, ইহারা বিশেষ সম্ভ্রান্ত-বংশীয়। যাঁহার বয়স অধিক তাঁহার চুল কিছু পাকিয়াছে, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু আরত ও অত্যন্ত উজ্জ্বল। বর্ণ গৌর, আকৃতি কিছু দীর্ঘ, শরীর কৃশ কিন্তু দুর্বল নয়, মুখের

ভাব গভীর। যুবক অনেকটা তাঁহারই মত দেখিতে, অত্যন্ত সুপুরুষ, মুখের ভাব অতি নম্র।

বংশীলাল ও নসীর খাঁকে দেখিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তি আসন ত্যাগ করিলেন না, কিন্তু তাঁহারা দুইজন অত্যন্ত বিনীত-ভাবে অভিবাদন করিলেন। যুবক উঠিয়া সেলাম করিল।

নসীর খাঁ ও বংশীলাল আদেশ-মত উপবেশন করিলেন। প্রৌঢ় পুরুষ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আমাদের বিপদে যে তোমরাও জড়িত হইতেছ ইহাতে আমার ক্ষোভ হইতেছে।

বংশীলাল কহিলেন, আমরা পুরুষানুক্রমে আপনাদের প্রজা, আমাদের যাহা কিছু আছে আপনাদের কৃপায়। আমাদের জান মাল আপনার আজ্ঞাধীন। এই রাজ্য আপনার, শত্রু আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছে।

পুরুষ নসীর খাঁকে কহিলেন, তুমি আমার আত্মীয়, কিন্তু তাহা হইলেও এই অল্প বয়সে যে তুমি আমাদের জন্য বিপদগ্রস্ত হইতে চাও ইহাতে কিছু কুণ্ঠিত হইতে হয়।

নসীর খাঁ হাতজোড় করিয়া কহিলেন, হজরত, আপনি নাজীর শাহের পৌত্র শাহ সুলেমান। আপনার সহিত আত্মীয়তা আছে বলিয়া আমি গৌরব করিতে পারি, কিন্তু আমিও প্রজা ও কিঙ্কর, আপনার কার্য্যে প্রাণের আশঙ্কা অতি তুচ্ছ মনে করি।

শাহ সুলেমান কহিলেন, বড় ভাগ্যবান না হইলে তোমাদের মত বন্ধু মিলে না! দেখ, আমি নিজে সব ছাড়িয়া দিয়া ফকীর হইতে পারি, কিন্তু এই বালক আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার অবর্ত্তমানে সিংহাসন ইহার, ইহাকে বঞ্চিত করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। সিকন্দর শাহ, তুমি কি বল?

যুবক সিকন্দর শাহ মস্তক অবনত করিয়া বলিল, আপনার আদেশ ছাড়া আমার কোন স্বতন্ত্র অভিপ্রায় নাই। আমার বলিবার কিছুই নাই।

শাহ সুলেমান উঠিয়া বংশীলাল ও নসীর খাঁকে বলিলেন, তোমরা একবার আমার সঙ্গে আইস।

পাশের ঘরে গিয়া শাহ সুলেমান তাঁহাদিগকে দেখাইলেন ঘরে বাক্স, সিন্দুক, সমস্ত খোলা পড়িয়া আছে, জিনিষপত্র চারিদিকে ছড়ান। আর এক ঘরেও সেইরূপ।

শাহ সুলেমান বলিলেন, আমরা এখানে দুই দিন হইল আসিয়াছি, কিন্তু ইহারই মধ্যে কাল রাত্রে কখন কে আমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বাক্স-পেটরা ভাঙিয়া তচনচ করিয়াছে, অথচ কিছু চুরি হয় নাই। সাধারণ চোরের কাজ নয় বুঝিতেই পারিতেছ। যাহা খুঁজিতে আসিয়াছিল তাহা পায় নাই। বাড়ীতে লোকজন, পাহারা, কিন্তু কখন ঘরে লোক আসিয়াছিল কেহ জানিতে পারে নাই।

বংশীলাল বলিলেন, আপনার লোক কি সব বিশ্বাসী?

—আমার লোকেরা পুরুষানুক্রমে আমাদের বংশে কাজ করিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ অবিশ্বাসী হইলে কত কাল পূর্ব্বে চুরি হইয়া যাইত। কি চুরি করিতে আসিয়াছিল তোমরা জান ত?

বংশীলাল বলিলেন, কিছু কাগজপত্র আছে জানি।

নসীর খাঁ বলিলেন, একটা প্রাচীন শিলমোহরও আছে।

শাহ সুলেমান বলিলেন, আছে তিনটি জিনিষ। সেই তিনটি জিনিষ না থাকিলে কেহ এ রাজ্য নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগ করিতে পারিত না। যাহারা আমাদিগকে বলপূর্ব্বক শঠতা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, সেই তিনটি সামগ্রী না পাইলে তাহারা শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হইবে। এ সকল রাজ্য শাহান শাহ মোবারক শাহের অধীন, তোমরা সকলেই জান। বৎসরে একবার করিয়া আমাদিগকে তাঁহার রাজধানীতে যাইতে হয়, সেই সময় সেই সকল নিদর্শন দেখাইতে হয়। না দেখাইতে পারিলে রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয়, শাহান শাহ আর কাহাকেও দিয়া দেন। তাঁহার সৈন্যবল এত অধিক যে, তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে কাহারও সাহস হয় না। আমাদের শত্রুগণ মাস হইল রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, আর দুই মাস পরে তাহাকে রাজধানী যাইতেই হইবে। সেইজন্য সেই তিনটি জিনিষের খোঁজ করিতেছে।

বংশীলাল বলিলেন, আপনাদের কোন আশঙ্কা নাই।

—এখন নয়। আমাদিগকে এখন হত্যা করিলে কোন ফল নাই। কেন না তাহা হইলে সে-সকল সামগ্রী একেবারেই না পাওয়া যাইতে পারে, আমরা অপর কাহাকেও দিয়া দিতে পারি। কিন্তু সে-সকল জিনিষ পাইলেই আমাদিগকে হত্যা করিবে।

নসীর খাঁ কিছু বেগের সহিত কহিলেন, আমরা আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সুলেমান শাহ বলিলেন, তোমরা আমার পরম মিত্র জানি, কিন্তু গুপ্তশত্রু হইতে কতক্ষণ রক্ষা করিবে? এই দেখ এত লোক থাকিতে এই বাড়ীতে লোক আসিয়াছিল। সিকন্দর ও আমি পিস্তল লইয়া শয়ন করি, রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দুজন সশস্ত্র প্রহরী থাকে, কিন্তু কোথায় কখন আমাদের প্রাণের আশঙ্কা তাহা কেমন করিয়া জানা যাইবে? তবে আমার বিশ্বাস এখন আমাদের প্রাণের আশঙ্কা নাই।

বংশীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কয়েকটা সামগ্রী সাবধানে রাখিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

অল্প হাসিয়া সুলেমান শাহ বলিলেন, সেই পরামর্শ করিবার জন্যই তোমাদিগকে ডাকাইয়াছি। সে জিনিষগুলা এখন পর্য্যন্ত আমার কাছেই আছে, কিন্তু কিছুদিন আর কোথাও রাখিতে পারিলে ভাল হয়। তোমরা একটু অপেক্ষা কর।

সুলেমান শাহ চলিয়া গেলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন তাঁহার হাতে তিনটি সামগ্রী, দুইটি ছাগচর্ম্মের টুকরা, তাহাতে পাকা কালীতে লেখা, আর একটি সোনার নাম খোদাই করা মোহর। তিনটিই অত্যন্ত প্রাচীন, কিন্তু দেখিতে এত সামান্য যে পথে পড়িয়া থাকিলেও কেহ চুরি করে না। অথচ এই তিনটি সামগ্রী একটা রাজ্যলাভের উপায়, ইহাদের অন্বেষণে কত লোক দিবারাত্র ফিরিতেছে।

—আমার ইচ্ছা এই তিনটি সামগ্রী আর একত্রে না রাখা হয়, তাহা হইলে সবগুলি একসঙ্গে অপহৃত হইবে না।

বংশীলালকে সম্বোধন করিয়া সুলেমান শাহ এই কথা বলিলেন।

বংশীলাল কহিলেন, হুজুর যেমন আদেশ করিবেন সেইরূপ হইবে। আমাকে যাহা রাখিতে বলিবেন রাখিব।

নসীর খাঁ কহিলেন, আমিও রাখিতে সম্মত আছি।

সুলেমান শাহ কহিলেন, যাহারা এই কয়টি জিনিষ চুরি করিয়া কিম্বা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারা জানে এগুলি আমার কাছে আছে। আমার নিকট হইতে অপহরণ করিবার অনেকবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তোমাদিগকে যে সন্দেহ করিবে না এমন মনে করিও না। আমাদের কাছে কে আসে যায় সে সন্ধান তাহারা রাখে। তোমরা আমার বিশ্বস্ত বন্ধু তাহাও তাহারা জানে। যদি তাহাদের সংশয় হয় যে, এই সকল জিনিষ তোমাদের কাছে আছে তাহা হইলে তোমাদের বাড়ী ত খুঁজিবেই, তোমাদের জন্য আশঙ্কাও আছে।

নসীর খাঁ বলিলেন, আপনি সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না, আমরা যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিব।

সুলেমান শাহ একখণ্ড চর্ম্ম ও মোহর আলাদা করিয়া কহিলেন, এই দুইটি অধিক প্রাচীন ও একটি না দেখাইতে পারিলে মোবারক শাহ কাহাকেও রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন না। তোমরা কে কোনটি রাখিবে?

বংশীলাল বলিলেন, প্রাচীন সনদ আমাকে দিন।

নসীর খাঁ বলিলেন, তাহা হইলে মোহর আমি রাখিব।

সুলেমান শাহ কহিলেন, আমি আরও একটা কথা ভাবিয়াছি। সিকন্দর শাহ কিছুদিন আমার কাছে না থাকিয়া আর কোথাও থাকিলে হয়। তাহাতে আশঙ্কা থাকিলেও লাভ আছে।

নসীর খাঁ যুক্তকরে কহিলেন, যুবরাজ যদি আমার গৃহে পদার্পণ করেন তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইব।

সুলেমান শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, সিকন্দর, তুমি কি বল?

—আপনার আদেশ হইলেই নসীর খাঁর সঙ্গে যাইব।

—আচ্ছা, তুমি নিজের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ লোকের পরিচ্ছদ পরিধান কর।

সিকন্দর শাহ বেশ বদলাইতে গেলেন। সুলেমান শাহ কহিলেন, তোমরা হাজার সাবধানে এখানে আসিলেও

তোমাদের পিছনে লোক আছে। বংশীলাল তোমার সঙ্গে লোক আছে?

—দু'জন লোক হাতিয়ার সমেত আছে।

—তোমার নিজের কাছে কোন অস্ত্র আছে?

বংশীলাল বক্ষের ভিতর হইতে একটি ছোট পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইলেন।

সুলেমান শাহ নসীর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছে কি আছে?

নসীর খাঁর কাছে দুইটি উৎকৃষ্ট পিস্তল ও কটিতে তীক্ষ্ণধার ছুরি ছিল।

সুলেমান শাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মোটরে আসিয়াছ?

—আজ্ঞা হাঁ।

—ফিরিবার সময় তুমি নিজে মোটর চালাইবে, আগে-পিছনে দৃষ্টি রাখিবে।

সিকন্দর শাহ সাধারণ নগরবাসীর ন্যায় পোষাক পরিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সুলেমান শাহের প্রশ্নের উত্তরে পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইলেন। সুলেমান শাহ নিজের কটি হইতে ছুরি বাহির করিয়া তাঁহাকে দিলেন, বলিলেন, এটাও রাখ।

বংশীলাল সনদ কটির বস্ত্রে বাঁধিয়া লইলেন, নসীর খাঁ মোহর রুমালে বাঁধিয়া মীরজাইয়ের ভিতর লইলেন।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া বংশীলাল ও নসীর খাঁ লক্ষ্য করিলেন একজন লোক কিছুদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেছে। তাঁহাদের তিনজনকে দেখিয়া সে একটা গলির ভিতর চলিয়া গেল।

৪

বংশীলালের কুঠীতে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইল। বংশীলাল নসীর খাঁকে বলিলেন, আপনারা আর একটু অপেক্ষা করিবেন কি? তাহা হইলে অন্ধকার হইয়া আসিবে।

সিকন্দর শাহ ও নসীর খাঁ একটু বসিলেন। ঘোর ঘোর হইলে নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ বাড়ীর বাহিরে আসিয়া মোটরে উঠিলেন। মোটর-চালককে নসীর খাঁ বলিলেন, মোটর আমি চালাইব, তুমি গাড়ীর ভিতর বস। তুমি পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিবে, আমাদের পিছনে কোন মোটর কি মোটর-বাইক আসিতেছে দেখিতে পাইলে আমাকে বলিবে। সামনের দিকে আমি নজর রাখিব।

সম্মুখ দিকে সিকন্দর শাহ নসীর খাঁর পাশে বসিলেন। নসীর খাঁ বলিলেন, আপনি পিস্তল বাহির করিয়া হাতে রাখুন। প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করিতে বিলম্ব করিবেন না।

একটা পিস্তল নসীর খাঁ নিজের পাশে রাখিলেন, আর একটা মোটর-চালকের হাতে দিলেন, বলিলেন, পিছন হইতে যদি কেহ আমাদের আক্রমণ করে তখনি গুলি করিবে।

শহর হইতে বাহির হইয়া নসীর খাঁ বেগে মোটর চালাইলেন। মোটর-চালক পিস্তল হাতে করিয়া পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। সিকন্দর শাহ পথের দুই পাশে লক্ষ্য রাখিলেন। নসীর খাঁর দৃষ্টি সম্মুখ দিকে, কিন্তু পাশের দিকেও তাঁহার নজর ছিল।

কিছুদূর গিয়া মোটর-চালক বলিল, পিছন হইতে একখানা বড় মোটর বড় জোরে আসিতেছে।

নসীর খাঁ পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন মোটরে দুইজন আছে, তাঁহার মোটরের অপেক্ষা এ মোটর বড় এবং গতির বেগও অধিক। আর কিছু দূর যাইতেই সে মোটর তাঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িবে। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন একটু আগেই রাস্তা বাঁ-দিকে বেঁকিয়া গিয়াছে। সেখানে জঙ্গলের মত পথের ধারে কয়েকটা বড় বড় অশ্বত্থ ও বটগাছ। নসীর খাঁ হঠাৎ মোটরের পিছন হইতে ধোঁয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। পথ ধোঁয়ায় অন্ধকার হইয়া গেল, পিছন হইতে আর কিছু দেখা যায় না। সেই অবসরে নসীর খাঁ রাস্তার মোড় ফিরিয়া মোটর একপাশে দাঁড় করাইলেন। তাঁহার ইঙ্গিত-মত মোটর-চালক পিস্তল হাতে নামিল। সিকন্দর শাহ নসীর খাঁর সঙ্গে নামিলেন। তিনজনে একটা বড় বটগাছের আড়ালে দাঁড়াইলেন। তখনও পিছনের মোটর আসিয়া পৌঁছায় নাই, বাতাসে ধোঁয়া অল্পে অল্পে উড়িয়া যাইতেছে।

বড় মোটর মোড় ফিরিতেই আরোহীরা দেখিল অল্প

মোটর পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখনি ব্রেক বাঁধিয়া আরোহী দুইজন লাফাইয়া পড়িল, দুইজনেরই হাতে পিস্তল। তাহারা নসীর খাঁর মোটরের দিকে অগ্রসর হইল।

তাহাদের পশ্চাৎ হইতে কে স্পষ্ট, কঠোর স্বরে কহিল, তোমরা যেমন আছ তেমনি দাঁড়াইয়া থাক। পিছনে মুখ ফিরাইও না। হাতের পিস্তল মাটিতে ফেলিয়া দাও।

সে দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন অল্প ঘাড় বাঁকাইয়া পিছনে দেখিবার চেষ্টা করিল। তৎক্ষণাৎ—দুম্! তাহার কানের পাশ দিয়া শোঁ করিয়া গুলি বাহির হইয়া গেল।

নসীর খাঁ সেইরূপ কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, এবার মুখ ফিরাইলে গুলি তোমার মাথায় লাগিবে। তোমাদের পিছনে তিনটি পিস্তল। তোমরা পিস্তল ফেলিয়া দাও নহিলে হাতে গুলি করিব।

পিস্তল দুইটা পথের মাঝখানে সশব্দে পড়িয়া গেল। নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ সেই দুই ব্যক্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাদের পিস্তলের লক্ষ্য তাহাদের বক্ষঃস্থল। নসীর খাঁ মোটর-চালককে কহিলেন, ইহাদের কাছে কি আছে দেখ।

নসীর খাঁ তাহাদের কাপড়চোপড় দেখিয়া দুইখানা ছুরি পাইল, একজনের পকেটে একখানা কাগজ ছিল, সেখানা নসীর খাঁ লইলেন। তাহার পর আদেশ করিলেন, ইহাদিগকে বাঁধ।

তাহাদের মাথার পাগড়ী খুলিয়া মোটর-চালক তাহাদিগকে বাঁধিল। নসীর খাঁ বলিলেন, ইহাদের মোটরের চাকা ফাটাইয়া দাও।

মোটর-চালক পিস্তলের গুলি দিয়া সব টায়ারগুলা ফাটাইয়া ফেলিল। বোমা ফাটার মত শব্দ হইল।

নসীর খাঁর আদেশে মোটর-চালক সেই দুই ব্যক্তিকে তাহাদের নিজের মোটরে বাঁধিল।

নসীর খাঁ সেই দুই ব্যক্তিকে বলিলেন, আবার তোমাদের দেখিলে চিনিতে পারিব, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আর দেখা না হওয়াই তোমাদের মঙ্গল। এবার তোমরা রক্ষা পাইলে, দ্বিতীয়বার পাইবে না।

৫

বাড়ীতে ফিরিয়া নসীর খাঁ মোটর-চালককে বলিলেন, রাত্রেও সাবধান থাকিতে হইবে।

মোটর-চালক এ পর্য্যন্ত একটা কথাও বলে নাই, নসীর খাঁর আদেশ নীরবে পালন করিয়াছিল। এখন বলিল, সেই দুইটা লোক আবার আসিতে পারে?

—তাহারাই হউক কিংবা অন্য লোক। ইহারা চোর নয়, আমাদের দুশমন।

—বাড়ীর অন্য লোককে বলিব?

—সকলকে বলিবে। সকলের কাছে যেন অস্ত্র থাকে।

সিকন্দর শাহ বাগান দেখিয়া, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিলেন, আপনার বাড়ী বেশ সুন্দর।

নসীর খাঁ কহিলেন, এখানে আপনার কোন কষ্ট হইবে না। আমাকে আপনার ভৃত্য বিবেচনা করিবেন।

সিকন্দর শাহ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, অমন কথা বলিবেন না, আপনি আমাদের পরম বন্ধু, আমাদের জন্য বিপদ স্বীকার করিয়াছেন।

আহারাদির পর নসীর খাঁ সিকন্দর শাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কুকুরের সখ আছে?

—খুব আছে, কিন্তু সঙ্গে আনিতে পারি নাই। আমাদিগকে গোপনে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

—আসুন, আমার কুকুর দেখিবেন।

বাড়ীতে, বাড়ীর বাহিরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল। যেখানে মোটর রাখা ছিল তাহার পাশের ঘর খুলিয়া নসীর খাঁ আলো জ্বালিলেন। সিকন্দর শাহ দেখিলেন বাঘের মত চারিটা কুকুর লোহার শিকলে বাঁধা রহিয়াছে। বলিলেন, এ ত তাজী কুকুরের অপেক্ষাও বড়। কোথায় পাইলেন?

—এগুলি বিদেশী কুকুর। আর এক দেশে গিয়া দুই জোড়া পাইয়াছিলাম।

—ইহাদের নাম কি রাখিয়াছেন?

এইটি রুস্তম, সকলের অপেক্ষা বলবান, ইহার পাশে ইহার জোড়া বানু। আর ও-পাশে খুসরু ও হনিফা।

নসীর খাঁকে দেখিয়া কুকুরগুলা ল্যাজ নাড়িতেছিল, সিকন্দর শাহকে দেখিতেছিল। তিনি রুস্তম বলিয়া ডাকিয়া রুস্তমের মাথায় হাত দিলেন। কি করেন? সাবধান! বলিয়া নসীর খাঁ তাড়াতাড়ি সিকন্দর শাহের হাত ধরিতে গেলেন, কিন্তু সিকন্দর শাহ হাসিতে লাগিলেন। রুস্তম তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

নসীর খাঁ বলিলেন, ইহারা অপরিচিত কোনো লোককে কাছে আসিতে দেয় না। কুকুর বশ করিবার আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।

সিকন্দর শাহ বলিলেন, আমি কুকুর ভালবাসি। ইহারা থাকিতে আপনার পাহারার প্রয়োজন কি?

—সকল রাত্রে ইহাদিগকে খুলি না, কিন্তু এখন ইহাদের দরকার। দশজন অস্ত্রধারী সিপাহীর অপেক্ষা রাত্রিকালে ইহাদের উপর ভরসা অধিক। ইহারা বড় একটা ডাকে না, যাহাকে ধরে তাহাকে প্রাণেও মারে না, মানুষ ধরিয়া তাহার পর সাড়া দেয়।

নসীর খাঁ কুকুর চারিটা খুলিয়া দিলেন। তাহারা নিঃশব্দে তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিল। নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিলেন, লোকজনকে সতর্ক থাকিতে বলিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় রুস্তমকে ভিতরে ডাকিয়া দরজা বন্ধ করিলেন, বলিলেন, রুস্তম তুমি আজ আমাদিগকে পাহারা দিবে।

রুস্তম একবার ল্যাজ নাড়িয়া নসীর খাঁর শয়নকক্ষের দ্বারদেশে গিয়া বসিল।

সেই ঘরে সিকন্দর শাহেরও শয্যা পাতা হইয়াছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া নসীর খাঁ কহিলেন, আমরা এখানে শয়ন করিব না, সাধ্যমত আমাদিগকে সাবধানে থাকিতে হইবে।

দুইটি শয্যায় বালিশ ও বিছানা নসীর খাঁ এভাবে সাজাইলেন যেন দুইটি লোক শুইয়া আছে। সেই ঘরের ভিতর দিয়া আর একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া নসীর খাঁ সিকন্দর শাহকে আর দুইটি শয্যা দেখাইলেন। বলিলেন, আমরা এইখানে শয়ন করিব। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত হউন, আমি জাগিয়া থাকিব।

সিকন্দর শাহ বলিলেন, সে কেমন কথা! আমার জন্য আপনার আশঙ্কা আর আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইব? নূতন স্থানে সহজেই আমার ঘুমের একটু ব্যাঘাত হইয়া থাকে, অতএব প্রথম রাত্রে কিছুতেই আমার নিদ্রা হইবে না। আপনি এখন নিদ্রিত হউন, আমার নিদ্রা আসিলে আপনাকে উঠাইয়া দিব।

—সেই ভাল কথা, বলিয়া নসীর খাঁ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত কোন রকম সাড়াশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় একবার বাড়ীর বাহিরে কুকুরের ডাক শোনা গেল। ঘরের ভিতর রুস্তম একবার ডাকিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সিকন্দর শাহ তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। নসীর খাঁ পিস্তল হাতে উঠিয়া আসিলেন, সিকন্দর শাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পিস্তল?

সিকন্দর শাহ নিজের হাতের পিস্তল দেখাইলেন।

নসীর খাঁ কহিলেন, কুকুর অকারণে ডাকিবে না, নিশ্চিত কোন লোক দেখিয়া থাকিবে।

নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। রুস্তম বেগে বাগানের একদিকে দৌড়িয়া গেল।

নসীর খাঁ বলিলেন, চলুন, আমরাও উহার পিছনে যাই।

মোটর-চালক ও অপর ভৃত্যেরা উঠিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছিল।

যেদিকে রুস্তম দৌড়িয়া গিয়াছিল সেইদিকে সকলে গিয়া দেখিলেন যেখানে বাগান বড় অন্ধকার সেইখানে একটা বকুল গাছের তলায় একটা লোক পড়িয়া আছে। খুসরু নামক কুকুর তাহার বুকে দুই থাবা দিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, আর দুইটা কুকুর তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যে লোকটা মাটিতে পড়িয়াছিল সে মানুষ দেখিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, আমাকে রক্ষা কর! কুকুরে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

নসীর খাঁ চাকরদের নিকট হইতে একটা লণ্ঠন

লইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। নিকটেই একটা পিস্তল পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইলেন।

তিনি খুসরু বলিয়া ডাকিতেই খুসরু সে লোকটাকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে ব্যক্তির শরীর অক্ষত, কেবল ভয়ে সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

নসীর খাঁর আদেশ-মত ভৃত্যেরা সে লোকটাকে টানিয়া তুলিয়া তাহার বস্ত্রের মধ্যে এক টুকরা কাগজ খুঁজিয়া পাইল।

ইহার পূর্ব্বে নসীর খাঁ মোটরের লোকেদের কাছে এক খণ্ড কাগজ পাইয়াছিলেন। সেখানা তাঁহার পকেটে ছিল। সেখানা বাহির করিয়া দ্বিতীয় কাগজের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন তুখানিই এক রকম, তাহাতে শুধু লেখা আছে, এই কাগজ আর মাল আনিলে প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাইবে।

নসীর খাঁ কাগজে লেখা সিকন্দর শাহকে দেখাইলেন। সিকন্দর শাহ পড়িয়া বলিলেন, ইহা জানা কথা।

নসীর খাঁ চাকরদের বলিলেন, এই লোকটাকে আমার বসিবার ঘরে লইয়া আইস।

নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ রুস্তমকে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানা ঘরে আসিলেন। যে লোকটা ধরা পড়িয়াছিল তাহাকে লইয়া আসিলে পর নসীর খাঁ ভৃত্যদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও ইহাকে আমি বন্ধ করিয়া রাখিব।

৬

ভৃত্যেরা বাহির হইয়া গেলে পর নসীর খাঁ দরজা বন্ধ করিলেন। ঘরের সব কয়টা আলো জ্বলিতেছিল। নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ পাশাপাশি বসিলেন, রুস্তম নসীর খাঁর পায়ের কাছে বসিল। হাতের পিস্তল দুইটা নসীর খাঁ নিজের পাশে রাখিলেন।

যে লোকটা ধৃত হইয়াছিল সে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তাহার কোন শাস্তি হয় নাই দেখিয়া তাহার সাহস ফিরিয়া আসিতেছিল।

নসীর খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে?

—আমি চোর, দেখিতেই পাইতেছেন।

চোরের কাছে কি পিস্তল থাকে?

আত্মরক্ষার জন্য কেহ ছুরি রাখে, কেহ পিস্তল রাখে।

—পিস্তল থাকিতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে না কেন, এত সহজে ধরা পড়িলে কেন?

চোরের মুখ শুকাইল। কহিল, বিপদ জানিলে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। আমি কুকুর দেখি নাই, কুকুরের ডাকও শুনি নাই, হঠাৎ আমার ঘাড়ে ও পিঠে যেন একটা প্রকাণ্ড পাথর পড়িল, পিস্তল কোথায় পড়িয়া গেল, আমি পড়িয়া গিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময় বাঘের মত একটা কুকুর আমাকে চাপিয়া ধরিল।

নসীর খাঁ অল্প হাসিলেন, সে হাসি দেখিয়া চোরের ভয় হইল। নসীর খাঁ বলিলেন, আমি একবার ইসারা করিলেই কুকুরে তোমার টুঁটি ছিঁড়িয়া খাইত, জান?

চোর বারকতক ঢোক গিলিয়া বলিল, হুজুর তা ত জানি।

—এ বাড়ীতে ত চুরি করিবার কিছুই নাই, টাকা-কড়ি আমি বাড়ীতে রাখি না, এখানে চুরি করিতে কেন আসিয়াছিলে?

—কিছু আছে কিনা কেমন করিয়া জানিব?

—তুমি কি চুরি করিতে আসিয়াছিলে, কে তোমাকে পাঠাইয়াছিল, আর এ কাগজে কাহার লেখা সত্য করিয়া বল।

—আমার আর কিছু বলিবার নাই, আমি আর কিছু বলিব না।

—বটে? কুকুর দিয়া খাওয়াইলে বলিবে? রুস্তম! রুস্তম উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোরের দিকে চাহিয়া লাফাইবার উপক্রম করিল।

চোর ভয়ে অস্থির হইয়া বলিল, হুজুর, হুজুর, আমি সকল কথা বলিতেছি, কুকুর লেলাইয়া দিবেন না।

নসীর খাঁ হাত নাড়িতেই রুস্তম আবার বসিল। নসীর খাঁ চোরকে বলিলেন, আমার কথার উত্তর দাও।

—আমি মোহর আর কাগজ চুরি করিতে আসিয়াছিলাম। এ কাগজে কাহার লেখা আমি জানি না। যে আমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিল তাহাকে আমি চিনি না। আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়া বলিয়াছিল জিনিষ আনিতে পারিলে আরও পাঁচশো টাকা পাইবে।

—যে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছিল সে কোথায় থাকে ?

চোর সহরে একটা বাড়ীর ঠিকানা দিল, বলিল, সে ব্যক্তি সে বাড়ীতে থাকে কি না বলিতে পারি না।

—আচ্ছা, আজ রাত্রে তুমি বন্ধ থাক, কাল সকালবেলা একটা ব্যবস্থা করিব।

নসীর খাঁ চোরকে একটা ছোট কুঠুরীতে বন্ধ করিলেন। একটি দরজা, ভিতরে জানালা ছিল না। বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া রুস্তমকে দরজার সম্মুখে বসাইয়া রাখিলেন।

দ্বিতীয়বার শয়ন করিবার সময় নসীর খাঁ সিকন্দর শাহকে কহিলেন, আমার মনে হয় এ ব্যক্তি সত্য বলিতেছে। যাহারা ইহার পিছনে আছে তাহারা ইহার নিকট আত্ম-পরিচয় দিবে না।

সিকন্দর শাহ বলিলেন, আমারও তাহাই মনে হয়।

৭

প্রাতে চোরকে সঙ্গে করিয়া নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ বংশীলালের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন। চোরকে দেখিয়াই বংশীলাল চিনিলেন, কহিলেন, কি, রাম-অবতার! কাল রাত্রে কি তোমার খাঁ-সাহেবের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল?

রামঅবতার মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, আপনি কি আমার জাত মারিতে চান ?

নসীর খাঁ বলিলেন, রামঅবতার আমাদের অতিথি। রাত্রের ঘটনা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাকে আপনি চেনেন ?

—বিলক্ষণ চিনি! বড় বাহাদুর লোক, কিছু টাকা পাইলেই সব করিতে প্রস্তুত। রামঅবতার, কাল রাত্রে তোমার জুড়িদার কে ছিল ?

—আমি একা ছিলাম, আমার সঙ্গে আর কেহ ছিল না।

—একজন এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

বংশীলাল সকলকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর পিছন দিকে লইয়া গেলেন। সেখানে একটা সরু সিঁড়ির পৈঠায় স্থানে স্থানে রক্তচিহ্ন। বংশীলাল বলিলেন, রামঅবতার, এই তোমার জুড়িদারের চিহ্ন। অন্ধকারে কোথায় চোট লাগিয়াছিল, আমাদিগকে না দেখাইয়াই চলিয়া গিয়াছে।

নসীর খাঁ হাসিয়া বলিলেন, রামঅবতারের গলাটাও বড় রক্ষা পাইয়াছিল, নহিলে আর কথা কহিবার শক্তি থাকিত না।

বংশীলাল বলিলেন, এখানে যে আসিয়াছিল তাহার পায়ে আমি গুলি করিয়াছিলাম। মাস-কয়েক তাহাকে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইবে।

নসীর খাঁ বলিলেন, রামঅবতার আমার বাড়ীতে খাইবে না, তাহার আতিথ্য সেবা কেমন করিয়া হইবে ?

—তাহার আর ভাবনা কি ? এখানে কে আছে ?

একজন বলবান দরওয়ান আসিল। বংশীলাল কহিলেন, রামঅবতার কাল রাত্রে খাঁ-সাহেবের বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়াছিল। ইহাকে খাইতে দাও, কিন্তু আমি হুকুম না দিলে ইহাকে ছাড়িবে না।

—বহুত খুব, শেঠজী, বলিয়া দরওয়ান রামঅবতারকে ধরিয়া লইয়া গেল।

তাহার পর সকলে গিয়া সুলেমান শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বংশীলাল ও নসীর খাঁকে ধন্যবাদ দিয়া সিকন্দর শাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নসীর খাঁর বাড়ীতেই থাকিবে ?

সিকন্দর শাহ কহিলেন, আমি বেশ আছি। খাঁ-সাহেবের যে কুকুর আছে তাহাতে চোর-ডাকাতের কোন ভয় নাই।

সুলেমান শাহ কুকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নসীর খাঁ বলিলেন, জাঁহাপনা যদি একদিন আমার গৃহে পদার্পণ করেন তাহা হইলে আপনাকে কুকুর দেখাই।

সুলেমান শাহ বলিলেন, আমি নিশ্চিত একদিন যাইব। আমার এখানে আর কোন উপদ্রব হয় নাই, উহাদের বিশ্বাস হইয়া থাকিবে জিনিষগুলা আমার কাছে নাই।

৮

নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ মীরমন্‌জিলে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধারে

উপস্থিত হইলেন। সেখানে নৌকার ঘর দেখিয়া সিকন্দর শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার ভিতর নৌকা আছে?

নসীর খাঁ বলিলেন, একটা ছোট মোটর-বোট আছে। আমি কখন কখন নদীতে বেড়াইতে যাই।

নৌকার ঘরের সম্মুখে আসিয়া লোহার গরাদের ভিতর দিয়া সিকন্দর শাহ মোটর-বোট দেখিতে পাইলেন। কহিলেন, আপনার অনুমতি হইলে আমি নদীতে একবার ভ্রমণ করিয়া আসি।

নসীর খাঁ কহিলেন, আসুন, আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

তালা খুলিয়া নসীর খাঁ ও সিকন্দর শাহ বোটে উঠিলেন। নদীতে যাইবার আর একটা দরজা ছিল, নসীর খাঁ সেটা খুলিয়া বোট বাহিরে আনিলেন। স্রোতে পড়িয়া বোট ভাসিয়া চলিল।

নসীর খাঁ বলিলেন, বোট আপনি চালাইবেন?

সিকন্দর শাহ এঞ্জিন চালাইয়া বোটের হাল ধরিলেন। নসীর খাঁ তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। নৌকায় গদি পাতা, মাঝখানে একটি ছোট কামরা, তাহার ভিতর দুইজন লোক আরামে বসিতে ও শুইতে পারে।

নদীর স্রোত একটানা, জলের প্রবাহ তীব্র। প্রশস্ত গভীর নদী, পর পারে চাষের জমি, কাছাকাছি নৌকা ও লোকজন নাই। সিকন্দর শাহ বোটের মুখ ফিরাইয়া উজানে চলিলেন। বোট জল কাটিয়া আশে পাশে ঢেউ ও ফেনা তুলিয়া তীরের মত চলিল।

মাঝে মাঝে কোথাও নদীর ধারে বাড়ী, বাড়ীর লোকেরা বোটের শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। এ ধারে চাষবাস নাই, যেখানে বাড়ী নাই সেখানে হয় উপবন, না হয় জঙ্গল।

সিকন্দর শাহ একহাতে হাল ধরিয়া আর এক হাত মাঝে মাঝে জলে ডুবাইতেছিলেন। জলপথে তাঁহার আলস্যের আবেশ হইতেছিল। নসীর খাঁ গদি ঠেসান দিয়া পা ছড়াইয়া ওপারে চাষীদের চাষ করা দেখিতে-ছিলেন।

সিকন্দর শাহ বলিলেন, কাছাকাছি দেখিবার মতন কিছু আছে?

—কিছুদূরে লালবিবির কবর আছে। চলুন দেখিতে যাওয়া যাক্।

আর কোন কথা হইল না, বোট সশব্দে জল তোল-পাড় করিয়া চলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে নসীর খাঁ কহিলেন, এইবার কিনারায় লাগান।

সিকন্দর শাহ বোটের বেগ সংযত করিয়া নিকটেই প্রাচীন ঘাট দেখিতে পাইয়া তাহার পাশে বোট লাগাইলেন। নসীর খাঁ কল বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি দিলেন।

ঘাটের কাছে একটা লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, চলুন, হুজুর, ভাল করিয়া আপনাদিগকে মকবরা দেখাইয়া আনি।

নসীর খাঁ কহিলেন, আমাদের সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে না, তুমি আমাদের নৌকা আগলাও, ফিরিয়া আসিয়া বখসিস দিব।

—বহুত আচ্ছা, জনাব, বলিয়া সে ব্যক্তি নৌকার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

নদীর ধারের নিকটেই কবর। দেখিতে বড় নয়, কিন্তু শ্বেত মর্ম্মরের উপর কারুকার্য্য বড় সুন্দর। সিকন্দর শাহ ও নসীর খাঁ চারিদিকে ঘুরিয়া উত্তমরূপে দেখিলেন। ফিরিবার সময় নসীর খাঁ যে ব্যক্তি তাঁহাদের বোটের কাছে দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে কিছু পুরস্কার দিলেন।

সিকন্দর শাহ পূর্ব্বের ন্যায় হাল ধরিলেন, নসীর খাঁ পরপারের দিকে দেখিতে লাগিলেন।

ফিরিতে অধিক বিলম্ব লাগিল না। একে স্রোতের টান, তাহার উপর মোটরের বেগ, বোট নক্ষত্রগতিতে চলিল। বাড়ীর কাছে আসিয়া সিকন্দর শাহ দেখিলেন আর একটা বাড়ীর দোতালায় খোলা জানালায় একটি সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বোট দেখিতেছে। সহসা চারিচক্ষে মিলন, রমণী সিকন্দর শাহকে দেখিয়া মৃদুমন্দ হাসিল।

নসীর খাঁ রমণীকে দেখিতে পান নাই, তিনি সেদিকে পৃষ্ঠ করিয়া বসিয়াছিলেন। সিকন্দর শাহ নৌকার বেগ

সংযত করিলেন দেখিয়া নসীর খাঁ উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে?

সিকন্দর শাহ কহিলেন, কিছুই না। বাড়ীও আর বেশী দূর নয় সেইজন্য নৌকার বেগ মন্দীভূত করিয়াছি।

মুক্ত গবাক্ষপথে রমণীকে দেখিয়া সিকন্দর শাহ নৌকার গতি সংযত করিয়াছিলেন সে-কথা প্রকাশ করিলেন না। নসীর খাঁকে উঠিতে দেখিয়াই যুবতী গবাক্ষ হইতে সরিয়া গিয়াছিল। সিকন্দর শাহ বুঝিলেন রমণী কেবল তাঁহাকেই দেখা দিয়াছিল। নৌকা হইতে দুইজনে যখন নামিলেন তখন সিকন্দর শাহ কিছু অন্যমনস্ক।

৯

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সিকন্দর শাহ বলিলেন, আমি একটু বাগানে ঘুরিয়া বেড়াই।

নসীর খাঁ বলিলেন, অধিক দূরে যাইবেন না। পকেটে পিস্তল আছে ত? আর আমার বিশেষ অনুরোধ যে, আপনি একা কোথাও যাইবেন না, রুস্তমকে সঙ্গে রাখিবেন।

দিনের বেলা সব কুকুর বাঁধা থাকিত। সিকন্দর শাহ আদেশ করাতে মোটর-চালক রুস্তমকে খুলিয়া দিল। সিকন্দর শাহ ডাকিতেই তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল।

সিকন্দর শাহ বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধারে গেলেন। সিকন্দর শাহ সচ্চরিত্র যুবক, মহৎ বংশের সন্তান, বিনয়ী, লজ্জাশীল। তাহা হইলেও যৌবনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা কিরূপে অতিক্রম করিবেন? রমণী রূপসী, যুবতী, সিকন্দর শাহকে দেখিয়া মুচকিয়া হাসিয়াছিল, কিন্তু পাছে নসীর খাঁ তাহাকে দেখিতে পান এই আশঙ্কায় সরিয়া গিয়াছিল। সিকন্দর শাহও তাহাকে ভাল করিয়া দেখেন নাই, একবার চকিতের মত দেখা। এখন তাঁহার মনে কিছু কৌতূহল, কিছু চক্ষের অতৃপ্তির লালসা। আর একবার কি তাহাকে দেখিতে পাইবেন?

সিকন্দর শাহ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। রমণী কে তাহা নসীর খাঁ না জানিতে পারেন, কিন্তু বাড়ী কাহার, কে সেখানে বাস করে তাহা নিঃসন্দেহ জানিতেন। সিকন্দর শাহ তাঁহাকে কিংবা বাড়ীর অপর লোককে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই। যথার্থ প:ক্ষ গোপন করিবার কিছুই ছিল না অথচ সিকন্দর শাহের বিবেচনায় তৃতীয় ব্যক্তিকেও কোন কথা বলা যায় না।

নদীর ধার দিয়া সিকন্দর শাহ যে বাড়ীতে রমণীকে দেখিয়াছিলেন সেইদিকে গমন করিলেন। রুস্তম কুকুর তাঁহার সঙ্গে ছিল। সেই বাড়ীর নিকটে উপনীত হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। নীচেকার দরজা জানালা বন্ধ, দেখিয়া মনে হয় সে বাড়ীতে কাহারও বাস নাই। সিকন্দর শাহ ভাবিতেছিলেন যদি কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি বলিবেন? কিন্তু কোথাও জনমনুষ্য দেখিতে পাইলেন না। যে গবাক্ষের সম্মুখে রমণী দাঁড়াইয়াছিল সিকন্দর শাহ সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন জানালা বন্ধ। সেটা বাড়ীর পশ্চাৎ ভাগ, বাড়ীতে প্রবেশ করিবার দরজা অন্যদিকে। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া কিছু নিরাশ হইয়া সিকন্দর শাহ ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় সেই গবাক্ষ ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। গবাক্ষ-পথে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই রমণীমূর্ত্তি!

সিকন্দর শাহ নির্নিমেষনয়নে সেই রূপের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। আলুলায়িতকুন্তলা, কুঞ্চিত, দীর্ঘ কেশ পৃষ্ঠে বক্ষে পড়িয়াছে, অনিন্দিত আনন বেষ্টন করিয়াছে। আয়ত চক্ষের অলস দৃষ্টি সিকন্দর শাহের মুখের দিকে। আবার চক্ষে চক্ষে মিলিল, আবার সুন্দরী বিকচ কমলের ন্যায় স্মেরমুখী, ঈষন্মুক্ত ওষ্ঠাধরের মধ্যে মুক্তাপঙক্তির ঈষৎ বিকাশ। দৃষ্টির তরলতায় অপূর্ব্ব মোহিনী।

বেশ কিছু শিথিল, মস্তকের ওড়না সরিয়া গিয়াছে, কণ্ঠ অনাবৃত। গবাক্ষ হইতে মুখ অল্প বাড়াইয়া রমণী দক্ষিণ হস্ত জানালার উপর রাখিল। কোমল চম্পক অঙ্গুলি, অর্দ্ধেক বাহু দেখা যাইতেছে। মসৃণ, ললাম বলয়িত বাহু, সর্ব্বাঙ্গে স্তরে স্তরে লাবণ্য পুঞ্জীকৃত, রূপের পূর্ণতায় অলক্ষ্যে তরঙ্গায়িত হইতেছে। সিকন্দর শাহের চক্ষু নমিত হইল।

আবার তিনি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রমণীকে চাহিয়া

দেখিলেন। মুখের হাসি আর একটু ফুটিয়াছে, চক্ষের আকর্ষণী আর একটু প্রবল। ধীরে ধীরে রমণী বক্ষের বস্ত্রের ভিতর হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরী বাহির করিয়া সেই কাগজে জড়াইয়া সিকন্দর শাহের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল।

সিকন্দর শাহ তুলিয়া লইয়া পড়িলেন—আজ সন্ধ্যার পর শিরীষ গাছের তলায়।

সিকন্দর শাহ উপরে চাহিলেন। রমণী অঙ্গুলি দিয়া বৃক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। বাগানের একপাশে একটা বড় শিরীষ গাছ, তাহাতে ফুল ভরিয়া আছে, তাহার আশেপাশে ছোট ছোট গাছপালায় অন্ধকার।

আংটী সোনার শীল আংটী, কোন অক্ষর বা নাম নাই। সিকন্দর শাহ আংটী তুলিয়া ধরিলেন। রমণী হাত দিয়া সঙ্কেত করিল, এখন থাকুক।

রমণী মস্তক অবনত করিয়া বিদায় জ্ঞাপন করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে, অঙ্গুলিসঙ্কেতে সিকন্দর শাহকে আকুলিত করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষের আমন্ত্রণে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া, ধীরে ধীরে গবাক্ষ রুদ্ধ করিল।

সিকন্দর শাহ গৃহের অভিমুখে ফিরিলেন, এক হস্তে অভিসারিকার নিমন্ত্রণ, অপর হস্তে অঙ্গুরীয় নিদর্শন!

১০

সেইদিন বৈকালে দুইখানা মোটর করিয়া সুলেমান শাহ ও বংশীলাল নসীর খাঁর বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছয়জন লোক, সকলেই সশস্ত্র হইয়া আসিয়াছেন।

নসীর খাঁ সসম্ভ্রমে সুলেমান শাহকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, আপনি কৃপা করিয়া আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আমার পরম সৌভাগ্য।

সুলেমান শাহ নসীর খাঁর পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া কহিলেন, আমি আমার কথা মত আসিয়াছি। তোমার কুকুর দেখাও।

সুলেমান শাহ সিকন্দর শাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাকে বেশ ভাল দেখিতেছি। আজ আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবে কি?

সিকন্দর শাহের চক্ষু উজ্জ্বল, মুখ উৎফুল্ল। ফিরিয়া যাইবার কথা শুনিতেই তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিলেন, যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে আরও দিন-কয়েক এখানে থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

নসীর খাঁ হাসিয়া বলিলেন, উনি নৌকায় ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন, আজই একবার গিয়াছিলেন।

সুলেমান শাহ কিছু উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আশঙ্কা নাই? জলে শত্রুভয় নাই?

—কিছুমাত্র না। আমার মোটর-বোট, কাছাকাছির মধ্যে আর কাহারও ওরকম নৌকা নাই। কোনো নৌকা আমার বোটকে ধরিতে পারে না।

সিকন্দর শাহ সুযোগ পাইয়া বলিলেন, নদীতে বেড়াইলে শরীর ভাল থাকে, আমি প্রতিদিন বোটে বেড়াইব।

সুলেমান শাহ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, তোমার কোনো চিন্তা নাই, আমি তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব না, তোমার যতদিন ইচ্ছা এইখানে থাক।

সিকন্দর শাহের মুখ আবার আনন্দে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যুক্তকরে পিতৃব্যকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

নসীর খাঁ কহিলেন, আমার একটি নিবেদন আছে, অনুমতি হইলে জানাইতে পারি।

সুলেমান শাহ কহিলেন, স্বচ্ছন্দে বল, সঙ্কোচ কিসের?

—যদি কৃপা করিয়া রাত্রে এখানে আহার করেন—

—এই কথা! তোমার গৃহে আহার করিব—ইহা ত আনন্দের কথা।

নসীর খাঁ বংশীলালের দিকে ফিরিলেন, কহিলেন, শেঠ-সাহেব, আপনাকে কি বলিব?

বংশীলাল কহিলেন, আপনার কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই, আমি আহার করিয়া আসিয়াছি। আমাদের রাত্রিকালে আহার করা নিষিদ্ধ।

নসীর খাঁ সুলেমান শাহকে বলিলেন, কুকুরগুলা এইখানে আনিতে বলিব?

—না, না, চল, আমরা গিয়া দেখিব।

সকলে বাড়ীর বাহিরে আসিলেন। নসীর খাঁর

আদেশক্রমে কুকুর চারিটাকে খুলিয়া দিল। রুস্তম একেবারে সিকন্দর শাহের নিকট লাফাইয়া আসিল, আর কয়েকটা কুকুর অপর লোক দেখিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, আবার নসীর খাঁর ইঙ্গিতে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিল।

স্থলেমান শাহ কুকুরগুলিকে উত্তমরূপে দেখিয়া বলিলেন, এই জাতের কুকুর এ দেশে বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক দিন পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছিলাম। এমন বলবান কুকুর কখন দেখি নাই। তোমার এই চারিটা কুকুর দশজন প্রহরীর সমান। ইহাদের আর একটা বড় গুণ, বড়-একটা ডাকে না, চোর কিংবা অপর লোক দেখিলে নিঃশব্দে আক্রমণ করে, কিন্তু যাহাকে ধরে তাহার রক্ষা নাই।

নসীর খাঁ কহিলেন, আমি ইহাদিগকে শিখাইয়াছি সহজে কাহাকেও প্রাণে মারে না, ফেলিয়া দিয়া চাপিয়া ধরে। সে রাত্রেও তাহাই করিয়াছিল, তবে যদি কোনো ব্যক্তি আমাকে কিংবা এ বাড়ীর কাহাকেও আক্রমণ করে তাহাকে দেখিতে পাইলে মারিয়া ফেলিতে পারে।

স্থলেমান শাহ বাগানে, নদীর ধারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, আর সকলে তাঁহার পশ্চাতে। একবার মোটর-বোট দেখিলেন, নসীর খাঁ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, নৌকায় আর একদিন বেড়াইতে যাইবেন, আজ নয়।

কথা কহিতে কহিতে স্থলেমান শাহ, সিকন্দর শাহ, বংশীলাল ও নসীর খাঁ কিছু অগ্রসর হইয়া গেলেন, আর সকলে পিছনে পড়িল। স্থলেমান শাহ বলিলেন, আর অধিক সময় নাই, শত্রু প্রাণপণে ঐ জিনিষগুলির সন্ধান করিতেছে, যদি না পায় তাহা হইলে হয়ত ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে। আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি আমার বিশ্বাস যতদিন তাহারা ঐ তিনটি সামগ্রী না পায় ততদিন আমাদের প্রাণের আশঙ্কা নাই, কিন্তু যদি নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া যায় আর তাহাদের অনুসন্ধান নিষ্ফল হয় তাহা হইলে রাজ্য ত তাহাদের হইবেই না, কিন্তু আমাদিগকে হত্যা করিলে তাহাদের ক্রোধের উপশম হইবে।

নসীর খাঁ বলিলেন, এই তিনটি প্রমাণ লইয়া আপনিই কেন মোবারক শাহের নিকট যান না?

—তাহা হইলে পথে আমাদিগকে নিঃসন্দেহ মারিয়া ফেলিবে। যদি কোনোরূপে আমরা মোবারক শাহের নিকট যাইতে পারি তাহা হইলেই বা কি হইবে? যদি তাঁহার নিকট সৈন্যবল প্রার্থনা করি তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, বলিবেন, তোমার রাজ্য তুমি রক্ষা করিতে পার না? এই কয়দিন বলপ্রকাশের কোনো চেষ্টা হয় নাই বটে, কিন্তু আমরা একদণ্ডও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি না। প্রতিদিন তাহারা নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। আপাততঃ সকল চেষ্টা গোপনে হইতেছে, প্রকাশ্যরূপে বল প্রকাশ করিবে না। কতক লোক আমাদের বিপক্ষে হইলেও অনেকে আমাদের স্বপক্ষে, সুতরাং অনেক লোকবল লইয়া এখন আমাদিগকে আক্রমণ করিবে না। অনেকবার অন্বেষণ করিয়া কিছু পায় নাই। তোমাদের দুইজনের বাড়ীতে খুঁজিবার চেষ্টা করিয়া ঠকিয়াছে। এখন কি করিবে?

বংশীলাল বলিলেন, তাহাই যদি জানা যাইবে তাহা হইলে এত আশঙ্কা থাকিবে কেন? বিপদ যদি পূর্ব্বে জানিতে পারা যায় তাহা হইলে উদ্ধার হইবার উপায় করা যায়, কিন্তু আমরা ত কিছু জানিতে পারিতেছি না, সুতরাং সর্ব্বদা সাবধান থাকা ছাড়া আমরা কি করিতে পারি?

নসীর খাঁ বলিলেন, আমাদের পক্ষ হইতে কয়েক-জন বিশ্বস্ত ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে শত্রুপক্ষের প্রধান লোকেরা আমাদের পক্ষ অবলম্বন করে। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলে আর বিশেষ আশঙ্কা থাকিবে না। তবে এই সময় আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে, কারণ দিন-কয়েকের মধ্যে একটা কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা।

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে। নসীর খাঁ স্থলেমান শাহকে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা আর একটা ঘরে বসিল। সিকন্দর শাহ কিছুক্ষণ তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন, তাহার পর এ-ঘর ও-ঘর করিয়া ঘুরিতে

লাগিলেন। অবশেষে অপরের অলক্ষ্যে পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

১১

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী রাত্রি, সন্ধ্যার পরেই গাঢ় অন্ধকার করিয়া আসিল। বাড়ীর বাহিরে আসিয়াই সিকন্দর শাহ দ্রুতপদে নদীতীরে উপনীত হইলেন। নদীর ধার দিয়া সংকেতস্থানে গমন করিলেন।

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন রুস্তম তাঁহার পিছনে আসিতেছে। সিকন্দর শাহ গোপনে একা যাইতেছিলেন, সঙ্গে কুকুর লইয়া যাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। রুস্তমকে তিনি হাত নাড়িয়া ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, মুখে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না পাছে তাঁহার কণ্ঠস্বর আর কেহ শুনিতে পায়। রুস্তম দাঁড়াইল, ফিরিয়া গেল না। সিকন্দর শাহ মাটির ঢেলা তুলিয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রুস্তম কিছু পিছাইয়া গেল কিন্তু সিকন্দর শাহ আবার যেমন অগ্রসর হইলেন অমনি গাছের আড়ালে আড়ালে তাঁহার পশ্চাতে চলিল, সিকন্দর শাহ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

শিরীষ গাছের তলায় গিয়া দেখিলেন কেহ কোথাও নাই। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই শুষ্কপত্রের ক্ষীণ মর্ম্মর শব্দ হইল, লঘু পদক্ষেপে তরুণী ছায়াময়ী মূর্ত্তির মত সিকন্দর শাহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে তাহার মুখ ও অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দ্রুত আগমনের জন্য বা অন্য কারণে নিঃশ্বাস কিছু বেগে বহিতেছে, ওষ্ঠাধর কিছু মুক্ত, বক্ষে কিছু চঞ্চলতা। মস্তকের ওড়না স্রস্ত হইয়া কটিদেশে পড়িয়াছিল, তুলিয়া মাথায় দিবার সময় রমণীর হাত সিকন্দর শাহের গাত্রে ঠেকিল। সিকন্দর শাহ তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার হাতের ভিতর রমণীর ক্ষুদ্র, কোমল করপল্লব ঈষৎ কাঁপিতেছিল, অঙ্গুলীতে অঙ্গুলীর ঈষৎ চাপ পড়িতেছিল। রমণী অতি মৃদুস্বরে, তরুপল্লবে মর্ম্মরিত বসন্ত-বাতাসের ন্যায় কহিল, আমি এমন করিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতেছি, না জানি তুমি কি মনে করিবে!

সিকন্দর শাহ কহিলেন, আমি মনে করিতেছি আমার তুল্য কেহ ভাগ্যবান নাই। তোমার মত সুন্দরী আমি কখন দেখি নাই, কখন কোনো রমণীর অঙ্গস্পর্শ করি নাই।

যুবতী হাসিল। হাসির চাপা শব্দ সিকন্দর শাহের শ্রবণে জলতরঙ্গ বাজনার মত মধুর শুনাইল। রমণী কহিল, তাহা হইলে তোমাকে অত্যন্ত কঠোর শাসনে থাকিতে হয়?

—কই না। আমি অত্যন্ত স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছি। শাসন বংশ-প্রথার। তরুণ বয়সের চাঞ্চল্য আমাকে সংযম করিতে হয়।

যুবতী আবার হাসিয়া সিকন্দর শাহের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল, বলিল, আর এখন?

—এখন আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি, এক মাত্র তোমার শাসন মানি।

—আমি কে তাহা ত তুমি জান না, অপরিচিতার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছ।

—তোমার রূপই তোমার পরিচয়। অপর পরিচয় দেওয়া-না-দেওয়া তোমার ইচ্ছা।

—তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব? না, বিনা পরিচয়ে আমাদের সম্ভাষণ হইবে?

—তাহাও তোমার ইচ্ছা। আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবে আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত।

—যুবরাজ সিকন্দর শাহকে কে না জানে? বলিয়া রমণী সিকন্দর শাহের কণ্ঠলগ্ন হইল।

যুবতীর পশ্চাতে শুষ্কপত্রে পদশব্দ হইল। সিকন্দর শাহ তাহার স্কন্ধের পার্শ্ব দিয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি দ্রুতপদক্ষেপে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে, নক্ষত্রালোকে তাহার হাতের ছুরি একবার ঝলসিত হইল।

রমণীও মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, ভীত উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, ইহাকে আঘাত করিতে পাইবে না, আঘাত করিবার কোনো কথা হয় নাই।

সে ব্যক্তি দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া, অনুচ্চ কঠোর-স্বরে কহিল, তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও। তোমার কর্ম্ম তুমি করিয়াছ, আমার প্রতি যেমন আদেশ হইয়াছে আমি পালন করিব।

সিকন্দর শাহ রমণীর বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে

মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পাছে রমণীর অঙ্গে আঘাত লাগে এই ভয়ে অধিক বল প্রকাশ করিতে পারিলেন না। রমণীও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, মারিতে হয় আমাকে মার, ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পাইবে না।

সে ব্যক্তি কহিল, তোমার শাস্তি পরে হইবে। এই বলিয়া ছুরি তুলিয়া অগ্রসর হইল।

সহসা তাহার পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দে ব্যাঘ্রের ন্যায় একটা জন্তু এক লম্ফে তাহাকে আক্রমণ করিল। সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল, হাতের ছুরি তাহার মুষ্টিমুক্ত হইয়া দূরে পড়িল। সে একবার চীৎকার করিয়াই স্তব্ধ হইল।

রুস্তম সিকন্দর শাহের অলক্ষ্যে তাঁহার পিছনে আসিয়া একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। রমণীকে আসিতে দেখিয়া কিছু করে নাই। ছোরা হস্তে আক্রমণকারীকে দেখিয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়াছিল। সে ব্যক্তি সিকন্দর শাহকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেই তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। এবার তাহাকে শুধু ফেলিয়া দিয়া রুস্তম ক্ষান্ত হইল না। বিড়ালে যেমন ইঁদুর ধরে সেইরূপ সে ব্যক্তির টুঁটি ধরিয়া, কয়েকবার ঝাঁকানি দিয়া তাহাকে হত্যা করিল।

রমণী ভীতস্বরে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। সিকন্দর দেখিলেন অন্ধকারে আরও কয়েকজন লোক দৌড়িয়া আসিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে রমণীকে ঘাসের উপর শয়ন করাইয়া শিরীষ গাছের আড়ালে লুকাইলেন। রুস্তম মৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আরও লোক আসিতেছে দেখিয়া একবার ডাকিল। অতি গম্ভীর শব্দ। তাহার ডাক শুনিয়া যাহারা আসিতেছিল তাহারা একবার থমকিয়া দাঁড়াইল।

সিকন্দর শাহ পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন পকেটে পিস্তল রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিয়া আনেন নাই, সর্ব্বদাই তাঁহার পকেটে থাকিত, বাহির করিয়া রাখিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মৃদুস্বরে রুস্তম বলিয়া ডাকিতেই কুকুর তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাঁচ ছয়জন লোক ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। শব নাড়াচাড়া করিতে একজনের হাতে রক্ত লাগিল, সে বলিয়া উঠিল, ইহার গলা কাটিয়া দিয়াছে!

তাহাদের পিছনে কিছু দূরে আর একজন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল, ছুটাছুটি করিতেছিল না। সে বলিল, আমার হুকুম তোমাদের মনে নাই। সিকন্দর শাহ এখানেই কোথাও আছে, তাহাকে জীবিত হউক মৃত হউক আমার নিকটে লইয়া আইস।

মৃত ব্যক্তি ও মূর্চ্ছিতা রমণীকে ছাড়িয়া অপর লোকেরা সিকন্দর শাহকে খুঁজিতে লাগিল। একজন গাছের পিছনে গিয়া বলিল, এই যে, এখানে লুকাইয়া আছে!

অমনি পিস্তলের শব্দ হইল, যে কথা কহিয়াছিল সে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তাহার পশ্চাতে আর একজন, রুস্তম এক লাফে তাহার টুঁটি ধরিয়া তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া ফেলিল।

১২

সুলেমান শাহ, বংশীলাল ও নসীর খাঁ একটা ঘরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। সুলেমান শাহ বলিলেন, শত্রু এখন কি করিবে তাহা না জানিতে পারিলেও আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে-কয়টা সামগ্রীর সন্ধান করিতেছে তাহা না পাইলে কি করিবে?

নসীর খাঁ কহিলেন, হুসেন শাহ আপনার রাজ্য অপহরণ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। মোবারক শাহকে সে তিনটি জিনিস দেখাইতে না পারিলে তিনি তাহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবেন না, হয়ত বিদ্রোহী বলিয়া তাহাকে ধৃত করিবেন। সময়ও আর অধিক নাই। হুসেন শাহ গোপনে আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া উৎপীড়ন করিতে পারে। আপাততঃ হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে না।

সুলেমান শাহ বলিলেন, আমারও তাহাই মনে হইতেছে।

বংশীলাল বলিলেন, এই অনুমান সঙ্গত বিবেচনা

হয়। সেইজন্ত আমি আরও কয়েকজন বলবান লোককে নিযুক্ত করিয়াছি। শত্রু সহসা আপনাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল, আহার প্রস্তুত।

সুলেমান শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, সিকন্দর কোথায়?

নসীর খাঁ উত্তর করিলেন, বোধ হয় পাশের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।

নসীর খাঁ উঠিয়া গিয়া দেখিলেন পাশের ঘরে ছয়জন লোক বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। নসীর খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, সিকন্দর শাহ কোথায়?

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, তিনি একবার এ ঘরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে ত বসেন নাই। অনেকক্ষণ হইল চলিয়া গিয়াছেন।

চারিদিকে খোঁজ পড়িল, নসীর খাঁ ও বংশীলাল কয়েক বার সিকন্দর শাহের নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কোনো উত্তর নাই। সুলেমান শাহ ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমরা যে আশঙ্কা করিতেছিলাম হয়ত তাহাই ঘটিয়াছে।

নসীর খাঁ একটা টানা খুলিয়া কয়েকটা বিদ্যুতের পকেট-মশাল বাহির করিয়া সুলেমান শাহ, বংশীলাল ও অপর লোকের হাতে দিলেন, একটা নিজে লইলেন। সকলের কাছে অস্ত্র ছিল।

বাড়ীর বাহিরে তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন মোটর-চালক ও অপর ভৃত্যেরা জড় হইয়াছে। কুকুর তিনটাও সেই সঙ্গে আসিয়াছে।

নসীর খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, সিকন্দর শাহকে তোমরা বাগানে বেড়াইতে কিংবা ফটকের বাহিরে যাইতে দেখিয়াছ?

সিকন্দর শাহকে কেহই দেখে নাই।

সকলে নদীতীরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অকস্মাৎ পুরুষ-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ ও তাহার পরেই নারী-কণ্ঠের চীৎকার শ্রুত হইল। মুহূর্ত্তকাল পরেই কুকুরের গম্ভীর ডাক। নসীর খাঁ বলিলেন, রুস্তম! আর তিনটা কুকুর রুস্তমের গলা শুনিয়া তীরের মত সেইদিকে ছুটিয়া গেল। নসীর খাঁ ও আর সকলে সেইদিকে ধাবমান হইলেন। সুলেমান শাহ তরুণবয়স্ক না হইলেও যুবকের ন্যায় বেগে চলিলেন।

চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল। নসীর খাঁ আর সকলকে ছাড়াইয়া আগে ছুটিলেন, তাঁহার পরেই সুলেমান শাহ। আর সকলে ঠিক তাঁহাদের পশ্চাতে, কেবল বংশীলাল মোটা বলিয়া কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। নসীর খাঁ হাঁকিলেন, যুবরাজ, আপনি কোথায়?

শিরীষ গাছের তলা হইতে সিকন্দর শাহ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, এইদিকে! এইদিকে!

নসীর খাঁর বাম্ হস্তে মশাল ছিল, কল টিপিতেই আলোক জ্বলিয়া উঠিল। দক্ষিণ হস্তে পিস্তল। তাঁহার দেখাদেখি আর সকলে মশাল জ্বালিল। উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

নসীর খাঁ দেখিলেন, সিকন্দর শাহ পিস্তল্ হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কোথাও আঘাত লাগে নাই ত?

সিকন্দর শাহ কিছু লজ্জিতভাবে কহিলেন, না, আমার কোথাও আঘাত লাগে নাই।

নসীর খাঁ ও বংশীলাল মশাল ঘুরাইয়া দেখিলেন, তিনজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক মাটিতে পড়িয়া আছে, কুকুরগুলা সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে, রুস্তম সিকন্দর শাহের পাশে। আর তিনজন লোক পলায়ন করিতেছে। কিছু দূরে একখানা প্রকাণ্ড মোটর, তাহার এঞ্জিনের শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। একবার মোটরে উঠিতে পারিলে এই তিন ব্যক্তিকে আর পাওয়া যাইবে না।

সুলেমান শাহ কোনো কথা কহেন নাই, সিকন্দর শাহকেও কিছু বলেন নাই। যে তিন ব্যক্তি পলায়ন করিতেছিল মশালের আলোকে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি সবেগে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন।

নসীর খাঁ কহিলেন, আপনি কেন যাইতেছেন, আমাদিগকে আদেশ করিলেই হইবে।

স্থলেমান শাহ থামিলেন না, নসীর খাঁও তাঁহার সঙ্গে দৌড়িলেন।

তিনজনের মধ্যে একজন আগে যাইতেছিল; তাহার অঙ্গে বহুমূল্য পোষাক। সে যেমন মোটরে উঠিবে অমনি স্থলেমান শাহ তাহাকে গুলি করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেল, অর্দ্ধেক শরীর গাড়ীর ভিতর, অর্দ্ধেক বাহিরে। আর দুইজন টানাটানি করিয়া তাহাকে মোটরে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্থলেমান শাহ আর পিস্তল ছুঁড়িলেন না। নসীর খাঁ দৌড়িয়া গিয়া একটা চাকা লক্ষ্য করিয়া দুই তিনটা গুলি চালাইলেন, ঘোর শব্দে মোটরের টায়ার ফাটিয়া গেল।

পিছন হইতে আরও লোক ছুটিয়া আসিল। মোটর-চালক ও আর দুইজন বন্দী হইল। যাহার গুলি লাগিয়াছিল তাহাকে নীচে নামাইয়া সকলে দেখিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

স্থলেমান শাহ মৃত ব্যক্তির মুখে মশালের আলোক ধরিয়া নসীর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চিনিতে পার?

নসীর খাঁ স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, হুসেন শাহ!

১৩

বাড়ীর ভিতর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যে তিনজন ধরা পড়িয়াছিল নসীর খাঁর আদেশ-মত তাহারা হুসেন শাহের মৃতদেহ বহন করিয়া শিরীষ গাছের তলায় লইয়া গেল। সেখানে তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন মৃত আর দুইজন আহত। রমণী মূর্চ্ছাভঙ্গের পর উঠিয়া বসিয়াছে। স্থলেমান শাহ কহিলেন, লাশ নদীতে ফেলিয়া দাও, আর সব বন্দীকে নসীর খাঁর বাড়ীতে লইয়া চল।

এ পর্য্যন্ত সিকন্দর শাহকে কেহ কোনো কথা বলে নাই, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই, তিনিও নীরব ছিলেন। নসীর খাঁর বাড়ীতে উপনীত হইয়া স্থলেমান শাহ সিকন্দর শাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছিল? তুমি কেমন করিয়া ওখানে গিয়াছিলে?

সিকন্দর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রমণী কহিল, জাঁহাপনা! যুবরাজের কোনো অপরাধ নাই, আমি একা অপরাধিনী। আমি উঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। শাস্তি আমাকে দিন।

সিকন্দর শাহ কহিলেন, ইনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। ইনি না থাকিলে আমি নিহত হইতাম।

স্থলেমান শাহ রমণীকে বলিলেন, তুমি কে, সকল কথা খুলিয়া বল।

রমণী কহিল, আমার পিতা মাতা হুসেন শাহের আশ্রিত, তাঁহার আজ্ঞা আমরা সকলেই পালন করি। আপনারা এখানে আসিবার পরেই হুসেন শাহ গোপনে এখানে আসেন। আমরা কয়েকজন সেই সঙ্গে আসি। যুবরাজ এখানে আসিয়াছেন জানিয়া আমরা পাশের বাড়ীতে আসিয়াছিলাম। হুসেন শাহের আদেশানুসারে আমি যুবরাজকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়াছিলাম। হুসেন শাহ আমাকে শপথ করিয়া বলেন, তিনি যুবরাজের কোনো অনিষ্ট করিবেন না, তাঁহাকে বন্দী করিলেই আপনি রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন। যুবরাজের কোনোরূপ আশঙ্কা আছে জানিতে পারিলে আমি তাঁহাকে বিপন্ন করিতে স্বীকার করিতাম না। আমার অপরাধ আমি স্বীকার করিতেছি। আপনার যেমন অভিরুচি হয় আমার শাস্তি বিধান করুন।

সিকন্দর শাহ কহিলেন, সকল কথা ইনি বলেন নাই। হুসেন শাহের লোক যখন ছোরা দিয়া আমাকে আক্রমণ করে সে-সময় ইনি নিজের অঙ্গ দ্বারা আমাকে রক্ষা করেন। সে লোকটাকে রুস্তম মারিয়া ফেলে।

নসীর খাঁ রুস্তমের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, সাবাস রুস্তম!

স্থলেমান শাহ বন্দীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি বলিবার আছে?

—আমাদের প্রতি আদেশ ছিল যুবরাজকে বন্দী করিতে, হত্যা করিতে নয়। সেইজন্ম বড় মোটর আনা হয়। কুকুর দেখিয়া হুসেন শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, যুবরাজকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় যেমন করিয়াই হউক ধরিতে হইবে।

স্থলেমান শাহ কহিলেন, যে প্রকৃত অপরাধী আমি স্বহস্তে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়া আমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াছি। বংশীলাল ইহাদের কি দণ্ড হওয়া উচিত?

—ইহাদের পক্ষে কারাদণ্ড যথেষ্ট।

—তাহাই হইবে। আর এই রমণীর কি শাস্তি হইবে? ইহার কৌশলেই ত যুবরাজের বিপদ হয়।

কেহ কোনো কথা কহিল না, কেবল সিকন্দর শাহ কিছু বেগের সহিত বলিলেন, এই রমণী না থাকিলে আমাকে জীবিত দেখিতে পাইতেন না, সে কথা আপনি শুনিয়াছেন।

সুলেমান শাহ স্মিতমুখে কহিলেন, অর্থাৎ তোমাকে বিপদে ফেলিয়া তাহার পর আরও কঠিন বিপদ হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছে। তাহা হইলে ইহার লঘু দণ্ড হওয়া উচিত।

এবার সিকন্দর শাহও নীরব, শুধু রমণী কথা কহিল, বলিল, আমার অপরাধ গুরুতর, আমাকে গুরুদণ্ড দিতে আদেশ হউক।

সুলেমান শাহ রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর সিকন্দর শাহের অভিমুখে দৃষ্টি করিলেন। রমণীর মুখে ভয়ের চিহ্ন নাই, চক্ষের দৃষ্টি কঠিন, সিকন্দর শাহের মুখ ম্লান, হস্তের অঙ্গুলী কাঁপিতেছে।

সুলেমান শাহ রমণীকে বলিলেন, হুসেন শাহ নাই, আমার আশ্রয়ে তুমি থাকিলে তোমার বাপ-মার কোনো আপত্তি আছে?

রমণী বাক্‌শূন্য হইল, বিস্ফারিত স্থির নয়নে সুলেমান শাহের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুলেমান শাহ হাসিয়া বলিলেন, এখন তুমি শাহজাদীদের মহলে থাকিবে, তাহার পর প্রয়োজন হইলে তোমার নিজের মহল হইবে।

সুলেমান শাহ সিকন্দর শাহের প্রতি কৌতুকপূর্ণ কটাক্ষপাত করিলেন। রমণী কাঁদিয়া সুলেমান শাহের পা জড়াইয়া ধরিল, সুলেমান শাহ তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন, কহিলেন, আহারাদির পর তোমাকে মহলে পাঠাইয়া দিব। তুমি যুবরাজ সিকন্দর শাহের প্রাণরক্ষা করিয়াছ, উনি মহলে তোমার বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

বন্দীদিগের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। যাহারা আহত হইয়াছে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দাও। ইহাদের সহিত আমার কোনো বিবাদ নাই।

সিকন্দর শাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য সুলেমান শাহের করচুম্বন করিলেন।

রমণীকে আহারের নিমিত্ত আর একটা ঘরে লইয়া গেল। সিকন্দর শাহ দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় রমণী ফিরিয়া দেখিল সিকন্দর শাহ তাহার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীতে ধারণ করিলেন।

জৈন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের উন্নত

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা

১

১৩৩৫ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় "জৈনী শ্রাবক ও ওসওয়াল" প্রবন্ধে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন আমরা তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব ও যে যে স্থলে তাঁহার সহিত মতানৈক্য ঘটিয়াছে তাহা প্রদর্শন করিব।

জৈনগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম সনাতন বলিয়া মানেন। তাঁহারা কালপ্রবাহকে চারি যুগে বিভক্ত না করিয়া ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন—তাহার প্রত্যেক ভাগকে "আরা" বলে। এই ছয় আরাতে যে সময় হয় তাহাকে (১) উৎসর্পিণী বা (২) অবসর্পিণী কহে। উৎসর্পিণীর পর অবসর্পিণী ও অবসর্পিণীর পর উৎসর্পিণী ক্রমাগত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে ও চলিতে থাকিবে।

উৎসর্পিণীতে প্রত্যেক বস্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও অবসর্পিণীতে ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীতে চব্বিশজন করিয়া তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। যিনি কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন ও সাধু-সাধ্বী শ্রাবক-শ্রাবিকারূপ চতুর্ব্বিধ সঙ্ঘ বা তীর্থ স্থাপন করেন তাঁহাকে তীর্থঙ্কর বলে। অধুনা যে কাল চলিতেছে তাহা 'অবসর্পিণী'। ইহার পূর্ব্বে যে 'উৎসর্পিণী' অতীত হইয়া গেল তাহাতে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। বর্ত্তমান অবসর্পিণীতেও চব্বিশ-জন তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের নাম, জন্মস্থান ও লাঞ্ছন এস্থলে দেওয়া হইল। প্রত্যেক তীর্থঙ্করের এক একটি চিহ্ন আছে—তাহাকে লাঞ্ছন কহে। যে তীর্থঙ্করের প্রতিমা থাকে তাহাতে তাঁহার লাঞ্ছন খোদিত থাকে। নাম না থাকিলেও তদ্দ্বারা কোন্ তীর্থঙ্করের প্রতিমা তাহা সহজেই স্থির করা যায়।

তীর্থঙ্করের নাম	জন্মস্থান	লাঞ্ছন
১। ঋষভ দেব	বিনীতা	বৃষ
২। অজিতনাথ	অযোধ্যা	হস্তী
৩। সম্ভবনাথ	শ্রাবস্তী	অশ্ব
৪। অভিনন্দন	অযোধ্যা	বানর
৫। সুমতিনাথ	ঐ	ক্রৌঞ্চ
৬। পদ্মপ্রভ	কৌশাম্বী	পদ্ম
৭। সুপার্শ্বনাথ	কাশী	স্বস্তিক
৮। চন্দ্রপ্রভ	চন্দ্রপুরী	চন্দ্র
৯। সুবিধিনাথ (পুষ্পদন্ত)	কাকন্দি	মকর
১০। শীতলনাথ	ভদ্দিলপুর	শ্রীবৎস
১১। শ্রেয়াংসনাথ	সিংহপুর	গণ্ডার
১২। বাসুপূজ্য	চম্পা	মহিষ
১৩। বিমলনাথ	কম্পিলপুর	বরাহ
১৪। অনন্তনাথ	অযোধ্যা	শ্যেন
১৫। ধর্ম্মনাথ	রত্নপুর	বজ্র
১৬। শান্তিনাথ	হস্তিনাপুর	মৃগ
১৭। কুন্থুনাথ	ঐ	ছাগল
১৮। অরনাথ	হস্তিনাপুর	নন্দ্যাবর্ত্ত
১৯। মল্লিনাথ	মিথিলা	কুম্ভ
২০। মুনিসুব্রত	রাজগৃহ	কচ্ছপ
২১। নমিনাথ	মিথিলা	নীলপদ্ম
২২। নেমিনাথ	শৌরীপুর	শঙ্খ
২৩। পার্শ্বনাথ	বারাণসী	সর্প
২৪। মহাবীর (বর্দ্ধমান)	ক্ষত্রিয়কুণ্ড	সিংহ

শেষ তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর বৈশালীর অন্তর্গত ক্ষত্রিয়কুণ্ড নগরে ক্ষত্রিয় বংশে জ্ঞাতৃকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম 'সিদ্ধার্থ' ও মাতার নাম 'ত্রিশলাদেবী'। বৈশালী গণতান্ত্রিক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের প্রধান অধিপতি এ সময়ে মহারাজ 'চেটক' ছিলেন। ইনি মহাবীরের মাতুল। 'সিদ্ধার্থ' গণতন্ত্রের অধীনে কুণ্ডনগরের শাসক ছিলেন। ইনি স্থল-বিশেষে রাজা বলিয়া, কিন্তু অনেক স্থলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া, উল্লিখিত হইয়াছেন। সমগ্র গণতন্ত্র হয়ত কতিপয় প্রদেশে বিভক্ত ছিল ও প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে রাজা নামে অভিহিত করা হইত। কুণ্ডনগর দুইভাগে বিভক্ত ছিল—ব্রাহ্মণকুণ্ড গ্রাম ও ক্ষত্রিয়কুণ্ড গ্রাম। প্রথমটিতে ব্রাহ্মণগণ ও দ্বিতীয়টিতে ক্ষত্রিয়গণ বাস করিতেন। রাজা সিদ্ধার্থের দুই পুত্র—নন্দীবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান (বা মহাবীর)।

শ্রমণ ভগবান মহাবীর ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহস্থাবাসে ছিলেন, তৎপরে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বার বৎসর পর্য্যন্ত ঘোর তপস্যা করেন। ঘোর তপস্যা ও অসাধারণ সহন শক্তির জন্য ইনি 'মহাবীর' বলিয়া বিখ্যাত হন। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে ইঁহার কেবল-জ্ঞান (১) উৎপন্ন হয়। কেবলী অবস্থায় ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া চতুর্ব্বিধ তীর্থ বা সঙ্ঘ (সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকা) স্থাপন করেন। বাহাত্তর বৎসর বয়সে বিহারের অন্তর্গত "অপাপা পুরীতে"—যাহাকে অধুনা "পাওয়া পুরী" বলা হয়—খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

---

(১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্মের সম্পূর্ণ ক্ষয়ে যে পূর্ণ জ্ঞান প্রকটিত হয় তাহাকে কেবল-জ্ঞান কহে। যাঁহার এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে—তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ লোকালোক প্রত্যক্ষীভূত হয়।

ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। পার্শ্বনাথের নির্ব্বাণ মহাবীরের নির্ব্বাণের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। অতএব তাঁহার নির্ব্বাণাব্দ ৭৭৭ পূঃ খৃষ্টাব্দ। তিনি একশত বৎসর জীবিত ছিলেন, অতএব তাঁহার জন্মাব্দ ৮৭৭ পূঃ খৃষ্টাব্দ। অধ্যাপক শীল মহাশয় আলোচ্য প্রবন্ধে পার্শ্বনাথের জন্মকাল ৮১৭ পূর্ব্ব ঈশাব্দ লিখিয়াছেন। তাহা মুদ্রাকরপ্রমাদ কি অসাবধানতাবশতঃ তাঁহার ভ্রান্তি হইয়াছে—বুঝিতে পারিলাম না। আশা করি, তিনি এ বিষয়ে ভ্রমসংশোধন করিবেন।

ভগবান মহাবীরের নির্ব্বাণের পর তাঁহার শিষ্য পঞ্চম গণধর স্থধর্ম্মস্বামী জৈন-সঙ্ঘের নায়ক হইলেন। তিনি ২০ বৎসর ও তাঁহার পরে জম্বুস্বামী ৪৪ বৎসর নায়ক ছিলেন। জম্বুস্বামীর শিষ্য প্রভবস্বামী তৃতীয় আচার্য্য। ইনি বীরাব্দ ৬৫ হইতে ৭৫ অর্থাৎ ১১ বৎসর পর্য্যন্ত জৈন-সঙ্ঘের অধিপতি ছিলেন। অতএব ইঁহার সময় ৪৬৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৫২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। অধ্যাপক শীল মহাশয় এস্থলে আর একটি ভুল করিয়াছেন, তিনি প্রভবস্বামীর সময় ৪০৩ হইতে ৩৯৭ পূর্ব্ব ঈশাব্দ লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয় তিনি বিক্রমাব্দের পরিবর্ত্তে খৃষ্টাব্দ লিখিয়াছেন। কারণ মহাবীরের নির্ব্বাণ ৪৭০ পূর্ব্ব বিক্রমাব্দে হইয়াছিল। এই হিসাবে প্রভবস্বামীর শাসন-কাল ৪০৬ হইতে ৩৯৫ পূর্ব্ব বিক্রমাব্দ হয় যাহা অধ্যাপক মহাশয়ের প্রদত্ত পূর্ব্ব ঈশাব্দের কাছাকাছি। তিনি প্রভবস্বামীর শাসনকাল ৬ বৎসর লিখিয়াছেন, তাহাও ১১ বৎসর* হইবে।

মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে অধ্যাপক শীল মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণের ৭০ বৎসর পরে উপকেশ-পত্তনে রত্নপ্রভ সূরি কর্ত্তৃক স্থাপিত মহাবীর স্বামীর প্রতিমা ও মন্দিরই যে প্রথম মূর্ত্তি ও মন্দির তাহা জৈনগণ স্বীকার করেন না। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে তীর্থঙ্করের মূর্ত্তিপূজা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। লঙ্কাধীপ রাবণ জিন-মূর্ত্তি পূজন করিতেন। দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে যাইবার পূর্ব্বে জিন প্রতিমা পূজন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহা ষষ্ঠ অঙ্গ "নায়া ধম্ম কহা" (জ্ঞাতা ধর্ম্ম কথা)তে বর্ণিত আছে। জৈন প্রাচীনতম গ্রন্থ "অঙ্গ" গুলিতে স্থানে স্থানে নিজ প্রতিমা, অরিহন্ত চৈত্য প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়—৬ষ্ঠ অঙ্গ "নায়াধম্মকহা"তে "জিন ঘর" ও "জিনপড়িমা" শব্দ, ৫ম অঙ্গ "ভগবতী"তে "অরিহন্ত চেইয়ানি" শব্দ, উপাঙ্গ "রায়পসেনী"তে বিস্তারিতভাবে জিন-প্রতিমা পূজার বিবরণ ও "ঠানাঙ্গ", "জীবাভিগম" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে প্রতিমা পূজার কথা লিখিত আছে। এতদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, সে সময়ে জিন-প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল। এতদ্ব্যতীত জৈন গ্রন্থসমূহে অনেক স্থলে চৈত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই চৈত্যগুলিতে যক্ষের প্রতিমা থাকিত। প্রায় প্রত্যেক নগরেই এরূপ চৈত্য (যক্ষায়তন) থাকিত। বোধ হয় এই যক্ষগণ নগরপাল দেবতারূপে পূজিত হইতেন। আমরা এইস্থলে কয়েকটির নাম দিতেছি :—রাজগৃহ নগরের "গুণশীল" চৈত্য, বানিয়াম (বাণিজ্য-গ্রাম) নগরের "দুই পলাস" (দ্যুতি-পলাস) চৈত্য, চম্পা নগরের "পুন্নভদ্দ" (পূর্ণভদ্র) চৈত্য, বারাণসীর "কোট্টয়" (কোষ্টক) চৈত্য ইত্যাদি। কাজেই এ কথা বলা যায় না যে, সে সময়ে ভারতে প্রতিমা পূজা অজ্ঞাত ছিল। অবশ্য আজকালকার ন্যায় নানা সম্প্রদায়ের অসংখ্য প্রতিমা হয়ত তখন ছিল না—কিন্তু একেবারেই ছিল না এ কথা স্বীকার করা যায় না।

ঐতিহাসিক গবেষণাতে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বেকার লেখ-সহ কোন জিন-প্রতিমা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মেবাড়ের অন্তঃপাতী "বারলী"* গ্রামে প্রাপ্ত শিলাখণ্ড এ সময়ে শিলালিপি-সহ প্রাপ্ত জৈন-প্রতিমা প্রভৃতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই অনুমিত হয়। কেননা ইহাতে ভগবান মহাবীরের চতুরশীতি সম্বৎসর খোদিত আছে। ইহা কোন এক শিলাখণ্ডের ভগ্নাংশ—হয়ত মন্দির-তোরণ বা সেইরূপ অন্য কিছু ছিল। ইহা একণে আজমীর মিউজিয়ামে রক্ষিত

* *An Epitome of Jainism* by Nahar, p.p. 658-659.

* *Jain Inscriptions*, Part I by Nahar

আছে। মথুরাতে কঙ্কালী টিলায় খোদিত লিপিসহ যে সমস্ত জিন-প্রতিমা, আয়াগ পট্ট, মন্দির-তোরণ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের *। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী খণ্ডগিরিতে (হাতিগুম্ফার) শিলালেখের পাঠোদ্ধারে কলিঙ্গ চক্রবর্ত্তী সম্রাট খারবেলের যে ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, মগধের অধিপতি নন্দ কলিঙ্গ জয় করিয়া তথা হইতে যে কলিঙ্গ-জিন-প্রতিমা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা খারবেল পাটলীপুত্র জয় করিয়া পুনরায় লইয়া আসেন। নন্দবংশের যে নরপতি কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন তিনি নন্দবর্দ্ধন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। নন্দবর্দ্ধনের সময়ে নন্দাব্দের প্রচলন হয় ও তাহা বিক্রমাব্দের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেকার। শ্রমণ ভগবান মহাবীর ৪৭০ পূর্ব্ব বিক্রমাব্দে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবীরের নির্ব্বাণের ৭০ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে সুদূর কলিঙ্গ দেশ পর্য্যন্তও জিন-প্রতিমার প্রচলন হইয়াছিল। কলিঙ্গ-জিন-প্রতিমা যে মহাবীরের প্রতিমা এরূপ কোন উল্লেখ নাই—পার্শ্বনাথের প্রতিমা হওয়া অসম্ভব নয়। তাহা হইলে যদি আমরা এরূপ অনুমান করি যে, মহাবীরের জীবিতকালে কি তৎপূর্ব্বেও জিন-প্রতিমা প্রচলিত হইয়াছিল, তবে বোধ হয় তাহা অনুচিত হইবে না।

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, মহাশয় প্রণীত 'লেখমালানুক্রমণী' প্রথম খণ্ড ২৮ হইতে ৬৬ সংখ্যক শিলালিপি দ্রষ্টব্য। এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৩২ নং শিলালিপির যে অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে 'মোগলিপুত্তস' শব্দের 'মুদগলী গোত্রীয়া মাতার পুত্র' এরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় "মোগলিপুত্তস" শব্দ "পুষ্পকের" পিতৃকুলের পরিচয় প্রদান করিতেছে, মাতৃকুলের নয়—কেননা জৈনগ্রন্থে আমরা অনেকস্থলে মহাবীরকে "নায়পুত্ত" বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই—তাহা তাঁহার পিতৃকুলের পরিচায়ক, মাতৃকুলের নয়।

পিতৃ-ঋণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

আমাদের বেদান্তবাগীশ মশাই ছিলেন অগাধ পণ্ডিত। তাঁর স্তব্ধতা, তাঁর গাম্ভীর্য্য বোধ হয়, প্রশান্ত মহাসমুদ্রের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। দেখ্‌লেই মনে হয় বুকে অসীম ব্যথা বহন ক'রছেন; কিন্তু মুখে পরিচয়ের তার একটি সূক্ষ্ম রেখা-পাত পর্য্যন্ত নেই! জ্ঞানের প্রগাঢ়ত্ব সংসারের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের বহু ঊর্দ্ধে যে মানুষকে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে পারে, সে বিশ্বাস তাঁকে দেখ্‌লে নিঃসন্দেহে আপনিই যেন মনের মধ্যে এসে পড়ে!

তাঁর বয়স যে কত হয়েছিল তা' পাকা আমটির মত সে-চেহারাখানি দেখে কেউ নির্ণয় করতে পারতো না। কেউ কেউ বলতো তিনি বীরভূমের নীচেই নাকি সমুদ্র দেখেছেন; কেউ বলতো, তিনি নাকি মানস-সরোবরের তীরে বসে যৌবনে তপস্যা ক'রেছিলেন, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধ'রে।

এ সবই শোনা কথা। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, মৃদু হেসে ব'লতেন—অতীত যা', গত যা', তার আলোচনায় ফল কি, বাপু?

কৌতূহল রুদ্ধ হ'লে মরে যায় না; দিকে দিকে দৈত্যের প্রতাপে সেটি বেড়ে উঠে; গল্পের পর গল্প, গুজবের পর গুজবই সৃষ্টি করতে থাকে।

বীরভূম ছিল তাঁর আদি-নিবাস। কিন্তু সে সব স্মৃতি যেন তাঁর মন থেকে মুছে গেছে। তাঁর শৈশব ছিল, কি যৌবন ছিল, কি ঘর ছিল, কি স্ত্রী পুত্র পরিবার ছিল, এর একটু-আধটু খবর কেবল দাদামশাই-এর

কাছেই যা পাওয়া যেত। তাও এত কম, এক বিন্দুর মত ছোট যে, মনের আশা কিছুতেই মিট্‌তে পারে না।

দাদামশাই ছিলেন আমাদের বন্ধু; তাঁর কাঁধে চড়া, টিকি ধরে টানা—এ সবের প্রশ্রয় যতই না কেন থাকুক, বেদান্তবাগীশ মশাইএর কথা বললে তিনি হঠাৎ সংযত-বাক্‌ হয়ে গিয়ে, দুহাত কপালে তুলে নমস্কার করে বল্‌তেন—ওঁর কথা? ওঁকে কে চেনে, কে জানে?

আজকাল কোথায় আছেন তিনি?

সে-কথা দাদামশাই কানে তুলতেন না যেন; কিন্তু আমরাও ছাড়বার পাত্র নই, জোর কর্‌তুম, বলতুম বলতেই হবে তোমাকে।

শেষকালে দাদামশাই বল্‌তেন, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর কি?

কবে আস্‌বেন?

বেঁচে থাকলে, পূজোর সময়।

আমরা প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌তুম। আর পূজোর ক'মাস? আঙুল গোণা সুরু হ'য়ে যেত।

কিন্তু দিদিমা ছিলেন আমাদের বেদান্তবাগীশ মশাই সম্বন্ধে একখানি ত্রি-শিরা কাঁচের মত। খবরটা তাঁর মুখ দিয়ে সাতরঙা রামধনুকের মত যেমন সুন্দর তেমনি বিচিত্র হ'য়েই বার হতো।

জিজ্ঞেস করলেই হলো; তিনি পা ছড়িয়ে, চরকায় সুতো কাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে বলতেন, আমি তো ঠিকই করেছিলুম মন্তর নেব; কিন্তু যখন শুনলুম, উনি ভূত মানেন না, ভবিষ্যৎ মানেন না……দিদিমা গলাটা খাট করে এদিক ওদিক চেয়ে বল্‌তেন, শুনেছি উনি নাকি নাস্তিক, ঈশ্বরও …..

সেই কথা শুনে আমাদের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌তো, বুক দুদ্দুড় করতো—উঃ কী সাওস্‌! ঈশ্বর পর্য্যন্ত মানে না? বাবা!

আচ্ছা দিদিমা, উনি বাগ্‌ ভাল্লুক এলে কি করেন?

দিদিমা বলতেন, শোননি ধ্রুবর গল্প, শোননি পেল্লাদের গল্প? বাগ্‌ ভাল্লুকে কি করবে তাঁদের। এক মন্তরে—তারা সব ছবির মত হ'য়ে যায়!

আমাদের মনে সে ছবি উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌তো।

নিবিড় অন্ধকার বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আর চারিদিকে সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক সব চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে!

আচ্ছা, দিদিমা, উনি ঈশ্বর কেন মানে না?

দিদিমা বলতেন, উনি ভূতও মানেন না, ঈশ্বরও মানে না।

আচ্ছা, উনি মর্‌লে নরকে যাবেন?

দিদিমা দুই চোখ বন্ধ করে, মাথা নেড়ে বল্‌তেন, দূর পাগ্‌লা, ধ্রুবর মতো ওঁর জন্যেও একটা গোলক তৈরি হয়ে আছে।

গোলকধাঁধা খেলে খেলে বৈকুণ্ঠ, গোলক, এ সব্‌ আমাদের মুঠোর মধ্যে হয়ে গিয়েছিল প্রায়। ও আমরা সহজেই বুঝ্‌তাম।

২

দাদামশাইএর বাড়ীটি ছিল প্রকাণ্ড। … চাকর-নফর সে যে কত তা' বলে উঠা যায় না। গরু ছিল আড়াই কুড়ি; দুধ হ'তো রোজ মণকে মণকে। চারিদিকের মাঠে যতখানি নজর চলে, জমি, সব আমাদেরই। বর্ষা সুরু হ'তেই জোড়া জোড়া জোড়া বলদ দিয়ে লাঙল চলতো। পূজোর আগেই ধানের গাছে চারিদিক হেসে উঠ্‌তো; সবুজে সবুজ।

কি জানি কেন, দাদামশাইএর পাকা ইটের ঘর একখানিও ছিল না। যদিও তাকে "কোঠা" বলা হ'তো, কিন্তু সে সবই ছিল 'মাট-কোঠা'। একতালা নয়, দোতালা।

সে-সব লম্বা লম্বা ঘর, একটি ক'রে দোর, আর সারি সারি ছোট ছোট খুব্‌রি খুব্‌রি জান্‌লা।

নীচের ঘরগুলোতে থাকতো ধান-চাল, আলু-মটর কলাই, খড় ভূষো, আরো কত কি—ছাই বলাই এ ভরা। ঘরে ঘরে ঝুলতো বড় বড় তালা। উপর তলাতেই শোয়া বসা—কেবল, দাদামশাইয়ের বৈঠকখানা ঘর, আর অন্দরের রান্নাঘর এই দুটোই শূন্যে নয়।

বাড়ীর উত্তর দিকের মাট-কোঠার উপরে যেতে আমাদের কেমন ভয় ভয় কর্‌তো। তার কারণও ছিল। শুনেছি, দাদামশাইএর এক সৎমা নাকি গলায় দড়ি দিয়ে-

ছিলেন ঐ ঘরে। ঘরটার পিছন দিকে প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান। একদিকে তেঁতুল গাছের সার; শেওড়া গাছও এক আধটা বোধ হয় ছিল।

বাগানের শেষের দিকে ঈশান কোণে ছিল পঞ্চবটী। এখেনে দাদামশাইএর ঠাকুরদাদা নাকি কালী-সিদ্ধ হতে গিয়ে বেদী ফেটে পাগল হ'য়ে যান। ওদিকেও যেতে কেমন গা ছম্ ছম্ করে।

কুলীন বনেদী বংশে সেকালে ঘরজামাই করা ছিল একটা মস্ত মান্ত। পুত্র কন্যা দুই তো সমান, তবে মেয়েকে বাড়ী ছাড়া ক'রে, পরের বাড়ী বিদায় করে দেওয়া—সে যাদের অবস্থায় কুলোয় না, তারাই করে। কোন্ বড় কুলীনের ঘরে সে কালে জামাইএর রাজপুত্রের সমাদর না ছিল ?

[illegible] বাবা ছিলেন গরীবের ছেলে, আর দাদামশাই-[illegible] হাত। সকল কাজে, সকল পরামর্শে ডাক হ'তো [illegible] গিরিধর !

[illegible]মামা আর বাবাতে ছিল পরম বন্ধুত্ব। দুজনের [illegible] ছিল অখণ্ড। দুই বন্ধুতে মিলে এক কুস্তির [illegible] খুলে শরীরকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিয়ে তারপর আর [illegible] সাধন করতেন।

সকালে ছোলা আর কাঁচা দুধ খেয়ে তাঁদের চেহারা হয়েছিল গোল আর লাল। ভয় বলে কোন বৃত্তি তাঁদের মনে তিলেকের জন্যেও স্থান পেত না।

দাদমশাই ওঁদের কাণ্ড দেখে হাস্তেন, বল্তেন, ডাকাত পড়লে ওরাই তাদের পগার পার করে দিয়ে আস্‌বে।

পিতৃপুরুষের বিষয়-সম্পত্তি পূর্ব্বপুরুষদের একটা অনুজ্ঞা বহন করে এনেছিল; বছর বছর দুর্গাপূজা কর্‌তেই হবে। অবশ্য, একটা চল্‌তি কথা আছে; বাবার বিগ্রহ ছেলের গলায় নিগ্রহের মত ঝুল্‌তে থাকে। বৎসরের পুজোটাকে কিন্তু নিগ্রহ মনে করে নেবার মত অবস্থা সেকালের লোকের ছিল না, অন্ততঃ আমার দাদামশাই-এর তো মোটেই ছিল না।

[illegible] বছর বছর ঘরে মাকে নিয়ে আস্‌তে পারা, সে তো পরম ভাগ্যের কথা। শুধু তাই নয়, এই একটা উপলক্ষ্য যে সুযোগে দেশবিদেশের নিজের জনকে ঘরে আহ্বান কর্‌তে পারা যায়।

সে কটা দিন যে কি আনন্দে কাটে তা বলে শেষ কর্‌তে পারা যায় না। আনন্দময়ী সত্যই তিনি, তাঁর আগমনে আনন্দে দেশটা ছেয়েই যায়।

সেবার হঠাৎ আত্মীয়-কুটুম্বও এলেন খুব বেশী। এত বড় বাড়ীতে লোক আর ধরে না। বৈঠকখানা বাড়ীতে যে দুটি ছোট কুঠুরি ছিল, তা বেদান্তবাগীশ মশাইএর জন্য একেবারে রিজার্ভ করা। সেখেনে আর কারুর জায়গা হতেই পারে না। তাঁর জপতপ ক্রিয়াকলাপ সে-সব যেমন অদ্ভুত, তেমনি বাইরের লোকের দেখারও অধিকার ছিল না।

মুস্কিল হলো সব চেয়ে ছোটমামা আর বাবার; তাঁদের না হয় বাইরে স্থান, না হয় অন্দরমহলে। তখন তাঁরা গেলেন একদম মরিয়া হয়ে।

ছোটমামা এসে বললেন, মা, আমরা যাই কোথায় ? বাইরের ঘরে তো বেদান্তবাগীশের বুজরুকী সুরু হলো— আর বাড়ীর মধ্যে বৌ-ঝিয়ে ভরা, আমাদের তো একটা আস্তানা চাই ?

দিদিমা বেদান্তবাগীশ মশাইএর কথা শুনে দুই কানে আঙুল দিয়ে বললেন, কি হচ্ছিস দিন্ দিন্ ভোলা; তুই আর লোক পেলিনে ? ওঁকে অবাক্যি কুবাক্যি ?

অনেক তর্কাতর্কির পর ছোটমামারা সেই [illegible] দড়ির ঘরে গিয়ে ঠাঁই ঠিক করলেন।

লোকজন লেগে গেল সেই ঘরের পরিষ্কার করতে। দিদিমা রইলেন দাদামশাইএর একবার সাক্ষাতের প্রতীক্ষায়। তিনি ঘোর আপত্তি করতে লাগলেন, ও ঘরে কতদিন কত কি দেখে মানুষ আঁৎকে উঠেছে,—ও ভোলা ও গিরিধর, লক্ষীটি আমার, অমন কাজ কিছুতেই করিস নে রে তোরা !

ওঁরা হাসেন, বলেন, কি বাজে ভয় পাচ্চ মা, ভূতটুত আমরা কিছু মানিনে। দেখিই না একবার, ভূতের কতদূর দৌড়।

দিদিমা বললেন, 'রাম নাম কর্, কান মল্, এমন কথা মুখে আন্‌তে নেই।

সেদিনের জন্যে দিদিমার হ'লো জিৎ। দাদামশাই একেবারে বাইরে গিয়ে বেদান্তবাগীশ মশাইএর সঙ্গে গভীর পরামর্শ জুড়ে দিলেন।

আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে লাগলুম।

বেদান্তবাগীশ মশাই বললেন, ভূত আমি দেখিনি কোনো দিন বটে, কিন্তু নেই, বা থাকতে পারে না এমন কথাও বলিনে।

দাদামশাই অবাক হয়ে বললেন, আপনি দেবতা মানেন না, আর ভূত মানেন?

তিনি বললেন, এক ঐশ শক্তি ছাড়া কোনো শক্তিই সৃষ্টিবিধানে কাজ করে না; কিন্তু সে শক্তি খণ্ডিত হয়ে নানা আকারে প্রকাশ পেতে পারে। যেমন,—বলে তিনি একটু থেমে যেন কি ভাবতে লাগলেন।

খানিক পরে বললেন, যেমন ধরে নিন্ এই গঙ্গা; বর্ষায় যখন আকাশের অতিরিক্ত জল এসে এতে পড়ে তখন সে জলে দুই তটই তার প্লাবিত হয়ে কত পুকুর ভ'রে যায়; তার পর যখন বর্ষা শেষ হয় তখন গঙ্গা ছোট হ'য়ে যায়; সেই সময় পুকুর, কি শাখা-নদী খণ্ডিত হ'য়ে পড়ে। যে জানে না, সে মনে করে, এ সবের বুঝি স্বাধীন অস্তিত্ব আছে; কিন্তু তা নয়; ঐ গঙ্গাই ওদের উৎপত্তির আদি কারণ।

তেমনি ঐ এক ঐশ শক্তি থেকেই অগণিত শক্তির উদ্ভব। দুর্গা কল্পনা, ঐশ শক্তির খণ্ডিত, বিশেষ কল্পনা মাত্র। মানুষও ঐ শক্তির এক বিন্দু। মানুষ মরলে শক্তির ধ্বংস হয় না, রূপান্তর হয় মাত্র। পুকুরের জলের যেমন বিকার ঘটে, আবার গঙ্গার জল পেলে যেমন সে বিকৃতি দূর হয়—তেমনি মানুষের বিকারও ঐশ শক্তির যোগে দূর হতে পারে।

ভূত, প্রেত, সবই ঐশ শক্তির যোগরাহিত্যে বিকৃত অবস্থা। যদি আবার যোগ স্থাপনা করতে পারা যায় তো ঐ বিকারটা কাটিয়ে উঠে।

দাদামশাই বললেন, তারপর? কি ব্যবস্থা?

বেদান্তবাগীশ মশাই বললেন; ঐ ঘরে কাল প্রাতে আমি উপনিষদের মন্ত্র পাঠ ক'রে দেওয়ার পর, যে-সকল লোকাচার আছে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

দাদামশাই প্রশ্ন করলেন, সে কি?

শালগ্রামশিলার পূজা এবং এক রাত্রি গো-বন্ধন।

দাদামশাই বললেন, গো সম্ভব হবে না, একটা বাছুর বেঁধে রাখা যেতে পারে।

বেদান্তবাগীশ হাসলেন, ওটা আচার মাত্র। আপনাদের অভিরুচি।

তারপর, আপনি মনে করেন যে, ও ঘর ব্যবহার করলে গৃহস্থের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না?

না, না, না, বলে তিনি হাসতে লাগলেন।

গৃহ-সংস্কারের ব্যবস্থা অচিরে হ'য়ে গেল। ছোট মামা শুনে বললেন, হামবাগ্। বাবা বললেন, ননসেন্স!

আমরা অবাক হ'য়ে রইলুম।

৩

এক রাতে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড হ'লো। [illegible] দড়ি ঘরে শুয়েছিলেন ছোট মামা আর বা[illegible] ক'দিনই শুচ্ছিলেন তাঁরা।

সেদিন দুপুর রাতে ঘুম ভাঙতেই ছোটমামা [illegible] যে তাঁর পাশের ছোট জানলাটির গরাদে ধরে একটা লোক ব'সে একদৃষ্টে কটমট ক'রে তাঁর দিকেই তাকিয়ে!

যতই সাহস থাকুক, যতই কেন ভূতকে মুখে অবিশ্বাস করা যায়, মনের মধ্যে কোথায় একটা ভূতের ভয়ের অন্ধকার হাঁড়ি সরা-চাপা থাকে। যদি একবার ভয় হ'লো তো তার ভিতর থেকে কালো ধোঁয়ার মত সেটা বেরিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে যেন নিমেষে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

ছোট মামার সে চীৎকারে বাড়ীতে কারুর উঠতে বাকি রইল না।

দাদামশাই নিজে গিয়ে তাকে নামিয়ে আনলেন। সবাই বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, গিরি, তুমি কি বল? কিছু দেখেছিলে?

বাবা হেসে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বললেন; ও কিছু না, সেরেফ একটা স্বপ্ন।

তখন সবাই হাসে, বলে ভোলা খুব ভূতই দেখেছে।

ছোটমামা বলেন, আমি একেবারে জেগে ছিলুম, পরিষ্কার দেখেছি—একটা লোক, নেড়া মাথা, গরাদে ধরে বসে তাকিয়ে আছে কটমট করে… এ যদি ভুল হয় তো, আমি বাজি ফেল্‌চি, আমি দেখিয়ে দিতে পারি গিরিধরকে, কাল যদি ও শোয় আমার জায়গায়।

বাবা বললেন, আল্‌বাৎ রাজি—এতো একটা প্রকাণ্ড লাভ। যা কখ্‌খনো দেখিনি তাই পাব দেখতে!

ব্যাপারটা এমনি করে শেষ পর্য্যন্ত উড়ে গেল। সবাই হাসে, সবাই বলে, ভারি মন্দ কিনা!

পরের দিন, আবার সেই হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। বাবা বললেন, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে ওটা ভূত। কিন্তু গোল লাগলো সেইখেনে, গলায় দড়ি দিয়ে ও ঘরে ম'রেছেন যিনি তিনি স্ত্রীলোক, আর এ-যে ভাহা পুরুষ!

টিক্‌-টিপ্পনির অভাব হয় না। কে বললে, তাতে কি? ওরা যখন যেমন ইচ্ছে রূপ ধরতে পারে; ওরা ইচ্ছে করলে গরু পর্য্যন্ত হ'তে পারে। আর একজন বললে, হুৎ, সে তো গো-ভূত, আমাদের মামার বাড়ীতে খোলার চালের ওপর দিব্যি বেড়াচ্ছে, একটুও হড়মড়ানির শব্দ নেই!

রাত প্রায় তর্কবিতর্কেই কেটে গেল।

সকাল থেকে সেই ঘরে বেদান্তবাগীশ মশাইএর আবার উপনিষদ পাঠ আরম্ভ হ'লো। ধূপ-ধুনো জেলে বাড়ীটাকে তিনি গন্ধে আমোদ ক'রে দিলেন।

মানুষের আত্মা, কর্ম্ম কি অদৃষ্টের ফলে যদি অসদ্‌গতি প্রাপ্ত হয় তো এই তার সবচেয়ে বড় পথ, তার মধ্যে আবার ঈশ্বরের শক্তির প্রেরণা ফিরে আন্‌বার।

এ সব কূট, সূক্ষ্ম, জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করার সাধ্য আমাদের ছিল না, কিন্তু একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠ্‌ছিল। সেই নেড়া মাথা ভূতটাকে যদি একবার দেখতে পেতুম!

ভয় মানুষকে নিবৃত্ত করে, কিন্তু জ্ঞানের প্রেরণা মানুষের মধ্যে তার চেয়ে ঢের বেশী প্রবল, অনেক গভীর। ভূত আছে, কি নেই। যদি থাকে তো ওটা কোন্‌ ভূত, কার ভূত, কোত্থেকে আমদানি হ'লো—এই-সব নিঃশেষে জানবার জন্যে আমাদের মনের ছটফটানির আর শেষ ছিল না।

তিনদিন বিধিমত পাঠ করে বেদান্তবাগীশ মশাই নিজে সেই ঘরে শোবার প্রস্তাব করলেন।

আমাদের মন দুই বাহু তুলে নৃত্য ক'রে উঠ্‌লো!

কিন্তু দাদামশাই বেঁকে বসলেন, সেকি হয়? আপনি বুড়ো মানুষ, ও কথা আমি কিছুতেই শুন্‌তে পারিনে।

বেদান্তবাগীশ মশাই খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, তবে আজকেই আমাকে বিদায় দিন্‌ দয়া ক'রে।

দুঃখে ক্ষোভে তাঁর মুখটা কালো দেখাচ্ছিল।

দাদামশাই ভয়ঙ্কর অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, এতখানি কঠিন আঘাত দেবে তাঁর কথাটা, তা তিনি কল্পনাতেও আন্‌তে পারেননি, তাই দুই হাত জোড় ক'রে বললেন, আমায় মার্জ্জনা করুন, বেদান্তবাগীশ মশাই—

তিনি হাস্‌লেন, বললেন, আমার মনে একটা গভীর সন্দেহ জেগেছে, তার নিরাকরণ আবশ্যক। এই সন্দেহ যদি সত্য হয় তো আপনাদের সমূহ ক্ষতি। তাই এই সংকল্পে আমাকে অনুগ্রহ ক'রে বাধা দেবেন না।

আমাদের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো।

শোনা আর দেখার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বেদান্তবাগীশ মশাই সম্বন্ধে শুনে যা ধারণা ক'রেছিলুম তাতে কুহেলিকার মত অনেকটা আব্‌ছায়া ছিল; তত্ত্ব অবাস্তবের ছায়া এত বড় যে, সহজেই যেন মনের মধ্যে ভয় সঞ্চিত হয়; কিন্তু সে-সব এই মানুষটির সংযত কথা, শান্ত ভদ্র অথচ দৃঢ়-অটল ব্যবহারে পরিষ্কার দূর হ'য়ে গেল। বুঝলুম, তিনি ভূতও অস্বীকার করেন না; আবার ভগবানকে মনের শ্রেষ্ঠ আসনই দেন; কেবল ভূতের সঙ্গে ভগবানকে জড়িয়ে ফেলে অন্য মানুষের মত একটা খিচুড়ির তাল পাকিয়ে ভয়ের ভূতের শ্রাদ্ধ করেন না।

তাই তাঁর মনের গভীর সন্দেহের কথা শুনে বাড়ীর আগা-গোড়া সকলেরই মন ভয়-মিশ্রিত কৌতূহলে ব্যগ্র হ'য়ে রইল। সকলেরই মনে যেন হ'তে লাগ্‌লো,

জীবন ও মৃত্যু

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গুহ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

যিনি একটি বৃথা কথা উচ্চারণ করেন না তিনি যখন সন্দেহ করছেন তখন ব্যাপারটা আর মোটেই অবহেলার নয়, গুরুতরই !

দাদামশাই বললেন, রাত্রে আপনার কোনো কিছুর দরকারও তো হ'তে পারে আর একজন কেউ আপনার সঙ্গে গিয়ে শু'ক।

বেদান্তবাগীশ মশাই শিশুর মত হেসে বলেন, ভয়টা আপনার আমার চেয়ে বেশী দেখ্‌ছি ! জীবনে কত বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ালুম তার ঠিক-ঠিকানা নেই, হয়তো আরো কত না ঘুরতে হবে।

ভয় কি ? আহার নিদ্রা আর ভয়, এই তিনটিকে যতই বাড়ান যায়, ততই বাড়ে।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনো চিন্তার কারণ নেই।

দাদামশাই স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

দাদামশাইএর বড় একটা অদ্ভুত প্রকৃতি ছিল। তিনি বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হলেও তাঁর সকল বিষয়ে শেষ কর্তৃত্বের অধিকার থাকলেও, সেটাকে জাহির করে, অন্যের ন্যূনতাকে ক্ষুণ্ণ কি আহত করে কোনো কাজই করতেন না। তর্ক উঠ্‌লে তিনি চুপ করে যেতেন। লোকের আপত্তিকে শ্রদ্ধা এবং স্তব্ধতার সঙ্গে মেনে নিয়েও যা উচিত তা করতেও কিছুমাত্র দ্বিধা তাঁর হতো না। বিশেষ করে এই চালটি দিদিমার সঙ্গেই তাঁর চল্‌তো বেশী। গোড়ায় একটা কথা শুনে কি না শুনে, বুঝে কি না বুঝে, দিদিমা হৈ হৈ করে একটা আপত্তি তুল্‌তেন। দাদামশাই তখন হেসে বলতেন, বেশ তো গো, তোমার আপত্তি আছে তো ঠাণ্ডা হ'য়ে বল না, গোলমাল কর কেন ? আমি তো আর দিব্যি গেলে বসিনি। তোমাদের অমতে কবে কোন্ কাজটা হয়েচে ?

দিদিমা থেমে যেতেন, কিন্তু দাদামশায়ের কথাই শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়াত, আর তার ফলও হ'তো সব চেয়ে ভাল।

সে রাত্তে, তাই বেদান্তবাগীশ মশাইএর অজ্ঞাতে বাড়ীর সব চেয়ে হুঁসিয়ার চাকর মাণিক সেই ঘরে গিয়ে শুয়ে রইল।

সকালে উঠে যেন বুঝতে পারলুম, রাত্তে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে। ঝড় শেষ হ'লেও যেমন তার চিহ্নটা গাছপালার ওপর রেখে যায়, এও যেন ঠিক তেমনি ! কারুর মুখে হাসি নেই, সবাই যেন একটা সমূহ বিপদের আসন্নতায় মলিন।

বাইরে গিয়ে দেখি দু'দু'জন ডাক্তার আর আমাদের সুপরিচিত কাল-বদ্যি ব'সে আছেন। দাদামশাইএর নেয়ারের খাটটির ওপর বেদান্তবাগীশ মশাই যেন শেষ নিদ্রায় ঢলে প'ড়েছেন। শিব-চক্ষু !

আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হ'লো না, এমনি গম্ভীর মুখ তাদের। অবশেষে মাণিক, আমাদের পরম বন্ধু, ইয়ার এবং কর্ত্তাদের সাম্‌নে শাসন-কর্ত্তা, তাকেই ধরলুম !

কি হয়েছে মাণিক ?

মাণিক ব'ল্লে, চুপ—পরে সব ব'লবো। এখন [illegible]— সে এমন একটা ইঙ্গিত ক'র্‌লে যে সেকথা [illegible] নেই, কথায় বল্লে; বেদান্তবাগীশ মশাই আর [illegible] বাঁচবেন না।

অসুখ হ'য়ে দিনকতক ভুগে মানুষ ম'রে যায়, এটা সে বয়সে শিখেছিলাম; কিন্তু হঠাৎ একটা জলজ্যান্ত মানুষ, কোথাও কিছু নেই, অজ্ঞান হ'য়ে গেল, আর, তারপর জ্ঞান না হ'য়ে মারা গেল, একথা ভেবে যেন সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসে। স্বপ্নে পিছনে বাঘ আসচে তবুও যেন আর কিছুতেই দৌড়তে পারা যায় না আমার এ-যেন ঠিক তেমনি হ'তে লাগ্‌ল।

এ বাড়ীতে ও-ঘর তো আছেই, তাতে সেই গলায় দ'ড়েও আছে, এখন তাকে ক্ষেপিয়ে তোলা হ'লো, আর বাঁচার কি আশা ! নিজের জন্তে যত না ভয় হ'লো—তার চেয়ে হ'লো বাবার জন্তে, ছোটমামার জন্তে।

যেন রাগ হলো। কি দরকার ছিল বাহাদুরী করার !

আর সবচেয়ে বেশী রাগ হ'লো ঐ হতভাগা মাণিকটার ওপর। বেশ বুঝলুম যে, ও ঘুমিয়েছে; ওকে তো পাহারা দেবার জন্তেই দাদামশাই পাঠিয়েছিলেন।

সত্যি ! দাদামশাই কি আগেই সব জেনে ব'সে থাকেন !

কালো মেঘের ছায়া পড়ল যখন সবাই শুনলে যে

বেদান্তবাগীশ মশাই বলেছেন তিনি আর বাঁচবেন না।

খেতে বসে বড়রা গল্প করছিলেন। সেকথা শোনার চার-জোড়া কাণ থাক্‌লে যেন আমাদের ভাল হয়!

ছোটমামা বল্লেন, কি যেন একটা মিস্ট্রী আছে এর ভেতর...

বাবা বল্লেন, কিন্তু ওঁর বাঁচা শক্ত!

ছো। কেন?

বা। বাঁচবার ইচ্ছা-শক্তি যখন চ'লে যায়, তখন স্বয়ং শি ও কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারেন না, আর ওঁর যা বয়েস! ওর মধ্যে আমরা বার দুই আনা-গোনা করব এ পৃথিবীতে...

বড়মাসীমা কাছে বসেছিলেন! তিনি প্রায় ঝঙ্কার দি ব'লে উঠ্‌লেন, আঃ গিরি! ওকি সব অলুক্ষণে যে তুমি বল; ও-সব কথা বলতে নেই। দিন যায় মানুষের ক্ষ্যান্ যায় না।

বাবা হ সেন।

মাণিক এসে বলে গেল, ছোটবাবু আর জামাই বাবুকে কর্ত্তাবাবু খানিক পরে ডেকেছেন।

ঝড়ের আগে উড়ি। বাইরে গিয়ে এমন জায়গায় লুকিয়ে রইলুম যাতে একটা কথাও না ফস্‌কে যায়।

দাদামশাই বললেন, বেদান্তবাগীশ মশাইকে নিয়ে তোমাদের অবিলম্বেই কাশী যেতে হবে; তিনি আর এখেনে থাকতে ইচ্ছুক নন্—

ছোটমামা বল্লেন, কিন্তু এ অবস্থায়...

দাদামশাই বল্লেন, তাতো বুঝি, কিন্তু উনি তো আর একদিনও দেরি করতে চান্ না, বলেন, এ যাত্রায় ওঁর রক্ষে নেই।

দাদামশাই যেন আরো কিছু ব'লতে চাইছিলেন। কিন্তু না ব'লে হঠাৎ থেমে গিয়ে বল্লেন, এসব কথার যত কম আলোচনা হয় ততই ভাল; এর সত্য মিথ্যা নিরূপণের কোন উপায় নেই; মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, প্রবৃত্তিই মানুষকে চালায়।

তোমাদের বোধ হয় বেশীদিন থাকৃতে হবে না। নারদঘাটের ঠিক ওপরেই ওঁর একজন আত্মীয় থাকেন; সেখেনে পৌছে দিতে পারলেই তোমরা ফিরে আস্‌তে পারবে। কাল দিনটা ভাল আছে, অবশ্য পরশু তার চেয়ে ভাল দিন, তবে কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম্। মাণিকও তোমাদের সঙ্গে যাক্, কি বল?

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বেদান্তবাগীশ মশাই শান্ত, নিস্তব্ধ, নিঝুম অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। ছোট ছেলের যেতে মানা, তাই সব সময়েই সেখেনে আমাদের মনটা পড়ে আছে।

দাদামশাই যতই না কেন আলোচনা করতে মানা করুন মেয়েরা ছাড়বে? রান্নাঘরের হাতা-বেড়ি ঠন্-ঠনানির মত ও গল্প চলেইছে চলেইছে।

দিদিমা শুনতেন দাদামশাইএর কাছ থেকে, তারপর তাঁর উর্ব্বর মস্তিষ্কে কল্পনা যে সব ছবি এঁকে যেত সে-গুলো বোধ হয় তাঁর কাছে দিনের আলোতে সত্য হ'য়ে উঠ্‌তো।

দিদিমা বল্লেন, আর কেউ নয়; ওঁর ছেলেই ওঁকে ভর করেছে।

ছেলে? সবাই আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, ছেলে? বেদান্ত-বাগীশ মশাই-এর ছেলে ছিল?

দিদিমার সত্য থেকে ঐটুকু সংগ্রহের পুঁজি ছিল বোধ হয়। কিন্তু তিনি গল্পের অর্দ্ধেকে থামতেন না, তাই নিত্য নূতন, অফুরন্ত গল্পের উৎস ছি দিদিমাটি আমাদের।

৪

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘিরে আসচে চারিদিকে—বেদান্ত-বাগীশ মশাইএর পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে মাণিক ছুটে চল্‌ছে; বেহারাদের চাপা-শব্দ নিঃশব্দ পথে যেন প্রেতপুরীর শব্দসমুদ্রের সে এক ঝলক মাত্র!

দিদিমা বল্লেন, দুর্গা দুর্গা—

দাদামশাই মৌন, অটল।

ছোটমামারা আগেই ইষ্টিশানে চ'লে গিয়েছিলেন; কেননা, তিন-বামুনে "যাত্রা নাস্তি; ফলম্ মরণম্।"

কাশী থেকে যখন কোন চিঠি-পত্র এলো না, আর তাঁরাও ফিরলেন না, তখন যে কি জমাট ভার সকলের

মনের ওপর চেপে বসলো তা লেখা সহজ নয়, অনুমানই করা যেতে পারে।

দিনগুলো যেন গরুর-গাড়ীর চাকার গতিতে চলেছে —সে চলা কি না-চলা বোঝা যায় না।

মেয়েরা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন, "তার" কর ; কিন্তু তার করতে হ'লে তো একটা ঠিকানা চাই !

দিদিমা গিয়ে ধরেন দাদামশাইকে, না হয় তুমি চ'লে যাও।

দাদামশাই একটুও ব্যস্ততা না দেখিয়ে বলেন, কাল তারা নিশ্চয় আসবে গো, অত ব্যস্ত হ'লে কি আমাদের এই বয়সে চলে ?

দিদিমা বকতে বকতে চলে যান্‌, তোমাদের মত তো আর পাথর-বাঁধা মন নয় সকলেরই।

দাদামশাই কথা শুনে হাসেন, সে হাসির মানে সবাই যেন চোখে দেখ্‌তে পায়, তার ভাষা যেন কাণে এসে পৌছয় ; ফাটতে পাথরই যে আগে ফাটে !

একদিন সকালে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ীর সাম্‌নে। আমরা ছুটে গিয়ে দেখি ছোটমামা বাবা আর মাণিক।

কি শীর্ণ তাঁদের মুখ, কি মলিন তাঁদের চেহারা। দেখেই মনে হয় যমের সঙ্গে লড়াই করেছেন এঁরা ; যম বোধ হয় নিছক দয়া করেই ছেড়ে দিয়েছে।

[illegible]ন সাহস হয় না একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে। দুজনে দাদামশায়কে প্রণাম ক'রে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ালে তিনি কষ্টে চোখের জল সামলে বললেন,

কবে ৺কাশী প্রাপ্তি হলো ?

ছো। পরশু।

দা। উঃ, এতদিন ভুগ্‌লেন ?

বা। মনে করলে উনি তো বাঁচতে পারতেন, আমরা চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লুম, একেবারে ইচ্ছামৃত্যু।

দাদামশাইএর দু'চোখ উদাস হ'য়ে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। সমস্ত দেহটা যেন নিষ্পন্দ !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন,

নারদ ঘাটের বাড়ীতেই তো উঠেছিলে ?

ছো। হঁ, তাঁরা কেউ নেই, বৃন্দাবন গেছেন।

তাই, বলে দাদামশাই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লেন ; তাই তোমরা বিব্রত হয়ে প'ড়ে আর চিঠিপত্র দিতে পারনি ;...হঁ ..

বা। না, আমরা তো পৌছেই একটা চিঠিতে সব কথা লিখেছিলুম !

ভারিগলায় দাদামশাই বল্লেন, সে চিঠি আমরা পাইনি।

ইচ্ছা মৃত্যু ? হায় ! হায় ! বেদান্ত-বাগীশ মশাইও ...আমার অপরিণত মন গভীর শোকাচ্ছন্ন হ'লো এই দুঃসম্বাদে।

ইচ্ছা-মৃত্যু মানে আমি গলায় দড়ি মনে করেছিলুম, দিনরাতই ভাবি কেন মানুষে গলায় দড়ি দিয়ে মরে ? দুঃখে ? কৈ আমার তো কত দুঃখ হয় ; কিন্তু ও কথা মনে করলেই তো ভয়ে গা থর্‌ থর্‌ ক'রে [illegible]।

কেমন ক'রে সেই অসুস্থ বুড়ো মানুষটি [illegible] ক'রে অবসর পেলেন ঝুলে পড়তে ! আর [illegible] বসে দেখ্‌লেন ?

মাকে জিজ্ঞাসা করি, মা, মানুষে কেন গলায় দ[illegible] দেয় ? মা একেবারে খেকিয়ে উঠেন, দেখ[illegible] ছেলের কথা ! তোর কি যত সব...

ভয়ে পালিয়ে যাই। তা' বলে ভাবনা তো আমায় ছেড়ে পালাবে না !

ছোটমামার গল্প বলার ধৈর্য্য ছিল না। তাই সবাই একদিন ধরে পড়লো বাবাকে বলতেই হবে, কি কি হ'য়ে ছিল তোমাদের কাশীতে গিয়ে।

বাবা বলেন, আরো দিনকতক যাক্‌। উঃ, ভাব্‌লেও সে-সব কথা !

কিন্তু যারা শুনতে চায়, তাদের আর তর সয় না।

শেষকালে গল্প সুরু হ'লো একদিন। মেয়েরা তাড়াতাড়ি করে রাতের কাজ চুকিয়ে এলেন।

ঘরের আলো ঢিমে করে দিয়ে আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে ব'সলুম।

৫

বাবা বলতে লাগ্‌লেন।

রেলগাড়িতে চড়েই যেন বেদান্তবাগীশ মশাই একেবারে সুস্থ হয়ে গেলেন।

বল্লেন, আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি, তোমাদের বোধ হয় কেবল কষ্টই দেওয়া হলো।

আমরা বল্লুম, এতে কষ্ট তো আর কিছু নেই, মধ্যে থেকে কাশীটা বেশ দেখা হয়ে যাবে।

তিনি যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে বল্লেন, তা' ঠিক, দেখার মত জায়গা বটে!

আমরা বল্লুম, আচ্ছা, আপনি সত্যিই কি কাশীকে একটা মহা পবিত্র পুণ্য স্থান বলে মনে করেন?

বে। তা' করি বই কি! খাসা জায়গা!

.. 'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে কাশীতে মরলে মানুষ শিব হয়?

বে। শিব? মরলে শব হয় তাতো তোমরা মান? শবে আর শিবের প্রভেদ তো বিশেষ কিছুই নেই। মৃত্যু, এ সংসারের পরম কল্যাণের বিধান।

তবে মরতে মানুষের এত ভয় কেন?

বে। তার কারণ এই যে, মানুষ জড়-দেহ নিয়ে জীবনটা আরম্ভ করে; দুঃখ সুখ সবই ওই জড়ের চতুর্দ্দিকে ঘিরে এমন বদ্ধমূল হ'য়ে যায় যে, শেষ পর্য্যন্ত দেহ ছাড়া যে আর কিছু আছে তা' মানুষের পক্ষে মনে ক'রে নেওয়াই একান্ত কঠিন দাঁড়ায়। মৃত্যু-ভয়টা মানুষের জন্মের সঙ্গেই আসে, সেটা গোড়ায় ভয় থাকে না, মগ্ন-চেতনার মধ্যে বীজের মত ঐ জ্ঞানটি নিহিত থাকে মানুষের মধ্যে। ভয় ওর একটা বিকৃত সংস্করণ। অন্য লোককে দেখে মানুষ ভয় করতে শেখে।

আমরা তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলুম যে, কাশীতে মরলে শিব হব, এমন লোভ নিয়ে তিনি কাশী যাচ্ছিলেন না। কি একটা গভীর রহস্যের সঙ্গে তাঁর জীবনটা যেন নিবিড়ভাবে গাঁথা, জড়ানো ছিল!

নারদঘাটে যাঁদের বাড়ী তাঁরা অবস্থাপন্ন লোক, বোধ হয় জমিদার।

আমরা গিয়ে দেখি সব বন্ধ-ছন্দ। শুধু একটা ঘরে একজন সেপাই, বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে আছে।

রক্ষে, বুড়ো মনরূপ সিং বেদান্তবাগীশ মশাইকে চিন্‌তো। এক গাল-পাট্টা থেকে অন্য গালপাট্টা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হাসি হেসে, যখন মনরূপ বল্লে, মালিকমনি তো বৃন্দাবন গৈলি, তখন আমরা চারিদিকে অন্ধকার দেখলুম।

বাইরের একটা ঘর পাওয়া গেল, সে কেবল মাথা গুঁজে থাকার মত। মাণিক জুটলো গিয়ে মনরূপের সঙ্গেই।

কাশীর গুণ যে, সব অবস্থায় মানুষই সেখেনে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। রাজা-মহারাজ থেকে দীন-দরিদ্র পর্য্যন্ত সবাই সেখানে যেন কিসের নেশায় ভোলানাথের মত ভুলে থাকে! দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, দৈন্য আছে; কিন্তু ঐ পাথরের পুরীতে তারা শিকড় ফেলতে পারে না, পুকুরের পানার মত ভেসে থাকে, লোকপ্রবাহে, কাল-প্রবাহে, স্রোতের মুখে আবর্জ্জনার মত ভেসে চ'লেছে নিরন্তর।

এই হিসাবে ভারি চমৎকার কাশী।

বেদান্তবাগীশ মশাই বলতেন, যাও একটু ঘুরে এসো গে। আজ কেদারে যাও, ভারি সুন্দর গম্ভীর রূপ নিয়ে কেদার ওখেনে বিরাজ করছেন।

মনে হতো কেদার যেন ওঁর পরম বন্ধু, যেন পাথরের মূর্ত্তি নয়, যেন একান্ত আপনারই জন।

কেদারে বিধবারা খুবই যান্। বিধবাদের মনে শিব বোধ হয় গম্ভীর রূপে বাস করেন।

মোট কথা গোড়ার দিনগুলো আমাদের ভারি সুখে কেটে যাচ্ছিল।

এক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল কাদের যেন চাপা কথা কানে আসাতে।

নিঃশব্দে বিছানায় উঠে বসে শুনতে লাগলুম। শব্দ পাই, কিন্তু কথা একটাও বুঝতে পারিনে।

দেশলাই জেলে ক্ষণিকের আলোতে যা দেখলুম তাতে অন্তর-আত্মা একেবারে চমকে গেল!

দেখি, সেই নেড়া-মাথা, গৌরবর্ণ তরুণ বয়সের ছেলেটি বেদান্তবাগীশ মশাইএর শিয়রে বসে!

নিমিষে সে মিলিয়ে গেল।

সকালে উঠে বেদান্তবাগীশ মশাইকে আমরা ভীষণ পীড়াপীড়ি ক'রে ধরলুম, বলতেই হবে ব্যাপার কি।

শান্ত মৃদু হেসে বল্লেন, আচ্ছা, শোন তবে।

৬

বেদান্তবাগীশ মশাই বল্‌তে লাগ্‌লেন,

সাধারণ মানুষের মতই আমার জীবন আরম্ভ হয়। কৈশোরে আমার স্মৃতিশক্তি কিছু বেশী ছিল, তাই আমার শিক্ষাগুরুর আমি একান্ত প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠি। হয়তো সেকালে দেহসৌষ্ঠবও আমার ছিল কিছু। তাই গুরুগৃহে বিদ্যার সঙ্গে তাঁর কন্যাটিকেও লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটে!

আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় ভালবাসা জন্মায়। ভালবাসার, মণির মতই জ্বালাহীন দীপ্তি, মনকে স্নিগ্ধ করে, পূর্ণ করে; হৃদয়ের মধ্যে অমিত শক্তির সঞ্চার করে। তাই দয়িতাকে পাবার জন্যে আমি তিলমাত্র চঞ্চল হই নি।

যে অটুট ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে পারে, ঈপ্সিত তার লাভ হয়ই।

কিন্তু সুখসম্পদ, সৌভাগ্য মানুষের চিরদিন থাকে না। একটি পুত্র দান ক'রে, স্ত্রী আমার পরলোকের যাত্রী হইলেন। বোধ করি ভালবাসায় আমাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্যই এই নিষ্ঠুর বিধান তাঁর!

ছেলেটিকে জননীর স্নেহ দিয়ে আমি মানুষ ক'রে তুল্‌লাম।

সে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হ'য়ে আমাদের বংশের প্রদীপের মতই চতুর্দ্দিক আলো ক'রে উঠেছিল সেদিন!

(এই পর্য্যন্ত বলে বেদান্তবাগীশ মশাই যেন একটু ইতস্তত কর্‌তে লাগলেন।)

কিন্তু একটা ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পার্থক্য হয়ে গেল। যৌবনে আমিও ভালবেসেছিলুম, সৌভাগ্যবশেই হয়তো সফল মনোরথ হ'য়েছিলুম। কিন্তু গোবিন্দসুন্দর আমার সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করে এক অসবর্ণা কন্যার প্রেমে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আমাদের দোষ যে, আমরা মানুষের বিচার করি বিচারকের নিরপেক্ষতা দিয়ে নয়, আমাদের প্রবৃত্তি সংস্কার এবং সর্ব্বোপরি দণ্ডদাতার নিষ্ঠুর মন দিয়ে। এ কথা মনে থাকে না যে, জীবনের মধ্যেই কল্যাণ; বিধিবিধানে তারি উদ্বোধন, আবাহন।

তাই প্রিয়তম পুত্রের সঙ্গেও আমাদের বিচ্ছেদ হ'য়ে যায় চিরদিনের জন্য; হয়ত জন্মজন্মান্তরের জন্য···যদি তা থাকে!

গোবিন্দসুন্দরকে ডেকে বললুম, বাবা, পৃথিবীর মধ্যে তুই আমার সর্ব্বাধিক প্রিয়; তাই তোর কলঙ্কে আমার অপরিসীম ব্যথা, মর্ম্মান্তিক আঘাত।

পুত্র অটল। সে আমারি কাছে শিখেছিল, মানুষ আগে, জাতি পরে; মানুষের সঙ্গে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ প্রেমের; রক্তের সম্বন্ধ তার চেয়ে নিকৃষ্ট।

এই সত্যের উপর দাঁড়িয়ে সে বললে, আমি ঘর চাইনে, দোর চাইনে, পিতৃ-বংশের মর্য্যাদা চাইনে, আমি চাই কল্যাণীকে।

বল্লুম, কিন্তু কল্যাণী যে শূদ্রাণী।

গোবিন্দ নির্ব্বাক হয়ে মাথা অবনত করে দাঁড়িয়ে রইল, আর দুই চোখ দিয়ে তার তরল আগুন টপ্‌ টপ্‌ করে মাটিতে পড়তে লাগল।

বুঝলুম, বৃথা তাকে বাধা দেওয়া। বৃথা আশা পুত্রের সৌভাগ্যে সুখী হওয়ার।

গভীর রাত্রে সেই আমি ভিটে থেকে বা'র হয়েছি, আর ফিরিনি।

জানিনে, কোন দিন জানার ইচ্ছা পর্য্যন্ত হলো না যে, কি হলো আমার ছেলের, কি হলো আমার ভিটে-মাটির।

পথিক, শুধু চলেছি, জানিনে কোথায় সে পথের শেষ, কবে সে শেষ আস্‌বে!

পদ্ম-পাতার উপর জলের বিন্দুটির মতই এ জীবন টল্‌ টল্‌ করে! কিসের জন্য এ চাঞ্চল্য, কে বলবে!

মানুষ জানার ভাণ করে, এখনো মানুষের সবই বাকি আছে জান্‌তে!

তখন আমি কাশীতে, এই বাড়ীতেই সংবাদ পেলুম গোবিন্দ আত্মহত্যা করেছে।

বুকটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। কোথায় একদিনের জন্য বিশ্রাম করতে মন চায়নি, কেবলি চলেছি, ছুটেছি—ঠিক যেন পালিয়ে চলেছি···হিমাচলে গেলে মনে হয় শান্তি ঐ মহাসমুদ্রে—আবার সমুদ্রে যেন দেখি

বাড়বাগ্নি! এমনি ক'রে শত বৎসর অশান্ত হয়ে, পাগল হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে, শেষকালে ··থাক্ সে অবান্তর কথা!

তোমাদের বর্ণনা শুনে সন্দেহ হ'লো। মনে হ'লো হয়ত বা গোবিন্দ। তাই কর্ত্তার অনিচ্ছায় গিয়ে শুলুম ওই ঘরে।

দেখি, সত্যই আমার গোবিন্দসুন্দর এসেছেন। বুক জুড়িয়ে গেল; এত অভিভূত হ'য়ে পড়লুম যে জ্ঞান-চৈতন্য সব রোধ হ'য়ে গেল।

গোবিন্দ আর আমাকে ছেড়ে থাকৃতে পারছে না; আমিও যে আর পারিনে। যত শীঘ্র যেতে পারি।

বেদান্তবাগীশ মশাইএর ঢুই চোখ বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগলো।

বেদান্তবাগীশ মশাই প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বললেন, তোমরা দেখেছ, গোবিন্দসুন্দরের মাথাটি নেড়া।

নিজের কল্পিত দুষ্কৃতির মনস্তাপে সে প্রায়শ্চিত্ত করেছিল; কিন্তু তাতেও যখন তার মনের আগুন নিভ্‌ল না, তখন সে উদ্বন্ধনে দেহ ত্যাগ করলে। লক্ষ্য করনি হয়তো গলায় তার এখনো রজ্জু ঝুলচে, ওটা যজ্ঞোপবীত বলে ভুল হয়, কিন্তু তা নয়।

আর একটি কথা বললেই, আমার শেষ কথা বলা হয়।

তোমরা আমার সৎকারের জন্য শব বহন, কি শবের অনুগমন করো না।

পাছে গৃহস্থের অকল্যাণ হয় ব'লে আমি কর্ত্তাকে অনুনয় ক'রে কাশীতে এসেছি। পাছে তোমাদের কোন অকল্যাণ হয় বলে আমার এই শেষ অনুরোধ।

এ বাড়ী যে খালি তা' আমি জানতুম। এঁদের ফিরতে আরো অনেক দেরি।

৭

বাবা বললেন,

এই কথাগুলি ব'লে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়িলেন। তারপর আর তাঁর জ্ঞান হয়নি। তিনদিন অচৈতন্য অবস্থায় থেকে, ধীরে ধীরে তাঁর দেহ থেকে প্রাণবায়ু ব'ার হ'য়ে গেল যখন, তখন সবে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছেন।

আমরা লোকজন ডাকিয়ে তাঁকে মণিকর্ণিকার ঘাটে পাঠিয়ে দিলুম। একবার মনে হ'লে দেখে আসি; কিন্তু না গিয়ে ভারি বুদ্ধির কাজই করা হয়েছিল।

চারিদিক থেকে প্রশ্ন হ'লো, কেন? কেন? কেন?

উত্তরে বাবা বললেন, গোবিন্দসুন্দর শব বহন করেছিল। বেদান্তবাগীশ মশাইএর মুখাগ্নিও সেই করেছিল।

আমরা সঙ্গে থাকৃলে তার হয়তো শেষ কর্ত্তব্য কেবল বাধাই দেওয়া হ'তো আর তার ফলও হয়তো ভাল হ'তো না।

রাত তখন প্রায় বারোটা; মড়ুই পোড়া বামুনরা ফিরে এলো। আমরা তাদের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলুম।

তারা খেয়ে-দেয়ে পরিতৃপ্ত হ'লে, চারজনের আট টাকা দক্ষিণা দেওয়াতে বললে, দেখচেন না, আমরা তিনজন।

কেন? তোমরা তো চার জনই ছিলে?

না বাবু, এই গলিটা পেরুতেই একজন ছোকরা বল্লে আমার বাবার শব আমাকে বইতে দাও। ওদের সঙ্গে ঝগড়া, তাই যাইনি ওখেনে।

সে সঙ্গে গেল, মুখে আগুন দিলে। সব কাজ শেষ হ'লে সে কোথায় চলে গেল।

আমরা বললুম, টাকাটা নিয়ে যাও দেখা হ'লে দিয়ে দিও তাকে।

তা কি হয় বাবু? কেউ বাপের সৎকার ক'রে টাকা নেয়?

আমরা বল্লুম, না, না, যে লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে ও এসেছিল—তার তো আশা ছিল। সে হয়তো ক্ষুণ্ণ হ'য়ে চ'লে গেছে।

আচ্ছা দিন্, দিয়ে দেব তাকে। কিন্তু এ তার উচিত প্রাপ্য নয়।

ব'লে তারা চ'লে গেল।

কোন রকমে পরের দুপুর পর্য্যন্ত কাটিয়ে আমরা গাড়ী পেতেই ছুট্ ··বাবা! আর কি থাকা যায় সেখানে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাবা বললেন, কিন্তু নামটি চমৎকার—

গোবিন্দসুন্দর!

রামমোহন রায় ও রাজারাম

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

১৮৩০, ১৫ই* নভেম্বর তারিখে রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের নিকট বিদায় লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল—পালিতপুত্র বালক রাজারাম, পাচক রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, এবং ভৃত্য রামহরি দাস, —রামমোহনের সকল জীবন-চরিতেই এ কথা আছে।

রাজারামের জন্মকথা কিছু রহস্যাবৃত। নানা জনের নানা অভিমত। কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা বলা কঠিন। সরকারী কাগজপত্র হইতে তাহার জীবন-কথা কতটুকু সংগ্রহ করিতে পারা যায়, দেখা যাক।

৬ সালে রাম-মোহন-সংক্রান্ত একখানি পুস্তক লিখিবার জন্য আমাকে ভারত-সরকারের দপ্তরখানা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। দপ্তরখানার কাগজপত্রের মধ্যে রামমোহন রায়ের ও তাঁহার সঙ্গীদের জাহাজে যাত্রী হইবার দুইখানি অনুমতি-পত্র ছিল। রামমোহনের অনুমতি-পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ :—

"রামমোহন রায় নামক জনৈক দেশীয় ভদ্রলোক 'অ্যালবিয়ন' জাহাজে ইংলণ্ড যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আবেদন করায় তাঁহাকে জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্র এই মাসের [অক্টোবর ১৮৩০] ৭ই তারিখে মঞ্জুর করা হইয়াছে।"*

রাজা রামমোহন রায়

রামমোহনের সঙ্গীদের অনুমতি-পত্রের তারিখ ১৫ই নভেম্বর ১৮৩০, অর্থাৎ জাহাজ ছাড়িবার দিন। পত্রখানি এই-রূপ :—

"১৫ই নভেম্বর তারিখে রামরতন মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ দাস ও শেখ বক্‌সুকে জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্র দেওয়া হইল। ইহারা রাম-মোহন রায়ের সঙ্গীরূপে 'অ্যালবিয়ন' পোতে ইংলণ্ড যাত্রা করিতে-ছেন।"†

শেখের অনুমতি-পত্রখানি হইতে আমরা রামমোহনের ইংলণ্ড-যাত্রার সঙ্গী—রামরতন মুখোপাধ্যায়, **হরিচরণ দাস** ও **শেখ বক্‌সুর** নাম পাইতেছি। কিন্তু রামমোহনের সমস্ত জীবন-চরিতেই তাঁহার সঙ্গীদের নাম দেওয়া আছে—রাম-রত্ন মুখোপাধ্যায়, **রামহরি দাস** ও **রাজারাম**।

---

* *India Gazette* : 15 Nov. 1830 : Shipping Intelligence : Departure of Passengers : Per Ship *Albion* :—Baboo Rammohun Roy and servants. 15th November 1830 : Station of Vessels in the River. Diamond Harbour : *Albion* passed down.

* *Public Body Sheet*, 12th October 1830, No. 95.

† "Orders for reception granted to Ramrutton Mookerjee, Hurichurn Doss and Sheik Buxoo—15th November proceeding to England in attendance on Rammohun Roy on the *Albion*."—*Public Body Sheet*, 16 November, 1830.

এমন কি বিলাতে রামমোহনের সমাধিকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি তালিকার প্রতিলিপিতেও শেষোক্ত তিনটি নামই পাওয়া যায়।* তাহা হইলে রামহরি দাস ও রাজারাম নামের পরিবর্ত্তে

রামরত্ন মুখোপাধ্যায়

আমরা সরকারী অনুমতি-পত্রে পাইতেছি হরিচরণ দাস ও শেখ বকস্থর নাম। এই গরমিলের কারণ কি?

বিনা অনুমতি-পত্রে জাহাজে বিদেশ যাইবার উপায় নাই। সরকারী অনুমতি-পত্রে উপর্য্যুপরি দুই-দুইটি নামের ভুল থাকা সম্ভব নয়। তবে রামমোহন কি হরিচরণ দাস ও শেখ বকস্থর নামে অনুমতি-পত্র লইয়া রামহরি দাস ও রাজারামকে বিলাত লইয়া গিয়াছিলেন? এরূপ মিথ্যার আশ্রয় লইবার কারণ অথবা সম্ভাবনাই বা কি? বিলাত যাইবার সময়, দিল্লীশ্বরের ব্যাপার লইয়া রামমোহনের সহিত বাংলা-সরকারের পত্রের যে আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহা পাঠে ধারণা হয়, সরকারের নিকট হইতে বিলাত যাইবার অনুমতি-পত্র মিলিবে কি না, এ বিষয়ে রামমোহনের মনে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল।† এ অবস্থায় তিনি সরকারের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য অপরের নামে অনুমতি-পত্র লইয়া নিজে বিলাত যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া নিজের সঙ্গী-তিনজনের মধ্যে দুইজনকে মিথ্যা নামে অভিহিত করিয়া, বিলাত লইয়া যাইবেন কেন? ধরা পড়িলে সাজা যাহাই হউক, তাঁহার বহুদিনপুষ্ট বিলাত-যাত্রার অভিলাষ যে ব্যর্থ হইত, তাহা ঠিক। এরূপ প্রতারণা ও নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিবার পাত্র রামমোহন ছিলেন না।

তবে হরিচরণ দাস ও শেখ বকস্থই কি রামহরি দাস ও রাজারামের নামান্তর? কিন্তু তাঁহাদের নামের এরূপ পরিবর্ত্তন হইল কেমন করিয়া?

যদি কেহ বলেন,—শেখ বকস্থ ও রাজারাম একই লোক নয়; এদেশ হইতে জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে কোন কারণে শেখ বকস্থর যাওয়া হয় নাই, তাহার জায়গায় রামমোহন রাজারামকে লইয়া গিয়াছিলেন,—তাহা হইলে এরূপ যুক্তি বা অনুমান মানিয়া লইবার পক্ষে বাধা আছে। যেদিন জাহাজ ছাড়ে ঠিক সেইদিনই রামমোহনের সঙ্গীদের—রামরতন, হরিচরণ ও শেখ বকস্থকে জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্র দেওয়া হয়; পুনরায় সেইদিনই আবার শেখ বকস্থর নাম বাতিল করিয়া রাজারামের যাত্রী হইবার কথা মানিয়া লওয়া কতটা সঙ্গত হইবে জানি না। এমন কি মানিয়া লইলেও আর-একটি গোল উঠিতেছে। বিলাত-যাত্রার জন্য শেখ বকস্থর নামে অনুমতি-পত্র লওয়া হইয়াছিল; তাহা বদলে রাজারাম গিয়া থাকিলে, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সরকারী দপ্তরখানায় তাহারও কোন-না-কোন প্রমাণ থাকিত। কিন্তু সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বালক রাজারাম যে অপর কাহারও সহিত রামমোহনের পূর্ব্বে বিলাত গিয়া থাকিবে—একথাও মানা চলে না; রামমোহনের কোন জীবন-চরিতে বা সরকারী কাগজপত্রে তাহার উল্লেখ নাই।

---

* Mary Carpenter's *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*, (2nd ed.), p. 131.

† লেখকের রচিত *Rammohun Roy's Mission to England*, (1926), pp. 20-21.

সুখের বিষয়, আমাদের সন্দেহ নিরাকরণের কিছু সূত্র আছে। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত, রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র শ্রীযুক্ত নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প" পুস্তিকায় আছে :—

"রাজা রামমোহনের সহিত যাঁহারা ইংলণ্ড গমন করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আপন নামের যোগে নাম রাখেন।"

সরকারী অনুমতি-পত্রের "হরিচরণ দাস ও শেখ বক্স্‌র"—"রামহরি দাস ও রাজারাম" নামে পরিণত হইবার ইহা একটি সঙ্গত কারণ হইতে পারে। রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে 'রাম' থাকায় কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। নিজ নাম 'রাম'-এর উপর রামমোহনের—হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারে—বিলক্ষণ মোহ ছিল। অনেক সময় বাদ-প্রতিবাদেও (যেমন ডাঃ টাইট্‌লারের সহিত) তিনি 'রামদাস' নাম ব্যবহার করিতেন। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর বহুস্থলে তিনি 'রাম' নাম ব্যবহার করিয়া উদাহরণ দিয়াছেন।* রামমোহনের সহিত তিনজন 'রাম'-নামযুক্ত লোকের যাওয়ার সম্ভাবনাও কম। সুতরাং নিজ নামের যোগে তিনি যে তাঁহার সহযাত্রীদের নামকরণ করেন, ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অতএব, শেখ বক্স্‌ ও রাজারাম একই লোক; রাজারাম শেখ বক্স্‌র নামান্তর মাত্র। এমনও হইতে পারে যে, বিলা[ত] যাইবার পূর্ব্বে শেখ বক্স্‌র ডাক-নাম ছিল রাজারাম বাংলা-সরকারের নিকট হইতে তাহার প্রকৃত নামে অনুমতি-পত্র চাওয়া হইয়াছিল।

১৮৩১, ৮ই এপ্রিল সহযাত্রীদের সহিত রামমোহ[ন] লিভারপুলে পৌঁছেন। তখন বাষ্পীয়-পোত সৃষ্ট হয় নাই জাহাজ পালের জোরে চলিত—কাজেই এখনকার ম[ত] ১৫-২০ দিনে বিলাত-পৌঁছান সম্ভব ছিল না। বিলা[তে] অবস্থান কালে রামমোহন ইউরোপীয় উপায়ে রাজারামকে যথারীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন একথা মেরী কার্পেণ্টারের পুস্তকে আছে। [তি]নি রাজারামকে পুত্রবৎ দেখিতেন। অনেক গ্রন্থে তাহ[াকে] রামমোহনের পালিতপুত্র বলা হইয়াছে।

ষ্টেপলটন্ গ্রোভ

রামমোহন আর স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পা[রেন] নাই। ১৮৩৩, ২৭এ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলের নিকট 'ষ্টেপ[লটন্] গ্রোভে' তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রভুর মৃত্যুর অল্পদিন প[রে] রামরত্ন ও রামহরি দেশে ফিরিয়াছিলেন।† রাজ[ারাম] তাঁহাদের সঙ্গে ফেরেন নাই। তিনি লণ্ডনে আ...

* ১ম প্রকরণ।..."ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন।" ২য় অধ্যায়, ১ প্রকরণ।..."রামচরণ, রামভদ্র, ইত্যাদি।"—পৃঃ ৭১৩, ৭১৯।

† রামহরি দাস সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছে[ন] "রাজার এই বাগান, তাঁহার মালী রামদাস প্রস্তুত করিয়া[ছিল]। রামদাস রাজাকে বড় ভালবাসিত। রামদাস রাজার সহিত [বিলাত] গিয়াছিল। এই রামদাস আমার অধীনেও কিছুদিন।

এমন কি বিলাতে রামমোহনের সমাধিকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি তালিকার প্রতিলিপিতেও শেষোক্ত তিনটি নামই পাওয়া যায়।* তাহা হইলে রামহরি দাস ও রাজারাম নামের পরিবর্ত্তে

রামরত্ন মুখোপাধ্যায়

আমরা সরকারী অনুমতি-পত্রে পাইতেছি হরিচরণ দাস ও শেখ বক্সুর নাম। এই গরমিলের কারণ কি?

বিনা অনুমতি-পত্রে জাহাজে বিদেশ যাইবার উপায় নাই। সরকারী অনুমতি-পত্রে উপর্য্যুপরি দুই-দুইটি নামের ভুল থাকা সম্ভব নয়। তবে রামমোহন কি হরিচরণ দাস ও শেখ বক্সুর নামে অনুমতি-পত্র লইয়া রামহরি দাস ও রাজারামকে বিলাত লইয়া গিয়াছিলেন? এরূপ মিথ্যার আশ্রয় লইবার কারণ অথবা সম্ভাবনাই বা কি? বিলাত যাইবার সময়, দিল্লীশ্বরের ব্যাপার লইয়া রামমোহনের সহিত বাংলা-সরকারের পত্রের যে আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহা পাঠে ধারণা হয়, সরকারের নিকট হইতে বিলাত যাইবার অনুমতি-পত্র মিলিবে কি না, এ বিষয়ে রামমোহনের মনে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল।† এ অবস্থায় তিনি সরকারের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য অপরের নামে অনুমতি-পত্র লইয়া নিজে বিলাত যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া নিজের সঙ্গী-তিনজনের মধ্যে দুইজনকে মিথ্যা নামে অভিহিত করিয়া, বিলাত লইয়া যাইবেন কেন? ধরা পড়িলে সাজা যাহাই হউক, তাঁহার বহুদিনপুষ্ট বিলাত-যাত্রার অভিলাষ যে ব্যর্থ হইত, তাহা ঠিক। এরূপ প্রতারণা ও নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিবার পাত্র রামমোহন ছিলেন না।

তবে হরিচরণ দাস ও শেখ বক্সুই কি রামহরি দাস ও রাজারামের নামান্তর? কিন্তু তাঁহাদের নামের এরূপ পরিবর্ত্তন হইল কেমন করিয়া?

যদি কেহ বলেন,—শেখ বক্সু ও রাজারাম একই লোক নয়; এদেশ হইতে জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে কোন কারণে শেখ বক্সুর যাওয়া হয় নাই, তাহার জায়গায় রামমোহন রাজারামকে লইয়া গিয়াছিলেন,—তাহা হইলে এরূপ যুক্তি বা অনুমান মানিয়া লইবার পক্ষে বাধা আছে। যেদিন জাহাজ ছাড়ে ঠিক সেইদিনই রামমোহনের সঙ্গীদের—রামরতন, হরিচরণ ও শেখ বক্সুকে জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্র দেওয়া হয়; পুনরায় সেইদিনই আবার শেখ বক্সুর নাম বাতিল করিয়া রাজারামের যাত্রী হইবার কথা মানিয়া লওয়া কতটা সঙ্গত হইবে জানি না। এমন কি মানিয়া লইলেও আর-একটি গোল উঠিতেছে। বিলাত-যাত্রার জন্য শেখ বক্সুর নামে অনুমতি-পত্র লওয়া হইয়াছিল; তাহার বদলে রাজারাম গিয়া থাকিলে, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায়, সরকারী দপ্তরখানায় তাহারও কোন-না-কোন প্রমাণ থাকিত। কিন্তু সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বালক রাজারাম যে অপর কাহারও সহিত রামমোহনের পূর্ব্বে বিলাত গিয়া থাকিবে—একথাও মানা চলে না। রামমোহনের কোন জীবন-চরিতে বা সরকারী কাগজপত্রে তাহার উল্লেখ নাই।

* Mary Carpenter's *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*, (2nd ed.), p. 131.

† লেখকের রচিত *Rammohun Roy's Mission to England*, (1926), pp. 20-21.

সুখের বিষয়, আমাদের সন্দেহ নিরাকরণের কিছু সূত্র আছে। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত, রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র শ্রীযুক্ত নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প" পুস্তিকায় আছে :—

"রাজা রামমোহনের সহিত যাঁহারা ইংলণ্ড গমন করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আপন নামের যোগে নাম রাখেন।"

সরকারী অনুমতি-পত্রের "হরিচরণ দাস ও শেখ বক্স্মু"—"রামহরি দাস ও রাজারাম" নামে পরিণত হইবার ইহা একটি সঙ্গত কারণ হইতে পারে। রামরত্ন বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অতএব, শেখ বক্স্মু ও রাজারাম একই লোক; রাজারাম শেখ বক্স্মুর নামান্তর মাত্র। এমনও হইতে পারে যে, বিলাত যাইবার পূর্ব্বে শেখ বক্স্মুর ডাক-নাম ছিল রাজারাম; বাংলা-সরকারের নিকট হইতে তাহার প্রকৃত নামেই অনুমতি-পত্র চাওয়া হইয়াছিল।

১৮৩১, ৮ই এপ্রিল সহযাত্রীদের সহিত রামমোহন লিভারপুলে পৌছেন। তখন বাষ্পীয়-পোত সৃষ্টি হয় নাই। জাহাজ পালের জোরে চলিত—কাজেই এখনকার মত ১৫-২০ দিনে বিলাত-পৌছান সম্ভব ছিল না। বিলাতে

ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভ

মুখোপাধ্যায়ের নামে 'রাম' থাকায় কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। নিজ নাম 'রাম'-এর উপর রামমোহনের—হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারে—বিলক্ষণ মোহ ছিল। অনেক সময় বাদ-প্রতিবাদেও (যেমন ডাঃ টাইটলারের সহিত) তিনি 'রামদাস' নাম ব্যবহার করিতেন। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর বহুস্থলে তিনি 'রাম' নাম ব্যবহার করিয়া উদাহরণ দিয়াছেন।* রামমোহনের সহিত তিনজন 'রাম'-নামযুক্ত লোকের যাওয়ার সম্ভাবনাও কম। সুতরাং নিজ নামের যোগে তিনি যে তাঁহার সহযাত্রীদের নামকরণ করেন, ইহা সত্য অবস্থানকালে রামমোহন ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে রাজারামকে যথারীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন,—একথা মেরী কার্পেণ্টারের পুস্তকে আছে। তিনি রাজারামকে পুত্রবৎ দেখিতেন। অনেক গ্রন্থে তাহাকে রামমোহনের পালিতপুত্র বলা হইয়াছে।

রামমোহন আর স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। ১৮৩৩, ২৭এ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলের নিকট 'ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভে' তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রভুর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই রামরত্ন ও রামহরি দেশে ফিরিয়াছিলেন।† রাজারাম তাঁহাদের সঙ্গে ফেরেন নাই। তিনি লণ্ডনে আসিয়া

* ১ম প্রকরণ।..."ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন।" ২য় অধ্যায়, ১ প্রকরণ।..."রামচরণ, রামভদ্র, ইত্যাদি।"—পৃঃ ৭১৩, ৭১৯।

† রামহরি দাস সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"রাজার এই বাগান, তাঁহার মালী রামদাস প্রস্তুত করিয়াছিল। রামদাস রাজাকে বড় ভালবাসিত। রামদাস রাজার সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছিল। এই রামদাস আমার অধীনেও কিছুদিন চাকুরি

বেডফোর্ড স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতাদের আশ্রয় লইলেন। রামমোহনের‌ও প্রবাস-জীবনের অনেক দিন এই হেয়ার-পরিবারের প্রাসাদতুল্য ভবনে কাটিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে, খুব সম্ভব সদাশয় হেয়ার-পরিবারের চেষ্টা-যত্নে, রাজারাম বোর্ড-অফ-কণ্ট্রোলের আপিসে একটা চাকরি পান। বোর্ডের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে তৃতীয় বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত বেতন দিবার ব্যবস্থা হইল; ইহা ছাড়া যেরূপ পরিশ্রম-সহকারে তিনি কাজ করিয়াছেন এবং যে অবস্থায় বিলাতে আসেন,—তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এক শত পাউণ্ড দান করা হইল। * ১৮৩৮ এপ্রিলের শেষভাগে রাজারাম বিলাত ত্যাগ করিয়া আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি

Rajah Ram Roy. 48 Bedford Square London

Ramrotun Mukerjah শ্রীরামরত্ন মুখুয্যে

Ramhurry Dass

শ্রীরামহরিদাস

সভাপতি—স্যর জন্ হবহাউসের ১৮৩৫, ৪ আগষ্ট তারিখের মিনিটে প্রকাশ,—"বোর্ডের সভাপতি পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রের হইয়া একখানি আবেদন-পত্র পাইয়াছেন।" স্বদেশে ফিরিবার পূর্ব্বে বিলাতে সরকারী কার্য্য পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধে রাজারামকে জ্ঞানলাভের সুযোগ দিবার জন্য আবেদন-পত্রে অনুরোধ ছিল। ১৮৩৫ আগষ্ট মাসে, বাৎসরিক এক শত পাউণ্ড বেতনে, প্রথমে এক বৎসরের জন্য অতিরিক্ত কেরানী হিসাবে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু বাংলা দেশের জন্য কোন 'রাইটার'-এর (Writer অর্থাৎ সিভিলিয়ানের) পদ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। বোর্ডের আপিসে প্রায় তিন বৎসর কাজ করিবার পর রাজারাম ভারতবর্ষে ফিরিবার স্বদেশে আসিয়া পৌছেন। † রাজারাম সম্বন্ধে ইহার অধিক সংবাদ এখনও জানা যায় নাই। শোনা যায়, এদেশে ফিরিয়া তিনি না-কি কাষ্টম্‌স্ কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত, রামমোহন সম্বন্ধীয় পুস্তকের পরিশিষ্টে মেরী কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন,—"রাজারাম ইতিপূর্ব্বেই মারা গিয়াছেন।"

২

এইবার রাজারাম সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলি আলোচনা করা যাক।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ কার্পেণ্টার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ

করিয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রামদাস বর্দ্ধমানের মহারাজার গোলাপবাগের প্রধান মালী (Head Gardener) ছিল। বোলপুরের শান্তিনিকেতনের আমার বাগান রামদাস প্রস্তুত করিয়াছিল।" (*The Queen*, 28 Sep. 1896 হইতে অনূদিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৭৩৪।

* রাজারামের বিলাত-প্রবাসের ইতিহাস আমি গত অক্টোবর মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে প্রকাশিত করিয়াছি।

† *India Gazette*, dated 13 August 1838—Supplement. Shipping Intelligence. Arrivals at Kedgeree. 11 August.—English ship *Java*. [Captain R. Jobling, from London, 27 April. Arrivals of Passengers—Per *Java*:—Rajah Ram Roy, son of the late Rajah Rammohun Roy.

করেন।[1] এই পুস্তিকায় রাজারামকে "রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র" বলিয়া উল্লেখ করায় ১৮৩৫ সালে এদেশ হইতে রামমোহনের কোন [সাহেব?] বন্ধু ডা কার্পেণ্টারকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে রাজারামের ইতিহাস এইরূপ দেওয়া আছে:—

"আপনার পুস্তকে কোনো ভুল থাকিলে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছেন। একটি ভুলের প্রতি রামমোহনের ভারতীয় বন্ধুরা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—রামমোহনের চরিত্রের সুনামের দিক্ দিয়া তাহার সংশোধন আবশ্যক। রামমোহনের সহিত যে বালক 'রাজা' বিলাত গমন করে, সে তাহার পুত্র নহে,— এমন কি হিন্দুবিধি-মতে পোষ্যপুত্রও নয়। সে এক অনাথ বালক—অবস্থাচক্রে পড়িয়া রামমোহন তাহাকে আশ্রয় ও শিক্ষা দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে বিশেষ ঘটনায় পড়িয়া রাজারাম তাঁহার আশ্রয় পাইয়াছিল, সে কথা রামমোহন আমাকে বলিয়াছিলেন—তাহা এখনও আমার বেশ স্মরণ আছে। এ বিষয়ে অন্যান্য লোকের মুখেও যাহা শুনিয়াছি, তাহার সহিত আমার স্মৃতিগত মিল আছে। হরিদ্বারের এক বার্ষিক মেলায় যখন দুই-তিন লক্ষ লোক সমাগম হয়, সেই সময় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান ডিক (Dick) সাহেব এই শিশুটিকে অসহায় ও পরিত্যক্ত অবস্থায় কুড়াইয়া পান। ইহার মাতাপিতা হিন্দু কি মুসলমান,—তাহারা শিশুকে হারাইয়া ফেলে, কি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া যায়,—এসব কথা কিছুই জানা যায় নাই। ডিক সাহেবই বালকটির প্রতিপালনের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন তাহার কি ব্যবস্থা করা যায়, সে বিষয়ে রামমোহনের সহিত পরামর্শ করেন। বেশ স্মরণ আছে, আমার পরলোকগত বন্ধু রামমোহন বলিয়াছিলেন, "যখন দেখিলাম একজন ইংরেজ—একজন খৃষ্টিয়ান—এক দরিদ্র অনাথ বালকের মঙ্গলের জন্য এত যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, তখন এদেশের লোক হইয়া কেমন করিয়া আমি বালককে আশ্রয় দিতে—তাহার ভরণপোষণের ভার লইতে ইতস্তত করি?" ডিক সাহেব আর ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই—বিলাতের পথেই বোধ হয় তাহার মৃত্যু হয়। বালকটি রামমোহনের কাছেই রহিয়া গেল। সে তাঁহার এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে—সময়ে সময়ে তাঁহাকে এ কথাও বলিয়াছি—অতিরিক্ত আদর দিয়া তিনি তাহার অনিষ্ট করিয়াছেন।" *
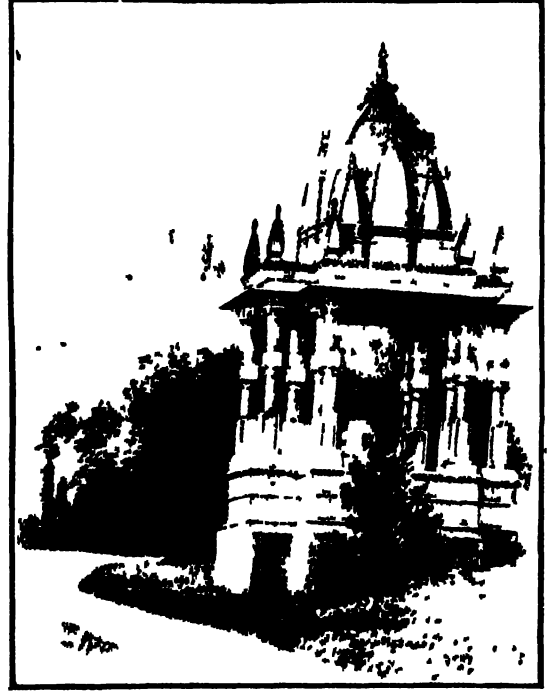
রামমোহনের সমাধি মন্দির

রামমোহনের জীবনচরিত-লেখকদের অনেকেই এই কাহিনীটিকে রাজারামের প্রকৃত পরিচয়-বোধে গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন।

রামমোহনের প্রধান শিষ্য, চন্দ্রশেখর দেব কিন্তু রাজারামের অন্যরূপ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার বন্ধু রাখালদাস হালদারকে বলেন (১৮৬৩),—"জনরব, এক সময় রামমোহন রায়ের এক প্রণয়িনী ছিল,

[1] Lant Carpenter's *A Review of the Labours, Opinions, and Character of Rajah Rammohun Roy*, London & Bristol 1833).

* Mary Carpenter's *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*, (2nd ed), p. 173.

সাধারণের বিশ্বাস, রাজারাম তাঁহারই গর্ভজাত। আমি কিন্তু রামমোহনের মুখে শুনিয়াছি—অনাথ বালক রাজারাম এক সাহেবের দরওয়ানের পুত্র—রামমোহন তাহাকে প্রতিপালন করেন।"*

রাজারাম সম্বন্ধে উপরের গল্প-দুইটির মধ্যে সম্পূর্ণ মিল নাই—অথচ বলা হইতেছে, দুইটিই রামমোহন রায়ের মুখে শোনা! তবে এ পার্থক্য কেন? ডাঃ কার্পেণ্টার তাঁহার রচনায় রাজারামকে "রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র" বলায়,† "পাছে রামমোহনের নৈতিক চরিত্রে সন্দেহ উপস্থিত হয়" এইজন্য এদেশ হইতে রামমোহনের কোন অজ্ঞাতনামা বন্ধু রাজারামের প্রকৃত পরিচয়রূপে প্রথম গল্পটির উল্লেখ করেন। এই বন্ধুটি কে, তিনি দেশী কি বিদেশী, এবং তাহার কথার মূল্যই বা কতটা, আজ তাহা জানিবার বা যাচাই করিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার লেখায় এমন-সব কথা আছে যাহা গল্পটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত করিতে পারে। তিনি ত রামমোহনের দোহাই দিয়া স্পষ্ট বলিতেছেন, এই অনাথ বালকের "মাতাপিতা জাতিতে হিন্দু কি মুসলমান তাহা অজ্ঞাত।" কিন্তু প্রশ্ন উঠিতেছে, যদি বালক রাজারামের জাতিই অজ্ঞাত ছিল, তবে কেমন করিয়া রামমোহন তাহার নাম দিলেন—শেখ বক্সু? শেখ বক্সু ত আর হিন্দু নাম হইতে পারে না! সুতরাং এই গল্পটির মূলে কতটা সত্য আছে, তাহা ভাবিবার কথা।

গল্পটি যে অসার তাহা মনে করিবার আরও একটি কারণ আছে। সত্যসত্যই ডিক বলিয়া কোন সিভিলিয়ান রাজারামকে হরিদ্বারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন কি?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজারাম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"রাজার পালিতপুত্র রাজারাম বড় দুষ্ট ছিল। রাজার সহিত অনেক প্রকার দুষ্টমি করিত। কিন্তু রাজা কিছুতেই তাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন না। বাস্তবিক আমি এ পর্য্যন্ত যত লোক দেখিয়াছি, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় সুমিষ্ট মেজাজের লোক দেখি নাই। এক দিবস মধ্যাহ্নে আমি রাজার বাটীতে গমন করিলাম। রাজা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রাজারাম আমাকে ডাকিয়া বলিল, 'একটা তামাসা দেখিবে তো এস।' আমি তাহার সহিত গমন করিলাম। রাজারাম ধীরে ধীরে রাজার শয্যার নিকটে গমন করিল, এবং হঠাৎ রাজার বক্ষঃস্থলের উপর ঝম্প দিয়া পড়িল। রাজা জাগ্রৎ হইলেন, এবং 'রাজারাম' 'রাজারাম' বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।" *

ইহা পাঠ করিলেই মনে হয়, মহর্ষি ও রাজারাম প্রায় সমবয়স্ক—বড়জোর দুই-চার বৎসরের ছোট-বড় হইতে পারেন। মহর্ষি যে-সময়ের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তখন (তিনি নিজেই বলিয়াছেন) তাঁহার বয়স ৮ কি ৯। মহর্ষির জন্ম ১৮১৭ সালে, তাহা হইলে আনুমানিক ১৮২৫-২৬ সালের কথা হইতেছে। এ সময় রাজারামেরও বয়স যে ৮-৯ বৎসরের বেশী ছিল না, মনে করিবার একটি কারণ আছে। ১৮৩১, ১৩ই জুন তারিখে, *Monthly Repository*র সম্পাদক রেভারেণ্ড ফক্সকে লিখিত একখানি পত্রে রামমোহন রাজারামকে, 'my little youngster' বলিতেছেন।† ১৮৩৩ সালে মিস ক্যাসেলকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি রাজারামকে 'my youngster' বলিয়াছেন, এবং 'দুষ্টামি করিলে তাহাকে সংশোধন করিয়া দিবার' অনুরোধও পত্রে আছে।

---

* 'Chunder Sekhar Deb—the disciple who, it will be remembered, suggested the formation of the Brahmo Samaj—stated in conversation with a friend R D H, at Burdwan, so late as January, 1863, that 'rumour had it that at one time he [Rammohun] had a mistress; and people believed that Rajaram was his natural son, though he himself said Rajaram was the orphan of a Durwan of some Saheb, and Rammohun Roy brought him up.'—Miss Collet's *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, (2nd ed), p. 169.

† "On the 8th of April, 1831, the Raja arrived at Liverpool, accompanied by his *youngest son, Raja Ram Roy*, and two native servants one of them a Brahmin"—Mary Carpenter's *The Last Days of the Rajah Rammohun Roy*, (2nd ed), p. 68.

* মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৭০-৭১।

† "I shall endeavour to bring my little youngster with me, agreeably to your kind request."—Rammohun Roy to Rev. W. J. Fox dated 13 June 1831 (Miss Collet, 2nd ed, p. 187).

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, ১৮৩৩ সালে রাজারামের বয়স ১৬-১৭ বৎসরের বেশী ছিল না। বোধ হয়, এই-সব কারণেই মিস কোলেট প্রভৃতি রামমোহনের জীবনচরিতে, ১৮৩০ নভেম্বর মাসে বিলাতযাত্রাকালে রাজারামের বয়স "আন্দাজ ১২ বৎসর" বলিয়াছেন।*

হরিদ্বারের গল্পে পাই, ডিক নামে কোম্পানীর একজন সিভিলিয়ান হরিদ্বারের এক বার্ষিক মেলায় বালকটিকে [রাজারামকে] অসহায় ও পরিত্যক্ত অবস্থায় কুড়াইয়া পান। তিনিই বালকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করেন। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে তিনি রামমোহন রায়ের উপর বালকের ভরণপোষণের ভার দেন। ডিক সাহেব আর ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই; ইংলণ্ডের পথেই তাহাকে বোধ হয় তাঁহার মৃত্যু হয়।" †

রাজারামের বয়স যাহাই হউক, ধরা যাক, তাহাকে ১৮১৫ হইতে ১৮২৫ সালের মধ্যে কোন সময়ে রামমোহনের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখা দরকার, এই দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে 'ডিক' নামধারী কোম্পানীর কোন সিভিলিয়ান এদেশ হইতে বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন কি না।

১৮৩৯ সালে বিলাত হইতে প্রকাশিত *Alphabetical List of the Bengal Civil Servants, from 1780 to 1838* একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। এই প্রামাণিক গ্রন্থে সেই সময়ের সকল সিভিলিয়ানের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে 'ডিক' নামধারী নয়জন সিভিলিয়ানের কর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে সাতজন ১৮৩০ সালে রামমোহনের বিলাত-যাত্রার পরেও এদেশে চাকরি করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাদের কেহই গল্পোল্লিখিত ডিক হইতে পারেন না। অষ্টম ডিক—সার রবার্ট কীথ ডিক, ব্যারনেট—১৮১৩, ১৬ই ডিসেম্বর "এদেশে কোম্পানীর কর্ম্মে ইস্তফা দেন।" অতএব ইনিও হরিদ্বারের গল্পের ডিক হইতে পারেন না। তাহা হইলে বাকী রহিলেন নবম ডিক—John Dick. তাঁহার কর্ম্মজীবনের তালিকা এইরূপ—

নিয়োগ :—

১৮১৮, ১১ই আগষ্ট...ত্রিহুতের ম্যাজিষ্ট্রেটের সহকারী
১৮২১, ৬ই জুলাই বীরভূমের " ",
১৮২২, ১০ই এপ্রিল শান্তিপুরের কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট
১৮২৩ — হরিপালের অস্থায়ী " "
মৃত্যু—কলিকাতায় ১৮২৫, ২০এ জুলাই।"

কিন্তু দেখা যাইতেছে, এই জন্ ডিকের কর্ম্মস্থল কোনদিনই হরিদ্বার বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থলে ছিল না। যদিই ধরিয়া লওয়া যায়, কোনো সময়ে তিনি ছুটিতে হরিদ্বারে গিয়াছিলেন, তাহা হইলেও প্রমাণ হয় না যে, তিনিই সেই ডিক যিনি "রামমোহনের হাতে রাজারামকে সঁপিয়া দিয়া বিলাতযাত্রা করেন।" কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উপরের জন্ ডিক ১৮২৫, ২০এ জুলাই কলিকাতায় মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহার কর্ম্মস্থল ছিল—কলিকাতার সন্নিকটস্থ হরিপালে। সরকারী দপ্তরখানায় অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বাস্থ্যহানি হেতু সরকারের নিকট বিলাতযাত্রার ছুটি বা জাহাজে যাত্রী হইবার অনুমতি-পত্রের জন্য আবেদন করেন নাই। এই-সমস্ত কারণে মনে হওয়া স্বাভাবিক, রামমোহনের অজ্ঞাতনামা বন্ধু ডাঃ কার্পেণ্টারকে লিখিত পত্রে রাজারামের পরিচয়-প্রসঙ্গে যে ডিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেরূপ কোন ডিকের অস্তিত্ব তখন ভারতে ছিল না। তবে কি সেই সময় ভারতে 'ডিক' নামধারী অনেকগুলি সিভিলিয়ান থাকায়, হরিদ্বারের গল্পটিতে 'ডিক' নাম যোগ করিয়া, পাঠকের মনে প্রথম-দৃষ্টিতেই উহার প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল?

---

* Miss Collet (2nd. ed.), p. 169: নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত," (৫ম সংস্করণ), পৃষ্ঠা ৬০৭।

† "Mr. Dick, a civil servant of the Company,... had him clothed and fed and when he was under the necessity of leaving the country for the recovery of his health, he consulted with Rammohun Roy how the child should be disposed of. Mr. Dick never returned to India, having died, I believe, on his passage to England, and the child remained [illegible]"—Mary Carpenter.

জনপ্রবাদ, রাজারাম (শেখ বক্সু) বিলাত হইতে ফিরিয়া রামমোহনের বিষয়ের উপর দাবি করেন। শেষে কিছু টাকা দিয়া না-কি তাঁহাকে বিদায় করা হয়। ইহার মূলে কিছু সত্য থাকা সম্ভব, কারণ হরিহরের গল্পটি পড়িলেই মনে হয়, রাজারাম রামমোহনের নিজ পুত্র নামে প্রচারিত হইলে পাছে কোনদিন সে বিলাত হইতে ফিরিয়া বিষয়-সম্পত্তি দাবি-দাওয়া করে, এরূপ একটা আশঙ্কাবশেই যেন তাহাকে রামমোহনের 'পালিত-পুত্র' বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা এই গল্পটির মধ্যে রহিয়াছে।

দ্বিতীয় গল্পটিতে রাজারামকে এক সাহেবের দরওয়ানের পুত্র বলা হইতেছে। দরওয়ান বলিতে সচরাচর হিন্দুই বোঝায়। দেখা যাইতেছে, দুইটি গল্প পরস্পর-বিরোধী। কোনটিকেই আমরা তথ্য-রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। দুইটি গল্পই যদি রামমোহনের মুখে শোনা হয়, তবে কি রামমোহন ইচ্ছা করিয়া রাজারামের পরিচয় গোপন রাখিবার জন্য, তাহাকে পালিতপুত্ররূপে প্রচার করিয়া, নানা গল্পের সৃষ্টি করিয়াছিলেন? একথা অবশ্য বলা যায় না; স্মরণ রাখিতে হইবে, উপরের দুইটি গল্পই তাঁহার মৃত্যুর পর প্রচারিত।

৩

রাজারামের পরিচয়ে যে একটা রহস্য রহিয়াছে তাহা স্পষ্টই মনে হইতেছে।

রাজারাম, ওরফে শেখ বক্সু, যে রামমোহনের পুত্র ছিলেন—পালিতপুত্র নহে—নানা কারণে তাহাই আমার মনে হইয়াছে। বিলাত-প্রবাসকালে রামমোহন রাজারামকে 'পুত্র' বলিয়াই পরিচয় দিতেন,—অবশ্য পালিতপুত্রকে 'পুত্র' বলিলেও কোন ভুল হয় না। মিস্ কিডেল, ডাঃ কার্পেণ্টারের কন্যা মেরী কার্পেণ্টার, রেভারেণ্ড ফক্স প্রভৃতিকে লিখিত পত্রে রামমোহন 'my son' 'my little youngster' বলিয়াই রাজারামের উল্লেখ করিয়াছেন।* ডাঃ কার্পেণ্টার রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—তাঁহাদের মধ্যেই রামমোহন প্রবাসের অনেকদিন কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কোনদিনই রামমোহন তাঁহার নিকট 'পালিতপুত্র' বলিয়া রাজারামের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া কোন মুদ্রিত প্রমাণ নাই। ডাঃ কার্পেণ্টার রাজারামকে "রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র" বলিয়াই জানিতেন, মুদ্রিত সমুদয় প্রমাণ হইতে এইরূপ মনে হয়। তবে ভারতবর্ষে রামমোহনের অনেক সাহেব বন্ধু রাজারামকে রাজার পালিতপুত্ররূপে জানিতেন। রাজারামের চাকরির জন্য বোর্ড-অফ-কণ্ট্রোলে যে দরখাস্ত গিয়াছিল, তাহাতেও "রামমোহনের পুত্র" বলিয়াই তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল।* রাজারামের প্রতি রামমোহনের স্নেহের আতিশয্য, সযত্নে ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদান, এবং স্বদেশে হিন্দু আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী পরিজনবর্গের মধ্যে না রাখিয়া, কিশোর বালককে সঙ্গে করিয়া বিলাত লইয়া যাওয়া—এ সমস্তই ইঙ্গিত করে যে, মুসলমান শেখ বক্সু (রাজারাম) রামমোহন রায়ের পুত্র। রামমোহন পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী; কাজেই আত্মীয়স্বজনরা তাঁহার উপর বিরূপ ছিলেন। শোনা যায়, দুই স্ত্রীর

* "I had yesterday the pleasure of receiving your letter of the 6th, and rejoice to learn that you find my son peaceable and well behaved. I however entreat you will not stand on ceremony with him. Be pleased to correct him whenever he deserves correction. My observation on, and confidence in, your excellent mode of educating young persons, have fully encouraged me to leave my youngster under your sole guidance. I at the same time cannot help feeling uneasy now and then, at the chance of his proving disrespectful or troublesome to you or to Miss Castle...Dr. Carpenter (I think) left London on Saturday last. I doubt not you will take my youngster every Sunday, to hear that pious and true minister of the Gospel."—Rammohun to Miss Kiddell, dated 9 July 1833. (Mary Carpenter, 1st. ed., pp. 118-19, facsimile of autograph letter to Miss Carpenter to face p. 114; 2nd. ed., pp. 107, also 109, etc.

* "The President of the Board of Commissioners for the Affairs of India has received an application on behalf of the son of the late Rajah Rammohun Roy, who died in this country."—*Minutes of the Board of Control. Vol. 4*, p. 460. (India Office Records).

সহিতও তাঁহার বনিবনাও ছিল না।* এই কারণেই বোধ হয় তিনি শেখ বক্সুকে এদেশে রাখিয়া যাওয়া নিরাপদ মনে করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রচলিত কিংবদন্তীরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সত্য বটে, জনপ্রবাদ ও কিংবদন্তী স্বয়ং প্রমাণ নহে; কিন্তু অন্য প্রমাণ বা অনুমানের সমর্থকরূপে তাহা গ্রহণ করা চলে।

রামমোহনের প্রিয় শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবই রাখালদাস হালদারের নিকট প্রকাশ করেন,—"জনরব, একসময়ে রামমোহন রায়ের এক প্রণয়িনী ছিল; সাধারণের বিশ্বাস, রাজারাম তাঁহার গর্ভজাত।" সাধারণে যখন এই জনরব সত্য বলিয়া মনে করিত, তখন এক কথায় ইহা উড়াইয়া দেওয়া চলে না; বিশেষতঃ রামমোহন রায়ের চরিতকার ও বিশেষ ভক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও লিখিতেছেন,—"রাজারাম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের একটি দুর্নাম আছে।† রাজারাম সম্বন্ধে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সন্দেহ ছিল। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন,—"বালক রাজারামের সঙ্গে রামমোহনের কি সম্বন্ধ ছিল? পোষ্যপুত্র? তবে কি মিশনরিসুলভ বিদ্বেষবশতঃ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেন?" ‡

চন্দ্রশেখর দেবের উল্লিখিত জনরবে প্রকাশ, "রাজারাম —রামমোহনের এক প্রণয়িনীর গর্ভজাত।" রামমোহনের এই প্রণয়িনী মুসলমান ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। আগেই প্রমাণিত হইয়াছে, রাজারামের আসল নাম— শেখ বক্সু; এই নামেই জাহাজে যাত্রী হইবার সরকারী অনুমতি-পত্রে পাওয়া গিয়াছে। শেখ বক্সু—মুসলমানের নাম, তাহার মাতাও যে মুসলমান ছিলেন, এরূপ মনে করা অন্যায় হইবে না। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁহার পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"অনেক লোকের সংস্কার ছিল রাজারাম মুসলমানের সন্তান। রামমোহন তাহাকে গৃহে রাখিয়া সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতেন বলিয়া পৌত্তলিকেরা তাঁহার সহিত আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"* এখানেও রাজারামকে মুসলমান বলিয়া অনেকের বিশ্বাসের উল্লেখ করা হইতেছে, এবং 'মুসলমানের সন্তান' বলিতে 'মুসলমান-নারীর গর্ভজাত' —এরূপ বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, চন্দ্রশেখর দেব ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে-দুইটি জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে সত্য একথা তাঁহারা স্পষ্ট না বলিলেও, তাহার মধ্যে মিল রহিয়াছে, এবং ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে—রাজারাম মুসলমান এবং তাহার মাতাই রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনী। কিংবদন্তী—আজ পর্য্যন্ত রংপুরে রামমোহনের এই মুসলমান-প্রণয়িনীর বংশ রহিয়াছে; রামমোহন ইঁহার গর্ভজাত এক কন্যারও না-কি তথায় বিবাহ দিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকেরা অনেকে—এমন কি চাষাভুষারাও একথা বলিয়া থাকে। আরও শোনা যায়, রামমোহনের বিলাতযাত্রার সঙ্গী রামহরি দাস বলিতেন, রামমোহন রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিলে তাঁহার প্রণয়িনীও এখানে আসেন। তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রে গোপনে আসিয়া রামমোহনের সংবাদ লইয়া যাইতেন। জনপ্রবাদ, রাজারাম এদেশে আসিয়া মুসলমানদের দলে মিশিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের দুইটি নাম ছিল—গোলাম নবী ও নন্দকুমার; যেমন শেখ বক্সুর হিন্দু নাম ছিল— রাজারাম। রাজারাম যে মুসলমান ছিলেন—এ প্রবাদ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জানা ছিল। তাঁহার এক চরিত-কথায় প্রকাশ:—"রাজা রামমোহনের প্রসঙ্গে রাজারামের কথা উঠিল। তিনি [স্যর গুরুদাস] বলিলেন, রাজারামের বাড়ী তাঁহার বাড়ীর কাছেই ছিল। রাজারাম মোসলমান ছিলেন বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও

* "Rammohun lived apart from his wives simply because they were Hindus, and he was considered an outcast by them. His wives did not like to live with him."—Nagendranath Chatterji to Miss Collet, dated 2 January, 1883.

"Rammohun has left in India a wife, from whom he has been separated (on what account we know not) for some years.'—"Rammohun Roy"—*Asiatic Journal*, Nov. 1833, p. 208.

† "মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৪০৫

‡ "মানসী ও মর্ম্মবাণী", আষাঢ়, ১৩৩৩, পৃঃ ৫১০-১১

* "মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৪৩৬

তাঁহার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেন নাই। রমাপ্রসাদ রায়কে 'ঠাকুর-পো' বলিতেন, এইরূপ তিনি বাল্যে শুনিয়াছিলেন।"*

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, গোঁড়া হিন্দু-সমাজ ত রামমোহনের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন—রামমোহনের কোনো মুসলমান প্রণয়িনী থাকিলে সেকথা কি তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিত? আর জানা থাকিলে কি তাঁহারা নীরব থাকিতেন?

কলিকাতার কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন † 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' নাম লইয়া রামমোহন রায়কে চারিটি প্রশ্ন করেন। তৃতীয় প্রশ্নে ছিল,—"ব্রাহ্মণসজ্জনের পক্ষে অবৈধ হিংসার দ্বারা আত্মোদরভরণ অনুচিত কি না?" চতুর্থ প্রশ্নে ছিল,—"লজ্জা ও ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান ও ব্যভিচার করেন, তাঁহারা বিরুদ্ধকারী কি না?" ১৮২২ সালে রামমোহন প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। "তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত, এবং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রানুযায়ী ব্রহ্মোপাসক" হরিহরানন্দ স্বামীর শিষ্য রামমোহন তন্ত্র-শাস্ত্রের সাহায্যে ছাগবধ, সুরাপান ও যবনী-গমন সমর্থন করিয়াছেন। তর্কপঞ্চাননের আক্রমণ রামমোহনকেই উপলক্ষ্য করিয়া। যাঁহারা রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলীতে প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পাঠ করিবেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে একমত হইবেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একথা স্বীকার করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন,—"এই-সকল প্রশ্নে, রামমোহন রায়ের কোন কোন মত ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল।" রামমোহনের জীবনচরিতেও প্রকাশ, ছাগমাংস-ভক্ষণ ও সুরাপান রামমোহনের অভ্যস্ত ছিল। যবনী-গমনের অপবাদও যে তাঁহার ছিল, তাহাও তাঁহার প্রত্যুত্তর হইতে পরিস্ফুট হইবে।

রামমোহনের মতে, "ব্যভিচার মহাপাতক, কিন্তু তান্ত্রিকদিগের পক্ষে শৈব-বিবাহে দোষ নাই। শৈব-বিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই। কেবল সপিণ্ডা না হয়, আর সভর্ত্তৃকা না হয়, তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্র-প্রমাণে হয়।" কেবল তান্ত্রিক সাধকদিগের জন্য মাংস, মদ্য ও শৈববিবাহ বিহিত, কিন্তু স্মার্ত্ত মতে, এ সকল একেবারে নিষিদ্ধ।*

রামমোহনের রচনার এই অংশটি হইতে কথাটা আরও পরিস্ফুট হইবে:—

"যবনী কি অন্য জাতি, পরদার মাত্র গমনে সর্ব্বদা পাতক, এবং সে ব্যক্তি দস্যু ও চণ্ডাল হইতেও অধম; কিন্তু তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী, সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় গম্যা হয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী, জন্ম হইবামাত্রই পত্নী হইয়া সঙ্গে স্থিতি করে, এমত নহে। বরঞ্চ দেখিতেছি, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না, সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী অদ্য হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী, সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্ত্রকে এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন, এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়। খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্রপ্রমাণে হয়...শৈববিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয় তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক।" †

"চারি প্রশ্নের উত্তর" প্রকাশিত হইলে, রামমোহনের ঘোর বিপক্ষ—নন্দলাল ঠাকুর-এর ইচ্ছায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে ২০৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করেন। ইহাতে রামমোহনের উপর অজস্র কটুকাটব্য বর্ষণ করা হইয়াছিল। 'পাষণ্ড', 'নগরান্তবাসী ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করা হয়। 'নগরান্তবাসী' কথাটির দুইটি অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ—নগরের অন্তে যিনি বাস করেন, অর্থাৎ

* তত্ত্ব ভজনান প্রসঙ্গ—শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। পৃঃ ৩৩

† ইনি পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন।

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', ৫র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২২৫-২৬

† "চারি প্রশ্নের উত্তর", পৃঃ ২৫০

রামমোহন রায় মাণিকতলায় বাস করিতেন ; অপর অর্থ—চণ্ডাল। .

'পাষণ্ডপীড়ন'-এর প্রত্যুত্তর-স্বরূপ রামমোহন 'পথ্যপ্রদান' পুস্তক লিখিলেন (১৮২৩)। ইহাতে তিনি লিখিতেছেন,—

"১৬২ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে, 'সুশীল সুজনদিগের বৃথা কেশচ্ছেদন, সুরাপান, সম্বিদাভক্ষণ, যবনীগমন ও বেশ্যাসেবন সর্ব্বকালেই সম্ভব।' উত্তর। এ যথার্থ বটে, অতএব ধর্ম্মসংহারকে যদি ইহার ভূরি অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়, তবে দুর্জ্জন পদপ্রয়োগ তাঁহার প্রতি সঙ্গত হয় কি না? শৈবধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে, বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ হয় না, যদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান, তবে তান্ত্রিক মন্ত্র গৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়? শাস্ত্রবোধে স্মৃতি ও তন্ত্র উভয়ই তুল্যরূপে মান্য হইয়াছেন। একের মান্যতা, অন্যের অমান্যতা হইবাতে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নাই।" *

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই মনে হয়, সুরাপান ও ছাগমাংস-ভোজনের ন্যায়, যবনী-গমনের দুর্নামও তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু-সমাজ রামমোহনের উপর আরোপ করিতেন। কাজ তিনটি যে দোষাবহ নহে, তাহা তন্ত্র-সাধক রামমোহন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তন্ত্র-সাধকের পক্ষে যবনী-গমন তিনি অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন না, এবং তাঁহার মুসলমান প্রণয়িনী থাকা সত্য হইলে তিনি তাঁহাকে সম্ভবতঃ শৈব-মতে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মুসলমান-নারীই যে রাজারামের—ওরফে শেখ বক্সুর—মাতা, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ-বলে তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

রাজারাম-সম্পর্কে যাহা লেখা হইল, তাহাতে রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় না। রামমোহন মানুষ ছিলেন। তিন স্ত্রীর* স্বামী হইয়া যদি তিনি শৈব-মতে এক মুসলমানীকে গ্রহণ করিয়াই থাকেন, তাঁহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই ; বিশেষতঃ সে-যুগে কোন প্রকার ধর্ম্মমত অনুসারে বিবাহ না করিয়াও মুসলমান বা অন্য নারীর সংসর্গ করায় কিছু নূতনত্ব ছিল না। সুতরাং এ-যুগের আদর্শের [illegible] সে-যুগের রীতিনীতি ও আদর্শের বিচা[illegible] নহে।

* "পথ্যপ্রদান"—চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ৩৩১

* রামমোহনের তিন বিবাহ সম্বন্ধে মিস্ কোলেটের [illegible] আছে,—

"While yet a mere child, his father married him three times. The first bride died 'at a very early age' (not specified), and after her death, as we learn from William Adam's letters, 'his father, when he was only about nine years of age, married him within an interval of less than a twelve month to two different wives.'" His second wife, who died in 1824, was the mother of all of Rammohun's children. The third wife survived him. (Miss Collet, 2nd ed., p. 6).

কাবুলিওয়ালা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বড়বাজারের কাবুলিওয়ালা আর বোলপুরের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা মস্ত বড় পার্থক্য আছে। আর সেটা হচ্ছে এই, যে, কাবুলিওয়ালার কাছে আত্মদর্শন নামে বিষয়টি একটা মস্ত-বড় hallucination; একটা মস্ত-বড় আজগুবি মনের ভ্রম মাত্র,—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে তা নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে আত্মানং বিদ্ধি—know thyself ইত্যাদি বাক্যগুলো পাগলের প্রলাপ নয়—অপর পক্ষে কাবুলিওয়ালার কাছে ও-সবের কোন মানেই হয় না। অনেকে বোধ হয় আশ্চর্য্য হবেন শুনে, যে, এই বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রকম একজন কাবুলিওয়ালা দেখা দিয়েছে। এই কাবুলিওয়ালার যদি বাংলার চিন্তা-জগতকে তাদের চিন্তা দিয়ে প্রভাবিত করতে কৃতকার্য্য হয় তবে খুব সম্ভব পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই বাংলা দেশ বিলকুল বাচ্চা-ই-সাকাওর আফগানিস্থানে পরিণতি লাভ করবে।

কিন্তু সুখের কথা এ আশঙ্কা করবার কোন কারণ নেই। কেন-না কোন ব্যক্তিগত বিশেষ মানুষ সাময়িক কোন উত্তেজনাবশে যে কথাই বলুক বা বিশ্বাস করুক না কেন, মানুষের অন্তরতম সত্তা সেইখানেই চিরকাল পরম নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকৃতে পারবে না। সমাজে দু'চারজন এমন লোকের আবির্ভাব হবেই যাঁদের সকল পরম নিশ্চিন্ততার মাঝেও "ততঃ কিম্?" এই প্রশ্ন আকুল করে তুলবেই এবং তাঁদের অন্তরের hallucinationএর শক্তিই কাবুলিওয়ালার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে ক্ষুদ্র ক'রে দেখাবেই। সাময়িক কলহের ক্রুদ্ধ গালাগাল শাশ্বত বাণীকে চিরকাল ডুবিয়ে রাখতে পারবে না। চেঙ্গিস্ বা তৈমুর সাময়িক, কিন্তু শৃন্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—এ বাণী শাশ্বত।

মানুষের সভ্যতা বলে আমরা যে ব্যাপারটিকে স্বীকার ক'রে নিয়েছি সেই ব্যাপারটি চাল ডাল বস্ত্রের ব্যাপার নয়—সেটা হচ্ছে আসলে ঐ hallucination জাতীয় কতগুলো বিষয়ের ব্যাপার। আসলে মানুষের সভ্যতার আরম্ভই সেইখান থেকে যেখানে সে আহার নিদ্রা ও মৈথুন তার এই তিনটি সহজ ধর্ম্মকে অতিক্রম করেছে। মানুষের এই তিনটি সহজ ধর্ম্মের বাইরে যা-কিছু সে সবই কোনো দিন-না-কোনো দিন তার hallucination এর, তার স্বপ্ন-জগতেরই বিষয় ছিল। এমন কি এই যে চাষ যেটা না হ'লে আজ কোন সভ্য মানুষেরই এক পাও চল্‌বার উপায় নেই কোন একদিন এই চাষ-ব্যাপারটাও মানুষের স্বপ্ন-জগতেরই বিষয় ছিল। সেদিন এর সম্বন্ধেও সেদিনের কাবুলিওয়ালাদের ঠোঁটে নিশ্চয়ই অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু চাষের ব্যাপারটা চর্ম্মচোখেই দেখা যায়। তাই কাবুলিওয়ালাদের চাষ-সম্বন্ধে অবজ্ঞার হাসিটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। অপর পক্ষে আত্মদর্শন চর্ম্মচোখের ব্যাপার নয়। তাই ও-সম্বন্ধে কাবুলিওয়ালাদের অবজ্ঞার অট্টহাসি চিরদিনই আমাদের শুনে চল্‌তে হবে। কিন্তু বলা বাহুল্য কাবুলিওয়ালার অবজ্ঞার হাসিই মানব-চৈতন্যের সকল সত্য নিরূপণের মাপকাঠি নয়। মানুষের গভীর মন এ-কথা অনিবার্য্যরূপে জানে। তাই যেখানেই মানুষের মন গভীর হয়ে উঠেছে সেখানেই সে মানুষের টান বড়বাজারের চাইতে বোলপুরের দিকে বেশী। টাকা ধার নিতে হ'লে সে বড়বাজারেই ছোটে বটে, কিন্তু যখন সে একটা উচ্চতর আনন্দ-লোকের স্পর্শ পেতে চায় তখন সে 'গীতাঞ্জলি' খুলে বসে। অথচ গীতাঞ্জলিতে যা আছে তা কাবুলি যেওয়ার মতো নিরেট বাস্তব কোনোদিক থেকেই নয়।

আর এই যে গভীর মনের টান এই টানের পিছনে মানুষের যা আছে সেটা তার বুদ্ধির আহাম্মুকি নয়—

সেটা হচ্ছে তার অন্তরের দিব্যানুভূতি। কিন্তু কাবুলিওয়ালা হয়ত বলে যেহেতু পৃথিবীর লোক-সমষ্টির অনুপাতে ঐ দিব্যানুভূতির মানুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, সুতরাং তাদের আমরা অবজ্ঞা ক'রে চল্‌ব। অর্থাৎ কাবুলিওয়ালা বলে, যেহেতু ফুলগাছে ফুলের চাইতে পাতার সংখ্যা বেশী, সুতরাং পাতাই আমাদের আদরের। কিন্তু ফুলগাছের সাধনার যে সিদ্ধি তা তার পাতায় নয়, সে হচ্ছে তার ফুলে। মাটির রস আনন্দের কোন পৈঠা পর্য্যন্ত উঠতে পারে ফুলগাছের ফুলই হচ্ছে তার নিদর্শন। পাতাকে পুষ্ট হতেই হবে, কিন্তু সে ঐ ফুল ফুটবারই জন্যে। পাতারা যদি বলে যে আমরা পুষ্ট হব, কিন্তু ফুলকে কিছুতেই ফুটতে দেব না তবে তা করতে হ'লে সবার আগে তাদের বিশ্ব-প্রকৃতির মূল নিয়মটাকে উল্‌টে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তা যতদিন না হবে ততদিন ফুলকে তারা ব্যর্থ করতে পারে একমাত্র তাদের নিজের মৃত্যুকে অঙ্গীকার ক'রে। বিশ্বমানবের যে সাধনা সে-সাধনার সিদ্ধির অভিজ্ঞান কাবুলের সহস্র সহস্র কাবুলিওয়ালা নয়—সে-সিদ্ধির অভিজ্ঞান হচ্ছে দু'একটি রবীন্দ্রনাথে। ফুলগাছের ফুল যেমন একটা পরম সত্য, অসংখ্য সাধারণের মাঝে মুষ্টিমেয় অসাধারণ তেম্‌নি বিশ্বমানবের একটা পরম সত্য। মানুষের শক্তি আনন্দের কোন্ পৈঠা পর্য্যন্ত উঠেছে এই মুষ্টিমেয় অসাধারণ কয়জন তারই নিদর্শন।

কিন্তু মানুষের গণ-তান্ত্রিক মন এইখানে মুখ বেঁকিয়ে বসে। গণতান্ত্রিক বলে—চাইনে অসাধারণ। সে বলে —"সুপারম্যান হচ্ছে সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা, তার অবনতির মূর্ত্ত প্রতীক। তত্ত্বকথার ছলেই হোক্, আর অস্ত্রশাস্ত্রের বলেই হোক্ সমস্ত মানুষকে নিল-ডাউন ক'রে রেখে নিজের উচ্চতা প্রদর্শনের প্রয়োগনৈপুণ্য যাদের তারাই হচ্ছে সুপারম্যান। কিন্তু মানুষের এই স্পেসিস-এর লোপ আসন্ন হ'য়ে এসেছে, শীঘ্রই এরা মিসিং লিংকএ পরিণত হবে। সমস্ত মানুষ সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে কারু মাথা কারুকে ছাড়িয়ে ওঠে না। সোশ্যালিজম চায় সমস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ করতে—সুপারম্যানের এক্‌জিবিশন খুলতে নয়।" তারপর সে নিকোলাস্ রোমানক্‌কে জাহান্নামে পাঠায় এবং লেনিনের জয়ধ্বনি করে ওঠে। অবশ্য সরল-বুদ্ধি গণতান্ত্রিকের কাছে এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বার উপায় নেই যে, নিকোলাস রোমানক্ আর লেনিনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড মিল আছে। আর সেটা হচ্ছে এই যে, এঁরা দুজনেই সম্রাট্। নিকোলাস্ ছিলেন একটা দেশের সম্রাট্, লেনিন হচ্ছেন একটা যুগের সম্রাট্। নিকোলাসের রাজত্বকাল ফুরিয়েছে—লেনিনের রাজত্বকালের কেবল গোড়াপত্তন হয়েছে। নিকোলাসের সম্মুখে রাশিয়ার মানুষ নিরানন্দের সঙ্গে তাঁদের দেহকেই নত করেছে—লেনিনের সম্মুখে রাশিয়ার ও তার বাইরেরও মানুষ আনন্দের সঙ্গে তাদের মন নত করেছে। ভাত-কাপড়ের সমস্যা গণতান্ত্রিকের জীবনকে এম্‌নি আচ্ছন্ন করেছে, বাইরেটাকে সে এমনি বড় করে দেখ্‌ছে যে, শক্তির স্বরূপ তার চো[illegible] আর উপায় নেই। কুইন্ এলিজাবেথের সিংহ[illegible] চোখে স্পষ্ট, কিন্তু উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ারের সিংহ[illegible] দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

আসলে বর্ত্তমান অবস্থার চাপে ও [illegible] রাজনৈতিক আকাশে যে-সব চিন্তারাশি আজ অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে তাদের আব্‌হাওয়ায় গণতান্ত্রিকের ক্রুদ্ধ মনে এই সহজ সত্যটা সত্য বলে প্রতিভাত হওয়ার উপায় নেই যে মানুষের স্থূল প্রয়োজনই মানুষের জীবনের প্রথম প্রয়োজন বটে, কিন্তু সেইটেই তার জীবনের পরম অভিলাষ নয়। অন্নবস্ত্র মানুষের জীবনের যতই প্রয়োজনের সামগ্রী হোক না কেন আজকার মানব-মনের পরম লক্ষ্য-বস্তু তা নয়। মানব সভ্যতা ব'লে বিষয়টিকে যদি আমরা স্বীকার করে নেই তবে এটাও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সে সভ্যতার অবদান চাষা ও তাঁত এ দুয়েকেই ছাড়িয়ে উঠেছে। আজ যদি জাতির ঠাকুর-ঘরে এই চাষ ও তাঁতকে প্রধান দেবতার সিংহাসনে বসিয়ে কেবলমাত্র তারই আলোকে সমাজ-ব্যবস্থার সূত্র বাঁধি তবে সে সূত্রের পরাজয় ধীরে ধীরে হবেই। কেননা চাষ ও তাঁত আসলেই আজকের মানুষের জীবনে প্রধান নয়। যে মুহূর্ত্তে মানুষের ক্ষুৎপিপাসা মিটবে তার বস্ত্রের অভাব দূর হবে সেই মুহূর্ত্তে তার সমাজে

"ততঃ কিম্ ?" এই প্রশ্ন ধীরে ধীরে মাথা তুলবে। মানুষের মন অমৃতের সন্ধানী। সেই কারণেই চাষ ও তাঁতকে দেবতার আসনে বসিয়ে চিরকাল পূজা করবার তার উপায় নেই। কেননা ঐ দুই বস্তু তাকে অমৃতের সন্ধান দিতে পারবে না। মানুষের আত্মা ঊর্দ্ধলোকের আলোকের আত্মীয়, মাটির স্নেহরস তাকে চিরকাল আপন ক্রোড়ে ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না। মানুষের চেতনা গহন-ঘন আনন্দের অধিকারী জীবনের ক্ষুদ্র প্রয়োজনের তাগিদ তাকে কিছুতেই তা থেকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারবে না।

বাড়ীর ছোট ছেলেটা রাজনৈতিক বক্তার বক্তৃতা শুনে এসে যদি বাড়ীতে এই ব'লে আস্ফালন সুরু করে যে, "আমি স্বাধীন হব—আমি স্বাধীন হব—আর কিছু হব না, যে সেটা নিশ্চয়ই একটা হাস্যজনক কথা হবে। [illegible]ক যদি সোশ্যালিজ্‌ম্‌এর বক্তৃতা শুনে এসে [illegible]শ গান ধ'রে দেয় যে, "আমি ভাত-কাপড় চাই—[illegible]ম ভাত-কাপড় চাই, আর কিছু চাইনে"—তবে [illegible]ম হাস্যজনক ব্যাপার হবে না। সোশ্যালিজ্‌ম্‌এর বক্তৃতা শুনে শুনে যদি গণতান্ত্রিক জীবন ভরে কেবল রাশি রাশি ভাত আর হাজার হাজার কাপড়ের গাঁঠরিরই স্বপ্ন দেখ্‌তে থাকে তবে তার সঙ্গে সেই কৃষকের বিশেষ কোন তাৎপর্য্যও থাকবে না যে একদিন রাণী রাসমণিকে স্বপ্নে দেখেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—"কি রকম দেখ্‌লি রে ?" সে উত্তর দিলে—"দ্যাখলাম রাণী-মা থাবার থাবার চেনি খাচ্চিচে।" এই যে মন এই মনকে বিশ্বমানব উঁচু সিংহাসনে বসিয়ে আজ পূজো করতে বসে যাবে না। তা সে মন গণতান্ত্রিকেরই হোক্ আর রাজতান্ত্রিকেরই হোক্, সে-মন রাজারই হোক্, বা চাষীরই হোক্। মানব সভ্যতার প্রশ্ন—"সংখ্যা কত ?" তা নয়—এ প্রশ্ন হচ্ছে—"মন কি ?" মানুষের সভ্যতার শেষ অনুসন্ধান [illegible]য়, মানুষ কত দুঃখকষ্ট পাচ্ছে তা নয়—বা কে [illegible]য় আলালের ঘরের দুলালের মতো প্রতিপালিত হচ্ছে তা নয়—তা হচ্ছে কোথায় মানুষ অমৃতের দিকে কতটা হাত বাড়িয়েছে। কোথায় মানুষ সেই আনন্দবহ হয়ে উঠেছে, যে আনন্দের আভাস মহাজনের চালের আড়তেও নেই বা ধনপতির ব্যাঙ্ক একাউন্টের মধ্যেও নেই। কাবুলিওয়ালা এই আনন্দকে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু সেইটেই মানুষের চৈতন্যের পরম অভিব্যক্তি নয়। অভিজাত ও বুর্জ্জোয়ার চটাচটি, বুর্জ্জোয়ার ও প্রলিটেরিয়েটের সংঘর্ষ, ক্যাপিট্যাল ও লেবারের মারামারি—এ-সবকে এড়িয়ে এ-সকলকে অতিক্রম করে' চলেছে মানব সভ্যতার অমৃত-সন্ধানীদের ইতিহাস। গণতান্ত্রিক যদি এই অমৃত-সন্ধানীদের তাঁর জীবনের ইতিহাসের পাতে অপ্রধান করে তোলে তবে সে আপনার গভীরতম চেতনার সত্ত্বাকেই অপ্রধান করবে। এবং গণতান্ত্রিক যদি আপনার গভীরতম চেতনার সত্ত্বাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী অস্বীকার করে' চলতে কৃতকার্য্য হয় তবে হাজার দু'হাজার বছরে যে বিশ্বমানব মিসিং লিংকএর জাত-ভাইয়ে পরিণত হবে সে সম্বন্ধে কোনই ভুল নেই। কেননা বিশ্বমানব আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেচে সেটা মুষ্টিমেয় মানুষের ঐ গভীরতম চেতনার স্বপ্নের আলোকে আলোকে। তবে যদি অন্তরের গভীরতম চেতনার সত্ত্বাকে অস্বীকার করেও গণতান্ত্রিক এমন কল ও কৌশলের আবিষ্কার করতে সমর্থ হয় যাতে করে' রাশিয়ার বারো কোটি মানুষ বারো কোটি লেনিনে পরিণত হবে তবে তার চাইতে আনন্দের ব্যাপার আজ কি হ'তে পারে। কারণ তখন আমরা ধ'রে নিতে পারব যে Super-Leninএর আবির্ভাবের সময় হয়েছে। কেননা মানুষের সম্পূর্ণতা ব'লে কোন ছক-কাটা দাগ-দেওয়া সমস্ত পুঁটুলিত বস্তু বিশ্ব-প্রকৃতির বাজারে এপর্য্যন্ত দেখা দেয়নি। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই ত এইখানে যে সে চির-অসম্পূর্ণ। মানুষের অভিব্যক্তির অনন্ত সম্ভাবনা আছে বলেই শাশ্বত তার অসম্পূর্ণতা। যে গরু দিয়ে মানুষ চাষ করে সে গরুর সঙ্গে মানুষের প্রকাণ্ড পার্থক্যই এইখানে। সোশিয়ালিজম্ যদি সম্পূর্ণ করতেই চায় তবে তা সমস্ত গরুকেই সম্পূর্ণ করতে পারবে, সমস্ত মানুষকে নয়! কেননা মানুষের শেষ কথা কি তা মানুষ নিজেই জানে না।

একটা জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস ও তার

আধ্যাত্মিক ইতিহাস দুটো আলাদা ব্যাপার। রাজনৈতিক ইতিহাস মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার শৃঙ্খলার (বা বিশৃঙ্খলার) ইতিহাস—আর আধ্যাত্মিক ইতিহাস তার জ্ঞানার্জ্জনের, তার অমৃত আস্বাদের প্রচেষ্টার ইতিহাস। রাজনীতি হচ্ছে মানুষের প্রাকৃত ধর্ম্মকে নিয়ে, তার রাগ দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, আহারবিহার, শত্রুমিত্র এই সবকে ঘিরে—আর আধ্যাত্ম হচ্ছে মানুষের অতিপ্রাকৃত ধর্ম্মকে নিয়ে। মানুষের মধ্যে যে-একজন জ্ঞানপিপাসু, যে-একজন অমৃত-সন্ধানী আছে তাকে ঘিরে। মানুষের রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিচয় তার যুদ্ধবিগ্রহ আর্ম্মি, নেভি, পার্লিয়ামেণ্ট, মন্ত্রিসভা ইত্যাদিতে আর তার আধ্যাত্মিক ইতিহাসের পরিচয় তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান শিল্প সঙ্গীত রিলিজন ইত্যাদিতে। মানুষের রাজনীতির আরম্ভ অন্ন-বস্ত্রের প্রশ্নে—তার আধ্যাত্মের শেষ ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়। এই অন্নবস্ত্র থেকে আরম্ভ ক'রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত এই নিয়ে মানবের সমগ্র জীবন। কিন্তু মানুষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এম্নি কোলাহল এম্নি চীৎকার যে, তাই শুন্‌তে শুন্‌তে আমাদের কারো কারো মনে এই ধারণা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যে, ঐটেই মানুষের জীবনের আসল, তার আধ্যাত্মিক ইতিহাস না হলেও চলে, সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। কেননা আজও গভীর অরণ্যের অন্তরালে এমন সমাজ খুঁজে পাওয়া যাবে যার আধ্যাত্মিক ইতিহাস বলে কোন বস্তু নেই অথচ তাদেরও চল্‌ছে। কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে মানুষ সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চৈতন্যলোকে পরদার পর পরদা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়গুলি না হলেও চলে ঠিক সেই বিষয়গুলির দিকেই তার চিত্ত আকৃষ্ট হ'তে থাকে। আর এর কারণ হচ্ছে এই যে, তার জীবনে একদিকে যেমন এই বিষয়গুলির আনন্দ দান করবার ক্ষমতা বেশী অন্যদিকে তেমনি এদের সংস্পর্শে তার অন্তরের বৃহত্তর শক্তি উদ্বুদ্ধ হওয়ার ও সার্থক হ'য়ে উঠবার সম্ভাবনাও অধিক। জীবনে খাওয়া না হ'লে চলে না, কিন্তু প্রেম না হ'লেও চলে। কিন্তু তবুও সুযোগ পেলেই পেটুক প্রেমিক হ'য়ে উঠতে চায়, কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তার কারণ প্রেমানুভূতির যে আনন্দ দান করবার ক্ষমতা আছে চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-সমন্বিত একটা বিরাট ভোজের তা নেই। তাই ভীম নাগের একখানি সন্দেশ ও কিশোরীর একটি চুম্বন এ দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বল্‌তে কলেজের ছোক্‌রা যে কোন্ দিকে মুখ বাড়াবে তা বল্‌বার দরকার করে না। একটি ভোজ বাগানো বেশী কথা নয়, কিন্তু একখানি হৃদয় অর্জ্জন করা কঠিন। তাই পেটুকের চাইতে প্রেমিক আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রে নেয়।

আসলে মানুষের রাজনৈতিক জীবন একটা সীমাবদ্ধ জীবনের ইতিহাস আর আধ্যাত্মিক জীবন জীবনের একটা অনন্ত সম্ভাবনার আভাস। রাজনৈতিক জীবন যেন একটা বিশেষ বৃত্তের মধ্যেকার জীবন। সেই বৃত্তের পরিধির বাইরে এর যাবার উপায় নেই। সেই পরিধির মধ্যেই এ জীবন ঘুরছে ফিরছে উঠ্‌ছে বস[illegible] পরা সুখ দুঃখ সখ্য কলহ শান্তি সংগ্রাম নি[illegible] সেই বৃত্তের পরিধির মধ্যেই আবহমান [illegible] আপনাকে নানাভঙ্গীতে সাজিয়ে দে[illegible] এ-জীবনের রংই বদলায়, কিন্তু কাঠামো [illegible] প্রসাধনের সামগ্রীই বদলাচ্ছে, কিন্তু রূপ বদ্‌লাবার উপায় নেই। বহু প্রচেষ্টা, বহু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যদি এ-জীবন এমন অবস্থায় কোনদিন পৌঁছেই যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে উঠ্‌বে, যুদ্ধবিগ্রহ লুপ্ত হ'য়ে যাবে, শান্তি সহজলভ্য হ'য়ে থাক্‌বে তবুও তাতে বিশ্বমনের নূতন কিছু অর্জ্জন করা হবে না।

কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন মানুষের ঐ বৃত্তসীমা থেকে মুক্তির জীবন, মানুষের জীবনের অনন্ত সম্ভাবনার আভাস। যেন ঐ বৃত্ত পরিধি একস্থানে একটু ফাঁক হয়ে অনন্ত আকাশের অসীম আলোকের দিকে আপনাকে উন্মুক্ত করেছে। এইখান থেকে আরম্ভ মানুষের বৃহত্তর শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ—এইখান থেকে আরম্ভ মানুষের বৃহত্তর চেতনার কঠিনতর উদ্যমের নিবিড়তর আনন্দের জীবন। এইখানে মানুষের কথা কবিতা হয়ে ওঠে, হৃদয়ের সুখদুঃখ সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়, অন্তরের রাগ দ্বেষ, ইন্দ্রিয়াতীত রস বিগ্রহে পরিণত হয়। দৃষ্টি দিব্য হয়ে উঠে, অন্তরীক্ষ প্রত্যক্ষ

হয়ে ওঠে—মানুষ চেতনা থেকে চেতনান্তরে গিয়ে গিয়ে অবশেষে ভাবে—আমি মানুষ না দেবতা !—আমি মর্ত্ত্যের জীব না অমৃতের পুত্র ! মানুষ অতিমানুষ হতে চায়—ম্যান অসীম সাহসে বলে—আমি সুপারম্যান হব। এই হচ্ছে বিশ্বমানবের প্রগতির জীবন। তার ক্রমঃ উৎকর্ষ্যের পথ। তার উচ্চ থেকে উচ্চতর সার্থকতার সাধনা। বড় কবি রাশি রাশি ছোট কবিদের সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা হতে পারে। কিন্তু সে মানবচেতনার বৃহত্তর শক্তির রূপ বৃহত্তর কৃতার্থতা, বিশ্বমানবের বৃহত্তর গৌরব। সুপারম্যান যদি সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা হয়, যদি সমস্ত মানুষের অবনতির মূর্ত্ত প্রতীক হয় তবে বাপের অতি মেধাবী ছেলেটা সমস্ত পরিবারের সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা, সমস্ত পরিবারের অবনতির মূর্ত্ত প্রতীক—ভেতো ও ভীরু অপবাদ-ক্লিষ্ট বাঙালীর যে [illegible] সুদূর ব্রেজিলে গিয়ে বীরত্ব দেখিয়ে কর্ণেল হ'ল [illegible] বাঙালী জাতির সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা, অবনতির [illegible]তীক। কিন্তু আসলে সুপারম্যান সমস্ত মানুষের [illegible]র মূর্ত্ত প্রতীক নয়—সুপারম্যান হচ্ছে বিশ্বমানবের [illegible] গৌরব-শিখর। কেননা মানুষের চেতনার ঐ [illegible] পরম সামর্থ্যের পরিচয়। বৃহৎ শক্তি, বৃহৎ জ্ঞান, বৃহৎ আনন্দ মানুষের জীবনের অপরাধ নয়। এ-কাল পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতা এ-সবকে অভিনন্দিত করে এসেছে। ভবিষ্যতেও তাই করবে। গণতান্ত্রিকের সাময়িক রাজনৈতিক রোষ কিছুতেই তা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। কেননা ব্যক্তিগত সুখদুঃখের জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করবামাত্র মানুষের দৃষ্টি খুলে যাবে। আর তখন সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, দৈনন্দিন জীবনে কে কতখানি দুধ ঘি খাবে তারি ব্যবস্থা নিয়ে মানুষ যেখানে ব্যস্ত সেখানে সে তত বড় নয়, যত বড় সে যেখানে অনির্দ্দেশ্যের অভিযানে ছুটছে। একটি ক্ষুদ্র পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে যিনি বাজার সরকার বৃহত্তর জাতীয় জীবনে তিনিই রাজস্ব-সচিব হয়ে ওঠেন এবং রাজস্ব-সচিব যত বড় সাম্রাজ্যেরই রাজস্ব-সচিব হউন না কেন একটি কবিচেতনা চিরকালই তাঁর নাগালের বাইরে—যে-চেতনা ঊর্দ্ধতর লোকের আলোকে ও সঙ্গীতে উদ্ভাসিত ও পুলকিত সে-চেতনা পর্য্যন্ত পৌঁছিবার তাঁর কোনদিনই সম্ভাবনা নেই। রাজস্ব-সচিব আমাদের প্রয়োজনের, কিন্তু কবি আমাদের আনন্দের। তাই রাজস্ব-সচিব আমাদের আত্মীয়তার, কিন্তু কবি আমাদের পূজার। রাজস্ব-সচিব আমাদের জীবন-ধারণ, কবি আমাদের জীবনে প্রকাশ—রাজস্ব-সচিব আমাদের পথ-চলার খোরাক, কবি আমাদের সেই পথ-চলা—রাজস্ব-সচিব আমাদের দেহের, কিন্তু কবি আমাদের আত্মার। রাজস্ব-সচিব হচ্ছে নীচের ক্ষিতি ও জল আর কবি হচ্ছে উর্দ্ধের অগ্নি, বায়ু ও আকাশ।

সুতরাং কাবুলিওয়ালা তার বৈশ্য-আত্মা নিয়ে তার বৈশ্য-বুদ্ধি ও বিশেষ সীমাবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে বড়বাজারে বসে যে-কথাই বলুক না কেন বোলপুরে এসে যেন সে অনধিকার চর্চ্চা না করে। রাজস্ব-সচিব যেন না বলে যে, যেহেতু কবি লাঙল ঠেলে না সুতরাং জাতীয়-জীবনে সে পরভৃত-বৃত্তিক। গণতান্ত্রিক যেন না বলে যে সুপারম্যান হচ্ছে সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা সমস্ত মানুষের অবনতির মূর্ত্ত প্রতীক—মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রয়াস, তার অন্নবস্ত্রের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রচেষ্টা যেন না বলে যে মানুষের গভীরতর চেতনার যা-কিছু শক্তি, যা কিছু উদ্যম, যা কিছু আনন্দ সব স্বপ্ন—এক কথায় মানুষের রাজনৈতিক জীবন যেন না বলে যে, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড hallucination. কেননা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, এই দিকটাই হচ্ছে মানুষের মুক্তির দিক, তার গতির দিক, তার বৃহত্তর চেতনার বৃহত্তর প্রচেষ্টার বৃহত্তর আনন্দের দিক। সুতরাং একে অস্বীকার করার অর্থ বিশ্ব-মানবের ক্রমঃ কৃতার্থতার পথ রুদ্ধ করা।

কিন্তু যদি কোন সুসভ্য সমাজ একে অস্বীকার করেই তবে এ এম্‌নি একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা যে এই মিথ্যাকে নিয়ে সে সমাজ চিরকাল স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কর্‌তে পারবেই না—যদি না সেই সমাজের প্রত্যেক নরনারী যাদুমন্ত্র-বলে সহসা একেবারে মানবের আদিম অবস্থা প্রাপ্ত হয়—যদি না গভীরতর চেতন-লোকের সঙ্গে তাদের আত্মার যোগসূত্র নিঃশেষে ছিন্ন হ'য়ে যায়। এই মিথ্যার

মধ্যে একটা দারুণ অসোয়াস্তি ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সত্য হ'য়ে উঠ্‌বেই। তাদের মনে হবেই যেন কি থেকে তারা বঞ্চিত হ'য়ে হ'য়ে চলেছে। যেন কোন্ দূর তীর্থ লক্ষ্য ক'রে তারা যাত্রা করেছিল, কিন্তু মাঝের পান্থ-নিবাসই তাদের অসত্য ক'রে তুল্‌ল। তাদের কারো-না-কারো মনে এই কথাটা ধীরে ধীরে সত্য হ'য়ে উঠ্‌বেই যে, এই পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা যত নিবিড়, যত গভীরই হোক্ না কেন মানুষকে তা চিরকালের তৃপ্তি দিতে পারে না। মানুষ কেবল মানুষই নয়—সে যেন আরও কি। এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই পৃথিবী কতটুকু! তার মধ্যে আবার এই মানুষ কতটুকু! কিন্তু সেই মানুষের মনের হিসাব, আত্মার হিসাব পৃথিবীর ঐ ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে নেই—আছে ঐ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের মধ্যে। হাজার সুখ, শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য আরামের মধ্যেও সে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌বে—সুদূরের পিয়াসী হ'য়ে উঠ্‌বে। সে বল্‌বে—এইখানেই আমি শেষ নই—কোনোখানেই আমি শেষ নই। আমি চলব আমার চেতন-লোকের আলোকে আলোকে—আমার শক্তির ইসারায় ইসারায়—আমার আনন্দ-লোকের সুরে সুরে। আমি দেবতা—আমি অমৃত পিয়াসী—আমি—

সেদিন সে স্পষ্ট আবিষ্কার কর্‌বে যে, কাবুলিওয়ালা তাকে ঠকিয়েছে।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

১৪

প্রথম দিন ষ্টীমারে খাওয়া-দাওয়া লইয়া বিশেষ কিছু গোলমাল হইল না। ফল-মিষ্টি খাইয়া ইন্দু রহিল, সঙ্গে সঙ্গে মায়াও তাহাই করিল। বিকালের দিকে নিরঞ্জন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে ইন্দু, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ত ?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "আর কোনো অসুবিধে নেই মেজদা, কেবল এই খুপরীর মধ্যে বসে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। সামনের ঘরেই একগাদা মুসলমান, তাদের ভয়ে দরজাও খুলতে পারছি না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে দরজা খোল, কোনো ভাবনা নেই। ষ্টীমারে কেউ কিছু করতে কখনও ভরসা করে না। তা চল্ না একটু উপরের ডেকে বেড়াবি, সারাদিন কেবিনে বসে থাকার কি দরকার ?"

ইন্দুর বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু মায়া প্রস্তাব শুনিয়াই আঁৎকাইয়া উঠিল। বলিল, "না পিসিমা, কাজ নেই গিয়ে, যা লোকের ভিড়। সব হাঁ করে চেয়ে থাকে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "চেয়ে থাকলেই বা ক্ষতি কি তা না যেতে চাও যেয়ো না। আমার চেনা এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন সপরিবারে, তাঁদের কেবিনে যাবি ?"

ইন্দু বলিল, "ওমা তাঁরই গিন্নিকে তাহলে স্নানের ঘরে দেখলাম। বেশ ফরসা রং, চোখে চশমা, খুব মেমসাহেবী সাজ। তোমাকে চেনে বলেও বল্‌লে। কি নাম ভদ্রলোকের ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "নগেনবাবুর স্ত্রীই হবেন। জাহাজে বাঙালী মেয়ে আর কেউ নেই। চল্, যাবি ত নিয়ে যাচ্ছি।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "ঘর এমনি খোলা থাকবে নাকি ? এত জিনিষপত্র রয়েছে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তালা দিয়ে যাওয়া যাক। এখানে চোরের অভাব নেই। আমার কাছে তালা আছে নিয়ে আস্‌ছি।"

কেবিনে তালা বন্ধ করিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন। নগেনবাবুদের কেবিন কিছুদূরে, খুঁজিয়া

বাহির করিতে হইল। ভদ্রলোক কেবিনেই ছিলেন, নিরঞ্জনের ডাকে বাহির হইয়া আসিলেন। "ওঁরা ভিতরেই আছেন সব। চলুন, আমরা ডেকে বেড়াই," বলিয়া তিনি নিরঞ্জনকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

নগেনবাবুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মায়াকে এবং ইন্দুকে অভ্যর্থনা করিলেন। এখন আর তাঁহার অত সাজসজ্জা নাই। চুল খোলা, পরণে শান্তিপুরে শাড়ী, পায়ে মখমলের চটি।

মায়া এবং ইন্দু একটু সঙ্কুচিতভাবেই আসিয়াছিল, কিন্তু ভদ্রমহিলার সাদর সম্ভাষণে একটু যেন নিশ্চিন্ত হইয়া ভিতরে ঢুকিল। একটি বছর দশ বারোর ছেলে এবং একটি পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে অভ্যাগতাদের দেখিয়া ঝোলান খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বালক বলিল, "মা আমি চল্লাম বাবার কাছে।" মায়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল।

নগেনবাবুর স্ত্রী একটু হাসিয়া বলিলেন, "মণ্টু আমার ঐ একরকম। এমনিতে তো মুখে খৈ ফোটে, দুষ্টুমীর অন্ত নেই। কিন্তু বাইরের লোক যদি দেখলে তা হলেই হ'য়েছে। একেবারে দেশছাড়া হ'য়ে যাবে। ওরে বাণী, একটা মাদুর-টাদুর পেতে দেনা, এঁরা বসবেন।"

বাণী তাড়াতাড়ি একটা জাপানী ছবি আঁকা মাদুর আনিয়া কেবিনের মেঝেতে কোনোমতে জায়গা করিয়া পাতিয়া দিল। তাঁহাদের সবে বোধ হয় চা খাওয়া শেষ হইয়াছে, পেয়ালা, পিরীচ্, প্লেট্, সব চারিদিকে ছড়ানো। মায়া ত ছোঁয়াছুঁই হইবার ভয়ে একেবারে কোণ ঘেঁষিয়া যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচাইয়া বসিল। গৃহিণী ব্যাপারটা বুঝিয়া কন্যাকে বলিলেন, "পেয়ালা-টেয়ালাগুলো একটু এক জায়গায় করে রাখ, বয়টা এসে নিয়ে যাবে।"

বাণী সব কিছু এক ঠেলায় খাটের নীচে চালান করিয়া দিল এবং বোধ হয় অভ্যাগতাদের খাতিরেই তাহার পর হাতটা ধুইয়া ফেলিল।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এই দুটিই বুঝি? আর হয়নি?"

গৃহিণী বলিলেন, "আর একটি ছেলে আছে, সে ঘরে কিছুতেই থাকতে চায় না, চাকরের সঙ্গে ওপরে বেড়াচ্ছে। রাত্রে কেবল ভিতরে এসে শোয়, সারাদিন ডেকেই থাকে।"

ইন্দু বাণীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "মেয়ের বুঝি এখনও বিয়ে হয়নি?"

বাণী অকস্মাৎ ভয়ানক গম্ভীরভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার মা বলিলেন, "না, কৈ আর হয়েছে। ওঁর মেয়েদের ছোটবেলায় বিয়ে দেওয়া মত নয়। এখনও পড়ছে, গান-টান শিখছে।"

ইন্দু বলিল, "ওমা, তাহলে আমার মেজদারই দলের লোক। এই নিয়ে তাঁতে আর বৌতে তো চিরদিন লাঠালাঠি হ'ল। এখন অবিশ্যি তাঁর মতই চল্‌বে। বৌ তো মেয়ের বিয়ের সব জোগাড় করছিল, এমন সময় তার ডাক পড়ল।"

মৃতা জননীর প্রসঙ্গে মায়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। নগেনবাবুর স্ত্রী কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, "কি রে বাণী, মুখ হাঁড়ি করে বসে রইলি যে? মায়ার সঙ্গে একটু গল্প-স্বল্প কর না? এখন তো একদেশেই থাকবি। যদিও আপনাদের বাড়ী অনেকটাই দূরে, তাহ'লেও মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ তো হবেই।"

বাণী একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "এমনি বা কি দূর? কোকাইনে তো এখন ইচ্ছে করলে আধ ঘণ্টায়ই পৌঁছন যায়। বাবা যে সারাদিন গাড়ী নিয়ে খালি কাজে ঘোরেন, তা না হ'লে আমরা কত জায়গায় যেতে পারি।"

বাণীর মা হাসিয়া বলিলেন, "তোর বাবার না হয় একখানা মাত্র গাড়ী। মায়ার বাবা ত শুনছি মেয়ের জন্যে আগে থেকেই আলাদা গাড়ী কিনে রেখেছেন, তার বেড়াবার কিছু অসুবিধা হবে না। তখন মনে করে আমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে এস, মা লক্ষ্মী।"

মায়া চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল। বাণীর সঙ্গে গল্প করিতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল বটে, কিন্তু কি কথা যে সে বলিবে তাহা ভাবিয়াই পাইল না। ইন্দু

জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা এর মধ্যে মেয়ের জন্তে গাড়ীও কিনে রেখেছেন নাকি? মেয়ে যে আসবে তার তো কিছু ঠিক ছিল না? হঠাৎ বৌ মারা যাওয়াতেই না নিয়ে যেতে হল?"

নগেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "মনে মনে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে বোধ হয় অনেক দিন থেকে। আমরা তো কবে থেকে শুনছি বাড়ী সাজাচ্ছেন, গাড়ী কিনছেন, মেয়েকে পড়াবার মাষ্টার-শুদ্ধ ঠিক করে রেখেছেন।"

মায়ার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তাহার বাবা তাহা হইলে সর্ব্বদাই তাহার কথা মনে করিতেন? সে দেশে বসিয়া মনে করিত তিনি তাহাকে ভুলিয়াই গিয়াছেন বুঝি।

বাণী এতক্ষণে মায়ার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সহরে কখনও থাকনি বুঝি?"

মায়া বলিল, "দু একবার কলকাতায় এসেছি। কিন্তু কলকাতা আমার ভাল লাগে না, সারাদিনই ঘরে বন্ধ থাকতে হয়। আর এত গোলমাল, কানে তালা লেগে যায়।"

বাণী বলিল, "তাহলে তোমার কোকাইনে ভালই লাগবে। লোকও নেই, জনও নেই, ধূ ধূ করছে মাঠ, আর লেক্। আমার কিন্তু ও-সব জায়গায় মোটেই ভাল লাগেনা বেশীক্ষণ। এই "পিক্‌নিক্" করতে গেলাম, খানিক সবাই মিলে হৈ চৈ করে বাড়ী চলে এলাম, এইরকম হলে ভাল লাগে।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী বুঝি একেবারে সহরের মধ্যে?"

বাণী বলিল, "আরে বাপ্‌রে! সহরের মধ্যে বলে মধ্যে! একেবারে যত থিয়েটার আর বায়োস্কোপের আড্ডায়, দুপুর থেকে রাত সাড়ে এগারোটা অবধি ব্যাণ্ডের শব্দ সমানে চলে। আমার কিন্তু কিছু খারাপ লাগে না, দিব্যি সয়ে গেছে। চুপচাপের মধ্যেই বরং টিকতে পারি না, সময় আর কাটতেই চায় না। মায়ের অসুখের জন্তে একবার কিছুদিন ইন্‌সিনে গিয়েছিলাম, আমার তো প্রাণ বেরোবার জোগাড়। আচ্ছা, তুমি কখনও বায়োস্কোপ দেখেছ?"

মায়া বলিল, "কলকাতায় গিয়েছিলাম একদিন।"

বাণী জিজ্ঞাসা করিল "কি ছবি ছিল সেদিন?"

মায়া বলিল "তা তো জানি না। সব ইংরিজীতে লেখা, বুঝতেও পারলাম না কিছু।"

বাণী জিজ্ঞাসা করিল, "ইংরিজী তুমি একেবারেই পড়নি বুঝি?"

মায়া একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "না, কার কাছে পড়ব? মা বাংলা আর সংস্কৃত জানতেন, তাই তাঁর কাছে কিছু কিছু পড়েছিলাম।"

বাণী বলিল, "তা তোমার বাবা এইবার তোমাকে নিশ্চয়ই সব শেখাবেন। তাঁর তো খুব সাহেবী পছন্দ বলে শুনি। আমার বাবাও আধাআধি সাহেব, তবে মায়ের জন্তে বেশী কিছু করে উঠতে পারেন না।"

মায়ার ইচ্ছা হইল বলে যে তোমার মাও তো দিব্য মেমসাহেব দেখা যাইতেছে, কিন্তু সেটা হয়ত ভদ্রতা-সঙ্গত হইবে না, মনে করিয়া সে চুপ করিয়া গেল।

ইন্দুতে এবং বাণীর মা-তেও বেশ গল্প জমিয়া উঠিয়াছিল। মেয়েদের গল্প করিবার বিষয়ের কখনও অভাব হয় না, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষার যতই প্রভেদ থাকুক না কেন।

ইন্দু বলিতেছিল, "ভালই হল জাহাজে আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে। একেবারে অচেনা জায়গায় যাচ্ছি, তবু দু চারটে মানুষের সঙ্গে চেনাশোনা থাকলে, একটু যাওয়া-আসা হবে, দুটো কথা বলে বাঁচব।"

বাণীর মা বলিলেন, "নিশ্চয় যাব, আপনিও আসবেন। আমিও যখন প্রথম আসি, তখন পাঁচ ছ'মাস কেঁদেই মরতাম। একটা মানুষ নেই যে কথা বলি, বাড়ীতে শুধু আমি আর এক মাদ্রাজী আয়া। না তার কথা আমি বুঝি, না সে আমার কথা বোঝে। ভয়েই কাঁটা হয়ে থাকতাম। উনি তো সেই দশটায় বেরতেন, আর রাত সাড়ে ন'টায় ফিরতেন। ভাবতাম মাদ্রাজী বুড়ী যদি আমার গলা টিপে মেরে সর্ব্বস্ব নিয়ে পালায়, তা না বলবার কেউ নেই। ক্রমে সয়ে গেল। মেয়েটাও হল, তখন আর খালি খালি লাগত না।"

ইন্দু বলিল, "কতদিন আছেন এ দেশে?"

বাণীর মা বলিলেন, "তা ষোলো বছর নিশ্চয় হবে। এখন এই দেশই নিজের দেশের মত হয়ে গেছে। দেশে গেলেই বরং অসুবিধা ঠেকে। এদেশে নিজেই গিন্নী গোড়া থেকে, শাশুড়ী ননদ নিয়ে কখনও ঘর করতে হয়নি। চাল-চলন সব স্বাধীন হয়ে গেছে, দেশে ঠিক মানিয়ে চলতে পারি না, পদে পদে নিন্দে হয়।"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, মেয়েমানুষেরও আপদ তো লেগেই আছে। প্রাণপাত করে খাটলেও নিন্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। নিজেরাই আমরা নিজেদের সব চেয়ে বড় শত্রু। ঘরের বউকে কষ্ট তো আর শ্বশুর ভাসুরে দিতে আসে না, শাশুড়ী ননদেই দেয়।"

বাণীর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ছেলে পিলে ক'টি ?"

ইন্দু হাত উল্টাইয়া বলিল, "ও সব ভগবান দেননি, ভালই করেছেন। দেখছেন তো কপাল, এমনি একলা আছি, তাই ভাইদের ঘাড়ে চড়ে খাচ্ছি, ছেলেপিলে থাকলে আবার তাদের খোরাকী জোটাতাম কোথা থেকে ?"

নগেনবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "ওমা, ভাগ্নে-ভাগ্নীকে কি আর আপনার ভাইরা ফেলে দিত ? আর তাঁদের অভাব কিসের ? তাঁদের টাকায় বলে বাইরের দু'শো লোক খাচ্ছে।"

ইন্দু বলিল, "যাক্ গে ভাই, নেই যখন তার জন্যে ভাবনাও নেই। ভাইদেরই ছেলেপিলে মানুষ করে আমার দিন কেটে যাবে। এই দেখ না, বউ মরে একটা তো আমার ঘাড়ে দিয়ে গেল। ভাবছিলাম একটু তীর্থ ঘুরে আসব, না ভাইঝি আগ্‌লাতে এসে জুটলাম বর্ম্মায়। এখন কতদিনে ছাড়া পাব কে জানে।"

বাণীর মা বলিলেন, "ভাইঝির বর জুটবার আগে ক আর ছাড়া পাবেন, তা তো মনে হয় না। আর আপনার ভাইয়ের যেরকম সাহেবী পছন্দ, মেয়েকে ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে তবে তো বিয়ে দেবেন ? কাজেই এখন বছর-কতকের মত নিশ্চিন্ত।"

এমন সময় নগেনবাবু এবং নিরঞ্জন বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নিরঞ্জন বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ইন্দু, এখন চল্। আবার কাল আসিস্ এখন।"

ইন্দু এবং মায়া বাহির হইয়া আসিল। নিজেদের কেবিনে আসিয়া ইন্দু বলিল, "কিরে মায়া, এ বেলাও খাবি না কিছু ?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "না খেয়ে তিনদিন তো কাটাতে পারবে না, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।"

মায়া বলিল, "আজ ফল-মিষ্টি খেয়ে বেশ থাকতে পারব। কাল যদি থাকতে না পারি তো অন্য কিছু খাব।"

ইন্দু বলিল, "একটা তোলা উনুন পেলে ঘরেই ওকে চাল ডাল দুটো ফুটিয়ে দিতাম, কোনো আপদ থাকত না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ষ্টোভ জোগাড় করতে পারি, কিন্তু কেবিনের মধ্যে তো জ্বালাতে পারবি না, ডেকে গিয়ে জ্বালাতে হবে। সেখানে তোর গিয়ে রান্না করা পোষাবে না। দেখি রাঁধবার লোক যদি জোগাড় করতে পারি।"

মায়া ফিস ফিস করিয়া বলিল, "আমি যার তার রান্না কিন্তু খাব না।" নিরঞ্জন মেয়ের কথা বোধ হয় শুনিতে পান নাই, তিনি কেবিন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দু শাসনের সুরে বলিল, "সব কিছু নিয়ে প্যান্ প্যান্ করিস্ নে। মেজদা শেষে চটে যাবে। এখন বাপে যেমন চালাবে, তেমনি চল্‌তে হবে।"

রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভয়ে তাহারা শুইতেই পারিল না। দরজার খিল বন্ধ করিয়াও তাহাদের তৃপ্তি হইল না, বড় ট্রাঙ্ক বিছানা সব কিছু টানিয়া আনিয়া দরজার কাছে জড় করিল। তাহার পর অনেকক্ষণ জাগিয়া পিসি-ভাইঝিতে কথা বলিল। অবশেষে জাহাজের শব্দে এবং দোলানীতে কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

ইন্দুর খুব ভোরেই উঠা অভ্যাস। সে যখন জাগিল তখন যাত্রীদের ভিতর আর কেহই উঠে নাই বোধ হয়। মায়াকে তুলিয়া বলিল, "কারো তো সাড়াশব্দ পাই না রে, দরজা খুলব, না এখন থাকবে ? লোকজনের ভিড় সুরু হবার আগে স্নানটানগুলো সেরে আসতে পারলে হত।

মায়া বলিল, "বাক্সগুলো তো সরানো যাক্, তারপর উঁকি মেরে দেখব। যদি দু-একটা লোকও উঠে থাকে, তাহলে চট্ করে গিয়ে নেয়ে আসব।"

দুইজনে টানাটানি করিয়া দরজার সামনের বাক্স প্রভৃতি সরাইয়া ফেলিল। তারপর দরজা খুলিয়া একবার উঁকি মারিল। জনমানবের চিহ্ন নাই।

ইন্দু বলিল, "কাজ নেই বাপু বেরিয়ে। শেষে কি হতে কি হবে। মেজদাদা আগে আসুক।"

সৌভাগ্যক্রমে নিরঞ্জন খুব বেশী দেরী করিলেন না। সেদিনকার মত ইন্দু এবং মায়া বেশ নির্ব্বিবাদেই স্নান সারিয়া লইল।

নিরঞ্জন অনেক চেষ্টা করিয়াও পত্নী সাবিত্রীকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। বাপ-মায়ের ঘরে সে যে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল, সে শিক্ষা কোনক্রমেই তাহাকে ভুলান গেল না। দেখিয়া শুনিয়া নিরঞ্জনের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বাল্যকালের শিক্ষাই আসল শিক্ষা। কন্যা জন্মগ্রহণ করার পরেই তিনি তাহাকে নিজের আদর্শানুযায়ী গড়িয়া তুলিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারেও ভাগ্য বিরূপ হওয়ায় এতদিন পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন মায়াকে লইয়া যাইতেছিলেন বটে, কিন্তু তাহার রকম-সকম দেখিয়া তাঁহার মনে একটা সংশয় ক্রমেই বেশী করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। সাবিত্রীরই মেয়ে ত? ইহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালান যাইবে কি না সন্দেহ! তবে ভালবাসায় অসাধ্য সাধনও হয়। মেয়ের ভালবাসা লাভ করিতে যদি পারেন, তাহা হইলে তাহাকে বাগ মানান কঠিন হইবে না। সাবিত্রীর নিকট তাঁহার পরাজয়ের কারণই এখানে। স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই। তাই স্বামীকে সুখী করিবার জন্য কোনো ত্যাগস্বীকার তাহার পক্ষে সহজ হয় নাই।

নিরঞ্জন ষ্টীমারেই নিজের প্ল্যান ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মায়াকে হঠাৎ একেবারে বদলাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে কোনই লাভ হইবে না। এখন তাহার মন মাতৃ-বিচ্ছেদের দুঃখে অভিভূত, মাতার স্মৃতি সে স্বভাবতঃই বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবে। অল্পে অল্পে তাহাকে নিজের মতে আনিতে হইবে। বাধ্যতাটা মায়ার খুব ভালই অভ্যাস হওয়ার কথা। পিতার বাধ্য তাহার হওয়া উচিত, ইহা কোনোপ্রকারে বুঝিয়া লইলে তাহাকে চালান শক্ত হইবে না।

দ্বিতীয় দিনও মায়ার জাহাজের খাবার খাইতে প্রবল আপত্তি দেখা গেল। ইন্দু বলিল, "তবে কি শুকিয়ে মরবি? তোর আমার সঙ্গে পাল্লা দেবার এত সখ কেন রে? আমার মত পোড়া কপাল যেন শত্রুরও না হয়। চিরদিন মাছভাত খেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে তোরা থাকবি, তোদের এ সব করার কি দরকার?"

মায়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "তাই বলে যার-তার হাতে আমি খেতে পারব না। ভাণ্ডারী যে হিন্দু বলছ, তা ও তো মুরগীও রাঁধে দেখি, সব ছোঁয়াছুঁই করে দেবে ত?"

নিরঞ্জন দাঁড়াইয়া ভগিনী এবং কন্যার তর্কাতর্কি শুনিতেছিলেন। মায়া ভাণ্ডারীর হাতে খাইতে কিছুতেই যখন রাজী হইল না, তখন তিনি অন্য উপায় কিছু করিতে পারেন কি না দেখিতে বাহির হইয়া গেলেন।

সৌভাগ্যক্রমে উপায় একটা শীঘ্রই হইয়া গেল। নগেনবাবুদের সঙ্গে তাঁহাদের পুরাতন দারোয়ান রামনরেশ চলিয়াছিল। সে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ষ্টীমারে সেও ফল খাইয়াই থাকে, রান্না করা জিনিষ খায় না। মাছমাংস জীবনে স্পর্শও করে নাই। বখশিসের লোভে এবং প্রভুর অনুরোধে সে একবার করিয়া মায়ার জন্য খিচুড়ী ও ভাজা প্রস্তুত করিয়া দিতে রাজী হইল।

নিরঞ্জন কেবিনে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "চাল, ডাল, ঘি আর তরকারিগুলো বার করে দে ইন্দু। নগেনবাবুর বুড়ো দারোয়ান রেঁধে দেবে। সে তোদের চেয়েও ঢের ভাল হিন্দু। মাছমাংস তাদের চৌদ্দপুরুষে কেউ কোনদিন ছোঁয়নি। তুইও তো খেতে পারিস্ তার হাতে।

ইন্দু ভাঁড়ার বাহির করিতে করিতে হাসিয়া বলিল, "আমার আর কাজ নেই দাদা। এজন্মটা এমনিই কেটে যাক। আমার কষ্টও কিছু হয় না। ব্রতেব্রতে কতবার লম্বা লম্বা উপোস করেছি, তাতেও কোনো কষ্ট হয়নি।"

নিরঞ্জন চলিয়া গেলেন। মায়া বলিল, "সময় আর কাটতে চায় না পিসিমা। এই এক খাঁচার মধ্যে বসে

বসে প্রাণও হাঁপিয়ে উঠেছে। ক্রমাগত ঘণ্টা গুণছি কতক্ষণে নামব ডাঙায়। মাগো মা, ডেকের লোকগুলো কি করে যে যাচ্ছে জানি না।"

ইন্দু বলিল, "যাক আর একটা দিন তো কেটেই যাবে। বাণীদের ওখানে যাবি? গিন্নিটি লোক মন্দ নয়, যতই মেমসাহেবী সাজ করুক।"

মায়া বলিল, "মেয়েটা বোধ হয় একটু দেমাকে। আমি ইংরিজী জানি না, তাদের মত ঘাঘরা, জুতো মোজা পরি না বলে আমাকে সে একটা কি-না-কি মনে করে। বাবা, রেঙ্গুনের সব মানুষ যদি অমনি হয়, তাহলেই গিয়েছি।"

ইন্দু বলিল, "তা বেশীর ভাগই ঐ রকম হবে বৈকি। আমাদের পাড়াগাঁয়ের মত ধরণধারণ তুই সহরে কোথায় পাবি? তাও আবার এই সাগর-পারের সহরে। এখানে কে কার ধার ধারে? ক্রমে তোরও সয়ে যাবে।

এমন সময় দরজার গায়ে বাহির হইতে কে ঠক্ ঠক্ করিয়া টোকা মারিল। মায়া বলিল "কে আবার এল? দরজা খুলব?"

ইন্দু বলিল, "তুই বড় ভীতু। দিনদুপুরে কি চোর আসবে, না ডাকাত?" সে নিজেই উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া নগেনবাবুর স্ত্রী এবং বাণী। ইন্দু হাসিয়া বলিল, "আসুন, আসুন, অনেকদিন বাঁচবেন, এখনি আপনাদের কথাই হচ্ছিল।"

নগেনবাবুর স্ত্রী ঢুকিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? খুব গাল দিচ্ছিলেন বুঝি? সাহেবীয়ানা করি, বয়দের হাতে খাই বলে?"

ইন্দু বলিল, "ওমা কোথায় যাব। গাল দিতে গেলাম কেন? যে দেশের যেমন। আর সধবামানুষের কি আর অত বাছ-বিচার করলে চলে? স্বামী যেদিকে চালাবে সেইদিকে চলবে। এই নিয়ে বউকে আমি কত বকতাম। তা সে কি আর কারো কথা শোনবার মেয়ে ছিল? স্বামীর কথাই উড়িয়ে দিত, তা আমরা। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

মা মেয়ে বসিলেন। বাণী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, একবারও যে তুমি 'ডেকে' যাও না? ভাল লাগে না?"

মায়া বলিল, লোকের ভিড় বড্ড বেশী, আর এত হাওয়া, আমার ভয়ই করে।"

বাণী বলিল, "হাওয়াই তো ভাল, কেবিনের মধ্যে বসে বসে তো মাথা ধরে ওঠে।"

মায়া বলিল, "কেবিনেও ভাল লাগে না। এর চেয়ে ট্রেনে যাওয়া ঢের ভাল। কতবার দাঁড়ায়, কতলোক ওঠে নামে, একরকম করে সময় কেটে যায়। এ তিনদিন ধরে চলেছে তো চলেইছে। জল ছাড়া কিছু দেখাও যায় না।"

বাণী বলিল, "ট্রেনের যেমন সুবিধে তেমনি অসুবিধেও আছে। কেবিনে তবু নিজের মত ব্যবস্থা করে থাকা যায়। যত ছোট জায়গাই হোক বাইরের লোক এসে ঘাড়ে পড়ে না। ট্রেনে তো রাত্রেও আরাম করে শোবার জো নেই, কখন্ কোন ফিরিঙ্গী এসে গুঁতো মারবে, তার ভয়ে জড়সড় হয়ে থাক। জিনিষপত্রও চুরি যাবার ভয়।

তাহার মা বলিলেন, "আর জাহাজে বুঝি সবাই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির? সেবার আমার স্যুটকেস্-শুদ্ধ চুরি হয়ে গেল না?"

বাণী বলিল, "সে যদি তুমি এখন ঘরদোর খুলে দিয়ে বেড়াতে চলে যাও, তো লোকে চুরি করবে না?"

ইন্দু বলিল, "আমার ট্রেন বা ষ্টীমার কিছুই ভাল লাগে না বাপু। ঘরের মানুষ কতক্ষণে ঘরে ফিরব, তাই কেবল ভাবি।"

বাণীর মা বলিলেন, "কাল বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাব যেমন করে হয়। গিয়ে ঘর-দোরের কি ছিরি দেখব, তাই কেবল ভাবছি। আপনাদের সে সব ভাবনা নেই, বেশ পাতানো ঘরকন্নার মধ্যেই গিয়ে পড়বেন।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "একলা পুরুষমানুষ, তার আবার ঘরকন্না। চাকরবাকরও তো শুনছি সব মাদ্রাজী, আর মুসলমান। বাঙালী চাকর একটা ঠিক করে রাখতে মেজদা তার করেছিল, তা পেরেছে না কি কে জানে। আমাদের তো দেখছেন, একেবারে অজ পাড়াগেঁয়ে, নিজেদের ব্যবস্থা সব নিজেরাই গিয়ে কর্‌তে হবে।"

নগেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ভাত ছড়ালে আবার

চাকের অভাব! চাকর যথেষ্টই পাবেন, তবে কোনো কাজের হবে কি না জানি না। চাটগেঁয়ে আর নোয়াখালীর লোকই বেশী, তাদের কথা বুঝতেই প্রাণ বেরবে। তার উপর চোর যা! দু-টাকার বাজার করতে দেন তো এক টাকা বার আনা পারলে চুরি করে রাখবে। বাবুগিরি যা এক একজনের! কে বাবু, কে চাকর, কিছু বোঝবার জো নেই। মাইনে এক একটির কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকা করে।"

ইন্দু গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, চাকরের মাইনে কুড়ি-পঁচিশ টাকা! কলকাতায় এল-এ, বি-এ, পাশ করা মানুষেই পঁচিশ টাকার কাজের জন্যে হাঁ করে থাকে।"

গল্পস্বল্প করিয়া ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তাহার পর নগেনবাবুর পুত্র মন্টু আসিয়া খবর দিল ভাণ্ডারী রান্না করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সুতরাং বাণী এবং তাহার মা নিজেদের কেবিনে ফিরিয়া গেলেন।

মায়ার খাবারও আসিয়া পৌছিল। রামনরেশের রান্না খাইয়া তাহার জাত বাঁচিল বটে, তবে জিহ্বা একান্তই অতৃপ্ত থাকিয়া গেল। বাসন-কোশন মায়া নিজেই কোনো মতে ধুইয়া রাখিল, কারণ ব্রাহ্মণ মানুষ উচ্ছিষ্ট কিছুতেই স্পর্শ করিবে না। কেবিনে যেটুকু জল ছিল তাহা বাসন ধুইতেই খরচ হইয়া গেল।

হঠাৎ বাহিরে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। ইন্দু গলাটা একটুখানি দরজার বাহিরে বাড়াইয়া বলিল, "ওমা বাণীর মায়ের গলা না? এ রকম করে কাকে বকছে?"

পর মুহূর্ত্তেই একটা ছোকরা মেয়েদের স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। বাণীর মাও বকিতে বকিতে বাহির হইয়া আসিলেন। "অভি ক্যাপ্টেন কো পাস্ বোলেগা, তুম লোককো কুছ্ আক্কেল নহি, জেনানা গোসোলখানামে ক্যা ওয়াস্তে গিয়া?"

একজন বিপুলাকার মাড়োয়ারী সামনের একটা কেবিন হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাণীর মাকে সে কি যেন বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ভদ্র-মহিলা তখন এতই উত্তেজিত, যে, তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, বকিয়াই চলিলেন। ব্যাপার কতদূর গড়াইত বলা যায় না, তবে নগেনবাবু আসিয়া পড়াতে সহজেই চুকিয়া গেল।

"বাবু, ও ছোক্‌রা পড়নে নহি জানতা, আউর কভি নহি যায়েগা," বলিয়া মাড়োয়ারী তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিল। গৃহিণী বকিতে বকিতে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইন্দু বলিল, "নগেনবাবু না থাকলে গিয়ে শুনে আসতাম কি হল। বাবা, এ সহজ স্থান নয় দেখছি। মানে মানে নেমে যেতে পারলে বাঁচি।"

মায়া বলিল, "একলা আর ওদিকে যেয়ো না, পিসিমা, এ লোকগুলো সব ভয়ানক দুষ্টু।"

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নগেনবাবু সর্ব্বদাই নিরঞ্জনের কেবিনে আড্ডা দিতে প্রস্থান করিতেন। গৃহিণীকে ঠাণ্ডা করিয়া আবার যে তিনি বাহির হইয়া যাইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। সুতরাং অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, ইন্দু আর মায়া কেবিনে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কয়েকবার যাওয়া-আসার ফলে তাহারা এখন পথ চিনিয়া ফেলিয়াছিল।

দরজায় টোকা দিতেই বাণী দরজা খুলিয়া দিল। নগেনবাবুর স্ত্রী এখন দিব্য নিশ্চিন্তভাবে একখানা বাংলা মাসিকপত্র পড়িতেছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির চিহ্নও আর তাঁহার মধ্যে ছিল না।

ইন্দু ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল দিদি? ও ছোঁড়াটা কি করেছিল?"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "করবার ওর বাপের সাধ্যি আছে? স্নানের ঘরে গিয়েছি, দেখি হতভাগা দিব্যি মেয়েদের স্নানের ঘরে ঢুকে মুখ ধুচ্ছে। গালাগালি দিতেই ছুটে পালাল।"

মায়া বাণীকে বলিল, "তোমার মায়ের তো খুব সাহস ভাই। আমি হ'লে তো ভয়েই মরে যেতাম।"

বাণীর মা বলিলেন, "তোমাদের তো ভয় লাগবেই মা, ছেলেমানুষ তোমরা। আমাদের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমাদের কি এখন অত ভয় করলে চলে?"

ইন্দু বলিল, "শুধু বয়সেই কি আর সাহস হয়?

আমারও তো বয়স কম হয় নি, কিন্তু দশ হাতের মধ্যে অচেনা লোক দেখলে এখনও মুখ শুকিয়ে যায়।"

বাণীর মা বলিলেন, "ওটা কি জানেন ভাই, দায়ে পড়লে সাহস করতেই হয়। আপনারা চিরকাল আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থেকেছেন, ভয় পাবার কোনো কারণই আপনাদের ঘটে নি। আমাদের অল্পবয়সেই বিদেশে আসতে হ'য়েছিল, আগ্‌লাবার কেউই ছিল না। আর রেঙ্গুনের যা সব বাড়ী! এক এক বাড়ীতে ছত্রিশ জাতের [illegible], কাঠের তক্তা দিয়ে শুধু তফাৎ করা। তার ভিতর চোর, জোচ্চোর, গাঁটকাটা, ডাকাত সবই থাকতে পারে। সারাদিন তো পুরুষমানুষরা বাইরেই ঘোরে টাকার খোঁজে, নিজেদের সাহসের উপর নির্ভর করে মেয়েদের একলাই থাকতে হয়। কতবার বর্ম্মা ফিরিঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে, কর্ত্তা বাড়ী নেই, নিজেই গলা জাহির করে জিত্‌তে হয়েছে। দেশের মত ঘোমটায় ঢাকা কনে-বউ হয়ে থাকলে কি এ সব জায়গায় চলে? কথায় বলে মগের মুল্লুক। এখানে চাকরে শুদ্ধ কথায় কথায় মনিবের গলায় ছুরি দেয়।"

ইন্দু বলিল, "তবেই হয়েছে। খুব তো আপনি বলে দিলেন। আমি তো ভয়েই মরে থাক্‌ব দেখছি। দেশ ছেড়ে এমন জায়গায় সব ম'তে আসে কেন?"

নগেনবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনার আবার ভাবনা! মস্ত বাড়ীতে গুণ্ডা চাকর নিয়ে থাকবেন।"

ইন্দু বলিল, "চাকরাও তো ভাল নয় বল্‌ছেন।"

বাণীর মা বলিলেন, "সবাই কি আর একরকম? ওর মধ্যে ভালোও আছে। আপনার দাদার ওখানে দরোয়ান, মালী—এগুলো অনেক দিনের পুরণো, তাদের উপর বেশ বিশ্বাস করা যায়।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "বিশ্বাস না করে যখন উপায় নেই, তখন বিশ্বাস করতেই হবে।"

(ক্রমশঃ)

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা বিদ্যাপীঠ

বোম্বাইয়ের শেঠ মূলরাজ খাটাও এবং তাহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র শেঠ ত্রিকম্‌দাস ও শেঠ গোর্দ্ধন দাস খাটাও তিনজনে মিলিয়া হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মহিলা বিদ্যাপীঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আড়াই লক্ষ টাকা দান করেন। টাকা লইয়া কিছুদিন কিছু গোলমাল চলে—এই অবসরে সুদ সমেত সেই টাকা দুই লক্ষ চৌরাশী হাজারে দাঁড়ায়। তাঁহারা টাকা দান করিবার সময় এই কয়টি সর্ত্ত করেন—

১। চৌরাশী হাজার টাকা ইমারৎ ইত্যাদিতে ব্যয় হইবে ও বাকী দুই লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী ফণ্ডের সুদ হইতে কলেজের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

২। কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হইবে ও ছাত্রীনিবাসে ব্যয়ের জন্য ছাত্রীদের নিকট হইতে কোনও [illegible] হইবে না।

৩। এই মহিলা বিদ্যাপীঠটি সম্পূর্ণ নারীদের দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং ইহাতে পুরুষদের প্রবেশাধিকার থাকিবে না।

লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া এই কলেজ-গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে, বাকী টাকা জমা আছে। তাহারই সুদ হইতে কলেজের ও ছাত্রীনিবাসের সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। এই সুদ মাসিক হাজার টাকার কিছু কম—ইহা ছাড়া কলেজের বা ছাত্রীনিবাসের আর কোনও আয় নাই।

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথেই বাট বিঘার উপর জমি ঘিরিয়া তাহার মধ্যে মেয়েদের কলেজ নির্ম্মিত হইয়াছে। কলেজ বাড়ীটি সম্প্রতি দ্বিতল। একতলাতে একশত ছাত্রীর থাকিবার ব্যবস্থা আছে এবং দোতলায় কলেজের ক্লাস হয়।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা বিদ্যাপীঠ—শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীবৃন্দ

ছাত্রীসংখ্যা—হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বর্ত্তমান চল্লিশ।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণী (আর্টস্)	১২		
দ্বিতীয় „ „	১০	বিজ্ঞান	১
তৃতীয় „ „	৫	„	১
চতুর্থ „ „	৪		
পঞ্চম „ „	৪		
ষষ্ঠ „ „	১		
আইন (প্রারম্ভিক)	১		

তাহার মধ্যে বাঙালী ১৩, হিন্দুস্থানী ও বিহারী ১২, পাঞ্জাবী ৩, মারাঠি ও গুজরাটী ৬, মাদ্রাজী ২, আসামী ২।

ইঁহাদের মধ্যে ৭টি সধবা, ৬টি বিধবা ও তিনজনের ছেলেমেয়ে আছে।

ছুটি ছাত্রী তাঁহাদের কন্যাদের লইয়াই ছাত্রীনিবাসে থাকেন ও পড়াশুনা করেন।

মেয়েদের কলেজে বর্ত্তমান কেবল আর্ট্‌স্ বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী খোলা হইয়াছে। বাকী ছাত্রীরা ও ইণ্টারমীডিয়েট বিজ্ঞানের ছাত্রীরা হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সহিত পড়াশুনা করেন।

কলেজের হাতায় মেয়েদের টেনিস, ব্যাডমিণ্টন ও বাস্কেট-বল খেলিবা'র ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বর্গ মাইল পরিমিত প্রশস্ত স্থানের ভিতরে যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে পারেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের ইচ্ছা আছে, যে, কলেজের আরও কিছু আয় বাড়িলে মেয়েদের জন্য হাতার ভিতরে সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুক ছোঁড়া ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। হাতার ভিতর তাহার জন্য স্থান রাখা হইয়াছে। মেয়েদিগকে শারীরিক স্বাস্থ্য ও পটুতা লাভের জন্য এবং আত্মরক্ষায় সমর্থ করিবার নিমিত্ত

বড়োদা রাজ্যে প্রবর্ত্তিত মেয়েদের উপযোগী কতকগুলি দেশী খেলা এবং লাঠি খেলা ও জিউজিৎসু শিখান উচিত।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মহিলা বিদ্যাপীঠের রচনা করা হইয়াছে—তাহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

১। উন্মুক্ত ও স্বাস্থ্যকর স্থানে কলেজটি অবস্থিত হওয়ায় এবং মেয়েদের ঘুরিয়া বেড়াইবার স্বাধীনতা আছে বলিয়া ছাত্রীদের স্বাস্থ্য এখানে সাধারণতঃ ভাল থাকে।
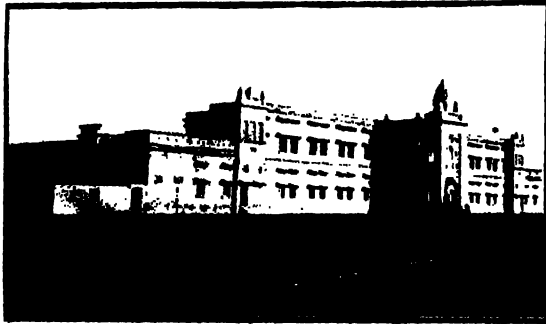
কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা বিদ্যাপীঠ

২। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে মেয়েরা এখানে আসিয়া যোগদান করে বলিয়া আশা করা যায়, যে, ভবিষ্যতে ইহাদের প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ ভাব কাটিয়া গিয়া জাতীয়তার উদার ভাব পরিস্ফুট হইবে, অথচ প্রাদেশিক বিশিষ্টতাও রক্ষিত হইবে।

৩। এখানে মধ্যবিত্ত ও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিশেষ সুবিধা আছে। কারণ মেয়েদের নিকট হইতে শিক্ষার জন্য বা ছাত্রী-নিবাসে বাসের জন্য কোনও প্রকার ফী লওয়া হয় না। কেবলমাত্র তাহাদের খাওয়া ও আলো ইত্যাদির জন্য মাসিক ১৮৲ আন্দাজ খরচ হয়। ইহার জন্যও শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিরলা তাঁহার স্বর্গগতা পত্নী শ্রীমতী মহাদেবী বিরলার স্মৃতিরক্ষার্থে দরিদ্র ছাত্রীদের সাহায্য করিতে মাসিক পনের টাকার কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে বাইশটি ছাত্রী এই মহাদেবী বিরলা বৃত্তি পাইতেছেন।

এখানে ভবিষ্যতে একটি বৃহৎ জাতীয় নারী-শিক্ষা-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এখানে দুটি বড় অভাবের জন্য কাজ অগ্রসর হইতেছে না। প্রথমতঃ, অর্থের অভাব ও দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মীর অভাব। সরকারের নিকট হইতে বা কোনও দানশীল ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইলে এখানে আরও অধ্যাপিকা নিযুক্ত করিতে পারা যাইবে ও মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির জন্য আরও খেলা-ধূলার ব্যবস্থা ও একটি ভাল লাইব্রেরীর প্রারম্ভ করা যায়।

আর যদি কোন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এখানকার কাজে আসিয়া যোগদান করেন, আর এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করেন তাহা হইলে আর্থিক সাহায্য না পাইলেও এখানকার কাজ অগ্রসর হইতে পারে।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত ইণ্টারমীডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষার অন্যতম শিক্ষার ও পরীক্ষার বিষয়। ইহা শিখাইবার জন্য মহিলা অধ্যাপিকার প্রয়োজন।

ব্রহ্মদেশে বাঙালীর একটি কীর্ত্তি

রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীমৃণালবালা দেবী

বেঙ্গল একাডেমী রেঙ্গুনে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার তাঁহার বন্ধু শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহায্য লইয়া ও স্বর্গীয় দানবীর দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, উদারহৃদয় রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার (পরে হাইকোর্টের জজ) মিষ্টার জে, আর, দাসের আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৯ সালের ২৪শে নবেম্বর তারিখে আট দশজন বাঙালী বালক লইয়া যে একটি ক্ষুদ্র প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, গত বিশ বৎসরে তাহারই এতদুর উন্নতি হইয়া বর্ত্তমানে ইহার ছাত্র-বিভাগের জন্য প্রায় দুইলক্ষ টাকা ব্যয়ে সুদৃশ্য, সুবৃহৎ, সুন্দর, সুরম্য স্কুলগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং প্রায় পাচশত ছাত্র ও ছাত্রী (ছাত্রীদের জন্য পৃথক পাকা বাড়ীতে সম্পূর্ণ আলাদা পড়াইবার বন্দোবস্ত আছে) ইহাতে অধ্যয়ন করিতেছে।

বাঙালী ছেলেদের শিক্ষার অত্যন্ত অসুবিধা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে দুইবার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল। একবার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার বন্ধুরা ছেলে-স্কুল, অন্যবার শ্রীযুক্ত হারাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী ছেলেমেয়েদের মিশ্র বিদ্যালয়, নিজেদের গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার স্থায়ী কোন ফল হয় নাই, কারণ তখন বাঙালীর সংখ্যা অল্প ছিল, প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিলে ব্রহ্মদেশে বাঙালী শিক্ষক পাওয়া যাইত না। যদি কেহ শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতেন তিনি অন্য ভাল চাকুরী পাইয়া প্রস্থান করিলে বিদ্যালয় উঠিয়া যাইত। ক্রমে বাঙালীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে বাঙালী বালকবালিকার সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়। তাহাদের শিক্ষার অসুবিধা সকলে অনুভব করেন। গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বাঙালী ছেলেদের পড়িবার বন্দোবস্ত হয় কি না তাহার জন্য

রেঙ্গুন বেঙ্গল একাডেমী—পুরাতন বাড়ী

গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগকে চিঠি লেখা হয়। তাহার উত্তরে শিক্ষা-বিভাগ বলে যদি সাড়ে বার হাজার টাকা বাঙালীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা রাখে তবে উহার সুদ হইতে অনধিক মাত্র চল্লিশজন বাঙালী ছাত্রের জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন বাঙালী শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন। উদ্যোগ কর্ত্তারা গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই এবং সে চেষ্টা পরিত্যাগ করা হয়। ডাক্তার প্রসন্নবাবু স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন এবং ইষ্টারণ লাইফ ইনসিওরেন্স্ কোম্পানীর সেক্রেটরী সহৃদয় মিষ্টার জে, এন,ঘোষাল মহাশয়ের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র গৃহে মিষ্টার জে, আর, দাস মহাশয় প্রদত্ত মাসিক পনের টাকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাঁদায় সংগৃহীত মাসিক পঁচিশ টাকা, মোট চল্লিশ টাকা সম্বল করিয়া শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর শিক্ষকতায় একটি প্রাইমারী স্কুলের কার্য্য আরম্ভ করেন।
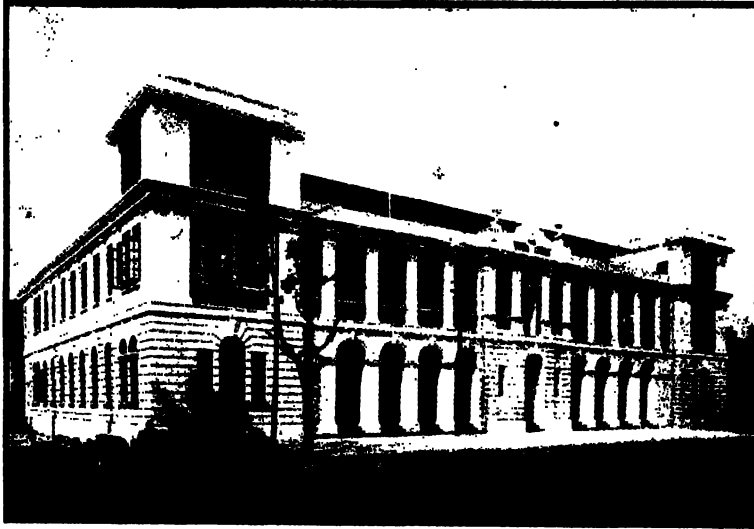
অল্পদিন মধ্যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে অন্য একটি বড় বাড়ীতে স্কুল স্থানান্তরিত করা হয়। পরে আরও ছাত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনরায় ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অপেক্ষাকৃত একটি বড় বাড়ীতে স্কুল স্থানান্তরিত করা হয়। এই বাড়ীতে আসিবার কিছুদিন পর স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ মিত্রের সঙ্গে ঢাকার বিখ্যাত ষড়যন্ত্রের মোকর্দ্দমায় যোগ ছিল বলিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। নিশিবাবুর গ্রেপ্তারের পর বিদ্যালয়ের সমূহ সঙ্কট উপস্থিত হয়। অনেকে ভয়ে বিদ্যালয়ের সংস্রব পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ক্রমে সকল বিপদ কাটিয়া যায়। নিশিবাবুর স্থলে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তিনি দশ বৎসর কর্ম্ম করিয়া বার্দ্ধক্যতাপ্রযুক্ত অবসর গ্রহণ করেন।

রেঙ্গুন বেঙ্গল একাডেমী- নূতন বাড়ী

বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে তৃতীয়বার আরও বড় বাড়ীতে ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে স্কুল স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১৩ সালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গুপ্ত আহার ও বাসস্থান বাদ মাসিক ৬০৲ বেতনে (প্রসন্নবাবু আহার ও বাসস্থান দিয়াছিলেন) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাজ করেন। তাঁহার ছাত্রহিতৈষণা ও পরিশ্রমে ছাত্র ও অভিভাবকগণের মধ্যে তাঁহার সুনাম প্রচারিত হইয়াছিল। স্বাস্থ্যরক্ষা না হওয়ায় তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করেন।

অর্থাভাব, দলাদলি ইত্যাদি নানা-প্রকার অন্তরায় সময় সময় স্কুলের উন্নতির পথে অল্পাধিক বাধা জন্মাইলেও শ্রীযুক্ত প্রসন্নবাবুর যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে ধীরে ধীরে সকল বাধাই দূর হইয়াছিল। উদ্যোগীগণ সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যে মহদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন ক্রমে তাহা সফলতার নিকটবর্ত্তী হয়। ১৯১৪ সালে চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়ের জন্য একটা সুন্দর বাড়ী ক্রয় করা হয়। বার তের বৎসর এই বাড়ীতে বিদ্যালয়ের কাজ চলে। এই টাকার অর্দ্ধেক

রেঙ্গুন বেঙ্গল একাডেমীর ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ

গবর্ণমেণ্ট ও অৰ্দ্ধেক সাধারণের দানে পাওয়া গিয়াছে। অবাঙালীর মধ্য হইতে ডাক্তার প্রসন্নবাবু একহাজার টাকার উপর সংগ্রহ করেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এডভোকেট, মিষ্টার জে, এন ঘোষাল ও আরও অনেকে অর্থসংগ্রহের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সনে স্কুল যখন মধ্য-ইংরাজী করা হয় তখন প্রসন্নবাবুর অনুরোধে সিংহলনিবাসী ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ভি, এন, সিবায় এম-এ, বি-এল, মহাশয় তাঁহার গৃহের নিম্নতল স্কুলের জন্য বিনা ভাড়ায় প্রদান করেন। এই ১৯১৪ সনে সপ্তম ষ্ট্যাণ্ডার্ড (মধ্য-ইংরেজী) পর্য্যন্ত শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ, মহাশয় স্কুলের কোষাধ্যক্ষের কাজে নিযুক্ত হইয়া স্কুলের উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য স্কুলের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তিনি অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী রায় চৌধুরী বি-এ, বি-এল্ মহাশয় কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, চৌধুরী মহাশয়ও সততার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া স্কুলের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এখনও তিনি সে কাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

স্কুলের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে এবং ১৯২০ সালে উহা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া যখন চারি শতের উপর হয় তখন এই স্কুলগৃহে স্থানের সঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া উঠে এবং ১৯২২ সালে পরিচালকগণ নূতন বড় বাড়ীর কল্পনা করিতে বাধ্য হন। প্রসন্নবাবুর অনুরোধে ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার জে, কে, ঘোষ মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে স্কুলের নূতন বাড়ীর নক্সা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই নক্সা অনুযায়ী ১৯২৫, ৬ই ফেব্রুয়ারি স্কুলের সভাপতি মিষ্টার জে, আর, দাস ব্যারিষ্টার কর্ত্তৃক স্কুল বাড়ীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার ঘোষের অনুরোধে মিস্ ফ্লোরি পরিবর্ত্তিত নক্সা বিনা পরিশ্রমে তৈয়ার করিয়া দেন। এই নক্সা অনুযায়ী ১৯২৯ সনের ১৬ই মার্চ্চ প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্কুলের জন্য

সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া অতি ধুমধামের সহিত ব্রহ্মদেশের গবর্ণর সার চার্লস্ ইনিস্ কর্ত্তৃক গৃহ উন্মুক্ত হয়। বাড়ী-নির্ম্মাণের ব্যয় অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট হইতে ও অর্দ্ধেক জনসাধারণের দান হইতে পাওয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল একাডেমীর গত বিশ বৎসরের জীবনের চারি বৎসর প্রাইমারী, সাত বৎসর মধ্য-ইংরেজী এবং দশ বৎসর উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়রূপে পরিচালিত
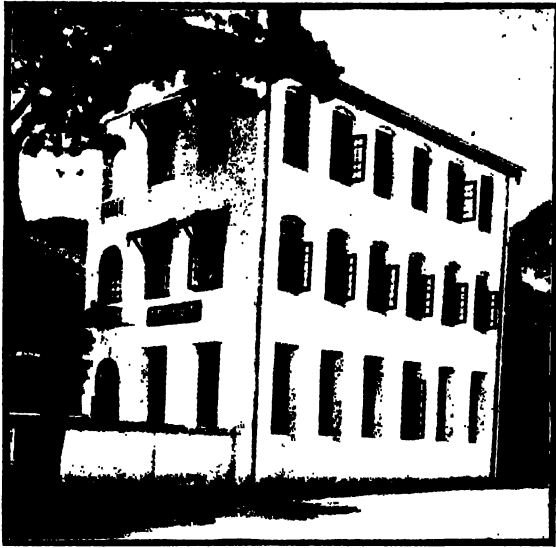
রেঙ্গুন বেঙ্গল একাডেমী—বালিকা বিভাগ

হইয়াছে। ডাক্তার পি, কে, মজুমদার (প্রসন্নকুমার মজুমদার), জাষ্টিস্ জে, আর দাস, মিষ্টার এস্, এন, সেন ও ডাক্তার পি, কে, দে ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে এবং পরলোকগত মিষ্টার পি, সি, সেন ব্যারিষ্টার এবং জাষ্টিস জে, আর, দাস সভাপতিরূপে বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন।

বর্ত্তমান হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি, বি-এল বিদ্যালয়ের মধ্য-ইংরেজীর অবস্থায় ১৯১৭ সালে ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তদবধি ইহার উন্নতি সাধনে ব্রতী আছেন, বর্ত্তমানেও যোগ্যতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। স্কুলের শিক্ষকেরা অধিকাংশ বি-এ পাশ, তাঁহাদের যোগ্যতা, পরিশ্রম ও যত্নচেষ্টার ফলে এই বিদ্যালয় ব্রহ্মদেশে একটা আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। প্রায় প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের মধ্য-ইংরেজী ও স্কুল ফাইনেল পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া গবর্ণমেণ্টের এবং সর্ব্বসাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিয়াছে।

বিদ্যালয়ে যাঁহারা এক হাজার টাকার অধিক বা প্রায় এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নিয়োগী, মার্চেণ্ট	১৭,০০০৲
২—মিঃ জাষ্টিস্ জে, আর, দাস (মাসিক চাঁদা সহ)	১০,০০০৲
৩— ,, পি, সি, সেন, ব্যারিষ্টার	২,০০০৲
৪— ,, কে, সি, বসু ,,	১,০০০৲
৫— ,, এস, পি, দাস, কণ্ট্রাক্টার	১,০০০৲
৬—শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসু ,,	১,২০০৲

৭—ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার কিঞ্চিদধিক এক হাজার টাকা ১৯২৭ সালে মাসিক ৮০৲ হিসাবে এক বৎসর দান করিয়াছেন।

৮—ডাঃ যোগেন্দ্রকুমার মজুমদার প্রায় এক হাজার টাকা ১৯২৮ সালে মাসিক ৮০৲ হিসাবে এক বৎসর দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত এক হাজার টাকার নীচে আরও অনেক দান সংগৃহীত হইয়াছে। স্কুলের সুবৃহৎ হল-ঘরকে "শশিভূষণ নিয়োগী হল" এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

বেঙ্গল একাডেমীর বালিকা বিদ্যালয় বিভাগ :—

রেঙ্গুনে বাঙালী মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ হওয়ায় ১৯১৮ সালে বেঙ্গল একাডেমীর অন্যতম সভ্য, কর্ম্মকুশল ডাক্তার মণিলাল কুণ্ডু ও আরও কয়েক জনের বিশেষ উদ্যোগে বেঙ্গল একাডেমীর সঙ্গে একটি বালিকা বিভাগ খোলা হয়। কর্ত্তব্যপরায়ণা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী মুখার্জ্জি বি-এ, প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হন। বালিকাদের শিক্ষার জন্য ১৯১০ সালে ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার বেঙ্গল একাডেমী গৃহে প্রাতে একটা স্কুল খোলেন। সেখানে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী বিনা পারিশ্রমিকে প্রাতে পড়াইতেন, কিছুদিন পর তাহা উঠিয়া যায়। পরে রামমোহন একাডেমী নাম দিয়া ছেলেমেয়েদের একটা মিশ্র স্কুল শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে এই স্কুলও অকৃতকার্য্য হইলে বেঙ্গল একাডেমী মেয়েদের পড়ার ভার গ্রহণ করে। মেয়ে-বিভাগ খোলা হইলে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে স্কুলে পুনরায় গ্রহণ করা হয়।

১৯২২ সনে বেঙ্গল একাডেমীর কম্পাউণ্ডের এক অংশে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বালিকা

বিদ্যালয়ের জন্ত পাকা ত্রিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্যয়ের অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট হইতে ও অর্দ্ধেক জনসাধারণের চাঁদা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে শতাধিক বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। বালিকা-বিদ্যালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্যে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার, কণ্ট্রাক্টর নুরবক্স সাহেব ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ঘোষাল যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার মণিলাল কুণ্ডু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অধিকাংশ টাকা ডাক্তার কুণ্ডু একা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বালক-বিদ্যালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণে এবং অর্থ-সংগ্রহে যাঁহারা পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন তাঁহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রথম ভাগে সাব-ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইনি পরলোকগমন করেন), শেষ ভাগে শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত কর অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া এই সুবৃহৎ কাজ সম্পন্ন করিতে স্কুলকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অর্থ-সংগ্রহে শ্রীযুক্ত কুমুদিনী কর, প্রফেসার মৌলবী গোলাম আকবর এম-এ, শ্রীযুক্ত শচীন মুখোপাধ্যায় (ডাকনাম "বাসু",) প্রফেসার রমাপ্রসাদ চৌধুরী এম-এ, পি-আর-এস, শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মুখার্জ্জি ও ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

ঝড়ের যাত্রা

শ্রীপরেশনাথ চৌধুরী

এই জীবনের কান্নাহাসির ঘাটে
আমার তরীখানি
ভাসিয়ে দিলেম কল-ঢেউয়ের নাটে
আজকে ভাগ্য মানি।
পথ না জানার উতল নেশায় ভুলে
তটের বাঁধন এবার দিলেম খুলে,
দিগন্তরের পরদা হেলায় তুলে
দূরের দিশায় কে দিল হাতছানি!

মন রে আমার চাস্‌নে লগন তিথি
পথে চলার শেষ,
থাক্ পড়ে থাক্ তীরের কুসুমবীথি
বাঁশির মৃদুরেশ।
আজ সুরু হোক্ কালবোশেখীর বেলা
ঘূর্ণীপাকের মৃত্যুগহন খেলা,
কূলের নিদেশ উদ্‌লো মেঘের মেলা
ঝাপ্‌টা হেনে করুক নিরুদ্দেশ।

পাগল নদীর নিতল কাজল জলে
ডেকেছে আজ বান,
মাতন লাগায় গভীর কোলাহলে
ঝড়ো-হাওয়ার গান।
এই তুফানের বক্ষে দিয়া পাড়ি
মন রে আমার কণ্ঠ দে তোর ছাড়ি,
উল্লাসে তুই গান গেয়ে চল সারি
তাণ্ডবে আজ ভরে' নে তোর প্রাণ।

চলার পথের আপদ আঘাত খুঁজে
প্রতি পদেই থামি
জীবনটারে রাখ্‌বি অনেক যুঝে
এতই কি সে দামী?
তীরের কাণায় কাণায় তরী বেয়ে
চলিস্ নে আজ সুদিন সুখন চেয়ে,
দেখ্ চেয়ে কোন্ সর্ব্বনাশী মেয়ে
ঘূর্ণী হাওয়ায় তোর সে অগ্রগামী।

আউল বাতাস দীঘল চাঁচর কেশে
দিয়েছে তার হানা,
নীলাম্বরীর ত্রস্ত আঁচল ভেসে
ঢাকে আকাশখানা।
চপল আঁখির তড়িৎ-দৃষ্টি মাঝে
মরণ-জয়ের অভয় দীপ্তি রাজে,
মঞ্জীরে তার, মন রে, কি সুর বাজে
যায় ভেসে যায় সকল বন্ধ মানা।

ঝঞ্ঝা আসুক বজ্র উঠুক বেজে
আজ আমি নির্ভয়,
রুদ্র লীলায় প্লাবন আসুক সেজে
ক্ষিপ্ত সাগরময়।
অন্ধ নিশার ক্ষুব্ধ তামস-তীরে
ভাসিয়ে দিলেম আমার তরীটিরে,
অনিশ্চিতের ভয়াল ভ্রূকুটিরে
হাস্যরোলে করব আজি জয়।

ফ্রান্সের নব মনোভাব

মাদ্রাজ হ'তে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রে ইংরাজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখি। সে প্রবন্ধের নাম Future of Civilization. ...উক্ত প্রবন্ধে আর পাঁচ কথার মধ্যে আমি এই কথা বলি যে,

We Indians to-day hanker after a To-morrow which would be a facsimile copy of Europe's To-day...Situated as we are we cannot conceive of any other future. In the result we fail to realize that Europe's To-day will be its Yesterday by the time we reach the desired goal.

আমাদের আদর্শ আগামী কল্য ইউরোপের গতকল্য হবে। কথাটা কতকটা বীরবলী গোছের শোনায়।...আমি কিন্তু কথাটা রসিকতাচ্ছলে বলিনি, কেননা আমার ধারণা যে ইউরোপীয় সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তারিখে থেমে যায় নি। এখনও তা চলচে এবং পুরোদমে চলছে। যে জাতির অন্তরে জীবনীশক্তি আছে সে জাত যুগে যুগে জীবনে ও মনে নব কলেবর ধারণ করবে। এক মৃত ছাড়া কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আর ইউরোপ যে জীবন্ত তার প্রমাণ আমরা হাড়েমাসে পাচ্ছি। ইউরোপের মনের কাঁটা যে টলমল করচে এর স্পষ্ট পরিচয় পাই আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে। কি উপন্যাস কি কবিতা সকলেরই ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন সুর কানে পড়ে, আর সে সুর হচ্ছে সন্দেহের সুর. ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত অকাট্য সত্যের প্রতি অসন্তোষ ও অবজ্ঞার সুর। যেন ফ্রান্সের লোক এবিষয়ে সচেতন হয়েচে যে নব সভ্যতার সোজা ও বাঁধা পথে তেড়ে চল্‌তে গিয়ে, তারা মনুষ্যত্বের কোন কোন অংশ হারিয়ে বসেছে। এবং তার ফলে সভ্য মানবের চিত্ত দীন ও চরিত্রহীন হ'য়ে পড়েছে।... ইউরোপীয়েরা বলে যে তাদের সুখও নেই শান্তিও নেই।...অনেকের ধারণা যে সব সত্য তারা হারিয়ে ফেলেছে তার পুনরুদ্ধার করতে পারলেই তারা আবার জীবনে ও মনে সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠবে। যে মনোভাবকে মানুষে একবার মিথ্যে ব'লে পরিহার করেছে, সেই মনোভাবকে আবার সার সত্য ব'লে অঙ্গীকার করার নাম বোধ হয় reaction। কিন্তু ও নামে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই কারণ re-actionও একরকম action, অপর পক্ষে in-actionই মানব জাতির নাশের মূল; সে মানসিক in-actionএর নাম ইভলিউশানই দেও আর progressই দেও তাতে কিছু আসে যায় না। মানব-সমাজ রেলের গাড়ী নয় যে একরোখে একটানা গিয়ে সভ্যতার terminusএ পৌঁছবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে জাতির প্রাণ আছে তারা এগুতেও জানে পিছুতেও জানে। ইউরোপের মন এখন কোন্ স্রোতের বিরুদ্ধে উজিয়ে চলতে চেষ্টা করছে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।...

পৃথিবীতে দু-শ্রেণীর লোক আছে যাঁরা সকলকেই নিজ মতাবলম্বী করা তাঁদের কর্তব্য মনে করেন। একদল হচ্ছেন ধর্মাচার্য্য, আর এক দল হচ্ছেন বিজ্ঞানাচার্য্য। কারণ উভয়েরই বিশ্বাস যে জগতের মূল সত্য তাঁদের করায়ত্ত। এবং তাঁদের কথা বেদবাক্য ব'লে মানলেই মানবজাতি উদ্ধার হ'য়ে যাবে। ইউরোপের অধিবাসীরা সেকালে এই ধর্মযাজকদের বশীভূত ছিল এবং একালে এই বিজ্ঞানাচার্য্যদের বশীভূত হয়েছে। এই উভয় শ্রেণীর লোকই সর্বজ্ঞতার দাবী করে। এবং যেহেতু বিজ্ঞান একালে সর্বশক্তিমান সে কারণ বৈজ্ঞানিকদেরও সর্বজ্ঞ ব'লে মানা অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে যে স্বল্পসংখ্যক লোক মনোজগতে স্বাধীনতা চায় তারাই কলমের জোরে জাতির মনের মোড় ফেরায়। সুতরাং স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যিকদের মতামত উপেক্ষণীয় নয়। এই শ্রেণীর লোকের মনোভাবকে আমি ফ্রান্সের নব মনোভাব আখ্যা দিয়েছি।...

সম্প্রতি La Renaissance Religieuse নামক একখানি ফরাসী পুস্তক আমার হস্তগত হয়েছে।...এই বইখানিতে প্রায় বিশজন লেখকের বিশটি প্রবন্ধ আছে।...এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই দার্শনিক হিসেবে, নভেলিষ্ট হিসেবে, প্রবন্ধকার হিসেবে খ্যাতনামা লেখক।... ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিকে সকলেই পিঠ ফিরিয়েছেন। Laicismeএর বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করচেন। Laicismeএর ভাল বাঙলা কি? ঐহিকতা? কিন্তু ঐহিকতার অর্থ কি? আমার বিশ্বাস সর্বদর্শন-সংগ্রহের বক্ষ্যমান কথা কটির ভিতর তার পুরো অর্থ পাওয়া যায়।

'যাঁহারা লৌকিক বাক্যের বশবর্তী হইয়া নীতি ও কাম শাস্ত্রানুসারে কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, পারলৌকিক অর্থ স্বীকার করেন না, সেই সকল চার্বাক মতানুবর্তীরাও এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন এই নিমিত্তই চার্বাক মতের 'লোকায়ত' এই অপর নামটি সার্থক হইয়াছে।"...

ফ্রান্সের এই নব চিন্তার ধারার দুটি মুখ আছে। প্রথমতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি অনাস্থা, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মের সত্যের প্রতি আস্থা। প্রথম মনোভাবটি negative, দ্বিতীয়টি positive, আজকে আমি এই negative মনোভাবেরই পরিচয় দেব।...

আমি এখানে যাঁর মতের পরিচয় দেব তাঁর নাম Pant Archambaut। ইনি কে আমি জানিনে, কিন্তু লেখা প'ড়ে মনে হয়, লেখক একজন অধ্যাপক; এবং সম্ভবতঃ দর্শনশাস্ত্রের। তিনি লিখেছেন, "গত দশ বিশ বৎসরের মধ্যে ধর্মমনোভাব scientisme নামক মনোভাবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, এবং অতি শীঘ্রই যে তা socilogisme নামক শাস্ত্রেরও মূল উচ্ছেদ করবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই সব মত যে আসলে অমূলক তাই প্রমাণ করা আমাদের দেশের নব চিন্তার negative অংশ।

"Scientisme একদম বাতিল হয়ে গিয়েছে। Scientisme বলতে কি বোঝায়? সেই মত, যে মতানুসারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই মানুষের একমাত্র জ্ঞান, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকরা যে সকল postulates এবং hypothesesএর উপর বিজ্ঞানশাস্ত্র গ'ড়ে তুলেছেন, postulate-এর hypothesisকে ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস করা, আর যে সত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জানা না যায় সে সত্যকে মিথ্যা জ্ঞানে পরিহার করা, এবং যা বিজ্ঞানের বহির্ভূত তাকেই অলীক সাব্যস্ত করা, ফলে

quality, personality, liberty, morality প্রভৃতি মানবধর্মকে বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা।

"সকলেই জানেন এই মত Renan, Taine এবং Berthelotএর প্রসঙ্গে গত শতাব্দীতে লোকের মনের উপর কিরূপ একাধিপত্য লাভ করেছিল। কিন্তু উক্ত মতের গোড়া আলগা ক'রে দিয়েছে ধর্ম-প্রচারকেরা নয়—পরবর্তী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা। একদিকে Boutroux এবং Bergsonএর মত দার্শনিক, অপর পক্ষে Poincaré, Duhern, Milhaud, Le Roy প্রভৃতি গণিত শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানের জগৎপূজ্য গুরুরা।"

Archambautএর এ কথা যদি সত্য হয়—আর এ কথা যে সত্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই অন্ততঃ তার মানে যিনি Bergsonএর Creative Evolution এবং Poincare'র Science et Hypothesis নামক গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্গে সুপরিচিত—তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে scientismeএর সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে সমাজের মনকে মুক্তি দিয়েছে Science।...

এ বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করবার একমাত্র চাবি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয় এ জ্ঞান বহু বৈজ্ঞানিকেরও হয়েছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের Figaro নামক দৈনিক পত্রে Academie des science-এর সভাবৃন্দ এবিষয়ে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। তার থেকে দেখা যায় যে এযুগের বৈজ্ঞানিকরা প্রায় সকলেই একমত যে Science এবং religion উভয়েই সমান সত্য, কারণ সত্যে পৌঁছিবার মনোজগতে দুটি পথ আছে; একটি বিজ্ঞানের পথ, অপরটি ধর্মের পথ। এর একটির দোহাই দিয়ে অপরটি বন্ধ করবার চেষ্টাই আহাম্মকি। আমাদের দেশের ভাষায় ব্যবহারিক সত্যের দোহাই দিয়ে অনুভব-সিদ্ধ সত্যকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই scientisme-এর বাধামুক্ত হ'য়ে ফরাসী-মন আবার ধর্মের পথে মনকে অগ্রসর করবার জন্য ব্রতী হয়েছে।...Science যেমন মানুষের অশেষ উপকার করেছে তেমনি তার ঐকান্তিক চর্চার কতকগুলো কুফলও ফলেছে—যথা, সামাজিক জীবনে industrialismএর আতিশয্য ও ধনীর নব feudalism ইত্যাদি এবং মানসিক জীবনে ঐহিকতা। Science রক্ষা ক'রে তার এই সব কুফল কি ক'রে দূর করা যায়—এই হচ্ছে ইউরোপের একালের প্রধান সমস্যা। তাই কেউ সমাজকে ঢেলে সাজাতে চান, কেউ আবার মনকে মুক্তি দিতে চান। জীবন মনকে তৈরি করে কিম্বা মন জীবনকে তৈরী করে তা আমি বলতে পারি নে। তবে একথা সত্য যে কোনও জাতির মন যখন বদলায় তখন তার সত্যতা যে নবরূপ ধারণ করবে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।...

Conservatism মানুষের মজ্জাগত। Religious conservatism গত শতাব্দীতেও চ'লে যায় নি এবং scientific conservatives বর্তমান ফ্রান্সে প্রবল পক্ষ নয়। কোনও ফরাসী Bertrand Russellএর মত die-hard লেখকের সাক্ষাৎ আমি এযুগের ফরাসী সাহিত্যে পাইনি।

আমরা যাকে নতুন মনোভাব বলি তা অবশ্য পুরোনো মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অথবা বিভিন্ন নয়। ক্ষণিক বিজ্ঞান যেমন মনের ধর্ম নয়, ক্ষণিক জীবনও তেমনি প্রাণের ধর্ম নয়। মানুষ দেহমনে ক্ষণে মরে ক্ষণে বাঁচে এমন কথা পাগলের প্রলাপ মাত্র। মানুষের দেহ যেমন যুগে যুগে নূতন রূপ ধারণ করে অথচ চিরজীবন তার একটা বাঁধা কাঠামো থেকে যায়, মানুষের মনও তেমনি যুগে যুগে নূতন রূপ ধারণ করে কিন্তু তার অন্তরে একটা বিশিষ্ট কাঠামো থেকে যায়।...

তেমনি আবার বিভিন্ন জাতির ও মনেরও প্রকৃতির প্রভেদ আছে। সব জাতির মন একই পথে একই চালে চলে না। এ জাতিগত বৈচিত্র্যের জন্য প্রতি জাতির ইতিহাস দায়ী। মানুষের মন একেবারে সাদা কাগজ নয় যে যার যা খুসি সেই তার উপরে নূতন রচনা করবে। ও কাগজের উপরে জাতির ইতিহাস অনেক কথা লিখে দিয়েছে যে একেবারে মুছে ফেলা যায় না। এই সত্যটি উপেক্ষা ক'রেই গত শতাব্দী ইউরোপের মনের নব রচনা করতে বসেছিল। ফলে আজকার ইউরোপের মনে যে, তার যুগ সঞ্চিত ধর্মভাব মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। সে মনোভাব জাতির স্তরে কখনই মরে নি শুধু ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েছিল, এখন হয়ত আবার পুনর্জীবিত হ'য়ে উঠছে। আমাদের দেশেও পুরাকালে নানারকম বাহ্যধর্ম বৈদিক ধর্মকে আচ্ছন্ন করেছিল, এবং সে ধর্মের পুনরুত্থানের সময় মেধাতিথি ব'লে গিয়েছেন যে—"বাহ্যধর্মাস্তু সর্ব্বে মূর্খধূর্ত্তশীল-পুরুষ প্রবর্ত্তিতাঃ কিয়ন্তং কালং চলাবসরা অপি পুনরস্তমুপয়ান্তে। নহি ব্যামোহো যুগ সহস্রানুবর্ত্তী ভবতি"। অবশ্য ইউরোপে আজকের দিনে কেউ মেধাতিথির মত কটু কথা বলবেন না। তাঁরা এই পর্য্যন্ত বলতে প্রস্তুত—নহি ব্যামোহো যুগ-সহস্রানুবর্ত্তী ভবতি। Scientismeএর ব্যামোহ কাটিয়ে উঠলে ফরাসী মন, ফরাসী-মনই থাকবে জার্মান মন হবে না।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বাহ্যধর্মের বিরুদ্ধে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁদের হাতে বৈদিক-ধর্ম যেমন বৈদান্তিক ধর্ম হ'য়ে উঠেছিল আমার বিশ্বাস ইউরোপের এই সব ধার্ম্মিকদের হাতে খৃষ্টান ধর্মও নবরূপ ধারণ করবে। বৈদান্তিক দর্শনের বিশেষত্ব এই যে তার অন্তরে গোটা বৌদ্ধ-দর্শন গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আর আমার বিশ্বাস ফ্রান্সের এই নূতন ধর্ম-মনোভাব, scienceএর সকল সত্যই অঙ্গীকার করবে। এ অনুমানের কারণ কি তা বলছি।

Jacques Chevalier নামক জনৈক যুগপৎ দার্শনিক এবং নিষ্ঠাবান Catholic বলেছেন যে St. Thomasএর দর্শনে আমাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তার প্রথম কারণ তিনি scienceএর কিছুই জানতেন না, দ্বিতীয়তঃ গত ছ' শ' বৎসরের ভিতর ইউরোপে যে দার্শনিক চিন্তার স্রোত ব'য়ে গিয়েছে তা উপেক্ষা করা শুধু মূর্খতা নয়—অসম্ভব।...আমাদের নূতন ধর্মভাব কোনও অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয়ে প্রাণ ধারণ করতে পারবে না। ভগবানে বিশ্বাস তখনই আমাদের অটল হবে—যখন আমরা যুক্তির ভিত্তির উপর সে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। এ হচ্ছে খাঁটি ফরাসী মনের কথা, কারণ ফরাসীরা হচ্ছে মূলতঃ নৈয়ায়িকের জাত।...

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে প্রতি জাতির মনের একটা বিশেষ দিকে ঝোঁক আছে। ফরাসী জাতির মনকে Descartes যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথেই ফরাসী-মন অদ্যাবধি চ'লে আসছে এবং সে পথেই সহজে চলতে পারে। সে পথ হচ্ছে আলোর পথ। ছায়ার পথে ফরাসী-মন যুক্তি ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে না। এই কারণেই ফরাসী পদ্য-সাহিত্য এত দরিদ্র এবং ফরাসী গদ্য-সাহিত্য এত ঐশ্বর্য্যবান। আমরা যাকে scientific philosophy বলি তার প্রবর্তক Descartes, Newton নন ...Scientismeএর খণ্ডন যে ফ্রান্সের গ্রাহ্য হয়েছে তার কারণ নূতন Science এই তার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। অপর পক্ষে এক দলের লেখক যে St

Thomas-এর দর্শনের দিকে ঝুঁকেছে তার কারণ St. Thomas আর কিছু না হন চমৎকার logician। তিনি religionকে scienceএ পরিণত করেছিলেন।

কি করে religion ও science উভয়ই রক্ষা করা যায়, এই হচ্ছে বর্তমান ফরাসী-মনের সমস্যা। এ ক্ষেত্রে অনেকে Pascalএর মীমাংসার উপরই নির্ভর করছেন। Pascal বলেছেন যে কেবলমাত্র reasonএর উপর নির্ভর করে সকল সত্যের সে সাক্ষাৎ পায় না; অপর পক্ষে যে কেবলমাত্র unreasonএর উপর নির্ভর করে সে সকল মিথ্যারই সাক্ষাৎলাভ করে।

ফলে ফরাসী-মন unreasonকে বরণ করতে প্রস্তুত নয়, reasonএর নাগালের বাইরেও যে সত্য আছে সেই সত্যেরই তারা সন্ধান করছে।...

Archambault বলেছেন—Scienceএর মূলে যে কতকগুলি postulate মাত্র আছে এ কথা শুনে অনেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে scienceও একটা ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কি মাত্র। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। Meyerson দেখিয়ে দিয়েছেন যে Scienceএর অন্তরেও ধ্রুবসত্য আছে। Meyerson হচ্ছেন একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক।...তাঁর শিষ্য Andre Metz নাকি এক কথায় Meyersonএর সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন। Metz লিখেছেন Meyersonএর সিদ্ধান্তের সঙ্গে Pascalএর সিদ্ধান্তের কোনও প্রভেদ নেই। মানুষ সৃষ্টির গোড়ার কথাও জানে না, শেষ কথাও জানে না,—জানে শুধু ইতিমধ্যের কথা। এ সব কি গীতার একটি শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ নয়?

"অব্যক্তাদীনী ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্যেব এব কা পরিবেদনা"

মানব-মনের যে শক্তি এ ব্যক্তমধ্যের জ্ঞান লাভ করে সেই শক্তিই বৈজ্ঞানিক মনের একমাত্র শক্তি, এবং যে-শক্তির সাহায্যে অব্যক্তের সন্ধান পায় সেই শক্তির উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অতএব science religionএর হন্তারক নয়।...

ফ্রান্সের নতুন মনোভাব এই বিজ্ঞানশাসিত মন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। বিজ্ঞানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কোনও সত্যের সন্ধান করা ফরাসী-মনের পক্ষে অসম্ভব। ধর্ম্মবিশ্বাসকে মনে যদি স্থান দিতে হয় ত তা করতে হবে বিজ্ঞানের অবিরোধে—এই হচ্ছে ফরাসী-মনের আসল কথা। অর্থাৎ স্বর্গে যেতে হ'লে বিজ্ঞানের সিঁড়ি ভাঙতে হবে।...

একটি বিশেষ মনোভাবকে আমি এ প্রবন্ধে বরাবর religious বলছি।...যথার্থ religious লোক যে spiritual নন্ এমন কথা কেউ বলেন না। কিন্তু বহুলোক spirituual হ'য়েও religious না হ'তে পারে। কারণ religious শব্দের সকল দেশেই একটি সঙ্কীর্ণ অর্থ আছে এবং সে অর্থে religious হওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে "আমি বিশ্বাস করি" "আর আমি বিশ্বাস করিনে" এই দুই উক্তিই সমান মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। কারণ এ বিশ্বাস, অবিশ্বাস দুইটি spiritual স্বাধীনতার পরিচায়ক।...

যদি চল্লিশ বৎসর পিছু হ'টে যাওয়া যায় ত দেখা যাবে যে সে কালের সাহিত্যের উপর Scientismeএর প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। Zola প্রমুখ naturalist লেখকেরা religion of scienceএর গোঁড়া ভক্ত; আর Anatole France হচ্ছেন যে scientific scepticismএর পূর্ণ অবতার।

কিন্তু সে দেশের হাল্ সাহিত্যের ভিতরে একটি নূতন সুর কানে পড়ে। এ সুরের নাম spiritual ছাড়া আর কি দেব জানিনে। এ সুর অবশ্য অতি ক্ষীণ; তবুও কান এড়িয়ে যায় না। ফ্রান্সে যাঁদের neo-romantics বলে তাঁদের রচিত সাহিত্যে এই spiritual সুর অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। কিন্তু Proustএর মত লেখক, যাঁর লেখায় কোন রকম ফিলজফির সন্ধান পাওয়া যায় না, তাঁর লেখা পড়তে আমার মনে হয় যে তাঁর লেখার ভিতর থেকে Bergson উঁকিঝুঁকি মারছে, এমন কি তাঁর প্রাকৃতিক বর্ণনাতেও। আর তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর নভেলে যে কটি অপূর্ব্ব সুন্দর কথা বলেছেন তা যে intuition লব্ধ সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। Intuition মানলেই mysticism মানতে হয়। Mysticism কথার বাঙলা প্রতিশব্দ আমি জানিনে। সনৎকুমার নারদকে বলেছিলেন যে "তুমি অতিবাদী হও আর লোকে যদি বলে তুমি অতিবাদী তার উত্তরে বলো যে হাঁ আমি অতিবাদী।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ) এই "অতি" বস্তুটির সাক্ষাৎ science তার গণ্ডীর মধ্যে পায় না, অতএব তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে science ন্যায়ত বাধ্য। আমার মনে হয় যে Bergson এই অতিবাদকে মুক্তি দিয়েছেন। কথাটা খুব স্পষ্ট হ'ল না কেননা "অতিকে" পূর্ণ আলোকে আনা যায় না অথচ অনেকের মন তার সাক্ষাৎ পায়। ফ্রান্সের নব মনোভাবের অন্তরে আছে মনোজগতে নূতন মুক্তির আনন্দ।...

ইউরোপের মনের গতি নূতন দিকে যাচ্ছে আমার এ অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তাহ'লে ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতার To-morrow যে ইউরোপীয় সভ্যতার Yesterday হ'য়ে যাবে এ আশঙ্কা সহজেই মনে উদয় হয়।

আমি বিশেষ ক'রে ফ্রান্সের নবভাবের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু সত্য কথা এই যে সমগ্র ইউরোপে এ চিন্তার ধারা এখন উজান ভাবে বইছে। Whitehead, Eddington, Haldane, Mcdougall প্রভৃতি বিলাতের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরা একই সুর ভাঁজছেন কেউ মিঠে সুরে কেউ আবার চড়া আওয়াজে।...আমার বিশ্বাস গত এক শ' বৎসরের শিক্ষাদীক্ষার ফলে, আমাদের দেহেরও রঙ ফিরে যায়নি, মনেরও নয়, যা বদলে গিয়েছে সে হচ্ছে আমাদের বাক্য। আমরা সবাই আজ ইউরোপীয় চলতি বুলি বলতে শিখেছি। আমাদের সাহিত্য ও সংবাদপত্র আমাদের সামাজিক জীবন ও আমাদের মানসিক জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। এর কারণ ইউরোপীয় ভাবের স্পর্শে আমাদের মন গরম হয় বটে কিন্তু তাতে বলক ওঠে না।

La Renaissance Religieuse নামক পুস্তকের লেখকদের মধ্যে দুই একজন Orientalist আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন, Paut-Masson-Oursel!...Oursel বলেন, ইউরোপ এসিয়াতে তার science পাঠাক, কিন্তু তার মনোভাবের যেন আর রপ্তানি না করে। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব হ'তে পারে সে বিষয়ে তিনি নীরব। তিনি আশা করেন যে relativity যখন বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে তখন জীবনেও স্বীকৃত হবে। সকল সভ্যতাই তার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা রক্ষা করবে, কেউ অপর সভ্যতার মনের অধীন হবে না। অর্থাৎ মনোজগতেও ঐ Einsteinই আমাদের আক্কেল দেবে। আমাদের সাহেব হওয়াটার Orientalistও লিপজ্জনক মনে করেন।

বিচিত্রা—আশ্বিন, ১৩৩৬] শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

—

অভিভাষণ

নবীন সাহিত্য, যা আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক-পত্রে ও নানাভাবে অনবরত বেরুচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি।...আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে—জিনিষটা সত্যই বিশ্রী হয়ে উঠেছে। আমি বরাবর চেয়েছিলাম, কবিরা যাকে রসবস্তু বলেন, এইটিই যেন তাঁরা তাঁদের যৌবনের শক্তি, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি নিয়ে সাহিত্যে গড়ে তুলতে পারেন।...এইজন্ত মনে করি, বয়স যাদের কম, তাদের নূতন আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও তার সঙ্গে একটা শুদ্ধ মন নিয়ে সত্য সত্য সাহিত্য তাঁরা রচনা করবেন।...কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মন ঠিক অন্য রকম হয়ে গেছে। আমি দেখছি, আমি যাকে রস ব'লে বুঝি, তাঁদের ভিতর তার বড্ড অভাব। চোখ মেলে চাইলে অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি ক'রে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না। দুই-তিনজন বন্ধু দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা এটা করছ কেন? উত্তরে তাঁরা বল্লেন—এইজন্ত করছি, আমাদের আর scope নাই। আমরা যখন যা ভাবি, যা করি, যৌবনে যা প্রার্থনা করি, সে দিক থেকে রস রচনা বা সাহিত্য-রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাই না—এই ব'লে তাঁরা দুঃখ করলেন। আমি তাঁদের বল্লাম—কেবল একটা ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করছ। অনেক দিনের সংস্কার, অনেক দিনের সমাজ—এতে ত্রুটি বিচ্যুতি, অভাব-অভিযোগ অনেক থাকতে পারে। বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাও না? মানব-জীবন, সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি এ সব ত রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে—এ সব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন? এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের লাগে না? এর জন্ত প্রাণটা কাঁদে না কি? তোমাদের সাহস আছে, কিন্তু সাহস কেবল এক দিকে হ'লে চলবে না। যেটাকে তোমরা সাহস মনে করছ, আমি মনে করি, সেটা সাহসের অভাব। এদিকে ত শাস্তির ভয় নাই, কেহ তোমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবে না। যে দিকে শাস্তির ভয় আছে, সে দিকে সত্য সত্যই সাহসের দরকার। সেখানে তোমরা নীরব।...

তার জবাব তাঁরা দিলেন, আমরা সাহিত্যিক মানুষ, সে সমস্ত সাহিত্যের দিক নয়। ওদিক দিয়ে আমরা পারি না, ইচ্ছাও করে না, অভিজ্ঞতাও নাই।...

এতগুলি তরুণ স্কুলের ছাত্র—যারা পড়ছে, সাহিত্য চর্চ্চা করছে, তাদের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলব, তাদের হাত দিয়ে সাহিত্য যে খুব একটা উঁচু পর্দ্দায় বা ধাপে উঠছে, তা নয়। রবীন্দ্রনাথ যত বড়া ক'রে বলছেন, তেমন ক'রে বলবার শক্তি আমার নাই, থাকলে হয় ত তেমন ক'রে বলতাম। সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার। আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হ'লে মানুষ আনন্দ বোধ করে, মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এ সব চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার। আমি গল্প লেখার দিক থেকে বলছি, কবিতার দিক থেকে নয়। এক দিকে চলেছে। সংবাদপত্র—মাসিক—যখন পড়ি, কেবলই যেন মনে হয়, একই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এক বন্ধুর বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী, বোধ হয়, ২০।২৫ জন হবে, উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বল্লেন—দুঃখের ব্যাপার এই—আমরা লিখতে জানি না, সেইজন্ত আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে, তাতে আমরা লজ্জায় ম'রে যাই। কম বয়সের ছেলেরা হয় ত মনে করে, এ সব জিনিষ আমরা বুঝি ভালবাসি। আপনি যদি সুবিধা ও সুযোগ পান, আমাদের তরফ থেকে বলবেন—এ সব জিনিষ আমরা বাস্তবিক ভালবাসি না। পড়তে এমন লজ্জা হয়—তা প্রকাশ করতে পারি না। প্রতিবাদ ক'রে কিছু লিখলে তাঁরা গালিগালাজ আরম্ভ করবে, কটূক্তি বর্ষণ করবে—সে সব আমরা সহ্য করতে পারব না। সেই জন্ত সব সহ্য ক'রে যাচ্ছি। বহু ছেলে আপনার কাছে যায়, আমাদের হয়ে এ কথা তাদের জানাবেন ...

আজ ৫৪ বৎসর বয়সে যা ভালবাসি, তার সঙ্গে মিলিয়ে হয় ত এঁদের লেখার অনেকখানি বুঝতে নাও পারি, মনে হ'তে পারে অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গত এক বৎসর তাঁদের বহু রচনা প'ড়ে তাঁদের কিছু বল্‌বার সুযোগটাই খুঁজছিলাম। সেই সুযোগ আজ পেয়েছি। আমি বলি—তাঁরা সংযত হউন। সত্যিকার রসবস্তু কি, কিসে মানুষের হৃদয়কে বড় করে, সাহিত্য কি—এ সব তাঁরা ভেবে দেখুন।...যথার্থ বন্ধুভাবে আমি তাঁদের বলছি—তাঁরা সংযমের সীমা অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারংবার মনে পড়ে। সেদিন অনেকেই মনে করলেন, যেন আমি তাঁর কথার পাল্টা উত্তর দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা করিনি, কোন দিন করব ব'লে মনেও করি না। সেদিন তাঁর কথা আমার অতটা না বল্লেও হয় ত হ'ত। কারণ, অতখানি বোধ করি অত্যন্ত কঠোর ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল, সত্য ছিল না। কিন্তু এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারিনে।

আজ মনে হয়, যতই এঁদের বিরুদ্ধে কথা উঠছে, ততই যেন এঁদের আক্রোশ বেড়ে চলেছে। অন্ততঃ, আক্রোশের থেকে করছেন বলেই সন্দেহ হয়। মনে হয়, যেন তাঁরা বলছেন—বেশ করেছি, আরো করব। তোমরা বলছ, সে জন্ত আরো বেশী ক'রে করব। একে কিন্তু সাহস বলে না। যে দিকে শাস্তির ভয় আছে, সেদিকে যদি এই পরিমাণ সাহস দেখাতে তাঁরা পারতেন, তা হ'লে মনে করতাম, আর কিছু না থাক্‌, অন্ততঃ সত্যকার সাহস এঁদের আছে।...

এ সব আমি ভারি দুঃখের সঙ্গেই বলছি। বহুদিন সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রে যা ভাল বুঝেছি, তার থেকেই বলছি—সংযত হওয়া দরকার। তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ—একটু আধটু করেছ, তা নয়, অনেকখানি করেছ। একটু আধটু যায়গায় কোথাও কিছু হ'লে কিছু হ'ত না। এ ক্ষেত্রে তা একবারে নয়। এ কথার উত্তরে যদি তোমরা কেউ বলো—আমিও ত এটা লিখেছি, রবীন্দ্রনাথও অমন লিখেছেন—হ'তে পারে, আমরা লিখেছি। তাতে কিন্তু প্রমাণ হয় না যে, তোমরা ভাল কাজ করছ।

মাসিক বসুমতী—আশ্বিন, ১৩৩৬] শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—

অধ্যাপক রমণের নূতন আবিষ্কার

অধ্যাপক স্যর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কাটারাম রমণের নূতন মৌলিক গবেষণায় পদার্থবিজ্ঞান-জগতে নূতন সাড়া আসিয়াছে।...এই

বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে, ১৯০০ সালে মনীষী প্লাঙ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত আলোকের কণাবাদ (Quantum Theory) হইতে আরম্ভ করিতে হয়। তাঁহার মতে, আলোক যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পড়ে, তখন কতকগুলি সূক্ষ্ম বিকম্পমান কণা (oscillator) তাপকে ছোট ছোট কণাপরিমাণে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যায়। প্লাঙ্কের তাপপ্রবাহের এই কণাবাদ অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেয় বটে, কিন্তু উপরোক্ত বিকম্পমান কণার অস্তিত্ব লইয়া এখনও অনেক মতভেদ আছে। প্লাঙ্কের বিকিরণধারা (Radiation formula) নির্ণয় করিতে হইলে এই বিকম্পমান কণার শক্তি নিরূপণ করিতে হয়, এবং নিরূপণ কালে র‍্যালেভিন্সের প্রাচীন ধারার (Classical formula) সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু প্রাচীন মতে পদার্থ-বিজ্ঞানের যে সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয় না, তাহা বুঝাইবার জন্যই প্লাঙ্ক তাপপ্রবাহের কণাবাদ প্রচার করেন। তাপপ্রবাহের প্রাচীন ব্যাখ্যা অনেকেই বোধ হয় জানেন। ইহা প্রথমে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল প্রচার করেন। ম্যাক্সওয়েলের মতে আলোকপ্রবাহ গোলাকার তরঙ্গরূপে চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়।

জগদ্বিখ্যাত মনীষী আইন্‌ষ্টাইন আলোকপ্রবাহের আণবিক তত্ত্বের এক সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, পণ্ডিতপ্রবর বোর (Bohr) পরমাণুর প্রকৃতির যে ব্যাখ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে প্লাঙ্কের বিকম্পমান কণার কোনরূপ সাহায্য না লইয়াও তাঁহার বিকিরণধারার নির্ণয় করা যায়। আইন্‌ষ্টাইনের যুক্তি এইরূপ :—

বোরের মতে একটি পরমাণুর মধ্যে একটা ভারী অংশকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন বা ঋণ-তাড়িত কণা বৃত্তাকার পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটি পরমাণুর মধ্যে এইরূপ বৃত্তাকার পথের সংখ্যা অনেক। বোরের মতে যখন একটি পরমাণু উত্তেজিত হয়, তখন একটি ইলেক্‌ট্রন্ কাছের বৃত্তাকার পথ হইতে দূরের বৃত্তের মধ্যে পড়ে। তখন এই ইলেক্‌ট্রন তাপশক্তি শোষণ করে। অনেক সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে একটি ইলেক্‌ট্রন্ দূরের বৃত্তাকার পথ হইতে কাছের বৃত্তাকার পথে বিক্ষিপ্ত হয়। এই সময়ে ইলেক্‌ট্রন্ হইতে তাপ নির্গত হইয়া থাকে।

বোরের পরমাণুর এই ব্যাখ্যা হইতে প্ল্যাঙ্কের বিকিরণধারা নির্ণয় করিতে গিয়া আইন্‌ষ্টাইন দুইটি বিষয় অনুমান করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, পরমাণুর মধ্যে যখন একটি ইলেক্‌ট্রন্ ছোট বৃত্তাকার পথ হইতে বড় বৃত্তাকার পথে নিপতিত হয়, তখন খানিকটা উত্তাপ শোষণ করে। কিন্তু বড় বৃত্তাকার পথ হইতে ইলেক্‌ট্রন্ ছোট বৃত্তাকার পথে পতিত হইলে তাপ দ্বিধা নির্গত হয়। একটিকে স্বতোনির্গম (spontaneous emission) আর একটিকে বিপরীতার্থক শোষণ (negative absorption) বলে। প্রথমতঃ, যখন বড় বৃত্তাকার পথে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা বেশী হয়, তখন ভারসাম্যের (equilibrium) জন্য আপনা আপনিই কিছু কিছু ইলেক্‌ট্রন্ ছোট বৃত্তাকার পথে পড়ে। ইহাকে স্বতোনির্গম বলে। দ্বিতীয়তঃ, পতিত আলোক-রশ্মির সহিত ভারসাম্য রাখিতে গিয়া কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন্ আলোক-রশ্মির প্রাবল্য অনুসারে বড় বৃত্তাকার পথ হইতে ছোট বৃত্তাকার পথে পড়ে। ইহাকে বিপরীতার্থক শোষণ বলে। ইহাকেও তাপের এক রকম নির্গম বলা যায়। কাজেই মোটামুটি ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, পরমাণু উত্তেজিত হইলে ইলেক্‌ট্রন্ ছোট বৃত্তাকার পথ হইতে বড় বৃত্তাকার পথে আসিবার সময় তাপের শোষণ হয়, এবং বড় বৃত্তাকার পথে বিক্ষিপ্ত হইবার সময় দুইভাবে শক্তিনির্গম হয়। শীঘ্রই এই শোষণ ও নির্গমের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হয়। এই কল্পনা হইতেই আইন্‌ষ্টাইন্ প্ল্যাঙ্কের বিকিরণধারা নির্ণয় করেন।

পণ্ডিতপ্রবর কম্‌টন্ ইহার পরে এক বিচিত্র গবেষণা করিয়া বিজ্ঞানজগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি দেখাইলেন যে, রণ্টগেন্ রশ্মি বা এক্স-রে একটি পরমাণুর উপর পড়িলে পরমাণুর ইলেক্‌ট্রন্‌গুলিকে ধাক্কা দিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কম্পন-শক্তিরও অনেকটা হ্রাস হয়।...আবিষ্কারের জন্য কম্‌টন্ নোবেল্ পুরস্কার পান। কম্‌টনের মতে রণ্টগেন রশ্মি ঠিক পরমাণুকে ধাক্কা দেয় না, তাহার পারিপার্শ্বিক ইলেক্‌ট্রন্‌গুলিকে ধাক্কা দেয় মাত্র। রমণের আবিষ্কারের তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক।...

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্মেকেল (Smekal) বলিয়াছিলেন যে, আইনষ্টাইনের মতানুসারে সাধারণ আলোকরশ্মি একটি অণু বা পরমাণুর উপর পড়িলে দুইভাবে প্রতিক্ষিপ্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ—পরমাণুর মধ্যে উপরের একটি বৃত্তাকার পথ হইতে ইলেকট্রন্ নীচের কোন বৃত্তাকার পথে পড়িতে পারে। তখন ইলেক্‌ট্রন্ তাপ নির্গত করে। কাজেই প্রতিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মির তেজ বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ—নীচের একটি বৃত্তাকার পথ হইতে আলোকরশ্মি উপরের একটি বৃত্তাকার পথে পড়িতে পারে। তখন ইলেক্‌ট্রন্ তাপ শোষণ করে; কাজেই প্রতিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মির তেজ কমে। স্মেকেলের এই ভবিষ্যদ্বাণী এ যাবৎ কেহ কার্য্যতঃ দেখাইতে পারেন নাই। এত দিন সকলে গ্যাস লইয়া কাজ করিয়াছিলেন। গ্যাসের মধ্যে অণু ও পরমাণুগুলি ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ও কম সংখ্যায় থাকে। কিন্তু তরল পদার্থমধ্যে অণু ও পরমাণুগুলি জমাট বাঁধিয়া থাকার জন্য আলোকরশ্মি তন্মধ্যস্থ যে কোন অণু বা পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনগুলিকে ধাক্কা দিবার অনেক বেশী সুযোগ পায়। কাজেই সেই সময়ে দুইপ্রকারের—একটি কম তেজের ও একটি বেশী তেজের—আলোকরশ্মি প্রতিক্ষিপ্ত হইতে পারে এবং উহাদিগকে ফটোগ্রাফীর সাহায্যে ধরা যাইতে পারে। অধ্যাপক স্যার সি, ভি, রমণ তরল পদার্থ লইয়া পরীক্ষা দ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বিচিত্র আবিষ্কারের ফলে আইনষ্টাইনের অনুমানগুলির—অর্থাৎ পরমাণুর উপর আলোকরশ্মির সংঘর্ষণের ফলে তাপের বিকীরণ ও শোষণ এবং তৎসঙ্গে স্বতোনির্গম ও বিপরীতার্থক শোষণের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে। বোরের পরমাণুর প্রকৃতির এবং আলোকপ্রবাহের কণাবাদেরও সুন্দর মীমাংসা হইয়াছে। প্রিংসহাইম্ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা অধ্যাপক রমণের এই আবিষ্কার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা রমণের এই আবিষ্কারকে "রমণ-এফেক্ট" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, একজন ভারতবাসীর এইরূপ সাফল্যে ও যশঃপ্রাপ্তিতে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত হইয়াছি। "রমণ-এফেক্ট" ও 'কম্‌টন্-এফেক্ট"-এর মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু "রমণ-এফেক্ট" আলোক-রশ্মি পরমাণুর মধ্যস্থিত ইলেক্‌ট্রনের উপর পড়িয়া প্রতিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "কম্‌টন্ এফেক্ট" আলোকরশ্মি পরমাণুর পারিপার্শ্বিক ইলেক্‌ট্রনের উপর পড়িয়া প্রতিক্ষিপ্ত হয়।

প্রকৃতি—ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৬] শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী

—

শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি নিবেদন

যে কারণেই হউক, অনেক বাঙালীর এইরূপ একটা ধারণা আছে, যে, বাংলাদেশ সব বিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে উন্নততম প্রদেশ। মানবজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইহা কিন্তু সত্য নয়। বাংলাদেশ যদি কোন কোন বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইয়া থাকে, তাহা হইলেও অন্ত অনেক প্রদেশ সেই সকল বিষয়ে বঙ্গের সমান হইয়া উঠিতেছে—কোন কোন বিষয়ে হয়ত বা তাহারা বাংলাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে।...

বাংলার লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী; সুতরাং বাংলা স্ত্রীশিক্ষায় সকলের চেয়ে অগ্রসর হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে বঙ্গেই বেশী ছাত্রী পাস্ হওয়া উচিত। বস্তুতঃ তাহা হয় না, তাহা পাঠিকারা সরকারী রিপোর্টে উল্লিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারিবেন।...

শিক্ষকতার কার্য্যের পরীক্ষায় মান্দ্রাজে এত ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়—মোট ১৭৮ জন, যে, তাহার সহিত অন্ত কোন প্রদেশের তুলনাই হয় না। মান্দ্রাজে যে এত মহিলা শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন, তাহা হইতেই সেই প্রদেশের লোকদের স্ত্রীশিক্ষায় অনুরাগ কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে। মান্দ্রাজী পুরুষেরা যে নানা দিকে অগ্রণী হইয়া উঠিতেছে, মান্দ্রাজে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার তাহার অন্যতম কারণ।

সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, আইন শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, শিক্ষকতা শিক্ষা—কোন বিষয়েই বাংলাদেশ ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষায় প্রথমস্থানীয় নহে। কিন্তু পুরুষদের শিক্ষা বিষয়ে পাসের সংখ্যায় বাংলাদেশ প্রথমস্থানীয়। নারীশিক্ষায় বঙ্গের পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়ার নানা কারণ আছে। প্রধান দুটির উল্লেখ করিতেছি। বাংলাদেশে অবরোধপ্রথা থাকায় বালিকাদের ও নারীদের শিক্ষালয় চালান অধিক ব্যয়সাধ্য। গাড়ীর খরচ দেওয়াই দুঃসাধ্য। তদ্ভিন্ন অবরোধপ্রথার অস্তিত্বপ্রযুক্ত অন্তঃপুরের বাহিরের জীবনে নারীরা অভ্যস্ত না থাকায় মহিলারা এমন কোন কাজ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, যাহাতে বাহিরে যাতায়াত করিতে এবং পারিবারিক-সম্পর্কহীন পুরুষদের সহিত কথাবার্ত্তা ও পত্র-ব্যবহার করিতে হয়। অবরোধপ্রথা থাকায় যে-সব মহিলা বাড়ীর বাহিরে চলাফিরা ও কাজ করেন, পুরুষদের তাঁহাদের প্রতি মনের ভাব ও দৃষ্টি বাঞ্ছনীয় রকমের নহে। বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার কম হইবার আর একটি কারণ, ইহা মুসলমানপ্রধান প্রদেশ। ইহার অধিবাসীদের অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান। প্রাথমিক পাঠশালার নীচের শ্রেণী বাদ দিলে মুসলমান বালিকা ও নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত কম; অথচ তাঁহারা যে খুব উচ্চশিক্ষা পাইতে পারেন, দু-একজন শিক্ষিতা মুসলমান যুবতীর কৃতিত্ব হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।...

এখন প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজেও নারীদের উচ্চশিক্ষা বিস্তারলাভ করিতেছে। কিন্তু যদি মুসলমান সমাজেও ইহা আদৃত হইতে আরম্ভ করিত, তাহা হইলে বাংলাদেশ এবিষয়ে অচিরে অন্ত কোন প্রদেশের পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিত না।

অবরোধপ্রথা যে বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের প্রধান বাধা, তাহা আগে বলিয়াছি। নারীদের অন্ত কোনপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার পক্ষেও ইহা একটা মস্ত বাধা।

মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, অন্ধ্রদেশে, দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীন কাল হইতে সামাজিক স্ত্রীস্বাধীনতা থাকায় তথায় কেবল যে স্ত্রীশিক্ষারই বিস্তার সহজে হয়, তাহা নহে; অন্ত সবরকম দেশহিতকর কাজও নারীরা অপেক্ষাকৃত সহজে বেশী পরিমাণে করিতে পারেন। এইজন্ত ঐসকল অঞ্চলে সার্ব্বজনিক কাজে বাংলাদেশের চেয়ে অধিক মহিলাকে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

ছাত্রদের ও ছাত্রীদের জন্ত যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা আমি নিখুঁত বা পূর্ণাঙ্গ মনে করি না। কিন্তু তাহা অপেক্ষা ভাল কিছু নাই বলিয়া, মেয়েদিগকে মূর্খ করিয়া রাখা অপেক্ষা তদনুসারে শিক্ষা দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি অনুসারে যাঁহারা শিক্ষা দেন, তাঁহারা ভালই করেন। কিন্তু যাঁহারা কেবল প্রচলিত প্রণালীর দোষ দেখাইতে ও শিক্ষিতা মহিলাদের নিন্দা করিতেই নিপুণ, কোন প্রকার শিক্ষা যাঁহারা মেয়েদিগকে দেন না, তাঁহাদিগকে সম্মানার্হ মনে করি না।

যে সকল প্রদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা বরাবর আছে, তথাকার নারীরা ঘরের ভিতর ও বাহির দুই-ই স্বভাবতই জানেন; সুতরাং বাহিরে কোন ভাল কাজ করিতে তাঁহাদের বাধ বাধ ঠেকে না। তথাকার পুরুষেরাও ভদ্রমহিলাদিগকে বাহিরে দেখিতে অভ্যস্ত থাকায় তাঁহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, যেন তাঁহারা কোন অপূর্ব্ব জানোয়ার, কিংবা মাতা, ভগিনী বা কন্যা-স্থানীয়া নহেন। বাংলাদেশের অবস্থা দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ নহে। সুতরাং মহিলাদের এখানে কাজকরা খুব সহজ নয়।

যাহা হউক, আমার নিবেদন এই, যে, সহস্র বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও বঙ্গের শিক্ষিতা মহিলাদিগকে মেয়েদের উন্নতিতে মন দিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে এমন একজনও নাই, যিনি অন্ততঃ একজন নিরক্ষর বালিকা বা নারীকে লিখিতে বা পড়িতে শিখাইতে না পারেন। একজনকে শিখান হইয়া গেলে আর একজনকে শিখাইবেন। এই প্রকারে নিরক্ষরতা ধীরে ধীরে কমিতে থাকিবে। যাঁহাদের আরও বেশী অবসর বা সামর্থ্য আছে, তাঁহারা নিজের বা অন্ত কাহারও অন্তঃপুরে ক্লাশ খুলিয়া কয়জনকে একসঙ্গে শিখাইতে পারেন। যাঁহাদের অন্ত রকমের সামর্থ্য আছে, বা যাঁহারা দান বা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহারা ছোট-বড় বালিকাবিদ্যালয় খুলিতে পারেন।

লিখন পঠনই একমাত্র শিখাইবার বিষয় নহে। নানারকম গৃহকর্ম্ম, কুটীরশিল্প, শুশ্রূষা, সেলাই, চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত—এগুলিও যাঁহারা জানেন, শিখাইলে সমাজের উপকার করা হইবে।

শিক্ষিতা মহিলাদের বাংলাদেশে কয়েকটি সমিতি আছে। তাঁহারা সমিতির সভা আহ্বান করিয়া এবং নিজেরা স্বতন্ত্রভাবেও নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে নারীসমাজের উপকার হইবে:—

(১) প্রত্যেক ডিবিজনে একটি করিয়া কলেজ সরকারী ব্যয়ে মেয়েদের জন্ত স্থাপন ও পরিচালন করিতে হইবে। তাহাতে ছাত্রীনিবাস থাকিবে।

(২) প্রত্যেক জেলায় সরকারী ব্যয়ে অন্ততঃ একটি করিয়া উচ্চশ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেকটিতে ছাত্রীনিবাস থাকা চাই।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্ত যে নূতন আইন হইতেছে, তাহাতে সমগ্র বঙ্গের জন্ত একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাসমিতি এবং প্রত্যেক জেলার জন্ত একটি করিয়া জেলাশিক্ষাসমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীয় সমিতিতে এবং প্রত্যেক জেলাসমিতিতে উপযুক্ত সংখ্যক

নারীশক্ষা থাকা দরকার। নতুবা বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার শীঘ্র হওয়া সুদূরপরাহত।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বঙ্গে যত ব্যয় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে ও পরিচালনে ব্যয়িত হওয়া চাই। ইহা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব। অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া বালিকাদের শিক্ষা অবহেলিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই প্রস্তাবে কাহারও আপত্তি করা উচিত নয়।

(৫) প্রাথমিকের পর উচ্চতর শিক্ষার জন্ম যত ব্যয় হইবে, তাহার অন্ততঃ সিকি অংশ মেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। ইহাও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব।

(৬) বালিকাদের প্রাথমিক পাঠশালা হইতে কলেজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশস্ত খেলার জায়গার এবং ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষিতা মহিলারা আমার আবেদনে কর্ণপাত করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।

বঙ্গলক্ষ্মী—কার্ত্তিক, ১৩৩৬] শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

—

"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি প্রবাদ-বাক্য বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রবাদ বাক্যটি এই :—"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।" ইহার অর্থ এই যে, যদি কেহ অর্থাভাবে বিপদে পড়ে, তাহা হইলে গৌরী সেন অর্থ দিয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, গৌরী সেন পরদুঃখকাতর, মুক্ত-হস্ত ও মহাত্মা লোক ছিলেন।...

সহর হুগলীর নিকটে বালী-নামক একটি স্থান আছে। সেই স্থানে হরেকৃষ্ণ মুরারিধর সেন নামক একজন সামান্ত গৃহস্থ লোক বাস করিতেন। ইনি জাতিতে সুবর্ণ-বণিক্ ছিলেন। মহাত্মা গৌরী সেন ইঁহারই পুত্র। গৌরী সেনের প্রকৃত নাম "গৌরীশঙ্কর সেন।"... হুগলী-নিবাসী সুপণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্বর্গগত শম্ভুচন্দ্র দে, বি এল মহাশয় বলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়, গৌরী সেনের অধস্তন অষ্টম পুরুষ ছিলেন। শম্ভুবাবু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে ঈশ্বরবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়াছিলেন। শম্ভুবাবু তৎকালে আরও বলিয়াছিলেন যে, ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌরী সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং এতদনুসারে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু লঙ্ সাহেবের প্রবন্ধে জানিতে পারা যাইতেছে যে, বড়বাজার নিবাসী বৈষ্ণবচরণ শেঠ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে গৌরী সেনকে অংশীদার করিয়াছিলেন। সুতরাং শম্ভুবাবুর মতে দেখা যায় যে, যখন গৌরী সেন বৈষ্ণবচরণের অংশীদার হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৪৬ বৎসর, কিন্তু ইহা অসম্ভব। বোধ হয়, ঈশ্বরবাবু আপনাকে গৌরী সেনের অষ্টম পুরুষ বলিয়া ভুল করিয়াছেন। ফল কথা এই যে, পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বেই গৌরী সেন ও বৈষ্ণবচরণ বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া উভয়েই ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌরী সেনের জন্ম হইয়াছিল।...

গৌরী সেনের পিতা হরেকৃষ্ণ সেন অবস্থাপন্ন ছিলেন না। তিনি একজন সামান্ত গৃহস্থ মাত্র ছিলেন। গৌরী সেন কায় ক্লেশে সামান্ত ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন।...

তৎকালে কলিকাতা-বড়বাজারে বৈষ্ণবচরণ শেঠ নামক একজন ধনাঢ্য তন্তুবায় বাস করিতেন। তিনি যেরূপ ধনে কুবের, সেইরূপে ধর্ম্মেও যুধিষ্ঠির ছিলেন।...কলিকাতার প্রাচীন-ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবচরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তিনি বাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি কোম্পানীকে টাকা ধার দিয়া তাঁহাদিগের যথেষ্ট উপকার করিতেন। এই বৈষ্ণবচরণ তৎকালে একজন পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।...

বৈষ্ণবচরণ, গৌরী সেনের সাধুতা ও ধার্ম্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় ব্যবসায়ে অংশীদার করিয়া লইয়াছিলেন। একবার বৈষ্ণবচরণ, অংশীদার গৌরী সেনের নামে প্রচুর "দস্তা" ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখিলেন যে, এই দস্তার সঙ্গে প্রচুর-পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত রহিয়াছে। তখন তিনি গৌরী সেনকে কহিলেন, আপনারই সৌভাগ্যে এই দস্তার সঙ্গে এত রূপা রহিয়াছে। ইহা বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে, তাহা আপনিই লইবেন, আমি লইব না। এই বলিয়া সমস্ত লাভের টাকা বৈষ্ণবচরণ, গৌরী সেনকে আহ্লাদ সহকারে প্রদান করেন।...

গৌরী সেন এই সময় হইতেই প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ধন সৎকার্য্যেই ব্যয়িত হইতে লাগিল। দীন-দুঃখী লোক সকল তাঁহার নিকটে সাহায্য পাইয়া আপনাদের দুঃখ দূর করিতে লাগিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সময়ে যাহারা দেনার দায়ে জেলে যাইত, তাহারা যতদিন না দেনা পরিশোধ করিতে পারিত, ততদিন তাহারা জেলে আবদ্ধ থাকিত। সুতরাং জীবনে দেনা শোধ করিতে না পারিলেই জেলের মধ্যে তাহাদের মৃত্যু হইত। এই হেতু, এখনও আমাদের দেশে এই একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে,—"তোকে জেলে পচাব।"

গৌরী সেন যেরূপ বিনয়ী, সেইরূপ তেজস্বী ছিলেন। বলরাম সেন নামক একজন ধনাঢ্য বৈদ্য হাতীর উপরে চাপিয়া একবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসেন। হাতীর উপর হইতেই নিমন্ত্রণ করায় গৌরী সেন আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া বলরাম সেনকে কহিলেন, আপনি যদি হাওদা হইতে নামিয়া আসিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ না করেন, তবে আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না। বলরাম লজ্জায় ও ক্রোধভরে হাতীর উপর চাপিয়া চলিয়া গেলেন।

গৌরী সেন যখন-তখন নিজ বাটীতে মহা-সমারোহে ক্রিয়াকলাপ করিতেন। একবার তিনি কোন বিশেষ কার্য্যের উপলক্ষে হুগলী ও অন্যান্ত স্থানের স্বজাতীয় গণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল তাঁহাদিগকে পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত লোককে প্রচুর ধন-সম্পত্তিও দান করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, গঙ্গার পশ্চিম পারে কেহ কখনও এরূপ সমারোহে কার্য্য করিতে পারেন নাই। যে কোন ব্যক্তির অর্থাভাব হইত, সে মনে মনে জানিত যে, গৌরী সেন আছেন, আমার ভাবনা কি?—এইজন্যই "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন",—এই প্রবাদ-বাক্য বহুকাল হইতেই বাঙ্গালা দেশে চলিয়া আসিতেছে।

পঞ্চপুষ্প—আশ্বিন, ১৩৩৬] শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

ব্রজনাথের বিবাহ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নৌকা হইতে নামিয়া রাধানাথ ঠাকুর নিজের বাড়ী না গিয়া সোজা বরদা ঘোষের বাড়ী গেল। বরদাকান্ত বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। রাধানাথকে দেখিয়া বলিলেন,—তুমি কোথা থেকে আস্‌চ? তোমার হাতে ও কি?

রাধানাথ বলিল,—তোমার বেহাই বাড়ী থেকে আস্‌চি। তোমার বেহাই আমাকে এই গরদের জোড় দিয়েচেন, আর রাহাখরচ বলে' দশ টাকা দিয়েচেন।

গরদের জোড় বাহির করিয়া রাধানাথ বরদাকান্তকে দেখাইল। বরদাকান্ত কিছু অসন্তুষ্টভাবে বলিলেন,—আর আমি যা বলেছিলাম তার বুঝি কিছু করনি?

—তাও করেচি। এখানকার দারোগা ত এখন আমাদের মুঠোর মধ্যে, কলকেতায় বড় আপিস থেকে জেনে এসেচি তারাও কিছু কর্‌বে না। তোমার ভাবনার আর কোন কারণ নেই। তবে আগেকার সে সব পাট একেবারে তুলে দিতে হবে।

বরদাকান্তর দুর্ভাবনা দূর হইল। বলিলেন,—সে সব ত চুকে-বুকে গিয়েচে, আমি আর কখনো ওমুখো হব না। বেহাই বাড়ী তুমি কেমন করে' গেলে?

—জামাইয়ের সঙ্গে কল্‌কেতায় দেখা হল, তার সঙ্গে তাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। তুমি না বলেছিলে জামাই ছেলেমানুষ, কারবারের ও কি বুঝ্‌বে?

—সে ত ঠিক কথা।

—হিজলী গিয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যে এক লক্ষ টাকা লাভ করে এনেচে, পথে ডাকাতের দল তাদের পিছনে লেগেছিল, তাদের মেরে ভাগিয়ে দিয়েচে।

—ও সব ওদের লম্বা লম্বা কথা রেখে দাও। টাকা ত আর খোলামকুচি নয় যে কুড়িয়ে পাবে।

—ওদের লম্বা কথা বলা অভ্যাস নেই। জামাই, জামাইয়ের বাপ দু'জনেই আমাকে বলেচে। কলকেতায় জামাই মস্ত কারবার কর্‌বে বলে, বাড়ী দেখ্‌তে গিয়েছিল। গ্রামে তাদের বেশ বড় বাড়ী আর যথেষ্ট মানসম্ভ্রম। তুমি মনে করেছিলে তোমার মেয়ে অপাত্রে পড়েচে কিন্তু অমন পাত্র দেশময় খুঁজ্‌লে পাওয়া যায় না। ইন্দুর ভাগ্যে বিধাতা অনেক সুখ লিখেছেন তাই বিনা সন্ধানে অমন পাত্র পাওয়া গিয়েচে। তুমি হীরার টুক্‌রো জামাই পেয়েচ।

—ও কথায় তোমার নিজের বড়াই হচ্চে। তুমিই ত জামাই ধরে এনেছিলে।

—বড়াই নয়, তবে আমার খুব আহ্লাদ হয়েচে বটে। আদত কথা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। ভবিতব্যের উপর ত কোন কথা নেই। তা না হ'লে ইন্দুর বিয়ের সব ঠিক হয়ে সে ছেলেই বা হঠাৎ রোগে পড়্‌ল কেন? এখন কাজের কথা শোন। ইন্দুর শ্বশুর আমাকে বলে দিয়েচেন যে ২০শে ফাল্গুন তাঁরা বউ নিয়ে যাবেন। মাঝে গোটা-কতক দিন আছে কিন্তু এর মধ্যে তোমাকে লোক পাঠিয়ে তত্ত্ব কর্‌তে হবে, আর দানসামগ্রী আর বরাভরণ সব পাঠিয়ে দাও। আর এবার জামাই এলে যেন কোন বেফাঁস কথা বলে বসো না, জামাইকে যেমন সমাদর কর্‌তে হয় তাই কর্‌বে।

—আচ্ছা, তাই হবে।

রাধানাথ বাড়ীর ভিতর গিয়া হেমাঙ্গিনীকে সকল কথা বলিল। আহ্লাদে হেমাঙ্গিনী বাড়ীসুদ্ধ লোককে সুসংবাদ শুনাইলেন। রাধানাথের হাত ধরিয়া কহিলেন,—তোমাকেই সব কর্‌তে হবে, আমার সব ভরসা তোমার উপর। ঠাকুরঝিকে খবর দিতে হবে যে! তিনি আস্‌বেন বলে গিয়েছেন।

—তাঁকে খবর পাঠাব। তোমরা ভাল করে তত্ত্ব

পাঠাও, বাড়ীতে সকলে আমোদ আহ্লাদ কর। আমি ত এখানেই আছি, যা বল্‌বে তাই কর্‌ব। কর্ত্তাও এখন বুঝ্‌তে পেরেচেন কেমন জামাই হয়েচে। মেজাজও ঠাণ্ডা হয়েচে। আমি এখন একবার বাড়ী যাই, আবার কাল আস্‌ব।

দিন-সাতেক পরে সোমড়া হইতে অমরনাথের বাড়ীতে তত্ত্ব আসিল। অনেক লোকজন, প্রচুর সামগ্রী। দানের সমস্ত বাসন খাগড়ার, জামাইয়ের জন্ম উত্তম শান্তিপুরী ধুতি চাদর, জামাইয়ের মায়ের জন্ম বেনারসী নমস্কারী সাড়ী, অমরনাথের জন্ম গরদের জোড়, ভোলানাথ ও তাহার বিবাহিতা ভগিনীর জন্ম ধুতি চাদর ও সাড়ী, বাঁকে করিয়া ফলের ঝুড়ি ও অনেকগুলা থালা সাজানো বিস্তর মিষ্টান্ন। জিনিষপত্র দেখিয়া ভবসুন্দরী বলিলেন,—বেশ দিয়েচে। বেয়াই বেয়ানের নজর খুব ভাল।

ইন্দুলেখাকে যে দাসী মানুষ করিয়াছিল সে সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহাকে সঙ্গে করিয়া ভবসুন্দরী দোতলায় লইয়া গিয়া ব্রজনাথের ঘর দেখাইলেন। বলিলেন,—এই তোমাদের মেয়ের ঘর।

ঘর বেশ বড় আর বেশ সাজানো। কতক জিনিষ নূতন কেনা হইয়াছে, বড় পালঙে বিছানার উপরে ধবধবে চাদর পাতা, দেওয়ালে প্রমাণ আরসী, ঘরে মাদুরের উপর গালিচা পাতা। ঘর দেখিয়া দাসী বলিল,—এ যে খাসা ঘর। বাড়ীতে গিয়ে আমি মা-ঠাক্‌রুণকে বল্‌ব।

—হ্যাঁ ঝি তোমার নাম কি?

—আমার নাম বিন্দু।

—হ্যাঁ বিন্দু, তোমরা যখন এলে তখন বেয়ান কি কর্‌ছিলেন?

—এই সব জিনিষপত্র সাজিয়ে গুণে লোকদের দিচ্ছিলেন। আমাকে অনেক করে তোমায় বল্‌তে বল্‌লেন, তত্ত্ব পাঠাতে দেরী হয়েচে বলে কিছু মনে করো না। পুরুত-ঠাকুর গিয়ে তোমাদের কত সুখ্যাতি কর্‌ছিল।

—আমার বউমা কেমন আছে? সে কি কর্‌ছিল?

—সব ভাল আছে। দিদিমণি একটা ঘরে লুকিয়ে বসেছিল, তাকে সবাই ধরে এনে জিনিষপত্র দেখালে।

—বউমা না কি খুব সুন্দরী?

—সে কথা আমরা বল্লে কি তোমাদের বিশ্বাস হবে? তোমার ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর না? এখানে এসে কই জামাইবাবুকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

—সে বোধ হয় বাইরে আছে। রসো, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

—তোমার ছেলে যেন রাজপুত্তুর। আবার তেমনি গুণের ছেলে। এরি মধ্যে জাহাজ বোঝাই করে' টাকা এনেচে।

ভবসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন,—ও সব বাড়ানো কথা।

ব্রজনাথ আসিয়া বলিল,—মা, তুমি আমায় ডেকেচ?

—তোর শ্বশুরবাড়ী থেকে এত জিনিষপত্র এল, তুই দেখ্‌বি নে? চমৎকার তত্ত্ব করেচে, দেখ্‌লে চোক জুড়োয়।

—আমি আবার কি দেখ্‌ব? তোমরা দেখ্‌লেই হ'ল।

—একে দেখেছিস্? তোর শ্বশুরবাড়ীর পুরানো লোক, বউমাকে মানুষ করেচে।

ব্রজনাথ বিন্দুর দিকে চাহিয়া দেখিল। বিন্দু বলিল—জামাইবাবু, তোমাকে সেই বিয়ের রাত্তিরে দেখেছিলাম আর এই আজ দেখ্‌চি। তোমার মা জিগ্‌গেস কর্‌চেন বউ সুন্দর কি না। তুমি ত বিয়ে করেচ, তুমি বল না। শুভদিষ্টির সময় কেমন দেখেছিলে?

ভবসুন্দরী বলিলেন,—বিন্দু ত ঠিকই বলেচে। ওদের মেয়ে ওরা ত সুন্দর বল্‌বেই, তুই কেমন দেখ্‌লি?

—তোমরা কেবল সুন্দর সুন্দর কর, রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? কত সুন্দরী আছে যাদের কোন গুণ নেই, লোকে জ্বালাতন হয়ে উঠে কথায় কথায় ত সবাই মাকাল ফলের কথা বলে, সেটা কি মনে রাখা উচিত নয়? রূপ দেখে ত আর কাঁচের আলমারীতে তুলে রাখ্‌বে না? সুন্দর রূপে হয় না গুণে হয়।

বিন্দু বলিল,—এই হ'ল লাখ কথার এক কথা। বেশ বলেচ, জামাইবাবু। আমি ত একরত্তি মেয়ে থেকে দেখে আস্‌চি, আমি বড় গলা করে' বল্‌তে পারি তোমরা রূপে গুণে সমান বউ পেয়েচ।

ভবসুন্দরী বলিলেন,—ছেলের মুখের কাছে কে পারবে ? আমাদের মুখ বন্ধ করে' দিলে।

ব্রজনাথ বাহিরে গিয়া যাহারা তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছিল তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিল। পরদিবস তাহাদিগকে টাকা, কাপড়, পথখরচ দিয়া বিদায় করা হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসে বসন্তের দক্ষিণ-বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল, গাছে নূতন পাতা দেখা দিল, মুঞ্জরিত আম্রশাখায় বসিয়া কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করিল। মুকুলের গন্ধে মৌমাছির গুঞ্জনে বাতাস ভরিয়া গেল।

ইন্দুলেখাকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া যাইবে সংবাদ পাইয়া হরিমতী সোমড়ায় আসিলেন। ইচ্ছা, জামাই কেমন হইয়াছে একবার দেখিবেন। আগে যেখানে কথা হইয়াছিল সেখানে ইন্দুলেখার বিবাহ হইলে হরিমতী আসিতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু এ রকম নূতনতর বিবাহের ব্যাপার শুনিয়া তাঁহার মনে জামাইকে দেখিবার ঔৎসুক্য হইয়াছিল। হেমাঙ্গিনী যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন সকল কথা তাঁহাকে বলিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে জামাই এত টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছে, শুনিয়া হরিমতী বলিলেন, ইন্দুর কপাল ভাল। তার বর ত কুড়িয়ে পাওয়া বল্‌লেই কিন্তু সব দেশ খুঁজে বেড়ালে এমন জামাই তোমরা কোথায় পেতে ?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন,—এখন তোমরা আশীর্ব্বাদ কর দু'জনে যেন বেঁচে-বর্ত্তে সুখে থাকে।

—আশীর্ব্বাদ করব বলেই ত এত দূর থেকে এসেচি।

ইন্দুর জন্য হরিমতী একছড়া মুক্তাবসানো হার গড়াইয়া আনিয়াছিলেন, ইন্দুকে ডাকিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন। ইন্দু তাহার দুই পায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। হরিমতী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, আদর করিয়া বলিলেন,- এইবার তো তোকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে। ঘরের মেয়েগুলো এমনি করে পরের হয়ে যায়।

বাড়ীতে চারিদিকে সকলে ব্যস্ত, জামাই আসিয়া মেয়েকে লইয়া যাইবে। রাধানাথ নিত্য আসে, সব দেখে শোনে, ইন্দুর শ্বশুরবাড়ীর, ব্রজনাথের গল্প করে। বরদাকান্ত বাড়ীতেই থাকিতেন, কোথাও বড়-একটা যাইতেন না। তাঁহার প্রকৃতিতেও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেন সব সময় সপ্তমে চড়িয়া থাকিতেন, এখন হাঁকডাক কিছু কমিয়া গিয়াছিল। রাধানাথ ঠাকুর কোনো কালে তাঁহাকে ভয় করিত না। বড়-একটা সমীহও করিত না, কিন্তু বরদাকান্তর উপর রাধানাথের প্রভাব দিন দিন বাড়িয়া উঠিল। রাধানাথের কথায় বরদাকান্ত জামাইকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মেয়েমহলেও সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনীর আনন্দ ধরে না, এতদিনের দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা দূরীভূত হইল, জামাই আসিতেছে মনে করিয়া আহ্লাদের অস্থিরতা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। বিনাকাজে কেবলি ঘুরিয়া বেড়ান, ঘরদোর পরিষ্কার থাকিলেও নিজের হাতে আবার পরিষ্কার করেন, জামাই আসিলে তাহাকে কি খাওয়াইতে হইবে এখন হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইন্দুলেখাকে দুই বেলা সাজাইয়া দেন, তাহার থুঁতি ধরিয়া বার বার তাহার মুখ দেখেন, তাহার মলিন মুখখানি আবার প্রফুল্ল হইয়াছে, কি না দেখেন। যদি মেয়ের মুখখানি শুকাইয়া থাকে তাহা হইলে জামাই দেখিয়া কি বলিবে ? এমন যে ধীর প্রকৃতি, শান্ত হেমাঙ্গিনী, তাঁহার মনে ও শরীরে অনিবার্য্য চঞ্চলতা দেখা দিল।

আর ইন্দুলেখা ? সে কেবল পাশ কাটাইয়া বেড়াইত, কে কোথায় তাহাকে কি বিদ্রূপ করিবে। সে সকল রঙ্গ শ্রুতিপ্রিয় হইলেও তাহার কি সঙ্কোচ বোধ হইবে না ? এতদিন সকলে যেন তাহাকে কৃপাচক্ষে দেখিত, তাহার অসাক্ষাতে তাহার ভাঙা কপালের জল্পনা করিত, তাহার সাক্ষাতে সে কথা চাপা দিত। এখন বাড়ী-সুদ্ধ লোকের মুখে অন্য কথাই নাই, কেবল ইন্দুর বর আসবে, ওরে ইন্দুর বর আসচে, ওকে নিয়ে যাবে, এই এক কথা। কেহ তামাসা করে, কেহ হাসে, কেহ চোখ টিপে। কেহ বলে,—ওরে, বিয়ের রাত্রে বর চোরের মতন পালিয়ে গিয়েছিল এইবার সাধু সেজে আসচে। অপর কেহ বলে,—ওরে, বরের অনেক টাকা হয়েচে, পথে টাকা ছড়াতে ছড়াতে আসবে। এ কথার উত্তরে অল্পবয়স্কা কিশোরী ও যুবতীরা বলে,—পাগল ত আর হয়নি যে

পথে টাকা ছড়াবে। শেজতোলানি না দিয়েই পালিয়েচে। আমরা কান ধরে' এক শো টাকা শেজতোলানি আদায় করে' নেব। কেহ ইন্দুলেখাকে আঁকড়িয়া ধরে, কেহ জোর করিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলে,—তোর মুখে আহ্লাদ ফুটে বেরুচ্চে, লুকিয়ে রাখ্‌বি কোথায়? কেবল ঐ রকম সব কথা। ইন্দুলেখা কি বেহায়া যে ঐ সব কথা কাণ পাতিয়া শুনিবে? ছি! সে সঙ্গিনীদের কথার মধুবিষের জ্বালায় মাতার কাছে পলায়ন করিয়া গিয়া নিস্তার পাইত। কিন্তু মেয়েগুলা কি তাহাকে মিছামিছি জ্বালাতন করিত? সেই ছিল এক ইন্দুলেখা যখন অজানিত আশঙ্কাবিষাদের কালিমা তাহার অনিন্দ্য মুখখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, আর এখন? সে ছায়া অপসৃত হইয়াছে, দুর্ভাবনার রাত্রি অতীত হইয়া নির্ম্মল কোমল পূর্ব্বাকাশে প্রভাত অরুণের আলোক বিকীরিত হইতেছে। শৈবালাচ্ছন্ন পদ্মিনী শৈবালমুক্ত হইয়া প্রভাত সূর্য্যকিরণে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। অকারণে যখন তখন ইন্দুলেখার মুখে লাল আভা দেখা দেয়, একা থাকিলে থাকিয়া থাকিয়া বুক চমকিয়া ওঠে, কিসের শব্দ শুনিবার জন্ত কাণ পাতিয়া থাকে, জানালা খুলিয়া বাগানের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। এ সকল কেহ দেখিতে পাইত না, কেহ জানিত না। চঞ্চলতা যে সকলের অপেক্ষা ইন্দুলেখার অধিক তাহা কেহ জানিতে পাইত না, তাহাকে সর্ব্বক্ষণ চিত্ত দমন করিতেই হইত।

১৫ই ফাল্গুন ইন্দুলেখার শ্বশুরবাড়ী হইতে তত্ত্ব আসিল। তত্ত্ব দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, কেবল বরদাকান্ত নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন,—আমার কাছে বড়মানুষী দেখাতে এয়েচে! কতকগুলো কাঁচা পয়সা হয়েচে কি না!

রাধানাথ ঠাকুর চটিয়া গেল। বলিল,—তারা বউকে ভাল করে' তত্ত্ব করেচে, ইন্দুকে দামা দামী এক গা গহনা দিয়েচে, সেটাও কি তাদের অপরাধ হল?

—মখমলের উপর জরির কাজ করা নতুন ঢাকা, রূপার থালা, ঝিয়েদের হাতে মোটা মোটা সোনার তাগা, এত সব বাড়াবাড়ি কেন?

—যাদের আছে তারা দেবে না কেন? বিয়ের রাত্রে ত জামাইয়ের চালচুলো নেই বলে' তাকে শুনিয়ে অপমান করেছিলে, পাছে আবার সকাল বেলা অপমান কর এই ভয়ে তাকে আমি রাতারাতি সরিয়ে দিই। আর যেই দেখলে জামাই ভাল ঘরের ছেলে, বাপ সঙ্গতিপন্ন লোক, জামাই এই অল্প বয়সে ছ মাসের মধ্যে লাখো টাকা নিজে রোজগার করেচে অমনি তোমার চোখ বুক টাটাচ্চে! তোমার নিজের মেয়ে নিজের জামাই বলে একটু মায়া হয় না?

—জামাই বলে' অত জাঁক কেন?

—কিসের জাঁক দেখ্‌লে আর কবেই বা তুমি তাকে দেখ্‌লে? আমি তাকে দেখেচি আর আমি জানি যে সে তোমার মত পাঁচটাকে ট্যাঁকে গুঁজতে পারে।

বেহাই-বাড়ীর লোক আসিতেছে দেখিয়া বরদাকান্ত থামিয়া গেলেন।

বাড়ীর ভিতর তত্ত্ব তুলিয়া লইয়া হেমাঙ্গিনী তত্ত্ব-বাহকদের আহারের আয়োজন করিতেছিলেন। সঙ্গে যে কয়জন ঝি আসিয়াছিল তাহারা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া দেখিল, বড়মানুষের বাড়ী বটে। যে ঝি ব্রজনাথকে মানুষ করিয়াছিল সে ইন্দুলেখাকে ভাল করিয়া দেখিল। বলিল,—দাদাবাবুর কোথাও কিছু নেই, আমাদের বাড়ীতে কেউ কিছু জানে না, পথের মাঝখানে বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু সাত দেশ খুঁজলেও ওঁরা এমন বউ কোথায় পেতেন?

লোকজন যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের আহারের সময় বাড়ীর মেয়েরা নিজে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। হরিমতী দাঁড়াইয়া কাহার কি আবশ্যক জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন। ধামা হইতে গোছা গোছা তপ্ত লুচি পাতে পড়িতেছিল। পুকুরের পোনা মাছ, সোমড়ার কাঁচাগোল্লা, কাঁচরাপাড়ার চাঁপা, বাগানের ইচড়ের ডালনা, বেগুন পটল ভাজা পাতে পাতে স্তূপাকার হইয়া উঠিল। খুরিতে দই ক্ষীর ফুরাইলেই আবার তখনি পাত্র পূর্ণ হইতেছে।

আহারের পর হেমাঙ্গিনী বেহাই-বাড়ীর পুরাতন ঝির সঙ্গে গল্প করিতে বসিলেন। বলিলেন,—পাঁচ দিন পরে তোমাদের বউ ত তোমরা নিয়ে যাবে। জামাই কবে আস্‌বেন? এখানে দুদিন থাকবেন না?

সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসগ্রহণ

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

—কবে আসবে তা ত আমরা কিছু জানি নে। মা-ঠাকরুণ আমাদের কিছু বলে' দেননি, আর বাবুর সঙ্গে দাদাবাবুর কি কথা হয় আমরা তা কেমন করে' জানব? দাদাবাবু না কি কলকাতায় যাবে।

—কেন?

—সেইখানে নাকি কারবার কর্‌বে। সবাই বলে দাদাবাবু খুব কারবার বোঝে। এই দেখ না, হিজলী থেকে কত টাকা এনেচে।

—তাত শুনেচি। কলকাতায় কি একলা থাকবে, না ইন্দুকেও নিয়ে যাবে?

—দাদাবাবু মা-ঠাকরুণকে বল্‌ছিল, কল্‌কাতায় একখানা বড় বাড়ী কর্‌বে, সবাইকে নিয়ে যাবে, ছোট দাদাবাবু সেখানেই পড়্‌বে। কর্ত্তা বোধ হয় যাবেন না। তাঁর বয়স হয়েচে, এ বয়সে দেশ ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

—জামাইয়েরা কয় ভাই বোন?

—দুই ভাই, এক বোন। দিদিমণি শ্বশুরবাড়ী, একটি ছেলে। বউমা গেলে পর তাকে বোধ হয় নিয়ে আসবে। একটা কথা বল্‌ব?

—কি বল্‌বে বল।

—বাবু বউমাকে যে গয়না দিয়েচেন দাদাবাবু নিজে পছন্দ করে' সে সব গড়িয়ে দিয়েচে। আমাদের বড় সাধ সেই গয়না একবার বউমার গায়ে দেখি।

—এ আর কি এমন বড় কথা! তোমরা বস, পান খাও, আমি তাকে গয়না পরিয়ে নিয়ে আসচি।

তত্ত্বের সঙ্গে ইন্দুলেখার যে-সকল গহনা আসিয়াছিল তাহা হেমাঙ্গিনীর দেরাজে তোলা ছিল। দেরাজ খুলিয়া তিনি ইন্দুলেখাকে ডাকিলেন।

ইন্দুলেখাকে গহনা পরানো হইবে শুনিয়া সুরমা ও অপর মেয়েরা ছুটিয়া আসিল। হরিমতীও আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তত্ত্বের সঙ্গে খুব ফিকে গোলাপী রংয়ের সাড়ী ছিল, হেমাঙ্গিনী কন্যাকে সেইখানি পরাইলেন। তাহার পর একে একে অলঙ্কার গায়ে সাজাইয়া দিলেন। সমস্ত সাঁচ্চা জড়োয়া গহনা, মোটা মোটা জবড়জঙ্গ কিছু নাই। হাতে জড়োয়া চুড়ি, জড়োয়া বালা, গলায় বড় বড় মুক্তার সাত নরী হার, মাঝখানে একখানা বড় পান্নার পদক। কাণে হীরা আর চুনির দুল, মাথায় হীরার ঝাপটা আর ছোট তাজ। পায় চরণ-পদ্ম আর পাঁইজর। হেমাঙ্গিনী ইন্দুলেখাকে মাথায় ঘোমটা দিতে দিলেন না, বলিলেন,—ওরা দেখতে চাইচে, ভাল করে' দেখুক।

হরিমতী সুরমার গাল টিপিয়া দিয়া বলিলেন,—কি সুরো, গয়না দেখে তোর হিংসে হচ্চে না?

—পিসিমার যেমন কথা! আহ্লাদ হবে না হিংসে হবে?

—তোরও যদি রাতারাতি ঐ রকম একটি বর জোটে তা হলে বেশ হয়।

—অমন কর ত পিসিমা পালিয়ে যাব।

হেমাঙ্গিনী ইন্দুলেখার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া আসিলেন। অলঙ্কারে প্রতিফলিত আলোক, নম্রমুখী কন্যার অতুল রূপরাশি, মৃদু পদবিক্ষেপে নূপুর-শিঞ্জন। সকলে ইন্দুলেখাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সোমড়ায় যাহারা তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিল তাহারা উলুবেড়ে ফিরিয়া গিয়া ভবসুন্দরীর কাছে সকল কথা বলিল। বধূ অসামান্যা সুন্দরী শুনিয়া তাঁহার ত আনন্দ হইলই, তাহার উপর কুটুম্ব ভাল হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার আরও আনন্দ হইল। পুরাতন দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীর কর্ত্তাকে কেমন দেখ্‌লি?

—তিনি ত একবার দেখা দিয়েই সরে' গেলেন, আর তাঁকে বড়-একটা দেখতে পাইনি। তাঁকে দেখ্‌লে মনে হয় না যে তোমার বউ তাঁর মেয়ে। গোঁফ জোড়া ছুটো মুড়ো ঝাঁটার মতন, চোখ যেন কপালে চড়ে' আছে, একবারও মুখে হাসি দেখ্‌লাম না। কিন্তু তোমার বেহান একেবারে মাটির মানুষ, আমাদের কত যত্ন করলেন, কত ঘটা করে' খাওয়ালেন। আমি বল্‌তেই মেয়েকে গয়না পরিয়ে সাজিয়ে নিয়ে এলেন। মেয়ের কি যে রূপ, কেমন নরম স্বভাব, দেখলেই বুঝ্‌তে

পারবে। আমাদের ত এত বয়স হতে গেল, এমন সুন্দরী আজ পর্য্যন্ত দেখিনি। আর পিসিমা, তিনি সে বাড়ীতে থাকেন না, দাদাবাবুকে দেখ্‌বার জন্য এয়েচেন, তিনি খুব পাকা সেয়ানা মেয়েমানুষ।

—এই ত আর চারটে দিন গেলেই বউমা আস্‌বে।

ভবসুন্দরী ব্রজনাথকে কেবলি তাগিদ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য কাপড়-চোপড় নিজে সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—তুই কোথায় চুপিচুপি বিয়ে করে' এলি, আমি কি বউয়ের মুখ দেখ্‌ব না?

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল,—তোমরা যেদিন স্থির করেচ তার আগে ত আর আমাকে পাঠাতে পার না।

—না, তাই বল্‌চি, এ দুটো দিন কেটে গেলে হয়।

ব্রজনাথ পিতার অনুমতি লইয়া কলিকাতা হইতে একটা ছোট ষ্টীমার ভাড়া করিল। আর একটা যে আয়োজন করিল অমরনাথ তাহার কিছু জানিলেন না। ব্রজনাথ হরেরাম সর্দ্দারের কাছে দু'একবার গিয়া কি পরামর্শ করিয়া আসিল।

১৯শে ফাল্গুন আহারাদির পর ব্রজনাথ দুজন চাকর সঙ্গে করিয়া ষ্টীমারে উঠিল। সন্ধ্যার সময় সোমড়ায় পঁহুছিবার কথা।

উলুবেড়ে ছাড়াইয়া ক্রোশখানেক উত্তরে গিয়া ব্রজনাথ দেখিতে পাইল একটা ঘাটের কাছে কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। ঘাটের সম্মুখে একটু দূরে ব্রজনাথ ষ্টীমারের নোঙ্গর ফেলিতে আদেশ করিল। ষ্টীমারের দুইখানি বোট ঘাটে গিয়া সেই সকল লোককে ষ্টীমারে লইয়া আসিল। কুড়িজন হাতিয়ারবন্ধ জোয়ান, গদা তাহাদের দলপতি।

সোমড়ায় পঁহুছিতে অন্ধকার হইয়া আসিল। বোটে করিয়া ব্রজনাথ দলবল-সমেত নিঃশব্দে ঘাটে নামিল। ঘাটে বরদাকান্তর ছিপ বাঁধা ছিল। ছিপে একটা লণ্ঠন ছিল, সেইটা তুলিয়া লইয়া ব্রজনাথ মাঝিদের একে একে মুখ দেখিল। শঙ্কর মাঝির মাথায় কাটা দাগ দেখিয়া বলিল—এই যে আমার চিহ্ন রয়েচে আমাকে চিন্‌তে পার?

শঙ্কর মাঝি ব্রজনাথকে দেখিল, তাহার পিছনে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে তাহাদিগকে দেখিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া নমস্কার করিয়া বলিল,—আজ্ঞে, চিন্‌তে পারি বই কি! আপনার ত আস্‌বার কথা আছে।

শঙ্কর মাঝি হাত কচলাইতে লাগিল। ব্রজনাথ হাসিয়া বরদাকান্তর বাড়ীর অভিমুখে চলিল।

বরদাকান্ত বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। জামাই আজ আসিবে কি পরদিন আসিবে সে সংবাদ তিনি জানিতেন না। জামাই আসিবে বলিয়া তাঁহার মুখে প্রসন্নতার কোন লক্ষণ ছিল না। মুখ ভার করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। জামাই আসিলে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন সেই কথা ভাবিতেছিলেন। অবশ্য তাহাকে অপমান করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু তাহাদের টাকা আছে বলিয়া যে জামাইয়ের কাছে নরম হইতে হইবে এমনও কোন কথা নাই। বিবাহের রাত্রে তিনি যে রূঢ় কথা বলিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার কখন কিছুমাত্র অনুতাপ হয় নাই। চীৎকার করিয়া না বলিলে হয়ত জামাই শুনিতে পাইত না, কিন্তু সে শুনিলেই বা কি আসিয়া যায়? রাধানাথ ঠাকুর যেন বাড়ীর কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথা-মত জামাইকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের এত কথা যদি জানা না থাকিত তাহা হইলে বরদাকান্ত তাহাকে দেখিয়া লইতেন। জামাই আসিলে যে কয়টা কথা না বলিলে নয় তাহাই বলিবেন। আদর-অভ্যর্থনা বাড়ীর মেয়েরা করিবে।

বরদাকান্ত এইরূপ অপ্রিয় জল্পনা করিতেছেন এমন সময় কাহার পায়ের শব্দ হইল। তিনি মুখ তুলিয়া দেখেন, বৈঠকখানার দরজার দুই পাশে দাঁড়াইয়া দুইজন বলিষ্ঠ পুরুষ। দুইজনের হাতে খাপখোলা তরোয়াল, মুখে একটিও কথা নেই। কিছুদিন পূর্ব্বে এই দলের লোকেদের সঙ্গে বরদাকান্তর বিশেষ পরিচয় ছিল, কিন্তু এই দুই ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলেন না।

সহসা বাড়ীর বাহিরে অনেকগুলা মশালের আলোকে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। জানালা দিয়া সে আলোক বৈঠকখানায় পড়িল। বরদাকান্ত চাহিয়া

দেখিলেন সতের আঠারোজন সশস্ত্র লোক মশাল জ্বালিয়া বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছে।

বরদাকান্ত পুলিশের লোককে যেরূপ ভয় করিতেন, ডাকাতকে তেমন ভয় করিতেন না। করিবার কথাও নয়। তিনি রাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—আমার বাড়ীতে এ কি এ? আমি কে তোমরা জান?

একজন উত্তর করিল,—বিলক্ষণ জানি। আপনি ভোলাবাবু।

—কোন্ সাহসে তোমরা এখানে এসেছ?

—সর্দ্দারের হুকুম।

—কে তোমাদের সর্দ্দার?

—হরেরাম সর্দ্দার।

—সেও এখন বুড়ো হয়েচে, তার নামও কেউ জানে না। আমার বাড়ীতে কি মতলবে এয়েচ? ডাকাতি কর্‌বে?

—রাম, আমরা কাণাকড়িও নেব না। সর্দ্দার বলে দিয়েচে, কে একজন বাবু এখানে আসবে, তাকে কেউ কিছু না বলে তাই আমাদের দেখ্‌তে হবে।

—তোমরা পথ ছাড়, আমি বাহিরে যাব।

দুইজনে বরদাকান্তর পথ রোধ করিল। যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল সে বলিল,—রসো বাবু, অত ব্যস্ত হও কেন? একটু সবুর কর।

বরদাকান্ত দেখিলেন, ব্রজনাথ দিব্য জামাইয়ের সাজে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বরদাকান্তর দিকে না চাহিয়া সোজা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। জামাইকে অভ্যর্থনা বা সম্ভাষণ করিবার সমস্যা আপনা আপনি চুকিয়া গেল। কিন্তু অপমান হইল কাহার? জামাইয়ের ত নয়।

ব্রজনাথ চলিয়া গেলে পর সে দুই ব্যক্তি বরদাকান্তর পথ ছাড়িয়া দিল। যে বরদাকান্তর সঙ্গে কথা কহিয়াছিল সে বলিল,—দেখো বাবু, যেন কোন গোলমাল না হয়, তা হলে আমরা বাড়ীর ভিতর যাব, সর্দ্দারের হুকুম।

বরদাকান্ত রাগিয়া আঙুল কামড়াইতে লাগিলেন, বাড়ীর ভিতর গেলেন না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জামাই আসিবে বলিয়া বাড়ীর ভিতর সকলে ভারি ব্যস্ত। কোন সংবাদ না আসিলেও জামাই অন্ততঃ এক রাত্রি শ্বশুরবাড়ীতে কাটাইবে এ আশা সকলেই করিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় মেয়েরা যেখানে সাজগোজ করিতেছিল হরিমতী সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—ছাখ্, বিয়ের রাত্রে আমি এখানে ছিলাম না, বাসরও জাগিনি। আজ আমি জামাইয়ের সঙ্গে দুটো কথা কইব। আজ আমি ঠান্‌দিদি।

সুরমা বলিল,—ও কি কথা, পিসিমা! তুমি কি জামাই-বাবুর সঙ্গে তামাসা কর্‌বে না কি? তুমি যে শাশুড়ী হও।

—সে কাল হব। আজ আমি তোদের দলে।

—আমি বলে' দেব তুমি শাশুড়ী হয়ে' ঠান্‌দিদি সেজেচ।

—আমি বল্‌ব ইন্দুর বিয়ে হয়েচে বলে' তোর হিংসে হয়েচে, তুই বিয়ে-পাগলী হয়েচিস্।

—ও সব কি ছাই কথা! ও রকম কর্‌লে আমি পালিয়ে যাব।

এই রকম কথাবার্ত্তার মাঝখানে একজন ঝি ছুটিয়া আসিল। তাহার মাথার কাপড় খসিয়া গিয়াছে, ভয়ে চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—সর্ব্বনাশ হয়েচে! বাড়ীতে ডাকাত পড়েচে!

ভয়ে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। রাধানাথ ঠাকুর হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছিল, গোলযোগ শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে?

—ডাকাত পড়েচে!

—পাগল না কি! সন্ধ্যারাত্রে কি ডাকাত পড়ে? আর এ বাড়ীতে ডাকাতের ভয় নেই। তোমরা গোলমাল করো না, আমি দেখে আস্‌চি।

রাধানাথ বাহিরে যাইতেছে, দরজা গোড়ায় ব্রজনাথের সঙ্গে দেখা। রাধানাথ বলিল,—এস, এস, জামাইবাবু, বাড়ীর সকলে তোমার পথ চেয়ে রয়েচে। বাইরে কিসের গোল।

—কিছুই না। অন্ধকার বলে' আমার লোকেরা মশাল জ্বেলেচে, তাই কেউ কিছু মনে করে থাকবে।

—কর্ত্তার সঙ্গে দেখা হয়েচে?

—হবে এখন, সেজন্ত বিশেষ কিছু তাড়া নেই।

রাধানাথ ব্রজনাথের মুখের দিকে চাহিয়া আর কোন কথা কহিল না। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। তখন ভয়ের স্তব্ধতার পরিবর্ত্তে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। হেমাঙ্গিনীর ঘরে আসন পাতিয়া জামাইকে বসান হইল। ব্রজনাথ একমুঠা মোহর দিয়া হেমাঙ্গিনীকে প্রণাম করিল।

তিনি বলিলেন,—থাক্ থাক্, তোমাকে আমরা দেখ্‌তে পেয়েচি এই আমাদের কত ভাগ্যি।

রাধানাথ ফস্ করিয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল। মশাল সমস্ত নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছে, গদা আর তাহার দল নিতান্ত ভাল মানুষের মত দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও হাতে কোন অস্ত্র নাই। বরদাকান্ত মুখ ভার করিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। রাধানাথ গিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েচে?

বরদাকান্ত জ্বলিয়া উঠিলেন,—আমার বাড়ীতে আমাকে অপমান! এত বড় আস্পর্দ্ধা!

—কে অপমান কর্‌লে?

—এ সব ডাকাতের দল, আমাকে ঘরে আটকে রেখেছিল, বেরুতে দেয় নি।

রাধানাথ ঠাকুর ফিরিয়া ভিতরে গেল। তাহার মনে একটা উৎকট আনন্দ হইতেছিল।

বাড়ীর ভিতর মেয়েরা সকলে ব্রজনাথকে ঘিরিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী উঠিয়া গিয়া জামায়ের আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অপর মেয়েদের সঙ্গে হরিমতীও ব্রজনাথের সাক্ষাতে আসিলেন। সুরমা তাঁহাকে হাজার ভয় করিলেও সুযোগ পাইয়া কুটুস্ করিয়া কামড় দিতে ছাড়িল না! বলিল,—ইনি আমাদের নতুন ঠান্‌দি।

ব্রজনাথ হরিমতীকে প্রণাম করিয়া বলিল—সে রাত্রে ত আপনাকে দেখিনি।

—আমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলাম, এই কিছুদিন হ'ল ফিরেচি। আমি শুন্‌লুম বিয়ের রাত্রে তুমি নাকি চোরের মতন পালিয়ে গিয়েছিলে? আর আজ যখন এলে তখন সবাই মনে করেছিল বাড়ীতে ডাকাত পড়েচে। ব্যাপারখানা কি?

—এমনি ত হয়ে থাকে, আগে চুরি তার পর ডাকাতি। তা আমি আপনাদের নির্ভয় দিচ্চি, কিছু লুঠপাট হবে না।

—সে কথা বল্‌লে শুনব কেন? আমাদের বাড়ীর সাত আদরের মেয়েকে নিয়ে যাবে আর তুমি ডাকাত নও?

—আপনারাই ত আমাকে সেধে এনে দিয়েছিলেন।

সকলে হাসিতে লাগিল। রমণীদের মধ্যে একজন বলিলেন,—জামাইয়ের সঙ্গে কথায় পার্‌বার জো নেই, বিয়ের রাত্রেই তা আমরা দেখেছিলুম।

হরিমতী বলিলেন,—তাইতো দেখ্‌চি। কি গো জামাই, তুমি না কি অনেক টাকা রোজগার করে এনেচ? কথা বেচে বুঝি?

—সে ব্যবসা আপনাদের। কথার মহাজনী আপনাদের একচেটে।

—তুমি এই বয়সে এত কথা শিখ্‌লে কোথেকে?

—আপনাদের পাঠশালায় পড়ে'। যেমন গুরু তেমন চেলা।

—তা হলে তুমি সারাক্ষণ মেয়ে-মহলেই বেড়াও?

—আর কি করি বলুন? ঐ মহলই তো সব চেয়ে বড় মহল।

—আচ্ছা, তামাসা রেখে তুমি একটা সত্যি কথা বল দেখি। বিয়ে ত তোমার হঠাৎ হ'ল, কিন্তু অনেক খুঁজে পেতে দেখ্‌লেও কি এর চেয়ে ভাল বউ পেতে?

—ও কথার আমি কি উত্তর দেব? পড়ে' পাওয়া চোদ্দ পোয়া।

—আমাদের মেয়ে বুঝি কুড়িয়ে পাওয়া হ'ল?

—না হয় আমিই কুড়ুনো। কুড়িয়ে পাওয়া জামাই আপনাদের কেমন ঠেক্‌বে?

—আমাদের মুখে নিজের সুখ্যাত শুন্‌তে চাও?

—এতক্ষণ ত শুনচি, না হয় আর একটু শুন্‌লুম।

—কথায় তো তোমায় খুব টন্‌কো দেখ্‌চি, কাজের বেলা কি সেই রকম খাঁটি?

—পাঁটি কি মেকি বাজিয়ে দেখ্‌লেই পারেন।

হরিমতী মনে মনে খুসী হইলেন। জামাই বেশ চালাক চতুর, হাসিমুখ, কথাবার্ত্তায় খুব চট্‌পটে। হরিমতী অন্যকথা পাড়িলেন। হিজলীতে ব্রজনাথ কিসের ব্যবসা করিতে গিয়াছিল, কোন্ ব্যবসায় কেমন লাভ, কলিকাতায় বসিলে কারবার বাড়িবার সম্ভাবনা, এই রকম অনেক কথা বলিলেন। ব্রজনাথ দেখিল এই রমণী অসামান্যা বুদ্ধিমতী, কাজকর্ম্মের বিষয় অনেক জানাশোনা আছে। গোড়াতে জামাইকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন সেটা শুধু নিয়ম-রক্ষা, কথার পয়তারা।

হেমাঙ্গিনী আর এক ঘরে জামাইয়ের আহার সাজাইতেছিলেন। হরিমতী উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বউ, তুমি যে কত গুণের জামাই পেয়েচ তা আমি বলতে পারি নে। ওর সঙ্গে কথা ক'য়ে আমার বড় আহ্লাদ হয়েচে।

—ঠাকুরঝি, তুমি তো মানুষ চেনো, তুমি যখন ভাল বল্‌চ তখন আমার আর কোনো ভাবনা নেই। যেমন হাতে মেয়ে পড়েচে তেমনি যেন সুখে থাকে।

—তোমার মেয়ে রাজরাণীর চেয়েও সুখে থাক্‌বে। একেই বলে বিধাতার নির্ব্বন্ধ! না কথাবার্ত্তা, না দেখাশোনা, সন্ধ্যেবেলা যার মুখ দেখা তার সঙ্গে বিয়ে! দেবতা যেন রাধানাথ ঠাকুরের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে এই ছেলের সঙ্গে তিনি ইন্দুর সম্বন্ধ ঠিক করে' রেখেছেন। ভবিতব্যির সঙ্গে তো কারুর জোর চলে না। আমরা বসে' বসে' কত কি হিসেব করি আর ঠাকুর দেখে দেখে হাসেন।

রাত্রিকালে ব্রজনাথের আহারের সময় হেমাঙ্গিনী উপস্থিত থাকিয়া থালা, বাটি রেকাব সমস্ত সাজাইয়া দিলেন। জামাইয়ের সম্মুখে বসিয়া তাহাদের বাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আর এক ঘরে হরিমতী ইন্দুকে আহার করাইলেন।

আহারান্তে ব্রজনাথ উঠিয়া গিয়া আবার ঘরে বসিল। সেই সময় বরদাকান্ত একবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—জামাইয়ের খাওয়া হয়েচে?

একজন স্ত্রীলোক বলিলেন,—হ্যাঁ, এইমাত্র জামাই খেয়ে এল।

বরদাকান্ত ব্রজনাথকে বলিলেন,—তোমাদের কি কালই যাওয়া হবে? আর দুদিন থেকে গেলে হত না?

—বাবা পাঁজি দেখে দিন স্থির করেচেন। কালই ত যাত্রার ভাল দিন।

—তবে তাই হবে। কাল সকাল বেলা খাওয়া-দাওয়া করে' যেও।

—যে আজ্ঞে।

হেমাঙ্গিনীকে বরদাকান্ত বলিলেন,—তোমরা ইন্দুর সব গোছগাছ করে' রেখো। সে শ্বশুরবাড়ী যাবে।

মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যাইবার কথা হইতেই হেমাঙ্গিনীর চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল। আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, গোছগাছ সব করাই আছে।

বরদাকান্ত চলিয়া গেলেন। একটু পরেই ব্রজনাথকে শয়ন-গৃহে লইয়া গেল।

ব্রজনাথ দেখিল প্রশস্ত সজ্জিত প্রকোষ্ঠ, একধারে বৃহৎ পালঙ্কে উৎকৃষ্ট শয্যা, দেয়ালে একজোড়া দেয়াল-গিরি। দক্ষিণের জানালা খোলা, জানালা দিয়া আম্র-মুকুলের সৌরভবাহী সমীরণ বহিতেছে। ব্রজনাথ জানালার গরাদে হাত দিয়া দাঁড়াইল। শুক্লপক্ষের অষ্টমী, জ্যোৎস্না অধিক উজ্জ্বল না হইলেও বড় মধুর, চারিদিকে শুভ্র মায়ার আবরণ পড়িয়াছে। গাছের পাতায় মর্ম্মর শব্দ, গাছের নীচে ছায়ার দোল। কখনো কোকিল ডালের ভিতর বসিয়া ডাকিতেছে, কখনো পাপিয়া আকাশ পরিপূরিত করিয়া ডাকিয়া উড়িয়া যাইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন ঝিল্লীরবে কানন মুখরিত হইতেছে।

ব্রজনাথের পিছন হইতে কে বলিল,—জানালা গোড়ায় দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌চ?

ব্রজনাথ ফিরিয়া দেখে, সুরমা। সুরমার সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা, সঙ্কুচিতকায়া আর একজন।

সুরমা মল পরিত না, ইন্দুলেখা মল খুলিয়া রাখিয়াছিল। মুক্তদ্বারে দুইজনে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।

ব্রজনাথ সস্মিত মুখে কহিল,—তোমাকে ভাব্‌ছিলুম। তোমার সঙ্গে আমার কত দিনের ভাব।

—আমাকে বই কি! যা'র জন্যে ভাবছিলে তাকে নিয়ে এসেচি।

—তুমিও একটু বসো না, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

—আমার সঙ্গে আবার কি কথা! কথা কইবার মানুষ ত পেয়েচ।

সুরমা দরজা বাহির হইতে ভেজাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

ব্রজনাথ ইন্দুলেখার হাত ধরিয়া, আলোকের দিকে ফিরাইয়া, ধীরে ধীরে ঘোমটা খুলিয়া দিল। বাম হস্ত দিয়া কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া কাছে টানিয়া লইল। অঙ্গে অঙ্গ স্পৃষ্ট হইল, অঙ্গের সৌরভ অঙ্গে মিশিল। ইন্দুলেখার চিবুকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া ব্রজনাথ তাহার লজ্জা-রাগরঞ্জিত মুখ তুলিয়া ধরিল। আবার চারিচক্ষু মিলিল, আবার চক্ষে চক্ষে আলিঙ্গন, চক্ষে চক্ষে ভাষাতীত কথা।

অনেকক্ষণ দুইজনে এইরূপ রহিল, কেহ কোন কথা কহিল না। ইন্দুলেখার চক্ষু ঈষৎ আর্দ্র, ওষ্ঠাধর ঈষৎ মুক্ত, হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল। ব্রজনাথ মুগ্ধ, নিবিড়, নির্ণিমেষ-নয়নে সেই লাবণ্যের ছবি দেখিতেছিল।

ব্রজনাথ বলিল,—আজ কি আমাদের বাকি বাসর, না ফুলশয্যা?

ইন্দুলেখার হাত ব্রজনাথের হাতে ঠেকিল, ইন্দুলেখার মস্তক ব্রজনাথের স্কন্ধে নমিত হইল।

ইন্দুলেখা বলিল,—তুমি যা বল।

সমাপ্ত

মহিলা-সংবাদ

ত্রিশ বৎসরের অধিক হইল পরলোকগত গুরুদয়াল সিংহ মহাশয় কুমিল্লায় "ত্রিপুরা হিতৈষী" নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা স্থাপন করেন। 'সিংহ প্রেস" নাম দিয়া একটি ছাপাখানাও তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীমতী উর্ম্মিলা সিংহ

পত্রিকাটি এখনও নিয়ম-মত চলিতেছে। গুরুদয়ালবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কমনীয়কুমার সিংহ কাগজখানি চালাইতেন। পাঁচ বৎসর হইল কমনীয়কুমার অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তদবধি তাঁহার বিধবা পত্নী শ্রীমতী উর্ম্মিলা সিংহ যোগ্যতার সহিত "ত্রিপুরা হিতৈষী"র সম্পাদকতা করিতেছেন এবং ছাপাখানাটিও চালাইতেছেন। বাংলা দেশে অতি অল্পসংখ্যক মহিলা পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইহা তাঁহাদের একটি কার্য্যক্ষেত্র হওয়া উচিত, ও হইতে পারে। অতএব শ্রীমতী উর্ম্মিলা সিংহ মহাশয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়।

—

শ্রীমতী সুপ্রভা রায় ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী বালিকা শিক্ষালয় এবং পরে কলিকাতার ডায়োসিজন কলেজ হইতে প্রবেশিকা এবং বি-এ ও বি-টি পরীক্ষায় প্রশংসনীয় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। বি-টি পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি বিদ্যাময়ী বালিকা শিক্ষালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেন। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯২৮ সালে গবর্ন্মেণ্টের বৃত্তি পাইয়া শিক্ষা-প্রণালী অধ্যয়নার্থ বিলাত

যান। লণ্ডনে প্রায় এক বৎসর কাল থাকিয়া শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ে ডিপ্লোমা পাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বালকবালিকাদের শিক্ষা-বিষয়ে অনেক উচ্চ আদর্শ তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

শ্রীমতী সুপ্রভা রায়

—

শ্রীমতী রাজবালা দেবী পুরুলিয়ার "তরুণশক্তি" পত্রিকার সম্পাদিকা ও মানভূম জেলার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামের কর্ম্মিসংসদ ও আশ্রমের পরিচালিকা। গত জ্যৈষ্ঠমাসে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হন। তিনি জেলে যাইবার পূর্ব্বে ইঁহার উপর আশ্রম ও অন্যান্য কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া যান। সেই-সময় হইতে রাজবালা দেবীকে রামচন্দ্রপুর গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয় ও নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা, তরুণশক্তি পত্রিকার সম্পাদন, গ্রামের মেয়েদিগকে সূচীকার্য্য শিক্ষা দেওয়া ও আশ্রমের অন্যান্য সকল কাজ করিতে হইতেছে। এই সকল কাজ তাঁহাকে অত্যন্ত আর্থিক অনাটনের মধ্যে চালাইতে হইতেছে। একজন সহৃদয় ভদ্রলোক 'তরুণ-শক্তি'র ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আশ্রমের সমুদয় ব্যয় ও নিজের ভরণপোষণ তাঁহাকে শিল্পকার্য্যের দ্বারা অতি কষ্টে নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাঁহার স্বগ্রামবাসীরা এবিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য এবং সহানুভূতি করা দূরে থাকুক ভয়ে দূরে সরিয়াই থাকে। এই অবস্থায় রাজবালা দেবী যে নির্ভীকভাবে এই সকল কাজ চালাইতেছেন ইহা অতিশয় প্রশংসার বিষয় এবং সকলেরই অনুকরণীয়।

শ্রীমতী রাজবালা দেবী

দুর্গাপূজা

আশ্বিন মাসের প্রবাসীর "দুর্গাপূজা" প্রবন্ধ। (১) চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক কারণ অতি প্রাচীনকালে ঋষিগণ অবগত ছিলেন (ঋগ্বেদ ১০।৮৫ ৩১ ঋক)। ২৭ নক্ষত্রের মধ্য দিয়া চন্দ্রের আরোহিণী ও অবরোহিণী গতি আছে। আরোহিণী গতিদ্বারা সূর্য্য হইতে দূরে যায়, তখন এক কলা করিয়া বাড়ে, পনর দিনে চন্দ্র পূর্ণ হয়, তৎপরে অবরোহিণী গতিদ্বারা সূর্য্যের যত নিকটে আইসে ততই কমে, অমাবস্যাতে সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলে আবার অবরোহিণী গতি আরম্ভ হয়। এই রোহিণীনাম্নী গতিই চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ। চন্দ্রের প্রতি দক্ষের অভিশাপের গল্পের মূল ইহাই। খৃঃ পূঃ ৩৫৩৯—২৫৮৩ পর্য্যন্ত রোহিণীতে ক্রান্তিপাত হইয়াছে (আমার "The Universe" ২৮১ পৃষ্ঠা দেখুন)। সম্ভবতঃ এই সময় ঐ পৌরাণিক গল্প রচিত হইয়া থাকিবে।

(২) প্রতিমার চালে দেবাসুরের যুদ্ধ অঙ্কিত হয়। দেবাসুরের যুদ্ধ অন্তরীক্ষে অর্থাৎ তিব্বত প্রভৃতিতে হইয়াছে। অন্তরীক্ষ অর্থ আকাশ, তাই চালে আকাশের রং ফলান সম্ভব। দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী। তিনি দশ দিকে দশ হস্ত ও প্রভাব বিস্তার করিয়া ভক্তের দুর্গতি নাশ করেন (আমাদের মত ভক্তের নহে, প্রকৃত ভক্তের)। যে অসুরের মূর্ত্তি থাকে তাহা চণ্ডীর মতে মহিষাসুরের। চণ্ডী, কাশীখণ্ড এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-মতে তিনি দুর্গ অসুরকে বধ করিয়া দুর্গা হইয়াছেন। দুর্গতিই দুর্গ অসুর, তাহা নাশ করিয়াই তিনি দুর্গা।

(৪) যিনি দুর্গাকে ভক্তির চক্ষে দেখেন না, তাঁহার নিকট পুতুল ঘর-সাজান সামগ্রী, কিন্তু প্রকৃত ভক্তেরা তাহাতে শক্তি দেবীকে আবাহন ও বিসর্জ্জন করে। আবাহনের পূর্ব্বে পুতুল বিসর্জ্জনের পরেও পুতুল, মধ্যসময়ে ভক্তের পরম ধন। ভগবানকে ভক্ত যে ভাবে আরাধনা করে তিনি সেই ভাবেই অনুকম্পা করেন (গীতা ৪।১১)। দেবপূজক দেবতাকে, নিরাকার পূজক "আমাকে" পায় (গীতা ৯.২৫)। অতএব বিদ্বান, বুদ্ধিমান ভক্ত ধীরেন্দ্রবাবু হয়ত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকিবেন, তাই তিনি কুমারটুলীতে যান না, কিন্তু মূর্খের উপায় কি? যে নিরাকার ধারণা করিতে পারে না, সে কি করিবে? তাহার ফুল জল ভগবান লইবেনই (গীতা ৯।২৬)। তাহার কুমারটুলী ব্যতীত উপায় নাই। বাইবেল, কোরাণ সর্ব্বত্রই প্রতিমা-পূজকের বিবরণ আছে। মূর্খ সর্ব্বত্রই আছে। সকলেই মুসা নহে, এব্রাহাম বা খ্রীষ্ট নহে, সুতরাং কুমারটুলী বাদ দিলে মূর্খের উপায় কি? ভক্ত মুসা জ্যোতিঃ স্বরূপকে দেখিয়াছেন, তাঁহার হস্তস্থিত দণ্ডও সর্পের মত নড়িয়াছে, কিন্তু এব্রাহাম ও খ্রীষ্ট তাহাও দেখেন নাই। মূর্খ অথচ প্রকৃত ভক্ত কি দেখে? বৃহৎ নদীতে বা সমুদ্রে জাহাজ দূরে একটি কাল দাগের মত দেখায়, যত নিকটে আইসে ততই স্পষ্ট হয়। তেমনি ভক্ত দূরে একটি উজ্জ্বল দাগ দেখে (যথা মুসা)। যে ভক্ত যত সিদ্ধ হয় সে তত ঐ দাগের নিকটবর্ত্তী হয়, দাগ ততই স্পষ্ট হয় (যথা মুসার যষ্টি নড়া)। যদি সে আরও নিকটে যাইতে পারে, তবে তন্মধ্যে বাঞ্ছিত ধনকে দেখে। প্রহ্লাদ ধ্রুব এই শ্রেণীর ভক্ত। রামপ্রসাদ "মা কালী" দ্বারা বেড়া বাঁধাইয়াছিলেন। তিনি নিরাকার হইয়াও সাকাররূপে আমাদের অতি নিকটে চক্ষের উপর সর্ব্বদাই থাকেন, ভক্তের ইচ্ছানুসারে দণ্ডমধ্যে আবির্ভূত হন, কুমারটুলীর পুতুলও বাদ যায় না।

শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন

—

'আদলি' শব্দের অর্থ

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীর 'আলোচনা'য় প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত 'আদলি' শব্দটিকে অর্দ্ধস্থালী বলা হইয়াছে। আমার অনুমান উহা অর্দ্ধস্থালী না হইয়া আজ্যস্থালী হওয়াই অধিকতর সঙ্গত। আজ্যস্থালী কথার অর্থ যজ্ঞের ঘৃত রাখিবার পাত্র। যজ্ঞস্থলে বেদীর নিম্নদেশে কদলীবৃক্ষ রোপিত হইত। আর আজ্যস্থালী বেদীর উপরে, অর্থাৎ কদলীবৃক্ষের উপরে, রক্ষিত হইত। কবি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যজ্ঞস্থলের এই ব্যবস্থা একেবারে উলটাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বিপর্য্যস্ত আজ্যস্থালীর উপরে যেন কদলীবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। কবিতাটির এইরূপ অর্থ করিলে 'ব্যঞ্জনা' (suggestiveness) নানারূপ হইতে পারে। সুধীভির্বিভাব্যম্।

শ্রীগৌরীহর মিত্র

বনিয়াদী ঘর

শ্রীসীতা দেবী

অনন্ত গুহ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন গুহ-বংশের অচলা লক্ষ্মী রীতিমত চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন। এক-কালে দেশে তাহাদের বংশের খ্যাতি এবং ধনের খ্যাতি সমানই ছিল, কিন্তু অনন্তের পিতামহ নানা প্রকার লাভজনক ব্যবসায়ের ফন্দি করিয়া বিস্তর টাকা-কড়ি লোকসান করিয়া বসেন। তাঁহার পুত্র আদি-নাথ আবার হইলেন অতি হিসাবী। যেখানে এক পয়সা খরচের প্রয়োজন তিনি সেখানে আধ পয়সা খরচ করিতেন। কিন্তু এত করিয়াও ভাঙন-ধরা কূল রক্ষা পাইল না। অনন্ত বড় হইয়া দেখিল তাহার পারিবারিক সম্পত্তির মধ্যে ভাঙা বসতবাড়ী, সামান্য কিছু জমি-জায়গা, এবং বিপুল বংশমর্য্যাদা।

অনন্তের মা এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার মত হইলেন। যে ঘর চিরদিন দাসদাসীর কলরবে মুখরিত, আজ তাহা নীরব। তাঁহাকে নিজের কাজ নিজে করিতে হয়, সারা দিন ছেলে ট্যাঁকে করিয়া ঘুরিতে হয়, ইহাতে তাঁহার অশান্তির শেষ ছিল না। এই অশান্তির ভাগ স্বামীকেও দিতে তিনি ক্রটী করিতেন না। কিন্তু আদিনাথ সহজে বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি কেবল হাসিয়া বলিতেন, "গিন্নী, যে ছেলে বইতে এত কাতর হচ্ছ, সেই ছেলেই আবার লক্ষ্মীকে বয়ে আনবে। ওর কুষ্ঠী দেখলে না? ওকে ভাল করে মানুষ করতে পারলে আর ভাবনা নেই।"

অনন্তকে মানুষ করিতে চেষ্টা যথেষ্টই করা হইল। তাহার মায়ের দু'চারখানা গহনা যাহা ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া বাড়ী বাঁধা দিয়া তাহার কলিকাতায় পড়িবার খরচ জোগান হইল। ভবিষ্যতে এই ভাঙা বাড়ীর বদলে নূতন বাড়ী এবং মায়ের দুচারখানা গহনার বদলে এক গা গহনা যে তাহাকে নিজের কৃতিত্বে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সে-বিষয়ে অনন্তের সন্দেহ ছিল না। পড়াশুনা খাওয়া এবং ঘুমানোর অবকাশে টাকা রোজগারের কত ফন্দিই যে তাহার মাথায় ঘুরিত তাহার ঠিকানা নাই। ছুটিতে বাড়ী আসিলেও, মায়েপোয়ে কেবল এই আলোচনাই হইত।

মা বলিতেন, "এই তুই বি এ, টা পাশ করে নেনা। তখন দেখিস, কেমন ঘর থেকে বউ আনি। সমস্ত বাড়ী সাজিয়ে আস্‌বাব, মেয়ের গা সাজিয়ে গহনা, আর থলি ভরা টাকা যে বাপে দিতে না পারবে, সে যেন আমার ছেলের দিকে না তাকায়।"

ছেলে বিনয় কুরিবার চেষ্টা করিয়া বলিত, "হাঁ, তোমার ছেলের জন্যে কে এত দিতে যাবে? ভারি ত বি-এ পাশ! আজকাল কলকাতার এক গলিতে দশ-বারোটা করে বি-এ পাশ বসে থাকে।"

মা বলিতেন, "তা না হয় আছে, কিন্তু সকলের বংশ কি তোদের মত? এ বংশে একটা ছেলে জন্মানোও যা, ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা থাকাও তা। এর কম নিয়ে এ বাড়ীতে কোনো বউ আসেনি জানিস্? তোর দাদামশায়ের ব্যবসা ফেল পড়ল কিসে? আমার বিয়ে দিতে গিয়ে না? কিন্তু এর জন্যে একটা হায় হুতাশ মুখ দিয়ে কখনো কেউ শোনে নি তাঁর। কাজের মত কাজ করে গেছেন।"

অনন্ত মায়ের কথা বিশ্বাস করিত। কাজেই নিজেকে বহুমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করা তাহার অভ্যাস হইয়া গেল।

বি-এ পাশ যথাসময়েই সে করিল। তখন মাতা মহালক্ষ্মী চারিদিকে ঘটক-ঘটকী লাগাইয়া দিলেন। মেয়ের বাপের টাকার থলি যেন তাহারা আগে দেখে, পরে অন্য সব কিছুর খোঁজ।

বাংলা দেশে কনের দুর্ভিক্ষ কোনদিনই নাই, যেমন ফরমাস কর, কোথাও-না কোথাও পাওয়া যাইবে। কাজেই ধনবান কন্যার পিতার সন্ধান অনেকই মিলিতে লাগিল।

এক জায়গায় কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। মেয়ে দেখিতে মন্দ নয়, বয়স তেরো-চৌদ্দ। মহালক্ষ্মী বলিলেন, "তার মানে ষোলো-সতেরো, একেবারে ধাড়ী হয়ে গেছে যে। এত বড় মেয়ে বাগ মানান শক্ত। শেষে ছেলেটাকে না পর করে দেয়।"

আদিনাথ বলিলেন, "এ বংশের ছেলে কখনো স্ত্রীর আঁচল ধরে চলে, শুনেছ? দেনাপাওনায় যদি না ঠেকে ত মেয়ের বয়সের জন্যে ঠেকবে না।"

মেয়ের পিতা রাজী হইয়া গেলেন। মহালক্ষ্মী আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। ক্ষমতা থাকিলে বিবাহের দিনটাকে তিনি হিড় হিড় করিয়া কাছে টানিয়া আনিতেন। তাহা যখন সম্ভব নয় তখন তিনি পনের টাকা হাতে পাইবামাত্র কি কি গহনা গড়াইবেন তাহার কল্পনাতেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। কর্ত্তা যে বলিয়াছিলেন তাহা সত্যই হইতে চলিল। এই ছেলেই আবার লক্ষ্মীকে ঘরে আনিবে। মেয়ের বাপ পাঁচ হাজার টাকা নগদ এবং গহনাগাঁটি দানসামগ্রীতেই আরো পাঁচ হাজার দিতে রাজী হইয়াছে। তাহার মেয়ে ঐ একটিই, কাজেই তত্ত্ব-তালাশ ভাল করিয়াই করিবে।

কিন্তু মানুষ গড়ে, বিধি ভাঙেন। কার্য্যতঃ যাহা ঘটিল, তাহার সঙ্গে মহালক্ষ্মীর কাল্পনিক চিত্রের বিশেষ কিছু মিলিল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘটা করিয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া, একদল বরযাত্রী লইয়া আদিনাথ ছেলের বিবাহ দিতে বাহির হইয়া গেলেন। মহালক্ষ্মী প্রতিবেশিনীদের লইয়া জমকাইয়া গল্প করিতে এবং বউভাতের আয়োজন করিতে বসিয়া গেলেন। বংশের উপযুক্ত ভাবে বৌভাত করিয়া সব মাগীকে দেখাইতে হইবে যে, মরাহাতীও সওয়া লাখ।

বিবাহ, বাসি বিবাহ হইয়া গেল, বউ লইয়া ছেলে আজ বাড়ী ফিরিবে। আত্মীয়স্বজনে ঘর গম্ গম্ করিতেছে। বধূকে অভ্যর্থনা করার আয়োজন যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়, সেদিকে মহালক্ষ্মী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর সারাক্ষণ সপ্তমে চড়িয়াই আছে। বাহিরে রসুনচৌকী বসিয়াছে, তাহাদের বাঁশীগুলা থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, আবার নীরব হইতেছে। বধূ গৃহপ্রবেশ করিলে তখন পূর্ণ উদ্যমে বাজাইবে।

মহালক্ষ্মীর বাপের বাড়ী হইতে তাঁহার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী একটি মেয়ে লইয়া আসিয়াছে, আর বড় কেহ আসে নাই।

ননদে ভ'জে কথা হইতেছিল। "হ্যাঁ ঠাকুরঝি, বউ নাকি দেখতে বিশেষ সুন্দর হয়নি?"

মহালক্ষ্মী গরম হইয়া উঠিলেন, "কোন্ চোক্‌খাকী এ কথা বলেছে গা? তারা গিয়ে দেখে এসেছে?"

ভাজ বলিল, "অমন কত কথা ওঠে, তাতে রাগ করলে চলে কি? অনেক দেবেথোবে শুনেছে কি না, তাই ভাবছে মেয়ের নিশ্চয় কোনো খুঁৎ আছে।"

ইহাতে মহালক্ষ্মীর রাগ আরোই বাড়িয়া গেল। খুব ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন গো, আমার ছেলে কি ফ্যালনা? তাকে দেওয়া যায় না পাঁচ হাজার টাকা পণ? কত বড় বংশ ওদের। এমন বনেদী ঘর এ অঞ্চলে আর একটা আছে? পদ্মিনীর মত মেয়ে, দশ হাজার টাকা পণ এ ঘরে লোকে সেধে দেবে। কেন, আমার ছেলের বিয়েই চোকখাকীরা দেখ্‌ছে, এ বাড়ীর আর কারো বিয়ে দেখেনি? এ ঘরে কমটা নিয়ে কোন বাপের বেটা ঢুকেছে?"

এমন সময় বাহিরে মহাশব্দে বাজনা বাজিয়া ওঠাতে বকাবকি, রাগারাগি সব থামিয়া গেল। সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে বউ দেখিতে ছুটিল।

বউ তোলা, বরণ করার গোলমালে মহালক্ষ্মীর স্বামীকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার সুবিধা হইল না। বউ দেখিতে বিশেষ ভাল নয়, তবে কুৎসিৎও কিছু নয়। ছেলের মুখ বড় ভার ভার; মহালক্ষ্মী ভাবিলেন, বোধ হয় বউ খুব সুন্দরী না হওয়াতেই ছেলে বিরক্ত হইয়াছে। মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, মেয়েমানুষের রূপ আর ক'দিন? দুটি তিনটি কোলে হইলেই পদ্মিনী এবং চাবানীর তফাৎ কিছু থাকে না। ধর না তাঁর নিজের কথা।

পাড়াপ্রতিবেশী যখন বউ দেখিয়া, মিষ্টমুখ করিয়া বিদায় হইল, তখন মহালক্ষ্মী একটু অবসর পাইলেন।

শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দেখিলেন স্বামী গম্ভীর মুখে শুইয়া আছেন। একটা কিছু অশুভ আশঙ্কা করিয়া মহালক্ষ্মীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, অমন করে শুয়ে পড়লে যে ?"

আদিনাথ বলিলেন, "শুনলেই ত চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। কিন্তু আমি বলি লোকের কাছে নিজেদের বোকামী প্রকাশ করে লাভ নেই, চেপে যাওয়াই ভাল।"

মহালক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি হয়েছে তাই বল না আগে।"

আদিনাথ বলিলেন, "পনের টাকা পাইনি।"

মহালক্ষ্মীর আপাদমস্তক যেন জ্বলিয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তবে ও উমুনমুখী বৌ নিয়ে এলে কি করতে ? বর উঠিয়ে আনতে পারলে না ?"

আদিনাথ বলিলেন, "কই আর পারলাম ? কনের বাপের অসুখ, হাতে ধরে কাঁদতে লাগল, তিন মাসের মধ্যে টাকা দেবে প্রতিজ্ঞা করল। না যদি দিতে পারে, মেয়ে নিয়ে যাবে, আমরা ছেলের আবার বিয়ে দিতে পারব, একথা শুদ্ধ নিজের মুখে বললে। কি আর করি, নেহাৎ কশাইয়ের মত ছেলে তুলে আনতে পারলাম না। বড় বংশের চাল বজায় রাখতে গেলে অনেক সময় ঠকতেও হয়। গহনা দানসামগ্রী যা দেবে বলেছিল, তা ঠিকই দিয়েছে।"

মহালক্ষ্মী চড়া গলায় বলিলেন, "তুমি দানসামগ্রী নিয়ে ধুয়ে খেও। বেটার বউ এক গা গয়না পরে বেড়াবে, দেখে ত আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে যাবে। হাতের শাঁখা বাদে আর সব বেচে ছেলেকে পড়িয়েছি, ভেবেছিলাম ছেলে মানুষ হলে সব হবে। কিন্তু এমন বোকা তুমি ! ছি ছি, আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে। ঐ মিথ্যুক, জোচ্চোরের বেটীকে আমি কালই ঝাঁটা মেরে বিদায় করে দেব।"

আদিনাথ একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এত তাড়া কিসের ? তিন মাস পরে টাকা না দেয়, যত পার ঝাঁটা মের এখন। আমি কথা দিয়ে এসেছি, কথা রাখতে হবে।"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "ওরা কথা রেখেছে যে আমরা রাখব ?"

আদিনাথ বলিলেন, "এ অঞ্চলে আমাদের ব্যবহার দেখে অন্য সকলে চালচলন শিখেছে, আমরা কারো দেখে শিখিনি !"

যতই তর্জ্জনগর্জ্জন করুন কর্ত্তার অমতে মহালক্ষ্মী বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মনকষাকষির ভিতর একরকম করিয়া বউভাত হইয়া গেল। বউ নিজের অবস্থা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিল, কিন্তু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ভিন্ন তাহার উপায় ছিল না। বাপের বাড়ী অনেক কান্নাকাটি করিয়া চিঠি লিখিল, তাঁহারা যেন এবার কথা রক্ষা করেন, না হইলে তাহার ললাটে অশেষ দুর্গতি আছে।

কিন্তু দুর্গতি জিনিষটা অধিকাংশ বাঙালীর মেয়ের ভাগ্যেই জন্মক্ষণ হইতে বেশ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জোটে, নববধূ ললিতাও বঞ্চিত হইল না। অনন্ত তাহাকে খুব বেশী যন্ত্রণা না দিক অত্যধিক আদরও কিছু করিত না। যাই হোক, ললিতা তাহার অনাদরটা গায়ে তত মাখিত না। কারণ ইহার মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা আদর মিশান থাকিত। শাশুড়ীর বাক্যবাণগুলিই হইত সব চেয়ে গুরুপাক, কিন্তু চোখের জল ফেলা ছাড়া বালিকার আর কোনো উত্তর ছিল না। শ্বশুরের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্কই ছিল না। বিনাপণে যে বউ ফাঁকি দিয়া তাঁহাদের বনিয়াদী বংশে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে তিনি মনে মনে বউ বলিয়া স্বীকারই করিতে পারিতেছিলেন না, কাজেই নীরবে উপেক্ষা প্রদর্শন করা ভিন্ন তিনিও আর কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ব্যাপার কিন্তু এইখানেই থামিল না। তিন মাসের পর টাকার বদলে খবর আসিল যে, ললিতার বাবার যায় যায় অবস্থা। টাকা সামনের বছরে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে যেমন করিয়া পারেন দিবেন, সম্প্রতি ললিতাকে যেন দয়া করিয়া একবার পাঠাইয়া দেওয়া হয়, ছোট মেয়েটিকে দেখিবার জন্য বাপের প্রাণ অত্যন্তই অস্থির হইয়াছে।

বলা বাহুল্য তাঁহার দারুণ পীড়ার সংবাদে এ বাড়ীতে শোকের তুফান উঠিল না।

"নিয়ে যাক্ মিন্সে মেয়েকে, চিরদিনের জন্তে নিয়ে যাক্।" মহালক্ষ্মী বধূকে ঝাঁটা মারিয়া বাহির করিবার জোগাড় করিতেছিলেন, নিতান্ত আদিনাথের বনিয়াদী চাল বজায় রাখার জেদে ললিতা রক্ষা পাইল। অনন্ত হাঁ না কিছুই বলিল না। বাপ মায়ের সুপুত্র সে, তাঁহাদের উপর কথ বলিতে পারে না। অশ্রুসিক্ত মুখে তাহার স্ত্রী যখন সত্য সত্যই বিদায় হইয়া গেল, তখন তাহার বুকের ভিতরটা একবার মোচড় দিয়া উঠিল বটে, কিন্তু শ্বশুর তাহাকে কি রকম ঠকাইয়াছে মনে করিতেই তাহার মনটা আবার কঠিন হইয়া উঠিল।

অনন্তকে বেশী দিন বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না। তাহার দ্বিতীয়া পত্নী মেঘমালা শীঘ্রই আসিয়া ঘর আলো করিয়া বসিল। এ মেয়েটি ললিতার চেয়ে দেখিতে ভাল। একবার উৎসর্গ হইয়া যাওয়ায় অনন্তের দর কিছু কমিয়া গিয়াছিল, তবু সে নিতান্ত মন্দ পাইল না। এবারের শ্বশুর দেনা-পাওনা লইয়া কোনো প্রকার গোলমাল করিল না। মহালক্ষ্মী মনের সুখে গহনা গড়াইয়া লইলেন। মেঘমালার প্রতি তাঁহার চিত্ত বেশ প্রসন্নই হইয়া উঠিল। মেয়েটির জন্ম নীচু বংশে হইলে কি হয়, ভাল শিক্ষা পাইয়াছে। শাশুড়ীকে দেবীর মত ভক্তি করে। দিন একরকম ভালই কাটিতে লাগিল। অনন্ত সুপারিশের জোরে ব্যাঙ্কে কাজ পাইল এবং হিসাবের জোরে ক্রমেই টাকা জমাইয়া তুলিতে লাগিল। বাপ মা বাঁচিয়া, কাজেই স্ত্রীকে কলিকাতায় আনিতে পারিল না। সপ্তাহে একদিন বাড়ী গিয়া গার্হস্থ্যের স্বাদ লাভ করিয়া আসিত, বাকি ছ'টা দিন মেশের বন্ধুদের সাহচর্য্যে কাটাইয়াই সুখী থাকিত।

ললিতার খোঁজখবর কেহ লইল না, তাহারও কোনো খবর দিল না। লোকমুখে তাহার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল। কালেভদ্রে অনন্তের মনের এক কোণে কোমল একখানি মুখ এবং জলভরা দুটি চোখের স্মৃতি এক-আধবার জাগিয়া উঠিত, কিন্তু খুব বেশী আমল পাইত না।

মেঘমালা যে অত্যন্তই পয়া সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। গুহ-বংশের পড়তির দশা কাটিয়া গিয়া, আবার উঠতির দিন আসিয়া পড়িল। মহালক্ষ্মীর গহনা হইল, বসতবাড়ী মেরামত হইয়া রং ফিরাইয়া একেবারে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। দাসদাসী আবার ফিরিয়া আসিল। মহালক্ষ্মীর পাড়া-প্রতিবেশীর চালচলন এবং ভাল-মন্দের চর্চ্চা করা ছাড়া কোনো কাজই রহিল না। তাহার ক্ষুরধার রসনা এবং অখণ্ড অবসরের ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত থাকিত, কখন কাহার উপর তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িবে, কিছুই বলা যায় না।

রবিবারে অনন্ত বাড়ী আসিলেই দেখিত, মা দুই চারিটি প্রতিবেশীকে লইয়া সামাজিক বিচারালয় খুলিয়া বসিয়াছেন। আসামীরা সকলেই অনুপস্থিত, কিন্তু তাহাতে বিচারকর্ত্রীদের উৎসাহের কোনোই অভাব দেখা যাইতেছে না। সকলের প্রতিই তাঁহারা দণ্ডবিধান করিতেছেন।

অনন্ত সময় এবং অর্থ, উভয় সম্বন্ধেই অত্যন্ত হিসাবী। এত সময়ের অপব্যয় দেখিলে তাহার গা গিস্‌গিস্ করিত, কিন্তু ভরসা করিয়া মাকে কিছু বলিতে পারিত না।

একদিন আর থাকিতে না পারিয়া কথাটা একটু ঘুরাইয়া বলিল, "মা, ঐ বুড়ীগুলোর কি আর কাজ নেই কিছু? সারাক্ষণ দেখি তোমার কাছে বসে ভ্যান্ ভ্যান্ করছে। তোমার ত কাজকর্ম্মও আছে।"

মহালক্ষ্মী মস্ত একটা হাই তুলিয়া, গোটা-দুই তুড়ি দিয়া বলিলেন, "কি আর কাজ বাছা? একটা নাতি-পুতিও ত ঘরে হল না যে কোলে করে সময় কাটবে? তুই আমার একমাত্র ছেলে, বিয়ের ত তিনবছর হতে চল্‌ল কই কিছু ত দেখি না?

অনন্তের নিজের মনের এ বিষয়ে একটু সংশয় জাগিয়া উঠিতেছিল, মায়ের কথায় তাহার মনটা একান্তই ভার হইয়া উঠিল। মেঘমালা সেদিন অনেক চেষ্টা করিয়াও স্বামীর মুখে হাসি ফুটাইতে পারিল না।

কলিকাতায় আসিয়াও অনন্ত মায়ের আক্ষেপোক্তিটা ভুলিতে পারিল না। সত্যই ত এতদিন হইয়া গেল, একটা সন্তানও হইল না। হইবেই না নাকি? তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ। এত বড় বংশ লোপ হইয়া যাইবে। নিরপরাধিনী প্রথমা পত্নীকে বর্জ্জন করারই এই শাস্তি

হইল নাকি? হয়ত ছেলে না হওয়ার জন্ত আবার তাহাকে বিবাহ করিতে বাবা মা বলিবেন। বেচারী মেঘমালা, মেয়েমানুষের অদৃষ্ট বড় খারাপ। শাস্তি তাহারা ক্রমাগতই পাইতেছে, কিন্তু দোষ অধিকাংশ স্থলে অদৃষ্টের, তাহাদের নহে।

আরো দু'চার বছর দেখা যাক, মেঘমালার বয়স অল্পই। মা বাবা মত করিলে, এবার তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবে, ভাল ডাক্তার দেখাইবে, চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে করাইবে। আচ্ছা, ললিতাকে আবার আনা যায় না? না, মেঘমালা কখনও সতীনের ঘর করিতে রাজী হইবে না। কিন্তু সতীন তাঁহার অমত সত্ত্বেও হয়ত আসিয়া জুটিবে। তাহা হইলে যেটি আছে, সেইটিই আসুক না, অন্ত আর একটির কি প্রয়োজন? ললিতা বাঁচিয়া আছে কিনা, কোথায় আছে সব খোঁজ লওয়া দরকার।

এ সব কথা অবশ্য অনন্ত মনে মনেই রাখিত, মুখে কাহারও কাছে প্রকাশ করিত না। কিন্তু মেঘমালা বেশ বুদ্ধিমতী, স্বামীর মনে যে একটা ভাবনা সারাক্ষণই লাগিয়া আছে তাহা সে বুঝিতেই পারিত। ভাবনাটা যে কিসের তাহা বুঝিতেও তাহার দেরি হইল না, কারণ অনন্ত যতই চুপ করিয়া থাক না কেন, তাহার শাশুড়ী চুপ করিয়া থাকার পাত্রী মোটেই ছিলেন না। তাঁহার আক্ষেপ আজকাল সময়ে অসময়ে খুব প্রবল ভাবেই প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাগা, তাবিজ, মাদুলি, যেখানে যাহা পাইতেছেন সব নির্ব্বিচারে সংগ্রহ করিয়া আনিতেছেন এবং বধূর অঙ্গে চাপাইতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া মেঘমালারও মন অত্যন্ত দমিয়া গেল।

হঠাৎ আদিনাথ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দিনকতকের মত মেঘমালার ছেলে না হওয়ার আলোচনাও থামিয়া গেল। অনন্তকে একমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিতে হইল, কারণ বাড়ীতে এমন কেহ নাই যে, রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা বুঝিয়া-সুঝিয়া করিবে।

গ্রামটি বেশ বড়, স্কুল আছে, হাঁসপাতাল আছে, পাশ করা ডাক্তারও একজন আছে। প্রথমে তাঁহাকে দিয়াই চিকিৎসা চলিতে লাগিল। আদিনাথ দু' একদিন একটু ভাল থাকেন, আবার অসুখ বাড়ে, আবার কমে। সপ্তাহখানেক এইভাবেই কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে ডাক্তার অনন্তকে ডাকিয়া বলিল, "দেখুন অনন্তবাবু, আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। আপনার বাবা বৃদ্ধমানুষ, ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন। এখানে থাকলে তিনি সারবেন না, এমন কথা আমি মোটেই suggest করছি না, কিন্তু বুড়োমানুষের বেলা extra careful হলেও ক্ষতি নেই। আপনি যদি তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চান, ত এই বেলা যান। নইলে বেশী দেরি হলে হয়ত নাড়ানাড়ি করাই শক্ত হবে।"

অনন্ত অত্যন্তই দমিয়া গেল। ডাক্তারবাবু যতই চাপা দিবার চেষ্টা করুন, সে বুঝিতেই পারিল যে, রোগ সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইঁহার ক্ষমতায় আর কুলাইতেছে না। সেইদিনই এক বন্ধুর কাছে বাড়ী ঠিক করিতে টেলিগ্রাম করিল, নিজে ছুটিল ষ্টেশনে গাড়ী রিজার্ভ পাওয়া যায় কিনা দেখিতে। বউ, মা, সকলকেই লইয়া যাইতে হইবে, কারণ মহালক্ষ্মী না গিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না, এবং বউকে এখানে একলা রাখা যায় না। বাপের বাড়ী পৌঁছাইয়া আসিবারও সময় নাই। তাছাড়া রোগীর সেবার জন্তও তাহাকে খানিকটা প্রয়োজন।

সৌভাগ্যক্রমে গাড়ী বাড়ী দুই-ই পাওয়া গেল। পাল্‌কীতে রোগীকে চড়াইয়া, ঘোড়ার গাড়ীতে মাকে ও বউকে লইয়া অনন্ত যাত্রা করিল। পিছনে গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া তাহাদের জিনিষপত্র আসিতে লাগিল। এত দুঃখের ভিতরও থাকিয়া থাকিয়া অনন্তের মনে হইতে লাগিল, "একসঙ্গে একরাশ টাকা খরচ হয়ে গেল।"

কলিকাতায় পৌঁছিয়া আদিনাথের চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হইল না। কিন্তু বৃদ্ধের আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছিল। আর দিন দিন ভুগিয়া তিনি বনিয়াদী বংশের সকল বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। মরিবার আগেও আক্ষেপ করিয়া গেলেন, নাতির মুখ দেখিলেন না, বলিয়া। মেঘমালার মনে মৃত্যুশোকের উপরে আরো একটা কি যেন আসন্ন বিপদের ছায়া আসিয়া পড়িল।

মহালক্ষ্মী ত কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইতে লাগিলেন। কোনো কিছুতেই তাঁহার আর সান্ত্বনা রহিল না, জগৎ

একেবারে তাঁহার কাছে বিস্বাদ হইয়া গেল। অনন্ত বলিল, "চলমা, গাঁয়েই ফিরে যাই, এখানে থাকার আর কি দরকার?"

মহালক্ষ্মী প্রবল আপত্তি করিলেন, "ও বাড়ীর দিকে আর আমি তাকাতে পারব না রে। সব চোখখাকীদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, এক গা গহনা পরতাম বলে তাদের চোক টাটাত, এবার আমায় দেখে চোখ জুড়বে। তাদের কাছে এ পোড়ামুখ আর দেখাবো না রে।"

অনন্ত বলিল, "বাড়ীঘর সব ভূতের বাথান হয়ে উঠবে যে? এমন করলে কি চলে মা? আমাদের পোড়া কপাল, তাই বাবা চলে গেলেন, কিন্তু তবুও ত সংসার করতে হবে? বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করলে চলবে না মা।"

মহালক্ষ্মী একটু শান্তভাবে বলিলেন, "তুই-ই আমার ধনসম্পত্তি বাবা, তুই বেঁচে থাকলে ঢের। কার জন্যে ও সব যক্ষির ধন আগলাতে যাব? তোর ত ছেলেপিলে কিছুই হল না। আমরা গেলে বাড়ীঘর সব মুখপোড়া জ্ঞাতিরাই ত ভোগ করবে? তাদের জন্যে আর বাড়ী সাজিয়ে রাখতে হবে না, তার চেয়ে আমাদের চোখের সামনেই ভেঙেচুরে যাক।

অনন্তের বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল। সত্যই ত। কাহার জন্য সে এত করিয়া টাকা জমাইতেছে, বিষয় বাড়াইতেছে? তাহার ঘর ত নিঃসন্তান শ্মশান হইয়াই রহিল।

রাত্রে মেঘমালা বলিল, "হ্যাঁ গা, কি ঠিক করলে? এখানেই এখন থাকা হবে নাকি?"

অনন্ত বলিল, "কি যে করি কিছু ভেবেই পাচ্ছি না। বাবার শ্রাদ্ধটা অন্ততঃ দেশে গিয়ে করতেই হবে, তারপর মা নিতান্ত রাজী না হন, ত এইখানেই থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা একদিক দিয়ে ভালই, তোমাকে এখানে নিয়ে আসবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। এর পর তোমায় একটু ডাক্তারটাক্তার দেখাতে হবে।"

মেঘমালা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন, ছেলে হচ্ছে না বলে?"

অনন্ত বলিল, "ওটা নিতান্ত কিছু হাসির কথা নয়। আমি মা-বাপের একমাত্র সন্তান, আমার যদি ছেলেপিলে না হয় তাহলে ত বংশই লোপ পেয়ে যাবে। সেটা কি সামান্য ব্যাপার? আমাদের বংশ একটা যা তা বংশ নয়।"

মেঘমালা বলিল, "এতদিন যখন ছেলে হল না, তখন ডাক্তার দেখালেই কি আর হবে? তুমি না হয় আর একটা বিয়েই কর।"

কথাটা সে খানিকটা ঠাট্টার ছলে এবং খানিকটা স্বামীর মন বুঝিবার জন্যই বলিয়াছিল। বলিয়াই স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। অনন্ত খুব গম্ভীরভাবেই বলিল, "তা অদৃষ্ট যদি তেমনি হয় অবশেষে তাও করতে হতে পারে।" মেঘমালার মুখে আর কথা জোগাইল না।

অনন্তের ভাবনার সীমা ছিল না। আদিনাথের মৃত্যুসংবাদ দিতে ললিতার বাপের বাড়ী লোক পাঠান হইয়াছিল। তাহাতে জানা গেল পরিবারের কেহই আর এখন এ গ্রামে বাস করে না, বসতবাটি ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িয়া আছে। কর্ত্তা, গৃহিণী মারা গিয়াছেন, ছেলেরা কার্য্যগতিকে ভারতবর্ষের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোথায় যে কে আছে তাহার খোঁজই পাওয়া গেল না।

অনন্তের মন দমিয়া গেল। ললিতাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলে অনেক দিক দিয়াই সুবিধা হইত। আর একটা বিবাহ করিলে বন্ধুবান্ধব মহলে তাহার অখ্যাতির সীমা থাকিবে না। তাহারা ত প্রয়োজনটা বুঝিবে না, উচ্চকণ্ঠে নিন্দা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইবে। দুই স্ত্রী বাঁচিয়া, এমন বরকে কন্যা সম্প্রদান করিতে বিশেষ কেহই উৎসাহ দেখাইবে না, যতই ভাল ঘরের ছেলে হোক না কেন। নিতান্ত কোনো কারণে যাহার বিবাহ হইতেছে না, এমন মেয়েই সে পাইবে। কিন্তু মেঘমালার মত রূপবতী, গুণবতী স্ত্রী ফেলিয়া, একটা কিম্ভূতকিমাকার বউ লইয়া ঘর করাও খুব সুসাধ্য ব্যাপার হইবে না। মেঘমালারই বা গতি কি হইবে? মনের দুঃখে সে একটা সর্ব্বনেশে কাণ্ড না করিয়া বসে। ললিতাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলে এক ঢিলে অনেকগুলি পাখী মারা যাইত: অখ্যাতির বদলে যথেষ্ট সুখ্যাতিই হইত, অনন্তের নিজের

বিবেকও তুষ্ট হইত। আর মেঘমালাও নূতন সতীন বিবাহ করিয়া আনা অপেক্ষা, পুরানো সতীনকে ফিরাইয়া আনাই বেশী পছন্দ করিত, কারণ ইহার দাবী তাহারও আগের। ললিতা আছে জানিয়াই মেঘমালার মা বাবা বিবাহ দিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারাও খুব বেশী আপত্তি করিতে পারিতেন না। ললিতা মেয়েটি চমৎকার, রূপসী না হউক অনন্তের পক্ষে দুই বউকে একসঙ্গে ঘর করিতে রাজী করাও নিতান্ত অসম্ভব না হইতে পারিত। কিন্তু ললিতার কোনো খোঁজই মিলিল না। একদিন নিতান্ত অপমান অনাদর করিয়া যাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আজ তাহার সাদর অভ্যর্থনার জন্ম ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেও সে আর ফিরিল না। ভারতবর্ষের ত্রিশকোটী মানুষের মেলায়, সেই বালিকা কোথায় যে হারাইয়া গেল কোনো সন্ধান রাখিয়া গেল না।

দেশের বাড়ীতে গিয়া পিতার শ্রাদ্ধাদি করিয়া মা এবং বউকে লইয়া অনন্ত আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। দিন আগেরই মতন কাটিতে লাগিল। অনন্ত মেঘমালার চিকিৎসার জন্ম মুক্তহস্তে টাকাকড়ি খরচ করিতে লাগিল, মহালক্ষ্মীও অদম্য উৎসাহে মাদুলি, কবচ, অব্যর্থ মহৌষধ প্রভৃতি জোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেঘমালার আশা দিনের দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

তবু স্ত্রীর বয়স অল্পই, বলিয়া অনন্ত একেবারে হাল ছাড়িল না। আরো বছর দুই-চার দেখা যাক, তাহার পর মেঘমালাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহার অনুমতি লইয়া, আবার বিবাহই করিতে হইবে। মেঘমালার বিন্দুমাত্রও অনাদর সে করিবে না, সেই গৃহিণী থাকিবে, নূতন বৌ তাহার পায়ের নীচে থাকিবে।

ইদানীং মহালক্ষ্মীও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার দেখানর নামে তিনি হাড়ে চটিয়া উঠিতেন, কাজেই কিছুকাল তাঁহার চিকিৎসাই হইল না।

একদিন কিন্তু বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। অনন্তও বাড়ী নাই, কাজে গিয়াছে, চাকরটাও খাইয়া-দাইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, ফিরিবে সেই বেলা চারিটায়। বাড়ীতে লোকের মধ্যে পীড়িতা শাশুড়ী, সন্ত্রস্তা বধূ এবং একটা বুড়ী ঝি।

শাশুড়ীর অবস্থা দেখিয়া মেঘমালার ত ভয়ে হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ঝিকে বলিল "ওরে কাউকে ডাক, শীগ্গির ওঁকে কোনোরকমে খবর দিক্।"

ঝি বলিল, "কাকে ডাকব বৌমা? দুপুরে কেই বা ঘরে বসে আছে, সব আপন আপন কাজে গেছে।"

মেঘমালা আকুল হইয়া বলিল, "তবে কি হবে?"

ঝি বলিল, "এক কাজ করি বৌমা, গলির মোড়ে বড় রাস্তার উপর একজন মেয়ে-ডাক্তার থাকে, খুব পশার তার, তাকেই ডেকে আনি।"

মেঘমালার ধরে প্রাণ আসিল, বলিল, "তাই যা শীগ্গির দৌড়ে যা। টাকা উনি এলে পাঠিয়ে দিলেই হবে।"

বৃদ্ধা ঝি যথাসম্ভব দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল। মিনিট পনেরো কুড়ির ভিতর আধুনিক সাজে সজ্জিতা একটি যুবতীকে লইয়া সে ফিরিয়া আসিল। ঝিয়ের হাতে ছোট একটি হ্যাণ্ড ব্যাগ।

মেঘমালাকে দেখিয়া লেডী ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "কার অসুখ? কি অসুখ? আপনার ঝি ভাল করে কিছুই বলতে পারল না।"

মেঘমালা বলিল, "আপনি এই ঘরে আসুন। অসুখ আমার শাশুড়ীর।"

লেডী ডাক্তার ভিতরে ঢুকিল। মেয়েমানুষ একে, তাহাতে অল্পবয়স্কা, মুখখানিও কোমল। দেখিয়া মহালক্ষ্মীর ভালই লাগিল, কাজেই অন্য ডাক্তারের বেলা যেরূপ প্রবল আপত্তি করিতেন এখন সে-সব কিছুই করিলেন না। যুবতী তাঁহাকে নিপুণভাবে পরীক্ষা ও প্রশ্ন করিয়া ব্যাপার বুঝিয়া লইল। তাহার পর বুড়ী ঝিকে নিজের বাড়ী পাঠাইয়া দরকারী ঔষধাদি সব আনাইয়া লইল এবং ঘণ্টাখানিক পরিশ্রম করিয়া, মহালক্ষ্মীকে খানিকটা সুস্থ করিয়া বিদায় হইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, বাড়াবাড়ি হইলে তাহাকে আবার খবর দিতে। সে না থাকিলেও বাড়ীতে দু' চারজন নার্স ও থাকে, তাহারা আসিয়া সাহায্য করিবে।

মেঘমালা বলিল, "উনি বাড়ী এলেই আপনার 'ফি'এর টাকা পাঠিয়ে দেব।"

লেডী ডাক্তার হাসিয়া বলিল, "তার জন্মে কোনো তাড়া নেই, যখন হয় দেবেন।" সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মেঘমালা শাশুড়ীর কাছে ফিরিয়া গেল। তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বউমা, ক'টা বাজল গা? খোকার আসবার সময় হয়নি।"

অনন্ত সেদিন বেশ খানিকটা আগেই আসিয়া পৌছিল। মেঘমালা ছুটিয়া গিয়া বলিল, "যাক্ বাঁচলাম, আগে এসেছ, বেশ করেছ। মা ত যাচ্ছিলেন আর একটু হলে। ঝি বুদ্ধি করে মোড়ের কাছ থেকে এক লেডী ডাক্তার ডেকে আনল, তাই রক্ষা। দেখবে চল, বড় ছটফট্ করছেন। ডাক্তারকে কিন্তু 'ফি' দেওয়া হয়নি; তুমি এলে পাঠিয়ে দেব বলেছি।"

অনন্তের নিজের শরীর হঠাৎ বড় খারাপ লাগাতে সে আপিস হইতে ছুটি লইয়া আসিয়াছিল। এখন মায়ের অসুখের খবরে আর সব ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাকে দেখিতে ছুটিল।

মহালক্ষ্মী ছেলেকে দেখিয়া বলিলেন, "এসেছিস? মুখ বড় শুকনো দেখাচ্ছে যে।"

অনন্ত বলিল, "আমার মুখের ভাবনা পরে ভেব। নিজে ত শুনছি যেতে বসেছিলে। এখন দেখলে ত চিকিৎসা না করার ফল।"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "বুড়ো ত হয়েছি, আর কতকাল বাঁচব? তোকে রেখে এখন মানে মানে যেতে পারলে বাঁচি।"

অনন্ত বলিল, "তা এই লেডী ডাক্তারই দেখুক না হয়। আর কাউকে ত তুমি কাছে আসতে দেবে না। কাছেই থাকে শুনলাম, যখন দরকার আসতে পারবে।"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "তা ডাক। মেয়েটা বেশ, কার মত যেন দেখতে, চট করে মনে এল না।"

অনন্ত বাহির হইয়া গেল। মেঘমালাকে বলিল, "গা টা কেমন জর জর করছে, এখন আর কিছু খাব না। একটু শুয়ে থাকি।"

মেঘমালা বলিল, "হয়েছে তা হলেই। এখন মাকে দেখি না, তোমাকে দেখি? কথায় বলে বিপদ কখনও একলা আসে না।"

অনন্ত বলিল, "কি আর করা যাবে? অসুখ ত কেউ ইচ্ছা করে বাধায় না? হলে উপায় কি?"

সত্যই তাহার বেশ পাকাপাকি জর আসিল। মেঘমালা বেচারীর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, কাহাকে যে সামলায় তাহার ঠিক নাই। শাশুড়ীর সেবার ভার ঝিয়ের উপর দিলে তিনি চটিয়া যান, অথচ স্বামীর রোগশয্যা ছাড়িয়া তাহার নড়িতেও ইচ্ছা হয় না।

অনন্ত উভয়সঙ্কট দেখিয়া বলিল, "এখন আর টাকার ভাবনা ভাবলে চলে না। তোমার মিস্ মিত্রকে ডেকে একটা নার্স ই আনাও মায়ের জন্মে। ওবুড়ীটা কিছু গুছিয়ে করতে পারে না বলে মা চটে যান।"

মেঘবালা ঝিকে দিয়া আবার ডাক্তার মিস্ মিত্রকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি আসিলে নার্সের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া, তাড়াতাড়ি স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল। একলা থাকিলে অনন্ত বড়ই মুষড়াইয়া পড়িত।

লেডী ডাক্তার গিয়া মহালক্ষ্মীর বিছানার পাশে বসিল। তিনি বলিলেন "এস বাছা এস, একদিন দেখেই তোমার উপর মায়া পড়ে গেছে। তোমার নাম কি বলত? ডাক্তার বলে ত আর মেয়েমানুষকে ডাকা যায় না?"

লেডী ডাক্তার বলিল, "আমার নাম লতিকা মিত্র।"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "বে থা হয়নি বুঝি? এই কাজ নিয়েই আছ? চোখে অতবড় চশমা যে? চোখ খারাপ নাকি?

মিস্ মিত্র বলিল, "হ্যা খারাপই বটে। আপনি আজ আছেন কেমন?" সে আর মহালক্ষ্মীকে গল্পের অবকাশ না দিয়া কাজের কথা পাড়িয়া বসিল।

মেঘমালা এমন সময় আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মহালক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন খোকা কেমন আছে বৌমা?"

মেঘমালা ম্লানমুখে বলিল, "কের ত বিকেল হতেই জর উঠছে ?"

লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, "রোজই এই রকম হয় নাকি ?"

মেঘমালা বলিল, "হ্যাঁ, এত ওষুধ খাচ্ছেন কিছুতে ত কিছু হচ্ছে না।"

লেডী ডাক্তার বলিল, "অনেক দিনের জন্যে Changeএ চলে যান! এ সব অসুখের প্রধান চিকিৎসাই হাওয়া বদ্‌লানো। সহরে এখন ওঁর থাকা উচিত নয়।" মহালক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনারও বাইরে গেলে উপকারই হবে।"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "আমার উপকার মাথায় থাক বাছা, ছেলের অসুখ শুনে অবধি গায়ের রক্ত জল হয়ে গেছে। তাকে রেখে যেতে পারলেই আমার ঢের। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, ঐ গুঁড়টুকু আমার সম্বল।" বুড়ী ঝি আসিয়া লতিকাকে বলিল, "একটি খোকা এসে আপনাকে ডাকছে মা।"

লতিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা যাই এখন। নার্স আমি কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব।"

মহালক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকাটি কে ? তুমি ত বিয়েও করনি ?"

লতিকা কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "একটি ছেলেকে পালন করেছি, সেই।" আর না দাঁড়াইয়া সে বাহির হইয়া গেল।"

মহালক্ষ্মী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "এ সব খ্রীষ্টান ছুঁড়ীদের বিশ্বাস নেই। কার পেটে যে কি থাকে বলা শক্ত।"

অনন্তের অসুখ সারিবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তাহার ডাক্তারও অবশেষে তাহাকে মাস-ছয়ের জন্য পাহাড়ে চলিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

অনন্ত একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। রোগ যে তাহার কি, অন্ততঃ কিসে যে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে, তাহা সে একরকম বুঝিতেই পারিয়াছিল। গুহ-বংশ তাহার সঙ্গেই অবসান হইবে, এই দুঃখটাও মৃত্যুভয়ের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে খোঁচা দিতে লাগিল।

মেঘমালা আসিয়া বলিল, "দেখ মা বল্‌ছিলেন কি, তাঁর ঘরটায় হাওয়া ঢের বেশী, তোমায় সেইখানে নিয়ে যেতে। তিনি তবু এধার ওধার ঘোরেন, তুমি ত এই এক জায়গাতেই আছ।"

আপত্তি করিবার মত জোরও যেন অনন্তের ছিল না। সে শুধু বলিল, "আচ্ছা।"

চাকরবাকরকে ডাকিয়া এ ঘরের জিনিষপত্র, আসবাব, সব ওঘরে চালান করিয়া দেওয়া হইল।

সকালে মেঘমালা রান্নাঘরে স্বামীর পথ্য তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত ছিল। অনন্ত একলা শুইয়া ভাবিতেছিল, আর ক'টা দিন তাহার বাকি আছে কে জানে ? মাতার, স্ত্রীর কি ব্যবস্থা সে করিয়া যাইবে, কে তাহাদের দেখিবে ?

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকিত হইয়া দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল। এ কে ? প্রেতমূর্ত্তি না মানুষ ?

মেয়েটিও ঘরে ঢুকিয়া থতমত খাইয়া গিয়াছিল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "এ ঘরে মা ছিলেন না ?"

অনন্ত বলিল, "হ্যাঁ, কাল বিকেল থেকে আমি এখানে এসেছি। কিন্তু আপনি কে ? আমার চোখের ভুল কিনা জানি না। তুমি কি ললিতা ?"

মেয়েটি চোখের চশমাটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "এক-কালে ছিলাম বটে। এখন আমি মিস্ লতিকা মিত্র, লেডী ডাক্তার। তোমার মা কোথায় বল। তাঁকে দেখে যাই।"

অনন্ত বলিল, "কি আশ্চর্য্য! মা তোমায় এতদিন চিন্‌তে পারেন নি ? রোজ ত তুমি তাঁর কাছে আস্‌ছ।"

লতিকা বলিল, "তিনি কি আমার মুখের দিকে কোনোদিন ভাল করে চেয়েছিলেন ? প্রথম যেদিন তোমাদের ঘরে পা দিলাম, সেদিন কেবল একবার। তারপর ত নাক অবধি ঘোমটা টেনে থাকতাম, কে আমায় দেখতে আসত ? গাল দিতেই তোমার মা ব্যস্ত থাকতেন। তা ছাড়া দশ বছরে মানুষের চেহারা ঢের বদলায়। চোখেও সর্ব্বদা আমি নীল চশমা দিয়ে রাখি।"

এমন সময় বছর আট নয়ের একটি ছেলে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, বলিল, "দেখ মা, তুমি কি রকম ভোলা, ব্যাগ ফেলেই চলে এসেছ।"

ললিতা ব্যাগ লইয়া বলিল, "যা, যা, সব তাতে সর্দ্দারি! তোকে কে আসতে বলেচে ? বাড়ী যা।"

অনন্ত বাধা দিয়া বলিল, "ওকে থাকতে দাও, একটু ভাল করে দেখি। ললিতা, এ ছেলে কার ?"

ললিতা মুখ ফিরাইয়া জান্‌লা দিয়া বাহিরে চাহিয়া

রহিল। অনন্ত খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কেন ওকে লু[illegible] রেখেছিলে? জান একটি ছেলের অভাবে আম[illegible]ন ব্যর্থ হতে বসেছে। মরতেও পারছি না আমি নিশ্চিন্ত হয়ে।"

ললিতা বলিল, "পরের জীবন ব্যর্থ করবার আগে এক মিনিটও ত তোমরা ভাব নি?"

অনন্ত বলিল, "তার শাস্তি ঢের হয়েছে। এখন তুমি ফিরে এস, ছেলেকে আমায় দাও।"

ললিতার মুখ হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কে বল্লে ও তোমার ছেলে? ওকে আমি কুড়িয়ে মানুষ করেছি।"

অনন্ত বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি মিথ্যে কথা বল্ছ।"

ললিতা বলিল, "হয়ত বল্ছি। কিন্তু সত্যি মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে না তুমি।"

এই বলিয়া সে দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিশি-ভোর

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১

তুমি এলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
মুকুলে মুকুলে ফুলের স্বপন
হয়নি ভোর।

কালো টুপি-পরা কৃষ্ণা-তিথির
আধেক চাঁদ
ঝাউবীথি-শিরে দাঁড়ায়ে হেরিছে
ছায়ার ছাঁদ!
দুয়ারে আমার দাঁড়ায়ে অতিথি—
দেখিনি ভালো,
মাটির উপরে ছায়াখানি তার
আলোয় কালো!
দেখি নাই তার নয়নে ছিল কি
নীলিম ক্ষুধা,
মৃদু বিহসিত অধর-আধারে
রঙীন সুধা।
রজনীগন্ধা-ফুলের শাখাটি
শিথিল করে
ছিল বুঝি? তার সুবাস লভিনু
তন্দ্রাভরে!
নখে মাটি খুঁটি' বাজালে নূপুর,
অধীর-থির,
আমি শুনেছিনু ঝিঁঝিঁর ঝুমুরে
সে মঞ্জীর!
ছায়ারি নেশায় জেগেছিনু সেই
জ্যোৎস্না-রাতি,
ওগো ছায়াময়ী, সে ছায়া তোমারি
রূপের ভাতি!

২

তুমি গেলে, যবে উষার আবীরে
ভোরের তারা
চক্ষু আবরি' শিশিরে শিশিরে
কাঁদিয়া সারা।
তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
ফোটা ফুলে-ফুলে মধুপান করে
মধুপ চোর।
নদী-পরপারে, আকাশে রাঙায়
রবির আঁখি,—
নিমেষে মিলায় অজানার মোহ
যা' ছিল বাকি!
যতদূর দেখি—কোথা সেই ছায়া
সজল-কালো?—
তার পাশে সেই ধুতুরা-ধবল
অস্ফুট আলো?
কোথা সেই রূপ?—চোখ দিয়ে যারে
যায় না ধরা,
যে-রূপ রাতের স্বপন-সভায়
স্বয়ম্বরা!
কোথা সেই তুমি? দেখেছিনু যারে
দেখার আগে!—
সে ছায়া মিলা'ল—কায়াখানি দেখি
সমুখে জাগে!

তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর
কুঞ্জে মোর
ফুটিল মুকুল—ফুলের স্বপন
হ'ল যে ভোর!

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

পিথোরাগড়, মায়াবতী, চম্পাওয়াৎ

সুখীডাংয়ের জঙ্গল

আসকোট হইতে নূতন পথে আমরা কনালিছিনা হইয়া পিথোরাগড়ের দিকে যাত্রা করিলাম। পথে বৃষ্টি প্রবল হইয়াই নামিল। পুরাতন বর্ষাতি গায়ে ছিল, তাহাতে যে প্রকারে দেহ রক্ষা হইল, তাহার কথায় আর কাজ নাই। অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টিতে আশ্রয়ের প্রয়োজন বোধ করিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলাম কোথায় আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে। কিছু দূরে বামে, লম্বা সারি সারি অনেকগুলি গৃহ একত্র সন্নিবিষ্ট। একটি ব্যারাকের মত। সেইদিকেই দৌড়াইলাম। শ্রেণীবদ্ধ সকলগুলি গৃহই দ্বিতল। প্রথম তলটি নীচু, দ্বিতীয় তল বাসোপযোগী, কিছু উচ্চ; তাহার উপর এই পর্ব্বত-অঞ্চলে যেমন হয়, ঢালু ছাদ—প্রত্যেক ঘরে উঠিবার উচ্চ উচ্চ সোপানশ্রেণী ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নিম্নতলে গরু-বাছুর, ঘোড়া, গাধা, এবং তাহাদের খোরাক, খড়কুটা, আবার ঘুঁটে, জ্বালানী কাঠ-কুটাও সঞ্চিত আছে। দ্বিতলে রন্ধন ও শয়নগৃহ। সারিবন্দী ঘরগুলিতে দশ বারো ঘর শ্রমজীবী লোক বাস করিতেছে। তাড়াতাড়ি এমনই একটি গৃহে, তিন চারিটি ধাপ উঠিয়া দ্বারে দাঁড়াইলাম। হাতে ছিল সেই পাহাড়ি লাঠি, তাহার উপর মাথায় জলসিক্ত পাগড়ী। গায়ের পুরাতন বর্ষাতি ও কাপড় হইতে জল ঝরিতেছে। এক মুখ দাড়ি-গোঁফ, সুতরাং মূর্ত্তিটি একেবারেই নয়নের অরুচিকর, একথা আর না বলিলেও চলে।

একটি অশীতিপর বৃদ্ধা কুলায় গম বাছিতেছিল। আমার মূর্ত্তি দেখিয়া সে কি যে বলিল বুঝিতেই পারিলাম না। তাহার সম্মুখে শিশুকোলে একটি সুকুমারী শীর্ণা বালিকামূর্ত্তি বসিয়া আছে। আমি বৃদ্ধাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "থোড়ী বৈঠনেকী জগহ্, বহুত বরখা।" তখন বৃদ্ধা আর কিছু না বলিয়া নীচের দিকে দেখাইয়া দিল। কাজেই নীচের তলে আসিয়া লাঠিটি বাহিরের দেওয়ালে ঠেসান দিয়া রাখিলাম এবং দ্বারহীন সেই ক্ষুদ্র গোয়ালঘরে প্রবেশ করিলাম। চারি দিকেই কাঠ-কুটা, ঘুঁটে বিচালীতে ভরা, মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র খাটিয়া পাতা—দেওয়াল ঘেঁষিয়া, আমি তাহারই উপর বসিয়া পড়িলাম।

প্রথমে দেখিতে পাই নাই, সেই ভগ্ন খাটিয়া-পার্শ্বেই বিচালীর উপর দুইটি বালক বসিয়া ছিল। তাহাদের পরণে কৌপীন মাত্র। আমায় দেখিয়া ভয় পাইয়া তাহারা বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল। দুজনের হাতে দুটি পয়সা দিয়া, তাহাদের গালে হাত দিয়া একটু আদর করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, নাম কি? ভয়েই তাহারা আড়ষ্ট, তা উত্তর দিবে কি! ইতিমধ্যে উপর হইতে ছোট বালিকাটি আসিয়া সিঁড়িতে গুঁড়ি মারিয়া আমার কাণ্ড দেখিতেছিল।

ভাগ্যবানের ঘরে হইলে এই বালকবালিকার রূপ দেখিবার বস্তু হইত। দারিদ্র্যদোষে লাবণ্যহীন, চুল রুক্ষ, মুখে প্রফুল্লতা নাই, মলিন বস্ত্র। এই হিমালয় পাহাড়ের হিন্দু অধিবাসিগণের মধ্যে কোথাও কুশ্রী বা কুরূপ

দেখিলাম না। এতটা অভাব ও দারিদ্র্যপীড়িত জনসমাজে ঘরে ঘরে এমন সৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসিল এটা ভাবিবার বিষয়। আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে যে, "সুখের ঘরে রূপের বাসা।" যদি এটা সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের হিসাবে ইহারা দরিদ্র হইলেও স্বীকার করিতে হইবে ইহারা সুখী। অন্ততঃ মনের দিক দিয়া দরিদ্র মোটেই নয়।

যাহ হউক প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বৃষ্টি থামিলে উঠিয়া গুটি গুটি পা চালাইলাম ও প্রায় একটা নাগাদ কনালিছিনায় পৌঁছিলাম। সঙ্গী-মহাশয় আগে পৌঁছিয়াছেন জানিতাম। আসকোট হইতে এই তেরটি মাইল পথে চড়াই উৎরাই নাই বটে, কিন্তু এই যে প্রবল বৃষ্টি ইহার জন্যই প্রায় এক ঘণ্টা দেরী হইয়া গেল। এখানে যে সরকারী মুদীর দোকানটি আছে সেইখানে খোঁজ করিতেই সঙ্গী-মহাশয়ের পাত্তা পাইলাম। এই মাত্র তিনি গ্রামের মধ্যে গিয়াছেন এবং আমাকেও যাইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমি এখানে আর বিশ্রাম না করিয়া একেবারেই তাঁহার উদ্দেশে পা চালাইয়া দিলাম। দ্রুত আসিয়া পথিমধ্যেই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। আমার বিলম্বের জন্য দেখিলাম মেজাজ রাগত। আমরা দুজনে সে-বেলা দুইটি ব্রাহ্মণ সংসারে অতিথি হইলাম। ভোজন হইল, খোসাসুদ্ধ উর্দকী দাল, ভাত আর দধি। মুখশুদ্ধির হরিতকীও ছিল।

এখানে শতাবধি ঘর ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের বাস আছে। একটি কাপড় ও দর্জ্জির দোকান ও একটি মুদীর দোকান আছে। আমরা কাপড় ও তৎসংলগ্ন দর্জ্জির দোকানেই রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রাতে একেবারে স্নানাহার সারিয়া পিথোরাগড়ের দিকে রওয়ানা হইলাম।

এপর্য্যন্ত পর্ব্বতের গা বাহিয়া হিমালয়ের যত রাস্তা দিয়া যাতা াত করিয়াছি কনালিছিনা হইতে পিথোরাগড়ের মত এমন সুন্দর রাস্তা কোথাও দেখি নাই। এই বারো মাইল পথটি প্রায়ই সমতল, কেবল শেষের দিকে অল্পখানিকটা চড়াই। চারিদিকে শস্যক্ষেত্র, তখন সবুজে ভরা। যেদিকেই চাহিবে কেবল যেন শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। পূর্ব্বে হিন্দুদের সময়ে এই পিথোরাগড় শোর রাজ্যের রাজধানী ছিল, এখন জেলা আলমোড়ার একটি মহকুমার সদর। এখানে মুনসেফ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর প্রভৃতির কাছারী আছে। এখানে টেলিগ্রাফ আপিসও আছে। এখান হইতে বরাবর তার-স্তম্ভ (টেলিগ্রাফ পোষ্ট) টনকপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে।

সহরটি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু মনোরম, ও অনেকটা উচ্চ-ভূমির উপর অবস্থিত। একটি কেল্লা ছিল, এখন ডেপুটি কলেক্টরের কাছারী তাহার মধ্যে। আমরা পেস্কার-মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইলাম, তিনি গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণ। মোটঘাট নামানো হইলে একবার সহরটি বেড়াইয়া আসিলাম। প্রধান অথবা সদর রাস্তা পাথর দিয়া বাঁধানো, অপ্রশস্ত। দুধারে দোকানশ্রেণী। তাহার মধ্যে একটি বিশাল চত্বর। তাহার চারিদিকে অনেক কিছুরই ব্যাপার চলিতেছে। মধ্যে বড় বড় দোকান। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির বহুবিধ কারবার বহুকাল ধরিয়া সহরকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই ঘোর পার্ব্বত্য-অঞ্চলে সমৃদ্ধিশালী সহর দেখা যায় না কারণ এখানে বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়া এই পার্ব্বত্য জনসমাজের মধ্যে নিরন্তর অভাবরাশি সৃষ্টি করিবার উদ্দাম প্রবৃত্তি এখনও বিস্তার করে নাই।

এখানে কুলীবাহক পাওয়া গেল না। আসকোট হইতে রাজওয়াড়ার লোক ত এইস্থানে আমাদের মাল পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, কিন্তু এখান হইতে মাল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহাই হইল ভাবনা। এক লাদ্দু ঘোড়া পাওয়া গেল। পেস্কার-মহাশয় আমাদের বাঙালী দেখিয়া প্রথম হইতেই তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। এখন আমাদের মাল চালান করিবার বেলায় এখান হইতে চম্পাওয়াৎ পর্য্যন্ত এক ঘোড়াওয়ালাকে সাড়ে চারি টাকা স্থির করিয়া দিলেন। আসলে এখান হইতে আড়াই বা তিন টাকার বেশী হওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। তিনি নিজে হইলেও দিতেন না। ঘোড়াওয়ালা ছিল ব্রাহ্মণ; যদিও তাহার মলিন 'জানাউ' ব্যতীত

মানস-সরোবরের যাত্রাপথ

আকৃতি-প্রকৃতিতে তাহাকে ব্রাহ্মণ বংশীয় বলিয়া ধারণা করা অসম্ভব ছিল।

পিথোরাগড়ে আসিয়াই বাড়ীতে একখানি তার করিয়া দিলাম "আমরা দশদিনের মধ্যেই পৌছিব।" পরদিন আমরা আহারাদির পর গুরণা যাত্রা করিলাম। গুরণা এখান হইতে সাত মাইল মাত্র। সেখানে একটি ডাকবাংলা আছে, তাহার বারান্দায়ই আমরা মোটঘাট নামাইলাম। পথে আমার লাঠিটির নীচের

এখন আপনাদের জন্ম কি করা যায়?" তখন সঙ্গী-মহাশয় বলিলেন, "এখানে ব্রাহ্মণ এমন কেহই নাই কি আমাদের জন্ম দুই চারিখানি রুটি পাকাইতে পারে?"

স্বামীজী বলিলেন,—"অপর কেহই নাই, এই ছত্রি বালক দুইটিই আছে, যদি আপত্তি না থাকে, তবে ইহাদের দ্বারাই আপনাদের খাবার রুটি প্রস্তুত করাইয়া

লোহাঘাটের আশ্রম

দিতে পারি।" "তাহাই হউক," বলিয়া সঙ্গী-মহাশয় দাড়িতে অঙ্গুলী চালনা করিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে বালক দুইটির দিকে তাকাইতে লাগিলেন। সেইরাত্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়া বালকেরা বাজার হইতে আলু, আটা, ঘি, প্রভৃতি আনিয়া চুলা ধরাইয়া আমাদের জন্ম রুটি ও তরকারী পাক করিল। স্বামীজী নিজ হাতে ছুরি দিয়া আলু ছাড়াইয়া দিলেন।

যখন সকল প্রস্তুত হইল, তখন সঙ্গী-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৈরিক পরিবার আগে আপনারা কি ছিলেন, উপাধি কি ছিল, মুখুজ্যে না বাঁড়ুজ্যে নাকি?" দূর হইতে তিনি বলিলেন, "আমরা মিত্র-বংশীয়।"

সঙ্গী-মহাশয়টি আমার তখন, "ওঃ আচ্ছা, বেশ, তবে আমি এইদিকেই খাইব, হামকো ও পাত্র হাতমে দেও তো," বলিয়া হাত বাড়াইয়া পাত্রটি বালকের হাত হইতে লইয়া আমাদের সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্ম খুব করিয়াছেন, অনেক করিয়াছেন, বেশ, হাঁ,—আপনারাও বসুন না, খান না, তাতে কি?" এক্ষেত্রে এইরূপে আমার নিষ্ঠা ও আচারবান সঙ্গী-মহাশয় নিজের জাতিত্ব এবং উচ্চ ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা বাঁচাইয়া লইলেন।

আমাদের আহার শেষ হইলে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম এবং রাত্রি প্রভাত হইলেই প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া স্বামীজী আমাদের সঙ্গে করিয়া মায়াবতীর পথ দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, "আপনারা মায়াবতীতে যাইয়া খাইয়া সুখ পাইবেন, সেখানে ফলমূল ও শাকসবজী বেশ প্রচুরই আছে।"

লোহাঘাট হইতে চম্পাওয়াৎ ছয় মাইল, ঠিক মধ্যেই মায়াবতী পড়ে। লোহাঘাট হইতে মায়াবতী প্রায় চারি মাইল। স্বামীজী আমাদের সঙ্গে আসিয়া মায়াবতীর পথ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিলেন, আমরা অগ্রসর হইলাম। কতকটা চড়াই উঠিয়া বনপথ পড়িল। দুই পার্শ্বেই ঘন জঙ্গল। এ পথেও জোঁকের উৎপাত কম নয়। প্রায় নয়টা আন্দাজ মায়াবতী পৌঁছিলাম।

মায়াবতীকে এ অঞ্চলে মায়াপট্ বলে। পূর্ব্বে এখানে এক সাহেবের চা বাগিচা ছিল। পরে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রসিদ্ধ মার্কিণ লক্ষপতি ক্যাপটেন সেভিয়র আসিয়া আশ্রমার্থ এই পাহাড়টি খরিদ করেন, পরে অদ্বৈত-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইলে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিকপত্র এখান হইতে বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এখনও উহা বিশেষ গৌরবের সহিত চলিতেছে। মায়াবতী বলিতে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত পার্ব্বত্য ভূখণ্ড বুঝায়, এখন উহা অদ্বৈতআশ্রমের অধিকারে।

আমরা যখন উপস্থিত হইলাম তখন সীতাপতি ব্রহ্মচারী ব্যতীত মঠে আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম অন্যান্য স্বামিগণ নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে মেলা দেখিতে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন।

আমাদের জন্ম বড় বাংলাটির নিকটবর্ত্তী একটি ছোট বাংলার দ্বিতল কক্ষে ব্রহ্মচারী-মহাশয় স্থান ঠিক করিয়া দিলেন। মালপত্র সেইখানেই ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরেই আত্মচৈতন্য প্রমুখ মঠের অন্যান্য

মায়াবতী অদ্বৈতআশ্রম

সকল কর্মী সন্ন্যাসিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের আগমনে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে আত্মচৈতন্য ব্রহ্মচারী-মহাশয় একটু যেন অনুরোধের ভাবেই প্রস্তাব করিলেন, "আপনারা অনেকটা ক্লান্ত আছেন, আশা করি এখানে দুই চারিদিন বিশ্রাম করিয়া যাইবেন।" সঙ্গী-মহাশয় তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া ও-কথা শেষ করিয়া দিলেন যে, "আমরা অনেক দিন ঘর হইতে বাহির হইয়াছি, আর কোথাও ভাল লাগিতেছে না, আমরা কল্যই যাত্রা করিব। তিন দিনেই টনকপুর পৌঁছিব এবং দেশে গিয়াই বিশ্রাম করিব।" যখন তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না, তখন অগত্যা তাঁহারা নিরস্ত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, "এখানে আমরা বাঙালী সঙ্গী পাই না, যে-কয়জন এখানে আছি সেই কয়জন ছাড়া ত আর আমাদের দেশের লোকের মুখ দেখিবার জো নাই। আপনাদের পাইয়া আমরা বাস্তবিকই আশা করিয়াছিলাম কিছুদিন দেশের লোকের সঙ্গ পাইব, অন্ততঃ কিছুদিন ছাড়িব না,—কিন্তু যখন একান্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা, তখন আর কি বলিব।"

মায়াবতী স্থানটি যে কি মনোরম তাহা প্রত্যক্ষ না দেখিলে শুধু ভাষায় বর্ণনা হয় না। সাধনার অনুকূল এবং পূর্ণস্বাধীনতার হাওয়ায় সর্ব্বস্থান যেন সজীব হইয়া আছে। এমন ভাবে এই অদ্বৈতআশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত যে দেখিলেই প্রাণে শান্তি আপনিই আসে। ইহা একটি পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর স্থাপিত। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ না হইলেও সমুদ্রতল হইতে ছয় হাজার ফিটের কম হইবে না। তখন ঘোর বর্ষা, আকাশে দিবারাত্রই মেঘের আড়ম্বর, আর মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি ত আছেই, সেই কারণে আমরা ভাল করিয়া স্থানটি উপভোগ করিতে পারি নাই। কিন্তু শুনিলাম আকাশ পরিষ্কার থাকিলে দূরদূরান্তের চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি অতি পরিষ্কার দেখা যায়। এখান হইতে নন্দাদেবী অতি সুন্দর দেখা যায়।

পাহাড়ের তিনটি স্তর—সেই তিন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের জন্য বৃহৎ গৃহ-সকল নির্ম্মিত এবং পরিপাটি সজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেক গৃহ, বিশিষ্ট কর্ম্মের প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ আসবাবে পূর্ণ, কোথাও অতিপ্রাচুর্য্য নাই, কোথাও দৈন্য নাই। ক্ষুদ্র এবং বিরলবসতি হইলেও

গম্ভীর এবং সমৃদ্ধিশালী একটি গ্রাম, এই মায়াপট্ পর্ব্বত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্র আপেল নাসপাতি, আখরোট খোবানীর গাছ। প্রথম স্তরে ফুল ও ফল, দ্বিতীয় স্তরে শাকসবজী, তৃতীয় স্তরে ক্ষেত্র। আর সকল স্তরের সম্বন্ধ সূত্রে পরিষ্কার সুসমতল সযত্ননির্ম্মিত এবং সুরক্ষিত রাস্তাগুলি। মায়াবতী ভারতের গৌরব।

ভোজনের সময় যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনারা কোথায় ভোজন করিবেন?" তখন এখানেও ভোজনব্যাপারে সঙ্গী-মহাশয় নিজ জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিলেন। সাধারণ ভোজনগৃহে যেখানে পরিপাটি সমবেত-ভোজনের ব্যবস্থা আছে সেখানে ভোজন না করিয়া বলিলেন, তিনি কাহারও সহিত খাইবেন না, নিজ গৃহেই ভোজন করিবেন। পরে আমার দিকে দেখাইয়া ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বলিলেন, "তবে এই বাবু যদি ইচ্ছা করেন ত আপনাদের সঙ্গে খাইতে পারেন। ওঁর ত আপনাদের সঙ্গে চলে।" তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে আমার অন্তর তিক্ত হইয়া উঠিল। কাঠগুদাম হইতে আরম্ভ করিয়া ভোটিয়া আশ্রয়দাতা মহাজনের আশ্রয়ে পর্য্যন্ত এতদিন কাটানো হইয়াছে ইহার মধ্যে তাঁহার আচার-নিষ্ঠার গভীরতা যে কতটা আমার ত দেখিতে কিছুই বাকী ছিল না। কিন্তু নিজের দেশের এই পবিত্র সঙ্ঘের মধ্যে আসিয়া তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার এত বিসদৃশ লাগিল, আমার আর তাঁহার সহিত বাক্যালাপের ইচ্ছা হইল না। আমার নিকট সকলের সঙ্গে একত্র-ভোজনের আনন্দই শ্রেয়ঃ বোধ হইল। আমি তাহাই করিলাম।

মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের পর আমরা আশ্রমের সর্ব্বস্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। প্রথমে প্রবুদ্ধ-ভারত কার্য্যালয়, একটি বৃহৎ দ্বিতল কাষ্ঠনির্ম্মিত সুন্দর গৃহ। নিম্নতলে যন্ত্র ও দপ্তরখানা প্রভৃতি। দ্বিতলে বৃহৎ একখানি কক্ষে বহুল পরিমাণে স্তরে স্তরে কাগজ সংগৃহীত আছে, অপরখানিতে এখানকার প্রকাশিত পুস্তকাবলী। পার্শ্বেই সম্পাদকের ঘর। আরও কয়েকখানি ঘর, তাহাতে এই বৃহৎ ছাপাখানার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অতি পরিপাটি-রূপে সংগ্রহ করা আছে। কোথাও কোন ব্যাপারে খুঁৎ নাই। সজ্জা ও পারিপাট্যের এমন মধুর সমাবেশ এই পার্ব্বত্য প্রদেশে এক অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক ব্যাপার।

এই প্রবুদ্ধ ভারত কার্য্যালয়ের কিছুদূরে একটি ক্ষুদ্র সাধনগৃহ আছে যেখানে সাধক একান্তে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন। ইহার পর নীচের স্তরে নামিয়া চিকিৎসালয় দেখিলাম। ইহার ব্যবস্থা দেখিয়া বিশিষ্ট দর্শকগণের মন্তব্যের খাতায় সঙ্গী-মহাশয় লিখিলেন, "এখানকার সকল দেখিয়া শুনিয়া নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিলাম।" আমরা অনেকক্ষণ এখানকার সমস্ত দেখিয়া নিম্নস্তরে নামিয়া ক্যাপটেন সেভিয়রের গৃহ দেখিলাম। সকল গৃহ, সকল স্থান, উদ্যান, পথ, ক্রীড়াভূমি সকল দেখিতে দেখিতে উপভোগের আনন্দে আমাদের জীবন ধন্য হইল। নিস্তব্ধ একটি প্রেমের রাজত্ব।

এখানে একটি ডাকঘর হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে যদিও তখনও কার্য্যারম্ভ হয় নাই। সেই স্থানটিও দেখিলাম। আমার প্রাণের মধ্যে এমন স্থানে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা এতটা প্রবল হইয়াছিল যে, সঙ্গী-মহাশয়কে বলিয়া ফেলিলাম, "দুই একদিন আরও থাকিলে ক্ষতি কি?" তিনি একেবারে দেশের লোক দেশে পৌঁছাইয়া চূড়ান্ত বিশ্রাম করা যাইবে বলিয়া শেষ করিয়া দিলেন। যাহা হউক স্বামীজীদের অনুরোধে সন্ধ্যার পর সঙ্গীতে ভজন করিতে হইল, তাহাতে সকলেই আনন্দ পাইলেন। পর দিন প্রাতে আমরা যাত্রার সঙ্কল্প করিয়া রাত্রে ভোজনান্তে ভগবান রামকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিতে করিতে শয়ন করিলাম।

প্রাতে জল আরম্ভ হইল। আশ্রমের সাধুজন সকলেই আর একবার একবাক্যে থাকিয়া যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় অটল। অগত্যা তাঁহারা খেচরান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আহারাদির পর বৃষ্টি থামিতেই সঙ্ঘের সাধুগণকে নমস্কার করিয়া আমরা চম্পাওয়াৎ যাত্রা করিলাম। মায়াবতী হইতে বনপথে আমরা চার মাইল অতিক্রম করিয়া দেড় ঘণ্টার মধ্যেই চম্পাওয়াৎ পৌঁছিলাম।

এখানে ঘোড়া কুলি বাহক প্রভৃতির এজেন্সি আছে।

এখানকার বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে প্রতি পড়াও পিছু এক মণ মোটের মজুরী ছয় আনা। সেই হিসাবেই আমাদের টনকপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত কুলী বাহক লওয়া হইল। আমরা টাকা জমা দিলাম চারিটি পড়াওয়ের জন্য, প্রত্যেককে দেড় টাকা দিয়া রসিদ পাইলাম। দেউড়ি এখান হইতে পনের মাইল, ইহাকে দুইটি পড়াও ধরা হয়। তাহার পর সুখীডাং, পরে টনকপুর।

বর্ত্তমান চম্পাবতী আর নগর নহে, একখানি গ্রাম মাত্র বলিলেও ভুল হয় না। তবে বহুবিস্তৃত এবং উচ্চ ভূমির উপর। গ্রামের মধ্যে প্রবেশের পথে একটি ফটক আছে, তাহার পর সদর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র নদী প্রায় দুই শত ফিট নীচে, ক্ষীণকায়া, এখন তাহা বর্ষার প্রভাবে দুকূলে পূর্ণ। চারিদিকেই শস্যক্ষেত্র, সবুজের বিস্তৃত সভাতল। আমরা চম্পাওয়াতে বেশীক্ষণ ছিলাম না, বাহকের ব্যবস্থা করিতে যত সময় লাগে। তাহার পরই আমরা দেউড়ি যাত্রা করিলাম,—এখান হইতে প্রায় ১৫ মাইল। লম্বা পাড়ি দিয়া অবসন্ন-শরীরে সন্ধ্যার মধ্যেই পৌছিলাম। ডাকবাংলার বারান্দায় মালপত্র লইয়া আড্ডা করা গেল।

চম্পাবতীর রাজপথ

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমরা আহারাদিও সারিয়া লইলাম। রাত্রে গভীর ক্লান্ত নিদ্রার মাঝে ঘোরতর বর্ষার আবির্ভাব। ব্যাঘাত পাইয়া শয্যাদ্রব্যাদি গুটাইয়া বারান্দা হইতে ঘরের মধ্যেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। পরদিন প্রায় সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলাম। সঙ্গী-মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এ বেলা স্নানাহার শেষ করিয়াই একেবারে সুখীডাংএর দিকে যাত্রা করা যাইবে। মনে আনন্দ আছে যে, পরদিন আমরা টনকপুর রেল ধরিতে পারিব।

যাইতে হইলে এখান হইতে দুইটি পথ আছে, একটি "নাওয়া" ও অপরটি "পুরাণা সড়ক্"। উভয় পথেই বেশ প্রশস্ত একটি নদী পড়ে ও ঘোর জঙ্গলের মধ্য দিয়াই রাস্তা। পুরানো পথটিতে একটি ঝোলা পুল আছে, নূতন পথে পুল এখনও হয় নাই। কাজেই এক কোমর জল ভাঙিয়াই যাইতে হয়। আমরা "পুরাণা সড়ক" দিয়াই যাইব স্থির করিলাম যদিও শুনিলাম তাহাতে কতকটা চড়াইও আছে। মেঘ হইয়া আসিতেছে, আমি পা বাড়াইয়াই দ্রুত চলিতে সুরু করিয়া দিলাম এবং প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই পুলের নিকটে উপস্থিত হইলাম। সরু পুলটি, উপরে লোহার তারের কাটি ও নীচে পাতলা সারি সারি কাঠের পাটা দিয়া লঘুপ্রণালীতে প্রস্তুত, এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চলিতে চলিতে বুঝা যায় পুলটি ভারে নাচিতেছে। বেশ আরামপ্রদ। সেই নির্জ্জন পথটিতে চলিতে চলিতে বড় আনন্দেই পুলের এপারে আসিলাম, দেখিলাম, বিজন জঙ্গলের মধ্যে বন্ধুর পথ আমার সম্মুখে।

যে পর্ব্বতগাত্রে সেতুর অবলম্বন, তাহার উপর দিয়া একটি পথ গিয়াছে, আবার উহার বামেও একটি পথ আছে, সেটি পাকদণ্ডি বা বনপথ বুঝিতে পারিলাম।

সঙ্গী বাহকগণ, যাহারা মূলত পথপ্রদর্শক, তাহারা পশ্চাতে অনেকটাই দূরে রহিয়াছে। তাহাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই, বনপথ ধরিয়া গেলে ঠিক বড় রাস্তায় পড়িব ভাবিয়া অগ্রসর হইলাম। সেইখানেই আমি একটা ভুল করিলাম। তখন বুঝিতে পারিলাম না। এইটুকু কেবল ধারণা ছিল যে, আমায় বামে যাইতে হইবে, সেইদিকেই গন্তব্য পড়াও। এরূপ ভয়ঙ্কর জঙ্গলময় পথ হিমালয়ের উচ্চস্তরে নাই, উহা এই শিবালিকা-শ্রেণীর মধ্যেই।

যাহা হউক আমি ত সেই সেতুটি পার হইয়া পাকদণ্ডি ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রাণে আনন্দ, শরীরে বল, হাতে পাহাড়ি লম্বা লাঠি, মাথায় পাকবাঁধা, গায়ে ছিল একটা জামার উপর পুরানো বর্ষাতি এবং নগ্ন-পদ। যতই পথ শেষ হইয়া আসিতেছিল ততই হিমালয়ের উপর একটি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম। এত কষ্টের তীর্থভ্রমণ ও কঠিন পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কাল আমরা সমতলভূমিতে পৌছিব এবং রেলষ্টেশন পাইব, কাজেই হিমালয়ের নির্জ্জনতা যতটুকু পাওয়া যায় সবটুকুই উপভোগের জিনিষ। এইভাবে চলনের তালে মগ্ন হইয়াই যাইতেছিলাম।

ক্রমশঃ পথটি মিলাইয়া যাইতে লাগিল, পথের রেখা ভাল দেখা যায় না। একস্থানে কতকটা চড়াইয়ের মত পথে বর্ষার ধারা নামিয়া স্থানে স্থানে গভীর দাগ পড়িয়া খাল হইয়া গিয়াছে। এইরূপ কতকটা উঠিয়া দেখিলাম, কতকগুলি শাখামৃগ খেলা করিতেছে। সেই স্থানটি এত পরিষ্কার যেন কেহ উহা সযত্নে পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছে, ঠিক যেন কোন ঋষির আশ্রম বা তপোবন। তখন প্রাণের স্ফূর্ত্তি অবাধ,—অন্যমনস্ক হইয়া তাহার মধ্য দিয়াই চলিলাম। সেই স্থানটি বড় বড় গাছে পূর্ণ, ছোট গাছ কম। তাহার পর বৃক্ষশ্রেণীর উপর ঘন পত্রাচ্ছাদন হেতু স্থানটিতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। সেইজন্য সমগ্র ভূমিটি জুড়িয়া তাপহীন স্নিগ্ধ অন্ধকার, তাহারই মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক খণ্ড উজ্জ্বল কিরণ কচিৎ পত্রব্যবধান ভেদ করিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়াছে, তাহাতে দৃশ্যটি আরও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে।

পথ ক্রমশ সঙ্কীর্ণতর হইতে হইতে কখন মিলাইয়া গিয়াছে দেখিতে পাই নাই। একতালে বেশ স্ফূর্ত্তিতেই চলিতেছিলাম। যখন লক্ষ্য আমার পথের উপর পড়িল তখন হঠাৎ পথ দেখিতে না পাইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম;—একি! পথ কোথায়! কোনো দিকে ত পথ বলিয়া কিছু দেখিতে পাইতেছি না। তাই ত পথ কোন্ দিকে! তবে কি পথ হারাইলাম?

সেতু পার হইবার সময় হইতেই মনের মধ্যে এটি ঠিক ছিল যে, আমার গতি উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে। সম্মুখে কতকটা সমতল জঙ্গলের মধ্যে মৃত্তিকা মিশ্রিত প্রস্তর স্তর সমাকীর্ণ বনপথের মত বোধ হইতে লাগিল, উহা পাকদণ্ডি ভাবিয়া সেইদিকেই চলিতে লাগিলাম। কতকটা যাইয়াই বুঝিতে পারিলাম, পথ বলিয়া যেটা ধরিয়া আসিয়াছি সেটি বিপথ। উহা এমন স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে যেখান হইতে পথ পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, যেহেতু এই স্থানটি ঝুপি জঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বৃক্ষ এবং বড় বড় গুল্মে পরিপূর্ণ। আশ্চর্য্য এই যে, মধ্যে মধ্যে দুই একটা কলাগাছ দেখা যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমার এই বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, নিকটে নিশ্চয়ই পথ বা লোকালয় আছে,না হইলে এখানে কলাগাছ কেন? মানুষে না বসাইলে কলাগাছ হইতেই পারে না। এই বুদ্ধিকে বলবৎ করিয়া আমি লতাগুল্ম পদদলিত করিয়া ত্বরিৎপদে চড়াইয়ের উপর উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু হায়,—কল্পনা-পরিচালিত বুদ্ধি, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট বুদ্ধি ফলে বিপরীতই ঘটাইল। পথও মিলিল না, লোকালয়ও মিলিল না। যদিও অন্তরের মধ্যে তখনও বিশ্বাস রহিয়াছে যে, জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে, তখনও মনের বল হারাই নাই। ভাবিলাম সহজেই পথ খুঁজিয়া লইতে পারিব এখন জঙ্গল হইতে কোনক্রমে বাহির হইতে পারিলে হয়। দ্রুতগতিতে জঙ্গল ভাঙিয়া পা চালাইলাম। বাহির হইব কি, যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই ঘন জঙ্গল, গলিত শুষ্ক শাখাপত্রসঙ্কুল পথের চিহ্নশূন্য বন সম্মুখে পড়িতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে রাশিকৃত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আয়তন লতাগুচ্ছের মধ্যে পা জড়াইয়া যাইতে লাগিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সূর্য্যের

মুখ দেখা যায় না; বেলা যে কতটা হইয়াছে তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। আন্দাজ নয়টার সময় বাহির হইয়াছিলাম, এখন হিসাব করিয়া বেলা আন্দাজ একটা হইবে, তাহার বেশী হইবে না বলিয়াই মনে হইল।

ভিতরে উৎসাহ পূর্ণরূপেই ছিল। ভাবিলাম যখন পথ কোনও প্রকারে পাওয়া যাইতেছে না তখন যেমন করিয়া হোক একবার শিখরদেশে উঠিতে পারিলেই বোধহয় পথ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এবার উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম, লক্ষ্য হইল শিখরদেশ। প্রায় দুই ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের পর ঘন জঙ্গল ছাড়াইয়া শিখর-দেশে উঠিয়া চারিদিক চাহিতে লাগিলাম। উপরে লতা-গুল্ম কম, ছোট ও মাঝারী গাছই বেশী, বড় গাছ নাই।

যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, তখন প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, চারিদিকেই পর্ব্বতশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে কি বিশাল ঘন কালো জঙ্গল চলিয়া গিয়াছে, কোথাও জমি দেখা যাইতেছে না। যেদিক হইতে আসিয়াছি একবার সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম, তখনও দিকভ্রম হয় নাই। দেখিলাম বহু দূরে নীচের দিকে সেই সেতুটি মাকড়সার জালের মত দেখা যাইতেছে। এতক্ষণে বোধ করি সঙ্গী-মহাশয় সুখীডাংয়ে পৌঁছিয়া থাকিবেন, আর আমি জঙ্গলে পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছি। এক একবার তাঁহার নিষেধবাক্য—অত আগে যাওয়া ভাল নয়—মনে হইতে লাগিল। এরূপভাবে জঙ্গলের মধ্যে যে পথভ্রান্তি ঘটিবে তাহা স্বপনেরও অগোচর। মনেই আসে নাই যে ভুল পথে পা বাড়াইয়া আমায় দিবারাত্র কত বিপদের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে।

এখন এই অজগর জঙ্গলের মধ্য হইতে বাহির হইব কি প্রকারে, পথ বলিয়া ত কিছুই চক্ষে পড়িতেছে না। এদিকে দাঁড়াইয়া ভাবিলেও ত চলিবে না। আর না দাঁড়াইয়া পা চালাইয়া দিলাম। এবারে নামিতে লাগিলাম। পথ ত নাই-ই—স্থূল লতা কাণ্ড ও বৃক্ষশাখা ধরিয়া নামিতে লাগিলাম। পথ যদি থাকে ত নীচেই আছে এইটুকুই কেবল মনের মধ্যে জাগিতে লাগিল। ক্রমশ জঙ্গল বড়ই ঘন বোধ হইতে লাগিল, আবার আকাশও এদিকে ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, চারিদিক কালো হইয়া গেল—যেন ঝড় ও জলদানবের আসিতে আর বিলম্ব নাই। এতক্ষণ দেখি নাই—হঠাৎ দুই পা কন্ কন্ করিয়া উঠিল। পদপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে কটিদেশ পর্য্যন্ত জোঁকে ধরিয়াছে, দেখি দুই পা দিয়া রক্ত ঝরিতেছে। তাহারা রক্ত পান করিয়া দষ্ট স্থান হইতে শ্রাবিত ঘন রক্তে জমিয়া কালো হইয়া গিয়াছে। বস্ত্রখানির অনেকটাই রুধিরসিক্ত। এখন যদি বসিয়া এই-সব পরিষ্কার করি তবে হয় ত বেলাটুকু চলিয়া যাইবে। সেদিকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুত নামিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পথ পাইবার আশায় যত তাড়াতাড়ি নামিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম ততই পদস্খলন হইতে লাগিল। তাহার উপর আবার একটি নূতন উপসর্গ উপস্থিত হইল, সেটা আগে অত ছিল না, এখন বেশী বেশী পাইলাম—সেটা ঘন ঘন বিছুটির জঙ্গল।

এত বড় বিছুটি গাছ জীবনে কখনও দেখি নাই। এক একটি গাছ যেন শিউলি গাছের মত আয়তন এবং ডালপালা অতই স্থূল। পাতাগুলি সেই অনুসারেই প্রকাণ্ড, আবার কাঁটা বা শোঁয়াগুলি সেই অনুপাতে দীর্ঘ। তাহার মধ্যে কতকগুলি গাছ যে কতকালের তাহার ঠিক নাই। মরিয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের গলিত পত্রগুলি নীচে পড়িয়া মাটি হইয়া গিয়াছে, কেবল সকণ্টক কাণ্ডটি ঠিক দাঁড়াইয়া আছে। একবার ঐরূপ একটি স্থূল শিকড়কে দৃঢ়রূপেই অবলম্বন করিয়া যেমন নামিতে যাইব, হাতের কাণ্ডটি হাতেই রহিল, একেবারে পাঁচ ছয় হাত নীচে একটি প্রকাণ্ড শৈবালাকীর্ণ প্রস্তরের উপর পড়িয়া আমার হাঁটুর উপরেই চোট বেশী লাগিল, ভিতরে পাথরের কতকটা ধারালো কোণ ঢুকিয়া গেল। তখন অতটা টের পাইলাম না। সে বেদনা অল্পক্ষণেই হজম করিয়া ফেলিলাম, পদতলে ও হাতের তালুতে কাঁটা ফুটিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, লাঠিটা আর মুষ্টির মধ্যে ধরিতে পারিতেছি না। চলিতে ত হইবেই, এখন দিনশেষ আসিতেছে, এখন ত চলা বন্ধ হইতে পারে না।

ক্রমশ বেলাঅবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নোৎসাহ হইলাম, মাথার ঠিক আর রহিল না। তখন ঘন কণ্টকলতা-সমাকীর্ণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল না মানিয়া পা চালাইলাম। তাতে

বেতালে মাতালের মত পা পড়িতে লাগিল। অবশেষে কতকগুলি লতা পায়ে জড়াইয়া আবার পড়িয়া গেলাম। এবারে সংঘাতিক লাগিল ঘাড়মুড় গুঁজিয়া প্রায় ছয় সাত হাত নীচে এক পাথরের উপর পড়িয়া সংজ্ঞারহিত হইলাম। নাকের গোড়া ও কপালে চোট লাগিল। কতকক্ষণ উঠিতেই পারিলাম না। কানের গোড়ায় কি একটা সড় সড় করিয়া উঠিল। তখন আবার আগন্তুক কোন বিপদাশঙ্কার চেষ্টা করিয়া উঠিলাম। সেটা তাড়াতাড়ি ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া গেল, দেখিতেই পাইলাম না। সন্ধ্যা আগতপ্রায়,—হায়! এই বিজন অরণ্যে কে আমায় পথ দেখাইয়া দিবে?

ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এখনও কি বাহির হইবার পথ পাওয়া যাইতে পারে না?—হয়ত পারে। আর একবার সেই অসম্ভব আশা জাগিয়াই যেন হঠাৎ নিভিয়া গেল। কিসের জন্য জানি না,—তবে এটা বুঝিয়াছিলাম ভয়ে নয়,—আমার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল, আমি ঊর্দ্ধ দিকেই চাহিয়া রহিলাম। আমি গলদশ্রুনয়নে কয়েকবার কাহাকে ডাকিলাম। তাহার পর আর একবার বনস্থলী কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া "জগদম্বা" বলিয়া সেইখানেই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িলাম। প্রাণ আমার বুঝি এত কাতর কখনও হয় নাই। ভক্ত বলিয়া নিজের উপর যে অভিমানটি ছিল তাহা চূর্ণ হইল। হঠাৎ কোনও আগন্তুকের বেশে ভগবান আসিয়া পথ দেখাইয়া দিবেন এ আশাও ঝটিতি মনের মধ্যে একবার চমকাইয়া গেল। কিন্তু হায়! পথ দেখাইতে কেহই আসিল না, যেটি ক্রমে ক্রমে বড় নিকটেই আসিতে লাগিল সেটি কেবল অন্ধকার।

মনে দার্ঢ্য আনিয়া তখন ঠিক করিলাম বৃথা ভগবান ডাকার ঢং না করিয়া এখন রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করাই উচিত। কিন্তু তত্রাচ মনের মধ্যে "হায় ভগবান একি করিলে," বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তখন হঠাৎ একটি সতেজ গম্ভীর বাণী স্পষ্টই আমার কানে আসিল,—"তোমার কৃতকর্ম্মে তুমি কি ভগবানকে কর্ত্তা বলিয়া মান?" আমি চমকিত হইলাম। স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম—না, আমি তাহা মানি না। নিজ কর্ম্মের কর্ত্তা নিজেকে মানি,—নিজ কর্ম্ম মানি ও তাহার ফল মানি। আর ভগবানকে ব্যক্তিগত জীবচৈতন্ত হইতে পৃথক সমষ্টিগত বিরাট্ চৈতন্ত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলিয়াই মানি, যাহার সহিত সকৃতকর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। এ সকল বোধসত্ত্বেও তবে নিজ কর্ম্মাধিকারে ভাবের আবেগে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া আকুল প্রাণে, "কোথায় আনিলে, পথ দেখাইয়া দাও" ইত্যাদি প্রার্থনা কেন করিতেছি। ইহা মনুষ্যস্বভাবেরই গুণ, বাল্যে বিপদে পড়িলে পিতামাতাকে ডাকা, আর প্রাপ্ত বয়সের বিপদে মধুসূদনকে ডাকা।—এটা জীবধর্ম্ম, যেন প্রাণের ক্রিয়ার মতই স্বাভাবিক হইয়া আছে।

চঞ্চল অবস্থায় যেটি বহু কল্পনাপ্রসবিনী, মন স্থির হইলে সেইটি বুদ্ধি হইয়া যায়। বেশ টের পাইলাম বুদ্ধি স্বস্থানেই স্থির হইল—আর বিপদের যত কল্পনা সবটুকুই কাটিয়া গেল। বিপদ বলিয়া এমন কি ঘটিয়াছে। আকস্মিক কারণে বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হওয়ায় অসাবধানতাবশতঃ পথভ্রান্তি ঘটিয়াছে, তাহাতেই বিপথে জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। পুরুষার্থের দ্বারা এই ঘোর জঙ্গল হইতে বাহির হইবার চেষ্টাও ত হইয়াছে তবে তৎক্ষণাৎ বা সদ্য তাহার ফল পাওয়া যায় নাই, তা সকল অবস্থায় ত পুরুষার্থের ফল সদ্য পাওয়া যায় না বা স্বাভাবিক নহে। দেশ কাল আধার হিসাবে দৈর্ঘ্য বাড়িয়া ত যায়ই। এত বড় একটা ভীষণ জঙ্গলরাজ্য উৎকট পুরুষার্থের দ্বারা এখনই পার হইয়া যাওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে কি সম্ভব? —তাহার পর হিংস্র জন্তু, ব্যাঘ্র সর্প ও ভল্লুকাদির আক্রমণের ভয়। সে বিচার ত পড়িয়াই আছে। আমার মধ্যে হিংসা থাকিলে তবেই না তাহারা আমায় হিংসা করিবে। না হইলে ভয়ের কারণ কোথায়? তাহা ছাড়া সর্পব্যাঘ্রাদি সাক্ষাৎ এবং তাহাদের দ্বারা অনিষ্ট ত আমার কর্ম্মফলগত, তাহা এড়াইবার জো কোথায়?

এখন রাত্রি কাটাইব কিরূপে? সেরূপ বড় গাছ নাই যাহার শাখায় উঠিয়া নিরাপদে রাত্রি যাপন করিব। এদিকে অন্ধকার ক্রমশ ঘনীভূত হইতে লাগিল। হৃদয় হইতে বিপদের গুরুভার নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু সকল

ভারটা যেন নামিয়া পায়ে গিয়া জমা হইয়াছে। পা আর তুলিতে পারি না,—কি দুঃসহ ভারী হইয়াছে!

একটা জিনিষ বিপদাশঙ্কায় এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটিতেছিল; গলাও শুকাইয়া গিয়াছিল। এখন বিপদ কাটিয়া যেন তৃষ্ণা চাপিয়া ধরিল। চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম,—এই জঙ্গলে কোথায় জল পাইব? এবার আবার মরীচিকার পালা আরম্ভ হইল। ঐ যে কুলু কুলু শব্দ, ঐ যে জল যাইতেছে; সম্মুখেই। গিয়া দেখিলাম কোথাও কিছুই নাই। আবার যেন বাম দিক হইতে শব্দ আসিতেছে, আবার কোথাও কিছু নাই। আবার দক্ষিণে আরম্ভ হইল। এইরূপে বোধ হইতে লাগিল কে যেন আমায় লইয়া খেলাইতেছে। যাহা হউক কতকটা নামিয়া কতক্ষণ পর একটি ক্ষীণ জলস্রোত পাইয়াছিলাম। প্রাণ পূর্ণ করিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া সুস্থ বোধ করিলাম, পরে ধীরে ধীরে একটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর রাত্রিযাপনের সঙ্কল্প করিয়া বসিলাম। উপরটা অসমতল ও শৈবালাকীর্ণ এবং আরও সুখের কথা এই যে, প্রায় চারিদিকেই জল-বিছুটির জঙ্গল। মাথার কাপড়খানি পাতিয়া তাহার উপর বসিলাম। তখন অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়াছে। আমার আসনের স্থানটুকু প্রায় আধ হাত চওড়া, লম্বায় কিছু বেশী হইতে পারে। তাও আবার ঢালু এবং অসমতল। ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেল। ঘোর তমসাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঠিক যেন আমার আজিকার ভাগ্য-আকাশেই নিজেকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে কি অপূর্ব্ব মিলন, এমনটি বুঝি বহুকাল ঘটে নাই!

আমি স্থিরভাবে বসিয়া সেই বিজন জঙ্গলের নিস্তব্ধতা অনুভব করিতে করিতে তাহার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম। বোধ হয় শেষ প্রহরে, ঘোর মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠিক সেই

সুখীডাংএর জঙ্গলে

সময়ে দেখিতে দেখিতে ভড়্ ভড়্ শব্দে উপর হইতে একটি বৃহৎকায় জীব আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি তখন কাপড়ের আঁচল দিয়া একটা ঝাপ্টা দিবামাত্র সে আবার ভড়্ ভড়্ শব্দে উপরের জঙ্গলে উঠিয়া বিকট করুণস্বরে ডাকিয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। বুঝিলাম এটা হরিণের স্বর। কিছুক্ষণ পর সে থামিল, আবার বৃষ্টি নামিল। প্রায় এক

ঘণ্টা বর্ষণের পর ক্ষীণ চাঁদ উঠিল। আমি আবার আমার আসনে স্থির হইলাম।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জঙ্গলের মধ্যে সবে প্রভাতের আলো লাগিতেছে, তখন নয়ন উন্মীলন করিলাম। যে আনন্দময় অবস্থায় আমার এই রাত্রি কাটিয়াছিল তাহা আর বলিবার নহে। যখন চৈতন্য হইল তখন অন্তরের মধ্যে এই কথাগুলি লইয়াই জাগিলাম যে, নীচের দিকে নামিয়া গেলেই পথ পাইব। ভাল করিয়া আলো হইতেই আমি উঠিলাম। হায় আবার সেই আকর্ষণ! যে-স্থানে কত কষ্ট পাইয়া সমস্তদিন বিক্ষিপ্তচিত্তে শরীর ও মনের মধ্যে কত পীড়া ও উদ্বেগ ভোগ করিয়াছি,—রাত্রিটুকু থাকিবার জন্য এতটুকু অসমান শৈবালাচ্ছাদিত মলিন প্রস্তরখণ্ডমাত্র পাইয়াছি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি,—সেই স্থানটি ছাড়িতে আবার ব্যথা? যেন জীবনের কি এক মহারত্ন এখানে ছাড়িয়া যাইতেছি। নির্ভয় ও উদ্বেগশূন্য চিত্তে বড় আনন্দে একরাত্রি কাটাইয়া স্থানটি যেন আমার হইয়া গিয়াছে। ইহার সবটুকুই মহান্, সবটুকুই পবিত্র। সেই পবিত্র প্রস্তরখণ্ডকে প্রণাম করিয়া প্রাণের মধ্যে এক আনন্দ ও শরীর মনে একটি শক্তির স্পন্দন লইয়া উঠিলাম। এইবার নামিতে লাগিলাম।

বনের কথা অনেক হইয়া গিয়াছে, আর বেশী কথায় কাজ নাই। সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্য হইতে ক্রমাগত নামিতে নামিতে প্রায় এক প্রহরের পর হঠাৎ সম্মুখেই পথ দেখিতে পাইলাম। আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল,—গগনভেদী হরিধ্বনির সহিত সেই অরণ্যধাত্রীকে আর একবার দেখিয়া লইলাম। হায় সুখীডাংএর জঙ্গল! তোমায় আমি এ জীবনে কখনও কি ভুলিতে পারিব?

পদতল ক্ষতবিক্ষত, একস্থানে বসিয়া পরণের কাপড় ছিঁড়িয়া তিন চারি পাট করিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া লইলাম ও পরে চলিতে লাগিলাম, বুঝি বিদ্যুতের মত ছুটিতে লাগিলাম পড়াওর দিকে। সেখানে গিয়া শুনিলাম সঙ্গী-মহাশয় মালপত্র লইয়া আজ প্রাতে টনকপুর রওয়ানা হইয়াছেন। সুখীডাং হইতে টনকপুর ষ্টেশন বারো মাইলের কিছু উপর হইবে। একপাত্র গোঁড়া-লেবুর সরবৎ পান করিয়া আবার ছুটিলাম।

প্রায় মাইলখানেক যাইয়া একটি মুক্ত স্থান হইতে বহু দূর-দূরান্তরে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র নয়নে পড়িল। আঃ, কি আনন্দই সেই দৃশ্যের মধ্যে ছিল! সমতলক্ষেত্রের জীব আমরা, এই দীর্ঘকাল পরে আবার সমতলক্ষেত্র নজরে পড়িল। একজন শ্রমজীবী যাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু সাহেব! এত করিয়া কি দেখিতেছ?" আমি বলিলাম, "ভাবর"—সমতলভূমিকে পাহাড়ীরা ভাবর বলে।

এবার উৎরাই। রাজপথে সোজা না গিয়া আবার বনপথে সুপরিষ্কৃত মনোহর অরণ্যের মধ্য দিয়া প্রায় চারি মাইলের মাথায় একটি খরস্রোতা তটিনী পার হইয়া প্রায় একটার সময় টনকপুর পৌঁছিলাম। সঙ্গী-মহাশয় আহারাদি সারিয়া ষ্টেশনে বসিয়া ছিলেন। দুইটার সময় ট্রেণ ছাড়িবে। একখানি মাত্র গাড়ী। তাড়াতাড়ি বাজার হইতে শাক পুরী প্রভৃতি গ্রহণান্তর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আসিয়া দেখি ট্রেণ চলিতেছে। তখন রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ট্রেণ ধরিলাম।

ধৈর্য্যশীল পাঠক! আমার ভ্রমণকাহিনী শেষ হইল। এখন পথে আমাদের আহারাদি এবং মাল লইবার জন্য বাহক কুলী প্রভৃতিতে কত খরচ হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে আমাদের প্রত্যেকের কত খরচ লাগিয়াছিল।

আহারাদির খরচ—

কাটগুদাম হইতে আলমোড়া অবধি আমাদের প্রত্যেকের রোজ ৷৷৶০ চৌদ্দ আনা হিসাবে লাগিয়াছিল।

তিন দিনে—	২৷৷৶০
আলমোড়ায় দশদিন, প্রতিদিন ৷৷৶০ আনা হিসাবে—	৮৷৷০
পথের জন্য খাবার—	৪৲
আলমোড়া হইতে আসকোট প্রতিদিন ৷৷০ হিঃ— ৪½ দিন—	৩৷৶০

"ভাবর্"

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
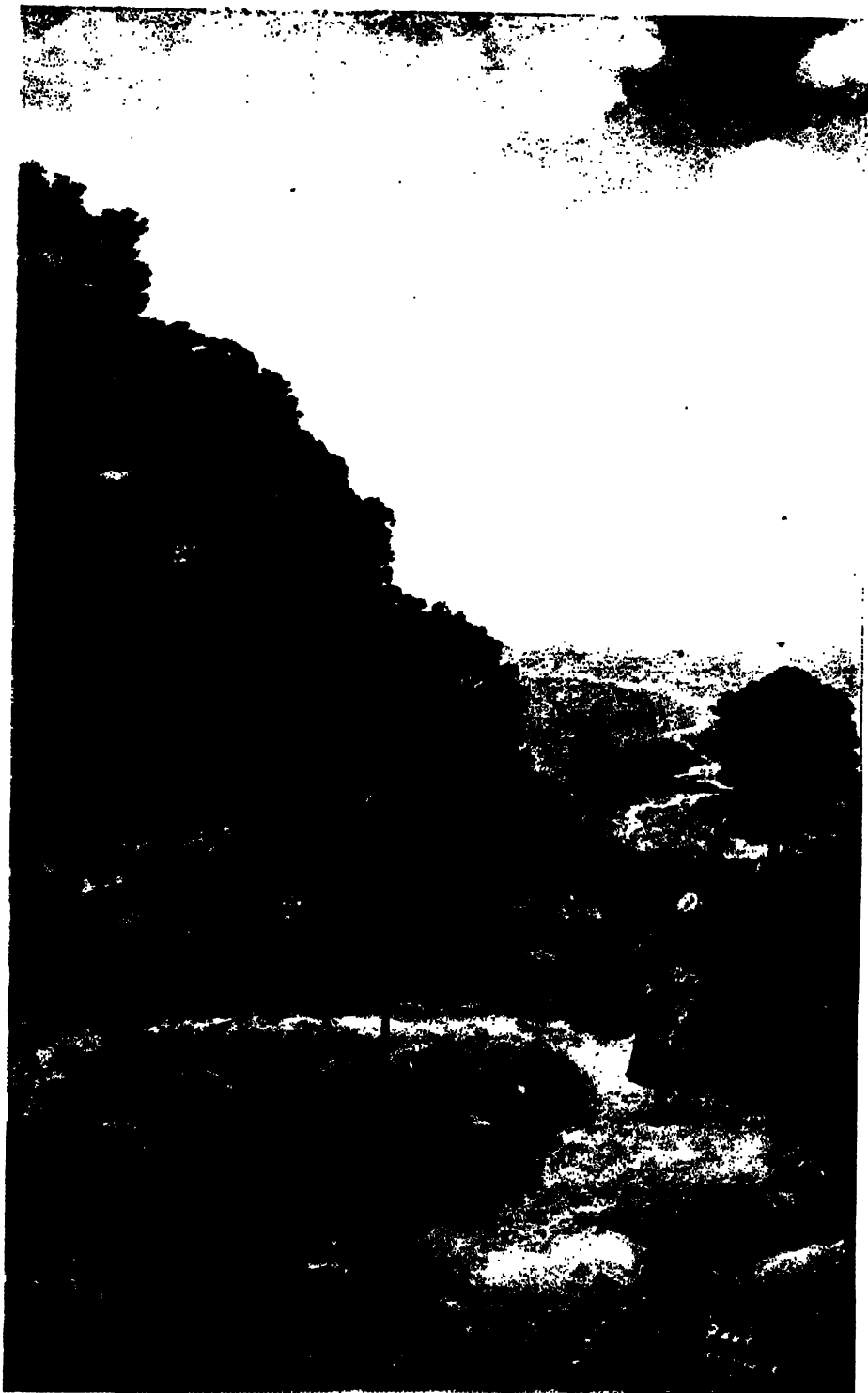
এয়ারশিপের কথা—

গ্রাফ ট্সেপেলিনের আকাশপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ আজ আমাদের গল্পের কথা; নবনির্ম্মিত R 101 এর অসাধারণ ক্ষমতার কথা সংবাদপত্রে বিঘোষিত; অথচ ট্সেপেলিনের আকাশ চড়া

চতুর্থ ট্সেপেলিনের আকাশে অভিযান

নবনির্ম্মিত এয়ার-শিপ R-100

বিংশশতাব্দীতেই প্রথম। ১৯০০ সালের জুলাই মাসের এক সন্ধ্যায় কন্‌ষ্টেন্স্ হ্রদের সুনীল জল হইতে প্রথম ট্সেপেলিন L Z-1 আকাশে উড্ডীয়মান হয়। আবিষ্কর্ত্তা কাউন্ট্ ফার্ডিনেণ্ড্ ফন্ ট্সেপেলিনের নামে ইহার নামকরণ হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌ষ্টেন্স্ হ্রদের ধারেই কাউণ্ট ফন ট্সেপেলিনের জন্ম। সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি লেফ্‌টেনাণ্ট্ হন। পরে আমেরিকায় ১৮৬০-৬৪ সনের যুদ্ধে যোগদান করেন। দৈবক্রমে সেখানে তিনি একটি বেলুনবাহিনীতে নিযুক্ত হন। এই কাজ হইতেই

কাউণ্ট ফন্ ট্সেপেলিন

তাঁহার মাথায় কলচালিত বেলুনের পরিকল্পনা আসে এবং ইহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কাগজপত্রে একটি ট্সেপেলিনের নক্সা করেন। আর্থিক

পরিচালনকক্ষে কাউণ্ট ট্সেপেলিন

কাউণ্ট ট্সেপেলিনের দ্বিতীয় জাহাজ

ট্সেপেলিন কন্‌ষ্ট্যান্স্‌ হ্রদ হইতে উঠিতেছে

সাহায্যের জন্ম Wurtemburgএর রাজার শরণাপন্ন হন। অসম্ভব কল্পনা বলিয়া রাজা তাহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হন। কাউণ্ট তখন জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত। ট্সেপেলিন নির্ম্মাণে আরও মনোনিবেশ করিবার জন্ম তিনি সে পদ ত্যাগ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের নিকট তিনি তাহার নক্সা উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহারা কাউণ্টের নক্সা অনুযায়ী ট্সেপেলিন নির্ম্মাণ সম্ভবপর মনে করেন নাই। কাউণ্ট ফন ট্সেপেলিনের বয়স যখন যাট বৎসর তখন তাঁহার পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার সুযোগ আসে। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একদল লোক এয়ারশিপে আকাশে ভ্রমণ করিবার চেষ্টায় বিফল হওয়ায় তাঁহার পরিপোষকদের মন ভাঙ্গিয়া যায়। বহু যুক্তিতর্কের পর তিনি তিনি ট্সেপেলিন নির্ম্মাণ করিবার আদেশ পান। কন্‌ষ্টেন্স হ্রদের উপর ভাসমান গৃহে ট্সেপেলিনের জন্ম এবং ১৯০০ সালের জুলাই মাসে ইহার প্রথম আকাশ অভিযান। প্রথমবারে ইহার গতি ঘণ্টায় ১৩ মাইল হইয়াছিল। ইহাতে মাত্র দুটী ১৬ H. P.র মোটর ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় জাহাজে ৮৫ H. P.র মোটর দেওয়া হয় এবং তাহার গতি হয় ঘণ্টায় ২৯ মাইল। জার্ম্মাণ সরকার তাঁহার কৃতিত্বে এবং সাফল্যে আকৃষ্ট হইয়া L Z-4. নির্ম্মাণের আদেশ দেন। ১০০ H. P. ইঞ্জিনের জোরে L Z-4 আল্‌প্‌স্‌ অতিক্রম করিয়া লুসার্ণ হইতে ঘুরিয়া আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন বাঁধন ছিঁড়িয়া ট্সেপেলিনখানি একাকী আকাশে উড়ে এবং ফলে ইহার অভ্যন্তরস্থ হাইড্রোজেন গ্যাস্‌ জ্বলিয়া যায়। কাউণ্ট ফন ট্সেপেলিন এই দুর্ঘটনায় নিরুৎসাহ না হইয়া সরকারের

হ্যাঙ্গারে বাঁধা গ্রাফ ট্সেপেলিন

নিউইয়র্ক-এর উপরে গ্রাফ ট্সেপেলিন
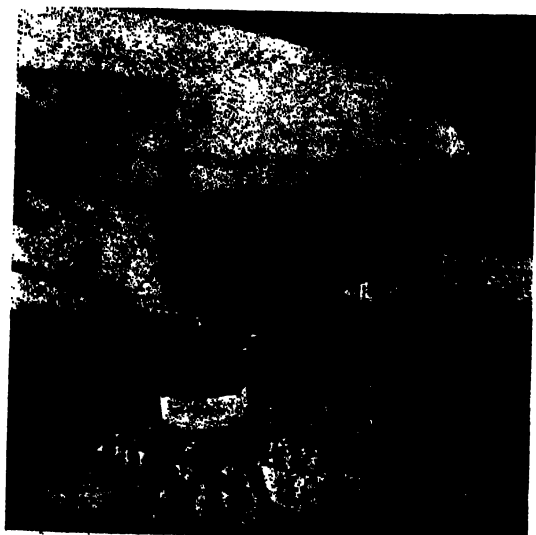
বালুচিথেরিয়াম যূথ

অর্থ বলে আরও বহু আকাশ-জাহাজ নির্ম্মাণ করেন। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার নির্ম্মিত ট্সেপেলিনে ৩৭,২০০ লোক ১০,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। বিগত মহাযুদ্ধে সকলগুলি ট্সেপেলিনই যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়। Staaken ফ্যাক্টরীতে নির্ম্মিত ট্সেপেলিন হইতে লণ্ডন ও প্যারিসে বোমা বর্ষিত হয়। কিন্তু এই ধ্বংসকার্য্যে ট্সেপেলিনের শিক্ষাও হয় যথেষ্ট। ৪খানি জেপেলিন ঝড়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া শত্রুসীমানায় গিয়া পড়ে এবং শত্রুর গুলিতে ভূমিস্থ হয়। সাধারণ বায়ুচাপের উপযুক্ত করিয়া এঞ্জিনগুলি তৈয়ারী ছিল, স্বল্পচাপ বায়ুতে তাহাদের চালান কষ্টসাধ্য হয়। এই অভিজ্ঞতার ফলে এখন সকল এঞ্জিন ১০,০০০ ফিটের উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হয়। যুদ্ধকালে কাউণ্ট ফন ট্সেপেলিন একটি নূতন জিনিষ আবিষ্কার করেন। ইহার নাম observation car। ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইবার জন্য ইহার প্রয়োজন। ট্সেপেলিন-খানি মেঘের উপর থাকিয়া observation car গুলি আধমাইল পর্য্যন্ত নীচে নামাইয়া দিতে পারে। observation car হইতে একজন লোক টেলিফোন যোগে উপরে খবর পাঠায়।

১৯১৭ সালে কাউণ্ট ফন ট্সেপেলিনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর দুইবৎসর পরে তাঁহার ট্সেপেলিনের অনুকরণে নির্ম্মিত ব্রিটিশ R-34 প্রথম আটলাণ্টিক অতিক্রম করে আর আজ গ্রাফ ট্সেপেলিন তাঁহার কল্পনাকে চরম সাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

—

বালুচিথেরিয়াম, জগতের বৃহত্তম স্তন্যপায়ী জন্তু— পৃথিবীতে আজ কাল আমরা যে-সকল জীবজন্তু দেখিতে পাই তাহাদের সকলগুলিই এক সঙ্গে পৃথিবীতে আসে নাই, ক্রমবিবর্ত্তন ধর্ম্ম অনুসারে পূর্ব্বতন কোন জন্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রথমে কেবলমাত্র শিরদাঁড়াহীন প্রাণী ছিল, তাহার পর মাছ ও উভচর জীব, ক্রমে সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী জীব প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। স্তন্যপায়ী জীবদের আবির্ভাবের কাল ভূতত্ত্ববিদ্গণ যাহাকে টার্শিয়ারী যুগ বলেন সেই সময়ে। এই যুগের মাঝামাঝি সময়ে অতিকায় তৃণভোজী স্তন্যপায়ী জন্তু,—গরু, বাইসন, হরিণ, ম্যাষ্টোডন, নানা ধরণের গণ্ডার, প্রভৃতি প্রাণী পৃথিবী ছাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যে জন্তুটি সকলের চেয়ে বড় ছিল তাহার নাম 'বালুচিথেরিয়াম'। ইহা মধ্য এশিয়ার অধিবাসী ছিল।

ইহার কঙ্কাল অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার 'মিউজিয়াম অফ্ ন্যাচেরল হিষ্ট্রি' হইতে রয় চ্যাপম্যান এণ্ড্রুজের নেতৃত্বে যে অভিযান মঙ্গোলিয়া যায়, তাহার দ্বারাই ইহার প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ উদ্ধার হইয়াছে। রয় চ্যাপম্যান এণ্ড্রুজ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া এবং বালুচিস্তানে ইহার অস্থি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এই জন্তুটির বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হইয়াছে 'বালুচিথেরিয়াম এণ্ড্রুজাই'।

বলা বাহুল্য এই জন্তুটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ কঙ্কালও পাওয়া যায় নাই। করোটি, ঘাড় ও পায়ের কয়েকটি হাড় হইতে ইহার আকৃতি ও আয়তন অনুমান করিয়া লইতে হইয়াছে। এই অনুমান নিছক কল্পনামাত্র এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। প্যালিঅণ্টলজি বিজ্ঞান অনুযায়ী এইরূপ পুনর্গঠনের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী আছে। সম্পূর্ণ কঙ্কাল পাইলে এই পুনর্গঠন আরও নির্ভুল হইতে পারিত সত্য, কিন্তু যাহা পাওয়া

গিয়াছে তাহা হইতেও এই জন্তুটির আকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে।

বালুচিথেরিয়াম গণ্ডারজাতীয় জীব এবং গণ্ডারের নিকট জ্ঞাতি। ইহার নাসিকার উপর গণ্ডারের ন্যায় কোন শৃঙ্গ নাই। আকারে ইহা একটি বিরাট ঘোড়ার মত। ইহার বহিরাকৃতি সম্বন্ধে আর যাহাই অজানা থাক বিরাটত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পাঁচ ফুট লম্বা মস্তক, সুদীর্ঘ এবং সুবৃহৎ পায়ের হাড় তাহার প্রধান প্রমাণ। এই জন্তু যে আফ্রিকার বৃহত্তম হস্তী অপেক্ষাও বৃহৎ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অতিকায় জন্তু সব্‌জীভোজী ছিল সুতরাং বৃক্ষবহুল দেশে বাস করিত।

গুঞ্জরি

শ্রীসুখলতা রাও

কার্ত্তিক মাস, পূর্ণিমা তিথি। কটক সহরে মহানদীর ধারে মেলা বসিয়াছে, সেখানে শহরের লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আশেপাশের পল্লীগ্রাম হইতে, নদীর ওপার হইতেও কত লোক আসিয়াছে। প্রতিবৎসরই এখানে এই 'বালি যাত্রা' বা বালির মেলা হয়। বোধ হয় কোন-কালে মহানদীর বালিতেই এ মেলা বসিত, কিন্তু এখন মহানদীর বাঁধান পারের ধারে, ঘাসে ঢাকা বালি জমিতে এ মেলা বসে। দেশের দারিদ্র্য দেশের আমোদ-প্রমোদের ভিতরেও স্পষ্ট দেখা দেয়। ধনী শহরের অত্যুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, অত্যাশ্চর্য্য অভিনব দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ সুবিশাল মেলা এ নয়। এখানে আলোক-স্তম্ভ, পার্ব্বত্য রেলগাড়ী, কলের পুতুল, নানা-প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক, এ-সব কিছুই নাই। দর্ম্মা দিয়া ঘেরা কতকগুলি দোকান; দোকানদারেরা চকচকে বিদেশী সস্তা খেলনা, দেশী কাঠের ও মাটির রং-করা পুতুল ঘোড়া হাতী গাড়ী ইত্যাদি, শিংএর তৈয়ারী খেলনা, পিতলের বাসন, কাঁসার বাসন, মিঠাই লুচি প্রভৃতি সাজাইয়া বসিয়াছে। রঙীন কাগজ ও কাপড় দিয়া সাজাইয়া সেই দোকানগুলিকেই চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিয়াছে। একটা নাগরদোলাও খাটান হইয়াছে। রাত্রে যখন দোকানে দোকানে কেরোসিনের আলো জ্বলে তখন সেগুলি যে বালক-বালিকাদিগের এবং সরল গ্রামবাসী-দিগেরও মনোহরণ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর কিছু না হউক, গ্রাম্য বধূদের টুকটুকে লাল সবুজ ও কমলা রংএর বিচিত্র দক্ষিণী শাড়ীর ঝলকে ও বালক-বালিকার আনন্দ-কোলাহলে স্থানটি উৎসবময় হইয়া উঠে।

মেলার একধারে এক যায়গায় কতগুলি লোক গোল হইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মাঝখানে একটা লোক একটা বাঁদর নাচাইতেছিল। দর্শকদের ভিতর হইতে একজন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতে একটি কাগজের ঠোঙা। বাঁদর মনে করিল তাহাতে নিশ্চয় কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে, সে দৌড়িয়া আসিয়া লোকটির সম্মুখে বসিল এবং সতৃষ্ণনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। লোকটিও তামাসা দেখিবার জন্য, চুপ করিয়া ঠোঙা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ বাঁদরটা তাহার পায়ের কাছে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া দুই তিনটা প্রণাম করিল! দর্শকদিগের ভিতর হাসির রোল উঠিতে, ব্যাপার কি জানিবার জন্য চারিপাশের লোকেরা ঠেলাঠেলি করিয়া আসিয়া তাহাদের ঘাড়ের উপর পড়িল।

এই ভিড়ের মাঝখানে একটি তের চৌদ্দ বৎসরের বালিকাও ছিল, তাহার হাতে ছোট একখানি টিন-বাঁধানো ফুলকাটা আয়না। তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন কোনো এক পুরাতন দেবমন্দিরের গাত্র হইতে একটি খোদিত মূর্ত্তি নামিয়া আসিয়া একখানি শাড়ী পরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে একমনে বাঁদরের কাণ্ড দেখিতেছিল। ঠেলাঠেলিতে আয়নাখানি তাহার হাত হইতে পড়িয়া একেবারে দুইখান হইয়া গেল। পাশেই দুইজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক গল্প করিতেছিল, আয়না ভাঙার শব্দে তাহারা ফিরিয়া চাহিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন চ্যাঁচাইয়া উঠিল, "করলি কি লক্ষীছাড়ি, এত পয়সার মাল একবারে নিকেশ করে দিলি!" সঙ্গেসঙ্গেই পিছন হইতে বালিকার কোমল গণ্ডে ভীষণ এক চপেটাঘাত! উগ্রমূর্ত্তি একটা চাষাড়ে লোক চোখ কটমট করিয়া বলিল, "চল্ আগে বাড়ী চল, দেখাব তোকে।" ভয়ে ও প্রহারের যন্ত্রণায় বালিকার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল।

এত লোক উপস্থিত, তাই সে কোনও রকমে অতি কষ্টে কান্না সামলাইয়া লইল, কিন্তু তাহার দুই গাল বাহিয়া

বড় বড় জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল। অপর স্ত্রীলোকটি তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল, "আহা, দুগণ্ডা পয়সার জিনিষের জন্য ছেলে-মানুষকে এমন ক'রে মারে? কেঁদ না মা লক্ষ্মীটি। আহা, এমন ঠাণ্ডা মেয়ে। আমার নন্দর জন্য—" কথা শেষ হইতে-না-হইতে চাষাড়ে লোকটা বালিকার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

ধনা বা ধনঞ্জয় জাতে চাষা, অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতি। নদীর ওপারে তাহার একখানা খড়ের বাড়ী ও কিছু জমিজমা আছে। তাহার পরিবারের মধ্যে প্রৌঢ়া স্ত্রী ও বালিকা ভাইঝি গুঞ্জরি, যে আয়না-ভাঙার অপরাধে অপরাধিনী। পাড়াপ্রতিবেশীর সহিত ধনার কলহের বিরাম নাই। কাহারও ক্ষেতের ধান তাহার বলদে নষ্ট করিয়াছে, কাহারও ছেলেকে সে ঠ্যাঙাইয়াছে, কাহাকেও বা গালি দিয়াছে, এইরূপ একটা-না-একটা কিছু লাগিয়াই থাকিত। রাত্রে কাহারও ঘরে চুরি হইলে লোকে মনে মনে তাহাকে সন্দেহ করিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না; তাহার গুণ্ডার মত চেহারা এবং ভাঙ খাইয়া লাল গোল গোল দুই চোখ দেখিয়া ভয় করিবারই কথা। তাহার উপর মেজাজ ত ঐরূপ, রাগিলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। অভাব-অনটন তাহার সংসারে লাগিয়াই থাকিত; কেন না সামান্য যাহা উপার্জ্জন হইত, তাহার অর্দ্ধেক উড়িয়া যাইত নেশার খরচ যোগাইতে।

মেলায় যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই কোমল-হৃদয়া স্ত্রীলোকটি নিজে যাচিয়া গুঞ্জরিকে তাহার পুত্রবধূ করিতে চাহিল। ধনার কোনো আপত্তি হইবার কারণ নাই; মেয়েটাও ঘাড় হইতে নামিবে, উপরন্তু কিছু লাভও হইতে পারে, যেহেতু অপর পক্ষের অবস্থা ভালই। সুতরাং অবিলম্বেই কথা পাকা হইয়া গেল। বরের নাম নন্দদুলাল, কিছু সৌখীন প্রকৃতির মানুষটা, যেখানে যেখানে পুরুষমানুষের গহনা পরিবার রীতি আছে, সেখানে সেখানেই সে সোনা-রূপার গহনা পরিয়াছে, একটি অলঙ্কারও বাদ পড়ে নাই। তবে সে লোক মন্দ নয়, আর গুঞ্জরিকে দেখিয়া তাহার পছন্দও হইয়াছে খুব।

ধনার স্ত্রীকে নন্দর মা জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েকে দেবে-থোবে কিছু?" ধনার স্ত্রী চোখ মুছিয়া উত্তর করিল, দুবেলা পেট ভ'রে খাওয়া জোটে না তা দেবথোব কি? জানই ত কর্ত্তার স্বভাব! ভাঙ খেয়ে ভোর হ'য়ে থাকে।" নন্দর মা বলিল, "তা থাক্, নাই বা দিলে, যা পারি আমিই দেব। বিয়ের সময় পরবার জন্য দুগাছা খড়ু আর পায়ের মল পাঠিয়ে দেব।" অগত্যা ধনার স্ত্রী বলিল, "ওর ছোটবেলার একছড়া কণ্ঠি আছে, তাই বেচে একখানা নূতন শাড়ী কিনে দেব, আর যা খরচ আছে তাও হয়ে যাবে। হাতে ত একটি পয়সাও নেই।" নন্দর মা হাসিয়া বলিল, "তার জন্য দুঃখ কি? মেয়েটিত লক্ষ্মী।"

শুভক্ষণে বা অশুভক্ষণে গুঞ্জরির বিবাহ হইয়া গেল। বেহাইবাড়ী হইতে শুধু গুঞ্জরির নয়, ধনা ও তাহার স্ত্রীর জন্যও উপহার আসিয়াছিল এবং অন্য কেহ হইলে সে উপহার পাইয়া বেশ খুসীই হইত। কিন্তু ধনার লোভ বড় বেশী; বিশেষতঃ জামাতার গায়ের গহনাগুলি দেখিয়া তাহার যেন জিবে জল পড়িতে লাগিল। তাহার বাড়ীতে তিনখানি ঘর; মাঝে ছোট একটি কাঁচা উঠান; উঠানের একদিকে একটি ঘরে সে ও তাহার স্ত্রী থাকে, সেই সঙ্গে লাগা একটি ছোট্ট ঘর, সেটা রন্ধনশালা, গুঞ্জরি আগে সেখানেই শুইত। এখন গুঞ্জরি ও নন্দর জন্য উঠানের অন্য দিকের গুদাম ঘরখানিতে একটু যায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উঠানের ধারে ধারে পাচিলের গায়ে দু-একটা নেবু গাছ, পেঁপে গাছ ও পেয়ারা গাছও আছে। একটা চালকুমড়ার লতা ঘরের চালে উঠিয়াছে।

সেদিন ধনা নেশার ঘোরে কাহার সহিত মারপিট করিয়া অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছে, সমস্ত গায়ে ধূলা মাখা, মেজাজ অত্যন্ত চটা। তাহার মেজাজের ভয়ে তাহার স্ত্রী সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিত। সে বেচারা এতক্ষণ ভাত লইয়া জাগিয়া বসিয়া আছে, ঘুমে চোখ লাগিয়া আসিতেছে, হঠাৎ একটা ধাক্কা খাইয়া সে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। ধনা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ব'সে ব'সে ঘুমুচ্ছিস্, ভাত-টাত দিবি না নাকি?" ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া সে ভাত তরকারি বাড়িয়া দিল। প্রকাণ্ড একটা গ্রাস মুখে দিতে দিতে ধনা কোনও প্রতিবেশীর উদ্দেশে গালি দিয়া বলিতে লাগিল, "—র আস্পর্দ্ধা দেখ না! ভারি ত টাকা দিয়েছেন তার জন্ম আবার তাগাদা? আবার বলা হচ্ছে 'পুলিশে দেব', ধনাকে পুলিশে দেওয়া অমনি মুখের কথা কিনা?"

ঠিক সেই সময়ে উঠান পার হইয়া গুঞ্জরি আসিতেছিল সেই ঘরে, দুটি পানের জন্য। প্রদীপের আলোতে খোলা দরজা দিয়া ধনার মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাহার গালি শুনিয়া ভয়ে সে একপাশে একটা পেয়ারা গাছের ছায়ায় লুকাইয়া পড়িল, তাহার পর পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইল, ইচ্ছা, ভাত খাইয়া ধনা উঠিয়া গেলে ঘরে ঢুকিবে। শুনিল তাহার কাকীমা বলিতেছে, "একটু আস্তে কথা কও, পাড়ার লোককে শুনিয়ে অত চ্যাচালে লাভ কি? পরের টাকা নিয়েছ, শোধ না করলে যদি পুলিশে দেয় ত ঠেকায় কে বল? তার জন্ম

মারপিট করলে যে আরো খারাপ হবে গো।” উদর-পূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে ধনার মেজাজও একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু নেশার ঘোর কাটে নাই। সে খানিক ভাবিয়া বলিল, “দ্যাখ, একটা মতলব করেছি। নন্দা যখন আজ ঘুমাবে, তার গয়নাগুলো কেড়ে নেব—।” “চুপ, চুপ, আস্তে বল না—” বলিয়া উঠানের ওধারের দিকে একবার চাহিয়া, তাহার স্ত্রী বলিল, “দোর বন্ধই আছে, তারা শুয়েছে।”

“আর খানিক যাক; উত্তুরের জানলার কাঠগুলো ঘুন ধরা, টান মারলেই খুলে যাবে ঢুকতে কোন মুস্কিল হবে না।”

“জামাই যদি জেগে যায় তার গয়না কি সে অমনি ছাড়বে? হয়ত চ্যাচাবে। আর, ওসব বুদ্ধি মাথায় এনো না।”

চোখ পাকাইয়া ধনা বলিল, “চ্যাচায় ত গলা টিপে দেব; যেমন করে হোক গয়নাগুলো আমার চাই-ই, নইলে টাকা শুধবো কোথা থেকে?” ভীতকণ্ঠে তাহার স্ত্রী বলিল, “না না, ওসবে কাজ নেই। তা ছাড়া গুঞ্জরিও ত থাকবে সে ঘরে।” তাচ্ছিল্যভরে ধনা হাত নাড়িয়া বলিল, “হায়, সে আবার একটা মানুষ! আমার এক ধমক্ খেলেই ভয়ে কাট হয়ে যাবে।”

গুঞ্জরি পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কোল ছাড়িয়া একেবারে ঘরের পিছনে চলিয়া গেল। যখন বুঝিল তাহার কাকা কাকী ঘুমাইয়াছে তখন অতি সাবধানে নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। নন্দ ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জাগাইয়া সকল কথা বলিল। সে ত অবাক; কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই যে, নূতন জামাই শ্বশুরবাড়ী আসিয়া এমন বিপদে পড়িবে। জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি করি?” গুঞ্জরি তাহাকে একরকম টানিয়া বিছানা হইতে উঠাইয়া বলিল, “শীগ্‌গির যাও, দেয়াল টোপ্‌কে বেরিয়ে পড়, একবারে সোজা গ্রামের দিকে চ’লে যাও, নইলে তোমার রক্ষা থাকবে না, জানই ত—”

“কিন্তু আমাকে না দেখলে তোকে কি আর ছেড়ে দেবে?” গুঞ্জরি ব্যস্ত হইয়া “তার জন্ম ভাব্‌তে হবে না, সে আমি ঠিক ক’রে নেব। তুমি আর একটুও দে’রি করো না” বলিয়া তাহাকে দরজার বাহিরে টানিয়া আনিল। নন্দ যাইবে না, “তুইও চল্‌না?” “না না, সে হতে পারে না; এখনি এসে পড়বে, তুমি যাও। আমি এখন গেলে তুমি বেশী দূর পালাতে পারবে না, মাথা খাও, যাও যাও।”

তাহার পায়ের উপর প্রণাম করিয়া গুঞ্জরি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিল, নূতন বিবাহের পর এমন আকস্মিক বিচ্ছেদে স্বামীকে বিদায়-সম্ভাষণ করিবারও একটু অবসর দিল না, কারণ অবসর ছিল না। তারপর জানালা দিয়া অশ্রুপ্লাবিত চোখে দেখিল নন্দ দেয়া’ল পার হইয়া বাহিরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। গুঞ্জরি ধীরে ধীরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু এমন সময়ে ঘুম কি আসে কখনও? সে মনে মনে ঠাকুর-দেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিল।

জানালায় কবাট ছিল না, খোলাই রহিল। কিছুক্ষণ পরে জানালার কাছে খুট্‌ করিয়া একটা আওয়াজ হইল, অন্ধকার আকাশের গায়ে একটা কালো মাথা দেখা দিল। গুঞ্জরি চাদরটা ভাল করিয়া মুড়ি দিয়া ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া আছে। ধনা ঘরে ঢুকিয়া দেখে বিছানার একদিক খালি, তাহার মতলব বুঝি ফাঁস হইয়া যায়। সে গুঞ্জরির গায়ের চাদরটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ধাক্কা দিতে দিতে বলিল, “ওঠ্‌ বল্‌ছি ওঠ্‌, জামাই কোথা শীগ্‌গির বল্‌. নইলে মেরে ফেলব।”

গুঞ্জরি যেন কিছু জানে না· “অ্যাঁ, জামাই? এই ত ঘুমুচ্ছিল।” ধনা মুখ ভ্যাংচাইয়া “ঘুমুচ্ছিল?” বলিয়া তাহাকে উঠানে টানিয়া আনিল। তাহার মনে ভয় হইতে লাগিল বুঝিবা জামাই সব কথা শুনিয়াছে। একহাতে বজ্রমুষ্টিতে গুঞ্জরির হাত ধরিয়া অন্য হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধনা বলিল, “চ্যাচাবি ত মেরে ফেল্‌ব, বল্‌ এক্ষুনি জামাই কোথা গেছে।” “জানি না।” কিল চড় লাথি বর্ষণ হইতে লাগিল। তথাপি দৃঢ়স্বরে বালিকা বলিতে লাগিল, “কোথায় গেছে জানি না, জানলেও বল্‌ব না।” অবশেষে প্রহারের চোটে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। পাছে বলিয়া ফেলে সেই ভয়ে সে প্রাণপণ শক্তিতে হাত ছাড়াইয়া লইল এবং “বল্‌ব না, কক্ষনো বল্‌ব না” বলিতে বলিতে ছুটিয়া পলাইল।

ধনার মাথায় আগুন চড়িয়া গিয়াছিল। কাছে একটা দা পড়িয়াছিল, সেটা উঠাইয়া লইয়া সে গুঞ্জরিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। দা-খানা সজোরে গিয়া তাহার কাঁধের উপর পড়িতেই, “মা গো” বলিয়া বালিকা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। গোলমালে ঘুম ভাঙিয়া ততক্ষণে তাহার কাকীমা আসিয়াছে। সে দৌড়িয়া গিয়া গুঞ্জরিকে ধরিয়া ফেলিল।

ব্যাপার যে এইরূপ দাঁড়াইবে ধনা তাহা মোটেই মনে করে নাই, রাগের মাথায় কি যে একটা কুড়াইয়া লইয়াছিল তাও ভাল করিয়া দেখে নাই। তাহার স্বভাব দুর্দ্দান্ত, এবং যখন নেশার ঝোঁকে থাকিত তখন “খুন্ করব, মেরে ফেলব” এসব কথা বলিতও, কিন্তু ভাইঝিকে মারিবার অভিসন্ধি তাহার ছিল না। তাই গুঞ্জরির বিবর্ণ মুখ ও রক্তের স্রোত যেন তাহাকে অভিভূত

করিয়া ফেলিল, সে ধপ্ করিয়া উঠানের মাঝখানে বসিয়া পড়িল।

দূরে লোকজনের পায়ের শব্দ ও কথাবার্ত্তা শোনা যাইতে লাগিল। ধনার এইবার চেতনা হইল; উঠিয়া আসিয়া ভাইঝির গায়ে হাত দিয়া বলিতে লাগিল, "গুঞ্জরি—গুঞ্জরি, মরে গেলি কিরে? না না তুই ওঠ্, নইলে যে আমায় ফাঁসি যেতে হবে।" বালিকার চোখের পাতা নড়িল, বুঝি সে কাকার কাতর অনুনয় শুনিতে পাইল, "ওঠ গুঞ্জরি! আমি তোকে মেরে ফেলব বলে মারিনি।" নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে সে ধনার মুখের প্রতি চাহিয়া আবার চোখ বুজিল, তাহার ঠোঁট দুখানি নড়িয়া উঠিল, কিন্তু কি যে বলিল বোঝা গেল না।

দরজা ভাঙিয়া হুড় হুড় করিয়া পাড়ার লোক বাড়ীর ভিতর আসিয়া তাহাদের সেই অবস্থায় দেখিতে পাইল। কেহ কেহ তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বালিকার মাথায় মুখে দিতে লাগিল, কেহ কেহ ধনাকে গালি দিতে লাগিল। আবার বালিকার চোখের পাতা নড়িল; সকলে তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে এমন হ'ল? কে মারলে?" গুঞ্জরি তাহার কাকার আকুল মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি অনুভব করিল, অতিকষ্টে অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে বলিল, "আমি নিজে।" আর কিছু বলিল না, চোখও আর খুলিল না। ধনা বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী বুদ্ধিমতী, সকলকে বুঝাইয়া দিল যে নন্দর সহিত কলহ করিয়া বোধ হয় বালিকা এ কাজ করিয়াছে; কারণ তাহাদের কলহের শব্দে ধনা ও সে উঠিয়া আসিয়াছিল। খুঁজিয়া দেখা গেল নন্দও পলাতক, কাজেই লোকে এ কথা একরূপ বিশ্বাস করিয়াই লইল। আর নন্দ? সে তখন আপন সদ্যবিবাহিতা বালিকা পত্নীর সুন্দর মুখখানির কথা চিন্তা করিতে করিতে গ্রামের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কবে আবার সেই মুখটি দেখিবে ভাবিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছিল।

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

পরলোকে মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—

গত ১১ই নবেম্বর সোমবার দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার সার্কুলার রোডস্থিত বাস-ভবনে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপূরণীয়। তিনি সারাজীবন যে দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনী পাঠ করিলেই তাহা পাওয়া যায়।

মহারাজার দানের কথা কে না জানে? তাঁহার দানের সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—"গত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আমি তাঁহার বদান্যতার কথা জানি, ঐ সময়েই প্রথম তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়; কিন্তু এ দান যে কত বেশী আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে সে ধারণা আমার ছিল না। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, তাহার দানের পরিমাণ কোটি টাকা অপেক্ষা অধিক। কোন পার্শী যে মহারাজা কাশিমবাজারের অপেক্ষা অধিক দান করিয়াছেন, ইহা আমার স্মরণ হয় না।"

মহাত্মা গান্ধী খদ্দরের প্রচারকার্য্য উপলক্ষে বহরমপুরে গমন করিলে মহারাজার সম্বন্ধে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

মহারাজা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার উপর দিয়া অনেক দৈব-দুর্ঘটনা বহিয়া যায়; তাঁহার বয়স যখন মাত্র ২ বৎসর তখন তিনি মাতৃহারা হন এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু সমস্ত দৈবদুর্ব্বিপাক বালককে অভিভূত করিতে পারে নাই।

মহারাণী স্বর্ণময়ী মহারাজার মাতুলানী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার ষ্টেটের উত্তরাধিকারী হন। কাশিমবাজার ষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র দেশের শিক্ষা বিস্তারকল্পে বাঙ্গলা এবং বঙ্গের বাহিরে এক কোটির অধিক টাকা ব্যয় করেন। শিক্ষার বিস্তারকল্পে তাঁহার দানশীলতার তুলনা দুর্লভ।

মহারাজা একজন প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার অর্থে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কলিকাতায় সার্কুলার রোডের যে জমির উপর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ভবন প্রতিষ্ঠিত, সে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীরই দান।

মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁহাকে ব্যথা দিত। তিনি কলিকাতায় এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতাল স্থাপনের সময় প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। কাশিমবাজারস্থিত কার্জ্জন দাতব্য হাঁসপাতালে যাবতীয় ব্যয় ভার তিনি একাকী বহন করিতেন অন্যান্য বহু স্থানে তিনি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দেশের কৃষ্টি ও সাধনার ইতিহাসে পরলোকগত মহারাজার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, কলিকাতা কংগ্রেসে যেবার প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় দেশবাসী তাঁহাকে উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন নেতৃত্ব করিতে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্, রাজগাঁও ষ্টোন ওয়ার্কস্ প্রভৃতি তাঁহারই উদ্যোগে ও পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন; এজন্য তাহার উদার হৃদয় সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিত এবং তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না, দেশে মঙ্গলের জন্য তিনি এমনি-ভাবে একাগ্রচিত্তে তাঁহার সমগ্র অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন; গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

(বঙ্গবাণী)

বহুপাহাড়ীর হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ—

গারো পাহাড়ে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব—নানা শ্রেণীর সহস্র সহস্র পার্ব্বত্য নর-নারীর যোগদান—পূজান্তে সহস্রাধিক রাভাজাতীয় লোকের হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ।

আসাম গৌরীপুর হিন্দু মিশনের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ উপেন্দ্র-কৃষ্ণজীর উদ্যোগে জেলা গারোহিলের ফুলবাড়ী থানার অন্তর্গত পাহাম নামক স্থানে বিগত পূজার সময়ে মহাসমারোহে একটি সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা হিন্দুধর্ম্মে নবদীক্ষিত রাভাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার কয়েকদিন অহোরাত্র সকলকেই মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাহাদের যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে তাহা ব্রহ্মচারীজীর নিকট সানন্দে প্রকাশ করিয়া তাহার নিকট হইতে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ শ্রবণ করে। বিগত ২০শে আশ্বিন অষ্টমী পূজার দিন বেলা ৩ ঘটিকার সময় মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ব্রহ্মচারী ও উপস্থিত বক্তাগণ হিন্দু ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বেলা ৫ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। ধুবড়ীর শ্রীযুক্ত হিরণ্যকান্ত বসু মহাশয় নবমী ও দশমী রাত্রে ছায়াচিত্র যোগে হিন্দুধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস সমাগত জনমণ্ডলীকে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন। দশমী দিবস পূজা প্রাঙ্গণে একটি বিরাট দীক্ষা যজ্ঞের আয়োজন করা হয়; তথায় সহস্রাধিক রাভা জাতীয় নর-নারী ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ উপেন্দ্রকৃষ্ণজী কর্ত্তৃক সনাতন হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। আরও বহু লোক দীক্ষিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে,

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

—

বিদেশ

ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক স্মৃতিতর্পণ—

প্রতিবৎসর ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিষ্টল নগরে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতির তর্পণ করা হয়। এবারেও এই উপলক্ষ্যে রামমোহন রায়ের ভক্তবৃন্দ 'আর্ণোজ ভেল' সমাধিস্থানে সমবেত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এবারে লিউইন মিড চ্যাপেলে, যেখানে রামমোহন রায় একবার ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এবং পার্ক হাউসে, (ষ্টেপলটন), যেখানে রামমোহন ইংলণ্ড প্রবাসকালে বাস করিতেন এবং যেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেখানে দুইটি ফলক
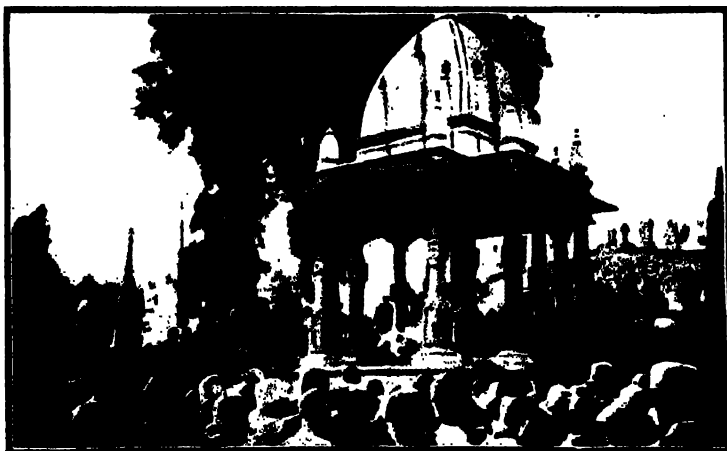
শ্রীমতী রঙ্গ রাও ফলক উন্মোচন করিতেছেন

আর্ণোজ ভেলে রাজার সমাধি-মন্দির

উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে। এই উৎসবে কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাণী, মিসেস্ এস্ সি মুখার্জ্জি, বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্যর আলবিয়ন

শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সঙ্গীত

রাজকুমার ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি বহু গণমান্য ব্যক্তি, রাজকীয় কর্ম্মচারী ও ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ব্রিষ্টলের লর্ড মেয়র ভারতীয় অভ্যাগত-দিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। দর্শকবৃন্দ তখন রামমোহনের স্মৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট জায়গা-গুলি পরিদর্শন করেন। মিস্ টিউডর জোন্‌স্ লিউইন মিড চ্যাপেলের ফলকটি উন্মোচন করেন এবং শ্রীমতী রজ রাও টেপলটনের ফলকটি

লিউইন মিড চ্যাপেল

IN MEMORY OF
RAJAH RAM MOHUN ROY
FOUNDER OF ...
MANY ...
A GREAT ...
SOCIAL AND POLITIC...
... LIVED IN THIS ...
... HERE ON ...
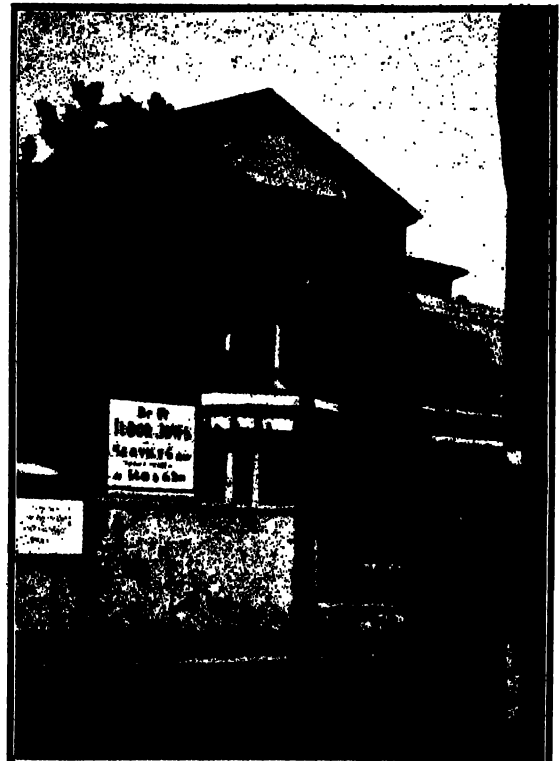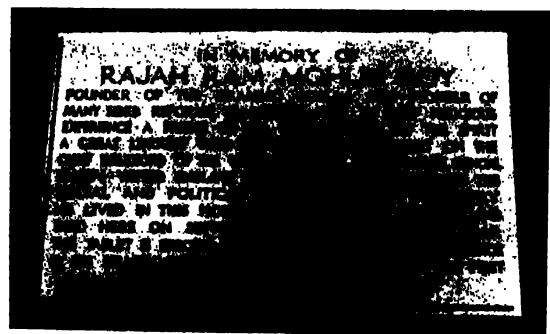
স্মৃতি ফলক

উন্মোচন করেন। শ্রীমতী সুনীতি দেবী একটি বাংলা ধর্ম্মসঙ্গীত করেন এবং সেই সঙ্গে উৎসব সমাপ্ত হয়।

পুস্তক-পরিচয়

কোষ্ঠীর ফলাফল—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৫০৮ পৃঃ। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। দাম ২৷৹।

পুস্তকটির বিষয় একটি কাল্পনিক ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইংরেজীতে যেমন Pickwick Papers, বাংলায় তেমনি এই বহিখানি এক নূতন পন্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইহাতে ভূগোল নাই ইতিহাস নাই তীর্থমাহাত্ম্য নাই, আছে কেবল স্বাস্থ্যান্বেষী পর্য্যটক বাঙালীর বিচিত্র সমাগম এবং পরস্পর আলাপের অদ্ভুত বর্ণনা। মানুষের অতি-সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে যে কৌতুক বিক্ষিপ্ত আছে, গ্রন্থকার তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, এবং নিপুণহস্তে তাহা ঘন করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। প্লট নাই রহস্য নাই সমস্যা নাই, তথাপি সমগ্র বিষটি এক সূত্রে গাঁথা এবং অতি চিত্তাকর্ষক। কুতূহলী পাঠকের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখ দিয়া সারি সারি মানুষ চলিতেছে ফিরিতেছে হাসিতেছে হাসাইতেছে, কখনও বা কাঁদিতেছে কাঁদাইতেছে। তরুণীর দেখা পাইলাম না, দু একটি তরুণ যাহারা আছে তাহাদের একজন কোট খুলিয়া তাল ঠুকিয়া হাস্যরত পাণ্ডার দলকে যুদ্ধে আহ্বান করে, আর একটি গোঁয়ার আর্ত্তসেবা করিতে গিয়া নিজেকে বিপন্ন করে এবং কিঞ্চিৎ অবসর পাইলেই বেহুঁস হইয়া ভোজন করে,—প্রেমের ফুরসৎ নাই। জয়হরির লাল-আলুর পিঠা ভোজন, লোহা-ব্যবসায়ী অমরের তিন-হন্দরী গুরুদেব, বাগিচার মালিক পাঁড়েজি গিনি দেওঘরের সবাইকে 'কেলা' খাওয়ান, ভৃত্য বাণেশ্বরের সহিত কর্ত্তা-মহাশয়ের নিরন্তর বাগ্‌যুদ্ধ, কুণ্ডু-ক্যাবিনের ছাগলদুধের চা,—আরো কত কি—সমস্তই পরম উপভোগ্য। পাঁচশ পাতা শেষ করিয়া হাত পাতিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—আরো চাই। লেখক চীন ঘুরিয়া আসিয়াছেন, ভারতেরও বহুদেশ দেখিয়াছেন এখন আর তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে বলি না। কেবল এই অনুরোধ—একবার ধ্যানস্থ হইয়া কলিকাতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, এবং যে অপরূপ দৃশ্য দেখিবেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করুন।

রা. ব.

পথের পাঁচালী—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রঞ্জন প্রকাশালয়, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

এই পুস্তকখানিকে উপন্যাস বা গল্প না বলিয়া চিত্রমালা বলিলে ইহার স্বরূপ অনেকখানি বুঝা যায়। এই সংসার-পথের যে-সকল পাঁচ রঙা ছবি দুটি বালক ও বালিকার জীবনে উজ্জ্বল ছাপ ফেলিয়া গিয়াছে ইহা যেন তাহারই সযত্নসংগৃহীত একটি মালা। ইহাতে বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণ এবং বয়স্ক হরিহর ও সর্ব্বজয়ার স্থান থাকিলেও দুর্গা ও অপুর কিশোর বয়সের দৃষ্টি দিয়াই গ্রন্থকার এই জগৎ চিত্রশালা দেখিয়াছেন। নিশ্চিন্দিপুরের আমবাগানে, পুকুর পাড়ে, পোড়ো ভিটায়, রেল-লাইনের ধারে, যাত্রার আসরে সর্ব্বত্রই পাঠককে ঘুরিতে হইবে এই বালক বালিকার পিছু পিছু তাহাদের চোখের অঞ্জন চোখে দিয়া। ঘুরিতে ঘুরিতে মনে হয় আবার সেই শৈশবে ফিরিয়া গিয়াছি যেখানে পুঁতির মালা, কুড়ানো আম, মেম-পুতুল ও কড়ির পুঁটুলি এই সবই জগতের শ্রেষ্ঠ ও সার সম্পদ; যেখানে আকাশে উড়িতে পাতালের অতলতলে ঝাঁপ দিতে কি বাতাসের বেগে জগৎটা মাৎ করিয়া আসিতে কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, কেবল স্বপ্নের রথে কল্পনা সারথী হইলেই চলে।

বিভূতিবাবু এই চিত্রগুলি প্রাণের সমস্ত মমতা দিয়া আঁকিয়াছেন; তাঁহার তুলির স্পর্শ অতি সুকুমার ও নিপুণ। ভারী রঙে ও বেয়াড়া রেখাপাতে চিত্রমালার কোনো অংশ চক্ষুকে পীড়া দেয় না। যে ভাষা ও লিখনভঙ্গীর সাহায্যে তিনি এই চিত্রমালা আঁকিয়াছেন তাহা পৌরাণিকও নয়, অতি-আধুনিকও নয়, কাজেই পাঠকের মনে তাহা সহজ সরল গতিতে আপনার স্থান খুঁজিয়া লয়। পুরাতন জড়োয়া জাঁকজমকও নাই, আধুনিক সার্কাসের সঙের মত মৌলিকতাও নাই; কাজেই তাহাকে দেখিলে হঠাৎ চমক্ লাগে না, আপনার অজ্ঞাতেই ঘরে ডাকিয়া লইতে ইচ্ছা করে।

ইহার রচনা-ভঙ্গী ও ছোট ছোট চিত্র-গল্পগুলি Rollandর John Christopherএর Dawn অধ্যায় মনে পড়াইয়া দেয়।

লেখক এই ভঙ্গীতে অপুর পরবর্ত্তী জীবন পথের আরো কিছু পরিচয় আমাদের দিবেন আমরা আশা করি।

তাঁহার নিপুণ লেখনী অক্ষয় রূপসৃষ্টিতে সার্থক হউক ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রীশান্তা দেবী

ত্রিপুরার স্মৃতি—শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা প্রণীত। পৃষ্ঠা ২২৫। ত্রিপুরাব্দ ১৩৩৭। কলিকাতা।

পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপা ভাল। পুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলি বেশ সুন্দরভাবে লেখা হইয়াছে। লেখকের মুন্সীয়ানা প্রশংসার যোগ্য। আমরা সমস্ত বইখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। বেশ ভালই লাগিয়াছে। পুস্তকখানিতে পাইটকারা পরগণা, ময়নামতী, লালমাই, চণ্ডীমুড়া, উদয়পুর, হীরাপুর, অমরপুর, উনকোটী প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ সাধারণ ও ঐতিহাসিক ভাবে দিবার চেষ্টা আছে। কিন্তু বর্ণনা কোথাও নীরস হয় নাই। ইহাতে ২২খানি ঐতিহাসিক ও প্রয়োজনীয় চিত্র আছে। পরিশিষ্টে ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক গোবিন্দমাণিক্যের নিকট লিখিত পত্রের প্রতিলিপি প্রভৃতি কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বইখানিতে গোঁড়ামির প্রশ্রয় বিশেষ নাই দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। ত্রিপুরার কিয়দংশ এক সময়ে পাল ও অন্য বংশীয় নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল গ্রন্থকার অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বয়কামতা ও চাঁদনীর বিবরণ, উদয়পুর, হীরাপুর, দেবতামুড়ার বিবরণগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। পুস্তকখানিতে আলোচনা সম্পর্কে ভ্রম-প্রমাদ খুব অল্প। শিলালিপিগুলির পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনায় গ্রন্থকারের আরও একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তবে এখানি ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব নয়—সাধারণ আলোচনা। কিন্তু সাধারণ আলোচনা হইলেও লেখক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আবরণ দিয়া এরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের পাঠকও তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। "মহাভিনিখক্রমণ" (পৃঃ ১৭) [মহাভিনিষ্ক্রমণ] ব্যতীত পুস্তকখানিতে মুদ্রাকর প্রমাদ নাই বলিলেই হয়। আমরা এই পুস্তকখানির বহুলপ্রচার কামনা করি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

আগ্রার চিঠী—শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা। প্রকাশক—রাণা হৃওবীরজঙ্গ বাহাদুর, ৫৯-১ বালীগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা।

পুস্তকখানিতে আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন, ভরতপুর ও দিল্লীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলির বর্ণনা আছে। মোগল-ইতিহাস সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ, কাজেই যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই অজ্ঞ প্রদর্শক ('গাইড')-এর মুখে শোনা কথা প্রদর্শকদের অনেক কথার মূলেই কোন সত্য নাই—ইহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। ফলে অনেক মিথ্যা ইতিহাস

ও প্রবাদ পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। দুই চারিটি উদাহরণ দিতেছি, স্থানাভাবে সব কথা বলা সম্ভব নয়।—

(১) ৩৩ ও ৩৫ পৃষ্ঠায় "বাবর বাদশাহের মৃতদেহ লাহোরে গোর দেওয়ার" কথা আছে। বাবরের সমাধি লাহোরে নহে—কাবুলে। কাবুলে বাবরের সমাধি-মন্দিরের চিত্র Smith's *Oxford History of India* পুস্তকের ৩২৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।

(২) ৩৪ পৃষ্ঠায় আছে,—"মোমতাজ বেগম ব্যতীত শাহ্জাহাঁ বাদশাহের আর কোন পত্নীর নাম শুনা যায় নাই।" আচার্য্য যদুনাথ সরকারের গ্রন্থগুলি পড়িলে লেখক দেখিবেন ইতিহাসে শাহ্জাহানের আরও দুই পত্নীর—আকবরাবাদী-মহল ও ফৎপুরী-মহল এর উল্লেখ আছে। (See *Aurangzib*, iii. 140: *Studies in Mughal India*, p. 28).

(৩) ৪৮ পৃষ্ঠায় লেখক "ফতেহ্পুর সিক্রী" নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে দুইটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"কোন্‌টি প্রকৃত, তাহা বলা কঠিন।" সম্রাট্ আকবর গুজরাট-বিজয়ের পর সিক্রীর নামকরণ করেন—'ফতাবাদ' বা বিজয়-নগরী। ক্রমে 'ফতাবাদ' লোকমুখে ও সরকারী কাগজপত্রে 'ফৎপুর'-এ পরিণত হইয়াছে। (Smith's *Akbar*, p. 105)).

(৪) ৪৯ পৃষ্ঠায় আছে:—"ফতেহ্পুর সিক্রী পরিত্যক্ত হওয়ার সম্বন্ধে প্রবাদ এই—অকবর বাদশাহ্ এখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলে অনেক লোকের আসা যাওয়াতে শেখ সেলিম চিশ্‌তীর ঈশ্বর উপাসনায় ব্যাঘাত হইতে লাগে, তাই তিনি নাকি অকবরকে বলিয়াছিলেন—হয় তুমি এখানে থাক আমি চলিয়া যাই। নয় আমি থাকি তুমি চলিয়া যাও। আমাদের দুজনে এখানে থাকা অসম্ভব। একথাতেই নাকি অকবর এ স্থান পরিত্যাগ করেন।"

এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য নাই। ১৫৭০ হইতে ১৫৮৫ সালের শরৎকাল পর্য্যন্ত—এই ১৫-১৬ বৎসরই প্রকৃতপক্ষে আকবর ফৎপুর-সিক্রীতে বাস করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৩ বৎসর তাঁহাকে পঞ্জাবে বাস করিতে হয়। তাহার পর তিনি আগ্রায় ফিরিয়াছিলেন (১৫৯৮)—ফৎপুর-সিক্রীতে যান নাই বা আর কখনও সেখানে বাস করেন নাই।

শেখ সলীম চিশ্‌তীর সাধনার ব্যাঘাত আকবরের সিক্রী-ত্যাগের কারণ হইতে পারে না; কারণ ১৫৭২ সালের প্রারম্ভেই সলীম চিশ্‌তীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে আরও ১২-১৩ বৎসর আকবর সিক্রীতে বসবাস করিয়াছিলেন। সিক্রী-ত্যাগের মূল কারণ,—ভীষণ জলকষ্ট; সিক্রীর মত একটি ছোট গ্রামে কোনমতে পানীয় জল পাওয়া যাইতে পারে। ফলে রাজসভাসদ্, অসংখ্য হাতী ঘোড়া, উট ও চাকর-বাকরের অকাল মৃত্যু ঘটিত। দ্বিতীয় কারণ,—আগ্রা যমুনার উপর; উত্তর-পশ্চিম হইতে আক্রমণ রোধ করিবার ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে অভিযান পাঠাইবার পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক।

(৫) ৫৬ পৃষ্ঠায় আছে,—"[ফতেহ্পুর সিক্রীর] পাঁচমহলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'সোনেরা মহল।' লোকে বলে—'মরিয়মজমানী নামে অকবর বাদশাহের একজন বেগম সেখানে থাকিতেন। তিনি কে ছিলেন ইহা ঠিক জানা যায় না। প্রবাদ এই—তিনি আর্ম্মেনিয়েন খৃষ্টান বা পর্ত্তুগিজ ছিলেন।"

আকবরের খৃষ্টান-পত্নী লইয়া সাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা আছে। মরিয়ম জমানী বা মরিয়ম-উজ্-জমানী (অর্থাৎ 'সে যুগের মেরী') জয়পুর-পতি বিহারী মলের কন্যা। ১৫৬২ জানুয়ারী মাসে আকবর তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং এই হিন্দু-পত্নীর গর্ভেই জহাঙ্গীরের জন্ম। সিকান্দ্রায় যেখানে আকবরের সমাধি আছে তাহার নিকটেই মরিয়ম-জমানীর সমাধি মন্দির।

মরিয়ম-জমানী যে পোর্ত্তুগীজ খৃষ্টান—এই মারাত্মক ভুলটি অনেক পুস্তকেই স্থান পাইয়াছে; যেমন, ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত মহম্মদ লতিফের *Agra* (পৃঃ ১৯১)। আকবরের বহুসংখ্যক বেগমের মধ্যে কেহ যে পোর্ত্তুগীজ বা খৃষ্টান ছিলেন এরূপ বিশ্বাস করিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। যিশুও মহম্মদের স্বীকৃত প্রেরিত-পুরুষ পয়গম্বর। এই কারণে মুসলমানেরা যিশু জননী মেরীকে অতীব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, এবং উচ্চপদস্থ মুসলমান মহিলাগণ মৃত্যুর পর যে-নামে অভিহিত হইতেন তাহাতে 'মেরী'র পুণ্যনাম যুক্ত হইত। এইরূপেই আকবরের প্রথম হিন্দু-পত্নী 'মরিয়ম-জমানী' এবং মাতা 'মরিয়ম-মকানী' হইয়াছেন। মৃত্যুর পর তাঁহাদের এই নূতন নাম লোকমুখে সংক্ষেপে 'মরিয়ম' বা 'মরিয়ম-বিবি' রূপে উচ্চারিত হইত। তাহার ফলে লোকেরা ধরিয়া লইয়াছে যে মরিয়ম বা মরিয়ম-বিবি নিশ্চয়ই কোন খৃষ্টান মহিলার নাম—মুসলমানী নাম হইতে পারে না; অতএব আকবরের খৃষ্টান মহিষী ছিল!

সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি বর্ণনাকালে লেখক জাঠদের লুণ্ঠনের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আসল কথাটাই বলিতে ভুলিয়াছেন। এ ভুলটা তাঁহার কেন আরও অনেকের হয়। পর্য্যটকদের মধ্যে খুব কম লোকেরই জানা থাকে যে, তাহারা সিকান্দ্রায় যে সমাধি মন্দির দেখিতে যাইতেছে, সেখানে আর আকবরের মৃতদেহ নাই! ১৬৯১ সালে আওরংজীব যখন দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত সেই সময় সংবাদ আসিল—গ্রামবাসী কয়েকজন দুর্দান্ত জাঠ সিকান্দ্রায় সমাধিস্থল অপবিত্র করিয়াছে—আকবরের অস্থিগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ব্রোঞ্জের সুবৃহৎ ফটকগুলি ভাঙ্গিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সোনা-রূপা ও বহুমূল্য পাথরের কাজগুলি ছিঁড়িয়া লুঠপাট করিয়াছে—যাহা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই তাহা নষ্ট করিয়া গিয়াছে। "পাষণ্ডেরা সমাধিস্থল খুঁড়িয়া সরোষে আকবরের অস্থিগুলি আগুনে পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়াছে।" (See Manucci's *Storia do Mogor*, ed. by Wm. Irvine, i. 142, ii. 320 *n*: Smith's *Akbar*, p. 328)

এরূপ পুস্তকে আরবী ও তুর্কী নামের বানান সম্বন্ধে বেশী সঙ্গতির আশা করা যায় না। লেখক সনাতন "আকবর" উঠাইয়া "অকবর" লেখায় পক্ষপাতী, কিন্তু "রিজিয়া" বা "অলতমাস্" রাখিয়াছেন, যদিও তাঁহার উচিত ছিল "রজিয়া" ও "ইলতুৎমিশ্" লেখা। এই বর্ণ-বিন্যাস এখন পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেন (see *Cambridge History of India*, vol. III).

দিল্লী আগ্রা সংক্রান্ত ভাল hand book-এর অভাব নাই। লেখক যদি Sir Henry Sharp's *Delhi* (2nd. ed., 1928) ও Havell's *Agra & the Taj* (2nd. ed) পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলে, আমাদের বিশ্বাস, আগামী সংস্করণে তিনি তাঁহার পুস্তকের অনেক ভ্রম সংশোধন করিতে পারিবেন। তাজ-মহল সম্বন্ধে তাঁহাকে স্যর যদুনাথের *Studies in Mughal India* পুস্তকের অন্তর্গত "Who built the Taj Mahal?" প্রবন্ধটি পড়িতে অনুরোধ করি।

পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও চিত্র উৎকৃষ্ট। বহু চিত্র দিয়া পুস্তকখানি পাঠকের চিত্তগ্রাহী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—এ বিষয়ে তিনি হয়ত অনেকটা সফলও হইয়াছেন। কিন্তু রচনা-নৈপুণ্যের অভাবে পুস্তকখানি পাঠকের কতটা মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, তাহা সন্দেহের কথা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
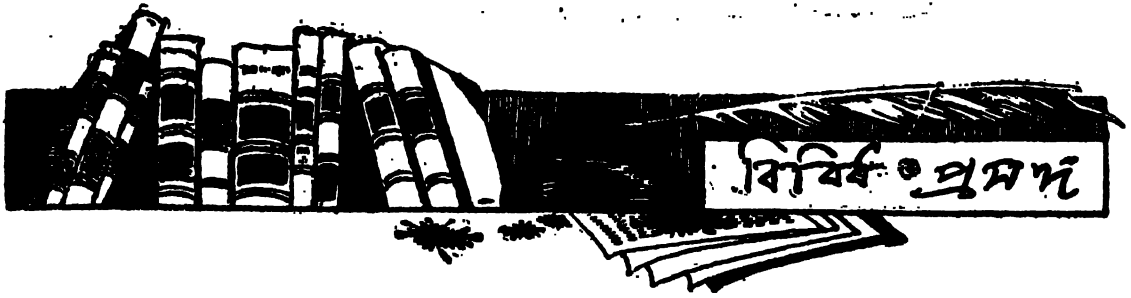
"মাদার ইণ্ডিয়া" এবং "ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ"

মিস্ মেয়োর লিখিত "মাদার ইণ্ডিয়া" নামক বহিতে ভারতবর্ষের লোকদের—বিশেষ করিয়া হিন্দুদের—চরিত্রের জঘন্য নিন্দা আছে, তাহাদের ধর্ম্মের কুৎসিত নিন্দা আছে, তাহাদের সামাজিক নানা প্রথার কুৎসা আছে, ভারতবর্ষের ভক্তিভাজন লোকদিগকে অবজ্ঞেয় করিবার চেষ্টা আছে। যদি সৎ উদ্দেশ্যে সত্য দোষ দেখান হয়, তাহা হইলে দোষপ্রদর্শককে বন্ধু মনে করা যাইতে পারে। যদি কোন জাতিকে জগদ্বাসীর চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদের সত্য দোষ দেখান হয়, তাহা হইলেও নিন্দুককে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু মিস্ মেয়ো অসৎ উদ্দেশ্যে কখন বা সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় লইয়া, কখন বা আংশিক সত্যকে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করিয়া হিন্দুদিগকে অতি অধম বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার মিথ্যা উক্তির অসত্যতা এবং অতিরঞ্জিত বর্ণনার অতিরঞ্জন অনেকে পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এই পুস্তক হিন্দুদিগকে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে একদিকে ভারতীয় জাতি এবং অন্যদিকে ইংরেজ ও আমেরিকান্ জাতির মধ্যে অসদ্ভাব ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষে ইহার প্রচার বন্ধ করেন নাই। লেখিকা বা তাহার প্রকাশককে দণ্ড দিবার ক্ষমতা ভারত গবর্মেণ্টের নাই; কেন না, তাহারা ভারতবর্ষে থাকে না এবং বহিখানা ভারতবর্ষে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু উহা ভারতবর্ষে আনয়ন ও বিক্রয় আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইতে পারিত। তাহা হয় নাই।*

অন্যদিকে, আচার্য্য সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের "ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ্" বহিখানি ভারতবর্ষের লোকদের স্বরাজ পাইবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য লিখিত হইয়াছে। তাহারা আত্মশাসক না হইয়া অন্যের দ্বারা শাসিত হওয়ায় কি কি কুফল হইয়াছে, স্বরাজের আবশ্যকতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাহা লেখা অত্যাবশ্যক বলিয়াই গ্রন্থকারকে ব্রিটিশ শাসনের দোষ পুস্তকের কতকগুলি অধ্যায়ে দেখাইতে হইয়াছে; ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিন্দা করা বহিখানির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ইংলণ্ডের কোন ধর্ম্মের, ইংলণ্ডের সমুদয় বা কোন সামাজিক প্রথার নিন্দা ইহাতে নাই, ইংরেজ পুরুষ বা নারীদের চারিত্রিক কুৎসা ইহাতে নাই, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ও ভক্তিভাজন কোন লোককে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ইহাতে নাই, ইংরেজ জাতিকে হেয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা ইহাতে নাই। বরং গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরে ইহাতে লিখিয়াছেন যে, তিনি আমেরিকার নীচেই ইংলণ্ডকে ভালবাসেন এবং তিনি কোন অর্থেই ইংলণ্ডের শত্রু বা অহিতৈষী নহেন। তাঁহার মতে দুটি ইংলণ্ড আছে। এক ইংলণ্ড ম্যাগ্না কার্টার ইংলণ্ড, মিল্টন পিম হ্যাম্‌ডেনের ইংলণ্ড, আমেরিকান উপনিবেশগুলির প্রতি ন্যায্যব্যবহারপ্রার্থী পিট ফক্স বার্কের ইংলণ্ড, দাসত্বপ্রথা-বিলোপক ইংলণ্ড, কবডেন ব্রাইট রিপন মেরী কার্পেণ্টার ফসেট স্যার হেনরী কটন প্রভৃতির ইংলণ্ড, এবং শ্রমিক দলের অনেক সভ্যের ইংলণ্ড। এই ইংলণ্ডকে তিনি ভাল বাসেন লিখিয়াছেন। যাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক মত অদ্যবধি তাহাদের ইংলণ্ড পূর্ব্বোক্ত ইংলণ্ড হইতে ভিন্ন। সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেব বিশেষ করিয়া শ্রমিক দলের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বহি তাহাদেরই আমলে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক ক্রূর পরিহাস!

সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের উদ্দেশ্য যে মন্দ ছিল, তাহা প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা সরকার পক্ষ হইতে করা হয়

* মিস্ মেয়োর বহির পাল্টা জবাব স্বরূপ লেখা ভারতবর্ষে মুদ্রিত "আঙ্কল্ শাম্" নামক বহির আমেরিকায় আমদানী ও বিক্রী বন্ধ হইয়াছে।

নাই। তিনি যে সব কুফল ও দোষত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টাও গবর্ন্মেণ্ট পক্ষ হইতে করা হয় নাই। কেবল এই বলা হইয়াছে, যে, লেখক ও প্রকাশকের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বহিটির দ্বারা গবর্ন্মেণ্টের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ উৎপাদিত হইয়াছে বা হইতে পারে। সেইজন্য গ্রন্থখানির মুদ্রাকর ও প্রকাশক দণ্ডিত এবং বহিখানি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট কোন স্বতন্ত্র জীব নহে; কতকগুলি মানুষের সমষ্টিকে গবর্ন্মেণ্ট বলা হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন মানবের সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গবর্ন্মেণ্ট বলিয়া উক্ত হয়। গবর্ন্মেণ্টের দোষবর্ণনা এই সকল মানুষের ও তাহাদের সমর্থকদের দোষবর্ণনা; সমগ্র ইংরেজ জাতির কিংবা তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দোষবর্ণনা নহে।

কিন্তু "মাদার ইণ্ডিয়া" ও "ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ্" বহি দুখানির এইরূপ প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও মিস্ মেয়োর বহিটার কিছু হইল না, অথচ সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের বহির প্রচার বন্ধ হইল। ইহার মানে এই, যে, প্রবল জাতির কতকগুলি লোকের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্য দোষ দেখানও মহা অপরাধ, কিন্তু দুর্ব্বল সমগ্র জাতিকে মিথ্যার সাহায্যে ধর্ম্ম সমাজ রাষ্ট্রনীতি চরিত্র প্রভৃতি সকল দিক্ দিয়া হেয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা অপরাধ নহে।

হইতে পারে, যে, কোন কোন ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের কোন কোন প্রকার সত্য বর্ণনাও ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টকে লোকের বিরাগভাজন করিতে পারে, এবং আইন অনুসারে তদ্রূপ বর্ণনা দণ্ডনীয়ও হইতে পারে। কিন্তু যে সব সত্য ব্যাপারের বর্ণনা দণ্ডনীয়, সেই ব্যাপারগুলা বেশী নিন্দার্হ, না তাহাদের বর্ণনা বেশী নিন্দার্হ? জানি, এরূপ প্রশ্ন করা বৃথা। কারণ, প্রবল পক্ষের শাস্তি দিবার ক্ষমতা থাকায় উত্তর দিবার প্রয়োজন হয় না।

—

মহানুভব মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

জগতে জন্ম হয় অনেক মানুষের, মৃত্যুও হয় অনেকের। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত মানুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্য ঘটে না।

তাঁহার কথা ভাবিলে প্রথমেই মনে পড়ে, তাঁহার বিরাট দানযজ্ঞের কথা। এত বড় দাতা আধুনিক ভারতে দেখা যায় না। তিনি জীবিতকালেই এক কোটির
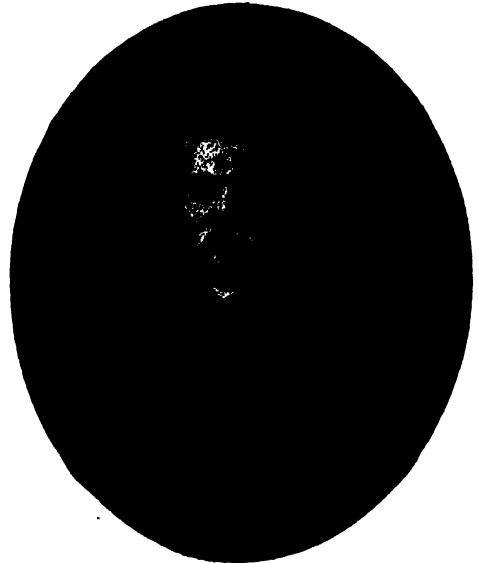
পরলোকগত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

অধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, দানশীল পার্সীদিগের মধ্যেও ইঁহার মত দাতা দেখা যায় না।

তাঁহার দানশীলতার অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার দান কখনও অপাত্রে পড়ে নাই বা কেহ তাঁহাকে ঠকাইয়া টাকা লয় নাই, এরূপ বলা যায় না বটে। কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব এইখানে, যে, উপকৃত কোন ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হইলেও, তাঁহার দান অনুপযুক্ত ব্যক্তি পাইয়াছে জানিতে পারিলেও, কেহ প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়াছে জানিতে পারিয়াও, তিনি মানবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বা মানববিদ্বেষী হইয়া যান নাই।

জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি কোমলহৃদয়, দয়ালু, বিশ্বাসপ্রবণ এবং সৎকর্ম্মে উৎসাহী ছিলেন।

তাঁহার দানশীলতায় প্রাচীন ও নবীন ভাবের সম্মিলন হইয়াছিল। আগেকার লোকে যে-প্রকার সৎকাজের জন্য দান করা পুণ্যকর্ম্ম মনে করিতেন, তাঁহার সেরূপ দান বিস্তর ছিল; আবার আধুনিক দানশীল লোকেরা বিদ্যাপীঠস্থাপন, দরিদ্র ছাত্রদের ভরণপোষণ, তাহাদের পুস্তকক্রয়ে সাহায্যদান, পরীক্ষার ফীদান, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের জন্য প্রভূত দান, সর্ব্বসাধারণের লাইব্রেরী বা পণ্ডিত-বিশেষের গবেষণা-লাইব্রেরীর জন্য বহু অর্থদান, দরিদ্র গ্রন্থকারের বহি ছাপাইবার ব্যয়-নির্ব্বাহ, বিদ্বৎ পরিষদে ভূমিদান ও অর্থদান, বিদ্বজ্জন-সম্মেলনের জন্য অর্থদান, প্রভৃতির জন্য ব্যয়ও তাঁহার খুব বেশী ছিল।

তিনি জানিতেন ও বুঝিতেন, যে, আমাদের দেশে যে-সব পণ্যশিল্প ছিল, তাহার অনেকগুলি লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে, এবং তাহাদের অনেকগুলির জায়গায় বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী পণ্যদ্রব্যোৎপাদনের কারখানা স্থাপিত না হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। এই কারণে তিনি আধুনিক পণ্যশিল্পক্ষেত্রেও উদ্যোগিতা দেখাইয়া গিয়াছেন এবং প্রভূত অর্থ এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের জন্য কলিকাতার টাউন হলে প্রথম যে সভা হয়, তিনি তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কৃষি ও পণ্যশিল্পে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিতেন। ব্যাঙ্কস্থাপন, জীবনবীমা কোম্পানী স্থাপন, প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহার উদ্যোগিতা ছিল।

তিনি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যত সৎকার্য্য করিয়াছেন ও যত দান করিয়া গিয়াছেন, কেহ যন্ত্রের মত তাহা করিয়া গেলেও, তাহারও প্রশংসা হইত। কিন্তু মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার কাজের চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁহার মত সকল ধর্ম্মের সাধুলোকদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও প্রীতিসম্পন্ন, নিরহঙ্কার, নম্র, অমায়িক ও অতি-ভদ্রলোক কচিৎ দেখা যায়। তাঁহার যে এত ব্যয় হইত, তাঁহার যে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল, তাহা নিজের বিলাস ও ভোগসুখের জন্য নহে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের গুণাবলী তাঁহাতে লক্ষিত হইত। তিনি তৃণাদপি সুনীচ নিজেকে মনে করিতেন, তরুর মত সহিষ্ণু ছিলেন, নিজে সম্মানপ্রয়াসী না হইয়া অন্যকে মান দিতেন;—তিনি হরিগুণগানের যথার্থ উপযুক্ত ছিলেন। ধন্য তিনি। ধন্য তাঁহার বংশ ও জন্মভূমি।

—

বড়লাটের ঘোষণার ধারা

ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কিরূপ শাসনপ্রণালী দিবেন এবং কি প্রকারে সেই শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইবে, সে বিষয়ে নবেম্বরের গোড়ায় বড়লাট এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন। ইহা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে "নেতাদিগকে" পাঠান হইয়াছিল, এবং "নেতারাও" তাহার আলোচনা করিয়া সে-বিষয়ে একটা বক্তব্যপত্র বাহির করিয়াছিলেন।

এই পদ্ধতিটা আমরা ভাল মনে করি নাই। অন্য মানুষদের মত নেতাদেরও সকল বিষয়ে নিজেদের মত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু দেশের পক্ষ হইতে কিছু বলিতে হইলে দেশের লোকদের মত জানা দরকার। কিন্তু বড়লাট তাঁহার ঘোষণা দেশের লোকদিগকে জানাইবার পূর্ব্বেই নেতাদিগকে জানাইলেন। সুতরাং সে বিষয়ে দেশের লোকদের মত গঠন ও প্রকাশের সুবিধা হইবার পূর্ব্বেই নেতাদের মত প্রকাশিত হইল। ইহাতে কার্য্যতঃ দেশের লোকদের এবং তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় কংগ্রেস প্রভৃতি সভা-সমিতির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। এরূপ বলিবার কারণ বলিতেছি।

কলিকাতায় কংগ্রেসের গত অধিবেশনে স্থির হয়, যে, এই বৎসর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস নিশ্চিত পাইবার প্রতিশ্রুতি না পাওয়া গেলে কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং তাহা লাভ করিবার জন্য উপায়

অবলম্বন করিবেন। বড়লাটের ঘোষণাতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের উল্লেখ আছে বটে। কিন্তু কংগ্রেস যেরূপ প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন, ঐ উল্লেখ তাহা কিংবা তাহার সমান কিনা, তাহা কোন নেতা বা কতকগুলি নেতা বলিতে পারেন না। তাহা কংগ্রেসই বলিতে পারেন। কলিকাতা কংগ্রেসে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব কাহারও বৈঠকখানায় কেবলমাত্র কয়েকজন নেতার পরামর্শ অনুসারে নির্দ্ধারিত প্রস্তাব নহে। উহা কংগ্রেসের প্রকাশ্য সভায় তুমুল তর্কবিতর্কের পর প্রতিনিধিদের অধিকাংশের মতে ধার্য্য হয়। ইহাই উহার গুরুত্বের কারণ।

ভারতীয় অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের প্রতিনিধি-সভা কংগ্রেস অপেক্ষা বড়, কংগ্রেস আবার তাহার মহত্তম নেতা ও সমুদয় নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা বড়। কংগ্রেস যাহা করিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তন কংগ্রেসই করিতে পারেন।

বড়লাটের ঘোষণা যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিলে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস সম্বন্ধে বা পূর্ণস্বাধীনতা বিষয়ে কোন প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না।

এই সকল কারণে, বড়লাট দেশের সকল লোকদের জন্য প্রচার করিবার পূর্ব্বে এবং পূর্ব্বাহ্নে কেবল কয়েকজন প্রকৃত ও তথাকথিত নেতাকে ঘোষণার বিষয়টি জানাইয়া ভাল করেন নাই। এই সকল নেতাদেরও, তাহা দেশের লোকদের জন্য তাহা প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, তৎসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে রাজী হওয়া উচিত হয় নাই। যদি বড়লাট আগেই তাহা প্রতিনিধিস্থানীয় কাহাকেও জানান একান্ত দরকার মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কংগ্রেস, লিবার্যাল ফিডারেশ্যন, মুস্লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতির সেক্রেটারীদের মারফতে ঐ সকল সভার কার্য্যকরী সমিতিকে জানাইতে পারিতেন। ব্যক্তিগতভাবে কতকগুলি লোককে আগে হইতে জানান ঠিক হয় নাই। ফলেও দেখা গিয়াছে, যে, দেশের লোকে নেতাদের বক্তব্যপত্রে সায় দেয় নাই—যদিও ইংরেজদের বিলাতী ও ভারতীয় কাগজগুলা এবং প্রকৃত ও তথাকথিত নেতাদের অনুবর্ত্তী কয়েকখানা দেশী কাগজ তারস্বরে বলিতেছে, যে, বড়লাটের ঘোষণায় সমস্ত দেশে সন্তোষ, শান্তি ও উল্লাস দেখা যাইতেছে।

নেতৃবর্গ যে বড়লাটের ঘোষণাটি ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই, উহা হইতে এরূপ কিছু আশা করিয়াছিলেন যাহা উহাতে নাই, তাহা পার্লেমেণ্টের উভয় কক্ষের বিতর্কে প্রমাণিত হইয়াছে; এবং নেতারাও তাহা বুঝিতে পারিয়া আবার ১৮ই নবেম্বর এলাহাবাদে তৎসম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবেন।

—

বড়লাটের ঘোষণায় নূতন কিছু আছে কি?

বড়লাটের ঘোষণায় ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ দেওয়া হইবে, এই কথা আছে বটে। কিন্তু আমরা মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসীতে উক্ত ঘোষণার অন্যূন একমাস আগে দেখাইয়াছি, যে, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ যে ভারতবর্ষকে দেওয়া হইবে তাহা আট বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বলিয়াছেন। আমরা গত কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম, ১৯২১ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ভারতের বড়লাটকে যে সংশোধিত উপদেশপত্র ("Revised Instrument of Instructions") দান করেন, তাহা উড়াইয়া দিবার জো নাই। তাহার অষ্টম অনুচ্ছেদে আছে:—

> "For above all things, it is Our will and pleasure that the plans laid by Our parliament for the progressive realization of Responsible Government in British India as an integral part of Our Empire may come to fruition to the end that British India may attain its due place among Our Dominions."

তাৎপর্য্য। "সর্ব্বোপরি আমাদের ইচ্ছা ও খুশি এই যে, আমাদের সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূতভাবে ব্রিটিশ ভারতে দায়ী গবর্ন্মেণ্ট ক্রমোন্নতি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে অভিপ্রায় পার্লেমেণ্ট করিয়াছেন তাহা যেন সফল হয়—এই চরম পরিণতির জন্য যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষ যেন ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে তাহার ন্যায্য স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

রাজা পঞ্চম জর্জ্জের এই ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও, তাহার পর কয়েক বৎসর হইল স্যার ম্যালকম হেলী ভারত

গবর্ন্মেণ্টের স্বরাষ্ট্রসদস্য (হোম মেম্বর) রূপে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্ক করেন, যে, ভারতবর্ষকে যে দায়ী গবর্ন্মেণ্ট দিবার প্রতিশ্রুতি আছে, তাহার মানে ইহা নহে, যে,তাহাকে ডোমিনিয়ন করা হইবে। ইংরেজ রাজভৃত্যদের মতে রাজার ঘোষণার মূল্য এত কম! আর, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের প্রতিনিধি নেতারাও এমন বিস্মৃতিপরায়ণ, যে, তাঁহারা হেলী সাহেবের জবাবে রাজার উপদেশটি উপস্থিত করিতে পারিলেন না, এমন কি তাঁহারা যখন নেহরু কমিটির রিপোর্টে হেলীর তর্কের বিস্তৃত উত্তর দিলেন, তখনও রাজার উপদেশটির উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন। সত্য বটে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাকে রাজপুরুষেরা যেমন কার্য্যতঃ তুচ্ছ জ্ঞান করেন, রাজা পঞ্চম জর্জ্জের উপদেশপত্রকেও তেমনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু তর্কস্থলে ঐ উপদেশ উপস্থাপিত হইলে তাহাকে প্রকাশ্যভাবে মূল্যহীন বলিতে সরকারী কোন লোক সাহস করিতেন না। পার্লেমেণ্টেও কোন মন্ত্রী বা অন্য সভ্য রাজার উপদেশটির উল্লেখমাত্র করিলেন না। বিস্ময়কর রাজভক্তি! যাহা হউক, আমরা দেখাইলাম, ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের প্রতিশ্রুতি নূতন নহে।

১৯১৭ সালের ঘোষণায়, ১৯১৯ সালের "ভারত গবর্ন্মেণ্ট আইনের" হেতুবাদে, ১৯২১ সালের রাজার উপদেশপত্রে, কোথাও লেখা নাই ভারতবর্ষ কখন্ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ পাইবে। অতএব বড়লাট লর্ড আরুইন যদি তাঁহার ঘোষণায় বলিতেন, কবে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন করা হইবে, তাহা হইলে তাহা একটা শুনিবার যোগ্য নূতন কথা হইত বটে। তিনি যদি বলিতেন, সাইমন কমিশন বাহির হইবার পর নূতন যে ভারত-গবর্ন্মেণ্ট আইনের খসড়া পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করা হইবে, তাহাতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসেরই ব্যবস্থা থাকিবে, তাহা হইলে ডোমিনিয়নত্বলিপ্সু দিগের সন্তুষ্ট হইবার কারণ ঘটিত। যদি তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষকে সেই সব ক্ষমতা দিবার ব্যবস্থা উক্ত বিলে থাকিবে যে-সব ক্ষমতা কানাডা দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি ডোমিনিয়নের আছে, তাহা হইলে তাঁহাদের উল্লসিত হইবার কারণ ঘটিত। কিন্তু বড়লাট এরূপ কিছুই বলেন নাই। সুতরাং নেতারা যে তাঁহাদের বর্ণনাপত্রে ধরিয়া লইয়াছিলেন, যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির অব্যবহিত পরবর্ত্তী ধাপ ডোমিনিয়নত্ব-লাভ, সেরূপ ধরিয়া লইবার কোনই কারণ ছিল না।

—

গোল টেবিলের বৈঠক

বড়লাটের ঘোষণায় যে গোল টেবিলের বৈঠকের উল্লেখ ও অঙ্গীকার আছে, তাহা নূতন বটে। কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং তাহার বাহিরে নেতারা যেরূপ গোল টেবিলের বৈঠক চাহিয়াছিলেন, ইহা সেরূপ বৈঠক নহে। দেশের লোকদের প্রতিনিধিরূপে নেতারা ইহাই চাহিয়াছিলেন, যে, তাঁহারা দেশের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন, এবং রাজপুরুষদের সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া যাহা স্থির হইবে, তদনুসারে পার্লেমেণ্টে ভারতশাসনবিষয়ক বিল উপস্থিত করা হইবে। দেশের লোকেরা "সেল্ফ-ডিটার্মিনেশ্যন" অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের অধিকার চায়, এবং সেই জন্য সাইমন কমিশনকে বয়কট করা হইয়াছিল। নেতাদের প্রস্তাবিত গোল টেবিলের বৈঠক ঠিক্ এই অধিকারের দাবী না হইলেও ইহার কাছাকাছি বটে। কিন্তু লর্ড আরুইন যে কন্ফারেন্সের কথা বলিয়াছেন, তাহা এরূপ বৈঠক নহে। তাঁহার ঠিক্ কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, এবং তাঁহার উক্তির সমর্থন করিয়া ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন হাউস অব কমন্সে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বড়লাট বলেন :—

"When the Commission and the Indian Central Committee have submitted their reports and these have been published, and when His Majesty's Government have been able, in consultation with the Government of India, to consider these matters in the light of all the materials then available, they will propose to invite representatives of different parties and interests in British India and representatives of the Indian States to meet them, separately or together as circumstances may demand, for the purpose of a conference and discussion in regard both to the British Indian and the all-Indian problems. It will be their earnest hope that by this means it may subsequently prove possible on these grave issues to submit proposals to Parliament which may command a wide measure of general assent."

ভারতসচিব বলেন :—

"The Rt. Hon. gentleman opposite asked questions about the conference and I should like to use careful words because it was extremely important. Representative Indians will now have the opportunity of coming forward and expounding their views and pressing their solutions, supported by all the arguments and all the conviction which they can bring to bear. They will have direct access and their views will be heard and considered, not at some remote stage when the opinion of the Cabinet is already declared, but at a stage when everything they say will be heard with an open mind.'

দেখা যাইতেছে, যে, আগে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও তাহার সহকারী ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট বাহির হইবে এবং তাহার অনেক কন্‌ফারেন্স হইবে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট আগামী বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে বাহির হইতে পারে, কর্তৃপক্ষ এইরূপ বলিয়াছেন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট তাহার আগে বাহির হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন লাভ নাই; কারণ সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বাহির না হইলে কন্‌ফারেন্স ডাকা হইবে না।

রিপোর্ট দুইটা বাহির হইয়া গেলে বিলাতের গবর্মে‍ণ্ট ভারত গবর্মে‍ণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া তৎকালে তাঁহাদের সম্মুখস্থ সব উপকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। মানুষ শুধু শুধু আলোচনা করে না। কিছু একটা বা অনেকগুলা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য আলোচনা করে। সুতরাং তাঁহারা আলোচনার সময় কর্ত্তব্যনির্ণয়ও করিবেন। যাহা হউক, আলোচনা হইয়া যাইবার পর তাঁহারা ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন দলের ও স্বার্থের প্রতিনিধিদিগকে এবং দেশী রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদিগকে তাঁহাদের সহিত একত্র হইয়া কন্‌ফারেন্স করিতে ডাকিবেন। অতএব কন্‌ফারেন্স আগামী যে জুন মাসের আগে হইবে না, ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ কন্‌ফারেন্সে এবং এইরূপ বিলম্বে আহূত কন্‌ফারেন্সে নেতারা যদি রাজী হন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিত কিছু প্রতিশ্রুতি পাইবার পূর্ব্বেই কংগ্রেসের ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে কাজ করিয়া বসিবেন। এই প্রস্তাবটিকে এই প্রকার কৌশলে বাতিল করান ইংরেজ রাজপুরুষদের অভিপ্রেত ছিল না, কেহ বলিতে পারেন কি?

কন্‌ফারেন্স কিরূপ হইবে?

এই কন্‌ফারেন্সে সকল দলের ও স্বার্থের প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হইবে। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ও আহ্বানের ভার গবর্মে‍ণ্টের হাতে। সুতরাং তাঁহারা ধামাধরা বাক্যে সন্তুষ্ট বা অল্পে সন্তুষ্ট প্রভৃতির লোক দ্বারা কন্‌ফারেন্স বোঝাই করিতে পারিবেন। স্বাধীন প্রকৃতির স্বরাজলিপ্সু দুএক জন লোক রাখিলেই চলিবে।

কন্‌ফারেন্সে দেশী রাজ্যগুলির প্রতিনিধিও থাকিবে। দেশী রাজ্যের কোন কোন নৃপতিই কি প্রতিনিধি হইবেন, না তাঁহাদের প্রজাদের প্রতিনিধিরাও তাহাতে স্থান পাইবে? এবিষয়ে বড়লাট বা ভারতসচিব কেহই কিছু বলেন নাই।

কন্‌ফারেন্স একটা না হইয়া দুটাও হইতে পারে, এমন কথাও বলা হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্মে‍ণ্ট একসঙ্গে বা স্বতন্ত্রভাবে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি এবং দেশী রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত কন্‌ফারেন্স বা আলোচনা-সভা করিতে পারেন। সম্ভবতঃ আলাদা আলাদা সভাই হইবে। দেশী নৃপতিদের সঙ্গে আলোচনা আগে হউক বা পরেই হউক, তাঁহাদের মতের দ্বারা যে ব্রিটিশ-ভারতীয় অগ্রসর স্বাধীনতাকামীদের মতের গুরুত্বও জোর কমাইবার চেষ্টা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কি রকমের দেশীয় নৃপতিগণ দেশী রাজ্যসকলের প্রতিনিধি হইবেন, তাহা জানা দরকার। পাটিয়ালার মহারাজা নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার। খুব সম্ভব তিনি একজন প্রতিনিধি হইবেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর নানা অভিযোগ প্রকাশ্যভাবে বড়লাটের নিকট করা হইয়াছে, এবং তাঁহার নামে অন্য গুরুতর অভিযোগও খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছে। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে বড়লাট তাঁহাকে দোষমুক্ত বলিয়া ঘোষণা না-করিলে তাঁহাকে বা তদ্বিধ অভিযুক্ত অন্য কোন নৃপতিকে লইয়া কন্‌ফারেন্স করা সমীচীন হইবে না।

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস ও দেশী রাজ্যসমূহ

আমরা উপরে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের উপদেশের যে অষ্টম অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে ব্রিটিশ

ভারতকে ডোমিনিয়নত্ব দিবার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে। তাহাতে দেশী রাজ্যগুলির কোন উল্লেখ নাই। এই জন্য ঐ অনুচ্ছেদটির অভিপ্রায় আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি, যে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন হইবেই—দেশী রাজ্যসমূহের বা অন্য কাহারও মতামতের উপর তাহা নির্ভর করিবে না।

এই জন্য, আমাদের বিবেচনায়, ব্রিটিশ ভারতকে ডোমিনিয়নত্ব কখন দেওয়া হইবে কি না হইবে, সে-বিষয়ে দেশী রাজ্যসমূহকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার দরকার নাই—জিজ্ঞাসিত হইবার অধিকারও তাহাদের নাই। রাজার উপদেশের ৮ম অনুচ্ছেদে কেবল ব্রিটিশ ভারতের উল্লেখ যদি না থাকিত, তাহা হইলেও দেশী রাজ্যসমূহের আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এবং ডোমিনিয়নত্ব প্রাপ্তির সময় সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার থাকিত না।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন করিয়া বা তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কোন একটি সময়ে ডোমিনিয়ন করিবার কথা দিয়া, ডোমিনিয়ন-ভারতবর্ষের সহিত দেশী রাজ্য-সকলের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, কেবল সেই বিষয়েই তাহাদের সহিত আলোচনা হইতে পারে। ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি ও প্রগতিতে বাধা দিবার জন্য দেশী নৃপতিদিগকে রাজনৈতিক দাবা খেলার ব'ড়ে স্বরূপ ব্যবহার করা উচিত হইবে না, সুফলপ্রদও হইবে না।

—

কন্‌ফারেন্সের সভ্যদের অধিকার ও ক্ষমতা

কন্‌ফারেন্স ডাকা হইল, তাহাতে সমগ্র ভারতের নানা দলের ও শ্রেণীর প্রতিনিধিরাও উপস্থিত হইলেন, ধরিয়া লইলাম। তাঁহারা সেখানে কি করিবেন? তাঁহাদের অধিকার ও ক্ষমতা কি হইবে? এবিষয়ে লাট আরুইনের ও ভারতসচিব মিঃ বেনের কথা হইতে কি জ্ঞান পাওয়া যায়, দেখা যাক্।

লাটসাহেব বলিতেছেন, যে, কন্‌ফারেন্সে ব্রিটিশ ভারতের এবং দেশীভারতের—উভয়ের সমস্যাসমূহের আলোচনা হইবে; তাহার ফলে আশা করা যায়, যে, পরে পার্লেমেন্টের নিকট এই সকল গুরুতর বিষয়ে এরূপ সব প্রস্তাব উপস্থিত করা যাইতে পারিবে যাহা বহুসংখ্যক লোকের অনুমোদন লাভ করিবে। ভারতসচিব বলিতেছেন, প্রতিনিধিরা সোজাসুজি কর্ত্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত হইতে পারিবেন (কি সৌভাগ্য!) এবং তাঁহাদের মত শ্রুত ও বিবেচিত হইবে। কিন্তু সাইমন কমিশনের সম্মুখে যে সকল সাক্ষী উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মতও ত শ্রুত ও বিবেচিত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের কাহারও কাহারও সাক্ষ্যের কোন কোন অংশ কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হইয়া থাকিলে তদনুসারে কোন কোন প্রস্তাবও পার্লেমেন্টে উপস্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং সাইমন কমিশনের সম্মুখে সাক্ষী রূপে হাজীর হওয়া এবং প্রস্তাবিত কন্‌ফারেন্সে প্রতিনিধিরূপে হাজীর হওয়ার মধ্যে গুরুতর রকমের প্রভেদ ত দেখিতেছি না। উভয় ক্ষেত্রে যাঁহাদের হুজুরে হাজীর হইতে হইবে, তাহাতে কিঞ্চিৎ তফাৎ আছে বটে। সাইমন কমিশনের সভ্যেরা পার্লেমেন্টের দ্বারা নিযুক্ত, যদিও তাঁহারাও পার্লেমেন্টের সভ্য এখনও আছেন বা কোন কালে ছিলেন, এবং কন্‌ফারেন্সে যাঁহাদের দ্বারা প্রতিনিধিদের মত শ্রুত ও আলোচিত হইবে, তাঁহারা পার্লেমেন্টের সভ্য এবং মন্ত্রিমণ্ডলের সভ্য। কিন্তু এই প্রভেদের জন্য সাইমন-কমিশন-বয়কটকারী আমাদের কোন নেতা কি বস্তুতঃ সাক্ষী কিন্তু নামতঃ প্রতিনিধি হইতে রাজী হইবেন? এইরূপ সকল ক্ষেত্রে 'বিবেচনা' 'বিবেচিত' প্রভৃতি কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা এখনও ভারতবর্ষের লোকদের জানিতে বাকী আছে কি? বড় মেজ ছোট কত লাটের কাছে আমাদের কত ডেপুটেশ্যন বা প্রতিনিধিসমষ্টি গিয়াছে; তাহাদের কথা উক্ত উচ্চপদস্থ লোকদের দ্বারা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক "শ্রুত" ও "বিবেচিত" হইয়াছে; কিন্তু কর্ত্তাদের যাহা আগে হইতে স্থিরীকৃত সঙ্কল্প, কাজ তদনুসারেই হইয়াছে।

ভারতসচিব বলিতেছেন বটে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের কথা এমন সময়ে শোনা হইবে না যখন ক্যাবিনেটের (মন্ত্রিমণ্ডলের) মত পূর্ব্বেই ঘোষিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু এমন অবস্থায় শোনা যাইবে যখন মন্ত্রিমণ্ডলের মন স্থির-নিশ্চয় হয় নাই। মন্ত্রিমণ্ডলের মত "ঘোষিত" হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদের কথা শোনা হইবে, এবিষয়ে

সন্দেহ করি না। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ও ভারত গবর্ন্মেণ্টের পূর্ব্ববর্ণিত আলোচনার পর ক্যাবিনেটের মত "গঠিত" হইয়া গেলে কেবল "ঘোষিত" হইতে যখন বাকী থাকিবে, সেই অবস্থায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের মত "শ্রুত ও বিবেচিত" হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা; এবং তখন মন্ত্রিমণ্ডলের মনের দরজা নূতন কিছুর আগমন ও অভ্যর্থনার জন্ত ওপ্‌ন্ অর্থাৎ খোলা থাকিবে না। কারণ তাহার পূর্ব্বেই তাঁহারা স্থিরনিশ্চয় হইয়া যাইবেন।

—

পার্লেমেণ্ট ও বড়লাটের ঘোষণা

ভারতীয় নেতারা বড়লাটের ঘোষণার এই মানে ধরিয়া লইয়াছিলেন, যে, অতঃপর ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নত্বই দেওয়া হইবে, ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ও ডোমিনিয়নত্বের মধ্যে আর কোনও ব্যবধান থাকিবে না। নেতাদের এই অনুমান সত্য কি না, তাহা জানিবার জন্ত মিঃ লয়েড জর্জ্জ ভারতসচিব মিঃ বেনকে বার বার প্রশ্ন করেন, কিন্তু তিনি হাঁ কি না কিছুই বলেন নাই; বরং তিনি ও প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডন্যাল্ড বলিয়াছেন, মণ্টেগু ঘোষণার এবং ভারত-গবর্ন্মেণ্ট আইনের হেতুবাদে ব্যক্ত ভারতশাসন-নীতির বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই নীতি হইতেছে, ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে দায়ী গবর্ন্মেণ্টের উচ্চ চূড়ায় ভারতবর্ষকে আরোহণ করিতে দেওয়া। যে সকল ভারতীয় নেতা মনে করেন, শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের মতে আমাদের কেবল একটা ধাপ বাকী, এক লম্ফেই শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল আমাদিগকে তাহা অতিক্রম করিতে দিবেন, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন। আমরা কাজ না দেখিয়া বিশ্বাস করিব না। রাষ্ট্রনীতি জিনিষটি এমন নহে, যে, কোন এক জন বা দুজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সদভিপ্রায়ে সরল অন্তঃকরণে ঐকান্তিকতায় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

—

লর্ড আরুইনের সদভিপ্রায়ে বিশ্বাস

বিলাতী নানা কাগজে লেখা হইয়াছে, লর্ড আরুইনের ঐকান্তিকতায় ও সারল্যে ভারতীয়েরা মুগ্ধ, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের প্রতি ভারতীয়দের অবিশ্বাস তাঁহার দ্বারা দূর হইয়াছে, ইত্যাদি। ইংরেজদের ভারতীয় কাগজগুলাতেও এইরূপ কথা আছে। ইহার প্রতিধ্বনি ভারতীয় কতকগুলি কাগজের লেখাতেও লক্ষিত হয়। আমরা লর্ড আরুইনের এরূপ কোন জাদুকরী ক্ষমতার ফল প্রত্যক্ষ করি নাই। আমরা তাঁহাকে কপটাচারী বা সরল, কৌশলী বা ঋজু স্বভাবের মানুষ, কিছুই বলা দরকার মনে করি না। তাঁহার আগেকার কোন কোন বড়লাটকেও তাঁহারই মত প্রশংসা অনেকে করিয়াছিল। অন্ত অনেক বড়লাটকে কেন যে ঐরূপ প্রশংসা করা হয় নাই বলিতে পারি না। তাঁহারা কি সবাই প্রশংসিত লাটদের চেয়ে অধম ছিলেন? কেবলমাত্র লর্ড রিপনকে ইংরেজরা কেন বাহবা দেয় নাই, তাহা জানা কথা। এবিষয়ে বেশী কিছু লিখিবার প্রয়োজন দেখি না। আমাদের আসল প্রয়োজন কাজ লইয়া। কাহার অভিপ্রায় কি, তাহাতে আমাদের কি আসে যায়? একটা ইংরেজী প্রবাদ আছে, তাহাতে বলে, একটা অনুল্লেখ্য ও অবাঞ্ছিত স্থান সদভিপ্রায় দ্বারা আস্তীর্ণ। বর্ত্তমান ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল ও বড়লাট পরামর্শ করিয়া বড়লাটের ঘোষণাপত্রের মুসাবিদা করেন, ভারতসচিবের বক্তৃতা হইতে তাহা বুঝা যায়। তাঁহাদের এরূপ ঘোষণাপত্র রচনা করিবার উদ্দেশ্য খুবই ভাল হইতে পারে। কিন্তু ফল এ পর্য্যন্ত ভাল না হইয়া মন্দই হইয়াছে। ইহার দ্বারা নেতৃস্থানীয় ও অনেতৃস্থানীয় বিস্তর লোকের মধ্যে মতভেদ ও কলহের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের ঈপ্সিত স্বরাজলাভের অনুকূল নহে। তদ্ভিন্ন, অদূর ভবিষ্যতে ডোমিনিয়নত্ব না দিয়া বা অঙ্গীকার না করিয়াও, গত কংগ্রেসের ডোমিনিয়নত্ববিষয়ক প্রস্তাবটিকে বড়লাটের ঘোষণা দ্বারা যে কার্য্যতঃ নাকচ করা যাইতে পারে, তাহা কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না? কংগ্রেসের প্রস্তাবের এক অংশ এই ছিল, যে, ৩১শে ডিসেম্বর নাগাদ ডোমিনিয়নত্ব লাভ না হইলে বা নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে তাহা লাভের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পাইলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পূর্ণস্বাধীনতাকেই ভারতবর্ষের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার জন্য চেষ্টা আরব্ধ হইবে। বড়লাটের

ঘোষণা নেতারা সন্তোষকর বলিয়া গ্রহণ করিলে এই অংশ ব্যর্থ হইয়া যায়। কংগ্রেসের সমুদয় প্রস্তাবটিকে চতুরতাসহকারে ব্যর্থ করা ঘোষণাটির উদ্দেশ্য ছিল না, কেহ বলিতে পারেন কি? বড়লাট ও ভারতসচিবের এবং সমুদয় শ্রমিক ব্রিটিশ মন্ত্রীর অন্তরঙ্গ প্রাণের বন্ধু ভারতীয়দের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের মনের কথা জানিতে পারেন। অন্ত লোকেরা ত তাহা জানে না। তাহারা কাজের দ্বারা ও ফলের দ্বারাই বিচার করিবে। ইতিমধ্যেই বড়লাটের ঘোষণার ফল যাহা ফলিয়াছে, তাহা পার্লেমেণ্টে ভারতসচিবের বক্তৃতায় কতক পাওয়া যায়। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

First, I take Reuter's telegram of the day following that whereon the Announcement was made. "The reponse favourable to the Viceroy's Announcement is wider than might have been expected. The effect of the statement may be summed up as having at a stroke removed the tension from Indian politics and reintroduced a spirit of confidence and trust between the Government and the governed and delivered a blow at the independence movement, which has hitherto been gaining daily adherents among the Congressmen."

পাঠকদিগকে উদ্ধৃত শেষ কথাগুলি মন দিয়া পড়িতে বলি। রয়টারের প্রতিনিধির সঙ্গে সরকারী লোকদের দহরম মহরম আছে। তিনি বড়লাটের ঘোষণার পর দিন বিলাতে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন, যে, উহা "ভারতীয় স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার উপর খুব সাংঘাতিক এক কোপ মারিয়াছে—যে প্রচেষ্টায় তখন পর্য্যন্ত প্রত্যহ নূতন নূতন কংগ্রেসওয়ালারা যোগ দিতেছিল।"

আমরা উপরে ঘোষণাটির যেরূপ ফল বর্ণনা করিলাম এবং রয়টারের প্রতিনিধি যেরূপ ফল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য ঐরূপ নিশ্চয়ই ছিল না, কে বলিতে পারে? ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা দূরদর্শী না হইলে, কোন্ কাজের কোন্ চা'লের কিরূপ ফল হইবে আগে হইতে বুঝিতে না পারিলে, এত বড় সাম্রাজ্য চালাইতে পারিতেন না।

—

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের অঙ্গীকার-দানে বাধা কি ?

শ্রমিক গবন্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডনাল্ডকে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ বলডুইন জিজ্ঞাসা করেন, এ পর্য্যন্ত ভারতশাসনে যে নীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল বড়লাটের ঘোষণা সেই নীতির পরিবর্ত্তন সূচনা করিয়াছে কি না, কিংবা ভারতকে ডোমিনিয়নত্ব কবে দেওয়া হইবে তাহার সময় সম্বন্ধেও কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না। উত্তরে মিঃ ম্যাকডনাল্ড বলেন :—

"আপনার উ য় প্রশ্নের জবাবেই আমি বলিতেছি, "না"। আপনিও জানেন, যে, ভারতশাসনের নীতি ১৯১৯ সনের ভারতশাসন আইনেই বর্ণিত হইয়াছে। যাবৎ এবং যতদিন পার্লেমেণ্ট এই আইন সংশোধন না করেন, তাবৎ এই নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।"

এই জবাবে কোন ভুল নাই। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষকে অচিরে ডোমিনিয়নত্ব দিবার চেষ্টা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে কোন বাধা হয় না। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের যদি ভারতবর্ষকে অচিরে ডোমিনিয়ন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা বলিতে পারেন, "আমরা ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন করিবার একটি বিল পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিব।" পার্লেমেণ্টে তাহা পাস হইবে কিনা তাহা অবশ্য তাঁহারা বলিতে পারেন না। বিলাতের প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নানা বিষয়ে বিলাতের লোকদিগকে নিজেদের ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ নানা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষকে ওরূপ কথা দিলে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের লোকেরা খুব চীৎকার জুড়িয়া দিত বটে, এবং শ্রমিক গবন্মেণ্টকে পরাস্ত এবং ক্ষমতাচ্যুত করিতেও চেষ্টা করিত। কিন্তু ভবিষ্যতে শ্রমিক গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষের জন্ত কিছু করিতে চাহিলে তখনও ত ঐরূপ কাণ্ড হইবে। নিজেদের দেশের লোকদের জন্ত বিলাতী প্রত্যেক রাজনৈতিক দল বিরোধীদের যতটা আন্দোলন সহ্য করিতে প্রস্তুত হন, মিশরের জন্ত যতটা আন্দোলন সহ্য করিয়াছেন, ভারতবর্ষের জন্ত ততটা সহ্য করিতে প্রস্তুত নন।

সাইমন কমিশন নিয়োগে বিলাতী সব দলের লোকদের সম্মতি ছিল। আপত্তি উঠিতে পারে, যে, উহার রিপোর্ট বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রিমণ্ডল কেমন করিয়া ডোমিনিয়নত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলেন? উত্তরে আমরা বলি, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট মন্ত্রিমণ্ডল তাগিদ দিয়া ইতিপূর্ব্বেই বাহির করাইতে পারিতেন। সাইমন কমিশনের সহকারী হার্টগ কমিটি উহার পর নিযুক্ত হয়। তাহার রিপোর্ট বাহির হইয়া গিয়াছে। সাইমন কমিশনের সহকারী ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি স্যার্ শঙ্করন্ নায়ারের সভাপতিত্বে উক্ত কমিশনের অনেক পরে নিযুক্ত হয়। তাহার রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া তাহাতে সভ্যদের দস্তখত হইয়া গিয়াছে। এই কমিটির বিবেচ্য বিষয় সাইমন কমিশনের বিবেচ্য বিষয়ের সহিত এক। পরে নিযুক্ত দুই দুইটা কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া গেল, আর সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রস্তুত হইতে পারিত না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

আমাদের অনুমান এই, যে, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বাহির করা হইতেছে না। কারণ, খুব সম্ভব, ঐ কমিশন ভারতবর্ষকে অবিলম্বে ডোমিনিয়ন করিবার সুপারিশ করিবে না। তাহা ৩১শে ডিসেম্বরের আগে জানা পড়িলে, কংগ্রেসের পূর্ণস্বাধীনতা-কামী সভ্যেরা তৎক্ষণাৎ কংগ্রেস দ্বারা স্বাধীনতা ঘোষণা করাইবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাতে দেশে তুমুল আন্দোলন এবং তজ্জনিত অশান্তির সৃষ্টি হইবে। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট তাহা চান না; এবং তদ্রূপ আন্দোলন ও অশান্তি আগে হইতে বন্ধ করিবার জন্য সম্ভবতঃ বড়লাটের ঘোষণার উৎপত্তি।

—

ব্রিটিশ জাতির অভিনেতৃত্ব

খুব কর্ম্মিষ্ঠ না হইলে বৃহৎ সাম্রাজ্য চালান যায় না। কিন্তু অভিনেতাদিগকে যেমন ভাণ করিতে হয়, তাহা করিতে না পারিলেও সাম্রাজ্য চালান যায় না। বড়লাটের ঘোষণাটা যে আস্ত একটি দিল্লী কা লাড্ডু, নেতাদের বর্ণনাপত্রে স্বাক্ষরকারীরা ও তাঁহাদের নিতান্ত অনুগত লোকেরা ছাড়া এখন সকলেই তাহা বুঝিয়াছেন। অথচ ইহার সম্বন্ধে বিলাতে কি অভিনয়ই না হইয়া গেল! "ভারতবর্ষে বাঘ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে," ভারতে ব্রিটিশ ক্ষমতার লোপ হইল, ইত্যাকার কত রব তথায় উত্থিত হইল; লর্ডস্ ও কমন্সে বিরুদ্ধ প্রস্তাব এবং উভয় পক্ষের বক্তৃতা হইল, প্রশ্নোত্তর, রাগারাগি, কত কি হইল। যেন ভারতবর্ষে বড়লাট একটা 'অনাছিষ্টি' মারাত্মক কিছু করিয়া বসিয়াছেন! কিন্তু রাজনৈতিক অভিনয় ও চা'লবাজী আমরাও অল্পস্বল্প যে না বুঝি, এমন নয়। অতএব বলি, প্রভুরা নিজমূর্ত্তি ধরিলে ভাল হয়। প্রকৃত রুদ্র মূর্ত্তি ছদ্ম প্রসন্ন মূর্ত্তি অপেক্ষা পরিণামে হিতকর, যদিও আপাতমধুর নহে।

—

নেতাদের সর্ত্ত

সরকার পক্ষের প্রস্তাবিত কন্‌ফারেন্সটিকে সুফলপ্রদ করিতে হইলে ভারতবর্ষে লোকের মনের ভাব শান্ত ও গবর্ন্মেণ্টের প্রতি মৈত্রীসম্পন্ন হওয়া দরকার বলিয়া, অন্যান্য সর্ত্তের মধ্যে নেতারা লর্ড আরুইনকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে হত্যাদি অপরাধ ভিন্ন অন্য অপরাধে দণ্ডিত কয়েদীদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক। অনুরোধের ফল কিরূপ হইবে, তাহা নীচে মুদ্রিত বিলাতী টেলিগ্রামগুলি হইতে পাঠকেরা অনুমান করিতে পারিবেন।

লণ্ডন ১২ই নবেম্বর। গতকল্য কমন্স সভার অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর-দানের সময় স্বাধীন শ্রমিকদলের রাজনৈতিক সেক্রেটারি এরূপ প্রস্তাব করেন, যে, বড়লাটের ঘোষণার পর সদ্ভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করা হউক এবং যে সব ক্ষেত্রে মুক্তিদান করিলে হিংসা নিবারণের পক্ষে বাধার সৃষ্টি হইবে না, সেই সব বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।

মিঃ ওয়েজউড বেন দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, যে তিনি সেরূপ কোন ব্যবস্থা করিতে সমর্থ নহেন।

ভারতবর্ষে দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারা অনুসারে রাজদ্রোহ মামলার সংখ্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যে অতঃপর মামলার সীমা সঙ্কীর্ণ করিয়া কেবল মাত্র হিংসামূলক কার্য্যাবলীর জন্য কিংবা যে সব স্থলে ঐরূপ কার্য্যে প্রেরণা দেওয়া হইয়া থাকে, কেবলমাত্র সেরূপ ক্ষেত্রেই এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করার নিয়ম করা হইবে কি না?

ভারতসচিব উত্তরে বলেন, যে, ইহা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচ্য ব্যাপার। দণ্ডবিধি অনুসারে পরিষ্কারভাবে আইন লঙ্ঘন করা না হইয়া থাকিলে, কোন রাজদ্রোহের অভিযোগ উত্থাপিত হয় না।

লণ্ডন ১২ই নবেম্বর। অদ্য কমন্স সভায় কমাণ্ডার কেনওয়ার্দি প্রশ্ন করেন, যে, ভারতের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যবহার করা হইবে?

মিঃ ওয়েজউড বেন উত্তরে বলেন, এক্ষণে গুপ্তভাবে এই বিষয়ে একটি তদন্ত চলিতেছে, সুতরাং এখন তিনি তৎসম্পর্কে কোনও উত্তর দিতে পারেন না।

মীরাট মামলা আরম্ভ হইবার পর হইতে, বৈপ্লবিক প্রচার কার্য্য হইয়াছে বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে, তাহা রুশিয়ার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের পর হইতে থামিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে, মিঃ বেন্ বলেন যে মীরাট মামলা এখনও বিচারাধীন।

মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে বলেন যে, পঞ্জাবের কর্ত্তৃপক্ষ কংগ্রেসের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের পিছনে গোয়েন্দা লাগাইয়াছেন এবং লোকেরা যাহাতে লাহোর কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে না পারে, এরূপ ভাবে চাপ দেওয়া হইতেছে।

এই উক্তির জবাবে মিঃ বেন্ বলেন যে, তিনি এই বিষয়ে তদন্ত করিবেন।

—

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র, দার্শনিক সাধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "সাধনা" তিনি কিছু কাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। ছোটগল্প লেখায় এবং নানাবিধ প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি অতি নিরহঙ্কার অমায়িক সরল ও সাধু স্বভাবের লোক ছিলেন। নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তিনি পরিশ্রম দ্বারা সহায়তা করিতেন।

—

বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা বিল

ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বাংলা দেশের প্রতি টাকা সম্বন্ধে বরাবর অবিচার করিয়া আসিতেছেন; বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের অধিকাংশ বরাবর অন্যত্র খরচ করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য প্রদেশে প্রাপ্ত রাজস্বের যত অংশ তাহাদিগকে খরচ করিতে দেওয়া হয়, বাংলাকে তত অংশ দিলে এখানে অনায়াসে সব বালকবালিকা বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষা পাইতে পারে; তাহার জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। এই হেতু আমরা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ট্যাক্স বসাইবার বিরোধী। কিন্তু সিলেক্ট কমিটী এখন ট্যাক্সের হার ও ভাগ যাহা করিয়াছেন, তাহা আগেকার চেয়ে ভাল। আগে হার ছিল জমীর খাজানার টাকা প্রতি পাঁচ পয়সা; এবং ভাগ ছিল ঐ পাঁচ পয়সার এক পয়সা দিবেন জমীদার, চারি পয়সা দিবেন রায়ৎ। এখন হার ও ভাগ হইয়াছে, খাজানার টাকা প্রতি চারি পয়সা এবং জমিদার ও রায়ৎ দুপয়সা করিয়া তাহা দিবেন। তা ছাড়া, বঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য যাহারা করেন তাঁহাদের উপরও শিক্ষা-ট্যাক্স বসান হইবে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এক শত টাকার অধিক হইবে না।

আগেকার বিলে প্রাথমিক শিক্ষাদান সম্বন্ধে সব কাজ করিবার ভার ছিল গবর্ন্মেণ্টের উপর। সংশোধিত বিলে ভার দেওয়া হইয়াছে একটি লোকপ্রতিনিধি বোর্ড বা সমিতির উপর। এই পরিবর্ত্তন অনুমোদনীয়। সিলেক্ট কমিটি আরও দুটি ভাল প্রস্তাব করিয়াছেন। যেখানে যেখানে শিক্ষা-ট্যাক্স বসিবে, সেখানে পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বেতন দিতে হইবে না। দ্বিতীয় প্রস্তাব, দশবৎসরের মধ্যে বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করিতে হইবে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা কিরূপে পাঁচ বৎসরে আবশ্যিক করা যায়, তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। বাংলা দেশের গবর্ন্মেণ্ট ও লোকেরা পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছেন।

—

রুশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার নববিধ চেষ্টা

অনেক দেশে আগে এইরূপ নিয়ম ছিল এবং এখনও আছে, যে, সমর্থ-বয়সের সুস্থ সব পুরুষকে যুদ্ধ শিখিতে এবং দরকার মত যুদ্ধ করিতে হইবে। এই নিয়মকে কন্স্ক্রিপ্‌শ্যন বা বলপূর্ব্বক যোদ্ধৃতালিকাভুক্তকরণ বলে। রুশিয়ার একটি সহরে অন্য রকমের কন্স্ক্রিপশ্যন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেখানে নিয়ম হইয়াছে, যে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধের প্রকার ও প্রণালী এই, যে, ১৮ ও ৫০ বৎসর বয়সের প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, যাহারা কোন বিদ্যাশালায় ৬ বৎসরের অধিক শিক্ষা পাইয়াছে, বৎসরে ২১৮ ঘণ্টা শিক্ষা দিতে বাধ্য হইবে।

নৈশ বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা দিতে হইবে। সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রী কাহারও দৈনিক নিত্য কর্ম্মে বাধা জন্মিবে না। যাহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সময় কাজ করিতে পারিতেছে না দেখা যাইবে, তাহাদের উপর একটা বিশেষ ট্যাক্স বসান হইবে। "ওয়েলফেয়ার" নামক কলিকাতার ইংরেজী সাপ্তাহিকে এই সংবাদটি দেওয়া হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মানুষের উপর ট্যাক্স বসান অপেক্ষা রুশিয়ার এই সহরের ঐ নিয়মটি সুচিন্তিত এবং অর্থনীতিশাস্ত্রের অধিকতর অনুমোদিত। ট্যাক্স বসাইলে লোকের নিয়মিত আয় কমান হয়। কিন্তু রুশিয়ার এই নিয়মটিতে অধিবাসীদের আয়ের সমষ্টি পরোক্ষভাবে বাড়িয়া যায়। কারণ, যে শিক্ষাদানের কাজটি অনেক টাকা খরচ করিয়া করাইতে হইত, অধিবাসীদিগের অবসর সময়ের কিয়দংশের সদ্ব্যয়ে তাহা নির্ব্বাহিত হইয়া যাইবে। সুতরাং বেতনভোগী শিক্ষক রাখিতে হইলে যত ব্যয় হইত, সমগ্র সমাজের আয় তত বাড়িয়া সৎকার্য্যে তাহা ব্যয়িত হইতেছে, ধরিতে হইবে। অবসর-সময়ের এরূপ সদ্ব্যয়ে, বিনাবেতনে শিক্ষা যাঁহারা দিবেন, মানব-সেবা দ্বারা তাঁহাদেরও চারিত্রিক উন্নতি হইবে।

বঙ্গে ও ভারতবর্ষের অন্য সব প্রদেশে এইরূপ নিয়ম করিলে খুব ভাল হয়। তাহাতে নিরক্ষরদের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং অলস প্রকৃতির শিক্ষিত লোকদের আলস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—যুগপৎ উভয়ই করা হইবে।

গবর্মেণ্ট রুশিয়ার সহরটির মত আইন নিশ্চয়ই করিবেন না। কিন্তু আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া একমত হইয়া এরূপ নিয়ম অন্ততঃ ক্ষুদ্র এক একটি গ্রামের জন্যও করিতে পারি না কি? এক জন মানুষও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ নিয়মপালনের ব্রত গ্রহণ করিলে তাহারও সুফল ফলিবে।

—

সন্তরণ-দক্ষতা

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ পাল বাগবাজারের ষ্টীমার ঘাটে সাঁতার দিয়া সর্ব্বাগ্রে গঙ্গা পার হওয়ায় পুরস্কৃত হইয়াছেন। পার হইতে তাঁহার ২১ মিনিট ৫০ সেকেণ্ড লাগিয়াছিল।

—

বাল্যবিবাহনিরোধ আইন ও স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীযুক্ত হরবিলাস শারদা মহাশয়ের দ্বারা উপস্থাপিত বাল্যবিবাহনিরোধ বিল আইনে পরিণত হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রভূত মঙ্গল হইবে। তাহার মধ্যে বালিকাদের শিক্ষার অধিকতর সুযোগপ্রাপ্তির কথাই এখন বলিতে চাই।

বালিকাদের শিক্ষার বাধা যত আছে, অল্প বয়সে

রায় সাহেব হরবিলাস শারদা

বিবাহ তাহার মধ্যে একটি। বাল্যবিবাহ প্রথা থাকায়, যে-সব বালিকা পাঠশালায় যাইত তাহাদিগকেও অল্প বয়সে লেখাপড়া ছাড়াইয়া আনা হইত। ফলে, তাহারা অল্প যাহা শিখিত, তাহাও অনেকে কালক্রমে ভুলিয়া যাইত। বাল্যবিবাহনিরোধ আইন হওয়ায় এখন বালিকাদিগকে অন্যূন চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিতে হইবে। অতঃপর যাঁহারা বালিকা-দিগকে কিছু শিক্ষা দিতে চান, তাঁহারা তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্ত যথেষ্ট সময় পাইবেন

ছয় বৎসরে হাতে-খড়ি দিয়া চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত লেখাপড়া শিখাইলে আট বৎসরে মোটামুটি অনেক বিষয় শিখান যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে হাজার-করা কতজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক লিখন-পঠনক্ষম ছিল, তাহা হইতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা শিক্ষায় পরস্পর হইতে কত দূরে বুঝা যাইবে।

প্রদেশ	হাজার-করা লিখনপঠনক্ষম পুরুষ	হাজার-করা লিখনপঠনক্ষম স্ত্রীলোক
মান্দ্রাজ	১৫২	২১
বোম্বাই	১৪১	২৫
বাংলা	১৫৯	১৮
আগ্রা-অযোধ্যা	৬৫	৬
পঞ্জাব	৬৭	৮
ব্রহ্মদেশ	৪৪৮	৯৭
বিহার-উড়িষ্যা	৮৮	৬
মধ্যপ্রদেশ	৮৪	৭
আসাম	১১০	১৩
ব্রিটিশ ভারত	১৩০	১৮

১৯২১ সালে সমগ্রভারতে প্রতি পঞ্চাশ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে এক জনের কম স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানিত; এখন তার চেয়ে অবস্থা যে বেশী ভাল হইয়াছে, তাহা নয়। ঐ সালে প্রতি সাত জন পুরুষের মধ্যে এক জনের কম লেখা পড়া জানিত। বাংলা দেশে ঐ সালে শতকরা প্রায় ১৬ জন পুরুষ এবং শতকরা প্রায় ২ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিত; অর্থাৎ পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সামান্য লেখাপড়ারও বিস্তার অষ্টমাংশেরও কম হইয়াছিল।

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ ভারতে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিক্ষালয় কত ছিল দেখাইতেছি।

	প্রাথমিক	উচ্চতর	আর্ট্‌স্ কলেজ
ছেলেদের জন্য	১৬২,৬১৬	১০,৩৭৩	২১৩
মেয়েদের জন্য	২৬,৬৮২	৯৬৫	১৯

মেয়েদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছেলেদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সংখ্যায় অত্যন্ত কম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মোট পুরুষ ও স্ত্রীলোক অধিবাসীর মধ্যে শতকরা কতজন পাঠশালা হইতে কলেজ পর্যন্ত সবরকম প্রতিষ্ঠানে ১৯২৭ সালে শিক্ষা পাইতেছিল, নীচে তাহার সংখ্যা দেওয়া হইল।

প্রদেশ	মেয়ে	ছেলে
মান্দ্রাজ	২.৫	৯.২
বোম্বাই	২.৩	৮.৮
বাংলা	১.৮	৭.৭
আগ্রা-অযোধ্যা	০.৫	৪.৮
পঞ্জাব	০.৮	১.৮
ব্রহ্মদেশ	২.৬	৪.১
বিহার-উড়িষ্যা	০.৭	৫.৬
মধ্যপ্রদেশ	০.৬	৫.০
আসাম	০.৯	৭.৯
ব্রিটিশ ভারত	১.৫	৬.৯

ছেলেদের শিক্ষা মেয়েদের শিক্ষা, কোনটাতেই বাংলা দেশ প্রথমশ্রেণীস্থ নহে। ছেলেদের শিক্ষায় বাংলা চতুর্থস্থানীয়, মেয়েদের শিক্ষাতেও চতুর্থস্থানীয়।

১৯২৭ সালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য কত খরচ হইয়াছিল এবং ছেলেদের শিক্ষার তাহা শতকরা কত অংশ, নীচের তালিকায় দেখান গেল।

প্রদেশ	মোট ব্যয়	ছেলেদের শিক্ষাব্যয়ের শতকরা কত
মান্দ্রাজ	৪৯.৮৫ লক্ষ	১৭.২
বোম্বাই	৫৩.২৫ ,,	১৯.৫
বাংলা	২৮.০৯ ,,	১০.৯
আগ্রা-অযোধ্যা	২৩.১৪ ,,	১২.১
পঞ্জাব	১৯.৭৬ ,,	১০.৪
ব্রহ্মদেশ	১৭.০২ ,,	১৮.১
বিহার-উড়িষ্যা	৮.০৪ ,,	৭.৩
মধ্যপ্রদেশ	৬.৪৪ ,,	৯.৭
আসাম	২.৭৫ ,,	১০.১
ব্রিটিশভারত	২১৯.৯২ ,,	১৪.৪

সমগ্র ব্রিটিশভারতে ছেলেদের শিক্ষার জন্য যত ব্যয় হয়, মেয়েদের জন্য তাহার সাত ভাগের একভাগ খরচ হয়; বাংলা দেশে মেয়েদের শিক্ষার ব্যয় ছেলেদের শিক্ষা ব্যয়ের নয় ভাগের এক ভাগ। টাকার পরিমাণ ধরিলে দেখা যায়, বাংলা দেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে অনেক কম খরচ হয়। বস্তুতঃ প্রকৃত তুলনা করিতে হইলে কোন্ প্রদেশে নারীর সংখ্যা কত তাহা বিবেচনা করা উচিত। মোটামুটি ঐ সংখ্যা দিতেছি। মান্দ্রাজ ২১০ লক্ষ, বোম্বাই ৯০ লক্ষ, বাংলা ২২০ লক্ষ, আগ্রা-অযোধ্যা ২১০ লক্ষ, পঞ্জাব ৯০ লক্ষ, ব্রহ্মদেশ ৬০ লক্ষ, বিহার-উড়িষ্যা ১৭০ লক্ষ, মধ্যভারত ৭০ লক্ষ, আসাম ৩০ লক্ষ, ব্রিটিশভারত ১২০০ লক্ষ। বাংলা-দেশে বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষার জন্য বোম্বাই মান্দ্রাজ

পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণ অত্যন্ত কম উৎসাহ দেখাইয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা শোচনীয়। এ বিষয়ে শিক্ষিতা মহিলাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহা হইতে অনেক সুফলের আশা করা যাইতে পারে। শিক্ষিত পুরুষদেরও অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সকল দিক দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন এখনও আছে। এখানে কেবল এক প্রকার প্রয়োজনের কথা বলিতেছি।

বাল্যবিবাহনিরোধ আইন পাস হওয়ায় এখন বালিকাদিগকে অন্যূন চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিতেই হইবে। যে-সব অভিভাবক বালিকাদিগকে শিক্ষিত করিতে চান, তাঁহারা, চৌদ্দ কেন, ষোল পর্য্যন্তও তাহাদিগকে স্কুলে রাখিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে চাহিবেন। তাঁহাদের প্রধান বাধা হইবে, দেশে যথেষ্ট উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ের অভাব। প্রত্যেক জেলার সদরে একটি ও মহকুমাগুলিতে একটি করিয়া এরূপ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত।

যাঁহারা এখন নিজেদের বাড়ীর মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন না, তাঁহাদিগকে নূতন আইনের দ্বারা পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা ভাবিতে হইবে। চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে অশিক্ষিত অবস্থায় অবিবাহিত রাখায় তাহাদের বিপদের আশঙ্কা এবং সামাজিক অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। ছোট মেয়েদের প্রতি দুষ্ট লোকদের যত দৃষ্টি পড়ে, অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক মেয়েদের প্রতি তাহাদের পাপদৃষ্টি তার চেয়ে অনেক বেশী পড়িবার কথা। এবং বাংলা দেশের হিন্দুসমাজে অবিবাহিতা বালিকারা সমান বয়সের বিবাহিতাদের চেয়ে চলাফিরার স্বাধীনতা অধিক পাইয়া থাকে। তাহা তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই—তাহা কমান উচিত নহে। কিন্তু স্বাধীনতাকে যথাসম্ভব নিরাপদ করিবার জন্য বালিকাদিগকে নৈতিক, দৈহিক ও সাধারণ শিক্ষা ভাল রকমের দেওয়া দরকার। তাহাদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য যতটা জন্মে ততই মঙ্গল। অবশ্য, যে-দেশে নারীদের স্বাধীনতা যে-পরিমাণে বাড়িবে, সে-দেশে তাহাদের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সেই পরিমাণে পুরুষদের সাহস চারিত্রিক দৃঢ়তা—এক কথায় প্রকৃত পৌরুষ—বাড়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বিস্মৃত হইতেছি না। কিন্তু বাংলা দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে, অন্ততঃ পুরুষ রক্ষক কেহ না আসিয়া পৌঁছা পর্য্যন্ত, মেয়েদের আত্মরক্ষা চেষ্টার সাহস ও সামর্থ্য, সাহায্যের প্রয়োজন জানাইবার মত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহস, থাকা দরকার। দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক সুশিক্ষা হইলে এইরূপ সামর্থ্য ও সাহস জন্মিবে ও বাড়িবে।

দেশে পুরুষদের মধ্যেও অধিকাংশ অশিক্ষিত, এবং শিক্ষিতদের মধ্যেও অনেকে অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুযায়ী ব্যবস্থার আবশ্যকতা সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। যাঁহারা চিন্তা করিতে অসমর্থ এবং যাঁহারা সামর্থ্য থাকিতেও চিন্তা করেন না, এইরূপ সকল লোকদের চিন্তার অভাব সমাজহিতৈষী সমাজনেতাদিগকে দূর করিতে হইবে।

বাল্যবিবাহনিরোধ আইন পাস হইবার পূর্ব্বেও বালিকাদের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। আমরা বঙ্গের অবস্থা বুঝিয়া মনে করি তাহার প্রয়োজন এখন বাড়িল। যে জমীতে চাষ হয় না, তাহাতে আগাছা জন্মে। শিক্ষার দ্বারা হৃদয়মনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা না হইলে তাহাতেও আগাছা জন্মে। একথা সকলকে মনে রাখিতে হইবে।

ছেলেদের জন্য যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, মেয়েদের জন্য তাহা সর্ব্বাংশে উপযোগী নহে। কিন্তু ইহাও সত্য নহে, যে, উভয়ের শিক্ষা একেবারেই আলাদা রকমের হওয়া চাই। বালিকাদের সম্পূর্ণ উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া না-উঠা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যে-সব বালিকা-বিদ্যালয় ও কলেজ আছে, তাহারই সাহায্য লইতে হইবে।

যাঁহারা আধুনিক রকমের বালিকা-বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা সেই ওজুহাতে নিজেদের বাড়ীর বালিকাদিগকে মূর্খ করিয়া রাখিলে তাহাদের সাতিশয় অনিষ্ট করিবেন। অন্য রকমের বালিকা-বিদ্যালয়ও কতকগুলি আছে, এবং তাহার পক্ষপাতীরা চেষ্টা করিলে তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে পারে। কলিকাতায় শ্যামবাজারে যে সারদেশ্বরী আশ্রম ও বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তাহাতে কতক প্রাচীন রীতি ও কতক আধুনিক প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। যাঁহাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তাঁহারা এখানে বালিকাদিগকে পাঠাইতে পারেন। মৈমনসিংহ প্রভৃতি সহরে মহাকালী পাঠশালা আছে।

তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বালিকারাও পড়ে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত ভদ্রকালী ব্রহ্মচর্য্য বালিকা আশ্রমের বৃত্তান্ত তাহার একজন কর্ম্মী আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। তাহা পড়িয়া মনে হয়, সেখানেও প্রাচীন ধরণের শিক্ষার সহিত নানাবিধ অর্থকর কাজ শিখান হইয়া থাকে।

—

শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন

অনেক বাধা সত্ত্বেও বঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। বঙ্গের বাহিরেও বাঙালী শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক হয়। এই জন্য অনেক শিক্ষিতা মহিলা শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে সমাজের উপকার হইবে, এবং তাঁহাদেরও উপকার হইবে। আমরা কার্ত্তিকের প্রবাসীতে ১৫৯—৬০ পৃষ্ঠায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে তুলনা করিবার জন্য যে তালিকা দিয়াছি তাহাতে দেখা যায়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মহিলা অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষা দেন। ঐ প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের ইহা অন্যতম কারণ।

শিক্ষয়িত্রীর কাজ লোকহিতকর ও সম্মানের কাজ, ইহা মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই বুঝিতে হইবে। আর একটি বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে। উত্তর-ভারতে পর্দ্দা-প্রথা থাকায় যাঁহারা বাহিরে চলাফিরা করেন এরূপ মহিলাদের চালচলন গতিবিধি নূতনত্ববশতঃ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং সে বিষয়ে আলোচনাও হয়। কিন্তু আমাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে, যাহাতে কোন শিক্ষিতা মহিলার সম্বন্ধে কেহ মন্দ একটা কিছু বলিলেই তাহা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস না করিয়া বসি। পুরুষদের সম্বন্ধে মন্দ কিছু সহজে বিশ্বাস করা দোষের বিষয়। মহিলাদের সম্বন্ধে সেরূপ কিছু সহজে বিশ্বাস করা অধিকতর দোষের বিষয়। কারণ মিথ্যা নিন্দায় তাঁহাদের ক্ষতি বেশী হয়, এবং সেরূপ নিন্দা হইতে আত্মরক্ষার উপায় তাঁহাদের কম। মহিলাদিগের প্রতি আমাদের মনের ভাব তাঁহাদের সমক্ষে এবং অন্যত্র সশ্রদ্ধ হওয়া উচিত।

পল্লীগ্রামস্থিত বালিকা-বিদ্যালয় সমূহের জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কলিকাতার নারীশিক্ষাসমিতি চেষ্টা করিতেছেন। সমিতির চেষ্টা কোন কোন স্থলে সফল হইয়াছে। এই চেষ্টার বিশেষ বৃত্তান্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়কে ৬।১ বিদ্যা-সাগর ষ্ট্রীট ঠিকানায় চিঠি লিখিলে জানিতে পারা যাইবে।

—

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল

কয়েকদিন হইল আমরা কুষ্টিয়ার ৺মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোহিনী মিল দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা খুব বড় কারখানা নয়, কিন্তু ইহাতে প্রস্তুত সুতা ও কাপড় উৎকৃষ্ট। ৬০ নং পর্য্যন্ত সুতা ও তাহার কাপড় এই মিলে প্রস্তুত হইতেছে, দেখিলাম। ৮০ ও ১১০ নম্বরের সুতা আমদানী করিয়া এখন তাহা হইতে কাপড় বুনান হয়। এরূপ সুতাও এই মিলে ভবিষ্যতে প্রস্তুত হইবে।

এই মিলটির একটি বিশেষত্ব এই, যে, ইহার অধিকাংশ শ্রমিক ও কারিগর বাঙালী, এবং অনেকে নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে আসিয়া কাজ করিয়া কর্ম্মান্তে প্রত্যহ বাড়ী ফিরিয়া যায়। তজ্জন্য তাহারা পারিবারিক জীবনের প্রভাবের বাহিরে চলিয়া যায় না।

—

চট্টগ্রামের সতীশচন্দ্র ঘোষ

চট্টগ্রাম জেলার সতীশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন সাহিত্যিক কর্ম্মীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি অনেক কষ্টস্বীকার করিয়া চাক্‌মা জাতির বৃত্তান্ত রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিল। চট্টগ্রামের বিবরণী তাঁহার অন্যতম পুস্তক। তিনি আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। বঙ্গের নানা অঞ্চল হইতে তিনি কথাবার্ত্তায় চলিত প্রায় ছয় হাজার শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপ চলিত শব্দের একটি অভিধান লিখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

—

মন্দিরে প্রবেশের জন্য সত্যাগ্রহ

হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে সচরাচর কয়েকটি "উচ্চ" জাতির লোক ভিন্ন অন্য জাতির লোকদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এমন কি, পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরেও চর্ম্মকারদিগের প্রবেশের নিষেধ আছে। দুই এক জায়গায় সদাশয় কোন কোন হিন্দু ভদ্রলোক তাঁহাদের অধিকারভুক্ত মন্দিরে সকল হিন্দু জাতিকেই প্রবেশ করিতে দিতেছেন। যেমন শেঠ যমুনালাল বজাজ। অন্যত্র কোথাও কোথাও সকল জাতির জন্য সব মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভের চেষ্টা হইতেছে। ইহার জন্য মহারাষ্ট্রে পুণায়, বঙ্গে মুন্সীগঞ্জে সত্যাগ্রহ চলিতেছে। কখন কখন সত্যাগ্রহ মারামারিতে পরিণত হইতেছে, এইরূপ সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইতেছে। এই সমস্যাটির নিরুপদ্রব মীমাংসা হইলে বড় ভাল হয়। যাঁহাদিগকে মন্দিরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না, আমরা সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহাদের অভিলাষের সমর্থন করি। কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন পক্ষেরই জোর-জবরদস্তী আমরা পছন্দ করি না। জোর করিয়া মন্দিরে ঢুকিয়া পূজা করিবার

চেষ্টা করিলে, "পৈত্রিক গুরু" পায়ের ধূলা দিতে রাজী না হওয়ায় যে শিষ্য জুতা মারিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা আদায় করিবার ভয় দেখাইয়াছিল, তাহার কথা মনে পড়ে। আমাদের বিবেচনায় আপোষে নিষ্পত্তি যত হয়, ততই ভাল। কিন্তু ধর্‌না দেওয়াতে কাহারও বাধা দেওয়াও উচিত নয়।

ব্রাহ্মণেরা যদি নিতান্ত একগুঁয়েমি করেন, তাহা হইলে অন্যেরা নিজেদের মন্দির নির্ম্মাণ করাইবেন ও তাহাতে বিগ্রহ স্থাপন করাইবেন। তাহাতে তাঁহাদের কি লাভ? আর যিনি পতিতপাবন, তাঁহার মন্দিরে কেহ ঢুকিলে তিনি অপবিত্র হইয়া যাইবেন, এমন অদ্ভুত ধারণা কেমন করিয়া জন্মে? ব্রাহ্মণেরা যাঁহাদিগকে হেয় মনে করিতেছেন, তাঁহারা খৃষ্টিয়ান বা মুসলমান হইয়া গেলে তাঁহাদের কি লাভ হইবে?

"যোগ্যপাত্রে পুষ্পমাল্য"

"সঞ্জীবনী" এই নাম দিয়া লিখিয়াছেন :—

"আমাদের দেশে যাঁহারা সম্মানিত, যাঁহারা নানা গুণসম্পন্ন, যাঁহারা ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান্‌, যাঁহারা দেশহিতৈষী, এমন সকল ব্যক্তিকে ফুলের মালা দিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করি ও তাঁহার কার্য্য সমর্থন করি। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন, শ্রীমতী বেশান্ত, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ধর্ম্মগুরু, পীর, হাজি ও মৌলানা সকলকে পুষ্পমাল্যে সম্মান করা হয়। বরিশালের গোকনা-অপহরণকারী মহিউদ্দীন পাঁচ শত টাকার জামিনে খালাস পাইলে বরিশালের মুসলমানগণ তাহাকে পুষ্প ও মাল্যে ভূষিত করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট।"

কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা

দিঘাপাতিয়ার পরলোকগত কুমার বসন্তকুমার রায় নিজের জেলায় কৃষিশিক্ষা দিবার জন্য উইল দ্বারা যে আড়াই লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সুদে-আসলে এখন ৫ লক্ষ হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, গবর্মেণ্ট তাহার দ্বারা সত্বর রাজশাহীতে কৃষিশিক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন।

জগত্তারিণী পদক

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বীয় জননীর নামের এই পদক বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদিগকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্তা কামিনী রায়কে ইহা দিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচন সকল দিক্‌ দিয়া প্রশংসনীয় হইয়াছে।

স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষার বিস্তার

স্বায়ত্তশাসন খুব অল্প ও আংশিক হইলেও যে তাহা সম্পূর্ণ পরায়ত্ত শাসন অপেক্ষা সুফলপ্রদ হয়, তাহার প্রমাণ পাইলে সহজেই মনে হয়, সম্পূর্ণ স্বরাজ নিশ্চয়ই অধিকতর সুফলপ্রদ হইবে। কয়েক বৎসর হইল শিক্ষা মন্ত্রীদের হাতে গিয়াছে। তাঁহারা যথেষ্ট টাকা পান নাই এবং স্বাধীনভাবে কাজ করিতেও পান নাই। তথাপি কিরূপ ফল হইয়াছে দেখুন। ১৯২২ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের সরকারী শিক্ষা রিপোর্টে ভারত-গবর্মেণ্টের শিক্ষা কমিশনার লিখিতেছেন :—

"Whatever may be the opinions held regarding the methods adopted or the standards of education attained, the foregoing tables unquestionably reveal the fact that there has been remarkable and unprecedented expansion during the quinquennium. The number of recognized institutions has increased by 37.737 as against an increase of 18, 347 institutions in the previous quinquennium, and the number of scholars under instruction in recognized institutions of all kinds has increased by 2 787,125 as against an increase of only 534 917 in the previous period. It is true that progress in the previous quinquennium was seriously handicapped by post-war economic conditions, by epidemics and the non-co-operation movement. But even the removal of these obstacles during the period under review cannot by any means account solely for the recent remarkable statistical advance. The increase in the total number of pupils under instruction is over 100 per cent. higher than any previously recorded increase, the increase in the number of pupils in both recognized and unrecogniezd institutions between 1911-12 and 1916-17 being only just over 1,000,000. The progress made during the quinquennium can be appreciated by the fact that while prior to 1922 it took 42 years to increase the enrolment by less than 6.5 millions, it has taken only 5 years since 1922 to increase the total enrolment by over 2.75 millions in all kinds of institutions. In fact over one quarter of the present enrolment has been contributed during the last five years only."

রিপোর্টটির এই অনুচ্ছেদে বলা হইতেছে, যে, ১৯২২-২৭ বর্ষপঞ্চককে পূর্ব্বের যে-কোন বর্ষপঞ্চক অপেক্ষা শতকরা ১০০ জনের বেশী ছাত্র সব রকম শিক্ষালয়ে মোট বাড়িয়াছে। ১৯১৭-২২এ ৫৩৪,৯১৭ বাড়িয়াছিল, ১৯২২-২৭এ ২৭,৮৭,১২৫ বাড়িয়াছে; ১৯১১-১২ ও ১৯১৬-১৭র মধ্যে মোটে ১০লক্ষ বাড়িয়াছিল। ১৯২২এর আগে ৪২ বৎসরে ৬৫লক্ষ ছাত্র বাড়িয়াছিল, কিন্তু ১৯২২-২৭ পাঁচ বৎসরেই ২৭॥ লক্ষ বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যার সিকি অংশ গত পাঁচ বৎসরেই বাড়িয়াছে।

এই অঙ্কগুলি হইতে কেবল যে পরায়ত্ত শাসন অপেক্ষা স্বল্পমাত্র স্বায়ত্তশাসনের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়, তাহা নহে, আগেকার শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষদিগের অবহেলার পরিচয়ও ইহা হইতে পাওয়া যায়।

প্রবাসী প্রেস, ১২০-২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
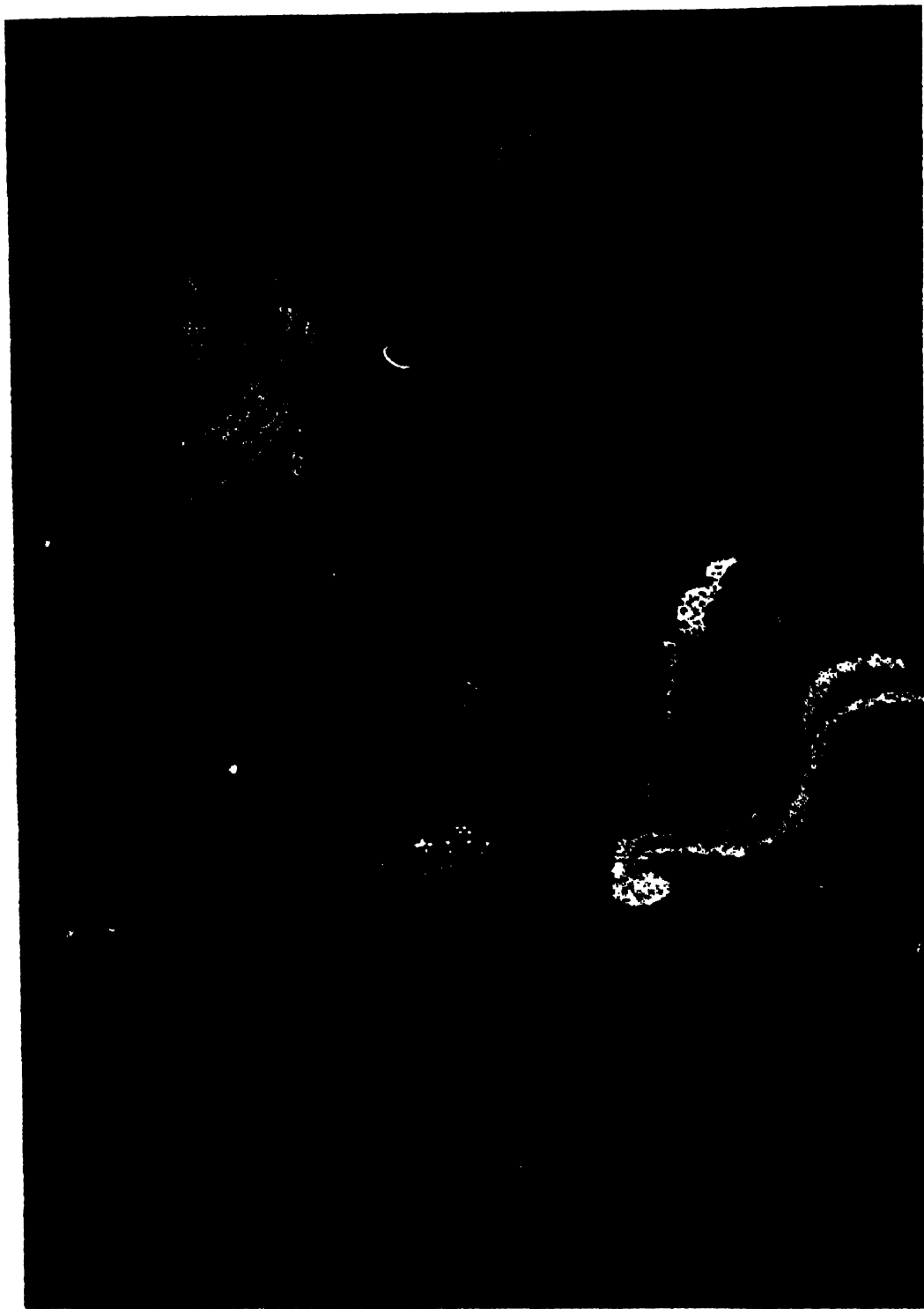
সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩৬

৩য় সংখ্যা

কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোরীয় যুবকটি সাধারণ জাপানীর চেয়ে মাথায় বড়ো। ইংরেজি সহজে বলেন, উচ্চারণে জড়তা নেই। জাপানী রসনায় ইংরেজি ভাষা অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। ভাষায় যত সহজ অধিকার থাকে ভাবেরও তত উজ্জ্বলতা। অনেক সময় যাদের মনে করি ক্ষীণবুদ্ধি তাদের ম্লানতা বুদ্ধিতে নয়, বিদেশী ভাষার কুয়াশায় হয়তো তাদের চিন্তার দীপ্তি আচ্ছন্ন। জাপানীদের সম্বন্ধে এরকম ভুল করবার আশঙ্কা ঘটে। কোরীয় যুবকটি যে বুদ্ধিমান তাঁর অবাধ ভাষার গুণে সে কথা বুঝতে সময় লাগল না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কোরিয়ায় জাপানী রাষ্ট্রশাসন তোমার পছন্দ নয়?"

"না।"

"কেন? জাপানী আমলে তোমাদের দেশে পূর্ব্বেকার চেয়ে কি ব্যবস্থা ভালো হয়নি?"

"তা হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে দুঃখ সেটা সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায়—জাপানী রাজত্ব ধনিকের রাজত্ব। কোরিয়া তার মুনফার উপায়, তার ভোজ্যের ভাণ্ডার। প্রয়োজনের আসবাবকে মানুষ উজ্জ্বল ক'রে রাখে, কারণ সেটা তা'র আপন সম্পত্তি, তাকে নিয়ে তা'র অহমিকা। কিন্তু মানুষ তো থালা ঘটি বাটি কিম্বা গাড়োয়ানের ঘোড়া বা গোয়ালের গোরু নয় যে, বাহ্য যত্ন করলেই তা'র পক্ষে যথেষ্ট।"

"তুমি কি বলতে চাও, জাপান যদি কোরিয়ার সঙ্গে প্রধানত আর্থিক সম্বন্ধ না পাতিয়ে তোমাদের 'পরে রাজ-প্রতাপের সম্বন্ধ খাটাত, অর্থাৎ বৈশ্যরাজ না হয়ে ক্ষত্রিয়রাজ হ'ত তাহলে তোমাদের পরিতাপের কারণ থাকত না?"

"আর্থিক সম্বন্ধের যোগে বিরাট জাপানের সহস্রমুখী ক্ষুধা আমাদের শোষণ করে, কিন্তু রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত, সীমাবদ্ধ; তা'র বোঝা হাল্‌কা। রাজার ইচ্ছা কেবল যদি শাসনের ইচ্ছা হয় শোষণের ইচ্ছা না হয় তবে তাকে স্বীকার ক'রেও মোটের উপর সমস্ত দেশ

আপন স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মান রাখ্‌তে পারে। কিন্তু ধনিকের শাসনে আমাদের গোটা দেশ আর-একটি গোটা দেশের পণ্যদ্রব্যে পরিণত। আমরা লোভের জিনিষ, আত্মীয়তার না, গৌরবের না।"

"এই যে কথাগুলি ভাবচ এবং বলচ, এই যে সমষ্টিগত-ভাবে জাতীয় আত্মসম্মানের জন্মে তোমার আগ্রহ, তার কি কারণ এই নয় যে, জাপানের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তোমরা আধুনিক যুগের রাষ্ট্রিক শিক্ষায় দীক্ষিত?"

কোরীয় যুবক দ্বিধার ভাবে চুপ ক'রে রইলেন।

আমি বললুম, "চেয়ে দেখো সামনে ঐ চীন দেশ। সেখানে স্বজাতীয় আত্মসম্মানবোধ শিক্ষার অভাবে দেশের জন-সাধারণের মধ্যে অপ্রবুদ্ধ। তাই দেখি ব্যক্তিগত ক্ষমতা-প্রাপ্তির দুরাশায় সেখানে কয়েকজন লুব্ধ লোকের হানা-হানি কাটাকাটির ঘূর্ণিপাক। এই নিয়ে লুটপাট অত্যাচারে ডাকাতের হাতে সৈনিকের হাতে হতভাগ্য দেশ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তে প্লাবিত, অসহায়ভাবে দিন-রাত সন্ত্রস্ত। শিক্ষার জোরে যেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে স্বাধিকার-বোধ স্পষ্ট না হয়েচে সেখানে স্বদেশী বা বিদেশী দুরাকাঙ্ক্ষীদের হাতে তাদের নির্যাতন ঠেকাবে কিসে? সে অবস্থায় তা'রা ক্ষমতালোলুপের স্বার্থসাধনের উপকরণ-মাত্র হয়ে থাকে। তুমি তোমার দেশকে ধনীর উপকরণ-দশাগ্রস্ত ব'লে আক্ষেপ ক'রেছিলে, সেই পরের উপকরণ-দশা তাদের কিছুতেই ঘোচে না যারা মূঢ়, যারা কাপুরুষ, ভাগ্যের মুখপ্রত্যাশী, যারা আত্ম-কর্তৃত্বে আস্থাবান নয়। কোরিয়ার অবস্থা জানিনে, কিন্তু সেখানে নবযুগের শিক্ষার প্রভাবে যদি সাধারণের মধ্যে স্বাধিকারবোধের অঙ্কুর-মাত্র উদ্গত হয়ে থাকে তবে সে শিক্ষা কি জাপানের কাছ থেকেই পাওনি?"

"কার কাছ থেকে পেয়েচি তাতে কি আসে যায়? শত্রু হোক, মিত্র হোক, যে-কেউ আমাদের যে-উপায়ে জাগিয়ে তুলুক না কেন, জাগরণের যা ধর্ম্ম তা'র তো কাজ চল্‌বে।"

"সে কথা আমি মানি, সে তর্ক আমার নয়। বিচারের বিষয় এই যে, তোমার দেশে শিক্ষাবিস্তার এতটা হয়েচে কিনা যাতে দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা যথার্থভাবে দাবী করতে পারে। যদি তা না হয়ে থাকে তবে সেখানে বিদেশী নিরস্ত হলেও সর্ব্ব-সাধারণের যোগে আত্মশাসন ঘটবে না, ঘটবে কয়েকজনের দৌরাত্ম্যে আত্ম-বিপ্লব। এই স্বল্প লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে সংযত করবার একমাত্র উপায় বহু লোকের সমষ্টিগত স্বার্থবোধের উদ্বোধন।"

"যে-পরিমাণ ও যে-প্রকৃতির শিক্ষায় বৃহৎ ভাবে সমস্ত দেশের চৈতন্য হতে পারে সেটা আমরা সম্পূর্ণভাবে পরের হাত থেকে প্রত্যাশা ক'রব কেমন করে?"

"তোমরা শিক্ষিত লোকেরা দেশে সেই শিক্ষার অভাব যদি অনুভব করো তবে এই শিক্ষাবিস্তারের সাধনাকেই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যরূপে নিজেরাই গ্রহণ করবে না কেন? দেশকে বাঁচাতে গেলে কেবল তো ভাবুকতা নয়, জ্ঞানের প্রয়োজন করে। আমার মনে আরো একটি চিন্তার বিষয় আছে। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক বা জাতীয় প্রকৃতিগত কারণে কোরিয়া অনেক কাল থেকেই দুর্ব্বল। আজকের দিনে যুদ্ধবিগ্রহ যখন বৈজ্ঞানিক সাধনাসাধ্য ও প্রভূত ব্যয়সাধ্য তখন জাপান হতে নিজের শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমরা নিজের শক্তিতেই কি আত্মরক্ষা করতে পারো? ঠিক ক'রে বলো।"

"পারিনে সে-কথা স্বীকার করতেই হবে।"

"যদি না পারো তবে একথাও মানতে হবে যে, দুর্ব্বল কেবল নিজের বিপদ নয়, অন্যেরও বিপদ ঘটায়। দুর্ব্বলতার গহ্বর কেন্দ্রে প্রবলের দুরাকাঙ্ক্ষা আপনিই দূর থেকে আকৃষ্ট হয়ে আবর্ত্তিত হতে থাকে। সওয়ার সিংহের পিঠে চড়ে না, ঘোড়াকেই লাগামে বাঁধে। মনে করো রাশিয়া যদি কোরিয়ায় ধ্বজা গেড়ে বসে তবে সেটা কেবল কোরিয়ার পক্ষে নয় জাপানের পক্ষেও বিপদ। এমন অবস্থায় অন্য প্রবলকে ঠেকাবার জন্যই কোরিয়ায় জাপানের নিজের শক্তিকেই প্রবল করতে হয়। এমন অবস্থায় কোনো একদিন জাপান বিনা পরাভবেই কোরিয়ার ক্ষীণ হস্তেই কোরিয়ার ভাগ্যকে সমর্পণ করবে এ সম্ভবপর নয়। এর মধ্যে জাপানের শুধু মুনফার লোভ না, প্রাণের দায়।"

"আপনার প্রশ্ন এই যে, তাহলে কোরিয়ার উপায় কী। জানি, আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সৈন্যদল বানিয়ে তুলতে পারব না। তারপরে যুদ্ধের জন্য ভাসান্ জাহাজ, ডুব জাহাজ, উড়ো জাহাজ, এ সমস্ত তৈরী করা, চালনা করা বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কল্পনার অতীত। সেই উদ্দেশে চেষ্টা করাও বিদেশী শাসনাধীনে অসম্ভব। তবু তাই ব'লে হাল ছেড়ে দেব একথা বলতে পারিনে।"

"এ কথা বলা ভালোও না। হাল ছাড়ব না, কিন্তু কোন্ দিক বাগে হাল চালাতে হবে সেটা যদি না ভাবি ও বুদ্ধিসঙ্গত তা'র একটা জবাব না দিই তবে মুখে যতই আস্ফালন করি ভাষান্তরে তাকেই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া।"

"আমি কী ভাবি তা বলা যাক। এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীতে জাপানী, চীনীয়, রুশীয়, কোরীয় প্রভৃতি নানাজাতির মধ্যে আর্থিক স্বার্থগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনারূপে থাকবে না। কেন থাকবে না তা বলি। যে-দেশের মানুষকে চলিত ভাষায় স্বাধীন ব'লে থাকে তাদেরও ঐশ্বর্য্য এবং প্রতাপের ক্ষেত্রে দুই ভাগ। এক ভাগের অল্প লোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, আর এক ভাগের অসংখ্য দুর্ভাগা সেই ঐশ্বর্য্যের ভার বয়; এক ভাগের দুচারজন লোক প্রতাপ-যজ্ঞশিখা নিজের ইচ্ছায় উদ্দীপিত করে, আর-এক ভাগের বিস্তর লোক ইচ্ছা না থাকলেও নিজের অস্থি-মাংস দিয়ে সেই প্রতাপের ইন্ধন জোগায়। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে এই মূলগত বিভাগ, এই দুই স্তর। এতদিন নিম্নস্তরের মানুষ নিজের নিম্নতা নতশিরেই মেনে নিয়েচে, ভাবতেই পারেনি যে এটা অবশ্য-স্বীকার্য্য নয়।"

আমি বললুম, "ভাবতে আরম্ভ করেচে কেননা আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য মহাদেশে নিম্নস্তরের মধ্যে শিক্ষা পরিব্যাপ্ত।"

"তাই ধ'রে নিচ্চি। কারণ যাই হোক, আজ পৃথিবীতে যে যুগান্তকারী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে সে ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতির মধ্যে নয়, মানুষের এই দুই বিভাগের মধ্যে, শাসয়িতা এবং শাসিত; শোষয়িতা এবং শুষ্ক। এখানে কোরীয় এবং জাপানী, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এক পংক্তিতেই মেলে। আমাদের দুঃখই আমাদের দৈন্যই আমাদের মহাশক্তি। সেইটেতেই জগৎজুড়ে আমাদের সম্মিলন এবং সেইটেতেই ভবিষ্যৎকে আমরা অধিকার করব। অথচ যারা ধনিক তা'রা কিছুতেই একত্র মিলতে পারে না, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে তা'রা বিচ্ছিন্ন। আমাদের মস্ত আশ্বাসের কথা এই যে, যারা সত্য ক'রে মিলতে পারে তাদেরই জয়। য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে সেটা ধনিকের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের বীজ আজ অসংখ্য পরিমাণে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রইল। সেই বীজ মানব-প্রকৃতির মধ্যেই, স্বার্থই বিদ্বেষ-বুদ্ধির জন্মভূমি, পালন-দোলা। এতকাল দুঃখীরাই দৈন্যদ্বারা অজ্ঞানের দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, ধনের মধ্যে যে-শক্তিশেল আছে তাই দিয়েই তাদের মর্ম্ম বিদ্ধ হয়েছে। আজ দুঃখদৈন্যেই আমরা মিলিত হ'ব আর ধনের দ্বারাই ধনী হবে বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীতে আজ রাষ্ট্রতন্ত্রে যে অশান্ত আলোড়ন, বলশালী জাতির মধ্যে যে দুরন্ত আশঙ্কা তাতে এইটেই কি দেখতে পাচ্ছিনে?"

এর পরে আমাদের আর কথা ক'বার অবকাশ হয়নি। আমি মনে মনে ভাবলুম অসংযত শক্তিলুব্ধতা নিজের মধ্যে বিষ উৎপাদন ক'রেই নিজেকে মারে এ কথা সত্য, কিন্তু শক্ত ও অশক্তের ভেদ আজ যে-একটা বিশেষ আকার ধ'রে প্রকাশ পাচ্চে সেইটেকে রক্তপাত ক'রে বিনাশ করলেই কি মানব-প্রকৃতি থেকে ভেদের মূল একেবারে চলে যায়? পৃথিবীর সমস্ত উচ্চভূমি ঝড়বৃষ্টির ঝাঁটার তাড়নায় ক্ষয় পেয়ে পেয়ে একদিন সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে এমন কথা শোনা যায়, কিন্তু সেইদিনেই কি পৃথিবীর মরবার সময় আসবে না? সমত্ব এবং পঞ্চত্ব কি একই কথা নয়? ভেদ নষ্ট ক'রে মানব-সমাজের সত্য নষ্ট করা হয়। ভেদের মধ্যে কল্যাণ সম্বন্ধ স্থাপনই তা'র নিত্য সাধনা, আর ভেদের মধ্যকার অন্যায়ের সঙ্গেই তা'র নিত্য সংগ্রাম। এই সাধনায় এই সংগ্রামেই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে। য়ুরোপ

আজ সাধনাকে বাদ দিয়ে সংগ্রামকেই যখন একান্ত করতে চায় তখন তা'র চেষ্টা হয় শক্তকে বিনাশ ক'রে অশক্তকে সাম্য দেওয়া। যদি অভিলাষ সফল হয় তবে যে-হিংসার সাহায্যে সফল হবে সেই রক্তবীজকেই জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সেই সফলতার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেবে। কেবলি চলতে থাকবে, রক্তপাতের চক্রাবর্তন। শান্তির দোহাই পেড়ে এরা লড়াই করে এবং সেই লড়াইএর ধাকাতেই সেই শান্তিকে মারে, আজকের দিনের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে কালকের দিনের যে-শক্তিকে জাগিয়ে তোলে আবার তারি বিরুদ্ধে পরদিন থেকে যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে। অবশেষে চরমশান্তি কি বিশ্বব্যাপী শ্মশানক্ষেত্রে?

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আমার যে-কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা'র ভাবখানা এই লেখায় আছে। এটা যথাযথ অনুলিপি নয়।

পিতাপুত্রে

স্যর যদুনাথ সরকার, সি-আই-ই

২

আকবরের বিদ্রোহ

১৬৮১ সালের ১লা জানুয়ারি দেবসুরীতে আকবর নিজকে দিল্লীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার অনুগত চারিজন মোল্লা এক ফতোয়া সহি করিয়া বাহির করিল যে আওরংজীব ইস্লাম-বিরুদ্ধ কাজ করিবার ফলে সিংহাসনে বসিবার অনুপযুক্ত, সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ কুমার আকবরকে বাদশাহ করিয়া ইসলাম ধর্ম্ম রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্ত্তব্য! এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ১৬৫৮ সালে আওরংজীব যখন পিতার সিংহাসন কাড়িয়া লন, তখন তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে দারা পৌত্তলিক, তাহাকে স্নেহ করিয়া বাদশাহ শাহজহান ইস্লাম ধর্ম্মে গ্লানি আনিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মরক্ষার জন্য ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দিল্লী-সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে লইতে হইল, নচেৎ তিনি পরমেশ্বরের নিকট পাপী হইবেন! আর, কাজী আবদুল ওহাব্‌ও এই যুক্তি দেখাইয়া পিতৃ-সিংহাসন-হরণ যে পাপ নহে, বরং এক্ষেত্রে ধার্ম্মিক মুসলমান রাজকুমারের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। আজ ২৩ বৎসর পরে সেই নাটকের পুনরভিনয় মাত্র হইল।

আকবর আজমীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। আওরংজীব তখন আজমীরে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ছিলেন; তাঁহার বড় বড় সেনাপতিরা সসৈন্য রাজপুতদের বিরুদ্ধে দূরে নানা স্থানে চলিয়া গিয়াছে, এমন কি বাদশাহের শরীর-রক্ষী সৈন্যদলও নিকটে নাই। কেবল জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধ সিপাহী, চাকর-বাকর, কেরানী ও খোজারা বাদশাহের সঙ্গে অবস্থান করিতেছে। অথচ বিদ্রোহী আকবরের সঙ্গে তাঁহার নিজ মুঘল সৈন্যদল (প্রায় দশ হাজার অশ্বারোহী) ছাড়া সমস্ত রাঠোর এবং অর্দ্ধেক শিশোদীয়া যোদ্ধা; লোকে বলে সত্তর হাজার অশ্বারোহী এইরূপে একত্র হইয়াছে।

আকবরের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ মনোদুঃখে বলিলেন, "আমি এখন অসহায়। ঐ যুবক বীর মহা সুযোগ পাইয়াছে। তবে কেন সে আমাকে মারিতে আসিতে বিলম্ব করিতেছে?"

আকবরের বিলাসিতা, যুদ্ধকার্য্যে অনভিজ্ঞতা এবং

বুদ্ধিহীনতার ফলে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তিনি আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট করিতে লাগিলেন; দেবহ্বরী হইতে আজমীর ১২০ মাইল, চারি-পাঁচদিনে আসা যায়; আকবর ইহাতে পনের দিন লাগাইলেন। এই অপ্রত্যাশিত সময় পাইয়া আওরংজীব সত্বর চারিদিক হইতে নিজ সৈন্য ফিরাইয়া আনিয়া আত্মরক্ষার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। কুমারের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া শিহাবুদ্দিন খাঁ (প্রথম নিজামের পিতা) বাদশাহের আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়া নিজ অশ্বারোহী দলসহ দুই দিনে ১২০ মাইল পথ পার হইয়া আজমীরে আসিয়া পৌঁছিলেন, অন্যান্য জনকয়েক সেনাপতিও আসিয়া জুটিল। আকবরের একমাত্র সুযোগ নষ্ট হইল।

বিদ্রোহের অবসান

তখন আওরংজীব আজমীর হইতে বাহির হইয়া দশ মাইল দক্ষিণে দো-রাহা নামক স্থানে শত্রুর অপেক্ষায় সসজ্জ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ১৫ই জানুয়ারি সন্ধ্যার সময় আকবর তাহার তিন মাইল দূরে পৌঁছিয়া তাঁবু ফেলিয়া থাকিলেন। সেই রাত্রেই তাঁহার কপাল চিরকালের জন্য ভাঙিল।

বিলাসী যুবক রাজকুমার আকবর নিজ উজীর তাহাউর্ খাঁর হাতের পুতুল মাত্র। তাহাউর্ই তাঁহার সব কাজ করেন, সৈন্যদের হুকুম দেন, এবং রাজপুতদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মধ্যস্থতা করেন। তাহাউরের শ্বশুর ইনাএৎ খাঁ আওরংজীবের শিবিরে উচ্চকর্ম্মচারী; বাদশাহের কথায় ইনাএৎ খাঁ জামাতা তাহাউর্কে সেই রাত্রেই লিখিয়া পাঠাইলেন—'তুমি এখনই আসিয়া বাদশাহের নিকট মাফ চাও, নচেৎ তোমার স্ত্রীগণকে প্রকাশ্যে বেইজ্জত করা হইবে এবং তোমার পুত্রদিগকে ক্রীতদাস করিয়া কুকুরের দামে বিক্রয় করা হইবে।" তাহাউরের পরিবারবর্গ বাদশাহের নিকট ছিল।

এই পত্র পাইয়া তাহাউর্ কাহাকেও কিছু না বলিয়া মহা উদ্বিগ্ন চিত্তে রাত্রে একাকী আকবরের শিবির ত্যাগ করিয়া বাদশাহের সৈন্যাবাসে উপস্থিত হইয়া বাদশাহের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। তখন রাত্রি দুপুর। বাদশাহ হুকুম দিলেন,সে যেন নিরস্ত্র হইয়া তাঁহার দরবারে ঢোকে। পরাজিত শত্রু বা অপরাধী কয়েদীকেই নিরস্ত্র অবস্থায় দরবারে আনা হয়; আর, তাহাউর্ আজ আকবরের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড করিয়া দিবার জন্য বাদশাহের নিকট আসিয়াছে, সম্রাটের এত-বড় উপকার আর কেহ করে নাই, সে মহা পুরস্কার ও সম্মানের আশা করিয়াছিল। সুতরাং অস্ত্র ত্যাগ করা অপমানজনক মনে করিয়া তাহাউর আপত্তি করিল; তাঁবুর বাহিরে উচ্চস্বরে তর্ক হইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া বাদশাহ রাগিয়া, জপের মালা হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া, তরবারি খুলিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, "বেশ ত, উহাকে তলোয়ার-হাতেই আসিতে দাও!"

তাঁহার অনুচরগণ এ সঙ্কেত বুঝিল। একজন দ্বাররক্ষী তাহাউর্-এর বুকে ধাক্কা মারিল। তাহাউর্ তাহার গালে চড় মারিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তাঁবুর দড়ি পায়ে বাধিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। আর অমনি বাদশাহের অনুচরগণ আসাসোঁটার ঘা দিয়া তাহাকে জখম করিল। তাহাউর্ কুর্ত্তার নীচে বর্ম্ম পরিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং সহজে তাহার প্রাণ গেল না; অবশেষে একজন তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিয়া গণ্ডগোলের অবসান করিল।

ইতিমধ্যে আওরংজীব এক ফন্দি করিয়াছিলেন। তিনি আকবরকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আমার মন্ত্রণা অনুসারে তুমি সব কার্য্যই করিতে, এবং সব রাজপুত সৈন্যদিগকে ভুলাইয়া আমার ফাঁদের মধ্যে আনিতে পারিয়াছ, এজন্য খুব তুষ্ট হইলাম। কাল প্রাতে যুদ্ধের সময় তুমি ঐ রাজপুতদের তোমার সেনার অগ্রগামী করিয়া আমাকে কপট আক্রমণ করিও, তখন সামনে হইতে আমার ও পিছন হইতে তোমার মুঘল সৈন্যদল ঐ রাজপুতদের পিষিয়া নির্ম্মূল করিবে।" আওরংজীবের শিখান-মত এই পত্রের বাহক আকবরের শিবিরে না গিয়া দুর্গাদাসের সৈন্যমধ্যে গেল, এবং ধরা পড়িয়া একটু মার খাইবার পর চিঠিখানা সমর্পণ করিল।

চিঠি পড়িয়া রাজপুতদের চক্ষুস্থির! দুর্গাদাস তখনই চিঠি-হাতে আকবরের তাঁবুতে গেলেন; তখন

রাত্রি গভীর, নবীন সম্রাট্ ঘুমাইতেছেন, হারেমে গিয়া তাঁহাকে জাগাইবে এমন সাহস কাহারও নাই।

তাহার পর দুর্গাদাস তাহাউর্-এর খোঁজে গেলেন, কিন্তু সারা শিবির ঘুরিয়াও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

রাজপুতদের মনের সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। এ হেন বিশ্বাসঘাতক সম্রাট্ ও শাহজাদার ফাঁদ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐস্থান হইতে পলায়ন। সেই শেষরাত্রেই চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার রাজপুত-সেনা আকবরের শিবির ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেল। প্রাতে আকবর জাগিয়া দেখিলেন, শিবিরে তিনি একা! তখন পলায়ন ভিন্ন প্রাণ বাঁচান অসম্ভব।

আকবরের প্রতি আওরংজীব

১৬ই জানুয়ারি জানা গেল, আকবর নিজের অবশিষ্ট সাড়ে তিন শত অশ্বারোহী লইয়া পশ্চিমদিকে পলাইয়াছেন, আর তাঁহার অধীনস্থ বাদশাহী সৈন্যদলের প্রায় সকলেই আওরংজীবের দলে যোগ দিয়াছে, কারণ এতদিন পর্য্যন্ত কুমার তাহাদিগকে জোর করিয়া নিজ সঙ্গে বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আনিয়াছিলেন। দুই দিন ও এক রাত্রি একাকী পলাইবার পর, আকবর দুর্গাদাসের দর্শন পাইলেন। কারণ ইতিমধ্যে রাঠোরেরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে আকবর তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই, ঐ চিঠিখানির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা,—আওরংজীবের কূটনীতির খেলা। তখন, আশ্রয়প্রার্থী কুমারকে রক্ষা করাই রাজপুতদের কর্ত্তব্য বুঝিয়া দুর্গাদাস তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, রাঠোর-সৈন্য দিয়া রক্ষা করিয়া, রাজপুতানার নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। পিছনে বাদশাহী সৈন্যগণ ধরিতে আসিতেছে। গুজরাতে পলাইবার পথ বন্ধ, কারণ তাহার সীমানায় মুঘল কর্ম্মচারিগণ সজাগ হইয়া পাহারা দিতেছিল। কয়েক মাস অবিশ্রান্ত ছোটাছুটির পর অবশেষে আকবর দুর্গাদাসের আশ্রয়ে ৯ই মে নর্ম্মদা নদী পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিলেন, এবং নাসিক নগরের পাশ দিয়া গিয়া মহারাষ্ট্র-রাজ্যে আশ্রয় লইলেন। শম্ভুজী তাঁহাকে কোঁকনে পালী নামক গ্রামে বাস করিবার স্থান দিলেন, অর্থসাহায্যও করিলেন (১লা জুন)।

আজমীরের নিকট হইতে আকবর পলায়ন করিবার পর আওরংজীব পুত্রকে কাছে ফিরাইয়া আনিবার জন্য এই পত্র লিখেন:—

"প্রাণপ্রিয় পুত্র মহম্মদ আকবর! ঈশ্বর সাক্ষী, আমি সকল পুত্র অপেক্ষা তোমাকে বেশী ভালবাসিয়াছি; কিন্তু ভাগ্যদোষে তুমি সয়তান-সদৃশ রাজপুতগণের প্রতারণা ও প্রলোভনে ভুলিয়া আদমের মত স্বর্গের সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছ এবং বিপদের গিরিমরুতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। আমি ইহার কি প্রতিবিধান করিতে পারি? তোমার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় দুঃখে ভরিয়া গিয়াছে, এমন কি জীবন তিক্ত বোধ হইতেছে। হায়! হায়! হাজার বার হায় হায়! বাদশাহজাদার মান-সম্ভ্রম ভুলিয়া গিয়া, নিজ তরুণ বয়সের কথা একবারও না ভাবিয়া, নিজ স্ত্রীপুত্রের প্রতি সদয় না হইয়া, নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে তুমি তাহাদের ঐসব পশু-সদৃশ হিংস্র-প্রকৃতি বদমায়েস রাজপুতের হাতে বন্দী অবস্থায় অতি দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলিয়া দিলে! আর, তুমি নিজে পোলো খেলার বলের মত চারিদিকে অবিরাম ছুটিতেছ!

বিশ্বপিতা সকল পিতার হৃদয়েই পুত্রস্নেহ দিয়াছেন; অতএব যদিও তুমি মহা অপরাধ করিয়াছ, আমি চাহি না যে তুমি নিজ কার্য্যের শাস্তিভোগ কর।—

তম্মের পঞ্জর হয় যদ্যপি নন্দন,
জনকজননী কাছে আঁখির অঞ্জন।

যাক্, যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে। এখন যদি তুমি অতীতের জন্য অনুতাপ করিয়া যেখানে ইচ্ছা আমার সঙ্গে দেখা কর, আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করিব এবং তোমাকে কল্পনাতীত অনুগ্রহ দিব।.....

রাজপুতদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা যশোবন্ত সিংহ দারা শুকোকে যে সাহায্য ও সমর্থন করিয়াছিল [তাহা কিরূপ বেশ জানা আছে]. সেইমত তুমিও নিশ্চয় জানিও, [রাঠোরদের প্রতিশ্রুত সাহায্যের ফলে] তোমার লজ্জা ও ঊঁটা ক্বশ

ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইবে না। ঈশ্বর তোমাকে সরল পথ দেখান!”

আওরংজীবের প্রতি আকবরের বিষময় পত্র

এই চিঠি পাইয়া আকবর যে উত্তর দিলেন তাহাতে নিশ্চয়ই দুর্গাদাসের হাত ছিল। চিঠিখানি কোন সুলেখক ফারসী মুন্সীর লেখা। রচনা-চাতুর্য্য ও শ্লেষ-উক্তির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইহা পূর্ব্বে ছাত্রদের পড়ান হইত। উত্তরটি এইরূপ :—

“...আপনি লিখিয়াছেন ‘আমি তোমাকে আমার আর-সব পুত্র অপেক্ষা বেশী ভালবাসি।’...ইহলোক ও পরলোকের বাদশাহ! সালাম। পিতার সন্তোষ-বিধান ও সেবা করা যেমন পুত্রের কর্ত্তব্য, তেমনি সকল পুত্রের প্রতিপালন, নৈতিক ও আর্থিক মঙ্গলচেষ্টা, এবং স্বত্ব রক্ষা পিতার কর্ত্তব্য। ঈশ্বর ধন্য হউন! আমি এতদিন পর্য্যন্ত পিতৃসেবায় কোন অংশে ত্রুটি করি নাই।...কনিষ্ঠ পুত্রকে রক্ষা ও স্নেহ করা সর্ব্বত্রই পিতার প্রধান সাধনা। আর, আপনি পৃথিবীর এই রীতির বিপরীত পথে গিয়া সব পুত্র অপেক্ষা আমাকে কম স্নেহ করিয়াছেন। আপনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে “শাহ” (=রাজা) উপাধি দিয়া সম্মানিত এবং নিজ উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহা কিরূপ ন্যায় বিচার? সব ছেলেরই পিতার ধনে সমান অধিকার আছে। এক পুত্রকে বড় করা এবং আর সকলকে তাঁহার নীচে ফেলা ধর্ম্মপুস্তকের কোন্ বিধি অনুযায়ী?...অথচ আপনার ধর্ম্মপ্রাণতা, কোরাণ মানিয়া চলা এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসরণ জগৎপ্রসিদ্ধ!...

“সত্যসত্যই এই পথের (অর্থাৎ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের) পথপ্রদর্শক ও শিক্ষাগুরু আপনি নিজেই, অপরে শুধু আপনার পদানুসরণ করিতেছে। যে-পথে আপনি নিজে চলিয়াছিলেন তাহাকে কিরূপে ‘অশুভ পন্থা’ বলা যায়? (পদ্য)

আমার পিতা স্বর্গের উদ্যান দুইটি
　　গমের বদলে বিক্রয় করিয়াছিলেন;
আমি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র হইব না যদি
　　এক দানা যবের লোভে বিক্রয় না করি।

[অর্থাৎ, সয়তানের প্ররোচনায় মানবের আদি পিতা বাবা আদম নিষিদ্ধ ফল—খৃষ্টান বাইবেলে আপেল, মুসলমান কোরাণে দুই দানা গম—খাইবার অপরাধে স্বর্গের উদ্যান হইতে পৃথিবীতে তাড়িত হন। আওরংজীব উপরের চিঠিতে লিখিয়াছেন যে রাজপুতদের প্ররোচনায় আকবর পিতৃগৃহের স্বর্গসুখ হইতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। এটা তাহারই উত্তর!

আকবর যে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কালযাপন করিতেছেন বলিয়া আওরংজীব শোক প্রকাশ করেন, তাহার উত্তরে আকবর লিখিলেন (ভাবার্থ)

দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?

এবং ‘বিপদের ভিতর দিয়াই সিংহাসন লাভ করা যায়।’

তাহার পর, আওরংজীব যশোবন্ত সিংহ ও রাজপুত জাতির যে নিন্দা করিয়াছিলেন সে সবগুলির খণ্ডন করিয়া এবং ভারত-ইতিহাস হইতে রাজপুতদের প্রভু-ভক্তির বহু দৃষ্টান্ত দিয়া, আকবর দেখাইলেন যে রাঠোরেরা নিজ রাজা যশোবন্তের নাবালক পুত্রের রাজ্য-রক্ষার জন্য তিন বৎসর ধরিয়া অকাতরে প্রাণ দিয়া এমন যুদ্ধ করিয়াছে যে হিন্দুস্থানের বাদশাহ, তাঁহার পুত্রগণ এবং ওমরাগণ নিষ্ফল ও নাকাল হইয়া এখনও তাহাদের বিরুদ্ধে ঘুরিতেছে।]

“আর, কেনই বা এমন হইবে না? আপনার রাজত্বে উজীরদের ক্ষমতা নাই, ওমরাদের উপর বিশ্বাস নাই, সিপাহীরা হীন দরিদ্র, লেখকেরা কর্ম্মহীন, সওদাগরদের সম্পত্তি নাই, রায়তেরা পদদলিত। সেইমত, দাক্ষিণাত্যের মত প্রকাণ্ড মহাদেশ—উৎসন্ন হইয়া মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছে।...হিন্দুদের উপর দুই বিপদ পড়িয়াছে, শহরে জজিয়া-আদায়, আর মাঠে শত্রুদের (অর্থাৎ মারাঠাদের) অত্যাচার।...সদ্বংশীয় পুরাতন ঘরের লোকেরা সব লোপ পাইয়াছে; আর আপনার রাজ্যের নানা বিভাগের কাজের এবং রাজকীয় মন্ত্রণার ভার পড়িয়াছে শুধু মুটে-মজুর, ছোটলোক, জোলা, সাবান-বিক্রেতা, পিরানের দর্জ্জি প্রভৃতির উপর। তাহারা জুয়াচুরির বিশাল আলখাল্লা বগলে, এবং প্রতারণার ফাঁস, অর্থাৎ জপের মালা, হাতে লইয়া মুখে কতকগুলি

ধর্ম্মগ্রন্থের শ্লোক এবং নীতিবাক্য আওড়াইতে থাকে। আপনি এই সব লোককে স্বর্গদূত জব্রিয়েল আস্রাফিল ও মিকায়েলের মত ভাবিয়া নিজের সঙ্গী, অন্তরঙ্গ এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রী করিয়াছেন এবং নিজকে অসহায়ভাবে ইহাদের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন।...

[রাজা মোদের] শাহ্ আলমগীর গাজী,
তাঁর যুগে হয়েছে সাবানওয়ালারা সদর আর কাজী,
জোলা আর তাঁতির হয়েছে এত অহঙ্কার,
যে এই ভোজে রাজা হয়েছেন তাহাদের সহচর।
ছোটলোকের হাতে এসেছে এমন অধিকার,
যে পণ্ডিত আশ্রয় লয় তাদের দ্বার।
মূর্খের হয়েছে এমন পদ উঁচু
যে বিজ্ঞেরও তাহা না হয় কভু।
আল্লা বাঁচান আমাদের এই যুগের বিপদ হ'তে
যখন আর্বী ঘোড়া লাথি খায় গাধার পদ হ'তে।

"আপনার রাজকর্ম্মচারীরা সওদাগরের ব্যবসা ধরিয়াছে, তাহারা টাকা দিয়া সরকারী চাকরি কেনে, আর ঘৃণ্য লাভের জন্য তাহা বিক্রয় করে। যে নুন খায় সে নুনের পাত্রটি ভাঙিয়া ফেলে এবং বিশ্বস্ততার বদলে অনাচার অত্যাচার করে।

"যখন আমি দেখিলাম, দেশের এই-সব অন্যায় আপনার দ্বারা সংশোধিত হওয়া অসম্ভব, তখন রাজবংশের উচ্চপ্রবৃত্তি আমাকে এই সংস্কার-কার্য্য নিজ হাতে লইয়া পুনরায় দেশে শান্তি ও সুখ, গুণের আদর ও জ্ঞানের সম্মান ফিরাইয়া আনিতে প্রণোদিত করিল।

"কি সুখের বিষয় হইবে, যদি আপনার এমন সুমতি হয় যে, এই কার্য্য আপনার ক্ষুদ্রতম পুত্রের হাতে দিয়া স্বয়ং মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন! তবেই লোকে আপনাকে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিবে।

"আপনি এতদিন ধরিয়া সমস্ত জীবন ধন ও পার্থিব বস্তুর অন্বেষণে কাটাইয়াছেন—সেগুলি স্বপ্ন অপেক্ষা অলীক এবং ছায়া অপেক্ষাও অনিশ্চিত। এখন সময় হইয়াছে—আপনি পরলোকের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করুন, তবে ত ঐহিক মোহবশে পূর্ব্বে পিতা ও ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে যে-সব দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। (পদ্য)

বয়স হয়ে গেল আশী, আর এখনও ঘুমাচ্ছ,
এই দুচার দিনের বেশী আর সময় পাবে না।

আপনার পত্রে আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আপনার নির্লজ্জ সাহস দেখিয়া লজ্জা পাই।

নিজের বাপ্‌কে কেমন ব্যবহার করেছিস্
যে পুত্রের কাছে এইমত ভক্তি আশা করিস?
তুমি জগতকে নীতি উপদেশ দিতেছ,
পরকে না শিখাইয়া সেই নীতি নিজে
মানিয়া চল, দেখি।"

আওরংজীবের আক্রোশ

এই চিঠি পাইবার পর আর ক্ষমা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আকবর ত পলাইয়া মহারাষ্ট্রে গেলেন, কিন্তু তাঁহার অনুচরদের ধরিয়া অতি নিষ্ঠুর শাস্তি দেওয়া হইল। রাজকুমারী জেব্-উন্-নিসা ('মখ্‌ফী' ছদ্মনামধারী কবি) আকবরকে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার চিঠিগুলি আকবরের পরিত্যক্ত শিবিরে পাওয়াতে তাঁহার সমস্ত ধন ও জাগীর জব্‌ৎ করিয়া তাঁহাকে দিল্লীর সলিমগড় দুর্গে আমরণ বন্দী করিয়া রাখা হইল। যে চারজন মোল্লা আওরংজীবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আকবরকে সম্রাট করিবার ফতোয়া সহি করিয়াছিল, তাহাদের খালি-পায়ে গড়বিটলীর চূড়ায় হড় হড় করিয়া টানিয়া হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া হইল, আবার সেইমত নীচে আনিয়া কাজীর বাড়ীতে লইয়া গিয়া তক্তার সহিত বাঁধিয়া পেঁচান চামের দড়ির চাবুক (দুর্‌রা) দিয়া কশাঘাত করা হইল। সমস্ত দিন বারংবার এই মত পাহাড়-চড়ান ও চাবুক-মারা চলিতে থাকিল; সন্ধ্যা হইলে তাহাদের কারাগারে লইয়া গিয়া শিকলে বাঁধিয়া রাখা হইল।

বিদ্রোহের অপর সব সাহায্যকারীকে, এমন কি যাহারা আকবরকে পত্র লিখিত তাহাদের পর্য্যন্ত, ধরিয়া কয়েদ করা হইল—তাহাদের সম্পত্তি জব্‌ৎ করা হইল। বাদশাহ হুকুম দিলেন, ভবিষ্যতে সব সরকারী চিঠি-

পত্র ও ইতিহাসে আকবরের নাম 'বাঘী' (=বিদ্রোহী) এবং 'আব্‌তর্' (=অধমতম) লেখা হইবে,—'আকবর' (=সর্ব্বপ্রধান) নহে।

দাক্ষিণাত্যে পলাইবার সময়, পাছে কেহ আকবরকে চিনিয়া বা মুসলমান রাজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিয়া ধরিতে না পারে, এইজন্ত তাঁহাকে ছদ্মবেশ পরাইয়া একেবারে রাঠোর রাজপুত সাজান হইল। তিনি দাড়ি কামাইয়া, আকর্ণ বিস্তৃত গোঁফ রাখিয়া, কানে মুক্তা পরিলেন—দেখিতে যেন ঠিক রাজপুত। মুসলমানের চিহ্নই দাড়ি। পুত্রের এই হিন্দু-সাজিবার সংবাদ পাইয়া গোঁড়া আওরংজীব রাগভরে কিছুক্ষণ নিজের লম্বা দাড়ি মুখে দিয়া চিবাইলেন, তাহার পর দাক্ষিণাত্যের পথের ও ঘাটির প্রহরী কর্ম্মচারীদিগকে অযত্নের দোষ দিয়া ভর্ৎসনা ও বেতন কম করিলেন। [জয়পুর-কাগজ]

কয়েক মাস পরে বাদশাহের দরবারে আরব দেশের চিঠিতে সংবাদ আসিল যে একদিন মক্কায় অতিবৃষ্টি হইবার ফলে বন্তা হইয়া শহরের রাস্তা ও বাড়ীগুলি ডুবিয়া যায় এবং ছয় হাজার দেশবাসী ও দুই হাজার বিদেশী যাত্রী (হাজী) প্রাণ হারায়। আওরংজীব জিজ্ঞাসা করিলেন এটা কোন তারিখে ঘটে; সংবাদপত্র পড়িয়া জানা গেল ৩রা জানুয়ারি ১৬৮১। অমনি বাদশাহ বলিয়া উঠিলেন, "তা আর হবে না কেন? ঠিক সেই সময়ই আমার মত ধার্ম্মিক মুসলমানের পুত্র বিদ্রোহী হয় এবং কাফিরদের সঙ্গে যোগ দেয়—ইসলামের পক্ষে এমন অশুভ দিন আর কি হইতে পারে!"

আকবর রাজপুতানা হইতে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছিয়াছেন শুনিয়া বাদশাহ বলিলেন, "আকবর যখন এই ভীমরুলের চাক্ হইতে বাহির হইয়াছে, তখন ঈশ্বরেচ্ছায় শীঘ্রই তাহাকে ধরা যাইবে।" [জয়পুর-কাগজ]

শম্ভুজীকে লিখিত আকবরের পত্র

মারাঠা দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া আকবর পথ হইতে শম্ভুজীকে ১১ই মে ১৬৮১ এই পত্র লেখেন:—

"নিজ রাজত্বের প্রথম হইতেই আলমগীরের মনের অভিপ্রায় ছিল হিন্দুদের সমূলে ধ্বংস করা। মহারাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর এই মতলব স্পষ্ট প্রকাশ পাইল; আর মহারাণা [রাজসিংহ]-কে আক্রমণও সেই অভিপ্রায়ে।

সব মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তিনি সকলেরই রক্ষক; অতএব যখন আমরা হিন্দুস্থানের বাদশাহ, তখন এই ভূম্যধিকারী জাতি (অর্থাৎ রাজপুত)—যাহাদের জন্তই হিন্দুস্থান দেশটা—তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে উচিত নহে।

আলমগীর বাদশাহের কর্ম্ম যখন সীমা অতিক্রম করিল, আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে যদি এই জাতির (অর্থাৎ রাজপুতদের) অধঃপতন হয়, তবে হিন্দুস্থান রাজ্য আমার রাজবংশের হাতে থাকিবে না। অতএব, নিজ পিতৃপুরুষের সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আমাদের অতি প্রাচীন শুভাকাঙ্ক্ষী এই জাতির রক্ষার জন্ত, রাণা রাজসিংহ ও দুর্গাদাস রাঠোরের প্রার্থনায়, এই স্থির করিলাম যে সৈন্ত লইয়া আজমীর গিয়া রাজার মত [বাদশাহের সহিত] যুদ্ধ করিব, তবে ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহা প্রকাশ হইবে। তাহার পর রাণা রাজসিংহের মৃত্যু হওয়ায় এই কাজে কয়েক দিন বিলম্ব হইল। [নূতন] রাণা জয়সিংহ এক মাস পরে বাদশাহ কুলী খাঁ [অর্থাৎ তাহাউর]-কে দিয়া পিতার সেই প্রার্থনাই আবার জানাইলেন, এবং বলিয়া পাঠাইলেন, 'হিন্দুস্থানের সম্মান বাঁচুক—ইহাই যদি আপনার মনের বাঞ্ছা হয়, আমরা সকলে আপনার পোষাকের কিনারায় ভিক্ষার হাত দিয়া, আপনার নিকট হইতে বিপদে ত্রাণ এবং মঙ্গলের আশা করি।'—তখন এই দুই প্রধান রাজপুত জাতির প্রার্থনায় আমি পৈত্রিক রাজ্য অধিকার করিবার জন্ত আজমীর-এর দিকে অগ্রসর হইলাম।..."

[পত্রের বাকী অংশে যে বিবরণ আছে তাহা আগে দেওয়া হইয়াছে।]

আকবরের মহারাষ্ট্র-প্রবাস

মহারাষ্ট্র দেশে আশ্রয় লইয়া আকবর সাড়ে পাঁচ বৎসর কাটাইলেন। শম্ভুজী তাঁহাকে বার বার আশ্বাস দিলেন যে অনেক হাজার মারাঠা সৈন্ত সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে রাজ-

পুতানায় পাঠাইবেন এবং সেখানে রাঠোর ও শিশোদিয় দলের সহিত আবার জুটিয়া বাদশাহজাদা আগ্রা দিল্লী সহজেই জয় করিয়া নিজকে ভারত-সিংহাসনের অধীশ্বর করিবেন,—আর আওরংজীব দাক্ষিণাত্যে আবদ্ধ থাকিয়া সব হারাইবেন। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, শম্ভুজী নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না, এবং তিনি যে সাহায্য করিবেন তাহার কোন চিহ্নও দেখা গেল না। ইতিমধ্যে বাদশাহের পরম শত্রু মারাঠারাজের সহিত আকবর যোগ দেওয়ায় আওরংজীব অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিলেন (নবেম্বর ১৬৮১), এবং শীঘ্র প্রবল সৈন্যদল পাঠাইয়া আকবরের উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। অবশেষে, পিতৃরাজ্য কাড়িয়া লইবার কোন সাহায্য শম্ভুজীর নিকট পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া আকবর তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া পারস্যে যাইবার জন্ত জাহাজ ভাড়া করিবার উদ্দেশ্যে গোয়া শহরের দশ মাইল উত্তরে বিচোলী নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন (১৬৮৩ সালে), এবং গোয়া ও অন্যান্ত বন্দরে লোক পাঠাইয়া জাহাজ সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় থাকিলেন। তাঁহার ভয় ছিল পাছে বাদশাহের আদেশে মুঘল নৌ-সেনাপতি সিদ্দী রণপোত লইয়া তাঁহাকে পথে বন্দী করে। ১৬৮৩ সালের নবেম্বরে হতাশ আকবর একখানা জাহাজে উঠিলেন বটে, কিন্তু শম্ভুজীর মন্ত্রী "কবিকলশ" তাড়াতাড়ি আসিয়া দুর্গাদাসের সাহায্যে তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া দেশত্যাগের ইচ্ছা হইতে বিরত করিলেন, কারণ আকবর চলিয়া গেলে শম্ভুজীর বড় দুর্নাম হইত।

আকবর নানাপ্রকার নূতন প্রতিজ্ঞায় ভুলিয়া আবার মহারাষ্ট্র দেশে আশ্রয় লইলেন, এবং মাল্‌কাপুর, রাজাপুর, সাখরপে প্রভৃতি স্থানে (রত্নগিরি জেলায়) আরও কয়েক বৎসর কাটাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই লাভ হইল না। এমন কি শম্ভুজী তাঁহার মণিমুক্তা কাড়িয়া লইয়াছিলেন এরূপ কথা এক পত্রে পড়া যায়। অবশেষে ১৬৮৬ সালের শেষাশেষি যখন আওরংজীব বিজাপুর-দুর্গ অধিকার করিয়া সেই রাজ্য নিজ দখলে আনিলেন, তখন আকবরের ভারতে আর কোন আশাই রহিল না, এমন কি এ দেশে বাস করাও ভয়ানক বিপদজনক হইল। তখন (ফেব্রুয়ারি ১৬৮৭) তিনি ফরাসীদের সাহায্যে রাজাপুর-বন্দরে একখানি ছোট জাহাজ ভাড়া করিয়া মাত্র ৪৫ জন অনুচর সঙ্গে লইয়া পারস্য-দেশের দিকে রওনা হইলেন। সমুদ্রে ঝড়ে তাঁহার জাহাজ মস্‌কটের অধীন একদ্বীপে গিয়া আশ্রয় .

মস্‌কটের শাসনকর্ত্তা (ইমাম্) তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়া আওরংজীবের নিকট লিখিয়া পাঠাইল যে, যদি তাহাকে দুই লক্ষ টাকা নগদ এবং সুরত-বন্দরে আমদানী সমস্ত মস্‌কটি পণ্যদ্রব্যের উপর মাশুল মাফ করার সনদ দেওয়া হয় তবে সে আকবরকে বন্দী করিয়া বাদশাহের নিকট সমর্পণ করিবে। কিন্তু পারস্যের রাজা শাহ সুলেমান্ সফবী সংবাদ পাইয়া আকবরকে নিজ দরবারে পাঠাইবার জন্ত ইমাম্‌কে হুকুম দিলেন, কারণ আকবর পারস্য-রাজের আশ্রয়প্রার্থী অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন। শাহের আক্রমণের ভয়ে ইমাম কুমার আকবরকে শাহের দূতের হাতে ছাড়িয়া দিল।

নির্ব্বাসিত আকবর

পারস্য-রাজধানী ইস্‌ফাহানে আকবর পৌঁছিলে শাহ সুলেমান তাঁহাকে সসম্মমে অভ্যর্থনা করিলেন; দুপক্ষে ঐ সময়ের উপযোগী হাফিজের পদ্য আবৃত্তি হইল! আকবর মহা আরামে অতিথি সেবা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন ভারত-সাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্ত পারস্যের সৈন্ত ও অর্থ সাহায্য চাহিলেন, শাহ উত্তর দিলেন, "পিতৃদ্রোহ মহাপাপ; আপনার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমি সাহায্য করিতে পারি না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাদের সঙ্গে লড়িয়া আপনার পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করিবার জন্ত আপনাকে যথাসাধ্য সৈন্ত ও অর্থ বল দিব।"

তখন আকবর আর কি করেন? দিন-রাত বসিয়া পিতার আশু মৃত্যু প্রার্থনা করিতে লাগিলেন! এই সংবাদ পাইয়া আওরংজীব তিক্ত হাসি হাসিয়া এই পদ্যটি আবৃত্তি করিলেন—

আমার মন থেকে কুম্ভকারের সেই কথাটা
যাইতেছে না ;
সে একটি অতি কোমল পিয়ালা নির্ম্মাণ
করিয়া তাহাকে বলেছিল,—
'জানি না আকাশ হইতে অদৃষ্টের চিল পড়ে
তোকে আগে ভাঙবে কি আমাকে আগে।'

ফলতঃ তাহাই ঘটিল। শাহ্ সুলেমানের মৃত্যুর পর হুসেন পারস্তের শাহ হইলেন। আকবর তাঁহার নিকট একবার পিতার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রটাইয়া সৈন্ত প্রার্থনা করিলেন। শাহ উত্তর দিলেন যে, ভারতবর্ষের পশ্চিম-বন্দরগুলিতে তাঁহার গুপ্তচর আছে, তাহাদের নিকট হইতে বাদশাহের মৃত্যু-সংবাদ সঠিক জানিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। পরে যখন আকবরের কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন পারস্ত-রাজদরবারে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা ও অযত্ন দেখা দিল।

অবশেষে বিরক্ত হইয়া আকবর পারস্তের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রদেশ খুরাসানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহা মুঘল-সাম্রাজ্যের আফঘানিস্থান প্রদেশের গায়ে সংলগ্ন, এখান হইতে অতি দ্রুত মুঘল দেশ আক্রমণ করা যায়। একন্ত কাবুলের সুবাদার কুমার শাহ আলম অত্যন্ত ভাবনায় রহিলেন।

যাহা হউক, অবশেষে তপ্তহৃদয় নির্ব্বাসিত আকবর ১৭০৩ সালের শেষে, অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বেই, প্রাণত্যাগ করিলেন। শুনিয়া আওরংজীব বলিলেন—

"হিন্দুস্থানের মহা অশান্তির কারণ থামিল।"

বিদ্রোহের পর মাড়োয়ারে পরিত্যক্ত আকবরের পুত্র-কন্তাকে দুর্গাদাস কেমন যত্নে প্রতিপালন করেন এবং আওরংজীবের নিকট তাহাদের আনিয়া দেন, সে এক মনোরম কাহিনী।

অপবিজ্ঞান

শ্রীরাজশেখর বসু

বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশঃ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন আবর্জ্জনা কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্ম্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া ওঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসকল ভ্রান্তধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :

-

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—বিদ্যুৎ। তীব্র বিদ্রূপের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ পইতায় বিদ্যুৎ গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ—এখন বড় একটা শোনা যায় না। কিন্তু এখনও বিদ্যুতের প্রভূত মহিমা। কিছুদিন পূর্ব্বে কোনো মাসিকপত্রিকায় এক কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—'সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন তুলসীগাছের সর্ব্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিকপ্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে।' এই অপূর্ব্ব তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন, চরকে কি সুশ্রুতে কিংবা নিজ মনের অন্তস্তলে, তাহা বলেন নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরো বেশী না হইবে কেন? বিলাতী খবরের কাগজেও বৈদ্যুতিক কোমরবন্দের বিজ্ঞাপন যার প্রশংসাপত্র বাহির

পুতানায় পাঠাইবেন এবং সেখানে রাঠোর ও শিশোদিয় দলের সহিত আবার জুটিয়া বাদশাহজাদা আগ্রা দিল্লী সহজেই জয় করিয়া নিজকে ভারত-সিংহাসনের অধীশ্বর করিবেন,—আর আওরংজীব দাক্ষিণাত্যে আবদ্ধ থাকিয়া সব হারাইবেন। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, শম্ভুজী নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না, এবং তিনি যে সাহায্য করিবেন তাহার কোন চিহ্নও দেখা গেল না। ইতিমধ্যে বাদশাহের পরম শত্রু মারাঠারাজের সহিত আকবর যোগ দেওয়ায় আওরংজীব অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিলেন (নবেম্বর ১৬৮১), এবং শীঘ্র প্রবল সৈন্যদল পাঠাইয়া আকবরের উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। অবশেষে, পিতৃরাজ্য কাড়িয়া লইবার কোন সাহায্য শম্ভুজীর নিকট পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া আকবর তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়া পারস্যে যাইবার জন্য জাহাজ ভাড়া করিবার উদ্দেশ্যে গোয়া শহরের দশ মাইল উত্তরে বিচোলী নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন (১৬৮৩ সালে), এবং গোয়া ও অন্যান্য বন্দরে লোক পাঠাইয়া জাহাজ সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় থাকিলেন। তাঁহার ভয় ছিল পাছে বাদশাহের আদেশে মুঘল নৌ-সেনাপতি সিদ্দী রণপোত লইয়া তাঁহাকে পথে বন্দী করে। ১৬৮৩ সালের নবেম্বরে হতাশ আকবর একখানা জাহাজে উঠিলেন বটে, কিন্তু শম্ভুজীর মন্ত্রী "কবিকলশ" তাড়াতাড়ি আসিয়া দুর্গাদাসের সাহায্যে তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া দেশত্যাগের ইচ্ছা হইতে বিরত করিলেন, কারণ আকবর চলিয়া গেলে শম্ভুজীর বড় দুর্নাম হইত।

আকবর নানাপ্রকার নূতন প্রতিজ্ঞায় ভুলিয়া আবার মহারাষ্ট্র দেশে আশ্রয় লইলেন, এবং মাল্‌কাপুর, রাজাপুর, সাখরপে প্রভৃতি স্থানে (রত্নগিরি জেলায়) আরও কয়েক বৎসর কাটাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই লাভ হইল না। এমন কি শম্ভুজী তাঁহার মণিমুক্তা কাড়িয়া লইয়াছিলেন এরূপ কথা এক পত্রে পড়া যায়। অবশেষে ১৬৮৬ সালের শেষাশেষি যখন আওরংজীব বিজাপুর-দুর্গ অধিকার করিয়া সেই রাজ্য নিজ দখলে আনিলেন, তখন আকবরের ভারতে আর কোন আশাই রহিল না, এমন কি এ দেশে বাস করাও ভয়ানক বিপদজনক হইল। তখন (ফেব্রুয়ারি ১৬৮৭) তিনি ফরাসীদের সাহায্যে রাজাপুর-বন্দরে একখানি ছোট জাহাজ ভাড়া করিয়া মাত্র ৪৫ জন অনুচর সঙ্গে লইয়া পারস্য-দেশের দিকে রওনা হইলেন। সমুদ্রে ঝড়ে তাঁহার জাহাজ মস্কটের অধীন একদ্বীপে গিয়া আশ্রয়

মস্কটের শাসনকর্ত্তা (ইমাম্) তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়া আওরংজীবের নিকট লিখিয়া পাঠাইল যে, যদি তাহাকে দুই লক্ষ টাকা নগদ এবং সুরত-বন্দরে আমদানী সমস্ত মস্কটি পণ্যদ্রব্যের উপর মাশুল মাফ করার সনদ দেওয়া হয় তবে সে আকবরকে বন্দী করিয়া বাদশাহের নিকট সমর্পণ করিবে। কিন্তু পারস্যের রাজা শাহ সুলেমান্ সফবী সংবাদ পাইয়া আকবরকে নিজ দরবারে পাঠাইবার জন্য ইমামকে হুকুম দিলেন, কারণ আকবর পারস্য-রাজের আশ্রয়প্রার্থী অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন। শাহের আক্রমণের ভয়ে ইমাম কুমার আকবরকে শাহের দূতের হাতে ছাড়িয়া দিল।

নির্ব্বাসিত আকবর

পারস্য-রাজধানী ইস্‌ফাহানে আকবর পৌঁছিলে শাহ সুলেমান তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন; দুপক্ষে ঐ সময়ের উপযোগী হাফিজের পদ্য আবৃত্তি হইল! আকবর মহা আরামে অতিথি সেবা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন ভারত-সাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্য পারস্যের সৈন্য ও অর্থ সাহায্য চাহিলেন, শাহ উত্তর দিলেন, "পিতৃদ্রোহ মহাপাপ; আপনার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমি সাহায্য করিতে পারি না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাদের সঙ্গে লড়িয়া আপনার পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য আপনাকে যথাসাধ্য সৈন্য ও অর্থ বল দিব।"

তখন আকবর আর কি করেন? দিন-রাত বসিয়া পিতার আশু মৃত্যু প্রার্থনা করিতে লাগিলেন! এই সংবাদ পাইয়া আওরংজীব তিক্ত হাসি হাসিয়া এই পদটি আবৃত্তি করিলেন—

আমার মন থেকে কুম্ভকারের সেই কথাটা
যাইতেছে না;
সে একটি অতি কোমল পিয়ালা নির্মাণ
করিয়া তাহাকে বলেছিল,—
'জানি না আকাশ হইতে অদৃষ্টের চিল পড়ে
তোকে আগে তাড়বে কি আমাকে আগে।'

ফলতঃ তাহাই ঘটিল। শাহ সুলেমানের মৃত্যুর পর হুসেন পারস্যের শাহ হইলেন। আকবর তাঁহার নিকট একবার পিতার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রটাইয়া সৈন্য প্রার্থনা করিলেন। শাহ উত্তর দিলেন যে, ভারতবর্ষের পশ্চিম-বন্দরগুলিতে তাঁহার গুপ্তচর আছে, তাহাদের নিকট হইতে বাদশাহের মৃত্যু-সংবাদ সঠিক জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। পরে যখন আকবরের কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন পারস্য-রাজদরবারে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা ও অযত্ন দেখা দিল।

অবশেষে বিরক্ত হইয়া আকবর পারস্যের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রদেশ খুরাসানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহা মুঘল-সাম্রাজ্যের আফঘানিস্থান প্রদেশের গায়ে সংলগ্ন, এখান হইতে অতি দ্রুত মুঘল দেশ আক্রমণ করা যায়। এজন্য কাবুলের সুবাদার কুমার শাহ আলম অত্যন্ত ভাবনায় রহিলেন।

যাহা হউক, অবশেষে ভগ্নহৃদয় নির্ব্বাসিত আকবর ১৭০৩ সালের শেষে, অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বেই, প্রাণত্যাগ করিলেন। শুনিয়া আওরংজীব বলিলেন—

"হিন্দুস্থানের মহা অশান্তির কারণ থামিল।"

বিদ্রোহের পর মাড়োয়ারে পরিত্যক্ত আকবরের পুত্র-কন্যাকে দুর্গাদাস কেমন যত্নে প্রতিপালন করেন এবং আওরংজীবের নিকট তাহাদের আনিয়া দেন, সে এক মনোরম কাহিনী।

অপবিজ্ঞান

শ্রীরাজশেখর বসু

বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশঃ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন আবর্জ্জনা কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্ম্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া ওঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসকল ভ্রান্তধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি:

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—বিদ্যুৎ। তীব্র বিদ্রূপের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ পইতায় বিদ্যুৎ গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ—এখন বড় একটা শোনা যায় না। কিন্তু এখনও বিদ্যুতের প্রভূত মহিমা। কিছুদিন পূর্ব্বে কোনো মাসিকপত্রিকায় এক কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—'সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন তুলসীগাছের সর্ব্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিকপ্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে।' এই অপূর্ব্ব তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন, চরকে কি সুশ্রুতে কিংবা নিজ মনের অন্তস্তলে, তাহা বলেন নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরো বেশী না হইবে কেন? বিলাতী খবরের কাগজেও বৈদ্যুতিক কোমরবন্দের বিজ্ঞাপন যার প্রশংসাপত্র বাহির

হইতেছে। সাহেবরা ঠকাইবার বা ঠকিবার পাত্র নয়, অতএব তোমার আমার অশ্রদ্ধার কোনো হেতু নাই। মোট কথা, সাধারণের বিশ্বাস—মিছরি নিম বা ভাইটামিনের ন্যায় বিদ্যুৎ একটি উৎকৃষ্ট পথ্য, যেমন করিয়া হোক দেহে সঞ্চারিত করিলেই উপকার। বিদ্যুৎ কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকার ও মাত্রা আছে কিনা, কোন্ রোগে কি রকমে প্রয়োগ করিতে হয়, এত কথা কেহ ভাবে না। আমাদের পরিচিত এক মালীর হাতে বাত হইয়াছিল। কে তাহাকে বলিয়াছিল, বিজলিতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলি আছে। মালী এক টুকরা ঐ তার সংগ্রহ করিয়া হাতে তাগা পরিয়াছিল।

উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দ্দেশ করে না, সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্ম্মী। অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ হইল কেন তাহার হেতু কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধোঁয়া বাহির হয়, তাহা অতি বিষাক্ত এই প্রবাদ বহু প্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে—জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয়, অতএব তাহাতে ফস্ফরস আছে, এবং ফস্ফরসের ধোঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা—ফস্ফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফস্ফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফস্ফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই অল্পাধিক ফস্ফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যতটা ফস্ফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তদ্রূপ।

কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক-নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্ব্বিচারে গটাপার্চা বলে। গটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাস। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারী চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে যাহাকে গটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

নাইট্রিক এসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলুলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ, কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতীর দাঁতের মত সাদা হয়। বায়োস্কোপের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুঁতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি বহু দ্রব্যের উপাদান সেলুলয়েড। চশমার জন্য নকল tortoise shell ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা—cellophane, viscose, galactite, bakelite ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী একরকম নয়। নকল রেশম, নকল হাতীর দাঁত, নানাপ্রকার বার্নিশ, বোতাম চিরুনি প্রভৃতি বহু সৌখিন জিনিষ ঐ সকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

বঙ্গভঙ্গের সময় যখন মেয়েরা কাচের চুড়ি বর্জন করিল, তখন একটি অপূর্ব্ব স্বদেশী পণ্য দেখা দিয়াছিল—'আলুর চুড়ি'। ইহা বিদেশী সেলুলয়েডের পাত জুড়িয়া প্রস্তুত। আলুর সহিত ইহার কি সম্বন্ধ বোঝা যায় না। বিলাতী সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত আজগবী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বাহির হয়। বহুকালপূর্ব্বে কোনো কাগজে পড়িয়াছিলাম—গন্ধকদ্রাবকে আলু ভিজাইয়া কৃত্রিম হাতীর দাঁত প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় এই উক্তিই আলুর চুড়ির ভিত্তি।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্ট হইয়াছে—

'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা এক প্রকার পশমী বস্ত্র। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম বা উজ্জ্বল সূতা (mercerized cotton) হইতে প্রস্তুত।

'টিন' শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজিতে ইহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু চলিত অর্থ—রাংএর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরাসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহার দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিতজনের প্রবল আগ্রহ আসিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্ব্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে—complex। অমুক লোকটি ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বৈজ্ঞানিকের দুর্ভাগ্য—তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন, সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া তুচ্ছ কাজে লাগায়, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ অভিধানে স্থান পাইয়া বৈজ্ঞানিককে স্বাধিকারচ্যুত করে।

মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারেরই সে কারণ জানিতে চায়। কিন্তু তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও অসাধারণ, তাই সে প্রমাদকে প্রমাণ মনে করে, বাক্‌ছলকে হেতুবাদ মনে করে। বাংলা মাসিকপত্রিকার জিজ্ঞাসাস্তম্ভের লেখকগণ অনেক সময় হাস্যকর অপবিজ্ঞানের অবতারণা করেন। কেহ প্রশ্ন করেন—বাতাস করিতে করিতে গায়ে পাখা ঠেকিলে তাহা মাটিতে ঠুকিতে হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। কেহ বা গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক তথ্য জানিতে চান। উত্তর যাহা আসে তাহাও চমৎকার। কিছুদিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী'র জিজ্ঞাসাস্তম্ভে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—মাছির মল হইতে পুদিনা গাছ জন্মায় ইহা সত্য কিনা। একাধিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন—আলবৎ জন্মায়, ইহা আমাদের পরীক্ষিত। এই লইয়া কয়েক মাস তুমুল বিতণ্ডা চলিল। অবশেষে মশা মারিবার জন্য কামান দাগিতে হইল, সম্পাদক মহাশয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মত প্রকাশ করিলেন—পুদিনা জন্মায় না।

আর একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—কর্পূর উবিয়া যায় কেন। উত্তর অনেক আসিল, সকলেই বলিলেন—কর্পূর উদ্বায়ী পদার্থ তাই উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্ত্তা বোধ হয় তৃপ্ত হইয়াছেন, কারণ তিনি আর জেরা করেন নাই। কিন্তু উত্তরটি কৌতুককর। 'উদ্বায়ী'র অর্থ—যাহা উবিয়া যায়। উত্তরটি দাঁড়াইল এই—কর্পূর উবিয়া যায়, কারণ তাহা এমন বস্তু যাহা উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্ত্তা যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিলেন। একবার এক গ্রাম্য যুবককে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছিলাম—কুইনীনে জ্বর সারে কেন। একজন মুরব্বী ব্যক্তি বুঝাইয়া দিলেন—কুইনীন জ্বরকে বন্ধ করে, তাই জ্বর সারে।

কর্পূর উবিয়া যায় কেন, ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলিবেন—জানি না। হয়ত কালক্রমে নির্দ্ধারিত হইবে যে পদার্থের আণবিক সংস্থান অমুক প্রকার হইলে তাহা উদ্বায়ী হয়। তখন বলা চলিবে—কর্পূরের গঠনে অমুক বিশিষ্টতা আছে তাই উবিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও প্রশ্ন থামিবে না, ঐ প্রকার গঠনের জন্যই বা পদার্থ উদ্বায়ী হয় কেন? বৈজ্ঞানিক পুনর্ব্বার বলিবেন—জানি না।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্দ্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে, কারণ পৃথিবী তাহা আকর্ষণ করে। কেন করে বিজ্ঞান এখনও ঠিক জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্ম্মের নাম gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ। এই আকর্ষণের রীতি

নির্দ্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা law of gravitation বা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে—ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্ম্মের নাম মরণ। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরণ নয়।

কারণনির্দ্দেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। ফল পড়ে কেন?—কারণ মাধ্যাকর্ষণ। এই প্রশ্নোত্তরে এবং কর্পূরের প্রশ্নোত্তরে কোনো প্রভেদ নাই, হেত্বাভাসকে হেতু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। উত্তরদাতা জানাইতে চান যে তিনি প্রশ্নকর্ত্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী খবর রাখেন। তিনি বলিতে চান—অনেক জিনিষই উবিয়া যায়, কর্পূর তাহার মধ্যে একটি; জড়বস্তু মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, পৃথিবী কর্ত্তৃক ফল আকর্ষণ তাহারই একটি উদাহরণ। কিন্তু কারণনির্দ্দেশ হইল না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে—মানুষ যেসকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহাও ব্যাপার-পরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই ইয়ত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ, তাহা বৈজ্ঞানিকের অনধিগম্য। দার্শনিক স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সন্ধান করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি অতিপরিচিত বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে—অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ। ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দান নয়, নিতান্তই ভারতীয় বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিবাদ নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে যে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় লয় তাহা অপবিজ্ঞান মাত্র।

বহুযুগের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের দূরদৃষ্টি জন্মিয়াছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ অনেক ব্যাপার-পরম্পরা সে নির্ণয় করিতে পারে। কিসে কি হয় মানুষ অনেকটা জানে এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে। কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার তাহার বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু আর সমস্তই অবোধ্য বা অসাধ্য। প্রথমোক্ত বিষয়গুলি তাহার 'দৃষ্ট' অর্থাৎ আয়ত্ত, শেষোক্ত বিষয়গুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনায়ত্ত। যাহা দৃষ্ট তাহাতে তাহার কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাহাতে মোটেই হাত নাই।

নিয়তিবাদী দার্শনিক বলেন—কিসে কি হইবে তাহা জগতের উৎপত্তির সঙ্গেই নিয়মিত হইয়া আছে, সমস্ত ব্যাপারই নিয়তি। মানুষের সাধ্য অসাধ্য সমস্তই নিয়তি। কাজ সহজে উদ্ধার হইয়া গেলে নিয়তির কথা মনে আসে না। কিন্তু চেষ্টা বিফল হইলেই মনে পড়ে, নিয়তি মানুষের অবাধ্য, যত্ন করিলেও সব কাজ সিদ্ধ হয় না।

বিজ্ঞানও স্বীকার করে—এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত এবং অখণ্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনো কোনো বিষয়ের ভবিষ্যদুক্তি করিতে পারেন, যথা অমুক দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, অমুক লোকের বিপদ হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তির কিয়দংশ তাঁহার জানা আছে বলিয়াই পারেন। বিচক্ষণ দাবা-খেলোয়াড় ভবিষ্যতের পাঁচ ছয় চাল হিসাব করিয়া ঘুঁটি চালিয়া থাকে। কিন্তু যাহা মানুষের প্রতর্ক্য বা অনুমানগম্য, তাহা সকল ক্ষেত্রে সাধ্য বা প্রতিকার্য্য নয়। আমাদের এমন শক্তি নাই যে চন্দ্রের গ্রহণ রোধ করি, কিন্তু হয়ত এমন শক্তি আছে যে অমুকের বিপদ নবারণ করিতে পারি। এমন প্রাজ্ঞ যদি কেহ থাকেন যিনি সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম জানেন, তবে তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহার কাছে নিয়তি 'অদৃষ্ট' নয়, দৃষ্ট ও স্পষ্ট। তিনি মানুষ, তাই সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না, কিন্তু অজ্ঞ মানবের তুলনায় তাঁহার সাধ্যের সীমা অতি বৃহৎ। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে মানবসমাজ এইরূপে উত্তরোত্তর অনাগতবিধাতা হইতেছে।

কূট তার্কিক বলিবেন—প্রকৃতির অখণ্ডনীয় বিধি মানিব কেন? তোমার আমার বুদ্ধিতে ফল মাটিতে পড়ে, যথাকালে চন্দ্রগ্রহণ হয়, দুই আর তিনে পাঁচ হয়। কিন্তু এমন ভুবন বা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যেখানে বিধির ব্যতিক্রম হয়। বৈজ্ঞানিক উত্তর দেন—তোমার সংশয় যথার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত

ভুবন এবং তোমার আমার মত প্রকৃতিস্থ মানুষের দৃষ্টি। যখন অন্য ভুবনে যাইব বা অন্যপ্রকার দেখিব, তখন অন্য বিজ্ঞান রচনা করিব। বৈজ্ঞানিক যে সূত্র প্রণয়ন করেন তাহা কখনো কখনো সংশোধন করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তনের জন্য নয়।

অতএব, অদৃষ্টের অর্থ—অনির্দেশ্য ও অসাধ্য ঘটনা-সহ, এবং নিয়তির অর্থ—সমস্ত ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব্ব্য। ঘটনার কারণ অদৃষ্ট বা নিয়তি নয়। কিন্তু সাধারণ লোকে অদৃষ্টকে অনর্থক টানিয়া আনিয়া সুখদুঃখের ব্যাখ্যা করে। জীবনযাত্রা যখন নিরুদ্বেগে চলিয়া যায় তখন কারণ জানিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি একটা বিপদ ঘটে, যদি কোনো পরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ বড়লোক হয়, তখনি মনে কষ্টকর প্রশ্ন আসে—কেন এমন হইল? বিজ্ঞলোক ব্যাখ্যা করেন—বাপু, কেন হইল সেটা বুঝিলে না?—সমস্তই অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য, নিয়তি। অমুক লোকটি মরিল কেন, ইহার উত্তরে যদি বলা হয়—কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স হইয়াছিল, তবে একটা কারণ বোঝা যায়। কিন্তু ইহা বলা বৃথা—মরণের অনির্দেশ্যতা বা অবাধ্যতাই মরিবার কারণ। অথচ, 'অদৃষ্ট' বলিলে ইহাই বলা হয়। যাহা অবিসংবাদিত সত্য বা truism, তাহা শুনিলে কাহারও কৌতূহলনিবৃত্তি বা সান্ত্বনালাভ হয় না, সুতরাং ইহাও বলা বৃথা—অমুক লোকটি ঘটনা-পরম্পরার ফলে মরিয়াছে। অথচ, 'নিয়তি' বলিলে ইহাই বলা হয়। 'অদৃষ্ট' ও 'নিয়তি' শব্দ সাধারণের নিকট প্রকৃত অর্থ হারাইয়াছে এবং বিধাতার আসন পাইয়া সুখ-দুঃখের নিগূঢ় কারণ রূপে গণ্য হইতেছে।

Professor Poyinting এর এই উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য।—'No long time ago physical laws were quite commonly described as the Fixed Laws of Nature, and were supposed sufficient in themselves to govern the universe... A law of nature explains nothing—it has no governing power, it is but a descriptive formula which the careless has sometimes personified.

হাওয়া

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সকাল থেকেই যাবার আয়োজন চল্‌ছিল। স্থান যাদের নেই তাদের প্রায়ই স্থান-পরিবর্তন করতে হয়।

আসন্ন-বিচ্ছেদের বিষণ্ণতায় অপরিসর অন্ধকার গৃহখানির আবহাওয়া কেমন যেন করুণ হয়ে উঠেছে। সহবাসী দুটি পরস্পর অপরিচিত গৃহস্থের মধ্যে এতকালের আলাপে একটি আত্মীয়তা ঘনিয়ে এসেছিল বলতে হবে বৈ কি।

এই একটু আগেও উভয়পক্ষের ভারাক্রান্ত অবসন্ন মনের ক্ষোভ ও বেদনা বারকয়েক প্রকাশ করা হয়ে গেছে, তবুও বিদায় নেবার সময় বড়-বৌয়ের চোখ দুটি ছল্ ছল্ করে' এল। একটি করুণ গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে' তিনি বললেন—মনেই ছিল না ম যে আমরা ভাড়াটে! এতকাল একসঙ্গে ছিলাম, একটি উঁচু কথা কোনোদিন ওঠেনি। আপনার লোক যে পথেও মেলে একথা কি জানতাম?

বিচ্ছেদ-কাতর ও নিঃশব্দ ঘরগুলির মধ্যে তাঁর কথাগুলি যেন তলিয়ে গেল। চারিদিক এমনই ম্লান, আচ্ছন্ন এবং রুদ্ধনিশ্বাস।

ভাসুর-পোটি বিদায়-সজ্জা করে' এতক্ষণ বকুলতলার কাছে দাঁড়িয়েছিল—এবার একটু অন্যদিকে এগিয়ে গেল; একবার এদিক-ওদিক তাকালো, পরে মৃদুকণ্ঠে বল্ল—তোমার কোনো উপকার আমি করতে পারিনি, যাবার সময় সেজন্যে ভারি দুঃখ হচ্ছে।

অল্পবয়সী একটি বিধবা মেয়ে এতক্ষণ থামের আড়ালে

মাথা-গুঁজে করে' দাঁড়িয়ে কি ভাবছিল কে জানে, ছেলেটির কথায় আচম্‌কা মুখ-তুলে' চেয়ে মাথাটি তার আরও হেঁট হয়ে গেল। বোধ হয় কি একটি উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ঠোঁটদুটি কেঁপে আবার স্থির হয়ে রইল।

বিদায়ের বেলায় স্বল্পপরিচিতা বিধবা কিশোরীকে এর চেয়ে বেশি আর কি বলা চলে!

ছেলেটি কিয়ৎক্ষণ একটি অস্বস্তিকর নীরবতা কাটিয়ে শুক্‌নো একটুখানি হেসে বল্‌ল—কি বল্‌তে এসেছিলাম ভুলেই গেছি! থাক্‌গে।

বেড়ার ওধারে বড়-বৌয়ের ক্ষোভ-প্রকাশ তখনও চল্‌ছে।

মন্দা ভয়ে ভয়ে অন্দরের দিকে একটুখানি সরে' গেল; সামান্ত দু'চারদিন যৎসামান্ত হাল্‌কা আলাপ তাদের হয়ে গেছে, কিন্তু এ-কথাটির উত্তর দেবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তার কিছুই ছিল না। শঙ্কাতুর দুটি বড় বড় চোখে সে একবার শুধু তাকালো।

যুবকটি বুঝ্‌লো, বুঝে নিজকে সাম্‌লে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার ক'রে সহজভাবে বল্‌ল—দাদা কোথায় তোমার?

মুখ তুলে মন্দা বলল—নেই। বোধ হয়—

যাবার সময় একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলে,—

তারপর কোনো কথাই আর খুঁজে পাওয়া গেল না। মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবার সময় আর একবার ছেলেটি কেবল বল্‌ল—আলাপ ত রইল, কিন্তু দেখা বোধ হয় আর হবে না। আমি তাহলে—কেমন?

বুকের সমস্ত রক্ত তোলপাড় ক'রে মন্দার শুধু একটি কথা বেরিয়ে এল—আচ্ছা! এবং পরমুহূর্ত্তেই ঈষৎ অন্ধকারে সে মিশিয়ে গেল।

বড়-বৌ আর একবার এধারে এলেন। বল্‌লেন—এবার তবে আসি মা?

পায়ের ধুলো নিয়ে ঘাড় নেড়ে মন্দা এবার সম্মতি জানাতেই বড়-বৌ ডান হাতে তার চিবুকটি তুলে ধরে বল্‌লেন—আর একটি কথা বলে যাই, তেরো বছর বয়েসে শাদা থান প'রে আইটার মুখে কালি দিস্‌নে মা; নরুন-পেড়ে ধুতি পরিস্‌, তবে যদি দূরে থেকেও বুক ধরতে পারি।

তারপর হঠাৎ চোখে আঁচল দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

অবিচ্ছিন্ন অবসাদের ভার কাঁধে নিয়ে এক-একটি দিন আবার পার হয়ে চলতে থাকে। ওদিকের ঘরগুলি খালিই প'ড়ে রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ভাড়াটে নাকি আবার একঘর আসবে।

ফাঁকা ঘরগুলি যেন মন্দার মুক্তি। সারাদিনের কাজের বন্ধন থেকে এক-একবার ছাড়া নিয়ে সে এই নির্জ্জন ঘরগুলিতে এসে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। কড়িকাঠের কোণে কয়েকটা চড়াই পাখী বাসা বেঁধেছে; তাদের সঙ্গে মন্দার বড় ভাব। তাদের অবিশ্রান্ত কোলাহল শুনতে শুনতে তার নিজের অন্তরও সেই সঙ্গে কলগুঞ্জন ক'রে ওঠে। একটি কালো-সাদা রঙের বিড়াল প্রায়ই বেড়াতে আসে; খাদ্যাভাবের দৈন্য তার মুখে সর্ব্বদা যেন লেগেই আছে; চোখদুটি শান্ত আত্ম-সমাহিত; বৈষ্ণবদের মত মদালসও বলা যেতে পারে। বেচারি চিরকালই আশ্রয়হীন। গায়ে বড় বড় লোম—যেন রেশমের গোছা। লেজটি তুলে মন্দার পায়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সোহাগ জানায়।

—আচ্ছা রাণি, তোকে এত গালাগাল দেয়, তবু ওদের রান্নাঘরে ঢুকিস্‌ কেন বল্‌ ত?

—মেউ!

একদিনও মার খাসনি, এই বাহাদুরি কচ্ছিস ত? কিন্তু ধরা পড়লে মারা যাবি যে!—ওকি তোমার নজর অত উঁচুতে কেন? ওরা কাঠি-কুটি দিয়ে দিব্যি ঘর বাঁধছে, তোমার ওদিকে চেয়ে অত হিংসে কি জন্যে?

—মেউ!

মন্দা তখন হেসে বিড়ালটিকে কোলে তুলে নেয়। কাঁধে ফেলে আদর করে।

একজোড়া গোলা-পায়রা সম্প্রতি কার্ণিশের তলায় একটু স্থান সঙ্কুলান ক'রে নিয়েছে। যখন তখন তাদের কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। মন্দা লুকিয়ে লুকিয়ে কার্ণিশের তলায় এসে দাঁড়িয়ে গাল ফুলিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে এক চমৎকার ভঙ্গীতে তাদের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করতে

সন্ধ্যা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস

থাকে। সন্ধ্যার সময় গোটা-দুই চারদিকে ছুটোছুটি করে —তাদের দেখলেই মন্দা ভয়ে ভয়ে অন্তদিকে চলে যায়।

আর সবার শেষে আসে একটি শান্ত ভদ্র কুকুর। অনেক দেরিতে এসে একপাশে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটিয়ে যায়।

—ধর্ম্মরাজ, তোমার ভাত নিয়ে রাত অবধি কে বসে থাকবে বল ত? আমার বাপু সন্ধ্যে হলেই ঘুম পায়।

উঠোনের একপাশে কতকগুলি ভাত দিয়ে কুকুরটার গায়ে একটি ঠোনা মেরে স্নেহের মৃদু হাসি হেসে মন্দা চলে যায়।

বাপের সংসারে সব কাজই করতে হয়। মাও নেই, একটি বোনও নেই। দাদা আছেন। গরীবের ঘর তাই বছরে এক-আধটি দিন ছাড়া কোনো দিনের কোনো বৈচিত্র্যই দেখা যায় না। একান্ত একঘেয়ে পুরাতন জীবনের বোঝা টেনে চলতে চলতে ছোট গৃহস্থটির যেন অকাল বার্দ্ধক্য ঘনিয়ে এসেছে। বাপ থেকেও নেই, একেবারে নিস্পৃহ ব্যক্তি। তামাক খাবার নাম ক'রে বেরিয়ে যান, আবার তামাক কিনে বাড়ীতে ঢুকে কোণের ঘরটিতে দিন কাটান। বোবা বৃহৎ পৃথিবী তাঁর দরজায় নিঃশব্দে হানা দিয়ে থাকে। দাদার দুবেলা মাষ্টারী—সময় বড় অল্প; পড়াশোনাও আছে। তাঁর আবার একটু চোখের দোষ ছিল। কাছের চেয়ে দূরের বস্তু তিনি যেন ভালই দেখতে পান।

—আঃ দাদা যেন কি! কালো কাপড় আর ফর্সা জামা—লোকে হাসবে যে! দাঁড়াও, আমি কাপড় বার ক'রে দিই।

দাদার তখন আর তর সয় না—ঠিক বলেচিস রে, সত্যি কথা—আমি ত এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। এসব দিকে নজর তোদের ভারি ধারালো। দে তবে দে ভাই একটু তাড়াতাড়ি। কই, কোথা গেলি? কাপড় একখানা আনতে এত দেরি হচ্ছে? তুই কোনো কাজের নয়, মুখপুড়ি। আর একটু হলেই লোকে বোকা বলতো আর কি! মন্দা, কই রে?

মন্দাকিনী কাপড় এনে দেয়। কাপড় বদল ক'রে দাদা বলেন—সময় কম, সময় বড় অল্প!

দাদাকে মন্দা একটু-আধটু তিরস্কার করতে ছাড়ে না।

—পেঁচেপোড়া বেরচারীর মতন তাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? তোমার ধমক খাবার বয়েস এখনও পার হয়নি, এ কথা মনে রেখো দাদা।

দাদা বলেন—তাহলে একটু বসি, ধমকটা কি ধরণের শুনে যাই—কি বলিস্? কাজকর্ম কোথাও কিছু নেই, শুধু বেড়াতে বেরোচ্ছিলাম।

মন্দা হেসে তখন একেবারে লুটোপুটি—তবে যে দৌড়চ্ছিলে দাদা? তবে যে সময় কম বলে আমায় ছুটোছুটি করালে? বেশ তুমি লোক যা হোক

—ওই ত আমার দোষ! কাজের চেয়ে কাজের ইচ্ছেটা আমায় ছোটায়।

মন্দা কাছে স'রে এসে দাদার হাতটি ধরে বলে—আচ্ছা দাদা?

—ওকি, কথা বলবার আগেই যে অমনি চোখ ছল ছল ক'রে এল! কি শুনি?

—তুমি বে'থা বুঝি করবে না? আমি আর একলা থাকতে পাচ্ছি না কিন্তু।

বিয়ে! তাইত—ওই যা, আজ আবার সভায় যেতে হবে; 'সারদা বিল' পাশ হচ্ছে—চোদ্দ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে হতে দেবো না!—দে ভাই, পান দে মন্দা।

পান হাতে নিয়ে মুখে দেবার আগেই তিনি ছুটতে থাকেন। দরজার কাছে গিয়ে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন—এ হে হে পান থেকে যে চুণ খসে' গেল। নাঃ মন্দাটা কোনো কাজের নয়!

রাস্তায় ছুটতে ছুটতে পানটি মুখে দেবার সময় আর তিনি পান্ না। সময় বড় অল্প!

মন্দাকিনী দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাদার ওই দ্রুত গতিটির দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসে।

এম্‌নি করেই দিন চলে।—

সেই যে বলে গিয়েছিল 'দেখা বোধ হয় আর হবে না'—তার স্মৃতি মনের কোন্ গভীর অতলে ডুবে গেছে, ডুবেছে একটু একটু করে'। ডুবে মরতে কি কেউ চায়? বাঁচবার চেষ্টায় মাঝে মাঝে মনটা তোলপাড় করেছে, নিদ্রাহীন কোনো কোনো রাত্রে ক্ষণে ক্ষণে ক্লিষ্ট ক্ষীণ

কণ্ঠে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেছে, একাদশীর রৌদ্রোজ্জ্বল নিস্তব্ধ দুপুরে মাঝে মাঝে ছোট্ট এক-একটি নিশ্বাস ফেলে গেছে।

মন্দা দিব্যি করে' বলতে পারে তার কথা এখন আর মনেই পড়ে না।

আবার একদিন এক ঘর ভাড়াটে এল বটে।

খানিকক্ষণ সোরগোল চললো, জিনিষপত্র গোছাবার সাড়াশব্দ হ'তে লাগলো, দু' একটি নর-নারীর অশান্ত কণ্ঠ শোনা গেল, একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ কানে এল। তারপর ক্রমে ক্রমে আবার নিত্য-নিয়মিত জীবন-যাত্রা সুরু হয়ে গেল। একটি স্বচ্ছন্দ সুশৃঙ্খল গৃহস্থালী সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এক সুরে বাঁধা থাকে।

কোনো-কিছুর সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা না-কি বিধবার নীতিবিরুদ্ধ। মন্দার তাই কোনো কৌতূহল নেই। সে বরং আত্মগোপন করে' দুনিয়া থেকে মুছে যাবে, কিন্তু অযৌক্তিক আত্মপ্রকাশ করে' মিথ্যা প্রাধান্ত নেবার মত দুর্ব্বলতা তার ছিল না। নিরুদ্বেগ আত্মস্থ মনটুকু আপনার মধ্যেই বিস্তার করে' সংসারের কাজ যেন তার সারাদিনে ফুরোতেই চায় না। সে যেন এই সংসারের লুক্কায়িত আত্মা—বাল্মীকীর মত নির্ব্বাসিত থেকেই আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

বৌটির কিন্তু বয়স বেশী নয়।

ঢুলঢুলে দুটি চোখ, এলো অগোছালো মাথার খোঁপা, শাদা শাদা দাঁত, মাথায় এয়োতির চিহ্ন—ইস্‌, একেবারে যেন আগুনের মত জল্‌ জল্‌ করতে থাকে! মাগো, এত সিঁদুর মানুষে মাথায় নেয়? কিন্তু পা দুখানিতে আলতা পরে' সে যখন এসে দাঁড়ায়—আহা, যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণটি!

নিবিড় আনন্দের উচ্ছ্বাসে মন্দার দুটি দীর্ঘায়ত কালো চোখ এক মুহূর্ত্তেই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

পরিচয় সহজে হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক যোগসূত্র যেখানে এক হয়ে মেলে, সেখানে কেমন একটি অভাব চোখে পড়ে। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলে বৌটি একটু গম্ভীর হয়ে যায়—বিধবা কিশোরীর মুখ ঘন ঘন দেখাটা তার যেন ঠিক কাম্য নয়। মাথার সিঁদুরের ওপর ঘোমটা টেনে ঢাকা দেবার চেষ্টা করে, হাতে সোনার চুড়িগুলি ও নোয়াটি লুকোয়। শুধু তাই নয়, হঠাৎ একদিন অসময়ে মন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেই সে চোখের একটি পালক ছিঁড়ে ফেলেছিল। কোলের ছেলেটিকে সে একটু সাবধানেই রাখে; বিশেষ করে' ছেলেকে খাওয়াবার সময় সে দরজাটা বন্ধই করে' দেয়। কেন দেবে না? ছেলের যদি নজর লাগে ত মন্ত্রপড়া জল আনতে আবার ছুটবে কে?

অর্থহীন এমনি কতকগুলি পীড়াদায়ক নিষ্ঠুর এবং জঘন্য কুসংস্কার মেয়েটির সমস্ত অন্তর এবং সারা যৌবনকে আবিল করে রেখেছে।

অনেক বিবেচনা, অনেক অবহেলা এবং অনেক দিনের পর একদিন সামান্ত একটুখানি আলাপ হ'ল বটে। কাছাকাছি এসে অথচ ইচ্ছাকৃত খানিকটা ফাঁক রেখে কপাল এবং কালো দুটি ভুরু যথাসম্ভব কুঞ্চন করে' বৌটি বল্‌ল—বয়স ত বেশি নয় দেখছি, কপাল পুড়লো কদ্দিন?

কথার মধ্যে তার যেন চাবুক আছে। প্রথমে গলার ভেতর মন্দার কথা প্রায় আটকে গেল। সে অনেক আশা করেছিল গোপনে এই সমবয়সী বৌটির সঙ্গে 'সখি' পাতাবে। ভয়ে ভয়ে মাথা হেঁট করে' বিবর্ণ মুখে মৃদু কণ্ঠে বল্‌ল—এই দু বছর।

বৌটি বল্‌ল—এত শান্ত কেন? অন্য কেহ হলে বলতো 'চুপো ভান্‌'! —ঘর করেছিলে?

হঠাৎ এক ঝলক রক্ত মন্দার মুখেচোখে ছড়িয়ে গেল। ছি ছি—এ কি লজ্জাকর শ্রীহীন প্রশ্ন। হেঁট-মাথা তার আরও হেঁট হয়ে গেল।

—যাই হোক, সে বুঝতেই পাচ্ছি। একাদশী কর? সে ত করতেই হবে—বামুনের ঘর। পেড়ে কাপড় পরেছ কেন, লোকে যে নিন্দে করবে!—রাঁধে কে?

ঘাড় নেড়ে মন্দা জানালো, সেই রাঁধে।

—তা ত' হবেই, একটা কিছু কাজ চাই ত! তা ছাড়া বিধবা মেয়ে গলায় পড়লে ঝি-রাঁধুনী লোকে ছাড়িয়েই দেয়, সেজন্তে কাউকে দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু অত ক'রে ছোঁয়া-ন্যাপাটা ভাল নয়; সবারই অমঙ্গল। গেরস্থর অকল্যেণ করা, কি ভাল?

প্রথম আলাপেই এমনি একটা উচ্চ-নীচ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সহজ বন্ধুত্বের মাঝখানে যদি ছোট-বড়র প্রশ্ন আসে ত তার চেয়ে করুণ আর কিছু নেই। মনের কথাগুলি প্রকাশ করবার পথ থাকে না, করতে গেলেই কেমন একটু ঘা খেয়ে ফিরে আসতে হয়। দেখা হয়ে গেলে মন্দা তাই মনে মনে ভয় পেয়ে লুকোবার চেষ্টা করে, আর নয় ত কোনো কথা খুঁজে পায় না।

একটি অস্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা বৌটিকে সদা-সর্ব্বদা যেন আচ্ছন্ন করে' থাকে। নিতান্তই সাধারণ মনোভাবের মানুষ। সে কারো ভালতেও নেই মন্দতেও নেই। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কারো সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন সে এতটুকু মনে করে না।

—অনেক পাপ না করলে বছরে আর পঁচিশটে একাদশী করতে হয় না। বিধবার মরণ ত আর নেই; আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে সেই একশো বছর অবধি টান্‌বে। ছি!

কিন্তু এই প্রচণ্ড অবজ্ঞাও মন্দার মনে রেখাপাত করে না, এ যেন তার সয়ে গেছে। এ ত ঠিক কথাই! এত বড় একটা অভিশাপ নিয়ে যদি বাঁচ্‌তেই হয়, তবে অন্যের প্রীতি পাবে সে কোন্ অধিকারে? সপ্রশংস দৃষ্টিতে বৌটির দিকে চেয়ে মন্দা ভাবে, অপরের তুলনায় নিজে সে কত ছোট! ভাবে, বৌটির কতকগুলি দুর্ব্বলতার তলায় একটি বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তা আত্মগোপন করে' রয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর ঘরকন্নার মধ্যে একটি চমৎকার ছন্দ এবং সৌন্দর্য্য মন্দার চোখে পড়ে। টুকরো-টাকরা এক-আধটি কথা,একটুখানি হাসির আওয়াজ এদিকে যা ছিট্‌কে আসে—তাই নিয়ে মন্দা মালা গাঁথে। বৌটির বয়স অল্প, অতএব প্রণয়-নিবেদনের ইঙ্গিত আভাস এখনো চলে। একটু জোরে কথা কইলেই এদিক-ওদিক সব একাকার হয়ে যায়। কিন্তু লজ্জাটি যেন মন্দারই বেশী। ওদিকে ওরা দুজনে যদি হাসি তামাসা করে ত এদিকে রান্নাঘরে বসে' মন্দার মুখখানি রাঙা হয়ে ওঠে; কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করে।

কিন্তু দেখা গেল বৌটি বোকা নয়। মাঝামাঝি কাঠের বেড়া দিয়ে এর আগেই দুদিক আড়াল করা ছিল, হঠাৎ সেদিন নজরে পড়লো—বেড়ার সমস্ত ছিদ্রগুলি বন্ধ করে' দেবার জন্য কাপড়ের কুটি গুঁজে দেওয়া হয়েছে। মন্দার সকল দৃষ্টিকে এড়াবার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ নিদারুণভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। একটি কঠিন এবং সুতীব্র অসন্তোষ বার বার তাকে যেন বিদ্ধ করবার চেষ্টা করছে।

—ধানের ভাত খাই, সবই বুঝতে পারি। ঘরের মেয়ে যে গোয়েন্দা হয় তা বাপু জানতাম না। লুকিয়ে লুকিয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে দেখা—বয়েস কালের বিধবা, আরো কত গুণ বেরোবে তা কে জানে!

আপনার আবিল দৃষ্টিশক্তি দিয়ে অন্যকে এমনি জঘন্য-ভাবে বিচার করবার দুষ্প্রবৃত্তি বৌটি মাঝে মাঝে প্রকাশ করে।

করুণ একটুখানি ম্লান হাসি মন্দার মুখে ফুটে ওঠে। কিন্তু এ ত তার বৈধব্যের প্রতি শাস্তি নয়—এ যে ঘৃণা! তা হোক—

সখির ছোট্ট ছেলেটি সবে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। কচি কচি আঙুল চুষে সে নিজের মনেই খেলা করে। ওধারে বসে বেড়ার ওপর হাত চাপ্‌ড়ে বোধ করি সময় সময় বাধাকে অতিক্রম করতে চায়। মন্দার মনটা তৎক্ষণাৎ একেবারে উত্তাল হ'য়ে ওঠে। ছেলের এই দুষ্টুমির শব্দ শুনে রান্নাঘরে বসে হাসতে হাসতে তার পেটে খিল্ ধরে যায়। ভাবে—কি বোকা! হোক না ছোট ছেলে, কিন্তু পুরুষ মানুষ এত বোকা হয়? ওধার থেকে একবারটি হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে এলেই ত তাকে দেখে যেতে পারে! মন্দার ইচ্ছা করে,শিশুটির কানে কানে গিয়ে বলে আসে—তুমি আর একটু বড় হলে তোমার মাকে লুকিয়ে আমরা লুকোচুরি খেল্‌বো!—মন্দার উন্মুখ এবং ব্যাকুল মন পাগলের মত কেবলই ভাবে, তার কাছে আসবার জন্যেই ছেলেটির যত কিছু দৌরাত্ম্যি!

সন্তানহীনা নারীর এ কোনো সাধারণ বাৎসল্য নয়, শিশুটিকে কোলে নিয়ে আপনার অন্তরকে সুশীতল করবার এ কোন সস্তা উচ্ছ্বাস নয়,—মন্দা যেন ছেলেটির মধ্যে নিজের মনকে খুঁজে পায়। দুজনের মধ্যে কোথায়

যেন একটি নিবিড় বন্ধুত্বের যোগাযোগ আছে। ছেলেটির আহারে, নিদ্রায়, কান্নায়, হাসিতে, খেলায়, দুষ্টামীর মধ্যে মন্দা নিজেকে বেশ অনুভব করতে পারে। ছেলেটির হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি যেন মন্দারই অন্তরের আত্মপ্রকাশ।

তারপর একদিন যে ব্যাপারটি ঘটলো তাতে যেন সমস্তটাই ছিন্ন-বিছিন্ন, বিধ্বস্ত ও পদদলিত হয়ে গেল।

মেঝে থেকে প্রায় এক বিঘৎ উঁচু করে কাঠের বেড়া বাঁধা। সেদিন দুপুর বেলা চকিত দৃষ্টিতে মন্দা চেয়ে দেখলো, ছোট ছোট আঙুলগুলি মাটিতে চেপে ছেলেটি বসে রয়েছে। এ লোভ আর মন্দা সামলাতে পারল না। বেড়ার এধারে বসে হেঁট হয়ে হাতটি গলিয়ে সে ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করতে লাগলো। অবোধ শিশুটি খেলাচ্ছলে মন্দার দুটি আঙুল আঁকড়ে ধরে মুখে পুরে দিল।

এই ত ঘটনা!

সখি হঠাৎ কোথা থেকে বিদীর্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠলো। মন্দা তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে একেবারে রান্নাঘরে দে ছুট। সে ভয়ানক হাঁপাচ্ছিল। একটি মস্ত বড় অপরাধ যেন অকস্মাৎ ধরা পড়ে' গেছে।

বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না। সখি এদিকে এসে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে' বল্‌ল—ছেলেকে আমার কি খাওয়াচ্ছিলি বেড়ার ফাঁক দিয়ে?

ভয়ে ভয়ে মন্দা বেরিয়ে এসে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌ল—কিছু ত খাওয়াইনি দিদি?

দিদি বলে আর সম্বন্ধ কাড়াতে হবে না। রাক্‌চুসি, কি খাওয়াচ্ছিলি শিগ্‌গির বল; নৈলে এখনি পুলিশে খবর দেবো।

মন্দা ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠলো। এক মুহূর্তে সজল চক্ষে বিকৃত কণ্ঠে বল্‌ল—আর কখনো এমন করবো না, এবার মাপ করুন।

—মাপ? দাঁড়া তোর ন্যাকামি আমি বার কচ্ছি। সোয়ামির ঘর করিসনি, ছেলে কোলে নিবি কেমন করে? তা বলে আমার ছেলেকে হিংসে? আবাগি ছোটলোক!

সেদিন সমস্তক্ষণ ধ'রে নানা রকম টোটকা ঊষধ খাইয়ে সখি তার ছেলের পেট থেকে বিষটুকু অবশ্য নামিয়ে দিয়েছিল। অতিরিক্ত মমতার অত্যাচারে রাত্রে ছেলেটার জ্বর এল।

পুলিশে খবর দিল না বটে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি মন্দাকে মাথা পেতে নিতে হল। দিন-তিনেক পরে দেখা গেল, সকাল বেলা গরুর গাড়ীর উপর মালপত্র চালান যাচ্ছে। এ বাড়ীতে থাকা সখির পক্ষে বিপজ্জনক। বিষবৃক্ষের গোড়ায় কি কেউ বাসা বাঁধে?

না, কেউ বাঁধে না!

সুমুখে একটি জামগাছ উত্তপ্ত হাওয়ায় শুধু সির্ সির্ করতে লাগলো, একটি ঘুঘুপাখীর পাখার শব্দ দূর থেকে দূরে ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগ্‌লো……

মন্দা সেইদিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

নববর্ষার আকাশ মেঘে মেঘে আকুল হয়ে ওঠে। দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করে মানুষের নীড়গুলির মাথায় অন্ধকার নেমে আসে। কেতকী-কদম্বের বনে বনে দীর্ঘ তীব্র কেকারব শোনা যায়। চারিদিক একাকার করে' অবিশ্রান্ত জলধারা নামে। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা যায়, অশ্রুধৌত দিগন্তের মুখখানি ধীরে ধীরে জ্যোতিমান হয়ে উঠেছে। রৌদ্রের হাসিতে তার সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল।

* * *

বর্ষার পরে শরতের প্রবেশ।

শহরের বাড়ী খালি পড়ে' থাকে না। আবার ভাড়াটে এল। একটি সুন্দরী মহিলা আর একটি সুন্দর কিশোর। মহিলাটি কোথাকার কোন্ জমিদার রাজার স্ত্রী। রাজার দ্বিতীয় পক্ষের দুর্ব্যবহারে তিনি ছেলেটিকে নিয়ে স্থান ত্যাগ করেছেন। ওই একটিই সন্তান। রাজকোষ থেকে যৎসামান্য মাসহারা আসে। ছেলেটিকে যেমন করেই হোক মানুষ করে তুলতে হবে।

টক্‌টকে রঙ, কালো কালো ঝাঁপা-ঝাঁপা চুল, ডালিমের দানার মত দাঁত,—দীর্ঘবিস্তৃত দুটি চোখ, কালোর চেয়ে নীলের আভা সে চোখে বেশি খেলে যায়। কণ্ঠস্বরের মধ্যে তার যেন একটি সঙ্গীত আছে, একবার শুনলে আর একবার শোনবার জন্য কান পেতে

রাখতে হয়। চৌদ্দ বছরের ছেলের গায়ে মত্ত হস্তীর মত শক্তি। নাম গোরা। গোরাই বটে! দুরন্ত দুর্ব্বার ছেলে কারো হাঁকডাক্ মানে না। সে যেন সত্যিই রূপকথার সেই রাজপুত্র; চোখে তার সেই তেপান্তরের আভাস, বুকে তার সেই সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হবার দুর্জ্জয় সাহস

দুদিন না যেতেই সমস্ত বাড়ীটা তার কলকণ্ঠের মুখরতায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে উঠলো। এইটুকুর মধ্যে তাকে যেন ধরে না। উদার আকাশ আর দিগন্ত-জোড়া প্রান্তর ভিন্ন দেওয়াল-ঘেরা ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে তাকে বাঁধা বড় কঠিন।

কিন্তু মন্দাকে আর সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনও খাটের তলায় জান্‌লার পাশে দরজার আড়ালে; কখনও রান্নাঘরের নির্জ্জনতায়; কখনও বা ছাদের কোণে তাকে আবিষ্কার করতে হয়। গোরাকে তার ভয়ানক ভয় করে! গোরা যখন মাঝখানের কাঠের বেড়াটা এক-একবার হাত দিয়ে নেড়ে এর অস্তিত্বের অপ্রয়োজনের কথা জানিয়ে যায়, মন্দার বুকের ভেতরটা তখনই গুর্ গুর্ করে ওঠে। গোরার গলার আওয়াজ শুনলে কিংবা তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনায় শঙ্কাতুর হরিণীর মত সে ওই রকম কোনো গোপন স্থানে গিয়ে লুকোয়। গোরা যেন তার প্রাণ-দেবতার নিভৃত মণি-কোঠার সংবাদ রাখে।

আত্মগোপন করে আর কতদিন চলে!

ছাদের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে গোরা বলে উঠলো—আরে বাঃ! দেখলে মা, দেখলে মজা? এদিকে আস্‌ছিল, আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল! শুন্‌চ—আমি বাঘ না ভাল্লুক? বলি ওই ও-বাড়ীর মেয়ে!

নিজের কথায় নিজেই সে উচ্চকণ্ঠে হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

মা বললেন—লজ্জা কি! তোমার মতন; তুই বাপু অত করে' চেঁচামেচি করিসনে। ছেলেমানুষ ভড়কে যায়।

—মেয়েটা খুব শান্ত না মা?

—শান্ত সবাই, তোমার মতন কেউ না!

রান্নাঘরে বসে মন্দা সবই শুনছিল। একটা উন্মত্ত মন্থন তার ভিতরে তখন তোলপাড় করছে। মনে হচ্ছিল, উত্তেজনায় এখুনি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে!

কাজ যখন কিছু থাকে না, গোরা তখন শিস দিয়ে দিয়ে সমস্ত বাড়ীটায় পায়চারি করে' বেড়ায়। ঠুক্‌ঠাক্ দুম্‌দাম্ শব্দ ত তার জন্ম লেগেই আছে। আকাশে উড়ন্ত পাখীর দিকে ঢিল ছোড়া তার একটি কাজ। সন্ধ্যার পর পড়ার সময় দেখা যায় রাণী আর ধর্ম্মরাজ তার দুই পাশে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে রয়েছে।

কলতলায় জল আনতে এসে আবার হঠাৎ সেদিন দুজনে দেখা।

—এবার? এবার কি হয়? পালাচ্ছিলে যে? এলেই তোমাকে ভয় খাইয়ে দেবো তাই লুকিয়ে বসে-ছিলাম! তুমি বুঝি ভেবেছিলে আমি বাড়ীতে নেই?

ঠক্‌ঠক করে কেঁপে মন্দার হাত থেকে বালতিটা পড়ে গেল। মা এসে সুমুখে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসছিলেন। বললেন—মন্দা, এসো মা, তুমি আমার কাছে। হতভাগা অমনি সবাইকে চম্‌কে দেয়।

গোরা বল্‌ল—মন্দা, মন্দা তোমার নাম? একে মন্দ বলে' মনে হয় মা?

মা বল্‌লেন—চুপ কর্ তুই গাধা। মন্দা মানে মন্দাকিনী। স্বর্গের নদী!

মন্দা ইতিমধ্যে বালতিটা তুলে নিয়ে কোনমতে পাশ কাটিয়ে ওদিকে চলে গেল। তার গতির দিকে চেয়ে হঠাৎ মা ও ছেলে দুজনের মুখেই কথা বন্ধ হয়ে রইল। মন্দাকিনী কি আঘাত পেয়েছে?

আঘাত সে কোথায় পে'ল কেউ জানলো না! আঘাতকে বিশ্লেষণ করে' বোঝাবার শক্তি ত তার নেই! আড়ালে গিয়ে ভয়ব্যাকুল হয়ে মন্দা হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

গোরা ততক্ষণ ছাদে বসে আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছিল—স্বর্গের নদী! স্বর্গে কি নদী বয়? ওই আকাশে?

মা এধারে এলেন। মন্দা চোখ মুছে উঠে এসে তাঁর কোলের কাছে দাঁড়ালো। মা বললেন—এ কি, চুল যে

ভিজে! জল বসে অসুখ করলে কেউ ত দেখবার নেই মা!

তাঁর কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে মন্দা মৃদু কণ্ঠে বল্‌ল—অসুখ করে না!

পাগলি কোথাকার!—বলে মা তাঁর চুল ফিরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—ঠোঁট দুখানি মুখটি যে শুকিয়ে গেছে! খাওয়া হয়নি এখনও?

ঘাড় নেড়ে মন্দা জানালো, না।

সে কি, বেলা যে গড়িয়ে গেল; চিলের ছাদে গিয়ে রোদ উঠেছে,—এত বেলায়—চুপি চুপি মন্দা বল্‌ল—আজ খেতে নেই মা!

—ও। তাই বটে! আমার ত মনে থাকবার কথা নয়; কিছু মনে করিস্‌নে মা। কিয়ৎক্ষণ পরে গোরার পায়ের শব্দ হঠাৎ ওধারে শোনা যেতেই ব্যাকুল হয়ে মায়ের হাত ছাড়িয়ে মন্দা পালাবার চেষ্টা করল—মা কিন্তু ছাড়লেন না। গোরা এধারে আসতেই তিনি সজল কণ্ঠে বলে উঠলেন—যা তুই যা এখান থেকে। এধারে আসিস্‌নে—যা।

তাঁর কোলের মধ্যে মন্দার দেহখানি তখন থর্ থর্ করছে।

আচ্ছা এর শোধ আমি নেবো,এই বলে রাখলাম!—বলে গোরা আবার দুপদাপ করে' চলে' গেল।

পরিচয় হয় না, আলাপ হয় না—কিন্তু ভয় মন্দার একটুখানি কমে গেছে। ইতিমধ্যে নিজের নামটি হয়েছে নিজেরই কাছে বিপজ্জনক। কারণ নেই, কৈফিয়ৎ নেই, প্রয়োজন নেই—যখন-তখন ওদিক থেকে গোরা তার নামটি ধরে' ডেকে ওঠে, সে তার কি কণ্ঠস্বর! নামের ওই দীর্ঘ আকারান্তটি ঘরেবাইরে চারিদিকে ঘা খেয়ে খেয়ে মন্দার অন্তরের মধ্যে এসে ডুবে যায়। নিজের নাম অন্য কারো মুখ থেকে শোনার মধ্যে একটি লজ্জাও যেমন আছে, একটি অপরিসীম তৃপ্তিও তেমনি রয়েছে। মন্দা সাড়া দেয় না বটে, কিন্তু তার সমস্ত দেহমন নিজের নামটিকে নিয়ে বীণার তারের মত ঝঙ্কৃত হতে থাকে। মুখখানি তার দেখতে দেখতে টকটকে রাঙা হয়ে ওঠে। কণ্ঠও রোধ হয়ে আসে।

গোরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। চীৎকার ক'রে সে মন্দার নাম ধরে' ডাকবে, চীৎকার করে সে মন্দার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে, চীৎকার করে সে মন্দার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে।

মা দাঁড়িয়েছিলেন। চট্ করে' মুখ ফিরিয়ে গোরা বল্‌ল—ও কি পালাচ্ছ যে? একটু খাবার জল আমাকে দাও মন্দা।

মন্দা জল এনে মাটিতে নামিয়ে রাখলো। গোরা বল্‌ল—হাতে দিলে জাত যায় বুঝি? দেখছ মা, দেখছ? এ রকম করলে আমি কিন্তু গিয়ে হাঁড়িকুড়ি সব ভেঙে দিয়ে আস্‌ব তা বলে দিচ্ছি।

মা বললেন—ওই বীরত্বটুকু দেখানো বাকি আছে বটে।

কিন্তু গোরার আর সবুর সইল না। সেদিন সবাই বেরিয়ে যাবার পর মায়ের বারণ অগ্রাহ্য করে' সে দু হাতের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে কাঠের বেড়াটা সরিয়ে দিল। মন্দা এই কাণ্ড দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠে ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করল। দরজা ঠেলে দিয়ে গোরা বল্‌ল—এবার নিরুপায়, কোথা যাবে যাও?

—ওমা এ ছেলে আগল ভেঙে ঘরে ছুটে আসে যে! মন্দা ভয়ে কাঠ হয়ে তার পায়ের দিকে চেয়ে রইল।

ঘরে ঢুকে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে গোরা বল্‌ল—অনেক ভুগিয়েছ তুমি মন্দা, কদিন থেকে আমার ভারি রাগ হচ্ছিল। একটা লাঠিসোঁটা কিছু পেলে তোমাকে দু এক ঘা—এই যে একটা ছড়ি পেয়ে গেছি; ভালই হল।—নাও, হাত পাতো দেখি?

সর্ব্বনাশ, ঘরে যে ঝড় লেগেছে! সব ওলোটপালট করে' দিতে এমন সর্ব্বনেশে ডাকাত এল কোথা থেকে?

এ যে প্লাবন! এ যেন বানের জল! সব টেনে বার করে' ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নাকি?

মন্দা হাত পাতছিল। মা এসে বললেন—ইস্ ভারি শাসন তোর! ইস্কুলে মার খেয়ে এসে তার শোধ বুঝি আমার মেয়ের ওপর তুলতে হবে? যা গোরা, তুই ঘর থেকে।

ছড়িটা একপাশে রেখে দিয়ে নির্মল হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করে' গোরা বেরিয়ে চলে গেল।

দাদা এলেন সন্ধ্যাবেলা। এদিক ওদিক উঁকি মেরে অকস্মাৎ একদিকে চেয়ে বললেন—ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে রে? নাঃ মন্দাকে নিয়ে আর পারা গেল না!

তাই ত অকারণে এই গোপন আবছা আলোয় সে এমন দাঁড়িয়ে কেন? সে কি আড়াল থেকে ওই রাজরাণী আর রাজপুত্রের দিকে চেয়ে কল্পনার জাল বুনছিল? কিন্তু তাদের যে বড়-জীবনের বড়-কথা, বড়-অভাব, বড়-ব্যর্থতা, বড়-অনাদর! রাজ-পরিবারের বড় বেদনার সঙ্গে পথপ্রান্তবাসিনীর ছোট্ট জীবনের দুঃখ ত কোথাও মেলে না!

জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে দাদা বললেন—অন্ধকার হয়ে এল যে মন্দা, আলো জ্বালতে হবে না?

হঠাৎ একবার স্তব্ধ হয়ে মন্দা চারিদিকে তাকালো। অন্ধকার হয়ে এসেছে, কই এতক্ষণ সে ত বুঝতে পারেনি! দাদা ডাকছেন আলো জ্বালতে?

তা বটে—

এবার আলো জ্বালবার সময়ই হয়েছে!

মন্দা সিঁড়ি থেকে নীচে নেমে এল। চোখের জলে তখন আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার আরও আবিল হয়ে এসেছে।

আলো জ্বালবার পর দাদা বললেন—বাপ রে, তোর দাঁড়াবার কি ভঙ্গী, দেখে আমার ভয় হয়ে গিয়েছিল! মনে হল যেন পাথর হয়ে গেছিস্! গোরা বুঝি তোকে অমনি করে' দাঁড় করিয়ে শাস্তি দিয়েছিল?

মন্দা বল্‌ল—কি যে বল দাদা! তার বুঝি আর কাজ নেই?

দাদা খেয়ে-দেয়ে ঘরে উঠে বই-কাগজ নিয়ে বসলেন। বাবা তার আগেই কাজ সেরে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বিছানায় উঠেছেন। নিস্পৃহ ব্যক্তি!

একাকিনী অন্ধকার রাত্রি আর একাকিনী মন্দা—দুটি তখন এক হয়ে যায়। আলো নিবে গেলেও মন্দার আর ভয় করে না। রাত্রির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বহুদিনের। ঘুম তার চোখে সহজে আসে না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিজেকে সে কোনো বিচিত্র স্থান থেকে আবিষ্কার করে' আনে। কখনো উঠানে, দালানে; কখনও ছাদের সিঁড়িতে কিংবা কলতলার ধারে; কখনো বা সদর দরজার পথে কিংবা শোবার ঘরের একটি কোণে। এলো-মেলো ধূলো-বালিমাখা মাথার চুল, গায়ে ব্যথা, চোখে ক্লান্তি—কেমন একটি আনন্দহীন অবসন্নতা!

—কে রে? মন্দা? এসো মা এসো। এত রাতে মাকে বুঝি মনে পড়লো?

মন্দা গিয়ে মায়ের কাছে বসলো। মা বললেন—এই চিঠিখানা পড়ছিলাম মা, ওঁর কাছ থেকে এসেছে। পড়ে' ত অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন; শিগ্‌গিরই গোরাকে দেখতে আসবেন—এই সব! তুমি এত রাত অবধি জেগে রয়েছ?

মন্দা বল্‌ল—শুতে যাচ্ছিলাম তাই একবার—

মা বললেন—পাগ্‌লি, এদিক-ওদিক চাইছিস যে? ভয় নেই রে ভয় নেই, সে ও-ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। তয় কি তুই সঙ্গে এনেছিস মুখপুড়ি?

মন্দা একটু হেসে তখনই আবার উঠে দাঁড়ালো। বল্‌ল—দাদাকে পান দিয়ে আসতে ভুলে গেছি।

মন্দা চলে' যাবার কিয়ৎক্ষণ পরে মায়ের চোখে বোধ করি তন্দ্রা এসেছিল। অকস্মাৎ গোরার চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে তিনি ধড়মড় করে' উঠে বসলেন। আলো ইতিমধ্যে নিবে গিয়েছিল। ছাদের পাঁচিল পার হয়ে কেবল এক ঝলক চাঁদের আলো এসে বারান্দায় পড়েছিল।

মা উঠে এসে গোরাকে ধরে' ফেলে বললেন—কি হয়েছে রে? স্বপ্ন দেখলি বুঝি?

ভয়ে আর বিস্ময়ে গোরার তখন কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছিল। এদিক-ওদিক ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে বল্‌ল—স্বপ্ন নয় মা……ঘুমোচ্ছিলাম……কে যেন—আমি কিন্তু ঠিক দেখেছি মা ··বিছানার ধারে এসে আমি আর একলা শুতে পারবো না কিন্তু।

মা বললেন—একলা থাকার বড়াই করতিস যে—চল্‌ আমার কাছে। ভয়িয়ে উঠেছিলি বুঝতে পাচ্ছি।

গোরা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল। মনে হল, রহস্যটি তার কাছে রহস্যই রয়ে' গেল! কিন্তু মন তার হালকা;

হঠাৎ ঘুম-চোখে মায়ের হাত ধরে' একটু হেসে বল্‌ল—মন্দা জেগে থাকলে আমার মজা দেখে হাসতো, না মা? আমার কিন্তু সত্যি ভয় লেগে গেছল!

মা বললেন—সেদিনও বললি, ঘুমের ঘোরে কে যেন তোর পায়ে হাত···দূর হোক গে ছাই, আজ থেকে আর আমার কাছ ছাড়া হোস্‌নে। অনেক লোকের আনাগোনা এ বাড়ীতে হয়ে গেছে কি না, তাই জন্তে—

তারপর একদিন রাজা এলেন। গাড়ী-ঘোড়া এল, লোকজনের হাঁকডাক পড়ে' গেল। উৎসবে, আয়োজনে, আনন্দে ওদিকটা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। কান্নার পর হাসি, দুঃখের পর সুখ, রাত্রির পর দিন।

ছেলে ও মায়ের নাগাল আর সহজে পাওয়া গেল না। আজ তাঁরা রাজ-পরিবারের অন্তর্গত। সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাত্রার সঙ্গে আজ আর তাঁদের সমশ্রেণীভুক্ত করা চলে না। প্রীতির চেয়ে আজ শ্রদ্ধা বেশি, ভয়ের চেয়ে ভক্তি,—বন্ধুত্বের চেয়ে আত্মসম্মান!

রাজার আগমনে আজ সবার ছোটখাটো সুখ-দুঃখ চাপা পড়ে' গেছে।

বাঁধা-ছাঁদা এর আগে থেকেই চল্‌ছিল—রাণী-মা বিলি-ব্যবস্থা করছিলেন। গোরা তখন একবার এধারে এল। পিছন থেকে বল্‌ল—ওকি, ছুঁচে সুতো পরানো নেই, কাপড় সেলাই হচ্ছে কি করে?

ছি, ছি, তাই ত—এ কি ভুল! মন্দা সেটা তাড়াতাড়ি কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌ল। গোরা বল্‌ল—বাবা আমাদের নিতে এসেছেন, আমরা চল্‌লাম মন্দা।

কাঙালিনী মুখ তুলে রাজপুত্রের দিকে তাকালো। দেখলো, রাজপুত্রের মাথায় মখমলের টুপি, গায়ে জরির কাজ-করা জামা, পরনে রেশমি ধুতি—সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্যের আভাস। প্রবল একটি আঘাতকে গোপন করে' আজ প্রথম নিতান্ত লজ্জাহীনার মত হঠাৎ বল্‌ল—চলে' যাবে? এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে?

তার সেই অন্তর্ভেদী, উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট কারুণ্যযুক্ত ছুটি বিশাল চক্ষুর দিকে চেয়ে রাজপুত্রের এতদিনের সমস্ত চঞ্চলতা থেমে গেল। মাথা হেঁট করে' শান্তকণ্ঠে শুধু বল্‌ল—হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি;—আবার এ বাড়ীতে নতুন ভাড়াটে আসবে—কি বল?

মন্দার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরোল না। কিই বা বলবে! রাজ-পরিবারের সঙ্গে এক আধ দিনের জন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এইটুকুই তার জীবনে যথেষ্ট নয় কি? পথবাসিনীর ইতিহাসে এইটুকুই ত স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত!

বিদায় বেলায় ভাষা আর কিছু খুঁজে না পেয়ে রাজপুত্র চলে গেল, পথের দিকে চেয়ে কাঙালিনীর দৃষ্টি কাঁপতে লাগলো।

* * *

চিরদিনের একটি অশান্তি দিয়ে গেছে! চিরকালের কাঁটা!

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উৎসাহ এবং বাঁচবার স্পৃহা যে-শিকড় থেকে আপনার রসসঞ্চয় করে তা হচ্ছে নারী-জীবনের একটি বড় ব্যর্থতার সুর। সে সুমহান্ ব্যর্থতার মধ্যে ছোটখাটো স্মৃতি, বিক্ষোভ, গ্লানি, পাওয়া-না-পাওয়া কোনোটাই ঠাঁই পায় না!

শুধু কেবল অশোক আর শিমুলের বনে বনে যখন আগুন লাগে, রজনীগন্ধার সকরুণ ইঙ্গিত যখন চন্দ্রালোকের দিকে উর্দ্ধায়িত হয়ে ওঠে, বনমর্ম্মর যখন ছায়াপথে সঙ্গীত রচনা করে—আর দিশাহারা দক্ষিণের হাওয়া যখন ঘরের ভেতর ঢুকে দাপাদাপি করে যায়—

মধ্যরাত্রে পক্ষিরাজের আগমন-সংবাদে রাজকন্তার ঘুম ভাঙে!

মন্দা ধড়মড় করে' জেগে ওঠে। নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপটিকে একটুখানি উজ্জ্বল করে' দেয়। আর ঘুমোলে যেন তার চলবে না—কেউ যদি এসে ফিরে যায়?

তাড়াতাড়ি উঠে সে বাইরে আসে। পাশের ঘরে ঢুকে দাদার গা ঠেলে বলে—ওঠো দাদা, ওঠো শিগ্‌গির একবার।

দাদা চমকে বিছানার ওপর উঠে বসেন—কেন রে?

দেখে এসো দিকি, একটু আগে কে যেন কড়া নাড়লো, ঘুমের ঘোরে সাড়া দিতে পারিনি। দেখে এসো ত!

দাদা চোখ রগড়ে কি যেন একটা আপত্তি করতে যান।

না দাদা না, সত্যি বলছি, আমি যে শুনলাম! আমার নাম ধরে' ডেকে ডেকে—ঠিক যেন সেই চেনা গলা—আমি ঘুমোইনি দাদা, জেগেই ছিলাম।—ওই শোনো, আবার শব্দ হচ্ছে!

দাদা সেইদিকে তাকিয়ে বলেন—ও যে হাওয়া!

উত্তেজিত মুখ আর চঞ্চল চোখ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মন্দা বলে—হাওয়া! কিছুতেই না—এত জায়গা থাকতে হাওয়া কি শুধু এই বাড়ীতেই দাদা?

—এটা যে ফাঁকা বাড়ী রে!

একটি বেদনাক্লিষ্ট অশ্রুভারাতুর গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে মন্দা শুধু বল্‌ল—ও—তাই বটে! তাইজন্যে ঘুরে ঘুরে শব্দ করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে!

আরও কি যেন বলতে গিয়ে তার মুখের কথা ফুরিয়ে গেল।

কবি শকাঙ্ক

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

পূর্বকালে বাঙ্গালী কবি গ্রন্থসমাপ্তিকাল লিখিয়া দিতেন। কেহ স্পষ্ট ভাষায় আঙ্কিক শব্দে লিখিতেন, কেহ স্পষ্ট না বলিয়া পাঠকের সহিত কিঞ্চিৎ কৌতুক করিতেন। অঙ্কস্য বামাগতি, সংস্কৃত গ্রন্থের এই বিধি বাঙ্গালী কবি প্রায়ই মানিতেন, কদাচিৎ মানিতেন না। না মানিবার একটা কারণ, ছোট সংখ্যা এবং প্রায় জানা সংখ্যা, আদি হইতে কিম্বা অন্ত হইতে বলিয়া গেলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না। বর্ত্তমান শক দক্ষিণাগতিতে ১,৮,৫,১; বামাগতিতে ১,৫,৮,১। যিনি জানেন ১৫০০ নয়, ১৮০০; তাঁহার নিকট দুইই সমান স্পষ্ট। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা গ্রন্থসমাপ্তিপ্রকাশের আকৃতি প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাসে" (২য় খণ্ডে) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন, এটি "বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে।"

> অনল রন্ধ্রকর লক্ষণ নরবই
> সক সমুদ্দকর (পুর?) অগিনি সসী।

অর্থাৎ লক্ষণ সম্বৎসরে অনল—৩, রন্ধ্র—৯, কর—২, বামাগতিতে ২৯৩, এবং শকে সমুদ্র—৪, কর—২, অগ্নি—৩, শশী—১, বামাগতিতে ১৩২৪। এখানে দ্বিতীয় পঙক্তির 'কর' পাঠ শুদ্ধ। কারণ 'পুর' আঙ্কিক নয়, যদিও কবিভাষায় কখন কখনও তিন বুঝাইত। এখানে তিন হইতে পারে না। লক্ষণ সম্বৎসরে ১০৩০।১০৩১ যোগ করিলে শক হয়। শ্লোকটির পরে মাসের নাম জ্যৈষ্ঠ আছে। অতএব ২৯৩+১০৩১= ১৩২৪ শক। লক্ষণ সম্বৎসর কার্ত্তিক শুক্লপ্রতিপৎ হইতে আরম্ভ হয়। এই কারণে উহা দুই শকে পড়ে। এখানে দ্রষ্টব্য সমুদ্র—৪। প্রাচীন রীতি এই ছিল।

কবি চণ্ডীদাসের একটা পদে নাকি আছে,

> বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।
> নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥

বিধু—১, নেত্র—৩, পঞ্চবাণ—৫×৫=২৫। ১৩২৫ শক। সংস্কৃতে 'পঞ্চবাণ' থাকিলে ৫৫ বুঝিতাম। ২৫ যে ঠিক, তাহা পাঠান্তরের 'বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ' হইতে বুঝিতেছি। 'পক্ষ' স্থানে 'পঞ্চ' কিম্বা 'পঞ্চ' স্থানে 'পক্ষ' হইয়াছে।

'নবহুঁ নবহুঁ রস' দ্বারা গীতের সংখ্যা বলা হইয়াছে। এখানে ৯৯৬, না ৬৯৯? বোধ হয়, ৬৯৯, একোনসপ্তশত।

কারণ কবি ১৯৬ গীতের পর আর ৪টি গীত বাঁধিয়া সহস্র পূর্ণ করিতেন।

এই শকাঙ্ক ও গীতাঙ্ক চণ্ডীদাসের বোধ হয় না। কারণ ভাষা পাঁচশত বৎসরের পুরাতন নয়। আরও, নেত্র—৩, এবং অঙ্কের দক্ষিণাগতি প্রাচীনত্বের বিরোধী।

(২) কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাসের স্বরচিত রামায়ণ পাওয়া যায় নাই। তিনি গ্রন্থসমাপ্তিকাল দিয়াছিলেন কি না, তাহাও জানা নাই। তাঁহার রামায়ণের ১৪৩২ শকের এক প্রতিলিপিতে "আত্মবিবরণ" নামক একটি পয়ার ছিল, শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার একস্থানে আছে,

> আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
> তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।

মাঘমাসের শেষদিনে রবিবার শ্রীপঞ্চমী, এই তিনের যোগ প্রায় ঘটে না। ইহাকে ধরিয়া সন ১৩২০ সালের "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা"য় ১৩৫৪ জন্মশক নিরূপণ করা গিয়াছে। এখন মিলাইয়া দেখিলাম, ঠিক আছে, ইংরেজী সন তারিখে ভুল ছিল। ১৩৫৪ শকে ২৯ মাঘ কুম্ভ সংক্রান্তি, রবিবার, ২৬ নক্ষত্র ২০ দণ্ড গতে ২৭ (রেবতী) নক্ষত্র, শুক্ল চতুর্থী ২৭ দণ্ড গতে শ্রীপঞ্চমী পরদিন সোমবার ২৩ দণ্ড পর্য্যন্ত ছিল। রবিবার রাত্রে কৃত্তিবাসের জন্ম, এবং সোমবার পূর্ব্বাহ্নে সরস্বতী পূজা হইয়াছিল। জন্মদিনটি ইং ১৪৩৩ সালের ২৫ জানুআরি। "আত্মবিবরণে" আরও আছে এগার বৎসর 'নিবড়িলে' বার বৎসরে প্রবেশ করিলে কৃত্তিবাস পাঠার্থে উত্তর দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। সে যাত্রিক শুভদিনও মিলিয়াছে। পাঠ সাঙ্গ করিয়া 'রাজপণ্ডিত' হইবার আশায় কৃত্তিবাস এক গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন।

কিছুদিন হইতে কৃত্তিবাসের উক্ত জন্ম শকে ঐতিহাসিকের সন্দেহ হইয়াছে। কারণ ১৩৫৪ শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইলে ইহার পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে গৌড়ের হিন্দু ঈশ্বর থাকা চাই। কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাসে তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে না। অতএব দেখা উচিত, "আত্মবিবরণ"টি অকৃত্রিম কিনা। অকৃত্রিমতার পক্ষে যুক্তি এই। (১) কৃত্তিবাসের সম্ভাবিত কালের মধ্যে ১৩৫৪ শক পড়িতেছে। মনঃকল্পিত হইলে একটা যা-তা লেখা হইতে পারিত, সম্ভাবিত কালে একটা শকও পাওয়া যাইত না।* বোধ হয়, বিশেষ যোগ বলিয়া শক লিখিবার প্রয়োজন মনে হয় নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইয়াছিল। সে রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। যদি শক জানা না থাকিত, আনুমানিক কাল জানা থাকিত, তাহা হইলেও জন্মদিন বাহির করিতে পারা যাইত।† (২) বিদ্যার্থে যাত্রিক শুভদিনও বর্ণিত দিবসে পাওয়া যাইতেছে। (৩) নিজের বংশ-পরিচয় কবি জানিতেন, কুলপঞ্জী-লেখক ঘটকের পক্ষে জানা সোজা হইত না। (৪) "আত্মবিবরণে" যে সকল অবান্তর আছে, প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত অন্যের কল্পনায় আসিত না। (৫) ভাষার শব্দ পুরাতন।

পয়ারটি কৃত্রিম মনে করিবার হেতু এই। (১) ১৩৫৪ শকের পরে হিন্দু গৌড়েশ্বর পাওয়া যাইতেছে না। রাজা দনুজমর্দ্দন ও তৎপুত্র মহেন্দ্র, এই দুই রাজাকে ৮ বৎসর রাজ্য করিতে দেখি। ১৩৪০ শকে তাঁহাদের রাজত্ব শেষ। রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যদু এবং দনুজমর্দ্দন ও তৎপুত্র মহেন্দ্র এক কি-না, সে বিষয়ে মতান্তর আছে। কিন্তু শেষ ফল একই, ১৩৪০ শকে সমাপ্তি। কিন্তু ১৩০০ শক হইতে ১৩২০ শকের মধ্যে একদিনও জন্মদিনের তিন যোগ হয় নাই। অতএব এই গৌড়েশ্বরকে ছাড়িতে হইতেছে। (২) ভাষার শব্দ পুরাতন বটে, কিন্তু ক্রিয়া-বিভক্তি

---

* ১৩৩৪ সালের ভাদ্রের "প্রবাসী"তে "ধর্ম্মের গান কত কালের' প্রবন্ধে রামাইপণ্ডিতের জন্মতিথি ও নক্ষত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈশাখীর শুক্ল পঞ্চমীতে চন্দ্র ভরণী নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। সুতরাং হয় জন্মতিথি নক্ষত্রে ভুল আছে, না হয় কোন পণ্ডিতের কল্পিত।

† উক্ত শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা ২৩ ফাল্গুন শনিবার পূর্ণিমা মঘাযোগে প্রায় ৪০ দণ্ড। দিবামান ২৯ দণ্ড। রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল। গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গুলি। ইং ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুআরি (Old Style)। ডিসেম্বর মাসে ইংরেজী সাল গত বলিয়া শক+৭৯ ধরিতে হইল। কৃত্তিবাসের জন্মশকেও তাই। সে কালে ইংরেজী দিন-গণনার বর্ত্তমান রীতি ছিল না। এই হেতু পুরাতন রীতিতে মাসের দিন বলা উচিত।

পাঁচশত বৎসরের পুরাতন নয়। বোধ হয়, কেহ তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। প্রাচীন পুথী মাত্রেরই এই দশা। সুতরাং শোনা কথা "আত্মবিবরণের" আধার হইতে পারে। জন্মতিথিতেও ভুল থাকিতে পারে।

অতএব মূল পরীক্ষা প্রথম কর্ত্তব্য। রামায়ণের ১৪৩২ শকের প্রতিলিপি বদনগঞ্জের হারাধন দত্তের নিকট ছিল। তিনি পুথীটি শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফীকে দিয়া প্রতিলিপি রাখিয়াছিলেন। চারি বৎসর হইল, শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পীড়নে আমি আবার বদনগঞ্জে পুথীর অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। হারাধন দত্ত গত, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যাবতীয় পুথীপত্র অদৃশ্য হইয়াছে। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালাও গত, তাঁহার স্বামীও গত। এখন মূল পুথী ও তাহার প্রতিলিপি কোথায় আছে, জানিতে পারি নাই। শুনিয়াছি কলিকাতায় গিয়াছে। যাঁহার হাতে পড়িয়াছে, তিনি অনুগ্রহ করিলে শ্রীযুত ভট্টশালীর পীড়ন হইতে রক্ষা পাই। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "আত্মবিবরণ"টি আরও অনেক পুথীতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পুথীর পাঠ পরীক্ষা কর্ত্তব্য। যদি সব পুথীর পাঠ একই দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। এমনও হইতে পারে, যে হিন্দুরাজার নিকটে কৃত্তিবাস গিয়াছিলেন তিনি বাস্তবিক পঞ্চগৌড়েশ্বর ছিলেন না, হিন্দু বলিয়া তাঁহাকে এই নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা', "আত্মবিবরণের" এই উক্তি রাজা গণেশ কিংবা দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধেও খাটে না। অতিশয়োক্তি স্পষ্ট। এখনও পুরীর রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিয়া আছেন। কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বরের পাত্রমিত্রের নাম এবং তাঁহার উর্দ্ধতন পুরুষদিগের নাম আছে। তাঁহাদের পরিচয় ধরিয়া গৌড়েশ্বরকে ধরিলে সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে। যতদিন বিরোধী প্রমাণ স্পষ্ট পাওয়া না যায়, ততদিন উক্ত জন্মশক মানিতে হইবে। এত অনুসন্ধানেও জন্মশক না মিলিলে 'পূর্ণমাঘ মাস', এই পদের অর্থ বিবেচনা করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা বর্ত্তমান বাঙ্গালায় সংক্রান্তিদিন না বুঝাইয়া তাহার পূর্বদিন বুঝাইতে পারে। এই রীতি ওড়িষ্যায় চলিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, বঙ্গেও এই রীতি ছিল।

(৩) কাশীরাম দাস

১৩১৯ সালের "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা"য় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু কাশীদাসের মহাভারতের বিরাটপর্ব হইতে তুলিয়াছেন,

> চন্দ্রবাণ পক্ষঋতু শক সুনিশ্চয়।

এখানে দক্ষিণাগতিতে ১৫২৬ শক পাইতেছি।

অন্য এক পুথী হইতে বসুজ মহাশয় আদিপর্বের সমাপ্তিকাল তুলিয়াছেন,

> সকাব্দা বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে।
> রুক্মিণি নন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে॥

বিরাট পর্বে ১৫২৬ শক না পাইলে আদিপর্বের এই রহস্য বুঝিতে পারা যাইত না। পঞ্চাননের পাঁচ মুখেই বিধু। অতএব বিধুমুখ=৫। ইহার তিনগুণ=১৫। রুক্মিণীনন্দন, কাম; কামের পঞ্চশর। 'অঙ্কে' শব্দ দ্ব্যর্থ; ১৫, এই অঙ্কের ৫ অঙ্ক; এবং অঙ্কে কোলে, দুই বাহুতে। অর্থাৎ ৫এর পর দুই। জলনিধি, সাগর=৪। সমুদয় অঙ্ক ১৫২৪ শক। (কোলে=২, পরে "শিবায়নে" পাওয়া যাইবে।)

(৪) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

১৩৩৫ সালের "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা"য় শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দত্ত ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" হইতে তুলিয়াছেন,

> বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
> এই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা॥

এখানে শ্রীযুত দত্ত রস=৭ ধরিয়া বেদ=৪, ঋষি=৭, রস=৭, ব্রহ্ম=১, বামাগতিতে ১৭৭৪ শক পাইয়াছেন। কিন্তু রস=৬, অথবা ৯; কুত্রাপি ৭ পাই নাই, পাইবার হেতুও নাই। রস অর্থে জল, জল অর্থে সমুদ্র, সমুদ্র=৭; ৭ অঙ্ক চাই, ইহা জানা না থাকিলে কেহ এই অর্থান্তরে যাইবেন না। রস অর্থে সমুদ্র মনে করিলে পদটির অর্থও হয় না। ঋষি বেদ লইয়া সমুদ্রে ব্রহ্ম দেখিতে পাইলেন? আমার মনে হয়, লিপিকর 'স্বর' লিখিতে যাইয়া 'রস' লিখিয়া ফেলিয়াছে। স্বর=৭। পদটির অর্থ, ঋষি বেদ লইয়া

স্বরে, সামগানে, ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন। অবশ্য রস অর্থে আনন্দ বুঝাইতে পারে, কিন্তু ৭ অঙ্ক যে চাই।

(৫) রামেশ্বরের শিবায়ন

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁহার "শিবায়ন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" এই তিন পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও এই শ্লোক হইতে স্পষ্টরূপে কোন শক বাহির করিতে পারিলাম না। মুদ্রিত পুস্তকে ঐ শকের স্থলে অঙ্কদ্বারা ১৬৩৪ শক নিবেশিত আছে। উহা অতি-কষ্টকল্পনায় সঙ্গত করা যাইতে পারে।" বুঝিয়া দেখি। চন্দ্রকলা=১৬, রাম=৩, করতল (কর)=২। অতএব দক্ষিণাগতিতে শকটি ১৬৩২। কিন্তু 'বাম হল্য বিধিকান্ত...' অর্থ কি? কবি বলিতেছেন, অঙ্কের বামাগতি,—এই বিধি। কিন্তু এখানে সে বিধি রূপ কান্ত বাম কি-না বক্র হইয়া অনলে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ, দক্ষিণাগতি ধরিবে।*

(৬) মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল

পণ্ডিত জনে লিপিকর হইতেন না। লিপিকর্ম্ম খুঁট-আঁখরোর ছিল। ইহারা পুথীর ভাষা কতক বুঝিত, কতক বুঝিত না, বুঝিয়া লিখিবার সময়ও পাইত না। ফলে "যদৃষ্টং তল্লিখিতং" করিত। কিন্তু দৃষ্টিও যে জ্ঞান-সাপেক্ষ, অজ্ঞানের দৃষ্টি মিথ্যা হইতে পারে। শকাঙ্ক সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত হইত, এখানে লিপিকর দিশা-হারা হইয়া অক্ষর-দৃষ্টে যা-তা লিখিয়া বসিত। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের পুথীতে ইহার চমৎকার উদাহরণ আছে। শকাঙ্কের পাঠ শুদ্ধ করিয়া লিখিলে,

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধসহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
শর্ব্বরী শয়াখি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত॥

শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন ১৩১৩ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" এই ধর্ম্মমঙ্গলের ভূমিকায় শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি

ঋতু (৬) বেদ (৪) সমুদ্র (৭)=৬৪৭
সিদ্ধি (৮) যুগ (২) পক্ষ (২)=৮২২

১৪৬৯

ধরিয়া ১৪৬৯ শক মনে করিয়াছিলেন। গ্রন্থের ভাষা আধুনিক দেখিয়া এই শকে আমার সন্দেহ জন্মে। আমি কবির বংশলতা সংগ্রহ করিয়া ১৩১৫ সালের "পরিষৎ পত্রিকা"য় ১৭০৩ শক দেখাইয়াছিলাম (১৩৩৩, ১৩৩৪ সালের "প্রবাসী"ও দ্রষ্টব্য)। ১৩৩৫ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা"য় শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দত্ত এই কাল নির্ণয়ে সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন, যখন যোগ-শাস্ত্রে সিদ্ধি আট প্রকার, তখন এই শ্লোকের সিদ্ধ=৮। যুগ=৪। অতএব

৬৪৭
৮৪২

১৪৮৯

অথবা, পুথীর 'সিদ্ধসহজ্যোগ' পদের 'জ্যোগ' পাঠ ঠিক। "যোগের আট অঙ্গ, সুতরাং যোগ=৮।" অতএব

৬৪৭
৮৮২

১৫২৯ শক

এখানে দুইটি বিষয় বিবেচ্য আছে। মুদ্রিত পুস্তকে 'সিদ্ধ' এবং কবির বাড়ীর পুথীতে 'সির্দ্ধ' আছে। 'সিদ্ধি' পাঠ পাইতেছি না। 'সির্দ্ধ' বানান থাকাতেই বুঝিতেছি, শুদ্ধ পাঠ 'সিদ্ধ' এবং ইহা কদাপি 'সিদ্ধি' হইতে পারে না। 'শুদ্ধ' শব্দ গ্রাম্যলেখক 'শুর্দ্ধ' ভাবিতে পারে, কিন্তু 'শুদ্ধি', 'সিদ্ধি' প্রভৃতি শব্দ কদাপি 'শুর্দ্ধি', 'সির্দ্ধি' হয় না, হইতে পারে না। তা ছাড়া, স্পষ্ট 'সিদ্ধ' শব্দ 'সিদ্ধি' মনে করিলে কবির প্রতি অত্যাচার হয়।

---

* "বঙ্গবাসীর" সংশোধিত ও দ্বিতীয়বার প্রকাশিত "শিবায়নে" (১৩১০) সালে, উক্ত শ্লোকটি

শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
বাম হল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥

প্রকাশিত পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" উপরি উক্ত শ্লোকটি, ও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সন্দেহ ও বিচার উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই পাঠটি অগ্রাহ্য করিবার হেতু নাই। চন্দ্রকলাকে রাম কোলে করিল। এই অর্থ। কোলে করিতে দুই বাহু লাগে। অতএব কোলে=২ ধরিতে হইতেছে।

সিদ্ধ = জিন = ২৪, চিরপ্রসিদ্ধ। জৈন তীর্থঙ্কর ২৪ জন ছিলেন, তাহা হইতে সিদ্ধ = ২৪ ধরা হইয়া থাকে। ২৪ ধরিলে শকটি মনের মত পাই না, অতএব সিদ্ধ শব্দের পারিভাষিক অর্থ পরিবর্তন কর,—ইহা অপব্যাখ্যা। বিবেচ্য দ্বিতীয় বিষয়টি আরও গুরুতর। সিদ্ধি = ৮, স্বীকার করি, কিন্তু তাহা হইতে সিদ্ধ = ৮ অভ্যুপগম স্বীকার করিলে আঙ্কিক শব্দের পারিভাষিকত্ব লুপ্ত হয়। যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া যোগ = ৮, ধরিলে আঙ্কিক শব্দের মূলোচ্ছেদ হয়। দেহ নবদ্বার; তা বলিয়া দেহ = ৯ কদাপি হইতে পারে না।

আমি উক্ত শ্লোকটির ব্যাখ্যায়

ঋতু (৬), বেদ (৪), সমুদ্র (৭) = ৬৪৭
সিদ্ধ (২৪), যুগ (৪), পক্ষ (১) = ২৪২৪
৩০৭১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে বামাগতি। অতএব ১৭০৩ শক। কবি প্রথম অঙ্কে দক্ষিণাগতি ধরিতে বলিয়া দিয়াছেন, অন্য দুই অঙ্কে বলা আবশ্যক মনে করেন নাই, কারণ বামাগতিই বিধি। কবির ভাষা, বিশেষতঃ তাঁহার বংশলতা দৃষ্টে এই শক সঙ্গত মনে হইবে। তথাপি দেখিতেছি, সুধীজনের সন্দেহ যাইতেছে না। শ্রীযুত দত্ত মাণিকরামকে টানিয়া না আনিলে আমি আবার কালক্ষেপ করিতাম না, বলিতাম,

প্রত্যক্ষানুভবং ন লুম্পতি বচো যুক্তিশতৈঃ।

সে হেতু ১৭০৩ শক ঠিক।

এই মন্তব্য লিখিতেছি, এমন সময় আমার কৌতূহল হইল। কবির দক্ষিণাগতি বামাগতিতে কট্-মটো দৃষ্টি নাই, কৌতুক-লহরী আছে। তিনি প্রথম সংখ্যাটিও অক্লেশে বামাগতিতে বলিতে পারিতেন, কিন্তু বলেন নাই। শকাঙ্ক একটি পঙ্‌ক্তিতে বলিতে পারিতেন, যেমন,

রামযুক্ত সিন্ধু ইন্দু বামে সুশোভিত।
এই শাকে সাঙ্গ হল্য শ্রীধর্ম্মের গীত

তিনি বার, তিথি (বুঝি না বুঝি), এমন কি, কত রাত্রে গ্রন্থসমাপ্তি, তাহাও ব্যক্ত করিলেন; করিলেন না মাস ও মাসের দিন! 'সিদ্ধ যুগ পক্ষ', বামাগতিতে ২, ৪, ২৪। যোগফল ৩০৭১ পাইবার নিমিত্ত ২, ৪, ২৪, এমন তিন অঙ্ক গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল? আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল বিতর্ক আমার মনে কখনও উঠে নাই! ২ দ্বারা কি জ্যৈষ্ঠ মাস, ৪ দ্বারা কি দিন-সংখ্যা, ২৪ দ্বারা কি নক্ষত্র ব্যক্ত হইয়াছে? ১৭০৩ শকের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ দিবসের পাঁজি গণিয়া দেখি, ঠিক তাই। সেদিন মঙ্গলবার (মহীপুত্র), কৃষ্ণাষ্টমী ৫১ দণ্ড, ২৩ নক্ষত্র ২৮ দং গতে ২৪ নক্ষত্র।

এখন বুঝিতেছি, কবি কেন এক পঙ্‌ক্তির স্থলে তিন পঙ্‌ক্তি লিখিয়াছেন, কেনই বা 'সিদ্ধ' পরিভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অঙ্ক ভাঙ্গিয়া ২, ৪, লিখিবার জো ছিল না। লিখিলে ২৪, এই একটি সংখ্যা বুঝাইত না। আরও দেখা যাইতেছে, কবি কেন ঘোর-ফেরে গিয়াছেন। ১৭০৩ শক চাই; কিন্তু ২,৪, ২৪ বলিয়া ১৭০৩ পাইবার জো নাই। শকাঙ্কে বামাগতি ধরিতে হইয়াছে। টোলে-পড়া কবি অঙ্কের বামাগতি জানিতেন। ২,৭, ২৪ অঙ্কও বামাগতিতে বলিয়া বিধি রক্ষা করিয়াছেন। ৬৪৭, এই তিন অঙ্কও বামাগতিতে ৭৪৬ না বলিয়া পাঠকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়াছেন।

কিন্তু 'অব্যাহিত তিথি' কি? টোলে-পড়া এক পণ্ডিত বলিলেন মাসের দুই প্রতিপৎ ও দুই অষ্টমী টোলে পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ, পড়ুয়ারা পাঠ হইতে 'অব্যাহতি' পান, টোলের ছুটি: পর পঙ্‌ক্তির 'গীত' শব্দের সহিত মিলাইতে 'অব্যাহতি' স্থানে 'অব্যাহিত' হইয়াছে। অথবা পদটি 'অব্যাহৃতি'। ব্যাহৃতি, ব্যাহার শব্দের অর্থ বাক্য। 'অ-ব্যাহৃতি তিথি,' যে তিথিতে কেবল অধ্যাপন নয়, অধ্যয়নও চলে না। চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমায় অধ্যাপন নিষিদ্ধ, কিন্তু অধ্যয়ন চলে। মাণিকরাম এক টোলে পড়িয়াছিলেন, পুঁথিপুথী লইয়া আর এক টোলে পড়িতে যাইতেছিলেন, পথে 'ধর্ম্মের বিষম মায়ায়' পাঠ আর হয় নাই, তিনি ধর্ম্মের গীত বাঁধিতে বসিয়া যান। যখন সঙ্গীত সাঙ্গ হইল, তখন শর্ব্বরী ২ দণ্ড; সূর্য্যোদয় হইতে শর (৫) অগ্নি (৩) = (বামাগতিতে) ৩৫ দণ্ড।*

* দ্বিজরূপরাম এক ধর্ম্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। মাণিকরাম তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছেন। পরে রূপরামের শক নিরূপণ করা যাইবে। তাহাতে দেখা যাইবে, মাণিকরাম ১৭ শত অব্দের পরবর্তী ছিলেন।

মাণিকরামের গীত এখনও সাঙ্গ হয় নাই। কারণ তিনি গীতারম্ভে চৌদিকের দেব-দেবীর চরণ বন্দনা করিতে করিতে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন-জীউরও করিয়াছেন। কথা উঠিয়াছে, ১৭০৩ শকে অর্থাৎ ইং ১৭৮১ সালে, মাণিকরামের গীত সমাপ্তিকালে, মদনমোহন-জীউ বিষ্ণুপুরে ছিলেন না, কলিকাতায় গোকুল মিত্রের আলয়ে বাঁধা পড়িয়া বিক্রীত হইয়া গিয়াছিলেন। অতএব গ্রন্থসমাপ্তিকাল ইং ১৭৮১ সাল হইতে পারে না। অর্থাৎ পরোক্ষ বলবান্, প্রত্যক্ষ বলবান্ নয়! সৌভাগ্যক্রমে কবি এই তর্কের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই একটি ঠাকুরের নাম করেন নাই, চৌদিকে যত ঠাকুরের নাম শুনিয়াছিলেন, সকলেরই করিয়াছেন। শোনা কথা, ভুল হইতে পারে, এই আশঙ্কায় লিখিয়াছেন,

যার যার যথার্থ না জানি নামধাম।
তার তার পদে মোর কোটি কোটি প্রণাম॥

তিনি বিষ্ণুপুরে আসিয়া মদনমোহন ঠাকুর দেখিয়া গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন কই?*

(৬) অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ

মাণিকরাম গ্রন্থসমাপ্তিকালের শক মাস দিন তিথি নক্ষত্র দিয়াছেন। এইরূপ, অদ্ভুতাচার্য্যও দিয়াছেন। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে (তৃতীয় সংস্করণে) অদ্ভুতাচার্য্যকৃত রামায়ণের এই কাল উদ্ধৃত হইয়াছে (৫০৮ পৃষ্ঠা),

সাকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্রেতে বি×তে।
সপ্তমি রেবতিযুত বার ভৃগুছতে॥
কর্কটাতে স্থিতি রবি পঞ্চদশমীতে।
কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে॥

এখানে স্পষ্ট লিখিত আছে ১৭৬৪ শকের কর্কট মাসের (শ্রাবণ মাসের) ১৫ই শুক্রবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি রেবতী নক্ষত্রে প্রথম প্রহরে রামায়ণ সমাপ্ত হয়। উক্ত শকের উক্ত দিবসের পাঁজি গণিয়া দেখিতেছি, কালটির সব ঠিক।*

(৭) জগৎরাম রায়ের অষ্টকাণ্ড রামায়ণ

গ্রন্থসমাপ্তিকালে শক ব্যতীত মাস দিন বার তিথি নক্ষত্র দিবার আর একটা উদাহরণ দিই। বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে জগৎরাম রায় নামে এক কবি ছিলেন। তিনি ১৬৯২ শকে "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" এবং ১৭১২ শকে "অষ্টকাণ্ড রামায়ণ" লিখিয়াছিলেন। পুস্তক দুইখানি মুদ্রিত হইয়াছে। রামায়ণখানি বাঁকুড়া জেলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুল্য সমাদৃত হইয়াছে। লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ডের মাঝে এক "পুষ্করকাণ্ড" আছে। সীতা কালীরূপে সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ করিয়াছিলেন। রামায়ণের ভণিতায় নাম "অদ্ভুত আশ্চর্য্য রামায়ণ।" কিন্তু "জগদ্রামী রামায়ণ" নামে জনসাধারণের নিকট খ্যাত। আমি "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" দেখিতে পাইলাম না।

ইং ১৮৯৬ সালের "দাসী" পত্রিকায় (৫ম ভাগে) শ্রীযুত সত্যকুমার রায় পুথীতে লিখিত গ্রন্থসমাপ্তিকাল যে সম্বতে নয়, শকে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। "দুর্গাপঞ্চরাত্রি"র শেষে আছে,

ভুজরন্ধ্র রসচন্দ্র শাকপরিমাণে।
মাধব মাসেতে শুক্লপক্ষ শুভদিনে॥
ষোড়শ দিবস প্রতিপদ্ গুরুবারে।
কৃত্তিকা নক্ষত্র যোগ সৌভাগ্য সুন্দরে॥

---

* কোন্ সালে মদনমোহন-জীউ বিষ্ণুপুর ত্যাগ করেন, তাহা জানিতে পারিলাম না। ইং ১৭৬০ সালে বিষ্ণুপুর ইংরেজ কোম্পানীর হাতে আসে। ইহার পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্যসিংহ ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র দামোদর সিংহের মধ্যে রাজ্যসিংহাসন লইয়া তুমুল বিবাদ চলিতেছিল। দামোদর সিংহ প্রথমে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ও পরে মীরজাফরের সাহায্যে চৈতন্য সিংহকে বিষ্ণুপুর হইতে বহিষ্কৃত করেন। তখন চৈতন্য সিংহ মদনমোহন ঠাকুরটি লইয়া প্রথমে মুর্শিদাবাদে পরে তথা হইতে কলিকাতায় ইংরেজ আদালতে নালিশ করিতে আসেন, এবং কপর্দ্দক-শূন্য হইলে বাগবাজারে গোকুল মিত্রের নিকট মাত্র ৭৩৩৭৲ টাকায় বিগ্রহটি বন্ধক রাখেন, পরে ছাড়াইতে পারেন নাই। ইং ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানী বাঙ্গালা বিহার ও মেদিনীপুরের দেওয়ানি প্রাপ্ত হন। অতএব বোধ হয়, ১৭৬০ সালের দুই এক বৎসর পরে বিষ্ণুপুর মদনমোহন-শূন্য হইয়াছিল। ইংরেজ আদালতে চৈতন্য সিংহের জয় হয়। তিনি বিষ্ণুপুরে ফিরিয়া আসিয়া এক নূতন কিন্তু পূর্ব্বটির তুল্য সুন্দর বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া শ্যামসুন্দর নামে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ এই, মদনমোহন-জীউ যাঁহার আলয়ে থাকিবেন, তাঁহার অমঙ্গল কখনও হইবে না। শ্যামসুন্দর-জীউ সে প্রবাদ সত্য রাখিলেন না, "সূর্য্যাস্ত" আইনের নির্ম্মম ফুৎকারে বৃহৎ ও প্রাচীন মল্লরাজ্য বারবার টুকরা টুকরা হইয়া নিলামে বিক্রি হইয়া গেল। বিষ্ণুপুরের এক প্রাচীন মদনমোহন "রণিআড়া" গ্রামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ গৃহে এখনও ভূতকালের সাক্ষী হইয়া আছেন। ইঁহাকে ধরিলে বিষ্ণুপুর রাজ্যে এখনও মদনমোহন আছেন।

* এই রামায়ণ এখনও শতবর্ষ দেখে নাই। কিন্তু শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণ প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছিল। + + আমার বিবেচনায় ১৭৬৪ শক গ্রন্থ-রচনার কাল নহে, উহা গ্রন্থ নকল করিবার কাল।" কিন্তু যাহারা পুথী নকল করিত, তাহারা পুথীর মধ্যে পাণ্ডিত্য ফলাইত না। শককে সম্বৎ মনে করাতে এই ধাঁধার উৎপত্তি।

ভুজ—২, রন্ধ্র—৯, রস—৬, চন্দ্র—১ ; ১৬৯২ শক স্পষ্ট। ঐ শকের ১৬ই বৈশাখ (মাধব মাস), বৃহস্পতিবার, শুক্ল প্রতিপৎ তিথি, কৃত্তিকা নক্ষত্র, সৌভাগ্য যোগ হইয়াছিল। 'সম্বৎ' ধরিলে এই সকল লক্ষণ মিলিত না। 'সম্বৎ', প্রকৃত নাম 'বিক্রমসম্বৎ'। বঙ্গদেশে এই সম্বৎ কোনও কালে চলিয়াছিল কিনা, সন্দেহ।

"রামায়ণে"র শেষে আছে,

> সপ্তদশ শতাব্দ দ্বাদশযুক্ত তাথে।
> ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
> ঊনত্রিংশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি।
> জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি॥

এখানে 'শতাব্দ' অর্থে শকাব্দ। কারণ ১৭১২ শকের ২৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ও শুক্লপঞ্চমী তিথি ছিল।*

(৮) রাধামাধব ঘোষের বৃহৎ সারাবলি

এই কবি ভাগ্যদোষে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। গ্রন্থের পরিমাণ ও নানা পুরাণের সারসংগ্রহ দেখিলে ইঁহাকে বাঙ্গালার বড় কবি বলিতে হয়। "বৃহৎ সারাবলি"র অপর নাম "পুরাণ সারসংগ্রহ।" নানা পুরাণ হইতে সারসংগ্রহ-ই বটে। ইহা পাঁচখণ্ডে বিভক্ত, যথা—কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, জগন্নাথলীলা, + + লীলা, গৌরাঙ্গলীলা। + + লীলাটির আধার, মহাভারত, কিন্তু নাম জানা নাই। + + লীলা ব্যতীত আর চারি লীলা বাঁকুড়ার মুখার্জি কোম্পানী ছাপাইয়াছেন। এই চারি লীলায় ৭৬০০০ শ্লোক আছে। অমুদ্রিত লীলা যোগ করিলে "সারাবলি"র পরিমাণ ৭৮০০০ শ্লোক হইবে। শেষ ও পঞ্চম খণ্ড, গৌরাঙ্গ লীলা। ইহার শেষে কবির পরিচয় ও "সারাবলি"র সমাপ্তিকাল আছে। ইঁহার নিবাস হুগলী জেলায় তারকেশ্বরের নিকট দশঘরা গণ্ডগ্রামে ছিল।

> "কায়স্থ সাকল্যিরাম, অশেষ গুণের ধাম, রামপ্রসাদ তাহার তনয়।
> মধ্যাংশ কুলের পতি, ঘোষজ পদবী খ্যাতি, তৎপুত্র রাধামাধব কয়॥"

কবির পিতা দশঘরা গ্রামে 'রাজমন্ত্রী' ছিলেন। তিনি স্বর্গগত হইলে কবি দশঘরা ত্যাগ করিয়া 'কর্ম্মক্রমে নানাদেশ' ভ্রমিতে ভ্রমিতে দশঘরার বহু পশ্চিমে জাহানাবাদ পরগণায় 'ভগবানপুর গ্রামের সামিল পশ্চিম পাড়া'য় আসিয়া পড়েন। সেখানে গঙ্গানারায়ণ দে কবিকে কন্যাদান করিয়া 'গঠিয়া দিলেন গৃহালয়।'

এই প্রবন্ধে গ্রন্থ-পরিচয়ের স্থান নাই, কাল-পরিচয়ের আছে। কিন্তু কবি পাঠকের বিদ্যাপরীক্ষার নিমিত্ত নানা প্রবন্ধে কাল ব্যক্ত করিয়াছেন। এক এক কবি পাঠকের সহিত কেমন কৌতুক করিতেন, তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে।

> (ক) পুস্তক সমাপ্ত হৈল শুন বন্ধুগণ।
> অতঃপর শুন সবে শক নিরূপণ॥
> শাকে দিয়ে জড় করি যত শক হয়।
> চারি বেদ ব্রহ্ম বহ্ন তাহে যুক্ত রয়॥
> রসভাসে রসগুণে তার যোগ দেও।
> এই শকে পুঁথী হলো লেখা করি লও॥

পাঠক লেখা করিতে পারিবেন কি না, কবির সন্দেহ ছিল।

> এ রস পূরিবে বুধ যেই বিচক্ষণ।
> বিবকুম্ভ তার হবে মূর্খের সদন॥
> মধ্যবিত্ত দেখিবেক কণ্টকের বন।
> নিষ্ঠাযুক্ত হইলে কিছু পাবে নিরূপণ॥

কবি 'নিষ্ঠাযুক্তে'র প্রতি দয়ালু হইয়া লিখিয়াছেন,

> শকের নির্ণয় লিখিলাম সংস্কারে।
> সন তারিখ লিখি কি ভাবত অনুসারে॥
> ইতিমধ্যে যেইজন হবে বুদ্ধিমান।
> সন দৃষ্টে করিবেক শকের সন্ধান॥
> (খ) ম্লেচ্ছ শাস্ত্র অনুসারে সন সংখ্যা হয়।
> অষ্টাদশ পৃষ্ঠে বেদ বহু বিরাজয়॥

পাঠক ইহাকেও 'কণ্টকের বন' মনে করিলে

> (গ) শালবান কৈল যেই সালের স্থাপন।
> তাহার মতানুসারে করিয়ে লিখন॥
> ঈশানাক্ষ বেদগুণে যত সংখ্যা পায়।
> বাণের উপরে বান নদী বয়ে যায়॥
> (ঘ) এই তত্ত্ব কহিলাম সাল নিরূপণ।
> অতঃপর কহি শুন তারিখ বর্ণন॥
> রাজচিহ্ন নামে বুঝা মাসের নির্ণয়।
> সিংহপৃষ্ঠে যুবতী পঞ্চম দিনে হয়॥

* শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে লিখিয়াছেন, "১৭১২ সম্বতে (১৬৫৫ খৃঃ অব্দ) এই পুস্তক [রামায়ণ] শেষ হয়। রামায়ণের পর এই কবি "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" নামক একখানা কাব্য রচনা করেন। + + ১৬০২ শকে (১৬৮০ খৃঃ অব্দ) ইহা সম্পূর্ণ হয়।" কিন্তু একই কবি একবার সম্বতে, একবার শকে কাল নির্দেশ করেন না। 'ভুজরন্ধ্র রসচন্দ্র শাক পরিমাণে,' এখানে সেন মহাশয় ভুজ—২, রন্ধ্র—০, রস—৬, চন্দ্র—১ ধরিয়া ১৬০২ শকে দিয়াছেন। কিন্তু ১৬০২ শকের ১৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার ও কৃষ্ণদশমী ছিল না। রন্ধ্র—৯, প্রসিদ্ধ।

বারেজারে তিথি পুরে নক্ষত্র দীপ্তমান।
যাপরে যে ক্ষেত্রে জন্ম হৈল ভগবান।
\+ + +
সুবুদ্ধি বুদ্ধির দ্বারে করহ বিচারি।
মুর্খের শকতি নহে বুঝিবারে তারি ॥

দ্বিজ রূপরামও তাঁহার ধর্মমঙ্গলে 'শাকে সীমে জড়' করিয়াছিলেন। তাহাতে দন্তস্ফুট হয় নাই। সে কথা পরে বলিতেছি। রাধামাধব শকে, ম্লেচ্ছসনে ও বাঙ্গালা সনে কাল লিখিয়া 'মূর্খ' ও 'মধ্যবিত্ত' পাঠকের নিকট ধরা দিয়াছেন।

প্রথমে (খ) দেখি। এটি ইংরেজী সাল। 'অষ্টাদশ পৃষ্ঠে'—১৮ পৃষ্ঠে কি-না পরে, (যেমন ১ এর পিঠে ২ = ১২), বেদ = ৪, বসু = ৮, অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। *

দ্বিতীয়ে (গ) দেখি। এটি বাঙ্গালা সাল। 'ঈশানাক্ষ বেদগুণে',—ঈশান = রুদ্র = ১১, অক্ষ = ইন্দ্রিয় = ৫; বেদ = ৪, গুণ = ৩। ঈশানাক্ষ = ১১ × ৫ = ৫৫; বেদগুণ = ১২। অঙ্কের বামাগতিতে ১২৫৫ সাল। সালে ৫৯৩ যোগ করিলে খ্রীষ্টাব্দ। ১২৫৫ + ৫৯৩ = ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব খ্রীষ্টাব্দ ও সাল দুইই মিলিতেছে।

এখন প্রথমে (ক) আসি। খ্রীষ্টাব্দ ১৮৪৮ − ৭৮ = ১৭৭০ শক পাইতে হইবে। এটি না পাইলে 'শাকে সীমে জড়' হইয়া পড়িয়া থাকিত। নানা শাক ও সীম অন্বেষণ করিয়া শেষে পাইলাম, যে যে তিথিতে শাকভক্ষণ ও শীমভক্ষণ নিষিদ্ধ। দশমী তিথিতে কলমী শাক, একাদশীতে শীম, দ্বাদশীতে পুঁই শাক খাইতে নাই। এখন কলমী ধরি, না পুঁই ধরি? কবি প্রথমে শাক দিয়া পরে সীম দিয়াছেন, অতএব দশমী ও একাদশী ধরিতে হইতেছে। 'শীমে শাকে' থাকিলে একাদশী ও দ্বাদশী ধরিতে হইত। এখন

শাকে সিমে = ১০ × ১১ =	১১০
চারিবেদ (১৬) ব্রহ্ম (১) বস্তু (বিষয় = ৫) =	১৬১৫
রস (৯) ভাসে (দৃষ্টি = ২) = ৯ × ২ =	১৮
রস (৯) গুণে (৩) = ৯ × ৩ =	২৭
	১৭৭০ শক

১৭৭০ + ৭৮ = ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

* শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়" পুস্তকে কবিকে "১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে" লিখিয়া একশত বৎসর পিছাইয়া দিয়াছেন।

কোথায় অঙ্কগুলি পর পর বসাইতে, কোথায় গুণ করিতে হইবে, তাহা শব্দের বিভক্তি দেখিয়া বুঝিতে হয়। আমরা বলি তিন-পাঁচে পনর, পাঁচে না বলিয়া তিন পাঁচ বলিলে ৩৫ বুঝায়।

বাঙ্গালা সালের পর, 'বাণের উপরে বান নদী বয়ে যায়,' ইহার সার্থকতা দেখিতেছি না। বোধ হয় ৫ + ৫ + ৭ = ১৭ বৎসরে কবি "বৃহৎ সারাবলি" সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিম্বা গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে ৫ + ৫ = দশ বৎসর নদীর মত বহিয়া গিয়াছে। এত সারসংগ্রহ করিতে দশ বৎসর লাগা আশ্চর্য নয়।

এখন (ঘ) দেখি। এখানে মাস দিন বার তিথি নক্ষত্র আছে। 'রাশ্যপ্রিয়' ভুল; হইবে 'রাশ্যাপ্রিয়'। অর্থাৎ রাশি নাম দ্বারা মাস নাম বুঝিতে হইবে। 'সিংহপৃষ্ঠে যুবতী'—সিংহ মাস ভাদ্র মাসের পৃষ্ঠে কি-না পরে যুবতী কন্যা মাস, আশ্বিন মাস। পঞ্চম দিন। 'বারেজারে' ভুল; হইবে 'বারাজারে' অঙ্গারক মঙ্গলবারে। 'নক্ষত্র দীপ্তমান, দ্বাপরে যে ক্ষেত্রে জন্ম হৈল ভগবান'। ১৭০৭ শকের ৫ই আশ্বিনের পাঁজি গণিয়া পাইতেছি, সেদিন মঙ্গলবার কৃষ্ণাসপ্তমী রোহিণী নক্ষত্র। রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হইয়াছিল। অতএব সেদিন রোহিণী নক্ষত্র মিলিয়া গেল। কিন্তু 'তিথি পুরে'? উক্ত মঙ্গলবারে সপ্তমী শেষ হইয়াছিল, কিন্তু নক্ষত্র রোহিণী শেষ হয় নাই, 'দীপ্তমান' ছিল।

(৮) দ্বিজরূপরামের ধর্মমঙ্গল

১৩৩৪ সালের ভাদ্রের "প্রবাসী"তে 'ধর্ম্মের গান কতকালের' প্রসঙ্গে রূপরামের ধর্মমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছি। এই পুথী ছাপা হয় নাই, মেদিনীপুর জেলার জাড়া গ্রামের শ্রীযুত মৃগাঙ্কনাথ রায়ের নিকট সম্পূর্ণ পুথী আছে। তাঁহারই অনুরোধে কবির কাল নির্ণয়ে বসি, কিন্তু কবির হেঁয়ালী লেখা করিতে পারি নাই। এখন কবি রাধামাধবের অনুগ্রহে 'শাকে সীমে জড়' করিবার সঙ্কেত পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে রূপরামই রাধামাধবের গুরু মনে হয়। তথাপি 'সুবুদ্ধি' চাই। কবি লিখিয়াছেন,

সাকে সিমে জড় হৈলে জত শক হয়।
চারি বাণ তিন যুগে বেদে যত রয় ॥

রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই সকে গিত হৈল লেখা কর‍্যা লেহ॥

এখন লেখা করি।

'শাকে শীমে'—১০×১১=　　১১০

চারি বাণ (২০) তিন যুগ (১২)

বেদ (৪)—২০+১২+৪=৩৬

১৪৬

'রসের উপরে রস', ১৪৬ অঙ্কের ৬ অঙ্কে রস। এই ৬ অঙ্কে ৬ যোগ করিতে হইবে,　　৬

১৪৬

১৫২

'তাহে রস দেহ্'　　১৫২৬ শক

এই ব্যাখ্যা যে ঠিক তাহার প্রমাণ 'রসের উপরে রস।' ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল 'রামগুণ রস সুধাকর'—১৬৩৩ শকে রচিত। অতএব রূপরাম, ঘনরামের একশত বৎসর পূর্ব্বের কবি।

মাণিকরাম লিখিয়াছেন 'বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম'। অতএব রূপরামের পরে মাণিকরাম আসিয়াছিলেন। এই এক রূপরাম ছাড়া ধর্ম্মমঙ্গল-গায়ক অন্য রূপরাম জানা নাই। দ্বিতীয়তঃ, মাণিকরামের অনেক পদ অবিকল এই রূপরামের পুথীতে আছে। মাণিকরাম, এই রূপরামের পরবর্ত্তী। রূপরাম ১৫২৬ শকে; মাণিকরাম এই শকের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন না, তাহা নির্বিবাদে সিদ্ধ হইল।

এখন প্রাচীন কবি-ভঙ্গিতে উপসংহার করি।

সপ্তদশশত পৃষ্ঠে চন্দ্রের উদয়।
কলাগতে যুগদিন বারে গুরু হয়॥
শকে বাড়ে পুত্র ঋষি বারে বাড়ে বেদ।
কবি-শক-অঙ্ক সার দিনে নাহি ভেদ॥

বিভীষণ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

ছাপাখানার বড়বাবু—তাঁর সাহেব হাতধরা। তাঁহার লেখাপড়ার শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে ফোর্থ হইতে নিম্নতম যে-কোন ক্লাস ইচ্ছামত ধরিতে পারা যায়, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে সেটুকু এমনই উজ্জ্বল যে, সহসা দেখিলে ধাঁধা লাগিবারই সম্ভাবনা। তাঁর দোআঁশলা সাহেব, ভাঙা ইংরেজী হিন্দী তো বোঝেই—বাংলার খিস্তি-খেউড়গুলিও তার দুরস্ত।

সুতরাং প্রতাপ অক্ষুণ্ণ এবং দোর্দ্দণ্ড। এক কথায় দু' তিনশো লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা তিনি।

ভাল জিনিষ পাইলে মনটিও তাঁর ভাল থাকে। সংসারে ন মাতা ন পিতা পুত্রপরিবারের বালাই বহুদিন হইতেই নাই। শুনা যায়, আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের অঙ্ক কষিয়া এ শুভ মাহেন্দ্রক্ষণটিকে সাদরে বরণ করিতে এ যাবৎ তাঁহার অবসরই ঘটিয়া উঠে নাই। কন্যা সুন্দরী হউক বা না হউক তাহাতে বড়-একটা যায় আসে না, কিন্তু অর্দ্ধেক রাজত্বের যোগ নাকি তাহার সঙ্গে থাকা চাই—ঘটকঠাকুর পাথনা-ভাঙা প্রজাপতিটিকে কাঁধে করিয়া কতবার বৃথা গতায়াত করিয়া অবশেষে মোটা পাওনার আশা একদম ছাড়িয়া দিয়াছেন। এদিকে বয়সও বাড়িয়া চলিয়াছিল!

আপিসের উপর তাই তাঁহার অখণ্ড মমত্ববোধ। ঝড়, জল, বজ্রাঘাত কিছুতেই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিত না। ছেঁড়া ছাতাটি মাথায়, তালি দেওয়া জুতা পায়ে—সস্তায় চোরাহাটে-কেনা জামা, প্যাণ্ট, হ্যাট এই সবে ভূষিত হইয়া নিত্য তিনি দর্শন দিতেন।

মুখে বলিতেন,—কিছুই জমে না, খালি খরচ, খালি খরচ। যেমন চা'ল-ডাল—তেমনি মাগ্গি কি জামা-কাপড়! ভদ্দরলোকের মানসম্ভ্রম আর থাকে না!

সেকথা ঠিক—অত কম মাহিনায়, মাত্র দুই শত টাকায় কি একটা ভদ্রলোকের চলে?

অথচ কোন কর্ম্মচারী মাহিনাবৃদ্ধির অনুনয় করিলে

তিনি বলিতেন,—আপনার যা বিদ্যে যথেষ্ট পাচ্ছেন। এটা মামার বাড়ী নয়। কোম্পানী আইন করে দিয়েছেন, আমি দেখ্‌ব ঠিক আইনমত কাজ হ'চ্ছে কি না? ৩০৲ টাকায় যে কোন ভদ্রলোকের স্ত্রীপুত্র নিয়ে হেসে-খেলে চ'লে যায়।

কোন কর্ম্মপ্রার্থী যদি আসিয়া শ্রীচরণের ধূলা লইয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইত, তিনি ভয়ানক গম্ভীর হইয়া চশমার ভিতর হইতে মিটমিটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—কি চাই?

সে বলিত, 'একটা চাকরী—যদি দয়া করেন।' বড়বাবু বলিতেন,—"সাহেবের কাছে যান—এখানে নয়।" সে ব্যক্তি অমনই কাঁদকাঁদ হইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিত—আপনাকেই যা হয় একটা উপায় করতে হবে। তিনি শশব্যস্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে করিতে বলিতেন—'হাঁ-হাঁ, করেন কি, করেন কি? পাগল নাকি! উঠুন। হাঁ, সংসারে আপনার কে আছে?' প্রার্থী উত্তর দিলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেন, 'গোয়ালে গরু আছে? গাছে ডাব আছে? তরিতরকারী সবই আছে? তবে আর এ ছাই'য়ের চাকরী করতে এসেছেন কেন? আপনি তো রাজা!' সে বেচারী ম্লানমুখে আর একবার অবনত হইতেই তিনি হাত ধরিয়া তুলিতেন ও পাশের টুলে বসাইয়া বলিতেন, 'আচ্ছা আচ্ছা—কাল আসবেন। দেখবো সাহেবকে ব'লে ক'য়ে। তবে কি জানেন—ডাব, নারকোল, কলা কুমড়ো এসবে লাভ অনেক। লাউ-টাউ…বুঝলেন কিনা? বাস্—কাল আসবেন।"

এইটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

পরদিন ১৫৲ টাকা মাহিনার চাকুরীতে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া সে ব্যক্তি চতুর্বর্গ ফল লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইত।

এই গেল এক শ্রেণীর। অপর শ্রেণীতে ছিল নিকট-আত্মীয়স্বজন,—বন্ধু-বান্ধব ও তৎ পুত্র পৌত্র ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীও নেহাৎ ভাঙা কুলোর মত—কয়েকজন ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অঙ্গুলির পর্ব্বে গোণা যায়।

কিন্তু প্রথম প্রার্থীরূপে আসিয়া কোন ব্যক্তি যদি উপরোক্ত দুইটি জিনিষের, অর্থাৎ আত্মীয়তা বা দুধ তরিতরকারীর, খাদ দিতে না পারিত ত প্রথম দিন বড়বাবুর মধুর বচনে আপ্যায়িত হইয়া একদম সীমানা ছাড়িয়া যাইত—আর এ মুখে হাঁটিত না।

এমনি করিয়া চলিত—সে বিরাট ছাপাখানা!

২

১১টায় বড়বাবু সবেমাত্র চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছেন চারু আসিয়া সম্মুখে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। প্রায় ১৫ মিনিট পরে খাতায় শ্রীদুর্গা আঁকিয়া, কালী-চরণে প্রণতি জানাইয়া তিনি মুখ তুলিলেন,—কি চাই?

চারু কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—'আজ্ঞে আজ লেট হয়ে গেছে।' বড়বাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'চাক্তি রেখে যান।' সে মাথা নীচু করিয়া প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলিল, 'আজ্ঞে, গরীব।' বড়বাবু বলিলেন, 'আপিস্ তো গরীব বড়লোক চায় না—সে চায় কাজ। চায় নিয়ম। ঘণ্টা মিনিটের হিসেব যে আমায় দিতে হবে। চারু কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল—'আজ নিয়ে তিনদিন হ'ল। দু'-আনা পয়সা যাবে। যদি দয়া করেন'—বলিয়া কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

বড়বাবু মুহূর্ত্তে কি ভাবিয়া পূর্ব্ববৎ কঠিন কণ্ঠে বলিলেন, এটা মামার বাড়ী নয়—আপিস। বুঝলেন? সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল বুঝিয়াছে।

তারপর নিষ্ফল আবেদন জানিয়া চাক্তিখানি টেবিলের উপর রাখিয়া গমনোদ্যত হইবামাত্র বড়বাবু ডাকিলেন, —হাঁ—শুনুন। গরীব, তো গরীবের মত থাক্‌লেই হয়।

সে ব্যক্তি ভাবিয়া পাইল না কি এমন বে-হিসাবী কাজ করিয়া সে সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

বড়বাবু পুনরায় কহিলেন,—আমার নিন্দেয় তো এদিকে চতুর্ম্মুখ। আমি ছুঁচো, আমি লোকের মন্দ ক'রে বেড়াচ্ছি! নয়?

চারু বিস্মিত কণ্ঠে শুধু বলিল—সে কি!

বড়বাবু মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন,—ন্যাকা, কিছুই জানেন না। উঃ, উপকার ক'রে চাকরী ক'রে দিয়েছি কিনা—তাই তার ঝাল ঝাড়ছেন! কলিকাল কিনা! আচ্ছা—আচ্ছা যান। ওসব দয়াটয়া আর নয়—এথার

সত্যিই ছুঁচো হ'য়ে দেখ্‌তে হবে লোকের কিছু করতে পারি কি না? আমি টাকার কুমীর। পেটে খাই না, পরণে পরি না? যতসব নেমকহারাম শা—

ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

একটু থামিয়া গলা নরম করিয়া বলিলেন,—আমি যত পাথ্‌না দিয়ে দোষ ঢেকে বেড়াই—সাহেবকে কিছু জানতে দিই না—ততই আমার দোষ! ওই তিনকড়িটা, সেদিন তো দিচ্ছিল সাহেব খতম করে। আমি কত ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে চাকরিটুকু বজায় করে দিলাম—আহা গরীব! তা সেসব চুলোয় দিয়ে ব'লে বেড়ায় কিনা ও সব আমারই চাল। হাভোর জাতের মুখে মারি ঝাঁটা —বলিয়া তিনি সত্যসত্যই সম্মার্জনী-প্রহারের ভঙ্গীতে টেবিলের উপর সশব্দে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

চারু তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—দোহাই বড়বাবু আমি কিছু বলিনি।

বড়বাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন—গজেন।

গজেন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

বড়বাবু চারুর পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, —এঁরা সব কি বলাবলি করছিলেন?

গজেন একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—এই—এই—আপনাকে যা না তাই—

বড়বাবু একটু পর্দ্দা চড়াইয়া কহিলেন,—কি, যা না তাই বল।—

গজেন দেখিল আর গোপন করিবার প্রয়াস বৃথা। কাজেই সে মরিয়া হইয়া বলিল,—'আপনি ছুঁচো কেপ্পণ, লোকের চাকরী খান, ঘুষ খান এই-সব।' বড়বাবু মৃদু হাসিয়া চারুর পানে চাহিয়া বলিলেন,—কেমন? সব মিছে?

চারু নির্ব্বাক।

মনে মনে বোধ করি বা গজেনের মুণ্ডপাত করিতেছিল। কিন্তু উপায় নাই। যাহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া দু'টা সুখ-দুঃখের কথা কহা যায় তাহারাই যদি এমন 'বিভীষণ'-গিরি আরম্ভ করে তো আপিসে টেঁকা কঠিন।

বড়বাবু একটু ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'যান্ কাজে যান্। দোষ আপনার নয়,—কালের।' ম্লানমুখে চারু চলিয়া গেল।

৩

গজেনের পরিচয় আবশ্যক। অবস্থা মন্দ নয়—চাকরি না করিলেও চলে। চাষবাসের জমিজমা যথেষ্ট আছে। তরিতরকারী, পুকুর, বাগান এ সবেরও অভাব নাই,—অভাব শুধু কর্ম্মী মনের। পনের-কুড়ি টাকার কেরানীগিরি করিয়া যে ক'তো-নবাবীটুকু,—আলবার্ট টেরি, রিষ্ট ওয়াচ, হিমানী স্নো বা ভেলভেট ক্রীম ব্যবহার, সস্তার নভেল পাঠ, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা, ইত্যাদি সৌখীন কার্য্যগুলি সুচারুরূপে নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হইয়া যায়—তাহা ত দেড়শো-দু'শো টাকার আয়শীল চাষের জমি হইতে সম্ভবে না। চাষীদের সঙ্গে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া জলকাদা ভাঙিয়া প্রখর রৌদ্রে তামাটে হইয়া অবিরত পরিশ্রম,—একি ভদ্রঘরের ছেলের পোষায়? সুতরাং মায়ের ব্যর্থ অনুনয়-বিনয় কুড়ি-পচিশ টাকার চাকরির মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে নাই। তার উপর ভবিষ্যৎ উন্নতি! ঘরের দুধ, তরিতরকারী, মাছ, ডিম, এসবের প্রচুর উপঢৌকন বড়বাবুকে এমন মোলায়েম করিয়া ফেলিয়াছে যে, কোন্ দিন হয়তো তিনি আদর করিয়া সবটুকু মধু উদ্গীরণ করিয়া তাহাকে ৩০্ টাকার কেরাণীগিরিটুকুও পাকা করিয়া দিতে পারেন। তখন?

তাই সে এসবের উপরেও অবিরত সঙ্গীদের গোপন কথাবার্ত্তাগুলি বড়বাবুর কানে গোপনে পৌঁছাইয়া দিয়া চরিতার্থতা লাভ করিত। সহকর্ম্মীরা বিরক্ত হইত, তাহাদের মাহিনা কমিয়া যাইত, কাইন হইত, আর সে মনে মনে তদনুপাতে নিজের উন্নতির চিত্র আঁকিয়া গর্ব্বে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

এমনই সময়ে সহসা তাহার গুপ্তচরগিরি প্রমাণ হইয়া গেল। আর তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন বড়বাবু নিজেই। ইহার পর সঙ্গীদের কাছে তাহার অবস্থাটা কল্পনা করিয়া সে মনে মনে শঙ্কিত হইয়াই উঠিল! ক্ষুব্ধচিত্তে আপনার টুলে আসিয়া বসিতেই অদূর হইতে কে বলিয়া উঠিল—'বিভীষণ।'

সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল যে যাহার কর্মে ব্যস্ত, কিন্তু মুখে সকলেরই একটু হাসি লাগিয়া আছে। সে হাসি যে তাহারই প্রতি বিদ্রূপে অনুরঞ্জিত তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

আর একজন কে কহিল,—আচ্ছা ভাই লঙ্কা কেন ধ্বংস হ'লো?

অন্যে তাহার দিকে অলক্ষ্যে অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া উত্তর দিল, '...মন্ত্রণায়।'

সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাসিয়া উঠিল।

অপমানে ক্রোধে গজেনের মাথা কান গরম হইয়া উঠিল। সে ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে বড়বাবুর কাছে আসিয়া নালিশ করিল।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কে একথা বলেছে?

গজেন বলিল—সবাই।

কিন্তু একসঙ্গে সকলকে তো শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বড়বাবু উঠিয়া গজেনকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে আসিয়া সকলকে ধমকাইয়া গোলযোগ করিতে নিষেধ করিলেন ও পাঁচ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় আপনার ঘরে গিয়া বসিলেন।

তিনি চলিয়া যাইতেই গজেনের উপর আক্রমণটা হইল স্পষ্টাস্পষ্টি। সকলেই বুঝিয়াছিল একটু আগে বড়বাবুকে ডাকিয়া আনার হেতুই গজেন। তাহাদের অবাধ রসনা শ্লীলতার বাঁধন কাটিয়া অতি কদর্য্য ভাষায় গজেনকে অভিনন্দন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা শঙ্কিত হইল না।

টিফিনের ঘণ্টা।

গজেন অপরাধীর মত আপনার টুলে একভাবে বসিয়া আছে। কাহারও সঙ্গে গল্পে বা হাসিতামাসায় যে আধঘণ্টা কাটাইবে সে পথ বন্ধ। বার বার তো বড়বাবুর কাছে নালিশ চলে না। শেষে যদি তিনি বিরক্ত হইয়া উঠেন!

আপনাকে আপনি ধিক্কার দিয়া সে বলিয়া উঠিল—ছি! ছি! কাজটা ভাল হয় নাই। যাহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া দু'দণ্ডের তরে মেশা যায় তাহাদের নামে চুক্‌লী কাটা—হউক সে আপনার আর্থিক উন্নতির জন্য—কথাটা মোটেই ভদ্রোচিত হয় নাই।

গজেনের অনুতপ্ত মনের উপর ভবিষ্যতের উন্নতির আশা ঝিলিক মারিয়া যাইতেই সে ভাবিয়া দেখিল আজ প্রায় পাঁচ বৎসর সে কাজে ঢুকিয়াছে। পনেরটি টাকার প্রথম চাকরিটুকু লাভ করিয়া অনবরত তোষামোদ, দ্রব্যাদির উপঢৌকন ও সত্যমিথ্যার চুক্‌লী উপহার দিয়া মাত্র দশটি টাকার উন্নতি সে লাভ করিয়াছে! সে তুলনায় তাহার তরিতরকারীর মূল্য? কিন্তু সে কথাও যাক্। পরের নামে এই কুৎসা রটাইয়া সে যাহা লাভ করিয়াছে তাহা অপরেও এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে সোজাসুজি পাইয়াছে। উপরন্তু সে পাইয়াছে বড়বাবুর কৃপা, হাসি, সময়ে-অসময়ে ছুটি—আর সঙ্গীদের কাছে পাইয়াছে অবজ্ঞা উপহাস! এ দোষ কার? তারই নিজের নয় কি? না। আজই চারুর কাছে মাপ চাহিতে হইবে।

৪

ঢং করিয়া টিফিনের ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে। যে যাহার জায়গায় বসিয়া তাহারই কথা লইয়া উপহাসের হাসি হাসিতেছে। কিন্তু অনুতপ্ত গজেনের মনে এ বিষাক্ত শরগুলি আর পূর্ব্বের তীব্রতা লইয়া আঘাত করিতে পারিল না, যন্ত্রণাও দিল না। সে মনে মনে বলিল—এই ঠিক।

ছুটির পরে আপিসের বাহিরে আসিয়া সে চারুর একখানা হাত ধরিয়া মাপ চাহিল। চারু সেদিকে ঘৃণাভরে চাহিয়া হাত ছাড়াইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। গজেন ছুটিয়া আসিয়া পুনরায় তাহার হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল,—'মাপ করলে না ভাই!' চারু সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল গজেনের চক্ষে জল!

তাহারও মনটা চোখের জলে নরম হইয়া গেল। কহিল,—তুমি বুঝ্‌তে পারনি আজ কতখানি ক্ষতি করেছ আমার। এর জন্যে ইন্‌ক্রিমেণ্ট তো বন্ধ হবেই—সামান্য ভুলে একটা মোটা রকম ফাইনও হয়ে যেতে পারে। ঘরে আধ-উপোসী বউ আর রোগা মেয়েটা! আমি ত কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করিনি—তবে কেন তুমি...বলিতে বলিতে রুদ্ধ অশ্রু গণ্ড ভাসাইয়া দিল। কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিতে মুছিতে চারু চলিয়া গেল।

গজেন এতখানি ভাবে নাই। ওই ৩০৲ টাকা

সিংহলে বোধিদ্রুমের পূজা

শ্রীমনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।]
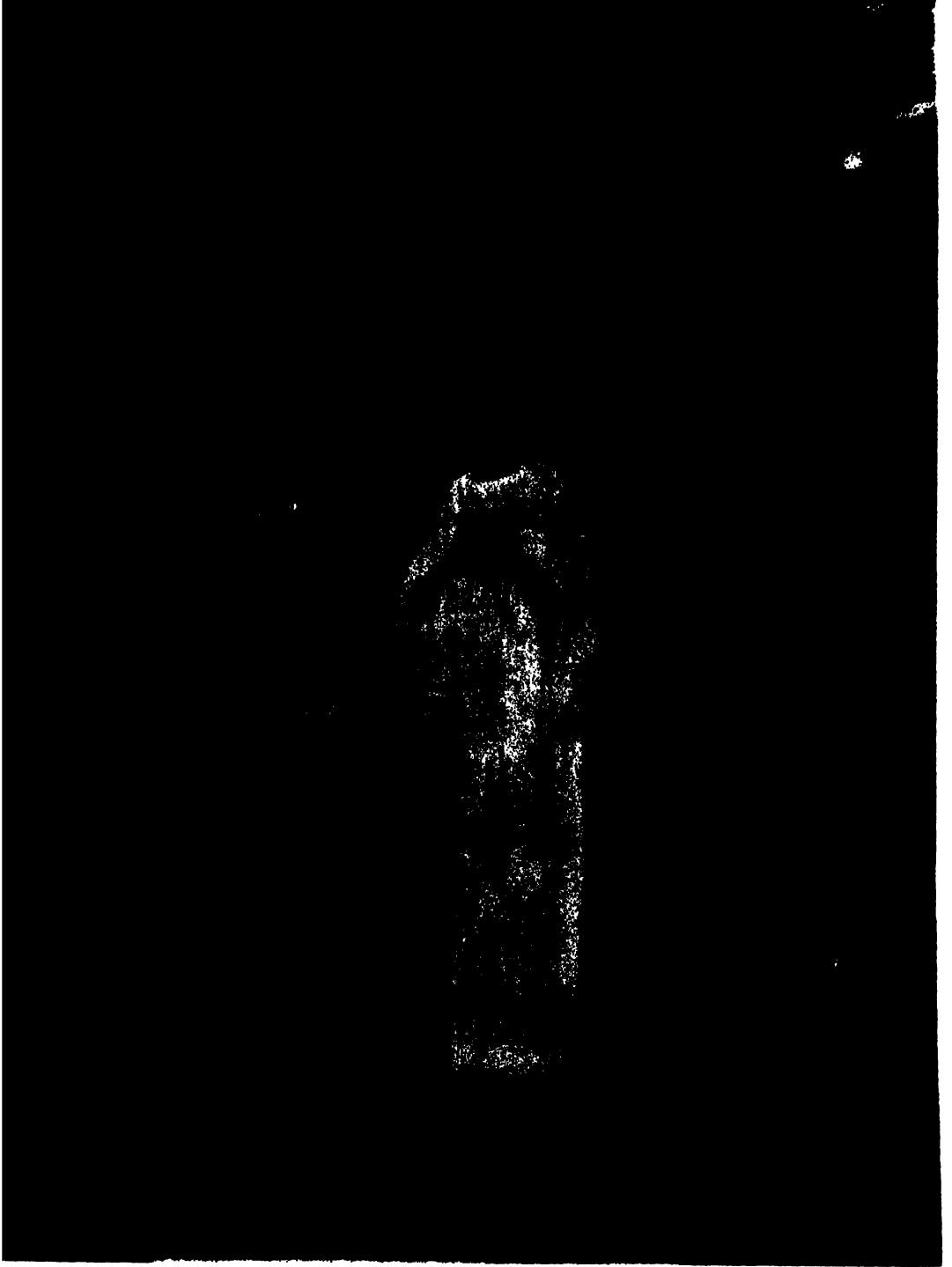
মাহিনার মধ্যে—স্ত্রী পুত্র কন্যা; অতাব অনটন এসব তাহার কল্পনার বাহিরে। সে জানিত আপিসের পয়সা শুধু বাবুগিরির জন্য—আমোদের জন্য। তাই চারুর বুক-ফাটা কথা শুনিয়া সে স্তব্ধ হইয়া পথের মাঝখানেই দাঁড়াইয়া আর একবার রুদ্ধ অন্তর খুঁজিয়া দেখিল—তাহার অপরাধের গুরুত্ব কতখানি!

৫

ইহার পর দুদিন কাটিয়া গেল;—চারু আপিসে আসে নাই। বড়বাবু হৃষ্টমনে তাঁহার মৃত্যুবাণ শানাইতে ব্যস্ত। গজেন টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল,—আজ দু' ঘণ্টার ছুটি চাই বড়বাবু।

বড়বাবু হাতের কলম থামাইয়া মুখ তুলিলেন—কি চাই? ··ওঃ—কিন্তু সাবধান যখন-তখন এ রকম শর্ট লিভ নিয়ো না—চাকরি যেতে পারে। এই দেখ চারুর—

আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়া গজেন দেখিল বিনা রিপোর্টে কামাই করার দরুণ চারুর মাহিনা কমাইবার মুসবিদা হইতেছে।

তাহার অন্তরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। কানে আসিয়া বাজিল চারুর সেই অশ্রুসিক্ত কাতর কণ্ঠস্বর—'তুমি বুঝতে পারনি আজ কতখানি ক্ষতি করেছ আমার।' অমনি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল তাহার ম্লান রুগ্ন অনাহার-ক্লিষ্ট স্ত্রীপুত্রের পাণ্ডুর মুখগুলি!

ব্যগ্রকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—না না বড়বাবু, বেচারীকে আর শাস্তি দেবেন না।

গজেনের মুখে একথা শুধু নূতন নহে, বিস্ময়করও বটে। বড়বাবু কি ভাবিয়া মৃদু হাসিলেন। পরে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—যাও কাজ করগে—দু' ঘণ্টার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিচ্ছি। হাঁ—আর দেখ পরের কথা নিয়ে অত মাথাব্যথা করা ভাল নয়, বুঝলে?

গজেন শুষ্কমুখে একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ ভাই চারুর ঠিকানাটা জান?

সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল—কেন পে রিডিউস করিয়েও তৃপ্তি হয়নি? বাড়ী বয়ে অনিষ্ট করতে চাও!

গজেন অপরাধীর মত নতমুখে নিঃশব্দে এ আঘাত সহ্য করিয়া পুনরায় কাতরকণ্ঠে বলিল—বিশ্বাস ক'রে একবার না হয় বললেই ভাই?

সে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া ঠিকানাটা বলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কাটিল—ঘর যদি ভেদ করতে পার, তবেই বুঝবো সার্থক নাম।

গজেন অতিকষ্টে সে আঘাতও সহ্য করিয়া নতমুখে আপিসের বাহির হইয়া গেল।

চলিতে চলিতে এমন জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল যেখানে দিনের বেলায়ও প্রচণ্ড সূর্য্য উঁকি মারিতে ভয় পান,—প্রবল বাতাসের 'প্রবেশ নিষেধ'। সঙ্কীর্ণ গলি, পাশে পচা নর্দ্দমা—দুধারে ঘেঁসাঘেঁসি খোলার চাল। যত-রাজ্যের জঞ্জাল পচিয়া ভাপ্সা গন্ধ উঠিতেছে, তারই মাঝে সন্তর্পণে চলিবার এতটুকু খালি পথ। কলিকাতার মধ্যে এমন নরকেরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে তাহা গজেনের কল্পনারও বাহিরে। নির্দ্দেশ-মত সে একটি রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—'চারু।'

দ্বার খুলিয়া গেল। চারু গজেনকে সম্মুখে দেখিয়া ভীত চকিত হইয়া কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। গজেন তাহার সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিল—দেখ্তে এলুম কেমন আছ? চল ঘরে গিয়ে বসিগে।

মাত্র একখানি ঘর। মেঝেয় ছেঁড়া চ্যাটাই পাতা, একধারে একখানা তক্তপোষ। পাশে বারান্দার মত একটু-খানি রহিয়াছে তাহাতে রান্না হয়। খাওয়া-শোওয়া সবই এই ঘরের মধ্যে। দারিদ্র্য যেন নগ্নমূর্ত্তিতে চারি-দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

গজেন তক্তপোষের উপর বসিতেই পাশে শিশুকণ্ঠে কে কাঁদিয়া উঠিল। সে সচকিতে অন্ধকূপের মধ্যে তীক্ষ্ন দৃষ্টি মেলিয়া দেখিল তক্তপোষের উপর ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া অন্ধকারের চেয়ে কালো শীর্ণ একখানা কঙ্কাল! চারুর রুগ্ন কন্যা! মৃত্যুর রাজত্বে বাস করিয়া এখনও সে কি করিয়া মরণকে ফাঁকি দিয়া আসিতেছে?

গজেনের চক্ষু মুহূর্ত্তে জলভারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হায়! এতদিন ইহাদেরই উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া সামান্য ৩০৲ টাকার চাকরির জন্য সে কি না করিয়াছে? কোঁচায়

খুঁটে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে বলিল,—ভাই যা দেখলুম জীবনে ভুলবো না।

চারু বলিল,—দেখছো তো ৩০৲ টাকায় কেমন সুখের জীবনযাত্রা! এই সুখটুকুর জন্ম আপিসে লাথি ঝাঁটা সবই সইতে হয়! .....তারপর আপিসের খবর কি? আমি না যাওয়াতে বোধ হয়—কথা শেষ না করিয়া আগ্রহে সে গজেনের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই নিদারুণ দুঃখের উপর সে-দুঃসংবাদ দিতে গজেনের প্রবৃত্তি হইল না। সে শুধু কহিল—যদি পার তো কাল একবার আপিস যেয়ো। জান তো বেশী দিন কামাই করলে ক্ষতি হতে পারে।

চারু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভাল রকমই জানি। পরশু মেয়েটা যায়-যায় হয়েছিল, কালও অবস্থা সুবিধে ছিল না, তাই...

গজেন সভয়ে সেদিকে আর একবার চাহিয়া শুষ্কস্বরে বলিল—কে দেখ্‌ছে?

চারু বলিল—ভগবান।

—সে কি ওষুধপত্তর কিছু—

চারু বুকফাটা এক হাসি হাসিয়া বলিল,—ভাল-কুকুরের হয়তো ডাক্তার মিল্‌তে পারে, কিন্তু গরীবের সে উপায়ও নেই। দেনাকর্জ্জে লণ্ডভণ্ড, স্ত্রীর অর্দ্ধাশন, দোকানীর শমন, মেয়ের অসুখ—কদিক আর টান্‌বো?

শুনিতে শুনিতে গজেনের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। সে আর্ত্তস্বরে বলিল,—থাম্‌ থাম আর শুনিয়ো না।

চারু ম্লান হাসিয়া বলিল,—কিন্তু এর একবর্ণও যে মিথ্যে নয় ভাই।...

গজেন তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া চারুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। এ টাকাটা সে থিয়েটারে খরচ করিবে ভাবিয়াছিল।

৬

আরও তিনদিন পরে চারু আপিসে আসিল। গজেন তাড়াতাড়ি তাহার কন্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেই যে উত্তর পাইল, তাহাতে একমুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া সান্ত্বনার বাক্যটুকুও স্তব্ধ করিয়া দিল। মৃত্যু না মুক্তি সেই কচি মেয়েটিকে অন্ধ তমসাবৃত অনন্ত কারাগার হইতে পরিত্রাণ দিয়াছে? কিন্তু সেই তমসার মাঝে যে স্নেহ-সরসীর স্নিগ্ধ বারিধারা ঊষর মরুবক্ষে নিয়ত সুধা ক্ষরণ করিত, দুখানি দাবদগ্ধ অন্তরে শান্তি সান্ত্বনায় ঝরিয়া পড়িত, শুষ্ক প্রবাহের উত্তপ্ত বালুকস্তরে সে দুটি হৃদয়ের আজ কি ভীষণ দাহ!... এ তীব্র শোকের সান্ত্বনা দিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে এমন মন্দাকিনী, গঙ্গা বা ভোগবতীর সৃষ্টি আজিও অবধি হয় নাই যাহার কুলুকুলু নাদে বক্ষজ্বালা জুড়াইয়া যায়।

সে বড়বাবুকে আসিয়া বলিল,—দেখুন চারুর মেয়েটি মারা গেছে; তার মাইনেটা আর—

বারুদের স্তূপে আগুন পড়িল।

তিনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,—বলেছি না পরের কথায় মাথা ব্যথা ক'রো না। যাও নিজের জায়গায়। আমি ছুঁচো—বদমাইস! যত-সব সাধু এসেছেন এখানে! সব মিছে কথা—ছুটি নেবার ফন্দী! আমিও দেখাচ্ছি এটা মামার বাড়ী নয়—চালাকীর জায়গা নয়—।

গজেন চলিয়া যাইতেই থাকহরি চারুকে বলিল,—ইস্‌ বড্ড দরদ যে! সেদিন আবার তোর ঠিকানা জেনে নেওয়া হ'চ্ছিল!

সুশীল বলিল,—এখানে লাগিয়ে-ভাঙিয়ে সাধ মেটেনি, আবার বাড়ীতে—একটা চাপাহাসি সকলের মুখে খেলিয়া গেল।

চারু তাড়াতাড়ি কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল।

অন্নদা বলিল,—খবরদার, ওর সঙ্গে কথা ক'য়ো না চারু—।

চারু ম্লান হাসিয়া বলিল,—আবার! এবার যদি বাড়ীতে যায় তো দোর খুলবো না। দু'মুখো সাপ!

* * *

বাড়ী আসিয়া গজেন মাকে বলিল,—মা আমায় ২০০৲ টাকা দিতে হ'বে।

একসঙ্গে এতগুলি টাকা গজেন কখনো চাহে নাই মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন? এত টাকা কি করবি?

গজেন বলিল,—একজনকে দেব।

মাতা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—ওসব বাজে কাজে আর এক পয়সা দেব না। চাকরি ক'রে মাথা কিনছেন! খালি টাকা—খালি টাকা। সেই আপিসে ঢুকে ইস্তক ক' পয়সা জমিয়েছ শুনি?

গজেন ছল ছল নেত্রে মায়ের পানে চাহিয়া বলিল,—না মা, দিতেই হবে। এবার অকাজে নয়, সৎ কাজেই টাকা খরচ করবো—বলিয়া মায়ের হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিল।

মা মনে মনে বিচলিত হইয়া বলিলেন,—তবু সব না শুনে টাকা দিতে পারি না।

গজেন চোখের জল মিশাইয়া চারুর দারিদ্র্যের করুণ ইতিহাস বলিয়া চলিল,—শুনিতে শুনিতে মাও কাঁদিলেন।

কাহিনী শেষ করিয়া গজেন ডাকিল—মা!

মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া সিন্দুক হইতে দু'খানি ১০০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া গজেনের হাতে দিয়া বলিলেন,—'আজই পাঠিয়ে দিস্ বাবা।

*　　　*　　　*

পরদিন।

বড়বাবু শ্রীদুর্গা কাঁদিয়া কালী প্রণাম করিয়া মুখ তুলিতেই ডাকপিয়ন আসিয়া একখানা খাম দিয়া গেল। সেখানা খুলিয়া পড়িয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সকলে আসিয়া তাঁহার টেবিলের চারিধারে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

তিনি চিঠিখানা হাতে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—নেমখারাম—নেমখারাম! এক কথায় চাকরি হ'লো, উন্নতি হ'লো, সাহেবের কাছে ব'লে-ক'য়ে কাল ৩০৲ টাকা পাকা করবার অর্ডার নিলুম—আর—আর—ক্রোধে দুঃখে তাঁহার মুখ হইতে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

মস্তবড় লাভের তালুকখানা নিলামে উঠিয়া বিক্রয় হইয়া গেলে ঋণী জমিদার যেমন আপশোষে হাত-পা কামড়াইতে থাকে তাঁহার অবস্থাও তাহার চেয়ে কম শোচনীয় হইল না।

সেখানা ছিল গজেনের রেজিগ্‌নেশন্‌ লেটার! সকলে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল—শুধু বড়বাবুর টেবিলের উপর ওই চিঠির কালো হরফগুলি—ডাব-নারিকেল, কলা-কচু দুধ-ক্ষীরের পরিবর্ত্তে রাশি রাশি বিকশিত হরিদ্বর্ণের সর্ষপ ফুলে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল!

কলরব করিতে করিতে যে যাহার জায়গায় গিয়া বসিল। একজন বলিল,—বাঁচা গেল বাবা! প্রাণ খুলে দু'টো সুখদুঃখের কথা কওয়া যাবে!

হরেন চারুকে বলিল,—কিরে মুখ ভার ক'রে ভাব্‌ছিস কি? প্রাণ খুলে ফস্তি কর—বিভীষণটা রিজাইন দিয়েছে।

কিন্তু এই পরম আনন্দের সংবাদে চারুর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল না। সে ধীরে ধীরে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখের টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধ করি বা অলক্ষ্যে সেই বিভীষণটার মহত্ত্বের পায়ে দু'ফোঁটা চোখের জল ঢালিয়া শ্রদ্ধা তর্পণ করিল।

সূর্য্যমুখী

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ঘাসে-ভরা পোড়ো জমি, লতাগুল্মে ঘন বৃক্ষে ঘেরা,
মাঝে মাঝে ঝোপে ঝাপে বাসা বাঁধে বুনো শালিখেরা।
পাশ দিয়ে মেঠো পথ, কচিৎ পথিক যায় চ'লে
কভু হাওয়া আসে কলরোলে।
শব্দহীন গতি
দিকে দিকে ডানা মেলে সঞ্চরি' বেড়ায় প্রজাপতি।
ভাঙা আলো পশে সেথা, নিরুদ্দিষ্ট খোঁজে যেন কা'কে,
অপরাহ্ণ সেথা যেন সারাবেলা ম্লান হ'য়ে থাকে।

প্রথম সৃজন-স্বপ্ন ছায়া-ঢাকা পত্রপুষ্প জালে
বিলম্বিত লগ্নে হেথা আজিও খেয়ায় দূর-কালে।
তারি মাঝে দেখিলাম তন্বীলতা, জন্ম-একাকিনী,
নিগূঢ় বসন্ত-রসে প্রাণের আনন্দে গরবিনী;
উৎসুক উৎসাহ ভরে, অনাদৃতা, নীল শূন্যে চেয়ে
আপনার শ্রেষ্ঠদানে পুষ্পমন্ত্র উচ্চে উঠে গেয়ে,
মিলনের পুলকে কৌতুকী,
পাণ্ডুর বেদনা তারি চেতনায় ফোটে সূর্য্যমুখী।

উর্ব্বশীর উৎপত্তি

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের রচিত উর্ব্বশী নামক কবিতায় কবি সমুদ্র-মন্থনের সময় উর্ব্বশীর আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। আর একটি কবিতায় তিনি লক্ষ্মী ও উর্ব্বশী দুইজনেরই উৎপত্তি সাগর-মন্থনকালে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লক্ষ্মী যে মথিত সমুদ্র হইতে উদ্ভূতা সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। উর্ব্বশীকে সাগরোত্থিতা বলা যায় কিনা সেই কথা বিচার্য্য।

প্রথম কবিতা অবলম্বন করিয়া কলিকাতায় আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। সভাস্থলে আপত্তি হয় যে, কবি যথেচ্ছা কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু কবি-কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া সমালোচক সেই অনুযায়ী আলোচনা করিতে পারেন না। এই যুক্তিতে আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। আলোচনা করিতে হইলে যে কবির কল্পনা ও অভিমত বিচার করিতেছি তাহা সমর্থন করিতে হয়, না হয় খণ্ডন করিতে হয়। খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে আমার প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। উর্ব্বশীর উৎপত্তি-কল্পনার প্রশংসাই করিয়াছিলাম। আপত্তিকার বলিলেন, পৌরাণিক মতে উর্ব্বশীর উৎপত্তি নারায়ণের উরুদেশ হইতে হয় আর আমাকে তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। হয়ত তাঁহার যুক্তির উদ্দেশ্য এরূপও হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা পুরাণের অনুযায়ী নয় এই কথা প্রথমে উল্লেখ করিয়া আমি অন্য কথা বলিতে পারিতাম। পুরাণ ছাড়া আর কোথাও উর্ব্বশীর উল্লেখ আছে কি না বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ভ্রম হইয়াছে কি না।

প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে লিখিত হয় যে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে উর্ব্বশীর উল্লেখ আছে। উক্ত মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম সূক্তে পুরূরবার সহিত উর্ব্বশীর কথোপকথনে উর্ব্বশী পুরূরবাকে বলিতেছেন, আমি প্রথম প্রভাতের তুল্য তোমার নিকট হইতে গমন করিতেছি। বায়ুর ন্যায় আমাকে ধারণ করা কঠিন। পুরূরবা বলিতেছিলেন, তুমি সলিলরাশি হইতে আমার জন্য নানা মনোরম উপহার লইয়া পতনোন্মুখ বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে আসিয়াছ। বেদে সমুদ্রমন্থন উল্লিখিত হয় নাই। জলরাশি হইতে উর্ব্বশীর অভ্যুদয় হইয়াছিল এ কথা লেখা আছে। উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত শতপথব্রাহ্মণে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা রূপক; পুরূরবা সূর্য্য, উর্ব্বশী প্রভাতের ও প্রদোষের বিসন্ধ্যা। পরে এই রূপক আরও স্পষ্ট হইয়াছে। উর্ব্বশী যখন রাজা পুরূরবার পত্নী হইতে স্বীকার করেন সে সময় তিনি দুইটি মেষশাবক লইয়া আসিয়াছিলেন। একটি শ্বেত ও অপরটি কৃষ্ণবর্ণ। পুরূরবাকে এই দুইটি মেষশাবককে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে বলেন। আরও বলেন ঐ দুইটি অপহৃত হইলে তিনি রাজাকে ত্যাগ করিবেন। শ্বেত মেষশাবক দিবা, কৃষ্ণ রাত্রি। শাবক দুইটি অপহৃত হইলে উর্ব্বশীও অন্তর্হিত হইলেন, কারণ দিবা রাত্রি না থাকিলে প্রভাত কিংবা সন্ধ্যা হইতে পারে না।

অপ্সরাও বৈদিক কল্পনা নয়। বেদে কেবল উর্ব্বশীর নাম পাওয়া যায়, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা, রম্ভা, মেনকা এ-সকল পৌরাণিক নাম। একমাত্র বেদের প্রমাণ গ্রহণ করিলে উর্ব্বশীকে অপ্সরা বলিতে পারা যায় না। অপ্সরাদিগের উৎপত্তি সমুদ্রমন্থন হইতে হইয়াছিল এ কথা স্পষ্টাক্ষরে রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, বেদে কোথাও নারায়ণের নাম নাই। নারায়ণ বিষ্ণু, পুরাণোক্ত ত্রিমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি। উপনিষদের ব্রহ্ম স্বতন্ত্র।

নারায়ণের উরুদেশ হইতে উর্ব্বশীর উৎপত্তির কল্পনা বেদের অনেক পরে, রামায়ণ এবং ভাগবতেরও পরে। মহাভারতের উর্ব্বশী দেবলোকে অর্জ্জুনের অভিসারে ব্যর্থকাম হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন। সেই শাপে

অর্জ্জুন এক বৎসর নপুংসক হইয়া বিরাটরাজের গৃহে রমণীদের মধ্যে বৃহন্নলা নাম ধরিয়া ছদ্মবেশে বাস করিয়াছিলেন। ইহাও কবিকল্পনা।

রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কবিতায় উর্ব্বশীর উৎপত্তি বৈদিক ভাব এবং রামায়ণ ও ভাগবতের আখ্যায়িকার অনুসারিণী। সুরসভাতলে নৃত্য মহাভারতের অনুযায়ী। উর্ব্বশী যে বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের বিচিত্র বিকাশ এই মহীয়সী কল্পনা কবির নিজের। তিনি কিংবা তাঁহার সমালোচক উর্ব্বশীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন আধুনিক পুরাণ অথবা উপপুরাণের কল্পিত আখ্যায়িকা গ্রহণ না করিয়া অপরাধী হইয়াছেন এ কথা স্বীকার করিতে পারা যায় না।

সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলার দান

অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

আজকাল বহুল গবেষণার ফলে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রত্নপ্রসূ বঙ্গভূমির কোন একটা ধারাবাহিক সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারা যায় কি রাজনৈতিক, কি সাহিত্যিক, সমস্ত বিষয়েই বঙ্গজননী বহু প্রাচীনকাল হইতে পরম প্রকর্ষ দেখাইয়া আসিতেছেন। এমন কি খ্রীষ্টজন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের বীরপুত্র বিজয়সিংহ সমুদ্রপথে লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়া বঙ্গের গৌরববর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবংশে' এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন—

> একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।

কবি সত্যেন দত্তও লিখিয়াছেন—

> আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ সিংহল করিয়া জয়।
> সিংহল নামেতে রেখে গেছে তার শৌর্য্যের পরিচয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে এই বিষয়ে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অনেক মনীষী বিজয়সিংহকে বঙ্গবাসী বলিয়াই স্বীকার করিতে চান না। যাহা হউক আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের ইহা আলোচ্য বিষয় নয়, সুতরাং আমরা আমাদের প্রবন্ধের প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বাঙ্গালার সাহিত্যচর্চ্চার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও দেখিতে পাই সাহিত্য অনুশীলনে বঙ্গদেশের খ্যাতি কম নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বের বাঙ্গালার সাহিত্যচর্চ্চার কোনও লিখিত প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্ব্বতগাত্রে নৃপতি চন্দ্রবর্ম্মার শিলালিপি, এবং দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দামোদরপুর গ্রামের তাম্রশাসন হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অন্ততঃ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙ্গালায় সাহিত্যচর্চ্চা প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহার পর ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখক দণ্ডীর কাব্যাদর্শে গৌড়ের অর্থাৎ বঙ্গদেশের লেখার রীতির উল্লেখ দেখিতে পাই। দণ্ডী বলিয়াছেন—

> তত্র বৈদর্ভ গৌড়ীয়ৌ বর্ণ্যেতে প্রস্ফুটান্তরৌ।

দণ্ডীর লেখা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গভূমিতে যথেষ্ট সাহিত্যচর্চ্চা হইত, এমন কি বাঙ্গালার নিজের একটি লেখার রীতি বা বিশেষত্বও সেই সময়েই অন্যান্য দেশের পণ্ডিতবর্গ বেশ ধরিতে পারিয়াছিলেন।

দণ্ডীর পর এবং পাল-রাজাদের সময়ের মধ্যে লিখিত অনেক অনুশাসন ও শিলালিপি প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই সকলের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই সময়েও বঙ্গভূমি সাহিত্যচর্চ্চায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল।

ইহার পর পাল-রাজাদের রাজত্ব সময়ে গৌড়ী রীতিতে অর্থাৎ বঙ্গদেশের বিশেষ লেখার পদ্ধতিতে বঙ্গের পণ্ডিত সন্তানগণ অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে জিনেন্দ্রবুদ্ধির "ন্যাস" ও সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার পর সেন-রাজবংশের রাজত্ব সময়ে বঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চ্চার এক নবযুগ আসিয়াছিল। এই যুগে এবং ইহার পরে বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেব, বিখ্যাত কবি জয়দেব ও ধোয়িক, নৈয়ায়িকাগ্রগণ্য রঘুনাথ ও জগদীশ এবং স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বঙ্গের কত সুসন্তান জীবনপাত পরিশ্রম করিয়া বঙ্গজননীর অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন।

ব্যাকরণ

পাণিনীয় সম্প্রদায়

বঙ্গদেশে অনেকগুলি ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত আছে। যদিও বর্ত্তমান সময়ে পাণিনি ব্যাকরণের তেমন একটা প্রসার দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি এদেশে বামন-জয়াদিত্য রচিত 'কাশিকাবৃত্তির' যে খুব সমাদর ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

জিনেন্দ্রবুদ্ধির "ন্যাস"

বাংলার প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধি এই কাশিকাবৃত্তির টীকা করিয়াছেন। এই টীকা 'ন্যাস' নামে অভিহিত। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'র পর 'ন্যাসের' ন্যায় আর দ্বিতীয় প্রামাণিক গ্রন্থ পরিদৃষ্ট হয় না। ভট্টোজি, পুরুষোত্তম, মৈত্রেয় ও মাধব প্রভৃতি 'ন্যাসের' প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। জিনেন্দ্রবুদ্ধি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ন্যাস' বঙ্গের রত্ন, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ন্যাসের প্রায় সমস্ত টীকাকার বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার হস্তলিখিত পুস্তক বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ রাজসাহী জেলাতেই পর্য্যাপ্তরূপে পাওয়া যায়। রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি হইতে 'ন্যাস' গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণকার্য্য হইয়াছে। এই সকল কারণে জিনেন্দ্রবুদ্ধিকে বঙ্গবাসী বলিয়া মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও মনীষী জিনেন্দ্রবুদ্ধিকে বঙ্গবাসী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

পুরুষোত্তমদেবের "ভাষাবৃত্তি"

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা মহর্ষি পাণিনি-রচিত অষ্টাধ্যায়ীর টীকা। এই টীকা 'ভাষাবৃত্তি' বা 'লঘুবৃত্তি' নামে অভিহিত। পুরুষোত্তম নিজেই বলিয়াছেন, "পুরুষোত্তমদেবেন লঘ্বীবৃত্তির্বিধীয়তে।" এই গ্রন্থে ভাষা অর্থাৎ লৌকিক সংস্কৃতের সাধুত্বসাধন প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার 'ভাষাবৃত্তি' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। পুরুষোত্তমদেব বৈদিক সংস্কৃত সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। এই গ্রন্থ ভর্ত্তৃহরির 'ভাগবৃত্তি' এবং বামনের 'কাশিকা' অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। ইহা সত্যসত্যই একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা পাঠ করিলে 'কাশিকা' ও 'ভাগবৃত্তি'র সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন—

কাশিকা ভাগবৃত্ত্যোশ্চেৎ সিদ্ধান্তং বোদ্ধুমস্তি ধীঃ।
তদা বিচিন্ত্যতাং ভ্রাতর্ভাষাবৃত্তিরিয়ং মম॥

পুরুষোত্তমদেব একজন বঙ্গীয় বৌদ্ধ ছিলেন। ইনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের সভায় তাঁহারই অনুরোধে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমদেবের 'ললিত-পরিভাষা' বা 'পরিভাষাবৃত্তি', 'জ্ঞাপকসমুচ্চয়' ও 'উণাদিবৃত্তি' নামে আরও কয়েকখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক পাওয়া যায়।

সৃষ্টিধরের 'ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতি'

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সৃষ্টিধর চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা ভাষাবৃত্তির টীকা। গ্রন্থকারের উপাধি প্রভৃতি হইতে তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়।

রক্ষিত মৈত্রেয় 'ধাতুপ্রদীপ'

খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে মৈত্রেয়রক্ষিত বা রক্ষিতমৈত্র এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পাণিনীয় 'ধাতুপাঠের'

টীকা। কেবল রক্ষিতমৈত্র এই নাম হইতেই গ্রন্থকারকে বঙ্গীয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ মৈত্র উপাধি বঙ্গদেশের বাহিরে প্রচলিত আছে বলিয়া শুনা যায় না। 'ধাতুপ্রদীপ' রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। রক্ষিতমৈত্রের তন্ত্রপ্রদীপ নামে আর একখানি ব্যাকরণশাস্ত্রীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শরণদেবের 'দুর্ঘটবৃত্তি'

প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শরণদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পাণিনি ব্যাকরণ অনুসারে অভিযুক্ত প্রয়োগের অর্থাৎ মহাকবি প্রয়োগের সাধুত্ব সমর্থন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের সভায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে—ইহা আমরা গ্রন্থকারের উক্তি হইতেই জানিতে পারি। শরণদেব যে লক্ষ্মণসেনের সভায় থাকিতেন এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি উদ্ধৃত করিতেছি—

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

কবিবর জয়দেবও শরণের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন "শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতেঃ॥"

তারানাথ তর্কবাচস্পতির 'সরলা'

কলিকাতাবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিগত শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা সিদ্ধান্তকৌমুদীর একটি সরল উৎকৃষ্ট টীকা। ইহার লেখার প্রণালী অতীব সরল, সুতরাং উক্ত টীকার 'সরলা' নাম যথার্থই সার্থক হইয়াছে।

দেবেন্দ্রকুমারের 'প্রভা'

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ কিছুদিন হইল প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা মহর্ষি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের টীকা। 'প্রভা' নিজের নির্ম্মল প্রভায় পাণিনিকে উদ্ভাসিত করিয়া আপনার নাম সম্পূর্ণ সার্থক করিয়াছে। এরূপ সরল ও মনোরম টীকা আর দ্বিতীয় নাই। অতএব উক্ত টীকা 'সরলা' ও 'প্রভা' দুইটি বিশেষণেরই যোগ্য, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এইরূপ আরও অনেক বৈয়াকরণ বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া পাণিনীয় সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। 'মুগ্ধবোধ', 'কলাপ' প্রভৃতি আরও কয়েকটি ব্যাকরণ অনেক-স্থলে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়া পাণিনীয় সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য ইহাদের পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিতেছি।

অপাণিনীয় সম্প্রদায়
বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ'

মহাত্মা বোপদেব গোস্বামী মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। সুদীর্ঘ পাণিনি ব্যাকরণের বিষয়গুলি ইনি অতি সংক্ষেপে এবং সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুগ্ধবোধের আখ্যাত প্রকরণ অতি উৎকৃষ্ট জিনিষ। মুগ্ধবোধের ন্যায় সংক্ষিপ্ত, সুন্দর, কাল ও কার্য্যোপযোগী মনোরম ব্যাকরণ আর দ্বিতীয় নাই। উক্ত ব্যাকরণের রচয়িতা বোপদেব বাঙ্গালী ছিলেন। অবশ্য ইনি শেষ জীবনে কিছুদিন দাক্ষিণাত্যে দেবগিরিতেও বাস করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ভাণ্ডারকর প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী বোপদেবকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় 'অর্চ্চনা' পত্রিকায় এবং মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, এম এ মহোদয় 'বৈদ্যহিতৈষিণী' পত্রে বোপদেবকে বাঙ্গালী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(ক) বোপদেবের লেখার পদ্ধতি সম্পূর্ণ গৌড়ীয় রীতির অনুরূপ। এই রীতিটি বঙ্গদেশের নিজস্ব। সুতরাং বোপদেবের লেখার রীতি হইতেই তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।

(খ) গোস্বামী উপাধি বাঙ্গালা দেশে বিশেষ প্রচলিত। অন্যদেশে এই উপাধি তেমন একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ইহা হইতেও বোপদেবকে বাঙ্গালী বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

(গ) তৃতীয়তঃ বোপদেব নিজের লিখিত গ্রন্থে নিজের জন্মস্থানের যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতেও তাঁহাকে নিঃসন্দেহে বঙ্গবাসী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। উক্ত লেখক কৃত 'বোপদেবশতক' নামক চিকিৎসা-গ্রন্থে—"দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহাস্থানম্" ইত্যাদি শ্লোকে বোপদেব নিজে লিখিয়াছেন, 'বরদানদীতীরে মহাস্থান নামক গ্রামে তাঁহার বাস।'

স্কন্দপুরাণ হইতে জানা যায় যে, করতোয়া নদী 'বরপ্রদা' (বরদা) নামে অভিহিত হইত। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, বগুড়া জেলার করতোয়ানদী-তীরে মহাস্থানগড় (মহাস্থান) নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। এই স্থানটি সত্য সত্যই মহাস্থান। এই স্থানে বেদবেদান্ত ও চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বোপদেবের পিতা একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন, সুতরাং মহাস্থানে যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের চরম উন্নতি সাধিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কারণ কি আছে? মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন মহোদয় অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রদেশে 'বোপদেবকারিকা' নামে কেবল কতকগুলি স্মৃতির কারিকামাত্র প্রচলিত আছে।

কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে বোপদেব-প্রণীত মুগ্ধবোধাদি গ্রন্থের নাম মাত্রও শুনা যায় না। মহারাষ্ট্রে বোপদেবের জন্মভূমি 'মহাস্থান' ও 'বরদা নদীর'ও কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং বোপদেবকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলা কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। বোপদেব নানাশাস্ত্রের বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভূমির গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে। যথা—

> যস্ত ব্যাকরণে বরেণ্য ঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধাদশ,
> প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽপি তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ।
> সাহিত্যে ত্রয় এব, ভাগবততত্ত্বোক্তৌত্রয়, স্তস্যতু
> ব্যস্তবর্গাণি শিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কেন লোকোত্তমাঃ॥

মুগ্ধবোধের প্রসিদ্ধ টীকাকার দুর্গাদাস ও রামতর্ক-বাগীশ বাঙ্গালী ছিলেন। মহর্ষি কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি যেরূপ বৃত্তি ও ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া পাণিনি-প্রণীত অষ্টাধ্যায়ীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গিয়াছেন সেইরূপ দুর্গাদাস ও তর্কবাগীশ মুগ্ধবোধের টীকা রচনা করিয়া উক্ত গ্রন্থখানিকে পরম আদরের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন।

কলাপের টীকা

মুগ্ধবোধের ন্যায় কলাপ ব্যাকরণও বাঙ্গালার অনেক স্থানে বিশেষ সমাদৃত হইত ও হইতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুসেন কবিরাজ, শ্রীপতি দত্ত ও ত্রিলোচন দাস প্রভৃতি বঙ্গের পণ্ডিতপ্রবরগণ কলাপের টীকা রচনা করিয়া উক্ত ব্যাকরণের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসারের টীকা

সংক্ষিপ্তসারের টীকাকার জুমরনন্দীও বঙ্গবাসী ছিলেন। জুমরনন্দীর টীকা রসবতী নামে অভিহিত। ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। মুরশিদাবাদ জেলায় জুমরের বাসস্থান ছিল ইহা জানিতে পারা যায়।

রূপগোস্বামীর 'হরিনামামৃত'

বৈষ্ণব ব্যাকরণ 'হরিনামামৃত' বাঙ্গালার যথেষ্ট গৌরববর্দ্ধন করিতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গ-জননীর সুপুত্র রূপগোস্বামী উক্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য। এই গ্রন্থে রাধা ও কৃষ্ণ নামে সংজ্ঞা প্রভৃতি করা হইয়াছে। বঙ্গদেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গ্রন্থখানি এখনও বিশেষ আদরের সহিত অধীত হয়। আমরা এখন কতকটা বুঝিতে পারিতেছি যে, বঙ্গদেশে ব্যাকরণের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

কাব্যশাস্ত্র

বঙ্গদেশে কাব্যশাস্ত্রের প্রভূত আলোচনা বহু প্রাচীন-কাল হইতেই হইয়া আসিতেছে, ইহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্যগুলির কেবলমাত্র নামই পাওয়া যাইতেছে। যেগুলি বর্ত্তমানেও পাওয়া যায় আমরা কেবল তাহাদের আলোচনা করিব।

'রামচরিত' মহাকাব্য

কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দী গৌড়ী রীতিতে 'রামচরিত' মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। অযোধ্যার রঘুবংশীয় রাম ও গৌড়ের রাজা রামপাল এই উভয় নৃপতির চরিত্র বর্ণনা করা এই কাব্যের উদ্দেশ্য। রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যের ন্যায় রামচরিত কাব্যও দ্ব্যর্থবাচক। প্রত্যেক শ্লোকের দুইটি অর্থ আছে; একটি রামের ও অপরটি রামপালের পক্ষে প্রযোজ্য। এই গ্রন্থে রামপালের ও তদ্বংশীয়

রাজাদের রাজ্যকালের ঘটনাসমূহ বিবৃত হইয়াছে। রামচরিতের টীকা ঐতিহাসিকের নিকট রামচরিত অপেক্ষাও মূল্যবান্ গ্রন্থ। কারণ টীকা আবিষ্কৃত না হইলে ঐতিহাসিকগণ 'রামচরিতে'র এত আদর করিতেন কি না সন্দেহ। এই টীকাতেই রামপালের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ন্যায় রামচরিতের চতুর্থ অধ্যায় 'রামোত্তর চরিত' নামে পরিচিত। এই গ্রন্থকর্ত্তা খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি যে বাঙ্গালী ছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্য

কবিরাজ পণ্ডিত 'রাঘবপাণ্ডবীয়' কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি দ্ব্যর্থবহুল। একটি অর্থ রাঘব রামের প্রতি ও অপরটি পাণ্ডবদের প্রতি প্রযোজ্য। গৌড়ী রীতি অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। কবিবর নবম শতাব্দীতে গৌড়ের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন। কাহারও মতে ইনি আদিশূরের এবং কাহারও মতে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন।

গোবর্দ্ধনের আর্য্যাসপ্তশতী

কবিবর গোবর্দ্ধনাচার্য্য আর্য্যাছন্দে রচিত সপ্তশত পদ্যে এই মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, গোবর্দ্ধন লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধন সপ্তশতী গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—

> সকল কলাঃ কল্পয়িতুং প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ।
> সেনকুলতিলকভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্চ॥

নাটক

বেণীসংহার নাটক

কবিবর ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নাটকের রচয়িতা। আদিশূর যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম এইরূপ শুনা যায়। "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত" হইতে ভট্টনারায়ণের অনেক বৃত্তান্ত জানা যায়। বেণীসংহারের রীতি গৌড়ী, সুতরাং পুস্তকখানি গৌড়ে রচিত ইহাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। সপ্তম শতাব্দীর শেষে বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মহাভারতের কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ ও দ্রৌপদীর বেণীমোচন অবলম্বনে নাটকখানি লিখিত। মহাভারতের ঘটনার সহিত ইহার স্থানবিশেষে অনেক বৈলক্ষণ্যও আছে।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

কবিকর্ণপুর এই নাটক রচনা করিয়াছেন। এই নাটকে চৈতন্যদেবের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কবিকর্ণপুর বাঙ্গালীর বৈদ্যবংশোদ্ভূত একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। কবিবর ষোড়শ শতাব্দীতে নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধীয় 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ' একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। কবিকর্ণপুরের পিতা শিবানন্দ সেনও একজন কবি ছিলেন। ইনি চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

দূতকাব্য

পবনদূত

লক্ষ্মণসেনের সভাকবি কবিচক্রবর্ত্তী ধোয়িক এই কাব্যখণ্ড রচনা করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে এই খণ্ডকাব্য রচিত হইয়াছে। স্বয়ং লক্ষ্মণসেন ইহার নায়ক। মলয়াচলের কুবলয়াবতী নামে কোনও এক গন্ধর্ব্ব-তনয়া ইহার নায়িকা। লক্ষ্মণসেন যখন দিগ্‌বিজয় উপলক্ষ্যে মলয়াচলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন মলয়াবতী লক্ষ্মণসেনের রূপ ও বীর্য্যসম্পদে মোহিত হইয়া লক্ষ্মণসেনের প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণসেন স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে মলয়াবতী অসহ্য বিরহব্যথা সহ্য করিতে অসমর্থ হন এবং দক্ষিণানিলকে দূতরূপে কল্পনা করিয়া নিজের বিরহ-যন্ত্রণার কথা লক্ষ্মণসেনের নিকট নিবেদন করিতে অনুরোধ করেন। দূত মলয়ানিলের পথবর্ণনা-প্রসঙ্গে মলয়াচল হইতে গৌড় পর্য্যন্ত আসিবার পথ ইহাতে সুন্দরভাবে মন্দাক্রান্তা ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কবিবর ধোয়িক একজন উচ্চদরের লেখক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইনি 'কবিক্ষ্মাপতি'বা 'কবিসম্রাট' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়দেবও বলিয়াছেন

"ধোয়ীকবিক্ষ্মাপতি"। ধোয়িক নিজেও নিজকে "কবিক্ষ্মা-ভৃতাং চক্রবর্ত্তী" বলিয়াছেন।

হংসদূত

এই দূতকাব্য বঙ্গীয় বৈষ্ণবকবি রূপগোস্বামী বিরচিত। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট গোপী ললিতা কর্ত্তৃক হংসের দূতরূপে প্রেরণ অবলম্বন করিয়া এই কাব্য লিখিত। রূপগোস্বামীর 'উজ্জলনীলমণি' প্রভৃতি আরও গ্রন্থ আছে। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পদাঙ্কদূত, উদ্ধবদূত, বাতদূত প্রভৃতি আরও অনেক দূতকাব্য বঙ্গে রচিত হইয়াছে।

গীতিকাব্য

জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ

'গীতগোবিন্দের' নাম সকলেই জানেন। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কবি নিজেই গাহিয়াছেন—

বাসুদেব কেলিকথা সমেতং।
প্রবন্ধমেতং করোতি জয়দেবকবিঃ।

গীতগোবিন্দের মত এত সরল অথচ মনোরম সংস্কৃত গীতিকাব্য আর নাই। গোপিকা রাধিকার মহিমাপ্রকাশ গীতগোবিন্দ কাব্যেই পূর্ণমাত্রায় হইয়াছে। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। ইনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি গ্রামের অধিবাসী।

'প্রসন্নরাঘব' নাটকও জয়দেব রচিত। কিন্তু গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব ও প্রসন্নরাঘবের রচয়িতা জয়দেব এক ব্যক্তি কিনা ইহা বিচার্য্য বিষয়। 'চন্দ্রালোক' নামে জয়দেবের আর একখানি অলঙ্কার গ্রন্থও আছে। প্রসন্নরাঘব ও চন্দ্রালোক এক জয়দেবের রচনা ও গীতগোবিন্দ অন্য জয়দেবের রচনা বলিয়া মনে হয়। প্রসন্নরাঘব ও চন্দ্রালোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জয়দেবের পিতার নাম মহাদেব এবং মাতার নাম 'সুমিত্রা'। কিন্তু গীতগোবিন্দ হইতে জানা যায় যে, এই গ্রন্থ-রচয়িতা জয়দেবের পিতার নাম 'ভোজদেব' ও মাতার নাম 'রামাদেবী'। কোনও কোনও পুস্তকে রামাদেবীর পরিবর্ত্তে বামাদেবী বা রাধাদেবী নামও পাওয়া যায়। অতএব 'প্রসন্নরাঘব'ও 'চন্দ্রালোকে'র রচয়িতা জয়দেব এবং গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব যে এক ব্যক্তি নহেন ইহাই প্রতীত হইতেছে। কিন্তু উভয় জয়দেবই বৈষ্ণব কবি ও বঙ্গবাসী এবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বর্ণনা বিষয়ে উভয়ের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কোষ ও অলঙ্কার গ্রন্থ

(ক) কোষ

মেদিনী কোষ

ইহা একখানি প্রসিদ্ধ কোষগ্রন্থ। মেদিনী কর এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন

শব্দকল্পদ্রুম

স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই বিরাট গ্রন্থখানি গত শতাব্দীতে জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। ইহা বঙ্গের এক উৎকৃষ্ট জিনিষ ইহাতে সন্দেহ নাই।

বাচস্পত্য অভিধান

কলিকাতাবাসী স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিগত শতাব্দীতে এই বিরাট কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ অদ্যাপি রচিত হয় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্য এই উভয় গ্রন্থই অতুলনীয় ও বিরাট বিশ্বকোষের স্থান অধিকার করিয়াছে।

(খ) অলঙ্কার

অলঙ্কারকৌস্তভ

কবিকর্ণপূর (পরমানন্দ সেন) এই অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রসঙ্গে উক্ত কবির সমস্ত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কারকৌস্তভ' 'কাব্যপ্রকাশের' আদর্শে লিখিত। ইহার অনেক উদাহরণ শ্লোকেই কৃষ্ণের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি রূপগোস্বামীর 'উজ্জলনীলমণি' অপেক্ষাও মনোরম।

উজ্জলনীলমণি

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রূপগোস্বামী এই অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। গোস্বামী মহাশয়ের 'নাটকচন্দ্রিকা', 'হংসদূত,' 'উদ্ধবদূত,' 'বিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থ আছে। ইনি

'উজ্জ্বলনীলমণি'র উদাহরণগুলি স্বরচিত গ্রন্থসমূহ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

কাব্যকামধেনু

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের রচয়িতা বোপদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বোপদেব যে বঙ্গভূমির অধিবাসী তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং কাব্যকামধেনুও সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গমাতার দান ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে।

সাহিত্যদর্পণ

বেবার ও ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি মনীষিগণ সাহিত্যদর্পণের রচয়িতা বিশ্বনাথকে বাঙ্গালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক কারণে বিশ্বনাথকে উৎকলদেশবাসী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সাহিত্য-দর্পণের প্রসিদ্ধ টীকাকার রামচরণতর্কবাগীশ যে বঙ্গবাসী এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

স্মৃতিশাস্ত্র

নব্যস্মৃতি

পণ্ডিতপ্রবর রঘুনন্দন নব্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক। ইনি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন বাল্যকাল হইতে নিজের অসীম প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

শূলপাণি-রচিত প্রাচীন স্মৃতির পুস্তকগুলি 'বিবেক' নামে অভিহিত। রঘুনন্দন আপনার নব্যস্মৃতিকে 'তত্ত্ব' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে স্মৃতিশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, নব্যস্মৃতিই তাহার জলন্ত প্রমাণ। নব্যস্মৃতির বিচার-প্রণালী এত সারগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে ভারতের সমস্ত পণ্ডিতবর্গই নব্যস্মৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সমস্বরে স্বীকার করিয়াছেন। নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায় বাঙ্গালার নিজস্ব। এই দুই শাস্ত্রের গৌরবে বঙ্গভূমি জগতের সমক্ষে উন্নতমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। রঘুনন্দন 'তিথিতত্ত্ব', 'উদ্বাহতত্ত্ব', 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব', প্রভৃতি আটাশ-খানি স্মৃতিনিবন্ধ লিখিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থেই ইনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

প্রাচীনস্মৃতি

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তা। শূলপাণির স্মৃতিনিবন্ধগুলি 'বিবেক' নামে অভিহিত। শূলপাণি প্রণীত 'শ্রাদ্ধবিবেক', 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' প্রভৃতি গ্রন্থের শেষে "ইতি সাহুড়িয়ান মহামহোপাধ্যায় শ্রীশূলপাণিকৃতঃ" এই উক্তিতে জানিতে পারা যায় যে, ইনি সাহুড়িয়ান গাঁই ছিলেন। 'সাহুড়িয়ান গাঁই' এই পরিচয়ের দ্বারা শূলপাণিকে ভরদ্বাজ গোত্র রাঢ়ীশ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করা যায়। সুতরাং শূলপাণির নিবন্ধগুলি বাঙ্গালার গৌরবের বিষয়। এক সময়ে বঙ্গদেশে শূলপাণিকৃত নিবন্ধের অধ্যয়ন অধ্যাপনা পূর্ণবেগে প্রচলিত ছিল। রঘুনন্দনকৃত নিবন্ধের প্রসারবৃদ্ধির পরে শূলপাণির নিবন্ধের অধ্যয়ন অধ্যাপনা উঠিয়া যায়। কিন্তু রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব অপেক্ষা শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক ও প্রায়শ্চিত্তবিবেক অধিকতর উপাদেয়। এইজন্যই রঘুনন্দনের নিবন্ধের সহিত শূলপাণির উক্ত দুইখানি বিবেকেরও অধ্যয়ন অধ্যাপনা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

কুল্লূকভট্ট

খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে মহামহোপাধ্যায় কুল্লূকভট্ট মনুসংহিতা নামক স্মৃতিগ্রন্থের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। কুল্লূকের বংশধরগণ অদ্যাপি রাজসাহী জেলায় বাস করিতেছেন।

জ্যোতিষ

অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রেও বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। 'জ্যোতির্বিজ্ঞান', 'কল্পলতিকা', প্রভৃতি গ্রন্থের এই প্রসঙ্গে নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও বঙ্গভূমিতে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মাধব করের নিদান ও চক্রপাণিদত্তের চক্রদত্ত গ্রন্থ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। চক্রপাণি নিজের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারি পাত্র নারায়ণস্তনয়ঃ
... ... শ্রীচক্রপাণি দত্তঃ।

বহরমপুরের অধিবাসী প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় চরক-সংহিতার জল্পকল্পতরু নামে একখানি উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ বঙ্গভূমিতে রচিত হইতেছে।

দর্শনশাস্ত্র

সর্ব্বশেষে আমরা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছি। দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেশ ও জাতির বিশেষত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে জাতির মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের যত উন্নতি সাধিত হইয়াছে সেই জাতিই বিদ্যা ও জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে তত উন্নত ইহা অনেকে মনে করেন। দর্শনশাস্ত্রের চরম উন্নতি ভারতবর্ষেই পরিদৃষ্ট হয়, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য দর্শনের সম্যক উন্নতি সাধিত হইলেও নব্যন্যায় দর্শনের উন্নতি-কল্পে একমাত্র বঙ্গভূমিই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন। পূর্ব্বে মিথিলা নগরীতে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বঙ্গের মনীষী সুসন্তান বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির অসীম অধ্যবসায়ের বলে বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়া নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নব্যন্যায় বাঙ্গালার নিজ সম্পত্তি। এই শাস্ত্রের আলোচনার প্রণালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বঙ্গবাসী মনীষিগণ কিরূপ অদ্ভুত বিচারশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। পৃথিবীর পণ্ডিতবর্গেরই নব্যন্যায়ের সম্মুখে মাথা নত করিতে হয়। এই নব্যন্যায়শাস্ত্রই বঙ্গের পাণ্ডিত্য-গর্ব্বের উজ্জ্বল স্তম্ভস্বরূপ চিরদিন বিদ্যমান রহিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীনকাল হইতেই কেবল মিথিলাতে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ বাসুদেব, রঘুনাথ, জগদীশ প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টায় খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে শ্রীনবদ্বীপে নব্যন্যায়শাস্ত্রের পরম প্রকর্ষ সাধিত হইয়াছে। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর মিথিলার নৈয়ায়িকদিগকেও বাঙ্গালার নিকট মাথা নত করিতে হইয়াছে।

নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার ফলে ন্যায়শাস্ত্রের একটি স্বতন্ত্র রকমের ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভাষায় 'অবচ্ছেদক' 'অবচ্ছিন্ন' প্রভৃতি শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায় এই ভাষাটি সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞের নিকট দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচারের সময় অনেক পণ্ডিতকে কেবল ভাষার ভূহকে পড়িয়াই নৈয়ায়িকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এখন আমরা নবদ্বীপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকের গ্রন্থের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সার্ব্বভৌমনিরুক্তি

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মিথিলার নৈয়ায়িকপ্রবর পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলী কোনও গ্রন্থ মিথিলা হইতে আনিতে দিতেন না। সুতরাং বঙ্গসন্তান বাসুদেব অগত্যা গঙ্গেশোপাধ্যায়ের সমস্ত তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ ও কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করিয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন ও নবদ্বীপে প্রথম ন্যায়বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। বাসুদেব বঙ্গভূমির গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য যতটা কষ্টস্বীকার করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি নিজে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির একখানি টীকা করেন। ইহার নাম "সার্ব্বভৌম নিরুক্তি।"

তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি

রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপন করিয়া মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট অধ্যয়নার্থ গমন করেন। রঘুনাথের বিদ্যাবত্তায় ও বুদ্ধিমত্তায় পক্ষধর নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ছাত্র রঘুনাথের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন ও রঘুনাথকে শিরোমণি উপাধিতে বিভূষিত করেন। রঘুনাথের একচক্ষু কাণা ছিল, সুতরাং মিথিলায় অনেকে তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিতেন—

অভাগ্যং গৌড়দেশস্য যত্রকাণঃ শিরোমণিঃ।

গৌড়দেশের দুর্ভাগ্য যে সেখানে কাণা শিরোমণি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রঘুনাথ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর একখানি টীকা লেখেন। ইহার নাম 'তত্ত্বচিন্তামণিদীধীতি'। এই টীকায় রঘুনাথ অনেক অভিনব বিষয়ের আলোচনা করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। রঘুনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইহারই চেষ্টা ও যত্নে নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করে।

মাথুরী

মথুরানাথ তর্কবাগীশ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নব্যন্যায়ের একটি টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকা মাথুরী নামে অভিহিত। এই টীকার ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। এইজন্য নবদ্বীপে এই টীকা প্রথম অবস্থায় তেমন প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। কারণ সেই সময়ে সরল ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করা পাণ্ডিত্যের পরিচায়করূপে গণ্য হইত না।

জাগদীশী

জগদীশ ভট্টাচার্য্য সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। নব্যন্যায়ের উপর ইঁহার লিখিত উৎকৃষ্ট একখানি টীকা 'জাগদীশী' নামে পরিচিত। আজকাল জাগদীশী টীকারই পঠন-পাঠন বিশেষরূপে হইয়া থাকে। জগদীশের 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'ও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে ন্যায়ের ভাবে ব্যাকরণশাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে এই পুস্তক হইতে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী

পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বনাথ তর্কাপঞ্চানন খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ন্যায়শাস্ত্রে প্রথম প্রবেশার্থীদের পক্ষে বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থখানি পরম উৎকৃষ্ট ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সরল ভাষায় ও সংক্ষেপে এই গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রের মোটামুটি বিষয় সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। ন্যায়সূত্রবৃত্তি নামে বিশ্বনাথ-রচিত আর একখানি পুস্তক আছে, সেই পুস্তকে গৌতমপ্রণীত ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

গাদাধরী

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে গদাধর ভট্টাচার্য্য বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে ন্যায়শাস্ত্রের একখানি উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়া নিজের অসীম বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এই টীকা 'গাদাধরী' নামে খ্যাত।

এইরূপ ন্যায়শাস্ত্রের আরও অনেক গ্রন্থ বঙ্গদেশে লিখিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সমস্ত শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা করা সম্ভবপর নয়।

মোটের উপর এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় বহু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের নিপুণভাবে আলোচনা হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে বঙ্গবাসী মনীষিগণ যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার তুলনা অন্যত্র বিরল।

ব্যর্থ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আমার হারানো চিন্তাগুলি—দুয়ে দুয়ে
মনের সোনার ক্ষেতে ধান্যশীর্ষ সম
ছিল ঝুলে ঝুলে—অতি কান্ত, অতি কম।
আসে বন্যা, বহে ঝঞ্ঝা, পড়ে তারা শুয়ে।
ভাবি ব'সে ব'সে, আজ তারা কোথা মম?
উপরে আকাশ নীচে মাঠ করে ধূধূ,
সরসতাহীন আমি পড়ে আছি শুধু;
আমারে কাঁদিতে দাও, অক্ষমতা ক্ষম।
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে যে-ক্ষেত্র সেচিনু,
নিষ্ফলতা-মূল্যে হায়, তাহারে বেচিনু,
যাহা ছিল, তাহা নাই, আর কেন তবে?
কঙ্করের তলে আজ শ্যামল অঙ্কুর
মেলে যদি—উপাড়িয়া ক'রে দাও দূর
যা ছিল হরিৎ, পূর্ণ-ধূসর তা হবে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

বৈষ্ণবসাহিত্যে গোবিন্দদাস নামে বহু কবি ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুর স্বীয় পদসংগ্রহগ্রন্থ পদামৃতসমুদ্রের টীকায় কতকগুলি পদের প্রকৃত পদকর্ত্তার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যতগুলিই গোবিন্দদাস থাকুক না কেন—গোবিন্দদাস-কবিরাজ নামে একজন মাত্র কবি ছিলেন এবং তিনিই যে গোবিন্দদাস-ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ এবং শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং এযাবৎ ছিলও না। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; এবং কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক বহু বহু সুললিত পদ রচনা করিয়া তৎকালীন বঙ্গীয় কবিগণের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ ইঁহার কবিত্বের সমুচিত সমাদর করিয়া ইঁহাকে অনন্য-সাধারণ কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন।...

সম্প্রতি বাঙ্গালা মাসিকপত্রের আসরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই গোবিন্দদাস-কবিরাজকে মিথিলাদেশবাসী অন্য এক কবি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার কিছু উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"বৈষ্ণব-কবিতায় যে কয়জন গোবিন্দদাস নামে পদ-রচয়িতা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। ইঁহাকে কবিরাজ অথবা কবীন্দ্র বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী, সে কথা অতি অল্পলোকই জানে।

"কবিরাজ বলিতে বৈদ্য বুঝায়, এই ভিত্তির উপর গোবিন্দদাস বৈদ্যজাতীয় অনুমান করিয়া অনেকে ইঁহার বাসস্থান, বংশ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাস সেন নামক কোন বৈষ্ণব কবি ছিলেন কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই।"

"—এই কবি কবিরাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। কবিরাজ ইঁহার জাতির পরিচয় সিদ্ধান্ত করিয়া ইঁহার নিবাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নির্ণীত হইয়াছে এবং যে বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম, তাহাও লিখিত হইয়াছে।"

নগেন্দ্রবাবু শুধু গোবিন্দদাস-কবিরাজের মৈথিলত্ব প্রতিপাদন করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তিনি শ্রীখণ্ডবাসী বাঙ্গালী প্রকৃত গোবিন্দদাস-কবিরাজের ঐতিহাসিকত্ব উড়াইয়া দিতে চাহেন। শ্রীখণ্ডবাসী প্রকৃত গোবিন্দদাস-কবিরাজের পরিচয় ও তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে; এবং গোবিন্দদাস-কবিরাজ নিজকৃত সঙ্গীত-মাধব নাটকে নিজের এবং ভ্রাতা রামচন্দ্রের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ঐতিহাসিকত্ব এককথায় উড়াইয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "এই কবি কবিরাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। কবিরাজ ইঁহার জাতির পরিচয় সিদ্ধান্ত করিয়া ইঁহার নিবাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নির্ণীত হইয়াছে এবং যে বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম, তাহাও লিখিত হইয়াছে।" বৈষ্ণবসাহিত্যে যাঁহার কিছুমাত্রও জ্ঞান আছে, তিনি জানেন যে, শ্রীখণ্ডবাসী গোবিন্দদাস, অধিকাংশ 'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র'র মত বংশসিদ্ধ উপাধিধারী ছিলেন না। ইঁহার কবিত্বশক্তি ও বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীজীব-প্রমুখ বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব গোস্বামি-সমাজ ইঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন।—

> গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
> সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয়॥
> শ্রীজীব-লোকনাথ-আদি বৃন্দাবনে।
> পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে॥
> কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
> কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি॥

—(ভক্তিরত্নাকর, বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩১)

এইস্থানে গোবিন্দদাস কবিরাজের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। গোবিন্দদাস খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার পিতা চিরঞ্জীব সেন শ্রীচৈতন্যদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ইঁহার আদিম বাসস্থান ছিল ভাগীরথীতীরবর্ত্তী কুমারনগর গ্রাম। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিত দামোদর সেনের একমাত্র কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডেই বসবাস করেন। তথায় ইঁহার দুইটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন—রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র অতিশয় সুপুরুষ, সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন, এবং উত্তরকালে তিনি রামচন্দ্র কবিরাজ বা শুধু কবিরাজ নামে খ্যাত হন। রামচন্দ্র যখন বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে গ্রামোপান্তে পুষ্করিণীতীরে আসীন সানুচর শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দেখিয়া তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হন এবং পরদিনই তাঁহার নিকট আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত রামচন্দ্র নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের ইনি অভিন্নাত্মা বন্ধু ছিলেন।

রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যখন শিশু, তখনই তাঁহাদের পিতার মৃত্যু হয়। মাতামহের আশ্রয়ে পালিত হইয়া, পরে তাঁহারা পৈতৃক স্থান কুমারনগরে বাস করেন, এবং আরও পরে তেলিয়া বুধরী গ্রামে উঠিয়া যান। মাতামহ শক্তি-উপাসক ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র এবং গোবিন্দও শক্তি-উপাসক হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের বৈষ্ণবতা দেখিয়া পরে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা লইতে বাসনা করিলেন। আচার্য্য খেতরী যাইবার পথে বুধরীতে আগমন করেন। তখন গোবিন্দ কঠিন গ্রহণী রোগে ভুগিতেছেন। আচার্য্য তাঁহাকে সুস্থ করাইয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। গোবিন্দের স্ত্রী মহামায়া ও পুত্র দিব্যসিংহও সেইসঙ্গে বৈষ্ণব-দীক্ষা লাভ করেন।

গোবিন্দের কবিত্বশক্তি দর্শনে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে আদেশ করেন। বাসুদেব ঘোষ গৌরলীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দকে গৌরলীলা বর্ণনা করিতে নিষেধ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার কবিতা পাঠে

চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ গীত লিখিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইবার জন্ত অনুরোধ করিতেন। তাঁহাদের উচ্চ প্রশংসাসূচক এই শ্লোক ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত আছে,—

> শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দ্রমণিরেন্দ্রকন্দ্রাসিতে-
> নানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধবান্।
> শ্রীমজ্জীবহরাজ্ঞি পাণ্ডরভূবো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
> সর্ব্বত্রাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমত্তৎ পরম্॥
>
> —(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৩১)।

...নগেন্দ্রবাবু বলেন, "কবীন্দ্র গোবিন্দদাসের ভাষা এমন মার্জ্জিত, তাঁহার শব্দের ঐশ্বর্য্য এত বিপুল যে, বাঙ্গালীর পক্ষে সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

যদিও এই যুক্তি অত্যন্ত অসার ও মূল্যহীন, তথাপি আমি এই স্থানে যথেচ্ছ কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী অনেক কবি গোবিন্দদাসের মতই মার্জ্জিত ও সুললিত ভাষায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরু হইতে যদৃচ্ছা কয়েকটি উদাহরণ তুলিয়া দিতেছি।

> বিকচ-সরোজ-ভান-মুখ-মণ্ডল দিঠি-ভঙ্গিম নট-খঞ্জন জোর।
> কিয়ে মৃদু-মাধুরি-হাস উগারই পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি
> ভোর॥
>
> বরণি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া।
> কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনিলমণিয়া।
> অঙ্গদ বলয় হার মণি-কুণ্ডল চরণে নূপুর কটি-কিঙ্কিণি-কলনা।
> অভরণ-বরণ-কিরণে অঙ্গ চর চর কালিন্দি জলে যৈছে চান্দকি
> চলনা॥
> চুকি চকেশ বেশ কুসুমাবলি শির পর শোভে শিখি-চান্দকি ছান্দে।
> অনন্তদাস-পহু রূপরূপ-লাবণি সকল-যুবতিমন পড়ি গেও কান্দে॥
>
> —(পদসংখ্যা ২৬৮)॥
>
> কাজর-রুচিহর রয়নি বিশালা। তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা।
> ঘরে সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর। নিশবদ-পথ-গতি চললিহ
> গোর।

...বঙ্গ-সাহিত্যে আর যাহা কিছুর অভাব থাকুক না কেন, সৎকবির অসদ্ভাব কোনকালেই ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্যের আদর চিরকালই আছে বটে, কিন্তু কবিদের জীবন-চরিত ও জীবন-কাল সম্বন্ধে বাঙ্গালী চিরকালই অতিমাত্রায় উদাসীন। আধুনিকপূর্ব্ব বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। তাঁহার আবির্ভাবকাল ও জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কি জানি? শুধু কতকগুলি গল্পমাত্র; এবং তাঁহার আবির্ভাব সময় লইয়া আলোচনাকারীর রুচি, ইচ্ছা এবং সুবিধামত পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত টানা-হিঁচড়া চলিতেছিল। শুধু শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-মহাশয় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হওয়াতে ভাষাতত্ত্ববিদ্দিগের সাহায্যে একটা মোটামুটি সময়ের ধারণা হইয়াছে মাত্র। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভুল ধারণা ছিল ও আছে। সে সকলের এযাবৎ কোন মীমাংসা হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতার ভূমিকায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক নূতন ও মূল্যবান্ তথ্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Journal of the Department of Arts-এ বিদ্যাপতির সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটি খুব মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু কবিশেখর, কবিরঞ্জন, রায় চম্পতি, সিংহভূপতি প্রভৃতি সত্য অসত্য ভণিতার পদ যথেচ্ছ বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়া দিতে চাহেন। "ভাবিয়া দেখিয়া গণিয়া দেখিলে" বিদ্যাপতির পদের সংখ্যা এক শতটির ঊর্দ্ধে যাইবে কি না ঘোরতর সন্দেহ। কৃত্তিবাস অত বড় কবি, তাঁহার উল্লিখিত "গৌড়েশ্বর" লইয়া দ্বন্দ্ব এখনও তুমুল চলিতেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লইয়া আলোচনার সম্বল তো কেবল "ডিহিদার মামুদ সরিপ" ও "ধন্ত রাজা মানসিংহ"। পদ্মপুরাণ রচয়িতা বিজয়-গুপ্তের বর্ত্তমান বংশধর তাঁহা হইতে পাঁচ পুরুষ মাত্র; তাহা হইলে তো বিজয়গুপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক হইয়া দাঁড়ান! দূরের কথা যাউক, সেদিনকার ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি? ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলি তো ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-মহাশয় লিখিয়া গিয়াছিলেন, আমরা সেই কবি-কাহিনী সকলের পুনরুক্তি করিতেছি মাত্র।

এই তো অবস্থা। ইহার মধ্যে গোবিন্দদাস-কবিরাজ হইতেছেন একমাত্র বড় কবি, যাঁহার সম্বন্ধে স্পষ্ট, বিস্তৃত ও সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার পিতৃকুল, মাতৃকুল, গুরুকুল, বন্ধু-সমাজ—কেহই অজ্ঞাত, অখ্যাত নহেন। শুধু তাহাই নহে। বঙ্গসাহিত্যে যাহা অনতিদুর্লভ, তাহা, অর্থাৎ গোবিন্দদাস-কবিরাজের কাব্যরচনার একটা প্রামাণিক ও ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। ইতিহাস-প্রবঞ্চিত বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এই সৌভাগ্যই বা আমাদের সহিবে কেমন করিয়া? সম্পূর্ণ পরিচয়যুক্ত এই একমাত্র কবির বঙ্গদেশে কোন অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া আমরা খেয়াল দেখিতেছি। ইতিহাস-সরস্বতীর অপূর্ব্ব বিদ্রূপ!

গোবিন্দদাস-কবিরাজ তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ মৈথিল-ভাষায় লিখেন নাই। তিনি যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা একটি মিশ্র ভাষা। এই ভাষা বিদ্যাপতি সমসাময়িক প্রাচীন মৈথিল ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং বাঙ্গালা ভাষার রসসঞ্চারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালী কবির লেখনীতে এই ভাষার জন্ম। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাস এবং শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-প্রসঙ্গই এই ভাষার উপজীব্য বস্তু বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার এই সাহিত্যিক পরগাছা বা উপভাষা "ব্রজবুলী" নামেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই পরগাছা এখন ভাষা-তরুর অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয়, এবং আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত এই ভাষার সাহিত্য-সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র ঘটক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিরা বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্রজবুলী সাহিত্যের ইতিহাস টানিয়া আনিয়াছেন। গোবিন্দদাস-কবিরাজ এই বিস্তৃত কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। বিদগ্ধসমাজে তাঁহার কবিত্বের যথোচিত আলোচনা ও সমাদর তো হয়ই নাই, উপরন্তু নানাবিধ ভ্রমাত্মক তথ্য প্রচারিত হইতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬, ২য় সংখ্যা) শ্রীসুকুমার সেন

উত্তর-কলিকাতা যুব-সম্মিলনীতে শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

শুনিলাম, আপনারাও নাকি একটা উভয় সঙ্কটের মাঝে পড়িয়াছেন। দেশব্যাপী প্রচণ্ড দলাদলির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া আপনারা নাকি চুবিয়া অন্ধকার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যাপারটা

যদি আপনারা সোজাসুজি দলাদলি মনে করিতেন, তাহা হইলে বলিতাম—মাভৈঃ! দলাদলি আমাদের বাঙ্গালী সমাজের সনাতন ব্যবস্থা। উহা একেবারে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। পল্লীগ্রামের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা সকলেই জানেন, আহার-বিহারের পর যে সময়টুকু বাকি থাকে, সে সময়টুকু আমাদের অচলায়তনের রক্ষকেরা কেমন করিয়া সদ্ব্যবহার করেন।...

দুই এক পুরুষ কলিকাতায় বাস করিয়া রাজনৈতিক বচনাবলী আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছি বলিয়াই যদি আপনারা আবদার ধরেন, যে, আমাদিগকে এই পুরুষপরম্পরাসঞ্চিত সনাতনী মনোবৃত্তি একদিনে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমাদের উপর বেশ একটু অত্যাচার করা হয় বৈকি! নীরস জীবন সরস করিতে, নিরর্থক জীবন সার্থক করিতে, নিজেদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার সাহায্য করিতে ঐ দলাদলিটুকুই ত সম্বল। সেটুকু ছাড়িয়া দিলে আর বাকি থাকে কি? আপনারা হয়ত মনে মনে বলিবেন—"ওহে পরম প্রত্যাশাদ গর্দ্দভ! আধুনিক দলাদলি সে প্রাচীন সামাজিক দলাদলি নয়। ইহার ভিতর যে কত বড় বড় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক principles গজগজ করিতেছে, তাহার কোন খোঁজ রাখ? ইহার মধ্যে কতখানি Dominion Status আর কতখানি Independence গুঁতোগুঁতি করিতেছে, কতখানি অহিংসবৃত্তি হিংসবৃত্তিকে কোণঠাসা করিয়াছে, Fascismএর সঙ্গে Communism-এর কতটা চুলোচুলি বাধিয়াছে, পুরুষস্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতার কতখানি চোখাচোখি ও রোখারোখি লাগিয়া গিয়াছে—সে সব গূঢ়-তত্ত্বের অনুসন্ধান কি কখনও করিয়াছ?" এ সব কঠিন প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিব—না, সোজা কথাকে বাঁকা করিয়া বুঝিবার শক্তি ভগবান আমাকে দেন নাই। কিন্তু আপনাদের ঐ গভীর তত্ত্বগুলি বুঝি আর না বুঝি, ঐসব গভীর তত্ত্বের ফাঁকে ফাঁকে যে-সমস্ত অগভীর তত্ত্বগুলি উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, সেগুলির সবকয়টিই আমার কাছে সুপরিচিত। রাজনীতিই বলুন, সমাজনীতিই বলুন, আর অর্থনীতিই বলুন, সবগুলিই মানুষের আপনার প্রয়োজনসিদ্ধির কায়দা। মানুষকে ও তাহার প্রয়োজনকে জানিলেই সব বড় বড় নীতিগুলির গোড়ার কথা জানা যায়। যুগে যুগে মানুষ আপনার নূতন নূতন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্ত সমাজবিন্যাসের নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিতেছে, কিন্তু এই সমস্ত নূতন নূতন প্রণালীর মূলে চিরপুরাতন মানব প্রকৃতিই বর্ত্তমান।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, মেয়েদের কথা আমি তুলিব না। স্ত্রীলোক আমার কাছে তত্ত্বের অর্থাৎ ভক্তির বস্তু; সুতরাং দুর্ব্বোধ্য! তাঁহারা কি চান আর কি বলেন, আর তাঁহাদের চাওয়া ও বলার মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এ প্রশ্নের মীমাংসা আমি কোনদিনই করিতে পারি নাই। তবে এ কথা যদি সত্য হয় যে, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হইবার জন্ত কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা হইলে সে বিষয়ে আপনাদের কোন সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। বাংলাদেশে যদি একটা Husbands Protection League খোলা যায়, তাহা হইলে এমন পুরুষ নাই, যিনি গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া তাহার জন্ত চাঁদা না জোগাইবেন; পুরুষের কাঁধ হইতে নামিয়া গড়ের মাঠে স্বাধীন হাওয়া খাইবার ইচ্ছা যদি সত্যসত্যই এ দেশের মেয়েদের হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থির জানিবেন যে, বাঙ্গালাদেশে এমন বোকা পুরুষ নাই, যিনি সে শুভসঙ্কল্পে বাধা দিবেন। সুতরাং এ প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে ঘামাইতে আপনাদের "যুবক" সমিতিগুলি কেন যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কিম্ভূতকিমাকার "যুব" সমিতিতে পরিণত হইবে তাহার ত সম্যক্ কারণ দেখিতে পাই না। অকারণ "ক" বেচারাকে নির্ব্বাসিত করিলেই কি যুবকযুবতী একাকার হইয়া যাইবে? সব ভেদ মিটিবে? সব জ্বালা জুড়াইবে? তা যদি না হয়, ত পরের বোঝা ঘাড়ে লইয়া নিজেদের ভারাক্রান্ত করেন কেন? নারীস্বাধীনতার ভার নারীর স্কন্ধেই থাকুক, আপনারা নিজেদের "যুবক"ত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া সে প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন না।

যে কথাটা জানিবার জন্ত আমার মনে বিশেষ কৌতূহল হয়, তাহা এই,—আপনারা যে Fascism, Communism, Dominion Status, Independence হিংসা, অহিংসা প্রভৃতি মতবাদ লইয়া গবেষণা করেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ প্রশ্নগুলি আপনাদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত? হিংসা-বৃত্তির মানবজীবনে সার্থকতা আছে কিনা, অহিংসা চরম ও পরম ধর্ম্ম কিনা, এসব কথা লইয়া ভারতবর্ষীয় দার্শনিক ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন। সুতরাং সেই সমস্ত দার্শনিকদিগের বংশতিলকদের মনে যে এসব প্রশ্ন উঠিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয় যে, রাজ্যশাসন ও রক্ষণ ত ক্ষত্রিয় প্রভৃতির লোকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আর অহিংসা যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এ কথা ত ভারত-বর্ষীয় চিন্তাধারার মধ্যে কোথাও নাই। তবুও রাজনীতি ও অহিংসার আজ এক অভিনব খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়া মহাপুরুষেরা যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতেছেন, তাহার প্রতি আপনাদের অচলা শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি পুলকিত হইয়া উঠিয়াছি। আপনাদের অনেকেই রাজনীতিচর্চ্চার সহিত সংশ্লিষ্ট; আর রাজনীতিচর্চ্চার অর্থই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপালন। অহিংসার ভিত্তির উপর ক্ষত্রিয় ধর্ম্মস্থাপনের এই যে অভিনব চেষ্টা, ইহার কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত্ত আর কতখানিই বা ব্যর্থ পরানুকরণ তাহা জানিবার জন্ত কৌতূহল আমার মনে অতিশয় প্রবল। সেকালের বখাটে ছেলেরা কচু, আলু ও আদার মধ্যে সন্ধি স্থাপনের বৃথা চেষ্টায় একটা "কচ্্ঘাদা" শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। অহিংসার সহিত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সেইরূপ Entente cordiale স্থাপনের চেষ্টায় মহাপুরুষেরা একটা 'রাজনৈতিক কচ্্ঘাদার' সৃষ্টি করেন নাই ত? আর এই "কচ্্ঘাদা" প্রসাদাৎ তরুণের তারুণ্য দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে কি? যদি না হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি এই ভয়াবহ পরম-ধর্ম্মকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া আপনারা বাঙ্গালাদেশে একটা অনর্থক দলাদলির প্রশ্রয় দেন কেন?

তাহার পর ধরুন—Independence আর Dominion Status এর কথা। আইনজ্ঞ পণ্ডিতদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। বাপের বেটা হওয়ার চেয়ে পোষ্যপুত্র হওয়া যে বেশী গৌরবের ব্যাপার একথা প্রতিপন্ন করিতে তাঁহাদের এক মিনিটও সময় লাগিবে না। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংরেজের উপনিবেশগুলির উৎপত্তি ও পরিণতির কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অক্লেশে স্বীকার করিবেন যে, Dominion Statusই উহার পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু ভারতের ইতিহাসের পরিণতি ঐ Dominion Statusএ? দেশবন্ধু, মহাত্মাজী মাথায় থাকুন কিন্তু আপনাদের চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি, ভারতবর্ষের ঐ পরিণাম যদি হয়, তাহা হইলে আমাদের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষেরা কি দুই হাত তুলিয়া আপনাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন বলিয়া মনে হয়? ওটা আপনাদের শোনা কথা, না নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিচারের ফল?

তারপর ধরুন—Fascism ও Communismএর লড়াই। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ সে বিচার আমি করিতেছি না; কিন্তু

যাঁহারা ও-সমস্ত মতবাদ গড়িয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন সমাজের লোক। যে অবস্থায় যে যে কারণে ঐ সমস্ত মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সমস্ত অবস্থা ও কারণ আমাদের দেশে বর্ত্তমান কি না, এবং যদি না হয়, আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার আন্দোলন কিরূপ আকার ধারণ করা উচিত সে সম্বন্ধে আপনারা কতটা আলোচনা করিয়াছেন তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়। আলোচনা যে সম্যক হয় নাই, তাহা সন্দেহ করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। আমি দেখিতে পাই, আমাদের দেশের যে-সমস্ত যুবক আমেরিকায় যান, তাঁহারা তিনদিনের মধ্যেই আমেরিকান democrat হইয়া পড়েন; যাঁহারা রুশিয়ায় যান তাঁহারা ঠিক ঐ তিন দিনের মধ্যেই বিশ্বাস করিয়া লন যে, সত্য আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা dictatorship of the proletariat. এত সহজে এত বেশী পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনটায় স্বভাবতই একটু খোঁচা লাগে। যাঁহারা সেকালের নবাবী আমলের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছবি দেখিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তাঁহাদের সকলেরই বাবরী কাটা চুল। তারপর ইংরেজী আমলের ইংরেজীনবীশদের চুল দেখুন—সব গাড়োয়ান-মার্কা ছাঁট। চুল কাটায় যেমন একটা ফ্যাসান আছে, মতবাদেও তেমনি আছে। আমার জিজ্ঞাস্য—এই আপনাদের এই Fascism, Communism-এর ঝগড়ার মধ্যে কতটা ফ্যাসান, আর কতটা সত্যকার মতভেদ? সত্যকার মতভেদের চেয়ে ফ্যাসানের ঝোঁকটা যদি বেশী হয়, তাহা হইলে বলি—পরের ঝগড়া ঘরে আনিয়া দলাদলির মাত্রা বাড়াইয়া লাভ কি?

চারিদিকে একটা রব উঠিয়াছে—"তরুণের বিদ্রোহ"। যেরূপ নির্ব্বিকারচিত্তে আপনারা পরের মতামত আপনার ভাবিয়া লম্ফঝম্ফ করেন, তাহার মধ্যে বিদ্রোহের চেয়ে পাড়াগেঁয়ে দলাদলির ভাব বেশী, আর তারুণ্যের চেয়ে বাহাত্তুরে গতানুগতিকতার ভাবই বেশী বলিয়া মনে হয়। তারুণ্যের প্রধান লক্ষণ আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও ঋজুগতি। তারুণ্যের দ্বিতীয় লক্ষণ আদর্শনিষ্ঠা। তরুণ চায় অতীতের আবর্জ্জনাস্তূপ দুই হাতে সরাইয়া ফেলিয়া নূতন সৃষ্টির গোড়াপত্তন করিতে। দুনিয়ার কাছে ঘা খাইয়া যাহাদের আদর্শনিষ্ঠা মলিন হইয়া গিয়াছে, নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া যাহারা প্রতি পদে রফা করিতে ও প্যাঁচ কসিতে চায়, তাহাদের সাকরেদী করা তরুণের ধর্ম্ম নয়। তরুণের ইন্দ্রিয়গ্রাম সতেজ—সে চায় নিজের চোখে দেখিতে, নিজের কানে শুনিতে, নিজের মনে ভাবিতে, নিজের হাতে কাজ করিতে। "দাদার জয়" গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ান তারুণ্যের পরিচায়ক নয়।...

জোর করিয়া সকলকে এক নেতার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে গেলে ফল হয় গুঁতোগুঁতি আর মারামারি। চারিদিকে আজকাল তাই অনেকেরই মুখে শুনিতে পাই—ক্যাপচার কর। মিউনিসিপ্যালিটি ক্যাপচার কর। কাউন্সিল ক্যাপচার কর, জেলা বোর্ড ক্যাপচার কর, হিন্দুসভা ক্যাপচার কর, আঞ্জুমান ইসলাম ক্যাপচার কর, শিখলীগ ক্যাপচার কর, যে যাহাকে পায় ক্যাপচার করিয়া ফেল। নেতারা বলিতেছেন ছেলেদের ক্যাপচার কর, ছেলেরা মতলব আঁটিতেছে নেতাদের ক্যাপচার কর। কাহারও প্রাণটা আজ আর নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি নয়; সবাই সবাইকে ক্যাপচার করিবার জন্ত উন্মত্তের মতো ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনের কথাটা এই, আমার মতের সহিত যাহার মত না মিলিবে, আমার নেতৃত্বাধীনে যে কাজ করিতে রাজী না হইবে, দুনিয়ায় তাহার ঠাঁই নাই। প্রতিভাশালী, শক্তিমান পুরুষ যদি সাময়িক কার্য্যসিদ্ধির জন্ত এ দুর্গম পথ অবলম্বন করেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহার বিপক্ষে বেশী কথা না বলিলেও চলে, কিন্তু মুস্কিল এই প্রতিভাশালী পুরুষেরা স্বর্গলাভ করিবার সময় কাহাকেও তাঁহাদের প্রতিভার অধিকারী করিয়া যান না; চেলারা শুধু শিখিয়া রাখে ক্যাপচার। তাহার পর যখন গদি লইয়া মামলা বাধে তখন গলিতে গলিতে ঢাল টুকিয়া বেড়ায় মুসোলিনী ও লেনিন-এর ক্ষুদে ক্ষুদে সংস্করণগুলি, আর ধুম পড়িয়া যায় ক্যাপচারের; আর সঙ্গে সঙ্গে আসে চুলোচুলি, কিলোকিলি ও পরিশেষে অন্ধকার রাতে ছুরি মারামারি। এ হীনবৃত্তির ফলে সিংহাসন যদি বা দখল হয়, ত সে সিংহাসনে দেববিগ্রহ দর্শন ঘটিবে কি? আমার তাই মনে হয়, কাহাকে ধরিয়াও কাজ নেই, কাহারও কাছে অনর্থক ধরা দিয়াও লাভ নাই। কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিপুল; যিনি সত্যপথের পথিক তাঁহার সহধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী মিলিবেই মিলিবে।...

যুবক সমিতিগুলি যখন সবেমাত্র স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহাদের উপর ডাক পড়িল কংগ্রেসের তাঁবেদারী করিতে আর মজার কথা এই যে, সে ডাকটি আসিল তরুণের বিদ্রোহের নামে। কিন্তু ক্যাপচার-নীতির ফলে যুবক-সঙ্ঘগুলি হইয়া দাঁড়াইল কংগ্রেসের বি-টিম।

কিন্তু নেতারাও এই ছ'নৌকায় পা দিয়া যে অপরূপ রূপ ধরিয়া দেখা দিলেন তাহাও বেশ শোভন মনে হয় না। যাঁহারা যুবক-সমিতিতে আসিয়া বলিলেন দেশকে মতার্ণাইজ করিতে হইবে, যন্ত্র-পাতির ব্যবহার বাদ দিলে চলিবে না, তাঁহারাই আবার কংগ্রেসে ঢুকিবার সময় ব্যবস্থা দিলেন যে, কংগ্রেসের পবিত্র প্রাঙ্গণে শুদ্ধ শুদ্ধ খদ্দর ব্যতীত আর কিছু প্রবেশ করিলেই কংগ্রেসের স্পর্শদোষ ঘটিবে। যাঁহারা যুবক-সমিতিতে আসিয়া বলিলেন, ইংলণ্ডের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ণস্বাধীনতা লাভ করাই ভারতবর্ষের স্বাভাবিক পরিণতি, তাঁহারাই আবার পরক্ষণে ব্যবস্থাপক সভার বারদেশে শপথ গ্রহণ করিলেন যে, তাঁহারা পুরুষপরম্পরাক্রমে ইংলণ্ডেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিবেন। যাঁহারা যুবক-সমিতিতে আসিয়া বীরদর্পে লাঠির বহর দেখাইয়া গেলেন, তাঁহারাই কংগ্রেসে ঢুকিবার সময় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, অহিংস যে চরম ও পরম ধর্ম্ম, সে বিষয়ে আর তাঁহাদের সন্দেহমাত্র নাই। যাঁহারা তরুণ-সঙ্ঘের আবহাওয়ায় পড়িয়া কৃষক ও শ্রমিকের জন্ত অশেষ বেদনা জানাইলেন, তাঁহারাই আবার কংগ্রেসের সিংহদ্বার পার হইতে না হইতেই সে অশেষ বেদনা সামলাইয়া লইয়া ঘোষণা করিলেন—"খুব হুসিয়ার! যেন শ্রেণী সংঘর্ষ বাধাইয়া বসিও না। তাহা হইলে আমাদের এত সাধের জাতীয় একতা একেবারে পুটু করিয়া ভাজিয়া যাইবে।"...

জিজ্ঞাসা করি, হে বাঙ্গলার তরুণের দল, এই সম্বল লইয়া কি তোমরা মহাশক্তির উদ্বোধন করিবে? আত্মবিক্রয় করিয়া কি তোমরা মুক্তির অধিকারী হইবে? পরপদলেহন করিয়া কি তোমরা অমৃতের আস্বাদ পাইবে?

আমি ক্ষীণ বুদ্ধির দ্বারা যতটুকু বুঝি, তাহাতে মনে হয়—"দাদার জয়" গাহিয়া আপনাদের যৌবন সাফল্যমণ্ডিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।...কাহারও কাছে আত্মবিক্রয় করিবেন না। ভগবান যখন আপনাদের স্বতন্ত্র মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন, কাহারও লেজে বাঁধিয়া এ সংসারে পাঠান নাই, তখন নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাসবান্ হউন। উহাই তারুণ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার একমাত্র পন্থা।

(আনন্দবাজার পত্রিকা) শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

পিতৃযজ্ঞ

'শ্রাদ্ধ' শব্দ স্মৃতি-পুরাণ-গৃহ্যসূত্রে নানা স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব; এবং সেই অর্থ অনুসারে আমাদিগের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধপিণ্ডদানকর্ম্ম শাস্ত্রসঙ্গত কি না তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভগবান মনু পঞ্চ মহাযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিধি দিতেছেন যে, ঐ পাঁচটি যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ প্রতিদিন করিবেন। এই পাঁচটি যজ্ঞের নাম ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ। ঋষিযজ্ঞের অর্থ স্বাধ্যায় অর্থাৎ ঋষি-প্রণীত গ্রন্থপাঠ; ভূতযজ্ঞের অর্থ বলিবৈশ্বদেবকর্ম্ম অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত জীবের উদ্দেশে নৈবেদ্য প্রদান; পিতৃযজ্ঞের অর্থ তর্পণ অথবা "শ্রাদ্ধ"; দেবযজ্ঞের অর্থ যথাবিধি হোম করা; এবং নৃযজ্ঞের অর্থ অতিথিকে অন্নদান। (মনু ৩।৭০, ৮১)। সুতরাং শ্রাদ্ধস্বরূপ পিতৃযজ্ঞ আর্য্যগণের প্রত্যহ কর্ত্তব্য।... ভগবান মনুর মতে উহা নিত্যকর্ত্তব্য। এই কথাই অন্যভাবে বলিলে বলা যায় যে, নিত্যকর্ত্তব্য কোন এক অনুষ্ঠানের নাম শ্রাদ্ধ। আমরা কিন্তু মৃত পিতামাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ বৎসরে একদিন মাত্র করিয়া থাকি; প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করি না।...

মৃতের শোক-মোহে অভিভূত হইয়া অকস্মাৎ মৃতের শ্রাদ্ধ করায় ঋষিগণ অসঙ্গত কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া প্রাচীনকালে দুঃখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মৃতের শ্রাদ্ধ করিয়া তৃপ্তিবোধ করি, নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া লজ্জিত হই না। মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে মৃতের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা বিবৃত হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ভীষ্ম বলিয়াছেন, নিমিরাজা পুত্রশোকে আকুল হইয়া অমাবস্যা তিথিতে মৃত পুত্রের সদ্গতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণভোজন করাইয়াছিলেন এবং পুত্রের নাম-গোত্রাদির উল্লেখ করতঃ পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। তৎপর শোকের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে অনুতাপ করিয়াছিলেন যে "পূর্ব্বকালে মুনিগণ যেরূপ কার্য্য করেন নাই এরূপ কার্য্য আমি কেন করিলাম।"...

তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, শোকের প্রভাবেই তিনি ঈদৃশ অনার্য্য-সেবিত স্বর্গপ্রাপ্তির বিঘ্নকর দুষ্কর্ম্ম করিয়া বসিয়াছেন।

নিমিরাজা প্রথম মৃতকের শ্রাদ্ধ করেন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধ-বিধিকে "নৈমিক শ্রাদ্ধ" বলা হইয়া থাকে। মৃতের দাহ-কার্য্য এবং অন্ত্যেষ্টিকার্য্যকে ষায়ভব বিধি বলা হইয়া থাকে। এই দুই অনুষ্ঠানের দুই পৃথক নাম।

যাঁহারা মৃতকের শ্রাদ্ধ করেন তাঁহারা সকলেই বিশ্বাস করেন যে, শ্রাদ্ধ না করিলে মৃতের আত্মা নরকগামী হয়; এবং করিলে ঐ আত্মা স্বর্গগামী হয়; আর্য্যগণের সর্ব্বশাস্ত্রেই স্বকৃত কর্ম্মফলভোগের উল্লেখ অসংখ্যবার করা হইয়াছে। জীব যেরূপ কর্ম্ম করে তদ্রূপ ফলভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মজন্মান্তর নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে। এ কথা আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছে। এক্ষণে, পুত্র-পৌত্রগণ মৃতের শ্রাদ্ধপিণ্ডদান না করিলে যদি মৃতের নরকপ্রাপ্তি হয়, তবে ঐ মৃত ব্যক্তি, জীবিতকালে নানা সৎকর্ম্ম করিয়া থাকিলেও, স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিল না; বরং অপরের (পুত্র-পৌত্রগণের) অকর্ম্ম-হেতু তাহাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিলেও অপরের শ্রাদ্ধপিণ্ডদান কর্ম্মফলে স্বর্গসুখ ভোগের অধিকারী হইল। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা।...

এই প্রসঙ্গে পুনর্জন্মবাদও বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। আর্য্যশাস্ত্রে পুনর্জন্ম সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। জীবের এই জন্মই প্রথম ও শেষ নহে। মৃত ব্যক্তি স্বীয় সদসৎ কর্ম্মের ফলভোগ নিমিত্ত ভোগদেহ ধারণ করতঃ পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে। এ মতও আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তি যদি কৈবল্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে তাঁহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধপিণ্ডদান সর্ব্বথা নিষ্ফল। কিন্তু দোষগুণে পাপপুণ্যে জড়িত গৃহস্থ ব্যক্তি ত কৈবল্য মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেই হয়। এরূপ স্থলে তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ শ্রাদ্ধ করিলে কি ফল হইতে পারে? যে পুত্র শ্রাদ্ধ করিতেছেন, মনে করুন, তাঁহার পিতার নাম ছিল রামরতন। রামরতন মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার নাম হইয়াছে মহেশচন্দ্র। যে আত্মা স্থূল দেহ ধারণ করিয়া রামরতন বলিয়া পরিচিত ছিল সেই আত্মাই রামরতনের স্থূল দেহ ত্যাগের পর অপর এক স্থূল দেহ ধারণ করতঃ মহেশচন্দ্র নামে পরিচিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় "বাসাংসি জীর্ণানি" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থও তাহাই। রামরতনের পুত্র পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে কিংবা পিতার নামে পিণ্ডদান করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবে কে? মহেশচন্দ্র না কি? শ্রাদ্ধ ত স্থূল দেহের নহে; শ্রাদ্ধ ত আত্মার। রামরতনের আত্মা মহেশচন্দ্রের দেহে বসিয়া হয়ত শ্রাদ্ধ-বাসরে নিষিদ্ধ আহার করিতেছে। সে কি তৎকালে পুত্রের সাত্ত্বিক পিণ্ডপ্রাপ্ত হইবে? সে ত জানেই না যে, সে রামরতন ছিল এবং তাহার রামরতন অবস্থার পুত্র আজি শ্রাদ্ধ করিতেছে। সুতরাং ঐ শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানে তাহার তৃপ্তিলাভ হইবে কেমন করিয়া?

কোন কোন পুরাণে মৃতের শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ এবং কতিপয় স্থানে অপ্রসঙ্গতঃ মৃতের শ্রাদ্ধের কথার উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু দেবীভাগবতে, বিষ্ণুভাগবতে, শিবপুরাণে, আদিপুরাণে, বামনপুরাণে এবং আরও কোন কোন পুরাণে শ্রাদ্ধের উল্লেখ বিন্দুমাত্রও নাই।...

মনুসংহিতায় "পিতৃন শ্রাদ্ধৈঃ" কিংবা "পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্" নির্দেশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রাদ্ধতর্পণ দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করা উচিত। উহাই নিত্যঅনুষ্ঠেয় পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞ।...

পিণ্ডদান। মৃতের পিণ্ডদান একথার অর্থ কি? দাতার স্বত্ব লোপ এবং গৃহীতার স্বত্ব উদ্ভব হইলে দান কহে। পিণ্ডদাতা পিণ্ড দিবার পর তণ্ডুলাদি পিণ্ড পদার্থে তাঁহার যে স্বত্ব ছিল তাহার লোপ হইতে পারে; কিন্তু মৃতব্যক্তির ঐ পদার্থের স্বত্ব উদ্ভব হইবে কি প্রকারে? মৃতের ত কোন পদার্থে স্বত্ব উদ্ভব হইতে পারে না। সুতরাং মৃতের সম্বন্ধে দান শব্দও ব্যবহৃত হইতে পারে না। জীবিত ব্যক্তি-কেই দান করা চলে, মৃতব্যক্তিকে চলে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কোন কোন পুরাণে মৃতের শ্রাদ্ধ করিবার উল্লেখ আছে; কোন কোন পুরাণে নাই। পূর্ব্বে মৃতের শ্রাদ্ধ করা হইত না, পরে হইয়াছে। নিমিরাজার উপাখ্যান হইতেও তাহাই জানা যায়। তবে এ অনুষ্ঠানের মূল কারণ কি?...চীনদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মৃতকের উদ্দেশে নানাবিধ পদার্থ দান করা হইয়া থাকে। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর ভারতবর্ষে আসিয়া বুদ্ধগয়াদি স্থানে মৃতের শ্রাদ্ধতর্পণ করিলে ভারতীয়গণ সেই অনুষ্ঠান অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের ইহাতে অর্থপ্রাপ্তিও ছিল। সুতরাং তাঁহাদিগের চেষ্টায় এ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত প্রচলন হইয়া থাকিবে, ঈদৃশ অনুমান অসঙ্গত হয় না।

অর্থ, লোকে সঞ্চয় করিতে পারিলে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করে না। যে অনুষ্ঠানে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হয় সে অনুষ্ঠান প্রচলন করিতে নিশ্চয়ই বাহিক এবং আন্তরিক কারণের গুরুতর প্রভাব আবশ্যক হইয়াছিল। আন্তরিক কারণ ভক্তি, শোক, মোহ, স্নেহ; এবং বাহিক কারণ, ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিতগণের আধিপত্য এতদ্দেশীয় সমাজে অত্যন্ত অধিক ছিল। সুতরাং মৃতের শ্রাদ্ধপিণ্ডদান অবশ্য কর্তব্য অনুষ্ঠান স্বরূপে প্রচলিত হইবার ঐ উভয়বিধ কারণের অভাব হয় নাই। এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম একসময়ে বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎসহ চীনা-গণের অনুকরণ করাও অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল।...

যাহা হউক মৃতকের শ্রাদ্ধপিণ্ডদান কর্ম্ম অর্বাচীন প্রথা,—সনাতন প্রথা নহে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে।

(ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) শ্রীশশধর রায়

গুজরাট বিদ্যাপীঠ

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

প্রেমমহাবিদ্যালয়ের ছুটি হইল। ঠিক হইল, বারদোলী গিয়া সেখানকার কাজ দেখিব এবং গুজরাট বিদ্যাপীঠ যে প্রেমমহাবিদ্যালয়ের মত একটা গ্রাম্য কর্ম্মী তৈয়ার করিবার ক্লাস খুলিয়াছে তাহা দেখিব, গ্রাম-সংগঠন সম্বন্ধে আজ কয় বৎসর যাবৎ যিনি এত কথা বলিতেছেন সেই মহাত্মা গান্ধীকে দেখিবার জন্য মহাত্মার সবরমতী-আশ্রমে কিছুদিন থাকিব। এই উদ্দেশ্য লইয়া দুইটি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া রওনা হইলাম সবরমতীর উদ্দেশে।

প্রিন্সিপাল সাহেব আগেই বলিয়াছিলেন, আগে না গেলে মহাত্মাজীর সঙ্গে কথা বলিবার সুবিধা হইবে না, কেননা ১১ই জুন তিনি আলমোড়া চলিয়া যাইবেন।

আশ্রমে আসিয়া ৮ই জুন মহাত্মাজীর সহিত গ্রাম-সংগঠন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ হয়। তিনি গ্রাম-সংগঠন সম্বন্ধে বলিলেন যে, তাঁহার গ্রাম-সংগঠনের কথা আজ ভারতবাসীর নিকট প্রতিমাপূজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই গ্রাম-সংগঠন সম্বন্ধে অনেক কথা বলে, অনেকে আবার বড় বড় তালিকাও প্রচার করে, কিন্তু গ্রামে গিয়া কেহ কাজ করিতে রাজি হয় না। লোকে যেমন প্রতিমা পূজা করে তেমনি গ্রাম-সংগঠনকে প্রতিমার মত করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কেহ ইহাকে কাজের মধ্যে রূপ দিতে পারেন নাই। গ্রাম-সংগঠন করিতে হইলে চাই প্রাণের দরদ। প্রাণের দরদ লইয়া যে কর্ম্মক্ষেত্রে না নামিবে, যে গ্রামের ভাই-বোনদের দুঃখ-কষ্টকে না বুঝিবে তাহার পক্ষে কাজ করা খুব সহজ নহে।

গ্রাম-সংগঠন কি ভাবে আরম্ভ করা যায় এবং ইহার জন্য কর্ম্মীদের শিক্ষার আবশ্যকতা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, কর্ম্মীদের শিক্ষার আবশ্যকতা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু যেখানে প্রাণের দরদ আছে সেখানে শিক্ষার তত আবশ্যক হয় না। কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলেই তাহার সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর হইয়া যায়। খদ্দরকে ভিত্তি করিয়া গ্রামে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। বস্ত্রসম্বন্ধে যদি গ্রামগুলিকে স্বাধীন করা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য কাজ ধীরে ধীরে সহজ হইয়া আসিবে। খদ্দরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা (Adult education), স্বাস্থ্য, সামাজিক ব্যাপার, কৃষি প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বাদ দিলে চলিবে না।

বিদ্যাপীঠে যে কর্ম্মী তৈয়ারের জন্য একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে ঐ বিভাগের সমস্ত ভারই প্রায় পারিখ ভাই-এর হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। পারিখ ভাই অনেক দিন বারদোলীতে গ্রাম-সংগঠনের কাজ করিয়াছেন। তারপর গত বারদোলী কমিশনের সময় তিনি ও মহাদেব দেশাই ভাই লোকের পক্ষ হইতে কমিশনকে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তায় কমিশন অনেক সাঁচ্চা সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ

হইয়াছিল। প্রথম প্রথম কমিশন তাঁহাদিগকে সন্দেহের চোখে দেখিত। পরে তাঁহারা অনুপস্থিত থাকিলে কমিশনের কাজও বন্ধ হইত। পারিখ ভাই বারদোলী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এদিক দিয়া বারদোলীর সহিত বিদ্যাপীঠের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বারদোলীতে আজকাল সাত শত পরিবার আছে যাহারা বস্ত্রসম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহারা নিজেরাই ক্ষেতে তুলা উৎপন্ন করে, নিজেরাই তুলা ধুনে, নিজেরাই চরকায় সূতা কাটে, নিজেরাই তাঁতে কাপড় বয়ন করে এবং নিজেরাই মেশিনের সাহায্য না লইয়া হাতে কাপড় সেলাই করিয়া জামা তৈয়ার করে।

বারদোলীতে দুইটি কাজ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম খদ্দরের কাজ। দ্বিতীয় মাদকদ্রব্য-বর্জ্জন। খদ্দর ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই কিছু-না-কিছু উৎপন্ন হয়। কিন্তু সে-সব যায়গায় হয় বাজার হইতে চরকার সূতা খরিদ করা হয়, না হয় মজুরী দিয়া সূতা কাটান হয়। পরে সেই সূতা হইতে খদ্দর তৈয়ারী হয়। কিন্তু বারদোলীতে এইভাবে খদ্দর উৎপন্ন করিবার চেষ্টা তেমন করা হয় না। যাহাতে পরিবারগুলি নিজেদের কাপড় নিজেরাই তৈয়ার করিয়া পরিতে পারে, তাহার চেষ্টা হয়। কর্ম্মীরা এইভাবে গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রচার করে। যে-ভাবে প্রচারকার্য্য চলিতেছে এবং যে-ভাবে কাজের প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মনে হয় অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত বারদোলী-তালুক বস্ত্রে স্বাধীন হইবে এবং মাদকদ্রব্য বারদোলীর তালুকে দেখা যাইবে না।

বিদ্যাপীঠ-স্থাপনা

অসহযোগ আন্দোলন ভাঙনের ফলে স্কুল-কলেজ হইতে বহু যুবকের দল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ গ্রামে গিয়া গ্রাম-সংগঠনে মন দিল, তাহার ফলে ভারতের গৃহে গৃহে অসহযোগের আগুনের ফুলকি গিয়া ছিটকাইয়া পড়িল। একদল যুবক গ্রামে গেল না। তাহারা চায় উচ্চশিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা। নেতারাও দেখিলেন যে, যেমন ভাঙার আবশ্যকতা আছে আবার তেমনি গড়ার আবশ্যকতাও আছে। যদি ভাঙা-গড়ার কাজ এক সঙ্গে না চলে, তবে সে ভাঙার কোনো লাভ নাই। দেশের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য তৈয়ার করিতে হইলে চাই জাতীয় শিক্ষা। যে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ দেশের জন্য, দেশের ভাইবোনদের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে, দেশের নামে সমস্ত দুঃখকষ্ট সাদরে বরণ করিয়া লইয়া আত্মবিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহাই জাতীয় শিক্ষা। এই কথাটা মহাত্মা গান্ধী যখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন, তখন গুজরাট বিদ্যাপীঠের স্থাপনা হইল। সে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। দলে দলে ছেলে আসিয়া গুজরাট বিদ্যাপীঠ ভরিয়া তুলিল।

আমেদাবাদ শহরের নিম্ন দিয়া, গঙ্গার ফল্গুর মত বহিয়া চলিয়াছে সবরমতী নদী। আমেদাবাদ শহরটি মিলে ভর্ত্তি, নানা প্রকার বিলাসদ্রব্যে পূর্ণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার একটানা স্রোত শহরের বুকের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, গোলামীর মায়াজাল শহরের বুকখানা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এমন শহরে ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পারে না। তাই মহাত্মা গান্ধী শহরের আবহাওয়া হইতে দুই মাইল দূরে সবরমতী নদীর অপর তীরে এক অপূর্ব্ব মনোরম প্রান্তরের মধ্যে গড়িয়া তুলিলেন এই বিদ্যামন্দির। বিদ্যাপীঠের দেড় মাইল দূরেই আবার মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আশ্রম।

সত্যাগ্রহ আশ্রমকে কেহ বলে গান্ধীজীর আশ্রম, কেহ বলে উদ্যোগ মন্দির, কেহ বলে সত্যাগ্রহ আশ্রম, সবরমতী আশ্রম, ইত্যাদি; কিন্তু আমি বলিব, ইহা মহামানবের মিলনস্থল। রবিবাবুর বিশ্বভারতী যেমন বিশ্বসভ্যতার মিলনস্থল, সবরমতী আশ্রম আজ তেমনি দুনিয়ার বিশ্বমানবতার মিলন-কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যত ভাবুক আছেন, যত ঋষি আছেন, তাঁহাদের ভাবধারার সহিত মহাত্মাজীর ভাবধারা মিলিত হইয়া, এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে এই আশ্রমে। এই আশ্রমে বাস করার অর্থ জগতের ভাবধারার সহিত পরিচিত হওয়া। এই আশ্রমের প্রভাব বিদ্যাপীঠের উপর অনেকখানি আছে। আশ্রম যে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল কাকা কালেলকার সেই

আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বিদ্যাপীঠকে গঠন করিয়া চলিয়াছেন।

শিক্ষাবিধি

ভারতবর্ষে কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট কলেজ আছে। তবে মাত্র শত-খানেক ছাত্র লইয়া গুজরাট বিদ্যাপীঠ চালাইবার আবশ্যকতা কি? ইহা বুঝিতে পারিলেই ইহার শিক্ষাবিধি বুঝা যাইবে। হাজার হাজার ছেলে প্রতিবৎসর গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া বাহির হয়, আর এখান হইতে প্রতিবৎসর মাত্র ১৫।১৬টি ছাত্র পাশ করিয়া বাহির হয়। মাত্র ১৫টি ছাত্রের জন্য এত বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রতিবৎসর লাখখানেক টাকা খরচ করিবার আবশ্যকতা কি? আবশ্যকতা আছে। মহাত্মা গান্ধী বলেন, যদি প্রতিবৎসর একটি ছেলেও গুজরাট বিদ্যাপীঠ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়া ভারতের জন্য প্রাণ দিতে পারে, দেশের ভাইবোনদের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করিতে পারে, ন্যায়ের জন্য নিজকে বলি দিতে পারে, তাহা হইলেই গুজরাট বিদ্যাপীঠ চালনার সার্থকতা আছে। আজ পর্য্যন্ত যাহারা পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে তাহাদের কেহ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কেহ খদ্দরের কাজ করিয়া ভাইবোনদিগকে মুঠা অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেছে, কেহ অস্পৃশ্য উদ্ধারের জন্য লাগিয়া গিয়াছে, কেহ বারদোলীতে ন্যায়ের সংগ্রামের জন্য লাগিয়া আছে। ইহার উপরে তাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিয়া দশের জন্য, দেশের জন্য কাজ করিতেছে। প্রতি বৎসর এমনি যে দুই-চারটি ছাত্র বিদ্যাপীঠ হইতে বাহির হইতেছে, তাহারা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য বৃহত্তর কেন্দ্র স্থাপন করিয়া গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে স্বাধীনতার আলো পৌঁছাইয়া দিতেছে।

এখানে কলেজে বি-এ অনার্স কোর্সের সমান পড়ান হয়। তবে পড়ানর বিশেষত্ব আছে। এই পড়ার ভিতর দিয়া ছাত্রেরা জগৎ সম্বন্ধে একজন 'সিটিজেনের' যাহা জানা আবশ্যক তাহা জানে। অন্য কোন কলেজের ছাত্রের রাষ্ট্রীয় জ্ঞান হয় কি-না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সাহিত্য শিক্ষার ফলে যাহাতে

বিদ্যাপীঠে মহাত্মাজী

ছেলেরা পঙ্গু না হইয়া যায়, বসিয়া বসিয়া বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি না করে, অর্থাভাবে আত্মহত্যা না করে, তাহার জন্য ব্যাবহারিক শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য শিক্ষণীয়। বিদ্যাপীঠে কলেজ কোর্স পড়ান হয়। তাছাড়া একটা আদর্শ স্কুলও আছে। সম্প্রতি বিদ্যাপীঠ গ্রাম্যকর্মী-শিক্ষাবিভাগ নামে একটি বিভাগ খুলিয়াছে। কোনো এক সদাশয় ব্যক্তি এক লক্ষ টাকা এই বিভাগের জন্য দান করিয়াছেন। এই বিভাগে যাহারা অধ্যয়ন করিবে তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে গ্রামসেবা। দুই বৎসরের কোর্স শেষ করিয়া তাহারা বিদ্যাপীঠের অধীনে থাকিয়াই গ্রাম-সংগঠনের কাজে লাগিয়া যাইবে এবং আবশ্যকতা অনুসারে তাহারা মাসিক ৬০্ টাকা পাইবে। বিদ্যাপীঠ বুঝিতে পারিয়াছে গ্রাম-সংগঠনের কথা কেবল মুখে মুখে বলিলে চলিবে না, প্রকৃত কাজ আরম্ভ করিতে হইবে

গ্রামে। তাই তাহাদের ঐ প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যেই বিদ্যাপীঠের প্রফেসর ও ছাত্র মিলিয়া কয়েকখানা গ্রামের সর্ব্ববিধ 'সার্ভে' করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া গবেষণা-বিভাগও আছে। কয়েকজন পণ্ডিত গবেষণা কাজে লাগিয়া আছেন। জৈন সাহিত্য সম্বন্ধে খুব ভাল গবেষণা চলিতেছে। একজন ভদ্রলোক এইজন্য ২৫,০০০৲ টাকা দিয়াছেন। কলাবিভাগ শান্তিনিকেতনের একজন ছাত্রের দ্বারা পরিচালিত। গান-বাজনাকেও বিদ্যাপীঠ খুব উচ্চস্থান দিয়াছে। সুতাকাটা, কাপড়-বুনান, মিস্ত্রীর কাজ, আসন তৈয়ার করা প্রভৃতির কাজ শিখান হয়। শীঘ্রই কৃষি-বিভাগ খুলিবার চেষ্টা চলিতেছে।

স্কুলে এবং কলেজে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেই পড়ে। অবশ্য মেয়েদের সংখ্যা খুব কম। এখানে জাতিবিচার নাই। সমস্ত জাতির ছাত্রকেই ভর্ত্তি করা হয়।

শৃঙ্খলা

ভারতবাসীর ব্যক্তিগত জীবনে, জাতিগত জীবনে, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে যে জিনিষটির অভাব তাহা এখানে একবার আসিলেই চোখের সাম্‌নে ধরা পড়ে। শৃঙ্খলা জিনিষটাকে আমরা ভারতবাসীরা যেন সম্মান করিতেই জানি না। আমি ভারতের নানা প্রদেশের নানা রকমের প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন শৃঙ্খলা কোথাও দেখি নাই। ছেলেবেলা যখন হাই-স্কুলে পড়িতাম তখন ঠিক ১১টার সময় হাজির না হইলে হয় মাষ্টার-মহাশয়গণ ধম্‌কাইতেন, না হয় দেরীতে আসার জন্য জরিমানা দিতে হইত। কিন্তু সেখানে ব্যাবহারিক শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা শিক্ষা আমার হয় নাই। কেমন করিয়া কাপড় পরিতে হয়, কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কতটা হওয়া আবশ্যক, কোন্ জিনিষ কোথায় রাখিলে ভাল হয় এবং সুন্দর দেখায়, ক্লাসের বেঞ্চগুলি কি ভাবে রাখিলে ঘরের শোভা বৃদ্ধি পায়, বোর্ড কোথায় রাখিলে দেখিতে ভাল লাগে, এসব মাষ্টার-মহাশয়গণ কোনো দিনই শিখান নাই। ঘরের সাম্‌নেই হয়ত কতকগুলি আবর্জ্জনা জমিয়া আছে; ক্লাসের ছেলেরা হয়ত ময়লা কাপড় পরিয়াই আসিয়াছে, ঘরের বেঞ্চগুলি এলোমেলভাবে রহিয়াছে ইহাতে মাষ্টার-মহাশয়গণ কিছু বলিতেন না।

এখানে দেখিতে পাই সব জিনিষগুলি ঠিক উপযুক্ত স্থানে রাখা হইয়াছে, প্রত্যেক জিনিষটিই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে যেন এইমাত্র তৈয়ার করা হইয়াছে। পাটনা হাইকোর্টে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, জজের কামরার পাশেই পানের পিকে বার-লাইব্রেরী যাইবার রাস্তা ভরিয়া আছে। এখানে মাঝে মাঝেই আবর্জ্জনা ফেলিবার সুন্দর বন্দোবস্ত। সবাই যেন এই কাজের জন্য তৈয়ারী। কেহ যদি দেখিল কোথাও এক টুক্‌রা কাগজ পড়িয়া আছে অমনি তাহা উঠাইয়া আবর্জ্জনার চুপ্‌ড়িতে রাখিবে। এই শৃঙ্খলার দ্বিতীয় কারণ, বিদ্যাপীঠের ছাত্র হইতে মাষ্টার অধ্যাপক সবাই ভাবে বিদ্যাপীঠ তাহাদের নিজের জিনিষ, প্রাণের জিনিষ।

ছাত্রাবাস ও আহার

ছাত্রগণ যখন স্কুলে কলেজে পড়ে তখন শিখিতে হইবে কি করিয়া দৈনন্দিন জীবন যাপন করিতে হয়; জীবনটাকে কি করিয়া প্রত্যহ সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সুখময় করিয়া তোলা যায়। আজকাল কোন প্রতিষ্ঠানে এরূপ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা আমার জানা নাই। তবে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এদিকে একটু লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য দেশে এজন্য 'রেসিডেন্‌শিয়াল' শিক্ষার পদ্ধতি আছে। স্কুলে যাহারা পড়িবে তাহাদিগকে বোর্ডিংয়ে থাকিতেই হইবে। 'মন্তেসরি' শিক্ষা এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশে কলেজের সংখ্যা কম নহে। ছেলেরা বোর্ডিংয়ে থাকে। সেই-সব বোর্ডিং বা মেসগুলি শহরের এমন-সব আবর্জ্জনাময় স্থানে যে, তাহার আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিলে স্বাস্থ্য মোটেই ভাল থাকে না। মেসের এদিক-ওদিকে কত নর্দ্দামা যে পড়িয়া থাকে, বোধ হয় মাসে একবারও পরিষ্কার হয় না। ছাত্রেরা যে-ঘরে থাকে তাহা হয়ত চাকরে ঝাঁট না দিলে মাসের মধ্যে একদিন ঝাঁট পড়ে কি-না সন্দেহ। খাওয়ার ঘরের পাশেই নর্দ্দামা। সেখান

হইতে পচা গন্ধ অনবরত আসিতেছে। কাপড়-চোপড় সম্বন্ধেও ঐ কথা। হয়ত স্কুল-কলেজে যাইবার কাপড়-জোড়া একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বিছানার বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর প্রভৃতি ত ময়লায় কাল্‌চিটে হইয়া গিয়াছে।

এখানে দেখিলাম ছেলেদের সুখময় দৈনন্দিন জীবনে কোথায়ও যেন একটু ত্রুটি নাই। সব শৃঙ্খলাময়। দিনগুলি তাহাদের কাজের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া যে চলিয়া যায়, তাহা তাহারা ভাবিয়াই পায় না। তাহাদের এই সুখময় জীবনের কারণ, তাহারা স্বাবলম্বী। পরের ধার ধারে না। ধোপার আবশ্যকতা নাই; নিজেরাই কাপড় কাচে। মেথরের আবশ্যকতা নাই; নিজেরাই পায়খানা পরিষ্কার করে। নিজেরাই কামরা ঝাঁট দেয়, তাই কামরাগুলি অনবরত ঝক্‌ঝক্‌ করে।

প্রিন্সিপাল কাকা কানেলকারের সহিত খাওয়া সম্বন্ধে আলাপ হইল। তিনি অন্যান্য মেসের ও বোর্ডিংএর দোষ দেখাইয়া অনেক কথা বলিলেন। কথায় কথায় রামানন্দবাবুর কথা উঠিল। কানেলকারের ইচ্ছা ছিল রামানন্দবাবু ছেলেদের সহিত বসিয়া আহার করেন; তিনি অল্পক্ষণ বিদ্যাপীঠে ছিলেন বলিয়া তাহা হইয়া উঠে নাই। আমাকে ছেলেদের সহিত আহারের জন্য একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। ছেলেদের সহিত খাইয়া বেশ আরাম পাইলাম। খাওয়ার ঘরে কি শান্তি! যেন সবাই উপাসনায় বসিয়াছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা না বলাই ভাল। কোন জিনিষেরই ত্রুটি ধরিবার উপায় নাই। আর সব চেয়ে এই খাওয়ার ঘরটিই বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চামার মেথর একসঙ্গেই ভোজন করে। বাসন ছেলেরা নিজেই মাজিয়া থাকে। খাওয়ার ঘরের চারিদিকে কোন আবর্জ্জনা নাই। নির্ম্মল বায়ু চারিদিক হইতে সর্ব্বদাই আসিতেছে। আবর্জ্জনা যাহা জমা হয় তাহা মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্তের মধ্যে ঢালিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখা হয়। পরে ইহা ক্ষেতের সারের কাজে লাগে।

গ্রন্থাগার

বিদ্যাপীঠের গ্রন্থাগারটিও বেশ বড়। ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। গবেষণার জন্য গ্রন্থাগার পৃথক করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারটি বেশ সুন্দর। কোন বই-ই আলমারির ভিতর বন্ধ নহে। গ্রন্থাগারে

গুজরাট বিদ্যাপীঠ

প্রবেশ করিয়া যাহার যে বই দেখিবার ইচ্ছা, তাহা দেখিতে পারে। প্রত্যেক আলমারির কাছে চেয়ার বা ইজি-চেয়ার পাতা আছে। গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব ইহার শৃঙ্খলাবিধি। প্রত্যেকখানা বই ঠিক জায়গায় রাখা হইয়াছে। দশমিক পদ্ধতিতে পুস্তকগুলি সাজান হইয়াছে এবং পুস্তকের নম্বর দেওয়া হইয়াছে। আবার বিষয়-হিসাবেও পুস্তকগুলি ভাগ করা আছে।

অন্যান্য ভাষার পুস্তকের তুলনায় বাঙলা ভাষার পুস্তক কম নহে। দুই তিনটি আলমারি ভরা বাঙলা পুস্তক। আর সে-সব মামুলী পুস্তক নহে। যে-সব বই সাধারণ পাঠাগারে পাওয়া যায় না, এখানে সেই-সব মূল্যবান পুস্তক দেখিয়া অবাক হইলাম। রবিবাবুর প্রত্যেক খানা বই-ই আছে। রবিবাবুর পর প্রভাতবাবুর বই-ই বেশী। বাঙলা ভাষায় গবেষণামূলক যে বই বাহির হইয়াছে তাহাও এখানে দেখিলাম। প্রবাসী আপিসের ছাপান বই প্রায় সবই আছে।

এখানকার সবাই বাঙলা ভাষাকে খুব ভালবাসে এবং সম্মানের চোখে দেখিয়া থাকে। এখানকার

একজন গুজরাটি ছাত্র শান্তিনিকেতনে গিয়া বাঙলা শিখিয়া আসিয়াছেন। তিনি এখানে আজকাল অধ্যাপনা করেন। বাঙলার অনেক বই-ই গুজরাটিতে অনুবাদ করা হইয়াছে।

বিদ্যাপীঠ একটা পৃথক পথে চলিবার চেষ্টা করিতেছে। গুজরাটি অক্ষরের বদলে তাহারা দেবনাগরী অক্ষর

মহাত্মা গান্ধী

গুজরাটি ভাষায় ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। দুই-একখানি বইও এইভাবে ছাপান হইয়াছে। বিদ্যাপীঠের নিয়মাবলী গুজরাটি ভাষায়, কিন্তু দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা।

গ্রন্থাগারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, প্রভৃতি বহু পত্রিকা আসে। বাঙলা পত্রিকার মধ্যে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', ও 'স্বাধীনতা' দেখিলাম। বিদেশী পত্রিকাও খুব আছে। ইউরোপের অন্যান্য ভাষার পত্রিকাও দেখিলাম।

চিত্রকলা, সঙ্গীত ও গরবা

মানবের দৈনন্দিন জীবনের ভিতর শিল্প ও সঙ্গীতের আবশ্যকতা আছে। বিদ্যাপীঠ এই জিনিষটি বাদ দেয় নাই। শান্তিনিকেতনের ছাত্র শ্রীযুক্ত কনু দেশাই'র হাতে এই বিভাগের ভার। তিনি বয়সে কাঁচা হইলেও আর্ট সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বেশ পাকা এবং নিজে আর্টের উপাসক ও সৃষ্টিকর্তা। গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে গরবা নামক যে ছবিখানি প্রকাশিত হইয়াছে উহা তাঁহারই অঙ্কিত।

বিদ্যাপীঠে অনেক ছেলে এবং মেয়েই আর্ট ক্লাসে আসে এবং চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে।

মানুষের জীবনে সঙ্গীতের আবশ্যকতা যে কত তাহা ভারতবাসী বহুশত বৎসর পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিল। তাই কোনো ঋষি বলিয়াছিলেন যে, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে গানের মত সাধনা আর দ্বিতীয়টি নাই। হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া যে ভগবানকে লাভ করিতে না পারে সে একটি গানের সুরে ভগবানকে নিজের অন্তরে টানিয়া আনিতে পারে। সঙ্গীতকে বিদ্যাপীঠ খুব বড় করিয়া দেখিয়াছে। ছেলেমেয়েরা এখানে সবাই গানের ক্লাসে যোগ দেয়। বর্ত্তমান সময়োপযোগী গানের এবং বাদ্যের যাবতীয় বন্দোবস্তই বিদ্যাপীঠ করিয়াছে। এই গান-বাজনার জন্য ছেলেমেয়েরা বিদ্যা-পীঠকে সর্ব্বদা জীবন্ত করিয়া রাখে। বাহির হইতে মনে হয় এ যেন স্বপ্নপুরী। দুঃখের ছায়া যেন সেখানে কোন-দিনই ঘনীভূত হইয়া আসে নাই।

বিদ্যাপীঠের মত আশ্রমেও গান-বাজনাকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। আশ্রমের সমস্ত কর্ম্মের ভিতর গান-বাজনার সুর বাজিয়া উঠে তাই আশ্রমের কর্ম্মময় জীবন আরও মধুর, আরও সুখকর বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই মনে হয় আশ্রমের সমস্ত কর্ম্মই চিরনূতন।

আশ্রমের মেয়েরাই গান-বাজনায় বেশী যোগ দিয়া থাকে। গান-বাজনার ভিতর আবার নাচেরও স্থান আছে। এই নাচ থিয়েটারের অঙ্গভঙ্গী নয়, ইহাকে এখানকার লোকে গরবা বলে। এদেশে গরবা বহু প্রাচীন। ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে শোনা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করিয়া যখন দ্বারকায় আসেন তখনই তিনি দ্বারকায় রাসের প্রচলন করেন। গোপীরা রাসের ভিতর শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে বাহিরে অনুভব করিত। এই রাসকেই গুজরাটে গরবা বলিয়া থাকে। দ্বারকা নগর গুজরাট প্রদেশে

অবস্থিত তাই দ্বারকার রাস সমস্ত গুজরাটে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাথিওয়াড়ের মেয়েদের মধ্যেই ইহার বেশী প্রচলন।

আশ্রমে একদিন মেয়েরা গরবা করিল। বেশ সুন্দর। বিশেষ সাজপোষাক কিছুই নাই। সাধারণ বেশে কৃষ্ণবিষয়ক গীত গাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরিয়া তাহারা গরবা করিল। আমি গুজরাটি ভাল জানি না, তাই বুঝিতে কিছু মুস্কিল হইল। কিন্তু ইহা বুঝিলাম সবাই যেন শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের আত্মনিবেদন জানাইতেছে।

এই গরবাতে সকল ঘরের মেয়েরাই যোগ দিয়া থাকে। ছোট, বড়, এমন কি বৃদ্ধারাও ইহাতে যোগ দিতে কসুর করে না। রাস উপলক্ষেই এই গরবা বেশী হইয়া থাকে এবং সমস্ত গুজরাট গরবা গানে কয়দিন মুখরিত হইয়া উঠে, আর সেই কয়দিন গুজরাটের আকাশে বাতাসে এই গরবা গানেরই প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

১৬

নিরঞ্জন কন্যা ও ভগিনীকে লইয়া রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিবার পর দশ বারো দিন কাটিয়া গিয়াছে।

তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাজ জমিয়া উঠিয়াছিল বিস্তর। সে সকলের ব্যবস্থা করিতে নিরঞ্জন এমনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে,এ পর্য্যন্ত মায়া এবং ইন্দু বেশী কোথায়ও যাইতে পায় নাই। তবে বাড়ীর চারিধারেই বেড়াইবার জায়গা এত, যে তাহাদের নিতান্ত ঘরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত না। বিকাল বেলা কখনও মোটরে, কখনও দরোয়ানের সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া, তাহারা লেকের ধারে, রাস্তায় খুব বেড়াইয়া আসিত। মায়ার এ জায়গাটা ভালই লাগিতেছিল, প্রায় পাড়াগাঁয়েরই মত, চারিদিক খোলা, লোকের ভীড় নাই, গোলমাল নাই।

কিন্তু মনে তাহার একটা অশান্তি সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকিত। এখন ক'দিন বাবা ব্যস্ত আছেন বলিয়া মায়ার দিকে বেশী মন দিতে পারেন নাই। তাহারা আপনাদের মতেই চলিয়াছে। কেবল পোষাক-পরিচ্ছদ তাহাকে কিছু বেশী পরিয়া থাকিতে হয়। মখমলের চটিও তাহার জন্য জোড়া দুই তিন আসিয়াছে ঘরে পরিবার জন্য। তা সেগুলো মায়ার পায়ে বড় বেশী থাকে না। নিরঞ্জন যখন ঘরে থাকেন, তখন সে কোন মতে চটি পরিয়া থাকে, তিনি বাহির হইলেই আবার খুলিয়া ফেলে। কিন্তু এর পর কেমন চলিবে, ঠিক নাই।

বাঙালী চাকর একটা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার কাজের মধ্যে মশলা বাটা, গোটাচারেক থালা বাটি মাজা এবং রান্নাঘরের জল লইয়া আসা। বাকি সময় সে ইন্দু এবং মায়ার কাছে তাহার নানাবিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াই দিন কাটাইয়া দিত। রান্না ইন্দু নিজে করিত। নিজের তাহার একবেলা হইলেই চলিত, কিন্তু চাকরটার হাতে খাইতে মায়ার অনিচ্ছা দেখিয়া অগত্যা বিকালেও সে রান্না করিত। মেয়ে এবং বোনের জন্য সহর হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল, মিষ্টান্ন নিরঞ্জন প্রায় রোজই লইয়া আসিতেন। কাজেই জলখাবার আর কিছু বানাইতে হইত না।

এখানে আসিয়া ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যে ইন্দু খুবই খুশি হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিন বলিল, "বউ হতভাগীর অদৃষ্টে ছিল না, তা না হলে রাণীর হালে দিন কাটিয়ে যেত। তা না কোথা এক পাড়াগাঁয়ে অ-চিকিৎসায় একলা পড়ে মরল! তোর কপাল ভাল, সময়-মত এসে পৌঁছেছিস্।"

মায়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন পিসীমা এমন করে বলছ? মা নিজের ধর্ম্ম রেখে গেছেন সেই ভাল, না টাকার লোভে যদি চলে আসতেন সেই ভাল হত?"

ইন্দু দেখিল, জা'ত সাপের বাচ্চা বটে। এই বয়সেই ইহার গলায় সাবিত্রীর সুর বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাকে লইয়াও মেজদাদাকে ভুগিতে না হয়। বেচারার কি চমৎকার কপাল! স্ত্রীকন্যাই মানুষের জীবনের সান্ত্বনাদায়িনী। তাহার বদলে ইহার স্ত্রীকন্যা চিরদিন বোধ হয় হাড় জ্বালাতন করিয়াই রাখিবে।

মুখে বলিল, "আহা, কি বুদ্ধি গো তোমার! স্বামীর ঘরে এসে তাঁর বুঝি আর ধর্ম্ম পালন করা চলত না? হিন্দুর মেয়ের স্বামী-সেবার বড় ধর্ম্ম আবার কি রে? তুইও যেন এই সব বোকামী করে মেজদাকে জ্বালাস্‌নে। বেচারা কোনোদিন ত শান্তি পায়নি। তোকে নিয়ে এসেছে অনেক আশা করে; সে আশায় ছাই দিস্ না।"

মায়া চুপ করিয়া রহিল। গুছাইয়া তর্ক করিবার মত শিক্ষা তাহার হয় নাই, কিন্তু মন তাহার আপত্তিতে মুখর হইয়া উঠিল। মৃতা জননীকে স্মরণ করিয়া তাহার বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কেহই সেই হতভাগিনীকে বোঝে নাই, সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়াছে, অবিচার করিয়াছে। মায়া কখনও তাহা করিবে না। সেই সাবিত্রীর একমাত্র সন্তান, সেই মায়ের স্মৃতি রক্ষা করিবে। কখনও তাহার শিক্ষা, তাহার উপদেশ ভুলিবে না। কোনো প্রলোভনে সে বিচলিত হইবে না।

এমন সময় বাহিরে নিরঞ্জনের মোটরের হর্ণ সজোরে বাজিয়া উঠিল। ইন্দু বলিল, "ওমা, মেজদা এরি মধ্যে এসে গেল! যা, যা, চুল আঁচড়ে, কাপড় ছেড়ে আয়। তোকে এত করে বলি যে এ রকম ভূত সেজে থাকিস্ না, তোর বাপ দেখলে রাগ করে। তা কিছুতে যদি কথা শুনবি। চটি পর গিয়ে যা।"

মায়া তাড়াতাড়ি নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে ছুটিয়া পলাইল। মায়া আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই দুখানি ঘর তাহার জন্য সাজান ছিল। একটি তাহার শয়নকক্ষ, একটি তাহার পড়িবার ঘর। শুইবার ঘরটি পালঙ্ক, কৌচ, কাপড়ের আলমারি, আয়নাওয়ালা দেরাজ, আল্‌না প্রভৃতি দামী দামী আসবাবে সুসজ্জিত। তবে ঘরখানি মায়ার বিশেষ কাজে লাগে না, সে সারাদিন ইন্দুর সঙ্গে সঙ্গে হয় রান্নাঘরে, নয় তাহার শোবার ঘরে কাটাইয়া দেয়। তাহার কাপড়-চোপড় অবশ্য নিজের ঘরে থাকে। কাজেই চুল বাঁধিতে বা কাপড় ছাড়িতে হইলে তাহাকে এ ঘরে আসিতে হইত। ইহার সংলগ্ন একটি স্নানের ঘরও ছিল।

মায়া তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, আয়নার সামনে গিয়া চুলটা পরিষ্কার করিয়া আঁচড়াইয়া লইল। আল্‌নার দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহাতে ফরসা কাপড় একখানাও নাই। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তাহার কিছু কিছু কাপড়-চোপড় তৈয়ারী হইয়াছিল, সেগুলি এখানে আসিয়া ইন্দু আলমারীতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। প্রকাণ্ড আলমারীর এক-তৃতীয়াংশও অবশ্য তাহাতে ভরে নাই। ইন্দু বলিয়াছিল, "থাক, ক্রমে দেখবি এই এক আল্‌মারীতেও কুলবে না। তোর বাবার ত পয়সার অভাব নেই, আর তুই তার একমাত্র মেয়ে। না চাইতেই কত পাবি তার ঠিকানা নেই।"

মায়া বলিল, "মাগো, এত কাপড় নিয়ে আমি করব কি? আমি ত আর কাপড়ের দোকান খুলতে যাচ্ছি না?"

ইন্দু বলিয়াছিল, "আচ্ছা, সে দেখাই যাবে। আজ-কালকার মেয়েদের আমার জানতে বাকি নেই। তুই কালে জয়ন্তীকেও ছাড়িয়ে উঠবি।"

মায়া গিয়া আল্‌মারী খুলিয়া একটা ধোওয়া শাড়ী আর ব্লাউস বাহির করিল। পাড়াগাঁয়ে এত জামাজোড়া তাহাকে কোনোদিনও পরিতে হয় নাই, এখানে সর্ব্বদাই এই সব পরিয়া থাকিতে হয়, তাহার বড় অসুবিধা লাগে। তবে একেবারেই যে ভাল না লাগে, তাহা নয়। হাজার হইলেও সে নারী জাতি, এবং বয়স অল্প। সাজ-সজ্জার প্রলোভন খানিকটা তাহার ছিলই। সাবিত্রীর কঠিন শাসনে এ সব ভাব অবশ্য কোনোদিন প্রশ্রয় পায় নাই। মোটা কাপড়েই তাহার দিন কাটিয়াছে। এখানে এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া, তাহার আনন্দ এবং

গর্ব্ব খুবই হইত, ইচ্ছা করিত নিজের পল্লীবাসিনীদের সব ডাকিয়া দেখায়। তবে সদাসর্ব্বদা ধড়া-চূড়া আঁটা আর জুতা পায়ে দেওয়ার উৎপাতে, এ আনন্দটা মাঝে মাঝে ম্লান হইয়া যাইত।

কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া, চটি পায়ে দিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। নিরঞ্জন তখন কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছেন। আগে তিনি নীচেই শয়ন করিতেন, এখন কন্যা এবং ভগিনী আসাতে দোতালায় শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নইলে অত বড় বাড়ীর দোতলায় শুধু দুটি স্ত্রীলোক, তাহারা ভয় পায়।

নিরঞ্জনের 'বয়' টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইতেছে, দেখিয়া মায়া ইন্দুর রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দু তখন বঁটি লইয়া তরকারী কুটিতে বসিয়াছে। মায়া বলিল, "তুমি যে পিঠে করেছিলে তার কিছু বাবাকে দাও না, পিসীমা। রোজ রোজ কি ঐ ছাইপাশগুলো খান, ঘরের তৈরি জিনিষ কোনো দিন ত খান না ?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তবু ভাল যে বাপের কথা একটু মনে হয়েছে। ঐ যে ঐখানে ঢাকা রয়েছে, রেকাবীতে করে খান-চার নিয়ে যা।"

মায়া ছোট 'মীটসেফ'টি খুলিয়া কাঁসার রেকাবীতে পিঠা বাহির করিয়া সাজাইল। তাহার পর বলিল, "মিষ্টিও ত এক গাদা জমে গেছে পিসীমা, এত যে কেন বাবা নিয়ে আসেন, তার ঠিক নেই। আমরা যেন রাক্কোস! এর থেকে কিছু দেব? কালকের সন্দেশগুলো বেশ ভাল ছিল।"

বাপের যত্নের দিকে মায়ার মন গিয়াছে দেখিয়া ইন্দু অত্যন্ত খুশি হইল। এই বিষয়ে তাহার একটা দুশ্চিন্তা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মায়ার যে রকম মাতৃভক্তি, সে কি কখনও বাপের দিকে ভিড়িবে? মৃতা সাবিত্রীই এখন পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া আছে যেন।

মায়ার কথার উত্তরে বলিল, "দিগে যা না, যা যা ইচ্ছে। নিজে হাতে করে নিয়ে যা, খেতে বল, তা না হলে মেজদা সব একপাশে ঠেলে রেখে দেবে। কাছে বসে খাইয়ে আয়।"

মায়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "তাহলে তুমিও এস পিসীমা, একলা আমার বাবার কাছে যেতে কেমন এক রকম লাগে।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "মেয়ে যেন সং! বাপের কাছে যাবি, তার আবার কেমন একরকম কি লাগবে রে? যা, যা, নইলে ওর চা খাওয়া হয়ে যাবে। ঐ শোন সিঁড়ি দিয়ে নামছে। আমি এই ঝোলের তরকারিটা কুটে নিয়েই যাচ্ছি।"

অগত্যা মায়াকে একলাই যাইতে হইল। নিরঞ্জন ততক্ষণ আসিয়া টেবিলে বসিয়াছেন। পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন। মায়াকে দেখিয়া বলিলেন, "কি মায়া যে, এস, এস, বোসো ঐ চেয়ারটায়।"

মায়া আস্তে আস্তে আসিয়া মিষ্টান্নপূর্ণ রেকাবীখানা টেবিলের উপর রাখিল। নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "এত সব কার জন্যে নিয়ে এলে?"

মায়া কোন মতে বলিল, "আপনার জন্যে নিয়ে এলাম। এগুলো পিসীমা নিজে করেছেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা হলে ত খেতেই হবে। কিন্তু এত মিষ্টি নিয়ে এলে কেন? নিজেরা কিছুই খাও না নাকি? সব জমা করে রেখেছ আমার জন্যে?"

মায়া যে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। পিসীমার কাছে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকিয়া যাইত, কিন্তু বাপের কাছে দুইটার বেশী তিনটা কথা বলিতে হইলেই তাহার হইত, মহা বিপদ। বাবা যে তাহাকে অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে মনে করিবেন, এই ভাবনাতেই তাহার মুখ আরো বন্ধ হইয়া যাইত। তবু উত্তর না দিলেই বা তিনি কি ভাবিবেন? সুতরাং কোন মতে সে বলিয়া ফেলিল, "আরো যে ঢের রয়েছে, আপনি অনেক বেশী নিয়ে এসেছিলেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই নাকি? আচ্ছা কাল আর মিষ্টি আনব না তাহলে। তোমাদের কি দরকার, কিছু ত আমায় বল না, আমি আন্দাজমত যা তা নিয়ে আসি। কাল যাবার সময়, কি কি আনতে হবে, সব আমায় বলে দিও।"

নিরঞ্জন নিজের খাবার ফেলিয়া মায়ার আনীত

খাবারেই জলযোগ সারিয়া ফেলিলেন। এমন সময় ইন্দু তরকারী-কোটার কাজ সারিয়া আসিয়া বসিল। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে সেও ইহাদের কথা খানিক খানিক শুনিতে পাইয়াছিল। বলিল, "সত্যি, মেজদা, রোজ এত এত ফল মিষ্টি আন কেন? নিজে ত একটুকরো কিছু মুখে দাও না, আমরা কি আর এত খেতে পারি?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "তোরা ত কিছু বলিস না, তাই এরকম হয়। কাল থেকে বলে দিস্। নগেনবাবুর স্ত্রী তোদের একদিন নিয়ে যেতে বলছিলেন, তাঁর ছোট ছেলেটির অসুখ তাই আস্‌তে পারেন না। কাল যাবি ত চল না?"

ইন্দু বলিল, "তুমি ত সেই নটায় বেরিয়ে যাও, তত সকালে কি আর আমাদের হয়ে উঠ্‌বে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমার সঙ্গে যাবার কি দরকার? বেলা এগারোটা বারোটায়, নাওয়া খাওয়া সেরে যাস্। আমি ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দেব। মায়ার গাড়ী ত শুধু শুধু পড়ে রয়েছে, সন্ধ্যাবেলা আধঘণ্টা ঘোরা ছাড়া কোনোই কাজে লাগে না।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "কোথায় আর আমরা একলা একলা ঘুরব বল? কাউকে ত এখানে চিনিও না। নইলে এর বাড়ী ওর বাড়ী ঘোরা যেত। সহর দেখে বেড়াতে হলেও সঙ্গে একজন্ লোক চাই।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা এক কাজ কর, নগেনবাবুর স্ত্রীকে তোদের গাইড কর। ভদ্রমহিলার বেড়াবার সখ খুব, অথচ গাড়ী পান না বলে ঘুরতে পারেন না। মায়ার গাড়ী নিয়ে একদিন তোরা সারাদিন ঘুরে আয়। আমি ড্রাইভারকে রেখে যাব, সেদিনকার মত নিজেই চালিয়ে নেব। রেঙ্গুনে এলি, সব দেখা ত উচিত। বাড়ীতে বসে বসে তোদের ভালও লাগে না বোধ হয়।"

ইন্দু বলিল, "তা বেশ। নগেনবাবুর স্ত্রী যান ত ভালই, কাল তাঁর সঙ্গে গিয়ে দিন ঠিক করা যাবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "হ্যাঁ, এই বেলা বেড়িয়ে টেড়িয়ে নাও। সামনের মাস থেকে মায়ার পড়াশোনা আরম্ভ করব ভাব্‌ছি, তখন রবিবার ছাড়া ত বেড়াবার সুবিধা হবে না।"

মায়ার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এইবারই তাহার আসল পরীক্ষার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে। বাবা নিশ্চয়ই তাহাকে বিলাতী মেয়ের মত শিক্ষা দিতেই চাহিবেন। শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী সব কে কেমন হইবে ঠিকানা নাই। সাবিত্রীর আত্মা পরলোকে নিশ্চয়ই কষ্ট পাইবে। কিন্তু বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে দাঁড়াইবে কি করিয়া? আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায়ই যেন মায়ার মুখ শুখাইয়া উঠিল।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "ওকে কি ইস্কুলে দেবে, না বাড়ীতে পড়াবে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "প্রথম প্রথম বাড়ীতেই পড়াতে হবে বই কি। অনেক বড় হয়ে গেছে, অথচ বাংলা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ত শেখেনি স্কুলে দিতে হলে নেহাৎ নীচের ক্লাসে দিতে হবে। একেবারে ছোট ছোট মেয়ের সঙ্গে পড়তে ওর ভাল লাগবে না, লজ্জা করবে। তার চেয়ে কিছুদিন ঘরে পড়ে খানিকটা শিখে নিক, তারপর দরকার হয়ত স্কুলে দেব।"

সেদিন আর এ বিষয়ে কিছু কথা হইল না। নিরঞ্জন বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দু গেল নিজের রান্নাবান্না সারিয়া ফেলিতে। মায়া রান্নাঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ইহার পর জীবনের গতি তাহার যাইবে কোন্ মুখে? সে কি একেবারে অন্য মানুষ হইয়া দাঁড়াইবে? মায়ের শিক্ষা, মায়ের আদর্শ কিছুই কি তাহার মনে থাকিবে না?

আরও একটা কথা থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে বিদ্যুৎচমকের মত খেলিয়া যাইত। সে তাহার নিজের বিবাহের কথা। দেশে থাকিতে মা যে তাহার বিবাহের সব জোগাড় করিতেছিলেন, তাহা সে জানিত। এবং কাহার সঙ্গে যে সেই বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে, তাহাও জানিতে কাহারও বিশেষ বাকি ছিল না। সাবিত্রী যদিও কথা লুকাইতে খুবই চেষ্টা করিয়াছিল, তবু পীড়িত থাকার জন্য বিশেষ সক্ষম হয় নাই। প্রভাসের মাতার বার বার তাহার কাছে আসা, দুজনের গোপন পরামর্শ, ইহাতেই সকলের সন্দেহ হইয়াছিল। কাজেই সঙ্গিনীরা

এই লইয়া মায়াকে মাঝে মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে ঠাট্টা করিতেও ছাড়ে নাই।

প্রভাসের সঙ্গে বিবাহ হইলে সে কি খুশি হইত? হইতই বোধ হয়। বেশ ছেলে প্রভাস-দা। কিন্তু হিন্দুর মেয়ের এসব কথা ভাবিতে নাই বলিয়া মায়া তাড়াতাড়ি মন অন্য দিকে ফিরাইয়া লইত।

এখন সে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িল। প্রভাসের সঙ্গে এ জন্মে আর তাহার দেখাও হইবে না বোধ হয়। তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া বাবা কাহার হাতে দিবেন কে জানে? নিজের অজ্ঞাতেই যেন মায়ার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

(১৭)

পরদিন নিরঞ্জন যথাসময়েই সহরে চলিয়া গেলেন, মোটর-চালকটিকে রাখিয়া গেলেন ইন্দু এবং মায়াকে লইয়া যাইবার জন্য। ইন্দু একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, "এ লোকটার সঙ্গে একলাই যাব? কোনো ভয় নেই ত?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "কিছু না। ও অনেক দিনের পুরনো লোক। আর এর পর নিজেদের সামলাতে একটু একটু করে শেখ্ তোরা? দেখ্-দেখি বর্ম্মা মেয়ে-গুলো কেমন স্বাধীন, পুরুষমানুষের ধারই ধারে না। যেখানে খুশি একলা যায়, কাজকর্ম্ম, ব্যবসা, চাকরী কিছু এদের আটকায় না। এদের পুরুষরাই বরং কত জায়গায় এদের মুখ চেয়ে থাকে।"

ইন্দু বলিল, "তা আমাদের যেমন শিখিয়েছ, তেমনি হয়েছি। বাঙালীর মেয়ে এক পা এগোতে চাইলে অমনি দশ দিক থেকে তার পিঠে দশ ঝাঁটা পড়ে। কাজে কাজেই এমনি স্বভাব হয়েছে। আজন্ম যার পায়ে শেকল, তাকে হটাৎ শেকল কেটে দিলেই কি সে উড়ে যেতে পারে? উড়তে শিখতেও সময় লাগে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা ঠিক। উড়বার শিক্ষাটা এখান থেকেই করে যা, এখানে জায়গাও যথেষ্ট, বাধা দেবারও কেউ নেই।"

তিনি চলিয়া যাইবার পর, তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না ইন্দু শেষ করিয়া ফেলিল। মায়াকেও তাড়া দিয়া শীঘ্র স্নানাহার সব করাইয়া লইল। তাহার পর বলিল, "একটু ভাল করে চুল বেঁধে কাপড়-চোপর পর দিখি! ওদের মেয়েটি কেমন ফিট্‌ফাট্ হয়ে থাকে, তুই যেন ভূত সেজে থাস্‌নে। তোর গলার সে হারটা কি হল রে?"

মায়া বলিল, "বাক্সে আছে। আমি ত ওদের মত করে কাপড় পরতে জানি না, যদি ওরা দেখে হাসে?"

ইন্দু বলিল, "দেশে যেমন করে পর্‌তিস্, তাই পর। তারপর ওখানে গিয়ে বাণীকে না হয় বলে ঠিক করে পরিয়ে দেব।"

মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না পিসীমা, বাণীকে তুমি কিছু বোলো না, ওরা তাহলে মনে মনে নিশ্চয় হাস্‌বে। আজ আমি ওদের কাপড় পরা বেশ ভাল করে দেখে আস্‌ব, এর পর নিজেই পরতে পারব।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা। বেশ ভাল কাপড় একখানা পরগে যা। মেজদা যে জরি-দেওয়া নাগ্‌রা জুতো এনে দিয়েছে, সেইটা পায়ে দিস্, আর হারটাও বার করে গলায় দিস্। তোর মায়ের গহনার বাক্স থেকে একটা নেক্‌লেস বার করে দেব?"

মায়ার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "না পিসীমা, ও সব গহনা আমি পরব না।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তবে কে পরবে? তোর জন্যেই রেখে গেছে। তোর বিয়েয় দেবে বলে নিজে কোনোদিন একখানা গায়ে দেয়নি।"

বিবাহের নামে মায়ার গালের কাছটা অল্প একটু লাল হইয়া উঠিল। সে আর কিছু না বলিয়া কাপড় পরিবার জন্য নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

একখানা দামী মান্দ্রাজী শাড়ী এবং সেই রং-এর রেশমের ব্লাউস্ তাহার পছন্দ হইল। তাহাই যথাসম্ভব পরিপাটি করিয়া পরিল। চুলটাকেও বাণীর মত করিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিল, নিতান্ত মন্দ হইল না। কন্যার ব্যবহারের জন্য ক্রীম্, স্নো, পাউডার, এসেন্স কিছুই কিনিয়া আনিতে মায়ার বাবা ত্রুটি করেন নাই। সে-গুলা এতকাল আয়নার দেরাজের মধ্যে জমা হইয়াছিল, আজ কিছু কিছু বাহির হইল।

সাজগোজ শেষ করিয়া পিসীর সামনে আসিতেই ইন্দু তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া বলিল, "ওমা, এ যে একেবারে চেনা যাচ্ছে না। ঠিক যেন রাজকন্তা !"

মায়া লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "যাও পিসীমা, কি যে বল, তার ঠিক নেই। তোমার হয়েছে ত চল।"

ইন্দু বলিল, "আমার হতে আর কতক্ষণ, চাদরটা নিয়ে এলেই হয়। আমি আস্‌ছি, তুই ড্রাইভারকে গাড়ী ঠিক করতে বল।"

ড্রাইভার মুসলমান, তাহার সঙ্গে হিন্দী বা ইংরেজী না বলিলে সে বুঝে না। কোনোটাই মায়ার আসে না। কাজেই সে নিজেদের বাঙালী ভৃত্য নিকুঞ্জকে দিয়া ড্রাইভারকে গাড়ী ঠিক করিতে বলিয়া পাঠাইল। গাড়ী ঠিকই ছিল। হুকুম পাইবামাত্র চালক গাড়ী লইয়া সিঁড়ির সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিজের গরদের চাদর এবং মশলার কৌটা লইয়া ইন্দু আসিয়া হাজির হইল। ড্রাইভারকে নিজের স্বরচিত হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুম্ নগেনবাবুর বাড়ী জান্‌তা ত ?"

ড্রাইভার গম্ভীরভাবে উত্তর দিল,"হাঁ, জান্‌তা, আম্মা।"

মায়া অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিল, "পিসীমা, দোহাই তোমার, তুমি হিন্দী বল্‌তে যেয়ো না। যা চমৎকার হয় !"

ইন্দু বলিল, "হোক্ গে চমৎকার। বুঝতে ত পারে, তা হলেই হল। জানি না বলে কি চিরকাল মুখ বুজে থাকব্ ?"

তাহাদের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সহরে পৌছিতে লাগিল প্রায় আধ ঘণ্টা। প্রকাণ্ড এক বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইতেই, ইন্দু বলিল, "ও বাবা, বাড়ী ত কম নয় দেখি ! মেজদার বাড়ীর চেয়েও ত ঢের বড় !"

মায়া বলিল, "আহা পিসীমা, তুমি যেন কি ! সব বাড়ীটাতেই ওরা থাকে নাকি ? শুনলে না সীমারে বাণীর মা বললেন, এক বাড়ীতে ছত্রিশ জাত তাঁদের থাকতে হয় ? এরই মধ্যে কোনো একটা দিকে তাঁরা থাকেন।"

ইন্দু বলিল, "তাও ত বটে। এখন কোথা দিয়ে ঢুকতে হবে, তাও ত বুঝতে পারছি না।"

সৌভাগ্যক্রমে নগেনবাবুর ছেলে মন্টুকে ফুটপাথেই পাওয়া গেল। সে তাঁহাদের উপর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া গেল।"

ভিতরে ঢুকিবামাত্র বাণী আসিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া চলিল। বলিল, "মা খোকার জন্যে খাবার তৈরি করছেন, তিনি এখুনি এলেন বলে। আপনারা বসুন।" মায়ার সাজসজ্জার উন্নতিটা সে এক দৃষ্টিতেই দেখিয়া লইল।

ফ্ল্যাটটি খুব বড় নয়, রান্নাঘর প্রভৃতি বাদ দিলে, তিনটি মাত্র ঘর। সামনের ঘরটি বসিবার ঘররূপে ব্যবহৃত হয়, আবার ছেলেরা পড়াশুনাও এখানেই করে। কোণে একটা বড় টেবিলে তাহাদের বই খাতা প্রভৃতি সাজানো। ভিতরের ঘরটিতেই শোওয়া, কাপড় ছাড়া জিনিষপত্র রাখা, সব কিছুর ব্যবস্থা। একটি ঘরে বেশ আলো আসে, আর একটি কিছু অন্ধকার। স্থানের তুলনায় আসবাবপত্র কিছু বেশী। বড় শোবার ঘরটিতে এখন রোগীর আড্ডা। গৃহিণী সেইখান হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি এখুনি যাচ্ছি দিদি, আপনারা বসুন।"

ইন্দু বলিল, "ভারি ত সব মেমসাহেব আমরা, তাই বাইরের ঘরে বসে থাকব। আমরাও আপনার ওখানে বসি না ?"

তাহারাও ভিতরে গিয়া বসিল। বাণী বলিল, "চল ভাই, আমরা বাইরেই বসি, মায়া এখানে গল্প করুন," বলিয়া সে মায়াকে বাহিরের ঘরে আবার টানিয়া লইয়া আসিল।

একটা সোফায় দুজনে পাশাপাশি বসিল। মায়ার হাত ধরিয়া বাণী বলিল, "আজ তোমায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রথম প্রথম বড় সাদাসিদে হয়ে থাকতে। অবিশ্যি তখন তোমার সাজবার সময়ও ছিল না।"

মায়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। বাণী জিজ্ঞাসা করিল, "পড়াশুনো আরম্ভ করেছ নাকি ?"

মায়া বলিল, "না, এই ক'টা দিন গেলে, পরের মাস থেকে আরম্ভ করতে হবে বাবা বলেছেন।"

বাণী বলিল, "স্কুলে তুমি নিশ্চয়ই যাবে না, নয়? বাড়ীতেই সব শিখবে। তোমার বাবার ত আর টাকার ভাবনা নেই, একটার বদলে দশটা টীচার তিনি বাড়ীতেই রাখতে পারেন। আচ্ছা, আজ যে গাড়ীটাতে তোমরা এলে, ওটাই তোমার গাড়ী বুঝি? এটা ত দেখছি, বেশ নূতন 'গ্রাহাম্ পেজ্' তোমার বাবা যেটা নিয়ে বেড়ান সেটা ত 'ওভারল্যাণ্ড হুইপেট্'।"

মায়া কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া বলিল, "তা ত জানি না ভাই, গাড়ীগুলোর আবার নাম থাকে নাকি?"

বাণী বিজ্ঞভাবে বলিল, "ওমা, তা থাকে না আবার। কত রকম রকম গাড়ী আছে। একটু লক্ষ্য করলেই চেহারা দেখলেই কোনটা কি বোঝা যায়।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবার কি গাড়ী।"

বাণী তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "কোন্ কালের পুরনো এক পচা 'ফোর্ড'। বাবার ওসব দিকে খেয়ালই নেই; বলেন কোন মতে টেনে নিয়ে বেড়ালেই হল, নামে কি এসে যায়।"

বাণীর মা এমন সময় ইন্দুকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। মেয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আহা, মেয়ের যা কথা! খেয়াল থাকলেও বিনা পয়সায় ত আর 'রোল্‌স্ রয়েস্' পাওয়া যাবে না?"

ইন্দু এবং মায়া এই কথা-কাটাকাটির বিশেষ কিছু বুঝিল না। ইন্দু বলিল, "কিন্তু কবে আমাদের নিয়ে বেরবেন, তা ত কিছু বল্‌লেন না?"

বাণীর মা বলিলেন, "এই ক'টা দিন যাক ভাই, ছোট ছেলেটা ভাল করে না সারলে, তাকে রেখে যেতে পারব না। কান্নাকাটি করে অনর্থ করবে।"

ইন্দু বলিল, "তা ঠিক। কিন্তু সামনের মাস থেকে আবার মায়ার পড়া আরম্ভ হবে। তখন ত অত ঘুরবার সুবিধা হবে না?"

বাণীর মা বলিলেন, "তা হোক্ না, ছুটির দিন ঘোরা যাবে। তাহলে বাণীও যেতে পারবে।"

ইন্দু বলিল, "সেই ভাল। ছেলেপিলে রেখে গিয়ে কোনো সুখ নেই। তবে সেই কথাই ঠিক রইল। আস্‌চে রবিবারের পরের রবিবারে।"

(ক্রমশঃ)

রামমোহন

শ্রীসুকুমার সরকার

বিধর্ম্মীর ব্যর্থানুকরণে ভ্রান্তপ্রায় দেশ পথহারা
অকল্যাণ-তমিস্রে পায়নি কল্যাণের জ্যোতির্ম্ময় ধারা।
কুসংস্কারে শয়ন বিছায়ে জীর্ণ শীর্ণ সুপ্তি-ভোলা আঁখি
দৈন্য তবু তারি গর্ব্ব লয়ে পরেছিল অক্ষমের রাখী;
জগতের জীবন-উৎসবে যবে তার প্রাণহীন প্রাণ
লজ্জায় এসেছে ফিরে ফিরে পারেনি করিতে কিছু দান!
কর্ম্ম ছিল শাস্ত্রের দোহাই নিষ্প্রাণের পূজা ধর্ম্ম তার
জ্ঞান ছিল কূপমণ্ডূকতা, প্রেম নামে ঘৃণ্য ব্যভিচার;
সেদিন কি দেশমাতৃকার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের বেদনা
কর্ণে তব বয়েছে বাতাস দিয়ে প্রাণে কারুণ্য-চেতনা!
তাই এলে নন্দন তেয়াগী সমব্যথী কোমল নির্ম্মম
জন্ম নিলে বঙ্গভূমি-ক্রোড়ে সদ্যঃ ফোটা কুসুমেরি সম!

শৈশব ও কৈশোরেরে তুমি অতিক্রমি যৌবনের দিনে
প্রবেশিলে; কিন্তু নহে কভু বাসনার
সম্ভোগ-বিপিনে!
বাণী তব বাজিল না কভু লীলায়িত সঙ্গীতের সুরে
সে বাজিল ঝঞ্ঝা-ভৈরবীতে জীবনের মৌন অন্তঃপুরে।
সর্ব্বশাস্ত্র-জলধি মন্থিয়া তুলিলে যে ব্রহ্মনাম-মণি
স্পর্শে তার সোনা হোলো সব, মন্ত্রে তার উঠিল রণনি
প্রাণে প্রাণে ধর্ম্মানুপ্রাণতা, নহে আর অন্ধানুকরণ
বিবেকের দিগ্‌বিজয়ী বাণী উৎসারিল
ধার্ম্মিকের মন!
মন্ত্রস্রষ্টা মন্ত্রদ্রষ্টা তুমি অভিনব সাম্যের দেবতা
পুণ্যস্মৃতি-মন্দির-অঙ্গনে লহ অর্ঘ্য অন্তরের কথা!

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১) সুমাত্রা

মঙ্গলবার ১৬ই আগষ্ট ১৯২৭।—

বিকালে পিনাঙ থেকে সুমাত্রার জন্ত Kuala 'কুআলা' জাহাজে রওনা হওয়া গেল। কাল সকালে সুমাত্রার Belawan বেলাওয়ান বন্দরে পঁউছুবো। সেখানে ওলন্দাজ জাহাজে ক'রে কাল বিকালেই যবদ্বীপ-যাত্রা। সুমাত্রায় ঘণ্টাকতকের জন্ত মাত্র আমাদের অবস্থান ঘ'টবে। "সুমাত্রায় দশ ঘণ্টা"—মার্কিন ভবঘুরে'র উপযুক্ত দেশ-দর্শন বটে!—সুমাত্রাদ্বীপ আকারে আমাদের বাঙলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ।

'কুআলা' জাহাজখানি ছোট্ট। আমাদের পাড়ীও ছোটো। পিনাঙ আর বেলাওয়ান, সুমাত্রা প্রণালীর এপার-ওপার মাত্র, ষ্টীমারে ঘণ্টা ১৫।১৬র পথ। জাহাজে অন্ত যাত্রী বেশী নেই। প্রথম শ্রেণীতে আমরা চার জন, আর জন তিন চার ইউরোপীয়, আর দুটি ছেলে, একটি চীনে একটি শিখ। চীনে ছেলেটি এসে তার হস্তাক্ষর সংগ্রহের বইয়ে কবির হস্তাক্ষর লিখিয়ে নিয়ে গেল। এর আত্মীয়েরা সুমাত্রায় থাকে, পিনাঙ-এ ইস্কুলে পড়াশুনো করে, ছুটি হ'য়েছে, বাপ মার কাছে যাচ্ছে। শিখ ছেলেটির জন্ম এই ষ্ট্রেট্‌স্‌-এ, ভারতবর্ষে কখনও যায় নি, এ-ও পিনাঙ-এ ইস্কুলে পড়ে, এর বাপ আছেন সুমাত্রার Brastagi ব্রাস্তাগী ব'লে একটি পাহাড়ে শহরে, সেখানে বোধ হয় কোনও ঠিকাদারী কাজ নিয়ে গিয়েছেন, বাপের কাছে যাচ্ছে। ছেলেটির মাথায় লম্বা চুল, প্রকাণ্ড পাগড়ী, হাতে লোহার কড়া—ভারতের শিখদের পরিচ্ছদের সব বৈশিষ্ট্য তার আছে। ভারতবর্ষে যাবার তার ইচ্ছে হয় খুব, কিন্তু বাপ মা ভাই বোন্ সকলেই এ দেশে আছে, কবে যে যাওয়া হবে ব'লতে পারে না। সে জুনিয়র-কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষা দেবে।

সেকেণ্ডক্লাস আর ডেক প্যাসেঞ্জারদের স্থানটাও ঘুরে এলুম। সেখানে বেশী যাত্রী নেই। জন কতক চীনা, দুচার জন মালাই, আর কিছু ভারতীয়—হিন্দুস্থানী মুসলমান, গুজরাটী বোরা। একটি তামিল ছোকরা এসে নমস্কার ক'রলে। মুখ খানা চেনা ব'লে বোধ হ'ল। পরিচয় দিলে, নাম হ'চ্ছে কি-যেন আয়্যার; পিনাঙ-এ ফোটো-গ্রাফারের কাজ করে, ক'দিন আমাদের সঙ্গে পিনাঙ-এ ঘুরেছে, কবির কতকগুলি ছবিও তুলেছে, আর এই ছবি আশাতীত ভাবে বিক্রীও ক'রতে পেরেছে। আমাদের সঙ্গে চ'লেছে বেলাওয়ান আর মেদান-এ, সঙ্গে তার তোলা ছবি কিছু নিয়ে যাচ্ছে, আশা করে কবির শুভাগমনের ফলে তাঁর ছবিরও কিছু চাহিদা হবে। কালকেই আবার পিনাঙ ফিরবে। ডেকেই যাচ্ছে। ফরসা পাতলা চেহারার ছোকরা, তামিল-ব্রাহ্মণ-সুলভ বুদ্ধিমণ্ডিত মুখশ্রী। তার যাত্রার সাফল্য কামনা ক'রলুম।

জাহাজের খালাসীরা মালাই-জাতীয়, চাকর-বাকর চীনা।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ডেকের রেলিং ধ'রে একটু সাগরের প্রশান্ত সান্ধ্য মূর্ত্তি দেখা গেল। মনে মনে নানারকমের ভাবের উদয় হ'তে লাগ্‌ল। হাজার বারো-শো বছর পূর্ব্বে, এই সাগর দিয়ে ভারতবাসীদের চালিত কত জাহাজ—বাঙলা দেশের কত 'বোহিত' আর 'নাওড়ী', গুজরাটের কত 'কোটিয়া' আর 'নৌরী', আর দক্ষিণ-ভারতের কত 'কপ্পল্, সংগাত, তোণী, কূল্ল' আর 'পডও'—যাওয়া আসা ক'রেছে। মালাই, ভারতীয়, চীনা, আরব, আর পরে পোর্ত্তুগীস, ডচ, ইংরেজ—এ কয় জা'তের সম্মেলন স্থান এই সমস্ত উপকূল। হাজার বছর পূর্ব্বে এ সমস্ত দেশ ভারতেরই এক অংশ ব'লে পরিগণিত হ'ত। এই সুবর্ণদ্বীপ বা সুমাত্রার শ্রীবিজয় বা শ্রীবিষয় রাজ্য এক সময়ে কত উচ্চ গৌরবেই না মণ্ডিত

হ'য়েছিল! এখানকার শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজারা যবদ্বীপ মালয় দক্ষিণ শ্যাম পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রেছিলেন; আর ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের এক অদ্বিতীয় কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিল এই দেশ—আর বৌদ্ধ শাস্ত্রের চর্চ্চা ক'রতে এখানে কেবলমাত্র I tsing ঈ-ৎসিঙ্-এর মতন চীনা বিদ্যার্থী বা ভিক্ষুরা যে আসতেন, তা নয়, এখানে খাস ভারতবর্ষ থেকেও ছেলেরা আসত শাস্ত্রাধ্যয়ন ক'রতে; বাঙালীর গৌরব দীপঙ্কর অতীশ এই সুবর্ণদ্বীপেই এসে আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির কাছে বহু বৎসর ধ'রে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা ক'রে দেশে ফিরে যান, তার পরে ইনিই আটান্ন বৎসর বয়সে ভোটদেশ বা তিব্বতে গিয়ে, খ্রীষ্টীয় ১০৩৮ সালে, সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে দেন—তিব্বতীরা এখনও তাঁর পূজা করে; শৈলেন্দ্র-বংশের রাজা বলপুত্র-দেব বিহারে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার আর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য স্থানীয় কতকগুলি গ্রাম কিনিয়ে' যাতে তাদের আয় থেকে সমস্ত ব্যবস্থা ভালো ভাবে নিয়মিতরূপে হয় সে বিষয়ে তিনি মগধ আর গৌড়-বঙ্গের পালবংশীয় রাজা দেবপালদেবকে অনুরোধ ক'রে পাঠান; মহারাজ দেবপালদেব সেই মত কার্য্য করেন, আর পরে একখানি তাম্রশাসনে সব কথা লেখান; ভাগ্যক্রমে নালন্দায় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এই তাম্রশাসন-খানি পাওয়া গিয়াছে,—এর তারিখ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় ৮৯০এর দিকে; এই প্রাপ্তির ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বীপময় ভারত আর ভারতবর্ষের মধ্যে যোগসূত্র কি প্রকারের ছিল সে বিষয়ে একটি বড় খবর আমরা জানতে পারছি। সেই এক দিন ছিল, আর এই এক দিন। আমরা হংসাবতী, সুবর্ণভূমি আর শ্রীক্ষেত্র (দক্ষিণ বর্ম্মা), দ্বারাবতী (দক্ষিণ শ্যাম), কম্বোজ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (আনাম আর কোচিন চীন), নগর শ্রীধর্ম্মরাজ (ক্র সংযোজক), কটাহ দেশ (উত্তর মালয়), সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), যবদ্বীপ, বলি-অঙ্গ (বলিদ্বীপ) প্রভৃতি দেশের কথা এখন ভুলে' গিয়েছি; আর সে সব দেশের লোকেরাও—বিশেষতঃ সুমাত্রার আর মালয়ের লোকেরা—ভারতের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগের কথাও অনেকটা ভুলে' গিয়েছে। খালি যবদ্বীপে, আর শ্যাম আর কম্বোজে, তার স্মৃতি এখনও যা জাগরূক র'য়েছে;—আর সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের দেশের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, সেই ম্লান

মেদানে—চীনা সাংবাদিক দল ও কবি। (চীনাদের মধ্যে দণ্ডায়মান বাঁ দিক থেকে ডানদিকে ধীরেনবাবু, বাকে, ডাক্তার রূকার্স, প্রবন্ধকার, সুরেনবাবু)

স্মৃতি আজকাল একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছে, এইটুকু যা আশার কথা।

বুধবার ১৭ই আগষ্ট ১৯২৭।—

সকাল সাতটায় জাহাজ বেলাওয়ানের জেটিতে গিয়ে ভিড়্‌ল। জাহাজ ভিড়্‌তে ভিড়্‌তে আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলুম। ডেকের উপরে এসে দেখি, জেটিতে বিস্তর লোকের সমাগম হ'য়েছে; সাদা পোষাকে ডচ্ কর্ম্ম-চারীদের পাশে বিস্তর তামিল চেট্টি, কতকগুলি সিন্ধী, আর শিখ। ডচ্ ভদ্রলোক জন কতক এসেছেন মেদান শহর থেকে; বেলাওয়ান বন্দরটী তেমন বড় নয়,—সমুদ্র থেকে মাইল কতক দূরে দেশের অভ্যন্তরে Medan মেদান বা Medan Deli মেদান-দেলি শহর হ'চ্ছে এ অঞ্চলের প্রধান নগর, সরকারী কেন্দ্র, বেলাওয়ান এই মেদান শহরেরই বন্দর মাত্র। ভারতবাসী যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই মেদান থেকে। জেটিতে দেখলুম, আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাকে (A. A. Bake) সহাস্য মুখে দাঁড়িয়ে

কবিকে প্রণাম ক'রছেন। শ্রীযুক্ত বাকে হলাণ্ড-দেশীয়, প্রিয়-দর্শন দীর্ঘকায় যুবক, হলাণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, সেখানে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন ক'রতে আরম্ভ করেন, কিছুকাল ধ'রে শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক বাস ক'রছেন। বাকে-দম্পতির সঙ্গীত বিদ্যায় খুবই অনুরাগ।

সুমাত্রা দ্বীপের ছেলের দল

শান্তিনিকেতনে বাকের প্রধান কাজ—সংস্কৃত আর বাঙলা ভাষার চর্চ্চা, আর ভারতীয় সঙ্গীত আলোচনা করা। ধুতী-পাঞ্জাবী-পরা বাকে আর সাড়ী-পরা তাঁর স্ত্রী শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁদের চরিত্র-মাধুর্য্যের দ্বারা আর ভারতবর্ষের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার দ্বারা সকলের প্রিয় হ'তে পেরেছিলেন। কবির যবদ্বীপ যাত্রার কথা যখন স্থির হ'ল, তখন বাকে আর তাঁর পত্নী সঙ্গে থাকবেন এটাও ঠিক হয়। এঁরা নিজেরা ডচ্, যবদ্বীপ ঘুরবার সময় নানা বিষয়ে কবিকে এঁরা সাহায্য ক'রতে পারবেন, আবশ্যক হ'লে কবির দোভাষীর কাজও ক'রতে পারবেন; এঁরা ইংরেজী জানেন খুব চমৎকার; আর তা ছাড়া, কবির লেখার সঙ্গে এঁদের খুব পরিচয়ও আছে; শান্তিনিকেতনে আশ্রমের জীবনে অংশগ্রহণ ক'রেছেন, আর কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন; কবির ভাব আর উদ্দেশ্য, আর বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র ক'রে কবির নানাবিধ চেষ্টা, এ সকলের প্রতি এঁরা আস্থাযুক্ত, এসকলের মর্ম্মজ্ঞ; সুতরাং যবদ্বীপের ডচ্ ও ডচ্-ভাষী যবদ্বীপীয়-দের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী অনুবাদ ক'রে বা ব্যাখ্যা ক'রে ব'লতে পারবে, বাকে-দম্পতীর মত এরূপ গুণী সহকর্ম্মী দুর্লভ। বাকে-কে দেখে আমাদের বিশেষ আনন্দ হ'ল। বিদেশে পরিচিত লোক, যে সেখানকার সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও বেশী অভিজ্ঞ, তাকে পেলে, একটা মস্ত আশ্রয় পেলুম, এই রকম একটা আরামের ভাব মনে জাগে।

আমরা অবতরণ ক'রলুম। জেটীতেই কতকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে বাকে আমাদের পরিচয় করিয়ে' দিলেন। স্থানীয় ডচ্ কর্ত্তৃপক্ষদের যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা পরিচিত হ'লেন; মেদান থেকে আগত ডচ্ ভদ্রলোক ও মহিলা জন কতক; স্থানীয় থিওসোফিস্টদের প্রতিনিধি; চেট্টিদের প্রতিনিধি; সিন্ধীদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লীলারাম; আর মালাইদেশের ইপোঃ-নগরের ডাক্তার রজার্স্। কবিকে তিন তিন বার মাল্যদান হ'ল। তারপরে পাসপোর্ট দেখানো আর চুঙ্গীতে মাল-পত্র দেখিয়ে খালাস ক'রে নেওয়ার পালা; কবির সম্মানের জন্য এ ব্যাপারে কোনও রকম ঝঞ্ঝাট ক'রলে না। ডাক্তার রজার্স্ কবিকে নিয়ে গেলেন তাঁর অতিথি হিসাবে, মেদানে যে হোটেলে তিনি অবস্থান ক'রছিলেন সেখানে। বাকে, ধীরেন বাবু, আমি—আমরা তিনজনে মিলে' আমাদের মালপত্র বাতাবিয়া-গামী জাহাজ Plancius প্লানসিউস-এ তুলে দিয়ে এলুম, সারা দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মেদানের চেট্টিরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁদেরই মোটরে ক'রে ডাক্তার রজার্স্-এর হোটেলে তাঁরা আমাদের পৌঁছে দিয়ে' গেলেন। বেলাওয়ান্ থেকে মেদান, মোটরে মিনিট কুড়ির পথ হবে। পরিষ্কার রাস্তাটী। পথে বাকে যবদ্বীপে কবির ভ্রমণের কি রকম ব্যবস্থা হ'য়েছে সে সম্বন্ধে ব'ললেন। কবির আগমন সংবাদে ডচ্ ও যবদ্বীপীয় তাবৎ শিক্ষিত লোক অত্যন্ত খুশী হ'য়েছেন, তাঁর সংবর্দ্ধনার জন্য নানা সম্প্রদায় থেকে আয়োজন চ'লছে। কবিকে সম্মান দেখাবার জন্য ডচ্ জাহাজ কোম্পানী Koninklijke Paketvaart Matschappij (বা রাজকীয় বাষ্প পোত পরিচালক সমিতি) তাঁকে স্বাগত ক'রছেন, আর ঐ অঞ্চলে যেখানে যেখানে তাঁদের জাহাজে ক'রে তিনি যাবেন তাঁকে তাঁরা বিনা-ব্যয়ে নিয়ে যাবেন, তাঁর কাছ থেকে ভাড়া নেবেন না, আর তাঁর সঙ্গীদের জন্য অর্দ্ধেক ভাড়ার ব্যবস্থা ক'রেছেন।

এই জাহাজ কোম্পানী ডচ্ সরকারের পৃষ্ঠপোষিত,—ডচ্ সরকার বোধ হয় এর আংশিক মালিক। আমরা যে সময়ে বাতাবিয়ায় পঁউছোবো, তার অল্প কয় দিন পরেই বলিদ্বীপে কতকগুলি ঘটার ব্যাপার আছে—স্থানীয় রাজাদের অন্ত্যেষ্টি আর শ্রাদ্ধ—ঠিক সময়েই আমরা এসেছি, বাতাবিয়ায় দু-চার দিন থেকেই এই সব জিনিস দেখবার জন্য আমাদের বলিদ্বীপে ছুটতে হবে। বলিদ্বীপ ঘুরে' পরে আবার যবদ্বীপে আস্‌তে হবে, তখন যবদ্বীপ ভালো ক'রে দেখা হবে। কোন্ কোন্ শহরে যেতে হবে, কোথায় কোন্ দিন কি কি অনুষ্ঠান হবে, মোটামুটি তার একটি তালিকা তৈরী হ'য়ে গিয়েছে।

মেদানের Hotel Deboer হোটেল দেবুর্-এ উপস্থিত হ'লুম। তখন বেলা দশটা হ'য়ে গিয়েছে। ডাক্তার রজার্স্ কবির দিন যাপনের জন্য আর আমাদের জন্য কামরা নিয়ে রেখে ছিলেন, সেইখানে বিশ্রাম করা গেল। ঐশ্বর্য্যশালী লোকেদের জন্য এই হোটেল। বাকে আর আমি ডচ্ জাহাজ কোম্পানীর আপিসে গিয়ে আমাদের সকলকার টিকিট করিয়ে নিয়ে এলুম। একটু পরেই কবি-দর্শনার্থী নানা লোকের সমাগম হ'তে লাগ্‌ল। স্থানীয় চীনা খবর কাগজের পরিচালকেরা সদলে এলেন, কবির সম্বন্ধে তাঁরা প্রবন্ধ লিখেছেন দেখালেন, কবিকে নিয়ে' গ্রুপ ছবি তুললেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল; বেশ বুদ্ধিমান এই চীনা যুবক কয়টী, মালয় দেশের চীনারা যেমন।

মেদানে যে কয়ঘণ্টা ছিলুম, তারি মধ্যে বার দুই হোটেল থেকে বেরিয়ে শহরটা ঘুরে এলুম, খানিক হেঁটে, খানিক গাড়ী ক'রে। এক ঘোড়ার দু চাকার গাড়ী, ঠিক পশ্চিমে তাঙ্গার ভাব; বর্ম্মী টাট্টুর মতন ছোট্টো ঘোড়া; গাড়োয়ান আর সওয়ারী পিঠাপিঠি বসে; মালাই ভাষায় এই গাড়ীর নাম Sado 'সাদো', কথাটী ফরাসী dos-a-dos ('দোসাদো') বা 'পিঠাপিঠি' শব্দের অপভ্রংশ। গাড়ীগুলি পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে, ধোপদস্ত চাদরে গদী মোড়া, ঘোড়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট, চালকের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার আর প্রচুর। মেদান শহরটী ছোটো, নোতুন পত্তন হ'য়েছে। বেশীর ভাগ বাড়ী একতালার; টালীতে ছাওয়া ঘর, প্রশস্ত হাতার মধ্যে। স্থানীয় এক মালাই সুলতানের বাড়ী ছাড়া দ্রষ্টব্য আর কিছুই নেই। তবে বাড়ন্ত শহর: দেশটা ডচেদের হাতে এসে নোতুন ক'রে যেন উদ্‌ঘাটিত হ'চ্ছে, লোক-সংখ্যা বাড়ছে, আবাদ বেশী

'সাদো' গাড়ী

ক'রে হ'চ্ছে; স্থানীয় লোকেদের অবস্থাও বেশ ভালো ব'লেই মনে হ'ল; সুতরাং নগরের শ্রীও যে প্রবর্দ্ধমান হবে তার আশ্চর্য্য কি। মেদান থেকে আরও ভিতরে পাহাড়ের উপর Brastagi ব্রাস্তাগী ব'লে একটী স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, সুমাত্রার অন্য অংশ, যবদ্বীপ, ব্রিটিশ মালয়, এমন কি সুদূর শ্যাম দেশ থেকে লোকে সেখানে হাওয়া বদলাতে আসে; ব্রাস্তাগীর পথেই মেদান পড়ে। এখানে ধনী ডচ্ আর অন্য ভ্রমণকারীর দলের খুব আমদানী হয়; তাই সৌখীন জিনিসের দোকানও খুব—সিন্ধী রেশম আর মণিহারী জিনিস ওয়ালাদের কতকগুলি দোকান বেশ চ'লছে। রাস্তায় ভারতীয় লোক দেখলুম সংখ্যায় মন্দ নয়, তবে ব্রিটিশ মালয়ের মতন অত বেশী নয়। চীনার সংখ্যাও যেন কম ব'লে মনে হ'ল। মালাই আর যবদ্বীপীয় লোকই খুব বেশী। রঙীন সারং পরে অতি সুশ্রী মালাই বা সুমাত্রার মেয়েরা দল বেঁধে চলেছে; বাজারে তরী-তরকারী বিক্রী ক'রছে মালাইরাই; কিন্তু কাপড়-চোপড়ের দোকান ভারতীয়দের, আর হাতের কাজে যেখানেই হুনরের দরকার সেখানে চীনাদের একাধিপত্য। আধঘণ্টার মধ্যেই শহরটা ঘুরে আসা যায়। শহরের ডাকঘরে গেলুম, দেশের জন্য চিঠি ছাড়তে, কবির হ'য়ে তার ক'রতে। তামিলদের ভীড়; কেরাণীরা

চীনা, কিংবা যবদ্বীপীয়। এক দীর্ঘকায় শিখ ডাকঘরে পাহারাদার কাজ ক'রছে; আরও গুটী কতক শিখ এসেছে। ডচ্ সরকারও যে শিখ পাহারাদা রাখে তা দেখে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হ'লুম। লোকটীর সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। সে রবীন্দ্রনাথের আগমনের কথা কাগজে প'ড়েছে, সসম্ভ্রমে তাঁর বিষয় উল্লেখ ক'রলে—ব'ললে, 'হমারে সিক্‌খ্ গুরুলোগ জৈসে থে, আপ ভী বৈসে হৈঁ।' এ অঞ্চলে—উত্তর-পূর্ব্ব সুমাত্রায়, বিস্তর শিখ আছে, এরা দরোয়ানের কাজ করে, গোয়ালার ব্যবসা চালায়—নিজেরা গোরু রাখে। পাঠানও কিছু কিছু আছে। পুরবিয়া হিন্দুস্থানীও আছে। মোটের উপর ডচ্ সরকারের ব্যবহারে এরা সকলেই সন্তুষ্ট।

শহরের এক পাশে হাওড়ার ময়দানের মতন একটা মস্ত মাঠ। তারই লাগোয়া ব্যবসার কেন্দ্র—ইউরোপীয়দের আপিস, আর বিশেষ ক'রে তাদের জন্য যত দোকান-পাট। তার পরে দেশী পাড়া। তামিলদের জন্য আলাদা একটা পাড়া আছে। অন্য প্রদেশের ভারতীয়দের জন্যও বোধ হয় সেইরূপ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

শহরে ঘুরে' ঘুরে' কিছু ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড কিনলুম। সুমাত্রার পাহাড়ে' অঞ্চলের অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির ঘরবাড়ী আর জীবনযাত্রার ছবি। রাস্তার দোকানের সাইন-বোর্ডগুলি একটু অদ্ভুত লাগ্‌ল—তাদের ভাষার দরুণ। ইংরেজীর রেওয়াজ নেই ব'ললেই হয়। ডচ্ আছে, কিন্তু মালাই ভাষারই চলন বেশী। তা আবার মালাই দেশের মতন আরবী অক্ষরে লেখা নয়, আমাদের সহজবোধ্য রোমানে; আর এই রোমান মালাই, ডচ্ উচ্চারণ অনুসারী বানানে লেখে, ইংরেজী বানানে নয়। সরকারী ইস্তাহারও বেশীর ভাগ এই রোমান-মালাইয়ে। দ্বীপময় ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা এই রোমান মালাই-ই দাঁড়িয়ে গিয়েছে, আর তা ডচেদেরই চেষ্টায়। এই ভাষা সমগ্র ইন্দোনেসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একসূত্রে বেঁধে ফেলেছে, তাদের মধ্যে ঐক্য-বোধ এনে দিচ্ছে। একটু অভ্যাস হ'য়ে গেলেই, ডচ্ বানানের oe কে 'উ' পড়া (যেমন ইংরেজীর shoeর উচ্চারণে), j কে 'য়' পড়া, tj কে 'চ' পড়া, dj কে 'জ' পড়া, ngg কে 'ঙ' আর খালি ngকে 'ঙ' পড়া, nj কে 'ঞ' পড়া, sj কে 'শ' পড়ায় আর কোন বাধোবাধো ঠেকে না। সেওয়ালে যারা কাগজের বিজ্ঞাপনেও এই রোমান মালাই। Soesoe tjap prahoe 'সুসু চাপ্ প্রাউ'—নৌকা-ছাপ (বা মার্কা) দুধ—ভাইকিং (viking)দের জাহাজের রঙীন ছবি নিয়ে' এক সুইস্ কোম্পানীর টিনের দুধের বিজ্ঞাপন; সিন্ধীদের দোকানের উপর সাইনবোর্ডে প্রায়ই লেখা Toko Bombay অর্থাৎ 'বোম্বাইয়ের দোকান'; সেকরার দোকানে, Toekang emas 'তুকাঙ্ মাস্' বা 'সোনার কারিগর'; দাঁত বাঁধাইয়ের দোকানের উপর, Toekang gigi 'তুকাঙ্ গিগি' বা 'দাঁতের কারিগর' (দাঁতের পরিচর্য্যা দেখছি এ দেশে খুবই দরকার হয়)। ক'লকাতায় বাঙালীর দোকানের নাম-ফলকের কথা মনে পড়ল—সাইন-বোর্ডে ইংরেজী বা (আরও কিম্ভূত!) বাঙলা অক্ষরে লেখা 'গোল্ড-স্মিথ্‌স্ এণ্ড জুয়েলার্স্' আর 'ডেন্টিষ্ট্‌স্'—আমরা সহজে 'সেকরা বা স্বর্ণকার বা মণিকারের দোকান' বা 'দাঁত বাঁধাইয়ের দোকান' লিখবো না; মাতৃভাষার অক্ষর ব্যবহার করবো, কিন্তু তার শব্দ ব্যবহারে যেন লজ্জা হয়। এ সেই বাঙলা থিয়েটারের ইংরেজী নাম-করণের মত ব্যাপার। মালাইয়ে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হয়। একটা আপিসের উপরে বড় বড় রোমান অক্ষরে মালাই ভাষায় লেখা—Banka Boemipoetra 'বাঙ্কা বুমিপুত্র' (অর্থাৎ 'ভূমিপুত্র') —তলায় ডচ্ ভাষায় লেখা, Inlandersbank বা দেশীলোকদের ব্যাঙ্ক; ডচে Inlander মানে দেশী, Uitlander (ইংরেজী Outlander) মানে বিদেশী; ইন্দোনেসিয়ার মালাই ভাষায়, 'দেশীয়' অর্থে 'ভূমিপুত্র'—এই সংস্কৃত সমস্ত-পদটি ব্যবহার করা হয়। কথাটি বেশ লাগ্‌ল—আদি-যুগ থেকে যে জা'তের মানুষ দেশে বাস ক'রছে, তাদের জানাবার জন্য, Aborigines বা 'আদিম অধিবাসী' অর্থে এই 'ভূমিপুত্র' শব্দটী বাঙলারও প্রযুক্ত হ'তে পারে—ভাষার শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই যাঁরা তাতে ভাবের চিত্র দেখ্‌তে চান, তাঁরা এই শব্দটী নিশ্চয়ই পছন্দ ক'রবেন।

তামিলপাড়া দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে জন কতক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁরা খাতির ক'রে তাঁদের একজনের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানা ঘরটীতে বাঙালীর বাড়ীর বৈঠকখানার মতন একদিকে তক্তাপোষের উপর মাহুর-পাতা আর বিছানা, আর একদিকে কতকগুলি চেয়ার। দেওয়ালে প্রচুর ফ্রেমে-বাঁধা ছবি—ঠাকুর-দেবতার ছবিই বেশী—মাদ্রাজী পট, রবিবর্ম্মার আঁকা বোম্বাইয়ে' ছবি, দু এক খানা ক'লকাতার সেকেলে লিথোগ্রাফ দেবতার ছবিও আছে; আর আছে গৃহস্থের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন আর পৃষ্ঠপোষক সাহেব-সুবার ফোটোগ্রাফ। বাড়ীর মালিক এলেন, এক ধনী চেট্টি মহাজন; ইংরেজী বা ডচ্‌ জানেন না। সকালে এঁকে আমরা বেলাওয়ানে দেখেছিলুম। পরে আবার এঁকে দেখি, স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে যখন হোটেলে কবির ছবি তোলা হয়, তখন ইনিও ছিলেন; আবার বেলাওয়ানে ষ্টীমার পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যুদ্গমন ক'রতেও এসেছিলেন। এঁরই চেষ্টায় তামিলদের একটি মিলন-কেন্দ্র স্থাপিত হ'য়েছে। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটি, কতকগুলি দাঁত সোনা দিয়ে' বাঁধানো, মাথাটী উড়ে-কামানো, প্রসন্ন উজ্জ্বল চাহনী, শ্রীমানের মত চেহারা, দু কানে দুটী হীরের দুল; নিজের বাড়ীতে খালি গায়েই ছিলেন, কিন্তু পরে ছবি তোলাবার সময়ে দেখি, ইনি পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে এসেছেন, সাদা ফুল-তোলা জাপানী রেশমের লম্বা একটি কোট গায়ে, তার গোটা আটেক সোনার বোতাম, আস্ত আস্ত গিনি দিয়ে তৈরী, হাতে অনেকগুলি হীরা চুনি মরকত আর নীলার আঙটী, মাথায় জরীর পাড় পাগড়ী, গলায় সাদা জরী পাড় চাদর, লুঙ্গীর ধরণে পরা ধুতি, খালি পা। এঁরা খুবই শিষ্টাচার ক'রলেন, কবির আগমনে তাঁরা যে ধন্য সে কথা জানালেন, তবে দুঃখ এই রইল যে কবি দু এক দিন থেকে যেতে বা তাঁদের কিছু উপদেশ দিয়ে যেতে পারলেন না।

মেদান শহরের ময়দানে দেখি, একজন ভারতীয়—হিন্দুস্থানী মুসলমান—একটী ঠেলা-গাড়ীতে জলের হাঁড়ী, বরফ, রঙীন কাঁচের গেলাস নিয়ে শরবৎ বিক্রী ক'রছে। লোকটির সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। তার বাড়ী আজমগড় জেলায়; শরবৎ বিক্রী করে, এ রকম দেশের লোক, ভোজপুরী মুসলমান, এ তল্লাটে দু-দশ জন আছে; তা ছাড়া পাঁউরুটীর ব্যবসাও করে, এমন তার দেশোয়ালী ভাইও আছে। এই রুটী-বিস্কুটের কাজে আবার বাঙালী মুসলমানও দু-চার জন আছে। এরা ঘরে তুন্দুরের রুটী-বিস্কুট বানিয়ে সাহেব-সুবার বাড়ী বাড়ী দেয়, আবার ঝুড়িতে ক'রে মাথায় চড়িয়ে মালাই আর অন্য জাতের লোকদেরও বাড়ী বাড়ী বিক্রী করে। ভোজপুরে' হিন্দুও আছে, তারা মটর-ভাজা ফেরি ক'রে বেড়ায়। এক রকম ক'রে দিন গুজরানো হয়—আর, 'ক্যা করেগা সাব, তকদীরমেঁ এইসা লিখা হৈ, রোটীকে ওয়াস্তে পরদেশমেঁ ঘুমনা পড়তা'। 'এক সাল দো সাল বাদ ঘর লৌট্‌তা, দো পাঁচ মাহিনাকে লিয়ে।' হিন্দুস্থান থেকে মেদানে এক জন 'বড়া ভারী আলেম আদমী' এসেছেন, একদিনের জন্য, সে কথা সে শুনেছে; তবে সে গরীব লোক, 'অন্‌পঢ়', সে কিছু জানে না কি ব্যাপার হ'চ্ছে। 'বংগালী বাবু' কেউ এ দেশে কখনও আসে নি—অন্ততঃ কেউ যে কখনও এসেছে এমন কথা সে শোনে নি। বিদায় কালে ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের খুব সেলাম ক'রলে।

হোটেল-দেবুর-এর ব্যবস্থা খুব উঁচুদরের, ধনী লোকেদেরই উপযুক্ত। দেশের জল বায়ুর উপযোগী ক'রে হোটেল তৈরী হ'য়েছে। মস্ত মস্ত ঘর, প্রায় প্রত্যেক ঘরের লাগোয়া একটু ক'রে বারান্দা আছে। দুপুরে বিশ্রাম করা গেল, আর ডাক্তার রজার্স্‌-এর সঙ্গে আলাপ করা গেল। এই ভদ্রলোকটীর কথা আগে ব'লেছি, ইপো-র প্রসঙ্গে। ইনি সিংহল থেকে আগত তামিল খ্রীষ্টান, আর ইপো-র একজন প্রসিদ্ধ ধনী। আমরা ইপো-তে যে বিরাট্‌ ন টিনের খনি দেখতে যাই, ইনি সেই খনির মালিক। লম্বা পাতলা একহারা চেহারার মানুষটী, উজ্জ্বল চোখ, শিষ্টাচার-সম্মত চলা-ফেরা, কথা-বার্ত্তা, ব্যবহার। শরীর ভালো নয়, হাওয়া বদলাতে সুমাত্রায় ব্রাস্তাগি পাহাড়ে এসেছিলেন, এইবার ইপো-তেই ফিরবেন, রবীন্দ্রনাথ আসছেন জেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করবার জন্ত সেখানে র'য়ে গিয়েছেন। বস্‌বার ঘরের টেবিলে কতকগুলি ইংরেজী পত্র-পত্রিকা ছিল, আর ছিল ফোটোগ্রাফের আল্‌বম্‌, আর ছবিওয়ালা দু-একখানি বই। আল্‌বম্‌টী হাতে নিজেই তিনি আমাদের দেখতে ব'ল্‌লেন। তাতে তাঁর মেয়ের ছবি, বিলিতি কোর্ট-ড্রেস্‌ পরা, বিভিন্ন রূপে অবস্থানের কতকগুলি ছবি, লণ্ডনের এক উচ্চশ্রেণীর ফোটোগ্রাফরের তোলা। সুশ্রী শ্যামবর্ণা তন্বী একটি ভারতীয় তরুণী; পাতলা কাপড়ের বিলিতী পোষাকটা শ্যামবর্ণ চেহারার সঙ্গে কেমন বেমানান লাগ্‌ছিল। ডাক্তার রজার্স একটু পিতার গৌরবে, আর উচ্চ-সম্মান-বোধ-মিশ্র সম্ভ্রমের সঙ্গে, আমাদের জানালেন যে তাঁর এই মেয়েটি বিলেতে presented হ'য়েছিলেন, অর্থাৎ রাজসকাশে পরিচিত হ'য়েছিলেন— যেমন ইংলাণ্ডের অভিজাত ঘরের মেয়েরা হ'য়ে থাকেন। এইরূপ debutante হওয়া, অর্থাৎ ইংরেজ অভিজাত সমাজে এইরূপে প্রথম পরিচিত হওয়া, ভারতীয় বা অশ্বেতকায় জাতির মেয়েদের প্রায় ঘটে না; এইজন্ত ডাক্তার রজার্স-এর এই গৌরব-বোধ। ইনি আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, যখন তাঁর টিনের খনি আমরা দেখতে যাই, তখন আমাদের ভালো ক'রে খাতির-টাতির ক'রেছিল কিনা, আর আমাদের কি পানীয় দিয়েছিল। আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ব'ললুম যে আমরা সকলের ভদ্র ব্যবহারে খুবই আপ্যায়িত হ'য়েছিলুম, আর খনির কাজ যা দেখেছিলুম তা অপূর্ব্ব, তার কথা আমাদের চিরকাল মনে থাক্‌বে—এতবড় একটা খনির মালিক তিনি, এর কাজ যে বেশ ভালোই চ'লছে, নিশ্চয়ই এটা একটা আনন্দের কথা। এতে তিনি ব'ল্‌লেন, "হুঁ, তা কাজ মন্দ চ'ল্‌ছে না—কিন্তু খনিতে আপনাদের শ্যাম্পেন মদ পান ক'রতে দিয়েছিল কি? আমার বন্দোবস্ত আছে, আপনাদের মতন অতিথি এলে ঢালাও শ্যাম্পেন খাইয়ে' খাতির ক'রবে।" আমরা ব'ললুম, চীনা ইঞ্জিনীয়ার আর কর্ম্মচারীরা আমাদের শ্যাম্পেন দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা লেমনেড্‌-ই যথেষ্ট মনে ক'রেছিলুম। আমরা শ্যাম্পেন্‌ খেলেই তিনি খুশী হ'তেন, কারণ তিনি আমাদের ব'ল্‌লেন যে তাঁর খনির মর্য্যাদার জন্তে তিনি সব চেয়ে সেরা শ্যাম্পেনের প্রচুর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। —ডাক্তার রজার্স একখানি ছোটো সচিত্র পুস্তিকা আমাদের দেখ্‌তে দিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়রা ইংলাণ্ডে বছরে একবার ক'রে খেল্‌তে যায়, ইংলাণ্ডের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়। এই খেলা আর এতে হার-জিত ইংলাণ্ডের খেলার জগতে একটি বড়ো ঘটনা, এ নিয়ে' দুটো দেশে সপ্তাহ কয়েক ধ'রে খুব হৈ চৈ চলে। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়, তারা যাচ্ছে ইংলাণ্ডে, বা ফিরছে ইংলাণ্ড থেকে, ইংলণ্ডে গিয়ে খেল্‌ছে, আর কখন কখন খেলায় হারাচ্ছেও ইংলাণ্ডের সেরা খেলোয়াড়দের;—কাজেই সিঙ্গাপুর হ'য়ে যখন এরা যায় আসে, সেখানকার ইংরেজ আধা-ইংরেজ আর মালাই আর ভারতীয় মহলে একটা সম্ভ্রম-মিশ্র সাড়া প'ড়ে যায়—অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের অনেক সময়ে রাজোচিত আপ্যায়ন চলে। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের উপযুক্ত সংবর্দ্ধনা করবার এই রকম সুযোগ আর সম্মান ডাক্তার রজার্স একবার পেয়েছিলেন, আর তাতেই তিনি কৃতার্থম্মন্য। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, তিনি মালাই দেশের ভালো ভালো খেলোয়াড় বেছে নিয়ে একটি দল গঠন করেন, ডাক্তার রজার্স-এর দল Dr. Rogers' XI; অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা সিঙ্গাপুর থেকে এসে এদের সঙ্গে খেলে, আর ডাক্তার রজার্স-এর আতিথ্য স্বীকার করে, ডিনারে আপ্যায়িত হয়। এই ঘটনার স্মারক এই চিত্রময় পুস্তিকাখানি। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের ছবি, ডাক্তার রজার্স-এর আর তাঁর দলের লোকেদের ছবি, খেলার ছবি, কে কে বড়ো লোক এসে দর্শন দিয়েছিলেন তাঁদের কথা, আর ডিনারে কি কি পদ ছিল, তার তালিকা—menu card. একটু চাপা কিন্তু বিপুল আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ডাক্তার রজার্স আমার প্রশ্নের উত্তরে তাঁর এই সার্থক অনুষ্ঠানটির সম্বন্ধে খুঁটি-নাটি আমাদের শোনাতে লাগলেন। আমিও যথোচিত অভিভূত হ'য়ে গিয়ে শুন্‌তে লাগলুম। ব'ললুম—এত বড়ো একটা function বা অনুষ্ঠান হ'য়ে গেল, আপনার খরচ হ'য়েছিল খুব নিশ্চয়ই।

তিনি ব'ললেন, তা তো হবেই—প্রায় হাজার ডলার লেগেছিল।—ডাক্তার রজার্স বিশ্বভারতীর জন্তও কিছু দান ক'রেছিলেন। তবে ঠিক মনে প'ড়ছে না কত। ডাক্তার রজার্স-এর মত অমায়িক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রলুম।

দুপুরের 'সেবা' করবার জন্ত ডাক্তার রজার্স হোটেলের ভোজন-শালায় আমাদের নিয়ে গেলেন। একটি আলাদা কামরা আমাদের জন্ত ঠিক ছিল। ডচ্ হোটেলে খাওয়া। দ্বীপময় ভারতের বিখ্যাত Rijsttavel 'রাইস্ট্-টাফ্ল্' (Rice-table) বা 'ভাতের হাজরী' নামক আহার পর্ব্বের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টল। এই ব্যাপারটা আর কিছু নয়—যবদ্বীপীয় রীতিতে প্রস্তুত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত, ইউরোপীয় রীতিতে পরিবেশন করা। ডচেরা, যবদ্বীপের সংস্কৃতির কতকগুলি জিনিস গ্রহণ করে, প্রাচীন যবদ্বীপীয় পদ্ধতিতে ভাত-তরকারী খাওয়াটাও গ্রহণ করে। অনেক যবদ্বীপীয় ব্যেন ডচেদের ভালো লাগায়, তারা তা বর্জ্জন ক'রতে পারে নি। বেশী ঝাল মশলা যে সব জিনিসে দেওয়া হ'ত, সেগুলিকে একটু সংশোধন ক'রে নিজেদের রুচির অনুরূপ ক'রে নিয়েছে, আর নিজেদেরও দু চারটী জিনিস জুড়েছে। এই যবদ্বীপীয় ভোজনের ডচ্ সংস্করণে, মোটের উপর যবদ্বীপীয় ভাবটাই বিদ্যমান আছে। সোপকরণ 'রাইস্ট্-টাফ্ল্-এর মারফৎ যবদ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ—তার পাক-প্রণালীর সঙ্গে চাক্ষুষ ও রাসনিক পরিচয় হ'ল। একটি বড়ো পিরিচ দিলে, সেটি সামনে রইল, একজন পরিবেশক ভাত নিয়ে এল, তার কাছ থেকে ভাত নিয়ে সেই পিরিচে রাখা গেল। তার পরে দেখি, সার বেঁধে পরিবেশকের দল, প্রায় জন বারো পনেরো হবে। সকলেরই মাথায় যবদ্বীপী কায়দায় রঙীন আর চিত্রিত রুমালের পাগড়ী, গায়ে সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট, পরনে সাদা ইজার, আর জামার নীচে ইজারের উপর আজানুলম্বিত রঙীন সারং, চওড়া কোমর-বন্ধের মতন বা কটি-বস্ত্রের মতন জড়ানো। প্রত্যেকের হাতে থালায় বা অন্ত পাত্রে এক এক রকমের তরকারী। বাঁ পাশে টেবিলের উপরে আর একখানি বড় পিরিচ থাকে, তাইতে এই সব তরকারী একটু একটু করে নিয়ে রাখতে হয়, আর ঝোল-জাতীয় জিনিস ভাতের পাত্রেই নিতে হয়। যবদ্বীপের প্রধান খাদ্য হ'চ্ছে ভাত আর মাছ; রাইস্ট্-টাফ্ল্-এর তরকারীর মধ্যে মাছের পাটই বেশী, তবে মাংসও নানা রকম আছে। এ সব তরকারীর সোয়াদ ঠিক আমাদের দেশের তরকারীর মতন নয়, একটু আলাদা; না উত্তর-ভারতের মুসলমানী কোর্ম্মা-কালিয়া-কোফতার বা হিন্দু দাল-ভাজী-সাগ প্রভৃতির মতন, না আমাদের বাঙলার শুক্ত-ঘণ্ট-ডালনা বা মাছের-ঝাল-ঝোল ইত্যাদির মত; তবে এই রান্নার গোষ্ঠিটা শেষোক্ত পর্য্যায়েরই,—যদিও তার ব্যঞ্জনগুলির তার একটু অন্ত ধরণের; তবে একেবারেই চীনা রান্নার মতন নয়—সে এক পান্‌সে ব্যাপার, মরিচ আর মশলার সম্পর্ক নেই তাতে। বড় মাছ কেটে সিদ্ধ ক'রে তাকে চ'টকে নিয়ে একটা তরকারী করে; মাছের পাঁপর এক রকম হয়—ভাজা অবস্থায় দেখতে ঠিক আমাদের ডালের পাঁপরের মত,—এটি এ দেশের একটি অতি প্রিয় খাদ্য; ভাজাভুজির মধ্যে সুপক্ক কলা ভাজার রেওয়াজ আছে; নানা রকম তরকারী আর মাংস দিয়ে ঝোলের মতনও একটা জিনিস করে; চুনো জাতির মাছ কাঁচা অবস্থায় টকে জারিয়ে এক রকম চাট্‌নী করে; এ ছাড়া ডিমের ব্যাপারও আছে। প্রায় ১৮ কি ২০ রকম ব্যঞ্জন নিয়ে এই আহার-পর্ব্ব—ব্যঞ্জন কখনো কখনো সংখ্যায় আরও বেশী হয়।—বিস্তর ডচ্ ঔপনিবেশিক এই ভোজের মোহে প'ড়ে গিয়েছে, তারা দুপুরে রাইস্ট্-টাফ্ল্ই খায়, ইউরোপীয় খাদ্য খায় না। তবে ইউরোপীয় জঠরের (তায় আবার ডচ্ ইউরোপীয়!) মর্য্যাদা রক্ষার জন্ত ভারী-গোছ খাবার হিসাবে এই সঙ্গে মাংসের রোষ্ট একটি বেশী পদ ধরা থাকে—এত রকম তরকারী আর ভাতে যাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, তাঁরা অগত্যা এইতেই শেষটা পুরিয়ে নেন।

গুরুতর আহার, তাই পরে একটু বিশ্রাম চাই-ই। ডচেরা যবদ্বীপ অঞ্চলে এই বিশ্রামের ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। দুপুরের আহারের পরে নিদ্রার আবশ্যকতা ডচেরা স্বীকার ক'রে নিয়েছে, তাই আপিস আদালত দোকান সমস্তই এগারোটা থেকে চারটে পর্য্যন্ত

বন্ধ থাকে। আমরা কিন্তু একটা দিনের জন্ত সুমাত্রায় নেমেছি ; তাই খেয়েই, আবার বা'র হ'লুম খানিক শহর দেখবার জন্ত।

বেলা আড়াইটে-তিনটে আন্দাজ স্থানীয় প্রধান প্রধান ভারতীয়েরা এলেন, আর এলেন জন কতক ডচ্ ভদ্রলোক কবিকে দর্শন ক'রতে। অল্প দুচার কথা সকলের সঙ্গে হ'ল। ঐ দেশের অধিবাসী বা ডচ সরকারের প্রজা যারা নয়, সম্প্রদায় ধ'রে ডচ্ সরকার তাদের এক একজন মাতব্বর ঠিক ক'রে দেন। তাদের যা অভাব অভিযোগ এই মাতব্বর বা মোড়ল প্রমুখাৎ তারা সরকারকে জানায়, আর তাদের সম্বন্ধে কিছু বিধি-নিষেধ ঠিক ক'রতে হ'লে মোড়লের মত নেওয়া হয়, মোড়ল নিজের দলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজের মতামত সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নেন। এই নিয়মে এ সব দেশে কাজ চ'লছে বেশ। এই মোড়লদের কতকগুলি সম্মান-সূচক অধিকার আছে। স্থানীয় মালাই ভাষায় এই মোড়লদের Kapten 'কাপ্তেন' বলে (ইংরিজি captain), চীনাদের মোড়ল হ'চ্ছেন Kapten Tjina কাপ্তেন চীনা, তামিলদের হ'চ্ছেন Kapten Keling কাপ্তেন ক্লিং অর্থাৎ 'কলিঙ্গদের প্রধান', আর শিখ হিন্দুস্থানীআর সিন্ধীদের মোড়ল হ'চ্ছেন Kapten Banggali 'কাপ্তেন বাঙ্গালী' অর্থাৎ বাঙালীদের কাপ্তেন। (মালাই দেশে আর দ্বীপময় ভারতে যে সব ভারতবাসী আসে, দ্রাবিড়-ভাষী দক্ষিণ-ভারতীয় আর আর্য্য-ভাষী উত্তর-ভারতীয় হিসাবে তাদের দুটী ভাগে ফেলা হয়—দক্ষিণীদের অর্থাৎ তামিল তেলুগুদের বলে Keling বা Klirg 'ক্লিং' অর্থাৎ কলিঙ্গদেশীয়, আর উত্তর-ভারতীয়দের বলে Banggali 'বাঙ্গালী'—বাঙলাদেশের প্রধান বন্দর ক'লকাতার জাহাজেই এরা বেশী ক'রে আসে ব'লে। তাই এ সব দেশে হিন্দুস্থানী সিন্ধী পাঞ্জাবী পাঠান ব'ল্লে কেউ বুঝবে না, এদের সাধারণ নাম হ'য়ে গিয়েছে 'বাঙ্গালী' ; মালাইদেশের বাঙালী ডাক্তারের মুখে শুনেছি, সরকারী হাসপাতালে পাঠান রোগীর জাতি লেখা হয় 'বাঙ্গালী' ব'লে)। মেদানে ভারতবাসীদের সভায় 'কাপ্তেন ক্লিং' কাউকে দেখলুম না, 'কাপ্তেন বাঙ্গালী' বলে হরনাম সিং নামে একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। আমাদের কিছু ক্ষণ আগে পরিচিত সিন্ধি বোতামওয়ালা কোট গায়ে চেট্টিও এলেন।

এর পরে আমাদের জাহাজ ধ'রতে যেতে হবে। চারটের জাহাজ ছাড়বে, বেলাওয়ান বন্দর থেকে। আমরা সাড়ে তিনটের মোটরে ক'রে রওনা হ'লুম। সিন্ধীদের অনুরোধ মত একটু ঘুরে' যে রাস্তায় তাঁদের দোকান সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া হ'ল, তাঁদের দোকানের লোকেরা দোকানের সামনে এসে সকলে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপরে বেলাওয়ানের পথ ধরা গেল। যাকে আর আমি একত্র একখানি গাড়ীতে ছিলুম ; সঙ্গে ছিলেন দুটি তামিল ভদ্রলোক, এঁদের একজন ধুতি-পরা চেট্টি মহাজন, ইংরেজী জানেন না ; আর অন্যটি কোট-প্যাণ্টুলেন আঁটা ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি, সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট আর প্যাণ্ট পরা, কপালে শৈব ত্রিপুণ্ড্র, কানে হীরের দুল, আর মাথায় ফেল্ট হ্যাট্—মাথার চুল ছাঁটা (কিন্তু ফেল্ট হ্যাটের নীচে ঝুঁটীওয়ালা আধা-কামানো মাথাও দক্ষিণীদের মধ্যে অন্যত্র দেখেছি, আবার টুপীটি পরবার সময় মাথার উড়ে খোঁপাটি টেনে ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে তুলে নেওয়াও হয়, যাতে হ্যাটের তলায় না বেরিয়ে পড়ে।) যাক্, পথে এঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। মেদানের কোন ইংরেজ কোম্পানীর আপিসে কাজ করেন ব'ল্লেন ; নিজেই জানালেন যে তিনি একজন থিওসোফিস্ট্। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, কোন্ দলের—কৃষ্ণমূর্ত্তিকে জগদ্গুরু ব'লে মানা বেসান্তী দলের, না কৃষ্ণমূর্ত্তির বিরোধী দলের। ইনি কৃষ্ণমূর্ত্তি-ভক্ত দলের। এই জগদ্গুরু-বাদটি কি, তা আমাদের প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা ক'রলেন। যেন সর্ব্বমিদং ভতং—সেই পরব্রহ্ম লোক শিক্ষার জন্য এক একটি জগদ্গুরুর সৃষ্টি করেন ; এই যুগের উপযুক্ত জগদ্গুরু কৃষ্ণমূর্ত্তির দেহ আশ্রয় ক'রে প্রকট হ'য়েছেন বা হবেন। ঠিক মতন তাঁর বক্তব্যটি ব'লতে পারলুম কি না জানি না ; তাঁর দ্রুত মাদ্রাজী ইংরেজীতে তাঁর আলোচিত গভীর তত্ত্ববাদ আমাদের বোধের পক্ষে একটু কঠিন হ'য়েছিল, সুতরাং তাঁর বক্তব্যটি আমাদের দ্বারায় ঠিক ধরা হ'য়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশয়

আছে। কৃষ্ণমূর্ত্তির বিশেষত্ব কোথায়, তা জিজ্ঞাসা করাতে ইনি ব'ললেন তাঁর At the feet of the master আর অন্য অন্য বই পড়ুন, তা হ'লে জানতে পারবেন। At the feet of the master খানি দেখেছি; ব'ললুম, শুনেছি যে ঐ বইয়ে নাকি শ্রীযুক্তা আনী বেসান্তেরও হাত আছে। ইনি তা অস্বীকার ক'রলেন না। ব'ললেন, তাঁদের প্রতি নির্দ্দেশ আছে, ঐ বই পড়া, আর তার ভিতরের বচনগুলির গভীর ভাবের উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা, তার ধ্যান করা (to try to realize and to meditate on passages from the book)। বাকে ব'ললেন, তা গীতা উপনিষদ তো র'য়েছে, তা ছেড়ে হালের এই বই ধরা কেন, এর এমনই কি বা বিশেষত্ব। এর মধ্যে বেলাওয়ানের জেটিতে পৌঁছে গেলুম, আমাদের আলাপ এইখানেই ইতি ক'রতে হ'ল। ভদ্রলোকটিকে বেশ সরল বিশ্বাসী ভক্ত থিওসোফিস্ট ব'লে বোধ হ'ল।

জাহাজে আমাদের ক্যাবিন দখল ক'রলুম, সকলের মালপত্র ঠিক আছে দেখে নিলুম। মেদানের বন্ধুরা শেষ বিদায়ের জন্য জাহাজের প্রথম শ্রেণীর বৈঠকখানায় সমবেত হ'লেন, কাপ্তেন তার অন্য অফিসারেরা রইলেন। সমস্ত ডচ্ যাত্রীরা আশেপাশে সম্ভ্রমের সঙ্গে রইল। আমাদের চীনারাও এলেন। একদিনের আলাপে মেদানের ভারতীয়দের সারল্য আর হৃদ্যতার পরিচয় পেয়ে আমরা তৃপ্ত হ'লুম, এঁদের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালুম। রবীন্দ্রনাথ দুই একদিন রইলেন না, এই তাঁদের আক্ষেপ রইল। তার পরে যাত্রার ঘণ্টা প'ড়ল, যাঁরা প্রত্যুদ্গমন ক'রতে এসেছিলেন তাঁরা নেমে গেলেন। জাহাজ ছাড়্‌ল।

পরিষ্কার রোদে-ভরা সুনীল আকাশ, প্রসন্ন দিক্‌, প্রসন্ন নীল সাগর,—আমরা যবদ্বীপের অভিমুখে চ'ললুম। রুচি আর অভ্যাসমত জাহাজটি একটু ঘুরে' এলুম। এখানি বেশ বড়ো জাহাজ, ইউরোপ-থেকে যবদ্বীপ যাওয়া আসা করে। কিন্তু যাত্রী বেশী নেই—কি প্রথম শ্রেণীতে, কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে, আর কিই বা ডেকে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে জন দুই শিল্পী আছেন, এঁরা কলম্বোয় উঠেছেন, যবদ্বীপে যাবেন। জাহাজখানি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখা। খালাসীরা মালাই আর পশ্চিম যবদ্বীপের Sunda সুন্দা জাতীয় লোক; ক্যাবিনের চাকরদের মধ্যে যবদ্বীপীয় লোক আছে, কিন্তু মাদুরা দ্বীপের লোকই বেশী।

আজ সন্ধ্যায় উপরের ডেকে ব'সে যবদ্বীপের সম্বন্ধে আর ঐ অঞ্চলে আমাদের আসন্ন ভ্রমণ সম্বন্ধে বাকের সঙ্গে খুব আলাপ জ'মল;—কবিও এই আলাপে যোগ দিলেন।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই আগষ্ট।—

সকালে প্রাতরাশের টেবিলে এসে, ডচ্ আদব-কায়দা আর খাবার সময়কার রীতিনীতি একটু-আধটু দেখা গেল ডচেরা খুব গুরু-ভোজনশীল। জ্যাম, রুটি, মাখন, পনীর অঢেল; তা ছাড়া ডিম, মাছ, মাংস; আর আমাদের সরু-চাকলীর মত এক রকম পিঠে, pankookje বা ইংরিজির pancake, পাতলা গুড় দিয়ে খায়—বাঙালীর জিভে এ জিনিসটি মন্দ লাগ্‌ল না। ডচেরা ইংরেজদের মতন এত কেতা-দুরস্ত নয়—একটু ঢিলা-ঢালা ভাব; তাই এদের সঙ্গে আমাদের বনেও বেশ চট্ ক'রে। প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগারের হেড-খানসামাটি হচ্ছে প্রায় ছ ফুট লম্বা একটি ডচ্ পুরুষ। ডচেরা ইংরেজদের মতন জাতিভেদ মানে না, সাদায়-কালোয় অতটা পার্থক্যবোধ নেই। ডচেরা যবদ্বীপের মেয়ে বিয়ে করে, দেশী স্ত্রী ডচ্-সমাজে নিমন্ত্রণ-সভায় ডচ্ মহিলার মতনই সম্মান পায়। খাটী ডচ্-সমাজে মিশ্র ফিরিঙ্গি মেয়ে-পুরুষ অবাধে মেলে মেশে। আমাদের এই হেড খানসামাটিকে দেখতুম, আধাকালো ফিরিঙ্গি মেয়ে বা পুরুষ যাত্রীকে যে সম্মান ক'রত, তা বিশুদ্ধ ইউরোপীয় ডচ্ যাত্রীদের প্রতি প্রদর্শিত সম্মান থেকে কোনও অংশে কম নয়। বাকে ব'ললেন, এই রূপটাই ডচ সমাজে হ'য়ে থাকে।

আজ সারাদিন খালি কুড়েমি ক'রেই কাটল—ব'সে ব'সে যবদ্বীপের ইতিহাস পড়া গেল। Dr Goris ডাক্তার খোরিস বলে একজন ডচ পণ্ডিত বলিদ্বীপে আছেন, সেখানকার প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা ক'রছেন, তিনি ডচ ভাষায় এই বিষয়ে একখানি

বই লিখেছেন; এই বই অবলম্বন ক'রে বাকে ইংরিজিতে একটি প্রবন্ধ লেখেন. তাতে সংক্ষেপে বলিদ্বীপের প্রচলিত হিন্দু ধর্ম আর অনুষ্ঠানের একটু পরিচয় আছে; এই প্রবন্ধটি বাকে আমায় প'ড়তে দিলেন। (পরে Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XXII, 1926, No. 6, Article No. 36, 'Java and Bali', pp. 351—364 রূপে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হ'য়েছে)।

বিকাল পাঁচটার দিকে আমরা সিঙ্গাপুরে পৌঁছুলুম। কবি যে এই জাহাজেই সিঙ্গাপুর হ'য়ে বাতাবিয়ায় যাচ্ছেন, এ কথা প্রচার হয় নি, কবির সেদিন আবার সিঙ্গাপুরে নামবারও কথা ছিল না। জাহাজ জেটিতে লাগ্‌ল, ধীরেনবাবু আর আমি শহরে একটু ঘুরে এলুম, আর দেশে একটা তার ক'রে দিলুম।

সন্ধ্যের পরে উপরে নিরিবিলিতে আমাদের বেশ কাটল। কবির সঙ্গে নানা বিষয়ে খুব আলাপ-আলোচনা জ'মল।

মাঝ রাত্রে ঘুম ভাঙ্‌তে ক্যাবিন থেকে বাইরে খোলা ডেকে এসে খানিক সময় কাটানো গেল। পরিষ্কার রাত্রি, আধা-চাঁদের আলো সমুদ্রে প'ড়েছে, একদিকে আলোক-মালা পরিহিত সিঙ্গাপুর শহর—কাছাকাছি কতকগুলো বড়ো বড়ো আলো জলের উপরে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে; আর এক পাশে সিঙ্গাপুরের লাগোয়া একটি দ্বীপের উঁচু পাহাড়। খুব দূরে কোনো জাহাজের মেরামতী কাজের হাতুড়ীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আস্‌ছে, আর জেটির ধারে রাস্তার পাশে মালগাড়ী নিয়ে নাড়ানাড়ি ক'রছে এমন ইঞ্জিনের হুস্ হুস্ আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আস্‌ছে; আর সব চুপ্—দিনের অত কোলাহল কোথাও নেই, এই সব টুকরো আওয়াজ সত্ত্বেও একটা বিরাট গাম্ভীর্য্যের আর শান্তির ভাব!

শুক্রবার, ১৯শে আগষ্ট ১৯২৯।—

আজ বিকালে জাহাজ ছাড়বে। সকালে জাহাজে মাল ভরতি হ'তে লাগ্‌ল, দলে দলে তামিল আর চীনা কুলির আগমন। এদের জন্য, আর ডেকের যাত্রী যারা দুপুর থেকে এসে জাহাজে চ'ড়তে লাগ্‌ল তাদের জন্য, জাহাজের সামনে জেটির সড়কে এক বাজার ব'সে গেল। এই সমস্ত ব্যস্ত কুলী আর যাত্রী আর ফেরিওয়ালাদের গমনাগমন হাঁক-ডাক বিকি-কিনির সঙ্গে প্রবহমান জীবনস্রোতে বিরাট জেটির এই অংশটুকু খুব সর-গরম হ'য়ে উঠল। নানা রকম্ ফল-ফুলুরী, ভাত মাছ-মাংস-তরকারী, মনিহারী-জিনিস, কাপড়-চোপড়ের পসারীরা পসার সাজিয়ে ব'সল; তামিল পোদ্দারের দল সিঙ্গাপুরের টাকা ডচ টাকায় ব'দলে দেবে, আর অন্য দেশের টাকাও বদলাবদলি ক'রবে, তারা হাঁকাহাঁকি ক'রতে লাগ্‌ল—দু-চার আনা ক'রে বাটা নেবে এই তাদের লাভ। ক্ষুধার্ত্ত তামিল আর মালাই খালাসী আর কুলীর দল এসে ভাত-তরকারীর পসারীর সামনে উবু হ'য়ে ব'সে, চীনা-মাটির রেকাবে ক'রে ভাত, সব্জী, মাছ আর জলে-গোলা লঙ্কা বাটার মতন একটা চাকনা নিয়ে খেতে ব'সে গেল; পসারী বোধ হয় তামিল মুসলমান, বাঁকে ক'রে দুটো বোঝায় তাঁর মাল-পত্র নিয়ে এসেছে, একটা দিকে তোলা উনুন, রাঁধা আর কাঁচা মাছ তরকারী, আর এক দিকে হাঁড়ীতে ক'রে ভাত, আর জলের বালতী, আর চীনামাটির রেকাবী আর বাটি, আর সাজানো তৈরী তরকারী; নোতুন রান্না আর খ'দ্দেরকে খাওয়ানো এক সঙ্গেই চল'ছে। কবি একবার নামলেন, Kelly and Walshএর দোকানে বই কিন্‌তে; আর আমেরিকান এক্‌স্‌প্রেস কোম্পানীর আপিসে দরকার ছিল সেখানে গেলেন। নামাজীদের আপিসে কেউ তখনও আসেনি—কবি শ্রীযুক্ত নামাজীর এক কন্যার কাছে প্রতিশ্রুত তাঁর নিজের বই একখানি তাঁদের আপিসে পঁউছে' দিলেন, তারপরে তিনি বাকের সঙ্গে জাহাজে ফিরে গেলেন। সঙ্গীদের জিনিসপত্র কেনবার দরকার ছিল,—সুরেনবাবু আর আমি এই সওদা ক'রে পরে জাহাজে ফিরলুম।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে জাহাজেই ব'সে ব'সে জেটির উপরে যে হাট জ'মে উঠেছে তাই দেখতে লাগলুম। দুপুরের পর থেকেই ডেক যাত্রীদের আগমন আরম্ভ। গুজরাটি খোজা আর বোরোরা আসতে লাগল—তাদের অতি কুশ্রী পোষাক পরে—মাথায় জরিদার পাগড়ী, গায়ে

আচকান আর ওভার-কোটের অদ্ভুত সংমিশ্রণ কিম্ভূত-কিমাকার কালো কাপড়ের এক লম্বা বুক-খোলা জামা; প্রচুর মালাই আর যবদ্বীপীয় এল—তাদের মধ্যে চোখ-জুড়ানো রঙের নানা রঙীন সারং পরে কতকগুলি তম্বঙ্গী মালাই মেয়ে, সঙ্গে কতকগুলি অতি সুশ্রী ছোটো ছেলে; জন কতক পাঠান এল, এরা বাতাবিয়া যাচ্ছে; খাঁদানাক খর্ব্বকায় চীনা আর মালাই,—আর কৃষ্ণবর্ণ তামিল—এদের মধ্যে সুদীর্ঘ-বপু উচ্চশির উন্নত-নাসা আর গৌরাঙ্গ পাঠান কয়জনকে কত না তেজীয়ান্ আর সুন্দর দেখাচ্ছিল! এই পাঠানদের সঙ্গে পাঠান মেয়েদের অবগুণ্ঠনযুক্ত পরিচ্ছদে একটী মেয়ে ছিল, এদেরই একজনের স্ত্রী। পাঠান মেয়েরা এমনি ভারতবর্ষেই বড়ো একটা আসে না—এত দূর দেশে কি ক'রে কোথা থেকে এল—মনে একটু কৌতূহল হ'ল। তারপরে দেখি, মেয়েটি অত পরদা মানলে না, মুখের ঘেটা-টোপ অনেকখানি সরিয়ে' দিয়ে, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে পাঠান পুরুষদের সঙ্গে জাহাজে উঠল। তার স্বামী তার হাত ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে চ'লল; তখন তার মুখ দেখা গেল—দেখলুম যে সে পাঠান বা ভারতীয় নয়, একটি সুন্দরী মালাই-জাতীয়া মেয়ে। বুঝলুম, পাঠানদের মধ্যে একজন দূর মালাইদেশে চাকরী বা ব্যবসা উপলক্ষে এসেছে, আর এই দেশের মেয়েই এর চিত্ত জয় ক'রেছে—দুজনেই মুসলমান, বিবাহে বাধা হয় নি। তারপরে পাঠান তার মালাই স্ত্রীকে নিয়ে চ'লেছে যবদ্বীপে।

বিকালে শ্রীযুক্ত বুদ্ধ নামাজী, শ্রীযুক্ত হাজী নামাজী, শ্রীযুক্ত শিরাজী, শ্রীযুক্ত সুরতী, শ্রীযুক্ত জুমাভাই প্রমুখ ভারতীয় বন্ধুরা এসে উপস্থিত হ'লেন। কবির আগমনের খবর এঁরা পেয়েছেন, দেখা ক'রে শিষ্টাচার ক'রে গেলেন।

পাঁচটার দিকে জাহাজ ছাড়ল। প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে, আর ডেকে, এখন বিস্তর নূতন যাত্রী হ'ল—ইংরেজ, মালাই আর যবদ্বীপীয়, জাপানী, জারমান, চীনা, আর তামিল, গুজরাটি মুসলমান, সিন্ধী। ডেক একেবারে ভর্ত্তি। যবদ্বীপীয় নিম্নশ্রেণীর লোক অনেক; বেতের ঝোড়ায় ক'রে সব খাবার-দাবার নিয়ে যাচ্ছে, রঙীন সারং পরে ডেক জুড়ে শুয়ে আর ব'সে আছে।

আজও সান্ধ্য ভোজনের পরে অনেক ক্ষণ ধ'রে কবির সঙ্গে উপরের ডেকে ব'সে ব'সে নানা বিষয়ে গল্প আর আলোচনা চ'ল্ল। যবদ্বীপে পরশু আমরা নামবো। এতদিন পরে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বাণীর এই নবযুগের জন্য যোগ্য বাহক হ'য়ে কবি যবদ্বীপে যাচ্ছেন। একরকম ভারতের প্রতিভূ হ'য়েই তিনি চ'লেছেন, যবদ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগের কত না স্মৃতি তাঁর এই যাত্রায় জাগিয়ে' তুলবে। সময় আর অবস্থার উপযোগী একটি কবিতা তিনি লিখবেন। সেই কবিতা,ইংরিজি আর ইংরিজির থেকে ডচ্ আর যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুবাদেরই দ্বারায়, যবদ্বীপের জনগণের কাছে ভারতের প্রীতির শ্রেষ্ঠ এক প্রতীক বা অর্ঘ্য স্বরূপে উপস্থাপিত করা হবে।

শনিবার ২০শে আগষ্ট ১৯২৭।—

বাতাবিয়ার পথে, সরাসরি দক্ষিণ-মুখো চ'লেছি। আকাশ খটখটে, পরিষ্কার সমুদ্র। দুপুরে সুমাত্রার পূবে Banka বাঙ্কা দ্বীপের প্রধান বন্দর Muntok মুন্তোক-এ জাহাজ ধ'রলে। সুমাত্রা আর বাঙ্কা—এই দুইয়ের মাঝে একটি প্রণালী, তার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাবে। ডাইনে সুমাত্রা, দক্ষিণ-সুমাত্রার রাজধানী Palembang পালেমবাং—যার প্রাচীন নাম ছিল শ্রীবিজয়, বা শ্রীবিষয়। বাঙ্কা দ্বীপটীতে টিনের খনি আছে, তাই এ জায়গার কদর। জন কতক ডচ্ খনির ইঞ্জিনিয়ার খনির কাজের তদ্বির করবার জন্ম আছেন, আর আছে কিছু চীনা কুলি, কিছু মালাই। মুন্তোক বন্দর অতি চটান অগভীর উপকূলে অবস্থিত, বড় জাহাজ বন্দরের কাছে যেতে পারে না; দূরে গভীর জলে তাই আমাদের জাহাজ নঙ্গর ক'রলে, ডাঙা থেকে নৌকা এলো, নোতুন যাত্রী, ডাক আর মাল-পত্র এনে তুলে দিলে, বাঙ্কার জন্ম যাত্রী প্রভৃতি নিয়ে গেল। জন ছয়-সাত ডচ্ পুরুষ, আর তাদের সঙ্গে জন দুই-তিন ডচ্ মেয়ে, সরকারী নিশানওয়ালা নৌকা ক'রে এসে আমাদের জাহাজে উঠ্‌ল,—আর যে ঘণ্টা খানেক ওখানে আমাদের জাহাজ আটুকে ছিল, এরা সেই সময়টুকু জাহাজের প্রথম শ্রেণীর

বৈঠকখানায় ব'সে কাপ্তেন আর অফিসার আর অন্য সব ভদ্র মেয়ে পুরুষের সঙ্গে গল্প ক'রলে, বিয়ার খেলে। এই দূর দ্বীপে বেচারীরা প্রবাসে কাটাচ্ছে; সপ্তাহে দুই একবার এই রকম যা যাওয়া-আসার পাড়ি দিচ্ছে এমন জাহাজে স্বজাতীয়দের মুখ দেখতে দেখতে আসে, বাইরের দুনিয়ার দু-একটা খবর শুনতে আসে। আমাদের জাহাজ ছাড়বার সময় হ'ল, এরা বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

বাঙ্কা আর সুমাত্রার মধ্যকার সাগর প্রণালীটি নাকি বড়ই বিপদসঙ্কুল। এখানে চোরাবালি আছে, আর জলের তলায় ডোবা পাহাড়ও আছে, পাহাড়ের সঙ্গে জাহাজের ধাক্কা লেগে গেলেই সর্ব্বনাশ, জাহাজ ভেঙে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায়। বছর কয় পূর্ব্বে একখানা জাহাজ এই অবস্থায় ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ফলে ভেঙে ডুবে যায়—ইউরোপ-যাত্রী জাহাজ; পরিষ্কার চাঁদিনী রাত, সমুদ্র প্রশান্ত ছিল—জাহাজে একটি থিয়েটারের দল যাচ্ছিল, সন্ধ্যার আহারের পরে একটু নাচ গান চল্ছিল, এমন সময়ে এই সর্ব্বনাশ, হঠাৎ জাহাজ ডুবে যায়। যাত্রীদের যারা জলে পড়েছিল তারা সাঁতরে কোনও রকমে ডাঙায় উঠতে পার্‌ত, কিন্তু এ অঞ্চলে ভয়ানক হাঙরের উৎপাত—হাঙরের হাত থেকে অতি অল্প লোকই বাঁচতে পেরেছিল।

একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী এসে আলাপ ক'রলেন—কবির সঙ্গে দু-একটি কথা কইতে তাঁর বড়ো ইচ্ছে, সিঙ্গাপুরে কবিকে দেখেছেন, তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁর বইও পড়েছেন। নিজের পরিচয় দিলেন; বাগ্‌দাদের আরবী-ভাষী য়িহুদী, বোম্বাইয়ে ব্যবসা ক'রতে আসেন, বোম্বাই থেকে সিঙ্গাপুরে আগমন, আর সেইখানেই অবস্থান; এঁরা এখন ডচ্ প্রজা ব'নে গিয়েছেন;—এঁর এক ছেলে হলাণ্ডে গিয়ে ডাক্তারী প'ড়েছেন, চোখের ডাক্তার হ'য়ে ফিরেছেন, যবদ্বীপে সুরাবায়াতেই পেশা শুরু করবেন; ছেলের সঙ্গে সুরাবায়াতে চ'লেছেন। কবির অনুমতি পেয়ে এঁকে এনে কবির সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলুম, সপুত্রক ভদ্র-লোকটি এলেন, কবির শিষ্টাচারে তুষ্ট হ'য়ে চ'লে গেলেন।

কাল সকালে বাতাবিয়ায় পৌঁছুবো। কবি যবদ্বীপের উপরে একটি চমৎকার কবিতা রচনা ক'রেছেন। আমাদের শোনালেন, আর আমরাও নিজেরা নিয়ে প'ড়লুম। সেটির একটি ইংরিজি তরজমা ক'রতে ব'সলুম সন্ধ্যাবেলায়, জানি যে নিজের তরজমা ছাড়া অন্য কারুর তরজমাতে কবির পূর্ণ প্রীতি হয় না, আর আমার অনুবাদ কবিতার উপযুক্ত হবে না; তবে আমার তরজমা ক'রতে বসার উদ্দেশ্য, সেটা দেখে তাকে বাতিল ক'রে কবি নিজেই তরজমা ক'রে তাঁর বাঙলা কবিতার মর্য্যাদা নিজে রক্ষা ক'রবেন। হ'লও তাই—এই কবিতাটির ইংরিজি নিজেই আগাগোড়া ক'রে ফেললেন। বাকে তখন সেটির ডচ অনুবাদ ক'রতে লেগে গেলেন। (এই বাঙলা কবিতাটি ১৩৩৪ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হ'য়েছে—কবিতাটির আরম্ভটা এই রকম—'তোমায় আমায় মিল হয়েচে কোন্ যুগে এইখানে, ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েচে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।' ইংরিজি তরজমাটা পরে বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত হ'য়েছিল।) কবিতাটির যবদ্বীপীয় অনুবাদও হ'য়েছিল, আর যবদ্বীপের একজন শ্রেষ্ঠ কবি তার উত্তরে একটি সুন্দর কবিতা লেখেন, ডচ আর ইংরিজি অনুবাদ সমেত রোমান অক্ষরে তার মূলটি আমরা যথাসময়ে পাই।

প্রাচীন ভারতে রাজ্যপালন প্রণালী

শ্রীহরিহর শেঠ

প্রাচীন ভারতে রাজারা রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু কোন বিষয়েই তিনি সর্ব্বতোভাবে ক্ষমতাশালী হইতে পারিতেন না—মন্ত্রিগণের পরামর্শ ব্যতীত রাজ্যরক্ষা ও শাসনকার্য্য পরিচালনার অধিকারী ছিলেন না। বিবিধ গুণালঙ্কৃত এইরূপ মন্ত্রীর সংখ্যা সাধারণতঃ সাত আট জন থাকিত। রাজ্যের অপর সকল বিষয়ে যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁহাকে সেই বিষয়ের তত্ত্বাবধানকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত।

প্রজাপালন জন্য রাজাকে সমস্ত বিধান-সংহিতা মানিয়া চলিতে হইত। স্বচক্ষে সমুদয় দেখা সম্ভবপর হইত না বলিয়া রাজা উপযুক্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পরিদর্শনার্থ তত্ত্বাবধারক, গুপ্তচর, ছদ্মবেশধারী পুরুষ প্রভৃতি নিযুক্ত করিতেন।

ক্ষুদ্র গ্রামেও রাজার প্রতিনিধি থাকিত। পল্লীগ্রামে পঞ্চায়েৎ বিধি ছিল। সেখানে ছোট ছোট শাসনকার্য্য গ্রামীণ বা মণ্ডল দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। যে কার্য্য তাঁহার ক্ষমতার মধ্যে না হইত তিনি তাহা দশ গ্রামীণের নিকট পাঠাইতেন। তিনি যাহা না পারিতেন তাহা বিংশতীশের কাছে বিচারের জন্য প্রেরিত হইত। আবার এখান হইতে শতগ্রামশাস্তার—এইরূপে ক্রমশঃ উচ্চপদবীর ক্ষমতা-প্রাপ্ত লোকের কাছে বিচার ও শাসন জন্য দেওয়া হইত। ইহারা কেহই বেতনভোগী হইতেন না, সকলেই পদানুযায়ী ভূমি, গ্রাম বা নগর নিকর ভোগ করিবার জন্য পাইতেন। আবার ইহাদের কার্য্য পরিদর্শন জন্য প্রতি নগরে একজন করিয়া সর্ব্বার্থচিন্তক নামে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মচারী থাকিত। তাঁহার কাজের ন্যায় অন্যায় বিচার-ভার রাজার উপর ন্যস্ত থাকিত।

বিচারকার্য্য রাজা কখনও একাকী সম্পন্ন করিতেন না। যখন তিনি এ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন তখন সাধারণতঃ তিনজন মন্ত্রী তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। তিনি কোনদিন কোন কারণে উপস্থিত হইতে না পারিলে তাঁহার প্রতিনিধির দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইত। বিচারাসনে রাজার প্রতিনিধিকে প্রাড্‌বিবাক্ বলিত। মন্ত্রীত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই প্রায় এ আসনের ভারপ্রাপ্ত হইতেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অভাবে পর পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রীর উপর বিচারভার ন্যস্ত হইত। যিনিই বিচার করুন অপর দুইজন মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ না করিয়া একার্য্য করিতে পারিতেন না। বিচারকালে অন্যান্য সভ্যগণও উপস্থিত থাকিতেন। বিচারকালে কুলশীল-সম্পন্ন ও বয়োবৃদ্ধ লোকবৃত্ত-তত্ত্বজ্ঞ এবং বার্ত্তাশাস্ত্রদর্শী বণিক সভায় উপস্থিত থাকিতেন। উপস্থিত সভ্যগণের নিকট হইতে আবশ্যকমত বিচার-বিষয়ক পরামর্শ লইবার প্রথাও ছিল। অর্থী-প্রত্যর্থীদের বাক্যের বশানুসারে বিচারাসনে সমাসীন বিচারককে বিচারমার্গে আনয়ন করিতে যাঁহারা সহায়তা করিতেন তাঁহাদিগকে ব্যবহার-জীব বলা হইত।

বিচারকালে অগ্রে বাদীর প্রার্থনা শ্রবণ করা হইত এবং তাহার সমস্তই লিখিয়া লওয়া হইত। তৎপর প্রতিবাদীকে বাদীর সমক্ষে সমস্ত অভিযোগের কারণগুলি শুনাইয়া দেওয়া হইত। ইহা হইতেই যদি তত্ত্ব নির্ণয় হইয়া যাইত তাহা হইলে আর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইত না, নচেৎ হইত। বাদী প্রতিবাদী ও সাক্ষী সকলকেই প্রথমে সত্য শ্রাবণ করানোর প্রথা ছিল। সাক্ষীর জবানবন্দী সমস্তই লিখিয়া লওয়া হইত। বাদীর সাক্ষী কোন বিষয়ে অপলাপ করিয়াছে মনে হইলে প্রতিবাদীর পক্ষের সাক্ষী গ্রহণ করার ব্যবস্থা ছিল। মিথ্যা সাক্ষী দিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইত।

বিচারে যে ব্যক্তি জয়ী হইত তাহাকে যে কাগজপত্র দেওয়া হইত তাহাকে জয়পত্র বলিত। এ জয়পত্রে বাদী

প্রতিবাদী ও সাক্ষীর নামগোত্রাদি, বাদ-প্রতিবাদ, সাক্ষীর বচন-প্রতিবচন, বিচারকের প্রশ্ন ও বিচার, জয় পরাজয়ের কারণ, অভিযোগের সময়, বিচারনিষ্পত্তির সময়, কাহার দ্বারা বিচারকার্য্য হইল, এ সমস্তই লিখিয়া দেওয়ার রীতি ছিল।

পূর্ব্বকালে সুবিচারে সন্দেহ হইলে পুনর্বিচারের ব্যবস্থাও ছিল। বিচারকালে অভিযোক্তা অথবা অভিযোগীর পক্ষে প্রমাণ-প্রয়োগাদি পরিশুদ্ধরূপে গ্রহণ না হইয়া থাকিলে পুনর্বিচার হইতে পারিত। প্রাড্বিবাকাদি দ্বারা নিষ্পাদিত বিচারের প্রকৃত দোষ দেখাইতে না পারিলে অভিযোগ পুনর্নিষ্পাদনযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইত না। রাজার সমক্ষে ভিন্ন অন্যত্র পুনর্বিচার হইত না, এমন কি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পুনর্বিচার স্থগিত থাকিত। প্রথম বিচারপতির নিষ্পন্ন বিচারে দোষ প্রমাণিত হইলে দ্বিতীয় বিচারের মতানুসারে নৃপতি কর্ত্তৃক প্রথম বিচারকের দণ্ডবিধান করার ব্যবস্থা ছিল।

সেকালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ধর্ম্মাধিকরণ ভিন্ন সালিশির দ্বারাও বিবাদ নিষ্পত্তি হইত। কুল, মিত্র, শ্রেণী, পরিবার-রক্ষক, পিতা, মাতা এবং গুরু পুরোহিতাদিই অধিকাংশ স্থলে সালিশির কার্য্য করিতেন। ইঁহাদের দ্বারা নিষ্পন্ন মোকদ্দমার পুনর্বিচারের অর্থাৎ আপীলের স্থল থাকিত না।

শপথ ও দিব্য সম্বন্ধে তখনকার কালে এই নিয়ম ছিল, অভিযোগের কারণ সামান্য হইলে সাধারণতঃ পুত্রের মস্তক অথবা প্রিয় ব্যক্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইত। ব্রাহ্মণ বৈশ্যাদি জাতিদের জন্য শপথেরও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল।

পূর্ব্বকালে বিচারকার্য্যের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিশেষ কারণ ভিন্ন দিবসের প্রথম যাম অতিক্রান্ত হইলেই বিচারকার্য্য আরম্ভ হইত এবং চতুর্থ যাম পর্য্যন্ত বিচার হইত। মনে হয় সাধারণতঃ দিবা দুই প্রহরের পর সেদিন আর নূতন অভিযোগের বিষয় শ্রুত হইত না।

সাক্ষ্যগ্রহণ-বিষয়েও সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। পূর্ব্বাহ্লই সে সময় ছিল। স্বকর্ণে শ্রবণ ও স্বচক্ষে দর্শন ব্যতিরেকে কেহ সাক্ষী দিতে পারিত না। পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখ হইয়া যে যাহা দেখিয়াছে বা স্বকর্ণে শুনিয়াছে সে বিষয়ে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিবার নিয়ম ছিল। দেব-দ্বিজ এবং অর্থী-প্রত্যর্থীর সমক্ষে স্বয়ং রাজা অথবা প্রাড্বিবাক সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতেন। সাক্ষীকে বারংবার এক কথা জিজ্ঞাসা করা অথবা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আভাস দ্বারা তাহাকে সহায়তা করার প্রথা ছিল না।

চৌর্য্য ও হত্যাদি বিষয়ে যে কেহ সাক্ষী হইতে পারিলেও ঋণদানাদিরূপ বিষয়ে পাষণ্ড, নাস্তিক, মিথ্যাবাদী অপোগণ্ড বালক, ছলকারী, জটাধারী, ছদ্মবেশী, স্ত্রীজাতি, ধূর্ত্ত, ক্লীব, অঙ্গহীন মদ্যসংসর্গী ব্যক্তি, মহাপথিক, অযাজ্যযাজী, নট, নটী, সন্ন্যাসী, একস্থান-স্থায়ী, শত্রু, মিত্র, ও অবিভক্ত ভ্রাতা প্রভৃতি সাক্ষী হইতে পারিত না। তখন ঋষিগণ, রাজা, সন্ন্যাসী, বিদ্বান ও অতিবৃদ্ধের সাক্ষ্যদান হইতে নিষ্কৃতি ছিল।

ব্রাহ্মণের আধিপত্য ও প্রভুত্ব এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বিচারাসন ও মন্ত্রিত্ব সব সময়েই সর্ব্বাগ্রে বিপ্রজাতির প্রাপ্য ছিল। তদভাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বৈশ্যদের দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মন্ত্রণা বা পরামর্শ অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে শাসন করিবার ক্ষমতা রাজার ছিল না। মন্ত্রি-সঙ্ঘের সহিত পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন বিশিষ্ট কাজ করা রাজার ক্ষমতাধীন ছিল না। জাতি-মর্য্যাদা বা বংশ-গৌরব রাজকার্য্যে আদরণীয় ছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বদা স্বীকৃত হইলেও সেকালে নির্গুণ ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন এবং সগুণ শূদ্রও ক্রমে দ্বিজত্ব লাভ করিতে পারিত।

দূতের পদ পূর্ব্বকালে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ও গৌরবময় ছিল। তিনিও মন্ত্রিগণবাচ্য ছিলেন। বহুগুণসম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দূতপদে নিযুক্ত করা হইত। মিত্র ভূপতির সহিত সন্ধিবিগ্রহকালে তাঁহার অভিমত আবশ্যক হইত। সেনাপতিও একজন মন্ত্রিমধ্যে পরিগণিত হইতেন। সৈন্যসামন্ত পরিদর্শন পরিচালন প্রভৃতি ভিন্ন দণ্ডনীতিও তাঁহার আয়ত্তাধীন থাকিত। কুলপুরোহিতও রাজসভায় অমাত্যমধ্যে গণ্য হইতেন। বিচারকালে তাঁহার মতও প্রবল বলিয়া পরিগণিত হইত।

কর ও শুল্ক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতে অনেকাংশে এখনকার মতই গৃহীত হইত, কিন্তু কখনও তাহা অত্যধিক ছিল না, প্রজার পক্ষে ক্লেশকর ছিল না। অবস্থাবিশেষে ব্যক্তিবিশেষকে করভার হইতে নিষ্কৃতি দেওয়াও হইত। বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, অন্ধ, জড়, মূক, স্থবির প্রভৃতিও রাজকর হইতে মুক্ত ছিলেন। গৃহীত অর্থ সমস্তই প্রজাপালনে ব্যয়িত হইত। আয়, ব্যয় ক্ষয় ও বৃদ্ধি বিবেচনায় পণ্যদ্রব্যের আগম-নির্গমের দূরতা এবং পণ্যের প্রয়োজন অনুসারে মূল্যনিরূপণ করিয়া পরিমিত শুল্ক গৃহীত হইত। অচিরস্থায়ী মূল্যের পণ্যের মূল্য অনেক সময় হাটের মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে নির্দ্ধারিত হইত।

দোকানদারেরা মানদণ্ড ও পরিমাপক পাত্র তাহাদের ইচ্ছামত রাখিতে পারিত না। উহা রাজসরকার হইতে ছয় মাস অন্তর পরীক্ষা করা হইত। রাজকোষের আয়-ব্যয় পরীক্ষা, দূত ও গুপ্তচরের নিকট দৈনিকবার্ত্তা গ্রহণ করা, এ সকল কাজ রাজার নিজস্ব ছিল।

কোন প্রনষ্ট ধনের উদ্ধার হইলে স্থল ও বস্তু বিশেষে রাজাকে উহার ষষ্ঠাংশ হইতে দ্বাদশাংশ পর্য্যন্ত দিবার রীতি ছিল। আয়কর অথবা ব্যবসা-করের ন্যায় তখনও একপ্রকার রাজকর ছিল। অরণ্যের দ্রুম, মৃগয়ালব্ধ মাংস, বন হইতে আহৃত মধু, গোষ্ঠোৎপন্ন ঘৃত, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ওষধি বৃক্ষের রস, পত্র, শাক, ফল, মূল, পুষ্প ও তৃণ, ধেনুচর্ম্ম-নির্ম্মিত বা মৃণ্ময়পাত্র ও সর্ব্বপ্রকার প্রস্তরময় দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহাদের লভ্যাংশের ষষ্ঠ ভাগ কররূপে লওয়া হইত। পণ্যদ্রব্যের মূল্যাদি নিরূপণ বিশেষজ্ঞদের সহায়তাতেই নির্দ্ধারিত হইত। পশুপাল অথবা মণিমাণিক্যাদি বিক্রয়কারীদের লভ্যাংশের পঞ্চাশৎ ভাগের একভাগ রাজার প্রাপ্য ছিল। সাধারণতঃ ধান্যাদি শস্যেরও ষষ্ঠাংশের এক অংশ রাজস্ব-স্বরূপ দিতে হইত। তবে ক্ষেত্র, কাল, কৃষকের পরিশ্রম, উৎপাদনের ব্যয় প্রভৃতি বিবেচনায় বিশেষস্থলে দ্বাদশ ভাগের এক ভাগও দিতে হইত।

কুম্ভকার, মালাকার, সূপকার, সূত্রধর, চিত্রকর, মোদক, নাপিত, তন্তুবায়, স্বর্ণকার প্রভৃতি যাহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহাদের প্রতিমাসে একদিন করিয়া বিনা বেতনে রাজার কার্য্য করিয়া দিতে হইত। বাস্তুবাটীর উপর বার্ষিক কর গ্রহণেরও ব্যবস্থা ছিল।

তখনকার দিনে কালাতিক্রম-দোষ অর্থাৎ তামাদি সম্বন্ধেও বিধি ছিল। স্বল্পকালমধ্যে কোন ব্যক্তির স্বত্ব নষ্ট হইত না। দশ বৎসর অতীত না হইলে দেনা-পাওনার তামাদি হইত না। কোন ব্যক্তির কোন ধন তাহার সমক্ষে কেহ দশ বৎসর নির্ব্বিবাদে উপভোগ না করিলে তাহাতে তাহার স্বত্ব জন্মিত না। ভূমি-সম্বন্ধে ঐরূপ বিশ বৎসর না যাইলে উপভোগের স্বামিত্ব জন্মিত না। অপ্রত্যক্ষে যদি কেহ তাহার তিন পুরুষ কোন ভূমি বা ধন নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিত তবে তাহার ঐ বস্তুতে স্বত্ব জন্মিত। জ্ঞাতি, বন্ধু, সকুল্য, জামাতা, শ্রোত্রিয়, রাজা ও রাজমন্ত্রী সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। তাঁহারা বহু কাল উপভোগ করিলেও স্বামিত্ব জন্মিত না। অশক্ত, জড়, রোগার্ত্ত, বালক, ভীত ব্যক্তি, প্রবাসী, জন এবং রাজ-কার্য্যে নিয়োগহেতু ভিন্নদেশবাসী ব্যক্তিগণের কোন বস্তু প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অপরে উপভোগ করিলে ঐ সকল বস্তুর স্বামিত্ব নষ্ট হইত না।

প্রাচীনকালে লেখাপড়া-সংক্রান্তও কতকগুলি নিয়ম ছিল। লেখাপড়ার মধ্যে যাহা থাকিত তাহাকেই বিশেষ প্রমাণ বলিয়া ধরা হইত। তখন কাগজের প্রচলন হয় নাই, পত্র শব্দে তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র ও তাড়িৎ পত্র বুঝা যাইত। রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরাদি দানপত্র তাম্রফলকে লিখিত হইত, তাহাকে তাম্রশাসন বা তাম্রপত্র বলা হইত। উহাতে দাতাগৃহীতার নাম গোত্রাদি এবং দান-সংক্রান্ত সবিশেষ কথা লেখা থাকিত। তাম্রফলকের অভাবে কাষ্ঠফলকও ব্যবহৃত হইত। দেবপ্রতিষ্ঠাদি বিষয় প্রস্তরফলকে খোদিত হইত।

দানলেখ্যের সাধারণ নাম ছিল দানপত্র। নৃপতি কোন ব্যক্তি-বিশেষের বীরত্বে বা অন্য কোন গুণে সন্তুষ্ট হইয়া যে দান করিতেন এবং তাহার প্রমাণ-স্বরূপ যে লিখিত পত্র দিতেন তাহাকে প্রসাদপত্র বলা হইত।

বিচারনিষ্পত্তির পর জয়ী ব্যক্তিকে যে লেখা দেওয়া হইত তাহাকে জয়পত্র বলিত, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। উহা প্রায়ই স্পষ্ট অক্ষরে লেখা হইত। সম্পত্তি আদি বিভাগ হইয়া যে লেখাপড়া হইত তাহাকে বিভাগপত্র বলিত। ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে যে লেখা প্রস্তুত হইত তাহাকে ক্রয়-লেখ্য ও বিক্রয় বা সম্পত্তি-লেখ্য বলিত। বন্ধকী লেখাপড়া যাহা হইত তাহার মধ্যে উত্তমর্ণের লেখ্যকে সম্মতিপত্র এবং অধমর্ণের প্রদত্ত পত্রকে অধিলেখ্য বলিত। প্রজাবর্গ রাজার নিকট যে-সব প্রতিজ্ঞাপত্র দিত তাহার নাম ছিল সংবিৎপত্র। দাস প্রভুর নিকট যে লেখ্য দিত তাহার নাম দাসলেখ্য। অধমর্ণ ঋণ লইয়া উত্তমর্ণকে যে লেখ্য দিত তাহার নাম ছিল কুসীদ অথবা ঋণলেখ্য। রাজা প্রজাকে, প্রভু ভৃত্যকে, এবং উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যাহা লিখিয়া দিত তাহার নাম ছিল সম্মতি-পত্র।

বৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে প্রাপ্ত সামগ্রী-বিষয়েও কতকগুলি নিয়ম ছিল। বিদ্বান ব্রাহ্মণ সেরূপ কিছু পাইলে উহা রাজাকে জানাইয়া আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। রাজা স্বয়ং কোন গুপ্তধন পাইলে অর্দ্ধাংশ বিদ্বান্ ভূদেববর্গকে দিয়া অবশিষ্ট নিজে রাখিতেন। প্রাপ্ত ধনে যদি কোন ব্যক্তি সত্যবাদপূর্ব্বক দাবী করিত তবে রাজার জন্ত ষষ্ঠাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট তাহাকে দেওয়া হইত, কিন্তু পরে মিথ্যা প্রমাণিত হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইত এবং প্রদত্ত ধন তাহার নিকট হইতে লওয়া হইত। অস্বামিন্ ধন প্রাপ্ত হইলে উহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ জন্ত তিনবর্ষ পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইত এবং উত্তরাধিকারী অন্বেষণ জন্ত ঘোষণা প্রচার করার ব্যবস্থা ছিল। এই সময় মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ কেহ উপস্থিত হইলে তাহাকেই দেওয়া হইত, নচেৎ রাজকোষে গৃহীত হইত।

কুসীদ-বিষয়েও প্রাচীন ভারতে কতিপয় নিয়ম ছিল। কুসীদ শব্দে সুদ বুঝায়। শাস্ত্রানুসারে কুসীদজীবীর কাজ তখন অতি নিন্দনীয় ছিল। কেবল বৈশ্য জাতির পক্ষে এই ব্যবসায় অবিধেয় ছিল না। সে সময়ে ঋণের আসল ও সুদ এই দুই জড়াইয়া কখনও মূলের দ্বিগুণ হইতে পারিত না। ধান্তের পক্ষে এ নিয়ম ছিল না। তামাদির পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত সুদ ধরিলেও প্রত্যেক বর্ষে শতাংশের পাঁচ অংশের অধিক পাইত না। শেষ-কালে মূল ও সুদ উভয় মিলাইয়া কখনও দ্বিগুণের অধিক হইতে পারিত না। সুদের সুদকে চক্রবৃদ্ধি বলিত। ঋণদানের সময় চক্রবৃদ্ধির কথা না থাকিলে উত্তমর্ণ স্ব-ইচ্ছায় চক্রবৃদ্ধি গ্রহণের অধিকারী হইত না। এজন্য অঙ্গীকার-পত্র লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মাসে মাসে বা বর্ষে বর্ষে যাহারা সুদ লইত তাহারা চক্রবৃদ্ধি পাইত না। মাসে মাসে যে সুদ দেওয়া হইত তাহাকে কালিকা বলা হইত। নির্দ্দিষ্টকালে যে ঋণ শোধ হইত তাহাকেও কালিকা বলা হইত। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যে সুদ পরিশোধ হইত তাহাকে বলিত কায়িকা। বন্ধুবান্ধবকে সুদের কোন কথা না কহিয়া ঋণদান করিলে তখনকার আইনে সুদ দিতে বাধ্য থাকিত না। যদি কথার একটা নিষ্পত্তি হইত তখন সুদ না দিলে বিচারে বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকার অধিক সুদ কখন পাইতে পারিত না।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে অংশীদার লইয়া কাজ করিলে শতাংশের দুই ভাগ সুদ লইবার নিয়ম ছিল। শুক্ত অংশীদারের অংশের কোন উল্লেখ না থাকিলে সে ব্যক্তি লাভের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র পাইত।

প্রাচীনযুগে রাজ্যপরিচালন ও রাজ্যরক্ষা ভিন্ন প্রজা-সাধারণকে সর্ব্বাংশে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। অনাথ বালক-বালিকাদের বিষয়-বিভব, [illegible] জাতি, আচার-ব্যবহার রক্ষা এবং বিদ্যাশিক্ষা, সৎক্রিয়া প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ের সমস্ত ভার রাজা গ্রহণ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। মৃতপিতৃক শিশু যাবৎ বয়ঃপ্রাপ্ত ও জ্ঞানবান না হইত তাবৎ তাহাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। তৎপরে বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া লইবার মত ক্ষমতা হইলে রাজা সর্ব্বসমক্ষে তাহার সমস্ত বিষয় বৃদ্ধিসমেত তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতেন।

অনাথা স্ত্রীজনের প্রতিও রাজাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। বন্ধ্যাত্বহেতু যে স্বামী দারান্তর গ্রহণ করিয়া স্ত্রীকে পৃথক

হিমালয়ের সঙ্গীত

শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।]

য়া দিত, যে স্ত্রীলোক অনুদ্দিষ্টপতিক ও পুত্রাদি-রহিত, যে প্রোষিতভর্ত্তৃক, যে বিধবা নারীর পিতামাতা বা শ্বশুরকুলে অভিভাবক কেহ নাই অথবা যে নারী সামর্থ্যবিহীনা তাঁহারা সাধ্বী ও ধর্ম্মশীলা থাকিলে তাঁহাদের ধনমান, আচার-ব্যবহার সবই রাজা রক্ষা করিতেন।

সে সময় মৃতপিতৃক অনাথা স্ত্রী প্রভৃতি ছাড়া উন্মত্ত, জড়, মূক, অন্ধ আতুরাদি ব্যক্তিগণও রাজার পোষ্যমধ্যে পরিগণিত হইত। তাহাদিগের মধ্যে যাহার ধনসম্পত্তি থাকিত তাহাও সযত্নে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করা হইত এবং পরে উত্তরাধিকারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে সমস্ত সমর্পণ করা হইত।

প্রাচীন ভারতে রাজ্যপালন বিষয়ে এই সকল বিধি নিয়ম যখন প্রস্তুত হইয়া প্রবর্ত্তিত ছিল, তখন পাশ্চাত্য জাতিদের নাম পর্য্যন্ত এ দেশে বিশেষভাবে জানা ছিল না। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য জাতিদের দ্বারা শাসিত রাজ্যে যে-সকল আইন ও ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মিনিষ্টার, গ্রাম্যপঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, কাউন্সিল, ক্যাবিনেট্, উকিল, জুরি, ডিউটি, লাইসেন্, কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ড্স্ প্রভৃতির ঠিক অনুরূপ বিষয়গুলি যে তখন ছিল তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং মনে হয় ভারতের নিকট হইতেই বুঝি তাঁহারা এ সব পাইয়াছেন।*

* এই প্রবন্ধের প্রত্যেক বিষয়ই মনু, পরাশর সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, শৈবপুরাণ, নারদ সংহিতা, বৃহস্পতি সংহিতা, কাত্যায়ন সংহিতা, ব্যবহারতত্ত্ব, ব্যাস সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে গৃহীত। বাহুল্য ভয়ে মূল শ্লোকগুলি এখানে উদ্ধৃত করি নাই। "ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা" নামক একখানি গ্রন্থমধ্যে এ সমস্ত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণগুলিই একত্র সংগৃহীত আছে। বিশেষভাবেই আমি এ গ্রন্থের সহায়তা লইয়াছি।

ক্রীতদাসী*

শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরী

রায়ো ডি জ্যানীরোর বন্দরটি দেখিতে অতি সুন্দর এবং পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দরের মধ্যে একটি। যে উপসাগরের কূলে ইহা অবস্থিত, উহাকে মহাসাগর বলিলেও হয়। যত বড় নৌবাহিনীই হোক না কেন, এখানে আসিয়া নঙ্গর করিতে পারে।

আমার বন্ধু থাসেল্ এখানে বাস করিতেন। তিনি ওকালতী করিতেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ফরাসী, মাতা ব্রেজিলের এক ধনবতী মহিলা। মতামত তাঁহার উদারনৈতিক ছিল, ব্রেজিলের যথার্থ উন্নতির জন্ত তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। রক্ষণশীলদলের আর সকল কার্য্যের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা-মিশ্রিত করুণা দেখা যাইত, কিন্তু দাসত্বের বিষয়ে তিনি একেবারে দৃঢ়মত পোষণ করিতেন। এই মহা-পাপের সহিত কোনো আপোষ করা যায় না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ইহার সমূল উচ্ছেদসাধনের জন্ত তিনি প্রাণপণে লড়িতেন। সবল মানুষের দুর্ব্বল মানুষকে ক্রয় বিক্রয় করিবার অধিকার আছে, ইহা তিনি কিছুতেই স্বীকার করিতেন না।

একদিন ফেরী ষ্টীমারে নিকৃথিরয়ে যাইতেছি, এমন সময় যাত্রীদের মধ্যে থাসেলকে দেখিলাম। তাঁহার সদা-প্রফুল্ল মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং উত্তেজিত দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। আমি সহাস্য মুখে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার নিকটে বসিলাম এবং কথা-বার্ত্তা বলিয়া তাঁহার মনোভার দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। খানিক পরে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিলাম কেন তিনি এত বিষণ্ণ হইয়া আছেন।

* Elias Zerolo র স্পেনীয় গল্প হইতে

উত্তরে তিনি আমাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং কিছুদূরে, যেখানে একদল ক্রীতদাস দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে লইয়া গেলেন। ঐ হতভাগ্যগণ পরস্পরের গা ঘেঁষিয়া এমনভাবে দাঁড়াইয়াছিল, যেন পরস্পরের সান্নিধ্য হইতেই তাহারা কোনো সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। উহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধকে দেখিলাম, সে একটি সুন্দরী বালিকাকে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল ঝরিতেছে।

থাসেল তাহাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। আমরা দাঁড়াইয়া উহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

"এরা দুজন পিতা এবং কন্যা, দুই ভিন্ন প্রভুর কাছে দুইজনকে বিক্রী করা হয়েছে। আমরা নিকৃথিরয় পৌঁছলেই এদের ছাড়াছাড়ি হবে। যে আইনে এরকম অত্যাচার প্রশ্রয় পায়, তা কি নারকীয় নয় ?"

আমি তাঁহার উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এদের চেনেন নাকি ?"

তিনি তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "না এদের চিনি না। ষ্টীমারে উঠে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, এদের ইতিহাস শুন্‌লাম। কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। যেমন ব্যবস্থা, তেমনি অবস্থা। জিনিষের মালিকের অধিকার আছে, যার কাছে খুশী জিনিষ বিক্রী করবার।" অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি আবার দুঃখিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "এই মানুষগুলোর দুর্গতি দেখলে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। আমাদেরই মত এদের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি আছে, আমাদেরই মত এদেরও শিরায় লাল রক্ত প্রবাহিত। এই বেচারা বৃদ্ধ পিতা, আর তার মেয়েটিকে দেখে আমার যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে, তোমায় বলতে পারি না। এদের দেখে আমার নিজের পারিবারিক এক শোচনীয় ঘটনা আমার মনে পড়ছে। সে অনেক বছর হয়ে গেল, কিন্তু আমি নাম না করলেও, তুমি হয়ত গল্প শুনে অনেককে চিন্‌তে পারবে।

আমি গল্প শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিলাম, "বলুন না ?"

"তুমি যদি শুন্‌তে চাও ত বলতে পারি। দাসপ্রথার ভীষণতা সম্বন্ধে সকলেই কিছু-না-কিছু জানে, তবে ব্যক্তিগত গল্প শুন্‌লে সেটা তোমার মনে আরও গভীরভাবে আঘাত করবে। আমরা নিকৃথিরয় পৌঁছবার আগেই গল্পটা শেষ হবে।

আমার মাতুল গোষ্ঠীর সকলেই বহুকাল যাবৎ রায়ো ডি জ্যানীরোতে বাস করছেন, কেবল আমার বড়মামা ছাড়া। তিনি বাল্যকালেই বাড়ী থেকে পালিয়ে যান, এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অনেক দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করেন। পালিয়ে যাওয়ার তাঁর বিশেষ কোনো কারণ ছিল না, তবে শিশুকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত চঞ্চল এবং অসমসাহসী ছিলেন। অসাধারণ ব্যাপারমাত্রের প্রতিই তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। টাকা রোজগার করার ঝোঁকও তাঁর খুব ছিল, অল্প বয়স থেকেই। তিনি সৈনিক, নাবিক, শিকারী, খনির অধ্যক্ষ প্রভৃতি নানা কাজে ঢুকেছিলেন এবং সব কাজেই বেশ পয়সা করেছিলেন। আরও কত কি যে করেছিলেন, তার খবর কেউ জানে না। অবশেষে, অনেক বৎসর ভ্রমণের পর, তিনি পেরনাম্‌ব্যুকোতে ব্যবসা ফেঁদে বসলেন।

এই কাজেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ছিলেন, এবং এত বৎসর দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ফলে তাঁর রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানও হয়েছিল অসাধারণ। সফলতা তাঁর নিশ্চিতই ছিল এক রকম। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেনিয়র ডি লিমার কারবার দেশবিখ্যাত হয়ে উঠল।

দক্ষিণ-আমেরিকার বড় বড় শহরেই এ রকম চট করে বড়লোক হওয়া সম্ভব। এসব জায়গায় কেবল অর্থের ভাবনা, অর্থের উপাসনাই হয়। কিন্তু এখানে চট করে বড়লোক হওয়াও যেমন সাধারণ, এক নিমেষে পথের ভিখারী হয়ে যাওয়াও তেমনি। তুমি ক্রমে তা দেখবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে ডুবেই আমার বড়মামা তাঁর জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বছরগুলি কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু ক্রমে টাকায় তাঁর ক্লান্তি জন্মাতে লাগল। এসবের বিফলতা সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এবং অতীতের নানা স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠ্‌তে লাগল। তাঁর মনে পড়ল

যে জগতে তাঁকে পিতা নামে ডাকবার একটি মানুষ আছে। আর একাকী বাস করবেন না, বলে তিনি স্থির করলেন।

কয়েকদিন পরে তাঁর একজন ক্রীতদাসী কোলে একটি শিশু নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হ'ল। শিশুকে তাঁর সামনে তুলে ধরে বল্লে, "প্রভু, এ আপনার সন্তান।"

আমার মামা শিশুটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর সেই দাসীকে এবং তার সন্তানটিকে নিজের বহুদূরের এক খামারবাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। শিশু ছয় বৎসরের হ'লে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন।

কাফ্রী রমণী শিশুটিকে নিয়ে নিরাপদে খামার বাড়ীতে পৌঁছল। তার হাতে, ঐ খামারের ম্যানেজারের কাছে, বড়মামা একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন ঐ ক্রীতদাসী যতদিন শিশুকে স্তন্যদান করবে, তার উপর যেন কোনোপ্রকার অত্যাচার না হয়, এবং তাকে বেশী শ্রমসাধ্য কোনো কাজ যেন না দেওয়া হয়।

ম্যানেজারের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে এবং তার মাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে রাখলেন। শিশুকে তিনি নিকটতম গির্জায় ব্যাপ্‌টাইজ্‌ করিয়ে, মারিয়া নাম দিলেন। তিনি ক্রমেই শিশুটিকে এত স্নেহ করতে লাগলেন, যে, তাকে পোষ্য নেবার তাঁর খুব আগ্রহ হ'ল। স্বামীকে তিনি অনুরোধ করতে লাগলেন যেন শিশু এবং তার মাকে দাসত্ব মুক্ত করে দেওয়া হয়। তাঁর স্বামীটি যদিও বিশেষ ধর্ম্মভীরু মানুষ ছিলেন না, তবু স্ত্রীর অনুরোধে এ কাজ করতে রাজি হলেন। স্ত্রীর এই অনুরোধটা তাঁর কাছে কিছু অসাধারণ মনে হ'ল না। নিজে যদিও তিনি অশিক্ষিত ভব্যতাবিহীন মানুষ ছিলেন এবং ক্রীতদাসদের জানোয়ারের চেয়ে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না, তবু এই শিশুটির প্রতি তাঁরও একটু বিশেষ রকম স্নেহ ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি তাকে নিয়ে খেলা করে কাটিয়ে দিতেন। শিশু যখন ক্রমে আধ-আধ কথা বলতে আরম্ভ করল, তখন তাঁকেই বাবা বলতে লাগল। তাতে তিনি আপত্তি করলেন না।

শিশুর মা অত্যন্তই কৃতজ্ঞ হ'ল। কিন্তু এই সকল স্নেহের নিদর্শনে তার মনে নানা প্রকার আশঙ্কা হতে লাগল, সে শিশুর পিতার পরিচয় ঘূণাক্ষরেও কাউকে জানতে দিল না।

চার বৎসর পরে ঐ দাসী অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ল। পাছে তার রোগ অন্য সকলের মধ্যে সংক্রামিত হয়, এই ভয়ে সে খামারবাড়ী ছেড়ে, শিশুটিকে নিয়ে গোপনে পলায়ন করল। পথে অসহ্য কষ্ট পেয়ে, কোনোপ্রকারে সে পেরনাম্‌বুকোতে, আমার মামার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। হতভাগিনী বল্‌ল সে মরবার জন্যে তাঁর কাছে এসেছে। সত্যই সে মারা গেল। আমার মামা ক্ষুদ্র বালিকার মুখ দেখে বিস্মিত হলেন। সে অবিকল তাঁর এক ছোট বোনের মত দেখতে হয়েছে। ভাগ্য যেন ইচ্ছা করেই তাকে এই মুখশ্রী দিয়েছিল, যাতে সে পিতার স্নেহের অধিকারিণী সহজে হয় এবং যাতে তিনি তার পিতা বলে স্বচ্ছন্দেই পরিচয় দিতে পারেন।

বালিকাকে পরের দিনই তিনি কয়েকজন ভদ্রমহিলার স্কুলে রেখে এলেন। তাকে সযত্নে শিক্ষা দিতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু তার কোনো পরিচয় তিনি দিলেন না।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই বালিকা স্কুলের সেরা ছাত্রী বলে পরিগণিত হ'ল। তার বুদ্ধি যেমন প্রখর, তেমনি তার পড়ায় অনুরাগ। বড়মামা শুনে খুব খুশী হলেন, এবং মেয়েকে বাড়ীতে নিয়ে এসে রাখলেন। কন্যার স্থান অধিকার করেই সে রইল। তার পিতার মনে বহুদিন-বিস্মৃত স্নেহ-মমতার অনুভূতি সে জাগিয়ে তুলতে লাগল।

মারিয়ার মনে বাপের প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। সে গৃহস্থালীর পরিচালনায় খুবই নিপুণতার পরিচয় দিতে লাগ্‌ল এবং ক্রীতদাসদের সঙ্গে এমন সদয় ব্যবহার করতে লাগ্‌ল যে, তারা প্রতি ঘণ্টায় এমন গুণবতী প্রভুকন্যা পাওয়ার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগ্‌ল। পিতাকেও সে অনুরোধ করে দাস-দাসীদের বিষয় মন দেওয়ালো এবং তিনি তাদের দিনে এক ঘণ্টা করে কাজ থেকে ছুটি দিতে রাজি হলেন। এই সময় মারিয়া তাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিত, লিখতে

পড়তেও শেখাত। এই সমস্ত শিক্ষার ফল শীঘ্রই দেখা গেল। অন্য সব ক্রীতদাসদের থেকে আমার মামার দাস-দাসীদের প্রভেদ তাকাবামাত্রই বোঝা যেত। তাদের প্রফুল্লতা, কাজে উৎসাহ, সংযত জীবনযাত্রা সবই লোকের চোখে পড়ত।

মারিয়ার গায়ের রং এত ফরসা ছিল যে, ইউরোপীয় বালিকা ব'লে স্বচ্ছন্দেই তার পরিচয় দেওয়া যেত। তার বিশাল চোখ দুটি দীর্ঘপক্ষ্মশোভিত ছিল এবং তার দৃষ্টি ছিল কোমল ও বিনীত। নাকটি সুগঠিত, ঠোঁটদুটি পাত্‌লা ও রক্তবর্ণ এবং দাঁতগুলি মুক্তার মত। মুখের গড়ন ছিল বাদামী এবং মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল। পোষাক-পরিচ্ছদের রুচিও তার অনিন্দনীয় ছিল। মর্ম্মরপ্রতিমার ধরণের সুন্দরী সে ছিল না, অথবা তাকে দেখলে চিত্রকরের আঁকা নিখুঁৎ সুন্দরীর চিত্রও মনে পড়ত না। কিন্তু সে অতি লাবণ্যময়ী তরুণী ছিল, তার রূপে মানুষমাত্রেই মোহিত হ'ত। তাহার রূপ ও গুণের উপর ধনের আকর্ষণও কম ছিল না। আমার মামার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী বলেই সকলে তাকে মনে করত, কারণ সকলেরই ধারণা ছিল সে আমার মামার বিবাহিতা পত্নীর সন্তান। সুতরাং পেরনাম্‌বুকোর সমাজে তাহার আদরের সীমা ছিল না। সে যেখানেই যেত, তাহার চারিপাশে বিবাহার্থী যুবক-বৃন্দের ভীড় লেগে যেত। কাহাকেও সে বিন্দুমাত্রও আশা দিত না, কিন্তু তার ব্যবহার এত ত্রুটিশূন্য ছিল যে সকলেই তার প্রশংসা দশমুখে করত এবং সকলেই তার বন্ধুরূপে পরিচিত ছিল।

তাহাদের ভিতর একজন কিন্তু ক্রমাগত নিজের হৃদয় নিবেদন করে মারিয়াকে ব্যস্ত করে তুলেছিল। তার নাম সেনিয়র সুসা। পেরনামবুকোর সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান পাত্র বলে সে খ্যাত ছিল। কিন্তু টাকা থাকলে কি হয়, সে অতি লোভী ও কুচরিত্র ছিল, দাস-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তার মত মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি অল্পই ছিল। মারিয়াকে বিবাহ করলে এককালে সে অতুল ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হবে, এই লোভে সে পাগল হয়ে উঠেছিল। যুবতীর প্রতি তার যে বিশেষ কোনো অনুরাগ ছিল তা নয় তবে তার রূপে সে পশুর মত আকৃষ্ট হয়েছিল বটে। তার রূপ এবং টাকা এ দুটো হস্তগত করবার লোভ তাকে অস্থির করে তুলেছিল। আত্মতৃপ্তিই কেবল এর মূলে ছিল।

সব বিবাহার্থী যুবকগুলি অবশ্য সুসার দলের ছিল না। অনেকেই তাদের মধ্যে বেশ উপযুক্ত। কিন্তু মারিয়া তাদের এমনভাবে উপেক্ষা করত যে, অনেকে বলাবলি করতে আরম্ভ করল যে, মেয়েটি নিশ্চয়ই কোথাও হৃদয় দান করে ফেলেছে, না হ'লে এমন ব্যবহার করত না। তারা যদিও না জেনে গুজবটা তুলেছিল, তবু কথাটা ছিল ঠিক। মারিয়া একটি যুবককে ভালবাসত, তার নাম লুইস্, সে আমার বড়-মামার আপিসে কেরানীর কাজ করত। লুইস্ মারিয়াকে নিজের প্রাণের অধিক ভালবাসত, তার জন্যে যমের সম্মুখীন হতেও সে প্রস্তুত ছিল। দু'জনের ভিতর কোনো কথা হয়নি, কিন্তু তাদের দৃষ্টিই তাদের হয়ে সব কথা প্রকাশ করেছিল।

কিন্তু সুসা কোনো মানুষ বা কোনো-কিছুর কাছে হার মেনে সরে যাবার পাত্র ছিল না। সর্ব্বদাই টাকার খাতিরে লোকে তার কাছে মাথা নীচু করেছে, সুতরাং মারিয়ার প্রত্যাখ্যানে তার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। সে প্রবল অধ্যবসায় সহকারে আমার মামার বিগত জীবনের ইতিহাস তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করতে লেগে গেল। কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই সে খুঁজে পেল না এবং কিছুদিনের জন্য মনে হ'ল যেন তার কুঅভিসন্ধি ব্যর্থই হবে। কিন্তু একদিন যখন সে একগাদা পুরনো কাগজপত্র নিয়ে উল্টোচ্ছিল হঠাৎ তার মনে হ'ল যে, এত সব কাহিনীর মধ্যে মারিয়ার মায়ের উল্লেখ কোথাও একটুও নেই। তৎক্ষণাৎ তার মনে সন্দেহ জেগে উঠল। সে আবার নূতন উৎসাহে অনুসন্ধান সুরু করল। প্রথম প্রথম কোনোই ফল পেল না।

একদিন ভ্রমণ করতে করতে সে কাপিতারা নামক স্থানে এসে উপস্থিত হ'ল। এইখানেই বড়মামার সেই খামার বাড়ী। সেটা এখন তিনি বিক্রী করে ফেল

ছলেন, লোককে বলতে হ'লে বল্‌তেন, ওর থেকে কিছু লাভ হয় না। আসলে কারণ ছিল তাঁর ব্যবসায়ে কিছু ক্ষতি হয়েছিল।

পুরানো ম্যানেজার, নূতন মনিবের কাছে মোটেই সদ্ব্যবহার পেত না। সেজন্যে সে মুসার কাছে দশমুখে বড়মামার প্রশংসা করতে আরম্ভ করল। মুসা ইচ্ছা করে বড়মামার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলতে লাগল। সে বললে, সেনিয়র ডি লিমাই একমাত্র মানুষ যার চরিত্র সম্বন্ধে কোনো গুজব নেই। ম্যানেজার বলে ফেলল, সে একবার মামাকে সন্দেহ করেছিল বটে, তবে এখন তার মনে হয়, সে ভুলই করেছিল। এই ব'লে সে শিশু মারিয়া ও তার মাতার আগমন এবং তাদের হঠাৎ পলায়নের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করল। তখন থেকে তাদের কোনো খোঁজই সে পায়নি।

মুসার মত ধূর্ত্ত লোকের পক্ষে এই খোঁজটুকুই যথেষ্ট হল। ম্যানেজারকে কিছু না বলে, সে পরদিনই পেরনাম্‌ব্যুকোতে ফিরে এল এবং অভিসন্ধি আঁটতে বসল।

এর পর মুসাকে সর্ব্বদাই আপিসে বসে গাদা গাদা কাগজ আর হিসাবের খাতা ঘাঁটতে দেখা যেত। তার কাছে কেউ গেলে শুনতে পেত যে সে আপন মনে বিড় বিড় করে বকছে। তার খুশী যেন ফেটে পড়ছিল। এর মধ্যে একজন দালাল এসে তাকে খবর দিয়ে গেল যে, সেনিয়র ডি লিমার নামের দর আজকাল বাজারে কিছুই নয়। তাদের দিন বড় খারাপ যাচ্ছে, ব্যবসা টেঁকে কিনা সন্দেহ। মুসার মুখে দানবী হাসি ফুটে উঠল, সে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "কি কপাল জোর।"

সত্যই ভাগ্যলক্ষ্মী সেনিয়র ডি লিমার উপর বিরূপ হয়েছিলেন। তিনি পাওনাদারদের এক সভা ডাকলেন এবং কিছুদিনের মত টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন। তাঁর আশা ছিল যে, তারা তাঁর বিষয়বুদ্ধি এবং সততাকে বিশ্বাস করে তাঁর নূতন সর্ত্তে রাজি হবে। সময় পেলে তিনি আবার ক্ষতি সামলে উঠে, ব্যবসা নূতন করে দাঁড় করাতে পারবেন। একরকম নিশ্চিন্ত মনেই তিনি পাওনাদারদের অপেক্ষা করতে লাগ্‌লেন, কেমন ভাবে কথা পাড়বেন, কি ভাবে কাজ করবেন সব মনে মনে স্থির করে রাখলেন।

পাওনাদারেরা এসে উপস্থিত হ'ল। সভা আরম্ভ হতে যাবে এমন সময় মুসা এসে বল্‌লে সে গোপনে মামার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। মামা তাকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। মুসা বল্‌লে মামা যদি তার সঙ্গে মারিয়ার বিয়ে দিতে সম্মত হন, তা হলে সে অন্য পাওনাদারদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুবিধামত সর্ত্তে রাজি করাবে। যদি তারা রাজি না হয়, তাহলে মুসা নিজের সব ধনসম্পত্তি বড়মামার হাতে দেবে, তিনি যাতে আবার ব্যবসা গড়ে তুলতে পারেন। বৃদ্ধ কিন্তু এই-সব ছলনায় ভুললেন না। তিনি বললেন, বিয়েতে যখন মারিয়ার মত নেই, তখন তিনি সম্মতি দিতে পারেন না। মুসা তবু জেদ করতে লাগল। সে বল্‌লে মারিয়ার সঙ্গে তাকে একটু একলা কথা বলতে দেওয়া হোক, হয়ত বা মারিয়ার মত পরিবর্ত্তন হতে পারে। আমার মামা তাতেও রাজি হলেন না। তিনি জানতেন তাঁর পিতৃভক্ত মেয়ে বাপের দুর্গতির কথা জানতে পারলে, হয়ত আত্মবলি দিয়েই তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।

পাওনাদারদের সভায় মামা কৃতকার্য্য হলেন না। তারা প্রথম প্রথম তাঁর দিকেই ছিল এবং হয়ত তাঁর কথায় সম্মতও হত, কিন্তু মুসা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাওনাদার, সে কিছুতেই রাজি হ'ল না এবং ভয় দেখিয়ে অন্যদেরও ক্রমে নিজের মতে এনে ফেল্‌ল। একজন বৃদ্ধ এবং তার নিরপরাধা মেয়েকে পথে বসিয়ে মুসার যে কি লাভ হবে, তা যদিও তারা বুঝল না, তবু তার কথাতেই তারা চালিত হ'ল। বড়মামার যথাসর্ব্বস্ব গেল।

সেটউবিয়ার আদালতে কেস্‌ নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমার মামা জজের সামনে তাঁর যত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহার তালিকা রেখে দিলেন। মুসা কাগজখানি দেখতে চাইল। ক্রীতদাসদের তালিকায় মধ্যে মারিয়ার নাম না দেখে সে মহা গোলমাল আরম্ভ করল। সে আদালতের সামনে অনেক অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করল। সে বল্‌লে বড়মামা জুয়াচুরি করেছেন, মারিয়া

এখন পাওনাদারদের সম্পত্তি, তাকে লুকিয়ে রাখবার কোনো অধিকার তাঁর নেই।

আদালতে নিষ্পত্তি হতে বেশী দেরী হল না। আদালতের পেয়াদারা ক্রীতদাসীর সন্ধানে এসে দেখলে মারিয়া তার বাবার কাছে বসে আছে। সে ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধকে নানারকম আশার কথা ব'লে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। পেয়াদারা ঘরে ঢুকে তাঁকে আদালতের রায় জানাল এবং বল্‌লে যে তারা মারিয়াকে নিয়ে যেতে এসেছে, কারণ আইনের চোখে সে ক্রীতদাসী ভিন্ন কিছুই নয়। পাওনাদারদের টাকা মিটানোর জন্তে তাকে বিক্রী করা হবে।

এই নিদারুণ ক্ষণে ঠিক যে কি ঘটেছিল, তা আমি জানি না। আমার মামা প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। এ রকম আঘাত অসহনীয়, মুসা সেখানে উপস্থিত থাকায় তাঁর যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল।

অনেকদিন ডাক্তার এবং উকীলরা আমার মামার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করল। তাঁর যে শেষ অবধি কি দশা হবে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। কখনও তিনি দুই হাতে বুক চেপে ধরতেন, নয়ত চোখ বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে থাকতেন। আবার চোখ খুলে নিজের নির্যাতনকারীদের দিকে চেয়ে দেখতেন, যদিও তাঁর দৃষ্টির মধ্যে কোনো অর্থ ছিল না। কেবল এক বিষয়ে তাঁর আগের দৃঢ়চিত্ততা প্রকাশ পেত। আইনের বলও তাঁকে কন্তার কাছ থেকে পৃথক করতে পারেনি। অন্তান্ত ক্রীতদাসদের যে কদর্য্য স্থানে পশুর মত আট্‌কে রাখা হয়েছিল, মারিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সেইখানেই গিয়ে উঠ্‌লেন।

মারিয়া এই নিদারুণ সংবাদ অবিচলিত ধৈর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করল। ভগবানের কাছে করুণা ভিক্ষা করে সে ছোট্ট একটি প্রার্থনা করল, তারপর পিতার হস্ত চুম্বন করে তাঁর কাছে বিদায় চাইল। বৃদ্ধ কন্তার দিকে জড়ের মত তাকিয়ে রইলেন। পেয়াদারা লক্ষ্য করল যে, একবার মাত্র তরুণীর চোখে জল এবং তাকে কিছু বিচলিত দেখা গেল। তার পিতা যখন তাকে জড়িয়ে ধরে দাসদের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় চল্‌লেন, তখন সে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না।

এই স্থানে বাস করার সময় তাদের উপর অনেক অত্যাচার অপমান বয়ে গেল। ঐ পাপিষ্ঠ মুসা রোজ সেখানে এসে জুটত। মুখে বল্‌ত সে তাঁদের একটু সুখ-সুবিধা করে দেবার জন্তে আসে, আসলে আসত তাঁদের যথাসম্ভব অপমান এবং নির্যাতন করতে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমার মামা একদিনও ঐ পশুটাকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করেন নি। ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং অমানুষিক অত্যাচারের ফলে তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সকল যন্ত্রণারই অবসান আছে, ক্রীতদাসদের বিক্রীর দিন এসে পড়াতে তাঁদের এই শোচনীয় অবস্থার অবসান হ'ল।

এর চেয়ে ঘৃণিত অনুষ্ঠান কিছু কল্পনা করা শক্ত। মনুষ্যত্বের উপর এই ভয়াবহ পাশব অত্যাচার বর্ণনা করবার মত ভাষা নেই।

ক্রেতা এবং বিক্রেতারা এসে এক মঞ্চের কাছে সমবেত হয়। এর উপর ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসীদের সাজিয়ে রাখা হয়। তাদের খুব খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখা হয়, তার পর কেনাবেচা সুরু হয়। বিক্রেতারা তাদের মানুষরূপে দেখে না, কোনো যন্ত্র বিক্রী করতে হ'লে, তার প্রত্যেক কলকব্জা যেভাবে তারা পরীক্ষা করে, এদেরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং স্বাস্থ্য সেইভাবে বিচার করে দেখে। বিক্রয়ের জিনিষটি যদি নারী হয়, তাহলে যে-সব লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটে তা বর্ণনা করা যায় না। হতভাগিনীকে এক রকম অনাবৃত করেই মঞ্চে তুলে দেওয়া হয়, ক্রেতা তার শরীর ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করে। বিক্রেতা তার গুণাবলী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে, সে যদি কুমারী হয়, সে কথারও উল্লেখ করে। সুন্দরী হলে তাদের অদৃষ্টে যে শোচনীয় পরিণাম থাকে, তার উল্লেখ না করাই ভাল।

আমার মামার দাসদাসীরা সুস্থ এবং শিক্ষিত। যে মারিয়া তাদের যত্ন করে শিক্ষা দিয়েছিল, ভাগ্যচক্রে সেও আজ তাদের দলে বন্দিনী। এদের বিক্রয়ের দিনে বহু লোক সমাগম হ'ল। অনেকেই বোধ হয় হতভাগিনী মারিয়াকে বিক্রয়ার্থ মঞ্চে রক্ষিত দেখবার পাপ কৌতূহলেই এসেছিল। সে আর তার পিতা ঐ কৃষ্ণবর্ণ

মনুষ্যদল থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দেখে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী পশুতুল্য মানুষগুলিরও হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হচ্ছিল। ঐ করুণা সঙ্গে সঙ্গে অন্ত দাসগুলির প্রতিও সংক্রামিত হওয়ায়, সচরাচর তারা যে ব্যবহার পায়, এখানে তার চেয়ে ভালই পেল। কেবলমাত্র মুসারই চিত্তের কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে মারিয়ার কাছে গিয়ে, তার গায়ে হাত দিয়ে তার শরীর পরীক্ষা করবার উপক্রম করল। কিন্তু এই দারুণ স্পর্দ্ধায়, চারিদিকের কাক্রীদের মধ্যে ক্রুদ্ধ অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা গেল, তারা তাড়াতাড়ি মারিয়াকে নিজেদের শরীর দিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল। তাদের হিংস্র ভাব দেখে, মুসা কুৎসিৎ গালাগালি দিয়ে সরে দাঁড়াল।

সব দাসদাসী বিক্রী হয়ে গেল, কেবল মারিয়ারই ক্রেতা জুটল না। পিতার বাহু বন্ধন থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেবার দায়িত্ব কেউই নিতে রাজি হ'ল না। বিক্রেতা মারিয়ার অনিন্দ্য রূপ ও অসংখ্য গুণাবলি বর্ণনা করে করে গলা ভেঙে ফেল্‌ল। হতভাগিনী নতমস্তকে স্বল্পবস্ত্রে কোনো রকমে শরীর আবৃত করে ঐ সহস্র চক্ষুর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইল।

অবশেষে তার দর সুরু হ'ল। প্রথমে কয়েকজন অল্প দাম দিতে চাইল, তারপর আস্তে আস্তে দর উঠতে লাগল। তাকে নিজের হাতে পেলে খুশী হয়, এমন লোক যথেষ্টই ছিল। প্রথমটা তারা একটু সঙ্কোচ করে পিছিয়ে ছিল, কিন্তু একবার ডাক আরম্ভ হবার পর আর কারো কোনো লজ্জা রইল না; কিন্তু সব খরিদ্দারই ক্রমে মুসার কাছে হার মেনে সরে গেল। তাদের বিশ্বাসই হ'ল যে ঐ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাষণ্ড কোনো বাধাকে আর মানবে না, মারিয়াকে সে অধিকার করবেই। এমন সময় ভীড় ঠেলে একটি নূতন ক্রেতা এসে জুট্‌ল। এতক্ষণে বেচারী মারিয়ার মুখে একটু প্রাণের আভাস দেখা দিল। নূতন ক্রেতা লুইস্, যে আগে আমার মামার আপিসে কেরাণীর কাজ করত। সে মুসারও উপরে দর হাঁকল, আবার পূরোদমে নীলাম চলল, চারধারের লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখতে লাগল। মুসা যুবককে দেখে জানোয়ারের মত দাঁত দেখিয়ে একবার হাস্‌ল, তারপর দর চড়িয়ে যেতে লাগল। বিক্রেতা আনন্দে অধীর হয়ে হাত রগড়াতে লাগল। কিন্তু এ ব্যাপার অল্পক্ষণেই শেষ হল, লুইসের শেষ সম্বল পর্য্যন্ত সে ডাক্‌ল, তারপর বাধ্য হয়ে তাকে থেমে যেতে হ'ল।

মারিয়ার জন্তে সত্যিই খুব বেশী চড়া দাম পাওয়া গেল। মুসাই অবশ্য তার অধিকারী হ'ল। তার পাশব উদ্দেশ্য তার কুৎসিৎ মুখের ভঙ্গীতে, চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছিল অন্তরকম। আমার মামার নিরপরাধা পবিত্রা কুমারী কন্তাকে অপবিত্র করবার সুবিধা ঐ পাপিষ্ঠের হ'ল না।

নীলামের ফল যেই শোনা গেল, তৎক্ষণাৎ লুইস্ তীক্ষ্ণ একটা ছোরা হাতে করে মারিয়ার উপর লাফিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই মারিয়ার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, ছুরির এক আঘাতেই তার জীবন শেষ হল।"

বাকিটুকু শুনিবার জন্ত আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু খাসেল চুপ করিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লুইসের কি হ'ল?"

খাসেল বলিলেন, "সে পালিয়ে যায়। মুসা বা আইন, কেউই তার উপর প্রতিশোধ নিতে পারেনি। সে ছদ্মনামে পারাগুয়ে চলে গিয়ে সৈনিক-বিভাগে ভর্ত্তি হয়। তার কর্ম্মজীবন খুব যশোমণ্ডিত। ভয় যে কা'কে বলে তা সে জান্‌ত না, তার অসম সাহসের কথা সৈন্ত-বিভাগে একটা গল্প করবার জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো এক যুদ্ধে, তার অধীনস্থ সেনারা যখন শত্রুদুর্গ প্রায় অধিকার করেছে, তখন সে মারা যায়।"

খাসেল আবার চুপ করিলেন, তাঁহার বোধ হয় আর ঐ দুঃখের কাহিনী বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম, গল্প এখনও শেষ হয় নাই, তিনি আরও খানিকটা ইচ্ছা হইলে বলিতে পারেন।

খানিক পরে তিনি বলিলেন, "এই গল্পে তুমি এক বহু পুরাতন রোমান ঘটনার পুনরভিনয় দেখতে পাবে। লুইস্ যে কারণে মারিয়াকে হত্যা করে, ভার্জিনিয়াস্ সেই কারণে তাঁর কন্তাকে হত্যা করেন। শতাব্দীর পর

শতাব্দী কেটে যায়, কিন্তু একই দুঃখের কাহিনী বার বার শোনা যায়। এদের পরিণামও একই হয়, একই রকম যন্ত্রণার সৃষ্টি এরা করে। বৃক্ষ এক রকম হলে ফলও একই রকম হবে। কিন্তু এই কাহিনীতে সামান্য একটু তফাৎ আছে। আসল হত্যাকারী মারিয়ার পিতার কোনোই শাস্তি হ'ল না।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার বাবা হত্যাকারী কি রকম? আপনি না বললেন লুইস তাকে হত্যা করে?"

থাসেল শ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তার পিতাই হত্যাকারী। লুইসের হাতে অস্ত্রটা ছিল বটে, কিন্তু সে অস্ত্রের চালিত যন্ত্রমাত্র। আমার বড়মামা তাকে এ কাজ করতে আদেশ করেছিলেন। তাঁর কন্যা কখনও অপরের ক্রীতদাসী হবে না। যদি সে বিক্রীতা হয়, লুইস্ যেন তাকে তখনই ছুরির আঘাতে হত্যা করে।"

এই সময় ষ্টীমার নিকৃথিয়রে পৌঁছিয়া গেল। পাটাতন নামানোর শব্দ, শিকলের ঝন্‌ঝনি, যাত্রীর চীৎকারে স্থান সরগরম হইয়া উঠিল। থাসেলের বাকি কথা আর আমি শুনিতে পাইলাম না।

বিদেশে রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক

[শ্রীমান্ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মার্কিন দেশে প্রবাসকালে কোন আত্মীয়কে একখানি চিঠি লিখেন তাহা সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চিঠিতে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে সাধারণের অবিদিত কতকগুলি কথা আছে। পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে বলিয়া তাহা প্রকাশিত হইল।—ভাঃসং]

ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় অবস্থিতিকালে রামমোহন রায়কে যাঁহারা পাশ্চাত্য প্রবাসে চিনিতেন তাঁহাদের নিকট মৃত মহাত্মার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। যাহা শুনিয়াছি ভাবিয়া দেখিলে তাহা হইতে বড় সুন্দররূপে একটি শিক্ষা লাভ করা যায়। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাবস্থাপনা কিছুকাল হইতে উন্নতপ্রকৃতির মানুষের মধ্যে একটি আদর্শ কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর শেষ সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিলে ও এই সময়ের মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, "মানুষ মানুষের ভাই" এই ভাবটি যেন মহৎ প্রকৃতিকে আপনা হইতে নমিত করিয়া বশীভূত করিয়াছে। এই ভাবটির ধারণাই যেন মহত্ত্বের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু খাঁটি সোনায় যেমন গহনাপত্র গড়া হয় না বা সাধারণ্যে প্রচলিত রাজ-মুদ্রাও হয় না—কতকটা খাদ দিবার আবশ্যক হয়, তেমনই নিছক বিশুদ্ধ ভাবও পৃথিবীতে চলে না—আপনা হইতেই যেন কিছু খাদ আসিয়া পড়ে। মানুষের জাতিব্যাপী ভ্রাতৃভাবও এই সাধারণ নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে নাই। লোকে বলে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব স্থাপন কর। ভ্রাতৃভাব কি মানুষের ইচ্ছাধীন—ইহা যে আমাদের প্রকৃতিগত সত্য। পরমেশ্বর মানুষকে মানুষের ভাই করিয়া গড়িয়াছেন এবং অবিভাজ্য ঈশ্বর প্রত্যেকের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে চিনিলেই মানুষের ভ্রাতৃভাব অনুভব করা যায়। তাই আমাদের পক্ষে "ভ্রাতৃভাব স্থাপন কর" ইহা বিধি না হইয়া, বিধি হওয়া উচিত যে, "ঈশ্বরদত্ত ভ্রাতৃভাব উপভোগ কর।" ভ্রাতৃভাবের জন্য মানুষকে খুঁদাইয়া লইতে হইবে না—কেবল ঈশ্বরে সকল মানুষের একত্ব অনুভব করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সন্তান রামমোহন রায়ের ইহুদি ও খৃষ্টানের মধ্যে সস্নেহ সম্মান দেখিয়া ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাইয়াছি।

লণ্ডনে মিসেস্ গ্রে—র বাড়ীতে আহারান্তে সন্ধ্যা যাপনের জন্য একদিন আমার নিমন্ত্রণ হয়। গৃহস্বামিনী একজন খ্যাতনামা লেখিকা। সেখানে যথারীতিতে একজন সম্ভ্রান্ত ইহুদি ভদ্রলোক মিষ্টার লে—র সহিত পরিচিত হই। তিনি আমাকে পূর্ব্ব দেশীলোক দেখিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার একজন স্বদেশীয় লোক আমার পিতার পরমবন্ধু ছিলেন। আমিও তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি একজন অসাধারণ আশ্চর্য্য লোক ছিলেন।"

নাম জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তাঁহার পিতার বন্ধু ছিলেন রামমোহন রায়। তাঁহার পিতা ও অপরাপর বন্ধুগণ রামমোহন রায়ের ইহুদি ধর্ম্মের জ্ঞান ও গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। কথা শেষ করিবার সময় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "মহাশয়, রামমোহনকে আমার পিতা কেবল পূজা করিতে বাকী রাখিয়াছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পরও আমার পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার নাম করিতেন। রাজা একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। সে রকম লোক আমি আর কখনও দেখি নাই।"

মিসেস্ রো—সে—নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলার সহিত লণ্ডনে আমার পরিচয় হয়। এদেশে বয়স গণনার রীতি অনুসারে তিনি এখন বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। প্রচলিত পদ্ধতিমত ইনি একজন খ্যাতিপন্ন রমণী, লণ্ডনের কএকখানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার নিয়মিত লেখকশ্রেণীভুক্ত। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পিতৃভবনে ইনি রামমোহন রায়কে দেখিয়াছিলেন। রাজা অনেকবার ইঁহার পিতার নিমন্ত্রণে ডিনারে উপস্থিত থাকিতেন।

এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজা কি ডিনারের সময় আহারে যোগ দিতেন?"

তিনি উত্তর করিলেন, "না, আহারে ঠিক যোগ দিতেন না। তবে আহারের সময় টেবিলে আসিয়া বসিতেন। এবং ঈশ্বরের নামে রুটি নিবেদন করিয়া ভাঙিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিতেন।"

রামমোহন রায়ের সহিত ইঁহার পিতৃ-পরিবারের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। কখনও কখনও রাজা বন্ধুর বাড়ী আসিয়া কৌচের উপর শয়ন করিতেন এবং এই মহিলাকে ডাকিয়া গান গাহিতে বলিতেন। ইনি তখন দশ বৎসরের বালিকা মাত্র। আর এই বালিকার হাইভন্ গান শুনিতে শুনিতে রাজা নিদ্রা সেবা করিতেন।

অপরাপর ছোট ছোট কথার কথা সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই। কল কথাটা আমার মনের উপর দাঁড়াইয়াছে এই যে, লোকে জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়নিরপেক্ষ হইয়া রামমোহন রায়কে স্নেহ ও সম্মান করিত। আমার বোধ হয় এরূপ স্নেহ ও সম্মান আকর্ষণী শক্তি রাজার বিদ্যা বুদ্ধিজনিত নহে, ইহার উৎপত্তি-স্থান রামমোহনের সত্যনিষ্ঠতা। খৃষ্টের কথা ঠিক যে, সত্যই মানুষের সান্ত্বনাদাতা।

তবে আর একটা কথা বলিতে হইবে। কবি রোড্‌স্ নোয়েল আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বর্গীয়া মাতা কাউন্টেস্ অব্ গেন্‌স্‌বরা রামমোহন রায়ের একটী সুন্দর মার্বেল মূর্ত্তি তৈয়ার করাইয়াছিলেন। উহা এখন তাঁহার কোন বংশীয়ানের নিকট আছে। আমি এটা দেখি নাই। মৃত্যুর পর রামমোহন রায়ের মাথার একটা ছাঁচ তোলা হয়, তাহা এখন নিউইয়র্কে আছে—ইহা আমি দেখিয়াছি।

বষ্টনে আসিয়া দেখিলাম, একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম সুপরিচিত এক বংশ পূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ের মুখ্য নেতৃবর্গ রামমোহন রায়ের প্রশংসাশীল বন্ধু ছিলেন। চ্যানিং, ওয়েস, টাকারমান প্রভৃতির সহিত রাজার প্রত্যক্ষভাবে বা অপরের মধ্যবর্ত্তিতা অবলম্বন করিয়া চিঠিপত্র চলিত। একটি প্রকাণ্ড ভোজে মিঃ হেল—(ইনি বষ্টনের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার) রামমোহন রায়ের আরও কয়েক জন বন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন সেগুলি আমার মনে নাই।

টাকারমান রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইংলণ্ডে যান—মনে রাখিতে হইবে, যে কালের কথা হইতেছে, তখন কলের জাহাজের সৃষ্টি হয় নাই। এবং রামমোহন রায়ের সহিত দেখা করিয়া বলেন যে, "ঈশ্বর ধন্য, তিনি এই মানুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইলেন !"

রামমোহন রায়ের রচিত "Precepts of Jesus" এবং "Appeals to the Christian Public"—এই গ্রন্থগুলির এক সংস্করণ বষ্টন নগরে ছাপা হইয়াছে দেখিয়াছি।

এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ও প্রীতিকর একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে, তাহা এখনও বলি নাই। মিসনারী এডামের নাম আমাদের দেশে অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি প্রথমে শ্রীরামপুরের মিসনারীসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে রামমোহন রায়ের সঙ্গ পাইয়া খৃষ্টীয় ত্র্যাত্মক ঈশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বর খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এজন্য সহযোগী পাদ্রীরা তাঁহাকে Second Father Adam উপাধি দেন। ইয়ুরোপে আসিবার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, মাননীয় ৺রাখালদাস হালদার মহাশয় এডামের একটি বক্তৃতা পুস্তিকা আকারে ছাপাইয়াছিলেন।

এডামের বিধবা পত্নী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসরের অধিক, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি এখনও অক্ষুণ্ণ। বৃদ্ধা দুইটি কন্যা লইয়া বষ্টনের সন্নিকটে জেমেকা প্লেন নামক একটি পল্লীতে বাস করেন। বষ্টন হইতে ইঁহাদের বাড়ী রেলে ১৫ মিনিটের পথ।

আমার পরিচিত পাদ্রী ড—য়ের নিকট আমার সম্বাদ পাইয়া বৃদ্ধা আমাকে দেখা করিতে আমন্ত্রণ করেন। আমি বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আদেশ রক্ষা করিলাম।

মিসেস্ এডামের দুইটি কন্যাই ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে মনে হইতে লাগিল যেন কালের চক্র বিপরীত গতিতে চলিতেছে। বৃদ্ধা অবশ্য রাজা রামমোহনকে চিনিতেন। এডাম্ সপরিবারে শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া সারকুলার রোডের দক্ষিণ অংশে বাস করেন। এই রাস্তার অন্য দিকে রাজা নিজের বাগানবাটীতে থাকিতেন। এই বাগানবাটীতে সুকীস্ ষ্ট্রীটের থানা ছিল দেখিয়া আসিয়াছি। আমার বিবেচনায় এই বাটী ক্রয় করিয়া একটি সাধারণ মন্দির করা উচিত। মিসেস্ এডামের কাছে শুনিলাম কি অবস্থায় রাজা একটি বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহার রাজারাম রায় নামকরণ করেন। মিষ্টার ডিগবি নামক একজন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী এই অনাথ বালকটিকে মানুষ করিতেন। একদিন রাজা ডিগবির সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনেন যে, তিনি পদত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন, কিন্তু এ অনাথ বালকটিকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল। দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় বালক ঘরে ঢুকিয়া দুই একবার এদিক ওদিক চাহিয়া সস্নেহে রাজার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বালককে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

মিষ্টার এডাম রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺রাধাপ্রসাদ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধার সহিত রাধাপ্রসাদের বিশেষ কথা বার্ত্তা হয় নাই কিন্তু প্রতিদিন পড়িতে আসিবার ও পড়া শেষ করিয়া যাইবার সময় ইঁহার সহিত তাঁহার দেখা হইত। একদিন রাজা আসিয়া এডাম ও তাঁহার পত্নীকে বলিলেন, "রাধাপ্রসাদের মাতার মৃত্যু হইয়াছে—কিন্তু রমাপ্রসাদের মাতা এখনও জীবিত।" কথাটা ইঁহাদের নিকট একটা হেঁয়ালির মত বোধ হওয়ায় ইঁহারা রাজাকে সমস্যা পূরণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে বুঝিলেন যে, রাজাকে শৈশবে তাঁহার পিতা তিনটি বিবাহ দেন। রামমোহন রায়ের তৃতীয় স্ত্রীর কথা তাঁহার বংশীয়ানদিগের বাহিরে যে কেহ জানে—এই আমি প্রথম শুনিলাম। তবে রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ সহোদর ভাই। কিন্তু ইঁহাদের মাতা ভিন্ন এ কথার অর্থ বোধ হয় এই যে, রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রীকেই রমাপ্রসাদ মা বলিয়া জানিতেন—তাঁহার গর্ভধারিণীকে চিনিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর, বহুকাল পরে রমাপ্রসাদ অবগত হন যে, তাঁহার যথার্থ গর্ভধারিণী কে। এ কথা বাটীতে শুনিয়াছিলাম।

মিসেস্ এডাম বলেন, তাঁহার স্বামী ও রামমোহন রায় উভয়ে মিলিয়া গ্রীক ভাষা হইতে খৃষ্টীয়ানদিগের নূতন ধর্ম্মপুস্তক বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে উভয়েরই জীবন শেষ হইয়াছিল।

রাজা বিলাতে আসিবার সময় ইঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে আমরণ তিনি আর দেশে ফিরিবেন না এবং ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা যাইবারও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিসেস্ এডামের প্রত্যাশা ছিল যে এ দেশে রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু অনতিবিলম্বে রাজার মৃত্যু হওয়ায় সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নাই।

রামমোহন রায় খৃষ্টিয়ান কি না জানিবার জন্ত বিখ্যাত ডাক্তার উইলিয়ম এলরি চ্যানিং এডামকে পুনঃ পুনঃ চিঠি লেখেন। অবশেষে এডাম রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ প্রশ্নের কি উত্তর করিবেন। রাজা ইহাতে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অতীব সুন্দর, "আপনি আমার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস কিরূপ তাহা জানেন এবং জীবনে কিরূপ ব্যবহার কার্য্য করি তাহাও জানেন—ইহাতে যদি আমি খৃষ্টিয়ান হই তবে আমি খৃষ্টিয়ান।"

মিসেস্ এডামের পিতা পাদ্রী গ্রান্ট শ্রীরামপুরে কেরি মার্শমান প্রভৃতির সহযোগী ছিলেন। ইনি পিতা মাতার সহিত অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষে যান। শ্রীরামপুরে প্রথম বাঙ্গালীর খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা তাঁহার পরিষ্কাররূপ স্মরণ হয়। তাহার নাম কৃষ্ণ, সে জাতিতে তাঁতী।

একটি সতীদাহও মিসেস্ এডাম চাক্ষুষ করিয়াছিলেন। সে সময় ইংরেজরাজ্যে এই নৃশংস প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল তাই এ কুসংস্কার রাক্ষসের নিকট বলি দিবার জন্ত দিনেমার রাজ্য শ্রীরামপুরে যাইতে হইত। মিসেস্ এডাম ও তাঁহার মাতা গঙ্গাতীরে উপস্থিত। অপর পার হইতে একখানি নৌকা করিয়া বাদ্য বাজনা লইয়া কতকগুলি লোক আসিতেছিল। দেখিয়া মনে হয় কোন উৎসব উপলক্ষে যাত্রী আসিতেছে। নৌকা কূলে লাগিল। কিন্তু আরোহীদিগের মুখে উৎসবোচিত হর্ষ নাই—সকলেই বিষণ্ণ সকলই মলিন। সর্ব্বশেষে নৌকা হইতে একটি ক্ষীণা তরুণী নামিল। তাহার পর? তাহার পর ও হরি হরি! কোথায় উৎসব—আর কোথায় চিতা-সজ্জা। তরুণী গঙ্গায় স্নান করিয়া মৃত পতির সহিত চিতারোহণ করিল। গ্রান্টপত্নী এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। দুর্ঘটনা আশঙ্কা করিয়া আমি তাড়াতাড়ি অন্ত কথা পাড়িলাম। একটু পরে মিসেস্ এডাম বেগম সমরুর দরবারের কথা তুলিলেন। বেগমের সহিত একদিন তিনি হাজিরা খাইতে গিয়া দেখেন যে ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা দুয়ারের বাহিরে জুতা রাখিয়া টুপী মাথায় দিয়া বেগম সাহেবের নিকট হাজির হইলেন! এ কথা এখন কেহ বিশ্বাস করা সুকঠিন।

বলা বাহুল্য বৃদ্ধা ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরকে চিনিতেন। বেলগাছিয়া বাগানে তাঁহারা অনেকবার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সে বিষয়ে অনেক কথা শুনিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্তা রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে চিড়িয়াখানা দেখিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিলেন।

বৃদ্ধা বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া গিয়াছেন কি না প্রসঙ্গক্রমে এ কথা উঠিলে তিনি আমাদের চিরপরিচিত

"মশায়, মশায় তোমার প'ড়ো হাজির।
এক দণ্ড ছেড়ে দাও জল খেয়ে আসি॥"

ইত্যাদি আওড়াইলেন। ইঁহার বাঙ্গালা উচ্চারণ বিশুদ্ধ, কথায় অতি যৎসামান্ত টান। বাঙ্গালা এ পরিবারের সকলেই জানিতেন, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর অনভ্যাসে এখন কথা কহিতে অক্ষম। হাঁসের ছবিওয়ালা একটা আমাদের দেশীয় কাপড়ছাপা দেখাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন,

"হাঁসগুলা বালির উপর দৌড়ে দৌড়ে যায়।"

আর একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছিলাম। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিতও এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ইঁহাদের সহিত অনেকবার আহারাদি করিয়াছিলেন আরও অনেক কথা শুনিয়াছিলাম, সকলেরই এক সুর—যাহা ছিল তাহা নাই।

কাল কৃষক। আমরা শালী ফসল। পূর্ব্ব কৃতীগণকে কাল গত বৎসরের ফসলের স্তায় কাটিয়া যে গোলায় জমা করিয়াছে, সেখানে মানুষের চক্ষু যায় না।

সন্ধ্যারম্ভে আমি ভাবিতে ভাবিতে রেলের ষ্টেশনে ফিরিলাম,

All flesh is as grass
And all the glory of man
as the flower of grass
The grass withereth, and the
flower thereof falleth away
But the word of the Lord
endureth for ever.

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং, প্রতিদিনং যাতিক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্নদিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গ বিদ্যুচ্চলং জীবনং
তস্মান্ মাং শরণাগতং শরণদত্বং রক্ষরক্ষাধুনা॥

সত্য সুজনা বিনা সকলি বৃথায়।
দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়॥

বষ্টন, মাসাচুসেট্স্,
আমেরিকা,
১৫ মার্চ্চ, ১৮৮৭ সাল।

(ভারতী, বৈশাখ ১৩০০)

রামমোহন রায় ও রাজারাম

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬। রামমোহন রায়ের শৈবমতে বিবাহিত একটি মুসলমানী স্ত্রী ছিলেন, এ কথাটাও অনুমান হইলেও এই অনুমানের পক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ঘটিত প্রবল সাক্ষ্য বর্ত্তমান। প্রতিপক্ষের কটাক্ষের যে উত্তর তিনি দিয়াছেন, তাহাতে এ অনুমান অসঙ্গত নহে। তবে তাহা অনুমানই। কটাক্ষ তাঁহার প্রতি না হইয়া তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না যে, তা নয়। রামপ্রসাদ হইতে রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যিনিই orthodox তন্ত্রসাধন গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই "শক্তি" গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে এইরূপ তান্ত্রিক সাধনের জন্য গৃহীত 'শক্তিকে' বৈধ স্ত্রীরূপে ঘোষণা করিবার অধিকার কেবল রামমোহনেই সম্ভব হইয়াছে, অন্য কোন নিম্নশ্রেণীর জীবের পক্ষে সম্ভব হইত না। পরবর্ত্তীকালে রামমোহন কোন কোন তান্ত্রিক আচারকে "horrible Tantrik practices" বলিয়া যে নিন্দা করিয়াছেন, এইরূপে 'শক্তি' গ্রহণ ও পরে তাহাকে পরিত্যাগ, উহারই অন্তর্গত হইবে। তাহা না করিয়া, প্রচলিত প্রাজাপত্য মতে বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে শৈবমতে গৃহীত "শক্তি"কে সম্পূর্ণ একাসনে বসাইয়া রামমোহন হিন্দু সমাজের বিবাহ-সংস্কারের পথ শাস্ত্রীয় পন্থাতেই যে অনেকটা সুগম করিয়া দিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। রামমোহনের তিন বিবাহ তাঁহার শৈশবে হইয়াছিল। তাহার জন্য বহু বিবাহের দোষে তাঁহাকে দোষী করা না গেলেও তিনি মুসলমান স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকিলে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া করিয়াছিলেন বলিয়া তজ্জন্য তাঁহাকে বহু বিবাহের দোষ দেওয়া যাইতে পারে। একমাত্র এই বহু বিবাহ ছাড়া বর্ত্তমান বিবাহ-সংস্কারক আইনের সঙ্গে ইহার আর কোন অমিল নাই। নব সংস্কারযুগের সূচনা রামমোহন এইরূপেই করিয়াছেন। যাহা হউক, একটি মুসলমান-কন্যা রামমোহনের অন্যতমা পত্নী ছিলেন, ইহাতে রাজারাম যে তাঁহার ঔরসজাত পুত্র, ইহা প্রমাণিত হয় না। ব্রজেন্দ্রবাবু যে জনরবের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূল রামমোহনের এই মুসলমানী স্ত্রী। এটা তখনও অনুমান, এখনও অনুমান। তদতিরিক্ত দাবী করিলে *petitio principii* হইয়া যাইবে। জনরব কত সহজে প্রস্তুত হয় তাহার একটা নূতন দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করি। সম্প্রতি এক পল্লীগ্রামে এক জমিদারের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার চিকিৎসার নানা ব্যবস্থা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইবারও কথা হইয়াছিল। কিন্তু সময় হয় নাই। সেই সময়ে তত্র অঞ্চলে এরোপ্লেন দেখা দিয়াছিল। জনরব খুবই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, "ছোটকর্ত্তা"র চিকিৎসার জন্য কলিকাতা হইতে এরোপ্লেনে ডাক্তার আসিয়াছে। বড় বা ছোটদের কাছে ঐ সময়ে এরোপ্লেন আবির্ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতেও ছাড়িতেছে না। প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া ভুল ভাঙিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। আর তাহারা যখন স্বচক্ষে এরোপ্লেন দেখিয়াছে তখন তোমার আমার কথা তারা শুনিবেই বা কেন? সুতরাং এ প্রবাদ বংশানুক্রমে চলিয়া যাইবে। রামমোহনের যদি মুসলমানী স্ত্রী ছিল তখন মুসলমান রাজারাম তাঁহার ঔরসজাত পুত্র নয় তো কি? জনশ্রুতি একটা কিছু ধরিয়াই উৎপন্ন হয়, এই অর্থেই "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।" দেখা যাইতেছে, উভয়ত্রই জনশ্রুতিটা অনুমানমাত্র। তবে একটা কথা—যদি কোন বৈজ্ঞানিক একদিন প্রমাণ করেন, যে, ঐ পল্লীগ্রামে এরোপ্লেন অবতরণের কোন সম্ভাবনা ছিল না তাহাতে যেমন 'ছোটকর্ত্তার' অসুখ ও অন্যান্য চিকিৎসা মিথ্যা হইবে না তেমনই যদি কোনদিন প্রমাণ হয়, যে, রাজারাম বাস্তবিকই রামমোহনের পালিত পুত্র, তাহা হইলে তাঁহার মুসলমানী স্ত্রী বিষয়ক প্রশ্নের কোন ইতরবিশেষ হইবে না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

—

দুর্গাপূজা—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

আমার দুর্গাপূজা বিষয়ক ক্ষুদ্র স্থানে মূর্ত্তিপূজার ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয়ে একটা মত প্রচারের এত বড় অবসর আছে, বেদরত্ন বিনোদবাবু দেখাইয়া না দিলে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। আমি সে কথা উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না। আমার উদ্দেশ্য যে একেবারেই উহা নয়, এত বড় পণ্ডিত হইয়া তিনি ধরিতে পারেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। মূর্ত্তিপূজা যে মূর্খেরাই করে, এ কথা জানাইবার জন্য কলিকালে প্রবন্ধ রচনারও প্রয়োজন ছিল না, কেন না, সেকালের আচার্য্যেরাই বলিয়া গিয়াছেন, "কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাম্"। আমরা জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপ্রতিমাখানির নিদান অন্বেষণ করিয়াছি মাত্র। বিনোদবাবু কি বলিতে চান, এই প্রতিমাখানি ছাড়া মূর্ত্তিপূজার আর কোন অবলম্বন নাই? তিনি কি জানেন না, যে, "দুর্গা" নাম গ্রহণ করাই বহু মূর্ত্তিপূজকের কাছে পাণ্ডিত্যজনক? আবার, এক বিষয়ের জন্য প্রস্তুত মালমসলা অন্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কথায় কথা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, তবে কথাটা এই, বৌদ্ধের 'শূন্যে'র প্রতীক গোলাকার শিলাখণ্ডের যাঁরা 'নারায়ণ'কে দেখেন, বা গোলাকার পিণ্ডকে 'উদ্ধার চণ্ডীর' আবির্ভাব কল্পনা করিতে সমর্থ, তাঁরা যে মূর্খতাবশতঃ উহা করেন তা নয়, প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইলে যে শক্তির আবশ্যক বা যে অসুবিধা ভোগের প্রয়োজন, অনেক স্থলেই উহা তাহার অভাবজনিত কল্পিত ওজুহাত মাত্র। মূর্খে এত বড় কল্পনা সম্ভব নয়। উহা বৌদ্ধের উচ্ছিষ্টের প্রতি একটা অস্বাভাবিক মায়া। তিনি 'নেড়া বাজান' বা 'দণ্ড মধ্যে আবির্ভাবের' যে আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, তাতেই বুঝা যায়, প্রতিমা কল্পনা মূর্খের কর্ম্ম নয়। এ সব পণ্ডিতদের কারসাজি। ঋগ্বেদের কথা, এব্রাহাম মুসার কথা—একি মূর্খের কর্ম্ম। দুর্গাপূজার আদি নবপত্রিকায়, সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া কেবল বাজে কতকগুলি কথা দিয়া পুথি ভরা হইয়াছে। দেবাসুরের যুদ্ধ শিখতে হইয়াছিল, মানিলাম। কিন্তু বেদরত্ন মহাশয় কি "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" পড়েন নাই যে অনেক দেবাসুরের যুদ্ধ ঐ আকাশেই মেলে? দুর্গা যদি 'দুর্গ' অসুরকে মারিয়া থাকেন, তবে এই আখ্যায়িকার আদি ঐ আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে থাকিতে বাধা কি? নক্ষত্রাদি দিয়া আখ্যান রচনা প্রাচীন সব জাতিই করিয়াছে। সুতরাং আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

চণ্ডী কাশীখণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যে এই-সব আখ্যায়িকা রচনার বহু পরের রচনা, বেদজ্ঞ মহাশয় তাহা ভুলিলেন কেন? আখ্যায়িকায় আছে 'রোহিণী' নক্ষত্র সাতাইস নক্ষত্রের একজন—তা তো আর আরোহিণী ও অবরোহিণী গতি নয়? যাঁরা বৈজ্ঞানিক কারণ জানেন তাঁরাই যে এই-সব গল্প রচিয়াছেন তার প্রমাণ কোথায়? হিন্দুরা তো গ্রহণের কারণও জানিতেন। কিন্তু যাঁরা ঢাকঢোল বাজাইয়া রাত জাগায় তাদের সঙ্গে ঐ কারণ জানার যে কোন সম্পর্ক নাই, তা বোধ হয় বিধুশেখরবাবুও অস্বীকার করিবেন না। বেদজ্ঞ মহাশয় ভুলিয়া যাইবেন না, যে, এই-সব পৌরাণিক আখ্যায়িকার মূলে একাধিক রূপক থাকিতে পারে—ঐতিহাসিক তথ্যও যে এক-আধ কোঁটা না আছে তাহা নহে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

এবিষয়ে আর বাদ প্রতিবাদ প্রকাশিত হইবে না।

প্রবাসীর সম্পাদক

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে। রায়চৌধুরীদের বাড়ীর বড় ফটকে রবিবাসরীয় ভিখারীদলের ভিড় এখনও ভাঙে নাই। বীরু মুহুরীর উপর ভিখারীর চাউল দিবার ভার আছে, কিন্তু ভিখারীদের মধ্যে পর্য্যন্ত অনেকে সন্দেহ করে যে জমাদার শম্ভুনাথ সিংয়ের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে তাহারা ন্যায্য প্রাপ্য হইতে প্রতিবারই বঞ্চিত হইতেছে। ইহা লইয়া তাহাদের ঝগড়া দ্বন্দ্ব কোনোকালেই মেটে না। শেষ পর্য্যন্ত দারোয়ানেরা রাগিয়া ওঠে, রামনিহোরা সিং দু-চারজনকে গলাধাক্কা দিতে যায়। তখন হয় বুড়ো খাতাঞ্চি মহাশয় নয়ত গিরীশ গোমস্তা আসিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দেয়। প্রায় কোনো রবিবারই ভিখারী-বিদায় ব্যাপারটা বিনা গোলমালে নিষ্পন্ন হয় না।

রান্নাবাড়ীতে কি একটা লইয়া এতক্ষণ রাঁধুনীদের মধ্যে বচসা চলিতেছিল। রাঁধুনি বামনী মোক্ষদা থালায় নিজের ভাত সাজাইয়া লইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়াতে সেখানকার গোলমালও একটু কমিল। রাঁধুনীদের মধ্যে সর্ব্বজয়ার বয়স অপেক্ষাকৃত কম—বড়লোকের বাড়ী—সহর বাজার জায়গা, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বলিয়া ইহাদের এসব কথাবার্ত্তায় সে বড় একটা থাকে না। তবুও মোক্ষদা বামনী তাহাকে মধ্যস্থ মানিয়া সদু-ঝি-এর কি অবিচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল। যখন যে দলে থাকে, তখন সে দলের মন যোগাইয়া কথা বলাটা সর্ব্বজয়ার একটা অভ্যাস, এজন্য তাহার উপর কাহারও রাগ নাই।

মোক্ষদা সরিয়া পড়ার পর সর্ব্বজয়াও নিজের ভাত বাড়িয়া লইয়া তাহার থাকিবার ছোট ঘরটাতে ফিরিল। এ বাড়ীতে প্রথম আসিয়া বৎসর দুই ঠাকুরদালানের পাশের যে ঘরটাতে সে থাকিত, এ ঘরটা সেটা নয়; তাহারই সামনা সামনী পশ্চিমের বারান্দার কোণের ঘরটাতে সে এখন থাকে—সেই রকমই অন্ধকার, সেই ধরণেরই স্যাঁতসেঁতে মেজে, তবে সে ঘরটার মত ইহার পাশে আস্তাবল নাই, এই একটু সুবিধার কথা।

সর্ব্বজয়া তখনও ভাল করিয়া ভাতের থালা ঘরের মেজেতে নামায় নাই, এমন সময় সদু-ঝি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—বলি মুখি বামনী কি পরচের দিচ্ছিল তোমার কাছে শুনি? বদমায়েস মাগী কোথাকার, আমার নামে যখন তখন যার তার কাছে—লাগিয়ে করবে কি জিগ্যেস্ করি? বলে দেয় যেন বড় বৌরাণীর কাছে—যার যেন বল্‌তে—তুমিও দেখে নিও বলে দিচ্ছি বাছা, আমি যদি গিন্নিমার কাছে বলে ওকে এ বাড়ী থেকে না তাড়াই তবে আমি রামনিধি ভড়ের মেয়ে নই—নই—নই—এই তোমায় বলে দিলুম—

সর্ব্বজয়া হাসিমুখে বলিল—না সদু-মাসী, সে বল্‌লেই অম্‌নি আমি শুন্‌বো কেন? তা ছাড়া ওর স্বভাব তো জানো—ওইরকম, ওর মনে কোনো রাগ নেই, মুখে হাউ হাউ করে বকে—এমন তো কিছু বলেও নি—আর তা

আমি আর দু'মাস দশ মাস তো নয়, তোমায় দেখ্‌চি তিন বছর—বল্লেই কি আর আমি শুনি? তিন । এবাড়ীতে ঢুকিচি, কৈ তোমায় নায়ে—

সদু-ঝি একটু নরম হইয়া বলিল—অপু কোথায়, দেখ্‌চিনে—আজ তো রবিবার—ইস্কুল তো আজ বন্ধ—

সর্ব্বজয়া প্রতিদিন রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিয়া তবে স্নান করে। তেলের বাটিতে বোতল হইতে নারিকেল তৈল ঢালিতে ঢালিতে বলিল—কোথায় বেরিয়েচে। ওই শেঠেদের বাড়ীর পাশে কোন এক বন্ধুর বাড়ী সেখানে ছুটির দিন যায় বেড়াতে। তাই বুঝি বেরিয়েচে। ছেলে তো নয় একটা পাগল—দুপুরের রদ্দুর রোজ মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া চাই তার। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না মাসী? সদু বলিল—না, তুমি নাও খাও, আর বস্‌বো না—যাই কথাটা গিয়ে শুনে আসি, তাই এলুম। বলো ওবেলা মুখি বাম্‌নিকে, একটু বুঝিয়ে দিও—খোকাবাবুর ভাতে সেই দইয়ের হাঁড়ি বের করা মনে নেই বুঝি? সদুর পেটে অনেক কথা আছে, বুঝলে? দেখ্‌তেই ভালমানুষটি—বলো। বুঝিয়ে—

সদু-ঝি চলিয়া গেলে সর্ব্বজয়া তেল মাখিতে বসিল। একটু পরে দোরের কাছে পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—ওঃ রদ্দুরে ঘুরে তোর মুখ যে একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েচে! বোস্ বোস্—আয়—ওমা আমার কি হবে!...

অপু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একেবারে সোজা বিছানায় গিয়া একটা বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িল। হাতপাখা-খানা সজোরে নাড়িয়া মিনিটখানেক বাতাস খাইয়া লইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—এখনও নাও নি? বেলা তো দুটো—

সর্ব্বজয়া বলিল—ভাত খাবি দুটো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না—

—খা না দুটোখানি? ডাল ছানার ডাল্‌না আছে, সকালে শুধু তো ডাল আর বেগুন ভাজা দিয়ে খেয়ে গিইচিস্। খিদে পেয়েছে আবার এতক্ষণ—

অপু বলিল—দেখি কেমন?

পরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া মেজেতে ভাতের থালায় ঢাক্‌নি উঠাইতে গেল। সর্ব্বজয়া বলিল—ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে—থাক্ এখন, নেয়ে এসে দেখাচ্ছি—

অপু হাসিয়া বলিল—ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে, কেন আমি বুঝি মুচি? ব্রাহ্মণকে বুঝি অম্‌নি বলতে আছে? পাপ হয় না?

—যা হয় হবে—ভারী আমার বামুন, সন্দে নেই, আহ্নিক নেই, বাচ বিচের জ্ঞান নেই, এঁটো জ্ঞান নেই—ভারী আমার—

খানিকটা পরে সর্ব্বজয়া স্নান সারিয়া আসিয়া ছেলেকে বলিল—আমার পাতে বসিস্ এখন...

অপু মুখে হাসি টিপিয়া বলিল—আমি কারুর পাতে বস্‌চি নে, ব্রাহ্মণের খেতে নেই কারুর এঁটো—

সর্ব্বজয়া খাইতে বসিলে অপু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া স্বর নীচু করিয়া বলিল—আজ এক জায়গায় একটা চাক্‌রীর কথা বলেচে মা একজন। ইষ্টিশানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, গাড়ী যখন এসে লাগবে লোকেদের কাছে নতুন পাঁজি বিক্রী কর্ত্তে হবে। পাঁচটাকা মাইনে আর জল খাবার। ইস্কুলে পড়্‌তে পড়্‌তেও হবে। একজন বল্‌ছিল—

ছেলে যে চাকুরীর কথা একে ওকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায় সর্ব্বজয়া একথা জানে। চাকুরী হইলে সে মন্দ কথা নয়, কিন্তু অপুর মুখে চাকুরীর কথা তাহার মোটেই ভাল লাগে না। সে তো এমন কিছু বড় হয় নাই। তাহা ছাড়া রৌদ্র আছে, বৃষ্টি আছে। সহর বাজার জায়গা পথে ঘাটে গাড়ী ঘোড়া কত বিপদ। অত বিপদের মুখে ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে সে রাজী নয়।

সর্ব্বজয়া কথাটা তেমন গায়ে মাখিল না। ছেলেকে বলিল—আয় বোস্ পাতে—হয়েচে আমার। আয়—

অপু খাইতে বসিয়া বলিল—বেশ ভাল হয়, না মা? পাঁচ টাকা কোরে মাইনে। তুমি জমিও। তারপর মাইনে বাড়াবে বলেচে। আমার বন্ধু সতীনদের বাড়ীর পাশে খোলার ঘর ভাড়া আছে, দুটাকা মাসে। সেখেনে আমরা যাবো—এদের বাড়ী তোমার যা খাটুনি! ইস্কুল থেকে অম্‌নি চলে যাবো ইষ্টিশানে—খাবার সেখেনেই খাবো। কেমন তো?

সর্ব্বজয়া বলিল—কাট করে দেবো, বেঁধে নিয়ে যাস্।

দিন দশেক কাটিয়া গেল। আর কোন কথাবার্ত্তা কোনো পক্ষেই উঠিল না। তাহার পর বড় বাবু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত সঙ্গীন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার দিন পনেরো কাটিল। বাড়ীতে সকলের মুখে, ঝি-চাকর দারোয়ানদের মুখে বড়বাবুর অসুখের বিভিন্ন অবস্থার কথা ছাড়া আর অন্য কথা নাই।

বড়বাবু সাম্‌লাইয়া উঠিবার দিনকয়েক পরে একদিন অপু আসিয়া হাসি হাসি মুখে মাকে বলিল—আজ মা বুঝ্‌লে একটা ঘুড়ির দোকানে বলেচে যদি আমি বসে বসে ঘুড়ি জুড়ে দি আটা দিয়ে দিয়ে, তারা সাত টাকা করে মাইনে আর রোজ দু'খানা করে ঘুড়ি দেবে। মস্ত ঘুড়ির দোকান, ঘুড়ি তৈরী করে কল্‌কাতায় চালান দেয়—সোমবারে যেতে বলেচে—

এ আশার দৃষ্টি, এ হাসি, এ সব জিনিষ সর্ব্বজয়ার অপরিচিত নয়। দেশে নিশ্চিন্দিপুরের ভিটাতে থাকিতে কত দিন, দীর্ঘ পনেরো ষোল বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে কতবার স্বামীর মুখে এই ধরণের কথা সে শুনিয়াছে! এই সুর, এই কথার ভঙ্গি সে চেনে। এইবার একটা কিছু লাগিয়া যাইবে—এই বার ঘটিল, অল্পই দেরী। নিশ্চিন্দি-পুরের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পথে বাহির হওয়ার মূলেও সেই সুরেরই মোহ।

চারিবৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, এই দশা ইহারই মধ্যে। কিন্তু সর্ব্বজয়া চিনিয়াও চিনিল না। আজ বহুদিন ধরিয়া তাহার নিজের গৃহ বলিয়া কিছু নাই, অথচ নারীর অন্তর্নিহিত নীড় বাঁধিবার পিপাসাটুকু ভিতরে ভিতরে তাহাকে বড় পীড়া দেয়। অবলম্বন যতই তুচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর হউক, মন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যায়, নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

তাহা ছাড়া পুত্রের অনভিজ্ঞ মনের তরুণ উল্লাসকে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার চাপে শ্বাসরোধ করিয়া মারিতে মায়াও হয়।

সে বলিল—তা যাস্ না সোমবারে! বেশ তো,—দেখে আসিস্। হ্যাঁ শুনিস্ নি মেজ বৌরাণীরা শীগ্‌গির আসচেন, আজ শুন্‌ছিলাম রান্নাবাড়ীতে—

অপুর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কবে মা, কবে?

—এই মাসের মধ্যেই আস্‌বেন। বড়বাবুর শরীর খারাপ, কাজটাজ দেখ্‌তে পারেন না, তাই মেজবাবু এসে থাক্‌বেন দিন কতক—

লীলা আসিবে কিনা একথা দুই দুই বার মাকে বলি বলি করিয়াও কি জানি কেন সে শেষপর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বাহিরে যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল তাদের বাড়ীর সবাই আস্‌চে, মা বাবা আস্‌চে আর সে কি সেখেনে পড়ে থাক্‌বে? সেও আস্‌বে—ঠিক আস্‌বে—

পরদিন সে স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের ঘরটাতে ঢুকিতেই তাহার মা বলিল—অপু?...আগে খাবার খেয়ে নে। আজ একখানা চিঠি এসেচে—দেখাচ্চি—

অপু বিস্মিতমুখে বলিল—চিঠি কোথায়? কে দিয়েচে মা?

কাশীতে তাহার বাবার মৃত্যুর পর হইতে এ পর্য্যন্ত আজ আড়াই বৎসরের উপর এ বাড়ীতে তাহারা আসিয়াছে, কৈ, কেহ তো একখানা পোষ্টকার্ডে একছত্র লিখিয়া তাহাদের খোঁজ করে নাই? লোকের যে পত্র আসে, একথা তাহারা তো ভুলিয়া গিয়াছে!

সে বলিল—কৈ দেখি?

পত্র—তা আবার খামে! খামটার উপরে মায়ের নাম লেখা! সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খাম হইতে বাহির করিয়া অধীর আগ্রহের সহিত সেখানাকে পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ করিয়া বুঝিতে-না-পারার দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ভবতারণ চক্রবর্ত্তী কে মা?...পরে পত্রের উপরকার ঠিকানাটা আর একবার দেখিয়া লইয়া বলিল—কাশী থেকে লিখ্‌চে—

সর্ব্বজয়া বলিল—তুই তো ওঁকে নিশ্চিন্দিপুরে দেখিছিস্। সেই সেবার গেলেন, দুগ্‌গাকে পুতুলের বাক্স

ফিরে দিয়ে গেলেন, তুই তখন সাত বছরের। মনে নেই তোর ? তিনদিন ছিলেন সেবার আমাদের বাড়ী—

—জানি না, দিদি বল্‌তো তোমার জ্যাঠামশায় হন—মা ? তা এতদিন তো আর কোনও—

—আপন নয়, দূর সম্পর্কের। জ্যাঠামশায় তো দেশে বড় একটা থাক্‌তেন না, কাশীপরা, ঠাকুর দেবতার জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এখনও বেড়ান। ওঁদের দেশ হচ্ছে মনসাপোতা, আড়ংঘাটার কাছে। সেখেন থেকে কোশ দুই—সেবার আড়ংঘাটায় যুগল দেখ্‌তে গিয়ে ওঁদের বাড়ী গিয়ে ছিলাম দু' দিন। বাড়ীতে মেয়ে-জামাই থাক্‌তো। সে মেয়ে-জামাই তো লিখেচেন মারা গিয়েচে —ছেলে পিলে কারুর নেই—

অপু বলিল—হাঁ তাই তো লিখ্‌চেন। নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে আমাদের খোঁজ করেচেন। সেখেনে শুনেচেন কাশী গিইচি। তারপর কাশীতে গিয়ে আমাদের সব খবর জেনেচেন। এখানকার ঠিকানা নিয়েচেন বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুপুরবেলা খেয়ে একটু বড়ি গড়াই—ক্ষেমি ঝি বল্লে তোমার একখানা চিঠি আছে। হাতে নিয়ে দেখি আমার নাম—আমি তো অবাক্ হ'য়ে গেলাম। তারপর খুলে পড়ে দেখি এই—নিতে আস্‌বেন লিখেছেন শীগ্‌গির। ত্যাখ্‌ দিকি, কবে আস্‌বেন লেখা আছে কিছু ?

অপু বলিল—বেশ হয়, না মা ? এদের এখেনে একদণ্ড ভাল লাগে না। তোমার খাটুনিটা কমে—সেই সকালে উঠে রান্নাবাড়ী ঢোকো, আর ছুটো তিনটে—

ব্যাপারটা এখনও সর্ব্বজয়া বিশ্বাস করে নাই। আবার গৃহ মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে, নিজের মনোমত ঘর গড়া চলিবে! বড়লোকের বাড়ীর এ রাঁধুনীবৃত্তি, এ ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার কি এতদিনে—বিশ্বাস হয় না। অদৃষ্ট তেমন নয় বলিয়া ভয় করে।

তাহার পর দুজনে মিলিয়া নানা কথাবার্ত্তা চলিল। জেঠামশায় কি রকম লোক, সেখানে যাওয়া ঘটিলে কেমন হয়,—নানা কথা। উঠিবার সময় অপু বলিল—শেঠেদের বাড়ীর পাশে কাঠগোলায় পুতুলনাচ হবে একটু পরে। দেখে আস্‌বো মা ?

সকাল সকাল ফির্‌বি, যেন ফটক বন্ধ করে দেয় না, দেখিস্—

পথে যাইতে যাইতে খুসিতে তাহার গা কেমন করিতে লাগিল। মন যেন শোলার মত হাল্‌কা। মুক্তি, এতদিন পরে মুক্তি। কিন্তু লীলা যে আসিতেছে ? পুতুলনাচের আসরে বসিয়া কেবলই লীলার কথা মনে হইতে লাগিল। লীলা আসিয়া তাহার সহিত মিশিবে তো ? হয়তো এখন বড় হইয়াছে, হয়তো আর তাহার সঙ্গে কথা বলিবে না।

পুতুলনাচ আরম্ভ হইতে অনেক দেরী হইয়া গেল। না দেখিয়াও সে যাইতে পারিল না। অনেক রাত্রে যখন আসর ভাঙিয়া গেল, তখন তাহার মনে পড়িল এত রাত্রে বাড়ী ঢোকা যাইবে না, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে, বড়লোকের বাড়ীর দারোয়ানেরা কেহ তাহার জন্ত গরজ করিয়া ফটক খুলিয়া দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বড় ভয়ও হইল। রাত্রিতে এ রকম একা কখনো সে বাড়ীর বাহিরে কাটায় নাই। কোথায় এখন সে থাকে ? মা-ই বা কি বলিবে !

আসরের সব লোক চলিয়া গেল। আসরের কোণে একটা পান-লেমনেডের দোকানে তখনও বেচা-কেনা চলিতেছে। সেখানে একটা কাঠের প্যাক বাক্সের উপর সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না, ঘুম ভাঙিয়া দেখিল ভোর হইয়া গিয়াছে, পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

সে একটু বেলা করিয়া বাড়ী ফিরিল। ফটকের কাছে বাড়ীর গাড়ী দুইখানা তৈয়ারী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেউড়িতে ঢুকিয়া খানিকটা আসিয়া দেখিল বাড়ীর তিন-চার জন ছেলে সাজিয়া গুজিয়া কোথায় চলিয়াছে। নিজেদের ঘরের সাম্‌নে নিস্তারিণী ঝিকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মাসীমা, এত সকালে গাড়ী যাচ্ছে কোথায় ? মেজবাবুরা কি আজকে আস্‌বেন ?

নিস্তারিণী বলিল—তাইতো শুন্‌ছি। কাল চিঠি এসেচে—শুধু মেজবাবু আর বৌ-রাণী আস্‌বেন, লীলা-

দিদিমণি এখন আস্‌বে না—ইস্কুলের এগ্‌জামিন। সেই বড়দিনের সময় তবে আস্‌বে। গিন্নিমা বল্‌ছিলেন বিকেলে—

অপুর মনটা একমুহূর্ত্তে দমিয়া গেল। লীলা আসিবে না। বড়দিনের ছুটিতে আসিলেই বা কি—সে তো তাহার আগে এখান হইতে চলিয়া যাইবে। যাইবার আগে একবার দেখা হইয়া যাইত এই সময় আসিলে। কতদিন সে আসে নাই!

তাহার মা বলিল—বেশ ছেলে তো, কোথায় ছিলি রাত্তিরে? আমার ভেবে সারারাত চোখের পাতা বোজেনি কাল।

অপু বলিল—রাত বেশী হয়ে গেল, ফটক বন্ধ করে দেবে জানি, তাই আমার এক বন্ধু ছিল, আমার সঙ্গে পড়ে, তাদেরই বাড়ীতে—। পরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—না মা, সেখেনে পানের দোকানে একটা কেরাসিন কাঠের বাক্স পড়েছিল, তার ওপর শুয়ে—

সর্ব্বজয়া বলিল—ও মা আমার কি হবে! এই সারা-রাত্তির ঠাণ্ডায় সেখেনে—লক্ষীছাড়া ছেলে, যেও তুমি ফের্ কোনোদিন সন্দের পর কোথাও—তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না? ..

অপু হাসিয়া বলিল—তা আমি কি ক'রে ঢুক্‌বো বলো না? ফটক ভেঙ্গে বুঝি ঢুক্‌বো?

বাদানুবাদ খানিকটা চলিবার পর, রাগটা একটু কমিয়া আসিলে সর্ব্বজয়া বলিল—তারপর জেঠামশায় তো কাল এসেচেন। তুই বেরিয়ে গেলে একটু পরেই এলেন, তোর খোঁজ কর্ল্লেন, আজ ওবেলা আবার আস্‌বেন। বল্লেন, এখেনে কোথায় তাঁর জানাশুনো লোক আছে, তাদের বাড়ী থাক্‌বেন। এদের বাড়ী থাক্‌বার অসুবিধে—পরশু নিয়ে যেতে চাচ্চেন—

অপু বলিল—সত্যি? কি কি বল না মা, সব কথা হোল?

আগ্রহে অপু মায়ের সাথে খাটের ধারে বসিয়া পড়িয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। দুজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। জেঠামশায় বলিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, ইহাদেরই উপর সব ভার দিয়া তিনি কাশী যাইবেন। অনেকদিন পরে সংসার পাতিবার আশায় সর্ব্বজয়া আনন্দে উৎফুল্ল। ইহাদের বাড়ী হইতে নানা টুকিটাকি গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস নানা সময় সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে, একটা বড় টিনের টেমি দেখাইয়া বলিল—সেখেনে রান্নাঘরে জ্বাল্‌বো—কত বড় লম্পটা দেখিচিস্? ছ পয়সার তেল ধরে—

দুপুরের পর সে মায়ের পাতে ভাত খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় দুয়ারের সাম্‌নে কাহার ছায়া পড়িল। চাহিয়া দেখিয়া সে ভাতের গ্রাস আর মুখে তুলিতে পারিল না।

লীলা!

পরক্ষণেই লীলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল, কিন্তু অপুর দিকে চাহিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। অপুকে যেন আর চেনা যায় না—সে তো দেখিতে বরাবরই সুন্দর, কিন্তু এই দেড় বৎসরে কি হইয়া উঠিয়াছে সে! কি গায়ের রং, কি মুখের শ্রী, কি সুন্দর স্বপ্ন-মাখা চোখদুটী! লীলার যেন একটু লজ্জা হইল। বলিল—উঃ আগের চেয়ে মাথাতে কত বড় হয়ে গিয়েচ!

লীলার সম্বন্ধেও অপুর ঠিক সেই কথাই মনে হইল। এ যেন সে লীলা নয়, যাহার সঙ্গে সে দেড় বৎসর পূর্ব্বে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া কত গল্প ও খেলা করিয়াছে। তাহার তো মনে হয় না লীলার মত সুন্দরী মেয়ে সে কোথাও দেখিয়াছে—রাণুদিও নয়। খানিকক্ষণ সে যেন চোখ ফিরাইতে পারিল না।

দুজনেই যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল।

অপু বলিল—তুমি কি করে এলে? আমি আজ সকালেও জিজ্ঞেস্ করিচি। নিস্তারিণী মাসী বল্লে তুমি আস্‌বে না, এখন স্কুলের ছুটী নেই—সেই বড়দিনের সময় নাকি আস্‌বে—

লীলা বলিল—আমার কথা তোমার মনে ছিল?

—না, তা কেন? তার পর এতদিন পরে বুঝি—বেশ—একেবারে ডুমুরের ফুল—

—ডুমুরের ফুল আমি, না তুমি? খোকামণির ভাতের সময় তোমাকে যাওয়ার জন্যে চিঠি লেখালাম ঠাকুরমায়ের কাছে, এবাড়ীর সবাই গেল, যাওনি কেন?

অপু এসব কথা কিছুই জানে না। তাহাকে কেহ বলে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—খোকামণি কে?

লীলা বলিল—বা আমার ভাই! জানো না?…এই এক বছরের হোল ‥

লীলার জন্ত অপুর মনে একটু দুঃখ হইল। লীলা জানে না যাহাকে সে এত আগ্রহ করিয়া ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এ বাড়ীতে তাহার স্থান কোথায় বা অবস্থা কি। সে বলিল-দেড় বচ্ছর আসোনি—না? পড়্চ কোন্ ক্লাসে—

লীলা তক্তপোষের কোণে বসিয়া পড়িল। বলিল—আমি আমার কথা কিছু বল্‌বো না আগে—আগে তোমার কথা বলো। তোমার মা ভালো আছেন? তুমিও তো পড়ো—না?

—আমি এবার মাইনর ক্লাসে উঠবো—পরে একটু গর্ব্বিত মুখে বলিল—আর বছর ফার্ষ্ট হয়ে ক্লাসে উঠিচি প্রাইজ দিয়েচে—

লীলা অপুর দিকে চাহিল। বেলা তিনটার কম নয়। এত বেলায় সে খাইতে বসিয়াছে! একটু বিস্ময়ের সুরে বলিল—এখন খেতে বসেচ, এত বেলায়।

অপুর লজ্জা হইল। সে সকালে সরকারদের ঘরে বসিয়া খাইয়া স্কুলে যায়—শুধু ডাল-ভাত, তাও শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর বেগার শোধ ভাবে দিয়া যায়, খাইয়া পেট ভরে না। স্কুলেই ক্ষুধা পায়, সেখান হইতে ফিরিয়া মায়ের পাতে ভাত ঢাকা থাকে, বৈকালে তাহাই খায়। আজ ছুটীর দিনটা বলিয়া সকালে সকালেই মায়ের পাতে খাইতে বসিয়াছে।

অপু ভাল করিয়া উত্তর দিতে পারিল না বটে কিন্তু লীলা ব্যাপারটা কতক না বুঝিল এমন নহে। ঘরের হীন আসবাব পত্র, অপুর হীন বেশ, অবেলায় নিরুপকরণ দুটী ভাত সাগ্রহে খাওয়া—লীলার কেন যেন মনে বড় বিঁধিল। সে কোনো কথা বলিল না।

অপু বলিল—তোমার সব এনেচ এখেনে? দেখাতে হবে আমাকে? ভাল গল্প কি ছবির বই নেই?

লীলা বলিল—তোমার জন্তে কিনে এনেছি আস্‌বার সময়। তুমি গল্পের বই ভালোবাসো বলে এক খানা 'সাগরের কথা' এনেছি, আরও দু'তিন খানা এনেচি। আন্‌ছি, তুমি খেয়ে ওঠো—

অপুর খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছিল, খুসিতে বাকীটা কোনো রকমে শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। লীলা লক্ষ্য করিয়া দেখিল সে পাতের সবটা এমন করিয়া খাইয়াছে পাতে একটা দানাও পড়িয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর লীলার কেমন একটা অপূর্ব্ব মনের ভাব হইল —সে ধরণের অনুভূতি লীলার জীবনে এই প্রথম আর কাহারও সম্বর্কে সে ধরণের কিছু তো কখনও হয় নাই?

একটু পরে লীলা অনেক বই আনিল। অপুর মনে হইল, লীলা কেমন করিয়া তাহার মনের কথাটি জানিয়া সে যাহা পড়িতে জানিতে ভালবাসে, সেই ধরণের বইগুলি আনিয়াছে। 'সাগরের কথা' বইখানাতে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। সাগরের তলায় বড় বড় পাহাড় আছে আগ্নেয়গিরি আছে, প্রবাল নামক এক প্রকার প্রাণী আছে, দেখিতে গাছপালার মত-কোথায় এক মহাদেশ নাকি সমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া আছে—এই সব।

লীলা একখানা পুরাতন খাতা দেখাইল। তাহার ঝোঁক ছবি আঁকিবার দিকে—বলিল—সেই তোমায় একবার ফুলগাছ এঁকে দেখ্‌তে দিলাম মনে আছে? তার পর কত এঁকেচি দেখ্‌বে?

অপুর মনে হইল লীলার হাতের আঁকা আগের চেয়ে এখন ভাল হইয়াছে। সে নিজে একটা রেখা কখনো সোজা করিয়া টানিতে পারে না—ড্রইংগুলি দেখিতে দেখিতে লীলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বেশ এঁকেচো তো! তোমাদের ইস্কুলে করায়, না এমনি আঁকা?

এতক্ষণ পরে অপুর মনে পড়িল লীলা কোন্ স্কুলে পড়ে, কোন্ ক্লাসে পড়ে সে কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বলিল—তোমাদের কি ইস্কুল? এবার কোন্ ক্লাসে পড়্‌চো?

—এবার মাইনার থার্ড ক্লাসে উঠেচি—গিরীন্দ্র মহিলা গার্ল্‌স্ স্কুল—আমাদের বাড়ীর পাশেই—

অপু বলিল—জিগ্যেস্ করবো?

লীলা হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

অপু বলিল—আচ্ছা বলো—চট্টগ্রাম কর্ণফুলীর মোহানায়—কি ইংরিজি হবে?

লীলা ভাবিয়া বলিল—চিটাগং ইজ্ অন্ দি মাউথ অফ্ দি কর্ণফুলী—

অপু বলিল—ক'জন মাষ্টার তোমাদের সেখানে?

—আটজন, হেড্‌মিষ্ট্রেস্ এণ্ট্রেন্স পাশ,আমাদের গ্রামার পড়ান। পরে সে বলিল—মার সঙ্গে দেখা করবে না?

—এখন যাবো, না একটু পরে যাবো? বিকেলে যাবো এখন, সেই ভালো।—তাহার পর সে একটু থামিয়া বলিল—তুমি শোনোনি লীলা আমরা যে এখেন থেকে চলে যাচ্ছি—

লীলা আশ্চর্য্য হইয়া অপুর মুখের দিকে চাহিল। বলিল—কোথায়?

—আমার এক দাদামশায় আছেন, তিনি এতদিন পরে আমাদের খোঁজ পেয়ে তাঁদের দেশের বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছেন—

অপু সংক্ষেপে সব বলিল।

লীলা বলিয়া উঠিল—চলে যাবে—বা রে—

হয়তো সে কি আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল যাওয়া না যাওয়ার উপর অপুর তো কোনও হাত নাই, কোনো কথাই এক্ষেত্রে বলা চলিতে পারে না।

খানিকক্ষণ কেহই কথা বলিল না।

লীলা বলিল—তুমি বেশ এখানে থেকে স্কুলে পড়ো না কেন? সেখানে কি স্কুল আছে? পড়্‌বে কোথায়? সে তো পাড়াগাঁ—

—আমি থাক্‌তে পারি, কিন্তু মা তো আমায় এখেনে রেখে থাক্‌তে পারবে না—নইলে আর কি—

—না হয় এক কাজ কর না কেন? কল্‌কাতায় আমাদের বাড়ী থেকে পড়্‌বে? আমি মাকে বল্‌বো, অপূর্ব্ব আমাদের বাড়ীতে থাকবে; বেশ সুবিধে—আমাদের বাড়ীর সামনে আজকাল ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হয়েচে—ইঞ্জিন্‌ও নেই, ঘোড়াও নেই এম্‌নি চলে—তারের মধ্যে বিদ্যুৎ পোরা আছে, তাতে চলে—

—কি রকম গাড়ী? তারের ওপর দিয়ে চলে?

—একটা ডাণ্ডা আছে তারে ঠেকে থাকে, তাতেই চলে। কল্‌কাতা গেলে দেখ্‌বে এখন—ছ' সাত বছর হোল ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রাম হয়েচে—আগে ঘোড়ায় টান্‌তো—

আরও অনেকক্ষণ দুজনে কথাবার্ত্তা চলিল।

বৈকালে সর্ব্বজয়ার জ্যাঠামশায় ভবতারণ চক্রবর্ত্তী আসিলেন। অপুকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ঠিক করিলেন দুইদিন পরে বুধবারের দিন লইয়া যাইবেন। অপু দুএকবার ভাবিল লীলার প্রস্তাবটা একবার মায়ের কাছে তোলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কথাটা আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

২

সকালের রৌদ্র ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উলা ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতেই মনসাপোতা যাইবার সুবিধা। ভবতারণ চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ব হইতেই পত্র দিয়া গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাল রাত্রে একটু কষ্ট হইয়াছিল। এক্সপ্রেস্ ট্রেণখানা দেরীতে পৌঁছানোর জন্ত ব্যাণ্ডেল হইতে নৈহাটীর গাড়ীখানা পাওয়া যায় নাই। ফলে বেশী রাত্রে নৈহাটীতে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সারারাত্রি জাগরণের ফলে অপু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানে না। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ডাকে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল একটা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে গাড়ী লাগিয়াছে। সেখানেই তাহাদের নামিতে হইবে। কুলীরা জিনিসপত্র ইতিমধ্যে কিছু নামাইয়াছে।

গরুর গাড়ীতে উঠিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনবরত তামাক টানিতে লাগিলেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইবে, একহারা পাতলা চেহারা, মুখে দাড়ি গোঁফ নাই, মাথার চুল সব পাকা। বলিলেন—জয়া, ঘুম পাচ্ছে না তো?

সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলিল—আমি তো নৈহাটিতে ঘুমিয়ে নিইচি আধঘণ্টা, অপুও ঘুমিয়েছে। আপনারই ঘুম হয় নি।—

চক্রবর্ত্তী মহাশয় খুব খানিকটা কাশিয়া লইয়া বলিলেন—ওঃ সোজা খোঁজটা করেচি তোদের! আর বছর বোশেখে মেয়েটা গেল মারা, হরিধন তো তার আগেই।

এই বয়েসে হাত পুড়িয়ে রেঁধেও খেতে হয়েচে,—কেউ নেই সংসারে। তাই ভাব্‌লাম হরিহর বাবাজীর তো নিশ্চিন্দিপুর থেকে উঠে যাবার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকেই, যাই এখানেই নিয়ে আসি। একটু ধানের জমি আছে, গৃহদেবতার সেবাটাও হবে। গ্রামে ব্রাহ্মণ তেমন নেই,—আর আমি তো এখানে থাকব না। আমি একটু কিছু ঠিক ক'রে দিয়েই কাশী চলে যাবো। একরকম করে হরিহর নেবে চালিয়ে। তাই গেলাম নিশ্চিন্দিপুর—

সর্ব্বজয়া বলিল—আপনি বুঝি আমাদের কাশী যাওয়ার কথা শোনেন নি?

—তা কি করে শুন্‌বো? তোমাদের দেশে গিয়ে শুন্‌লাম তোমরা নেই এখানে। কেউ তোমাদের কথা বল্‌তে পারে না—সবাই বলে তারা এখান থেকে বেচে কিনে তিন চার বছর হোল কাশী চলে গিয়েচে। তখন কাশী যাই। কাশী আমি আছি আজ দশবছর। খুঁজতেই সব বেরিয়ে পড়্‌লো। হিসেব করে দেখ্‌লাম হরিহর, যখন মারা যান, তখন আমিও কাশীতেই আছি, অথচ কখনো দেখাশুনো হয় নি—তা হোলে কি আর—

অপু আগ্রহের সুরে বলিল—নিশ্চিন্দিপুরের আমাদের বাড়ীটা কেমন আছে দাদামশায়—

—সেদিকে আমি গেলাম কৈ! পথেই সব খবর পেলাম কিনা। আমি আর সেখানে দাঁড়াই নি। কেউ ঠিকানা দিতে পার্‌লে না। ভুবন মুখুয্যে মশায় অবশ্যি খাওয়া-দাওয়া কর্ল্লে বল্‌লেন, আর তোমার বাপের একশো নিন্দে—বুদ্ধিই নেই, সংসারিক জ্ঞান নেই—হেন তেন। যাক্ সে সব কথা, তোমরা এলে ভাল হোল। ধানটা যা আছে দেখে শুনে নিলে তোমাদের বছর তাতে যাবে। পাশেই তেলিরা বেশ অবস্থাপন্ন, তাদের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা আছে। আমিই পুজোটুজো করতাম অরিস্তি—সেটাও হাতে নিতে হবে ক্রমে। তোমাদেরই নিজেদের জিনিষ দেখে শুনে নিতে হবে—

উলা গ্রামের মধ্যেও খুব বন, গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথেও বন ঝোপ। সূর্য্য আকাশে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। চারিধারে প্রভাতী রৌদ্রের মেলা, পথের ধারে বন তুলসীর জঙ্গল, মাঠের ঘাসে এখনও স্থানে স্থানে শিশির জমিয়া আছে, যেন কোন্ রূপকথার দেশের মাকড়সা রূপালী জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে কিসের একটা গন্ধ, বিশেষ কোনো ফুল ফলের গন্ধ নয় কিন্তু শিশির সিক্ত ঘাস, সকালে বাতাস, অড়হরের ক্ষেত, এখানে ওখানে বনজ গাছপালা, সবশুদ্ধ মিলাইয়া একটা সুন্দর সুগন্ধ।

অনেক দিন পরে এই সব গাছপালার প্রথম দর্শনে অপুর প্রাণে একটি উল্লাসের ঢেউ উঠিল। অপূর্ব্ব অদ্ভূত, সুতীব্র; মিন্‌মিনে ধরণের নয়, পান্‌সে পান্‌সে, ঝোলো ধরণের নয়। অপুর মন সে শ্রেণীরই নয় আদৌ, তাহা সেই শ্রেণীর যাহা জীবনের সকল অবদানকে, ঐশ্বর্য্যকে প্রাণপণে নিংড়াইয়া চুষিয়া আঁটিসার করিয়া খাইবার ক্ষমতা রাখে। অল্পেই নাচিয়া ওঠে, অল্পেই দমিয়াও যায়—যদিও পুনরায় নাচিয়া উঠিতেও বেশী বিলম্ব করে না।

মনসাপোতা গ্রামে যখন গাড়ী ঢুকিল তখন বেলা দুপুর। সর্ব্বজয়া ছইএর পিছন দিকের ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিতেছে তাহার নূতনতর জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবার স্থানটা কি রকম। তাহার মনে হইল গ্রামটাতে লোকের বাস একটু বেশী, একটু যেন বেশী ঠেসাঠেসি, ফাঁকা জায়গা বেশী নাই, গ্রামের মধ্যে বেশী বন জঙ্গলের বালাইও নাই। একটা কাহাদের বাড়ী, বাহির বাটীর দাওয়ায় জনকতক লোক গল্প করিতেছিল, গরুর গাড়ীতে কাহারা আসিতেছে দেখিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। উঠানে বাঁশের আল্‌নায় মাছ ধরিবার জাল শুকাইতে দিয়াছে। বোধ হয় গ্রামের জেলে-পাড়া।

আরও শীঘ্র গিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। ছোট্ট উঠানের সাম্‌নে একখানা মাঝারি গোছের চালা ঘর, দুখানা ছোট্ট দোচালা ঘর, উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ও এক পাশে একটা পাতকুয়া। বাড়ীর পিছনে একটা বড় তেঁতুল গাছ—তাহার ডাল পালা বড় চালা ঘরখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সাম্‌নের উঠানটা বাঁশের জাফরী দিয়া ঘেরা। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গাড়ী হইতে নামিলেন। অপু মাকে হাত ধরিয়া নামাইল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে তেলিবাড়ীর কথা আসিবার সময় উল্লেখ করিয়াছিলেন বৈকালের দিকে তাহাদের ৗর সকলে দেখিতে আসিল। তেলি-গিন্নি খুব মোটা, রং বেজায় কালো। সঙ্গে চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে, ছটি পুত্রবধূ। প্রায় সকলেরই হাতে মোটা মোটা সোনার অনন্ত দেখিয়া সর্ব্বজয়ার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর হইতে ছখানা কুশাসন বাহির করিয়া আনিয়া সলজ্জভাবে বলিল—আসুন আসুন, বসুন—

তেলি-গিন্নি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলে ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূরাও দেখাদেখি তাহাই করিল। তেলি-গিন্নি হাসিমুখে বলিল—ছুপুরবেলা এলেন মা ঠাক্‌রুণ, তা একবার বলি যাই। এই যে পাশেই বাড়ী তা আস্‌তে পেলাম না। মেজ ছেলে এল গোয়াড়ী থেকে—গোয়াড়ী দোকান আছে কিনা? মেজ-বৌমার মেয়েটা বড় স্থাওটো, মা দেখ্‌তে ফুরসৎ পায় না, ছুপুরবেলা আমাকে একেবারে পেয়ে বসে—ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বেলা ছুটো। ঘুঙ্‌রী কাশি, গুপী কব্‌রেজ বলেচে ময়ূরপুচ্ছু পুড়িয়ে মধু দিয়ে খাওয়াতে। তাই কি সোজাসুজি পুড়্‌লে হবে মা, চৌষট্টি ফৈজৎ—কাঁসার ঘটির মধ্যে পোরো, তা খুঁটের জাল করো, তা টিমে আঁচে চড়াও। হ্যাঁরে হাজ্‌রী, ভোঁদা গোয়াড়ী থেকে কাল মধু এনেচে কিনা জানিস্?

আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তেলিগিন্নি তাহাকে দেখাইয়া বলিল—ঐটী আমার মেজ মেয়ে—বহরমপুর বিয়ে দিইচি। জামাই বড়বাজারে এঁদের দোকানে কাজকর্ম্ম করেন। নিজেদেরও গোলা, দোকান রয়েচে কাল্‌না—বেয়াই সেখানে দেখেন শোনেন। কিন্তু হোলে হবে কি মা—এমন কথা ভূভারতে কেউ কখনো শোনেনি। ছুই ছেলে, নাতি নাত্‌নী, বেয়ান মারা গেলেন ভাদর মাসে, মাঘ মাসে বুড়ো আবার বিয়ে করে আন্‌লে। এখন ছেলেদের সব দিয়েছে ভেন্ন করে। জামাইএরই মুস্কিল, ছেলেমানুষ—তা উনি বলেচেন, তা এখন তুমি বাবা আমাদের দোকানেই থাকো, কাজ দেখো শোনো শেখো, ব্যবসাদারের ছেলে তারপর একটা ছিল্লে লাগিয়ে দেওয়া যাবে—।

বড় পুত্রবধূ এতক্ষণ কথা বলে নাই। সে ইহাদের মত হড্‌বার্নিস নয়, বেশ টক্‌টকে রং। বোধ হয় সহর অঞ্চলের মেয়ে। এ-দলের মধ্যে সেই সুন্দরী, বয়স বাইশ তেইশ হইবে। সে নীচের ঠোঁটের কেমন চমৎকার এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া বলিল—এঁরা এসেচেন সারাদিন খাওয়া দাওয়া না, এঁদের আজ্‌কের সব ব্যবস্থা তো করে দিতে হবে? বেলাও তো গিয়েচে, এঁরা আবার রান্না করবেন—

এই সময় অপু বাড়ীর উঠানে ঢুকিল। সে আসিয়াই গ্রামখানা বেড়াইয়া দেখিতে বাহিরে গিয়াছিল। তেলিগিন্নি বলিলে—কে মা ঠাক্‌রুণ? ছেলে বুঝি? এই এক ছেলে? বাঃ, চেহারা যেন রাজপুত্তুর!—

সকলেরই চোখ তাহার উপর পড়িল। অপু উঠানে ঢুকিয়াই এতগুলি অপরিচিতার সম্মুখে পড়িয়া কিছু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেছিল, তাহার মা বলিল—দাঁড়া না এখানে! ভারী লাজুক ছেলে মা—এখন ওই টুকুতে দাঁড়িয়েচে—আর এক মেয়ে ছিল, তা—সর্ব্বজয়ার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। গিন্নি ও বড় পুত্রবধূ একসঙ্গে বলিল—নেই বুঝি মা! সর্ব্বজয়া বলিল—সে কি মেয়ে মা! আমায় ছল্‌তে এসেছিল, কি চুল, কি চোখ, কি মিষ্টি কথা! বকো, চকো, গাল দাও, মার মুখে উঁচু কথাটি কেউ শোনেনি কোনো দিন। ছোট বৌ বলিল—কত বয়েস ছিল মা?

—এই তেরোয় পড়েই—ভাদ্রমাসে তেরোয় পড়্‌লো আশ্বিন মাসের ৭ই—দেখ্‌তে দেখ্‌তে চার বছর হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ সহানুভূতির কথাবার্ত্তা হইবার পর তেলিগিন্নি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—আহা মা, তা কি করবে বলো, সংসারে থাক্‌তে গেলে সবই—তাই উনি বল্লেন—আমি বল্লাম আসুন তাঁরা,—চক্কত্তি মশায় পুজো-আচ্চা করেন—তা উনি মেয়ে জামাই মারা যাওয়ার পর থেকে এখানে বড় থাকেন না। গাঁয়ে একঘর বামুন নেই—কাজেকর্ম্মে সেই গোয়াড়ী দৌড়তে হয়—থাক্‌লে ভালো। বীরভূম না বাঁকুড়ো জেলা থেকে সেবার এল কি চাটুয্যে। কি নামটা রে পাঁচী? বল্লে বাস

করবো।- বাড়ী থেকে চাল ডাল সিধে পাঠিয়ে দিই। তিনবার রইল, বলে আজ ছেলেপিলে আনৃব, কাল ছেলেপিলে আনবো—ও মা, এক মাগী গোয়ালার মেয়ে উঠান ঝাঁট দিত আমাদের, তা বলি বামুন মানুষ এসেচে, ওঁরও কাজটা করে দিস্। বেয়ার কথা শোনো মা আর বছর শিবরাত্রির দিন—সেই তাকে নিয়ে —

বউ দুটী ও মেয়েরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সর্ব্বজয় অবাক হইয়া বলিল—পালালো নাকি ?

—পালালো কি এমন তেমন পালালো মা ? সেই সঙ্গে আমাদের এক প্রস্ত বাসন। কিছুই জানিনে মা সব নিজের ঘর থেকে—বলি আহা বামুন এসেছে—সরুক,আছে বাড়তি তা সেই বাসন কোসন সবশুদ্ধ নিয়ে দুজনে নিউদ্দিশ। যাক্ সে সব কথা মা, উঠি তা হোলে আজ ! রান্নার কি আছে না আছে বলো মা, সব দিয়ে দি বন্দোবস্ত কোরে—

আট দশ দিন কাটিয়া গেল সর্ব্বজয়া ঘরবাড়ী মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে। দেওয়াল উঠান নিকাইয়া পুছিয়া লইয়াছে। নিজস্ব ঘরদোর অনেক দিন ছিল না, নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধিই নহে—এতদিন পরে একটা সংসারের সমস্ত ভার হাতে পাইয়া সে গত চার বৎসরের সঞ্চিত সাধ মিটাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

জ্যাঠামশায় লোক মন্দ নহেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই সর্ব্বজয়া দেখিল তিনি একটু বেশী কৃপণ। ক্রমে ইহাও বোঝা গেল তিনি যে নিছক পরার্থপরতার ঝোঁকেই ইহাদের এখানে আনিয়াছেন তাহা নহে, অনেকটা আনিয়াছেন নিজের গরজে। তেলিদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরটী পূজা না করিলে সংসার ভালরূপে চলে না, তাহাদের বার্ষিক বৃত্তিও বন্ধ হইয়া যায়। এই বার্ষিক বৃত্তি সম্বল বলিয়াই তিনি কাশী থাকেন। পাকা লোক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে তিনি ইহাদের আনিয়া তুলিয়াছেন। সর্ব্বজয়াকে প্রায়ই বলেন, জয়া তোর ছেলেকে বল কাজ-কর্ম্ম সব দেখে নিতে আমার। মেয়াদ আর কত দিন ? ওদের বাড়ীর কাজটা দিক্ না আরম্ভ করে—সিধের চালেই তো মাস চলে যাবে—

সর্ব্বজয়া তাহাতে খুব খুসি।

সকলের তাগিদে শীঘ্রই অপু পূজার কাজ আরম্ভ করিল। দুটি একটি করিয়া কাজকর্ম্ম আরম্ভ হইতে হইতে ক্রমে এপাড়ায় ওপাড়ায় অনেক বাড়ী হইতেই লক্ষ্মীপূজায় মাকালপূজায় তাহার ডাক আসে। অপু মহাউৎসাহে প্রাতঃস্নান করিয়া উপনয়নের চেলীর কাপড় পরিয়া নিজের টিনের বাক্সের বাংলা নিত্য-কর্ম্মপদ্ধতিখানাকে হাতে লইয়া পূজা করিতে যায়। পূজা করিতে বসিয়া আনাড়ির মত কোন্ অনুষ্ঠান করিতে কোন্ অনুষ্ঠান করে। পূজার কোনো পদ্ধতি জানে না,—বার বার বইএর ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে কি লেখা আছে—"বজ্রায় হুং" বলিবার পর শিবের মাথায় বজ্রের কি গতি করিতে হইবে—"ওঁ ব্রহ্মপৃষ্ঠ ঋষি সুতলচ্ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা" বলিয়া কোন মুদ্রায় আসনের কোণ কি ভাবে ধরিতে হইবে। কোনোরকমে গোঁজামিল দিয়া কাজ সারিবার মত পটুত্ব তাহার আয়ত্ত হয় নাই, সুতরাং পদে পদে আনাড়িপানাটুকু ধরা পড়ে।

একদিন সেটুকু বেশী করিয়া ধরা পড়িল ওপাড়ার সরকারদের বাড়ী। যে ব্রাহ্মণ তাহাদের বাড়ীতে পূজা করিত, সে কি জন্য রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, গৃহদেবতা নারায়ণের পূজার জন্য তাহাদের লোক অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ীর বড় মেয়ে নিরুপমা পূজার যোগাড় করিয়া দিতেছিল, চোদ্দ বছরের ছেলেকে চেলী পরিয়া পুঁথি বগলে গম্ভীর মুখে আসিতে দেখিয়া সে একটু অবাক হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পুজো কর্ত্তে পারবে ? কি নাম তোমার ? চক্কত্তি মশায় তোমার কে হন ? মুখচোরা অপুর মুখে বেশী কথা যোগাইল না, লাজুক মুখে সে গিয়া আনাড়ির মত আসনের উপর বসিল।

পূজা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে নিরুপমার কাছে পূজারীর বিদ্যা ধরা পড়িয়া গেল। নিরুপমা হাসিয়া বলিল, ও কি ? ঠাকুর নামিয়ে আগে নাইয়ে নাও, তবে তো তুলসী দেবে ? অপু থতমত খাইয়া ঠাকুর নামাইতে গেল।

নিরুপমা বসিয়া পড়িয়া বলিল—উহু তাড়াতাড়ি কোরো না। এই টাটে আগে ঠাকুর নামাও—আচ্ছা, এখন বড় তাম্রকুণ্ডুতে জল ঢালো—

অপু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বইয়ের পাতা উল্টাইয়া স্নানের মন্ত্র খুঁজিতে লাগিল। তুলসীপত্র পরাইয়া শালগ্রামকে সিংহাসনে উঠাইতে যাইতেছে—নিরুপমা বলিল—ওকি? তুলসী পাতা উপুড় করে পরাতে হয় বুঝি? চিৎ করে পরাও—

ঘামে রাঙামুখ হইয়া কোনোরকমে পূজা সাঙ্গ করিয়া অপু চলিয়া আসিতেছিল, নিরুপমা ও বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে আসন পাতিয়া বসাইয়া ভোগের ফলমূল ও সন্দেশ জলযোগ করাইয়া তবে ছাড়িয়া দিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল।

সহরের বদ্ধ জীবনের দৈন্যের পর অপুর মন এই একমাসে গ্রামের পরিচিত সেওড়া বেঁটুবন, পাখীর ডাক, ধূলা মাটির পথের সোঁদা সোঁদা গন্ধকে যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় গিলিয়াছে। এই সবই সে চিনিয়াছে, জন্মিয়া অবধি মুক্ত প্রকৃতিকে দেখিয়া আসিতেছে, ভাল বাসিয়াছে, না দেখিলে থাকিতে পারে না। অনেক দিনের পর যেন পুরাতন সাথীদের মধ্যে সে ফিরিল।

কিন্তু তবুও অপুর কেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব্ব মায়ারূপ এখানকার কিছুতে নাই। এ গ্রামে নদী নাই, মাঠ থাকিলেও সে মাঠ নাই, লোকজন বেশী, গ্রামের মধ্যেও লোকজন বেশী। নিশ্চিন্দিপুরের সে উদার স্বপ্ন-মাখানো মাঠ, সে নদীতীর, সে রহস্যভরা বন এখানে নাই, শৈশব হইতে নিশ্চিন্দিপুর তাহার মনে যে অপরূপ রঙ ধরাইয়া দিয়াছে, প্রাণে যে স্বপ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, এখানকার চষা মাঠ, ধানের জমি, অড়হর, শাঁক আলুর ক্ষেত্র সে স্বপ্নের ঐশ্বর্য্যে যেন দীন।

তাহার পরিচিত অনেক গাছপালাই এদেশে নাই, বেশীর ভাগই নাই। এখানে বাসক ফুলের গাছ বেশী, আর একটা কি গাছ অপু চেনে না, পাড়ার মধ্যে লোকের ঘরের পিছনে তাহার ছোট ছোট ঝোপ। কিন্তু তাহাদের দেশের মত অত গাছপালা, অত ফুলফল, পাখী, নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব্ব বন-বৈচিত্র্য কোথায় সে সব? কোথায় সে নিবিড় পুষ্পিত ছাতিম বন, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর ছড়ানো সন্ধ্যা?

তাহা হইলেও ভাল লাগে। সহরের ইটপাথরে আর কয়লার ধোঁয়ায় তাহার যেন নিঃশ্বাসরুদ্ধ হইয়া ছিল, এই তিন চার বছর—এখানে আসিয়া সে বাঁচিয়াছে।

সরকার বাড়ী হইতে আজকাল প্রায়ই পূজা করিবার ডাক আসে। শান্তস্বভাব ও সুন্দর চেহারার গুণে অপুকেই আগে তাহারা চায়। বিশেষ বারব্রতের দিনে পূজাপত্র সারিয়া অনেক বেলায় সে ধামা করিয়া নানাবাড়ীর পূজার নৈবেদ্য ও চাল-কলা বহিয়া বাড়ী আনে। সর্ব্বজয়া হাসিমুখে বলে—ওঃ আজ চা'ল তো অনেক হয়েচে!—দেখি! সন্দেশ কাদের বাড়ীর নৈবিদ্যিতে দিলে রে! অপু খুসির সহিত দেখাইয়া বলে—কুণ্ডুবাড়ী থেকে কেমন একছড়া কলা দিয়েচে, দেখেচো মা?

সর্ব্বজয়া বলে—এইবার বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েচেন—এদের ঘরে থাকা যাক্, গিন্নী লোক বড় ভালো। মেজমেয়ের শ্বশুরবাড়ী থেকে তত্ত্ব পাঠিয়েচে—অসময়ের আম—অমনি আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়েচে—খাস্ এখন দুধ দিয়ে।

এত নানারকমের ভাল জিনিষ সর্ব্বজয়া কখনো নিজের আয়ত্তের মধ্যে পায় নাই। তাহার কতকালের স্বপ্ন! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীতে কত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে উঠানের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া বাঁশবনের পত্রস্পন্দনে, ঘুঘুর ডাকে, তাহার অবসন্ন অন্যমনস্ক মন যে অবাস্তব স্বচ্ছলতার ছবি আপন মনে ভাঙিত গড়িত—হাতে খরচ নাই, ফুটা বাড়ীতে জল পড়ে বৃষ্টির রাত্রে, পাড়ায় মুখ পায় না, সকলে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না—সে সব দিনের স্মৃতির সঙ্গে, আমরুল শাকের বনে পুরানো পাঁচিলের দীর্ঘ ছায়ার সঙ্গে যে সব দূরকালের দুরাশার রঙে রঙীন্ ভবিষ্যৎ জড়ানো ছিল—এই তো এতদিনে তাহারা পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে!

শীতকালের প্রথমে ভবতারণ চক্রবর্ত্তীর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। একটু সারিয়া উঠিয়াই তিনি কাশী চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তেলি বাড়ীর বৃত্তিটা যাহাতে তাঁহাকে কাশীতে নিয়মিতভাবে পাঠানো হয়, এসম্বন্ধে তিনি তাহাদের সঙ্গেই সরাসরি বন্দোবস্ত করিলেন। সর্ব্বজয়াকে বলিলেন—চিরকালটা তো দেশে কাটানো

গেল। এখন এসময় এ গঙ্গাহীন দেশে আর থাকতে মন যায় না রয়া—তোরা আছিস্, ভিটেতে সন্ধ্যেটা তো পড়বে ?

মেয়ে-জামাইএর মৃত্যুর পর দেশে তাঁহার আর মন টেঁকে না।

পূজার কাজে অপুর অত্যন্ত উৎসাহ। রোজ সকালে উঠিয়া সে কলুপাড়ার একটা গাছ হইতে রাশীকৃত কচি কচি বেলপাতা পাড়িয়া আনে। একটা খাতা বাঁধিয়াছে, সেখানাতে সর্ব্বদা ব্যবহারের সুবিধার জন্য নানা দেবদেবীর স্তবের মন্ত্র, ধ্যানের মন্ত্র, তুলসীদান প্রণালী লিখিয়া লইয়াছে। পাড়ার পূজা করিতে নিজের তোলা ফুল বেলপাতা লইয়া যায়, পূজার সকল পদ্ধতি নিখুঁত ভাবে জানা না থাকিলেও উৎসাহ ও একাগ্রতায় সে অভাব পূরণ করিয়া লয়। (ক্রমশঃ)

'বিসর্জ্জন' নাটকের ভূমিকা

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

'রাজা ও রাণী' হইতেই রবীন্দ্র-নাট্যের দ্বিতীয় পর্ব্বের সূচনা। এই পর্ব্বে বিশেষ করিয়া তিনটি নাটককে স্থান দিতে হয়; প্রথম 'রাজা ও রাণী', দ্বিতীয় 'বিসর্জ্জন', তৃতীয় 'মালিনী'। ভাব ও বিষয়-বস্তু, উভয়দিক হইতেই এই তিনটি কাব্য-নাট্যকে একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাট্যের প্রথম পর্ব্বেও 'বাল্মীকির প্রতিভা'কে বাদ দিলে অন্য দুইটি গীতি-নাট্যের মধ্যেও একটা idea, একটা সত্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; সমস্ত কথা ও ঘটনা-পরম্পরার ভিতর দিয়া সেই সত্যটাই একটা শিল্পরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে 'His dramatic work is the vehicle of ideas, rather than the expression of action' —টম্‌সন্ সাহেবের এই বিশ্লেষণ শুধু রূপকনাট্যগুলি সম্বন্ধে নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটক সম্বন্ধেও সত্য। এই যে নাটককে একটা idea একটা ভাবের বাহন করিয়া তোলা, রবীন্দ্রনাথের নাট্য-রচনার সূচনা হইতেই ইহা আমরা লক্ষ্য করি, এবং ক্রমে যত অগ্রসর হই, 'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জ্জন' 'মালিনী'র ভিতর দিয়া যতই রূপক-নাট্যের রাজ্যের সীমার মধ্যে আসিয়া পৌঁছাই ততই এই বিশেষত্বটুকু স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি মনে করি কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট সত্য বা ideaকে প্রকাশ করিবার জন্যই কোনো একটা বিশেষ নাট্য-রচনার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা হইলে হয়ত ভুল করিব; তাহা হইলে শিল্প বা সাহিত্য হিসাবে তাহার কোনো মূল্যই থাকিত না। বরং সর্ব্বত্রই আমরা দেখিব নাটকের পারিপার্শ্বিক শিল্পাবেষ্টনের ভিতর হইতে কবির বিশিষ্ট ভাবটি, সত্যটি আপনি আপনার অজ্ঞাতসারে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে; দেখিব, কোথাও কোনো idea বা ভাব philosophical truth বা তত্ত্বের রূপ ধারণ করিয়া নাটকীয়-সংস্থান, রীতি ও ভঙ্গিমাকে অথবা তাহার রসাভিব্যক্তিকে সহজে ব্যাহত করিতে পারে নাই—কোথাও সেই সত্য বা idea কোনো apostlic message হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব শিল্প-প্রতিভা ও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধিই তাঁহাকে এই অত্যন্ত সম্ভাবনীয় পরিণাম হইতে দূরে রাখিয়াছে।

'রাজা ও রাণী'র অল্প কিছুদিন পরেই 'বিসর্জ্জন' রচিত হইয়াছিল। 'বিসর্জ্জন' রবীন্দ্রনাথের ও শিক্ষিত বাঙালীর প্রিয় নাটক; বহুবার নানাস্থানে সাফল্যে অভিনীত হইয়াছে এবং আজ ইহার আখ্যানভাগ সকলের কাছেই অত্যন্ত পরিচিত। 'বিসর্জ্জনের' ঘটনা-বস্তুর বিন্যাস 'রাজা ও রাণী' এবং অন্যান্য নাটকের ঘটনা-বিন্যাসেরই অনুরূপ, 'রাজা ও রাণীর' মতনই ইহারও রচনা অমিত্রাক্ষর ছন্দে, শুধু পৌরগণের দৃশ্যগুলি গদ্যে। 'রাজা ও রাণী'র প্রথম চারিটি অঙ্কে ঘটনাস্রোতের একটা শিথিল মন্থরতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু 'বিসর্জ্জনে' তাহার আভাসও কিছু পাই না; প্রথম হইতেই ঘটনার পর ঘটনা এমন কৌশলে সুবিন্যস্ত হইয়াছে যে, কোথাও কোনো ফাঁক নাই, সর্ব্বত্র নাটকীয়-সংস্থান অত্যন্ত জমাট হইয়া পাঠক ও দর্শকের মন এবং অনুভূতিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু একথাটা স্বীকার করিতে হইলে খুব সংক্ষেপে বিষয়-বস্তুটির একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা, গুণবতী তাঁহার মহিষী। রঘুপতি রাজপুরোহিত—ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের তেজস্বী ব্রাহ্মণ। এই মন্দিরের সেবক রঘুপতির পালিত একটি রাজপুত যুবক—নাম তার জয়সিংহ। অপর্ণা একটি সরলা কোমলহৃদয়া বালিকা। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দেবীর পূজায় পশু-বলিদান বহুবৎসরের চিরাচরিত প্রথা—কেহ কোনোদিন এই প্রথার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করে নাই। প্রথম প্রতিবাদ জানাইল ভিখারিণী বালিকা অপর্ণা। বালিকার স্নেহের পুত্তলি ক্ষুদ্র একটি ছাগশিশুকে 'মায়ের' কাছে বলি দিবার জন্ত জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া আসা হইয়াছে; আর বালিকা চোখের জলে তাহার আহত হৃদয়ের দীপ্তি জ্বালিয়া রাজার কাছে ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। সেই করুণাকাতর কণ্ঠস্বরের প্রতিবাদ মন্দিরের সেবক জয়সিংহের ভক্তহৃদয়কে এক অপরূপ বেদনায় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে এবং আজ সর্ব্বপ্রথম তাহাকে বিশ্বজননীর প্রেমে সন্দেহাকুল করিয়াছে। সেইদিন হইতে গোবিন্দমাণিক্য নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন, মন্দিরে মায়ের পূজায় জীববলি হইতে পারিবে না। পুরোহিত রঘুপতি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, ধর্ম্মের বিনাশ আশঙ্কা করিয়া রাজ্যের মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ, যুবরাজ নক্ষত্র রায় ও প্রজাবৃন্দ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। সংশয়াকুলচিত্ত জয়সিংহও রাজার আদেশ শুনিয়া বিচলিত হইল, কিছুতেই সে আদেশকে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সংশয় নাই শুধু রাজার মনে, অন্তরের মধ্যে তিনি ভগবানের স্থির আদেশ লাভ করিয়াছেন, তিনি জানিয়াছেন,

> " মানবের
> বুদ্ধি দীপ সম, যত আলো করে দান,
> তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া, স্বর্গ
> হতে প্রাণে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
> টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই নাই।"

এদিকে ব্রাহ্মণ রঘুপতি তাঁর ক্রোধ সকল দিকে ছড়াইতেছেন; সকলকে রাজার বিরুদ্ধে, রাজার আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছেন—পুরবাসীরা রাজাদেশ অমান্ত করিয়া মন্দিরে বলি লইয়া আসিতেছে, আর রাজা নিরুপায় হইয়া সৈন্তবলের সাহায্যে সে বলি ঠেকাইয়া রাখিতেছেন। জয়সিংহ পায়ে ধরিয়াও রাজাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। রঘুপতির উন্মত্ততাও এদিকে ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, যুবরাজ নক্ষত্র রায়কে তিনি গোবিন্দমাণিক্যের হত্যায় প্ররোচিত করিলেন এবং জয়সিংহকেও বুঝাইলেন, 'রাজরক্ত চাই, দেবীর আদেশ!' জয়সিংহের সন্দেহ সংশয় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল—সত্যই কি মা এত নিষ্ঠুর পাষাণময়, সত্যই কি তিনি রক্তপিপাসু! "কিন্তু রাজরক্ত! ছি ছি! ভক্তি পিপাসিতা মাতা, তাঁরে বল রক্তপিপাসিনী"। তবে কি বলি বন্ধ হইবে, হোক্। কিন্তু তাহা হইতেই পারে না—তাহা হইলে যে গুরু রঘুপতির প্রতি অবিশ্বাসী হইতে হয়, প্রাণ থাকিতে তাহা সম্ভব নয়। "রাজরক্ত চায় যদি মহামায়া, সে রক্ত আনিব আমি! ভ্রাতৃহত্যা দিব না ঘটিতে।" কিন্তু সংশয় যে তাহার কিছুতেই কাটে না, আর অপর্ণা যে তাহার সংশয় আরও বাড়াইয়াই তোলে। রঘুপতি বলেন অর্পণা হইতে দূরে থাকিতে, কিন্তু তাহাকে দূরে রাখিতে যে জয়সিংহের বুকে বেদনার তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। তবুও গুরু বড়, গুরুর কথাই সত্য।

> " তাই হোক গুরুদেব!
> চলে যা অপর্ণা। দয়ামায়া স্নেহ প্রেম
> সব মিছে। সরে যা অপর্ণা। সংসারের
> বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
> তবে দয়াময় মৃত্যু। চলে যা' অপর্ণা!"

এমনি মর্ম্মন্তুদ বেদনা বুকে লইয়াও সে অপর্ণাকে দূরে রাখিতেই চায়, কিন্তু অপর্ণা বলে, "কেন যাবো?" এতটুকু অভিমান তার হয় না।

> "অভিমান কিছু নাই আর! জয়সিংহ
> তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
> সব গর্ব্ব চেয়ে বেশী! কিছু মোর নাই
> অভিমান।"

কিন্তু জয়সিংহ পারিল না রাজরক্ত আনিতে—মন্দিরের মধ্যে রাজাকে হত্যা করিতে গিয়া ছুরী তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল—পারিল না! রঘুপতির ক্রোধ আবার জ্বলিয়া উঠিল! আবার জয়সিংহকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল, "আমি এনে দিব রাজ-রক্ত শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।" রঘুপতি তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন—তাঁহারই চক্রান্তে মন্দিরের মধ্যে প্রস্তর-প্রতিমার মুখ ফিরিয়া যায় এবং সমস্ত প্রজা ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উঠে। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য নির্ব্বিকার—চিত্ত তাঁর অবিচল। আবার অপর্ণা ও জয়সিংহ—জয়সিংহকে অপর্ণা টানিতেছে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের করুণায় ভালবাসায়, সমস্ত অন্ধ আচারের মরুবালিরাশির ভিতর হইতে অখণ্ড নিষ্কলুষ নিঃসংশয় প্রেমের রাজ্যের দিকে সে তাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে; কিন্তু আর এক দিকে তাহাকে টানিতেছে গুরু রঘুপতির নিষ্করুণ স্নেহ, তাহার সুকঠোর আদেশ! এই দুই সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া জয়সিংহের অন্তর প্রতি মুহূর্ত্তে বেদনায় উৎপীড়িত হইতেছে। এদিকে রাজহত্যার চক্রান্তে লিপ্ত অপরাধে বন্দী হইয়া রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের বিচার-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন—বিচারে 'অষ্টবর্ষ নির্ব্বাসন'

দণ্ড হইয়াছে, দুই দিন পরে নির্ব্বাসনে যাইতে হইবে। এতদিন পর রঘুপতি আজ বিচলিত হইয়াছেন—

"গেছে গর্ব্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব।
* * * *
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি'
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ।"

কিন্তু অন্তরের হিংসাবহ্নি আজও তাহার নিভে নাই। 'রাজরক্ত চাই দেবীর'—একথা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া জয়সিংহের মুখ হইতে তৃতীয়বার এই প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত করিলেন—"রাজ-রক্ত চাহে দেবী; তাই তারে এনে দিব।" এদিকে নক্ষত্র রায় গোপনে মোগল-সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিতেছেন—ভাই'র বিশ্বাসঘাতকতায় বিচলিত গোবিন্দমাণিক্য কি করিবেন বুঝিতেছেন না। মন্দির বাহিরে ঝড় উঠিয়াছে, পূজোপকরণ লইয়া রঘুপতি মন্দিরে প্রবেশোন্মুখ—ঝড়ের উন্মত্ততা তাহার নিজের মধ্যেও হিংস্র উন্মত্ততা জাগাইয়া তুলিয়াছে। এমন সময় অপর্ণা জয়সিংহের অন্বেষণে আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু রঘুপতি তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন—"দূর হ' দূর হ' মায়াবিনী! জয়সিংহে চাস্ তুই! আরে সর্ব্বনাশী মহাপাতকিনী।" অপর্ণা চলিয়া গেল। একটু পরেই জয়সিংহ দৌড়িয়া আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজরক্ত কই!" জয়সিংহ বলিয়া উঠিল,

" আছে আছে! ছাড় মোরে!
নিজে আমি করি নিবেদন!—রাজরক্ত
চাই তোর দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা! নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা!—আমি রাজপুত, পূর্ব্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে!
এই রক্ত দিব! এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা! এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ত তৃষাতুরা।"

এই বলিয়া নিজেই সে নিজের বুকে ছুরী আমূল বসাইয়া দিল এবং মুহূর্ত্তেই ধরাশায়ী হইল! কিন্তু জয়সিংহ এ কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিল! সে যে রঘুপতির "একমাত্র প্রাণ, প্রাণাধিক জীবনমন্থন-করা ধন!" তাহাকে ছাড়িয়া রঘুপতি বাঁচিবে কি করিয়া?—

"জয়সিংহ! বৎস মোর গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি; অহঙ্কার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব দূর হ'য়ে যাক্,
তুই আয়!"

এমন সময় ছুটিয়া আসিয়া অপর্ণা দেখিল জয়সিংহের মৃত রুধিরাক্ত দেহ—"ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে! ফিরে দে!" কিন্তু ফিরাইয়া দিবে কে? প্রতিমা যে পাষাণ!!

জয়সিংহকে হারাইয়া রঘুপতির এতদিনে চৈতন্যলাভ হইয়াছে! দেবী তো জড় পাষাণের স্তূপ! সমস্ত ব্যথিত, বিশ্ব তাঁর পায়ে কাঁদিয়া মরিতেছে—তাঁর দৃক্‌পাত নাই! আর "মা বলিয়া ডাকে যত জীব—হাসে তত ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দ্দয় বিদ্রূপ।" মহারাণী গুণবতী মন্দিরে দেবীর চরণে পূজা লইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দেবী কোথায়? রঘুপতি উত্তর করিল,

" দেবী বল
তারে? এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী
তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিস্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি
মূঢ় পাষাণের পদে! দেবী বল তারে?
পুণ্য রক্ত পান করে' সে মহা রাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে।"

দেবী নাই, দেবী নাই, দেবী সে কোথাও নাই সেই মন্দিরে! অপর্ণা আসিল সেই মন্দিরে দেবীর মূর্ত্তি ধরিয়া।

"পাষাণ ভাঙিয়া গেল, জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী অমৃতময়ী।"

এই তো সংক্ষেপে নাট্য-বস্তুর বিবৃতি। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ঘটনার সংস্থান কোথাও একটু শিথিল হইয়া উঠিতে পারে নাই—একটির পর একটি প্রত্যেকটি আখ্যান-অংশ এমনি স্থির অথচ সচল গতিতে চলিয়া গিয়াছে যে, আমাদের বোধ ও দৃষ্টি প্রতি পদেই একটা নূতন অনুভূতির আস্বাদন লাভ করিয়া চলে। সমস্ত নাটকটির উপর দিয়া একটা ক্রুদ্ধ বাতাস যেন হু হু করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। রঘুপতির জ্বালাময়ী কথাগুলি যেন তা'র এক একটা ঝাপ্‌টা, সে বাতাসের গতি থাকিয়া থাকিয়া বাড়িয়া বাড়িয়া চলে, তাহার মুখে জয়সিংহের দ্বিধাসংশয় বার বার উড়িয়া যায়, বার বার অপর্ণা আসিয়া বিদ্যুতের মত তা'র চিত্তকে আলোকিত করে। শুধু গোবিন্দমাণিক্য ঝড়ের মুখে বিরাট মহীরুহের মত দাঁড়াইয়া থাকেন। কিন্তু গতি সংহত করিবার শক্তি তাঁহার কোথায়? জয়সিংহ যেখানে বুক পাতিয়া দিয়া ঝড়ের বেগ থামাইল সেইখানে

নাটকের গতিবেগও সংহত হইল—তাহার পর ধীরে ধীরে পা হওও নামিয়া আসিল। এই যে সমগ্র নাটকটির ভিতর এই গতিবেগের সঞ্চার, ইহার অন্য কারণও আছে, সে কারণটি নাটকীয় ভাববস্তুর সঙ্গে জড়িত। 'বিসর্জ্জন' আমাদের ধর্ম্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ প্রথম দেখা দিয়াছে একটি বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে এবং সেই প্রতিবাদকে ভাষা দিয়াছেন গোবিন্দ-মাণিক্য। নাটকটির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চিরাচরিত প্রথার সঙ্গে এই সংগ্রাম সর্ব্বত্র মুখর হইয়া আছে—জয় পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত তার বিরাম নাই। এই সংগ্রাম আরও জীবন্ত হইয়াছে ব্রাহ্মণ রঘুপতির চরিত্রে; তাহার জলন্ত বিশ্বাস যেন আগুন হইয়া তাহার কথার মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই দুই বিরোধী সমস্যাই নাটকের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বকে আগাগোড়া জাগাইয়া রাখিয়া উহাকে স্পন্দিত ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। কি মনের, কি বাহিরের, এতখানি দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নাট্যেই এমন জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠে নাই; এই হিসাবে 'বিসর্জ্জন' অতুলনীয়। জয়সিংহের মনের মধ্যে যে সংশয়ের নিষ্করুণ দ্বন্দ্ব, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব্ব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন খুব কম নাট্যেই তাহার তুলনা আছে। আর, কি জয়সিংহ, কি রঘুপতি, কি গোবিন্দমাণিক্য কি অপর্ণা, ইহাদের মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তাহা মনের মধ্যেই শুধু লীলায়িত হয় নাই, বাহিরে কথার ও গতি ভঙ্গিমার মধ্যেও তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। চিত্তের ও কর্ম্মের দ্বন্দ্বগতির এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নাটকেই এতটা সম্ভব হয় নাই। বিসর্জ্জন যে অভিনয়-সাফল্য লাভ করিয়াছে ইহাই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।

ভাববিকাশের দিক হইতেও বিসর্জ্জন প্রতি মুহূর্ত্তে লীলাচঞ্চলিত। প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্রেই একটা সংশয়ের চঞ্চলতা, একটা সংগ্রামের ক্ষুব্ধতা যেন দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে। এই সংশয়-সংগ্রাম সকলের চাইতে প্রবল জয়সিংহের চরিত্রে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এই সংশয় প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে, এবং সে সংশয়কে জাগাইয়াছে অপর্ণা।

> "আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
> বুঝিতে পারিনে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
> মানবের—দয়া নাই বিশ্বজননীর।"

এই যে সংশয় জাগিল এর নিবৃত্তি আর কোথাও হইল না—হইল শুধু মৃত্যুর মধ্যে। জীবনের সমস্তগুলি দিন তার শুধু নিষ্করুণ দ্বিধা সংশয়ের মধ্যে কাটিল, চিত্ত শতধা দীর্ণ হইল—প্রেমের মধ্যে শান্তির মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে আশ্রয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া বারবার তাহাকে গুরুর আদেশে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। অপর্ণা তাহাকে প্রতিদিন মুক্ত জীবনের প্রেম ও শান্তির মধ্যে টানিতে চাহিল, আর প্রতিদিন সে তাহাকে বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিল, সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহাকে ভালবাসিতে চাহিয়াও তাহার প্রকাশ চিরদিন তাহার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া কাঁদিয়া মরিল, গুরুর ইচ্ছার পদতলে, তুচ্ছ আচার ও সংস্কারের যূপকাষ্ঠে নিজকে বলি দিতে হইল—এমন সংশয়-নিপীড়িত আপাত-ব্যর্থ জীবন কাহার! এমন করিয়া নিজে মৃত্যুকে বরণ করিয়া পরকে জীবনের সন্ধান দিয়া যায় কে? অথচ নিজের জীবনের সংশয় শেষ পর্য্যন্ত তার ঘুচিল না। শেষ পর্য্যন্ত একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যেই তাহাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল! মন্দিরের দেবী কি সত্য, না অন্তরের বিশ্বাস সত্য; গুরুর আদেশ কি বড়, না প্রেমের আহ্বান বড়; কর্ত্তব্য বড়, না হৃদয় বড়? অপর্ণা তাহাকে শিখাইয়াছে, অন্তরের বিশ্বাসই সত্য, প্রেমের আহ্বানই বড়, হৃদয়ের নির্দ্দেশই অমোঘ; কিন্তু পিছন হইতে টানিয়াছে মন্দিরের দেবী, আজন্মের সংস্কার, গুরুর আদেশ, কর্ত্তব্যের আহ্বান এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহাদেরই নিষ্করুণ বিধানের নীচে তাহাকে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। এমন শূন্যতার মধ্যে এমন একটা জীবনের বিসর্জ্জন, ইহাই সমগ্র নাটকটিকে একটি বিরাট শূন্য ব্যর্থতায় একটা নিষ্করুণ বেদনার ভারে ক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে—

> "দেবি, আছ, আছ তুমি। দেবি থাক তুমি!
> এ অসীম রজনীর সর্ব্ব-প্রান্ত শেষে
> যদি থাক কণামাত্র হ'য়ে সেথা হ'তে
> ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বল মোরে,
> 'বৎস আছি'! নাই! নাই, দেবী নাই!
> নাই? দয়া করে থাক, অয়ি মিথ্যাময়ি
> মিথ্যা, দয়া কর, দয়া কর, জয়সিংহে
> সত্য হ'য়ে উঠ্! আশৈশব ভক্তি মোর
> আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
> এত মিথ্যা তুই?"

রঘুপতির মুখে এই যে আক্ষেপ, এ আক্ষেপের কোনো সান্ত্বনা আছে, না ইহার বেদনার কোনো সীমা আছে? কিন্তু সত্যই কি তার জীবন ব্যর্থ, সত্যই কি তার আত্ম-দান মানুষকে কোনো মহত্তর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করিয়া যায় নাই? এত বড় বিসর্জ্জন কি মানুষের অন্ধকার চিত্ত-পুরীর একটি কক্ষও আলোকিত করে নাই?

করিয়াছে, রঘুপতিকে সে জীবনের সন্ধান দিয়া গিয়াছে;

মানুষের একটা অন্ধ আচার ও সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া তাহাকে সত্যের জ্যোতির্ম্ময় আলোক রেখার দিকে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছে। রঘুপতি নিষ্করুণ, কিন্তু রঘুপতি ক্রূর, কুটিল নহে; তাহার বিশ্বাস ভুল হইতে পারে, কিন্তু সে নিজকে বঞ্চনা করে নাই, সত্যই সে বিশ্বাস করে দেবী চাহেন বলি, জীবরক্ত ছাড়া তাঁহার তৃষ্ণা মিটে না। ইহাই তাহার আজন্মের সংস্কার, এই সংস্কারের জালের মধ্যে নিজকে বন্দী রাখিয়াই সে তাহার সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব তার প্রদীপ্ত, তা'র অপমান তার ক্ষমতার হ্রাস তিলমাত্রও সে সহিবে না; নিজের ও দেশের চিরাচরিত আচার ও সংস্কারকে কিছুতেই সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না—যত কঠোর হোক রাজার আদেশ। তার বিরুদ্ধে যে উপায়, যে চক্রান্তই তাহাকে অবলম্বন করিতে হয়, সে তাহা করিবেই, কর্ত্তব্যবিচ্যুতি সে কিছুতেই ঘটিতে দিবে না।

"আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে' যায় রাজহস্ত হ'তে
মুকুট ধূলায় প'ড়ে লুটে।"

এমন প্রচণ্ড তাহার গর্ব্ব! এই গর্ব্বই তাহাকে রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবার যুক্তি দেয়, এই গর্ব্বই জয়সিংহকে বার বার বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া রাজরক্ত আনিতে পাঠায়। এই গর্ব্বই তাহার মানব-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ প্রীতি দয়া মায়া ভালবাসাকে উৎখাত করিয়া দিয়া সমস্ত জীবনটাকে শুধু একটা ধূ ধূ-করা তরাল তৃষ্ণার্ত্ত মরুভূমি করিয়া তোলে। পাপ কি, পুণ্য কি সে তাহা ভালই জানে, সত্য কি, মিথ্যা কি তাহাও তার অজ্ঞাত নয় কিন্তু আত্মাভিমানের কাছে, নিজের গর্ব্বের কাছে সব খর্ব্ব হইয়া যায়, সত্য মিথ্যা হইয়া যায়, মিথ্যা সত্যের মুখোস পরিয়া উপস্থিত হয়, পাপপুণ্যের ভেদাভেদ চলিয়া যায়, শুধু জাগিয়া থাকে প্রচণ্ড প্রদীপ্ত নিষ্করুণ অহং। কিন্তু মমত্ব কি তাহার চিত্তেও নাই? আছে, এই নিষ্করুণ হৃদয়ে এক কোণে একটু স্নেহের উৎস আছে। জয়সিংহকে সত্যই রঘুপতি ভালবাসে, তাহাকে হারাইবার চিন্তাও সে সহিতে পারে না—অপর্ণা তাহার প্রেমে জয়সিংহকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে, ইহা তাহার অসহ্য।

"সত্য করে বলি বৎস তবে। তোরে আমি
ভালবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হ'তে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে।"

অন্যত্র

"বৎস তোল মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণাধিক প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই।"

ইহা রঘুপতির ছলনা নয়। সত্যই রঘুপতি জয়সিংহকে ভালবাসে। কিন্তু সে ভালবাসাও যে আত্মাভিমানেরই তৃপ্তি! কিন্তু এই যে আত্মাভিমান, এই যে প্রচণ্ড গর্ব্ব, ইহাকে চূর্ণ করিয়া ধূলায় লুটাইতে না পারিলে যে রঘুপতির মুক্তি নাই, জীবনের রহস্য, ধর্ম্মের রহস্য যে সে জানিল না। এ অভিমান চূর্ণ করিল তাহারই স্নেহের পুত্তলি জয়সিংহ, তাহারই নিষ্ঠুর গর্ব্বিত অন্ধ উন্মত্ত খেয়ালের চরণে নিজকে বিসর্জ্জন দিয়া, আর জীবনের রহস্য, ধর্ম্মের রহস্য জানাইল অপর্ণা তাহার বালিকা-হৃদয়ের সহজ দ্বিধাবিহীন প্রেম ও বিশ্বাসের মধ্যে তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া। কিন্তু রঘুপতির চরিত্রের শেষ পরিণতিটা যেন একটু অকস্মাৎ ঘটিয়াছে, এবং তাহার পূর্ব্বাপর দৃপ্ত অনম্য চরিত্রের সঙ্গতিকে যেন একটু ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পর রঘুপতির আর পরিচয় যদি আমরা না পাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এই অসঙ্গতিটুকু আমাদের চোখে পড়িত না। যেখানে আছে, 'বৎস মোর গুরুবৎসল! ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর কিছু নাই চাই; অহঙ্কার অভিমান দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্। তুই আয়!' সেইখানেই যদি রঘুপতির পরিচয়ের সমাপ্তি ঘটিত তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাহার জীবনের ক্রুদ্ধ অমাবস্যা-রাত্রির অবসান হইয়াছে, শান্ত উষার অরুণোদয়ের আর বাকী নাই। নাটকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু পঞ্চমাঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে তাহার যে পরিচয় আমরা পাই তাহাতে মনে হয়, যেন সমগ্র জীবনের একান্ত পরাজয়ের মধ্যে তাহার চরিত্রের তেজোদৃপ্ত গর্ব্বটুকু একেবারে ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে, মনে হয় যেন নিজের কাছেই নিজে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এই দুর্ব্বলতা তাহার চরিত্রের নিজস্ব বস্তু নহে। কিন্তু আমার এই বিশ্লেষণটুকু সত্য কিনা তাহা আমি নিজেই পরে একটু বিচার করিয়া দেখিয়া লইব।

গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র এত শান্ত ও স্তব্ধ, এত স্থির ও অচঞ্চল লীলার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সহসা তাহা আমাদের অনুভূতিকে স্পন্দিত করে না—জয়সিংহ, রঘুপতি ও অপর্ণাই আমাদের সমস্ত বোধ ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। তাহার কারণও আছে। গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র মহৎ, কিন্তু বিকাশের দিক হইতে তাহা সুন্দর নহে, তাহার মধ্যে কোন দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সংশয় নাই; প্রতি মুহূর্ত্তের অনুভবের নূতনত্বের মধ্যে যে রসের লীলা, মনের মধ্যে সংশয়ের যে দোলা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে তাহা নাই। ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সে আপনাকে বিকশিত করিয়া

চলে না—কাজেই তাহার চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ নাই।

অপর্ণার চরিত্রের মধ্যেও যে এই সৃষ্টির আনন্দ খুব আছে তাহা নয়, সে চরিত্রের মধ্যেও খুব কিছু দ্বন্দ্বের লীলা নাই, সংশয়ের খুব দোলা নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও অপর্ণার চরিত্রের মধ্যেও রসের একটা লীলা আপন মাধুর্য্যে আপনি স্পন্দিত হইয়া আছে, সে লীলা, সে রহস্য সকল অবস্থাতেই সুন্দর। অথচ তাহার জীবনের কোনো বিকাশ নাই, ধীরে ধীরে সে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে না। অপর্ণাকে প্রথম আমরা যখন দেখি, তখন সে শুধু একটি সরল বালিকা মূর্ত্তি ধরিয়াই আমাদের সম্মুখে দাঁড়ায়, পরে অবশ্য ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে জয়সিংহের প্রতি একটা স্নেহ ও প্রেমাকর্ষণের ভাব ফুটিয়া উঠে এবং সর্ব্বশেষে জয়সিংহের বিসর্জ্জন-দৃশ্যে তাহা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অপর্ণার চরিত্রের ধীরে ধীরে এই যে পরিবর্ত্তন, এ যেন জীবনের কোনো বিকাশ নয়, যেন তাহার সরলা বালিকামূর্ত্তিরই আর একটা দিক মাত্র সরল দ্বিধাবিহীন একটি প্রেমানুভূতির ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেন সে যাহা ছিল শেষ পর্য্যন্ত তাহাই রহিয়া গেল। মনে হয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, তার দলগুলি একটি একটি করিয়া বিকশিত হয় নাই, একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়ে নাই। অপর্ণা বিচলিত করে, নিজে বিচলিত হয় না, হইলেও পরক্ষণেই নিজের সম্বিৎ নিজেই ফিরিয়া পায়। না পাইবেই বা কেন—সে যে একটা শাশ্বত সত্য, যার গন্ধ মধুর, যার স্পর্শ কোমল, যার রূপ সুন্দর—যার কোনো জন্ম নাই, বিকৃতি নাই, মৃত্যু নাই; একটি অবিকৃত সহজ সরল সত্যের সে রহস্যমূর্ত্তি বালিকার রূপ ধরিয়া স্নেহের ও প্রেমের শান্তস্নিগ্ধ রাজ্যের মধ্যে জয়সিংহকে, সকল সংশয়াকুল মানুষকে সে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছে। অপর্ণাকে একটা শাশ্বত সত্যের রহস্য-মূর্ত্তি বলিতে হয়ত অনেকের আপত্তি হইবে, কারণ রহস্য-মূর্ত্তির মত সে কাহাও ঘটনার পশ্চাতে থাকিয়া ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, কিংবা তাহাকে ধরিতে ছুঁইতে বা বুঝিতে পারা যায় না এমনও নহে। কিন্তু এসম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। অপর্ণা একটা সত্যেরই রসমূর্ত্তি, কোনো জীবনের বিকাশ নয়—রক্তমাংসের একটি মানব-কন্যার রূপ তাহার মধ্যে কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই। যদি একটা জীবনই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিচিত্র বিকাশ কোথায়, তাহার উদয় কোথায়, অস্ত কোথায়, তাহার দুঃখের বেদনা কোথায়, সুখের অনুভূতি কোথায়, চিত্তের বিকার কোথায়, অন্তরের চঞ্চলতা কোথায়? সে যে জয়সিংহকে ভালবাসে, তাহার সংশয়ও বেদনায় বিচলিত হয়, সেখানে শুধু সে সত্যের প্রকাশকেই আরও জীবন্ত, আরও রহস্যময় করিয়া তোলে—সত্য যে কোনো জড় নিশ্চল পদার্থ নয় সে যে জীবন্ত ও নিত্য-স্পন্দমান্ এই কথাই প্রমাণ করে। রঘুপতির চরিত্র যখন আমরা দেখি তখন বুঝি সে কোনো সত্যের মূর্ত্তি নয়—সে একটা জীবন যাহা নানান্ ঘটনার ভিতর দিয়া বিকৃত ও বিকশিত হইতেছে। জয়সিংহও কোনো বিশিষ্ট সত্যকে রূপায়িত করে না, সে নিজের জীবনকেই নানান্ সংশয়ের ভিতর দিয়া পরিণতির দিকে লইয়া চলে। কিন্তু অপর্ণার চরিত্র ঠিক তাহার বিপরীত। সে তাহার নিজের জীবনকে বিকশিত করে না, কোনো পরিণতির দিকে চালনা করে না, একটা সত্যকেই উদ্‌ঘাটিত করিতে সাহায্য করে, সেই সত্যেরই অস্পষ্ট মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া নাটকের সত্যটি ফুটিয়া উঠে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি পঞ্চমাঙ্কে প্রথম দৃশ্যের পর রঘুপতি চরিত্রের আর কোনো পরিচয় যদি আমরা না পাইতাম তাহা হইলে হয়ত ভাল হইত। একথা বলিবার পক্ষে কি যুক্তি আছে তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে প্রথমেই মনে হয় তাহা হইলে রঘুপতি চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা পাইত এবং আমাদের কাছে রঘুপতি অনন্তকালের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে পারিত। জয়সিংহ যেখানে একটা নিষ্ঠুর বিধানের নীচে আত্মদান করিল, যেখানে এক মুহূর্ত্তে স্নেহের গোপন কোনটির মধ্যে প্রচণ্ড বেদনার আঘাত লাগিয়া রঘুপতির চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, যেখানে একান্ত প্রিয় জয়সিংহকে হারাইয়া অপর্ণাও কিছুতেই নিজকে অবিচলিত রাখিতে পারিল না, সেইখানেই যদি নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিত, তাহা হইলে অভিনয় হিসাবে (stage effect) 'বিসর্জ্জনে'র রসমাধুর্য্য আরও নিবিড় হইতে পারিত। শুধু ঘটনা-বস্তুর বিকাশের (plot construction) দিক হইতে দেখিতে গেলেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এর পর রঘুপতি অথবা অপর্ণা, গোবিন্দমাণিক্য অথবা গুণবতী কাহার কি হইল, ঘটনার স্রোত কোন্ পথে চলিল, যে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য গোবিন্দমাণিক্য যুঝিয়াছিলেন, সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল কিনা, যে সংশয়ের জন্য জয়সিংহ প্রাণ দিল সে সংশয় ঘুচিল কি না, এসব জানিবার ঔৎসুক্য পাঠক অথবা দর্শকের থাকে না, জয়সিংহের বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাবস্তুর প্রতি তাহার মনোযোগ ও আকর্ষণ শিথিল হইয়া যায়। অপর্ণার চরিত্রটাও যে একটা সত্যের symbol হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার জন্য এই উপসংহার দৃশ্যটি কতকটা দায়ী। যেখানে জয়সিংহের মৃত রুধিরাক্ত দেহ দেখিয়া প্রতিমার

চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া অপর্ণা চীৎকার করিয়া উঠিল. 'ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে!' সেইখানেই যদি অপর্ণা-চরিত্রেরও পরিচয় শেষ হইত, তাহা হইলে অপর্ণার মধ্যে আমরা living being'র স্পন্দমান মানব-চিত্তের, সর্ব্বোপরি তাহার নারী-হৃদয়ের সত্যরূপটা দেখিতে পাইতাম, এবং সেইরূপেই সে আমাদের চিত্তের রসবোধকে বেশী তৃপ্ত করিত এবং তাহার ঐ পরিচয়ই আমাদের মনের উপর চিরকালের জন্য দাগ কাটিয়া যাইত। কিন্তু শেষ দৃশ্যে সে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন তা'র মধ্যে সেই human elementটুকু আর নাই, তখন সে এত শান্ত, এত স্থির যেন তা'র উপর দিয়া কোনো ঝড়ই বহিয়া যায় নাই, যেন তা'র চিত্তের কোনো বিকারই কোনো কালে হয় নাই, সে যাহা ছিল তাহাই যেন সে রহিয়া গেল। তাহার মুখের কথা-কয়টিও খুব লক্ষ্য করিবার—বার দুই তিন সে শুধু বলিল, 'পিতা, চলে এস! পিতা, এস এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা' যেন এই কথা-কয়টি'র ভিতর দিয়া এই মর্ম্মটিই ব্যক্ত হইল যে, সে যে সত্যের রহস্তমূর্ত্তি সেই সত্যটাকেই শেষ পর্য্যন্ত সে জয়ী করিয়া লইল, কিছুই তাহাকে বিকৃত ও বিচলিত করিতে পারিল না, সেই সত্যের আহ্বানেই রঘুপতিকে দেবীহীন মন্দির হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। যেন বালিকা অপর্ণা কেহই নয়, যেন সত্যের রহস্তমূর্ত্তি অপর্ণাই সব! ইহার ফলে আর একটা জিনিষও একটু বড় হইয়া উঠিয়াছে। একথা সকলেই জানেন যে 'বিসর্জন'-এর মধ্যে একটা idea খুব নিবিড় হইয়া আছে, সমস্ত নাটকটিতে সেই ideaটিরই সংগ্রাম। পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি নাটকটির উপর যবনিকাপাত হইত, তাহা হইলে সংগ্রামের শেষে সেই ideaটাই জয়ী হইল কিনা সে খবর আমরা পাইতাম না। কিন্তু শেষ দৃশ্য-গুলিতে দেখিলাম, সেই ideaটারই সম্পূর্ণ বিজয়োৎসব। একটা নির্দ্দিষ্ট সত্য-প্রতিষ্ঠার, একটা নির্দ্দিষ্ট idea'র জয়-প্রদর্শনের এই যে প্রয়াস, ইহা 'বিসর্জন'-এর রসবোধ ও অনুভূতির তীব্রতাকে একটু ক্ষুণ্ণ না করিয়া পারে নাই; এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সত্যটাই যে কবির মনকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল তাহাও কতকটা ধরা না পড়িয়া পারে নাই।

প্রথমেই কথা হইতেছে পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অর্থাৎ জয়সিংহের 'বিসর্জন' দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতির চরিত্রের পরিচয় কিছুতেই শেষ হইতে পারে না। তাহা হইলে রঘুপতি-চরিত্রের চরম পরিণতিটুকু কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না, তাহার ব্রাহ্মণ্যের দৃপ্তগর্ব্ব হঠাৎ বাধা পাইয়া যে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্ততায় নিজকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই দৃপ্তগর্ব্ব মাটির ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া চরম ব্যর্থতায় আত্মপ্রকাশ না করিলে রঘুপতির সবটুকু পরিচয় আমরা কিছুতেই পাইতাম না, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাটকটি যে পথে যাত্রা সুরু করিয়াছিল তাহাও একটা logical conclusionএ আসিয়া পৌঁছিত না। রঘুপতির স্বভাব-দৃপ্ত গর্ব্বিত চরিত্র যে প্রচণ্ড বেদনার আঘাতে একেবারে সকল দর্প গর্ব্ব হারাইয়া সকল অহঙ্কার অভিমান জলাঞ্জলি দিয়া একান্ত দুর্ব্বল অসহায়তার মধ্যে আপন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবং ধর্ম্মের রহস্তকে জানিয়াছিল তাহার আগেকার চরিত্রের ছায়াটুকুও যে থাকে নাই, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। মানুষের জীবনে ঠিক এইরকমই দেখা গিয়া থাকে—একটা অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া যখন কাহারও সমস্ত কর্ম্ম ও জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই অহঙ্কারের মধ্যেই সে একেবারে ডুবিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই সমস্ত রস ও পানীয় সংগ্রহ করে, বেদনার আঘাত লাগিয়া যখন সেই অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার আর আশ্রয় কিছু থাকে না, তাহার রস ও পানীয়ের উৎস শুকাইয়া যায়, এবং সেই অবস্থায় সে একান্ত নিঃস্ব ও অসহায় দুর্ব্বলতার মধ্যে নিজের স্বরূপটিকে জানিতে পারে। মানুষের চিত্তধর্ম্মের ইহাই স্বাভাবিক গতি। কিন্তু রঘুপতির চরিত্র যে জয়সিংহের বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইতে পারে না ইহাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জয়সিংহের চরিত্রই বুঝি সকলের অপেক্ষা করুণ-রসাত্মক এবং তাহার বিসর্জন দৃশ্যের মধ্যেই বুঝি নাটকের সমস্ত tragedyটুকু নিহিত রহিয়াছে। সেইজন্যই তাহার বিসর্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতি-চরিত্রের অবসান ঘটিলেই নাটকের tragedyটুকু ভাল করিয়া ফুটিতে পারিত, এইরকম মনে হয়—জয়সিংহের আত্মদানের tragedy খুব 'spectacular' সেই হেতু আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে, নাটকের tragedyটুকু জয়সিংহ-চরিত্রের মধ্যে ততটা নয়, যতটা রঘুপতির চরিত্রের মধ্যে; বস্তুতঃ জয়সিংহ-চরিত্র অপেক্ষাও গভীরতর tragedy নিহিত রহিয়াছে রঘুপতি-চরিত্রে এবং সেই tragedy'র বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে জয়সিংহের আত্মদানের পরমুহূর্ত্ত হইতে। সে মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও রঘুপতির একটা ঐশ্বর্য্য ছিল, একটা প্রচণ্ড সুবৃহৎ গর্ব্ব ছিল—তাহা তাহার বুদ্ধির অহঙ্কার, যুক্তির অহঙ্কার, বিশ্বাসের অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, এই অহঙ্কারই তাহার সমস্ত সত্তাটাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু জয়সিংহ যে মুহূর্ত্তে তাহার অহঙ্কারের নিষ্ঠুর বেদীমূলে আত্মবিসর্জন করিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সকল অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া

গেল—সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহার খসিয়া পড়িল, একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে সে 'গৃহচ্যুত হতজ্যোতি' তারকার মতন কোথায় যে গিয়া পড়িল তাহার ঠিকানা নাই। রঘুপতির এই যে একান্ত রিক্ততা, ইহাই নাটকের করুণতম ও চরমতম ট্রাজেডি—এই ট্রাজেডিটুকুর বিকাশ না হইলে রঘুপতি-চরিত্রের শেষ পরিচয় কিছুতেই আমরা পাই না।

শুধু এই রঘুপতি-চরিত্রের জন্যই পঞ্চমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পর সমস্ত নাটকটির উপর যবনিকাপাত আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। একথা ভুলিলে চলিবে না যে 'বিসর্জ্জন' শুধু নাট্য নহে, শুধু অভিনয়ই উদ্দেশ্য নহে, তাহা কাব্য-নাট্য—তাহার একটা কাব্যের দিক্ সাহিত্যের দিক্ আছে। আর শুধু নাটকের দিক হইতে দেখিলেও জয়সিংহের বিসর্জ্জন দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাপাত হইলে নাটকের কলাকৌশল একটু ক্ষুণ্ণ হইত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, তাহা হইলে একটা sensational ও tragic অস্থিরতার মধ্যে নাটকটির সমাপ্তি ঘটিত, নাটকীয় কলা-কৌশলের দিক হইতে তাহা খুব ভাল হইত না, রবীন্দ্রনাথও তাহা চাহেন নাই এবং চাহেন নাই বলিয়াই আখ্যান-বস্তুটিকে একেবারে শেষ logical ending পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া একটা স্থির অবিচল শান্তির মধ্যে সমস্ত নাটকটির উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন, পাঠক অথবা দর্শকের কোনো অস্থির চঞ্চল করুণ ব্যথাভারগ্রস্ত ভাবনার মধ্যে আন্দোলিত হইবার সুযোগ দেন নাই। বলা যাইতে পারে এই হিসাবে তিনি প্রাচীন গ্রীক নাটকের অথবা মধ্যযুগের শেক্সপীয়রীয় নাটকের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না, বরং আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য-রীতিই তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শকুন্তলার' উল্লেখই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হইবে। 'শকুন্তলার' তৃতীয় অঙ্কের যে দৃশ্যে বিস্মৃতি হেতু দুষ্মন্ত কর্তৃক শাপগ্রস্ত 'শকুন্তলার' প্রত্যাখ্যান, সেই দৃশ্যটিই সর্ব্বাপেক্ষা tragic ও sensational, সেইখানে কালিদাস নাটকটির উপর যবনিকাপাত করেন নাই, সমস্ত আখ্যানটিকে আরও ঘটনা-পরম্পরার ভিতর দিয়া শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং একটি পরিপূর্ণ শান্তি ও মিলনের মধ্যে উহাকে সমাপ্তি লাভ করিয়াছেন। তাহার ফলে 'শকুন্তলা' রস হিসাবে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রত্যেকটি চরিত্র পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং সেইজন্যই 'শকুন্তলা' নাট্যজগতের মধ্যে খুব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমার খুব বিশ্বাস, 'বিসর্জ্জন' রচনা-কালে রবীন্দ্রনাথ 'শকুন্তলার' নাট্যবিন্যাসের কথা না ভাবিয়া পারেন নাই। দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তার কিছু পরে নাটকটির উপর যবনিকাপাত আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, তাহা করিতে গেলে সমস্ত নাটকের ঘটনাবস্তু ও নাট্যবিন্যাস একেবারে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হয়। 'শকুন্তলা'র প্রত্যাখ্যান দৃশ্যের এবং তাহার পরে সমগ্র নাটকের পরিণতির রহস্য-চাবিটি রহিয়া গিয়াছে ঐ দুর্ব্বাসার অভিশাপটুকুর মধ্যে। সেই অভিশাপ না কাটিলে, দুষ্মন্তের বিস্মৃতির কালরাত্রি অতীত হইয়া 'শকুন্তলা'র সঙ্গে পুনর্মিলন না ঘটিলে নাটকের সমাপ্তি তো আমরা কিছুতেই কল্পনাও করিতে পারি না। 'বিসর্জ্জনে' তেমন কিছু কেন্দ্র-বস্তু নাই বটে, কিন্তু তাহারও রহস্যটি রহিয়াছে ঐ রঘুপতি-চরিত্রের চরম পরিণতিটুকুর মধ্যে—সেই পরিণতিটুকু বিকশিত হইয়া না উঠিলে 'বিসর্জ্জন' নাটকের সমাপ্তি আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

'বিসর্জ্জন'কে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, দুই বৎসর পরে রচিত 'মালিনী' নাটিকাখানির একটু স্মরণ লইতে হয়। 'মালিনী'র ঘটনাস্রোতের মধ্যে কোনো জটিলতা নাই, কোনো আবর্ত্তন নাই। তাহা ছাড়া 'বিসর্জ্জনে'র মধ্যে নাটকীয়-দ্বন্দ্ব যতটা নিবিড়, এবং সে দ্বন্দ্ব যতটা বহুক্ষণস্থায়ী ও বহুবিস্তৃত, 'মালিনী'তে তাহা ততটা নিবিড় মোটেই নহে, এবং সেইহেতু স্বল্পকালস্থায়ী ও স্বল্পবিস্তৃত। সেইজন্য আখ্যানবস্তু ও নাটকীয়-ভাববস্তু প্রায় একরকম হইলেও 'বিসর্জ্জনে'র মধ্যে যে dramatic element আছে, 'মালিনী'তে তাহা খুব কম। অথচ কি চরিত্র-সৃষ্টিতে, কি আদর্শ-বস্তুতে এ দু'টি নাটকের সাদৃশ্য কত বেশী! দুটি নাটকেই চিরাচরিত সনাতন প্রথা ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামকেই কেন্দ্র করিয়া নাট্যবস্তুকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। 'বিসর্জ্জনে' দেখি পুঁথিগত আচারগত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মানবধর্ম্ম বিশ্ব-ধর্ম্মের প্রতীক একটি ধর্ম্মকে দাঁড় করাইয়া দু'য়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং মানবধর্ম্মকে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী করা হইয়াছে। 'মালিনী'তে দেখি সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মানবধর্ম্ম বিশ্বধর্ম্মের একটি প্রতীক একটি ধর্ম্মকে দাঁড় করাইয়া দু'য়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে। দুই পক্ষের সাজসজ্জা ও যুক্তি-কৌশলও দুইটি নাটকেই একরকম—শুধু প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গিমা ভিন্ন। শুধুই কি তাই; দুইটি নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিও যেন একটির ছাঁচে আর একটি ঢালা। 'বিসর্জ্জনে'র রঘুপতি আর 'মালিনী'র ক্ষেমঙ্কর, 'বিসর্জ্জনের' জয়সিংহ আর 'মালিনী'র সুপ্রিয় প্রায় একই—ইহাদের ভাব ও গতি, ভাষা ও প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য খুব কম।

রঘুপতির মধ্যে দেখিয়াছি সনাতনধর্ম ও আচারের প্রতি তাহার অবিচল নিষ্ঠা, একটি প্রচণ্ড আত্মাভিমানের দীপ্তি, একটি প্রদীপ্ত প্রতিভার সুতীক্ষ্ণ যুক্তি-কৌশল যাহার সম্মুখে বার বার জয়সিংহের চিত্ত সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া মাথা নত করে। ক্ষেমঙ্করের মধ্যে নিষ্ঠার সে দ্যুতি নাই, প্রতিভার সে দীপ্তি নাই, যুক্তির সে তীক্ষ্ণতা নাই, একথা সত্য; কিন্তু সব কিছুরই প্রকার এক। দুইটি চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য শুধু তীব্রতায়, ইংরেজীতে বলিব, of degree, not of kind। রঘুপতির মতন ক্ষেমঙ্করের মুখেও যুক্তি যেন ছুরীর ফলা'র মতন ঝলসিয়া উঠে—সুপ্রিয় তাহার প্রতিবাদ করিবার পথ ও শক্তি খুঁজিয়া পায় না। বস্তুত, কি রঘুপতি কি ক্ষেমঙ্কর, ইহারা যুক্তিতে কখনো কাহারো কাছে হার মানে না, হার মানে শুধু সেইখানে যেখানে মনের মধ্যে কোথাও কোনো স্নেহের অথবা কোনো সূক্ষ্মতর অনুভূতির একটুখানি লীলা আত্মগোপন করিয়া আছে। বুদ্ধির মধ্যে জীবনের চরমতম সত্যের সন্ধানকে তাহারা জানে না, জানিতে পায় একটা পরম আঘাতের ভিতর দিয়া হৃদয়ের বেদনাময় অনুভূতির মধ্যে। সেই সত্যের সন্ধানও ক্ষেমঙ্কর শেষ পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু একথা সত্য যে, সুপ্রিয়কে বার বারই তাঁহার যুক্তির ও আবেদনের কাছে মাথা নোয়াইতে হইয়াছে। হইয়াছে বলিয়াই ক্ষেমঙ্করের চরিত্র ফুটিবারও অবসর পাইয়াছে। ক্ষেমঙ্করও রঘুপতির মতন নিষ্করুণ, সেও নিজকে বঞ্চিত করে না—জয়সিংহের জন্য রঘুপতির মনে যে স্নেহের একটি নিভৃত-কুঞ্জ রচিত হইয়াছিল, সুপ্রিয়'র জন্যও তেমনি ক্ষেমঙ্করের বুকে স্নেহের একটি নীরব উৎস সঞ্চিত হইয়া আছে; এবং এই দুই ক্ষেত্রেই এই স্নেহ ও ভালবাসা ইহা তাহাদের আত্মাভিমানেরই নামান্তর মাত্র!

কিন্তু একটা বিষয়ে রঘুপতি-চরিত্রের সঙ্গে ক্ষেমঙ্কর-চরিত্রের খুব মস্ত একটা অমিল আছে, এবং আমার মনে হয় এই হিসাবে ক্ষেমঙ্করের চরিত্র-সৃষ্টিতে নাট্যকৌশলের অভিব্যক্তি বেশী। রঘুপতির চরিত্রে আমি পূর্ব্বাপর একটু অসঙ্গতির উল্লেখ করিয়াছি। 'বিসর্জ্জন'-এর শেষ দৃশ্যে সমগ্র জীবনের একান্ত পরাজয়ের মধ্যে তাহার চরিত্রের তেজোদৃপ্ত গর্ব্বটুকু একেবারে ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে, মনে হয় সে যেন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ক্ষেমঙ্কর-চরিত্রে এ অসঙ্গতি কোথাও নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তার অহঙ্কারের দীপ্তি অটুট, অক্ষুণ্ণ, অকম্পিত প্রোজ্জ্বল দীপশিখার মত। রঘুপতি কারাদণ্ডের কথা শুনিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'গেছে গর্ব্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব!'—কিন্তু ক্ষেমঙ্কর মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনিয়া একটি মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই। রাজা প্রশ্ন করিলেন। যদি প্রাণদান করি, যদি ক্ষমা করি তাহা হইলে কি করিবে? অবিচলকণ্ঠে তাহার দীপ্ত জবাব উচ্চারিত হইল, "পুনর্ব্বার, তুলিয়া লইতে হ'বে কর্ত্তব্যের ভার; যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে যেতে হ'বে—" যে পথকে সে সত্য বলিয়া জানিয়াছে সে পথ সে ছাড়িবে না। এবং তাহা ছাড়িয়া তাহারই প্রিয়তম সুহৃদ সুপ্রিয় অন্যপথে চলিবে তাহাও সহিবে না। কাজেই মরিতে যদি হয়, একসঙ্গেই মরিব। রঘুপতির সম্মুখে যেমন করিয়া জয়সিংহ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া মরিয়াছিল, সুপ্রিয়'র মরণ সে মরণ নয়। সুপ্রিয়'র মরণ ঘটাইলেন ক্ষেমঙ্কর নিজে এবং ঘটাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন না···মৃতদেহের উপর পড়িয়া নিজেই বলিলেন; 'এইবার ডাক ঘাতকেরে।' এই তাহার শেষ কথা; এবং এই শেষ কথা তিনটিতেও তাহার চরিত্রের আজন্ম দীপ্তি ও গর্ব্বটুকু যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সমস্ত চরিত্রটির মধ্যে সৃষ্টি হিসাবে এতটুকু কোথাও ত্রুটি নাই, এতটুকু অসঙ্গতি নাই। রঘুপতি নিজেই নিজেকে মুছিয়া ফেলে, ক্ষেমঙ্কর এমনভাবে দাগ কাটিয়া যায় যাহা মুছিবার নয়। বিশেষত শেষদিকে শৃঙ্খলিত হইয়া রাজসভায় প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত নাটকীয়-সংস্থান হিসাবে ক্ষেমঙ্কর-চরিত্রের স্ফুরণ হিসাবে, সমস্ত নাটকের বিকাশ হিসাবে একেবারে অপূর্ব্ব, নিখুঁত; বুকের সমস্তটা নিঃশ্বাস যেন শেষ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে রুদ্ধ অনুভূতির তীব্রতায় স্পন্দিত হইতে থাকে, সর্ব্বশেষ পরিণতিটুকু এমনি dramatic! সেইজন্য মনে হয় stage effect'র দিক হইতে 'মালিনী' 'বিসর্জ্জন' অপেক্ষা সার্থকতর।

'বিসর্জ্জনে' রঘুপতি-চরিত্রের মধ্যেই নাটকটির করুণতম ও চরমতম ট্রাজেডিটুকু নিহিত রহিয়াছে, সে কথা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু তাহা হইলেও একথাটা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না যে, জয়সিংহের বিসর্জ্জন-দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে রঘুপতি-চরিত্রের প্রতি আমাদের আকর্ষণ অনেকটা কমিয়া যায়, রঘুপতি-চরিত্রের একান্ত রিক্ততায় যে ট্রাজেডি তাহা আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে না। নাটকীয়-সংস্থানও যেন কতকটা শিথিল হইয়া পড়ে। আমার মনে হয় তাহার একটা কারণ আছে। অত্যন্ত করুণ ব্যর্থতার মধ্যে যাহাদের জীবনের অবসান হইয়াছে, এমন দুইটি চরিত্র 'বিসর্জ্জনে' পাশাপাশি রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে—একটি জয়সিংহের, একটি রঘুপতির। জয়সিংহের যে tragic পরিণতি, তাহা একটু spectacular, কিন্তু রঘুপতির যে পরিণতি, তাহার যে রিক্ততা তাহা spectacular ত নয়ই, একেবারে মনের গভীরতর

অনুভূতির মধ্যে নিহিত। জয়সিংহের যে পরিণতি তাহা action'র মধ্যে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু রঘুপতির পরিণতি শুধু সুরের মধ্যে ধ্বনিত হয়, অনুভূতির মধ্যে রণিত হয়—একটির পরিণতির মধ্যে রহিয়াছে dramatic element, আর একটির পরিণতির মধ্যে রহিয়াছে lyrical element! সেইজন্যই একটা খুব আন্দোলনের মধ্যে চিত্তটা মথিত হইয়া যাইবার পর গানের সুরের মধ্যে মনটা শান্তি ও বিশ্রাম কামনা করে বটে, কিন্তু নাটকীয় বস্তুর কিংবা নাটকীয় আর কোনো চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ আর ততটা থাকে না, কিংবা আর কোনো গভীরতর ট্রাজেডির জন্য মনটা আবার নূতন করিয়া নাট্যবস্তুর মধ্যে ঢুকিতে চায় না; ইহার চাইতেও গভীরতর ট্রাজেডি যে এখনও রহিয়া গিয়াছে তাহাও ভাবিতে পারে না। তবু যদি সে ট্রাজেডির মধ্যে একটা সমান dramatic element থাকিত তাহা হইলে মনটা সহজেই আবার সজাগ হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু তাহা এতটা lyrical ও psychological যে, রসসৃষ্টি হিসাবে তাহা জয়সিংহ-চরিত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান্ হইলেও, নাট্য-বিন্যাসের দিক্ হইতে সে চরিত্রের পরিণতি কতকটা শিথিল না হইয়া পারে না।

এই যে lyrical element'র কথা বলিলাম তাহা অপর্ণার চরিত্রে আরও বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। অপর্ণা একটা গানের সুর—তাহার সমস্ত চরিত্রের মধ্যে যে জিনিসটা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা একান্তই lyrical, তাহার মধ্যে dramatic element নাই বলিলেই চলে। 'বিসর্জ্জনের' মতন নাটকেও এই lyrical element সমস্ত dramatic elementকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—শুধু তাহা অপর্ণার চরিত্রে নয়, শুধু তাহা রঘুপতির রিক্ত অবসানের মধ্যে নয়, সমস্ত নাটকটির মধ্যে যে একটি সত্য, একটি idea ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারও কারণ এই lyrical element.

আসল কথা হইতেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই মূলতঃ lyrical—গানের প্রতিভা, কবিতার প্রতিভা, সুরের প্রতিভা, আদর্শসৃষ্টির প্রতিভা। তাঁহার অসংখ্য গান ও কবিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার ছোট গল্প ও রূপক নাট্যগুলির দিকে তাকাইলে একথা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। নাটক তিনি অনেক রচনা করিয়াছেন, কিন্তু একথা বলিতেই হয় তাঁহার প্রতিভা নাটকের প্রতিভা নয়—তাহার মধ্যে dramatic element নাই। 'বিসর্জ্জনে' এবং 'রাজা ও রাণী'-তে তিনি পশ্চাত্য নাটকের রীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন বটে, এবং একটা বিশিষ্ট নাটকীয় বিন্যাসের মধ্যে ঘটনাবস্তু ও বিভিন্ন চরিত্রগুলি বিকশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কি 'রাজা ও রাণী,' কি 'বিসর্জ্জন' ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে প্রতিভার, যে রস ও সৌন্দর্য্যের, যে মন ও আদর্শের বিকাশ লাভ ঘটিয়াছে, তাহার জন্য কোনো বিশেষ নাটকীয় রীতি-পদ্ধতি, কোনো বিশেষ নাটকীয় বিন্যাসেরই প্রয়োজন ছিল না—যে কোনো শিল্পরূপের মধ্যেই তাহা পরিপূর্ণ-ভাবে বিকশিত হইতে পারিত, যেমন হইয়াছে 'বাল্মীকি প্রতিভা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পর্য্যন্ত নাটিকাগুলিতে, যেমন হইয়াছে 'মালিনী'তে, যেমন হইয়াছে 'শারদোৎসব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'রক্তকরবী' পর্য্যন্ত অপরূপ রূপক নাট্য-গুলিতে। Dramatic element বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহা ইহাদের মধ্যে নাই বলিয়াই, ইহাদের অভিব্যক্তির জন্য কোনো নির্দ্দিষ্ট dramatic form'রও প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকের মূল কথা হইতেছে একটা idea'র বা আদর্শের, একটা বিশেষ মনের lyrical expression'র—'বিসর্জ্জনে' তাহার জন্য পশ্চাত্য নাটকের সুনির্দ্দিষ্ট form'র কোনো প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই মনে হয়। 'মালিনী' অথবা বহু পরের 'রক্তকরবী'র মতন ট্রাজেডিতেও যখন তাহার দরকার হয় নাই—রবীন্দ্রনাথ অন্য রূপ নিজেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন—তখন মনে হয় এ অনুমান বুঝি-বা সত্য হইলেও হইতে পারে।

'মালিনী'র অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে সুপ্রিয়'র সঙ্গে জয়সিংহ-চরিত্রের সাদৃশ্যের কথা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু এই সাদৃশ্যের প্রকারই শুধু এক, difference in degree যথেষ্ট! কিন্তু এই degree'র পার্থক্য তীব্রতার পার্থক্য, এই পার্থক্যই শেষ পর্য্যন্ত রসসৃষ্টি হিসাবে জয়সিংহকে সুপ্রিয় অপেক্ষা মধুরতর ও নিবিড়তর করিয়াছে। 'বিসর্জ্জনে' অপর্ণা জয়সিংহকে সত্যের সন্ধান দিয়াছিল, 'মালিনী'তে মালিনী সুপ্রিয়কে সেই সত্যের সন্ধান দিয়াছে; কিন্তু জয়সিংহের মধ্যে দ্বন্দ্ব যত প্রবল, সে বারংবার শেষ পর্য্যন্ত যেমন করিয়া যুঝিয়াছে এবং মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেমন করিয়া সংশয়ে আন্দোলিত হইয়াছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সংশয়ের কোনো মীমাংসা করিতে না পারিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া যেমন করিয়া আত্মাহুতি দিয়াছে, সুপ্রিয়'র মধ্যে তাহা হয় নাই। সুপ্রিয় প্রথম দিকেই দু'একবার সংশয়ের খুব প্রচণ্ড দোলা অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু সংশয় যে বার বার জাগাইয়াছে, সেই ক্ষেমঙ্করই যখন দেশান্তরে চলিয়া গেল তখন সংশয় আর তাহার রহিল না—মানবধর্ম্মের কাছে, মালিনীর কাছে তখন আত্মনিবেদন করিয়া দিতে বিলম্ব তাহার

হইল না এবং পরে কেশবের হাতে যখন সে প্রাণটি তুলিয়া দিল, তখন কোনো সংশয় আর তাহার বোটে ছিল না, সে স্থির বিশ্বাস লইয়াই মরিতে পারিয়াছিল এবং তাহার মনের মধ্যে তখন মালিনীর 'সমুজ্জ্বল শান্তি তাহার প্রীতি, তাহার সুমঙ্গল অম্লান অচল দীপ্তিই বিরাজ' করিতেছিল। এই শান্তি, এই তৃপ্তি, এই অম্লান অচল দীপ্তি লইয়া জয়সিংহ মরিতে পারে নাই—শেষ পর্য্যন্ত সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মরিয়াছে। এইজন্যই জয়সিংহের চরিত্র পূর্ব্বাপর যেমন জীবন্ত, যেমন স্পন্দমান, সুপ্রিয়র চরিত্র সেই তুলনায় শিথিলতর, মন্থরতর। রসসৃষ্টি হিসাবে সেইজন্য জয়সিংহ-চরিত্র অধিকতর মূল্যবান।

'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জ্জন' 'মালিনী' তিনটিই কাব্য-নাট্য। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা এই কাব্য নাট্য-গুলিতেই বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। ইহাদের নাট্য-সংস্থান, ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতির কলাকৌশল কতকটা প্রাচীন নাট্যরূপ ও রীতিকেই অনুসরণ করিয়াছে, 'form'র দিক হইতে খুব নূতন কিছু সৃষ্টি ইহাদের মধ্যে নাই। কিন্তু রূপ ইহাদের প্রাচীন হইলেও বর্ণনা রীতি, কল্পনার ঐশ্বর্য্য, প্রকাশের বৈচিত্র্য, ভাষার সুষমা, সর্ব্বোপরি ভাবের গরিমা ও অনুভূতির অতিসূক্ষ্ম তীব্রতার দিক হইতে ইহারা বাঙলা সাহিত্যের কাব্য-নাট্যের জগতে সত্যসত্যই খুব শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এবং একথা বলা একটুও অত্যুক্তি হইবে না যে, দুই একটি দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কি বর্ণনাভঙ্গি, কি কল্পনার দীপ্তি, কি চরিত্রসৃষ্টির রসমাধুর্য্য, কি ভাবের লীলাচাতুর্য্য সকল দিক হইতে 'বিসর্জ্জন'-এর মতন কাব্য-নাট্য বাঙলা সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই বলিলেও চলে। সেই 'বিসর্জ্জনের' মধ্যে রঘুপতি-চরিত্র কবির একটি অপূর্ব্ব অনবদ্য সৃষ্টি—যার তুলনা বাঙলা সাহিত্যে একটিও নাই, বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব কমই আছে।

মূর্ত্তিতত্ত্বে গণেশ

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গণদিগের নায়ক বলিয়া "গণেশ" এই নাম। 'গণ'রা—যক্ষ। কিন্তু যক্ষগণের তালিকায় গণেশকে পাওয়া যায় না। তবে গণেশের আকৃতি সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই তিনি যে যক্ষদলের একজন তাহা অনুমান করিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়; তাঁহার বেয়াড়া বেখাপ্পা আকৃতি—আকৃতির এই অসামঞ্জস্যই তাঁহার যক্ষত্বের একটী প্রধান কারণ। তাঁহার বিপুল উদরের বৈশিষ্ট্য হইতেই তাঁহার নাম হইয়াছে—লম্বোদর। এই বিরাট্ উদরের সঙ্গে খর্ব্বাকৃতি—ধ্যানে ইহাকে "সুন্দরম্" বলিলেও—আদৌ মানানসই হয় নাই। গণেশের বিভিন্ন নাম হইতেও বোঝা যায় তিনি বিনায়ক ও গণের অধিপতি। ইহারা শিবের গণ, ভূত, যক্ষ প্রভৃতি। শিবের গণের মুখ, কাণ হাতী ও গরুর মত। অগ্নিপুরাণও (৫০ অধ্যায় ৪০ শ্লোক) তাই বলিয়াছে।—"গজগোকর্ণবক্ত্রাদ্যা বীরভদ্রাদয়ো-গণাঃ"। তাঁহার একটী নাম 'বিঘ্নেশ'। বিঘ্নেশ দেবতাদের শত্রু অসুরদের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করেন। আবার দেবতাদের যাহাতে বিঘ্ন না হয় তাহারও বন্দোবস্ত করেন। শেরমান নামক জর্ম্মান-পণ্ডিত গণেশের যক্ষত্ব প্রমাণে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা প্রণিধানযোগ্য (L. Schermann, Dickbauchtypen in der indisch ostasiatischen Goetterwelt, Jahrb. as. Kunst. 1. 1924)।

গুপ্তযুগের পূর্ব্বে গণেশের মূর্ত্তি কোথাও পাওয়া যায় না। হঠাৎ এই যুগেই গণেশমূর্ত্তির আবির্ভাব। দেওগড়

ও ভূমরের গণেশমূর্ত্তি (Mem. A. S. I. No 16. Pl. xv) এই সিদ্ধান্তের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হঠাৎ গণেশমূর্ত্তি গুপ্তযুগে কোথা হইতে আসিল? গণেশের মূর্ত্তির উপযোগী কল্পনা বহু পূর্ব্ব হইতেই লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ গণেশমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে। হাতীর মাথাওয়ালা মূর্ত্তির কথা যাজ্ঞিকী উপনিষদে পাওয়া যায়। যাজ্ঞিকী উপনিষৎ উপনিষদের পরিশিষ্ট হইলেও আড়াই হাজার বছরের পরে আসিবে না। যক্ষগণের মধ্যেও জন্তুর মুণ্ডের অসদ্ভাব নাই। ইহাও কম প্রাচীন নয়। অমরাবতীতেও কতকগুলি মূর্ত্তি আছে, ইহাদের হস্তে পুষ্পমাল্য। এই মূর্ত্তিগুলির হস্তিমুণ্ড—ইহারা খর্ব্বাকৃতি। এরূপ পুষ্পমাল্যবাহিনী মূর্ত্তি সাধারণতঃ যক্ষদেরই হইয়া থাকে। এই সমস্ত হইতে কোন রকমে গণেশমূর্ত্তির কল্পনা হইয়া থাকিবে। বৈদিকযুগের কোন তত্ত্ব হইতে গণেশের আকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

গণেশ-মন্দির

ভারতের সকল জায়গারই গণেশের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অজনেরীর নিম্নদেশে কতকগুলি ভগ্ন মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি দেবগিরির যাদবদের সময়ে (১১৫০-১৩০৮) নির্ম্মিত। এখানে অনেকগুলি নানা আকারের ভগ্ন গণেশমূর্ত্তি পড়িয়া আছে।

রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুরে ভৈঁসরোরগড় নামে একটা গ্রাম আছে। এই গ্রামে কএকটা গণেশমন্দির আছে। মন্দিরগুলি নবম বা দশম শতকে নির্ম্মিত।

মান্দ্রাজে চিদম্বরমে একটা বিরাট্ শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরে পাঁচটা মণ্ডপ আছে। ইহাদের মধ্যে একটা মণ্ডপে গণেশমন্দির আছে।

ব্রহ্মদেশে মহারাজ রামসাহী দেব ও তাঁহার ভ্রাতা [illegible]দশ শতকের শেষপাদে পাঁচ-ছয়টা গণেশ ও মহাদেব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

গোয়ালিয়র-দুর্গে নাম করিবার মত মন্দিরের মধ্যে তেলি-মন্দির উল্লেখ্য মন্দিরের মধ্যে তৃতীয়। দুর্গে এইটাই সর্ব্বোচ্চ স্থান। প্রথমে এটা বৈষ্ণব-মন্দির ছিল। আগেকার তৈরী দরজার উপর গরুড় প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। পঞ্চদশ শতকে যখন এটাকে শৈবেরা নিজেদের কাজে লাগান, তখন এই দরজার ভিতর আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট দরজা তৈরী করা হয়। এই দরজার মাথায় শিব-নন্দন গণেশের মূর্ত্তি আছে। দশম বা একাদশ শতকে এই মন্দিরটা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়।

ওড়িষায় কটকের যাজপুর সবডিভিসনে বরিউনিযুক্ত পাহাড়ের পবিত্র শৃঙ্গদেশে মহাবিনায়কের পূজা হয়। সন্ন্যাসীরা অনেককাল ধরিয়া ইহাকে শিবপূজার পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করিত। পরে বৈষ্ণবেরা পাহাড়ের উত্তরে ঢালু জায়গায় একটা আশ্রম নির্ম্মাণ করে। এখানে ১২ ফুট পরিধিযুক্ত একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড আছে। দেখিতে অনেকটা গণেশের মত। দক্ষিণদিকে একটা মুখের আকৃতি। লোকে ইহাকে গণেশের পিতা শিবের মুখ বলে। বামদিকের মুখটির মাথায় ঝুঁটীর মত। এটা লোকে গণেশের মাতা গৌরীর খোঁপা বলিয়া থাকে। সুতরাং পাহাড়ের এই অংশটাকে লোকে শিবগৌরী ও গণেশের সংযুক্ত মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করে।

মধ্যপ্রদেশের সুরগুজা ষ্টেটে রামগড় পাহাড়ে ২,৬০০ ফুট উচ্চে একটা অতি প্রাচীন পাথরের দরজা আছে। দরজার মাথায় গণেশের ক্ষোদিত মূর্ত্তি আছে।

ত্রিচিনোপলির বিখ্যাত পর্ব্বতে কতকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। এগুলিতে গণেশমূর্ত্তি আছে।

বোম্বাই প্রদেশে গণেশকে লোকে গণপতি বলে। এই প্রদেশে চন্দোরদুর্গ পাহাড়ের জৈনগুহা খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই গুহায় গণপতি ও দেবীর মূর্ত্তি আছে। ইহাতে তীর্থঙ্করদেরও মূর্ত্তি আছে।

হুলি নামক স্থানে একটা সুন্দর পঞ্চলিঙ্গদেবের ভগ্ন মন্দির আছে। পূর্ব্বে এটা জৈন বস্তি ছিল। এই মন্দির-মধ্যে একটা লিঙ্গায়তদের লিপি, একটি অদ্ভুত রকমের নাগমূর্ত্তি, আর একটা গণেশমূর্ত্তি আছে। সম্ভবতঃ অন্য মন্দির হইতে সংগৃহীত।

বোম্বাইয়ে বগেবদি উপত্যকায় বাসেশ্বরের একটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে গণপতি, সঙ্গমেশ্বর, মল্লিকার্জ্জুন ও বাসেশ্বরের মূর্ত্তি আছে।

বোম্বাইয়ে পুণা জেলায় চিন্‌চোয়াড় নামে একটা গ্রাম

আছে। এই গ্রামখানি গণপতি-মন্দিরের জন্ম বিখ্যাত। এই গণপতি সম্বন্ধে কৌতুকাবহ একটী আখ্যান আছে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি মোরোব নামে একটী ছোট ছেলের দেহ অবলম্বন করিয়া গণপতি আবির্ভূত হন। এই বালকের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যাবলী অনেকে প্রত্যক্ষ করে। ইহার মৃত্যুর পর ইহার বংশে গণপতি অনেক-বার অবতীর্ণ হন। মোরোব'র পুত্র চিন্তামন দ্বিতীয় জীবন্ত দেবতা হইয়াছিলেন। তুকারাম গর্ব্ব করিতেন যে, বিঠোবা তাঁহার সহিত ভোজন করিত। তাঁহার গর্ব্ব নষ্ট করিবার জন্ম ইনি গণপতির আকার ধারণ করেন। তুকারাম তাঁহাকে 'দেব' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহা হইতে এই বংশ দেব-বংশ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। চিন্তামনের মৃত্যুর পর নারায়ণ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। প্রবাদ আছে—ঔরঙ্গজেব তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্ম একটী পাত্রে গোমাংস রাখিয়া তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। নারায়ণ অদ্ভুত শক্তিবলে সেগুলিকে যুঁইফুলে পরিণত করেন। বাদশাহ্ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া এই দেব-বংশকে আটখানি গ্রাম বংশানুক্রমে ভোগ দখল করিবার অধিকার দেন। এই দেব-বংশের শেষ পুরুষ একটী অন্যায় কার্য্য করিয়া অভিশপ্ত হ'ন। তিনি মোরোব'র সমাধি খুঁড়িয়া বাহির করেন। মোরোব'র ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় তিনি বলেন যে তাঁহার পুত্রের পর আর কেহ ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ এই পুত্র ১৮১০ সালে অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। এই দেববংশ মনোরম অট্টালিকায় বাস করেন। প্রাসাদের নিকটে দেবের দুইটী মন্দির। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে এখানে গণপতির মেলা হয়। প্রায় ২,০০০ লোক জড় হয়। মেলা সাত দিন থাকে।

বোম্বাই এরণ্ডলে একটী গণপতি-মন্দির আছে।

এ প্রদেশে সপ্তশৃঙ্গ ও তওগাঁও নামক স্থানে গণপতির মন্দির আছে। তওগাঁওর মন্দির একশত বর্ষের পুরাতন।

পুণা City Municipality ও একটি গণপতির মন্দির তৈরী করিয়া দিয়াছে।

মগধে বৌদ্ধদিগের ভগ্নাবশেষ যেমন আছে, ব্রাহ্মণ্য ভগ্নাবশেষও আছে। এখানে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা, শিব, পার্ব্বতী ও গণেশের মূর্ত্তিও পাওয়া যায়।

গয়া জেলায় বরাবর পাহাড়ে শিব, দুর্গা ও গণেশের ক্ষোদিত-মূর্ত্তি আছে। মন্দির প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কতকগুলি পাথরমাত্র পড়িয়া আছে। মন্দিরের মধ্যে বাগীশ্বরী, ভৈরব, কার্ত্তিক ও গণেশের মূর্ত্তি আছে। একটী গর্ভগৃহে একটী বড় লিঙ্গ। প্রাচীরের নিকট একটী গর্ত্তে ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকের লিপি আছে।

কাশ্মীরে অবন্তীপুর গ্রামের নিকট অবন্তীশ্বর মন্দিরে অর্দ্ধনারীশ্বর ও গণপতির অতিপ্রাচীন অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে

শারদাতিলকের রাঘবভট্টের টীকায় (১।১১৬) পঞ্চাশ রকম গণেশের নাম আছে। পঞ্চাশ গণেশের পঞ্চাশ শক্তির নামও ইহাতে আছে। কিন্তু তাঁহাদের মূর্ত্তির কোন ধ্যান নাই। নিয়ে পঞ্চাশৎ গণেশ ও তাঁহাদের শক্তির নাম প্রদত্ত হইল :—

	গণেশ ও	তাঁহার শক্তি
১।	বিঘ্নেশ	হ্রী
২।	বিঘ্নরাজ	শ্রী
৩।	বিনায়ক	পুষ্টি
৪।	শিবোত্তম	শান্তি
৫।	বিঘ্নকৃৎ	স্বস্তি
৬।	বিঘ্নহর্ত্তা	সরস্বতী
৭।	গণ	স্বাহা
৮।	একদন্তক	মেধা
৯।	দ্বিদন্তক	কান্তি
১০।	গজবক্ত্র	কামিনী
১১।	নিরঞ্জন	মোহিনী
১২।	কপর্দী	নটী
১৩।	দীর্ঘজিহ্বক	পার্বতী
১৪।	শঙ্কুকর্ণ	জালিনী
১৫।	বৃষভধ্বজ	নন্দা
১৬।	গণনায়ক	সুপাশা
১৭।	গজেন্দ্র	কামরূপিণী
১৮।	সূর্পকর্ণ	উমা
১৯।	ত্রিলোচন	তেজোবতী
২০।	লম্বোদর	সত্যা
২১।	মহানন্দ	বিঘ্নেশানী

	গণেশ ও	তাঁহার শক্তি
২২।	চতুর্মূর্ত্তি	বররূপিণী
২৩।	সদাশিব	কামদা
২৪।	আমোদ	মদজিহ্বা
২৫।	দুর্মুখ	ভূতি
২৬।	সুমুখ	ভৌতিকা.
২৭।	প্রমোদক	অসিতা
২৮।	একরদ	রমা
২৯।	দ্বিজিহ্ব	মহিষী
৩০।	শূর	ভঞ্জিনী
৩১।	বীর	বিকর্ণপা
৩২।	ষণ্মুখ	ভ্রুকুটি
৩৩।	বরদ	লজ্জা
৩৪।	বামদেব	দীর্ঘঘোণা
৩৫।	বক্রতুণ্ড	ধনুর্দ্ধরা
৩৬।	দ্বিরণ্ডক	যামিনী
৩৭।	সেনানীগ্রামণ	রাত্রি
৩৮।	মত্ত	কামান্ধা
৩৯।	বিমত্ত	শশিপ্রভা
৪০।	মত্তবাহন	লোলাক্ষী
৪১।	জটী	চঞ্চলা
৪২।	মুণ্ডী	দীপ্তি
৪৩।	খড়্গী	দুর্ভগা
৪৪।	বরেণ্য	সুভগা
৪৫।	বৃষকেতন	শিবা
৪৬।	ভক্তপ্রিয়	ভর্গা
৪৭।	গণেশ	ভগিনী
৪৮।	মেঘনাদক	ভোগিনী
৪৯।	ব্যাপী	কালরাত্রি
৫০।	গণেশ্বর	কালিকা*

পুরাণাদিতে কিন্তু এতগুলি গণেশের নাম পাওয়া যায় না, এতগুলি শক্তিরও নাম নাই। গণেশের নামে একখানি উপনিষৎও তৈরী হইয়াছে। উপনিষৎখানির নাম—'গণেশাথর্ব্বশীর্ষ-উপনিষৎ'। এখানি কোনও প্রাচীন রচনা নয়। এগুলিতেও গণেশের এত প্রকারভেদ পাওয়া যায় না। অগ্নিপুরাণ গণেশের গায়ত্রী দিয়াছেন (৭১।৬), পূজা-পদ্ধতি দিয়াছেন (৭১।১—৩), পবিত্রা-রোহণ-মন্ত্র দিয়াছেন (৩৮।৮), গণেশের শক্তিরও নাম করিয়াছেন (৭১।৪—৫)। অগ্নিপুরাণের গণেশ-শক্তির নাম জ্বালিনী, নন্দা, সূর্য্যেশা, কামরূপা, উদয়া, কামবর্ত্তিনী, সত্যা, বিঘ্ননাশা ও গন্ধমুক্তিকা। এই শক্তিগুলির মধ্যে শারদাতিলকের নির্দ্দিষ্ট জ্বালিনী, কামরূপা, সত্যা ও বিঘ্ননাশা এই কয়েকটীকেই পাই।

সাধারণতঃ গণেশের যে সকল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে উচ্ছিষ্ট ও কেবল-গণেশের বিবরণ কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে আরও কয়েকটী মূর্ত্তি ধ্যানসহ দেওয়া যাইতেছে। এগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুত কৃষ্ণশাস্ত্রী ও স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও পণ্ডিতদ্বয়ের গ্রন্থ হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

মহাগণপতি

মুদ্গলপুরাণ মহাগণপতির ধ্যান দিয়াছে। এই ধ্যানানুসারে মহাগণপতি করি-মুণ্ড, ত্রিনেত্র, ইঁহার ললাটে চন্দ্রকলা—বর্ণ লোহিত। ইঁহার পত্নী ইঁহার অঙ্কে আসীনা। মহাগণপতি-পত্নীর হস্তে পদ্ম। মহা-গণপতির দশ হস্ত। মাদুরায় একটি মহাগণপতির মূর্ত্তি আছে। ইঁহার দশ হাত। কিন্তু প্রহরণগুলি অস্পষ্ট। ইন্দুরের উপর ইনি উপবিষ্ট। ইঁহার অঙ্কে দেবী। তিনেভেলি জেলার বিশ্বনাথ মন্দিরে একটী মহাগণপতি মূর্ত্তি আছে। কিন্তু ইঁহার বাহন ইন্দুর ইহাতে নাই। মহাগণপতির হস্তে প্রহরণ থাকা চাই-ই। যেখানে

* বিঘ্নেশো বিঘ্নরাজশ্চ বিনায়কশিবোত্তমৌ। বিঘ্নকৃদ্বিঘ্নহর্ত্তা চ গণৈকদ্বিহ্বদন্তকাঃ ॥ গজবক্ত্রনিরংজনৌ কপর্দী দীর্ঘজিহ্বকঃ। শঙ্কুকর্ণশ্চ বৃষভধ্বজশ্চ গণনায়কঃ ॥ গজেন্দ্রঃ সূর্পকর্ণশ্চ ত্রিলোচন-সংজ্ঞকঃ। লম্বোদরমহানন্দৌ চতুর্মূর্ত্তিঃ সদাশিবৌ ॥ আমোদদুর্মুখৌ চৈব সুমুখশ্চ প্রমোদকঃ। একরদো দ্বিজিহ্ব শূরবীরষণ্মুখাঃ ॥ বরদো বামদেবশ্চ বক্রতুণ্ডো দ্বিরণ্ডকঃ। সেনানীগ্রামণোমত্তো বিমত্তো মত্ত-বাহনঃ ॥ জটী মুণ্ডী তথা খড়্গী বরেণ্যো বৃষকেতনঃ। ভক্তপ্রিয়ো গণেশশ্চ মেঘনাদকসংজ্ঞকঃ ॥ ব্যাপী গণেশ্বরঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চাশদ্গণপা ইমে ॥

হ্রীঃ শ্রীশ্চ পুষ্টিঃ শান্তিশ্চ স্বস্তিশ্চৈব সরস্বতী। স্বাহা মেধা কান্তি কামিন্যোমোহিন্যপি বৈ নটী ॥ পার্ব্বতী জ্বালিনী নন্দা সুপাশাঃ কামরূপিণী। উমা তেজোবতী সত্যা বিঘ্নেশানী বররূপিণী ॥ কামদা মদজিহ্বা চ ভূতিঃ স্যাদ্ভৌতিকাসিতা। রমা চ মহিষী প্রোক্তা ভঞ্জিনী চ বিকর্ণপা ॥ ভ্রুকুটিঃ স্যাত্তথা লজ্জা দীর্ঘঘোণা ধনুর্দ্ধরা। যামিনী রাত্রিসংজ্ঞা চ কামান্ধা চ শশিপ্রভা ॥ লোলাক্ষী চঞ্চলা দীপ্তিঃ দুর্ভগা সুভগা শিবা। ভর্গা চ ভগিনী চৈব ভোগিনী সুভগা মতা ॥ কালরাত্রিঃ কালিকা চ পঞ্চাশৎ শক্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
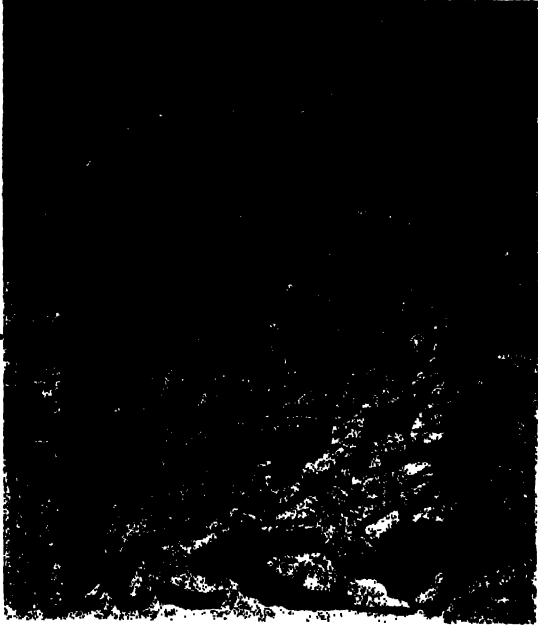
মহাগণপতি
মথুরা

মহাগণপতির-সঙ্গে দুইজন দেবী থাকেন সেখানে তাঁহার নাম লক্ষ্মী-গণপতি।

লক্ষ্মী-গণেশ—অষ্টভুজমূর্ত্তি

শুক, দাড়িম, পদ্ম, রত্নখচিত স্বর্ণজলপাত্র, অঙ্কুশ, পাশ, কল্পলতা ও বাণের কোরক অষ্টভুজে অবস্থিত। বর্ণ—শ্বেত। অঘোর শিবাচার্য্য ক্রিয়াক্রমদ্যোতিতে এই বর্ণনাই করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রমহোদধি-কার বলেন, লক্ষ্মী-গণপতির ত্রিনেত্র, দুই হস্তে দন্ত ও চক্র, এক হস্তে 'অভয়' মুদ্রা—চতুর্থ হস্ত সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। বর্ণ—স্বর্ণাভ; লক্ষ্মী এক হস্তে গণেশকে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার অপর হস্তে পদ্ম। লক্ষ্মী-গণেশের ধ্যান এইরূপ :—

"দন্তাভয়ে চক্রধরৌ দধানং করাগ্রগস্বর্ণঘটং ত্রিনেত্রম্।
ধৃতাব্জয়ালিঙ্গিতমব্ধিপুত্র্যা লক্ষ্মী-গণেশং কনকাভমীড়ে॥"
(মন্ত্রমহোদধি)

"বিভ্রাণশ্‌শুকবীজপূরকমলং মাণিক্যকুম্ভাঙ্কুশান্—
পাশং কল্পলতাঞ্চ বাণকলিকা প্রোতঃস্রয়োনিঃসরঃ (?)।
শ্যামো রক্তসরোরুহেণ সহিতো বিদ্ধয়েনাশ্রিকে (?)
গৌরাঙ্গো বরদাদিহস্তকমলো লক্ষ্মীগণেশো মহান্॥
(ক্রিয়াক্রমদ্যোতি)

প্রসন্ন-গণেশ

প্রসন্ন গণেশের মূর্ত্তি সর্ব্বত্রই দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই গণেশের শরীর ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন, কিন্তু কোথাও কোথাও আবার এই মূর্ত্তি সরলভাবে দণ্ডায়মান থাকে। গ্রন্থ-বিশেষের মতে মূর্ত্তিটি 'অভঙ্গ' হওয়া আবশ্যক, গ্রন্থান্তর মতে ইহা

প্রসন্ন-গণপতি (সমভঙ্গ-মূর্ত্তি)
ত্রিভাঙ্কুর্

'সমভঙ্গ'। যখন ভঙ্গ হইবে তখন সাধারণতঃ ত্রিভঙ্গ। মূর্ত্তি পদ্মাসনে স্থিত। প্রসন্ন-গণেশের মূর্ত্তি তরুণ অরুণের ন্যায় রক্তাভ ও রক্তবস্ত্র-পরিহিত। ইহার দুই হস্তে 'পাশ' ও 'অঙ্কুশ', অপর দুই হস্তে 'বরদ' ও 'অভয়' মুদ্রা। গ্রন্থে যদিও দুই মুদ্রার কথা লিখিত আছে, কিন্তু কোথাও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত: ঐ দুই হস্তে 'দন্ত' ও 'মোদক' থাকে। যেন শুণ্ডে করিয়া তুলিয়া মুখে দিতেছেন এইরূপভাবে মোদকটী স্থিত।

"উদ্যদ্দিনেশ্বররুচিং নিজহস্তপদ্মৈঃ
পাশাঙ্কুশাভয়বরান্দধতং গজাস্যম্।

রক্তাম্বরং সকলদুঃখহরং গণেশং
ধ্যায়েৎ প্রসন্নমখিলাভরণাভিরামম্ ।
(মন্ত্ররত্নাকর)

হেরম্ব-গণেশ

বিঘ্নেশ্বরের অন্যান্য মূর্ত্তি হইতে হেরম্ব-মূর্ত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহার পাঁচটী করিমুণ্ড। চারিটী মুখ চারিদিকে

হেরম্ব-গণপতি—নেগপটম্

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, ইহার পঞ্চম মুখ চারিটী মুণ্ডের উপর অবস্থিত বলিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। হেরম্বমূর্ত্তি শক্তিশালী সিংহোপরি অবস্থিত। ইহার হস্তে পাশ, দণ্ড, অক্ষমালা, পরশু ও ত্রিমস্তকবিশিষ্ট মুদ্গর। একহস্তে মোদক থাকিবে, অপর দুই হস্তে 'বরদ' ও 'অভয়' মুদ্রা। বর্ণ—পীতপ্রভ। ধ্যান এইরূপ :—

"সিংহোপরি স্থিতং দেবং পঞ্চবক্ত্রং গজাননম্ ।
দশবাহুং ত্রিনেত্রঞ্চ জাম্বুনদসমপ্রভম্ ॥
প্রসাদাভয়দাতারং পাত্রং পূরিতমোদকম্ ।
স্বদন্তং সব্যহস্তেন বিভ্রতং চাপি সুব্রতে ॥
... ...করং চাক্ষসূত্রঞ্চ পরশুং মুদ্গরং তথা
পাশাঙ্কুশকরাং শক্তিং দেবং লম্বোদরং শুভম্ ॥
পীবরং চৈকদন্তঞ্চ ভুমুরূণাং গণাধিপম্ ।"
(শিল্পরত্ন)

গণেশ-শক্তি গণপতি-হৃদয়া (বৌদ্ধ)
(বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের Buddhist Iconography হইতে গৃহীত)
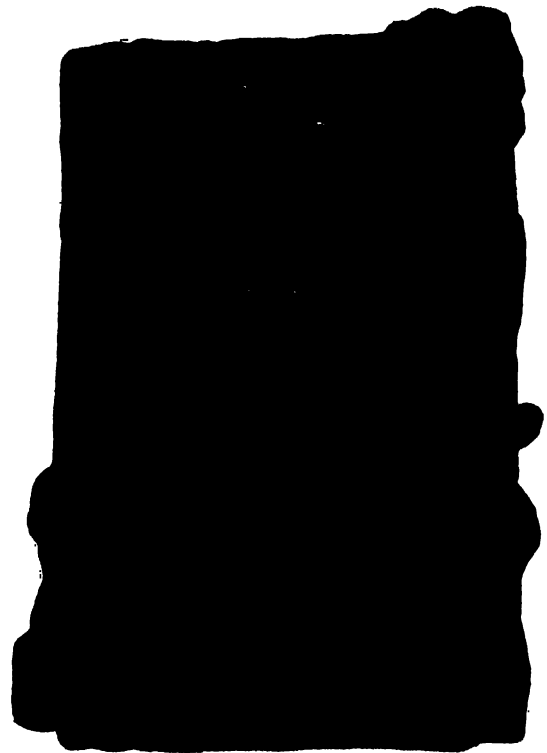
গণেশ (আসীন মূর্ত্তি) সাহেঠ-মাহেঠ
(A. S. R. 1910-11 হইতে গৃহীত)
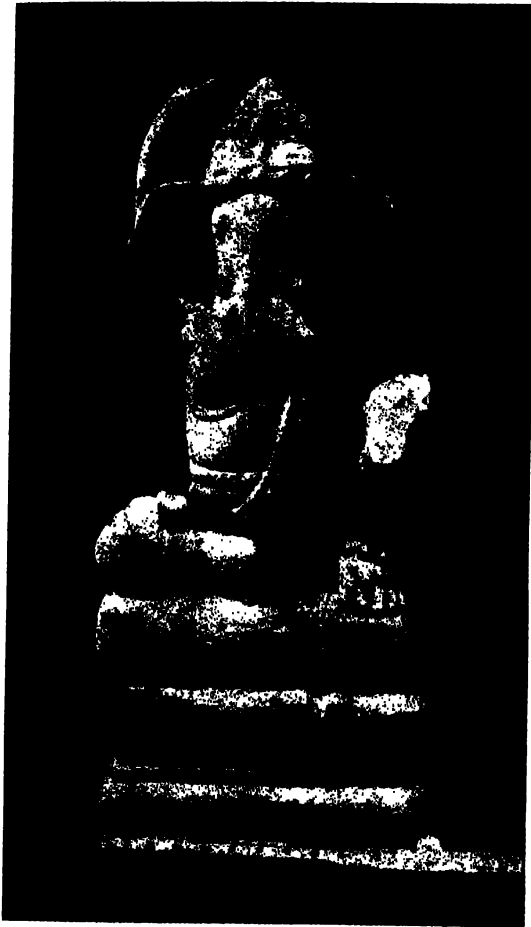
গণেশ—ভূমর
(A. S. R. 1920-21 হইতে গৃহীত)

"বরং তথাঙ্কুশং দন্তং দক্ষিণে চ পরশ্বধঃ।
বামে কপালং বাণাক্ষপাশং কৌমোদকীং তথা ॥
ধারয়ন্তং করৈরেভিঃ পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
হেরম্বং মূষকারূঢ়ং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থকামদম্ ॥' (রূপমণ্ডন)

"অভয় বরদহস্তং পাশদন্তাক্ষমালা—
পরশুমথ ত্রিশির্ষৈর্মুদ্গরৈর্মোদকঞ্চ।
বিদধতুব°সিংহ পঞ্চমাতঙ্গবক্ত্রঃ
কনকরুচিরবর্ণঃ পাতু হেরম্বনামা ॥" (ক্রিয়াক্রমদ্যোতি)

নৃত্ত-গণেশ

ইহা নর্ত্তনশীল গণেশের মূর্ত্তি। ইনি অষ্টভুজবিশিষ্ট। ইহার সাত হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, কুঠার, দন্ত, বলয় ও অঙ্গুরীয়। নৃত্তকালের হাবভাবের সুবিধার জন্ত এক হস্ত শূন্ত থাকে—ইহাতে কিছুই থাকে না। ইহার বর্ণ পীতপ্রভ। নৃত্তমূর্ত্তি বুঝাইবার জন্ত ইহার বাম চরণ ঈষৎ বক্রভাবে স্থিত। মূর্ত্তিটী পদ্মাসনে আসীন, দক্ষিণ
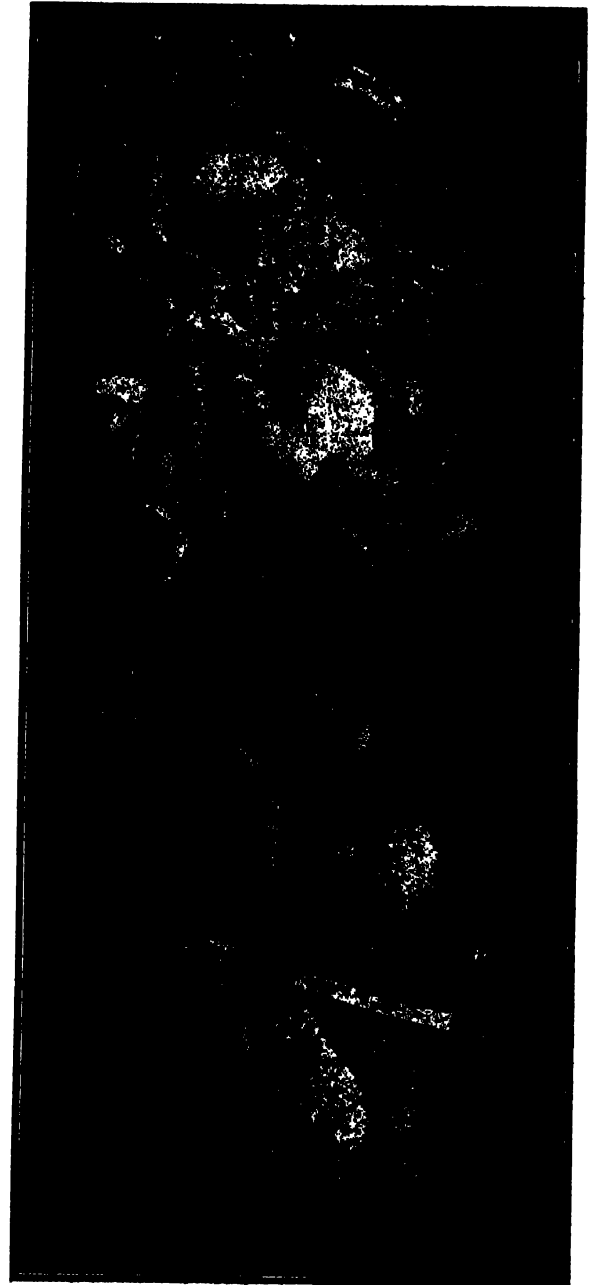
নৃত্ত-গণপতি
হয় সলেশ্বর মন্দির—হলেবিদ্

চরণ বক্রভাবে শূন্তে অবস্থিত। সাধারণতঃ নৃত্ত-গণেশের যে-সমুদায় মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিতে চতুর্ভুজই আছে, প্রয়োক্ত অষ্ট-ভুজ নয়। ধ্যান যথা :—

"পাশাঙ্কুশাপূপকুঠার দন্তচঞ্চৎকরং বলয় মঙ্গুলীয়কম্।
পীতপ্রভং কল্পতরুরুহস্তং ভজামি নৃত্তৈকপদং গণেশম্ ॥

জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকারী এডিসন—

টমাস আল্ভা এডিসন আমেরিকার, শুধু আমেরিকার বলিলে সঙ্গত হইবে না, জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকারী। তাঁহার

টমাস আল্ভা এডিসন—পরীক্ষাগারে

প্রথম ফনোগ্রাফ—সমসাময়িক চিত্র (১৮৭৯ সন)

অগণিত আবিষ্কারের মধ্যে ইলেক্‌ট্রিকের আলো বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৯ সনের ২১শে অক্টোবর উহা প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং গত ২১শে অক্টোবর এই আবিষ্কারের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিক, সকল গভর্ণমেন্ট, এবং সকল বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এডিসনকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই

পরীক্ষানিরত যুবক এডিসন

এডিসন—তাঁহার লাইব্রেরীতে। এডিসনের সম্মুখের যন্ত্রটির নাম 'এডিফোন', ইহার মধ্যে কথা কহিলে বক্তব্য বিষয় আপনা-আপনিই কাগজের উপর লিপিবদ্ধ হইয়া যায়

উৎসবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ হুভার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। 'রিলেটিভিটি'-বাদের আবিষ্কর্তা আইনষ্টাইন উপস্থিত থাকিতে না

পারিয়া জার্মেনী হইতে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইয়াছেন। হেনরী ফোর্ড এডিসনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ তিনি এডিসনের ইলেক্ট্রিক আলো আবিষ্কার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "এই আবিষ্কারের দ্বারা এডিসন জগতের যে উন্নতি এবং মানবের যে দুঃখলাঘব করিয়াছেন তাহা অন্য কোনও মানুষের দ্বারা হয় নাই। তিনি মানুষকে অন্ধকার

এডিসনের 'গোল্ডেন জুবিলী" উপলক্ষ্যে সমবেত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মধ্যে হেনরী ফোর্ড ও প্রেসিডেন্ট হুভার আছেন। পিছনের ট্রেণ ও ইঞ্জিনটি এডিসন শৈশবে যে-ট্রেণে কাজ করিতেন তাহার হুবহু প্রতিরূপ

হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন, এবং সূর্য্যের আলো ব্যতিরেকেও মানুষকে কাজ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া শিল্পের পরম সহায়তা করিয়াছেন।"

১৮৪৭ সনে এডিসনের জন্ম হয়। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। বার বৎসর বয়সে তাঁহাকে ট্রেণে খবরের কাগজ বিক্রয় করিবার কাজ লইতে হয়। এই কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানা
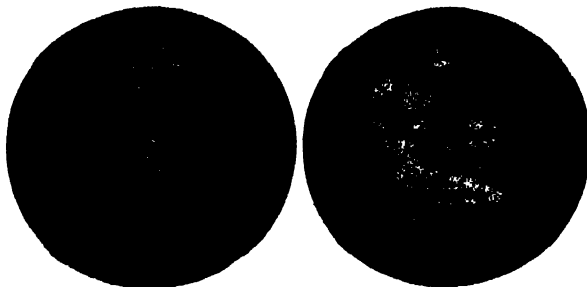
আমেরিকার কংগ্রেস হইতে প্রদত্ত মেডেলের দুইটি দিক

রাসায়নিক বিষয়ে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পনর বৎসর বয়সে এডিসন এই কাজ ছাড়িয়া 'টেলিগ্রাফ অপারেটর' হন। এই কাজ লওয়াতে তাঁহার ইলেক্ট্রিক সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ হয়। ছয় বৎসর এই কাজ করিবার পর তিনি একটি উন্নতধরণের টেলিগ্রাফ রিসিভার আবিষ্কার করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম আবিষ্কার। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর মাত্র। ইহার পর হইতে এডিসন যন্ত্রের পর নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন। আজ পর্য্যন্তও এই অক্লান্তকর্ম্মীর কর্ম্ম ও উৎসাহের বিরাম নাই। এডিসনের আবিষ্কারের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য ইলেক্ট্রিক আলো ও ফোনোগ্রাফ।

সাইবিরিয়ার উল্কাপাত—

১৯০৮ সনের ৩০শে জুলাই কয়েকটি উল্কাপিণ্ডের সমষ্টি পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে। এই সংঘাত হাজার হাজার মাইল জুড়িয়া অনুভূত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই উল্কাপিণ্ডগুলি পৃথিবীর কোনো জনবহুল স্থানে না পড়িয়া সাইবিরিয়ার একটি বিজন বনে পড়িয়াছিল। পাঁচশত মাইল দূর হইতে রুষীয় কৃষকেরা এই উল্কার আলো দেখিতে পাইয়াছিল এবং পড়িয়া ফাটিবার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। সেই সময় হইতে বিশ বৎসর ধরিয়া রুষ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই উল্কাটি ঠিক কোথায় পড়িয়াছে তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। গত বৎসর 'রাশিয়ান অ্যাকেডেমি অফ্ সায়ান্স'-এর সদস্য অধ্যাপক লিওনার্ড কুলিক ও 'সাইবিরিয়ান আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি'র সভ্য অধ্যাপক ভিক্টর সিটিনের নেতৃত্বে একটি অভিযান অবশেষে এই উল্কাপাতের স্থানটি আবিষ্কার করিয়াছে।

উল্কাপিণ্ডের সংঘাতে সমস্ত গাছপালা পড়িয়া গিয়াছে

অধ্যাপক কুলিক বহু বৎসর পূর্ব্বে এই উল্কাপাত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২৭ সনে তাঁহার প্রথম অভিযান স্থানটি কোথায় হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু খাদ্যাভাবে ও সাইবিরিয়ার নিদারুণ শীতের জন্য তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। পর বৎসর অধ্যাপক কুলিক, অধ্যাপক সিটিন ও অন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে লইয়া আবার উল্কাপাতের স্থানটির সন্ধান করিতে বাহির হন এবং অনেক চেষ্টার পর কৃতকার্য্য হন। এই অভিযান সম্প্রতি মস্কোতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বিরাট দৈবদুর্বিপাকের প্রামাণিক বিবরণ দিতে সক্ষম হইয়াছে।

অধ্যাপক কুলিকের অভিযান মস্কো হইতে তিন হাজার পাঁচশত মাইল দূরে টাইসেট্ নামক একটি ক্ষুদ্র শহর হইতে রেলপথ ছাড়িয়া যাত্রা করে। তারপর তিনশত মাইল ব্যাপী ঘন জঙ্গল ও জলাভূমি পার হইয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া পৌঁছে। এই গ্রামটিই সেই

অঞ্চলের মানববসতির শেষ সীমা। কয়েকটি সন্ত্রস্ত রুশ কৃষক ব্যতীত এই গ্রামের আর কোনো অধিবাসী ছিল না। ইহার পর লোকালয় ছাড়িয়া বনের মধ্য দিয়া আরও দুইশত মাইল যাইবার পর আগন্তুক উল্কাপাতের চিহ্ন দেখিতে পায়। প্রায় তিন চার বর্গ মাইল জুড়িয়া স্থানটি যেন বড় বড় কামানের আঘাতে বিধ্বস্ত। গাছপালা ভাঙিয়া গুঁড়া মাটিতে পড়িয়া আছে। চারিদিক অঙ্গার ও বন্যজন্তুর কঙ্কালে আকীর্ণ। এইরূপে কিছুদূর গিয়া অধ্যাপক কুলিক ও তাঁহার সঙ্গীগণ ঠিক যে জায়গায় উল্কাপিণ্ডগুলি মাটিতে আসিয়া লাগিয়াছিল সেই জায়গায় আসিয়া পৌঁছেন। সেই জায়গাটি উল্কাপিণ্ডগুলির সংঘাতে বসিয়া গিয়া একটা বিস্তৃত শুষ্ক হ্রদের মত হইয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক-কুলিক যে জায়গায় উল্কাপিণ্ডগুলি পড়িয়াছিল তাহার ফটোগ্রাফ লইতেছেন।
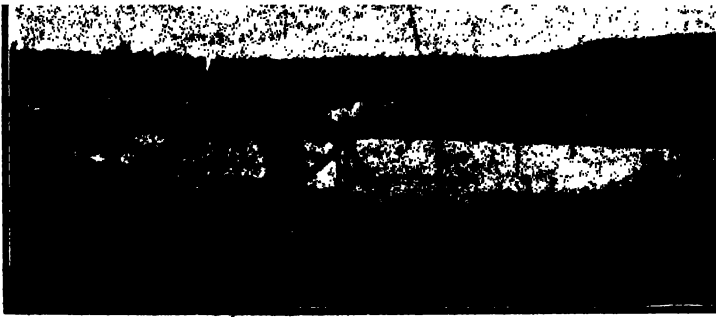
অধ্যাপক কুলিক অনুমান করেন যে উল্কাপিণ্ডগুলির ওজন অন্ততঃ চল্লিশ হাজার টন অথবা প্রায় দশলক্ষ মণ ছিল এবং ইহারা সম্ভবতঃ ঘণ্টায় দেড়হাজার হইতে দুই হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া আসিয়া পৃথিবীর গায়ে লাগে। উল্কাপিণ্ডগুলি বায়ুমণ্ডলে আসিয়া পড়িবার পর ইহাদের চলার বেগে একটা ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এই ঝড়ে যে জায়গায় উল্কাপিণ্ডগুলি আসিয়া পড়ে তাহার চারিদিকের কুড়ি পঁচিশ মাইলের মধ্যে প্রত্যেকটি গাছ পড়িয়া গিয়াছিল। এইরূপ উল্কাপাতের কথা পৃথিবীর ইতিহাসে কমই শোনা গিয়াছে।

—

প্লেনেটেরিয়াম—

বিজ্ঞানের দেশ জার্মানীতে প্লেনেটেরিয়ামের উদ্ভব। গেটে শিলার, হেগেল ফিখ্‌টের জন্মভূমি ইয়েনাতে প্রথম প্লেনেটেরিয়াম নির্মিত হয়। এই প্লেনেটেরিয়ামে এক বৎসরের মধ্যে একলক্ষ দশহাজার লোক বিশ্বজগৎ চাক্ষুষ করিতে আসে। জার্মানীর ১৫ টি সহরে এখন প্লেনেটেরিয়াম আছে। জার্মানীর বাহিরে একমাত্র রোম, ভিয়েনা ও মস্কোতে প্লেনেটেরিয়াম আছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে দুইটি নির্মিত হইতেছে।

প্লেনেটেরিয়াম দেখিয়া কেহ নিরাশ হইয়া ফিরে নাই। প্লেনেটেরিয়ামের দৃশ্য সত্যই আশাতীত। চক্ষের সম্মুখে সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়, ধীরে ধীরে গোধূলি নামিয়া আসে, গোধূলির পর রাত্রি তাহার গ্রহ তারার সম্ভার লইয়া আসে।

প্লেনেটেরিয়ামের উদ্দেশ্য কৃত্রিম আকাশ সৃষ্টি করা। সেই আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত, গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি, নক্ষত্ররাজী, ছায়াপথ সকলই দেখান হয়। শুধু তাই নয় পৃথিবীর যে কোন স্থানের

প্লেনেটেরিয়ামের অভ্যন্তর
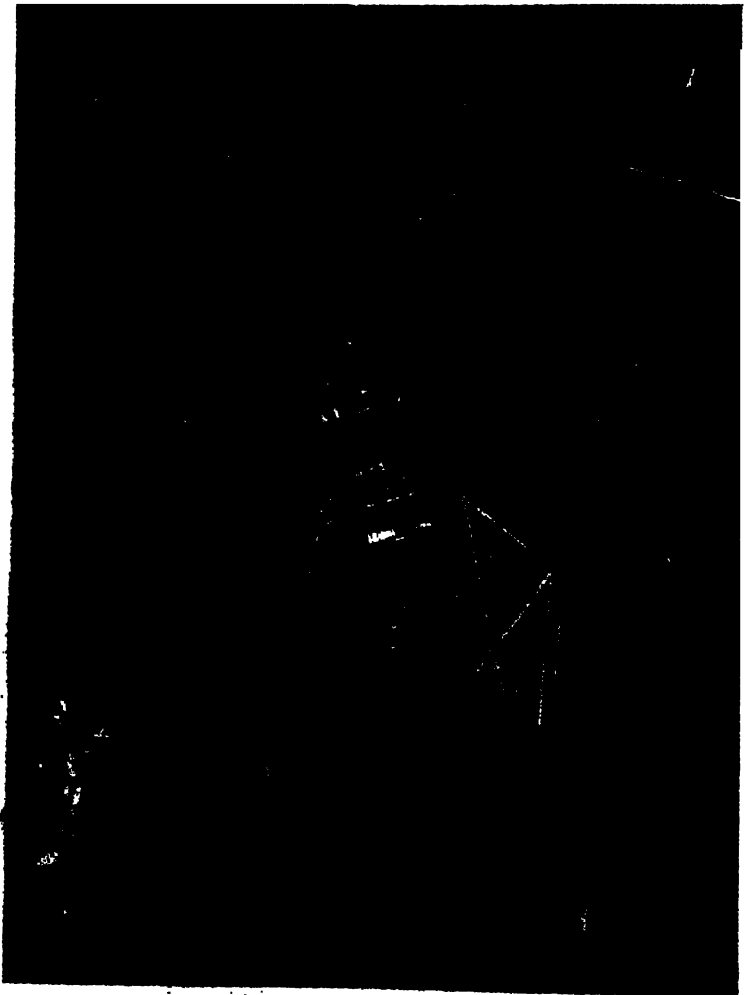
আকাশ প্লেনেটেরিয়ামে দৃষ্টিগোচর করান যাইতে পারে। উত্তর আকাশ, দক্ষিণ আকাশ, মেরুপ্রদেশের ছয়মাস দিন ছয়মাস রাত্রি, অনন্ত রাত্রি, অনন্ত দিন, প্লেনেটেরিয়ামে তাহাও সম্ভব। চিরধ্রুব ধ্রুবতারা মাথার উপর হইতে চক্রবাল রেখা অতিক্রম করিয়া অস্ত যায়। সুদূর ভবিষ্যতের বিশ্বরূপ যখন 'ভেগা' ধ্রুবতারার স্থান অধিকার করিবে, তাহাকেও প্লেনেটেরিয়ামে প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রোজেক্টর যন্ত্র

ইয়েনার প্লেনেটেরিয়াম
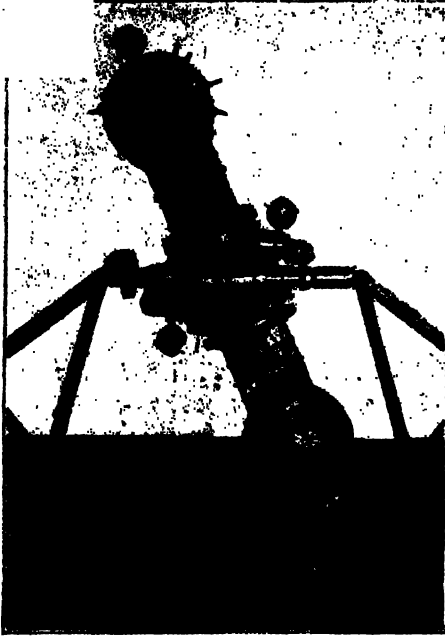
প্লেনেটেরিয়াম একটি সুবৃহৎ ডোম। ইহার মধ্যে ছয়শত লোক বসিবার মত স্থান আছে। গৃহের মধ্যভাগে দ্বি-মস্তক অদ্ভুতআকৃতি একটি যন্ত্র। দুদিকের মাথায় তার মাথা দুইটিতে অসংখ্য চক্ষু। যন্ত্রটিকে ইচ্ছামত গতি দিবার ব্যবস্থা আছে। এই যন্ত্রটির নাম Projector। ইহার দ্বারা ডোমের গায়ে সকল তারা, গ্রহ-উপগ্রহের ছবি ফেলা যায়। এই যন্ত্রটির দুই মাথায় দুইটি অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুত আলোক আছে। প্রত্যেকটি মাথায় ১৬ টি করিয়া লেন্স্ আছে। লেন্স্-এর পশ্চাতে একটি diaphragm আছে। লেন্স্-এর নির্মাণকৌশল এরূপ আশ্চর্য্য যে একটি লেন্সই বহু তারার আলোক নিক্ষিপ্ত করিতে পারে। উত্তর আকাশের তারা-সৃষ্টির জন্য একটি মাথা এবং দক্ষিণ আকাশের জন্য অপরটির প্রয়োজন হয়। গ্রহ এবং সূর্য্যের গতি নক্ষত্রের গতি হইতে বিভিন্ন বলিয়া তাহারা যন্ত্রের মধ্যভাগে অবস্থিত।

হাম্বোর্গের প্লেনেটেরিয়াম

প্লেনেটেরিয়াম গৃহের বৃহদাকার ছাদই আকাশ। 'প্রোজেক্টর' হইতে আলো নিক্ষিপ্ত হইয়া যথাস্থানে গ্রহতারার সৃষ্টি করে। স্থানবিশেষের স্থায়ী আকাশ সৃষ্টি করিয়াই এই যন্ত্রটি ক্ষান্ত হয় না। চারমিনিটের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ দিন হয়। সুতরাং চক্ষের সম্মুখে ইহাদের গতি উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীর একদিন ৪ মিনিট স্থায়ী হইলে মঙ্গল গ্রহ ৭.২ মিনিটে বৃহস্পতি ৪৭.২ মিনিটে, শনিগ্রহ ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এদিকে শুক্র ১৪৮ সেকেণ্ডে এবং বুধ ৫৮ সেকেণ্ডে বন্‌বন্ করিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে। একটি বোতাম টিপিয়া ইয়েনা হইতে উত্তরমেরুতে চলিয়া যাওয়া যাইতে পারে, ধ্রুবতারা তখন মাথার উপরে, সূর্য্য তখন সুদূর দক্ষিণ আকাশে। অনন্ত দিন-রাত্রি একমাত্র শুক্রগ্রহে সম্ভব। প্লেনেটেরিয়ামে তাহার দৃশ্যও ঘটান যায়। পৃথিবীর মেরুদণ্ডের গতি বৎসরে একবার মাত্র করিয়া দেওয়া হয়। ফলে পৃথিবীর একদিক চিরকাল সূর্য্যের আড়ালে থাকে, আর একদিক চিরকাল সূর্য্যের দিকে। সেখানে সূর্য্যের উদয়াস্ত উভয়ই অবর্তমান।

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযামিনীকান্ত সোম। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯২৯। মূল্য এক টাকা। ১৬৫ পৃষ্ঠা ও ২৩খানি স্বতন্ত্র মুদ্রিত ছবি। কাপড়ে বাঁধান।

প্রবাসীতে এই বহিখানির প্রথম সংস্করণের পরিচয় দিবার সময় ইহার প্রশংসা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে বহিখানি বড় হইয়াছে এবং সুন্দরতর হইয়াছে। ইহা হইতে ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথের, তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর এবং তাঁহার অন্য নানাবিধ কার্য্যের যথাযথ পরিচয় পাইবে। মানুষকে ও তাহার কাজকে বুঝিতে হইলে প্রীতি ও শ্রদ্ধা আবশ্যক। যামিনীবাবু প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত বহিখানি লিখিয়াছেন। সেইরূপ মনের ভাব ইহার ছোট ছোট পাঠকপাঠিকাদের মনেও সঞ্চারিত হইবে এবং তাহার দ্বারা তাহাদের কল্যাণ ও আনন্দ হইবে। এই বহিখানি বয়োবৃদ্ধদেরও কাজে লাগিবে।

বাংলা ভাষায় কেহ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য এইরূপ একখানি বহি লেখেন নাই, ইহা বাঙালীর জাতীয় ত্রুটি। কারণ, সাহিত্যের নানা বিভাগে, সংগীতে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে যাহা দিয়াছেন, সেই দানের সমষ্টি এই সব বিষয়ে অন্য যে-কোনও বাঙালীর দানসমষ্টির চেয়ে বৃহত্তর ও শ্রেষ্ঠ।

ফুলকারী—প্রথম খণ্ড, শ্রীনন্দলাল বসু, কলাভবন, শান্তিনিকেতন, বোলপুর। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

ইহা সূচীশিল্পের বহি। বিছানা, পর্দা, চাদর, ওড়না, সাড়ী, ছেলেদের ও মেয়েদের নানা রকমের জামা অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত ছুঁচের কাজের দশটি চিত্র এই বহিখানিতে আছে। মহিলারা অনেকেই নিজের হাতে এই সব জিনিষ ভূষিত করিতে চান। এই বহি তাঁহাদের কাজে লাগিবে। তদ্ভিন্ন, মেয়েদের যে সব সাধারণ বিদ্যালয়ে ও মহিলাশিল্প বিদ্যালয়ে সূচিশিল্প শিখান হয়, সেখানেও এই বহিটি ব্যবহৃত হইলে ছাত্রীদের উপকার হইবে। ইহাতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি ছোট ভূমিকা আছে।

র ।

চলবিদ্যুৎ—রায়সাহেব জগদানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—২৲।

রায়-মহাশয়, ক্রমে ক্রমে পদার্থবিদ্যার সমস্ত মূলতত্ত্বগুলি বাংলা ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক আকারে প্রকাশ করিতেছেন। এই পুস্তকগুলিতে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের দৈন্য যে কতকটা দূর হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। এই পর্য্যায়ের সমস্ত পুস্তকগুলি সুলিখিত; অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না। 'চলবিদ্যুৎ' পুস্তকে নানা জ্ঞাতব্য বৈদ্যুতিক তথ্য সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন বাংলা দেশের প্রধান প্রধান সকল নগরেই বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, মোটর, রন্ধনের পাত্র ও গৃহস্থালী-সম্পর্কীয় নানা কার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই-সকল যন্ত্রাদি কি প্রকারে চলে, বালক-বালিকাদের তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল হইয়া থাকে। জগদানন্দবাবু অতি বিশদভাবে এই পুস্তকে সেই-সকল তথ্য আলোচনা করিয়াছেন। বেতার টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন্ বিবরণও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তক যত অধিক প্রচার হয় বাংলা দেশের ততই মঙ্গল। পুস্তকের মূল্য দুই টাকা অত্যধিক বলিয়া মনে হয়।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ—বিস্তৃত ভূমিকা সমেত সটীক ও সানুবাদ মূল গীতগোবিন্দ। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন কৃত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯২, কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য দুই টাকা; প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের নাম বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। একদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত ইঁহার যেমন অনন্যসাধারণ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সাধারণ্যে স্বীকৃত, অন্য দিকে বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে ইঁহার মৌলিক গবেষণা ও সুধীসমাজে আদৃত হইয়া আছে। ইঁহার সম্পাদিত বৈষ্ণব সমাজের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তথা ভারতীয় সাহিত্যভাণ্ডারের অন্যতম অমূল্যরত্ন গীতগোবিন্দের সংস্করণ, পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্য-বিচার উভয় দিক দিয়াই উৎকৃষ্ট হইবার কথা, এবং ইঁহার কৃত বঙ্গানুবাদ যথাযথ ও সুপাঠ্য হইবার কথা, এবং হইয়াছেও তাহাই। ইঁহার গীতগোবিন্দ-খানি দেখিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। সংস্করণখানি সর্ব্বথা সুপণ্ডিত এবং সুলেখক, রসশাস্ত্রবিৎ এবং ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণব সাহিত্যরত্ন-মহাশয়ের উপযুক্তই হইয়াছে। ১৩১ পৃষ্ঠ-ব্যাপী ভূমিকায় শ্রীজয়দেবকবি, বৈষ্ণব রস-দর্শন এবং কবির কাব্য সম্বন্ধে অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণ আলোচনা আছে। কবি সম্বন্ধে যেখানে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, হরেকৃষ্ণবাবু সমস্তই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, সমস্ত বিষয়েরই অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ইহাতে অনেক নূতন কথা পড়িতে পারিবেন, পণ্ডিতজনেও বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্যের সন্ধান পাইবেন। শ্রীজয়দেবের কাব্যকথা প্রসঙ্গে কাব্যখানির বাহ্যরূপ তথা আভ্যন্তরীন তত্ত্ব উভয় দিক হইতেই ইহার সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জন্য সার্থক প্রয়াস করা হইয়াছে। লেখায় কোথাও অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস নাই সহজ সরল এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষায় আলোচ্য বিষয় লেখক ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তথ্য ও কাব্যালোচনা উভয় দিক দিয়া দেখিলে ভূমিকাটিকে মূল্যবান্ বলিতে হয়। মূল সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে বালবোধিনী টীকা ও পরে বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদটীর ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, এবং মূলানুসারী। তবে কেবল অনুবাদের মধ্য দিয়া জয়দেবের রস আস্বাদন করা চলে না; সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের অনুবাদে মূলকে বুঝিতে

সাহায্য করিবে। বইখানির ছাপা ও কাগজ সুন্দর, বাঁধাই পরিপাটী। সংস্কৃত অংশে দুই চারিটি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে; তবে বইয়ের অত গুণ স্মরণ করিয়া এই ত্রুটী ক্ষমার যোগ্য। বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীশ্রীজগোবিন্দের যে কয়খানি ভালো অনুবাদ ও সংস্করণ আছে, এইখানিকে সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষে তাহাদের মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। শুনিয়াছি, বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামিবর্গের নিকট এই পুস্তকের যোগ্য সমাদর হইয়াছে। আশা করি সাধারণ বাঙালী বিদ্বদ্গণের মধ্যেও এই পুস্তক ইহার উপযুক্ত মর্য্যাদা ও প্রচার লাভ করিবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু-বিবাহ—শ্রীরসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু, বাণী ভাণ্ডার, ঢাকা। পৃঃ ১১+১৪৩+১৫; মূল্য পাঁচসিকা।

এই পুস্তকে এই সমুদায় আলোচিত হইয়াছে (১) বিবাহ কি? (২) বিবাহের উদ্দেশ্য কি? (৩) হিন্দুবিবাহের আদর্শ (৪) বিবাহের প্রকার ভেদ (৫) নারীর গৌরব (৬) নারীর কর্ত্তব্য (৭) স্বামীর কর্ত্তব্য (৮) স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের কর্ত্তব্য (৯) গৃহিণীর কর্ত্তব্য (১০) বর-নির্ব্বাচন। (১১) কন্যা-নির্ব্বাচন (১২) কন্যা বিবাহের বয়স।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিবাহ বিষয়ক কয়েকটি গান দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহাতে অনেক শাস্ত্রীয় তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রাচীন-তন্ত্রের লোক। তিনি 'যুবতী বিবাহ' সমর্থন করেন না, কিন্তু তিনিও ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যাকে বিবাহ দিতে প্রস্তুত নহেন। গ্রন্থের শেষ অংশে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—"আমাদিগকে যুগপ্রভাবেই একটু পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া মনুর ব্যবস্থায় দ্বাদশ বর্ষ ও তৎপর তিন বৎসর অর্থাৎ ১২ হইতে ১৫ বৎসর কন্যার বিবাহের বয়ঃকাল নির্ণয় করিতে হইতেছে। ইহাতে বালিকা বিবাহের কুফল এবং যুবতী বিবাহের পাপ উভয় হইতেই সমাজ মুক্ত থাকিবে।" (পৃঃ ১৪৩)।

দৃগ্ দৃশ্য বিবেক—সটীক, সানুবাদ। অনুবাদক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীবিপিনচন্দ্র মল্লিক, ১৮নং কামাখ্যা লেন, সিটি বেনারস। পৃঃ ১+৶+২১৮, মূল্য ১।০

যাহা 'বাক্যসুধা' নামে পরিচিত, তাহারই অপর নাম দৃগ্ দৃশ্য বিবেক। এই পুস্তকের রচয়িতা কে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অনুবাদক 'ভূমিকা'তে গ্রন্থ, গ্রন্থকার, গ্রন্থের দুইজন টীকাকারের বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীতীর্থ ইহার লেখক।

এই সংস্করণে প্রথমে বঙ্গাক্ষরে মূল গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরে অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ। ইহার পরে দেওয়া হইয়াছে ব্রহ্মানন্দ ভারতী কৃত টীকার বঙ্গানুবাদ। টীকার মূল দেওয়া হয় নাই। কিন্তু টীকাকার যে-সমুদায় শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মূল বঙ্গানুবাদ সহ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের চারিটি পরিশিষ্ট। (ক) পরিশিষ্টে 'ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা'র বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ১০৭-১২৪)। (খ) পরিশিষ্টের বিষয় 'অনুমান প্রমাণ নিরূপণ'। (গ) পরিশিষ্টে বহু পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। (ঘ) পরিশিষ্টে আনন্দগিরি বিরচিত 'বাক্যসুধা' টীকার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

'দৃগ্ দৃশ্য বিবেক' একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক; শ্লোক-সংখ্যা ৪৬টী। কিন্তু ইহা পাঠ করিলেই সহজে বেদান্তের মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বুঝা যাইতে পারে। গ্রন্থের ভাষাও সহজ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্করণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থের পরিশিষ্ট অতি মূল্যবান। দুইটি টীকার অনুবাদ দেওয়ায় গ্রন্থের মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। আশা করি এই সংস্করণ জনসমাজে আদরণীয় হইবে।

বোধসার—অনুবাদক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থল—'কার্য্যাধ্যক্ষ, রত্নপিটক গ্রন্থাবলী, ১৮নং কামাখ্যা লেন, বেনারস সিটি। পৃঃ ১৸৴+৭০৪; মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

অনুবাদক বলেন—"এই গ্রন্থের রচয়িতা 'নরহরি' এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বারাণসী ধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের টীকাকার দিবাকর, তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। টীকা ১৭০৮ শকে সমাপ্ত হইয়াছিল।" অনুবাদক অনেক স্থলে এই টীকাকারের মতামত গ্রহণ করিয়াছেন; কোন কোন স্থলে তাঁহার ব্যাখ্যা পরিত্যাগও করিয়াছেন।

এই সংস্করণে প্রথমে বঙ্গাক্ষরে মূল সংস্কৃত ও তাহার পরে অন্বয় দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরে বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ মূলসঙ্গত; কিন্তু সব স্থলে কথায় কথায় নহে। অনেক স্থলে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা একসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। বোধসৌকর্য্যার্থে অধিকাংশ স্থলে অতিরিক্ত কথা সংযোজিত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে তাহা বন্ধনীর মধ্যেও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যাহা মূলে নাই, যাহা অতিরিক্ত, সর্ব্বস্থানেই তাহা বন্ধনীর মধ্যে দিলে ভাল হইত।

বেদান্তের সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে জীবন গঠন করা যায়, তাহাই এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্ত ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুখী হইবেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

যোগভ্রষ্ট—শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীসজনী-কান্ত দাস, রঞ্জন প্রকাশালয়। মূল্য দেড় টাকা।

যে শ্রেণীর বইয়ের শেষের পাতা পড়া হইয়া গেলে বই মুড়িয়া রাখিয়াই পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটার, বড়লাটের বক্তৃতা, আগামী কংগ্রেস বা এখনও শীত না পড়িবার কারণ সম্বন্ধে মামুলী জিজ্ঞাসাবাদ চলিতে পারে, "যোগভ্রষ্ট" সে শ্রেণীর বই নহে। বইয়ের মাঝামাঝি এবং শেষের দিকের কয়েকটি পাতা মনে এমন দাগ দিয়া যায় যে, বইখানি শেষ করিয়া খানিক ভাবিতে হয়। লেখকের অনুভূতি তীক্ষ্ণ বলিয়াই এক-একটা কথা এমন জোরালো যে মতগুলির বিরুদ্ধে যুক্তি খুঁজিবার জোর মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য হয়। বিশেষ করিয়া মনে থাকে তৃপ্তি ও রাজেন্দ্রকে। রাজেন্দ্রের পৌরুষ আত্মীয়ের অপেক্ষা real, চরিত্র-অঙ্কণের technique-এর দিক হইতেও রাজেন্দ্র বেশী ফুটিয়াছে। তৃপ্তি ও রাজেন্দ্রের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া তৃপ্তির যে মূর্ত্তির সহিত আমাদের পরিচয় হয়, তাহা কল্পনার জড়তা ঘুচাইয়া তাহাকে জাগ্রত ও জীবন্ত করিয়া তোলে। স্বামীর দেশহিতৈষিতার সখ মিটাইবার জন্ত আত্মীয়ের নিকট হইতে তৃপ্তির অর্থগ্রহণ এবং তাহার পরেই খামখেয়ালি আত্মীয়ের ভৎর্সনায় তৃপ্তির দিশাহারা ভাব এই ছবিটাতে লেখকের রসবোধের গভীরতা বুঝিতে পারি।

বইয়ের শেষে তৃপ্তি ও আত্মীয়ের সম্বন্ধ কিছু দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া যায়। তৃপ্তি হঠাৎ রোগশয্যাগত আত্মীয়ের প্রেমে পড়িয়া গেল, এ ব্যাপার হয়তো অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু লেখক একজন পাঠকের মন

পূর্ব্ব হইতে আদৌ তৈয়ারী করেন নাই বলিয়া ঘটনাটি পাঠকের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হইয়া ওঠে, একটু অবাস্তব বলিয়া মনে হয়।

সারা বইখানির মধ্যে আমরা একটি মৌলিক, জোরালো ও খাঁটি মনের পরিচয় পাই। অতিআধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের কল্পনার পঙ্কিলতা এবং একটা একপেশে, একঘেয়ে সুরের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া প্রাণ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ চলতে ঘাসের ফুল—শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রণীত এবং ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রঞ্জন প্রকাশালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এখানি কবিতার বই। কবিতা বলিতে আজকাল সাধারণত একটা বিশেষ ভঙ্গীতে লেখা যে-ধরণের পদ্য বোঝায়, 'ঘাসের ফুলে'র কবিতাগুলি সে-ধরণের নয়। বইখানিতে বৈশিষ্ট্য আছে। কবি বলিতেছেন, "কি করি! কল্পনাকে ছেড়ে দিলাম, সে তো পথ চলতে লাগল—যত বুনো পাহাড়-ঘেরা দেশ আফ্রিকা-আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া। পথের ধারে ধারে ঘাসের ফুল। তাই তুলে নিয়ে মালা গাঁথা সুরু হল।" তাই বহুদেশের বৈচিত্র্যে কবিতাগুলি অলঙ্কৃত। কালিফোর্ণিয়া, জাবেনী হইতে টোকিও শাংহাই কিছুই বাদ পড়ে নাই। কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি আন্তরিকতাপূর্ণ, কতকগুলি পরিহাসলঘু।

> থম্ থমে রাত্তির ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি,
> ডুব্‌ল কি পথঘাট ডুব্‌ল কি সৃষ্টি,
> ডুব্‌ল কি প্রেইরী, হারাল কি খেইরে,
> নীল মেঘ-বলাকীর আঁধারিল দৃষ্টি।

—সুতরাং আছে।

> আজিকে আমার এসেছে সহেলি, পহেলি এলাহী রাত্তিয়া
> মোর অঙ্গের ক্ষেতে খেলে দে খেলে দে হাজারো রঙীন বাত্তিয়া।

অথবা—

> তুমি এস বনপথে ছোঁয়াও সোনার কাঠি ঝুরু ঝুরু ঝরে যাক্ ঝরণা,
> ডাকৃছে পাহাড় বন ডাকৃছে এ দেহ মন, ফেলে দিয়ে এস ঘর-কন্নণা।

অথবা—'বুকে আমার এসে ফিরে গেছে অকাল বৈশাখী'

ছন্দে ও কবিত্বে সুন্দর।

কবিতার বই হইলেও গতানুগতিক নয় বলিয়া এখানি আগাগোড়া এক নিঃশ্বাসে পড়া যায়। ছাপা ও কাগজ ভাল।

দার্জ্জিলিং সাথী—শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার, এম্-এস্‌সি প্রণীত ও ৩৭ ৮২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

দার্জ্জিলিং-সম্পর্কিত দু'একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থাকা সত্ত্বেও এই গ্রন্থখানি লিখিবার কারণ বিবৃত করিতে গ্রন্থকার বলিতেছেন, "উহা আরম্ভ করে দেখি যে বাংলা ভাষায় দার্জ্জিলিং সম্বন্ধে কোন আধুনিক বই নাই।" পুস্তকখানিতে দার্জ্জিলিং সংক্রান্ত বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বইখানি সঙ্গে রাখিলে দার্জ্জিলিং যাত্রীদের অনেক সুবিধা হইবে। দুইখানি দ্বিবর্ণ ত্রিবর্ণ চিত্র, একখানি ম্যাপ এবং অনেকগুলি ফোটো আছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জানোয়ারের কাণ্ড—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত জানোয়ারের গল্প। ডবল ক্রাউন্ কোপ্ সাইজ—১১২ পৃষ্ঠার বই, ছবি ২৫ খানি। প্রাপ্তিস্থান, সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

এই সঙ্কলনে সেকালের 'সখা', 'মুকুল', 'সখাসাথী' প্রভৃতি শিশু-মাসিকের অনেকগুলি গল্প স্থান পাইয়াছে। লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুত বামনদাস মজুমদার, শ্রীযুত হেমচন্দ্র সরকার, এম্-এ, স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুত কুলদারঞ্জন রায় প্রভৃতি কয়েকজনের নাম সূচীপত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যান্য লেখকগণের নামও এই সঙ্গে স্বীকৃত হইলে ভাল হইত।

পাশ্চাত্যের জানোয়ারবিদ্ পণ্ডিতগণও বলিতেছেন যে, কোনো কোনো জানোয়ারের শুধু সহজ সংস্কার নয়, বুদ্ধিবৃত্তিও আছে। জানোয়ারের কাণ্ডের অনেক গল্পে সেই পশুবুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অতিরঞ্জন যে কোথাও নাই, এমন কথা বলা যায় না।

গল্পগুলি এরূপ চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ যে, শুধু ছোটরা কেন, বড়রাও ইহা পাঠে মুগ্ধ হইবেন। ছেলে বয়সে আমরা ইহার অধিকাংশ গল্প পড়িয়াছিলাম, প্রবীণ বয়সেও এখন আবার ইহার সহিত মুলাকাৎ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ পাইলাম। শিশুসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক যোগীন্দ্রবাবু এখন বাতে পঙ্গু—আধিব্যাধিতে প্রপীড়িত, এই অবস্থাতেও যে তিনি জানোয়ার-রাজ্যের বিবিধ তথ্য আহরণ করিয়া শিশুমহলের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন, এজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। জানোয়ারের কাণ্ড লইয়া দেশের ছেলেমেয়েরা মাতিয়া উঠুক, ইহাই আমাদের কামনা।

শ্রীনিশিকান্ত সেন

ডায়ারী, ১৯৩০—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

আমরা প্রকাশকের নিকট হইতে ১৯৩০ সনের Everyman's Diary ও শ্রীযুক্ত কে, এম, ঘোষ-সম্পাদিত সুপরিচিত Ghosh's Diaryর কয়েকখণ্ড পাইয়াছি। এই ডায়ারীগুলি নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সবই ভাল। প্রথমোক্ত ডায়ারীটির মূল্য বার আনা ও অপরগুলির আকার অনুযায়ী পাঁচ আনা হইতে তিন টাকা চার আনা। এই সুদৃশ্য ডায়ারীগুলি পাঠকবর্গের নিকট সমাদৃত হইবে আশা করা যায়।

ক. ন. চ.

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

১। শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ নাগ—শ্রীবিনোদিনী মিত্র
২। শ্রীরামচরিত—পণ্ডিত শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী
৩। ভারতধারা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন
৪। পতিতা—শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ
৫। বার্ষিক শিশুসাথী
৬। চাঁদামামা—শ্রীনিশিকান্ত সেন
৭। আত্মসমর্পণ যোগে—শ্রীমতিলাল রায়
৮। মরণবিজয়ী যতীন্দ্রনাথ দাস—শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
৯। দয়ানন্দ চরিত—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১০। মেকলানা-সবেট্‌স—আসাদ-উল্লাহ
১১। বঙ্গের বীরসন্তান—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
১২। মঞ্জুষা—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার
১৩। আফ্রিকায় সিংহ-শিকার—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর
১৪। রুদ্রবীণা—শ্রীপ্রিয়ব্রত সরকার
১৫। হিসাবী—শ্রীব্রজমাধব রায়
১৬। অভিনীকুমার—শ্রীতীর্থরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
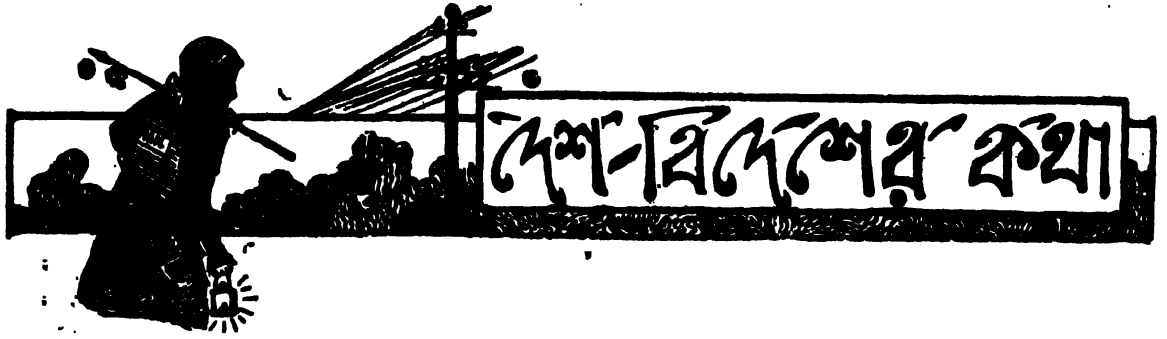
ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশ

মধু-মিলন—

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ (বাংলা ২০শে মাঘ, ১৩৩৬) শ্রীপঞ্চমী দিবসে কবিবর মাইকেল মধুসূদনপ্রমুখ খিদিরপুরবাসী কবিগণের স্মৃতিকল্পে খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর উদ্যোগে পঞ্চদশবার্ষিক "মধু মিলন" উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং ঐ সভায় নিম্নলিখিত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধলেখকগণকে পদক বিতরণ করা হইবে।

১। শ্রীবটুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত "রাধারাণী স্মৃতি" স্বর্ণ-পদক; বিষয়:—মেঘনাদবধকাব্যের "প্রমীলা" সম্বন্ধে কবিতা। কেবলমাত্র মহিলালেখিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে। লেখিকার স্বয়ং আসিয়া কবিতা পাঠ করা প্রার্থনীয়।

২। শ্রীঅমরনাথ দত্ত প্রদত্ত "সুশীলাবালা স্মৃতি" রৌপ্যপদক; বিষয়:—"পদ্মিনীচরিত্র চিত্রাঙ্কনে রঙ্গলাল" (প্রবন্ধ)। সর্ব্ব-সাধারণের জন্য।

৩। শ্রীশিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত "প্রমদাসুন্দরীস্মৃতি" রৌপ্যপদক; বিষয়:—"দশমহাবিদ্যা ও হেমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধ। সর্ব্বসাধারণের জন্য।

কবিতা ও প্রবন্ধাদি আগামী ২০শে জানুয়ারী ১৯৩০ এর মধ্যে উক্ত "মধু মিলন" সভার সম্পাদকের নামে ১৬ নং গণেশ সরকার লেন, খিদিরপুর (কলিকাতা) এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

পরলোকগত সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র ঘোষ—

শিক্ষিতসমাজে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণা করেন পরলোকগত সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের অনেকেরই নিকট সুপরিচিত ছিলেন।

সতীশচন্দ্র চট্টগ্রামের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ গ্রামে ১৮৮১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া সতীশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় সবিশেষ অগ্রসর হইতে না পারিলেও ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশীয়, আসামী, পার্শী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁহার বেশ দখল ছিল। তৎপ্রণীত চাক্‌মাজাতি গ্রন্থে 'চাক্‌মা' শব্দের সহিত অন্তত ১৫ রকম ভাষার শব্দের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। তিনি বহুবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার পরীক্ষক ছিলেন।

১৯০২ খৃঃ সতীশচন্দ্র পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটির উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। তথায় তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা ড্রইং প্রভৃতি সকল বিষয় কৃতিত্বের শিক্ষা দিতেন। রাঙ্গামাটিতে শিক্ষকতাবস্থায় সেখানকার চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্ত 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধাকারে বাহির হইলে তাঁহার কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর উৎসাহে তিনি ১৯১১ সনে ইংরেজীতে তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

সতীশচন্দ্রের প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া 'ইণ্ডিয়ান রিসার্চ সোসাইটী' তাঁহাকে ঐতিহাসিক শাখার বিশেষ সভ্য মনোনয়ন করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা পণ্ডিতসভা প্রত্নতত্ত্ববারিধি উপাধিতে ভূষিত করেন।

সাময়িক ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকাসমূহে 'চাকমা জাতি' উচ্চ-প্রশংসা পাইলে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এণ্ডার্সন রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় তাহার প্রশংসাপূর্ণ বিস্তৃত সমালোচনা করেন। তৎপর রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী সতীশচন্দ্রকে পৃথিবীর ত্রিশজন অবৈতনিক সদস্যের একজন সদস্য বলিয়া নির্ব্বাচন করেন ও আমেরিকার সোসাইটি অব আর্টস্‌ও তাঁহাকে অবৈতনিক সদস্য মনোনয়ন করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগও তাঁহাকে বৈদেশিক সহায়ক সদস্য করেন ও তাঁহাকে অন্যান্য জাতির তথ্যসংগ্রহের নিমিত্ত অনুরোধ করেন।

বিগত ৮ই কার্ত্তিক ৪৮বৎসর বয়সে স্বগ্রামে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধন—

শ্রীহট্ট হোম ইন্‌ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি 'জনশক্তি'তে প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে কুলাউড়ায় রিলিফ কমিটি সমূহের যে অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীহট্ট জিলার কৃষি এবং শিল্পের স্থায়ী উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, বন্যার আক্রমণে ফসল নষ্ট হইয়া যে অভাব অনটন হয় তাহার কথঞ্চিৎ উপশম করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি শ্রীহট্ট জেলার বিভিন্ন শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থার অনুসন্ধান করিয়াছেন।

সহর এবং বিশেষভাবে গ্রামবাসী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া নিজ অথবা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের শিল্পের অবস্থা কমিটিকে জানান তবে বিশেষ উপকার হয়। আমরা আশা করি জিলার বিভিন্ন স্থানে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধানক্রমে স্থানীয় শিল্পের অবস্থা আমাদিগকে জানাইবেন। ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে উত্তর পাওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের নামে উত্তর পাঠাইতে হইবে। Sylhet Home Industries Association নামে কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পে একটি স্থায়ী সমিতিও গঠিত হইয়াছে। শিল্পিগণকে পরামর্শদান ও অবস্থাবিশেষে অর্থসাহায্য করিয়া শিল্পের উন্নতিসাধন এ সমিতির উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ উক্ত সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সমিতি আশা করেন শ্রীহট্ট জিলার কুটীর-শিল্পের উন্নতি-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সমিতির সভ্য হইয়া নানাভাবে সাহায্য করিবেন। এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে একটি প্রশ্নপত্রও প্রচারিত করা হইয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলে দেশের কুটীর-শিল্পের উন্নতি হইবে আশা করা যায়।

এই এসোসিয়েশনের ঠিকানা—Sylhet Home Industries Association Sylhet.

আসাম বনবিভাগের উন্নতি—

আসামের বনবিভাগে পঞ্চবার্ষিক (১৯২৪-২৫ ইং হইতে ১৯২৮-২৯ইং) রিপোর্টে প্রকাশ, এই পাঁচ বৎসরে আসামের বনবিভাগের প্রভূত বিস্তৃতি লাভ ঘটিয়াছে। রিজার্ভ ফরেষ্টের আয়তন ২৯১ বর্গ মাইল বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কাঠের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় উহা বিশেষ লাভজনক হইয়াছে। এজন্য দ্বিতীয় একজন কনসারভেটার নিযুক্ত ও কর্মচারী সংখ্যা বাড়ান হইয়াছে। বনবিভাগের এই বিস্তৃতির দরুণ রাজস্বও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৭-২৮ ইংরাজীসনে রাজস্ব ৩৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায় ও তাহা হইতে ২১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। গত বৎসর এত টাকা রাজস্ব না হইলেও গত পাঁচ বৎসরে বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা গড়পড়তা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। গত পাঁচ বৎসরে কাঠের মিলগুলি আবার কার্য্যকরী হইয়া চা বাক্স ও প্যাকিং কেশ তৈয়ার করিতেছে। সুবিধা দরে কাঠ সরবরাহ করিয়া সরকারও এই এই শিল্পকে সাহায্য করিয়াছেন। ধুবড়ীতে একটি দেশলাইয়ের কল স্থাপিত হইয়াছে এবং কামরূপ জেলায় একটা কাঠের কল বসিয়াছে। এজন্য সিমুল কাঠের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কয় বৎসর শাল গাছ আপনা-আপনি খুব বাড়িয়াছে। শালের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য চেষ্টাও চলিতেছে। এই পাঁচ বৎসরে হাতীর খেদাও খুব বিস্তৃতভাবে চালান হইয়াছে, উহাও রাজস্ববৃদ্ধির অন্যতম কারণ। গত পাঁচ বৎসরে লাক্ষা চাষেও প্রায় ১,৮১,০১৮ টাকা শুল্ক পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়ে লাক্ষার চাষ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পল্লীযুবকগণের প্রশংসনীয় উদ্যম—

সাটিরপাড়া ঢাকা জিলার নরেন্দী পরগণার অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রাম। এই গ্রামে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। সম্প্রতি এই গ্রামের যুবকগণ পল্লীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে এবার পূজার ছুটিতে বিদেশগত যুবকগণ সমবেতভাবে নিজেদের অনুপ্রেরণা দ্বারা গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করেন। তাঁহারা সাটিরপাড়া পাব্লিক এসোসিয়েশনে এক নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত যথা—সাধারণ পাঠাগার, দরিদ্র ভাণ্ডার, এবং স্পোর্টিং ও নাট্যকলা বিভাগ। শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ রায় ও শচীন্দ্রনাথ রায় ও শচীন্দ্রভূষণ দত্ত উক্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটির প্রাণস্বরূপ। পূজার ছুটিতে উপরোক্ত সমিতির নবম বাৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে অনেকে গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তৃতাপ্রদান করেন। শ্রীযুত জিতেন্দ্রমোহন রায় তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে নারীহরণ, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের পন্থা নির্দ্দেশ করেন ও সুস্পষ্ট ভাষায় গ্রাম রক্ষীদলের উপকারিতা বুঝাইয়া দেন। বর্ত্তমানে পাব্লিক এসোসিয়েসন গ্রামস্থ বালকদিগের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইয়াছেন। শরীরচর্চ্চা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিয়মিত শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদের নিকট হইতে সামান্য বেতন লইয়া তাহাদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থাও এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে করা হইতেছে।

সাহিত্যচর্চ্চার উদ্দেশ্যে এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক "দীপ্তি" নামক একখানা হস্তলিখিত মাসিক প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকাখানি ভালই হইয়াছে।

ভদ্রকালী ব্রহ্মচর্য্য বালিকা আশ্রম ও বিদ্যালয়—

হুগলী জেলার ভদ্রকালী গ্রামে—প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, এই আশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে ৫০টি কুমারী আশ্রমের আদর্শ অনুসারে শিক্ষালাভ করিতেছে। আশ্রমে ৬টি বিভাগ আছে :—১টি পাঠ্যপুস্তক পাঠ বিভাগ, ১টি শিল্প বিভাগ, ১টি সঙ্গীত, ১টি ধর্ম্মশিক্ষা বিভাগ ও ১টি সেবা ও রন্ধনকার্য্য বিভাগ। এই ৬টি শিক্ষা বিভাগে তিনজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ৩জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন।

ভদ্রকালী বালিকা-আশ্রমের কুমারীগণকে এরূপ শিক্ষা দীক্ষায় গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ শিল্পশিক্ষায় বিশেষরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারে আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের তাহাই ঐকান্তিক চেষ্টা। যাহাতে মহিলারা শিল্পাদির দ্বারা নিজের সংসারের অভাব, অসুবিধার সময় স্বামীকে সাহায্য করিতে পারেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বিধবা হইলে পরের গলগ্রহ না হইয়া পুত্র-কন্যা লইয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপার্জ্জন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য।

এই আশ্রমে ৮ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কা বালিকাদিগকে গ্রহণ করা হয়। আশ্রমবিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগে নির্দ্দিষ্ট ৪ বৎসর শিক্ষার মধ্যে তাহাদের বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। আশ্রমে প্রত্যেক কুমারীকে নিজব্যয়স্বরূপ প্রতিমাসে ১০ টাকা করিয়া আশ্রমে অর্পণ করিতে হয় এবং ভর্ত্তি হইবার সময়ে কুমারীগণকে নিজ নিজ পরিধেয় বস্ত্র, শয্যাদ্রব্য ও আহারের জন্য তৈজসপত্রাদি সঙ্গে আনিতে হয়।

অনাথা দরিদ্রকুমারীদিগকে আশ্রম অবৈতনিকভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনাথা কুমারীগণের যাবতীয় ব্যয় আশ্রম বহন করেন। এই বিভাগে বৎসরে দুইটির অধিক কুমারী গ্রহণ করা হয় না। ইহাদের উন্নতির জন্য আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টিত থাকেন।

আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ রোগীর সেবা-গৃহ ও ধাত্রী-বিদ্যালয়ের জন্য আশ্রম-সংলগ্ন ভূমিতে তিন চারিখানি পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রোগীর সেবাগৃহ ও ধাত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যাহাতে দেশের সধবা এবং বয়স্কা কুমারীগণ জ্ঞানকরী শিক্ষা ও কুটীর-শিল্প শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই বিভাগে সেবা ও ধাত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করিয়া সমাজের মাতৃজাতির ও শিশুজনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তাহাই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। উক্ত সেবাগৃহ ও ধাত্রী বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণকার্য্যের জন্য অন্যূন ১০০০০৲ দশ হাজার টাকার প্রয়োজন। কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত টাকা সংগ্রহ করিতেছেন। যাহাতে উক্ত সেবাগৃহ ও ধাত্রীবিদ্যালয় শীঘ্র নির্ম্মিত হয় তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

কলিকাতায় ফরাসী টেনিস খেলোয়াড়—

এবার টেনিস কলিকাতায় একটু নূতন ধরণের সাড়া আনিয়া দিয়াছে। কলিকাতা সাউথ ক্লাবে অভ্যাগত ফরাসী খেলোয়াড়েরা সেদিন যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষীয় খেলোয়াড়-মহলে খুব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় দলও খেলার ভঙ্গী ও নিপুণতায় দর্শকদের বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দলে মদনমোহন ও মেটা পৃথিবীবিখ্যাত ফরাসীদলের বিপক্ষে যে দৃঢ়তার সহিত খেলা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় টেনিস খেলায় তাঁহাদের নাম অচিরকাল প্রতিষ্ঠালাভ হইবে; নবীন খেলোয়াড়েরা সেদিন মাঠে নিশ্চয়ই অভ্যাগতদের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

কলিকাতায় ফরাসী টেনিস খেলোয়াড়

বিখ্যাত ফরাসী টেনিস খেলোয়াড় এইচ. কশে

পি, লাঁত্রি

আর, মলেন

বিইরোঁ ও আর, সিং

মদনমোহন ও মেহ্‌তা

পি, লাঁড্রি ও আর, দয়াল
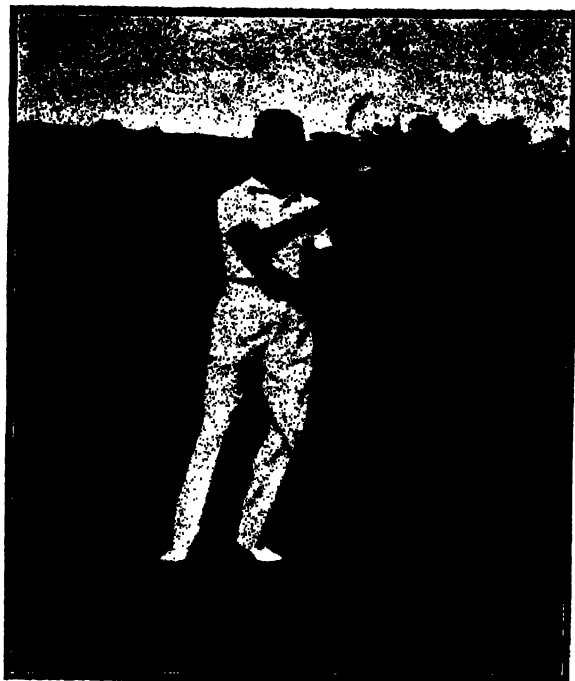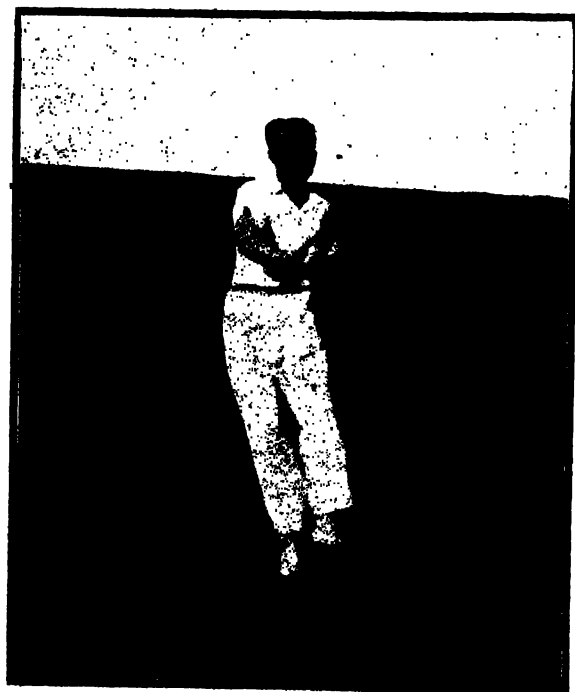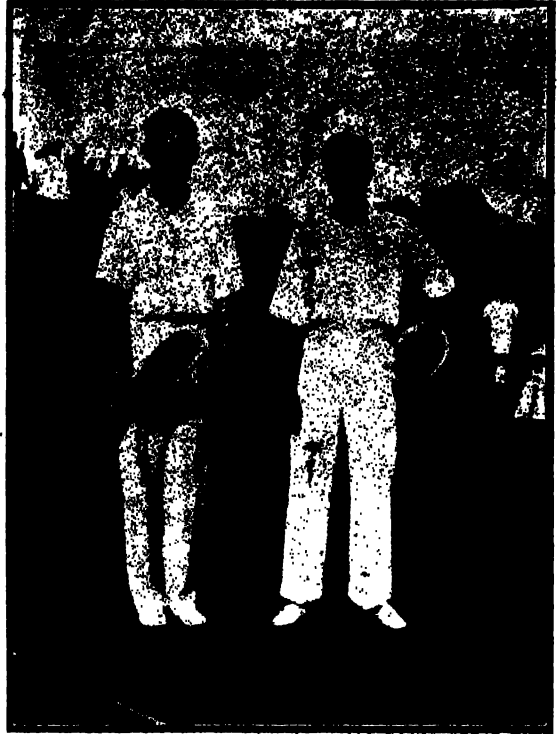
বর্ত্তমান বৎসরের নোবেল প্রাইজ—

সাহিত্য

১৯২৯ সালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যের জন্য জার্ম্মাণীর বিশিষ্ট গ্রন্থকার টমাস মান এই পুরস্কার পাইয়াছেন,

পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন

পদার্থবিদ্যার জন্য প্যারিসের ডাক্‌-দি ব্রোগালকে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। ইনি Undulating electrons আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৯২৯ সালের পুরস্কার ইনি পাইয়াছেন।

১৯২৮ সালের পদার্থবিদ্যার পুরস্কার অধ্যাপক ও, ডবলিউ, রিচার্ডসনকে দেওয়া হইয়াছে। ইনি লণ্ডনের কিংস্‌ কলেজের পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গবেষণার ডিরেক্টর।

১৯২৯ সালের জন্য নির্দ্দিষ্ট রসায়নের পুরস্কারটি দুইজনের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক আর্থার হার্ডেন এবং ষ্টকহলমের অধ্যাপক জন ইউলার—এই দুইজনে মিলিয়া রসায়নের পুরস্কারটি পাইয়াছেন।

(উপাসনা)

শুদ্ধিপত্র

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "ব্রহ্মদেশে বাঙালীর একটি কীর্ত্তি প্রবন্ধে ভুলক্রমে একজন দাতার নাম দানের তালিকায় দেওয়া হয় নাই। নিম্নে তাঁহার নাম দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার, উকিল, পিন্‌মানা (বর্ম্মা) ১,০০০৲ এক হাজার টাকা। শ্রীমৃণালবালা দেবী

এই সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৩৫০ পৃষ্ঠার পাদটীকার শেষে একটি ভুল আছে। "বিষ্ণুপুরের এক প্রাচীন মদনমোহন 'রণিআড়' গ্রামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ গৃহে এখনও পূর্ব্বকালের সাক্ষী হইয়া আছেন।"—এই অংশ হইতে "এক বৈদিক ব্রাহ্মণ গৃহে" কথাকয়টি বাদ যাইবে।
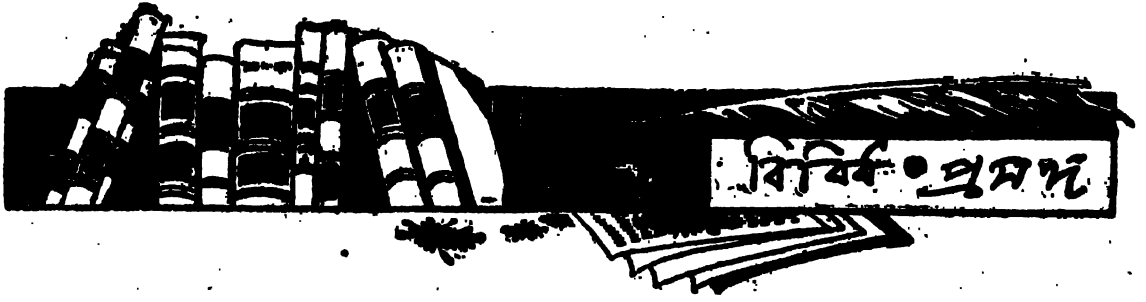
"সতীদাহ" নিবারণের শতবার্ষিক স্মৃতিসভা

খৃষ্টীয় ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আইন দ্বারা "সতীদাহ" প্রথা বন্ধ করা হয়। সেই শুভ দিন হইতে গত ৪ঠা ডিসেম্বর এক শত বৎসর অতীত হইয়াছে। সেই উপলক্ষ্যে ঐ তারিখে কলিকাতার এলবার্ট হলে একটি সভা হয়। তাহাতে বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার পরে আরও কয়েক জন বক্তৃতা করেন।

বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যত্র ঐ দিবস আর কোথাও সহমরণ অনুমরণ নিবারণ স্মরণার্থ সভা হইয়াছিল কি না, খবরের কাগজে তাহার কোন সংবাদ দেখি নাই।

এই প্রথা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কোন সময়েই প্রচলিত ছিল না। পঞ্জাবে "সতীদাহ" কচিৎ ঘটিত। দক্ষিণ-ভারতের সকলের চেয়ে সেকেলে অংশ মালাবারে ইহা নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশ, গঙ্গানদীর উপত্যকা, অযোধ্যা এবং রাজপুতানায় ইহা অধিক প্রচলিত ছিল। ১৮২৩ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সীতে ৫৭৫টি বিধবা স্বামীর চিতায় দগ্ধ হন; তন্মধ্যে কলিকাতার এলাকাতেই ৩১০ জন। ইঁহাদের মধ্যে ১০৯ জনের বয়স ৬০এর উপর, ২২৬ জনের ৪০ হইতে ৬০ বৎসর, ২০৮ জনের কুড়ি হইতে চল্লিশ এবং ৩২ জনের বয়স কুড়ির কম ছিল।

ভারতবর্ষের যে-সকল অঞ্চলে সহমরণ অনুমরণ বেশী প্রচলিত ছিল, সেখানেই ইহা নিবারণের জন্য নরনারী সকলেরই অধিক কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা দেশেও এই শুভ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি বেশী লোকে করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই প্রথা রহিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করা অন্ততঃ বঙ্গনারীদের উচিত ছিল। কিন্তু ৪ঠা ডিসেম্বরের সমগ্র ভারতের একমাত্র সভার স্থান এলবার্ট হলে সেদিন কেবল পাঁচটি নারী উপস্থিত ছিলেন, এবং তাহার মধ্যে শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এত অল্পসংখ্যক মহিলার উপস্থিতির কারণ কি বলিতে পারি না। সভাতে মহিলাদের উপস্থিতি যে বিশেষভাবে প্রার্থনীয় এবং তাঁহাদের জন্য পৃথক আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, হয় ত তাহা যথেষ্ট বিজ্ঞাপিত হয় নাই। কারণ যাহাই হউক, সর্ব্বত্র মহিলাদের সভা হওয়া উচিত। ৪ঠা ডিসেম্বর হয় নাই বলিয়া যে পরে হইতে পারে না, এমন নয়।

সহমরণ অনুমরণ প্রথা সম্বন্ধে ভারতীয়দের ও বিদেশীয়দের মধ্যে অনেকের দুই তিন প্রকারের ভ্রম আছে। বিদেশী অনেকে মনে করেন, ইহা কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল এবং ইহা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই কলঙ্ক। অন্য দিকে অনেক গোঁড়া হিন্দু মনে করেন, স্বামীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ স্বেচ্ছায় সহমরণ অনুমরণ কেবলমাত্র হিন্দুনারীই করিতেন, এবং তাহা কেবল হিন্দুসমাজেরই "গৌরব" (?)। উভয় ধারণাই ভ্রান্ত। তাহার প্রমাণ স্বরূপ নৃতত্ত্বের কয়েকটি তথ্য বিবৃত করিতে হইবে।

অতি পুরাকালে সব মহাদেশে সকলজাতীয় মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল, যে, মানুষের মৃত্যুর পরে পরলোকে সে যে-ভাবে জীবন যাপন করিবে, তাহা ইহলোকের জীবনের মতই। এই জন্য তাহার শবের সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় প্রোথিত করা হইত। অসভ্য মৃত শিকারী ও যোদ্ধা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ ও শিকারের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম দেওয়া হইত। মৃত স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাহাদের ঘরকন্নার জিনিষ এবং শিশুদের সঙ্গে খেলনা দেওয়া হইত। বর্ত্তমান কালেও খুব অসভ্য জাতিদের মধ্যে এই রূপ সব রীতি প্রচলিত আছে। মৃত ব্যক্তির

সহিত তাহার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার এবং অর্থ প্রোথিত করাও অসভ্য মানুষের একটি রীতি।

মৃত্যুর পর মানুষের কেবল যে জড় প্রাণহীন সম্পত্তিরই প্রয়োজন হয় তাহা নহে, জীবিত পশ্বাদি সম্পত্তিরও প্রয়োজন হয়, অসভ্য মানুষের বিশ্বাস এই রূপ। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন অসভ্য জাতির মধ্যে মৃতের সঙ্গে তাহার ঘোড়া, কুকুর, গরু, শূকর প্রভৃতি বধ বা সমাধিস্থ করার রীতি প্রচলিত দেখা যায়।

মৃতের পারলৌকিক জীবন ঐহিক জীবনেরই মত, এই বিশ্বাস হইতে এই সিদ্ধান্তও অসভ্যেরা করে, যে, তাহার যেমন খাদ্য পানীয় অস্ত্রশস্ত্র পরিচ্ছদ অলঙ্কার ও গৃহপালিত নানা জন্তুর আবশ্যক, তেমনি সহচর সহচরী ও ভৃত্যাদিরও প্রয়োজন। এই জন্য নানা মহাদেশ ও দেশে নানা অসভ্য জাতির মধ্যে পত্নী, দাস-দাসী (slaves), ভৃত্য এবং বন্ধুদের অনুমরণ বা বধের প্রথা দেখা যায়। মৃতের পরিচর্য্যা করিবার জন্য কোন কোন জাতি যুদ্ধে ধৃত বন্দীদিগকে বলি দেয়। কোন কোন অসভ্য নিগ্রো জাতি তাহাদের মৃত রাজার পত্নীদের সঙ্গে থাকিবার জন্য তাহাদের খোজাদেরও প্রাণবধ করে। সমুদ্রতটবর্ত্তী নিগ্রোরা রাজার বিশ্বাসী চাকরদিগকে বিষ প্রয়োগ বা শিরশ্ছেদ দ্বারা বধ করে। ফিজিতে, নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর, তাহার সাহচর্য্য করিবার নিমিত্ত তাহার প্রধান বন্ধুকে বলি দেওয়া হয়; অন্যত্রও এইরূপ প্রথার অস্তিত্বের প্রমাণ আছে।

মেক্সিকোতে প্রত্যেক মৃত বড়মানুষের পারিবারিক পুরোহিতকে হত্যা করা হইত। প্রাচীন জাপানেও এইরূপ জীবন্ত মানুষকে বলি দিবার রীতি ছিল।

স্বেচ্ছায় সহমরণের দৃষ্টান্ত নানাদেশে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে গুয়ারানী জাতির মধ্যে বিশ্বাসী অনুচরেরা তাহাদের প্রধানের সমাধিতে আত্মহত্যা করিত। পেরু দেশে মৃত রাজার স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় নিহত হইবার প্রস্তাব করিত, এবং কখন কখন এত অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক এইরূপে আত্মবলিদান করিতে প্রস্তুত হইত, যে, নূতন রাজাকে এই বলিয়া অনেকের আত্মহত্যা বন্ধ করিতে হইত, যে, অনেক নারী ইতিমধ্যেই গিয়াছেন, মৃত রাজার সেবার জন্য আর বেশী রাণীর দরকার নাই; অনেক বিধবা রাণী কবর প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পরলোকগত স্বামীর অধিকতর প্রশংসা লাভের জন্য নিজেদের দীর্ঘকেশপাশে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিত। চিব্‌চাদের মধ্যে অনেক বিধবা স্ত্রীলোক ও দাস-দাসী স্বেচ্ছায় মৃত ব্যক্তির কবরে প্রোথিত হইত। অতীত কালে টঙ্কিনে রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার দরবারের অনেক অমাত্য ও তাঁহাদের স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় তাঁহার কবরে জীবিত সমাধি লাভ করিতেন। য়োরুবানদের মধ্যে বড় লোকদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় তাঁহাদের বন্ধুরা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া তাঁহাদের সহিত সমাধিস্থ হন। পূর্ব্বে কঙ্গোদেশে রাজাকে যখন সমাধিস্থ করা হইত, তখন বারটি যুবতী কুমারী কবরে লাফ দিয়া পড়িয়া তাঁহার সহিত প্রোথিত হইত।

এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে চাহেন তাঁহারা হার্বার্ট স্পেন্সারের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, টেলরের আদিম মানব বিষয়ক গ্রন্থ প্রভৃতিতে তাহা পাইবেন। আর্য্য-জাতির সকল শাখার মধ্যে পুরাকালে সহমরণ অনুমরণ প্রথা বিদ্যমান ছিল।

ভারতবর্ষের সহমরণ অনুমরণ প্রথার সহিত অন্য অনেক দেশের ঐ প্রথার একটি এই প্রভেদ দেখা যায়, যে, এদেশে কেবল স্ত্রীলোকেরাই অনুমৃতা সহমৃতা হইতেন, অন্য অনেক দেশে পুরুষদিগকেও তাহা করিতে হইত। আমাদের দেশের যে-সব পুরুষ সহমৃতা অনুমৃতাদের প্রশংসা করেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি অন্ততঃ ২।১ জনও মৃতা স্ত্রীর সহিত সহমৃত বা অনুমৃত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রশংসার মূল্য বুঝা যাইত।

বস্তুতঃ ইহা একটি অতি অসভ্য ও নিষ্ঠুর প্রথা। যাঁহাদিগকে জোর করিয়া চিতায় চড়ান হইত, তাঁহাদিগকে ত অন্য নরহত্যার মত হত্যাই করা হইত। কিন্তু যে-সকল বিধবা স্বেচ্ছায় অনুমৃতা হইতেন, তাঁহারাও সামাজিক মতের প্রভাবে, লোকনিন্দার ভয়ে, স্বামীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ, বা অক্ষয় স্বর্গ-লাভের আশায়

যাহা করিতেন, তাহাও প্রশংসনীয় নহে। নারীর স্বতন্ত্র আত্মা, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনের আর কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই মনে করা গুরুতর ভ্রম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর যেমন স্বামী বাঁচিয়া থাকিয়া নিজের, পরিবারের, সমাজের, জাতির, দেশের, জগতের কল্যাণ করিতে পারেন, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীও সেইরূপ পারেন; এবং তাহাই করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা অনুমৃতা হইতেন, কেবল মাত্র তাঁহাদিগকে "সতী" আখ্যা দেওয়ায়, অগণিত পবিত্র-স্বভাবা সাধ্বী যে-সব বিধবা পতির মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া থাকিয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি পরোক্ষ ভাবে অবিচার করা হইয়াছে। শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া সোজা। শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইবার এখন কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু শাস্ত্র হইতেই প্রমাণ করা যায়, যে, সহমরণ অনুমরণ শাস্ত্রীয় নহে এবং শ্রেয়ের পথ নহে। ইহা বা ইহার মত অন্য কোন প্রথা শাস্ত্রীয় হইলেও তাহা বন্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

এত শত বৎসর পূর্ব্বে যে-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা প্রভূত মঙ্গলের কারণীভূত। বিনা আইনে এই নৃশংস বর্ব্বর প্রথা উঠিয়া গেলে আরও ভাল হইত। কিন্তু তাহা যখন সম্ভবপর হয় নাই, তখন আইন করা খুবই ঠিক্ হইয়াছিল। ইহার জন্য রাজা রামমোহন রায়, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং তাঁহাদের সমর্থকেরা চির-কৃতজ্ঞতাভাজন।

ভারতবর্ষে সহমরণ অনুমরণ প্রথা বন্ধ করেন সর্ব্ব প্রথমে পোর্ত্তুগীজ গবর্ণর আলবুকার্ক ১৫১০ সালে পোর্ত্তুগীজ-অধিকৃত অঞ্চলে। তাহার পর মুঘল সম্রাট আকবর সতীদাহ বলপূর্ব্বক করা বন্ধ করেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় সহমরণ অনুমরণ বন্ধ করেন নাই।

—

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন

শুধু হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে নহে, সকল ধর্ম্মেরই উচ্চ উপদেশের মধ্যে মিল আছে। কিন্তু বাহিরের অনেক ব্যাপারে গরমিল দেখিয়া লোকে বৈপরীত্য অনুমান করে। পরিহাসপ্রিয় লোকেরা বলে, মুসলমানীর উল্টা যাহা তাহাই হিন্দুয়ানী এবং হিন্দুয়ানীর যাহা উল্টা তাহাই মুসলমানী; কারণ হিন্দুরা পূর্ব্বমুখ হইয়া পূজা করে, মুসলমানরা পশ্চিমমুখ হইয়া নামাজ করে; হিন্দুদের লেখার পংক্তি বাম দিক হইতে দক্ষিণ-দিকে যায়, মুসলমানদের আরবী ফারসীর পংক্তি দক্ষিণ হইতে বামে যায়; ইত্যাদি।

কিন্তু রায় সাহেব হরবিলাস শারদা মহাশয় তাঁহার বাল্যবিবাহ নিরোধ বিলটিকে আইনে পরিণত করাইয়া গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যে অপূর্ব্ব মিলন সাধন করিয়াছেন! উভয়েই বলিতেছে, ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল! ইহা নিশ্চয়ই খুব অপূর্ব্ব আইন—ইহার পংক্তি-গুলি বোধ হয় জাপানী ধরণে উপর হইতে নীচের দিকে গিয়া শাণিত তীরের মত সংস্কৃত ও আরবী উভয় রকম লেখার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়াছে।

অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল, বলিতেছেন না, ইহা সুখের বিষয়; যদিও হিন্দুদের এমন "শাস্ত্র" আছে, যাহার অনুসরণ করিতে হইলে অল্পবয়স্কা বালিকাদের বিবাহ দিতেই হয়। কিন্তু অনেক দিন হইতেই বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হিন্দু ওরূপ "শাস্ত্র" অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন। মুসলমানদের কোন শাস্ত্রেই বাল্যে বিবাহ দিতেই হইবে, এমন কথা নাই। বস্তুতঃ মুসলমানদের বিবাহ একটি চুক্তি, ইহার মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। তথাপি কতকগুলি মুসলমান শারদা আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু অন্য অনেক মুসলমান এরূপ আন্দোলনের নিন্দা করিয়া আইনটির সমর্থন করিতেছেন।

১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে ভারতবর্ষে ১৫ ও তন্নিম্ন বয়সের অবিবাহিতা বালিকাদের সংখ্যা ছিল ৫,০৬,৮১,৪৭৭। এখনও মোটামুটি ঐ বয়সের অবিবাহিতা বালিকাদের সংখ্যা ঐরূপই হইবে; কয়েক লক্ষ বেশী হইতে পারে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে শারদা আইন জারী হইবে এবং ১৪ বৎসরের কম বয়সের মেয়েদের বিবাহ দেওয়া চলিবে না বলিয়া, কাগজে দেখিতে পাই, নানা প্রদেশের নানা স্থানের গোঁড়া লোকেরা

ছোট ছোট মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিতেছে। একটি কাগজে দেখিলাম বোম্বাই প্রদেশেই এইরূপ সাত হাজার বিবাহ হইবে। বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা দুই কোটি, সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ কোটি অর্থাৎ বোম্বাই প্রদেশের যোলগুণ। বোম্বাইয়ের মত সর্ব্বত্র যদি ১লা এপ্রিলের আগে বিবাহ দিবার তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায়, তাহা হইলে বোম্বাইয়ের যোলগুণ অর্থাৎ ৭০০০×১৬=১১২০০০টি ছোট ছোট বালিকার বিবাহ ১লা এপ্রিলের আগে হইয়া যাইবে। এই সংখ্যা এক লক্ষ বার হাজার না হইয়া যদি এক কোটিও হয়, তাহা হইলেও চারি কোটির উপর বালিকা সদ্য সদ্য বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্ব হইতে রক্ষা পাইবে। পরে যত বালিকা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা ত রক্ষা পাইবেই। রায় সাহেব হরবিলাস শারদা এবং ব্যবস্থাপক সভায় ও তাহার বাহিরে তাঁহার সমর্থকগণ এই অগণিত বালিকাদিগকে ঘোরতর অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এখন সকল বালিকার দৈহিক নৈতিক ও মানসিক সুশিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে এবং দেশের লোকদের নারীর সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে ও সাহস বৃদ্ধি পাইলে আইনটি সম্পূর্ণ সুফলপ্রদ হইবে।

—

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খুব মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য তাঁহার উত্তমরূপে জানা ছিল। তিনি ৪০ বৎসর কাল যোগ্যতার সহিত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাই বেশ লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থ সরস রচনায় পূর্ণ। তিনি অনেক বার সরকারী চাকরী পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না লইয়া বেসরকারী কলেজেই বরাবর কাজ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি অনেক শোক পাইয়াছিলেন। শেষ শোক পান তাঁহার একটি কন্যার ও স্ত্রীর মৃত্যুতে। তাহাতে অভিভূত হইয়া রোগে শয্যাশায়ী হন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

—

বাঙালী ডাক্তারের সম্মান

রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গে ম্যালেরিয়া বিনাশার্থ কেন্দ্রীয় কোঅপারেটিভ সভা স্থাপন করেন এবং তাহার শাখাস্বরূপ নানা স্থানে আরও সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই কল্যাণকর কাজের জন্ম তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে। এরূপ বড় কাজ এশিয়া মহাদেশে তিনিই প্রথম করিয়াছেন। এইজন্য বিলাতের রস্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ তাঁহাকে সম্মানিত ও যাবজ্জীবন সদস্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ম্যালেরিয়ার কারণ ও প্রতিকারের আবিষ্কারক বলিয়া পরিচিত ডাক্তার স্যার্ রোনাল্ড রসের সম্মানার্থ ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ-সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা হয়। যাঁহারা বিশেষ খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন, যে, ম্যালেরিয়ার সহিত মশার সম্পর্ক আবিষ্কারে গোপালবাবুর হাত ছিল।

—

সরোজনলিনী দত্ত মহিলা শিল্পবিদ্যালয়

কয়েক দিন হইল আমরা সরোজনলিনী দত্ত মহিলা শিল্পবিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে অনেকগুলি কুমারী সধবা ও বিধবা মহিলা নানা প্রকার গৃহশিল্প শিক্ষা করিতেছেন। নানা রকমের জামার কাট ছাট ও সেলাই, অন্যবিধ সূচিশিল্প, কাপড় গালিচা তোয়ালে নেয়ার প্রভৃতি বোনা, চুপড়ি ঝুড়ি প্রভৃতি নির্ম্মাণ, ইত্যাদি অনেক রকম কাজ এখানে শিখান হয়। এখানকার জিনিষের কাট্‌তিও বেশ আছে। অনেক ভদ্র পরিবারের নারীদেরও রোজগারের দরকার আছে। তাঁহারা এই প্রকার নানাবিধ গৃহশিল্প দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। যাঁহাদের পারিবারিক অবস্থা ভাল, তাঁহাদেরও নিজের কিছু টাকা থাকিলে স্বাধীনচিত্ততা ও আত্মসম্মান-বোধ বজায় থাকিবার ও বাড়িবার সুবিধা হয়। অর্থ

স্বয়ং অনর্থ নহে, তাহার অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহারই অনর্থ। সুতরাং উপার্জ্জনের চেষ্টা নরনারী কাহারও অনাবশ্যক বা মন্দ কাজ নহে।

এই বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষাও দেওয়া হয়।

—

নারীশিক্ষা সমিতি

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে নারীশিক্ষা সমিতির দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুরুচি দেবী সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন। শ্রীমতী হেমলতা দেবী স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং নারীদের উচ্চ অধিকার সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা বলেন। সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যাসাগর বাণীভবনের কোন কোন শিক্ষয়িত্রীও বক্তৃতা পাঠ করেন। একজন শিক্ষয়িত্রী ম্যাজিক লণ্ঠনের যে-সব ছবির সাহায্যে বাণীভবনের ও শিল্পবিদ্যালয়ের কাজ বুঝাইয়া দেন, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শেষে সভানেত্রী মহাশয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতাসহকারে সারবান্ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

নারীশিক্ষা সমিতির কর্ম্মিষ্ঠা পরিচালিকা শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহোদয়া যে বার্ষিক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, যে, ইহা কলিকাতায় ও মফঃস্বলে ৪০টি বালিকা-বিদ্যালয়, একটি হিন্দু বিধবাদিগের আশ্রম এবং কুটীরশিল্প শিক্ষা-দিবার জন্য একটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। শেষোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে দেখিতে গিয়া উভয়ের সুব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। শিল্পবিদ্যালয়ে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যগুলির বেশ কাটতি আছে। বিদ্যালয়ের কাজ ও পণ্যদ্রব্য সরবরাহের কাজ একত্র ভাল চলিতে পারে না বলিয়া সমিতির কর্তৃপক্ষ পণ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য একটি স্বতন্ত্র কোঅপারেটিভ সমিতি স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

—

শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ

রাঁচীনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশবাসী বাঙালীদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। রাঁচীতে দীর্ঘকাল যোগ্যতা ও সুখ্যাতির সহিত ওকালতী করিয়া তিনি অনেক বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন বিহারপ্রবাসী বাঙালীদের সম্মেলন হয়, তখন তিনি তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রদেশের বাঙালীদের প্রতিনিধিস্বরূপ একবার তথাকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ধর্ম্মবিষয়ে তিনি উদারমতাবলম্বী ও সকল সম্প্রদায়ের বন্ধু ছিলেন। পরোপকার তাঁহার প্রিয় কার্য্য ছিল।

—

বাংলাদেশে স্বরাজীদের দলাদলি

বাংলা দেশের স্বরাজ্য দল দুই বা ততোধিক উপদলে বিভক্ত। উপদলের সংখ্যা ঠিক্ জানি না। মতভেদ বা আদর্শভেদ ঘটিলে একটি দল একাধিক দলে বিভক্ত হওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু বঙ্গের স্বরাজীদের দলাদলি বোধ হয় মত বা আদর্শ লইয়া নহে। দলাদলির কারণ আমরা ঠিক্ জানি না। খবরের কাগজে উভয় পক্ষের লম্বা লম্বা চিঠি ও বর্ণনাপত্র বাহির হয় বটে; কিন্তু তাহা পড়িবার সময় পাই না, ইচ্ছাও হয় না। মোটামুটি দেখি, উভয় দলের কতকগুলি লোক কথা কাটাকাটি ও রূঢ় শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন এবং পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছেন। ইহা বড় লজ্জার বিষয়। এই ব্যাপার অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের লোককে বঙ্গের বাহির হইতে বিবাদ মিটাইবার জন্য আসিতে হয়, ইহাতে বাঙালীর মুখে চুণকালী পড়ে। বাহিরের লোকের মধ্যস্থতা করিতে আসা এই প্রথম নয়। এবারে কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ অন্ধ্রদেশের শ্রীযুক্ত পট্টাভি সীতারামায়া মহাশয়কে অনুসন্ধান ও বিবাদভঞ্জনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সুভাষবাবুর দল তাঁহাকে রূঢ় বাক্যবাণে আহত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বঙ্গে কংগ্রেসকে ইঁহাদের মত মসীলিপ্ত কেহ করেন নাই।

ব্যক্তিগত প্রাধান্য যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা বাঙালীর নেতা বলিয়া পরিচিত, এবং বাংলা দেশে তাঁহাদের অনুচরের অভাব হয় না, ইহা বঙ্গের কলঙ্ক।

—

বাঙালী ছাত্রদের সমিতি

বাঙালী ছাত্রদের সমিতি কয়টি, তাহাদের উদ্দেশ্য কি, এবং কে কে তাহার কর্ত্তা, কিছুই জানি না। জানিবার চেষ্টাও করি নাই। কারণ, বঙ্গীয় কংগ্রেসী স্বরাজীদের মত সমিতিওয়ালা বাঙালী ছাত্রেরাও বিবদমান একাধিক দলে বিভক্ত; এবং তাহার উপর আর এক উপসর্গ এই, যে, কংগ্রেসী দলগুলির কর্ত্তারা ছাত্রদিগকে পাকড়াও করিতে ব্যগ্র; যদিও মুখে প্রত্যেক কর্ত্তাই বলিতেছেন, ছাত্রদের সমিতি স্বতন্ত্র থাকা উচিত, এবং বঙ্গের রাষ্ট্রনেতাদের তাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

বাংলা দেশে বাঙালী পরিবারে আমাদের জন্ম, বঙ্গে বসতি, বাঙালী ছাত্র আমরা একসময়ে ছিলাম, এখনও তাহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকি। তাহাদের উৎসাহ এবং জনসেবার ইচ্ছা দেখিলে তাহা প্রশংসনীয় মনে করি। কিন্তু "ছাত্রশক্তি" জাগিয়াছে বলিয়া কোন প্রবন্ধ লিখি নাই; ছাত্রেরা ও তরুণেরা ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা, তাহারা একাধারে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর, জগৎকে ভারতকে অন্ততঃ বঙ্গকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ, ইত্যাকার তোষামোদ-বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে তিনি পয়সার কাজ আদায় করি নাই, করিবার দুরভিলাষও পোষণ করি নাই। সুতরাং উত্তেজনা-পূর্ণ শব্দবহুল গরম গরম বক্তৃতা দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টাও করি নাই। তাহাদের এবং তাহাদের নেতাদের বাক্যলোলুপতা ও উত্তেজনাপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সমিতিগুলির উদ্দেশ্য যে কি, তাহাও জানিবার চেষ্টা করি নাই। দু' একটি ছাত্র-সভা বার্ষিক অধিবেশনে ভ্রমক্রমে এই লেখককে সভাপতি করিয়াছিল। তাহাতে দেখিয়াছিলাম, বক্তৃতা অনেক হইল, কয়েক গণ্ডা প্রতিজ্ঞা ধার্য্য হইল, কিন্তু তাহার পর কাজ কি হইল; তাহার খবর এ পর্য্যন্ত পাই নাই।

আমরা বিদ্যার্থীদের সম্বন্ধে কতকগুলি সেকেলে মত পোষণ করি। তাহার মধ্যে প্রধান মতটি এই, যে, ছাত্র বা বিদ্যার্থী যত দিন ঐ নামে পরিচিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহার প্রধান কাজ হইবে বিদ্যা অর্জন, জ্ঞান লাভ, ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহারা যাহা হইবেন করিবেন তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া। ইহা শুধু বহি পড়িয়া করা যায় না। প্রকৃতির গ্রন্থও অধ্যয়ন করিতে হইবে, প্রকৃতির প্রভাব অনুভব করিতে হইবে, সমসাময়িক ঘটনাবলী ও প্রচেষ্টাসমূহের খবর রাখিতে হইবে, বিদ্যার্থীর প্রধান কাজ যাহা তাহা অবহেলা না করিয়া রাষ্ট্রিক ও সামাজিক নানাবিধ দেশের কাজও করিতে হইবে। কিন্তু ছাত্রদিগকে কোন বিষয়ে নেতৃত্বের অভিলাষ মাত্র হইতেও দূরে থাকিতে হইবে। "তরুণ" ও বিদ্যার্থীদের কর্ত্তব্য এক নহে। বিদ্যার্থী নহেন, ছাত্র নহেন, এরূপ যুবকের সামর্থ্য থাকিলে তিনি সম্পূর্ণরূপে কোন প্রকার লোক-হিতকর কাজে আপনার শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু যে যুবক বিদ্যার্থী, ছাত্র, তাঁহার তাহা করা উচিত হইবে না, এই জন্য, যে, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য অন্যবিধ। তিনি যদি অ-ছাত্র কোন যুবকের মত নিজের সম্পূর্ণ শক্তি কোন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কাজে নিয়োগ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তবে তাহা করা উচিত। বিদ্যার্থী নামটা রাখিব, বাপ-মায়ের টাকায় প্রতিপালিত হইব, কিন্তু শিক্ষক ও বাপ-মায়ের পরিবর্ত্তে কোন "জননায়কের" আজ্ঞা অনুসারে বিদ্যা অর্জ্জনটি ছাড়া আর সব নানা কাজ ও অকাজ করিয়া বেড়াইব, ইহা অসঙ্গত ও অনুচিত ব্যবহার।

"মশায়, তবে কি দেশের ডাক শুনিব না?"

অবশ্যই শুনিবেন—যদি তাহা অমুক চন্দ্র অমুকের, অমুক মোহন অমুকের, অমুক লাল অমুকের, অমুক নাথ অমুকের ডাক না হইয়া, বাস্তবিক দেশের ডাক হয়। দেশটা ত মাটির। তাহার উপর যে লোকগুলি বাস করে, তাহারাই দেশ। যাঁহারা দেশের ডাকের কথা বলেন, তাঁহারা স্ব স্ব মনকে, হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তুমি কয়জন সাধারণ লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া থাক, কয়জন নিরক্ষর লোককে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছ, কয়জন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোককে অন্ন জুটাইয়া দিয়াছ, কয় জন রুগ্ন লোকের চিকিৎসা সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত

করিয়া দিয়াছ, কয়জনকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখাইয়াছ, কয়জন বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, গৃহহীনকে আশ্রয় জোগাড় করিয়া দিয়াছ, কয়জন অত্যাচরিতা নারীকে রক্ষা করিয়াছ এবং অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছ, দেশ-শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কয়জন লোককে রাষ্ট্রনীতির জ্ঞান দিতে চেষ্টা করিয়াছ, সরকারী কর্তৃপক্ষের পুলিসের ভূস্বামীর ধনিকের অত্যাচার হইতে দরিদ্রদিগকে বাঁচাইবার কি উপায় করিয়াছ ?"

পতাকা ঘাড়ে করিয়া "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" বলিয়া চীৎকার করিলে এবং ভীড় করিয়া উত্তেজক বক্তৃতা শুনিলেই দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া হয় না।

দেশে যদি সত্য-সত্যই সরক্তপাত বা রক্তপাতহীন স্বাধীনতা-সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ছাত্র অছাত্র সমর্থ বয়সের অনেক মানুষকে তাহাতে যোগ দিতে হইতে পারে। কিন্তু তাহার কোন পূর্ব্বলক্ষণ দেখিতেছি না। এখন ইংরেজরা চালবাজী দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টা দেখিতেছেন, দেশের অধিকাংশ নেতাও হয় ভিক্ষাবৃত্তি নয় চালবাজী দ্বারা দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। বিদ্যার্থীদের এখন হইতেই তাঁহাদের প্রধান কাজ ছাড়িয়া দেওয়া হুজুক ভিন্ন আর কিছু নয়।

—

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক"

আজকাল পতাকায় ও মুখে-যে-সব জাদুমন্ত্র লিখিত ও উচ্চারিত হয়, "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" তাহার মধ্যে একটি। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্রিক, ধার্ম্মিক, সামাজিক ও আর্থিক বিপ্লব অনেক দেশে একাধিক বার হইয়াছে। ভারতবর্ষেও হইয়া গিয়াছে। হয় ত আবার হইবে। নানাদিকে কতকগুলি গুরুতর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আমরা তদ্রূপ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। কিন্তু পরিবর্ত্তনগুলি ক্রমে ক্রমে হইবে, না হঠাৎ বৈপ্লবিক উপায়ে হইবে, কেহ বলিতে পারে না। যাঁহারা বৈপ্লবিক উপায়ে পরিবর্ত্তন চান, তাঁহারা "বিপ্লব হউক" বলিবার অধিকারী। কিন্তু "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" কথাগুলির মানে কি ? এই যে রব বা চীৎকার, ইহার উদ্ভব "রাজা দীর্ঘজীবী হউন" (Long live the King !) এই ধ্বনির সহিত পাল্লা দিবার জন্য হইয়াছে। রাজার দীর্ঘজীবন কেহ প্রার্থনা করিলে তাহার প্রার্থনার মানে এই, যে, রাজা বাঁচিয়া থাকিয়া রাজধর্ম্মপালনরূপ তাঁহার নিত্যকর্ম্ম করিতে থাকুন। "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" প্রার্থনারও মানে ঐ রকমই হইবার কথা। তাহা হইলে যাঁহারা বিপ্লবের দীর্ঘজীবন কামনা করেন, তাঁহারা চান, যে, বিপ্লবের যে ধর্ম্ম গুরুতর পরিবর্ত্তন অতি শীঘ্র সংঘটন, তাহা নিত্যই চলিতে থাকুক; অর্থাৎ রাষ্ট্রে, সমাজে প্রভৃতিতে চরকীর মত ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতে থাক্! তাহা হইলে রাষ্ট্র আদিতে কোন দিন সকাল ৬টার সময় যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহা ৭ টার সময় যদি বদলাইয়া যায়, কিংবা যদি দুদিন বা ২ মাস বা ২ বৎসর পরেও বদলাইয়া যায়, তবে তাহার শুভ (বা অশুভ) ফলের পরীক্ষা কখন্ হইবে, শুভ ফল ভোগ কে, কখন্, করিবে ?

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" প্রার্থনাটির এইরূপ অর্থের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকায় যুগপৎ হাস্য ও আতঙ্কের উদ্রেক হয়।

—

শ্রীযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশে বাঙালীর জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠাকার্য্যে শ্রীযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী ছিলেন। তিনি ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯০৬ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত ইহার পরিচালক ছিলেন। তিনি পরিশ্রমী ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন বলিয়া এই কোম্পানীটির উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

—

শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্র। তিনি বেদজ্ঞ ও আর্য্যসমাজের অন্যতম নেতা এবং উদ্যোগী কর্ম্মী ছিলেন। ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহাতে কলিকাতার আর্য্যসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল।

—

অহিংস অসহযোগ ও কংগ্রেস

কংগ্রেস এখন পূরা অসহযোগীদের হাতে নাই; বহুদিন হইল স্বরাজীদের হস্তগত হইয়াছে। স্বরাজীরা কৌন্সিলগামী, এবং আইনজীবী স্বরাজীরা আদালতে আইনের ব্যবসাও করেন। কিন্তু তাঁহারা এবং তাঁহাদের অধিকৃত কংগ্রেস অসহযোগ ছাড়িলেও অহিংস ভাবটা (অন্ততঃ কথায়) বোধ করি ছাড়িয়া দেন নাই। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে কংগ্রেসে যোদ্ধবেশের এত আমদানী ও প্রাবল্য কেন? কলিকাতা কংগ্রেসে জেনারাল অফিসার কম্যাণ্ডিং ছিলেন এবং কর্ণেল মেজর ক্যাপ্টেন লেফটেন্যাণ্ট প্রভৃতি বিস্তর ছিলেন। লাহোরেও সেইরূপ সব আয়োজন চলিতেছে। কাগজে দেখিতেছি, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে "বীরোচিত সম্মান দেখান হইবে। শাদা ঘোড়ায় টানা একটি সুসজ্জিত গাড়ীতে চড়াইয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইবে। জি ও সি অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবক-দলের অধিনায়কের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকগণ শোভাযাত্রা করিবে। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাগণ পুরোবর্ত্তী থাকিবেন।" শেষোক্ত ব্যবস্থাটা কি "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ" নীতির অনুসরণ? "কুড়িজন ঘোড়সওয়ার খোলা তলোয়ার হাতে এবং এক শ জন ঘোড়সওয়ার স্বেচ্ছাসেবক আগে আগে যাইবেন।"

জাঁকজমক আবশ্যক হইতে পারে—যদিও তাহার আয়োজন করায় মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষকে দোষ দিয়াছিলেন। কিন্তু অসামরিক রকমের জাঁকজমক করা যায় না কি?

সম্ভবতঃ কংগ্রেসকর্তৃপক্ষ দংশন হইতে নিবৃত্ত থাকিলেও ফোঁস করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই।

কলিকাতা কংগ্রেসের আয়ব্যয়

গত কলিকাতা কংগ্রেসকে আলাদা করিয়া ধরিলে তাহার ৩৬৪৪১৮/০ ঘাটতি পড়িয়াছিল। তাহার প্রদর্শনীতে ৪৮১১৫৫৵৬ লাভ হইয়াছিল। উভয় হিসাব একত্র করিয়া মোট ১১৭৩৪০/৮ উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ৬৮৩১৭ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তা ছাড়া ১৩৫৮৫।০/৬ রক্ষী ও ভলাণ্টীয়ারদিগকে প্রদত্ত বলিয়া আলাদা হিসাব দেখান হইয়াছে। সভাপতির শোভাযাত্রার খরচ ৫৫৮৩৶৬ হইয়াছিল। "জি ও সি" সুভাষচন্দ্র বসুর মোটর কারের ব্যয় হইয়াছিল ২৮৪৩৷৶৬ এবং তাঁহার অশ্বারোহী দলের খরচ ৩৪১৭০/৯। ব্যাণ্ডমাষ্টার অর্থাৎ সঙ্গীতসর্দ্দারের পোষাক ও অন্যান্য ব্যয় হইয়াছিল ২৯৬০ টাকা। "নেতারা" থিয়েটার রোডের যে বাড়ীতে ছিলেন, তাহা ১০৯৫৲ ব্যয়ে মেরামত করা হয় এবং ইম্পীরিয়াল রেস্তরাঁতে তাঁহাদের ভোজ্যের বিল হইয়াছিল ৬৮৮০।০। যাঁহারা বিলাতী খানাপীনার ভক্ত এটা কেবল তাঁহাদের জন্য। দেশী ভোজ্যপানীয়ের ভক্তদের ব্যয় স্বতন্ত্র। নেতাদের ক্যাম্প খরচা ১১৭৫৪৶৬ দেখান হইয়াছে। ইহার মধ্যে কি কি দফা আছে? "নেতারা" কেবল রাষ্ট্রনীতিবিশারদ নহেন, ভোজনদক্ষও বটেন দেখিতেছি। "নেতা" কয়জন ছিলেন, যে, এক সপ্তাহে প্রায় সাত হাজার টাকার কেবল বিলাতী ভোজ্য-পানীয়ই উদরস্থ করিলেন? ইঁহারা "দরিদ্রনারায়ণের" প্রকৃত সেবক বটে!

কংগ্রেসের বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধানাদিতে খরচ হইয়াছিল ১২৪২৮০ টাকা।

নেপালের মহারাজা

নেপালের প্রধানমন্ত্রীই দেশের সব বিষয়ে কর্ত্তা, রাজা সাক্ষী গোপাল। প্রধান মন্ত্রীকে মহারাজা বলা হয়। ভূতপূর্ব্ব মহারাজা চন্দ্র শমশের জঙ্গ রাণা বাহাদুর শিক্ষিত দেশহিতৈষী পুরুষ ছিলেন। তিনি নেপালে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী, আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালী, বৈদ্যুতিক আলোক, রেলওয়ে প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুকৌশলে সতীদাহ প্রথাও রহিত করেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি নেপালে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ। ইহার জন্য রাজকোষের অনেক টাকা এবং তাঁহার নিজের অনেক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। লীগ অব্‌ নেশুন্সে ভারত গবর্ণেমেণ্টের এক ইংরেজ প্রতিনিধি বলেন, যে, মহারাজা চন্দ্র শমশের লীগের প্রভাবে ইহা করিয়াছেন।

মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে ইহার প্রতিবাদ করা হয় এবং ভ্রম দেখান হয়। শেষে ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হয়, যে, নেপালে দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ মহারাজা চন্দ্র শমশের জঙ্গ নিজেই করিয়াছেন, কাহারও প্রভাবে নহে। অতএব এই মহৎ কীর্ত্তির সম্পূর্ণ প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য।

—

অশ্লীল বহির কাটতি

সংকারের ভৃত্যদের মতে যাহা রাজদ্রোহব্যঞ্জক, এরূপ একখানা ইস্তাহারও নিষ্কৃতি পায় না, বহি ত দূরের কথা। কিন্তু অশ্লীল খবরের কাগজ ও বহির কাটতি বাড়িয়া চলিয়াছে। একখানা মাসিক কাগজকে অশ্লীলতার অপরাধে জরিমানা করা হইয়াছিল; তাহার যে-সব প্রবন্ধ অশ্লীল বলা হইয়াছিল তাহা তাই বটে কিনা, জানিনা, কারণ তাহা পড়ি নাই। কিন্তু সেই কাগজেই এবং অন্য কোন কোন কাগজেও যে-সব অশ্লীল গল্প ও উপন্যাস হইতে অতি অভদ্র কথা সমালোচনার্থ উদ্ধৃত হয় বলিয়া শুনিয়াছি, এবং অল্পস্বল্প দেখিয়াছি, সেরকম একটা গল্প বা বহির প্রকাশক বা লেখকের নামে মোকদ্দমা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। রাজদ্রোহব্যঞ্জক কোন কিছু বাজেয়াপ্ত না করিলে বিদ্রোহ হইত না, নিশ্চিত; কিন্তু অশ্লীল লেখার অবাধ প্রচারে সামাজিক ক্ষতি নিঃসন্দেহ হইতেছে।

—

নরনারীর চারিত্রিক আদর্শ

গত মাসে মাদ্রাজে মহিলাদের একটি সম্মেলন হয়। তাহাতে সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক কতকগুলি সমস্যার আলোচনা হইয়াছিল। মহিলারা এই একটি প্রস্তাব ধার্য্য করেন, যে, পুরুষ ও নারীর চরিত্রের আদর্শ ও মানদণ্ড এক ও সমান হইবে। এই প্রস্তাবটির অর্থ বুঝা কঠিন নহে; কিন্তু ইহার প্রয়োগ দুই রকম হইতে পারে। যেরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত, বলিতেছি। নারীদের চরিত্রের যেরূপ পবিত্রতা সমাজ দাবী করেন, পুরুষদের চরিত্রের ঠিক্ সেইরূপ পবিত্রতা দাবী করা সঙ্গত। কিন্তু কেহ যদি বলেন, পুরুষরা অনেকে যত প্রকার অপকর্ম্ম করিয়া থাকে নারীদিগকেও তাহা করিতে দেওয়া উচিত, পুরুষরা যাহা করিলে তাহার পাতিত্য ঘটে না, নারী তাহা করিলে তাহারও পাতিত্য ঘটিবে না, তাহা হইলে বিবেচক সমাজহিতৈষী লোক মাত্রেই তাহাতে আপত্তি করিবেন। মন্দ কাজ করিবার যত "স্বাধীনতা," উচ্ছৃঙ্খল হইবার যত "সুবিধা" পুরুষদের আছে, নারীদেরও তাহা থাকা উচিত, এরূপ প্রস্তাবে কখনও রাজী হওয়া যাইতে পারে না। নারীদের জন্য চারিত্রিক পবিত্রতার মানদণ্ড যাহা আছে তাহা বজায় থাকুক, এবং পুরুষদের ব্যবহার ও চরিত্রের বিচার তদনুসারেই হউক, ইহাই সুসঙ্গত ও সমীচীন প্রস্তাব।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা বুঝা কঠিন নহে। তথাপি তাহা বিশদ করিবার নিমিত্ত একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। নিম্নলিখিত সংবাদটি অনেক খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে।—

সাত বৎসর বয়সের সময় রেণুকাবালা দাসীর উপেন্দ্রনাথ দাস নামক এক চব্বিশ বৎসরের যুবার বিবাহ হয়। উপেন্দ্রর এই শিশুপত্নীকে ভাল লাগে নাই। সে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকের সহিত বাস করিতে থাকে। এখন তাহার পত্নী রেণুকাবালার বয়স উনিশ। তিনি তাঁহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু স্বামী তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিতে রাজী হয় নাই। রেণুকাবালার পতি-পরিত্যক্তা অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কালীপদ দাস নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে কুপথে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিতেছে ও তাঁহাকে উত্যক্ত করিতেছে। রেণুকা তাহাতে রাজী হন নাই, এবং অনন্যোপায় হইয়া তিনি আলিপুর পুলিশ কোর্টের আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা এই, যে, আদালত কালীপদর দুরভিসন্ধি হইতে, দরকার হইলে পুলিশের সাহায্য দিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করুন। আদালত পুলিশকে অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছেন। রেণুকাবালার অপর এই প্রার্থনা আছে, যে, তাঁহাকে নার্সের (শুশ্রূষাকারিণীর) কাজ শিখিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে তিনি সদুপায়ে জীবিকা অর্জন করিতে সমর্থ হন।

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন কিংবা কোন সুপরিচালিত বিধবাশ্রম বা অবলাশ্রম তাঁহার এই সুবিধা করিয়া দিলে ভাল হয়।

এই সংবাদটিতে পত্নী রেণুকাবালার ব্যবহারের সহিত স্বামী উপেন্দ্রনাথের ব্যবহারের আকাশপাতাল প্রভেদ। কোন সমাজহিতৈষী ব্যক্তি এরূপক্ষেত্রে রেণুকাবালাকে উপেন্দ্রর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া স্ত্রীপুরুষের সাম্য সাধন করিতে বলিবেন না।

মাদ্রাজের মহিলা-সম্মেলনে এইরূপ মতও গৃহীত হয়, যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র থাকিতে পারিবেন, এবং বিবাহবিচ্ছেদে উভয়ের সমান অধিকার থাকিবে। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার অবশ্য সমান হওয়া উচিত। কিন্তু কি কি কারণে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহা বিশেষ চিন্তা ও বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ

বলা যায় না। কিরূপ কারণে ও অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইলে স্বামীর বা স্ত্রীর বা উভয়ের আবার বিবাহ করিবার অধিকার থাকা উচিত, তাহাও বলা সহজ নয়। দুশ্চরিত্র স্বামীর ঘর করিতে কোন নারীকে বাধ্য করা উচিত নয়। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে, এমন কি কখন কখন সচ্চরিত্রা স্ত্রীকেও, স্বামীরা ত্যাগ করিয়াই থাকে। পুরুষেরা হীন আদর্শ অনুসারে কাজ করে। কিন্তু কোন নারী যদি স্বামীকে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁহার গৃহ ত্যাগ করেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আবার বিবাহ করিতে চাহিবেন না।

—

ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলন

নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রকাশ করিতে আমরা অনুরুদ্ধ হইয়াছি।

আগামী সরস্বতী পূজার সময়, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯ই মাঘ রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া, তিন দিন দক্ষিণ কলিকাতাবাসিগণের উদ্যোগে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হইবে। সম্মেলনের সুব্যবস্থার জন্য এক অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মেলনের এই অধিবেশনের সাধারণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন মহোদয়গণ যথাক্রমে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীমতী কামিনী রায়, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিজয় মজুমদার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়গণ সহকারী সভাপতি হইয়াছেন।

এই সম্মেলনের সহিত হস্তলিপি, কারুশিল্প, চিত্র, মুদ্রণ এবং সাহিত্য সম্বন্ধীয় নানা নিদর্শনের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে।

অভ্যর্থনা-সমিতি সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধগুলির প্রকৃত আলোচনা সম্ভবপর করার জন্য সম্মেলনের অধিবেশনের পূর্ব্বেই সম্মেলনে পঠিতব্য প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। সুতরাং আগামী পৌষ মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে লেখকদিগের প্রবন্ধ বা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার অভ্যর্থনা-সমিতির হস্তগত হইলে কার্য্যের সুবিধা হয়। বাঙালী সুধীবৃন্দের এই সম্মেলনের সাফল্যের জন্য ইহাতে যোগদান করা প্রয়োজন।

এই সম্মেলনের যাবতীয় সংবাদাদি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ সম্পাদকগণের নিকট ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশনের কার্য্য সম্পাদনের জন্য সাধারণ সভাপতি এবং এক এক বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচন যাঁহাদিগকে করা হইয়াছে, তাঁহাদের দ্বারা এই সকল কাজ উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। এই সম্মেলনে সাহিত্যানুরাগী সকলেরই যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

—

একটি বলিষ্ঠ যুবকের কথা

"আশুতোষ কলেজ ম্যাগাজিনে" ব্যায়ামদক্ষ ও বলিষ্ঠ দিগেন্দ্রচন্দ্র দে নামক একটি যুবকের যে বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে, তাহাতে অত্যাচরিতা অনেকগুলি নারীর তিনি উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ইনি নিজের সাহস ও শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

কলেজে আই এস সি পড়িবার সময় দিগেন নারীরক্ষা-সমিতির সাহচর্য্যে যে-সমস্ত কার্য্য করিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহ সহর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে নিভৃত একটা পল্লীতে ভুটমণি দাসী নাম্নী জনৈকা হিন্দুরমণীকে কতকগুলি দুর্ব্বৃত্তের কবল হইতে উদ্ধার করিতে যাইয়া সে প্রায় ২৫ জন অস্ত্রধারী দুর্ব্বৃত্তের দ্বারা আক্রান্ত হয়। দিগেনের বীরত্বে অনতিকাল বিলম্বে তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সে পরে স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিয়া সেই দুর্ব্বৃত্তদিগকে আদালতের সাহায্যে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিল।

জয়কিশোরী নাম্নী জনৈকা তীর্থযাত্রীকে কতকগুলি পাষণ্ড রাস্তা হইতে অপহরণ করিয়াছিল। দিগেন তাহার কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে সেই তীর্থের স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহারা দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে সেই স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিতে যাইয়া প্রায় ৫০ জন দস্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। আনন্দের বিষয়, এই ক্ষেত্রেও দস্যুগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে ও পরে শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নীরদাসুন্দরী দেবী, অহল্যা দাসী, সৌদামিনী ঘোষ, সুমতী দেবী প্রভৃতি প্রায় ১৫।১৬ জন নির্য্যাতিতা অসহায়া বঙ্গললনাকে সে উদ্ধার করিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের ঘটনাই অতীব লোমহর্ষক। ইহাতে আমরা দিগেনের প্রচুর সৎ সাহসের পরিচয় পাইতেছি। এই কার্য্য করিতে যাইয়া তাহাকে কোন কোন জমিদার ও হিন্দু মুসলমান দস্যুদের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল এবং তাহারা উহার প্রাণনাশের জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করে নাই। একদিন দিগেন বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকিলে, গভীর রাত্রে দুর্ব্বৃত্তগণ উহার বাড়ী ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিল।

—

শান্তিনিকেতনে যুযুৎসুশিক্ষক

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একজন জাপানী নিপুণ যুযুৎসুশিক্ষক আনাইয়াছেন। গতমাসে তথাকার খেলার মাঠে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। কবি তাঁহাকে বেদীর উপর নিজের পাশে বসাইয়া সম্মানিত করেন। তাহার পর তিনি যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—

ভয় মানুষকে হীন করে। নিজেকে হীন মনে করিলে কোন মহৎ কাজই সাধ্য হয় না। যে বিদ্যা জানা থাকিলে দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সর্ব্বদা নির্ভয়ে চলা যায়, যাহার প্রয়োগে অতর্কিত আক্রমণের সঙ্কট মুহূর্ত্তে দুর্ব্বল ব্যক্তিও সবল শত্রুকে বেকায়দায় ফেলিয়া কাবু করিতে পারে, যুযুৎসু সেই কৌশলী বিদ্যা। আমি বহু আয়াসে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আমাদের দেশে এই বিদ্যা প্রবর্ত্তনে অগ্রসর হইয়াছি। সকলকে সব সময় আমি নির্ভীক দেখিতে চাই। জাপানে যুযুৎসু শিক্ষার ৬টি গ্রেড আছে। সেখানে ৩।৪ গ্রেডের শিক্ষার্থীই অধিক। ৫ গ্রেড ছাড়াইয়াছেন এমন লোক খুব কম। সমগ্র জাপানে ৬ গ্রেডের যুযুৎসু মাত্র দুই তিনটি মিলে। আমাদের এই অধ্যাপক পাঁচ গ্রেড পার হইয়াছেন। এরূপ উপযুক্ত লোক জাপানেও দুর্লভ। জাপানে গিয়া যে বন্ধুর বাড়ীতে আমি অতিথি হইয়াছিলাম, তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় ইঁহার আগমন সম্ভব হইয়াছে। ইনি এখানে দুই বছর বাস করিবেন। আশা করি আমার প্রিয় ছাত্রবৃন্দ যথাসাধ্য প্রযত্নে ইঁহার নিকট হইতে যুযুৎসু বিদ্যা আয়ত্ত করিবেন।" (বঙ্গবাণী)

—

"রামমোহন রায় ও রাজারাম"

অন্যত্র ১৩০০ সনের "ভারতী" হইতে শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইল। তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ৪২ বৎসর পূর্ব্বে, আমেরিকা হইতে উহা চিঠির আকারে তাঁহার কোন আত্মীয়কে লিখিয়াছিলেন। উহা হইতে রাজারামের প্রকৃত পরিচয় জানা যাইবে। রাজারাম রামমোহনের পালিত পুত্র ছিলেন, উভয়ের মধ্যে কোন রক্ত-সম্পর্ক ছিল না। যে সিভিলিয়ানের নিকট হইতে রামমোহন রায় রাজারামকে পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম ডিগ্‌বী, ডিক্‌ নহে। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠিতে লিখিত তথ্যগুলি দ্বারা ব্রজেন্দ্রবাবুর লিখিত "রামমোহন রায় ও রাজারাম" প্রবন্ধের কোন কোন অনুমান খণ্ডিত হইতেছে। তাঁহার প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরে লিখিব।

যাঁহারা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অখ্যাতি-কর কোন অনুমান প্রকাশের জন্য প্রবাসীর সম্পাদকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এই সম্পাদক পত্রিকাসম্পাদনরীতি সম্বন্ধে একমত নহে। সত্যনির্ণয়ই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত; এবং সত্যনির্ণয় করিতে হইলে অনেক অপ্রীতিকর এবং হয়ত ভবিষ্যতে অসত্য বলিয়া যাহা প্রমাণ হইবে এরূপ অনেক কথারও আলোচনা করিতে হয়। ব্রজেন্দ্রবাবু রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের সরকারী কাগজপত্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তাহা মডার্ণ রিভিয়ুর পাঠকেরা অবগত আছেন। তাঁহার এতদ্বিষয়ক ইংরেজী অনেক প্রবন্ধ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। গত মাসের প্রবাসীতে মুদ্রিত তাঁহার প্রবন্ধটি মুদ্রিত করায় অন্ততঃ এই একটি সুফল হইয়াছে, যে, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত মোহিনীবাবুর প্রবন্ধটি আবার সর্ব্বসাধারণের গোচর হইল। ঐ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পর ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত রামমোহন রায়ের জীবনচরিতের কয়েকটি সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। অথচ তিনি এই প্রবন্ধটির অস্তিত্ব সম্ভবতঃ না জানায় উহা ব্যবহার করেন নাই। বহুঅনুসন্ধানপরায়ণ ব্রজেন্দ্র-বাবুও ইহার বিষয় অবগত ছিলেন না।

—

লাহোরে জাতীয় সপ্তাহ

লাহোরে বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেস ছাড়া চল্লিশটির অধিক কন্‌ফারেন্স হইবে। তাহাতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হয়, যে, রাষ্ট্রনীতিই ভারতবর্ষের সব লোকের একমাত্র চিন্তার বিষয় নহে।

একই সময়ে একই সহরে এতগুলি কন্‌ফারেন্স হইলে সর্ব্বসাধারণ কোনটিতেই ভাল করিয়া মন দিতে পারিবে না। কিন্তু লোকে সহরের খুব বেশী ব্যবসার জায়গাতেই যেমন নূতন দোকান খুলে, তেমনি কোন একটা কাজ উপলক্ষ্যে যেখানে খুব বেশী লোকের সমাগম হয়, সেখানেই সকলে নিজের কথা জানাইতে চায়। তা ছাড়া, সমস্ত দেশের আফিস আদালত স্কুল কলেজাদির কতকটা লম্বা ছুটি একই সময়ে বৎসরে বেশী বার হয় না। বড়-দিনের সময় এইরূপ একটা ছুটী হয় এবং শীতের সময় ভ্রমণের কষ্টও একদিক্ দিয়া কম। এই-সব কারণে ডিসেম্বরের শেষে যেখানে কংগ্রেস হয়, সেখানে কন্‌ফারেন্সও অনেক হয়। যাঁহার যেটির প্রতি মনের ঝোঁক বেশী, যিনি যেটিকে সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী মনে করেন, তিনি তাহার অধিবেশনগুলিতেই বেশী করিয়া যোগ দিতে পারেন।

—

"রাষ্ট্রভাষা"র সম্মান

মহাত্মা গান্ধীর এবং আরও অনেকের হিন্দীকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করিবার দিকে খুব বেশী ঝোঁক

আছে। তদনুসারে নেহরু কমিটির রিপোর্টেও হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষার পদ দেওয়া হইয়াছে। গান্ধীজি এই-রূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন, যে, দেশের কংগ্রেস আদি সভায় যতদিন কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী ভাষায় সব কাজ না হইবে, ততদিন দেশ স্বাধীন হইবে না। এই কথা এখন আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা অন্য একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করিতে চাই। তাহার সহিত পরোক্ষ সম্পর্ক থাকায় উপরের কথাগুলি লিখিলাম।

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি গান্ধীজির স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত জবাহরলাল নেহরু একটি ইংরেজী বহি ছাপাইয়া-ছেন। তাহার নাম "কন্যাকে লিখিত তাহার পিতার কয়েকটি চিঠি" ("Letters from a Father to his Daughter")। ইহা পৃথিবীর সেকালের কথা। বহি-খানি মন্দ নয়। ইহা লেখক ১৯২৮ সালে তাঁহার দশ বৎসর বয়সের কন্যা ইন্দিরাকে লিখিয়াছিলেন। পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন, "চিঠিগুলির ভাষা ইংরেজী হওয়ায়, অল্পসংখ্যক বালিকারই চিত্ত আকর্ষণ করিবে। ইহা সম্পূর্ণ আমার দোষ। আমি এখন ইহার প্রতিকার করিতে পারি কেবল একটি অনুবাদ প্রস্তুত করাইয়া। একটি হিন্দী অনুবাদ প্রস্তুত করা হইতেছে, এবং কোন বিঘ্ন না ঘটিলে তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।"

পণ্ডিত জবাহরলালকে আমরা জানি, তাঁহার কন্যাটিকেও জানি। জেনিভায় তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দিরাকে প্রথম দেখি। সমালোচনার ভাবে কিছু লিখিতে চাই না। কিন্তু শ্রীযুক্ত জবাহরলাল নেহরু নিশ্চয়ই জানেন, যে, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিতে হইলে শুধু সভাসমিতিতে হিন্দী বলিলে চলিবে না—তাহা তিনি বলেন—কিন্তু ইংরেজীজানা লোকদিগকে উহা প্রাণের জিনিষ করিতে হইবে। যাঁহারা হিন্দীভাষী তাঁহাদের জন্য এই কথা বলিতেছি, বাঙালীর জন্য নহে। কারণ, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হউক বা না-হউক, এরূপ বিখ্যাত বাঙালী অধুনা কেহ নাই (আগেও সম্ভবতঃ ছিলেন না) যিনি দশ বৎসরের বা তার চেয়ে বড় কন্যাকে ইংরেজীতে চিঠি লিখিয়া তাহা বহি করিয়া বাহির করিয়া তাহার বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন স্বীকার প্রকাশ্য ভাবে করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ, অনেক অবাঙালী ভারতীয় ইহা বাঙালীদের একটা দোষ মনে করেন, যে, তাহারা অবাঙালীদের সাক্ষাতেও পরস্পর ইংরেজী না বলিয়া বাংলা বলেন। এটা আমাদের রোগ বটে।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মিঃ ডব্লিউ সি বোনার্জির) চেয়ে আর কোন বাঙালী বেশী "সাহেব" বনিয়া যান নাই। কিন্তু তিনিও একবার হিন্দুস্থান রিভিয়ুতে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ শেষ করিয়াছিলেন বাংলা অক্ষরে

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"

এই ছত্রটি লিখিয়া। এলাহাবাদে ১৮৯২ সালের কংগ্রেসে তিনি সভাপতি ছিলেন। তাহার বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে "প্রস্পারাস্ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া"র লেখক ডিগবী সাহেবের টাকাকড়ি ব্যয় ঘটিত একটি আলোচনা হয়। প্রতিনিধিরূপে তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। আলোচনা অবশ্য ইংরেজীতে হইতেছিল। উহা শেষ হইয়া গেলে বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় বাংলাতে এই মর্ম্মের কথা বলিলেন, "এই সামান্য ব্যাপারটা যদি উড়িয়ে দিতে না পারব, তা হ'লে বৃথায় এত দিন ব্যারিষ্টারী করেছি।"

পণ্ডিত জবাহরলাল কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। কাশ্মীরের সঙ্গে বেশী যোগ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের কাশ্মীরীদের নাই। তথাকার সেকেলে কাশ্মীরীরা বেশী পরিমাণে ফারসীউদ্দ্‌ নবীস ও মুসলমানভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহার পরবর্ত্তী পুরুষের লোক যাঁহারা, তাঁহারা একটু বেশী ইংরেজীভাবাপন্ন। সব দিক্ দিয় স্বদেশীভাবাপন্ন ও হিন্দির অনুরাগী হইতে তাঁহাদের বিলম্ব হইতে পারে। ইহার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া চলে না।

কিন্তু ইহা বলা দরকার, যে, হিন্দুস্থানীভাষীরা যদিও তাঁহাদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চান, এবং তজ্জন্য সভাসমিতিতে ইংরেজাতে কেহ কিছু বলিলে "হিন্দী" "হিন্দী" বলিয়া চীৎকার করেন, তথাপি ইহাও সত্য, যে, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের খুব বিখ্যাত, খুব শিক্ষিত, খুব বুদ্ধিমান অনেক লোক হিন্দী লেখেন না। হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি না হইবার ইহা একটা প্রধান কারণ। বাঙালীদের অন্য অনেক দোষ থাকিলেও এই দোষটি তাহাদিগকে দেওয়া যায় না।

সম্প্রতি বোম্বাই হইতে "ভারতের নারী" (Women of India) নামক একখানি বহি বাহির হইয়াছে। উহাতে প্রধানতঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নারীদের কথা লিখিত হইয়াছে। উহার নামকরণ ঠিক্ হয় নাই। কিন্তু বহিখানি ভাল। উহার এক জায়গায় শ্রীমতী মিঠন চোক্সী নাম্নী এক বিদুষী পার্সী মহিলা সাহেবিয়ানাগ্রস্ত কোন কোন বাঙালীর সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন, যে, তাঁহারা স্বপ্নও দেখিতেন ইংরেজীতে, বাংলায় নয়। এরূপ বাঙালী কেহ যদি কখন ছিল, তাহা হইলে তাহাদিগকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসা অবশ্যই করা চলে। কিন্তু সেটা করা পার্সী সম্প্রদায়ের কাহারও উচিত নয়। কেন না, উহাদের বিস্তর পুরুষজাতীয় ব্যক্তি খুব বেশী ফিরিঙ্গিয়ানাগ্রস্ত এবং

তাহাদের মধ্যে অনেকের নাম পুরুষানুক্রমে রেজিমনি, কুপার, কার্পেণ্টার, ডক্টর, মাষ্টার, মরিস ইত্যাদি।

ইংরেজী ভাষার ব্যবহার ও বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে গত মাসের প্রবাসীতেও প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্রলেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হ'ত।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শাসনের একটি দৃষ্টান্ত কোন কোন পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কোন আত্মীয় একবার ইংরেজীতে তাঁহাকে একখানি চিঠি লেখেন। চিঠি খুলিয়া যেমন দেখিলেন যে সেটি ইংরেজীতে লেখা, অমনি না পড়িয়াই সে চিঠিখানি ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন।

শুনিতে পাই, পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর স্বাজাতিকতার দিকে অনেক পরিবর্ত্তনের কারণ তাঁহার পুত্র জবাহরলালের প্রভাব। এই নজীর অনুসারে জবাহরলালের কন্যা কল্যাণীয়া ইন্দিরার প্রভাবে তাঁহারও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কল্যাণীয়া ইন্দিরা অতঃপর তাঁহার পিতার ইংরেজীতে লেখা কোন চিঠি পাইলে বলুন না, "বাবা, হিন্দীতে না লিখ্‌লে তোমার চিঠি পড়্‌ব না!"

—

স্কচ্ পার্ব্বণ

পূজাপার্ব্বণের দিন হিন্দুরা উপবাস দেন, আবার ভূরিভোজন আমোদপ্রমোদও করেন। স্কচ্‌রা যখন রোমান কাথলিক ছিলেন, তখন কি করিতেন জানি না, কিন্তু সুসংস্কৃত প্রটেষ্টাণ্ট হওয়ার পর হইতে পূজাপার্ব্বণে উপবাস তাঁহারা বড় একটা করেন বলিয়া মনে হয় না। সেণ্ট এণ্ড্রু তাঁহাদের জাতির রক্ষক সাধুপুরুষ। ভারতবর্ষপ্রবাসী স্কচরা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ প্রতিবৎসর নবেম্বরের শেষে সভা করিয়া খুব ভূরিভোজন করেন ও মদ্যপান করেন। খানাপীনায় তাঁহাদের জাতিগুরু খুব নিপুণ ছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু চেলাদের ব্যবহারে ত মনে হয়, ছিলেন।

এই বার্ষিক ভোজসভায় তাঁহারা ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও কিছু বলিয়া থাকেন। কলিকাতায় লাটসাহেব, স্কচ হউন বা না হউন, সভাপতি হইয়া থাকেন। তিনিও রাজনৈতিক বক্তৃতা করেন। এবারকার কলিকাতার ভোজে স্কচ্ তরফের প্রধান বক্তা ছিলেন সাংবাদিক ব্রেয়ার সাহেব। সভাপতি ছিলেন বঙ্গের লাট। তাঁহাদের কাহারও বক্তৃতার বিস্তৃত সমালোচনা করিব না। দু একটা কথা বলিব।

আজকাল ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ দিবার কথা চলিতেছে। সেই প্রসঙ্গে ব্রেয়ার সাহেব বলেন:—

"It is, as Lord Reading has recently pointed out, a partnership; and the terms of a partnership cannot be varied by either party at will and without reference to the other; nor it is feasible for the junior to dictate to the senior, or to grab the entire assets of the firm. These facts are apt to be neglected in the turmoil of controversy and in the impatient quest after an ideal which has nev[illegible] been realized anywhere on land or sea. Bu[illegible] govern the situation and they cannot be [illegible] ignored."

ব্রিটিশ জাতি অর্থাৎ ইংরেজ ও স্কচরা এদেশে [illegible] যারা টাকা রোজগার করিবার জন্যই প্রথমে আসি[illegible]। সুতরাং ভারতবর্ষ তাহাদের হস্তগত হইবার পর [illegible] সব কাজ চালানটাকে একটা কারবার বলিয়া বর্ণ[illegible] ঠিকই হইয়াছে। কারণ, আর্থিক লাভটাই এখনও প্রধান উদ্দেশ্য বটে।

ব্রেয়ার বলিতেছেন, এই কারবারের অংশী দুজন, ব্রিটেন আর ভারতবর্ষ। ব্রিটেন হচ্ছে জ্যেষ্ঠ, ভারত কনিষ্ঠ। এই গুরুলঘু ভেদনির্ণয় কি নিয়ম অনুসারে হইল? সত্য, ব্রিটেন এখন ক্ষমতার ও রোজগারের প্রায় সবটা দখল করিয়া আছে, এবং জোর যার মুল্লুক তার কথাটাও ধর্ম্মনীতি হিসাবে না হইলেও তথ্য হিসাবে ঠিক্। কিন্তু ইহাও ঠিক্, যে, ব্রিটিশজাতির ভ[illegible] আগমনের পূর্ব্বে, এমন কি মিশ্র "ব্রিটিশ" জা[illegible] পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ ভারতবাসীদের ছিল, [illegible] প্রভুত্ব যেই করুক, পরিশ্রমটা বেশীর ভাগ [illegible] করে। সুতরাং অংশ ও অংশীর কথা যদি [illegible] হইলে বলিব, ভারতবর্ষই বড় অংশী। কিন্তু [illegible] ভাগাভাগিটাতেই আপত্তি।

মনে করুন, যদি একদল অতি সাধুপ্রকৃতি [illegible] পরহিতব্রতী লোক কোন গৃহস্থের ঘরবাড়ী, জমীজমা তাহার নিদ্রার তন্দ্রার বা মূর্চ্ছার নেশার সময় [illegible] কল্যাণার্থ দখল করিয়া বসে, এবং যদি [illegible] প্রকৃতিস্থ হইবার পরে নিজের ঘরের [illegible] হইতে চায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সাধুসম্প্র[illegible] চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারে, "ওহে, [illegible] এটা ভাগের কারবার এবং আমরাই [illegible] আমাদের বেদখল করবার চেষ্টা কোরো না। [illegible] অবস্থাচক্র আমরাই ঘুরাই?"

ব্রিটিশ জাতি যারা সৃষ্ট ফ্যাক্টস্ যে বর্ত সিচুয়েশনটা গভর্ণ করে, এবং তাহাদিগকে নিরাপদে (সেফ্‌লি) ইগ্নোর করা যায় না, তাহা অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না, ইহা ঠিক্। কেন না, নিত্য সিদীশনের মামলায় ও কারা তাহার স্মারকলিপি জাজল্যমান। কিন্তু

সাহেবের বক্তৃতায় একটা গবেষণার বিষয় ছিল, ব্রিটিশে-ভারতীয়ে রেষারেষি কেন হইল এবং কিরূপে তাহার প্রতিকার হইতে পারে। তাঁহার বক্তৃতা হইতে যে-অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেরূপ অসঙ্গত স্মারক কথায় প্রতিকার হইবে মনে করি না।

[illegible] ব্রিটিশ জাতির এবং তাহার ভারতপ্রবাসী [illegible] অস্বীকার করি না—এমন অদ্ভুত কাজ [illegible] করিব? কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও [illegible] তবাসীদের ভারতবর্ষের মালিক হওয়া [illegible] রা তাহা হইবে।

[illegible] সাহেব বলেন, "কনিষ্ঠ অংশী" ভারতবর্ষ [illegible] সম্পত্তি গ্রাস করিতে চায় এবং তাঁহার [illegible] অন্যায়। আমরা বলি, ভারতীয়েরা ইংরেজদের [illegible] ন সম্পত্তিই লইতে চায় না, যদিও ইংরেজরা [illegible] বর্ষের যাহা ইতিমধ্যেই লইয়াছে তাহা [illegible] কিছুই অন্যায় হইত না। ভারতীয়েরা [illegible]। ইংরেজদের নহে এবং ইংরেজরা যাহার [illegible] যথা—ভারতবর্ষের মাটি, ভারতবর্ষের [illegible] শস্যাদি দ্রব্য, ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া [illegible] ও তাহার ব্যবহার, ভারতবর্ষের পর্ব্বত [illegible] ভারতবর্ষের ভূগর্ভে নিহিত নানাবিধ পাথর [illegible] তেল গ্যাস দ্রব্য, ভারতবর্ষের সন্নিহিত সমুদ্র [illegible] তাহার ব্যবহার, এবং ভারতবর্ষের আকাশ। [illegible] ইংরেজরা যে-সব কারখানা ও কল স্থাপন [illegible] টাকায় করিয়াছে, তাহা ভারতীয়েরা চায় না, [illegible] দের টাকা তাহাদের কতটুকু সে বিষয়ে [illegible] বার আছে। কারণ, ইংরেজরা এদেশে [illegible] কোম্পানীর আমলের বহু বৎসর [illegible], আনে নাই। তাহাদের মূলধন ভারতবর্ষ হইতেই সংগৃহীত; তাহাই সুদে ও ব্যবসায়ে খাটিয়া স্ফীত হইয়া [illegible] আমদানী ব্রিটিশ মূলধন বলিয়া গর্ব্বে বুক [illegible] চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় লোকদের নিকট [illegible] ঋণের আকারে সংগৃহীত টাকায় যে-সব সরকারী [illegible], কারখানা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা [illegible] ভারতীয়েরা চায়; কারণ সেগুলি নিশ্চয়ই [illegible]

[illegible] সাহেব বলেন, আমরা যাহা চাহিতেছি সেরূপ স্বপ্ন নাকি স্থলে জলে আকাশে কোথাও বাস্তবে পরিণত হয় নাই। তাঁহার এই বহুমূল্য উক্তিটি তিনি তাঁহার ক্যাশ বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখুন, অসময়ে কাজে লাগিবে। আমরা সমসাময়িক ও অতীত ইতিহাস কিছু পড়িয়াছি। তাহাতে দেখা যাইতেছে, যে-দেশে যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে বা ঐতিহাসিক কোন যুগে আগন্তুকরূপে স্থায়ী আড্ডা গাড়িয়া বাস করে, তাহারা শীঘ্র বা বিলম্বে সে দেশের মালিক ও শাসন-কর্ত্তা হয়ই হয়। যাহারা বিদেশে রোজগারের জন্য আসিয়া আগুন্তুক হইয়া স্বদেশে চলিয়া যায়, তাহারা ঐ বিদেশের স্থায়ী হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা কখনও হয় না। এবং ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশ মনুষ্যেরা যে ঐজাতীয় জীব, তাহা ত তিনি নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলিতে নিজেই বলিয়াছেন:—

"We have been called 'birds of passage'. Let us examine the accusation and see where it takes us. Putting aside Government officials—who of course have always been altruists to a man—what is the aim and object of the average Britisher who comes out to India to engage in trade, in commerce, or in one of the professions? Isn't it generally to make as much money as he can in the shortest time possible, and then to make tracks for home at such a pace that you can't see him for the dust?"

ব্রেয়ার সাহেব ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশ রাজভৃত্যদের প্রত্যেককে পরার্থপর বলিয়াছেন!!! ব্যঙ্গ নয় ত?

আমাদের একটা মস্ত ভুল হইয়াছে। খানা পীনার পর সাহেবলোক বাচাল হইয়া যদি প্রলাপ বকে, গম্ভীর ভাবে তাহার আলোচনা করা অনুচিত ও অসঙ্গত।

—

সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজে বঙ্গের লাটের বক্তৃতা

বঙ্গের গবর্ণর সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজে তাঁহার বক্তৃতায় "methods of agitation based upon suspicion, mistrust and racial hatred" কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতীয়েরা কেহই ইংরেজদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে না, বলিতে পারি না। কিন্তু ইংরেজদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যাঁহারা আন্দোলন করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান অনেক লোকে ইংরেজবিদ্বেষ পোষণ করেন না। অপ্রধান অনেকেও করে না, যেমন আমরা। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, প্রধান ও অপ্রধান কর্ম্মিষ্ঠ ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলকগণ সাধারণতঃ ইংরেজদিগকে সন্দেহ করে ও তাহাদের কথায় অবিশ্বাস করে। হাজার হাজার বক্তৃতা ও ঘোষণা-পত্র দ্বারা এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস বিদূরিত হইতে পারে না—হইতে পারে কেবল ইংরেজ রাজ-পুরুষেরা কথা অনুসারে কাজ করিলে।

লাটসাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—

"Whilst ready to regard generously any orderly and legitimate expression of political feeling, they (the Government) must also be prepared to meet any emergency which in any way threatens to

disturb or interfere with the performance of the peaceful avocations of the inhabitants of this Presidency."

রাজপুরুষদের বক্তৃতায় ও ঘোষণাপত্রে 'অর্ডারলী', 'লেজিটিমেট', প্রভৃতি কথার ব্যবহার দেখিলে আমাদের হাসি পায়। রাজনৈতিক মত ও ভাবের প্রকাশ বৈধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার অবিরোধী হইতেছে কি না, তাহার বিচার ত কোন কালে তৃতীয় কোন পক্ষ দ্বারা হয় না। আইন করেন গবর্মেণ্টের লোক, তাহার ব্যাখ্যা করেন গবর্মেণ্টের লোক এবং তাহার প্রয়োগও করেন গবর্মেণ্টের লোক। সুতরাং এসব কথা বলা না-বলা সমান।

লাটসাহেব যে ভয় দেখাইয়াছেন, তাহাও বৃথা। কারণ, উহা বাহুল্য মাত্র। শাসনকর্তাদের অসুবিধা ও ক্ষতি হইলেই তাঁহারা, যাহারা তাহা ঘটায়, তাহাদিগকে বরাবরই শাস্তি দিয়া থাকেন। দেশের লোকেরা শান্তিতে নিজের নিজের কাজ করে এবং তাহাতে কেহ বাধা না দেয়, তাহা ত আমরাও চাই। কিন্তু যথেষ্ট কাজ কোথায় যে দেশের সব লোকে তাহা করিবে? দেশের অবস্থা এরূপ হইয়াছে, যে, অধিকাংশ লোকের নির্ভর চাষের জমীর উপর। কিন্তু তাহাদের সকলের জমী নাই; যাহাদের আছে তাহাদের অনেকের যথেষ্ট নাই এবং তাহাও আধুনিক উন্নততম প্রণালীতে চাষ করা হয় না। চাষীরা বৎসরের অধিকাংশ সময় দ্বিতীয় কোন পেশা না থাকায় অলস বেকার থাকে। তাহার একটা কারণ, দেশী পণ্যশিল্পের বিনাশ। প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা বিস্তর কলমবাজ ও জিহ্বাবাজ লোক প্রস্তুত হইতেছে যাহারা পূরা বেকার বা আধা বেকার থাকিতেছে। সকলের শান্তিপূর্ণ ভাবে করিবার কাজ নাই বলিয়া দেশের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিতে এমন পরিবর্তন ঘটান দরকার যাহাতে, সবাই না হউক, অধিকাংশ লোকে কাজ পাইতে পারে। বর্তমান রাষ্ট্রীয় বিধির পরিবর্তন করিতে হইলে তাহার সবটা কিম্বা কতকটা ভাঙিতে হইবে। তাহাতে যদি ধূলা উড়ে, গোলমাল হয়, অসোয়াস্তি ঘটে—উপায় কি? নিজেরাও কিছু করিব না, অন্যেরা আবেদন-নিবেদনে হায়রান হইয়া স্বয়ং কিছু করিতে চাহিলে চোখ রাঙাইব, ইহা সঙ্গত নহে। ব্রিটিশজাতি, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট, ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা যদি প্রয়োজনানুরূপ কোন উপায় অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে নিরস্ত্রভাবে আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে। দেশ প্রস্তুত হইতে যদি বিলম্ব থাকে, কিছু বিলম্বে হইবে; কিন্তু কাহারও ধমকে বিলম্বে হইবে মনে করা ভুল। দুঃখ সহ্য করিবার লোক এখন দেশে বাড়িয়া চলিয়াছে। কি প্রণালীতে কি প্রকারে কাজ করিয়া দুঃখ সহ্য করিলে প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে পারে এবং দেশে সম্পূর্ণ জাতীয় প্রভুত্ব স্থাপিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত হইলে দুঃখকে বরণ করিবার লোকের অভাব হইবে না।

—

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

বরিশালের জমিদার শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এরূপ অকালমৃত্যু অত্যন্ত শোকাবহ। দুই বৎসর পূর্বে দেবকুমার বাবুর পত্নী ও জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যু হয়। তাহাতে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়ে। তিনি পদ্যে ও গদ্যে সুলেখক ছিলেন এবং দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনেক প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

—

বাঙালী বিমানচালক

বাঙালী যুবকেরা বিমানচালকের কাজে অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ব্বে দুইজন বাঙালী বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে শিক্ষা পাইয়া বিমানচালকের সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম জে পি গাঙ্গুলী ও এন এন সরকার। সম্প্রতি আর একজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। তাঁহার নাম বি কে দাস।

ইঁহাদের পূরা বাংলা নামগুলি খবরের কাগজে বাহির হইলে ভাল হইত।

ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ। এখানে বিমানে যাতায়াত এবং ডাক ও মাল বহনের যথেষ্ট প্রয়োজন ও অবসর আছে। সুতরাং অচিরে বিমানের ব্যবহার বাড়িবে। তখন বিদেশ হইতে চালক আমদানী না করিয়া এই সকল শিক্ষিত যুবকদিগকে কাজ দিলে সুখের বিষয় হইবে।

—

বড়লাটের সহিত নেতাদের সাক্ষাৎকার

২৩শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু বড়লাটের সহিত দেখা করিবেন, এই সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। এরূপ অনুমানও প্রকাশিত হইয়াছে, যে, বড়লাটের ঘোষণা, নৈতাদের সর্ত্তচতুষ্টয় এবং গোলটেবিলের বৈঠক সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইবে। পার্লেমেণ্টে প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিব ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দান সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই, বড়লাট নিশ্চয়ই তাহা দিতে পারিবেন না।

কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতে পারেন, যে, শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের বিরোধী দলের। আরও বেশী গোলমাল করিবে বলিয়া প্রধান মন্ত্রী ও ভারতসচিব প্রকাশ্যভাবে কিছু প্রতিশ্রুতি দিতেছেন না বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের আছে। কিন্তু তাঁহাদের মনের কথা যাহাই হউক, প্রকাশ্য কোন প্রতিশ্রুতি না পাইলে নেতারা স্বয়ং বড়লাটকে কোন কথা দিতে পারিবেন না, এবং কংগ্রেসকেও থামাইয়া রাখিতে পারিবেন না। গোপন রাখিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া বড়লাটের কোন কথা গান্ধীজি ও মোতিলালজিকে বলা বৃথা হইবে। কারণ, তাঁহারা স্বয়ং সন্তুষ্ট হইলেই হইবে না, কংগ্রেসের বিশ্বাস উৎপাদন ও কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করাও আবশ্যক হইবে।

বড়লাট হয়ত রাজবন্দীদের খালাস দেওয়া সম্বন্ধে কিছু কথা দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা খালাস পাইলেও, ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন করিবার বিধি ব্যবস্থা করাই যদি গোলবৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে তাহাতে যোগ দিতে কংগ্রেসনেতারা পারিবেন না।

—

চীনে আবার গৃহবিবাদ

চীনে আবার অন্তর্যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এবং বিদেশীরা নিজ নিজ ধনপ্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে।

মডার্ণ রিভিয়ুর ডিসেম্বর সংখ্যায় চীনরাষ্ট্রবিপ্লবের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক সান্ য়াট্-সেনের বিধবা পত্নী সুং চিং-লিংএর সহিত চীনের বর্ত্তমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের অন্যতম নেতা টাই চি-টাওএর যে কথোপকথন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, যে, সান্ য়াট্-সেন যে-ভাবে সাধারণতন্ত্র চালাইতে চাহিয়াছিলেন, টাই চি-টাও প্রভৃতি সেভাবে চালাইতেছেন না, এবং সেই জন্য তিনি তাঁহাদের বিরোধী। শ্রীমতী সুং চি-লিং-এর মতে বর্ত্তমান দলপতিরা নিজেদের সুখসুবিধা দেখিতেছেন, দেশের দরিদ্র লোকদের দুঃখের প্রতি দৃষ্টি দিতেছেন না। এ অবস্থায় অসন্তোষ ও গৃহবিবাদ অনিবার্য্য। তাহার উপর, চীনে শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-সব বিদেশীর প্রভাব ও লাভ কমিবে, ভিতরে ভিতরে তাহাদের উস্কানিও থাকা সম্ভব।

—

ব্যবস্থাপক সভায় নারীহরণ সম্বন্ধে আলোচনা

শুনা যাইতেছে, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী বাংলা দেশে নারীহরণ ও নারীনিগ্রহের আধিক্যের কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন। তিনি এবিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিতে চাহিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইহা সদস্যদের প্রশ্ন করিবার অধিকারের অপব্যবহার, অতএব কৌন্সিল-কার্য্যবিধির ২৭ ধারা অনুসারে প্রশ্নগুলি অগ্রাহ্য হইল।" প্রশ্নগুলি না দেখায় বলিতে পারিলাম না, সেগুলি অসঙ্গত কিনা। নারীনিগ্রহ সম্পর্কে গবন্মেণ্টের উদাসীনতায় দেশের লোক অসন্তুষ্ট হইয়া আছে। এবং, দেশের লোক সন্তুষ্ট হউক বা না হউক, নারীদের সম্মান সতীত্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও প্রাণ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রশ্নগুলির ভাষাগত কোন ত্রুটির জন্য যদি সেগুলি নামঞ্জুর হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তব্যচ্যুতির একটি কারণ হইবে। প্রশ্নকর্ত্তা আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া আবার সেগুলি পেশ করুন। বৃহৎ ব্যবস্থাপক সভা এবং তাহার ব্যয়বাহুল্য সত্ত্বেও যদি নারীরক্ষারূপ একান্ত আবশ্যক কার্য্যের সম্যক্ আলোচনা তথায় না হয়, তাহা হইলে লোকে জিজ্ঞাসা করিবে, সভা কি সদস্যদের যাতায়াতের ও ভোজনের টাকা এবং প্রেসিডেণ্টের বেতন জোগাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে?

—

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভিক্ষ

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ কিছু দিন হইতে খবরের কাগজে বাহির হইতেছে। লোকের যে খুব অন্নকষ্ট হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনাহারে যে কাহারও কাহারও মৃত্যু হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অভয় আশ্রমের সেক্রেটারী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মত সুশিক্ষিত ও ত্যাগীপুরুষ দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃত্যু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন:—

> সরাই থানার অন্তর্গত তেলিকান্দি গ্রামের আবুমুসা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এই শোচনীয় সংবাদ কিছুদিন পূর্ব্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে সরকার পক্ষ এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা অনাহারই যে আবুমুসার মৃত্যুর কারণ সে কথা অস্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইস্তাহারে বলা হইয়াছে "গ্রামের বিটচৌকিদার এবং মৃতের পুত্রের পুত্র হইতে যে প্রকৃত এবং প্রামাণিক তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় আবুমুসা আমাশয় ও অন্যান্য রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" এই সরকারী ইস্তাহারের প্রতিবাদ করিয়া ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইতিপূর্ব্বেই সংবাদপত্রে একখানি চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সঙ্গে আমিও মৃত আবুমুসার স্বগ্রামবাসী বহুলোকের স্বাক্ষর সম্বলিত দুইখানি বর্ণনাপত্রের নকল প্রদান করিতেছি। মৃতের পুত্র এবং গ্রামের বিটচৌকিদার আবুমুসার মৃত্যুর প্রকৃত বিবরণ সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছে নিম্নোক্ত দুইখানি বর্ণনাপত্রে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ যাহাদিগের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, সেই চৌকিদার এবং মৃতের পুত্র উভয়েই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে যে, অনাহারই আবুমুসার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। গ্রামবাসী বহুলোক সমবেত ভাবে ইহার সমর্থন করিয়াছে। এই সুস্পষ্ট বর্ণনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গবর্ণমেণ্ট যদি স্বেচ্ছায় সত্য গোপন করিবার চেষ্টা নাও করিয়া থাকেন তথাপি যে রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন তাহার যথার্থতা সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যে দুখানি বর্ণনাপত্রের নকল দিয়াছেন, তাহা আমরা পড়িয়াছি। তাহাতে তাঁহার কথা সমর্থিত হয়। স্থানাভাবে সে দুটি ছাপিলাম না।

অনাহারে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহা যে অনাহারে মৃত্যু নহে, আক্ষরিক সত্যবাদিতা রক্ষা করিয়া ইহা বলা কঠিন নহে। যতীন্দ্রনাথ দাস জেলে স্বেচ্ছায় উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু অনাহারেই হইয়াছিল অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু যাহারা দুর্ভিক্ষে মারা পড়ে, তাহাদের মৃত্যু ত স্বেচ্ছামরণ নয়; তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় অখাদ্য কুখাদ্য যাহা পায় তাহাই উদরস্থ করিয়া যদি কোন পেটের পীড়ায় মারা যায়, তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যুর কারণ অনশন না বলিয়া কোন প্রকার পেটের অসুখ বলা সোজা। এক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অনশনক্লিষ্ট লোকদের দুর্দশার বর্ণনা ও তাহাদের ছবি নানা কাগজে যদি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য বিশ্বাসভাজন লোকেরা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ আরও কিছু টাকা উঠিতে পারে।

বঙ্গে মন্ত্রীসমস্যা

বাংলা দেশে কাহারও মন্ত্রী হওয়ার বিরোধী আমরা যে একটি প্রধান কারণে তাহা আগে আগে বলিয়াছি। আবার বলিব। অন্য কারণ যে নাই, তাহা নহে। বার বার মন্ত্রীনিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু বেতন মঞ্জুর না হওয়ায় কিম্বা তাঁহাদের উপর ব্যবস্থাপক সভার আস্থা নাই, অধিকাংশ সদস্যের মতে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় তাঁহাদিগকে চাকরী ছাড়িতে হইয়াছে। এবার যদি তিনজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বেতন আগে হইতেই মঞ্জুর হইয়া আছে। সুতরাং সে দিক দিয়া কোন বিঘ্ন নাই। কিন্তু তাঁহারা অধিকাংশ সদস্যের বিশ্বাসভাজন হইবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আমাদের প্রধান আপত্তি বরাবর এই, যে, বাংলা দেশকে ভারত গবর্মেণ্ট বরাবর বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের অত্যন্ত কম অংশ ইহার খরচের জন্য রাখিতে দেন। তাহা হইতে শিক্ষা কৃষি শিল্প প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিষয় সকলের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিবার টাকা পাওয়া অসম্ভব, সুতরাং এই সব বিভাগের কাজ সন্তোষজনক হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় প্রধানতঃ পদমর্য্যাদার জন্য ও বেতনের লোভে কাহারও মন্ত্রী হওয়া উচিত নয়। গবর্মেণ্ট যাঁহাকেই মন্ত্রী হইতে বলিবেন, তাঁহারই বলা উচিত, "আগে হস্তান্তরিত বিষয়সকলের জন্য বঙ্গের লোকসংখ্যার অনুপাতে অন্য বড় বড় সব প্রদেশের ব্যয়ের অন্ততঃ সমতুল্য টাকার বন্দোবস্ত করুন, তবে আমি মন্ত্রী হইব, নতুবা হইব না।" কিন্তু এমন কথা এ পর্য্যন্ত কেহ বলিলেন না।

বসু বিজ্ঞানমন্দির

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বার্ষিক সভায় অন্যান্য [illegible] মত এবারেও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় [illegible] নবোদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের কার্য্য প্রদর্শন করেন, [illegible] তাঁহার আবিষ্কৃত কোন কোন তত্ত্ব এবং একটি [illegible] কার্য্যকারিতা বুঝাইয়া দেন। এইসব দেখিয়া [illegible] হওয়া এবং হাততালি দেওয়া ছাড়া আমরা কি[illegible] পারি নাই।

বৈজ্ঞানিকেরা দুই রকম কাজ করিয়া থাকেন। প্রথম, কোন-না-কোন বিষয়ে শুধু মানুষের [illegible] জ্ঞান বৃদ্ধি; দ্বিতীয়, সাক্ষাৎ ভাবে মানুষের [illegible] লাগে এরূপ কিছু আবিষ্কার বা উদ্[illegible] বসু মহাশয় আগে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে [illegible] জ্ঞানবৃদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন আলোক এ[illegible] [illegible]ড়ত বিজ্ঞানে। কাজের জিনিষও উদ্ভাবন ক[illegible] তাহার পর, জড়ে ও অজড়ে, প্র[illegible] উদ্ভিদে সাড়ার সাদৃশ্য ও ঐক্য হইতে ন[illegible] আবিষ্কার তিনি করেন। উদ্ভিদের রস গ্রহণ দ্বারা বৃদ্ধি প্রভৃতি উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের অনেক আবিষ্ক্রিয়াও তিনি করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের বৈজ্ঞানিক মূল্য খুব বেশী। কিন্তু সাধারণ লোকে বলিতে পারে, এসব জানিয়া আমাদের কি লাভ? তাহারও উত্তর আছে। উদ্ভিদ কিরূপ খাদ্যে এবং শীতাতপ প্রভৃতি অন্যান্য

প্রভাবে কিরূপ বাড়ে না-বাড়ে সে বিষয়ে তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রসমূহের দ্বারা অনেক গবেষণা হইয়াছে। তাহার সাহায্যে কৃষিকার্য্যের খুব উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এই সাহায্য লয় কে? বঙ্গের জমীদারদের কাহারও কাহারও আয় আছে বেশ। কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁহাদের আয় কৃষি হইতে প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কৃষির উন্নতি বিষয়ে বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে উদ্যোগী কেহ আছেন কি? তাহার পর গবর্মেণ্টের কথা। আগেই বলিয়াছি, হস্তান্তরিত বিষয়ের জন্য যথেষ্ট খরচ করিবার টাকা বাংলা গবর্মেণ্টের নাই। সুতরাং বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে কৃষিপরীক্ষার কাজ চালাইবার টাকা তাঁহারা দিতে পারেন না বলিবেন। কিন্তু বঙ্গে ত প্রায়ই মন্ত্রী থাকে না। এক এক জন মন্ত্রীর বেতন বার্ষিক ৬৪০০০৲; তিন জনের বেতন বার্ষিক ১৯২০০০৲। এই টাকাটা শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি ও শিল্পের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করা কি চলিত না বা চলে না? অনর্থক মন্ত্রী-অন্বেষণে শক্তি ক্ষয় ও অর্থের অপচয় করা ভাল নয়।

শুনা যায়, গবর্মেণ্ট ডেরাডুনে চিকিৎসার একটা প্রতিষ্ঠান গড়িবেন ও চালাইবেন। নানা রকম ঔষধের পরীক্ষা করা ইহার একটা কাজ সম্ভবতঃ হইবে। এই চিকিৎসা-গবেষণাগার কলিকাতায় স্থাপন করিলে এখানকার অনেক হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ এবং বসুবিজ্ঞান মন্দিরের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। বসু [illegible] [illegible]ভারতীয় গাছগাছড়ার যে-সব গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা এই প্রকারে হইতে পারে। [illegible] কাজে অর্থসাহায্য করিলে এমন অনেক দেশী [illegible] গুণ আবিষ্কৃত হইতে পারে, যাহাতে মানুষের [illegible] [illegible]কারের সম্ভাবনা। মেজর বামনদাস বসুর বৃহৎ [illegible] নানা দেশী উদ্ভিদের রোগনিবারক গুণের উল্লেখ [illegible] তৎসমুদয়ের পরীক্ষাতেই ত অনেক সময় লাগিবে।

এই সকল কাজ যাহাতে হয়, সেদিকে দেশের ধনী লোকদের, ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভ্যদের এবং গবর্মেণ্টের মন দেওয়া উচিত।

—

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদে এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

বিষয়	বক্তা
১। বহির্বাণিজ্যে বাঙালী	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বি এস্ (প্যার্ড্যু)
২। সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্যের আর্থিক তত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচন্দ্র উকিল, এম্-বি
৩। কয়লার খনির মজুর	অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল,
৪। কলিকাতার বন্দর ও কিং জর্জ্জ ডক্	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল,
৫। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা	শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি-এ, এফ্ আর ইকন এস (লণ্ডন)
৬। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা	শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল

নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি লিখিত হইতেছে—

১। রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান—শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল।

২। য়ুরোপীয় আর্থিক চিন্তার ইতিহাস—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল

৩। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় তত্ত্বনিধি, বি-এ; এফ্ আর ইকন্ এস (লণ্ডন)

শ্রীযুক্ত মেজর বামনদাস বসু পরিষদকে ৫০০৲ টাকা দিয়াছেন একখানা ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ভূগোল (Commercial Geography of India) লিখিবার জন্য। গবেষকগণ এই কার্য্য করিবেন।

মেজর বসু মহাশয় তাঁহার সমস্ত জীবনে সঞ্চিত নোটগুলি পরিষদের হাতে দিয়াছেন। পরিষদের গবেষকগণ এইগুলিকে কাজে লাগাইবার জন্য খাটিতেছেন। ইহাতে নানা বিভিন্নবিষয়ক নোট্ আছে।

—

কুটীরশিল্প ও শিক্ষিত সম্প্রদায়

কলিকাতার সেণ্ট্রাল কলিজিয়েট স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে বাংলা গবর্মেণ্টের শিল্পবিভাগের অধ্যক্ষ ওয়েষ্টন সাহেব বলেন, দেশের শিক্ষিত লোকদের উদাসীনতায় দেশের কুটীরশিল্পগুলি লোপ পাইতেছে। ইহা কতকটা সত্য বটে। কিন্তু ইংরেজদের প্রভুত্বও কি কুটীরশিল্প বিনষ্ট হইবার একটি কারণ নয়? গবর্মেণ্ট সেগুলিকে আবার প্রবর্ত্তিত করিবার এবং নূতন কুটীরশিল্প চালাইবার জন্য কতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন?

১২০-২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ } মাঘ, ১৩৩৬ { ৪র্থ সংখ্যা
২য় খণ্ড

কালিদাসের অভিধান

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই

মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব নামে মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। মেঘদূত নামে খণ্ডকাব্য লিখিয়াছিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র এই তিন নামে তিনখানি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার সকলের চেয়ে বড় বই রঘুবংশ। তাহাকে মহাকাব্য বলিব কি না এ বিষয়ে লোকে বড়ই সন্দেহ করে। কারণ, এক বিশ্বনাথ কবিরাজ ছাড়া আর যত অলঙ্কার-লেখক মহাকাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন, সে লক্ষণে রঘুবংশ পড়ে না। সে-সকল লক্ষণে এক নায়ক নহিলে মহাকাব্য হয় না; সুতরাং সে মহাকাব্যের লক্ষণে রঘুবংশের জায়গা নাই। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন, একই নায়ক বা বহুনায়ক হউক, মহাকাব্য হইতে পারে। তাঁহার ইচ্ছাটা যেন রঘুবংশকে মহাকাব্যের ভিতরে ফেলা। শারদাতনয় নামে এক নাট্যশাস্ত্রকার মুসলমান আক্রমণের কিছুপূর্ব্বে মিরাট অঞ্চলে ভাবপ্রকাশ বলে একখানি বই লেখেন। তাতে তিনি কালিদাসের রঘুবংশকে সংহিতা বলিয়া গিয়াছেন। একথাটা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বলার দরকার, এইজন্ত বলিলাম। রঘুবংশ মহাকাব্য হউক আর নাই হউক, আমার বিশ্বাস এত বড় কাব্য আর কেহ কখনও জগতে কল্পনা করিতে পারিবে না।

কালিদাস আরও বই লিখিয়াছেন। তাঁহার ঋতুসংহারখানি তাঁহার নিজের দেশের ছয় ঋতুতে বর্ণনা। তিনি গ্রন্থখানি তাঁহার প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন। এ ছাড়া অনেক ছোট ছোট কাব্য কালিদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। শৃঙ্গারাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক, নলোদয় তাহার মধ্যে প্রধান। অনেক চুটকি কবিতা তাঁহার নামে চলিতেছে। ফুক্‌কুড়িও তাঁহার নামে চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার ফুক্‌কুড়ি যেমন গোপাল ভাঁড়ের নামে চলে, হিন্দীর ফুক্‌কুড়ি যেমন অকবর ও বীরবলের নামে চলে, সংস্কৃতের অনেক ফুক্‌কুড়িও কালিদাসের নামে চলে।

কালিদাস যে কাব্য আর রসের কথা লিখিয়া শেষ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার নামে একখানি ছন্দের বই চলিতেছে। ছন্দের বই-এর কর্ত্তা হইলেন পিঙ্গল, কালিদাসের অনেক আগে। কিন্তু পিঙ্গলের গণ আছে, মাত্রা আছে, বৃত্ত আছে, জ, গ, ম, ইত্যাদি আছে।

বীজগণিতের পরিবৃত্তি-অনুবৃত্তি আছে। ব্যাপারটা খুব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে সহজ করিবার জন্ত কালিদাস একখানি ছন্দের বই করিলেন। কঠিন ছন্দের বইকে মিষ্ট করিবার জন্ত ঋতুসংহারের মত প্রায়ই প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিতে লাগিলেন। যে ছন্দের লক্ষণ সেই ছন্দেই তিনি লক্ষণ করিলেন। কোন রকম পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিলেন না। প্রতিজ্ঞা করিলেন, শোনবা মাত্রই যাহাতে ছন্দের লক্ষণ বোঝা যায় তাহাই তিনি লিখিলেন। ইহাতে ৪৪টী কবিতা আছে, ৪১টী ছন্দের লক্ষণ আছে। পাণিনির সঙ্গে কলাপের যে সম্বন্ধ, পিঙ্গলের সঙ্গে ছন্দোবিষয়ে কালিদাসেরও সেই সম্বন্ধ। একজন লিখিয়াছেন পণ্ডিতের জন্ম। আর একজন লিখিয়াছেন অপণ্ডিতের জন্ম।

শ্রুতবোধ ছাড়া তাঁহার আর একখানি ছন্দের গ্রন্থ চলিতেছে, সেখানির নাম দেবীস্তুতি। উহাতে ৭১টী কবিতা আছে। ছন্দঃশাস্ত্র-ক্রম অনুসারে ৭১টী কবিতা সাজান। এক একটী কবিতায় এক একটী ছন্দ। দেবীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বর্ণনা। কথা আছে কালিদাস সরস্বতীর বর পাইয়া প্রথমেই সরস্বতীর স্তব করেন, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বর্ণনা করেন। তাহাতে সরস্বতী রাগিয়া বলেন, তুই আমাকে বেশ্যার মত বর্ণনা করিলি। তোর কার্য্য অশ্লীল হইবে। সেই ভয়ে কালিদাস দেবী-স্তুতিতে পা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভবেও তাহাই করিয়াছেন। এক-খানি জ্যোতিষের বই কালিদাসের নামে চলিতেছে। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে বইখানি ছাপা হইয়াছিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন, আমিই কালিদাস—রঘুবংশ ইত্যাদি লিখিয়াছি। সুতরাং সেকালের এক পণ্ডিত কালিদাসের এক জীবনচরিত পাওয়া গেল বলিয়া খুব গোলমাল করিয়া-ছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে জ্যোতির্বিদাভরণের কালগণনার আরম্ভ ১৬শ শতাব্দীতে হইয়াছে। গ্রন্থকারের বাড়ী উৎকলে ছিল। কালিদাসের সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিয়া আমরা এখন তাঁহার অভিধানের কথা বলিব। আমাদের আজকার বলিবার বিষয়ই সেই অভিধান।

মাদ্রাজের গভর্মেণ্ট ওরিএণ্টাল লাইব্রেরীতে কয়েক খানি পুঁথি আছে। তার মধ্যে একখানি 'নানার্থশব্দরত্নম্' ও তাহার টীকা 'তরলা'। মূল পুঁথিখানি কালিদাসের, টীকাটী 'নিচুল'-এর। রাওবাহাদুর রঙ্গাচারীয় প্রথম এই অভিধানখানির নাম প্রকাশ করেন ও বিবরণ লেখেন। ইনি লিখিয়াছেন, অভিধানখানি A Kalidas এর লেখা। অর্থাৎ কালিদাস নামে অনেক লোক ছিল। তাহার মধ্যে কোন অপ্রসিদ্ধ কালিদাসের লেখা। মহাকবি কালিদাসের লেখা নয়। তাঁহার দেখাদেখি আর যে-কেহ এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাঁহারাও ঐভাবে লিখিয়াছেন। ৺রামঅবতার শর্ম্মা তাঁহার কল্পদ্রুকোষের ভূমিকায় অভিধানশাস্ত্রের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি নানার্থশব্দরত্নকে অনেক পরে ফেলিয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের পরেই ফেলিয়াছেন।

কিন্তু এই অভিধানখানি মহাকবি কালিদাসের বলিবারও নানা কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, কালিদাস মেঘদূতের ১৪ শ্লোকের শেষ অংশে লিখিয়াছেন—

স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং।
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।

অর্থাৎ এই স্থান হইতে উত্তরমুখো হইয়া তুমি আকাশে ওড়। এই জায়গাটী বড় মনোহর। এখানে বেতগাছগুলি বড় সরস। দেখিও যাইবার সময় দিঙ্নাগেরা যেন তাহাদের মোটা শুঁড় তোমার পিঠে বুলায় না। এই স্থানে মল্লিনাথ টীপ্পনী করিয়াছেন যে, নিচুল শব্দে বেতগাছ বুঝায়। কিন্তু নিচুল একজন কবির নাম। তিনি কালিদাসের বন্ধু ছিলেন এবং কালিদাসের কাব্যের ভাল সমালোচনা করিতেন। আর দিঙ্নাগ নামে একজন বড় বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি ও তাঁহার দলভুক্ত লোকে কালিদাসের কাব্যের মন্দ সমালোচনা করিত।

মল্লিনাথের একথা যদি সত্য হয়, আর নিচুল যোগিচন্দ্র যদি কালিদাসের নানার্থরত্নের টীকা করিয়া থাকেন তাহা হইলে আর "A Kalidasa" বলিলে চলিতে পারিবে না। অভিধানকার যেন মনে হয় "The great Kalidasa." অভিধানখানি নানা দিক্ থেকে একখানি

আশ্চর্য্য বই বলিয়া মনে হয়। এ যে ইদানীন্তন কেহ লিখিয়াছেন তাহা মনে হয় না। আমরা এ অভিধানখানির ও তাহার টীকার একটু বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

অভিধানের মঙ্গলাচরণটী রঘুবংশের মঙ্গলাচরণটীর মত। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির নমস্কার।

> "তমেব শিরসা বন্দে পুণ্যোত্তরকলাদিকে।
> কীর্ত্ত্যং স্বমোকবন্ধাদৌ সব্যবামসিতাসিতঃ॥"
> Cal. p 1171.

কালিদাস যে শৈব ছিলেন সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নাই। শেষ বয়সে তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিরই উপাসক হইয়াছিলেন। এখানে এবং রঘুবংশে দুইয়েতেই অর্দ্ধ-নারীশ্বরের কথা আছে। যেমন পিঙ্গলকে সহজ করিবার জন্য তিনি শ্রুতবোধ লিখিয়াছিলেন, এ অভিধানখানিও তেমনি তিনি

> তত্রাপ্যেকাদিধাত্বর্থবাচকত্বে নিগ্রন্থিতে।
> মহাভাষ্যাদিবল্লোকে গ্রহীতুং নহি শক্যতে॥
> অতো যেনৈতদখিলমায়াসাতিশয়ং বিনা।
> আয়তে সুষ্ঠু সর্ব্বার্থশব্দরত্নং প্রদর্শ্যতে॥

অতিশয় আয়াস না করিয়া সহজে যাহাতে বোঝা যায় তাহারই জন্য লিখিয়াছেন। এ গ্রন্থখানি যে প্রাচীন তাহার আর একটী প্রমাণ দিতেছি। তিনি শব্দশাস্ত্রের মধ্যে পাণিনি, শক্তি, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র নির্ম্মিত ব্যাকরণের কথা বলিয়াছেন। পাণিনি, চন্দ্র, ইন্দ্র, নির্ম্মিত ব্যাকরণ লোকের জানা আছে। বোপদেব যে আটজন আদি শাব্দিকের নাম করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে এ তিনজনের নাম আছে। কিন্তু সূর্য্য আর শক্তির নাম কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু সূর্য্যের যে একখানি ব্যাকরণ ছিল তাহার কিছু প্রমাণ আমি পাইয়াছিলাম, তাহা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। তখন আমি তাহার বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। নেপালে আমি "পদসূর্য্য-প্রকাশ" নামে একখানি বই পাই। আমি সেখানি কলাপ ব্যাকরণের বই বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু কালিদাসের অভিধানে সূর্য্যের নাম পাইয়া আমি আবার পদসূর্য্য ব্যাকরণ দেখি। তাহাতে লেখা আছে, সর্ব্ববর্ম্মা ও গুহ প্রভৃতির মতের সহিত ঐক্য করিয়া এই পদসূর্য্য ব্যাকরণ লেখা হইতেছে। সুতরাং পদসূর্য্য ব্যাকরণ কলাপ হইতে স্বতন্ত্র। এবং এখন যে লোকে কলাপ ব্যাকরণকে কার্ত্তিকের লেখা বলে সেটাও ঠিক নয়। কারণ, সর্ব্ববর্ম্মার ব্যাকরণ স্বতন্ত্র এবং গুহের অর্থাৎ কার্ত্তিকের ব্যাকরণ স্বতন্ত্র। এই দুইখানি ব্যাকরণের পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহা ঠিক বলিতে যদিও পারা যায় না, তাহারা যে স্বতন্ত্র তাহা ঠিক বলিতে পারা যায়। গরুড়পুরাণে দু অধ্যায় ব্যাকরণের কথা আছে। তাহাতে কার্ত্তিক ও কাত্যায়ন দুজনের সংবাদ আছে এবং গরুড়পুরাণের যে ব্যাকরণ তাহা সূত্রে লেখা নয়। সিদ্ধ অর্থাৎ চলিত উদাহরণের দ্বারা শিখান হইত কিন্তু গরুড়পুরাণে যে-সকল উদাহরণ আছে তাহা সর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্র ব্যাকরণেও আছে। সুতরাং কার্ত্তিক, সর্ব্ববর্ম্মা, সূর্য্য, ইহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাকরণের কর্ত্তা। এ খবরটী আমরা কালিদাসের অভিধান হইতেই পাইলাম।

তাহার পর টীকাকারের কথা। মল্লিনাথ বলিয়া গিয়াছেন, টীকাকার নিচুল কালিদাসের বন্ধু ছিলেন। সেই নিচুলই দেখিতেছি কালিদাসের অভিধানের টীকা করিতেছেন। তিনি গোড়াতেই বলিয়াছেন—

> স্বমিত্রকালিদাসোক্তশব্দরত্নার্থজৃম্ভিতাম্।
> তরল্যাখ্যাংলসদ্ব্যাখ্যামাখ্যাস্তে তন্মতানুগাম্॥

সুতরাং তিনি যে কালিদাসের বন্ধু ছিলেন একথা নিজেই স্বীকার করিতেছেন। কালিদাস পাঁচজন ব্যাকরণকারের নাম লিখিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন যে, ব্যাকরণকার ছয় জন, শম্ভু (শিবসূত্র-পাণিনি), শক্তি, কুমার, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র। এ সংবাদ তিনি রহস্য নামক গ্রন্থ হইতে তুলিতেছেন। তিনি আরও বলিতেছেন—

> শ্রীশক্তিশম্ভুসূচিত বিভক্ত্যাকলনসিদ্ধপদযোগাৎ।
> চক্রে কুমারমূর্ত্তির্ব্যাকরণং সর্বদেশরসার্থম্॥

অর্থাৎ কুমার যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাহা শক্তি শম্ভু প্রভৃতির নিয়মানুসারে সিদ্ধ অর্থাৎ চলিত পদগুলি লইয়া করিয়াছেন।

নিচুল কবি কে ছিলেন? তিনি ভোজমহারাজের প্রবোধিত হইয়া এই টীকা লিখিয়াছেন। ভোজমহারাজ বলিলেই তো একাদশ শতাব্দীতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ একাদশ

শতাব্দীর ভোজ ধারা নগরাধিষ্ঠিত মহারাজাধিরাজ ভোজ। কিন্তু নিচুলের ভোজ মহারাজশিরোমণি ভোজমহারাজ। দুই ভোজ এক নয়। নিচুলের ভোজ খুব প্রাচীন হওয়ারই সম্ভাবনা।

কালিদাস যে অভিধানখানি পণ্ডিতের জন্য লেখেন নাই, সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজে বলিয়াছেন। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, কালিদাসের বর্ণমালা 'অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত'। বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে দুইরূপ বর্ণমালা চলিতেছিল—পণ্ডিতের জন্য অকারাদি হকারান্ত, আর সাধারণ লোকদিগের জন্য অকারাদি ক্ষকারান্ত। পাণিনি আদি বৈয়াকরণেরা 'ক্ষ'কে সংযুক্ত বর্ণ বলিয়া বর্ণমালার মধ্যে ধরেন নাই। বৌদ্ধ বৈয়াকরণেরাও ঐ পথেই গিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধ বইএ 'ক্ষ' বর্ণমালায় ভুক্ত আছে। তাহার উদাহরণ ললিতবিস্তর। বুদ্ধদেব যে বর্ণমালা শিখিয়াছিলেন তাহার শেষে 'ক্ষ' আছে।

এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন অভিধানকার কালিদাস "A Kalidasa" কি "The Kalidasa"।

ফিরে নাও

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

নেবোনা নেবোনা আর
এতদিন অনিবার
যা নিয়েছি দান।
সে দুর্লভ উপহার,
কভু কি যথার্থ তার
করেছি সম্মান?
বসন্তের গন্ধে ভরা
প্রতিদিন বসুন্ধরা
যাহা গেছে রাখি,
সমস্ত কি রয়ে রয়ে
চিত্ত হতে গেছে বয়ে—
কিছু নাই বাকি?
জন্ম হতে এতদিন
যা পেয়েছি গ্লানিহীন
অতল গভীর;
সে সমস্ত চিত্ততলে
আজও কেন নাহি জ্বলে
কেন নাই স্থির?
এতদিন এত কাজে,
এত দান এসে বাজে,
তবু চিত্ততল
কেন সেই শূন্য রয়
চঞ্চল বেদনাময়
করে টলমল!

নিতে নিতে যায় চলে,
ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে,
রিক্ত হয় মন,
আবার অমৃত সুধা
মিটাইতে মত্ত ক্ষুধা
করে আয়োজন।
দিনে দিনে দুখে সুখে
সেই পাত্র ধরে মুখে
তবু, ওরে, একি?
ক্ষণে ক্ষণে মোহময়
সিক্ত ওষ্ঠ শুষ্ক হয়
সব রিক্ত দেখি।
আর নয়, আর নয়,
মোহমত্ত চিত্তময়
উঠিয়াছে রোল,
গরলের পাত্র ধর
এরে শুষ্ক জীর্ণ কর
দাও শান্ত কোল।
এতদিন এই চিত্তে
যাহা এসে হ'ল মিথ্যে
ফিরে লও তারে,
অনন্ত শূন্যতা ভ'রে
এরে দাও চূর্ণ করে
মত্ত পারাবারে।

ত্রিপুরার গীতি-কবিতা

শ্রীসুধীরকুমার সেন

আমাদের দেশে অনেকের ধারণা গীতি-কবিতা ইংরেজী সাহিত্য মন্থনের অমৃত। আধুনিক গীতি-কবিতায় য়ুরোপীয় প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতি-কবিতা আমাদের দেশে ত নূতন সামগ্রী নয়। বাংলার সাধনা, বাংলার চিন্তাধারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—বাঙালীর সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ সুরের বিচিত্রতায়ই চিরকাল মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস - শুধু চণ্ডীদাস কেন, চর্য্যাপদ রচয়িতাদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

আধুনিক যুগ গীতি-কবিতা অথবা খণ্ডকাব্যের যুগ। কিন্তু এই আধুনিকতা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি শাখা পুরাতনের সহিত নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র রাখিয়া শহরের কোলাহল হইতে দূরে পল্লীগ্রামের ছায়াতলে আপন মনে বহিয়া চলিয়াছে। আজ তাহারই সামান্ত পরিচয় দিব।

এই সমস্ত গান কখন, কার দ্বারা রচিত হয় তার বিবরণ দেওয়া দুঃসাধ্য। দু'একটি গানে ভণিতা যে না আছে এমন নয়; তবু একমাত্র ইহার উপর নির্ভর করিয়া কল্পনার বলেও কোনপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। তবে বলা যাইতে পারে, বহু প্রাচীন কাল হইতেই এই গান পল্লীবাসীদের জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাদের পূজাপার্ব্বণ, আচার-অনুষ্ঠান সকল সময়েই এই সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে।

এই সঙ্গীতকে নানা পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—বিবাহের সঙ্গীত, পূজার মালসী, কার্ত্তিক ব্রত ও পরমেশ্বরের ব্রতের গান, গোষ্ঠ, বারমাসী, নিমাই-সন্ন্যাস, বিজয়া দশমী, সূর্য্যদর্শন, অন্নপ্রাশনের গীত, পুতুলখেলা, গাজন ইত্যাদি।

বাংলা দেশে অতি পুরাতন একটা কথা আছে—'কানু বিনা গীত নাই।' জানি না এই চিরকিশোর দেবতাটি কোন্ মন্ত্রবলে বাংলার হৃদয়টি চিরতরে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। বাংলার প্রেম, বাংলার হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান এই দেবতাটিকে আশ্রয় করিয়াই নানা রাগিণীতে, নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিবাহের সঙ্গীতে এই দেবতাটির স্থান অতি অল্প।

হিন্দু-পরিবার মিলনধর্ম্মী। আত্মীয়, অনাত্মীয়, পরিচিত, অপরিচিত সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া সে তাহার পরিবারকে গঠন করে। ইহা তাহার সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই আনন্দ-যজ্ঞে একমাত্র কন্যারই শুধু আমন্ত্রণ নাই। সমাজের কঠোর তাড়নায়, অতি অল্প বয়সেই পিতৃগৃহ হইতে সজল নয়নে তাহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। বাঙালী মাতাপিতা, বাংলার গ্রাম্য-কবি এই 'গৌরী'দানের ব্যথা বুঝিতেন; তাই বোধ হয় হরপার্ব্বতী নামের অন্তরালে তাহারা তাঁহাদের কন্যা-বিচ্ছেদ ব্যথা নিবেদন করিয়া দিয়াছেন।

রাধা-কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বিরহ সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের বস্তু হইতে পারে বটে, কিন্তু সমাজ ইহাকে কোনো কালেই স্বীকার করে নাই। আমাদের দেশে বিবাহ একটা মস্ত বড় সামাজিক অনুষ্ঠান। যে বধূ ঘরে আসিতেছে শুধু স্বামীকে লইয়াই সে সম্পূর্ণ নয়। বিবাহ মানেই সমাজ-বিধিকে স্বীকার করিয়া লওয়া—কিন্তু, সামাজিক বিধিকে অতিক্রম করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেম। তাই বিবাহের মূল তত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করিবে বলিয়াই বোধ হয় গ্রাম্য-কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীতকে বিবাহোৎসবে স্থান দিতে একটু কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন।

বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠানেই নানাপ্রকার মেয়েলী সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সমস্তগুলি

উদ্ধৃত করা সম্ভবপর নয়—প্রয়োজনও নাই। নমুনাস্বরূপ দু'একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ত্রিপুরা জেলায় মঙ্গলাচরণ অথবা পাকা দেখার পর বিবাহের পূর্ব্বে 'পান-খিলি' বলিয়া একটি উৎসব হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে পাড়ার এয়োস্ত্রীরা বিয়েবাড়ীতে সমবেত হইয়া গান ধরে—

এ শুভ উৎসবে সাজি আরলো তোরা এবোগণে।
চিরশুভঙ্করী তোরা, শুভ তোদের সম্মিলনে ॥
কোলের শিশু কোলে কর, সীমন্তে সিন্দুর পর
কুলবালার এই ত ভূষণ, কাজ কি অন্য আভরণে ॥
সাজাও সবে কুলডালা, ভরা জলে গাঁথব মালা,
পূজিব সর্ব্বমঙ্গলা সকলে তাঁর কৃপাগুণে ॥
তাঁহার প্রসাদ বলি, লব সবে কোলে তুলি,
হেরিব মহিমা তাঁরি বর-বধূর সম্মিলনে ॥

বাংলা দেশের আবহাওয়ায় রামসীতার দাম্পত্য প্রেম হরগৌরী অথবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর উপরে স্থান পায় নাই, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত; কিন্তু গ্রাম্য গীতি-কবিতা তাঁহাদের আদর্শেও অনুপ্রাণিত হইয়াছে এ প্রমাণ আছে। 'পানখিলির' পরে বিবাহের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যে-সব সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে নিম্নে তাহার একটি উদ্ধৃত হইল—

কাসেতে করতাল বাজে, ধলা ঘোড়া সাজে,
রামচন্দ্র চলিলেন সীতার বাসরে।
যদি রে সুন্দর রামরে, সীতা কর বিয়া,
কনক বাঁশের ধনু গুণ চড়াও গিয়া।
একে ত সুন্দর রাম, কাঁচা মাজের তনু,
কেমনে চড়াইব রামে কনক বাঁশের ধনু।
যদি রে সুন্দর রাম, সীতা কর বিয়া,
বাটা-ভরা অলঙ্কার লইয়া আস গিয়া।
রামেত লইল জিনিস বাটায় ভরিয়া,
লক্ষ্মণে লইল দোলক কন্যার ভরিয়া।
তর মায় যে কইছিল গো কন্যা নির্ঘাতা বলিয়া,
পর গো, পর গো কন্যা এড়িয়া বাড়িয়া।
ঘুমেতে চঞ্চল সীতা, নিদ্রায় কাতর,
জিনিষ কালাইয়া দিল পালঙ্কের উপর।
একে ত সুন্দর রাম বুদ্ধির সাগর,
জিনিষ টুকাইয়া লইল পালঙ্কের উপর।

একথা বলা বাহুল্য যে, সাহিত্য হিসাবে এই সঙ্গীতের মূল্য অতি অল্প। অধিকাংশস্থলেই বর্ণমিত্রতার অভাব, ভাষা প্রাদেশিকতার জন্য দুর্ব্বোধ্য, তবু দরদী পাঠক ইহার স্থানে স্থানে এমন সৌন্দর্য্য পাইবেন যে, সহজেই তাঁর মন মুগ্ধ হইবে। বিশেষত ইহা যখন স্ত্রীকণ্ঠে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গীত হয় তখন বড়ই মধুর শোনায়। বহু-কাল পূর্ব্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—" · বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়—তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্য সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে, সেই জন্যেই বাঙালীর কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে। বৈষ্ণবী যখন 'জয় রাধে' বলিয়া ভিক্ষা করিতে অন্তঃপুরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন কুতূহলী গৃহকর্ত্রী এবং অবগুণ্ঠিত বধূগণ তাহা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসেন; প্রবীণা পিতামহী, গল্পে গানে ছড়ায় যিনি আকণ্ঠ পরিপূর্ণ, কত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় ও কৃষ্ণপক্ষের তারার আলোকে তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়া গৃহের বালক-বালিকা যুবক-যুবতী একাগ্র-মনে বহু শত বৎসর ধরিয়া যাহা শুনিয়া আসিতেছে বাঙালী পাঠকের নিকট তাহার রস গভীর এবং অক্ষয়।"

বর বধূগৃহে আগমন করিলে মেয়েরা গান ধরে—

শিব সাজে বিয়ার কাজে, ঐ শিঙা ডমুরা বাজে,
সাজে শিব কৈলাসের ঈশ্বর। (গো ভবানী)
উমার পিতা গিরিরাজ, কইরাছে চণ্ডালের কাজ,
উমার লাগি আনল পাগলা জামাই ॥ (গো ভবানী)
উমার পিতা গিরিরাজ, কইরাছে চণ্ডালের কাজ,
আনল জামাই দুই চক্ষু খাইয়া ॥ (গো ভবানী)
ঝিয়ে বলে, ওগো মা, শিব নিন্দা কইর না,
এই শিব কৈলাসের ঈশ্বর ॥ (গো ভবানী)
মায় বলে, ওগো ঝি, অগ্নিকুণ্ডে ঢাল ঘি,
মায়ে ঝিয়ে মরিব পুড়িয়া ॥ (গো ভবানী)
ঘর ঘর বিচারি চাইলাম, শুধু ভাঙের লাড়ু পাইলাম,
দাইতে উমার কিছু নাই ॥ (গো ভবানী)
সিন্দুর পরিতে নাই ॥ (সখী গো ভবানী)

আমাদের দেশে বিবাহ অবিমিশ্র আনন্দের ব্যাপার নয়, ইহার একটি অতি করুণ দিকও আছে। সহস্র প্রকার কর্ম্মকোলাহল এবং বিচিত্র ব্যস্ততার মাঝে ও অবসরের ফাঁকে ফাঁকে যে কথাটি কন্যার মাতাপিতার মনে অহরহ

কাঁটার মতো ফুটিতে থাকে তাহা এই,—যাহাকে এতদিন এত স্নেহে লালন করিয়া আসিলাম সে আজ পর হইয়া গেল! ইহা ভিন্ন অপরিচিত আবেষ্টনীর ভিতর পড়িয়া শিশুকন্যা সুখী হইতে পারিবে কিনা, তাহাও অল্প চিন্তার বিষয় নয়। তাই বোধ হয় গ্রাম্য-কবি বর-বধূর যাত্রার সঙ্গীতগুলিতেই সমস্ত ব্যথাকে রূপ দান করিয়াছেন—

১। নয়নতারা প্রাণ গৌরী হারা হইলাম গিরিবর।
কি স্বপ্ন দেখিলাম আমি উমা নিতে আসল হর॥
কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, ঐ দুঃখে বুক ফেটে যায়,
উমার বিচ্ছেদ খেদে প্রাণে বাঁচা হইল দায়॥
কত দুঃখের উমা আমার, গিরি তুমি জান না,
গর্ভ নারীর গর্ভ বেদন বন্ধ্যা নারী বুঝে না॥
কি স্বপ্ন দেখিলাম গিরি, আজু নিশি প্রভাতে,
উমা আসি শিরে বসি মা বলিয়ে কান্দ্‌তেছে॥
হায় গিরিবর, হায় গিরিবর, হায় গিরিবর কি করি,
উমা ছাড়া প্রাণ বাঁচে না, এনে দাও মোর প্রাণ গৌরী॥
সপ্তমীতে আসল উমা, অষ্টমী ত রহিল,
নবমীতে যজ্ঞপূর্ণ, মাগো দশমীতে চলিল॥
লেঙ্‌টা বেটা, বুদ্ধি মোটা, ভাঙ ধুতুরা সদাই খায়,
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান ভাল ভাল শোভে তায়॥
কান্দিতে কান্দিতে উমায় মাকে প্রণাম করিল,
শিরে হস্ত দিয়া মায় গো আশীর্ব্বাদ করিল॥
সাবিত্রী সমান হওগো, যাউক গো তোমার দুর্গতি,
পাগ্‌লা মতি ছাইড়া মাগো, জামাইর হউক গো সুমতি॥

২। ছেড়ে যাবে কিনা উমা, গিরিপুরী আন্ধার করে।
আমি কেমন করে, শূন্য ঘরে, রইব গো তোরে না হেরে॥
এ ঘর হইতে ওঘর যাইতে নেচে নেচে নেচে,
অঞ্চল ধ'রে বেড়াইতে থাকতে কাছে কাছে॥
নিশিতে ঘুমেতে থাকি, স্বপনে মা তোরে দেখি,
সে ধন কিসে ভুলে থাকি, বলে যা পাষাণী মা'রে॥
সঁপিলাম উমা তোমায় ভিখারীর করে,
ক্ষুধায় শুখাইয়ে মাগো কে দিবে গো তোরে,
তাই যখন মনে পড়ে যে করে মায়ের অন্তরে,
আমি সে দুঃখ জানাব কারে, তুই মা হলে মা বুঝবি পরে॥

এই গানগুলি বিজয়া দশমীর সময়েও গীত হয়।

বিবাহের কিছুদিন পরে শ্বশুরগৃহ হইতে স্বামী সহ বধূর পিতৃগৃহে যাইবার একটি রীতি প্রচলিত আছে, ইহাকে দ্বিরাগমন বলে। এই সময়ে গীত হয়—

যাও হে গিরি, ত্বরা করি আনিতে প্রাণ উমারে।
হইল বৎসর গত, প্রাণে ধৈর্য্য নাহি মানে॥
শুনিয়াছি ত্রিপুরারি, ত্যজ্য কইরেছেন গৌরী,
আনন্দে বৃষভ চড়ি, শ্মশানে মশানে ফিরে॥
গত রজনী নিশীথে, দেখিয়াছি স্বপনেতে,
উমা কেন্দে কেন্দে বলে, "মা মনে না কর মোরে॥"

শরৎকালে যে জননী আমাদের গৃহে আসেন তাঁহাকে বাঙালী গ্রাম্য কবি শুধু দশপ্রহরণধারিণী জগজ্জননী রূপেই গ্রহণ করেন নাই; অপ্রাপ্তবয়স্কা নিঃসহায়া শিশু কন্যা রূপেও দেখিয়াছেন। সেখানে মায়ের এই ঐশ্বর্য্য নাই, আছে কন্যার দারিদ্র্য আর দুঃখ। তাই কবি গান—

১। রাণী, দেও গো জয়ধ্বনি।
তোমার উমা লইয়া আসিল নন্দিনী॥
একে শুক্র উদয় শরত সময়,
ভাগ্যে বুঝি ব্রহ্মময়ী আসল হিমালয়॥
উমা কোলেতে আনি, বসাইলেন রাণী,
আস আমার চাঁদবদনী জুড়াও গো প্রাণি॥
আমি জিজ্ঞাসা করি হেগো তারিণী,
কেমন কইরা হরের গৃহে আছিলা তুমি॥
না বহে বাণী, শুন জননী,
না দেয় বলে হরনাথে, উড়েছিল প্রাণি॥
জামাই কি আপন নিশির স্বপন,
উমা ধনকে না দেখিলে ত্যজিবে জীবন॥
এক পাগলের পুর, শুনিতে অদ্ভুৎ,
শ্মশানে মশানে ফিরে খায় ভাঙের গুড়া॥

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্যে বাৎসল্য রসকে অতি উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছে। যে ক্ষুদ্র শিশু দরিদ্রের পর্ণকুটীরে আসিয়া ধরা দেয় তাহার ভিতরে তাঁহারা বিশ্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই ইহার ভিতরে এত রস, এত সৌন্দর্য্য! সাধক কবীর তাঁহার পুত্র জন্মিবার পর যে পদটি রচনা করিয়াছিলেন, উহা তাই এত মধুর! বাঙালীও এই রস হইতে বঞ্চিত হয় নাই, গ্রাম্য-কবি গানে গানে এই আনন্দকে প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রিপুরা জেলায় সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে—

ভগবান পুত্র পেইয়ে, আনন্দে কোলে নিয়ে, রাণী নিদ্রা যায়।
গোপাল কান্দিছ না রে—ঐ আমার কোলে আয় রে॥
কে তোরে বলে কালো—গোপাল রে
যে তোরে বলে কালো, তার কিরে বাপ মরন কালো।
ঐ তোর ঐরূপে অন্ধকার করে আলো॥
(গোপাল কান্দিছ না রে)
একদিন দেইখাছি তোরে মৃত্তিকা বোধনের কালে,
জগত ব্রহ্মাণ্ড দেইখাছি তোর বদনে॥
(গোপাল কান্দিছ না রে)॥
ছিল তোর নয়নতারা,   দুঃখিনীর দুখপাসরা
তিলে তিলে হইলাম রে হারা।
(গোপাল) যাইও না যাইও না কারো গৃহে খেলাইতে;
গৃহে বইসে খেল, মা বলিয়ে ডাক,
শুনুক গোকুলেরই লোকে॥
(বাছা যাইও না যাইও না কারো গৃহে খেলাইতে)॥

গোষ্ঠও বাৎসল্য রসেরই গান ; তাহারও একটি উদ্ধৃত হইল—

প্রভাতকালে গোপালেরে সাজায় নন্দরাণী,
বলরামের করে সঁইপে দিল নীলমণি।
তখন নন্দরাণী বলে বলাইর নিকটে,
তোমরা সবে খেলা কর কালিন্দীর তটে,
দূরদেশে গেলে ভয় থাকে মায়ের মনে,
মা বিনে সন্তানের দুঃখ অন্যে কি বা জানে॥
যখন রে বাপ কেইন্দে বলবি খেইতে দেমা ননী,
তখন রে বাপ কোথায় পাবি এ ক্ষীর নবনী॥
কাত্যায়নী পূজি রে বাপ পাইলাম নীলমণি,
মা হইয়ে ভাণ্ড ভাণ্ড খাওয়াই ক্ষীর ননী॥

সন্ধ্যাবেলা সূর্য্য অস্ত গেলে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ পরিবৃত হইয়া পথের ধূলি উড়াইতে উড়াইতে ধেনুবৎস সঙ্গে গৃহে ফিরিতেছেন, ইহাকে এদেশে প্রচলিত ভাষায় ফিরা-গোষ্ঠ কহে। নমুনাস্বরূপ তাহারও একটি গান উদ্ধৃত হইল—

গোপাল আন্যা দেরে নন্দ, গোপাল আন্যা দে,
গোপাল বিনা অভাগিনীর প্রাণ ত বাঁচে না (রে নন্দ)।
আগে যে কইছিলাম নন্দরে,
আরে, বেচ্যা কালাও ধেনু,
নগরে মাগিয়া খাইতাম রে,
কোলে লইয়া কানু॥
ভাত হইল করকরা,
বেঞ্জন হইল বাসি ;
তবু ত না আইল গোপাল
দিনের উপবাসী॥
যেহানে খুঁইজাছে কত,
না দিলাম রাখিয়া।
ধেনুর সঙ্গে গেল হরি,
কান্দিয়া কান্দিয়া॥
বেলা গেল, সন্ধ্যা হইল,
রবি গেল পইরা।
তব ত না আইল হরি
দিনান্তের উপাসী॥
কবলী ধবলী গাভী
পুরীর প্রধান।
হেই গাভী হারাইয়া
(হরির) উইড়াছে পরাণ॥
বন থাক বনের পশু,
দেশ বহুত দূর।
তোমরা নি দেইখাছ যাইতে
শ্রীদামের বাছুর॥
বারে বারে করলাম মানা,
বেচ্যা কালাও ধেনু।
নগরে মাগিয়া খাব,
কোলে লইয়া কানু॥
বারে বারে করলাম মানা,
না যাইও গোয়াল পাড়া।
কাইড়া রাখে হাতের বাঁশী
ছিঁড়ে গলার মালা॥

ত্রিপুরা জেলায় মেয়েদের মধ্যে সই পাতানোর প্রথা আছে। বরবধূ-নির্ব্বাচনের ন্যায় সই-নির্ব্বাচনের অধিকারও পিতামাতা অথবা আত্মীয়স্বজনের। সই অপর সইএর বাড়ীতে রওনা হইবার সময় মেয়েরা গান ধরে—

সই সই বলিয়া সই নি আছ ঘরে গো,
বেদনী আগো সই গো।
সইএর বাড়ীত সইএ যাইতে, পন্থে হাঁটু পানি গো
বেদনী আগো সই গো।
সইএর কাছে কইল খবর, জাঙ্গাল বাইন্ধা দিত গো
বেদনী আগো সই গো।
সইএর বাড়ীত সইএ যাইতে, রইদে কষ্ট পাইলাম গো,
বেদনী আগো সই গো।
সইএর কাছে কইল খবর, ছত্র লইয়া আইত গো,
বেদনী আগো সই গো।
খিড়কি দুয়ার, বেতের যাঁপ, সই পলাইল ঘরে গো,
বেদনী আগো সই গো।
সইএর কাছে কইল খবর, বাহির কইরা দিত গো,
বেদনী আগো সই গো।

দুই সই-ই মালা, আল্‌তা, আয়না, চিরুণী, শাড়ী, শাঁখা ইত্যাদি সংগ্রহ করে। সই অপর সইএর বাড়ীতে পৌঁছিলে আলপনা দেওয়া পুকুর-কাটা স্থানে উভয়কে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া বসানো হয়, পরে সংগৃহীত জিনিষ বদল হয়, কোলকুলি হয়। এই সময়েরও গান আছে, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

বাংলা দেশের মহিলাদের ভিতরে নানা শাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রীয় গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা ও ব্রত প্রচলিত আছে ; তাহার সমস্তগুলির রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান ও সঙ্গীত সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। কার্ত্তিক ঠাকুর শাস্ত্রীয় দেবতা ; বেদে যদিও তাঁর নাম নাই, পুরাণে তিনি দেবমণ্ডলীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ষষ্ঠী ঠাকরুণের ন্যায় ইনিও পুত্রদাতা, ইহা ব্রতের গান হইতেও জানিতে পারা যায়।

কার্ত্তিক ব্রতে প্রচলিত গানগুলি অনেকের মতে খুব প্রাচীন। কিন্তু, বিশেষ করিয়া শুধু কার্ত্তিক ব্রতের গানকে এত পুরানো মনে করিবার খুব সঙ্গত কারণ আছে কি না আমাদের সন্দেহ। বর্ত্তমান সময়ে আমরা গানগুলি যে

ভাষাতে পাইতেছি তাহা একান্ত আধুনিক। অবশ্য গানের ভাষা যুগে যুগে গায়কের মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে, সেইজন্যই চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও তাঁহার প্রচলিত পদাবলীতে এত পার্থক্য। তবু, কার্ত্তিক ব্রতের প্রচলিত গীতকে বিনাপ্রমাণে প্রাচীন বলা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পূজার আগের দিন সংযম, সেই দিনই পূজামণ্ডপ তৈরি করিবার রীতি। এই সময়ের গান—

বিছাইয়া আইলাম পাটী রাবণের কাছে,
নিজ পতি ব্রাহ্মণ বাঁশেরে গেছে।
অবিয়াথা কার্ত্তিক ঠাকুর উদামে রইছে,
বেও গেছে বাঁশেরে, সে ও না আইল।
অবিয়াথা কার্ত্তিক ঠাকুর উদামে রইছে,
নিজপতি ব্রাহ্মণ ছনেরে গেছে।

(এইরূপে পর পর রুয়া, বেত ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া গীত হয়)।

পূজার দিন প্রায় সারারাত্রি গান গাহিবার নিয়ম—নমুনাস্বরূপ একটি গান মাত্র উদ্ধৃত হইল—

যেই হাটে যায়রে কার্ত্তিক খরচা করিবারে,
সেই হাটে যায় রে উবা ছত্র ধরিবারে।
কার্ত্তিক ঠাকুর যায় রে ঘট কিনিবারে,
সেই হাটে যায় রে উবা ছত্র ধরিবারে।

(এইরূপে তিল, তুলসী এবং কার্ত্তিক মাসের নানা ফলের উল্লেখ করিয়া গীত হয়)

সাক্ষী হইও দেবধর্ম্ম সাক্ষী হইও তুমি,
অবিয়াথা কার্ত্তিকের মাথায় উবায় ধরে ছাতি।

ত্রিপুরা জেলায় পরমেশ্বর ব্রত বলিয়া একটি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রতের কথাও আছে; তাহা আমি একটি বৃদ্ধা মহিলার নিকট শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি। দীপান্বিতার পরদিন প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস ব্রতের কথা বলিতে হয়। অসমর্থদের জন্য অন্য বিধানও আছে। যাহারা একমাস ব্রতের কথা বলে তাহারা মাটি দিয়া ঠাকুর তৈরি করিয়া উপরে তুলিয়া রাখিয়া দেয়, পূজার সময় ঠাকুর নামাইয়া পূজা করে। পুরোহিত পূজায় বসিলে মেয়েরা গান ধরে—

১। আমার এই বাসনা শবাসনা পূজব জবা বিল্বদলে,
বইস মাগো হৃদকমলে।
আর কিছু ত চাইনা মাগো, জায়গা দিও চরণতলে,
বইস মাগো হৃদকমলে।
ভক্তি জবা হৃদমনে, এইমাত্র মা রেখ যতনে,
ভক্তি বারি মিশাইয়ে অর্ঘ্য দিব গঙ্গাজলে।
শরৎ তোমার অবোধ ছেলে, নিও না মা আর কুপথে,
বইস মাগো হৃদকমলে।

২। আমি ঘরে বইসে চরণ পাব, কেন গঙ্গার তীরে যাব।
আপন জায়গা থাকৃতে কেন পরের জায়গায় বাস করিব।
আপন মাতা থাকতে কেন বিমাতাকে মা বলিব।
মায়ে পুতে মকর্দ্দমা শিবে শুনলে কি বলিব।
কালীর নামে ভক্তি থাকলে মকর্দ্দমা ডিক্রী হইব।

ত্রিপুরা জেলার তত্ত্ব-সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই সাধক কবি মনোমোহন দত্তের কথা স্মরণ হয়। কতিপয় ভক্তের আগ্রহ ও যত্নে তাঁহার গানগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিবের গাজন অতি প্রাচীন। যদিও ইহার কাল সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে আজ-পর্য্যন্ত কিছুই নির্দ্ধারিত হয় নাই, তবু ইহার প্রাচীনতা বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। কেহ কেহ শিবের গাজন মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করেন।

শিবের গাজন ত্রিপুরা জেলায় নীল-পূজা নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই শিবের গাজনে গান গাহিয়া থাকে,—কুমিল্লাতে মালীগণের মধ্যে ইহা প্রচলিত। সমস্ত চৈত্রমাসই গাজন গাহিবার রীতি। এই সময়ে যাহারা শিব, গৌরী এবং গঙ্গার সাজ নেয় এবং যাহারা সঙ্গে থাকে সকলকেই আমিষ আহার পরিত্যাগ করিতে হয়। তৈলমর্দ্দন, তাম্বুলচর্ব্বণ এবং ধৌতবস্ত্র পরিধান প্রভৃতি নিষেধ।

গাজনের একটি গান নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল—

একদিন অন্নপূর্ণা অন্নের ছলে বাহির হইল নগরে,—
সকলের কুলবধূ জিজ্ঞাসা করে—
তুমি পঞ্চাননের গিন্নী হইয়া ভিক্ষা মাগ নগরে।
তখন কেন্দে কেন্দে মনের খেদে উমা কয় মধুর স্বরে,
পতির গুণ বলব কত কপালে করে;
আমি যে দুখে গিরস্তি করি মন জানে বলব কারে।
সে যে বয়সেতে বাপের বড়, বেটা নিপুণ সিদ্ধিতে,
কুলীন দেখিয়া বিয়া দিয়াছিল পিতে,
অস্থির্মসার করিলাম তাও ধুতুরা বাটিতে।

সে যে শ্মশানে মশানে ফিরে অঙ্গে মাখে চিতার ছাই,
লজ্জাতে দেবসমাজে মুখ না দেখাই,
তাঁর লীলাখেলা ভূতের মেলা দিবা নিশা ভেদ নাই ।
তাঁরে সবে বলে পাগলা ভোলা, জাতিভেদ মানে না তার,
চণ্ডালে দিলে অন্ন ইচ্ছা কইরা খায়,
তাঁর নাই কোন গুণ, কপালে আগুন, বাদ্যার মত সাপ খেলায় ।
পাক্‌না চুল দাঁত লড়বইড়া আইজ মরে কি কাইল মরে,
পতির গুণ বলব কত কপালে করে]

এই গান অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পূর্ব্বে গাজনে নবনাথ এবং চৌরাশী সিদ্ধা বিষয়ক নানা সঙ্গীত গীত হইত; এখন ক্রমশঃ তাহা লোপ পাইয়া সেই স্থানে রাধাকৃষ্ণ, রামলক্ষ্মণ, ভগীরথ প্রভৃতি অনধিকার প্রবেশ করিতেছে। ইহাতে প্রাচীন ধারাটি যে ক্ষুণ্ণ হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বারমাসী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে; ছয় ঋতু নানাভাবে প্রাচীন কবিগণের মনকে দোলা দিয়াছে, তাহারই বিচিত্র ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের কাব্য ও সঙ্গীতে—

কান্দে রাধা চন্দ্রমুখী দিবস রজনী।
গোবিন্দে ছাড়িয়া গেল মুই সে অভাগিনী ॥
বৈশাখ মাসের দুঃখ শোন দিয়া মন।
আমাকে ছাড়িয়া গেল শ্রীনন্দের নন্দন ॥
কে মোর কাড়িয়া নিল কণ্ঠ মণিহার।
প্রভুর রাতুল পদ না দেখিব আর ॥
কান্দিতে কান্দিতে মুই হইলাম নির্ব্বল।
অভাগিনী রাধার চক্ষে কত আছে জল।
ভ্রমর-ঝঙ্কার নাই ময়ূর পেখম।
বৃন্দাবনে নাই শুনি কোকিল পঞ্চম ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসের দুঃখ কি কহিব আর।
আমাকে ফেলিয়া গেল অগ্নির মাঝার ॥
চিন্তায় আকুল তনু প্রাণ হইল শেষ।
আমার বিচ্ছেদে প্রভু গেল ভিন্ন দেশ ॥
রক্তমাংস নাই মোর অস্থিচর্ম্মসার।
হানিল হৃদয়ে শেল না খসিব আর ॥
তোমার কারণে মোর প্রাণ নহে স্থির।
আমারে করিলা প্রভু কুলের বাহির ॥
আষাঢ় মাসের দুঃখ শোন দিয়া মন।
মথুরা রইল কৃষ্ণ লইয়া গোপীগণ ॥
কৃষ্ণ নাটের প্রভু তোমা না দেখিলে।
জানিলাম রমণী সার বন্দী লইল ছলে ॥
কি করিব কোথায় যাইব উপায় না দেখি।
পরাণি ত্যজিলে যেন গরল যে ভখি ॥
বসিলে সোয়াস্তি নাই শুতিলে নাই c নিন্দ ।
আমারে ছাড়িয়া কোথা রইলা রে গোবিন্দ ॥
কিছু না গণিল মুই যৌবন গর্ব্ব করি।
গর্ব্ব কান্দে দিয়া প্রভু প্রাণ নিল হরি ॥
শ্রাবণ মাসের দুঃখ জ্বলি জ্বলি উঠে।
অগ্নি লাগিলে যেন বাঁশ বন ফাটে ॥
দহিয়া শরীর মোর কৈল ভস্মাকার।
যেই দিকে চাই প্রভু সেই দিক অন্ধকার ॥
মরিব মরিব প্রভু এই সে দুঃখ লাগি।
হেলায় বধিলা রাধা হইলা বধের ভাগী ॥
আগু পাছু না বুঝিয়া বাড়াইলাম ভাব।
হেলায় হারালাম প্রভু এই সে হইল লাভ ॥
মুই যদি জানিতাম প্রভু রইবা দূরদেশ।
তবে কেনে অভাগিনী বাড়াইতাম আবেশ ॥
ভাদ্র মাসের দুঃখ সহন না যায়।
অভাগিনী রাধার প্রাণ বধিলা লীলায় ॥
আহারে দারুণ বিধি দিলা এত দুঃখ।
আর না দেখিব প্রভুর চন্দ্র সমান মুখ ॥
তুমি ত রসিক কৃষ্ণ রসের নাগর।
আমারে ডুবাইয়া গেলা অকূল সাগর ॥
ডুবাইয়া সাগর মধ্যে কূল নাহি পাই।
• • • • • ঘুরিয়া বেড়াই ॥
আশ্বিন মাসের দুঃখ শোন শ্যাম রায়।
উঠিল সাপের বিষ সহন না যায় ॥
সকল শরীর মোর কৈল থরথর।
পীরিতি আনলে মোর—কলেবর ॥
জ্বলি জ্বলি উঠে—সহন না যায়।
কি করিব কোথায় যাইব না দেখি উপায় ॥
বিষ জ্বালে প্রাণ মোর দহিয়া সে যায়।
হিয়ার মাঝারে পোড়ে নিবান না যায় ॥
হৃদের মাঝারে কৃষ্ণ হানিল প্রেম শেল।
প্রাণ লইয়া প্রভু মোর কোন দেশে গেল ॥
কার্ত্তিক মাসের দুঃখ শোন প্রাণ সখি।
পীরিতি আনলে আমি মরিব হেন দেখি ॥
ঠেকিয়া পীরিতি কান্দে রাধা রসবতী।
কি করিব কোথায় যাইব স্থির নহে মতি ॥
অস্থির হইয়া মতি ভ্রমি দেশান্তর।
ধরাইতে না পারি চিত্ত দগধে অন্তর ॥
কি করিব কোথায় যাইব নাহি বুদ্ধি বল।
অমৃত হরিয়া দিল রাখিয়া গরল ॥
হাহাকার করি উঠে প্রাণ নহে স্থির।
গঙ্গাস্রোত যেহেন নয়ানে বহে নীর ॥
অগ্রাণ মাসেতে তনু পুড়িল আগুনে।
সোনার শরীর মোর খাইল দেখ ঘুনে ॥
আহা রে দারুণ বিধি কেন হেন কৈলা।
অগাধ সমুদ্র মধ্যে আমাকে ফেলিলা ॥
প্রাণ বধি পীরিতির নাই কোন হিত।
তুমি ত রসিক প্রভু নাগর পণ্ডিত ॥
হেলায় বধিলা প্রাণ মুই সে অভাগিনী।
যোগিনী হইয়া যাইব পাইব আগুনি।
কারে নি বলিব যে আপনা কর্ম্মফল।
জাতি, কুল, প্রাণ, ধন হারাইলাম সকল ॥

পৌষ মাসেতে বহিল হেমন্তের বাও।
দেখিতে তোমার শীত জ্বলি উঠে গাও ॥
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে মনের আগুনি।
পোড়য়ে অন্তর মোর ... ... ॥
সদা এ অন্তর পোড়ে প্রাণ নহে স্থির।
আষাঢ়ের ধারা যেন নয়ানে বহে নীর ॥
খেনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে হেমন্ত লক্ষণ।
খেনে ধরণীতে পড়ি হয় অচেতন ॥
হৃদয় মাঝারে কৃষ্ণ হানিল প্রেম শেল।
পরাণি লইয়া মোর কোন দেশে গেল ॥
মাঘ মাসেতে স্বপ্ন দেখিল নাগরী।
নাগর সহিত রঙ্গ করয়ে নাগরী ॥
চক্ষু মেলি না দেখিয়া কান্দে দীর্ঘ রায়।
খেনে ধরণীতে পড়ি ভূমিতে লুটায় ॥
না দেখিয়া অভাগিনী আছিলাম ভাল।
দেখিয়া অভাগিনী হইল দ্বিগুণ চঞ্চল ॥
ফাল্গুন মাসের দুঃখ শোন প্রাণ সখি।
পীরিতি আনলে প্রাণ যায় হেন দেখি ॥
ঠেকিয়া পীরিতি কান্দে পুড়ি পুড়ি মরি।
অবিরত স্বরে প্রাণ প্রিয়া প্রিয়া করি ॥
চৈত্র মাসের দুঃখ পূর্ণিত কারণ।
বসন্ত-দেখি পোড়ে মোর মন ॥
মাধব লবঙ্গ ফুল ফুটিছে ঘরে ঘরে।
কারে পরাইব পুষ্প প্রিয়া নাই ঘরে ॥
জানিয়া রাধার ভাব রসের নাগর।
অনুরাগ হইয়া কৃষ্ণ আসিল সত্বর ॥
আজি রাধার শুভ দিন পূরিল বারমাস।
আসিল উদ্ধব কৃষ্ণ পূরিল রাধার আশ ॥
চৌদিকে গোপিনী সবে পুষ্পবৃষ্টি করে।
আনন্দিত হইয়া সব গোপিনী অন্তরে ॥*

ইহা ভিন্ন লীলা ও সীতার বারমাসী আছে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

বাঙালী কবিগণ সুখ অপেক্ষা দুঃখ বর্ণনায়ই অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কবে কোন্ রৌদ্রালোকিত সকালে নববধূ কলসী-কক্ষে নদীতীরে দূর দিগন্তের পানে তাকাইয়া স্বামী বিরহে উদ্গত অশ্রুবিন্দু গোপন করিয়াছে, কখন কোন্ প্রোষিতভর্তৃকা বর্ষামুখরিত সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে দীপ জ্বালাইয়া অজানা ব্যথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে, গ্রাম্য কবি তাহারই সুরে সুরে বিরহ সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—

গগনে গুঞ্জরে দেওয়ায়, সই গো, কোথায় ময়ূর ময়ূরী,
একেলা মন্দিরে রাধায়, প্রিয় মধুপুরী গো,
　　　　শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না।

শূন্য হইল বৃন্দাবন সই, শূন্য সিংহাসন,
একেলা মন্দিরে রাধায় করতেছে রোদন,
　　　　শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না ॥
শূন্য হইল বৃন্দাবন সই, শূন্য তরুলতা,
পশুপাখীর রব না শুনি, না শুনি কৃষ্ণকথা;
　　　　শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না ॥
কাইল বলিয়া গেছে শ্যাম সই, সেই কাইল আসিব কবে;
সেই কাইল আসিব বুঝি আমি রাধা প্যারী মইলে;
　　　　শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না ॥
মথুরাতে নূতন রাজা হয় সই, কুব্জা পাটেশ্বরী,
আমারে করিলেন হরি ব্রজের কাঙালিনী গো;
　　　　শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না ॥

কতকগুলি গ্রাম্য-সঙ্গীতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

ত্রিভঙ্গ হইয়ে বাঁশীটি বাজায়ে
　　　　বসিয়া কদম্বমূলে,
রাধা রাধা বলে রে প্রাণনাথ
　　　　আসিব যমুনার কূলে।
যমুনায় আসিয়া পীরিতি করিব
　　　　হইব তোমার দাসী,
শরাঘাতে বধেছ প্রাণনাথ
　　　　বাজায়ে মোহন বাঁশী।
আগে যায় ছুঁজনা, পিছে যায় ছুঁজনা,
　　　　সকলের কানে রে সোনা,
কৃষ্ণের হাতে মোহন বাঁশী,
　　　　রাধিকার বন্ধু সেই জনা।
আগে না জানিয়া, পিছু না বুঝিয়া,
　　　　যেজন পীরিতি করে,
তুষের আগুনে হৃদয় মাঝারে
　　　　জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।
এ সুখ সংসার সকলি ছাড়িলাম
　　　　তোমার লাগি,
তুমি যদি ছাড়ি যাও প্রাণনাথ,
　　　　হইবা বধের ভাগী।
যমুনায় আসিয়া পীরিতি করিলাম,
　　　　পীরিতির এত জ্বালা,
হাতে ধরে মাথায় লইলাম
　　　　নিজ কলঙ্কের ডালা।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের সংসারত্যাগ-জনিত বেদনাও গ্রাম্য-কবির কবিত্বের উপাদান জুটাইয়াছে—

মা বোল মা বোল শুনলাম না রে
　　　　নইদা চান্দের মুখে,
জন্মাবধি রইল শেল
　　　　অভাগিনীর বুকে।
যখনে জন্মিলা রে নিমাই
　　　　নিমতরুর তলে,
হইয়া কেন ন মরিলা,
　　　　না লইতাম কোলে (রে) ॥

* প্রাচীন পুঁথির সঙ্গে তুলট কাগজে লেখা এই বারমাসীটি পাই। পুঁথি নকলের তারিখ ১২০৩ বঙ্গাব্দ।

নিমতরুর তলে থাক নিমাই,
　　　　নিমের মালা গলে,
মা বলিয়ে কে ডাকিবে,
　　　　সকালে বিকালে ॥

নিমতরুর তলে থাক নিমাই,
　　　　নিমফল খাইল।
আগে তোমার মা মরিলে
　　　　পাছে সন্ন্যাস যাইল ॥

সন্ধ্যাকালে আইল অতিথ,
　　　　রইতে দিলাম ঠাঁই।
প্রভাতে জাগিয়া দেখি,
　　　　নিমাই ঘরে নাই (রে) ॥

বাছিয়া করাইলাম বিয়া
　　　　কুলীনের ঝি,
নিমাই চান্দ সন্ন্যাসে যায়,
　　　　বধূর উপায় কি ॥

ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া
　　　　জলন্ত আগুনি,
কতকাল রাখিব মায়,
　　　　দিয়া সুখের পানি (রে) ॥

এমন মগধের দেশে
　　　　মক্কে কেমন জনা,
নিমাই চান্দ সন্ন্যাসে যায়
　　　　কেউ না করে মানা ॥
বিদেশে বিরাজে যায়
　　　　পুত্র মইরে যায়,
অন্ত কেহ না জানিতে
　　　　আগে জানে মায় (রে) ॥

এই সব গ্রাম্য-কবির গান লোকলোচনের অন্তরালে বসন্তকালের বন্যপুষ্পের মতই গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহার এই অসংস্কৃত রূপ, অমার্জিত ভাব সমস্তই গ্রামবাসীদের নয়নে, মনে ভাল লাগিয়াছে। এই গান তাহাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত; ইহা হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, আর পারিলেও তাহা শোভন হইবে না। এখনও যে পল্লীমায়ের কোলে এতটুকু শান্তি বিরাজ করিতেছে তাহার উৎস ঐখানেই। সম্প্রতি বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কার সেই উৎসমুখে পাথর চাপা দেওয়ার উপক্রম করিতেছে।

বিরহিণী

শ্রীরাধারাণী দত্ত

রৌদ্রদীপ্ত দিগন্তের মেঘচ্ছবি আঁকা সীমাশেষে
প্রান্তর অধরে যেথা আকাশের ওষ্ঠ আসি মেশে
নিবিড় আগ্রহ ভরে। ওরি পানে চেয়ে চেয়ে আজ
ভাবি মনে কত কী যে। শিথিল উদাস মর্ম্মমাঝ
অন্যমনা চিন্তারাশি ভেসে চলে ছন্দোবন্ধহীন,
শরৎ মেঘের সম শীর্ণ শুভ্র। আজি অমলিন
সুন্দর শীতের রৌদ্রে সুমিষ্ট মাধুর্য্য সুধা রস
ক্ষরিয়া পড়িছে যেন। চিত্তে লাগে বিরহ পরশ
বেদনা ভারাবনত, কার লাগি নাহি তাহা জানি,
দিছে মর্ম্মের তারে ভাষাহারা অকথিত বাণী।

অকারণ ঘন দুঃখে ওষ্ঠাধর ওঠে কেঁপে কেঁপে
শ্রাবণ-মেঘের সম বেদনা নামিছে প্রাণ ব্যেপে।
জীবন-দুয়ারে আসি যে অতিথি অতীত প্রভাতে
অশ্রু পরিম্লানমুখে ফিরেছে হতাশে শূন্যহাতে
সে দুখকাতর দিঠি সে মুখের মৌন ব্যথা রেখা
আমার নির্জ্জন ক্ষণে নিঃসঙ্গ মনের পটে লেখা।
বিহ্বল এ প্রাণে আজ বারে বারে জেগে ওঠে তাই
তারি আঁখি, স্মৃতি যার নিঃশেষে মুছিতে নিত্য চাই।

কৈশোরক

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আচ্ছা, একটা গল্প বলিতেছি, শোন। কিন্তু ভাল না লাগিলে আমায় দোষ দিও না।

সে অনেক দিনের কথা। আমার তখন বয়স কম। সবে বাল্য অতিক্রম করিয়াছি, এবং গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ, জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ অংশে উপস্থিত হইয়াছি—সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের কবিগণ নিয়ত যাহার জয়গান করিতেছেন। পৃথিবী তখনও আমার চোখে নূতন। জীবন অর্থপূর্ণ, রহস্যময়।

তোমরা বলিবে "এই রে! সেই পুরনো একঘেয়ে তরুণ আর প্রেমের গ সুরু করিল বুঝি!"

প্রেমের গল্প কিনা সেটা পরে বিচার করিও। কিন্তু আমার তরুণ বয়সের কাহিনী, তাহা স্বীকার করিতেছি। তারুণ্য একটা অপরাধ নয়। বরং, এই বয়সে, যখন উহাকে আর ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই, উহাকে আমার পরম কাম্য বস্তু মনে হইতেছে।

আমার মনে আছে, একদিন গ্রামের ডাক্তারখানায় কয়েকটা জিনিষ কিনিতে গিয়াছিলাম। কম্পাউণ্ডারবাবু সেগুলা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই নিন আপনার জিনিষ।" আমার জীবনে সেই প্রথম 'আপনি' সম্বোধন! আমার যেমন বিস্ময় বোধ হইল, তেমনি আনন্দ হইল। মনে হইল, বহুদিনের নীরব বীণার তারে কেহ আঘাত করিল। তাহার ঝঙ্কার আমার কানে সকল কাজের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ বাজিতে লাগিল—"নিন্ নিন্, আপনার জিনিষ নিন্।"

যৌবনের সেই উন্মেষ! সে যেন হঠাৎ নিজেকে নিজে আবিষ্কার করিলাম। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তখন নূতন বিস্ময়ে নূতন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। সম্ভাবনার তখন অন্ত নাই; আশা তখন বিশ্বগ্রাসী, কল্পনা বাধাহীন।

সেই সময়ের কথা। প্রতিদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙিয়া মনে হইত আজ আশ্চর্য্য একটা কিছু ঘটিবে; যাহা কোনো দিন ঘটে নাই, যাহা অসম্ভব—এমন একটা কিছু হয়ত ঘটিবে।

একদিন তাহাই ঘটিল।

সকালে ঘুম ভাঙিয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিতেই চোখে পড়িল, পাশের বাড়ীর বাগানে দামী কাপড় পরিয়া কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বেড়াইতেছে। আর আমার জানালার কাছেই একটি মেয়ে ফুলগাছ হইতে ফুল পাড়িতেছে। আমার সহিত চোখোচোখি হইতেই মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল।

সে যে আমার কি ভাল লাগিল, তা বলিতে পারি না। মনে হইল, শিশির-সিক্ত গোলাপের উপর প্রভাতের প্রথম রৌদ্র ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। আনন্দের আর সীমা রহিল না। হৃদয় যেন বাঁশীর মত বাজিয়া উঠিল। বলিতে চাহিল,—"কি সুন্দর! কি সুন্দর!"

মেয়েটি হয়ত আমার বয়সীই হইবে, কি আমার চেয়ে দুই এক বছরের বড়ই হইতে পারে। বাস্তবিক হয়ত সে দেখিতে অসাধারণ নয়; হয়ত কেবল সুশ্রী মাত্র। কিন্তু আমার সদ্য-ঘুমভাঙা চোখে তাহাকে অপরূপ লাগিল।

জানি, তোমরা হাসিতেছ। কিন্তু স্বীকার না করিয়া উপায় নাই,—আমার বারংবার মনে হইল,—এমনটি ত আর কখনও দেখি নাই, - এমনটি কখনও দেখি নাই। মনে মনে বলিলাম—"এই যে দেখিলাম, এই ত পরম লাভ। এই আমার মহার্ঘ সম্পদ।"

মেয়েটির মধ্যে কুণ্ঠার লেশমাত্র নাই। আমি তাহার পানে অপলকনেত্রে চাহিয়া আছি দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইল না। হাসিমুখে ফুল পাড়িয়া আঁচলে ভরিতে লাগিল। ফুল পাড়া শেষ হইলে সে বাড়ীর দিকে চলিল। চলিতে চলিতে এখানে-ওখানে থামিয়া, কখনো এগাছ হইতে একটা ফুল, কখনো ওগাছ হইতে একটা ফল বা

দু'টা পাতা ছিঁড়িয়া চলিল। বাড়ী পৌঁছিবার আগেই আঁচল একেবারে ভরিয়া উঠিল।

দরজার কাছে গিয়া মেয়েটি এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল; মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে তাকাইল। আমি তখনও তাহার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া মৃদু হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলাম,—"আমি দেখিয়াছি,—দেখিয়াছি। আজিকার প্রভাতটি আমার সার্থক হইল।"

আমার ছোটো বোন ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—"জানো দাদা, জনার্দ্দনবাবুদের বাগানে এতদিন ত কেউ থাকৃতো না;—কালকে রাত্তিরে ওরা সব এসেছে। ওদের মেয়েটি কি সুন্দর শাড়ী পরে সকালে বাগানে বেড়াচ্ছিল। কি রকম করে পরেছিল, জানো? আমাদের মতন করে নয়। কেমন সুন্দর এ—ম্নি করে পরেছিল। আর কেমন চমৎকার চুল বেঁধেছে - বিনুনি করে নয়, এম্নি। আন্দ মালী বলছিল, ও কলকাতার ইস্কুলে অনেক পড়েচে। গান গাইবার জন্তে প্রাইজ পেয়েচে;—আমিও কলকাতার ইস্কুলে পড়ব দাদা; আমাদের এখানকার ইস্কুলটা ভাল নয় - প্রাইজ নেই, কিচ্ছু না—"

এমনি সে অনর্গল বকিয়া চলিল।

শহরের মেয়ে। ঠিক ত। তখন ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু মনে পড়িল তাহার কাপড়-পরার শোভন ভঙ্গীটি, তাহার সহজ আচরণ, তাহার অকুণ্ঠিত হাসি,—সমস্তই নূতনই ত বটে!

সেদিনটা আমার শরতের লঘু মেঘের মত অনায়াসে কাটিয়া গেল। কোন কাজই বিরক্তিকর মনে হইল না। কোন পরিশ্রমেই ক্লান্তি আসিল না।

সমস্তদিন ধরিয়া জানালার কাছে বসিয়া কাজ করিতে করিতে দুই-তিনবার মেয়েটিকে বাগানের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্ত। আর সে আমাকে দেখে নাই। কেবল মনে হইতে লাগিল,—আবার কখন তাহাকে ভাল করিয়া দেখিব;—আবার কখন তাহার প্রসন্ন হাসিটি প্রভাতের আলোয় উজ্জল হইয়া উঠিবে।

জানি, তোমরা বলিতেছ—"এ ত জানাই ছিল বাপু! সুন্দরী মেয়েটিকে প্রথম ঘুম ভাঙিয়াই দেখিলে, আর তার প্রেমে পড়িয়া গেলে। এমনি ত হইয়াই থাকে। মাসিকপত্রের গল্পের কল্যাণে সেটা জানিতে কাহারও বাকি আছে কি?"

কিন্তু এ'ত সে নয়! সেই বিশেষ মুহূর্ত্তে আমি সেই বিশেষ মেয়েটির প্রেমে পড়িয়াছিলাম কিনা, জানি না। কিন্তু আজ এই জীবনের শেষপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিতেছি,—অনেক বড় বড়, অনেক প্রয়োজনীয় ঘটনা যখন নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে, তখনও আমার যৌবনের প্রারম্ভে সেই কয়টা দিনের বিমল আনন্দের স্মৃতি অন্তরের মণিকোঠায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ওকথা থাক্, গল্পটাই বলি।

তার পরদিন বোধ হয় একটু বেশী সকালেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছিল। জানালা দিয়া দেখিলাম, পাশের বাড়ীর বাগানে তখনও কেহ বাহির হয় নাই। কেবল আন্দ মালী মাথায় গামছাখানা বাঁধিয়া গাছে জল দিবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময়ে বাড়ীর দরজা খুলিয়া মেয়েটি দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিল। আমার জানালার কাছে যে ফুলগাছটা ছিল, সেখানে আসিয়া ফুল পাড়িতে গিয়া আমায় দেখিতে পাইল; আর হাসিয়া ফেলিল। তারপর ফুলের সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।

আন্দ মালী ডাকিয়া কহিল, "বেশী ফুল খেও না দিদিমণি,—বাবু বারণ করেছেন, অসুখ করবে।"

সে হাসিয়া বলিল,—"বেশী আর কই? দশ-বারটা ত মোটে খেয়েছি।"

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি বুঝি বাগানের শোভা দেখবার জন্তে ভোরে উঠে জানলায় বসে আছ? ভোরবেলায় এই গাছের পাতায়, ঘাসের ওপর শিশির ঝল্‌মল্ করছে,—আর ধোঁয়ার মত কুয়াসা—বেশ চমৎকার, না?"

আমি ভয়ানক ঘাবড়াইয়া গেলাম। সে যে হঠাৎ

আমার সহিত এরূপভাবে কথা বলিবে, তাহা আমার স্বপ্নেরও আগোচর ছিল। অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি জানালা হইতে সরিয়া আসিলাম। কিন্তু পাখীর গানের মত তাহার কণ্ঠস্বর আমার কানে সর্ব্বক্ষণ বাজিতে লাগিল।

তাহার কথাটার কোনো উত্তর না দিয়া চলিয়া আসাটা অভদ্রতা হইয়া গেছে মনে করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে জানালায় আবার আসিয়া দেখিলাম,—সে চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন দু'পর বেলা ছোড়দির ঘরের সামনে বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে ঘরের মধ্যে পাশের বাড়ীর মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। ভাল করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়া আরও আশ্চর্য্য হইলাম,—তাহারা আমার বিষয়ে কথা কহিতেছে!

দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেই সে আমাকে দেখিতে পাইল। কৌতুক হাস্যে তাহার মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

ছোড়দি প্রথমে আমাকে দেখিতে পায় নাই। সে দরজার দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মুখের এই ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিয়া ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে দেখিল। হাসিয়া কহিল,—"কি রে? কি খুঁজচিস্?"

আমি অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। মনে হইল একটা অত্যন্ত অকাজ করিতে করিতে ধরা পড়িলাম। ঢোঁক গিলিয়া বলিলাম, "আমি তোমার,—এই—আমার বইখানা পাচ্ছি না—আমার জিওমেট্রিখানা—কালকে পরীক্ষা আছে কিনা—"

ছোড়দি হাসিয়া ফেলিল। মেয়েটি সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "আমি কিন্তু তোমার বই নই।"

তাহারা দু'জনেই আবার হাসিয়া উঠিল। তার পর ছোড়দি সদয় কণ্ঠে কহিল,—"আয়, এখানে এসে বোস্।"

আলাপ জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেই মেয়েটি! তাহার আচরণ এত সহজ, এত অকুণ্ঠ তাহার চোখের চাহনি এত অসঙ্কোচ যে, সে যেন মাঝে মাঝে আমাকে বিদ্ধ করিতেছিল। আমি একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ভদ্রলোক, বাংলা সাহিত্যের কোনো গ্রন্থই আমি পড়িতে বাকি রাখি নাই, ইংরেজী সাহিত্যের বহু পাঠ্য, অপাঠ্য বই পড়িয়াছি, ডিবেটিং ক্লাবে ছেলেরা আমার প্রবন্ধ শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে আমার সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ হইয়াছে, এমন কি বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার-বাবু পর্য্যন্ত ইদানীং আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—অথচ এই মেয়েটি আমাকে লজ্জা করা দূরে থাক—কিছুমাত্র সমীহও করিতেছে না।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "তুমি বুঝি ফুল খেতে খুব ভালবাস?—আচ্ছা, কাল আমি তোমাকে অনেক ফুল পেড়ে দেব।"

মেয়েটি মাথা দোলাইয়া বলিল—"বাসিই ত!"

তারপর পাল্টা প্রশ্ন করিল—"আর তোমার বুঝি আমায় দেখ্‌তে খুব ভাল লাগে?—আচ্ছা, কাল থেকে আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার জানলার সাম্‌নে বেড়াব।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। এমন কি মনে মনে একটু বিরক্ত হইলাম। ইহার কি কিছুতেই আটকায় না?

ছোড়দি বলিল, "সত্যি বল্‌ছি ভাই;—শুধু ও কেন, আমারও ইচ্ছে করে অনেকক্ষণ ধরে তোমায় দেখি। তোমায় দেখলেই আনন্দ হয়।"

সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। তারপর হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এই বুঝি তোমার বই খোঁজা হচ্চে? কাল না তোমার জিওমেট্রির পরীক্ষা আছে?"

কি রূঢ় তাহার কথাগুলা!

আমি অত্যন্ত আহত হইলাম। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার ঘরে চলিয়া আসিলাম।

ঘরে আসিয়া জ্যামিতিখানা খুলিলাম। কিন্তু তাহার বৃত্তগুলা ত্রিকোণ বলিয়া বোধ হইল; এবং সরল রেখাগুলাও অতিশয় বক্র ঠেকিল। সুতরাং বইখানা আস্তে আস্তে মুড়িয়া রাখিলাম।

কি দুর্ব্বোধ্য এই মেয়েটি! এতক্ষণ তাহার সঙ্গে কাটাইয়া আসিলাম, কিন্তু তাহার রহস্যের কোনো অন্ত পাইলাম না। সে বিদ্যুৎ রেখার মত দীপ্ত, মনোহর; অথচ কত বড় প্রচণ্ড আঘাতই না তাহার মধ্যে উদ্যত

হইয়া থাকিতে পারে। আমার সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের সীমা নাই। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, আমার বিষয়ে জানিবার জন্যই সে ছোড়দির কাছে আসিয়াছিল; অথচ কত সহজেই সে আমাকে নিষ্করুণ আঘাত করিল।

মনে মনে কহিলাম,—ওরে নির্ব্বোধ, এ তোর ঠিকই হইয়াছে। কি আছে তোর? কিসের স্পর্দ্ধায় তুই তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলি? নগণ্য গ্রামের নগণ্য বালক তুই, ওই তড়িৎ-শিখার মত নগরবাসিনীর কাছে যে তুই নিজেকে জাহির করিতে গিয়াছিলি, তার উপযুক্ত শাস্তিই ত হইয়াছে। কেমন সে তোকে বিদ্রূপ করিল—"আমাকে বুঝি তোমার খুব ভাল লাগে?"

সেরাত্রে শুইবার সময় আমার বিছানার পাশের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলাম।

তোমরা হাসি আর চাপিতে পারিতেছ না? কিন্তু কি করিব? নিরুপায়! বলিতে যখন আরম্ভ করিয়াছি, তখন সমস্তটা বলিতেই হইবে। একথাও বলিয়া রাখি, সেন্টিমেন্টালিজম্ জিনিষটা হাসির হইলেও, মানুষের জীবনে এমন সময় আসিতে পারে যখন ঐ বস্তুটার প্রতি সে অতিশয় প্রলুব্ধ হয়। আর সেন্টিমেন্টালিজম্‌টা নিছক অকেজোও নয়। অন্ততঃ উহা হাস্যরসের চমৎকার উপাদান—একথা অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু তর্ক থাক্। গল্পটা শেষ করিয়া ফেলি।

তিন চারি দিন পরে ছোড়দি সন্ধ্যার সময় আমার ঘরে আসিয়া বসিল। একথা-ওকথার পর কহিল,—"জানিস্, কাল ওরা চলে যাচ্ছে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। চলিয়া যাইতেছে! কিন্তু তাহাতে আমার কি? শুষ্ককণ্ঠে কহিলাম, "চলে যাচ্ছে, তা আমি কি করব?"

ছোড়দি আশ্চর্য্য হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। "বলিস্ কি রে? ওরা চলে যাচ্ছে শুনে গাঁ-সুদ্ধু লোকে দুখ্খু করছে;—ছোটমামী ত ওর গলা ধরে কেঁদেই ফেল্লে।—আর তুই—"

আমি কহিলাম, "তা, আমি কি ওদের ধরে রাখ্‌ব না-কি?"

ছোড়দি অবাক হইয়া কহিল, "শোনো কথা ছেলের! আমি কি তাই বলিছি না-কি?—ঘাট হয়েছে বাবু, তোমাকে বলতে আসা।"

সে রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

উহারা চলিয়া যাইতেছে। তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? জীবনে এমন অনেকেই ত ক্ষণিকের জন্য আমাদের অনাড়ম্বর যাত্রাপথে উৎসবের রাগিণী গাহিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রথম দুই-একদিন দুঃখ বোধ করিয়াছি মাত্র। তাহাদের সুখের প্রদীপ্ত আলোকে একটা সম্পূর্ণতর, একটা বিস্তৃততর জীবনের আভাস অনুভব করিয়াছি; ক্ষণকালের জন্য তাহাদের আনন্দিত চঞ্চল পদধ্বনিতে, শুধু চলার সার্থকতাতেই চলিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি মাত্র। তাহার বেশী নয়।

একবার মনে হইল ছোড়দিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, আবার কবে উহারা আসিবে। তার পরেই মনে হইল, তাহা জানিয়াই বা আমার লাভ কি?

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমার ঘুম আসিল না। আলোকহীন নির্জ্জন ঘরে বসিয়া, আমি বার বার বলিলাম—"তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছ, সেই আমার ভাল। তুমি আমাকে যে দুঃখ দিয়াছ, সেই আমার জীবনে ফুলের মত ফুটিয়া থাকুক। আর কখনও তোমায় দেখিব কিনা জানি না, কিন্তু তোমার স্মৃতি আমার অন্তরে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।"

ভোরে ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মেলিতেই দেখিলাম, পাশের বাড়ীর মেয়েটি ঘরে ঢুকিতেছে। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিছু না বলিয়া চোখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সে হাসিমুখে বিছানার পাশের জানালাটা খুলিয়া দিতে দিতে বলিল, "জানলাটা বন্ধ করে রাখ কেন? বাগানটা দেখ্‌তে বুঝি তোমার আর ভাল লাগে না? সত্যি ভারি বিশ্রী বাগানটা। কেবল কতকগুলো কাঁটা-ওয়ালা ফুলগাছ, আর ঘেঁটুর জঙ্গল।"

আমি নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম।

"আমরা আজ চলে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই চলে যাবো। আবার কবে আস্‌ব ঠিক নেই। তোমার

জানলাটা আর বন্ধ করে রাখবার দরকার হবে না। ওটা খুলে রেখো।"

তারপর হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আমার হাতখানা দুই হাতে ধরিয়া অত্যন্ত মিনতি করিয়া কহিল,—"তুমি আমার ওপর রাগ করেছ—না?—বলো?"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। মনে মনে কহিলাম,—এর ত কোনো প্রয়োজনই ছিল না। রাগ যদি আমি করিয়া থাকি ত সে তোমার উপর নয়,—আমার নিজের উপর।

উত্তর দিলাম না দেখিয়া সে আবার কহিল,—"আচ্ছা, দোষ করে থাকি ত—না হয় মাপ চাচ্ছি।"

আমার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। চোখে জল আসিয়া পড়িল। অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সে হাসিয়া ফেলিল।

আমার অত্যন্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া হাসিমুখেই বলিল—"জানো, প্রথম দিন দেখেই তোমাকে আমার ভারি ভাল লেগেছিল।—সত্যি বল্‌ছি। ..আচ্ছা বলো না, আমাকেও তোমার প্রথমে দেখেই ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল,—না? আমাকে প্রায় ভালবেসে ফেলেছিলে,—নয়?"

একি অপ্রত্যাশিত আঘাত! চোখ দিয়া জল পড়িবার উপক্রম হইল। কিন্তু বিস্ময়েরও আর সীমা রহিল না। এ বলিতেছে কি? কিছুই কি ইহার মুখে বাধে না?

কিন্তু আরও বিস্ময়ের কারণ ঘটিল। এই অত্যাশ্চর্য্য মেয়েটি অসঙ্কোচে আমার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—"বলো না! সত্যি আমায় তোমার ভাল লাগে নি?—আমার ত তোমাকে খুব ভাল লেগেছে।—লক্ষীটি, বলো।"

আমার অসহ্য বোধ হইল। তাহার হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইলাম। সে আবার মিনতি করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময়ে অন্ধ মালীর গলা শুনিতে পাওয়া গেল,—"দিদিমণি, শীগ্‌গির—গাড়ী এসেছে।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুণ্ণিতভাবে বলিল—"বললে না? রাগ বুঝি এখনও পড়েনি?—তুমি - আচ্ছা, থাক্। চল্‌লুম।"

বলিয়া মৃদু হাসিয়া স্বচ্ছন্দে আমার গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া, সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। আমার ভাল লাগিল কিন্তু এমন ছেলেমানুষের মত আমার গাল টিপিয়া দিয়া গেল দেখিয়া অপমানে চোখে জলও আসিয়া গেল। বিচ্ছেদের অশ্রু তাহাকে আরও বাড়াইয়া দিল।

তারপর আর তাহাকে দেখি নাই। মাঝে মাঝে সংবাদ পাইয়াছি মাত্র। প্রথম প্রথম কিছুদিন সে ছোড়্‌দিকে নিয়মিত পত্র দিয়াছিল, এবং প্রতি পত্রেই আমার কথা জিজ্ঞাসা করিত। এমন কি আমি কখনো কলিকাতায় গেলে তাহার সহিত দেখা করিতেও অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু আমি কলিকাতায় কখনো যাই নাই।

ক্রমে তাহাদের পত্র-ব্যবহার কমিয়া গেল। তারপর বন্ধ হইয়া গেল।

আজ এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লইয়া বুঝিতে পারি,—আমি তাহাকে সত্যসত্যই ভালবাসিয়া ফেলি নাই; এবং তাহার পক্ষেও আমাকে ভালবাসার মত হাস্যকর অসম্ভব ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সেই আমার তরুণ বয়সে সেই যে সুন্দরী মেয়েটি আমাকে বলিয়াছিল,—"তোমাকে, আমার ভারি ভাল লেগেছে"—সেদিন আমি তাহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

এই শুনিলে গল্প? কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি গল্পটা তোমাদের ভাল লাগিল না। তোমরা বলিতেছ—"এ কখনও সত্যি নয়; এমন কখনও হইতেই পারে না।"

সে ত ঠিকই! গল্প কখনও সত্য হয়?

সিংহল-প্রবাসী বাঙালী

ডাঃ শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ডি, এস্‌সি

বিজয়া উপলক্ষে গত ২৭শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর) কলম্বোর নিকটবর্ত্তী কালুতারা শহরে সিংহল-প্রবাসী প্রায় সকল বাঙালীর সম্মিলন হইয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে সিংহল-প্রবাসী বাঙালীদিগের কথা একবার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দুই বৎসরের মধ্যে সিংহলে বাঙালীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রাজা বিজয়ের দেশের প্রতি বাঙালীর বংশগত আকর্ষণ ইহাতে সূচিত হয় কি না জানি না, তবে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 'তাম্রগন্ধী' আখ্যা দিয়াছেন, সেই মুদ্রাবিশেষের আকর্ষণ যে বাঙালীকেও ঘর ছাড়িয়া সুদূর সিংহলে টানিতে সক্ষম করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙালীর ভীরু ও 'কুণো' নাম ইহাতে অনেকটা কাটিয়া যাইবে বলিয়া ভরসা হয়। বাংলা দেশের কঠিন জীবন-সংগ্রামের ইহা একটি সুফল বলিতে হইবে।

জীবিকা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা একে একে সিংহলে আসিয়া জুটিয়াছেন, তাঁহাদের নাম, পরিচয় ও কর্ম্ম-কাহিনী পর পর সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রবাসী বাঙালীদের কথা পূর্ব্বে একবার প্রকাশিত হওয়ায় এই প্রবন্ধের কতক অংশ পুনরুক্তি বলিয়া মনে হইবে। ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে, ভারতের বাহিরেও বাঙালীর খ্যাতি আছে এবং ইহাও কম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় নহে যে, সুদূর সিংহলেও বাংলার আব্‌হাওয়া ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হইতেছে।

১। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, ইলেক্ট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম সিংহলে কর্ম্ম লইয়া আসেন। ১৯১৭ সাল হইতে ইনি কলম্বোতে সপরিবারে অবস্থান করিতেছেন। বোম্বে ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেক্‌নিকেল্ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে ইনি ইলেক্‌ট্রিকেল্ ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ করেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি বিলাতের বিখ্যাত কারখানাগুলি পরিদর্শন করিয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

২। শ্রীযুক্ত অজয়নাথ ঘোষ, বি-এ। ক্যাণ্ডির নিকটবর্ত্তী নাওয়ালাপিটিয়া শহরে অনুরুদ্ধ কলেজে ইনি

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী

অধ্যক্ষের কাজ করিতেছেন। ইনি বেঙ্গলী ও হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক স্বর্গীয় যদুনাথ ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র। প্রায় নয় বৎসর সিংহল-প্রবাসী। অনুরুদ্ধ কলেজের বর্ত্তমান উন্নতি ঘোষ মহাশয়েরই চেষ্টা ও উৎসাহের ফলে সম্ভব হইয়াছে।

৩। শ্রীযুক্ত দেবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বি, ইঞ্জ, (শেফিল্ড্) এ-এম্-আই-ই-ই। ১৯২৩ সাল হইতে ইনি কলম্বো গবর্ণমেণ্ট টেক্‌নিকেল্ কলেজে অধ্যাপনার কাজ করিতেছেন। ইঁহার পিতা বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত উত্তমলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের সহপাঠী ও বন্ধু। অধ্যাপনা ব্যতীত নাট্যকলায় ইঁহার খ্যাতি আছে। রেঙ্গুন হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল

শ্রীযুক্ত অজয়নাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত দেবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী দয়া দেবী

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ইঁহার সহধর্ম্মিণী।

৪। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, টেলিগ্রাফ ইন্‌স্পেক্টর। ছয় বৎসর পূর্ব্বে অতি অল্প বয়সে ইনি কলম্বোতে আসেন। স্বাবলম্বন-গুণে ইনি লণ্ডন ম্যাট্রিক্ এবং সিটি ও গিল্ড্‌সের টেলিগ্রাফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্ট বেতার-বিভাগে কাজ করিতেছেন। সম্প্রতি সিটি ও গিল্ড্‌সের ইলেক্‌ট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং

শ্রীসত্যনারায়ণ ঘোষাল　শ্রীকমলাক্ষ বসু　শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহা[illegible] ব্যতীত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গীত এবং সা[illegible] বেশ খ্যাতি আছে।

৫। ডাঃ ভূপেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম্-আর[illegible] (আয়েরল্যাণ্ড্) ডি পি-এইচ্ (লণ্ডন) হেল্‌থ অ[illegible], কালুতারা। পাঁচ বৎসর যাবৎ ইনি সিংহলের বি[illegible] শহরে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছেন। বিক্র[illegible] ভেলীরবাগের বিখ্যাত দাস-বংশে ইঁহার জন্ম। [illegible] শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের কন্যা ইঁহার প[illegible]

ডাঃ দাসগুপ্ত সম্প্রতি আমেরিকার পাবলিক অনুষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। রক[illegible] বৃত্তি লইয়া ইনি সিংহল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক [illegible] হইয়াছিলেন।

৬। ডাঃ প্রভাতচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, ডি-এস[illegible] (লণ্ডন)। ১৯২৫ সাল হইতে কলম্বো য়ুনিভ[illegible] কলেজে অধ্যাপনার কাজ করিতেছেন। আ[illegible] আন্তর্জাতিক বোটানিকেল্ কন্‌ফারেন্সের পঞ্চম অধি[illegible] কেম্ব্রিজে সম্পন্ন হইবে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় [illegible] সিংহলের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হইয়াছে[illegible]

আগামী লণ্ডন হর্টিকাল্‌চার কন্‌ফারেন্সের নবম অধিবেশনেও ইনি সিংহলের প্রতিনিধির কাজ করিবেন। ইহার পূর্ব্বেও ১৯২৭ সালে সাম্রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়

ডাঃ ভূপেশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও তাঁহার পত্নী

ব্রিটি... এসোসিয়েসন্ (বিজ্ঞান সমিতি) ও ...র এক ডেমীতে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সিংহলের প্র... ...স্থিত ছিলেন।

... ...গারী স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও ... সর্ব্বাধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র। এলাহাবাদের ... ...চন্দ্র মিত্রের পৌত্রী ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ... কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে।

... নলিনাক্ষ বসু, বি-এস্‌সি (Eng.) ... সিংহল গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার। ...বিদ্যালয়ের ইনি কৃতী ছাত্র। গণিতশাস্ত্র ও ... ইঞ্জিনিয়ারিংএ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ... হইয়াছিলেন। ১৯২৭ সালে ইনি সিংহলে আগমন করেন। সিংহলের প্রাচীন শহর অনুরাধাপুর ইহার বর্ত্তমান কর্ম্মস্থল। প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে গিয়া সকল ভারতীয়ই বসু-মহাশয়ের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া আসেন।

ডাঃ প্রভাতচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ও তাঁহার পত্নী ; ডাঃ ভানুভূষণ দাসগুপ্ত ও তাঁহার পত্নী

৮। শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র দে, এম্‌-এ (লণ্ডন)। ১৯২৭ সাল হইতে দে মহাশয় য়ুনিভার্সিটি কলেজের ইতিহাস-বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে ইহার পিতা। ইহার পত্নী কলিকাতার স্বরাজ-দলের শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসুর কন্যা।

৯। ডাঃ ভানুভূষণ দাসগুপ্ত, পিএইচ্‌, ডি (কলিকাতা), বি-এস্‌সি (লণ্ডন)। ১৯২৭ সাল হইতে ইনি য়ুনিভার্সিটি কলেজে অর্থনীতি-বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। ঢাকার অনাথ-আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেনের কন্যা ইহার পত্নী। বাংলা দেশের কৃতী ছাত্রী শ্রীসুধা সেন, বি-টি, দাসগুপ্ত মহাশয়ের শ্যালিকা। শ্রীসুধা সেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি বি-এ উপাধি পাইয়াছেন।

দাসগুপ্ত মহাশয়ের পত্নী সঙ্গীত-বিদ্যায় সুনিপুণ। কেবল বাঙালী বা ভারতীয় নহে—সিংহলবাসী সকলেই ইহার গান শুনিয়া মুগ্ধ। দাসগুপ্ত মহাশয় নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ।

সিংহলকে সঙ্গীত-বিবর্জ্জিত দেশ বলা যাইতে পারে—

স্বদেশীয় সঙ্গীত ও সাহিত্যের পরিবর্ত্তে ইংরেজী সঙ্গীত ও সাহিত্যের মোহই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। ইংরেজী সঙ্গীত ও সাহিত্যের চর্চ্চা কিছুমাত্র নিন্দনীয় নহে, কিন্তু হাল্‌কা Jazzএর তথাকথিত সুরই যখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নামে কাটিয়া যায় এবং দেশীয় সঙ্গীত

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বসু

অশ্রাব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন সিংহলের আর্ট-বোধকে মন্দ না বলিয়া উপায় নাই। সম্প্রতি সাহিত্য ও সঙ্গীতে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রতিক্রিয়ার মূলে সিংহল-দেশের কয়েকজন হিন্দু ও বৌদ্ধ নেতার প্রচেষ্টা বর্ত্তমান। পরলোকগত সার অরুণাচলম্, সার রামনাদন, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল, শ্রীযুক্ত ডিসিল্‌ভা, পরলোকগত ডাঃ হেওয়াভিরাণে, শ্রীযুক্ত জয়তিলক বিপুলানন্দ স্বামী, শ্রীযুক্ত কুলবসু, শ্রীযুক্ত সুন্দরলিঙ্গম্ প্রভৃতির নাম এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। য়ুনিভার্সিটি কলেজের ডাঃ মালালাশেখর রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে সিংহলী ভাষায় নাট্যকার জন্ ডিসিল্‌ভা তাঁহার নাটকের গানে সুর দিতে কলিকাতা হইতে একজন বাঙালী গায়ককে আনিয়াছিলেন। উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীত যে সিংহলের শিল্পরসবোধকে আপনার স্বাভাবিক গতি ও সুর আনিয়া দিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সিংহল-প্রবাসী বাঙালীদের ভিতর যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁহারা এই হিসাবে সিংহলের উপকারই করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র দে ও তাঁহার পত্নী

১০। ডাঃ সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ডি., এস্‌সি. (এডিনবরা)। ১৯২৮ সাল হইতে য়ুনিভার্সিটি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন।

১১। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম এ। নাতালে বৌদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া ইনি কয়েক মাস হইল পুনরায় সিংহলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় কলম্বো বৌদ্ধ বালিকা কলেজের অধ্যক্ষের কাজ প্রায় তিন বৎসর করিয়াছিলেন। সিংহলের বিদ্বজ্জনসমাজে ইঁহার যথেষ্ট সুনাম আছে।

পূর্ব্বকালে পালি বা বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অনেক বাঙালী ছাত্র সিংহলে আসিতেন। পরলো

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বিদ্যোদয় পিরিবিন্এ বৌদ্ধ-দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত নিতাইবিনোদ গোস্বামী ধম্মপদ অধ্যয়ন করিতে সিংহলে আসিয়াছিলেন। অধুনা লণ্ডন বিশ্ব-

ডাক্তার সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বিদ্যালয়ের পরীক্ষার মোহেই বাঙালী ছাত্র সিংহলে [illegible] থাকেন। প্রতি বৎসরই দুই চারিটি বাঙালী ছাত্র পরীক্ষার্থী থাকেন। এই বৎসর লণ্ডন ম্যাট্রিকিউলেশনের জন্য শ্রীমান সুধীরকুমার ঘোষ, শ্রীমান কমলাক্ষ বসু ও শ্রীমান সত্যনারায়ণ ঘোষাল কলম্বোতে আসিয়াছেন। শ্রীমান্ কমলাক্ষ বসু, ইঞ্জিনিয়ার বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ [illegible]। শ্রীমান্ সত্যনারায়ণ ঘোষাল স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট-সম্পর্কীয়। বাঙালী মজ্‌লিশে ইনি গানের জন্য বিশেষ আদৃত।

ছাত্র ব্যতীত প্রতি বৎসরেই ব্যবসার খাতিরে দুই চারিটি বাঙালী সিংহলে আসিয়া প্রবাসী বাঙালী-সমাজের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই বৎসর যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অখিলভূষণ রায় চৌধুরীর নাম করা যাইতে পারে।

সিংহলে স্থায়িভাবে প্রায় দশ বারো জন বাঙালী বৌদ্ধ আছেন। দুঃখের বিষয় ইঁহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর। সিংহলের বিভিন্ন বিহারে ইঁহারা ভিক্ষু। শোনা যায়, ইঁহারা সকলেই চট্টগ্রামবাসী।

সিংহলের পূর্ব্বতন বাঙালী প্রবাসীদিগের মধ্যে ডাঃ কালিদাস নাগ ও চিত্রকর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

ডাঃ নাগ গল্ মাহিন্দ কলেজে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতের এবং বিশেষ করিয়া বাংলার নানা বিষয়ে ইনি বক্তৃতা দিয়া সুনাম ত অর্জ্জন করিয়াছিলেনই —সিংহলে জাতীয়তার উদ্বোধনেও সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ের প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানটির সহিত এদেশীয় লোকের এত বেশী পরিচয় ঘটিয়াছিল যে এখনও সভা-সমিতিতে "বন্দে-মাতরম্" গীত হইবার পরেও জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গানটি গাহিবার অনুরোধ আসিয়া থাকে। কলিকাতায় বৃহত্তর ভারত পরিষদের সম্পাদকরূপে সিংহলের সহিত কালিদাসবাবুর যোগ এখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত মহাশয় কয়েক বৎসর কলম্বো আনন্দ কলেজের কলা-বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। সিংহলে ভারতীয় চিত্রকলার প্রচার তিনি করিয়াছিলেন। সিগিরিয়া পর্ব্বতগাত্রে অথবা ডাম্বোলা পর্ব্বতগুহার চিত্রাবলী যে ভারতীয় চিত্রকলারই অন্তর্গত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সিংহল-দেশবাসীর নিকট এই শিল্প-নৈপুণ্যের মর্য্যাদা

বা আদর নাই বলিলেই চলে। একবার সিংহলের দৈনিক একটি কাগজে ভারতীয় চিত্রকলার বিরুদ্ধে অযথা নিন্দা প্রকাশিত হইয়াছিল। মণীন্দ্রবাবু তাহার উত্তরে য়ুরোপীয় কলাবিদ্‌গণের অজস্র স্তুতিবাদ উল্লেখ করিয়া প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। য়ুরোপের নিকট প্রশংসিত হইলেই যে উহা প্রশংসার উপযুক্ত—এই মনোভাব বশতঃই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের নাম সিংহলে সুপরিচিত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত পরিচয় সিংহলের সাহিত্যিক-দিগের ভিতরেও একরকম নাই বলিলেই হয়। সিংহল গবর্ণমেণ্ট্ আর্ট-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ভিন্‌জার একদিন ভারতীয় চিত্রকলা প্রসঙ্গে নন্দলাল বসুর চিত্রের সহিত যে-কোন সাধারণ অপটু ইংরেজ মেয়ে-আর্টিষ্টের ছবির তুলনা করিতেছিলেন। সুখের বিষয়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের চিত্রাবলী তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। বিগত বৎসর সিংহল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে মণীন্দ্র গুপ্তের দুইখানা ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পূর্ব্বতন প্রবাসী বাঙালীর ভিতর অন্যতম। ইনি কয়েক বৎসর সিংহল স্পিনিং ও উইভিং কোংতে বয়ন শিক্ষকের কাজ করিয়া-ছিলেন। বসু মহাশয় মিলের মজুরদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কলের মালিকেরাও ইঁহার উপদেশ বহুবার গ্রহণ করিতেন। প্রায় এক বৎসর হইল তিনি ইন্দোরে চলিয়া গিয়াছেন। বরিশালের স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত সুধাংশু বসুর নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সিংহলের প্রসিদ্ধ নেতা অনারেব্‌ল্ স্যার্ রামনাদনের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীরূপে তিনি কয়েক বৎসর সিংহলে ছিলেন। এ কথা অনেকেই জানেন না যে সিংহলেও বিবেকানন্দ সোসাইটি বাঙালীর গৌরবস্মৃতি রক্ষা করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো যাইবার পথে কলম্বোতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্দেশে বিবেকানন্দ সোসাইটির স্থাপনা।

রবীন্দ্রনাথও বার-কয়েক সিংহলে আসিয়াছেন, নানা স্থানে বক্তৃতাও করিয়াছেন। সিংহলে বৃহত্তর ভারত-পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইলে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে ভাল কাজ হইবার সম্ভাবনা আছে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শের সহিত বর্ত্তমান সিংহলের আদর্শের অনেক প্রভেদ থাকিলেও শিক্ষিত সিংহলবাসীদিগের ভিতর শিক্ষা ও জাতীয়তার আদর্শ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা

শ্রীমান্ সুধীরকুমার ঘোষ

দিয়াছে। সম্প্রতি ১৮ জন বৌদ্ধ যুবক পাঁচ বৎসরের জন্য রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নের জন্য বৌদ্ধ সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে।

সিংহলের আর একটি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বাঙালীদিগের উৎসাহ, সহযোগ ও সহানুভূতি আছে। এই প্রতিষ্ঠানের নাম সিংহল উপাসনা সমিতি। য়ুনিভার্সিটি কলেজের শ্রীযুক্ত এফ্ এক্স্ কিংসবরী মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রায় এক বৎসর হইল এই সভার কাজ চলিয়া আসিতেছে।

সিংহল-প্রবাসী বাঙালীদিগের কথাপ্রসঙ্গে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, কয়েকজন বাঙালীর উৎসাহে এ বৎসর সর্ব্বপ্রথম সিংহলে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কিংস্‌বরী ও Y.M.C.A.এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিউএল্ মহোদয়ের উদ্যোগে সভার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। কলম্বোর প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী

শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস্ ডোইসা, কে, সি এই স্মৃতি-অনুষ্ঠানে সভাপতির কাজ করেন। শ্রীযুক্ত কিংস্বরী, ডাঃ শ্রীযুক্তা সত্যবাগীশ্বর আইয়ার, ডাঃ খাস্তগীর, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি রামমোহনের জীবনের বিভিন্ন দিক্ লইয়া আলোচনা করেন। রাজা রামমোহনের নাম সিংহলের শিক্ষিত লোকদিগের ভিতরেও অনেকেই জানেন না। সভাপতি ও বক্তা নির্ব্বাচনের সময়ে রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত সঙ্গে করিয়া উদ্যোক্তাদিগকে ঘুরিতে হইয়াছিল, ইহা অতি হাস্যকর ব্যাপার। সভায় ডাঃ সত্যবাগীশ্বর আইয়ারের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শতবর্ষ পূর্ব্বের বাঙালী মহাপুরুষের নাম করিয়া সিংহল-দেশীয় যুবকগণকে তিনি বলিয়াছিলেন—"আজ যদি এই মহাপুরুষের আদর্শ তোমাদের সকলের মধ্যে একজনও গ্রহণ কর—শত বৎসর পরে সমস্ত সিংহল এইরূপই এক সভায় সেই অনাগতকালের সিংহলী পুরুষের স্মৃতি-তর্পণ এইরূপভাবেই একদিন সম্পন্ন করিবে।" এ কথা সকল দেশের যুবকের প্রতিই প্রযোজ্য।

পূর্ব্বরাগ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বলিবে বলিয়া বেঁধে যে রেখেছ বছর ধরে'
বলো বলো—বলে' মেনে গেছি হায় মিনতি করে'—
—আজ তা বলো গো আজকে বলো;
কি এমন কথা বলিবারে চাও, বলিবে চলো।
......আজ না থাক্—আজকে থাক্—
ক্ষমো গো বন্ধু, এই ক'টা দিন কাটিয়া যাক্, কাটিয়া যাক্,
—আজকে থাক্।

সেদিনের পরে বহুদিন গেল—সময় হ'ল?
বলিবে বলিবে করিও না আর আজকে বলো,
.... এখন থাক্ থাক্গে আজ,
বেলা বেড়ে যায়, যাব বহুদূর, অনেক কাজ, অনেক কাজ,
—থাক্গে আজ।

গভীর রাত্রি, যে যাহার ঘরে ঘুমায় সবে,
জেগে বসে' আছি—আজকে তোমায় বলিতে হবে।
.. ...বড় ভয় করে, এখন থাক্—
রাত্রি পোহায়, জাগিবে সবাই, পড়িবে ডাক্, ডাকে যে কাক—
—এখন থাক্।

চলে' যাব আজই—যদি বলো কিছু—বলো তা আজ
মাথা হেঁট ক'রে আবার এসেছি, ভুলিয়া লাজ।

......একটু সময়—আজ না কাল,
ক্ষমো গো বন্ধু, একটি রাতের অন্তরাল, হোক্ সকাল,
বলিব কাল।

অরুণ আভায় পূর্ব্ব আকাশ রঙীন হ'লো
এই তো প্রভাত, বলার যা আছে, এখনি বলো,
......নিতান্ত যদি শুনিবে তবে—
যতই কঠিন লাগুক্ বন্ধু, সহিতে হবে, ক্ষমিতে হবে,
বলি তা' তবে।

বন্ধু, আমার হৃদয়-বন্ধু—উঠো না হেসে,—
প্রথম দেখায়, মরেছি তোমায় ভালো যে বেসে'!
—মনের ভুলে—মনের ভুলে;
অযোগ্যতায় এতদিন তাই, বলিনি খুলে, বেদনা খুলে'।

.... এতদিন ধরে' দিয়েছ বেদনা, সয়েছ ব্যথা,
এত ঘটা করে' জানালে আমারই পুরানো কথা।
—আমিও—থাক্!
অনেক সময় গিয়াছে যা বয়ে—গিয়াছে, যাক্,
বন্ধু, আমায় নূতন ভাষায় এবারে ডাক্।

দীক্ষিতা

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

অনুশীলন-সমিতির প্রাক্তন শিক্ষার্থী বৃদ্ধিচাঁদ যখন কলেজে ভর্ত্তি হইতে কলিকাতায় আসিল তখন তাহার সঙ্গে ছিল দুই সতীনের মতো একজোড়া মুগুরী। প্রথমটায় দুটিতে প্রায়ই ঠোকাঠুকি হইত, কিন্তু ইদানীং বৃদ্ধির বাহুর কৌশলে তাহার কণ্ঠ ঘেঁষিয়া তাহারা দুইজনে নির্ব্বিবাদে নৃত্যে মাতিতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

তেতলার প্রশস্ত ছাতের সিঁড়ি সংলগ্ন ছোট্ট একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ। এইখানে বৃদ্ধিচাঁদের দিন একরকম কাটিতেছিল,—ঘরের মধ্যে লেখাপড়া, ঘরের বাইরে ছাতে আসিয়া মুগুর ভাঁজা।

কিন্তু একদিন এই মূকদ্বয়ীর এক মুখরা প্রতিদ্বন্দ্বিনী আসিয়া জুটিল। ছাতের উপর দুইটা বাঁশ খাড়া করিয়া একটা তার ঝুলাইয়া 'বেতার' নামে আকাশের অশরীরী অপ্সরীকে ধরিবার ফাঁদ পাতিয়া বৃদ্ধিচাঁদ নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে সুরু করিল। মূক মুগুরীদ্বয় দেখিত বেয়াড়া বেতার অপ্সরী বৃদ্ধির একেবারে কানের উপর ঝুঁকিয়া কানে কানে অনর্গল কথা কহিয়া যায়, কখনো বা মিহি সুরে গান গাহিতে থাকে—বৃদ্ধি তাহা শুনিয়া তন্ময়। দেখিয়া দেখিয়া কাঠের পুত্তলী সখীদ্বয় ছাতের একটি কোণে অভিমানে বুক ফুলাইয়া পাশাপাশি ঠায় দাঁড়াইয়া থাকে।

আর একজন বৃদ্ধির গতিবিধি কিছু ঔৎসুক্যের সহিত লক্ষ্য করিত। সে একটি তরুণী। তিনচারিখানা দোতালা বাড়ী পার হইয়া প্রথম যে আবার তেতলা বাড়ী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তারই ছাতে সে ভোরে আসিত কলেজের পড়া মুখস্থ করিতে, আর সন্ধ্যায় আসিত পায়চারি করিয়া কলেজের সমস্ত দিনের অর্জ্জিত জড়তা দূর করিতে। বৃদ্ধি সকাল সাঁঝের এই দুইটি শুভমুহূর্ত্তকে বিশেষ করিয়া চিনিয়া লইয়াছিল। তাহাদের বাড়ী দুইটার ব্যবধান এত কম ছিল না যে, পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইতে লজ্জা বোধ করিতে পারে। একজন অপরের দিকে তাকাইলে অপরজন নিশ্চয় রূপে ধরিতে পারিত না যে, ঠিক তাহারই দিকে তাকাইয়াছে কি না। আবার ব্যবধানটা এত অধিক নয় যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইবার অন্তরায় থাকিতে পারে। মুগুর উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে যুবকের সুঠাম দেহের মাংসপেশীর শোভন সঞ্চলনের দিকে মেয়েটি প্রশংসার দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিত। বেতার যন্ত্রের 'হেড্‌ফোন'টা যখন বৃদ্ধির রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহাকে স্তব্ধ করিয়া রাখে, মেয়েটিও তখন নিরীক্ষণ করিতে স্তব্ধ। পায়চারির সঙ্গে সঙ্গে পাঠনিরতা মেয়েটির ঈষৎ আনত ও দোদুল্যমান মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য-সুষমার যতটুকু দূরত্বের দরুণ বৃদ্ধি চোখে ঠিক ঠাহর করিতে পারিত না, সেটুকু সে তার কল্পনার রঙীন তুলিতে বরং সুন্দরতর করিয়াই আঁকিয়া লইত। 'হেড্‌ফোন'টা কানে চাপিয়া যুবক যখন কোন্ সুদূর পারের তারের ঝঙ্কার নিজের কানে গ্রহণ করিত, তখন সে তরুণীর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত ঐ চিত্ততন্ত্রীতে যে ঝঙ্কার সকাল সাঁঝে বাজে, হায়, তাহা ধরিবার যন্ত্র কোথায়! কোন্ সে কবি যাহার কাব্যকেতাব ঊষার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন ঐ মূর্ত্ত যৌবনোন্মেষকে অমন তন্ময় করিয়া রাখে! প্রতি সন্ধ্যার যখন দিনমণি বিদায়ের চাহনি হানে তখন কি কোনো ভাগ্যবান প্রবাসীর বিদায়-ব্যথা স্মরণ করিয়াই ঐ তরুণীর প্রতিদিন অমন উদাস দৃষ্টি!

বিচিত্রানন্দ প্রতিদিনই ক্লাশের মাঝখানের একটা বেঞ্চি দখল করিয়া বসিত। কারণ সে লক্ষ্য করিয়াছিল প্রফেসরদের কাহারও ছিল 'শর্ট সাইট', অর্থাৎ সামনের বেঞ্চির ছেলেদের লইয়াই তাঁহারা আলোচনা করিয়া

সন্তুষ্ট থাকিতেন। আবার কাহারও ছিল 'লঙ সাইট'—পিছনকার নিরাপদ বেঞ্চিগুলাকেই খোঁচাইয়া বিপদসঙ্কুল করা তাঁহাদের পণ। মাঝামাঝি দৃষ্টি বড় কাহারও ছিল না। বিচিত্র সেইজন্য সেইখানেই একটা 'সিটে' ডুবিয়া থাকিয়া তাহার খাতাকে প্রফেসরদের নোটের পরিবর্ত্তে বিচিত্র নক্সা ও টিপ্পনীতে ভরাইতে থাকিত। সেক্সপীয়রের দক্ষ অধ্যাপক যখন নানান্ অঙ্গভঙ্গী করিয়া আবৃত্তি করিয়া যাইতেন, বিচিত্রের খাতায়, পাতায় পাতায়, তাঁহার বিবিধ ভঙ্গিমার চলচ্চিত্র আঁকা হইয়া যাইত। ঘণ্টা বাজিবামাত্র তাহা দেখিয়া সহপাঠীদের মধ্যে হাসির হল্লোড় পড়িয়া যাইত। প্রতি 'পিরিয়ডে'র মাঝে সংক্ষিপ্ত যে একটু অমূল্য অবসর, তাহাকে বিচিত্র সকলের সমক্ষে সার্থক করিয়া তুলিত কখনো ডেস্কের তবলা সহযোগে তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠের চাপা সঙ্গীতে, কখনো বেঞ্চির উপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া তাহার নৃত্যকুশল চরণক্ষেপে কখনো বা একটা বীর-রসাত্মক ব্যঙ্গ অভিনয়ের প্রদর্শনে।

বিচিত্র আকর্ষণ করিতে পারিত না শুধু বৃদ্ধিকে। যখন ক্লাশশুদ্ধ ছেলে বিচিত্রের কৌতুক সম্ভোগে মাতোয়ারা, বৃদ্ধি তখন একেবারে কাঠ হইয়া বসিয়া থাকিত। কলেজ ছুটির পর দল বাঁধিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া বিচিত্র বন্ধুদের বলিত,—"চ', কিছু খেয়ে আসি, অন্তত এক পেয়ালা চা।" ক্লাশের আর সকলেই কোন-না-কোন দিন তার এ আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে—করে নাই বৃদ্ধি। কারণ বৃদ্ধি বেশ বুঝিতে পারিত বিচিত্রের এই নিয়ম-করা নিমন্ত্রণ বন্ধু প্রীতিপ্রণোদিত নয়, তাহার দাম্ভিকতা-প্রসূত। বিচিত্র চাহিত সকলে জানুক তার দু'পয়সা আছে, জানুক যে পয়সা কি করিয়া খরচ করিতে হয় তা সে জানে। সে চাহিত সকলকেই তাহার অর্থে বা সামর্থ্যে বশীভূত করিয়া রাখিতে। বৃদ্ধিকে কিন্তু সে কিছুতেই বশ মানাইতে পারিতেছিল না। ঘুড়িটাকে গোঁৎ খাওয়াইতে যেমন সূতায় একটু টান দিতে হয় আবার সময়মত একটু ঢিলও দেওয়া প্রয়োজন বৃদ্ধিকে বাগে আনিতে বিচিত্র তেমনি তাহার সঙ্গে কখনও ঘনিষ্ঠতা কখনও বিরোধ পর্য্যায়ক্রমে করিয়া চলিত। যদি কখনো তাহার প্রতি উদাসীনতার ভাব দেখা যাইত তখনই কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিত তাহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

কিন্তু বিচিত্রের সকল প্রকার কৌশল যতই বিফল হইতে লাগিল তাহার অন্তর ক্রোধ ও জেদের উৎকটতায় ততই ভরিয়া উঠিল। টিফিনের ছুটির সময় সেদিন কলেজের তেতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া দুইজনের মধ্যে হঠাৎ বিষম তর্ক বাধিয়া উঠিল। বিচিত্রের বক্তব্য এই যে, ভারত-বর্ষের বর্ত্তমান সঙ্কট সমস্যায় 'ভক্তি' বলিয়া জিনিষটাকে দুই তুড়িতে উড়াইয়া দিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। সংখ্যাতীত দেবদেবীতে ভক্তি, দেবদেবীর নামে অগণ্য গাছপাথরে ভক্তি, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পতিভক্তি ইত্যাদির চাপে পড়িয়া আমরা আর মাথা তুলিতে পারিতেছি না। দেশের সেবা করিতে হইলে এ ভক্তির পথ রোধ করিতে হইবে।' বৃদ্ধি বলিতে চায় ভক্তির পথ বন্ধ করিলে দেখিবে দেশ-সেবার শক্তিও লোপ পাইয়াছে। তাহাদের তর্কের মীমাংসার উপর দেশের আসন্ন কোনো বিপদ বা সম্পদ উন্মুক্ত হইয়া আছে, এমনিতর একটা ভাবে প্রণোদিত হইয়া দুইজনে বিষম অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। নীচে রাস্তা দিয়া লোক চলিতে চলিতে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিয়া যে চলিয়া যাইতেছিল সেদিকে তাহাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। ক্রমে তর্ক বাড়িয়া এমন অবস্থায় আসিল, যখন মস্তিষ্কের যুক্তি ছাড়িয়া কণ্ঠের শক্তিকেই উভয়ে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উপায় বলিয়া ধরিয়া জোর গলা বাজি চালাইতে লাগিল। এমনি একটা উচ্চ অবস্থায় বৃদ্ধি হঠাৎ 'জানোয়ার' বলিয়া গালি দিয়া বসিল। বিচিত্রও প্রত্যুত্তরে বলিল 'গাড়োল'। কিন্তু বৃদ্ধি তাহার উপর আর কোন কথা কহে নাই এবং তর্কের সেইখানেই সমাপ্তি হয়।

সাধারণ চোখে দেখিতে গেলে কোনো বিতর্কের শেষ কথাটা যে কহিয়া শেষ করিতে পারে, সে-ই জয়ী বলিয়া প্রতীয়মান হয়—অর্থাৎ এমন কথা সে কহিয়াছে যাহার জবাব বিপক্ষ দিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু কলেজের শিক্ষিত এই যুবকদ্বয় জিনিষটাকে সাধারণের

আলোকে নিবিড়ভাবে দেখিল। বৃদ্ধি হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কটূক্তি করিয়া বলিয়াছিল তাহার পরমুহূর্তেই সে নিজের ব্যবহারে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিচিত্রের কাছ হইতে পাল্টা কটু কথাটা শুনিয়া সেখানে সংযত হইয়া চুপ করিয়া থাকিবার সুযোগ হারাইল না। বিচিত্র যখন দেখিল বৃদ্ধি নিজেকে সামলাইয়া লইল, তখন তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল সে নিজেই হারিয়াছে—তাহার নিজেরই শেষ বাক্যবাণটা লক্ষ্য সন্ধান করিতে না পারিয়া তাহারই কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। এ যে হার—বিষম হার!

কলেজ ছুটির পর বিচিত্র এ হারের প্রতিকারে মন দিল। রাস্তায় গিয়া বৃদ্ধির কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, "চল্, তোর 'রেডিও সেট্' দেখে আসি।"

বিচিত্র ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। নিজের হাতে এক একটা যন্ত্রখণ্ড সমাবেশ করিয়া যে সমগ্র যন্ত্রটি গড়িয়া তুলিয়াছে, কেতাবের থিওরিকে যে নিজের হাতে বাস্তবে বাঁধিতে পারিয়াছে, তাহার জন্য বৃদ্ধি নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করে এবং দর্শকের আগ্রহ প্রদর্শন তাহার আজিকার এই ক্ষুব্ধ হৃদয়কে জয় করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। বৃদ্ধি খুশী হইল। বিচিত্রের সঙ্গে অনেকেই জুটিল।

বৃদ্ধির অপরিসর ঘরের মধ্যে সপারিষদ বিচিত্র যন্ত্রের এটা-ওটা খানিক নাড়াচাড়া করিয়া হাঁপাইয়া উঠিল। "বাঃ! তোর ছাদটা তো বেড়ে," বলিয়াই সামনের খোলা ছাদে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বন্ধুরাও সেইদিকে অগ্রসর হইল। বৃদ্ধির মনটায় যেন একটু চাঞ্চল্য ও অস্বস্তি স্পর্শ করিল। কারণ তখন সন্ধ্যা সমাসন্নপ্রায় এবং তাহার সন্ধ্যাতারাটিও এতক্ষণে নির্দিষ্ট স্থানে উদিত হইয়াছে। শুধু একটু দর্শন—সেই দর্শনেও তাকে সে একান্তই নিজের করিয়া রাখিতে চায়। বন্ধুদের লুব্ধদৃষ্টির কলকে পাছে তাকে ম্লান করিয়া দেয়, এই তার ভয়! তাই সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আঃ, ছাদ আবার দেখে! চল তার চেয়ে নীচে আমাদের 'কমন্ রুম' দেখবে চল।"

"আরে দাঁড়াও, এতক্ষণ তো আসল জিনিষই দর্শন ঘটেনি আমাদের" এই বলিয়া বিচিত্র লোলুপ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। সকলের চোখই তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেইদিকে পড়িল। তারপর বিচিত্র ঘাড়টা বাঁকাইয়া মুখে অর্থভরা হাসি ভরিয়া একবার বৃদ্ধির দিকে আর বার বন্ধুদের দিকে তাকাইয়া কহিল, "তাই বলি বৃদ্ধিচাঁদ এই আকাশের কাছে এসে বাসা বাঁধলো কেন! এখানে যে আকাশ-কুসুমের ব্যবস্থা হচ্ছে তা কি আর জানি!" আকাশ কাঁপাইয়া একটা অট্ট-হাস্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি দেখিল মেয়েটি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া ছাত হইতে নীচে নামিয়া গেল। বৃদ্ধি ক্রোধটাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া বিচিত্রের দিকে তাকাইয়া কহিল, "এ তোমাদের ভারি অভদ্রতা, দেখ তো মেয়েটি কি মনে করে গেল!" বিচিত্র সে কথার উত্তরে শ্লীলতার বাহিরে একটা ভাষা প্রয়োগ করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কোরাসে আবার হাসির রোল চলিল। বৃদ্ধি আর সহ্য করিতে পারিল না। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত বিচিত্রের গালে বসাইয়া দিল। ব্যাণ্ডবাদ্য অবসানের মত সকলের হাসির রোল অকস্মাৎ থামিয়া গেল। বিচিত্র স্তব্ধ হইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর দৃঢ়তার সহিত একটা 'আচ্ছা' বলিয়া গট্ গট্ করিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। সে 'আচ্ছা' বলার ধরণটা ভবিষ্যতের কোনো বীরত্ব প্রদর্শনের আবরণে বর্তমান বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। অপরাপর সকলেও অচিরেই প্রস্থান করিল।

সকলে চলিয়া গেলে বৃদ্ধি শূন্য ছাতে পায়চারি করিতে লাগিল। তাহার অন্তর একটা অভূতপূর্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কলেজের বারান্দায় দাঁড়াইয়া যে বৃদ্ধি তর্কের মধ্যে জিহ্বাকে সংযত রাখিতে না পারিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল সে-ই এখন তার চপেটাঘাতের দ্বারা নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল। কারণ তখন ছিল একটা ভাবের পরিকল্পনার উপর লড়াই—আর এখনকার দ্বন্দ্ব হইতেছে একটি মনোরম বাস্তব লইয়া। তাহার মনে হইতে লাগিল অসহায়া বালিকার ইজ্জৎ, দূর হইতেও দুর্বৃত্তদের কুরুচির আক্রমণে মলিন হইবার

উপক্রম হইয়াছিল, তাহারই শক্তির একটিমাত্র প্রতিঘাতে সে সকলকে পরাস্ত করিয়া দেবীপ্রতিমাকে সগৌরবে উদ্ধার করিয়াছে। বালিকার শুভ্র হাতের প্রতি চাহিয়া তাহার মন বলিতে চাহিল—তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে রক্ষা করিলাম, তোমার অজ্ঞাতেই আমার পুরস্কার এইটুকু রইল আমার দুঃখ।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে কল্পনার বৃহৎ সংঘর্ষ রচনা করিয়া এবং তাহাতে বিজেতার ভূমিকায় নিজেকে বসাইয়া যখন বৃদ্ধি মনে মনে প্রভূত আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল, তখন সে অল্পই ভাবিয়াছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে সত্যই এমনি একটা ঘটনাও ঘটিতে পারে।

তখন বেলা নয়টাও বাজে নাই, সুষমা খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া কলেজের বইগুলি গুছাইতেছে—নীচ হইতে হাঁক আসিল, "গাড়ী আয়া বাবা।" সুষমা মোটর 'বাসে' গিয়া উঠিতেই তাহা অপ্রত্যাশিত বেগে ছুটিয়া চলিল এবং পরমুহূর্তেই সুষমা লক্ষ্য করিল যে সেখানা কলেজের 'বাস্' নয়, যদিও বাহির হইতে ঠিক সেইরকমই বোধ হইয়াছিল। তাহার বাড়ী সর্ব্বাপেক্ষা দূরে বলিয়া 'বাস্' তাহাকেই সর্ব্বপ্রথম লইতে আসে। প্রতিদিন সে-ই শূন্য 'বাসে' আসিয়া পদার্পণ করে। আজও গাড়ীতে একলা উঠিতে কোনো দ্বিধা করে নাই। তাকাইয়া দেখিল ড্রাইভার সহিস কাহারও মুখ পরিচিত নয় যদিও তাহাদের পোষাকের নকল হুবহু ঠিক। সুষমার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে গাড়ী হইতে প্রাণপণ চীৎকার করিতে লাগিল। সে চীৎকারকে ডুবাইয়া রাখিল মোটরের অবিশ্রান্ত হুঙ্কার ধ্বনি। এই অবিশ্রান্ত মোটরহর্ণ শুনিতে পথের লোকের অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক ঠেকিল না।

বৃদ্ধি ঠিক এই সময় প্রায় প্রতিদিনই তাহার মেসের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইত, সেদিনও দাঁড়াইয়া ছিল। প্রথম হইতে ব্যাপারটা সে সবই লক্ষ্য করিতেছিল। বাস্টা যেই তাহার মেসের সামনে দিয়া যাইবে অমনি সে ছুটিয়া আসিয়া ড্রাইভারকে ধমক দিয়া থামাইতে বলিল এবং প্রায় পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ড্রাইভার কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া যেমন জোরে চালাইয়া আসিতেছিল তেমনি সাঁ করিয়া বৃদ্ধির প্রায় গা ঘেঁষিয়াই চলিয়া গেল। হতবুদ্ধি বৃদ্ধি দুই কদম পিছনে পিছনে ছুটিয়াই চলিল কিন্তু একটু পরেই বুঝিল দ্রুতগতি মোটর-বাসের পিছনে দৌড়ানো বৃথা। ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল একটা খালি ট্যাক্সি। অমনি তাহাতে চড়িয়াই হুকুম দিল, "বাসের পেছনে ছোট।"

দারুণ উত্তেজনায় কত রাস্তা কত মোড় পার হইয়া চলিল। 'বাসে'র নাগাল পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। একটা মোড়ে আসিয়া দেখা গেল পুলিশ হস্তপ্রসারিত করিয়া যান-চালনার ক্ষণিক নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু 'বাস'টা সে নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই ছুটিল, ফলে অপর রাস্তার একটা গরুর গাড়ী ও একটা রিক্সকে গিয়া ধাক্কা লাগাইয়া বসিল। সেই অবসরে বৃদ্ধি তিন লাফে গিয়া বাস্-চালকের টুঁটি চাপিয়া ধরিল, কিন্তু শাস্তির মাত্রা বাড়াইবার পূর্ব্বেই পিছন হইতে একটা ট্যাক্সি হইতে গোটা-তিনচার গুণ্ডা বাহির হইয়া আসিয়া বৃদ্ধিকে আক্রমণ করিল। বৃদ্ধি তখন 'বাস্'চালককে ছাড়িয়া একটা নবাগতের নাকের উপর এক প্রচণ্ড ঘুষি লাগাইয়া তাহাকে বসাইয়া দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই দেখিল পাশ হইতে অপর ব্যক্তি তাহার বুকের উপর শাণিত ছোরা উত্তোলন করিয়াছে। ছোরার খেলা বৃদ্ধির বিলক্ষণ জানা ছিল। ফস্ করিয়া তাহার কব্জির উপরটা চাপিয়া ধরিল। এমন সময় তৃতীয় ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আসিল, কিন্তু পুলিশ পিছন হইতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। এই গোলমালের মধ্যে বৃদ্ধি দেখিল 'বাস'-চালক পলায়নের উপক্রম করিতেছে। বৃদ্ধি দৌড়াইয়া গিয়া তাহার চাপ দাড়ি চাপিয়া ধরিতেই তাহা খসিয়া আসিল এবং সে বিস্ময়ে রোষে বলিয়া উঠিল, 'ওরে র‍্যাস্কেল, তুই!' কারণ বাসচালক আর কেহ নয়—বিচিত্র।

সে-রাত্রে বিছানায় শুইয়া বৃদ্ধির ঘুম আসিতেছিল না এবং ঘুম আনিবার চেষ্টাও তাহার ছিল না। সমস্ত দিনটা যেন একটা স্বপ্নের মত তাহার কাটিয়াছে। জাগরণে যে স্বপ্ন তাহার মিলিয়াছে ঘুমের আবরণে

তাহাকে ঢাকিতে চায় না সে আজ। একটা আকস্মিক প্রবল ঝটিকার আঘাতে "কোন্ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে।" যে দূরের মানুষকে দূর হইতেই সে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া প্রতিদিন তৃপ্ত থাকিত, তাহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে কত কাছেই না আজ পাইয়াছে! গুণ্ডাদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইতেই সে কি নির্ভরশীলতার ভাবে তার প্রায় কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিল, "চলুন শীগ্‌গির বাড়ী নিয়ে চলুন।" তার পর বাড়ীতে আসিয়াই যখন দেখা গেল কলেজের প্রকৃত 'বাস্‌' বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর তার মামা সহিস ও ড্রাইভারের সঙ্গে তুমুল তর্ক বাধাইয়াছেন, "—তোমাদের গাড়ী এসেই তো তাকে তুলে নিয়ে গেছে।" "—না? তবে সে কোন্ গাড়ীতে গেল?" ইত্যাদি—ঠিক সেই সময় তাহারা গিয়া পড়াতে তিনি বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে যখন বৃদ্ধির দিকে তাকাইয়াছিলেন তখন কি ব্যাকুলভাবে সে দুই হাত তুলিয়া মামার সন্দেহভঞ্জন করিয়াছিল এবং প্রকৃত ঘটনা এক নিঃশ্বাসে বিবৃত করিয়াছিল!

বৃদ্ধির চিন্তার স্রোত বিচিত্রের উপর গিয়াও পড়িল। হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গার হুজুগে সাধারণ গুণ্ডা ও দুর্বৃত্তেরা নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির সুযোগ যে হারাইতেছে না তাহা বৃদ্ধি জানিত, কিন্তু একজন ভদ্রলোকের ছেলে যে আবার সেই গুণ্ডামির সুযোগ নিজের জঘন্য প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার কাজে লাগাইতে পারে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। বিচিত্র যে অধঃপাতের পথে যাত্রা করিয়াছিল তাহা সে জানিত। কিন্তু তার অধঃপতনের মাত্রা সম্বন্ধে বৃদ্ধি একেবারে অজ্ঞ ছিল। আজ যদি সে নিজে গিয়া মাঝখানে পড়িবার সুযোগ না পাইত, তবে যে কি পরিণতি হইত বৃদ্ধি ভাবিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু হতভাগার দুরভিসন্ধির পথে বিধাতা অপরূপভাবে বাধা দিয়া ঘটনাটিকে বৃদ্ধির পক্ষে কি মধুর করিয়া তুলিয়াছেন!

এই অম্লমধুর চিন্তার মাঝে ডুবিয়া অধিক রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙিলে দেখিল রোদ আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে এবং সুষমার মামা তার ঘরে চেয়ারটা দখল করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁর বাড়ীতে সকাল-বেলাকার চা পান করিবার নিমন্ত্রণ।

দুইদিনেই বহুদিনকার বাঁধ ভাঙিয়া সে-বাড়ীতে বৃদ্ধি খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু বৃদ্ধি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে, এই নবপরিচিত পরিবারের সঙ্গে কত ঘন ঘন দেখা করিতে গেলে ঠিক শোভনটি হইবে এবং কত বিরল যাওয়া আবার ভদ্রতাবিরুদ্ধ দাঁড়াইবে। যেদিন সে যাইত, বার বার যাইবে না ভাবিতে ভাবিতেও গিয়া পড়িত এবং কোনো দিন বা যাওয়া একেবারে ঠিক করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত সঙ্কোচ আসিয়া বাধা দিত।

এইরূপ একটি দ্বিধাজড়িত সন্ধ্যায় সে যখন সেখানে যাইবে বলিয়া মেস হইতে সবে পা বাড়াইতে যাইতেছে, একটি সৌম্যদর্শন বলিষ্ঠদেহ যুবক তাহার সম্মুখে একটা নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বৃদ্ধিচাঁদবাবু?"

"হ্যাঁ, কি চান আপনি?"

যুবকটি "বস্‌ছি" বলিয়া একবার চেয়ারখানার দিকে তাকাইল। বৃদ্ধি বাহির হইবার মুখে বাধা পাইয়া একটু অসহিষ্ণু হইলেও যুবককে বসিতে না বলায় অভদ্রতা হয় দেখিয়া বলিল, "বসুন না।"

যুবক চেয়ারটা টানিয়া বসিল। একটু থামিয়া বলিল, "দেখুন, আমি আস্‌ছি ভবানীমাতার আশ্রম হতে। সে-দিন আপনি বীরত্বের কাজ করে দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আপনি না থাক্‌লে মেয়েটির যে কি দশা হতো তা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের তরফ্‌ হতে প্রথমে আপনাকে তার জন্যে অভিবাদন জানাচ্ছি।"

বৃদ্ধি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ! এসব আপনি কি বলছেন? বীরত্ব কোথায় পেলেন? ও তো নিতান্ত স্বাভাবিক—"

যুবক বাধা দিয়া বলিল, "আচ্ছা থাক্, ও নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করবো না। এখন আমার দ্বিতীয় কথাটা শুনুন—আমাদের প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মীর বড়ই অভাব।

আপনার মতো কর্ম্মীর খুব দরকারই আছে। আপনাকে আমরা আমাদের মধ্যে চাই।”

বৃষ্টি এবারে হাসিয়া ফেলিয়া, বলিল, “এটা আপনি অপ্রত্যাশিত সম্মান আমায় দেখাচ্ছেন। আমি এর সত্যিই অযোগ্য। এ একেবারে অসম্ভব।”

যুবকও হাসিল এবং বলিল, “আপনাকে অবিশ্যি আমি এখুনি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তু এ কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে, আপনাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আপনি পরে ভাল করে ভেবে দেখবেন। এই রইল আমাদের আশ্রমের ঠিকানা, সুবিধামত দয়া করে আপনার মতামত জানাবেন। আচ্ছা, এখন উঠি। আপনি কোথাও বেরুচ্ছেন বোধ হয়—অনেক দেরী করে দিলাম।”

যুবক আবার একটি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। যুবকের ‘দেরী করে দিলাম’ কথাটা শুনিয়া বৃষ্টির মন কি এক রকম বিকল হইয়া গেল যে, সে প্রতিনমস্কারটা করিতে ভুলিল এবং যে কাগজটাতে যুবক ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিল সেটা অন্যমনস্কভাবে পকেটে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সুষমার বাড়ীতে ঢুকিয়াই বৃষ্টি অবাক হইয়া গেল। বাহিরের ঘরটাতে সুষমা একটা টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছিল। বৃষ্টি ঘরে ঢুকিতেই সে ছুটিয়া পলাইল। এ রকম অবস্থায় বৃষ্টি সেখানে দাঁড়াইবে, কি চলিয়া আসিবে ভাবিতেছে এমন সময় সুষমার মামা সমরেশবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, “বসো বৃষ্টি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।”

সমরেশবাবুর গাম্ভীর্য্য ও কথা বলার রকম দেখিয়া বৃষ্টি আরও অবাক হইয়া গেল।

ব্যাপার হল “বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।” সমরেশবাবু ভাগ্নীকে লইয়া কিছুদিন থানা ও আদালত ছুটাছুটি করিয়া অসহায় বাঙালী মেয়ের মর্য্যাদা কোনমতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বলিয়া যদি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন এমন সময় দেশ হইতে বিপদকালের ‘বন্ধু’গণ আসিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, সুষমার ‘ধর্ম্ম’ গিয়াছে, তাহাকে আর বাড়ীতে রাখা চলে না, রাখিলে ভবিষ্যতে সমরেশের মেয়েদের বিবাহে বিপদ আছে, ইত্যাদি। বালিকার উপর এই নিষ্ঠুর বিধানের কথা শুনিয়া রাগে দুঃখে সমরেশ ফুঁসিয়া উঠিলেও, বন্ধুদের কথায় পড়িয়া নিরুপায় সমরেশ তাহাকে অন্য কোথাও রাখা যায় কিনা ভাবিতে বাধ্য হইলেন। কতকটা সুষমার পড়াশুনায় উৎসাহ দেখিয়া, কতকটা তাহার বিবাহের কোন সুবিধামত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া উঠিতে না পারায়, এবং খানিকটা পিতৃমাতৃহীন বালিকার প্রতি নৈসর্গিক মমতাবশত সমরেশ তাহাকে বেশী বয়স পর্য্যন্ত কলেজে পড়াইতেছিলেন। এই কার্য্যটি হিতৈষীদের তেমন পছন্দ হইতেছিল না, কিন্তু বলিবার সুযোগ তাহাদের এতদিনে ঠিক মিলিয়াছে।

সমরেশ বৃষ্টিকে বলিতে লাগিলেন,—“কাল আমার বাড়ীতে দেশ থেকে দু’চারজন ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁরা সুষমার ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখছেন, বলছেন—ওকে আর বাড়ীতে রাখা চলে না।”

বৃষ্টি দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, “তার মানে?”

“মানে, ভাবছিলাম ওকে কোনো হোস্টেল-বোর্ডিংএ রাখা চলে কি না।”

বৃষ্টি দৃপ্তভাবে বলিয়া উঠিল, “তার আগে বরঞ্চ ভাল হয় ঐ বর্ব্বরগুলোকে এখুনি আপনার বাড়ী হতে বিদায় করার উপায়।”

সমরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “আস্তে আস্তে! ও কথা বলা চলে না বৃষ্টি—ওঁরা হলেন সমাজের মাথালোক। আজ ওঁদেরকে বাড়ী হতে বিদায় করলে ওঁরাই আমাকে চিরকালের মত সমাজ হতে বিদায় দেবেন।”

“অমন সমাজের—”

সমরেশ বাধা দিয়া বলিলেন, “থাক্ বৃষ্টি, ও-তর্কের সময় নয়। এখন একটা আপোষ মীমাংসায় পরামর্শ দিতে পার কি না বল।”

বৃষ্টি উত্তেজিতভাবেই বলিতে লাগিল, “যে মেয়েকে আপনি বাবা হয়ে বাড়ীতে স্থান দিতে পারছেন না, তার স্থান বোর্ডিং-এ কি করে হবে?”

উত্তরে সমরেশবাবু কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বৃষ্টি রাগে গর গর করিতে করিতে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় আসিয়া পকেট হইতে যুবকটির প্রদত্ত ভবানী-

আশ্রমের ঠিকানা লেখা কাগজটা বাহির করিয়া গ্যাসের আলোতে পড়িয়া লইল এবং পরক্ষণেই হন্ হন্ করিয়া ছুটিল।

সুষমার জীবনে এরকমতর একটি অধ্যায় যে অবতরণ করিয়াছিল তাহা সে কল্পনা করে নাই। একটা আকস্মিক বিপদ হইতে বৃদ্ধি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। সে-ই যে আবার সামাজিক জটিলতার মধ্য হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে কে তাহা ভাবিয়াছে! বৃদ্ধি সুষমাকে ভবানী-আশ্রমে লইয়া আসিয়াছে। সুষমা যতই নিজের জীবনের দিকে তাকায় ততই তার অবাক বোধ হয়। এই দেহমনে বলিষ্ঠ যুবকটি অল্প কয়দিনের মধ্যেই আজ তাহার কত ঘনিষ্ঠ! আশ্রম তাহার জীবনে একটি একটি করিয়া খসিয়া যে চরম সময়ে একেবারে নিরাশ্রয়ের বিভীষিকা দেখাইয়া চমকাইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে তাহাকে যে অনাত্মীয় এই রম্য আশ্রমে আনয়ন করিয়াছে—যেখানে সে সন্ন্যাসিনী ভবানীকে মাতারূপে ও আশ্রমবাসিনীদিগকে ভগ্নীরূপে পাইয়াছে—সে-কি পরমাত্মীয়ের দাবী একদিন করিবে না? যদি না করে তবে তাহার এত উপকার, সে যে ভিক্ষার দান! সুষমার হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধি সুষমাকে আশ্রমে আনিয়া একটা নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। সেদিন যখন আশ্রম হইতে আহ্বানকে সে যুবকটির নিকট প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তখন সে জানিত না যে, একটা গুরুতর কর্তব্যের উদ্বোধন সেই আহ্বানকে গ্রহণ করিয়া লইতে হইবে। এখন সে আশ্রমের অন্যতম কর্মী। দেশসেবার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় যে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতেছিল তাহার দরুণ আত্মশ্লাঘা অন্তরে জাগিতেছিল, কিন্তু সে সাধনার কেন্দ্র ছিল সুষমার সপ্রশংস দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিকেই লক্ষ্য রাখিয়া সে শত গৌরবের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িত, শত দুঃসহ দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিত। কিন্তু সুষমা ভাবিত, "হায়! এই মহৎ জীবনে আমার মত ক্ষুদ্র বালিকার স্থান কোথায়!"

সেদিন অতি-প্রত্যুষে গঙ্গাসাগরের বটতলার বাঁধানো বেদিকার উপর আসিয়া সুষমা বসিয়াছে। উষার আলোক তখনও জগতকে কুহেলিকা হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। সুষমার অন্তরেও কি একটা প্রচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকা জীবন-মরণ রণ করিতেছিল। হঠাৎ দেখিল গঙ্গার সিঁড়ি বাহিয়া কে একজন উঠিয়া আসিতেছে। কাছে আসিলে চিনিল—বৃদ্ধি। সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "এত ভোরে গঙ্গা নেয়ে এলে যে?"

বৃদ্ধি বলিল, "আজ যে আমাদের যুদ্ধমেলার অভিনয় দেখাবার দিন। আমাকে সবাই করেছে সর্দার। তাই গঙ্গা নেয়ে নিলুম।"

সুষমা একটু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সর্দার হ'লে গঙ্গা নাইতে হয় নাকি?"

"নাইতেই যে হবে তা নয়। ছেলেবেলায় রামলীলা পালা অনুষ্ঠে আমার বড় ভাল লাগতো। সে পালা এক রাতে শেষ হবার নয়। রাতের পর রাত পালা চলতো। যে ক'টা দিন রাম সীতা লক্ষ্মণ বনে কাটাতেন সেই সেই ভূমিকার অভিনেতারাও সেই বনের ফল মূল ভক্ষণে কাটিয়ে দিত। অভিনেতাদের এই নিষ্ঠাটুকু বড়ই চিত্তাকর্ষক। আমিও আজ সর্দারের অভিনয়ে ব্রতী হবার পূর্বাহ্ণে পুণ্যসলিলে স্নান করে কাজের ভার গ্রহণ করলুম, যাতে অভিনয়টা কাজে অন্ততঃ সার্থক করে তুলতে পারি।" সুষমার হৃদয় আবার ভরিয়া উঠিল। "তুমি আজ আশ্রমবাসীর গুরু, আমারও প্রণাম গ্রহণ কর" এই বলিয়া সুষমা নত হইতে গেল। কিন্তু বৃদ্ধি দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং পরক্ষণেই যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার মস্তকে একটি চুম্বন করিল।

বিহ্বলভাবে সুষমা বলিল, "এইখানে একটু বসো।" সদ্যস্নাত যুবকের স্নিগ্ধ স্পর্শে তাহার মন নিজের বশে ছিল না।

বৃদ্ধি হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

সুষমা একটু ম্লান হইয়া কহিল, "এখনও তোমাদের সে অভিনয়ের দেরী আছে, একটু বসো না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

হিন্দী-সাহিত্যে কবি-সমাদর

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

শাহজাদা দারা ও আমীর খুস্রু ছাড়াও বহু মুসলমান কবি হিন্দী-ভাষার সেবা করে ধন্য হয়েছেন। এঁদের মধ্যে রহীম, রস্ খান ও জায়সী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এঁদের লেখায় গোঁড়ামি ও বিদ্বেষের ছায়ামাত্র নেই। রহীম শেষজীবনে সর্ব্বরিক্ত হয়ে পড়েন। অগাধ অপরিমিত অর্থ জলের মত দান করে তাঁকে দারিদ্র্য-ব্রতী হতে হয়েছিল। রহীমের পূরো নাম হচ্চে নবাব বাহাদুর আব্দুল রহীম খান্খানান্ সাহেব। কিন্তু দেশবাসী ও অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবের দেওয়া তাঁর প্রিয় নাম ছিল রহীম বা রহিমন। রহীম আকবর বাদ্শার অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও তাঁর "নওরতনের" একজন প্রধান সদস্য ছিলেন। রহীম কবিদের পরম সমাদর করতেন। কবিদের লাখ লাখ টাকা দান করেও তাঁর যেন তৃপ্তি হত না। হিন্দু-ভাষার বিখ্যাত কবি গঙ্গের সহিত রহীমের গভীর সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়েছিল। তিনি তাঁর রচিত একটি কবিতা শুনে তাঁকে ছত্রিশ লাখ টাকা দান করেছিলেন। রহীম আকবর বাদ্শার সেনানায়ক ছিলেন। গঙ্গ কবি তাঁর বীরপণার উল্লেখ করেকবিতাটি রচনা করেছিলেন।

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর বড় সাধের 'নওরতন' ভেঙে যায়। মিথ্যা রাজদ্রোহ অপবাদে রহীমকে জাহাঙ্গীরের আদেশানুযায়ী জেলে যেতে হয়েছিল। রহীমের সমস্ত সম্পত্তি বাদ্শার সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। অনেক দিন পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কারামুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। প্রতিদিন তিনি লাখ-লাখ টাকা গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন—আজ তাঁর গৃহে অন্ন নেই! কারামুক্তির পরেও বহু যাচক-উপযাচক, রাজ্য সংক্রান্ত নানারূপ জটিল সমস্যা সমাধানের পরামর্শ নওয়ার জন্য বহু রাজন্যবর্গ তাঁর কুটীর-দুয়ারে সমাগত হতেন। তিনি তাঁদের অনেক বোঝাতেন যে যেন তাঁরা আর তাঁর কুটীরে না আসেন; কিন্তু কেউ সে কথা মান্ত না।

একদিন তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি উপস্থিত যাচকবর্গের নিকটে বলে চিত্রকূটে চলে যান।

> "এ রহীম দর্ দর্ ফিরে, মাঁগি মধুকরী খাহিঁ;
> যারো য়ারী ছাঁড়ি দো বহ রহীম অব নাহিঁ।"

অর্থাৎ,—

> এ রহীম এবে যেথায় সেথায় ফিরে,
> মাধুকরী করি কোনো রকমে খায়;
> বন্ধুরা আর এস না তাঁহার কাছে,
> এ রহীম ওগো সে রহীম আর নয়।

এই কবিতাটি যেন রহীমের মর্ম্মন্তুদ দুঃখের দু' ফোটা অশ্রুজল! অজস্র অর্থ দুই হাতে গরীব-দুঃখীকে যে আজন্ম বিলিয়েছে আজ তাঁকে মাধুকরী বৃত্তি—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে জীবনধারণ করতে হয়,—একথা ভাব্তে গেলেও বড় প্রাণে বাজে।

তবুও যাচকবর্গ রহীমকে সর্ব্বদাই ঘিরে থাক্ত। তিনি তাদের কিছুতেই ছাড়াতে পার্তেন না। একদিন এক গরীব ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেই ফেল্লে—

> "রহিমন দানি দরিদ্রতর, তউ যাঁচিবে যোগ;
> জহাঁ সরিতন সুখা পড়ে, কুঁয়া খনাওত লোগ।"

অর্থাৎ,—রহীম আজ সব দান করে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন; তবুও তিনিই একমাত্র যাচিবার উপযুক্ত লোক। নদী শুকিয়ে গেলেও সেখানেই জলের জন্যে লোকে কূয়ো (ইন্দারা) করে নেয়।

রহীম বহুদিন অযোধ্যার সুবাদার ছিলেন। আকবর বাদ্শার সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলে লোকে তাঁকে 'অওধ-নরেশ' বলে ডাকত।

গরীব ব্রাহ্মণটি যখন কিছুতেই রহীমকে ছেড়ে যায় না তখন তিনি আর কি করেন—তাঁর পরম প্রিয় মিত্র রেওয়ার মহারাজার নিকট একটি দু' লাইনের কবিতায় চিঠি লিখে দিয়ে তাকে রেওয়া-দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। কবিতাটি এই—

"চিত্রকূট মে রমি রহে
রহিমন 'অবধ-নরেশ';
যাপর বিপদা পড়তি হয়
সো আবত যহ দেশ।"

এর অর্থ হ'ল এই যে, 'অওধ-নরেশ' রহীম দুরবস্থায় পড়ে এখন চিত্রকূটে বাসা বেঁধেছেন। যার উপর বিপদ পড়ে সেই শুধু এদেশে এসে থাকে। মহারাজা তৎক্ষণাৎ তাঁকে এক লাখ টাকা পাঠিয়ে দেন।

তিনি সেই টাকা পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা যাচকবর্গকে দান করে ফেলেন। প্রার্থী ও যাচকদের উপদ্রবে তিনি আর চিত্রকূটে থাকৃতে পারলেন না। সেখান থেকে পালিয়ে রেওয়া রাজ্যের রাজধানীতে এসে এক ছোলাভাজাওয়ালার দোকানে চুলো জালাবার কার্য্য গ্রহণ করেন। মাধুকরী ব্রত ত্যাগ করে তিনি আত্মগোপন অভিপ্রায়ে এই নগণ্য চাকুরী গ্রহণ করেন।

একদিন তিনি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে "ভার্" ঝোঁক্‌ছেন অর্থাৎ চুলোতে কয়লা ভরে দিচ্ছেন ঠিক এমনি সময় রেওয়া-নরেশ সেই রাস্তা দিয়ে রথে চড়ে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি রহীম্‌কে ঐ অবস্থায় দেখতে পান। দেখতে পেয়েই রাজা রথ থেকে নেমে তাঁর নিকটে এসে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন। বলা বাহুল্য রেওয়ার মহারাজদের মধ্যে অনেকে সরস্বতীরও বরপুত্র ছিলেন।

"যাকে শির অস ভার,
সো কস্ ঝোঁকত ভার্ অস।"

অর্থাৎ যার মস্তকে অত বড় দায়িত্বের ভার ছিল সে এখন কেমন করে এমন 'ভার' ঝোঁকছে। এখানে 'ভার্' শব্দটির দুই অর্থ করা হয়েছে। এক অর্থ দায়িত্ব, অপর অর্থ চুলো।

রহীম কবিতাটি শুনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

"রহিমন উতরে পার,
ভার্ ঝোঁকি সব ভার্ মেঁ।"

অর্থাৎ রহীম সব 'ভার্' (দায়িত্ব) 'ভারে' দিয়ে (চুলোর দিয়ে) চলে এসেছেন। এখন তিনি বন্ধনমুক্ত—দায়িত্বের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা নন্।

রেওয়ার মহারাজা তাঁকে তাঁর পরিবারবর্গসহ চিরদিন প্রতিপালন করবেন—এ প্রতিজ্ঞা করেও তাঁকে রেওয়ায় রাখতে পারেন নি। তিনি অবিলম্বে রেওয়া ত্যাগ করেন।

রহীমের কাব্যচর্চ্চা ও দানের অজস্র কাহিনী শোনা যায়। রহীমের জীবন যেন তাঁরই রচিত একটি কবিতার এক কলির মতো—

"তরুবর ফল নাহি খাত হৈ,
সরবর পিয়ঁহি না পান;
কহি রহীম পরকাজ হিত,
সম্পতি সুঁচহি সুজান।"

অর্থাৎ,—বৃক্ষ নিজের ফল নিজে খায় না—পরকে সব বিলিয়ে দেয়, সরোবর নিজের জল নিজে পান করে না, সে জলে অন্য লোক তৃষ্ণা নিবারণ করে; তেমনি সু-জন অর্থ-সম্পত্তি সঞ্চয় করে পরের হিতের জন্যে দান করে থাকে।

এ যেন তাঁরই জীবনের কথা। এ যেন সর্ব্বস্ব বিলিয়ে তিনি যে সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসী—দারিদ্র্যব্রতী জ্ঞান-ভিক্ষু সেজেছিলেন—তারই ছবি।

আর এক জায়গায় রহীম বলছেন—

"রহিমন দেখি বড়েন্ কো,
লঘু না দীজিয়ে ডারি,
জহাঁ কাম আবৈ সুই,
কহা করে তরবারি।"

এর অর্থ হ'ল এই যে, রহীম তুমি 'বড়'র সঙ্গ করে 'ছোটো'কে ঘৃণা করো না; কারণ অনেক সময় ছুঁচ দ্বারা যে কাজ সাধিত হয় বৃহৎ তরবারি দিয়ে তাহা করা যায় না।

কবি রসখান মুসলমান ছিলেন এবং তিনি বাদশাহী পাঠান-বংশসম্ভূত। তিনি গোস্বামী বিঠ্ঠল নাথ জীউ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁর রচিত হিন্দী কবিতা যেমনি উচ্চাঙ্গের তেমনি গভীর ধর্ম্মভাবপূর্ণ।

সৈয়দ মুবারক আলী বিলগ্রামী একজন শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দীভাষা তাঁর বড় প্রিয় ছিল এবং এই ভাষাতেই তাঁর কবি-প্রতিভা প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মালিক মুহম্মদ জায়সী হিন্দী-ভাষার আর একজন বিখ্যাত কবি। "মালিক" হ'ল এঁদের উপাধি, আর "জায়স" নামক স্থানে অবস্থান করতেন বলে "জায়সী" বলে তাঁকে উল্লেখ করা হত। মুহম্মদ হিন্দী-ভাষাতে সুন্দর সুন্দর কবিতা অবাধে রচনা করতে পারতেন। তাঁর একটি বারমাস্যা কবিতা অমেঠীর রাজার এত ভাল লেগেছিল যে, তিনি কবি মুহম্মদ জায়সীকে জায়স থেকে নিয়ে এসে নিজের সভাকবি নিযুক্ত করেন ও কবিকে বহুবার পুরস্কৃত করেন। কবি জায়সীর মৃত্যুর

পর রাজার আদেশানুযায়ী রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে একটি কবরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

রহীমের 'রহীম সৎসই' আর জায়সীর 'পদ্মাবত' গ্রন্থ দুটি খুব প্রসিদ্ধ।

খুঁজলে আরও বহু হিন্দীপ্রেমিক মুসলমান-কবির জীবন-কাহিনী পাওয়া যেতে পারে। শিখ ও জৈনদের নিকটে কিরূপ হিন্দী ভাষা সমাদৃত হয়েছিল এখন তার কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

হিন্দী-ভাষার পুরানো নাম 'হিন্দবী' বা 'হিন্দুই' ছিল। হিন্দু শব্দের সহিত হিন্দী নামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়ে গেছে।

হিন্দী-ভাষা বৈষ্ণবদেরও পরম প্রিয় ছিল। বিষ্ণু সম্প্রদায়, রামানুজ সম্প্রদায়, মধ্ব সম্প্রদায় ও বল্লভ সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য বিষ্ণু, রামানুজ, মধ্ব ও বল্লভের লীলাকাহিনী হিন্দীতেই রচিত হয়েছে। তাঁদের ভক্তবৃন্দ ঐ হিন্দী ভাষাতেই তাঁদের গুণগান করে থাকেন। উক্ত আচার্য্য চতুষ্টয়েরও রচিত অনেক হিন্দী পদাবলী প্রক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়।

হিন্দীতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী এমনি মধুর ও প্রাণস্পর্শী হয়েছিল যে রহীম ও মালিক মুহম্মদ জায়সীর মত মহাপ্রতিভাশালী মুসলমানদেরও বৈষ্ণব কবিতে পরিণত করেছিল। জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরাও হিন্দী ভাষার সেবা করেছেন এবং জৈনপ্রধান বানারসী দাস হিন্দী-ভাষার একজন মহাকবি ছিলেন। হিন্দী সাহিত্য-ভাণ্ডারের দুটি মণিকোঠা এই দুই ধর্ম্মের আচার্য্যদের অবদানে উজ্জল হয়ে রয়েছে। তাঁদের দানের বৈশিষ্ট্য ভাবতে গেলেই মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরে উঠে। শিখ গুরুদের অনেকেই হিন্দী ভাষার পরম সমাদর ও সেবা করে গেছেন। শিখদের আদিগুরু নানক হিন্দীভাষার বহুলপ্রচার করেন। যেখানে যেতেন সেখানেই হিন্দী-ভাষাতে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। শিখদের পঞ্চমগুরু অর্জ্জুনদেব হিন্দীভাষার প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তিনি তাঁহার আগের সমস্ত শিখ-গুরুদের বাণী সংগ্রহ করে "গুরুগ্রন্থ সাহেব" নামে পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থ এখন পঞ্জাবের করতারপুরের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

গুরু তেগবাহাদুর সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা সম্বন্ধে হিন্দীভাষাতেই সম্রাট্ আওরংজীব্‌কে উপদেশ দিয়েছিলেন। শিখ-গুরুদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী হিন্দীভাষার আদর করে গেছেন গুরু গোবিন্দ সিংহ। হিন্দীভাষা প্রচারের জন্ম তিনি কয়েকটি হিন্দী পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। আর একজন শিখ-প্রধান ভাই সন্তোষ সিংহও হিন্দী ভাষার অনেক উন্নতিসাধন করে গেছেন। শিখদের আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সূর্য্যপ্রকাশ" তিনি হিন্দীভাষাতেই রচনা করেন।

গুরুগোবিন্দ সিংহ তাঁর একজন প্রিয় শিষ্য গুলাব্ সিংহকে হিন্দী শিখিবার জন্ম কাশীতে পাঠিয়ে দেন। কালে তিনি হিন্দী ভাষার একজন খ্যাতনামা লেখক হতে পেরেছিলেন এবং তাঁর দ্বারা হিন্দী ভাষার উপকার ও উন্নতি সাধিত হয়েছে।

বর্ত্তমানেও জ্ঞানী জ্ঞান সিংহ হিন্দী ভাষা প্রচারের জন্ম যথাসাধ্য যত্নচেষ্টা করচেন এবং "জ্ঞানপ্রকাশ" নামক তাঁর রচিত হিন্দীগ্রন্থটি পরম সমাদৃত হয়েছে।

হিন্দীভাষার সমাদর গুজরাতীরাও কম করেনি মীরাবাঈয়ের অমূল্য কবিতাবলীর দু-একটি গুজরাতী শব্দ বাদ দিলে দেখা যাবে যে তা প্রাঞ্জল পুরাতন হিন্দী ভাষাতে রচিত। নরসিংহমেহ্‌তা গুজরাতী ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি খুব ভাল হিন্দী জানতেন ও তাঁর কবিতায় যথাসাধ্য হিন্দীভাষার ব্যবহার করে গেছেন। গুজরাতী কবিগণের মধ্যে দয়ারাম, সামল ও নর্ম্মদা-শঙ্করের স্থান খুব উচুঁতে। এঁরা সকলেই হিন্দীভাষার সহিত বিশেষ পরিচিত।

হিন্দী-ভাষাতে তুলসীদাসের 'চৌপাই", সুরদাসের 'পদাবলী' ও গিরিধর কবির 'কুঁড়লিয়া' যেমন প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত ঠিক তেমনি গুজরাতী ভাষার নরসিংহমেহ্‌তার 'প্রভাতী', মীরাবাঈয়ের 'ভজন,' সামলের 'ছপ্পয়', দয়ারামের 'গরমিয়া' ও নর্ম্মদাশঙ্করের 'রোলা' ছন্দ পরম সমাদৃত।

হিন্দীভাষার আদিকবি হচ্চেন,—চন্দ্, জন্ম ও জগ্‌নিক। হিন্দীভাষার প্রারম্ভকালের মুখ্য কবিগণের নাম,—বিত্তাপতি, আমীর খুসরু, কবীর, নানক ইত্যাদি।

হিন্দীভাষার প্রৌঢ়কালের কবি হচ্ছেন,—সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, হিতহরিবংশ, দাদুদয়াল, গঙ্, রহীম, কেশোদাস, রস্ খান, সেনাপতি, সুন্দরদাস, বিহারী, ভূষণ, মতিরাম, লাল, ঘন-আনন্দ, দেব, বৃন্দ, ইত্যাদি। হিন্দীভাষার উত্তর সময়ের কবির নাম,—দাস, দুলহ গিরিধর, ঠাকুর, পদ্মাকর, গ্বাল, দীনদয়াল, রঘুরাজ, দ্বিজদেব, লক্ষ্মণ সিংহ ও গিরিধরদাস। ঐ যুগের মুখ্য গদ্য-লেখক হচ্ছেন,—লল্লুলাল, সদলমিশ্র ও রাজা লক্ষ্মণ সিংহ।

হিন্দীভাষার উৎপত্তি-কাল বিক্রমাদিত্যের সময়, অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে ধরা হয়ে থাকে। এর পর থেকে কাব্য-সাহিত্যের ধারা ক্রমেই প্রবল বেগে বয়েছে এবং অবশেষে শতমুখী হয়ে সমস্ত দেশকে প্লাবিত করেছে।

হিন্দী-সাহিত্যে দু-রকম ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। এক ব্রজভাষা, দ্বিতীয় বর্ত্তমান হিন্দী—যাকে হিন্দীভাষীরা "খড়ীবোলী" বলে উল্লেখ করে। পুরাতন কবিদের অনেকেই ব্রজভাষা ব্যবহার করতেন। সে হিন্দী পুরাতন। হালের কবিগণের রচনা 'খড়ীবোলী'তে রচিত। ব্রজভাষায় রচিত কাব্য আজকালকার হিন্দীপাঠকদের নিকট অতি সহজবোধ্য নয়। অনেক জায়গায় কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। সহজীবাঈ ও দয়াবাঈ হিন্দীভাষার বিখ্যাত মহিলা-কবি ছিলেন। উভয়েই পরম পুণ্যবতী ও ধার্ম্মিক রমণী ছিলেন। কলিকাতার সর্ব্বপুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক লল্লুলাল-জী একজন বিখ্যাত হিন্দী-কবি ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দীগ্রন্থ রচনা করেছেন। রেওয়ার মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ ও জয়সিংহ উচ্চদরের হিন্দী কবি ছিলেন। জ্ঞান-ভিক্ষু সাধু তাপস ও ছত্রপতি মহারাজা উভয়ের নিকটেই হিন্দীভাষা পরম সমাদৃত হয়েছে—এ দৃষ্টান্ত হিন্দীভাষার ইতিহাসের পাতায় পাতায় চোখে পড়ে।

বলা বাহুল্য, ভারতের প্রায় সকল সামন্তরাজগণের পারিবারিক ভাষা হিন্দী। তাঁহারা এই ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন। অযোধ্যার শেষ সামন্তরাজ মানসিংহ ওরফে দ্বিজদেব একজন শ্রেষ্ঠ হিন্দী-কবি ছিলেন। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে হিন্দীভাষার বঙ্কিমচন্দ্র বলা যেতে পারে। যোধপুরের মহারাজার পুত্র সমর সিংহ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা যশোবন্ত সিংহ হিন্দীভাষার বিখ্যাত কবি ছিলেন। ধর্ম্মসংস্কারকগণের প্রধানতম গুরুগোবিন্দ সিংহ, মলুকদাস, দাদুদয়াল, নানক, কবীর, রৈদাস তাঁদের বাণী এই ভাষাতে প্রচার করে গেছেন।

সুর-সাধন

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

(সাধু য়হ তন ঠাট তংবুরেকা—ইত্যাদি। কবীর)

হে সাধু, তোর দেহখানি　'তম্বুরা'রি ঠাট যে—জানি,
　মুচড়ে' 'খুঁটি' বাঁধলে তবেই 'হজুরী'-রাগ জাগ্‌বে ;
আর যদি তোর ভাগ্য-ফেরে　'খুঁটি' ভাঙে,—তারও ছেঁড়ে,
　ধুলোর জিনিষ ধুলো হ'য়েই ধুলোয় পড়ে থাক্‌বে।

'খুঁটি'র সাথে মিল্‌বে 'খুঁটি',
　তারের সাথে তার,—
কবীর কহে, এ সুর-সাধন
　কঠিন সাধনার!

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপু একদিন মাকে বলিল যে, সে স্কুলে পড়িতে যাইবে।

সর্ব্বজয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কোন্ স্কুলে?

—কেন এই তো আড়বোয়ালেতে বেশ স্কুল রয়েচে।

—সে তো এখান থেকে যেতে আসতে চার ক্রোশ পথ। সেখানে যাবি হেঁটে পড়্‌তে? তখন সর্ব্বজয়া কথাটা উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু ছেলের মুখে কয়েকদিন ধরিয়া বার বার কথাটা শুনিয়া সে শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, যা খুসি করো বাপু, আমি জানিনে। তোমরা কোনো কালে কারুর কথা তো শুন্‌লে না, শুন্‌বেও না—সেই একজন নিজের খেয়ালে সারাজন্ম কাটিয়ে গেল, তোমারও তো সে ধারা বজায় রাখা চাই! ইস্কুলে পড়্‌বো। ইস্কুলে পড়্‌বি তো এদিকে কি হবে? দিব্যি একটা যাহোক্ দাঁড়াবার পথ তবুও হয়ে আসচে...এখন তুমি দাও ছেড়ে—তারপর ইদিকেও যাক্, ওদিকেও যাক্—

মায়ের কথায় সে চুপ করিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গত পৌষ মাসে কাশী চলিয়া গিয়াছেন, আজকাল তাহাকেই সমস্ত দেখিতে শুনিতে হয়। সামান্য একটু জমি-জমা আছে, তাহার খাজনা আদায়, ধান কাটাইবার বন্দোবস্ত, দশকর্ম্ম, গৃহদেবতার পূজা। গ্রামে ব্রাহ্মণ নাই, তাহারাই একঘর মোটে। চাষী কৈবর্ত্ত ও অন্যান্য জাতির বাস, তাহা ছাড়া এ পাড়ার কুণ্ডুরা ও ও-পাড়ার সরকারেরা। কাজে কর্ম্মে ইহাদের সকলেরই বাড়ী অপুকে ষষ্ঠীপূজা মাকালপূজা করিয়া বেড়াইতে হয়। সবাই মানে, জিনিষপত্র দেয়।

সেদিন কি একটা তিথি উপলক্ষে সরকার বাড়ী লক্ষ্মীপূজা ছিল। পূজা সারিয়া খানিক রাত্রে জিনিষপত্র একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া সে পথ বাহিয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছিল। খুব জ্যোৎস্না, সরকার বাড়ীর সাম্‌নে নারিকেল গাছে কাঠ্‌ঠোক্‌রা শব্দ করিতেছে। শীত বেশ পড়িয়াছে, বাতাস খুব ঠাণ্ডা, পথে ক্ষেত্র কাপালির বেড়ায় আমড়া গাছে বউল ধরিয়াছে। কাপালিদের বাড়ীর পিছনে বেগুনক্ষেতের উঁচু নীচু জমিতে এক জায়গায় জ্যোৎস্না পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে,—পাশের খাদটাতেই অন্ধকার। অপু মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে যাইতেছিল উঁচু জায়গাটা একটা ভালুক, নীচুটা জলের চৌবাচ্চা, তার পরের উঁচুটা একটা নুনের ঢিবি। মনে মনে ভাবিল—কমলালেবু দিয়েচে, বাড়ী গিয়ে কমলালেবু খাবো। মনের সুখে সহরে শেখা একটা গানের একটা চরণ সে গুন্ গুন্ করিয়া ধরিল—

সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরী লীলা—

অনেকদিনের স্বপ্ন যেন আবার ফিরিয়া আসে। নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে ইছামতীর তীরের বনে, মাঠে কত ধূসর অপরাহ্নের, কত জ্যোৎস্না রাতের সে সব স্বপ্ন! ·· ছোট্ট চাষাগাঁয়ে চিরকাল এরকম ষষ্ঠীপূজা মাকালপূজা করিয়া কাটাইতে হইবে?

সারাদিনের রোদপোড়া মাটি নৈশ শিশিরে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এখন শীতের রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহারই সুগন্ধ।

অপুর মনে হইল রেলগাড়ীর চাকায় চাকায় যেমন শব্দ হয়—ছোট্ ঠাকুর পো—বট্ ঠাকুর-পো—ছোট্ ঠাকুর-পো—বট্ ঠাকুর-পো—

দুই এক দিনের মধ্যে সে মায়ের কাছে কথাটা আবার তুলিল। এবার শুধু তোলা নয়, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল। আড়বোয়ালের স্কুল দুই ক্রোশ দূরে তাই কি? সে খুব হাঁটিতে পারিবে এটুকু। সে বুঝি চিরকাল এই রকম চাষাগাঁয়ে বসিয়া বসিয়া

ঠাকুরপূজা করিবে? বাহিরে যাইতে পারিবে না বুঝি?

তবুও আরও মাস দুই কাটিল। স্কুলের পড়াশোনা সর্ব্বজয়া বোঝে না, সে যাহা বোঝে তাহা পাইয়াছে। তবে আবার স্কুলে পড়িয়া কি লাভ? বেশ তো সংসার গুছাইয়া উঠিতেছে। আর বছর কয়েক পরে ছেলের বিবাহ—তারপরই একঘর মানুষের মত মানুষ।

সর্ব্বজয়ার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু অপুর তাহা হয় নাই। তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। শ্রাবণের প্রথমে সে আড়বোয়ালের মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া বাড়ী হইতে যাতায়াত সুরু করিল।

অনেকটা পথ। দুই ক্রোশের বেশী হইবে তো কম নয়। দুই তিনখানা গ্রাম ছাড়াইয়া যাইতে হয়, খানিকটা মাঠও পড়ে। কত ধরণের লোকের সঙ্গে পথে দেখা হয়। দূর দূর গ্রামের লোক পথ দিয়া হাঁটে—কত দেশের লোক কত দেশে যায়। সে তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে পথ চলে। নানা খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞাসা করে—কোথায় তাদের বাড়ী, কেমন সে গ্রাম, ক'ঘর লোকের বাস, কোন্ নদীর ধারে? ক'জন লোক তাদের বাড়ী, কত ছেলেমেয়ে, কি করে তারা? বার বার নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার আশ মিটে না। চিরদিনই সে গল্প-পাগ্‌লা, গল্প একবার সুরু হইলে তাহা শুনিতে শুনিতে সে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়—যত সামান্য ঘটনাই হউক না কেন, তাহার ভাল লাগে। একা একা পথে বাহির হইয়া নূতন ভাবে পৃথিবীর সহিত পরিচয় হইতেছে, পথ ঘাটের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের কথা জানিতে ইচ্ছা হয়। পথ চলিবার সময়টা এইজন্য তাহার বড় ভাল লাগে, সাগ্রহে সে ইহার প্রতীক্ষা করে। স্কুলের ছুটীর পর বই লইয়া পথে বাহির হইয়াই ভাবে—এইবার গল্প শুনবো। পরে ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া আসিয়া কোনো অপরিচিত লোকের নাগাল ধরিয়া ফেলে। প্রায়ই চাষা লোক, অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া আসিতেছে, পায়ে ধূলা, হাতে হুঁকাকলিকা। অপু জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্চো হ্যাঁ কাকা? চলো আমি মনসাপোতা পজ্জন্ত তোমার সঙ্গে যাবো—মামজোয়ান গিইছিলে? তোমাদের বাড়ী বুঝি? না? নাম শুনিচি কোন্‌দিকে জানি নে। কি খেয়ে সকালে বেরিয়েচ হ্যাঁ কাকা?...

সেদিন সে স্কুলে গিয়া দেখিল স্কুল শুদ্ধ লোক বেজায় সন্ত্রস্ত। মাষ্টারেরা এদিকে ওদিকে ছুটাছুটী করিতেছেন। স্কুল-ঘর গাঁদা ফুলের মালা দিয়া সাজানো হইতেছে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় খামোকা একটা সুবৃহৎ সিঁড়ি-ভাঙা ভগ্নাংশ কষিয়া নিজের ক্লাসের বোর্ড পুরাইয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ আজ স্কুল-ঘরের বারান্দা ও কম্পাউণ্ড এত সাফ করিয়া রাখা হইয়াছে যে যাহারা বারোমাস এখানের সহিত পরিচিত, তাহাদের বিস্মিত হইবার কথা। হেডমাষ্টার ফণিবাবু খাতাপত্র, এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই লইয়া মহা ব্যস্ত। সেকেন্ পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, ও অমূল্যবাবু, চৌঠো তারিখে খাতায় যে নাম সই করেন নি? আপনাকে বলে বলে আর পারা গেল না। দেরীতে এসেছিলেন তো খাতাটা সই করে ক্লাসে গেলেই তো হোত? সব মনে থাকে এইটের বেলাতেই—। অপু শুনিল একটার সময় স্কুল দেখিতে ইন্‌স্‌পেক্টর আসিবেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ইন্‌স্‌পেক্টর আসিলে কি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে ক্লাসের ছেলেদের সে বিষয়ে তালিম দিতে লাগিলেন।

বারোটার কিছু পূর্ব্বে একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া স্কুলের সামনে থামিল। হেডমাষ্টার তখনও ফাইল দুরস্ত শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই বোধ হয়—তিনি এত সকালে ইন্‌স্‌পেক্টরের আসিয়া পড়াটা প্রত্যাশা করেন নাই, জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গাড়ী দেখিতে পাইয়াই উঠি পড়ি অবস্থায় ছুটিলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্ট ভেকের পায়ের মত সজীব হইয়া উঠিয়া তারস্বরে ও মহা উৎসাহে (অন্যদিন এই সময়টাই তিনি ক্লাসে বসিয়া মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাটুকু উপভোগ করিয়া থাকেন) দ্রব পদার্থ কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। পাশের ঘরে সেকেন্ পণ্ডিত মহাশয়ের হুঁকার শব্দ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চ কণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল—শিক্ষক বলিলেন, মড়ি-

তোমরা অবশ্যই কমলালেবু দেখিয়াছ, পৃথিবীর আকার—এই হয়েন—কমলা লেবুর ন্যায় গোলাকার—

হেডমাষ্টারের পিছনে পিছনে ইন্‌স্‌পেক্টর স্কুল ঘরে ঢুকিলেন। বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর হইবে, বেঁটে গৌরবর্ণ, সাটিন জিনের লম্বা কোট গায়ে, সিল্কের চাদর গলায়, পায়ে সাদা কেম্বিসের জুতা, চোখে চশমা। গলার স্বর ভারী। প্রথমে তিনি আপিস ঘরে ঢুকিয়া খাতাপত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখার পরে বাহির হইয়া হেডমাষ্টারের সঙ্গে ফার্ষ্ট ক্লাসে গেলেন। অপুর বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল; এইবার তাহাদের ক্লাশে আসিবার পালা। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় গলার সুর আর এক গ্রাম চড়াইলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টর ঘরে ঢুকিয়া বোর্ডের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা কি ভগ্নাংশ ধরেচে? তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাইল—বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, ছ' ক্লাশেই আমিই অঙ্ক কষাই কি না? ও ক্লাসেই অনেকটা এগিয়ে দিই—সরল ভগ্নাংশটা শেষ করে ফেলি—

ইন্‌স্‌পেক্টর এক এক করিয়া বাংলা রিডিং পড়িতে বলিলেন। পড়িতে উঠিয়াই অপুর গলা কাঁপিতে লাগিল। শেষের দিকে তাহার পড়া বেশ ভাল হইতেছে বলিয়া তাহার নিজেরই কানে ঠেকিল। পরিষ্কার সতেজ বাঁশীর মত গলা। রিন্‌ রিনে মিষ্টি।

—বেশ বেশ রিডিং। কি নাম তোমার?

তিনি আরও কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপরে সবগুলি ক্লাস একে একে ঘুরিয়া আসিয়া জলের ঘরে ডাব ও সন্দেশ খাইলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় অপুকে বলিলেন, তুই হাতে করে এই ছুটির দরখাস্ত-খানা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, তোকে খুব পছন্দ করেচেন, যেমন বাইরে আসবেন, অমনি দরখাস্তখানা হাতে দিবি—ছদিন ছুটি চাইবি—তোর কথায় হয়ে যাবে—এগিয়ে যা।

ইন্‌স্‌পেক্টর চলিয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ী কিছু দূর যাইতে না যাইতে ছেলেরা সমস্বরে কলরব করিতে করিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হেডমাষ্টার ফণিবাবু অপুকে বলিলেন, "ইনস্পেক্টরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েচেন তোমার ওপর। বোর্ডের একজামিন্‌ দেওয়াবো তোমাকে দিয়ে—তৈরী হও বুঝলে?

বোর্ডের পরীক্ষা দিতে মনোনীত হওয়ার জন্য যত না হউক ইন্‌স্‌পেক্টরের পরিদর্শনের জন্য ছুদিন স্কুল বন্ধ থাকিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে বাড়ীর দিকে রওনা হইল। অন্যদিনের চেয়ে দেরী হইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধেক পথ চলিয়া আসিয়া পথের ধারে একটা সাঁকোর উপর বসিয়া মায়ের দেওয়া খাবারের পুঁটুলি খুলিয়া রুটি, নারিকেলকোরা ও গুড় বাহির করিল। এই খানটাতে বসিয়া রোজ সে স্কুল হইতে ফিরিবার পথে খাবার খায়। রাস্তার বাঁকের মুখে সাঁকোটা, হঠাৎ কোনো দিক হইতে দেখা যায় না, একটা বড় তুঁত গাছের ডালপালা নত হইয়া ছায়া ও আবরণ দুই-ই যোগাইতেছে। সাঁকোর নীচে আমরুল শাকের বনের ধারে একটু একটু জল বাধিয়াছে, মুখ বাড়াইলে জলে ছায়া পড়ে। অপুর কেমন একটা অস্পষ্ট ভিত্তিহীন ধারণা আছে যে, জলটা মাছে ভর্ত্তি, তাই সে একটু একটু রুটির টুক্‌রা উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে মাছে ঠোক্‌রাইতেছে কি না!

সাঁকোর নীচের জলে হাত মুখ ধুইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল একজন ঝাঁকড়া-চুল কালো মত লোক রাস্তার ধারের মাঠে নামিয়া লতা কাটি কুড়াইতেছে। অপু কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকটা খুব লম্বা নয়, বেঁটে ধরণের, শক্ত হাত পা, পিঠে একগাছা বড় ধনুক, একটা বড় বোঁচকা, মাথার চুল লম্বা লম্বা, গলায় রাঙা ও সবুজ হিংলাজের মালা। সে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া ভাবিয়া বলিল—ওখানে কি খুঁজচো? পরে লোকটির সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। সে জাতিতে সাঁওতাল, অনেক দূরে কোথায় দুমকা জেলা আছে সেখানে বাড়ী। অনেক দিন বর্দ্ধমানে ছিল, বাঁকা বাঁকা বাংলা বলে। পায়ে হাঁটিয়া সেখান হইতে আসিতেছে। গন্তব্য স্থান অনির্দ্দিষ্ট—এরূপে যতদূর যাওয়া যায় যাইবে। সঙ্গে তীর ধনুক আছে, পথের ধারের বনে মাঠে যাহা শিকার মেলে—

তাহাই খায়। সম্প্রতি একটা কি পাখী মারিয়াছে, ও মাঠের ধারের কোনো ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক বড় বড় বেগুন তুলিয়াছে—তাহাই পুড়াইয়া খাইবার জোগাড়ে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইতেছে। অপু বলিল, কি পাখী দেখি? লোকটা ঝোলা হইতে বাহির করিয়া দেখাইল একটা বড় হরিয়াল ঘুঘু। সত্যিকারের তীর ধনুক—যাহাতে সত্যিকারের শিকার সম্ভব হয়—অপু কখনও দেখে নাই। বলিল, দেখি একগাছা তীর তোমার? পরে হাতে লইয়া দেখিল, মুখে শক্ত লোহার ফলা, পিছনে বুনো-পাখীর পালক-বাঁধা—অদ্ভুত কৌতূহলপ্রদ ও মুগ্ধকর জিনিষ!—

—আচ্ছা এতে পাখী মরে, আর কি মরে?

লোকটা উত্তর দিল, সবই মারা যায়—খরগোস, শিয়াল, বেজী, এমন কি বাঘ পর্য্যন্ত। তবে বাঘ মারিবার সময় তীরের ফলায় অন্য একটা লতার রস মাখাইয়া লইতে হয়। তাহার পর সে তুঁতগাছতলায় শুকনা পাতা-লতার আগুন জ্বালিল। অপুর পা আর সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না—মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল লোকটা পাখীটার পালক ছাড়াইয়া আগুনে ঝল্‌সাইতে দিল, বেগুনগুলাও পুড়াইতে দিল।

বেলা অত্যন্ত পড়িলে অপু বাড়ী রওনা হইল। আহার শেষ করিয়া লোকটা তখন তাহার বোঁচকা ও তীরধনুক লইয়া রওনা হইয়াছে। এ রকম মানুষ সে তো কখনো দেখে নাই! বাঃ—যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে যাওয়া—পথে পথে তীর ধনুক দিয়া শিকার করা, বনের লতাপাতা কুড়াইয়া গাছতলায় দিনের শেষে বেগুন পুড়াইয়া খাওয়া! গোটা আষ্টেক বড় বড় বেগুন সামান্য একটু নুনের ছিটা দিয়া গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়া কি করিয়াই নিমেষের মধ্যে সাবাড় করিয়া ফেলিল!

মাস কয়েক কাটিয়া গেল। সকাল বেলা স্কুলের ভাত চাহিতে গিয়া অপু দেখিল রান্না চড়ানো হয় নাই। সর্ব্বজয়া বলিল, আজ যে কুলুই চণ্ডী পূজো—আজ ইস্কুলে যাবি কি করে?···ওরা বলে গিয়েচে ওদের পূজোটা সেরে দেওয়ার জন্যে—পূজোবারে কি আর ইস্কুলে যেতে পারবি? বড্ড দেরী হয়ে যাবে—

—হ্যাঁ তাই বৈ কি? আমি পূজো কত্তে গিয়ে ইস্কুল কামাই করি আর কি? আমি ওসব পারব না, পূজো-টুজো আমি আর করবো কি করে, রোজই তো পূজো লেগে থাকবে আর আমি বুঝি রোজ রোজ—তুমি ভাত নিয়ে এস, আমি ওসব শুনচি নে—।

—লক্ষ্মী বাবা আমার। আচ্ছা, আজকের দিনটা পূজোটা সেরে নে। ওরা বলে গিয়েচে ওপাড়া শুদ্ধ পূজো হবে। চা'ল পাওয়া যাবে এক ধামার কম নয়—মাণিক আমার কথা শোনো, শুনতে হয়—।

অপু কোনমতেই কথা শুনিল না। অবশেষে না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। সর্ব্বজয়া ভাবে নাই যে, ছেলে সত্যসত্যই তাহার কথা ঠেলিয়া না খাইয়া স্কুলে চলিয়া যাইবে। যখন সত্যই বুঝিতে পারিল তখন তাহার চোখের জল আর বাধা মানিল না। ইহা সে আশা করে নাই।

অপু স্কুলে পৌঁছিলেই হেডমাষ্টার ফণিবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাক দিলেন। ফণিবাবুর ঘরেই স্থানীয় ব্র্যাঞ্চ পোষ্ট-আপিস্, ফণিবাবুই পোষ্টমাষ্টার। তিনি তখন ডাকঘরের কাজ করিতেছিলেন। বলিলেন, এসো অপূর্ব্ব, তোমার নম্বর দেখবে? আজ ইন্‌স্পেক্টর আপিস্ থেকে পাঠিয়ে দিয়েচে—বোর্ডের এগ্‌জামিনে তুমি জেলার মধ্যে প্রথম হয়েচ—পাঁচ টাকার একটা স্কলারশিপ পাবে যদি আরো পড়ো তবে। পড়বে তো?

এই সময় তৃতীয় পণ্ডিত মশায় ঘরে ঢুকিলেন। ফণি-বাবু বলিলেন—ওকে সে কথা এখন বল্লাম পণ্ডিত মশায়। জিজ্ঞেস্ করচি আরও পড়বে তো?

তৃতীয় পণ্ডিত বলিলেন—পড়বে না বাঃ। হীরের টুকরো ছেলে, ইস্কুলের নাম রেখেচে। ওরা যদি না পড়বে তো পড়বে কে, কেষ্ট তেলির বেটা গোবর্দ্ধন? কিচ্ছু না, আপনি ইন্‌স্পেক্টর আপিসে লিখে দিন যে, ও হাই ইস্কুলে পড়বে। ওর আবার জিজ্ঞেসাটা কি?··· ওঃ সোজা পরিশ্রম করিচি মশাই ওকে ভগ্নাংশটা শেখাতে?

প্রথমটা অপু যেন ভাল করিয়া কথাটা বুঝিতে পারিল না। পরে যখন বুঝিল তখন তাহার মুখে কথা জোগাইল

না। হেডমাষ্টার একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিলেন—এইখানে একটা নাম সই করে দাও তো? আমি কিন্তু লিখে দিলাম যে, তুমি হাই স্কুলে পড়্‌বে। আজই ইন্‌স্‌পেক্টর আফিসে পাঠিয়ে দেবো—

সকাল সকাল ছুটি লইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে মায়ের করুণ মুখচ্ছবি বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল। পথের পাশে দুপুরের রৌদ্রভরা শ্যামল মাঠ, প্রাচীন তুঁত-বট গাছের ছায়া, ঘন শাখাপত্রের অন্তরালে ঘুঘুর উদাস কণ্ঠ, সব যেন করুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই অপূর্ব্ব, করুণ ভাবটি বড় গভীর চাপ দিয়া গিয়াছিল। আজকার দুপুরটির কথা উত্তর জীবনে বড় মনে আসিত তাহার—কত কতদিন পরে আবার এই শ্যামছায়াভরা বীথি, বাল্যের অপরূপ জীবনানন্দ, ঘুঘুর ডাক, মায়ের মনের একদিনের দুঃখটি—অনন্তের মণিহারে গাঁথা দানাগুলির একটি, পশ্চিম দিগন্তে প্রতিসন্ধ্যায় ছিঁড়িয়া-পড়া, বহুবিস্মৃত মুক্তাবলীর মধ্যে কেমন করিয়া অক্ষয় হইয়া ছিল।

বাড়ীতে তাহার মাও আজ সারাদিন খায় নাই। ভাত চাহিয়া না পাইয়া ছেলে না খাইয়াই চলিয়া গিয়াছে স্কুলে—সর্ব্বজয়া কি করিয়া খাবারের কাছে বসে? কুলুই চণ্ডীর ফলার খাইয়া অপু বৈকালে বেড়াইতে গেল। গ্রামের বাহিরের মাঠে ধঞ্চেক্ষেতের ফসল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। চারি ধারে খোলা মাঠ পড়িয়া আছে। আবার সেই সব রঙীন্ কল্পনা! সে পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে! তার স্বপ্নের অতীত! মোটে এক বছর পড়িয়াই বৃত্তি পাইল!...সুমুখের জীবনের কত ছবিই আবার মনে আসে!...ঐ মাঠের পারের রক্তআকাশটার মত রহস্য-স্বপ্নভরা সে অজানা অকূল জীবন-মহাসমুদ্র!...পুলকে সারাদেহ শিহরিয়া উঠে। মাকে এখনও সব কথা বলা হয় নাই। মায়ের মনের বেদনার রঙে যেন মাঠ, ঘাট, অস্ত-দিগন্তের মেঘমালা রঙানো। গভীর ছায়াভরা সন্ধ্যা মায়ের দুঃখভরা মনটার মত ঘুলি ঘুলি অন্ধকার।

দালানের পাশের ঘরে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সর্ব্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় ছেলেকে ওবেলার কুলুইচণ্ডী-ব্রতের চিঁড়ে মুড়কীর ফলার খাইতে দিল। নিকটে বসিয়া চাঁপাকলার খোসা ছাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, ওরা কত দুঃখু করে আজ। সরকার বাড়ী থেকে বলে গেল তুই পুজো কর্‌বি—তারা খুঁজতে এলে আমি বল্লাম, সে স্কুলে চলে গিয়েচে। তখন তারা আবার ভৈরব চক্কত্তিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই অত বেলায়—তুই যদি যেতিস্—

আজ না গিয়ে ভালই করিচি মা। আজ হেডমাষ্টার বলেচে আমি এগ্‌জামিনে এস্কলারশিপ পেইচি। বড় স্কুলে পড়্‌লে মাসে পাঁচ টাকা করে পাবো। স্কুলে যেতেই হেডমাষ্টার ডেকে বল্লে—

সর্ব্বজয়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোথায় পড়তে হবে?

—মহকুমার বড় ইস্কুলে।

—তা তুই কি বল্‌লি?

—আমি কিছু বলিনি। পাঁচটা কোরে টাকা মাসে মাসে দেবে, যদি না পড়ি তবে তো আর দেবে না! ওতে মাইনেও ফ্রি করে নেবে আর ওই পাঁচ টাকাতে বোর্ডিংএ থাকবার খরচও কুলিয়ে যাবে—

সর্ব্বজয়া আর কোনো কথা বলিল না। কি কথা সে বলিবে? যুক্তি এতই অকাট্য যে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। ছেলে এস্কলারশিপ্ পাইয়াছে, বাহিরে পড়িতে যাইবে, ইহাতে মা-বাপের ছেলেকে বাধা দিয়া বাড়ী বসাইয়া রাখিবার পদ্ধতি কোথায় চলিত আছে? এ যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন্ দণ্ডী তার নির্ম্মম, অকাট্য দণ্ড উঠাইয়াছে, তাহার দুর্ব্বল হাতের সাধ্য নাই যে ঠেকাইয়া রাখে। ছেলেও ঐ দিকেই ঝুঁকিয়াছে! আজকার দিনটিই যেন কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল সে। ভবিষ্যতের সহস্র সুখস্বপ্ন কুয়াসার মত অনন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে কেন আজকার দিনটিতেই বিশেষ করিয়া?

মাসখানেক পরে বৃত্তি পাওয়ার খবর কাগজে পাওয়া গেল।

যাইবার পূর্ব্বদিন বৈকালে সর্ব্বজয়া ব্যস্তভাবে ছেলের জিনিষপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। ছেলে কখনও একা বিদেশে বাহির হয় নাই, নিতান্ত আনাড়ি, ছেলে-

মানুষ ছেলে। কত জিনিষের দরকার হইবে, কে থাকিবে তখন সেখানে যে মুখে মুখে সব অভাব যোগাইয়া ফিরিবে, সব জিনিষ হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবে? খুঁটিনাটি—একখানি কাঁথা পাতিবার, একখানি গায়ের—একটা জল খাইবার গ্লাস, ঘরের তৈরী এক শিশি সরের ঘি, এক পুঁটুলি নারিকেল নাড়ু; অপু ফুলকাটা একটা মাঝারী জামবাটিতে দুধ খাইতে ভালবাসে সেই বাটিটা, একটা ছোট বোতলে মাখিবার চৈ মিশানো নারিকেল তৈল, আরও কত কি। অপুর মাথার বালিশের পুরাণো ওয়াড় বদ্‌লাইয়া নতুন ওয়াড় পরাইয়া দিল। দধি-যাত্রায় আবশ্যকীয় দই একটা ছোট পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল। ছেলেকে কি করিয়া বিদেশে চলিতে হইবে সে বিষয়ে সহস্র উপদেশ দিয়াও তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। ভাবিয়া দেখিয়া যেটি বাদ গিয়াছে মনে হয় সেটি তখনি আবার ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল।

—যদি কেউ মারে টারে, কত দুষ্টু ছেলে তো আছে? অম্‌নি মাষ্টারকে বলে দিবি—বুঝলি? রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িস্‌নে যেন ভাত খাবার আগে? এ তো বাড়ী নয় যে কেউ তোকে ওঠাবে—খেয়ে তবে ঘুমুবি—নয়তো তাদের বল্‌বি যা হয়েচে তাই দিয়ে ভাত দ্যাও—বুঝ্‌লি তো?

সন্ধ্যার পর সে কুণ্ডুদের বাড়ী মনসার ভাসান শুনিতে গেল। অধিকারী নিজে বেহুলা সাজিয়া পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে—বেশ গানের গলা। কিন্তু খানিকটা শুনিয়া তাহার ভাল লাগিল না। শুধু ছড়া কাটা ও নাচ সে পছন্দ করে না,—যুদ্ধ নাই, তলোয়ার খেলা নাই, কেমন যেন পান্‌সে পান্‌সে।

তবুও আজকার রাতটি বড় ভাল লাগিল তাহার। এই মনসা-ভাসানের আসর, এই নতুন জায়গা, এই অচেনা গ্রাম্য বালকের দল, ফিরিবার পথে তাহাদের পাড়ার বাঁকে প্রস্ফুটিত হেনা ফুলের গন্ধ-ভরা নৈশ বাতাস, জোনাকী-জ্বলা অন্ধকারে কেমন মায়াময় মনে হয়।

রাত্রে সে আরও দু একটা জিনিষ সঙ্গে লইল। বাবার হাতের লেখা একখানা গানের খাতা, বাবার উদ্ভট শ্লোকের খাতাখানা, বড় পেঁটরাটা হইতে বাহির করিয়া রাখিল—বড় বড় গোটা গোটা ছাঁদের হাতের লেখাটা বাবার কথা মনে আনিয়া দেয়। গানগুলির সঙ্গে বাবার গলার সুর এমন ভাবে জড়াইয়া আছে যে, সেগুলি পড়িয়া গেলেই বাবার সুর কানে বাজে। নিশ্চিন্দিপুরের কত ক্রীড়াক্লান্ত শান্ত সন্ধ্যা, মেঘমেদুর বর্ষামধ্যাহ্ন, কত জ্যোৎস্না-ভরা রহস্যময়ী রাত্রি, বিদেশ-বিভূঁই-এর সেই দুঃখ-মাখানো দিনগুলির সঙ্গে এই গানের সুর যেন জড়াইয়া আছে—সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের রাণা, কাশীর পরিচিত সেই বাঙাল কথকঠাকুর।

সর্ব্বজয়ার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, হয়তো ছেলে শেষ পর্য্যন্ত বিদেশে যাইবার মত করিবে না। কিন্তু তাহার অপু যে পিছনের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। সে যে এত খাটিয়া, একে ওকে বলিয়া কহিয়া তাহার সাধ্যমত যতটা কুলায়, ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন একটা খাড়া করিয়া দিয়াছিল—ছেলে তাহা পায়ে দলিয়া যাইতেছে—কি জানি কিসের টানে! কোথায়? তাহার স্নেহদুর্ব্বল দৃষ্টি তাহাকে দেখিতে দিতেছিল না যে, ছেলের ডাক আসিয়াছে বাহিরের জগৎ হইতে। সে জগৎটা তাহার দাবী আদায় করিতে তো ছাড়িবে না—সাধ্য কি সর্ব্বজয়ার যে চিরকাল ছেলেকে আঁচলতলে লুকাইয়া রাখে?

যাত্রার পূর্ব্বে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দধির ফোঁটা অপুর কপালে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, বাড়ী আবার শীগ্‌গির শীগ্‌গির আস্‌বি, কিন্তু তোদের ইতুপুজোর ছুটি দেবে তো?

—হুঁ, ইস্কুলে বুঝি ইতু পুজোর ছুটি হয়? তাতে আবার বড় ইস্কুল। সেই আবার আস্‌বো গরমের ছুটিতে—

ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় উচ্ছ্বসিত চোখের জল বহু কষ্টে সর্ব্বজয়া চাপিয়া রাখিল।

অপু মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া ভারী বোঁচকাটা পিঠে ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

মাঘ মাসের সকাল। কাল একটু একটু মেঘ ছিল, আজ মেঘ-ভাঙা রাঙা রোদ কুণ্ডুবাড়ীর দো-ফলা আম গাছের মাথায় ঝলমল্‌ করিতেছে—বাড়ীর সামনে বাঁশ-বনের তলায় চক্‌চকে সবুজ পাতার আড়ালে বুনো আদার

রঙীন্ ফুল যেন দূর ভবিষ্যতের রঙীন্ স্বপ্নের মত সকালের বুকে।

৪

সবে ভোর হইয়াছে। দেওয়ানপুর গবর্ণমেণ্ট মডেল ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছেলেদের বোর্ডিং ঘরের সব দরজা এখনও খুলে নাই। কেবল স্কুলের মাঠে দুইজন শিক্ষক পায়চারী করিতেছিলেন। সম্মুখের রাস্তা দিয়া এত ভোরেই গ্রাম হইতে গোয়ালারা বাজারে দুধ বেচিতে আনিতেছিল, একজন শিক্ষক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, দাঁড়াও ও ঘোষের পো, কাল দুধ দিয়ে গেলে তো নিছক জল, আজ দেখি কেমন দুধটা! অপর শিক্ষকটি পিছু পিছু আসিয়া বলিলেন, নেবেন না সত্যেনবাবু, একটু বেলা না গেলে ভাল দুধ পাওয়া যায় না। আপনি নতুন লোক, এসব জায়গার গতিক জানেন না, যার তার কাছে দুধ নেবেন না—আমার জানা গোয়ালা আছে, কিনে দোব বেলা হ'লে—

সত্যেনবাবু ততক্ষণ ভাঁড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একমনে দুধ পরীক্ষা করিতেছেন। গোয়ালা বলিল, আজ্ঞে নেন্ কর্ত্তা, দুধ যেন বটের আটা। ওকি আর দেখ্‌তে হবে কর্ত্তা? এই তো সেদিন হেড্‌মাষ্টারবাবু নিলেন দু সের —ও খেঁড়ো গরুর দুধ, এম্‌নি জাল দিয়ে খাবেন, চিনি লাগ্‌বে না। আহা, তা আর কি, না হয় আঠারো পয়সার দরেই—নিন্ না—

বোর্ডিং বাড়ীর কোণের ঘরের দরজা খুলিয়া একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল ও দূরের করোনেশন ক্লক্‌-টাওয়ারের ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সত্যেনবাবুর সঙ্গী শিক্ষকটির নাম রামপদ বাবু, তিনি ডাকিয়া বলিলেন, ওহে সমীর, ওই যে ছেলেটি এবার ডিষ্ট্রীক্ট্ স্কলারশিপ্ পেয়েচে, সে কাল রাত্রে এসেচে না?

ছেলেটি বলিল, এসেচে স্যার, ঘুমুচ্চে এখনও। ডেকে দোবো?—পরে সে জানালার কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ব্ব? ও অপূর্ব্ব?

ছিপ্‌ছিপে পাতলা চেহারা চৌদ্দ পনেরো বৎসরের একটি খুব সুন্দর ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। রামপদবাবু বলিলেন, তোমার নাম অপূর্ব্ব? ও!·· এবার আড়বোয়ালের স্কুল থেকে স্কলারশিপ পেয়েছ?—বাড়ী কোথায়? ও! বেশ বেশ· আচ্ছা, স্কুলে দেখা হবে—

সমীর জিজ্ঞাসা করিল, স্যার, অপূর্ব্ব কোন্ ঘরে থাকবে এখনও সেকেন্ মাষ্টার মশায় ঠিক করে দেন নি। আপনি একটু বল্‌বেন?

রামপদবাবু বলিলেন, কেন তোর ঘরে তো সিট খালি রয়েচে—ওখানেই থাক্‌বে। সমীর বোধ হয় ইহাই চাহিতেছিল, বলিল, আপনি একটু বল্‌বেন তাহলে সেকেন্—রামপদবাবু চলিয়া গেলে অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? পরে পরিচয় শুনিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল। হয়তো বোর্ডিংএর নিয়ম নাই এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমানো, সে না জানিয়া শুনিয়া প্রথম দিনটাতেই হয়তো একটা অপরাধের কাজ করিয়া বসিয়াছে!··

একটু বেলা হইলে সে স্কুলবাড়ী দেখিতে গেল। কাল অনেক রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। রাত্রের অন্ধকারে আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া সাদা রংএর প্রকাণ্ড স্কুল বাড়ীটা তাহার মনে একটা আনন্দ ও রহস্যের সঞ্চার করিয়াছিল—আজ দিনের আলোয় দেখিয়া মনে হইল এত বড় স্কুল সে কখনও দেখে নাই, সহরে থাকিতেও নহে। সেখানেও হাই স্কুল ছিল বটে, কিন্তু সে একটা বড় মাঠের মধ্যে এদিকে ওদিকে ছড়ানো চার পাঁচটা ছোট ছোট বাড়ী—এতবড়ও নয়, এরকম সাজানোও নয়। স্কুলের দরজা জানালা বন্ধ, এখনও খোলে নাই, ওদিকের একটা জানালার খড়খড়ির পাখী তুলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল এক সারি ডেস্ক্-বসানো নতুন পালিশ করা বেঞ্চি, একটা বড় ব্ল্যাক্‌বোর্ড, কোণের দেওয়ালের গায়ে কিসের একখানা বড় ছবি টাঙানো, অন্ধকারে বেশী কিছু চোখে পড়িল না।

এই স্কুলে সে পড়িতে যাইবে।..কতদিন সহরে থাকিতে তাহাদের ছোট স্কুলটা হইতে বাহির হইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিতে পাইত—হাই স্কুলের

প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছেলেরা সকলেই এক ধরণের পোষাক পরিয়া ফুটবল খেলিতেছে। তখন কতদিন মনে হইয়াছে এত বড় স্কুলে পড়িতে যাওয়া কি তাহার ঘটিবে কোনো কালে—এসব বড় লোকের ছেলেদের জন্য, কিন্তু সে সহরে, সে হাইস্কুলে না হউক্ অন্য স্থানের অন্য স্কুলে একদিনে তাহার আশা তো পূর্ণ হইতে চলিল ?…

বেলা দশটার কিছু আগে বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ বিধুবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে কোন্ ঘরে আছে, নাম কি, বাড়ী কোথায়, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বলিলেন, সমীর ছোক্‌রা ভালো, একঘরে থাক্‌লে বেশ পড়াশুনো হবে। এখানকার পুকুরের জলে নাইবে না কখনো—জল ভালো নয়, স্কুলের ইঁদারার জলে ছাড়া—আচ্ছা যাও, এদিকে আবার ঘণ্টা বাজ্‌বার সময় হ'ল।

সাড়ে দশটায় ক্লাস বসিল। প্রথম বই খাতা হাতে ক্লাসরুমে ঢুকিবার সময় তাহার বুক আগ্রহে ঔৎসুক্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। বেশ বড় ঘর, নীচু চৌকির উপর মাষ্টারের চেয়ার পাতা—খুব বড় ব্ল্যাকবোর্ড। সব ভারী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত ভাবে সাজানো। চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, ডেস্ক্ সব ঝক্ ঝক্ করিতেছে, কোথাও একটু ময়লা বা দাগ নাই।

মাষ্টার ক্লাসে ঢুকিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। এনিয়ম পূর্ব্বে সে যে সব স্কুলে পড়িত সেখানে দেখে নাই। কেহ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইবার কথা মাষ্টার শিখাইয়া দিতেন। সত্য সত্যই এতদিন পরে সে বড় স্কুলে পড়িতেছে বটে !…

জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল পাশের ক্লাসরুমে একজন কোট প্যাণ্টপরা মাষ্টার বোর্ডে কি লিখিতে দিয়া ক্লাসের এদিক ওদিক পায়চারী করিতেছেন—চোখে চশমা, আধপাকা দাড়ি বুকের উপর পড়িয়াছে, গম্ভীর চেহারা। সে পাশের ছেলেকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, উনি কোন্ মাষ্টার ভাই ?

ছেলেটি বলিল—উনি মিঃ দত্ত, হেড্‌মাষ্টার—ক্রিশ্চান, খুব ভালো ইংরিজি জানেন—

অপূর্ব্ব শুনিয়া নিরাশ হইল যে তাহাদের ক্লাসে মিঃ দত্তের কোনো ঘণ্টা নাই। থার্ড ক্লাসের নীচে কোনো ক্লাসে তিনি নাকি নামেন না।

পাশেই স্কুলের লাইব্রেরী, ন্যাপ্‌থালিনের গন্ধ-ভরা পুরানো বইএর গন্ধ আসিতেছিল। তাহার মনে হইল এধরণের ভরপুর লাইব্রেরীর গন্ধ কখনো ছোটখাটো স্কুলে পাওয়া যায় না, একে হাইস্কুল, তাহার উপর গবর্ণমেণ্ট স্কুল না হইলে এত বই বা কোথায় থাকা সম্ভব হইত !

ঢং ঢং করিয়া ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে—আড়-বোয়ালে স্কুলের মত একখণ্ড রেলের পাটির লোহা বাজায় না, সত্যিকার পেটা ঘড়ি !…কি গম্ভীর আওয়াজটা !…

টিফিনের পরের ঘণ্টায় সত্যেনবাবুর ক্লাশ। চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের যুবক, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, ইঁহার মুখ দেখিয়া অপুর মনে হইল ইনি ভারী বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্‌ও বটে। প্রথম দিনেই ইঁহার উপর কেমন একধরণের শ্রদ্ধা তাহার গড়িয়া উঠিল। সে শ্রদ্ধা আরও গভীর হইল, ইঁহার মুখের ইংরেজি উচ্চারণের ধরণ শুনিয়া।

ছুটির পর স্কুলের মাঠে বোর্ডিংয়ের ছেলেদের নানাধরণের খেলা সুরু হইল। তাহাদের ক্লাসের ননী ও সমীর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অন্য সকল ছেলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। সে ক্রিকেট খেলা জানে না, ননী তাহার হাতে নিজের ব্যাটখানা দিয়া তাহাকে বল মারিতে বলিল ও নিজে উইকেট হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া খেলার আইনকানুন বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

খেলার অবসানে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। খেলার মাঠে পশ্চিম কোণে একটা বড় বাদাম গাছ, অপু গিয়া তাহার তলায় বসিল। একটু দূরে গবর্ণমেণ্টের দাতব্য ঔষধালয়। বৈকালেও সেখানে একদল রোগীর ভিড় হইয়াছে, তাহাদের নানাকলরবের মধ্যে একটি ছোট মেয়ের কান্নার সুর শোনা যাইতেছে। অপূর্ব্ব কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়সের মধ্যে এই আজ প্রথম দিন, যেদিনটি সে মায়ের নিকট হইতে বহুদূরে, আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রবাসে একা কাটাইতেছে। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ তাহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কত কথা মনে ওঠে, এই সুদীর্ঘ পনেরো বৎসরের জীবনে কি অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য, কি ঐশ্বর্য্য !

সমীর টেবিলে আলো জ্বালিয়াছে। অপুর কিছু ভাল লাগিতেছিল না—সে বিছানায় গিয়া শুইয়া রহিল। খানিকটা পরে সমীর পিছনে চাহিয়া তাহাকে সে অবস্থায় দেখিয়া বলিল, পড়বে না ?

অপু বলিল, একটু পরে, এই উঠ্‌চি—

আলোটা জ্বালিয়ে রাখো, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখুনি দেখতে আস্‌বে, শুয়ে আছ দেখলে বক্‌বে—

অপু উঠিয়া আলো জ্বালিল। বলিল, রোজ আসেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ! সেকেন্ মাষ্টার তো—না ?

সমীরের কথা ঠিক। অপু আলো জ্বালিবার একটু পরেই বিধুবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম লাগ্‌লো আজ ক্লাসে ? পড়াশুনো সব দেখে নিয়েচ তো ? সমীর, ওকে একটু দেখিয়ে দিস্ তো কোথায় কিসের পড়া ; ক্লাসের রুটিনটা ওকে লিখে দে বরং—সব বই কেনা হয়েচে তো তোমার ?···জিওমেট্রি নেই ? · আচ্ছা, আমার কাছে পাওয়া যাবে, একটাকা সাড়ে পাঁচ আনা, কাল সকালে আমার ঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসো একখানা—

বিধুবাবু চলিয়া গেলে সমীর পড়িতে বসিল, কিন্তু পিছনে চাহিয়া পুনরায় অপূর্ব্বকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বই বন্ধ করিয়া ও কাছে আসিয়া বলিল, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করচে—না ?

তাহার পর সে খাটের ধারে বসিয়া তাহাকে তাহার বাড়ীর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিল, তোমার মা একা থাকেন বাড়ীতে ? আর কেউ না ? তাঁর তো থাকতে কষ্ট হয়—

অপূর্ব্ব বলিল, ও কিসের ঘণ্টা ভাই ?

—বোর্ডিংয়ের খাওয়ার ঘণ্টা—চল যাই—

খাওয়াদাওয়ার পরে দু তিনটা ছেলে তাহাদের ঘরে আসিল। এই সময়টা আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভয় নাই, তিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শীতের রাত্রে আর বড় একটা বাহির হন না। ছেলেরা এই সময়ে এঘর ওঘরে বেড়াইয়া গল্পগুজবের অবকাশ পায়। সমীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, এসো নৃপেন, এই আমার খাটে বোসো—শিশির যাও ওখানে—অপূর্ব্ব জানো তাস খেলা ?

নৃপেন বলিল, হেডমাষ্টার আস্‌বে না তো ?

শিশির বলিল, হ্যাঁ, এত রাত্রিরে আবার হেড-মাষ্টার—

অপূর্ব্বও তাস খেলিতে বসিল বটে কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল মায়ের ও দিদির সঙ্গে কত কাল আগে খেলার সে বিদ্যা লইয়া এখানে তাসখেলা খাটিবে না। তাসখেলায় ইহারা সব ঘুণ, কোন্ হাতে কি তাস আছে সব ইহাদের নখদর্পণে। তাহা ছাড়া এতগুলি অপরিচিত ছেলের সম্মুখে তাহাকে তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগে পাইয়া বসিল, অনেক লোকের সামনে সে মোটেই স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা বলিতে পারে না, মনে হয় কথা বলিলেই হয়ত ইহারা হাসিয়া উঠিবে। সে সমীরকে বলিল, তোমরা খেলো, আমি দেখি। শিশির ছাড়ে না। বলিল, তিন-দিনে শিখিয়ে দোব, ধর দিকি তাস ?

বাহিরে যেন কিসের শব্দ হইল। শিশির সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল এবং হাতের তাস লুকাইয়া ফেলিয়া পরের পাঁচ মিনিট এমন অবস্থায় রহিল যে, সেখানে একটা কাঠের পুতুল থাকিলে সেটাও তাহার অপেক্ষা বেশী নড়িত। সকলেরই সেই অবস্থা। সমীর টেবিলের আলোটা একটু কমাইয়া দিল। আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। নৃপেন একবার দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরের বারান্দাতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিয়া নিজের তাস সমীরের তোষকের তলা হইতে বাহির করিয়া বলিল, ও কিছু না, এস এস—তোমার হাতের খেলা ছিল শিশির—

রাত এগারোটার সময় পা টিপিয়া টিপিয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলে অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের রোজ এম্‌নি হয় নাকি ? কেউ টের পায় না ?··· আচ্ছা চুপ করে বসে ছিল, ও ছেলেটা কে ?···

ছেলেটাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। ঘরে ঢুকিবার পর হইতে সে বেশী কথা বলে নাই, তাহার খাটের কোণটিতে নীরবে বসিয়াছিল। বয়স তের চৌদ্দ হইবে,

বেশ চেহারা। ইহাদের দলে থাকিয়াও সে এত দনে তাসখেলা শেখে নাই, ইহাদের কথাবার্ত্তা হইতে অপূর্ব্ব বুঝিয়াছিল।

পরদিন শনিবার। বোর্ডিংয়ের বেশীর ভাগ ছেলেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ছুটী লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব মোটে দুই দিন হইল আসিয়াছে, তাহা ছাড়া যাতায়াতে খরচপত্রও আছে, কাজেই তাহার যাওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু তবু তাহার মনে হইল এই শনিবারে একবার মাকে দেখিয়া আসিলে মন্দ হইত না—সারা শনিবারের বৈকালটা কেমন খালি খালি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছিল।

স্কুল কম্পাউণ্ডের ধারে একটা জায়গায় অনেকগুলা রক্তজবা ও পাতাবাহারের গাছ, মানুষের হাতে পোতা হইলেও অনেকটা বন ঝোপের মত দেখায়, এই দুই দিনেই সে জায়গাটিকে চিনিয়া লইয়াছিল—গাছপালা ভিন্ন সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না, গাছপালার সাহচর্য্য হইতে বেশী দিন দূরে থাকিতে হইলে প্রাণ তাহার কেমন হাঁপাইয়া ওঠে, বৈকালে আজ আর ক্রিকেট খেলার ধুম ছিল না, বোর্ডিংয়ের অধিকাংশ ছেলেই নাই—বেলা একটু পড়িলে সেখানটাতে আসিয়া দূর্ব্বা ঘাসের উপর সে বসিয়া পড়িল। কম্পাউণ্ডের ও-পারের বাড়ীটা কোন্ এক উকীলের, চূণকাম-করা ছোট বাড়ী, উঠানে একটা বেল গাছ, জানালায় পর্দ্দা টাঙানো।

রাস্তার দিক হইতে একটা ছোট রবারের বল আসিয়া তাহার পায়ের কাছে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট ছেলের উৎসুক মুখ কম্পাউণ্ডের পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে দেখা গেল। ছেলেটি বলিল, আমার বল্‌টা পড়েচে ওখানে?···দিন্ না—

অপু বলিল, তোমার নাম কি?

ছেলেটি আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ যে আপনার পায়ের কাছে পড়েচে, দিন্ না—

অপু বলটা ছুঁড়িয়া দিল। বলিল, নাম বল্লে না?···

বালক হাসিমুখে চলিয়া গেল।

অপু হাসিয়া ভাবিল—বলটা দিলাম, নাম বলা হল না। আচ্ছা রও, দুষ্টুমি ওর—দেখি কোন্‌দিকে গেল?···

কিন্তু উঠিতে গিয়া তাহার উঠিবার মন হইল না। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুই ভাবিতেছিল না, শুধু এই লম্বা পাতাবাহার গাছটার ছায়া, ধুলামাটির উপর বিছানো শুকনা পাতার রাশি, নরম দূর্ব্বা—বেশ লাগিতেছিল। এই যেন যথেষ্ট, ইহার বেশী যেন আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ্-ডি

ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কেবল আকারগত নহে, অনেকটা প্রকৃতিগত। ছোট গল্পের আয়তন ক্ষুদ্র, সেজন্য ইহার আর্টও স্বতন্ত্র। উপন্যাসের ব্যাপকতা ও বৃহৎ পরিধি নাই বলিয়াই ইহার বিষয়নির্বাচনে একটু বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। ইহাতে জীবনের এমন একটি খণ্ডাংশ বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার স্বল্পপরিসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে। ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষ রকম নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই। উপন্যাসের মত ধীর-মন্থর গতিতে ইহার আরম্ভ হইবার অবসর নাই, পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় বা বিশ্লেষণের জন্য ইহাতে স্থানাভাব। গল্পের পরিণতি বা চরিত্রবিকাশের জন্য যে স্বল্পসংখ্যক ঘটনা ইহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেগুলিকে সুনির্ব্বাচিত হইতে হইবে। কোনরূপ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ইহার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গল্পের যে অংশে ইহার যবনিকাপাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিণতি বা পরিসমাপ্তির লক্ষণ থাকা চাই, পাঠকের মন যেন তাহাকে সমস্যা-সমাধানের একটি ছেদচিহ্ন বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত কারণের জন্য ছোট গল্পের আর্ট উপন্যাসের আর্ট অপেক্ষা দুরধিগম্য। উপন্যাসের ঐক্য অনেকটা আল্‌গা ধরণের ; ইহার তন্তুগুলির মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিতে পারে ; এই ফাঁকগুলি ঔপন্যাসিক অনেক সময় গল্পবহির্ভূত প্রসঙ্গ বা মন্তব্যের দ্বারা পূরণ করিতে পারেন। ছোট গল্প লেখকের ভাগ্যে এই সমস্ত সুযোগের কোন সম্ভাবনা নাই।

অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় বঙ্গ-সাহিত্যে ছোট-গল্পের আপেক্ষিক মূল্য অনেক বেশী। আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা যেরূপ সঙ্কীর্ণপরিসর ও বৈচিত্র্যহীন, ইহার স্রোতোবেগ যেরূপ মন্দীভূত, তাহাতে ছোট গল্পের সহিতই ইহার একটি স্বাভাবিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে। উপন্যাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহাকে একটি বালুকাপ্রোথিত শীর্ণকলেবর জলধারার মতই দেখায়। এই স্বাভাবিক রসদৈন্য ও বৈচিত্র্যহীনতার জন্যই আমাদের উপন্যাসের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা, একটা বিরাট ফাঁকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বক্তব্য বিষয়ের গুরুতর অভাব যেন লেখককে একটা শূন্যগর্ভ অস্বাভাবিক স্ফীতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। এই বক্তব্যের অভাব মন্তব্যের প্রাচুর্য্য বা অনাবশ্যক দীর্ঘ বিশ্লেষণের দ্বারা পূর্ণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, ফল কিছুতেই সন্তোষজনক হইতেছে না। আমাদের জীবন যে সমস্ত ক্ষুদ্র বিক্ষোভের দ্বারা আন্দোলিত হয়, তাহা ছোট গল্পের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সহজেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে ; যতটুকু মাধুর্য্য ও ভাবগভীরতা আমাদের সাধারণ প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালার মধ্যে অনায়াসেই ধরিয়া রাখা যায়। তাহার জন্য উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

সুতরাং আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রার সহিত ছোট গল্পের একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। এবিষয়ে ইউরোপীয় ছোট গল্পের সহিত আমাদের একটা গুরুতর প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে জীবন-ধারার এমন একটি সহজ ও প্রচুর প্রবাহ, এমন একটি দুর্দ্দমনীয় গতি বেগ আছে, যে, ইহা উপন্যাসের বৃহৎ পরিধিকেও ছাপাইয়া যাইতে চাহে। পাশ্চাত্য জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলি এত সুদূরপ্রসারী, তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাত এতই বিচিত্র ও জটিল, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র এত ব্যাপক ও বিস্তৃত, যে, ছোট গল্পের মধ্যে সেগুলির স্থানসঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে জীবনের যে খণ্ডাংশ ছোট

গল্পের মধ্যে স্থান লাভ করে তাহা প্রায়ই গৌণ ও অপ্রধান। জীবনের কেন্দ্রস্থ গভীর ভাব ও অনুভূতিগুলিকে ছাড়িয়া, তাহার লঘুতর বিকাশগুলি, তাহার সীমান্তপ্রদেশের গৌণ বৈচিত্র্যগুলিকে লইয়াই তাহার কারবার। চটুল সরসতা, জীবনের বিস্ময়কর, আশ্চর্য্য সংঘটনসমূহ তাহার হাস্যরসপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতিগুলিই সাধারণতঃ ইউরোপীয় ছোট গল্পের বিষয়। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিতে ইহার বিপরীত ব্যাপার। তাঁহার দুই একটি গল্পে হাস্য-রসের প্রাচুর্য্য ও লঘুতর স্পর্শ থাকিলেও, অধিকাংশের মধ্যেই জীবনের গভীর কথা, সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন ও রহস্যময় সূত্রগুলিরই আলোচনা হইয়াছে। আমাদের এই বাহ্যতঃ তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রুসজল, ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে মরু-ভূমির বিশাল ধূসর বালুকাবিস্তার মাত্র দেখা যায়, তিনি সেখানেও সেই সর্ব্বদেশসাধারণ ভাবমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আমাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বাহির্জীবনে বাধা পাইয়া, বাহ্যবিকাশের দিকে প্রতিহত হইয়া অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হয় ও সেখানে গোপন মধুচক্র রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ নিজ ছোট গল্পগুলির মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার অবসর দিয়াছেন। বাস্তব জগতের রিক্ততার মধ্যে যে বিশাল ভাবসম্পদ কবিচক্ষুর প্রতীক্ষায় আত্মগোপন করিয়া আছে তিনি সেই ছদ্ম আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলি আমাদের কর্ণে এই আশার বাণী ধ্বনিত করে, যে, আমাদের বিষয়-দৈন্য ও বৈচিত্র্যহীনতার জন্য আমাদের কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, আমাদের রস-সম্পদের কোন অভাব নাই, অভাব কেবল সূক্ষ্মদৃষ্টির ও কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির।

আমাদের সামাজিক জীবনের বদ্ধ গলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে উপায়ে রোমান্সের মুক্ত বায়ু বহাইয়াছেন, তাহা যেমনি সহজ তেমনি আশ্চর্য্যরূপ ফলপ্রদ। তাঁহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়েই তিনি আমাদের প্রাত্যহিক সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অসাধারণতা ও দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন—(১) প্রেম; (২) সামাজিক জীবনে সম্পর্কবৈচিত্র্য; (৩) প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ; (৪) অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ। আমরা এই চারিটি উপায়ের বৈধতা ও কার্য্যকারিতা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি হইতে তাহাদের প্রভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১) প্রেম; একজন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন, Love is the solar passion of the race—প্রেমই মানবজাতির প্রবলতম প্রবৃত্তি। এই প্রেমই অতি সাধারণ জীবনে একটা বিপুল শক্তিবেগ, প্রবল ধ্বংসকারী উন্মত্ততা ও দুশ্ছেদ্য জটিলতাজাল সঞ্চার করিয়া ইহাকে রোমান্সের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তোলে, তুচ্ছতম জীবনের উপরে একটা বৃহৎ ব্যাপ্তি ও বিস্তার আনিয়া দেয়। প্রেমের উন্মাদনা জীবনকে তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে টানিয়া আনিয়া বাহিরের বিশ্বজগতের সহিত একটি নিগূঢ় সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ করে; হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুল আবেগকে, সুপ্ত কল্পনাবৃত্তিগুলিকে মুক্তি দিয়া, ও মানব-মনে অতর্কিত, অলক্ষিত পরিবর্ত্তন সংসাধন করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় রমণীয়তার সৃষ্টি করে। কবিরা প্রেমের এই দুর্ব্বার শক্তিকে অভিনন্দিত করিয়া তাহার স্তবগান করিয়াছেন, ঔপন্যাসিকেরাও ইহার গূঢ় প্রভাব ও প্রক্রিয়া মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক উভয়ের দৃষ্টি লইয়া প্রেমের যে বিচিত্র ও রহস্যময় বিকাশ লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা সাহিত্যজগতে নিতান্ত দুর্লভ। আবার, ব্যর্থ, প্রতিহত প্রেম জীবনকে যে একটি বৃহৎ দুঃখে অভিষিক্ত করে ও মর্ম্মস্পর্শী করুণ সুরে প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহাকেও তিনি আশ্চর্য্য গভীর সহানুভূতির দ্বারা অভিব্যক্তি দিয়াছেন।

যে-সমস্ত গল্পে প্রেমের এই বিচিত্র লীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে—'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'সমাপ্তি,' 'দৃষ্টিদান,' 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্ত্তিনী,' 'শাস্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত,' 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'অধ্যাপক' ও 'শেষের রাত্রি'।

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রধানতঃ কবিত্বময়, গীতি-কাব্যের উচ্ছ্বসিত সুরে বাঁধা। ঔপন্যাসিকের যে প্রধান কর্ত্তব্য মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, তাহা ইহাদের মধ্যে সেরূপ পরিস্ফুট নহে। 'একরাত্রি' গল্পে চরিত্রাঙ্কনের চেষ্টা নিতান্ত সামান্য, ইহা কেবল প্রলয়-দুর্য্যোগ-রাত্রির অন্ধকারে নীরব স্থির প্রেমের ধ্রুবতারাটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। 'মানভঞ্জন' গল্পটিতেও প্রধান আকর্ষণ—গিরিবালার উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য ও তাহার অতৃপ্ত-যৌবন চঞ্চল রক্ত-লহরীর উপর রঙ্গমঞ্চের যাদুময় প্রভাব বর্ণনাতে—উহার গল্পাংশে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। 'দুরাশা' গল্পটিতে সামান্য একটু মনস্তত্ত্বের স্পর্শ ও যথেষ্ট ঘটনা-

বৈচিত্র্য থাকিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে মহামহনীয় প্রেমের আত্মকাহিনী। কেশবলালের ব্রহ্মণ্যধর্ম একটি সনাতন, অপরিবর্ত্তনীয় মনোভাব বা কেবল একটা অভ্যাসের সংস্কার মাত্র—এই মনস্তত্ত্বমূলক প্রশ্নটি লেখক কেবল উত্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। 'অধ্যাপক' গল্পটির অনেকগুলি দিক আছে—একটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দিক। বক্তার লাঞ্ছিত সাহিত্যিক খ্যাতি ও ব্যর্থ কবি-যশঃ-প্রার্থিতার মধ্যে যে বিদ্রূপ-রসটি আছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। কিন্তু ইহার প্রধান বাণীটি প্রেমের—প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন শ্রীর সহিত সুন্দরী নারীর যে একটি নিগূঢ় প্রাণময় ঐক্য দেখান হইয়াছে, তাহা কবিপ্রতিভার সৃষ্টি—ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণ এখান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না।

কতকগুলি গল্পের মধ্যে কবির সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণপটুতার আশ্চর্য্যরূপ মিলন ও একীকরণ সাধিত হইয়াছে। 'সমাপ্তি' গল্পটিতে দুরন্ত বন্য মৃণ্ময়ীর অভাবনীয় আমূল পরিবর্ত্তন, যে অদৃশ্য প্রভাবে তাহার বালসুলভ চপলতা নিমেষমধ্যে রমণীপ্রকৃতির স্নিগ্ধ-সজল গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে তাহার চিত্রটি যেমন কবিত্বপূর্ণ, তেমনি মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া অনবদ্য। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি আগাগোড়া মৃদু কুসুম-সৌরভের ন্যায় নারীহৃদয়ের একটি অনুপম সংযত মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ—রমণীসুলভ কোমলতা, একটি স্নিগ্ধশীতল প্রলেপের মত সমস্ত গল্পটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোথাও একটু পরুষ, বুদ্ধি-কঠোর স্পর্শ বা পুরুষোচিত উগ্র ঝাঁঝাল সমালোচনার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। কি পল্লীপ্রকৃতি বর্ণনায়, কি জীবনের সমালোচনাতে সর্ব্বত্রই এই অনির্ব্বচনীয় সুকুমার পবিত্রতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির ছাপ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অন্ধের স্বচ্ছ গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাত্মক প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যবোধের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রশংসার অতীত। একটিমাত্র উদাহরণ দিব—"অথচ পত্র দ্বারা তিনি যে সর্ব্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যেদিন একটু প্রবেশ করে সেইদিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে—তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয়, সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি।" এই যে গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বোধ হয় চক্ষুহীন ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। গল্পটি পড়িলে মনে হয় যেন লেখক আপনার চক্ষুষ্মান্ প্রকৃতির সমস্ত সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া, পুরুষের সমস্ত শিক্ষাভিমান ও বুদ্ধিবিদ্যার সঙ্কুচিত করিয়া এই পরম রমণীয়, সূক্ষ্ম-অনুভূতিময়, স্বচ্ছ অন্ধলোকে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন।

'মধ্যবর্ত্তিনী' গল্পটিতে কবিত্ব অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরই প্রাধান্য। প্রেমের আবির্ভাব কি করিয়া তিনটি নিতান্ত সাধারণ যন্ত্রবদ্ধ জীবনযাত্রার মধ্যে গভীর বিপ্লব ও দুশ্চ্ছেদ্য জটিলতা আনিয়া দিয়াছে তাহারই কাহিনী ইহার বিষয়। আপিস ও গৃহস্থালীর লৌহনিগড়বদ্ধ, চিরাভ্যস্ত জীবনের নিতান্ত বাঁধা ধরা রাস্তার পথিক নিবারণ এই দুর্দ্দান্ত প্রেমের অত্যাচারে একেবারে সর্ব্বনাশের গভীর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়াছে। হরসুন্দরী প্রৌঢ় বয়সে এই অকাল-জাগ্রত, বুভুক্ষু মনোবৃত্তির অতর্কিত পরিচয় লাভ করিয়া নিজের লৌকিক কর্ত্তব্যরত অতীত জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও প্রবঞ্চিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। আর এই গল্পের তৃতীয় ব্যক্তি শৈলবালা প্রেমের অপরিমিত আদর ও অযাচিত সোহাগ অনায়াসে লাভ করিয়া জীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও পরিণতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অকাল-মৃত্যুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই কাহিনীটি আমাদের বাঙ্গালী পরিবারের অতিসাধারণ ঘটনা। কিন্তু লেখক এই অতিসাধারণ ঘটনার মধ্যেও কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার সহিত গভীর রসধারা সঞ্চারিত করিয়াছেন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

প্রেমমূলক অন্যান্য গল্পগুলির বিস্তৃত সমালোচনার সময় নাই। 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান' ও 'মধ্যবর্ত্তিনী'র সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, নিখুঁত সম্পূর্ণতা তাহাদের নাই। কিন্তু এগুলিতেও, কোথাও বা একটু চরিত্র-সৃষ্টি, কোথাও বা একটু অপরূপ প্রকৃতি-বর্ণনা, কোথাও বা মানবজীবন সম্বন্ধে একটু গভীর মন্তব্য, তাহাদের উপর একটি অনন্য-সাধারণ বিশিষ্টতা আনিয়া দিয়াছে। 'মহামায়া' গল্পে মহামায়ার দীপ্ত তেজোপূর্ণ চরিত্রটি, অভেদ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, সুদূর রহস্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এই চরিত্রটি কেবল সাধারণ বর্ণনার দ্বারাই অঙ্কিত হইয়াছে, কার্য্যে বা ব্যবহারে পরিস্ফুট করিয়া তোলা হয় নাই। ইহার মধ্যে দুইটি প্রকৃতি-বর্ণনা, মনের সহিত বহিঃ-প্রকৃতির নিগূঢ় ভাবগত ঐক্যের দুইটি মুহূর্ত্ত সমস্ত গল্পটিকে কল্পনালোকের উচ্চ প্রদেশে লইয়া গিয়াছে। একটির উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

"একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্না-রাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া রহিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির

শ্রান্ত স্বর তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জ্জিত রূপার পাতের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মানুষ এ রকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মত একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মত একটা ঝিল্লী ধ্বনি করে। রাজীব কি ভাবিল জানি না, কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার সমস্ত মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মত নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।"

'মাল্যদান' গল্পটিতে হরিণশিশুর ন্যায় উদার, সরল, লৌকিক বোধহীন বালিকার মনে প্রথম প্রেমের লজ্জা-কুণ্ঠিত অভ্যুদয়ের বর্ণনা উপলক্ষ্যে লেখক বেদনারহস্য-মণ্ডিত মানবহৃদয়ের সহিত স্বতঃউৎসারিত আনন্দ-নির্ঝরস্নাত ইতরপ্রাণী ও বহিঃপ্রকৃতির কি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ তুলনা করিয়াছেন। "যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প, তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোন প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল? জগতের এই সহজ উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরব মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে?" 'শেষের রাত্রি' গল্পটিতে প্রেমের আর এক নূতন দিক দেখান হইয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রীর ব্যাকুল আত্মপ্রতারণা স্খলিতপ্রায়, অপসরণোন্মুখ প্রেমকে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা সমস্ত গল্পটিকে একটি ব্যথিত করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাসে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে ও তাহার মধ্যে একটা রোগতপ্ত মনের বিকার আশ্চর্য্যভাবে সঞ্চারিত করিয়াছে।

(২) এইবার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের গল্পগুলির আলোচনা করিব। আমাদের এই অত্যন্ত বন্ধবদ্ধ সামাজিক জীবনে,—যেখানে সকলেরই একটা বিশেষ সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে ও ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সম্ভাবনা ও সুযোগ নিতান্ত সীমাবদ্ধ,—সেখানে মাঝে মাঝে একটি বিচিত্র,অপ্রত্যাশিত রকমের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া রোমান্সের সূত্রপাত করে। পারিবারিক জীবনে সাধারণতঃ যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে স্নেহধারা প্রবাহিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সেখানে একটা ক্ষুদ্র বিপর্য্যয়, একটা বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের সৃজন হইয়া থাকে। স্নেহ প্রেম প্রভৃতি মানুষের হৃদয়বৃত্তি, পারিবারিক ব্যবস্থা ও সমাজনির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে চাহে বলিয়াই রোমান্সের উদ্ভব হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোট গল্পে পূর্ণমাত্রায় এই সঙ্কীর্ণ অবসরের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন; আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অত্যন্ত পাকা প্রস্তর দুর্গের মধ্যে যে দুই-একটা গোপন অলক্ষিত রন্ধ্রপথ আছে, তাহার ভিতর দিয়া বৈচিত্র্যের প্রবেশ-পথ রচনা করিয়াছেন। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটিতে নির্জ্জন পল্লীজীবনে অবিশ্রান্ত বর্ষাধারাপাতের মধ্যে প্রবাসী পোষ্টমাষ্টারের সহিত অনাথা বালিকা রতনের যে একটি ব্যাকুল স্নেহসম্পর্কের সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে, পারিবারিক জীবনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই বলিয়াই তাহার এত করুণ, শঙ্কিত আবেদন। 'ব্যবধান' গল্পটিতে বনমালী হিমাংশুমালীর মধ্যে ভালবাসাটি পারিবারিক বিরোধ ও প্রতিকূলতার মধ্যে একটি শীর্ণ কুণ্ঠিত বেদনার মত নিজেকে কোন মতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। 'কাবুলি-ওয়ালা'তে এই স্নেহবন্ধন অনেক দুরতিক্রম্য বাধা লঙ্ঘন করিয়া এক রুক্ষদর্শন, পরুষমূর্ত্তি বিদেশীর সহিত বাঙালী ঘরের একটি ছোট মেয়ের একটি ক্ষণস্থায়ী প্রীতির সম্পর্ক রচনা করিয়াছে। 'দান-প্রতিদানে' শশিভূষণ রাধামুকুন্দের নিঃসম্পর্ক প্রীতিবন্ধনের মধ্যে একটা নীরব অনুযোগ ও রুদ্ধ অভিমানের স্পর্শ একটি ক্ষুদ্র ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা সহোদর ভ্রাতার সহজ সম্পর্কপ্রবাহের মধ্যে পাওয়া যায় না। 'মাষ্টার-মশায়ে' মাষ্টার হরলাল ও ছাত্র বেণু-গোপালের মধ্যে এরূপ একটা নিবিড় কুণ্ঠা-বেদনাজড়িত বাধাপ্রতিহত স্নেহপাশই হতভাগ্য হরলালের জীবনটিকে ট্র্যাজেডির দুশ্ছেদ্য জটিল জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছে।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে শশিভূষণের সহিত গিরিবালার সম্পর্কটিও এই মধুর অনিশ্চয়ের ম্লান ছায়া মণ্ডিত; গল্পের অন্তর্নিহিত করুণ রসটি শেষের গানটিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর গল্পটি শশিভূষণের জীবনকাহিনীর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের সমষ্টি বলিয়া আর্টের পরিণত ঐক্য লাভ করিতে পারে নাই।

সময় সময় একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও এই স্নেহসম্পর্ক ঠিক সহজ, স্বাভাবিক বিকাশের দিকে না গিয়া একটা বক্র, বঙ্কিম গতি বা অস্বাভাবিক তীব্রতা লাভ করিয়া থাকে। 'পণরক্ষা'য় বংশীবদন ও রসিকের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা ঠিক ভ্রাতৃপ্রেম নহে—তাহার মধ্যে মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাস ও প্রবল আবেগ সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে বিচিত্র জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সেইরূপ 'রাসমণির ছেলে'র মধ্যেও মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহ পরস্পর রূপান্তরিত হইয়া একটি অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যের হেতু হইয়াছে। পুত্রের প্রতি ভবানীচরণের স্নেহ মাতৃস্নেহের

মতই অজস্র প্রচুর ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে; রাসমণির ভালবাসার মধ্যে পিতৃশাসনের দৃঢ়তা ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবেশলাভ করিয়াছে। 'কর্ম্মফল' গল্পটিতে একদিকে পিতার কঠোর শাসন ও অন্যদিকে মাসীর অস্বাভাবিক ও অচিরস্থায়ী স্নেহাতিশয্য সতীশের জীবনের সমস্ত দুর্দ্দৈব সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য এই গল্পটি ঠিক বাস্তব অবস্থার অনুগামী বলিয়া ইহার মধ্যে রোমান্সের বৈচিত্র্য ততটা ফুটিয়া উঠে নাই; আর ইহার শেষ ফল ও চরম পরিণতিও ঠিক প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী।

এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে 'দিদি'ই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ছোট ভাইটিকে লইয়া শশিমুখীর স্বামীর সহিত যে 'নীরব দ্বন্দ্বের গোপন ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে', তাহা ঘটনাচক্রে একেবারে বিরোধের চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়া অত্যন্ত তীব্র ও সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে। আবার এই বিরোধ তাহার নবজাগ্রত প্রেমের স্বপ্নের মধ্যে অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসের মতই আসিয়া পড়িয়াছে ও তাহার শান্ত নীরব সহিষ্ণুতার মধ্যে একটি দারুণ দুর্ব্বিষহতা লাভ করিয়াছে।

আমাদের সমাজ ও পরিবারের আর একটা দিক আছে যাহা ঔপন্যাসিকের বৈচিত্র্যসৃষ্টির কাজে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে—তাহা সাধারণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহ। 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পটিতে এই ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহই প্রধান বর্ণনীয় বস্তু। বনোয়ারীলালের বৃহৎ ব্যক্তিত্ব তাহার পারিবারিক গণ্ডী ছাড়াইয়া অত্যন্ত অসঙ্গতরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য তাহার সহিত তাহার পরিবারের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, এখানে প্রেমের নিগূঢ় দাবীই বনোয়ারীলালের বিদ্রোহাগ্নিতে ইন্ধন জোগাইয়াছে। সে জমিদার-বংশের বড় ছেলে বলিয়া নহে, তাহার পুরুষকারের স্বাধীন অধিকারের দ্বারাই নিজ স্ত্রী কিরণলেখার চিত্ত জয় করিয়া লইতে চাহে—তাহার বাড়ীর অতি নিয়মিত ব্যবস্থা তাহার প্রেমিক হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট খোলা ও উদার নহে বলিয়াই বংশপরম্পরাগত প্রথার সহিত তাহার বিরোধের সূত্রপাত। আর তাহার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, কিরণও তাহার এই বিশাল প্রেমিক হৃদয়ের কোন সম্মান না রাখিয়া তাহার শত্রুদলে যোগ দিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধাচারী পরিবারবর্গের সহিত একাত্ম হইয়া মিশিয়া গিয়াছে—প্রেমের স্নিগ্ধরশ্মি পরিবৃতা কিরণলেখা হাল্‌দার-গোষ্ঠীর বড়বৌ-এর মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে। এই গূঢ় বিরোধ ও অসঙ্গতির কাহিনীটি যেমন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত বর্ণিত হইয়াছে, বনোয়ারীর চরিত্র-বিশ্লেষণও সেইরূপ সুন্দর হইয়াছে।

এই বংশগৌরবের নির্দ্দোষ, নিরীহ দিকের চিত্র 'ঠাকুরদা' গল্পে দেওয়া হইয়াছে। নয়নজোড়ের বাবু-বংশের শেষ প্রতিনিধি ঠাকুরদাদার বংশাভিমানে এমন একটি করুণ আত্মপ্রতারণা, মধুর সুষমা ও সহজ ভদ্রতা আছে যে, ইহা আমাদের বিরোধ ভাবকে মাথা তুলিতে দেয় না। 'ঠাকুরদা' গল্পটি কোন সত্যান্বেষী বাস্তবতা-প্রবণ লেখকের হাতে পড়িলে Thackerayর "Book of Snobs" একতম অধ্যায়ে পরিণত হইতে পারিত—রবীন্দ্রনাথের গভীর সহানুভূতি ইহাকে একটি করুণ হাস্যরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া সুন্দর ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

কতকগুলি গল্পে আমাদের সমাজের প্রধান কলঙ্ক—বিবাহের অত্যাচার আলোচিত হইয়াছে, যথা, 'দেনা-পাওনা', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'হৈমন্তী' ইত্যাদি। এই বিষয়ের আলোচনা বাংলা উপন্যাসের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় উপন্যাস-সাহিত্যের খুব সাধারণ পথেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে লেখক কেবল অবিমিশ্র করুণ রসেরই উদ্রেক করিয়াছেন, কেবল 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর চরিত্রাঙ্কনে একটু বিশেষত্ব আছে। মোট কথা এই শেষোক্ত শ্রেণীর গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

৩) তৃতীয় পর্য্যায়ের গল্পগুলিতে লেখক রোমান্স-সৃষ্টির এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ও কবিসুলভ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ঔপন্যাসিকের সহায়তাবিধানে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব-শক্তির বলে তাহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি কার্য্যকলাপ বা চিন্তাধারার সহিত বিশাল বহিঃপ্রকৃতির একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনাবলীরও আশ্চর্য্যরূপ রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। নিতান্ত অনায়াসে সামান্য দুই একটি রেখাপাতের দ্বারা তিনি মানব-মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সিংহদ্বারটি খুলিয়া দিয়াছেন—তাঁহার তুচ্ছ গ্রাম্য কাহিনীগুলিও প্রকৃতির সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপের তলে, তাহার আভাস ইঙ্গিত আহ্বান বিজড়িত রহস্যময় আকাশ-বাতাসের মধ্যে এক অপরূপ গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই কতকগুলি গল্পের মধ্যে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু কতকগুলি গল্প একেবারে আদ্যোপান্ত প্রকৃতির সহিত এই নিগূঢ় সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'সুভা' নামক গল্পটি মূক বালিকার সহিত মৌন বিরাট প্রকৃতির নিগূঢ় ঐক্যের পরিচয়ে আগাগোড়া পরিপূর্ণ। 'অতিথি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষমতার

চূড়ান্ত উদাহরণ। 'তারাপদ' লেখকের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এই সঞ্চরণশীল, প্রবহমান, চিরচঞ্চল পৃথিবীর প্রাণের সহিত তাহার এক আশ্চর্য্য সহানুভূতি ও গভীর একাত্মতা আছে। মানুষের এই অবিশ্রান্ত গতিশীলতা নাই বলিয়াই তাহার ভালবাসার মধ্যে এমন একটা প্রবল মোহ ও সঙ্কীর্ণ আসক্তি দেখা যায়। তারাপদর স্নেহবন্ধনের মধ্যে ধরিত্রীমাতার সেই উদার অনাসক্ত ভাব, সেই শিথিলতা ও পক্ষপাতহীনতা আছে। মানুষ নিজের জন্য যে ছোট ছোট ঘর রচনা করে, তাহার চারিদিকের স্নেহের বেষ্টনের মধ্যে এক গাঢ়তর মোহাবেশ আছে—প্রকৃতির স্নেহে কোনো মোহাবেশ, কোনো ব্যাকুল বাষ্প-সজলতা নাই। তারাপদ প্রকৃতির এই উদার অনাসক্তি, এই মোহমুক্ত চিরচঞ্চলতার মনুষ্য প্রতিরূপ। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ তাঁহার লুসি, রাথ ও অন্যান্য গ্রাম্য নরনারীর চিত্রে প্রকৃতির কল্যাণী মূর্ত্তির একটা বিশেষ দিক্‌কে আকার দিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার এই মূর্ত্তিকল্পনা মূলত তাঁহার প্রকৃতিবিষয়ক দার্শনিক মতবাদের কবিত্বময় রূপান্তর। যাহার সেই দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস নাই, সে এই চিত্রগুলির বৈধতায় ও নৈতিক উৎকর্ষবিষয়ে সন্দিহান হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তারাপদর চরিত্রে প্রকৃতির সহিত যে সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদের উপর নির্ভর করে না, সর্ব্বসাধারণের স্বাধীন অনুভূতিই তাহার রসোপলব্ধি করিতে পারে।

'তারাপদ'র সহিত 'আপদ' গল্পের নীলকণ্ঠের কতকটা অবস্থাগত সাদৃশ্য আছে এবং এই দুইটি চরিত্রের তুলনা করিলে তারাপদ-চরিত্রের গূঢ় মাধুর্য্য ও পবিত্রতা বিশেষরূপ বুঝা যাইবে। তারাপদ তাহার অবারিত সহজ প্রাণের বলেই মতিবাবুদের পরিবারের সহিত মিলিত হইয়াছে; নীলকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া দৈববশে কিরণদের বাগানবাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছে। একের অবাধ, অসঙ্কোচ আতিথ্যগ্রহণ; অপরের কুণ্ঠিত অনুগৃহীতের ভাব। তারপর পরস্পরের চরিত্রানুরূপ উভয়ের মনোরঞ্জনের উপায়ও বিভিন্ন—তারাপদ সাঁতার দিয়া, কাজকর্ম্মে সাহায্য করিয়া, নিজ সহজ শক্তির অবলীলাক্রম বিকাশে ও দাশুরায়ের পাঁচালী গাহিয়া কর্ত্তা গৃহিণী হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝিমাল্লাদের পর্য্যন্ত মনোহরণ করিয়াছে। নীলকণ্ঠ যাত্রার দলের গানের দ্বারা, কতকটা অভিনয়ের কৃত্রিম উপায়ে কেবল কিরণবালার প্রিয়পাত্র হইয়াছে, তাহার প্রচণ্ড দৌরাত্ম্যের জন্য বাড়ীর অপর সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছে। তারপর তারাপদর উদার হৃদয়ে ঈর্ষ্যা, অভিমান প্রভৃতির লেশমাত্র নাই—প্রকৃতিমাতার স্তন্যপানে লালিত, তাহার অন্তঃকরণে কোন সঙ্কীর্ণতার ছায়া পড়ে নাই। নীলকণ্ঠ কিরণের স্নেহের ভাগ লইয়া সতীশের প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াছে ও চৌর্য্যরূপ হেয় কর্ম্মে পর্য্যন্ত নামিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি তাহাকেও কতকটা ঔদার্য্য ও স্নেহশীলতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই; তাহার ঈর্ষ্যাপরায়ণতা তাহার বঞ্চিত, স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র, ইহাতে নীচতার কোন স্পর্শ নাই। আবার দুইজনের মধ্যে আবির্ভাবের যেমন, তেমনই তিরোধানেরও একটা বিভিন্নতা আছে—তারাপদ তাহার সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাহাকে বশীকরণের সমস্ত আয়োজন পায়ে ঠেলিয়া দিয়া, উদাস অনাসক্ত প্রকৃতিমাতার বক্ষে লুকাইয়াছে; নীলকণ্ঠ সকলের বিরাগ লইয়া ও একের ক্ষুব্ধ স্নেহমাত্র সম্বল করিয়া নিতান্ত অনাদৃতভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তারাপদ যে প্রকৃতির সহিত একাত্ম, নীলকণ্ঠ তাহার প্রসাদের কণামাত্র পাইয়াছে।

নীলকণ্ঠের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব স্নেহের মায়াদণ্ড-স্পর্শে তাহার সুপ্ত পুরুষোচিত আত্মসম্মানবোধের উদ্বোধন। লেখক অতি নিপুণতার সহিত তাহার এই গূঢ় পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। 'সমাপ্তি' গল্পে মৃণ্ময়ীর ন্যায় নীলকণ্ঠও অতি অল্পকালের মধ্যে ভালবাসার স্পর্শে আত্মবিস্মৃত বাল্যকাল হইতে পরিণত যৌবনে অবতীর্ণ হইয়াছে। ভালবাসার প্রভাবে এই মানসিক গূঢ় পরিবর্ত্তন রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে মৌলিকতার পরিচয় দেয় এবং ইহা আমাদের সামাজিক অবস্থার সহিত বেশ সহজভাবেই মিলিয়াছে।

(৪) এইবার চতুর্থ পর্য্যায়ের গল্পগুলি আলোচনা করিব। সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের সহিত অতিপ্রাকৃতের সংযোগসাধন এক দিক দিয়া বিশেষ সহজ, অপর দিকে বিশেষ আয়াসসাধ্য। সহজ এইজন্য যে, আমাদের মধ্যে এখনও কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার সজীবভাবে বর্ত্তমান আছে, যাহাদের অতিপ্রাকৃতের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আবার অন্য দিকে, আমাদের সাধারণ জীবন এতই বিশেষত্বহীন ও ঘটনা-বিরল, যে ইহার মধ্যে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ের দ্বারা অতিপ্রাকৃতের অবতারণা নিতান্ত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের গল্পমধ্যে উভয়বিধ গল্পেরই উদাহরণ মিলে। 'সম্পত্তিসমর্পণ', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প আমাদের সহজ ভৌতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কলা-কুশলতার পরিচয় নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পের যে প্রতিবন্ধক তাহা তিনি আশ্চর্য্য কল্পনা-সমৃদ্ধির সহায়তায় অতিক্রম করিয়াছেন। 'নিশীথে,' 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'মণি-হারা' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত, বাস্তব জীবনের সহিত অতিপ্রাকৃতের সমন্বয়-

সাধনের দুরূহতা বিষয়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংরেজ কবি কোলরিজ এ বিষয়ে—অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। কিন্তু তাঁহাকেও অতিপ্রাকৃতের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে অনেক আয়াস পাইতে হইয়াছে। তাঁহার Ancient Mariner ও Christabel উভয় কবিতাতেই তাঁহাকে নৈসর্গিকের সীমা লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, শরীরী প্রেতের আবির্ভাব ঘটাইতে হইয়াছে। আবার যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাঁহাকে এই অনৈসর্গিকের অবতারণা করিতে হইয়াছে তাহাতেও অজ্ঞাত অপরিচিত সুদূরের রহস্য মাখানো। 'Ancient Mariner'এ মেরুপ্রদেশের নিঃসঙ্গ ধবল তুষারস্তূপ রৌদ্রদগ্ধ নিবাত নিষ্কম্প অনন্ত মহাসাগরের নিবিড় নীরবতা, চঞ্চলশিখা, বিচিত্রাভ বাড়বানলের মধ্যে তাঁহাকে অতিপ্রাকৃতের আসন রচনা করিতে হইয়াছে; পরিচিত মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে মায়া-তরী ডুবাইতে হইয়াছে। 'Christabel'-এও নিশীথ স্তব্ধ অরণ্যানী ও মধ্যযুগের রহস্যমণ্ডিত দুর্গাভ্যন্তরেই প্রেতলোককে আমন্ত্রণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য কুহকবলে আমাদের অতিপরিচিত গৃহাঙ্গণের মধ্যেই অতিপ্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়াইয়া একপদও অগ্রসর হন নাই। ভৌতিকের মনোবিজ্ঞানসম্মত যে ব্যাখ্যা—"the spot in the brain that will show itself out" মস্তিষ্কবিকারের বাহ্য অভিব্যক্তি—তাহা তিনি তাঁহার গল্পগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলির প্রত্যেকটিই আধুনিক বিজ্ঞানের কঠোরতম পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।

'নিশীথে' গল্পটি দ্বিতীয়বার পরিণীত, প্রথম স্ত্রীর প্রতি অপরাধ হেতু গুরুভারগ্রস্ত স্বামীর সাময়িক মনোবিকার হইতে উদ্ভূত। মৃত্যুশয্যাশায়িনী প্রথমা স্ত্রীর ত্রস্ত ব্যাকুল প্রশ্ন 'ওকে, ওকে, ওকে গো' অনুতপ্ত স্বামীর মস্তিষ্কে এমন গভীর, অনপনেয় রেখাতে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই কয়েকটি সামান্য আর্ত্ত বাণীর প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত আকাশ-বাতাস আপন গভীর, অতলস্পর্শ স্বরে উহার শঙ্কিত শিহরণটুকু, উহার ব্যথিত রেশটুকু ধরিয়া রাখিয়াছে। আর এই মনোবিকারটুকু ঘটাইতে লেখকের বিশেষ আয়োজনবাহুল্য করিতে হয় নাই—একটা উপনগরস্থ বাগানবাড়ীর ম্লান জ্যোৎস্নালোকিত বকুলবেদী, বা পদ্মার তটে কাশবন-পরিপ্লুত নির্জ্জন বালুতটের মধ্যেই এই অতিপ্রাকৃতের শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে। অথচ সমস্ত গল্পটির মধ্যে সম্ভবের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে এমন একটি রেখাও নাই। এই অতিপ্রাকৃতের অসীম সাঙ্কেতিকতা, আরব্য উপন্যাস-বর্ণিত বোতলের মধ্যে আবদ্ধ দৈত্যদেহের ন্যায়, সঙ্কীর্ণপরিধি বাঙালী জীবনের মধ্যে সহজেই স্থানলাভ করিয়াছে।

'মণিহারা'ও অনেকটা 'নিশীথের' ন্যায় সদ্য পত্নী-বিয়োগ-বিধুর স্বামীর মনোবিকারের কাহিনী। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই তুষারশীতল, মৃত্যু রহস্যগূঢ় স্বপ্ন-কাহিনীর চারিদিকে একটা ইস্পাতের মত শক্ত বাস্তবতার বন্ধন দেওয়া হইয়াছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত যিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে স্বপ্নজড়িমার লেশমাত্র নাই। বরঞ্চ একটা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি শাণিত ছুরিকাগ্রভাগের ন্যায় চক্ চক্ করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে আদিম রহস্য ও বর্ত্তমান যুগের সমাজে সেই সনাতন নীতির বৈপরীত্য—এই অতিগভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ আলোচনার মধ্যে, বুদ্ধি তর্কের অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের ভয়াবহ ইঙ্গিতটি আশ্চর্য্য সুসঙ্গতির সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই realistic setting বা বাস্তব প্রতিবেশের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের অপরূপতা আরও রহস্যঘন হইয়া উঠিয়াছে। গল্পের উপসংহারটিও আবার বাস্তব সত্যকে প্রাধান্য দিয়া একটা সংশয়াকুল, সন্দেহবিজড়িত অনিশ্চয়তার মধ্যে গল্পটিকে হঠাৎ শেষ করিয়া দিয়াছে। এই সন্দেহ দোলায় দোলায়মান পাঠকের মন বলিতে থাকে,"Did I dream or wake ?" ক্ষুধিত পাষাণের অতিপ্রাকৃতের মধ্যে বাদশাহী যুগের সমস্ত ঐশ্বর্য্যদীপ্তি, রাজান্তঃপুরের সমস্ত অব্যক্ত ক্রন্দন, সমস্ত যুগযুগান্তরসঞ্চিত ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস তাহাদের ইন্দ্রজাল বর্ষণ করিয়াছে। বিজন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে অতীত যুগের বিলাস-বিভ্রম তাহার অতীন্দ্রিয় স্পর্শ ও রহস্যময় সঙ্কেত ছড়াইয়া রাখিয়াছে—কবি যেন এই পঙ্কিল উচ্ছ্বসিত কামনা-প্রবাহের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত "বস্তু-অংশ বর্জ্জন করিয়া রস-অংশ ছাঁকিয়া লইয়াছেন।" ভাষার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, সাঙ্কেতিকতায় এক De Quinceyর Dream Visions ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের অনুরূপ কিছু ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতপ্রবাহে বোধ হয় De Quincey রবীন্দ্রনাথ হইতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ইংরেজ লেখকের যে প্রধান দোষ বস্তুহীনতা ও ভাবের কুহেলিকাময় অস্পষ্টতা—তাহার লেশমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না। আবার এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বিবৃতি হইয়াছে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে, ট্রেন-প্রতীক্ষার অবসরে। এখানেও 'realistic setting'টি লেখককে গল্পের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটাইতে সুযোগ দিয়াছে,—তাঁহাকে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিবার অসুবিধা ভোগ করিতে দেয় নাই। এই তিনটি অতিপ্রাকৃত গল্প রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়—পৃথিবীর যে-কোন ঔপন্যাসিক

এই শক্তিতে গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি গল্প আছে যাহাতে অতিপ্রাকৃতের ছদ্মবেশে বস্তুতঃ প্রকৃত বিষয়েরই বর্ণনা পাওয়া যায়। 'কঙ্কাল' গল্পটিতে কথাগুলি দেওয়া হইতেছে মৃতা রমণীর মুখে; কিন্তু মৃতের এই আত্মজীবন-কাহিনীতে অতি-প্রাকৃতের তুষারশীতল স্পর্শটি আনিবার কোন চেষ্টা নাই। যে প্রগল্‌ভা রূপযৌবনমোহাবিষ্টা রমণী গল্পটি বলিতেছে, সে দুই চারিটি মর্ত্ত্যলোকসুলভ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া প্রেতলোকের বিশেষত্ব বিশেষ কিছু অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিতে একটি অসাধারণ মনোভাবের বিশ্লেষণ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে লেখক কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। জীবিতা শ্মশানপ্রত্যাগতা কাদম্বিনী নিজেকে সত্য সত্যই মৃত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে এবং লেখক তাহার চিন্তায় ও ব্যবহারে এক প্রকার সুদূর নির্লিপ্ততার ভাব মাখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে সেরূপ অনুভূতির গভীরতা নাই। সুতরাং গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবটি কল্পনারসে ভরপুর হইয়া বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনার প্রধান যুগটির পরিসমাপ্তি হইয়াছে এবং নিতান্ত আধুনিক সময়ে তিনি যে গল্পসাহিত্যের নূতন অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সহিত পুরাতন গল্পগুলির এইখানে ব্যবচ্ছেদরেখা টানা যাইতে পারে। আধুনিক গল্পগুলির আদর্শ ও রচনাপ্রণালী পূর্ব্বতন গল্প হইতে অনেকটা বিভিন্ন। এই প্রভেদ প্রথমতঃ বিষয়-নির্ব্বাচনেই দেখা যায়। পূর্ব্ব গল্পগুলি আমাদের সনাতন জীবনযাত্রার গভীর মর্ম্মস্থল হইতে উদ্ভূত। এক একটি গল্প যেন তাহার হৃদ-পদ্মের এক একটি বিকশিত পাপড়ি। ইহাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলি আলোচিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ের গভীর রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কেবল মাত্র জীবনের উপরিভাগে একটা বিক্ষোভ ও আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। নূতন গল্পগুলির মধ্যে এই বাহিরের চাঞ্চল্য ও আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়া বৈচিত্র্য আহরণের চেষ্টা হইয়াছে। হয়ত লেখক অনুভব করিয়াছিলেন যে পুরাতন রসধারা শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে আর নূতন কিছু করিবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং আমাদের পুরাতন সমাজের চারিদিকে যে নবীন উন্মাদনা ফেনিল হইয়া উঠিতেছে, যে অশান্ত তরঙ্গভঙ্গ পুরাতন উপকূলের আশেপাশে মুখরিত হইতেছে, তাহারই বিদ্রোহ-বেগটি জীবনের ছন্দে তালে গাঁথিয়া তুলিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। এই নূতন যুগের সমস্যাগুলি পুরাতনদের ন্যায় এত গভীর ও ব্যাপক নহে, ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই ইহাদের প্রভাব ও প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ। ইহারা প্রায়ই বুদ্ধিগ্রাহ্য, তীক্ষ্ণতর্ক-কণ্টকিত; বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করিয়া এখনও হৃদয়ভাবের গভীরতর স্তরে অবতরণ করে নাই। ইহাদের প্রভাব হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, চোখা চোখা বুলি, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ চারিদিকে ছুটিতে থাকে, অশ্রুর গভীর প্রবাহ উৎসারিত হয় না। তথাপি ইহাদের নূতনত্ব বিশেষ উপভোগ্য, আমাদের জীবনে যে তিল তিল করিয়া নবমেঘের সঞ্চার হইতেছে তাহার বিদ্যুচ্ছটার একটা ভীষণ রমণীয়তা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক ও পূর্ব্বসূচনকারী।

ইহাদের মধ্যে 'নষ্টনীড়' গল্পটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদিও রচনাকাল হিসাবে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পগুলির সম-সাময়িক, কিন্তু বিষয়ের দিক হইতে ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গল্পগুলির সমশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহার সমস্যাটি যে আধুনিক তাহা নহে, কিন্তু সাহিত্যে ইহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ একটা নূতন ব্যাপার। প্রেম বস্তুটিকে আমরা এতদিন রোমান্সের বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত করিয়া দেখিতেই অভ্যস্ত ছিলাম, ইহার বিচ্ছেদব্যথা, ইহার গোপন মাধুর্য্য, ইহার উচ্ছ্বসিত আবেগ, ইহার মুক্তি ও বিস্তারের দিকেই আমাদের লক্ষ্য আবদ্ধ ছিল। যাহাকে বাহিরের জগতে বড় করিয়া দেখিয়াছি, নিজ গৃহকোণে, পারিবারিক নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে, বিধিনিষেধের অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাহার যে কুৎসিত, লজ্জাকর অভিব্যক্তি তাহাকে আমাদের সাহিত্যের প্রকাশ্যতার মধ্যে টানিয়া আনিতে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং সাহিত্যে এই নূতন আবির্ভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অভাব হয় নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে এই জাতীয় বিষয়ের বৈধতা লইয়াও বাদ-প্রতিবাদের অন্ত নাই। মোটের উপর এবিষয়ে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, কলাসৌন্দর্য্য ও বিশ্লেষণকুশলতা থাকিলে প্রেমের এই সমস্ত সমাজ-বিগর্হিত বিকাশও সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে—বিপদ সেইখানে, যেখানে ইহাকে কেবলমাত্র কুৎসিত আলোচনার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, যেখানে কল্পনার স্বচ্ছসলিলে ইহার কালিমাকে ধৌত করিবার কোন প্রয়াস দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নষ্টনীড়ে' পূর্ব্বলিখিত সর্ত্তগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, অমলের প্রতি চারুলতার প্রেম একটা দুর্দ্দমনীয়, অপ্রতিরোধনীয় হৃদয়াবেগ মাত্র, ইহা চিন্তার সীমা অতিক্রম করিয়া পাপের পিচ্ছিল পথে পদক্ষেপ করে নাই। তার পর লেখক কি সুকৌশলে, পুঞ্জীভূত কারণ দেখাইয়া এই প্রেমের উদ্ভবটিকে সম্ভব করিয়াছেন—ভূপতির ঔদাসীন্য, অমল ও চারুর পরস্পর স্নেহসম্পর্কের মধ্যে তাহাদের

হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ, তাহাদের সাহিত্যচর্চ্চার নিবিড় নেশা ও নিভৃত গোপনতা, মন্দার প্রতি ঈর্ষ্যাতে তাহার গূঢ় পরিণতি, সর্ব্বোপরি অমলের বিবাহ-সংবাদে তাহার অনিবার্য্য, অনাবৃত প্রকাশ, এই সমস্ত ক্রমবিকাশের স্তরগুলিই লেখক যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাটি অতি নিপুণভাবে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। এই কাহিনীর অন্তরালস্থ গভীর ভাবগুলি মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান বাস্তবতাপ্রধান ঔপন্যাসিকেরা নিতান্ত অকারণে প্রেমের উদ্ভব ঘটাইয়া বাস্তবতার মূল ভিত্তির প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করেন। যেখানে সমাজনীতির বিরুদ্ধে প্রেমের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সেখানে এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের যথেষ্ট ও সঙ্গত কারণ না দেখাইলে, আমাদের বিচারবুদ্ধি তাহাতে সায় দিতে চাহে না।

'স্ত্রীর পত্র' বর্ত্তমানের নারীর অধিকারঘটিত আন্দোলনের প্রথম উৎপত্তিস্থল। লাঞ্ছিত, অপমানিত নারীর যে বিদ্রোহবাণী আজ প্রতি মাসিক পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই জ্বালাময়ী বাণীকে তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়াছেন। অবশ্য এখানে গল্পের উপযুক্ত ঘাত-প্রতিঘাত নাই, কেননা কথাগুলি সমস্তই একতরফা। এইরূপ তীব্রশ্লেষাত্মক একতরফা কথার propagandism হিসাবে মূল্য আছে, কিন্তু আর্টের অপক্ষপাত ও সমদর্শিতা তাহাতে নাই। বিশেষতঃ মৃণালের ক্রোধের ঝাঁজটা একটু অতিরিক্ত তীব্র বলিয়া মনে হয়, কেননা যে হতভাগ্য পুরুষ এই বিদ্রূপমিশ্রিত অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছে, তাহার নিজের ততটা অপরাধ নাই, সে সমগ্র পুরুষজাতির প্রতিনিধি স্বরূপেই এই অগ্নিবাণ হজম করিতে বাধ্য হইয়াছে।

'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটাও স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের নির্মম ব্যবহারের প্রতিবাদ, কিন্তু এই প্রতিবাদের ঝাঁঝের মধ্যে সত্যের তিক্ততা অধিক পরিমাণে আছে। গল্পের যে অংশ আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়, তাহা পুরুষের স্ত্রীজাতির উপর কাপুরুষোচিত আস্ফালনে; সমাজচ্যুতার বিবাহে বিঘ্ন নহে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের গভীর মন্তব্যগুলি ভাবগভীরতার অভাব পূরণ করে—যেখানে তিনি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ না করেন, সেখানেও তাঁহার বুদ্ধির খরধার তীক্ষ্ণতায় চমৎকৃত করিয়া থাকেন।

'পয়লা নম্বর' প্রধানতঃ অদ্বৈতচরণের individuality বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি—তাঁহার নিশ্চিন্ত ও একাগ্র জ্ঞানানুশীলনের পশ্চাতে যে একটি ক্ষুব্ধ নারীহৃদয় নীরব বিদ্রোহে প্রধূমিত হইতেছিল, তিনি সে বিষয়ে একেবারেই অন্ধ ও উদাসীন। অনিলা বরাবরই অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে—তাহার দিকের কথা ভাল করিয়া বোঝান হয় নাই। অদ্বৈতচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত-প্রকৃতি সিতাংশুমৌলির, সে নিজ সহজ ক্ষমতাবলে পরকে নিজের কাছে টানিতে পারে, ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্যই তাহার একমাত্র আকর্ষণ নহে। এই সহজ উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের বলে সে অনিলারও চিত্ত জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। অনিলার নিকট কোন সাড়া পায় নাই, কিন্তু তাহার নিশ্চল শান্তিকে বিচলিত করিয়া তাহাকে গৃহছাড়া করিয়াছে। এই গল্পটিতে দাম্পত্যসম্পর্কের বিশ্লেষণ-চেষ্টা থাকিলেও, মোটের উপর ইহা দুইটি বিপরীতপ্রকৃতি ব্যক্তির চরিত্র-চিত্রণ।

'নামঞ্জুর' গল্পে 'ঘরেবাইরে'র ন্যায় আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও বিপ্লববাদের ফাঁকা দিকটা দেখান হইয়াছে; বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে দেশমাতৃকার সেবার মধ্যে যে খ্যাতির লোভ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তাহাদিগকে সাংসারিক ছোটখাট স্নেহযত্নমণ্ডিত কাজের প্রতি বিমনা করিয়া তাহাদের স্ত্রীজাতিসুলভ কমনীয়তা ও মাধুর্য্যের হানি করিয়া থাকে। মিটিং করিয়া ভাঁইফোঁটার অনুষ্ঠান ও গৃহে রুগ্ন ভ্রাতার সেবাতে অবহেলা—এই দুয়ের মধ্যে যে একটা বিরাট ফাঁকির ব্যবধান আছে তাহা আমাদের সাধারণ আন্দোলনগুলির অন্তঃসারশূন্যতাই প্রমাণ করে।

এই শেষের কয়েকটি গল্পের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক লেখকদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের জাতীয়জীবনে যে সমস্ত সমস্যার নবীন উদ্ভব হইতেছে, তাহারা এখন পর্য্যন্ত হৃদয়ের গভীর স্তরে কাটিয়া বসিবার সময় পায় নাই, এখনও অন্তরের মাধুর্য্য-রসে অভিষিক্ত হয় নাই। সুতরাং তাহাদের বর্ত্তমান আলোচনায় হৃদয় হইতে বুদ্ধিবৃত্তিরই প্রাধান্য। কালে ইহারাই আমাদের অন্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইবে। ইহাদিগকে ঘেরিয়াই আমাদের গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বিকাশত হইয়া উঠিবে, ইহারাই মানুষের হৃদয়গত যোগসূত্র হইয়া নূতন সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবেশ রচনা করিবে। সুতরাং ইহারাই যে কালে ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকের প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা একরূপ নিশ্চিত।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা তাঁহার প্রসার ও বৈচিত্র্যে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমাদের পুরাতন ব্যবস্থা ও অতীত জীবনযাত্রার সমস্ত রসধারা অগস্ত্যের মত তিনি এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন—বাংলার জীবন ও বহিঃপ্রকৃতি তাহাদের সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও তাঁহার আশ্চর্য্য স্বচ্ছ অনুভূতির নিকট হইতে গোপন করিতে সমর্থ হয় নাই। অতীতের শেষ শস্যগুচ্ছ ঘরে

তুলিয়া তিনি ভবিষ্যতের ক্রমসঞ্চীয়মান ভাবসম্পদের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্যভাণ্ডারে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার বীজ বপন করিয়াছেন তিনি নিজে, কিন্তু তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন, তাহার পরিণত ফল কোন্ ভাগ্যবান আহরণ করিবে তাহা এখন আমাদের কল্পনারও অতীত। তাঁহার আগমনপ্রতীক্ষায় সমগ্র দেশ অনিমেষনয়নে ভবিষ্যৎ কালের দিকে চাহিয়া থাকিবে।

সন্ধ্যাতারা

শ্রীগোপাল লাল দে, বি-এ

ওগো সন্ধ্যার প্রথম পথিক, গোধূলি বেলার প্রিয়,
আকাশ-গেহের স্নেহের প্রদীপ, হে অনির্ব্বচনীয়,
নীল সায়রের প্রতীচি সোপানে,
স্বর্গবালার উলসিত স্নানে,
লক্ষ রূপের হোরি হেরিবারে এসেছ কি লোভনীয়,
সন্ধ্যাপথের প্রথম পথিক, গোধূলি বেলার প্রিয়।

শোণিতরক্ত বসন কাহারো উড়িছে দিগন্তরে,
নীল বাসখানি ছড়ায়ে দিয়েছে কেহ বা বিলাস ভরে,
কাহারো কনক চাঁপা বাসখানি,
সতেজ সবুজ কারো বা উড়ানি,
শ্বেত আসমানী জরদা বেগুনী পীত পট কারো তরে;
উলটি পালটি উড়ে শত শাটী নীল নভ অম্বরে।

ওগো কুতূহলী, কি দেখিতে এসো অপ্সরা লীলাস্নান,
অথবা মর্ত্ত্য-বধূ-বাম-করে সন্ধ্যাপ্রদীপ দান,
তুলসীতলায় রাখি দীপখানি,
প্রণমে যখন গলে বাস টানি,
দেবতা স্মরিতে মনে ফুটে ওঠে পরিচিত মুখখান,
লাজে বিস্ময়ে ভকতি হরষে ঘোমটায় দেয় টান।

দেবের সান্ধ্য আরতির ধ্বনি এখনই গিয়েছে থামি
দিবসকর্ম্ম অবসানে এই বসেছে গৃহস্বামী,
নন্দন পড়ে শাস্ত্রবচন,
দুহিতারা করে স্বপ্নরচন,
এখনও ত্বরিতে পদেতে গৃহিণী সেবারতা দিবাযামী,
মর্ত্ত্যসীমায় স্বর্গে হেরিতে এসো কি আকাশে নামি?

অপাপবিদ্ধা কিশোরী কুমারী পল্লীবালিকাগুলি,
তোমার উদয় সখীরে দেখায় তর্জ্জনী তার তুলি',
চারিটি তারকা গণিবার ছলে,
তোমা পানে চেয়ে রহে কুতূহলে,
চূর্ণ অলক উড়ে সাঁঝ-বায় খসি পড়ে বাস দুলি,
চেয়ে থাকে তবু অপলক-আঁখি নীলেন্দীবর খুলি।

এখনি যামিনী আসিবে শিখিনী উড়ায়ে পাখা,
তিমিরবর্হে খচিত অযুত হীরক-রাকা
আনিলে কি তারই আগমনী বাণী
অথবা আলোর জলধারা টানি;
অথবা দিবার শেষ-দীপ-শিখা বেদনামাখা,
অথবা শ্যামলী গোধূলির ভালে টিপ্‌টি আঁকা?

তুমি জীবনের শেষ আয়ু তুমি মরণে প্রথম আলো,
তুমি বিচিত্র, সুখশেষে আসি দুখ রাতে দীপ জ্বালো,
আলো ও আঁধারে হে চিরসন্ধি,
বিরহ ও প্রেমে করেছ বন্দী,
অন্তরে কস্তুরী-গন্ধ মৃগ-মদ-কণা ঢালো,
দুরাশার শেষ শান্তি সীমায় স্বপন লোকের আলো।

মানী

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

সন্তীর স্থলতের জীবনটা এ পর্য্যন্ত সুখপাঠ্য হ'ল না। না রস—না রূপ—সে যেন দেবীর প্রসাদবর্জ্জিত কাপালিকের মুখে ফেনিয়ে-তোলা শিঙের একটা বজ্র-গম্ভীর হাহাকার। অজানা ভবিষ্যৎটি দরজা-আঁটা, দৃষ্টির অগোচর, না জানি সেথায় আরও কত কি গভীর বিস্ময় জমে রয়েছে।

আকাশের এক মেঘগর্জ্জনের দিনে পড়সী এক পিসির কাছে সে শুনলে, পিতার ঘরে খেলার তার অবসান হয়েছে। অপর এক সীমানার গেট খোলা, তাকে এখন সেই পথে চলা সুরু করতে হবে। সারাটা দিন পিসির খাটুনি আর ঘরে কিছু বাড়্‌তি জিনিষপত্তর দেখে সে ভেবে নিলে পিসির কথাই সত্যি।

সন্ধ্যেবেলা ভাঙা পাল্‌কীতে চড়ে পথভোলা পথিকের মত পিসির হাতের আল্‌পনার কাছটায় কে এক অপরিচিত এসে নেমে পড়্‌ল। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার—সানায়ের ধুয়োটি পর্য্যন্ত নেই—বর নাকি সে। পিতা যে মল্লিকবাড়ীর বিয়ের ঢোল, কাঁশী আর সানায়ের তিন ওস্তাদকে দলছাড়া করে ঐ চালাটায় সরগরম করে বসিয়ে রেখেছিলেন সন্ধ্যার মহড়াটা দিয়ে যাবে বলে, তারাই বা গেল কোন্ চুলোয়? পিসি হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন। শোনা গেল, নিকটে একটা মৃত গোবৎসের সন্ধান পেয়ে 'রথ দেখা আর কলা বেচা' দুই ধ্যানেই তারা অবহিত হয়ে পড়েছে।

যাক্—আপদ গেছে। নেড়া উঠোনটায় ঢোলের বাদ্য, —ও না হওয়াই ভাল। পিসি কিন্তু নাছোড়বান্দা। শাঁকে ফুঁ পেড়ে সকল সঙ্কট দূর করে দিলেন। তাঁর বাদ্যের ছন্দে তাল মিলিয়ে বরটির চিত্ত উঠ্‌ল দিগ্বিজয়ী হয়ে। মেয়েটি গেল মোটা লাল সাড়ীটার ভিতরে ঘেমে।

যে এল, সে বংশী। পাশের গাঁয়েরই ছেলে।

আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। কিরণটুকু ঝিক্‌মিকিয়ে পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়্‌ল—আজকার এই নূতন জীবনের জন্মতিথিতে। পলকে মেঘ আবার কালো হয়ে ঘনঘটায় গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। ঠিক এই সময় দু'হাত এক করে পুরোহিত মিলন-মন্ত্র পড়্‌লেন। বুকের পাষাণভার গেল নেমে। কোন্ পিতার—মেয়েটির কি বরটির—মেঘের ডাকে মন্ত্রটি ঠিক বুঝা গেল না।

নিঃসঙ্গতার একঘেয়ে জীবনটি সতুর। অমাবস্যার ঘন তমিস্রারাশির মত। পিতার ঘরে একমাত্র পিতাকেই সে দেখেছে—আর অথের অঙ্কে শূন্য দেখেছে। পুরীটা ধনজনের অভাবে মরুভূমির মত গাম্ভীর্য্যে 'খাঁ' 'খাঁ' করত।

পাড়ার বিধু রজকিনী ছিল তার জিম্মাদার। প্রতিদিন সকালে মেয়েটিকে বিধুর উঠানে ঝেড়ে ফেলে রেখে সারদা দূরের চট্‌কলটার ধোঁয়া লক্ষ্য করে ছুট্‌ত পাছে ছ'য়ের ঘড়ি বেজে যায়। বেলা বারটায় ছুটি। মেয়েটি এ সময়টা বিধুর মেয়ের সঙ্গে পুতুল খেলে আর পিতার জন্যে ঠোঁট ফুলিয়ে কাটাত।

ছুটির পর সেই পায়ে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘরে ফিরত। রাঁধত্—বাড়্‌ত—খাওয়াত। বেলা দুটোয় আবার বিধুর হাতে সঁপে দিয়ে চলে যেত। আদর সোহাগ করার সময় হ'ত না। সন্ধ্যার পর ফিরে এসে যখন এই অন্ত্যজ ঘরের দাওয়ার উপর লুটিয়ে পড়া মেয়েটিকে কোলে তুলে মুখে চুমু খেত, আর উস্কো-খুস্কো চুলগুলি কানের পিঠে সরিয়ে দিত, ঘুমে তখন মেয়েটির দু'চোখ থাকত জড়িয়ে। কি যেন সে পেত—কি যেন সে পেত না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধান-ঝাড়া, চাল-কাঁড়া, ঘর-নিকানো এ সকল ছোট ছোট কাজে বিধুর মেয়ের সঙ্গে তাদেরই ঘরে সে হাত পাকিয়ে ফেললে। তখন আর সে এই পরাশ্রয়ের মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে থেকে সারাটা দিন আই-ঢাই

করে কাটাতে চাইত না। করুণ চোখে পিতাকে মিনতি করত,—আমাকে আর পরের ঘরে পুতুল খেলতে বলো না বাবা! ফিরে এসে দেখবে তুমি, ঘরের কতগুলি কাজকর্ম আমি সেরে-সুরে রেখেছি। ঘরে বাইরে এত পাটুনি খেটে কি মানুষ বাঁচে?

সেই থেকে পিতার সকল রকম আপত্তি খণ্ডন করে একলা ঘরে কাজকর্মের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে থাকত। সকাল বিকালের একটা সঙ্গিনীও তার জুটে গেল। সে অন্নদা চাটুর্য্যের মেয়ে রমা। রমার সঙ্গে খুব ভাব। তাদের মনের মাঝে আবরণ নেই, কেউ কাকেও রেখে-ঢেকে বাঁচিয়ে চলে না, এমনি গলায় গলায় ভাব। রমা বললে,—"সারাদিন খেটে মরিস্, একটু পড়াশুনো কর্ না ভাই?" সতু জবাব দিলে, "বই পাব কোথায়? বাবা একলা মানুষ, সময় বা তেমন কই?" সেই থেকে রমা নিজের বই দপ্তর সঙ্গে করে সকাল বিকেল প্রতিদিন এসে হাজির হত। আর স্কুলে যা শিখে পড়ে আস্ত, সতুর কানে উজাড় করে ঢেলে দিত। তরুণ শিক্ষয়িত্রীর ভুল-ভ্রান্তি কিছু কম হত না। ভুলে নির্ভুলে মিশে সতুর মনে কিন্তু একটা অনুভূতি সঞ্জাত হয়ে উঠ্ছিল। সে পথ খুঁজে পেলে। তখন রমার মত গুরুমশাই কাছে না থাক্লেও চলে যেত।

মেয়ের দিকে চেয়ে দেখে সারদা হঠাৎ একদিন চম্কে গেল। সতুর মাথা উঠেছে উঁচু হয়ে—খিড়কীর দ্বার দিয়ে গলে না। চোখের পাতা এসেছে নেমে—মাটি ছেড়ে ওঠে না। তৃষ্ণা মিটানোর যা কিছু, বিশ্ব-ভাণ্ডারীর হাত থেকে কত মহামূল্য আবরণ ছিনিয়ে নিয়ে দেহখানা কোন্ অবসরে সে সাজিয়ে ফেলেছে।

সারদা চটকলের কেরাণী। হাতের কলমটি পায়ের বেড়ী। সময় কই যে পাত্তর খোঁজে?" কেবল রাত্তির বেলা বিছানায় শুয়ে পড়ে মনে মনে রঙীন কল্পনা জমিয়ে তোলে। সতু যে শান্ত মেয়েটি, জন্মলগ্নে হয়ত বৃহস্পতি অথবা ঐ রকমের কোনো শুভগ্রহই রয়েছে। ও কি আর নোনা চাল্তা আর বৈঁচির বাগানে ঠাসা পড়ো একখানা গোলপাতার ঘরে পড়বে? না, মাসকাবারের আটটি টাকার জন্যে ডাকের দিকে চেয়ে তীর্থের কাক হয়ে বসে থাক্বে? চটকলেই ত ক'টি ছোক্রা বাবু এসে ঢুকেছে, বেশ মোটা মাইনে পায়। দিনে নেহাৎ কম করেও পাঁচটি বাক্স সিগারেট ফুঁকে ছাড়ে। সতুর রূপগুণের কথা শুনলে হয়ত একটা-না-একটা এসে গেঁথে যাবে। এইসব সরস কল্পনায় জেগে জেগে সারদার চোখে কালি পড়ে এল। ভোরবেলায় ছেঁড়া চাদরটা কাঁধে ফেলতে মেয়ের রূপগুণের কথা শোনানোর সৎ সাহস আর থাকে না। মতলব যায় ফেঁসে।

সারদা চেষ্টাচরিত্র তেমন করতে পারলে না। সতুও যৌবন নিয়ে ঝেঁকে উঠল। বংশীর সদর দরজা খোলাই ছিল। অবশেষে সারদা তাকে নিরাপত্তিতে টেনে এনে পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে দিলে।

সতু এসে দেখ্লে সেই তেমনি নির্জ্জনতায় তার স্বামীর ঘরটিও ভরপুর। চোখ দিয়ে অতর্কিতে খানিকটা জল ঝরে পড়্ল।

যাক্—দণ্ডের সঙ্গে এবার কিছু সুবিচার ছিল। এবার সে একেবারে নিঃসঙ্গ হ'ল না। ইঁদুর, বেরাল, আরশুলা, টিক্টিকি, গিরগিটি, চামচিকে আপনার লোকের মতই ঘরটি জুড়ে কিল্বিল্ করে। সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়াবিছে—এরা শত্রুলোক—গা ঢাকা দিয়ে থাকা স্বভাব এদের—হঠাৎ কুটুম্বর মত মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে চমক লাগায়। একটা কঙ্কালসার কুকুরও দাওয়ার কোণটি অধিকার করে চক্র ফেরে। কোনো কিছু দেখ্লে দাঁত খিঁচোয়। চিকণ দাঁতগুলো চোখে এসে বেঁধে।

এই ত গেল একটা দিকের ব্যাপার। আর ছিলেন স্বামী। স্বামীটি যে কোন্ বলে দৃপ্ত সতু তখনও ঠাওর করে উঠ্তে পারেনি। সে দেখ্লে, রান্নাঘরের ধূম মাঝে মাঝে বিগ্ড়ে যায়। ভিখারী দরজায় এসে বৃথা হাঁকে,—ভিক্ষে পাই মা! কুকুরটারও খিঁচুনি বেড়ে উঠ্ল। অথচ স্বামীর গা ঝাড়া দেবার লক্ষণ নেই।

বংশী বেলা ন'টা অবধি বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকে। কতক ঘুমিয়ে—কতক জেগে। যখন মুখের কাছে দেশলায়ের কাঠি জ্বলে ওঠে, সতু বোঝে—জেগে। যখন পাশবালিশটা হাতের বন্ধনে আটক পড়ে, আর নিশ্বাসের জোর শব্দ শোনা যায়, সতু ভাবে—ঘুমিয়ে।

তারপর উঠে বসে, হাই তোলে, তুড়ি দেয়, অঙ্গমোড়া খায়। দুর্গানাম হয়ত স্মরণ করে। মুখচোরা মানুষ, ফুটে বল্‌তে শোনা যায় না।

বিছানায় বসে আরও দু'একটি বিড়ি টেনে আলস্য ভাঙে। দাওয়ায় একখানা চৌকির উপর তামাক-পোড়ার কৌটা, নিমডালের দাঁতন—দুইমুখ নিখুঁত করে কাটা; মাজাঘষা জলের গাড়ু; গামছা একখানা ভাঁজকরা, প্রতিদিন সকালে যে সাজিয়ে রাখে, তার হাতের কাজে কোন গলদ নেই। বংশী এসে চৌকিখানার উপর ঠ্যাং তুলে বসে—জমীদার-পুত্রই বা কোথায় লাগে! সতু সে সময় উঠানের কোণে বসে মশাল গড়ে, ঘুঁটে দেয়, আঁকশী দিয়ে কাঁচকলা বা বিচেকলা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাড়ে। অথবা দুটো শাকের ডাঁটা—কি দুটো ঝিঙে তুলে তরকারী কোটার বঁটিখানার কাছে গুছিয়ে রাখে। তারপর রান্নার কাঠকুটো কতক পায়ে ভেঙে, কতক দা'য়ে কেটে জোগাড় করে। মুখে টুঁ শব্দটি নেই। বংশী দাঁতন ঘষে আর বসে বসে দেখে—হয়ত মাটিতে নেতিয়ে-পড়া কাপড়ের আঁচলটা, হয়ত কপালের ঘামে ভেজা স্খলিত চুলগুলো।

সতু চান্ করে এসে ডাব, পেঁপে, যেদিন যেমনটি সংগ্রহ কর্‌তে পারে একটু জলযোগের ব্যবস্থা করে। বংশী তাই খেয়ে ধোপ-দেওয়া কাপড় একখানা পরে কোঁচাটা ঝুলিয়ে দেয়। গায়ে ফিনফিনে গেঞ্জি, টেরিটা মাঝখান দিয়ে চেরা। লম্বা চুলগুলো সিঁথির দু'পাশ দিয়ে চেঁচে তুলে ঊর্দ্ধদিকে রুখে—খুব তোড়ে উঠে গেছে। মুখে পানের রাগ।

বেলা বারটা-একটায় সে ঘরে ফেরে। চোখ রাঙায়—ভাত কেন গরম নেই? রান্নার খুঁৎ ধরে গালিগালাজ করে। নাকে-মুখে গুঁজে আবার সে বের হয়ে যায়। আর আসে রাত বারটায়। সতু ভাত আগ্‌লে বসে ঝিমোয়।

গোলপাতার হেলা ঘরখানার ছ্যাঁদা মটকার উপর একটা বাঁশের ঝাড়। রাত্রির বেলা দেশের রাজ্যের ভূত-প্রেত একত্র জড়ো হয়ে বাঁশগুলো চুপে চুপে ধরে, বিকট শব্দ করে। সাম্‌নে একটা এঁদো পুকুর—শ্যাওলায় ভরা, ছিটে বেড়ার ফাঁকে দেখা যায়। গয়লাবৌয়ের কাছে শোনা,—এদেরই ঘরের একটা যুবতী বউ ডুবে মরে ওর জলে কি পাঁকে আত্মাটা স্থিতি করে রেখেছে। মাঝে মাঝে উপরটায় এসে নিশ্বাস ছাড়ে—জল বুজ্ বুজ্ করে ওঠে। পাড়ে গুটিপাঁচেক তালগাছ। পাতাগুলো সতুর অসহায় অবস্থা দেখে নৈশ বাতাসে অট্টহাসি করে। ঘরের পিছন দিক্‌টায় নারিকেল সুপারির একটা ছোট বাগানে—ঠাসা অন্ধকার। আনারস গাছের অধিকৃত স্থানটায় সাপ-খোপের বাস। নানারূপ ভয়-ভীতিতে সতুর বুকখানা ঢিপ্ ঢিপ্ করে।

বৎসরের চতুর্থাংশ অর্থাৎ পূজার আগের তিনমাস থিয়েটারের আখ্‌ড়ায়, বাকী কালটা এক গাঁজা আফিমের দোকানের আড্ডায় গ্রামের অকেজো ছেলেদের সময়টা জলের মত স্বচ্ছন্দে বয়ে যায়। ডিডিমণির গদাধরচন্দ্র, ভীম, জনা, দুঃশাসন, নারদ মুনি এই সবার নকলকণ্ঠে নিকটের বাসিন্দা লোকেরা ত্রাহি মধুসূদন ডাকে। বংশী এদের অভিভাবক।

আফিমের ঘরে উত্তর দিক্‌কার বাঁশের মাচায় ছেঁড়া মাদুরের উপর এদের আড্ডা। ছোট, বড়, মাঝারি, দরমাঝারি, কত্ রকমের সরস মূর্ত্তি। যেন যজ্ঞের থালায় রকমারি মিষ্টান্ন। স্বাদভেদ, রসভেদ, বর্ণভেদ, বয়সভেদ, জাতিভেদের জগাখিচুড়ী। ছোটরা এসে একটা রসিকতার কথা বল্‌লে, বড়রা যদি হেসে উঠ্‌ল, উৎসাহিত হয়ে তারা ভেবে নেয় যে, উৎরে গেল। তখন তারা মাটি ছেড়ে মাচার উপর উঠে বসে, দল যায় বেড়ে।

দক্ষিণের ছোট মাচার কাঠগড়ায় বসে যুবাবিক্রেতা অনুক্ষণ নিক্তির মাথায় বামহাতের সুপুষ্ট আঙুলের ঠোকর দেয়। মাথায় বাঁকা টেরি, চোখে চোরা চাহনি, মুখে কাষ্ঠ হাসি। সাম্‌নে ঠাকুরদাদার আমলের ছাতাধরা কাঠের হাতবাক্স। ক্রেতাদের কেহ কেহ ধূলিপায়ে সেইখানে বসে বসে ছোট কল্‌কের বড় ধূমে কুম্ভক রেচক করে। কেহ বা একমাত্রা কালো বড়ী মুখে পূরে চক্ষু বোজে। মাচার উপরকার রক্তহীন ছেলেদের—কারও কারও পা পিছ্‌লে যায়। নিক্তিওয়ালা বলে,—এই ত চাই, ভীমের গলা কি আপনি খোলে?
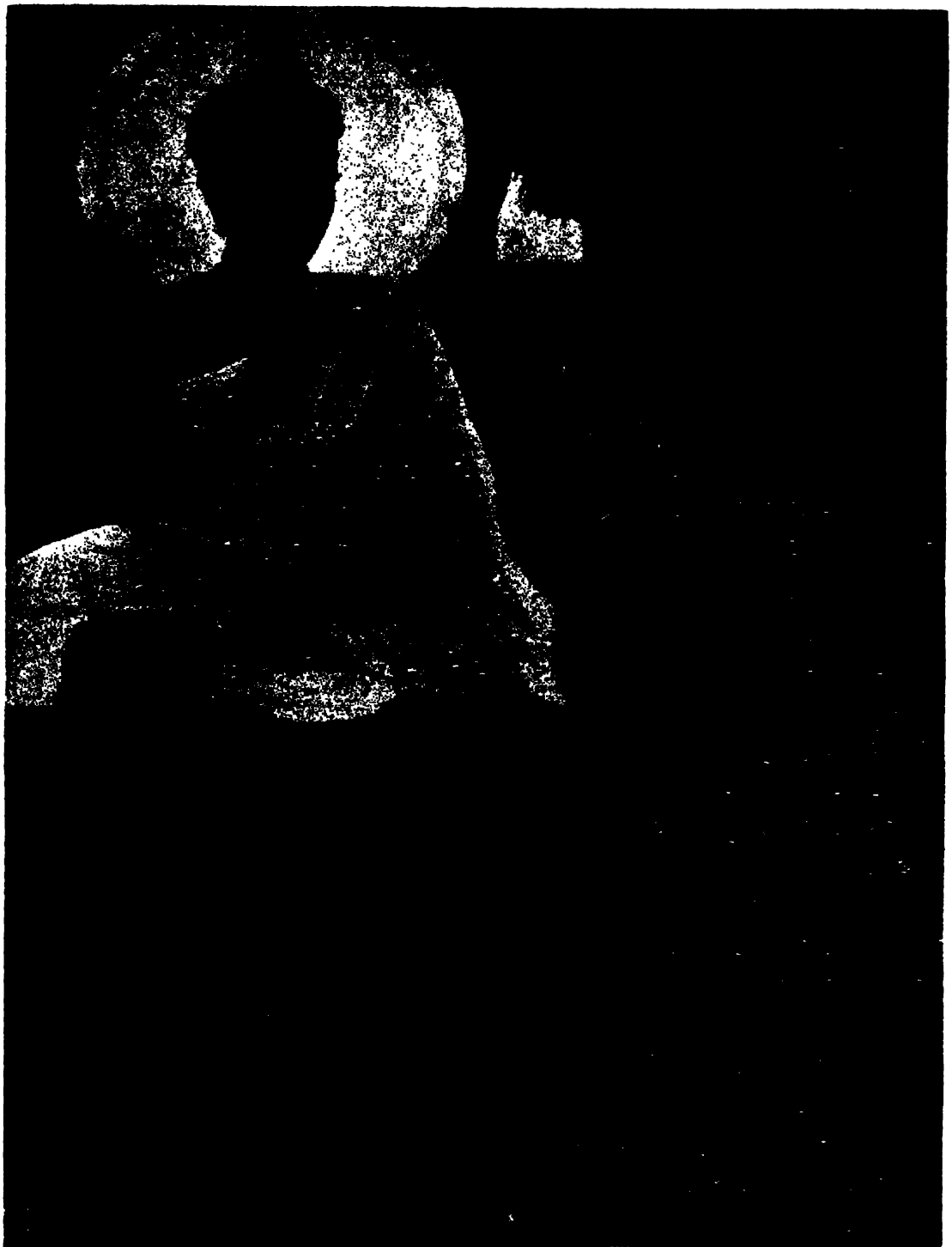
সতুকে গলায় করার আগে বংশীর দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল। চান্ করে পাড়ার উঠানে পিসিমা, খুড়ীমা বলে রব ছাড়্তে তাঁরা বলে উঠ্তেন,—'আহা! বেটা-ছেলে কি রাঁধ্তে বাড়্তে পারে? আয়! খেয়ে যাবি, আয়!' এখন রান্নার মানুষ হ'ল, সে সব আর চলে না।

সংসারে সতু কোনোদিন ছুটি লোক একত্রে পায়নি। স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তির পথে সমস্ত উদ্যম সে ছড়িয়ে চল্‌ছিল। ছু'টি বছর কতক গহনা বেচে, কতক নিজের হাতের তৈরি আনাজপত্র বেচে সে চালিয়ে দিলে। আর চলে না। সেদিন রাত্রির বেলা কাছে বসে মিনতি করে সে বল্‌লে,—

"এত রাত করে এস, ঘরের মটকার বাঁশঝাড়্টা যে ক্যাচ্ কোঁচ্ শব্দ লাগায়, ভয়ে আমার গা হিম হয়ে যায়। কাল ত উঠোনের কোণের আকন্দ গাছটা দেখে ভাব্‌লুম, সাদা কাপড় জড়িয়ে একটা মানুষ বুঝি ওৎ পেতে বসে রয়েছে। কতক্ষণ পরে চোখের ঘোর কাট্‌ল—তবে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি।"

বংশী তখন বালিশে ভর দিয়ে সুর ভাঁজ্‌ছিল,—

"দেখ পিতঃ! আজ্ঞা তব পালিয়াছি
অক্ষরে অক্ষরে। সুরঞ্জিত মম
সর্ব্ব অঙ্গ, মম মাতৃ-রক্তে। দেখ!
পার কি চিনিতে?——"

গলার ভাঁজে ভাঁজে সুরের স্পন্দন উঠে নেমে সতুর কানে যেন মধু ঢেলে দিলে। ওতে ত পেটভরার কিছুই নেই। গলার কাছে এল, বলে যে,—"পিতার আজ্ঞায় মাতৃরক্ত নাই বা নিলে? বিধাতার কাছে আদেশ মেগে স্ত্রীর বুকের রক্তটাই নাও—জুড়িয়ে তোল।" মুখে বেধে গেল। সে বল্‌লে,—"আমি যে কি বল্‌লুম, শুন্‌তে পেলে?"

বংশী বল্‌লে, "কি?"

"এইবার কিন্তু হাঁড়ি শিকের উপর উঠল। বল্‌লে কথা কানে তোল না। মেয়েমানুষ আমি, কি করে চালাই বলদিকিনি?"

বংশী তার সুরের নেশায় মসগুল হয়ে জবাব দিলে, "সে হবে-এখন একদিন। মারি ত গণ্ডার—লুটি ত ভাণ্ডার। যখন নড়ে-চড়ে বস্‌ব, লোকে বল্‌বে যে—হ্যাঁ। পরশুরামের পাটটা দিয়েছে আমায়। কেমন লাগ্‌ল?"

সতু বললে, "চান করে এসে কি কুটি, কি রাঁধি, আমি যেন আকাশ-পাতাল খুঁজে বেড়াই। ডান হাতের কাজ বন্ধ হলে যে বড় লজ্জা! ও বাড়ীর ভুলো-ঠাকুরপো চাঁড়াল-পোদের দেশে চাক্‌রী করে এক নৌকো ধান আন্‌লে। অতবড় সংসারটা একলাই ত সে চালাচ্ছে।"

বংশী দেখ্‌ত,—আজ উঠানের কোণে একখানা মাচা উঠ্‌ল—নীচে লাউ কুমড়োর চারা। দু'দিন বাদে দেখ্‌ত—গাছগুলি লতিয়ে লতিয়ে মাচাখানা ছেয়ে ফেলেছে। ফলও অনেকগুলি ঝুলছে। ঋতুমত পালম, পুঁই, শসা, শিম প্রভৃতি গাছের দ্বারা সতুর হাতের চর্চার নিদর্শন সে পেত। সংসারের সাশ্রয়ও এর দ্বারা অনেক-কিছু হচ্ছে সে বুঝ্‌তে পার্‌ত। মাঝে মাঝে উপবাস যে না যেত এমন নয়—গায়ে তেমন লাগ্‌ত না। কাজেই যা' খুঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চল্‌ছে, তার উপর অতিরিক্ত চলার কথায় সে ভেবে নিলে,—এ বুঝি তার কুড়েমিরই খবরদারী। স্ত্রী—সে তো দাসীবাঁদীরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। এ যেন তাকে ইট ছুঁড়ে মার্‌লে। সে উত্তপ্ত হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল,—

"ভুলো-ঠাকুরপো ঠাওরালি নাকি আমাকে? অত বড় পণ্ডিত? তাও আবার চোয়াড়ের দেশে? ছোট-লোকের মেয়ে কিনা?"

পিতার প্রতি এই অচিন্তনীয় আক্রমণে সতুর গলা যেন কিসে চেপে ধরল—মুখ খুল্‌ল না। সে কান্না চাপ্‌তে লাগ্‌ল।

বংশীর বিদ্যে কিছু কম ছিল না। পিতার তোষামোদের গুণে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত মধ্য-ইংরেজী পরীক্ষার একখানা সার্টিফিকেট, তিনচারখানা বাক্সে কাগজে মোড়ক করা, নেকড়ার টুক্‌রায় বাঁধা, বাক্সের সকল জিনিসপত্রের নীচে সযত্নে সংগৃহীত আছে। হয়ত গণ্ডার মার্‌তে অথবা ভাণ্ডার লুট্‌তে একদিন কাজে লাগ্‌বে।

পরদিন রান্নার কিছুই ছিল না। স্ফূর্ত্তিতে শিশ্ দিতে দিতে বংশী ঘরে ফির্‌ল। তেলের বাটিটা গামছাখানা চৌকির নিকটে ধরাই ছিল। সে চান্ করে এসে দেখ্‌লে

ঠাঁই প্রস্তুত। পাথার উপর গোটাকতক খোসা-ছাড়ানো পাকা কলা, নারকেল-কোরা আর গুড়। সতু কাছে বসে একটা ডাবের মুখ ফুটো কচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করলে,—

"ভাত রাঁধনি ?"

"না।"

"কেন ?"

মাথা নীচু করে সে বললে, "কিছুই ত ঘরে ছিল না।"

চোখের জলে ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছিল।

ডাবের জলটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বংশী বললে, "ওঃ! এইজন্যে পণ্ডিতি করার হুকুম হচ্ছিল ? গরু ঠেঙিয়ে রাখালরাজা—মন্দ কি ?"

স্বামীর সুরটা কিছু মোলায়েমগোছের হ'ল। এই অপ্রত্যাশিত মাধুর্য্যটুকু ব্যাপক করে রাখার ইচ্ছায় সতু কিছুক্ষণ কথা বললে না। কিন্তু শীতের গায়ে মসলিনের চাদর এঁটে ত বেশীক্ষণ তাজা থাকা যায় না। ভয়ে ভয়ে ফ্যালফেলে চোখে সে বললে, "তোমাকে কিছু বলতে ভয় করে, কি জানি তোমার পছন্দ হয় কিনা। ও-বাড়ীর শ্বশুর বলছিলেন, তাঁর কাছে যদি মুহুরী থাক, বেশ সুবিধে হবে। বিরাজ মল্লিক ঐ করেই ত দালান এমারত, জমি-জায়গা সবই করলে।"

বংশী বিকটস্বরে হেসে উঠল। বললে, "উকিলের মুহুরী ? তার আর কথা কি! মক্কেলের রক্ত চুষবেন মনিবে—আমি চিবুব হাড় !"

তারপর থেমে কর্কশ দৃষ্টিটার সমস্ত অগ্নি সতুর দেহের উপর সে ছড়িয়ে দিল। পরশুরামের কুঠারখানাই বা এনে বসে। সে বললে,—

"কানে কলম গুঁজে মনিবের পিছু পিছু হা—ডু—ডু ? খিড়কীর পাদাড়ে মুখ গুঁজে থাকবে যারা—তাদের আবার সদ্দারিগিরি দেখ! আচ্ছা মদ্দামেয়েলোকের পাল্লায় পড়া গেছে !"

সতু দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললে। দুই চোখের উচ্ছ্বসিত জল আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বাইরে আসতে লাগল।

বংশী আসনের উপর কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থেকে প্রশ্ন করলে,—

"ভব-কাকার কাছে যাওয়া হয়েছিল বুঝি ? কি সুপারিশ করলে তাঁর কাছে ? এই দেখি ঘরের খবর পাড়ায় দিতে লজ্জা পাও ?"

সতুর মুখে কথা ফুটল না। জিহ্বাটা যেন খল সর্পে চক্রাকারে পেঁচিয়ে ধরেছে।

২

অকূল ভাবনার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে, চোখদুটি রাঙিয়ে সতু যখন বিছানা ছেড়ে উঠল, তখন কাক ডাকেনি। আকাশ নক্ষত্রে ভরা। স্বামীর তিরস্কারের লজ্জাটা তখনও ঘিরে রেখেছে। আকাশের শেষ তারাটি যে পর্য্যন্ত না ডুবে গেল, সে পর্য্যন্ত দাওয়ার উপর পা ছড়িয়ে সেইদিকে চেয়ে সে বসে রইল। শুধু খাওয়া আর পরাই ত নারীজীবনের সমস্ত সাধ আর বাসনা নয়। সে কি আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে মরীচিকারই পিছু পিছু ছুটে চলল ? বংশী যদি কোনোদিন আদর করে তাকে দুই হাতে সমীপ-বর্ত্তী করে টেনে নিত, দুঃখকষ্টের ভিতর সকল কামনাই যে তার সার্থক হ'ত। যাক্ গে—সে আদর সোহাগ হয়ত বীজমন্ত্রেরই মত। কোনকালে কারও কাছে ফাঁস হবার নয়। কিন্তু গুরু লঘু বিচার নেই, গালিগালাজ করতে এমন বেহুঁস হলে কি করে বা টেঁকা যায় ? সতুর মন সঙ্কোচে গুটিয়ে যেতে লাগল।

যতই হোক্ স্বামীকে এরা যেন কেমন এক চোখে দেখে। দেবতায় যেমন কোলের ছেলে একটি একটি করে কেড়ে নিলেও, বাপ-মা সেই নিষ্ঠুর দেবতারই আরাধনা করে—সেই রকম। শত সহস্র নির্যাতনেও এদের চিত্তের সে কেন্দ্রগত ঝোঁক কাটে না। বেলা যত বাড়ছিল, সতুর মনও তত চঞ্চল হয়ে উঠছিল। এই নির্ভাবনার লোকটির ভাবনা সে ছাড়া আর কে বা ভাববার আছে ? নিকটে কোনও বাড়ীই আর বাদ নেই। দু'এক খুঁচি চাল সকল ঘরে ধার হয়েছে। তবুও আঁচল পাতবার জন্য পা বাড়িয়ে সে আবার গুটিয়ে নিলে। কি জানি কেউ যদি তাকে হীনতার নিম্নতম বাণী শুনিয়ে দেয়। সে

দাওয়ার উপর এসে স্তব্ধ হয়ে মুখে আঙুল ঠেকিয়ে বসে রইল।

বংশী এসে দেখলে, সতু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চোখের জল ফেল্‌ছে। জিজ্ঞাসা কর্‌লে,

"রান্না হয়নি?"

ঘরের মটকায় যে বাঁশগুলো রাত্রিকালে ভীতিজনক শব্দে ত্রাসিত কর্‌ত, সেগুলি সতু একে একে বিক্রী করে ফেলেছে। গাছের নারকেল এবার ভাবেই ফর্‌সা। কাগজি লেবুগুলো বড় হ'তে পায়নি। তা' ছাড়া—লাউয়ের মাচায় লাউ নেই—কুমড়োর মাচায় কুমড়ো নেই। গয়লাবৌ এ সকল বিক্রী করে সওদাপত্র জুগিয়েছে। এই করেই কষ্টে সংসার চল্‌ছিল। বংশীর কি এ সকল খোঁজ রাখার অবসর ছিল? সে শুধু এক একবার চেয়ে দেখত, মটকাটা খোলসা হয়ে ঘরখানা বেশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। নারকেলের ছোবড়া সারা উঠানে ছড়ানো—পা ফেলা দায়। রান্নাঘরের কোণটা কুপিয়ে ঢেলাভাঙা—বোধ করি কোন কিছুর বীজ পড়বে। এই পর্য্যন্ত।

সতুকে নিরুত্তর থাক্‌তে দেখে বংশী গায়ের গেঞ্জিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। তেলের বোতলটা নাড়াচাড়া করে রুক্ষ মাথায় সে চান্ কর্‌তে গেল।

স্নান সেরে এসে চুল পাট কর্‌তে কর্‌তে সে বল্‌লে, "কি আছে দাও। লোকে কজ্জপাতি করেও দুটোদিন চালায়। এক খুঁচি চালও কি মেলেনি পাড়ায়?"

এ পরিশোধ কি করে হবে, অত বেলায় আর ক্ষুধার সময় সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল না। বংশী বল্‌লে, "নেয়ে এসে বসে থাকা যায় নাকি? মাথামুণ্ডু কিছুই কি নেই ঘরে?"

সতু ঘরের মধ্যে উঠে গেল। ভব-কাকাদের বাড়ীর সত্যনারাণের সিন্নির গত কালকার কয়েকখানা বাতাসা ছিল। রেকাবীতে সাজিয়ে এক গ্লাস জল এনে দিল। বংশী অগ্নিশর্ম্মা হয়ে রেকাবীখানা উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

সরলা বালিকার ডাগর চক্ষু দুটি নিষ্পলক হয়ে গেল। সভয়ে উচ্চারণ করলে, "সিন্নির বাতাসা যে!"

বংশী সে কথায় কর্ণপাত না করে বল্‌লে, "গাছের দুটো নারকেলও ত বিক্রী করান যায়?"

দারিদ্র্যের কদর্য্য বীভৎসতা ঝুঁকে পড়েছে। আর রেখে ঢেকে চলা অসম্ভব। কাজেই এ সকল নিয়ে—কথা-কাটাকাটি করে প্রতিনিয়ত অপমানিত হবার ইচ্ছা সতুর আর ছিল না। তবু সে বল্‌লে,—

"নারকেল আর কতকাল থাক্‌বে? চালাচ্ছি ত ঐ সব দিয়ে। ঘোপে-ঘাপে যদি বা থাকে, আমি কি খোঁজ কর্‌তে পারি? না, বউ মানুষ রোজ রোজ লোক ডাকাডাকি করা পেরে উঠি?"

বংশী গম্ভীরভাবে একবার নড়াচড়া করে উঠল। বল্‌লে, "ভব-কাকার কাছে সুপারিশ কর্‌তে যেতে দেখি মরদের সেরা—আর এই সময় ঘোমটা খুলে পড়ে?"

সতু জবাব দিল না।

বংশী বাসিমুখে বের হয়ে গেল।

বিকালে গয়লাবৌয়ের নিকট সে শুনলে, তাদের বাড়ীতে শাঁসেজলে গুটিতিনেক নারকেল উদরস্থ করে বংশী আবগারীর বৈঠকে রং খেল্‌তে বসে গেছে। সতুর মুখে তখনও জলবিন্দু পড়েনি।

সেদিন সকালে ঘাট সেরে এসে সে দেখলে ঘরের পশ্চিম দিক্‌কার বারান্দার কপাট-জোড়া বিক্রয় করার জন্য গ্রামের দীনু চাঁড়ালের সঙ্গে স্বামী দরদস্তুর কর্‌ছেন। স্বামীকে আড়ালে ডেকে সে করস্পর্শ কর্‌লে। চেতনা জাগ্রত ক'রে এমন কোমল—এমন করুণ স্পর্শ সে। একটু হাস্‌লেও—চাঁদের ম্লান হাসির মত। বল্‌লে,—

"বাক্স ঘেঁটে-ঘুঁটে কানের দু'খানা ফুল পেয়েছি—ছোটবেলাকার। গয়লাবৌ বেচে পাঁচটা টাকা এনে দিয়েছে। দু'পাঁচ দিন বেশ চল্‌বে। এমনি লোকে কত কি বলে। বাড়ীখানা আর হতশ্রী করো না। ঘরের খড়কুটো একটা একটা করে বেচলেও ত বেশী দিন যাবে না। তারপর ত ভাবতে হবে? সেই ভাবনাটা এখন ভাব না?"

পর পর দু' দিনের অনাহারে বংশীর পেটের গর্ত্তটার আকার ঠিক ছিল না। এনাতুল্যার পাঠশালায় ভূচিত্রে সে দেখেছে, পৃথিবীটা আর কতটুকুনই বা? গোটাটা

বোধ হয়—এক ঢোঁকে গিলে ফেলা যায়। সেই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার আশু শান্তি হবার উপায় হ'ল দেখে বংশী একটু মুচকে হাসলে। মাঝে মাঝে একগুঁয়েমি করে হাঁড়ি চড়ায় না - তা হোক, মেয়েটির বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল। সম্মুখের যৌবনপ্রভাদীপ্ত চোখের দিকে চেয়ে চিত্ত বুঝি কিছু তৃষিত হয়ে উঠল। কিন্তু বাহুবন্ধনে টেনে নিলে না। পত্নীর প্রতি সকরুণ স্নেহ তখনও কি সময়ের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে বসে রইল? কে জানে? দীনুকে বিদায় দিয়ে মৃদুস্বরে গান ভাঁজতে ভাঁজতে বিজয়ী বীরের মত সে ঘরের বার হয়ে গেল।

৩

কালীঘাটে কর্পোরেশ'নর অধীনে এক বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর পদ পেয়ে সতু কল্‌কাতায় চলে এল। বংশীকেও সে সঙ্গে এনেছে। সতু এতদিনে নিঃসংশয়ে বুঝেছে, চান্ করে ডাঙায় পা দিতেই ওকে ক্ষুধায় ধরে। অথচ খাদ্য কোন্ পথে কি সূত্রে ঘরে আসে খোঁজ করা কয়কোষ্ঠীতে লেখেনি। তখন সংসারের ভার সে নিজেই বহন করতে পারে কিনা ভেবে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। এই সময় তার বাল্যসঙ্গিনী রমা স্কুল পরিদর্শন কর্‌তে তাদের গ্রামে এল। রমা এখন মেয়ে স্কুলের একজন পরিদর্শিকা।

রমার সঙ্গে সতুর অনেক কথা হ'ল। তারপর রমা-ই খরচপত্র দিয়ে এদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে সঙ্গে করে কল্‌কাতায় নিয়ে এল। রমার তদ্বিরে সতু প্রথমেই কাজ পেলে। তারপর ছ'মাস পরে ট্রেনিং পরীক্ষায় পাস করে কর্তৃপক্ষের মুখ বন্ধ করে দিলে।

কল্‌কাতা সহরের একটা মোহ আছে। দেখার জন্য বংশী কয়েকবার পোঁটলা-পুঁটুলি বেঁধেছে। খরচপত্রের অভাবে ঘটে ওঠেনি। তাই সে আপত্তি করল না। কিন্তু সেখানে পৌঁছে যখন দেখ্‌লে, সতু এসেই সরকারী বিদ্যালয়ের একখানা চেয়ার দখল করে বস্‌ল, তখন তার মনে ধিক্কার এল। স্ত্রীর অন্নদাস করে রাখারই ফন্দী এ সব। রমার এবং সেই সঙ্গে সতুর উপরে সে হাড়ে হাড়ে চটে গেল।

কিন্তু দিন তবু বেশ কেটে যাচ্ছে। একটু সতর্কভাবে চল্‌লে সুদূর পল্লীগ্রামে এ ঘৃণিত কলঙ্কটা বন্ধুমহলে প্রচার না হতেও পারে। কি আজগুবি সহর এ! রাস্তাঘাটে পা দিতেই বিস্ময় আর পুলক। সেই আনন্দে সমস্ত গ্লানিটা সে হজম করে ফেল্‌লে।

কল্‌কাতা সহর—থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড়, ফুটবল—এইসব ষড়যন্ত্রকারীরা মিলে বংশীর হাতের মাত্রা বাড়িয়ে তুল্‌লে। তা'ছাড়া কালীঘাট আর কল্‌কাতা ছুটোছুটির গাড়ীর খরচও আছে। এই খরচপত্র নিয়ে সতুর সঙ্গে সে তর্কই করে—মীমাংসা করে না। সতু দেখ্‌লে, একটা কিছু বাড়্‌তি আয়ের পথ না কর্‌লে আর উপায় নেই।

ভাতের খরচটা বংশীর হাত দিয়ে হত। বংশী কোনো কোনো দিন সেগুলো রং তামাসায় ঝেড়েঝুড়ে দিয়ে মুক্তি-স্নান করে ঘরে ফির্‌ত। এই রকমে সতুর স্কন্ধে অকারণে ঋণ এসে চেপে পড়তে লাগল।

সেদিন রবিবার। স্কুল নেই। ঘরের মেঝেটায় সতরঞ্চির উপর সতু ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠানে জলের কলটা খোলাই ছিল। বুঝি জল এল। ছর্ ছর্ শব্দ হচ্ছে। সতুর কানে অল্প অল্প ঢুক্‌ছে। অথচ সে তেমন সচেতনও নয়। এমন সময় সে অনুভব কর্‌লে, কে যেন তার আঁচলটা নিয়ে মাছের মত টোপ্ গিলছে। ধড়মড় করে চেয়ে দেখ্‌লে—বংশী। চাবির তাড়াটা তখন মুক্তি পেয়ে বংশীর হাতের মধ্যে গুটিশুটি মেরে মাথা লুকুচ্ছে। সতু হেসে বল্‌লে,—

"কি কর্‌বে চাবি নিয়ে? বাড়ীভাড়া—তোমার জামা-কাপড়ের দোকানের দেনা—বিড়ীওয়ালা এসেছিল, তার দোকানের পাঁচ টাকা—সবই পরিশোধ করে দিয়েছি। বাক্সে আর কিছু নেই।"

বংশী বুঝলে এ ওর শয়তানী, স্বামীর হাত-খরচ সস্তা করার ফন্দী। রমা না ক্ষেমা তারই হাতে হয়ত ও সঞ্চয়ের গোপন-বাক্স তৈরি করেছে। চাবির তাড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বল্‌লে—

"ঘুরে ফিরে আমারই খরচের ফর্দ্দটা শুনব বলে আমি আসিনি। তিনটে টাকার আমার এখুনি দরকার।"

সতু বল্‌লে, "টাকা ত নেই। পঁয়ত্রিশটে টাকা পাই। খরচের হিসেব ত তুমি জান।" কিছুক্ষণ পরে সে বল্‌লে, "খোলার ঘরে মাথা রেখেছি, তবু ত টানাটানি যায় না। তুমি বরঞ্চ একটা পানতামাকের দোকান কর। অল্প টাকায় লাভ মন্দ হয় না। পুঁজির টাকাটা আমি কর্জ্জপাতি করে এনে দিতে পারি। ঠিকও করে রেখেছি। বেশী টাকা লোকে আর কি দেখে দেবে?"

বাড়ী থাক্‌তেও সতু অনেকবার স্বামীকে সচেতন করে দিয়েছে। সে তেমন বেঁধেনি, আজ যেমন রক্তমাংস ভেদ করে হাড় পর্য্যন্ত ফুটে গেল। চারপায়ার উপর বসে সে যেন এই অতিকায় হুকুম জারি কর্‌লে। আর স্পষ্ট করে খুলে বলে দিলে,—সবাই কিছু কিছু ঘরে আন, নইলে এমন করে পরের টাকার নীচে মাথা গুঁজে থাকা আর চলবে না। বংশীর ইচ্ছা হ'ল, ঘরের চালের খোলাগুলো আর দেওয়ালের ইঁটগুলো এক একখানা করে টেনে টেনে খসিয়ে ফেলে। বল্‌লে,—

"বিবি ফির্‌বেন সেমিজ ঢুলিয়ে—আর এ হতভাগার বরাদ্দে তামাক টিকের কষ-কালি? বেল্লিক মেয়েলোক কোথাকার। বড্ড বেড়ে চলেছ। আচ্ছা?—"

এই বলে আলনার উপর থেকে জামাটা টেনে নিয়ে সে জোরে জোরে গায়ে পর্‌তে লাগ্‌ল। তারপর বিকৃত-মুখে ঘরের বার হয়ে গেল।

পক্ষকাল অতীত হ'ল, বংশী ঘরে ফিরে এল না। কোথায় গেল—কে উদ্দেশ করে দেয়? সতু অন্নজল ত্যাগ করে বস্‌ল। নিজেদেরই হিতকথা এমন নির্ম্মম নীতির মধ্য দিয়েও লোকে গ্রহণ করে? স্বামীর মঙ্গলের জন্য কিনা কর্‌তে পার্‌ত সে? তার অন্তরে যে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, আনন্দ ভালবাসা রাশীকৃত হয়ে জমে ছিল—সে কি বিদুরের খুদকুঁড়ো? সতু শয্যার উপর লুটিয়ে পড়ে 'হাউ হাউ' করে কেঁদে ফেল্‌লে।

সে যাদের ভাড়াটিয়া সেই ঘরের গৃহিণী পার্ব্বতী গোড়া থেকে এদের স্বামী-স্ত্রীর অনৈক্য লক্ষ্য করে আস্‌ছিল। বিশেষ বংশী যে একটি অবলার পরিশ্রমের অর্থ ফূর্ত্তি করে ফুঁকে দেয়, সে খবরও সে রাখ্‌ত। সে এসে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে,—

"মা! যেমন লক্ষ্মীমেয়ে তুমি, সোয়ামী তেমন পাওনি। তোমার অদেষ্ট কি কখনও মন্দ হতে পারে? তুমি কেঁদ না বাছা! এ কল্‌কাতা সহর। কেউ ওঁর জন্যে গরম গরম লুচি ভেজে রাখেনি যে, শিকড় মেলে সেখানকার মাটি চুষে চুষে খাবেন। তবে হ্যাঁ—সোয়ামীর মতিগতি কিসে ফেরে সেটা তোমাকেই দেখ্‌তে হবে। আমি একটা প্রক্রিয়ে বলে দিচ্ছি, করে দ্যাখো, যদি না ফলে আমার নাম পার্ব্বতী নয়।"

সতু চোখের জল মুছে ধীরে ধীরে উঠে বস্‌ল এবং জিজ্ঞাসু নেত্রে ব্যগ্রভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। পার্ব্বতী বল্‌লে,—

"দ্বাদশটা বেলের পাতায় বুকের রক্ত দিয়ে শিব-দুর্গার নাম লিকে, আর মনে মনে তোমার আকিঞ্চে জানিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে এস। দেখো, আমার কথা খাটে কিনা! যেখানে থাকুক তের পক্ষির মধ্যে এসে হাজির হবে সে।

সতুর আপত্তি ছিল না। অনাহারে অনিদ্রায়—দ্বাদশটি পাতায় নাম লিখার মত রক্ত বুকে আছে কিনা সে বসে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। আর বিধাতার কাছে জানিত অজানিত সকল অপরাধের মাপ চেয়ে একটা অক্ষরেরও অঙ্গহানি না হয়, এমন একটু রক্ত বুকের স্তরে স্তরে খুঁচিয়ে পাবার জন্য সে প্রার্থনা জানাতে লাগ্‌ল।

৪

বংশী আড্ডাবাজ লোক। কলিকাতায় এসেও সঙ্গী জুটতে বাধা হয়নি। সতুকে আঘাত দিয়ে বসিয়ে দেবার রাগত ইচ্ছায় রাজপথে উঠেই সৃষ্টিটার অ-রুণ চাহনি দেখে সে চম্‌কে গেল। সঙ্গীদের সাথে দেখা হলে সবাই জিজ্ঞাসা করে,—কি হে! গড়ের মাঠ—না, আনন্দমঠ? ষ্টারে যাবি নাকি আজ? মোহন-বাগানের খেলাটা বেশ সরগরমের ছিল কিন্তু। এই সব। কোলে আর কেউ টেনে নেয় না। এই রকমে গাছতলায় শুয়ে আর বায়ু খেয়ে গোটা দুই দিন কাট্‌ল। শরীর হীন হয়ে এল। ধূলোর উপরেও পায়ের দাগ

বসে না। ময়দানের এক গাছতলায় সবুজ ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে চোখে সে কত কি দেখ্ছিল। সারা পৃথিবীতে কেবল একটি মাত্র মানুষই যেন প্রাণের দরদে তার জন্যে খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে জানালার ফাঁকে মুখ দিয়ে বসে থাকত। সে যেন কোন্ অতীত কালে—সে যেন কোন্ অতীত যুগে। তার পর যেন সহস্র সহস্র বৎসর গেল, আর বুঝি সেদিনের নাগাল ধরা যায় না। গোপনে একটা নিঃশ্বাস সে টেনে নিলে। এই সময় কাপ্তেন-গোছের একটা ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। সে বল্লে,—

"বংশী যে! ঘাসের শয্যা করেছিস্—শ্রাদ্ধতর্পণ কর্‌বি নাকি? বাপ-মার ত বালাই নেই। মুখখানা যা দেখাচ্ছে—যেন ঘাটের মড়া। পুলিশের চোখে পড়ে গেলে বড় সুবিধের হবে না। নে—নে—ওঠ। অনেকটা পথ হেঁটেছিস্ বুঝি? চল, আর সময় নেই। ষ্টারে আজ চারি, সুরী, বসন্ত, আশ্চর্য্য—চতুর্দ্দশ রথী।"

বংশী বিশুষ্কমুখে বল্লে, "তুই যা, আমার পয়সা নেই।"

হরিশ হেসে বললে, "গভীর জলের মাছ তুই। আমারই ঘাড়টা মট্‌কাবি সেই মতলব। শুধু একখানা টিকিট কেটে দিলেই হবে ত? না, চা-চপের দোকান দেখ্‌লে আবার উস্‌খুস্ লাগাবি?"

এদের কাছে বংশীর লজ্জা সরম ছিল না। এখন আবার এই আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে পেটের ভিতর দানবের নৃত্য চলেছে। নাড়ীভুঁড়িগুলো টেনে নিতে যা বাকী। বংশী তার হাত দুখানা কাছে টেনে নিয়ে বল্লে—

"টিকিটের ভাবনা পরে ভাবিস্। পেটটা ঠাণ্ডা আগে কর্। নইলে এক পাও নড়াতে পার্‌বিনে।"

হরিশের চোখের ঘোরটা এতক্ষণে কেটে গেল। বললে, "তাই ত! সারাদিন খাস্‌নি—সেই লক্ষণই ত! মাষ্টার মানুষের স্বামী—কথার তোড় সাম্‌লাতে পারিস্‌নি বুঝি? আরে হতভাগা! আচ্ছা, দাঁড়া—"

এই বলে একটা দোকান থেকে এক ঠোঙা খাবার এনে বললে, "শীগ্‌গীর গিলে নে। সময় হয়ে এল। শনিবারের পাল্লা বাবা! বড্ড ভিড় হবে।"

থিয়েটার দেখে যখন এরা পথে উঠল, বংশী বল্লে, "তোর ওখানে শোবার ঠাঁই হবে? গাছতলায়ও থাকা যায়। তুই কাছে কাছে থাক্‌লে যেন ভরসা থাকে।"

হরিশ বল্লে, "দমদমা পর্য্যন্ত যাবি? তা' চল্। এত রেতে যেয়ে যদি মান ভাঙ্‌তে না পারিস্, বাইরের চাতালে হয়ত আবার মশার খোরাক হয়ে পড়্‌বি। কাল দিনের বেলা যেয়ে ধীরে-সুস্থে চরণ ভিক্ষে করিস্। সেই ভাল।"

সেই থেকে সে হরিশের আশ্রয়ে। নড়া-চড়ার লক্ষণ দেখা যায় না। খায়—বাইরের ঘরের ফরাশের উপর ঘুমোয়—আর মাঝে মাঝে হরিশের সঙ্গে কল্‌কাতায় এসে মজা লুটে যায়। একদিন হরিশের মা ছেলেকে ডেকে বল্লেন,—

"দিবারাত্তির তাকিয়া ঠেস দিয়ে পান চিবোয় আর সিগারেট ফোঁকে এ হাড়হাবাতে ছেলেটা কোথা থেকে এনে জুটুলি রে? বাড়ীঘর নেই নাকি এর? পরের বাড়ীতে লোকে এতদিনও পড়ে থাকে?"

বংশীর কানে কথাটা যেতেই মুখের সিগারেটটা ফরাশের উপর পড়ে গিয়ে চাদরটা বৃত্তাকারে জলে উঠ্‌ল। সে হাত দিয়ে চেপে, ডলে, নিবিয়ে কিছুক্ষণ সেইখানে ভূতের মত বসে রইল।

নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে বংশীর বুকের স্পন্দন তখন সতুর প্রতি এক অভিনব রসাস্বাদে জেগে উঠ্‌ছিল। হরিশের মায়ের বক্রোক্তিতে সেটা আরও অধিক উর্ব্বরা হ'ল। হায়! হায়! এমন সতী ললনার সঙ্গীহীন প্রাণের সঙ্গলালসা প্রতিপদে সে ব্যর্থ করে এসেছে। দেহমনের আশ্রয়ী শক্তি স্বামীর কল্যাণে ঢেলে দিতে যৌবনের লালসায় যে জয়া আন্‌লে তার বন্ধনগ্রন্থি ত একটুও শিথিল ছিল না। সে কেন নদীর মত নিম্নগামী হয়ে পুণ্যস্রোতে বুকের দাহ তার জুড়িয়ে দিতে পার্‌লে না?

বংশী যেন অন্যের দ্বারা চালিত হয়ে ভূতগ্রস্তের মত ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হল। টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠে বসে দেখ্‌লে, ফেরিওয়ালা ঠেলাগাড়ীতে করে নানা রকমের মনোহারী দ্রব্য হেঁকে বেড়াচ্ছে। হরিশের নিকটে

সেদিন ধার করে ফড়্ খেলে সে পাঁচটি টাকা অর্জ্জন করেছিল। সতুকে সে ত কোনদিন একটা লোহার কাঁটা পর্য্যন্ত কিনে দেয়নি। শিশি দুই গন্ধতেল, দু'বাক্স সাবান, কিছু জরির ফিতে, এই সকল কিনেও পকেট হাত্ড়ে সে দেখ্‌লে, চারগণ্ডা পয়সা অবশিষ্ট আছে। তার অন্তরে তখন এমন একটা করুণ ব্যথার খেলা চল্‌ছিল যে, এই অবশিষ্ট পয়সা ক'টিও সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌তে দুঃসহ বোঝার ভারে সে যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল। সে ঐ পয়সায় একশিশি তরল আল্‌তা কিনে ফেল্‌লে। ইহার কতক পকেটে, কতক হাতে করে রেখে আর পুনঃ পুনঃ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সে এক অননুভূত তৃপ্তিলাভ কর্‌তে লাগ্‌ল।

কালীঘাটে এসে বাসার দিকে সে এক রকম ছুটেই চলল। পার্ব্বতীর প্রক্রিয়ার গুণে এমনটি হ'ল কিনা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু দরজার গোড়ায় পা দিতেই সে দেখলে, পার্ব্বতী তাদের ঘরে বসে। সতুর বুকের কাপড় খোলা। বসুধারার মত রক্তের কয়েকটি ধারায় বুকের মাঝখানটায় স্রোত বেয়ে চলেছে। সেই রক্তে গভীর মনোযোগের সহিত তুলি দিয়ে বিল্বপত্রে সে কি লিখছে। সতুর লক্ষ্য পড়ে নাই। পার্ব্বতী চেয়ে দেখ্‌ল। বংশী তখন ঘরের মধ্যে এসে উঠে দাঁড়িয়েছে। পার্ব্বতী বললে,—

"দেখ মা, আমার কথা ফলে গেল কিনা? তোমার জন্যে ত বাবু না খেয়ে না নয়ে হাড়টিসার হয়ে গেছে, বুকে কি আর রক্ত আছে? কিন্তু কি গুণ দেখ! বেলপাতায় শিবদুর্গার নাম লিখে সোয়ামীকে কাছে পেল কিনা? গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবারও অপিক্কে রাখলে না, এমনি জোরবন্ত চীজ গো!"

ভয়ে ও উদ্বেগে বংশীর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কত কত দিনের অপরাধ মাসপঞ্জীর মত একত্রে এক পৃষ্ঠায় জড় হয়ে মেঝের উপর অক্ষরগুলো কিলবিল কর্‌ছে সে দেখতে পেলে।

বংশীর দেহ তখন কাঁপছিল। হাত থেকে আলতার শিশিটা পড়ে, ভেঙে ছিটকে সতুর অঙ্গের বস্ত্রখানা মাখাজোকা করে দিলে। তুচ্ছ ফিতে আর আলতার আভরণের মধ্যে মিলনের প্রতিশ্রুতি সার্থকতায় কতটা জেগে রয়েছে, সে কথা সে করুণ চোখদুটো দিয়েও প্রকাশ কর্‌তে পার্‌লে না। কিন্তু বুকের রক্তের প্রতিদানে স্বামীর আনীত এই সামান্য আল্‌তাটুকু কাপড় ছেড়ে সতুর অন্তরে তখন স্নেহের ছটায় রঙীন হয়ে উঠেছে।

স্বপ্ন-ভঙ্গ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জীবন কি এমনি সে যাবে চিরদিন
প্রতি উষা দেখে যাবে নূতন সঙ্কল্পে
ধনী মোরে, প্রতি সন্ধ্যা সাক্ষ্য দেবে অল্পে
অবসিত তাহা, নিত্য অকৃতিত্বে দীন?
না-করার গ্লানি হতে কে আমায় ওরে,
করিবে উদ্ধার? কত সম্ভাবনা, তার
কোন নিদর্শন আজ মেলে না ক আর!
সম্মুখে চলিতে—কিসে পিছে রাখে ধ'রে।

স্বপ্ন ভেঙে যায়, দারুণ পেষণ সম
বিষম উদ্বেগ রেখে যায় বক্ষে মম।
কি হতে পারিত, আর হয় নাই হায়
কতখানি? শুধু কল্পনায় গড়া-ভাঙা
তবুও হৃদয় রক্তে হয়ে ওঠে রাঙা।
হৃত যাহা, আর তাহা পাওয়া নাহি যায়।

কলাবিদ্যা

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের নিজের মনের সঙ্গে তার নিজের তৈরি কলের সাংঘাতিক লড়াই বেধে গেচে। মানুষের ব্যবহার্য্য দ্রব্যে তার মনের স্বাক্ষর কোথাও আর দেখবার জো নেই, সর্ব্বত্রই কলের ছাপ। এই কলের সন্ততিগণের মধ্যে কোথাও আর রূপভেদ নেই। সুলভতা এবং সুবিধার প্রলোভনে মানুষ এ স্বীকার ক'রে নিয়েচে—সেই প্রলোভনে মানুষ নিজের মনের কর্ত্তৃত্বকে নিজের সৃষ্টিশক্তিকে অস্বীকার করচে।...পরদেহজীবী পরাশ্রিত (parasite) জীব যেমন স্বাধীন উদ্যমশক্তি হারায়, কলাশ্রিত মানুষ তেমনি মনের রুচিস্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে, তার নিত্যব্যবহারের সামগ্রীতে তার আপন সৌন্দর্য্যবোধকে প্রয়োগ করবার স্বাভাবিক উদ্যম নির্জ্জীব অলস হ'য়ে যাচ্ছে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার সেই রুচিস্বাতন্ত্র্যনাশক মরু হাওয়া ভারতবর্ষীয় শিল্পগুলিকে সবই প্রায় নষ্ট করেচে। বহু যুগের অভ্যাসে যে নৈপুণ্য উৎকর্ষলাভ করে, একবার নষ্ট হ'লে ফরমাস দিয়ে মূল্য দিয়ে যে নৈপুণ্যকে আর ফিরে পাবার রাস্তা নেই, মানুষের সেই দুর্লভ সামগ্রী আমরা প্রায় হারিয়ে বসেচি।...

যা হ'ক, যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কলের কাছে মানুষের রুচির পরাভব সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ঘটচে সেখানে ভারতবর্ষ নিষ্কৃতি পাবে এমন আশা করি নে। যেখানে পণ্যের হাট সেখানে বাণিজ্যলক্ষ্মীর হাতে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর, কলের হাতে কলার অপমান বর্ত্তমান যুগের ললাটে লেখা আছে।

মানুষ আপন অন্তরতম ইচ্ছাকে ভালবাসাকে শুধু কেবল আপন ব্যবহারের দ্রব্যের মধ্যেই প্রকাশ করে তা নয়, তার সঙ্গীত, তার চিত্রকলা এই প্রকাশের প্রধান বাহন। এর দ্বারাই দেশ আপন অন্তরের আবেগকে বাহিরে রূপ দান করে এবং তাকে চিরন্তন ক'রে উত্তরকালের হাতে সমর্পণ ক'রে যায়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন একটা জিনিষ জাতিবিশেষে যার তারতম্য আছে কিন্তু প্রকারভেদ নেই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান।... অতএব বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিচ্ছে তা সর্ব্বত্র এক হবেই।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকবেই; আর থাকাই শ্রেয়। এ কে নষ্ট করা আত্মহত্যা করারই সামিল। এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যেই ঘটে। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যা-দানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোনো স্থান নেই। স্থান থাকার যে গুরুতর প্রয়োজন আছে সে বোধ পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত লোকের মন হ'তে চ'লে গেচে।

এর প্রধান কারণ, আমাদের দেশের বিদ্যা অভাবের অনুচর। ইংরেজি শিখলে চাকরী হবে বা রাজসম্মানের সুযোগ ঘটবে, দরিদ্রের এই মনোরথ আমাদের দেশের বিদ্যাকে চালনা করচে।

ইংরেজ ত তারা ভূগোল ইতিহাস গণিত বিজ্ঞান সবই শিখচে আর তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চিত্রকলা ও অন্যান্য সকল কলাবিদ্যাই শিখচে। এই সকল ললিতকলা শিক্ষা দ্বারা তার পৌরুষ খর্ব্ব হচ্চে এমন প্রমাণ হয় না। সঙ্গীতনিপুণ ব'লে জার্ম্মানজাতি অস্ত্রচালনায় অলস বা বিজ্ঞানচর্চ্চায় পিছপাও, একথা কে বলবে? বস্তুত আনন্দ প্রকাশ জীবনী-শক্তির প্রবলতারই প্রকাশ।...

আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে এই যে দারিদ্র্য তার লক্ষণ ও ফল আমাদের শান্তিনিকেতনের বালকদের মধ্যেও দেখতে পাই। এখানকার বিদ্যালয়ে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শেখাবার ভাল ব্যবস্থাই আছে। ছেলেদের অনেকেরই গান গাইবার, ছবি আঁকবার স্বাভাবিক শক্তি থাকে। যতদিন তারা নীচের ক্লাসে পড়ে ততদিন তাদের গান গাওয়া বা ছবি আঁকা শেখানো শক্ত হয় না, এতে তারা আনন্দই বোধ করে। কিন্তু উপরের ক্লাসে উঠবামাত্র আমাদের দেশের শিক্ষার লক্ষ্য তারা বুঝতে পারে, তার অন্তর্নিহিত দীনতা তাদের আক্রমণ করে।...

বাল্যকাল হ'তেই আমাদের ভদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা এইরূপে কলাবিদ্যার সংস্রব হ'তে দূরে থাকেন। এতে দেশের যে কত বড় ক্ষতি হচ্চে তা অনুভব করবার শক্তি পর্য্যন্ত তাঁরা হারিয়ে ফেলেন। কিছুদিন হ'তে য়ুরোপের চিত্রকলার নকল ছেড়ে দিয়ে আমাদের দেশের একদল চিত্রকর ভারতীয় চিত্রকলার অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হয়েচেন।

আর সঙ্গীতের দুর্গতির কথা একবার ভেবে দেখা যাক্। কন্সর্ট ব'লে যে কাংস্য-ক্রেঙ্কার-বহুল অত্যাচারকে আমরা পাড়ায় পাড়ায় সঙ্গীত ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েচি তার মত বর্ব্বরতা আর কিছুই নেই। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ এতে ত নেইই, তার পরে একে যদি আমরা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের নকল ব'লে কল্পনা করি তবে সেও একটা অতি অন্যায় লাইবেল। বিবাহসভায় ও শোভাযাত্রায় ব্যাণ্ডের সঙ্গে শানাইয়ের ধাক্কা লাগিয়ে দিয়ে সঙ্গীতের যে মহামারী ব্যাপার বাধিয়ে দেওয়াকে উৎসবের অঙ্গ ব'লে আমরা মনে করি সে কি কোনোমতেই সম্ভবপর হ'ত যদি সঙ্গীতকলার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র দরদ থাকত?

দেশের উদ্বোধনের কথা আমরা আজকাল সর্ব্বদাই ব'লে থাকি। মনে করি সেই উদ্বোধন কেবল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনসভায়। অর্থাৎ কেবল অভাবের ক্রন্দনে, দরিদ্রের প্রার্থনায়। এই আমাদের মজ্জাগত ভিক্ষুকতায় আমরা ভুলে গিয়েচি, যেখানে দেশের আপন সম্পদ নিহিত সেইখানেই দেশের আপন গৌরব প্রছন্ন আছে। সেই সম্পদ যতই উদ্ঘাটিত হবে আমাদের গৌরবের ততই উদ্বোধন হবে। আমাদের নব উদ্বোধনের উৎসব বিলাতী গোরার বাদ্যে অথবা দেশী সঙ্গীতের হাড়গোড়-ভাঙা একটা বিরূপ ব্যাপারের দ্বারা সম্পন্ন হবে না। আর আমাদের দেশের নির্ব্বাসিত লক্ষ্মীকে নূতন আবাহন কালে মন্দিরের দ্বারে যে আল্পনা আঁকতে হবে তার ডিজাইন কি জর্ম্মানি হ'তে সংগ্রহ ক'রে আনব?

(বিচিত্রা, কার্ত্তিক ১৩৩৬) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভোলা ময়রা

ইঁহার প্রকৃত নাম,—ভোলানাথ দে।...ইনি "ভোলা ময়রা" নামেই বিখ্যাত ছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরিত পত্র পাইয়া গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৩০৪ বঙ্গাব্দে "ভারতী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "ভোলা ময়রার জন্মস্থান গুপ্তিপাড়া; ত্রিবেণীতে তাহার বিবাহ হয়। ভোলার পিতার নাম কৃপারাম; এই ব্যক্তি "কিপু ময়রা" নামে বিখ্যাত ছিল। তাহার মায়ের নাম গঙ্গামণি। ভোলার বাস্তবিক বাগবাজারে দোকান ছিল। তাহাকে স্বয়ং দেখিয়াছে, এমন লোক এখনও জীবিত। ভোলানাথের কনিষ্ঠ সহোদর হৃদয়নাথ মোদক তালতলায় দোকান করিত। তাহার বংশ এখনও আছে।"...

ঈশানবাবুর এই সকল কথা তাঁহার স্বকপোল কল্পিত। ভোলানাথের বহুসংখ্যক বংশধর এখনও বর্ত্তমান, এবং তাঁহাদের অনেকেই বিলক্ষণ কৃতবিদ্য।...ভোলানাথের নাৎজামাই স্বর্গত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী (ভোলানাথের পৌত্রী), এই সকল কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। স্বর্গত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় বঙ্গবিখ্যাত লোক। বাগবাজার রসগোল্লার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। নবীনবাবুই এই রসগোল্লার জন্মদাতা।...তিনি ভোলানাথের কনিষ্ঠ পুত্র মাধবচন্দ্রের জামাতা। নবীনবাবুর সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিতা। নবীনবাবুর সহিত আমার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল।...

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, ভোলানাথ পূর্ব্বে সিমলায় থাকিতেন। কলিকাতাই তাঁহার জন্মস্থান। গভীর অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, বাগবাজারে ভোলানাথের দোকান ছিল। এই দোকানে তিনি সন্দেশ, মিঠাই, পুরী, খই, মুড়কী ও বাতাসা প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত করিতেন। বারুদখানার ঠিক দক্ষিণদিকেই তাঁহার দোকান ছিল। উত্তরে মারহাট্টা-ডিচ্ ও চিৎপুর ক্রীক্, দক্ষিণে পাউডার-মিল রোড (বর্ত্তমান সময়ে বাগবাজার ষ্ট্রীট), পূর্ব্বে হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট এবং পশ্চিমে গঙ্গা ও চিৎপুর রোড,—এই চতুঃসীমার অন্তর্গত স্থানকে লোকে পূর্ব্বে "বারুদ-খানা" বলিত।...

বসু পাড়া লেনে ভোলানাথের বাসাবাড়ী ছিল, ইহাও শুনিয়াছি।...স্বর্গত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটীর ঠিক সম্মুখ দিয়া পশ্চিম দিকে যে ফুটপাথ চলিয়া গিয়াছে, সেই ফুট-পাথের কোণে ও মহারাজ নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের মোড়ে একখানি দ্বিতল-গৃহ অদ্যাপি বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানি ভোলানাথের নিজ বসতি-বাটী।...১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে (১১৮২ বঙ্গাব্দে) ভোলানাথের জন্ম ও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে (১২৫৮ বঙ্গাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।...

ভোলানাথের সংসার জাজ্বল্যমান। তাঁহার পিতার নাম রামগোপাল মোদক (দে)। ভোলানাথের চারি পুত্র,—চিন্তামণি, চন্দ্রনাথ, রসিকলাল ও মাধবচন্দ্র। প্রথম তিনজন নিঃসন্তান হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মাধবচন্দ্রের চারিটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা। পুত্রগুলির নাম,—যোগেন্দ্রনাথ, কালীনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। যোগেন্দ্রনাথের পাঁচটি পুত্র,—অতুলকৃষ্ণ (এম-বি), দিবাকর (রায় সাহেব), শোভাকর, ফণীন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। কালীনাথ মৃত ও নিঃসন্তান। নগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান। সুরেন্দ্রনাথের দুইটি পুত্র,—নরেন্দ্র ও হরেন্দ্র। মাধবচন্দ্রের পাঁচটি কন্যার মধ্যে এখন একমাত্র কন্যা জীবিতা আছেন। ইনিই বিখ্যাত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।...

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জীবনের শেষভাগে ভোলানাথের প্রসার ও প্রতিপত্তি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে হরুঠাকুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগুরু ছিলেন। তিনি রাম বসু অপেক্ষা ভোলানাথকেই অধিক ভালবাসিতেন। এই হেতু, তিনি উৎকৃষ্ট সুরে উৎকৃষ্ট গান বাঁধিয়া ভোলানাথকেই দিতেন। ভোলানাথ যেখানে গাহনা করিতে যাইতেন, হরুঠাকুরও প্রায় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। এজন্য হরুঠাকুর ও ভোলানাথের উপরি রাম বসুর আক্রোধ জন্মিয়াছিল। রাম বসুর রচিত গানে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।...ভোলানাথ অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তাঁহার যে অন্তর্নিহিতা বলবতী শক্তি ছিল, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি স্বয়ং গান ধরিলে, তাঁহার পরম প্রিয় ও সুদক্ষ ঢুলি তিনু (তিনকড়ি) ও নুটো (নটবর) ঢোল বাজাইলে এবং তাঁহার পরমারাধ্য গুরু হরুঠাকুর আসরে উপস্থিত থাকিলে, স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকেও আসরে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে, এবং সমস্ত আসরও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িবে। দিগ্বিজয়ী ভোলানাথের মুখের কথা এই:—

ভোলা যদি ধরে বোল　　তিনু নুটো ধরে ঢোল,
　　আসরে বসিয়া যদি হরু দেন কোল।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর　　সবে হন অগ্রসর
　　নিস্তব্ধ হইয়া যায় মানুষের গোল॥

...ভোলানাথের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলবৎ ছিল। বিশেষতঃ, তিনি গালাগালির গান বাঁধিতে নিরতিশয় দক্ষ ছিলেন। ভোলানাথের দলে হরু ঠাকুর ভিন্ন আরও এই কয়েকজন বাঁধনদারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—সাতু রায় (অবৈতনিক), গদাধর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।..

মেদিনীপুর-জেলার অন্তঃপাতী ঘাটাল সাবডিভিসানের অধীনতায় "জাড়া"-নামক একখানি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম আছে। এই গ্রামে বহুদিন হইতেই "রায়" উপাধিধারী এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশ অদ্যাবধি বাস করিতেছেন। এই গ্রামের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ-দিকে "মাণিক-কুণ্ড"-নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান "মূলার" জন্য বিশেষ বিখ্যাত।...একবার জাড়াগ্রামে ভোলানাথ কবিগান করিতে গিয়াছিলেন। স্বর্গত গোলক-নারায়ণ রায় মহাশয় তৎকালে "রায়"-বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ ও কর্ত্তা ছিলেন। ঘাটালের নিকটবর্ত্তী নিমতলা নিবাসী যজ্ঞেশ্বর দাস নামক একজন ধোপা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। যজ্ঞেশ্বর, 'রায়'বাবু মহাশয়-দিগকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তাই তিনি "জাড়া" গ্রামকে সাক্ষাৎ গোলক-বৃন্দাবন এবং গোলক-নারায়ণ বাবুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তেজস্বী ভোলানাথ ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রায় বাবুদের সম্মুখেই এই গানটি ধরিয়া বলিলেন:—

"কেমন ক'রে বল্লি যগা! জাড়া গোলক-বৃন্দাবন!
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা, চৌদিকে দেখ বাঁশের বন।
(কেমন ক'রে বল্লি যগা! জাড়া গোলক-বৃন্দাবন!)
(যগা!) কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড, কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড,
কোথা রে তোর গিরি গোবর্দ্ধন,
ও তার কোন চিহ্ন, নাইকো অন্য, চারিদিকে দেখ ব্যানার বন।
সামনে আছে মাণিক-কুণ্ড, কর্ গে মূলো দরশন।
(কেমন ক'রে বল্লি যগা! জাড়া গোলক-বৃন্দাবন!
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা, চৌদিকে দেখ বাঁশের বন।)
কবি গাইবি, পয়সা নিবি, খোসামুদি কি কারণ?

"কৃষ্ণ" হওয়া কি সহজ কথা, কৃষ্ণ বলিস্ কারে ?
সংসার-সাগরে যিনি, বগা ! তরাইতে পারে।
বাবু বটে ঈশ্বর বাবু, বাবু শম্ভু রায়,
উমেশ বাবু ত' টুকো বাবু, ব'সে আছেন কেদারায়।
বাবু তো বাবু লালা বাবু, কোল্‌কাতায় বাড়ী,
বেগুন-পোড়ায় নুণ দেয় না যে ব্যাটা, সে হাড়ি।
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুক্তের মধু অলি,
রাগ ক'রো না, রায় বাবু গো, ছুটো সত্যি কথা বলি,—
বগা খোপা খোসামুদে, অধিক বলবো কি,
গরম ভাতে বেগুন-পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি !"

...প্রসিদ্ধ কাশিমবাজার-রাজবংশের প্রথিতনামা রাজা হরিনাথ বাহাদুর একবার ভোলা ময়রা ও রাম বসুর দলের বায়না করিয়া তাঁহাদিগকে কাশিমবাজার রাজবাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীত-সমরে ভোলানাথেরই জয় হইয়াছিল। আসর ভাঙ্গিবার পরে রাজা বাহাদুর ভোলানাথকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করেন। ভোলানাথের সহিত আলাপ করিয়া রাজা বাহাদুর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা বাহাদুর বলিলেন, "ভোলানাথ ! তোমার আত্ম-পরিচয় দাও ; অর্থাৎ তোমার নাম, ধাম, জাতি বাসস্থান এবং সংবৎসর ধরিয়া যাহা কর, তাহা বল।" ভোলানাথ, রাজা বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে এইরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন :—

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা
(ওগো) সর্দ্দি-গর্ম্মি নাহি মানি।
ফুরাইলে বার মাস বড় ঋতুর হয় নাশ
(ওগো) কেবল এই কথাটা জানি ॥
শীতে ভাজি মুড়ি খই গর্ম্মি-কালে ঘোল দই
বার মাস ভিঁয়াই সন্দেশে।
খাইতে ভোলার গোজা ফিরিঙ্গী এণ্টনি মোল্লা
হল্লা ক'রে তাল্লা দিয়া বসে ॥
কাল মেঘে বর্ষাকালে বক উড়ে দলে দলে
ময়ূরের প্যাখমে বাহার।
ষড় ঋতু বারমাসে মাঘের মেঘের শেষে
পেটের দায়ে জাতীয় ব্যাপার।
নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস
পুজো হ'লে পুরী মিঠাই ভাজি।
বসন্তের কুহু শুনে ভক্তির চন্দন সনে
কৃষ্ণ-পদে মন ফুল সাজি ॥
যা কিছু পয়সা জোটে নাহি তাহা দিই পেটে
কবির নেশায় দিই ঢালি।
কি শরতে কি হেমন্তে কি শিশিরে কি বসন্তে
ভোলার খোলা ওগো নাহি খালি ॥
দেখে যদি কবি পাই হ'টে কভু নাহি যাই
হোক্ ব্যাটা যত বড় মদ্দ।
জাহাজ ডোঙ্গা সোলা নাও যাহাতে লাগায়ে দাও
ভোলা নয় কিছুতেই জব্দ ॥
হরু ঠাকুরের চেলা তাঁর পদে মত ভোলা
নমি' তাঁরে আসরে নামিল।
"ভোলা এল" এই বোল বাজিল ডিমুর ঢোল
গণ্ডগোল চৌদিকে পড়িল ॥
আসরে নামিলে ভোলা পিঁড়িয়ে উঠে কবি ওয়ালা
কত দেয় গালাগালি।
বাবু যারা সমজদার করি' সূক্ষ্ম সুবিচার
ভোলারে দেন জয়-ডঙ্কা তুলি ॥
নবকৃষ্ণ লালা বাবু সব বাবুকে করেন কাবু
ঠাসা রস তাঁদের ভিতরে।
বাবু ত বৈকুণ্ঠ মুন্সী যেন চাবি আর মুন্সী
মুন্সী আনা কবির আসরে ॥
অন্য বাবু যত সব যেন এক এক শব
সঙ্গীতের না বুঝেন মর্ম্ম।
ওস্তাদী কবির দল সুমধুর নিরমল
রসবোধ প্রাক্তনের কর্ম্ম ॥

...পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিতেন, "বাঙ্গালা-দে সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের বক্তার, 'হুতোম-প্যাঁচার' লেখকের ন্যায় রসিক লোকের, ভোলা-ময়রার ন্যায় কবি-ওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া নি আবশ্যক।"...

কোন এক আসরে ভোলানাথ কবি-গান করিতে গিয়াছিলে সেখানে কর্ত্তারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঙ্গালা-দেশের কে স্থানে কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায় ? ভোলানাথ এই উ দিয়াছিলেন :—

ময়মনসিংহের মুগ ভাল, খুলনার ভাল খই,
ঢাকার ভাল পাত-ক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই।
কৃষ্ণনগরের ক্ষীর-পুরী ভাল, মালদহের ভাল আম,
উলোর ভাল বাঁদর-বাবু, মুর্শিদাবাদের জাম।
রংপুরের শ্বশুর ভাল, রাজসাহীর জামাই,
নোয়াখালির নৌকা ভাল, চট্টগ্রামের ধাই।
শান্তিপুরের শাড়ী ভাল, গুপ্তিপাড়ার মেয়ে,
মাণিককুণ্ডের মুলো ভাল, চন্দ্রকোণা ঘিয়ে।
দিনাজপুরের কায়েৎ ভাল, হাবড়ার ভাল শুঁড়ি,
পাবনা-জেলার বৈষ্ণব ভাল, ফরিদপুরের মুড়ি।
বর্দ্ধমানের চাষী ভাল, চব্বিশ-পরগণার গোপ,
পদ্মানদীর ইলিস ভাল,—কিন্তু বংশ-লোপ।
হুগলীর ভাল কোটাল লেঠেল, বীরভূমের ভাল ঘোল,
ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভাল,—হরি হরি বোল !

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়...মধ্যে মধ্যে ভোলানাথের গা বলিতেন। এক দিন মদীয় অধ্যাপক স্বর্গত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামগ ন্যায়রত্ন ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ে সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সে আজ ৪৭ বৎসরের কথা। কথা কথায় রাজকৃষ্ণবাবু ভোলা ময়রার কথা তুলিলেন। তখন বিদ্যাসাগ মহাশয় স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন, "ভোলার মত তেজস্বী, বুদ্ধিমান্ উপস্থিত কবি আমি দেখি নাই। ভোলার জুড়ি মেলা ভার।"...

ভোলানাথ যে ঘোর বৈষ্ণব ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কথায় কথায় তিনি 'কৃষ্ণ' নাম করিতেন। শুনিতে পাও যায়, তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন।...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ভোলানাথ বৈষ্ণবোচিত তিলক-সেবা ও তুলসীর মাল ধারণ করিতেন।

মাসিক বসুমতী—কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

গ্রন্থাগারের ইতিহাস

গ্রন্থাগারের ইতিহাস বহু প্রাচীন—অনেকে মনে করেন যে গ্রন্থালয়গুলো সবই একালের আমদানী। বর্ণমালা আবিষ্কৃত হবার বহু পূর্ব্বেই যখন মানুষ নিজের অন্তরের ভাবকথা এঁকে দেখাতে শিখেছে, তখন থেকেই গ্রন্থাগারের উৎপত্তি হ'য়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ আমি শুধু কতকগুলি বিদেশের ও দেশের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করব। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পকলার জীবন্ত বিগ্রহ যে পিরামিড তা তৈরি করারও পূর্ব্বে, যিশুর জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ঐ মিশরেরই পাথরের টালির পাঠাগার এখন মাটি খুঁড়ে বার করা হ'য়েছে।—আর সেই সব টালিতে শুধু আছে কতকগুলো ছবি আঁকা। তারপর আমেরিকার অধ্যাপক মিঃ হিল্‌প্রেখ্‌ট্‌ ব্যাবিলনের নিপুর সহরের মাটির নীচে পঁচিশ হাজার মৃত্তিকা ফলক সমেত একটা বড় গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ বার করেন, এবং প্রমাণ করেন যে সেটি অন্ততঃ খৃষ্টের জন্মাবার ৩৪ হাজার বছর আগের। ১৮৫০ সালে মিঃ লেয়ার্ড নিনেভা সহরে ত্রিশ চল্লিশ ফুট খোঁড়ার পর একটা বড় বারান্দায় তেকোণা অক্ষরে লেখা কতকগুলি পাথরের টালি পান, এবং পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেন যে সেটা বোধ হয় অ্যাসিরিয়ার রাজা সার্ডানা-পলসের পাঠাগার। আর সেই পাঠাগার থেকেই "ইস্তার ও ইসতুবার" একখানা মহাকাব্য এবং "সুমের" ও "আকাদ" নামে নামে দুটো জাতির বহু প্রাচীন ইতিহাস এবং আরও কত কি আবিষ্কৃত হয়।

গ্রীসের বিপুল শক্তিরও ভিত্তি ছিল এই সব পাঠাগার। সেই মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির যুগেই ইউক্লিড পিসিসট্রেটাস্ প্লেটো অ্যারিষ্টটল প্রভৃতি সবারই নিজের নিজের পাঠাগার ছিল।... লুসিয়ানের সময় নানারকমের নূতন নূতন পুস্তকাদি সংগৃহীত হ'তে থাকে। এমনকি শেষকালে ওটা যেন বিলাসিতার পর্য্যায়-ভুক্ত হয়ে পড়ে। এবং এই সমস্ত পুস্তক সংগ্রহের ফলে আলেক-জাণ্ড্রিয়ার পাঠাগার সব পাঠাগারকে ছাপিয়ে উঠেছিল। মহাবীর আলেকজ্যাণ্ডারের সেনাপতি প্রথম টলেমি ঐখানে দুইটি গ্রন্থালয় স্থাপন করেন—একটি ব্রুকিয়াম এবং আর একটি সেরাপিয়ামে। দ্বিতীয় টলেমী আবার এই পাঠাগার দুটিতে সর্ব্বসমেত ৬।৭ লক্ষ বই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তৃতীয় টলেমীর সময় উৎপীড়ন করে পুস্তক-সংগ্রহের চেষ্টা চলেছিল তাই অ্যালেকজ্যাণ্ড্রিয়ার বন্দরে যখনই কোন জাহাজ বই নিয়ে আসত, অমনি জাহাজের অধ্যক্ষের কাছ থেকে বল-প্রয়োগে সে সমস্ত বই হস্তগত করা হ'ত। এ রকম করে শুধু তারা পুস্তক সংগ্রহ করেই নিশ্চিন্ত ছিল না—নানা দেশদেশান্তর থেকে পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক ও লেখক এনে "স্ক্রীপটোরিয়ামে" (নকলখানায়) তাদের দিয়ে হাজারে হাজারে নানাদেশের বই নকল করা হত—টীকাটিপ্পনি লেখান হত—আবার কত নূতন নূতন বইও রচনা করা হত। এতখানি অক্লান্ত চেষ্টা পরিশ্রম ও আয়োজনের ফলে আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ার পাঠাগার যখন সর্ব্বজনবিদিত হ'য়ে উঠেছিল তখন জুলিয়াস সিজার উদ্দাম জয়লালসার অধীর হ'য়ে একদিন আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ার সব নৌবহরে আগুন লাগিয়ে দেন—আর সেই আগুনের লেলিহান শিখার মুখে সমুদ্রের কাছে ঐ বড় পাঠাগারটি একেবারে পুড়ে যায়। সিজরের বন্ধু এন্টনি ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ পারগামামের একটা প্রকাণ্ড পাঠাগার ব্রুকিয়াম পাঠাগারের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন—তবে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে অরেলিয়ানের আক্রমণের সময় এই পাঠাগারটিও ভস্মীভূত হ'য়ে যায়।

এইবার রোমের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্।... এভেন্টাইন পাহাড়ের উপরে খৃষ্টের জন্মাবার প্রায় ৫০।৫০ বৎসর আগে ইলিরিয়ান যুদ্ধের পর এসিনিয়াস পলিও প্রথম পাঠাগার স্থাপন করেন—তারপর তখন থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে রোমে অনেকগুলো পাঠাগারই হ'য়েছিল; তবে আল্‌পিয়াস্ ট্রাজানসের গ্রন্থাগারই সকলের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী বলে পরিচিত হয়েছিল। কনষ্টানটাইন যখন বাইজ্যানটিয়াম্ বা কনষ্টান্টিনোপলে তাঁর রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে যান্ তখনও সেখানে অনেক বড় বড় পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—একটি গ্রন্থাগারে প্রায় দুলক্ষ আন্দাজ বই ছিল—তবে পুনঃ পুনঃ অগ্নিদাহে কনষ্টান্টিনোপলের প্রায় ২৭।২৮টি গ্রন্থাগারের অনেক ক্ষতিই হ'য়েছিল। তারপর রোমরাজ্য ভেঙে গেলেও পোপেরা বড় বড় পাঠাগার স্থাপন করেছিলেনএবং সাধারণের পাঠের সুবিধা ও সুবন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন।

আরবীয়েরাও গ্রীকদের মত পুস্তক সংরক্ষণে ও সংগ্রহে সচেষ্ট ছিল। হারুণ অল্‌রশিদ ও তাঁর ছেলেদের রাজত্ব সময়ে বাগদাদ, বাসোরা, কর্ডোভা প্রভৃতি নানাস্থানে গ্রন্থালয় স্থাপিত হ'য়েছিল—কাইরো সহর বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিল—আর সেখানকার ফতিমিদ বংশীয়দের পাঠাগারে প্রায় দেড় লক্ষ আন্দাজ পুস্তক ও পুঁথিপত্রাদি সংগৃহীত হ'য়েছিল—শেষে তুর্কদের দ্বারা বিতাড়িত হবার পরও তাঁরা আবার নতুন নতুন গ্রন্থালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আরবদের অধিকারভুক্ত (স্পেনরাজ্য) ইয়োরোপের মধ্যে অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়ে উঠেছিল—সেখানে অল্‌হাকিম নামে একজন আরবীয় পণ্ডিতের চেষ্টায় ও যত্নে কর্ডোভার গ্রন্থালয়ে প্রায় ৬।৭ লক্ষ পুস্তকাদি সংগৃহীত হ'য়েছিল।

এ সমস্ত ত গেল সেকালের পুরণো কথা।...সম্প্রতি আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন নগরে নতুন একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে—সেখানে এক কোটিরও বেশী বই রাখার বন্দোবস্ত আছে এবং দরকার হ'লে আরও বেশী রাখার ব্যবস্থা করা যায়। সেখানকার গ্রন্থাধ্যক্ষদের কি করে বই সাজাতে ও তালিকাভুক্ত করতে হয়, এর জন্যে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়—আর তাদেরই সুবিধার জন্য কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পর্য্যন্ত বার করা হ'য়েছে।...

তক্ষশীলা ও নালন্দা আজও ভারতের স্মৃতিতে জল্ জল্ কোরে ফুটে উঠছে—লিপি প্রচলনের যুগে বৌদ্ধদের চেষ্টার ফলেই এরাই ভারতের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাকেন্দ্র বলে পরিগণিত হ'য়েছিল—এই নালন্দাতেই ফা হিয়ান, ইটসিং, হিয়ানসাং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকেরা শিক্ষালাভ করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছিল—এবং যাবার সময় কুড়িটে ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে এখানকার সব পুঁথিপত্র নিয়ে যায়—আর এইগুলোই এখন নানা পণ্ডিতের দ্বারা অনুদিত হ'য়ে ভারতের গৌরবের কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। নালন্দার "রত্নোদধি" নামে একটা নয়তল বিশিষ্ট প্রাসাদে এত পুঁথি ছিল যে ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে অক্ষয় কীর্ত্তি থেকে যেত—কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কতকগুলো বৌদ্ধদ্বেষী সন্ন্যাসী অত বড় গ্রন্থাগারটাকে অগ্নিদাহে নষ্ট করে দেয়।...

তারপর বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরীর পাঠাগার বিশ্ববিশ্রুত হ'য়ে ওঠে—সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুঁথিই রাখা হ'ত—

কিন্তু মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে বক্তিয়ার খিলিজী তাইতে আগুন দিয়ে শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলে। বিক্রমশীলার পাঠাগারও এইরকমে নষ্ট হয়। বল্লালসেনের একটা বড় পাঠাগার ছিল, সেটাও কিনা শেষে মুসলমানের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলে না। শেষকালে প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুসলমানের হাত থেকে গ্রন্থাগারগুলো রক্ষা করতে অকৃতকার্য্য হ'য়ে কতকগুলো বৌদ্ধ ভিক্ষু নেপালে পালিয়ে গিয়ে খানকতক গ্রন্থ রক্ষা করেছিল ...

ধাররাজ্যের ভোজরাজার পাঠাগার, তারপর মালব প্রদেশ জয় করার পর চালুক্যরাজ বিজাপুরে যে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ত্রিতল বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন সেই বিদ্যামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও তার জীর্ণ স্মৃতি বুকে করে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ ছাড়াও ভারতীভাণ্ডার জয়পুর, যোধপুর, ঝান্সি, তাঞ্জোর, বরোদা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের গ্রন্থালয়গুলো একদিন যে বিশ্বের বুকের ওপর আলো জেলে দিয়েছিল একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

নেপালে অনেকদিন পর্য্যন্ত মুসলমান আক্রমণ হয়নি বলে সেখানকার নিবার রাজারা প্রায় দুহাজার বছরের পুরাণো পুঁথি সংগ্রহ করে রাখতে পেরেছিল—তারপর নিবার রাজাদের হাত থেকে গুর্খা রাজাদের হাতে রাজ্য এলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠাগারটিও লুট হয়ে যায়। তবে সুখের বিষয় এই যে, ৫০।৬০ বছর হল জঙ্গ-বাহাদুরের সময় থেকে এই পাঠাগারটি আবার নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে। এখন এই পাঠাগারের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড হল ও ঘণ্টাঘর তৈরী হ'য়েছে—আর বইও আছে অনেক। তালপাতার পুঁথি তিন হাজার, সংস্কৃত পুঁথি কুড়ি হাজার, ভোটদেশের পুঁথি দশ হাজার, চীনদেশের ত্রিপত্রক পুঁথি ৪।৫ হাজার এবং এসব ছাড়া অনেক পুরাতন ও নব্যতন্ত্রের অনেক ইংরাজি বই ও ছবি আছে।

রাজপুতানার প্রায় সকল রাজার কেল্লাতেই এক একটা করে পুঁথিখানা ছিল। এখনও ৫।৭ হাজার পুঁথি অনেক পুঁথিখানাতেই আছে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুরোহিত মধুসূদন অনেক বই সংগ্রহ করেছিলেন। গুজরাটের জৈনেরা আলাউদ্দিনের সময় বহু-সংখ্যক পুঁথিপত্রাদি নিয়ে যশল্মীরে পালিয়ে যায়। তারপর বরুণার ধারে তিন-চারশ বছর আগে সর্ব্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য্য সরস্বতী নামে এক সন্ন্যাসী একটা প্রকাণ্ড পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—এখনও তার একটা তালিকা আছে একথা আমি সেদিনও কাশীতে শুনেছি।...

প্রায় সমস্ত মুসলমান সম্রাটদেরই এক একটা নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল—এতে যে শুধু আরবী ফারসী বই থাকত তা নয়—হিন্দুস্থানেরও অনেক বই থাকত,—আবার শিক্ষানুরাগী বাদসাহেরা অন্যান্য ভাষার বই আরবী ফারসীতে অনুদিত করবার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন।

তারপর আমাদের বাঙ্গলাদেশেও পাঠাগার ছিল—বাঙ্গলার জগদ্দল বিহারের নাম একদিন সবার কাছেই চিরপরিচিত হ'য়ে উঠেছিল—এইখান থেকেই ভুটিয়ারা প্রায় দশ হাজার বই অনুদিত করে নিয়ে গিয়েছিল।

(ছাত্র—আশ্বিন; ১৩৩৬) শ্রীগুরুদাস রায়

—

স্বরাজ—রাষ্ট্রে কি জাতীয় সাধনায়

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা এই কথাই সচরাচর বলিয়া থাকেন—আর নব্য ভারতের যাঁহারা পাশ্চাত্য ভাবে অভিভূত, তাঁহারাও তাহাই বিশ্বাস করেন—যে ভারতবর্ষে এতদিন 'নেশনেলিটি' বা জাতীয়তা বলিয়া কোনও পদার্থ ছিল না। এদেশ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ধর্ম্মে ছিন্নবিচ্ছিন্ন; আজ পশ্চিমের সংস্রবে আসিয়া এদেশে জাতীয়তা গড়িয়া উঠিতেছে মাত্র। আমাদের মনে হয় ঠিক ইহার উল্টা—ভারতে এতদিন পর্য্যন্তই বাস্তবিক জাতীয়তা ছিল, তাহা ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে।

জাতীয়তার মৌলিক বন্ধন বা ঐক্যসূত্র তিন প্রকারের—(১) ভৌগোলিক, (২) সাধনা বা সংস্কৃতিগত ও (৩) রাষ্ট্রীয়।

ভারতের ভৌগোলিক একতা অসাধারণ।...প্রথমতঃ যখন আর্য্যজাতি এই দেশে বসতি বিস্তার করে, তখন উত্তর-ভারতকেই তাহারা আপন নিবাস বলিয়া মনে করিত; সেজন্য তার নাম হইয়াছিল আর্য্যাবর্ত্ত। প্রাচীন ঋষিগণের প্রচারিত মন্ত্র ও উপাসনাদিতে যে সকল নদনদীর নাম পাওয়া যায় তাহাদের সকলই আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থিত—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী পারুষ্ণি (বিপাসা), আশিক্নি (চন্দ্রভাগা), সুষুমা (সিন্ধু), প্রভৃতি উত্তর-ভারতেই অবস্থিত। ক্রমে যেমন আর্য্যগণ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইল, তাহাদিগের ভৌগোলিক দৃষ্টিও বাড়িতে লাগিল এবং সমগ্র ভারতকে তাহারা আপন দেশ বলিয়া গণ্য করিল—আমরা যেমন এখন করিয়া থাকি। তখন দক্ষিণ-ভারতের নদনদীও তুল্যরূপে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইল—প্রাচীন একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণভাবের মন্ত্রের স্থানে উক্ত হইল—

> গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
> নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

ভারতের অসংখ্য তীর্থস্থানসমূহ উত্তরাখণ্ডের ন্যায় দক্ষিণ-ভারতেও অবস্থিত—কাঞ্চী ও রামেশ্বর এবং মহেন্দ্র, মলয় ও সহ্য পর্ব্বতকে হিন্দু তুল্যরূপে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। শঙ্কর ও চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংস্কারকগণ সমুদয় ভারত পর্য্যটন করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া (উত্তর হিমালয়ে জ্যোতির্ম্মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গারী মঠ, পূর্ব্বে পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ এবং পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ) ভারতীয় জাতীয়তায় ভৌগোলিক ঐক্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

আর্য্যগণ যেমন সিন্ধুতট হইতে ভারতের মধ্যভাগে অগ্রসর হইতে লাগিল তাহাদিগের সহিত আদিম অধিবাসিগণের সংঘর্ষ বাধিল—অনেক যুদ্ধ হইল।...বৈদিক সাহিত্যের বিবিধ স্থানে ইহারা বিধর্ম্মী, অপবিত্র ও অতি নীচ বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়াছে, কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াও কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে হেয় জ্ঞান করা হইয়াছে।...এই বর্ণ-বিভাগই এদেশের জাতি-ভেদের মূল। কিন্তু আর্য্যগণ ইহাদিগের সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন না করিয়া অথবা দাসত্বের অবস্থায় পরিণত করিয়া না রাখিয়া ইহাদিগকে নিজ সমাজভুক্ত করিয়া লইয়াছিল—এইরূপে ইহারা শূদ্র নামে সমাজের নিম্নবর্ণে স্থানলাভ করিয়া রহিল।

কোথাও বিজেতা-রূপে, কোথাও বা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, আর্য্যগণ এই আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে বিস্তারলাভ করিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের উচ্চ সভ্যতা ইহাদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছিল। আদিম লোকদিগকে এইরূপে আর্য্যভাবাপন্ন করিতে

যাওয়ায় তাহাদিগের সংস্রবে ক্রমে আর্য্যগণের মৌলিক ধর্মপদ্ধতিতে কতক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এইরূপে সম্ভবতঃ প্রাচীন অধিবাসিগণের বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের দ্রবিড়ীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের উপদেবতার উপাসনা-পদ্ধতি আর্য্যগণের ভাবে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইয়া কালক্রমে শৈব-ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রাচীন বৈদিক দেবতা রুদ্র কিরূপে ক্রমে পরবর্তী হিন্দু-ধর্ম-সম্মত মহাদেবের রূপ ধারণ করিলেন, তাহার ঠিক ধারা নির্ণয় করা অবশ্যই কঠিন। কিন্তু দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এইটি সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল। (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে) মেগাস্থিনিস যাঁহাকে এদেশে Dionysos দেব বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে আমাদের উপাস্য দেবতা শিব বলিয়াই ধরা হইয়াছে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে শৈব-ধর্ম ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংমিশ্রিত লক্ষণ-যুক্ত চিহ্ন-সকল ইণ্ডো-সীথিয় (শক) রাজগণের মুদ্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন নাটকাদি সাহিত্যে শিব প্রধান মঙ্গলদাতা দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শিব-চরিত্র দুই বিরুদ্ধ লক্ষণযুক্ত—একটি ভয় উৎপাদক, অপর কল্যাণপ্রদ। তিনি মঙ্গলময়, তিনিই ভয়ঙ্কর। শিবপত্নী শিবানী ঐরূপ দুই বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্তা—তিনি উমা ও অম্বিকা কল্যাণদাত্রী জগন্মাতা; তিনিই কালী ও করালী কৃষ্ণরূপিণী ভয়ঙ্করী। এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের দেব-কল্পনায়—অস্পষ্ট হইলেও—আর্য্য ও অনার্য্যগণের ঐশ্বরীয় ভাবের বিভিন্ন উপলব্ধির সংমিশ্রণ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর্য্যভাব কল্যাণকর স্নেহময়, আর অনার্য্যভাব বিনাশকারক ও ভয়ঙ্কর।

এইরূপে যে বিরাট ধর্ম্ম-সমন্বয় আরম্ভ হইল, তাহাই ইতিহাসে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে—আর্য্যসাধনার অতি উচ্চ বেদান্তমত হইতে আরম্ভ করিয়া আদিম মানবের জড়বাদ ও ভূতবাদ পর্য্যন্ত সমুদয় ধর্ম্মমতের বিভিন্ন ভাব ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।...

হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত যে-সকল বিভিন্ন ধর্ম্মমত আছে, তাহাতে যতই বৈষম্য থাকুক্ না কেন, তাহার ভিতরে একটি অসাধারণ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্প্রদায় আছে বটে, কিন্তু কেহ এক দেবতার উপাসক বলিয়া, অন্য দেবতার উপাসনায় ত্রুটি করে না।...একই হিন্দু তীর্থ-যাত্রায় বহির্গত হইয়া শিব, কৃষ্ণ, দেবী, রাম, গণেশ বা মহাবীরের মন্দির দর্শন করিয়া আসে। একই হিন্দু আপন বাড়ীতে সম্বৎসরকাল মধ্যে এসকল এবং আরও অনেক দেব-দেবীর পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; কবি ভর্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন, এই সকল উপাসক সম্প্রদায়ের মৌলিক দৃষ্টিতে একই দেব—শিব বা কৃষ্ণ।

ভারতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা ও বৌদ্ধ এবং জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম-মতের অন্তর্গত ব্যবহারিক নীতি (ethical principles) সমূহ সর্ব্বত্র এক—সর্ব্বভূতে দয়া, ত্যাগ ও কর্ম্ম-বাদ।...গ্রীক, পারথীয়, সীথিয় ও হূন্ জাতীয় লোকেরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহাদের হয় বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল, অথবা হিন্দুধর্ম্মের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর সাহিত্যদর্শনাদির জ্ঞান ও হিন্দুর প্রতিষ্ঠানাদির অন্তর্গত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীকরাজ মিনেণ্ডার এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—'মিলিন্দ-প্রশ্ন' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে তিনিই রাজা 'মিলিন্দ' নামে খ্যাত হইয়াছেন; কুশন্ বংশের রাজা দ্বিতীয় কেড্‌ফাইসীস্ শিবের উপাসক ছিলেন, আর তাঁহার সুবিখ্যাত বংশধর কণিষ্ক ও হুবিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের পরম ভক্ত ছিলেন। পারথীয়-বংশোদ্ভব পহ্লব রাজগণ দক্ষিণ-ভারতে চারিশত বৎসর ধরিয়া পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই হিন্দু হইয়া গিয়াছিলেন; কাঞ্চী বা কঞ্জেভরম্ তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল; তাঁহাদিগের সময় হইতেই এই কাঞ্চী হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ও তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াবাড়ের শক-রাজগণ (ক্ষত্রপ) বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।...

হিন্দু সভ্যতা পরিণামে মুসলমান সভ্যতা ও মুসলমান শাসন ব্যবস্থাদির উপর আপনার প্রভাব দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিয়াছিল। একবার ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর মুসলমানগণ ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িল।...

পক্ষান্তরে মুসলমান-ধর্ম্মের নিরাপোষ একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্ম্মের উপর সজোরে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তাহারই ফলে চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া দলে দলে সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম-সংস্কারকগণ হিন্দুসমাজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই পরমেশ্বরের একত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন, জাতিভেদের উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং মুসলমানকেও স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। রামানন্দ, কবীর, নানক ও চৈতন্যের নাম ইঁহাদের মধ্যে প্রধান।...

হিন্দু ও মুসলমান সংমিশ্রণের এইরূপ সুন্দর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে উভয়ের মধ্যে মৈত্রী ও সমবেদনা সৃষ্টি আপনিই হইতে লাগিল; বিশেষ করিয়া দেখা গেল যে উচ্চ ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেদান্তের সর্ব্বেশ্বরবাদ উভয় সম্প্রদায়ের হৃদয় স্পর্শ করিয়া এক উচ্চ মিলন-ক্ষেত্রের সৃজন করিল (মুসলমানের সুফী মতবাদ ও হিন্দুর বেদান্ত বাদে বিশেষ পার্থক্য কিছু নাই); আর নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুসমাজ হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্ব জাতিগত ও সমাজগত সংস্কারাদি ত্যাগ করিতে না পারিয়া, হিন্দুদিগের পূজাপার্ব্বণ উৎসবাদিতে উৎসাহ ও আনন্দে যোগদান করিত। হিন্দুরাও মহরম প্রভৃতি মুসলমানী উৎসবে যোগদান করিত।...

কর্ম্মবাদ বা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী হওয়াতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাবগত যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, ব্যবহারিক জীবনে উভয়েই সন্তোষ, শান্তি ও সামাজিক সাম্যের পক্ষপাতী ছিল। প্রায় সকল লোকেই তখন গ্রামে বাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন বিরাজ করিত, কেন্দ্রীয় রাজশক্তি হইতে তাহারা অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিত; ইহাতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে পরস্পর মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত ছিল।

প্রজাদিগের মধ্যে এই মৈত্রী থাকাতে তার প্রভাব দেশের রাজনীতির উপরে আপনিই আসিয়া পড়িত—হিন্দু হউক্ বা মুসলমান হউক্ রাজশক্তিকে এই সাম্যনীতি মান্য করিয়া চলিতে হইত।...এতৎ প্রসঙ্গে মোগল-সম্রাট্ বাবর তৎপুত্র হুমায়ুনের প্রতি যে উপদেশবাক্য দেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—

(১) তুমি কোনও বিশেষ ধর্ম্ম-বিধান বা সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হইবে না; পরন্তু সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদির প্রতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে ন্যায়পরায়ণ থাকিবে। (২) বিশেষ করিয়া গো-বধ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে; তাহা হইলে সমগ্র হিন্দু জাতির অন্তরের উপর অধিকার লাভ করিতে পারিবে, এবং এ দেশীয় লোকদিগকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিবে। (৩) কোনও সম্প্রদায়ের দেবস্থান নষ্ট করিবে

না, সর্ব্বদা ভারপরায়ণ থাকিবে ; তাহা হইলেই রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ মধুর হইবে ও দেশে সুখ-শান্তি বিরাজ করিবে।...

সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল হইতে শাহজাহানের শাসন পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে মুসলমান-শাসনের শ্রেষ্ঠ যুগ। এই সময়েই হিন্দু ও মুসলমানে ঐক্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে দেখা যাইয়া থাকে। আকবর এদেশে গো হত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন এবং হোম (হিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠান) করিতেন।...

আকবরের শ্রেষ্ঠ রাজ-পারিষদ্ আবুল-ফজলকে তৎসময়ের লোকেরা অনেকে হিন্দু বলিয়াই জানিত। জাহাঙ্গীর আকবরের এক হিন্দু মহিষীর গর্ভজাত সন্তান। শাহজাহানও তেমনি জাহাঙ্গীরের এক হিন্দু রাণীর পুত্র। আকবরের এই হিন্দুত্বের অনুকূল রাজনীতি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন।...

দারা এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মমত সমীকরণের প্রয়াস পান। তিনি পঞ্চাশখানি উপনিষদের অনুবাদ করাইয়াছিলেন।...

দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সদ্ভাব বিদ্যমান ছিল তৎসম্বন্ধে ইংরেজ-লেখক হেমিণ্টন্ বলিতেছেন যে—"নিজামের অধিকৃত দেশসমূহের অনেক প্রজা মুসলমান ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা নিম্নশ্রেণীভুক্ত, চাষবাস করিয়া থাকে—তাহারা প্রায় সকলেই হিন্দু রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে।" বঙ্গদেশের রঙ্গপুর জিলা সম্বন্ধে উক্ত লেখক বলিতেছেন যে, "এই দুই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী লোকেরা অধিকাংশই মৈত্রীভাবে বাস করিয়া থাকে।"...

১৮০৯ খৃঃ অব্দে ডাঃ টেলার ঢাকার বিবরণ লিখিতে গিয়া বলিতেছেন, "হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে কোনও প্রকার ধর্ম্ম-বিরোধ এখানে প্রায় দেখা যায় না। এই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর মৈত্রীভাবে শান্তিতে বসতি করিতেছে। যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা লর্ড মেষ্টন এক স্থানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, "স্মরণাতীত কাল হইতে এ প্রদেশের অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পর মৈত্রীর বন্ধনে শান্তিতে অবস্থান করিয়া আসিতেছে।"...

এই প্রকার মৈত্রীভাবের ফলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য আপনিই আসিত।...

মুসলমান শাসনকালে যে এদেশে প্রজাগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিদ্যমান ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় যখন দেখা যায় যে, মুসলমান নৃপতিগণ শাসনকার্য্যে কোনও সাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বন করিতেন না, এবং তাহাতে মুসলমান প্রজাদিগের মধ্যে কোনও অসন্তোষ উৎপাদন হইত না। তাঁহাদিগের রাজপরিষদে মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তির স্থান না ছিল এমন নয়—কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা জাতি ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই প্রধান প্রধান দায়িত্বপূর্ণ রাজ-কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিতেন। আকবরের মত সম্রাটের কথা বলা হইতেছে না—মানসিংহ, টোডরমল, বীরবল প্রভৃতি বিশ্বাসী হিন্দু-গণ ও হিন্দুভাবাপন্ন আবুল-ফজল, ফৈজী প্রভৃতি মুসলমানগণ যে তাঁহার রাজপরিষদ অলঙ্কৃত করিতেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু যে-সকল মুসলমান রাজা হিন্দুর প্রতি তেমন অনুরক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ নহেন, তাঁহারাও এরূপ জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দেশের মধ্যে যাহারা অধিক উপযুক্ত তাহাদিগকেই রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

(ভারতের সাধনা—অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) শ্রীপ্রমথনাথ বসু
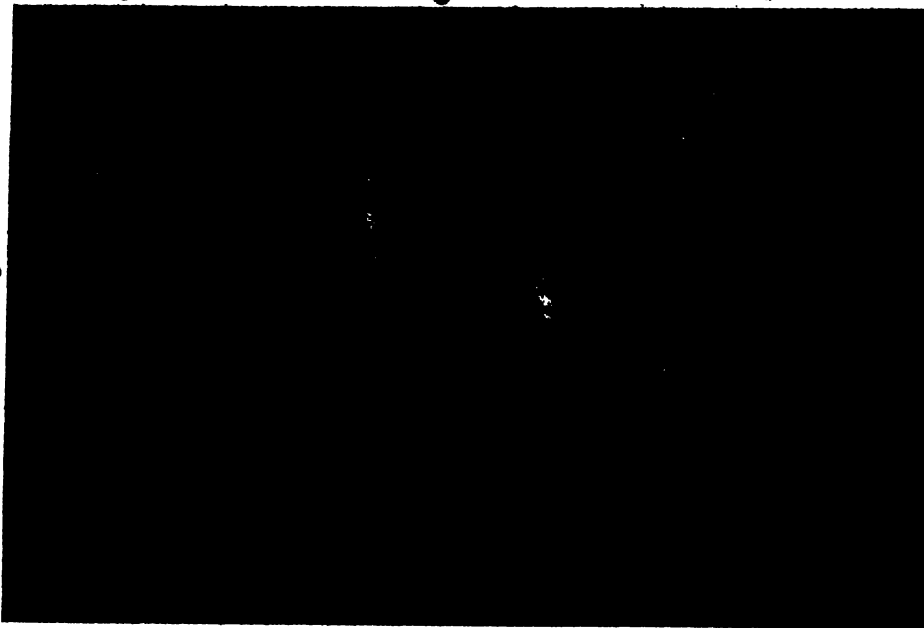
মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(১৮)

সকালবেলা ইন্দু বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল, মায়া অভ্যাসমত কাছে বসিয়া ডালার তরকারীগুলা নাড়া-চাড়া করিতেছিল এবং অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিল।

সে বলিতেছিল, "আচ্ছা, পিসীমা, সত্যি বল ত, আমাদের গাঁয়ের চেয়ে তোমার এ দেশটা ভাল লাগছে?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "ভাল বলি বলেই কি আর ভাল লাগে বেশী? হাজার হোক সে নিজের দেশ, জন্মভূমি। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কত সেখানে? হয়ে অবধি সেখানে আছি। অন্যের ছেলে রাজপুত্তুরের মত দেখতে হলেও মা নিজের খাঁদা বোঁচা ছেলেকে তার চেয়ে ভালবাসে বেশী। এও তেমনি আর কি? এখানে সুখ-সুবিধে কত; নূতন দেশ, নূতন মানুষ, দুদিনের জন্যে খুবই ভাল লাগছে। কিন্তু চিরজন্ম এখানে থাকতে বললে কি আর তা পারি, না তাই আমার ভাল লাগে?"

মায়া মুখ ম্লান করিয়া বলিল, "কিন্তু আমাকে হয়ত তাই থাকতে হবে। মাগো, কি করে যে আমি পারব!"

ইন্দু বলিল, "মেয়েমানুষে সবই পারে রে। তাদের শেকড়সুদ্ধ উপড়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে রাখবে বলে ভগবান তাদের সেইরকম করেই গড়েছেন। তোর বাবা এখানে, তোর সবই এখানে হবে। ক্রমে সবই সয়ে যাবে। আর এর পর পড়াশুনো সুরু করলে, ভাল লাগছে না মন্দ লাগছে তা ভাববার সময়ও পাবি না।"

মায়া বলিল, "ঐ ভেবে ত আমার আরো ভয় করে, পিসীমা। কাকে না কাকে মাষ্টার রাখবেন তার ঠিক নেই, সাহেব না ফিরিঙ্গী না কি। তারা যে আমায় কি অদ্ভুত জানোয়ার ভাববে তার ঠিকানা নেই, আমিও ঘেন্নায় ভয়ে অস্থির হব। কেন যে ভগবান সব ওলট-পালট করে দিলেন, তার ঠিকানা নেই। বেশ ছিলাম!"

ইন্দু সান্ত্বনার সুরে বলিল, "যা হয়ে গেছে তা ত গেছেই, তা নিয়ে দুঃখ করে আর করবি কি? আর বাপের কথাটাও ত একটু মনে করে দেখতে হয়? সে বেচারা কি চিরকাল একলা একলাই কাটাবে? তুই তার একমাত্র মেয়ে। স্ত্রী ত ঘরই করল না। তুইও যদি চিরদিন দূরে দূরেই থাকিস্, তা হলে তার মনটা কেমন হয়? মায়ের প্রতি যেমন তোর কর্ত্তব্য, বাপের প্রতিও ত আছে? তাকে দেখবি না? এরপর বুড়ো হয়ে পড়েছেন, তাঁর সেবা শুশ্রূষা করবে কে?"

মায়া বলিল, "তাও যদি তুমি বরাবর এখানে থাকতে ত একরকম হত। তাও ত না, তুমি ত দুদিন পরে পালাবে, আমি তখন পড়ব একেবারে একলা।"

ইন্দু বলিল, "এখনি তার ভাবনা কেন? এখনও ত কিছুদিন আছিই, এর পরেও মাঝে মাঝে যাব আসব। বড় বৌরাও ত একবার আসবে বলে কথা দিয়েছে। তুই যখন রইলি তখন সবাই এক আধবার করে আসবে। আর তোর নিজেরও সয়ে যাবে দেখিস্ এখন। গোড়ায় নূতন জায়গায় যেমন প্রাণ ছটফট্ করে, শেষ অবধি তাই যদি করত, তাহলে কেউ কি কোথাও টিঁকতে পারত নাকি?"

মায়া বলিল, "আমার কিন্তু চিরকালই দেশের বাড়ী এখানকার চেয়ে ভাল লাগবে।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে দেখাই যাবে। তুই এখন ওঠ্ ত, নাইগে যা। বসে বসে কেবল বেলা করছিস্। আমার ত এই তরকারীটা শুধু বাকি, আর সবই হয়ে গেছে।"

মায়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া পড়িল এবং সিঁড়ি দিয়া যথাসম্ভব আস্তে উপরে উঠিতে লাগিল। সারাটা দিনই তাহার হাতে পড়িয়া থাকে, কি করিয়া যে সময় কাটে

তাহার ঠিকানা নাই। বাড়ীতে মানুষের মধ্যে এক পিসীমা। তা একটা মানুষের সঙ্গে আর কতই বা গল্প করা যায়? বাবার কাছে ত সে ভয়ে যাইতেই পারে না। কি কথা বলিবে সে তাঁহার সঙ্গে? নিরঞ্জন ডাকিলেও সে কোনোমতে পাঁচ ছয় মিনিট বসিয়া তাহার পর পলাইয়া আসে।

স্নান করিয়া খানিক পরে সে খাইতে নামিয়া আসিল। ইন্দু তাহাকে ভাত বাড়িয়া দিয়া বলিল, "এখন ত খুব আমার উপর জুলুম চালাচ্ছিস, আমি চলে গেলে তখন কি না খেয়ে থাক্‌বি?"

মায়া খাইতে খাইতে বলিল, "আহা, আমি যেন আর নিজের জন্যে দুটো ভাতে ভাত সেদ্ধ করে নিতে পারব না?"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, যখন দশটা চারটা ইস্কুল ছুটতে হবে, তখন ভাতে ভাত রাঁধার সময় পাবি কখন্ শুনি?"

মায়া বলিল, "যাও পিসীমা, তুমি শুধু শুধু আমায় ভয় পাইও না। আমার মা কি না করে গেছেন, তবুও নিজের ধর্ম্ম ছাড়েন নি, আর আমি তাঁর মেয়ে হয়ে দুটো রেঁধেও খেতে পারব না?"

ইন্দু বলিল, "যাতে মায়ের মত বোকামী না কর, সেইজন্যেই না আমার এত করে বলা? নিজেও চিরজীবন কষ্ট পেল, মেজদাকেও কষ্ট দিল। তুই কোথায় বাপকে সান্ত্বনা দিবি, এতদিন পরে একটু জুড়তে দিবি, তা না খালি সেই মায়ের সুরই ধরছিস্। মেজদার জন্যে তোর একটু কষ্ট হয় না রে?"

মায়া খানিকক্ষণ খাওয়া ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "কি জানি পিসীমা, ঠিক করে কিছু বুঝতে পারি না। মনে হয় আমি যাই করি, বাবার তাতে বেশী কিছু এসে যাবে না। এতদিন ত আমাকে না নিয়েই ছিলেন। তাঁর বেশ চলে গিয়েছে। কিন্তু মায়ের ত আমি ছাড়া কেউ ছিল না। বাবাও তাঁকে ত্যাগই করেছিলেন। তাই মনে হয় আমি যদি এখন মায়ের মতের বিরুদ্ধে চলি, তাহলে তিনি স্বর্গে থেকেও শান্তি পাবেন না। তাই কি আমার করা উচিত হবে?" কথা বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওমা, ওকি, খেতে বসে চোখের জল ফেলিসনে, ওরকম করতে নেই। আচ্ছা এখন ওসব কথা থাক, পরে হবে। তবে তুই যা বল্‌ছিস, তাও ঠিক নয়। মেজদা তোকে কতখানি যে ভালবাসে, তা তুই বুঝতে পারিস না। পুরুষ মানুষ হাজার কাজে ঘোরে, তাদের ভালবাসা কাজ দিয়ে বুঝতে হয়, কথায় অত বোঝা যায় না। তাদের স্বভাবে আর মেয়েদের স্বভাবে তফাৎ ঢের।"

তখনকার মত কথাটা ঐখানেই চাপা পড়িল। মায়ার খাওয়া শেষ হইলে ইন্দু খাইতে বসিল। মায়ার মনটা বড় বেশী ভার হইয়া উঠিয়াছিল। সে আর পিসীমার সঙ্গে গল্প করিবার চেষ্টা করিল না। উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে চুপচাপ শুইয়া পড়িল। ইন্দুও বোধ হয় তাহাকে খানিকক্ষণ ভাবিতে সময় দেওয়া দরকার মনে করিতেছিল। সেও নিজের ঘরে বসিয়া "অমিয় নিমাই চরিত" পড়িতে আরম্ভ করিল।

নিরঞ্জনের গাড়ী আসিয়া থামার শব্দে মায়া খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। সে ঘুমাইতে পারে নাই, শুইয়া শুইয়া কেবল আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। নিরঞ্জনের চা খাইবার সময় এখন রোজই সে কিছু না কিছু খাবার লইয়া গিয়া উপস্থিত হয়। কথা বলিতে পারুক বা নাই পারুক, বাপের কাছে বসিয়া থাকে।

আজও সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার জন্যে আজ কিছু তৈরি করনি, পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "না, আজ আর কিছু করিনি। তবে ক্ষীরের ছাঁচগুলো এখনও বেশ ভাল আছে, তাই দুখান নিয়ে যা না?"

মায়া রেকাবীতে করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ বাহির করিতে করিতে বলিল, "তুমি চল না? খুব ত পড়েছ, এখন থাক।"

ইন্দু বলিল, "যা যা, মেয়ে যেন সং। বাপের কাছে

যাবি তা এত ভয় কিসের? তোকে মারে না ধরে? তুই বা এখন, আমি পরে যাব।"

মায়া নাছোড়বান্দা, বলিল, "তুমি না গেলে বাবা নিশ্চয় খোঁজ করবেন। সেই যখন যেতেই হবে, তখন না হয় আমার সঙ্গেই গেলে? ঐ শোন, ঘরে আবার কার গলা শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় কেউ বাইরের লোক এসেছে। আমি যাব না, পিসিমা।"

ইন্দু বই বন্ধ করিয়া রাখিল। বলিল, "বাবা, তোর মত মেয়ে যদি আর একটা আমি দেখেছি! একেবারে নবাবের বেগম! বাইরের লোক দেখে ফেললে একেবারে ক্ষয়ে যাবি, না? একরত্তি ত মেয়ে, তার এত বাড়াবাড়ি কেন রে?"

এমন সময় নিরঞ্জনের 'বয়' আসিয়া বলিল, "সাহেব ডাকছেন।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার ঘরে আর কে কে আছে?"

'বয়' বলিল, "আর একজন শুধু বাইরের বাবু আছেন।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম বাবু রে? তুই আগে তাকে কখনও দেখিস্‌নি?"

'বয়' বলিল আগে এ বাড়ীতে তাহাকে দেখি নাই। একজন বুড়াবাবু।

ইন্দু বলিল, "যা তবে। বুড়োমানুষ, তার কাছে আবার লজ্জা কি? ক্ষীরের ছাঁচ আর দুখানা নিয়ে যা। সে লোকটিও অবিশ্যি মেজদার সঙ্গে চা খাবে।"

নিরঞ্জন ডাকিয়া না পাঠাইলে মায়া হয়ত শেষ পর্য্যন্ত যাইতে অস্বীকারই করিত, কিন্তু সাবিত্রীর শিক্ষায় আর যাহা হউক বা নাই হউক, বাধ্যতা জিনিষটা তাহার এমন অস্থিমজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছিল যে, গুরুজনের আদেশ অবহেলা করার চিন্তা মাত্রও কোনোদিন তাহার মাথায় আসিত না। অতএব রেকাবীতে করিয়া গুটিকতক ক্ষীরের ছাঁচ লইয়া সে কম্পিতপদে খাইবার ঘরের দিকে যাত্রা করিল। ইন্দুও তাহার পিছন পিছন চলিল। সে ঘরে ঢুকিবে না, আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিবে মানুষটা কে।

খাইবার ঘরে ঢুকিয়া মায়া দেখিল, তাহার বাবার চেয়ারের সামনা-সামনি একটা চেয়ারে, প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তাঁহাকে মায়া ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। মাথায় টাক, গোঁপজোড়া বেশ পাকা, পরনে অর্দ্ধমলিন ধুতি ও পাঞ্জাবী, কাঁধে একখানা পুরানো তসরের চাদর। পায়ের জুতাজোড়াও বেশ পুরানো।

মায়া ঘরে ঢুকিতেই নিরঞ্জন বলিলেন, "এইটি আমার মেয়ে, যোগীনবাবু।" মায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি তোমাকে বাংলা, আর সংস্কৃত পড়াবেন, সামনের হপ্তা থেকে।"

মায়া খাবারের রেকাবী টেবিলের উপর রাখিয়া ভদ্রলোককে প্রণাম করিল। তিনি অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "থাক্ মা, থাক্। তুমি বসো। তোমার নাম কি?"

মায়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, "শ্রীমতী মহামায়া দেবী।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "এঃ, একেবারে আমাদের সেকালের নাম রেখেছেন যে। তা মেয়ে বেশ বুদ্ধিমতী, খুব চট্‌পট্ শিখ্‌তে পারবে।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "রসুন, আগে পড়া আরম্ভই করুক, তারপর বুদ্ধিমতী কিনা বোঝা যাবে। এতকাল ত একরকম কিছুই করেনি, এখন একটু তাড়াতাড়িই এগোনো দরকার।"

যোগীনবাবু বলিলেন, "তা ত বটেই। আমি যথাসাধ্য যত্ন করব। তবে হাজার হোক মেয়ে ছেলে, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ত তাকে হতে হবে না, মোটের উপর খানিক শিক্ষা হলেই হবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমার ছেলে ত নেই, কাজেই মেয়েকে দিয়েই সব সাধ মেটাতে হবে। ছেলে থাকলে তাকে যেরকম শিক্ষা দিতাম, একেও তাই দেব। যাক, সে কথা পরে হবে। কৈ আপনি ত কিছুই খাচ্ছেন না দেখি। মায়া, আজ কি এনেছ?"

মায়া বলিল, "ক্ষীরের ছাঁচ। পিসী মা আজ আর কিছু তৈরি করেন নি।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার মাষ্টার-মশায়ের প্লেটে বেশী করে দাও। কেক্‌টেক্ একেবারেই খাবেন না

নাকি?" ভদ্রলোক একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন "ওসব খাওয়া বেশী অভ্যেস নেই কিনা? আর এই যে এত ফলটল দিয়েছেন, কত আর খাব? দাও মা, এই প্লেটেই দাও, আর আলাদা জায়গা দরকার নেই। আমার এক গেলাস জল হলেই চল্‌বে, চা সেই সকালে একবার খাই, নেহাৎ সর্দ্দিটর্দ্দি হলে দুবার খাই।"

মায়া উঠিয়া গিয়া ভদ্রলোকের জন্ম জল লইয়া আসিল। নিরঞ্জনই অবশ্য তাহাকে যাইতে বলিলেন। কারণ খ্রীষ্টান 'বয়ের' হাতে জল খাইতেও হয়ত তাঁহার আপত্তি হইতে পারে।

মায়া পাশের ঘরে আসিতেই ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা রে, কে ও ভদ্রলোক?"

মায়া তাহার ভাবী মাষ্টার দেখিয়া যথেষ্ট আশ্বস্ত হইয়াছিল। ইনি একেবারে ঠিক তাহাদের দলের মানুষ। খাঁটি হিন্দু, কোথাও সাহেবীআনার নামগন্ধও নাই। ইহার কাছে পড়িবে শুনিয়া সে খুবই নিশ্চিন্ত বোধ করিতে লাগিল। ইন্দুর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "বেশ চমৎকার ভদ্রলোক পিসীমা, ঠিক যেন বাড়ীর লোকেরই মত। আমাকে সামনের হপ্তা থেকে বাংলা আর সংস্কৃত পড়াবেন। বাপ রে আমি ভয়ে মর্‌ছিলাম, না জানি বাবা সাহেব না মেম কি যে ধরে আনবেন।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তোর সব তাতেই কেবল ভয় আর ভয়। শুধু বাংলা ত পড়বি এঁর কাছে, আর সব পড়াবার জন্যে তোর বাবা কাকে ধরে আনে তাই দেখ্‌ আগে।"

মায়ার মুখ ম্লান হইয়া আসিল। ইন্দু বলিল, "এই ত্যাও, মেয়ের অমনি কন্যাদায়ের ভাবনা চাপল। যা যা, জল নিয়ে যা।"

মায়া জল লইয়া বাহির হইয়া গেল। সত্যই ত এত আগেভাগে খুসি হইবার তাহার কোনো কারণ নাই। আচ্ছা, তাহার এত ভয়ই বা হয় কেন? সব মানুষেই কি বরাবর একভাবে থাকিতে পায়? বিশেষ বাংলাদেশের মেয়েমানুষ, তাহারা বাপের বাড়ী হয়ত একভাবে গড়িয়া ওঠে, শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া একেবারে ভিন্ন রকম হালচাল ধরিতে বাধ্য হয়। তাহা লইয়া কেউ এত ত মাথা-কোটাকুটি করে না? কিন্তু তাহার যেন সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তনের নামে প্রাণ বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হয়। এ রকম কেন হয়? সবটাই কি মৃতা জননীকে, তাহার শিক্ষাদীক্ষা স্মরণ করিয়া? সে নিজে এ সবে কতটা বিশ্বাস করে? মায়া বুঝিতে পারে না।

যাই হোক, সম্প্রতি সে জল লইয়া ফিরিয়া গেল। যোগীনবাবুর খাওয়া এক রকম শেষই হইয়া গিয়াছিল। তিনি বসিয়া বসিয়া নিরঞ্জনের সহিত কি কি বই মায়ার জন্ম প্রথম প্রয়োজন হইবে, সেই বিষয়ে গল্প করিতে-ছিলেন। চা খাওয়া শেষ হইতেই নিরঞ্জন তাঁহাকে লইয়া নিজের আপিস-ঘরে উঠিয়া গেলেন। মায়া পিসীর কাছে গিয়া জুটিল। ইন্দু বসিয়া বসিয়া একখানা চিঠি পড়িতেছিল। পাশে আর একখানা চিঠি খোলা পড়িয়া আছে।

মায়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "একটা ন' খুড়ীর মেয়ে সরোজ লিখেছে, আর একটা বড় বৌদি।"

মায়া কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজ পিসী কি লিখেছে? গাঁয়ের সবাই ভাল আছে?"

তাহার পিসী হাসিয়া বলিল, "গাঁ-সুদ্ধর খবর কি আর দিয়েছে? তাদের বাড়ীতে সব জরজাড়িতে ভুগ্‌ছে। আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকের দেওয়ালটা নাকি ঝড়ে পড়ে গিয়েছে। ওরা যখন থাকবার জন্যে বাড়ী নিল তখন ত খুব মুখ বড় করে বলেছিল, মেরামত যা যা দরকার হবে সব নিজেরাই করিয়ে নেবে, এখন নাকি কিছু কর্‌ছে না। বল্‌তে হবে মেজদাকে। বড়দা ত এ সব কথা কানেও নেয় না।"

মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওমা দেওয়াল না বগালে আমাদের ঘর দোর সব নষ্ট হবে যে? ভিতরে যত গরু-বাছুর ঢুকে ফুল গাছটাছ সব খেয়ে ফেল্‌বে।"

ইন্দু বলিল, "তাইত ভাবছি। এতকালের বাপ-পিতামর ভিটে, কি দশা সব করছে কে জানে? নিজের লোক একটাও যে নেই এমন, যাকে ওখানে রাখা যায়।"

মায়া বলিল, "পিসীমা, আমার ইচ্ছে করছে, এখনি তোমায় নিয়ে দেশে চলে যাই। আহা, অমন সুন্দর ফুলগাছগুলো আমার! ফুল ফুটলে সারা উঠোনটা যেন আলো হয়ে উঠত।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তা তোর বাবা ত তোকে ছাড়বে না ফুলগাছ চৌকী দিতে। বলে-কয়ে দেখি যদি আমাকে ছাড়ে। আমি থাকলে ঘরদোরের কিছু অযত্ন হবে না।"

মায়ার চোখে একেবারে জল আসিয়া পড়িল। সে বলিল "পিসীমা, কিরকম নিষ্ঠুর তুমি! আমাকে একলা রেখে তুমি চলে যাবে? এখন কিছুতেই আমি তোমায় ছাড়ব না।"

পিসী তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনার সুরে বলিল, "আরে আজই আমি যাচ্ছি নাকি? আগে দেখি মেজদা কি বলে। বাপের কাছে থাকবি, তার আবার একলা কিসের? এর পর পড়াশুনো নিয়েই ত সারাদিন কেটে যাবে। আবার বড় বৌদি কি লিখেছে জানিস্?"

মায়া নিরুৎসাহভাবে বলিল, "কি লিখেছেন?"

"লিখেছে, তারা শীগ্‌গিরই এখানে বেড়াতে আসবে। জয়ন্তীর নাকি কোথা থেকে খুব ভাল বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। যদি বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে একেবারে মেয়ে-জামাই নিয়ে বেড়াতে আস্‌বে। আর যদি বিয়ে নাই হয়, তাহলে ত আগেই আস্‌বে। বড়দা না এলেও জয়ন্তীর মামা তাদের নিয়ে আস্‌বে।"

মায়া বলিল, "দিদি কিন্তু একদিন বল্‌ছিল বি-এ পাশ না করে কখনও বিয়ে করবে না।"

ইন্দু বলিল, "হিন্দুঘরের মেয়ের সব নিজের মতেই হয় কিনা? বাপ-মা যখন যার হাতে দেবে, তাই স্বীকার করে নিতে হবে?"

মায়া হঠাৎ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, নিজের মতে বিয়ে করলে কি হিন্দুর মেয়ের পাপ হয়, পিসীমা?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "পাপ হ'তে যাবে কেন? তবে আমাদের সমাজে এখন ওটার চলন নেই, পুরাকালে সবাই ত স্বয়ম্বরাই হত। কেন, তোর কাউকে বিয়ে করতে মন গেল নাকি?"

"যাও পিসীমা, কি যে বল!" বলিয়া মায়া একছুটে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

রাজা রামমোহন ও রাজারাম

রাজারাম সম্বন্ধে ও তাঁহার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে Sir William Foster কৃত *"John Company"* পুস্তকের ২৬৬-৬৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ লেখা আছে :—

"It is rather surprising to find a native of India acting as a clerk in the office of the Board (India Board). This happened in 1835-38, and is part of an interesting story. Many years before, an Englishman in the Company's service, while attending a religious festival at Hardwar, found alittle Indian boy wandering about forlorn and destitute, his parents having either died or lost him in the crowd. Taking pity on the child, he carried him down to Calcutta, and, being himself on his way to England, asked Rammohun Roy, the celebrated Bengali religious reformer, to take charge of him temporarily. However, the good Samaritan died at sea, and the boy grew up under the care of Rammohun Roy, who treated him as a son, though he did not formally adopt him. When in 1830 Rammohun Roy, now dignified with the title of Raja, embarked for England to claim certain lands for the Company on behalf of the

Great Mogul, he took with him Rajaram Roy, as the youth was named. Rammohun Roy, though his mission proved unsuccessful, was much lionized in England and France, largely on account of his enlightened views on religious matter; and much regret was expressed when he died at Bristol in the autumn of 1833. Rajaram Roy, thus left alone in a strange land, was doubtless befriended for a while by the admirers of the deceased Raja; but in time he found himself obliged to look around for means of support. In August, 1835, he was appointed by Sir John Hobhouse (then President) an "extra clerk" in the office of the Indian Board for one year at a salary of £100, on the plea that he desired to obtain some insight into the system of transacting public business before returning to his own country. His engagement was continued until the spring of 1838, when, as he was about to embark for India, the Board resolved to pay him up to the following August and to give him a gratuity of £100. His subsequent history has not been traced."

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত

—

"রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"

বেঙ্গল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা

এই কার্য্যের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা ইহার ভিত্তিস্থাপন হয়। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয় আরও অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণের ন্যায় শ্রদ্ধেয় শশীবাবুকে সাহায্য করিয়াছিলেন মাত্র। বেঙ্গল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বাস্তবিক যদি কাহারও সম্মান প্রাপ্য হয় ত তাহা শশীবাবুরই।

বেঙ্গল একাডেমীর উন্নতি ও পরিপুষ্টির জন্য যাঁহারা প্রসন্নবাবু অপেক্ষা বহুগুণ বেশী পরিশ্রমস্বীকার ও আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে লেখিকা বিশেষ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। প্রসন্নবাবু বেঙ্গল একাডেমীর বিশ বৎসর জীবনের মধ্যে ইহার পাঠশালা অবস্থায় প্রথম এক বৎসর মাত্র সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর যথাক্রমে মিঃ জে-আর-দাস, মিঃ এস-এন-সেন ও ডাঃ পি কে দে, মহাশয়েরা ৪, ৮ এবং ৭ বৎসর করিয়া সম্পাদক ছিলেন। বর্ত্তমানে ডাঃ পি-কে-দে মহাশয়ই সম্পাদক আছেন। ইঁহারা এবং রেঙ্গুনের অন্যান্য বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়েরা সকলেই এই বিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রসন্নবাবু তাঁহাদেরই অন্যতম। তাঁহাকে প্রধানতম বলিয়া চিত্রিত করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বেঙ্গল একাডেমীর উন্নতি সম্পর্কে যদি কোন একজন ব্যক্তিরই নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে তিনি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত জ্যোতিশরঞ্জন দাস মহাশয়। বিদ্যালয়ের জন্ম হইতেই তিনি ইহার সহিত সংযুক্ত, প্রথমে সম্পাদকরূপে পরে সভাপতিরূপে। অর্থাভাব, দলাদলি ইত্যাদি নানা প্রকার অন্তরায়ের মধ্যে তিনি নিজের অর্থ, চিন্তা ও পদমর্য্যাদা দ্বারা বিদ্যালয়টির জীবনরক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বেঙ্গল একাডেমীতে যাঁহারা এক হাজার বা তাহার অধিক টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদের তালিকার মধ্যে ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার ও তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ যোগেন্দ্রকুমার মজুমদারের নামের ব্যাখ্যা এই:—মাসিক ৮০৲ টাকা হিসাবে এক বৎসর যে দানের কথার উল্লেখ আছে, তাহা তাঁহাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পরিদর্শক হিসাবে বেতন ছিল। ঐ টাকা তাঁহারা লন নাই। তাঁহাদের পরবর্ত্তী ডাঃ কে-সি-ঘোষ ও ডাঃ বি-কে-বিশ্বাস মহাশয়েরাও তাঁহাদের বেতন লন নাই। এইরূপ আর একজনের নাম বাদ পড়িয়াছে যিনি বাস্তবিক এক হাজার টাকা বিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন; তাঁহার নাম মিঃ বি-কে-হালদার।

তবে প্রসন্নবাবু বেঙ্গল একাডেমীর আর্থিক দুরবস্থার সময় মধ্যে মধ্যে সুদসহ টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাহার জন্য এই সুযোগে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী দানবীর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বেঙ্গল একাডেমীর আর্থিক দুরবস্থার সময় তিনি বহু অর্থ বিনা-সুদে ধার দিয়া সাহায্য না করিলে বিদ্যালয় টিকিত কিনা সন্দেহ। যখনই বিদ্যালয়ের অর্থের অনটন হয় তখনই তিনি ইহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন। এইরূপ সময়োপযোগী সাহায্যের দ্বারা তিনি বেঙ্গল একাডেমীকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

এই বিদ্যালয়ের ইতিহাস এই। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতের পার্থক্য হওয়াতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেঙ্গল একাডেমীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রামমোহন একাডেমী নামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিদ্যালয় সুন্দর ভাবে ছয় বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। পরে বেঙ্গল একাডেমীর কর্ত্তৃপক্ষের ঐ বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি বালিকা-বিভাগ খুলিবার বাসনা হওয়াতে ভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপন না করিয়া তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত রামমোহন একাডেমীকেই তাঁহাদের বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। শশীবাবু ঐ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে ১৯১৮ সালে রামমোহন একাডেমী বালিকা বিভাগ রূপে বেঙ্গল একাডেমীর সহিত যুক্ত হইয়া যায় এবং শশীবাবু ও তৎসঙ্গে পুনরায় বেঙ্গল একাডেমীতে যোগদান করেন।

বেঙ্গল একাডেমীর ইতিহাস সম্পর্কে শেষ কথা আমাদের এই যে, ইহা কোন 'একজন' ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় হয় নাই। এই বিশ বৎসর ধরিয়া বহুব্যক্তি ইহার উন্নতির জন্য নানা প্রকার পরিশ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ বাঙ্গালী-সাধারণের সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই এই বিদ্যালয়টি বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী

—

সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলার দান

১৩৩৬ সনের পৌষের প্রবাসীতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের কয়েকটি স্থানের সম্পর্কে গোটা-কয়েক কথা মনে হইতেছে।

(১) মাননীয় অধ্যাপক মহাশয় ব্যাকরণ—পাণিনীয় সম্প্রদায়ে—

পুরুষোত্তম দেবের ভাষাবৃত্তি ও সৃষ্টিধরের ভাষাবৃত্তার্থবিবৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আধুনিক বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নাম কি উল্লেখ্য মনে হয় না? তিনি বহুদিন পাণিনীয় ব্যাকরণ চর্চ্চা করিয়া প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি ইহার একখানা উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তথায় বি-এ বিশেষ শ্রেণী ও এম্-এ তে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া উহাকে বঙ্গে প্রচারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(২) ত্রৈলোক্যমোহন গুহ-নিয়োগীর মেঘদৌত্যম্ মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের পরিশিষ্টরূপে লিখিত হইয়া ১৯০৯ খ্রীঃতে প্রকাশিত হয়। ইহা মেঘদূতের অনুরূপ আগাগোড়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত ও পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ দুই খণ্ডে সমাপ্ত। পূর্ব্বমেঘে মেঘদূত-পূর্ব্বমেঘে বর্ণিত পথে মেঘের গমন ও উত্তরমেঘে মেঘদূত-উত্তরমেঘে বর্ণিত যক্ষপ্রিয়াকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন। অধিকন্তু যক্ষবনিতার কথা শ্রবণ করিয়া মেঘের কুবেরের নিকট গমন ও উভয়ের বার্ত্তা নিবেদন করিয়া সুহৃদের মুক্তি প্রার্থনা এবং কুবেরের কোপশান্তি ও বিরহিতদ্বয়ের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য অনেকস্থলে ইহাতে মেঘদূতের অনুরূপ শব্দসমষ্টি ও বাক্যাবলী যথাযথ অনুকৃত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি ইহা সুপাঠ্য—কাব্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলার এই দান অগ্রহণীয়ও নহে।

(খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে চর্যা গ্রন্থখানি নেপালের মহারাজের গ্রন্থাগার হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন [তিনি যাহাকে চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় বলিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যাহার নাম আশ্চর্য্যচর্য্যাচয় কিনা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন] তাহা অনেক বিজ্ঞ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের মতে অবিসংবাদিতরূপে বাংলা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অন্ততঃ অনেকানেক পদকর্ত্তা যে বাঙ্গালী সে বিষয়ে বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। লুইপাদ তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। তেঙ্গুরেও তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার রচিত চারিখানি সংস্কৃত পুঁথি আছে; উহা বজ্রগুরুগণের পুঁথি—(১) বজ্রসত্ত্বসাধন, (২) বুদ্ধোদয় (৩) শ্রীভগবদভিসময়, ও (৪) অভিসময় বিভঙ্গ। এতদ্ব্যতীত সবরপাদ বা শবরীশ্বর, কাহ্নপা বা কৃষ্ণাচার্য্য, আর্য্যদেব প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যগণের ও বৌদ্ধবজ্রযান পন্থার প্রচার ও প্রকাশোপযোগী বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

(গ) বাণের কাদম্বরী অতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কথাগ্রন্থ। রচনা-রীতির সমৃদ্ধির জন্য উহা সাধারণের অপ্রবেশ্য ও অনধিগম্য সংস্কৃত সাহিত্যের মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ কাননে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত উহার একটি সরল, সহজ ও সকলের অধিগম্য সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) কোষ ও অলঙ্কার গ্রন্থে—১১৫৯ খ্রীঃতে রচিত বন্দ্যঘটির সর্ব্বানন্দের অমরকোষের টীকাসর্ব্বস্বের উল্লেখ না দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। ইহা শুধু কোষগ্রন্থ বলিয়াই মূল্যবান নহে; ইহাতে অতিপ্রাচীন বহু বাংলা শব্দের অস্তিত্ব থাকায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও অত্যন্ত বেশী।

(৪) আয়ুর্ব্বেদেও শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনের প্রত্যক্ষশারীরম্ ও ৺ভগবানচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত মাধবনিদানের টীকা—মনোরমা পঞ্জিকা, (প্র প্র ১৮২৯ শকাব্দ) এবং ৺গঙ্গাধর সেনের জল্পকল্পতরু নামক ৬০,০০০ শ্লোকে রচিত চরকের টীকা বিশেষ উল্লেখ্য। ইহাদের উল্লেখ না থাকায় চৌধুরী মহাশয়ের অমন সুলিখিত প্রবন্ধটি অঙ্গহীন ও ম্লান হইয়াছে। গঙ্গাধর সেনের নাম বহুকারণেই উল্লেখ্য ছিল। তিনি মুগ্ধবোধ, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি তিনখানি উপনিষদ প্রভৃতির টীকা ও ভাষ্য, অগ্নিপুরাণোক্ত আয়ুর্ব্বেদের ভাষ্য "প্রাচ্যপ্রভা" প্রভৃতি বহু টীকা ও ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং "দুর্গাবধ" "লোকালোক পুরুষীয়" কাব্য, "নির্ব্বৃতি প্রাদুর্ভাব" আখ্যায়িকা, "হর্ষোদয়"—চিত্রকাব্য ও চৈতন্যাষ্টক, "গোবর্দ্ধন বর্ণন" "রাধাকৃষ্ণ বর্ণন" প্রভৃতি বহু কাব্যাদিও রচনা করিয়াছিলেন।

ইহারা ছাড়া স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ যায় ধাতুপাঠম্ ত আছেই, আরও অনেক বাঙ্গালীর রচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ যে না আছে এমন নয়।

শ্রীহরিপদ সেন-গুপ্ত

দিয়ে নিয়ে

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

"কালীঘাটের কুকুর।" হরিশ সুধা ব্রজ ভোলা পুঁটি ইন্দিরা সনৎ শিবরাম সবাই দূরে সরে গেল। যার উদ্দেশে ঐ কথাটি বলা হয়েছিল সে বছর-নয়ের একটি দুরন্ত অভিমানী মেয়ে;—গৌরী তার নাম।

আঁচলে অনেকগুলো কাঁচা কষা পেয়ারা কামরাঙা ছিল, চোখের জলের সঙ্গে সেগুলোও ঝরে পড়ে গেল।

ওরা ঠিক আমাদের এখনকার মতন ও কথাগুলোকে অবিশ্বাস করত না। খানিক আগেই 'চোর' হয়ে বাড়ী যাওয়া এবং অখাদ্য কিছু পুড়িয়ে ভাত খাওয়ার উপদেশে গৌরীর মেজাজটা চড়েই ছিল, তারপর আবার এই অপবাদ! ও যে দৌড়তে পারে না, আর ওরা সবাই বয়সে বড়, তাই পারে—সে কি ওর দোষ? ওকে ওরা কোলে করে নিত, কিন্তু সে ওঁর ভাল লাগে না;

কিন্তু ওরা যে কেবলি তাই বলে ওকেই ছুঁয়ে দেয়

রোজ,—আজকে আবার 'চোর' করে রেখে দিয়েছে—ভারী অন্যায়। ওই শ্যামপিয়ারী লক্ষ্মীছাড়িটাই তো যত নষ্টের গোড়া, ওই তো প্রথমেই ওকে ছুঁয়ে দিয়ে চোর করেছিল। আর গৌরী বেচারী ত ওই হরিশদাদা ছোটমাসী আর দিদিদের মতন দৌড়তে পারে না, তাই সাত দান ওকেই চোর হ'য়ে থাকতে হল।

সন্ধ্যেটা বেশ ঘনিয়ে এসেছে। গৌরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। 'ব্যাঙ পুড়িয়ে ভাত খাওয়া'র প্রস্তাবেই যথেষ্ট হয়েছিল, তার ওপর আবার "কালীঘাটের কুকুর।" কাল তো চলেই যাবে—বাবার পূজার ছুটি শেষ হয়ে গেছে; তবু বড়মাসীমার ছেলে হরিশদাদা অন্য মাসীর ছেলেরা, ছোটমাসীরা সব ওকে ওই রকম করছে—ছাই মামার বাড়ী!

কেন শ্যাম ওকে ছুঁলে, ওতো চাকরের মেয়ে? ও কেন খেল্‌বে ওদের সঙ্গে? গৌরীর মনে হচ্ছিল শ্যামকে কেউ এই রকমের চোর করে দেয় তো ঠিক হয়।

শ্যাম একটু দূরে অন্য দিকে ম্লানমুখে দাঁড়িয়েছিল; তার হাতে একটা ভাল পুতুল, অনেক "হীরে মুক্তোর" বিছে হার, কামরাঙা হার চিক ইত্যাদি পরা, শাড়ীখানিও দামী রেশমের টুকরোর। সেইটেই গৌরী রাগে ফেরৎ চেয়েছিল, আর ওই হতভাগা দুষ্টু ছেলেগুলো তাই ওকে এমনি করে জ্বালাতন করছে। এমন কি গৌরীর দাদা দিদিরাও ওদের দলে।

"ওতো আমার মেয়ে" চোখে অগ্নি বর্ষণ ক'রে—তখন জল শুকিয়ে গেছে—গৌরী বল্‌লে, "ওকে নিলেও বুঝি দোষ হয়?"

শাস্ত্রে এবং তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি হরিশের ছিল। বয়সেও গৌরীর চেয়ে বড়; তার উপর ও ছিল বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের ডানপিটে ছেলে। পুজোর সময় ওর আসার অপেক্ষায় উৎসুক ভক্তের সংখ্যা মামার বাড়ীতে কম ছিল না, সে বল্‌লে "মেয়ে তো দিয়ে দেয়। জানিস নে কন্যাদান বলে? আর নিবি তো নেনা, আমাদের কি ভাই? তোর ইচ্ছে তুই দিয়ে নিবি।"

"মেয়ে তো বাপের বাড়ী আসে" আগুনটা নিবিয়ে জল এসে পড়ল। "কেন শ্যাম ছোঁবে আমাকে, আমি কক্ষণো দোব না পুতুল। ভেঙে যাক বিয়ে—ছাই বিয়ে আমি চাইনে। ওকে নিয়ে কেন খেলবে হরিশ দাদা...।"

খেলাটা যে অনেকগুলো সঙ্গী নইলে জমে না এবং এ যাবৎকাল অবধি জাতি বর্ণ ভেদের কথা কেউ তোলেইনি আর এই মামাবাড়ীতে তো এটি সর্ব্ববাদি-সম্মতই ছিল। এ সব কথা গৌরীর মনে হ'ল না। যাবার দিনের আগে অবধি শ্যাম-সমস্যা ওঠেই নি! বরং শ্যামের মা'র রুটী আর ডাল নিজেদের মায়েরা ঘুমিয়ে পড়লে কতদিন অত্যন্ত সঙ্গোপনে দল বেঁধে ওরা সকলে পরিতোষ করে খেয়েছে, আঁচায়নি অবধি। সেদিন কালুর জামার পকেট থেকে তার এক টুকরা আবিষ্কার করে নতুনমাসী হেসে লুটোপুটি খেলে। ওরা সব নিরীহ ভালমানুষের মতন চুপ করে রইল। কালুর পকেটে শ্যামের মার রুটী? তাই তো, কে জানে কি করে এল? এ বিষয়ে মন্ত্রগুপ্তির একতা আর প্রকাশ্যে 'ধোপা নাপিত বন্ধ' অর্থাৎ দলচ্যুতি—তাতেও মতভেদ দেখা যায়নি। কাজেই আজকে শ্যামপিয়ারীর অপরাধ গৌরী ছাড়া আর কারুর কাছেই গুরুতর মনে হচ্ছিল না। সবাই তো 'চোর' হয়; শ্যামও তো 'চোর' হয়।

আসলে গৌরী আর শ্যাম প্রায় এক বয়সী; দুজনেই দৌড়তে কম পারে ওদের চেয়ে,—কাজেই শ্যাম গৌরীকে 'চোর' করে, গৌরী শ্যামকে চোর করে; এ ছাড়া গতি থাকে না। ঘটনাচক্রে আজ গৌরী 'সাতদান চোর' রয়ে গেল, একবারও শ্যামকে ছুঁতে পারলে না।

'সাতদান চোর' হয়ে থাকলে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে খেলুড়ে আইন ও দল ভেদে নানাবিধ রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেটা পালন করতে না পারলে বা না করলে তার সেদিনের খাবার নির্দ্দেশ করে দেওয়ারও প্রথা আছে। সেটা সকলে এমনি সমবেত নিষ্ঠার সঙ্গে ঘোষণা করে দেয় যে, তা অনেক সময় বড়দের বড় বড় আচার-নিষ্ঠার ব্যবস্থার ঘোষণার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

দলপতি বা নেত্রীর আদেশ না মেনে বড়দের কাছে আশ্রয় পাওয়া যায়, কিন্তু তার পরদিন আর খেলা করা যায় না।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে, প্রায় রাত্রি, আকাশে তারা ভরে উঠেছিল, ঠাণ্ডাও বেশ পড়ে আসছিল। বাড়ীর ভেতর থেকে ডাক্ পড়ল, "ওরে খাবি আয়। ছোটগুলোকে নিয়ে আয় না, হিম পড়ছে যে।" চাকররা সচেতন হয়ে ডাকতে এল।

শ্যাম আস্তে আস্তে তার সালঙ্কারা বন্ধুকে তার রুদ্রমূর্ত্তি মার পায়ের কাছে রেখে নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেল। গৌরীর পায়ের কাছে পেয়ারা কামরাঙার সঙ্গে পুতুলটা পড়ে রইল। সে চুপ করে চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

পরিশিষ্টে সকলে যতখানি আমোদের কল্পনা করেছিল সেটা তো হলই না, উপরি একটা গোলমাল হয়ে খেলার আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। বাড়ীর ছেলেরা বাড়ীর ভেতরে ঢুকল। অন্য বাড়ীর দলেরাও চলে গেল।

গৌরী দিদিমার বিছানায় না খেয়ে চুপ করে শুয়েছিল। ও রকম অবস্থায় ঘুম আসে না, কিন্তু ঘুমনো উচিত, নইলে এখুনি দিদিমা জানতে পারলে এসে 'গরম' করে খাইয়ে দেবেন। হয়ত খোকাটা সব বলে দেবে, বাবা মামারা সব হাসবেন, জিগেস করবেন, তারপর বড়দের সঙ্গেই বসে খেতে হবে।

"হ্যারে গৌরী কই?—খেলে না? শুলি যে?"—নতুনমাসী ধাক্কা দিয়ে ডাকলে।

গৌরীর দাদা সনৎ শ্লেটে ছবি আঁকছিল, গম্ভীরভাবে বল্‌লে, "কি জানি? ঘুমুচ্ছে—।"

আর সকলে খেয়ে-দেয়ে ভালমানুষের মত শুয়ে পড়েছিল।

নতুনমাসী গৌরীর জাগা ঘুম ভাঙাতে না পেরে ফিরে গেল—"ও ভাই সেজদি, তোমার মেয়ে ঘুমলো, তুলতে পারলাম না।" আর একটি দিনমাত্র আছে, সেজদি মার সঙ্গে গল্পে মহা ব্যস্ত; কোলের কাছে খোকাও শুয়ে—গৌরীর চার বছরের ছোট ভাই, বল্‌লেন, "বিকেলে খেয়েছে খাবার? দুধ খায় তো খাবে'খন।"

*　　*　　*　　*

"হ্যাঁ ভাই ছোড়দা, তুমি কালীঘাট দেখেছ?" নতুন মাসীমা চলে গেলে সুধা জিগেস করলে।

"হুঁ—উঁ। তুই বুঝি দেখিস্ নি?'

"সেখানে অনেক কুকুর আছে?"

"কেন?"

'ঐ যে তোমরা গৌরীকে বল্‌ছিলে। তা' যারা যারা দিয়ে নিয়ে নেয় সব্বাই কি কালীঘাটেই কুকুর হয়ে থাকে? অন্য কোথাও থাকে না?'

ছোড়দা ওরফে হরিশ কালীঘাটে একবার ঠাকুমা'র সঙ্গে গিয়েছিল জেঠতুতো বোনের বিয়ের পরে মা-কালীকে সিঁদুর পরানোর সময়ে। সে সময়ে কুকুর-বাহুল্য ছিল কিনা তা তো তার মনে নেই তবে ভিখারী পাণ্ডা পূজারীর প্রাচুর্য্যে দর্শনার্থীদের ঠেলাঠেলিতে সকলের ত্রাহি মধুসূদন মনে হচ্ছিল, সেইটেই বেশ মনে আছে। ঠাকুমা দিদির প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল, জ্যেঠামশায়ের ছেলে নরেন-দা, রেগে উঠে কা'কে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল ··। কিন্তু কুকুর তো খুব বেশী দেখতে পায় নি—হয়ত ছিল তারা,—কোথাও রাস্তা গলিতে ছিল। আছে নিশ্চয়ই। বল্‌লে, "আছে বই কি, কিন্তু তারা তো মার খায় কিনা, তাই দূরেই থাকে বোধ হয়। আমি দেখিনি তাই। আর সবাই তো দিয়ে নিয়ে নেয় না, তাই সবাই কুকুরও হয় না।"

সুধা একটু চুপ করে রইল, তা হলে কি বেচারী গৌরী একলাই কুকুর হবে? "আচ্ছা ভাই, সবদেশের লোকই তো মরে যায়? তারা কেউ কেউ ওরকম আছে তো। সেদিন তো কিষণ তার বোনের কাছ থেকে পেনসিলটা নিয়ে নিলে,—ওই তো দিয়েছিল।"

"ও তো মরেনি, মরলে পরে তো হবে। আর অন্য জায়গায়ও বোধ হয় এই রকম মন্দিরের কাছে তারা থাকে।"

গৌরীর নতুনমাসী একবাটী দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, "কোন মন্দির রে? কে থাকে?"

বড়রা চুপ করে রইল, খোকা এসে শুয়েছিল গৌরীর পাশে, বল্‌লে "ঐ কালীঘাটের কুকুর—ছোড়দি আজ শ্যামের কাছ থেকে পুঁতুল নিয়ে নিয়েছে কিনা।"

গৌরীর জেগে ঘুম রেগে ভেঙে গেল, "আমি বুঝি নিয়েছি—আমি তো ছুঁইও নি।"

"ওমা জেগে আছিস? তা খাবি চল্। কি হয়েছে কি, মুখখানা নীল হয়ে উঠেছে?"

গৌরীর দাদা সনৎ বললে, "চাইলি তো—তাহলেই নেওয়া হল। জানো নতুনমাসী, ও শ্যামের কাছ থেকে পুঁতুল ফিরিয়ে চেয়েছে।"

নতুনমাসীর ব্যাপারটি বোধগম্য হ'ল, "তাই বুঝি তোমরা কালীঘাটের কুকুর সমস্যা তুলেছ।" নতুনমাসীর বয়স এত বেশী নয় যে, তখন সেটাকে মনে মনে উপভোগ করে, কলহাসিতে ঘর ভরিয়ে পাশের ঘরের ভাইদের ডেকে বললে, "ও ভাই ছোড়দা শোনো, ছেলেগুলোর দুষ্টু বুদ্ধি শোনো। তাই গৌরী খায় নি! 'কালীঘাটের কুকুর' হয় না—কালীঘাটের হাতী হয়! কাল ওরা চলে যাবে—পাজী ছেলেরা ওকে ক্ষেপাচ্ছে।"

যদিও ব্যাপারটা মন্দ লাগছিল না, তবু একটু গম্ভীর চালে সকলকে বকে গৌরীকে সে খাওয়াতে নিয়ে গেল। এবং খাবার দালানে সমবেত দিদিমা দাদামশাই মামারা মামী, মাসীরা গৌরীর মা বাবার মাঝখানে কুকুর-সমস্যা আলোচনা অট্টহাস্যে মৃদুহাস্যে একচোট হয়ে গেল।

খাওয়াটা গৌরীর ভালই হ'ল। দাদামশাইয়ের পাশে বসে তাঁর পাতের নিরামিষের ক্ষীর মিষ্টি দিদিমার নির্দ্দেশে বড়দের জন্ত বিশিষ্ট আমিষের সংখ্যা কটাও লাভ হ'ল।

কিন্তু ভাবনা কমল না। তাহলে কি কুকুর হয় না? সবাই যে হাসলেন? মিছে কথা কি ওটা? বোধ হয় ব্যাঙ পুড়িয়ে খাওয়ার মতন মিথ্যে কথাই—কুকুর হলে কত কুকুর থাকত না কি? ছোড়দা তো বলছিল বেশী দেখতে পায়নি। কিন্তু কেউই তো দিয়ে নিয়ে নেয় না। গৌরীর জানা শোনা জগতে এমন দুর্জ্জন অনেক আছে যারা মারে, দল থেকে তাড়িয়ে দেয়,—অন্যের জিনিষ কেড়ে নেয়, নিয়ে নেয়,—কিন্তু তারা কেউই যে দিয়ে নিয়ে নিয়েছ একথা তো মনে পড়ছে না……। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, গৌরীর ঘুম আসে না আর। আচ্ছা, কাল একেবারে পুতুলটা দিয়ে দেবে…মেয়েও বলবে না…কক্ষণো আর নেবে না। এমন কি আর যত পুতুলের গয়না, মালা ভাল কাপড় আছে ওসব দিয়ে দেবে—সেই বিলিতী মুক্তোর লম্বা হারটাও দিয়ে দেবে……। বাবার কাছ থেকে আবার পয়সা নিয়ে কিনবে'খন। আচ্ছা, যদি ও রাগ করে না নেয়? চাকরের মেয়ে বলেছে… শ্যাম তো কাঁদেনি, কিন্তু মুখটা কাঁদকাঁদ মনে হচ্ছিল খুব—সে আর একটা কথাও তো কয়নি…… মুখটা নীচু করেই পুতুলটা রেখে গেল। আচ্ছা, সেই ছোট্ট খোকা-পুতুলটা তো ও একদিন চেয়েছিল—সেটা ও দিয়ে দেবে তাহলে নেবে বোধ হয়। মনে পড়ল, পুতুলটা দেবে কি করে—সেটা তো আনা হয় নি? সে তো বাগানেই পড়ে আছে—কেউ কি তুলেছে? দেখেনি তো! গৌরী উঠল, ঘরের বাইরে উঠানে হেরিকেন জ্বলছিল; সেইটে নিয়ে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, শ্যামের বাবা সীতারাম সেখানে বসেছিল। বললে, "ও সীতারামজী একবার এসো না।"

"কি মইয়া—কি বোলছে?" সীতারামের ধারণা সে বাংলা জানে।

"একবারটি এসো।"

বাগানে গিয়ে সব খুঁজলে, পেয়ারা কামরাঙাগুলো সব পড়ে ছিল, শুধু পুতুলটা নেই।…তবে কি শ্যাম নিয়ে গেছে? সে তো নেবে না—কিন্তু কে নিলে? দাদা দিদিরাও তো তোলে নি।

"সীতারামজী আমার একটা পুঁতুল হিঁয়া থা, দেখা?"

"নেহি গৌরী মইয়া, আমি দেখবে তো দিয়ে দেবে কি। চলো ভিতরে, দাদামোশা দেখবে তো লড়বে,—বলবে, সাঁপ আছে।"

মশা সেদিন গৌরীকে অনেক কামড়ালে, গরমও খুব বোধ হ'ল, মা বকলে, বাবা জল দিলেন, দাদা দিদির খোকা কেমন ঘুমুচ্ছে। মশায় মার ঘুমেও একটু বিঘ্ন হ'ল না, বাবাও ঘুমলেন।

চাঁদ উঠে অস্ত গেল, ঝিঁঝিঁপোকাগুলো একবার করে খুব জোরে ডাকে আবার থেমে যায়—শেয়াল ডাকাও শুনতে পেলে…… ও ওমা, মা, ওমা। মার ঘুম ভাঙল না, বাবার ঘুম ভেঙে গেল। "কিরে?"

"আমার ভয় করছে।" বাবার পাশে একটু জায়গা নিয়ে গৌরী শুয়ে পড়ল।

কালীঘাট গৌরী দেখেনি, কালীঘাটের মন্দির একটা ছোট্ট শিবমন্দিরের মতন,—সামনে তার অনেক দোকান, তাতে সেই ফুল-দেওয়া অনেক রকম ছোট-বড় রঙীন টিনের বাক্স, কাচের পুতুল, চুড়ী, শাঁকা খাবার কতরকমের —অনেক ছোট ছেলেমেয়ে লোকজন পূজা করবার মতন লালপাড় কাপড় পরা—তাদের মা'রা-সব কত কিনছে, দোকানের সামনে অনেক কুকুর—কালো কালো রোগা, মড়াখেগো বিচ্ছিরি দেখতে, হাঁপাচ্ছে লক্ লক্ করছে জিব, সবাইকে কামড়াতে আসছে,—লোকেরা তাদের লাঠি দিয়ে মারছে। একটা কুকুর গৌরীকে তেড়ে এলো - গৌরী উঠে পড়ল—সবে ফরসা হয়েছে। ঘরের দরজা খুলে বাইরে এলো, শুধু দাদামশায় উঠেছেন আর কেউ ওঠেনি। গৌরী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে।

গৌরী আবার পুতুল খুঁজে এলো—নেই।

আসবার সময় সালঙ্কার বাক্স পুতুল অন্য সমস্ত সে শ্যামকে দিয়ে দিতে গেল, কিন্তু সেদিন শ্যাম আর ওখানে খেলতে আসেনি, গৌরী তাকে খুঁজে পেলে না।

বারো তেরো বছর কেটে গেছে—গৌরী আর মামার বাড়ী আসেনি। বিয়ে হয়ে গেছে। একটি তিন বছরের মেয়ে নিয়ে মামার খোকার ভাতে গৌরীর মা গৌরীকে নিয়ে এলেন। দাদামশাই দিদিমা বুড়ো হয়ে গেছেন, গৌরীর দিদি দাদা আরও সব মাসতুতো অন্য ভাই বোনেরা এসেছে।

বাড়ীতে অনেক লোক। অতিথি কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি বন্ধুতে বাড়ী ভরা। শ্যামের বাপ বুড়ো সীতারামজী এখনো আছে, তার ছেলেও কাজ করছে।

সমস্ত বাড়ীতে বাগানে যেন তার সেই হারানো ছোটবেলাটা মূর্ত্তি ধরে লুকিয়ে আছে। এখনো একলা পেলেই তারা যেন শিরিষ শিশু গাছের তলা থেকে, আম পেয়ারা গাছের পাশ থেকে, জুঁই সেঁউতির ঝোপ থেকে উঁকি মেরে দেখে। সিঁড়ির তলার খেলাঘর থেকে, সেটাতে এখন ময়লা কাপড় থাকে—তেতলার ছাতের কোণ থেকে মনে হয় তারা লুকিয়ে দেখছে। বুড়ো অশথের ঝুরি দুলিয়ে হেসে ছুটে যেন পালিয়ে যায়।

তখনকার সঙ্গীরা সবাই বড় বড়, দাদারা পড়ায় ব্যস্ত। ডানপিটে হরিশ-দা এখন ফুটবল খেলতে, সাঁতার কাটতে পড়াতে সমান মজবুত আর কারুকে বকে না। দিদিরা তিন-চারটি করে ছেলেমেয়ের মা। এখনকার ছোট ছেলেরা আর কোন দলপতির কথা শোনে না। সন্ধ্যে-বেলাও সব 'লুডো' 'স্নেক ল্যাডার' খেলে ছোট্টরাও আবার বলে গীরিন্ লেড্ (গ্রীন রেড), চোর-চোর কাণামাছি কেউই বড় খেলে না। বড়রা 'ওয়ার্ড মেকিং' 'ক্যারম' খেলে। মস্ত দলের খেলা আর কেউ করে না। কেষ্টচূড়ো গাছের ফল গেঁদা ফুলের ভেতরের শাঁস সব নতুন নতুন আবিষ্কার করা খাবারে—চাকরের ঘরের রুটীতে ক্ষুধানিবৃত্তি জলযোগ ওরা করে না।

গৌরীর মা-মাসীদের কাছে শ্যামের মা দেখা করতে এল। "মইয়ারা ভাল আছে তো? কি ছেলেমেয়ে—জামাইবাবুরা কি করেন? কত মাইনে পান—কেমন 'শশুরাল ঘর' আছে ইত্যাদি"

গৌরী একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললে, 'শ্যাম কোথা?' শ্যামের কথা ওর মন থেকে আজও যায়নি।

"আর মইয়া—তার একটি খোকা হইয়েছিলো—মরিয়ে গেছে, একটি মইয়া হয়েছে, আমার কাছেই আছে।" কথা পেলে ঐ বয়সের মতন শ্যামের মাও আর কিছু চায় না; বললে "একদিন রুটি খাবে মইয়া? ভাল করে করে দোব ভুট্টার রুটি জনারের যবের।"

গৌরী চুপ করে রইল, আহা বেচারার ছেলেটি মারা গেছে!

রুটীর কথায় একটু হাসলে। তার মা বল্লেন, "তা দিস্, খাবে না কেন।"

তেমনি ধারা একটা পুতুল গৌরী কিনেছিল ছেলে-বেলা এখান থেকে ফিরে গিয়ে শ্যামকে দেবার জন্যে। আজ অবধি তার ক্যাশব্যাক্সে সেণ্ট সুগন্ধি চিঠিপত্র টুকিটাকি সৌখীন জিনিষপত্রের সঙ্গে সেটিও আছে। সেটা দেওয়া আর হয়নি। কতক মামাবাড়ী আর

না আসার জন্যে—কতক লজ্জায় দেবার মতন কারুকে না পাওয়ায় সেটা রয়েই গেছে। মনে করেছিল তখন, এখানে আসবে যখন চুপি চুপি দিয়ে দেবে।

এক এক করে বারো তেরো বছর কেটে গেছে—ছোট-বেলার কালীঘাটের কুকুর হবার ভয় ভাবনা আর নেই। এমন সব আরও কাজ হয়ত করেছে, যাতে—সুন্দরবনের বাঘ থেকে এঁদো পুকুরের মশা মাছি অবধি অনেক প্রাণীই হতে পারে। কিন্তু মনের ক্ষোভটা সেই রকমই আছে। আর কারুরই কোনো কথা মনে নেই। শুধু গৌরীর জীবনের একটা পাতা শ্যামের কথাতে ভরে আছে—শ্যামের ত্রস্ত শুষ্ক মুখখানি। সেই পুতুল ফিরে চাওয়ার সময়ের ছোট স্মৃতিটুকু এতটুকু ম্লান হয়নি।

"মা, একদিন শ্যামকে আসতে ব'ল না?"

"আসবে মইয়া একটুখানি তার খোখীটা বড় হোবে তো আসবে। আচ্ছা, আমি ভেজ দোব।"

দুপুর বেলা। গৌরীর খুকু মার পাশে ঘুমুচ্ছে, গৌরী একখানা বই পড়ার বৃথা চেষ্টা করছিল, বইটার চেয়ে ঘুমের প্রতাপ প্রভাব বেশী বোঝা যাচ্ছিল।

'গৌরীদিদি,' কোমল মৃদুস্বরে কে ডাক্‌লে, তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

'কেমন আছিস শ্যাম?'

শ্যামের শান্ত মুখশ্রী আর সজল চোখ তার জবাব দিলে। গৌরীর চোখেও জল এলো।

তারপরে অনেক কথা হ'ল—খুকি কেমন হয়েছে, ক'মাসের—খুকির বাবা কোথায়—কি কাজ করে—শ্বশুরবাড়ী কোন্ গাঁয়ে—কে কে আছে—কেমন তারা—বৌকে যত্ন করে কি না? বর কেমন—ও কবে যাবে সেখানে?

ছোট বেলার মতনই দুই খেলার সাথীতে কথা কইছিল দ্বিধাহীন সঙ্কোচহীনভাবে। পড়ন্ত বেলার রোদ্দুর শ্যামের মুখে এসে পড়ছিল—গৌরী উঠে রোদ্দুর আড়াল করতে জানলা বন্ধ করে দিয়ে বস্‌ল। ছেলেবেলায় দুরন্ত গৌরী ত্রস্ত সঙ্কুচিত শ্যাম মনের যেখানে এক হ'য়েছিল আজও যেন সেইখানেই দুজনে মিলেছে। মাঝে মাঝে কথার পাশ থেকে শোকার্ত্ত মার মনটি চোখে ফুটে উঠে দুটি জননীকেই নতুন করে আরও 'এক' করে নিচ্ছিল।

গৌরী বাক্স খুলে অনেক ছোট জামা জাঙিয়া মোজা কাঁথা বের করলে, একটু অপ্রস্তুতভাবে বললে, "নিবি শ্যাম? আমার খুকির জামা তোর খুকুর জন্যে?"

এরকম প্রশ্নে শ্যাম অপ্রতিভ হয়ে গেল। কেন নেবে না। ওরা তো নেয়। আর এতো ওর মেয়ের দিদির জামা কাপড়।'

গৌরী ক্যাশবাক্স থেকে তার খুকির চার গাছা মল আর সেই পুতুলটা বের করে বললে, "তোর খুকি বড় হ'য়ে খেলা করবে—দিস্।"

"মল থাক্ না দিদি মইয়া, পুতুলটা বেশ।"

"না, না, আমিও তো তোর মেয়ের মাসী—পরিয়ে দিস্ মলটা।"

শ্যাম শুধুই পুতুলটা আর মল ক'গাছা নিয়ে রেখে দিলে জামা কাপড়ের সঙ্গে, কিছু বল্‌লে না। তার বোধ হয় ঝগড়ার কথা, অবমাননার কথা মনেও ছিল না। কতকালের স্মৃতি যে ওই ছোট পুতুলটার সঙ্গে জড়িত তা তার মনে এল না।

সঙ্কোচে গৌরীও কিছু বল্‌তে পারলে না। একটু আশা ছিল হয়ত শ্যাম ছেলেবেলার সেই কাহিনীটা পেড়ে বসবে। কিন্তু শোকার্ত্তা জননী শ্যামের স্মৃতিতে সে কাহিনীর কোনো খোঁজই মিল্‌ল না। এক যুগের সঞ্চিত আশা গৌরীর অপূর্ণই থেকে গেল। তবু ক্ষোভের ভার যেন অনেক কমে গেল। সে যে আবার ফিরে দিয়েছে।

বাঙ্গলার কাব্যসাহিত্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ

বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে সামান্য গোটাকয়েক কথা আজ আমি বলিতে চাই। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী জাতির পক্ষে গৌরব করিবার বস্তু যদি কিছু থাকে, তবে সে তাহার কাব্যসাহিত্য, একথা অসংশয়েই বলা যায়। যে স্নিগ্ধ-মধুর রসধারা জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে বহিয়া আসিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালীর মনকে নানা দুঃখের মধ্যেও উজ্জীবিত রাখিয়াছে। জয়দেবের উল্লেখ করিলাম, কারণ বাঙ্গালী কবির কণ্ঠে সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গলা গান কত 'মধুর কোমল-কান্ত' হইতে পারে, গীতগোবিন্দে আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করি। চণ্ডীদাসের সূক্ষ্ম রসবোধ, বিদ্যাপতির অপরূপ রচনারীতি আজ বাঙ্গালী ছাড়া অন্য জাতিরও বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। মৈমনসিংহ-গীতিকবিতার সহজ স্বচ্ছ অনাড়ম্বর কাব্যরসে বিদেশী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অমৃত গীতাঞ্জলিধারা স্বয়ং বিশ্বভারতী সাদরে গ্রহণ করিয়া কবিকে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

জটিল প্রত্নতত্ত্ব ছাড়িয়া দিলে, জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশিষ্ট কোনও বাঙ্গালী কবির পরিচয় পাই না, আর চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে রচিত বাঙ্গলাকাব্যের কথা না ধরিলেও বোধ করি চলে। এই কাব্যধারার বিশেষত্বের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, তাহা একান্তভাবে চিরশ্যামল নদীমাতৃক এই বাঙ্গলা দেশেরই উপযোগী। সর্ব্বত্র উদার, স্নিগ্ধ, মধুর ও গভীর; নিয়ত গতিশীল, স্থিরলক্ষ্য, সাগরসঙ্গমপ্রয়াসী। জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে ধারা চলিয়া আসিয়াছে, আজিও তাহার বিরতির লক্ষণ নাই। কাব্যসাহিত্য বস্তুতই বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু।

কিন্তু একটা কথা কোনমতেই ভুলিবার উপায় নাই যে, বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি,—মুসলমানের অতি সামান্য দানের কথা বাদ দিলে,—তাহা সম্পূর্ণভাবে একটি পরাধীন দাসজাতির রচিত কাব্যসাহিত্য। জয়দেব সরস্বতী যাঁহার সভাকবি ছিলেন, সেই লক্ষ্মণ সেন দেশের জন্য দাসত্বের যে আদি ও অকৃত্রিম খাত কাটিয়া দিলেন, বাঙ্গলা দেশের উচ্চ নীচ, উত্তম অধম সমস্ত কবি বাধ্য হইয়া সেই খাতেই তাঁহাদের কাব্য-রসধারা বহাইয়া চলিয়াছেন। মহম্মদ ঘোরীর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার ও ভারতের বক্ষের উপর কত দুঃখের ঝড় উঠিল, দৈন্যের বন্যা বহিল, বিপ্লবের বহ্নি জ্বলিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কিছুতেই বাঙ্গালী কবির রস-সমাধি ভাঙিতে পারিল না। বাঙ্গালীর জীবনে যে বিশেষ কোনও দুঃখ অভাব ছিল বা আছে, বাঙ্গলা কাব্যে তাহার বড়-একটা পরিচয় নাই। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, মধুসূদন—কোথাও তাহার চিহ্ন নাই। কেবল মৈমনসিংহ-গীতিকা ও মুকুন্দরামে তাহার সামান্য বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে দুয়েকবার সে কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কাব্যে সে দুঃখ কোথাও তেমন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয় নাই। নিজে হয়ত বিষপান করিয়া ভোলানাথ মৃত্যুঞ্জয়ের মত দেশকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন; ইহাই বাঙ্গালী কবির প্রতিভা। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর গদ্যসাহিত্য কথঞ্চিৎ সচেতন, কিন্তু গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য আজিকার বক্তব্য নহে।

যাহা হউক, এজন্য কাব্য যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিংবা কবিদের চিন্তা ও ভাবে কোনও দোষস্পর্শ ঘটিয়াছে, এমন কথা আমি বলিতেছি না। আমি এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে চাই যে,—ভাল হউক, আর মন্দ হউক,—সমগ্র বাঙ্গলাকাব্য গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত দাসজাতির

সৃষ্টি। যে সাহিত্য দাসত্বের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া তাহারই আব্‌হাওয়ায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত, তাহার ললাটে কি দাস্যরসের তিলক অঙ্কিত নাই? যেদিন আমরা এই সাহিত্যকে বিশ্বের সাহিত্য মজ্‌লিসে আসন দিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, সেদিনে এ কথা ভুলিয়া লাভ নাই। বরং সাহিত্যবিচারে এই অতি বড় সত্য কথাটা মনে রাখিলে হয়ত অনেক প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে। বাঙ্গলা কাব্য যে পুরুষকারহীন ও অতিমাত্রায় দৈবাশ্রয়ী ইহার কারণ হয়ত বা এইখানে।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে প্রেম ও রসতত্ত্ববিশ্লেষণ বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রাণ। ইহাতেই তাহার সার্থকতা ও কৃতিত্ব। ব্যাবহারিক জগতের পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে উদাসীন না হইলে, জীবনের বহিরঙ্গে নিতান্ত নিশ্চিন্ততা না আসিলে, অন্তর্বিশ্লেষণে এমন অসাধারণ সাফল্যলাভ সম্ভবপর মনে হয় না। পুরুষানুক্রমে এই নিশ্চিন্ততা কাব্যরসধারাকে অব্যাহত রাখিবার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু এই নির্লিপ্ততা, এই নিবৃত্তিই দাস্যভাবের জনক ও পরিপোষক। বর্ষার দুর্ব্বার বন্যায় বাঙ্গলার নদী কূল ছাপাইয়া তীরভূমি প্লাবিত করে; বাঙ্গলার কৃষক তাহাকে রোধ করে না; সে জানে এ জল নামিয়া যাইবে, এক মাসের প্লাবন এগার মাসের জন্য জমিকে উর্ব্বর করিয়া দিবে; তখন সে অতি অল্পায়াসে তাহাকে পুনরায় শস্যশ্যামল করিয়া তুলিবে। দেশ মধ্যে মধ্যে লুণ্ঠিত হয়, দুর্ভিক্ষে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে দুঃখদৈন্যের অবধি থাকে না; কিন্তু বাঙ্গালী কবি তন্ময়চিত্তে সেই একই গান গাহে। অনশনক্লিষ্ট ভিক্ষুকও প্রেমের গান গাহিয়া গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়ায়। সেই চিরন্তন রাধাকৃষ্ণের মিলন ও বিরহের গান, সেই দেবদেবীর অপরূপ লীলামঙ্গল, সেই সীমার পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া অসাধারণ প্রতিভাবিচ্ছুরিত অসীমের সন্ধানগীতি। বাঙ্গালী শ্রোতা মুগ্ধচিত্তে সেই গান শোনে এবং সমস্ত দৈন্যের মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়া বন্ধনের মধ্যে পীড়িত ও ক্লিষ্ট হইয়াও সে প্রাচুর্য্য, মাধুর্য্য ও মুক্তির স্বাদগ্রহণে পরিতৃপ্তি লাভ করে। বাঙ্গলার জলে মাটিতে অদৃষ্টে ইহাই লেখা ছিল, ইহাই সার্থক হইয়াছে।

বীজ যেমনই হউক, মাটির গুণে ফলের তারতম্য হয়। যে কৃষ্ণ ব্যাসের লেখনীতে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' বলিয়া দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ঘটাইলেন, সেই কৃষ্ণই লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের কলমে স্বয়ং কেবল 'দেহি পদপল্লব-মুদারং' লিখিয়া কবিকে ধন্য করিয়া গেলেন; বক্তিয়ার খিলিজি বা লক্ষ্মণ সেনের কথা তাঁহার মনেও আসিল না। হরিবংশের কৃষ্ণ উত্তর-ভারতে বসিয়াও মগধের সংবাদ রাখিতেন—অত্যাচারী জরাসন্ধের শাস্তিবিধান করিতেই তাঁহার সমস্ত যৌবন ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু তৈমুর-লঙ্গের অসিধারে উত্তর ভারত যখন ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত, মগধকবি বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ তখনও আপনার কৈশোর অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াও বাঙ্গলার ভগবান বাঙ্গালীর কোমলমধুর স্বভাব ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইলেন; শঙ্খ চক্র গদা ভুলিয়া আসিলেন, পদ্মও পথের ধূলায় লুটাইতে লাগিল। তখন ভারতের পুরাতন রণভূমে পাঠান মোগলে যে নূতন কুরুক্ষেত্র বাধাইয়াছে, হায়! পার্থসারথীর সেখানে আর ডাক পড়িল না। সে ডাক শুনিবার অবস্থাও তাঁহার নাই। রসতৃষাতুর বাঙ্গালীর প্রাণের ডাক তখন তাঁহার কানে বড় হইয়া বাজিয়াছে।

অসুরনাশিনী দুর্গা বাঙ্গালীরই দেবী। কিন্তু বাঙ্গালীর পিতামাতার গিরিরাজ ও মেনকার স্নেহে তাঁহাকে সিংহ ও অসুর ত্যাগ করিয়া উমারূপেই দেখা দিতে হইল; নচেৎ বাঙ্গালী তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না। ভারতচন্দ্রের বুড়া ভিখারী শিবঠাকুর যেভাবে অন্নদার সহিত কলহ বাধাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার 'লটাপট্ট জটাজুট-সঙ্ঘট্ট গঙ্গা' একান্তই নিষ্প্রয়োজন ছিল। কলিকাতা পত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া পলাশীর যুদ্ধ ও তাহার পরবর্ত্তী ব্যাপার যে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের চক্ষের উপর ঘটিতেছিল, তাহা কে বলিবে? বাঙ্গালীর আরাধ্যা শক্তি তখন স্বহস্তে ভক্ত কবির 'বেড়া বাঁধিয়া' দিয়াই স্বীয় মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

'অসীম চাহিছে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।' বাঙ্গালী ভক্তে ও বাঙ্গালী ভগবানে এই চিরমধুর সম্বন্ধ—এই চিরন্তন বেড়াবাঁধাবাঁধি আজও সমানভাবে চলিতেছে। বাঙ্গালী কবি আজও

তাহার সাধনা পরিবর্ত্তিত করে নাই, বাঙলার প্রকৃত কাব্যরসিকসমাজও তাহার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। এমন কি, বাঙালী মুসলমান কবির রচনা পড়িয়া দেখুন, সেই একই কথা। কচিৎ দুয়েকস্থানে সাধনার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা ব্যতিক্রম মাত্র।

জগতের সকল বস্তু ও বিষয়ই ভাল মন্দে গঠিত। এমন যে দাসত্ব—তাহারও ভাল দিক্ আছে। অর্থ হারাইয়া পরমার্থে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে, নিরুপায় হইয়া সে নিশ্চিন্ত হয়। বাঙ্গালীর সাধনা মুক্তি লইয়া নহে, ভক্তি লইয়া। চৈতন্যদেবের বাণীর পক্ষে বাঙ্গলার জলবায় যে বিশেষ করিয়াই উপযোগী, তাহা বলাই বাহুল্য। কাব্যেও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির উপযোগিতা অনেক বেশী; কাব্যসাহিত্যে বাঙ্গালী তাই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে মুক্তির স্থান ভক্তির বহু উর্দ্ধে, তাই বাঙ্গালী সেখানে বহুদিন হইতে অধঃপতিত। সর্ব্বদুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতেই হইবে, ইহাই মুক্তিকামীর সাধনা। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ক্ষেত্রে উপায় বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু উভয় সাধকেরই উদ্দেশ্য ও প্রেরণা এক। ভক্তির উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সে দুঃখকে বরণ করিয়া আপন করিতে চায়; অথবা অতি সিধা পথে ফাঁকি দিয়া তাহাকে এড়াইয়া যাইতে চায়; কঠোর সাধনায় কষ্টসাধ্য পথে তাহাকে জয় করিতে চায় না।

"চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি কেবল দুখের ঘর"··· ···"দুখ হবে মোর মাথার মাণিক সাথে যদি দাও ভকতি"—চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কাব্য সাধনা চিরদিন এই ভক্তির পথে; সে আবার মনকে ইহাও বুঝাইয়াছে যে, এই পথই মুক্তির শ্রেষ্ঠ পথ, কারণ নিতান্ত সোজা পথ। ভক্তির পথে যে মুক্তির সম্ভাবনা অল্প, ইহার প্রমাণ চারিদিকে। কারণ ভক্ত প্রকৃতপক্ষে মুক্তিকে চাহে না বরং তাহাকে ভয় করে।

বাঙ্গালী কবির মুখ দিয়া বাঙ্গালী জাতি যে বাণী প্রচার করিয়া আসিয়াছে তাহা একদিকে সার্থক হইয়াছে; হয়তো জগতে ইহাই বাঙ্গালীর দান, কিন্তু সে নিজে অন্যদিকে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালী কবির সাধনা সার্থক হইয়াছে—চারিদিক চাহিয়া দেখিলে সন্দেহ থাকে না, "কানুর পিরীতি কেবল দুখের ঘর"। এই কানুর পিরীতি তাহাকে যেমন অন্তরে সমৃদ্ধ করিয়াছে, বাহিরে তেমনি কাঙ্গাল করিয়া রাখিয়াছে। কাঙ্গাল না হইলে কাঙ্গালের ঠাকুর সম্যক্ পূজা পান্ না। প্রখর বুদ্ধি, অতুল মনীষা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি—এ সকল সত্ত্বেও বাঙ্গালী ভক্তিভরে দুঃখকেই তাহার মাথার মাণিক করিয়া রাখিয়াছে।

অতি উচ্চ অঙ্গের ভক্তির কথা ছাড়িয়া দিই; শক্তির সহিত হয়তো তাহার বিরোধ নাই; পন্থা ছাড়িয়া গন্তব্যে পৌছিলে হয়-তো বা সব বিরোধের সমন্বয় হয়; কিন্তু সাধারণ যাত্রীর জীবনে ভক্তি যে শক্তির বিরোধী, ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্য শক্তিকে নিজ শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর জানিয়া তাহাকে সানন্দে মানিয়া লওয়ার মধ্যেই ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। অপর পক্ষে, নিজের শক্তিকে কাহারও শক্তির অপেক্ষা হীন মনে না করা—প্রয়োজন ক্ষেত্রে সোঽহং মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারা—ইহাই মুক্তি-পথিকের পথ। ভক্তি সকলকেই বাঁধে—ভগবানকে পর্য্যন্ত। শক্তি সকলকেই মুক্ত করে—দাসকে পর্য্যন্ত। ভক্তি-সাধনা দাসের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক, কিন্তু অনুপযোগী; কারণ ইহাতে তাহার জীবনের মূল ক্ষয়িত হইয়া যায়। এই সাধনায় বাঙ্গালী কাব্যে জিতিয়াছে, জীবনে ঠকিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভক্তিকে প্রেম নামে অভিহিত করিলেও আমার মূল বক্তব্যের অন্যথা হয় না, কারণ দুইই একই মনোবৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কথা উঠিতে পারে, ভক্তি লইয়া কাব্য রচনা বাঙ্গালীর একচেটিয়া নহে; ধর্ম্মমূলক সাহিত্য রচনা সমগ্র ভারতের এমন কি প্রাচ্য জগতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহারই মধ্যে বাঙ্গালী নিজের বিশিষ্ট পথ বাছিয়া লইয়াছে। স্বাধীন জাতির কাব্য-সাধনার পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর আছে। কালিদাসের হিমাচলপ্রতিম সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি করুন—রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা, মেঘদূত—যাহার এক একটি শৃঙ্গ। দেখিতে পাইবেন ভারতের ধর্ম্ম ও বাঙ্গলার ভক্তিতে কি প্রভেদ। আর যদি ভক্তি লইয়া কাব্য-রচনা বাঙ্গালীর একচেটিয়া না হয়, শক্তি হারাইয়া দাস্য করাও বাঙ্গালীর

একচেটিয়া নয়। উভয়কেই প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে।

মাঝে মাঝে শুনিতে পাই, ইংরেজি যুগে বাঙ্গালীর কাব্য খাঁটী বাঙ্গলার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করিয়াছে। এজন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ছোট-খাটো বিষয়ে একথা কথঞ্চিৎ সত্য হইলেও মোটের উপর ইহা সত্য নহে। পশ্চিমের সংঘর্ষে আসিয়া যোগসূত্র ছিন্ন করিবার চেষ্টা কিছু কিছু হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালীর প্রকৃতি ও প্রতিভা তাহার বিরোধী বলিয়া, সে চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। মাইকেলকেও ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখিতে হইয়াছিল এবং সে-লেখা তাঁহার প্রাণ দিয়াই লেখা। ভানুসিংহের পদাবলী যে নিতান্তই রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের খেয়াল মাত্র নয়, তাহা তাঁহার প্রবীণ বয়সের ব্রহ্ম ও বাউল সঙ্গীত দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। ধারা একই রহিয়াছে মাঝে মাঝে বাঁক ফিরিয়াছে মাত্র।

বহু বিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গলা কাব্য স্বকীয় বিশেষত্ব হারাইতেছে; পুনরায় নিজেদের সনাতন স্বরূপ চিনিয়া সেইখানে তাহার ফিরিয়া যাওয়ার প্রয়োজন। আমি বলিয়াছি, রূপ কিছু বদলাইলেও তাহার স্বরূপের বদল হয় নাই; কিন্তু এই যে ফিরিয়া যাইবার ফরমাইস্ আইসে, সে কোথায়? সেই যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা, পদাবলী, পাঁচালীর যুগে বাঙ্গালীর যে culture ফেলিয়া আসিয়াছি, সেইখানে? মাঝে মাঝে ফিরিতে লোভ হয় বটে; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, কি দেখিতে পাই? সুদীর্ঘ দাস-জীবনের দৈবনির্ভরশীল সহজ নিশ্চিন্ততা এবং অনায়াসলব্ধ শস্যসম্পদ-সম্ভূত কর্ম্মবিমুখ আলস্যপ্রিয়তা যে আনন্দের মূলে, সে আনন্দ অপেক্ষা আজকার দুঃখও যে বরণীয়।

কাব্যসাহিত্যে বাঙ্গালীর যে বিশিষ্ট cultureএর পরিচয় পাইয়াছি তাহা বক্তিয়ার খিলিজি আসিবার পূর্ব্বের নহে, পরের—একথা ভুলিবার কথা নহে। সেইখানে ফিরিয়া সনাতন দাস্য রসকে ভাবী বাঙ্গলার সাহিত্যের মধ্যেও বনিয়াদী করিয়া তুলিতে হইবে, একথা সঙ্গত মনে করি না। অদ্যকার বাঙ্গালী জীবনের দুঃখের মূল সেই পুরাতনের মধ্যেই রস সংগ্রহ করিতেছিল, অতীতের অবিমৃষ্যকারিতাই বর্ত্তমানকে এমন শ্রীহীন করিয়াছে। তথাপি পিতামহদের ক্ষেতভরা ধান ও দেহভরা স্বাস্থ্য ছিল; দুঃখ তখনও আজকার মত এমন মূর্ত্ত হইয়াও দেখা দেয় নাই; দুঃখ অসহ ছিল না বলিয়া তাহাকে লইয়া তখন ঘর করা এমন কি আনন্দ করাও চলিত, কিন্তু আজ তাহা অন্যায় হইবে, আজ বাঙ্গালীর দুঃখের অবধি নাই; কল্পনায় নিজেকে সর্ব্ব দুঃখের উর্দ্ধে তুলিয়া রাখিয়া আজি আমরা কাব্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান জীবনে আজ তাহা নিতান্তই আত্ম-প্রবঞ্চনা হইয়া উঠিতেছে, একথা বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নহে।

ফরমাইসে কাব্য রচিত হয় না; কিন্তু ফরমাইস যদি দিতেই হয় তবে বলিতে হয়, পুরাতনে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া বাঙ্গলার কাব্য-আদর্শ নূতন রূপ গ্রহণ করুক্। জগৎকে যদি প্রেম ভক্তির মন্ত্র দানই এই সাহিত্যের কার্য্য হয়, তবে তাহাকে এখন শক্তি ও মুক্তি পথের পথিক হইতে হইবে, স্বদেশী গান রচনা করিতে হইবে বলিতেছি না, কারণ তাহার বোধ করি অভাব নাই; যে সাহিত্যে আত্মনির্ভরশীল মনুষ্যত্ব দুঃখের সহিত মুখোমুখি পরিচয় স্থাপন করিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে পারে, অকুণ্ঠিত শক্তির সাহায্যে জয়ের সাধনা করে, ভক্তিভরে কেবলই রফা করিয়া পথ চলে না—সে সাহিত্যের রূপ কিরূপ হইবে বলিতে পারি না। আত্ম-প্রত্যয়ী শক্তিমানের নিকট হইতে ভিন্ন কেহই কোন দান গ্রহণ করিবে না, প্রেমের দান তো নহেই। যাহা আছে তাহাও রক্ষিত হইবে না যদি আমরা তাহাকে চিরদিনই সুকুমার করিয়া রাখি।

কিন্তু আশার কথা এই, বাঙ্গালী তাহার কাব্যের সম্মুখে যে আদর্শমূর্ত্তি ধরিয়াছে, তাহা যেমন মধুর তেমনি বিরাট। বাঙ্গলার ও বাঙ্গলা গীতিকাব্যের প্রাণ কৃষ্ণলীলায় মুগ্ধ; শ্রীকৃষ্ণের জন্মও দাসত্বের মধ্যে—কংশ-কারাগারে। তাঁর আত্মবিস্মৃত কৈশোরের মধুর লীলা বাঙ্গালীর কাব্যে সজীব ও শ্যামল, কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণের যৌবন তো বৃন্দাবন ছাড়িয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক

হইয়াছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারাও তাঁহারই জীবন-লীলার অনুসরণ করুক, আজিকার দিনে এই প্রার্থনা করিতেছি।

কিন্তু ভয় হয় এই বাঙ্গলার জলবায়ুকে, তাহা এমনি বিচিত্র যে, এযুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ও মুক্তিকামী বীর চিত্তরঞ্জন কবি ছিলেন এবং বৈষ্ণব ছিলেন। কঠিন অস্থির মধ্যে যেমন কোমল মজ্জা নিহিত থাকে, তেমনি এই তেজস্বী মুক্তিপন্থীর মধ্যেও চিরকোমল বাঙ্গালী-ভক্তের রসমূর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল। বাঙ্গলার হয়তো ইহাই বিশেষত্ব, ইহাই গৌরব। কিন্তু ইহাতে যে জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্য যদি বজায় রাখিতেই হয়, তবে কবির বাক্যই সফল হইবে—'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছ বাঙ্গালী করে' মানুষ করনি।" পুরুষকারবর্জ্জিত দৈবী সাহিত্যে হয়তো দেবতা গড়িতে পারে, কিন্তু মানুষ গড়িতে পারে না; তাই কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গেও আমি প্রশ্ন তুলিতে চাই—বাঙ্গালীর বাঙ্গালী থাকাই বাঞ্ছনীয়, না তাহার মানুষ হওয়ার প্রয়োজন?

চিরদিন বাঙ্গালী কবি বঙ্গবাণীর যে ধ্যানমূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছে, নিজে চিরজীবন মায়ের যে রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ, আজ এই জীবনের অপরাহ্নে মনে হইতেছে, মা অন্য মূর্ত্তিতে পূজা চাহেন। বাঙ্গালীর হাতে উমারূপে পূজাগ্রহণের সাধ মায়ের যেন মিটিয়াছে। আজ দশভুজা মূর্ত্তিতে মা আমাদের পূজা মাগিতেছেন। সে মূর্ত্তিতে বীণাপাণি সরস্বতীর পূজা বাদ পড়িবে না, বরং অধিকতর সার্থক হইয়া উঠিবে। দেশের যে মনোভূমির উপর সমস্ত কবি ভূমিষ্ঠ হন, সেখানে যেন এই দশভুজার মূর্ত্তিরই বেদী নির্ম্মিত হইতেছে, অনুভব করিতেছি।*

---

* বেলগাছিয়া সুহৃদ সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। ২৯এ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্প

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

অনেক দিন আগে আমি যখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কয়েকটি জায়গা দেখিতে যাই, তখনই আমার মনে প্রথম এই কথাটা জাগে, যে, সেখানকার স্থাপত্য ও কলাশিল্প মধ্যযুগের প্রথম দিকের বাংলা ও বিহারের কলা ও স্থাপত্য হইতে বিভিন্ন। যতদূর স্মরণ হয়, আমার সঙ্গে সে-বারে পণ্ডিত শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় (ইঁহারা দুইজনেই এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত আছেন), এবং সাহিত্যপরিষদের শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় ছিলেন। সেই যাত্রা আমরা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ও শুশুনিয়া এবং মানভূমের অন্তর্গত পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী ছাতড়া গ্রাম দেখিয়া আসি। এই জায়গাগুলিতে আমরা যত মন্দির ও বিগ্রহ দেখি তাহাদের নির্ম্মাণ-রীতি আমার নিকট বাংলা ও বিহারের সুপরিচিত নির্ম্মাণ-রীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। তারপর ১৯২৫ সনে শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চ যখন কালেক্টর ছিলেন, সে সময় আমার আর একবার বাঁকুড়ার অনেক সুদূর ও দুরধিগম্য জায়গা দেখিবার সুযোগ ঘটে। সে-বারেও আমি দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা ও খাস্ বাংলার ভাস্কর্য্যে যে কত বড় একটা তফাৎ রহিয়াছে, তাহা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করি।

একথাটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বাঁকুড়া নামটি আধুনিক এবং এই জেলা ঊনবিংশ শতাব্দীতে গঠিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উড়িষ্যার হিন্দু রাজার।

এই অঞ্চল জয় করেন। তখন স্থানীয় সামন্তরা গজপতি রাজগণের বশ্যতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু এই অধীনতার মধ্যে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে

বাঁকুড়া জেলার জয়পুর গ্রামে প্রাপ্ত লকুলিশ শিবমূর্ত্তি
শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চের সৌজন্যে

মোগলেরা উড়িষ্যাবিজয় সম্পূর্ণ করে এবং সেই সঙ্গে এই সকল জায়গা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। মহিষাদল, তমলুক,* মানভূম, সিংহভূম ও রায়পুর তখন বিষ্ণুপুর জমিদারীর এলাকায় ছিল। প্রথম দিব্যসিংহ খুর্দ্দার ও সর্ব্বেশ্বর ভঞ্জ ময়ুরভঞ্জের রাজা, এইরূপ উল্লেখ থাকাতে বাঁকুড়া ঠিক কোন সময়ে উড়িষ্যার অধীন হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বাঁকুড়া যে উড়িষ্যার অধীন ছিল তাহার চিহ্ন আমরা এখন কেবল মাত্র এই অঞ্চলের মন্দিরের স্থাপত্যে পাই, ভাস্কর্য্যে তাহার কোনও আভাস নাই। সেই সময়ে মানভূম ও সিংহভূম বিষ্ণুপুরের রাজাদের অধীন ছিল। তখন পর্য্যন্ত এই দুই জেলার কোনো পৃথক সত্তা ছিল না। এই দুই জেলার আদিম অধিবাসীরাও তখন বিষ্ণুপুরের বশ্যতা স্বীকার করিত। সুতরাং বাঁকুড়ার ভাস্কর্য্যের আলোচনা করিতে গেলে মানভূম এবং সিংহভূমের শিল্পকেও বাদ দেওয়া চলে না।

খৃষ্টীয় প্রথম সহস্র বৎসরের শেষ কয় শত বৎসর ধরিয়া একটি সুসভ্য ও শক্তিমান জাতি এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বাস করিত, একথা এখন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বর্ব্বরও আদিম জাতিরা পরে ইহাদিগকে স্থানচ্যুত করিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করে। প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈনধর্ম্ম এখানকার প্রধান ধর্ম্ম ছিল। এই কারণে বাঁকুড়া, মানভূম, সিংহভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ময়ূরভঞ্জের উত্তর ভাগে বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু মূর্ত্তি অপেক্ষা জৈন মূর্ত্তিই বেশী দেখা যায়। এই অঞ্চলের ভাস্কর্য্যকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) Artistic অথবা মধ্যযুগের, (২) বর্ব্বর অথবা আধুনিক। এই দুইটি শ্রেণীবিভাগের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রথম পর্য্যায়ের শিল্পের আলোচনার পূর্ব্বে বাঁকুড়ার আধুনিক (অথবা বর্ব্বর) ভাস্করশিল্পের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর গ্রামের কাছে একটি গাছের নীচে

সোনামুখীর সিংহমূর্ত্তি
শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চের সৌজন্যে

একটি লকুলিশ শিবমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি আধুনিক (১৬০০-১৭০০খৃঃ মধ্যে নির্ম্মিত) বলিয়া মনে হয়, কারণ উত্তরপূর্ব্ব-ভারতে লকুলিশের পূজা অতি বিরল। খুব সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পর উহা লোপ পায়; অন্ততঃ তাহার পর

ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। বামবাহুর মূলে লকুলিশের বিশিষ্ট চিহ্নটি অতি স্পষ্ট। মনুষ্যমূর্ত্তি-গঠনের দিক হইতে ইহাতে নৈপুণ্যের অত্যন্ত অভাব। ইহা হইতেই এই মূর্ত্তিটি যে আধুনিক এবং বর্ব্বর তাহা অনুমান করা যায়। বিখ্যাত সোনামুখী গ্রামে ইটের আসনে বসান যে সিংহমূর্ত্তিটি আছে তাহাকেও এই পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। সিংহের বসিবার ভঙ্গীটি সুন্দর হইলেও মূর্ত্তিটি উচ্চাঙ্গের নয়। ইহার সঙ্গে বাঁকুড়া সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে ছাতনা গ্রামের খোদিত ফলকের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে, উহা আসলে একটি বীরমূর্ত্তি (Hero-stone); কোনো তামিল কিংবা কর্ণাটক দেখামাত্রই ইহাকে 'বীরক-কলু' আখ্যা দিবে। নারায়ণপুরের একটি অতি-আধুনিক পার্ব্বতী অথবা দেবীর মূর্ত্তিতে এই দ্বিতীয় পর্য্যায় (অর্থাৎ বর্ব্বর ভাস্কর্য্য) শেষ হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটির technique মধ্যযুগের প্রথম ভাগের। উহার চালিটি বাংলা দেশের ধরণের। একটি ত্রিপত্রের আকারের খিলান দুইটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপরে স্থাপিত; দুই পার্শ্বে দুইটি "গজসিংহ"; সিংহ দুইটি শায়িত গজের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে।

বিহারীনাথের সিংহ
শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চের সৌজন্যে

চতুর্ভুজা দেবী পদ্মের উপর দণ্ডায়মান; উপরের দুই ভুজে জপমালা ও বৃক্ষশাখা, নীচের বাম ভুজে ঘট এবং দক্ষিণ ভুজে বরদা মুদ্রা ভঙ্গী। শরীর ও মুখের গঠন মূর্ত্তিটির আধুনিকতার পরিচায়ক। উহার আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চ প্রথমে যখন মূর্ত্তিটি আমাকে দেখান তখন আমি উহাকে প্রাচীন বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিবার পরই আমার মনে হয়, যে, ইহাকে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিলেই ঠিক হইবে।

এখন আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলির আলোচনা করিব। ইহাদের মধ্যেই আমরা মধ্যযুগের প্রথমভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে কোনো লেখক কিংবা কোনো পুরাতত্ত্ববিদ্ আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেন নাই। এই পর্য্যায়ের ভাস্কর্য্যের নিদর্শনের মধ্যে প্রথমেই আমরা পাই মাঝখানে মানুষের মূর্ত্তিযুক্ত একটি চক্র (medallion)। এই ধরণের চক্র পরবর্ত্তী কাল অপেক্ষা গুপ্তদের রাজত্বকালে বেশী প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যাতে এইরূপ চক্র ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত। কুষাণ-যুগে মথুরার স্থাপত্য-শিল্পে অলঙ্কার-রূপে ব্যবহৃত চৈত্য-গবাক্ষে, গুপ্তযুগে সারনাথ, ভুমরা, দেওগড় ও অন্যান্য স্থানের শিল্পে আমরা এই চক্রের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন রূপ দেখিতে পাই। এই ধরণের কারুকার্য্যের প্রচলন যে কত বিস্তৃত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাদামী গুহায়; সেখানেও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নির্ম্মিত দুই নম্বর বৈষ্ণবগুহায় আমরা এইরূপ চক্র দেখিতে পাই।

শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চ এই ধরণের একটি সুন্দর চক্র

পাত্রশায়েরথানার অধীন কান্তোড়ে আবিষ্কার করিয়াছেন। বাদামীগুহার পূর্ব্বোল্লিখিত চক্রে এবং ইহাতে শিবের তাণ্ডবনৃত্য একই ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। চক্রটি ভাঙাচোরা হইলেও মূর্ত্তির সুন্দর গড়নটি সহজেই
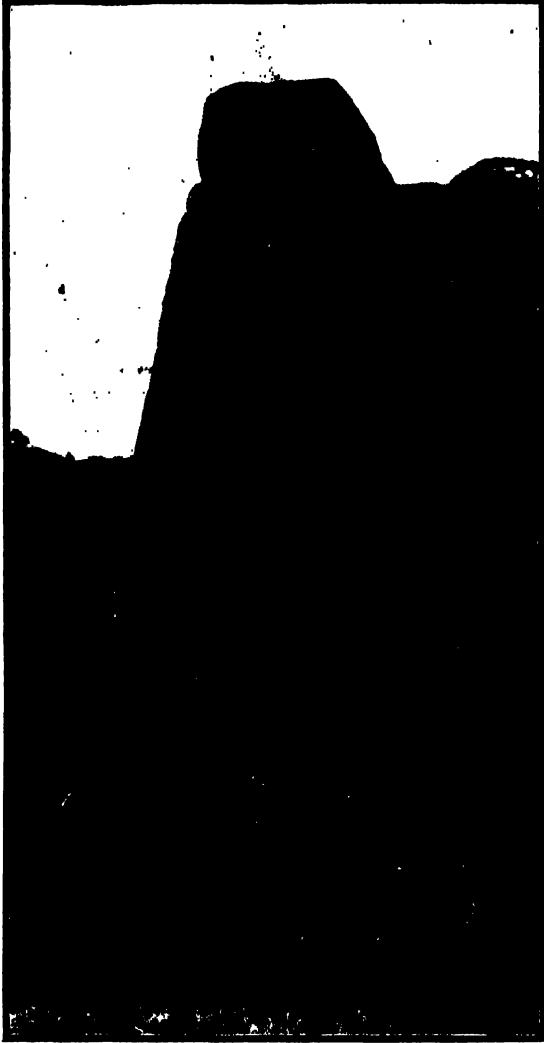
চাড়নার খোদিত বীরমূর্ত্তি
শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চের সৌজন্যে

ধরা যায়। ইহা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পরের নয়। পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ আমার জন্য ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের কেদার-গৌরী মন্দিরে যে দুইটি বিভিন্ন ধরণের নটরাজ-মূর্ত্তি সংগ্রহ করেন, তাহাদের অপেক্ষা এইখানি যে পুরাতন একথা নিশ্চিত বলা চলে।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্পীদের মনুষ্যমূর্ত্তি-গঠনের পদ্ধতি খাস বাংলা হইতে স্বতন্ত্র ছিল এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঁকুড়া কিংবা বীরভূমে প্রাপ্ত কোন বৌদ্ধমূর্ত্তির আলোকচিত্র আমার কাছে নাই। সুতরাং আমাকে জৈনমূর্ত্তির উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। এই অঞ্চলে জৈনমূর্ত্তির সংখ্যাও অনেক। তুলনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কয়েকজন সভ্য ও আমি বর্দ্ধমান জেলার উত্তর-ভাগে মঙ্গলকোটে যে জৈনমূর্ত্তিটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহার উল্লেখ করিতেছি। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শ্রীযুক্ত কে-এন দীক্ষিত বাঁকুড়া জেলায় অনেকগুলি জৈনমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বহুলাড়ায় আবিষ্কৃত পার্শ্বনাথের মূর্ত্তিটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। আমার আবিষ্কৃত মূর্ত্তিটি ও এইটি একই সময়ের এবং একই কৌসগ্গের (কায়োৎসর্গ) হইলেও দুই-এর মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য দেখা যায়। ইহাদের মুখের ভাব এবং শরীরের গড়ন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মূর্ত্তি দুইটির গঠন-পদ্ধতির এই বৈষম্য হইতেই খাস বাংলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার আর্টের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা বুঝা যায়। বাঁকুড়া এবং মানভূমের জৈনমূর্ত্তির নিদর্শন যে এই কয়টি-মাত্র মূর্ত্তিই তাহা নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের অনেক মূর্ত্তিতেই একটা বর্ব্বরোচিত শক্তি ও মুখের মাংসপেশীগুলির একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মিঃ ফ্রেঞ্চ যাহাকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া মনে করেন, বোরামের সেই সুন্দর দুর্গা মূর্ত্তিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিম সীমানায় বরাকর নদীর তীরে বরাকর গ্রামের বড় মন্দিরের বাহিরে যে স্ত্রীমূর্ত্তিটি আছে তাহাতেও এই বিশেষত্ব খুব পরিস্ফুট। এই জায়গারই আর একটি সম্পূর্ণ স্ত্রীমূর্ত্তিতে পূর্ব্বোক্ত বৈশিষ্ট্য আরও সুস্পষ্ট। মূর্ত্তিটি খুব সম্ভব জৈন শাসনদেবী চক্রেশ্বরীর। মিঃ ফ্রেঞ্চের সৌজন্যে আমার বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় সারেণগড় দেখা ঘটিয়াছিল। সারেণগড় কুমারী নদীর তীরে; কয়েকটি জীর্ণ কুটীরমাত্র এখন তার সম্বল; কিন্তু নদীতীরের পাঁচ ছয়টি ভাঙা মন্দির তাহার অতীত গৌরবের পরিচয় দেয়। এখানকার সবচেয়ে

বড় মন্দিরটি জৈন। পূর্ব্বে এখানে স্থাপিত বিরাটকায় পার্শ্বনাথ এবং মন্দিরের সুবৃহৎ ভিত্তি ইহার পূর্ব্বতন গৌরবের একমাত্র প্রমাণ। আমাদের ক্যামেরা বিকল হইয়া যাওয়ায় আমরা ইহার ছবি তুলিতে পারি নাই। আমাদের দ্বারা পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী ছাতড়ায় আবিষ্কৃত পার্শ্বনাথের সঙ্গে এই পার্শ্বনাথের তুলনা করা যাইতে পারে। সারেণগড়ের দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি সূর্য্যদেবকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটিকে বাঁকুড়া জেলায় মিঃ ক্রেক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একেশ্বর মন্দিরের গণেশপ্রমুখ উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিগুলির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

সারেণগড়ের তৃতীয় মন্দিরে একটি লিঙ্গ এবং একটি ভগ্ন দুর্গামূর্ত্তি আছে। সারেণগড়ে কুমারী নদীর তীরে আর একটি মন্দির ছিল। সেখানেও একটি লিঙ্গ ছিল বলিয়া মনে হয়। মিঃ ক্রেকের মতে সারেণগড় কথাটার ব্যুৎপত্তি দুইটি কথা হইতে হইয়াছে, সাঁওতালি সারুণ—দেবতা, এবং গড়—দুর্গ। বাঁকুড়া হইতে সারেণগড় যাইতে হইলে মানপুরের নিকট মানভূম জেলার এক অংশ অতিক্রম করিতে হয়। সুতরাং সারেণগড়ের ভাস্কর্য্য ছাতড়া এবং মানভূমের অন্যান্য মূর্ত্তির সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত।

নারায়ণপুরের পার্ব্বতী মূর্ত্তি
শ্রীযুক্ত জে-সি ক্রেকের সৌজন্যে

কিচান্দার বিশাল শাসনদেবীর মূর্ত্তি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিচান্দা বাঁকুড়া জেলার রাতড়া থানার এলাকাভুক্ত। মূর্ত্তিটি উচ্চে প্রায় আট [illegible]। উহার পিছনের চালিতে পাঁচটি জিন অথবা তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি আছে। প্রধান মূর্ত্তিটির মাথার উপরে কতকগুলি সফল আম্রশাখা এবং পাশে তেরটি পঙক্তিতে জৈনপুরাণের গল্পাংশ উৎকীর্ণ আছে। দেবী যে পদ্মটির উপর দাঁড়াইয়া আছেন তাহার নীচে একটি সিংহ উপবিষ্ট। বিহারীনাথের উৎকীর্ণ সিংহ দেখিয়া মনে হয়, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্পকলার পতন দ্বাদশ শতাব্দীর পর আরম্ভ হয়। পা-দানের শিলালিপিটি অস্পষ্ট। দ্বিতীয় পঙক্তির প্রথম শব্দ "শ্রীজগপালস্ত" বলিয়া
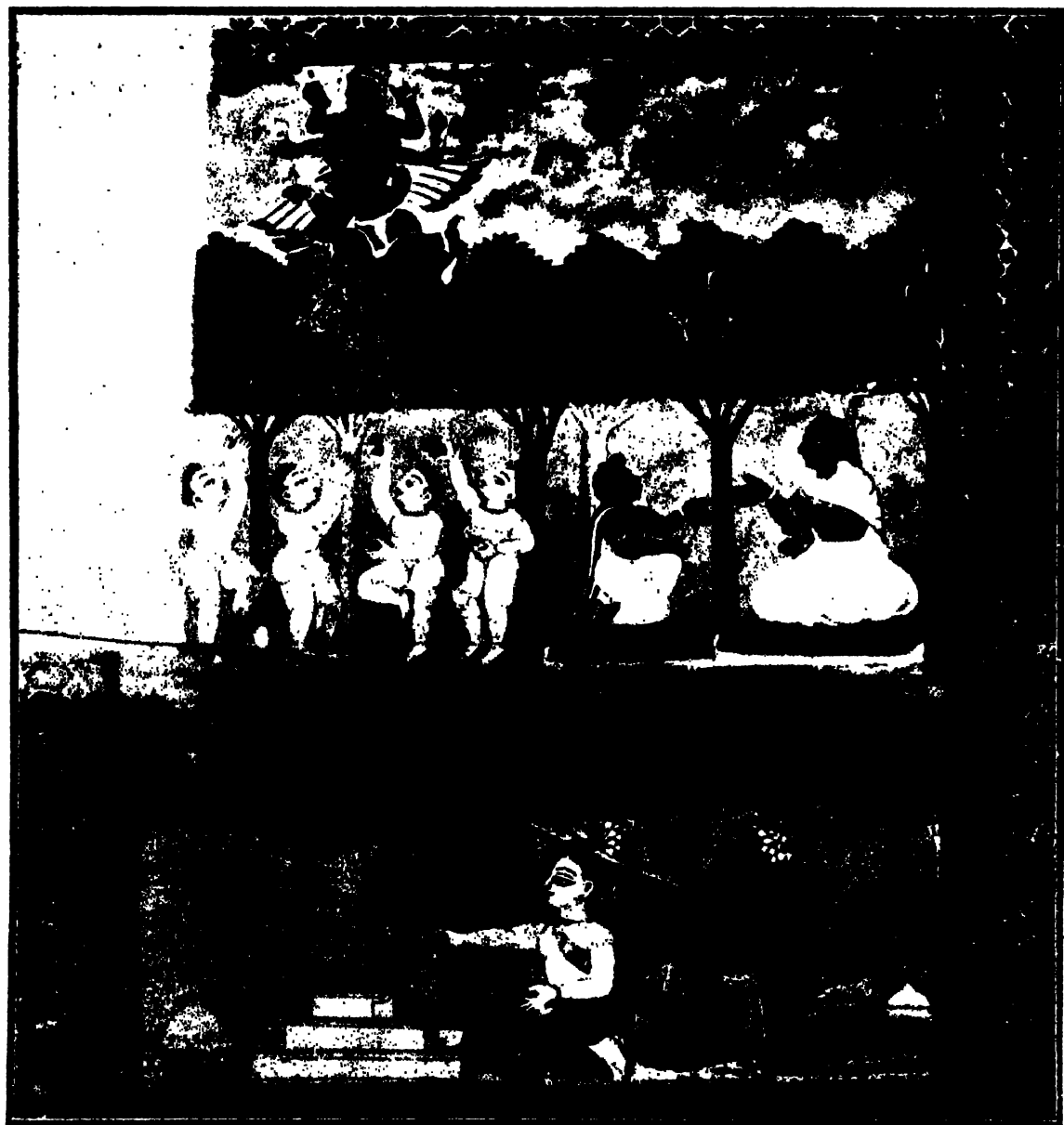
বাঁকুড়ার চিত্রকলা—১২ং চিত্র
শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চের সৌজন্যে

বাঁকুড়ার চিত্রকলা—২ নং চিত্র
শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চের সৌজন্যে

বাঁকুড়ার চিত্রকলা — ৩ নং চিত্র
শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চের সৌজন্যে
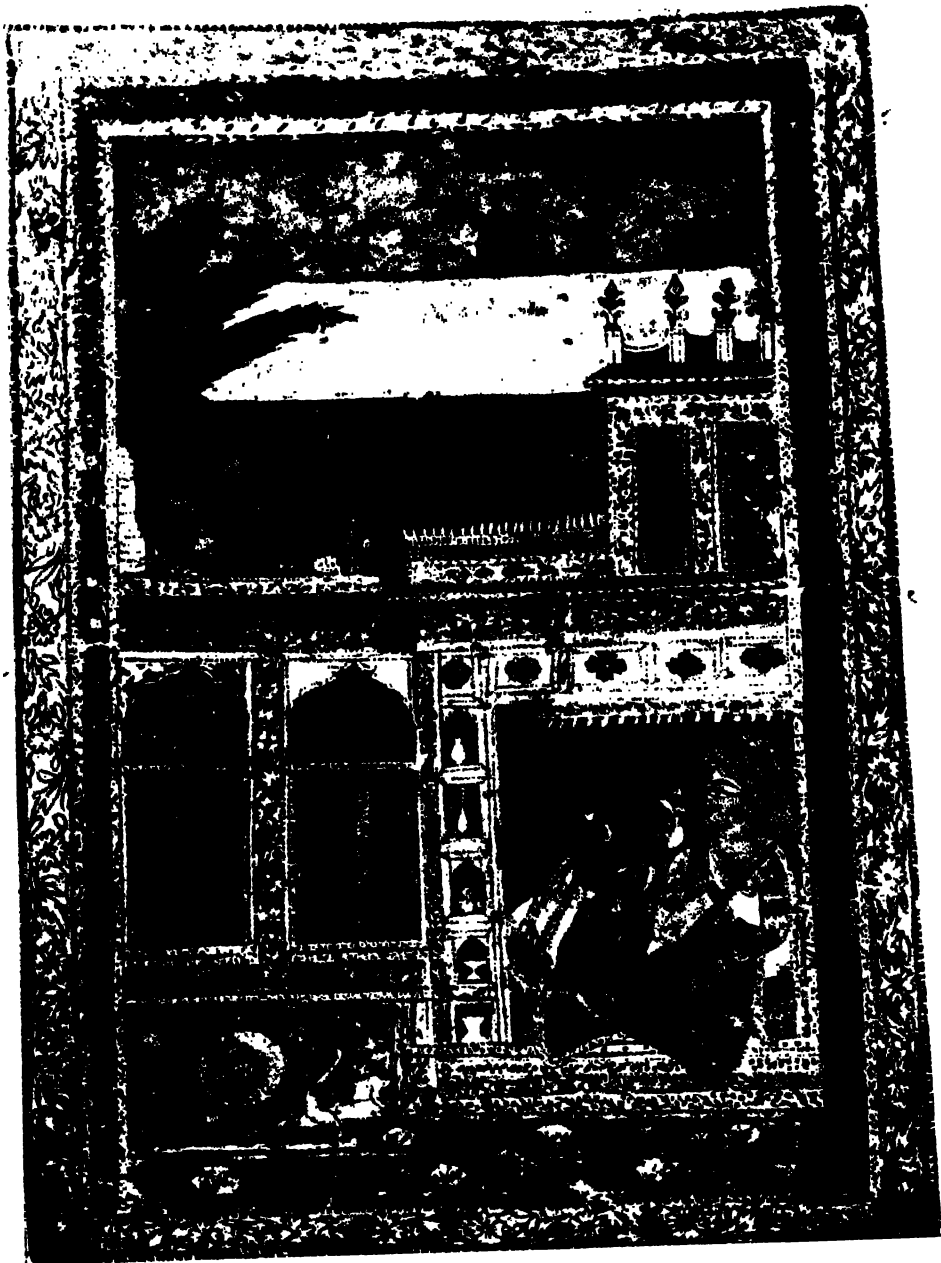
জন রমণী দুই হস্তে দীর্ঘ মৃণালযুক্ত দুইটি পদ্ম ধরিয়া আছেন; ইহাদের চারিদিকে পূজার সামগ্রী। দ্বিতীয় চিত্রটি বন্য হস্তী, ময়ূর, পেচক, ও হরিণে পরিপূর্ণ একটা পার্ব্বত্য জায়গার; একজন পুরুষ হাতে কি একটা চিত্রকলার কোনো বর্ণনা বা সমালোচনা পড়ি নাই। আমাদের বিখ্যাত কলাবিৎ অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলী মহাশয়ও এ-সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন বলিয়াও আমার জানা নাই। ১৯০৬ সনের পর আমি তালপাতার

চক্রের মধ্যে নটরাজ শিবের মূর্ত্তি
শ্রীযুক্ত জে-সি ফ্রেঞ্চের সৌজন্যে

জিনিষ লইয়া এই দুর্গম জায়গার ভিতর দিয়া চলিয়াছেন। তৃতীয় চিত্রে একটি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখভাগ দেখান হইয়াছে; ইহার ভিতরে রাজা ও রাণী বসিয়া আছেন, রাণীর হাতে একটি সেতার কিংবা বীণা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা এ-কে কুমারস্বামীর রচনায় আমি বাঁকুড়ার উপর আঁকা অনেক ছোট ছোট ছবি দেখিয়াছি—সেগুলি এখন নেপালে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু কলিকাতা প্রদর্শনীতে এবং মিঃ জে-সি ফ্রেঞ্চের নিকটে ভিন্ন বাঁকুড়ার চিত্রকলার কোনও নিদর্শন আমি আর কখনও বা অন্য কোথাও দেখি নাই।

রামমোহন রায় ও রাজারাম

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম

অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "রামমোহন ও রাজারাম" প্রবন্ধটি পড়িলাম। সুলিখিত প্রবন্ধটি অনেক পরিশ্রমের ফল বেশ বুঝিতে পারা গেল। ব্রজেন্দ্রবাবু রাজার একজন ভক্ত; কি-না পরিশ্রম করিয়া যুগপ্রবর্ত্তকের জীবনের বিস্মৃত বৃত্তান্ত ও লুপ্ত কীর্ত্তির উদ্ধারসাধন করিতেছেন! যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসুর নিকট সপক্ষ ও বিপক্ষের কথার আলোচনা অত্যাবশ্যক মনে হয়। ব্রজেন্দ্রবাবু ধীরভাবে সতর্কতার সহিত উক্ত বিষয়ে তাঁহার জিজ্ঞাসা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইল না যে, একটা নিঃসন্দিগ্ধ সমাধানে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে। তাঁহার সমাধান-চেষ্টা জিজ্ঞাসার সীমা অতিক্রম করিয়া নির্ণয়ের ভিত্তিতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। এ অবস্থায় কাহারও 'প্রবাসী'-সম্পাদকের উপর ক্রুদ্ধ হইবার কারণ দেখি না। এই জিজ্ঞাসাসূত্রে যদি একটি হাঁ কি না-তে আমরা পৌঁছাইতে পারি, তাহা হইলে ত ভালই হয়। রামমোহন রায়ের শৈশবে ও বাল্যে বিবাহিতা তিন পত্নী এবং দুই পুত্র ছিলেন—আমরা জানিতাম; এখন না হয় জানিলাম তিন পুত্র আর চার পত্নী। কিন্তু জানাটা যেন আন্দাজমাত্র না হয়। একদিকে যেমন এই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, অপর দিকে শৈববিবাহ বিবাহই নয়—এই কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তবেই তথ্যনির্ণয়ের সাহায্য হইবে, নতুবা নয়।

রামমোহন ও বহুবিবাহ

শৈববিবাহের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বহুবিবাহ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের কি মত ছিল জানিয়া রাখা ভাল। রামমোহন রায় একাধিক পত্নী গ্রহণকে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মনে করিতেন না, inexpedient (অকুশল) ভাবিতেন। মিস্ কলেটের লিখিত রাজার চরিত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"So strongly was he opposed to polygamy that (Mr. Adam tells us) he inserted clauses in his will disinheriting any son or more remote descendant who had more than one wife at the same time. But he was, we are informed, a monogamist not on religious grounds but on grounds of expediency." (Collet's *Life*. p. 77).

এডাম সাহেবের চিঠির তারিখ ১৮২৬ খৃঃ অব্দ। মনে হয়, দেখিয়া শুনিয়া ভুগিয়া রাজা শেষবয়সে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন যেন তাঁহার বংশে কেহ বহুবিবাহ না করে। তবু তাঁহার মতে বহুবিবাহ অধর্ম্ম নয়, অকুশল, অহিতকর কার্য্য।

রামমোহন ও শৈববিবাহ

রাজা বহুবিবাহকে অধর্ম্ম মনে করিতেন না। শৈব-বিবাহ যে তিনি ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ বলিয়া জানিতেন—ব্রজেন্দ্রবাবু ইহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু লোকের ধারণা শৈববিবাহ ও ব্যভিচার একই পদার্থ, বাস্তবিক তাহা নয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে তুলিয়া দিলাম—

শৈববিবাহের স্বরূপ

যে স্ত্রী ব্রাহ্মবিবাহ দ্বারা পরিগৃহীত হয়, সেই ভার্য্যাই পত্নী ও গৃহেশ্বরী হইয়া থাকে। এই পত্নীর অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিই আর পুনর্ব্বার ব্রাহ্মবিবাহ করিতে পারে না। হে কুলেশ্বরি! ব্রাহ্ম-বিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান বা তদ্বংশীয় কেহ বর্ত্তমান থাকিতে শৈববিবাহে বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইতে পারিবে না। হে পরমেশ্বরি! শৈববিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যা ও তাহার গর্ভজাত সন্তানগণ শৈববিবাহ-কর্ত্তার ধনভোগী উত্তরাধি-কারীর নিকট বিত্তানুসারে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রাপ্ত হইবে। হে শিবে! শৈববিবাহ দ্বিবিধ; এই দুই প্রকার বিবাহই কুলচক্রে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এক প্রকার বিবাহ চক্রের নিয়মানুসারে চক্রনিবৃত্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী, দ্বিতীয় প্রকার বিবাহ জীবনাবধি স্থায়ী। চক্রানুষ্ঠানকালে ধীর সমাহিত চিত্তে শক্তিসাধক স্বজনগণের সহিত পরিবৃত হইয়া উভয়ের (শক্তির ও নিজের) ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিবেন। প্রথমতঃ তিনি ভৈরবী ও বীরবৃন্দের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিবেন যে—"হে শক্তিসাধকগণ! আমাদের উভয়ের শৈব-বিবাহ বিষয়ে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।" তৎপর ভৈরবী ও বীরবৃন্দের অনুমতি লইয়া "পরমেশ্বরি স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র অষ্টোত্তর শত বার জপ করিয়া পরমদেবী কালিকাকে নমস্কার করিবেন। শিবে, অতঃপর বীর শক্তিসাধকগণের সন্নিধানে সেই রমণীকে বলিবেন যে হে দেবি, আমাকে অব্যাজহৃদয়ে পতিত্বে বরণ কর। হে দেবেশি! পরে সেই কুলকামিনী শ্রদ্ধাযুক্ত-হৃদয়ে গন্ধপুষ্পা-ক্ষত দ্বারা প্রিয়জনকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক বরণ করিয়া তাহার হস্তোপরি হস্তদ্বয় প্রদান করিবে। তখন চক্রেশ্বর "রাজরাজেশ্বরী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতঃ সেই দম্পতীকে অভিষিক্ত করিবেন এবং চক্রস্থিত সমস্ত বীরবর্গ সাদরে 'স্বস্তি স্বস্তি এই মাঙ্গল্য বাক্য বলিবেন।

মন্ত্রার্থ যথা—"রাজরাজেশ্বরী, কালী, তারিণী, ভুবনেশ্বরী, বগলা, কমলা, নিত্যা ও ভৈরবী, ইঁহারা তোমাদের উভয়কে রক্ষা করুন।' চক্রেশ্বর উক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ মদ্য বা অর্ঘোদক দ্বারা দ্বাদশবার উভয়কে অভিষেক করিবেন। পরে দম্পতী প্রণাম করিলে চক্রেশ্বর 'ক্রীঁ' 'শ্রীঁ' এই বীজদ্বয় শ্রবণ করাইবেন। হে কুলেশ্বরি, সেই কুলীন দম্পতি সেই বিবাহস্থলে যাহা যাহা অঙ্গীকার করিবেন নিম্নোক্ত বিধি অনুসারে তৎসমস্তই সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে। এই শৈববিবাহস্থলে কত বয়স, কোন্ বর্ণ বা কোন্ জাতি তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই; শম্ভুর এই প্রকার আজ্ঞা আছে যে, ভর্ত্তৃহীনা ও অসপিণ্ডা হইলেই তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে॥ সন্তান-কামনায় ঋতুকাল দেখিয়া চক্রনিবৃত্তি পর্য্যন্ত সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া যে কামিনীকে বিবাহ করা হইবে, চক্রশেষ হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অনুলোম-বিবাহে বিবাহিতা শৈব-ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান মাতৃবৎ আচার-ব্যবহার করিবে। কিন্তু যদি বিলোম-বিবাহ হইয়া থাকে, তবে তদ্‌গর্ভজাত সন্তান সামান্য (বর্ণসঙ্কর) জাতির ন্যায় আচার-ব্যবহার করিবে। এই সমস্ত সঙ্কর জাতির পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে কেবল কৌল ব্যক্তিদিগকেই ভোজ্য প্রদান ও ভোজন করান বিহিত। হে দেবি, ভোজন ও মৈথুনই এই দুইটি মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবতঃ প্রিয়। এই জন্য উভয়ের সঙ্কোপের জন্য এবং তদ্দ্বারা হিতসাধনার্থ শৈবধর্ম্মে তাহার সীমা নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং হে মহেশানি! শৈবধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই॥—মহা নির্ব্বাণতন্ত্র, নবমোল্লাস ২৬৬—২৮৪ শ্লোকের পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ।

শৈববিবাহ পরদারাভিমর্ষণ নয়, বেশ্যাগমন নয়, গুপ্ত প্রণয় নয়, 'পরকীয়া পীরিতি' নয়—সমবিশ্বাসীদের সমক্ষে অসপিণ্ডা ও ভর্ত্তৃহীনার ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক পতি গ্রহণ। ইহাতে চক্রেশ্বর (presiding priest) আছেন, তাঁহার দ্বারা অভিষেক আছে, সম্প্রদান আছে, অনুমতি গ্রহণ আছে, অসপিণ্ডা এবং ভর্ত্তৃহীনার গণ্ডী দেওয়া আছে। এত থাকিতে কি জোর করিয়া বলিবার জো আছে যে ইহা বিবাহ নয়? কেহ বলিতে পারেন এ বিবাহের এক রকম ত দেখিতেছি চক্রান্ত পর্য্যবসায়ী; ইহা কতকটা সিয়া মুসলমানদের মোতা নিকার মত। কিন্তু এই রকম বিবাহের সঙ্গে ত কিংবদন্তী রামমোহনকে সম্পর্কিত করিতেছে না, বরং বলিতেছে তিনি যবনীর সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই। "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট" বনামে [সম্ভবতঃ] রামমোহন শৈবমতে বিবাহিতা যবনীকে তাঁহার পত্নী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—জোর করিয়া সেই বিবাহিতা পত্নীকে উপপত্নী বলিলে চলিবে কেন? স্মার্ত্তমতও হিন্দুর ধর্ম্ম শৈবমতও হিন্দুর ধর্ম্ম। কেহ বলিতে পারেন শৈব বিবাহের স্ত্রীর মর্য্যাদা কোথায়? আর পুত্র ত বিষয় পায় না, কি করিয়া বলি শৈব বিবাহের স্ত্রী পত্নীই? স্মার্ত্তমতে বিবাহিতা বিভিন্ন বর্ণের পত্নীদের পদমর্য্যাদার সাম্য ও গর্ভজাত পুত্রদের উত্তরাধিকারের ত সাম্য দেখিতেছি না। ব্রাহ্মণীর কুমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ক্ষত্রিয়ার পুত্র তদপেক্ষা অল্প, বৈশ্যাপুত্র তাহার চেয়েও কম ও শূদ্রার পুত্র আরো কম পায়। সুতরাং দায়াধিকার সাম্যের সহিত হিন্দুর বিবাহের অতি অল্পই সম্পর্ক আছে। অথচ স্মৃতির ব্যবস্থায় ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণের বৈধ পত্নী—উপপত্নী নহেন। বিষয়টা পরিষ্কার করিবার জন্য নিম্নে মহাভারত, মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা উদ্ধৃত করা গেল :—

ব্রাহ্মণীর গর্ভজাতপুত্র অগ্রে পিতৃধন হইতে সুলক্ষণ বৃষ ও যান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তু সকল শ্রেষ্ঠাংশস্বরূপ গ্রহণ করিবে। তৎপরে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দশ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতেও ব্রাহ্মণীগর্ভসমুৎপন্ন পুত্র চারি অংশ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে। বৈশ্য গর্ভজাত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং শূদ্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে একাংশ মাত্র গ্রহণ করিবে। যদিও শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে সমুৎপন্ন পুত্র পৈত্রিক ধন গ্রহণের একান্ত অনুপযুক্ত তথাপি তাহাকে দয়া করিয়া অল্পমাত্র ধন প্রদান করা কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণের ধন দশ অংশ করিয়া সবর্ণা ও অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্রেরা এইরূপে অধিকার করিবে। যে স্থলে সকল পুত্রই সমানবর্ণা হইতে উৎপন্ন হইবে সে স্থলে পিতৃধনের সমান অংশ কল্পনা করাই বিধেয়। শূদ্রাতনয় শম দম প্রভৃতি সদ্গুণ বিরহিত বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আর তিন বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যাহারা জন্মগ্রহণ করে তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়, শাস্ত্রে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্চমবর্ণ নাই। এই চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্র নিকৃষ্ট বর্ণ। এই নিমিত্ত শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণের ধন হইতে দশ অংশের একাংশ মাত্র গ্রহণ করিবে। তাহাও আবার পিতা যদি স্বেচ্ছানুসারে দান করেন তাহা হইলেই গ্রহণ করিতে পারিবে। নতুবা সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাচ তাহাতে হস্ত প্রসারণ করিতে পারিবে না, তথাচ শূদ্রাপুত্রকে নিতান্ত বঞ্চিত না করিয়া পৈতৃকধন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করা পিতার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়, ১১-১৯ শ্লোক)

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্রমশঃ বিবাহিত চারি জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদিগের প্রাপ্য বিষয়বিভাগ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। ব্রাহ্মণীর গর্ভজ সন্তান একটি কর্ষক, একটি বৃষ, একটি যান, অলঙ্কার এবং একটি বাটী ও অপর বিষয়ের এক প্রধান অংশ প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্মণ তিন অংশ, ক্ষত্রিয়াসুত দুই অংশ, বৈশ্যা পুত্র দেড় অংশ এবং শূদ্রাসুত একাংশ প্রাপ্ত হইবে॥ অথবা একজন বিভাগধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি দশ ভাগ করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে বিভাগ করিবেন। ব্রাহ্মণ চার অংশ, ক্ষত্রিয়াসুত তিন অংশ, বৈশ্যাসুত দুই অংশ এবং শূদ্রাসুত এক অংশ প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া অথবা বৈশ্যা—কাহারও গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হউক বা না হউক, শূদ্রাগর্ভজ সন্তান দশম ভাগের অতিরিক্ত পাইবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যের অনূঢ়া (?) শূদ্রা গর্ভজ পুত্র ধনভাগী হয় না। পিতা ইচ্ছা-পূর্ব্বক যাহা ইহাকে দিয়া যাইবেন, তাহাই প্রাপ্ত হইবে।

(মনুসংহিতা, ৯ম অধ্যায়, ১৪৯-১৫৫ শ্লোক)

চতুস্ত্রিংশোকভাগাঃ স্যুর্ব্বর্ণশো ব্রহ্মণাত্মজাঃ।
ক্ষত্রজাস্ত্রিংশোকভাগা বিড়্জাস্তু দ্ব্যেকভাগিনঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১২৮ শ্লোক।

চারিজন (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চাতুর্ব্বর্ণীয় পত্নীর গর্ভজাত) ব্রাহ্মণ পুত্র বর্ণানুক্রমে সমস্ত পৈতৃকধনের চারিভাগ, তিনভাগ, দুইভাগ ও একভাগ; তিনজন (ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই ত্রিবর্ণীয় পত্নীর গর্ভজাত) ক্ষত্রিয় পুত্র বর্ণানুক্রমে তিন ভাগ, দুইভাগ ও একভাগ, এবং দুই জন (বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজাত) বৈশ্য পুত্র দুইভাগ এবং এক ভাগ প্রাপ্ত হইবে। (ব্রাহ্মণের সম্পত্তি দশভাগ হইবে; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণী পুত্র চারিভাগ, ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যাপুত্র দুইভাগ ও শূদ্রাপুত্র এক ভাগ পাইবে)।

বৈদিক ধর্ম্মানুসারী ব্রাহ্মণেতর বর্ণের প্রতিই স্মৃতিকারেরা সুবিচার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তখন বেদানুকূলমাত্র শৈবমতাবলম্বী বা তন্ত্রধর্ম্মচারীদের শিববাক্যে তন্ত্রমতে বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তানের প্রতি যে সুবিচার হইবে ইহা আশা করা যায় না। শৈববিবাহেও হিন্দুর অভ্যস্ত বৈষম্যবাদের ছায়া পড়িয়াছে। তবু খোরপোষের অধিকার দিবার তন্ত্রে ব্যবস্থা আছে, শুধু তাই নয় বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র বংশের কেহ না থাকিলে শৈববিবাহের স্ত্রীর পুত্র বিষয় পাইবার ইঙ্গিত রহিয়াছে। খোরপোষের অধিকারও একটা অধিকার বটে। কালক্রমে অপরের অভাবে উত্তরাধিকারও বলিতে হইবে। এই সম্পর্কে বলিয়া রাখি আজকালের ইংরেজ সরকার কর্তৃক সংস্কৃত হিন্দু আইনের কথা ভাবিলে চলিবে না। ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে কি ব্যবস্থা ছিল ও ইংরাজরাজত্বের সূত্রপাতকালে কি চলিতেছিল তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

রামমোহন রায় রংপুরে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সংস্পর্শে আসেন। তিনি কৈশোরে ও যৌবনে বাইশবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে হরিহরানন্দের মত সিদ্ধাচার্য্যের নিকট সাধন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা কিছু অসম্ভব নয়। দেখিতেছি রামমোহন তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া আপন বাড়ীতে স্থান দিতেছেন। যে মহানির্ব্বাণতন্ত্র রামমোহন রায় বহুল পরিমাণে উদ্ধার করিয়াছেন সেই তন্ত্র বলেন :—

বিবাহো ভৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রেঽপি পার্ব্বতি।
সর্ব্বথা সাধকেন্দ্রেণ কর্ত্তব্যঃ শৈববর্ত্মনা॥
বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্।
পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র,—অষ্টমোল্লাস ১৭৮—১৭৯ শ্লোক।

হে পার্ব্বতি, শিব-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতঃ ভৈরবী চক্রে ও তত্ত্বচক্রে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করা সাধকের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যদি কোন বীরপুরুষ শৈববিবাহ ব্যতীত শক্তিসেবা করে, তাহা হইলে তাহাকে পরস্ত্রীগমনজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে; ইহাতে সংশয় নাই।

খুব সম্ভব সাধনসৌকর্য্যার্থ গুরুর আদেশে রামমোহনকে শৈববিবাহ করিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, তখনকার দিনে স্ত্রী লইয়া দূরস্থ কর্ম্মস্থানে যাইবার প্রথা ছিল না। রামমোহন রায়ের শৈববিবাহিতা যবনী পত্নী থাকিলেও থাকিতে পারেন। তিনি সম্ভবতঃ রামমোহনের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু রাজারাম যে তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র তাহার কোন প্রবল প্রমাণ নাই।

ব্রজেন্দ্রবাবু যে পাসপোর্টের প্রমাণ দিয়াছেন তাহা অন্যস্থলে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত কিন্তু এ স্থলে নয়। কেননা, বেনাম ব্যবহার রামমোহনের অস্থিমজ্জাগত ছিল। এডামের কথা উদ্ধার করিয়া মিস্ কলেটের স্থূলীভূত শ্লেড সাহেব বলিতেছেন—

Mr. Adam adds: "I regret that he continues to publish these things in the name of another, but I cannot succeed in dissuading him from it. This persistent assumption of other people's names is indeed a puzzle. There seems to have been a secretive strain in Rammohun's blood, which made him favour this pseudonymous authorship."

রামমোহন রায় কখন রামদাস কখন শিবপ্রসাদ শর্ম্মা, কখন চন্দ্রশেখর দেব, কখন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী কখন বা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বা হরচন্দ্র রায় ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি শিষ্য বা বন্ধুদের নামে প্রকাশিত যে সঙ্গীতগুলি তাহাও রামমোহন রায়ের রচিত বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রকৃত কারণ খুঁজিতে গেলে উপলব্ধি হয় যে, রামমোহনের ব্যক্তিত্ব বহুব্যূহ-সমন্বিত (multi-personal) ছিল। একের মধ্যে বহুর প্রকাশ বিরাট পুরুষের লক্ষণ। তিনি যে এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সিরিজের চিন্তা ও কর্ম্ম করিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহার মধ্যে এই বিরাটত্ব ছিল বলিয়াই। এ বিষয় আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার স্থল ও সময় এ নয়। তিনি শুধু নিজে বদলিয়া যাইতেন তাহা নয়, পরকেও বদলাইতেন। রামমোহনের প্রদৌহিত্র নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "রামমোহন সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প" পুস্তকে লেখেন—"রাজা রামমোহনের সঙ্গে যাঁহারা ইংলণ্ডে গমন করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আপনার নামের যোগে নাম রাখেন। রামরত্নের পূর্ব্বনাম শম্ভু এবং রামহরি দাসের পূর্ব্বনাম হরিদাস।" পাসপোর্টে দেখিতেছি শম্ভু রামরতন হইয়াছেন, রাজারাম সেখ বক্সু হইয়াছেন, আর হরিদাস হরিদাসই থাকিয়া গিয়াছেন। আবার বিলাত গিয়া সেক বক্সু রাজারাম এবং হরিদাস রামহরি দাস হইয়াছেন। রাজাতে পরিবর্ত্তনপ্রবণতা ছিল বটে, কিন্তু বৃথা চাঞ্চল্য ছিল না। যিনি পরিবারের

মধ্যে রাজারাম বলিয়া পরিচিত, যাঁহার বক্স নাম রামমোহন ব্যতীত অপর কেহ জানে না, তাঁহাকে পাসপোর্টের বেলায় বক্স করিবার হেতু কি? হয়ত যে সাহেবের নিকট হইতে ইঁহাকে আনা হইয়াছিল সে বালকটিকে বক্স বলিয়া ডাকিত আর বক্স লিখিতে হইলেই তাহার সঙ্গে সেখ জুড়িতে হইবে, এই কারণে সেখ বক্স নামে পাসপোর্ট লওয়া হইয়াছিল; না হয় রাজারামকে বিলাত লইয়া যাওয়ার সম্বন্ধে রাধাপ্রসাদের বা পরিবারবর্গের আপত্তি ছিল। রামমোহন রায় একটা নামকরণ করিয়া সেই নামে পাসপোর্ট লইয়া এই সঙ্কট এড়াইলেন। বিলাত যাত্রার দিনে এই পাসপোর্ট হস্তগত করিবার ইহা একটি কারণ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্তটি হওয়া বেশী সম্ভব।

এখন কিংবদন্তীর কথা। চন্দ্রশেখর দেব বলেন—রামমোহন রায় বলিতেন জনৈক সাহেবের দরওয়ানের শিশুকে তিনি পালন করিতেছেন। লোকে বলিত এটি তাঁহারই উপপত্নীর সন্তান। লোকে ত অনেক কথাই বলিয়াছে। নিত্য গোবৎসবধের কথাও বলিতে ছাড়ে নাই। আবার যে কিংবদন্তী ডিক্ সাহেবের নামের সঙ্গে জড়িত তাহাতেও বলা হইতেছে রামমোহন নিজে বলিয়াছেন রাজারাম তাঁহার ঔরসপুত্র নহেন। মিসেস্ এডামের কথা যাহা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় সংগ্রহ করিয়া বহু বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতী'তে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাহা 'প্রবাসী'র গত পৌষ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেও প্রকাশ রাজারাম রামমোহন রায়ের ঔরসপুত্র নহেন। কিংবদন্তীর পল্লবিত অংশের অনৈক্য থাকিলেও এই এক অংশে সুস্পষ্ট ঐক্য রহিয়াছে—রাজারাম তাঁহার ঔরসপুত্র নহেন।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি পাসপোর্টে নাম বদলাইলেই প্রমাণ হয় না যে, রাজারাম মুসলমান ছিলেন। আর মুসলমান হইলেও মনে করিবার কারণ নাই যে, সেখ বক্স রামমোহনের শৈবমতে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত। আর রাজারাম বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুসলমান-সমাজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন ইহা সত্য হইলেও প্রমাণ হয় না যে, তিনি মুসলমান ছিলেন। জাত হারাইলে মানুষ শুধু বৈষ্ণব হয় যে তা নয়, মুসলমানও হয়। সিভিল সারভেণ্ট হইয়া আসিতে পারিলে হয়ত ইনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান মেম বিবাহ করিয়া আসিতেন; তাহা ত পারেন নাই। শোনা যায় এখানে আসিয়া কাষ্টমসের কালেক্টর হইয়াছিলেন; আর ইনিটেরিয়ান মুসলমান-কন্যা বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সম্পর্কে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ তখনও হিন্দুবর্ণভেদের আওতা এড়াইয়া উঠিবার সময় পায় নাই। আর রাধাপ্রসাদ বা রমাপ্রসাদ অনুকূল ছিলেন বলিয়া ত মনে হয় না; সুতরাং হিন্দুসমাজে তাঁহার স্থান হওয়া দুষ্কর ছিল। প্রবাদ আছে যে, রাজারাম বিষয় সম্পর্কে একটি দানপত্র লইয়া আসিয়াছিলেন; তাহা জনার্দ্দন সাহা নামক এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করেন। ইহা ক্রমে ৺নীলকমল মিত্রের হাত হইয়া রমাপ্রসাদ রায়ের হস্তগত হয়। রাজারাম রমাপ্রসাদ-গৃহিণীকে বউঠাকুরাণীই বলুন আর যাই বলুন, রমাপ্রসাদের সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই।

যদি ইহা কখনও প্রমাণিত হয় যে, রামমোহনের (অনুমিতা) শৈববিবাহিতা পত্নী রাজারামকে সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিয়া একত্র বাস করিয়াছেন তাহা হইলেই রাজারামের যবনীমাতৃকত্ব প্রমাণিত হইবে, রামমোহনের ঔরসজ বলিয়া অনুমিত হইবার কোঠায় আসিবে। Sometimes a negative is more pregnant with directions to truth than a barren positive, as ashes are more productive than dust—এই সুধীজন-বাক্য মনে রাখিয়া তথ্যানুসন্ধানের সাহচর্য্যকল্পে লিখিলাম। যদি কিছু সাহায্য হয় কৃতার্থ হইব। এখানে বলিয়া রাখি যে রামমোহন রায়ের শৈবমতে বিবাহিতা যবনী পত্নীর অস্তিত্ব, আর রাজারাম যে তাঁহারই গর্ভজাত ইহা যদি কখনো প্রমাণিত হয়, তাহাতে রামমোহনের উদারমতাবলম্বী শিষ্যদিগের ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই কারণ নাই।

মনে রাখিতে হইবে, তাঁহার শৈশবেই তাঁহার এক পত্নীর মৃত্যু হয়, অপর দুই পত্নীর সহিত বিবাহ প্রায় শৈশবেই হয়, এবং এই দুই পত্নী তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহার সহিত বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কত বয়সে এই সম্পর্কত্যাগ ঘটিয়াছিল, তাহা জানা নাই; এবং তিনি যদি মুসলমানী বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এইরূপ সম্বন্ধবিচ্ছেদের পর করিয়াছিলেন কিনা, তাহাও জানা নাই।

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(২) যবদ্বীপ—বাতাবিয়া—প্রথম পর্ব্ব

২১শে অগষ্ট ১৯২৭, রবিবার।—

বাতাবিয়ার বন্দর Tandjong Priok তান্‌জোং-প্রিওক্‌-এ যখন আমাদের জাহাজ পৌছুলো, তখন বেলা প্রায় আটটা। দু' রাতের পাড়ীর পর সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজ আস্‌ছে, মস্ত জাহাজ, কাজেই খানিকটা ব্যস্ততার সাড়া চা'র দিকে প'ড়ে গেল,—যাত্রীরা মোট-ঘাট বেঁধে ঠিক হ'তে লাগ্‌ল। আমাদের প্রাতরাশ ইতিমধ্যেই চুকে' গিয়েছে; মালপত্র ডেকের উপরে এক-জায়গায় স্তূপাকার ক'রে রেখে, দূর থেকে যবদ্বীপের ভূমি দর্শন করবার জন্ত রেলিং ধ'রে দাঁড়ালুম। সকালেই কাপ্তেনের সঙ্গে কবির বিদায় অভিভাষণ হ'য়ে গিয়েছে। আমাদের জাহাজে সেকেণ্ড ক্লাসে ভারতবর্ষ থেকে এক দল ইউরেশীয় ফুটবল খেলোয়াড় যাচ্ছিল; তাদের মধ্যে জন-কতকের খাকী শার্ট্‌ আর ফুট্‌বলের মোজা পরা—এরা মালাইদেশ হ'য়ে যবদ্বীপ ফিলিপাইন দ্বীপ প্রভৃতি ঘুরে আবার দেশে ফিরবে- আমাদের মোহন-বাগানের দল যেমন একবার ক'রেছিল। এদের কতকগুলো ছোকরা আর আধাবুড়ো খেলোয়াড়, ক'লকাতার ইউরেশীয়দের খুব-ভব্য-নয় এমন ধরণ-ধারণ নিয়ে আমাদের আশে-পাশে এসে দাঁড়াল। জাহাজ ঘাটে লাগ্‌ল, সিঁড়ি নামাচ্ছে, নীচে ডাঙায় রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার জন্ত বিরাট এক জনতা হ'য়েছে, ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো বৃহৎ এক মোটর গাড়ী এনেছে, আর ফুলের মালা আর মস্ত মস্ত তোড়া হাতে ভারতবাসীর দল এসেছে—সিন্ধী, শিখ, তামিল, সিন্ধীই বেশী,—আর তা ছাড়া ডচ্‌, যবদ্বীপীয়, চীনা। এই ফিরিঙ্গী খেলোয়াড়ের দল বলাবলি ক'রতে লাগ্‌ল—'ব্যাপারটা কি হে, লোকের ভীড় যে, কেউ বড় লোক এই জাহাজে যাচ্ছেন নাকি।' কবি তখন ভিতরে তাঁর কামরাতে ফিরে গিয়েছেন। একজন ফিরিঙ্গী একটা ডচ্‌ যাত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লে সমারোহের উপলক্ষ্য কে;—রবীন্দ্রনাথের নাম শুন্‌লে,—ফিরিঙ্গী খেলোয়াড়, তার জ্ঞান-গোচরের বা বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতটাই বা হবে; তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্ত ডচ্‌ ভদ্রলোকটি ব'ল্‌লেন He is the Bengali poet. ইনি হ'চ্ছেন বাঙ্গালী কবি;—এসব দেশে বাঙ্গালী অর্থে ভারতীয়, কারণ Indian ব'ল্‌লে এদেশে যবদ্বীপীয়কেই বোঝায়। ভারতের ইউরেশীয়ান এই ভিতরের কথাটুকু বুঝ্‌তে না পেরে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল, দূর থেকে চীৎকার ক'রে সে দলের আর পাঁচজনকে শুনিয়ে দিলে যে এত সব আয়োজন ক'রেছে for the Bengali poet. এদের মধ্যে আপোষে একটু আলোচনা চ'ল্‌ল কি ব্যাপারটা হ'চ্ছে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাইরে ডেকের উপরে এলেন—দূর থেকে এঁকে দেখে এরা চুপ ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে স্থান ক'রে দিয়ে স'রে গেল।

সিঁড়ি লাগাতেই রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করবার জন্ত কতকগুলি ভদ্রলোক জাহাজে এলেন। আমরা অবতরণ ক'রলুম। বাকে-গৃহিণী উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে, ডাক্তার Bosch বস্‌, ইনি ডচ্‌ সরকারের নিযুক্ত দ্বীপময় ভারতের প্রত্ন-বিভাগের অধ্যক্ষ, প্রাচীন-ভারত-বিদ্যায় প্রবীণ, আর ডাক্তার Hocsein Djajadiningrat হুসেন জয়দিনিঙ্‌রাট্‌ ইনি এক জন অভিজাত যবদ্বীপীয় বংশের বিদ্বান্‌, হলাণ্ডে আইন অধ্যয়ন ক'রেছেন, সংস্কৃত প'ড়েছেন, মালাই ভাষায় একজন বিশেষ জ্ঞানী পণ্ডিত, স্থানীয় আইন-কলেজের অধ্যাপক—এঁরা এসেছিলেন; এঁদের দুজনের নামের সঙ্গে পূর্ব্বেই পরিচিত ছিলুম। আরও কে কে ছিলেন—পরে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। 'কাপ্তেন পাঞ্জাবী' ব'লে সিন্ধীদের একটি মাতবরের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। ডচ্‌ ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয়ের পর, সিন্ধীদের দ্বারা কবিকে মাল্যদানের, ফুলের তোড়া দানের আর তাঁর পদধূলি গ্রহণের ধুম লেগে গেল। স্থানীয় চীনাদের Tjong Hoa Kwe Kwan 'চোং হোআ কে কান্‌' সভার পক্ষ থেকে কবিকে দুটো বিরাট ফুল-লতা-পাতার wreath বা মালা দেওয়া হ'ল, কবি এঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচিত হ'লেন।

স্থানীয় ভারতবাসীরা কবির জন্ত যে সাজানো মোটর গাড়ী এনেছিল, তাতে তিনি উঠ্‌লেন না, সাধারণ একখানি গাড়ীতেই উঠ্‌লেন। মালপত্র Hotel des Indes যেখানে আমরা উঠ্‌বো সেখানকার লোকেদের

স্ব ক'রে দেওয়া হ'ল। তান্‌জোং-প্রিওক্ বন্দর থেকে বাতাবিয়া শহরের Weltevreden ভেল্‌টেফ্রেডন্ নামক অংশে যেতে প্রায় বিশ মিনিটের মোটরের পথ। চওড়া এক খালের ধার দিয়ে এই রাস্তা। আদি বাতাবিয়া শহরের এখন আর পূর্ব্বের মতন জৌলুষ নেই—খালি ডচ্ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কতকগুলি প্রাচীন বাড়ী, খালের ধারে কতকগুলি চীনা বস্তী. আর কিছু কিছু আপিস আর গুদাম-বাড়ী নিয়ে এই শহর তার পুরাতন গৌরবের স্মৃতি রক্ষা ক'রছে। বাতাবিয়ার পত্তন হ'য়েছিল ভারতবর্ষে যে ভাবে মান্দ্রাজ বোম্বাই আর ক'লকাতার পত্তন হয়; ১৬১৯ সালে ডচেরা এখানে প্রথম একটি গড় তৈরী করে, আর গড়ের নাম দেয় 'বাতাবিয়া'—হলাণ্ড দেশের লাটিন নাম হ'চ্ছে Batavia—বাতাবী লেবুর সঙ্গে সঙ্গে এই দেশ বা নগর বাচক নামটি বাঙলা ভাষায় প্রবেশ ক'রেছে। ডচ্ শক্তি আর ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাতাবিয়ার-ও উন্নতি। হলাণ্ড কাটা খালের দেশ; ডচেরা এদেশে এসে পিতৃভূমির অনুকরণে বাতাবিয়াতে অনেক-গুলি খাল কাটায়, সেগুলির পাশে পাশে রাস্তা, এই শহরের এক বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে এই সব খাল। বাতাবিয়ার দক্ষিণে ডচ্ অধিবাসীরা নিজেদের বাসের জন্য দুটি পল্লী গ'ড়ে তোলে, তাদের নাম দেয় Weltevreden ভেল্‌টেফ্রেডন্ (অর্থাৎ well-content বা স্বস্তি-সন্তোষময়) আর Meester Cornelis মেস্‌টর্‌-কর্‌নেলিস্। ভেল্‌টেফ্রেডন্ এখন পুরাতন বাতাবিয়াকে অতিক্রম ক'রেছে—আপিস আদালত, বড় বড় দোকান, ইস্কুল, হোটেল, মিউজিয়ম, অভিজাত জনগণের বাস, সবই এখানে। বাতাবিয়া, ভেলটেফ্রেডন্ আর মেস্‌টর-করনেলিস্—তিনে জড়িয়ে' লোক সংখ্যা হ'চ্ছে তিন লাখের উপর, এর মধ্যে হাজার ত্রিশেক হ'চ্ছে ইউরোপীয়, বাকী দেশী আর মিশ্র।

রাস্তায় লোকজন যাদের দেখলুম, তারা মালাইদেশের থেকে একটু অন্য ধরণের। সাধারণ যবদ্বীপীদের গায়ের রঙটা মালাইদের মত অতটা ফরসা বা হরিদ্রাভ নয়, একটু কালোটে-কালোটে, একটু বেশী ভারতবর্ষকে স্মরণ করিয়ে' দেয়। লোকগুলিকে কিন্তু একটু বেশী 'মজবুত' ব'লে মনে হ'ল, আর পোষাকে এরা মালাইদের তুলনায় ঢের বেশী রঙ পছন্দ করে। শহরতলীর বিরল-বসতি সড়ক পেরিয়ে, ভেলটেফ্রেডনের ট্রাম মোটর-ঘোড়ারগাড়ী-সঙ্কুল রাস্তা পেরিয়ে কাটিয়ে, আমাদের হোটেলে পৌছলুম। এই হোটেলটী দ্বীপময় ভারতের সব চেয়ে বড় হোটেল; নামটির অর্থ 'ভারতের হোটেল'। প্রকাণ্ড ভূখণ্ড নিয়ে এর নানা ইমারত; বিস্তর কুঠরী, বেশীর ভাগ কুঠরীর সামনে একটু ক'রে বারান্দা—এদেশের বাড়ীর রেওয়াজ মতন। দোতালার উপরে আর তালা নেই; এদেশে বাড়ী ঘর আশে-পাশে ছড়িয়ে' পড়ে, মার্কিন-দেশের মত 'আকাশ-চাঁচা' পদ্ধতির বাস্তু-শিল্প এখনও আবশ্যক হয়নি। এই হোটেল-বাড়ীর দ্রষ্টব্য জিনিস হ'চ্ছে, এর প্রধান ফটকের দু পাশে দুটো বিরাট বিশাল মহীরুহ আছে; এই গাছের নাম Waringin 'ওআরিঙিন'। আমাদের বট গাছের মত এর ঝুরি নামে,—গাছটা বট গাছেরই ভাব, এই জন্য কখনও কখনও এদেশে একে banian ও বলে; কিন্তু বট গাছ যেমন চারদিকে ছড়িয়ে' পড়ে, এ সে-রকম নয়, বরং উঁচুতেই ওঠে; তবে অনেক খানটা জায়গা জুড়ে' এই গাছ হয় বটে। এ রকম বিশাল আর উঁচু গাছ দেখে মনটা বিরাট-দর্শনের আনন্দ-বিস্ময়ে পূর্ণ হয় বটে।

যবদ্বীপের বটগাছ (ওআরিঙিন্)

আমাদের ঘর ঠিক ক'রে নিয়ে ব'সলুম, মাল পত্রও এসে গেল। জেটি থেকে হোটেল পর্য্যন্ত যে সমস্ত ডচ্ ভারতীয় চীনা আর যবদ্বীপী বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরা উপস্থিত কালের মত বিদায় নিয়ে গেলেন। Mr. Crossby মিষ্টার ক্রসবি বাতাবিয়ার ইংরেজ কন্‌সাল, ইনি রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী, কবির সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা প'ড়ে তাঁর গুণ-

মুগ্ধ ভক্ত যারা হ'য়েছে তাদের মধ্যে ক্রস্‌বি সাহেবের মতন চমৎকার অমায়িক মানুষকে দেখে ভারী আনন্দ হ'ল। কবির আগমনে ক্রস্‌বি সাহেবের বিশেষ প্রীতি

'পাসার গাম্বির' প্রদর্শনীর তোরণ
(বাতাক্ জাতীয় বাস্তু রীতি)

হ'য়েছিল, পরে কবিকে আর অন্য ভারতীয়দের নিমন্ত্রণ ক'রে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে তাঁর সেই প্রীতির পরিচয় দেন।

দুপুরে বিশ্রামের পরে, সকলে মিলে কবির সঙ্গে হোটেলের সাধারণ ভোজনশালায় গিয়ে আহার সেরে নিলুম। এখানেও সেই রাইস্‌ট্-টাফ্‌ল্ এর পালা, তবে সুমাত্রার চেয়েও আরও গুরুতর ব্যাপার। পরে সুরেন বাবু ধীরেন বাবু আর আমি শহরে যথেচ্ছ একটু ঘুরে আসবার জন্য বা'র হ'লুম। এবার আমরা বাতাবিয়ায় দিন তিনেক মাত্র থাকবো, আজ রবিবার, মঙ্গলবার দিন বলিদ্বীপ যাত্রা ক'রবো,—তাই যতটুকু পারা যায় এ কয় দিনে যা দেখবার দেখে নিতে চাই। শহরের প্লান হাতে ছিল—পথ ভুলবার সম্ভাবনা নেই। মিউজিয়মে গেলুম—মিউজিয়ম তখন বন্ধ। মিউজিয়মটির সামনে Koningsplein ব'লে মস্ত বড় একটা ময়দান, তার মধ্যে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ আছে। সেখানে এক একজিবিশন ব'স্‌বে, তার বাড়ী-ঘর সব তৈরী হ'চ্ছে। প্রদর্শনীর তোরণ আর কতকগুলি বাড়ীর কাঠামো ক'রেছে সুমাত্রা দ্বীপের বাতাক্ জাতি যে ধরণের কাঠের বাড়ী করে সেই ধরণের। এই রকম বাড়ীর নিজস্ব বেশ একটা সৌষ্ঠব আছে। কাঠের পাটাতনের উপর বাড়ী, খুঁটির উপরে তৈরী; দেয়ালের কাঠে নানা নক্সা খোদা; খড়ের চাল। মালাই জাতের স্বকীয় বাস্তু শিল্প। দিন তিন চারেকের মধ্যেই একজিবিশন ব'স্‌বে, আমরা বলিদ্বীপ আর পূর্ব্ব যবদ্বীপ দেখে বাতাবিয়ায় ফিরে আস্‌তে আস্‌তেই শেষ হ'য়ে যাবে। এই একজিবিশনটি বাতাবিয়ায় বছর বছর বসে, এর নাম Pasar Gambir 'পাসার-গাম্বির'। দোকান-পাট সব সাজাচ্ছে। এক সিন্ধী রেশম আর মণিহারী জিনিস ওয়ালার দোকান ব'স্‌ছে, সিন্ধী লোক র'য়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। Chotirmal চোটিরমল হ'চ্ছে মালিকের নাম—এঁর কারবার খুব ফলাও, বোম্বাই ক'লকাতা সিঙ্গাপুর বাতাবিয়া হঙকঙ শাঙহাই আর জাপানে এঁর অনেকগুলি দোকান আছে। ধনী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ভারতবাসী দেখে, আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গের লোক জেনে' খুব যত্ন ক'রলেন, লেমনেড খাওয়ালেন। তাঁর দোকানটিকে নানা সুন্দর
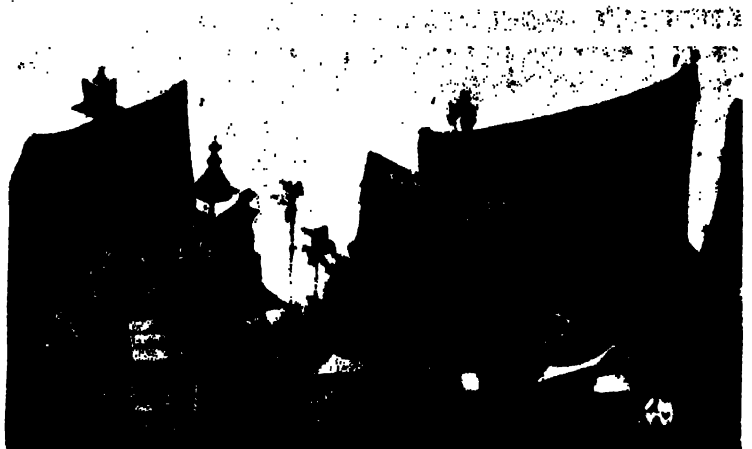
বাতাক্ জাতির বাস্তু শিল্প

জিনিসের সমাবেশে একটি Museum of Art শিল্পের সংগ্রহশালা ব'ললেই হয়, দোকানের সব জিনিস দেখালেন ;—সে কোথায় বা জাপানী হাতীর দাঁতের জিনিস বা ব্রঞ্জের মূর্ত্তি বা কিংখাপ, কোথায় বা চীনা ছবি বা মাটির বাসন, কোথায় বা ভারতের যবদ্বীপের ব্রহ্মের আর শ্যামের অপরূপ শিল্পের ভাণ্ডার। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমারা খানিক পায়ে হেঁটে আর খানিক ঘোড়ার গাড়ী (সাদো) ক'রে বেড়ালুম। এখানকার মেয়েরা দল বেঁধে চ'লেছে, রঙ্গীন সারং আর জামা পরা, খালি পা, একখানা ক'রে রঙীন চিত্র-বিচিত্র বড়ো রুমালের মতন চাদর পিঠে—অপূর্ব্ব ধরণের সুন্দরী বোধ হ'ল এদের। শহরটায় যেন দারিদ্র্য কোথাও নেই। Senen সেনেন ব'লে একটি মহল্লায়

বাতাবিয়া—রাস্তার ধারে

গেলুম—সেখানে চীনাদের পুরাতন মণিহারী জিনিসের দোকান ঘুরে প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রলুম—আমি পেলুম একটি ছোটো পিতলের বৌদ্ধ ভিক্ষু মূর্ত্তি, চীনা কাজ, ভিক্ষুর মুখের ভাবটি ফুটিয়েছে অতি চমৎকার, আর পেলুম একটি প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাজ, পিতলের ছোটো পান রাখবার ঠিলি।

এখানকার শিক্ষিত ডচেরা মিলে একটি সাহিত্য আর কলা চর্চ্চার সমিতির ক'রেছেন, সমিতি নাম Kunstkring কুন্‌স্ট্‌ক্রিং। ইউরোপীয়-শিক্ষিত কতক-গুলি যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকও এতে যোগ দিয়েছেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য,—চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার কলার প্রসার করা—ইউরোপ থেকে বড়ো চিত্রকর বা গাইয়ে কিংবা বাজিয়ে, বা সাহিত্যিক এলে, এখানে তাঁকে সমাদর ক'রে গ্রহণ করা হয়, তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়, বা তাঁর গান-বাজনার জলসা হয়, বা সাহিত্যিক পাঠ বা বক্তৃতা হয়। নানা রকম প্রদর্শনীও এঁরা করেন। যবদ্বীপের প্রায় সব বড়ো বড়ো শহরে এই সমিতির শাখা আছে, অনেক জায়গায় সমিতির চমৎকার বাড়ীও আছে। মানসিক উৎকর্ষ বর্দ্ধনের জন্য ডচেরা এই ভাবে যথেষ্ট খরচাও ক'রে থাকেন। যবদ্বীপে আসবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা যাঁরা আমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই কুন্‌স্ট্‌ক্রিং সমিতি ছিল প্রধান। এই সমিতির বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের আগমনে এক সান্ধ্য সম্মিলন হ'ল। বাতাবিয়ার প্রায় সমস্ত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সুন্দর দোতালা বাড়ী, তখন সেখানে একটা ছবির প্রদর্শনী চ'লছিল, আমরা সেখানে এলুম। সকালে যাঁদের দেখেছিলুম সেই ডচ আর যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকেদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশা গেল। নানা বিষয়ে আলাপ চ'লল, আর কবির কথা শোনবার জন্য বা তাঁকে দেখবার জন্য সকলের কী আগ্রহ। দ্বীপময় ভারতের শিক্ষাবিভাগের ডচ কর্ত্তা ছিলেন ; মানুষটিকে বেশ হৃদয়বান ব'লে মনে হ'ল, তিনি কবির সঙ্গে খুব আলাপ ক'রলেন। ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার হুসেন জয়দিনিঙরাট্ প্রাচীন বিদ্যা আর ভাষা, ইতিহাস আর সাহিত্যের লোক, এঁদের সমান-ধর্ম্মা পেয়ে কথা ক'য়ে বেশ আনন্দ হ'ল। ডাক্তার J. Kats কাট্‌স্ ব'লে এখানকার একজন বড়ো প্রত্নবিৎ—যবদ্বীপের ছায়া নাট্যের উপর মস্ত এক বই লিখেছেন, যবদ্বীপের প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প আর বিদ্যার নানা দিকে এঁর মূল্যবান্ গবেষণা আছে, প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার অনেক বই সম্পাদন ক'রেছেন, এঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। আর একজন ছিলেন, শ্রীযুক্ত P. A. J. Moojen মোয়েন্—ইনি বলি-দ্বীপের বাস্তু শিল্পের উপর সম্প্রতি এক বৃহৎ সচিত্র পুস্তক লিখেছেন। এই সমস্ত শিক্ষিত লোক, যাঁরা নিজেদের সমগ্র বিদ্যা বুদ্ধি আর শক্তি অর্পণ ক'রেছেন যবদ্বীপের সংস্কৃতির আলোচনায়,—প্রথম দিনেই এঁদের সঙ্গে পরিচয় আর সদালাপ আমার পক্ষে একটা পরম লাভের বিষয় হ'ল।

হোটেলে ফিরে এসে আহার চুকিয়ে' নিলুম। গরমের দিন, এদেশে ডচেরা আরামের সব ব্যবস্থা ক'রেছে, খালি বিজলীর পাখার ব্যবস্থা করে নি। ঘরের ভিতর জোর হাওয়া বওয়াকে এরা বড়ো ভয় করে—পাছে ঠাণ্ডা লাগে। হলাণ্ডের শীতের হাড়-কাঁপানো উত্তুরে' আর সাগুরে' হাওয়ার কথা, সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর পারের এই চির-বসন্তের দেশে এসেও এরা ভুলতে পারে নি। গরমী কালেও পাখা না নিয়ে, বোধ হয় দরজা জানালা বন্ধ করে, কি ক'রে যে ডচেরা কাটায়, তা ভারতবর্ষে ইংরেজদের আর ধনীলোকের ঘরে পাখার ঘটা দেখে আমাদের আশ্চর্য্য লাগল। রাত্রি সাড়ে দশটা ; হোটেলে নাচের জন্য চার পাশ খোলা চণ্ডীমণ্ডপের মত কাঠের পাটাতন দেওয়া একটা হল-ঘর

আছে, সেখানে প্রতি রবিবার রাত্রে নাচ হয়। বাতাবিয়ার ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয় সমাজের অনেকে আসে। আমরা একটা টেবিল দখল ক'রে ব'সে নাচের সঙ্গে এদের কায়দা-করণ দেখতে লাগ্‌লুম, আর কিছু লেমনেড আনিয়ে পান ক'রতে লাগলুম। আমাদের আশঙ্কা হ'চ্ছিল, অদূরে কবি তাঁর ঘরে র'য়েছেন, এই নাচের jazz জাজ্ ব্যাণ্ডের উৎকট আর উদ্দাম আওয়াজে হয় তো আদ্ধেক রাত ধ'রে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘ'টবে; কবির অনুরাগী দু'চার জন ডচ সজ্জনেরও এই আশঙ্কা হ'য়েছিল। ঘণ্টা খানেক হোটেলের অতিথি অভ্যাগত মেয়ে পুরুষদের এই নাচ দেখে আমরা রাত সাড়ে এগারোটায় নিজ নিজ কামরায় এলুম।

সোমবার, ২২শে অগষ্ট।—

সকালে ইংরেজ কন্‌সাল্ ক্রস্‌বি সাহেব এসে কবিকে নিয়ে গেলেন ডচ গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে দেখা করাতে। আমরা বা'র হলুম শহর দেখ্‌তে, আর বই-টই কিছু কিন্‌তে। সকাল বেলা ভেল্‌টেফ্রেডনের বড়ো এক সড়ক Noordwijk নোর্ড্-ওয়েইক্-এর ধার দিয়ে বেড়িয়ে যেতে বেশ মনোরম লাগ্‌ল। বিদ্যুতের ট্রাম চ'লেছে, কতকগুলি গাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেখা Inlanders বা 'দেশী লোক'—কুলী-মজুরদের জন্য শস্তা-ভাড়া গাড়ীতে এই লেখা থাকে। নোর্ড-ওয়েইক্ রাস্তাটা একটি খালের দুই ধার দিয়ে গিয়েছে। খ'লে অতি ময়লা ঘোলা জল—ক'লকাতার রাস্তায় জোর বৃষ্টির পরে জল দাঁড়ালে যেমন ঘোলা জল হয়, এ যেন তেমনি। জল কোথাও এক বুকের বেশী হবে না, তবে গতি আছে। খালটা খুব চওড়াও নয়। খালের পাড় ইটে গাঁথা, আর মাঝে মাঝে দুধারেই পাড় বেয়ে ইটের বা পাথরের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে; আর দুপাশের রাস্তাকে যোগ ক'রে কতকগুলি সাঁকো-ও আছে। সিঁড়ি-বাঁধানো ঘাটগুলিতে বিস্তর মেয়ে পুরুষ এই সকাল বেলায় খালের ঘোলা জলে স্নান ক'রছে। ঠিক ভারতবর্ষের ভাব। আর এ দেশে মেয়েদের এই সব ঘাটে ব'সে সাবান দিয়ে কাপড় কাচবার ঘটাটাও একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ। গৃহস্থের বাড়ীর ঝী-বউ রঙীন সারং জামা কাপড় সব নিয়ে এসে, ঘাটের সিঁড়িতে ব'সে গল্প গুজবের সঙ্গে এই দৈনন্দিন ব্যাপারটী সারছে। যবদ্বীপীয়দের দৈনন্দিন জীবনের এটা হ'চ্ছে একটি নিত্য ঘটনা। বেশ বিচিত্র দেখায় এই ব্যাপারটী। মনে হয় যেন সারা শহরের মেয়েরা খালের ঘাটে এসে কাপড় কাচা ছাড়া সকালে আর কিছু করে না—মাইলের পর মাইল ধ'রে বাতাবিয়া আর ভেল্‌টেফ্রেডনে এই সব খাল চ'লে গিয়েছে, আর তার ধারে ধারে কোথাও যেন একটুও ফাঁকা জায়গা নেই, সব খানেই গল্প-নিরত

বাতাবিয়ায়—খালের ধারে

ব্যস্ত-সমস্ত মেয়েদের দল মহাউৎসাহে স্নানে বা বস্ত্র-ধাবনে নিযুক্ত।

দুই একটা ডচ বইওয়ালার দোকানে যবদ্বীপের ইতিহাস আর শিল্পের উপরে, আর যবদ্বীপের নৃত্যকলার উপরে কিছু বই কেনা গেল। তারপর ডাক্তার বস্-এর আপিসে গেলুম। এখানকার প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগকে বলে Oudheidkundige Dienst (Antiquities Service) ভারতবর্ষের Archaeological Surveyর মতন এই বিভাগ কার্য্য করেন। প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি যে কেবল রক্ষা করেন তা নয়, জীর্ণ সংস্কারও করেন, ভাঙা-চোরা মন্দিরকে আবার নোতুন ক'রে গ'ড়েও তোলেন। যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু আমলের কীর্ত্তি সংরক্ষণে এদেশের প্রত্ন-বিভাগ যা ক'রেছেন, তা অতুলনীয়; প্রত্যেক ভারতবাসীর, প্রত্যেক হিন্দু-সন্তানের এজন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করা

উচিত। উপস্থিত এদের যে যে কাজ চ'লছে তার কিছু কিছু পরিচয় ডাক্তার বস্ আমায় দিলেন। Boro-Budur বোরো-বুদুর-এর কাজ এক রকম শেষ হ'য়েছে—বোরো-বুদুর যবদ্বীপের হিন্দু আমলের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি, বিরাট বৌদ্ধ স্তূপ এটী; বোরো-বুদুরের গায়ে যে সমস্ত খোদিত চিত্র আছে, তার ছবি নিয়ে বই ক'রে বা'র করা হ'য়ে গিয়েছে। Prambanan প্রাম্বানান্-এর ব্রাহ্মণ্য মন্দির-ত্রয়ের পুনর্গঠন চ'লছে,তার খোদিত চিত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা চ'লছে। বোরো-বুদুর আর প্রাম্বানান্ খ্রীষ্টীয় অষ্টম আর নবম শতকের কীর্ত্তি। এর পূর্ব্বেকার যুগের Dieng দিয়েং মালভূমির মন্দিরগুলির জীর্ণসংস্কার হ'য়ে গিয়েছে। এখন পূর্ব্ব যবদ্বীপ অঞ্চলে যবদ্বীপের শেষ হিন্দু রাজধানী Madja-pahit মজ-পহিৎ নগরের ধ্বংসাবশেষে অনুসন্ধান চ'লছে; আর সেখানকার Panataran পানাতারান্ আর অন্য অন্য স্থানের ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের সংরক্ষণ আর মন্দিরের ভাস্কর্য্যের অনুশীলন চ'লছে। মজপহিৎ নগরের পতন হয় খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকের শেষ পাদে। তার পূর্ব্বেই যবদ্বীপের শিল্প, নোতুন এক পথে গিয়েছে—ভারতের শিল্পের যে বিকাশ যবদ্বীপের ভূমিতে দিয়েং, বোরো-বুদুর আর প্রাম্বানানে প্রথম হ'য়েছিল, সে বিকাশ এখন যবদ্বীপের আব-হাওয়ার গুণে, যবদ্বীপীদের জাতিত্বের মূল তাদের মালয়-প্রকৃতির আত্ম-বিকাশের ফলে, তার ভারতীয় প্রকৃতিকে যেন অনেকটা বর্জ্জন ক'রে, শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পের গুণ তার নিসর্গ-নিবদ্ধ অনৈসর্গিকতা, তার ধীরোদাত্ত শান্ত-সমাহিত ভাব আর তার দান্ত স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বিরাট্ রূপকে যেন ভুলে গিয়ে, মালাই-জাতি-সুলভ কল্পনার উদ্দাম লীলায়, নিসর্গকে উপহাসকারী অপস্মার-পুরুষোচিত ভঙ্গীতে, আর একটা রূঢ় শক্তিশালী সারল্যে গিয়ে পৌঁছেচে। যবদ্বীপের প্রাচীনতম যুগের শ্রেষ্ঠ কতকগুলি নিদর্শনের সঙ্গে আগে থেকেই চাক্ষুষ পরিচয় ছিল; বস্-সাহেবের আপিসে অর্ব্বাচীন যুগের মজপহিৎ শিল্পের কতকগুলি চমৎকার শিল্পবস্তু—পোড়ামাটীর কতকগুলি মুখের ছবিতে—সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এই শিল্প দেখে নোতুন জ্ঞান আর আনন্দ লাভ ক'রলুম।

ডচ্-সরকার যবদ্বীপে বিদেশী ভ্রমণ-কারীদের আকর্ষণ করবার জন্য আর তাদের সাহায্য করার অভিপ্রায়ে একটী Official Tourist Bureau স্থাপন করেছেন। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপ সম্বন্ধে এই আপিস থেকে কিছু বই ম্যাপ আর প্ল্যান সংগ্রহ ক'রে আনা গেল। এই আপিসের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত P. J. van Baarda ফান্-বার্দা সৌজন্যের অবতার, তিনি নানা বিষয়ে পরামর্শ দিলেন।

বিকালে ছিল ভারতীয়দের অভিনন্দনের পালা। আমাদের হোটেলের এক বড়ো সভাগৃহে এর আয়োজন হ'য়েছিল। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন ভারতীয় বণিক আর ভদ্রলোক এসে জমা হলেন—ইংলাণ্ডের কন্সাল মিষ্টার ক্রস্বি, আর অনেক ডচ্ আর দুচার জন যবদ্বীপীয় ভদ্র ব্যক্তির সমাগম হ'য়েছিল। চা পান, অভিনন্দন পাঠ, ছবি তোলা—এই হ'ল এই অনুষ্ঠানের কার্য্যক্রম। সিন্ধীদের সঙ্গে বিশ্বভারতী আর কবির জীবনের কার্য্যাবলী, তাঁর লেখা আর জগতের সাহিত্যে তাঁর দান, এই সব বিষয়ে কথা-বার্ত্তা কইলুম। সকালে শহরে বেড়াতে বেড়াতে যে পাড়ায় এঁদের দোকান, সেই Pasar Baroe 'পাসার বারু' পাড়ায় একটু ঘুরে এসেছিলুম; এঁদের সঙ্গে আমার বেশ জ'মে গেল। এঁরা প্রায় সকলেই রেশমের আর curio বা মণিহারীর দোকানের মালিক, ম্যানেজার বা কর্ম্মচারী; উচ্চাঙ্গের মানসিক উৎকর্ষের ধার না ধারলেও, সব বিষয়ে খুব খবর রাখেন; এঁরা বেশ বুদ্ধিমান, আর ভদ্র সজ্জনের সঙ্গে এঁদের কারবার ক'রতে হয় ব'লে এঁরা খুবই মিশুক আর ভদ্র। বলিদ্বীপ ঘুরে এসে বাতাবিয়ায় এই সিন্ধীদের সঙ্গে কয়দিন একত্রে বাস ক'রেছিলুম, তাতে এঁদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্টভাবে মিশ্‌তে পেরেছিলুম,আর সেই সূত্রে এঁদের নানা সদ্গুণের পরিচয় পাই, আর বিদেশে এঁদের সমাজের সুখদুঃখের নানা কথা জান্‌তে পারি। যথা-সময়ে সে সব কথা ব'ল্‌বো। থিওসোফিকাল সোসাইটীর প্রভাব ওলন্দাজদের মধ্যে খুবই বেশী, এদেশে থিওসোফির বিস্তর ভক্ত আছে; এই দলের প্রধান-স্থানীয়া একটী মহিলাও এসেছিলেন। এক আমেরিকান মেথডিস্ট্ মিশনারী আর তাঁর স্ত্রী, উভয়ে খাসা লোক, কবির বিশেষ ভক্ত, এঁরাও ছিলেন। তামিলদের মধ্যে জীবরাজ ডেনিয়েল বলে একটি খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, যুবক, ত্রিবাঙ্কুরে বাড়ী, ধর্ম্মে খ্রীষ্টান হ'লেও জা'ত অর্থাৎ জাতীয়তা হারান নি, ভদ্রলোকটী তাঁর একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, মেয়েটির নাম রেখেছেন সরোজিনী। এঁর সঙ্গে সদালাপে বেশ খুশী হ'লুম। ভারতের সংস্কৃতির প্রতি অসীম অনুরাগ। মাতৃভূমির উদ্দেশে নিজের লেখা একটী ইংরিজী কবিতা আমায় দিলেন। পরে বাতাবিয়ায় আমাদের দ্বিতীয়বার অবস্থানের কা'লে নানা বিষয় আমাদের সাহচর্য্য ইনি ক'রেছিলেন। সন্ধ্যে একটু বেশী ঘনিয়ে আস্‌তে সভা ভঙ্গ হ'ল, কবিকে একটু বেড়িয়ে আনবার জন্য মোটরে ক'রে নিয়ে গেল।

রাত আটটায় মিষ্টার ক্রসবির বাড়ীতে ছিল ভোজ, মিষ্টার ক্রসবির সহকারী ভাইস্ কন্সাল সাহেব এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। অন্য অভ্যাগতদের মধ্যে ডাক্তার

বস্, ডাক্তার জয়দিনিঙ্ রাট, আর শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মিষ্টার Hardeman হাডে'মান 'ছলেন। এই ভদ্রলোকটী কবিকে তাঁর শিক্ষা বিষয়ে মত আর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আহারের পরে বাইরে বারান্দায় গিয়ে সকলে ব'স্লুম। দেখি যে আরও কতকগুলি অভ্যাগত এসেছেন,—ভারতীয়দের প্রধান ব্যক্তিরা, আর অন্য ডচ্ আর যবদ্বীপীয় লোক। আহারের পরে যোগদানের জন্য এঁরা নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন। মিষ্টার ক্রস্‌বি একটী অতি সুন্দর আর মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে, কবির লেখা তাঁর জীবনকে কতটা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রেছে আর তাঁকে কতটা অপরিসীম আনন্দ দান ক'রেছে সে কথা বলে তাঁকে তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রলেন। তাঁর ক্ষুদ্র বক্তৃতার আবেগময়ী ভাষা আর তার হার্দ্দিকতা আমাদের সকলেরই খুব মনোজ্ঞ হ'য়েছিল। তারপর ডাক্তার হাডে'মান ব'ল্লেন, তার পরে কবিকে সংক্ষেপে উত্তর স্বরূপে দু চার কথা ব'লতে হ'ল। ক্রসবি সাহেবের আগ্রহে কবিকে কিছু পাঠ ক'রতে হ'ল—তিনি তাঁর যবদ্বীপের উপর লেখা কবিতাটীর ইংরেজী অনুবাদ The Indian Pilgrim to Java পাঠ ক'রলেন। Volks-lectuur অর্থাৎ 'জনসাধারণের পাঠ' ব'লে (ফরাসীতে এর নাম-করণ ক'রেছে Service pour la Litterature populaire অর্থাৎ 'জনসাধারণের জন্য সাহিত্য প্রচার বিভাগ') ডচ্ সরকার একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রেছেন—উদ্দেশ্য, দেশীয় ভাষায় শস্তায় সৎসাহিত্য প্রচার করা, লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়ানো, শিক্ষা আর মানসিক উৎকর্ষ বর্দ্ধক পত্রপত্রিকা দেশভাষায় প্রকাশ করা, আর এই সব উপায়ে এদেশের জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। এই প্রতিষ্ঠানের মাইনে-করা লেখক আর অনুবাদক আছে, চিত্রকর আছে, মস্ত ছাপাখানা আছে; এর কার্য্যালয়টিকে মালাই ভাষায় বলে Balai Pestaka 'বালাই-পুস্তাকা' অর্থাৎ 'পুস্তকের আগার'; মালাই, যবদ্বীপীয়, সুন্দা, মাদুরা আর বলি প্রভৃতি ভাষায় এখান থেকে প্রচুর পুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটীর কর্ম্মসচিব মহাশয়-ও এসেছিলেন, তার সঙ্গে কথা ক'য়ে এর সম্বন্ধে জানা তথ্য জানা গেল—ঠিক হ'ল, কাল আমরা 'বালাই পুস্তাকা' দেখতে যাবো। এই রকম সৎ প্রসঙ্গে রাত্রির অনেকটা কাটিয়ে, বারোটায় হোটেলে ফেরা গেল। হোটেলে এসে অত রাত্রেই জিনিস-পত্র গুছিয়ে ফেলা গেল, কারণ কালই আমাদের জাহাজে ক'রে সরাসরি বলিদ্বীপ যাত্রা ক'রতে হবে।

মঙ্গলবার, ২৩শে অগষ্ট।—

আজ বিকাল চারটায় আমাদের বলিদ্বীপ যাবার জাহাজ ছাড়বে। সকাল আর দুপুর-টুপুরের মধ্যে এ যাত্রায় বাতাবিয়ার যতটা পারি দেখে নিতে হবে। জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা তৈরী হ'য়ে আছে, সে দিকে আর কিছু ঝঞ্ঝাট নেই। প্রাতরাশের পরে বাকে আমায় নিয়ে গেলেন 'বালাই পুস্তাকা'র বাড়ীতে। কাল রাত্রে এখানকার ম্যানেজার যাঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল তিনি আমাদের স্বাগত ক'রলেন, আর তার পরে সঙ্গে নিয়ে সব ঘুরিয়ে দেখালেন। সৎশিক্ষা আর সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য ডচেরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে অবলম্বন ক'রে যা ক'রেছে, তাতে এদের প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। মালাই আর অন্য ভাষায় এরা একটি বিরাট সাহিত্য গ'ড়ে তুলছে, সঙ্গে সঙ্গে এই সব ভাষার প্রাচীন সাহিত্যেরও মুদ্রণ ক'রে সংরক্ষণ আর প্রচারও ক'রছে। মালাই ভাষার বই সাধারণতঃ এই 'বালাই পুস্তাকা' থেকে রোমান হরফেই ছাপা হ'য়ে বা'র হয়; আর যবদ্বীপী ভাষা হয় যবদ্বীপীয় অক্ষরে নয় রোমান অক্ষরেই ছাপে। ম্যাপ, প্রাচীন ছবি, ঐতিহাসিক চিত্র, ছেলেদের জন্য নানা সচিত্র গল্পের আর জ্ঞানবর্দ্ধনে অন্য বই-ও ছাপানো হ'চ্ছে। নানা ইউরোপীয় ভাষা থেকে সৎসাহিত্যের বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হ'চ্ছে; এক তরজমা বিভাগ ব'সে গিয়েছে, সেখানে এই কাজ হ'চ্ছে। আবার উচ্চ শ্রেণীর গবেষণাত্মক বই,—ডচে, বা দেশ ভাষায়—বিজ্ঞান, প্রাচীন বিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে, তাও প্রকাশিত হ'চ্ছে। যবদ্বীপের ছায়াবাজীর পুতুল-নাচের মধ্য দিয়ে রামায়ণ মহাভারত আর প্রাচীন ইতিহাসের গল্প নিয়ে এক রকম অভিনয় হয়, এই অভিনয়—Wajang Poerwa 'ওআইআং পূর্ব্ব' এর নাম—এটী হ'চ্ছে যবদ্বীপের সংস্কৃতির একটী বিশেষ অঙ্গ, জিনিসটী খুবই লোকপ্রিয়—এই নাট্যাভিনয়ের উপর সচিত্র রঙীন আর এক-রঙা ছবিতে ভরা বিরাট এক পুস্তক ডচ্ ভাষায় Kats কাট্‌স্ সাহেব লিখেছেন—এই বই 'বালাই-পুস্তাকা' থেকে বেরিয়েছে। যবদ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতির জ্ঞানকেও সাধারণ্যে সুলভ ক'রে দেবার চেষ্টাও এখান থেকে হ'চ্ছে। প্রাম্বানান আর পানাতারান এই দুই জায়গার প্রাচীন মন্দিরের গায়ে পাথরের উপরে রামায়ণের ছবি উৎকীর্ণ আছে; এই সব ছবি ফোটোগ্রাফিওর ক'রে ছাপিয়ে এক খণ্ডে প্রকাশ ক'রেছে, যবদ্বীপী ভাষায় রোমান অক্ষরে টিপ্পনী সমেত; সঙ্গে সঙ্গে আর দুই খণ্ডে ঐ ভাষায় রামায়ণের আলোচনা আছে—বাল্মীকির রামায়ণের মূল আখ্যান, প্রাচীন যবদ্বীপে এই রাম কথা যে রূপ গ্রহণ করে, তার আলোচনা, আর যবদ্বীপে সব-চেয়ে বেশী প্রচলিত এদের ভাষায় লেখা কবিতাময় প্রাচীন রামায়ণ একখানি—সঙ্গে সঙ্গে Wajang-এর পুতুলের

ঢঙে আঁকা ছবি ; এই তিনখণ্ডে যবদ্বীপে রাম-কাহিনীর সম্বন্ধে মোটামুটী জানবার পক্ষে, আর যবদ্বীপের প্রাচীন আর আধুনিক শিল্পে রামায়ণ-কথা কি ভাবে চিত্রিত হ'য়েছে তা বোঝবার পক্ষে সহজ হয়—সমস্ত বইখানি রোমান অক্ষরে ছাপা ব'লে ভারী সুবিধা। বড়ো আকার তিনখণ্ডে এই উপযোগী বই, সুন্দর কাগজ আর ছাপা, প্রচুর ছবি, টাকা তিনেকের মধ্যে বিক্রী ক'রছে। যবদ্বীপের রাজ পরিবারের কুমারী মেয়েরা প্রাচীন হিন্দু আমল থেকেই এক অপূর্ব্ব সুন্দর নৃত্য কলার চর্চ্চা ক'রে আস্‌ছেন, Tyra de Kleen নামে এক সুইডেন-দেশীয়া মহিলা এই নাচের চমৎকার কতকগুলি রঙীন ছবি আঁকেন, এই ছবিগুলি ডচ্ আর ইংরিজী ভূমিকার সঙ্গে এখান থেকে বেরিয়েছে। ছোটো-বড়ো জড়িয়ে প্রায় আট ন'শ' বই, একুনে প্রায় চল্লিশ হাজার পৃষ্ঠা, এইসব ভাষায় এ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে। Sri-Poestaka 'শ্রী-পুস্তক' নামে রোমান-মালাইয়ে আর যবদ্বীপীয় ভাষায় দুখানি সচিত্র মাসিক পত্র এখান থেকে বা'র হয়, আর এই দুই ভাষায় Pandji-Poestaka 'পঞ্জী-পুস্তক' অর্থাৎ 'পুস্তক-কেতন' নামে সাপ্তাহিক কাগজ ও একখানি বা'র হয়। দ্বীপময় ভারতে চারদিকে 'বালাই পুস্তাকা'র বই প্রচার লাভ ক'রেছে—ডচেরা এ দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য বেশী কিছু করেনি, কিন্তু গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ইস্কুল খুলেছে অনেক ; এই সব ইস্কুলের মারফতে বইয়ের প্রচার ; ইস্কুলের সংশ্লিষ্ট ছোটো ছোটো পুস্তকালয় প্রায় সর্ব্বত্রই আছে, এই রকম পুস্তকালয় সারা দ্বীপময়-ভারতে আড়াই হাজারের উপর হ'য়েছে, এক একটী পুস্তকালয় ২৫ থেকে ৩০০।৪০০ পর্য্যন্ত বই নিয়ে—এই সব পুস্তকাগারকে মালাই ভাষায় Taman Poestaka অর্থাৎ 'পুস্তকের উদ্যান' বলে ; পনেরো দিনের জন্য এক আধ আনা দিয়ে এই সব লাইব্রেরী থেকে গ্রামের লোকেরা বই নিয়ে প'ড়তে পারে। ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত, প্রায় দেড় দু'লাখ বই বিক্রী হ'য়েছে, আর দুলাখের উপর লোকে যোলো সতেরো লাখ বই এই সব লাইব্রেরী থেকে নিয়ে প'ড়েছে। এই সবের ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, তলা থেকে আস্তে আস্তে এদেশে শিক্ষা বেড়ে যাচ্ছে। আর সমগ্র দ্বীপময়-ভারতকে মালাই-ভাষার সূত্রে আস্তে আস্তে এক ক'রে ফেল্‌তে সাহায্য করা হ'চ্ছে। 'বালাই পুস্তাকা'-র বই, আর এই সব গেঁয়ো লাইব্রেরীর কল্যাণে, সুদূর Timor তিমোর দ্বীপের জেলের ছেলে, আর সুমাত্রার পাহাড়ের বর্ব্বর বাতাক্ জা'তের ছেলে, বা সেলেবেস বা বোরনিও দ্বীপের জঙ্গলী জাতের ছেলে, 'দেসা' বা পল্লীর ইস্কুলে গিয়ে রোমান অক্ষরে মালাই প'ড়তে শিখে, Kiplingএর Jungle Book, Jules Verneএর উপন্যাস 'আশীদিনে পৃথিবী পরিক্রমণ,' Ballantyneএর Coral Island, Marryatর Peter Simple, Alexandre Dumasএর Monte Cristo, F. W. Bainএর Digit of the Moon, আর সংস্কৃত মহাভারত থেকে ডচ অনুবাদের মারফৎ অনূদিত সাবিত্রীচরিত—এইসব বিদেশী সাহিত্য, আর তা-ছাড়া প্রাচীন মালাই যবদ্বীপী আর অন্য ইন্দোনেসীয় সাহিত্য, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব কৃষির উন্নতি আর অন্য সাধারণ বিষয়ে জ্ঞান আর আলোচনা নিয়ে নানা বই, ঘরে ব'সে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে। দ্বীপময়-ভারতের যে যে অংশে ভারতীয় সভ্যতা ভালো ক'রে প্রবেশ ক'রতে পারেনি, সেই সেই অংশ এখন আর বর্ব্বরের দেশ থাকছে না। এই কাজ দেখে ডচ্ জা'তের মানসিক-উৎকর্ষ কামিতা যতটা উপলব্ধি করা গেল, আর কিছুতে ততটা নয়।

'বালাই-পুস্তাকা'র প্রকাশিত বইয়ের মুদ্রিত তালিকা কতকগুলি নিয়ে 'পুনর্দ্দর্শনায়' ব'লে এবারের মত বিদায় নেওয়া গেল। তার পরে ডাক্তার বস্-এর আপিসে এলুম। মালাই দেশে সুঙেই-সিপুৎ-এ যে তামার বিষ্ণু-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল, যেটী তামিল চেট্টি বীরস্বামী আমাদের দেখান, তার ছবি বস্-সাহেবকে দেখালুম ; এই তাম্রমূর্ত্তির কথায় যবদ্বীপের তাম্র আর পিত্তল-মূর্ত্তি শিল্প নিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা হ'ল। তাঁর দপ্তরে যবদ্বীপের প্রাচীন শিল্পের আলোক-চিত্র কিছুক্ষণ ধ'রে দেখে,—কাছেই মিউজিয়ম-বাড়ী, সেখানে ডাক্তার বস্-এর সঙ্গে এলুম। মিউজিয়মের মধ্যেই যবদ্বীপের প্রাচ্যবিদ্যা আর বিজ্ঞান আলোচনার জন্য Koninklijk Genootschap van Kunst en Wetenschappen অর্থাৎ রাজকীয়-কলা-বিজ্ঞান-পরিষৎ-টী প্রতিষ্ঠিত। এটী আমাদের Asiatic Society of Bengalএর অনুরূপ পরিষৎ ; আর এশিয়ার মধ্যে এই ধরণের যত প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির মধ্যে এটী সব চেয়ে প্রাচীন। ১৭৮৪ সালে Sir William Jones স্যর্ উইলিয়ম জোন্‌সের চেষ্টায় ক'লকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়, আর এই এশিয়াটিক সোসাইটীর পরে ইংলাণ্ডে ফ্রান্সে আর ইউরোপের অন্যত্র প্রাচ্য সভ্যতা আর ইতিহাস আলোচনার জন্য নানা পরিষদের উদ্ভব হয়। ভারতে ইংরেজদের হাতে এ রকম কাজ আরম্ভ হবার ছ'বছর পূর্ব্বেই ডচেরা বাতাবিয়ার এই পরিষৎটী স্থাপন ক'রেছিল—১৭৭৮ সালে। মিউজিয়মের মধ্যেই এই পরিষদের আপিস, পুস্তকালয়, সভা-গৃহ। দ্বীপময়-ভারতের ভাষা ইতিহাস সাহিত্য সমাজতত্ত্ব আর

নৈসর্গিক জগৎ নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা করবার জন্ম খুব বড়ো পুস্তকালয় আর সংগ্রহশালা এই পরিষদে-র সঙ্গে বিদ্যমান। এখানকার পুস্তকাধ্যক্ষের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, আর এদেশের নৃতত্ত্ব আর সমাজ-তত্ত্বের সম্বন্ধে একজন মস্ত একপত্নী পণ্ডিত অধ্যাপক Schrieke স্খ্রীকে-র সঙ্গে আলাপ হ'ল। ডাক্তার বস্-এর সঙ্গে তার পরে মিউজিয়মটা একটু ঘুরে আসা গেল। ইতি মধ্যে ধীরেনবাবু আর স্বরেন বাবু মিউজিয়মে এসে গিয়েছেন, আর তাঁরা প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তির সংগ্রহের ঘরে সেখানকার ভাস্কর্য্যের নিদর্শনের মধ্যে এক সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার খোলা পেয়ে, খাতা বা'র ক'রে পেন্সিলে স্কেচ্ ক'রতে লেগে গিয়েছেন। ডাক্তার বস্ আমায় পিতল আর তামার মূর্ত্তির ঘরে আগে নিয়ে গেলেন। প্রাচীন যবদ্বীপের শিল্পের এদিকটা আমার প্রায় কিছুই জানা ছিল না, এখানকার সংগ্রহে সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলুম। নানা বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি; বোর্ণিও-দ্বীপ থেকে প্রাপ্ত চমৎকার একটা দাঁড়ানো বুদ্ধ-মূর্ত্তি, প্রায় হাতখানেক লম্বা হবে; অপূর্ব্ব সুন্দর কতকগুলি দাঁড়ানো শিবের মূর্ত্তি, আর বসা শিব-উমার মূর্ত্তি;—রাক্ষস-মূর্ত্তি, পিতলের ঘণ্টা, বড়ো বড়ো নক্সা-কাটা তামার থালা; এ সব দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। ডাক্তার বস্ আমায় ব'লেছিলেন যে যবদ্বীপের এই সব মূর্ত্তির সঙ্গে বিহারের নালন্দায় প্রাপ্ত তামার আর পিতলের মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে—আর এই সাদৃশ্যের কারণ, তাঁর মতে, যবদ্বীপের শিল্প ভারতের প্রভাবে জাত ব'লে ঘ'টেছে মনে না ক'রে, যবদ্বীপ থেকেই মাতৃভূমি ভারতে শিল্প বিষয়ে প্রতিপ্রভাব গিয়েছে তাই এই সাদৃশ্য, এ রকমটাও মনে করা যেতে পারে। যবদ্বীপের ওলন্দাজ পণ্ডিত কারু কারু একটা ধারণা দাঁড়িয়েছে যে যবদ্বীপের হিন্দু আমলের সংস্কৃতি, তার বাস্তু-শিল্প ভাস্কর্য্য আর অন্য কলাকে অবলম্বন ক'রে যা দাঁড়িয়েছিল তা বেশীর ভাগই যবদ্বীপীয় লোকেদের নিজেদের চেষ্টার ফল, এর কৃতিত্ব বেশীর ভাগ ভারতের ব'লে তাঁরা মানতে চান না। একথা কিন্তু সহজে মেনে নেবার নয়। যা হোক, এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'য়েছে, বিচার চ'লছে, শেষ কথা এখনও বহু দূরে,—এই তো সবে চর্চ্চার আরম্ভ। একমাত্র ভারতীয় পণ্ডিত যিনি এতাবৎ এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন তিনি হ'চ্ছেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। পিতল তামার মূর্ত্তির ঘরটা মোটামুটী সেরে, ডাক্তার বস্-এর সঙ্গে মিউজিয়মের Schats-kamer 'স্খাট্স্-কামের্' বা রত্ন-ভাণ্ডার দেখতে গেলুম। লোহার দরজা কবাট আঁটা এই ঘর, দরজায় প্রহরী, এক সঙ্গে এক জনের বেশী ঢুকতে বা বেরুতে পারে না। ভিতরে গিয়ে দেখ্লুম, সোনা রূপোর জহরতের কাজে বড়ো বড়ো আলমারী ভরা; পাঁচটা রাজকন্যার বিবাহের যৌতুক যেন সাজানো র'য়েছে। প্রাচীন সুমাত্রা যবদ্বীপ বলিদ্বীপের সোনার কাজের প্রচুর নমুনা; সব চেয়ে বিস্ময়কর হ'চ্ছে বলিদ্বীপের সোনার কাজ। বিস্তর ক্রীস বা ছোরা আর ছোট তলওয়ারের খাপ, সোনার নকাশী কাজ করা, হাতল গুলিতে সোনার রাক্ষসমূর্ত্তি, বলিদ্বীপের শিল্পের এ একটি বৈশিষ্ট-যুক্ত সৃষ্টি; আর বলিদ্বীপের সোনা রূপো মোড়া মূর্ত্তি, আর খাঁটা সোনার ভারী ভারী পাত্র—পানের বাটা, পান-পাত্র, থালা-বাটা। অপরূপ লতা-পাতা, হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি, রাক্ষস মূর্ত্তি, এই সব পাত্রের গায়ে ক'রেছে। প্রাচীন যবদ্বীপের প্রচুর সোনার মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরীয়—সীল আংটী—দেখলুম যবদ্বীপীয় অক্ষরে নাম খোদা র'য়েছে, বা পদ্মফুল, মাছ ইত্যাদি মাঙ্গল্য-চিহ্ন,আর "শ্রী" শব্দটা প্রাচীন অক্ষরে লেখা র'য়েছে; সোনার ছোট একটা অঙ্গুলিত্রাণ দেখলুম, অতি সূক্ষ্ম কাজে সেটাতে পাহাড় গাছ-পালা হরিণ প্রভৃতি খোদাই করা। এ-ছাড়া রূপার আর সোনার নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে।

এই ঘরটা বেশ ক'রে দেখে যখন বেরুলুম, তখন দেখি অনেক দেরী হ'য়ে গিয়েছে; শীঘ্র শীঘ্র হোটেলে ফিরতে হবে, খাওয়া-দাওয়া ক'রতে হ'বে, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। তাই তাড়াতাড়ি মিউজিয়মের অন্য অংশ গুলি যথা সম্ভব সংক্ষেপে ঘুরে এলুম। নীচের তালায় পাথরের ছোটো বড়ো মূর্ত্তি সব এনে রেখেছে। এখানেই অনায়াসে দুতিন ঘণ্টা কাটানো যায়। এ যাত্রা একবারের মতন খালি চোখ বুলিয়ে নিলুম মাত্র, বলিদ্বীপ থেকে ফিরে ভালো ক'রে দেখবার জন্য রেখে দিলুম—এ সব না দেখে যেতে বড়ো কষ্ট হ'ল। স্বরেনবাবু আর ধীরেনবাবু ইতি মধ্যে তাঁদের স্কেচ-বইয়ের বিস্তর পৃষ্ঠা পেন্সিলে আঁকা ছবিতে ভরিয়ে ফেলেছেন। পাথরের মূর্ত্তির ঘরে, ছবির সাহায্যে পূর্ব্বেই পরিচিত কতকগুলি মূর্ত্তি দেখলুম। মজপহিতের প্রথম রাজা কৃতরাজস জয়বর্দ্ধনের মূর্ত্তি, হরি-হররূপে কল্পিত—বিরাট ভাব-দ্যোতক অতিকায় আকারের মূর্ত্তি—খ্রীষ্টীয় চোদ্দর শতকের; এইটা, আর জয়বর্দ্ধনের প্রধানা মহিষীর এরই অনুরূপ একটী মূর্ত্তি, পার্ব্বতী রূপে কল্পিত,—এই দুইটা, পাথরের মূর্ত্তির ঘরে প্রবেশ করবার দরজার দু-ধারে দণ্ডায়মান; দেখে আগেই মনে বিশেষ শ্রদ্ধা-বিস্ময় জনিত আনন্দের উদয় হয়, পরে আমরা ঘরের ভিতরে যেতে পারি। ভিতরে বহু বহু অন্য মূর্ত্তির মধ্যে, তিনটী অতি গম্ভীর ভাবদ্যোতক দেবমূর্ত্তি দেখে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না—মনে শুদ্ধ-ভাব হয় এই তিনটী মূর্ত্তি দেখে, দেব-দর্শনের উদ্দেশ্য যা তাই

তনটী মূর্ত্তি হ'চ্ছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর শিবের। মূর্ত্তিগুলি মানুষের চেয়ে একটু বড়ো আকারের; মধ্য যবদ্বীপের চণ্ডী-বানোনের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এনে রেখে দিয়েছে, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্ব্বেকার কাজ। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আর শ্মশ্রুমান লম্বোদর শিব এখন আর সম্পূর্ণাঙ্গ নাই,—হাত আর হাঁটুর নীচের অংশ ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু আর সব অংশ এক রকম ঠিকই আছে, বিশেষ মুখমণ্ডল। দ্বীপময়-ভারতে শিবকে নির্ব্বাণমন্ত্র দাতা গুরু ব'লে কল্পনা করে, আর ভারতবর্ষ থেকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আনয়নকারী মহর্ষি অগস্ত্যকে শিবেরই অংশ বা অবতার ব'লে মনে করে; তাই শিবের সাধারণ নাম "বটার' গুরু" (অর্থাৎ 'ভট্টারক গুরু'), আর শিবের এক সাধারণ রূপ হ'চ্ছে শ্মশ্রুমান্ ব্রাহ্মণ বা ঋষির রূপ। বিষ্ণু মূর্ত্তিটার হাত চারিটা ভেঙে গেলেও প্রায় সম্পূর্ণ আছে; বিষ্ণুর পিছনে পাখা-ওয়ালা গরুড় র'য়েছে, অতি মনোহর এই মূর্ত্তিটা—যবদ্বীপ যাত্রার কালে মাদ্রাজ মিউজিয়মে পল্লব যুগের যে বিষ্ণুমূর্ত্তিটী দেখে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিলুম, সেটার কথা মনে হ'ল। দেবতাদের যারা এমন বিরাট ক'রে ধ্যান ক'রেছিল, আর সেই ধ্যানকে যারা প্রাণহীন পাথরে মূর্ত্ত ক'রে যেন জীবন্ত ক'রে তুলেছিল, কত বড় জা'তের লোক ছিল তারা, আর কী গভীর ভক্তি আর ভাবশুদ্ধিই বা ছিল তাদের! এসব মূর্ত্তি দেখে, সুদূর অতীত কালে যাঁরা ভারতের চিন্তা আর ভারতের আধ্যাত্মিকতার আধারের উপরে ভারতের দেবমূর্ত্তির সব মহনীয় কল্পনা ক'রে গিয়েছেন, উমা শিব বিষ্ণুর কল্পনা ক'রে যাঁরা বিশ্ব-মানবের কাছে এক চিরন্তন রহস্যময় অপার্থিব শাশ্বতবস্তুর রসানুভূতির দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে দিয়ে গিয়েছেন,—যাঁরা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন শিল্পকলার উৎস আবিষ্কার ক'রে দিয়ে গিয়েছেন,—তাঁদেরই চিন্তা-ধারার উত্তরাধিকারী আধুনিক যুগের ভারতীয় আমি, আমি তাঁদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ চিত্তে মনে মনে প্রণাম ক'রলুম।

বিষ্ণু শিব ('বটার গুরু')

(যবদ্বীপের চণ্ডী-বানোন্ মন্দির হইতে)

যবদ্বীপের কতকগুলি সুন্দর মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি র'য়েছে। ভারতের নানা অংশে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা বা চামুণ্ডার যে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা আছে—যেমন মহাবলিপুরের পল্লবশিল্পে, এলোরার চালুক্য শিল্পে, মহীশূরে হোয়সাল শিল্পে, আর আমাদের বাঙলাদেশে পাল যুগের শিল্পে আর তারই বিকারে জাত আধুনিক বাঙলার মৃন্ময়ী দুর্গামূর্ত্তিতে—যবদ্বীপের পরিকল্পনা এসব থেকে অনেকটা আলাদা। প্রাচীন যুগের শিল্প ছাড়া, যবদ্বীপের মধ্য বা পরবর্ত্তী হিন্দু যুগের ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন দেখলুম। এগুলির সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না, তাড়াতাড়ি দেখে গেলুম—কিন্তু এর এক নোতুন ধরণের সৌন্দর্য্য দেখা মাত্রেই মনকে আকৃষ্ট ক'রলে। এইশিল্প, মানুষের বোধের আর মানব-জগতের অতীত, কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত সৌন্দর্য্য আর মহিমা-মণ্ডিত এক দেবলোকে সুধর্ম্ম-সভায় বিহার ক'রছে না—সে উচ্চ কল্পনা, সে শান্তভাব, সে ধরণের মানসিক শক্তি আর নাই। কল্পনা এখন ধরণীর সুখ দুঃখের মধ্যে নেমে এসেছে; তার উড্ডয়নশক্তি বা আধ্যাত্মিক দর্শন নেই; কিন্তু এসবের বদলে পেয়েছে ভূয়োদর্শন,

আর তার সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার-জ্ঞান, পেয়েছে একটা আদিমকালের শক্তি আর তার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতরস আর ভয়ানক রস সম্বন্ধে একটা সচেতনতা। Sublime আর imaginative, classic আর noble থেকে শিল্পের ধারা পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে realistic আর decorative, Gothic আর grotesqueএ। যেখানে এই শেষোক্ত যুগের শিল্প realisticএর দিকে ঝুঁকেছে, সেখানে কল্পনাকে

মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা
(মধ্য যবদ্বীপের একটি মন্দির হইতে)

কন্যা
(যবদ্বীপ মজপাহিৎ যুগের মূর্ত্তি)

একেবারে বর্জ্জন করে নি—আর বিষয়-গৌরব বা বিষয়ের লঘুতাকে ভোলে নি; তাই যবদ্বীপের মধ্যযুগের এই শিল্পে পুরুষের আর মেয়েদের প্রস্তরময় প্রতিকৃতি অতি সজীব আর সুন্দর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দু তিনটি এই রকম মেয়ে আর পুরুষের মূর্ত্তি আমার বড়ই চমৎকার লাগ্‌ল। সুরেন বাবু আর ধীরেন বাবুর শিল্পীর চোখে সেগুলি এড়ায় নি, এঁরা তার স্কেচ নিয়েছেন। (পরে দেশে ফিরে আমি দু চারটির ফোটোগ্রাফ আনিয়েছি)।—পাথরের ঘরগুলি তাড়াতাড়ি ঘুরে দ্বীপময়-ভারতের সভ্যতার অন্য নিদর্শন যাতে প্রচুর আছে, নৃতত্ত্ববিদ্যার উপযোগী জিনিসে ভরা অন্য বড়ো বড়ো ঘরগুলির মধ্যে দিয়ে একবার চ'লে গিয়ে, এবারের মত মিউজিয়ম-দর্শন সাঙ্গ ক'রে আমরা হোটেলে ফিরলুম।

আহারাদির পরে, স্থানীয় ভারতীয়েরা কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। বিশ্বভারতীর কথা, আর বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের কোন্ বাণী কবি প্রচার ক'রতে চান্ আর বিদেশে এসে প্রবাসী ভারতীয়ের দায়িত্ব কি, এই সব বিষয়ে তিনি এঁদের ব'ললেন। এঁরা সকলেই বিশ্বভারতীকে সাহায্য ক'রতে স্বীকার ক'রলেন; ঠিক হ'ল, এঁরা এখানে যবদ্বীপের প্রাচীন আর আধুনিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত যত বই পারবেন সংগ্রহ ক'রে বিশ্বভারতীর পুস্তকালয়কে উপহার দেবেন। তার জন্য টাকা তোলবার বন্দোবস্ত এঁরা ক'রবেন। সিন্ধী বণিকরাই এই কার্য্যটি স্বীকার ক'রে নিলেন, কারণ এখানে এঁরাই সব চেয়ে লক্ষ্মীমন্ত আর প্রতিষ্ঠাশালী। এই কাজে শ্রীযুক্ত মেথারাম আর শ্রীযুক্ত নবলরায় রূপচন্দ্ অগ্রণী হ'লেন।

তার পর আমরা জাহাজ ধরবার জন্য তাঞ্জোং প্রিওক্‌-এ গেলুম। চারটেয় জাহাজ ছাড়্‌ল। অনেকে বিদায় দিতে এসেছিলেন। এক ডচ্ পাদরী সস্ত্রীক এই জাহাজে চ'লেছেন; দাড়ীওয়ালা, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, পাতলা একহারা চেহারার লোকটিকে দেখে খুব ভক্ত খ্রীষ্টান ব'লে মনে হ'ল, যেন মোটা-বুদ্ধির লুথার-গুরুর মতের খ্রীষ্টান, বাইবেলের গণ্ডীর বাইরে যাবে না, বা তার বাইরেকার কিছু বুঝবে না। তার দলের অনেকগুলি লোক এসেছিল বিদায় দিতে, ডচ্ মেয়ে আর পুরুষ আর দু চার জন যবদ্বীপীয়—এরা নীচে দাঁড়িয়ে তার-স্বরে ডচ্ ভাষায় ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাইতে লাগ্‌ল, আর জাহাজের উপর থেকে আমাদের পাদরী মহাশয় খুব হাত নেড়ে যোগ দিতে লাগ্‌লেন—এক একটা গান শেষ হয়, আর সকলে হিব্রু শব্দ Hallelujah 'হাল্লেলুইয়া' ('ঈশ্বরের স্তব করো') উচ্চারণ করে জয়ধ্বনি ক'রে; পাদরী ও শেষ মুহূর্ত্তে যতক্ষণ পারেন ধর্ম্ম-বিষয়ে এদের উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন্—জাহাজ ছাড়ার ব্যস্ততা, কাছে দূরে নানা চেঁচামেচি আর আওয়াজ, এসবে ভ্রূক্ষেপও ক'রলেন না। শেষটায় যখন জাহাজ ধীরে ধীরে ছাড়্‌ল, শেষবার 'হাল্লেলুইয়া' চীৎকার হ'ল, তখন সব মিট্‌ল। বহু দিনের স্বপ্নের দেশ বলিদ্বীপের দিকে এইবার চ'ললুম।

মহিলা-সংবাদ

গত ২২শে অগ্রহায়ণ প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের সহধর্ম্মিণী ও প্রবর্ত্তক নারীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাধারাণী দেবী পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন।

১২৯৬ সালের ৬ই আষাঢ় চুঁচুড়ায় রাধারাণী দেবীর জন্ম হয় এবং নয় বৎসর বয়সে চন্দননগরের ৺বিহারীলাল রায়ের পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র মতিলালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে দুই বৎসর তিনি স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। এই স্বল্পকালস্থায়ী পাঠাবস্থার মধ্যে অনেক পুরস্কার পাইয়া রাধারাণী নিজের পাঠানুরাগ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। বিবাহের পর সাংসারিক সুখ বলিতে যাহা বুঝায় রাধারাণী বেশীদিন তাহা ভোগ করেন নাই। একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামী তরুণ যৌবনেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন। রাধারাণী দেবীও সকল বিলাসবাসনা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কাজ করেন। তখন হইতে আমরণ তিনি তপস্বিনীর জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন।

স্বদেশীর যুগে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যখন কলিকাতা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া ফরাসী-শাসিত চন্দননগরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় এবং তাঁহার পত্নীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। অরবিন্দ তখন রাধারাণী দেবীর মহিয়সী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে "দিব্যমাতা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ইঁহার পর জ্যোতিষচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, অতুলচন্দ্র, নলিনীমোহন, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ অনেক জাতীয় কর্ম্মী শাসকদের কোপ হইতে রাধারাণী দেবীর নিকটে গিয়াই শান্তিলাভ করিয়াছেন।

রাধারাণী দেবী "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের" কর্ম্মীদিগের মাতৃ-স্বরূপা ছিলেন। বালিকা বয়সে তিনি নিজগ্রামের এক মুদীর দোকানে প্রায়ই খেলা করিতে যাইতেন। সেখানে তাঁহার একটি কাজ ছিল মাটিতে ছড়ান সরিষার কণা-গুলি সংগ্রহ করা। দোকানী তাঁহার এই কাজ দেখিয়া একদিন তাঁহাকে বলিল, "তুই এই সরিষাগুলির মত অনেক ছেলেমেয়ের মা হবি।" শেষবয়সে রাধারাণী এই কথা স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রায়ই বলিতেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার সেই মুদীকাকার আশীর্ব্বাদ-টুকুই খাঁটি হয়ে জীবনে ফলে গিয়েছে।"

প্রবর্ত্তক-নারীমন্দির-প্রতিষ্ঠা রাধারাণী দেবীর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। তিনি বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের সাধিকা ছিলেন। এই অবগুণ্ঠনবতী, নগ্নপদচারিণী, ভারতীয়া সাধ্বী জীবনে যে মন্ত্র পালন করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রথম ও শেষ কথা "ভগবানে আত্মসমর্পণ।" তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নারীমন্দিরে এই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রবর্ত্তক নারীমন্দিরের বালিকা কিশোরী বিবাহিতা ও অবিবাহিতা যুবতীরাও এই আদর্শেরই অনুসরণ করে। তাহাদেরও মন্ত্র "ভাগবত জীবনলাভ ও ভারতজাতির মধ্যে প্রেম ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।" এই উচ্চ আদর্শ সিদ্ধ করার

পরলোকগতা রাধারাণী দেবী

জন্য নারীগণ একত্র, এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করে, কেহ স্বতন্ত্র অর্থ-সম্পদ্ রাখে না, বিলাসব্যসন বর্জ্জন করে। তাহারা জীবনের সকল শক্তি ও অবদানই ভাগবত কার্য্য সাধন করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছে। শিক্ষার সঙ্গে শ্রমকে উপেক্ষা করে না; গীতা, পুরাণ, দর্শন ও ব্যাকরণচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে চরকায় সুতা কাটে, রন্ধন-শালায় অন্ন রাঁধিয়া শত ভ্রাতাভগ্নীর পাতে পরিবেশন করিয়া স্নেহ ও তৃপ্তির সহিত খাওয়ায়, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া, মুড়িভাজা, দুগ্ধ দোহন করা প্রভৃতি কোন গৃহ-শিল্প ও শ্রমসাধ্য কর্ম্মকেই তুচ্ছ জ্ঞান করে না।
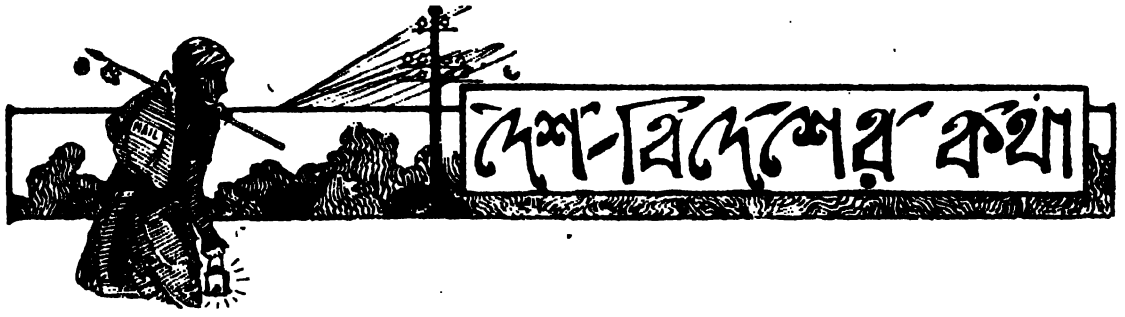
বাংলা

ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—

আমরা ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের উদ্যোক্তাদের নিকট হইতে সম্মেলন সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি পাইয়াছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন প্রায় ২০ বৎসর হইল বঙ্গের সুধী ও সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় এবং আলাপ পরিচয়াদির সুবিধা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে আগামী সরস্বতী পূজার সময় ১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ কলিকাতাবাসিগণের উদ্যোগে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। যাহাতে এই অধিবেশনের সুচিন্তিত প্রবন্ধ পঠিত ও যথার্থ-ভাবে আলোচিত হয় সেই উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা সমিতি অধিবেশনের পূর্ব্বেই সম্মেলনের পঠিতব্য প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার মুদ্রিত করিয়া বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

যাহাতে এই সম্মেলনে বঙ্গ সাহিত্য অনুরাগিগণের মধ্যে পরিচয়, মিলন ও ভাব বিনিময় করিবার সুবিধা হয় সেই নিমিত্ত অভ্যর্থনা সমিতি উদ্যানসম্মেলন, বৈঠকী মজলিস্, সঙ্গীত প্রভৃতি আয়োজন করিতেছেন।

সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের নিমিত্ত একাধিক মনীষী দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও আলোকচিত্র সম্মিলিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হইতেছে।

অভ্যর্থনা সমিতি বিভিন্ন স্থান হইতে কারুশিল্পের নিদর্শন, হস্তলিপি পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা, চিত্র, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, প্রস্তর ও ধাতু মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া একটি প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। মূল্যবান পুস্তক ও দ্রব্যাদি রাখিবার সুব্যবস্থা করিতেছেন। এই প্রদর্শনীর সফলতা সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর নির্ভর করে। সেজন্য অভ্যর্থনা সমিতি সাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন যে সকলেই নিজ নিজ সময় ও রুচি অনুসারে প্রবন্ধ, কারুশিল্প-নিদর্শন, হস্তলিপি, পুঁথি, প্রাচীন মুদ্রা, চিত্র, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, প্রস্তর ও ধাতু মূর্ত্তি প্রভৃতি পাঠাইয়া ও উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

সম্মেলনের প্রতিনিধি ও সভ্যগণের চাঁদা ২৲ টাকা। সম্মেলনের যে সমস্ত সভ্য কলিকাতাতে নিজ নিজ বাসের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না, অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদের বাসের ও আহারের ব্যবস্থা করিবেন। সম্মেলনের একটি বিস্তৃত মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণ অধিবেশনের পর বিনা মূল্যে সম্মেলনের সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

এই সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, দর্শনশাখার সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ইতিহাস শাখার—কুমার শরৎকুমার রায় এবং বিজ্ঞানশাখার সভাপতি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। সহঃ সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, এম-এ, বার-এট-ল, ও সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম-এ।

ময়মনসিংহ মহিলা সমিতি—

আজিকার ভারতব্যাপী নারী জাগরণের দিনে ময়মনসিংহের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় নারীসম্প্রদায় অপ্রত্যাশিতভাবে সাড়া দিয়াছে। চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র এই সহরে একটি মহিলা সভা আহ্বান করিয়া সর্ব্ব প্রথম "ময়মনসিংহ মহিলা সমিতি" সংস্থাপন করেন ও কলিকাতার "সরোজ নলিনী মহিলা সমিতির" সহিত এই সমিতি সংশ্লিষ্ট করেন। প্রায় এক বৎসর সমিতির কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কিন্তু এক বৎসর যাইতেই সমিতির কার্য্য বন্ধ হইয়া পড়ে। পুনরায় তিন বৎসর পরে গত সেপ্টেম্বর মাসে লুপ্ত সমিতির পুনরুত্থান হইয়াছে। ১০ই সেপ্টেম্বর উক্ত সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। সে সভায় বিশেষ ভাবে সর্দ্দার বিল সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, পক্ষে ১০৩ ভোট ও বিপক্ষে ৩০ ভোট হইয়া সর্দ্দার বিল গৃহীত হয়।

মহিলা সমিতির কতকগুলি শাখাসমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই সহরে ৬টি শাখা সমিতি খোলা হইয়াছে এবং শীঘ্রই সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন। উক্ত শাখা সমিতিগুলিতে মেয়েদের কুটীর শিল্প বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। গরীবের ঘরের প্রতি-দিনকার প্রয়োজনীয় জিনিষ নানা প্রকার খাবার জ্যাম, জেলী, বড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। মোটের উপর সকল প্রকার অর্থকরী বিদ্যায় উৎসাহ দেওয়া হয়। মেয়েদের মানসিক ও শারীরিক উন্নতির অনুশীলনের জন্য শীঘ্রই বন্দোবস্ত হইবে।

গত ১৮ই নবেম্বর স্থানীয় বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত "ময়মনসিংহ মহিলা সমিতির" আহ্বানে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সে সভায় স্থানীয় বহু গণ্যমান্য স্ত্রী-পুরুষ যোগদান করেন। সে সভায় ১৪ জন পুরুষ ও ১৫ জন মহিলা লইয়া "ময়মনসিংহ জেলা মহিলা সংগঠন সমিতির" একটি অস্থায়ী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্তা প্রতিভা নাগ (সম্পাদিকা, মহিলা বিভাগ) ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদক (পুরুষ বিভাগ) নির্ব্বাচিত হন। এই সমিতির উদ্দেশ্য স্থানীয় পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ মহিলা সমিতিকে কেন্দ্র করিয়া ময়মনসিংহ জেলার সর্ব্বত্র মহিলা শাখা সমিতি সংগঠন করা ও জেলাস্থ সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সহানুভূতি আকর্ষণ ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া সহরস্থ মহিলা সমিতিগুলিকে পুষ্ট করা। এই অধিবেশনে জেলার কালেক্টর

যুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই. সি, এস, মহাশয় যে বক্তৃতা করেন াহা মৃতকল্প বাঙালী জাতির বাঁচিবার মন্ত্র। দত্ত মহাশয়ের দিনকার সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে যে সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহা এই, যে, মেয়েদের বি-এ, এম-এ পাশ করা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য নহে, শিক্ষিতা করিতে হইবে গৃহিণী করিয়া। ব্যক্তির গৃহ, সমাজের গৃহ, জাতির গৃহ, এই গৃহিণীদের শিক্ষা দিতে হইবে রান্না বাড়ায়, ঘর-কন্নায়, গৃহসজ্জায়। দেশের মেয়েরা আবার কৃষি শিক্ষা করিবেন, শাক সবজির বাগান প্রস্তুত করিবেন, শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিবেন ও স্বহস্ত প্রস্তুত দ্রব্যদ্বারা গৃহ সাজাইবেন। দেশের মেয়েরা আবার দুহিতা হইবেন তাঁরা গৃহকে ফলে ফুলে খাদ্যে ও স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন।

দত্ত মহাশয়ের এই বক্তৃতা মৈমনসিংহের নারীসমাজে প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রেরণা আনিয়াছিল। এক সপ্তাহ পরে মহিলা সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় সিটিস্কুল প্রাঙ্গণে যে মহিলা শিল্প প্রদর্শনী হয় তাহাতে সহস্রাধিক নারী সমাগম হইয়াছিল। প্রদর্শনীর কক্ষগুলি কেবল সাজাইয়া রাখিবার দ্রব্যসম্ভারে ভরিয়া যায় নাই; সেখানে বিশেষ ভাবে স্থান পাইয়াছিল গরীবের দৈনন্দিন ঘরকন্নার বেতের বাঁশের ডালা কুলা, কাঁথা-কাপড়, মুড়ি মোয়া মুড়কি। সম্মিলিত নারী-সঙ্ঘের মধ্যে দত্ত মহাশয় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। সে দিনের বক্তৃতার বিষয় পূর্ব্বদিনের অনুরূপই ছিল, কয়েকটি নূতন কথাও বলিয়াছিলেন।

অতঃপর গত ৮ই ডিসেম্বর স্থানীয় জেলা মহিলা সংগঠন সমিতির উদ্যোগে অমরাবতী হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। গৌরী-পুরের জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সুকণ্ঠ ও সহজ ভাষায় সে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। তৎপর কলিকাতা সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি হইতে আগত শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী নারীজাগরণ ও স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

বাঁকুড়া জিলার গঙ্গাজলঘাটী জাতীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও অমরকানন আশ্রম—

আমরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। ১৯২১ সালে দেশে যে সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, নানাদিক হইতে প্রবল বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। আজিও নানা প্রতিকূল ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে গঙ্গাজলঘাটীর প্রতিষ্ঠান যে টিকিয়া আছে—ইহা তাহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

সম্প্রতি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কংগ্রেসের প্রধান কর্ম্মি শ্রীযুক্ত শিবরাম মণ্ডল মহাশয় ১২৪ (ক) ধারায় রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন—তাঁহার বিচার বাঁকুড়ায় হইতেছে।

প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ সিংহ ১৩৩১ সালের মাঘ মাস হইতে ১৩৩৫ সালের পৌষ মাস পর্য্যন্ত কার্য্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিদ্যালয়—এই বিভাগে ছাত্রগণকে এক্ষণে ম্যাট্রিক ষ্টাণ্ডার্ডের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে ছাত্র সংখ্যা ১০০। ৮ জন সুশিক্ষিত শিক্ষক আছেন। ছাত্রগণকে সাধারণ শিক্ষা ছাড়া সুতা কাটা, কাপড় বোনা, চাষের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

সেবাবিভাগ—এই বিভাগে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় আছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৩৩৩ জন, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৪২৯, ১৯২৮ সালে ৬৬৪ জন রোগী চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যাদি পাইয়াছে। কর্ম্মীগণ মধ্যে মধ্যে গ্রামে গিয়া রোগীর সেবা করিয়া থাকেন। আকস্মিক বিপদ আপদেও সেবা বিভাগের কর্ম্মীগণ আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। সেবাবিভাগ ক্রমশঃ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে।

পুস্তকাগার—বিদ্যালয় সংলগ্ন পুস্তকাগার ছাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুস্তকাগার নামে একটি সাধারণ পুস্তকাগার পরিচালিত হয়। মোট পুস্তক সংখ্যা ৫০০। জাতীয় সাহিত্য ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী ধর্ম্ম পুস্তকই সংখ্যায় বেশী। বাংলার বিখ্যাত দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি পুস্তকাগারে আসে তন্মধ্যে যুগদীপ, প্রবাসী, Modern Review বিনামূল্যে ও স্বদেশবাজার অর্দ্ধমূল্যে পাওয়া যায়।

কৃষিবিভাগ—স্থানীয় কৃষকগণের মধ্যে নূতন নূতন ফসলের চাষের প্রবর্ত্তনই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য তিন প্রকার আলু ও তিন প্রকার আকের চাষ করা হইয়াছে। এখানকার মাটিতে বড় পেঁপে ও ভাল কলা জন্মায়। কাঁটালের পক্ষে এই মাটি উৎকৃষ্ট। যে কয় প্রকার আলু চাষ করা হইয়াছে তন্মধ্যে দার্জ্জিলিং আলুর ফসলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।

বয়ন ও সূতা প্রস্তুত বিভাগ—এই বিভাগে দুইটি তাঁতে কাজ হয়। ১৯২৮ সালে ৫টী ছেলে বয়ন শিক্ষা করিয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটি ছেলে আশ্রমের খরচেই শিক্ষালাভ করিয়াছে। একজন সুদক্ষ তন্তুবায় বয়ন কার্য্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। দুইখানি তাঁতেই চরকা ও দেশী মিলের সুতায় কাজ হইয়া থাকে।

বীমা শিক্ষায় বাঙালী—

পাবনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়, এম্-এ, বি-এল্ কলিকাতার

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল

একটি বীমা কোম্পানীতে দেড় বৎসর কাল সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া ১৯২৮ সনের শেষ ভাগে ইংলণ্ডে গমন করেন। জীবন-বীমা শিক্ষা করা এবং বিদেশী বিখ্যাত বীমা কোম্পানীগুলির কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত

পরিচিত হওয়াই ছিল তাঁহার ইংলণ্ডে গমনের উদ্দেশ্য। প্রায় এক বৎসর বিলাতে থাকিয়া সেখানকার নামজাদা জীবন-বীমা-অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত লুইস্. ই. ক্রিষ্টনের তত্ত্বাবধানে জীবন-বীমা অধ্যয়ন করেন। তাঁহারই সহায়তায় সুরেশবাবু কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিলাতী, আমেরিকান ও ফরাসী বীমা-কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করেন।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশসমূহে শারীরিক অসুস্থতা, বার্দ্ধক্য, বেকার ইত্যাদি বিষয়েরও বীমা করিবার রীতি আছে। Friendly Societies, National (বা political) Insurance প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। ভারতবর্ষে এইরূপ কোনও কোম্পানী এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুরেশবাবু এই বিষয়ও শিখিয়া আসিয়াছেন। ইহা শিখিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন; জেনিভাতেও কিছুকাল থাকিয়া লিগ্ অব্ নেশন্‌স এর অন্তর্গত আন্তর্জাতিক শ্রমিক পরিষদে অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয়ের সমস্ত তথ্য অবগত হইয়াছেন।

সুরেশ-বাবুর লেখা বীমাবিষয়ক প্রবন্ধ লণ্ডনের policy এবং ম্যানচেষ্টারের Policy-Holder পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাত-প্রবাসে তাঁহার যত ব্যয় হইয়াছে তাহার অধিকাংশই জীবন-বীমা কার্য্যে লব্ধ অর্থ দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়াছে।

সুরেশবাবু সংপ্রতি স্বদেশে ফিরিয়াছেন। শিক্ষিতলোকেরা তাঁহার মত জীবন-বীমা কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে দেশের মহা কল্যাণ হইবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভিক্ষ —

৫ই জানুয়ারী ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তন্নিমিত্ত সাহায্য করা দেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। আঞ্জুমান-ইস্‌লামিয়া সাহায্য কমিটিও নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর থানা, কসবা থানা, সরাইল এবং নসিরনগর থানা অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে। উক্ত স্থানসমূহে বন্যার নিমিত্ত পাট এবং ধান্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। আউস ধান্য মোটেই হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত। তাহাদের পেটে খাদ্য নাই, পরিবার বসন নাই, মাঠে বপন করিবার বীজ ধান্য নাই। এই দুর্ভিক্ষ প্রায় ছয় মাস পর্য্যন্ত থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। এক্ষণে দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সদাশয় ব্যক্তিগণ যদি এই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য না করেন তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ১৩২২ সালের চেয়েও এ বৎসরের দুর্ভিক্ষের ছবি অতীব করুণ। বর্ত্তমানে অন্যান্য স্থান হইতে যদি সাহায্য না করা হয় তাহা হইলে এই অভাবগ্রস্ত লোকদের দুঃখের আর অবধি থাকিবে না। সরকার কৃষি ঋণের নিমিত্ত ২॥ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা উত্তপ্ত মরুভূমিতে কয়েক ফোঁটা জলের ন্যায়। কাজেই এ সময়ে প্রত্যেকেরই সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক। কোষাধ্যক্ষ মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ হামিদ—এই ঠিকানায় যিনি যাহাই পাঠাইবেন সাদরে তাহা গৃহীত হইবে।

(ফ্রি প্রেস, বঙ্গবাণী)

মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনী—

আগামী ১৮ই জানুয়ারী শিল্প ও নানাবিধ কারুকার্য্যের উন্নতিকল্পে এবং নারী শিক্ষা সমিতির সাহায্যার্থে ২০৪ অপার সারকুলার রোডস্থ, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে চতুর্থ বাৎসরিক মহিলাশিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রদর্শনী তিন দিন খোলা থাকিবে।

এই উপলক্ষে মহিলাদিগকে হস্তনির্ম্মিত নানাপ্রকার শিল্প ও কারুকার্য্য প্রদর্শনী কমিটির সহকারী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা তরলা দত্ত মহাশয়ার নামে ২৮ নং বাদুড়বাগান লেনে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। আগামী ৭ই জানুয়ারী হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি গৃহীত হইবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্রব্যাদির দুইটি তালিকা তৎসঙ্গে প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা প্রদর্শনীতে "ষ্টল" লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রদর্শনী কমিটীর সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা উষালতিকা সেন মহাশয়ার নিকট নারী শিক্ষা সমিতি আপিস, ৬।১ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে আবেদন করুন। ষ্টলের ভাড়া ৫৲ টাকা।

নিম্নলিখিত বিভাগে কার্য্যের উৎকৃষ্টতা অনুসারে পারিতোষিক দান করা হইবে। মফঃস্বল হইতে প্রেরিত প্রদর্শিত দ্রব্যাদির জন্য বিশেষভাবে পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(১) বয়ন—সূতী, রেশম। (২) ছাঁচের কাজ। (৩) সাধারণ সেলাই। (৪) জ্যাম, জেলী, চাটনী। (৫) নানাবিধ মিষ্টান্ন। (৬) নরুণের কাজ। (৭) চট্ ও কার্পেটের আসন। (৮) মাটির কাজ। (৯) চরকা (১০) পুঁতির কাজ। (১১) গৃহে উৎপন্ন ফুল বা সব্‌জি।

লীগ অব নেশনসের নিরস্ত্রীকরণ সংঘ)
বিশহাজার লীগ অতল জলে!
'লীগ' অর্থে সংঘ এবং যোজন দুই হয়।
চিত্রকর নিরস্ত্রী-করণ সঙ্ঘের কার্য্যফল
দেখাইতেছেন Il 420, Florence.
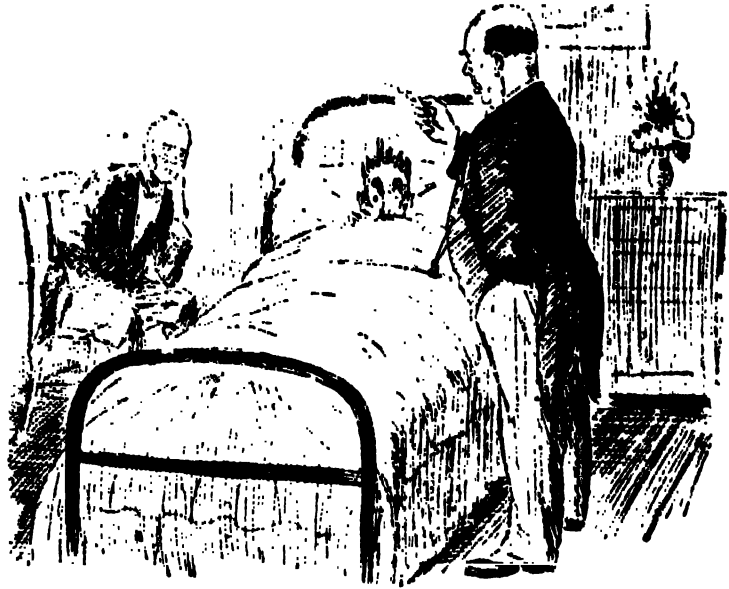
বৈদ্যসঙ্কট

ডাক্তার। (সহযোগী ডাক্তারকে)—আচ্ছা, আপনার মতেই ব্যবস্থা হোক। কিন্তু রোগী মরলে পর শবব্যবচ্ছেদে দেখতে পাবেন যে আমার বিচারই ঠিক। (Everybody's Weekly, London)

নিউইয়র্কে লালবাতি।
মার্কিন স্যাম খুড়ো (দেউলিয়া জার্ম্মেনির দারোয়ানকে —ভায়া, এবার আমাকেও একটু ঠাঁই দিতে হবে।
(সম্প্রতি নিউইয়র্কে বিষম অর্থসঙ্কট চলেছে। শেয়ারের দাম হু হু করে পড়ে যাওয়ায় বহু লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। (Kladderdatsch, Germany।

ভাইপো—ও জ্যেঠামশাই, বসো না। চেয়ারটা যে ভাঙা!

অধ্যাপক—আমাদের সময়ে ছেলেগুলোর আরো একটু রসবোধ ছিল।

Lustige Blatter, Berlin'
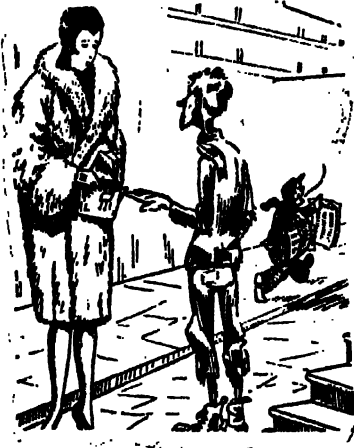
নিউইয়র্কের অর্থবিপ্লবের ফল।

মহিলা—তোমার কি কেউ নেই ?

ভিখারী—নিউইয়র্কে আমার এক খুড়ো আছে। কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ।
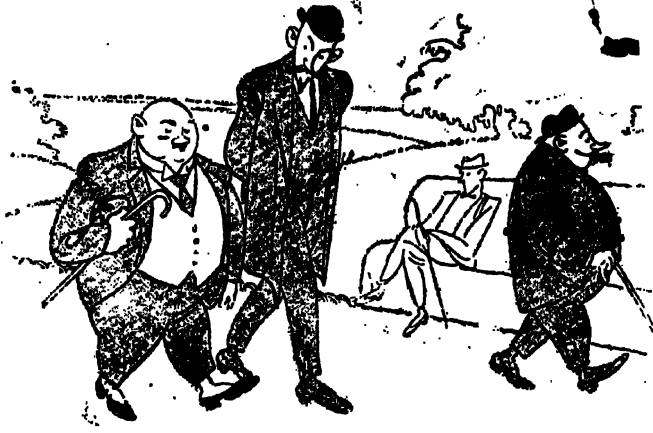
—আপনার কারখানায় কত লোক কাজ করে।

—মাইনে দি দুশো জনকে, কিন্তু কাজ করে তার অর্দ্ধেক।

Nagels Lustige Welt, Berlin

বৃহত্তম ডুবুরী জাহাজ।

কাপ্টেন, এত নীচে ডুব দেবার কি দরকার !

—কেলগ সন্ধি কি রকম চল্‌ছে দেখতে চাই।"

অর্থাৎ কেলগ সন্ধি এখন অতল জলে।

(Guerin, Meschino. Milan)
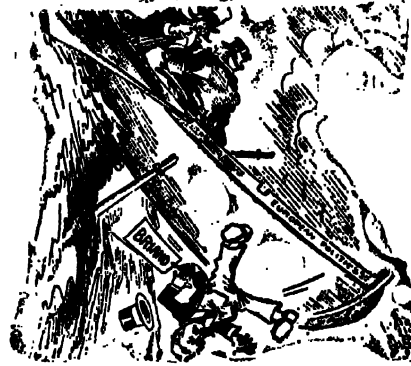
জলপথে অপঘাত। ফরাসী মন্ত্রীর ইতি শেষ।

(ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে এত দিন ফ্রান্স সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল নূতন মার্কিনি নৌবলনীতি প্রসঙ্গে ইংলণ্ড হঠাৎ ফ্রান্সকে একঘরে করেছে।

(Wasbington Post)

ভ্রম-সংশোধন

পৌষের প্রবাসীর ৩৬৪ পৃষ্ঠায় 'হরিনামামৃত' রূপগোস্বামী প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহা রূপগোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামীর রচিত।

ঐ সংখ্যার ৩৭৭, ৩৭৯ পৃষ্ঠায় যে দুইখানি ছবি আছে সেগুলি মহাত্মার সবরমতী আশ্রমের, গুজরাট বিদ্যাপীঠের নহে।

আত্মজীবনস্মৃতি—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২৪৮ পৃষ্ঠা।

আমরা এই পুস্তকটি পড়িয়া উপকৃত হইয়াছি। ইহা একজন ভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী স্বাবলম্বী ব্যক্তির জীবনস্মৃতি। খাসিয়াদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া নীলমণিবাবু প্রসিদ্ধ। তাহাদের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতির বৃত্তান্ত চিত্তাকর্ষক। আজকাল হিন্দুমুসলমান অনেকেই আদিম জাতিদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্মে আনিবার ইচ্ছা করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে তাহাদিগকে কেমন করিয়া সকল দিক দিয়া উন্নত করিতে হয়, এবং প্রচারককে কিরূপ "দশকর্ম্মান্বিত" হইয়া বাস্তবিক "জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত সবই করিতে হয়, নীলমণিবাবু তাহার প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যাঁহারা আদিম জাতিদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে আনিতে চান তাঁহাদের ও অন্য সব ধর্ম্মপিপাসু লোকদের এই বহি পড়া উচিত।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মহেশ্বরপাশা পরিচয়—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত। মূল্য ৩৲, পৃষ্ঠা ৩৫৮। মহেশ্বরপাশা খুলনা জেলার একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রন্থকার এই গ্রামখানির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র একটি ক্ষুদ্র অথচ সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের ঐতিহাসিক ও জনশ্রুতিমূলক বিবরণের সহিত বাহিরের জগতের সম্বন্ধ অতি অল্প। তাহা হইলেও লেখকের উদ্যম প্রশংসার্হ। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে ভারতের সত্যকার প্রাণের স্পন্দন তাহার অযুত পল্লীগ্রামের জীবন-প্রবাহের মধ্যেই পাওয়া যায়। এবং ইহাও সত্য যে পল্লীর জীবনের ছায়ালোকময় বৈচিত্র্য এত ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন যে তাহা ঐতিহাসিকের কোনও প্রয়োজনে আসে না। কিন্তু রাজনীতিক ইতিহাসের পক্ষে ইহা সত্য হইলেও ইহারও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক ইতিহাস-লেখকের পক্ষে পল্লীজীবনের ইতিহাস, প্রবাদ ও ছড়াগুলি অকিঞ্চিৎকর নহে। কুলজী গ্রন্থগুলি এই কারণে মূল্যবান্। ভারতের অসম্পূর্ণ রাজনীতিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলেও প্রদেশে, জনপদে, জেলায় ও পল্লীগ্রামে অনুসন্ধান না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থখানিতে একখানিমাত্র পল্লীগ্রামের পরিচয় থাকিলেও উপকরণ-সংগ্রহ হিসাবে এরূপ প্রয়াসের যথেষ্ট মূল্য আছে। সেইজন্যই এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত হয়, ততই ভাল মনে হয়। মহেশ্বরপাশায় অনেক গুণী ও প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যথা—স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার (কুচবিহার রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ার), রায় সাহেব শশিভূষণ পাল (বিখ্যাত চিত্রকর) ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী পাল (সূচিচিত্রে প্রতিভাবতী) প্রভৃতি। ইহাদের এবং অন্যান্য কৃতী ব্যক্তিগণের জীবনী ও চিত্রে গ্রন্থের সম্পদ্ বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রূফ দেখিবার দোষে ইংরেজি অংশগুলিতে অনেক ভুল ছাপা হইয়াছে। এই সুমুদ্রিত ও সু-প্রথিত পুস্তকে সেগুলি সহজেই বর্জ্জিত হইতে পারিত।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ব্রহ্মচর্য্য। বিধবাবিবাহ—মহাত্মা গান্ধী লিখিত, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রকাশক—শ্রীবিজয়রত্ন সেন, তরুণ সাহিত্য মন্দির, ১৬।১ গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা ও দশ পয়সা।

পুস্তক দুইটির ভাষা সুন্দর ও সুবোধ্য। প্রথমটির বিষয়—ইন্দ্রিয়সংযম ও জন্মনিরোধ। মহাত্মা গান্ধী বলেন—অবিবাহিত ও বিবাহিত সকলেরই আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য, এবং তাহার জন্য সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম আবশ্যক। 'যদি সারাজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিতাম তবে আমার উৎসাহ ও শক্তি হাজার গুণ বেশী হইত, এবং আমি সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজের ও দেশের কাজ করিতাম।... আত্মা যত নিষ্পাপ ও নির্বিকার হয়, শরীরও তত নিরোগ হয়। নিরোগ শরীরের অর্থ বলবান শরীর নয়, শক্তিশালী আত্মা ক্ষীণ শরীরেই বাস করে।...অবশ্য খাঁটী ব্রহ্মচারীর শরীর অতি তেজপূর্ণ ও বলশালী না হইয়া পারে না।...যিনি রসনা সংযত করেন নাই তিনি কামদমন করিতে পারিবেন না।...আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে স্ত্রী-পুরুষের ভিতরকার এই আকর্ষণ স্বাভাবিক; ইহা সত্য হইলে বুঝিব প্রলয়ের বেশী দেরি নাই। ভাই-বোন, মাতা-পুত্র ও পিতা-পুত্রীর ভিতর যে আকর্ষণ আছে তাহাই স্বাভাবিক।... মিলনের উদ্দেশ্য সুখ নহে, ইহার উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন করা।... সন্তানলাভের ইচ্ছা না থাকিলে পরিমিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিও নীতিবিরুদ্ধ।' মহাত্মা গান্ধী সংযমের দ্বারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিতে চান, তাঁহার মতে কৃত্রিম উপায় অত্যন্ত গর্হিত। কয়েকজন কৃত্রিম উপায় সমর্থন করিয়া যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা এবং মহাত্মার প্রত্যুত্তর এই পুস্তকে আছে। বহু বিবেচক ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি মহাত্মার যৌনসম্বন্ধীয় কঠোর মত সমর্থন করিবেন না. কিন্তু সংযম-সাধনার যে উপায় সকল এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে তাহার উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করিবেন।

'বিধবা বিবাহ' পুস্তকে মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন—'জবরদস্তির সাহায্যে বিধবাদিগকে ঠেকাইতে গেলে বৈধব্যধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না।...শুদ্ধ বৈধব্য হিন্দুসমাজের অলঙ্কার।...বালবিধবার কাল্পনিক বৈধব্য হেতু হিন্দুসমাজ পতিত হইতেছে।...শারীরিক সম্ভোগের অভাবে মন যদি ভোগের চিন্তায় ডুবিয়া থাকে, তবে দেহের ক্ষুধা শান্তি করাই ধর্ম্ম—এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। বিধবা-বিবাহ কোনো পাপ কাজ নয়, বিপত্নীকের বিবাহে যতটুকু পাপ হয়, ইহাতেও ততটুকু পাপ হইবে। বৈধব্য মাত্র ধর্ম্ম নয়।...যে বৈধব্য স্বেচ্ছায় পালিত হয় তাহা প্রশংসার যোগ্য; বলপ্রয়োগে পালিত বৈধব্য নিন্দনীয়।' গ্রন্থের পরিশিষ্টে অনুবাদক লোকসংখ্যার যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইবে যে বাঙালী হিন্দুর প্রায়

সকল জাতির মধ্যেই নারীর সংখ্যা কম, সুতরাং বিধবাবিবাহের প্রসারের ফলে পাত্রীর আধিক্য হইবে এমন আশঙ্কা অমূলক।

পুস্তক দুইটি অতিশয় চিন্তাকর্ষক এবং বহুপ্রচারযোগ্য।

রা. ব.

মৈত্র্যুপনিষদ্—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বেদান্তবাগীশ, বিদ্যাভূষণ, তত্ত্ব-বারিধি, এ-মএ, কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এবং প্রকাশিত (৩ ডি নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা পৃঃ ১৫—১৮০; মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থে প্রথমে মূল সংস্কৃত বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার পরে দেওয়া হইয়াছে, টীকা। লেখক প্রধানতঃ রামতীর্থের 'দীপিকা' অবলম্বন করিয়া এই টীকা লিখিয়াছেন। শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে ছোট বন্ধনীর '()' মধ্যে। সুতরাং কোন্‌টি মূল, কোন্‌টী অর্থ, ইহা বুঝিবার কোন অসুবিধা হইবে না। যাহা অতিরিক্ত শব্দ বা বাক্য, তাহা বড় বন্ধনীতে '[ ]' দেওয়া হইয়াছে। টীকার পরে অবিকল বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করিতে যাইয়া কোন কোন স্থলে অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এই সমুদায় অংশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মূলের ঠিক অনুবাদ কতটুকু তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

বঙ্গানুবাদের পরে লেখক অনেকস্থলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমুদায় মন্তব্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ। একটী মন্তব্য বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কয়েকটী স্থলে (পৃঃ ১০, ১৭৯, ১৮০) তিনি নচিকেতাকে 'রাজপুত্র' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা সমর্থন করিবার জন্য অনেক যুক্তিও প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস নচিকেতা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণপুত্র। এ বিষয়ে আমাদিগের যুক্তি এই—

(১) কঠোপনিষদের মতে নচিকেতার পিতা "ঔদ্দালকি আরুণি" (১।১১)। উদ্দালক, ঔদ্দালকি, অরুণ, আরুণি, সকলেই ব্রাহ্মণ: সুতরাং নচিকেতা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণপুত্র।

(২) গোতম-বংশে যাহাদের জন্ম, তাহাদিগের নাম গৌতম। এই অর্থে নচিকেতা ও তাহার পিতা উভয়ই গৌতম। কঠোপনিষদের ১।১০ অংশে নচিকেতার পিতাকে গৌতম এবং ৪।১৫ ও ৫।৬ অংশে নচিকেতাকে গৌতম বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩:১১।৮।২) নচিকেতাকে বলা হইয়াছে "গৌতমকুমার।" গৌতমগণ সকলেই ব্রাহ্মণ।

(৩) কঠোপনিষদে দুইবার নচিকেতাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হইয়াছে (১:৭; ১:৮) ঐ উপনিষদেরই আর একটি মন্ত্রে (১৯) যম নচিকেতাকে দুইবার "ব্রহ্মন্‌" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই সমুদায় উক্তিকে মূল্যবান বলিয়া মনে করেন নাই। আমরা এই সমুদায় স্পষ্ট উক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

(৪) কঠোপনিষদের মতে নচিকেতার পিতার নাম "বাজশ্রবস।" বাজশ্রবার বংশধরকে 'বাজশ্রবস' বলা হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে (১।৩।১০।৩) যে বাজশ্রবসগণ বেদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্রব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'বাজশ্রবা' একজন আচার্য্য। ব্রাহ্মণগণই আচার্য্য-ব্রত গ্রহণ করিতেন।

শতপথব্রাহ্মণে একজন বাজশ্রবসের উল্লেখ আছে (১০।৫।৫।১)। ইনি অগ্নিচয়ন করিতেন। ঐ স্থলেই ইহাকে গৌতম বলা হইয়াছে। এস্থলেও দেখা যাইতেছে যে বাজশ্রবসগণ ব্রাহ্মণ। সুতরাং নচিকেতাও ব্রাহ্মণ।

যাহা হউক এ সমুদায় অবান্তর বিষয়। মুখ্য বিষয় মৈত্রি উপনিষদের ব্যাখ্যা। গ্রন্থকার অসাম্প্রদায়িকভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহাদের সাধারণ সংস্কৃত জ্ঞান আছে, তাঁহারাও সহজে মূলগ্রন্থ বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করেন, তাঁহাদের মৈত্রি উপনিষদও পাঠ করা উচিত। ইহাও একখানা প্রাচীন গ্রন্থ; ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। গ্রন্থের ভূমিকাতে শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন।

বঙ্গভাষায় এপ্রকার সংস্করণ আর প্রকাশিত হয় নাই। আশা করি জনসমাজে ইহা আদৃত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

খেলার পুতুল—শ্রীনরেন্দ্র দেব। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পৃঃ ৩২৯। দাম দুই টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে দেশের নারী-সমস্যার একটা প্রধান দিক বেশ সহানুভূতির সহিত দেখানো হইয়াছে। আমাদের সমাজে পতিপুত্রহীনা দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের বিধবার অবস্থা যে কত অসহায় তাহা প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে দিয়া আমরা জানি। বিশেষ করিয়া তিনি যদি তরুণী ও সুরূপা হন তাহা হইলে তাঁহাকে অর্থ-নৈতিক সমস্যা ছাড়াও আরও যে বহু প্রকারের সমস্যার স্থল হইয়া দাঁড়াইতে হয়, দরদী লেখক তাহা সুহাসের চিত্রের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উপন্যাসখানির মধ্যে সন্ধ্যা ও অনিলা এই দুইটী অন্য ধরণের type চিত্রিত হইলেও সুহাসের চিত্রই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বেশী। সুহাসকে লেখক মামুলি করিয়া না আঁকিয়া তাহাকে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে দিয়াছেন, নিজের তেজ ও আত্মসম্মানজ্ঞানের ভিতর দিয়া নিজের পন্থা খুঁজিয়া লইতে দিয়াছেন।

সত্যসুন্দর—বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স। ১৫, কলেজ স্কোয়ার। পৃঃ ২৫৪। দাম দেড় টাকা।

উপন্যাস হইলেও বইখানির বক্তব্য একটি ছোট গল্পের মধ্যে বেশ বলা চলিত। সমগ্র বইএর মধ্যে মেনকা ও তাহার পুত্র অমিয় সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য—বাকী পাতাগুলি নিরর্থক কেনানোতে ভর্ত্তি। ভাষা অধিকাংশ স্থলেই লালিত্যবিহীন ও আড়ষ্ট।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদান্তানুশাসন—শ্রীগুরুপ্রসাদ মিত্র। প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভদ্র, ৫ নং নয়াবাজার, ঢাকা। মূল্য ১৲ টাকা। ২৫৩ পৃষ্ঠা।

উপনিষদ আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রাচীন তত্ত্বগ্রন্থ। অনেক কাল পূর্ব্বে লেখা বলিয়াই ইহাদের লেখকদের কোনও নাম বা পরিচয় আমাদের জানা নাই। এবং এগুলি এককালে লেখা হইয়াছিল কিনা তাহাও আমরা বলিতে পারি না। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য ঐতরেয় তৈত্তিরীয় বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য এই দশখানিই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া প্রথিত। অনেকে

ইঁহাদের সহিত শ্বেতাশ্বতরকেও ধরিয়া এই ১১খানি উপনিষদ্‌কে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণনা করেন। ইঁহাদের পরে আরও অনেক গ্রন্থ ঠিক্ উহাদেরই অনুকরণে লিখিত হইয়া উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি বেদেরই শেষভাগ, সেইজন্য সেগুলিকে বেদান্তও বলা হইয়া থাকে। এই উপনিষদ্‌গুলিতে কেবলমাত্র যে অনেক তত্ত্বকথা আছে তাহা নয়, তৎকালিক অনেক উপাসনা-পদ্ধতি অনেক ব্রহ্মানুসন্ধানের আখ্যায়িকা প্রভৃতিও দেখা যায়। বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ সেগুলি বুঝেনও না এবং তাঁহাদের কোনও উপকারেও আসে না। উপনিষদ্‌গুলি বেদেরই অংশ বলিয়া পরিগণিত। সেইজন্য যাঁহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী তাঁহারা এগুলিকে অনাদি ও অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সেইজন্য বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে সমস্ত উপনিষদ্‌গুলির একটি অখণ্ড তাৎপর্য্য সংগ্রহণ করিতে চেষ্টা করা হয়। তাঁহার পূর্ব্বেও কাশকৃৎস্ন ঔড়ুলোমি প্রভৃতিরা ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ইহাও একরূপ নিঃসংশয়ভাবে বলা যায়। ইহার পরে অনেক ব্যাখ্যাতারা ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে যে সমস্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তন্মধ্যে অষ্টম শতাব্দীর শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাই প্রাচীন। তারপর ভাস্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বলদেব প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিরা ব্রহ্মসূত্রের ও উপনিষদের বিভিন্ন রকম তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা সকলেই এই কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে সমস্ত উপনিষদে এক কথা বলিতেছে এবং সে কথাটি কেবলমাত্র তাঁহাদেরই বিশেষ মতটি সমর্থন করে।

কিন্তু আধুনিক রীতিতে অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক উপনিষদের একটি বিশেষ বক্তব্য কথা আছে। এবং সকল উপনিষদে, এমন কি এক উপনিষদের সর্ব্বত্রও যে একই রকম কথা বলা হইয়াছে তাহা নয়। গুরুপ্রসাদবাবু তাঁহার গ্রন্থে ঈশ হইতে শ্বেতাশ্বতর পর্য্যন্ত সমস্ত উপনিষদ্‌গুলির মধ্য হইতে অনেকগুলি প্রধান প্রধান বচন পর পর সাজাইয়া সুন্দরভাবে বাংলা তর্জ্জমা করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে শঙ্করের ভাষ্যগ্রন্থ হইতেই দুই এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিয়া অর্থ পরিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি এই হিসাবে সাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমার নিজের ঘরে উপনিষদের অনেক সংস্করণ আছে, তথাপি সুলভাবে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য আমি এইখানিই অনেক সময়ে ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ছাড়া ভূমিকাতে তিনি উপনিষদের অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত এই চতুর্ব্বিধ ব্যাখ্যারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। গুরুপ্রসাদবাবু ঢাকার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। তিনি যে দেহতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে আত্মতত্ত্বেরও অনুশীলন করেন এবং বৈরোচনের ন্যায় কেবলমাত্র দেহকেই আত্মা মনে করেন না ইহাতে অনেকে একটু আশ্বস্ত বোধ করিবেন। আমরা আশা করি যে, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গুরুপ্রসাদবাবুর নিকট হইতে আরও কিছু পাওয়া যাইবে। তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানিতে সাধারণ জিজ্ঞাসুর অনেক উপকার হইবে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

ডিসপেপসিয়া বা অজীর্ণে জল-চিকিৎসা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি-এল প্রণীত, ২০এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে এন, সি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। ১২০ পৃঃ, মূল্য এক টাকা।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, "স্বভাব চিকিৎসা"র মতে অজীর্ণ রোগই অন্য সমস্ত রোগের কারণ। অজীর্ণ রোগের জন্য শরীরের মধ্যে খাদ্যগুলি অজীর্ণ অবস্থায় থাকিয়া শরীরের প্রতি বিসদৃশ ব্যবহার করে ও ক্রমশঃ শরীরের মধ্যে বিসদৃশ পদার্থ রূপে (morbid matter) সঞ্চিত থাকে। ইহা হইতে গ্যাস জন্মাইয়া শরীরের মধ্যে উত্তাপ অর্থাৎ জ্বর ও অন্যান্য রোগের সৃষ্টি করে। "জলচিকিৎসা" কোষ্ঠশুদ্ধির ও ঐ গ্যাস দমন করিবার বিশেষরূপে সহায়তা করে।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার পাকাশয়ের কাজ, অজীর্ণ রোগের কারণ ও লক্ষণ, ও উহার চিকিৎসারূপে উপবাস, অন্ত্রধৌতি, সিট্‌স্ বাথ (sitz-bath) ব্যায়াম প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে পথ্য পানীয় সম্বন্ধে উপদেশ, সাধারণ খাদ্যারম্ভ নিয়মাবলী ও বাঙালীর আদর্শ খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। অজীর্ণ রোগীদের এ পুস্তক পাঠে উপকার হইবে আশা করা যায়।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

লালকুঠি—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। এম-সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। এক টাকা চার আনা।

গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাস রচনা দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জক সাহিত্য সৃষ্টি করিতেও তাঁহার লেখনী সুপটু। আলোচ্য পুস্তকখানি তাহার প্রমাণ। পুস্তকটি ছেলেদের উপযোগী একখানি উপন্যাস। মৌচাক মাসিক পত্রিকায় উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন, আমরা জানি, ছেলেমেয়েরা বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছিল। ইহাকে একত্র পাইয়া এখন তাহারা আনন্দিত হইবে সন্দেহ নাই। পুস্তকটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও সরল হইয়াছে।

ঘুমের আগে—শ্রীউমা দেবী। এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। আট আনা।

ছেলেমেয়েদের উপযোগী ছোট ছোট কবিতা, ছড়া ও ঘুমপাড়ানি গানের সমষ্টি। অধিকাংশ কবিতাই ভাল। বইটি ছেলেমেয়েদের ভালই লাগিবে। কিন্তু কয়েকটি কবিতায় ছন্দের ত্রুটি ও ছাপার ভুল লক্ষিত হইল।

চাঁদা মামা—শ্রীনিশিকান্ত সেন। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, কলিকাতা। চার আনা।

বইটির নাম, ছবি ইত্যাদি ছেলেমেয়েদের পক্ষে লোভনীয় হইয়াছে। ইহাতে কবিতা, ছড়া, গল্প ও রূপকথা কয়েকটি আছে। অনেকগুলি পড়িয়া ছেলেমেয়েরা আনন্দ লাভ করিবে, কিন্তু সকলগুলিই তাহাদের নিকট সমান আনন্দকর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প

জানোয়ারের মেলা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রচিত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, ২৬।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুস্তকখানিতে জানোয়ারের লড়াই, জীবজন্তুর হাতিয়ার, জীবজন্তুর সুখদুঃখ, ন্যাজের গুণ, আধা-পাখী আধা-জন্তু প্রভৃতি সতেরটি বিভিন্ন অধ্যায়ে পশুপক্ষী সম্বন্ধে সতেরটি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা আছে। বইখানি সুচিত্রিত। প্রাণিতত্ত্বের খুঁটিনাটির অবতারণায় বিষয়বস্তু জটিল না করিয়া 'জীবজন্তুদের হালচালের

মোটা কথাগুলি সাদাসিদেভাবে বলা হইয়াছে।' বাঘ সিংহ ভালুক হাতী গণ্ডার গরিলা হইতে আরম্ভ করিয়া সাপ, বাদুড় বহুরূপী, হাঙর কুমীর প্রভৃতি সকল রকম জীবজন্তুর ছবি ও কথায় ভরা বইখানি ছেলেদের মনোহরণ করিবে।

একখানি ছবির নীচে লেখা আছে, 'উটের চাষ।' পাটের চাষ, ধানের চাষ, কপির চাষের কথা জানি, কিন্তু উটের চাষ কি? উট দিয়ে চাষ অর্থে উটের চাষের প্রয়োগ ব্যাকরণ ও ব্যবহার বিরুদ্ধ।

আশ্চর্য্য দ্বীপ—শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। প্রকাশক—এম্‌-সি-সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

Jules Verne-এর Mysterious Island নামক গল্প অবলম্বনে বইখানি রচিত। আশ্চর্য্য এবং দুঃসাহসিক ঘটনাবলী চিরকালই বাল্য-কল্পনা উত্তেজিত করে। শুধু ছোটরা নয়, বড়রাও বইখানি আগ্রহসহকারে পড়িবে। অনুবাদ ভাল। কোথাও বাধে না। কিন্তু 'পারে'র জায়গায় পার, 'রওনা'র জায়গায় 'রোয়ানা' প্রভৃতি প্রাদেশিকতা শিশুসাহিত্যে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। শিশু পাঠকেরা কিন্তু আশ্চর্য্য দ্বীপ হইতে দ্বীপ-প্রবাসীদের উদ্ধার অধীরভাবে অপেক্ষা করিবে। অতএব ইহার দ্বিতীয় ভাগ শীঘ্র প্রকাশ করা উচিত।

কায়াহীনের কাহিনী—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, এম্‌-সি-সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

শিশু-সাহিত্যে স্বর্গগত মণিলালবাবুর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ঘটনা এবং বহির্বিষয়ের বর্ণনাই আজকাল সাধারণতঃ বাংলা শিশু-সাহিত্যের সম্বল। কল্পনার অভাবে ছেলেদের বইগুলি অনেক সময় 'ছেলেমানুষি' হইয়া পড়ে। মণিলালবাবু এই ভুল করেন নাই। তাঁহার লেখা ছেলেদের বই শিশুদের 'সাহিত্য' বটে। 'কায়াহীনের কাহিনী'তে হরতনের গোলাম, বাঁশীর ডাক, লাট্টুর ঘূর্ণী, কঙ্কালের টঙ্কার, অতিথির আহার এবং খোট্টাই সরবৎ এই ছয়টি অলৌকিক কাহিনী আছে। কাহিনীগুলি চিত্তাকর্ষক। সাধারণ ভূতের গল্পের মত এগুলি বৈচিত্র্যহীন কল্পনার পুনরাবৃত্তি নয়। 'বাঁশীর ডাক' গল্পটি করুণ কবিতার মত মনকে অভিভূত করে। রচনা সরল এবং সরস। ছাপা ও বাঁধা ভাল।

মরণ-বিজয়ী যতীন্দ্রনাথ দাস—শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও সঞ্জীবনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা

আয়ার্লণ্ডের ম্যাকস্যুইনী এবং ভারতবর্ষের যতীন্দ্রনাথ—এই দুই দেশভক্ত বীরের আত্মোৎসর্গ পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে। যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুর মধ্য দিয়া দেশবাসীর নিকট পরিচিত হইলেও তাঁহার জীবনও সাধারণ নহে। নির্বাসন, কারাবাস, নির্জ্জন কক্ষ—কিছুই এই বীরকে কখনও টলাইতে পারে না।

জীবনচরিত, কারাগারে মহাব্রত-উদ্‌যাপন, মরণবিজয়ীর সম্বর্দ্ধনা, ভারতব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস, লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা, প্রভৃতি সাতটি অধ্যায়ে অনেক ভাবিবার কথা আছে।

প্রজাপতি—শ্রীসরোজকুমার বসু প্রণীত ও ৪১।১১ সি মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

এখানি উপন্যাস। গল্পটি মোটামুটি এই—পৈত্রিক জমিদারী এবং উপন্যাসোচিত সকল গুণের অধিকারী, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী অসিতকুমার নামক এক অবিবাহিত যুবক পত্রযোগে পিসির বাড়ীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল, পাছে ধনীকন্যা মিস অরুণা রায় নাম্নী সুবেশা সুন্দরী সামাজিক 'প্রজাপতি'র সহিত আলাপ হইয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে অসিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, তাহার ছোট বোনের এক শিক্ষিতা সঙ্গিনী চাই। পত্রে 'প্রজাপতি' কথাটিতে অপমান বোধ করিয়া অরুণা শোধ তুলিবার জন্য ভিন্ন নামে বিজ্ঞাপন অনুযায়ী অসিতের ভগিনীর সঙ্গিনীরূপে নিযুক্ত হইল। যেমন হয়, অসিত ও অরুণা প্রেমে পড়িল। অবিবাহিত নাম খণ্ডনে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। ইহাতে নাই কি? Oxford-এর M. A. আছে, young squire আছে, heiress আছে, society girl আছে, butterfly আছে, governess আছে, গভর্ণেস রূপে অবিবাহিত গৃহস্বামীর মনোহরণের বৃত্তান্ত আছে। অর্থাৎ বিগত যুগের সুলভ বিলাতী উপন্যাসের যাবতীয় উপকরণই ইহাতে বর্ত্তমান। অতএব ইহা বাংলার সামাজিক উপন্যাস না হইবে কেন? দেশী পরিচ্ছদে বিলাতী ঘটনার অযথা সমাবেশ অপেক্ষা, বিলাতী ভাল উপন্যাসের যথাযথ অনুবাদ আমরা ঢের ভাল বলিয়া মনে করি।

কর্ম্মভূমি—শ্রীনবচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রণীত ও বাবুপুর, নোয়াখালী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য পাঁচ সিকা।

Smiles' Self-help প্রভৃতি গ্রন্থের ধরণে বইখানি লেখা। ইহাতে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতা, চরিত্র ও মহত্ত্ব, প্রভৃতি একুশটি প্রবন্ধ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতবর্ষীয় বহু কৃতীপুরুষ সংক্রান্ত ছোট ছোট গল্প বিবৃত করা হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

রামপ্রসাদ—শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—জিতেন্দ্রলাল বসু, এম্‌ এ, বি-এল্‌
হা ডু ডু ডু—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ
ভূদেব-নির্ব্বাণ—কাব্যবিনোদ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
আর্য্যেতর ও অনার্য্যজাতির ইতিহাসের রহস্য
—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৬। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাবসান—শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত
৭। বেদের ঐতিহাসিকত্ব—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার
৮। কাব্যজিজ্ঞাসা—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
৯। গাছপালা—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়
১০ ভাগবত ধর্ম্ম—শ্রীঅবনীমোহন বটব্যাল কর্ত্তৃক অনূদিত
১১ পারের চিন্তা—শ্রীমিহিরমোহন মুখোপাধ্যায়
১২ মন্দাকিনী—শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়
১৩ কায়াহীনের কাহিনী—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
১৪ সমানাধিকারবাদ—শ্রীহৃষীকেশ সেন
১৫. রাজা রামমোহন রায়ের পঞ্চোপনিষদ
—শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬। মহাভাগবত রায় মহাশয়—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন
১৭। ভারতে সমর সঙ্কট—শ্রীযদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
১৮। ভাবী এশিয়া—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
১৯। টেরেন্স ম্যাকস্যুইনী—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
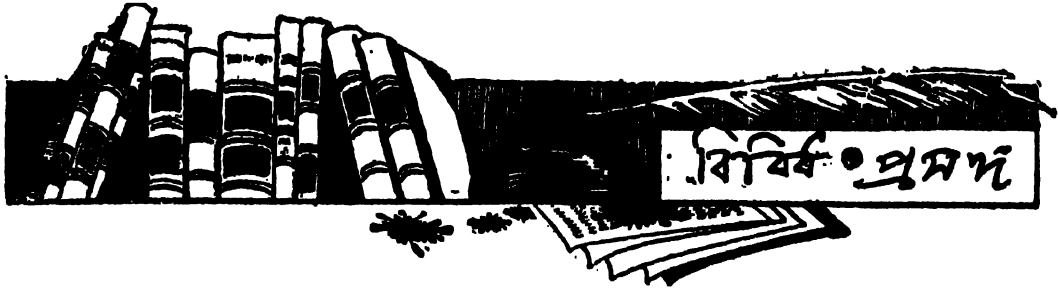
পৌষ মাস

সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের ও উন্নতির যেমন কতকগুলি সাধারণ কারণ ও উপায় আছে, তেমনই তাহাদের অমঙ্গলের সাধারণ কারণ ও উন্নতির সাধারণ বিঘ্নও কতকগুলি আছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক দেশের ও জাতির, প্রত্যেক প্রদেশের জেলার নগরের গ্রামের চিন্তনীয় সমস্যাও কতকগুলি আছে। সমগ্র মানব জাতির জ্ঞানবৃদ্ধির উপায় নিরূপণ ও বর্দ্ধিত জ্ঞানের আলোচনা যেমন আবশ্যক, মানব জাতির ছোট ছোট অংশের জ্ঞানবৃদ্ধির ও বর্দ্ধিত জ্ঞানের আলোচনাও তেমনি দরকার। সকল মানুষের কতকগুলি অভাব অভিযোগ যেমন আছে, তেমনি মানব জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের, নানা শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের, অভাব অভিযোগও তেমনি আছে।

প্রত্যেক দেশের ও জাতির কল্যাণ ও উন্নতির জন্য, অমঙ্গল নিবারণের জন্য, নানাদিকে সংস্কারের আবশ্যক। স্বাধীন দেশ সকলের যে সকল সমস্যা আছে, পরাধীন দেশ সকলের তাহার অতিরিক্ত একটি গুরুতর সমস্যা আছে। তাহা, স্বাধীনতালাভের উপায় নির্দ্ধারণ ও সেই উপায় সকল অবলম্বন দ্বারা বন্ধনমুক্ত হওয়া।

ভারতবর্ষ যদিও পরাধীন, তথাপি ইহার পক্ষে আশার কথা এই, যে, কল্যাণ ও উন্নতির এমন কোন দিক্ নাই, এমন কোন উপায় নাই, এমন কোন অন্তরায় ও বিঘ্ন নাই, যাহার প্রতি ভারতবর্ষের কোন না কোন লোক-সমষ্টির, সভাসমিতির, দৃষ্টি না পড়িয়াছে। বহুবৎসর হইতে ইহারা এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে সরকারী ছুটি থাকায় সাধারণতঃ সমগ্র-ভারতীয় সকল প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা এই সময়ে হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রতর ভূখণ্ডের এবং নানা শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত বহুবিধ প্রশ্নের ও সমস্যার আলোচনাও এই সময়ে হইয়া থাকে। এই জন্য ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহটিকে জাতীয় সপ্তাহ বলা হয়। বস্তুতঃ কিন্তু ভারতীয় নানা কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি কখন কখন এই সপ্তাহের আগে হইতে হয় এবং তাহার পরও এইরূপ সভা হইয়া থাকে। এই কারণে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহকে জাতীয় সপ্তাহ না বলিয়া বরং পৌষ মাসকে জাতীয় মাস বলা অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। বর্ত্তমান ভারতীয় বৎসর ধরুন। পৌষের প্রথম সপ্তাহে লাহোরে ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সপ্তাহ শেষ হইতে না হইতে বোলপুরে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবাদি আরম্ভ হয়। কলিকাতায় চিত্র ও অন্যবিধ শিল্পের দুটি প্রদর্শনী এই সময়ে হয়। তাহার পর লাহোরে কংগ্রেস এবং চল্লিশ বা তাহার অধিকসংখ্যক কনফারেন্সের অধিবেশন হয়, এবং মান্দ্রাজে ভারতীয় উদারনৈতিকদিগের বার্ষিক সভা হয়। নাগপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশনও এই সময়ে হয়। পৌষের তৃতীয় সপ্তাহে এলাহাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। গোয়ালিয়রে ঐতিহাসিক দলিল ও অন্যবিধ উপাদান সম্বন্ধীয় কমিশনের বার্ষিক অধিবেশনও পৌষ মাসে হইয়া গিয়াছে। ২৯শে ও ৩০শে পৌষ এবং ১লা মাঘ আহমদাবাদে গুজরাট বিদ্যাপীঠের ছাত্রদিগকে উপাধি-দানের বার্ষিক সভা উপলক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মীদিগের একটি কন্‌ফারেন্স হইবার কথা। তাহাতে আলোচ্য বিষয়গুলি প্রয়োজনীয়।

বিবিধ কল্যাণচেষ্টা ও সংস্কারচেষ্টা

পৌষ মাসে ও অন্য সময়ে যত প্রকার কল্যাণচেষ্টা ও সংস্কারচেষ্টা হইয়া থাকে, প্রত্যেকটির নাম করিয়া

স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে পারা যাইবে না। কিন্তু যাঁহারা দৈনিক কাগজগুলি পড়েন, তাঁহারা জানেন, মানুষের বহুবিধ জ্ঞান ও কর্ম্ম এবং নানাবিধ প্রয়োজনের অধিকাংশই কোন না কোন কন্‌ফারেন্সে আলোচিত হইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা, অর্থনীতি, কৃষিশিল্পবাণিজ্য, ললিতকলা, চিকিৎসা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান—কিছুই বাদ পড়ে নাই।

আমরা যেদিকেই উন্নতি করিতে চাই, যে বিষয়েই বর্ত্তমান অবস্থা শুধরাইয়া কিছু সংস্কার করিতে চাই, বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে সেই উন্নতি ও সংস্কার অন্য নানাবিধ উন্নতি ও সংস্কারের উপর নির্ভর করে। কোন্ দিকে উন্নতি ও সংস্কার আগে করা দরকার, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। একই সঙ্গে সকল দিকেই উন্নতি ও সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সব মানুষের শক্তি সমান নহে এবং সকলের প্রবৃত্তি ও রুচিও এক রকম নহে। সাধারণ মানুষের কথা দূরে থাক, অসাধারণ মানুষেরাও সকল রকম কাজে হাত দিতে পারেন না। তাঁহাদেরও দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পরিমিত, সুতরাং সময়ের অভাব তাঁহাদেরও ঘটে। তাঁহাদেরও শক্তি সর্ব্বতোমুখী নহে—যদিও কাহারও কাহারও শক্তি বহুমুখী বটে। এইজন্য সাধারণ বা অসাধারণ কোন মানুষই মানবের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আবশ্যক সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারেন না, নানা জনে নানা কাজ করেন। কখন কখন এরূপও দেখা যায়, যে, কোন কোন বিষয়ে অসাধারণ শক্তিশালী কোন কোন ব্যক্তি একদেশদর্শিতাবশতঃ অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করেন না, এমন কি কোন কোন বিদ্যার ও প্রচেষ্টার বিরোধিতাও করেন। কিন্তু তাহা হইলেও উপরে ধর্ম্ম সমাজ প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহার কোনটিই অনাবশ্যক নহে। যাঁহার যে দিকে মনের ঝোঁক তিনি তাহাতে আত্মনিয়োগ করিবেন, তাহা স্বাভাবিক। আমরা যাহা ভালবাসি ও যাহাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছি তাহাকে অন্য সব কিছু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় মনে করাও স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহারা অন্য কিছুতে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বা তাঁহাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে ভুল করা হইবে। মানুষের হিতকারী সকল লোকের মধ্যে যথাসম্ভব সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

বড়লাটের ট্রেন ধ্বংস করিবার চেষ্টা

৯ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর) লাহোর পৌঁছিয়া তথাকার এংলোইণ্ডিয়ান দৈনিক সিবিল ও মিলিটারী গেজেটে দেখিলাম তাহার আগের দিন, বড়লাট যে ট্রেনে দিল্লী যাইতেছিলেন, দিল্লী পৌঁছিবার দশ মাইল আগে তাহা বোমা দ্বারা ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু একজন ভৃত্য কিছু আহত হওয়া এবং রেল লাইনের ও একটা গাড়ীর অল্পসল্প ক্ষতি ছাড়া বেশী কিছু অনিষ্ট হয় নাই। এই কাজ যে-ই করিয়া থাকুক, ইহা আমরা গর্হিত মনে করি। কে করিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই, কখনও জানা যাইবে কি না বলিতে পারি না। যদি এক বা ততোধিক লোক ধৃত হইয়া দণ্ডিত হয়, তাহা হইলেও তাহারাই দোষী কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে।

বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ ইহা করিয়াছে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও, নিশ্চয় তাহাদেরই কেহ ইহা করিয়াছে জোর করিয়া বলা যায় না। বড়লাট যখন রেলে কোথাও যান, তখন ও তাহার পূর্ব্ব হইতে লাইনের দুদিকে কয়েক হাত অন্তর অন্তর চৌকীদার দাড়াইয়া থাকে। রাত্রে তাহারা মশাল জ্বালিয়া দাড়াইয়া থাকে। তাঁহাকে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অন্য উপায়ও অবলম্বিত হইয়া থাকে। তাহা সত্ত্বেও পুলিশের অজ্ঞাতসারে লাইনের মধ্যে কিরূপে বোমা রক্ষিত হইল, এবং তাহা ফাটাইবার জন্য তাহার সহিত দুই তিনশত গজ লম্বা বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত করিয়া তাহার অপর প্রান্ত ব্যাটারীর সহিত সংলগ্ন কিরূপে করা হইল, এবং পুলিশের অলক্ষিতে বোমাওয়ালারা ঐপ্রান্তে বসিয়া কি প্রকারে বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা বোমা ফাটাইল, তাহা বাস্তবিক রহস্যময়। পুলিশের লোকে গ্রামে নগরে ভাঙ্গা বাড়ীতে আঁধার ঘরের কোণে বাক্সের ও

ব্যাগের মধ্যে লুকান বোমা রিভলভার চিঠিপত্র আবিষ্কার করিতে পারে, আর খোলা জায়গা বিস্তর চৌকীদারের বিদ্যমানতা এবং নানাবিধ সতর্কতার মধ্যেও এতবড় একটা কাণ্ড তাহাদের অজ্ঞাতসারে কিরূপে ঘটিয়া গেল, তাহা বুঝা বড়ই কঠিন। এই দুষ্কর্ম্ম করিয়া ব্যাটারী প্রভৃতি লইয়া মোটরে চড়িয়া বোমাওয়ালারা চলিয়া গেল, পুলিশ ইহা অনুমান করিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও ধরিতে পারে নাই! ইহা তাহাদের হুঁসিয়ারীর পরিচায়ক।

এই ঘটনার জন্য অবশ্য ভারতবর্ষের পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রকেই সন্দেহ করা অন্যায় হইবে। কিন্তু স্থানীয় গুপ্ত পুলিশ বা তাহাদের চর ও গোয়েন্দারা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সহজেই সন্দেহ হয়। যখনই রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে খালাস দিবার কিংবা দেশের লোকদিগকে গবর্ন্মেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তদ্রূপ কিছু করিবার কথা উঠে, তখনই বোমা ফাটে, বোমা পিস্তল আবিষ্কৃত হয়, বিপ্লব-উত্তেজক "লাল" পুস্তিকা পত্রী প্রচারিত হয়, বা তদ্রূপ কিছু ঘটে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। নেতাদের সহিত বড়লাটের যে-সব বিষয়ে আলোচনা ২৩শে ডিসেম্বর হইবার কথা ছিল, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে খালাস দেওয়া তাহার মধ্যে অন্যতম। সুতরাং দেশে অশান্ত ভাব থাকায় যাহাদের লাভ, তাহাদের ইহা প্রমাণ করা দরকার ছিল, যে, দেশে এখনও দুর্দ্দান্ত বিপ্লবী অনেক আছে, অতএব রাজনৈতিক বন্দী খালাস করিয়া তাহাদের দল পুষ্ট করা অকর্ত্তব্য। সিবিল ও মিলিটারী গেজেটের যে সংখ্যায় বড়লাটের ট্রেন ধ্বংস করিবার চেষ্টার খবর ছিল, তাহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতেও বুঝা যায়, যে, এই চেষ্টা হইতে বন্দীমোচনের অনৌচিত্য প্রমাণ করিবার লোক ভারতবর্ষে আছে। কারণ, ঐ প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিল, যে, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে খালাস দিতে যাহারা বলে, এই দুষ্কর্ম্ম তাহাদের কথার সমুচিত উত্তর। *

এসোসিয়েটেড্ প্রেসের সংবাদে লেখা আছে, "The attempt was deliberate and carefully planned and carried out with great skill and secrecy. If the bomb had properly exploded, it would have been fraught with graver consequences"। 'যদি বোমাটা ঠিক্ মত ফাটিত, তাহা হইলে ফল গুরুতর হইত।' বোমাটা যে ঠিক্ মত ফাটে নাই, তাহা ভালই হইয়াছে, কিন্তু এই দুশ্চেষ্টার আয়োজন খুব সাবধানতার সহিত ও যত্নপূর্ব্বক করা হইয়া থাকিলেও বোমাটা যে ঠিক মত ফাটে নাই, তাহাও কি ঐ সাবধানতা ও যত্নেরই ফল হইতে পারে না? অর্থাৎ যাহারা এই কাজ করিয়াছিল, তাহাদের এই রূপ উদ্দেশ্য থাকা কি অসম্ভব, যে, কাহারও প্রাণনাশ বা অন্য গুরুতর ক্ষতি না হইয়া একটা খুব গোলমাল হৈচৈ বাধুক, যাহাতে রাজনৈতিক বন্দী খালাস বা ভারতবর্ষে শান্তভাব উৎপাদন না হয়?

যাহা হউক, আমরা ধরিয়া লইলাম, যে, কাজটা গুপ্ত পুলিশের বা তাহাদের চরদের দ্বারা, বা তাহাদের প্ররোচনায় হয় নাই, বিপ্লবীদের দ্বারাই হইয়াছে। সেই অনুমান করিয়া আমরা এই গর্হিত কার্য্যের পুনর্ব্বার নিন্দা করিতেছি। কিন্তু গুপ্ত পুলিশের বা তাহাদের চরদের দ্বারা, বা তাহাদের প্ররোচনায় ইহা ঘটিয়া থাকিলে তাহাও অবশ্য গর্হিত কাজ। তবে সে ক্ষেত্রে এরূপ কাজের জন্য তিরস্কার গবর্ন্মেণ্টের দ্বারাই আগে হওয়া উচিত, এবং গবর্ন্মেণ্ট তাহার জন্য দণ্ডবিধান করিতেও বাধ্য।

—

স্বাধীনতালাভ ও হিংসা

এই প্রসঙ্গে, পরাধীন দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য হিংসার পথ অবলম্বন করা উচিত কি না, তাহার সম্যক আলোচনা করা অনাবশ্যক। ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক পরাধীন দেশ যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, এবং স্বাধীনতার এই সব যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই রক্তারক্তি হইয়াছে ও অনেকের প্রাণ গিয়াছে। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই কর্ত্তব্য, বৈধ ও ন্যায্য নহে;—অন্ততঃ সকল দেশে ও সকল সময়ে কর্ত্তব্য, বৈধ ও ন্যায্য নহে। সে বিষয়ে আলোচন

* "This outrage might well be regarded as an adequate answer to those who would urge the grant of an amnesty for the political prisoners on the eve of the publication of the Simon Commission Report." *The Civil and Military Gazette.*

না করিয়া ইহা বলাই এখন যথেষ্ট, যে, ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ করিবার আয়োজনের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন যুদ্ধায়োজন ত ভারতীয় বিপ্লবীদের নাই-ই, কোন আয়োজনই নাই; সুতরাং যুদ্ধ করা ন্যায্য ও বৈধ কিনা, তাহার আলোচনা করা অনাবশ্যক।

যে সব পরাধীন দেশ যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, তাহাদের সহিত ভারতবর্ষের একটি প্রভেদ আছে, তাহা লেখাপড়া-জানা লোকদিগকে মনে রাখিতে বলিতেছি। যে-সব দেশ যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, সেখানকার সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই যুদ্ধের জ্ঞান-বিশিষ্ট অল্প বা অধিক লোক ছিল; নিরক্ষর লোকদের মধ্যে ছিল, লিখনপঠনক্ষম লোকদের মধ্যেও ছিল। সুতরাং যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীন হইতে যাওয়ায় তাহাদের এ আশঙ্কা ছিল না, যে, স্বাধীন হইবার পর দেশটা শিক্ষায় ও সভ্যতায় অনুন্নত লোকদের পদানত হইবে। এখন ভারতবর্ষের কথা ভাবিয়া দেখুন। ভারতবর্ষে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়া সেনাদলে প্রবেশের বা সেনাদলে প্রবেশের পর যুদ্ধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের নিয়মাবলী ও রীতিপদ্ধতি এরূপ, যে, দেশের লিখনপঠনক্ষম শ্রেণীর অতি সামান্য অংশ সিপাহী হয় এবং সেনানায়কও তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই হয়। সুতরাং লিখনপঠনক্ষম ও সভ্যতায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রেণীর লোকদের যুদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান ও যুদ্ধ করিবার অভ্যাস নাই। অতএব, যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইতে হইলে যাহাদের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে, তাহাদিগকে প্রভুত্বশক্তিও দিতে হইবে—অন্ততঃ তাহাদিগকে প্রভু বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু তাহারা কি বাস্তবিক রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত? কংগ্রেস, উদারনৈতিক সংঘ, মুস্লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, অব্রাহ্মণ দল—যে কোনও দলের নেতাদের নাম লউন তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধের জ্ঞান কার্য্যতঃ কাহারও নাই, অথচ তাঁহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালন করিবার যে শক্তি আছে এবং তাঁহারা সাধারণ শিক্ষায় যেরূপ উন্নত, সেরূপ শক্তি ও উন্নত শিক্ষা বিশিষ্ট লোক সিপাহী ও সিপাহীনায়ক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিরল—নাই বলিলেও চলে।

এই জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীনতা লাভের মানে উন্নত শ্রেণীর লোকদের নেতৃত্বের পরিবর্ত্তে অনুন্নত লোকদের প্রভুত্ব স্বীকার। ইহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফল আমানুল্লার রাজত্বের সহিত বাচ্চা-ই-সাকোর রাজত্বের তুলনা হইতে অনুমিত হইতে পারে।

যুদ্ধ না করিয়া অহিংসার পথে থাকিয়া ভারতবর্ষকে স্বরাজ অর্জ্জন করিতে হইলে শান্ত ধীর ত্যাগী সহিষ্ণু শিক্ষিত ও সাহসী লোকদের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এবং সকলশ্রেণীর অনেক লোককে তাঁহাদের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের সাহস, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে। ইহাতে দেশের বিশেষ হিত ও উন্নতি হইবে।

এবিষয়ে বেশী লেখার প্রয়োজন নাই; কারণ যুদ্ধ নামের উপযুক্ত কোন লড়াই দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান অবস্থায় কেহ করিতে পারেন না। তথাপি, যদি উহার সম্ভাবনা থাকেও, তাহা হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার ফলাফলের বিষয় বিবেচ্য বলিয়া কিছু লিখিলাম।

বর্ত্তমান বড়লাট ভাল লোক কিনা, ভারতহিতৈষী কিনা, তাহার বিচার অনাবশ্যক। তিনি যদি ভাল লোক না হন, ভারতহিতৈষী না হন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রাণবধ করিতে হইবে, ইহা কোন্ যুক্তিতে বলে? বড়লাটকে মারিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাইবে না। যে প্রকার শাসন ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাহার জায়গায় অন্যবিধ শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে দেশ স্বাধীন হইবে। সে শাসন কিরূপ, তাহা সুবিদিত। কিন্তু বড়লাটকে মারিয়া তাহা পাওয়া যাইবে না।

পৌরুষ দ্বারা, বীরত্বের দ্বারা ভারত মুক্তি লাভ করিবে স্বীকার করি। কিন্তু নিজেরা গোপনে থাকিয়া দূর হইতে বোমা ফাটাইয়া দোষী নির্দোষ নির্ব্বিশেষে কতকগুলি লোককে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা পৌরুষ নহে, বীরত্ব নহে। যুদ্ধের সময় কখন কখন এই প্রকারে নরহত্যা করা হয় বটে; কিন্তু তাহাও ধর্ম্মসঙ্গত নহে, এবং পৌরুষ বা বীরত্ব নহে।

লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন

আগেই বলিয়াছি, এবার পৌষের দ্বিতীয় তৃতীয় সপ্তাহে চল্লিশটির উপর সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কংগ্রেস সকলের চেয়ে বড়। তাহা স্বাভাবিক। দেশের লোকদের অন্যান্য নানা বিষয়ে যত মতভেদ আছে, রাষ্ট্রনীতিতে তত মতভেদ নাই, এবং অন্য অনেক বিষয়ে যত ঔদাসীন্য আছে, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে ততটা উদাসীনতা নাই। রাষ্ট্রনীতিতেও মতভেদ একেবারে নাই, এমন নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের, আত্ম-শাসন ক্ষমতা লাভের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যত লোক একমত, অন্য কোন বিষয়ে তত লোক একমত নহে। কি প্রকারে এবং কতটুকু অধিকার লাভ করিতে হইবে, সে বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লাভেচ্ছু ভারতীয়েরা প্রধানতঃ কংগ্রেস এবং উদারনৈতিক সংঘ এই দুই মহাসমিতির অধীন হইয়াছেন। কংগ্রেস-ওয়ালাদের দলই সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। এই জন্য, কংগ্রেস সমগ্র ভারতীয় মহাজাতির প্রতিনিধিস্থানীয় না হইলেও, ইহা যে পরিমাণে তাহার প্রতিনিধিস্থানীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠান সে পরিমাণে নহে।

লাহোরে কংগ্রেস ও অন্যান্য সভা এবং প্রদর্শনীর জন্য গবর্মেণ্ট শহর হইতে দূরে এবং বিলম্বে রাবী নদীর পর পারে জায়গা দিয়াছিলেন। ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তাদের অনেক অসুবিধা হইয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহারা সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া সমুদয় বন্দোবস্ত যথাসময়ে শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় অসুবিধা হইয়াছিল। কারণ বসিবার জন্য মাটিতে পাতা সতরঞ্চ বা চাদরের ব্যবস্থা ছিল, ভিজা মাটিতে বা কাদার উপর তাহা বিছান চলে না। অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্ব্বেই বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ায় ভিজা জমীর উপর পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া বসিবার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জুতা খুলিয়া বসাই দেশী রীতি। কিন্তু এরূপ বৃহৎ সভায় তাহা করা যায় না। এই জন্য, যখন বৃষ্টি বাদলের সম্ভাবনা থাকে, তখন চেয়ার বেঞ্চি বা পায়াযুক্ত অন্য কোন প্রকার কাঠের আসন সুবিধাজনক। অবশ্য বসিবার দেশী রীতিতে খরচ কম হয় এবং অল্প জায়গায় বেশী লোক বসিতে পারে।

স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ নিখুঁত না হইলেও, মোটের উপর তাহাদের শ্রমসামর্থ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, বুদ্ধিমত্তা, শিষ্টাচার ও স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করিতে হয়। সচরাচর কোথাও এত জনতা হয় না এবং নানাপ্রকার গাড়ীর চলাচলও এত হয় না। তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সহজ নয়। স্বেচ্ছাসেবকেরা যেভাবে কাজ করিয়াছিল, লাহোরের পুলিশ তাহা পারিত না।

আমি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইয়া যাই নাই, সুতরাং কংগ্রেসের শিবিরে বাস করি নাই। কিন্তু কয়েকজন বাঙালী প্রতিনিধির মুখে তাঁহাদের স্নানাহার নিদ্রাদির বন্দোবস্তের প্রশংসা শুনিয়াছি। এ সময় লাহোরে শীত কিরূপ, বঙ্গের বাঙালী তাহা অনুমান করিতে পারিবেন না। এরূপ দুরন্ত শীতে তাঁবুতে মানুষকে শীত হইতে বাঁচাইবার জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা আগুন গরম জল প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের অভ্যাস ও রুচিমত খাদ্যের আয়োজনও ছিল। অভ্যর্থনা-সমিতি প্রতিনিধিদিগকে সুস্থ অবস্থায় আরামে রাখিবার জন্য অর্থব্যয় খুব করিয়াছিলেন। তথাপি সভাপতি একদিন কংগ্রেসে বলেন, ১৭০০ লোক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।

কংগ্রেস-মণ্ডপটি খুব বড় করা হইয়াছিল—গত কলিকাতা কংগ্রেসের চেয়ে বড় কিনা বলিতে পারিলাম না। কাহারও কণ্ঠের শক্তি এমন নাই যে এত বড় জনতাকে নিজের কথা শুনাইতে পারেন। সেই জন্য লাউড-স্পীকার বা "উচ্চ-ভাষী" যন্ত্র বসান হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার ন্যায় লাহোরেও ইহা মধ্যে মধ্যে বিগড়াইয়া যাইতেছিল। সুতরাং এরূপ বন্দোবস্তও সন্তোষজনক নহে। কংগ্রেসের প্রতিনিধির সংখ্যা এক হাজারের অনধিক এবং বিষয়নির্ব্বাচন কমিটির সভ্যের সংখ্যা একশতের অনধিক করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা কার্য্যসৌকর্য্যের দিক্ দিয়া ভালই, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে মতভেদ হইলে, এরূপ বৃহৎ সভায় কোন্ পক্ষে কতজন ভোট দিলেন, গণনা করা সহজ নয়।
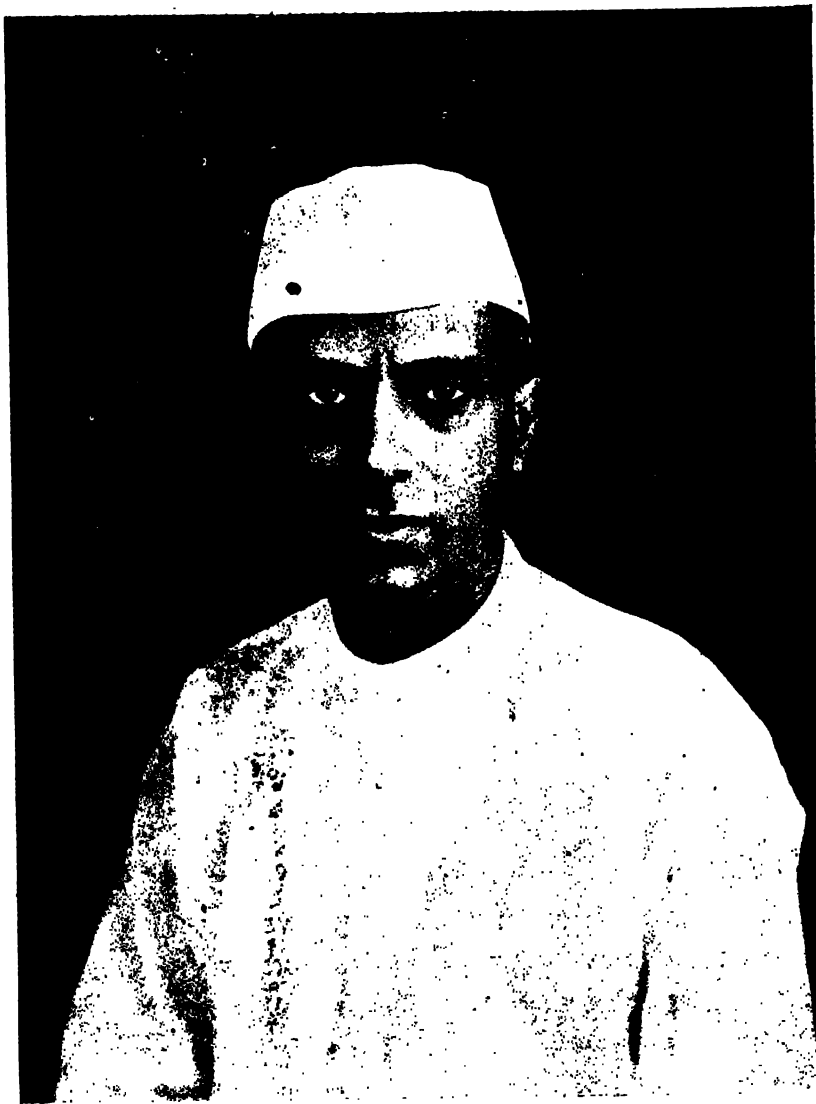
জবাহরলাল নেহরু

কংগ্রেস-সভাপতির বক্তৃতা

কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বক্তৃতা করিয়াছিলেন হিন্দুস্থানী ভাষায়; তাহারই ইংরেজী খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। ইংরেজী বক্তৃতাটি হিন্দুস্থানী বক্তৃতার অনুবাদ নহে। ইংরেজীটিই লিখিত হইয়াছিল। যাহা ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি দেশভাষায় বলেন। এলাহাবাদ হইতে জবাহরলাল যে ট্রেনে লাহোর যান, আমি সেই ট্রেনে যাইতেছিলাম। তাঁহার সৌজন্যে ট্রেনে তাঁহার বক্তৃতার ইংরেজী টাইপলিপি পড়িতে পাইয়াছিলাম। পরে লাহোরে অন্য এক খণ্ড টাইপলিপিও পাইয়াছিলাম। কিন্তু ইংরেজীতে যাহা আছে, দেশভাষায় তিনি ঠিক্ তাহাই বলিয়াছিলেন কিনা, জানি না; কারণ যথাসময়ে

টিকিট না পাওয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রথম দিন আমি মণ্ডপে যাইতে পারি নাই।

সভাপতির ইংরেজী অভিভাষণটি নাতিদীর্ঘ ও সুলিখিত। ইহাতে বাহ্যাড়ম্বর নাই, আস্ফালন নাই, ভয়প্রদর্শন নাই। হৃদয়ের কথা সোজা ভাষায় সরল ভাবে বলা হইয়াছে। তাহাতে সাহসের অভাব নাই। জবাহরলাল বলিয়াছেন, তিনি সোশিয়ালিষ্ট বা সামাজিক সাম্যবাদী ও সাধারণতন্ত্রবাদী। কিন্তু তিনি যদিও নিজের মত বিন্দুমাত্রও গোপন করিয়া বা খাট করিয়া বলেন নাই, তথাপি তিনি স্বপ্নবিলাসী নহেন। অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের মত তিনি বুঝেন, যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার আদর্শ কি পরিমাণে বাস্তবে পরিণত হইতে পারে।

তাঁহার অভিভাষণের গোড়ায় তিনি যথোচিত বিনয় ও গাম্ভীর্য্য সহকারে পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেস-সভাপতি ও কর্ম্মীদের প্রশংসা করেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। যে-সকল অল্পবয়স্ক দেশসেবক প্রাণ দিয়াছেন বা অন্য প্রকার দুঃখ সহ্য করিয়াছেন, তাঁহাদেরও যথোচিত প্রশংসা করেন।

এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন, "বিশ্বাসের যুগ চলিয়া গিয়াছে," কিন্তু নিজেই আবার ঘোষণা করিতেছেন—

"We appear to be in a dissolving period of history when the world is in labour and out of her travail will give birth to a new order."

মানবসমাজে যে নূতন বিধান, ব্যবস্থা বা শৃঙ্খলা দেখা দিবে তিনি বলিতেছেন, ইহা কি বিশ্বাস নহে? বিশ্বাসের রূপ বদলাইতেছে, কিন্তু বিশ্বাস জিনিষটি লোপ পায় নাই, লোপ পাইতে পারে না।

ইউরোপ ও এসিয়ার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে সভাপতি কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য কথা বলিয়াছেন, যাহা লোকে অনেক সময় বিস্মৃত হইয়া থাকে। তাঁহার মতে এখন কর্ম্মিষ্ঠতার কেন্দ্র ইউরোপ নহে, আমেরিকা। এবং লোকে এখন নূতন কিছুর জন্য আমেরিকার দিকে তাকাইয়া থাকে। রুশিয়ার দিকেও কতকটা, বলিলে আরও ঠিক্ হইত।

"অলীক ও অসম্পূর্ণ ইতিহাসের প্রভাবে আমরা অনেকে মনে করিয়া থাকি, যে, ইউরোপ চিরকালই পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে, এবং এসিয়া চিরকালই অগণিত পাশ্চাত্য বাহিনী কর্ত্তৃক বারবার উপদ্রুত হইয়া প্রত্যেক আক্রমণের পর আবার ধ্যানমগ্ন হইয়াছে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যে, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এসিয়ার অসংখ্য সেনাদল ইউরোপের নানা অংশ আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছে, এবং আধুনিক ইউরোপীয়দের অনেকে এসিয়ার এই সব আক্রমণকারীদের বংশধর। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যে, ভারতবর্ষই দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের শক্তি ভাঙ্গিয়া দেয়। মনন-শক্তি এসিয়ার—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের—গৌরব বটে, কিন্তু কর্ম্মের ক্ষেত্রেও এসিয়ার কৃতিত্ব সমান বিশাল। কিন্তু আমরা এখন কেহই চাহি না, যে, ইউরোপ বা এসিয়ার বাহিনীসকল আবার মহাদেশসমূহের বক্ষে বিচরণ করে। এরূপ উপদ্রব যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ তাহার সামাজিক সৌধ অসাম্যের ভিত্তির উপর নির্ম্মাণ করায় স্বাধীনতা হারাইয়াছে। "অতএব ভারতের জীবনমরণের সমস্যা সামাজিক ও আর্থিক সাম্য স্থাপন।"

অতঃপর বক্তা সংখ্যান্যূন জনসমষ্টি সকলের সমস্যা, এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ভয়ের ভাবের উল্লেখ করেন। হিন্দুরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বলিয়া তিনি তাহাদিগকে মহানুভব ও ত্যাগশীল হইতে অনুরোধ করেন। সমগ্রভারতীয় বিষয়ে এই অনুরোধ হিন্দুরা রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু যে যে প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ, তথাকার প্রাদেশিক বিষয় সকলে তাঁহাদেরও মহানুভব ও ত্যাগশীল হওয়া কি উচিত নয়? এবিষয়ে জবাহরলাল কিছু বলেন নাই। হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর অবিশ্বাস ও ভয়ের কারণ সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বাক্। বাংলা দেশ সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি বুঝি, তাহাতে মনে হয়, হিন্দুমুসলমানের পুঁথিগত নৈতিক আদর্শ ও মাপকাঠি যাহাই হউক, কার্য্যগত আদর্শ ও

মাপকাঠি এক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, স্ত্রীজাতির প্রতি মুসলমানদের আচরণের কার্য্যগত আদর্শ ও হিন্দুদের কার্য্যগত আদর্শ এক নয়। হিন্দুরা সবাই সাধু, বলিতেছি না। এ বিষয়ে আচরণের সাম্য স্থাপিত না হইলে, অন্ততঃ বঙ্গে হিন্দুমুসলমানের প্রকৃত মিলন ও সহযোগিতা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু যে বলিয়াছেন, যে, স্বাধীন ভারতে হিন্দুরা শক্তিহীন হইতে পারে না, তাহা সত্য।

তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সমষ্টিগত সংঘর্ষ ও সংগ্রাম ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়ে হইবে না, আর্থিক শ্রেণীতে শ্রেণীতে হইবে; অর্থাৎ জমীদারে রায়তে, ধনিকে শ্রমিকে, ইত্যাদি। তাহা সম্ভব বটে। তাঁহার মতে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস ও ইণ্ডিপেণ্ডেন্স (পূর্ণ-স্বাধীনতা) কথা দুটির পার্থক্যকে গুরুতর মনে করা উচিত নয়; নাম যাহাই হউক, আসল কাজ হইতেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জিনিয়া লওয়া, এবং তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে।

পার্লেমেণ্টের মেম্বর মিঃ ফেনার ব্রকওয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে ভারতসচিব মিঃ বেন পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন, যে, ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ গত দশ বৎসর ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ ভোগ করিতেছে। জবাহরলাল এই বক্তৃতার তীব্র ও তীক্ষ্ণ ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আমরা প্রকৃত ক্ষমতা চাই; লণ্ডনে হাই কমিশনারের পদ, ভারতে গভর্ণরের পদ, লীগ অব নেশুন্সে প্রতিনিধিত্ব, এ সমস্তই চাকরী; এসব সত্ত্বেও ভারতবর্ষ দোহন খুব বেশী পরিমাণে চলিতেছে এবং ভারতবর্ষের গরীবদের উপর বোঝা বাড়িয়াই চলিতেছে। "আমরা ভারতবর্ষের দরিদ্র অধিবাসীদের শ্রমে ও ধনে বিদেশীদের ধনী হওয়া বন্ধ করিতে চাই, এবং চাকরীর পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে প্রকৃত ক্ষমতা চাই।"

"ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" বা পূর্ণ-স্বাধীনতা কথাটি সম্বন্ধে তাঁহার কোন মোহ নাই, কিন্তু তিনি পূর্ণ-স্বরাজ চান এই জন্য, যে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর কোন জাতিসঙ্ঘে সমান-সভ্যরূপে প্রবেশ করিয়া নিজের স্বাধীনতার কিয়দংশ উহার অপর সভ্যদের মত মানব জাতির হিতার্থ ছাড়িয়া দিতে পারিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এরূপ একটি জাতিসঙ্ঘ নহে, এবং ইহাতে থাকিয়া ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ কখনও সমান-সভ্যত্বব্যঞ্জক ততদিন হইতে পারে না, যতদিন ইহা সাম্রাজ্যবাদ এবং দরিদ্রশোষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

"আমি আশা করি আমরা ঘোষণা করিব, যে, ভারতবর্ষ আর বিদেশীর প্রভুত্বের বশ্যতা স্বীকার করে না।"

স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য কংগ্রেস শান্তির পথে চলিবে কিনা, তাহার আলোচনা করিয়া তিনি বলেন :—

"The majority of us, I take it, judge the issue not on moral but on practical grounds, and if we reject the way of violence, it is because it promises no substantial results. But if this Congress or the nation at any future time comes to the conclusion that methods of violence will rid us of slavery then I have no doubt that it will adopt them. Violence is bad but slavery is far worse."

"আমার ধারণা, আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক হিংসা বনাম অহিংসা তর্কের বিচার কার্য্যতঃ ফলদায়কতার দিক্ দিয়া করেন, ধর্ম্মনীতির দিক্ দিয়া নহে, এবং আমরা হিংসা ও বল প্রয়োগের পন্থা অবলম্বনীয় মনে করি না এই কারণে, যে, উহা হইতে বিশেষ কোন সুফল লব্ধ হইবার আশা নাই। কিন্তু যদি এই কংগ্রেস কিংবা ভারতীয় জাতি ভবিষ্যতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা দাসত্ব পরিহার করিতে পারা যাইবে, তাহা হইলে আমার কোন সন্দেহ নাই, যে, ঐ উপায় অবলম্বিত হইবে। বলপ্রয়োগ ও হিংসা খারাপ, কিন্তু দাসত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী খারাপ।"

জবাহরলাল বলিয়াছেন, বলপ্রয়োগ ও হিংসা ফলপ্রসূ হইবে না বলিয়া বেশীর ভাগ ভারতীয় লোক উহার পক্ষপাতী নহে। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি এরূপ কতকগুলি লোকেরও অস্তিত্ব অবগত আছেন, যাঁহারা বলপ্রয়োগ ও হিংসা ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ বলিয়া অনবলম্বনীয় মনে করেন।

বোমা, পিস্তল প্রভৃতি দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করার বিরুদ্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,—

"Contemporaneous attempts at sporadic violence can only distract attention and weaken it."

স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে, দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোককে, ন্যূনকল্পে বিস্তর লোককে, একটি কোন প্রচেষ্টায় যোগ দিতে হইবে। বহুজনের অবলম্বনীয় এই প্রচেষ্টা শান্তিপূর্ণ হইবে কিনা, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন, ইহা শান্তিপূর্ণ ই হইবে :—

"We have to choose and strictly to abide by our choice. What the choice of the Congress is likely to be, I have no doubt. It can only choose a peaceful mass movement."

স্কুল কলেজ, আদালত, ও কৌন্সিল বর্জ্জন সম্বন্ধে তিনি বর্ত্তমানে কেবল কৌন্সিল বর্জ্জনই সমীচীন মনে করেন। অভিভাষণের শেষে তিনি বলেন :—

"We play for high stakes; and if we seek to achieve great things, it can only be through great dangers. Whether we succeed soon or late, none but ourselves can stop us from high endeavours and from writing a noble page in our country's long and splendid history.

"We have conspiracy cases going on in various parts of the country. They are ever with us. But the time has gone for secret conspiracy. We have now an open conspiracy to free this country from foreign rule and you, comrades, and all our countrymen and countrywomen are invited to join it. But the rewards that are in store for you are suffering and prison and it may be death. But you shall also have the satisfaction that you have done your little bit for India, the ancient but ever young, and helped a little in the liberation of humanity from its present bondage."

তাৎপর্য্য। "আমরা খুব বড় বাজি জিতিবার জন্য খেলিতেছি। আমরা যদি মহৎকাজ করিতে চাই, তাহা কেবল খুব বেশী বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে করিতে পারা যাইবে। আমরা সফলপ্রযত্ন শীঘ্র হই বা বিলম্বে হই, আমরা নিজেরা ব্যতীত আর কেহ আমাদিগকে মহৎ উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না; আমরা নিজেরা ব্যতীত আর কেহ আমাদিগকে আমাদের দেশের দীর্ঘ ও গৌরবপূর্ণ ইতিহাসের একটি মহৎ পৃষ্ঠা রচনা করা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না।

"দেশের নানা অঞ্চলে ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা চলিতেছে। সেগুলা লাগিয়াই আছে। কিন্তু গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দিন অতীত হইয়াছে। বিদেশীর শাসন হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য আমাদের মধ্যে এখন একটি প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। সহচরগণ, আপনারা এবং দেশের সব নরনারী ইহাতে যোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। কিন্তু আপনাদের জন্য যে-পুরস্কার মজুত আছে তাহা দুঃখভোগ, কারাগার, এবং সম্ভবতঃ মৃত্যু। কিন্তু আপনারা এই তৃপ্তিও লাভ করিবেন, যে, আপনারা ভারতের জন্য, যে ভারত প্রাচীন অথচ চিরনবীন তাহার জন্য, আপনাদের কর্ত্তব্যের সামান্য কিছু করিয়াছেন, এবং মানব জাতিকে তাহার বর্ত্তমান দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য সামান্য কিছু সাহায্য করিয়াছেন।"

—

"আগে দেশ, পরে ধর্ম্ম"

লাহোরের কংগ্রেস-মণ্ডপ যে-সব ইংরেজী বচন দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল তাহার একটির বাংলা, "আগে দেশ, পরে ধর্ম।" ভারতবর্ষের কোন কোন বৃদ্ধ নেতারও বুলি যখন এইরূপ, অনেক যুবক নেতার বিশ্বাস যখন এই প্রকার, লাহোর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তার শৈফুদ্দিন কিচলু তাঁহার বক্তৃতায় যখন এই রকম কথাই বলিয়াছেন, তখন এই প্রকার একটি উক্তি যে মণ্ডপের অলঙ্কারের মধ্যে স্থান পাইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমাদের ধারণা এই, যে, যাঁহারা এই প্রকার কথা বলেন, ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ও সার অংশ কি, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। শ্রেষ্ঠ অংশ এই বিশ্বাস, যে, এই বিশ্ব খামখেয়ালী ভাবে চলে না, এখানে যেমন কর্ম্ম সেইরূপ ফল ফলে; ইহা এরূপ নিয়মে চলিতেছে, যে, ইহার গতি সত্য, ন্যায় ও প্রীতির জয়ের দিকে, এবং এই জয় হইতেছে ও হইবেই। নিয়ন্তার নাম ও স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মত ব্যক্ত হইয়াছে ও হইতে পারে। নিয়ন্তা কেহ আছেন কিনা, সেবিষয়েও অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে ও হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মে বা ধর্ম্মনিয়ন্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস সাক্ষাৎ ভাবে স্বীকার করেন না, অথচ রাজনৈতিক সামাজিক বা অন্যবিধ কোন হিতকর প্রচেষ্টার সহিত যাঁহাদের প্রাণের যোগ আছে, তাঁহাদের কাজ যে নিগূঢ় বিশ্বাসের পরিচায়ক, তাহার মূলে ধর্ম্মবিশ্বাস রহিয়াছে। তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না, এ বিষয়ে চিন্তা করেন না, বলিয়া বুঝিতে পারেন না।

লাহোরেই চল্লিশটির উপর সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কতকটা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে।

কিন্তু প্রত্যেকটির জন্য যাঁহারা অন্তরের সহিত খাটিয়াছেন, তাঁহারা এই বিশ্বাসে খাটিয়াছেন, যে, অবস্থা এখন যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা ভাল হইতে পারে; আন্তরিক চেষ্টা ফলবতী হয়; সুতরাং তাঁহারা যাহার আশায় চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কখন না কখন ঘটিবে। এরূপ বিশ্বাসের অস্তিত্ব হয়ত তাঁহারা অনুভব করেন না, কিন্তু মনটাকে একটু পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"দেশ আগে, ধর্ম্ম তার পরে," এই নীতির কুফল সামান্য চিন্তা দ্বারাই ধরা পড়ে। ভারতীয় বৃদ্ধ ও যুবা সকল রাজনৈতিক কর্ম্মী ও অকর্ম্মীই বলেন ও বিশ্বাস করেন, যে, ইংরেজ জাতি ইংলণ্ডকে ধনশালী ও শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষকে পদানত রাখিয়াছে ও শোষণ করিতেছে, এবং এই বিশ্বাসে তাঁহারা ইংরেজদের নিন্দা করেন। কিন্তু কেন নিন্দা করেন? ইংরেজরা ত এই নিন্দার উত্তরে বলিতে পারে, "দেশ আগে, ধর্ম্ম তার পরে। সুতরাং আমরা আমাদের দেশের ধন-দৌলৎ শক্তিসম্পদ কিসে বাড়ে, তাহারই চেষ্টা সর্ব্বপ্রকারে আমরা করিতেছি; এই চেষ্টা ধর্ম্মসঙ্গত কিনা তাহা ভাবিবার আমাদের প্রয়োজন নাই; আমরা তোমাদের কংগ্রেসভূষণ বচনটিরই অনুসরণ করিতেছি।" তখন আমাদের রাজনীতিজ্ঞেরা অবশ্যই বলিবেন, "তোমরা অন্যায় কাজ করিতেছ, অন্যের অনিষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা উচিত নয়; সব জাতির অধিকার সমান এবং সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া উচিত," ইত্যাদি। তাহা হইলে তখন কথা উঠিবে, এই যে ন্যায়বুদ্ধি, এই যে ঔচিত্যঅনুচিত্যবুদ্ধি, এই যে সকল দেশের ও জাতির মধ্যে মৈত্রীর সম্বন্ধ বোধ, ইহা "দেশ আগে, ধর্ম্ম পরে" নীতি হইতে উৎপন্ন নহে, উৎপন্ন হইতে পারে না। দেশের উপর আরও কিছু আছে, যাহা আমাদিগকে বলিয়া দেয় কোন্ পথে কি নিয়মে দেশের হিত চাহিতে ও সাধিতে হইবে। ধর্ম্মই এই পথ ও নিয়ম নির্দ্দেশ করেন।

যাঁহারা বলেন, "দেশ আগে ধর্ম্ম পরে", তাঁহাদের এরূপ বলিবার দুটি কারণ অনুমান করা যায়। তাঁহারা ধর্ম্মকে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিতেছেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম মানে বুঝিতেছেন হিন্দুসমাজ, মুসলমান ধর্ম্ম মানে বুঝিতেছেন মুসলমান সমাজ, ইত্যাদি। অনেক মুসলমান দেশের মঙ্গলের চেয়ে ও তাহার আগে মুসলমান সমাজের স্বার্থ বেশী দেখেন। তাঁহাদের দেখাদেখি কোন কোন হিন্দুর ও চেষ্টা ঐরূপ হইয়াছে। অনেক শিখের চেষ্টাও ঐরূপ। সুতরাং যাঁহারা ভারতবর্ষের মুক্তি চান, তাঁহারা বলিতেছেন, "দেশ আগে ধর্ম্ম পরে।" কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের বলা উচিত, "দেশ বা জাতি আগে, তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বার্থ পরে দেখিতে হইবে।"

আর একটি কারণ এই, যে, কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরের সহিত ঝগড়াবিবাদে, পরস্পরের ধর্ম্মগুরু বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নিন্দাকুৎসায়, পরস্পরের সহিত ঈর্ষাদ্বন্দ্ব দ্বেষাদ্বেষিতে লাগিয়াই আছে। সেইজন্য রাজনীতিজ্ঞেরা ধর্ম্মের উপর চটিয়া গিয়া তাহাকে বাদ দিতে চান। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই মত পরস্পরের সহিত ঝগড়াবিবাদ মারামারি করিয়া থাকেন, তাহার ফলে খুন পর্য্যন্ত হইয়াছে। তাহা হইলে ধর্ম্মের মত রাজনীতিকেও তাঁহারা বাদ দেন না কেন? বাস্তবিক এই-সব ঝগড়া-বিবাদ রাষ্ট্রনীতির সারবস্তু নহে। সেইরূপ সাম্প্রদায়িক কলহও ধর্ম্মের সারবস্তু নহে। কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপও ধর্ম্মের সারবস্তু নহে। ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, যে, বাহ্য কোন ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই-সব বাহ্য জিনিষ দেশ কাল রুচি প্রবৃত্তি প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। অথচ এইগুলিকেই অনেকে ধর্ম্মের সারবস্তু মনে করা অনেক ঝগড়াবিবাদ হয়।

অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত নির্দ্দোষ অভ্রান্ত কোন দেশ অর্থাৎ সেই দেশের লোক ইতিহাসে দেখা যায় না। সুতরাং কোন দেশকেই পরম দেবতার স্থানে বসান যায় না।

কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রস্তাব

বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজলাভ এতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এখনও উদ্দেশ্য তাহাই রহিল। কিন্তু লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় স্বরাজের মানে পূর্ণ-স্বরাজ বা পূর্ণ-স্বাধীনতা হইল।

গত কলিকাতা কংগ্রেসের পূর্ব্বে মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। তা ছাড়া অনেক রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মী ও নেতা এবং সংবাদপত্র-সম্পাদক অনেক দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন, যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং কথাটা কিছু নূতন নয়। তবে এবার কংগ্রেসে ঐ লক্ষ্য ঘোষিত হওয়ায় যে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে, তাহার কতকগুলি কারণ আছে।

গত কলিকাতা কংগ্রেসে বলা হইয়াছিল, যে, ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যদি ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস না দেন, তাহা হইলে পূর্ণ-স্বাধীনতা লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। ঐ তারিখের মাস দুই আগে বড়লাট ইহা ঘোষণা করেন, যে, ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন করা হইবে, কিন্তু কখন করা হইবে তিনি তাহা বলেন নাই, পার্লেমেণ্টে ভারতসচিবও বলেন নাই। গবন্মেণ্টপক্ষ হইতে ইহাও বলা হয়, যে, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইলে একটা গোলটেবিল বৈঠক লণ্ডনে হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষের নানাদলের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা হইবে, তাহার পর পার্লেমেণ্টে নূতন ভারতশাসন বিল উপস্থিত করা হইবে। কিন্তু ঐ গোলটেবিল বৈঠকে যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস অনুযায়ী বিলের খুঁটিনাটি আলোচিত হইবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি সরকারী কোন ব্যক্তির মুখ হইতে বাহির হয় নাই। বিলাতে ও ভারতে কর্ত্তৃপক্ষ যাহা দিবেন বলিয়াছেন, তাহার চেহারা ও দিবার সময় সম্পূর্ণ অনির্দ্দিষ্টই থাকিয়া গিয়াছে। অথচ তাহা সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন, যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের এই সব অস্পষ্ট উক্তিকে অবিলম্বে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দানের প্রতিশ্রুতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের পূর্ণস্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইতে নিবৃত্ত থাকা উচিত ছিল। নিবৃত্ত না-থাকায় অনেকে কংগ্রেসের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এবং ইংরেজরা ত চটিবেনই।

আমাদের মনে হয়, কলিকাতা কংগ্রেসে যেরূপ প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল, তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থায় এবার পূর্ণস্বাধীনতা ঘোষণা না করিলে কংগ্রেসের মান ও সঙ্গতি রক্ষা হইত না। অবশ্য, কংগ্রেস-নেতারা যে নিজেদের মুখরক্ষা করিবার জন্যই পূর্ণস্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি না। বাহিরের দর্শকরূপে আমরা দেখিতেছি, যে, ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কংগ্রেস ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের জন্য প্রতীক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন। ঐ তারিখের রাত্রি ১২টা পর্য্যন্তও তাহা পাওয়া দূরে থাক্, তৎসম্বন্ধে, ধরা ছোঁয়া যায় এমন কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষে পূর্ণস্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা কলিকাতা কংগ্রেসের স্বাভাবিক ও সঙ্গত ফল বলিয়া আমরা মনে করি। যদি কংগ্রেস তাহা না করিতেন, তাহা হইলে কংগ্রেসকে বলিতে হইত, আমরা ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পাইয়াছি, অতএব পূর্ণস্বাধীনতাই লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস না পাওয়ায় ইহা বলা চলিত না। কংগ্রেস আর কিছু বলিতে পারিতেন কি? কংগ্রেস কি বলিতে পারিতেন, যে, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ অবিলম্বে, যখনই অতঃপর পার্লেমেণ্টে নূতন ভারতশাসন আইন পাস হইবে, তখন হইতে পাওয়া যাইবে? তাহাও বলিতে পারিতেন না। কারণ এরূপ প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তি দেন নাই। তাহা হইলে কি বলিতে পারিতেন, আমরা যদিও নির্দ্দিষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি পাই নাই, তথাপি আশা করিতেছি, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস অবিলম্বে পাইব? তাহাও পারিতেন না। কারণ, এরূপ আশার ভিত্তি কি, কিছুই বলিতে পারিতেন না; এবং কলিকাতার কংগ্রেসের প্রস্তাবে একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পাইবার সর্ত্তই ছিল, আশা করার সর্ত্ত ছিল না। অতএব, অবশ্য, লাহোর কংগ্রেস বলিতে পারিতেন, "আমরা কলিকাতায় যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা হুমকি ও ধাপ্পাবাজি মাত্র; ভয় দেখাইয়া কিছু পাওয়া যায় কিনা, তাহাই দেখিতেছিলাম; কলিকাতার প্রস্তাবটা আমাদের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে নাই। আমরা স্বাধীনতা-টাধীনতা কিছুই ঘোষণা করিব না, সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিব।" লাহোর কংগ্রেস যদি এরূপ বলিতেন, কিংবা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া ঐরূপ বলারই সমতুল্য আচরণ করিতেন, তাহা হইলে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পাইবার পক্ষেও কোন সুবিধা হইত কি? ভারতীয় জাতির প্রতি লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধা বাড়িত কি?

এইসব কারণে সমুদয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, লাহোর কংগ্রেস যাহা করিয়াছেন, কলিকাতা

কংগ্রেসের প্রস্তাব লঙ্ঘন না করিয়া এবং তাহার ও নিজেদের অমর্য্যাদা না করিয়া, তদ্ভিন্ন কিছু করা চলিত না।

এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন, "তোমার সব যুক্তি কলিকাতার প্রস্তাবের ভিত্তির উপর খাড়া করিয়াছ। ঐ প্রস্তাবটাই কি ভাল হইয়াছিল?" উত্তরে বলিব, "কলিকাতার প্রস্তাবের ঔচিত্যানুচিত্যের বিচারের সময় চলিয়া গিয়াছে। যখন ঐ প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে এক বৎসরের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পাওয়া যাইবে না।" এক বৎসরের মধ্যে ভারতকে তাহা দেওয়া অবশ্য অসম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্য কারণে না হউক, হয় ত কেবল এই কারণেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাহা দেয় নাই বা দিবার নির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয় নাই, যে, তাহা দিতে উহার দর্পে ও অহঙ্কারে আঘাত লাগিত, তাহা দিলে পাছে লোকে মনে করে যে ইংরেজরা ভয় পাইয়াছে এই আশঙ্কা তাহাদের ছিল। এই হেতু আমরা ঐরূপ তারিখ-দেওয়া প্রস্তাবের পক্ষে ছিলাম না।

নাম করিয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপর ধাপ্পাবাজির অভিসন্ধি আরোপ সমীচীন নহে। কিন্তু ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষীয় কাহারও কংগ্রেসকে চালবাজিতে হারাইবার ইচ্ছা ছিল না ধরিয়া লইলেও, ব্যাপারটা একটা চালবাজির রূপ ধারণ করিয়াছে। সেইজন্য, কংগ্রেস যে ধোঁকায় পড়িয়া ঠকেন নাই ও নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই, ইহাতে আমরা খুশি হইয়াছি।

—

পূর্ণ-স্বরাজ লাভের উপায়

আমরা বাংলা ও ইংরেজীতে অনেকবার লিখিয়াছি, কেবল পূর্ণস্বাধীনতাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য হওয়া উচিত; যদিও পথের মধ্যের একটা আড্ডা স্বরূপ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পাইলে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, বরং তাহা পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবার পক্ষে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। কিন্তু ভারতবর্ষ কেমন করিয়া পূর্ণ-স্বাধীনতা পাইবে, তাহার ঠিক উপায় কখনও বলিতে পারি নাই। কংগ্রেসের নেতারা কি উপায়ে উহা লাভ করিতে পারিবেন মনে করেন, জানি না। কিন্তু যাহা শ্রেয়ঃ তাহা লাভের উপায় আপাততঃ জানা না থাকিলেও শ্রেয়ই যে আমাদের লক্ষ্য, তাহা বলা অনুচিত নহে। যাহাতে অপমান আছে, সে অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় আপাততঃ জানা না থাকিলেও, কোন্ অবস্থা সম্মানকর তাহা বলা কর্ত্তব্য।

আপাততঃ তাঁহারা কৌন্সিল বর্জ্জনের পরামর্শ দিয়াছেন, এবং পরে সুযোগ হইলে নিরুপদ্রবভাবে আইন অমান্য কোথাও কোথাও করিবেন বলিয়াছেন।

কৌন্সিল বর্জ্জন হইতে সাক্ষাৎভাবে ইংরেজ জাতি ও গবর্মেণ্টের উপর বিশেষ কিছু চাপ পড়িবে না। বরং বিরোধীদলের কতকগুলি লোক কৌন্সিলে না থাকিয়া অধিকতর নমনীয় লোকেরা তাহাতে থাকিলে ইংরেজপক্ষের সুবিধাই হইবে। কিন্তু কৌন্সিলত্যাগী লোকেরা যদি নিজ দৃষ্টান্ত, দেশী দ্রব্য উৎপাদন ও প্রচার দ্বারা দেশের লোককে বিলাতী কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ বর্জ্জন করাইতে পারেন, তাহা হইলে ইংরেজের উপর চাপ পড়িবে। যদি তাঁহারা দেশকে প্রস্তুত করিয়া নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন প্রচেষ্টা চালাইতে পারেন, তাহা হইলে আরও চাপ পড়িবে।

বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রচেষ্টা এবং নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন শান্তিপূর্ণভাবে চালাইতে হইবে। দুইটিকেই উপদ্রবপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবার লোকের অভাব হইবে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি দেশের লোকে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া ধীর শান্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের জিত হইবে।

কাপড় ও অন্যান্য বিলাতী যে যে পণ্যদ্রব্যের মত জিনিষ ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় বা হইতে পারে, তাহা উৎপাদনে ও কেবল মাত্র তাহার ব্যবহারে দেশের কোন ক্ষতি নাই, দুঃখ নাই—লাভই আছে। যে সব দেশী লোক ঐ সব বিলাতী পণ্যের বিক্রেতা, তাঁহাদের কিছু ক্ষতি কিছু দিন হইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অল্প এবং বিলাতীর জায়গায় দেশী জিনিষের কারবার করিলেই তাঁহাদের লাভ বজায় থাকিবে। অতএব ইহাকে জাতীয় ক্ষতি বা দুঃখ মনে করা উচিত নয়।

নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘনে, যাঁহারা আইন অমান্য করিবেন তাঁহাদের দুঃখভোগ ও ক্ষতি অনিবার্য্য। লোকহিতের জন্য যাঁহারা তাহা শান্তভাবে সহ্য করিতে পারিবেন, তাঁহারা ধন্য। কিন্তু তাঁহারা যদি উৎপীড়নে ও ক্ষতিতে উত্তেজিত হইয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হন, তাহা হইলে সু-ফলের পরিবর্ত্তে কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। অতএব বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোথাও আইন লঙ্ঘন কার্য্য আরম্ভ না করা ভাল।

অনেকে বলিয়া থাকেন, স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধের সময় সমর্থ বয়সের সব পুরুষ মানুষ দরকার হইলে সব দেশেই অন্য সকল কাজ ছাড়িয়া যুদ্ধে যোগ দিয়া থাকেন; এখন আমাদের দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, অতএব আমাদের দেশেও সকলেরই অন্য সব কাজ ছাড়িয়া এই সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া উচিত। ইহা

যদি সত্যও হইত, তাহা হইলে যাঁহাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা নিজের রোজগারের উপর নির্ভর করেন, যাঁহাদের স্বাধীন জীবিকার উপর নির্ভর, তাঁহাদের অনেককেই নিজের নিজের বৃত্তি ও ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখিতাম। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের প্রবলতম অবস্থাতেও তাহা দেখা যায় নাই। সুতরাং স্কুলকলেজের ছেলেদিগকে শিক্ষালয় হইতে ছাড়াইয়া লওয়া ঠিক হয় নাই। বিশেষতঃ যখন তাহাদের সকলের বা অধিকাংশের জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রাম-সম্পর্কীয় কোন কাজের ব্যবস্থা করা হয় নাই। আর একটা কথা এই, যে, সাধারণতঃ ১৮ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের লোকেরাই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। সুতরাং স্কুলের বালকরা রেহাই পায়। অতএব স্বাধীনতা-যুদ্ধের ওজুহাতে স্কুলের ছেলেদিগকে স্কুল ছাড়ান উচিত নয়।

সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত শিক্ষালয় সকল হইতে ছাত্রছাত্রীদিগকে বাহির করিয়া আনিবার আর এক কারণ এই বলা হইয়া থাকে, যে, সেখানে তাহারা আদর্শানুরূপ শিক্ষা পায় না এবং তাহাদের মনের ভাব দাসত্বের অনুকূল হইয়া যায়। ঐ সব শিক্ষালয়ে তাহাদের শিক্ষা আদর্শানুরূপ হয় না, সত্য কথা। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, সেখানে তাহারা এরূপ কিছু জ্ঞান লাভ করে যাহা সত্যমূলক ও কেজো। তাহারা যেখানে আদর্শানুরূপ অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এরূপ শিক্ষালয় তাহাদের জন্য চালাইলে এবং তাহাতে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইতে পারিলে ভাল হয়, স্বীকার করি। কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক সেইরূপ শিক্ষালয় কখনও স্থাপিত হয় নাই, এবং যতগুলি স্থাপিত হইয়াছে তাহাতেও যথেষ্ট বিদ্যার্থী জুটে নাই। তাহার একটা কারণ, সেখানে বিদ্যা শিখিয়া রোজগারের কোন পথ বিদ্যার্থীরা দেখিতে পায় নাই। সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত শিক্ষালয় সকলে ইংরেজ-প্রভুত্বের এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারের অনুকূল মনের ভাব জন্মাইবার চেষ্টা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে হইয়া থাকে, জানি। কিন্তু সাক্ষাৎ চেষ্টা অল্পই সফল হয়। পরোক্ষ চেষ্টার সামান্য ফল ফলে, কিন্তু তাহাও স্থায়ী হয় না।

এই সব কারণে, আদর্শানুরূপ জাতীয় শিক্ষালয় যথেষ্টসংখ্যায় স্থাপন ও তথায় রোজগারের উপায় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে আমরা স্কুলকলেজের ছাত্রদিগকে সেখানেই রাখিবার পক্ষপাতী। যাদবপুরের বেঙ্গল টেক্নিক্যাল স্কুলের মত জাতীয় বিদ্যালয় অনেক স্থাপিত হইলে ভাল হয়।

যাহা হউক, এ যাত্রা কংগ্রেস স্কুলকলেজ বয়কট করিতে বলেন নাই।

স্বাধীনতাকামী লোকদের পক্ষে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের আদালতের সাহায্য লইতে যাওয়া ক্লেশকর ও অপমানকর হইতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট ক্ষমতাশালী অন্য কোন আদালত না থাকায় অগত্যা নানা কারণে ব্রিটিশ আদালতের সাহায্য লইতে হয়। নতুবা দুর্বৃত্তের দমন হয় না, এবং আরও অনেক অসুবিধা ও ক্ষতি হয়। ব্রিটিশ আদালতের সাহায্য লইতে হইলে উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টারও চাই। বোধ হয় সেইজন্য এবার কংগ্রেস আদালত বর্জ্জন করিতে বলেন নাই।

কৌন্সিল বর্জ্জনের একটা অসুবিধা উল্লেখযোগ্য। কৌন্সিলের সাহায্যে এমন কোন কোন আইন হইয়াছে যাহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে। আরও এরূপ কোন কোন আইন হইতে পারে। যেমন শ্রীযুক্ত সারাভাই হাজীর উপকূলের নিকটস্থ সমুদ্রে জাহাজচালন সম্বন্ধীয় বিল। সত্য বটে, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ বা পূর্ণস্বরাজ লব্ধ হইলে এরূপ সব আইন সহজেই হইবে। কিন্তু তাহা লাভ করিতে কত বিলম্ব হইবে বলা যায় না। ততদিন নানাবিধ অনিষ্ট ক্ষতি অসুবিধা সহ্য করা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। যাঁহারা কৌন্সিলে দেশহিতকর কাজ করিতে সমর্থ, তাঁহাদের তাহাতে থাকার সপক্ষে কিছু বলিবার আছে। যাঁহারা এখন কৌন্সিলে আছেন, তাঁহারা তাহা বর্জ্জন করিয়া সকলেই কংগ্রেসের পদ্ধতি অনুসারে দেশের কাজ করিবেন বা করিবার উপযুক্ত, ইহা কি সত্য? কেবল নিয়মরক্ষার জন্যও কংগ্রেসওয়ালা সকল সভ্যের কৌন্সিল বর্জ্জন উচিত বটে। কিন্তু তাঁহারা বাহির হইয়া আসিয়া কি করিবেন, ভাবিয়া দেখা উচিত।

যাঁহারা এরূপ স্বাধীনচিত্ত ও স্বাধীনতাকামী, যে, বিদেশী রাজার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ শেলের সমান তাঁহাদের হৃদয়ে বাজে, তাঁহারা ত কৌন্সিলে যাইতেই পারেন না। কিন্তু তাঁহারা কৌন্সিলে গিয়াছিলেন কি করিয়া এবং এতদিন তাহাতে ছিলেন কি প্রকারে? ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ত জন্মিয়াছে আজ নয়। মান্দ্রাজে কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণস্বাধীনতা লাভ বলিয়া ঘোষণাও দুই বৎসর আগে হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসওয়ালা সভ্যেরা কি এত দিন মনের প্রতি চোখ ঠারিতেছিলেন? রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ যাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য এরূপ লোকেরা ছাড়া, নির্লোভ দেশহিতকামী যে-কেহ কৌন্সিলের কাজ ও তাহার বাহিরে কংগ্রেসানুমোদিত দেশের কাজ দুইই করিতে পারেন, তাঁহার কৌন্সিলে থাকা উচিত। মোটের উপর আমাদের মনে হয়, বর্জ্জনত্রয়ের মধ্যে বিদেশী

কাপড় বর্জ্জন সর্ব্বাপেক্ষা সুসাধ্য এবং তাহাতে দেশের কোন ক্ষতি নাই। অবশ্য ইহা করিতে হইলে সূতার ও কাপড়ের মিল স্থাপন এবং চরকা ও হাতের তাঁত চালান, দুই-ই করিতে হইবে।

—

বড়লাটকে বধ চেষ্টার কংগ্রেসে নিন্দা

বোমা দ্বারা ট্রেন ধ্বংস করিয়া বড়লাটকে বধ করিবার চেষ্টার নিন্দা করিয়া কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। এইরূপ চেষ্টা যে গর্হিত, তাহা আগেই বলিয়াছি। কংগ্রেসে এরূপ প্রস্তাব উত্থাপনের বিরুদ্ধে এ কথা বলা যাইতে পারিত, যে, তাহা অনাবশ্যক; কারণ, কংগ্রেস এখন পর্য্যন্ত শান্তি ও অহিংসার পথে স্বরাজলাভ চেষ্টার পক্ষপাতী আছে ইহা জানা কথা। এইজন্য কোথাও রাজনৈতিক হত্যার চেষ্টা হইলেই কংগ্রেসের পক্ষে সেরূপ চেষ্টাকে পুনঃ পুনঃ গর্হিত বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাঁহারা কংগ্রেসে এরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও ভোট দিয়াছিলেন, প্রস্তাবটির অনাবশ্যকতা তাঁহাদের সকলের বা অধিকাংশের সেরূপ করিবার কারণ বলিয়া মনে করা যায় না। বিরুদ্ধবাদী বক্তাদের বক্তৃতা এবং সমর্থক বক্তাদের বক্তৃতায় বাধাজনক চীৎকার হইতে বরং এই ধারণাই তর্কবিতর্কের সময় হইয়াছিল, যে, প্রস্তাবটির বিরোধীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিংসার পথ, গুপ্তহত্যার পথ, অবলম্বন আপত্তিকর মনে করেন না। আমরা তাঁহাদের মতাবলম্বী নহি।

অন্য সময়েও এরূপ প্রস্তাব ধার্য্য করা হয় ত অনাবশ্যক হইত না। এবারকার কংগ্রেসের পূর্ব্বে নেতারা বড়লাটের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আহ্বান প্রত্যাখান করায় এবং কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বরাজই লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় তাহাতে এই প্রস্তাব ধার্য্য করা ঠিক হইয়াছে।

ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প ভোটের আধিক্যে গৃহীত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, দেশে বলপ্রয়োগ ও হিংসা দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষপাতী লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে। আমরা ইহা শুভলক্ষণ মনে করি না। অনেকের মনের ভাব যে এইরূপ হইতেছে, তাহার অন্য কারণ যাহাই থাক, গবর্মেণ্টও তাহার জন্য দায়ী। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করায় তাহাতে কোন বা যথেষ্ট ফল ফলিতেছে না দেখিয়া লোকের মন তাহার বিপরীত উপায়ের দিকে ঝুঁকিতেছে। বক্তৃতায়, খবরের কাগজের প্রবন্ধে এবং পুস্তকে ব্রিটিশ শাসনের দোষ ও অকৃতকার্য্যতার বৃত্তান্ত লিখিয়া দেশের লোকদের আত্মশাসন অধিকার লাভের সপক্ষে যাহা বলা হইতেছে, সরকার পক্ষ তাহার অসত্যতা প্রমাণ না করিয়া (তাহা করা অসম্ভব) বলপূর্ব্বক লেখক ও প্রকাশকদিগকে শাস্তি দিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিতেছেন। সুতরাং যাঁহারা গভীরভাবে দূরদর্শিতার সহিত চিন্তা করেন না, তাঁহাদের এরূপ মনে করা আশ্চর্য্য নহে, যে, তথ্য ও যুক্তির বিরুদ্ধে যখন গবর্মেণ্ট তথ্য ও যুক্তি প্রয়োগ না করিয়া বলপ্রয়োগ করিতেছেন, তখন বলপ্রয়োগই চরম উপায়। এরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন নৈতিক, দার্শনিক, বা আধ্যাত্মিক যুক্তি প্রয়োগ না করিয়া আমরা ইহা বলাই যথেষ্ট মনে করি, যে, বলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে হইলে সরকার পক্ষের সঙ্ঘবদ্ধ বাহুবল এবং সুশৃঙ্খল যন্ত্রবল যাহা আছে তাহার বিরুদ্ধে তাহা অপেক্ষা অধিক ঐরূপ বল, অন্ততঃ তাহার সমান ঐরূপ বল, প্রয়োগ করা দরকার। কিন্তু সেরূপ বল কোথায়? কামানের বিরুদ্ধে পটকা ছুঁড়িয়া বৃথা বলক্ষয়ে ও চিত্তবিক্ষোভ উৎপাদনে কি লাভ?

—

কংগ্রেসের সময় পরিবর্ত্তন

অতঃপর ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস না হইয়া ফেব্রুয়ারী বা মার্চ্চ মাসে হইবে। ১৯৩০ সালে কোন কংগ্রেস হইবে না। ১৯৩১ সালে করাচীতে উহার অধিবেশন হইবে। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সরকারী ও বেসরকারী আফিস, সরকারী আদালত এবং সমুদায় স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় তখন যত সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে সভ্যের ও দর্শকের উপস্থিতি বেশী হয়; কংগ্রেসেও তাহা হয়। ফেব্রুয়ারী বা মার্চ্চে তাহা হইবে না। তখন কেবল যাঁহারা কংগ্রেসের কাজে উৎসাহী এবং তাহার জন্য কিছু কাজের ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাঁহারাই তাহাতে যোগ দিবেন। ছুটির আমোদ ভোগ করিতে ব্যগ্র সৌখীন লোকদের আমদানী কম হইবে। একদিক দিয়া ইহা ভাল। আজ কাল কংগ্রেসে লোকের আধিক্যে সুশৃঙ্খলভাবে আলোচনা ও কার্য্যনির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিনিধি ও দর্শকের সংখ্যা কমিলে কাজ করা সহজ হইবে।

অন্য দিকেও কিছু বলিবার আছে। যাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দেন না, দেখিয়া শুনিয়া সেরূপ লোকেও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন। সে সম্ভাবনা এখন আর থাকিবে না।

কংগ্রেস ছাড়া অন্য সার্ব্বজনিক সভাগুলির এই সুবিধা হইবে যে, ডিসেম্বরের শেষে তাহাদের অধিবেশন হইলে তাহার সভ্যেরা একাগ্রতার সহিত অধিকতর সংখ্যায় তাহাতে যোগ দিতে পারিবেন।

—

আর্ল রাসেলের উক্তি

সহকারী ভারতসচিব আর্ল রাসেল গত ৬ঠা জানুয়ারী এক বক্তৃতায় বলেন, যে, এই মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষের ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ অসম্ভব এবং দীর্ঘকাল তাহা সম্ভব হইবে না। মনের কথাটা বলিয়া ফেলিয়া তাহার পর তিনি বলিতেছেন,আমি ঠিক্ ওরূপ কথা বলি নাই, আমার প্রিয় কুকুরটি পীড়িত হওয়ায় তাহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত ছিলাম বলিয়া বক্তৃতাটি ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে পারি নাই, "দীর্ঘ কাল" (long time) কথা দুটি আমার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে যথাস্থানে না বসিয়া অন্যত্র বসিয়াছে, ইত্যাদি। তাঁহার কুকুরটি পীড়িত থাকায় তিনি তদপেক্ষা কম মনোযোগের যোগ্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য গুছাইয়া রাজনীতিবিশারদজনোচিত ধোঁকাবাজীর সহিত বলিতে পারেন নাই, সোজা আন্তরিক কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ব্রিটিশ সরকারী বেতারবার্ত্তায় আসিয়াছিল। তাহা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। ইংলণ্ডের মর্নিংপোষ্ট প্রভৃতি কাগজও বলিতেছে, যে, আর্ল রাসেলের বক্তৃতার চুম্বক আগে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহাই ঠিক ; এখন তাহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী, ভারতসচিব মিঃ ওয়েজউড বেন প্রভৃতি মন্ত্রীরা এবিষয়ে কিছু বলিলে কি বলেন তাহা জানিতে কৌতূহল হয়।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে পার্লেমেণ্টে যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তদুপলক্ষে ভারতসচিব বক্তৃতা করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন, যে, ভারতবর্ষ গত দশ বৎসর কার্য্যতঃ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস ভোগ করিয়া আসিতেছে ! কেন না, একজন ভারতীয় হাই কমিশনারের চাকরী করেন, কয়েকজন ভারতীয় লীগ অব্ নেশুন্সে ভারত গবর্ন্মেণ্টের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন, ভারত গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে কোন কোন ইংরেজ দুএকটা দলিলে স্বাক্ষর করিয়াছে,(ইংরেজদের ও ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য) কোন কোন ভারতীয় পণ্য-কারখানা রক্ষণ-শুল্কের সুবিধা পাইয়াছে, ইত্যাদি। তাঁহার তালিকাটি পড়িয়া মনে হইবে, "রাম! রাম! এরই নাম কার্য্যতঃ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ ভোগ? এবং এইরূপ আরও কতকগুলি ভুয়ো জিনিষ একত্র করিয়া তাহার উপর ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ ছাপ মারিয়া দেওয়া হইবে কি না বা কখন্ হইবে, তাহারই জন্য এত মাথাব্যথা ?" আর্ল রাসেলের বক্তৃতায় ব্রিটিশ মন্ত্রীদের মনের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এরূপ সন্দেহ অনেকেই করিবেন।

ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের মানে নানা রকম হইতে পারে, পূর্ণস্বরাজের মানে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সে হিসাবে, পূর্ণ-স্বরাজ চাওয়াই ভাল।

—

লাহোর কংগ্রেসে দলাদলি

কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে কেবল মহাত্মা গান্ধী ও নেহরু পিতাপুত্রের পছন্দসই লোক লওয়া হইয়াছে। যে-সব দেশে কোন রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য অনুসারে তাহাকে দেশ শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তথায় সেই দলের লোক লইয়াই মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়। কংগ্রেসে এই রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে। তাহাতেই সুস্পষ্ট হইয়াছে, যে, কংগ্রেসে দলাদলি হইয়াছে। এই দলাদলিটাই অবাঞ্ছনীয় মনে করি—ইহাতে শক্তিক্ষয় হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে নানা মতের লোক থাকিলে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বিলম্ব হয়, এবং পূর্ণশক্তি ও একাগ্রতার সহিত তদনুসারে কাজ করিতে বাধা জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। অন্যদিকে ইহাও মানিতে হইবে, যে, ভিন্ন মতের অন্ততঃ দু'এক জন লোক থাকিলেও সব বিষয়ের আলোচনায় দুটা দিকই বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা অধিক হয়। ভিন্ন মতের লোকেরা ভাল প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ও সুপরামর্শ দিতেও পারেন। এইজন্য কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যমূর্ত্তি প্রভৃতি দু তিন জন লোককে লইয়া দলাদলি কতকটা ভাঙিয়া দিলে মন্দ হইত না। নতুবা সুভাসবাবুর মত লোক কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে না থাকায় কাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

—

দেশের কাজে বাঙালী

এক সময়ে সমগ্র ভারতের জন্য চিন্তায় ও আদর্শ সন্ধান ও নির্দ্দেশে এবং সমগ্রভারতীয় কাজে বাঙালীর নেতৃত্ব ছিল। নেতৃত্ব চিরকাল বাঙালীর থাকিবে, এরূপ ইচ্ছা করাও অন্যায়; কারণ তাহার মানে এই দাঁড়ায় যে, দেশের অন্য লোকেরা চিরকাল অনগ্রসর থাক্। কিন্তু বাঙালী কাহারও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া না পড়ে এরূপ ইচ্ছা অন্যায় নহে। সমুদয় মানব জাতির জন্য চিন্তায় এবং আদর্শ নির্দ্দেশে বাঙালী এখনও ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের লোকদের পশ্চাতে পড়িয়া যায় নাই, বরং কোন কোন বিষয়ে অগ্রণীই আছে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অনেক দিকে বাঙালীর নেতৃত্ব গিয়াছে, হয়ত বা বাঙালী পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। তাহার

একটা স্থূল প্রমাণ দেখুন। সমগ্র ভারতের জন্ম ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সভ্যদের চেষ্টায় বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন প্রভৃতি যে-সব কল্যাণকর আইন হইয়াছে, কোন বাঙালী সভ্য তাহার একটিরও রচয়িতা ও প্রবর্ত্তক নহেন।

লাহোরে ও অন্যত্র সমগ্রভারতীয় কতকগুলি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার ষষ্ঠাংশ বাঙালী। এই সকল সভার নেতা ও প্রধান কর্ম্মীদের মধ্যে ষষ্ঠাংশ বাঙালী থাকিবেন এরূপ আশা করা যায় না; কারণ যখন যে-প্রদেশে সভাগুলি হয়, অধিকাংশ কর্ম্মী সেই প্রদেশের লোকই হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই প্রদেশের বাহিরের যত নেতা ও প্রধান কর্ম্মী তথায় উপস্থিত হইবেন, তাহার ষষ্ঠাংশ বাঙালী হইবেন, ইহা আশা করা অনুচিত নহে। আমরা বলিতেছি না, প্রত্যেক প্রদেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে বাহির হইতে নেতা ও কর্ম্মী লওয়া উচিত; কারণ সেরূপ অসঙ্গত প্রস্তাব ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অনুসারে চাকরী দিবার প্রস্তাব বা রীতির মতই অনুমোদনের অযোগ্য। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই, যে, সমগ্রভারতীয় কাজে বাঙালীরা এরূপ উৎসাহ, বিচক্ষণতা, কর্ম্মিষ্ঠতা ও তৎপরতা দেখাইবেন, যে, স্বভাবতই তাঁহারা ঐরূপ কাজে উপযুক্ত সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইবেন। পৌষমাসের সারা দেশের কাজে লাহোরে বাঙালীর স্থান বাংলার লোক-সংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট ছিল না। আমরা যত দূর জানি, কয়েকজন মাত্র বাঙালী কয়েকটি সভার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ও কাজ—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—কংগ্রেসপ্রদর্শনী খোলা, এবং লাইব্রেরী কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—চিকিৎসা কনফারেন্সের সভাপতিত্ব।

শ্রীমতী সুহাসিনী নাম্বিয়ার (ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভগ্নী)—

নওজুয়ান (যুবক) সভার সভানেত্রীত্ব।

শ্রীবিমলানন্দ নাগ—

খৃষ্টীয় কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—

একেশ্বরবাদীদিগের কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব এবং জাতপাত-তোড়ক (জাতিভেদ ও পংক্তিভেদ নাশক) মণ্ডলের কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব।

ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্

ধার্ম্মিক ও দার্শনিক বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইবার জন্ম বিলাতে হিবার্ট ট্রাষ্ট্ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক বিখ্যাত লোক হিবার্ট লেক্‌চ্যার দিয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি হিবার্ট লেক্‌চ্যার দিতে নিমন্ত্রিত হন। অসুস্থতাপ্রযুক্ত তিনি এ পর্য্যন্ত তাহা দিতে পারেন নাই। তাহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ আহূত হন। তিনি সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে "An Idealist View of Life" (মানব জীবন সম্বন্ধে আদর্শানুসারী একটি অভিমত) বিষয়ে চারিটি বক্তৃতা করেন। লণ্ডনের একেশ্বরবাদীদের কাগজ ইন্‌কোয়ারারে এই বক্তৃতাগুলির খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছে। ঐ কাগজের ২১শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে :—

"Throughout the course the audiences were large and highly appreciated the eloquence, humour and learning of the lecturer. Professor Radhakrishnan spoke on the modern challenge to religious beliefs offered by the sciences, the ways of escape provided by dogmatic denial and dogmatic affirmation, the nature of religious experience, and finally the confirmation of intuition in the spheres of intellectual endeavour, aesthetics and ethics."

"Few lectures given at the University in living memory have awakened such keen interest and evoked such warm enthusiasm."

—

বন্দবিলায় সত্যাগ্রহ

বন্দবিলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনে তথাকার লোকদের আপত্তি সত্ত্বেও গবর্ন্মেণ্ট সেখানে বোর্ড স্থাপন করিয়া ট্যাক্স আদায় করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহারা ট্যাক্স না দেওয়ায় সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম এবং অন্যবিধ উৎপীড়ন চলিতেছে। ইউনিয়ন বোর্ড দ্বারা যদি লোকদের হিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া বোর্ড স্থাপন করাই কর্ত্তব্য ছিল। সরকার বাহাদুরের ক্ষমতা আছে। কিন্তু ক্ষমতা থাকিলেই বলপ্রয়োগ দ্বারা সব কাজ করিবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমত্তা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

উৎপীড়ন ও ক্ষতি সত্ত্বেও যে লোকেরা সত্যাগ্রহে দৃঢ় আছে, তাহা প্রশংসার বিষয়।

—

উপকূলের নিকটস্থ সমুদ্রে জাহাজ চালন

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের আরম্ভের সময়েও ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলে হাজারটি বন্দর ছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোক জাহাজ নির্ম্মাণ, জাহাজ চালন, জাহাজ বোঝাই ও মাল খালাস প্রভৃতি কাজ করিয়া রোজগার করিত। তাহার পর কোম্পানীর ও ইংরেজ বণিকদের কৃপায় বন্দরের সংখ্যা সামান্য কয়েকটিতে পৌঁছিয়াছে, দেশী লোকদের জাহাজ খুব কমিয়াছে এবং ভারতে একটিও

ড় জাহাজ আর নির্ম্মিত হয় না। অথচ পুরাকালে ভারতীয়েরা অন্যতম প্রধান সমুদ্রগামী জাতি ছিল। এখন তাহারা জাহাজ চালাইতে গেলে ইংরেজ জাহাজ কোম্পানীরা ভাড়ার প্রতিযোগিতা দ্বারা ভারতীয়দের উদ্যম ব্যর্থ ও নষ্ট করে।

জাহাজ চালান ভারতীয়দের হাত হইতে চলিয়া যাওয়ায় বেকারের সংখ্যা বাড়িয়াছে, বৎসর বৎসর অনেক কোটি টাকা বিদেশীদের হস্তগত হইতেছে, এবং ভারতীয়দের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি হইতেছে না। এইজন্য উপকূলের নিকটস্থ সমুদ্রে মাল ও যাত্রী বহনের অধিকার কেবল ভারতীয়দের জাহাজের থাকিবে, এই মর্ম্মের একটি বিল শ্রীযুক্ত সারাভাই হাজী ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন। উহা প্রথমে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী মুসাবিদা করেন। এই বিলটি পাস হইয়া যাহাতে আইনে পরিণত না হয়, তাহার জন্য ইংরেজ বণিকরা সকল প্রকার চেষ্টা করিতেছে। ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে আপোষে কোন বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায় সম্প্রতি একটা কন্‌ফারেন্সও হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ জাহাজ কোম্পানীগুলার অসঙ্গত প্রস্তাব ও ব্যবহারে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহারা চায়, যে, ভারতীয় জাহাজ-কোম্পানীসমূহ তাহাদের জাহাজগুলা ক্রমে ক্রমে কিনিয়া লউক এবং তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনেক টাকা দিউক! বেশী দাম দিয়া তাহাদের পুরাতন জাহাজ না লইয়া অপেক্ষাকৃত কম দামে ভাল নূতন জাহাজ নানা দেশে কিনিতে পাওয়া যাইবে। ক্ষতিপূরণই বা কিসের? তোমরা ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের একটা ব্যবসা নষ্ট করিয়াছ। অন্যান্য দেশের নজীর অনুযায়ী ন্যায্য উপায়ে আমরা সেই ব্যবসা আবার হস্তগত করিতে চাই। তাহার জন্য আবার ক্ষতিপূরণ কেন দিব? ইংরেজ বণিকদের প্রতিনিধিরা বলিতেছে, ক্ষতিপূরণটা ভারতীয় জাহাজ-কোম্পানীসমূহকে দিতে হইবে না, ভারতবর্ষের সরকারী টাকা হইতে দেওয়া হউক। কিন্তু সে টাকাও ত আমরাই ট্যাক্সের আকারে দিয়াছি।

—

কুম্ভমেলা

বৃহস্পতি মেষ রাশিতে আসিলে এবং চন্দ্রসূর্য্য মকর রাশিতে আসিলে প্রয়াগে কুম্ভমেলা বসে। বার বৎসর অন্তর ইহা হইয়া থাকে। ইহাতে প্রকৃত সাধু-সন্ন্যাসী কতকগুলি আসিয়া থাকেন, ভেকধারী সন্ন্যাসীর সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। তীর্থযাত্রী গৃহস্থ লোকদের সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী হয়। এবারকার কুম্ভের প্রধান দিন চারিটি—(১) ৩০শে পৌষ মকর সংক্রান্তি, (২) ১৫ই মাঘ অমাবস্যা, (৩) ২০শে মাঘ বসন্তপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী, এবং (৪) ১লা ফাল্গুন মাঘীপূর্ণিমা। তাহার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী লোক স্নান করিবে অমাবস্যার দিন। অনুমিত হইয়াছে, যে, সে দিন পঁচিশ লক্ষ লোক স্নান করিবে। বার বৎসর আগে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল তাহাতে স্নানকারীর সংখ্যা সরকারী অনুমান অনুসারে মকরসংক্রান্তিতে হইয়াছিল ১০ লক্ষ, অমাবস্যায় ২৫ লক্ষ এবং বসন্তপঞ্চমীতে ৫ লক্ষ।

পুলিশের দ্বারা শান্তি, সম্পত্তি ও প্রাণরক্ষার এবং স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীদের দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার সমুচিত বন্দোবস্ত হইয়াছে। রেল কোম্পানীরাও অন্য বারের চেয়ে এবার বেশী সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ভাড়া কমান উচিত ছিল; কিন্তু তাহা তাহারা কমায় নাই।

বিস্তৃত মেলা-ভূমি এবার তাড়িত আলোক দ্বারা আলোকিত হইবে। ইহা এবারকার নূতনত্ব।

—

স্বাধীনতা-লক্ষ্য ঘোষণা ও দমননীতি

কংগ্রেস স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ঘোষণা করায় বিলাতে ও ভারতে দমননীতি প্রয়োগের কথা উঠিয়াছে। তাহার প্রয়োগ অসম্ভব নহে। কিন্তু অদম্য লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে বাড়িয়া চলিতেছে। তাহাদের মধ্যে এরূপ লোকও আছেন, যাঁহারা মৃত্যুর নিমেষ পর্য্যন্ত দমিবেন না। মানুষের চেয়ে মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ আরও অদম্য। দমননীতির দ্বারা তাহা বিনষ্ট করা যায় না। দমননীতি অনেক সময় আগুনে ঘি ঢালার কাজ করে। গবর্ন্মেণ্টের অন্য কোন অস্ত্র আছে কিনা, তাহা রাজপুরুষেরা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। "স্বাধীনতার সংগ্রাম একবার আরম্ভ হইলে, রক্তাক্ত পিতা হইতে পুত্রের হস্তে নীত হইয়া, অনেকবার ব্যর্থ হইলেও, সকল স্থলেই জয়যুক্ত হয়", ইহা একটি ইংরেজী কবিতায় কথিত হইয়াছে। তাহার পংক্তিগুলি লাহোর কংগ্রেস-মণ্ডপে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত ছিল।

—

বিমান চালনে বাঙালী

কলিকাতায় বিমান চালনার প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার দাস পনর জন ইউরোপীয়কে পরাস্ত করিয়া প্রতিযোগিতার "কাপ্" পুরস্কার পাইয়াছেন।

—

"ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ"

আমেরিকার ভারতবন্ধু ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ নামক পুস্তকের মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ঐ পুস্তক বাজেয়াপ্তির হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। প্রধান বিচারপতি, অন্য এক জন ইংরেজ জজ এবং একজন মুসলমান জজের নিকট শুনানী হয়। আপীল না-মঞ্জুর হইয়াছে। প্রধান বিচারপতির মতে রাজদ্রোহ সম্বন্ধে আইন যেরূপ তাহাতে তিনি যেরূপ রায় দিয়াছেন তাহার বিপরীত রায় দেওয়া যায় না। কেহ যেন মনে না করেন, প্রধান বিচারপতি আইন বদলাইতে বলিয়াছেন, কিংবা গবন্মেণ্ট তাহা বদলাইবেন। আইন আরও কঠোর করা হইবে কি না, তাহারই অনুমানে হয়ত অনেকে লাগিয়া যাইবেন।

—

আগ্রা-অযোধ্যায় বিজ্ঞান পরিষদ

অধ্যাপক ডাক্তার মেঘনাদ সাহার প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আলোচনার জন্য আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে একটি বিজ্ঞান-পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের গবন্মেণ্ট ইহার খরচ দিবেন। ডাঃ সাহা প্রভৃতি যোগ্য বৈজ্ঞানিকদিগের পরিচালনায় ইহার দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতি আশা করা যায়।

—

"কর্ত্তার কি দয়া!"

গল্প আছে, এক গৃহস্থের ছেলেরা একটা চোরকে ধরিয়া খুব প্রহার করিতেছিল। বাড়ীর কর্ত্তা বৈষ্ণব ছিলেন। চোরের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তিনি ঘটনাস্থলে আসিয়া বলিলেন, "আরে, আরে, কৃষ্ণের জীব, মারিস্ নে।" তখন ছেলেরা নিবৃত্ত হইলে চোর ভাবিল কর্ত্তা বড়ই দয়ালু। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটা চুরি করেছে, কিছু শাস্তি ত হওয়া চাই। কি করব?" কর্ত্তা বলিলেন, "কৃষ্ণের জীব, গায়ে হাত তুলিস্‌নে। ওকে একটা চটের থলিতে পুরে নদীতে ফেলে দে।" চোর আঁৎকিয়া উঠিয়া বলিল, "কর্ত্তার কি দয়া!"

শ্রীমতী এনী বেসান্ত ও শ্রীযুক্ত শিবরাও কর্ত্তৃক সম্পাদিত নিউ ইণ্ডিয়া কাগজে নিম্নমুদ্রিত টিপ্পনীটি পড়িয়া আমাদের ঐ গল্পটি মনে পড়িল।

Citizen or Outlaw?—We are aware that now-a-days a man cannot be put outside the protection of the law. Yet we think that when a man refuses to pay taxes and practises civil disobedience, instead of distraining his goods, it would be far better merely to put him outside the protection of the law. He, who refuses to pay his share of the cost of the protection of which he takes advantage has no moral right to it, although the generosity of the citizens may allow him to share in the amenities they provide."

তাৎপর্য্য। "আমরা জানি আজ কাল কাহাকেও আইনের দ্বারা ব্যবস্থিত রক্ষণের শক্তির বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। তথাপি আমরা মনে করি, যখন কেহ ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে এবং নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন নীতি অবলম্বন করে, তখন তাহার সম্পত্তি ক্রোক না করিয়া তাহাকে কেবল আইন দ্বারা ব্যবস্থিত রক্ষা হইতে বঞ্চিত করিলে অনেক ভাল হইবে। যে সম্পত্তি রক্ষা, দেহরক্ষা ও প্রাণরক্ষার বন্দোবস্তের সুবিধা গ্রহণ করে, অথচ তাহার ব্যয়ের অংশ দিতে চায় না, সে ঐরূপে রক্ষিত হইতে ন্যায়তঃ অধিকারী নহে, যদিও পৌরজনের দয়া তাহাদের ব্যয়ে ব্যবস্থিত সুবিধা তাহাকে দিতে পারে।"

উদ্ধৃত কথাগুলির যুক্তি পরীক্ষা করা অনাবশ্যক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্রোকের পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত উপায়টি অনেক ভাল কেমন করিয়া হইবে? মাল ক্রোক ও নিলাম করিলে, মালিকের কেবল সম্পত্তি যায়। কিন্তু আইন তাহাকে রক্ষা করিবে না, এরূপ হুকুম দিলে, যে কেহ তাহার সব সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে পারে, তাহাকে কুকথা বলিয়া অপমান করিতে পারে, তাহাকে মারিতে পারে, তাহার নাক কান বা হাত পা কাটিয়া ফেলিতে পারে, তাহার প্রাণবধ পর্য্যন্ত করিতে পারে; অথচ এরূপ কিছু কেহ করিলে বা করিতে চাহিলে আদালতে তাহার বা তাহার আত্মীয়স্বজনের নালিশ করিবার বা কোন প্রতিকার পাইবার অধিকার থাকিবে না। ক্রোকে শুধু সম্পত্তি যায়, নিউ ইণ্ডিয়ার প্রস্তাবিত উপায়ে সম্পত্তি ত যাইতেই পারে, অধিকন্তু অপমান, প্রহার, অঙ্গহানি, এমন কি প্রাণনাশও ঘটিতে পারে। সুতরাং বলিতে হইতেছে, "নিউ ইণ্ডিয়ার কি দয়া!"

এখন বন্দবিলায় ট্যাক্স না দিয়া লোকে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন দ্বারা সত্যাগ্রহ করিতেছে। পূর্ব্বে গুজরাটের খেড়া জেলা, এবং বারদোলি ও চম্পারনে এইরূপ সত্যাগ্রহ হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের নেতারা বলিয়াছেন, সুবিধা মত দেশের নানা জায়গায় ট্যাক্স না দিয়া বা অন্য প্রকারে অহিংসভাবে আইন অমান্য করা হইতে পারে। এ অবস্থায় নিউ ইণ্ডিয়ার সদয় ইঙ্গিত ও প্রস্তাবটির সময়োপযোগিতার ও তাহার অন্তর্নিহিত করুণার গুণ সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন।

১২০-২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চৈতন্যের জন্ম

শ্রীনন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
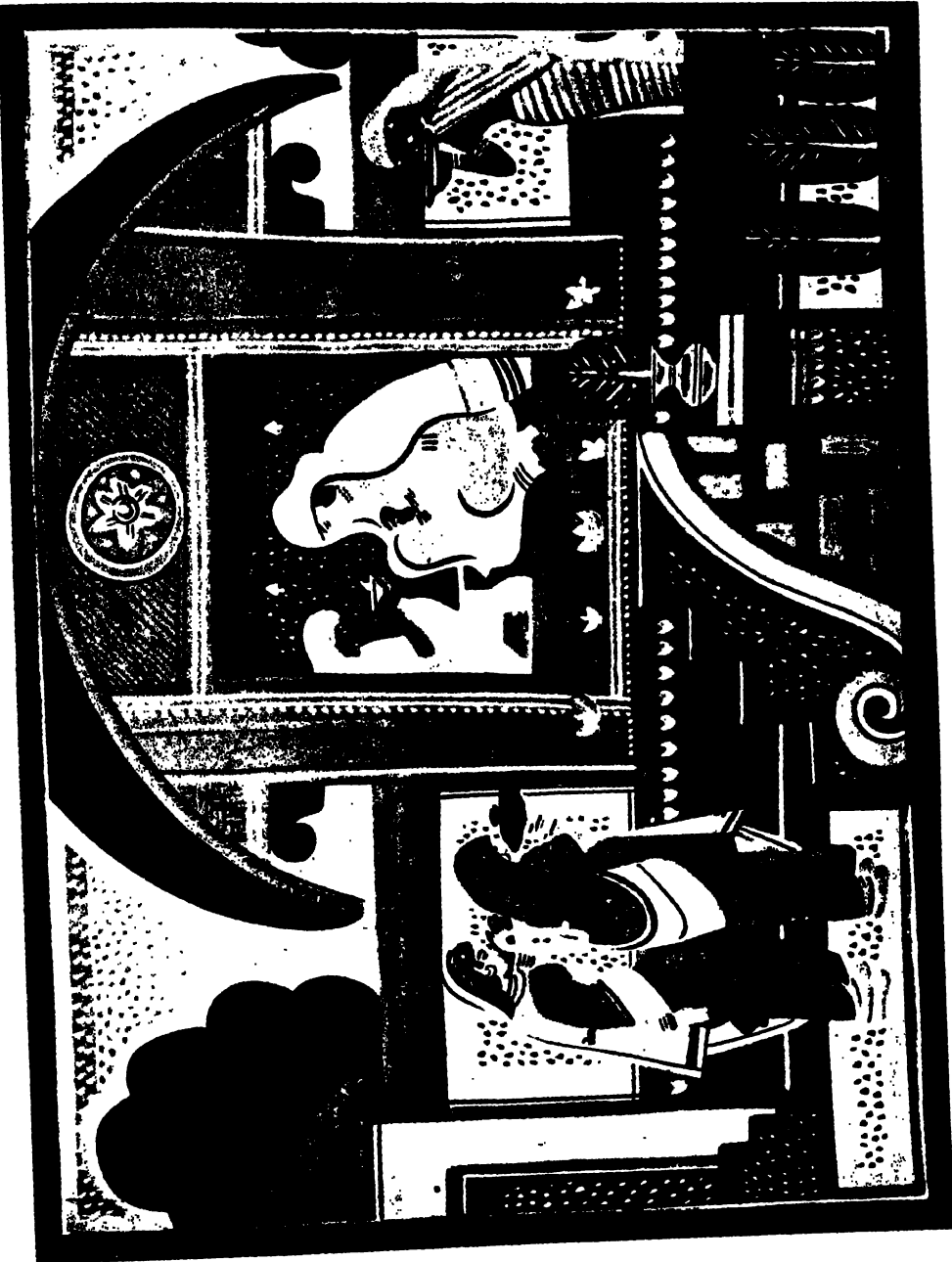
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৩৬

৫ম সংখ্যা

শঙ্করের অধ্যাস

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র-রচয়িতার নাম লইয়া অনেক গোলমাল। ব্যাসের রচিত বলিয়া এতগুলি গ্রন্থ আছে যে, কোন্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রকার, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। ভাগবতে বেদব্যাস নামে পরিচিত ব্যাসই যদি ব্রহ্মসূত্রকার হন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই পরাশরপুত্র বাদরায়ণ। ব্রহ্মসূত্রে অন্ততঃ সাতবার বাদরায়ণের নাম উল্লিখিত আছে। ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে ব্যাস বা বেদব্যাসের নামে কয়েকটী মতের অবতারণা করিয়াছেন। 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভাষ্যকার সর্ব্বদা আচার্য্য বলিয়াই দর্শনকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত উল্লেখ হইতে ডয়সেন সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সূত্রকার ব্যাস ও ভাগবতের বাদরায়ণ অভিন্ন। সূত্রকার যে নিজেই নিজের নাম সূত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত বা সন্দিগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই। অনেকের মতের সহিত যেখানে ঋষিগণের মতের অনৈক্য সেইখানে অথবা যেখানে তাঁহাদের প্রিয়মত প্রচার করা দরকার, সেইখানে তাঁহারা নিজ নাম দিয়া থাকেন। ইহাই প্রাচীন প্রথা। আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্রে এইরূপ কতকগুলি ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্কর যে সূত্রকারকে আচার্য্য অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই, কেন না তিনি অন্ততঃ দুইটী স্থানে বলিয়াছেন যে, আচার্য্য বাদরায়ণ ব্যতীত আর কেহই নন। সূত্রকার যে বাদরায়ণ ব্যতীত অন্য কেহ নন, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কোন কোন পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা আছে বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমানকালে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই এই দর্শনের প্রাচীনতম ভাষ্য বলিয়া প্রখ্যাত। ইহার ভাষ্য সর্ব্বদা সূত্রানুযায়ী।

শঙ্কর তাঁহার উক্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য অনেক সময় নানা শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "ইতি শ্রূয়তে বা স্মর্য্যতে"; শাস্ত্রের নাম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার উক্তির প্রামাণ্য স্বরূপ তিনি কোন্ শাস্ত্রকে অবলম্বন করিতেন, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার উদ্ধৃত বচনাবলী

একত্র করিলে বুঝা যাইবে, তিনি কোন্ শাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। অধিকন্তু, এই বচনগুলির সাহায্যেই সহজেই তাঁহার লিখিত গ্রন্থ-নিচয়ও নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে। শঙ্করাচার্য্য এইভাষ্যে পুনরুক্তি সমেত ২,৫২৩টী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; তন্মধ্যে ২.০৬০টী ঔপনিষদিক বচন, ১৫০টী বৈদিক এবং ৩১৩টী বেদেতর গ্রন্থোদ্ধৃত বচন। শঙ্করাচার্য্য মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রীয় বচনের অধুনা প্রচলিত বচন হইতে বিভিন্ন পাঠও দিয়াছেন। পাঠের একটু ইতর বিশেষ করিলে বচনগুলি একাধিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে ঐ শাস্ত্রীয় বচন যে কোন্ গ্রন্থের, তাহার নির্ণয় করা কঠিন।—ভয়সেনের 'বেদান্ত'

শঙ্কর লিখিতেছেন—"যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ, তদ্-ভেষজম্"—তৈত্তিরীয়-সংহিতা ২।২।১০।২। অথচ কাঠকে আছে—"মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চ অবদৎ, তদ্ভিষজমাসীৎ।" মৈত্রায়ণী-সংহিতায় আছে—"আপো বৈ শ্রদ্ধঃ", অথচ শঙ্কর দিতেছেন—"শ্রদ্ধা বা আপঃ—তৈত্তিরীয়-সংহিতা ১।৬।৮।১। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৩।৩।১)—"সপ্ত বৈ শীর্ষং প্রাণাঃ।" বা পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ (২২।৪।৩)—"সপ্ত শিরসি প্রাণাঃ।" শঙ্কর—"সপ্ত বৈ শিষন্যাঃ প্রাণাঃ।" ইত্যাদি

এইরূপ বিভিন্ন পাঠের বচনগুলির আকরস্থান বিভিন্ন শাখা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। শঙ্কর মাঝে মাঝে অন্যান্য শাখা হইতে বচনসকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ স্থলেই তৈত্তিরীয় শাখা হইতেই বচন দিয়াছেন।

বেদান্তসূত্র-ভাষ্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শঙ্কর এক "অধ্যাসভাষ্য" লিখিয়া অদ্বৈতমতের মূলভিত্তি কি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ভাষ্যে তিনি বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্—বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য তদ্ধর্ম্মাণাং চাধ্যাসঃ".

আমরা যখন "আমার দেহ", "আমার মন" "আমার হস্ত" প্রভৃতি বাক্যের ব্যবহার করি, তখন আমাদের দেহ, মন ও হস্ত প্রভৃতির অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র "আমি" পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেন না, যদি "আমি"এবং দেহ, মন এক পদার্থ হইত, তাহা হইলে মন দেহাদির সহিত সম্বন্ধ-সূচক 'আমার' পদ ব্যবহৃত হইতে পারিত না। এই 'আমি'ই দর্শনশাস্ত্রের 'চিদাত্মা' এবং দেহ, মন ইত্যাদি "আমি" ভিন্ন অনাত্ম পদার্থ। শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগকে 'উপাধি' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই আমি বা আত্মা 'বিষয়ী' বা 'অস্মৎপ্রত্যয়বাচ্য' এবং তদতিরিক্ত যাহা-কিছু সমস্তই 'বিষয়' বা 'যুষ্মৎপ্রত্যয়বাচ্য।' তমঃ ও প্রকাশ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, সেইরূপ অস্মৎপ্রত্যয়বাচ্য-বিষয়ী ও যুষ্মৎপ্রত্যয়বাচ্য বিষয়ও পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব। যেমন, যাহা অন্ধকার তাহা আলোক নয়, সেইরূপ যাহা বিষয়ী তাহা বিষয় নয়। আর যদি স্বীকার করা যায়, বিষয়ীর ভাব বিষয়ের ভাবের বিরোধী, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিষয়ীর ধর্ম্মও বিষয়ে বিদ্যমান নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চিদাত্মক অস্মদাখ্য বিষয়ীতে যুষ্মদাখ্য বিষয়ের অধ্যাস বা আরোপ করা অথবা বিষয়কে বিষয়ী বোধ করা রূপ ভ্রম হওয়া যুক্তিসহ না হইলেও, লোক-ব্যবহারে "মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত" সচরাচর সত্য যে বিষয়ী তাহার সহিত মিথ্যা যে বিষয় তাহার মিথুনীকরণ হইয়া থাকে; ইহা 'নৈসর্গিক'। কাজেই বিষয় ও বিষয়ী 'অত্যন্ত বিবিক্ত' হইলেও বিষয় ও বিষয়ীকে পৃথক্ না করিয়া লোক-ব্যবহারে একের ভাব ও ধর্ম্ম অন্যে সহজেই আরোপিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই আমরা 'অহমিদম্' 'মমেদম্'—এই আমি, ইহা আমার, এইরূপ বলিয়া থাকি। কখন কখন শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, কখন বা দৃষ্টিদোষে একমাত্র চন্দ্রকে দুইটী চন্দ্র দেখা যায়—এইরূপে এক বস্তুতে অন্যবস্তুর আরোপ হইয়া থাকে। এই আরোপের নাম অধ্যাস। বস্তুনিচয়ের এই ভ্রান্তিমান আরোপ এবং চিদাত্মার সহিত বাহ্যজগতের সম্বন্ধ অসম্ভব নয়। দেহাদিতে আত্মবোধ ভ্রান্তির ফল। আত্মা প্রকাশক, দেহাদি প্রকাশ্য। প্রকাশক ও প্রকাশ্য, দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক নয়। কিন্তু ব্যাবহারিক হিসাবে যখন দেহাদিতে আত্মবোধ হয়, তাহা তখন অধ্যাস। শঙ্কর নিজ ভাষ্যে বিষয়টী প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশদ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—অবিষয় যে প্রত্যগাত্মা তাহাতে বিষয়-ধর্ম্মের

কিরূপে অধ্যাস হইতে পারে? সকলেই যখন পুরোবস্থিত বিষয়েই বিষয়ান্তর অধ্যাসিত করিয়া থাকে, তখন আপনি যে প্রত্যগাত্মার কথা বলিতেছেন, তাহা যুষ্মৎপ্রত্যয়বাচ্য হইতে বিচ্ছিন্ন এবং তাহা অবিষয়।

উত্তর—ইহা নিতান্ত অবিষয়ও নয়। কেন না, ইহা অস্মৎ-প্রত্যয়বিষয়। ভাল করিয়া বুঝিলে দেখিবে, ইহা 'সাক্ষী' নয়, ইহা কেবল 'কর্ত্তা'; অর্থাৎ ব্যক্তিগত আত্মা বিষয়-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া অহংপ্রত্যয় বিষয় হইয়াছে। প্রত্যগাত্মা যে অপরোক্ষ নয়, ইহা দ্বারাই প্রত্যগাত্মার সম্যক্ অর্থ প্রতিভাত হইতেছে। আর যে বিষয়ে বিষয়ান্তর আরোপিত হইবে, তাহা যে আমাদের পুরোভাগে থাকিবেই, এরূপও নয়; যেমন মূর্খলোকেরা আকাশে পৃথিবীর বর্ণ আরোপ করিয়া থাকে। এই প্রকারেই আত্মায় প্রত্যগাত্মার এবং অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস হইয়া থাকে।

আমরা এই অধ্যাসবশতঃ নানারূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা এই অধ্যাসকে অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। যতদিন অবিদ্যা-পাশ ছিন্ন না হয় ততদিন দুঃখের শেষ হয় না। মানুষ অবিদ্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে 'মুক্তি' পাইয়া থাকে। অবিদ্যাই সকল অনর্থের মূল। বিচার ও শাস্ত্রপ্রদর্শিত উপায় দ্বারা অবিদ্যার দূরীকরণের জন্যই বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। ইহাই বেদান্তদর্শনের মূলভিত্তি। ইহাই অবলম্বন করিয়া শঙ্কর নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। এই অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে শঙ্করের মত স্থাপিত হইতে পারে না।

শঙ্করের অধ্যাসভাষ্য অতি কঠিন। কিন্তু অধ্যাস না বুঝিলে তাঁহার ভাষ্য কিছুই বুঝা যায় না। আমরা দর্শন হিসাবে অধ্যাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অধ্যাসের অর্থ মিথ্যা আরোপ, জড়ের ধর্ম্ম চৈতন্যের [illegible] ও চৈতন্যের ধর্ম্ম জড়ের উপর আরোপিত হইয়া [illegible] জগদ্-ভ্রম হইয়া থাকে। জগৎ বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই [illegible]। ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম হয়। এই ভ্রম [illegible]র ধর্ম্ম, চৈতন্যের উপর ও চৈতন্যের ধর্ম্ম জড়ের উপর [illegible]ত হইয়াই হয়। কিন্তু চৈতন্য ও জড় কোথা হইতে আসিল? চৈতন্য আত্মার ধর্ম্ম। যাহা চেতনের বিপরীত, তাহাই জড়ত্ব। জড়ত্ব জড়ের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী পৃথক্ পদার্থ নয়। আত্মাই ব্রহ্ম। ইহা শ্রুতিরই তাৎপর্য্য।

শ্রুতি বলেন, কেবল মাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই, এবং আত্মাই ব্রহ্ম। শ্রুতি ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ, আনন্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম সৎ, চৈতন্যময় ও ব্রহ্মে আনন্দ আছে। কিন্তু ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ এবং চৈতন্য- ও আনন্দময়। ব্রহ্মকে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে সৎ, চিৎ ও আনন্দের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাতেই জগদ্-ভ্রম হইয়া থাকে। জগদ্-ভ্রম অধ্যাসবশতঃ হয়। অধ্যাসের কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা ও অজ্ঞান একার্থক। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইবার কারণ যেমন অজ্ঞান, তেমনই ব্রহ্মে জগদ্-ভ্রম হইবার কারণও অজ্ঞান। অজ্ঞান কেমন করিয়া হয়, আমরা বলিতে পারি না; অজ্ঞান-বশতঃই যে ভ্রম হয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

দর্শন-শাস্ত্র সকলের মূলে কারণ অনুসন্ধান করে। কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে সর্ব্ব-কারণের কারণটী অনুসন্ধান করিবার দিকেই দর্শনের প্রবৃত্তি। আমরা যতক্ষণ না সর্ব্বকারণের কারণটী পাই ততক্ষণ আমাদের সংশয় থাকে। আমাদের অনুভূতি বা জ্ঞানে যাহা আসে, দার্শনিক তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। দার্শনিক তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে যতক্ষণ না সর্ব্বকারণের কারণ পর্য্যন্ত উপনীত হন, ততক্ষণ কিছুতেই সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। একমাত্র কারণই সৎ, কার্য্য অসৎ। আমরা যদি বলি, অজ্ঞানই জগতের কারণ, আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন হয়, অজ্ঞানের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর না পাইলে অজ্ঞানের স্বরূপ আমাদের বোধগম্য হইতে পারে না। কোন্ ভিত্তির উপর অজ্ঞান দাঁড়াইয়া আছে, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিলে, অজ্ঞান যে জগতের কারণ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। রজ্জুতে আমাদের সর্প-ভ্রম হয়, তাহা যে অজ্ঞানবশতঃ হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সর্প আমরা

পূর্ব্বে দেখিয়াছি,রজ্জু আকৃতিতে সর্পসদৃশ। সর্পে আমাদের আশঙ্কার কারণ আছে। অন্ধকারে রজ্জুর অপরাপর বিশেষত্ব প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কেবল ইহার সর্পসদৃশ ভাবটী যখন আমাদের বোধগত হয়, তখন পূর্ব্ব-সংস্কারবশতঃ মনোমধ্যে ভীতির উদয় হয় ও সেই ভীতিজনিত মোহ-বশতঃ আমাদের রজ্জুতেই সর্পভ্রম হইতে পারে। এই প্রকার যত ভ্রম, তন্মূলে এই ভাবের বিশিষ্ট কারণ থাকে। ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের মূলে এই ভাবের বিশিষ্ট কারণ আছে কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। যদি এই ভাবের কারণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, জগদ্ভ্রম অজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে। যদি স্বীকার করা যায় যে, ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের মূলে এই ভাবের বিশিষ্ট কারণ আছে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ব্রহ্ম ছাড়া এমন কোন কিছু আছে, যাহা জগৎসদৃশ ও যাহার ব্রহ্মের সহিতও সাদৃশ্য আছে। আত্মার ব্রহ্মসম্বন্ধে ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আছে, আমরা ভ্রমবশতঃ ব্রহ্মের উপর সেই বস্তুর ধর্ম্মের অধ্যাস করিয়া থাকি। তাহা হইলে জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মও আছে, জগৎও আছে এবং ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়েরই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে; ভ্রমবশতঃ আমরা ব্রহ্মকেই জগৎ মনে করিতেছি। কিন্তু ব্রহ্মও জগৎ এক নহে, আমাদের ভ্রমবশতঃ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সুতরাং জগদাকারে আমরা ব্রহ্মকেই দেখিতেছি। ভ্রম বিদূরিত হইলে ও তৎফলে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পাইলে, আমরা স্বরূপতঃ ব্রহ্মকেই দেখিব, এবং ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম আর সম্ভব হইবে না। কিন্তু শঙ্করের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্য নহে, শঙ্করও স্বয়ং এ কথা স্বীকার করেন না, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, জগৎ বা জগদাকারের কিছুই নাই। আছেন কেবল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া অপর কোন আত্মারও অস্তিত্ব নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতটাই এখন আলোচ্য।

ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে, জগতের সত্তা স্বীকার করা হয় নাই। অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মারও পারমার্থিক সত্তা অস্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এই শ্রুতিবাক্যের সহিত কাহারও বিরোধ নাই। ব্রহ্ম সৎ, কেন না, ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, কারণ একমাত্র চৈতন্যেরই সত্তা আছে। আনন্দের সহিত চৈতন্যের নিত্যসম্বন্ধ। আনন্দ বাদ দিলে চেতন-সত্তার কিছুই থাকে না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, অর্থাৎ সকল বৈদান্তিকই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত, তৎসম্বন্ধে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু জগৎ বা অবিদ্যা আসিল কোথা হইতে? যাহার বিদ্যমানতা আছে, তাহা সৎ, যাহার বিদ্যমানতা নাই তাহা অসৎ। সৎ-এর আর একটী বিশেষণ এই যে, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। একমাত্র ব্রহ্মই অপরিণামী, সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মই সৎ। জগৎ পরিণামী, সুতরাং জগৎ সৎ নহে। জগতের অস্তিত্ব প্রতীয়মান, বস্তুতঃ জগতের অস্তিত্ব নাই, সেই হিসাবে জগৎ অসৎ। কিন্তু জগৎ প্রতীয়মান হইবার পক্ষে কারণস্বরূপ অবিদ্যা, সুতরাং অবিদ্যা অসৎ নহে। কিন্তু অবিদ্যা নিত্যপরিণামী এবং বিদ্যার আবির্ভাবে, অবিদ্যা অদৃশ্য হয়, সুতরাং অবিদ্যা সৎ নহে। যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, তাহা অনিবার্য্য। অতএব অবিদ্যা অনির্ব্বাচ্য। অবিদ্যাকে মায়াও বলা হয়। এই মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ অবিদ্যার ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; বিদ্যা ও অবিদ্যা ব্রহ্মেরই অংশভূত। আলোকের সহিত অন্ধকারের যে সম্বন্ধ, বিদ্যার সহিত অবিদ্যারও সেই সম্বন্ধ। যেমন অন্ধকারের বিনাশে আলোকের উদয় ও আলোকের বিনাশে অন্ধকারের উদয় হয়, তদ্রূপ অবিদ্যার তিরোধানে বিদ্যার আবির্ভাব ও বিদ্যার তিরোধানে অবিদ্যার আবির্ভাব হয়। বিদ্যার আবির্ভাবে তত্ত্বের প্রকাশ হয় ও অবিদ্যার আবির্ভাবে মিথ্যাভূত জগতের প্রকাশ হয়। যখন তত্ত্বের প্রকাশ হয়, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই সত্তা উপলব্ধি হয় না। সুতরাং তখন কোনরূপ ভেদজ্ঞান থাকে না। কিন্তু যখন মিথ্যাভূত জগতের প্রকাশ হয়, অর্থাৎ যখন বিদ্যার তিরোধানে অবিদ্যা আত্মাকে আশ্রয় করে, তখনই অভেদাত্মক জ্ঞান বিষয়ও বিষয়িভেদে দুই ভাগে বিভক্ত হয় অর্থাৎ তখন আত্মা বিষয়িরূপে পরিণত হইয়া, বিষয়রূপ জগৎকে সম্মুখে অনুভব করে।

শ্রুতি 'বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ' বাক্য দ্বারা দুই প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানের দ্বারা চেতন ও অবিজ্ঞানের দ্বারা জড় পদার্থ বুঝায়। বাস্তবিক জড় ও চেতন-ভেদে স্বতন্ত্রভাবে বিবিধ পদার্থ নাই। আত্মারই জড়বুদ্ধি ও চৈতন্যবুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই দ্বিবিধ বুদ্ধি পারমার্থিক নহে। অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মার পারমার্থিক জ্ঞান দ্বিখণ্ডিত হইয়া, দ্বিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। অবিদ্যা তিরোহিত হইলে জ্ঞানের দ্বিবিধ ভাব বিলুপ্ত হয়, অর্থাৎ ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। জ্ঞানের একটী ধর্ম্ম এই যে, ইহা আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে সংযোগ সাধন করে। কিন্তু আত্মায় ও অনাত্মায় আলোক-অন্ধকার প্রভেদ। এই পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মী আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ সূচনা, আপাততঃ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রথমে এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া, পরিশেষে বলেন যে, আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ-সূচনা পারমার্থিক ভাবে অসম্ভব বটে, কিন্তু ব্যাবহারিক ভাবে সম্ভব হইয়াছে। আত্মা ও অনাত্মার পারমার্থিক সম্বন্ধ না থাকিলেও ব্যাবহারিক ভাবে ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অনাদিসিদ্ধ। যাহা অনাদি-সিদ্ধ, তাহার অন্ততঃ ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

যদি একটীর পারমার্থিক সত্তা ও আর একটীর ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে? পারমার্থিক সত্তা যথার্থ সত্তা, ব্যাবহারিক সত্তার কোন যাথার্থ্য নাই। যাহার পারমার্থিক সত্তা আছে, ব্যাবহারিক সত্তা তাহারই প্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে। এ ছাড়া আমরা ব্যাবহারিক সত্তার অন্য কোনরূপ সার্থকতা দেখি না।

কিন্তু যদি অনুমান করা যায় যে, পারমার্থিক সত্তার অজ্ঞান বা ভ্রমবশতঃ ব্যাবহারিক সত্তার সৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ আত্মাকে অবিদ্যা আশ্রয় করিয়া অনাত্মার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে আত্মার উপর পরিণাম দোষ অর্শে। কিন্তু শ্রুতি আত্মাকে অপরিণামী বলিয়াছেন। আত্মা যদি অপরিণামী হয়, তাহা হইলে আত্মা কেমন করিয়া অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইতে পারে? বিশেষতঃ অজ্ঞানের অপূর্ণকে আশ্রয় করাই সম্ভব, পূর্ণকে অজ্ঞান আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মা যে অপূর্ণ নহে, তাহার কারণ এই যে, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। অপূর্ণ কাহাকে বলে? যাহা অংশ তাহাই অপূর্ণ, অথবা যাহাকে আত্মরক্ষার জন্য অপর কিছুর উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাই অপূর্ণ। আত্মা কোন কিছুরই অংশও নহে এবং তাঁহাকে আত্মার রক্ষার জন্য অপর কিছুরই উপর নির্ভর করিতেও হয় না। সুতরাং আত্মাকে অজ্ঞান আশ্রয় করিতে পারে না। বিবরণাচার্য্য প্রভৃতি যে ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যদি অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জগতের কারণ হয়, যাহা হইলে ভামতীকার যে জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু জীব যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হয় তাহা হইলে জীবেরও পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য জীবের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না। তিনি বিবরণাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মকেও অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন না, আবার ভামতীকারের ন্যায় জীবকেও অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন না। তিনি এ সম্বন্ধে এক সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম বিষয়ও হইতে পারেন না, বিষয়ীও হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার মতে অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মা বিষয়। 'আমি' জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে বুঝা যায়, তাহাই অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মা এবং তাহা 'আমি'-জ্ঞানের বিষয়। এইরূপ কৌশল দ্বারা, ব্রহ্মকে বিষয়-বিষয়ীর ধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল এবং জীবের পারমার্থিক সত্তাও স্বীকার করা হইল না।

অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মা বিষয়। কাহার বিষয়? 'আমি' জ্ঞানের বিষয়। 'আমি' জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? অবিদ্যা হইতে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মা ব্রহ্মের বিষয় নহে। অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারে না, সুতরাং অবিদ্যাসম্ভূত যাহা, তাহা ব্রহ্মের বিষয় হইতে পারে না। 'অহংজ্ঞান' ব্রহ্মও নহে, ব্রহ্মসম্ভূতও নহে। অহংজ্ঞান অবিদ্যাসম্ভূত। অবিদ্যা বা মায়া ব্রহ্মের অংশ বটে, কিন্তু ব্রহ্ম তাহাতে লিপ্ত

নহেন, অর্থাৎ তিনি অবিদ্যাতে আসক্তিশূন্য। গীতায়ও এইরূপ ভাবের কথা আছে। গীতায় আছে,—

"অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।"

সাংখ্যের মতে অহঙ্কারের উদ্ভব প্রকৃতি হইতে। সেইরূপ বেদান্তের মতে অহংজ্ঞানের উদ্ভব অবিদ্যা হইতে। যেমন প্রকৃতি একাকী অহঙ্কারের সৃষ্টি করিতে পারে না, পুরুষের সংসর্গে অহঙ্কারের সৃষ্টি করে, সেইরূপ অবিদ্যা ব্রহ্মের সান্নিধ্যে 'অহংজ্ঞানের' সৃষ্টি করে। ব্রহ্ম তাহাতে কোনরূপ লিপ্ত বা আসক্ত থাকেন না বা ব্রহ্মের স্বরূপের কোন ব্যতিক্রমও হয় না।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অধ্যাস-ভাষ্যে অপূর্ব্ব প্রতিভার পরি . দিয়াছেন। তিনি সকল দিক্ বজায় রাখিয়া, অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক, পূর্ণভাবে কেমন তাঁহার অদ্বৈতবাদটী সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার এই ভাষ্য উত্তমরূপে না বুঝিলে তাঁহার অদ্বৈতবাদ অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট বলিয়া বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা।

শঙ্করাচার্য্যের মতটী এক শ্রেণীর বৌদ্ধ মতের সদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। এই শ্রেণীর বৌদ্ধেরা অনাত্মবাদী। শঙ্করাচার্য্যও প্রকারান্তরে অনাত্মবাদী ইহাও মনে হইতে পারে। অনাত্মবাদী বৌদ্ধদিগের মতে নির্ব্বাণ সাধিত হইলে কিছুই থাকে না। মনে হইতে পারে, শঙ্করাচার্য্যের মতে নির্ব্বাণ বা মুক্তিতে তাহাই হয়। বিবরণাচার্য্য প্রভৃতির মতে জীব ও ব্রহ্মে কোনও প্রভেদ নাই। ব্রহ্মই অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জীবাকারিত হন। অবিদ্যা তিরোহিত হইলেই ব্রহ্মের জীবভাব বিদূরিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম অজ্ঞানমুক্ত হন। অজ্ঞানমুক্ত হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভামতীকারের মতে জীবই অবিদ্যার আশ্রয়। অবিদ্যা অন্তর্হিত হইলে সে স্থলে জীবের নিকট ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে প্রতীত হ'ন। ভামতীকার শাঙ্কর ভাষ্যেরই টীকাকার, সুতরাং তিনিও অদ্বৈতবাদী। জীবভাব যে ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ, তাহা তাঁহার অভিপ্রায়। তবে জীব ব্রহ্মের অংশরূপে অনাদিকালাবধি অবস্থিত। যাহা অনাদিকালাবধি অবস্থিত, তাহার স্থিতি সুতরাং অনন্তকালব্যাপী। রামানুজাচার্য্যের মতে ঈশ্বর জীব হইতে পারেন না। মোক্ষ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে। ঈশ্বরের প্রতি দাস্য ভাবে জীবের চরিতার্থতা। কিন্তু এইরূপ মনে হইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্যের মতে জীব ব্রহ্মও নহে, এবং জীবের পারমার্থিক অস্তিত্বও নাই। জীব অবিদ্যাসম্ভূত; সুতরাং জীবত্ব মিথ্যা বা অলীক। যাহা অবিদ্যা বা অজ্ঞানসম্ভূত এবং সুতরাং অলীক, তাহার জ্ঞানের উপর নির্ভর করা চলে না। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও অনাসক্ত, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীবভাবের কোন সম্পর্ক নাই, জীব ব্রহ্মকে জানিতেও পারে না, এবং ব্রহ্মে জীবের চরিতার্থতাও হইতে পারে না। ইহা এক প্রকার শূন্যবাদ। জীবন ও সংসার যদি দুঃখেরই মূল হয়, তাহা হইলে এই মতের সার্থকতা থাকে। এই মতে নির্ব্বাণ বা মুক্তি সাধিত হইলে সবই শূন্য হইয়া যায়। আমি যদি না থাকিলাম, ব্রহ্ম থাকিলেন, কি না-থাকিলেন তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমি থাকিলে তবে জগৎ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বা মঙ্গলে আমার সার্থকতা হইতে পারে, নচেৎ এ সকল থাকিল বা গেল, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, আমি পারমার্থিক ভাবে জীব নহি, আমি অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা অধ্যাস, তাহা হইলে প্রকারান্তরে শূন্যবাদই স্বীকার করা হয়। যাঁহারা শাঙ্কর ভাষ্যের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝেন, তাঁহাদের শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহার বৌদ্ধত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।

কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিতে পারেন যে, তিনি বাস্তবিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নহেন, তবে তিনি পূর্ণাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে গিয়া বিশেষ গোলযোগে পড়িয়া উক্ত কৌশলের অবতারণা করেন ও তাহাতে তাঁহাকে একটু গোঁজ দিতে বাধ্য হইতে হয়। তিনি কৌশল অবলম্বন করিয়াও সকল দিক্ বজায় রাখিতে পারেন নাই। তাহার উদ্দেশ্য শূন্যবাদ প্রচার করা নহে, পূর্ণাদ্বৈতবাদ প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

বাস্তবিক পূর্ণাদ্বৈতবাদই যে সম্পূর্ণরূপে সমীচীন ও সঙ্গত, তাহা বিশিষ্ট দার্শনিকদিগের মত। আমরা পূর্ণাদ্বৈতবাদ ছাড়া অন্য কোনও মতকে যুক্তিসঙ্গত

বলিয়া বুঝাইতে পারি না। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পারমার্থিক ভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারি না। যদি বলা যায়, জীবসকল পরস্পর স্বতন্ত্র, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরস্পর স্বতন্ত্র জীবসকলের পরস্পর সম্বন্ধ-সূচনা কেমন করিয়া হইতে পারে? অর্থাৎ পরস্পর স্বতন্ত্র জীবসকল পরস্পরের সম্বন্ধে আসে কেমন করিয়া? একজন আর একজনের সহিত আলাপ করিতে পারে, তাহার কথা শুনিতে পায়, তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে কেমন করিয়া? কি এমন সংযোগসূত্র আছে, যাহা আমাদের সকলের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে? কোন সংযোগসূত্র ব্যতীত যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ-সূচনা হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণাতীত। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে বাধ্য হই যে, এমন কোন বস্তু নিশ্চয়ই আছে, যাহা সাধারণ তত্ত্বরূপে আমাদের সকলেরই মধ্যে অনুস্যূত আছে। কেবল জীব-সকলই যে পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে আসে, তাহা নহে; এই পরিদৃশ্যমান জগৎও আমাদের সম্বন্ধে আসে এবং আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতের সম্বন্ধে আসি। বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, সকলেরই সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ব্যোমমার্গে বিচরণশীল নক্ষত্রপুঞ্জও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, আমরা তাহাদের গতি-নির্দ্ধারণেও সমর্থ হই, সমুদ্রপথে অর্ণবযানে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের সাহায্যে দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারি। সুতরাং নক্ষত্রাবলীর সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ সূচনাকার্য্যে আমরা কোন্ সূত্রের সাহায্য পাই? আমরা কি অনুমান করিতে বাধ্য হই না, এমন কোন সাধারণ সূত্র সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অনুস্যূত আছে, যাহা এই বিশ্বের প্রত্যেক অংশের সহিত অপর অংশের সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে? যদি এমন কোন সাধারণ সূত্র থাকে, তবে তাহার বিশ্বের কোন অংশের সহিত পার্থক্য থাকিতে পারে না। কারণ, সকল অংশেরই সহিত আবার তাহার সম্বন্ধ আছে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা সকল অংশের মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া, বিশ্বের সকল অংশের পরস্পর সম্বন্ধ সূচনা করিতে পারিত না। আমি যে তোমার কথা শুনিতে পাই, বায়ুমণ্ডল তোমার ও আমার মধ্যের ব্যবধানটীকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে তাই, সূর্য্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি যে ব্যোমমার্গে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া আবর্ত্তিত ও বিঘূর্ণিত হইতেছে, ঈথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থ বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাই। মধ্যে সংযোগ-সূত্র না থাকিলে এক সাধারণ সম্বন্ধ সূত্র বিশ্ব ব্যাপিয়া, বিশ্বের সকল অংশের মধ্য দিয়া অনুস্যূত না থাকিলে কখনই বিশ্বের অংশ-সকল নিয়মবদ্ধ থাকিয়া ও পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিত না। এই সংযোগ-সূত্রটী গীতায় সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গীতা শ্রুতিরই প্রতিধ্বনিস্বরূপ বলিতেছেন,—

> বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
> সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

পুনশ্চ—

> 'যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।'

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে একেরই সত্তা সূচনা করিতেছে, এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তা যে সমস্ত বিশ্বমধ্যে অনুস্যূত তাহা প্রাচীন হিন্দুঋষিগণ কতপূর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব গ্রন্থে, তারকাসুর-প্রপীড়িত দেবতাগণের ব্রহ্মার স্তুতি মধ্যে লিখিত আছে:—

> নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
> গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্‌ভেদমুপেয়ুসে॥

ইহা অপেক্ষা অদ্বৈতবাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কি হইতে পারে? শ্লোকটির 'প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে' শুধু এই কথাটীর উপর যদি লক্ষ্য রাখা যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, কালিদাস শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

রথযাত্রা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

একটি ছোট ঘর। দেয়ালে কয়েকখানা অল্প দামের ছবি। একখানি ছবি ধ্রুবের, বনে বালক তপস্যা করিতেছেন। আর একখানা নৃসিংহ মূর্ত্তির, স্তম্ভ ভেদ করিয়া নরসিংহ বাহির হইতেছেন, গদাহস্তে ভ্রূকুটি-কুটিল নয়ন, ভীমদর্শন হিরণ্যকশিপু, বদ্ধাঞ্জলি অবনত মস্তক বালক প্রহ্লাদ। অপর ছবিতে ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, অর্জ্জুন গাণ্ডীবে শরসংযোগ করিয়া পিতামহের পিপাসানিবৃত্তি করিবার জন্য পাতাল ভেদ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অন্য ছবিতে বল্কল ধারণ করিয়া বনে যাইতেছেন, পুরবাসিগণ রোদন করিতেছে। একখানি জলচৌকির উপর কতকগুলি ঔষধের শিশি, তাহার পাশে বেদানা ও কমলা লেবু। কুলুঙ্গীতে একটি ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছে। ঘরের মাঝখানে তক্তপোষে বিছানা পাতা, তাহার উপরে শয়ন করিয়া তের বৎসরের বালিকা অমৃতা। অমৃতা সুন্দরী, কিন্তু এখন শীর্ণ, রোগক্লিষ্ট মূর্ত্তি, মুখখানি ম্রিয়মাণ পদ্মের মত, চুল আলুথালু, কপালের উপর পড়িয়াছে. চক্ষু বসিয়া গেলেও উজ্জ্বল, হাতের শিরা দেখা যাইতেছে। শিয়রে বসিয়া অমৃতার দিদিমা, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছেন, চুল সরাইয়া মাথার পিছনে গুছাইয়া দিতেছেন। ঘরের মেঝেতে বসিয়া অমৃতার মা. তাঁহার পাশে তাঁহার ছোট জা।

অমৃতার পিতা আপিসের পোষাক পরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার ভাদ্রবধূ ঘোমটা টানিয়া দিলেন। অমৃতার দিদিমা শয্যা হইতে উঠিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন অমৃতার পিতা সেইখানে উপবেশন করিলেন। অমৃতা নিজের হাত তাঁহার হাতের উপর রাখিল। তিনি এক হাতে তাহার হাত ধরিয়া আর এক হাত তাহার মাথায় দিলেন।

অমৃতা। বাবা, তুমি বেরুচ্ছ ?

বাবা। হাঁ মা। যদি পারি ত সকাল সকাল ফিরে আসব। তুমি এখন কেমন আছ ?

অমৃতা। এখন ভাল আছি। তোমার সকাল সকাল আসবার কি দরকার ? (ঘড়ির দিকে চাহিয়া) দশটা বাজে, তুমি যাও, নইলে তোমার দেরী হবে।

বাবা। এই যে যাই।

তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ভাদ্রবধূ ঘোমটা খুলিলেন। দিদিমা আবার অমৃতার শিয়রে বসিলেন।

দিদিমা। অমী, এখন তোমার কোন কষ্ট নেই ?

অমৃতা। না, দিদিমা। আগে আমার গাঁটে গাঁটে যেন এঁটে বেঁধেছিল, ব্যথায় যেন ফেটে যাচ্ছিল। এখন যেন বাঁধন একে একে খুলে দিচ্ছে, আর কোন যন্ত্রণা নেই।

অমৃতার মা ও দিদিমা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। অমৃতার মা'র চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

দিদিমা। ছোটমেয়ে, তুমি একবার অমীর কাছে বস'বে ? আমি ঠাকুরঘরের শিকলটা দিয়ে আসি।

অমৃতার খুড়ীমা। হাঁ মা, আমি ত বসে' রয়েছি।

দিদিমা উঠিয়া গেলেন। খুড়ীমা উঠিয়া আসিয়া অমৃতার মাথার কাছে বসিতে যাইতেছেন—

অমৃতা। তুমি ওখানে বসো না, খুড়ীমা, আমার কাছে এস, তোমাকে দেখি।

খুড়ীমা নিকটে আসিতেই অমৃতা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

অমৃতা। (খুড়ীমার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া) তোমার সঙ্গে আমার সব মনের কথা, কেমন ?

খুড়ীমা। তুমি যে আমাকে বড় ভালবাস।

অমৃতা অনেক দিন থেকে। সেই যে তুমি যখন ছোট্ট বউটি এসেছিলে তখন থেকে।

খুড়ীমা। সে কথা বুঝি তোমার মনে আছে? এত অসুখেও কি তোমার তামাসা আসে?

অমৃতা। কেন আসবে না? সবই তামাসা, সুখও তামাসা, অসুখও তামাসা।

অমৃতার মা বাটিতে দুধবালি লইয়া আসিলেন।

মা। অমী, এই দুধটুকু খাও। ওষুধ ত খানিক আগে খেয়েচ। ছোটবউ, দুটি বেদানা ছাড়িয়ে দাও ত।

খুড়ীমা একখানি রেকাবিতে বেদানা ছাড়াইয়া আনিলেন। অমৃতা দুধ খাইয়া বেদানা মুখে দিল। অমৃতার সমবয়সী দুটি মেয়ে, মঞ্জুলা ও শেফালিকা দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মা। তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এস, ঘরের ভিতর এস।

অমৃতা। মঞ্জুলা আর শেফালি, তোরা যে বড় এমন সময়? স্কুলে যেতে হবে না?

কন্যা দুইটি তক্তপোষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জুলা। আজ যে রথের ছুটি।

অমৃতা। তাও ত বটে। আমার এই অসুখ হয়ে সব কথা ভুলে যাই। হাঁ মা, ছোটবেলায় দোরগোড়া থেকে আমি কেমন ভেঁপু কিনে আনতাম!

মা। এখন বুঝি আর ছোট নেই? মস্ত গিন্নী হয়েছিস, না?

অমৃতা। তা বলে এখন আর ভেঁপু বাজাবার বয়স আমার নেই। (পথে ভেঁপুর শব্দ) ঐ শোন।

মা। আজ রথের দিন, ছেলেমেয়েরা ত ভেঁপু বাজাবেই।

অমৃতা। মা, খুড়ীমাকে একটা ভেঁপু কিনে দাও না।

খুড়ীমা। শুনলে দিদি, মেয়ের কথা? আমার সঙ্গে কেবল তামাসা। এখনি বলছিল, আমি যখন বিয়ের ক'নে এ বাড়ীতে আসি সে কথা ওর মনে আছে।

মা। তোমাকে সমবয়সী মনে করে' তোমাকে ক্ষেপায়।

খুড়ীমা। আমি ক্ষেপতে গেলাম কেন? ও যা বলে তাই আমার মিষ্টি লাগে।

শেফালিকা কোঁচড়ের ভিতর হইতে কতকগুলা কদম ফুল বাহির করিয়া অমৃতার হাতের কাছে রাখিল। দিদিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অমৃতা। বাঃ কি সুন্দর কদম ফুল! (একটা হাতে তুলিয়া) কি চমৎকার গন্ধ! ফুলের শুঁয়া দেখেচ? যেন আহ্লাদে শিউরে রয়েচে! তা, শেফালি, তুই যে বড় কদম ফুল এনেছিস? তোর ত শিউলি ফুল আনতে হয়!

সকলের হাস্য।

দিদিমা। বিছানায় শুয়ে না থাকলে কে বলবে মেয়ের অসুখ করেচে? ওর মতন মজার কথা আমাদেরও মুখে আসে না।

খুড়ীমা। এইবার ভাল হয়ে উঠ্‌বে।

মা। বাছা সেরে উঠলে আমি পাঁচ টাকার পূজো দেব। অসুখ হতেই মানত রেখেচি।

অমৃতা। হাঁ, অসুখের গেরোগুলো খুলে যাচ্চে। আর আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

সকলে নীরব। মঞ্জুলা ও শেফালিকা খুড়ীমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

অমৃতা। আচ্ছা দিদিমা, সোজা রথ আর উল্টো রথ কেন বলে?

দিদিমা। জগন্নাথের চানযাত্রা কি না। যাবার সময় সোজা রথ, ফিরে আসবার সময় উল্টো রথ।

অমৃতা। রথের ঘোড়া কি হ'ল?

দিদিমা। সেকালে ঘোড়ায় টানত, এখন মানুষে টানে।

অমৃতা। সেকালে রথে চেপে যুদ্ধ করতে যেত। মেয়েদের কি রথে উঠতে নেই? তা হলে সুভদ্রা দুই ভাইয়ের মাঝখানে রথে ওঠেন কেন?

দিদিমা। ঠাকুরদের সঙ্গে মানুষের কথা! দেবতার রথে কি মানুষের উঠতে আছে?

অমৃতা। মানুষদেরও রথ ছিল। আমার রথে উঠতে ইচ্ছে করে। মঞ্জুলা আর শেফালি রথে উঠবি?

মঞ্জুলা আর শেফালির ফিক ফিক করিয়া হাসি।

শেফালিকা। রথে উঠে কি হবে? ঘড়র ঘড়র করে' টেনে নিয়ে যায়, ছুটে যেতে পারে না। তার চেয়ে মটর গাড়ী ভাল, দেখতে দেখতে কত দূর চলে যায়।

অমৃতা। (কদম ফুল হাতে করিয়া নিজের মনে) কদমতলায় শ্যামের বাঁশী কেমন করে বাজত? যমুনার জল স্থির হয়ে থাকত, গাছে পাখী চুপ করে শুনত। বাঁশী শুনে কদম ফুলের গায় কাঁটা দিয়েছিল, তাই এ সব শুঁয়া বেরিয়েচে।

দিদিমা। অবাক! যে সব কথা তোর মনে আসে আমরা এত বুড়ো হয়েচি আমরা সে সব ভাবতে পারিনে।

অমৃতা। (দিদিমার কথা শুনিতে না পাইয়া) ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে কেষ্টোঠাকুর বাঁশী বাজাতেন। ঠাকুর ত চিরকাল থাকেন তবে এখন কেন বাঁশী বাজে না? না, এখন আর কেউ তেমন কান পেতে শোনে না তাই শোনা যায় না? আচ্ছা দিদিমা, আষাঢ় মাসে চানযাত্রা আর শ্রাবণ মাসে ত ঝুলনযাত্রা?

দিদিমা। হাঁ ভাই।

অমৃতা। রাধাকেষ্ট দোলায় ত একসঙ্গে দোলেন, কিন্তু রাধা কই ত রথে ওঠেন না। সুভদ্রা যে কেষ্ট-ঠাকুরের বোন বৃন্দাবনে কেউ ত সে কথা জানত না। তা সেখানে রথই বা কোথা থেকে আসবে? রাখালের কি রথ থাকে?

মা। এই একরত্তি মেয়ে এত কথা জানে! ছেলে-বেলা থেকে ঠাকুরদেবতাদের সব কথা পড়ে।

দিদিমা। তাই ও সব কথা ওর মনে পড়চে।

অমৃতা। মঞ্জুলা, আমি যখন রথে উঠব তোরা তখন দেখিস। হয় ত তোরা দেখতেই পাবি নে।

মঞ্জুলা। তুই কি সুভদ্রা হবি?

অমৃতা। তা কেন? আমার জন্য অন্য রথ আসবে। তোরা ভেঁপু বাজাবি আর আমার রথ গড়গড়িয়ে চলে যাবে।

শেফালিকা। তোর রথের কাছি ধরে' আমরা টানব।

অমৃতা। আমার রথ ঘোড়াতে টানবে,—পক্ষীরাজ ঘোড়া।

মঞ্জুলা। তা হলে ত রথ উড়ে যাবে। এরোপ্লেনের মতন।

মা। তোরা মেয়ে-ছুটো বড়্ বড়্ করচিস, তোদের খাওয়া হয়েচে?

মঞ্জুলা। না মাসীমা, আজ ছুটি কি না, তাই তেমন তাড়া নেই।

মা। অনেক বেলা হয়েচে, তোমরা খেতে যাও। বিকেল বেলা না হয় এস।

মঞ্জুলা ও শেফালিকার প্রস্থান।

মা। অমী, তুমি রোগা মেয়ে এখন একটু ঘুমোও। কেবল কথা কইলে কাহিল বোধ হবে।

অমৃতা। আচ্ছা মা।

অমৃতা পাশ ফিরিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া চক্ষু বুজিল।

দিদিমা। তোমরা ছুই জায়ে খেয়ে এস, আমি ততক্ষণ বসে আছি।

মা। আমরা ছু গরস মুখে দিয়ে এখনি আসচি। অমী একটু ঘুমোক।

ছুই জা চলিয়া গেলেন। দিদিমা তক্তপোষের নীচে মেঝেতে বসিয়া রহিলেন। কিছু পরে অমৃতার খুড়ীমা ফিরিয়া আসিলেন।

খুড়ীমা। (দিদিমার কানে কানে) মা, এইবার তুমি যাও। দিদিরও হয়েচে, তিনি আসচেন।

দিদিমা নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। অমৃতার মা পা টিপিয়া টিপিয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়া, ঘরে প্রবেশ করিয়া ছোট জায়ের পাশে বসিলেন।

মা। (ছোট বউয়ের কানে কানে) বেশ ঘুমিয়ে আছে।

অমৃতা। (ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া) হাঁ, মা, আমি ঘুমিয়ে আছি। তুমি যে আমাকে ঘুমুতে বলেছিলে।

মা। ঘুম বুঝি হয় নি, শুধু চোক মট্‌কে ছিলি?

অমৃতা। না মা, ঘুম কি আর বললেই আসে? তন্দ্রা বুঝি এসেছিল, তন্দ্রার দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। জান ত মা, সে আর একটা দেশ আছে। সে এক মজার ওলট-পালটের দেশ, কোথায় যে কি হচ্চে তার কোন ঠিকঠিকানাই নেই! এই দেখ রাজকন্যার সাম্‌নে ময়ূর নাচচে, আবার কোথাও কিছু নেই পথের ধারে বসে' ভিখারীর মেয়ে কাঁদচে। বাঘ সিঙ্গী যেন

কুকুর-বেরালের মতন বেড়াচ্চে। কেবল যেন ভেল্কিবাজী, একটা চোকের সামনে আসে আর একটা মিলিয়ে যায়।

মা। তুমি বুঝি স্বপন দেখছিলে? রোগা হলে ওরকম হয়।

অমৃতা। স্বপন? তা হবে। স্বপনটাই যেন সত্যি আর সব মিথ্যে। তোমাদের ঘরসংসারকে ত তোমরা স্বপন বল না. কিন্তু এ সব কি মিথ্যে নয়?

মা। অত সব বড় বড় কথা তুমি কোথায় শিখলে? ও সব আমরাই বুঝতে পারি নে।

অমৃতা। মা গো, আমাদের সবাইয়ের চোকে যে ঠুলি বাঁধা। তিনি দয়া করে যদি খুলে দেন। তাঁর ত ছোট-বড় নেই, বয়সের কোন হিসেব নেই। ধ্রুব প্রহ্লাদের কত বয়স হয়েছিল? বয়স যে কখন ফুরোয়—

দিদিমা আর তাঁর সঙ্গে আর একটি বৃদ্ধা রমণী আসিলেন। অমৃতার কথা বন্ধ হইল। অমৃতার মা ও খুড়ীমা উঠিয়া বৃদ্ধার পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিলেন।

মা। রাঙাদিদি, তুমি কবে এলে? কত তীর্থি ঘুরে এলে!

রাঙাদিদি। আর মা, কপালে যা ছিল। দ্বারিকায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে পেরভাস। দ্বারিকায় গেলেই পেরভাসে যেতে হয়। পেরভাসে মিলন হয়েছিল কি না। কেষ্টো আর অর্জ্জুন যে নরনারায়ণ ছিলেন।

দিদিমা। (কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া) নর-নারায়ণকে নমস্কার! তুমি কত দেখে এলে, তোমাকে দেখলেও পুণ্যি হয়।

রাঙাদিদি। ওসব বাড়াবাড়ি কথা। অমীর বড় অসুখ শুনে তাড়াতাড়ি দেখতে এলুম।

মা। বাছা আমার কুড়ি দিন ধরে' ভুগচে, আজ একুশ দিন। আজ একটু হালুচালু হয়েছে।

রাঙাদিদি। অমীকে আমার মনে আছে ঠিক যেন মোমের পুতুলের মতনটি ছিল। এখন যেয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েচে, যেন পাতখানি।

অমৃতা। (অস্ফুট স্বরে গুন গুন করিয়া) মাটিকে দেহিয়া মট্টীমে মিল যানা—তাদেলমান! তাদেলমান!

রাঙাদিদি। অমী গুন গুন ক'রে কি গান করচে?

অমৃতা। ও কিছু নয়, ফকীরদের একটা কথা। হাঁ, রাঙাদিদি, দ্বারিকায় কেষ্টোঠাকুর রাজা ছিলেন, সেখানে তাঁর রথ দেখলে?

রাঙাদিদি। রথ?

মা। আজ রথ কি না, তাই কেবল রথের কথা কইচে। মঞ্জুলা আর শেফালি এসেছিল, তারা কতক-গুলো কদম ফুল দিয়ে গিয়েচে। কদম ফুল দেখে অমী বৃন্দাবনের কত কথা বলছিল।

রাঙাদিদি। বৃন্দাবনে কটাই বা কদম গাছ! আমি ত খুঁজে খুঁজে দেখতেই পাইনে।

অমৃতা। নাইক সে বৃন্দাবন, নাইক সে মদনমোহন! রাঙাদিদি, দ্বারিকায় রথ দেখলে, না শুধু কলা বেচাই সার?

রাঙাদিদি। শোন কথার বাঁধুনি! এখন ত মেয়েরাও বক্তিমে করে, কিন্তু অমীর মুখের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। না ভাই, রথ থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আমরা কই ত দেখি নি।

পথে কোলাহল। রথ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ। রাঙাদিদি ও দিদিমা একবার বাহিরে গিয়া রথ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। জনতা ও রথের শব্দ দূরে চলিয়া গেল।

অমৃতা। (নিজের মনে মৃদুস্বরে) ঠাকুর যখন বিশম্ভর মূর্ত্তি ধরেন তখন আর রথ নড়ে না, হাজার লোক মিলেও রথ টানতে পারে না। আর জগন্নাথের রথ চাকার তলায় মানুষকে পিষে দিয়ে চলেচে, চাকার সুমুখে যে পড়ে তার আর রক্ষে নেই। সুয্যির রথ চলে আকাশ দিয়ে, রং বেরংয়ের ঘোড়া, ঘোড়ার পায়ের তলা দিয়ে আলোর ফিনকি ওঠে, আগুনের ধূলো ওড়ে। আলোতে রথ ঢাকা পড়ে।

রাঙাদিদি। (অমৃতার মার মুখের দিকে চাহিয়া) বিব্‌ভুল বকচে?

মা। বালাই, বিব্‌ভুল কেন বকতে যাবে? ওর কথা শুনলে অবাক হ'তে হয়। কত সব জ্ঞানের কথা বলে।

রাঙাদিদি। তাই ত, আমি ভেবেছিলাম শুধু বুঝি তামাসাই করে, তা আমি ত সম্পর্কে ওর ঠানদিদি হই। ঐটুকু মেয়ে, গলা টিপলে এখনো দুধ বেরোয়, এমন সব কথা শিখ্‌লে কোত্থেকে ?

অমৃতা। কলিকাল, কলিকাল! জান না, রাঙা-দিদি ? কলিকালে সবই অনাছিষ্টি !

রাঙাদিদি। না, না, তা কেন ? তোমার ও সব কথা সত্যিযুগের মতন।

অমৃতা। দিদিমা, শুনলে ত, আমি সত্যিযুগের মেয়ে পথ ভুলে কলিকালে এসে পড়েছি।

দিদিমা। মা, মা, মা! এত কথাও তোর আসে!

অমৃতা। (স্মিতমুখে) ছুটোছুটি করবার এখন ত আর সাধ্যি নেই, মুখখানাই নাড়াচাড়া করি।

রাঙাদিদি। এখন তবে আসি। বউমা কাল বাপের বাড়ী গিয়েছে, উল্টো রথের পরে আসবে। সংসারের সব কাজ আমাকেই করতে হচ্চে। অমী শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে উঠুক এই আশীর্ব্বাদ করচি।

মা। তোমাদের আশীর্ব্বাদে মেয়ে আমার যেন ভাল হয়ে ওঠে।

রাঙাদিদি। তা হবে বই কি! তুমি ভেব না মা, আজ ত অমীকে ভালই দেখাচ্চে। ঠাঁকে ডাক, তিনি ভাল করে' দেবেন।

অমৃতা। তখন রথে উঠব।

রাঙাদিদি চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে দিদিমাও ঘরের বাহিরে গেলেন। অমৃতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মা। দেখতে দেখতে বেলা গেল। একটু পরেই ডাক্তার আসবে। ছুটীর দিন বলে' ছেলেরা কে কোথায় বেরিয়ে গিয়েচে, এখনি এসে খাবারের জন্য পাগল করে' তুলবে। যাই, ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে আসি।

খুড়ীমা। আমি ত রয়েচি দিদি, তুমি কাজ সেরে এস।

মা উঠিয়া গেলেন।

অমৃতা। খুড়ীমা, একটু খাবার জল দাও ত।

খুড়ীমা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) একটা কমলালেবু ছাড়িয়ে দেব ?

অমৃতা। এখন নয়, শুধু একটু জল দাও। (জল পান করিয়া) খুড়ীমা, আমার বুকে একবার হাত দাও ত।

খুড়ীমা। (বুকে হাত দিয়া) এ কি, তোমার বুক অমন ধড়াস ধড়াস করচে কেন ? নিঃশ্বাস ফেলতে কি কষ্ট হচ্চে ? যাই, দিদিকে ডেকে নিয়ে আসি।

অমৃতা। (খুড়ীমার হাত চাপিয়া ধরিয়া) তোমার কাউকে ডাকতে হবে না। চুপ করে বসো আমার কাছে। বনের পাখীকে খাঁচার ভিতর পুরলে কি রকম ছট্‌ফট্‌ করে দেখেচ ? খাঁচার শিকে পাখা-ঝাপটা মারে, কেবল এদিক-ওদিক ঘোরে। খাঁচা খুলে দিলে উড়ে যায়, আর ধড়ফড় করে না। আমার বুকের পাঁজরা-গুলো লোহার গরাদ, তার ভিতর থেকে পাখী বেরুবার জন্য ও রকম করচে।

খুড়ীমা। ও সব কি কথা! অমন কথা বলতে নেই।

অমৃতা। শুধু তোমাকে বলচি। রথে উঠলেই আমার সব সেরে যাবে।

মা ও দিদিমার প্রবেশ।

খুড়ীমা। অমী অমন করচে কেন ? অসুখ বাড়ে নি ত ?

মা। (অমৃতার কাছে আসিয়া) কি হয়েচে মা ? অসুখ করচে ? কোন কষ্ট হচ্চে ?

অমৃতা। একটু যেন কি রকম বোধ হচ্চে। আমি কি ভাবচি জান ? এই যে সোজা রথে যাব, উল্টো রথে আর আসব না।

মা। ও কি রকম কথা! রথের কথা বলতে নেই। এখুনি ডাক্তারবাবু আসবেন, তিনি ওষুধ দিলেই সেরে যাবে।

অমৃতা। আমার এমন কিছু ত হয় নি। তা বেশ ত, ডাক্তার বাবু আসুন।

একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রবেশ। ইনি অমৃতার মাতার মামা। তাঁহার পিছনে মঞ্জুলা ও শেফালিকা।

বৃদ্ধ। আজ পথে বড় ভিড়, আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।

মা। মামা, তুমি ত কবিরাজ, একবার অমীকে দেখ ত। মেয়ে যেন কি রকম করচে।

অমৃতা। দাদাবাবু এয়েচ ? মঞ্জুলা শেফালি তোরাও এসেচিস ?

বৃদ্ধ অমৃতার নাড়ী দেখিলেন। এমন সময় অমৃতার পিতা আপিসের পোষাকে আসিলেন। অমৃতার মুখ দেখিয়া, ঘরে আর সকলের মুখ দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। বৃদ্ধ অনেকক্ষণ নাড়ী দেখিলেন। তিনি নাড়ী দেখিতেছেন এমন সময় ডাক্তারবাবুও আসিলেন।

বৃদ্ধ। (অমৃতার হাত ছাড়িয়া দিয়া) ডাক্তারবাবু, আপনি দেখুন।

ডাক্তারবাবু। আপনি কেমন দেখলেন ?

বৃদ্ধ। বলচি। আপনি আগে দেখুন।

ডাক্তার অমৃতার হাত দেখিলেন।

অমৃতা। (একবার হাঁপাইয়া, অল্প হাসিয়া ক্ষীণ স্বরে) ডাক্তারবাবু, কেমন দেখচেন ? দাদাবাবু, আমার জন্য রথ আসচে, জান ?

বৃদ্ধ। ও কি বলচে ?

দিদিমা। আজ রথ কি না, সারাদিন বলচে রথে উঠবে।

ডাক্তার ও বৃদ্ধ ঘরের বাহিরে আসিলেন। অমৃতার পিতা বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া অমৃতার পাশে দাঁড়াইলেন। মাতা অশ্রুসিক্তনয়নে অমৃতার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। খুড়ীমা মাথায় ঘোমটা দিতে ভুলিয়া গিয়া অন্য পাশে দাঁড়াইলেন। দিদিমা কাছে দাঁড়াইয়া। মঞ্জুলা ও শেফালিকা অমৃতার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার মুখ দেখিতেছে।

ঘরের বাহিরে ডাক্তার ও বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার। নাড়ী নেই !

বৃদ্ধ। তেমন বিশেষ শ্বাসেরও লক্ষণ নেই। খুব অল্পক্ষণ মেয়াদ। মকরধ্বজ আর মৃগনাভি দিয়ে দেখা যাক্।

ডাক্তার। তাই দেখুন।

দু'জনে আবার ঘরে আসিলেন। বৃদ্ধ খলে মকরধ্বজ ও মৃগনাভি মাড়িয়া অমৃতাকে সেবন করাইতে গেলেন। অমৃতা মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিল।

অমৃতা। ও সব আর কিছু না। দেখচ না সব বাঁধন খুলে গিয়েচে ? শুধু রথ আসতে বাকি। দেখ—বাবা এঁদের বেশী কাঁদতে দিও না, কান্নার সুর আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

মা। ও মা, আমায় কিছু বলবি নে ?

অমৃতা। মা আসি। এর পর আবার সব—কথা হবে। খুড়ীমা, দিদিমা, দাদাবাবু, সবাই পায়ের ধুলো দাও। হাঁ মা, এত অন্ধকার কেন ? ওই আলো—আলো—আলো ! রথের চাকায় আলো ! কে গা তুমি রথে বসে ? ঠাকুর, তুমি ? এই যে যাই !

অমৃতার একটি ছোট নিঃশ্বাস পড়িল, তাহার পর স্তব্ধ। চক্ষু স্থির, সর্ব্বাঙ্গ স্থির।

বাবা। হা ভগবান, তোমার মনে এই ছিল !

বৃদ্ধ। স্বর্গ থেকে রথ নেমে এসেছিল তাইতে উঠে—

মা। অমৃতা ! অমৃতা ! মা ! দেবী ! দেবী !

চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগ

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম-এ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পদাবলীর প্রথমভাগেই পূর্ব্বরাগের পদ স্থাপিত হইয়াছে। ঐ পদগুলি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার সময়ে পূর্ব্বরাগের উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি গরু চরাইতেছিলেন, একদিন তাঁহার একটী গাভী বৃষভানুপুরে চলিয়া গেল; তিনি অনুসন্ধান করিতে যাইয়া রাধিকাকে দেখিয়া আসিলেন, এবং তাহার পরেই তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইল। অতএব গোষ্ঠলীলার এক অধ্যায়ে পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে ইহা ধারণা করাই স্বাভাবিক।

পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে যে ভাবে পদগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, তাহারা পরস্পর সম্বন্ধবিহীন, ধারাবাহিকরূপে কৃষ্ণ-চরিত্র বর্ণনা তাহাতে নাই। বস্তুতঃ কোন পদ-সংগ্রহ গ্রন্থেই পদগুলি এইভাবে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে আমরা ইহার নিদর্শন পাই। আবার দীন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ও রাসলীলা সম্বন্ধীয় যে সকল পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদের সমবায়ে পালাগান রচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ ও ২০৮৯ নম্বরের পুঁথির পদগুলি পাঠ করিয়াও (সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩৩৩ ও ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কাজেই শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী পদসাহিত্যে দীন চণ্ডীদাসের রচনার একটা ধারাও পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বরাগের পদগুলিতে যে এই ধারার নিদর্শন বর্ত্তমান আছে আমরা প্রথমেই তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

নায়ক-নায়িকার মিলনের প্রথম আকাঙ্ক্ষার নাম পূর্ব্বরাগ। প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রাদিতে কিন্তু "পূর্ব্বরাগ" শব্দটী ব্যবহৃত হয় নাই, বিপ্রলম্ভের শ্রেণী-বিভাগে পূর্ব্বরাগ শব্দের পরিবর্ত্তে কোন্ গ্রন্থে কি কি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইল* :—

কাব্য-প্রদীপে—	অভিলাষ
কাব্য-প্রকাশে—	ঐ
কাব্যানুশাসনে—	ঐ
ধ্বন্যালোকে—	ঐ
রসগঙ্গাধরে—	ঐ
রসতরঙ্গিণীতে—	ঐ
সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে—	ঐ
প্রতাপ-রুদ্রীয়ে—	ঐ
দশরূপে—	ঐ
অলঙ্কার-শেখরে—	পূর্ব্বানুরাগ
বাগ্‌ভট্টালঙ্কারে	ঐ
শৃঙ্গার-তিলকে—	ঐ
কাব্যালঙ্কারে—	প্রথমানুরাগ
রসরত্নহারে—	আদ্যানুরাগ

কিন্তু সাহিত্য-দর্পণ ও সাহিত্য-কৌমুদীতে পূর্ব্বরাগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপরের তালিকায় পাঁচখানা গ্রন্থে পূর্ব্বানুরাগ, প্রথমানুরাগ বা আদ্যানুরাগ শব্দ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এই ধারণা জন্মে যে, পূর্ব্বরাগ ও পূর্ব্বানুরাগ শব্দদ্বয় পরস্পরের সমনামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটী শব্দ দুই যুগের, ইহাদের সহিত একটু ধর্ম্মের ইতিহাসও জড়িত আছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ২৩ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, সনাতনকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাইয়া চৈতন্যদেব প্রেমের ক্রমিক অভিব্যক্তির স্তর নির্দ্দেশ করিয়া

---

* Schmidt's *Beitrage Zur Indischen Erotik*, 1st ed. p. 120 দ্রষ্টব্য।

বলিয়াছিলেন যে, প্রেম ক্রমে গাঢ় হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও তৎপর মহাভাবে পরিণত হয়। অতএব চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-দর্শনে রাগের পরবর্ত্তী অবস্থার নাম অনুরাগ (অনু—পশ্চাৎ), রাগ ও অনুরাগ একার্থ-বোধক নহে। কাজেই পূর্ব্বরাগ শব্দ পূর্ব্বানুরাগের সমনামরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। এজন্য চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-শাস্ত্রে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনাকাঙ্ক্ষা বুঝাইতে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বরাগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বানুরাগ চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শব্দ, তখন রাগ ও অনুরাগের মধ্যে অর্থগত ব্যবধান সূচিত হয় নাই। শৃঙ্গারতিলকের ন্যায় চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু বিশ্বনাথ সাহিত্য-দর্পণে পূর্ব্বরাগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী সাহিত্য-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থেও পূর্ব্বরাগ শব্দই পাওয়া যায়। বিশ্বনাথের সময়-নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া ডাঃ সুশীলচন্দ্র দে মহাশয় তাঁহাকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপিত করিয়াছেন (*History of Sanskrit Poetics*, by Dr. S. K. De, Part 1. p. 236)। কিন্তু তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বেবর-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশ্বনাথকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপিত করিয়াছেন (Weber's *History of Sanskrit Literature*, p. 231, *n.* 244)। বিশ্বনাথ সাহিত্য-দর্পণের তৃতীয় অধ্যায়ে (৩১৪ ক) তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ নারায়ণকে কলিঙ্গরাজ নরসিংহের সমসাময়িক বলিয়াছেন। পণ্ডিতগণ ইহাকে দ্বিতীয় নরসিংহ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তিনি ১২৭৯ খ্রীঃ হইতে ১৩০৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ পিতামহ বর্ত্তমান থাকিলে বিশ্বনাথের সময় প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই হয়। যদি তাহাই হয়, তবে এই উৎকল-দেশীয় পণ্ডিতটি যে চৈতন্যদেবের প্রভাবের অধীন হইয়াছিলেন তাহাও ধারণা করা যাইতে পারে এবং এইজন্যই বোধ হয় তিনি পূর্ব্বানুরাগের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বরাগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতেছি যে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্যের পরবর্ত্তী সকল বৈষ্ণব গ্রন্থেই পূর্ব্বরাগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবপদ যাঁহারা সঙ্কলন করিয়াছেন তাঁহারাও এই প্রথানুযায়ী কতকগুলি পদকে পূর্ব্বরাগ-বিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার প্রেমের আখ্যান লইয়া যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী অভিলাষ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন কালিদাসের শকুন্তলায় দুষ্মন্তের প্রথম দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাটি। কিন্তু পূর্ব্বরাগের নিশানা দিয়া কোন কবি তাঁহার রচনা চিহ্নিত করিয়াছেন, এমন কথা আমরা জানিতে পারি নাই। বঙ্গদেশে জয়দেবের গীত-গোবিন্দই রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ, তাহাতে পূর্ব্বরাগের অবস্থাটি বর্ণিত হয় নাই। ইহার প্রথম সর্গে রাধার যে অবস্থা লইয়া বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে তাহা প্রথম মিলনের পরবর্ত্তী বিরহাবস্থা, তাহার পূর্ব্বেই রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরকে জানিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বড়ায়ির মুখে রাধার রূপের বর্ণনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ মোহিত হইলেন বটে, কিন্তু রাধা তাঁহার প্রস্তাব ঘৃণার সহিত পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এখানে পূর্ব্বরাগের বর্ণনা কেবল কৃষ্ণের পক্ষেই হইয়াছে, রাধার পক্ষে হয় নাই; বিশেষতঃ, বড়ু চণ্ডীদাস "পূর্ব্বরাগ" শব্দটি তাঁহার রচনায় কখনও ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু দীন চণ্ডীদাস পূর্ব্বরাগের নিশানা দিয়া পদ-রচনা করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৩৮৯ নম্বর পুথির ১৯০৬ নং পদে আছে—

> পূর্ব্বরাগ নবোঢার কথা কহিল নিশ্চয়ে।

এবং

> পিক কহে শুনিলাও পূর্ব্বরাগ-কথা।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দীন চণ্ডীদাসের সময়ে পূর্ব্বরাগ শব্দটী অলঙ্কার-শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া সাধারণে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। এই শব্দটীর ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা উপরে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এরূপ অবস্থা চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাতেও দীন চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

পূর্ব্বরাগ কাহাকে বলে ? সাহিত্য-দর্পণে আছে—

> শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
> দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

শ্রবণন্তু ভবেত্তত্র দূতবন্দিসখীমুখাৎ।
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্।

৩য় পরিঃ।

দশরূপে আছে—

সাক্ষাৎ প্রতিকৃতিস্বপ্নচ্ছায়ামায়াসু দর্শনম্।
শ্রুতির্ব্যাজাৎ সখীগীতমাগধাদি গুণস্তুতেঃ॥

৪র্থ পরিঃ।

অর্থাৎ দর্শণ বা শ্রবণের দ্বারা নায়ক-নায়িকার মনে যে অভিলাষ জাগরিত হয়, তাহাই পূর্ব্বরাগ। দূত, ভাট, বা সখীর মুখে গুণকীর্ত্তন শুনার নাম শ্রবণ, আর ইন্দ্রজালে, চিত্রে, স্বপ্নে বা সাক্ষাৎ দর্শনের নাম দর্শন। আবার পূর্ব্বরাগের দশাও দশবিধ। সূত্রে আছে—

অভিলাষচিন্তা স্মৃতি গুণ—
কথনোদ্বেগ সংপ্রলাপাশ্চ।
উন্মাদোঽথ ব্যাধিজড়তা
মৃতিরিতি দশাত্র কামদশাঃ॥

সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিঃ।

অর্থাৎ অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথা, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদনা, জ্বর, জড়তা, এবং মৃত্যু এই দশপ্রকার কামদশা। ব্যর্থ প্রেমের প্রভাবে একে একে এই সকল অবস্থার মধ্যে প্রেমিক পতিত হয়। প্রায় সকল অলঙ্কার-শাস্ত্রেই এই দশ দশার উল্লেখ আছে।

এখন পরিষদের পদাবলীর পূর্ব্বরাগের পদগুলি লইয়া আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। যে চণ্ডীদাস এই পদগুলি লিখিয়াছেন, তিনি অতি সুন্দরভাবে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের একটি গাভী হারাইয়া গিয়াছিল, অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি বৃষভানুপুরে রাধাকে দেখিয়া বিমোহিত হন। পরদিন সুবল সখাকে এই কথা বলিয়া তিনি স্বীয় অনুরাগ জ্ঞাপন করেন। সুবল ইন্দ্রজাল প্রভাবে রাধার মূর্ত্তি ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই পূর্ব্বদৃষ্ট রমণী বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। তখন সুবল পুনর্মিলনের আশ্বাস দিয়া পাঁচজন সখাসহ ইন্দ্রজাল বিদ্যা দেখাইতে বৃষভানুপুরে গমন করেন। সেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ধারণ করা মাত্র, রাধিকা তদ্দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অবশেষে সুবল তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণ-নাম প্রদান করিলে তাঁহার পুনরায় চৈতন্ত সম্পাদিত হয়। তখন রাধাকে স্নান করিবার জন্ত যমুনায় পাঠাইতে উপদেশ দিয়া সুবল চলিয়া আসেন। তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী রাধা সখীসহ স্নান করিতে যাইয়া যমুনাতীরে কুঞ্জমধ্যে কৃষ্ণকে দর্শন করেন। কিন্তু দর্শনমাত্র, স্পর্শন হয় নাই তাহা কবি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। ইহার পরেই রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে।

কবি ঘটনাটি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, পড়িলেই বোধ হয়, তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের একখানা বহি সম্মুখে রাখিয়া এই আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে সাক্ষাৎ দর্শন, ইন্দ্রজালে দর্শন, নাম শুনিয়া মোহিত হওয়া, অনুরাগ জন্মিবার পরের দশা, পুনরায় দর্শন অথচ স্পর্শন নহে, ইত্যাদি বিষয় অতি নিপুণতার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যেন একটি আদর্শ দেখিয়া আর একটি চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বরাগের যে সকল লক্ষণ আমরা ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি ঠিক সেই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া এই আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে। কবি যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পদাবলীর ৪৪ নম্বরের পদটির প্রতি আমরা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাহাতে স্পষ্টই লিখিত আছে—

নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে থুই।

৩১-৩২ পংক্তি।

ইহা লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, তখনও শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হয় নাই। ইহার পূর্ব্বেই যদি মিলন হইয়া যায়, তবে অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্রানুযায়ী আর পূর্ব্বরাগের সময় থাকে না। তৎপরবর্ত্তী আক্ষেপ হয় বিরহের, পূর্ব্বরাগের নহে। এইজন্ত রাধিকার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে কবি এই কৌশলটি অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ ও শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ একই হাতের রচনা, এবং ঘটনা-পরম্পরায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে, কোন্ চণ্ডীদাস এই পদগুলি রচনা করিয়াছেন? বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসের ভণিতার বিভিন্ন ধারা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমরা দেখাইয়াছি যে, বড়ু কখনও দ্বিজ বা দীন ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। এখন এই পূর্ব্বরাগের

।দগুলি পরীক্ষা করা যাউক। পরিষদের পদাবলীর ঃ নম্বরের পদটিতেই দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। এই পদটিতে শ্রীকৃষ্ণ বৃষভানুপুরে রাধাকে কিরূপ দেখিয়াছেন, তাহাই সুবলের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গাভী হারান, এবং তাহার খোঁজ করিতে যাইয়া রাধার দর্শন, ও সুবলের নিকট বর্ণনা ইত্যাদি দীন চণ্ডীদাসেরই পরিকল্পনা। এই বর্ণনা ১৬ নম্বরের পদ পর্য্যন্ত চলিয়াছে, তৎপর ১৭ নম্বরের পদ হইতে "সুবল-মিলন" আখ্যায় সুবল কর্ত্তৃক কৃষ্ণকে প্রবোধ-দান, ইন্দ্রজাল-প্রভাবে রাধার মূর্ত্তিপরিগ্রহণ, বৃষভানুপুরে গমন, রাধার মূর্চ্ছাপনোদন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যে পূর্ব্বরাগের প্রথম পরিকল্পনার সহিত একই সূত্রে গাঁথা তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই পদগুলির মধ্যে ২৭,৩০,৩২,৩৫ ও ৪০ নম্বরের পদে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতাও পাওয়া যায়। অতএব এই পালাগানটি যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

তারপর শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ। ৫৪ নম্বরের পদে "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম" এই বিখ্যাত পদটি রহিয়াছে, তাহাও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত। সুবল যখন রাধার কর্ণে শ্যাম-নাম শুনাইয়াছিলেন, তখন মূর্চ্ছান্তে রাধার এই কথা বলাই স্বাভাবিক, নতুবা এই পদের পূর্ব্বপ্রসঙ্গ অজ্ঞাত রহিয়া যায়—কে শ্যাম নাম শুনাইয়াছিলেন, এবং রাধা কি ভাবে তাহা শুনিয়াছিলেন তাহা কিছুই আমরা বুঝিতে পারি না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এখানেও দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার ধারাই চলিতেছে। আবার ইহাও দ্রষ্টব্য যে, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ কাহ্নু নামে অভিহিত হইয়াছেন, শ্যাম নামে পরিচিত হন নাই। দীন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়াই এই পদে শ্যাম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর ৫৬,৫৭, ৬৪,৬৫ নম্বরের পদেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। এইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ ও শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ একই কবির রচিত এবং পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত।

এই ভণিতা পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত আরও একটি অকাট্য প্রমাণ আমরা এখানে উপস্থিত করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ নম্বরের পুঁথির ১১০৬ নম্বর পদে আছে—

> চারি পুরাণ খাটি সখা উক্তি হয়ে।
> পূর্ব্বরাগ নবোঢ়ার কথা কহিল নিশ্চয়ে॥
> সুবলমিলন আর পূর্ব্বকথা শুনি।
> নানা মত পুরাণ কথা রসতত্ত্ব আনি॥

এবং

> পিক কহে শুনিলাও পূর্ব্বরাগ কথা।
> সখা উক্তি নবোঢ়া রস রতিগুণ গাথা॥

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণের) পূর্ব্বরাগের সঙ্গে সুবলমিলন এবং নবোঢ়ার প্রেম উক্তি (অর্থাৎ কথা বা পূর্ব্বরাগের অভিব্যক্তি-সূচক পদ) রচনা করিয়াছিলেন। পরিষদের পদাবলীর পূর্ব্বরাগের বর্ণনাতেও আমরা ঠিক এই বিষয়গুলিই পাইতেছি, এবং তাহার অনেক পদ আবার দ্বিজ ভণিতাযুক্ত পাওয়া যাইতেছে, কাজেই এই পালাটি যে দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের রচিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

নায়ক-নায়িকার প্রেমের গল্প লইয়া যাঁহারা বহি লিখিয়াছেন, তাঁহারা কোন না কোন প্রকারে পূর্ব্বরাগের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক গ্রন্থেরই পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রকারের। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা, আর পুরূরবা ও উর্ব্বশীর প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা একই প্রকারের নহে। ইন্দ্রজাল-প্রভাবে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ-সঞ্চারের একটা দৃষ্টান্ত আমরা কর্পূর-মঞ্জরীতেও পাইতেছি, অথচ তাহার সহিত দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার কোনই সাদৃশ্য নাই। এক কবি যে ভাবে ঘটনার সমাবেশ করেন, অন্য কবি তাহা অনুকরণ করেন না, বরং নূতন ভাবে গল্পের অবতারণা করেন, ইহাই কবিদের স্বভাব। আর অনুকরণ করিলেও, পরবর্ত্তী কবিই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাব অনুকরণ করিতে পারেন। বড়াইর মুখে রাধার রূপ-বর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছিল, কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহাই বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা। দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা ভিন্ন প্রকারের। অতএব এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, উভয় কবির পদ একই গল্পাংশের বিষয়ীভূত হইবে। দীন চণ্ডীদাসের কল্পিত আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া পদ-

রচনা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন কবির পক্ষেই সম্ভবপর, বড়ু চণ্ডীদাসের পক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ তিনি দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। কাজেই পূর্ব্বরাগের পদের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের কল্পনার বিষয়ীভূত বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত কোন পদ থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। যদি থাকে, তাহা যে ভেজাল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ দুই একটী পদ যে দীন চণ্ডীদাসের রচনায় স্থান পাইয়াছে, তাহাও আমরা দেখাইতেছি। পরিষদের পদাবলীর ১৩ নম্বরের পদটী এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে

বজনি, ও ধনি কে কহ বটে।
গোরচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পাযের উপরে পা॥ ইত্যাদি

কিন্তু ইহার ভণিতাটী এইরূপ ভাবে আছে—

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
শুনহে নাগর চন্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

রাধা যমুনাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সেই কথা কৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন। কৃষ্ণ-সুবল-ঘটিত রাধার স্নানের আখ্যায়িকাটী দীন চণ্ডীদাসের কল্পনার বিষয়ীভূত। বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস তাহা অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন, ইহা যে রাম না হইতে রামায়ণ-রচনার মত বোধ হয়। আবার দেখুন, বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা "সাগরের ঘরে" "পদুমার উদরে" (কৃষ্ণকীর্ত্তন ৬ পৃঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃষভানু রাজার নন্দিনী যে রাধা একথা বড়ু চণ্ডীদাস প্রচার করেন নাই। অথচ এখানে ভণিতার মধ্যে তাহাও প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল কারণে ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ থাকিলেও আমরা এই পদটীকে ভেজাল বলিতে বাধ্য হইতেছি। দীন চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কোন কবি তাঁহার গল্পাংশ অবলম্বন করিয়া এই পদটি রচনা করিয়াছেন, এবং বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সকল দিক তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভেজাল জিনিস এইরূপেই ধরা পড়ে। তথাপি এই ভেজালের মধ্যেও একটি মহাসত্যের সন্ধান আমরা পাইতেছি। যে সময়ে এই পদটি রচিত হয়, সেই সময়ের লোকেরা জানিতেন যে, বড় চণ্ডীদাসের প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি ছিলেন বাশুলীর সেবক, এবং ভণিতার মধ্যে তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন। দীন চণ্ডীদাস হইতে পৃথক্, এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বাশুলী সেবক আর এক চণ্ডীদাস যে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা তখনকার লোকের নিকট অবিদিত ছিল না। নতুবা তাঁহার নামে এইভাবে এই পদ চালাইবার চেষ্টা হইত না।

কিন্তু ভেজালের অনেক দোষ; নানাদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে তাহা অনেক রকমেই ধরা পড়ে। এই পদটি পদকল্পতরুতেও আছে। পরিষদের 'তরুর সংস্করণে এই পদের অনেক পাঠান্তরের ভণিতায় লোচনদাসের নাম পাওয়া যায়, যথা—

দাস লোচন কহয়ে বচন, ইত্যাদি—১৪০।৩১ পৃঃ।

আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৯০ নম্বর পুঁথির ২ নম্বরের পদে "জগন্নাথের" ভণিতা মিলিতেছে, যথা—

কহে জগন্নাথ সখিগণ সাথ, ইত্যাদি।

এরকমটা কেন হয়? একটা কথা আছে যে, ভাঙ্গা পা'ই গর্ত্তে পড়ে। যেখানে ভেজাল, সেখানেই নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি, কিন্তু খাঁটি চিনি আঁধারেও মিষ্টি লাগে।

পরিষদের পদাবলীর ১৫ নম্বরের পদটিও এইরূপ সন্দিগ্ধ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

পরবর্ত্তী কবিদিগের রচিত এইরূপ অনেক পদ দীন চণ্ডীদাসের পদমধ্যে স্থান পাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখন আমরা রাধিকার পূর্ব্বরাগের পদগুলি লইয়া আলোচনা করিব। এই অধ্যায়ে পদ আছে ২৫টি মাত্র, তন্মধ্যে পাঁচটি পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এবং তিনটি পদে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। শেষোক্ত শ্রেণীর একটি পদ লইয়া আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ৪৯ নম্বরের পদটিতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। এই পদটি আমরা সম্পূর্ণই এখানে তুলিয়া দিলাম।

সোনার নাতিনী কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি অরুণ বরণ আঁখি
জাতিকুল সব পাছে যায়॥

যমুনার জলে যাও   কদমতলার পাণে চাও
না জানি দেখিলা কোন্ জনে।
শ্যামল বরণ হিরণ পিন্ধন   বসি থাকে যখন তখন
সে জন পড়েছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও   সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে   কি বোল বলিবে তোরে
বাড়িয়া ভাজিবে তোর মাথা॥
একে তুমি কুলনারী   কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ু য়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে   কুলশীল সব ভাসে
লাগিল কালিয়া প্রেম মধু॥

তুলনামূলক সমালোচনার জন্য ৫০ নম্বরের পদটীও আমরা তুলিয়া দিতেছি :—

সোনার নাতিনী   এমন যে কেনি
হইলি বাউরি পারা।
সদাই রোদন   বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা॥
যমুনা যাইতে   কদম্বতলাতে
দেখিয়া সে কোন্ জনে।
যুবতী জনার   ধরম নাশক
বসি থাকে সেই খানে॥
সে জন পড়ে তোর মনে।-
সতীর কুলের   কলঙ্ক রাখিলি
চাহিয়া তাহার পানে॥
একে কুলনারী   কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ু য়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে   কুলশীল নাশে
কালিয়া প্রেমের মধু॥

এই দুইটী পদের ভাব এবং শব্দগত সাদৃশ্য এত বেশী যে, একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যায় যে, একটী অপরটীর আদর্শে রচিত হইয়াছে। ইহার কোন্‌টি আদি এবং কোন্‌টি নকল আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি, তাঁহার কোন পদ পরিবর্ত্তিত আকারে তাঁহার বিশেষত্বসূচক বড়ু ভণিতা বাদ দিয়া প্রচার করিবার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। কাচকে কাঞ্চনের মূল্যে বিক্রয় করিতেই লোকে চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু কাঞ্চনকে কাচের দরে বিলাইয়া দেয় না। অতএব ইহাই সম্ভবপর যে, অন্যের পদই বড়ু ভণিতায় চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আমরা এই পদটীতেও রাধার যমুনা-স্নানে যাইবার কালে কৃষ্ণকে দেখার কথা পাইতেছি; এই প্রসঙ্গ যে দীন চণ্ডীদাসের কল্পিত আখ্যায়িকার বিষয়ীভূত তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। অতএব বড়ু চণ্ডীদাস এই জাতীয় পদ লিখিতে পারেন না। ইহাতেও ধরা পড়িয়া যাইতেছে যে, ৪৯ নম্বরের পদটিই ভেজাল, এবং ৫০ নম্বরের পদটিই খাঁটি। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যায় যে, শেষোক্ত পদটীর প্রত্যেক চরণে দুই একটি শব্দ যোগ করিয়া ৪৯ নম্বরের পদটী রচনা করা হইয়াছে। যে দুই-এক চরণে কিছু নূতনত্ব দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী কারিগরের কীর্ত্তি, বড়ু চণ্ডীদাস সে জন্য অণুমাত্রও দায়ী নহেন।

৫৮ ও ৫৯ নম্বরের পদদ্বয় তুলনা করিলেও দেখা যায় যে, ইহারা পৃথক্ পদ নহে, কিন্তু একটী অপরটীর আদর্শে রচিত হইয়াছে। ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ নম্বরের পদত্রয় কেন যে পূর্ব্বরাগের মধ্যে স্থান পাইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ইহারা প্রকৃত পক্ষে বিরহের পদ। পদগুলি পড়িলেই বুঝা যায় যে রাধাকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বেই পরস্পর পরস্পরকে জানিয়াছেন এবং তাঁহাদের মিলনের পরে বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে। ৬৯ নম্বরের পদটীর ভণিতাতেও চণ্ডীদাস তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা॥
কেবল মরমে ঔখদ রাধা॥

বিশেষতঃ এই তিনটী পদ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ইহাতে একটা পৃথক্ পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়। কৃষ্ণ নিকুঞ্জে আসিয়া রাধার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার অবস্থা অতীব সঙ্কটাপন্ন, একজন সখী দেখিয়া আসিয়া রাধাকে সেই সংবাদ দিতেছেন, এইরূপ আখ্যায়িকার অবতারণা ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। কাজেই এই তিনটী পদ পূর্ব্বসম্বন্ধবিহীন, পূর্ব্বরাগ-বিভাগে তাহাদের স্থান হইতে পারে না। ৪৮ নম্বরের পদটিতেও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, কিন্তু আর কোন পুঁথিতেই আমরা এই পদটি পাইতেছি না, কাজেই ইহাও সন্দিগ্ধ পদের মধ্যে গণনীয়।

পরিষদের পদাবলীতে দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের সবগুলি পদ প্রকাশিত হয় নাই, পালাটি অসম্পূর্ণ

রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বিভাগের শেষ পদটিতে (৪৪ নম্বরের পদে) আছে—

সূর্য্যপূজা ছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরাণ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব॥ ইত্যাদি

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাধা স্নান করিয়া চলিয়া যাইবার পরে সূর্য্য-পূজার ছলে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের একটা পালা ইহার পরে ছিল; এবং এই মিলনের পরেই পূর্ব্বরাগের পালা শেষ হইয়াছিল। এই সকল পদের কোন নমুনা আমরা পাইতেছি না। সূর্য্য-পূজার পরিকল্পনাও কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, কিন্তু ললিতমাধব গ্রন্থে আছে। ললিতা, বিশাখার নামও কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায় না। ভাগবতে ও গীতগোবিন্দে গোপীদের কথা আছে, কিন্তু তাঁহাদের কাহার কি নাম ছিল তাহার উল্লেখ নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন, কিন্তু পদাবলীতে তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রমণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ-লীলার পূর্ণ বিকাশ প্রাচীন-কালে সংঘটিত হয় নাই, কাজেই এই সকল সখীগণের নামকরণও হয় নাই। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রসচর্চ্চার জন্য বিবিধ সখীর নামকরণের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাজেই এই জাতীয় রচনা যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালের তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই স্থানে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, দীন চণ্ডীদাসের রচিত পূর্ব্বরাগের অনেক পদ এখনও আমাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে।

আমাদের আর একটি বক্তব্য এই যে, পরিষদের পদাবলীতে পূর্ব্বরাগের পদগুলি যথাযথভাবে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। রাধা যমুনাস্নানে আসিয়াছেন, এই কথা আমরা ৪৪ নম্বরের পদটিতে পাইতেছি। কাজেই যমুনায় স্নানকালীন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার রূপ-বর্ণনার পদগুলি (যেমন ১২, ১৩ প্রভৃতি সংখ্যাচিহ্নিত পদ-সকল) ৪৪ নম্বরের পদের পরে স্থাপিত হওয়া উচিত। নতুবা ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষিত হয় না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের ৬৯টী পদের মধ্যে একটিকেও আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করিতে পারিলাম না। অনেকে হয়ত এই জন্য আমাদের প্রতি বিরূপ হইবেন, কিন্তু আমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিলাম, সত্য গোপন করিতে চেষ্টা করি নাই। আর আমাদের এই বিশ্বাসও আছে যে, ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। কারণ পদগুলি যেমন ছিল তেমনই আছে, কেবল তাহাদের রচয়িতা সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে পাঠকের রস-আস্বাদনের কোনই ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই। সংগ্রহ-গ্রন্থাদিতে পদগুলি যেভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা পরস্পর সম্বন্ধবিহীন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শিকলের গ্রন্থিগুলি যেমন একটি অপরটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, পদগুলিও সেইরূপ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। অযত্নরক্ষিত ফুলের মালার ন্যায় বিশৃঙ্খলতার একটা ধারণা প্রথম আমাদের মনে জন্মে বটে, কিন্তু যে সাধারণ সূত্রে ইহারা গ্রথিত, সেই সূত্রটির সন্ধান করিয়া ধরিয়া তুলিলেই ইহারা পুনরায় সুবিন্যস্ত হইয়া যায়। নানা প্রকার যুক্তি-তর্কের সাহায্যে আমরা ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

সন্ধ্যার সময় সে ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিল। ঘরে সে একা, সমীর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, এ রকম চুণকাম-করা বড় ঘরে একা থাকিবার সৌভাগ্য কখনো তাহার হয় নাই, সে খুসি হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজের খাটে বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল এইবার সমীরের মত একটা টেবিল আমার হয়? একটা টেবিলের দাম কত, সমীরকে জিগ্যেস্ কর্‌বো।

পরে সে আলোটা লইয়া গিয়া সমীরের টেবিলে পড়িতে বসিল। রুটিন্‌টাতে লেখা আছে—সোমবারে পাটীগণিতের দিন। অনেক অঙ্ক কষিয়া ক্লাসে লইয়া যাইতে হইবে, বলিয়া দিয়াছে। অঙ্ককে সে বাঘ বিবেচনা করে, বিশেষ করিয়া পাটীগণিতের অঙ্ক। বইখানা খুলিয়া সভয়ে প্রশ্নাবলীর অঙ্ক কয়েকটি দেখিতেছে, এমন সময় দরজা দিয়া ঘরে কে ঢুকিল। কাল রাত্রের সেই শান্ত ছেলেটি। অপু বলিল—এস, এস, বসো। ছেলেটি বলিল—আপনি বাড়ী যান নি?

অপু বলিল—না, আমি তো মোটে পরশু এলাম, বাড়ীও দূরে। গিয়ে আবার সোমবারে আসা যাবে না—

ছেলেটি অপুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপু বলিল—বোর্ডিংয়ে যে আজ একেবারেই ছেলে নেই, সব শনিবারেই কি এম্‌নি হয়? তুমি বাড়ী যাওনি কেন? তোমার নামটা কি জানি নে ভাই।

—দেবব্রত বসু—আপনার মনে থাকে না। বাড়ী গেলাম না কি ইচ্ছে করে? সেকেন্ মাষ্টার ছুটি দিলে না। ছুটি চাইতে গেলাম, বল্লে আর শনিবারে গেলে আবার এ শনিবারে কি? হবে না যাও!

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। তাহার বাড়ী টাউন হইতে মাইল বারো দূরে, ট্রেণে যাইতে হয়। সে শনিবারে বাড়ী না গিয়া থাকিতে পারে না, মন হাঁপাইয়া ওঠে, অথচ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ ছুটি দিতে চায় না। তাহার কথাবার্ত্তার ধরণে অপু বুঝিতে পারিল যে, বাড়ী না যাইতে পারিয়া তাহার মন আজ খুবই খারাপ, অনবরত বাড়ীর কথা ছাড়া সে অন্য কোনো কথা বড় একটা বলিল না।

দেবব্রত খানিকটা বসিয়া থাকিয়া অপুর বালিশটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকটা আপন মনে বলিল—সামনের শনিবারে ছুটি দিতেই হবে, সেকেন্ মাষ্টার না দেয়, হেড্‌মাষ্টারের কাছে গিয়ে বল্‌বো।

অপু এ ধরণের দূর প্রবাসে একা রাত্রিবাস করিতে আদৌ অভ্যস্ত নয়, চিরকাল মা-বাপের কাছে কাটাইয়াছে, আজকার রাত্রটা তাহারও সম্পূর্ণ উদাস ও নিঃসঙ্গ ঠেকিতেছিল।

দেবব্রত হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বলিল—আপনি দেখেন নি বুঝি? জানেন না? আসুন না আপনাকে দেখাই, আসুন উঠে!...

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া পিছনের দেওয়ালের বড় জানালাটার কাছে লইয়া গিয়া দেখাইল, সেটার পাশাপাশি দুটা গরাদে তুলিয়া ফেলিয়া আবার বসানো চলে। একটা লোক অনায়াসে সে ফাঁকটুকু দিয়া ঘরে যাতায়াত করিতে পারে। বলিল—শুধু সমীর-দা আর গণেশ জানে, কাউকে যেন বোল্‌বেন না!

একটু পরে বোর্ডিংয়ের খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল।

খাওয়ার আগে অপু বলিল—আচ্ছা ভাই, এ কথাটার মানে জানো?...এক খণ্ড ছাপা কাগজ সে দেবব্রতকে দেখিতে দিল। বড় বড় অক্ষরে কাগজখানাতে লেখা আছে—Literature. এতবড় কথা সে খুব কম পাইয়াছে, অর্থটা জানিবার খুব কৌতূহল। দেবব্রতও জানে না, বলিল—চলুন, খাওয়ার সময় মণিদাকে জিগ্যেস্ কর্‌বো।

মণিমোহন সেকেণ্ড্ ক্লাসের ছাত্র, দেবব্রত কাগজখানা দেখাইলে সে বলিল—এর মানে সাহিত্য। এ ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীর বইয়ের বিজ্ঞাপন, কোথায় পেলে ?

অপু হাত তুলিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই লাইব্রেরীর কোণটায় কুড়িয়ে পেয়েচি, লাইব্রেরীর ভেতর থেকে কেমন করে উড়ে এসেচে বোধ হয়। কাগজখানার আঘ্রাণ লইয়া হাসিমুখে বলিল—কেমন ন্যাপথালিনের গন্ধটা !

লাইব্রেরীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আবহাওয়া হইতে কাগজখানা যেন একরাশ পাণ্ডিত্যের বোঝা লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে !

কাগজখানা সে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল।

হেড্‌মাষ্টারকে অপু অত্যন্ত ভয় করে। প্রৌঢ় বয়স, বেশ লম্বা, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ—অনেকটা যাত্রা-দলের মুনির মত। ভারী নাকি কড়া মেজাজের লোক, শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন। অপু এতদিন তাঁহাকে দূর হইতেই দেখিয়া আসিতেছিল। একদিন একটা বড় মজা হইল। সত্যেনবাবু ক্লাসে আসিয়া বাংলা হইতে ইংরাজি করিতে দিয়াছেন, এমন সময় হেড্‌মাষ্টার ক্লাসে ঢুকিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল ! হেড্‌মাষ্টার বইখানা সত্যেনবাবুর হাত হইতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন —আচ্ছা এই যে এতে ভিক্টর হিউগো কথাটা লেখা আছে, ভিক্টর হিউগো কে ছিলেন জানো ? ক্লাস নীরব। এ নাম কেহ জানে না। পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছেলে, কেহ নামও শোনে নাই।—

কে বল্‌তে পারো—তুমি-. তুমি ?

ক্লাসে ছুঁচ পড়িলে তাহার শব্দ শোনা যায়।

অপুর অস্পষ্ট মনে হইল নামটা যেন তাহার নিতান্ত অপরিচিত নয়, কোথায় যেন সে পাইয়াছে ইহার আগে। কিন্তু তাহার পালা আসিল ও চলিয়া গেল, তাহার মনে পড়িল না। ওদিকের বেঞ্চিটা ঘুরিয়া যখন প্রশ্নটা তাহাদের সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িল নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে সেই পুরাতন বঙ্গবাসীগুলার মধ্যে কোথায় সে এ কথাটা পড়িয়াছে—বোধ হয় সেই 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে হইবে। তাহার মনে পড়িয়াছে ! পরক্ষণেই সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—ফরাসী দেশের লেখক, খুব বড় লেখক। প্যারিসে তাঁর পাথরের মূর্ত্তি আছে, পথের ধারে—

হেড্‌মাষ্টার বোধ হয় এ ক্লাশের ছেলের নিকট এ ভাবের উত্তর আশা করেন নাই, তাহার দিকে চশমা-আঁটা জলজলে চোখে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিতেই অপু অভিভূত ও সঙ্কুচিত অবস্থায় চোখ নামাইয়া লইল। হেড্‌মাষ্টার বলিলেন—আচ্ছা বেশ। বসো, বসো সব।

সত্যেনবাবু তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ছুটির পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। ছোটখাট বাড়ী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একাই থাকেন। ষ্টোভ্ জালিয়া চা ও খাবার করিয়া তাহাকে দিলেন, নিজেও খাইলেন। বলিলেন—আর একটু ভাল কোরে গ্রামারটা পড়্‌বে—আমি তোমাকে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেবো।

অপুর লজ্জাটা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, সে আল্‌মারীটার দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওতে আপনার অনেক বই আছে।

সত্যেনবাবু আল্‌মারী খুলিয়া দেখাইলেন। বেশীর ভাগই আইনের বই, শীঘ্রই আইন পরীক্ষা দিবেন। একখানা বই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—এখানা তুমি পোড়ো, বাংলা বই, ইতিহাসের গল্প।

অপুর আরও দু একখানা বই নামাইয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারিল না।

মাস দুই তিনের মধ্যে বোর্ডিংয়ের সকলের সঙ্গে তাহার খুব জানাশোনা হইয়া গেল।

হয়ত তাহা ঘটিত না, কারণ তাহার মত লাজুক ও মুখচোরা প্রকৃতির ছেলের পক্ষে সকলের সহিত মিশিয়া আলাপ করিয়া লওয়াটা একরূপ সম্ভবের বাহিরের ব্যাপার, কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার সহিত যাচিয়া আসিয়া আলাপ করিল। তাহাকে কে খুসি করিতে পারে ইহা লইয়া দিনকতক যেন বোর্ডিংয়ের ছেলেদের

মধ্যে একটা পাল্লা দেওয়া চলিল। খাবার ঘরে খাইতে বসিবার সময় সকলেরই অপু তাহার কাছে বসে, এ তাড়াতাড়ি বড় পিঁড়িখানা পাতিয়া দিতেছে, ও ঘি খাইবার নিমন্ত্রণ করিতেছে। প্রথম প্রথম সে ইহাতে অস্বস্তি বোধ করিত, খাইতে বসিয়া তাহার ভাল করিয়া খাওয়া ঘটিত না, কোনো রকমে খাওয়া সারিয়া উঠিয়া আসিত। কিন্তু যেদিন ফার্ষ্টক্লাসের রমাপতি পর্য্যন্ত তাহাকে নিজের পাতের লেবু তুলিয়া দিয়া গেল, সেদিন সে মনে মনে খুসি ত হইলই, একটু গর্ব্বও অনুভব করিল। রমাপতি বয়সে তাহার অপেক্ষা চার পাঁচ বৎসরের বড়, ইংরাজি ভাল জানে বলিয়া হেডমাষ্টারের প্রিয়পাত্র, মাষ্টারেরা পর্য্যন্ত খাতির করিয়া চলেন, একটু গম্ভীরপ্রকৃতির ছেলেও বটে। খাওয়া শেষ করিয়া আসিতে আসিতে সে ভাবিল—আমি কি আর ওই শ্যামলালের মত? রমাপতি-দা পর্য্যন্ত সেধে লেবু দিলে! দ্যায় ওদের? কথাই বলে না।

দেবব্রত অন্ধকারের মধ্যে কাটালতলাটায় তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। বলিল—আপনার ঘরে যাবো অপূর্ব্ব-দা, একটা টাস্ক্ একটু বলে দেবেন?

পরে সে হাসিমুখে বলিল—আজ বুধবার, আর চারদিন পরেই বাড়ী যাবো—শনিবারটা ছেড়ে দিন, মধ্যে আর তিনটে দিন। আপনি বাড়ী যাবেন না, অপূর্ব্ব-দা?

প্রথম কয়েক মাস কাটিয়া গেল। স্কুল কম্পাউণ্ডের সেই পাতাবাহার ও চীনা জবার ঝোপটা অপুর বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। রবিবারের শান্ত দুপুরে রৌদ্রে পিঠ দিয়া শুক্‌না পাতার রাশির মধ্যে বসিয়া বসিয়া বই পড়ে। ক্লাসের বই পড়িতে তাহার ভাল লাগে না, সে সব বই-এর গল্পগুলা সে মাসখানেকের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিয়াছে, কিন্তু মুস্কিল এই যে, স্কুল-লাইব্রেরীতে ইংরাজি বই বেশী, যে বইগুলার বাঁধাই চিত্তাকর্ষক, ছবি বেশী সেগুলা সবই ইংরাজি। ইংরাজি সে ভাল বুঝিতে পারে না, কেবল ছবির তলাকার বর্ণনাটা বোঝে মাত্র।

একদিন হেড্‌মাষ্টারের আপিসে তাহার ডাক পড়িল। হেড্‌মাষ্টার ডাকিতেছেন শুনিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে ভয়ে আফিস ঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া দেখিল আর একজন সাহেবী পোষাক পরা ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন, হেড্‌মাষ্টারের ইঙ্গিতে সে ঘরে ঢুকিয়া দুজনের সাম্‌নে দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি ইংরাজিতে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও সাম্‌নের একখানা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিয়া লইয়া একখানি ইংরাজি বই তাহার হাতে দিয়া ইংরাজিতে বলিলেন—এই বইখানা তুমি পড়তে নিয়েছিলে?

অপু দেখিল বইখানা The World of Ice, মাস-খানেক আগে লাইব্রেরী হইতে পড়িবার জন্য লইয়াছিল। সবটা ভাল বুঝিতে পারে নাই।

সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ইয়েস—

হেড্‌মাষ্টার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন - ইয়েস সার!

অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিব শুকাইয়া আসিতেছিল, থতমত খাইয়া বলিল—ইয়েস, সার—

ভদ্রলোকটি পুনরায় ইংরাজিতে বলিলেন—স্লেজ কাকে বলে?

অপু ইহার আগে কখনো ইংরাজি বলিতে অভ্যাস করে নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া ইংরাজিতে বানাইয়া বলিল—এক ধরণের গাড়ী, কুকুরে টানে। বরফের উপর দিয়া যাওয়ার কথাটা মনে আসিলেও হঠাৎ সে তাহার ইংরাজি করিতে পারিল না।

—অন্য গাড়ীর সঙ্গে স্লেজের পার্থক্য কি?

অপু প্রথমে বলিল- স্লেজ হ্যাজ্—তারপরই তাহার মনে পড়িল আর্টিক্‌ল্ সংক্রান্ত কোনো গোলোযোগ এখানে উঠিতে পারে। 'এ' বা 'দি' কোন্‌টা বলিতে হইবে তাড়াতাড়ির মাথায় ভাবিবার সময় না পাইয়া সোজাসুজি বহুবচনে বলিল—স্লেজেস হ্যাভ নো হুইল্‌স্—

—অরোরা বোরিয়ালিস কাকে বলে?

অপুর চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাইল। মাত্র দিন কতক আগে সত্যেনবাবুর কি একখানা ইংরাজি বইতে সে ইহার ছবি দেখিয়াছিল, সে জায়গাটা পড়িয়া মানে না বুঝিলেও কথাটা খুব বড় ও গাল-ভরা বলিয়া সত্যেন বাবুর নিকট উচ্চারণ জানিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি বলিল—অরোরা বোরিয়ালিস্ ইজ্ এ কাইণ্ড অফ্ এ্যাটমোস্ফেরিক্ ইলেক্‌ট্রিসিটি—

ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিল, আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলিতেছেন—আন্‌ইউযুয়াল ফর এ বয় অফ দি ফোর্থ ক্লাস। কি নাম বল্লেন? এ ষ্ট্রাইকিংলি হ্যাণ্ডসাম্ বয়—বেশ বেশ!

অপু পরে জানিয়াছিল তিনি স্কুলবিভাগের বড় ইন্‌স্পেক্টর,না বলিয়া হঠাৎ স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন।

মাঝে মাঝে সে রমাপতির ঘরে আঁক বুঝিতে যায়: রমাপতি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, নিজের সিট বেশ সাজাইয়া রাখিয়াছে। টেবিলের উপরে পাথরের দোয়াত-দানি, নতুন নিব-পরানো কলমগুলি সাফ করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে, বিছানাটি ধবধবে, বালিশের উপর তোয়ালে। অপুর সঙ্গে পড়া-শুনার কথাবার্তা মিটিবার পর সে বলিল—এবার তোমায় সরস্বতী-পুজোতে ছোট ছেলেদের লীডার হতে হবে, আর তো বেশী দেরীও নেই, এখন থেকেই চাঁদা আদায়ের কাজে বেরুনো চাই।

অপু মৃদু স্বরে বলিল—আমি ও লীডার-টিডার হোতে পারবো, না রমাপতিদা। ও সব ভারী—

রমাপতি ভাবিয়াছিল, কথাটা শুনিয়া অপূর্ব্ব খুসি হইবে। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন হে, এতে অমত কি আছে? ভালো কথা তো!

অপু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। আর কোনো প্রতিবাদ করিল না বটে কিন্তু মনে মনে ঠিক করিল উহার মধ্যে সে যাইবে না। আসল কথা সে কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবে না। ছেলের দলের আগে আগে সহরে বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া চাঁদা চাওয়া—অসম্ভব, তাহার কাজ নয়।

উঠিবার সময় ভাবিল, রমাপতিদার মত এইরকম একটা দোয়াতদান হয় আমার? চমৎকার ফুলকাটা? লিখে আরাম আছে।

সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল দেবব্রত সমীরের টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে। অপু বলিল—কি দেবু বাড়ী যাও নি আজ?

দেবব্রত মাথা না তুলিয়াই বলিল—দেখুন না কাণ্ড সেকেন মাষ্টারের, ছুটি দিলে না—ও শনিবার বাড়ী যাই নি, আপনি তো জানেন অপূর্ব্ব-দা! বল্লে, তুমি কি শনিবারে বাড়ী যাও, তোমার ছুটি হবে না—

দেবব্রতের জন্য অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। বাড়ীর জন্য তাহার মনটা সারা সপ্তাহ ধরিয়া কি রকম তৃষিত থাকে অপু সে সন্ধান রাখে। মনে ভাবিল, ওরই ওপর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের যত কড়াকড়ি, থাকতে পারে না ছেলেমানুষ, আচ্ছা লোক!

অপু বলিল—রমাপতিদাকে দিয়ে আমি একবার বিধু বাবুকে বলাবো?

দেবব্রত ম্লান হাসিয়া বলিল—কাকে বোলবেন? তিনি আছেন বুঝি? মেয়ের জন্যে নিখে বেহারাকে দিয়ে বাজার থেকে কমলা লেবু আনালেন, কপি আনালেন। তিনি বাড়ী চলে গিয়েচেন কোন্ কালে, সেই ছুটোর ট্রেনে—আর এখন বলেই বা কি হবে, আমাদের লাইনের গাড়ীও তো চলে গিয়েচে—আজ আর গাড়ী নেই।

অপু তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিল—এস, একটা খেলা করা যাক। তুমি হও চোর, একখানা বই চুরি কোরে লুকিয়ে থাকো, আমি ডিটেক্‌টিভ্ হবো, তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবো—কিংবা ওইটে যেন একটা নক্সা, তুমি ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পালাবে, আমি তোমাকে খুঁজে বার করবো—পড়ো নি 'নিহিলিষ্ট রহস্য'? চমৎকার বই—উঃ সে কাণ্ড! প্রতুলের কাছে আছে, চেয়ে দেবো।

দেবব্রতের খেলাধূলা ভাল লাগিতেছিল না, তবুও অপুর কথার কোনো প্রতিবাদ না করিয়া মাথা তুলিয়া বসিল। বলিল—আমি লাইব্রেরীর ওই কোণটায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবো?

—লুকিয়ে থাকতে হবে না, এই কাগজখানা একটা দরকারী নক্সা, তুমি পকেটের মধ্যে নিয়ে যেন রেলগাড়ীতে যাচ্চো, আমি বার কোরে দেখে নেবো, তুমি পিস্তল বার করে গুলি কর্ত্তে আসবে—

দেবব্রতকে লইয়া খেলা জমিল না, একে সে 'নিহিলিষ্ট রহস্য' পড়ে নাই, তাহার উপর তাহার মন খারাপ। নূতন

ধরণের যুদ্ধ-জাহাজের নক্সাখানা সে বিনা বাধায় ও এত সহজে বিপক্ষের গুপ্তচরকে চুরি করিতে দিল যে, তাহাকে এসব কার্য্যে নিযুক্ত করিলে রুষীয় সম্রাটকে পতনের অপেক্ষায় ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিদ্রোহের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। বোর্ডিংয়ের পিছনে দেওয়ানী আদালতের কম্পাউণ্ডে অর্থী-প্রত্যর্থীর ভিড় কমিয়া গিয়াছে। দেবব্রত জানালার দিকে চাহিয়া বলিল—ক্লক্-টাওয়ারের ঘড়িতে কটা বেজেচে দেখুন না একবার? কাউকে বোলবেন না অপূর্ব্ব-দা, আমি এখুনি বাড়ী যাবো।

অপু বিস্ময়ের স্বরে বলিল—এখন যাবে কিসে? এই যে বল্লে ট্রেণ নেই?

দেবব্রত স্বর নীচু করিয়া বলিল—এগারো মাইল তো রাস্তা মোটে, হেঁটে যাবো, একটু রাত যদি হয়ে পড়ে জ্যোৎস্না আছে, বেশ যাওয়া যাবে।

—এগারো মাইল রাস্তা এখন এই পড়ন্ত বেলায় হেঁটে যেতে যেতে কত রাত হবে জানো? রাস্তা কখনো হেঁটেচো তুমি? তা ছাড়া না বোলে যাওয়া—যদি কেউ টের পায়?

কিন্তু দেবব্রতকে নিবৃত্ত করা গেল না। সে কখনো রাস্তা হাঁটে নাই তাহা ঠিক, রাত্রি হইবে তাহা ঠিক, বিধুবাবুর কানে কথাটা উঠিলে বিপদ আছে, সবই ঠিক, কিন্তু বাড়ী সে যাইবেই—সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না—যাহা ঘটে ঘটিবে। অবশেষে অপু বলিল—চল তা'হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

দেবব্রত বলিল—তাহলে সবাই টের পেয়ে যাবে, আপনি তিন চার মাস বোর্ডিং ছেড়ে কোথাও যান নি, খাবার-ঘরে না দেখতে পেলে সবাই জান্‌তে পারবে।

দেবব্রত চলিয়া গেলে অপু কাহারও নিকট সে কথা বলিল না বটে, কিন্তু পরদিন সকালে খাওয়ার-ঘরে দেখা গেল দেবব্রতের অনুপস্থিতি অনেকে লক্ষ্য করিয়াছে। রবিবার বৈকালে সমীর আসিলে তাহাকে সে কথাটা বলিল। পরদিন সোমবারে দেবব্রত সকলের সম্মুখে কি করিয়া বোর্ডিংয়ের কম্পাউণ্ডে ঢুকিবে বা ধরা পড়িলে কৃত কার্য্যের কি কৈফিয়ৎ দিবে এই লইয়াই দুজনে অনেক রাত পর্য্যন্ত আলোচনা করিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া দেবব্রতকে সমীরের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে দেখিয়া সে দস্তুরমত অবাক হইয়া গেল। সমীর বাহিরে মুখ ধুইতে গিয়াছিল, আসিলে জানা গেল যে, কাল অনেক রাত্রে দেবব্রত আসিয়া জানালায় শব্দ করিতে থাকে। পাছে কেহ টের পায় এ জন্য পিছনের জানালার খোলা-গরাদেটা তুলিয়া সমীর তাহাকে ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে।

অপু আগ্রহের সঙ্গে গল্প শুনিতে বসিল। কখন সে বাড়ী পৌঁছিল? রাত কত হইয়াছিল, তাহার মা তখন কি করিতেছিলেন? ইত্যাদি

রাত অনেক হইয়াছিল। বাড়ীতে রাতের খাওয়া প্রায় শেষ হয় হয়। তাহার মা ছোট ভাইকে প্রদীপ ধরিয়া রান্নাঘর হইতে বড়ঘরের রোয়াকে পৌঁছাইয়া দিতেছেন এমন সময়—

অপু কত দিন নিজে বাড়ী যায় নাই। মাকে কত দিন যে দেখে নাই। ইহার মত হাঁটিয়া যাতায়াতের পথ হইলে এতদিন কতবার যাইত। রেলগাড়ী, গহনার নৌকা, আবার খানিকটা হাঁটা-পথও। যাতায়াতের দেড় টাকা খরচ, তাহার একমাসের জল খাবার। কোথা পাইবে দেড় টাকা যে, প্রতি শনিবার তো দূরের কথা, মাসে অন্ততঃ একবারও বাড়ী যাইবে? জল খাবারের পয়সা বাঁচাইয়া আনা আষ্টেক পয়সা হইয়াছে, আর একটা টাকা হইলেই—বাড়ী। হয়তো এক টাকা জমিতে জমিতে গরমের ছুটিই বা আসিয়া যাইবে কে জানে?

পরদিন স্কুলে হৈ হৈ ব্যাপার। দেবব্রত যে লুকাইয়া কাহাকেও না বলিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল এবং রবিবার রাত্রে লুকাইয়া বোর্ডিংয়ে ঢুকিয়াছে, সে কথা কি করিয়া প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। বিধুবাবু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—সে কথা হেড্‌মাষ্টারের কানে তুলিয়াছেন। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া সমীরের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গেল, সে-ই যে জানালার ভাঙা গরাদে খুলিয়া দেবব্রতকে তাহাদের ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে, সে কথা হেড্‌মাষ্টার জানিতে পারিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? সমীর রমাপতির ঘরে

গিয়া অবস্থাটা বুঝিয়া আসিল। দেবব্রত নিজেই সব স্বীকার করিয়াছে সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু সমীরের জানালা খুলিয়া দেওয়ার কথা কিছুই বলে নাই। বলিয়াছে সোমবারের খুব ভোরে চুপি চুপি লুকাইয়া বোর্ডিংয়ে সে ঢুকিয়াছিল, কেহ টের পায় নাই। স্কুল বসিলে ক্লাসে ক্লাসে হেড্‌মাষ্টারের সার্কুলার গেল যে, টিফিনের সময় স্কুলের হলে দেবব্রতকে বেত মারা হইবে, সকল ছাত্র ও টিচারদের সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকা চাই।

সমীর গিয়া রমাপতিকে বলিল—আপনি একবার বলুন না রমাপতি-দা হেড্‌মাষ্টারকে, ও ছেলেমানুষ থাকতে পারে না বাড়ী না গিয়ে, আপনি তো জানেন ও কি রকম home-sick ? মিথ্যে মিথ্যে ওকে তিন শনিবার ছুটি দিলে না সেকেন্‌ মাষ্টার, ওর কি দোষ ?

উপর-ক্লাসের ছাত্রদের ডেপুটেশনকে হেড্‌মাষ্টার হাঁকাইয়া দিলেন। টিফিনের সময় সকলে হলে একত্র হইলে দেবব্রতকে আনা হইল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। হেড্‌মাষ্টার বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন যে, এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তিনি শুধু বেত মারিয়াই ছাড়িয়া দিতেছেন নতুবা স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতেন। অপু দেখিল হেড্‌মাষ্টার হইতে সকল টিচারই দেবব্রতকে বোর্ডিং-পালানো দুরন্ত, উচ্ছৃঙ্খল বালকের উদাহরণ বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন, তাহার আসল মনের রূপটি কেহই বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না। রীতিমত বেত চলিল। কয়েক ঘা বেত খাইবার পরই দেবব্রত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেড্‌-মাষ্টার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—চুপ ! bend this way, bend—মার দেখিয়া বিশেষ করিয়া দেবব্রতের কান্নায় অপুর চোখে জল আসিয়া গেল।

অপু উঠিয়া বারান্দায় গেল। ফিরিয়া আসিতে সমীর ধমক দিয়া চুপিচুপি বলিল—তুই ও-রকম কাঁদচিস্ কেন অপূর্ব্ব ? থাম্ না—হেড্‌মাষ্টার বক্‌বে—

৬

সরস্বতী পূজার সময় তাহার আটআনা চাঁদা ধরাতে অপু বড় বিপদে পড়িল। মাসের শেষ, হাতেও পয়সা তেমন নাই, অথচ সে মুখে কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না, সরস্বতী পূজার চাঁদা দিয়া হাত একেবারে খালি হইয়া গেল। বৈকালে সমীর জিজ্ঞাসা করিল—খাবার খেতে গেলিনে অপূর্ব্ব ?

সে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সমীর তাহার সব খবর রাখে, বলিল—আমি বরাবর দেখে আস্‌চি অপূর্ব্ব হাতের পয়সা ভারী বে-আন্দাজি খরচ করিস্ তুই—বুঝে সুজে চললে এ রকম হয় না—আটআনা চাঁদা কে তোকে দিতে বলেচে ?

অপু হাসিমুখে বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা যা তোকে আর শেখাতে হবে না—ভারী আমার গুরুঠাকুর—

সমীর বলিল—না হাসি নয়, সত্যি কথা বলচি। আর ওই ননী, তুলো, রাসবেহারী ওদের ও-রকম বাজারে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াস্ কেন ?

অপু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিল—যাঃ বকিস্‌নে—ওরা ধরে খাওয়াবার জন্যে তা কর্‌বো কি ?

সমীর রাগ করিয়া বলিল—খাওয়াতে বল্লেই অমনি খাওয়াতে হবে ? ওরাও দুষ্টুর ধাড়ি, তোকে পেয়েচে ওই রকম তাই। অন্য কারুর কাছে তো কই ঘেঁসে না। আড়ালে তোকে বোকা বলে তা জানিস্ ?

- হ্যাঁ বলে বৈকি !

—আমার মিথ্যে কথা বলে লাভ ? সেদিন মণি-দার ঘরে তোর কথা হচ্ছিল—ওই বদ্‌মায়েস রাসবেহারীটা বল্‌ছিল—ফাঁকি দিয়ে খেয়ে নেয়,—আর ও সব কলার লোজেঞ্জুস্ কিনে এনে বিলিয়ে বাহাদুরী কর্ত্তে কে বলেচে তোকে ?

সমীর নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। জীবনে এই প্রথম নিজের খরচপত্র অপুকে নিজে বুঝিয়া করিতে হইতেছে, ইহার পূর্ব্বে কখনও পয়সাকড়ি নিজের হাতের মধ্যে পাইয়া নাড়াচাড়া করে নাই—কাজেই সে টাকা পয়সার ওজন বুঝিতে পারে না। স্কলারশিপের টাকা-হইতে বোর্ডিংএর খরচ মিটাইয়া টাকাদুই হাতখরচের জন্য বাঁচে—এই দেড় টাকা দু'টাকাকে সে টাকার হিসাবে না দেখিয়া পয়সার হিসাবে দেখিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কখনও আটটা পয়সা একত্র হাতের মধ্যে পায় নাই—একশো কুড়িটা পয়সা তাহার কাছে কুবেরের ধনভাণ্ডারের

সমান অসীম মনে হয়! মাসের প্রথমে ঠিক রাখিতে না পারিয়া সে দরাজ হাতে খরচ করে—বাঁধানো খাতা কেনে, কালি কেনে, খাবার খায়। প্রায়ই দুচারজন ছেলে আসিয়া ধরে তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে। তাহার খুব প্রশংসা করে, পড়াশুনার তারিফ্ করে। অপু মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করে, ভাবে—সোজ ভাল ছেলে আমি! সবাই কি খাতির করে! তবুও তো মোটে পাঁচ মাস এসিচি!

মহাখুসির সহিত তাহাদিগকে বাজারে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়ায়।

ইহার উপর আবার কেহ কেহ ধার করিতে আসে, অপু কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না।

এরূপ করিলে কুবেরের ভাণ্ডার আর কিছু বেশী দিন টিকিতে পারে বটে কিন্তু একশত কুড়িটা পয়সা দশদিনের মধ্যেই নিঃশেষে উড়িয়া যায়. মাসের বাকী দিনগুলিতে কষ্ট ও টানাটানির সীমা থাকে না। দু দশটা পয়সা যে যাহা ধার লয়, মুখচোরা অপু কাহারও কাছে তাগাদা করিতে পারে না,—প্রায়ই তাহা আর আদায় হয় না।

সমীর ব্যাড্মিণ্টনের র‍্যাকেট হাতে বাহির হইয়া গেল। অপু ভাবিল—বলুক বোকা। আমি তো আর বোকা নই? পয়সা ধার নিয়েচে কেন দেবে না—সবাই দেবে।

পরে সে একখানা বই হাতে লইয়া তাহার প্রিয় গাছপালা ঘেরা সেই কোণটিতে বসিতে যায়। মনে পড়ে এতক্ষণ সেখানে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে, চীনে জবা গাছে কচি কচি পাতা ধরিয়াছে। যাইবার সময় ভাবে, দেখি আর ক'টা লেবেঞ্চুস্ আছে? পরে গোটাকতক বোতল হইতে বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া দেয়।·· ভাবে, আস্‌চে মাসের টাকা পেলে ঐ যে আনারসের একরকম আছে, তাই কিনে আন্‌বো একশিশি—কি চমৎকার এগুলো খেতে! এ ধরণের ফলের আস্বাদযুক্ত লেবেঞ্চুস্ সে আর কখনও খায় নাই।

কম্পাউণ্ডে নামিয়া লাইব্রেরীর কোণটা দিয়া যাইতে যাইতে সে হঠাৎ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। একজন বেঁটে মত লোক ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া স্কুলের কেরাণী ও বোর্ডিংয়ের বাজার-সরকার গোপীনাথ দত্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছে।

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল··· সে কিসের টানে যেন লোকটির দিকে পায়ে পায়ে আগাইয়া গেল·· লোকটা এবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে· হাতটা কেমন বাঁকাইয়া আছে, তখনি কথা শেষ করিয়া সে ইঁদারার পাড়ের গায়ে ঠেস্ দেওয়ানো ছাতাটা হাতে লইয়া কম্পাউণ্ডের ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। লোকটাকে দেখিতে অবিকল তাহার বাবার মত।

কতদিন সে বাবার মুখ দেখে নাই। আজ চার বৎসর।···

উদ্গত চোখের জল চাপিয়া জবাতলায় গিয়া সে গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিল।

অন্যমনস্ক ভাবে বইখানা উল্টাইয়া যায়। তাহার প্রিয় সেই তিন-রঙা ছবিটা বাহির করিল, পাশের পৃষ্ঠায় সেই পদ্যটা।

স্বদেশ হইতে বহুদূরে, আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে, আলজিরিয়ায় কর্কশ, বন্ধুর, জলহীন মরুপ্রান্তে একজন মুমূর্ষু তরুণ সৈনিক বালুশয্যায় শায়িত। দেখিবার কেহ নাই। কেবল জনৈক সৈনিকবন্ধু পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুখে চামড়ার বোতল হইতে একটু একটু জল দিতেছে। পৃথিবীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার সময় সম্মুখের এই অপরিচিত. ধূসর, উঁচুনীচু বালিয়াড়ি, পিছনের আকাশে সান্ধ্যসূর্য্যরক্তচ্ছটা, দূরে খর্জ্জুরকুঞ্জ ও উর্দ্ধমুখ উষ্ট্রশ্রেণীর দিকে চোখ রাখিয়া মুমূর্ষু সৈনিকটির কেবলই মনে পড়িতেছে বহুদূরের রাইন নদীতীরবর্ত্তী তাহার জন্মপল্লীর কথা·· তাহার মা আছেন সেখানে। বন্ধু, তুমি আমার মায়ের কাছে খবরটা পৌছাইয়া দিও, ভুলিও না।

For my home is in distant Bingen, Fair Bingen on the Rhine.

মাকে অপু দেখে নাই আজ পাঁচ মাস।·· সে আর থাকিতে পারে না···বোর্ডিং তাহার ভাল লাগে না, স্কুল

আর ভাল লাগে না ··মাকে না দেখিয়া আর থাকা যায় না।

এই সব সময়ে এই নির্জ্জন অপরাহ্ণগুলিতে নিশ্চিন্দিপুরের কথা কেমন করিয়া তাহার মনে পড়িয়া যায়। সেই একদিনের কথা মনে পড়ে—বাড়ীর পাশের পোড়ো ভিটার বনে অনেকগুলা ছাতারে পাখী কিচ্‌কিচ্‌ করিতেছিল, কি ভাবিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেই দলের মধ্যে ছোট একটা পাখী ঘাড় মোচড়াইয়া টুপ্‌ করিয়া ঝোপের নীচে পড়িয়া গেল, বাকীগুলা উড়িয়া পলাইল, তাহার ঢিলে পাখী সত্য সত্য মরিবে ইহা সে ভাবে নাই, দৌড়িয়া গিয়া মহা আগ্রহে দিদিকে ডাকিল, ওরে দিদি, শীগ্‌গির আয়রে, দেখ্‌বি একটা জিনিষ, ছুটে আয়—

দুর্গা আসিয়া শুনিয়া বলিল, দেখি দে দিকি আমার হাতে? পরে সে নিজের হাতে পাখীটিকে লইয়া কৌতূহলের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, দুর্গার আঙুলে রক্ত লাগিয়া গেল। দুর্গা তিরস্কারের সুরে বলিল, আহা কেন মাত্তে গেলি তুই?

অপুর বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল মন একটু দমিয়া গেল।

দুর্গা বলিল, আজ কি বার রে? সোমবার না? তুই তো বামুনের ছেলে—চল্‌ তুই আর আমি একে নিয়ে গাঙের ধারে পুড়িয়ে আসি—এর গতি হয়ে যাবে।

তারপর দুর্গা কোথা হইতে একটা দেশলাই সংগ্রহ করিয়া আনিল, তেঁতুলতলার ঘাটের এক ঝোপের ধারে শুকনো পাতার আগুনে পাখীটাকে খানিক পুড়াইল; পরে আধ-ঝলসানো পাখীটা নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া সে ভক্তিভাবে বলিল- হরিবোল হরি, হরি ঠাকুর ওর গতি কর্‌বেন, দেখিস্‌ আহা কি করেই ঘাড়টা থেঁত্‌লে দিইছিলি? কখ্‌খনো ওরকম করিস্‌ নে আর? বনেজঙ্গলে উড়ে বেড়ায়, কারুর কিছু করে না, মাত্তে আছে ছিঃ।—

নদী হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া দুর্গা চিতার জায়গাটা ধুইয়া দিল।

সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরিবার সময় কে জানে তাহারা কোন্‌ মুক্ত বিহঙ্গ আত্মার আশীর্ব্বাদ লইয়া ফিরিয়াছিল?

দেবব্রত আসিয়া ডাক দিতে অপুর নিশ্চিন্দিপুরের স্বপ্ন মিলাইয়া গেল। দেবব্রত বলিল—অপূর্ব্বদা এখানে বসে আছেন? আমি ঠিক ভেবেচি আপনি এখানেই আছেন—কি কথা ভাবচেন—মুখ ভার ভার—

অপু হাসিয়া বলিল—ও কিছু না, বসো এসো। কি? চল দেখি রাসবেহারী কি করচে—

দেবব্রত বলিল—না যাবেন না অপূর্ব্ব-দা, কেন ওদের সঙ্গে মেশেন? আপনার নামে লাগিয়েচে ধোপার পয়সা দেয় না, পয়সা বাকী রাখে, এই সব। যাবেন না ওদের ওখানে—

—কে বলেচে এসব কথা?

—ওই ওরাই বলে। বিনোদ ধোপাকে শিখিয়ে দিচ্ছিল আপনার কাছে পয়সা বাকী না রাখতে। বলছিল ও আর দেবে না—তিন বারের পয়সা নাকি বাকী আছে।

অপু বলিল, বারে, বেশ লোক তো সব! হাতে পয়সা ছিল না তাই দিই নি—এই সাম্‌নে মাসের প্রথমেই দিয়ে দেবো—তা আবার ধোপাকে শিখিয়ে দেওয়া—আচ্ছা তো সব?

দেবব্রত বলিল—আবার আপনি ওদের যান খাওয়াতে। আপনার সেই খাতাখানা নিয়ে ওই বদমাইস্‌ হিমাংশুটা আজ কত ঠাট্টা-তামাসা করছিল—ওদের দেখান কেন ওসব?

অপূর্ব্ব বলিল—এসব কথা আমি কিচ্ছু জানি নে, আমি লিখ্‌ছিলাম, ননীমাধব এসে বলে ওটা কি? তাই এট্টুখানি পড়ে শোনালাম—কি কি—কি বল্‌ছিল?

আপনাকে পাগল বলে—যত রাজ্যির গাছপালার কথা নাকি শুধু শুধু খাতায় লেখা। আবোল-তাবোল শুধু, তাতেই ভর্ত্তি। ওরা তাই নিয়ে হাসে। আপনি চুপ করে এই খানে মাঝে মাঝে এসে বসেন বলে কত কথা তুলেচে—

অপুর রাগ হইল, একটু লজ্জাও হইল। ভাবিল, খাতাখানা না দেখালেই হতো সেদিন! দেখ্‌তে চাইলে তাই তো দেখালাম নইলে আমি সেধে তো আর—

মাঝে মাঝে তাহার মনে কেমন একটা অস্থিরতা আসে, এ সবদিনে বোর্ডিংঘরে আবদ্ধ থাকিতে মন চাহে না। কোথায় কোন্‌ মাঠ বৈকালের রোদে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে,

ছায়াভরা নদীজলে কোথায় নববধূর নাকছাবির মত পানকলস সেওলার কুচা কুচা শাদা ফুল ফুটিয়া নদীজল আলো করিয়া রাখিয়াছে, মাঠের মাঝে উঁচু ডাঙায় কোথায় ঘেঁটুফুলের বন—এই সবের স্বপ্নে সে ভোর থাকে, মুক্ত আকাশ, মুক্ত মাঠ, গাছপালার জন্ম মন কেমন করে। গাছপালা না দেখিয়া বেশী দিন থাকা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। মনে বেশী কষ্ট হইলে একখানা খাতায় সে বসিয়া বসিয়া যত রাজ্যের গাছের, লতাপাতার নাম লেখে এবং যে ধরণের ভূমিশ্রীর জন্ম মনটা তৃষিত, তাহার একটা বর্ণনা লেখে। তাহার মধ্যে নদী থাকে, নদীর পাশেই থাকে মাঠ, বাবুলবন, নানা বনজ গাছ, পাখী ডাকে, সকাল-বিকালের রোদ—ফুল।...ফুলের সংখ্যা থাকে না। ঘণ্টা-দুই লিখিলে তবে মনের তৃষ্ণা অনেকখানি মিটে, বোর্ডিংএর ঘরটায় আবদ্ধ থাকিয়াও মনে মনে সে নানা অজানা মাঠে, বনে, নদীতীরে বেড়াইয়া আসে। একখানা বাঁধা খাতাই সে এভাবে লিখিয়া পুরাইয়া ফেলিয়াছে।

অপু বলিল—বলুক গে, বয়ে গেল, আর কথ্‌খনো কিছু দেখাচ্ছি নে। ওদের সঙ্গে এই আমার হয়ে গেল। দেবো আবার কখনো ক্লাসের ট্রান্‌স্লেশন বলে—

(ক্রমশ)

ফাল্গুনে

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

এত কলি, এত মধু, এত গুঞ্জরণ
এত কেন বিচিত্র বরণ
আমার দুয়ারে আজি আনিলে বল্লভ!
নিশিদিন নবীন পল্লব
দক্ষিণের মৃদু বায়ে শিহরি সঞ্চরি
এই মোর মুগ্ধ হিয়া ভরি
এত কথা কেন কহে? হে প্রিয় আমার
আনন্দের এত উপহার
সহিতে যে পারে না পরাণ; গেছ ভুলি
কি ব্যথায় গেছে দিনগুলি?

সেই তীব্র বেদনার অন্ধকার টুটি'
উঠে আজি চারিদিকে ফুটি
একি আভা, একি জ্যোতিঃ! উচ্ছ্বসিয়া বুক
ঝলকিছে কি মহা-ময়ূখ!
অন্তহীন রিক্ততার হিমশীর্ণ হাতে
বসন্তের কিরণ-সম্পাতে
প্রাচুর্য্যের একি শুভ্র লীলা-শতদল
দিলে আনি সুধায় কোমল
একেবারে এত সুখ হানি হৃদিতলে
ভাসাইলে কেন আঁখিজলে?

রাগ করিয়ো না, প্রিয়! এতদিন পরে
হে বাঞ্ছিত, এলে তুমি ঘরে
মোর তরে নিয়ে এলে করি আহরণ
কত বেশ, কত আভরণ
মরমের বীণাখানি যতনে সাধিয়া
কত সুরে আনিলে বাঁধিয়া
নাহি মনে অপ্রশংসা তার; সমারোহ
চিত্তে মোর জাগায়ো না দ্রোহ
শুধু ভয়, পাছে গুরু নৈবেদ্যের ভারে
হারাইয়া ফেলি দেবতারে।

সেকালের কলিকাতায় ইংরাজী স্কুল

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি-এ

১৭৭৪ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় ইংরাজী-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। খিদিরপুর-পুলে উঠিবার সময় দেখিতে পাওয়া যায়, পশ্চিম দিক্ দিয়া একটি রাস্তা গঙ্গাতীরের দিকে চলিয়া গিয়াছে ; ঐ অঞ্চলের নাম "কুলী-বাজার"। ইহা অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানেই ১৭৭৫, ৫ই আগষ্ট শনিবার দিবসে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল। পলাসীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বৎসর হইতেই বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। যে-সকল কুলী ও মজুর দুর্গ-নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিল, তাহারা এই স্থানে বাস করিত বলিয়া লোকে অদ্যাপি ইহাকে "কুলী-বাজার" বলিয়া থাকে।

যে-সকল ইংরাজ সৈনিক পুরুষ শ্রীরঙ্গপট্টন বা পলাসীর প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া কুলী-বাজারেই বাস করিতেন। তখন কলিকাতায় অতি অল্পই পাকাবাড়ী ছিল; সুতরাং খড়ের ঘরেই তাঁহাদিগকে বাস করিতে হইত। তাঁহাদের অনেকে যুদ্ধকার্য্যে অসমর্থ হওয়ায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইয়া দিন-যাপন করিতেছিলেন। প্রত্যেক লোকে দৈনিক একটাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তাঁহারা সকলেই প্রায় নিষ্কর্ম্মা,—তামাক খাইয়া ও গল্প করিয়া দিন কাটাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যৎসামান্য ইংরাজী জানিতেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্, তিনি একটি স্কুল খুলিয়া বসিতেন। তাঁহার দেখাদেখি কোন বিধবা সৈনিক-রমণীও আর একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। মাষ্টার-সাহেব একখানি ভগ্নপ্রায় পুরাতন চেয়ারে বসিয়া সম্মুখস্থিত একটি বেতের মোড়ার উপর পা-দুখানি তুলিয়া দিয়া ছাত্রগণকে A B C ইত্যাদি অক্ষর শিক্ষা দিতে বসিলেন। মুখে একটি গুড়গুড়ির নল বিরাজ করিতে লাগিল। ছাত্রগণকে প্রহার করিবার জন্য হাতে একগাছি বেত রাখিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ একটি পা-জামা ও চাপকান। এক একটি ছাত্র মোড়ায় বসিয়া পড়িত। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্র "মিশ্রভাগ" পর্য্যন্ত অঙ্ক কষিত। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত স্কুল বসিত। মাষ্টার-সাহেবের গৃহিণী তরকারী ছাড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে রন্ধনের আয়োজন করিতেন। পলাসীর যুদ্ধের পরবর্ত্তী কাল হইতে কয়েক বৎসর এই ভাবেই শিক্ষাদান করা হইত।*

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপেই কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্ত্তী ২৫ বৎসরে শিক্ষার অবস্থা যৎকিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছিল। ১৮১৭, ২০ জানুয়ারি সোমবার "হিন্দু-কলেজ" স্থাপিত হইলে পাশ্চাত্য প্রণালী মতে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে হিন্দু-কলেজে রীতিমত শিক্ষাদান করা হইতে লাগিল এবং ক্রমশই তাহার সুফল ফলিতে লাগিল।

সেকালের কলিকাতায় যে-সকল ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল,† তাহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) চ্যারিটি স্কুল (Charity School)। পলাসীর যুদ্ধের ২৩ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ‡ এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার কোন্ স্থানে কোন্ ব্যক্তি ইহা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহাই কলিকাতায় সর্ব্ব প্রথম ইংরাজী স্কুল। এইহেতু পরবর্ত্তী সময়ে লোকে ইহাকে "ওল্ড্ চ্যারিটী স্কুল" বলিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জানবাজারে কোন একজন

---

* *Calcutta Review*, vol. xiii, p. 443.

† ফ্রি-স্কুল, হিন্দু-কলেজ, প্রেসিডেন্সী-কলেজ, হিন্দু স্কুল, হেয়ার-স্কুল, মেডিক্যাল-কলেজ, ওরিয়েণ্ট্যাল-সেমিনারী, মাদ্রাসা-কলেজ, সংস্কৃত-কলেজ, বিশপ্‌স-কলেজ ইত্যাদির কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

‡ *Calcutta Review* (1853) পত্রে এই স্কুল-প্রতিষ্ঠার বৎসর ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মতে ১৭৩৪।

সাহেবের বাগানবাড়ীতে স্কুলটি উঠিয়া আসিয়াছিল। এই স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ, মাসিক ও বাৎসরিক চাঁদা আদায় করা হইত। দ্বিতীয়তঃ, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া St Anne's Church ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়ায় তাহার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ পরবর্ত্তী নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে ক্লাইভ এক কোটী সত্তর লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। এই টাকার কিছু অংশ ক্লাইভ চ্যারিটী-স্কুলের উপকারার্থ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই টাকার পরিমাণ জানা যায় না। তৃতীয়তঃ, Lawrence Constantine নামক এক ধনাঢ্য পর্ট্‌গীজের উইল-অনুসারে তাঁহার ম্যানেজার Charles Weston ১৭৭১-৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বহস্তে ছয় সাত হাজার টাকা চ্যারিটী-স্কুল ফণ্ডে দান করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানীও স্কুলটির সাহায্যার্থ অনেক টাকা দিয়াছিলেন। পঞ্চমতঃ, Mr. Bourchier এই স্কুলের নিমিত্ত প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া যান। এস্থলে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি প্রথমে কলিকাতার Master Attendant ছিলেন। তৎপরে তিনি সামান্য ব্যবসায় হইতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তৎকালে মেয়র ও অল্‌ডারম্যান কলিকাতায় বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য পৃথক্ বিচার-গৃহ ছিল না। তাঁহাদিগের অসুবিধা দূর করিবার জন্য বুরশির সাহেব একটি বিচার-গৃহ[১] নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। চ্যারিটী-স্কুলের নিমিত্ত বাৎসরিক চারি হাজার (আর্কট) মুদ্রা দান করিবেন, এই সর্ত্তে ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কোম্পানীকে বাড়ীখানি দিয়াছিলেন। কোম্পানী বাহাদুর এই টাকা রীতিমত দিতেন। এই টাকা বাদেও কোম্পানী মাসে মাসে আরও ৮০০৲ টাকা করিয়া দান করিতেন। ষষ্ঠতঃ, রাজা উমিচাঁদও এই স্কুলের উন্নতিকল্পে ৩০,০০০৲ দান করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৭৩৪ হইতে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই স্কুলটি স্বাধীন-ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইহাতে পাশ্চাত্য প্রণালী মতে উপযুক্ত শিক্ষাদান করা হইত না। এই হেতু, Calcutta Free School নামক আর একটি ইংরাজী স্কুলের সহিত ১৭৮৯, ... ডিসেম্বর ইহা মিলিত হইয়া যায়। প্রথমতঃ, উভয় স্কুলের ধন-ভাণ্ডার লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হয়। এই অসুবিধা-নিবারণের জন্য ১৮০০, ১৪ এপ্রিল তারিখে দুইটী স্কুলের ধন-ভাণ্ডার একত্র মিলিয়া যায়, এবং দুইটী স্কুলই একটি বলিয়া গণ্য হয়।*

(২) রামনারায়ণ মিশ্রের স্কুল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সুপ্রিম-কোর্ট স্থাপিত হইলেই অনেক বাঙ্গালী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে। তখন যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী জানিলেই মানুষ বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে পারিত। রামরাম মিশ্র নামক একটি লোক কিঞ্চিৎ ইংরাজী জানিতেন; অর্থাৎ তিনি কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজী প্রতিবাক্য শিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার একটি ছাত্র ছিলেন,—তাঁহার নাম রামনারায়ণ মিশ্র। রামনারায়ণ যোড়াবাগানে একটি ইংরাজী স্কুল খুলিয়াছিলেন। তিনি উকীলের কেরাণীগিরি করিতেন এবং কিঞ্চিৎ আইন জানিতেন বলিয়া লোকের দরখাস্তও লিখিয়া দিতেন। তাঁহার স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রকে অবস্থানুসারে ৪৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন দিয়া পড়িতে হইত। সুপ্রিম-কোর্ট স্থাপনের পূর্ব্বেই এই স্কুলটি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই স্কুলে Thomas Dice-এর Spelling Book পড়ান হইত।

(৩) কিয়ারন্ডান্ডার (Kiernander) স্কুল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে, ১ ডিসেম্বর তারিখে এই স্কুলটি কিয়ার-ন্ডান্ডার সাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কতকগুলি ক্রিশ্চান ছাত্র এই স্কুলে কেবল পড়িত, অবশিষ্ট ছাত্রগণ পড়িত

(১) বর্ত্তমান Writers' Buildings-এর পূর্ব্বদিকে যে স্থানে St. Andrew's Church স্থাপিত সেই স্থানেই ১৭২৭ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত Mayor's Court বসিয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে "সুপ্রিম কোর্ট" স্থাপিত হইলে কিছুকাল ইহা Mayor's Court-এর বাড়ীতেই বসিত। ১৮১৫, ৩০শে নবেম্বর St. Andrew's Church-এর ভিত্তি স্থাপিত, এবং ১৮১৮, ৮ই মার্চ্চ হইতে এখানে উপাসনা-কার্য্য আরম্ভ হয়।

* *Calcutta Review*, 1850; Cotton's *Calcutta: Old and New*; Raja Binaykrishna's *Early History and Growth of Calcutta.*

ও আহার পাইত। বর্ত্তমান মিসন-চার্চ লেনে এই স্কুলটি অবস্থিত ছিল।

(৪) হেজেস্-বিবির বালিকা-বিদ্যালয় হেজেস্ সাহেবের পত্নী ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহাই কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম বালিকা-বিদ্যালয়। ইহাতে নৃত্য-কলা ও ফরাসী-ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। শুনিতে পাওয়া যায়, এই বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকাগণ অত্যন্ত অসভ্য, অশান্ত ও অবাধ্য ছিল। যাহা হউক, বিবি-সাহেব এই স্কুলের কৃপায় অনেক টাকা লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন।*

(৫) চিৎপুর বয়জ্ বোর্ডিং স্কুল। চিৎপুর অতি প্রাচীন স্থান। আজকাল যেখানে গঙ্গাতীরে বাগবাজার ও চিৎপুরের মধ্যে একটি সেতু রহিয়াছে, তাহার কিছু উত্তরদিকেই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁর একটি সুরম্য প্রাসাদ ও উদ্যান ছিল। এই প্রাসাদের নিকটেই বালকদিগের জন্য ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে একটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। কোন্ সাহেব ইহা স্থাপন করেন, তাহা বলা যায় না। ছাত্রগণ স্কুলে পড়িত এবং আহারাদি করিত। যাহারা মাষ্টারের সহিত টেবিলে বসিয়া খাইত, তাহারা মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন দিত। কিন্তু যাহারা পৃথক্ বসিয়া খাইত ও স্কুল-বাড়ীতে থাকিত, তাহাদিগকে মাসিক ৩০৲ টাকা দিতে হইত। এই স্কুলে ১৪ জনের অধিক ছাত্র লওয়া হইত না।

(৬) পিট্স্-বিবির স্কুল (Mrs. Pitt's School for Young Ladies)। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোক-গণের জন্য ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পিটস্-বিবি এই স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বয়ঃস্থা নারীদের নিমিত্ত অন্য কোন স্কুল স্থাপিত হয় নাই।

(৭) ডারেল বিবির (Mrs. Durrell's) সেমিনারী। এই স্কুলটিও স্ত্রীলোকদের জন্য ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। তাৎকালিক গণ্যমান্য সাহেবগণ এই স্কুলটির জন্য অনেক টাকা চাঁদা তুলিয়া দিতেন।

* Rainey's *Historical and Topographical Sketches of Calcutta.*

(৮) হজেস্-সাহেবের স্কুল (Hodges' School)। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হজেস্-নামক একজন সাহেব এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, আর্ম্মানী গির্জ্জার নিকটে একটী গভর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুল খোলা হইবে। এই স্কুলে বই পড়া, হাতের লেখা ও সূচের কাজ শিখান হইবে।

(৯) গ্রিফিথ্ সাহেবের বোর্ডিং স্কুল। শিয়ালদহের নিকটে বৈঠকখানায় গ্রিফিথ্ সাহেব ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাগানবাড়ীতে একটী স্কুল খুলিয়াছিলেন।

(১০) আপার এণ্ড্ লোয়ার অর্ফ্যান্ স্কুল্স্। ১৭৮২, আগষ্ট মাসে মেজর কীলপ্যাট্রিক সাহেব প্রস্তাব করেন যে, মাতাপিতৃহীন বালক-বালিকাগণের নিমিত্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে Military Orphan Society নামক একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে দুইটি স্কুল স্থাপিত হইল, একটির নাম Upper School, অপরটির নাম Lower School. প্রত্যেক স্কুল আবার দুইভাগে বিভক্ত হইল,—একটি বালকদিগের নিমিত্ত ও আর একটি বালিকাদিগের নিমিত্ত। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণের পুত্র ও কন্যাগণ Upper Schoolএ এবং সৈনিকগণের বালক-বালিকা-গণ Lower Schoolএ পড়িত। প্রথমতঃ, উক্ত স্কুলগুলি হাবড়ায় স্থাপিত হয়, কিন্তু ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরে উঠিয়া আসে। যে বাড়ীখানিতে বালিকা-বিদ্যালয় বসিত, তাহা Kyderpur House নামে পরিচিত ছিল। ইহার সম্মুখ-ভাগে নৃত্য করিবার একখানি গৃহ ছিল। শিক্ষার্থিনীগণ বল্-নাচ করিতেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে "আপার স্কুল" এবং কয়েক বৎসর পরে "লোয়ার স্কুল" উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন যে-সকল ছাত্র ও ছাত্রী এই স্কুলে পড়িত, তাহাদিগকে অন্যান্য স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(১১) সেরবোরনের (Sherborne's) সেমিনারি। সেরবোরণ সাহেব একজন ফিরিঙ্গি ছিলেন। তাঁহার স্কুল অতি প্রাচীন, সম্ভবতঃ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর, হরকুমার (মহারাজ যতীন্দ্র মোহন

ঠাকুরের পিতা), প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, এবং মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কুলে প্রথমতঃ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরিশেষে কৃতবিদ্য, কৃতকর্ম্মা ও যশস্বী হইয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাবুদের বাটীতে সেরবোরণ সাহেবের সুনাম ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। ঠাকুরবাবুদের বাটীতে ক্রিয়াকলাপের উপলক্ষে সাহেব-মহাশয় তাঁহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া হাঁড়ি হাঁড়ি খাবার তাঁহার স্ত্রীর জন্য বাটীতে লইয়া আসিতেন। এখন যেখানে "আদি ব্রাহ্ম-সমাজ" আছে, তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকেই সাহেবের বাটী ও স্কুল ছিল।

(১২) রামজয় দত্তের স্কুল। রামজয় দত্ত, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কলুটোলায় এই স্কুল স্থাপন করিয়া তৎকালোচিত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতেন। প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই স্কুলে আমি 'তুতিনামা' ও 'এরেবিয়ান্ নাইটস' পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছিলাম। তৎকালে এদেশে ইংরাজী অভিধান বা ইংরাজী ব্যাকরণ ছিল না।"

(১৩) ইউনিয়ন স্কুল। এই স্কুলটী কলিকাতায় কোন্ স্থানে কোন্ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা জানা যায় না। ইহা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলটী খোলা থাকিত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহাতে একশত ছাত্র পড়িত। (১)

(১৪) মার্টিন বাউলের (Martin Bowl's) স্কুল। মার্টিন বাউল নামক এক জন ফিরিঙ্গী আমড়াতলায় একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল মহাশয় এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। সম্ভবতঃ ইহা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

(১৫) ক্যানিং একাডেমি। ক্যানিং (Canning) নামক একজন সাহেব ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই স্কুলটি খুলিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব এই স্কুলেই বিদ্যাশিক্ষা করেন।

(১৬) আর্চার্-সাহেবের স্কুল। আরচার (Archer's) ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলক্ষণ সুনাম ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

(১৭) ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ। কোম্পানীর সিভিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণর-জেনারল ওয়েলেসলী, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট তারিখে এই কলেজটী স্থাপন করেন। এই স্কুলে বাঙ্গালা-বিভাগের শিক্ষকগণের মধ্যে আমরা রামরাম বসুর নাম পাই। তিনি এখানে শিক্ষকতা কালেই "প্রতাপাদিত্য চরিত" রচনা করেন।

(১৮) কলিকাতা একাডেমী। সম্ভবতঃ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। কামিং সাহেবই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র, স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই স্কুলে ইংরাজী ভাষা প্রথম শিক্ষা করিয়াছিলেন।(১) তখন এই স্কুলে ডাইক সাহেবের 'স্পেলিং বুক' ও 'স্কুল মাষ্টার' এই দুইখানি পুস্তকের অধ্যাপনা হইত।

(১৯) রিড্ সাহেবের স্কুল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রিড (Reid) হাটখোলায় এই স্কুলটি স্থাপন করেন। কোন্নগর-নিবাসী মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব কয়েক মাস এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

(২০) এর‍্যাটুন-পিটার্সের (Arratoon Peter's) স্কুল। এই স্কুলটী সম্ভবতঃ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। স্বর্গত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,"সাহেবের যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলুটোলার কাণা নিতাই সেন ও খোঁড়া অদ্বৈত সেন প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ব্যাকরণহীন ইংরাজী বলিতে পারিতেন এবং একটু-আধটু ইংরাজী লিখিতে পারিতেন বলিয়া তৎকালীন কলিকাতা-সমাজে ইঁহাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। ইঁহারা যাত্রা প্রভৃতি উৎসবাদিতে আপনাদের পদ-গৌরবের চিহ্ন-স্বরূপ কাবা চাপকান পরিয়া ও জরীর জুতা পায়ে দিয়া আসিতেন। লোকে সম্ভ্রমের সহিত ইঁহাদিগের দিকে তাকাইয়া দেখিত।"

---

(১) Raja Benaykrishna Deb Bahadur's *Early History and Growth of Calcutta*

(১) "He acquired the rudiments of his English education at a school in Bowbazar, then known as Mr. Cumming's Calcutta Academy."—*The Rapid Sketch of the Life of Raja Radhakanta Deb Bahadur*, p. 17

(২১) আনন্দীরামের স্কুল। আনন্দীরাম মহাশয় তাঁহার বসতি-বাটীতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটি খুলিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-ছাত্রগণকেই পড়াইতেন। তাঁহার পড়াইবার নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। ছাত্রেরা গিয়া তাঁহার বাটীতে বহুক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকিত। যেদিন তাঁহার ইচ্ছা হইত, সেইদিন তিনি তাহাদিগকে পড়াইতেন। তাঁহার একখানি খাতায় কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ ও তাহাদের ইংরাজী প্রতিবাক্য লেখা ছিল। ইহা দেখিয়াই পাঁচছয়টী শব্দ তিনি ছাত্রদিগকে মধ্যে মধ্যে শিখাইতেন।

(২২) এল্‌ স্যানাবেলস (L. Schnabel's) স্কুল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পিয়ানোফোর্টে শিক্ষা দেওয়া হইত। মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা।

(২৩) ষ্ট্যাথাম্‌স্‌ একাডেমী। বড় ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এই স্কুলটী অবস্থিত ছিল। ষ্ট্যাথাম (Statham) এই স্কুল পরে হাবড়ায় উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

(২৪) নিত্যানন্দ সেনের স্কুল। নিত্যানন্দ সেন নামক জনৈক ভদ্রলোক আনুমানিক ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কলুটোলায় এই স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল, মার্টিন বাউল সাহেবের স্কুল পরিত্যাগ করিয়া এই স্কুলে কিছুদিন ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। এই স্কুলে তখন Murray's *Grammar, Introduction* ও *Spelling Book* পড়ান হইত।

(২৫) ধর্ম্মতলা-একাডেমী বা ড্রামণ্ড একাডেমী। উত্তরে শুমঘর, পূর্ব্বে হার্ট সাহেবের আস্তাবল, দক্ষিণে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্‌, পশ্চিমে হস্পিট্যাল্‌ লেন, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ডেভিড ড্রামণ্ড সাহেব ১৮১০ খৃষ্টাব্দে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিতকার লিখিয়াছেন, "ড্রামণ্ডই সর্ব্ব-প্রথমে নিজ স্কুলে ইংরাজী ব্যাকরণ প্রবর্ত্তন করেন এবং গ্লোবের ব্যবহার সম্বন্ধেও শিক্ষাদান করিতে থাকেন। তৎকালে এই স্কুলটি, কলিকাতায় যাবতীয় স্কুল অপেক্ষা শিক্ষাদানে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। ছাত্রগণের সংখ্যাও অধিক ছিল এবং ছাত্রদত্ত বেতন হইতেও যথেষ্ট লাভ হইত। হস্তাক্ষর, ইংরাজী পুস্তকপাঠ ও অঙ্কশিক্ষার দিকেই ড্রামণ্ড সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কি গভর্ণমেণ্ট আপিস, কি সওদাগরী আপিস,—এই দুই স্থানে চাকরী করিতে হইলে উক্ত তিন প্রকার বিদ্যাশিক্ষারই প্রয়োজন হইত। কিন্তু ড্রামণ্ড সাহেব ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না—তিনি ক্রমে ক্রমে ইংরাজী এবং ল্যাটিন সাহিত্যও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তৎকালে যে কয়েকটি ইংরাজী স্কুল ছিল, তাহাদের কোনটিতেই ছাত্রগণের বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ড্রামণ্ড সাহেবই নিজ বিদ্যালয়ে বাৎসরিক পরীক্ষার সৃষ্টি করেন। প্রসিদ্ধ ডিরোজিও (Derozio) সাহেব (যিনি একদিন সমগ্র হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন), এই স্কুলের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন।

ড্রামণ্ড সাহেব কুব্জপৃষ্ঠ ছিলেন। এ জন্য লোকে তাঁহার স্কুলকে "কুঁজো-সাহেবের স্কুল" বলিত। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি অসাধারণ ছিল। তিনি স্বয়ং একজন সুকবি ছিলেন। তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি লোয়ার সার্কুলার রোড্‌ সমাধি-স্থানে সমাহিত হইয়া রহিয়াছেন।*

(২৬-২৮) হ্যালিফ্যাক্স স্কুল, লিন্‌ড্‌স্টেড্‌ ও ড্রাপার সাহেবের স্কুল। এই তিনটি স্কুল কলিকাতায় কোন্‌ স্থানে ও কোন্‌ বৎসরে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না।

(২৯) রেভারেণ্ড ইয়েট্‌স্‌ সাহেবের বালক-বিদ্যালয়। এই স্কুলটির ইতিহাসের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না।

(৩০) লসন্‌-বিবির স্কুল।

(৩১) ফ্যারেল সেমিনারী। আরচার্‌ সাহেব ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে যে স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি বিলক্ষণ লাভবান্‌ হইতেছেন দেখিয়া ফ্যারেল্‌ (Farrel) সাহেবও পর বৎসরে একটি স্কুল খুলিয়া বসিলেন। কিন্তু ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া এই স্কুলটি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৩২) হাটারম্যান্‌-সাহেবের স্কুল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে

* *Calcutta Review*, 1850; Cotton's *Calcutta: Old and New*; Edwards' *Life of Derozio*

হাটারম্যান্ সাহেব বৈঠকখানায় এই স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছয়টি ভাষা জানিতেন। তাঁহার মত ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত লোক তৎকালে কলিকাতায় আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার স্থাপিত স্কুল ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। হাটারম্যান্ সাহেবের স্কুল হইতে অনেকগুলি লোক সুচারুরূপে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।

(৩৩) দি ক্যালকাটা বেনাভোলেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউট্। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বউবাজারে এই স্কুলটি স্থাপিত হইয়াছিল। দরিদ্র ক্রিশ্চানদিগকে শিক্ষাদান করাই এই স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীরামপুর মিসনের ডাঃ উইলিয়াম কেরীই এই স্কুলের প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন। কিছুকাল পরে হিন্দু, মুসলমান, পর্টুগীজ, আর্ম্মাণী, মগ, চীনে ম্যান প্রভৃতি জাতির বালকগণও ইহাতে প্রবেশ করিয়াছিল।

(৩৪) বিশপস্ কলেজ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বিসপ মিড্‌লটন্ এই কলেজের ভিত্তিস্থাপন করেন। এদেশীয় ক্রিশ্চানদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের জন্য প্রস্তুত করাই এই কলেজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। এখন যেখানে শিবপুর এন্‌জিনিয়ারিং কলেজ রহিয়াছে, সেইখানেই পূর্ব্বে বিশপ্‌স্ কলেজ ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিশপস্ কলেজের বাড়ীখানি গভর্ণমেন্টকে বিক্রয় করা হইলে এই কলেজ ৩৩নং সার্কিউলার রোডে উঠিয়া আসে। অবশেষে ২২৪ নং লোয়ার সার্কিউলার রোডে জমি কিনিয়া বাটী নির্ম্মাণ করা হয়। এখন এই কলেজ স্থায়িভাবে এইখানেই অবস্থিত রহিয়াছে।

(৩৫) ম্যাকে সাহেবের স্কুল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ম্যাকে সাহেব নিমতলা ষ্ট্রীটে এই স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় এই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই এই স্কুলটি উঠিয়া যায়। ম্যাকে-সাহেব স্কটল্যাণ্ড দেশবাসী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী অতি উত্তম ছিল।

(৩৬) লেডিস্ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন। বিবি উইলসন (বিবি কুক) ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটি স্থাপন করেন।

(৩৭) আর্ম্মিনিয়ান্ ফিল্যান্‌থ্‌পিক ইন্‌ষ্টিটিউশন। আর্ম্মাণীগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ ১৮২১, ২রা এপ্রিল এই স্কুলটি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(৩৮) ইউরোপিয়ান ফিমেল অরফ্যান এসাইলাম। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বিবি টমসন এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বামী টি, টমসন সাহেব স্বয়ং এই স্কুলের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে-সকল সৈনিক-পুরুষ যুদ্ধে বা অন্য কোন কারণে প্রাণত্যাগ করিতেন, তাঁহাদের প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাগণকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য সহৃদয় রেভারেণ্ড টমসন সাহেব এই স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে সারকিউলার রোডে ৩৭,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া জমি ক্রয় করা হইয়াছিল। এই স্কুলটি দ্বারা ইউরোপীয় সৈনিক-কন্যাগণের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল।

(৩৯) লিন্‌ড্‌ষ্টেট্ ও অর্ডের সেমিনারী। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে দুইজন সাহেবের সহযোগিতায় এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। স্কুলটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

(৪০) ইণ্ডিয়ান একাডেমী। রাজা রামমোহন রায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে শুঁড়িপাড়ায় এই স্কুলটি স্থাপন করেন। সাধারণ লোকে ইহাকে "রামমোহন রায়ের স্কুল" বলিত। রামমোহনের দুই পুত্র রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিছু দিন এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন। মহর্ষি লিখিয়াছেন, "শৈশব কাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটা হেদুয়া-পুষ্করিণীর ধারে অবস্থিত।" এই স্কুলের অনতিদূরে হরীতকী-বাগানে স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী ছিল। নিকটে বলিয়া তিনি বাল্যকালে কিছুদিন এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন। ভূদেববাবু যখন এই স্কুলে Reader No. II পড়িতেন, তখন কাশীনাথ মিত্র নামক একটি লোক তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। একদিন

তিনি ভূদেববাবুকে বিলক্ষণ প্রহার করায় তিনি স্কুল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৩০, ১৫ই নভেম্বর রাজা রামমোহন রায় বিলাত-যাত্রা করেন। কিন্তু এদেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তিনি পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে প্রধান শিক্ষক এবং নবীনমাধব দে-কে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামমোহনের বিলাতযাত্রার পরে উভয়ের মধ্যে হিসাবপত্রের ব্যাপার লইয়া গোলযোগ হওয়ায় নবীনমাধব দে একটি নূতন স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৪১) কলিকাতা গ্রামার স্কুল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। পেরেন্ট্যাল একাডেমীর অধ্যক্ষগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ায় স্কুলটির সৃষ্টি হয়।

(৪২) পেরেন্ট্যাল একাডেমী বা ডভটন কলেজ (Doveton College)। ১৮২৩ ১লা মার্চ জন উইলিয়ম রিকেট্স্ এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা ক্রিশ্চানদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার সম্যক্ আলোচনা হয়, তদ্বিষয়ে এই স্কুলটি যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। এই স্কুলটি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৪৩) প্র্যাট্ মেমোরিয়্যাল গের্ল্‌স্ স্কুল। ৮৪এ নং লোয়ার সার্কিউলার রোডে বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। এখন ইহা ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত।

(৪৪) মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর একাডেমি। মধুসূদন চক্রবর্ত্তী নামক একজন নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মাণিকতলায় এই স্কুলটি স্থাপন করেন। নবীনমাধবের স্কুল ছাড়িয়া ভূদেববাবু পাঁচ মাস এই স্কুলে পড়েন। স্কুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি অবশেষে হেয়ার সাহেবের স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

(৪৫) ভেরিউলাম (Verulam) একাডেমী। ড্রামণ্ড-সাহেবের স্কুলের অবস্থা যখন শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন তাহার সহিত এই স্কুলটি মিলিত হইয়াছিল। মাষ্টার্স্ নামক একজন সাহেব এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল।

(৪৬) সেণ্ট্রাল স্কুল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মে মাসে এই স্কুলের ভিত্তি-স্থাপন ও পরবর্ত্তী বৎসরে নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল। কুমারী উইলসন এই স্কুল পরিদর্শন করিতেন।

(৪৭) গোবিন্দ বসাকের স্কুল। এই স্কুলটি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। হাইকোর্টের জজ স্বর্গত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

(৪৮) চার্চ মিসনারী স্কুল। দরিদ্র হিন্দু বালক ও বালিকাগণের নিমিত্ত ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলের সৃষ্টি হইয়াছিল।

(৪৯) জয়নারায়ণ মাষ্টারের স্কুল। এই স্কুলটি নিমতলায় অবস্থিত ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়া সেই বৎসরেই লোপ পাইয়াছিল। ভোলানাথ চন্দ্র কয়েক মাস এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

(৫০) কলিকাতা হাই স্কুল। ১৮৩০, ১লা জুন তারিখে এই স্কুলটির সৃষ্টি হইয়াছিল। রেভারেণ্ড্ ম্যাক্‌কুইন সাহেব ইহার প্রথম রেক্টার হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ইহার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহার অধঃপতন হয়।

(৫১) নবীনমাধব দের স্কুল। রাজা রামমোহন রায় বিলাত গমন করিলে প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র মিত্র ও দ্বিতীয় শিক্ষক নবীনমাধব দে উভয়ে মিলিয়া রাজার প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান একাডেমী" চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু লভ্যাংশ লইয়া বিবাদ হওয়ায় নবীনমাধব দে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে একটি অবৈতনিক ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান একাডেমী ত্যাগ করিয়া এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কৈলাসচন্দ্র বসুও কিছুদিন এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ভূদেববাবু লিখিয়াছেন, "আমি যখন এই স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন নবীনমাধববাবু একদিন হেয়ার সাহেবকে আপন স্কুলে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করাইলেন। হেয়ার সাহেব সন্তোষ প্রকাশ করিলে নবীনবাবু সাহেবকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার স্কুলের কোন ছেলেকে সাহেব যেন নিজের স্কুলে ভর্ত্তি না করেন,—করিলে তাঁহার স্কুলটি উঠিয়া যাইবে। হেয়ার সাহেব এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, এবং বরাবরই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।"

(৫২) ক্ষেম বসুর স্কুল। ক্ষেমঙ্কর বসু নামক জনৈক কায়স্থ পাথুরিয়াঘাটায় একটি স্কুল করিয়াছিলেন। ১৮৩০ ও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল বলিয়া মনে হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথমতঃ এই স্কুলেই লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

(৫৩) সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রোম্যান্ ক্যাথলিক সাহেবগণ এই কলেজটি স্থাপন করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জেসুয়িট্গণ চলিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে বহুকাল ধরিয়া এই কলেজটির সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

(৫৪) লা-মার্টিনিয়ার স্কুল। ১৮৩৬, ১ মার্চ্চ তারিখে এই স্কুলটি স্থাপিত হইয়াছিল। মেজর-জেনারল ক্লড্ মার্টিন এই স্কুলের নিমিত্ত যথেষ্ট টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে ছাত্রগণ বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা করে ও আহারাদি পায়।

(৫৫) নেটিভ অর্ফ্যান্ স্কুল। বিবি উইলসন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এই স্কুল স্থাপন করেন।

(৫৬) জেনারল এসেম্ব্লিস ইনষ্টিটিউশন ও ফ্রি চার্চ ইন্ষ্টিটিউশন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড ডাফ সাহেব এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। এ দেশীয় বালকদিগকে শিক্ষাদান করা তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিলেও তাঁহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করাই তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। প্রথমতঃ এই স্কুল ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটীতে অবস্থিত ছিল। প্রথম দিন ৬ জন মাত্র ছাত্র ভর্ত্তি হয়। রাজা রামমোহন রায় মহাশয় এবিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হেদুয়া-পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান বাড়ীখানি নির্ম্মিত হইলে সেইস্থানে এই স্কুল উঠিয়া আসিয়াছিল।

কয়েক বৎসর পরে ডাফ সাহেবের সহিত তাঁহার সঙ্গিগণের মনোন্তর ঘটিলে ডাফ সাহেব ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে নিমতলায় প্রসিদ্ধ "ফ্রি-চার্চ ইন্ষ্টিটিউশন" কলেজ খুলিয়াছিলেন।

(৫৭) ইউনিয়ন্ স্কুল। এই স্কুলটি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দুপেট্রিয়ট-সম্পাদক প্রসিদ্ধ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।

(৫৮) মেট্রপলিট্যান একাডেমী। হাটখোলার দত্তবংশীয় গুরুচরণ দত্ত মহাশয় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটি স্থাপন করেন। গরাণহাটায় বাঁধা-বটতলার উত্তরদিকে ঠিক চিৎপুর রোডের পশ্চিম ভাগে যে বৃহৎ বাটীখানি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই উক্ত স্কুল বসিত। এই বাটীতে পূর্ব্বে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর শাখা স্কুল ছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই বাটীতেই "জুলিয়াস সিজর" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। দর্শকগণকে টিকিট কিনিয়া অভিনয় দেখিতে হইয়াছিল। টিকিট বিক্রয় করিয়া বাঙ্গালী এই প্রথম অভিনয় করেন।

(৫৯) লোরেটো হাউস। ইহা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৭নং মিড্ল্টন্ রোডে স্থাপিত হইয়াছিল। "লোরেটো সিস্টারস্" ইহার প্রধান অভিভাবিকা ছিলেন। সম্ভ্রান্ত সাহেবদিগের কন্যাগণ ইহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। ধর্ম্মতলায় ইহার একটি শাখা-স্কুল আছে। Cathedral Female School, Bowbazar Female School ও St. John's Female School নামক আর তিনটি শাখা-স্কুলও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলিও লোরেটো সিসটারদিগের দ্বারা পরিচালিত। ইহাতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বালিকাগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকেন। ইহারাও যথাক্রমে ১৮৪২, ১৮৪৪ এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল।

(৬০) কেথিড্রাল অরফ্যানেজ। ক্রিশ্চানগণের চেষ্টায় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। গৃহশূন্য মাতাপিতৃহীন ছাত্রেরাই এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করে। কতকগুলি ছাত্র বেতন দেয়, অবশিষ্ট ছাত্রগণের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট বেতন দিয়া থাকেন।

(৬১) ইটালী অর্ফ্যানেজ "লোরেটো সিস্টার"-গণের চেষ্টায় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। ইটালী নর্থ-রোডের উত্তর দিকে ডক্টার কেরিউ সাহেব একখানি সুবিস্তৃত বাড়ী ও তৎসংলগ্ন প্রচুর জমি স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া ইহাতে এই স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। স্কুলটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে ছাত্রগণ বেতন দিয়া পড়ে। দ্বিতীয় বিভাগে মাতাপিতৃহীন বালকগণ বিনা বেতনে পড়াশুনা করে। তৃতীয়

বিভাগে, খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষিত দেশীয় মাতাপিতৃহীন বালকগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে।

(৬২) সেণ্ট জোসেফ্‌স্ স্কুল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ৬৯নং বউবাজার ষ্ট্রীটে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে ইহার নাম ছিল, The Bowbazar Boys' School. ইহা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত। এই স্কুলটি দুই ভাগে বিভক্ত, একটিতে ছাত্রগণ বেতন দিয়া পড়ে, অপরটিতে দরিদ্র ছাত্রগণ বিনা বেতনে পড়িয়া থাকে।

(৬৩) হিন্দু চ্যারিটেবল্ ইন্‌ষ্টিটিউসান্ বা হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়। ১৮৪৫, ২ জুন হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রমাপ্রসাদ রায়, হরিমোহন সেন, নবীনচন্দ্র সিংহ, সাতু সিংহ, রাধানাথ দত্ত, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ছাতুবাবু, লাটুবাবু প্রভৃতি কলিকাতার তাৎকালিক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা রাধাকান্তদেব এই বিদ্যালয়ের সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন।

স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিনের জন্ম মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে এই স্কুলের হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন।

হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ের ফণ্ডের টাকা আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) হাত দিয়া "ইউনিয়ন-ব্যাঙ্কে" জমা ছিল। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া যাওয়ায় ফণ্ডের সমস্ত টাকাই নষ্ট হইল এবং স্কুলটিও শীঘ্রই উঠিয়া গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বহুযত্নে এই স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

(৬৪) সেণ্ট-পল্‌স্ স্কুল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-হাই-স্কুলের অধঃপতন হওয়ায় পর বৎসর ইহার স্থানে সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল।

(৬৫) সেণ্ট-জন্‌স্ কলেজ জেসুয়িটগণ সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ পরিত্যাগ করিয়া যাইলে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল।

(৬৬) বীটন্ নেটিভ ফিমেল স্কুল। ১৮৫০, নভেম্বর মাসে জে, ই, ডি বেথুন (বীটন্) সাহেব এই স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন। ডিরোজিও সাহেবের প্রসিদ্ধ ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বেথুন কলেজের জন্ম ভূমি দান করিয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ডেপুটি গভর্ণর স্যার জন্ লিট্‌লার ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। স্কুল-স্থাপনের সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

(৬৭) সেণ্ট্ স্তান্‌ডাক্‌টস্ (St. Sanduct's) সেমিনারী। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মিনিয়ান্ ফিল্যানথ্রপিক্ ইন্‌ষ্টিটিউসন বিলুপ্ত হইলে পর বৎসর এই স্কুলটি স্থাপিত হইয়াছিল।

(৬৮) সেণ্ট্ জেম্‌স্ স্কুল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৮৪নং লোয়ার সার্কুলার রোডে সেণ্ট্ জেম্‌স্ চার্চ্চের নিকটেই এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। যে-সকল ছাত্র বেতন দিতে অক্ষম, তাহারাই এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্কুল-বাড়ীখানির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

নিষ্ফল সাধনা

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

তুমি ফুটাইলে ফুল শরতের শেফালিকা-বনে
অন্ধকারে নীরবে গোপনে;
ভেবেছিলে রূপে, রসে, গন্ধে তা'রে পরিপূর্ণ করি,
সারা নিশি ধরি'
সে মাধুরী একা তুমি প্রাণ ভরি পান করি ল'বে,
জগৎ জাগিবে যবে, আলসে সে ধূলে প'ড়ে রবে।

হে বিলাসী, ব্যর্থ কিন্তু হ'য়ে গেছে তবে মনোরথ,—
ফিরাতে হ'য়েছে তব রথ
তোমার স্বর্গের পানে অসময়ে, ব্যথিত অন্তরে;
আপনার করে
যেই মানসীরে তুমি মধুময় দিয়ে গেলে রূপ;
বিশ্বের প্রেয়সী হ'য়ে সে রহিল অতুল, অনুপ।

বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র—গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের "বেঙ্গল গেজেট," অথবা শ্রীরামপুরের মিশনরীদের "সমাচার-দর্পণ"—এই লইয়া 'প্রবাসী'তে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে।*

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে *Calcutta Review* পত্রে পাদ্রী লং প্রথমে শ্রীরামপুরের সমাচার-দর্পণকেই আদি বাংলা সংবাদ-পত্র বলিয়াছিলেন, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে ১৮৫৫ সনে তাঁহার *Descriptive Catalogue of Bengali Works*-এ এই মত বর্জ্জন করিয়া ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের *Bengal Gazette*কে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে *Bengal Gazette* বাহির করেন। তিনি বিদ্যাসুন্দর, বেতাল ও অন্যান্য পুস্তকের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করিয়া অনেক পয়সা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাগজখানি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল।"†

রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বাংলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস লেখকেরা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের বেঙ্গল গেজেটকেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়াছেন। কেদারনাথ মজুমদার, সুশীলচন্দ্র দে-প্রমুখ অনেক আধুনিক লেখকও এই মত পোষণ করেন। ইঁহারা সকলেই লং সাহেবের পরে লিখিয়াছেন, এবং খুব সম্ভব ঐ পাদ্রীর কথার বলেই 'বেঙ্গল গেজেট'-এর নাম করিয়াছেন।

অপর পক্ষ—যাঁহারা ১৮১৮, ২৩এ মে তারিখে প্রকাশিত 'সমাচার-দর্পণ'কেই বাংলার প্রথম সংবাদপত্র বলিতে চান, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রীরামপুরের মিশনরীদের নাম করিতে হয়; ইঁহাদের *Friend of India*, সমাচার দর্পণ, ও অন্যান্য পুস্তকে একথা বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস লিখিতেছেন; তিনিও সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—

"সমাচার-দর্পণের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির হইয়া থাকিলে…সমসাময়িক অন্য কোন কাগজে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। অন্ততঃ সমাচার দর্পণও তাহার নাম করিত।… দুঃখের বিষয় কেহই প্রস্তাবিত *Bengal Gazette*খানি দর্শন করেন নাই। বাঙ্গালা *Bengal Gazette* কোনদিন বাহির হয় নাই। এই ভ্রান্ত প্রবাদের মূল লঙ্ সাহেব। আর লঙ সাহেব তাঁহার লেখায় যথেষ্ট ভুল করিয়াছেন—এটী নূতন নয়।"*

"সমসাময়িক অন্য কাগজ, অন্ততঃ সমাচার-দর্পণেও" যে বেঙ্গল গেজেটের উল্লেখ নাই, একথা সত্য নহে। ১২৩৮, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি (১৮৩১ জুন) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদ-চন্দ্রিকা'য় জনৈক সংবাদপত্র-পাঠকের একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। ইহাতে আছে—

"শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু।—

"বাঙ্গলা সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম গত ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন তন্মধ্যে এক কথা লেখেন যে,—

'এই অপূর্ব্ব সমাচার দর্পণাবতারের পূর্ব্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল না যে বাঙ্গালা সমাচারপত্র নামে কোন পদার্থ আছে।'

---

* প্রবাসী, ১৩২৮, মাঘ, পৃ. ৫০৫; চৈত্র, পৃ. ৮২৪-২৭

† "In 1816 the *Bengal Gazette* was started by Gangadhar Bhattacharji who had gained much money by popular editions of the Vidya Sundar, Betal and various other works, illustrated with woodcuts; the paper was shortlived."—*Descriptive Catalogue of Bengali Works*, by Rev. J. Long, 1855, p. 66.

* পঞ্চপুষ্প,—কার্ত্তিক, পৃঃ ৯২৪—"প্রাচীনপঞ্জী—বাঙ্গালার প্রথম।"

"উত্তর ঐ লেখক মহাশয় বুঝি এতন্নগরবাসী না হইবেন কেননা ৺গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য যিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবিসহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচারপত্র সৰ্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বিশেষ বাধিত হইয়া, তাঁহার নিজ ধাম বহরাগ্রামে* গমনকরাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন। অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

উপরের পত্রখানি হইতে জানা যাইতেছে, পাদ্রী লং-এর পূর্ব্বেও লোকে 'বাঙ্গালা গেজেট'কেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া জানিত—সমাচার-দর্পণকে নহে। লং-এর লেখার সহিত 'বাঙ্গালা গেজেট'-এর উপরিউক্ত বিবরণের অতি সামান্তই পার্থক্য।

সংবাদ-চন্দ্রিকায় প্রকাশিত উক্ত চিঠিখানি সমাচার-দর্পণের সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ১৮৩১, ১১ই জুন (১২৩৮, ৩০ জ্যৈষ্ঠ) সংখ্যার ১৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া, সেই সংখ্যারই ১৯৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ মন্তব্য করেন :—

"চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক, দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন না। এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গালা গেজেট নামক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

"ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমাদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট নামে পত্র প্রকাশ হয়। কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।"

দেখা যাইতেছে, 'দর্পণ'-সম্পাদক মহাশয়ও অতি স্পষ্টভাবে 'বাঙ্গালা গেজেট'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তবে তাঁহার "অনুমানে" উহা না কি দর্পণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের দুই সপ্তাহ পরে বাহির হয়!

'সমাচার-দর্পণ'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ ছিল—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদ-চন্দ্রিকা'। বাঙ্গালা গেজেটকেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া চন্দ্রিকা-সম্পাদকের ধারণা ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন 'সমাচার-দর্পণ' বন্ধ করিবার কথা উঠে, তখন 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক দুঃখ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"সমাচার দর্পণ রহিতের কল্পবিষয়ক।—আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে, এসকলের অগ্রজ অনুমান হয় ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচার পত্র সৰ্জ্জন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কাল প্রাপ্তি হয়। অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ সংবাদপ্রদ।"

'চন্দ্রিকা'-সম্পাদকের এই মন্তব্য ১৮৩৪, ১৫ই নভেম্বর (১২৪১, ১লা অগ্রহায়ণ) তারিখের 'সমাচার-দর্পণ'-এর ৫৪৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছিল।* কিন্তু 'বাঙ্গালা গেজেট' যে আদি বাংলা সংবাদপত্র—'চন্দ্রিকা'-সম্পাদকের এই উক্তির বিরুদ্ধে 'দর্পণ'-সম্পাদক আর কোনই আপত্তি উত্থাপিত করেন নাই।

তাহা হইলে দেখা গেল, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী লং-এর লেখার পূর্ব্বেও প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া 'বাঙ্গালা গেজেট'-এর নাম অনেকের জানা ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, কেন পাদ্রী লং ১৮৫০ সালে প্রথমে সমাচার-দর্পণকে আদি বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া, পাঁচ বৎসর পরে সেই মত পরিবর্ত্তন করিয়া *Bengal Gazette*এর নাম করিয়াছিলেন।

আমার বিনীত নিবেদন, এ যাবৎ একখানিও 'বাঙ্গালা গেজেট' আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া কেহ যেন ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান না হন। এ বিষয়ে এখনও বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইণ্ডিয়া আপিসে সন্ধান করিলে 'বাঙ্গালা গেজেট'-এর কোন সংখ্যা আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে।

---

* ইহা শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান বড়া।

* কলিকাতায় Imperial Libraryতে 'সমাচার দর্পণ'-এর ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত—সাত বৎসরের ফাইল আছে। সাহিত্য-পরিষদে ইহার প্রথম তিন বৎসরের ফাইল পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতার মূল্য

শ্রীসুরুচিরা দেবী

পূজার বহুপূর্ব্বেই দার্জ্জিলিং যাবার জন্যে মনটা ছটফট্ করে উঠ্‌লো, যদিও তখন খবরের কাগজে দার্জ্জিলিংএর weather report অতিবৃষ্টিই ঘোষণা করছিল।

পিস্‌তুতো বোন অণিমা বললে, "দাদা, বিয়ে তো হবেই এই দুমাস পেরোলেই অঘ্রাণে, আগে থেকে বউএর মুখটা কি না দেখলেই নয়? এত তাড়া কিসের? কেউ তো কেড়ে নেবে না।"

আমি তার চুলের মুঠি ধরে বললুম, "যা, যা, ফাজলামি করতে হবে না—তোর বর খুঁজ্‌তে যাচ্ছি জানিস্!"

সে 'তা বই কি' বলে দৌড়ে পালালো, আমি বাক্স গুছোনোয় মন দিলুম।

গত পাঁচ বৎসর থেকে আমার বিয়ের ঠিক, অর্থাৎ বাগদত্ত হয়ে আছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার ভাবী গৃহলক্ষ্মীটিকে দেখিনি। কথাটা একটু খুলে বলি। আমি যখন বিলেতে তখন আমার মায়ের মৃত্যু হয়। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান—বিলেতে সুদূর পারে যখন এ খবর পৌছলো, তখনকার অবস্থা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। পাছে পড়া শেষ না হতেই চলে আসি, তাই মা অসুখের বাড়াবাড়ির খবরটি পর্য্যন্ত জানাতে দেন নি, একেবারেই পেলাম চিরবিদায়ের বার্ত্তা। শেষ সময়ে তাঁকে চোখে দেখলুম না, সেবা করতে পেলুম না এ বেদনা বুকে কাঁটার মত বিঁধে রইল। মায়ের মৃত্যুর পর সংসার আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে উঠলো, মনে করলুম সারা-জীবন এই অনাত্মীয় নির্ব্বান্ধব ইংরেজের দেশে কাটিয়ে দেব, এমন সময় পিসিমা'র এল এক চিঠি। ইনি আমার বাবার ছোট বোন,—নিজের ছেলে ছিল না বলে পুত্রস্নেহে আমায় ভালবাস্‌তেন। তিনি লিখ্‌লেন—

বাবা বিপাশ,

তোর মা যাবার আগে একজনের কাছে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হোয়ে গেছেন, সে কথা তোকে এতদিন জানাই নি, তার কারণ বউদিদিকে হারিয়ে মন মাথা কিছুই ঠিক ছিল না। শিউলি আমার বড়জায়ের মেয়ে, ঘটনাচক্রে বউদিদির অসুখের সময় ও আমার কাছে ছিল—ও প্রাণপাত করে তাঁর সেবা করেছে। সে যে কি সেবা, কি অক্লান্তপরিশ্রম ও স্থিরধৈর্য্যে ও রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, তাঁর রোগ-শয্যার পাশে বসে কাটানো—চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করতে পারবি নে। বৌদি মৃত্যুর আগে আমার জায়ের কাছ হতে মেয়েটিকে চেয়ে নিয়ে তোর বউ ঠিক করে গেছেন—নিজের গলা থেকে তোর ছবি দেওয়া হার খুলে শিউলিকে তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ জানিয়ে গেছেন। শেষ সময়ে যখন তোর অভাব তাঁর অসহ্য হোয়ে উঠেছিল, কিন্তু কিছুতেই তোকে আস্‌তেও লিখলেন না, তখন শিউলিই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল। এসব কথা লিখে বলা যায় না। আশা করি তুই মায়ের শেষ দানটির অমর্য্যাদা করবি না, ফিরে এসে শিউলিকে গ্রহণ করে মায়ের শেষ কামনা পূর্ণ করবি।

ইতি
তোর পিসিমা

মনের যে অবস্থায় পিসির এই চিঠি পেয়েছিলুম তখন আর কিছুই ভাবতে পারি নি, কিন্তু অদেখা অচেনা মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠেছিল। কিন্তু আজ পনেরো দিন হল, দেশে পা দিয়ে তাকে দেখবার জন্তে মনটা এমন ছটফট্ করে উঠলো যে, কৃতজ্ঞতা জানাবার আর তর সইল না। পিসিমা খবর দিলেন, সে কয়েক-মাস হোল দার্জ্জিলিঙে মামার বাড়ীতে আছে—অমনি দার্জ্জিলিং যাওয়া স্থির করে ফেল্লুম।

শুভক্ষণে পিসিমার আশীর্ব্বাদ ও অণুর সকৌতুক পরিহাস নিয়ে শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌছলুম। রাত্রিটা

ট্রেনের একটা নির্জ্জন কামরায় কতক জেগে ও কতক ঘুমিয়ে কাটিয়ে শিলিগুড়িতে এসে নামলুম।

মেলট্রেনে বেশী ভিড় ছিল না বটে কিন্তু দার্জ্জিলিঙের ছোট ছোট গাড়ীগুলি নানারকম যাত্রীতে ঠাসা দেখলুম। একে তো বসে বসে কাটাতে হবে, তার ওপর মুখোমুখি অতজনকে নিয়ে বস্‌তে হবে মনে করলে একটুও স্থবিধে বোধ হয় না। একটা শূন্য ফার্ষ্টক্লাস কামরায় উঠে পড়লুম। মনে আশা রইল, অতঃপর আর কেউ উঠ্‌বে না, শুয়ে, বসে, বই পড়ে, অথবা পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে সময়টার সদ্ব্যবহার করা যাবে। শিলিগুড়ি রিফ্রেস্‌মেণ্ট-রুমে চা পেয়ে যখন নিজের কামরায় ফিরে আস্‌ছি, তখন দূর থেকে—হায় অদৃষ্ট! একটি ছাতা দেখা গেল। সত্রাসে এগিয়ে এসে দেখি সেটি লেডিস্‌-ছাতা এবং স্বয়ং তার মালিক একটি মহিলা নতনয়নে তার হাত-ব্যাগ খুলে কুলিকে পয়সা দিচ্ছেন। আমাকে গাড়ীতে উঠ্‌তে দেখেই বল্‌লেন, "কিছু মনে করবেন না। অন্য গাড়ীগুলোতে বেজায় ভিড় দেখে এটাতে উঠে পড়েছি, এটা কি আপনার গাড়ী?"

বল্লুম, "গাড়ীটা আমার নয়, রেল কোম্পানীর। আপনি স্বচ্ছন্দেই যেতে পারেন, কারণ রিজার্ভ নয়।"

মেয়েটি আর কিছুই বল্‌লেন না, জিনিষপত্র গুছিয়ে ভাল করে বস্‌লেন।

একটা জোরে হুইসল্‌ দিয়ে গাড়ীটা ছেড়ে দিলে, আমিও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উল্টো দিকের বেঞ্চটায় বসে পড়লুম। মেয়েটি তখন চলন্ত গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বের করে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন।—সেই স্থযোগে আমি তাঁর দিকে অভদ্রের মত চেয়ে রইলুম।

সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে খুব কম মিশেছি। এই পাঁচ বৎসরের ইউরোপীয় অভিজ্ঞতায় বাঙালী মেয়েদের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চমত পোষণ করি না। তবু এই মেয়েটিকে আশ্চর্য্য স্থন্দর বোধ হল। এঁর গায়ের রং তপ্তকাঞ্চন অথবা ফ্যাকাশে নয়, স্নিগ্ধ শ্যামল। কপালের দুপাশে কুঞ্চিত দুই গোছা চুল বাতাসে চঞ্চল, আয়তমান ভ্রূ দুটির নীচে নিবিড় কালো দুটি চোখ, ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ে একটি মায়াময় ভয়-বিহ্বল স্বপন করে আছে। নাকটি একেবারে নিখুঁত, ঠোঁটের কমনীয়তায় কপালের কোমল আভায় মুখখানি এক অপূর্ব্ব মহিমায় পূর্ণ। পরণে একখানি নীলাম্বরী শাড়ী ও লাল মোটা রেশমের জামা—খোঁপার উপরে অল্প একটুখানি গুণ্ঠন দুটি ছোট ব্রোচে আটকানো। তিনি যে বিবাহিতা নন্‌ তাও বুঝে নিলুম, কারণ বিলিতি মতে তাঁর আঙুলে কোনো আংটি নেই ও দিশী মতে তাঁর সিঁদুর অথবা লোহা নেই।

আমার চোখের একাগ্র দৃষ্টি বোধ হয় তিনি অনুভব করেছিলেন, তাই আমাকে সমনস্ক করবার জন্যে চামড়ার ছোট ব্যাগটি খুলে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পড়তে বস্‌লেন। দেখলুম তাঁর ব্যাগটির গায়ে M. Roy লেখা। একটু কথা বলবার ছুতো পেয়ে বল্লুম, "আপনার এই ব্যাগটি কি নামিয়ে রাখ্‌ব মিস্‌ রায়? বোধ হয় আমার ভুল হয় নি, এই নাম আপনার।" তিনি একটু হেসে নিজেই ব্যাগটা নামিয়ে রাখলেন, আর বল্‌লেন, "হাঁ, আমার নাম মঞ্জুশ্রী রায়।" একটু সাহস বাড়লো, বল্‌লুম, "আপনি শিলিগুড়ি থেকে এলেন বুঝি? কলকাতার গাড়ীতে তো দেখিনি।"

বল্লেন, 'আমি দার্জ্জিলিঙেই থাকি, পরশু আমার এক বন্ধুর মরণাপন্ন অসুখ শুনে তাকে শিলিগুড়িতে দেখতে এসেছিলুম।"—এর পর আর কি বলা যায়, না ভেবে পেয়ে বল্লুম, "আচ্ছা, আপনি পড়ুন আর বিরক্ত করব না।" তিনি হেসে বইটা বন্ধ করে বল্‌লেন, "আপনি গল্প করুন না, বইটা নিতান্ত বাজে, সময় কাটানো বই তো নয়।"

উৎসাহ পেয়ে বল্লুম, "দেখুন, ভালই হোল যে আপনার সঙ্গে পরিচয় হোল, আমি এর আগে কখনো দার্জ্জিলিং যাই নি, মোটামুটি একটা রাস্তাঘাটের আইডিয়া নিয়ে নেব।"

"আচ্ছা, মেরী কটেজটা কোন্‌ দিকে জানেন?"

মিস্‌ রায় আমার দিকে বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ও তারপর অন্যদিকে চেয়ে একটু হাসলেন

আমি মহা অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম, বল্লুম, "দেখুন, ভয় নেই, আপনাকে আমার গাইড করব না!" বললেন, "দার্জিলিঙে সব পথই আমার জানা, প্রায় মাস-পাঁচেক আছি ওখানে। মেরী কট জলাপাহাড়ের উপর—এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে। রাস্তার নাম বল্‌লেও তো আপনি বুঝতে পারবেন না, তার চেয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করে নেবেন।"

"ওঃ, আমি মনে করেছিলুম Sorry Cottage-এর পাশে Merry Cottage বল্‌লেই বুঝে নেব।"

আমার কথায় তিনি হেসে ফেল্‌লেন, হাসির আলোয় তাঁর চোখ ছুটি দীপ্ত হোয়ে উঠলো, ভারী সুন্দর দেখালো।

বল্‌লেন, "মেরী কটেজেই থাক্‌বেন বুঝি?"

"না আমি হোটেলেই থাক্‌ব, সেখানে আমার এক আত্মীয়া আছেন। দেখা করতে হবে তাই জেনে নিচ্ছিলুম।"

বল্‌লেন, "আপিসের কাজেই ওখানে যাচ্ছেন বোধ হয়। আজকাল যা বৃষ্টি হচ্ছে, বেড়াতে আর কে যাবে?"

"না, ঠিক আপিসের কাজ না।"

"তবে বোধ করি ব্যবসা-সংক্রান্ত?"

"না, তাও না।"

"তবে কি ঐ আত্মীয়াটির সঙ্গে দেখা করতে?"

"তাই বটে, কিন্তু আপনার কৌতূহল তো বড় কম নয়।"

তিনি একটু সলজ্জভাবে বইয়ে মন দিলেন। আমি কথাটা বলে অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম, ছি, ছি, মেয়েদের সঙ্গে ভাল করে কথা কইতে শিখলুম না, কি মনে করলেন?

কিন্তু মেয়েটি কি সপ্রতিভ ও বুদ্ধিমতী! শিউলি কি এমনি হবে? কখনই না। সে যে সুন্দর এমন কথা পিসিমা তো একবারও বলেন নি—গুণেরই একটা লম্বা লিষ্টি দিয়েছেন! এই মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী, আর কি সহজ সরল ব্যবহার।

পাঠনিরতা মঞ্জুশ্রী দেবীকে একটু সচকিত করে বল্‌লুম, "দেখুন, কিছু মনে করবেন না, মেরী কটেজে কি আপনার যাওয়া-আসা আছে?"

"আছে বই কি।"

"আপনি তাহলে নিশ্চয় শিউলিকে চেনেন?"

"শিউলি? ও শিউলি। আমাদের রমেশবাবুর ভাগ্নী, চিনি বই কি, খুব আলাপ আছে।" তিনি এবার বেশ ভাল করে একবার আমার দিকে চাইলেন। ভাগ্নী লজ্জা করতে লাগলো, এই মেয়েটি নিশ্চয় শিউলির ভাবী বরের কথাও শুনেছেন ও হয়তো আমাকেই সেই বিশেষ ব্যক্তি ঠাউরেছেন।

আমি আর কোনো কথা না বলে খবরের কাগজ খুলে পড়তে বসলুম। গাড়ী তখন পাহাড়ী সাপের মত ঘুরতে ঘুরতে ক্রমেই উপরে উঠছে, হাওয়া ঠাণ্ডা হোয়ে আসচে, বোধ করি আমার একটু তন্দ্রাও এসেছে। হঠাৎ গাড়ীর ভেতরে একটা উঃ শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখি মঞ্জুশ্রীদেবী জানালার উপরে মাথা রেখে মুখ গুঁজে বসে আছেন।

বল্লুম, "মিস রায়, কি হোয়েছে আপনার?" তিনি মুখ তুলতেই দেখলুম, সমস্ত মুখটা রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বললেন, "বেশী কিছু নয়, এই ঘোরা-গাড়ীতে উঠলেই আমার মাথা ঘোরে।"

বোধ হয় আমার মুখে ভয়ানক উদ্বেগের ভাব দেখে বললেন, "এখুনি সেরে যাবে।"

কিন্তু আশ্বাস কার্য্যে পরিণত হল না, কষ্ট যে তাঁর ক্রমেই বাড়ছে তা' বুঝলুম।

বল্লুম, "ইঞ্জিনের উল্‌টো দিকের বেঞ্চে বসলে মাথা ঘোরা কম বোধ হয়, আপনি এই দিকটাতে আসুন, আর শুয়ে পড়ুন।"

বালিশ একটাও ছিল না, ওভার কোটটা ভাঁজ করে রেখে উঠতে বল্লুম।

তিনি উঠলেন না, জানলায় মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে রইলেন। আমারই জন্মে এ সংকোচ তা' বুঝলুম, বল্লুম, "আমি পরের ষ্টেশনে অন্য গাড়ীতে নেমে যাব, কিন্তু এইভাবে বসে থাক্‌লে আপনার কষ্ট কিছু

করবে না, লক্ষ্মীটি শুয়ে পড়ুন, জানেন তো—আতুরে নিয়মঃ নাস্তি।

আর বোধ হয় বাধা দেবার শক্তি ছিল না, নির্দ্দিষ্ট জায়গায় শুয়ে পড়লেন।

আমি আর কথা কইলুম না, কার্সিয়াং-এর অপেক্ষায় বসে রইলুম। গাড়ী থামতেই বললেন, "মাথা-ঘোরার ওপর খেলেই আমার বমি হয়ে যাবে, যান্ আপনি খেয়ে আসুন।"

বল্লুম, "আপনার জন্যে কিছু পাঠিয়ে দিই, কল্ টিল্ ?"

"না পাঠাতে হবে না, আসবার সময় দুটো লেবু কিনে আনবেন।"

হাণ্ড ব্যাগটা খোলবার জন্যে উঠতেই বল্লুম, "পয়সা তো পরে দিলেও হবে, আপনি শুয়ে থাকুন, উঠবেন না।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে দেখি মিস রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। অবশ্য বরাবরই উনি চোখ বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু এবার আমার ঢুকতে আর দরজা বন্ধ করতে যেটুকু শব্দ হোল তাতেও চোখ খুললেন না।

গাড়ী ছাড়তেই হিমশীতল বাতাস কামরায় ঢুকতে লাগলো, আকাশে বেশ মেঘ জমে উঠেছে। আমি তাঁর কমলা রং-এর শালটা দিয়ে তাঁর পা দুটি ঢেকে দিলুম, টের পেলেন না। তাঁর ঘুমন্ত মুখখানি আমি বারবার দেখলুম—মুদ্রিত দুটি চোখের দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি কোমল গালের উপর ছায়া ফেলে রেখেছিল। মনে হ'ল এই মেয়েটি যেন রাত্রিশেষের একটি অর্ধফুটন্ত শতদল পদ্ম, রবির আলোয় কখন্ সব দলগুলি মেলে ফুটে উঠবে, কে জানে! সেই ভাগ্যবান রবিটি কে? হতভাগ্য আমি আগেই শিউলি ফুলকে জাগাবার ভার নিয়েছি।

কতক্ষণ কেটে গেল, আমিও একটু ঘুমিয়ে নিলুম। জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসতেই সেটা বন্ধ করবার মৃদু শব্দে মঞ্জুশ্রী দেবী উঠে বসলেন; "আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, আমায় জাগান নি কেন? দার্জ্জিলিং কত দেরী?" বল্লুম, "ব্যস্ত হবেন না, ঠিক সময়ে জাগিয়ে দতুম। শরীর কেমন লাগছে?"

লজ্জিতভাবে বললেন, "ঘুমিয়ে ভারী উপকার হয়েচে, একেবারে সেরে গেছি। এই যে লেবু এনেছেন দেখছি, সত্যি ভারী খিদে পেয়েছিল।"

তাঁর বলার ভঙ্গীটি এমন ভাল লাগলো, আমরা তো বৃথা ভদ্রতা করেই মরি, মেয়েরা কত শীগ্‌গির আপনার করে নেয়! লেবু খেয়ে বললেন, "আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলুম।" বল্লুম, "কৃতজ্ঞতা জিনিষটা নেহাৎ মন্দ না। এই দেখুন না, কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে এতদূর পথ ছুটে এসেছি, কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিষ সংসারে আছে।"

"আছে বই কি। কৃতজ্ঞতা কি ঐ শিউলির কাছেই জানাবেন? সে তো নিতান্তই একটা সাধারণ মেয়ে—সে যে কারো কৃতজ্ঞতার যোগ্য হতে পারে—"

"না, সত্যিই তিনি যোগ্য। কিন্তু ভাগ্যচক্রে এ যে শুধু কৃতজ্ঞতা নয়—এ ফাঁস হোয়ে আমার গলায় চেপে ধরেছে! আচ্ছা, তিনি কি নিতান্তই সাধারণ মেয়ে?"

"নিতান্তই। আপনি রাগ করছেন না তো?"

"রাগ?—না, রাগ করব কেন? মাপ করবেন, সংসারের সব মেয়েই যে আপনার মত হতে হবে তার কি মানে আছে?"

"ভাগ্যে হয় নি, তাই বাংলা দেশের ছেলেগুলো বেঁচে গেছে, কিন্তু থাকগে, শিউলি আমার বন্ধু, তাই কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করছি,—শিউলিকে যে পছন্দ করতেই হবে তার কি দরকার? তার সঙ্গে তো কেবল আপনার কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক!" "না, তার চেয়েও বেশী, আপনি হয় তো সব কথা জানেন না। মা মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে গেছেন।"

"তাই নাকি? তবে তো সত্যিই এ ফাঁস আপনার গলায় চেপে ধরেছে বলুন। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন? শিউলি ভারী অভিমানিনী, সে যে কারুর কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে গলায় মালা দেবে আমার তা বোধ হয় না।"

"ছি, ছি, এ সব কথা যেন তাঁর কানে তুলবেন না, তিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্রী, আমি তাঁকে বিয়ে নিশ্চয়

করব। তিনি আমার হারানো মায়ের নির্ব্বাচিত বধূ।"

গাড়ী 'ঘুম' ছাড়িয়ে দার্জ্জিলিঙের পথে চলেছিল। মনে হোল, এই তো শেষ, তারপর এই মেয়েটির সঙ্গে আর কি দেখা হবে?—এ যে নিতান্তই আমার পথের সঙ্গিনী, তার বেশী আর কিছুই নয়।

বল্লুম, "এত আলাপ হল, কিন্তু আপনি হয় তো ভুলে যাবেন।"

হেসে বল্লেন, "আমার মাথাধুকনির অসুখ দেখে আমার মাথার ব্যারাম আছে ভাববেন না। স্মরণশক্তি খুব প্রখর!"

"আমি কৃতজ্ঞ রইলুম।"

"আবার কৃতজ্ঞতা? একটার ঠ্যালা সাম্‌লাতে এতদূর পথ আস্‌তে হোল! দেখুন আপনারা সাধ করে গলায় ফাঁস লাগান, তার পরে হায় হায় করেন। ঐ তো দার্জ্জিলিং এসে পড়লো—এটার কি নাম জানেন? রিট্রিট,......এখানটার নাম কি জানেন? বাতাসিয়া,—এ কি আপনি কিছুই দেখ্‌ছেন না যে।"

আমি তখন ওঁর মুখের একটা অপূর্ব্ব রহস্যময় হাসি দেখ্‌ছিলুম, কোনো কথাতেই কান দিই নি। এই কথায় লজ্জা পেয়ে বল্লুম, "ওসব পরে দেখ্‌ব, কিন্তু আপনার দেখা আর পাব না বোধ করি!"

মৃদু হেসে বল্লেন, "নাই বা পেলেন, কৃতজ্ঞতার ঋণ তো আপনার অভ্যাসই আছে!"

গাড়ী দার্জ্জিলিঙে থাম্‌লো।

দার্জ্জিলিঙে পৌছে দেখি, মেঘে চারিধার অন্ধকার হয়ে আছে, বৃষ্টি কখনও পড়ছে, কখনও পড়চে না, কিন্তু চারিদিকেই ভিজে স্যাঁত্‌স্যেঁতে ভাব মাখানো। মনটাও খিঁচড়ে আছে। শিউলির কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আসা এখন যেন অত্যন্ত অনাবশ্যক বোধ হল। কেবলই সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে বিদায় বেলায় সেই ক্ষণিকের পরিচিতা নারীর অপূর্ব্ব হাসিটি মনে আস্‌তে লাগ্‌লো। বহুদিন পরে হারাণো মায়ের 'পরে একটা বুকফাটা অভিমান জেগে উঠল। মা! তুমি তো চলেই গেলে, কিন্তু এ কি বন্ধনে আমায় বেঁধে রেখে গেলে? তোমার ইচ্ছেরই জয় হোক্, কিন্তু এ আমার বড় কঠিন পরীক্ষা!

বিকেলে আকাশ কতক পরিষ্কার হোল, মেরী কটেজের সন্ধান নিয়ে যাত্রা করলুম। পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট বাড়ী দূর থেকেই চোখে পড়লো। আর চোখে পড়লো তারই সাম্‌নের ছোট্ট বাগানটিতে একটি তরুণী একটি কচি মেয়ের হাত ধরে ফুল সংগ্রহ করছে। দূর থেকে তার মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আমার দিকে চোখ পড়তেই সে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লো। মনে ভাব্‌লুম এই মেয়েটিই আমার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী শিউলি দেবী হবেন। কিন্তু ও পালালো কেন? ওকে যদি এই গোধূলি সন্ধ্যায় পাহাড়ের গায়ে বাসন্তী রঙের বসনে, আলুলায়িত কেশে, ফুলের গুচ্ছ হাতে দেখ্‌তুম—হয় তো আমার হৃদয়টাকে নাড়া দিতে পারতো—ঘরের ভেতর কায়দাদুরস্তভাবে বসে ওকে আমার কিছুতেই ভাল লাগ্‌বে না জানি।

বাড়ীতে ঢুকতেই সেই তরুণীর সঙ্গিনী ছোট্ট মেয়েটি বল্লে, "বাবা মা বেড়াতে গেছেন, আপনি বসুন।"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলুম, বাঁচা গেছে! নইলে প্রথম পরিচয়ের পালা সাম্‌লানো এক দায়। বল্লুম, "খুকু, তুমি কি রমেশবাবুর মেয়ে?" খুকি ঘাড় নাড়লে। "তোমার শিউলি-দি বাড়ী আছেন?"

'আছে—ডাকব?"

"হ্যাঁ, বলবে কলকাতা থেকে বিপাশ গাঙ্গুলী দেখা করতে এসেছে।"

খুকু খবর দিতে ছুট্‌লো—আমি কম্পিত হৃদয়ে তাঁর আসার অপেক্ষায় রইলুম। টেবিলের উপর একটা ছবি ছিল, সেটা মঞ্জুশ্রী দেবীর, তা চিন্‌তে একটুও দেরী হোল না। বোধ করি শিউলিকেই এই ছবিখানি দিয়ে থাকবেন, বেদনায় বুকটা টন্ টন্ করে উঠলো।

একটু পরে খুকি ঢুকলো এক টুকুরা কাগজ নিয়ে, তাতে লেখা—

বিপাশ বাবু, আমি মঞ্জুর কাছে সমস্তই শুনেছি। তুচ্ছ কৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করে আপনাকে আসতে

হল, এজন্তে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। কিন্তু কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে আমি হৃদয় দিতে রাজী নই, এটা বোঝা উচিত ছিল। আপনার মা রোগশয্যায় পড়ে কি একটা ভুল করেছেন বলে আপনাকে যে তা মান্‌তে হবে এমন শপথ নেই। আপনি দয়া করে বাড়ী ফিরে যান্, বাংলা দেশে মেয়ের অভাব হবে না।

শিউলি

রাগে অপমানে আমার সর্ব্বশরীর জলে উঠলো। আমি মঞ্জুর কাছে এমন কি বলেছি যার জন্তে শিউলি এমন অপমানিত হ'ল?—ছি ছি, কি লজ্জা! চিঠির টুক্‌রো পকেটে ভরে তখুনি উঠে পড়লুম। জবাব-দিহি করতে পর্য্যন্ত ইচ্ছে হোল না।

খুকি বল্‌লে, "দিদি বল্‌লে চা খেয়ে যেতে হবে।

মুখ বেঁকিয়ে বল্লুম, "তোমার দিদিকে বোলো চা খাওয়াবার জন্তে বাংলা দেশে ছেলেরও অভাব হবে না।" গট্‌গট্ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলুম ও পরদিনই দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করলুম।

বাড়ী ফিরে এসে বল্লুম, "আমি কিছুতেই ওকে বিয়ে করব না পিসিমা।"

পিসিমা বল্‌লেন, "কেন রে? পছন্দ হ'ল না? ও যে খুব সুন্দরী।"

"হোক্ সুন্দরী—ওর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে দাও—"

পিসি ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, "থাক্ থাক্ দিব্যি দিস্ না —কিন্তু বৌদিদির শেষ আদেশ।"

"আমি আজীবন কুমার থাক্‌ব! মা স্বর্গ থেকে সবই জানছেন পিসিমা।"

ব্যাপার যে কি হয়েছিল তিনি আর আমার রাগের মূর্ত্তি দেখে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না। বোধ হয় মনে ভাব্‌লেন, মাথা ঠাণ্ডা হলে আপনিই সব বুঝ্‌তে পারবে।

পিসিমার হাত থেকে তখনকার মত রেহাই পেলাম। কিন্তু মঞ্জুশ্রীর এক অদৃশ্য শক্তি আমায় কি মোহপাশে যে বদ্ধ করল এক মুহূর্ত্ত তার চিন্তা থেকে রেহাই পেলুম না। কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল, এমন হঠ করে দার্জ্জিলিং ছেড়ে চলে আসা ঠিক হয় নি। নিজের মুখ্যুমির জন্তে একটা ঠিকানা পর্য্যন্ত রাখি নি। কেমন করে আবার তাঁর দেখা পাব? সেই কয়েক ঘণ্টার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠতে লাগল। বুঝলুম, এ জীবনে তাঁকে ভুল্‌তে পারব না।

পিসিমা অণিকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে ফিরে গিয়েছিলেন। মাসখানেক পরে একদিন হঠাৎ এসে বললেন, "শিউলিকে বিয়ে না করলে যে সর্ব্বনাশ হবে বাবা। আমার ঝা তো অকূলে পড়েছেন। বেচারীর বাপ নেই, তোর সঙ্গে বিয়ের ঠিক জেনে এতদিন পর্য্যন্ত থুব্‌ড়ো করে রেখেছেন, এখন ঐ মেয়ে নিয়ে উপায় হবে কি বাবা। ও তো আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে বসেছে।"

আমি চুপ করে রইলুম। পিসি আবার বললেন, "কেন যে বাছা তুই অমত করছিস্, সে তুই জানিস্—কি যে সুন্দর আর ভালো মেয়ে ও! কি প্রাণঢালা যত্ন ভাল-বাসা দিয়ে তোর মাকে সেবা করেছিল, সে যদি চোখে দেখতিস্!"

একমুহূর্ত্তে সমস্ত মন বিকল হয়ে গেল। মায়ের যে সেবাটুকু আমার করবার কথা—যে অপরিচিতা নারী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তার সমস্ত দায়িত্বটুকু গ্রহণ করেছিল—সে যেমনই হোক, সে আমার নিতান্ত আপন। আমারই জন্ত সে দীর্ঘ পাঁচ বছর অপেক্ষা করে আছে—আমি তুচ্ছ পাঁচ ঘণ্টার মোহে পড়ে তাকে অবহেলা করতে পারব না। ভাল যদি তাকে না বাস্‌তেও পারি, সে আমার গৃহলক্ষ্মী হয়েই আসুক। বল্লুম, "পিসিমা, বিয়ের ঠিক কর, আমার অমত নেই।"

অগ্রাণের প্রথম সপ্তাহে বিয়ের দিন পড়লো। শুভদিন এসে পড়তেও দেরী হোল না। মঞ্জুকে ভুলি নি, ভুল্‌তে পারি নি—নিজেকে ভুলে যাই তবু তাকে ভুলতে পারি কই? সে আমার নিদ্রায়, জাগরণে, অবসরে, অনবসরে, দেহে মনে মিশিয়ে রইল।

বিয়ের চিঠিতে "শ্রীমান বিপাশের সহিত শ্রীমতী শিউলির শুভবিবাহ" দেখে অণুকে বল্লুম, "তোদের

শিউলির কি একটা পোষাকি নামও নেই? অন্তত শেফালী হলেও যে চল্‌তো।”

অণু বল্‌লে, “তোমার যা পছন্দের শ্রী! কেন শিউলি নামটি কি মন্দ?—কিন্তু ওর একটা সত্যি ভাল নাম আছে, ও বিয়ের চিঠিতে কিছুতেই বের করতে দিল না।”

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, “কারণ?”

“ও বল্‌লে সেই বিশ্রী খটমট নাম শুন্‌লে তোর দাদা আরো ঘাবড়ে যাবে।”

“হ্যারে অণি, চেহারাটাও তেমনি বিশ্রী, না?”

অণি হেসে ফেল্‌লে, “হ্যা, ভয়ানক বিচ্ছিরি দাদা, বাঁশবনের পেত্নী!”

ও ছুটে পালালো। শিউলি সম্বন্ধে মনকে কিছুতেই কোমল করতে পারছি না।

বরের আসনে বসে নতমস্তকে বিয়ে করছি, পুরোহিত কি মন্ত্র পড়ছে কিছু কানে যাচ্ছে না—মন চলেছে পাহাড়ি পথ দিয়ে চলন্ত রেলগাড়ীতে। চোখে ভাসছে একটি সুন্দরী নারী-পরম নির্ভাবনায় একান্ত নির্ভয়ে ঘুমিয়ে আছে—আমি তার পাশে জেগে বসে আছি। বিশ্বচরাচরে আমি যেন তার একমাত্র রক্ষক—জীবন-মরণের সাথী।

খানিকটা কৌতূহলে ও অন্যমনে চোখ তুলে ক'নের দিকে চাইলুম। এ কি এ যে মঞ্জুশ্রী! এ কি সম্ভব! তাঁর কথা ভেবে ভেবে নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কিংবা স্বপ্ন দেখ্‌ছি! আমার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা শিথিল হয়ে এল—চোখের সাম্‌নে বিশ্বজগৎ নৃত্য সুরু করলো।

বাসর-ঘরে তাকে একান্তে পেয়ে বল্লুম, “আপনি শিউলি কেমন করে হলেন?”

“আমি তো চিরদিনই শিউলি ছিলুম।”

“আপনি কি মঞ্জুশ্রী নন্?”

“আমি শিউলি, আমি মঞ্জুশ্রী, আমি বাংলা দেশের একটি মেয়ে— আমি—”

“আমি বাধা দিয়ে বল্লুম, “আমি জানি তুমি কি—কিন্তু এমন আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে, তুমি নিশ্চয় সব জানতে পেরেছিলে।”

“পেরেছিলুমই তো, মেরী কটেজের আত্মীয়ার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে শুনেই বুঝে ফেল্‌লুম। নইলে তুমি কি ভাবো আমি সম্পূর্ণ একজন অজানা ছেলের সঙ্গে অত কথা কইব, তাকে লেবু কিনে দিতে বল্‌ব, পয়সা দেব না, পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘণ্টা দু'এক ঘুমোব, আমার কি লজ্জা ভয়ডর কিচ্ছু নেই?”

আমি খুব একচোট হেসে বল্লুম, “মেয়েরা এম্‌নিই বটে, আমি কোথায় তোমায় দেখবামাত্র হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ভালবেসে ফেল্লুম, আর তুমি তখন আমায় খুব যাচাই করছ! আচ্ছা, দার্জ্জিলিং থেকে আমায় তাড়ালে কেন বল তো?

“সে আমার দুষ্টুমি।”

“বিয়ের চিঠিতে ভাল নাম গোপন করলে কেন?”

“সেটাও আমার দুষ্টুমি।”

“কিন্তু এই নিরীহ লোকটির সঙ্গে—”

“দেখ্‌লুম তোমার কৃতজ্ঞতার দৌড় কতখানি।”

আমি তাকে আদর করে বল্লুম, “আমার কৃতজ্ঞতার যে এত বড় মূল্য পাব, তাকি আমি জানতুম?”

বৈজু বাওরা

শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব্বকালে সংখ্যায় অতি অল্প বালকই লেখাপড়া শিখিত। কিন্তু যাহারা শিখিত তাহাদের বেতন দিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে হইত না। বর্ণ পরিচয় ও সাহিত্য শিক্ষা অপেক্ষা সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্রগঠনের প্রতি শিক্ষকরা বেশী মনোযোগী হইতেন। সকল দেশেই শিক্ষক-সম্প্রদায় চিরকাল ত্যাগী, দরিদ্র কিন্তু পুরাকালে তাঁহারা সমাজে যেমন সম্মানিত ছিলেন, এখন তেমন নাই। তাঁহারা রাজার কাছে বৃত্তি লইয়া বা দেশের ধনবানদের কাছে সাহায্য গ্রহণ করিয়া ছাত্রদের অন্নবস্ত্র পুস্তকাদি যোগাইয়া বিদ্যাদান করিতেন, বিদ্যার্থী ছাত্রদের কাছে বেতন গ্রহণ করা অতি হীন কার্য্য বিবেচনা করিতেন। ছাত্ররাও শিক্ষককে পিতা অপেক্ষা সম্মানার্হ লালনপালন-কর্ত্তারূপে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিত। এখনকার বিদ্যার্থী ভাবেন, স্কুলে যখন মাসে মাসে বেতন দিতে হয় ও সেই বেতন হইতে মাষ্টাররা বেতন পায়, তখন মাষ্টাররা প্রকারান্তরে বেতনভুক চাকরমাত্র।

পূর্ব্বে কোন বিশেষ বিষয়ে গুণীরা লোকের কাছে আপনার পরিচয় দিবার সময় বাপ-পিতামহের নামধাম বা বংশপরিচয় না দিয়া গুরুর নাম বলিত। কাহার কাছে ঐ বিদ্যার্জ্জন করিয়াছে তাহার পরিচয় দিবার নিয়ম ছিল; কোন বিদেশী বিদ্বান বা গুণী আসিলে লোকে বলিত অমুকের শিষ্য অমুক আসিয়াছে। গুরুর পরিচয় না দেওয়া বা গুরু অস্বীকার করা মহা অপরাধ বিবেচিত হইত। সমাজ এমন ব্যক্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ও শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইত না।

এখন বৃন্দাবন বলিলে মথুরার নিকট একটি ছোট নগর বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রাচীনকালে বৃন্দাবন অর্থে ব্রজভূমি বা ব্রজমণ্ডল ছিল। এই ব্রজভূমি ৮৪টি বনে বিভক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ ৮৪টি বনের এক বনের নাম বৃন্দাবন। কিন্তু বৃন্দাবন শব্দ ব্রজমণ্ডলের জন্যও ব্যবহৃত হইত। বনে নানাস্থানে ঋষি ও আচার্য্যদের তপোবন অথবা আশ্রম ছিল; সেখানে বাস করিয়া তাঁহারা নানাবিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সঙ্গীত তখন ধর্ম্মের ও শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বিবেচিত হইত। শব্দকে ব্রহ্ম বিবেচনা করিলে সঙ্গীত তপস্যার প্রধান অঙ্গ হইয়া যায়।

ঈশাব্দের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে পশ্চিম দেশ হইতে আগত মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী তুর্করা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু দেশে ভারতের পঞ্চ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ সৌর, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও গাণপত্য) ও বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি শাখা সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানগুলি তখনও ভাল অবস্থায় ছিল। দিল্লী তখন মুসলমান-সম্রাটদের রাজধানী ছিল। নিকটের কোনও কোনও মন্দির ধ্বংস করা হইয়াছিল ও সমৃদ্ধিশালী মথুরানগর বহুপূর্ব্বে আক্রমণকারীরা লুঠ করিয়াছিল, কিন্তু বৃন্দাবন তখন পূর্ণ গৌরবে বিরাজিত। আগ্রা তখন সামান্য নগণ্য স্থান, বৃন্দাবন তখন কোন আধুনিক নগরে সীমাবদ্ধ নহে—বহুবিস্তৃত চুরাশীটি বনের সমষ্টি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে বৃন্দাবন বা ব্রজমণ্ডলের কোনও বনে এক সঙ্গীতসিদ্ধ পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার কয়েকটি শিষ্য ছিল। তিনি সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞরূপে শিক্ষা দিতেন। তবে বিশেষ প্রতিভাবান্ ছাত্র না হইলে অন্য স্থানে শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। এই তপস্বীর নাম ছিল ব্রজলাল। কিন্তু তিনি কোন্ দেশবাসী, কি জাতি, কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত কিছুই জানা নাই। তিনি সর্ব্বদা ভাবে বিভোর থাকিতেন। কাহারও সহিত সাধারণ লোকের মত গ্রাম্যকথা বলিতেন না। সাংসারিকরা যাহাতে সর্ব্বদা বিরক্ত না করে, সেইজন্য প্রায়ই সাধকদের পাগলের মত ভাণ করিতে দেখা যায়। তিনিও সেইরূপে পাগল সাজিয়া থাকিতেন; অথবা তিনি যথার্থই

হরিপ্রেমে পাগল ছিলেন। লোকে তাঁহাকে "বৈজু বাওরা" অর্থাৎ "পাগল বৈজু" বলিত। তাঁহার ঈশ্বরদত্ত এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি যে কোনও জীবজন্তুর ডাকের অবিকল অনুকরণ করিতে পারিতেন এবং এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, একদিবস তিনি গভীর বনমধ্যে একাকী বসিয়াছিলেন তখন এক ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন; তিনিও অনুকরণ করিয়া সেইরূপ গর্জ্জন করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া ব্যাঘ্র তাঁহার নিকট আসিল। তিনি নির্ভয়ে বসিয়া রহিলেন। অল্প পরে ব্যাঘ্র আবার বনে প্রবেশ করিল। ব্রজলাল সন্দেহ করিলেন যে, শব্দে কোনও প্রকার আকর্ষণী শক্তি আছে। সেই শক্তিদ্বারাই ব্যাঘ্র আসিয়াছিল. তিনি নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পরীক্ষাচ্ছলে নানা বন্যজন্তুর ডাকের অনুকরণ করিয়া দেখিলেন প্রত্যেকবারই যাহার ডাকের অনুকরণ করেন সে নিকটে আসে।

বৈজু সঙ্গীতবিদ্যাতে উচ্চশ্রেণীর বিদ্বান্ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি পশুর ডাকের ঠিক অনুকরণ না করিয়া, সেই ডাক যে সুরের সেই সুরে কণ্ঠস্বর বাহির করিয়া দেখিলেন যে, তাহাতেও পশু আকৃষ্ট হয়। এই রহস্য আবিষ্কার করিবার পর তিনি গান করিবার সময় যখন যে পশুকে ইচ্ছা সঙ্গীতদ্বারা আকর্ষণ করিতেন। সঙ্গীত শুনাইতেন ও মোহিত করিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা নিশ্চল পুত্তলিকাবৎ বসাইয়া রাখিতেন। কথিত আছে, এই পশুরা গানের সময়ে এমন মোহিত হইত যে, তাহাদের স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া যাইত। একটি ব্যাঘ্র ও একটি মৃগকে সঙ্গীত দ্বারায় একই সময়ে আকর্ষিত করিলে তাহারা আসিয়া উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া গান শুনিত; তাহাদের প্রকৃতিগত খাদ্য খাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া যাইত। বনের অধিবাসীদের বাসস্থান তাঁহার আশ্রম হইতে দূরে হইলেও তাহারা এই দৃশ্য দেখিতে আসিত ও নিজেরা মোহিত হইয়া ব্যাঘ্র, মৃগ ও পক্ষীদের সহিত তাঁহার আশ্রমে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ১২৯৬ ঈশাব্দে দিল্লীতে আফগান-বংশীয় বৃদ্ধ জালালুদ্দিন ফিরোজ খিল্‌জি সম্রাট্ ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে দিল্লীর তুর্কী সম্রাটদের সামন্ত ও সেনাপতি ছিলেন। রাজবংশে কেহ না থাকায় সামন্তরা তাঁহাকে সম্রাট নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র আলাউদ্দিনকে তিনি কন্যাদান করিয়া জামাতা করিয়াছিলেন। এই আলাউদ্দিন তখন "কড়া"র শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রয়াগ জেলার মধ্যে আধুনিক এলাহাবাদ নগরের উত্তর-পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গার দুইকূলে কড়া ও মাণিকপুর নামক দুইটি নগর আছে: উভয়ের সমষ্টি "কড়ামাণিকপুর" নামে খ্যাত। তখন কড়া এ অঞ্চলের শাসনকর্ত্তার প্রধান বাসস্থান ছিল। আলাউদ্দিন আপনার জ্যাঠাকে হত্যা করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উদ্যমের জন্য বিস্তর সৈন্যবলের অর্থাৎ বহুধনের প্রয়োজন—তাহা আলাউদ্দিনের ছিল না। তিনি হঠাৎ দেবগিরির যাদব-বংশীয় রাজাকে আক্রমণ করিয়া বহুধন লাভ করিলেন। প্রাচীন দেবগিরির নাম মুসলমানদের সময়ে 'দৌলতাবাদ' রাখা হইয়াছিল। এখন নিজাম-রাজ্যের মধ্যে আওরঙ্গাবাদ হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে রেলের ধারে দেবগিরি দুর্গের ভগ্নাবশেষটি দেখিবার বস্তু। দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণকারীরা ও দর্শকমণ্ডলীরা প্রতি বৎসর তাহার পূর্ব্বগৌরবের সম্মান করিয়া যায়। প্রয়াগে বা কড়াতে ফিরিয়া আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎকালে নবতিপর বৃদ্ধ পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠতাতকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়া আলাউদ্দিন রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। রাজ্যলাভ করিবার পরই তিনি গুজরাট ও মহারাষ্ট্রদেশ আক্রমণ করিয়া (১২৯৭-৯৮ ঈশাব্দ) দেশ ছারখার করিয়া বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করিলেন।

গুজরাট ও মহারাষ্ট্র দেশ লুণ্ঠিত হইলে সেই দেশ হইতে গোপাল নামক একজন সঙ্গীতসিদ্ধ পুরুষ আপনার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ব্রজমণ্ডলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশবাসী ছাড়া গোপালের পূর্ব্বজীবনের আর কোনও পরিচয় জানা নাই। বৃন্দাবনে আসিবার পর গোপাল প্রায়ই বৈজুর কাছে আসিতেন। উভয়েই সঙ্গীত বিদ্যায় কৃতী। অতএব উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। গোপাল সঙ্গীত রাগরাগিণী সিদ্ধ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গানে প্রায়ই প্রতিযোগিতা

প্রশ্নোত্তর বা কথাকাটাকাটি হইত। গোপাল বৈজুকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সফল না হইয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেন। গোপাল একদিন "খরজ কাঁহানস" ইত্যাদি গান করিয়া একটি প্রশ্ন করিলেন। বৈজু তদুত্তরে "মেই কি সুর খরজ" ইত্যাদি গান করিলেন। (এই দুইটি ধ্রুপদ গান ও স্বরলিপি সংস্কৃত "ধ্রুপদ স্বরলিপি" পুস্তকে দ্রষ্টব্য)। অনেক সম্প্রদায়ে নিয়ম ছিল যে এরূপ প্রতিযোগিতায় পরাজিত ব্যক্তিকে জেতার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইত। কোনও কোনও প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজিত ব্যক্তি জেতার দাস বলিয়া গণ্য হইত ও তাহার প্রাণ হরণ করিয়া সম্পূর্ণ ক্ষমতা জেতা প্রাপ্ত হইত। হিন্দু ও বৌদ্ধ বিবাদ কালের অনেক গল্প ইতিহাসে পাওয়া যায় যে দুই সম্প্রদায়ের দুইজন প্রবল বিদ্বানের মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ হইল ও পরাজিত ব্যক্তি জেতার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। শঙ্করাচার্য্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হইয়া তাহার প্রধান শিষ্য ও তাঁহার অন্তর্ধানের পর গদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। গোপাল এইরূপ প্রশ্নোত্তর-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বৈজুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু তিনি এই শিষ্যত্ব অপমানসূচক বিবেচনা করিয়া দুঃখিত থাকিতেন ও লোকের কাছে বৈজুকে আপনার গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই সময়ে গোপালের স্ত্রী দেহরক্ষা করিলেন। তখন গোপাল আপনার কন্যা মীরাকে লইয়া বৈজুর আশ্রমের কাছেই এক কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্যাও ধীশক্তিসম্পন্না ছিলেন। অল্পকালে তিনিও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিনী ও যশস্বিনী হইলেন।

এইরূপে পাঁচ ছয় বৎসর কাটিলে গোপালের এই জনমানবহীন বনে বৈজুর শিষ্যরূপে বাস করা ভাল লাগিল না। তিনি রাজধানী বা অন্য জনবহুল স্থানে স্বাধীনভাবে বাস করিতে উৎসুক হইলেন ও কয়েকটি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গুরুর সম্মান ভোগ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি চাহিলে বৈজু আনন্দিত মনে তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন।

সম্রাট আলাউদ্দিন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ্য লাভ করিবার পর যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন সেরূপ উন্নতি তাঁহার পূর্ব্বে মুসলমান-সম্রাটদের মধ্যে কেহ করে নাই। তিনি 'সিকন্দর সানি" অর্থাৎ দ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার উপাধি ধারণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজসভাতে এত বিদ্বান, কবি, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, সাধু, সিদ্ধপুরুষ, গুণী নানা বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ একত্র হইয়াছিলেন যে, সে সময়কার ঐতিহাসিকরাও আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। গোপাল রাজসভাতে সঙ্গীতজ্ঞদের আদর ও সম্মান দেখিয়া রাজধানী দিল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অল্প কয়েক দিনেই তিনি রাজধানীতে সঙ্গীতসিদ্ধ পুরুষরূপে সম্মানিত হইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস জানিত না। তিনি আপনার গুরুর নাম, শিক্ষার স্থান বা পূর্ব্ববাসস্থান প্রকাশ করিতেন না। ক্রমে তিনি রাজসভাতে সঙ্গীত-সমাজে পরীক্ষা দিতে আহূত হইলেন। সম্রাট তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নায়কপদ ও যথোপযুক্ত বৃত্তি দিয়া সম্মানিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার যশ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আপনার গুরুর পরিচয় না দিয়া আপনাকে ঈশ্বর অনুগ্রহে বা দৈববলে শিক্ষিত ও সিদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিলেন। কিন্তু গুরুর নাম অস্বীকার করায় অনেকে বিরক্ত হইলেন।

"বৈজু" কিছুকাল পরে দৈববশে যশ উদ্দেশে রাজধানী দিল্লীনগরে আসিলেন। সেখানে আসিয়াই শুনিলেন যে, দুইচারি দিবস পরে কোনও পর্ব্ব উপলক্ষ্যে সঙ্গীতের বিরাট সভা হইবে। সেখানে রাজসভার প্রধান রত্নস্বরূপ গায়ক গোপাল নায়ক সঙ্গীতে আপনার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিবেন। তিনি গোপাল নায়কের বর্ণনা শুনিয়া তাহাকে আপনার প্রাচীন শিষ্যরূপে সন্দেহ করিলেন বটে, কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলেন না, কেননা গোপাল নায়ক কাহার শিষ্য কোথায় শিক্ষিত তাহা তাঁহার সংবাদ-দাতারা কেহ বলিতে পারিলেন না। ক্রমে সঙ্গীত-সভার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। বিস্তৃত রাজসভাতে স্বয়ং সম্রাট আলাউদ্দিন সিকন্দর সানি নানা রত্নজড়িত সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বসিলেন।

তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাজবংশীয় কুমারয়া, সভাসদ সামন্ত ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা বসিলেন। ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিদ্বানমণ্ডলী, কবি চিকিৎসক, গায়ক, বাদক, ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা, সাধক ইত্যাদি গুণিসমাজ সমাসীন। একদিকে নাগরিক সাধারণ শ্রোতাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন গোপাল নায়কের গান আরম্ভ হইল তখন এই বিরাট সভা মোহিত হইয়া মৃণ্ময়পুত্তলীবৎ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সভাতে সূচী-পতনের শব্দ স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হওয়া সম্ভব ছিল। নিকটেই রাজোদ্যানে পালিত মৃগ ছিল, গোপালের এক একটি উচ্চতান শুনিয়া সেই মৃগগুলি জনতা উপেক্ষা করিয়া সভাতে প্রবেশ করিল ও নিকটে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। মৃগের আকর্ষণ দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে গোপালের গানের সময়ে অনেকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা যে এত জনতাপূর্ণ স্থানেও আকর্ষিত হইবে তাহা কেহ আশা করে নাই। এখন সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে, একজন মলিন জীর্ণবস্ত্রধারী কতকটা পাগলের মত মানুষ সভাতে নির্ভয়ে প্রবেশ করিল ও গোপালের কাছে গিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, বলিল 'বাহ বেটা, বহুৎ আচ্ছা গায়া' ও নিকটেই বসিয়া পড়িল। গোপাল বৈজুকে সভাতে ঐরূপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইলেন, কিন্তু প্রণাম অভিবাদন ইত্যাদি কিছুই করিলেন না। সম্রাট্ আগন্তুকের ব্যবহারে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া গোপালকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু গোপাল গুরু স্বীকার করিলেন না, বলিলেন "জাঁহাপনা, আমি উহাকে চিনি না, তবে উহার ব্যবহারে বোধ হইতেছে ও আমাকে কোথাও দেখিয়াছে। উহার রূপ ও বেশ দেখিয়া একটা পাগল বলিয়া বোধ হইতেছে।" যখন বার বার প্রশ্ন করিয়াও গোপালের কাছে সদুত্তর পাইলেন না, তখন সম্রাট আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে, আপনি কি গোপালকে পূর্ব্বে চিনিতেন?" বৈজু একটু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "আমি ভগবানের একজন নগণ্য সেবক মাত্র, এই গোপাল পূর্ব্বে কিছুকাল আমার কাছে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল, উহাকে অনেক দিন দেখি নাই, তাই দেখিতে আসিয়াছি।" সম্রাট বুঝিতে পারিলেন যে গোপাল গুরু অস্বীকার করিতেছেন। এ ব্যক্তি যখন নিজেকে গোপালের গুরু বলিয়া পরিচিত করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ক্ষমতাশালী সঙ্গীতজ্ঞ ও গুণী হইবে। সম্রাট রাগ করিয়া বলিলেন—"গোপাল, সঙ্গীতসিদ্ধরূপে তোমার এত অহঙ্কার হইয়াছে যে তুমি গুরু অস্বীকার করিতে সাহস করিতেছ। এখন তোমাদের গুরুশিষ্যের বিচার হইবে সেজন্য প্রস্তুত হও। বিচারে হারিলে তোমার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রাণদণ্ড হইবে।" বাদশাহের আদেশে গোপাল মৃগতান রাগে গান করিলেন। "দিল্লীপতি নরেন্দ্র সিকন্দর সা" ইত্যাদি।* গান শুনিয়া সভাতে একটি হরিণ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার গলায় এক ছড়া মালা দিয়া তাহাকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইল। পরে গান শেষ হইলে হরিণ চলিয়া গেল। সম্রাট এইবার বৈজুর দিকে চাহিয়া গান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সাধক বৈজু ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কালকে আগে কিসীকী কুছ নহীঁ চলতী।" ইহার বহুকাল পরে ভারতগৌরব ভক্তকবি মীরাবাঈ এই ভাবটি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—

> করম গত টারে নহিঁ টরে
> বজ্র কিও বলি দেন ইন্দ্রাসন
> সো পাতাল ধরে।
> মীরাকে প্রভু গিরিধর-নাগর
> বিষ সে অমৃত করে॥
> করম গত টারে নহিঁ টরে॥

বৈজু সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। গোপালও বোধ হয় মনে মনে ভবিষ্যৎ ঘটনার কোনও আভাস পাইয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তথাপি প্রকাশ্যে নিঃশঙ্কে বৈজুর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। বৈজুর সঙ্গীত আরম্ভ হইতেই রাজোদ্যানে পালিত নানা প্রকার মৃগ ব্যাঘ্র ইত্যাদি ও গগনবিহারী পক্ষীরা আসিয়া সভাতে একত্র হইল। তন্মধ্যে পূর্ব্বের মাল্য-চিহ্নিত মৃগও ছিল। ক্রমে সঙ্গীতের শক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। এই বিরাট সভার শ্রোতারা মনুষ্য পশু পক্ষীরা মোহিত ও

---

* মৎ প্রণীত ধ্রুপদ স্বরলিপি দ্রষ্টব্য।

বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া শুনিতে লাগিল। কথিত আছে, শক্তি চরমে উঠিতেই আঙিনায় পাতা প্রস্তর দ্রবীভূত হইয়া গেল। তখন বৈজু আপনার হাতের তাল (করতাল বা মঞ্জিরা) দ্রবীভূত প্রস্তরাঙ্গণে ফেলিয়া দিলেন ও গান শেষ করিলেন। গান বন্ধ হইতেই প্রস্তর আবার কঠিন হইয়া গেল ও বৈজুর হাতের তাল সেই প্রস্তরে আবদ্ধ হইয়া রহিল। সম্রাট এমন শক্তিশালী সঙ্গীত পূর্ব্বে শুনেন নাই ও এরূপ ঘটনাও তাঁহার সভাতে পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। তিনি গোপালকে বলিলেন—"তুমি আপনার সঙ্গীত-শক্তির বড় গর্ব্ব করিয়া থাক—এখন সঙ্গীতবলে প্রস্তর দ্রবীভূত করিয়া ঐ আবদ্ধ তাল তোমাকে উঠাইতে হইবে। না পারিলে তোমাকে অন্যায় গর্ব্বের উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

গোপাল এবার আপনার পূর্ণবল প্রয়োগ করিয়া গান ধরিলেন। কিন্তু বৈজুর গানে যেমন প্রস্তর দ্রব হইয়াছিল সেরূপ হইল না। তিনি প্রস্তরে প্রোথিত তাল তুলিতে পারিলেন না। সেকালে এরূপ অপরাধের একমাত্র শাস্তি ছিল শিরশ্ছেদন। আবার শাস্তির কঠোরতা সম্রাটের সে সময়ে কোপের পরিমাণের উপর নির্ভর করিত; বাঁধা আইনকানুন কিছুই ছিল না। সম্রাটের মুখ দিয়া কোনও আজ্ঞা বাহির হইলে তাহার পুনর্বিচার, আপিল বা ক্ষমা ছিল না। তবে সম্রাট নিজে মনে করিলে প্রত্যাহার করিতে পারিতেন।

গোপাল রাজসভাতে গায়কপদ পাইয়া আমীর-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে আমীরের সুবিধা অসুবিধা সকলই ভোগ করিতে হইল। তিনি ঐ গানের সভাতে সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া আরও উচ্চপদলাভের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দৈব বাম হয় তখন সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হয়। রাজাজ্ঞায় তাঁহার শিরশ্ছেদন করা হইল। বৈজু শিষ্যের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য বিস্তর কাকুতিমিনতি করিলেন, কিন্তু সেকালে সম্রাটের আজ্ঞা ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক যখন সম্রাটের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তখন পালিত হইতই। তাহার অন্যথা অসম্ভব ছিল। প্রজার জীবনের, সে যতই গুণবান, সম্মানার্হ বা উচ্চপদস্থ হউক না কেন, কোনও মূল্যই ছিল না। গোপালের সঞ্চিত ধনরত্ন রাজকোষে প্রবেশ করিল। তাহার সৎকারের ব্যয় শ্রোতাদের দয়ার দানের উপর নির্ভর করিল।

গোপালের সন্তানের মধ্যে একমাত্র কন্যা মীরা। সে মুখাগ্নি করিয়া সৎকার করিল। পরে অস্থিগুলি যমুনার জলে বিসর্জ্জন দিবার সময়ে রোদন করিতে করিতে গান করিয়াছিল। প্রবাদ আছে, উহা মীরা কী মল্লার। জনশ্রুতি এইরূপ যে কন্যার আন্তরিক শোকোচ্ছ্বাসে ও গানের প্রভাবে গোপালের শরীরের অস্থিগুলি জুড়িয়া পূর্ণ কঙ্কালরূপ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মাংস উৎপন্ন হইল না। সেই অস্থিময় শরীর বা কঙ্কাল হইতে সকলে শব্দ শুনিতে পাইল। গোপাল বলিতেছেন—"মীরা, তুনে বহুৎ কিয়া, লেকিন মেরে করম্‌কা ফল মৈঁ হী ভোগুঁগা।" মীরা এখন পিতৃমাতৃহীনা, বন্ধু-বান্ধবহীনা, কপর্দ্দকহীনা যুবতী অথচ আশ্রয়হীনা। তাহার অবস্থা বর্ণনাপেক্ষা কল্পনাসাপেক্ষ। অন্য আত্মীয়-কুটুম্ব কেহই নিকটে নাই। মীরা ও গোপাল মহারাষ্ট্রদেশ-বাসী—সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণকুলে তাহাদের জন্ম। ইহা ছাড়া আর কোনও পরিচয় কেহ জানিতেন না। মীরা স্বয়ং বাল্যাবস্থার কোনও সংবাদ দিতে পারিল না। তাহার দেশ কোথায়, সেখানে আত্মীয় কেহ আছে কি না, কিছুই জানিত না। এমন অবস্থায় সম্রাটই তাহার একমাত্র অভিভাবক। তিনি তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে চিন্তা ও ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। সেকালে দিল্লী, বদাঁও, বিয়ানা, অযোধন, মুলতান ইত্যাদি স্থানে অনেক-গুলি মুসলমান সুফী সাধুপরিবার স্থায়িভাবে বাস করিতেন। বিদ্যার্জ্জন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সঙ্গীতসাধনা, যোগসাধনা ইত্যাদিতে তাঁহাদের বংশগত অধিকার ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কোনও কোনও সাধু এত ধনরত্ন ও স্থাবর সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, আটদশপুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বংশধরেরা ধনবানদের মত জীবন যাপন করিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের মঠগুলি অতি সচ্ছল অবস্থায় আছে। সম্রাটের আজ্ঞাতে মীরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল ও কোনও সঙ্গীতজ্ঞ সাধুবংশে তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। প্রাচীন গুণী খাঁ-সাহেবেরা বলেন—

এই সাধুবংশে মহম্মদ ঘওস জন্মগ্রহণ করেন এবং ইঁহারই কন্যার সহিত তানসেনের বিবাহ হয়।

বৈজু শিষ্যের মৃত্যুর পর বিরক্ত হইয়া রাজসভা ত্যাগ করিলেন ও অবশিষ্ট জীবন তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কাটাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহার পর তিনি আর কোনও সঙ্গীত-সভাতে যোগ দেন নাই। অনেকে অনুমান করেন, গোপালের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না।

নারীর মূল্য

শ্রীঅলকা দেবী

১

বদরপুরের সীতানাথ চক্রবর্ত্তী দাওয়ায় বসিয়া বাঁশ চাঁছিতে চাঁছিতে আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে-ছিল—

কাজ কি মা সামান্য ধনে
কাঁদছে কে তোর ধন বিহনে,

নবীন সাহা আসিয়া উঠানের পৈঠায় বসিল।

—"খবর কি ?"

নবীন এদিক-ওদিক চাহিয়া চাপা-গলায় বলিল,—"বিপিন ঘোষের ভাই-বৌকে আজ পাঁচ দিন পাওয়া যাচ্ছে না।"

সীতানাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, "কোন্ বিপিন ঘোষ ? মাঝের পাড়ার ? তার ভাই নলিন তো তিন চার বছর হ'ল মারা গেছে।"

—"হ্যাঁ, সেই নলিন তোমার আখ্‌ড়ায় কুস্তী শিখতো, তারই বউ। এতদিন বাপের বাড়ী ছিল, মা মারা গেছে, ভাই-ভাজে লাঞ্ছনা করে, মাসকয়েক হল ভাসুরের বাড়ী এসেছিল।"

—"তা বৌটা কি মন্দ নাকি ? ইচ্ছে করে গেছে ?"

নবীন চুপিচুপি বলিল,—"না, আমাদের ক্ষান্ত মাসী ওদের বাড়ী খুব যায়, বলে বৌটা খুব লক্ষ্মী, ঠিক-দুপুরে নিমদীঘিতে জল আনতে গিয়েছিল; সেই বদমাস করেজ আর নরহরি মিলে ধরে নিয়ে গেছে। বিপিন ঘোষ লজ্জায় থানায় খবর দেয় নি। সন্ধ্যেবেলা নরহরির বাড়ী গিয়েছিল। তারা দুজনে তাকে নিয়ে সোনাপাড়া পালিয়েছে।"

—"লজ্জা !" বলিয়া সীতানাথ হাতের বাঁশ আছড়াইয়া উঠানে ফেলিল। তাহার চোখে আগুন। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল,—"এতদিন তোরা কি করছিলি, আমায় একটা খবর দিতে পারিস্ নি ?"

—"আমরা কি জান্‌তাম ? ভদ্দর লোকেদের খবর এত শীগগির আমাদের পাড়ায় পৌঁছয় না, গাঁয়ে কানা-ঘুষো হচ্ছে, সবাই জানে, কিন্তু কেউ মেয়েটাকে বাঁচাতে যায় নি। সোনাপাড়ার রাস্তায় কাল গরুর গাড়ীর মধ্যে যদুময়রা কান্না শুনেছে।"

গ্রামের বুকের উপর দিনের বেলা এমন পৈশাচিক কাণ্ড করিয়া নরপশুরা নির্ব্বিবাদে পলাইল আর এতগুলা লোক নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল! নারীর সম্মানের কোন মূল্য নাই! সীতানাথের শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে দা বাঁশ ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপিন ঘোষের বাড়ী অভিমুখে ছুটিল।

বিপিন ঘোষ জাতিতে কায়স্থ, আগে অবস্থা ভাল ছিল, এখন ভগ্নদশা। বিপিন বিমর্ষমুখে ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছিল। সীতানাথ ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত হইল।

সীতানাথকে বদরপুরের ভদ্রলোকেরা যেমন ভয় করিত, দীনদরিদ্র গরীব চাষা-শ্রেণীর লোকেরা তেমনই ভালবাসিত। লোকের বিপদে-আপদে বুক

দিয়া পড়িলেও অন্যায় সে সহিতে পারিত না, সেজন্য গোঁয়ার বলিয়া অখ্যাতি তাহার ছিল।

সীতানাথ আসিয়াই উগ্রকণ্ঠে বলিল,—"কি শুনছি ?"

বিপিন আতঙ্ক-বিহ্বল নয়নে সীতানাথের দিকে চাহিল। মনে হইল কুসংবাদ চাপা থাকে না। চুপ করিয়া থাকিলে রক্ষা নাই জানিয়া কাতরভাবে সব কথা জানাইল। বিপিনের স্ত্রীর অসুখ হওয়ায় বৌ একলা নিমদীঘি হইতে জল আনিতে গিয়াছিল। মাঠের পথে নরহরি আর ফয়েজ আসিয়া তাহাকে বাঁধিয়া নিয়া গিয়াছে, দূর হইতে নন্দ বোষ্টমের মা দেখিয়াছে।

ইহার মধ্যে বিপিনের স্ত্রীর অসুখের কথা মিথ্যা, নলিনের বউ রোজই নিমদীঘিতে জল আনিতে যাইত। নরহরিকে কয়েক দিন হইতে ঘাটের পথে সর্ব্বদা দেখা যাইত। সেদিন নলিনের বউ-এর জল আনিতে বেলা হইয়াছিল, ঘাট জনশূন্য, সেই নির্জ্জনতার সুযোগে পাপিষ্ঠরা কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছে।

সীতানাথ গুম্‌ হইয়া সকল কাহিনী শুনিয়া বলিল,—"থানায় খবর দিয়েছ ?"

বিপিন হতাশভাবে বলিল,—"থানায় খবর দিয়েই বা করব কি ? তাকে তো আর ঘরে নিতে পারব না।"

সীতানাথ গর্জ্জিয়া উঠিল,—"কাপুরুষ, একটা অসহায় মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, তার উদ্ধারের চেষ্টা না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছো! সমাজ চুলোয় যাক্। আগে তার উদ্ধার কর। মানুষের রক্ত কি তোমাদের গায়ে নেই ?"

বিপিন কোভে চুপ করিয়া রহিল।

সীতানাথ তাহার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—"নাও ওঠো, আমার সঙ্গে থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে আসবে, তার পর যা করবার আমি করব।"

বিপিন অনিচ্ছুকভাবে দু-একবার ইতস্ততঃ করিল। ভ্রাতৃবধূকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, আর যখন তাহাকে ঘরে লওয়া যাইবে না তখন এত হাঙ্গামা কেন ?

অভাগিনীর ভাগ্যই মন্দ, নতুবা তাহার ভীমের মতন ভাই অকস্মাৎ এক রাত্রির ব্যারামে মারা পড়ে ? অতএব সবই সেই মন্দভাগিনীর কপালে চাপাইয়া তাহারা কেবল নিঃশ্বাস ফেলুক! বরং তাহার উদ্ধার না করিলে সমাজে তাহার হুকা বন্ধ হইবে না, কিন্তু উদ্ধার করিয়া ঘরে স্থান দিলে কি আর উপায় আছে ?

কিন্তু সীতানাথের তাড়ায় তাহাকে উঠিতে হইল।

থানা গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দূর। ভাগ্যক্রমে থানায় তখন নূতন দারোগা আসিয়াছেন। নবীন যুবক, সবে পুলিস লাইনে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি শুনিয়াই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সহ একজন চৌকীদারকে সীতানাথের সহিত পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন, তিনি কাল সকালে বদরপুরে যাইবেন।

সীতানাথ যখন গ্রামে ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বিপিন জিজ্ঞাসা করিল,—"চক্রবর্ত্তী মশায়, এখন কি করবেন ?"

সীতানাথ অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতেছিল, চমকিয়া বলিল,—"তুমি বাড়ী যাও, আমি এখনি সাহাপাড়া থেকে জনকয়েক লোক নিয়ে সোনাপাড়া যাব।"

বিপিন শঙ্কিত হইয়া বলিল,—"সোনাপাড়া ফয়েজের শ্বশুরবাড়ী, ও পাড়াটাই দুঁদে, সেখানে এই রাত্তিরে—"

সীতানাথ ধমক দিয়া বলিল,—"তুমি চুপ কর। নিজের প্রাণের ভয় আছে, নিজের ঘরের ঝি-বউকে টেনে নিয়ে গেলেও তুমি কথা কইতে না পার। সীতানাথ চক্রবর্ত্তী মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ, মায়ের জাতের এ অপমান সয়ে প্রাণের ভয়ে পিছিয়ে থাকবে ? এতে যদি প্রাণ যায় সেও ভালো।"

বিপিন নতমুখে নিজের বাড়ী চলিয়া গেল।

সীতানাথ গিয়া নবীন সাহাকে ডাকিয়া সব কথা বলিল। নবীন তৎক্ষণাৎ পাড়া হইতে জনকয়েক বলিষ্ঠ যুবককে লাঠি দিয়া সীতানাথের সঙ্গে পাঠাইল। সীতানাথ সদলে যাত্রা করিয়া ভাবিতে লাগিল, যেখানে ভদ্রশ্রেণীর বিপিন ঘোষ নিজের ভ্রাতৃবধূকে দুঃসহ অপমান হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিল, সেখানে ইহারা তাহার একটা কথায় তাহার উদ্ধারের জন্য চলিল, অথচ ইহারা ভদ্রশ্রেণীর অস্পৃশ্য।

সোনাপাড়ায় যখন তাহারা পৌঁছিল তখন বেশ

রাত হইয়াছে। সেখানে নলিনের বউ অথবা অপরাধী দুইজনকে পাওয়া গেল না। তাহারা অনুমান করিল, তাহাকে লইয়া পাপিষ্ঠেরা ষ্টেশনে যাত্রা করিয়াছে, জেলায় গৃহের ব্যক্তিবর্গ এই কথা স্বীকার করিল।

তাহারা ষ্টেশন অভিমুখে রওয়ানা হইল।

বেশী দূর না যাইতেই তাহারা গরুর গাড়ীর আলো দেখিতে পাইল। অনুমানে বুঝিল দুইজন লোক নয়, আরো তিন চারিজন আছে। নিঃশব্দে গিয়া তাহারা গাড়ী আটক করিল।

সংখ্যায়, বলে সীতানাথের লোকেরা বেশী, কাজেই তাহাদের ধরিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। তাহাদের বাঁধিয়া গাড়ীর মধ্যে অন্বেষণ করিয়া সীতানাথ নলিনের বউকে পাইল না, তাহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, পথপার্শ্বে অস্ফুট গোঙানী শুনিয়া আলো আনিয়া দেখিল হাত-পা-মুখ বাঁধা নলিনের বউ পড়িয়া আছে।

তাড়াতাড়ি তার বাঁধন খুলিয়া সীতানাথ অর্দ্ধমূর্চ্ছিত মেয়েটির মুখে বাতাস করিতে লাগিল, তার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। হতভাগিনী মেয়েটির বয়স বড়জোর ষোল-সতের হইবে, সুন্দর মুখখানি শুকাইয়া একেবারে কালি হইয়া গিয়াছে।

তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া তাহারা থানা অভিমুখে অগ্রসর হইল।

২

তিনটা মাস কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। এই তিন মাস আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সীতানাথ জেলা আর ঘর করিয়াছে, দরিদ্র বিপিন ঘোষের সামর্থ্যই নাই। সীতানাথ কলিকাতায় নারীরক্ষাসমিতির কথা জানিত, তাঁহাদের সাহায্যে তিন মাসে মামলার নিষ্পত্তি হইল। আসামীরা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও উদ্ধার পাইল না। যথাযোগ্য না হইলেও সকলেরই শাস্তি হইয়া গেল। নলিনের বউ রাধারাণী এতদিন জেলার উকীলবাবুর গৃহে ছিল।

যেদিন আসামীরা জেলে গেল, বিপিন ঘোষ শুকমুখে সীতানাথকে বলিল,—"এখন কি করি চক্রবর্ত্তী-মশায়, বৌমাকে আর এখানে রাখা যাবে না, গাঁয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না, কলকাতায় কোন আশ্রমে পাঠাতে পারলে হয়।"

সীতানাথের চোখ জ্বলিয়া উঠিল,—"সে ইচ্ছে করে যায় নি, তবু তাকে তুমি ঘরে রাখ্‌তে পারবে না? না হয় তোমার ঘরের কাজ নাই করবে, তুমি ভাসুর বর্ত্তমান থাকৃতে তাকে আশ্রমে পাঠাবে কেন? যার দুকুলে কেউ নেই, সে-ই আশ্রমে যাবে।"

বিপিন পাংশুমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সীতানাথ সমাজের লাঞ্ছনার কথা জানিত না এমন নয়, কিন্তু এই অল্পবয়স্কা অসহায়া মেয়েটাকে ভাসাইয়া সমাজ রক্ষা করিতে হইবে ইহা মনে করিয়া তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তবু তাহাকে আত্মসংবরণ করিতে হইল—সেই মেয়েটারই মুখ চাহিয়া। কোন রকমে বিপিনকে বুঝাইয়া রাধারাণীকে আপাততঃ বাড়ীতে লইয়া যাইতে সম্মত করিয়া বলিল,—"এখন তো আর এখানে রাখা যায় না, তোমার বাড়ীতে রেখে দেখ, তার পর না হয়, যে রকম ব্যবস্থা করলে ভাল হয় তাই করা যাবে।"

অগত্যা বিপিন রাধারাণীকে বাড়ী লইয়া গেল।

সীতানাথ বাড়ী ফিরিয়া অবসন্নভাবে বসিয়া রহিল। এতদিন কেবল মনে হইয়াছে অপরাধীরা যাহাতে শাস্তি পায় সেই ব্যবস্থা করা দরকার, তাহা তো হইয়া গেল। অপরাধীরা যতদিন পরেই হোক মুক্তি পাইবে, আবার তাহারা সগর্ব্বে সমাজের বুকের উপর বিচরণ করিবে, আর সেই নিরপরাধিনী মেয়েটা এমনিই তো বিধবা হইয়া ইহজন্মের সকল সুখ শেষ করিয়াছে, সমাজপতিরা তর্কক্ষেত্রে হিন্দু বিধবার দেবীত্ব যতই জোর গলায় প্রচার করুন, গৃহক্ষেত্রে তাহার দাসীত্ব অপরিহার্য্য, যদি না স্বামী পাঁচ দশ হাজার রাখিয়া যান। এতদিন তবু সে হেলায় একমুঠা অন্ন দিবারাত্রি পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে পাইত, এখন সে পথও বন্ধ। হায় রে হৃদয়হীন সমাজ, যাহাকে প্রাচীরে, অবগুণ্ঠনে রাখিয়া অধিকতর ভীরু সঙ্কুচিত করিয়াছ, তাহাকে রক্ষা করার পৌরুষ তোমারে নাই, আছে কেবল সেই মূক নির্য্যাতিতার বক্ষ নিষ্পেষণ করিয়া তোমার অচলায়তনের চক্রচালনার অন্ধ কাপুরুষতা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, সীতানাথের পরিচারিকা হরির মা বলিল,—"উনুনে আঁচ দিলুম দা-ঠাকুর, যাও ওঠো, ছুটো ফুটিয়ে মুখে দাও, তিন মাস ধরে ছুটোছুটি করে যা হাল হয়েছে তা বলবার নয়।"

এদিকে বিপিন রাধারাণীকে গৃহে আনিবামাত্র পাড়ার শিরোমণি-মশায় হইতে সুরু করিয়া মুখুজ্যে, বাঁড়ুয্যে, গাঙ্গুলী, ঘোষাল, বসু, ঘোষ, মিত্র ইত্যাদি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া বিপিন ঘোষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। একে দরিদ্র, তাহাতে নূতন বিপদাপন্ন, কাজেই ভয়সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হইয়া নীরবে বিপিন আসিয়া দাঁড়াইল।

শিরোমণি-মশায় শিখা নাড়িয়া বলিলেন,—"তুমি তোমার পতিতা ভাদ্রবৌকে ঘরে এনেছ, সুতরাং পতিতার সংস্পর্শে তোমার পাতিত্য-দোষ ঘটেছে, এ-সব স্বেচ্ছাচার বদরপুরে চলবে না। যদি সমাজে থাকতে চাও, কালবিলম্ব না করে তাকে ত্যাগ করে প্রায়শ্চিত্ত কর।"

বিপিন শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—'সে তো ইচ্ছে করে যায় নি, তাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল, সহরের উকীলবাবু বলছিলেন যে, শাস্ত্রে আছে এ রকম অবস্থায় একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে জাতে নেওয়া যায়।"

শিরোমণি-মশায়ের চক্ষু আরক্ত, কাসিয়া বলিলেন,—"শাস্ত্র! সেই ম্লেচ্ছ উকীল আবার শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করেছে নাকি! আমরা শাস্ত্র জানি না? কোনও শাস্ত্রে এমন কথা নেই।"

যদু ময়রার ছেলে সেই সভায় উপস্থিত ছিল, সে সহরে যাওয়া-আসা করে এবং পড়া-শুনা করে বলিয়া অনেক খবর তাহার জানা, সে তাড়াতাড়ি বলিল,—"হ্যাঁ শিরোমণি-মশায়, দেবল স্মৃতি বলে একখানা শাস্ত্র আছে, তাতে এ কথা আছে।"

শিরোমণি চোখ পাকাইয়া বলিলেন,—"যদো ময়রার ছেলে শিরোমণিকে শাস্তর শেখাতে এসেছে। ময়রার ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে আর উপায় আছে? শোনো বিপিন, শাস্তর কথা তোমাদের মুখে কেউ শুনতে চায় না, আমরা বামুনরা যা বিধান দেব, তাই তোমাদের মানতে হবে। দেশাচার সবার উপর, অতএব তোমার ভাদ্রবৌকে ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তুমি একঘরে।"

বিপিন সভয়ে কাতরকণ্ঠে বলিল,—"আমি গরীব, প্রায়শ্চিত্তের খরচই বা পাব কোথা, আর বৌটাকেই বা কোথায় পাঠাব?"

শিরোমণি-মশায় বলিলেন,—"তার আবার ভাবনা কি! ও স্বচ্ছন্দে মুসলমান হয়ে নিকে করতে পারে, নইলে বোষ্টমদের আখড়ায় যেতে পারে। আর তোমার প্রায়শ্চিত্ত?—সে তুমি, দশের শরণ নিলে যেমন করে হোক আমরা উদ্ধার করে দেব, কি বল হে বনমালী?"

বনমালী মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন।

তুলসী দাস বৈষ্ণব, সে বলিল,—"কিন্তু শিরোমণি-মশায়, ওকে মোছলমানে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ওকে কেউ বোষ্টম করবে না।"

—"তাই তো, তা যাক্ ঐ কলকাতা নবদ্বীপ সব কোথা আশ্রম আছে, সেখানে পাঠালেই হবে।"

—"কে নিয়ে যাবে?"

পাড়ার যত নিষ্কর্ম্মা যুবকরা কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া উঠিল, সকলেই লইয়া যাইতে রাজি। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হইল, কাল রাধারাণীকে গোবিন্দ ঘোষালের ছেলে হরেন কলিকাতায় অবলা-আশ্রমে রাখিয়া আসিবে তারপর দিন স্থির করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইবে।

পরদিন যখন বিপিনের গৃহদ্বারে গাড়ী দাঁড়াইয়া শিরোমণি-প্রমুখ সমাজপতিরা পাপ বিদায় করিবার জন্য হুঁকা হাতে উপস্থিত হইলেন।

গৃহমধ্য হইতে কাতরস্বর শোনা গেল—"দিদি, আমি তো কোন অপরাধ করিনি, আমায় শুধু বাড়ীতে থাকতে দাও, তোমাদের কিছু আমি ছোঁব না।"

উত্তরে একটা চাপা তর্জ্জন শোনা গেল।

ঠিক এই সময়টিতে সীতানাথ আসিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হচ্ছে?"

সীতানাথকে অনেকেই ভয় করিত, কারণ চিরকাল সীতানাথ অন্যায় অসহিষ্ণু, কাহাকে ভয়ও সে করে না।

শিরোমণি-মশায় একবার বক্রকটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বিপিন তার ভাদ্দরবৌকে কলকাতা পাঠাচ্ছে।"

সীতানাথ স্পষ্ট বুঝিল, কাল সমাজের পঞ্চায়েতে ইহাই স্থির হইয়াছে। সে পাড়ার ভদ্রশ্রেণীর সহিত বেশি মেশে না বলিয়া কথাটা তাহার অজানা ছিল। সীতানাথ স্তম্ভিত হইয়া গেল। পঞ্চায়েত বসিবে সে জানিত, কিন্তু নিকর্ম্মা পঙ্গু সমাজপতিরা এত শীঘ্র কর্ম্ম-তৎপর হইয়া উঠিবে ইহা তাহার ধারণা ছিল না।

জিজ্ঞাসা করিল,—"কে নিয়ে যাবে?"

শিরোমণি-মশায় সোৎসাহে বলিলেন,—"এই হরেন রাজি হয়েছে। ওর নিজের কলকাতা যাবার কাজ ছিল, তা ভালই হয়েছে, ওর নিজের খরচ ও নিজেই দেবে, খালি বৌটার খরচ দিলেই হবে।"

সীতানাথের রোষ-কষায়িত দৃষ্টি দেখিয়া পরোপকারী উৎসাহী যুবক হরেন সভয়ে দু'পা পিছাইয়া গেল।

রোরুদ্যমানা রাধারাণীকে তাহার জা গাড়ীতে ঠেলিয়া উঠাইয়া দিল। রাধারাণী কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল,—"দিদি গো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় আর কোথাও পাঠিও না।"

সমবেত দর্শকবৃন্দের কাহারও আঁখি করুণায় ছল ছল করিল না, সব যেন পাষাণ! সীতানাথের চোখ জ্বলিয়া উঠিল,—"ভয় নেই মা, তুমি আমার বাড়ী চল, কার কাছে কাঁদছ? মানুষ হ'লে ওদের কাছে কান্নার ফল ছিল! চল সুদাম, আমার বাড়ী নিয়ে চল।"

শিরোমণি রুখিয়া দাঁড়াইলেন,—"বিপিনের ভাদ্দর-বউ, সে যা খুসি করবে, তুমি বাধা দেবার কে?"

সীতানাথ হাতের লাঠি ঠুকিয়া সগর্জ্জনে বলিল,—"আমি মানুষ, এক পশুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলাম আবার আর একদল পশুর হাত থেকে উদ্ধার করছি, তোমাদের সাধ্য থাকে যা পার কোরো।"

সমাজপতিরা নিরাপদ ব্যবধানে হঠিয়া গিয়া চোখ রাঙাইয়া বলিলেন,—"তোমার নামে আমরা মামলা করব, তোমায় জাতে ঠেলব। মগের মুল্লুক পেয়েছ না কি?"

সুদামকে অ-নড় দেখিয়া সীতানাথ নিজেই গরু হাঁকাইতে হাঁকাইতে বলিল—"আমার জাত অত ঠুনকো নয়, যা খুসী কোরো।"

নিজের বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী থামাইয়া সীতানাথ ডাকিল,—"এসো মা, তোমার গরীব ছেলের বাড়ী।"

রাধারাণী অভিভূতের মত বসিয়া রহিল। তার মনে হইতেছিল এই তিনমাস সে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটাইতেছে। ইহার সকল ঘটনা যেমন অচিন্তিতপূর্ব্ব তেমনই ভীষণ। সংসারের ভীষণ ভ্রূকুটির মধ্যে এই একটি জায়গায় একটু আলোর রেখা চোখে পড়ে। এই মহৎ-প্রাণ লোকটির পরিচয় সে তিন মাস ধরিয়া পাইতেছে, আজ যখন সে মনে করিতেছিল তার দুর্গ্রহ তাহাকে আবার কোন নবতর অকল্যাণের পথে লইয়া যাইতেছে, তখন বরাভয় দাতার মূর্ত্তিতে সে-ই উপস্থিত হইল।

সীতানাথ রাধারাণীকে নিস্তব্ধ দেখিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সে যেন পাষাণপ্রতিমা। সীতানাথের বুকটা অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড় দিয়া উঠিল, তাহার মেয়েটি জীবিত থাকিলে এত বড়ই হইত। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল,—"এসো মা!" রাধারাণী কাঁদিয়া বলিল,—"আমায় জায়গা দিয়ে তুমি বিপদে পড়বে বাবা, তোমায় আমি শান্তি দিতে পারব না, তুমি আমায় কোথাও রেখে এসো।"

সীতানাথের অগ্নিদাহে শুষ্ক চোখ অশ্রুসজল হইল,—"মেয়ের জন্ত আমায় যে শাস্তি সমাজ দেয় তা আমি নেব, আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে।" রাধারাণী ঘরে আসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সীতানাথ বাধা দিল না, কাঁদুক, অভাগিনীর সারা জীবন তো কান্নার ইতিহাস। সে কান্না কাহার প্রতি অভিযোগ? ভাগ্য-বিধাতা, দুরাচারী পিশাচ, না নির্ম্মম সমাজ? হরির মা সন্ধ্যা দেখাইয়া বাড়ী চলিয়া গেল, সীতানাথ আসিয়া বলিল,—"রাধারাণী ওঠো, মুখ-হাত ধুয়ে একটু জল খাও।"

সারাদিন উপবাসী রাধারাণী [illegible]
"আমার খিদে নেই, বাবা।"

সীতানাথ সস্নেহে কহিল- [illegible]

খেয়ে আর ক'দিন থাকবে? মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিতে নেই।"

সীতানাথের পীড়াপীড়িতে রাধারাণী সামান্য কিছু খাইল। সীতানাথ ঘরের এক প্রান্তে বিছানা দেখাইয়া বলিল,—"তুমি ঘুমোও, কোনো ভয় নেই। আমি এপাশে রইলাম, মাঝখানে এই কাপড় টাঙানো রইল।"

সকালে উঠিয়া সীতানাথ দেখিল হরির মা আসে নাই, কারণ বুঝিয়া নিজেই ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইল।

রাধারাণী সঙ্কোচে কুণ্ঠায় এতটুকু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একে সে কায়স্থকন্যা, তার উপর এখন তো তার পদে পদে শৃঙ্খল।

তাহাকে এ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সীতানাথ সহাস্যে বলিল,—"ছেলের কাজ দেখ্‌ছ, মা?"

সঙ্কোচে রাধারাণী বলিল,—"বাবা, আমি উঠোন-গুলো ঝাঁট দিলে কোন দোষ হবে?"

—"দোষ কিসের মা, উঠোন ঘর সবই তুমি পরিষ্কার করবে। তুমি না করলে একি আমার দ্বারা হবে?"

রাধারাণী নিঃশব্দে আসিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইল। বাসী ঘর মুক্ত করিয়া পাশের ডোবায় স্নান করিয়া সে দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সীতানাথ একটা চাবী তাহার সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"এই রান্নাঘরের চাবী, সেখানেই ভাঁড়ার আছে, রান্নাবাড়া কর।"

সভয় সঙ্কোচে রাধারাণী মুখ তুলিল,—"তুমি?"

সীতানাথ বলিল,—"মা কি ছেলেকে না দিয়ে একলাই সব খাবে?"

রাধারাণীর চোখের কোল বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইল, কোনরকমে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,—"আমি কায়স্থের মেয়ে, আর—আর—আপনি তো সবই [illegible]" আবার তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠি[illegible]

[illegible] ম সম্বন্ধে গোঁড়া মোটেই [illegible] পূর্ব্বে কখনো করে নাই, [illegible] মাজপতিদের অন্যায় বিচারে [illegible] উপর রাধারাণীকে আশ্রয় দিয়া খাওয়া বাঁচাইয়া জাতরক্ষার কল্পনা তাহার ন্যায়-নিষ্ঠ মনে ভীষণ একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেন, যে নারী স্বামী-শ্বশুরের গৃহে থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত, কেবল তাহার দুর্ব্বলতার অপরাধে, দুর্বৃত্তদের হস্তে নিগৃহীত সেই বালিকা সীতা সাবিত্রী হইতে কোন্ অংশে কম? সমাজের দণ্ড যাহাই হোক, মানুষের অন্তঃকরণ যাহার আছে সে এ দণ্ড মাথা পাতিয়া লইবে না। সুতরাং রাধারাণীর হাতে তাহাকে খাইতেই হইবে।

বলিল,—"কলকাতায় যখন পড়তাম, গলায় পৈতে দিয়ে কত জাত এসে খাইয়ে গিয়েছে। আমি জাত মানি নে, আর আমি জানি তুমি পবিত্র। মেয়েদের যদি কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায় সে পাপ সমাজের পুরুষের। তুমি ওঠো মা, কাল আমি কিছু খাই নি।"

কিন্তু রাধারাণী কিছুতেই সম্মত হইল না দেখিয়া যখন সে-ও অনাহারে রহিল, তখন রাধারাণীকে রাঁধিতে হইল। রাঁধিতে রাঁধিতে অবিরল অশ্রুপ্রবাহে বুক ভিজিয়া গেল, মনে হইল তাহার জন্মান্তরের শত সহস্র পাপের মধ্যে বোধ হয় একটু সুকৃতি ছিল।

সীতানাথের গৃহে আর কেহ নাই। মাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া শৈশবে অতি আদরে তাহার লেখাপড়া বেশী হয় নাই, গ্রামের স্কুলে পাঠ শেষ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছিল, কিন্তু প্রবেশিকার পূর্ব্বেই পড়া ছাড়িয়া দেয়। মায়ের হাতে কিছু টাকা ছিল, বাড়ী বাগান ও সামান্য জমিজমা ছিল, কাজেই তাহার চাকরির দরকার ছিল না। মা পুত্রের বিবাহও দিয়াছিলেন, কিন্তু একটি কন্যা প্রসব করিয়া বধূ মারা যায়। কন্যাটিও বেশীদিন বাঁচে নাই, পুনরায় বিবাহে সীতানাথ কোনো ক্রমেই রাজি হইল না। বৎসরাধিক হইল মাতা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। গ্রামের দলপতিদের সহিত তাহার মতে মিলিত না বলিয়া সে কাহারও সহিত বড়-একটা মিশিত না, কিন্তু গ্রামের ইতর-ভদ্রনির্ব্বিশেষে বিপদের দিন তাহার দেখা পাইত। নীচশ্রেণীর নিকট চক্রবর্ত্তী-ঠাকুর দেবতার আসন পাইয়াছিল, কাহারও অন্যায় দেখিলে মুখের উপর তাহাকে স্পষ্ট কথা শুনাইত

বলিয়া পাড়ার কেহ তাহাকে ঘাঁটাইত না, তা'ছাড়া তাহার বলিষ্ঠ শরীর ও তাহার অনুগত বাগ্দী সাহাদের ভয়েও অনেকে তাহাকে এড়াইয়া চলিত।

রাধারাণীকে আশ্রয় দেওয়াতে তাহার একান্ত অনুগত নবীন সাহাও একটু অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু সীতানাথ তাহাতে রাগ করিতে পারিল না। উচ্চশ্রেণীর নিকট যে শিক্ষা তাহারা পাইয়াছে তাহা তাহাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে আরও শিকড় গাড়িয়া বসিবে বিচিত্র কি?

মধু ধোপা আসিয়া বলিল,—"দাদাঠাকুর, তোমার কাপড় আর আমি কাচতে পারব না।"

সীতানাথ সহাস্যে বলিল,—"কারণ?"

"তুমি নাকি একঘরে হয়েছ, বিপিন ঘোষের ভাই-বৌকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছ?"

সীতানাথ হাসিয়া বলিল,—"এই অপরাধ, আচ্ছা মধু, তোমরা তো গাঁয়েরই লোক, সীতানাথ চক্রবর্ত্তীকেও চেন, ঐ শিরোমণি গোবিন্দদের ঘরের সব খবরও রাখ, বল তো কে অপরাধী?"

মধু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—"সবই আমি জানি, দাদা, কি করব দশের আজ্ঞা!"

নাপিতকে আর বলিতে হইল না, সীতানাথ সহাস্যে বলিল,—"দাড়ী রাখতে সুরু করলাম, তারিণী।"

অন্তরালে রাধারাণীর চোখ জলে ভাসিয়া গেল। কি কুক্ষণেই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কোন্ শৈশবে বিবাহ হইয়াছিল, মনে জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই স্বামীকে হারাইয়া রাক্ষসী নামে অভিহিত হইল। তবু মায়ের স্নেহাঞ্চলতলে এক রকম করিয়া দিন কাটাইতেছিল, জন্মঅভাগিনীর সেটুকুও সহিল না। মায়ের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃজায়ার নিদারুণ লাঞ্ছনায় অতিষ্ঠ হইয়া তা'কে জানাইতে তা নিকটে আনেন। সে যে অভাগিনীর প্রতি করুণায় তাহা নয়, অবস্থা হীন হইলেও সুখলালিতা [illegible]নীর কন্যার অনভ্যস্ত পরিশ্রম সহিত না। এমন অবস্থায় শুধু খোরাকপোষাক দিয়া দিনরাত্রির দাসী পাইলে মন্দ কি? যাক্ তবু সুখে দুঃখে দিন কাটিতেছিল, হঠাৎ তাহার জীবনে এ কি ভীষণ কালবৈশাখী আসিল! তাহার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ এমন লোককে তাহার মত অভাগিনীর জন্য কি লাঞ্ছনা সহিতে হইতেছে! সীতানাথ না থাকিলে তাহার কি হইত ভাবিয়া আতঙ্কে হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

৪

সীতানাথ শুনিল, বিপিন এক বিঘা জমি বিক্রী করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেছে। সেদিন পথে শিরোমণি-মশায়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি খুব আত্মীয়তা করিলেন,—"সীতানাথ, কেন পরের পাপে নিজে কষ্ট পাচ্ছ? ওকে বিদায় করে দাও, আগে যেমন ছিলে তেমনি থাক।"

সীতানাথ হাসিয়া বলিল,—"আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?"

শিরোমণি চক্ষু টানিয়া বলিলেন,—"তুমি বামুনের ছেলে, আর তোমার ঘরের বউও নয়, কাজেই বামুন খাওয়ালেই তোমার মুক্তি। তবে শুনছি তুমি নাকি ওর হাতে খাও। তা একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্গু করে দিলেই হবে। আর ভায়া, আগেকার মতন বিচার-আচার কি আর আজকাল সমাজে আছে? ছেলেগুলো তো সবাইকার হাতে যা খুসী খাচ্ছে।"

সীতানাথ চলিয়া যায় দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"কি বল?"

সীতানাথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আচ্ছা, মুসলমানদের তো প্রায়শ্চিত্ত নেই, তাদের কোন ভাবনাও নেই। ঐ নরহরি তো হিন্দু, সে জেল থেকে ফিরে এলে আপনারা তার কি দণ্ড দেবেন?"

শিরোমণি সাশ্চর্য্যে কহিলেন,—"শোনো কথা, সে পুরুষ মানুষ, তার পাপের যা দণ্ড তা হয়ে গেছে, বেটা-ছেলে সমাজে আবার ঠেলা থাকবে?"

—"সে পুরুষ মানুষ বলে [illegible], [illegible] মেয়েটা দুর্ব্বল বলে অপরাধী। [illegible]গুলোর কোন মূল্য নেই, [illegible] পাপে তার দণ্ড হবে?"

শিরোমণি-মশায় হাত নাড়িয়া বলিলেন—'নিষ্পাপ, একথা বলো না—আমাদের সীতাসাবিত্রীর দেশে সতীর তেজে স্বয়ং যমও ভয় পান। আসল সতী হলে সাধ্য কারো আছে তার গায়ে হাত দিতে?"

ক্রোধে সীতানাথের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল—শুধু শিরোমণি নয় এমন কথা বাংলা দেশের বহু পুরুষের মুখে শোনা গিয়াছে। উচ্চকণ্ঠে বলিল—"কি বল্‌ব, আপনি আমার চেয়ে বয়সে ঢের বড়, নইলে আর কেউ এমন কথা বল্‌লে তাকে আর সেই মুখে বাড়ী যেতে হত না। ধিক্ আপনাদের নির্লজ্জতায়! এত অত্যাচার করেও শেষ নেই, আরো অপবাদ?"

শিরোমণি সভয়ে পলায়নপর হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি গিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—'বড় লেগেছে, না? অত আত্তি কিসের তা যেন লোকে জানে না?" বলিয়া গোবিন্দর বৈঠকখানা ঘরখানায় ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। সীতানাথ ক্রোধপ্রজ্বলিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। এমন হীন কাপুরুষকে মারিয়া হাত কলঙ্কিত করিতেও তাহার ঘৃণা হইল।

যথাসময়ে বিপিন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিল। ভোজনান্তে গ্রামসুদ্ধ লোক সীতানাথের বাড়ীর সম্মুখ-ভাগে কলরব করিয়া জানাইয়া গেল বিপিন পাপমুক্ত হইয়াছে। রাধারাণী খুঁটির মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, বলা বাহুল্য সীতানাথের নিমন্ত্রণ হয় নাই।

পূজা আসিয়া পড়িল, সমস্ত গ্রামখানি আনন্দে টলমল করিয়া উঠিল, খালি গৃহাভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অগোচর থাকিয়া এক অভাগিনীর বেদনা-ব্যাকুল প্রাণ অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল।

এমন সময়—"কই সীতানাথ-দাদা কোথা" বলিয়া একটি যুবক [illegible] উঠানে দাঁড়াইল। রাধারাণী চকিতে [illegible] সরিয়া গেল।

[illegible] সীতানাথ [illegible] আসিয়া দেখিল গ্রামের জমিদার [illegible] নরেন। জমিদার কলিকাতায়ই [illegible] পূজা বজায় রাখিবার জন্ত একবার গ্রামে আসেন। পূজান্তে চলিয়া যান। নরেন কলিকাতায় কলেজে পড়ে

নরেন সীতানাথের সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিয়া তাহার সৎকাজে খুব উৎসাহ দিয়া সেও যে গ্রামের লোকের মত মানে না ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত চাহিয়া রাধারাণীর সাজা পান খাইয়া চলিয়া গেল। গৃহের ভিতর রাধারাণীর মন এই যুবকটির প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল, সীতানাথের মহত্ব যে একজনও অন্ততঃ সমর্থন করে ইহা ভাবিয়া। ইহার পর প্রায়ই নরেন আসিত। ছোটবাড়ী কাজেই রাধারাণীকে তাহার সম্মুখ দিয়া চলাফেরা করিতে হইত, সীতানাথ না থাকিলে নরেন ডাকিয়া চলিয়া যাইত।

সেদিন রাধারাণী প্রাঙ্গণের একপাশে কুয়াতলায় কাপড় কাচিতেছিল, অষ্টমী পূজা, গ্রামসুদ্ধ যাত্রা শুনিতে গিয়াছে, সীতানাথ বাড়ী নাই। "দাদা" বলিয়া নরেন আসিয়া ঢুকিল। ত্রস্তে কাপড় লইয়া রাধারাণী দাওয়া পার হইয়া ঘরে ঢুকিল।

নরেন চারিদিকে চাহিয়া—"দাদা বুঝি বাড়ী নেই, ওঃ," বলিয়া দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়া বলিল—"দুটো পান দাও তো বৌদি, খেয়ে যাই। তুমি আমায় অত লজ্জা কর কেন? নলিন-দার সঙ্গে আমরা কত খেলা করেছি।"

পান সাজা ছিল, কিন্তু তাহার সম্মুখে গিয়া পান দিতে রাধারাণীর সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। চৌকাঠের ওপার হইতে হাত বাড়াইয়া পানের থালা রাখিতেই নরেন চিলের মত ছোঁ মারিয়া পানের থালা-সুদ্ধ রাধারাণীর হাত চাপিয়া ধরিল।

"মা গো" বলিয়া রাধারাণী হোঁচট খাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তার মুখ ভয়ে পাংশু হইয়া গেল, পর মুহূর্ত্তেই এক ঝটকায় হাত টানিয়া লইল। ঠিক সেই সময়ে সীতানাথ আসিয়া ব্যাপার বুঝিয়া বাঘের মত লাফাইয়া নরেনের গলা চাপিয়া ধরিল, সক্রোধে বলিল—"তুমি এইজন্ত আমার বাড়ী এসো, তুমি উচ্চ-শিক্ষিত? ধিক্ তোমাদের, বাঘের থেকেও তোমরা হিংস্র, পশুর অধম।"

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।
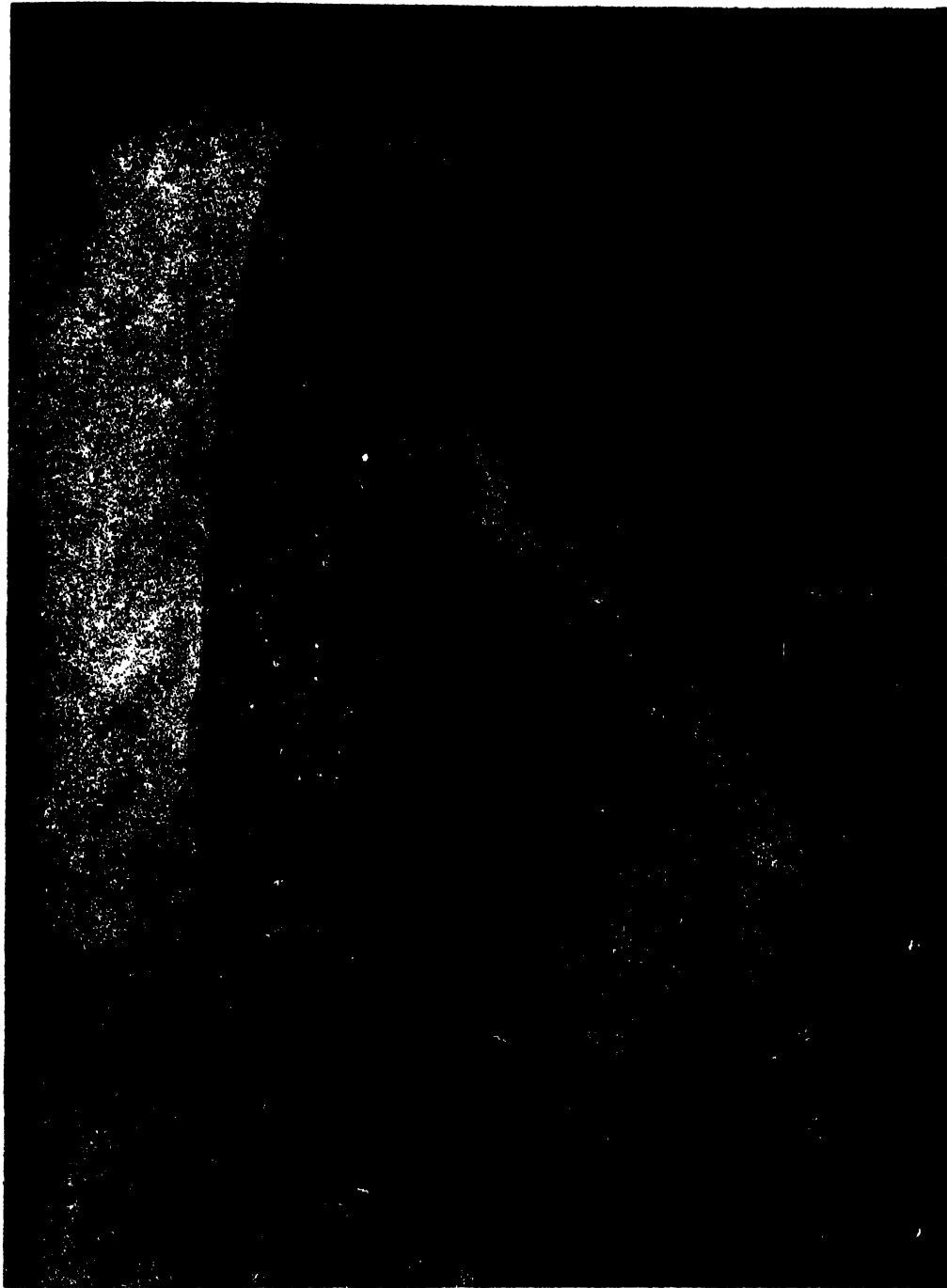
ভয়ে নরেনের গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া আসিল। সীতানাথের শারীরিক শক্তি সুবিখ্যাত, তাহার উপর অন্যায় কার্য্যের জন্য ও লোকলজ্জার ভয়ে সে জ্ঞান হারাইল, হাতজোড় করিয়া বলিল,—"আমার অন্যায় হয়েছে আমায় ক্ষমা করুন।"

সীতানাথ গলা ছাড়িয়া সক্ষোভে বলিল,—"এই তোমাদের শিক্ষা, দেশের আশা-ভরসা তোমরা? রাধারাণীকে তুমি স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারতে, ওরা তোমাদের স্বজাতি, দেশের আদর্শ হতে পারতে, তা নয় খালি লালসা! এমন জাত ধ্বংস হবে না তো হবে কারা! আমার কাছে কি মাপ চাইছ? যার কাছে অপরাধী তার কাছে মাপ চাও, আর তোমার মুখ আমায় যেন না দেখতে হয়।"

নরেন চলিয়া গেলে সীতানাথ ঘরে ঢুকিয়া ভূলুণ্ঠিতা রাধারাণীর মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে বলিল,—"কেঁদ না মা, তোমায় আমি এখানে রাখ্‌বো না। চারিদিকে পশুর দল, তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমাদের নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করা দরকার, শিক্ষা চাই নইলে তোমরা চিরকাল এই রকম আত্মমর্য্যাদাহীন হয়ে থাকবে। খালি কান্না ছাড়া মেয়েদের আর কোন পথ নেই এ ধারণা ভোল।"

রাধারাণী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল,—"আমার জীবনে ঘৃণা হয়ে গেছে বাবা, আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই।"

সীতানাথ ধীরকণ্ঠে বলিল,—"আত্মহত্যার ইচ্ছা মহাপাপ, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তিতেই মনুষ্যত্ব, আমি জগতকে দেখাবো সমাজ যাকে ঠেলেছে তার কতখানি শক্তি। তুমি ওঠো, জিনিষপত্র কিছু গুছিয়ে নাও, চারদিকে এত অমঙ্গলের মধ্যে তোমার শান্তি নেই, নইলে আমি গ্রাম ছাড়তাম না. দেখতাম কত শক্তি সমাজের।"

রাধারাণী চোখ মুছিয়া বলিল,—"বাবা, আমার জন্য তুমি আর দুঃখ করো না। আমার আগে আশ্রমে যেতে ভয় ছিল, এখন দেখছি আমার মত হতভাগীর লোকালয়ে থাকা উচিত নয়। কলকাতায় কোনো আশ্রমে আমায় রেখে এসো।"

সীতানাথ বলিল,—"আচ্ছা সে আমি বুঝব।"

৫

ব্যর্থ আক্রোশে জলিয়া নরেন কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। পিতার নিকট যদি সীতানাথ সব বলিয়া দেয় তো তাহার মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। পিতার নিকট দোষমুক্ত হইয়া থাকিবার নিমিত্ত এক সময় নির্জ্জনে তাঁহাকে একনিঃশ্বাসে অনেক কথা বলিয়া গেল যে সীতানাথ তাহাকে কলঙ্কিতা বিধবার পাণিগ্রহণ করিবার কথা বলিয়াছে এবং প্রলোভনে ফেলিবার জন্য রাধারাণীকে দিয়া তাহাকে পান খাওয়ায়, আজ সে অসম্মতি জানাইলে তাহাকে অপমান করিয়াছে।

মিত্র মহাশয় বুদ্ধিমান লোক, পুত্রের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল, কিন্তু সীতানাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সীতানাথ শুনিয়া আগুন হইয়া উঠিল, উত্তেজিত হইয়া সকল কথা বলিল। মিত্র মহাশয় পুত্রের উপর বিরক্ত হইলেও সে কথা প্রকাশ করিলেন না, ধীরভাবে "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" গোছের করিয়া সীতানাথকে কলিকাতায় গিয়া রাধারাণীকে লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাবলম্বিনী করিয়া দিবার উপদেশ দিলেন।

পুত্রকে ডাকিয়া কঠিন তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"সীতানাথের পদধূলির যারা যোগ্য নয় তাদের দলে মিশিয়া সে পিতার মুখ হাসাইল। এই পুত্রের পিতা বলিয়া তিনি সীতানাথের নিকট পরিচিত হইলেন। শুধুই কি তাই, সেই শত রকমে নিগৃহীতা বালিকা যার বেদনা অনুভব করিয়া সমাজের ভয়ে কিছু করিতে না পারিলেও তাঁহারা মর্ম্মপীড়িত, তাহার উপর আবার অত্যাচার! আর সে ভদ্র শিক্ষিত নামে পরি[illegible] অপরাধী, এত নির্যাতন [illegible] নাই, তাহার জন্যই তা[illegible] হইল।

নরেনের অপরাধপীড়িত মন অনুতাপে ভরিয়া উঠিল, এত মিথ্যা বলিয়া সমাজপীড়িত অমন তেজস্বী ব্যক্তিকে আর নিরপরাধী রাধারাণীকে ছোট করিতে চাহিয়াছে ভাবিয়া মরমে মরিয়া গেল। ক্ষণিকের কুপ্রবৃত্তি যদি তাহার শিক্ষার সংযমের বাঁধ এমন করিয়া ভাসাইয়া দেয় অশিক্ষিত নবহরি ফয়েজের আর অপরাধ কি! সত্যই সে তাহাদের অপেক্ষাও পশু।

সীতানাথ গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় নবীন সাহা-প্রমুখ ভক্তেরা কাঁদিয়া ফেলিল। সীতানাথের চোখও জলে ভরিয়া আসিল। এই আর এক নিগৃহীত মূক-শ্রেণী—সুখে-দুঃখে তাহারা দাদাঠাকুরের সহায়তা ও উপদেশ পাইয়াছে আজ তাহাকে বিদায় দিতে তাহাদের বুক ফাটিয়া কান্না আসিল—কে বলে! ভগবান মঙ্গলময়?

সীতানাথের সঙ্গে তাহারা ষ্টেশনে চলিল, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ভদ্রশ্রেণীর শাসন আর তাহারা মানিবে না, সীতানাথ যেখানে সমাজপীড়িত, সেই পীড়কেরা ভদ্র!

পথে বনমালী গোবিন্দ সীতানাথকে পরিহাস করিয়া বলিল,—"কি ভায়া, কোথা চলেছ, কাশী না বৃন্দাবন?"

সীতানাথ সংক্ষেপে বলিল,—"না দাদা, সে সব পুণ্য স্থান তোমাদের মতন পুণ্যাত্মারা পূর্ণ করবে, আমরা পাপী মানুষ, দেখি কোন্ নরকে ঠাঁই পাই। ভাবনা নেই আবার এখানেও আসব।

ষ্টেশন অনেক দূর। তাহারা পৌঁছিতেই গাড়ী আসিয়া পড়িল। তাহারা ট্রেনের কামরায় উঠিয়াছে, এমন সময় দেখা গেল কে একজন মাঠের পথ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে।

ট্রেন যখন নড়িয়া উঠিয়াছে, নরেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া একতাড়া নোট সীতানাথের কোলে ফেলিয়া দিল।

সীতানাথের দু' চোখ জ্বলিয়া উঠিল—নারীর সম্মানের এই মূল্য! সমাজ এই দিয়া তাহাকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিবে অর্থে তোমার সম্মান বিক্রীত হয়, মুখ বন্ধ করিবার অমোঘ উপায়! সজোরে নোট ক'খানা নরেনের গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিল, কি বলিল ইঞ্জিনের বিকট শব্দে শোনা গেল না।

বিহ্বল নরেন যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, সভায় সমাজপতিরা সানন্দে গ্রামের অনাচারীদের বিদায় হইয়াছে কেবল তাঁহাদের আচারনিষ্ঠার জন্য—এই আলোচনা করিতেছিলেন। প্রতিমার নিকট চণ্ডী-পাঠ হইতেছিল—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।"

বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজ

বাঙ্গালা দেশে কিরূপে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গিলিয়া ফেলিয়াছে, সেই কথাটা আজ কিছু বলিব। যখন আফগানেরা বাঙ্গালা দখল করেন, তখন পূর্ব্বভারতের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ছিল। তাহার পূর্ব্বে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরাই বাঙ্গালা ও বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেনেরা ইহার মধ্যে এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার একাংশে রাজা ছিলেন মাত্র। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা যে শুদ্ধ বাঙ্গালা ও বিহারে রাজত্ব করিতেন, এমন নহে; এ দুয়ের বাহিরে অনেক দেশে তাঁহাদের অধিকার ছিল। এক শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা পেশোয়ার হইতে গোদাবরীর মুখ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও মগধের বৌদ্ধ সাহিত্য বৌদ্ধ ব্যাকরণ, বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ সভ্যতা সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ছাইয়া গিয়াছিল।

ইংরাজী ৭৩২ অব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানসন্ততি...কয় জন ছিলেন? বল্লাল সেন তাঁহাদের সংখ্যা করিয়াছিলেন; দেখিয়াছিলেন,—৩৫০ ঘর রাঢ়ী ও ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্র বাঙ্গালায় ছিলেন। তাহার উপর আর ৭০০ ঘর সাতশতী, আর ৫০০ ঘর বিদেশীয় ব্রাহ্মণ ধরিলেও ২০০০ ঘরের বেশী ব্রাহ্মণ এ দেশে ছিলেন না। ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে বাঙ্গালায় ২৫টা জেলা হিন্দু করা যায় না, উহার দশ ভাগের এক ভাগও হিন্দু করা যায় না ...

বাঙ্গালায় যদি কোন ইতিহাসের গূঢ় কথা থাকে, যদি কোন নিগূঢ় কথা থাকে, তবে তাহা এই। রহস্য-জাল ভেদ করিয়া এই কথাটা খুলিয়া দিলে বাঙ্গালীর চক্ষু স্পষ্ট দেখিতে পায়—তাহারা কি ছিল, কি হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কি হইতে পারে।...

মুসলমান অধিকাররূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই সাত শত বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-বিশেষ করা যায় না। আবার ইংরাজ অধিকাররূপ বোতলে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি বন্ধ হইয়া থাকিলে, কয়েক শত বৎসর পরে তাহারা যে এক হইয়া যাইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? এখনই ত অনেকে বলেন যে, এই যে মুসলমান জাতি এখন বাঙ্গালা দেশে অর্দ্ধেকের উপর বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন, ইঁহারা সেই বিশাল বৌদ্ধসমাজের একদেশ মাত্র। অর্থাৎ বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমান একজাতি মাত্র।...

অনেক পণ্ডিত ভাবেন, তাঁহারা মনে করেন যে, বৌদ্ধ বলিতে শুদ্ধ ভিক্ষুসমাজ বুঝায়, কেন না, বুদ্ধদেব নিজে ভিক্ষুসমাজ লইয়াই থাকিতেন।...

আর এক দল বলেন,—না। গৃহস্থ বৌদ্ধও ছিল, যাহারা ব্রাহ্মণ মানিত না। ভিক্ষুদের কাছে ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ লইত। ভিক্ষুদের খাওয়াইত, আদর করিত, ভিক্ষুদের জন্য বিহার, সঙ্ঘারাম তৈয়ার করিয়া দিত, ভিক্ষুদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিত, তাহাদের অন্তর্বাস বহির্বাস জোগাইত, তাহারাই গৃহস্থ বৌদ্ধ।...

আর এক দল বলেন যে, না। বুদ্ধদেব ভিক্ষুর জন্য দশ শীল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু ধার্ম্মিক গৃহস্থের জন্য অষ্ট শীল, আর অপরাপর গৃহস্থের জন্য পঞ্চ শীল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুতরাং গৃহস্থ বৌদ্ধ অনেক ছিল।...

অতএব সব বৌদ্ধকে ভুক্ত করিয়া লইতে পারে, এমন একটা বৌদ্ধের লক্ষণের দরকার হইল। সে লক্ষণ দেখা দিল এগার শতকে। তিন জন গুপ্ত একখানি বই লিখিয়া বইখানির নাম দিলেন,—আদিকর্ম্মরচনা। তাঁহারা বলিলেন, যে কেহ প্রাতঃকালে উঠিয়া বলিবেন—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ও সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, তিনিই বৌদ্ধ। আপামরসাধারণ আপনি আপন এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতেন। বৌদ্ধের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত।

কিন্তু 'শীল' দিবার সময় বড় গোল বাধিত। যাহারা মাছ ধরিয়া খায়, মাছ ধরা, শীকার করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, চুরি করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, তাহারা শীল লইতে পারিত না। বৌদ্ধধর্ম্মে তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি লাভের আশা থাকিত না। তবে তাহারা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, হালিকাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে শীল দিবার কোনও আপত্তি থাকিত না। যাহারা জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িত না, তাহারা হয় বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বনিম্ন স্তরে পড়িয়া থাকিত, অথবা তাহাদের জন্য ধর্ম্মান্তরের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যথা—কৌলধর্ম্ম, মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম, মীননাথের ধর্ম্ম, গোরক্ষনাথের ধর্ম্ম ইত্যাদি।

একবার বৌদ্ধ হইলে, সে পঞ্চ শীল লইতে পারিত, অষ্ট শীল লইতে পারিত, দশ শীল লইয়া ভিক্ষু হইতে পারিত; ভিক্ষু হইলে ক্রমে উন্নতি করিয়া স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ এবং পরে বোধিসত্ত্ব হইয়া বুদ্ধ বা জগদ্গুরু হইতে পারিত। কিন্তু সে সকল জন্মজন্মান্তরসাধ্য।

যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতার পূজা হয় না, ধর্ম্ম উপদেশ পাওয়া যায় না, তাঁহারাই হিন্দু। হিন্দুরা জাতিভেদ মানেন। এক জাতিতে জন্মিলে এ জন্মে আর উচ্চ জাতিতে যাওয়া যায় না, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারাই হিন্দু। যাঁহারা দেবতা মানেন, কিন্তু দেবতা হইতে চান না, তাঁহারাই হিন্দু। ব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যে সকলের উঁচু। ধর্ম্ম ও নীতি তাঁহাদেরই হাতে। ক্ষত্রিয়েরা দেশ শাসন করেন। বৈশ্যেরা কৃষি [illegible]
করেন। শূদ্রেরা উপরের তিন [illegible]
কিন্তু ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ভিন্ন জা[illegible]
লোপ পাইয়াছে, অর্থাৎ—[illegible]
এড়াইয়াছেন।

ব্রাহ্মণের সকল বইই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ পড়িতে পারিবে না। যাঁহারা হিন্দু হইয়া শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা সংস্কৃত শিখিতে পারিবেন না। কিন্তু বৌদ্ধেরা—বিশেষ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংস্কৃত পড়িতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সংস্কৃত পড়া বন্ধ করিতে পারেন নাই।...কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধদের সংস্কৃতকে অশুদ্ধ বলিতেন ও তাহা পড়িয়া নাক সিঁটকাইতেন। বৌদ্ধেরা বলিতেন, আমরা স্তুশব্দবাদী নহি সত্য, কিন্তু আমরা যাহা বলি, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সত্য!...

ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-দলভুক্ত লোকদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি সামাজিক সম্বন্ধ রাখিতেন। এবং নিতান্ত নীচধর্ম্মী ও নীচকর্ম্মী লোক ভিন্ন আর কাহাকেও অস্পৃশ্য বলিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের মতে হিন্দু ভিন্ন আর সকল জাতিই অনাচরণীয় ছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় যেমন শত্রুপক্ষকে বড় এবং ছোট সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করা হয়, তেমনি হিন্দুরা বিধর্ম্মীদিগকে অনাচরণীয় মনে করেন। তাঁহাদের মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ' ব্রাহ্মণ বলাইলেও তাহারা অনাচরণীয়। কারণ, তাহারা বিদেশী ও বিধর্ম্মী। মুসলমানেরা অনাচরণীয়; যেহেতু তাহারা বিধর্ম্মী। বৌদ্ধেরাও অনাচরণীয়। এই সকল অনাচরণীয় জাতিরা অনেকে এখন ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা সেই সকল ব্রাহ্মণকে পতিত ও অনাচরণীয় মনে করেন।

প্রথম প্রথম তাঁহারা ব্রাহ্মণের ব্যাকরণ পাণিনি লয়েন নাই। অন্য নানা ব্যাকরণের সাহায্যে বই লিখিতেন। পরে তাঁহারা নিজেদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং এইরূপ ব্যাকরণ কয়েকখানা খুব চলিয়াও যায়। তাহার পর তাঁহারা পাণিনির টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই টীকায় তাঁহারা পতঞ্জলির মহাভাষ্যকে এক হিসাবে ছাঁটিয়া ফেলিতে চান। তাঁহাদের পাণিনির টীকা বাঙ্গালায় খুব চলিয়া যায়।

কোষে তাঁহাদের অসীম প্রভুত্ব। তাঁহাদের অমরকোষ সকলকেই লইতে হইয়াছিল।...

ছন্দেও তাঁহাদের ভাল ভাল বই আছে। তাঁহারা পিঙ্গল নাগের অনুসরণ করিয়া অনেক ছন্দের বই লিখিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ভামহ বৌদ্ধ ছিলেন। তাহা হইলে অলঙ্কারে তাঁহাদের প্রভুত্ব খুবই বলিতে হইবে।...

দর্শনেও বৌদ্ধদের প্রভাব ঢের বেশী। তাঁহাদের দর্শন সমস্ত এসিয়া এখনও পড়িতেছে, পড়াইতেছে ও তাহার টীকা টিপ্পনী লিখিতেছে। তাঁহাদের তর্কশাস্ত্রেরও সেইরূপ এসিয়ায় সর্ব্বত্র আদর। এখনও জাপানে বৌদ্ধমন্দিরে বৌদ্ধতর্কশাস্ত্র পড়া হয়, এবং ইউনিভার্সিটিতে ইউরোপীয় লজিক পড়ান হয়।...

বৌদ্ধদের গল্পের বইগুলি অতি চমৎকার। পালি ভাষার কথা আমার এখানে বলার কোন দরকার নাই। সংস্কৃতে বৌদ্ধদের দুই জাতীয় গল্প আছে,—১। জাতক, ২। অবদান। জাতক বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের কথা, আর [illegible] বুদ্ধদেব ও তাঁহার চেলাদের পূর্ব্বজন্মের [illegible] একটা [illegible]মতে গাঁথা থাকে। আরব্য [illegible] গল্পের আর একরূপ কাঠাম। [illegible] স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র।...

[illegible] তেন, তাহাতে মনোনিবেশ [illegible]ক সময় উদ্ধারও করিতেন। [illegible] সকল বই আছে, বৌদ্ধেরা [illegible] গুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের উক্তি—অনেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা এবং তাহার সংস্কৃতও বিভিন্ন রকমের। প্রজ্ঞাপারমিতার ভাব এক, ভাষা এক, উপদেশ এক এবং ধর্ম্ম এক। আর চণ্ডমহারোষণ তন্ত্রের ভাব আর এক, ভাষা আর এক, উপদেশ আর এক, আর ধর্ম্মও আর এক। দুইই কিন্তু বুদ্ধবচন।...

দশ ও এগার শতকে তাঁহারা স্মৃতির বই লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে অবৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, বৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, মন্দির নির্ম্মাণ, মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, নিত্যকর্ম্ম, দিনের কায প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

বুদ্ধবচনে তন্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু সে শেষের দিকের বুদ্ধবচনে।

এ বৌদ্ধ-সাহিত্য গেল কোথায়? এ জিজ্ঞাসার এক উত্তর,—হয় হিন্দুরা তাড়াইয়া দিয়াছে, নয় গ্রাস করিয়াছে। কেমন করিয়া গ্রাস করিয়াছে বা গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কতক কতক আভাস এখন দিব ও তাহার পর কেমন করিয়া প্রকাণ্ড বৌদ্ধসমাজটা গ্রাস করিয়াছে বা গিলিয়াছে, তাহারও কতক কতক আভাস দিব।

গোড়ায় ব্যাকরণ ধরিয়াছি। ব্যাকরণ গ্রাসের কথাটাই আগে বলি। আমরা জানি, পাণিনিই সংস্কৃতের ব্যাকরণ। ইহার সঙ্গে কাত্যায়নের বার্ত্তিক, ব্যাড়ির সংগ্রহ ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য, এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের ব্যাকরণ।...

পরে তাঁহাদের নিজের একখানি ব্যাকরণ লেখা দরকার হয়। তাঁহারা যে ব্যাকরণ তৈয়ারী করেন, তাহার নাম চান্দ্র ব্যাকরণ। গ্রন্থকার চন্দ্র গোমী। তিব্বতীয় ভাষায় 'পগ্-সম্-জোন্-জঙ্' নামে যে বই আছে, তাহাতে বলে যে, চন্দ্র গোমীর বাড়ী বরেন্দ্রভূমে, তিনি থাকিতেন চন্দ্রদ্বীপে, তাঁহার সময় ৪৫০ হইতে ৫০০ ইংরাজি সন।...

চান্দ্র ব্যাকরণ এখন ভারতবর্ষে একেবারে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ ব্যাকরণ তিব্বতীয় তর্জ্জমায় পাওয়া যায়। প্রোফেসর বেণ্ডল নেপাল হইতে ও বিউলার সাহেব কাশ্মীর হইতে ইহার কোন কোন অংশ পাইয়াছিলেন। আমি উহার একখানি পুরা সূত্রপাঠ পাইয়াছিলাম। সেখানি জার্ম্মানিতে ছাপা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার নামে একখানি ব্যাকরণ আছে; সেখানি বাঙ্গালায় রাঢ়দেশে চলে—এখনও চলিতেছে। ইহার সূত্রকার ক্রমদীশ্বর একজন শৈব ছিলেন। তিনি হিন্দুদের জন্য বই লিখেন। যেখানে যেখানে চন্দ্র ও পাণিনি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে সেখানে তিনি আপন সূত্রে বিকল্প শব্দ যোজনা করিয়াছেন।...সংক্ষিপ্তসারে চান্দ্রের ও কাতন্ত্রের যাহা কিছু ভাল, সব লওয়া হইয়াছে। তাই চন্দ্র ভারতে একেবারে লোপ পাইয়াছে আর কাতন্ত্র কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গে লুকাইয়া আছে।

চান্দ্রদাস নামে একজন কায়স্থ বৌদ্ধ একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন; তাঁহার বইখানি লোপ পাইয়াছে।...চান্দ্রদাসের সেই কারিকাগুলি এখনও উড়িষ্যায় পড়া হয়। কারিকার টীকাকার একজন বৈষ্ণব। তিনি বলিয়াছেন, চান্দ্রদাস বুদ্ধদেবকে নমস্কার করেন কেন?...ব্রাহ্মণেরা নিজ ইষ্টদেব বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। কায়স্থেরা নিজ ইষ্টদেব বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। বৈশ্যেরা স্মরণ করে সূর্য্যদেবকে, শূদ্রেরা শিব ও অন্যান্য দেবতাকে স্মরণ করে।...

এই সকল হেতুতে বোধ হয়, সংক্ষিপ্তসারের প্রভাবে চান্দ্র, কাতন্ত্র, মুগ্ধ, চান্দ্র লোপ পাইয়াছেন।...

পাণিনির বৌদ্ধ টীকাগুলির খুব আদর ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দের প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভট্টোজী দীক্ষিত ও তাঁহার শিষ্যেরা সেই সকল পুস্তককে অনেক অপাণিনেয় ও ভাষ্যবিরুদ্ধ প্রয়োগ দেখিয়া

তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিলেন। তাহাতে ২।৩ শত বৎসরের মধ্যে তাহাদের প্রচার এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল।…

ইহার উপর আবার মহারাষ্ট্রীয়দের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মহারাষ্ট্রে স্থান না পাইয়া, গঙ্গার দুধার আশ্রয় করিল এবং মিথিলার সুপদ্ম-ব্যাকরণ মিথিলায় স্থান না পাইয়া যশোর, খুলনা ও ২৪পরগণা আশ্রয় করিল। বৌদ্ধ ব্যাকরণগুলি লুপ্ত হইয়া গেল। মুগ্ধবোধের বহুসংখ্যক টীকাকার আছেন, এক ভরত মল্লিক ছাড়া সবই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। একজন ছাড়া সুপদ্মের টীকাকারগুলি সব বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।…

অভিধানের ব্যাপার কিন্তু আর এক রকম। সংস্কৃত অভিধান তিন জিনিষ লইয়া,—পর্য্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ। পর্য্যায় মানে, এক মানের অনেক শব্দ। নানার্থ মানে, এক শব্দের নানা অর্থ। লিঙ্গ মানে কোন্ শব্দের কোন্ লিঙ্গ। বররুচি, ব্যাড়ি, কাত্য, কালিদাস, অমর প্রভৃতি অনেকেই ইহার এক একটি অংশের বই লিখিয়া যান। কিন্তু বৌদ্ধ অমর সিংহ এই তিনটি অংশ লইয়াই 'নামলিঙ্গানুশাসন' এবং 'ত্রিকাণ্ড' নামে একখানি সরল ও সুন্দর পুস্তক লেখেন; আগেকার সব পুথি চাপা হইয়া যায়।…

অমরের পর 'বিশ্বপ্রকাশ' অভিধান বৌদ্ধের লেখা; উহা কিন্তু নানার্থ শব্দ মাত্র।…গ্রন্থকার বোধ হয়, বাঙ্গালী ছিলেন। কেন না, তাঁহার বইএ এক অংশ আছে বানানের জন্য। অভিধানে বানানের কথা এই প্রথম। বইখানি লেখা ১১১১ খ্রীঃ অব্দে।

আর একজন বৌদ্ধ অভিধানকার পুরুষোত্তম দেব; তিনি অমরের পরিশিষ্ট লিখেন।…

তাঁহার আরও একখানি অভিধান আছে, তাহার নাম 'হারাবলী'। যেখানে যত অপ্রচলিত শব্দ আছে, হারাবলীতে তাহার মানে দেওয়া আছে। তাঁহার একখানি ব্যাকরণ আছে; নাম 'ভাষাবৃত্তি'। অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলি হইতে স্বর ও বৈদিক অংশ বর্জ্জন করিয়া যাহা থাকে, তাহারই বৌদ্ধমতে ব্যাখ্যা। লোকে বলে, লক্ষ্মণসেনের আজ্ঞায় এই বই তিনি লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার আর এক কার্য্য আছে—সেটা বানান দুরস্ত করা। অন্যান্য দেশে সংস্কৃত বানানের বইএর দরকার হয় না; কিন্তু বাঙ্গালায় আমরা অন্তস্থ "য" ও বর্গীয় "জ," এই উভয়ের ভেদ করিতে পারি না। অন্তস্থ "ব" ও বর্গীয় "ব"এর উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। মূর্দ্ধণ্য "ণ" ও দন্ত্য "ন"-কারের উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। তিনটা "শ, ষ, স" ও আমরা একই ভাবে উচ্চারণ করি। এ জন্য বানানে আমাদের অনেক গোলমাল হয়। তিনি এই সব বানানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং যে সকল শব্দের দুই রকম বানান হইতে পারে, তাহারও একটা তালিকা করিয়া দিয়াছেন।…

ছন্দঃশাস্ত্রে অনেকেই বই লেখেন, কিন্তু আগে সেই পিঙ্গল নাগের 'ছন্দঃসূত্র'ই চলিত। পরে 'বৃত্তরত্নাকর' চলিতেছে। তাহার পর 'ছন্দোমঞ্জরী' বৈদ্য গোপালদাসের পুত্র গঙ্গাদাসের লেখা। বৌদ্ধদের একখানি খুব বড় অঙ্গের ছন্দের বই ছিল; লেখক—রত্নাকর শান্তি। ইনি বিক্রমশীল বিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন এবং একজন প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। অধিক বলিতে কি, ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু আর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতদেশে এখনও দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন। কিন্তু এত বড় যে রত্নাকর-শান্তি, তাঁহারও ছন্দের বই টিকিল না—লোপ পাইল।

ভামহ যদি বৌদ্ধ না হন—না হইবার সম্ভাবনা অধিক, তবে বৌদ্ধদের অলঙ্কারের বই সব লোপ পাইয়াছে।…

ন্যায়শাস্ত্রে অর্থাৎ লজিকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সব বই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল বইএর তর্জ্জমা এশিয়ার নানা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব আমাদের মীমাংসকদের ন্যায় ৭।৮টি প্রমাণ মানিতেন। কিন্তু ক্রমে খসিয়া খসিয়া প্রমাণগুলি নাগার্জ্জুনের সময় চারিটিতে দাঁড়ায়—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। মৈত্রেয়নাথ উপমান পরিহার করেন; তাহার পর দিঙ্নাগ শব্দকেও প্রমাণের লিষ্ট হইতে বাদ দেন। তখন বৌদ্ধদের দুইটি মাত্র প্রমাণ দাঁড়ায়—প্রত্যক্ষ আর অনুমান। আমাদের ন্যায়সূত্রখানি নাগার্জ্জুনের সময়ে বা তাহার একটু পরে লেখা হয়। ইঁহারাও ৪টি প্রমাণ মানিতেন।…

আমাদের গৌতমসূত্র তিনরূপ অনুমান স্বীকার করেন,—(১) পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য, (২) শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণ এবং (৩) সামান্যতো দৃষ্ট। বৌদ্ধেরা দুইরূপ অনুমান মানেন—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। ইহার মধ্যে পরার্থানুমানের জন্যই অবয়বের দরকার হয়; অবয়ব অর্থাৎ 'সিলোজিস্‌ম্'।…

বার শতকের শেষ ভাগে মিথিলার মঙ্গলবনী নামক গ্রামে গঙ্গেশোপাধ্যায় আমাদের ন্যায়শাস্ত্র ধৃত চারিটি প্রমাণের উপর চারিখানি চিন্তামণি রচনা করেন। চারিখানির সাধারণ নাম 'তত্ত্বচিন্তামণি'। এই পুস্তক রচনা বা সঙ্কলনের উদ্দেশ্য—"প্রচণ্ডপাষণ্ড তমস্তিতীর্ষয়া," অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের প্রচণ্ড মত খণ্ডন করা। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের বই আমাদের দেশে মূল বলিয়া বিখ্যাত। এই মূলের বহুসংখ্যক টীকা হইয়াছে। এই সকল টীকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র বাঙ্গালা, এমন কি, ভারতবর্ষ হইতেও তিরোহিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ দর্শন প্রথম হইতেই ক্ষণিকবাদী। এখনকার নৈয়ায়িকেরা বলেন, জ্ঞান ত্রিক্ষণস্থায়ী—এক ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, উহার উৎপত্তি ও ধ্বংস এক ক্ষণেই হয়, উহার স্থিতি নাই। উঁহারা দুই সত্য মানেন—এক সাংবৃত সত্য, আর এক পরমার্থসত্য। সাংবৃত সত্য পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায়, উহার মূল নাই, উহা মায়া। আরও পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায় যে, সে মায়াও নাই। এই মাধ্যমিকদের শেষ বিচার। ইহার নাম অপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বধর্ম্মবাদ। উঁহাদের পরমার্থসত্য ধর্ম্মধাতু। ধর্ম্মধাতু অনির্ব্বচনীয়, উহার আর এক নাম শূন্য। শূন্য অভাববাদ নয়, ভাববাদও নয়; উহা অনির্ব্বাচ্য একটা স্বরূপ—যাহা বাক্য মনের অগোচর। উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অছিদ্র, দৃঢ়, সার, অদাহি, অবিনাশি,—এই শূন্যতার নামই বজ্র। ইহা ভাব নয়, অভাব নয়, ভাবাভাব নয়, অভাবাভাব ভাবাভাবও নয়। মানে আমরা উহা ধারণা করিতে পারি না অথচ উহা যে আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না।

এই যে সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল, তাহা দুই দিক হইতে হিন্দুরা আক্রমণ করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক দিকে শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার পরম গুরু গৌড়পাদাচার্য্য এই মতগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আপনাদের মত প্রচার করিয়াছেন।…

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা কিন্তু এরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই। তাঁহারা "তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া" করেন নাই। তাঁহারা ন্যায় ও বৈশেষিক, এই দুইটি দর্শনের

ঐক্য করিয়া বৌদ্ধদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান আচার্য্য উদয়ন।...

বৌদ্ধদের স্মৃতির বই নাই। কিন্তু ১১।১০ শতকে লেখা কয়েকখানি স্মৃতির বই আমার হস্তগত হইয়াছে। অধিকাংশগুলি উপাধিধারী বৌদ্ধদের লেখা। তাহার ব্যাপার দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, বালককে দীক্ষা দেওয়া (নাম—আশীর্ব্বাদ), বিয়ের কাজ, বারব্রত ইত্যাদি।...

আমার মনে হয়, বৌদ্ধ স্মৃতির বিষয়গুলি শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রথম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ব্রাহ্মণেরা লইয়াছেন।

তন্ত্রের উৎপত্তি লইয়া নানা মত আছে। ব্রাহ্মণেরা বলেন, উহা অথর্ব্ববেদের অংশ। যাহার কিছু গোড়া পাওয়া যায় না, তাহাই অথর্ব্ববেদ। এ কথার কি মূল্য জানি না। আমি গুপ্তাক্ষরের শেষ অবস্থায় লেখা দুখানি পুথি দেখিয়াছি। একখানিতে বশীক ও মন্ত্রের কথা বলিয়াছেন দৈবিবাশ্যো। একজন বলিতেছেন, এ আবার কি হইল? আমরা ত বৈদিক দীক্ষাই জানি, এখন আবার এ একটি কি দীক্ষা আসিল? ইহাকে তান্ত্রিক দীক্ষা বলে। আর একজন বলেন, তান্ত্রিকও পুরাণ দীক্ষা—বিষ্ণু শিবের নিকট এই দীক্ষা লইয়াছিলেন। সুতরাং তন্ত্রের গোড়া ত এইখানেই পাওয়া গেল।

আর একখানি পুথিও ঐ অক্ষরেই লেখা। এখানির নাম 'কুব্জিকামত' বা 'কুব্জিকামত'। ইহাতে ঈশ্বর দেবীকে বলিতেছেন,—

"গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্ব্বতঃ :"
"বাহিরেণাধিকারস্তে ন সম্মতঃ সহ ॥"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে। বলিবে, কৈলাস পর্ব্বত হইতে আসিয়াছে। কিন্তু কৈলাস ত ভারতবর্ষের বাহিরে বলিয়া কেহ বলে না। পুথি দুইখানিই ৮ম শতকের শেষ ভাগের লেখা।

আমার বোধ হয়, খৃঃ ৭ ও ৮ শতকে যখন উম্মেদিয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাগণ তুর্কীস্তানে আপনাদের আধিপত্য ও ইসলাম-ধর্ম্ম বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সেখানে নানা রকমের লোক-চালিত ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা সে সকল ধর্ম্ম নষ্ট করায় তাহাদের পুরোহিতেরা পলাইয়া ভারতে আসেন; তাঁহারাই তন্ত্র এ দেশে প্রচার করেন। তখন ভারতে কোথাও তন্ত্র ছিল না, তাহার কারণ, জলন্ধর, কামাখ্যা, ওড়িয়ান, পূর্ণা, শ্রীপর্ব্বত, এই সকল স্থানই দেবী দখল করেন ও সেই সব স্থান হইতে ভারতবর্ষে নানা দেশে উহার প্রচার হয়। আমার মনে হয়, এই তন্ত্রের গোড়া।

শৈব তন্ত্রগুলি কাশ্মীরে ও মধ্যভারতে বেশী; উহাদেরও বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই বৌদ্ধ তন্ত্র ভাঙ্গা। বাঙ্গালায় বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল। বিক্রমশীল বিহারে, (ভাগলপুরের কাছে) জগদ্দল বিহারে ও নালন্দাতেও শেষ অবস্থায় অনেক তন্ত্র জন্মিয়াছিল। বৌদ্ধ বিহার মাত্রেই তন্ত্র ছিল। সুতরাং বাঙ্গালায় বৌদ্ধ তন্ত্রেরই প্রাদুর্ভাব বেশী হইয়াছিল।

শেষ সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের লেখা তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।...

বৌদ্ধ তন্ত্রই বাঙ্গালায় খুব বেশী ছিল। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রে বেশী মন দিতে পারেন নাই। কিন্তু মুসলমান অধিকারের পর দুই শত বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায় না; বাঙ্গালার কথাও নয়। মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতেই মারামারি কাটাকাটি বেশী আরম্ভ হয়। তাহাতে হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদেরই ক্ষতি বেশী হয়। বিহারগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, ভিক্ষুরা হয় কাটা পড়ে অথবা পলাইয়া যায়। তাহাদের বিহার লুঠ হয়। ঠাকুর সব ভাঙ্গা পড়ে। মুসলমানেরাও বড় সুস্থির ছিল না। বক্তিয়ার খিলিজি গৌড় দখল করিয়া আসাম আক্রমণ করিয়া দখল করেন। তাহার পর প্রচুর সৈন্য সঙ্গে তিব্বত দখল করিতে যান। সেখানে তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। অনেক সৈন্য মারা যায়। ফিরিয়া আসিবার পথে আসামীরা অবশিষ্ট সৈন্য জলে ডুবাইয়া দেয়। বক্তিয়ার ২০টি মাত্র সিপাহী লইয়া ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হন। এবং ক্ষোভে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর আলি মর্দান নামক একজন বাঙ্গালার কর্ত্তা হন। তাঁহার কর্তৃত্ব বেশী দিন থাকে নাই। তাঁহার পর হইতে ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালায় আসে, সেই স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে, আর দিল্লী হইতে তাহাকে দমন করিবার চেষ্টা হয়। ক্রমে বাঙ্গালার নাম "বগডার দেশ" হইয়া উঠিল। একবার ১২৮০ সালে গিয়াসুদ্দীন বুলবন বাঙ্গালায় আসেন। তিনি সোনারগাঁ-এর 'রায়' বা রাজার সঙ্গে সন্ধি করেন। অনেক লোক মারিয়া মুসলমান বিদ্রোহ দমন করেন ও আপনার বড় ছেলেকে বাঙ্গালার কর্ত্তা করিয়া দিয়া যান, এবং বলিয়া যান যে, তুমি যদি দিল্লী হইতে পৃথক হইতে চাও, তোমাকেও শূলে দিব। তিনি আবার বাঙ্গালাকে এত ভালবাসিতেন যে, দিল্লীর সিংহাসনে নিজের ছেলেকে বসাইয়া নিজে বাঙ্গালায় রহিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রকে দিল্লীর সুলতানেরাও সুলতান বলিত। এই তিন পুরুষেই তাহারা পূর্ব্ববাঙ্গালার হিন্দু রাজত্ব লোপ করেন। আবার ১৩২৫ সালে জেলালুদ্দীন খিলিজি বাঙ্গালায় আসিয়া, বাঙ্গালা তিন ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া যান—সাতগাঁ, গৌড় ও সোনারগাঁ। এই তিন কর্ত্তায় আবার ঘোরতর লড়াই ঝগড়া বাধান এবং শেষ ১৩৪৫ সালে শমসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমস্ত বাঙ্গালার রাজা হন। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা ইহার খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহারা তিন পুরুষে বাঙ্গালায় কতক শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের পর রাজা গণেশ বাঙ্গালার কর্ত্তা হন এবং তিন পুরুষ রাজত্ব করেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা আবার জাগিতে আরম্ভ করে। ইহারা একজন ব্রাহ্মণকে খুব সম্মান করিতেন। তাঁহার কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। তিনি শুদ্ধ অমরকোষের টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাহা হইতেই বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের চর্চ্চা বাঙ্গালায় নব জীবন প্রাপ্ত হয়।...

বৃহস্পতি হইতে আবার বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের নব-জীবন। বৃহস্পতি কতকগুলি চলিত সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া, তাহাদের পঠন-পাঠনের সুবিধা করিয়া দেন এবং 'স্মৃতিরত্নহার' নামে একখানির স্মৃতির বই লিখিয়া হিন্দুর সমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারই সময় কৃত্তিবাস বড় গঙ্গা পার হইয়া, গৌড়ে আসিয়া সুলতানের কাছে আদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। মিথিলায় বিদ্যাপতি এই সময়েই তাঁহার সুমধুর গানে দেশ মুগ্ধ করেন এবং তাঁহার শৈব ও স্মার্ত্ত পুস্তকসকল রচনা করেন। চণ্ডীদাসও এই সময়ে তাঁহার গানে বাঙ্গালায় একটা নূতন জাগরণ আনিয়া দেন। সুতরাং গণেশবংশীয় রাজাদের সময়েই বাঙ্গালায় হিন্দুসমাজের জাগরণ হয়। এ সময়েও বৌদ্ধেরা বেশ প্রবল ছিলেন। ১৪২৩, ১৪৩৬ ও ১৪৪৪ সালেও বাঙ্গালায় ভাল ভাল বৌদ্ধ গ্রন্থ কপি করা হয়। বর্দ্ধমানের সেপুরাদের মিত্রেরা 'বোধিচর্য্যাবতার' কপি করাইয়াছিলেন। একজন ভিক্ষু লিখিয়াছিলেন, আর একজন সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং আর এক ব্যক্তির পড়ার জন্য কপি করা। মিত্র মহাশয় নিজে ও তাঁহার পুত্র দুই জনই 'বোধিচর্য্যাবতার' পড়িয়াছিলেন।

১৪০০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতেছিলেন আর বৌদ্ধরাও বাঙ্গালায় গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিতেছিলেন। সে সময়েও ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ কাব্য ও বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক পড়িতেন ও তাহা হইতে উদ্ধার করিতেন।

মুসলমান অধিকারের পূর্বেও বৌদ্ধদের অনেক তন্ত্র বই ছিল। কিন্তু ঐ অধিকারের পর হইতে আর বড় একটা তাহাদের বাঙ্গালা দেশে লেখা তন্ত্রের বই দেখা যায় না।...

কিন্তু যাঁহারা বৌদ্ধতন্ত্র পূর্ববাঙ্গালার হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন, তাঁহারা তিন জন—ত্রিগুণানন্দ তাঁহার চেলা ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার চেলা পূর্ণানন্দ। পূর্ণানন্দের 'তত্ত্বচিন্তামণি' ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। সুতরাং তাঁহাদের সময় ১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে। ইঁহাদের এক গাড়ী বই পাওয়া যায়। রসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের অনেকগুলি বই ছাপাইয়াছেন। তাহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দের 'তারারহস্য' একখানি। সেখানিতে বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির কথা আছে।...

অনেক দেবতার ধ্যান বৌদ্ধদেরও যেরূপ, আমাদেরও সেইরূপ। উদাহরণ—ক্ষেত্রপাল উদাহরণ—কালী। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, বাঙ্গালার বৌদ্ধতন্ত্র ক্রমে হিন্দু তন্ত্রভুক্ত হইয়া গিয়াছে, আর যাহা হয় নাই, তাহা লোপ পাইয়াছে।...

এই সকল দেবতা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বুদ্ধদেব আমাদের জগন্নাথ হইয়াছেন, তিনি বিষ্ণুর অবতার। বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতার হইয়াছেন। ধর্ম ধর্মঠাকুর হইয়াছেন। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম অনেক সময় স্তূপের আকারে পূজা পাইতেন। স্তূপের পাঁচ দিকে পাঁচটি কুলুঙ্গি থাকে। তাহাতে দেখিতে কচ্ছপের মত হয়। ধর্মঠাকুরও কচ্ছপাকৃতি। যেখানে ধর্মঘরে যোগী ধর্মঠাকুরের পূজারী, সেখানে ধর্মঠাকুর এখনও বৌদ্ধ আছেন। কেন না এই যোগী পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন না। কিন্তু যেখানে অন্য জাতি পূজারী, সেখানে ধর্মঠাকুর হিন্দু হইয়া গিয়াছেন।...

সংঘ আর দেবতা নাই তিনি শঙ্খ হইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, ময়নার একটা পুকুর খুঁড়িতে ধর্মঠাকুরের একটা মূর্ত্তি এবং একটা শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। যে সকল গন্ধবণিক্ সংঘে গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করিতেন, তাঁহারা এখন শঙ্খ আশ্রম হইয়াছেন। আর সংঘ শব্দ এখন আমাদের সাংখ্যের মধ্যে আছেন। যেমন—"সং সাংখ্যাতিন নাস্তিম নির্ভিম।" সংঘ আর দেবতা নাই।...

বুদ্ধ শব্দ প্রথম প্রথম কল্যাণমিত্র বুঝাইত, ক্রমে উহা গুরুতে আসিয়া দাঁড়ায়। লামা শব্দের অর্থ গুরু, বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করে, তাই তাহারা গুরুভাবু। আর আমরা দেবতা ভজনা করি বলিয়া আমরা 'দেবতাভু'। আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা এখন অর্দ্ধ হিন্দু, অর্দ্ধ বৌদ্ধ। যখন আমরা সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু আমাদের কাণে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ।

আচ্ছা, যে ভাবে তোমরা বাঙ্গালার আদিম গণিলে, সে ভাব গ্রাস করিয়া এরূপ আধা বৌদ্ধ আধা-হিন্দু ভাব লইলে কেন? তাহার কারণ এই যে, আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম। পাঁচ জন ই ত আসি নাই। বল্লালের সময় ৪০০ ঘর মাত্র হইয়াছিলাম। আমরা রাজার সাহায্য পাইতাম, তা রাজা বৌদ্ধই হউন আর হিন্দুই হউন। আমাদের সমাজও ছোট ছিল। যাহারা অবৌদ্ধ এমন ব্রাহ্মণ-পক্ষ ছিল, তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতাম। আমাদের একটি সমাজ ছিল। তাহার পর, মুসলমান যখন দেশ অধিকার করিল, তখন আমরা রাজার সাহায্য হারাইলাম। আমাদিগকে মুসলমানদের অধীন হিন্দু প্রজাদের উপরই কেবল নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং আমাদের দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের সুবিধাও হইল। ছিন্নমূল বৌদ্ধসমাজ এক রকম বেওয়ারিশ মাল। যে যাহাকে পারে, আপন দলভুক্ত করিতে লাগিল।

এ সকল ঘটনা বোধ হয়, ১২০০ হইতে ১৪০০ সাল, এই দুই শত বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল। যাহারা প্রথম হিন্দুদলভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা ভাল ব্যবহার পাইয়াছিল। তাহাদিগকে 'নব শাখ' বলে অর্থাৎ নূতন শাখা। তাহার পর কায়স্থগণ আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণের দলে আসিয়া তাঁহারা সে মর্যাদা হারান নাই।...

কিন্তু তখনও কায়স্থদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম চলিতেছিল। বেণুগ্রামে মিত্রদিগের বাড়ী তখনও বৌদ্ধধর্মের বই নকল হইতেছিল। তখনও দেশে অনেক ভিক্ষু ছিল এবং যে বই নকল হইতেছিল, তাহা কোন বিশেষ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বই নয়, একেবারে মহাযানের বই, মহাযানের সর্ব্বস্বের বই। সে বইখানা ইংরাজী ১৪৩৩ সালে নকল করা হয়। এই সময়ে আরও বৌদ্ধ বই নকল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। কালচক্রযানের অতি শুদ্ধ বাঙ্গালা অক্ষরের একখানি বই কেম্বিজে আছে। কল্যাণবাকদেব টীকা টিপ্পনী শুদ্ধ বই বৌদ্ধ মঠধারীর জন্য কপি করা হয়। সেখানি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে।

চৈতন্যদেব নিজে দক্ষিণদেশে বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদের হিমালয়ের মধ্যে দেখিয়াছেন। কেবল চূড়ামণিদাস বলিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করায় বৌদ্ধেরা খুব আনন্দিত হইয়াছিল।...

১৪০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যদিগের অভ্যুত্থান। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, টীকাকার মথুরানাথ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ গোবিন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য শ্রীকর শ্রীনাথ, রঘুনন্দন—এক সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালায় ন্যায় ও স্মৃতির প্রচার করেন। স্মৃতির প্রচার মানে সমাজ বাঁধা। ইঁহাদের পুস্তকে বৌদ্ধদের নাম বড় একটা নাই, কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিকার শূলপাণি লিখিয়াছেন—বৌদ্ধ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বৌদ্ধ যদি দেশে অধিক থাকিত, তাহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণদিগকে বাঁধিয়া দিতে হইত। যে দিকেই হউক, ১৫০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত এই এক শত বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধদের নাম লোপ হয়, আর ব্রাহ্মণেরা সমস্ত দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলেন।...

১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, ধনের গৌরবে, পদমর্য্যাদার গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে বা অন্য কোনও কারণে বৌদ্ধধর্মের নায়ক ছিলেন, নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদের হিন্দু করিলেও, নিত্যানন্দদেব তাঁহাদের মন্ত্র দিলেও, তাঁহারা অনাচরণীয় হইয়াই রহিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। কবিকঙ্কণ লিখিয়া গিয়াছেন, 'বর্ণভিন্ন হয় মঠধারী' অর্থাৎ অনাচরণীয় জাতিদের যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও মঠধারী, অর্থাৎ ভিক্ষু। আমরা পূর্ব্বপুরুষদের নিকট শুনিয়াছি যে,

এই সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন, ইঁহাদের গলায় পৈতা দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। তাহার পর রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় জীবিকার আশায়, অনেক সময়ে অন্য কারণে বর্ণের ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং আপনাদের পূর্ব্ব গাঞী গোত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন।...

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৬) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

—

নারীর অধিকার

পূজার্হা গৃহদীপ্তি বলিয়া যাঁহাদিগকে আমরা গৃহের শান্তচ্ছায়ায় ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলাম, তাঁহারা আর আজ ঘরে থাকিতে চাহেন না। বাহিরের আকাশ-বাতাস আজ তাঁহাদিগকে ডাক দিয়াছে। কল্যাণময়ী স্নেহময়ী গৃহিণীর গৌরবের কমলাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কমলার মত যাঁহারা গৃহকে মধুর ও প্রীতিময় করিয়া রাখিতেন, তাহারা আজ সগর্ব্বে বলিতেছেন—"গৃহই আমাদের সব নয়, বাহিরও আমাদের চাই। ঘর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া আমরা নিজেকে জানিতে চাই। আমাদেরও মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তিতেই আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি, আর এই পরিপূর্ণ বিকাশই আমাদের কাম্য।"...

নারীর মনে এই ভাব আজ বেশী দিন সক্রিয় হইয়া উঠে নাই। হেনরিক ইবসনের Doll's House নামক জগদ্বিখ্যাত নাটকে নায়িকা নোরা আট বৎসর বিবাহের পরে আবিষ্কার করিল যে, তাহাদের বিবাহ সত্যকার প্রেমে গঠিত নহে। অথচ তাহাদের সম্বন্ধ প্রীতিতে নিগূঢ় ও স্নেহে মধুর ছিল।

মনুর কাছে আমরা শিখিয়াছি :—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা॥"

নোরা এই সনাতনী সহজ প্রথার বিরুদ্ধে বলিয়া উঠিল, পিতা ও স্বামী নারীর ব্যক্তিত্বকে অবহেলা করিয়া পাপ করিতে বসিয়াছে।

নোরার স্বামী বলিল, "Before all else, you are a wife and a mother."

নোরার উত্তর আধুনিক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে।

"I believe that before all else, I am a reasonable human being just as you are or at all events, that I must try and become one."

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইবসেন এই বাণী প্রচার করিলেন, মনুষ্যত্বের অধিকারই নারীর প্রথম দাবী, পত্নী ও জননী হওয়া পরের কথা।

কি নারী, কি পুরুষ প্রত্যেককেই পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ ও অধিকার দিতে হইবে। এই যে আদর্শ, ইহাকে পৃথক্ করিয়া দেখিলে চলিবে না। ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাজগতে যে গভীর পরিবর্ত্তন দেখা দিয়া মানুষের সত্যকার নবজন্ম দিয়াছে, সেই স্বাধীনতার আনুষঙ্গিক ভাবধারাই নারীচিত্তে এই মুক্তির আহ্বান জাগাইয়াছে।

ফরাসী-বিপ্লবের রথীরা বলেন, ফরাসী বিপ্লব হইতে নবযুগের প্রথম বর্ষ গণনা করা হইবে। ইহার অতিশয়োক্তির অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা এই, পুরাতন রাষ্ট্রে গোষ্ঠী পরিবার ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হইয়াছিল।...

প্রাচীন সমাজ ও বর্ত্তমান সমাজের পার্থক্য এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা যদি নবযুগের এই আদর্শকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে নারীকেও তাহার স্বভাবজ বৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তির অধিকার দিতে হইবে।...

এত কাল আমরা নির্ব্বিবাদে রাম ও সীতার চরিত্র মনোজ্ঞ ও মহিমময় মনে করিয়া যাত্রাপথের সম্মুখে ধরিয়াছিলাম। Feminist বলিতেছেন, না, এ আদর্শ চলিবে না।

সীতাকে বনবাস দেওয়ার রামের অধিকার নাই। আত্মগৌরব ও যশোবৃদ্ধির জন্য তিনি সীতার আত্মা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারেন না। প্রজার প্রতি তাহার যতটুকু কর্ত্তব্য ছিল, সীতার প্রতি তাহার অপেক্ষা অধিক থাকা উচিত।

শুধু রামায়ণের সীতা নহে, মহাভারতেও যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর প্রতি অবিচার করিয়াছেন। দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রাখা তাঁহার পক্ষে ভয়ানক অন্যায় হইয়াছিল। অবশ্য এই দুই ক্ষেত্রেই স্বামী মহারাজ পত্নীর উপর অক্ষুণ্ণ একাধিপত্যের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমানের নারী তাহা মানিতে প্রস্তুত নহে।

এই সমস্যা-সমাধানের জন্য মানুষের জীবনের ঈপ্সিত আদর্শ নির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজন। চাকচিক্যময় য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল সুর ভোগ; প্রকৃতিকে পরাজয় করিয়া মানুষের অক্ষুণ্ণ অধিকার বিস্তার। সে সভ্যতার পতাকা সংঘর্ষ ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ঘোষণা করিতেছে। যে দুর্ব্বল, তাহার প্রতি তাহার সহানুভূতি নাই, গায়ের জোরে যে দাবী করে, তাহার দাবীই সে শোনে। যন্ত্রতান্ত্রিক কলকারখানার এই সভ্যতা মানুষকে স্বার্থপর যন্ত্রই গড়িয়া তুলিতেছে।

কিন্তু আমাদের দেশের আদর্শ কি ?

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥"

আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টির প্রসার করিয়া আমাদিগকে অনুভব করিতে হইবে, যেন আমরা বিশ্বচরাচরে ব্রহ্মের স্পর্শ অনুভূতি করিয়াছি। মনে করিতে হইবে, যেন ভাগবত অমৃতে সমস্ত জগৎ পরিপ্লুত। অতএব ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে হইবে, কাহারও ধনে লোভ করা চলিবে না।

মুক্তি, নির্ব্বাণ, পরা শান্তি, মোক্ষ যাহাই আমাদের কাম্য হউক না কেন, আমাদিগকে ত্যাগী ও কর্ম্মী হইতে হইবে।

আমাদের গৃহ-জীবন গীতোক্ত নিষ্কাম ও নিরাসক্ত কর্ম্মের আদর্শে গঠিত, সে আদর্শ আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হইবে।...

আমার কথার অর্থ এই নহে যে, বিপুলা পৃথ্বীর বিপুল পরিবেশের সহিত ভারতবাসীরা চলিবে না, নূতনকে ও অভ্যুদয়কে তাঁহারা মানিবেন না, জড় ও সনাতনী কূপমণ্ডূক হইয়া সকলেই বসিয়া রহিবেন।...

আমাদের এই চিরন্তন জাতীয় আদর্শ অনুসারে প্রত্যেকেরই জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক বিরাট ধর্ম্মবোধের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত।

এই ধর্ম্মজীবন ধর্ম্ম-বিবাহের দ্বারা মিলিত পতি ও পত্নীর সাধনায় সৃষ্ট পবিত্র গৃহ-জীবনের আশ্রয়েই পরিপুষ্ট। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা শক্তিসম্পন্ন নর ও নারী যখন প্রেমে সুখের নীড় বাঁধেন, তখন কামনা ও তৃপ্তির উপর তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না, নিঃশ্রেয়সলাভের বাসনাই তাঁহাদিগকে জীবনপথে, গন্তব্য স্থানের অভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। মানুষের মনে যে নগ্ন কামনার লেলিহান শিখা জ্বলে,

তাহাকে ভোগরূপ বাতাসের দ্বারা বিস্তৃত করিবার ইচ্ছা ভুলাক্রমেও আমাদের চিত্তে নাই। আমরা জানি, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।" তাই companionate marriage (সখিমূলক বিবাহ), divorce (বিবাহবিচ্ছেদ) প্রভৃতির কল্পনাও আমাদের পক্ষে তীব্র পীড়াদায়ক।...

জীবনের সম্যক্ পূর্ণতার জন্য, অভীষ্টলাভের জন্য নর ও নারী উভয়েই যাত্রী—নারী অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ," অতএব নারীর অধিকার আমরা কোথাও ক্ষুণ্ণ করি নাই, তাহাকে ছোট করি নাই। পতির যে কর্ত্তব্য, যে ধর্ম্ম, যে যাত্রাপথ—পত্নীরও তাহাই কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ও যাত্রাপথ।

নারীকে আমরা বড় করিয়া দেবীরূপেই দেখিয়াছি। প্রতি নারীই মা, ইহাই ভারতীয় আদর্শ। যে কোন নারীই হউক, সে আমাদের মা, তাহার সহিত flirt করিবার সদিচ্ছা বা অসদিচ্ছা আমরা পোষণ করি না এবং এই flirt করিবার অধিকার দিতে আমরা নারাজ। "পরদারেষু মাতৃবৎ" আমাদের শুধু পুস্তকস্থ নীতি নহে। মাসীমা, পিসীমা, জ্যেঠাইমা, খুড়ীমা, দিদিমা, ঠাকুরমা, বুড়মা, আয়িমা, বৌমা প্রভৃতি সমস্ত সম্বন্ধবাচক পদমাত্রেই মায়ের যোগ, এই উক্তির সমর্থন করিবে।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" হয় ত তর্ক উঠিবে, ইহা কেবল আদর্শই রহিয়া গিয়াছে, কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তর্কস্থলে যদিও স্বীকার করি যে তাহাই সত্য, তথাপি আমরা আমাদের এই সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণীর আদর্শ উপেক্ষা করিয়া, প্রতীচ্যের আদর্শ গ্রহণ করিব না বরং আমাদের গৌরবময় মহিমার আদর্শ যাহাতে জনসাধারণের জীবনে সত্য হইয়া উঠে, সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

সতীত্ব ও মাতৃত্বের উপর ভারতীয় সভ্যতার দৃঢ় ভিত্তি। আমাদের মনে হয়, ইহার অপেক্ষা অমূল্য ধন আর নাই। নারীকে যেমন একনিষ্ঠ প্রেমে স্বামীকে গ্রহণ করিতে হইবে ও সতীত্বমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, পুরুষকে তেমনই একনিষ্ঠ হইতে হইবে।...

যে সঞ্জীবনী প্রেম নর ও নারীকে এক অলৌকিক জীবনের স্পর্শ আনিয়া দেয়, সে প্রেম কামস্পৃহা নহে, ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণ নহে, তাহা কল্যাণে মণ্ডিত, সমাজ-জীবনের আশীর্ব্বাদে পুষ্ট ও ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাহি।...

ভারতবর্ষের নারীত্ব, সতীত্ব ও মাতৃত্বকে বরণ করিয়া যে কোনও জাতি আশা ও আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারে। দূরেই হউক আর নিকটেই হউক, স্বর্গেই হউক আর মর্ত্ত্যেই হউক, সতী নারী পতির চির-সহযাত্রী—পতির কর্ম্মে কর্ম্মী, পতির ধর্ম্মে ধর্ম্মী।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ঋষিকন্যা ও ঋষিপত্নী ঘোষা ও বিশ্ববারা বেদমন্ত্রদ্রষ্ট্রী, অর্জ্জুনপ্রেয়সী সুভদ্রা তাঁহার রথচালিকা, সীতা ও দ্রৌপদী পতির সহিত বনবাসিনী, মিহির প্রিয়া খনা জ্যোতির্বিদ্যার পারদর্শিনী। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিচিত্র আচারের মধ্যেও ভারতবর্ষের নারী আপন আপন প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী ও উভয়ভারতী, সীতা, সতী, দময়ন্তী ও শৈব্যা, জনা ও সুভদ্রা, ধর্ম্মপ্রচারিকা সঙ্ঘমিত্রা, ভিক্ষুণী অধিনায়িকা মহাপ্রজাপতী গৌতমী, সংযুক্তা, পদ্মিনী, যোধাবাঈ, তারাবাঈ ও অহল্যা প্রভৃতি মহীয়সী নারী স্বীয় স্বীয় প্রতিভার মহিমায় ভারতবর্ষকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন।

পশ্চিমের যাহা কিছু, তাহাই ভাল, এ অন্ধবিশ্বাসে যেন আমরা না চলি। তাহাদের আদর্শ এখনও পরীক্ষার বিষয় হইয়া রহিয়াছে; সেই পরীক্ষাধীন আদর্শ গ্রহণ করিয়া যেন আমরা ধ্রুব ও অধ্রুব উভয়কে না হারাই।...

এই আদর্শ—এই ভাব-জীবন—এই সুমধুর কল্পনা আমাদের যেন শুধু কাব্যের উৎস না হয়, ইহা যেন ভারতের গৃহে গৃহে সন্ধ্যার মঙ্গল-দীপের মত প্রতিদিন নব নব ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হয়।

য়ুরোপের ভোগের বাণী, য়ুরোপের বিষগ্রাসী ক্ষুধা, য়ুরোপের বাহিরের আড়ম্বর ও সমারোহ তাহার বিদ্যুজ্জ্বালা লইয়া চক্ষু ঝলসাইতে পারে, কিন্তু আমরা যেন মনে রাখি, চকচক করিলেই সোনা হয় না।...

আমি আশা করি, ভারতের নারী ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মধারাকে মর্ম্মে মানিয়া, সতীত্বের ও মাতৃত্বের অমর আদর্শকে বরণ করিয়া নব নব পথে নব নব অভ্যুদয় লাভ করিবে। ভারতীয় ব্রহ্মবোধ ত্যাগ ও সেবার সহিত য়ুরোপের নবনবোন্মেষশালিনী গতি নিয়মানুগত্য ও দৃঢ়তার সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করিয়া ভারতের নারী বিশ্বের আদর্শ-স্থানীয়া হইবেন। "অধিকার", "অধিকার" বলিয়া শুধু উচ্চ চীৎকার না করিয়া প্রেমে ও ত্যাগে, কল্যাণে ও সেবায় জগৎকে মধুময় ও মঙ্গলময় করিয়া আপন প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন। পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষে নহে, বরং সহযোগিতায় ও সম্মিলনে নারীর ব্যক্তিত্ব প্রকট হইবে। পুরুষের ও নারীর উভয়ের সমবেত সাধনায় উভয়ের আত্মবিকাশ হয়। কি পুরুষ, কি নারী কেহই স্বতন্ত্রভাবে আপন আত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ ও পুষ্টিলাভ করিতে পারেন না। পুরুষের শক্তি আর নারীর প্রীতির সংযোগে আনন্দময় গৃহের প্রতিষ্ঠা, আর সেই গৃহে নারী গৃহশ্রী ও উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী মহিমময়ী সম্রাজ্ঞী।

(মাসিক বসুমতী ১৩৩৬) শ্রীমতিলাল দাশ

—

দারার ধর্ম্ম-মত

দারার ধর্ম্মমত কি ছিল জানিতে হইলে আকবরের ধর্ম্মের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন। কেননা জাহিরী ইস্‌লাম দুজনকেই কাফের মনে করে। অনেকের ধারণা শাহজাদা তাহার প্রপিতামহের বহু-রূপীর পোষাকটা পাইয়াছিলেন; তাঁহার স্বরূপ ও প্রকৃত ধর্ম্মমত ঐ বহুরূপীর পোষাকে প্রচ্ছন্ন ছিল; তাই তিনিও কাফের স্থির হইয়াছেন। আকবরের ধর্ম্ম কি ছিল লোকে বুঝিতে পারিত না; কিংবা যে ধর্ম্ম তিনি মানিতেন মানুষের অভিধানে তাহার কোন পরিভাষা নাই; অন্ততঃ স্মিথ সাহেব খুঁজিয়া হতাশ হইয়াছেন। জাহিরী ইস্‌লাম ও সুন্নী মৌলানাদের সহিত বাদশার বিবাদের সংবাদ পাইয়া পর্ত্তুগালের পাদ্রী, পারস্যের অগ্নি উপাসক, তিব্বতের লামা, গিরনার পাহাড়ের জৈন-যতী ও কাশীর পণ্ডিত দরবারে হাজির হইলেন। ফতেপুর সিক্রীর ইবাদত খানার বৈঠকে প্রথমে পাদ্রীর ডাক পড়িল; বাবাজীর বক্তৃতার জোরে সকলের মুখের জল শুকাইয়া গেল—বাদশা বাহবা দিলেন। পাদ্রী সাহেব বুঝাইয়া দিলেন খৃষ্ট-ধর্ম্ম যেন একটা আমাদের কল; এ রকম মেওয়া হিন্দুস্থানে নূতন আমদানী, এটা খাইলে সব পাপ হজম হইয়া যাইবে; আঁধারে আলো দেখিতে পাইবেন; বিশেষতঃ শরাবটা হামালের একজিস্ত্রী উপরে; ওটা

নারী-সমবায়

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসিজানতাং
দেবভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে,
সমানীব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানিবঃ।
সমানবস্তু বো মনঃ যথাবঃ সুসহাসতি।"

এই বহু পুরাতন ঋষিবাক্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ানের গুণগান মানবসভ্যতার আদিযুগে এবং তার পূর্ণ সভ্যতার গৌরবময় দিনে—

"অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা, তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" অথবা "সংহতি শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি," ইত্যাদি বাক্যে সমবায় নীতির উচ্চপ্রশংসা মুক্তকণ্ঠেই করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য মতেও union is strength, united we stand, divided we fall—ঐক্যেই যে ইহপারলৌকিক সকল প্রকার সুখসম্পদপ্রাপ্তি সম্ভব, এবং অনৈক্যের ফল যে কিরূপ বিষময়, তাহার পরিচয় ভারত-ইতিহাসের সকল পৃষ্ঠাতেই জলন্ত অগ্নিময় অক্ষরে চিরলিখিত রহিয়াছে।

বহু প্রাচীনকালে যখন আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃত সমস্ত প্রদেশই অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তখন হইতেই এদেশে গণতান্ত্রিক (Federation), কুলতান্ত্রিক Tribal Republic), মুখ্যতন্ত্র Oligarchy), প্রজাতান্ত্রিক (Democracy) প্রভৃতি সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। এই সকল শাসন-প্রণালী সঙ্ঘশক্তির পূর্ণ পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য।

আবার শুধু কর্ম্মক্ষেত্রেই নহে প্রাচীন ভারতে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক ভারতে ধর্ম্মক্ষেত্রেও সঙ্ঘবদ্ধের পরিচয় সম্পূর্ণরূপেই পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপেই সঙ্ঘের ধর্ম্ম, সঙ্ঘশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া একদা এই বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মজগৎ অধিকৃত করিয়াছিল। আজও অর্দ্ধজগৎ জুড়িয়া তাহার জয়ধ্বনি বিঘোষিত হইতেছে, এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র তিনটির মধ্যের একটি মন্ত্রই এইরূপ—

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—

যাঁহারাই বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই জানেন যে, সঙ্ঘশক্তিকে বৌদ্ধধর্ম্মের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ শ্রমণ শ্রামণের ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ এই সঙ্ঘশক্তির একান্ত অধীনে রহিয়াই জগতের অধ্যাত্ম রাজ্যে অতুল জ্ঞানসম্পদরাজি প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমাদের সমাজ-গঠন ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার ভিত্তির উপর নহে। আমাদিগের সমাজ-গঠনে, আমাদিগের যৌথ-পরিবারে, আমাদিগের গ্রাম্যমণ্ডলী-সকল সংস্থাপনে, আমাদিগের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে আবহমান কালাবধিই উচ্চনীচ, সক্ষম ও অক্ষম, সবল ও দুর্ব্বল সকলকারই যথাযথ স্থান ছিল এবং এখনও তাহার ধ্বংসচিহ্ন প্রাচীন তান্ত্রিকসমাজ-অঙ্গে সুপরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। আজ যাদের জন্য depressed class নীচ জাতীয় বলিয়া আমরা কাঁদিয়া খুন হইতেছি, একদিন আমাদের সকল সুখদুঃখে উৎসবে-ব্যসনে তাদেরও যথানির্দ্দিষ্ট অংশ ছিল—ইহা অবিসম্বাদী সত্য।

কুর্য্যাৎ সমানুভূতিং স্বগ্রামীণে সুখদুঃখয়োঃ।

আর্য্যাণাং ব্রাহ্মণে শূদ্রেহন্ত্যজাতৌ প্রতিবাসিষু।

ইত্যাদি বচনও তাহার প্রমাণ।

কিন্তু এখন সে-সব অতীত গাথা! আজকাল ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার যুগ আসিয়াছে। এখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের নাই। তাই আমরা তার শোধ তুলিতেছি, যথেচ্ছভাবে সমাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর দিয়া। "সংবোমনাংসিজানতাং" ছাড়িয়া নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলেই এখন একই গান গাহিতেছেন, "স্বাধীনতা-

হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" (অবশ্য এ স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নহে)।

আসলে কিন্তু মুখে সাম্য মৈত্রীর বাণী আওড়াইয়া আমরা যথার্থ সাম্য—'সমানা হৃদয়ানিবঃ' বিস্মৃত হইয়াছি। স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের ধনী-দরিদ্রের ভেদ দিনে দিনেই পর্ব্বত-মেরুর ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

কালের প্রভাবে পূর্ব্বতন রীতিনীতি-সকল ক্রমশই ধ্বংসোন্মুখ, সুতরাং সমাজে এখন নিত্যনূতন সমস্যার অভ্যুদয় অনিবার্য্য। যে সবল যে শক্তিমান তাহার পক্ষে কোন সমস্যার সমাধানই কঠিন নহে, নব্যতন্ত্রতার ফলে দুর্ব্বলের পক্ষেই জীবনসংগ্রাম প্রাণান্তকর হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান যুগের নীতি অনুসারে দুর্ব্বলের অবশ্য বাঁচিয়া থাকার অধিকারও নাই, তাহার ধ্বংসপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত এবং স্বাভাবিক। এই কারণেই সকল দেশে অসংখ্য অসংখ্য শক্তিহীনের কঙ্কালস্তূপের উপর মুষ্টিমেয় শক্তিমানের বিজয়কেতন উড়িতেছে।

ভারতবাসী আজ 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'—পরাধীনতার অনিবার্য্য ফলস্বরূপে তাহাদের মধ্যে দাস-মনোভাবের (slave mentality) অভাব ঘটিতেছে না। ইংরেজীতে একটা প্রবাদবাক্য আছে—"Yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table"—ভারতেও ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। গ্রামের ভূসম্পত্তি কয়েকজনের করতলগত, ক্ষেত্রস্বামী কৃষক অন্নহীন ও মহাজনের অথবা ভূস্বামীর দাস এবং অনেকস্থলেই সহায়সম্পত্তিবিহীন।

যৌথপরিবারের অস্তিত্ব দিনে দিনেই বিলুপ্ত হইতেছে। এক সুনিয়ন্ত্রিত, সাম্যভাবাপন্ন ত্যাগ সংযমশীল বহিষ্ণু পরিবারের পরিবর্ত্তে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছন্নছাড়া গৃহহীন গৃহস্থের সৃষ্টি। জীবনসংগ্রাম কঠিন হইতে কঠিনতর, উপার্জ্জনক্ষম একক পুরুষের উপর বহু সন্তান ও নারীর নির্ভর এবং তাহার মৃত্যুতে ইহাদের অসহায় অবস্থা ইহার ফল। দেশময় এই যে দারিদ্র্য, ইহার মূল কারণ আয়বৃদ্ধি অপেক্ষা ব্যয়বৃদ্ধি। আধুনিক ভারতবাসী তার নিত্য এবং নৈমিত্তিক সকল ব্যাপারেই স্বদেশী এবং বিদেশী সকল প্রকার বিলাসিতার আমদানী করিয়া নিজেদের প্রয়োজনকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাহার যোগান দিতে ভারতকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে।

নারী এদেশে—বিশেষতঃ এই স্বার্থ-প্রধান যুগে- অনেক বেশি অসহায়। তাদের সর্ব্বত্রেই অভাব। শিক্ষার অভাব, সুযোগের অভাব, এবং সর্ব্বোপরি শক্তির অভাব। যেদেশে একদা বাণী, কমলা ও মহাশক্তিকে নারীশক্তির প্রতীক করিয়া পুরুষে পূজা করিত, সেদেশের নারী আজ অবলামাত্র।

মাতৃজাতির শারীরিক মানসিক দুর্ব্বলতার ফল সন্তানের উপর কতখানি ফলে তাহা নূতন করিয়া বলিতে বসিবার আবশ্যক আছে মনে হয় না। সুভদ্রার গর্ভেই অভিমন্যু জন্মিতে পারে।

এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার নারীর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা। দুর্ব্বল অসহায়ের শক্তি অল্প; কিন্তু বহুদুর্ব্বল একত্র হইলে অসীম শক্তিশালী হইতে পারে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

"একদাসমবিত্তাশ্চেৎ আকর্ষন্তি রথং বলাৎ
সমাসীনং জগন্নাথং রথস্থ চাল্যতেতদা।"

জগন্নাথের রথ সকলে মিলিত হইয়া স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, ধনী দরিদ্র নর এবং নারী সকলে মিলিত হইয়া টানিতে হয়। ইহাই সমবায়ের নীতি। শুধু মিলিত হওয়া নয়, সে মিলন মনে প্রাণে, কায়ে কর্ম্মে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। পরস্পরের সহায় ও পরস্পরের সুখদুঃখের সমভাগী হইতে হইবে। সকলের লক্ষ্য হইবে সঙ্ঘের উন্নতি—জগন্নাথের রথ চালানো। ইহাতেই আত্মোন্নতি।

উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র ব্রাহ্মণ-অন্ত্যজ হিন্দু-মুসলমান, পার্শী খৃষ্টান যে কোন সাম্প্রদায়িক, যে কোন জাতি গোত্র স্বদেশীয় অথবা বৈদেশিক সকল মহিলাই এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। কেবলমাত্র দশজন শিক্ষিতা উচ্চবংশজা অবস্থাপন্না মহিলার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া আজকাল যে-সকল সভা বা সমিতি করা হইতেছে, তাদের সঙ্গে এইখানেই ইহার প্রভেদ রাখিতে হইবে, এই সাম্যই সমবায়ের প্রাণ।

সমবায়ের দৃষ্টান্ত মনুষ্যসমাজ অপেক্ষা নিম্নতর জীব-জগতে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পিপীলিকারা

খাদ্যের সন্ধান পাইলে সকলকে সংবাদ দেয় এবং সকলে মিলিয়া গুরুভার বস্তুও বহন করিয়া লইয়া যায়। মধুমক্ষিকা ইত্যাদি সকল ইতরপ্রাণীদের মধ্যেই ঐক্যবন্ধন যথেষ্ট সুদৃঢ়।

সমবায় নীতি কেবলমাত্র কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনেই নহে, যে-কোন উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হইতে পারে। মহাজনের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত সমবায় ঋণসমিতি স্থাপন করিলে বিপন্না বিধবা প্রভৃতির যথেষ্ট উপকার হয়। ব্যবসায়ী অতি লোভের বশে মূল্যের হার অনাবশ্যক বৃদ্ধি করে; ফলে, দরিদ্রের বিশেষ অসুবিধা হয়। দশজনে অল্প অল্প মূলধন তুলিয়া কোন একজনের বাটীতে একটি সমবায় দোকান খুলিতে পারিলে এবং সাধারণ গৃহস্থের সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নামমাত্র লাভে বিক্রয় করিতে পারিলে অনেকের অভাব দূর হয়।

সহরে দুগ্ধের অভাব অত্যধিক, ভাল দুগ্ধ সম্ভব মূল্যে না পাইলে শিশুপালন সুকঠিন। ভারতে শিশুমৃত্যুর হার কম করিয়া ধরিলেও হাজার করা দুইশত পঞ্চাশ। এই শিশুমৃত্যুর এবং দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুর প্রাচুর্য্যের প্রকৃত মূলতত্ত্বই এই দুগ্ধাভাব। সমবায় দুগ্ধ-বিক্রয় সমিতি কিছু চেষ্টা করিলেই নানাস্থান হইতে দুগ্ধ সংগ্রহপূর্ব্বক সাধারণের এত বড় একটা প্রচণ্ড অভাব মোচন করিতে পারেন। আমার মনে হয়, সমাজে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তোলার চাইতে মেয়ে-পুরুষের এই সমবায় নীতি প্রতিপালনপূর্ব্বক প্রকৃত দেশহিতৈষণা দেখাইবার যথেষ্ট উপায় পড়িয়া রহিয়াছে, অবশ্য ইহাতে বাহবা পাওয়া কিছু কম পড়িতে পারে এবং খাটিতে হয়—ফাঁকির মূল্যে নাম কেনা চলে না; কিন্তু কাজ ঢের বেশী হয়।

অপচয় ও অমিতব্যয়িতা এদেশের মহাশত্রু। কত প্রকারে কত পরিবারে কত দ্রব্যই যে অপব্যয়িত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার নিবারণ আবশ্যক। দেশের ধনবৃদ্ধির প্রধান উপায় মিতব্যয়িতা, বিশেষতঃ যেদেশের শিল্পবাণিজ্য সমস্তই পরহস্তগত। মিতব্যয়িতার ভিত্তি সংযমের উপর। বৃথাব্যয় নিবারণ করা প্রয়োজন। প্রত্যহ এক পয়সা সঞ্চয় করিলে দশ বৎসরে প্রায় ৬০৲ টাকা জমা হয় এবং এই সহরেই যদি দশ হাজার নারী ইহা করেন তাহা হইলে একা এই মজঃফরপুরেই উক্ত সময় মধ্যে ছয়লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইতে পারে। এক পয়সা অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু ছয়লক্ষ টাকায় কত সৎকার্য্য করা যাইতে পারে,—একবার ভাবিয়া দেখুন ত!

এই মিতব্যয়িতার শিক্ষা শিশুকাল হইতেই পুত্রকন্যাকে দেওয়া প্রত্যেক মাতার কর্ত্তব্য এবং নিজে কাজে করিয়া তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখানো প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে যৌথ পরিবার ধ্বংসের ফলে বিধবা হয় পরের গলগ্রহ, না হয় নিরাশ্রয়। ইহার প্রতিকারের

শ্রীঅনুরূপা দেবী

উপায় স্বাবলম্বন শিক্ষা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করিয়াও সকল অবস্থার সকল মেয়েদেরই কিছু কিছু ধনোপার্জ্জন চেষ্টা করা। ঘরে বসিয়াই কত প্রকারে ধনোপার্জ্জন হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বলিতেছি। যথা—দরজীর কাজ অর্থাৎ কাটা কাপড়ের এবং মশারী বেড কভার, বালিশের ওয়াড়ে শিল্পকার্য্য সুজনী, বালাপোষ প্রভৃতি সেলাই করা। এই সকল বস্তু সকল ঘরেই সর্ব্বদা প্রয়োজন হইয়া থাকে। অর্ডার লইয়া করিলে খুব ভালই হয়, তারপর জ্যাম জেলী

আচার চাটনী মোরব্বা ইত্যাদি প্রস্তুত করা, এ সকল এখনকার লোকে অনেকেই বাজার হইতে কিনিয়া খায়। জরি রেশম এবং সূতার ক্রুশের কাঁটার এবং পিলোর লেশ বোনা; শান্তিপুর এবং কাশ্মীরের অনুকরণে সূতীর উপর সূতার এবং রেশমীর উপর রেশমের ফুল ও পাড় তোলা; কার্পেটের এবং চটের গালিচা আসন; পশমের সোয়েটার কোট প্যাণ্ট দস্তানা মোজা মাফলার টুপী গেঞ্জি প্রভৃতি বোনা; কলে মোজা গেঞ্জি এবং বোম্বাই কাজ করা; সলমা ও বাদলার সূক্ষ্ম শিল্প এবং রেশমী এমব্রয়ড়ারি; পুঁতির খেলানা হইতে সাড়ী জ্যাকেটের কাজ ব্যাগ ছবি ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত তাঁদের চরকায় সূতা কাটা এবং তাঁতে সাড়ী ধুতী জামার থান প্রভৃতি বোনা খুব প্রকটা অবশ্য-প্রয়োজনীয় কার্য্য হইতে পারিবে। বেহারী মেয়েরা বেতের ডালা বাস্কেট প্রভৃতি এবং সূচের সূক্ষ্মকারু-কার্য্য অতি সুন্দর করিতে পারে। আজকালকার দিনে এসবের চাহিদা কিছু কম নয়।

কাশীতে আমাদের অনুগত এবং পরিচিত কতকগুলি এই ধরণের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমাদের অনেক জিনিষ তাঁরাই করিয়া দেন। বাজার দরের চেয়ে দর কমই পড়ে। সরোজনলিনী নারী-সমিতি নানা স্থানে এইভাবেই কাজ করিতেছেন, তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি শিল্পাশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মজঃফরপুরে এভাবের নয়, শুধু বয়স্থা মেয়েদের শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য কিছুদিন হইতে একটি সেলাই ক্লাশ খোলা হইয়াছে, কিন্তু কোন এক স্থলে বা কোন দুই চারি দশটির দ্বারা তো বহুর অভাব মোচন সম্ভব নয়। বেনারসের হিন্দু-মহিলাশ্রমে দেখিতে পাই অনাথা বিধবা পতিত্যক্তা অভাগিনীদের নিত্য আবেদন আসিতেছে। অর্থাভাব এবং স্থানাভাব বশতঃ কর্ণপাত করিতে পারা যায় না।

নারী শিল্পসমিতি সমবায় দ্বারা প্রতি নগরীর প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে—যাহাতে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া আসা করা যায়—এবং প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সহস্রের অভাব মোচন জন্য আয়োজনও সুপ্রচুরতর করিতে হইবে। অঙ্গুলী দ্বারা গণিত হওয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা তাহা হওয়া সম্ভব নয়, এবং একক অথবা দুচার দশজনের চেষ্টাসাধ্যও নহে। এর জন্য একান্তভাবে কায় এবং মনের দ্বারা সমবায় নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

এই প্রদেশেই একদা গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী প্রচলিত থাকার সংবাদ আমরা পাই। এই প্রদেশেই মানব-সভ্যতার প্রধান নীতি কৃষির সর্ব্বপ্রথম উন্নতি হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়, এই প্রদেশেই সমগ্র জগতের জ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণের যুগ যুগ পূজ্যা ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর ব্রহ্মবাদ ধ্বনিত হইয়াছিল। এ প্রদেশ আর্য্য মহিলাগণের, সকল সতী নারীর চিরআদর্শভূতা সীতা দেবীর অভ্যুদয়-গৌরবে গৌরবান্বিত, এখানে নারীশক্তি কখনই খর্ব্ব থাকিতে পারে না, চেষ্টা করিলে আজও আমরা আমাদের বিগত অতীতকে আমাদের আশাময় ভবিষ্যতে পুনরাবর্ত্তিত করিতে পারি। কালচক্র নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যাহার অতীত ছিল, তাহার ভবিষ্যৎ আকাশকুসুম হইতে পারে না।

আমার মনে হয়, আপাততঃ একটি প্রধান কেন্দ্র এই মজঃফরপুরে স্থাপন করিয়া পল্লীতে পল্লীতে এবং গ্রামে গ্রামে ইহার শাখা-সমিতি সকল সংস্থাপন প্রভৃত যত্ন ও শ্রম দ্বারা করিতে চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা সফল না হইবার কোনই কারণ নাই। ইহার জন্য সমবায় সমিতি হইতে দল গঠনপূর্ব্বক পল্লীবাসিনীদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। সমবায় সমিতি উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর সন্ধান করিয়া (পূর্ব্বোক্ত আশ্রম প্রভৃতি হইতে) আনাইয়া তাহাদের ঐ সকল কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তাঁরাই তাঁদের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বস্ত্রাদি উপকরণ পাইকারী দরে কিনিয়া লইয়া ঐ সকলকে প্রদান করিবেন, ইহাতে অপেক্ষাকৃত সুলভে শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারিবে। প্রস্তুতকরা দ্রব্য-সকল বিক্রয়ের ব্যবস্থা ঐ সমবায় সমিতিই করিয়া দিবেন এবং উহার

লভ্যাংশ হইতে নির্ম্মাণকারিণীদের পারিশ্রমিক উহারাই দিবেন।

আর এক কথা, সকলের জন্ম একই পথ বা এক ব্যবস্থা করা চলে না। পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ বেহারের পল্লীতে ('দেহাতে') শিল্প সমবায়কে সাবধানে ব্যবস্থা করিতে হইবে। মনে করুন, একটি সেলাইয়ের কল দিয়া কল-চালান শিখাইয়া দেওয়া হইল, কিছুদিন কল চলিল, তারপর হঠাৎ একদিন একটু কি গোল বাধিল, কল অচল, মেরামত করিবার লোক কোথায়? বিশ পঁচিশ মাইল বহিয়া আনিয়া মেরামত করিয়া লইয়া যাওয়া (এমন মধ্যে মধ্যেই) সম্ভব হয় না। মনে করুন সলমার কাজ তৈরি হইল, বিক্রি সহরে ভিন্ন সেখানে হইবে না, খরচ বেশী পড়ে বিক্রীর জন্য প্রত্যাশা করিয়া থাকিতে হয়। তার চেয়ে ঐ সকল স্থানে যা সহজে করা যায় এবং স্থানীয় লোকের অভাব পূরণ করে তাহাই উৎপন্ন করান সমীচীন। তাঁত ও চরকাকেই প্রধান করা সঙ্গত। বস্ত্ররঞ্জন পাকা পাড়ের জন্য, সুতরাং কুশের ও বেতের কাজ, কাঁথা সেলাই ও টুপি কুর্ত্তা প্রভৃতি তৈরি হইলে বিক্রী হইতে কোন অসুবিধা বোধ হইবে না এবং এইরূপে দুঃস্থা ভদ্রমহিলাগণ গৃহের বাহিরে না গিয়া, অবসর সময় বৃথা অপব্যয়িত না করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। আত্মনির্ভরতা বাড়িবে, পারিবারিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইবে,—তদ্ভিন্ন সঙ্ঘবদ্ধ হইবার—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার শিক্ষার মূল্য জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অল্প প্রয়োজনীয় নহে।

শুনিয়াছি জাপানের কোন সহরে এক প্রকাণ্ড মন্দিরে অসংখ্য জাপানী মহিলার স্বেচ্ছা-কর্ত্তিত কেশরাশি দ্বারা সুদৃঢ়রূপে বিন্যস্ত একটি প্রকাণ্ড দড়ির স্তূপ রক্ষিত আছে। সুসভ্য জাপান পুরুষ-শক্তির পরাভবকারী নারী মহিমার এবং সম্মিলিত নারীশক্তির প্রতীকভাবে আজিও তাহার পূজা করিতেছে।

একদিন স্পার্টান মহিলাগণও নিজ নিজ মস্তক হইতে কেশ কর্ত্তনপূর্ব্বক ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিয়া দিয়া শত্রুহস্ত হইতে দেশ রক্ষা করার সাহায্য করিয়াছিলেন। এদেশের ক্ষত্রিয় মহিলারা রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লবে সমবেতভাবে আত্মরক্ষা ও আত্মাহুতি দিতে অভ্যস্তা ছিলেন, শত্রু বিজয়েও তাঁহারা সঙ্ঘশক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, একথাও ঐতিহাসিক সত্য। তাই বলি যাহা অন্যত্র হইয়াছে, এদেশে হইয়াছে, এখনও হইতেছে, যুদ্ধ অধ্যুষিত প্রদেশ-সকলে এই সে দিনও হইয়া গিয়াছে তাহা প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র, আবার এদেশে কেন না হইতে পারিবে? আর শুধু শিল্পই নহে ইহাতে পরস্পরের সম্মিলনে শিক্ষার প্রসার হইয়াও আমাদের মধ্যে যথেষ্ট উপকার হইবে বলিয়া আমি আশা করি।

শিক্ষা বলিতে শুধু বইএর পড়াকেই বোঝায় না। শিক্ষা অনেক প্রকারেই লাভ করা যায় এবং শিক্ষাও নানাপ্রকার। যেমন রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, স্বাস্থ্যশিল্প সাহিত্যাদি বিষয়ক, আর্থিক ও দৈহিক ইত্যাদি বহুবিধ। শিক্ষার প্রধান উপায় কথা-প্রসঙ্গ ও ভাবের আদান-প্রদান—পুস্তকপাঠে যে শিক্ষা তাহাও ঐ ভাবের আদান-প্রদানেরই অন্তর্বর্ত্তী। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যদি আমরা একটা নিয়মবদ্ধভাবে পরস্পরের সহিত মিলিতে শিখি, পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়ের দ্বারা আমাদের মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যা ব্যতিরেকেও সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, আর্থিক, নৈতিক এমন কি নারীর পক্ষে এদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় দৈহিক প্রভৃতি নানারূপ শিক্ষাই বর্দ্ধিত হইতে পারে।

অবশ্য এসকল শিক্ষা যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থাও সমবায় সমিতির দ্বারাই ব্যবস্থিত করিতে হইবে। কেবল কথায় নহে, কার্য্যদ্বারা এবার আমাদের প্রমাণ করিবার কাল আসিয়াছে যে, শুধু পুরুষের পক্ষেই নয়, নারীর পক্ষেও একইভাবে—"সংহতি কার্য্যসাধিকা"—এই প্রাচীনবাক্য এবং "united we stand" এই আধুনিক বচন সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ এবং ইহাতেই আমাদের স্বদেশের উন্নতি।

স্বদেশের ভারতের উন্নতি অর্থেই ভারতবাসী তেত্রিশ-কোটি নরনারীর উন্নতি। শুধু আমার, শুধু তোমার ব্যক্তিগত উন্নতিই পর্য্যাপ্ত নহে। শুনিয়াছি তিব্বতের দালাইলামা বলিয়াছিলেন, "যতক্ষণ না প্রত্যেকের

মুক্তি হইতেছে, ততক্ষণ আমি নিজের মুক্তি কামনা করি না।"

ভারতের উন্নতি ভারতবাসীর উন্নতি একমাত্র কো-অপারেসনের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। শতধাবিভক্ত ভারত এই একই উপায়ে সম্মিলিত এবং সংযুক্ত হইয়া সবল ও সুস্থ হইতে সমর্থ। পুরাণে আছে—"সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে।" হিন্দুশাস্ত্রমতে যেহেতু এখন কলিকাল, সেইহেতু এযুগের যুগশক্তি সঙ্ঘশক্তি! সেই সঙ্ঘের আবাহন এবং উদ্বোধন-মন্ত্রই এযুগের মূল-মন্ত্র! এ মন্ত্রের শরণ লইতে পারিলে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ শূদ্র ধনী দরিদ্র স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নর এবং নারী একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া এক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে জাগতিক কোন উন্নতিলাভেরই আর অন্তরায় থাকিতে পারে না। Dominion Status অথবা পূর্ণ স্বাধীনতা কিছুই ইহার পর আর অসম্ভব থাকিবে না। ইহাই প্রকৃত স্বরাজ। *

* মজঃফরপুর লেডীস কো-অপারেটিভ কন্‌ফারেন্সের সভানেত্রী কর্ত্তৃক পঠিত।

পক্ষান্তর

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

যতীন ও সুরেশ কুমুদের আবাল্য বন্ধু, কলেজের পথেও অনেকদূর সহযাত্রী বটে। উভয়ে সেদিন স্থির করে এসেছিল, কুমুদের বিয়ে সম্বন্ধে আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

বছর ঘোরে, কুমুদের স্ত্রী সুরমার মৃত্যু হ'য়েছে। সেই থেকে তার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের চেষ্টা চলছে, কিন্তু কুমুদ রাজী হয় না। বন্ধুবান্ধবের এতে বিস্ময়ের অন্ত নেই। কেননা সে চিরদিন সংসারে বাঁধা নির্দ্দিষ্ট পথে চলে এসেছে—চমকপ্রদ নূতন কিছু তাকে দিয়ে করানো যায় নি। এত টানাটানি কিছুতেই তাকে দিয়ে অসহযোগ করানো গেল না। সুরেশ যখন আইন কলেজের সঙ্গে অসহযোগ করে পার্কে পার্কে বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিযজ্ঞ ক'রেছে, কুমুদ তখন তার ভাঙা লণ্ঠন জ্বেলে টিম্‌টিমে আলোতে ইংরাজী সাহিত্যের নোট মুখস্থ করেছে। যতীন যখন প্রতিজ্ঞা করল, চিরকাল অবিবাহিত থেকে দেশের কাজ করবে এবং তার বিধবা মা সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা সংবরণ করবার জন্ম পুত্রের কাছে চোখের জল ফেলছেন, তখন কুমুদের পিসী গ্রামে ক'নে পছন্দ, দিন স্থির করে খবর দিলেন। কুমুদ নির্ব্বিবাদে গিয়ে বিয়ে করে এল। মেয়ের পিত্রালয় অজ পাড়াগাঁয়ে, বয়েস তেরর কোঠায় এবং লেখাপড়া জানে কি জানে না সন্দেহ শুনে যতীন ঘৃণায় সে বিয়েতে বরযাত্রী হয় নি। বছর দেড়েক পরে কিছুকাল হ'ল সেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সকলেই আশা করছে এমত অবস্থায় সংসারের পনের আনা লোক যে-পথে চলে কুমুদও সেই পথ অনুসরণ করে কোনও দরিদ্রের লক্ষ্মীশ্রীশালিনী ডাগর মেয়েকে বিবাহ ক'রে আবার সংসারের পাকা রাস্তা বেয়ে চলবে। কিন্তু কুমুদ বিয়ে করতে সম্মত হচ্ছে না।

যতীন ও সুরেশ কুমুদের পটলডাঙ্গার বাসায় এসে উপস্থিত হ'ল। সুরমার মৃত্যুর পর বুড়ো পিসিমা ছাড়া বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক আর কেউ নেই। ভুতো চাকর দরজা খুলে দিয়ে জানালো, বাবু কলেজ থেকে তখনও ফেরেন নি। কুমুদ মিসনারী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপকতা করত।

পিসিমা চোখের জল ফেলে বললেন,—বাবা, এ শূন্য পুরীতে ত আর—

সুরেশ বলল,—এবার একটা বৌ আপনাকে না জুটিয়ে দিয়ে ছাড়ছি নে পিসিমা।

—দেখ বাবা দেখ, যদি পারো। ওর ভাব দেখে

আমার ত ভয় ধরে গেছে। এতদিন ত এক রকম কেটেছিল। এখন আবার এক শুরু করেচে। বলে, মন্তর নেব। এই কি ওর মন্তর নেবার বয়েস?

সুরেশ বলল,—হ্যাঁ, মন্তর নেবে! আপনিও যেমন শোনেন। এই মাসটা সবুর করুক, শ্রাবণ মাসে সস্ত্রীক মন্তর নেয় যেন।

যতীন জোর দিয়ে বল্‌ল,—এই মাসের মধ্যেই ওর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি দেখুন।

যতীনের জোর দেবার কারণ ছিল। যতীন তার ভীষণ পণ ত্যাগ করে সম্প্রতি বিয়ে করেছে। ভাবে এমন দেখিয়েছিল যেন দেশের জন্য বিয়ে না করার চাইতে বিয়ে করাটাই বড় দরের আত্মত্যাগ। সেই গভীর আত্মত্যাগ কথঞ্চিৎ পূরণ করবার জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সুরেশ-প্রমুখাৎ বন্ধুবান্ধব রূপে গুণে যতীনের উপযুক্ত ক'নের সন্ধানে এক রকম আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিল। সারা বাংলা ওলট-পালট। শেষকালে বেহার-প্রবাসী এক বাঙালী ভদ্রলোকের মেয়ে মানানসই বিবেচিত হ'ল! মেয়েটির রূপ আছে, বিশ্বনিন্দুক সুরেশও এ কথা স্বীকার করল। এবং গুণের কোঠায় তার জমার অঙ্ক যতীনের চাইতে কম যায় না। তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে অসহযোগ করে ইস্কুল ছেড়ে সে খদ্দর ফিরি করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

দেশের এহেন মেয়েকে আবিষ্কার এবং বিয়ে ক'রে যতীন মনে মনে গর্ব্ব পোষণ করে। সেই স্ত্রী কুমুদ বউ মরে গেলে আবার বিয়ে করতে চাইছে না শুনে, যতীনের কাছে সুস্পষ্ট ভাষায় তার তারিফ করেছে। যতীন যে চির-কৌমার্য্য ব্রত নিয়েছিল কুমুদের পণ যেন তাও ছাপিয়ে উঠ্‌ছে। তাই যতীনের পণ—কুমুদের ফিরে বিয়ে দিতেই হবে।

খান পাঁচ ছয় মোটা মোটা বই বগলে পূরে কুমুদ প্রবেশ করতেই সুরেশ বল্‌ল,—বোঝা ত বাপু কম বইছ না। শাকের আটিটিতে এত আপত্তি কেন বল ত?

কুমুদ জিজ্ঞাসু মুখে সুরেশের দিকে চাইতেই যতীন হাত উঁচু করে সুরেশকে থাম্‌তে ইঙ্গিত ক'রে টেবিলের উপর দুই কনুয়ের ভর দিয়ে গম্ভীরভাবে বললে,—তুমি বিয়ে করবে কি না সেই কথাটা আমরা স্পষ্ট শুন্‌তে চাই।

বইগুলি রেখে ততোধিক গম্ভীরভাবে কুমুদ বললে,—আমি ত বলেছিই, আর বিয়ে করব না।

যতীন বললে,—কারণ?

কুমুদ ভ্রূ কুঁচ্‌কে নীচের ঠোঁট দাঁতে ঈষৎ চেপে একটু ভেবে বল্‌লে,—দ্বিতীয়বার বিয়ে আমার মতে মেলে না।

সুরেশ মাথাটা উঁচু করে জিজ্ঞেস করলে,—কেন? একটু প্রকাশ করে বল শুনি।

কুমুদ বললে,—বার বার বিয়ে করাটা ইন্‌কন্সিস্‌টেন্সির পরিচয়। আমি কনসিস্‌টেণ্ট হতে চাই।

সুরেশ বাধা দিয়ে বললে,—আহা হা, এমন বিপরীত কথা বল কেন? যে বিয়ে করেনি তা'র পক্ষে বিয়ে করাটা ইন্‌কনসিস্‌টেণ্ট্‌, যে একবার ক'রেছে তার দ্বিতীয়বার করাটাই ত কনসিস্‌টেণ্ট্‌। তা'র আবার আইবুড় থাকাই ত পূর্ব্বাপর সম্বন্ধচ্যুত হয়ে' পড়ে।

কুমুদ বল্‌লে,—ঠাট্টার কিছু নেই এর মাঝে। তুমি এ সব গভীর বিষয়ে কিছুই বোঝ না। আজ একে, কাল ওকে ভালবাসা যায় না, একটিমাত্র মানুষকে একবার মাত্র ভালবাসা যায়। এই হ'ল দাম্পত্য প্রেম।

সুরেশ হেসে বল্‌লে,—Bravo! ভুল হে ভুল! ফ্রয়েড্‌, হ্যাভলক্‌ এলিস্‌ পাঠিয়ে দেব, পড়ে দেখো।

—তুমি তা বল্‌তে পার, কিন্তু যতীনও যে তোমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে এই আশ্চর্য্য।

যতীন ঘাড় হেঁট ক'রল—যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছে। কুমুদের কথাটা তার মনে লেগেচে। সে বার বার তার স্ত্রীর গা ছুঁয়ে গদগদ স্বরে বলেছে, সে যদি মরে যায়, যতীন কখ্‌খন আর বিয়ে ক'রবে না। তার স্মৃতি নিয়ে সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটাবে।

সুরেশ হেসে বল্‌ল,—আচ্ছা বাপু, তোমার দাম্পত্য প্রেমটা ঘট্‌ল কখন আমায় বল্‌তে পার? বার বছরের মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলি। প্রথমবার এসে বৌঠান ত বাপের বাড়ীর জন্তে কেঁদে কাটিয়েছে—পিসিমার ছেলে-

ভুলোনর যত রকম বিদ্যে সব ফেল। শেষকালে একটা ব্যামোট্যামো দাঁড়ানর আশঙ্কায় ভয়ে ভয়ে মাসখানেক পরে মায়ের মেয়েকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে রক্ষে। বছরখানেক পরে একটু ডাগর হয়ে যখন তোমার বক্ষে ফিরে এলেন, তখন চিড়িয়াখানা আর যাদুঘর দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিন কেটেছে ব্যারাম হবার আগ পর্য্যন্ত। এমন গভীর দাম্পত্যপ্রেমটা ঘট্‌ল কখন্ হে?

যতীন বল্‌ল,—তাই ত!

কুমুদ রাগ করে' উঠে গেল।

পরদিনই সুরমার যে দুই তিনখানি ফটো ছিল, বহু দামে বাঁধিয়ে ঘরে ঘরে টাঙালো। বাসর-রাতে তার শ্যালক সুরমার যে ছবি তুলেছিল তার ওয়াটার কলার ফুলসাইজ করিয়ে শয়নঘরে চন্দনকাঠের চৌকীর ওপর দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে রাখ্‌ল। গলায় দিল দামী ফুলের মালা।

অনেক তর্কবিতর্কের ফলে কুমুদ ক্রমে সুরেশের মতটা মুখ্যত স্বীকার ক'রেছে। একাধিকজনকে ভালবাসা সম্ভবপর না হলেও, একের প্রতি যে প্রেম তা অন্তত আর একজনের মাঝে বেঁচে থাকতে এবং সফল হতে পারে।

আরও কিছুদিন বাদে টেবিলের ওপরকার ফটোটা নাড়তে নাড়তে সুরেশ বল্‌ল,—একটা মেয়েকে জানি ঠিক বৌদির মত।

কুমুদ কাগজ থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস্ করল—কোথায়?

—এখানেই। রাজসাহীর এক হেড মাষ্টারের মেয়ে। বাপ মারা যাওয়ায় এখানে মামাদের আশ্রয়ে আছে। দিব্যি লেখাপড়া জানে। বাপ যত্ন করে শিখিয়েছিল।

কুমুদ ফটোটা দেখিয়ে বল্‌লে,—উনি কিন্তু তেমন লেখাপড়া জানতেন না।

সুরেশ থতমত খেয়ে বল্‌লে,—ইনিই কি আর তোমার আমার মত জানেন? যা জানেন তা অপরকে বুঝ্‌বার পক্ষে যথেষ্ট, তাই বলছিলাম। ধর, তুমি যদি তাকে বিয়ে কর, সে একটা দিনে তোমায় বুঝে নেবে।

কুমুদ জিজ্ঞেস করল,— দেখতেও ওরই মত?

সুরেশ বল্‌ল,—ঠিক ওর—এই অনেকটা ওরই মত।

—আশ্চর্য্য ত!

পরের মাসের প্রথম শুভদিনে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে সুরেশ কুমুদের বিয়ে সম্পন্ন ক'রল। বুক-পকেটে সুরমার কার্ড সাইজ ছবি, নীচের পকেটে তার প্রথম চিঠি পুরে রুমালে চোখের জল মুছতে মুছতে কুমুদ বিয়ে করে এল। সে ভাল করে মন্ত্র পড়ে নি, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজে ছিল এবং বাসর-ঘরে এমন প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল যে, ঠাট্টার সম্পর্কীয়রা ভয়ে কাছে ঘেঁসতে পারে নি।

***

বাড়ী এসে কুমুদ সদ্যপরিণীতা বধূকে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। হেমাঙ্গিনীর রূপে গড়নে ভঙ্গীতে সুরমার সঙ্গে কোথাও মিল নেই। সুরমা ছিল সৃষ্টিকর্ত্তার খেয়ালে গড়া, হেমাঙ্গিনী রূপকারের আনন্দে। তার প্রস্ফুটিত নিটোল যৌবনে এমন একটি রমণীয় গাম্ভীর্য্য আছে যে, দৃষ্টি অবাক মানে। চোখ দুটি এমন স্নিগ্ধ, চাহনি এমন স্থির, চলনে এমন সংযম, যেন সে বহির্জ্জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে আপনার মাঝে সংহত করেছে। সে শুধুমাত্র রূপসী নয়, সে বিস্ময়ের বস্তু। শুধু দেখেই সে শেষ হয় না, তার রূপ যেন ভেবে নিতে হয়। কুমুদ মনে মনে সুরমার সঙ্গে নূতন স্ত্রীকে মিলিয়ে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে।

পিসিমা চোখের জল ফেলে বরবধূ বরণ করলেন। উৎসবের সঙ্গে শোক উথলে কেমন একটা বিশ্রী হয়ে উঠ্‌ল। সুরেশ যতীন অকারণ হাসিতে তা ঢাকবার বৃথা চেষ্টা ক'রল।

ফুলশয্যার রাত্রিতে কুমুদ পাশ ফিরে সুরমার শোকে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করল। হেমাঙ্গিনী নিমীলিত চক্ষে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে ভোরবেলায় উঠে এসে পিসিমার সঙ্কীর্ণ শয্যাপার্শ্বে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দিন গম্ভীর, রাত্রি ভারি—দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি একই ভাবে কাটে। ক্ষুদ্র সংসার ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে যেন আপনার কাজ আপনি চালিয়ে চলেছে। কোথাও নূতন ঘরকন্নার নবীন উৎসাহ চোখে পড়ে না।

দুপুরে যখন বিশ্রামের সময় আসে, পিসিমা তাঁর

বিগতা বধূর গল্প করেন। তার রূপ, তার গুণ, তার বারব্রত উপবাস, তার পতি-অন্ত প্রাণ একে একে পিসিমা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বর্ণনা করেন—হেমাঙ্গিনী অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে শোনে।

"আবাগী ত চার দিনের জ্বরে চোখ বুজল, ছেলেও যেন পাগল হল। দিন রাত আমার কি ভয়ে ভয়েই কেটেচে, মা।" তারপর আশ্বাসের সঙ্গে সমাপ্ত করেন, "এইবার আমার ভয় ঘুচলো। তুমি এখন তাকে তার দুঃখ ভুলিয়ে আপনার করে নাও।" এই বলে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে অঙ্গুলি চুম্বন করেন।

হেমাঙ্গিনী চুপ করে থাকে। পিসিমা এক সময়ে দেখেন কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে!

চারিদিকের ছবিগুলি লক্ষ্য করে হেমাঙ্গিনী সুরেশকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, এ ছবি সব—

সুরেশ চারিদিকে তাকিয়ে বললে,—আগের বৌ সুরমা বৌদির।

"ও" বলে হেমাঙ্গিনী আর একবার সেগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে।

যতীন সেই অবসরে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কুমুদের অদ্ভুত মতটার কথা হেমাঙ্গিনীকে জানিয়ে দিল। এবং তার রূপের পরিচয়ে যে একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল সুরেশকে, তাও প্রকাশ করে দিলে। হেসে বললে,—আচ্ছা, ওঁর কোন জায়গাটায় মিল আছে, আগের বৌয়ের চেহারার সঙ্গে, সুরেশ? কোথাও না।

সুরেশ ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠে মুখ লাল করে হাসতে হাসতে বললে,—বৌদি, রাগ করো না আমার ওপর। আসলে কুমুদ প্রিন্সিপলের ফাঁকা আওয়াজ করে। আমি তার বন্ধু মানুষ, তাকে যদি একটু তোয়াজ করেই থাকি, সে তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য নয়, ওকে একটু খুশী করতে।

হেমাঙ্গিনী মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলে,—বন্ধু বুঝি ফিরে বিয়ে করতে রাজী ছিলেন না?

সুরেশ ঘুরিয়ে বললে,—ঐ যদ্দিন তোমার খোঁজ না পেয়েছিল।

***

সংসারে অনেক দিকে অনেক রকম উন্নতি ধীরে ধীরে হয়ে উঠেচে। গাদা করা বাক্স পেটরা দেরাজ উপযুক্ত স্থান পেয়েচে। বিছানাপত্রের চেহারা ফিরেছে। কুমুদের সেপ্‌টিপিনে-ফুটো-আঁটা পুরানো মশারি কঠিন কর্তব্য থেকে মুক্তি পেয়েছে। নূতন এসেছে। জানালায় পরদা, টেবিলে ঢাকনী, কেদারায় কুশান। বৈঠকখানা-ঘরে নূতন ধোয়া চাদরের ওপর বাহার দেওয়া ওয়াড়ের তাকিয়া। মাঝখানে খাসা একখানা অ্যাসট্রে পোড়া ছাইয়ের জন্য রঙীন বুক পেতেছে। এমন কি ভূতো চাকরের শ্রী ফিরে গেছে! সে তার তৈলসিক্ত ছিন্ন আট-হাতি জোলার কাপড় ফেলে টেকা পাড় মিলের ধুতি কোঁচা ক'রে পরেছে। গায়ে দিয়েছে ডোরা-কাটা ছিটের ফতুয়া।

বাইরের এত পরিবর্তনেও কুমুদের কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। কলেজ-যাত্রার সময়ে রোজই ধোপ কাপড়ের পাট ভাঙে কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে, যেন একটা রীতিমত অত্যাচারে উপায়হীনের মত আত্মসমর্পণ করছে। ভূতো জুতোয় ব্রুশ ঘসতে ঘসতে হাঁপাতে থাকে। কুমুদ ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে। একদিন জিজ্ঞেস করলে,—ও তোকে কে করতে বলেছে?

"মা বলেছেন।" বলে সে আরও জোরে ঘষতে লাগল।

কুমুদ রেগে বললে,—নে, ঢের হয়েছে।

তার কুঞ্চিত ভ্রূ, উদাস দৃষ্টি, গভীর নিঃশ্বাস ঘোচে না। বরং দিনে দিনে ঘনিয়ে আসছে। হেমাঙ্গিনী তাকে প্রচুর পরিসর দিয়ে কোথায় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, নজরেই পড়ে না। ভাব দেখে পিসিমা কি করবেন ভেবে পান না। ছেলের মন বৌয়েতে বসাবার যে-সকল কলাকৌশল তাঁর জানাশোনা—বৌকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আরও সুন্দর করে তোলা—তা খাটাবার অবকাশ পান না। হেমাঙ্গিনীর তাঁতের শাড়ীতে ভাঁজের দাগ মেলায় না, গা থেকে সূক্ষ্ম কাপড়ের ব্লাউজ নামে না, তার হাল-ফ্যাসানে বাঁধা চুল এতটুকু স্থানচ্যুত হয় না। তিনি কখনও তার দেমাক দেখে তিরস্কার করেন, সে হাসে। কখনও তার চিবুক ধ'রে চোখের জল ফেলেন, তখনও সে মৃদু হাসে।

হেমাঙ্গিনী তরকারি কোটে, ভাঁড়ার দেয়, পিসিমার পুজোর আয়োজন করে। মেঝেতে হাঁটু পেতে বসে স্তূপাকার ধোপার কাপড় বার বার গুণে ঠিক করে দেয়। কুমুদ বারান্দায় খেতে বসলে, রান্না-ঘরে উবু হয়ে বসে ঠাকুরকে খাবার গোছাতে উপদেশ দেয়—খোলা দরজার ফাঁকে তার পিঠের খানিকটে দেখা যায়। সন্ধ্যার সময়ে অন্ধকারে যখন অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, হেমাঙ্গিনী চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে হাতটা বাড়িয়ে পাশের স্বইচটা টিপে দিয়ে যায়।

সংসারের কোথাও কিছু বেঠিক আছে, হেমাঙ্গিনীর ব্যবহারে তার এতটুকু আভাস নেই। তার এই নিতান্ত সাদা চালে কুমুদের অসহিষ্ণুতা বেড়ে চলেছে। সুরমার শোক তারই জন্ম প্রতিদিন সে একটু একটু ক'রে দৃঢ় করেছে। সেই শোকের গৌরবে সে মশ্‌গুল। সে তার প্রথম প্রণয়ের ওপর একনিষ্ঠতার নিশান উড়িয়ে তারই পরাভবের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হয়ে বসেচে। তাকে সস্তায় জয় করা চলবে না। তার ওপর সুরেশ তাকে ঠকিয়েছে—সুরমার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর মিল নেই। সুতরাং তার চেষ্টা হবে প্রাণপণ, তপস্যা গৌরীর তপস্যাকে ছাড়িয়ে উঠবে, তবে সুরমার শূন্য সিংহাসনে তা'র অধিকার।

কিন্তু তপস্বিনীর সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। সে ঘর-গেরস্তালী, ভাঁড়ার, রান্না ধোপা কাপড় সেরে অবসর-মত হয় চিঠি লেখে নতুবা এটা ওটা বই পড়ে। মাঝে মাঝে অত্যন্ত সন্তর্পণে এসরাজে গুন্ গুন্ করে রাগিণী আলাপ করে।

***

সুরমার স্মৃতিতে যে ছায়া পড়েছে, কুমুদ প্রবল উদ্যমের সঙ্গে তা মুছে ফেলবার জন্ম প্রস্তুত হ'ল। ভ্রমসংশোধন। সুযোগও অনুকূল হ'ল। গুরুদেব তীর্থপর্য্যটন ক'রে এই সময়ে এলেন নূতন শিষ্যের বাড়ীতে।

গুরুদেব আত্মার অমরত্ব ও দাম্পত্য সম্বন্ধের জন্ম-জন্মান্তরের গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে একটা উপদেশ দিয়েছেন। কুমুদের সেটা ভারি মনে ধরেচে। হৃদয়ঙ্গম করেচে সুরমার আত্মার সঙ্গে মিলন শুধু সাধনাসাপেক্ষ। সুরমার ছবিগুলি নূতন করে ঝাড়ামোছা হল। ফুল-সাইজ ছবির ক্ষণিক অনাদর দ্বিগুণ যত্নে ডুবে গেল। কুমুদের শয্যা হল সেই ছবির সম্মুখে—মেঝেতে। কঠোর সাধনার জন্ম কুমুদ প্রস্তুত হতে লাগল। এ সাধনাতেও গুরুর দীক্ষা চাই। সেজন্ম তিথি লগ্নের বিচার চল্‌ছে।

কুমুদ স্বকৃত ভ্রমের জন্ম অনুতাপের সঙ্গে গুরুদেবের কাছে অশ্রুবর্ষণ করেছে। সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছেন,—ভ্রম হয়েছে বটে। মানুষ মায়ার দাস। আপনার পাপ আপনার কর্ম্ম দ্বারাই ক্ষালিত হবে। তোমার আত্মা ক্ষণিক মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। সুরমা-মা ত তোমাকে কখ্‌খন ত্যাগ করেন নি।

সুরমার ও কুমুদের কোষ্ঠী মিলিয়ে দেখেছেন, সুরমা পূর্ব্বজন্মেও তার পত্নী ছিল। এবং এই জন্মে তাকে পতিরূপে লাভ করবার জন্ম সেই জন্মেই কঠোর সাবিত্রী-যজ্ঞ সম্পন্ন করে রেখেছিল।

কুমুদ ভ্রমসংশোধনে একাগ্রচিত্তে তৎপর হ'ল। নানা অনুষ্ঠানে সাধনা সুরু হ'ল। সেই তাণ্ডব যজ্ঞের উত্তর-সাধক গুরুদেব, আহুতি হেমাঙ্গিনী। দুর্দয় মনের কোনও কোণে অতর্কিতে প্রবেশ করে না সাধনাচ্যুত করে, সেজন্ম আয়োজনের সীমা নেই।

শয়ন-ঘরের ছবিটার ঝাড়পোঁছ কুমুদ স্বহস্তে করে, ভৃত্যের উপর হুকুম,—যখন ঘরে না থাক্‌ব, দরজা বন্ধ করে রাখবি।

পাশের ঘরে শুয়ে হেমাঙ্গিনী শুন্‌তে পায়। বাঁ-হাতে কপালের উপরকার চুল ধীরে ধীরে পিছনের দিকে টান্‌তে টান্‌তে ফিরে শোয়। ছুটির দিনে কুমুদ সারা দুপুর ওঘরে টুকটাক এটা-ওটা-সেটা করে। এঘরে তার শব্দ আসে। বিছানায় শুয়ে বুকের নীচে বালিশ দিয়ে পা নাড়তে নাড়তে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে।

সম্প্রতি কুমুদের দিনের বেলায় গুরুদেবের পদসেবা আর রাত্রিবেলায় সুরমার ছবির সম্মুখে ধ্যান চলেছে। কঠোর সাধনা। জন্মজন্মান্তরের দাম্পত্য প্রেমে মৃত্যুর ব্যবধান নেই। গুরুদেব পন্থা নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। নির্ভুলে পালন করলে সুরমাকে ধরা দিতেই হবে।

কাণ্ডকারখানা দেখে এবং বৌয়ের মুখ চেয়ে পিসিমা

আহারনিদ্রা একরকম ত্যাগ করেছেন। যতীন কুমুদের একনিষ্ঠতা মনে মনে শ্রদ্ধা করে। গুরুদেব যখন না থাকেন সেই ফাঁকে এসে কুমুদের সঙ্গে একটু-আধটু সাক্ষাৎ করে যায়। বাড়ীর ভেতরে ঘেঁসে না। সুরেশ নিত্য আসে। ওঘরে কুমুদের সঙ্গে তার পাগলামি নিয়ে তর্ক থেকে তুমল ঝগড়া করে রাগে গম্ গম্ করে। যখন ভেতরে আসে, হেমাঙ্গিনী তার ক্রুদ্ধ গাম্ভীর্য্যের গায়ে পরিমিত তরল রহস্যের হাল্কা হাওয়া লাগায়। চায়েতে খাবারে আপ্যায়ন করে অত্যন্ত বাজে গল্প ফাঁদে। হঠাৎ পিসিমা এসে একটা ভূমিকা সুরু করেন। হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হয়ে নিপুণতার সঙ্গে সেইখানেই সেটা চাপা দেয়। পিসিমা টের পান না। সুরেশ বুঝ্তে পারে। এক সময়ে উঠে পড়ে বলে,—উঠি বৌঠান!

***

আসছে পঁচিশে সুরমার মৃত্যুর তারিখ। বিশেষ করে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হবে। গুরুদেব স্বয়ং পৌরহিত্য করবেন। সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিক রকমের একটা উৎসব ঘটার সঙ্গে সম্পন্ন হবে। তার আয়োজন চলছে। যতীনের সঙ্গে উৎসবের দিকটা নিয়ে একটা আলোচনা হয়েছিল। সুরেশ তার কাছ থেকে খবর পেয়ে এসে কুমুদকে একান্ত মিনতি করে বল্লে,—দোহাই তোমার, এ পাগলামিটা আর কর' না। তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেল?

কুমুদ বল্লে,—তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ? কত না বলেছিলে এর মাঝে তাকেই পাওয়া যাবে? আর মাঝেটাঝে না। এর মাঝে তার আভাসও নেই। আমি তাকেই ফিরে পেতে চাই। এই বলে' প্রথম প্রণয় এবং দাম্পত্য সম্বন্ধে গুরুদেবের উক্তির খানিকটে আবৃত্তি করলে।

সুরেশ নির্ব্বাক হয়ে রইল। যে মানুষ গম্ভীরভাবে এহেন প্রলাপ নিষ্ঠার সঙ্গে বল্‌তে পারে, তাকে বল্‌বার কি-ই বা থাকে?

রাগের সঙ্গে বল্লে,—তোমার প্রথম ভালবাসা বেঁচে থাক্, অমর হোক। কিন্তু এগুলি তুমি বাদ দাও। মেয়েটার বয়েস হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। তাকে এমন করে করে অপমান কর' না। সুরমার গলা অক্ষয় বেষ্টনে আঁকড়ে থাক। কিন্তু তা নিয়ে উৎসবটুৎসবগুলো আর কর' না।

যতীন বলে,—যাই বল সুরেশ, এমন দেখা যায় না। কুমুদের প্রিন্সিপল্ আছে। লোকটা প্রেমের গোঁড়া।

সুরেশ রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তেও হেসে বল্লে, "সত্যি এমন দেখা যায় না। ওরিজিন্যাল্!" দাঁতে দাঁত চেপে বল্লে—ননসেন্স।

ওদিকে মৃত্যুপারের প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলনের গুহ্য পথের সন্ধানে নিগূঢ় সাধনা চলেছে। যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র সমস্ত বাড়ীর উপরে যেন মরণলোকের ছায়া বিস্তার করেছে। বাড়ী যেন পাতালপুরী। বাতাস উঠেছে ভারি হয়ে। হেমাঙ্গিনীর নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট বোধ হয়।

দ্বিপ্রহরে চারিদিক যখন স্তব্ধ হয়ে আসে, রাস্তায় রোদ প্রখর হয়ে ওঠে, লোকচলাচল কমে আসে, সমস্ত সহর গুম্ মেরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে আপন কাজে মগ্ন হয়ে যায়, হেমাঙ্গিনী বিছানায় পড়ে চোখ বুজে বিশ্রাম করে। হঠাৎ রুক্ষ শব্দে ঝাঁঝ বাজিয়ে বাসনওয়ালা হেঁকে ওঠে, —থালা ঘটি বাটি—। ক্লান্ত ঘোড়া শিথিল পায়ে খপ্ খপ্ করে দৌড়য়। সামনের বাড়ীর দেয়ালে বেধে রোদ যেন ফিন্‌কি দিয়ে এসে পড়ে। হেমাঙ্গিনী আপন মনে বলে,—কি গরম!

বাড়ীটা কি ফাঁকা! আত্মীয়স্বজন, ছেলেপিলের কোলাহল কলরব কিছু নেই। এক বুড়ো পিসিমা। হঠাৎ তার মনে হয়, আগের বৌয়ের একটা ছেলে থাক্‌ত!

হেমাঙ্গিনী পাশ ফিরে শোয়। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের নানা রকম বিচিত্র শব্দ নিকট দূর হতে কানে আসে। মনটা অনেক দূর, অজানা পথঘাট, না-দেখা সাগর পার হয়ে বিদেশী সহরের অচেনা পল্লীতে চেনা মুখে উঁকি মেরে আসে। এক বচ্ছর হল বিমলের চিঠি আসে না।

***

চার বছর আগে পুরীর সমুদ্রতীরে এক সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্যের আবেশ তখনও জলে আকাশে লেগে রয়েছে, এমনি সময়ে বাতাস ওঠে ক্ষিপ্ত হয়ে। বালির ঝাপটে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। নিজেকে সামলে

পথ চলা কঠিন। সেই দুর্দৈবের মাঝে বিমলের প্রথম পরিচয় পরম ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। রাত ধরে হেমাঙ্গিনীকে বাড়ী পৌঁছে দিতে হয়েছিল।

সেই থেকে দূরত্ব যতই হোক, সংযোগ আর বিচ্ছিন্ন হতে পায় নি। বিমল দার্জ্জিলিং থেকে বহু অধ্যবসায়ে ভোটানী কিউরিও সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে, কাশ্মীর থেকে লিখেছে প্রাকৃতিক বর্ণনা, সঙ্গে দিয়েছে নিজের হাতে তোলা ফোটোগ্রাফ। জন্মদিনে শুভ ইচ্ছা, বিজয়ায় সম্ভাষণ, পরীক্ষার সুফলে অভিনন্দন কখনও কোনও সুযোগ ত্যাগ করে নি। হেমাঙ্গিনী প্রত্যুত্তরে কখনও কিছু বলেছে, কখনও বা বলেনি, সেজন্য প্রচ্ছন্ন অভিমানের সঙ্গে অভিযোগ করতে বিমল ছাড়েনি। হেমাঙ্গিনীর পিতার কাছে স্নেহ, মাতার কাছে আদর পেয়েছে, শুধু তার কাছে যথেষ্ট প্রশ্রয় পায়নি। ভাবে ইঙ্গিতে আপন অন্তরের অনুভূতিতে ঝঙ্কার উঠেছে। কিন্তু কাছে এসে সুনিশ্চিত হতে পায় নি—খানিকটা দূরেই হেমাঙ্গিনীর অবিচল সংযমের দৃঢ় বাঁধ। এই অনিশ্চয়তার বিজয় অভিযান ক্ষান্ত হতে পারে নি।

যখন দুই পক্ষেরই বন্ধু-মহলে দুইজনের নাম একত্র করে উল্লসিত কানাকানি উঠেছে এমনি সময়ে বিমল বিলাতযাত্রার উদ্যোগ করল। হেমাঙ্গিনীর পিতামাতা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। এমন কি তার মা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, বিমলের বিলেত যাওয়ার সংবাদ ঠিক কি না। মেয়ে জানালে, সে ঠিক জানে না। তবে যাবার জন্য চেষ্টা করছিলেন বটে। বিমলের বিলেত যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশী সম্ভাবনা যায় সেটা বিলেত যাবার আগে ঘটাই সকলে আশা করছিল।

যাবার সময় যখন ঘনিয়ে এল, হেমাঙ্গিনী তখন রাজসাহীতে বাপের কাছে। বিমল যাত্রার দুইদিন আগে সেখানে গিয়ে হাজির। বিদায় নেবার আগে এক সুযোগে অবরুদ্ধ কণ্ঠে মিনতি করে হেমাঙ্গিনীর কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় করে নিলে, ডাকে ডাকে তাকে চিঠি লিখবে। হেমাঙ্গিনী বিস্মিত হল, কিন্তু অস্বীকার করতে পারলে না।

আশা-আশঙ্কায় কটা দিন কেটে যাবার পরে বিমলের প্রথম চিঠি এল ফরাসী বন্দর থেকে। তা'তে সমুদ্রকে মরুভূমি বলে' বর্ণনা করা। আকাশে বাতাসে বেদনার সুর, অগ্রসর হবার পথ অন্ধকার, আলো পেছনে, পা বাড়াতে মন সরে না। দিনরাত্রি শূন্য শূন্য শূন্য।

হেমাঙ্গিনী ভেবে ভেবে উৎসাহ দিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিলে। সেই থেকে চিঠির বিরাম ছিল না। বছরখানেক দেড়েক বিচ্ছেদের ঢালুতট বেয়ে নিরুদ্ধ আবেগের প্রস্রবণ হেমাঙ্গিনীকে ডুবিয়ে দিয়েছে। তার একান্ত স্বাভাবিক দৃঢ়তার ফলে ভাসিয়ে নিতে পারেনি।

ক্রমে নিজের থেকে দেশের দশের সমাজের আবহাওয়ায় চোখ পড়ল। নূতন দেশ, নূতন দৃশ্য, নূতন মানুষের বর্ণনা অতিক্রম করে করে চিঠি এসে ঠেকল নূতন সহপাঠিনীর পরিচয়ে। মেলের পর মেলে সে পরিচয়ের বর্ণনায় বিমলের লেখনীতে উৎসাহের দমকা হাওয়া লাগে। তার অসাধারণ রূপের সঙ্গে অসামান্য দাক্ষিণ্য উদারতা এবং সর্ব্বশেষে সৌহার্দ্দের ইতিহাস ক্রমে ক্রমে এসে পৌঁছল। এমন দেখা যায় না। ছেঁড়া মোজার সেলাই কাটতে-না-কাটতে তার নজরে পড়ে, যত্ন করে সেলাই ক'রে দেয়। খাবার জন্য জিদের অন্ত নেই—নতুবা শরীর টিঁকবে কেন? বেশী না খেয়ে উপায় নেই। একদিন বিমলের মাথা ধরেছিল, ইউক্যালিপ্‌টাস্ তেলে ভেজা রুমাল তার নাকে ধ'রে এক ভাবে কুড়ি মিনিট বসেছিল। বিমল কত বলেছে, কিন্তু নড়েনি। অসাধারণ ধৈর্য্য, অদ্ভুত সেবাপরায়ণতা। এই সেবা-সৌহার্দ্দের চোরাবালিতে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ চিঠিপত্র তলিয়ে গেছে বছরখানেক হতে চলল। ইতিমধ্যে হেমাঙ্গিনীর পিতার মৃত্যু হয়েছে। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী মায়ের তৎপরতায় ও চেষ্টায় মামাদের সাহায্যে হেমাঙ্গিনীর বিয়ে হয়েছে। এবং তারপর কত কি-ই হয়ে চলেছে।

অগ্নিবর্ষী দ্বিপ্রহরে নিমীলিত চক্ষে আপন ভাগ্যের এলোমেলো ইতিহাসে চোখ বুলোতে বুলোতে হেমাঙ্গিনীর হঠাৎ মনে হ'ল, এতদিনে হয় ত বিমলবাবু ফিরে এসেছেন।

হয় ত কলকাতারই য়ুনিভার্সিটিতে পড়ান। ইনি ত কোন্ কলেজে পড়ান? সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, এঁর সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে নাকি?

অসহ্য গরমে উঠে বসল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে চেয়ে মনে মনে বললে, বাপ্ রে, এই আগুনে মানুষ বাঁচে। মাকে দেখে এলে হয় একবার।

*
* *

সামনে একটা খবরের কাগজ খুলে জানালার বাইরে বিকেল বেলায় পড়ন্ত রোদের দিকে চেয়ে কুমুদ চুপ করে বসেছিল। দীর্ঘ বিধিপালনের পরে গত কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রির দ্বিপ্রহরে সুরমার আত্মার আবির্ভাব হবে গুরুদেব বলেছিলেন। ছবির মুখেই সুরমা কথা কইবে। গুরুদেবের নির্দ্দেশ মত বহুবিধ ক্রিয়া-প্রক্রিয়াদি করে তাঁর পঠিত মন্ত্রে সুরমার আত্মার আবাহন করে ছবির মুখের প্রতি একাগ্রদৃষ্টিতে চেয়েছিল, কিন্তু কথা শুনতে পায়নি। মাঝে মাঝে গুরুদেব বলেছেন, ঠোঁট নড়ছে, কুমুদ প্রাণপণে উৎকর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ফোটে নি। ভোররাত্রির দিকে গুরুদেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন,—বাড়ীতে নিশ্চয়ই কোনও বিরুদ্ধ স্থূল আত্মা বাসা বেঁধেছে। পরদিন তিনি তীর্থে বেরিয়েছেন—তাঁর যোগবলের যে ক্ষয় হয়েছে তারই কথঞ্চিৎ পূরণ করবার জন্য। কথা আছে যখন যেখানে থাকেন জানাবেন এবং সময় হলেই আসবেন।

বাড়ীতে বিঘ্ন বাসা নিয়েছে, এখনও সময় আসে নি, এই সমস্যা আঁকড়ে কুমুদের মন যেন গা ছেড়ে দিয়ে একটু নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মৃত্যুপারের প্রেয়সীকে এপারে এনে তার কথা শোনবার জন্য যে জপতপ কৃচ্ছ্র সাধনের রকমারি বিধি, দীর্ঘকালের রোগীর মত তা পালন করবার উৎসাহ আর নেই। মনের ইঙ্গিতে একনিষ্ঠতার বাষ্প আর শক্তি যুগিয়ে উঠতে পারছে না। দেহমন কেমন যেন একটা ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। অথচ তার গুমোর ঘোচে না। যার সুনিশ্চিত আক্রমণ থেকে পূর্ব্ব প্রণয়কে রক্ষা করতে একনিষ্ঠতার এই ব্যূহ রচনা, তার সেদিকে খেয়ালই নেই। দুনিয়ায় কোথাও যেন এতটুকু কিছু ঘটছে না। নীরবে এতবড় কঠিন বিদ্রূপ। একটা নিষ্ফল রোষ অতি গোপনে কুমুদের মনে কিছুদিন থেকে গুমরে ফিরছে।

কাগজটা টেনে নিলে। ওঘর থেকে হেমাঙ্গিনীর সেলাইয়ের কলের ঘর্ঘর্ আওয়াজ আসছে। কুমুদের মনে পড়েও পড়ছে না, কি যেন একটা কাজ ছিল তার ওঘরে। ভূতো এসে একটা মোটা খাম দিয়ে অন্য হাতে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে জানালো, পিওন সহি চায়। কুমুদ দেখলে রেজেষ্ট্রী করা একটা বড় খামে ভারি চিঠি—হেমাঙ্গিনীর নামে তার মামাবাড়ীর ঠিকানা থেকে রিডাইরেক্‌ট হয়ে এসেছে। টিকিটে লণ্ডনের ছাপ, নামের গোড়ায় লেখা মিস্! কুমুদ অবাক্ হয়ে বার বার নেড়েচেড়ে খামটা দেখলে। রোদের দিকে চোখের সামনে ধরে ভিতরের রহস্যের একটু আভাস পেতে চেষ্টা করল—কিছুই দেখা যায় না। দারুণ কৌতূহলে মনে হচ্ছে খুলেই ফেলা যাক্। হঠাৎ নজরে পড়লো ভূতো হাঁ করে চেয়ে দেখ্‌ছে। ভ্রূ কুঁচকে তাড়াতাড়ি কাগজটায় নাম সই করে বললে,—পিওনকে দে, আর এটা ওঘরে দিয়ে আয়। এখানে নিয়ে এসেছিস্ কেন?

ওধারের বাড়ীর আড়ালে সূর্য্য হেলে পড়ল। দুই পাশের গগনভেদী বাড়ীর মাঝের সঙ্কীর্ণ রাস্তার অন্ধকূপে অপরাহ্নের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। শুধু সূর্য্যমুখো পশ্চিমের দ্বিতল ত্রিতল বাড়ীগুলির মাথায় মাথায় নিস্তেজ রৌদ্রের রঙীন্ আলো ঝলমল করছে। রাস্তার চঞ্চলতা বেড়ে উঠেছে। লোক-চলাচল গাড়ীঘোড়ার শব্দে ঝিমন্ত সহর যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

সারা বাড়ী নিস্তব্ধ। পিসিমা হয় ত তাঁর হরিনামের মালায় নিমগ্ন, হেমাঙ্গিনীর সেলাইয়ের কলের শব্দ থেমে গেছে, বোধ হয় সে সদ্য আগত ডাকে নিবিষ্টচিত্ত। আড্ডা অনেক দিন হ'ল ভেঙে গেছে। সুরেশ আর আসে না, যতীন অমিয়াকে নিয়ে পাহাড়ে বেড়াতে গেছে। একলা ঘরে জানালার বাইরে চেয়ে চেয়ে কুমুদের মনে হতে লাগল শব্দ-মুখরিত বহির্জগতের আড়ালে তাদের বাড়ীটা যেন চোখ বুজে কান এঁটে পড়ে আছে।

উঠে ধীরে ধীরে উপরে চলল। একবার হেমাঙ্গিনীর

ঘরে যাওয়া দরকার। ঐ ঘরে কোন্ দেরাজে সুরমার লেখা ক'খানা চিঠি আছে। তারিখ হিসেবে নম্বর ফেলে মরক্কো লেদারে বাঁধাই ক'রে সোনার জলে নাম লেখা হবে ব'লে সেগুলি সংগ্রহ করবার কথা হয়েছিল অনেক দিন আগে। হঠাৎ সে কথা মনে হ'ল।

দরজার সামনে বাইরে একটু দাঁড়াল। ভিতরে মেঝের যতটুকু দেখা যাচ্ছে হেমাঙ্গিনী নাই। খোলা কল সেলাইয়ের কাপড় সমেত নীচের কার্পেটের ওপর তখনও পড়ে, তোলা হয় নি। হয় ত সেলাইকারিণী অন্য কোথাও গেছে। কুমুদ চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে ঘরের ওদিকে চেয়ে দেখে প্রশস্ত পালঙ্কের বিস্তৃত বিছানায় হেমাঙ্গিনী দুই হাতের উপর মাথাটা কাৎ করে রেখে চোখ বুজে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সামনে চিবুকের নীচে খোলা দীর্ঘ চিঠি এবং তার পাশেই সাহেবী পোষাকে এক যুবকের বাষ্ট ফোটো, পশ্চিমের জানালা দিয়ে শেষ সূর্য্যরশ্মি পড়ে রক্তিম আভায় ঝকমক করছে। নীচের কোণে কাৎ ক'রে বাংলায় লেখা, তোমার অযোগ্য– শেষটা হেমাঙ্গিনীর কনুয়ের নীচেয় অদৃশ্য হয়ে গেছে। হেমাঙ্গিনীর বাঁ চোখের নীচেয় নাকের কোণে এক ফোঁটা জলের দাগ চক্ চক্ করছে এবং পাতলা ঠোঁট দু'খানি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে

কুমুদের মন একটা প্রবল ধাক্কায় ধপ্ ক'রে উঠল— এ পক্ষেও ছবি! তারই সামনে এমন করে লুটিয়ে পড়ে নীরবে এই অশ্রুবর্ষণ! সুরমার ছবিতে সে যত দামী ফুলের মালা পরিয়েছে, ধূপ দীপ আলো দিয়ে সাজিয়েছে, তা সমস্ত ছাপিয়ে এই ছবির ওপর বর্ষিতপ্রায় ঐ অশ্রুবিন্দু কেমন যেন চকচক্ করতে লাগল। রক্ত যেন উন্মত্ত বেগে মাথায় গিয়ে পাক খেয়ে উঠল। চীৎকার করে ডাক দিলে,—হেমাঙ্গিনী!

***

কুমুদ রুদ্ধনিঃশ্বাসে চিঠিখানা দুই-তিনবার পড়ল— হেমাঙ্গিনী দূরে জানালার গরাদ ধ'রে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমুদ যতই মাথা ঠাণ্ডা ক'রে অভিনিবেশ সহকারে পড়তে যায়, চিঠির ভাষা ততই যেন দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে। বক্তব্য কোথাও পরিষ্কার নয়, আগাগোড়া শুধু একটা সুস্পষ্ট আভাস। কি একটা ক্ষণিক মোহের ভ্রমে ধ্রুব আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, আলেয়া উঠেছিল আলো ছাপিয়ে। তারই জন্য পাতার পর পাতা বেয়ে অকপট অনুতাপের সঙ্গে অতি করুণ অশ্রুর বন্যা চলেছে, এবং কাতর মিনতির সঙ্গে বারংবার মার্জ্জনা ভিক্ষা করে, এই বলে' সমাপ্ত করা আছে,—যদি না মেলে সমুদ্রের গভীর জলে শান্তি মিল্‌বে।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করল,—ইনি তোমাদের কে?

হেমাঙ্গিনী জানালায় মাথা ঠেকিয়ে তখনও দাঁড়িয়েই ছিল। বাইরের দিকে চেয়েই আস্তে জবাব দিল— কেউ না।

কুমুদ সারারাত্রি জাগরণে কাটাল। তার চঞ্চল পদবিক্ষেপের শব্দে ব্যস্ত হয়ে পিসিমা বার বার রুদ্ধ দরজায় নিষ্ফল করাঘাত করে ফিরে গেছেন। কুমুদের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে যেন আগুন ছোটে। বাংলা দেশের পুরুষকুলে সেই একমাত্র স্বামী যা'র স্ত্রীর ক্ষমা না পেলে তার কুমারী-কালের বন্ধুর সমুদ্রের গভীর তল ছাড়া পৃথিবীর কোথাও শান্তি নেই। এ মরণের ওপার থেকে সূক্ষ্ম আত্মার আবাহন নয়, জীবনের এপারে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের ক্ষমাভিক্ষা। সেই হৃদয়ের অজস্র করুণা একটি মাত্র অশ্রুবিন্দুতে সুদীর্ঘ কালের বেদনার পরে উদ্যত হয়ে রইল। মূক ছবির নীরব ক্ষমাভিক্ষা এবং রোরুদ্যমান ঠোঁটের ঈষৎ কম্পন তার মাথার ভিতর দিয়ে দুম্‌দুম্ শব্দে কেবলি যেন সমুদ্র পারাপার করতে লাগল। প্রথম পাখীর ডাকে কুমুদ চমকে উঠল, পুরুষ-সমাজে সে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? ছুটে গিয়ে হেমাঙ্গিনীর রুদ্ধ দ্বারে জোরে ধাক্কা দিয়ে ডাক দিল।

আস্তে দরজা খুলে হেমাঙ্গিনী কপাট ধ'রে দাঁড়াল। কুমুদ কিছু বলবার আগেই মৃদু কণ্ঠে বল্‌লে,—মা আছেন এলাহাবাদে। একবার দেখতে যাবো।

***

কুমুদের জন্য আবার পাত্রী সন্ধান চল্‌ছে। এবারে ক'নে নির্ব্বাচনের ভার নিয়েছেন স্বয়ং গুরুদেব। বয়েস হবে বন্ধুর ফাঁড়া বাঁচিয়ে এবং কর‌কোষ্ঠীতে পূর্ব্বতন তিন জন্মের ইতিহাসে বন্ধুর স্থান শূন্য থাকা চাই।

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল

সাহিত্য স্থির নয়। যুগে যুগে সাহিত্য নব নব রূপ ধারণ করে। নিত্যই সে নব-কলেবর পরিগ্রহ করিয়া অ-পূর্ব্ব বৈচিত্র্যে অভিব্যক্ত হইয়া ওঠে। চিরপ্রবহমান মানবজীবন যাহার অবলম্বন সেই আবেগশীল সাহিত্য অচল হইয়া থাকিবে কেমন করিয়া? সাহিত্যের গতি আছে।

সাহিত্যের গতি আছে, বেগ আছে, চাঞ্চল্য আছে, ইহা যেমন সত্য, এ কথা তেমনই সত্য যে সাহিত্যের একটি অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতি আছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে এ প্রকৃতির রূপান্তর নাই, বিকার নাই, বৈলক্ষণ্য নাই। চিরন্তন মানবের হৃদয়ের রসে, শাশ্বত আনন্দ-বেদনায় ইহার প্রতিষ্ঠা।—

বিগত বর্ষের বৈশাখ মাসে রামমোহন লাইব্রেরী হলে 'সাহিত্যে আধুনিকতা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ছিলেন সভাপতি। পরে 'বিচিত্রা'য় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। পত্রান্তরে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাহার আলোচনা করেন। সেই প্রবন্ধ শেষ করিয়াছিলাম এই ধরণের কথা দিয়া, সেই কথা দিয়াই আজিকার আলোচনা আরম্ভ করিতেছি।

উপরের উক্তিটি বিশদ করিয়া বলিবার পূর্ব্বে সাহিত্য শব্দটির প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা বলিয়া লইতে হয়।

যে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে মানুষের ভাষা স্ফূর্ত্ত হইয়াছে, সেই আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতাতেই সাহিত্যের সৃষ্টি। মানুষ আপনাকে ব্যক্ত করিতে চায়। আপনার কাছে আপনি ব্যক্ত হইয়া তাহার তৃপ্তি নাই। সে পরকে আপনার কথা শুনাইতে চায়, জানাইতে চায়, বুঝাইতে চায়। পর আমার কথা ভাল করিয়া বুঝিল কি না, সে আমার কথা আনন্দসহকারে গ্রহণ করিল কি না, হৃদয়ের এই আগ্রহেই আর্টের উৎপত্তি। আর্ট হইতেছে প্রকাশের সৌষ্ঠব, প্রকাশের সৌন্দর্য্য। অর্থাৎ, আর্ট হইতেছে প্রকাশের সেই কৌশল যাহা শুধু নিজের নয় পরেরও পরিতোষ বিধান করে।

দর্শন বিজ্ঞান বিচার-বিশ্লেষণের জিনিষ, বুদ্ধির ফল, —হৃদয়ের সামগ্রী নয়। এই দর্শন বিজ্ঞানের কথাও কোন-কোন অবস্থায় সাহিত্য হইয়া পড়ে। সে কখন? হাক্সলীর বৈজ্ঞানিকী কথা বা রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিকী কথা পড়িয়া আমরা আনন্দ পাই এই জন্য যে হাক্সলী বা রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার প্রকাশ-সৌন্দর্য্য আমাদের মনের তৃপ্তিবিধান করে।

যেখানে রচনা আর্টে পরিণত হইয়াছে, কি-না যেখানে বিষয়-বস্তু ছাড়িয়া দিয়া প্রকাশ-সৌন্দর্য্যে মাত্র আমরা মুগ্ধ হই, লেখা সেইখানেই সাহিত্য। সাহিত্য কথাটা সচরাচর আমরা এইভাবে ব্যবহার করি। ইহা হইতেছে সাহিত্যের সাধারণ ধারণা। ইংরেজী literature কথাটিও এই রকম ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিচার করিয়া দেখিতে গেলে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব সাহিত্যের সহিত হৃদয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ। মানসিক অনুভূতিই সাহিত্যের প্রাণ। কবির মনোভাব রচনার ভিতর দিয়া পাঠকের অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ করে।

কবির মনোভাবের কথা কেন বলিলাম? রচনার বিষয়গত বস্তু কি পাঠকের মনকে আন্দোলিত করে না? বর্ণিত বস্তু বা আলোচিত বিষয়টিকে আমরা সাহিত্যের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে পাই না। কবির প্রতীতি এবং অনুভূতির ভিতর দিয়া আমরা তাহা লাভ করি। যেটি যাহা সেটি ঠিক তাহাই, তাহার এতটুকু বেশীও নয় এতটুকু কমও নয়, এমনভাবের অরূপান্তরিত জিনিষ ত আর আমরা সাহিত্যের মধ্যে পাই না। বিজ্ঞান বা দর্শনে চাই একান্তভাবে আদি অকৃত্রিম বস্তুটি। কিন্তু সাহিত্যে এমন অঘটন ঘটে না। কবির মনোভাবের ভিতর দিয়া

সাহিত্যের বিষয়বস্তু দেখি, তাই সকল সাহিত্য কবির হৃদয়ের রাগে রঞ্জিত হইয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়। কবির হৃদয়ের স্পর্শে আমাদের চিত্তবৃত্তিও উন্মুখ হইয়া উঠে। কিন্তু সে উন্মুখীনতাও আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তির অনুযায়ী। বাহিরের বস্তু বা ভাব মনের সংস্পর্শে আসিলে উপভোগের মধ্য দিয়া কবির অন্তরেন্দ্রিয় যে আস্বাদ লাভ করে, তাহারই অনুরূপ আস্বাদ পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইয়া যায়। তাই বিষয়বস্তু নিজে নয়, কিন্তু বিষয়বস্তু সম্পর্কে কবির মনোভাবই সাহিত্যের প্রধান জিনিষ। ইতিহাসের যেটুকু তথ্যের যথাযথ বিবৃতি অথবা উপকরণের যথোপযুক্ত বিন্যাস সেটুকু সাহিত্য নয়, তাহার যতটুকু ঐতিহাসিকের বিশেষ দৃষ্টির আলোকে আলোকিত ততটুকুই সাহিত্য। জার্মান ইতিবৃত্ত লেখকেরা বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক মাত্র, ম্যাস্পেরো বা গিবন একাধারে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক।

অতএব প্রকৃত সাহিত্য কবির মনোভাবে রূপায়িত, আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে, রসে প্রতিষ্ঠিত। তাই কাব্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতি হৃদয়প্রধান রচনাই সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য। রস-সাহিত্যের রস কথাটি বাহুল্য মাত্র, রস না থাকিলে রচনা আর যাহাই হোক, সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে না। সাহিত্যের ইহাই সঙ্কীর্ণ অর্থ। ইংরেজিতেই হোক আর বাংলাতেই হোক, এখন সাহিত্যের অর্থের এতটা আঁটাআঁটি নাই, আজকাল একটু শিথিলভাবেই কথাটা ব্যবহৃত হয়। সুলিখিত সুব্যক্ত সুচারু রচনাই সাহিত্য। সাহিত্যের ইহাই ব্যাপক অর্থ।

প্রবন্ধ নিবন্ধ সমালোচনা প্রভৃতি রচনার স্থান কোথায়? বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া যাহা লিখিত হয়, তাহা বুদ্ধির উপর, যুক্তির উপর, জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন একটি সমগ্র জিনিষ। অনুভূতি বুদ্ধি ও কামনাকে একান্তভাবে পৃথক করা যায় না। বুঝিবার এবং বুঝাইবার সুবিধার জন্য মনের এক-এক দিককে পৃথকভাবে দেখানো চলে, কিন্তু খণ্ড করা চলে না। তবে মোটামুটিভাবে বুদ্ধি ও হৃদয়কে স্বতন্ত্র করিয়া ধরিয়া নিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

বিচারপ্রধান রচনায় হৃদয়ের আধিপত্য নাই। তবুও প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যে এবং সৌন্দর্য্যে এরূপ রচনা যে প্রীতিকর হইয়া উঠে, তাহা বার্টাণ্ড রাসেল, বার্ণার্ড শ, ম্যাথু আর্ণল্ড অথবা বীরবলের প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারি। বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইলেও বিচারনৈপুণ্যে এবং রচনার প্রাঞ্জলতায় গিরীন্দ্রশেখরের 'স্বপ্ন' আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। এইরূপ আলোচনায়—রচনার রীতি,কৌতূহল মিটাইবার শক্তি ও কৌশল, বাক্যের বিন্যাস এবং বিষয়ের সংস্থান-পদ্ধতিতে আমরা তৃপ্তিবোধ করি। হৃদয়ের যোগ এইটুকু। এখানে রচনা ব্যাপক অর্থে সাহিত্য।

প্রয়োজন-মত সাহিত্যের অর্থকে টানিয়া না বাড়াইয়া আমরা বলিতে পারি, সাহিত্যের দুটি বড় বড় বিভাগ আছে— রস-সাহিত্য ও জ্ঞান-সাহিত্য। হৃদয়প্রধান রচনা রস-সাহিত্যের এবং বিচারপ্রধান অর্থাৎ বুদ্ধিমূলক রচনা জ্ঞান-সাহিত্যের অন্তর্গত।

প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনাকে সাহিত্য বলা হয় কেন, কি-হিসাবে এবং কতটা-পরিমাণেই বা ইহারা সাহিত্য, রস-সাহিত্যের অন্তর্গত না হইলেও ইহারা যে জ্ঞান-সাহিত্য বটে, বাংলায় আমিই বোধ হয় প্রথম সে কথা পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করি। তারপর এ-কথা আরও কেহ-কেহ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরেজী সমালোচনা-গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে কোন মতামত পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াও ত আমার জানা নাই।

সম্প্রতি আমরা জ্ঞান-সাহিত্যের আলোচনা করিব না, রসসাহিত্যের কথাই বলিব। গদ্য ও কাব্য দুই-ই রস-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কাব্যকথার বহু আলোচনা হইয়া গেছে, আজ কেবল কথা-সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। বাস্তববাদ হইতেছে সাহিত্যের উপকরণ লইয়া তর্ক। বাস্তববাদীদের মনের কথা এই, সংসারে যাহা কিছু ঘটে, যাহা তথ্য, জীবনযাত্রার পথে যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিষয়। মনের জিনিষ মায়া মাত্র। কল্পনা অলীক। তাহা স্বপ্ন সৃষ্টি করে; প্রাণকে জাগায় না। বাস্তব-সাহিত্য মনকে নাড়া দেয়, সজাগ করে, সতর্ক করে। অতএব সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে বাস্তবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে;

বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবের আদর না করিয়া কল্পনাকে প্রাধান্ত দিয়াছেন। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভাকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিব কেন ?

ইহা হইল সাহিত্যের সামাজিক তর্ক। সাহিত্য পড়িয়া সমাজ কতটা লাভবান হইবে, তাহার হিসাব-নিকাশের ভাব এই তর্কের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই, যাহারা বাস্তবপন্থী তাহারাই আবার সামাজিক কল্যাণ অকল্যাণের বিবেচনাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে, সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতি অতি অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার। সাহিত্য সুনীতি দুর্নীতির অতীত। অথচ সমাজ ও নীতির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

উনবিংশ শতাব্দী Romanticism-এর যুগ। এই শতাব্দীর প্রায় সকল সাহিত্যই অ-লোক কল্পনায় রঙীন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণবৈচিত্র্যহীন সঙ্কীর্ণ সামাজিকতা লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারই প্রতিক্রিয়া-রূপে গত শতাব্দীর স্বভাব ও বিস্ময়বাদ, বৈচিত্র্য ও আদর্শবাদ আর্টে এবং সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ফরাসী সাহিত্যে হ্যুগোর কীর্ত্তি অবিনশ্বর। হ্যুগোর রচনায় এই রীতি অপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে। যুগধর্ম্মের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া কোন সাহিত্য গড়িয়া ওঠে না। যুগধর্ম্মের বশে বঙ্কিমও রোমান্টিক। বাংলায় রোমান্টিসিজমের ঘোর এখনও কাটে নাই। [শ]রচ্চন্দ্রের উপন্যাস আপাত-বাস্তব, মূলত রোমান্টিক।

রোমান্টিসিজমের যুগ চলিয়া গেছে। রিয়ালিজমের [প্র]ভাবে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বিবিধ সমস্যায় এবং [বিক্ষো]ভে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহাতে কি? উপকরণ লইয়া [সা]হিত্য বিচার চলে না। বিশ্বজগৎ এবং অন্তর্জগতের [সম]স্ত বস্তুই সাহিত্যের উপকরণ হইতে পারে। বাহিরের [জি]নিষ লইয়া তর্কে সাহিত্যের স্বরূপ অজ্ঞাত থাকিয়া [যায়]।

অতএব দেখিতেছি, সাহিত্যের একটি বাহিরের [দিক] আর একটি অন্তরের দিক আছে। এই বাহিরের দিক [দিয়া] সাহিত্য চঞ্চল অস্থির প্রবহমান। সাহিত্যের [বাহি]রে যে পরিবর্ত্তন প্রভেদ অনৈক্য দেখিতে পাই, তাহা বাহ্য। সাহিত্যের স্ব-ভাব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। সাহিত্যের আত্মার বিকার নাই।

সাহিত্যের অন্তরে মানব-হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি শুনিতে পাই। জীবনের অনির্ব্বাণ কামনা সাহিত্যের স্বচ্ছ আবরণে চিরভাস্বর। সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তির জীবন বিশ্ব-জীবনে পরিণত। মানবের জীবনলীলার প্রকাশে সাহিত্য জীবন্ত। সাহিত্য জীবনধর্ম্মী।

এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, জীবনের কৌতূহল যতদূর পৌঁছায়, সাহিত্যের গণ্ডী ততদূর প্রসারিত। বাস্তব রোমান্স আদর্শ—সাহিত্য কিছুর মধ্যেই বদ্ধ নহে। নিরুদ্বেগ প্রকৃতি আজ যদি তাহার আকর্ষণের বস্তু হয়, উদ্দাম নাগরিক জীবন কাল তাহার ভাল লাগিবে। যুগধর্ম্মে বস্তুতন্ত্র সাহিত্য আদরের জিনিষ হইলেও রোমান্টিক সাহিত্যের দর কিছু মাত্র কমিবে না। কেন?

আমার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধের আলোচনায় আর্টের প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস, art for art যখন আর্টের একমাত্র মূলমন্ত্র হয় তখন কথাটা সত্য, কিন্তু উক্ত মন্ত্র জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রাহ্য করলেই তা হয়ে পড়ে অসত্য।" কথাটি মূল্যবান। এবং কথাটি সত্য বলিয়াই সাহিত্যে এ নীতি খাটে না, কেন-না জীবনের সহিত সাহিত্য যে একান্তভাবে সম্পর্কিত। জীবন সমাজ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে art for art's sake কথাটির অর্থ হয় নহিলে এ মন্ত্র নিরর্থক।

মানুষ মাটির উপর চলে, কিন্তু তাহার মন মাটিতে বদ্ধ থাকে না। মৃত্তিকার জগৎ ছাড়াইয়া তাহা বহু ঊর্দ্ধে চলিয়া যায়। জীবনের কাছে বাস্তব ও কল্পনা উভয়ই সত্য। সাহিত্য যে উপকরণ লইয়াই রচিত হোক, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বস্তু চিরকাল রস বলিয়াই পরিগণিত হইবে। রস হইতেছে মনের অনুভূতি-বিশেষ। কবির মনোভাবই রসে পরিণত হয়। এই রসের আস্বাদ কবির রচনার ভিতর দিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া আনন্দের সৃষ্টি করে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত "কাব্য-জিজ্ঞাসায়" প্রাচীন আলঙ্কারিকদের রস-

বিচারের যে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে আচার্য্য অভিনবগুপ্তের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, "রস হইতেছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদন-রূপ একটি ব্যাপার।"

অতএব রসসৃষ্টি যেখানে ব্যাহত হইয়াছে, রচনা সেখানে আর সাহিত্য নয়। যাহার সম্ভাবে আমরা সাহিত্যে দেশ-কালের অন্তর ভুলিয়া যাই, রস সেই বস্তু। ইহার অভাবে কোন সাহিত্যের স্থায়িত্ব থাকে না। সমসাময়িক লোকপ্রিয়তা এবং সমালোচনার জয়ধ্বনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। প্রমাণ— Southey, Tennyson, Kipling. কিপলিংকে লোকে কবি মনে করে, কিছুদিন পরে আর করিবে না। সাদের কবিতা লোকে ভুলিয়া গেছে। টেনিসনের আর সে আদর নাই। অথচ আর্টগত বহুল ত্রুটি সত্ত্বেও ব্রাউনিং আমাদের প্রিয়তর হইয়া উঠিতেছে।

আধুনিক বলিলে সাহিত্যকে বড়ও করা হয় না, ছোটও করা হয় না। ইহাতে শুধু বুঝায় যে, এ সাহিত্যে যুগধর্ম্ম জয়ী হইয়াছে। যুগধর্ম্মের মূল্য আছে। কিন্তু রসের দিক দিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে যুগধর্ম্মকে বড় করা চলে না।

'কপালকুণ্ডলা'র কথা ধরা যাক। কপালকুণ্ডলার আখ্যানভাগে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, সংসারে তাহা সচরাচর ঘটে না। ঘটে না বলিয়া ঘটিতে পারে না এমন নহে, ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প। অর্থাৎ এ উপন্যাসের ঘটনাবস্তু সাধারণ নহে। পরিকল্পনা অসাধারণ বলিয়াই 'কপালকুণ্ডলা' রোমান্টিক। কল্পনা না হইয়া বাস্তবও উপন্যাসের উপাদান হইতে পারিত। কিন্তু উপাদান নিজে নয়, সেই উপাদান হইতে রস কতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই সাহিত্যের বিচারের বস্তু।

জগতের চিরন্তন-পুরুষ চিরন্তন-নারীকে কামনা করিতেছে। পুরুষ যখন নারীকে অন্তরঙ্গভাবে লাভ করিতে পারে, সংসার তখন সফল হয়। এই কামনার অচরিতার্থতাই জীবনের ট্র্যাজেডি। নবকুমার পুরুষ, কপালকুণ্ডলা নারী। পুরুষ নারীকে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। কিন্তু নারীর প্রকৃতি উদাসীন। কপালকুণ্ডলা অরণ্যপালিতা, লোকসমাজ হইতে দূরে বর্দ্ধিতা বলিয়াই যে তাহার নারী-প্রকৃতি সংসারের আহ্বানে সাড়া দেয় নাই তাহা নহে, কপালকুণ্ডলার বৈরাগ্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ। এই উদাসিনী নারীকে আপনার করিবার জন্য নবকুমারের ব্যগ্র ব্যাকুল নিরন্তর প্রয়াসের মধ্যে জীবনের ট্র্যাজেডি ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। সহস্র চেষ্টায় নারী যখন কিছুতেই ধরা পড়িল না, পুরুষের পৌরুষ এবং কামনা একান্তভাবে ব্যর্থ করিয়া জীবনের লক্ষ্যপথ হইতে সে যখন কে-জানে-কোথায় সরিয়া গেল, কোন্ দুর্ব্বার দুর্লঙ্ঘ্য রহস্যময় কালস্রোতে অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল, জীবনের চরম ট্যাজেডি তখনই সাহিত্যের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। এই চিরদিনের অতৃপ্ত কামনার মধ্যে যে করুণ রসের সাক্ষাৎ পাই, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ঘটনাবস্তু কল্পনাগত হইলেও তাহার প্রয়োগ ব্যবহার ও সংস্থানে কোন বিরোধ কোন অসঙ্গতি নাই। রূপের দিক দিয়া 'কপালকুণ্ডলা' একটি নিখুঁত মুক্তার মত উজ্জ্বল সুন্দর সুডৌল। সে মুক্তা কিন্তু অশ্রুর মুক্তা, জীবনের বেদনা জমাট বাঁধিয়া কাব্যে পরিণত হইয়াছে। রূপের দিক দিয়া যেমন ইহার কলাগত কমনীয়তায় কোন ত্রুটি নাই, রসের দিক দিয়া তেমনি ইহা পরিপূর্ণ গভীর অব্যাহত। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা হইলেও রসসাহিত্যে এই রোমান্টিক উপন্যাসের স্থান অনেক উচ্চে।

তাই বলি, যুগধর্ম্মের কল্যাণে বাস্তব-সাহিত্য আজ আমাদের কৌতূহলের বস্তু হইলেও রসিকের কাছে সে দিনের ভাবতান্ত্রিক সাহিত্যের গৌরব এতটুকু খর্ব্ব হইবে না। মনের প্রবণতা নানা দিকে। বৈচিত্র্যের উপভোগে মনের অরুচি নাই। তথ্য এবং ঘটনা, কল্পনা এবং সম্ভবনা উভয়ই তার কাছে সমান উপভোগ্য।

সকল রকম উদ্দাম উগ্রতাই জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট করে। রিয়ালিজমের যুগে রোমান্সের আলোচনা সাহিত্যের মধ্যে সুসঙ্গতি আনিবে। প্রকৃত সাহিত্যের আলোচনা সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যিক অতিরেকের corrective—সংশোধক।

এ-কথা ঠিক, সাহিত্য অ-মূল পাদপ নয়। জানি, জার্মান-সাহিত্য টিউটনিক বৈশিষ্ট্যে এবং ফরাসী-সাহিত্য ল্যাটিন মনোভাবে প্রভাবিত হইবেই। জানি, দেশের সমাজের পারিপার্শ্বিক প্রভাব কাটাইয়া কোন সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাহা ছাড়া কালের ছাপ সাহিত্যের উপর থাকিবেই। কিন্তু এ কথাও মানি, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বস্তু দেশ কাল জাতিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে। তাই কালিদাসকে আমরা ভালবাসি, হোমারকে ভক্তি করি, শেলীকে আত্মীয়জ্ঞান করি। তাই বিংশ শতাব্দীতেও বঙ্কিম-সাহিত্য আদরের বস্তু।*

* ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখায় পঠিত।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

১৯

দিন দুই পরে মায়ার জন্য একগাদা বই খাতা আসিয়া পৌঁছিল। যোগীনবাবু কি কি বই দরকার সব তালিকা করিয়া দিয়াছিলেন। রেঙ্গুনে যাহা পাওয়া গেল নিরঞ্জন কিনিয়া আনিলেন, বাকি যাহা রহিল তাহার জন্য কলিকাতায় চিঠি লিখিয়া দিলেন।

মায়া বইগুলা লইয়া খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করিল, তাহার পর বসিবার ঘরের আলমারির মধ্যে সাজাইয়া রাখিয়া দিল। তাহার পড়া আরম্ভ হইতে এখনও তিন-চার দিন দেরী আছে। বাবা ত তাহাকে একেবারে লীলাবতী বানাইয়া তুলিতে চান, এখন তাহার বুদ্ধিতে কুলাইলে হয়।

পরদিন নিরঞ্জন আপিসে যাইবার আগে ইন্দু গিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন তখন খাইতে বসিয়াছেন। বাটিতে করিয়া খানিকটা সুক্তা লইয়া ইন্দু তাঁহার প্লেটের পাশে নামাইয়া রাখিল, তাহার পর খাইবার টেবিল হইতে একটা চেয়ার কিছু দূরে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "নিজেদের তরকারী মিষ্টি-ত আমায় দুবেলা খুব খাওয়াচ্ছিস, একদিন আমার হেঁসেলের রান্না তোরা খা।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তোমার মেয়েকেই খাইও, আমার কপালে কি আর তা লেখা আছে যে খাব? তা সে কথা যাক, পরশুর আগের দিন সরোজের এক চিঠি পেলাম।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই নাকি? কে মরল কার ছেলে হল, কার বিয়ে, কার অন্নপ্রাশন সব খবর আছে ত?"

ইন্দু বলিল, 'না অত খবর দেয়নি। তা আমাদের বাড়ীর খবর কিছু আছে। ঝড়ে নাকি পশ্চিমদিকের দেওয়াল পড়ে গেছে, সেখান দিয়ে উঠোনে রাজ্যের গরু বাছুর, কুকুর, শেয়াল ঢুকছে। এর পর ঘরের দেওয়ালও পড়তে সুরু হবে। নিস্তারপিসী বাড়ী নেওয়ার সময় ত খুব বড় গলা করে বললেন দেখাশোনা, মেরামত সব তিনি নিজের খরচায় করবেন, এখন নাকি কিছুই করছেন না। বোধ হয় গাঁয়ে আর থাকবার মতলব নেই, তাই আর ট্যাঁকের পয়সা খরচ করতে চাইছেন না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তাই ত আমি ভাবছিলাম ছোট-খোকাকে পাশটাশ করলে পর গ্রামেই বসিয়ে দেব। তার যে রকম মতিগতি দেখি, সহরে থেকে ৫০৲ টাকার চাকরী করার চেয়ে চাষবাস গ্রামের উন্নতি করা এ সবই তার পোষাবে বেশী। কিন্তু বাড়ীঘর সব নষ্ট হলে চলবে কি করে? দেখি দাদাকে চিঠি লিখে।"

ইন্দু তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তুমিও

যেমন! দাদা আবার ওসব দেখবে। কোনোকালে দেখেছে? যত দিন মা ছিলেন, তিনিই সব সাম্‌লেছেন, তার পর আমাতে, বৌয়েতে মিলে যা পেরেছি করেছি। ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে যেমন করে হোক্।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "মন্দ নয়। তিনি কলকাতায় বসে ব্যবস্থা করতে পারবেন না, আর আমি বর্ম্মায় বসে বসে ব্যবস্থা করব।"

ইন্দু বলিল, "আমি বল্‌ছিলাম কি, আমাকে কেন দেশে পাঠিয়ে দেও না? নিস্তারপিসী যদি থাকেনও, তাহলেও আমার জায়গার অভাব হবে না। পূব্‌দিকের ছোটঘরখানা, আর নিরামিষ হেঁসেলের ঘরখানা ছেড়ে দিলেই আমার চল্‌বে। আমি থাকলে বাড়ীঘরও দেখতে পারব, আদায়-টাদায়ও ঠিকমত হবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কেন তুই ছাড়া কি আর আমাদের চৌকীদার জুটবে না? তুই গেলে মায়া থাকবে কি করে? একেই ত সে নূতন জায়গায় এসে ঘাব্‌ড়ে রয়েছে।"

ইন্দু বলিল, "ওমা, আমি চিরজন্ম বসে তোমার মেয়ে আগ্‌লাব নাকি? ও বয়সে আমরা বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী গেছি। সে ত আরও একেবারে অজানা, অচেনা, আমাদের ত কেউ আগ্‌লাতে যায়নি? মেয়ে-মানুষের এত আদুরে হলে চল্‌বে কেন?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "আদুরে ত কত! আদর জিনিষটায় তার এমনি অনভ্যাস, যে কেউ আদর করতে গেলে ভয়ে মেয়ের চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসে। তা ছাড়া নূতন বাপের বাড়ী আর নূতন শ্বশুরবাড়ী এ দুটো জিনিষে অনেক তফাৎ। সে যাই হোক, তোর যাওয়া এখন হইতেই পারে না। বাড়ী পড়ে যায় যাবে, আবার বানাব।" বৌদিদিরা আস্‌বেন শুন্‌ছি কিছুদিনের মধ্যে। নিতান্তই না গেলে যদি না চলে, তাহলে ওদের সঙ্গে যাস্ না হয়।"

ইন্দু বলিল, "তোমায় আসার কথা কিছু লিখেছেন নাকি? আমায় লিখেছিল বটে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "দাদা চিঠি লিখেছিলেন মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে বলে, শেষে এই খবরটুকুও দিয়েছেন।"

বাড়ীতে বিবাহের নামে মন উৎসাহে ভরপূর না হইয়া ওঠে, এমন নারী সংসারে দুর্লভ। ইন্দুও ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে নাকি? সেই চক্রবর্ত্তীদের ঘরেই? ছেলে বেশ ভাল বটে, তবে ঘর আমাদের চেয়ে ঢের নীচু।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "নীচু কি রে? তাদের চারতলা বাড়ী বড়রাস্তার উপরে, আর আমাদের ঘর বল্‌তে ত দেশের খড়ের ঘর। তাহলে তারাই হ'ল উঁচু, আমরাই নীচু। আজকালকার উঁচুনীচুর মাপ আগের কালের মাপকাঠিতে হয় না।"

ইন্দু বলিল, "আহা বাড়ী বড় হলেই বংশও বড় হয়ে গেল আর কি? এখন বলে তাই এ সম্বন্ধ হতে পারছে, মা বাবা বেঁচে থাকলে একথা কানেই নিতেন না। তা কি রকম দিতেথুতে হবে? ছেলে ত এম্‌-এ পাশ, তাতে আবার পরীক্ষায় প্রথম না দ্বিতীয় হয়েছে, দর নিশ্চয়ই তারা খুব চড়াবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "অবশ্য। যদিও ছেলে পরে চল্লিশ টাকাও রোজগার করবেন কিনা সন্দেহ। নগদই তারা চারহাজার টাকা চাইছে। সেইজন্যেই দাদা চিঠি লিখেছেন। গহনা গাঁটি, ইত্যাদি বোধ হয় বৌদিদির ঘাড় দিয়েই চালাবেন। আর ত সব কটাই ছেলে। নগদ টাকাটা কোথা থেকে জোটে সেই হয়েছে ভাবনা।"

ইন্দু বলিল, "সব টাকাই তোমার কাছে চেয়েছেন নাকি? সব না দাও, কিছুটা দিও, নইলে দাদা পেরে উঠবেন কি করে? তাঁর ত আয় বেশী নয়, ছাপোষা মানুষ, কিছুই বোধ হয় জমাতে পারেন নি।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "জয়ন্তীর নামে লিখে দিলে যদি তারা রাজী হয়, তাহলে চার হাজার পাঁচ হাজার যা চায় দিতে রাজি আছি। কিন্তু একটা অকর্ম্মা ছোঁড়াকে কিন্‌বার জন্যে আমি এক পয়সাও দেব না। চার হাজার সে কোনকালে রোজগার করতে পারবে?"

ইন্দু বলিল, "ওমা মেয়ের নামে লিখে দিলে তারা রাজী হবে কেন? তাদের হয়ত এই টাকা দিয়ে ঋণ শোধ করতে হবে, না হয় বিয়ের খরচা করতে হবে। অনেকে বলে এইজন্তে গহনা শুদ্ধ নেয় না, সেগুলো মেয়ের সম্পত্তি

বলে, সবই নগদ নেয়। তোমাদের মেয়েকে তারা চিরদিন পুষবে, তার জন্যে কিছু দেবে না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা বেশ। কিন্তু তারা লিখে দিক যে মেয়েকে কোনোদিন কষ্ট দেবে না, খোঁটা দেবে না, ভাত কাপড় দিচ্ছে বলে তার উপর সর্দ্দারি করবে না। খোরপোষের টাকা নিয়ে যখন তাকে ঘরে নিচ্ছে, তখন চিরদিন অতিথির মত আদর যত্নে রাখবে। এতে রাজী হয় ত আমি টাকা দেব।"

ইন্দু উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "এ আবার তোমার অনাছিষ্টি 'আব্দার মেজদা। হিন্দুর ঘরে বরের বাড়ীর লোকেই হুকুমজারি করে, কনের বাড়ীর লোক মাথা পেতে নেয়। তুমি দেখি সব ব্যবস্থা উল্টে দিতে চাও। তাদের কি আর বৌ জুটবে না যে, তারা এই-সব লেখাপড়া করতে রাজী হবে? মেয়ের বিয়ে না দিলেই নয়, আর ছেলের বিয়ে না দিলেও তাদের কিছু এসে যাবে না। তবে ঠেকা কাদের, তোমাদের না তাদের?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ঠেকা যারই হোক, এক মাকাল ফল বর কিনতে টাকা আমি দেব না।"

ইন্দু বলিল, "নিজের মেয়ের বিয়ের বেলায় ও-সব সর্ত্ত কোরো,তাতে লোকে রাজী হবে। জানে ত ঐ এক মেয়ে, পরে সব কিছু সেই পাবে। দাদা বেচারার ত সেরকম কোনো কিছু নেই, তাকে টাকা দিয়েই মেয়ে পার করতে হবে। তাকে এখন মানে মানে উদ্ধার করে দাও।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "মেয়ে কি জলে পড়েছে? সবে ত পনেরো না ষোল বয়স, এখনি বিয়ে না হলেই বা কি? পড়েছে পড়ুক না? ভাল করে পাশটাস্ করলে কত ছেলে তাকে যেচে বিয়ে করতে আসবে।"

ইন্দু বলিল, "তুমি বুঝছ না মেজদা, হিন্দুর মেয়ে যতই লেখাপড়া করুক, তার কোনো দাম নেই। বাপের টাকার জোরেই তার দাম ওঠে নামে। যত বয়স বাড়বে, বিয়ে দেওয়াও তত শক্ত হয়ে উঠবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আচ্ছা, এখন আমার উঠতে হল, সমাজতত্ত্বের আলোচনা পরে করা যাবে। মোটের উপর আমার কথা এই, পণ দেবার জন্যে টাকা আমি কিছুতেই দেব না।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তা দিও না। আমাকে দেশে পাঠাবে কি না তাই বল এখন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, 'তাও পাঠাব না, অন্ততঃ মাস কয়েক আরও তোকে এখানে থাকতে হবে। দাদাকে লিখব, তিনি কিছু না করেন ত গ্রামে কারো কাছে লিখে টাকা পাঠিয়ে দেব, এখনকার মত একটা দেওয়াল দিয়ে রাখবে। পরে ভেবেচিন্তে ব্যবস্থা করা যাবে।"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, আমাদের গ্রামের লোকগুলি তেমনই বটে, টাকাটা নিয়ে দিব্যি হজম করে বসে থাকবে, দেওয়াল যা উঠবে তা বুঝতেই পারছ।"

নিরঞ্জনের সময় হইয়া গিয়াছিল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ইন্দুও ফিরিয়া নিজের রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

মায়া পিসিকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বল্লেন পিসিমা, তোমায় যেতে দিতে রাজী হলেন?"

ইন্দু বলিল, না গো না, যেমন তুমি তেমনি ত তোমার বাবা?"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবা কি বল্লেন বল না?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "গিয়ে শুন্তে পারিস্নি? বললেন, এখন তোমার যাওয়া হবে না। আমার মেয়ের বিয়ে না হওয়া অবধি বসে বসে তাকে আগলাও।"

মায়া বলিল, "যাও পিসিমা, সব তাতে কেবল তোমার ঠাট্টা। যাক্, তোমায় যেতে ত দেবেন না এখন? তাহলেই হল।"

ইন্দু বলিল, "তা ত বটেই, নিজের মতলব সিদ্ধি হলেই হল। এদিকে দেশের বাড়ীঘর সব যে যেতে বসল।"

মায়া বলিল, "তোমাকে আর আমাকে যদি একসঙ্গে যেতে দিতেন ত বেশ হত।"

ইন্দু বলিল, "বলে দেখ না তোমার বাবাকে? দেবে এখন দুই গালে চড় কষিয়ে।"

মায়া বলিল "হ্যাঁ, আমি তেমনি বোকা কিনা, তাই বাবাকে এই-সব বলতে যাব। আমার আর দেশে এ জন্মে যাওয়া হবে না, তা আমি খুব ভাল করেই জানি,"

বলিতে বলিতে তাহার গলা ভার হইয়া আসিল, চোখ ছলছল্ করিতে লাগিল।

ইন্দু বলিল, "বালাই, এ জন্মে যাবি না কেন? জয়ন্তীর বিয়েতে যদি আমরা কলকাতায় যাই, তাহলে কি আর দেশে একবার ঘুরে আস্‌ব না? আর এখন যদি নাও যাওয়া হয়, দুচার বছর পরে নিশ্চয় যাবি। তুই শুধু শুধু এত মন খারাপ করিস্ কেন? যা এখন নাইগে যা।" মায়া উঠিয়া গেল।

বিকালবেলা আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মায়া চুল বাঁধিতেছে, এমন সময় নীচে তাহার বাবার গাড়ী থামার শব্দ শোনা গেল। গাড়ীর শব্দ পাইলেই সে হয় জানলার কাছে, নয়, গাড়ীবারান্দায় গিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখে, কিন্তু সম্প্রতি বিনুনী করিতে ব্যস্ত থাকায় আর জায়গা ছাড়িয়া নড়িল না।

কয়েক মিনিট পরে ইন্দু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওরে, তোর হল চুল বাঁধা? আবার কে তোর মাষ্টার এসেছে দেখ্‌গে যা। মেজদা তোকে চুল বেঁধে পরিষ্কার হয়ে যেতে বললে। খালি পায়ে যাস্‌নে যেন, রাগ করবে আবার।"

মাষ্টারের নাম শুনিয়াই মায়ার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বাবার কথা না শুনিয়াও উপায় নাই। অগত্যা যথাসম্ভব শীঘ্র সে ফিট্ ফাট্ হইয়া লইল। তাহার পর কম্পিতপদে নীচে নামিয়া চলিল।

নীচের বড় হল ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল, তাহার বাবা সেইখানেই বসিয়া। তাঁহার নিকটে একটি অল্পবয়স্কা মেমসাহেব বসিয়া আছে, মায়াকে দেখিয়া সে খুব হাস্যমুখে তাহার দিকে চাহিয়া কি যেন একটা বলিল।

মেম দেখিয়াই মায়ার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, তাহার পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "মায়া, এদিকে আয়।" মেম-সাহেবের দিকে চাহিয়া ইংরেজীতে বলিলেন "এইটিই আপনার ছাত্রী, মিস্ এলিস্।"

মায়া পিতার আহ্বানে একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মিস্ এলিস উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া যেই নিজের দিকে আকর্ষণ করিল, তৎক্ষণাৎ মায়ার মাথার ভিতর সব যেন কেমন উলট-পালট হইয়া গেল। আজন্মের সংস্কার শিক্ষা সব তাহার মনে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। ম্লেচ্ছের স্পর্শ! এক ঝটকায় তরুণীর হাত ছাড়াইয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কোনোমতে উপরে উঠিয়া, নিজের খাটের উপর একেবারে গিয়া গড়াইয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর কে যেন তখন হাতুড়ি পিটাইতেছে, কানের ভিতর ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইতেছে। বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

কতক্ষণ যে কাটিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। কয়েক মিনিট, না কয়েক ঘণ্টা? মায়া সময়ের আন্দাজ হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

হঠাৎ পায়ের শব্দে সে মুখ তুলিয়া তাকাইল। তাহার বাবা দাঁড়াইয়া। ভয়ে তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিল। না জানি কি ভীষণ শাস্তি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটিল অন্য রকম। নিরঞ্জন আসিয়া তাহার খাটে বসিয়া, তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিলেন, "মায়া!"

মায়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। নিরঞ্জন বলিলেন, "তুইও আমায় এমনি করে কষ্ট দিবি মায়া? আমার তুই ছাড়া ত কেউ নেই।"

মায়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ কি? তাহার এমন পাষাণের মত কঠোর পিতা তাঁহার চোখে জল? তাহার বুকের ভিতরটা বেদনায় মোচড় দিয়া উঠিল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমার কথা শুনবি না মায়া? মিস এলিসকে তাহলে চলে যেতে বলব?"

মায়া উঠিয়া বসিল। তাহার দুই চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, আমি তোমার কথাই শুন্‌ব। চল আমি যাচ্ছি।"

নিরঞ্জন তাহাকে সস্নেহে নিজের বুকের উপর টানিয়া লইলেন। পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

খানিক পরে নিরঞ্জন মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "যাও মা, মুখটা ধুয়ে এস, তারপর আমরা নীচে যাব।"

মায়া গিয়া মুখ ধুইয়া মুছিয়া আসিল। তাহার পর নিরঞ্জনের পিছন পিছন আবার নীচে নামিয়া আসিল।

মিস্ এলিস এবারেও তাহাকে দেখিয়া হাসিল বটে, তবে কাছে আসিবার কোনো চেষ্টা করিল না। নিরঞ্জনের কথামত মায়া একটা চেয়ারে গিয়া বসিল।

নিরঞ্জন শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন, "আমার মেয়েটি বড় বেশী লাজুক, বাহিরে মেলামেশা তাহার অভ্যাস নাই।

মিস্ এলিস হাসিয়া বলিল, "অল্প দিনেই এ ভাবটা কাটিয়া যাইবে।"

(২০)

রোজ ভোরে উঠিয়াই ইন্দু স্নান করিয়া পূজার ফুল তুলিতে বাগানে আসিয়া প্রবেশ করে। তাড়াতাড়ি কাজ সারে না, ধীরেসুস্থে বেড়াইতে বেড়াইতে ফুল তুলিতে তুলিতে তাহার ঘণ্টাখানিক কাটিয়া যায়। মায়াও আসিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়।

আজ কিন্তু ইন্দুর ফুল তোলা বেড়ান প্রায় সাঙ্গ হইয়া আসিল, তবু মায়ার দেখা মিলিল না। ইন্দু ভাবিল, "কাল ঐ মাষ্টারনী নিয়ে অত কান্নাকাটি করে আজ হয়ত শরীর খারাপ হয়ে থাকবে, তাই বেলা অবধি ঘুমুচ্ছে। পূজো সেরে গিয়ে দেখব এখন।"

মায়া কিন্তু তখন ঘুমাইতেছিল না। ঘরের মেঝেতে বসিয়া ট্রাঙ্কের তলায় কি যেন খুঁজিতেছিল। চট্ করিয়া না পাওয়াতে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হইয়া, সব জিনিষ টান মারিয়া সে বাহির করিয়া ফেলিল। তলা হইতে বাহির হইল, সাবিত্রীর এক ছবি।

মায়া ছবিখানা লইয়া আবার খাটের উপর গিয়া বসিল। ছবিখানা সাম্‌নে রাখিয়া সে অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, "মা, আমি তোমার কথা রাখতে পারলাম না, আমায় ক্ষমা কোরো। বাবার মনে আমি কষ্ট দিতে পারব না। তিনি যা বলবেন করব, পরে না হয় প্রায়শ্চিত্ত করব।"

সাবিত্রীর ছবি যেন কঠোরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মায়া ছবিখানি আবার বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া তাহার উপর জিনিষ পত্র চাপাইতে লাগিল। ছবিখানা বাহিরে রাখিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু কেন জানি না তাহার ধারণা হয়েছিল এ বাড়ীতে তাহার মায়ের ছবির আদর হইবে না, তাই সেখানা সে লুকাইয়া রাখিত।

বাক্স গোছান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় ইন্দু আসিয়া বলিল, "কি রে তোর আজ এত দেরী যে? শরীর ভাল নেই নাকি?"

মায়া তাড়াতাড়ি বাক্সের ডালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, না শরীর ত বেশ ভালই আছে। আজ বাগানে যেতে আর ইচ্ছে করল না।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "তা সকালেই বাক্স নিয়ে বসেছিস্ কেন? যা মুখ ধুয়ে দুদটুদ খেগে যা। ঠাণ্ডা হয়ে গেল এতক্ষণে।"

মায়া পিসির পিছন পিছন নীচে নামিয়া গেল।

ইন্দু রান্না চড়াইতে চড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল মেজ্দা তোকে বকেচে নাকি রে?"

মায়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল বকেন নাই। ইন্দু বুঝিল কালকার কথা আলোচনা করিতে মায়ার বিশেষ ইচ্ছা নাই, সুতরাং সেও চুপ করিয়া গেল।

খানিক পরে মায়া নিজেই বলিল "এই দুটো দিন মোটে ছুটি, এর পর ত সারাদিন পড়া নিয়েই থাকতে হবে।"

ইন্দু বলিল, "সারাদিন বসে বাজে ভাবনা ভাবার চেয়ে পড়া নিয়ে থাকা ত ভালই। আমার যদি আর পড়বার বয়স থাকত ত আমিও তোর দলে জুটে যেতাম।"

মায়া বলিল বেশ ত পিসিমা, তুমিও আমার সঙ্গে বাংলা আর সংস্কৃত পড় না? বয়স একটু বেশী হলে কিই বা এসে যায়? বাবাকে বলব?"

ইন্দু বলিল, "থাক্ থাক্, তোমার আর সাত তাড়াতাড়ি বাবাকে বল্‌তে হবে না। আমার যদি বরাবর এখানে থাকার ঠিক থাকত, তাহলে না হয় সুরু করতাম। কখন যাই, কখন থাকি, কিছু ঠিক কি আছে? শুধু শুধু সংএর মত আরম্ভ করে কি হবে?"

মাঝের দুইটা দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। তাহার পর মায়ার পড়াশুনা সুরু হইল। সকাল বেলা যোগীনবাবু আসিয়া বাংলা, সংস্কৃত পড়াইয়া যাইতেন। আসল চাপ পড়িত, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে। তখন ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বাজনা সব কিছু এক সঙ্গে আসিয়া জুটিত। বড় পিয়ানোটা এতদিন পরে খোলা হইল, এতকাল সেটা কেবল গৃহসজ্জার কাজই করিয়া আসিয়াছে।

প্রথম দিন বড় বেশী সময় গেল না। ঘণ্টা খানেক পরেই মেম সাহেবকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, ইন্দু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে এরই মধ্যে এত পড়া সব হয়ে গেল?"

মায়া বলিল, "আজ কেবল কি কি পড়তে হবে, তাই দেখিয়ে দিলে। কি যে মুস্কিল পিসিমা, ও আমার কথা বুঝতে পারে না, আমিও ওর কথা বুঝতে পারি না। হিন্দীও যদি ভাল জানতাম ত চল্‌ত এক রকম, তাও যে ছাই ভাল করে জানি না।"

ইন্দু বলিল, "যা জানিস্, তাই বলিস্। লজ্জা করলে কি কখনও কাজ হয়?"

মায়া বলিল, "হাঁ, তা বই কি? তোমার মত চমৎকার হিন্দী বলি, আর ও হেসে খুন হোক!"

ইন্দু বলিল, "হাস্‌লে ত আর গায়ে ফোস্কা পড়বে না?"

যাহা হউক কোনো রকমে ভাঙা ভাঙা হিন্দীর সাহায্যেই কাজ আরম্ভ হইল। ইন্দু আসিয়া মাঝে মাঝে পড়ার সময় বসিয়া থাকিত। মায়া যখন অঙ্ক কষিত, কি হাতের লেখা লিখিত, তখন সে মহোৎসাহে মিস্ এলিসের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিত। হলেই বা মেমসাহেব, মেয়েমানুষ ত বটে? ভাষার বাধাও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। পিসির অপূর্ব্ব হিন্দী শুনিয়া মায়া মাঝে মাঝে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত।

পড়াশুনা এক রকম চলিতে লাগিল। বাজনাটা মায়ার খুবই পছন্দ হইল, অল্প কয় দিনের মধ্যেই সময়ে অসময়ে তাহার পিয়ানো অভ্যাসের চোটে বাড়ীর লোকে অস্থির হইয়া উঠিল। ইংরেজীটা এক রকম আয়ত্ত হইয়া আসিতে লাগিল, কেবল অঙ্ক লইয়া বাধিল ষোল আনা গোলোযোগ। অঙ্ক তাহার মোটেই ভাল লাগে না, সে কষিতেও পারে না। একটা অঙ্ক মিস্ এলিস্ দশবার বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মহা বিপদ!

মিস্ এলিস্ একদিন নিরঞ্জনকে বলিল, "মায়া বেশ accomplished মেয়ে হইবে বটে, তবে যদি তাহাকে Universityর পরীক্ষা পাশ করাইতে চান, তবে কত দূর পারিয়া উঠিবে, বলিতে পারি না। অঙ্ক সে মোটে বুঝতেই পারে না।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "মনও দেয় না বোধ হয়?"

মিস্ এলিস্ বলিল "তা ঠিক মনে হয় না। আপনার মেয়ে বেশ মনোযোগী, পড়া সম্বন্ধে কোনো অবহেলা করে না।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তবে ত মুস্কিল। আমার ঐ একমাত্র সন্তান, আমি মনে করিয়াছিলাম, এখানে ম্যাট্রিক পাশ করাইয়া উহাকে বিলাত পাঠাইব। অঙ্ক একেবারে না পারিলে চলিবে কিরূপে?"

মিস্ এলিস্ বলিল, "কেন এরূপ হয় ঠিক বুঝি না। হয়ত আমার কথা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। দিন কয়েক অঙ্কের জন্য কোনো বাঙালী শিক্ষক রাখিয়া দেখিতে পারেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই না হয় দিন কয়েকের জন্য রাখিয়া দেখিব। কিন্তু আপনার কথা আর সব কিছুর বেলা বুঝিতে পারে কেবল অঙ্কের বেলাই বা পারে না কেন?"

যোগীনবাবুকে দিন কয়েকের জন্য অঙ্কের মাষ্টারও রাখা হইল। তাহাতেও খুব বিশেষ কোনো প্রভেদ বোঝা গেল না। তবু মন্দের ভাল বলিয়া যোগীনবাবুই মায়াকে অঙ্ক কষাইতে লাগিলেন, মিস্ এলিস্ অন্য যেমন সব পড়াইতেছিল তেমনি পড়াইতে লাগিল।

ইন্দু একদিন মায়াকে বলিল, "তোর পড়ানোর পেছনেই মেজদা যা টাকা ঢালছে, দেশে তাতে দশটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়।"

মায়া বলিল, "আবার ত হপ্তায় দুদিন করে ড্রয়িং

পেণ্টিং শেখাতে একজন আস্‌বে। কত যে শিখব তার ত ঠিকানা নেই, টাকা ত বাবা জলের মত ঢালছেন।"

ইন্দু বলিল, "থাক, তোরই ত সব পাওনা, তা এখনই খরচ হোক, কি পরেই খরচ হোক্। জয়ন্তীটার বিয়ে কি হ'ল কে জানে, আর ত কোন খবর পেলাম না। হয়ত মেজদা টাকা দিতে না চাওয়ায় রাগ করে ওরা আর চিঠিপত্র লিখছে না।"

মায়া বলিল, "বাবা যে আবার পণ দেবার কথা শুনলেই মহা চটে যান, দেশে ত সবাই পণ দেয়।"

ইন্দু বলিল, "বৌও ত পণ দিয়েই তোর বিয়ের জোগাড় করছিল। বাপ্‌রে মেজদা শুন্‌লে যা চট্‌ত।"

মায়া চুপ করিয়া রহিল। মায়ের কথা আলোচনা করিতে এখনও তাহার গলার কাছে কান্না ঠেলিয়া উঠিত। এমন সময় 'বয়' আসিয়া খবর দিল সেলাই লইয়া দরজী আসিয়াছে, কাজেই তখনকার মত সে আলোচনা থামিয়া গেল।

সাজপোষাক সম্বন্ধে মায়া ক্রমেই আজকাল সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। যেখানেই যাইত অন্য সকলের পোষাকপরিচ্ছদ খুব খুঁটাইয়া দেখিত। কোন্ রংএর সঙ্গে কোন্ রং মানায়, কি রকম মুখে কি ধরণের চুল বাঁধা, কি ফ্যাশানের দুল মানায়, এসব বিষয়ে বাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই আলোচনা করিতে বসিয়া যাইত। নিরঞ্জন খরচ করিতে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত, বিশেষ করিয়া কন্যার সম্বন্ধে, সুতরাং যখন যাহা কিছু কিনিতে বা অর্ডার দিতে মায়ার কোনোই বাধা ছিল না। পোষাকের আল্‌মারী ক্রমেই ভরিয়া উঠিতেছিল।

জয়ন্তীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল, কারণ মনোরঞ্জন কিছুতেই পণের টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। দুই ভাইয়ে ইহা লইয়া খানিকটা মনোমালিন্যও ঘটিয়া গেল। নিরঞ্জন ইচ্ছা করিলেই এ বিবাহ হইতে পারিত, তিনি শুধু একটা বাজে জেদ করিয়া টাকা দিলেন না। এই হইল মনোরঞ্জন এবং তাঁহার স্ত্রীর ধারণা। সুতরাং রেঙ্গুনে বেড়াইতে আসার প্রস্তাবটা এক রকম চাপাই পড়িয়া গেল।

মায়ার পড়াশুনা চলিতে লাগিল। এই ভয়াবহ জিনিষটার মধ্যেও যে রস আছে, তাহা সে ক্রমে বুঝিতে শিখিল। তাহার গোঁড়ামীও অনেক দিক দিয়া কমিয়া আসিতেছে দেখিয়া নিরঞ্জন খুসি হইলেন। ছোঁয়াছুঁয়ি লইয়া আজকাল সে মোটেই গোলমাল করে না। মিস্ এলিস্‌কে নিজে চা করিয়া দেয়, এবং সে চা পান করিলে পর পেয়ালা নিজের হাতে অনেক সময় তুলিয়া লইয়া যায়। প্রথম প্রথম পড়া শেষ হইবার পরই সে ঘরে ছুটিয়া গিয়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলিত এবং ইন্দুর কাছে গঙ্গাজল চাহিয়া লইয়া মাথায় গায়ে ছিটাইত। এখন আর সে সব উৎপাত নাই।

কিন্তু খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে এখনও সে আগেরই মত রক্ষণশীল। পিসির রান্না ছাড়া কোনো কিছু মুখেও দেয় না। এত জায়গায় ঘোরে, কিন্তু এক টুকরা কেকও কখনও ছোঁয় না। নিরঞ্জনের খ্রীষ্টান বা মুসলমান চাকর বাকর এখন পর্য্যন্তও মায়ার কোনো কাজ করিবার অনুমতি পায় নাই। 'বয়' একদিন ঘর ঝাঁট দিতে আসিয়াছিল, মায়া তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দিল।

ইন্দু একদিন বলিল, "আর কেন অত পিটপিটনি বাছা? মেজদা ত তোকে বিলেত পাঠাবে ঠিক করে রেখেছে, সেখানে গিয়ে এসব চালাবে কি করে?"

মায়া বলিল, "দেখো বিলেতে গিয়েও চালাব। বাবার মনে কষ্ট যেমন দিতে পারি না, মায়ের আত্মাকেও দুঃখ দিতে পারব না। তার জন্যে নিজের যত কষ্ট হয় হবে।"

ক্রমশঃ

আম্র-প্রসঙ্গ

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভারতবর্ষই আমের জন্মস্থান। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এ-গাছ জন্মাতে পারে, শীতপ্রধান দেশে এ-গাছের স্থান নেই। ছোটনাগপুর, নাগাপর্ব্বত এবং ভারতের দক্ষিণে পূর্ব্বে এ-গাছ আপনিই জন্মাত। এখন ভারতের সকল স্থানেই এ-গাছ রোপণ করা হয় এবং অল্পাধিক পরিমাণে সকল স্থানেই ফল হয়ে থাকে।

বর্ত্তমানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বিহার প্রদেশস্থিত দ্বারভাঙ্গা জেলার জলবায়ু এবং মাটিই আমের পক্ষে অধিক স্বাস্থ্যানুকূল ব'লে বোধ হয়। কারণ, এই জেলাতেই নানাবিধ সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যবান ফলের প্রাচুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

চরিত্র

পরিমিত লবণাক্ত নরম মাটিতেই আমগাছ বেশী জন্মে থাকে এবং স্বাস্থ্যবান হয়। বলা বাহুল্য, এই-সব গাছই প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যবান ফল প্রসব করতে পারে।

আগে সকলে আমের আঁটি পুঁতেই আমগাছ করতেন। বর্ত্তমানে আমগাছ করবার প্রণালী ত্রিবিধ,—চারা, যোড়-কলম এবং গুলকলম। বলা বাহুল্য—কলম করবার প্রণালী বিদেশীরাই আমাদের শিখিয়েচে। আঁটি-পোতা চারাগাছের থেকে কলমের আম বহুগুণে উৎকৃষ্ট হয়। কলমের গাছকে বাগানে এক-কোমর উঁচু মাটির ঢিবি তৈরী করে তাতে রোপণ করতে হয়। বিশেষ যত্ন না করলে কলমের গাছ নষ্ট হয়ে যায়—এ-গাছ বড় সুকুমার আমগাছের গোড়ায় ভাঙা বাড়ী (অবশ্য মাটির), ভাঙা প্রাচীর এবং পুকুরের শুকনো পেঁকো মাটি দিলে গাছ খুব সতেজ হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশে সাধারণতঃ পৌষ মাসে আমের মুকুল বার হ'তে আরম্ভ হয়। মাঘ-ফাল্গুন মাসে ছোট ছোট আম ধরে। এই মটর-সদৃশ ছোট আমকে চলতি বাংলায় গুটি বা কড়েয়া বলে। জ্যৈষ্ঠ মাসে বাংলার প্রায় সব আমই পেকে যায়। কিন্তু দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলে আমের মুকুল ধরে ফাল্গুন মাসে, গুটি ধরে চৈত্রের মাঝামাঝি এবং আম পাকতে সুরু হয়, সেই আষাঢ় মাসে। মহাকবি কালিদাস বিরচিত নিত্যকালের অমর কাব্যতে আমরা দেখতে পাই—আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে—"ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ।" —পূর্ব্বমেঘ, ১৮। সকলের আগে পাকে বোম্বাই আম। মোট কথা, আমের রাজ্যে—বাংলার শেষেই পশ্চিম প্রদেশসমূহের আরম্ভ আর-কি! আমের প্রস্ফুটিত মুকুলে বৃষ্টির জল লাগলে মুকুলের বীজকোষ জ্বলে যায়। কাজেই এ-সময়ে বৃষ্টি বা শিলা প্রভৃতির ক্ষণিক আবির্ভাবও আমের অজন্মাজনক।

পর্য্যায়ভেদ

সংস্কৃতানুগ বাংলা ভাষায় আমের যতগুলি পর্য্যায় দেখতে পাওয়া যায়, নিম্নে তার একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হ'ল।

অ—অম্ব, অম্রফল, অলিপ্রিয়। ৩

আ—আম্র, আঁব, আম। ৩

ক—কামাঙ্গ, কামবল্লভ, কামশর, কীরেষ্ট, কোকিলাবাস, কোকিলোৎসব। ৬

গ—গন্ধবন্ধু। ১

চ—চ্যূত। ১

ন—নৃপপ্রিয়। ১

প—পিকপ্রিয়, পিকবল্লভ, পিকরাগ প্রিয়াম্বু। ৪

ব—বসন্তদূত, বসন্তক্র। ২

ভ—ভৃঙ্গাভীষ্ট। ১

ম—মদিরাসখ, মধুব্রত, মধুলী, মধ্বাবাস, মন্মথালয়, মাকন্দ, মাধবক্রম, মোখাদ্য। ৮

র—রসাল। ১

ষ—ষটপদাতিথি। ১

স—সহকার, সীধুরস, সুমদন, স্ত্রীপ্রিয়। ৪

দেশভেদে পর্য্যায়ভেদ—সমগ্র হিন্দুস্থানে এই ফল আম নামেই প্রসিদ্ধ। অবশ্য দেশ বা ভাষাভেদে এর অন্যান্য কয়েটি পর্য্যায়ও আছে; নীচে তারও এক তালিকা দিচ্ছি।

১।	বিহার ও উড়িষ্যা		আম
২।	মহারাষ্ট্র	...	আম্বাফল
৩।	কর্ণাট	...	মাবিন ফল
৪।	তৈলঙ্গ	...	মাবিড়ি
৫।	গুজরাট	...	আংবো
৬।	আসাম	...	আম
৭।	ফারসী	...	আম্বা
৮।	আরবী	...	অম্বজ
৯।	লাটিন	...	ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা (Mangifera Indica)
১০।	ডাক্তারী নাম		ম্যাঙ্গো-ট্রি (Mango tree)
১১।	ইংরাজী	...	ম্যাঙ্গো (Mango)

আমের গুণ

আমের গুণ বহু এবং বহুমুখী। কথায় বলে—

যদি পাই আমের রসী
খাই না খাই গায়ে ঘসি—

এই বিভাগে আমের অবস্থাভিন্ন গুণই বর্ণিত হচ্ছে।

আম্র-মুকুল—আম্রপুষ্প বা আম্রমুকুল। সাধারণতঃ চলতি ভাষায় একে আমের বকুল বা আমের বোল বলে। এর দ্বারা অতিসার, কফ, পিত্ত, প্রমেহ এবং রক্তদোষ নষ্ট হয়। তা ছাড়া আমের মুকুল রুচিকারক, ধারক এবং বায়ুবর্দ্ধক।

কচি আম—কচি আমের স্বাদ কষায়, সুগন্ধযুক্ত ঈষদম্ল। এতে বায়ু, পিত্ত এবং রক্ত বর্দ্ধিত হয়।

তরুণ বা কাঁচা আম—কাঁচা আমের স্বাদ অতি অম্ল। গুণ,—রুচিজনক, স্নিগ্ধতাকারক, শীতলস্পর্শ এবং লেখন, অর্থাৎ জমাটবদ্ধ কফ উৎক্ষেপক। কিন্তু কাঁচা আমের গুণ অপেক্ষা দোষটাই ফলতঃ কিছু বেশি; যথা—রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্তদূষক। রসনা বালিয়ে নেবার জন্যে, অম্লপ্রিয় অনেকেই— বিশেষ করে বাঙালী মেয়েরা—লবণ সহযোগে অত্যধিক মাত্রায় কাঁচা আম খেয়ে থাকেন। তাঁদের জেনে রাখা উচিত—অত্যন্ত টক খাওয়ার ফলে মূত্রকষ্ট, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, চোখের দোষ এবং উত্তরকালে দাঁতের এমন অবস্থা হয় যে, কোনো শক্ত জিনিষ দাঁতে চিবুতে গেলেই দাঁতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর শির্ শির্ করে ওঠে। এক কথায়—তা, রোম ও দন্তের হর্ষজনক। আর, বিশেষ করে' মেয়েদের, এও জেনে রাখা ভাল যে, বেশি টক যাঁরা খান তাঁদের চোখ এবং ভ্রূ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এ ছাড়া বেশি টক খাওয়ার ফলে ভ্রম (ঘূর্ণি-রোগ) পিপাসা, দাহ, তিমির নামক নেত্র-রোগ, জ্বর, কণ্ডু, পাণ্ডু রোগ, বিসর্প, শোথ, বিস্ফোটক এমন কি কুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

এ হ'ল স্বাভাবিক কাঁচা আমের দোষ। অস্বাভাবিক কাঁচা আমের কিন্তু কতকগুলি গুণ আছে। মানুষের প্রয়োজনানুবর্ত্তী হয়ে সিদ্ধ, পক্ক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পাকচক্র ঘুরে যে আম বেরিয়ে এসেচে (যেমন—আচার, চাটনি, অম্বল প্রভৃতি) অস্বাভাবিক কাঁচা আম বলতে তাহাই বুঝতে হবে। প্রথমে আটপৌরে জিনিষটারই গুণ বর্ণনা করি।

আম্র-পেশী—চলতি ভাষায় সাধারণতঃ একে আমচুর বা আমশী বলে। কাঁচা আমের কসী ও খোসা ফেলে (খোসা না ফেল্লেও চলে) তাকে খণ্ড-খণ্ড করে কেটে রোদে শুকিয়ে নিলেই আমচুর তৈরি হয়। অবশ্য শুকাবার সময় পরিমাণ মত নুন, হলুদ মাখিয়ে নিলে তা শীগগির নষ্ট হতে পারে না। এর স্বাদ—অম্ল-মধুর-কষায়; গুণ—ভেদক, কফ, এবং বায়ুনাশক। যাঁদের স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা আছে তাঁরা নিয়মিতভাবে আমচুর খেলে পেটের উদ্বেগ কমে আসে।

জালি—জালি আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত আচার। প্রস্তুত-বিধি—কাঁচা আম বেশ করে পেষণ করে তাতে

পরিমাণ মত সরষে, নুন ও ভাজা হিঙ্‌ দিয়ে বেশ করে পবিত্রভাবে চটকে নিলে তাকে জালি বলে। এর গুণ এবং আময়িক প্রয়োগ,—জিহ্বার কুণ্ঠনাশক ও কণ্ঠশোধক। মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে খেলে এ-জিনিষ রুচিজনক ও অগ্নিপ্রদীপক হয়। মনে রাখতে হবে—লোভের বশীভূত হয়ে বেশি খেলে কু-ফল ফলে—জিনিষটা খুব গুরুপাক।

সম্ভবতঃ এই জিনিষটিই রূপান্তরিত হয়ে বাংলার কাসুন্দী হয়েচে। অতএব নিয়ে কাসুন্দী তৈরি করবারও এক সাধারণ প্রক্রিয়া দিচ্ছি।

কাসুন্দী—কাসুন্দী তৈরি করতে হ'লে প্রধানতঃ এই এই জিনিষগুলির প্রয়োজন :—(১) খোসা এবং কসী-ফেলে-দেওয়া কাঁচা আম; ধরুন ১৫, সের। (২) বীজ-বিহীন পাকা তেঁতুল ৪॥০ সের। (৩) বেশ-করে-ধোয়া পরে রোদে শুকানো সরষে চূর্ণ (রাই হ'লে আরও ভালো হয়) ১ সের। (৪) বেশ-করে ধোয়া পরে রোদে শুকানো হলুদ-চূর্ণ—১ পো'। (৫) নুন—এক সের তিন পো'।

প্রস্তুত-প্রণালী।—প্রথমে উপরোক্ত ১নং জিনিষটির ৫ সের নিয়ে বেশ খণ্ড খণ্ড করে কেটে নিন, ২নং নিন ১॥০ সের, ৩নং নিন সবটুকু, ৪ নম্বরও তাই; নিয়ে ঢেঁকিতে (অভাবে উদূখলে) বেশ করে' একসঙ্গে কুটে নতুন ধোয়া হাঁড়িতে ঢাকা দিয়ে তুলে রাখুন। চার দিন পরে আবার ১নং জিনিষের ৫ সের নিয়ে খণ্ড খণ্ড করুন, ২নং নিন ১॥০ সের; নিয়ে হাঁড়ির আচারের সঙ্গে মিশিয়ে ঢেঁকিতে কুটে আগেরই মতো হাঁড়িতে তুলে রাখুন। এইবার সাতদিন পরে—১নং ও ২নং জিনিষের বাকীটুকু (যথাক্রমে ৫ এবং ১॥০ সের) এবং ৫ নম্বরের সবটুকু নিয়ে হাঁড়ির আচারের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ ঢেঁকিতে কুটে হাঁড়িতে ভরে ফেলুন। এই হ'ল কাসুন্দী। কাসুন্দী মাঝে মাঝে রোদে না দিলে পচে' যেতে পারে। বাংলার মেয়েরা এ-দিয়ে বেশ 'অম্বল' রাঁধেন, খেতে সুস্বাদু হয়।

এ ছাড়া পশ্চিম দেশে কাঁচা আমের 'কলৌঁজী' 'খাটমিট্টি', 'কুচ্চি' প্রভৃতি অতি মুখরোচক ভাল ভাল মূল্যবান আচার তৈরী হয়; বাহুল্য-ভয়ে আর সে সবের উল্লেখ করলাম না।

আমের পানা। প্রস্তুত-বিধি।—কাঁচা আমকে জলে সিদ্ধ করে অথবা ভাল করে আগুনে সিদ্ধ করে, খোসা এবং কোসী ফেলে পরিষ্কার করে ধুয়ে, বেশ করে চট্‌কে ঠাণ্ডা জলে গুলতে হবে। পরে তাতে পরিমাণ মত চিনি, কর্পূর ও মরিচ চূর্ণ করে মিশিয়ে নিলেই পানা তৈরী হ'ল। কাঁচের গ্লাসে ঢেলে উপরে দু' একখণ্ড বরফ দিয়ে নিলে ত কথাই নাই! সুশ্রুত বলেন, এই পানা সর্ব্বপ্রকার প্রপানক হতে শ্রেষ্ঠ। গুণ—সদ্য রুচিকর, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পক।

পাকা আম। পাকা আমের গুণের বুঝি অন্তই নেই—নন্দনকাননের ফলই বটে। অবস্থাভেদে পাকা আমের গুণ আবার বিভিন্ন, তাই তার অবস্থাভিন্ন গুণই নিয়ে বর্ণিত হবে। তবে সাধারণতঃ পাকা আমের গুণ এই—সুমিষ্ট, রসনাতৃপ্তিকর, সুগন্ধযুক্ত, মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘ্ন, হৃদ্য, শরীরের কান্তিবৃদ্ধিকর, শীতবীর্য্য, কষায়ানুরস, অগ্নি ও সুখ বর্দ্ধক। এতে ত্রিদোষ নষ্ট হয়, উপরন্তু এ পিত্তকর নয়।

পাকা আমের একটা বিশিষ্ট গুণ এই যে, তা খুব কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। এইজন্য আম খেলে শরীর প্রায় সর্ব্বরোগমুক্তই হয়ে থাকে। পাকা আমকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সালসা বলা হয়।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ। সাধারণতঃ একটি পাকা আমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এইরূপ :—

জল	৭৫·৫ ভাগ
আমিষ-জাতীয় উপাদান (protein)	১·২ ভাগ
শালি বা অঙ্গার-জাতীয় উপাদান (carbo-hydrate) ...	১৭·৫৮ ভাগ
স্নেহ (fat)	০·৭৬ ভাগ
লবণ	১·২ ভাগ

গাছপাকা আম। গাছপাকা আমের স্বাদ,—মধুরাম্ল। গুণ,—গুরুপাক, বায়ুনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, কান্তিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ এবং পুষ্টিকর।

পালপাকা আম। পালপাকা আম অম্লরসবিহীন ও মধুর বলে পিত্তনাশক। এই আম পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি হয় বলে' গাছ-পাকা আমের থেকেও বেশি রুচিকারক, বলপ্রদ. বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘু, শীতবীর্য্য, সত্বপাচ্য, সারক এবং বাতপিত্তনাশক হয়।

পাকা আমের গালিত রস। পাকা আমের গালিত রসের গুণ,—বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ; বেশি খেলে কফ বর্দ্ধিত হয়।

বিখণ্ডিত আম্র। পাকা আমকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে খেলে তার গুণ হয়,—গুরু, রুচিকারক, মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, বলকর, শীতবীর্য্য, বায়ুনাশক এবং চিরপাকী অর্থাৎ বিলম্বপাচ্য।

দুগ্ধযুক্ত আম্র। দুগ্ধযুক্ত আমের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, শীতবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, অতিমাত্র রসনাতৃপ্তিকর, বায়ুপিত্তনাশক, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, রুচিবর্দ্ধক এবং শরীরের কান্তি-বৃদ্ধিকর। এ-ছাড়া দুগ্ধযুক্ত আমের একটা বিশিষ্ট গুণ,—তা অব্যর্থ মৃদু-বিরেচক।

অতিভোজনের দোষ ও তাহার প্রতিষেধক। বেশি আম খেলে অগ্নিমান্দ্য ও রক্তদুষ্টির সম্ভাবনা আছে। তারপর আমগুলো যদি আবার অম্লরসযুক্ত হয় (যেমন গাছপাকা আম) ত উপরন্তু হিসেবে বিষমজ্বর, চক্ষুরোগ প্রভৃতি জোটে।

ঘটনাচক্রে বেশি আম খেয়ে ফেল্লে, উক্ত দোষের প্রতিষেধক হিসেবে শুণ্ঠির ক্বাথ অথবা যথোপযুক্ত মাত্রায় সচললবণের সঙ্গে জীরে খাওয়া উচিত।

আমসত্ব। হিন্দীতে আমসত্বকে অম্বট বা আমওঠ বলে। সমগ্র হিন্দুস্থানেও আমসত্ব সাধারণতঃ আমওঠ বা আমোঠ নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্রে কিন্তু আমসত্বকে বলে আঁবেরদাচীং পোলী। ইংরেজীতে—inspissated mango juice।

আমসত্বের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ,—তৃষ্ণা, বমি, বায়ু, পিত্ত নাশক, সারক এবং রুচিকারক। সূর্য্যোত্তাপে পাক হওয়ায় আমসত্ব খুব লঘু হয়, কাজেই খুব সহজপাচ্য। যাঁদের স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা আছে তাঁরা নিয়মিত আমসত্ব খেলে পেটের উদ্বেগ কমে আসে।

আমের মোরোব্বা। প্রস্তুত প্রণালী।—পাকলে যে-আম শক্ত থাকে এবং যে আমে আদৌ আঁশ থাকে না (পালপাকা ল্যাঙড়া, বোম্বাই, কৃষ্ণভোগ, দড়্মা প্রভৃতি আমই প্রশস্ত) সে-আম বেশ বড় বড় করে কেটে প্রথমে ঘিয়ে একটু ভেজে নেবেন। তারপর তাকে মিছরীর রসের মত গাঢ় চিনির রসে ফেলে দিলেই মোরব্বা তৈরি হয়। পাকা আমের সাধারণ গুণের প্রায় সবগুলিই এতে থাকে। আর ঘিয়ে ভাজা হয় ব'লে বাতপিত্তনাশক হজমশক্তি এবং বল ও কান্তি বৃদ্ধিকর হয়। এ-জিনিষ কিন্তু খুব বেশী দিন অবিকৃত থাকে না, তবে বায়ুশূন্য টিনের কৌটায় রাখলে থাকে।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত অম্রখণ্ড। পাকা আমের তৈরি এক সুস্বাদু বহুরোগনাশক অতি উপাদেয় সামগ্রীর নাম অম্রখণ্ড। প্রস্তুতপ্রণালী—সুমিষ্ট আমের রস কাপড়ে ছেঁকে নিন। ঐ রস ৬২ সের, পরিষ্কার চিনি ৴৮ সের, গাওয়া ঘি ৴৪, শুঁঠচূর্ণ ৴১, মরিচচূর্ণ ৴৷৹, পিপুলচূর্ণ ৴।৹, দুধ ৴৮, মূর্চ্ছিত ঘিয়ের সঙ্গে সব জিনিষ একত্র পাক করুন। পাক সিদ্ধ হলে, পিপুলমূল, মুথা, চৈ, ধনে, জীরে, কালো জীরে, শঠি, বড় এলাচ, দারুচিনি, তালিসপত্র সূক্ষ্মচূর্ণ করে কাপড়ে ছেঁকে প্রত্যেক দ্রব্য ৴৷৹ নিন। তরমুজ-বীজ, লবঙ্গ এবং নাগকেশর চূর্ণ করে প্রত্যেক জিনিষ ২৪ তোলা, খাঁটি মধু ৴৪ সের। এ-সব বেশ করে একসঙ্গে মিশিয়ে ঘিয়ের ভাঁড়ে রেখে দিন। মধ্যে মধ্যে রোদে দেওয়া দরকার। মাত্রা দুই তোলা, ঈষদুষ্ণ দুধের সঙ্গে সেবন করতে হয়। এতে নেত্ররোগ, বায়ুরোগ, অম্লপিত্তজনিত রোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, প্রভৃতি অনেক রকম রোগ নষ্ট হয়। তা ছাড়া এতে দেহের কান্তি ও বল যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিয়মিত খেলে অত্যুত্তম সালসার কাজ করে।

আম্র-বীজ। হিন্দীতে আম্র-বীজকে কোইলিয়া বলে। চলতি বাংলায় কসী। কসীর গুণ বা আময়িক প্রয়োগ,—ঈষৎ অম্লসংযুক্ত কষায়মধুররস, বমি, অতিসার, কফ, বাত, হৃদয়ের দাহনাশক এবং ভেদক

(অন্যান্য গুণের জন্য, 'আময়িক প্রয়োগে আম্র' বিভাগ দ্রষ্টব্য)।

কসীর রুটি। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের দরিদ্র লোকেরা আমের সময় পথে পথে আঁটি কুড়িয়ে তার ভিতর হ'তে কসী বার করে। পরে তা জলে ভিজিয়ে, রোদে শুকিয়ে ময়দার মত চূর্ণ করে' গরম জলে মেখে তা দিয়ে রুটি তৈরি করে খায়। বলে,—ঈষৎ কষায় হ'লেও তা নাকি বেশ সুস্বাদু।

নব পল্লব। আমের কচি পাতার গুণ,—রুচিকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক (এই প্রবন্ধের 'আময়িক প্রয়োগে আম্র' বিভাগ দৃষ্টব্য)।

আম্র মূল। আম্র-মূল হচ্চে সঙ্কোচক। সেইজন্যে তা' জলে সিদ্ধ করে' সেই জল উদরাময় রোগীকে পান করতে দিলে বিশেষ উপকার হয় ('আময়িক প্রয়োগে আম্র' বিভাগ দ্রষ্টব্য)।

আময়িক প্রয়োগে আম্র

ওষুধ হিসেবে আমের অনেক ব্যবহার আছে। সাধ্য-মত তারই এক বহুপরীক্ষিত তালিকা দিতেছি।

পাকা আম—১। মধুর সঙ্গে পাকা আম মিশিয়ে খেলে ক্ষয়রোগ, প্লীহা, বাত, শ্লেষ্মা প্রভৃতি অনেক প্রকার রোগে উপকার পাওয়া যায়।

২। ঘিয়ের সঙ্গে পাকা আম মিশিয়ে খেলে বাত ও পিত্ত নষ্ট হয় এবং হজম-শক্তি, বল ও কান্তি বৃদ্ধি ঘটে।

৩। দুধ দিয়ে পাকা আম বাত-পিত্তাদি রোগে হিতকারী।

কাঁচা আম—৪। (টোটকা) কিছু কচি আম শুকিয়ে বাড়ীতে রেখে দেওয়া ভাল। উদরাময় রোগে শিশুদের এই কচি আমের কাথ পান করতে দিলে দু'তিন দিনেই উপকার পাওয়া যায় (পরীক্ষিত)।

৫। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বলেন,—কচি আম চক্ষু-প্রদাহে, কণ্ডুরোগে এবং হাঁপানী কাসিতে বিশেষ উপকারী।

আমের কসী—৬। আমের কসী জলে সিদ্ধ করে' সেই জল খাওয়ালে উদরাময় নষ্ট হয়।

৭। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা আমের কসী, শুঁঠ এবং কাঁচা বেল একসঙ্গে সিদ্ধ করে' রক্তামাশয় এবং উদরাময় রোগে ব্যবস্থা করে' বিলক্ষণ উপকার পেয়েছেন।

৮। (টোটকা)—নাক দিয়ে রক্তস্রাব হ'লে কসীর রসের নাস নিলে অবিলম্বে রক্ত বন্ধ হয় (পরীক্ষিত)।

৯। ইণ্ডিয়ান ফারমাকোপিয়াতে লেখা আছে, আমের কসীতে প্রচুর পরিমাণে অম্লসার (gallic acid) থাকায় এতে কৃমি নষ্ট হয়, এবং বাধক ও অর্শরোগে এর কাথ পান ক'রলে উপকার হয়।

১০। বৈদ্য রাজবল্লভীর মতে এতে তৃষ্ণা, সর্দ্দি, এবং অতিসার নষ্ট হয়।

১১। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে, কচি আমের কসী চক্ষু-প্রদাহে, কণ্ডুরোগে এবং হাঁপানি কাসিতে বিশেষ উপকারী।

আমের কচি পাতা—১২। আমের কচি পাতার সঙ্কোচক গুণ থাকায়, তা সিদ্ধ করে সেই জল খাওয়ালে উদরাময় ভাল হয়।

আমের মূল—১৩। আমের কচি পাতার মত আমের মূলেরও সঙ্কোচক গুণ আছে।

মল্লজগতে ভারতের স্থান

ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী

ভারতে যে-সব মল্লের উদ্ভব হইয়াছে তাঁহারা বর্ত্তমান মল্লজগতকে কতটা আলোড়িত করিয়াছেন এবং তাহার ফলে মল্লজগতে ভারতের স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহারই কথা আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান ভারতের অগ্রণী মল্লগণ

যখন স্যানডোর খ্যাতি-প্রতিপত্তি ইউরোপের সীমা অতিক্রম করিয়া এসিয়া আমেরিকার প্রান্তে শ্রুত হইতেছিল তখন ভারতের মল্লভূমিতে গোলাম, দেবীচৌধুরী ও রামমূর্ত্তি—এই ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটে। ইহারা ভারতীয় ব্যায়াম-পদ্ধতির উপযোগিতা ও উৎকৃষ্টতা এবং ভারতবর্ষীয় মল্লগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিশেষ ভাবেই উৎসুক ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ ব্যায়াম-পদ্ধতির পরস্পর তুলনামূলক আলোচনার পক্ষে ইহা একরূপ সন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। যাঁহারা এসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যান্বেষী তাঁহাদের পক্ষে অপূর্ব্ব সুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছিল।

বিশ্বজয়া গোলাম; জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তুরস্কদেশীয় তিনজন সুবিখ্যাত মল্ল প্যারিসে উপস্থিত হন। তাঁহাদের নাম ইসুফ ইসমাইল, নৌবূলা এবং কারা-ওসমান্। ইসুফের উচ্চতা ৬-২″, ভার ২৬৯½ পাউণ্ড, বক্ষস্থল ৫১½″ এবং গ্রীবা ১৮½″; নৌবূলার উচ্চতা এবং ভার যথাক্রমে ৬′-৬″ এবং ৩৩০½ পাউণ্ড; আর কারা-ওসমানের উচ্চতা ছিল ৫′১০½″, শরীরের ভার ২২০½ পাউণ্ড এবং বক্ষস্থল ৫১½″। ইহারা তিনজনেই Smooth type-শ্রেণীভুক্ত। যাহা হউক, ইসুফ ফ্রান্সের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মল্ল সাবেস্‌কে (Sabes)—যাঁহার সহিত বল পরীক্ষা করিতে তখন কেহই সমর্থ ছিল না—কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পরাজিত করেন। তারপর ইসুফ সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া যে-যে মল্ল তাঁহার সহিত বল-পরীক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছিল তাঁহাদের সকলকেই ভূতলশায়ী করেন।

তারপর মহা বলশালী ভীমকায় তুরস্কদেশীয় মল্ল কুর্‌ডেরেলি ইউরোপে পদার্পণ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া পাশ্চাত্য মল্লজগৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয় এবং তিনি সকলকেই তাঁহার সহিত বলপরীক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেও কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হন নাই।

তারপর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে মল্লযুদ্ধ পটু গোলাম ভ্রাতা কাল্লু এবং রহমানের সহিত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে দেখা দেন। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে ভারতীয় মল্লের ইহাই সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাব। "বিশ্বজেতা" উপাধিলাভের জন্য গোলাম ১৯০০ সালের ২৯শে মে তারিখে পাশ্চাত্যের যাবতীয় মল্লগণকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। পণ্ডিত মতিলাল প্রতিভূস্বরূপ তত্রস্থ ভেলো নামক ধনাগারে পনের হাজার ফ্রাঁ গচ্ছিত রাখেন। কিন্তু একজন ইউরোপীয় মল্লও সে আহ্বানে সাড়া দিতে অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে—"লাগু দ্যে লা প্রেস্"-এর পরিচালক ভাইকাউণ্ট অফ্ চেম্বার, তুর্কীমল্ল কুরডেরেলির পক্ষ হইতে ৫০০০ ফ্রাঁ বাজি রাখিয়া উভয়ের মধ্যে শক্তিপরীক্ষার সুযোগ করিয়া দেন। 'বুলভার অফ্ ক্লিসির' বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুচবিহারাধিপতি ছিলেন মীমাংসক। যুদ্ধ উপস্থিত হইবামাত্রই গোলাম লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ডেরেলির উপর পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভূতলশায়ী করেন ও ডেরেলির দুই স্কন্ধদেশ ভূমিলগ্ন করিয়া রাখেন। কিন্তু কতকগুলি লোকের পক্ষপাতিত্বে অনেক তর্কবিতর্কের ফলে পুনঃপরীক্ষাই স্থির হয়।

গোলাম-ডেরেলি দ্বন্দ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয়বারেও ডেরেলি গোলাম কর্ত্তৃক বহুবার ভূপতিত হইলেও প্রত্যেক বারেই উঠিয়া দাঁড়ান। তিনি তখন বিলক্ষণই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, যথাযথ রীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিলে তাঁহার পরাজয় অপরিহার্য্য। সেইজন্যই তিনি "মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকা"ই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবিলেন; তাঁহাকে দাঁড় করাইবার শতচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কোন মতেই উঠিলেন না। এই প্রহসন অন্যূন দেড় ঘণ্টা পর্য্যন্ত চলিল। গোলাম এই নিয়মের ব্যতিক্রমের বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদ জানাইলেন। ডেরেলি কিন্তু "যথাপূর্ব্বং তথাপরম্।" পরিশেষে গোলাম কয়েকটি পদাঘাতের দ্বারা ডেরেলিকে আপ্যায়িত করিয়া এই প্রহসনের উপসংহার করেন এবং বিজয়ী বলিয়া বিঘোষিত হন।

হেকেনস্মিট্ (Hackenschmidt)-এর শিক্ষাদাতা ডাঃ ফন্ ক্রাইয়েভস্কি এবং শরীরসাধনবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ ফরাসী অধ্যাপক দেবনে উপস্থিত থাকিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গোলামের অসাধারণ শক্তির পরিচয়ে বিস্মিত হন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাঁচ মিনিট পর্য্যন্তও গোলামের সম্মুখে ভরসা করিয়া দাঁড়াইতে পারে এমন মল্ল সারা পৃথিবী অন্বেষণ করিলেও মিলিবার সম্ভাবনা নাই।

১৯০০ সালের জুন মাসে মস্কোর রঙ্গভূমিতে পেশাদার-ভাবে হেকেনস্মিট্-এর উপস্থিতি সেই প্রথম। তখন তিনি এমাব্ল্ পেত্রফ্ কস্তা ল্যে বুশে, পেরুস্ প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বাইশ বৎসর, অটুট স্বাস্থ্য, অদম্য উৎসাহ। আর তখন গোলামের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর! সুতরাং ১৯০০ সালের ২৯শে মে হইতে ৩০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘকালের মধ্যে, ইচ্ছা থাকিলে বা সাহসে কুলাইলে হেকেনস্মিট্ নিশ্চয়ই গোলামের আহ্বানে বল-পরীক্ষা করিয়া নিজের কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন। গোলাম-ডেরেলি দ্বন্দ্বযুদ্ধ দর্শক তাঁহার শিক্ষক ডাঃ ক্রাইয়েভস্কির বুঝিতে বাকী ছিল না যে, তাঁহার ছাত্রাপেক্ষা গোলাম কত বড় মল্ল ও কত বেশী শক্তিমান পুরুষ। তত্রাচ এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে, হেকেনস্মিট্ একজন প্রথম-শ্রেণীর মল্ল, কিন্তু গোলাম ছিলেন অতুলনীয়।

গোলাম Smooth type, তাঁহার দেহের পরিমাণেই তাঁহার অসাধারণ আকৃতির অনুমান সহজ হইবে। দৈর্ঘ্য ৫´-৮½″, গ্রীবা ২০½″, বক্ষ (স্বাভাবিক) ৫৭¾″, বাহু (আকুঞ্চিত) ১৯¾″, পুরোবাহু ১৩¾″, উরু ৩১½″, নিম্ন পাদদেশ ১৮½″, ওজন ২৮৬½ পাউণ্ড।

মল্লসম্রাট কিক্কর

প্যারিসে অতি অল্পবয়স্ক কাল্লুর সহিতও সেখানকার প্রবীণ মল্লেরা প্রতিযোগিতায় সাহসী হন নাই। একবার কলিকাতায় টমক্যানন সে চেষ্টা করিয়া অতি সহজেই পরাস্ত হন। তখনই ইউরোপ বা আমেরিকায় কাল্লুর সমকক্ষ কেহই ছিল না। অতঃপর অভাবনীয়ভাবে কাল্লুর দৈহিক উন্নতি ঘটে। বলে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, মল্লক্রীড়া-পরিচালনার কৌশলে তিনি তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত ভ্রাতা গোলামের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোলামের মৃত্যুর পরে কাল্লুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকেন। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ইহার বিপর্য্যয় ঘটিল। সেই স্মরণীয় ঘটনা—পঞ্জাবের ভীমবল অতিকায় কিক্করের আবির্ভাব। ভারোত্তলন জগৎ যেমন আর্থার স্যাক্সন-এর দ্বারা নূতন-ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, তেমনই এই মহাবীর মল্লশ্রেষ্ঠ কিক্করের আবির্ভাবে মল্লজগতে একটা ওলট-পালট ঘটিয়া গেল। অবশ্য অপরিণতাবস্থায়, অসম্পূর্ণ শিক্ষা-বশতঃ কিক্কর বাল্যে গোলাম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু যখন তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, তাঁহার শরীর ও শক্তির চরম পরিণতি ঘটে, তখন তাঁহার সম্মুখীন হওয়া অতিবড় মল্লদিগের পক্ষেও ভীতিজনক ছিল। কাল্লুর যখন নিখুঁত অবস্থা তখনই কাল্লুকে বার বার জয় করা কিক্করের পক্ষে মুহূর্ত্তের ব্যাপারমাত্র হইয়াছিল। কিক্করকে কোনও বিশেষশ্রেণীভুক্ত করা চলে না; কিক্করের শ্রেণী কিক্কর নিজেই; তাহার তুলনা রহিত। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁহার বক্ষপরিধি প্রায় ৮০″ আর

বাহু আকুঞ্চিত ২৪½″। দুঃখের বিষয়, তাঁহার অঙ্গের অন্যান্য অংশের পরিমাণ যে কত ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিঙ্কর ও কাল্লু উভয়ই Smooth type। এত বড় আর এতটা শক্তিশালী মল্ল এক কিঙ্কর ব্যতীত পৃথিবীতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর এই যে এত শক্তি ও এত বৃহদাকার শরীর—ইহাও কেবলমাত্র ভারতীয় প্রথানুযায়ী ব্যায়ামাভ্যাসের ফল।

ভার-উত্তোলনে ভারত কি প্রকার আদর্শ স্থাপন করিয়াছে

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ভার-উত্তোলনকারিগণ পৈশিক শক্তির যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, মানব উপযুক্ত সাধনা দ্বারা কত অধিক শক্তি লাভ করিতে পারে। আর এই পাশ্চাত্য পদ্ধতি ও তাহা হইতে উৎপাদিত শক্তির আদর্শের সহিত ভারতীয় পদ্ধতি ও আদর্শের তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতীয় পদ্ধতি শক্তির আদর্শকে কত উচ্চতর সোপানে উত্তোলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে পেশীর আয়তন এবং শক্তি উভয়েরই বৃদ্ধিসাধনে ভার লইয়া ব্যায়ামের প্রবর্ত্তন হয়। তারপর মধ্যযুগে ভারতে যদিও এই প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত থাকে, তত্রাচ তাহার অবনতি ঘটে। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ভারতে ভারতীয় মল্লবিদ্যার এই অঙ্গ প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। সেই জন্যই বর্ত্তমান ভারত বহুসংখ্যক খ্যাতনামা ভার-উত্তোলনকারী মল্ল-সমাজে উপস্থিত করাইতে পারে নাই। তবু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমতাবস্থাতেও ভারতীয় প্রথায় সৃষ্ট ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত ভারতের সন্তান দেবী চৌধুরী তাঁহার অমানুষিক ভারোত্তোলন ক্ষমতায় জগতকে স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অমানুষিক শক্তির তুলনা জগতে মেলা ভার। তাঁহার শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের পাশ্চাত্য বলশালিগণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে।

সুঠাম সুবিন্যস্ত দেহের আদর্শ স্যাণ্ডো। আধুনিক যুগে ব্যায়াম-জগতে স্যাণ্ডোর দান অসাধারণ। "Muscular Type"এর মধ্যে স্যাণ্ডোর সুগঠিত দেহ ছিল অতুলনীয়।

দৈর্ঘ্য	৫′-৭″ ৭/১০
কব্জী	৭ ২/১০″
গ্রীবা	১৬½″
বক্ষ (স্বাভাবিক অবস্থায়)	৪৪ ১/১০″
কটি	৩২ ৭/১০″
বাহু (আকুঞ্চিত)	১৬ ৯/১০″
পুরোবাহু	১৩ ৩/৫″
উরু	২৩½″
পায়ের নিম্ন (calf)	১৫ ২/৫″

দৈহিক ওজন ১৮০ পাউণ্ড।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেহের গঠনসৌন্দর্য্যে তাঁহার সমকক্ষ কচিৎ দৃষ্ট হয়; আর উপযুক্ত উপায় অবলম্বন
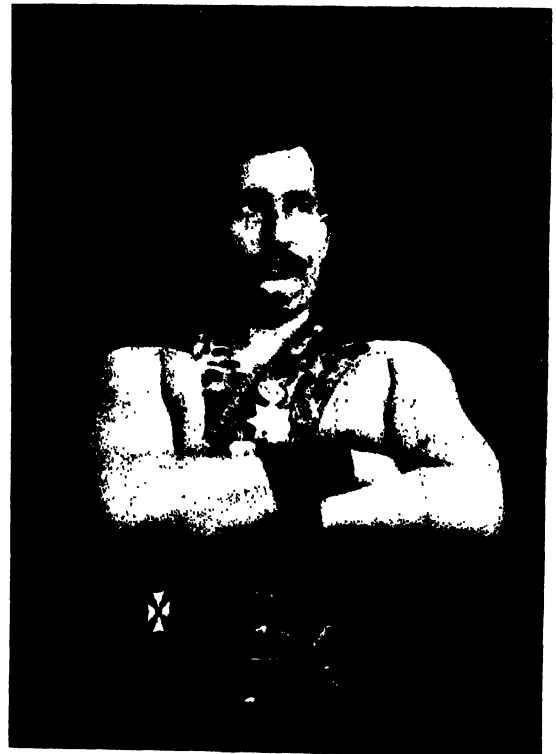
ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী

করিলে শরীরকে যে এমনই সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলা যায় তাহার পথপ্রদর্শক ও প্রবর্ত্তক স্যাণ্ডো। বলা বাহুল্য, সমগ্র শারীরসাধক তাঁহার নিকট চিরঋণী। এই প্রসঙ্গে ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য যে, বর্ত্তমানে

প্রচলিত ভারতীয় রীতিতে গঠিত এমন সুদর্শন সুন্দরাকৃতি দেহ একান্তই বিরল। এই আকৃতিগত উৎকর্ষে স্যাণ্ডোর পরেই রুষসিংহ হেকেনস্মিট্। তাঁহার দেহের পরিমাপ :—

দৈর্ঘ্য	৫´-৯½˝
কব্জী	৮˝
গ্রীবা	১৯˝
বক্ষ (সহজাবস্থায়)	৪৯˝
বাহু (আকুঞ্চিত)	১৮˝
পুরোবাহু	১৪½˝

Heavy Weight Muscular Type মল্লগণের মধ্যে হেকেন্স্মিট্-এর গঠনসৌষ্ঠব ও আকৃতিগত সৌন্দর্য্য যথেষ্টই ছিল। Heavy Type যে কতদূর পেশীবহুল হইতে পারে তিনিই তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতীয় রীতিতে ইহাও দুর্লভ। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, Smooth Type-এর এখানে পরম ও চরম পরিণতি হইয়াছে।

"স্মুদ টাইপ" ও "মাস্কিউলার টাইপ

Muscle separation, bulging, contour প্রভৃতি muscular type-এর বৈশিষ্ট্য; আর smooth type-এ skeletal muscle-এর অত্যধিক পুষ্টি, সুতরাং পেশী-সমূহের পরস্পরে স্বল্প ব্যবধান, চর্ম্মতলে পুঞ্জীভূত মেদের স্তর দৃষ্টিগোচর হয়; এই সঞ্চিত মেদ (অবশ্য অপরিমিত না হইলে) পেশীর আকুঞ্চনে কোনই বাধা জন্মায় না, বরং পেশী কুঞ্চিত হইলে লোহার মত কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। অবশ্য এমন কুস্তিগীর আছেন যাঁহারা প্রতিনিয়ত অপরিমিত মেদের বোঝা অনর্থক বহিয়া বেড়ান। এই মেদ-বৃদ্ধির কারণ—অমিতাহার এবং স্বাস্থ্যানুকূল অন্যান্য নিয়মাদির প্রতি অবহেলা। তদ্রূপ আবার muscular type-এর মধ্যে ক্ষীণদেহ লোকের অভাব নাই, অথচ তাহাদের পৈশিক ব্যবধান (muscle separation) খুবই স্পষ্ট। বিচারে উভয়কেই নিয়ম-লঙ্ঘনের দোষে দোষী বলা চলে। সে যাহা হউক, smooth typeরা muscle type অপেক্ষা অধিকতর বলশালী হইয়া থাকে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে ইহার কারণ নির্দ্দেশ সম্ভবপর নয়। স্যাণ্ডো, হেকেনস্মিট্, মাস্কিক্—ইহারা Muscular type; আর সির, স্বোবোডা, ম্যেক্‌র্কে—ইহারা smooth type। এখন পরস্পরের তুলনায় শেষোক্তরাই অধিকতর বলিষ্ঠ ও পুষ্ট।

স্যাণ্ডো কি বিশ্বজিৎ ?

১৮৮৯ সালের ২রা নভেম্বর যখন স্যামসন্ ও তাঁহার শিষ্য স্যাণ্ডো কর্ত্তৃক পরাভূত হন, তখন হইতেই স্যাণ্ডো অপরিমেয় শক্তিশালী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পর তিনি ভূপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করেন ও সেই সময়ে সর্ব্বপ্রধান বলবান্ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকেন। কিন্তু সত্যই কি তিনি বিশ্বজয়ী বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য ছিলেন? আমরা কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতে পারি না। সে সময়ে তাঁহার অপেক্ষা অনেক শক্তিমান্ লোকই বর্ত্তমান ছিলেন। আপলো এবং ভাসোর ফ্রান্সে, আবো এবং স্যাকসন জার্ম্মেনিতে, স্বোবোডা এবং ষ্টাইনাবাখ অষ্ট্রিয়াতে, হেকেনস্মিট ও লুরিখ রুষিয়ায়; জটম্যান ও নর্ডকোয়েষ্ট আমেরিকায়, সির ও বারে কানাডায়, দেবী চৌধুরী ও ভীমভবানী ভারতবর্ষে। ইহারা সকলেই শক্তিসামর্থ্যে স্যাণ্ডো অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। তত্রাচ ইহা অকপটে ও অসঙ্কোচ স্বীকার্য্য যে, তিনিও একজন খুবই বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড স্যাণ্ডো আর জার্ম্মানিতে কার্ল আবো—উভয়েই গুণ ও ক্ষমতানুসারে নিজ নিজ প্রাপ্য সম্মান পাইতেছিলেন। তখন স্যাণ্ডোর বয়ঃক্রম বাইশ বৎসর, আর কার্ল আবো-র আটত্রিশ বৎসর। কার্ল আবোর দৈর্ঘ্য ছয় ফিটেরও বেশী ছিল। তাঁহার পুরোবাহুর শক্তি বিস্ময়জনক, তিনি মাত্র এক হস্তে ১০৫ পাউণ্ড লম্বমানভাবে (muscle out) রাখিতে সমর্থ ছিলেন। ভারোত্তোলন-সম্পর্কে তিনি স্যাণ্ডোর অপেক্ষা অনেক বেশী বলিষ্ঠ ছিলেন। স্যাণ্ডোও তাঁহার সহিত বলপরীক্ষায় কখনও অগ্রসর হন নাই, যদিও সে সুযোগ খুবই ছিল। বরং স্যাণ্ডো তাঁহাকে এড়াইয়াই চলিতেন।

লণ্ডনে লুই

১৮৯২ সালের ১৯শে জানুয়ারী মহাবল লুই সির লণ্ডন নগরীতে পদার্পণ করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় বীরগণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন। সে এক বিরাট ব্যাপার। স্যাণ্ডো, স্যাম্‌সন্, লুই অ্যাটিলা, লল্টন্ গএলিয়ট আরও বহু শক্তিগর্ব্বিত ব্যক্তি সেইস্থলে (Royal Aquarium) উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই সে মদোদ্ধত আহ্বানের যথোচিত প্রত্যুত্তর দিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং লুই সির পৃথিবীর মহা শ্রেষ্ঠ শক্তিমান্ পুরুষ বলিয়া অবধারিত হন। তবে তিনি কেবলমাত্র প্রতীচ্য জগতেই এইভাবে গৃহীত হইলেন—ভারতের সংশ্রবে নয়, যেহেতু ভারত-সন্তান কেহই সে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আহূত হন নাই বা উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার সমসাময়িক অসীম বীর্য্যবান্ ভারত-সন্তান দেবী চৌধুরী যে গুরুভার অনায়াসে উত্তোলন করিতে সমর্থ ছিলেন তাহা ইঁহাদের কল্পনারও অতীত। দেবী চৌধুরীর জীবদ্দশায় বলবত্তায় "বিশ্ববিজয়ী" বলিয়া আখ্যাত হওয়ার ন্যায়সঙ্গত দাবী অপর কাহারও ছিল না।

লুই সির-এর শক্তিমত্তার পরিচয়

দুইটি অশ্বের গতিরোধ। এক হস্তে ১৬১ পাউণ্ড উত্তোলন, যাহা আজও কেহ পারিয়া উঠেন নাই। একটিমাত্র অঙ্গুলির দ্বারা ৫৫২½ পাউণ্ড উত্তোলন। দক্ষিণ হস্তে লম্বভাবে (muscle out) ১৩১ পাউণ্ড রাখা। ১৮৯৫ সালের ২৭শে মে পৃষ্ঠের দ্বারা ৪,৩০০ পাউণ্ড উত্তোলন করেন। অদ্ভুত কর্ম্মী!

ফরাসী বীর আপলো

বলশালিত্বে সির-এর নিম্নেই ইঁহার স্থান। ইনিও বিস্ময়জনক শক্তির অধিকারী ছিলেন। ২২৫ পাউণ্ড বারবেল্ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা snatch করিতেন। এই বারবেল্-এর দণ্ড এত স্থূল ছিল যে, তাহা ভূমিসংলগ্ন থাকিলে ভূমিবিচ্ছিন্ন করা অনেকেরই সাধ্যায়ত্ত হইত না। কথঞ্চিৎ নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অবস্থিত হইয়াও ২৫৪ পাউণ্ড বারবেল্ (স্থূল দণ্ডবিশিষ্ট) রাখিতে পারিতেন। সির-এর ছাত্র হরেস্ বারে প্রায় গুরুতুল্যই বলবান্ ছিলেন; একহস্তে military press ধারণে বারে ছিলেন তৃতীয়, অষ্ট্রিয়ার কে-ভিট্‌সেল্‌বের্গেরার প্রথম। সির, আপলো, বারে—ইঁহারা ছিলেন Smooth type-শ্রেণীভুক্ত। Muscular type স্যাণ্ডো ছিলেন ইঁহাদের নিকট বলে বালকবৎ।

অষ্ট্রিয়ার ভিল্‌হেল্‌ম্ টুর্ক

১৮৯৮ সালে, ৩১শে জুলাই ভিয়েনা নগরে ইনি "চ্যাম্পিয়ন" পদবী লাভ করেন এবং পৃথিবীর একজন অন্যতম বলী বলিয়া পরিচিত হন। স্যাণ্ডোর বয়স এই সময় একত্রিশ বৎসর। টুর্ক-এর সান্নিধ্য তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই বর্জ্জন করিতেন। টুর্ক two dumb-bell press-এ ২৭৯¾ পাউণ্ড, আর Barbell Press-এ ৩০০ পাউণ্ড তুলিতে পারিতেন। উপবিষ্টাবস্থায় ২৫৩ পাউণ্ড press করিতে সক্ষম ছিলেন। দুই হস্তে continental jerk-এর পরিমাণ ছিল ৩৫৫ পাউণ্ড। স্যাণ্ডো এতটা পারিতেন না।

মল্লক্রীড়ায় স্যাণ্ডো

"দেশে আমি সর্ব্বেসর্ব্বা, একচ্ছত্রী"—১৮৯১ সালের Pimlico-তে জনৈক সাক্ষাৎপ্রার্থীর প্রশ্নোত্তরে এই কথা স্যাণ্ডো জানাইয়াছিলেন। ইটালীতেই প্রথমে স্যাণ্ডো মল্লভাবে ক্রীড়াভূমিতে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি কয়েকজনকে পরাস্তও করেন। এমন কি, একত্রে দুই বা তিনজনকেও পরাভূত করিতে সমর্থ হন। এ সকল স্যাণ্ডো-স্যাম্‌সন প্রতিযোগিতার পূর্ব্ব ঘটনা। ইহার ফলে জার্ম্মেনী ও ইটালিতে তিনি একজন অজেয় মল্ল বলিয়াই গৃহীত হন। মল্লক্রীড়ায় বার্তোলেটি, সালি, সারিনি, ভোকোলি, ম্যুলার এবং মিলো সকলেই স্যাণ্ডো কর্ত্তৃক বিজিত হন। আমাদের ধারণানুসারে কিন্তু ইঁহারা কেহই মল্ল বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যই নহেন। সুতরাং ইঁহাদিগকে পরাজয় করিতে তেমন বিদ্যাবত্তা (মল্লশাস্ত্রে) বা ক্রীড়া-কৌশল প্রয়োজন হয় না। আমি এমন একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। কলিকাতা এই ঘটনার স্থান। এক পক্ষে ভীমভবানী, অপর পক্ষে

"রাষিয়ান স্যাণ্ডো।" এই স্যাণ্ডো অনেকবারই নিক্ষিপ্ত হন এবং অতিকষ্টে ভূমিসাৎ হওয়ার দায় হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে ভীমভবানী একজন "মল্ল" (wrestler) বলিয়া গণ্য হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। তবে এ বিষয়ে তাঁহার কতকটা অভিজ্ঞতা অবশ্যই ছিল। ইহার পরে এই রুষিয়ার স্যাণ্ডোকে হরনাম সিংহ মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন কিন্তু সে আহ্বানের উত্তর দিবার মত যোগ্যতা ও সাহস ইঁহার আদৌ ছিল না। আমরা এই রুষিয়ার স্যাণ্ডোর কথা স্থগিত রাখিয়া স্বয়ং স্যাণ্ডোর কথাই বলিতেছি যে, ভারত-ভ্রমণকালে ভারতীয় মল্লগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া প্রাধান্যস্থাপনের সুযোগ তাঁহার যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। ইউরোপ, আমেরিকাতেও এই সুবিধার কোনও অভাব ঘটে নাই, তত্রাচ তিনি বার বার সে সুযোগ গ্রহণ না করায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, তিনি প্রকৃত 'মল্ল' বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন না।

রুষিয়ার হেকেনস্মিট্

বলে টুর্ক-এর নিয়ে, কিন্তু আকারে ও বলে ইনি স্যাণ্ডোর উপরে। তবুও ইঁহাকে ভার-উত্তোলনে 'চ্যাম্পিয়ন' বলা চলে না, যেহেতু তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি সর্ব্ববিজয়ী কুস্তিগীর হইবার অভিপ্রায়েই নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার wrestler's bridge lift বিস্ময়জনক ও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া আখ্যাত।

ভিয়েনার জোসেফ্ ষ্টাইনবাথ

ইঁহার উদয়ে টুর্ক-এর প্রতিপত্তি অস্তমিত হইতে আরম্ভ হয়। Double-handed lifting-এ তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। তিনি গুল্ফ দুইটি পরস্পর সংলগ্নভাবে রাখিয়া ২৮৫ পাউণ্ড barbell press করিতে পারিতেন। Continental jerk-এ তাঁহার সীমা ছিল ৩৮৬ পাউণ্ড। এই টুর্ক ও ষ্টাইনবাথ ছিলেন Smooth Type-শ্রেণীভুক্ত; উভয়েই স্যাণ্ডো ও হেকেনস্মিট অপেক্ষা বলশালী ছিলেন।

সারি—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ প্রণীত; মূল্য ১৷৹; প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০৩।১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তি, তাঁহার 'নীলাম্বরী', 'কানের দুল', 'মুদ্রাদোষ', 'বিবি বউ' প্রভৃতি পুস্তকগুলি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। এবার তিনি যে গল্প-সংগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তাহার নাম দিয়াছেন 'সারি'। সারি, প্রেমের ঠাকুর, অচেনা, মুক্তার মালা, অসতী, বাইজী, আমার কন্যাদায়, ঠাকুর ঝি ও সম্পাদকের দায়িত্ব, এই নয়টী ছোট গল্প এই পুস্তকে আছে এবং প্রথম গল্পের নামেই বইখানির নামকরণ করা হইয়াছে। প্রথম গল্প 'সারি' পড়িয়া খগেন্দ্রনাথের অনেক দিন পূর্ব্বের লেখা 'বাঁশীচোর' গল্পের কথা মনে পড়িল। যখনই যাহার লিখিত কোন গল্প পড়ি, তখনই একবার করিয়া খগেন্দ্রনাথের বাঁশীচোর গল্পের ছবি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই, আর তখনই মনে হয়, আর কেহ অমন ভক্তিভরে গল্প লেখেন না কেন? এতদিন পরে 'সারি' গল্পটি পড়িয়া সে ক্ষোভ দূর হইল; সুকবি, সুগায়ক খগেন্দ্রনাথকে এই গল্পের মধ্যে মূর্ত্তিমান দেখিলাম, ভক্তের সাধনার ইঙ্গিত পাইলাম। তার পরেই প্রেমের ঠাকুর,—ইহাও ঐ এক সুরেই বাঁধা। অন্য গল্পগুলিও ভাল হইয়াছে—বিশেষতঃ সম্পাদকের দায়িত্ব; কিন্তু সকল কথা ছাপাইয়া শুধু জাগিয়া উঠিতেছে বনমালীর সেই গান—

"নয়নক নিঁদ গেও বদনক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গে দুখ মঝু পাশ॥"

ইহার পর আর কিছু বলিবার আছে কি? গল্পগুলি পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি এবং বনমালীর মধ্যে খগেন্দ্রনাথের স্বরূপ দেখিয়া শান্তিলাভ করিয়াছি।

শ্রীজলধর সেন

ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য—(বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, ও টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত), পঞ্চম খণ্ড, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত।

শ্রদ্ধাস্পদ তর্কবাগীশ মহাশয় বিগত ১৩২০ সালে ইহা আরম্ভ করেন। ইহার প্রথম খণ্ড বাহির হইলে এই 'প্রবাসী'তেই আমি কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। আজ এই পঞ্চম খণ্ডে গ্রন্থখানি পরিসমাপ্ত হইল। তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার এই গ্রন্থখানি ক্রমশ প্রকাশ করিয়া আমাদের উত্তরোত্তর গভীরতর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বহু সময়ে একদেশদর্শী বলিয়া করুণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই পুস্তকখানি একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিজের মত পরিবর্ত্তন করিবেন। বস্তুতই তর্কবাগীশ মহাশয় বাৎস্যায়ন ভাষ্যের ব্যাখ্যা লিখিতে গিয়া নিজের বহুমুখ গভীর পাণ্ডিত্য, সুনিপুণ সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ও দুর্লভ বহুশাস্ত্রজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গবেষণার সহিত তাঁহার যে বিশেষ পরিচয় আছে তাঁহার গ্রন্থ তাহারও সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রণালী বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের 'অনুমান চিন্তামণি' ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয়ের "মুক্তিবাদের" অনুবাদে তর্কবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থের প্রেরণা থাকিতে পারে।

আজকাল কোনো জিনিসের দর ঠিক করিবার বাজার পশ্চিমে, তা সে জিনিস স্বদেশীই হউক আর বিদেশীই হউক। তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায়ভাষ্য-অনুবাদের ভাষাটি যদি বাঙ্লা না হইয়া কোনো ইউরোপীয় ভাষা হইত তাহা হইলে ইহার আদর ও প্রচার যে, আমাদেরও দেশে অনেক বেশী হইত তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। তর্কবাগীশ মহাশয় বঙ্গভাষাকে এক অপূর্ব্ব দান দিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বস্তুতই একটি বড় কাজ করিলেন।

আমাদের এই আলোচ্য খণ্ডে ন্যায়দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় আহ্নিক হইতে অবশিষ্ট সমগ্র অংশ আছে। ইহার মধ্যে নানাস্থানে বৌদ্ধদর্শনের কথা আছে। ইহা আলোচনা করিতে গিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় সম্প্রতি প্রকাশিত মূল বৌদ্ধশাস্ত্রও আলোচনা করিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তাঁহার ব্যাখ্যা সুন্দর হইয়াছে। মূল পুস্তকের পাঠ স্থির করিতেও ইহা ইহাকে সাহায্য করিয়াছে। এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়। ন্যায়বার্ত্তিকে ৪.২.২৫শ সূত্রে বসুবন্ধুর বিং শ তি কা (বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি) হইতে দুইটি কারিকা (১২শ, ১৪শ) উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমটি এই:—

ষট্‌কেন যুগপদ্ যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
ষণ্ণাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ॥

এ কারিকাটি বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়। মুদ্রিত পুস্তকের (লেবি সাহেবের সংস্করণ) ইহাই পাঠ। ন্যায়বার্ত্তিকের কোনো সংস্করণে (কাশী) পূর্ব্বার্দ্ধে "যুগপদ্ যোগাৎ" এই পাঠই আছে, কোনো সংস্করণে (কলিকাতার) আছে 'যুগপদ্ যোগে।' বসুবন্ধুর নিজের ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় পাঠই সমর্থিত হয় ("পরমাণুর্যুগপদ্ যোগে সতি")। তিব্বতী অনুবাদেও (ছ্যোর-ব-ন) ইহাই স্পষ্ট প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় অর্দ্ধে, অর্থাৎ তৃতীয় পাদে উল্লিখিত দুইটি সংস্করণেই "সমানদেশত্বে" পাঠ আছে, কিন্তু তর্কবাগীশ মহাশয় ঠিকই দেখাইয়াছেন, মুদ্রিত বিংশতিকায় পঠিত হইয়াছে "সমান দেশত্বাৎ।" বসুবন্ধুর বৃত্তিতেও ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু "সমানদেশত্বে" এই পাঠও যে অতিপ্রাচীন তাহা তিব্বতী অনুবাদে দেখা যায় (গো. চিগ. ন)। "তেষামাপ্যেকদেশত্বে" পাঠ ঠিক নহে।

ন্যায়বার্ত্তিকে (কলিকাতা, পৃ ৫২২; কাশী, পৃ ৫১৭) বিংশতিকার ১৪শ কারিকাটিও উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এখানেও একটু পাঠভেদ দেখা যায়, বিংশতিকায় আছে "দিগ্‌ভাগভেদঃ," কিন্তু বার্ত্তিকে রহিয়াছে "দিগ্‌দেশভেদঃ।"

এই প্রসঙ্গে তর্কবাগীশ মহাশয় গাইকোয়াড় প্রাচ্যগ্রন্থমালায় প্রকাশিত 'তত্ত্বসংগ্রহের" রচয়িতার নাম বলিয়াছেন (পৃ ১০৫) শা ন্ত র ক্ষি ত। অবশ্য ইহাই মুদ্রিত হইয়াছে, এবং ঐ গ্রন্থমালার পরিচালক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও অন্যান্য

লেখকেরা এখনো তাহাই লিখিতেছেন—যদিও ঐ পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে কোনো ইউরোপীয় সমালোচক এক সুপ্রসিদ্ধ বৈদেশিক ত্রৈমাসিকে তাহা ঠিক নহে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থকারের আসল নাম শান্তি রক্ষিত, শান্ত রক্ষিত নহে।

বিজ্ঞানবাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে (পৃ ১৩০) তর্কবাগীশ মহাশয় বিংশতিকার দ্বিতীয় কারিকাটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পুস্তিকাখানি লেবি সাহেব যে পুঁথি হইতে সংস্করণ করেন তাহার প্রথম পাতাখানি ছিল না। তাই উহাতে মূল পুস্তকের যতটুকু তাহার মধ্যে ছিল তাহা তিনি ভারতীয় পাঠকগণের সুবিধার জন্য তিব্বতী ও চীনা অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতে পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা তিনি সেখানে পাদটীকায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন।* দ্বিতীয় কারিকাটি ইহারই মধ্যে পড়িয়াছে। তিনি এইরূপে তাহার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন (ইহা বসুবন্ধুর পাঠ নহে)—

যদি বিজ্ঞপ্তিরনর্থা নিয়মো দেশকালয়োঃ।
সন্তানস্যানিয়মশ্চ যুক্তা কৃত্যক্রিয়া ন চ ॥

এই পাঠবিচারে বসুবন্ধুর বৃত্তির লুপ্তাবশিষ্ট পঙ্‌ক্তিটিও সাহায্য করে। যাহাই হউক, উল্লিখিত পাঠটি যে সর্ব্বাংশে ঠিক হয় নাই, তর্কবাগীশ মহাশয় ইহা ঠিকই বলিয়াছেন। মূল পাঠ ঠিক করিতে হইলে তিব্বতী ও চীনা অনুবাদের মধ্যে তিব্বতীই সাহায্য করে অনেক বেশী। নীচে এই কারিকার তিব্বতী অনুবাদটি উদ্ধৃত হইল :—

গল. তে. র্নম. রিগ. দোন. মিন. ন।
য়ুল. দঙ. দুস. ল. ঙেস. মেদ. চিঙ.।
সেমস. ক্যঙ. ঙেস.মেদ. ম. য়িন. ল।
ব্য. ব. বোদ. প'ঙ. মি. রিগস. 'গ্যুর ॥

ইহার ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ আমি আমার ছাত্রগণকে করিয়া দিয়াছিলাম—

বিজ্ঞপ্তির্যদ্যনর্থা ন নিয়মো দেশকালয়োঃ।
সন্তানানিয়মো নৈব যুক্তা কৃত্যক্রিয়া ন চ ॥

তর্কবাগীশ মহাশয় পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ পাঠ করিতে চাহেন—

অনর্থা যদি বিজ্ঞপ্তির্নিয়মো দেশকালয়োঃ।
সন্তানস্য চ যুক্তো ন যুক্তা কৃত্যক্রিয়া ন চ ॥

প্রথম পাদের সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। তৃতীয় পাদে তিব্বতী অনুসারে পাঠ হইবে 'সন্তানানিয়মো নৈব," পূর্ব্বে যেরূপ দেখান হইয়াছে, তর্কবাগীশ মহাশয় এখানে প্রস্তাব করিয়াছেন "সন্তানস্য চ যুক্তো ন।" উভয়ের মধ্যে অনেক ভেদ হইতেছে। তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে অন্বয় হইবে "সন্তানস্য চ নিয়মো ন যুক্ত"; অপর পক্ষে তিব্বতী অনুসারে 'নিয়মঃ' না হইয়া 'অনিয়মঃ' হইবে। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, উভয়ের মধ্যে কোন্ পাঠটি বৃত্তির দ্বারা সমর্থিত হয়। আমার মনে হইতেছে দ্বিতীয় পাঠটি।*

তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই গম্ভীর গ্রন্থের যথাযথ আলোচনা করিবার উপযুক্ত স্থান ও কাল কিছুই এখন বর্ত্তমান লেখকের নাই। তাই এ সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া আর একটিমাত্র কথা উল্লেখে এই ক্ষুদ্র আলোচনাটি শেষ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা একটি খুবই শুভ লক্ষণ যে, দেশে প্রাচীন বহু শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে এবং নবীন-পন্থীদের এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের দ্বারা অনেক জিনিস প্রকাশিত হইতেছে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। ইঁহাদের একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। দেশের প্রাচীন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের নিকট যে সকল তত্ত্ব এখনো আছে, তাঁহারা যাহা বলেন, নবীনপন্থীরা তাহা যেন একবার অবধান-পূর্ব্বক শ্রবণ করেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের গ্রন্থ তাহাদিগকে বহু জিনিস দিতে পারিবে। এ প্রসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে আমি বলিতে ইচ্ছা করি—

গম্ভীর ন্যায় ভাষ্যাব্ধের্বিলোড়ন-বিচক্ষণঃ।
অগ্রণীর্বিদুষাং মান্যো ন কস্য ফণিভূষণঃ ॥

তর্কবাগীশ মহাশয় এতদিনে তাঁহার আরব্ধ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিলেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। যিনি দেন তাঁহার নিকট প্রার্থনা বাড়িয়াই যায়। এবার তিনি 'বার্ত্তিকে' হাত দিতে পারেন, অথবা 'ন্যায়বিন্দু', বা ঐরূপ অন্য গ্রন্থও গ্রহণ করিতে পারেন।

বৌদ্ধ রমণী—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি।

বিমলাচরণ বাবু অল্পকালের মধ্যে বৌদ্ধসাহিত্য অবলম্বনে অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি 'বৌদ্ধসাহিত্যে স্ত্রীলোক' (Women in Buddhist Literature) নামে ইংরাজীতে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, "বৌদ্ধরমণী" তাহারই বঙ্গানুবাদ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সাতটি পরিচ্ছেদ আছে—বৌদ্ধযুগে উদ্বাহতত্ত্ব, বৌদ্ধযুগে ক্রীতদাসী, বৌদ্ধযুগে নর্ত্তকী ও বারবনিতা, নারীচরিত্র, বৌদ্ধযুগে স্ত্রী-শিক্ষা, গৌতম বুদ্ধ ও রমণীগণ, ও খ্যাতনামা বৌদ্ধ রমণীগণ। বৌদ্ধসাহিত্যে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ভাল-মন্দ উভয়ই দিক্ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে, বিমলা বাবু প্রধানত বহু পালি গ্রন্থ হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া এক পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত রূপে সাজাইয়া দিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকগণ এখন অনায়াসে এই পুস্তকের সাহায্যে বৌদ্ধ ভারতের স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় জানিতে পারিবেন। বঙ্গে পালিভাষায় আলোচনা বহুদিন হইতে চলিতেছে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বঙ্গভাষায় ঐ বিষয়ে যত পুস্তক রচিত বা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, তাহার এক অংশও হয় নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঈশানবাবু এই বৃদ্ধবয়সে জাতক অনুবাদে যে শ্রম করিয়াছেন, বাঙ্‌লার কোনো যুবকও তাহা করেন নাই। অত্যন্ত

---

* "La premiere page manque au manuscrit; j'ai tenté de la restituer en sanskrit, pour la commodité des lecteurs indiens, en m'aidant des traductions en tibétain et en chinois."

* তিব্বতীর মূল শব্দটি হইতেছে 'সেমস', সাধারণত 'চিত্ত' ('চেতস্', 'চেতনা', 'মনস্') শব্দ দ্বারা ইহার অনুবাদ করা হয়। মূল তিব্বতীতে এখানে 'সন্তান' বাচী কোনো শব্দ (র্গ্যুদ, র্গ্যুন) নাই, কিন্তু বৃত্তির মূল সংস্কৃতে 'সন্তান' শব্দই আছে। তাই স্পষ্টতই বুঝিতে হয় এখানে বৃত্তির 'সন্তান' শব্দ চিত্ত-সন্তান অর্থে ধরিতে হইবে।

* পরে দেখিতেছি তর্কবাগীশ মহাশয় শুদ্ধিপত্রে ঐ স্থানে "সন্তানানিয়মো নাপি" পাঠ করিয়াছেন। ইহা ঠিকই হইয়াছে, এবং আমি মুক্তকণ্ঠে আনন্দের সহিত বলিব, ইহাই একমাত্র পাঠ; আমার পাঠ অপেক্ষা এই পাঠই সুন্দরতর, এবং তিব্বতীকে ঠিক অনুসরণ করিলে "নৈব" না হইয়া "নাপি" পাঠই হইবে। তিব্বতীর "ক্যঙ" অর্থে "অপি", "এব" নহে।

দুঃখের বিষয়, তাঁহার অনূদিত জাতকগুলির যেরূপ প্রচার হওয়া উচিত ছিল এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই হয় নাই। বিমলাচরণ বাবু ইহার মধ্যে এই আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহা আ'রো আনন্দের বিষয় হইত যদি তিনি একটু সাবধানতার সহিত ইহা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলিতে পারা যায়।

প্রধানত পালি হইতেই পুস্তকের উপকরণ গৃহীত হইয়াছে। ইউরোপীয় লেখকেরা অনুবাদ প্রভৃতিতে সংজ্ঞা বা ব্যক্তিবাচক পদগুলিকে পালি-আকারেই সাধারণত রাখিয়া থাকেন, উহার সংস্কৃত শব্দ দেন না। বিমলাচরণ বাবুও তাহাই করিয়াছেন, কিন্তু মনে হয়, আমাদের দেশের পাঠকগণের দিকে লক্ষ্য রাখিলে পালি অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিলে পাঠকগণের তাহা অনেক সুগম হইত—নানা দিক্ দিয়া; অপর পক্ষে পালি শব্দ অনেক স্থলেই অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। যেমন, উ দে ন (পৃ. ১৩) না বলিয়া যদি উ দ য় ন, প্র সে ন দি (পৃ. ৮) না লিখিয়া প্র সে ন জি ৎ, অথবা ব জ্জি রা না বলিয়া যদি ব জ্রী, কিংবা ভ দ্দা (পৃ. ১৪১) না বলিয়া ভ দ্রা, অথবা অ জা ত স ত্তু (পৃ. ৩) না বলিয়া যদি অ জা ত শ ত্রু বলা যায়, তবে ভারতীয় বা অন্তত বঙ্গীয় পাঠকগণের সকলেরই অনেক সুগম হয়।

বিমলা বাবু যদি সর্ব্বত্রই এই নীতি অনুসরণ করিতেন তবে তাহাও একটা হইত, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। অনেক স্থলে আবার সংস্কৃত নাম দিয়াছেন। যেমন, অ র্দ্ধ কা শী (পৃ. ৪৫), শা ল ব তী (পৃ ৩৮), ইত্যাদি।

আবার স্থানে-স্থানে একাংশে পালি অপরাংশে সংস্কৃত। যেমন "অ জা ত শ ত্তু র (অজাতশত্রুর)", পৃ. ১৭; কো শ ম্বী (পৃ. ১৬৯, ও নির্ঘণ্ট), ইত্যাদি।

তিনি এক স্থানে (পৃ. ৮) লিখিতেছেন বা স ভ খ ত্তি য়া, অপর স্থানে (পৃ. ১৫৩, ১৫৭) বা স ব ক্ষ ত্তি য়া। একবার বলিতেছেন ব জ্জি রা, অপরবার বলিতেছেন ভ জ্জি রা (পৃ. ১৬০)। স্পষ্টতই ইংরাজী হরফে ছাপা পুস্তকের v অক্ষরটির অনুলিখনে ভ্রম হইয়াছে। এই কারণেই অ বী চি নরক অ ভী চি (পৃ. ১৫৮) হইয়াছে। উ চ্ছি খ ভ ত্ত (পৃ. ৬০) হইবারও অন্য কারণ দেখা যায় না, ইংরাজী লেখা (ucchittha bhatta) হইতে অনুলিখনে ভ্রম হইয়াছে।

এরূপ ও অন্যরূপও ত্রুটি আরো অনেক লক্ষিত হইল। বর্ণাশুদ্ধিও আছে। অন্তত তিন বার (পৃ. ৩, ৬) পি তৃ ষ সা, ও বহুবার (পৃ. ৩২-৪৫) বা র ব ণি তা মুদ্রিত হইয়াছে।

বিশাখার মি গা র মা তা নাম (পৃ. ৫০) তাঁহার শ্বশুরের নাম হইতে, পুত্রের নাম হইতে নহে।

বাঙ্লা পুস্তকে নির্ঘণ্টের শব্দগুলি ইংরাজী বর্ণমালাক্রমে না সাজাইলেই ভাল হইত।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

কামন্দকীয় নীতিসার—শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদ। ১৩৩১। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ।০×১৪৪×৶০

কামন্দকীয় নীতিসার একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। কত প্রাচীন ঠিক বলা যায় না। অগ্নিপুরাণে কামন্দকীয় নীতির পুরাপুরি একটা অধ্যায় উদ্ধৃত করা আছে। কে কাহার নকল করিয়াছে বলা কঠিন। এ গ্রন্থ যে ভবভূতির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বলিদ্বীপেও কামন্দকীয় নীতিসারের খুব প্রচলন ছিল। অর্থনীতির অনুশীলনকারীদিগের নিকট এই গ্রন্থের মূল্য খুব বেশী। ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়াছে। বর্ত্তমান অনুবাদক মুখবন্ধে তাহাদের সামান্য পরিচয়ও দিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদের কথা কিছু বলেন নাই। ইহার তিনখানি অনুবাদও হইয়াছিল। প্রথম অনুবাদ হয় হিন্দীতে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। অনুবাদক লাহোর Government Upper Schoolএর সংস্কৃত শিক্ষক পণ্ডিত রামরত্ন। ১৮৯৬ সালে টীকাটিপ্পনীসহ ইহার একটী ইংরেজী অনুবাদ মন্মথনাথ দত্ত মহাশয় প্রকাশ করেন। তারপর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটী বঙ্গানুবাদ বাহির হইতে থাকে। অনুবাদটী সম্পূর্ণ হয় নাই। অতঃপর ১৩২৪ সালে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে সামান্য সামান্য ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। বুঝিতে কষ্ট হয় না। তবে অনুবাদের সঙ্গে অন্যান্য নীতিশাস্ত্রের তুলনামূলক একটী মন্তব্য থাকিলে গ্রন্থখানি আরও উপাদেয় হইত সন্দেহ নাই। অনুবাদ সম্বন্ধে একটা কথা বলিবার আছে। স্থানে স্থানে অনুবাদে কিছু কিছু অসতর্কতা লক্ষ্য করিয়াছি। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে সে বিষয়ে তিনি সাবধান হইবেন। দু'একটী উদাহরণ দিতেছি:—

অনুবাদক প্রথম সর্গের সপ্তম শ্লোকের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'সমস্ত বিদ্যার পারদর্শী মহামতি বিষ্ণুশর্ম্মার সুদৃষ্টিতে পতিত হইয়া, রাজনীতি-শাস্ত্রের জটিলতা ও অপ্রিয়তা দূরীভূত হইয়া, অর্থবিশিষ্ট অথচ একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।' ৬ষ্ঠ শ্লোকে বিষ্ণুগুপ্তের নির্দ্দেশ আছে। ৭ম শ্লোকে তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "বিষ্ণুগুপ্ত" ও "বিষ্ণুশর্ম্মা" যে একব্যক্তি নন, অনুবাদক তাহা বুঝেন নাই। 'সুদৃশঃ' পদের অর্থ জয়মঙ্গলা করিয়াছেন—"যথাবদধিগতবিদ্যার্থত্বাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানস্য"—সুতরাং 'সুদৃষ্টিতে পতিত হইয়া' বলিলে চলিবে না। তারপর 'রাজবিদ্যাপ্রিয়তয়া'র অর্থ হওয়া উচিত 'রাজবিদ্যাপ্রিয়তাবশতঃ,' বা 'রাজবিদ্যা আমাদের প্রিয় বলিয়া', "রাজনীতিশাস্ত্রের জটিলতা ও অপ্রিয়তা দূরীভূত হইয়া" নয়। ১৩শ শ্লোকের অনুবাদে অনুবাদক লিখিয়াছেন, "যবন নামে এক ভূপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া দীর্ঘকাল পৃথিবী উপভোগ করিয়াছিলেন।" যবন নামে কোন রাজার এইরূপ হইয়াছিল বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও উল্লেখ নাই। কলিকাতা সংস্করণের পাঠ ভুল। "ধর্ম্মাদ্যৈ যবনো রাজা চিরায় বুভুজে ভুবম্"—জীবানন্দের পাঠ। গণপতি শাস্ত্রীর বিশুদ্ধ পাঠ হইতেছে "ধর্ম্মাদ্ বৈজবনো রাজা চিরায় বুভুজে মহীম্।" বৈজবন রাজার কথা শাস্ত্রে আছে। এইরূপ অনবধানতা অনুবাদে আছে। গ্রন্থে তর্জ্জমার সঙ্গে স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা মিশিয়া গিয়াছে। ব্যাখ্যাগুলি পৃথক্ বা পাদটীকায় থাকিলেই ভাল হইত।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ঝড়ের পরে—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসুরথচন্দ্র মিত্র। ১৪, দাস লেন, বহুবাজার। দাম পাঁচ সিকা।

ছোট গল্পের বই। নায়ক নায়িকাদের কথাবার্ত্তায় শরৎচন্দ্রের বাক্য রীতির অনুকরণ বড় বেশী। কাগজ ও ছাপা মন্দ নহে।

শান্তা—শ্রীবিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক এম্, এন্, রায় চৌধুরী এণ্ড কোং। ১১, কলেজ স্কোয়ার। দাম ১৷০

উপন্যাসখানি ভাল লাগিল। শান্তার চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। ভাষা সুমার্জ্জিত। প্রচ্ছদপটটি ভাল হয় নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার—শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এল্‌-এম্‌-এস্‌ প্রণীত। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২০৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲ মাত্র।

যক্ষ্মারোগ সম্প্রতি যেরূপ দ্রুত বিস্তৃতিলাভ করিতেছে তাহাতে এইরূপ সুলিখিত পুস্তকের প্রকাশ সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভূমিকায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে আজকাল যক্ষ্মা সম্বন্ধে যদিও অনেক সংবাদ-পত্রে ও পুস্তক আকারে আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে প্রায়ই ঠিক খবর থাকে না, সেইজন্য বহুলোকের উপকারের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাশ হইতেছে।

সাধারণের বিশ্বাস যে যক্ষ্মা ব্যাধি হইলে আরোগ্য হয় না—কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। যক্ষ্মারোগের সহিত রোগীর যুদ্ধ করিতে হইলে সুচিকিৎসককে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাঁহার পরামর্শমত না চলিলে রোগীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

লেখক প্রথম অধ্যায়ে ক্ষয়রোগ ও তন্নিবারণ সম্বন্ধে কয়েকটি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ক্ষয়রোগ দেখা দিবার প্রাথমিক লক্ষণগুলি, আক্রমণের প্রণালী, জীবাণুর স্বরূপ ও প্রকৃতি, ব্যাধি নিবারণের উপায়, জনসাধারণের শিক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রোগের কয়েকটি বিশেষ উপসর্গের সহজ প্রতিকারোপায় বা গৃহ-চিকিৎসা ও পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে, পথ্যাপথ্য, টিউবারকিউলিন, সৌরস্নান, ইন্‌জেকশন চিকিৎসা, স্যানাটোরিয়ামগুলির বৃত্তান্ত, যক্ষ্মা জীবাণু ধ্বংসের উপায়, রোগের সুলক্ষণ ও কুলক্ষণাবলী প্রভৃতি আরও অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সাধারণের জন্য বিশেষভাবে লিখিত হইলেও, চিকিৎসা-শিক্ষার্থী ও এমন কি অনেক চিকিৎসকেরও ইহা পাঠ করিলে উপকার হইবে। এ দেশে যক্ষ্মারোগের সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। রোগ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে প্রতিকার সম্বন্ধে সচেষ্ট হওয়া যায় না। সুতরাং এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। রোগীর নিকট এই পুস্তক একখানি থাকিলে, রোগী ও চিকিৎসক উভয়েরই প্রভূত সাহায্য হইবে। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুদৃশ্য।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ নাগ—শ্রীবিনোদিনী মিত্র (নাগ-দুহিতা) প্রণীত এবং ৭৭ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, দুর্গাচরণ আলয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

নাগ মহাশয় গৃহী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার জীবন যে সাধারণ জীবন হইতে ভিন্ন, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় নাগ-দুহিতা সেই কথা বিবৃত করিয়াছেন।

প্রতারক—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত এবং গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস, কালকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৸০।

আজকাল রিয়ালিষ্টিক উপন্যাসের যুগ। কোন্‌টাই বা বাস্তব-আর কি-ই বা কাল্পনিক, তাহা কিন্তু ঠিক করাই মুস্কিল। বস্তু-তান্ত্রিক বলিয়া অভিহিত হইলেও এই উপন্যাসখানিতে বৈচিত্র্য আছে। কাজেই ইহা স্বাদহীন হইয়া পড়ে নাই। বাঙ্গালী যুবকের সহিত ইংরেজ-তরুণীর প্রণয় ও পরিণয়ে বিশেষত্ব আছে। মিলনান্ত হইলেও সমস্ত পুস্তকখানির মধ্যে ট্র্যাজেডির করুণ সুর বাজিতেছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

জোয়ার-ভাঁটা—শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ, জাটিয়া, কাঁচড়াপাড়া। মূল্য বার আনা।

উপন্যাস। একদিকে মমতাহীন সমাজের রূঢ় আবেষ্টন, অন্যদিকে আশা-আকাঙ্ক্ষাময় মানবজীবন। এই দোটানায় পড়িয়া এক তরুণী নারীর মন কোন্‌ দিকে পরিণতি লাভ করিতেছে, উপন্যাসখানিতে তাহারই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মনের সূক্ষ্ম ভাববিপর্য্যয় আঁকিবার ক্ষমতা লেখকের আছে কিন্তু লেখকের ভাষার ভঙ্গীটি ভিন্ন ধরণের হইলে ভাল হইত। ভাষা কিছু আড়ষ্ট।

হিসাবী—শ্রীব্রজমাধব রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনলিনী নাথ দে, মাধব প্রেস মেদিনীপুর। মূল্য আট আনা।

এই আট আনা দামের ছোট গল্পের ছোট বইখানি অনেক দু'টাকা দামের বৃহদাকার উপন্যাসের চেয়ে আমাদের ভাল লাগিল। বইখানিতে ছয়টি গল্প আছে। লেখা ঝরঝরে। মনস্তাত্ত্বিক কচকচি নাই। প্রভাতবাবুর ধরণে এক একটি ছোট ঘটনা লইয়া এক একটি পরিহাসলঘু ছোট গল্প রচিত হইয়াছে। লেখকের ক্ষমতা আছে।

সবুজ পাখী—বঙ্কুশ্রী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুখময় বসু চৌধুরী, ৬০ সা-সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।

রহস্য-নাট্য। পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত—বিয়োগান্ত। স্বপ্নাবেশ-ঢাকা হইলেও এই বিচিত্র কাহিনীটির নাটকীয় গতি আছে। নাটকের সংস্থান পাহাড়-জঙ্গলায়, ঘটনার বিন্যাস রোম্যাণ্টিক। পাঁচটি অঙ্কের ঘটনা তিনটি অঙ্কে সংক্ষিপ্ত করিয়া নাটকখানিকে ছোট করিতে পারিলে ভাল হইত।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সুইট্‌সারল্যাণ্ড—শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত, প্রকাশক শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী; প্রাপ্তিস্থান—আর্য্য সাহিত্যভবন, কলেজ ষ্ট্রীট্‌ মার্কেট, ডবল ক্রাউন, ১৬ অংশিত, ॥০+৬৭ পৃঃ (সচিত্র) দাম ৸০ আনা।

বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক বিনয়বাবু বাঙ্‌লার পাঠক-সমাজে সুপরিচিত। এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় ইতঃপূর্ব্বে প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। কিরূপে দেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় সে বিষয়ে বিনয়বাবুর দক্ষতা অসাধারণ। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের সংবাদপত্র, ঘড়ির ব্যবসা, দুধের ব্যবসা, নারী স্বাধীনতার আন্দোলন, ফ্যাক্‌টরী সম্পদ প্রভৃতি সম্বন্ধে অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে ইহা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। যথাস্থানে ভারতীয় অবস্থা ও ভারতবাসীর সহিত সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের অবস্থা ও তদ্দেশবাসীর তুলনা করিয়া বিনয়বাবু বক্তব্য বিষয়গুলি যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ করিয়া তুলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সুইস্‌ নরনারীর ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবন এবং তাহাদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দ্বারাও গ্রন্থখানি উপভোগ্য হইয়াছে। ইহার ছাপা ও কাগজ অনিন্দ্য; তদুপরি চারিখানি হাফটোন্‌ ছবিতে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখান হইয়াছে। শিক্ষিত দেশবাসীর নিকট পুস্তকখানির যথেষ্ট সমাদর হইবে আশা করা যায়।

ক

মঞ্জুষা—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার। প্রকাশক শ্রীজগদীশচন্দ্র গুহ, গুহ-ভিলা, পাবনা। বারো আনা।

কবিতার বই। কবিতা-রচনায় লেখকের হস্ত যে পটু তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব অত্যন্ত বেশী সুস্পষ্ট। 'ড়' র স্থানে 'র' ব্যবহার এবং ছাপার ভুল অনেক চোখে পড়িল। পল্লী সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি আমাদের বেশ ভাল লাগিল।

প

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৩) বলিদ্বীপের পথে।

২৩শে আগষ্ট ১৯২৭, মঙ্গলবার।

আমাদের এই জাহাজ খানি আকারে ছোটো—K. P. M. এর জাহাজ, এটি হলাণ্ডে যায় না, দ্বীপময় ভারতের মধ্যেই ঘোরঘুরি ক'রে থাকে। যে ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজে আমরা সিঙ্গাপুর থেকে মালাক্কা, আর পিনাঙ থেকে বেলাওয়ান যাই, তাদের জাহাজগুলির চেয়ে K. P. M-এর জাহাজ ঢের বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব'লে মনে হ'ল। জাহাজের খালাসী খানসামা সব যবদ্বীপীয়। বেশী যাত্রী এই জাহাজটিতে নেই, তবে শুনলুম, সুরাবায়া শহরে অনেক গুলি যাত্রী উঠ্‌বে—বলিদ্বীপের যাত্রী কতকগুলি, আর বাকী সব অন্য অন্য দ্বীপে যাবে। Semarang সেমারাং আর Soerabaja সুরাবায়া হ'য়ে, আমাদের বলিদ্বীপে নামিয়ে দিয়ে, এই জাহাজ উত্তরে Celebes সেলেবেস আর বোর্ণিও দ্বীপে যাবে।

আজকের বিকালটী বেশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের দ্বারা উদ্ভাসিত সাগরের উপর দিয়ে পূব মুখে আমাদের জাহাজ চ'লেছে। ডানদিকে দক্ষিণে যবদ্বীপের উপকূল, দূরে নীল পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। একজন ওলন্দাজ সাংবাদিক চ'লেছেন আমাদের সঙ্গে, বলিদ্বীপের দাহ আর শ্রাদ্ধ উৎসব দেখ্‌তে, "মালায়া-ট্রিবিউন" প্রমুখ ইংরেজদের কাগজগুলিতে মালাই-দেশে কবিকে আক্রমণ ক'রে লিখ্‌লে কেন, সে বিষয়ে আমায় প্রশ্ন ক'রলেন। যবদ্বীপীয়, ভারতীয়, আর ইউরোপীয় অন্যান্য জা'তের প্রজা যে সব জা'ত,—তাদের ভালো দেখ্‌তে পারে না, তাদের চেপে রাখতে চায়, এমন একদল ডচ যবদ্বীপে আছে। রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপেরই যেন এক রকম অতিথি, সভ্য জগতে তাঁর আসন কোথায় তাও এরা জানে, তাই এরা কিছু ব'লতে চায় না, কিন্তু "মালায়া-ট্রিবিউন"-শ্রেণীর পত্রিকার লেখা প'ড়ে, আর রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপে এলে যবদ্বীপের স্বাধীনতা-কামী জনগণের উপর তাঁর প্রভাব কি ভাবে প'ড়বে তা চিন্তা ক'রে, এরা একটু ভীত হ'য়ে প'ড়েছে। আর "মালায়া-ট্রিবিউন"-এর ইঙ্গিতে নাচ্‌তে আরম্ভ ক'রবে, এ রকমও একদল ডচ্ আছে। তবে "মালায়া-ট্রিবিউন"-এর রবীন্দ্র-বিদ্বেষ, আর মালয় দেশের ইংরেজ শাসক-বর্গের ভদ্রতা—এই দুটোর সামঞ্জস্য এরা ক'রতে পারছিল না। বাকের অনুরোধে ব্যাপারটা কি হ'য়েছিল তা এই ডচ সাংবাদিকটীকে আমি সবিস্তারে ব'ললুম। এ সম্বন্ধে ইনি লিখবেন ব'ললেন।—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডচ সাম্রাজ্যবাদীর দল কিছু লেখে-টেখে নি, যদিও দুই এক জায়গায় তিনি সাধারণ ভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর ইউরোপের হাতে নানা দিক দিয়ে এশিয়ার লাঞ্ছনার কথা ডচ শ্রোতাদের সামনেই বলেছিলেন।

সন্ধ্যায় ব'সে কবির সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন অবস্থার শোচনীয়তা, তার নানা জাতির আর নানা ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে পরিবর্দ্ধমান অনৈক্য, তার অর্থ-নৈতিক অবনতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক অবনতির দ্রুত বৃদ্ধি, স্বরাজ-অর্জ্জন বিষয়ে ভারতের উত্তরোত্তর শক্তিহীনতা—দেশের এই সব নৈরাশ্য-জনক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হ'ল। যেখানে আমাদের শক্তির অভাব, সেখানে কিসে অভাবাত্মক কারণগুলিকে দূর ক'রে শক্তির বৃদ্ধি করা যায় তার চিন্তা না ক'রে, সেই কাজ ক'রতে কোমর বেঁধে লেগে না গিয়ে, আমরা সে সম্বন্ধে চোখ বুজেই র'য়েছি, বড়ো বড়ো কথার মোহে নিজেদের ভুলিয়ে রাখ্‌ছি। দেশের সাম্‌নে আমাদের ভিতরকার গলদের সম্বন্ধে সত্য কথা স্পষ্ট ক'রে বলার দরকার হ'য়েছে।

২৪শে আগষ্ট বুধবার।—

আজ সকাল সাড়ে আটটায় সেমারাং বন্দরের সাম্‌নে জাহাজ ভিড়্‌ল। এখানে শহরের ধারে জল গভীর নয়, ডাঙা পর্য্যন্ত জাহাজের পৌছুনো কঠিন, তাই অনেকটা দূরে নঙ্গর ক'রলে। সেমারাং একটা বড়ো বাণিজ্য-কেন্দ্র, দেড় লাখের উপর এর অধিবাসী, কিন্তু সেমারাং-এ যবদ্বীপীয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত দুই একটী ইস্কুল ছাড়া কিছু বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস নেই। আমরা নামলুম না। কতকগুলি ডচ্ সজ্জনের সঙ্গে ব'সে ব'সে দুপুর বেলাটা নানা আলোচনায় কাটিয়ে দিলুম। কবিও মাঝে মাঝে তাতে যোগ দিলেন। ডাঙার ধারে থেকেই জাহাজের একটু বেশ দুলুনি আরম্ভ হ'ল, সমুদ্র বেশ একটু চঞ্চল, যদিও হাওয়া এমন বিশেষ কিছু নেই। একটি ডচ্ ইস্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার ছিলেন, বেঁটে-খাটো মানুষটি, কথা-বার্ত্তায় যবদ্বীপীয়দের প্রতি এঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি আর সৌহার্দ্দ্যের পরিচয় পাওয়া গেল। Official Tourist Bureau-র শ্রীযুক্ত P. J. Van Baarda ফান্‌-বার্দা মহাশয় চ'লেছেন এই জাহাজে, ইনি সস্ত্রীক বলিদ্বীপে যাচ্ছেন, এঁর কাছথেকে নানা খুঁটিনাটি খবর পেলুম। বলিদ্বীপে যে সমস্ত ঘটা হবে, তার চলচ্চিত্র নেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে, কতকগুলি আমেরিকান ফিল্‌ম-ওয়ালাও বলিদ্বীপে জুটছে। বলিদ্বীপের উপর খানদুই ভালো বই ছিল, এঁর কাছ থেকে নিয়ে সেগুলি একটু দেখা গেল। ডচ্ চিত্রকর W. O. J. Nieuwen-kamp-এর আঁকা ছবিতে ভরা বলিদ্বীপের অধিবাসী আর তাদের জীবনের উপর একখানি চমৎকার বড়ো বই আছে—Zwerftochten op Bali—সেখানির সঙ্গে পরিচয় হ'ল। নিউএন্‌কাম্পের চোখ আছে, যা দেখবার তা তাঁর চোখকে এড়াতে পারে নি; আর তাঁর হাতও আছে, তাঁর চিত্রাঙ্কন-রীতি সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব, এই রীতির একটি বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। ইনি ভারতবর্ষেও এসেছিলেন, মাদুরা কাশী আগরা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন, আর উচ্ছ্বসিত ভাষায় ভারতের বাস্তশিল্পের বন্দনা ক'রে গিয়েছেন তাঁর আঁকা ছবিতে।

২৫শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার।—

কালকের দিনটি যেমন চুপ-চাপ শান্তির সঙ্গে জাহাজে কেটেছে, আজ তার উল্‌টো, প্রায় সমস্ত দিন্ ধ'রে খুব ঘোরাঘুরি করা, অনেক কিছু দেখা, অনেক লোকের সঙ্গে মেশা। সকাল সাড়ে সাতটায় সুরাবায়ায় Tanjong Perak তান্‌জোং-পেরাক্-এর জেটিতে আমাদের জাহাজ পৌছুলো। সুরাবায়া পূর্ব্ব-যবদ্বীপের সব চেয়ে বড়ো শহর, যবদ্বীপের ব্যবসায়ের প্রধানতম কেন্দ্র, যবদ্বীপের চিনি রপ্তানী হয় এই বন্দর থেকে; এর অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দু লাখ। নানা দেশ থেকে ব্যবসা উপলক্ষে এখানে নানা জাতের লোক এসেছে। চীনা আছে, আরমানী আর বোগ্‌দাদী য়িহুদী আছে, আরব কিছু আছে, আর ভারতীয়দের মধ্যে আছে গুজরাটী খোজা, পাঞ্জাবী মুসলমান আর হিন্দু, আর সিন্ধী। তামিল চেট্টি বা অন্য শ্রেণীর লোক নেই। গুজরাটী আর পাঞ্জাবীরা চিনির ব্যবসা করে—যবদ্বীপ থেকে চিনি ভারতে চালান দেয়; আর সিন্ধীদের রেশমের কাপড় আর curio বা মণিহারী জিনিস আর গালিচার দোকান আছে অনেকগুলি। রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করবার জন্য জেটীতে যথারীতি ভীড় হ'য়েছিল। ভারতীয় অনেকে এসেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে মদনলাল ঝাম্ব্ নামে একটি যুবক ছিলেন, ইনি এক পাঞ্জাবী চিনির মহাজনের আড়তের ম্যানেজার। ডেরা-ইস্‌মাইল্-খাঁ-তে এঁর বাড়ী, জাতিতে খত্রী অরোড়া, অতি সুপুরুষ, বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত চেহারা, লেখা পড়া জানা, কলেজে ইংরিজি-হিন্দী-সংস্কৃত-পড়া যুবক, উচ্চ শিক্ষা আর নানা সদ্‌গুণে আর যোগ্যতায় এখানকার ভারতীয়দের সহজ নেতা ব'লে এঁকে মনে হ'ল। জাহাজের সিঁড়ি লাগানো হ'তেই এঁরা উপরে এলেন, ঘন ঘন—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি আর 'ডক্টর রবীন্দ্রনাথ টেগোর কী জয়', 'মহাত্মা গান্ধী জী কী জয়' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কবিকে মাল্য-দান হ'ল, সকলকে ফুলের তোড়া বিতরণ হ'ল, আর পুষ্প বর্ষণ হ'ল। এঁদের সঙ্গে শিষ্টালাপ করা হ'ল। আজকে বিকালেই জাহাজ বলিদ্বীপের জন্য যাত্রা ক'রবে। আমরা বলিদ্বীপ দেখে যখন ফিরে আস্‌বো তখন এই সুরাবায়াতে তিন-চার দিন থাকবো।

তখন আমরা এখানকার একজন অভিজাত যবদ্বীপীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁর অতিথি হবো। ইনি আগে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সুরাকর্ত্তা শহরে। কি কারণে ডচেদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায়, উনি নাকি সেই রাজপদ পরিত্যাগ ক'রেছেন। সেই রাজপদের উপাধি হ'চ্ছে Mangkoenogoro 'মঙ্কুনগর' অর্থাৎ 'নগর- বা দেশ-পাল' (যবদ্বীপীয় ভাষায় 'মঙ্কু' অর্থে 'ক্রোড়','মঙ্কু-নগর' কিনা 'যাঁর কোলে নগর আছে, যিনি নগর বা দেশকে পালন করেন')। ইনি ছিলেন Mangkoenogoro VI; এঁরই এক জ্ঞাতি এখন রাজপদ পেয়েছেন—তাঁর পদবী হ'চ্ছে Mangkoenogoro VII. এই Ex-Mangkoenogoro মহাশয়ের ছেলে এলেন, কবিকে স্বাগত ক'রতে; ইনি একজন প্রিয়দর্শন যুবক, ইংরিজি জানেন, কাজেই আলাপ বেশ জ'মল। ভারতীয়েরা কবির অভ্যর্থনার যেরূপ ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, সেই অনুসারে ঠিক হ'ল যে, কবি আপাততঃ জাহাজেই থাকবেন, পরে এগারোটায় বাকের সঙ্গে বেরিয়ে সুরাবায়া জেলার ডচ্ রেসিডেন্ট্ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবেন। তারপরে বৃদ্ধ মঙ্কুনগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আস্‌বেন। বাকের এক ভাই সুরাবায়ায় থাকেন, সরকারী কর্ম্মচারী, সকালে কবিকে স্বাগত ক'রতে এসেছিলেন, বাকে তারপরে কবিকে তাঁর এই ভাইয়ের বাড়ীতে নিয়ে যাবেন একটু বিশ্রাম ক'রতে। Hotel Oranje হোটেল ওরানয়ে-তে ভারতীয়েরা বেলা সাড়ে-বারোটায় কবির জন্য মাধ্যাহ্নিক আহারের ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাতে কতকগুলি প্রধান ভারতীয় আর অন্য লোক আস্‌বেন, কবির সঙ্গে সকলকার পরিচয় করানো হবে। ভারতীয়দের দ্বারা এইরূপে আপ্যায়ন হ'লে পরে তিনি জাহাজে ফিরবেন। কবির সঙ্গে সুরেনবাবু আর বাকে রইলেন। ধীরেনবাবু আর আমি সিন্ধীদের সঙ্গে বা'র হলুম, শহরটা একটু দেখবার জন্য। শ্রীযুক্ত ভী, লোকুমল ব'লে একজন বর্দ্ধিষ্ণু সিন্ধী বণিক্ তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে চ'ললেন। পথে কতকগুলি পাঞ্জাবী মুসলমান আর গুজরাটী খোজার সঙ্গে দেখা হ'ল—গুজরাটী খোজাদের পোষাকটা কিছুতেই আমার চোখে ভালো লাগ্‌ল না।—শ্রীযুক্ত লোকুমলের দোকান শহরের ব্যবসায়ের কেন্দ্রের মধ্যে। মোটরে আস্‌তে আস্‌তে শ্রীযুক্ত লোকুমল বলিদ্বীপের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের সামান্য কিছু খবর দিলেন। ওই দ্বীপে তাঁর দোকানের একটি শাখা খোলা যায় কিনা সে বিষয়ে খোঁজ ক'রতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও দেশে ইউরোপীয় আর আমেরিকান যাত্রী বেশী যাওয়া আসা ক'রছে না, আপাততো সেদিকে বিশেষ কিছু সুবিধার না দেখে তিনি ফিরে আসেন। তবে বলিদ্বীপের সম্বন্ধে আর অধিবাসিদের সম্বন্ধে খুব বিশেষ কিছু জানেন না। এ অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের কথা তাঁকে কিছু কিছু ব'ললুম। বলিদ্বীপের ভারতীয় সভ্যতা আর সেখানকার লোকেদের অবস্থা আমরা চর্চ্চা ক'রতে এসেছি শুনে তিনি বিশেষ প্রীত হ'লেন। আমার সঙ্গে কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ—সংস্কৃত আর ইংরিজি বই আছে, আর পূজার উপকরণও সব নিয়ে যাচ্ছি, ভারতে প্রচলিত পূজার রীতি বলিদ্বীপের 'পেদণ্ড' বা পুরোহিতদের দেখাবো ব'লে;—এসব শুনে, ভারত আর বলিদ্বীপের ধর্ম্ম আর সংস্কৃতির পুরাতন যোগ আবার হয়তো আমাদের বলি-ভ্রমণের ফলে সুদৃঢ় হবে, এই ভেবে, তিনি বিশেষ হর্ষপ্রকাশ ক'রলেন। এই কার্য্যে আমাদের সামান্য কিছু সাহায্য ক'রতে পারলে তিনি কৃতার্থ হবেন, বার বার আমাদের এই কথা ব'ললেন। আমি তাঁকে ব'ললুম, ডচ্ ভাষায় লেখা হিন্দু সভ্যতা আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে হ'ত, গীতার ডচ্ অনুবাদ হ'য়েছে, অন্ততো তার দুএকখানা হ'লে বেশ হ'ত। এই কথা শুনে তিনি একেবারে সুরাবায়ার সব চেয়ে বড় বইয়ের দোকানে আমাদের নিয়ে হাজির ক'রলেন, আর ব'ললেন, যে রকম বই আমি চাই তা যদি ঐ দোকানে থাকে, তা হ'লে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি কিনে দেবেন। দোকানে ডচ ভাষায় ভগবদ্গীতা তিনখানা পাওয়া গেল, থিওসফিষ্টদের প্রকাশিত হিন্দু ধর্ম্ম আর দর্শন বিষয়ে শ্রীযুক্তা আনী বেসান্টের খান কতক বই পেলুম, রবীন্দ্রনাথের গুটীকতক গদ্য গল্পের ডচ অনুবাদ, আর যবদ্বীপীয় লেখক Notosoeroto নতসুরত (নাথ-সুরথ) কর্ত্তৃক রবীন্দ্র-

নাথের সম্বন্ধে আর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে লেখা বই,—এই গুলি মিল্‌ল, প্রায় টাকা ত্রিশেকের বই হবে—শ্রীযুক্ত লোকুমল আমায় কিনে দিলেন। আমি সানন্দে তাঁর এই দান গ্রহণ ক'রলুম; পরে বলিদ্বীপে এই বই গুলি বিশেষ কাজে লেগেছিল, ডচ প'ড়তে পারেন এমন বলিদ্বীপের দুই চার জন শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমি গীতার অনুবাদ আর অন্য বই দিই,—আর 'সুরাবায়ার ভারতীয় বণিক শ্রীযুক্ত ভী লোকুমলের উপহার,' ইংরিজীতে এই কথাটা বই গুলির ভিতরে লিখে দিই।

তার পরে আর্মানী ফোটোগ্রাফর Kurkdjian কুর্ক-জিয়ানের দোকানে গিয়ে যবদ্বীপের কিছু ছবি কেনা গেল, কিছু অর্ডারও দেওয়া গেল। শ্রীযুক্ত লোকুমল তাঁর দোকানে নিয়ে এলেন। আশে পাশে আরও দু পাঁচটা সিন্ধীদের দোকান। এঁরা জাপান থেকে রেশমের কাপড় আনিয়ে পাইকারী আর খুচরা বিক্রী করেন। এইটাই এঁদের বড় ব্যাপার। এ ছাড়া, নানা রকমের জাপানী, চীনা, যবদ্বীপীয়, সিয়ামী, বর্ম্মী, ভারতীয়, সিরীয় curio, কাপড়-চোপড়, গাল্‌চে—এ সব আছে। মোটের উপর, এঁদের ব্যবসা ভালোই চ'লছে।—আরও পাঁচজন সিন্ধীদের এসে জ'মলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা, ভারতের সেবায় তাঁর কার্য্য, জগতের সাহিত্যে তাঁর স্থান—এ সব বিষয়ে জিজ্ঞাসু সিন্ধীদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে হ'ল। এঁরা উচ্চ-শিক্ষিত ডচেদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছেন, অথচ তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানেন না, তাই লজ্জিত। সিন্ধীরা কেমন ভাবে ব্যবসা করেন, কি রকম জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, শ্রীযুক্ত লোকুমলের দোকান দেখে এই প্রথম তার একটু ধারণা করা গেল। দোকান একটি মস্ত বাড়ী নিয়ে। নীচের তলায় সাম্‌নে দোকান ঘর—এখানে খ'দ্দেরের জন্য জিনিসপত্র সাজিয়ে' রাখা হ'য়েছে। নীচের তলায়, বাড়ীর ভিতরে, গুদামঘর, রান্নাঘর। সিন্ধী ১০।১২জন কর্ম্মচারী যারা আছে তাদের আর মালিক বা ম্যানেজারের থাকবার ঘর দোতালায়। একটি মস্ত হল জুড়ে' এদের শোবার ব্যবস্থা। এরই মধ্যে কাঠের আড়াল দিয়ে ঘিরে একটি ছোটো ঠাকুর-ঘর ক'রে নিয়েছে। লোকুমল তাঁর ঠাকুর-ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন—কাঠের পাটাতনের দেয়ালের উপরে নানা ঠাকুর-দেবতার রঙীন ছবি—ক'লকাতাই আর বোম্বাইয়ে ছবি, আর সেকেলে হাতে আঁকা রাজপুত পদ্ধতির ছবি দু-একখানি; মূর্ত্তি নেই, তবে বিরাট এক শিখদের গ্রন্থ সাহেব খোলা র'য়েছে, রোজ সকাল-সন্ধ্যা একটু ক'রে তা থেকে পড়া হয়; আর ছোটো খাটো দু চারখানা অন্য ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে হিন্দী আর সংস্কৃত গীতাও দেখলুম। ব্যবসার হিসাব-কেতাবের অন্তরালেও যে এই ধর্ম্মের জন্য একটু চিন্তা, এটি বেশ লাগল। এমনি ক'রে সুদূর প্রবাসী ভারতসন্তান তার ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে নিজ জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একটু যোগ বজায় রাখবার জন্য এই আকুল উদ্বেগ দেখাচ্ছে। গীতা, গ্রন্থ সাহেব—প্রাচীন আর মধ্যযুগের ভারতধর্ম্মের দুই প্রধান বই—সিন্ধীরা এই দু' খানি বই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়, আর এই দুটী বইয়ের আশ্রয়ে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে তাদের ভারতীয়ত্বকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে।

একজন পাঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসায়ী এলেন লোকু-মলের দোকানে, আলাপ হ'ল। অতি অমায়িক কথা-বার্ত্তা, বিশেষ ভদ্র সজ্জন ব'লে মনে হ'ল, ইউরোপ ঘুরে এসেছেন, নানা বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন। শ্রীযুক্ত লোকুমল তারপরে আমাদের নিয়ে বেরুলেন শহরটা একটু দেখাতে। 'সাদো' গাড়ী ক'রে বেরুলুম। চীনাদের বাস খুব, আর তারা বেশ স্বচ্ছল অবস্থাতেই আছে ব'লে মনে হয়। এ অঞ্চলের যবদ্বীপীয়েরা—কি মেয়ে কি পুরুষ—বাতাবিয়া অঞ্চলের লোকেদের মত অতটা সুশ্রী বা গৌরবর্ণ নয়। একটা সরকারী Laand-Kantoor অর্থাৎ Loan Office বা টাকা ধার দেওয়ার আপিস পথে পড়ায়, আর সেখানে খুব ভীড় জ'মেছে দেখে,এই সব সরকারী মহাজনী দোকান কি রকম জিনিস তা দেখবার জন্য ঢুকলুম। দ্বীপময় ভারতের কাবুলীওয়ালা হ'চ্ছে আরবেরা। এরা মুসলমানদের ধর্ম্মগুরুর স্বজাতীয় ব'লে মুসলমান যবদ্বীপীয়েদের কাছে খাতির পায়, কিন্তু এরা অনেক স্থলে অর্থগৃধ্নুতা দেখিয়ে সেই খাতিরের খতরা ক'রছে। এরাই দেশে মহাজনী কারবার ক'রে থাকে, খুব বেশী সুদে যবদ্বীপীয়েদের টাকা ধার

দেয়, আর নির্মমভাবে প্রাপ্য আদায় করে। মালাই জাতীয় লোকেরা বড়ই অপরিণামদর্শী, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে' চলে না। আজ হাতে টাকা এল, অমনি রঙচঙে' পোষাক কিনে, হাত-ঘড়ি কিনে, ভালো-ভালো মোজা জুতো জামা কিনে সব খরচ ক'রে ফেল্লে; এদের মনে ছেলেমানুষী ভাব খুবই বিদ্যমান, নোতুন কিছু সৌখীন বা বিলাসের দ্রব্য দেখলে আর স্থির থাকতে পারেনা—অথচ দু দিন পরে অভাবে প'ড়ে সেই জিনিসই হয় আধা-ক'ড়েতে বিক্রী ক'রবে, নয় বাঁধা দেবে। অবস্থা বুঝে ডচ সরকার একটা ব্যবস্থা ক'রেছে—এতে প্রজার অসুবিধা নেই, আর সরকারী রাজস্বের ও যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হ'চ্ছে। সেটা হ'চ্ছে একটা সরকারী তেজারতী বিভাগ। সমস্ত বড়ো বড়ো শহরে, আর মফস্বলেও, এই সব লান্‌ড্‌-কান্‌টোর বা ধারের আপিস আছে—সাধারণ লোকে জিনিস-পত্র নিয়ে বাঁধা দিতে পারে—সোনা-রূপোর গয়না, পিতল-কাঁসার তৈজস, পোষাক-পরিচ্ছদ, শয্যা-দ্রব্য—যা বাজারে বিক্রী হ'তে পারে, সবই নেয়, তার স্থায্য মূল্য ধ'রে নিয়মমত তার উপর টাকা ধার দেয়, খুব কম হারে সুদ নেয়। জিনিসটি মেয়াদের মধ্যে খালাস ক'রতে না পারলে নীলামে চড়ে। এই রকম নীলামে অনেক সময় নানা টুকিটাকি জিনিস শস্তায় পাওয়া যায়। আমরা যে লাণ্ড্‌-কান্টোরে যাই, তখন সেখানে নীলাম লেগেছে। গৃহস্থালীর জিনিস, শস্তা ঘড়ি, টেবিল চেয়ার—এই সবই বেশী। কতকগুলি চীনা খরিদ্দার ও এসে জমেছে। হৈ চৈ বেশী নেই। মিনিট দু পাঁচ সেখানে থেকে, আবার রোদ্দুরে বেরিয়ে পড়লুম।

এদিকে প্রায় বেলা বারোটা বাজে, আমরা Oranje Hotel-এ এলুম। কবির বসবার জন্য একখানি ঘর ঠিক করা হ'য়েছে, শ্রীযুক্ত মদনলাল বাম্ব সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছেন। একে একে অতিথিরা আসতে লাগলেন, কবি এলেন। মঙ্কুনগরের পুত্র, যিনি সকালে জাহাজে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন, তিনি এলেন। দু তিন পুরুষ ধ'রে এদেশে বাস ক'রছেন এমন একটি গুজরাটী খোজা পরিবারের একজন ভদ্র লোক হ'চ্ছেন স্থানীয় "কাপ্তেন বাজালী", তিনি এলেন। এই ভদ্রলোকটি নিজের জাতীয়তা হারিয়েছেন, একরকম মালাই ব'নে গিয়েছেন; গুজরাটী জানেন না, হিন্দুস্থানী দু এক কথা মাত্র জানেন, ইংরিজী জানেন না। সুরাবায়ার প্রতিনিধি-কনসাল শ্রীযুক্ত Hillyer হিলিয়ার ব'লে একটি ইংরেজ ভদ্রলোক এলেন। সকালে ইনি জাহাজে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছিলেন। আহারের সময়ে এঁর পাশেই আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল। একটু পরিচয় হল। অতি নম্র প্রকৃতির ভদ্রলোক। লড়াইয়ে একটি হাত কাটা গিয়েছে। কেম্ব্রিজের মডলিন-কলেজের ছাত্র ছিলেন। সিন্ধীদের মধ্যে যারা প্রধান, তাঁরাও এসেছিলেন। ইউরোপীয় ভোজের পূরণ-স্বরূপ কিছু ভারতীয় মিষ্টান্নও তৈরী ক'রে এঁরা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। এঁদের সকলের সঙ্গে নানা আলাপের মধ্যে ভোজন সমাধা ক'রে, খানিক বিশ্রামের পর, তিনটের দিকে আমরা সকলে জাহাজে ফিরলুম।

জাহাজ ছাড়্‌ল সাড়ে চারটেয়। এর মধ্যে কতকগুলি শিক্ষিত ডচ্‌ ভদ্রলোক এলেন কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে। আমরা আবার যাত্রা করলুম। সুরাবায়ার ঠিক সামনা-সামনি মাদুরা দ্বীপ। দ্বীপটি ছোটো, আর যবদ্বীপ আর এর মাঝামাঝি একটি সংকীর্ণ প্রণালী আছে, সেই প্রণালীর ভিতর দিয়ে আমাদের জাহাজ চ'লল। উত্তরে মাদুরার পাহাড় বেশ দেখা যেতে লাগল। সুরাবায়ার কাছাকাছি অনেকটা পথে খুব নৌকো আর পালের জাহাজের চলাচল দেখলুম। জেলেরা আবার অনেকগুলি বড়ো বড়ো নৌকো ক'রে মাছ ধ'রছে। আমাদের ষ্টীমার মৃদু গতিতে চ'লেছে।

সুরাবায়া থেকে বিস্তর নূতন যাত্রী উঠ্‌ল। একজন হলাণ্ডের অভিজাত বংশীয় ব্যক্তি—কাউণ্ট—স্ত্রী কন্যা আর অন্য আত্মীয় সঙ্গে নিয়ে চ'লেছেন। শ্রীযুক্ত G. W. J. Drewes নামে একটি ডচ যুবক, মালাই-ভাষাবিৎ, Volkslectuur-এর একজন কর্ম্মচারী, ইনিও চ'লেছেন। বলিদ্বীপ পরিভ্রমণ-কালে ইনি আমাদের সঙ্গে থাক্‌বেন, মালাই ভাষা বেশ

ব'ল্‌তে পারেন, মালাই সাহিত্যের খবর রাখেন, একটু সংস্কৃতও প'ড়েছেন শুনলুম। যবদ্বীপীয় সঙ্গীতে ওস্তাদ একটি ডচ ভদ্রলোক চ'লেছেন। একটি আমেরিকান দম্পতীও উঠলেন—কর্ত্তাটি একজন ধর্ম্মজীবী, পাদরী। আমার ক্যাবিনে আমি একাই ছিলুম, আজ বিকালে একজন সহযাত্রী এলেন, উত্তর-সেলেবেস-দ্বীপের একটি ভদ্রলোক। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারী আনন্দ হ'ল, রাত্রে ঘুমোবার সময় নিজ-নিজ বার্থে শুয়ে'-শুয়ে' অনেক রাত অবধি নানা বিষয়ে কথা হ'ল। এঁর নামটি হচ্ছে ডাক্তার Ratoe Langgie রাতু লাঙ্গি —('রাতু' অর্থে রাজা, 'লাঙ্গি' বা লাঙ্গিৎ' অর্থে স্বর্গ— 'স্বর্গ-রাজ')। উত্তর সেলেবেস-এর Minahasa মীনাহাসা জাতীয়। সেলেবেসের রাজধানী Macassar মাকাসার-এ যাবেন। ডাক্তার রাতু লাঙ্গি বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি, স্থইট্‌জরলাণ্ডের কি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D., গণিত-শাস্ত্রে। ইংরিজি বেশ বলেন, জারমান আর ডচ ভালোই জানেন, ফরাসীও একটু জানেন। ইনি বাতাবিয়ায় রাজকীয় রাষ্ট্র-পরিষদের একজন সভ্য, সেলেবেস-দ্বীপের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্যতম। উত্তর-সেলেবেস থেকে এ রকম উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘ'টবে, ওই দ্বীপে এ রকম শিক্ষার বিস্তার ঘ'টছে, এ তথ্য জানতে পারবো, স্বপ্নেও এ কথা ভাবিনি। ডাক্তার রাতু লাঙ্গি বেশ সদালাপী পুরুষ—বেঁটে খাটো মানুষটি, গুরখার মতন ভাব। সঙ্গে চাকর আছে। এঁর দেশের খবর নিলুম। সেলেবেসের লোক-সংখ্যা তিরিশ লাখের উপর—নানা বিষয়ে যবদ্বীপের পরেই এই দ্বীপটির স্থান। দ্বীপটীর মধ্যে এক মালাই জাতিরই কয়টি ভিন্ন ভিন্ন শাখা বাস করে—মাকাসার জাতি, বুগী জাতি, তোরাজা জাতি, আর উত্তরে মীনাহাসা জাতি। মাকাসার আর বুগীরা যবদ্বীপীয়দের মতন, ধর্ম্মে মুসলমান। তোরাজারা আর মীনাহাসারা সেদিন পর্য্যন্ত বন্য বর্ব্বর ছিল, শত্রুদের মাথা কেটে নিয়ে এসে জারিয়ে' ঘরে শিকেয় টাঙিয়ে রাখ্‌ত। এখন তোরাজারা মুসলমান আর খ্রীষ্টান হ'য়েছে। মীনাহাসারা সকলেই খ্রীষ্টান হ'য়েছে—মীনাহাসাদের সংখ্যা আড়াই লাখের কাছাকাছি; এরা এখন বেশ সভ্য, চাষবাস ক'রে খায়। ডাক্তার রাতু লাঙ্গি নিজেও খ্রীষ্টান।

ডাক্তার রাতু লাঙ্গির সঙ্গে আলাপ জ'ম্‌ল ক্যাবিনে। চমৎকার সূর্য্যাস্তের পরে ডেকে ব'সে, আর-আর পাঁচ জন সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে সন্ধ্যাটা কাট্‌ল। সূর্য্যাস্তের একটু পরে, মাদুরা-প্রণালীর পরিষ্কার তারায় ভরা আকাশের তলায় স্বচ্ছ সমুদ্রের উপরে আমাদের জাহাজের ডেকে সেই আলো-আঁধারীর ছবি চোখে যেন ভাসছে। কবিকে ঘিরে, ব্রেউএস্‌, বাকে আর আমরা ব'সে নানা কথা কইছি। সদানন্দ প্রকৃতির শ্রীযুক্ত ফান বার্দা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও বা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। ওলন্দাজ কাউন্ট্‌টি কবির সঙ্গে পরিচিত হবার পরে আলাদা তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ব'সেছেন; তাঁর মেয়েটি একটি নিখুঁত Nordic বা Germanic type-এর সুন্দরী, মাঝারী চেহারা, সোনালী চুল, নীল চোখ—তিনি ব'সে চিঠি লিখছেন; পরে বলিদ্বীপে ঐ দেশীয় সুন্দরীদের পাশে এঁকে আর অন্য ইউরোপীয় মেয়ে দু একটিকে—মালাই আর জরমানিক, ছুটি বিভিন্ন জাতির সৌন্দর্য্যের—পাশাপাশি সমাবেশ দেখেছি। মানুষ স্বাস্থ্য-শ্রীযুক্ত হ'লে সর্ব্বত্রই সুন্দরই—সৌন্দর্য্যের ছাঁদ বা ঢঙ্‌ আলাদা হ'তে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে ভালো-লাগা না-লাগা মাত্র ব্যক্তিগত রুচি আর শিক্ষার কথা।

আমেরিকান পাদরীটাকে দেখে মনে হ'ল, তাঁর স্ত্রীই তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। লোকটি অতি ভালো মানুষ। বোকা ধরণের। আমার কাছে এসে ব'ল্‌লে, "আপনি তো কবির সঙ্গে যাচ্ছেন, দু মিনিটের মতন কবির সঙ্গে আমায় কথা কইয়ে' দিতে পারেন?" কবিকে গিয়ে এঁর অনুরোধের কথা জানালুম—তাঁর কাছে একে নিয়ে এলুম। কবির সঙ্গে সরাসরি করমর্দ্দনের পরে ব'ল্‌লেন—"দেখুন, আপনার ধর্ম্ম আর আমাদের ধর্ম্ম—দুইয়ে বড়ো বেশী পার্থক্য নেই। আমরা তো একই ভগবানের আরাধনা করি—ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তো এক।" কবি ব'ল্‌লেন, "সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।" উত্তর হ'ল—"কেন? আমরা তো God the Father-কে মানি।" কবি লোকটিকে কি ভাবে নেবেন তা বোধ হয়

ভাবছিলেন।—মাঝে মাঝে উৎসাহী খ্রীষ্টান পাদ্রি তাঁকে খ্রীষ্টান মতে দীক্ষিত করবার আশায় কোমর বেঁধে ধর্ম্ম-আলোচনায় লেগে গিয়েছে, এরূপ উৎপাতের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। আমি পাদ্রির মুখের কথার সঙ্গে সঙ্গে ব'ললুম, "হাঁ, আর তা-ছাড়া আমরা God the Mother, God the Son, God the Friend, God the Lover, আর এমন কি God the Sweet-heart-কেও মানি।" সদা-প্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে শেষ সম্পর্কগুলির কথা শুনে' বেচারা একটু হকচকিয়ে' গেল। এক রসবোধহীন অত্যন্ত গম্ভীর-প্রকৃতিক ব্রাহ্ম প্রচারকের কথা শুনেছিলুম—কোন উপাসনা-সভায় তিনি আচার্য্যের কাজ করেছিলেন, সেখানে একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, গাওয়া হ'য়েছিল, তাতে ঈশ্বরকে "ওহে জীবন-স্বামী" ব'লে আহ্বান করা হ'য়েছে; তা শুনে, আর গানটীতে মানবাত্মা আর ঈশ্বরের সম্পর্কে কতকটা বৈষ্ণব রূপকের ভাব আরোপিত হ'য়েছে দেখে, উপাসনার শেষে গৃহকর্ত্তা আর গায়ক দু-জনকে ডেকে তিনি ব্রাহ্ম উপাসনায় এই প্রকারের গানের অনুপযোগিতা এবং অবৈধেয়তা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধ'রে উপদেশ দিয়েছিলেন—তাঁর একটি প্রধান আপত্তি ছিল এই—"সকল মানবাত্মা ঈশ্বরকে যদি স্বামী-ভাবে আহ্বান করে,তা হ'লে কি সমবেত-ভাবে ঈশ্বরের প্রতি বহু-বিবাহের আরোপ করা হয় না?" পাদরী বেচারীর অবস্থা বোধ হয় তাই হ'ল—সে আর দেরী না ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেল, আর তার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে আমরা বলি কী, বোধ হয় তাই নিবেদন ক'রতে লাগ্‌ল।

কাল ভোরে বলিদ্বীপে পৌঁছুবো—কথায় কথায় ঘুমুতে অনেক র'ত হ'য়ে গেল, আর ভোরে তৈরী হ'য়ে নামতে হবে এই চিন্তায়, আর উৎসাহে, বাকী রাতটুকু ও ভালো ঘুম হ'ল না।

(৪) দ্বীপময় ভারত—আধুনিক অবস্থা—পূর্ব্বকথা।

ছোটোবড়ো অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে দ্বীপময় ভারত। যবদ্বীপ এই দ্বীপাবলীর কেন্দ্রস্থানীয়। আমাদের ভারতবর্ষের পরিমাণ ১৮ লাখ বর্গ-মাইলের উপর, লোকসংখ্যা ৩১ কোটির উপর; দ্বীপময় ভারতের পরিমাণ ৭ লাখ বর্গ-মাইলের কিছু কম, লোক সংখ্যা ৫ কোটি। বাঙলা-দেশের পরিমাণ ৭৮,৬৯৯ বর্গ-মাইল, লোক সংখ্যা ৪ কোটি ৬৬ লাখ। কতকগুলি দ্বীপের পরিমাণ বাঙলাদেশের চেয়েও বড়ো। সুমাত্রার পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার বর্গ-মাইল, যদিও লোক-সংখ্যা ৬ লাখেরও কম; নিউ-গিনি হ'চ্ছে আকারে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় দ্বীপ, এর অর্দ্ধেকটা ডচেদের—তার পরিমাণ ১ লাখ ২১ হাজার বর্গ-মাইল। মাদুরা আর যবদ্বীপ জড়িয়ে' পরিমাণ হ'চ্ছে ৫০,৫৫৭ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। বোর্ণিও একটি বিরাট দ্বীপ, এর বেশীটুকু ডচেদের অধীনে। প্রাকৃতিক সম্পদে দেশটি অতুলনীয়, কিন্তু যবদ্বীপ মাদুরা বলিদ্বীপ আর সেলেবেস ছাড়া অন্যত্র লোকের বাস কম—বহুস্থল আদিযুগের বনের দ্বারা এখনও আবৃত। এক নিউ-গিনি ছাড়া, আর সর্ব্বত্র একটি বিরাট মালাই জাতির নানা শাখা দ্বারা এই দ্বীপগুলি অধ্যুষিত। মালাই শাখার নানা ভাষা এরা বলে—তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আমাদের বাঙলা হিন্দী উড়িয়া মারহাট্টী গুজরাটী পাঞ্জাবী মৈথিল নেপালীর মতন—মালাই ভাষা এদের মধ্যে আমাদের হিন্দুস্থানীর কাজ করে। ধর্ম্মে এরা এখন বেশীর ভাগ মুসলমান—কিন্তু বনে-জঙ্গলে এখন ও অনেকে আদিম বর্ব্বর অবস্থায় আছে, বিশেষতঃ বোর্ণিও দ্বীপে আর সুমাত্রায়। নিউ-গিনির লোকেরা পাপুআন জাতীয়, নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু শ্রেণীর মানুষ এরা, সভ্যতায় অতি নিম্ন স্তরে এরা প'ড়ে আছে, মালাই জা'তের সঙ্গে এদের কোনও সম্বন্ধ নেই। দ্বীপময় ভারতে এখন যারা মুসলমান, তাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা প্রায় সকলেই হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধধর্ম্ম মানত। একমাত্র বলিদ্বীপে আর তার পূর্ব্বের লম্বকদ্বীপে হিন্দু এখনও পাওয়া যায়—বলিদ্বীপের লোকেরা সরকারী গণনা অনুসারে শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, লম্বকের দশভাগের একভাগ আন্দাজ হিন্দু। এদেশের মুসলমানেরা মোটেই গোঁড়া নয়; যবদ্বীপে দেখেছি তারা হাজী হ'য়ে এলেও ভারতের সাধারণ মুসলমানের মত পিতৃপুরুষের কৃতিত্ব বা সভ্যতাকে অস্বীকার করে না, বরং তা নিয়ে যথেষ্ট গৌরব করে। হিন্দু আচার অনুষ্ঠান যথেষ্ট পালন করে, এখনও মন দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত শোনে, তার পুতুল

নাচ আর যাত্রা গান সারারাত ধ'রে জেগে দেখে, ছেলেমেয়েদের বড়ো বড়ো সংস্কৃত নাম দিয়ে থাকে। অথচ মসজিদেও যায়, নমাজও পড়ে, হজও খুব করে। হজের সময়ে সমস্ত মোসলেম-জগৎ থেকে একলাখ থেকে একলাখ বিশ হাজার যাত্রী মক্কায় এসে জমে। এদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সংখ্যা—অর্দ্ধেক হবে—বাট পঁয়ষট্টি হাজার প্রায়—আসে এক যবদ্বীপ আর দ্বীপময় ভারতের অন্ত অংশ থেকে। এইরূপে হজ ক'রে এসে পাকা মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতির প্রাচীন সংস্কৃতি আর ইতিহাসের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রতে এদের মোটেই বাধে না।

যবদ্বীপ আর মাদুরায় মালাইজাতির শাখা তিনটি জা'ত বাস করে—পশ্চিম যবদ্বীপে সুন্দা জা'ত, মধ্য আর পূর্ব্ব যবদ্বীপে খাস যবদ্বীপী জা'ত, আর মাদুরা দ্বীপে মাদুরী জা'ত। সুন্দারা সংখ্যায় ৭০ লাখের কিছু উপর, মাদুরী জা'ত প্রায় ১৭ লাখ, যবদ্বীপীয়েরা ২॥০ কোটীর উপর। এ ছাড়া মালাই ভাবী লোক আছে, বিশেষতও পশ্চিমে বাতাবিয়া অঞ্চলে। বলিদ্বীপের বলী জা'ত, সংখ্যায় এরা সাড়ে পনেরো লাখের কিছু উপর, এরা সবাই প্রায় হিন্দু। বলিদ্বীপের পূর্ব্বেই হ'চ্ছে লম্বক দ্বীপ,—সেখানে প্রায় চল্লিশ হাজার বলী জাতীয় লোক আছে, এরাও হিন্দু; এ ছাড়া লম্বকদ্বীপে আছে ওই দ্বীপের আদিম অধিবাসী যাঁদের Sasak সাসাক বলে, সংখ্যায় এরা প্রায় সাড়ে চার লাখ, এরা মুসলমান। অন্ত অন্ত জা'তের নাম করবার বা তাদের সংখ্যা নির্দ্দেশের দরকার নেই।

ডচেরা এই দ্বীপগুলিতে অপ্রতিহত প্রতাপে এখন রাজত্ব ক'রছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ, আর ইন্দোচীনে ফরাসীরা যেমন। সমগ্র দ্বীপময় ভারতে এক গবর্ণর জেনেরাল আছেন, বাতাবিয় তাঁর রাজধানী, আর Buitenzorg বইটন্‌সর্গ তাঁর গ্রীষ্মাবাস। দ্বীপময় ভারত ৩৭টি প্রদেশ বা জেলায় বিভক্ত, এক যবদ্বীপেই এইরূপ ১৭টি জেলা আছে, আর বলিদ্বীপ আর লম্বকদ্বীপ নিয়ে একটি জেলা। দেশটি শাসন হয় Dyarchy নিয়ম অনুসারে। খাস যবদ্বীপের শাসন পদ্ধতি এই—প্রত্যেক জেলার যিনি প্রধান শাসক, যেন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁর পদবী হ'চ্ছে Resident রেসিডেন্ট। ইনি ডচ্ জাতীয়। রেসিডেন্ট-এর অধীনে জেলার প্রতি মহকুমাতে দুজন ক'রে কর্ম্মচারী থাকেন, একজনের পদবী হ'চ্ছে Regent রেখন্ট্, আর একজনের পদবী Assistant Resident সহকারী রেসিডেন্ট। Regent দেশীয় লোক হন, আর Assistant Resident ডচ্ জাতীয়। Regentএর অধীনে থাকেন Patih (এঁর সেক্রেটারী), আর Wedono আর Mantri নামে দুজন দেশীয় কর্ম্মচারী; আর Assistant Resident-এর অধীনে থাকেন Controleur, ইনি ও ডচ্। Regent-এর কাজ, 'আদৎ' বা প্রচলিত দেশীয় আইন অনুসারে Patih, Wedono আর Mantriর সাহায্যে দেশীয়দের পরিচালনা করা। Resident, Assistant Resident, Controleur এঁরা হ'লেন জেলা-শাসনের ডচ্ অঙ্গ, আর Regent, আর তাঁর সঙ্গে Patih Wedono আর Mantri, এঁরা হ'লেন দেশীয় অঙ্গ। যথার্থ ক্ষমতা এই ডচ্ অঙ্গেরই আয়ত্ত থাকে, কিন্তু দেশীয় অঙ্গের প্রতিপত্তিও কম নয়। ডচ্ কর্ম্মচারীরা দেশীয় কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সাধারণতঃ বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে চলেন, আর ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার ক'রে থাকেন। রেসিডেন্ট্ আর তাঁর অভাবে আসিষ্টাণ্ট রেসিডেন্ট, আর রেখন্ট্—প্রায় সমান মর্য্যাদা পান, এক রকম উঁচু চেয়ারে পাশাপাশি বসেন, তবে ডচ রেসিডেন্ট হ'চ্ছেন যেন দেশীয় রেখন্ট-এর বড়ো ভাই—দাদা—তিনি বসেন ডান দিকে। Controleur পদ-মর্য্যাদায় Regent-এর নীচে, তাই এঁরা দু'জনে পাশাপাশি ব'স্‌লে, Regent-ই বসেন ডান দিকে। Resident, Assistant Resident আর Controleur,—এদের নিয়ে যেন দ্বীপময় ভারতের সিভিলিয়ান-জগৎ; আর Regent হ'চ্ছেন যেন দেশীয় রাজা বা জমীদার, যাঁকে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হ'য়েছে। Regent-রা সাধারণতঃ বড়ো ঘরের ছেলে, আর বিশেষ ভাবে এই কাজের উদ্দেশ্যে তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এঁদের ডচ শেখানো হয়, আর ডচ কর্ম্মচারীরা সকলেই বেশ মালাই ব'লতে শেখেন। এই রকমে দু-প্রস্থ শাসনে কিন্তু চ'লছে বেশ। নানা বিষয়ে

ডচেদের শাসন ইংরেজদের ভারত-শাসনের চেয়ে ভালো ব'লেই মনে হ'ল। একটা জিনিস লক্ষণীয়—দেশের জনসাধারণ ছমুঠো খেতে পায়, ভারতের মতন কঙ্কাল-সার চিরন্তন-দুর্ভিক্ষগ্রস্তের মূর্ত্তি এদেশে একটীও দেখিনি। আবার কতকগুলি বিষয়ে ইংরেজদের ঢের বেশী উদার ব'লে মনে হ'ল। অবাধে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে ইংরেজ আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন ক'রে দিয়েছে, আমাদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়ে' দিয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারে কিন্তু ইংরেজদের চেয়ে ডচেরা দেশীয়দের সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা করে, বেশী হৃদ্যতার পরিচয় দেয়।

রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ-ভ্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, ভারত কি ক'রে যবদ্বীপকে আপনার ক'রেছিল তা চাক্ষুষ দেখে আসা, যবদ্বীপের cultureকে একটু বোঝবার চেষ্টা করা। এদেশের কৃষি-বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্প বা শাসন-পদ্ধতি ভালো ক'রে দেখবার সুযোগ আমাদের হয় নি,আর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—যেমন যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি—তার দিকেও আমরা নজর দিতে পারি নি। ভারতের সাহচর্য্যে যবদ্বীপের সভ্যতার বিকাশ—এর-ই একটু আধটু দেখতেই আমরা যত্নশীল ছিলুম।

ভারতের সভ্যতা কিভাবে নিজের ছাপ এই দ্বীপময় ভারতে রেখে গিয়েছে, তার পরিচয় আমরা যা পেয়েছি—প্রাচীন কীর্ত্তিতে আর দেশের অধিবাসীদের জীবনে—তার বর্ণনার পটভূমিকা হিসাবে যবদ্বীপের আর বলিদ্বীপের ইতিহাসের মূলসূত্রগুলি এইবার একটু ব'লে নেবো।

ক্রমশঃ

ওপার

শ্রীহিরণ্ময় মুন্‌সী

পটে যেন রয় আঁকা,
ঐ যে ওপার চারিধার ঘন শ্যামল ছায়ায় ঢাকা।
ঐ বালুচর মরু-অন্তর ভরা রৌপ্যের কুচি,
রৌদ্র সিনানে সদ্য-বিধবা হয়েছে শুভ্র শুচি।
সরুপথ এক চলে গেছে ঐ চরের বক্ষ কেটে,—
করেছে কোমল জলপিচ্ছল পল্লীবধূরা হেঁটে।
কত যে পায়ের আলতায় রাঙা হয়ে ওঠে পথখানি,
দেখে মনে হয় কাহার বুকের রক্ত,—কিছু না জানি।
নদীজলধারা হ'য়ে দিশাহারা চরের চরণ ধরি,
শত তরঙ্গে আছাড়ি পড়িয়া শতখান হয় মরি!
মাথা কুটে যেন বলে ও 'আমার সঙ্গেতে সবে চল,—
কে আছ তোমরা ওগো গতিহীন!—ভাবা ওর
কল কল।
ঐ গাং ধারে উচ্চ পা'ড়েল,—ঐ বটগাছতলা,—
স্বপনের মত মনে হয় যবে বসিত রথের মেলা।
সরিষা গুঁজির হলুদে আঁচল জড়াত ও-পথে যেতে,
গাঁয়ের চাষারা 'মুর্শিদা' গেয়ে চলিত ফিরিত রেতে।
ভাঙনের কাছে ঐ পোঁতা আছে একটি কলার চারা,
ওটা যে শ্মশান,—ঐখানে হ'ল কতজন কত হারা!
গহন সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসে,—সে দিনও এমনি সাঁঝে,
বলিতে পারি না,—চোখে জল আসে,—কি ব্যথা
এ বুকে বাজে।

আঁধারে নিভিল পরাণ প্রদীপ,—ডুবিল গাং-এর জলে
ভরা ভরা মোর সোনার তরণী কোন্ অতলের তলে।
থাক্, ও কথায় আর কাজ নাই,—থাক্ চাপা বুকে স্মৃতি,
চিতার আগুনে শেষ করে দিছি হাসি, গান,প্রেম, প্রীতি।
নির্ব্বিকারের মত চাহি শুধু ঐ ওপারের পানে,
কে যেন আমারে অজ্ঞাতে তবু ঐ শ্মশানেই টানে।
ঐ যে ওপার খালি,—
কিছু নাই,ওরে কিছু নাই হোথা,—আছে শুধু ধূলোবালি।

ব্যঙ্গচিত্র

মোটরচালক—ডাইনে সরে যাও, গাধা!
Il 420, Florence

পত্নী—শুন্‌চ, বিজ্ঞান মানুষের আয়ু আরও
দশ বছর বাড়াবার উপায় বের করেছে
উৎপীড়িত স্বামী—কোন্ দুঃখে?
Smith's Weekly, Sydney

এই ঝি! শূয়ারেও এসব খাবার
খেতে পারে না!
—ওঃ, আচ্ছা, শূয়ারে যা খেতে পারে
তাই এনে দিচ্ছি।
Bulletin, Sydney

(শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের পুনরায় রুষিয়ার
সহিত মিত্রতাস্থাপনের প্রসঙ্গে)
অনেকে দেখে শেখে, কিন্তু কেউ কেউ ঠেকেও শেখে না
Washington Post

উপরের চিত্র—মিলিটারিজম্ বিতাড়িত।

নীচের চিত্র—মিলিটারিজম্—ওঃ, একজন অন্ততঃ আমাকে ভালবাসে।

New York Tribune

রাস্তা চলার আইন অমান্ত।

[চীন ও রুষিয়া কেল্‌গ্ সন্ধিপত্র না মানিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল]

Brooklyn Times

শ্যামখুড়ো—(ইয়ুরোপের প্রতি)—কোন্ দিকে যেতে চাও, সামনে না পেছনে?

[আমেরিকার সহিত যুদ্ধের উদ্যোগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বর্ত্তমান যুগে ইয়ুরোপের পক্ষে অসাধ্য]

New York Tribune
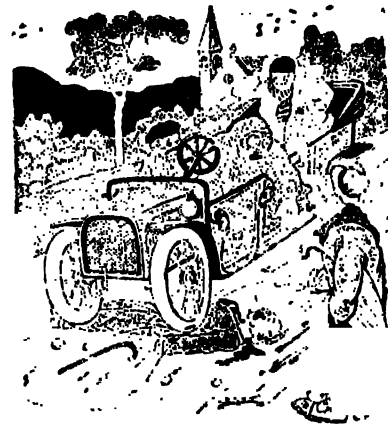
মোটরচালক—শীগ্‌গীর ডাক্তার ডেকে আন।

গ্রামবাসী—কি করে আন্‌ব?

মোটরচালক—কেন?

গ্রামবাসী—ও যে গাড়ীর নীচে!

Il 420 Florence

ভারতবর্ষ

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন—

১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেস, 'অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন', তাহার গঠন কার্য্যপদ্ধতির তালিকা ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই বিভাগে এতকাল কার্য্য বিশেষ কিছুই হয় নাই। সম্প্রতি কিছুদিন হইল এই বিভাগে ব্যাপকভাবে কার্য্য করিবার জন্য কংগ্রেস একটি স্বতন্ত্র শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া কতিপয় বিশিষ্ট কর্ম্মীর হস্তে ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই শাখা সমিতি স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া উচ্চজাতীয় ধনী বড়লোকদের বুঝাইয়া বিদ্যালয়, কূপ, দেবমন্দির সম্পর্কে তথাকথিত নিম্নজাতীয়দের কিছু কিছু অধিকার প্রদান করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মাঝে মাঝে এই কমিটির কার্য্যতালিকা প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষে নিম্নজাতি ও অন্ত্যজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীগুলি, হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্রই ঘৃণাজনক ব্যবহার পাইয়া থাকে। তবে দক্ষিণ-ভারতেই উহার কঠোরতা চরম। সম্প্রতি এই কমিটি এক ঘোষণাপত্রে জানাইতেছেন, দাক্ষিণাত্যের সাতারা জিলার আউন্ধ নামে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। উহার অধিপতি ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ রাজা খুব উদার—তিনি দেবায়তনে, বিদ্যালয়ে এবং সাধারণ সভাদিতে সর্ব্বজাতীয়ের সমান অধিকার দিয়াছেন। এবং যাহাতে তথাকথিত নিম্নজাতীয় বালকবালিকারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, বিদ্যা এবং নীতিপরায়ণ হয়, সেজন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে তিনি বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই শ্রেণীর কার্য্যপদ্ধতি কেবল কংগ্রেস নহে, হিন্দুমহাসভাও গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার এমন অনেক কর্ম্মীকে আমরা জানি, যাঁহারা চিন্তায় ও আচরণে এই কুসংস্কারমূলক ভেদবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বাক্য ও আচরণের মধ্যে কোন ভণ্ডামী নাই। তথাপি তাঁহারা সমাজে ব্যাপকভাবে কিছুই করিতে পারিতেছেন না, তথাকথিত নিম্নজাতিগুলির অবস্থার সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছেন না।

গত বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত হোসেনী রাউথকে বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইতে দিয়া মেদিনীপুরের যে সমস্ত হিন্দু রাষ্ট্রক্ষেত্রে সকল হিন্দুর সমান অধিকার স্বীকার করিয়াছেন এবং যে সমস্ত ভদ্রলোক ও প্রতিষ্ঠান শ্রীযুক্ত রাউথের বিনাবাধায় নির্ব্বাচনে সহায়তা করিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার পথপ্রদর্শক হইয়াছেন, এই সভা তাঁহাদিগকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছে এবং এই আশা করিতেছে যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ তাঁহারা শ্রীযুক্ত রাউথকে যে সমান অধিকার দিলেন, ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারেও সেরূপ অধিকার দিয়া হিন্দু-সমাজের, তথা দেশের, কল্যাণ-সাধন করিবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা

এলাহাবাদে কুম্ভমেলা—

বার বৎসর পর এবার প্রয়াগে কুম্ভমেলা বসিয়াছিল, বৃহস্পতি মেষরাশিতে এবং চন্দ্র সূর্য্য মকর রাশিতে আসিলে এই মেলা বসে। অন্যান্য বারের মত এবারও এই উপলক্ষে বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছিল। তীর্থ যাত্রীর সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় ৫০ লক্ষ। রেলকোম্পানী ভাড়া না কমাইলেও অন্যবার অপেক্ষা এবার যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। অমাবস্যায় সরকারী অনুমানে
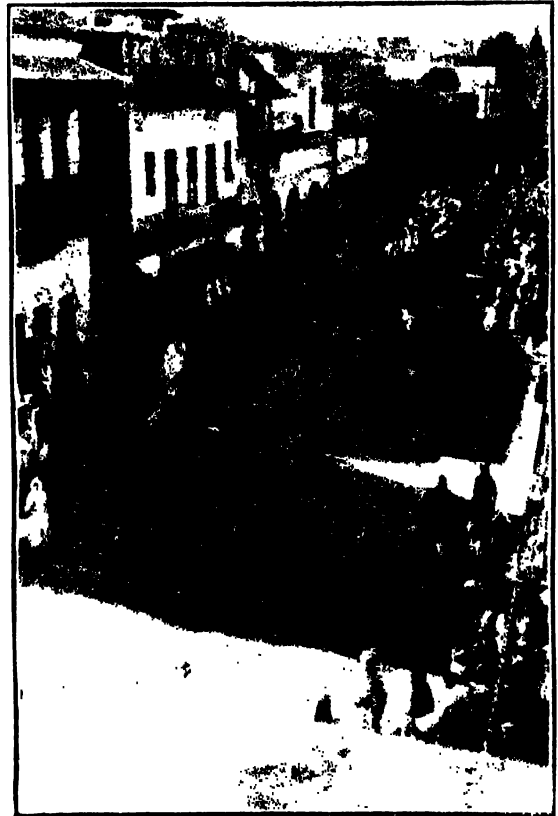
আখড়াগুলি সহরে প্রবেশ করিতেছে

৪৫ লক্ষ লোক সঙ্গমে স্নান করিয়াছিল। বার বৎসর আগে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল তাহাতে অমাবস্যায় ২৫ লক্ষ লোক স্নান করিয়াছিল।

স্নানের সময় এবার কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। ১০০ জন মাত্র স্নানের ভিড়ে সামান্য আঘাত পাইয়াছিল এবং ৪৫ লক্ষ লোকের ভিড়ে এক-হাজার স্ত্রীলোক ও শিশু হারাইয়া যায়। সেবা সমিতি ইহাদের ভার

স্নানের ঘাটে

গ্রহণ করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহাদের অভিভাবক খোঁজ করিয়া পাঠাইয়া দেন। সেবা-সমিতি, স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী এবং পুলিসের পরিশ্রম এবং চেষ্টায় শান্তি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ত্রুটি হয় নাই। ৫০০০ বৈরাগী ক্ষেপিয়া একদিন শান্তিভঙ্গের চেষ্টা করে কিন্তু সেবা-সমাজের কর্ম্মীরা অতি কৃতিত্বের সহিত ইহাদের দমন করেন।

তড়িৎ আলোকিত বিস্তৃত মেলাভূমিতে অনেক দেখিবার জিনিষ ছিল। কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সমর্থন—

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী, বৈকাল বেলা এলাহাবাদে এক মহিলা সম্মেলনে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনে শ্রীযুক্ত শারদার বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন সমর্থন করিয়া ও ঐ আইনের প্রতিবাদীগণের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে এই মর্ম্মেও একটা প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এই আইন যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইতেছে কিনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যদি কোন কমিটি নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে উহা যেন নারীগণ দ্বারাই গঠিত হয়, কেননা নারীগণ ব্যতীত এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া কষ্টসাধ্য হইবে।

নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে সম্মেলনে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের একত্র অধ্যয়ন সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে এই মর্ম্মেও আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ নারী কর্ত্তৃকত্ব সম্পন্ন নারীদের জন্য পৃথক পৃথক কলেজসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং ঐ কলেজে ছাত্রীদিগকে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে। অন্য একটি প্রস্তাবে নারী-শিক্ষার জন্য কম অর্থ মঞ্জুরীতে সরকারী ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং পুরুষদের তুল্য ব্যবস্থার দাবী করা হয়।

—ফ্রী প্রেস

—

বাংলা

মধু-মিলন উৎসব—

পরলোকগত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনার্থ গত সোমবার খিদিরপুরে মধু-মিলনের পঞ্চদশ বার্ষিকী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মনসাতলার শিশুদের খেলিবার ময়দানে উৎসবের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাতীয় পতাকা সুশোভিত একটি মণ্ডপে সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও রঙ্গলাল, দেশবন্ধু দাশ ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতি সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই সভায় রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁহার সঙ্গীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া সঙ্গীত ও আবৃত্তি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মধু-মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পরলোকগত কবি ও সাহিত্যিকদিগের জীবনী ও কার্য্য আলোচনা করিতে গিয়া জাতীয় জীবন গঠনের অনেক উপাদান পাওয়া যায়।

সভাপতি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতায় বাঙ্গলা ও ইংরাজী সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া জাতীয় জীবনের প্রগতির সহিত উহার সম্পর্ক সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন—

গত ২রা ফেব্রুয়ারী, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হয়। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন পৃথক পৃথক স্থানে বসে। বহু প্রতিনিধি ও দর্শক সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর নেতৃত্বে প্রধান মণ্ডপেই সাহিত্য শাখার অধিবেশন বসে। এই সম্মিলনীতে বহু প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সুলেখক ও মনীষীগণের লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলগৃহে বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হয়। বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি একটি সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন।

কুমার শরৎকুমার রায়ের সভাপতিত্বে ঐতিহাসিক শাখার অধিবেশন হয়। কুমার শরৎকুমার বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এবং বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব গবেষণা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। কয়েকটি সুচিন্তিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ এই শাখায় পঠিত হয়।

দর্শন শাখার অধিবেশন পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। তর্কবাগীশ মহাশয় হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ একটি অভিভাষণ পাঠ করেন।

অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। সন্ধ্যাকালে প্রতিনিধি ও দর্শকগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর গঙ্গোপাধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বাঙ্গলার চিত্র ও ভাস্কর্য্যের কতকগুলি চিত্র প্রদর্শন করেন।

মঙ্গলবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সভানেত্রী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রেরিত লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন। অপরাহ্ণে দুইটার সময় চারি শাখার সম্মিলন অধিবেশন পুনরায় বসে। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট মনীষী ও সাহিত্যিকগণ সভায় আলোচনা করেন এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সন্ধ্যাকালে সম্মিলনীর অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

কুম্ভমেলার চিত্র

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

মাধব সম্প্রদায়ের একটি বামন সাধু

গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মধ্যস্থলে

নেপাল হইতে আগত নাগা-সন্ন্যাসী

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরুর জন্মোৎসব

স্নানের পর প্রত্যাবর্ত্তন
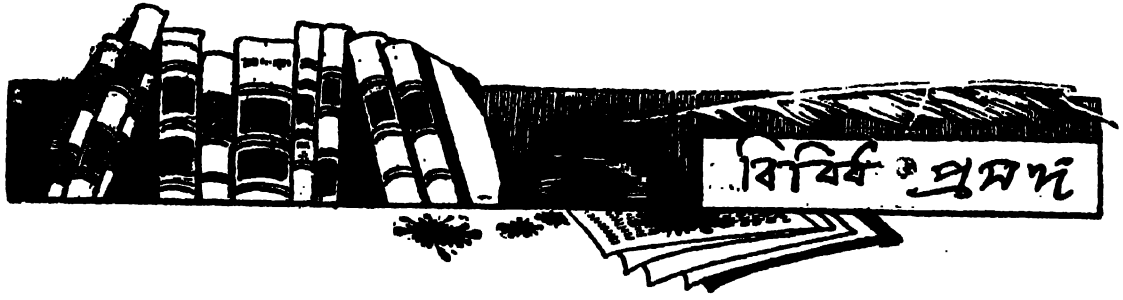
ভেদনীতি

১৯২২ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্‌স্‌এর নিকট অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে যে দীর্ঘ টেলিগ্রাম করেন তাহার শেষে এই কয়েকটি কথা ছিল,—

"অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই কি নীতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন উপসংহারে তাঁহারা তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতে চান। এই নীতি অবলম্বনে বিপদের যে আশঙ্কা আছে তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত নয়। তবুও যে গভর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচকদের কথা মত কোনও কঠোর ব্যবস্থা করেন নাই তাহার কারণ ইহা নয়, যে, কোনও উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তাঁহাদের হাত-পা বাঁধা কিংবা কঠোর নীতি অবলম্বনের ফলে দেশে যে সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা দমন করিবার মত শক্তি এবং নিজের সেই শক্তিতে আস্থা গভর্ণমেণ্টের নাই। গভর্ণমেণ্ট এতদিন পর্য্যন্ত যে নীতির বশে চলিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিবার কারণ তাঁহাদের এই বিশ্বাস, যে, কোনও কার্য্যের আপাতঃ ফলাফল অপেক্ষা দূর ও স্থায়ী ফলাফল কি হইবে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখাই প্রকৃত রাজনীতিকের কাজ।

"ভারতবাসীদের সহায়তায়ই আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন চলিয়া আসিতেছে, এবং ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ কার্য্যকারিতার জন্যও এই সহযোগিতার অত্যন্ত আবশ্যক। সেজন্য অসহযোগ আন্দোলন দমন করিবার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিতে যাইবার পূর্ব্বে কি করিলে এই সকল ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের লোকদের যতটুকু অনুমোদন এবং সম্মতি থাকা সম্ভব তাহা থাকে সে কথাটাই গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বিচারতর্ক হইতে যতটুকু বোঝা যায় তাহাতে মনে হয় এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।"

ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভুত্ব ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথাটাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু নূতন নয় বলিয়াই, উহার পিছনে যে একটা গভীর সত্য আছে তাহা যদি আমাদের কাছে ম্লান হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সম্প্রতি "টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশিত স্যর আর্থার কোনান ডয়েলের একটি পত্র পড়িয়া এই বিস্মৃতপ্রায় সত্য কথাটা আজ আবার আমাদের মনে নূতন করিয়া জাগা উচিত।

স্যর আর্থার বলিতেছেন, "আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে আন্দোলনের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু উহার বিরুদ্ধে যে প্রতি-আন্দোলন সৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে অতি সহজ, সে প্রতি-আন্দোলন সম্বন্ধে কোনো কথাই আমাদের কানে আসিয়া পৌছিতেছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিব। আমরা মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি কি, উহারা একটা স্থায়ী হিন্দু মেজরিটি দ্বারা পাশ করা আইন মানিতে প্রস্তুত কি না? দেশীয় রাজন্যবর্গও একথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিবেন কি তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যগুলিকে একটা স্বাধীন দেশের মধ্যে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত করিয়া রাখিতে প্রস্তুত কি না? পঞ্জাবকে কি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, উত্তর সীমান্ত হইতে কোনও আক্রমণ হইলে ব্রিটিশ সাহায্য ছাড়া সে কত অসহায়? ইংরেজের সুশাসন ও ইংরেজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষের অরাজকতা, এই দুয়ের মধ্যে কোনটি তাহারা চায়, একথা প্রকাশ্যভাবে বলিতে কি পার্শী সম্প্রদায়কে আহ্বান করা

হইয়াছে? ভারতবর্ষে ছয় কোটি অস্পৃশ্যকে কি জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে চায় কি না? ..

"প্রতি-আন্দোলনের এই সকল উপায়ই আমাদের হাতে রহিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি তাহা কাজেই না লাগাইলাম তবে এ সকলের থাকা না থাকা সমান।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনধিকারী, ভারতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, শার্লক হোম্‌সের স্রষ্টা, নব্যপ্রেততত্ত্বে আস্থাবান স্যর আর্থার কোনান ডয়েল কথাগুলি নূতন ভাবিয়াই বলিয়াছেন। তাঁহার এই সরলতা দেখিয়া কলিকাতার ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার একটু হাসি পাইয়াছে। স্যর আর্থারের চাঞ্চল্য দেখিয়া ষ্টেটস্‌ম্যান যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন তাহার ভিতরে একটু মজা আছে। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বলিতেছেন,

"আমাদের বিবেচনায় টাইম্‌স্ পত্রিকায় স্বাধীনতা-বাদীদের বিরুদ্ধে প্রতি-আন্দোলন করিবার সপক্ষে চেঁচামেচি করিতে গিয়া স্যর আর্থার কোনান ডয়েল নিরর্থক দুশ্চিন্তা ভোগ করিতেছেন। 'মুসলমানরা স্থায়ী হিন্দু মেজরিটি দ্বারা পাশ করা আইন মানিতে প্রস্তুত কি-না' একথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, কারণ মুসলমানরা নিজেরাই বার বার সে প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। 'ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাহাদের রাজ্যগুলিকে একটা স্বাধীন দেশের মধ্যে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে প্রস্তুত কি-না' একথা জিজ্ঞাসা করাও নিষ্প্রয়োজন, কারণ আজ কতকদিন ধরিয়াই আমরা শুনিতেছি যে তাঁহারা সেরূপ করিতে প্রস্তুত নহেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে পঞ্জাবের বিপদ হইবে একথা বলাতেও কোনো ফল নাই। কারণ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনই হয় তবে পঞ্জাব হয় আত্ম-বিরোধ লইয়া এত ব্যস্ত থাকিবে যে তাহার আর আক্রমণের দিকে মনোযোগ দিবার অবকাশ হইবে না, অথবা সে ভাল করিয়াই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। সত্য কথা বলিতে কি, স্যর আর্থার যে কথাটা তিনি নিজেই শুধু জানেন বলিয়া মনে করিতেছেন তাহা হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, পাঞ্জাবী, সকলেরই জানা। তিনি যে প্রতি-আন্দোলন চান সে আন্দোলন তাহাদের ভিতর হইতেই আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং উহা দেখিয়া তাহাদের নেতারাও আনন্দিত।"

কিন্তু শুধু হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, পাঞ্জাবী নয়, ইংরেজ রাজপুরুষদেরও এ কথা জানা কি-না, এবং শুধু হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, পাঞ্জাবীর নেতা নয়, ইংরেজ রাজপুরুষেরাও এই আন্দোলন দেখিয়া আনন্দিত কি-না, ষ্টেটস্‌ম্যান তাহা খুলিয়া বলেন নাই—বোধ করি রস-বোধের সূক্ষ্মতার পরিচয় দেওয়া হইবে না বলিয়া।

—

পূর্ণস্বরাজ ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ

প্রথমে ভারতীয় রাজন্যবর্গের কথাই বলিব। তাঁহাদের পক্ষ হইতে পূর্ণ স্বরাজকামীদিগকে সাবধান করিয়া দিবার ভার পড়িয়াছে পাটিয়ালার মহারাজার উপর। ইহাতে আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। কারণ, তাঁহার রাজ্যশাসন-প্রণালী কিরূপ, তদ্বিষয়ক নানা অভিযোগ নামধামসহ দীর্ঘকাল সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে থাকা সত্ত্বেও পাটিয়ালারাজ বা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন প্রতিবাদ এ পর্য্যন্ত করেন নাই। এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ প্রকাশ্যভাবে করা হইয়াছে, আর যাহার কোনও প্রতিবাদ এখনও হয় নাই, তাহা এইরূপ, যে, সেগুলি সত্য হইলে তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট না থাকিয়া কারাগারে থাকিবার কথা। এই সকল অভিযোগের মধ্যে কোনও সত্য থাকিলে, ইংরেজের অনুগ্রহের উপরই তাঁহার রাজত্ব নির্ভর করে, এবং ইংরেজ সরকার তাঁহাকে দিয়া যে কথা বলাইতে চান, সেকথা বলিতে তিনি বাধ্য। যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ সমূহের প্রকাশ্য বিচার করিয়া তাঁহাকে দোষমুক্ত বলেন, তাহা হইলে হয় ত তাঁহার কথার মূল্য কিছু থাকিতে পারে। এখনও তাহা হয় নাই। আজ দুই বৎসর ধরিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট মিত্র ও করদ-রাজ্যগুলির তথাকথিত স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবীকে ভারতবর্ষের ঐক্য ও রাজনৈতিক উন্নতির বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড যুক্তি হিসাবে খাড়া করিয়াছেন। পাটিয়ালার মহারাজার উক্তি এই সকল যুক্তিরই প্রতিধ্বনি

মাত্র। ভারতীয় রাজন্যবর্গের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মত হিসাবে ইহার কোনই মূল্য নাই। সেজন্য এ কথাটা খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন, যে, এই সকল বক্তৃতা হইতে আমরা যেন মনে না করি আজ আবার দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আমাদের পূর্ণ-স্বরাজলাভের পথে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া নূতন আর একটা প্রতিপক্ষ দাঁড়াইল। আমাদের প্রতিপক্ষ এক। দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধাচরণই হউক, মুসলমানদের প্রতিকূলতাই হউক, কিংবা অস্পৃশ্যদের অদূরদর্শী ইংরেজ পক্ষপাতিত্বই হউক, সকলেরই পিছনে এক জিনিষ। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত উহাদের নিজস্ব বিশেষ কোনও প্রেরণা, বোধ করি সত্তাও নাই। তাহা ছাড়া আর একটা বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে। পাটিয়ালা প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজারা যাহা বলিয়া থাকেন, মহীশূরের মহারাজা, নিজাম, বড়োদার মহারাজা, কাশ্মীরের মহারাজা প্রমুখ ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ তাহাতে বড়-একটা যোগ দেন না।

—

দেশীয় রাজাদের ভারতবর্ষে একটা আলষ্টার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে কি ?

কিন্তু পাটিয়ালার মহারাজা যদি মাত্র কয়েক লক্ষ শিখের প্রজাপীড়ক বলিয়া অভিযুক্ত শাসক না হইয়া এক জন বড় রাজা হইতেন এবং তিনি যদি সমস্ত দেশীয় রাজাদের প্রতিভূ হিসাবে এই কথাগুলি বলিতেন, তাহা হইলেও আমাদের ভয়ের বিশেষ কোন কারণ ছিল না। ভারত-বর্ষীয় রাজাদের ভারতবর্ষের মধ্যে আর একটা আলষ্টার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই। কেন নাই, সে কথা বিস্তারিতভাবে বলা প্রয়োজন। পাটিয়ালার মহারাজা বলিতেছেন,

"সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজ এবং গ্রেট্ ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদকেই তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।... আমার মনে হয়, কংগ্রেসের নেতারা স্বাধীন ভারতবর্ষ বলিতে সমগ্র ভারতবর্ষই বোঝেন এবং বিশ্বাস করেন, যে, স্বাধীন ভারতবর্ষের অধিকার দেশীয় রাজ্যগুলির উপরও খাটিবে। আমরা দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীরা—রাজা এবং প্রজা উভয়েই—আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়া উহার বিরুদ্ধাচরণ করিব। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমরা যে-সকল বন্ধনে আমরা আবদ্ধ তাহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় আমাদের নাই।...আমরা কোনও ব্যক্তিবিশেষের, সে ব্যক্তি যতই উচ্চপদস্থ হউক না কেন, কিংবা কোনও প্রতিষ্ঠানের, সে প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হউক না কেন, আদেশে এই সকল বন্ধন কিছু নয় বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিব না। এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কংগ্রেসের দেশীয় রাজ্যসমূহের পক্ষ হইতে কোনও কথা বলিবার কি অধিকার আছে ?...

"আমরা মনে করি এখন সেই সময় আসিয়াছে যখন স্পষ্টভাষায় আমাদের বলা উচিত, যে, যদি গ্রেট-ব্রিটেনের সহিত ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ কোনও সম্বন্ধ না রাখে, তবে আমাদের—দেশীয় রাজাদের পক্ষেও ব্রিটিশ ভারতের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখা সম্ভব হইবে না।...

"দেশীয় রাজ্যের রাজা ও প্রজা কাহারও ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক উন্নতিতে বাধা দিবার ইচ্ছা নাই। সে-দেশের যে কোনও ন্যায্য রাজনৈতিক দাবীতে যে আমাদের সহানুভূতি আছে একথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। আমরা ইহার উপরেও কিছু দূর যাইতে প্রস্তুত—ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে যাঁহারা বর্ত্তমান ধারা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান ভিত্তির উপর, রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা আমরা করিব। কিন্তু আমরা কখনও পূর্ণস্বরাজরূপ আলেয়ার অনুসরণ করিব না।...

"যদি ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনের উদ্দেশ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব নাই বলিয়া ধরিয়া কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তবে সমগ্র দেশের পক্ষে দুর্দ্দিন আসিয়াছে বলিতে হইবে; কারণ আমরা তখন আমাদের অধিকার-রক্ষার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে দ্বিধা করিব না। তখন আমরা যে-সকল উপায় অবলম্বন করিব, তাহার দায়িত্ব আমাদের উপর আরোপ করিলে চলিবে না। সে দায়িত্ব তাহাদের, যাহারা আমাদিগকে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে বাধ্য করিবে।"

পাটিয়ালার মহারাজার কথাগুলির অর্থ সুস্পষ্ট।

তিনি বলিতে চান, যদি ভারতবর্ষের লোকেরা পূর্ণ-স্বরাজের জন্য আন্দোলন করিতে প্রস্তুত হয় তাহা হইলে দেশীয় নৃপতিগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি দিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবেন, এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষ যদি কোনোদিন স্বাধীনও হয় তাহা হইলেও বিনা যুদ্ধে তাঁহাদিগকে স্বাধীন-ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

সত্যই যদি দেশীয় রাজাদের এইরূপ করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে ব্যাপারটা গুরুতর হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। ইহাই আমাদের বক্তব্য।

আমরা যে যে কারণে ভারতবর্ষে আর একটা আল্‌ষ্টার সৃষ্ট হইতে পারে না মনে করি, তাহা এই—(১) প্রথমতঃ, ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের অধিবাসীরা এবং দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীরা জাতিতে, ধর্ম্মে, ভাষায়, সভ্যতায় ও আচার-ব্যবহারে বিভিন্ন নয়। ভাষা, সভ্যতা ও দেশাচারের তারতম্যে ভারতবর্ষ যে কয়েকটি স্বাভাবিক বিভাগে বিভক্ত দেশীয় রাজ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। দেশীয় রাজ্যগুলির সীমাভেদ সম্পূর্ণ কৃত্রিম। (২) দ্বিতীয়তঃ, প্রজাদের পক্ষ হইতে কিছু বলিবার অধিকার দেশীয় রাজাদের নাই। তাহাদের ও তাহাদের প্রজাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা শাসক ও শাসিতের এবং অনেকের মধ্যে সম্বন্ধ, অত্যাচারী ও অত্যাচরিতের, ভোক্তা এবং ভক্ষ্যের। যদি ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কোন সংঘর্ষই উপস্থিত হয় তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীরা তাহাদের শাসকদের পক্ষে না গিয়া ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গেই যোগ দিবে। এদিক হইতে দেশীয় রাজাদিগকে ফরাসী-বিপ্লবের সমসাময়িক অত্যাচারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্ম্মাণ সামন্তদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। (৩) তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনকে বাধা দিতে হইলে যে শক্তি, ঐক্য, ও নৈতিক প্রেরণার আবশ্যক তাহা ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদের নাই। তাহারা সংখ্যায় বহু এবং বিভক্ত, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধের কারণেরও অভাব নাই। তাহারা প্রায়ই অকর্ম্মণ্য, নির্ব্বোধ এবং বিলাসী। সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, তাহারা শুধু নিজেদের অধিকার এবং স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্যই চিন্তিত, ধর্ম্ম, জাতীয় স্বাধীনতা কিংবা এই ধরণের মহান্ কোন প্রেরণা তাহাদের স্বার্থান্বেষণকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরিণত করিবে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটা কথা মনে রাখা উচিত। আলষ্টার গ্রেট-ব্রিটেনের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিবার জন্য ১৯১৪ সালে গ্রেট-ব্রিটেনের সহিতই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ভারতীয় রাজাদের সে সাহস কখনও হইবে না। ভারতে ব্রিটিশ-শক্তিই তাহাদের প্রথম এবং শেষ ভরসা। আজ ব্রিটিশ-শক্তি ভারতবর্ষে প্রবল, সেজন্য আজ তাহারা ব্রিটিশ-শক্তির তাঁবেদারী করিতেছেন; কাল যদি ভারতবাসীর শক্তি অধিক হয়, তবে তাঁহারা ভারতবাসীরও আনুগত্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না।

—

দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে আর একটি কথা

তবুও দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের দেশীয় রাজাদিগকে কোন্ পথে চালাইবার ইচ্ছা, তাহার একটা আভাস দিয়া পাটিয়ালার মহারাজা আমাদের উপকারই করিয়াছেন। এই উপকারের বিনিময়ে আমাদেরও তাঁহাকে এবং তাঁহার সমধর্ম্মী দেশীয় রাজন্যদিগকে একটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবার আছে।

তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন, যে, ভারতবর্ষে আজকাল যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ চলিয়াছে তাহা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী একটা আন্দোলনের অংশমাত্র। সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকা ব্যাপিয়া শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহাতে আজ না হউক, ভবিষ্যতে একদিন শাসিতের জয় অবশ্যম্ভাবী। ইহার কারণ যে শুধু শাসিতের শক্তিবৃদ্ধি তাহাই নয়, শাসকদের ন্যায়বুদ্ধির উদ্বোধনও বটে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশই এযুগে, সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবিরোধী, যুদ্ধসমর্থক ও যুদ্ধনিবারক, এই দুই দলে বিভক্ত। এই কারণে এবং শ্রমিক ধনিকদের

বিরোধ ও শ্রমিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার প্রসারের জন্ত কোনও দেশের পক্ষে এখন আর যুদ্ধে অখণ্ড শক্তি নিয়োগ করা সম্ভব হইবে না। বিগত আইরিশ বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজদের পক্ষে সৈন্তসামন্ত নিয়োগ করিয়া বিদ্রোহ দমন করা কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ডে আইরিশ জাতির সহিত সহানুভূতিশীল এক প্রবল দল থাকায় তাহা করিতে পারা যায় নাই।

এই সকল কারণে এক সময়ে গ্রেটব্রিটেনকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সহিত একটা রফায় পৌছিতে হইবেই হইবে। তখন গ্রেটব্রিটেন নিজের স্বার্থ যথাসম্ভব বজায় রাখিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে যাহারা তাহাদের সপক্ষাচরণ করিয়াছে তাহাদের স্বার্থও কিছু কিছু বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে সত্য, কিন্তু সমগ্র শক্তি দিয়া কিছু করিবে না। তখন ইংরেজ-মুখাপেক্ষী ভারতীয় রাজন্যদের কি দশা হইবে?

এই ভয় যে নিতান্ত অমূলক নয়, তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বোঝা যাইবে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে অনেক আমেরিকান ইংরেজের দলে যোগ দিয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতালাভের পর উহারা কানাডায় বিতাড়িত হয়।

গত আইরিশ বিদ্রোহের সময়েও অনেক দক্ষিণ আয়ার্লাণ্ডবাসী ইংরেজদের সপক্ষাচারণ করে। গ্রেট-ব্রিটেন সিনফাইনের সহিত সন্ধিস্থাপনের সময়ে তাহাদের জন্তও বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। তাহাদের পক্ষ হইতে পার্লামেণ্টে আন্দোলন করিতে গিয়া একজন কনসার্ভেটিভ মেম্বর কনসার্ভেটিভ পার্টির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া দল হইতে বহিষ্কৃত হন।

মিঃ লয়েড জর্জ এবং ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যেই গ্রীকগণ এশিয়া-মাইনরে কতকগুলি স্থান পায় এবং তুর্কদের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত হয়। মুস্তাফা কেমালের জয়লাভের পর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই। লয়েড জর্জ বৃথা যুদ্ধোদ্যম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মন্ত্রিত্বের অবসান হয়। এখন গ্রীকগণ তুরস্ক হইতে, এমন কি তুরস্কের যে সকল স্থানে তাহারা পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছিল সে সকল জায়গা হইতেও বহিষ্কৃত হইয়াছে।

ইজিপ্টে মহম্মদ মামুদ পাশা ইংরেজের ভরসায়ই ওয়াফাদ বা জাতীয় দলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এখন ওয়াফাদ দল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে রক্ষা করা প্রয়োজনও বিবেচনা করেন নাই।

রুশিয়ায় বলশেভিক তন্ত্র প্রচারের পর ইংরেজ ও মিত্র-শক্তিবর্গের প্ররোচনায় বহু "শ্বেত" বিদ্রোহ হইয়াছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এখন রুশিয়ার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু কলচাক্, ডেনিকিন, র‍্যাঙ্গেল—তাহারা আজ কোথায়? তাহাদের দলভুক্ত, অসংখ্য রুষিয়ান অভিজাত আজ কনষ্টাণ্টিনোপল, বার্লিন, প্যারিস্, রোম, লণ্ডনে মোটরচালক, হোটেলের চাকর, দারোয়ান, কুকুররক্ষক, প্রভৃতির কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। হয়ত আমাদের রাজন্তবর্গের মধ্যে অনেকেও শিক্ষাদীক্ষায় এ সকল কাজের খুবই উপযুক্ত, কিন্তু রুষিয়ান প্রিন্সদের জন্ত ইয়ুরোপে অন্তের পক্ষে এই সকল কাজ পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

—

ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা

পূর্ণ-স্বরাজের জন্ত আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের বর্ত্তমান অসদ্ভাবকেও কি করিয়া কাজে লাগান সম্ভব তাহার একটা ইঙ্গিত আমরা পাই "স্বাধীনতা দিবসে" ছাত্রদের মিছিল বাহির করা উপলক্ষ্যে ঢাকায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হইতে। গত ২৬শে জানুয়ারী ঢাকায় যে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও গুপ্ত আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহা প্রায় সাত দিন ধরিয়া চলে। এই দাঙ্গায় বহু লোকের প্রাণ-নাশ হইয়াছে, বহু লোক আহত হইয়াছে এবং বহু অর্থক্ষতি হইয়াছে। দাঙ্গার জন্ত যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং বিচারাধীন আছে তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। উহাদের বেশীর ভাগই হিন্দু।

এই দাঙ্গার কারণ কি ? এ কথাটা গোপন করিয়া লাভ নাই, যে, এই দাঙ্গার মূল কারণ আমাদের পূর্ণ-স্বরাজ-লাভের প্রচেষ্টা ; প্রচেষ্টা বলাও ঠিক হইবে না, এই দাঙ্গার কারণ পূর্ণ-স্বরাজলাভের ইচ্ছাপ্রকাশ মাত্র।

লাহোর কংগ্রেসের পর হইতেই বড়লাট এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ আমাদিগকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যে, রক্তপাত ও অরাজকতা কংগ্রেস-কর্ত্তৃক অবলম্বিত কর্ম্মপদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল। লর্ড আরউইন বলেন,"And although the very authors of the present policy deprecate, some on grounds of principle and some on grounds of expediency, resort to violence, they can hardly be so lacking in either imagination or recollection of past events in India as not to be able to picture results in this direction which must follow, as they have always followed, from adoption of the policy they recommend."

বৈধ আইন-অমান্য আন্দোলন হইতে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কা একেবারে নাই, এ কথা এই আন্দোলনের কোনও নেতা বলিবেন না, বলেন নাই। এই জন্যই মহাত্মাজীর আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে এত দ্বিধা। কিন্তু এই বিষয়টারও আর একটা দিক আছে। রক্তপাত ও দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য আর একটা পক্ষের প্রয়োজন হয়। অহিংস আন্দোলনকে হিংস আন্দোলনে পরিণত করিতে পারিলে পূর্ণ-স্বরাজ-বিরোধীদের লাভ। সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইতে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করিবার সঙ্গত কারণের অভাব নাই। তবুও যদি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা কেবলমাত্র নিজেদের অধীনস্থ পুলিশ ও সৈন্যসামন্ত দ্বারাই আইন-অমান্য আন্দোলন দমন করিবার চেষ্টা করিয়া নিরস্ত হন, তাহা হইলেও দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তপাতের সম্ভাবনা কম। প্রকৃত বিপদ ঘটিবে তাহারা আমাদের গৃহবিরোধ ও জাতিগত ধর্ম্মগত বিদ্বেষের সুবিধা পাইয়া দেশের একদল লোককে অন্য দলের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্ররোচিত করিলে। ঢাকার দাঙ্গার পিছনে এইরূপ কোনও ব্যাপার আছে কিনা তাহা বলিবার উপায় আমাদের নাই। কিন্তু এইরূপ একটা সম্ভাবনা সর্ব্বত্রই উপস্থিত আছে, ইহা ধরিয়া লইয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে এবং পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হইতে হইবে।

—

ঢাকার দাঙ্গার জন্য দায়ী কে ?

ঢাকার দাঙ্গার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সংবাদপত্রে যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহা পড়িয়া আমাদের মনে দুইটি প্রশ্ন জাগিয়াছে। প্রথমতঃ, 'স্বাধীনতা-দিবসে' হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিতে পারে এ আশঙ্কা পুলিশের মনে জাগিল কেন ?

ষ্টেট্স্ম্যানের নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, "পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুর আদেশ পাইয়া স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি 'স্বাধীনতা-দিবসে' যথোচিত আড়ম্বরের সহিত উৎসব করিতে প্রস্তুত হয়। ধ্বজা উত্তোলন, সভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোনও জায়গা অপেক্ষা ঢাকায়ই সম্ভবতঃ হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক একটু সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত (delicately adjusted)। এই কারণে 'মস্জিদের সম্মুখে বাদ্য' এইরূপ কোনও উপলক্ষ্যে যাহাতে শান্তিভঙ্গ না হয় সেজন্য পুলিশ সেদিন পাশ ভিন্ন মিছিল বাহির হইতে পারিবে না। এই মর্ম্মে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে।"

পুলিশের কার্য্যকলাপের এই ব্যাখ্যা আমাদের নিকট খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। স্বাধীনতা-দিবসের কোন অনুষ্ঠানই মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তাহাতে এমন কিছু ছিলও না যাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম, স্বার্থ বা সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে। বরঞ্চ ইষ্ট-বেঙ্গল 'টাইম্স্'-পত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে মনে হয় সেদিনকার উৎসবে ভদ্র ও শিক্ষিত মুসলমানদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছিল। তবুও ব্যাপারটা ঘটিল কি করিয়া ?

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন,

"'হিন্দু স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী একদল মতলববাজ মুসলমান কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রই এই দাঙ্গার

মূলে আছে। তাহারাই স্বাধীনতা-দিবসের সুযোগ লইয়া, মুসলমান গুণ্ডাদিগকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্ররোচিত করিয়াছে। দাঙ্গার অবসানের পর গত ২রা ফেব্রুয়ারী শান্তিসমিতির বৈঠকে মৌলবী মহবুব আলি খাঁ, ডাঃ মোহিনীমোহন দাস প্রভৃতিও এই 'তৃতীয় পক্ষই' যে দাঙ্গা বাধাইবার মূল তাহা প্রকাশ্যভাবেই বলিয়াছেন। শান্তিসমিতি সহরে জনসাধারণের নিকট যে আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ দুষ্কৃতকারীদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।" উহারা কে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে উহাদের অভিযোগ কি, এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে জানিয়াও পুলিশ ছাত্রদের বে-আইনী মিছিল বাহির হইতে দিল কেন? এই প্রসঙ্গে ষ্টেটস্‌ম্যানের সংবাদদাতা বলেন, যে, ছাত্রেরা পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া মিছিল বাহির করিবে, এই মর্ম্মে "হ্যাণ্ডবিল পুলিশের নজরে আসিলে তাহারা একটা সমস্যায় পড়ে। শেষ পর্য্যন্ত ইহা স্থির হয়, যে, মিছিলে বাধা দিতে গেলে কেবলমাত্র দাঙ্গাহাঙ্গামার সুযোগ দেওয়া হইবে, সেজন্য এখন মিছিল বাহির হইতে দিয়া পরে উহার নেতাদিগকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইবে।" এই বিবরণ যদি সত্য হয়, তবে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষকদের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্যের ক্রটি আর কিছু হইতে পারে না। এই একটিমাত্র ক্রটির জন্য ঢাকায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সমগ্র দায়িত্ব পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যায়তঃ ও আইনতঃ আরোপ করা যায়।

কিন্তু দায়িত্ব যাহারই হউক এই দাঙ্গায় লাভ হইয়াছে সরকারের। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট না-কি বলিয়াছেন, যুবক সঙ্ঘ, ছাত্র সঙ্ঘ তাহাদের লাঠি ও ছোরাখেলা, তাহাদের ভলাণ্টিয়ারদের ড্রিল—এ সকলই এ দাঙ্গার কারণ; ছাত্র ও যুবকরাই এক্ষেত্রে প্রথম আক্রমণকারী, তাহাদিগকেই শাস্তি দিতে হইবে এবং এ সকল জিনিষ বন্ধ করিতে হইবে।

—

"লীবারেল" দল

লীবারেল দল দেশের মঙ্গল চান না, কিংবা স্বার্থান্বেষী একথা বলিবার অধিকার আমাদের না থাকিলেও আমরা এটুকু বলিতে পারি, যে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তও দেশের অনৈক্য এবং ইংরেজ রাজপুরুষদের আশা ও আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছে।

আমরা বিবিধ প্রসঙ্গের প্রারম্ভে গভর্ণমেণ্টের যে টেলিগ্রামটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই প্রমাণিত হইবে, যে দেশের একদল লোকের সাহায্যে আর এক দলকে দমন করাই গভর্ণমেণ্টের মূল রাজনৈতিক নীতি। গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় নেতাদের এবং ভারতীয় জনমতের ঐক্যকে যতটা ভয় পান আর কোনও জিনিষকে তত ভীতির চক্ষে দেখেন নাই। এই জন্যই সাইমান কমিশন নিযুক্ত হওয়ার ফলে ভারবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এক শ্রেণীভুক্ত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের এত দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। আজ শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ও লর্ড আরউইন জাতীয় আন্দোলনের সহিত যতদূর রফা করিতে প্রস্তুত বা স্বীকৃত হইয়াছেন তাহাও সেই সঙ্ঘবদ্ধ বিরুদ্ধাচরণের ফল এবং আমাদের সেই একতাকেই বিনষ্ট করিবার ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত। আমরা একথা বলিতে চাই না, যে, ব্রিটিশ ও ভারত গভর্ণমেণ্টের মতপরিবর্ত্তনের ইহাই একমাত্র বা প্রধান কারণ। কিন্তু ৩১শে অক্টোবরের ঘোষণার পিছনে যে এই উদ্দেশ্য, অন্ততঃ এই আশা, ছিল না একথা বলা নিতান্তই শিশুসুলভ হইবে। আমরা জানি এ প্রসঙ্গে লর্ড আরউইনের "আন্তরিকতা" সম্বন্ধে অনেক কথা উঠিবে। লর্ড আরউইন আমাদের প্রতি সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। কিন্তু কথাটা একেবারেই অবান্তর। রাজনীতির মূলমন্ত্র কোন দেশে কোনকালেই আন্তরিকতা বা পরহিত নয়, রাজনীতির মূলমন্ত্র স্বার্থরক্ষা। ইহার মধ্যে লজ্জা বা অগৌরবের কথা কিছুই নাই, কারণ এ স্বার্থ ক্ষুদ্র স্বার্থ বা ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, একটা জাতি ও সাম্রাজ্যের স্বার্থ। এই স্বার্থের উল্লেখ

করিয়াই ইটালীর পররাষ্ট্রসচিব ব্যারন সনিনো বলিয়াছিলেন, "ইটালি পবিত্র স্বার্থান্বেষিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত।" লর্ড আরউইন ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি। ভারতে ইংরেজ অধিকার যাহাতে স্থায়ী হয় তাহার ব্যবস্থা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি যদি চার্চ্চিল ব্রেণ্টফোর্ড, বার্কেনহেড প্রমুখ ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ইংরেজ রাজনৈতিকদের উপদেশ অনুসরণ করিয়া কয়েক শত লোককে নির্ব্বাসিত ও গুলি করিয়া মারিয়া আরও একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি না করিয়া, জাতীয়দলের সহিত একটা মিটমাট করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সে তাঁহার বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। এই পথ অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য আছে তিনি তাহাই পালন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় নাই, সে ভার ভারতবাসীর।

—

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বা জাতির পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত শপথের উপর নির্ভর করিয়াও জাতীয় কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা করিবার অধিকার আমাদের নাই।

"লেবর ম্যাগাজিন" বিলাতের শ্রমিক দলের মুখপত্র। এই পত্রিকার গত ডিসেম্বর সংখ্যায় মেজর গ্র্যাহাম পোল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিগত একশত বৎসরের মধ্যে কয়টি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং কয়টি প্রতিশ্রুতি ভাঙিয়াছেন তাহার একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "জাতি হিসাবে আমরা বড়ই প্রতিশ্রুতি তৎপর।" ৩১শে অক্টোবরের প্রতি শ্রুতিও মহারাণীর ঘোষণাপত্র এবং অন্যান্য পুরাতন প্রতিশ্রুতির পথে যাইবে কিনা সে কথা কে বলিতে পারে? বিশেষ করিয়া প্রতিশ্রুতিটি মুসাবিদা করিবার যে নিপুণ মুন্সিয়ানা!

কিন্তু ইংরেজ-জাতিকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবঞ্চক বলিয়া অভিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে একথাটাও আমাদের মনে রাখা উচিত, যে, তাহারা সর্ব্বোপরি আত্মপ্রবঞ্চক। জার্ম্মেণী নৌবলে ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইতে চাহিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড জার্ম্মেণীর সহযোগিতাপ্রার্থী মিত্র হইতে কুড়ি বৎসরের মধ্যে ঘোর শত্রুতে পরিণত হয় এবং অবশেষে জার্ম্মেণীর নৌবাহিনীকে বিনষ্ট করে। যুদ্ধের পর আমেরিকাও ঠিক তাহাই করিতে বদ্ধ-পরিকর। ইংলণ্ডের পক্ষে আজ আমেরিকার সহিত রণপোতনির্ম্মাণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভবপর নয়, সেজন্য ইংলণ্ড আমেরিকার সহিতে রফা করিতে ব্যগ্র। তবু ইংরেজ-জাতি সত্য সত্যই বিশ্বাস করে আমেরিকার বিরুদ্ধে তাহাদের কোনও অভিযোগ নাই, কেবল মাত্র রক্তসম্পর্ক ও বিশ্বমৈত্রীর খাতিরে তাহারা আমেরিকার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে।

ইংরেজ-মনের অখণ্ড সত্যের প্রতি অনাসক্তি ও ব্যাবহারিক সত্যের প্রতি পক্ষপাত ইয়ুরোপের অন্যান্য জাতির কাছে বরাবরই অবোধ্য ছিল। সেজন্যই ইয়ুরোপে ইংলণ্ডের নাম "Perfidious Albion।" কিন্তু সম্প্রতি একজন বিখ্যাত ফরাসী-লেখক ইংরেজ জাতির এই মনস্তাত্ত্বিক রহস্যটি অতি সুন্দরভাবে ধরিয়া দিয়াছেন। তিনি পত্রচ্ছলে এক কাল্পনিক বান্ধবীর কাছে লিখিতেছেন,—"এই যে দার্শনিক মত, যাহা তোমার আত্মার বিভিন্ন অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করে, অথচ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহা এক ইংরেজের মস্তিষ্কপ্রসূত, সে কথা তোমাকে বোধ করি আর বলিয়া দিতে হইবে না। তবে এ কথাটা তোমার জানা উচিত, যে, ইহা এই জাতির সমগ্র দার্শনিক চিন্তারই একটা বিশেষত্ব। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা তোমার কাছে আরও পরিষ্কার হইবে। ইংরেজের কাছে গোলাপ মাত্রেই লাল গোলাপ, শাদা গোলাপ, মুকুলিত গোলাপ, ঝরা গোলাপ। কিন্তু লাল, শাদা, মুকুলিত, ঝরা, সকল গোলাপের মধ্যেই যে লালও নয়, শাদাও নয়, ঝরাও নয়, মুকুলিতও নয়, এমন একটা নিরুপাধিক গোলাপ আছে, তাহার ধারণা করিতে উঁহাদের লক্‌ ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলদের ভয়ানক কষ্ট হয়। সেদিন আমাকে কে যেন একটা গল্প বলিতেছিল, যে, একটা কুকুর আছে সে তাহার প্রভুকে দাঁড়ান অবস্থায়

দেখিলে চিনিতে পারে, কিন্তু শোয়া অবস্থায় দেখিলেই ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠে, অবস্থাভেদ সত্ত্বেও এই দুইটি জিনিষের মধ্যে যে একই ব্যক্তি রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে চায় না। মেলিসাঁদ, তুমি নিশ্চয় জানিও এ কুকুরটা একটা বিলাতী কুকুর।" (Lettres A Melisande par Julien Benda, p.36).

—

ভারতবর্ষের শীঘ্র "ডোমিনিয়নত্ব" পাইবার সম্ভাবনা আছে কি?

লীবারেল নেতাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কম নয়, বুদ্ধিতেও তাঁহারা খাটো নহেন, সুতরাং তাঁহারা যে কেবল মাত্র বড়লাটের আন্তরিকতা ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া 'রাউণ্ড টেবিল' কনফারেন্সে যোগ দিতে এবং গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাহা মনে হয় না। তবে কি লর্ড আরউইন ও মিঃ ওয়েজউড বেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষকে শীঘ্র ডোমিনিয়নত্ব দিবেন বলিয়া কোনও গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন? আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে যতটুকু কুলায় তাহাতে এরূপ কোনও আশ্বাস তাঁহারা পাইয়াছেন বা পাইতে পারেন বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। আমাদের মতে লীবারেল দলের সহযোগনীতি অবলম্বন করিবার কারণ দুইটি,—(১) তাঁহাদের বর্ত্তমান লেবর গভর্ণমেণ্টের উপর আস্থা এবং শেষ পর্য্যন্ত এই লেবর গভর্ণমেণ্ট বিলাতের উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলের বিপক্ষতা, সে দেশের অধিবাসিগণের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা, গ্রেটব্রিটেনের বণিক ও ধনিকদের স্বার্থ—ভারতবর্ষের ডোমিনিয়নত্ব প্রাপ্তির পথে এতগুলি গুরুতর বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদের জন্য কিছু-না-কিছু করিবেন এরূপ একটা ক্ষীণ আশা; এবং (২) আমরা কেবলমাত্র নিজেদের চেষ্টায়, বিলাতের দলবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে দানের প্রত্যাশায় না থাকিয়া, ডোমিনিয়নত্ব বা পূর্ণ-স্বরাজ আদায় করিতে পারিব এই বিশ্বাসের অভাব।

শেষোক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিয়া লাভ নাই। কারণ উহা বিশ্বাস ও সাহসের কথা। কেহ যদি নিজের শক্তি নিজের অন্তরে অনুভব না করেন তবে তাঁহাকে শুধু বক্তৃতা বা যুক্তির দ্বারা সাহসী করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান লেবর গভর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি অভিরুচি সে-সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

লেবর গভর্ণমেণ্ট বা কোনও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ধরিয়া রাখিবার শক্তি থাকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দিবেন না একথা বোধ করি কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই, এবং লেবর গভর্ণমেণ্ট যে আজ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতবর্ষকে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ বা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্-এর কাছাকাছি কোনও জিনিষ দিবেন একথা বলেন নাই, ইহাও বোধ করি সকলেই মানিয়া লইবেন। ৩১শে অক্টোবরের বক্তৃতা, তাহার সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে আলোচনা ও মিঃ ওয়েজউড বেনের বক্তৃতা, বড়লাটের ২৫শে জানুয়ারীর বক্তৃতা কোন কিছুতেই এরূপ কোন অঙ্গীকার বা অঙ্গীকারের আভাসও নাই। লর্ড আরউনের শেষ বক্তৃতা ভারতসচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া লিখিত। উহাকে আমরা লেবর গভর্ণমেণ্টের মত বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। বড়লাট বলিতেছেন, "আমি কখনও ভারতবর্ষের লোকদের মনে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি করিতে চাহি নাই, যে, আমাদের লক্ষ্য কি সেকথা স্পষ্ট ভাষায় বলিলে শুধু এই কথাগুলি উচ্চারণ করার ফলেই সেই লক্ষ্যে পৌছিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে যে-সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে তাহার সমাধান হইয়া যাইবে। আমাদের লক্ষ্য কি সে-কথা স্পষ্টভাষায় বলা এবং সেই লক্ষ্যে পৌছান, এই দুইটি জিনিষ স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র জিনিষ হইতে বাধ্য। কোনও বুদ্ধিমান পথিক একথা বলিবেন না, যে, তাঁহার গন্তব্য স্থান কি সে-কথা বলিয়া দেওয়া আর তাঁহার গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া যাওয়া একই জিনিষ। উহা পথের নির্দ্দেশ মাত্র। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কাছে এই পথ-নির্দ্দেশের বিশেষ একটা মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি। এদেশের যাঁহারা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্বাধিকারলব্ধ

ডোমিনিয়নের সহিত সাম্য চাহেন তাঁহারা যদি জানিতে পারেন, যে, এ-বিষয়ে গ্রেটব্রিটেনও তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তাহা হইলে তাঁহারা এই একমতজনিত আস্থা হইতে শেষ লক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া সেই লক্ষ্যে কি করিয়া পৌছান যায় সেই সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন।"

বড়লাটের বক্তৃতা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, ডোমিনিয়নত্ব আমাদের সম্মুখের দীর্ঘপথের শেষ মাত্র। 'অনেক হ'ল দেরী, আজো তবু দীর্ঘপথের অন্ত নাহি হেরি!" কিন্তু বিলম্বিত হইতে হইতে আমাদেরও ধৈর্য্যের বাঁধন টুটিয়া আসিতেছে।

লেবর গভর্ণমেণ্ট কোন বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত আমাদিগকে কথা দেন নাই, দিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ, হয়ত দিবেনও না। ভাষার পারিপাট্যের কথা ছাড়িয়া দিলে বড়লাটের বক্তৃতা ও আর্ল রাসেলের বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য বিষয়ে মূলগত কোনও পার্থক্য নাই। তবে কি আর্ল রাসেলের কুকুরটি ভারতবর্ষ স্পষ্ট ভাষা কিভাবে গ্রহণ করে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ দিবার জন্যই সময় বুঝিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল?

কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত যাহাই হউক, লেবর গভর্ণমেণ্ট আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত। তাঁহারা প্রথমতঃ সাইমন কমিশনকে মুখ্য হইতে গৌণ বিষয়ে পরিণত করিয়াছেন, এবং বিলাতী পলিটিক্সের ধারা হইতে যতদূর মনে হয়,—এখনও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি করিবেন সে বিষয়ে স্থির কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। লেবর গভর্ণমেণ্ট উচ্চ আশা লইয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। যুদ্ধের পর ইংলণ্ড যে-সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও পররাষ্ট্রীক সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের একটা সমাধান করিয়া ইংলণ্ডের জন্য চিরকালের মত একটা কাজ করিয়া যাইবেন এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহারা রাখেন। ভারতসমস্যা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের একটা গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসা সহজ নয়। সেজন্য হয়ত তাঁহারা উত্তেজনার মুখে তাড়াতাড়ি একটা কিছু না করিয়া একদিকে ভারতবর্ষের লোককে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া, অপর দিকে ইংলণ্ডের লোককে প্রবোধ দিয়া, আন্দোলন থামিবার অবসর দিয়া ১৯৩১ সনে নিজেদের সামর্থ্য ও ভারতবর্ষের শক্তির ওজন করিয়া যাহা করিবার করিবেন। এই অনুমানই যদি সত্য হয় তবে লেবর গভর্ণমেণ্ট শেষে যাহা স্থির করিবেন তাহা আমাদের দান গ্রহণ করিবার আগ্রহের উপর নির্ভর করিবে না—আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের শক্তির উপর নির্ভর করিবে।

—

দুইটি পথ

লর্ড আরউইন তাঁহার লক্ষ্ণৌ-এর বক্তৃতায় (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০) আমাদিগকে দুইটি পথ দেখাইয়া তাহার মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার এই অংশটি তাঁহার ভাষায়ই উদ্ধৃত করিব—

"On the one side is free membership in the British Commonwealth, where the diverse gifts of each constituent part may be linked for the common betterment of the whole society and of the human race, and on the other lies independence, for which India is invited to destroy that influence for unity which springs from a common loyalty to the person of the Crown in order that, when the flames of anarchy have exhausted their destructive force, she may perhaps at last achieve a state of precarious and powerless isolation."

ইংরেজ লেখক ও রাজনীতিবিদ্‌গণ যে ডোমিনিয়নত্ব ও "ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ অফ নেশন্‌স্‌" সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন এবং তাহার জন্য গৌরব অনুভব করেন, সেকথা আমরা জানি। তাঁহাদের এই ধারণা যে একেবারে অযৌক্তিক তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তবুও আমরা বড়লাটের অঙ্কিত এই পরস্পরবিরোধী চিত্র দুইটির সত্যতা মানিয়া লইতে পারিলাম না। লর্ড আরউইন সঙ্গীহীন স্বাধীনতার বিপদ ও ডোমিনিয়নত্ব ও পূর্ণ-স্বরাজ এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি

শ্রেয়ঃ, এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা পূর্ব্বে আমরা অনেক করিয়াছি। এবারেও অল্পত্র কিছু বলিব। কিন্তু লর্ড আরউইন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অনেক ইংরেজও মানেন না, আমরাও মানিলাম না। আমাদের মনে হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবার সুবিধা কি তাহা বুঝাইতে গিয়া লর্ড আরউইন তাঁহার বক্তৃতায় ১৯২৬ সনের Inter-imperial Relations Committee-র রিপোর্টের ভূমিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার ও লীগ্ অফ নেশন্‌স্-এর আদর্শের একটা সমন্বয় করিতে চাহিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রে, এমন কি চিন্তাক্ষেত্রেও, এ সমন্বয় আজও হয় নাই। কোনও দিন হইবে কিনা সন্দেহ আছে। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক মিঃ এইচ-জি ওয়েল্‌স্ বলিয়াছেন, কিছুদিন পূর্ব্বে এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন 'কালচারের' সমন্বয় করিয়া পৃথিবীতে বিশ্বমৈত্রী স্থাপিত করিতে পারিত। কিন্তু সেদিন গিয়াছে, সে সুযোগ সে হারাইয়াছে। পৃথিবী আজ আর ব্রিটিশ জাতির জন্ম অপেক্ষা করিয়া নাই,—

"For me, I live in the Empire as a man who occupies a house with an expiring lease. I can contemplate the disappearance of the last imperial links with equanimity. The Union Jack now signifies neither exceptional efficiency nor exceptional promise.........I should be glad to see the English-speaking communities throughout the world free now to recombine in some more progressive unity, un-encumbered by any special responsibility for India, most alien of lands, and freed from our formally snobbish traditions."

—

ভারতবর্ষের কোনদিন ডোমিনিয়নত্ব পাইবার সম্ভাবনা আছে কি ?

কিন্তু তবুও যদি সুদূর ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষের একটা ডোমিনিয়নে পরিণত হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত, তবুও আমরা শেষ লক্ষ্য হিসাবে না হউক, পথের পাশে একটা বিশ্রামের স্থান হিসাবেও ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্‌কে বরণ করিয়া লইতাম। কিন্তু ভারতবাসীদের পক্ষে ডোমিনিয়নত্বের আশা করা প্রায় মরীচিকার পিছনে ছুটার মত। আমাদের এই বিশ্বাস মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল বা লর্ড বার্কেনহেডের মত ইংরেজ রাজনীতিবিদ্‌গণের আপত্তি ও বাধার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ডোমিনিয়নত্বের প্রকৃত স্বরূপের ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ডোমিনিয়নত্ব কি ? ১৯২৬ সনের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের রিপোর্টে ডোমিনিয়ন কাহাকে বলে তাহার একটি সংজ্ঞা আছে। সংজ্ঞাটি এই—"They are autonomous communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British Common-wealth of Nations." এবং একটু পরেই বলা হইয়াছে যে,"Every self-governing member of the Empire is now the master of its destiny. In fact, if not always in form, it is subject to no compulsion whatever." ভারতবর্ষ যে এই সকল স্বাধীন অংশীদারদের একজন নয় তাহাও স্পষ্টভাবায় এই রিপোর্টেই বলা হইয়াছে।

ডোমিনিয়নত্বের এই সংজ্ঞা পড়িয়া প্রথমেই যে কথাটা মনে জাগে তাহা এই—গ্রেটব্রিটেন ও ডোমিনিয়নগুলির মধ্যে বাধ্য-বাধকতার অভাব। গ্রেটব্রিটেনের পার্লামেণ্ট ডোমিনিয়নের আভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্রিক কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, কোনও ডোমিনিয়ন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধের সময়ে গ্রেটব্রিটেনের পক্ষে যোগ না দিতে

পারে কিংবা তাহাকে সাহায্যও না করিতে পারে, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য কোনও কেন্দ্রীভূত মন্ত্রিসভা বা পরিষদ্ নাই, অথচ এক অংশের আর এক অংশের উপর কোন ক্ষমতাও নাই—মোটের উপর আইন ও যুক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে একটা অরাজক ও অযৌক্তিক ব্যাপার। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নেতি-বাদ বা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। একথা ১৯২৬ সনের রিপোর্টের লেখকগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 'পজিটিভ' আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান উহার প্রাণ। স্বেচ্ছায় সহযোগিতা উহার কর্ম্মনীতি। শান্তি, আপৎশূন্যতা, ও উন্নতি উহার লক্ষ্য।" প্রকৃতপক্ষে উহা ইংরেজ জাতির রক্তসম্পর্কগত, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক অপেক্ষা এই সম্পর্ক অনেক দৃঢ়। সেইজন্যই ইংলণ্ডের এক ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী বলিতে ভরসা পাইয়াছিলেন, যে, "কাল যদি অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার স্বাধিকার-প্রাপ্ত ডোমিনিয়ন বলে, যে, আমরা আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নই, তবে আমরা তাহাদিগকে জোর করিয়া অধিকারে রাখিবার চেষ্টা করিব না। ডোমিনিয়ন হোমরুল অর্থ নিজেদের পথ নিজেদের স্থির করিয়া লইবার অধিকার।" (মিঃ বোনার ল'র ১৯২০ সনের মার্চ্চ মাসের বক্তৃতা)। এই কথা বলিবার সময়ে মিঃ বোনার ল জানিতেন, যে, গ্রেটব্রিটেন ও এই দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহাতে তাহাদের ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার কোনও কথা উঠিতে পারে না। মিঃ বোনার ল'র বক্তৃতায় দক্ষিণ-আফ্রিকার উল্লেখ নাই, আইরিশ ফ্রি ষ্টেটও তখন ডোমিনিয়ন হয় নাই, সুতরাং ভিন্নজাতীয়, ভিন্নভাষাভাষী, ও ভিন্নধর্ম্মী ডোমিনিয়নের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদগণ কি বলিবেন এবং কি করিবেন সে বিষয়ে কোনও নজীর নাই। আমাদের মনে হয়, দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বাধীনতা-কামী বোয়ার, আয়ার্ল্যাণ্ডের রোমান ক্যাথলিক রিপাব্লিকান ও কানাডার ফরাসীভাষীদের সম্বন্ধে 'ইচ্ছা হয় থাক, ইচ্ছা না হয় না থাকিতে পার' এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে না। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিতে এবং ব্রিটিশ-সম্পর্ক বজায় রাখিতে ইচ্ছুক যথেষ্টসংখ্যক ইংরেজ অথবা ইংরেজ-পক্ষপাতী লোক এই ডোমিনিয়নগুলিরও প্রত্যেকটিতেই থাকায় গৃহবিরোধ না ঘটাইয়া ইহাদের ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার উপায় নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এরূপ কোনও ভরসা নাই। ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন করিয়া দেওয়া আর পূর্ণ-স্বাধীনতা দেওয়া প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইবে। অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিলণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের স্বার্থের সম্পর্ক ততটা নাই, রক্তের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ আছে। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ স্বার্থের সম্বন্ধ, রক্তের সম্পর্ক কিছুই নাই। এক্ষেত্রে এই দুই দেশের মধ্যে হিন্দু যৌথ-পরিবারে পিতা ও প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেরূপ একটা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না।

—

আমাদের লক্ষ্য

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বর্ত্তমানে যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে অদূর বা কল্পনা করা যায় এরূপ কোনও সুদূর ভবিষ্যৎ কালেও ভারতবর্ষের ডোমিনিয়ন হইবার সম্ভাবনা নাই, একথা বার বার আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বিলাতের রক্ষণশীল রাজনীতিবিদগণ আমাদের উপকারই করিতেছেন এবং এই সত্যটা ভুলিয়া গিয়া ডোমিনিয়নত্বে আমাদের আস্থা আছে এই কথা প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের লীবারেল দল কেবলমাত্র আত্মপ্রবঞ্চনা ও মতবিরোধের প্রশ্রয় দিতেছেন। পৃথিবীতে আন্তর্জ্জাতিক মনোভাবের প্রসারের ফলে ভবিষ্যতে যদি কখনও এমন দিন আসে যখন জাতিগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত ও ধর্ম্মগত বৈষম্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষের পক্ষে সাম্যের অধিকার বজায় রাখিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকা চলিতে পারে, তখন আর আমাদের পক্ষে বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবার কোনও প্রয়োজন থাকিবে না, তখন

পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও সমস্ত সভ্যতা সম্মীভূত হইয়া যাইবে, লীগ অফ নেশ্তন্‌স্ সত্যে পরিণত হইবে। সে অবস্থায় শুধু গ্রেটব্রিটেন কেন, রুষিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, আমেরিকা সকলেই আমাদের সমান আত্মীয় ও সমান বন্ধু হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু আজ আমাদের সম্মুখে শুধু এক লক্ষ্য, সে লক্ষ্য পূর্ণ-স্বরাজ, আর সকলই আলেয়ার পিছনে ছুটা।

অনেকে বলিবেন, এ সকল নিতান্তই ছেঁদো কথা, কার্য্যক্ষেত্রে এ সকলের কি মূল্য আছে? তাঁহাদিগকে আমরা লর্ড আরউইনের ভাষায়ই উত্তর দিব। আমরা জানি, গন্তব্যস্থান নির্দ্দেশ ও গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া যাওয়া এক জিনিষ নয়। কিন্তু এই পথনির্দ্দেশের একটা বিশেষ মূল্য আছে। পথের শেষ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই আমাদের অনৈক্য, নিরুৎসাহ ও শক্তিক্ষয়ের মূল কারণ। আমরা যদি আজ নিঃসংশয়ে জানি, যে, পূর্ণ-স্বরাজই আমাদের লক্ষ্য, তাহা হইলেই আমরা এই লক্ষ্যে পৌছিবার পথে যে-সকল বাধা আছে তাহা অতিক্রম করিবার জন্য অনন্যমনে ও একনিষ্ঠভাবে নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারিব।

কংগ্রেসের পর

কংগ্রেসও বিশেষ বিবেচনার পর এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে এখনও আরম্ভ হয় নাই। কংগ্রেসের প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালীর আভাস পাইয়া বিদেশী পর্য্যবেক্ষকরা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, যে, পূর্ণ-স্বরাজ ভারতবর্ষের লক্ষ্য বলিয়া স্থির হইবার পরে ভারতবর্ষে একটা বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে এবং তাহা দমন করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে, ফলে একটা নিদারুণ অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি হইবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, আমেরিকা—সকল দেশের সাময়িকপত্রেই আমরা এই ধরণের একটা ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম। কার্য্যক্ষেত্রে অবশ্য তাহা হয় নাই এবং হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল বলিয়াও আমরা মনে করি নাই। আর একদিকে এদেশের অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, যে, পূর্ণ-স্বরাজ ও বৈধ আইন-অমান্য প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর গবর্ণমেণ্ট ধৈর্য্য হারাইয়া ১৯১৯ সন বা ১৯২১ সনের মত চারিদিকে ধরপাকড় আরম্ভ করিয়া একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিবেন। এ আশাও সফল হয় নাই, এবং এক্ষেত্রেও এরূপ কোন ব্যাপার ঘটিবে বলিয়া আমরা মনে করি নাই। এখনও গবর্ণমেণ্টের দমননীতির বিরাম নাই সত্য, কিন্তু যে ধরণের দমননীতি অবলম্বনে আমাদের উৎসাহবৃদ্ধি ও সরকারের শক্তিক্ষয় হইত, সে ধরণের দমননীতি, এখন বিলাতে লেবর গভর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা বলিয়াই হউক, কিংবা ভারতবর্ষীয় ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের ঠেকিয়া জ্ঞানলাভের ফলেই হউক, অবলম্বিত হয় নাই। তাই স্তর মাইকেল ওড্‌ইয়ারের ক্রোধ বিলাতে নিষ্ফল বক্তৃতায়ই অপব্যয়িত হইতেছে।

এখন আমরা যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থাও বলা চলে না, যুদ্ধও বলা চলে না। আন্তর্জ্জাতিক আইনে এরকম একটা অবস্থার উল্লেখ আছে, তাহাকে Severance of diplomatic relations (রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ বিচ্ছেদ) বলে। ১৯২৭ সনের মে মাসের পর রুষিয়ার সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ও ভারত গবর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রায় সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। জাতীয় দল জানাইয়াছেন যে, পূর্ণ-স্বরাজই তাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতে আর কিছু প্রত্যাশা করেন না, কিংবা তাঁহাদের সহিত আর সহযোগিতা করিবেন না, লর্ড আরউইনও তাঁহার বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে জানাইয়াছেন, যে, লাহোর কংগ্রেসের ফলে তাঁহাদের মত কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই, 'রাউণ্ড টেবিল' কনফারেন্স হইবেই, তাহাতে কংগ্রেস যোগ দেন বা না দেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কিছুই আসিয়া যায় না। ইহার পর গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস এই দুয়ের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে দরকষাকষির আর কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু এ দুয়ের একের সম্পূর্ণ পরাজয় না হইলে ভারতীয় সমস্তার শেষ মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা আছে কি?

কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার কোনও আশু সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কংগ্রেস পূর্ণ-স্বরাজ-লাভের উপায় হিসাবে আমাদিগকে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা আমরা প্রবাসীর গত সংখ্যায় বলিয়াছি, এবং এই প্রসঙ্গে আমরা এই অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছি যে, তিনটি বর্জ্জনের মধ্যে আমরা বিদেশী কাপড় বর্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা সুসাধ্য এবং দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কম ক্ষতিকর মনে করি। কিন্তু বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের কথাটা এদেশে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সেই কারণে উহার সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের মনে আর নূতনত্বের আকর্ষণ নাই। সাধারণ মানুষ বিচারবুদ্ধির বশে চলে না, ঝোঁক, উৎসাহ বা আবেগের বশে চলে। সেজন্য এখন এমন একটা পথ ধরা আবশ্যক যাহাতে লোকের মনে উৎসাহ জন্মে। "স্বাধীনতা-দিবসে"র মত উৎসবের এই দিক হইতে একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু আমাদের কাজ শুধু উৎসবেই আরব্ধ ও উৎসবেই শেষ হইলে চলিবে না। আরও নির্দ্দিষ্ট একটা কার্য্যপ্রণালীর দরকার।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এইরূপ আপত্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া দেশকে সেনাপতির প্রতি আস্থাবান থাকিতে বলিয়াছেন, এবং একথাও বলিয়াছেন, যে, মহাত্মা গান্ধীর আদেশ আসিতে বেশী দেরী হইবে না। মহাত্মাজীও ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের এক সংবাদদাতার নিকট বলিয়াছেন, যে, আমাদের উদ্যোগ শেষ হইলেই বৈধ আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবে, এই আন্দোলন বার্দোলীতে অবলম্বিত প্রণালী অনুসারেই পরিচালিত হইবে, ও কয়েকমাসের মধ্যেই এক সময়ে নানা জায়গায় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবে। ইহা আমরা সমীচীন মনে করি। আইন-অমান্য আন্দোলন গুরুতর জিনিষ। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ না হইলে উহা আরম্ভ করা উচিত হইবে না। তাহা হইলে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিরই সম্ভাবনা অধিক।

মহাত্মা গান্ধী এই সংবাদদাতার নিকটই অ[illegible] বলিয়াছেন, যে, এইবারে আইন-অমান্য অ[illegible] যাহাতে চৌরিচৌরার দাঙ্গার মত ঘটনার দ্বারা অ[illegible] বন্ধ না হইয়া যায় তাহার একটা উপায় তিনি বা[illegible] করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তবে এ বিষয়ে এখন প[illegible] তিনি বিশেষ কোন একটা স্থিরসিদ্ধান্তে আসিতে পা[illegible] নাই, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।

আমরা এই অভিমতেরও সমর্থন করি। আ[illegible] পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, বিলাতী পণ্যবর্জ্জনের চেষ্টা [illegible] নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন শান্তিপূর্ণভাবে চালাইতে হইবে; এই দুইটিকেই উপদ্রবপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবার লোকে[র] অভাব হইবে না; তাহা সত্ত্বেও যদি দেশের লো[ক] সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া ধীর শান্ত থাকে, তাহা হই[লে] তাহাদের জয় হইবে।

এই ত গেল আইনলঙ্ঘন আন্দোলনের নৈতি[ক] যোগ্যতার কথা। এবারে আমরা ব্যবহারিক বুদ্ধির দি[ক] দিয়া আইনলঙ্ঘন আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করিব।

যে যাহাই বলুক না কেন, আইনলঙ্ঘন আন্দোল[ন] যুদ্ধেরই আর একটা দিক। ১৯২৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের পর হইতে জার্ম্মেনীর রুহ্‌র প্রদেশে যাহা ঘটে কিংবা ১৯২৬ সনের মে মাসে ইংলণ্ডের শ্রমজীবীরা যাহ[া] করিতে চায়, তাহা আন্তর্জ্জাতিক আইনের সংজ্ঞা অনুসারে যুদ্ধ না হইলেও দুই জাতি ও দুই শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধেরই মত প্রচণ্ড একটা শক্তি-পরীক্ষা। যুদ্ধে যে দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শক্তির প্রয়োজন হয়, এই সকল সংঘর্ষেও ঠিক সেই শক্তির, বরঞ্চ আরও বেশী দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শক্তির প্রয়োজন হয়। একটা খুব বড় ধাক্কা না খাইলে কোন জাতিই নিজের মধ্যে সেই শক্তির সন্ধান পায় না। এই ধাক্কা জাতীয় বিপদের আশঙ্কা হইতে আসিতে পারে, ধর্ম্মের উপর আক্রমণের আশঙ্কা হইতে আসিতে পারে, আত্মসম্মানের উপর আঘাত হইতেও আসিতে পারে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এরূপ কোনও ধাক্কা আছে কি? আমরা জাতি-হিসাবে এখন যে অবস্থায় আছি তাহাতে দুঃখ, দারিদ্র্য ও

গ্লানির অভাব আছে একথা আমরা বলি না, কিন্তু এই দুঃখ, দারিদ্র্য ও গ্লানি সম্বন্ধে যতটুকু অসহিষ্ণুতা থাকিলে আমরা তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতাম এবং তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইতাম, সেই অসহিষ্ণুতা আমাদের দেশের সকল অবস্থার, সকল শ্রেণীর লোকের মনে জাগিয়াছে কি? আমাদের মনে হয় ১৯১৯ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত দেশের অনেকটা সেইরূপ মানসিক অবস্থা ছিল। তখন চার-পাঁচটি কারণের জন্য আমাদের জাতীয় জীবনে একটা অসাধারণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। সেই কারণগুলি এখন আর বর্ত্তমান নাই। সেই চার-পাঁচটি কারণ এই:— (১) হঠাৎ জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়াতে আর্থিক অসচ্ছলতাবৃদ্ধি, (২) তুরস্কের সুলতান ও খলিফার প্রতি অবমাননার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের অসন্তোষ, (৩) যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈন্য ও মজুরদের দাবী ও আত্মপ্রত্যয়, (৪) রুষিয়া, জার্ম্মেনী ও ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশে পুরাতন শাসনপ্রণালীর অবসানের ফলে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া একটা নূতন যুগের আশা ও বিপ্লববাদের সাড়া, (৫) মিত্রশক্তিবর্গের স্বার্থপ্রণোদিত প্রচারকার্য্যের ফলে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন, (৬) অমৃতসর ও পঞ্জাবের নৃশংস দমননীতির ফলে অসহ্য অপমানের গ্লানি। এখন দেশের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক। শুধু একটা জিনিষ তখন ঠিক বর্ত্তমান রূপ ধরিয়া দেখা দেয় নাই, সে যুবক-আন্দোলন। কিন্তু যুবক-আন্দোলনের যতই শক্তি থাকুক তাহাকে সমগ্র দেশের কৃষক ও শ্রমজীবীর চাঞ্চল্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

—

গভর্ণমেণ্টের নীতি

গভর্ণমেণ্ট যে ধীরে ধীরে জাতীয় আন্দোলনের নেতা-দিগকে রাজদ্রোহমূলক অতিব্যাপক আইনের মধ্যে ফেলিয়া জেলে পুরিবেন তাহা আমরা শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু-প্রমুখ কংগ্রেস-কর্ম্মীদের কঠিন শাস্তি দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। সুভাষ বাবুরা যে পথে গিয়াছেন সে পথে এখনও অনেককে যাইতে হইবে, এবং আমরা আশা করি, দেশে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার লোকের অভাব হইবে না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টও যে ঝোঁকের মাথায় কিছু করিয়া দেশে একটা উত্তেজনা সৃষ্টির অবসর দিবেন তাহা আমাদের মনে হয় না। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের প্রস্তাবের ফলে দেশের জনমতে একটা ভেদ-সৃষ্টি হওয়ার ফলে গভর্ণমেণ্ট এখন বেশ একটু খুসী আছেন। তাঁহাদের এই সন্তোষ বড়লাটের বক্তৃতায়, স্যর ম্যাল্‌কম হেলীর বক্তৃতায়, এবং ইয়ুরোপীয় এসোশিয়েশনের বাৎসরিক ভোজের দিনে বাংলার গভর্ণরের বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। স্যর ষ্ট্যান্‌লী জ্যাক্‌সন্ তাঁহার বক্তৃতায় এক স্থলে বলিয়াছেন যে, 'কংগ্রেসের মতকেই ভারতবর্ষের মত বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন হেতু নাই। রাজনৈতিক ব্যাপারে যাঁহারা মধ্যপন্থী তাঁহারা, চরমপন্থীরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার মূঢ়তা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, চরমপন্থীরা যে সব উন্মত্তের মত প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা যদি বিনা বাধায় মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে যে কেবলমাত্র দেশের রাজনৈতিক উন্নতির পথে বাধা আসিয়া পড়িবে তাহাই নয়, দেশের শান্তিও নষ্ট হইবে। চারিদিকেই লক্ষণ দেখিতেছি, যে, মধ্যপন্থীরা এতদিন নীরব ও নিশ্চল থাকার পর এতদিনে জাগিয়া উঠিয়াছেন," ইত্যাদি।

সুতরাং গভর্ণমেণ্ট আপাততঃ কোনও চণ্ডনীতি অবলম্বন করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা যে আইন-অমান্য আন্দোলনও সহ্য করিবেন না একথাও তাঁহারা স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। এ-বিষয়ে অন্য কাহারও উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া বড়লাটের বক্তৃতা হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

বড়লাট বলিতেছেন, "But it is no less incumbent upon me to make it plain that I shall discharge to the full the responsibility resting upon myself and upon my Government for the effective maintenance of laws, authority, and for the preservation of law and order."

এই সঙ্কল্প যে কেবলমাত্র বড়লাটের, তাহাই নয়

বিলাতের গভর্ণমেণ্টও ইহার পিছনে আছেন। পার্লামেণ্টে ভারত গভর্ণমেণ্টের দমননীতি সম্বন্ধে এক রক্ষণশীল মেম্বরের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বেন বলেন, যে, তিনি বড়লাটের বক্তৃতায় যাহা আছে তাহার বেশী আর কিছু বলিতে প্রস্তুত নহেন এবং এই উক্তি তাঁহার সহিত পরামর্শের পর রচিত। রক্ষণশীল মেম্বরগণ কংগ্রেসের স্পর্দ্ধার একটা কড়া উত্তর দিতে চান। লেবর গভর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত নহেন। একদিক হইতে ইহা আমাদের পক্ষে একটা আশঙ্কার কথা। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের সংবাদ-দাতাকে সত্যই বলিয়াছেন, "মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের পদপ্রাপ্তি আমাদের পক্ষে একটা বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ইহার পূর্ব্বে আমাদের পথ খুব সোজা ছিল। টোরীরা কখনই আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করিত না, মেশিন গান ব্যবহার করিত; আমরাও আমাদের সম্মুখে কি আছে বুঝিতে পারিতাম ···· " কিন্তু এখন?

এরূপ ক্ষেত্রে সব দিক না দেখিয়া হঠাৎ আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা ঠিক হইবে না। এ বিষয়ে বিলাতের "জেনারেল ষ্ট্রাইক" সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। ১৯২০ সন হইতেই শ্রমিক দল "জেনারেল ষ্ট্রাইকে"র ভয় দেখাইয়া আসিতেছিলেন এবং তখন লোকের মনে এরূপ ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে একটা ভয়ও ছিল। কিন্তু আয়োজন সম্পূর্ণ না করিয়া হঠাৎ ধর্ম্মঘট করাতে সেই ধর্ম্মঘট বিফল হইয়া গেল। এখন ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে লোকের ভয়ও ভাঙিয়া গিয়াছে। বিলাতে ভবিষ্যতে আর "জেনারেল ষ্ট্রাইক" হইবে বলিয়া মনে হয় না। আইন-অমান্য আন্দোলন যাহাতে এইরূপ একটা ব্যাপারে না দাঁড়ায় সে-বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

—

আইনলঙ্ঘন আন্দোলনের আয়োজন

সেইজন্য আমাদের মনে হয়, আইন-লঙ্ঘন আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত এবং গভীর করিতে হইবে। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যেই অনেকাংশে আবদ্ধ। এই আন্দোলনকে কৃষকদের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। শ্রমজীবীদের মধ্যেও প্রচার করিতে হইবে। আমাদের নিম্নশ্রেণীর লোক এখনও অদৃষ্টে বিশ্বাসী, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে, তাহাদের দুঃখদারিদ্র্য অদৃষ্টের ফল নয়। তাহারা একটু সচেষ্ট হইলেই উহার প্রতীকার হয়। এদিক হইতে কংগ্রেস ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। দৈনিকপত্রে পল্লী-অঞ্চলে কংগ্রেসের কাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হইয়াছে।—

রায়বেরিলি, ৬ই ফেব্রুয়ারী। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু পল্লী-অঞ্চল পরিভ্রমণের মানসে গতকল্য সকালবেলা রায়-বেরিলী আসিয়া পৌছিয়াছেন। বৈকালবেলা পণ্ডিতজী মোটরযোগে কয়েকটি গ্রামে গমন করেন। সৈন্নী গোরাচাঁদপুর নামক স্থানে তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা দান করেন। ঐ সভায় চার পাঁচ শত কৃষাণ উপস্থিত ছিল। ঠাকুর মহেশ নারায়ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জবাহরলাল, বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, ইংরেজের শোষণ-যন্ত্রের চাপ হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় স্বাধীনতার্জ্জন। অযোধ্যার কৃষকদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তিন বৎসর পর পর শস্য খারাপ হইয়াছে, তদুপরি গুরু করভারে তাহারা নিপীড়িত—অত্যাচার, নির্যাতন, উচ্ছেদ ইত্যাদি সচরাচরই হইতেছে। তাহারা দুর্দ্দশার চরমে আসিয়া পৌছিয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক, তাহাই এখন বিবেচ্য। কৃষাণগণের এখন অবিলম্বে কংগ্রেসে যোগদান করা আবশ্যক। কংগ্রেস যদি কৃষাণগণকে করদান বন্ধ করিতে নির্দ্দেশ দেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে অবিলম্বে একযোগে করদান বন্ধ করিতে হইবে; কিন্তু কেহ যেন ব্যক্তিগতভাবে বা কংগ্রেসের নির্দ্দেশ ব্যতীত উহা না করেন। বর্ত্তমানে করবৃদ্ধি অতিশয় মারাত্মক। কৃষাণ-গণের বর্দ্ধিত করদান বন্ধ করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। বড়ই সুখের বিষয়, কংগ্রেসের অধীনে বহু সংখ্যক পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (ফ্রী প্রেস)

বাংলা দেশে বন্দবিলায়ও প্রজারা যেভাবে সত্যাগ্রহ করিতেছে তাহা অতিশয় গৌরব ও প্রশংসার বিষয়।

কিন্তু পল্লীঅঞ্চলে কাজ করিবার পথে কয়েকটি গুরুতর বাধা আছে। পণ্ডিত জবাহরলাল বা যাঁহাদের তাঁহার মত প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা আছে তাঁহাদিগকে পল্লীতে পল্লীতে বক্তৃতা করিতে দেখিলেও মফস্বলের সরকারী কর্ম্মচারীরা হয়ত উপদ্রব করিতে বা বাধা দিতে সাহস পাইবে না। কিন্তু মফস্বলের সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অতিশয় দুরূহ। মফস্বলের সরকারী কর্ম্মচারীরা সাধারণত অধিকতর ক্ষমতাশালী ও অত্যাচারী। গভর্ণমেণ্টও সহরে সভা-সমিতি, বক্তৃতা অপেক্ষা মফস্বলের সভাসমিতি সম্বন্ধে অনেক বেশী সতর্ক। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর পুনঃ পুনঃ কারাদণ্ড ইহার প্রমাণ। পল্লীগ্রামের জনসাধারণও সহরবাসীদের অপেক্ষা ভীরু, অজ্ঞ ও সরকারী কর্ম্মচারীর স্তাবক। সেজন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মফস্বলের সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম অভিযান করা উচিত। জেলায় মহকুমায় সরকারী কর্ম্মচারীরা যাহাতে স্কুল কমিটি, কলেজ কমিটি, স্থানীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে না যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। মফস্বলের জনসাধারণের মনে যাহাতে স্বাবলম্বনের অভ্যাস গড়িয়া উঠে তাহার চেষ্টা করা উচিত। শিক্ষিত ভদ্র-লোকদের মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটীর মোহ ঘুচান উচিত। ভারত গভর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এখন মফস্বলের লোকদের রাষ্ট্রীয় উদ্বোধনের কাজ আরম্ভ করাই প্রথম কথা।

—

স্বাধীনতা সম্বন্ধে বড়লাটের মত

২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী, লক্ষ্ণৌর দরবারে বড়লাট যে বক্তৃতায় ভারতবর্ষের ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ ও পূর্ণ-স্বরাজ বা স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ করেন, তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। এই বক্তৃতাতে তিনি আরও বলেন যে—

There can no longer be any doubt that whatever the means by which that policy is brought to fruition, Great Britain can never have any other purpose for India than to bring her to a place of equal partnership with the other Self-governing Dominions. *As a step towards the achievement of this purpose* His Majesty's Government, on whom along with Parliament the ultimate responsibility rests, have solicited the counsel of representatives drawn from the several sides of life and thought in India, that desire and deserve to have the opportunity of responding to His Majesty's Government's invitation. There are some who seem determined to tread a different path and who have proclaimed a policy which, if it might ever succeed, could not fail to involve India in irreparable misfortune and disaster. The sinister possibilities of civil disobedience are not such as to be controlled by any formula however patiently pondered or cunningly devised. It is impossible to suppose that people can be incited to break the law without such incitement culminating, whether its authors so desire or not, in violent action. On the one side is free membership in the British Commonwealth, where the diverse gifts of each constituent part may be linked for the common betterment of the whole society and of the human race and on the other lies independence for which India is invited to destroy that influence for unity which springs from a common loyalty to the person of the Crown in order that when the flames of anarchy have exhausted their destructive force she may perhaps at last achieve a state of precarious and powerless isolation.

বড়লাটের বক্তৃতার এই অংশে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের মাহাত্ম্য এবং পূর্ণ-স্বরাজের মহা অনিষ্ট-কারিতা ও বিপদ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস যে কবে পাওয়া যাইবে, তাহা বড়লাট বলেন নাই, ব্রিটিশ কোন মন্ত্রীও বলেন নাই। বরং যত দিন যাইতেছে ততই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভারত-বর্ষকে অন্য ডোমিনিয়নগুলির সমান অধিকার বিশিষ্ট ডোমিনিয়ন করিবার ইচ্ছা ব্রিটিশ রাজপুরুষদের নাই। এই লক্ষ্ণৌয়ের বক্তৃতাতেই বড়লাট বলিয়াছেন, যে, ভারত-বর্ষকে ডোমিনিয়নত্বে লইয়া যাইবার সোপানশ্রেণীর একটি ধাপ অতিক্রম করিবার জন্য ("as a step towards the achievement of this purpose") গোল টেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতীয় জীবন ও চিন্তার নানা দিকের প্রতিনিধিদের পরামর্শ চাহিয়াছেন। গোল টেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্য যে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে ডোমিয়নত্বদান নহে, তাহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের গত জানুয়ারী মাসের বক্তৃতাতেও পরিষ্কার বুঝা যায়।

বড়লাট বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের লক্ষ্যস্থল কি এবং

তাহাকে কোন্ পথে যাইতে হইবে। কিন্তু একথা ত আগে অনেক রাজপুরুষ বলিয়াছেন, এবং স্বয়ং রাজা পঞ্চম জর্জ ১৯২১ সালে তাঁহার এক উপদেশপত্রে বলিয়াছেন। সুতরাং কংগ্রেসের অধিবেশনের কিছু আগে বড়লাটের ঐ ঘোষণাটি করিবার একান্ত আবশ্যকতা বা ঐকান্তিক ও কেবলমাত্র ভারতহিতৈষণা এখনও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

ডোমিনিয়নত্ব যে অচিরে লভ্য নহে, এমন কি সুদূর ভবিষ্যতেও কখন্ পাওয়া যাইবে, তাহারও স্থিরতা নাই, একথা সহকারী ভারত-সচিব আর্ল রাসেলও তাঁহার প্রিয় কুকুরটির পীড়ার অব্যবহিত পরে অতিসাবধান অসাবধানতা সহকারে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের ডোমিনিয়নত্বপ্রাপ্তির সমর্থক এবং গোল টেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষীয় সকল দলের লোকদের যোগদানের সমর্থক মেজর গ্রেহাম পোল তাঁহার ডিসেম্বরের লেবর ম্যাগাজিনের প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "As a nation we are good at making declarations," "আমরা জাতি হিসাবে [মহৎ উদ্দেশ্য] ঘোষণা করিতে সুনিপুণ ;" এবং তাহার পর ১৮৭৮ সালের ২রা মে তদানীন্তন বড়লাট লিটন ভারত-সচিবকে যে লিখিয়াছিলেন, যে, ভারত গবন্মেণ্ট ও ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট যথাসাধ্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন, লিটনের সেই চিঠি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকারও পালিত হইত কিনা বা কখনও হইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

লাটসাহেব স্বাধীনতালাভ চেষ্টার পথে যে-সব বিভীষিকা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বিপদ আছে বৈ কি ? কিন্তু স্বাধীনতা লব্ধ হইলেও যে তাহা ডোমিনিয়নত্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা কম কল্যাণকর, তাহা অসংখ্য বড়লাট অগণিতবার বলিলেও অবিশ্বাস্য। কারণ, স্বাধীনদেশ মাত্রেই শক্তিহীন, সঙ্গীহীন, একাকী, এ কথা সত্য নহে। ব্রিটেন ছাড়া পৃথিবীতে বিস্তর স্বাধীন দেশ আছে। তাহাদের মিত্র আছে, সহায় আছে, শক্তি আছে। ভারতবর্ষও স্বাধীন হইলে তাহার সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক মহাজাতির অভাব হইবে না। ব্রিটেনই তাহার সহিত সন্ধির জন্য লালায়িত হইতে পারে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস এক সময়ে ইংলণ্ডের অধীন ছিল। অনেক বিপদ অতিক্রম করিয়া তাহারা স্বাধীন হইয়াছে। এখন পূর্ব্বপ্রভু ইংলণ্ড আমেরিকার বন্ধুত্ব লাভের জন্য লালায়িত।

পূর্ণ-স্বরাজ লাভ অতি কঠিন ও বিপদসঙ্কুল ইহা মানি ; কিন্তু পূর্ণ-স্বরাজ অপেক্ষা ডোমিনিয়নত্ব অধিক সুখ-সমৃদ্ধি, সম্মান ও শক্তির মূলীভূত, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক কথা। কেবল একটা দৃষ্টান্ত লউন। আমেরিকায় ডোমিনিয়ন কানাডাও পূর্ণস্বাধীন ইউনাইটেড ষ্টেটস পাশাপাশি অবস্থিত। কানাডা দুইয়ের মধ্যে বৃহত্তর দেশ। উভয়েরই প্রধান অধিবাসীরা ইউরোপীয় বংশ সম্ভূত। কিন্তু আত্মরক্ষাশক্তি, পরাক্রম, সমৃদ্ধি, সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প-যন্ত্রোদ্ভাবনক্ষমতা, বাণিজ্য, লোক-সংখ্যা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে কানাডা ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের তুলনায় নগণ্য। ইহা ফেব্রুয়ারীর মডার্ণ রিভিয়ুতে একটি প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে।

নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘনে বিপদ আছে মানি। কিন্তু আইনলঙ্ঘকেরা বলপ্রয়োগ ও হিংসার পথ অবলম্বন করিবেই, ইহা মানি না। দক্ষিণ-আফ্রিকা, গুজরাতের খেড়া, বিহারের চম্পারন, গুজরাতের বারদোলী, যশোরের বন্দবিলা, প্রভৃতি স্থানে অন্যায় আইন বা ট্যাক্সের প্রতিরোধকেরা বলপ্রয়োগ করে নাই, হিংস্র হয় নাই ; বলপ্রয়োগ করিয়াছে সরকারী লোকেরা নিরুপদ্রব প্রতি-রোধ চেষ্টা বিনষ্ট করিবার জন্য। একমাত্র চৌরিচৌরার দৃষ্টান্ত দ্বারা অহিংস প্রতিরোধনীতিকে দাঙ্গাহাঙ্গামা মারামারি রক্তারক্তির অবশ্য কারণ বলা যায় না। ঐ নীতি হইতে যদি কুফলের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রধানতঃ সরকারী লোকদের দোষে হইবে বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীর নানাদেশে স্বাধীনতা লাভ চেষ্টার ইতিহাসে দেখা যায়, সেই সব দেশে দু'একটা দলের লোক সর্ব্বদাই দেশের স্বাধীনতার চেয়ে ক্ষুদ্রতর জিনিষের পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছে। ভারতবর্ষেও এরূপ অনেক লোক আছে। গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের। তাঁহারা যে এমন অনেক

লোক বেশী সংখ্যায় বাছিবেন না যাহারা ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নত্বেরও যোগ্য মনে করে না, তার চেয়েও নিকৃষ্ট কিছু চায়, এরূপ কোন গ্যারান্টি কেহ দিতে পারে কি? ব্রিটিশ-শাসিত ভারতেই ইংরেজদের পছন্দসই "প্রতিনিধি" যথেষ্ট আছে। তাহার উপর পাটিয়ালার মহারাজার মত দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসকেরা প্রতিনিধিরা আছে। সুতরাং গোল টেবিল বৈঠক আমাদিগকে ডোমিনিয়নত্বের নিকট সেই পরিমাণে লইয়া যাইতে পারে, আকাশের যেদিকে রামধনু উঠে সেইদিকে দৌড়িয়া গেলে যে পরিমাণে রামধনুর নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়। আমাদের অনুমানটা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী, ভারত-সচিব, বড়লাট—যে-কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঠিক করিয়া বলুন না কবে কতদিন পরে ভারতের ডোমিনিয়নত্বপ্রাপ্তি ঘটিবে?—পাঁচ বৎসর, দশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর, এক শতাব্দী, দুই শতাব্দী—কত দিন পরে?

—

"ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ"

সরকার "ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ" বহি রাজদ্রোহউত্তেজক বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। উহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এই হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি ও অন্য দুজন জজ একত্র বসিয়া আপীল নামঞ্জুর করিয়াছেন। প্রধান বিচারপতির রায়ে বলা হইয়াছে:—

"People who are so unfortunate as to be unable to advocate change in the form of government without attempts to bring into hatred or contempt or to excite disaffection towards he Government established by law have not been specially favoured by legislature either by the terms of the section itself or by the explanations. They may take their grievance, if any, to the legislature but the section while it stands must be interpreted according to the plain and natural meaning of its words."

প্রধান বিচারপতি এরূপ কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির নাম যদি করিয়া দিতেন যিনি ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট পরিবর্ত্তনার্থ ব্রিটিশ-শাসনের এরূপ সমালোচনা করিয়াছেন যাহার অক্ষরে অক্ষরে ঐ শাসনের ও শাসনকর্ত্তাদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও প্রেমের বন্যা বহিয়াছে, তাহা হইলে আমরা নিরতিশয় অনুগৃহীত হইতাম। ইংলণ্ডের বড় বড় রাজনীতিজ্ঞেরাও (যাঁহাদের অনেকের উক্তি এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে) এই অসাধ্যসাধন করিতে পারেন নাই।

প্রধান বিচারপতির রায় হইতে বুঝা যায়, পিনাল কোডের ধারাটি কিরূপ অমোঘ ও সাংঘাতিক।

ভারতসচিব ওয়েজউড্ বেন্ বলিয়াছেন, মত প্রকাশের জন্য কাহারও দণ্ড হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই বহিতে কোথাও কাহাকেও বলপ্রয়োগ বা হিংসা করিতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বলা হয় নাই। কেবল অনেক ব্রিটিশ রাজপুরুষদেরই মতে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। অথচ ইহার জন্য মুদ্রাকর ও প্রকাশকের শাস্তি হইয়াছে।

বেন সাহেব আরও বলিয়াছেন, এখন তর্কযুক্তিরই জয় হইবে, অসহযোগের নহে। উত্তম কথা। কিন্তু মহাশয়েরা যে পুরামাত্রায় তর্ক করিতেও দেন না, অকাট্য ও ব্রিটিশ জাতির পক্ষে অসুবিধাজনক তথ্যের ও যুক্তির অবতারণা করিলেই মুখ বা কলম বন্ধ করিয়া দেন, তাহার প্রতিকার কে করিবে?

—

নাগপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন এবার নাগপুরে হইয়াছিল। প্রবাসী বাঙালীরা যে-সকল স্থানে থাকেন তাহা হইতে নাগপুর দূরবর্ত্তী বলিয়া এবং বড়দিনের সময় লাহোরে কংগ্রেস ও অন্য নানা সভায় বহুসংখ্যক প্রবাসী বাঙালীকে যোগ দিতে হওয়ায় সম্মেলনে বেশী প্রতিনিধি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার কাজ সুনির্ব্বাহিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সাধারণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্মেলনের আগামী অধিবেশন আজমীরে হইবে। তথায় বাঙালীর সংখ্যা কম হইলেও তাঁহাদের মধ্যে উৎসাহী লোক আছেন।

—

বঙ্গে অন্নাভাবের একটি কারণ

নগদ টাকা পায় বলিয়া বঙ্গের অনেক স্থানে কৃষকেরা ধানের চেয়ে পাটের চাষ বেশী করে, এবং কখন কখন পাট বেচিয়া বেশী টাকা পাইয়া তাহার কতক টাকায় ধান চাল কিনে। কিন্তু পাটের দরের উপর তাহাদের হাত নাই। পাটের দর যে স্বাভাবিক কারণেই সব সময় বাড়ে কমে, তাহাও নহে। ইহাতে পাট ক্রেতাদের কারসাজিও আছে। এবার পাটের দর কমিয়াছে। সুতরাং পাট-চাষীদের হাতে চাল কিনিবার যথেষ্ট টাকা না থাকায় বাংলার নানা জায়গায় তাহাদের অন্নাভাব ঘটিয়াছে। নিজেদের সম্বৎসরের খোরাকের মত ধান আর্জ্জাইবার জমীতে ধান চাষ করিয়া বাকী জমীতে পাটের চাষ করিলে বুদ্ধিমানের কাজ করা হয়।

—

নেপালে তুলা ও লবণ কর রহিত

নেপালের নূতন প্রধান মন্ত্রী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সময় তুলা ও লবণের উপর আমদানী শুল্ক রহিত করিয়াছেন। মানুষ জীবন ধারণ করিবার জন্য বাতাস ও জল স্বাভাবিক অবস্থায় বিনামূল্যে পায়। তাহার পরই তাহার অন্নবস্ত্রের দরকার। খাদ্যের সঙ্গে লবণ সব সভ্য দেশেই নিত্যব্যবহার্য্য। বস্ত্রের দরকারও সভ্য মানুষ মাত্রেই অনুভব করে। তুলা তাহার প্রধান উপ-করণ। এই কারণে লবণ ও তুলার উপর কর উঠাইয়া দিয়া, নেপালের মন্ত্রী বুদ্ধিমত্তা ও দয়ার কাজ করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের এরূপ বুদ্ধি ও প্রজাপ্রীতি হয় না কেন?

—

ভারতীয় ছাত্রদের ভ্রমণ ও ভৌগোলিক শিক্ষার ব্যবস্থা

ভারতে জাতীয় ভৌগোলিক সমিতি (National Geographic Society) নাই। একটা সমিতি গঠন করা একান্ত দরকার। উক্ত প্রকারের সমিতি দ্বারা যদি ভারতের ভূগোলচর্চ্চা, ও ভারতের সীমান্তে অবস্থিত দেশে অভিযানের ব্যবস্থা হয় ত বিশেষ উপকার হয়। ভারতের হিমালয় লঙ্ঘন করিবার জন্ম জার্ম্মাণ, ইতালিয়নরা প্রয়াস পায়, ভারতের লোকের নিজেদের দেশ পর্য্যন্ত দেখিবার প্রয়াস নাই। যদি থাকেও ত খুব কম। দেশভ্রমণ যে জ্ঞানলাভের জন্ম এ ভাবটা এখানে বড় দেখা যায় না।

ভারতের অতীত গৌরবের দিনে ভারতের আচার্য্যেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতেন এবং জ্ঞান বিতরণের জন্ম নানা প্রকারের যত্ন করিতেন। আজ ভারতে সে ভাব নাই। ভারতবাসীর বিদেশের কাছ হইতে, বিশেষতঃ ইংরাজদের কাছ হইতে, অনেক শিখিবার আছে। একটা উদাহরণ দিব। লণ্ডনের টাইম্‌স পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, যে, ইংলণ্ডের পাবলিক্ স্কুলের একদল ছেলে ভারতবর্ষ দর্শনের জন্ম উপযুক্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ক্রিষ্টমাসের বন্ধে আসিয়াছিল। ভারতের বড় বড় সহরে, বিশেষতঃ দিল্লীতে, যত ইংরেজ আছে তাহারা এই ছেলেদের সাদরে নিজেদের বাড়ীতে রাখিয়াছিল। ভারতবর্ষটা কি, ভারতবর্ষে ইংরাজ কিরূপে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ভারতে ইংরাজের আধিপত্য রক্ষার দায়িত্বটা এই সমস্ত ছেলেদের প্রাণে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দিল্লীতে অবস্থানকালে সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস হইতে বর্ত্তমান দিল্লীর ইতিহাস ছেলেদের বক্তৃতা দ্বারা ও নানা উপায়ে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে কয়জন ছেলেকে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বিদেশ-ভ্রমণের জন্ম বন্দোবস্ত করা হয়? বাংলার স্কুলের ছেলেদের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে দিল্লী, এলাহাবাদ, পাটনা, মুরশিদাবাদ, বোম্বাই, লাহোর, অমৃতসর ও ভারতের প্রসিদ্ধ সহরে প্রত্যেক বৎসর ভ্রমণের ও ইতিহাস শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। ভারতের ছাত্রদের মধ্যে কয়জন শিবাজী, রাণা প্রতাপ, গুরুগোবিন্দ, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি ভারতীয়দের জন্মস্থান কীর্ত্তির লীলাভূমি দেখিয়াছে? ভারতবর্ষে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভারতের জাতীয় ইতিহাস দেশ-ভ্রমণের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা দরকার।

১২০–২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
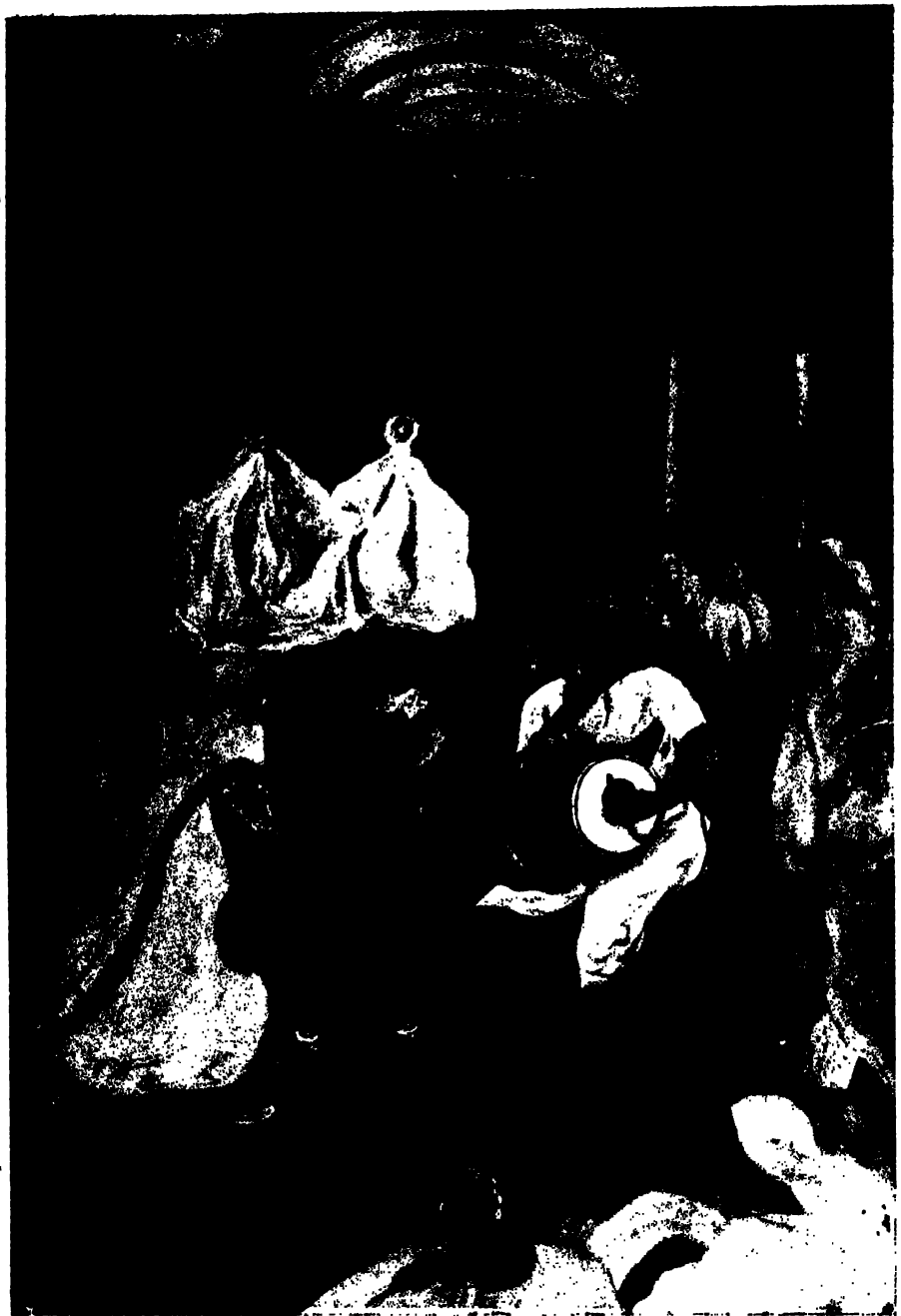
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৩৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এবার বুঝি ভোলার বেলা হোলো—
ক্ষতি কি তাহে যদি বা তুমি ভোলো।
যাবার রাতি ভরিল গানে
সেই কথাটি রহিল প্রাণে,
ক্ষণেক তরে আমার পানে
করুণ আঁখি তোলো

সন্ধ্যাতারা এমনি ভরা সাঁঝে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশ মাঝে।
এই যে সুর বাজে বীণাতে
যেখানে যাব রহিবে সাথে,
আজিকে তবে আপন হাতে
বিদায়দ্বার খোলো॥

শান্তিনিকেতন
২১ ফেব্রুয়ারী
১৯৩০

বিজ্ঞান ও শিক্ষা

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম-এ, ডি-ফিল্ (লাইপ্‌জিগ)

আমাদের দেশে বিদ্বৎসমাজে বিজ্ঞানশিক্ষার যেরূপ আদর আছে, শিক্ষা-বিজ্ঞানের সেরূপ নাই। বাস্তব জগতে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলে স্বীকার করেন বটে, কিন্তু দৈনিক জীবনে শিক্ষা-বিজ্ঞানের উপকারিতা অনেকেই অনুভব করেন না। বিজ্ঞান, শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে একটি বিশেষ স্তর অধিকার করে, সে-সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইবে না; কিন্তু শিক্ষা যে বৈজ্ঞানিক বিষয়-সমূহের মধ্যে স্থান পাইতে পারে, সে ধারণা করিতে অধিকাংশ লোকেই কুণ্ঠিত হইবে না।

এই কুণ্ঠার কারণ কি? আমার মনে হয়, শিক্ষা এবং বিজ্ঞান—এই উভয় বিষয় সম্বন্ধেই কতক অসম্পূর্ণ ও কতক ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এই কুণ্ঠার উদ্রেক হয়। বিজ্ঞান বলিলেই আমাদের মনে Physics, Chemistry, Botany, Laboratory, এই সকলেরই একটি ছায়ার উদয় হয়। সুতরাং তাহার মধ্যে শিক্ষা-সমস্যার কোনো যোগাযোগ দেখিতে পাই না। অপর দিকে, শিক্ষা অর্থে নানা লোক নানারূপ কল্পনা করিয়া থাকেন এবং সেই সকল কল্পনার মধ্যে ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যই অধিক। তবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ আলোচনাই হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, এই বিষয়ে। এই ঔচিত্য অনৌচিত্যের মীমাংসা নির্ভর করে আবার আরও একটি বৃহত্তর প্রশ্নের উপরে,—মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই শেষ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দেয় না—দেয় দর্শন। অতএব, শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা বিজ্ঞানের নয়, দর্শন-শাস্ত্রেরই অন্তর্গত হওয়া উচিত—ইহাই সাধারণের কথা।

সাধারণের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। শিক্ষা এবং বিজ্ঞান, ইহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তে যে উপনীত হওয়া যায় না, তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নানাবিধ জটিল প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থিত হয়। এই সমস্ত প্রশ্ন লইয়া আজকাল আমাদের দেশে একটি তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে, সকল বিষয়েই আমূল পরিবর্ত্তন, সমূল উৎপাটন প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে। এই সমস্ত সমস্যার সন্তোষ-জনক সমাধান করিতে হইলে যে-পন্থা আমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা সহায়ক হইতে পারে, এই প্রবন্ধে তাহারই একটি ইঙ্গিত দিতে প্রয়াস পাইব।

দেখা যাউক, বিজ্ঞানের বিশেষত্ব কি। Physics, Chemistry প্রভৃতি যে বিজ্ঞান, সে-সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যদি শুধু ঐগুলিকেই বিজ্ঞান বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা করা হয়। আমরা সচরাচর এইরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণাই পোষণ করি। তাহার কারণ বোধ হয় শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা। বিশ্ববিদ্যালয় Science Course-এর জন্য যে-সকল বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেইগুলিই বিজ্ঞান, এবং যেগুলি Arts Course-এর জন্য বলিয়া দিয়াছেন, সেইগুলিই Arts, এইরূপ বিশ্বাস করি। কিন্তু সামান্য বিচার করিলেই দেখা যাইবে, এই মাপ-কাঠির দ্বারা বিষয়ের শ্রেণী ভাগ করা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, ন্যায়শাস্ত্র-বহির্ভূতও বটে। সুতরাং, ব্যাবহারিক জীবনে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেও, বিজ্ঞানের বিশেষত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে আরও অগ্রসর হইতে হইবে এবং অন্য মানদণ্ডের সাহায্য লইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কেনই বা কতকগুলি বিষয়কে বিজ্ঞান বলেন, এবং অন্যগুলিকে অন্যরূপ ছাপ মারিয়া দেন?

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে দৈনিক জীবনে যে-সমস্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসি, তাহাদের স্বরূপ এবং পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা সকলকেই

করিয়া লইতে হয়। এই ধারণা-সমূহ যে আমরা সব সময়েই জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক গড়িয়া লই, তাহা নহে। এমন কি, আমাদের সারাদিনের কাজ কর্ম্মের পশ্চাতে যে এইরূপ কোনো ধারণা আছে, তাহাও আমরা অনেক সময়ে উপলব্ধিই করি না, সকল সময়ে ভাবিয়াও দেখি না, এবং দেখিবার প্রয়োজনও হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই চালিত হই। Huxley বলিয়াছেন—"Science is perfected common sense," অর্থাৎ এই সাধারণ বুদ্ধির চরম উৎকর্ষই বিজ্ঞান। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে, কিংবা একই বস্তু সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে-সমস্ত ধারণা পোষণ করি, তাহার মধ্যে অনেক বিরোধ বা বৈষম্য থাকিয়া যায়। এই সমস্ত বৈষম্য দূর হইয়া সাধারণ বুদ্ধি যখন পূর্ণভাবে মার্জ্জিত হয়, তখনই বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। মোটামুটিভাবে এই কথা মানিয়া লইয়া আরও একটু গভীরভাবে বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বিজ্ঞান সৃষ্টির দুইটি উপকরণ—বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানের বস্তু।

প্রথম, বৈজ্ঞানিকের দিক্ হইতে দেখা যাক। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সহিত প্রাকৃতজনের যখন তুলনা করি, তখন দেখিতে পাই বৈজ্ঞানিকের প্রথম বিশেষত্ব হইতেছে—তাঁহার অনুসন্ধিৎসা। যে-কোনো বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান লাভ করিলে দৈনিক জীবন অনায়াসে অতিবাহিত করা যায়, প্রাকৃতজন তাহার অধিক জানিবার চেষ্টা করেন না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তীব্র অনুসন্ধিৎসার তাড়নায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুর কার্য্য-কারণ সম্পর্ক, তাহার উৎপত্তি, স্থিতি, বিকার, লয় প্রভৃতির ন্যায়সঙ্গত তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারেন, ততক্ষণ তিনি ক্ষান্ত হন না। এইখানে আবার আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির লোভে প্রণোদিত হইয়া বৈজ্ঞানিক তাঁহার অনুসন্ধানে রত হন না। বস্তুকে নিষ্কামভাবে শুধু তাহার বস্তুত্ব হিসাবে দেখাই তাঁহার স্বভাব। বস্তু, তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি অথবা আত্মসুখ-চরিতার্থতার উপকরণ হিসাবে তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হয় না। ইহাই বৈজ্ঞানিকের আর একটি বিশেষত্ব। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মূলে স্বার্থের সন্ধান যদি থাকিত তাহা হইলে আজ আমরা বিজ্ঞানের এই বিশ্ববিজয়ী বাণী শুনিতাম না। তাহার এই মহামহিমময় রূপ আজ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিত না। জেম্স্ তাই বলিয়াছেন,—

"যখনই কেহ পদার্থ-বিজ্ঞানের চমৎকার প্রাসাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং উপলব্ধি করেন কিরূপে উহা গড়িয়া উঠিয়াছে, কত সহস্র নিঃস্বার্থ সাধুজীবনের উপর উহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, কত ধৈর্য্য ও ত্যাগ, কত ইচ্ছা দমন, বহির্জ্জগতের ঘটনাবলীর উদাসীন নিয়তির নিকট কত পরাজয়, উহার প্রস্তরে প্রস্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, কিরূপ সম্পূর্ণ অব্যক্তিকরূপে আপন মহান্ মহিমায় ইহা উজ্জ্বল,—তখন স্বেচ্ছায় ধূম্রমণ্ডলীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া আপনার ব্যক্তিগত স্বপ্নের দ্বারা চালিত হইয়া ঘটনা-রহস্যের সমাধান করিবার ভাণ যাঁহারা করেন, সেই ভাব-প্রধান ব্যক্তিগণ কিরূপ প্রমত্ত ও নিন্দার্হ বলিয়া প্রতীয়মান হন!"—(*The Will to Believe*, 1897 p.7.)

যখন যে অনুসন্ধানে রত সেই বিষয়ে এই নিরাসক্তিই বৈজ্ঞানিকের বিশেষ গুণ। কিন্তু নিরাসক্তভাবে অনুসন্ধান করেন বলিয়া যে, সেই বিষয়ের প্রতি বৈজ্ঞানিকের প্রাণের কোন যোগ নাই, তাহা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। বরং ইহার বিপরীত কথাটাই সত্য। তিনি এই আকর্ষণ এত বেশী অনুভব করেন যে, বস্তুর সহিত আপনাকে এক করিয়া দিতে চাহেন। বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তিনি তাহার অন্তঃস্থলে পৌঁছাইতে চাহেন, তাহার স্বরূপ দেখিতে চাহেন, যে-কোনো বৈজ্ঞানিকের জীবনী পাঠ করিলেই দেখা যাইবে যে, তাঁহার সাফল্যের ভিত্তি এই দুইটি চিত্তবৃত্তি। আমার মনে হয়, এই অনুসন্ধিৎসা এবং এই অনুসন্ধানে স্বার্থহীন আত্মদান ডারউইন-এর জীবনে এরূপভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহাকেই বৈজ্ঞানিকের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এইবার দেখা যাক, বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানের বিষয় কি? এক কথায় বলা যায় 'facts' বা ঘটনাবস্তু। যে-সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব বা যে-

সকল ঘটনা আমরা অনবরতই মানিয়া লইতেছি, যাহাদের বিষয় অনেক সময় কোন জিজ্ঞাস্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না, তাহাই বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয়। কিন্তু 'facts' শূন্যে ঘুরিয়া বেড়ায় না। যতক্ষণ না কেহ সেই ঘটনাবস্তু অনুভব করিতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতেছেন, ততক্ষণ fact-এর অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং অনুভূতির বিষয়-সমূহই বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানের বস্তু। শুধু বিজ্ঞান কেন, সাহিত্য বলুন, দর্শন বলুন, সকলের উৎপত্তিই ঐ বিষয়ানুভূতি হইতে। তবে, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?

প্রভেদ তাহাদের outlook অর্থাৎ লক্ষ্যে এবং উদ্দেশ্যে। বিজ্ঞান বাস্তব জগত লইয়া কার্য্য করে। বিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যে উদ্দেশ্য, মূল্য, সামাজিক উপকারিতার কোন কথা নাই। বস্তুকে বিজ্ঞান শুধু তাহার বস্তুত্ব হিসাবেই অনুসন্ধান করে। পৃথিবীতে তাহার দাম কি, সমাজে তাহার প্রয়োজনীয়তা কি, সে-সমস্ত নিরূপণ করা বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

"বৈজ্ঞানিকের বাস্তব অবস্থিতির উপর স্বাভাবিক আসক্তি প্রকাশিত হয়, যখন, ব্যবহার ও উদ্দেশ্য, সুশৃঙ্খল সার্থকতা, সৌন্দর্য্য, সামাজিক উপকারিতা, ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ইত্যাদির অপসারণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীর অনাড়ম্বর 'কেন'তেই স্পষ্টতঃ সাড়া দেন, আরও অধিক মনোযোগ বা গুণগ্রহণের দাবি করিলে তিনি অস্বীকারসূচক সাড়া দিয়া থাকেন।"—(Titchener *Systematic Psychology*, 1929 pp. 32-33)

তাই বিজ্ঞানের কার্য্যপ্রণালী শুধু observation বা সমীক্ষা। অভিনিবেশপূর্ব্বক ধৈর্য্যের সহিত ঘটনাবলীর সমীক্ষণ এবং বর্ণন—ইহাই বৈজ্ঞানিকের কার্য্যধারা। তাই যত অধিক তথ্য অনুসন্ধান করা হইতে থাকে, বিজ্ঞান ততই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। কিন্তু বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিলেই যে অধিকতর গভীরভাবে দার্শনিক হওয়া যায় তাহা নহে।

একই ঘটনার নানা দিক, তাই নানা বিজ্ঞান। বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে অনেক দিক হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতে হয়। ক্ষুধার সময় খাওয়া একটিই ঘটনা, কিন্তু উহা Physics, Chemistry, Physiology, Psychology সকল শাস্ত্রেরই অধ্যয়নের বিষয় হইতে পারে। তাই যদিও বিষয়-হিসাবে আমরা সাধারণতঃ বিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ করি, মূলতঃ আমাদের attitude অথবা দেখিবার পদ্ধতির উপরেই উহা নির্ভর করে।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু আভাস দিয়াছি, এখন দেখা যাক শিক্ষার সহিত বিজ্ঞানের সংস্পর্শ কোথায়।

আমরা 'শিক্ষা' শব্দটির যথেষ্ট অপব্যবহার করি বলিয়া আমার মনে হয়। সাধারণতঃ 'শিক্ষিত' অর্থে এম্-এ, বি-এ পাশ করা, এইরূপ ধারণা করিয়া লই। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনকেই শিক্ষা বলিয়া মানিয়া লই। আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে বুদ্ধিবৃত্তিও নহে, শুধু স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষই আমাদের কাছে 'শিক্ষা' নামে অভিহিত হয়। কারণ এম্-এ, বি-এ পাশ করা অনেক সময় শুধু স্মৃতিশক্তির উপরই নির্ভর করে।

ইহার দুইটি কারণ আছে বলিয়া মনে করি। একটি অর্থনৈতিক; কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত লোকে দেখিতে এম্-এ, বি-এ পাশ করিলেই অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হয়, তাই জীবন-সংগ্রাম যত প্রবল হইতে লাগিল, অন্য মনোবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচর্য্যা করাই বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিল। কালক্রমে ইহাই 'শিক্ষা' শব্দের একমাত্র অর্থ হইয়া দাঁড়াইল। এ বিষয়ে আমার বিশেষ বলিবার কিছু নাই। শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ অর্থ যে অসম্পূর্ণ এবং কার্য্যকরীও নহে আমরা আবার তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

আর একটি কারণ, বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে সাধারণ লোকের একটি উচ্চ ধারণা আছে। সকল মনোবৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান সকলে দিয়া থাকে, এবং তাহারা বিশ্বাস করে যে, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইলে অন্য সকল বিষয়েও আশানুরূপ ও সন্তোষজনক ফল লাভ হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি মানবতার ভিত্তি; তাই এই বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনই শিক্ষার মন্ত্র। সেইজন্য এই অর্থে উচ্চশিক্ষিত

ব্যক্তির যখন চরিত্রগত অন্য কোনরূপ দোষ বা ন্যূনতা দৃষ্ট হয়, লোকে আশ্চর্য্য হয়, বলে, "লোকটা লেখাপড়া শিখেও মানুষ হ'ল না।"

'লেখাপড়া শেখার' ক্ষমতার উপর এই যে প্রগাঢ় বিশ্বাস, ইহা শুধু অহেতুক নহে, অতিশয় অতিরঞ্জিত এবং একেবারে অবৈজ্ঞানিক। এই ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়াই আধুনিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং সময়ের অনুপযোগী। সংস্কার যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা সকলেই অনুভব করি, কিন্তু কোথা হইতে আরম্ভ করিয়া কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্থানে স্থানে সংস্কার করিলে জীর্ণ ইমারত কিছুদিন হয়ত দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু তাহার অচিরাৎ পতন অবশ্যম্ভাবী—যদি তাহার ভিত্তি যথোচিতভাবে স্থাপিত না হইয়া থাকে। এইখানে বিজ্ঞানের সহিত শিক্ষার প্রথম সংস্পর্শ আমরা দেখিতে পাই। বিজ্ঞান আমাদের ভিত্তির দুর্ব্বল অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিয়াছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে যে, বুদ্ধিই মানবজীবনের সার নহে; জীবন সংগ্রামে বুদ্ধি যত প্রয়োজনীয়, কর্ম্ম প্রবণতা, ভাব-প্রবণতাও ঠিক সেইরূপ প্রয়োজনীয়। এইটি আমাদের এখন বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। যে-কোন শিক্ষা-সংস্কারের পরিকল্পনায় শেষোক্ত দুটির স্থান নাই, তাহা কখনই ফলবতী হইবে না। শিক্ষার আদর্শ বড় করিয়া দেখিলেই শিক্ষার উন্নতি করা যায় না। আদর্শ দরকার, কিন্তু বাস্তব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আদর্শ কল্পনা করা কবিত্বের পরিচায়ক হইলেও কার্য্যকারিতার পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

শিক্ষাক্ষেত্রের এই বাস্তবতার বিষয়ে বিজ্ঞান আমাদের পদে পদে সাহায্য করিতেছে। ডারউইন্‌এর ক্রম-বিকাশ-তত্ত্ব শিশুমন-অধ্যয়নের গুরুত্বের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়; সুতরাং শুধু স্কুল, কলেজ সংস্কার করিলে গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার মতই হয়। বিজ্ঞান আরও বলিতেছে, প্রথম পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যেই শিশুচরিত্রের মূল ভিত্তি স্থাপিত হইয়া যায়। সুতরাং, এই সময়ই সর্ব্বাপেক্ষা সাবধান হওয়া উচিত। তাই শিক্ষক অপেক্ষা পিতামাতার দায়িত্ব যে কত গুরুতর তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা-সম্বন্ধে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য আমরা জানিয়াছি যে, শিশুমাত্রেই কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেইগুলি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এই দুইটিই শিক্ষার উপকরণ। কিন্তু এই দুইটি সম্বন্ধেই আমাদের উদাসীনতার অভাব নাই। এইখানে শিক্ষা-বিজ্ঞানের গবেষণার প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে প্রতি বৎসর কত সহস্র শিশুর দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের প্রত্যেক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ করিবার কল্পনাও যে অধিকাংশ লোকের মনে উদয় হয় না, তাহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আধুনিক যুবকদের নানারূপ দোষ দেখাইয়া আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিই; কিন্তু যে আবহাওয়ায় তাহারা বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টা করার কথা মনে করি না।

Healthy mind in a healthy body প্রবচন সকলেই জানেন, কিন্তু শরীরের সহিত মনের সংযোগ যে কত ঘনিষ্ঠ,তাহা Physiologyর প্রতি নূতন আবিষ্কারেই দেখিতে পাইতেছি। সামান্য অস্ত্রোপচারের ফলে, অনেক আপাতজড়বুদ্ধি শিশুর বুদ্ধি স্বাভাবিক শিশুর ন্যায়ই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে। মূক, বধির, অন্ধ প্রভৃতিদের শিক্ষিত করিবার প্রণালী দেখাইয়া দিয়া বিজ্ঞান যে সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে?

শিশুবিজ্ঞানের এইরূপ নানা তত্ত্ব নিত্যই আবিষ্কৃত হইতেছে। এই নূতন জ্ঞানের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। বহুল প্রচার যে হয় না, তাহার কারণ আমাদের দেশে Education বিষয়টি শুধু Training Collegeএর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাহার স্থান নাই। মনোবিদ্যা-বিভাগে ইহার তত্ত্বগত চর্চ্চা কিছু হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাবহারিক দিকে তাহা কার্য্যকরী করিবার কোনরূপ সুবিধা নাই।

আশা হয়, দেশবাসীর দৃষ্টি শীঘ্রই এইদিকে পড়িবে,—তাহার লক্ষণ চারিদিকে দেখা যাইতেছে। করপোরেশ্যান

প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইয়া যেরূপভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সুফল ফলিবারই সম্ভাবনা। আমাদের দেশের বালকবালিকার সহজাত মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের শিক্ষকদের নিকট হইতে পাইবার ভরসা আমরা রাখি। কিন্তু তাহা কেবল শিক্ষার একটি দিক। অপর দিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা। তাহা আবার শারীরিক ও মানসিক। এই দুইটি অবস্থা যাহাতে শিশুমনের বিকাশের অনুকূল হয়, সে বিষয়েও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাহা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। তাই আজ আমি তাঁহাদের এই অনুরোধ করিতে চাই যে, তাঁহারা শিশু-মনোবিকাশের গতি অধ্যবসায়ের সহিত অনুসন্ধান করুন, এবং আপন আপন গৃহে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে যত্নবান হউন।*

* ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখায় পঠিত।

চাপা আগুন

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

শ্রাবণ মাসের যে দিনটিতে উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব এক মুহূর্ত্তের জন্যেও মেঘের আড়াল হন না, সেদিনটি পূর্ব্বদিনের অজস্র বারিপাতসত্ত্বেও বৈশাখের দিনগুলির মতই গরম হইয়া উঠে। মনে হয়, হিসাবের গোলমালে গ্রীষ্মের একটা বাড়তি দিন প্রকৃতি বর্ষার দিনগুলির মাঝে গুঁজিয়া দিয়াছেন।

সকাল সাতটায় শিবপদ খদ্দরের বস্তা ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়াছিল, ফিরিল বেলা তিনটায়। দেহ শ্রান্ত, মুখ শুষ্ক, গায়ের খদ্দরের জামা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্তরাত্মা হাহাকার করিতেছে। ধপাস্ করিয়া খদ্দরের বস্তা ফেলিয়া সেই বস্তার উপরে বসিয়াই শিবপদ ডাকিল, "বৌদি!"

বৌদি মাধবী দুরন্ত খোকাটিকে ঘুম পাড়াইয়া সবে চোখ বুজিয়াছিল, দেবরের ডাক শুনিয়া উঠিয়া আসিল।

"কি ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্যের কথা ঠাকুরপো!"

"মানে?"

"এত সকাল সকাল দেশের কাজ থেকে ছুটি পেলে? সবে তিনটে বেজেছে।"

শিবপদ হাসিল। বলিল, "ঠাট্টা করবার ঢের সময় পাবে বৌদি, আগে এক গ্লাস জল দিয়ে দেওরের প্রাণটা বাঁচাও। তেষ্টায় মরে যাচ্ছি।"

"জামা খোলো, জিরিয়ে জল খাবে," বলিয়া মাধবী ঘরের ভিতর হইতে পাখা আনিয়া শিবপদকে বাতাস করিতে লাগিল।

শিবপদ বলিল, "জিরিয়ে জল খেতে খেতে তেষ্টায় বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, বৌদি।"

মাধবী বলিল, "মুখ দেখেই সেটা বুঝতে পারছি, ভাই। মিছরির সরবত করে ভিজে ন্যাকড়ায় গ্লাস জড়িয়ে রেখেছি, একটু ঠাণ্ডা হয়ে খেয়ো।"

মাধবীর কণ্ঠে অপূর্ব্ব মমতা। একান্ত স্নেহাস্পদ এই দেশসেবকের স্বেচ্ছাবৃত আত্মনিগ্রহে নিত্য তার চোখে জল আসে, গোপনে মুছে। এমনি একটি ভাই ছিল তার, খেয়ালী ভগবানের খেলার মর্য্যাদা দিতে নিজের খেলা ভাঙিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে এত বড়ই হইত। বিবাহের পরেই ভাইকে সে হারায়, স্বামিগৃহে আসিয়া তার ব্যথাতুরা ভগিনীর প্রাণ এই দেবরটিকে পাইয়া ভরিয়া গিয়াছিল। তারপর ছয় বৎসর কাটিয়াছে, ষোল বছরের শিবপদ বাইশ বছরের হইয়াছে। এই ছয় বৎসরের সঞ্চিত স্নেহ ও ভালবাসার ভারে হৃদয়ের কতকগুলি

তন্ত্রী এমনি টান্ টান্ হইয়া উঠিয়াছে যে, এতটুকু আঘাতে বেদনা বোধ হয়। গোঁয়ার আত্মভোলা দেবরটির জন্ম স্বস্তি সে একদিনও পায় নাই, ওই কারণেই। নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, দেহটার যে বিশ্রামের প্রয়োজন হয় সে সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার সীমা নাই, ভবিষ্যতে যে কি করিয়া দিন চালাইবে, সে-বিষয়ে মারাত্মক উদাসীনতার অন্ত নাই, কংগ্রেস, খদ্দর, পিকেটিং এই সব লইয়াই পাগল হইয়া আছে। কলেজ ছাড়িয়াছে। অত্যন্ত কম পড়িয়া এবং এতটুকুও স্বাস্থ্য হানি না করিয়া সে যে বরাবর ফার্ষ্ট হইত, ম্যাট্রিকে পনের টাকা স্কলারশিপ পাইয়াছিল, গর্ব্বোজ্জ্বলমুখে পাড়াপড়শীকে সেকথা শুনাইতে মাধবীর বুক ফুলিয়া উঠিত। সে গর্ব্বে ঘা পড়াতে মাধবীর বাজিয়াছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী বাজিয়াছে দেবরের শরীরের প্রতি নির্ম্মম অবহেলা এবং অত্যাচার। পড়াশুনা ছাড়িয়াছে, ছাড়ুক। দেশসেবা করিতেছে, করুক। শরীরটার দিকে যদি এতটুকু নজর দিত ছেলেটা, মাধবী বাঁচিত।

নিত্য অনুযোগ দেয়, আজও দিল। বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, নিজেকে অনর্থক কষ্ট না দিলে কি দেশের সেবা হয় না?"

"বিছানায় শুয়ে শুয়ে?"

"খোঁচা দিয়ে আমায় চটাতে পারবে না ভাই, মিথ্যা চেষ্টা। সারাদিন খেটে—মরুক গে, তোমাদের প্রকাণ্ড একটা ভুল ধারণা আছে ঠাকুরপো যে, খুব খানিকটা কষ্ট ভোগ করলেই চমৎকার দেশসেবা হয়ে গেল! প্রয়োজন থাক্ আর না থাক্। যে দুঃখকে এড়ান যায়, ইচ্ছে করে তাকে টেনে আনার মধ্যে এতটুকু দেশভক্তির পরিচয় নেই, এ তোমায় আমি বলে রাখছি। কোন লাভ না থাকলেও মিছামিছি কষ্টভোগ করা শুধু উচ্ছ্বাস, দেশ-ভক্তি নয়।"

শিবপদ বলিল, "মিছামিছি কি রকম?'

"মিছামিছি নয়? কোন্ সকালে চারটি মুড়ি খেয়ে বার হয়েছিলে, ফিরলে শেষবেলায়। সমস্তটা দিন অনাহারে—খাওনি নিশ্চয় কিছু।"

মৃদু হাসিয়া শিবপদ বলিল, "না।"

মাধবী বলিল, "সে জানি। এই যে না খেয়ে রইলে এটাই তো মিছামিছি কষ্টভোগ করা। নাওয়া-খাওয়া না ছাড়লে দেশের সেবা হয় না, এর সপক্ষে একটা যুক্তিও কি তুমি দিতে পার?"

শিবপদ কি বলিতে উদ্যত হইতেই বাধা দিয়া মাধবী বলিল, "কেন খাওনি জানি। স্যর ফিলিপ সিডনির মত তুমি মহানুভব, 'গ্রেটার নিড'-এর খাতিরে যে কটি পয়সা খাবার কিনে খেতে খরচ হত, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে দান কর। কিন্তু এমন করলে কদিন কাজ করতে পারবে ভেবে দেখেছ? সব জিনিষেই সংযম হল সব চেয়ে বড় কথা। দেশসেবার বেলাতেও তার অন্যথা নেই। বাড়াবাড়ি করলে তার ফল কোনদিন ভাল হয় না। প্রকৃতির কাছে দেশভক্তির ওজর চলে না, শত্রুতা করলে প্রতিশোধ সে নেবেই। পয়সা দিয়ে খাবার না কিনতে চাও, এগারটা-বারটার সময় ফিরে খেয়ে দেয়ে আবার বার হতে পার্তে।

শিবপদ বলিল, "দেরী হল কেন শুন্বে? বড়বাজারে পিকেটিং করলাম এগারটা পর্য্যন্ত। তার পরে খদ্দর নিয়ে বার হলাম। একটার সময় ফিরব ভেবেছিলাম, কিন্তু আর একটা বাড়ী ঘুরে যাই এই রকম করতে করতে দেরী হয়ে গেল।"

মাধবী বলিল, "রোজ তো তাই হয়! দুটো তিনটের কমে একদিনও ফের না। দু একখানা কাপড় কম বিক্রি হলে বিশেষ ক্ষতি নেই, অসুখ হয়ে পড়লে যে একখানাও বিক্রি করতে পারবে না! বিছানায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণতে হবে। ক'জোড়া বিক্রি হল?" শিবপদ হাসি মুখে বৌদির স্নেহের অনুযোগ শুনিতেছিল, হাসি মিলাইয়া তার মুখ ম্লান হইয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আড়াই জোড়া।"

"ঠাকুরপো!"

মুখ তুলিয়া শিবপদ দেখিল মাধবীর চোখে জল।

"এ পণ্ডশ্রম কেন করছ ভাই? তোমার এ পরিশ্রমের দাম যে একশ জোড়া বিক্রি হলে ওঠে না!"

শিবপদ কথা কহিল না, তার অন্তরেও জ্বালা ধরিয়া গিয়াছিল। পণ্ডশ্রম? ভাবিতেও তার অসহ্য মনে হয়। কিন্তু কি প্রাণপাত পরিশ্রমের কি তুচ্ছ

প্রতিদান! কত বড় আশা লইয়া সে কাজে বাহির হয়, কি নিবিড় নিরাশা লইয়া ফিরিয়া আসে! বুকভরা উদ্যম, প্রাণভরা উৎসাহ, সাফল্যের কল্পনায় অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি, এমন সব সম্পদ তার থাকে প্রত্যেকটি দিনের প্রারম্ভে! দিনের শেষে ব্যর্থতার আঘাতে সে-সকল ঠনকো কাঁচের বাসনের মত টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া যায়। ভাঙা কাঁচের মতই সে টুকরাগুলি তার হৃদয়কে রক্তাক্ত করিয়া তোলে।

—মা ফলেষু কদাচন। সে জানে। এই মহামন্ত্র স্মরণ করিয়া প্রত্যেক দিনের নিষ্ফলতার বিষাক্ত মাদকতা মন হইতে দূর করিয়া দেয়। বর্ত্তমানকে অস্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের সার্থকতার স্বপ্ন দেখিয়া সে সান্ত্বনা পায়; কিন্তু সকল সময়ে বর্ত্তমানকে ভুলিয়া যাইতে কি মানুষ পারে?

—খদ্দর? খদ্দর মশাই টেঁকে কম, দামও বেশী। দেশী মিলের কাপড় পরছি, আর কি চান? দুএকখানা যা আছে তাতেই কাজ চলে যায়, মিটিং-টিটিংয়ে যেতে— বোঝেন না? এমনি ধরণের কথা শোনে সে বাড়ী-বাড়ী। ক্ষুধার্ত্ত শ্রান্ত ব্যর্থতাপীড়িত দেহমনে 'বোঝেন না?'-র অর্থযুক্ত রেশটুকু যেন আগুন ধরাইয়া দেয়। বোঝে বৈকি সে, ভাল করিয়াই বোঝে। আর বোঝে বলিয়াই এক এক সময় ইচ্ছা করে খদ্দরের বোঝা রাস্তায় ফেলিয়া গঙ্গায় ডুব দিয়া আসে; ফিরিবার পথে বড়বাজার হইতে কিনিয়া আনে খানকতক খাঁটি বিলাতি বসন!

কতক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া শিবপদ বলিল, "তোমার বাতাস মিষ্টি লাগছে বৌদি, কিন্তু তেষ্টা মিটছে না।"

পাখা রাখিয়া মাধবী উঠিয়া গেল। একটু পরে পাথরের গ্লাসে সরবত লইয়া প্রবেশ করিল শিবপদর ছোট-বোন অলকা। বছর পনর বয়স, শান্তশ্রীমণ্ডিত মুখখানির দিকে চাহিলে সুন্দরী বলিতে ইচ্ছা না করিলেও, বেশ ভাল লাগে। রূপের পরিস্ফুট দীপ্তি নাই, আভা আছে।

শিবপদর হাতে সরবতের গ্লাস দিয়া অলকা বলিল, "একবার ওঘরে যাবে ছোড়দা?

"কেন রে?"

"আর্শিতে চেহারাখানা একবার দেখবে।"

"কেন? চেহারাটা খুলেছে নাকি আজ?"

অলকা বলিল, "খোলেনি আবার! কে যেন এক বোতল কালি ঢেলে দিয়েছে। তোমার খদ্দরের বস্তায় আগুন না দিলে চলছে না ছোড়দা।" একনিঃশ্বাসে গ্লাসটা খালি করিয়া শিবপদ বলিল, "বুঝলি অলি, কিন্তু হ'ল না! এক কলসী হ'লে হয়ত হ'ত! কি বলছিলি? খদ্দরে আগুন দিতে চাস? দে না, বাঁচি তাহ'লে।"

"বাঁচো যা জানা আছে। খদ্দরে আগুন দিলে তোমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না? বোসো তেল আনছি, রোজ রোজ রুক্ষ নাওয়া আবার তোমার এক বিটকেলে সখ," বলিয়া অলকা চলিয়া গেল।

শিবপদর দাদা রমাপদ সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়াই ভাইকে ডাকিল। নাইট স্কুলে পড়াইতে যাইবার জন্য শিবপদ জামা পরিতেছিল; ডাক শুনিয়া দাদার ঘরে ঢুকিল। শ্রান্তদেহে রমাপদ তক্তপোষের কোণে পা গুটাইয়া বসিয়াছিল, বলিল, "কাল আমার সঙ্গে আপিসে বেরুবি শিবু। নীরদবাবুর পোষ্টটা তোকে দিতে বড়-বাবু রাজী হয়েছেন। এখন পয়তাল্লিশ পাবি, সাম্‌নের বছর সত্তর করে দেবে," বলিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে বলিতে লাগিল, "বাপ, যে করে বড়বাবুকে হাত করেছি! তিনটে-না-চারটে এম-এ, বি-এল পর্য্যন্ত দরখাস্ত দিয়েছিল। কি ভয়ানক দিনকাল পড়েছে, ভাবলেও মাথা ঘুরে যায়।"

বহুদিন হইতেই ভাইয়ের একটা হিল্লে লাগাইবার চেষ্টায় সে ছিল, এতদিন পরে সফল হইয়া সে যে অত্যন্ত খুশী হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল।

শিবপদর মুখ ম্লান হইয়া গেল।

অনেকদিন হইতেই দাদার মুখে এমনি একটা প্রস্তাব শুনিবার আশঙ্কা সে করিতেছিল। সংসারের অনটনের কথা সে ভাল করিয়াই জানে। আশীটি টাকা পায় তার দাদা, বাড়ীভাড়া যায় কুড়ি। বাকী ষাটটি টাকা হইতে পাঁচটি মানুষের বাঁচিয়া থাকার ব্যবস্থা করিতে অর্দ্ধেক মাস কাবার না হইতেই বৌদিকে যে কি বিপুল সমস্যার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইতে হয় সে-সংবাদও সে রাখে। দুঃখের তার সীমা থাকে না।

নিজের অভাব-অভিযোগ যতদূর সম্ভব কমাইয়াছে। দুবেলা দুমুঠা ভাত, দুখানা ধুতি আর একটি জামা, এছাড়া তার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। যেখানেই সে থাক আর যাই করুক না ও তার জুটিবেই। দেশের কাজে সে তার সমস্ত শক্তি এবং সময় ব্যয় করিতে পারিবে। কিন্তু স্নেহের যাদের তুলনা নাই, সংসারে যারা তাকে একান্ত আপনার বলিয়া কাছে টানিয়া লইয়াছে, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আশার প্রদীপের সলিতা উস্কাইয়া দিয়াছে, তাদের প্রতি নিজের কর্ত্তব্যের কথা সে কি করিয়া বিস্মৃত হইবে? বিরূপ ভগবানের অভিশাপে অভিশপ্ত এই অভাগা দেশে নিজেদের ছোট ছোট গণ্ডীর মাঝে রাষ্ট্র ও সমাজের শত অত্যাচার সহিয়াও যারা সুখের নীড় রচিয়া স্বর্গের আনন্দসুধা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে বাইশ বৎসর সেই সুধা পান করিয়া সক্ষম যৌবনে তাদের দাবীকে সে অস্বীকার করিয়া বসিবে কোন প্রাণে?

হাতবাক্স খুলিয়া বৌদিকে কতদিন সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে। অক্ষমতার গ্লানি আর বিরুদ্ধ যুক্তির সংগ্রামে অন্তর তার রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেশকে যে ভালবাসিল, নিজের দারিদ্র্য এবং দুঃখ সে হাসিমুখে বরণ করিতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর দেড়শো কোটি নরনারীর মাঝে যে-কটি মানুষের স্থান বিধাতা একেবারে তার হৃদয়ের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন তাদের দুঃখ সে কেমন করিয়া সয়? কেমন করিয়া জোর গলায় বলে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখদুঃখের কাছে তোমাদের সুখদুঃখ আমার চোখে তুচ্ছ হইয়া গেছে। আমি দেশসেবক,—দেশ ছাড়া কারও কথা ভাবিবার অবকাশ আমার নাই!

বলা যায় না। বলিলেও সে হয় মিথ্যা। দেশের জন্য সে বেদনা বোধ করে সত্য, কিন্তু তার চেয়ে বেশী বেদনা অনুভব করে প্রিয়জনের উপর অভাবের পীড়ন দেখিয়া। হয়ত এ তার দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রের প্রতি সুবিপুল ভালবাসাকে ছোট করিয়া বৃহতের প্রতি ভালবাসাকে সুবিপুল করিয়া তুলিতে না পারার অক্ষমতা। কিন্তু যে দুর্ব্বলতাকে জয় করা তার সাধ্যাতীত, যে দুর্ব্বলতা তার আছে এবং চিরদিন থাকিবে, জোর করিয়া নাই বলিলেই ত সে আর যাইবে না!

শিবপদর আশা ছিল খদ্দর বিক্রয় করিয়া সংসারে টাকা দিবে, কালে খদ্দরের একটা বড় দোকান খুলিবে—এ স্বপ্নও সে দেখিয়াছে। কিন্তু চার আনা পাঁচ আনার বেশী লাভ তার হয় না—যেদিন সবচেয়ে বেশী হয়, আট আনা। দাদার প্রস্তাবে মত দেওয়া ছাড়া সংসারের সচ্ছলতা বিধান করিবার অন্য ক্ষমতা তার নাই।

অথচ, যে অধীনতাকে, যে দাসত্বকে সে পাপ বলিয়া জানিয়াছে, জীবনের অভিশাপ বলিয়া জানিয়াছে, প্রিয়জনের মুখ চাহিয়া কেমন করিয়াই বা সে সেই পাপকে বরণ করিয়া লইবে, সেই অভিশাপকে মানিয়া লইবে?

কি কঠিন সমস্যা!

রমাপদ আবার বলিল, "কাল সকালে কোথাও বেরুসনে তাহ'লে।"

মৃদুস্বরে শিবপদ বলিল, "আমি চাকরী করতে পারব না দাদা।"

রমাপদ চটিয়া বলিল, "কি করবি তবে? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবি?"

শিবপদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। তার আরব্ধ সাধনার বিপুল নিষ্ফলতাকে যদি ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার সংজ্ঞা কেহ দেয় তবে ভবিষ্যতে সে নিষ্ফলতার স্তূপ সাফল্যের স্পর্শে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিবে কি উঠিবে না, সে লইয়া আর তর্ক করা চলে না।

রমাপদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, "মতলবটা কি, এঁ্যা? উদয়াস্ত পরিশ্রম করে আমি তোকে খাওয়াবো আর তুই টো টো কোম্পানী করে স্বদেশী করবি? লজ্জা করে না তোর? অপদার্থ হ'লে কি সব দিক দিয়েই হতে হয়!"

রমাপদ অতিশয় শান্ত ও কোমল প্রকৃতির মানুষ, কঠিন কথা বলা তার অভ্যাস নয়। কিন্তু সংসারের কঠোর শুষ্কতা ও দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ তার অন্তরের রসধারা ও কোমলতা শুকাইয়া তুলিতেছিল। প্রত্যেকটি কথা ভাইয়ের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছে বুঝিয়াও

সে বলিয়া চলিল, "সবাই আবার স্কুল-কলেজে ঢুকে দিন কিনছে, বাবু যে বখাটে সে বখাটেই রয়ে গেলেন। দুবেলা ভাত জুটলে পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা মেরে বেড়াতে ভাল আর লাগে না কার? অত বড় জোয়ান ছেলে একটি পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই। আমি হ'লে দেশসেবার ন্যাকামি না করে গলায় দড়ি দিতাম।"

দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া মাধবী নিঃশব্দে খোকার জামা সেলাই করিতেছিল, শিবপদর মুখের দিকে চাহিয়া তার কান্না পাইল। বলিল, "তুমি যাও তো, মুখ-হাত ধুয়ে আসবে। রোজগার করবার বয়সটা ঠাকুরপোর কি এমন গিয়েছে শুনি?"

রমাপদ আর কথা না কহিয়া উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। শিবপদ পাষাণের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তীব্র অভিমান তার নয়নের অন্তরালে যে বর্ষণোদ্যত মেঘের সৃষ্টি করিয়াছিল, অশ্রুবর্ষণ হইতে তাহাদের নিবৃত্ত করিয়া রাখিতেই তার সবটুকু শক্তি ব্যয়িত হইতে লাগিল।

পরদিন সকালে সে বাহির হইল না। দশটার সময় রমাপদর সঙ্গে আপিসে চলিয়া গেল।

২

অক্ষমতার সান্ত্বনা আছে, অশক্তের কৈফিয়ৎ আছে। না-পারার বেদনা তাদের এই আত্মগ্লানিতে অসহ হইয়া ওঠে না যে, শক্তি থাকিতেও কিছু করিতে পারিল না। সক্ষমের সে সান্ত্বনা নাই। তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে জীবনের সত্য যাচাই হইয়া গিয়া পথ এবং লক্ষ্য যার স্থির হইয়া গেল, সেই পথ ধরিয়া লক্ষ্যের পানে আগাইয়া যাইবার শক্তির সন্ধান যে নিজের ভিতরে আবিষ্কার করিল, নিজে নিজের হাত পা বাধিয়া গতিবেগ বিসর্জ্জন দিতে হইলে তার দুঃখ যেন সীমা ছাড়াইয়া যায়।

দশটা হইতে পাচটা অবধি শিবপদ কলম পেষে, মাসান্তে পঁয়তাল্লিশটি টাকা আনিয়া মাধবীর হাতে দেয়। আর ভাবে, মাসিক পঁয়তাল্লিশটি টাকার ঋণে সংসার তাকে কিনিয়া লইয়াছে!

লজ্জা, লজ্জা! শোচনীয় লজ্জার কথা তার। নিবারণের সঙ্গে পথে দেখা হয়, ডান কাঁধের খদ্দর বাঁ কাঁধে সরাইয়া অর্থযুক্ত হাসি হাসিয়া নিবারণ বলে, "খদ্দর কিনবেন স্যার? ভাল খদ্দর।"

বন্ধুর পরিহাস। বিষমাত কাঁটার মত সে পরিহাস কি মর্ম্মান্তিকভাবে শিবপদর অন্তরে বিঁধিয়া জ্বালা ধরাইয়া দেয় বন্ধু তা বোঝে না।

হরেনবাবু দূর হইতে দেখিতে পাইলেই হাঁকাহাঁকি সুরু করেন, "ওহে শিবপদ, শোন শোন।" কাছে গেলে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। বলেন, "একেবারে সাহেবের গোলামী! না হয় একটা দোকান-টোকানই খুলতে হে!"

শিবপদ নিঃশব্দে তার সহানুভূতির চাবুক সহ্য করে। তর্ক করে না, লাভ নাই বলিয়া। ধনী দেশসেবক যে তার কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না, সে জানে। মোটরে দুই টাকার তেল খরচ করিয়া যিনি খদ্দর বিক্রির আট আনা লাভ জমা দিয়া নাম কেনেন এবং আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন, শিবপদর কথা বুঝিবার মত করিয়া বিধাতা তার মনকে গড়েন নাই।

নাইট স্কুলে পড়াইতে যায়। বন্ধুদের আলোচনা কানে আসে—মাস দুই, বড়-জোর আর মাস দুই! বিয়ের ফুলটি ফুটবে, দেশসেবার ফুলটি বোঁটাসুদ্ধ ঝরবে। কি গর্ব্বই ছিল ছেলের!

মাথা নীচু করিয়া শিবপদ পথে নামিয়া আসে, সেদিন আর পড়ান হয় না। আর সেই কামাই করা বন্ধুদের সিদ্ধান্তকে চমৎকার সমর্থন করে!

এমনিভাবে দিন যায়।

পৌষ মাস। আপিসের ভিতর দিনের আলো অতি ম্লানভাবে প্রবেশ করে, ঢুকিলেই মন কেমন দমিয়া যায়। সারাদিন সেই শীর্ণ রোগীর হাসির মত দীপ্তিহীন আলোতে কাজ করিতে করিতে শিবপদর মনে হয় সে যেন রূপ-কথার নিদ্রাপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছে। রাস্তার গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ অতি ক্ষীণভাবে কানে আসে, নিস্তব্ধ আপিস-ঘরে সহকর্ম্মীদের কলম চালানোর একটানা মৃদু খস্ খস্ শব্দ ওঠে। উদাস বৈরাগ্যে শিবপদর অন্তর ভরিয়া যায়।

বাহিরের লক্ষ মানুষের জীবন-প্রবাহের যে উন্মত্ত কলরোল হইতে মাত্র ঘণ্টাকয়েক পূর্ব্বে সে এখানে ঢুকিয়াছে, তাহা যেন সহসা কল্পনার বস্তু হইয়া যায়। সত্য হইয়া থাকে শুধু কলম-চালানো। উচ্ছ্বাস নাই, উদ্বেগ নাই, চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতের বালাই নাই, আত্মবিশ্লেষণের প্রচেষ্টা নাই, যন্ত্রের মত শুধু লিখিয়া যাওয়া ছাড়া জীবনের যেন আর কোনো অর্থও নাই। মন্দ লাগে না। দুঃখ-যন্ত্রণা পর্য্যন্ত যেন বৈরাগ্যের মোহগ্রস্ত হইয়া সমাধি পায়।

পাঁচটার পর বাহিরে আসে। দেখে, শীতের অপরাহ্ণের সূর্য্যালোক পরিম্লান হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া মন তার আরও দমিয়া যায়। ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা তার চোখে যেন ঘষা কাঁচের চশমা পরাইয়া দেয়, জীবনকে মনে হয় মলিন এবং নিষ্প্রভ' জনস্রোতের ব্যস্ততা তাকে যেন ব্যঙ্গ করে।

ধীরে ধীরে সে চলিতে আরম্ভ করে। কোনো কোনো দিন বাড়ী পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়ার চিন্তাটা অসহ্য মনে হয়। ট্রামে চাপিয়া বসে। টিকিটের পয়সা গুণিয়া দিবার সময় এই কথা ভাবিয়া তার মুখে জ্বালাভরা হাসি ফুটিয়া উঠে যে, একদিন ক্ষুধার জ্বালা পর্য্যন্ত তাকে দিয়া জলখাবারের কটা পয়সা ব্যয় করাইতে পারে নাই।

যেদিন হাঁটিয়া বাড়ী ফেরে প্রথমটা ঝিমাইতে ঝিমাইতে মন্থরপদে চলে। তারপর হাঁটিতে হাঁটিতে তার বহুক্ষণের নিষ্ক্রিয় আড়ষ্ট দেহযন্ত্র সতেজ হইয়া উঠে। গতিবেগ বাড়িতে বাড়িতে তার স্বাভাবিক অতি-দ্রুত চলায় পরিণত হয়। ওইটুকু পরিশ্রমেই তার দেহমনের ম্যাজমেজে ভাবটা অনেকখানি কাটিয়া যায়।

সেদিন হাঁটিয়াই ফিরিতেছিল ধর্ম্মতলা দিয়া। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছাকাছি পৌছিয়াছে, পিছন দিক হইতে একটি দামী মোটরকার তাকে ছাড়াইয়া একটু আগাইয়া গিয়াই ব্রেক কষিয়া থামিয়া গেল। পিছনের সিটে হেলান দিয়া বসিয়াছিল এক তরুণী, সোজা হইয়া বসিয়া ডাকিল,—"শিবপদ!"

শিবপদ নিজের চিন্তায় বিভোর হইয়া অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে পথ চলিতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইল। মুখ ফিরাইয়া আরোহিণীকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

তরুণী বলিল, "অনেকদিন পরে দেখা হ'ল।"

শিবপদ বলিল, "হ্যা।"

"শুধু হ্যা বল্লে, আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না?"

"আর কি বল্‌ব নীতি?"

নীতি হাসিল, "একটু উচ্ছ্বাস! আমায় দেখে যে ভয়ানক খুশী হয়েছ তার একটুখানি প্রকাশ! না, খুশী হওনি?"

শিবপদ বলিল, "কি যে বল! খুশী হয়েছি বৈকি। কেমন আছ?"

"তবু ভাল, এতক্ষণে ভদ্রতা-জ্ঞানটা দেখা দিয়েছে। ভালই আছি। মোটা হয়েছি মনে হচ্ছে না তোমার?"

ঠিক উল্টাটাই শিবপদর মনে হইতেছিল। নীতি রোগা হইয়া গিয়াছে। ছয় মাস পূর্ব্বে শ্রাবণের এক নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণব্যাকুল দিনে শেষবার নীতিকে সে দেখিয়াছিল বর্ষার তটিনীর মতই স্বাস্থ্যসম্পদে পরিপূর্ণ, ছয় মাস পরে শীতের স্বল্পায়ু দিনের শেষে আজ নীতিকে দেখিল, শীর্ণ এবং ম্লান। হাস্যদীপ্ত যে আননে অন্তরের আনন্দআলোকের ছটা দেখিয়া একদিন সে অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিত, বিষাদ ও ক্লিষ্টতার পাণ্ডুর ছায়া সে-আনন ঘেরিয়া রহিয়াছে। শিবপদ অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিল। নীতির শেষ প্রশ্নটার জবাব সে দিল না, দিতে পারিল না। আর একটা প্রশ্ন করিল, "তোমার বাবা ..... ভাল আছেন নীতি?"

"হ্যা। এদিকে কোথায় গিয়েছিলে?"

শিবপদ সংক্ষেপে বলিল, "আপিসে!"

নীতি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আপিসে! তার মানে?"

"মানে খুব সোজা, চাকরী করছি।"

নীতির মুখ ম্লান হইয়া গেল। ধীরে ধীরে বলিল, "বিশ্বাস করা শক্ত ঠেকছে, কিন্তু পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কোনো জিনিষ নেই। ঠাট্টা করছ না তো? সত্যি?"

শিবপদ একটুখানি হাসিল। কথার চেয়ে সে-হাসি স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিল ইহা ঠাট্টা নয়, সত্য।

নীতি বলিল, "কিসে এটা সম্ভব হ'ল?"

"সংসারে টানাটানি, তাই। বড় হয়েছি, কিছু রোজগার না করলে চলবে কেন ?"

"শুধু এই !"

শিবপদ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "সংসারে টাকার টানাটানি জিনিষটা কি, তোমার জানা নেই নীতি, তাই ও-কথা বলতে পারলে। তোমার পরণের শাড়ীখানার যা দাম, আমাদের ছুভায়ের একমাসের রোজগারে বোধ হয় তত হবে না।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয় নীতি বলিল, "থাক গে ও কথা। তুমি এখন বাড়ী যাচ্ছ তো ? গাড়ীতে এসো, কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে নামিয়ে দেব।"

শিবপদ বলিল, "না থাক।"

মুখ লাল করিয়া নীতি বলিল, "না কেন ?"

শান্তকণ্ঠে শিবপদ বলিল, "সেটা তো তোমার না বুঝবার কথা নয় নীতি !"

নীতির চোখ অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, মুখে ফুটিয়া উঠিল অন্তরের কঠিন জ্বালার প্রতিচ্ছবি। যে হাসির আড়াল রচিয়া, যে সহজভাবের মুখোস পরিয়া সে কথা কহিতেছিল, এক নিমিষে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেল। মুখ ফিরাইয়া সে অন্যদিকের দোকান-ঘরগুলির দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিল; ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার আত্মবিস্মৃতি এবং অন্তরের বিপ্লবী সত্তার কাছে তার মুহূর্ত্তের পরাজয় শিবপদর চোখে পড়িতে দিল না।

মুখ ফিরাইয়া শিবপদর দিকে যখন চাহিল তখন সে আত্মসংবরণ করিয়াছে। অধরের কোণে জোর করিয়া ফোটান সেই ছলনার হাসি জাগাইয়াছে। নিপুণা অভিনেত্রীর মত মুখে কৌতুকচ্ছটা ফুটাইয়াছে এবং চোখের দৃষ্টি শান্ত ও কোমল করিয়া আনিয়াছে। পরিহাসতরলকণ্ঠে বলিল, "বুঝেছি। এতটা পথ পাশাপাশি যেতে পাছে পুরনো স্মৃতি আমায় দুর্ব্বল করে ফেলে, সেই ভয়ে তুমি গাড়ীতে আসবে না। সময় সময় ভারি মজার কথা তুমি বল শিবপদ," এই বলিয়া হাত উঁচু করিয়া আংটি দেখাইয়া বলিল, "বুঝতে পারছ ?"

"পারছি।"

"কি বল তো ?"

"এনগেজমেণ্ট রিং।"

হাতটি নামাইয়া নীতি বলিল, "ঠিক। হীরাটা লক্ষ্য করেছ বোধ হয় ? কার পয়সায় কেনা শুনতে কৌতূহল হচ্ছে না ?"

"হচ্ছে। ভারি আনন্দিত হলাম নীতি, তুমি যাকে পছন্দ করেছ সে যে—"

বাধা দিয়া নীতি হাসিয়া বলিল, "আগে নামটাই শোন। কুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে তুমি নিশ্চয় চিনতে, কি বল ?"

শিবপদ চমকাইয়া উঠিল। হীরাবসানো বহুমূল্য এনগেজমেণ্ট রিং দিবার মত সখ যার সে বড়লোক, এটুকু বুঝিতে তার বিলম্ব হয় নাই, কিন্তু সে যে জিতেন চৌধুরী এ তো সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। জিতেন চৌধুরী ! সেই মাতাল পশুটা ! তার দেওয়া এনগেজমেণ্ট রিং নীতির আঙুলে ! কি ভয়ানক কথা এ !

নীতির হাতটি কোলের উপর পড়িয়াছিল, শিবপদ আংটির হীরাটার দিকে চাহিল। মনে হইল, হীরাটা অসংখ্যমুখে দাতার তপ্ত-আর্ত্ত প্রেমের সুতীব্র জ্বালা বিচ্ছুরিত করিতেছে। শিবপদর অধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না। চাপা বেদনার অভিব্যক্তিতে তার মুখ মরণাহত অসহায় মূক প্রাণীর মত বিকৃত হইয়া গেল। অত্যুগ্র শঙ্কায় একেবারে আর্ত্ত-হইয়া-ওঠা দৃষ্টি মেলিয়া সে নীতির মুখের দিকে চাহিল।

নীতি মুখ ফিরাইয়া বলিল, "জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বিয়ে হবে। নেমন্তন্নপত্র অবশ্য পাবে, মুখেও বলে যাচ্ছি যেও কিন্তু নিশ্চয় ! আচ্ছা চললাম। ঘুমাও, ঘর—"

শোফার গাড়ী চালাইয়া দিল। রাস্তায় একটা গ্যাস-পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা গেল শিবপদ চাহিয়া রহিল।

গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেলে শিবপদ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। মন্থরপদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রবেশ করিয়া একপাশে নিরিবিলি ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে কপাল টিপিয়া ধরিল। চমৎকার জীবন ! আনাচে-কানাচে শুধু কঠিনতম সমস্যা উঁকি দিতেছে। কি যে তার সমাধান—এতটুকু ইঙ্গিতও মিলিতেছে না।

নিজে নিজে যে সমাধান করিতেছে তাহাই কঠিন আলিঙ্গনে হৃদয়কে নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে।

কি বলিয়াছিল নীতি? নিজেকে ঠকিও না, ওতে কোনো লাভ নাই। দুজনে মিলে আমরা দেশের কাজ করব।

বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণ-সন্ধ্যায় অন্তরের সুমহান্ সত্যের দাবীতে নারীত্বের সুগভীর লজ্জাকে জয় করিয়া ধীর স্থির শান্তকণ্ঠে এই কথা নীতি বলিয়াছিল। গভীর মিনতি-ভরা চোখে তার চোখে চোখে চাহিয়া আরও কত অনুচ্চারিত বাণী নীতি জানাইয়াছিল, বুঝিবার জন্য প্রয়াসের প্রয়োজন হয় নাই। সেণ্টিমেণ্টালিটি নীতি দেখায় নাই, ন্যাকামিও না। নারী হইয়া সে যে তার প্রেমের কথা উচ্চারণ করিয়াছিল, তার অন্তরের দাবী জানাইয়া দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে নাই, তাহাতে বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি ছিল না। প্রেমের খেলা খেলিতে খেলিতে অসংখ্য রহস্যভরা ইঙ্গিতে ও প্রেমিকের দৃষ্টিতে ছাড়া একেবারে অর্থহীন খুঁটিনাটি ব্যবহারে মনের কথা প্রকাশ করিতে তার বিশেষ আপত্তি ছিল। তাই, হৃদয়ের নবজাগ্রত সত্য যখন তার কাছে পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং সেই সত্যের অনুভূতিতে শিবপদর অন্তরের সত্যও যখন নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছিল, তখন তুচ্ছ লজ্জা ও সঙ্কোচের অধীনতার অপমান যে তার ভালবাসা স্বীকার করিয়া লইবে এ তার অসহ্য মনে হইয়াছিল। কবিত্বের কুয়াশা রচনা করিবার চেষ্টা না করিয়া সহজ সরল ও সুস্পষ্ট অর্থযুক্ত কথায় সে তার দাবী জানাইয়াছিল।

শিবপদ বলিয়াছিল, "কি আশ্চর্য্য কথা নীতি! আমার যে মাসে পনেরটা টাকা আয় নেই!"

নীতি বলিয়াছিল, "এখন নেই, কিন্তু লম্বা ভবিষ্যৎটা পড়ে আছে।"

শিবপদ বলিয়াছিল, "তুমি তো ভাল করেই জান নীতি, টাকা আমার কোনোদিন হবে না। তাছাড়া এমন অসম্ভব কথা তোমার বাবার কাছে কিছুতেই আমি উচ্চারণ করতে পারব না। উচ্চারণ করেও লাভ হবে না, সেও তুমি বোঝ।"

এই কথার জবাবে কত কথাই নীতি বলিয়াছিল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কাহাকেও সে চাহে না, শুধু শিবপদকে জীবনের সাথী করিয়া পাইতে চায়। আজন্ম-অভ্যস্ত বিলাসিতার প্রতি তার বিন্দুমাত্র মমতা নাই,—দরিদ্র শিবপদর দরিদ্রা শিষ্যা, দরিদ্রা প্রিয়া হইয়াই সে থাকিতে চায়। আশা-নিরাশার আলো-ছায়ায় নীতির অপরূপ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া শিবপদর হৃদয় বিদ্রোহ করিতে চাহিয়াছিল। দেশের মুক্তি যে চায় তার নিজের মুক্তি চাই সকলের আগে, এই সুকঠিন সত্য অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিল। জীবনের আরব্ধ সাধনার সমাপ্তি করিয়া দিয়া মধুর বন্ধনে নিজেকে চিরতরে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কি কঠিন সেই ক্ষণটি! বিপ্লবী, উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়কে বশে আনিতে কত রক্ত ঝরিয়াছিল, কোনোদিন সে কি তাহা ভুলিবে!

নীতি তাকে এতটুকু ভোলে নাই, ভুলিতে পারে নাই। জিতেন চৌধুরীকে বিবাহ করিতে মত দিয়া হাসিমুখে এনগেজমেণ্ট রিং দেখাইয়া নীতি তাহাকে যে আঘাত করিতে চাহিয়াছে তাহাতেই সে সত্য তার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ধনীর দুলালী এই মেয়েটির বাহিরের বিলাসিতার আবরণের অন্তরালে অন্তরের যে পরিচয় সে জানিয়াছিল তাহাতে প্রথম হইতে তার আশঙ্কা ছিল সে সহজে ভুলিতে পারিবে না। অসার হৃদয়ের পঙ্গু ভালবাসার অভিনয় সে তো করে নাই। তার গভীর হৃদয়ে নিবিড় প্রেম জাগিয়াছিল, কোনোদিন ভুলিতে পারিবে কিনা কে জানে! জিতেন চৌধুরীর ভালবাসায় এমন কোন সম্পদই তো সে পাইবে না যাহাতে তার অতীতের ক্ষতির ক্ষত মিলাইয়া যাইতে পারিবে। চরিত্রবান দৃঢ়চিত্ত স্বামীর শুদ্ধ শান্ত প্রেমের স্পর্শে একদিন নীতির অন্তরের জ্বালা প্রশমিত হইত, কিন্তু তাকে আঘাত দিবার জন্য সাধ করিয়া সে অন্তরের চিতাগ্নি জীবনব্যাপী জ্বলিবার উপযোগী সমিধ সংগ্রহ করিতে চলিয়াছে। এ কি কঠিন শাস্তি নীতি তাহাকে দিল!

উষ্ণ অশ্রুতে শিবপদর হাত ভিজিয়া গেল। অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল

জন্ম যার বুকে তুমি ভালবাসা জাগিয়েছ, তার সে ভালবাসার দীপ নিভিয়ে দাও। জীবন নিয়ে সে যে শোচনীয় খেলা সুরু করেছে, ভুল ভাঙিয়ে তার সে খেলা ভেঙে দাও। তোমার শ্রেষ্ঠ দান যাকে দিলে তাকে সুখী কর।

৩

মাসখানেক পরের কথা। সবে সন্ধ্যা হইয়াছে।

জানালার কাছে দাঁড়াইয়া শিবপদ বাহিরের কুয়াশার দিকে চাহিয়াছিল। কুয়াশার বেশীর ভাগ ধোঁয়া, তাহাও চিমনির এবং গৃহস্থের উনুন ধরাইবার কয়লার।

মাধবী বলিল, "আজ পড়াতে যাবে না ঠাকুরপো?"

"না, আজ বন্ধ।"

"ও হাঁ, তোমাদের নাইট স্কুলে আবার শুক্রবারে রবিবার হয়। রান্নাঘরে বসবে চল না, গল্প করা যাবে।"

রান্নাঘরের মেঝেতে মাধবী আসন পাতিয়া দিল, শিবপদ বসিল। ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়া মাটিতে বসিয়া মাধবী বলিল, "তুমি আমায় ভয়ানক ভালবাস, না ঠাকুরপো?"

শিবপদ হাসিয়া বলিল, "নাঃ।"

"বল কি? ভালবাস না?"

"ভাল হয়ত বাসি, কিন্তু সেটাকে ভয়ানক বলে মানতে আমি রাজী নই। সে যাক, ভূমিকা কিসের?"

মাধবী বলিল, "ভারি বুদ্ধি তো তোমার ঠাকুরপো, ভূমিকা বলে ঠিক ধরেছ! আমার একটা জিনিষ চাই।"

"কি জিনিষ, পুতুল?"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু বেশ বড়সড় আর জ্যান্ত।"

শিবপদও হাসিল। বলিল, "বুঝলাম।"

মাধবী বলিল, "বুঝেছ? বাঁচলাম। বল্‌তে এমন ভয় করছিল আমার! অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলাতে দাদাকেই খুন করতে চেয়েছিল, তোমার আই-বুড়োত্ব ত্যাগ করতে বল্লে বৌদিকে কি করবে ভেবে পাচ্ছিলাম না।"

শিবপদ বলিল, "অর্জ্জুনের মত আমি গোঁয়ার নই বৌদি, তোমাকে সন্দেশ খাওয়াবো। আর এক শিশি কবিরাজী তেল কিনে দেব।"

"তেল কি করব?"

"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, মাখবে।"

"আচ্ছা এনে দিও, মাখবো। কিন্তু তোমার বিয়ের নেমন্তন্নের সন্দেশ না হলে খাব না। অলকা দু-দিন বাদে পরের বাড়ী চলে যাবে, একটি জা না হলে আমার সত্যি চল্‌বে না ভাই।"

শিবপদ বলিল, "সতীন হলে যদি চলে তো এনে দিতে পারি।"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "বাপ রে, অত বড় সৌভাগ্য আমার সইবে না, হবেও না। তোমার দাদার অত দয়া নেই। একটি ছোট্ট জা এনে দাও তাতেই চল্‌বে," বলিয়া হাসি বন্ধ করিয়া মাধবী বলিল, "ঠাট্টা নয় ভাই, খুব ভাল একটি সম্বন্ধ এসেছে। উনি দেখে এসেছেন, খাসা মেয়ে, দেবে-থোবেও বেশ। ওঁর ভারি ইচ্ছে এ কাজটা হয়। ঠাকুরপো দাদাটি, আর অমত কোরো না।"

শিবপদ সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

মাধবী চটিয়া বলিল, "হাসলে যে?"

"একটা কথা ভাবছি।"

মাধবী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

শিবপদ বলিল, "ঠাকুরপো দাদাটি বলে আদর করার পরেও আমি যখন বলব মত নেই, কোনো দিন মত হবেও না, তখন তোমার মুখখানা কি রকম হয়ে যাবে ভেবে হাসি পাচ্ছে বৌদি। যদিও কান্না পাওয়াই উচিত।"

ভাত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গম্ভীরমুখে উঠিয়া গিয়া মাধবী হাঁড়ির মুখের সরাটা সরাইয়া দিল এবং অনাবশ্যক মনোযোগের সহিত সদ্যফোটা চাল তুলিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিল সিদ্ধ হইয়াছে কি না।

"রাগ হ'ল বৌদি?"

"রাগ নয় ভাই, উনি কথা দিয়েছেন।"

শিবপদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কথা দিয়েছেন! আমায় জিজ্ঞাসা না করেই?"

মুখ ফিরাইয়া মাধবী বলিল, "তুমি যে এখনও এমন

ছেলেমানুষ আছ বুঝতে পারেন নি। সত্যি তোমার মত নেই ঠাকুরপো ?"

কয়েক মুহূর্ত মাধবী দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কতকগুলি মিনতি ও অনুরোধের বাণী উচ্চারণ করিতে যাইতেছিল, করিল না। শুধু "আচ্ছা বলিগে ওঁকে," বলিয়া চলিয়া গেল। শিবপদ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অন্ধকূপের মত রান্নাঘর, পিছনের একটা গলির দিকে একটি মোটে রান্নাঘর। গলির ও-পাশের দেয়ালটা বাড়ীর যেন জানালায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, গলিটির পরিসর এতই বেশী। কোথা দিয়া বাতাস আসিতেছিল বলা কঠিন, কেরাসিনের ডিব্‌রির সুস্পষ্ট শিখাটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। ডিব রির নীচের অন্ধকারে একটা ফাটলের ভিতরে শরীরের আধখানা অন্তরালে রাখিয়া একটা আরশোলা শুঁড় নাড়িতেছিল। সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে একটা উদ্ভট কল্পনা শিবপদর মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিল।

মাধবীর অনুরোধ নীতিকে মনে পড়াইয়া দিল। বিবাহ ? কত বড় হাসির কথা ! হোক হাসির কথা, ধর সে বিবাহ করিল। মনে মনে বিবাহ করিতে আর আপত্তিটা কি ? আর যখন কল্পনার বিবাহ তখন বৌদির এই খাসা মেয়েটিকে টানাটানি না করিয়া নীতিকে কনের আসনে বসাইয়া দিলেই বা এমন কি ক্ষতি ? ধর নীতি হইল এ বাড়ীর ছোটবৌ। বড় জা-এর সঙ্গে বধূ নীতি এই রান্নাঘরে আসিয়া বসিল। ফাটলের ভিতর হইতে আরশোলাটা বাহির হইয়া সর সর করিয়া নীতির গা বাহিয়া ফর ফর করিয়া উড়িয়া গেল। আতঙ্কে শিহরিয়া নীতি বলিয়া উঠিল,—"মাগো !"

বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত দামী কার্পেট-পাতা সোফা চেয়ার পিয়ানো অর্গান অয়েলপেন্টিং সমাকীর্ণ ড্রয়িং-রুমে ঝলমলে মান্দ্রাজী শাড়ী পরা নীতিকে আধময়লা মিলের শাড়ীতে মাধবীর মত বধূবেশে সজ্জিত করিয়া কেরোসিনের ডিব রির আলোয় আলোকিত, চোকলা-ওঠা মেঝে ও ফাটলধরা দেয়ালযুক্ত রান্নাঘরে টানিয়া আনিয়া তার গায়ে আরশোলা ছাড়িয়া দিয়া শিবপদ অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল।

এই রকম হইয়াছিল আজকাল তার। অফুরন্ত কর্ম্মের মাঝে হঠাৎ তার দেহের যে পরিমাণ বিশ্রাম জুটিয়াছে, কল্পনার প্রসার তেমনি বাড়িয়া গিয়াছে,—সম্ভব অসম্ভবের সীমা ছাড়াইয়া। শুধু দেহ দিয়া কাজ হয় না, মনকেও প্রয়োজন হয়। দেহ খাটে, মন খাটায়। যখন দেহটাকে বিশ্রামের অবসর না দিয়া যন্ত্রের মত খাটাইত, মনও তার সেই কাজের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইত, কর্ম্মকোলাহলের অসংখ্য ছোট-বড় বৈচিত্র্যময় সুরে তার চিত্ত পূর্ণ হইয়া থাকিত ; অবসাদ ও উৎসাহের দোলায় সে দুলিত। এখন কাজ নাই, সারাদিন দেহ এক রকম নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। আপিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুচ্ছ হিসাবনিকাশের অনভ্যস্ত আলিঙ্গনে মন তার ক্লিষ্ট হইয়া যায়। মুক্তি পাইবামাত্র দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া কেবলি ছোটাছুটি করে, কল্পনার জ্যোৎস্নালোকে নাচিয়া বেড়ায়। খুশীর নাচ, বুদ্ধির সঙ্গত নাই, বাস্তবের সমালোচনা নাই, যেখানে খুশী যেমন করিয়া খুশী পা ফেলে আর তাহাতেই অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি পায়।

হৃদয়বীণার একটি তার কল্পনা যেন একটি বিশেষ সুরে বাঁধিয়া দিয়াছে। যখনই আঘাত লাগে একই সুর বাজে—নীতি ! যে কাজের নেশায় হৃদয়ের আর্ত্তনাদকে উপেক্ষা করিয়া নীতিকে জীবনে অনাবশ্যক বলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছিল, সে কাজের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে। তেমন করিয়া নেশা আর জমে না। চাওয়াকে না পাওয়া অভাব। কাজ সে চায়, পায় না। এবং সেই অভাব-বোধকে আর-একটা-চাওয়াকে-না-পাওয়ার বেদনা বড় বেশী মূর্ত্ত করিয়া তোলে। আর প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের বশে সেই বেদনার তীব্রতা প্রশমিত করিতে সে স্বপ্নের জাল বোনে, কল্পনার মাঝে সান্ত্বনা খোঁজে। প্রেম তার মনের—রিক্ততা মনে। মনের কল্পনা দিয়াই সে সেই রিক্ততার পূর্ণতা পাইতে চায়। শিশুর মত সব কল্পনাকেই গ্রহণ করে,—বাছে না, বিচার করে না।

মাধবী ফিরিয়া আসিল। বলিল, "উনি ডাকছেন ঠাকুরপো।"

শিবপদ কাছে গিয়া দাঁড়াইতে রমাপদ বলিল, "অলকা ঘোলোয় পড়েছে।"

শিবপদ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অলকা বোলোয় পড়িয়াছে, অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু অলকার বয়সের সঙ্গে তার নিজের বিবাহ করার কি সম্বন্ধ আছে ভাবিয়া পাইল না।

রমাপদ বলিল,—"দু'বছর ধরে ওর সম্বন্ধ চলছে, আজ পর্য্যন্ত একটি পাত্র স্থির হল না। টাকা না হলে যে কোনো দিন হবেও না সেটাও ভাল করেই বুঝতে পারছি। দু'বছর আগে আমার ধারণা ছিল, রূপগুণ যে পরিমাণে থাকে, মেয়েদের বিয়েতে টাকাটাও সেই পরিমাণে কম লাগে। এ দু'বছরে আমার সে ধারণা ভেঙে গেছে। অলকার রূপগুণ শিক্ষাদীক্ষার এতটুকু মূল্যও যে কোনো ছেলের বাবা দেবে না, এই সত্যটা ভাল করে উপলব্ধি করছি। অনুপযুক্তের হাতে দেওয়া যায়, কিন্তু তার চেয়ে ওর হাত পা বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়াই আমি ভাল মনে করি। আমাদের ওই একটি মাত্র বোন, ওর কথা ভেবে স্বর্গে গিয়েও মা বাবার আত্মা বোধ হয় শান্তি পাচ্ছে না। যাকে তাকে ধরে কোন মতে ওর বিয়ে দেওয়া চলে না, এটা বোধ হয় স্বীকার কর?"

এ কি প্রশ্ন! শিবপদ নতদৃষ্টিতে মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপদ বলিতে লাগিল, "বিয়ে ওর দিতে হবে এবং সৎপাত্রের সঙ্গে। তাতে টাকার প্রয়োজন, সে টাকা আমাদের নেই। হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে কতকগুলি টাকা পাব তারও কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। সতীশবাবুর ছেলেটি এম-বি পাশ করেছে, তার সঙ্গে আমি অলকার বিয়ে দিতে চাই। সতীশবাবু যা দাবী জানিয়েছেন, আড়াই হাজারের কমে হবে না। তোমার যে সম্বন্ধ আমি স্থির করেছি তারা দেড় হাজার নগদ দেবে, বাকী হাজার টাকা তোমার বৌদির দু' একখানা গয়না বেচে আর ধার করে আমি যোগাড় করতে পারব। আড়াই হাজার টাকা সংগ্রহ করবার সাধ্য আমার নেই, কাজেই তুমি যদি বিয়ে করতে রাজী না হও, অলকার এ সম্বন্ধ ভেঙে দিতে হবে। এত কম টাকায় এমন পাত্র হয়ত আর জুটবে না। অলকাকে আইবুড়ো করে রাখা চলবে না, শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে এমন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে যে সারাজীবন চোখের জলে ভাসবে।"

একটু থামিয়া ভাইকে অবস্থাটা উপলব্ধি করিবার সময় দিয়া বলিল, "বিয়ে করতে তোমার আপত্তিই বা কি, আমি ত ভেবে পাচ্ছি না। আজ ঝোঁকের মাথায় না কর, দুদিন পরে করবে, মাঝখান থেকে আমাদের একটিমাত্র বোনকে আমরা সুখী করতে পারব না। বিয়ে করে লোকে কি দেশের কাজ করতে পারে না? বড় হয়েছ, তোমায় বেশী বলবার প্রয়োজন নেই, নিজের জন্য না কর, অলকার জন্য তোমায় এ বিয়ে করতে হবে। তাড়াতাড়ি কিছু নেই, কটা দিন বুঝে দ্যাখো।

৪

শিবপদ বুঝিয়া দেখিতে লাগিল। এমন বোঝাই বুঝিতে লাগিল যে তার রাত্রির ঘুম পর্য্যন্ত টুটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

সে বিবাহ করিবে,—টাকা লইয়া। সেই টাকায় অলকার সৎপাত্রের সহিত পরিণয় সম্ভব হইবে, অলকা সুখী হইবে। কথাটা এই। অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য। কিন্তু কি কঠিন সমস্যার রূপ ধরিয়াই তার জীবনে দেখা দিল!

জীবনসাগরের এক একটা প্রকাণ্ড ঢেউ প্রচুর শব্দ ও বিভীষিকা লইয়া তার উপরে আছড়াইয়া পড়িতেছে, এতটুকু খেলনার মত তাকে তুলিয়া ডুবাইয়া ঘুরপাক দিয়া মিলাইয়া যাইতেছে; রাখিয়া যাইতেছে স্মৃতির ছোট ছোট অসংখ্য উর্ম্মি-স্পন্দন। বিপর্য্যয় আঘাতটা সামলাইয়া সে ভাবিতেছে, এই শেষ, ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে তালে দুলিয়া তার পাড়ি জমিবে ভাল। হঠাৎ ভাগ্য দানবের দুরন্ত নিঃশ্বাসে উদ্বেলিত সাগরের বুকে জাগিয়া উঠিতেছে তেমনি শব্দ ও বিভীষিকা লইয়া আর একটি বিপুল ঢেউ!

আশ্চর্য্য! স্নেহ করা কি এমন একটা অপরাধ যে তার এত বড় শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে বিধাতা?

বিয়ে করেও লোকে দেশের কাজ করতে পারে—পারে কি? পারিলেও সে সাধনায় সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া দেওয়া চলে কি? যে দাসত্বের শৃঙ্খল সে পায়ে পরিয়াছে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে তার বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইতে পারে,—তার সান্ত্বনাও তাই। কিন্তু এ বাঁধনের হাত হইতে কিছুতেই যে মুক্তি নাই। আজীবন স্বর্ণশৃঙ্খলের বাঁধন অটুট হইয়া থাকিবে, দিনে দিনে দৃঢ় হইবে, বাঁধনের পাক

বাড়িয়া যাইবে। হায় রে, নীতিকে একদিন সে অনাবশ্যক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এই পরিণাম হইবে বলিয়া?

শিবপদর মনে হইল, প্রকাণ্ড একটা সরীসৃপ দুই কুটিল চোখের ক্রূর মোহকরী চাহনিতে তাকে সম্মোহিত করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, পাকে পাকে তাকে বেড়িয়া ধরিয়া মৃত্যুশীতলস্পর্শভরা নিবিড় আলিঙ্গনে জীর্ণ করিয়া ফেলিবে।

অলকার দিকে চাহিয়া শিবপদ নিঃশ্বাস ফেলে। তাহাকে লইয়া সংসারে যে একটা প্রবল অশান্তির স্রোত বহিতেছে অনুভব করিয়া শান্ত মেয়েটির লজ্জা ও আত্মধিক্কারের সীমা নাই। মুখ তার ম্লান হইয়াই থাকে। কতদিন শিবপদ তার নির্জ্জনের প্রার্থনা শুনিতে পাইয়াছে,—"একটা যাহোক করে ফেল ঠাকুর, সকলকে মুক্তি দাও।" কতদিন অলকার চোখে অকারণের অশ্রু আবিষ্কার করিয়াছে। একান্ত স্নেহাস্পদার মর্ম্মযাতনার পরিচয়ে তার বুক দুলিয়া উঠিয়াছে, আঁখি সজল হইয়াছে।

বোনটিকে সুখী তার করিতেই হইবে। আর তার উপায় ওই দেড় হাজার টাকা। নিজেকে বিক্রয় করা ছাড়া ও টাকা কি মেলে না?

শিবপদ ভাবিল, ধনী উদার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীর তো তার অভাব নাই, দেড় হাজার টাকা ধার মিলিবে না? শোধ সে যেমন করিয়া পারে করিবেই। তাকে তো সবাই চেনে। হরেনবাবুর কাছে ছুটিয়া গেল। বলিল, "কিছু টাকা ধার দিতে হবে হরেনদা।"

—"তাই তো হে!"

হরেনবাবুর মুখভাবের পরিবর্ত্তনে এবং কণ্ঠস্বরে শিবপদ একটু দমিয়া গেল। বলিল,"শোধ আমি নিশ্চয় দিতে পারব হরেনদা। চাকরীর টাকা কিছু কিছু জমিয়ে আমি দোকান খুলবো, প্রাণপণে খাটব. তিন চার বছরের ভেতরে নিশ্চয়ই টাকাটা তুলতে পারব। না পারি, দোকান বিক্রি করে আপনার টাকা দিয়ে দেব।"

হরেনবাবু মনে মনে হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন,"কত টাকা?"

"দেড় হাজার।"

"বলো কি হে! অত টাকা দিয়ে করবে কি?"

শিবপদ সব কথা খুলিয়া বলিল। বলা শেষ হইলে মিনতি করিল, "আপনার কত টাকা ব্যাঙ্কে পচছে. আমায় বাঁচান হরেনদা।"

হরেনদা বাঁচাইল না। ভদ্রতা ও মিষ্টতার আবরণে শিবপদকে বাঁচাইতে তার অক্ষমতার চমৎকার কারণ দেখাইল। অকাট্য যুক্তি, ব্যাঙ্কে টাকা পচা দূরে থাক তার নিজের খরচ চলিবার মত টাকাও না-কি তার নাই।

শেষ করিলেন কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া এই কথা বলিয়া,— "তোমার কাছ থেকে কথা বার হবে না জানি বলেই বলছি শিবপদ, এগার হাজার টাকা দেনা! কি করে শোধ দেব ভেবে অন্ধকার দেখছি হে. বুঝলে?"

দেনার কথাটা না বুঝিলেও শিবপদ আসল কথাটা বুঝিল। হরেনদাকে সে শ্রদ্ধা করিত, সে শ্রদ্ধা হারাইয়া অত্যন্ত বেদনা বোধ করিল। টাকা না দিত নাই দিত, এমনভাবে মিথ্যা ও ছলনা দিয়া সেই না-দেওয়াকে বিকৃত করিয়া তুলিবার কি প্রয়োজন ছিল?

আরও দুই একজনের কাছে যাইবে ভাবিয়াছিল, গেল না। শ্রদ্ধা হারাইবার দুঃখ সহিতে তার মন রাজী হইল না। বাড়ী ফিরিয়া আবার ভাবিতে বসিল।

দিন-তিনেক পরে সকালে ঘুম ভাঙিতেই সমস্যাটার অত্যন্ত সহজ সমাধান শিবপদ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। মুখ হাত ধুইয়াই সে সলিলের কাছে ছুটিয়া গেল। সলিল তার বন্ধু। বড়লোকের ছেলে, সচ্চরিত্র এবং এইবার এম-এ পাশ করিয়াছে।

সলিল শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল. "সে হয় না ভাই. বাবার মত হবে না। আমি যে কত দূর দুঃখিত হলাম—"

শিবপদ বলিল, "রাখ্ তোর দুঃখ। অলকাকে তুই চিনিস, কাকাবাবুর মত হবে না কেন? তাঁর তো টাকার অভাব নেই যে ছেলের বিয়েতে কিছু রোজগার না করলে চলবে না। তুইও তো প্রতিজ্ঞা করেছিলি পণ না নিয়ে গরীবের মেয়ে বিয়ে করবি।"

সলিল মৃদু হাসিয়া বলিল, "এখনো ছেলেমানুষ আছিস শিবু। চাঁদলা পুকুরের জমিদার মেয়ের টকটকে রঙ আর চকচকে টাকা দেখিয়ে বাবার চোখে এমন ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে যে অন্য কোনো মেয়ে তিনি চোখেই দেখতে পাবেন না। বুঝলি?"

শিবপদ বুঝিল। বুঝিয়া মাথা নীচু করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেই সলিল তার হাত চাপিয়া ধরিল;

মুখ ফিরাইয়া শিবপদ দেখিল, সলিলের মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছে, চোখ ছল ছল করিয়া আসিয়াছে। অন্তরের সুতীব্র বেদনার ছাপ এমন স্পষ্টভাবে তার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, দেখিয়া শিবপদর বুক টন টন করিয়া উঠিল। সলিলের মুখ কোনো দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে হাসি ছাড়া দেখে নাই, কি যে তার অন্তর্বেদনা ভাবিয়া অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিল।

একটুখানি ম্লান হাসিবার চেষ্টা করিয়া সলিল বলিল, "মাকে বলেছিলাম ভাই, মত হয়নি। অন্ততঃ মারও যদি মত থাকৃত বাবার অমতেও রমাদার কাছে অলকাকে আমি ভিক্ষা চেয়ে নিতাম। কিন্তু মার মনে দুঃখ দেবার সাধ্য আমার নেই ভাই।" এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল,"তোদের বাড়ী আর যাই না বলে রাগ করিস্ কিন্তু আমি যেতে পারি না, আমার ক্ষমতায় কুলোয় না।"

সলিলের মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ শিবপদ আবিষ্কার করিল, স্নেহের দাবী কতদিকে কতভাবে কত রূপান্তরিত অভিশাপের মূর্ত্তি লইয়া সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত বাড়াইয়াছে!

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে শিবপদ ভাবিল, সে আর বাকী থাকে কেন? স্নেহেরই জয় হোক তবে।

বাড়ী ফিরিয়াই দাদাকে জানাইল তার মত আছে। রমাপদ খুশী হইল। শিবপদর মুখের ভাবটা না দেখিয়া সোল্লাসে মাধবী উলুধ্বনি করিয়া উঠিল।

মাঘ মাসের সাতাশে তারিখে শিবপদর বিবাহ হইয়া গেল এবং তার মাস দুই পরে বৈশাখের এক শুভলগ্নে অলকারও বাঙ্গালী গৃহস্থকন্যার জীবনের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপারটি সমাপ্ত হইয়া গেল।

৫

সাত বৎসর পরের কথা।

এই সাত বৎসরের ইতিহাস অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক রকমের অত্যন্ত সাধারণ। বাঙালী জীবনের ইতিহাস কবেই বা অসাধারণ হয়!

রমাপদ বছর-তিনেক মারা গিয়াছে। দুটি ছেলে লইয়া মাধবী বিধবা হইয়াছে। শিবপদর দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে হইয়াছে। আর একটি ছেলে কিংবা মেয়ে শীঘ্রই পৃথিবীতে আসিবে বলিয়া নোটিস দিয়াছে।

শিবপদ মাহিনা পায় সত্তর। দুটি ট্যুসনি করিয়া কুড়ি, সে টাকাটা বাড়ীভাড়া দিতেই যায়। শিবপদর বড় ছেলেটি চিররুগ্ন, টানাটানি করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ঔষধ এবং ডাক্তারের পিছনে প্রতিমাসে কিছু টাকা ঢালিতে হয়। তার এবং মাধবীর অন্য সন্তানগুলিকেও যমের রোগদূতেরা মাঝে মাঝে ধরিয়া টানাটানি করিতে ছাড়ে না। শিবপদর স্ত্রী আরতির এই সেদিন টাইফয়েড হইয়া গেল। কিছু ধার হইয়াছিল, শোধ হয় নাই। মাসে মাসে পাঁচ দশ টাকা করিয়া পরিশোধ না করিলে ঋণদাতা ছাড়ে না। আরও অসংখ্য খুঁটিনাটি খরচ। সত্তরটি টাকা হইতে এত খরচ করিয়া তিনটি পূর্ণবয়স্কের এবং পাঁচটি শিশুর আহারের আয়োজন করিতে হয়, পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কি করিয়া হয় বলিবার প্রয়োজন নাই, সকলেই জানে। ভাল করিয়া জানে বাংলার দুর্ভাগ্য তরুণেরা, মধ্যবিত্ত সংসারের যুবকেরা—অক্টোপাসের মত সংসার যাদের কুক্ষিগত করে, যৌবনের স্বপ্ন যাদের আরম্ভ না হইতেই টুটিয়া যায়, জীবনে অপরিসর গণ্ডীর মাঝে অনন্ত চিন্তা এবং অফুরন্ত দুর্ভাবনার জেলখানায় যাদের বৈচিত্র্যহীন প্রাণহীন বন্দীজীবন যাপন করিতে হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে ভয়ানক বন্যা হইয়া গিয়াছে, অসংখ্য গ্রাম সলিলসমাধি লাভ করিয়াছে। গরু-বাছুর ইত্যাদি গৃহপালিত পশু তো মরিয়াছেই, মানুষও মরিয়াছে ঢের। বন্যাপীড়িতের বুকফাটা আর্ত্তনাদ স্কুল-কলেজের ছেলেদের বুকে আসিয়া ঘা দিয়াছে। দলে দলে ভলাণ্টিয়ার হইয়া গিয়াছে রিলিফ কাজ করিবার জন্য। যারা যায় নাই প্রত্যহ মিছিল বাহির করিয়া চাঁদা তুলিতেছে, সলিলসমাধি যারা এড়াইয়াছে দুর্ভিক্ষ ও রোগের গ্রাস হইতে তাদের বাঁচাইবার জন্য।

বড় খোকার অসুখ—পাঁচদিন জ্বর ছাড়ে নাই। শিবপদ ঔষধ ও পথ্য আনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, বাড়ীর সামনে ছেলেদের মিছিল আসিয়া দাঁড়াইল। খদ্দর-পরিহিত সুদর্শন একটি যুবক শিবপদর সম্মুখে আসিয়া বলিল "ফ্লাড রিলিফ ফাণ্ডে কিছু চাঁদা দিন।'

ছেলেদের সমবেত তরুণকণ্ঠে তখন অসংখ্য আর্ত্ত

নরনারীর জন্য সাহায্য চাহিয়া করুণ আবেদনের সঙ্গীত চলিয়াছে। আন্তরিকতাভরা গানের সহজ কথা এবং সহজ সুরের মাঝে এতগুলি সমবেদনাভরা কোমল প্রাণ যেন দুঃখপীড়িতের নিবেদনের ভাষা মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। অকস্মাৎ শিবপদর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল। নিমেষে সে ফিরিয়া গেল বহুবর্ষ পূর্ব্বেকার দিনগুলিতে, যখন, দেশমাতৃকার না দেখা সন্তানগুলির দুঃখের কাহিনীতে তার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া শ্রান্তিক্লান্তিকে উপেক্ষা করিয়া এমনিভাবে পথে পথে গান গাহিয়া সেও দেশবাসীকে জানাইয়া দিত তাহাদেরই ভাইবোন অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে রোগের পীড়নে কেমন করিয়া মরিতেছে! এমনিভাবে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সেও চাঁদা তুলিত, জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে দান করিত।

খুচরা টাকা নিঃশেষ হইয়াছিল, দশটাকার নোটের শেষ সংখ্যাটি লইয়া সে ঔষধ কিনিতে যাইতেছিল। নোটটি বাহির করিয়া নিঃশব্দে ছেলেটির হাতে তুলিয়া দিল।

ছেলেরা হঠাৎ গান বন্ধ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "বন্দেমাতরম্!"

সেই শব্দে শিবপদর স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। অতীতের কল্পনাকুঞ্জের মধুস্বর্গ হইতে বর্ত্তমানের বাস্তব পৃথিবীতে নামিয়া আসিল। ছেলেটির হাতের নোটটি পকেটে চলিয়া গেল দেখিয়া শিহরিয়া সে স্মরণ করিল সেদিন মাসের মাত্র কুড়ি তারিখ এবং এই নোটটি ছাড়া একটি আর টাকাও তার বাক্সে নাই!

বিদ্যুতের ঝলকের মত আরও কতকগুলি নির্ম্মম সত্য এক মুহূর্ত্তে তার মনের ভিতর চমকাইয়া গেল। অসুস্থ সন্তানের ঔষধ এবং পথ্য, মাসের বাকী দশদিনের চাল ডাল তেল নুন—

একটা খাতা খুলিয়া ছেলেটি বলিল, "আপনার নামটি লিখে দিতে হবে অনুগ্রহ করে।"

শিবপদ বলিল, "নাম কেন?"

ছেলেটি বলিল, "দশ টাকা চাঁদা দিলে নাম লিখে নেবার নিয়ম আছে।"

শিবপদ একটা ঢোক গিলিল। বলিল, "দশ টাকা—দশ টাকা তো আমি দিই নি! এক টাকা"—ছেলেটি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাহিল।

শিবপদ চোখে চোখে তাকাইতে পারিল না, আরক্ত অবনত মুখে কোনো মতে উচ্চারণ করিল, "দশ টাকা দেবার মত অবস্থা আমার নয়, ভাই। এক টাকার বেশী দিতে পারব না।"

"ও আচ্ছা," বলিয়া ছেলেটি পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া নয়টি টাকা গুণিয়া শিবপদর হাতে দিল।

আবার গান ধরিয়া ছেলেরা অগ্রসর হইল। পাথরের মূর্ত্তির মত শিবপদ মিছিলটির দিকে চাহিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

গান যতক্ষণ শোনা গেল শিবপদ স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বাড়ীর ভিতরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

মাধবী শঙ্কিত হইয়া বলিল, "শুয়ে পড়লে যে ঠাকুরপো? শরীর ভাল নেই?"

শিবপদ কথা কহিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া কপালে হাত দিয়া মাধবী ডাকিল, "ঠাকুরপো!"

শিবপদ চোখ মেলিল। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "জীবনটাকে এক এক সময় কি মনে হয় জান বৌদি? মনে হয় অন্তরের দাবীকে আগাগোড়া ফাঁকি দিয়ে চলাই জীবনের সব চেয়ে বড় কথা!"

ত্রিশ বৎসর বয়সে যার শ্রান্তির অবধি নাই, জীবনের ভারে যৌবনেই যে নুইয়া পড়িয়াছে, তার মুখের মর্ম্মান্তিক অবসাদ-ভরা কথা! মাধবীর চোখে জল আসিল।

শিবপদ আবার বলিল, "বুঝলে বৌদি, এক এক সময় ইচ্ছা করে পালাই! সব ছেড়েছুড়ে ছুট দিই ঊর্দ্ধশ্বাসে, একেবারে সাহারা-কাহারা কোথাও গিয়ে বালির ভেতর মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকি।"

জ্বালাভরা দীপ্তিতে শিবপদর চোখ জ্বলিয়া উঠিল। নালিশ! আগুন যেমন আকাশের শূন্যতার দিকে শিখা বাড়াইয়া নালিশ জানায় তেমনি এক নালিশের ভাষা ফুটিয়া উঠিল তার দুই চোখে।

অন্তরের যে আগুন ভারচাপা পড়িয়া গেল তার কি মুক্তি নাই?

বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর চিন্তাধারা

শ্রীগোপাল হালদার

(১)

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর। কঁপিয়েনের অরণ্যানী মধ্যে সেদিনকার শীতপ্রভাত বর্ণমুখর। মিত্রশক্তির সেনাপতি মার্শাল ফস্ জার্ম্মাণ সন্ধিদূতদিগকে যুদ্ধক্ষান্তির সর্ত্তগুলি যখন শুনাইলেন, তখন সন্ধিপ্রার্থী শান্তিপ্রত্যাশী জার্ম্মাণ দূতগণ শিহরিয়া উঠিলেন, উদ্বেগ ও বিষাদে তাঁহাদের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। জেনারেল ফন্ ভিন্‌টের্য়ারফেল্‌ট্-এর মুখ পাংশু হইয়া গেল, তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। শান্তস্বরে মার্শাল ফস্ কহিলেন, "এই সর্ত্তসমূহ আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন—বাহাত্তর ঘণ্টা পরে আমি আপনাদের উত্তর শুনিব।" জার্ম্মাণদূত এয়ারৎসবের্গেয়ার কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বিধাতার নামে কহিতেছি, মসিয়ঁ লা মারেশাল! আর বাহাত্তর ঘণ্টা দেরী করিবেন না, আজই যুদ্ধ ক্ষান্ত করুন। আমাদের সৈন্যগণ উচ্ছৃঙ্খল, বলশেভিক্‌বাদ আমাদের দুয়ারে আসিয়া পড়িয়াছে—সেই বিভীষিকা বুঝি জার্ম্মেণীর বুকের উপর দিয়া ফ্রান্সে আসিয়া পড়ে!" শান্ত, কঠিন কণ্ঠে উত্তর হইল, "আপনাদের সৈন্যগণ কি অবস্থায় আছে তাহা আমি জানিতে চাহি না।" আমি জানি আজ আমার সৈন্যবর্গের সম্মুখে কি রহিয়াছে। আমার পক্ষে এই আক্রমণ হইতে এই সময়ে নিরস্ত হওয়া অসম্ভব। আমি বরঞ্চ দ্বিগুণ বলে শত্রু-আক্রমণের ও শত্রু-অনুসরণের আদেশ দিতেছি।"—বাহাত্তর ঘণ্টা পরে এফেল টাওয়ারে জার্ম্মাণ বেতারবার্ত্তা শোনা গেল—"জার্ম্মাণ সরকার ৮ই নভেম্বরের সর্ত্তগুলিতে স্বীকৃত হইলেন।" প্রত্যূষ সাড়ে পাঁচটায় হতাশ জার্ম্মাণ দূতগণ কঁপিয়েনের বনমধ্যে সেই নিদারুণ যুদ্ধবিশ্রামের পত্রে স্বাক্ষর করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন, বেলা এগারটায় কামানের ধ্বনিতে মহাযুদ্ধের অবসান বিঘোষিত হইল। তারপর হৃতবল সর্ব্বস্বহারা জার্ম্মেণী ভের্সাএ'র সন্ধিসভায় ভিক্ষুকের বেশে কৃপাপ্রার্থী হইয়া মিত্রশক্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ১৯১৯ সনের ২৮শে জুলাই জার্ম্মাণ প্রতিনিধিগণ জার্ম্মেণীর মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, সমগ্র জগৎ নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে জানিল মিত্রশক্তির কঠোর শপথ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে—"ডেলেণ্ডা এষ্ট কার্থেগো"—পৃথিবীর পট হইতে কার্থেজের মতই জার্ম্মেণীর নামও মুছিয়া গেল।

দশ বৎসর পরে আজ আবার পৃথিবী দেখিতেছে ভের্সাএ'র চিতাভস্ম হইতে নবকান্তি, নবদেহ লইয়া আর এক জার্ম্মেণী উঠিয়া দাঁড়াইতেছে—"বর্ত্তমান কালের এই চরমতম পরাজয়ের শেষে, নিদারুণ দারিদ্র্য ও ঋণভার স্কন্ধে বহন করিয়া, বৎসরের পর বৎসরের ক্ষুধাতৃষ্ণা, তিক্ততা ও অসহায়তা সহিয়া মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে ছয় কোটি মানবসন্তান একমাত্র নিজেদের শক্তি আশ্রয় করিয়া, নির্বান্ধব জীবনযাত্রায় চতুর্দ্দিককার বৈরিতা ও বিরোধিতা মাথা পাতিয়া লইয়া, আজ আবার উঠিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতির দেহে স্বাস্থ্যসুষমা ফিরিয়া আসিতেছে, বিস্মিত জগৎ তাহার কীর্ত্তিকে মানিয়া লইতেছে।"*

পরাজয়ের বজ্র মাথা পাতিয়া লইতে পারে পৃথিবীতে এইরূপ জাতি বেশী নাই। সেই বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও যে জাতি নবকান্তি লইয়া আবার জীবন-সংগ্রামে যোগদান করিতে পারে, বুঝিতে হইবে বিধাতার কঠিন পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। যাহার মধ্যে অমৃতত্বের মন্ত্র নাই, সত্যকারের স্বপ্ন ও সাধনা নাই, সে জাতি চিতাভস্মের তলেই চাপা পড়িয়া যায়; কিন্তু যাহার প্রাণ আছে, প্রাণের মন্ত্র ও সাধনা যে ভুলিয়া যায় নাই, সে একদিন রাশি রাশি ভস্ম উড়াইয়া মৃত্যুহীন মহিমায় আবার দাঁড়াইয়া উঠে। য়েনার যুদ্ধশেষে এমনি শ্মশান-

* Emil Ludwig

এই গাড়ীতে মার্শাল ফশ্ জার্মাণ দূতদিগকে সন্ধিপত্রের সর্ত্তগুলি পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন

ভস্ম উড়াইয়া ভৈরবের বেশে জার্ম্মেণী জাগিয়া উঠিয়াছিল, মহাযুদ্ধের অবসানে আবার জার্ম্মেণী সেই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র লইয়া উঠিয়া বসিতেছে। পৃথিবীর মুমূর্ষু ও মৃত্যুপাণ্ডুর জাতিদের কানে জার্ম্মেণীর এই অমৃতমন্ত্র প্রবেশ করিলে হয়ত তাহারা আজ আপনাদের ভাগ্যলিপি পরিবর্ত্তিত করিতে পারে।

আজও জার্ম্মেণীর দুর্য্যোগ রাত্রি কাটে নাই সত্য—যুদ্ধশ্রান্ত কোন্ জাতিরই বা তাহা কাটিয়াছে? তবে, জার্ম্মেণী এই নৈশ-নৈরাশ্যের নীচে অবসন্ন হইয়া বসিয়া নাই। তাই নবীন গরিমা আবার একদিন যে তাহার আননে দীপ্তি পাইবে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। সেইদিন খুব দূরেও নয়। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি আজ অবসন্ন, বিভ্রমবিভ্রান্ত; কিন্তু জার্ম্মেণীর চিরদিনকার শক্তি, তাহার কর্ম্মনিষ্ঠা, তাহার অন্তরের সত্য, তাহার দুর্ভাগ্যকে দুই হাতে গ্রহণ করিয়া জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

।২।

য়েনার পরেও জার্ম্মেণী আপনার দুর্ভাগ্যের কারণ নির্ণয়ে উদ্যোগী হইয়াছিল, আজও জার্ম্মেণীর চিন্তা ও গবেষণার জগতে অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে এই পরাজয়ের কারণানুসন্ধান। কেন জাতির এ পরাজয় ঘটিল? তাহা জানিলেই জাতিকে নূতন ভিত্তিতে দাঁড় করাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে। জার্ম্মাণ মনীষী, জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনিয়ন্তা, জার্ম্মাণ সেনাপতি ও জার্ম্মাণ দলপতি সকলেই তাই মহাযুদ্ধের এই পরিণামের কারণ খুঁজিয়াছেন। রাষ্ট্রনৈতিক চালে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রপতিদের ভুল হইয়াছে. তাহারা যদি অষ্ট্রিয়ার মত জড়তাগ্রস্ত শক্তির ভরসা না রাখিতেন, যদি বিসমার্কীয় যুগের রুশ-জার্ম্মাণ সৌহার্দ্দ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা চলিত, যদি ত্রিশক্তির মিলন পণ্ড করা যাইত, যদি মহাযুদ্ধের যুদ্ধাঙ্গন হইতে আমেরিকার বিপুল শক্তিকে নির্লিপ্ত রাখা সম্ভব হইত, তাহা হইলে জার্ম্মেণীর হয়ত এই দুর্দ্দৈব সহিতে হইত না।

কিন্তু জার্ম্মেণীর কি যুদ্ধে পরাজয়ই ঘটিয়াছে? এমন কথাও কেহ কেহ বলিতে সাহস করিয়াছেন যে, জার্ম্মেণীর পরাজয়ের ক্ষেত্র যুদ্ধাঙ্গন নয়—ভের্সাই-এর সন্ধিসভা। শাতো থিয়েরি, ভিলের ব্রিতেনিউ পথ, আররা, ভের্দাঁ, রেন্স, কেনাল্ দ্যু নর, কেনাল স্যাঁ কেঁতে, হিণ্ডেনবুর্গ লাইনের কথা, মিত্রশক্তির একশত দিনের সেই অবাধ অপরাজেয় সৈন্যপ্লাবন—এই সব জার্ম্মাণীর মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা চলিয়াছে। কেহ কেহ সমস্ত পরাজয়ের হেতু দেখিতেছেন নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহে ও সমাজ-তান্ত্রিকদের বিপ্লবে। যাহাই হউক, এই কথা স্বীকৃত

সে, এই পরাজয় জার্ম্মেণীর দুর্ভাগ্যের কথা কিন্তু জার্ম্মাণ-বাহিনীর পক্ষে লজ্জার কথা নহে।

যুদ্ধশেষে জার্ম্মেণীর সেনানায়কগণ হিণ্ডেনবুর্গ কাইজার লুডেনডর্ফ

জার্ম্মেণীর পরাজয় জার্ম্মাণ সামরিকতার পরিণাম—এই কথাও কেহ-কেহ বলিতেছেন। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের শীর্ষভাগে দাঁড়াইয়াছিলেন কাইজার—আর তাঁহার অসহনীয় দম্ভ ও দুর্দ্দম রণপিপাসার পশ্চাতে ছিল প্রশীয় ক্ষাত্রধর্ম্মী অভিজাত সম্প্রদায়। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য এই ক্ষাত্র আভিজাত্যের নীতির উপরে দাঁড়াইয়াই সদর্পে বলিতেছিল—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তাই, কূট রাষ্ট্রনীতির পরাজয়ে জার্ম্মাণগণ বিচলিত হয় নাই, তাই যখন ১৯১৪ সনের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল তখন তাহাদের আর অবসর সহিল না। ১৮৭০-র মত দুইদিনেই আবার বিজয়গর্ব্বে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব, ইহাই ছিল প্রত্যেক জার্ম্মাণের বিশ্বাস। কিন্তু যুদ্ধ যখন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বহিয়া চলিল, তখন ক্ষাত্রাভিজাত্যের শেষপরীক্ষা হইয়া গেল। জার্ম্মাণ যুদ্ধ যেমন অনিবার্য্য ছিল, জার্ম্মেণীর পরাজয়ও ছিল তেমনি অনিবার্য্য—দুয়েরই হেতু প্রশীয় ক্ষত্রিয় অভিজাতগণ।

কিন্তু, সত্যই কি জার্ম্মাণ যুদ্ধ জার্ম্মেণীর জন্যই সঙ্ঘটিত হইয়াছে? ভের্সাই-এর সন্ধিপত্রের একটি সর্ত্ত হইতে এইরূপই ধারণা জন্মে। কিন্তু বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর সমস্ত প্রচেষ্টা এই কলঙ্ক-ক্ষালনে নিয়োজিত হইয়াছে। মাসে মাসে জার্ম্মেণী বিশেষপত্রে, বিশেষ গ্রন্থে, নিজেদের ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনেতা, বিদেশীয় রাষ্ট্রদূত, ঐতিহাসিক ও মনীষীদের তথ্যপূর্ণ রচনা ও গোপন সংবাদ বাহির করিয়া তাহার এই অপরাধ ও অপযশ মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর এই উদ্যোগ, এই তৎপরতা ও এই নিষ্ঠা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, মনে মনে একটু করুণাও জাগে, একটু হাসিও পায়! পরাজয়ের লজ্জা ও দুর্ভাগ্য হইতেও যেন জার্ম্মেণীর নিকট যুদ্ধারম্ভের কলঙ্ক অসহনীয়!

জার্ম্মেণীর মিথ্যা কলঙ্ক
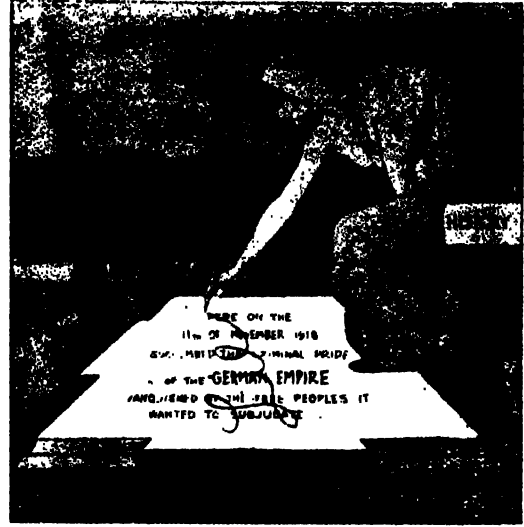
বর্ত্তমান যুগের জার্ম্মাণ ঐতিহাসিকগণ যে স্বদেশের অপযশ বিমোচনে চেষ্টিত হইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক তাঁহার গবেষণার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও মাতৃভূমিকে বিস্মৃত হন না। মমজেন্-এর বিপুল ও বিস্ময়াবহ ঐতিহাসিক সাধনার গৌণ উদ্দেশ্য ছিল, সর্ব্ববন্ধন-মুক্ত রাজশক্তিকেই জাতির বিস্তার ও বিকাশের পক্ষে শ্রেয়স্তম শক্তিকেন্দ্র বলিয়া প্রমাণ করিয়া সমসাময়িক জার্ম্মেণীর সমক্ষে একটি আদর্শ স্থাপন করা। কিন্তু বর্ত্তমান জার্ম্মেণী যে শুধু এইরূপ ঐতিহাসিক গবেষণাই করিতেছে এমন নয়,—গ্রীক ইতিহাস (বেলখ ও কারষ্টেট্-এর, এবং ভিল্‌কেন-এর মিশরের টলেমীয় যুগের ধর্ম্মব্যাখ্যান), রোমের ইতিহাস (ডেশাউ, ষ্টাইন্ প্রভৃতি), বেবিলন ও অ্যাসিরিয়ার, ইতিহাস (মাইস্‌নার্-রচিত), মিশর ও অ্যাসিরিয়ার প্রাচীন কাহিনী (মাইয়ের), য়িহুদীদের ইতিহাস (কীটেল-সঙ্কলিত), মধ্যযুগের চার্চ্চের বৃত্তান্ত (শুবার্ট রচিত)—বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর নিস্পৃহ ঐতিহাসিক

সাধনার সাক্ষী। ইঁহাদের শিষ্যের অভাব নাই, গ্রন্থের ও গবেষণারও অভাব নাই। তাহা ছাড়া ঐতিহাসিক আলোচনার অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে বর্ত্তমান যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক কাহিনী ও যুদ্ধপূর্ব্ব জার্ম্মেণী ও অন্যান্য জাতির সমসাময়িক ইতিহাস। ইতিহাসের তীব্র রশ্মিপাতে এখন অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ মেটেরনিক্ ও জার্ম্মাণ শক্তির প্রতিষ্ঠাতা বিসমার্কের জীবনেতিহাস যাচাই করা চলিতেছে। টিমে ও মেণ্ডেল্‌সোন্ বার্টোল্ডি রচিত ইয়ুরোপীয় মন্ত্রিমণ্ডলের 'রাষ্ট্রীয় সাধারণ বৃত্তান্তের' * প্রথম ছয় খণ্ড বিসমার্কের মন্ত্রিত্বকালের ইতিহাস, বাকী আটচল্লিশ খণ্ডের উপরও তাঁহারই বিরাট পুরুষকারের ছায়া। জার্ম্মেণীর বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সেই লৌহদৃঢ় মূর্ত্তিই যেন একমাত্র স্থির আশ্রয়, সম্পাদকমণ্ডলীর এবং আর্ণল্ড মাইয়েরের গবেষণারও ইহাই প্রতিপাদ্য। ট্রসিক্‌শ্‌-এর মত ঐতিহাসিক কিন্তু আবার স্পর্দ্ধাভরে বলিতেছেন যে, একচ্ছত্র রাজপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ও সমগ্র শাসনতন্ত্রকে সেই একের আজ্ঞাবহ করিয়া, বিসমার্ক নবজাগ্রত জনশক্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন। সেই স্থূল ও স্ফীত জার্ম্মাণ শাসনতন্ত্র ফ্রেডারিক দি গ্রেট্-এর মত সম্রাটের অভাবে ও বিসমার্কের মত মন্ত্রীর অভাবে ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য।

বাহিরের জগতে এই গবেষক মণ্ডলীর অপেক্ষাও বেশী পরিচিত এমিল লুডভিক্, রেণে ফিউলেপ মিলার, অস্‌ভাল্ড স্পেঙ্গলেয়ার, কাউণ্ট হার্ম্মান্ কাইজারলিং প্রমুখ মনীষিগণ। লুডভিক্ দ্বিতীয় উইলিয়ম ও বিসমার্কের যে চরিতাখ্যান লিখিয়াছেন তাহা ঠিক ইতিহাসের পর্য্যায়ে পড়ে না। ইংরেজ সাহিত্যিক লিটন ষ্ট্রেচি, ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মরোয়া ব্যক্তিবিশেষের জীবনকে বুঝিবার ও বুঝাইবার যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, লুডভিকও সেই পথেরই পথিক। তাঁহার নেপোলিয়ন ও গেটেও আদৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার খৃষ্ট জীবনী (মানব-সন্তান) বিশেষ সম্বর্দ্ধনা পায় নাই। রেণে ফিউলেপ মিলার বলশেভিজমের মন ও রূপ চিত্রিত করিয়াছেন; বোধ হয় আধুনিক কালের ইতিহাসের এই পরিচ্ছেদের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুচিন্তিত সমালোচনা। কিন্তু তাঁহার 'রাসপুটিন' সে পর্য্যায়ের নীচে। অস্‌ভাল্ড স্পেঙ্গলেয়ার সমসাময়িক ঘটনার খণ্ড-বিশ্লেষণ করিতে বসেন নাই, তিনি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণস্পন্দন গণিতেছেন। সে স্পন্দন থামিয়া আসিতেছে, পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতা যে-পথে গিয়াছে পশ্চিমের দৃপ্ত সভ্যতা তাহার গরিমার ঔদ্ধত্য লইয়া সেই পথেই চলিয়াছে। জীবন্ত 'কাল্‌চার' যখন স্থাণু 'সিভিলিজেশনে'র স্তরে আসিয়া ঠেকে, তাহার পরই সভ্যতা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে চলে। পশ্চিমের 'কাল্‌চার' আজ 'সিভিলিজেশনে' পৌঁছিয়া মৃত্যুশয্যা লইয়াছে—প্রাণতত্ত্ব ও দর্শনের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দুই খণ্ডে স্পেঙ্গলেয়ার এই কথাই প্রমাণ করিতেছেন। বোধ হয় আধুনিক জগতের সমস্ত চিন্তাবীরকে এইরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে আর কোনো মনস্বীই সাহস পান নাই। কাইজারলিঙের নাম বিশেষ কারণে আমাদের দেশেও সুপরিচিত—দার্শনিকের ভ্রমণ ডায়েরী অত্যুজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, গভীর চিন্তাশীলতায় জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধীয় মতবাদ সঙ্কলনের দ্বারাও তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনীষার আলোক বিকীর্ণ হইয়াছে সর্ব্বোপরি তাঁহার সমসাময়িক জগতের চিন্তা ও কর্ম্মধারার আলোচনায়। পৃথিবীর পুনর্গঠন, ও বর্ত্তমান ইয়ুরোপের জাতিচয়ের কর্ম্ম ও মানসিক জীবন তাঁহার আলোচ্য। তীক্ষ্ণধী, উদার মন ও ব্যাপকদৃষ্টিতে তিনি যুদ্ধান্তের ইয়ুরোপকে পরীক্ষা করিতেছেন ও তাঁহার সত্তাকে পুনঃপ্রজ্জ্বলিত করিতে চাহিতেছেন।

(৩)

অস্‌ভাল্ড স্পেঙ্গলেয়ার বা কাইসারলিঙ কিন্তু ঐতিহাসিক নহেন—ইতিহাসের বিশেষ একটি ধারা তাঁহাদের আলোচ্য—তাঁহাদের মন দার্শনিকের, তাঁহাদের দৃষ্টি জিজ্ঞাসুর। জার্ম্মেণীর সত্যকার মন আসলে ভাবুকের মন, দার্শনিকের মন—যদিও সে মন আজ বস্তুনিরপেক্ষ দর্শনের একান্ত পক্ষপাতী নয়। জার্ম্মেণী কাণ্ট ও

* Die Grosse Politik der Europaischen Kabinette 1871-1914.

ফিক্তের দেশ। এই যুগেও জার্ম্মাণ মনীষা তাহার স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হয় নাই। যুদ্ধশ্রান্ত জার্ম্মেণী কোনও নূতন নৈরাশ্যবাদ আশ্রয় করে নাই। সত্য বটে নব্য কাণ্টীয়-বাদের জীবনকাল ফুরাইয়াছে। তাঁহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে হুসেরল ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর 'ফেনোমেনোলজি'। দ্রষ্টা যে দর্শনীয় বস্তু সম্বন্ধে সচেতন হয় তাহার হেতু এই যে, সে নিজেই আপনার সেই বস্তু-জ্ঞানকে আপনি সৃষ্টি করে। তাই যে বস্তুর জ্ঞান সে সৃষ্টি করিতে পারে না তাহার সম্বন্ধে সে কিছুই জানিতেও পারে না। বস্তুজগৎ মানব-চেতনার মধ্য দিয়াই সত্য হয়, অন্যথা অলীক হইয়া যায়। ইহা হয়ত অনেকদিনকার কথা। কিন্তু এই নূতন দর্শন সেই পুরাতনবাদ হইতে অনেক বিভিন্ন। হুসেরল এই নব্য দর্শনের প্রবক্তা। গেটিঙ্গেন ও ফ্রাইবুর্গ হইতে ইহা জার্ম্মেণীর সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে, মিউনিক দার্শনিকমণ্ডলী এই বাদ সোৎসাহে গ্রহণ করিয়াছে। গুরুর পরেই এই নব্য দর্শনের নেতা মার্টিন হাইডেগ্গার।

জার্ম্মেণীর পরাজয়ের হেতু-জিজ্ঞাসায় পরাজিত জার্ম্মাণীকে দেখিতে পাওয়া যায়; সেই পরাজিত জার্ম্মেণীর নূতন সন্ধান আবার পাওয়া যায় বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর দর্শনে নহে, তাহার ধর্ম্মতত্ত্বে। সত্য বটে যুদ্ধের পূর্ব্বেই 'ঐতিহাসিক খৃষ্টের' সম্বন্ধে লোকের মন উদাসীন হইয়া উঠিতেছিল, হোলটস্‌মান, হারনাক প্রভৃতির প্রভাব খর্ব্ব হইতেছিল। হারনাক-এর 'ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিহাস' উদারনৈতিকগণ খুবই আগ্রহসহকারে বরণ করিয়াছিলেন—'স্বর্গরাজ্য' এই বর্ত্তমান সভ্যতারই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিণতি মাত্র—ঐতিহাসিক যীশু এই সভ্যতার সেই ভাবী পরিণতিরই প্রবক্তামাত্র। যুদ্ধের প্রাক্কালেই বুসে ও ভাইস-প্রমুখ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু এই মতের প্রতিবাদ আরম্ভ করেন, যুদ্ধান্তে উহা একেবারে ভাসিয়া গেল। বুল্টমানের 'যীশু'তে খৃষ্টের শিক্ষা ও বাণীকেই উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহাই যুদ্ধশেষের জার্ম্মেণীর মনের প্রতিলিপি। সহজ মানুষের গরিমায় আর তৃপ্তি নাই—অচল নিষ্ঠায় ভগবানের উদ্গীরিত 'বাণীতে' নির্ভর করাই মানুষের একমাত্র গতি। সহজ মানুষ, এই জগৎ, এই প্রচলিত ভালমন্দ—এই সকলে আর আস্থা নয়, খৃষ্টের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী, কালে-কালে মানবের অন্তরের তাগিদে যেমন রূপ লইয়াছে, তাহাতেই আস্থা রাখিতে হইবে, সেই পরিত্রাণের প্রতি-শ্রুতিতে, সেই কঠোর বিচারের আদর্শেই মানুষ পথ খুঁজিয়া পাইবে। রুডল্‌ফ অটো ইতিহাসাতীত যুক্তির অতীত সেই সত্যোপলব্ধির উপরই তাঁহার তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে স্থাপিত করিতে চাহেন। হাইলেয়ার-প্রমুখ জ্ঞানীদের উপর তাঁহার সমধিক প্রভাব। জার্ম্মাণ তত্ত্বজিজ্ঞাসা যুদ্ধের পূর্ব্বে মানুষকেই কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। যুদ্ধশেষে মানুষের বৈভব আর নাই; তাই এই তত্ত্বজিজ্ঞাসার কেন্দ্র ঈশ্বর—ঈশ্বরের উচ্চারিত বাণী, সেই পরমপ্রতিশ্রুতি—কার্ল বার্তের চমকপ্রদ গ্রন্থ 'ডগমাটিক্'-এ ইহারই ব্যাখ্যান চলিয়াছে।

(৭)

যুদ্ধকালীন তিক্ততা ও যুদ্ধশেষের আশা-নৈরাশ্যের তরঙ্গ-বিক্ষেপ জার্ম্মেণীর সাহিত্য ও শিল্পকে, বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণ নাট্যসাহিত্যকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে। 'এক্স্‌প্রেশনিজম'—প্রকাশবাদ—যুদ্ধের পূর্ব্বেই পূর্ব্ববর্ত্তী জার্ম্মাণ সাহিত্যের ন্যাচারালিজমের—প্রকৃতিবাদের—কঠিন বস্তুনিষ্ঠাকে ছাড়াইয়া উঠিতেছিল, যুদ্ধান্তের আশা-নিরাশার দ্বন্দে, ভবিষ্যতের নূতন যুগের আশায় ও অতীতের ক্লেদাক্ত যুগের তিক্তস্মৃতিতে—যে নাট্য-সাহিত্য জার্ম্মেণী সৃষ্টি করিল তাহাতে 'এক্সপ্রেশনিজমে'র ভঙ্গিমা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্যের মূল প্রেরণা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যায়ধর্ম্মী সমাজবিন্যাসের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা ও ভাবী সুদিন সম্বন্ধে অফুরন্ত আশা। ইহা তরুণ মনের বিদ্রোহের মঞ্জরী। দুর্দ্দম ঘৃণার ও অনন্ত ভরসার, ক্ষমাহীন তিক্ততার ও অবাধ স্বপ্নবিলাসের, নির্ম্মম ধ্বংসের ও সুন্দর সৃষ্টির বাণীতে এই নাট্যসাহিত্য মুখর। ঘৃণাই হউক বা আশাই হউক, যে অন্তর এই বাণী উৎসারিত করিতেছে তাহা অধীর উল্লাসে ও অস্থির উত্তেজনায় থর-থর

কম্পমান। সেই অধীরতাকেই সে প্রকাশগৌরব দিতে চাহে—প্রকাশই তাহার আর্টের একমাত্র অভীষ্ট। তাই, 'এক্‌স্‌প্রেশনিজমে'র ভাবমূল অধীর উচ্ছ্বাসে, তাহার বস্তুমূল সমাজের নূতন বিন্যাসের দাবীতে, আর তাহার রূপ খণ্ড শব্দে, খণ্ড কথায়, খণ্ডিত বাক্যে, ব্যাকরণনিয়মহীন শব্দে, উপসর্গ-যতি-হীন কথাবার্ত্তায়। ন্যাচারালিজম্ ফটোগ্রাফের দ্বারা অনুপ্রাণিত, এক্‌স্‌প্রেশনিজম মানব-মনের পলায়মান ও বিলীয়মানভাবকে ধরিতে চায়,—স্পষ্ট করিয়া নয়, যেমন করিয়া আবছা সেইসব ভাব মানব-মানসে ছোঁয়া দেয়, ঠিক তেমনি ভাবে তাহাদের রূপ দিয়া। নেচারেলিষ্টের দৃষ্টি অন্তরের কামনার গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে শ্রান্ত হইয়া আসে, এক্‌সপ্রেশনিষ্টের চক্ষু নিমীলিত—তাহার অন্তরের পটে মানবাত্মার যে গহনতম ও নিগূঢ়তম খণ্ডিত দাগ পড়ে, তাহাই তাহার আর্টের উপজীব্য। তাহার শিল্পের কেন্দ্র নিজ চেতনা—যে চেতনা একান্ত নয়, সমগ্র মানবের সমান ধর্ম্ম। তাই তাহার শিল্প ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতার কাহিনী নয়—সমগ্র মানবের সমান অভিজ্ঞতার কাহিনী, তাহাতে বিশিষ্টোপলব্ধির ইতিহাস নাই—তাহাতে ছাঁচে-ঢালা মানুষের কথা মাত্র আছে, তাই তাহার অঙ্কিত চরিত্র 'টাইপ্'—যেন গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এই সব নাটকে চরিত্রের নাম নাই—তাহারা রূপকমাত্র, যথা, পিতা, পুত্র, মা, গণিকা, নাম না জানা লোক, লম্বা টুপী-পরা ভদ্রলোক; আবার একসঙ্গে একটা শ্রেণীকেও এই নাটকের চরিত্রে পরিণত করা হয়, যেমন সৈন্যগণ, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতগণ ইত্যাদি। কাইজার, ভেরফেল, ফন্ উনরু ও টোলার এক্‌সপ্রেশনিষ্ট নাট্যকারদের অগ্রণী, ব্রাম্ এই উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গিমার চরমপন্থী লেখক। এই সকল লেখকদের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা মিল আছে। নর-নারীর অনুরাগ ইহারা বিষয়বস্তু হইতে বর্জ্জন করিয়াছেন। ইহারা সকলেই শান্তিবাদী, সকলেই শ্রমিক-বিপ্লবের কল্পনায় মত্ত। কাইজারের ডি কোরালে ও গ্যাস-এ, টোলারের মাসে-মেনশে ও ডি মাশিনেনষ্টিউর্মার-এ মানবের মুক্তিকামী আদর্শবাদী, সে যাহাদের হিত কামনা করে তাহাদেরই হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। ফন্ উনরুর (আইন গেশ্লেশ্‌ত ও প্লাত্‌জ) নাটকে সৈনিকের কর্তব্য ও ব্যক্তির বিবেকের দ্বন্দ্ব; ভেরফেলের (স্পিগেলমেনশ্) নাটকত্রয়ে একটি ত্যাগের বৈরাগ্য রাগিণী। কিন্তু ফন উনরু ও ভেরফেল দুজনেই আসলে গীতিকবি- নাট্যকার নহেন।

একসপ্রেশনিজমের শান ১৯২১ সনেই শেষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আজ তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। টেলিগ্রাফ শব্দে রচনা, সাময়িক উত্তেজনাকে সংহত করিবার শক্তির অভাব, উৎকট উচ্ছ্বাসের রূপান্তর সাধনে অক্ষমতা, শ্রমিক বিপ্লবের আলেয়া বেশীদিন টিকে নাই। এইসব নাট্যকারই আজ আবার টাইপ্-মূলক রূপক ছাড়িয়া নূতন নাট্যরচনা করিতেছেন। ঐতিহাসিক নাটকেরও ঢেউ আসিয়াছে। ফন্ উনরু, ভেরফেল প্রভৃতি ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। নব্য-বাস্তব নাটক ও নব্য ব্যঙ্গ নাটক দুইই একস্‌প্রেশনিষ্টের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া। আর্নেষ্ট ব্রুক্ষ (ডি ভেলফে) ও আর্নল্ট ব্রোনেন (অফ্‌পলাটজ্গ, ডি সিনগেণ্ড ফিস ইত্যাদি) একদিকে যৌন সম্পর্কের উৎকট ও বিকট ব্যাখ্যা দিতেছেন, হাসেনক্লেভের ব্যঙ্গ ও রঙ্গনাট্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। টোলার এখনো রঙ্গমঞ্চকে বক্তৃতামঞ্চে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—হাউপ্টম্যানের প্রতিভা এই কালের নহে।

একসপ্রেশনিজমের ধোঁয়া কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এক সময়ে ইহার জ্বালায় ধোঁয়া দেখাও যায় নাই। ইহার প্রসাদে জার্ম্মেণী জীবনের চরম ও পরমসত্যকে রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিল—সমস্ত বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও এই শ্রদ্ধেয় চেষ্টা জার্ম্মাণ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একসপ্রেশনিজমের যুগকে বড় করিয়া রাখিবে।

এই যুগের জার্ম্মেণীর সাহিত্যিক প্রতিভা কিন্তু নাট্যে নহে, উপন্যাসে। জার্ম্মাণ উপন্যাস ইতিপূর্ব্বে কোনদিন অন্য জাতির নিকট এতটা আদর লাভ করে নাই। যাহা হাউপ্টম্যান ও সুদারম্যান পান নাই, ১৯২৯-এ এক অখ্যাতনামা জার্ম্মাণ আজ তাহাই লাভ করিয়াছেন। এরিক মারিয়া রেমার্ক আঠার বৎসর বয়সে বন্ধুদের

সঙ্গে সামান্য পদাতিকরূপে পশ্চিম-সীমান্তে প্রেরিত হয়—চার বৎসর ব্যাপী সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের শেষে নির্বান্ধব ফিরিয়া রেমার্ক অনেক কিছুই করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। তাঁহার শেষ কাজ সেই অস্থির মনোবৃত্তির, এই ধ্বংসগ্রস্ত জীবনেতিহাসের মূল নির্দ্দেশ করা। 'পশ্চিম সীমান্তে সব শান্ত'---সেই ব্যাধি নির্দ্দেশ। "ইহা অভিযোগ নয়, ইহা স্বীকারোক্তি নয়, ইহা সাহসিকতার কাহিনী ত নহেই ; কারণ মৃত্যুর সঙ্গে এইরূপ মুখোমুখী নিমেষে নিমেষে যাহার হইয়াছে, সাহস তাহার প্রাণে আর থাকে না। এ শুধু তাহাদের কথা, যুদ্ধ যাহাদের প্রাণে না মারিয়া দেহমন বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।" এই দুর্দ্দান্ত, মর্ম্মন্তুদ, নিদারুণ কাহিনীর ইহাই ভূমিকা। যুদ্ধসম্পর্কীয় উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশমাত্র এই উপন্যাস শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছে। ইহাতে বেদনা, করুণা, নির্ম্মম পশুপ্রায় চেতনাহীন সৈনিকজীবনের নির্লজ্জতা, সৌহার্দ্দ্য, গভীর মানবতা, আবার উৎকট বীভৎসতা ও অশেষ ক্লান্তি এক সঙ্গে জমিয়া উঠিয়াছে। ইহা যুদ্ধ-দেবতার নগ্ন কুৎসিৎ মূর্ত্তি।

যুদ্ধ-উপন্যাসের লেখক হিসাবে প্রথম অভিনন্দিত হন 'সার্জ্জেন্ট গ্রিশার' লেখক আর্ণল্ড টুস্‌ভাইগ্‌। যুদ্ধের একটি ঘটনাখণ্ড ইহার বিষয়বস্তু। ইহাতে যুদ্ধের প্রভাব আছে, কিন্তু যুদ্ধ দেখা যায় না। তাঁহার 'ভের্দাঁ'তে হয়ত সে দৃশ্য দেখা দিবে। ফন্‌ উনরু-এর 'বলির পথ' লেখা হইয়াছিল যুদ্ধকালে কাইজারের নিমন্ত্রণে—কিন্তু ইহার ছত্রে-ছত্রে এই সেনা-নায়কের নৈরাশ্য, তিক্ততা ও ক্লান্তি এমনি উৎকট অসংযত ভাবে জমিয়া উঠে যে, উহা আর জার্ম্মাণ সেনামণ্ডলীর হাতে পৌছাইতে দেওয়া হইল না। যুদ্ধের বাস্তবতা ইহাতে আছে, কিন্তু সাহিত্যিকের সংযত শক্তি নাই।

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ব্রুনো ফ্রাঙ্ক-এর 'ফ্রেডারিক্‌ দি গ্রেট্‌' ও 'পলেটিশে নফেলে' ও (ইংরেজী অনুবাদ পার্শিয়ান্‌স্‌ আর কামিং) হয়ত যুদ্ধেরই একটি সচেতন বা অচেতন প্রভাবেই লিখিত। উপন্যাসহিসাবে ইহা সার্থক সৃষ্টি—কিন্তু হয়ত বর্ত্তমান্‌ জার্ম্মেণীর আত্মপরীক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসও ইহার সৃষ্টির মূলে কাজ করিয়াছে। ইহা যুগধর্ম্মের ফল। বর্ত্তমান যুগে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরভ্যুদয়ও এই যুগধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। এ ঐতিহাসিক উপন্যাস আর রোমান্স নয়। জীবনী যেমন চরিত্র-চিত্র ও চরিত্র-বিশ্লেষণে পরিণত হইয়াছে, রোমান্সও তেমনি যুগ-চিত্রে ও যুগ-বিশ্লেষণে রূপান্তরিত হইয়াছে। ফ্রাঙ্ক, নয়মান (সয়তান), ভাসেরমান (যৌবনের জয়), রিকার্ডা হুক্‌ (পরাজয়) ও সর্ব্বোপরি লিও ফয়েক্‌ট-ভাঙ্গের এই নূতন রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। 'কুরূপা ডাচেস্‌' চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অষ্ট্রীয়া জার্ম্মেণী লইয়া লেখা, ইহা সার্থক সৃষ্টি নহে ; কিন্তু 'জু সিউস্‌' অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা ক্ষুদ্র জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের নিখুঁত প্রতিলিপি এবং উহাকে অবলম্বন করিয়া তৎকালীন সমগ্র যুগ-জীবনের একটি চিত্র। ষ্ট্রেচি, মোরোয়া, লুডভিক যেমন চরিতাখ্যানের হাওয়া বদলাইয়াছেন, ফয়েক্‌টভাঙ্গেরও তেমনি স্বদেশে ও বিদেশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের লুপ্তধারাকে বালুশয্যা হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ কবিরাও যুদ্ধোন্মত্ততা ও যুদ্ধশেষের তিক্ততার ধূপে কাবালক্ষ্মীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ ধূপের গন্ধ ক্ষণস্থায়ী। উহার উৎকট মাদকতা শেষ হইয়া গিয়াছে। শুধু ষ্টেফান জর্জ্জের 'যুদ্ধ' আজও বাঁচিয়া আছে, কারণ উহার সুর উন্মত্ততায় বাঁধা নহে, গভীর উদার রাগিণীতে। তেমনি করিয়া যুদ্ধশেষের বহুশত প্রোলে-টেরিয়ান কবি দিনমজুরের দৈন্য ও গ্লানিকে এক্স-প্রেশনিষ্ট কবিতায় ফুটাইতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু টোলার বার্থেল, হাইনরিক্‌ লেরুশ-এর কবিতা না-ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িয়াছে। অথচ তাঁহাদের সমকালীন প্রতিভা রাইনেয়ার মারিয়া রিল্‌কের শান্ত ও অক্ষুব্ধ সুষমা আজ আবার কাসাক প্রভৃতি কবির উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। রক্তের গন্ধ, কবরের আর্দ্র বাতাস, কল-কব্জার কর্কশ শব্দ, শ্রমিকের পীড়িত স্নায়ু-বিকার, সহরের উচ্চধ্বনি-বিক্ষোভ—এই সব আর জার্ম্মেণীর তরুণ কবিকে আকর্ষণ করিতেছে না। জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করিয়া শান্ত সহজ সুরে সেই সত্যকে কাব্যে উদগীত করাই তরুণ জার্ম্মাণ কবিদের সাধনা। বিরাটের রূপে মুগ্ধ

না হইয়া জার্ম্মান সাহিত্যিক সত্যের রূপকেই প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন—ইহাই তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-সাধনার মর্ম্মকথা।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের শাস্ত্র প্রায় জার্ম্মেণীতেই গত পঞ্চাশ বৎসরে উদ্ভাবিত হইয়াছে। এখনও জার্ম্মেণীতে তাহার আলোচনা বা গবেষণা হ্রাস পায় নাই, কাণ্টের স্বদেশীয়গণ নিছক তত্ত্বালোচনার দিকেও এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সৌন্দর্য্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে জার্ম্মেণীতে যুদ্ধপূর্ব্বে যে নব্যতম 'আইনফিউলুঙ্' বা 'এমপাথি' (অনুভূতি-যোগ) বাদ প্রতিপাদিত হইয়াছিল, এখনও তাহারই বিচার ও বিশ্লেষণ চলিতেছে। ইহার মূল কথা অনেকটা এই যে শিল্পসৃষ্টির মধ্যে আমাদের হৃদয়াবেগ অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়াই আমরা আনন্দ বা রসাস্বাদন করিতে পারি; এই রসাস্বাদনে বা আনন্দে আমাদের হৃদয়াবেগ পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু এই রসের স্বরূপ বা আস্বাদ কোনো বিশেষ শিল্প-নিদর্শনের প্রকাশিত রূপের উপরেই নির্ভর করে—তাহার বাহিরে বা তাহা ছাড়াইয়া এইরূপ রসাস্বাদনের উপায় নাই। অর্থাৎ আস্বাদন অনেকাংশেই রসিকের চিত্তের ধর্ম্ম—'সাবজেক্‌টিভ',—কিন্তু আবার শিল্পের বিশেষ রূপটিরও ইহা গুণ,—অতএব 'অবজেক্‌টিভ'ও। বর্ত্তমান সৌন্দর্য্য-তত্ত্বালোচনা প্রধানত ইহার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তবে, এই রসবিচার ছাড়া নিছক রূপের দিক হইতেও সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বহুল পরিমাণে আলোচনা হইতেছে। এই দিক হইতে মিউনিকের কুর্ট ভুল্‌ফের প্রকাশিত গ্রন্থমালা ও প্রপিলেয়েন শিল্প নিদর্শনের গ্রন্থাবলী জার্ম্মাণীর শিল্প-চর্চ্চার ও শিল্প-পূজার বিস্ময়াবহ উপহার। সত্য বটে, নিছক সৃষ্টিতে ফরাসী জাতিই অগ্রণী; কিন্তু জার্ম্মাণ শিল্পীর শক্তিও অবজ্ঞেয় নহে। তাহা ছাড়া তত্ত্বালোচনায় সমস্ত জাতির মনে এতটা রুচিবোধ জাগিয়াছে যে, জার্ম্মাণীর প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যজাতের মধ্যে প্রযুক্ত শিল্পের যেরূপ উৎকর্ষ লক্ষিত হয় তাহা আর কোনো জাতিই আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

(৫)

যুদ্ধশেষের জার্ম্মেণীতে পুরাতন জার্ম্মেণীর অনেক জিনিষই পরিত্যাগের প্রয়োজন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক জার্ম্মাণ শিক্ষাপদ্ধতি ও জার্ম্মাণ যুবকান্দোলন সেই পুরাতনকেই পরিত্যাগের চেষ্টা। পুরাতন জার্ম্মেণীর শিক্ষাপদ্ধতি পৃথিবীর সর্ব্বজাতির নিকট বিস্ময় ও ভয়ের বস্তু ছিল। উহার ভিত্তি ছিল ক্ষাত্রধর্ম্ম, তাই জার্ম্মাণ ছাত্রের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল কঠোর সামরিক শৃঙ্খলায় বা সৈনিকের মনোবৃত্তির চেতনাহীন আদর্শে। এই আদর্শ যেমন কার্য্যকরী তেমনি ভয়ঙ্কর। আবার যখন এই আদর্শ খসিয়া যায় তখন এই সব শৃঙ্খলা-কবলিত মানুষ শৃঙ্খলিত অসহায় জীব হইয়া দাঁড়ায়, একেবারে কলের মানুষ হয়। এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুরু হইয়াছে অনেকদিন। ১৯০১ সনে কার্ল ফিশরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপন্থী পল্লীমুখীন 'উড়োপাখী'র দলের সূচনা হয়। তখনই রুশো ও পেষ্টালটসির প্রচারিত স্বচ্ছন্দ প্রাকৃতিক জীবন যাপন ও স্বাধীন চিত্তবিকাশের দাবী উঠে। যুদ্ধান্তে এই দাবী একেবারে কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। নূতন জার্ম্মেণীর শিক্ষাপদ্ধতি নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত। উহার প্রকার ভেদ আছে, কিন্তু আদর্শ এক।

যুবক জার্ম্মেণী কলা বা সাহিত্যের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদাসীন, তাহার প্রধান অনুরাগ রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায়। 'উড়ো পাখী'র সমাজ ১৯১৩ পর্য্যন্ত যেরূপে বিকশিত হইতেছিল তাহাতে রাষ্ট্রনীতির প্রতি ঔদাসীন্যই লক্ষিত হইত। সেকালের যুবকচিত্ত সমাজের লৌহনিগড়, রাষ্ট্রপূজা, ক্ষাত্র-আভিজাত্যের আড়ম্বর প্রভৃতির প্রতি বিরূপ হইয়া ধরণীর সহিত নিবিড়তর যোগাযোগ সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিল। তখনকার যুগ যৌবনান্দোলনের স্বপ্নময় রোমান্টিসিজ্‌মের যুগ। তখন দলে দলে জার্ম্মাণ যুবক সহর ছাড়িয়া 'গ্রামছাড়া রাঙা মাটির' পথের পরে লুটাইয়া পড়িতে গিয়াছে—দূর অরণ্যে, পাহাড়ে, নির্জ্জন পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার মাটির সহিত নিজেদের পরিচিত করিয়াছে, পল্লীবাসীর সহজ প্রাণের, সহজ গানের, সহজ জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবন মিশাইয়া সেই সভ্যতা-নিপীড়িত জীবনকে সহজসুরে বাঁধিয়াছে। সেই যুগেই জার্ম্মাণ পল্লীগীতের উদ্ধার ও জনসমাজে তাহার প্রবর্ত্তন সুরু হইল। তারপরে আসিল যুদ্ধ—'উড়ো পাখী' যেন সেই

ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মধ্যেই নীড়ের আহ্বান শুনিল। যুদ্ধ শেষ হইল—যাহারা ফিরিল তাহারা সর্ব্বনাশী নৈরাশ্য লইয়া ফিরিল। যৌবন আন্দোলন নানা রাষ্ট্রীয় দলের শাখায় পরিণত হইল। ১৯২০-এর কাছাকাছি পুরাতন আন্দোলনের রূপান্তর দেখা দিল—'উড়ো পাখী'র দল বিভিন্ন 'বুণ্ড' বা গোষ্ঠী গড়িয়া ফেলিল। বিশেষ একটি নেতার বা নেতৃসমাজের চতুর্দ্দিকে এক একটি ছোট গোষ্ঠী। তাহাদের মূলমন্ত্র এক—ইতালির ফাশিস্তদের অনুরূপ—বাধ্যতা ও সেবা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ কাটিয়া গিয়া রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের যুগ দেখা দিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কাজ চলিল ১৯২৩-২৫ পর্য্যন্ত। ১৯২৫-এ এই ঐক্য-বন্ধন প্রায় সমাপ্ত হইয়া গেল। জার্ম্মেণীর বিভিন্ন যুবকগোষ্ঠী এক যুবকসঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে। আজও তাহাদের নীতি ও রীতি বিভিন্ন, কিন্তু আদর্শে তাহারা এক। রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্র-সভার নিয়ন্ত্রণে তাহারা একমত—নব্যরাষ্ট্র গড়িতে হইবে। এই নব রাষ্ট্র ইতিহাসের আলোকপাতে ভবিষ্যতের কোলে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমানে ইহার জন্য তিনটি কাজ প্রয়োজন—যুবক সঙ্ঘকে জার্ম্মাণ শিক্ষা-পরিসদগুলি অধিকার করিয়া নিজেদের জাতির ভাবী শিক্ষাদাতার পদ গ্রহণ করিতে হইবে, জার্ম্মাণ শ্রমিক ও ধনিকের সম্পর্কটি স্বচ্ছন্দ ও সহজ করিয়া শ্রমশালাকেই পাঠশালায় পরিণত করিতে হইবে, পূর্ব্ব-ইয়ুরোপে এক নূতন অভিজাত কৃষক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়া তাহার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জার্ম্মেণীর নব্যরাষ্ট্রের স্বপ্ন এইরূপ।

(৬)

স্বপ্ন যাহাই হউক জার্ম্মাণ-জীবনের বর্ত্তমান রূপ ভুল করিবার মত নয়। তাহা একটি সহজ, কঠিন সত্য, কেবলমাত্র ভাবীকালের সুন্দর স্বপ্ন নয়। এই যুগে জার্ম্মেণীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সাহিত্যে নয়, শিল্পে নয়, তাহার পুনপ্রচলিত শেক্সপিয়রীয় গবেষণায় নয়, তাহার পরাজয়াত্মসন্ধানে ও পরাজয়-ক্ষালনে নয়, এমন কি তাহা তাহার নব্যশিক্ষা-পদ্ধতি ও নব-যৌবনান্দোলনেও সম্পূর্ণরূপে প্রকট হয় নাই। তাহার প্রতিভা আজ যেখানে একান্ত ও পরিপূর্ণরূপে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে সে 'কুল্‌টুরে'র প্রশস্তিতে নয়, সে অর্থনৈতিক পুনর্জ্জীবনের সাধনায়, সে শিল্প-বাণিজ্যের আধুনিকতম উন্নতির প্রচলনে। বর্ত্তমান জার্ম্মেণী জ্ঞানযোগী নয়, ভাবযোগী নয়, কর্ম্মযোগী। কাণ্ট-হেগেলের মানস-সন্তানদের জ্ঞান-গরিমা কর্ম্মের কঠিন শিলাখণ্ডকেই আশ্রয় করিয়া অর্থ-নৈতিক দূরদর্শিতা ও শিল্প-নৈতিক তৎপরতার রূপে দেখা দিয়াছে; ক্ষাত্র শৃঙ্খলা কর্ম্মযোগের শ্রমযুদ্ধে অপূর্ব্ব উদ্যম ও সহনশীলতা রূপে ফুটিতেছে।

বর্ত্তমান জার্ম্মেণীতে অর্থশাস্ত্রের সবিশেষ চর্চ্চা হওয়া স্বাভাবিক। অর্থসঙ্কটে জার্ম্মেণী ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দল নিজ নিজ তত্ত্বকে তখন উদ্ধারের একমাত্র পথ বলিয়া তত্ত্বপ্রচারে ও আলোচনায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। কিন্তু ধন বিজ্ঞানের আলোচনা এক কথা আর আর্থিক জীবন গড়া আর এক কথা। সেই জীবন গড়িবার পক্ষে কাজে লাগিয়াছে একটি বিশেষ প্রয়োগ-নৈপুণ্য—এই সব ধন-বৈজ্ঞানিকের পোঁয়াটে আলোচনা নয়।

জার্ম্মেণী কার্ল মার্কস-এর জন্মভূমি—যুদ্ধের পূর্ব্বেও জার্ম্মেণীর সোশ্যালিষ্ট আন্দোলন ছিল সকলের চেয়ে শক্তি-সম্পন্ন। জার্ম্মাণ বিপ্লবের মূলেও চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী সাম্যবাদীরা ছিলেন। কিন্তু স্পার্টাকিষ্টদের প্রচেষ্টাকে বার্লিন ও কিল্‌-এর পথে রক্ত-সমাধি দিয়া মধ্যপন্থী গণতান্ত্রিক সাম্যবাদীরাই জার্ম্মেণীর রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করিয়াছেন। ইঁহারা মার্কসের শিষ্য। তাই, উগ্র ও ধীর বহুবিধ সমাজতান্ত্রিকের তত্ত্বালোচনার অভাব হয় নাই। কিন্তু একটি কথা সুস্পষ্ট—মার্কস্‌-এর মানসসন্তানগণ মার্কস্‌-কথিত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যানে, ক্রমপুঞ্জিত দুর্গতির ভবিষ্যদ্বাণীতে, অদূর বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতায় আর এখন আস্থা রাখেন না। তাঁহার এই সকল তত্ত্ব সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দল তাঁহাদের ১৯২৫ সনের হাইডেলবেয়ার্গ সম্মেলনের কার্য্যক্রম হইতে বর্জ্জন করিয়াছেন। সাম্যবাদের তত্ত্বভাগ ও ইতিহাস-ভাগ, দুইই বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর শ্রেষ্ঠ ধন-বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক

সোম্বার্ট তাঁহার 'আধুনিক ধনতন্ত্রে' আলোচনা করিয়াছেন। ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ তাঁহার গভীর দৃষ্টি ও অধ্যয়নের প্রমাণ। তিনিও মনে করেন যে, ধনতন্ত্রের জড়তা আসিয়াছে, তাহার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা, প্রভুত্বের বাসনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উগ্রতা তাহাকে বর্ত্তমান কালেই ছাড়িতে হইবে,—ভাবীকালে ধনতন্ত্রের অন্ত হইবে; কিন্তু তাহার এখনও অনেক দেরী আছে। অধ্যাপক আডলফ্ বেবর তত্ত্বাংশই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সে আলোচনার প্রণালী অন্যরূপ। তিনি বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর বাজারের কথা, দর, শ্রম, বাণিজ্য, টাকাকড়ির সমস্যা, ইত্যাদি—এক একটি আর্থিক প্রশ্ন লইয়া ইতিহাসের আলোকে যাচাই করিয়াছেন। তিনি মুক্ত কর্ম্মশক্তি ও স্বাধীন প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী।

বাজারের উঠা-নামা ধন-বিজ্ঞানের একটি জটিল প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে পুরাতন বুলি ছাড়িয়া নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার আমেরিকার কীর্ত্তি। অধ্যাপক ভাগেমান এই সম্পর্কে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তবে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এখনও অসম্ভব। এইরূপ সমস্যা আমেরিকা ও জার্ম্মেণী কি চোখে দেখে অধ্যাপক মহাশয় তাহার তুলনা করিয়াছেন। আমেরিকার নিকট আর্থিক জীবন যেন একটি যন্ত্র মাত্র; জার্ম্মেণীর নিকট ইহা প্রাণ-বিজ্ঞানের একটি প্রশ্নরূপে গণ্য।

বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর অর্থনৈতিক জীবন তত্ত্বালোচনা বা আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে না—তাহা নির্ভর করে আর্থিকজীবনের পুনর্গঠনে অর্থাৎ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের উপর। বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর ভাবনার বিষয়—'রেশেনালিজেশন'—উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি-বিধান, শ্রমিক-ধনিকে সহযোগিতা, ট্রেড-ইয়ুনিয়নের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ, ট্রাষ্ট ও কার্টেলে বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের একীকরণ ও তাহাদের পরিচালনা, শিল্পের ও ব্যাঙ্কের সম্বন্ধের যথোচিত নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি। তাই, জার্ম্মেণীর আর্থিক জীবনে ও অর্থ-জিজ্ঞাসায় শিল্প-নেতাদের আসন এই সব অধ্যাপকদেরও উপরে। সোম্বার্ট বা বেবরও রেশেনালিজেশন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয়ে বার্লিন চেম্বর অফ্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ বেশী প্রামাণিক। এই গ্রন্থ জার্ম্মাণ শিল্পনেতা, অধ্যাপক, রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞগণের লিখিত সতেরটি প্রবন্ধের সমষ্টি। নবশিল্পযুগের নানা দিক তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন।

জার্ম্মেণী মুক্ত কণ্ঠে একথাটা স্বীকার করে যে, 'রেশনালিজেশন' এই শব্দ ও জিনিস, দুইই আমেরিকার। ফ্রেডারিক্ টেইলর ও হেনরি ফোর্ড—ইঁহারাই এই নূতন পন্থার পথ-প্রদর্শক। টেইলরের 'বিজ্ঞানসম্মত শিল্প-ব্যবস্থার নীতি' ১৯১১ সনে প্রকাশিত হয়। উহাতে খুব ব্যাপক আলোচনা নাই; কিন্তু উহাতেই এই বিষয়ের পথ-নির্দ্দেশ করা আছে। আমেরিকান শিল্প-বাণিজ্যের অকল্পনীয় উন্নতি ও বিস্তৃতি একদিকে টেইলরের নাম, অপরদিকে প্রয়োগ কুশলী কর্ম্মবীর ফোর্ডের নাম পৃথিবীতে অক্ষয় করিয়াছে। জার্ম্মাণ শিল্পনেতাদের বিশ্বাস, ইঁহাদের নীতি আশ্রয় করিলেই জার্ম্মেণীও আমেরিকার মত সমৃদ্ধির অধিকারী হইবে। রেশনালিজেশন প্রয়োগ-কুশলতা,—ধনতত্ত্ব নয়। জার্ম্মেণীতে ইহার প্রবর্ত্তন একটি কারণে সহজ হইয়াছে। যুদ্ধের পরেই জার্ম্মেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনাধিকারিগণ স্বেচ্ছায় সহযোগী হইয়া এক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, (কার্টেল) গড়িয়াছিলেন। এইরূপ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন, তদারক ও সরবরাহ, সব কাজই অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে, কম সময়ে ও কম খরচে সম্ভব হয়। বহুল-উৎপাদনের সুবিধা অনেক। আবার উন্নত প্রণালীর যন্ত্র প্রবর্ত্তনেও ইহারা অগ্রবর্ত্তী হয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান টাকার অভাবে সেইরূপ যন্ত্র সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। তাই সুবৃহৎ শিল্পকেন্দ্র এই নবশিল্প-নীতির প্রথম কথা। জার্ম্মেণীতে ক্ষেত্র তৈয়ারীই ছিল, তবে সত্যকারের রেশনালিজেশন-এর প্রবর্ত্তন হয় ১৯২৫ এ, যখন আর্থিক সর্ব্বনাশের শেষে জার্ম্মেণীতে 'শিল্প পুনর্গঠন পরিষদের' প্রতিষ্ঠা হইল। বড় বিশেষজ্ঞের ছোট ছোট সমিতি লইয়া এই পরিষদ গঠিত; এই কেন্দ্র-পরিষদের সহিত বিভিন্ন শাখা-সমিতির যোগ আছে, প্রয়োজনানুসারে তাহারা পরামর্শ দেয় ও শ্রমিক অদল-বদলের ব্যবস্থা করে। পরিষদ অবশ্য সরকারী সাহায্যে প্রতিপালিত, কিন্তু উহার আত্মকর্তৃত্ব আছে। এখন এই পরিষদ

ছাড়াও অনেক প্রতিষ্ঠান রেশনালিজেশন-নীতি প্রচারে ও প্রচলনে সহায়তা করে; জার্ম্মেণীর বিশ্ব-বিদ্যালয়, বৃত্তি-শিক্ষালয় ও বাণিজ্য-বিদ্যালয়গুলির সহিত এইরূপ অনেক সমিতি সংযুক্ত আছে। রেশনালিজেশন্-এর মূলমন্ত্র খরচ-সঙ্কোচ, তাহা হইলেই উৎপন্নজাত সস্তা হইবে, তাহার চাহিদা বাড়িবে ও শিল্প-বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করিবে। এই উদ্দেশ্য তিন উপায়ে আয়ত্ত করা সম্ভব—উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া, শ্রমশক্তির অপচয় নিবারণ করিয়া, এবং দুইই যথাক্রমে বাড়াইয়া। ধন-শক্তির মত শ্রমশক্তিকেও কেন্দ্রীভূত করিলে, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা অসঙ্কোচে প্রবর্ত্তন করিলে, এবং পুরাতন কলকব্জার মায়া ছাড়িয়া নূতন যন্ত্র গ্রহণ করিলে অনেক অপচয় নিবারিত হয়। জার্ম্মাণ শিল্পে তাহাই হইয়াছে—ব্রিটিশ শিল্পে আজও তাহা হয় নাই। রসায়ন ব্যবসায়ে লর্ড মেলচেট্-প্রমুখ ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় ধন-সহযোগ সম্ভব হইয়াছে, বস্ত্র-শিল্পে ম্যাঞ্চেষ্টর, ল্যাঙ্কেশায়ার ইহার চেষ্টায় আছে, কয়লার খনিতে কোনরূপ উন্নতির আশাই ইংলণ্ড দেখিতেছে না অথচ রুহ্‌রে জার্ম্মাণ কয়লার ব্যবসায় রেশনালিজেশনের ফলে ও অন্যান্য কারণে সুসমৃদ্ধ। রেশনালিজেশন শিল্প-বিপ্লবের নূতন রূপ—ইহার কথা অপচয় নিবারণ, অর্থাৎ উপযোগিতা বৃদ্ধি; ইহা অনেকাংশেই উৎপাদন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন, অর্থাৎ—প্রয়োগ-বিদ্যার উন্নয়ন।

শিল্প-বিপ্লব যেমন করিয়া কারিগরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে রেশনালিজেশনেও তেমনি নূতন নূতন যন্ত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা কমিয়াছে। বেকার শ্রমিকের পৃথিবীব্যাপী সমস্যা রেশনালিজেশানে বাড়িবে, না কমিবে? অভিজ্ঞ জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ মনে করেন, প্রথমাবস্থায় অনেক মজুর কাজ হারাইলেও যন্ত্র-প্রবর্ত্তনে মজুরের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ে। জার্ম্মাণ মজুর রেশনালিজেশনের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। তাহা ছাড়া, ইহার প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সাহায্যে উৎপন্নজাতের দাম না কমাইয়া যদি স্বার্থান্বেষী ধনিককুল নিজেরা লাভবান হইতে চাহেন, তাহা হইলেও সেই লাভ খাটাইতে তাঁহারা মজুরদেরই অধিকতর সংখ্যায় নিয়োগ করিবেন। শুধু প্রথমাবস্থায় বেকার ও শেষাবস্থায় পুনর্নিয়োগের মধ্যবর্ত্তী সময় যাহাতে অল্পস্থায়ী হয় তাহাই দ্রষ্টব্য। জার্ম্মেণীতে সেই সময় মোটেই দীর্ঘ নয়।

জার্ম্মাণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দশম সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রেসিডেন্ট হিণ্ডনবুর্গ

রেশনালিজশনের আর এক দিকই ধনিক শ্রমিকের সৌহার্দ্দ্য। আজ পর্য্যন্ত শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে সন্দেহ ও মজুরী কষাকষির সম্বন্ধই সর্ব্বত্র রহিয়াছে। তাহাতে শিল্পের ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু যদি হেনরি ফোর্ডের নীতি অনুসরণ করিয়া শ্রমিক ও ধনিকের সম্পর্ক, সহৃদয়তা ও সহমর্ম্মিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহা হইলে ফোর্ডের মতই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হয়। এক দিক দিয়া হেনরি ফোর্ড বোধ হয় বর্ত্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। জার্ম্মাণীর শ্রমিকনেতা ও ধনিকনেতারা তাঁহার

শিক্ষা উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেছেন না। ট্রেড্ ইয়ুনিয়ন আন্দোলনের ধারা এখনও সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু তাহা আর বিপ্লবের পথে চলিতেছে না। ফ্রিট্জ নাফতালি ইহাদের নির্দ্দেশে 'আর্থিকগণবাদের' যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, গণশক্তি রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইলেই যে, রাষ্ট্র অধিকার করিতে পারে অথবা আর্থিক গণতন্ত্রের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা নয়। জার্ম্মাণীতেও তাহা হইতেছে না। তবে পৃথিবীর সকল জাতিই প্রায় মানিতেছে যে, ধনশক্তির হাতে আর সমাজের হিতাহিতের ও স্বাস্থ্যরোগের ভার রাখা উচিত নয়। ঐ গুলি ও মূল খাদ্যদ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণের ভার এখন সাধারণের হাতে আসা উচিত। আমেরিকাও এই নীতি অনুমোদন করে। যুদ্ধান্তের জার্ম্মাণীর আর্থিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া নাফতালি দেখিতেছেন যে, মোটের উপর আজ ব্যক্তিগত স্বার্থের অপেক্ষা সাধারণ স্বার্থ বড় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; উৎপাদন ধনিকের একচেটিয়া না রাখিয়া তাহার সম্বন্ধে ধীরে ধীরে শ্রমিককেও কথা বলিবার অধিকার দেওয়া হইতেছে, সমাজবীমা আইন বিধিবদ্ধ ও কার্য্যে পরিণত হওয়ায় ন্যায়সঙ্গত ধন-বণ্টনের ব্যবস্থাও খানিকটা প্রচলিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই সংস্কার ও সংগঠনের পথেই জার্ম্মাণ শ্রমিকের অগ্রসর হওয়া উচিত। কার্ল ট্রস্‌ভিজের গ্রন্থে ট্রেড ইউনিয়ন্ ও ধনিক-শ্রমিকতন্ত্রের তত্ত্বাংশ একটু বেশী আলোচিত হইয়াছে। তিনি ধনিক ও শ্রমিকের সমানাধিকার বিশ্বাসী। তাই ইহাদের সম্পর্ক যাহাতে সমানে-সমানে সহকারেতার সম্পর্ক হয়, তাঁহার মতে ট্রেড্ ইউনিয়ন-গুলির সেইজন্যই সচেষ্ট হওয়া উচিত। এই নব ধনিক-শ্রমিকতন্ত্র আমেরিকাতেও ধীরে ধীরে গৃহীত হইতেছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানির মত সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সহিত বৈঠকে বসিয়া পারিশ্রমিক ও শ্রমিক-নিয়োগের সর্ত্ত আলোচনা করিতেছে। ট্রেড্ ইয়ুনিয়ন ও ম্যানেজমেণ্টের মধ্যেও এইরূপ সহযোগিতার বাঁধন ক্রমেই দৃঢ় হইতেছে। ইংলণ্ডে মেলচেষ্ট-টার্ণার কথাবার্ত্তায় এই ধরণের সহকারিতার সম্পর্ক স্থাপন স্থিরীকৃত হইয়াছে—যদিও তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিতেছে না। ট্রেড ইয়ুনিয়নের নেতারা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য আর তেমন উৎসাহী নহে। নাফতালি তবু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশা রাখেন,-ট্রস্‌ভিজ মনে হয় সেই আশাও পোষণ করেন না; পোষণ করিলে তাঁহার সমাজতন্ত্র

জার্ম্মেণীর পরলোকগত রাষ্ট্রনেতা গুস্তাভ ষ্ট্রেজেমান্

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদ নহে বলিতে হইবে। ট্রস্‌ভিজ দেখিতেছেন ধনতন্ত্র দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন রূপ লইতেছে। যতদূর অনুমান করা সম্ভব তাহাতে মনে হয় যে, ইহার ভাবী রূপান্তর ধন ও শ্রমের সমন্বয় ও সংযোগ। ইঁহার মতে এই ভাবী পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ট্রেড ইয়ুনিয়নের অগ্রসর হওয়া উচিত।

(৭)

বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর ধর্ম্ম আমেরিকার ধর্ম্ম—জার্ম্মেণীর চিন্তাজগতে ও কর্ম্মজগতে আজ যে-তরঙ্গাঘাত শোনা যাইতেছে তাহার উদ্ভব আটলাণ্টিকের পরপারে। কাণ্ট ও হেগেলের জন্মভূমি, গ্যয়টে ও শিলারের স্বদেশ, জ্ঞানবৃদ্ধ জার্ম্মেণী সর্ব্বশক্তিমান্ ডলারের নিকটে অনুগত ছাত্রের মত উপস্থিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ মনস্বী কাইজারলিঙ তাঁহার স্বদেশের পরম গরীয়ান্ ভবিষ্যতে আস্থাবান।

জার্ম্মেণী জগতের বীক্ষণ-মন্দির, জার্ম্মেণী পৃথিবীর বিবেক-চেতনা। কিন্তু আজ তিনি ভয়ে ও দুঃখে স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি জার্ম্মেণীর অধ্যাত্ম চিন্তাবীরদের আমেরিকার অবস্থা ও ব্যবস্থাকেই আদর্শ বলিয়া দিনে দিনে বড় করিয়া তোলা সভয়ে লক্ষ্য করিতেছেন। তিনি বলেন, সত্য বটে সেই ভয়ানক সর্ব্বনাশের পরে জার্ম্মেণীর আর্থিক প্রতিষ্ঠা যাহাতে অবিলম্বে পুনঃস্থাপিত হয় তাহার জন্য যাহা কিছু করা প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকান্ ব্যবস্থা ও প্রণালীর প্রবর্ত্তন ও তদুপলক্ষে আমেরিকার সহিত জার্ম্মেণীর সহযোগিতাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু ইহাকে যদি জার্ম্মেণী মুক্তি-সংগ্রামের পূর্ব্বেকার আয়োজন ছাড়া বড় কিছু বলিয়া মনে করে, তবে জার্ম্মেণী অধঃপাতে যাইবে। যদি জার্ম্মেণী আমেরিকানিজম-কেই আদর্শ করে তবে জার্ম্মেণী অধঃপাতে যাইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে বহু বহু জার্ম্মানের সম্বন্ধেই আজ এই কথা সত্য। (ইয়ুরোপ ও জার্ম্মেণী, পৃঃ ১১৭)।

ক্যাণ্ট-হেগেলের জননী কি আপন আত্মার গরিমা বিস্মৃত হইবেন—জড়, বস্তুপিণ্ডের উপর আপনার ঘর বাঁধিবেন। সম্ভবত নয়, সম্ভবত এই আর্থিক জীবন গঠনের অভিজ্ঞতা, এইখানকার শৃঙ্খলা, এইখানকার কর্ম্মনিষ্ঠা লইয়া জার্ম্মেণী আবার পুরাতম 'কুলটুরে'র ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, আপনার অন্তর্জীবনের সত্যের সন্ধানে বাহির হইবে। বুঝি যে তপশ্চর্য্যা আত্মজিজ্ঞাসায় একদিন উৎসারিত হইয়াছে, তাহাই যুগবিপ্লবে অর্থ-জিজ্ঞাসার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এইখানেও—আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যেও, সেই জ্ঞানস্পৃহা, সেই কর্ম্মনিষ্ঠা সেই চিন্তাকুশলতা ও চিন্তাবীরত্বেরই সাক্ষাৎ মিলিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেই কি পৃথিবীর নেতৃত্ব ভাবযোগী জ্ঞানীর হাত হইতে কর্ম্মযোগী জ্ঞানীর হাতে চলিয়া যায় নাই? আজ তাহা হইলে এই বিলাপ কেন? জীবনের গোড়াকার কথা কি জীবিকা নয়?

কিন্তু গোড়াকার কথাই কি শেষের কথাও?

প্রশ্ন মনে জাগে যে, যে-দেশ আত্মার গরিমায় সমস্ত মধ্য-ইয়ুরোপের আকাশকে অনন্তকাল ধরিয়া উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, আজ কি আটলাণ্টিক পারের তীব্র বহ্নিচ্ছাতির নিকট তাহার সমস্ত প্রভা ও সমস্ত প্রজ্ঞা ম্লান হইয়া গেল? কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে ভাবা উচিত যে, মার্কিনের মশালে কেহ নিজের দীপ জ্বালাইলেই কি তাহার দেহমন মার্কিনের পায়ে বিক্রীত হইয়া যায়? স্মরণ রাখা উচিত যে, শিল্প-বিপ্লবের প্রথম সূচনা ইংলণ্ডে, আজ তাহা সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত; তাই বলিয়া কি পৃথিবীর সকল জাতিই মনোজগতে ইংরেজের দাস? শিল্পযুগের এই রূপান্তরের প্রারম্ভ আমেরিকায়; আর কেহ এই নবযুগের মাঙ্গলিকে যোগ দিলেই যে সে স্বধর্ম্ম হারাইবে এই আশঙ্কার কারণ কি? আমেরিকা যে তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছে তাহার জাত নাই, কারণ তাহা সত্য। জীবন্ত জাতি জাত হারাইবার ভয়ে সত্যকে এড়াইয়া যায় না—সত্যকে গ্রহণ করিবার মধ্যেই তাহার শক্তির ও প্রাণধর্ম্মের পরীক্ষা। বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর সেই পরীক্ষাই হইতেছে।

আমেরিকানিজম্ কথাটা শুনিলেই চম্‌কাইয়া উঠিতে হয়। কিন্তু, ভাল হউক, মন্দ হউক, পৃথিবীর অদূর কালের ভাগ্যলিপি বোধ হয় আজ পড়া যাইতেছে। যদি কেহ আজ সেই ভাবী জীবনের মঙ্গলশঙ্খের সন্ধান পাইত, তবে কি তাহা কানের কাছে ধরিলে তাহার মধ্যে এই আটলাণ্টিকের প্রলয়োচ্ছ্বাস, অবাধ্য বিক্ষুব্ধ কর্ম্ম-কলরোল শুনিতে পাইত না? চীনে, জাপানে, জার্ম্মেণীতে—কোথায় আজ আটলাণ্টিকের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ? তাই মনে হয়, বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর চিন্তাবীর কাইজারলিঙ্ নহেন, সে আসন রাটেনাউ-এর।

তোমারে ভুলেছি আজ

জসীমউদ্‌দীন

তোমারে ভুলেছি আজ—
সারাদিন বসি' তোমারে ভাবিব, তারি ত প'ড়েছে কাজ !
সকালে উঠিয়া বেড়াইতে যাই, নদীটির তীরে যাই—
সেইখানে তুমি নিতুই আসিতে, হাসি যে থামে না ছাই !
সেই কবে তুমি রাঙা পাও মেলে এসেছিলে নদীতীরে ;
সে পায়ের রেখা কবে মুছে গেছে ভরা বরষার নীরে ,
সেথা যে এখন ঘন কাশবন, তুমি ভাবিয়াছ বুঝি
সেই কাশবন দুহাতে সরায়ে তব পা'র রেখা খুঁজি।
বালাই প'ড়েছে, আমি সেথা রোজ এমনি বেড়াতে আসি,
কাশের পাতায় শিশির জড়ান, তাতে রোদ যায় ভাসি।
প্রথম রবির সিঁদুরিয়া রোদ, তোমার রঙীন ঠোঁটে,
কতদিন আমি দেখেছি ওমনি রাঙা রাঙা হাসি ফোটে।
তাই ব'লে আমি তোমারে ভাবিনে, কাশের ক্ষেতের পরে
কাঁচা-পাকা ধান অঝোরে ঘুমায় দেখিও স্মরণ ক'রে।
সারারাত তারা স্বপন দেখেছে, জোছনায় গাও মেলি'
বক্ষে তাদের রাতের শিশির স্বেচ্ছায় গেছে খেলি।
তোমারি গায়ের রঙখানি যেন সেই ধানক্ষেতে পাতা ,
তাই বুঝি আমি সেইখানে যাই ? এমনি হয়েছি যা-তা !!
সেইখানে বসি' দুবালি লতায় কলমীর ফুল বাঁধি—
আজো মনে আছে, কবে দিয়েছিনু তোমার গলায় সাধি ?
আজো মনে আছে—সেই কবে তুমি মঞ্জরী ধান তুলি
কানে পরেছিলে হাতে বেঁধেছিলে দুএকটি তার তুলি ?
আজো কি আমার স্মরণে রয়েছে বলেছিনু সেই কবে ?
'এমন সাজেতে যে দেখিবে তোমা, কৃষাণের রাণী কবে।'

ভুল—ভুল সখি, ও সব ভাবায় অবসর নাহি আর
পারিনে এখন সময় কাটাতে কথা লয়ে যার তার,
বিকালে কেবল বেড়াইতে যাই—নদীর তীরেই যাই,
সেখানেতে বুঝি তুমি ছাড়া আর কেহ কভু আসে নাই ?

সেই পথ দিয়ে কত লোক চলে—সেই চলা-পথ ধ'রে
চলে মহাকাল দিন রজনীর আলো-ছায়া পাখা জুড়ে।
চলে কত রবি, চলে কত চাঁদ—চলে শত গ্রহ তারা,
রেখা-লেখাহীন অনামিক পথে হইয়া আপনহারা।
দিন বলাকার বলয় ঘিরিয়া নির্মম পথ-সাপ
ঘুমায়েছে আজো গাঁয়ে পড়িল না কাহারো পায়ের দাগ।
সেই পথ দিয়ে তুমি এসেছিলে, ফুলতনু রথখানি
উড়ায়ে যাইতে ভাবিয়াছ সেথা গেছ ফুলরেখা টানি !
ভাবিয়াছ, তব গায়ের গন্ধ উড়েছিল বায়ুভরে ;
সবটুকু তার রাখিয়াছি আমি বুকের আঁচলে ধরে !
—আজো সে গন্ধ ছড়াইয়া দিবে সাঁঝের উতল বায়
এই বালুচরে একলা আমার সময় কাটিয়া যায় ?
মিথ্যা সজনী—মিথ্যা এ সব, নিজেরেই লয়ে মরি
নিজেরেই মোর সামলান দায় পরেরে কখন স্মরি ?

দূর পশ্চিম গগনের কোলে নানান মেঘের মেলা
তারি পরে বসে নানান বরণ রৌদ্রের হাসিখেলা,
সে হাসি আবার ঝরিয়া পড়েছে কতক নদীর নীরে
নদী ও আকাশ লালে লাল হাসে ধরিয়া এ-ওরে
তুমি ভাবিয়াছ সেথায় পাতিয়া রঙের ইন্দ্রজাল
তোমারে ধরিতে রোজ সন্ধ্যায় একলা কাটাই কাল
তুমি বুঝি ভাব ওই যেখানেতে দুলিতেছে ঝাউ বন,
সেখানে বসিয়া কত কি ভাবিয়া কাঁদি আমি সারাখন।
আমি বুঝি ভাবি সেই কবে তুমি ধরিয়া আমার কর
বলেছিলে, "এই ভালবাসা মোরা রাখিব জনম ভর।"
কাশের পাতায় মোর হাতখানি বাঁধিয়া তোমার হাতে
"এই বন্ধন অটুট রহিবে" বলেছিলে নিরালাতে।
আরো বলেছিলে, "এই কাশপাতা যদি বা ছিঁড়িয়া যায়
মনের বাঁধন মনেই রহিল টুটিতে দেব না তায়।"

আমি বলেছিনু,—"সোনার বন্ধু, বড় ভয় করে মোর
প্রণয়ের রাতি ঘুম না ভাঙিতে হয়ে যায় যে গো ভোর।
শিয়রে প্রদীপ জলিতেই থাকে, রজনী যে হয় বাসি
এদেশে যে সখি বাসরের রাতে বাজে বিদায়ের বাঁশী।
তুমি বলেছিলে যদি বা কখনো রজনী পোহাতে চায়
এ দুটি কোমল বাহুর বাঁধনে ফিরায়ে আনিব তায়।
আমি কয়েছিনু, "শোন গো সজনী, কাঁদে মোর ভীরু হিয়া,
বড় ভয় করে যদি বা তোমারে আর কেহ যায় নিয়া।
পদে পদে মোর কত অপরাধ, হয় ত মনের ভুলে
যদি কোনদিন ও ফুলতনুতে কোনো ব্যথা দিই তুলে,
তখন কি তুমি মোরে ছেড়ে যাবে? শোন ওগো মনোরমা,
সেদিনের সেই অপরাধ হ'তে করিবে আমারে ক্ষমা?
তুমি সুন্দর, জগত জুড়িয়া পূজামন্দির পাতি'
মন্ত্রে মন্ত্রে ডাকিতেছে তোমা পূজারীরা দিবারাতি।
মোর এই গেহে হৃদয়ের পূজা, বাতাসে ভাসিয়া হায়,
যদি কোনোদিন আর কারো গান লাগে এসে তব গায়,
এ মোর গেহের নানান ছিদ্র যদি ভক্তির পথ বেয়ে
আর কোনো কারো গান ভেসে আসে কাহারো প্রণয়ে
নেয়ে?
[illegible]খন কি তুমি মোরে ছেড়ে যাবে?" তুমি বলেছিলে হায়,
[illegible] ভয়ের দেউল গাঁথিয়া ঠকায়ো না আপনায়।
[illegible] মার ঘরের যত ফাঁক আমি বুকের আঁচল চিরে
এমনি করিয়া বাঁধিয়া রাখিব স্নেহমমতায় ঘিরে।
আর কারো গান পশিবে না হেথা, শুধু তুমি আর আমি,
তার [illegible] থ সাথে রহিবে সাক্ষ্য দীর্ঘ দিবস যামী।
তু[illegible] বিয়াছ সেদিনের সেই তরুণ তৃণের মাঠ
[illegible] কথা বক্ষে লিখিয়া আজিও করিছে পাঠ!
সেদিনের সেই শুক্নো নদীরে সাক্ষ্য মানিয়া হায়,
এমনি যে সব শুনেছিনু কথা বসিয়া তোমার ঠাঁয়।
—আজিকার নদী সে নদী ত নাই, যদিও বরষা শেষ
তবু এর বুকে লেখা নেই সখি সে সবের কোনো লেশ।
সেদিনও এমনি ছুয়েছিল সখি শূন্যের নীল মায়া
—তবু এ আকাশ সে আকাশ নয়, এর বুকে মেঘছায়া।
সেদিনও এমনি বিভোল বাতাস,—আজিকার মত নয়
—এ যেন কি ব্যথা সহিতে না পেরে কাঁদিছে ভুবনময়।

এই বালুচর,—একি সেদিনের? হায় হায় সখি হায়,
কি ব্যথারে এ যে গুঁড়ো করে আজি উড়িছে উতল বায়।
এরা কেউ তার সাক্ষ্য হবে না—নাই তারো প্রয়োজন
তুমি যদি মোরে ভুলে গেলে সখি, মোর ভোলা কতখন।

তোমারে স্মরিয়া কাঁদিতেছি আমি, চোখে পোকা
লাগিয়াছে
তাই এত জল, প্রত্যয় নাহি শুধাও না কারো কাছে?
ফুলে পোকা লাগে, বুকে পোকা লাগে—লাগে ভালবাসা
মাঝে,
এ ভবে এমন বিস্ময় কিবা চোখে যদি পোকা রাজে?
তোমারে আজিকে ভুলে গেছি আমি, বক্ষে নখর হানি'
ভাবিতেছি হায় ছেঁড়া যায় নাকি ব্যথাভরা মনখানি!
সারা দেহে আমি বালু মাখিতেছি, বালুর কঠোর ঘায়
দেখি যদি এই জীবন হইতে কারো স্মৃতি মোছা যায়।
রাতের কালিরে মুঠি মুঠি ধরে সারা গায়ে বসে মাখি,
মনে হয় এরি কুহেলী মায়ায় বেদনারে বেঁধে রাখি।

তুমি ভাবিয়াছ তোমারে ভাবিয়া রাতে ঘুম নাই মোর,
শিয়রে প্রদীপ জলিতেই থাকে আমার হয় না ভোর!
মিথ্যা এসব—কলাবন ধরি রাতের বাতাস কাঁদে,
বাঁকাচাঁদ তারে ধরিবারে চায় জোছনার মায়া ফাঁদে।
রাতের বিরহী ঝিঁঝিরা বাজায় বে-ঘুম বুকের কথা,
তারি সাথে যেন ডাক ছেড়ে কাঁদে—এ মূক মাটির ব্যথা।
তারি সাথে সাথে গান ভেসে আসে কবরের মাটি ফাঁড়ি,
সেই সুরে সুরে আমিও আমার বুকের ব্যথারে ছাড়ি।
এই ধরণীর কঠোর মাটির মহা-তার বুকে নিয়ে,
অনন্তকাল এ মাটির সনে কেঁদেছে যাদের হিয়ে
সেই সব মৃত সাথীদের সনে গলাগলি ধরি রোজ,
আরো অভিনব তীব্র ব্যথার একা আমি করি খোঁজ।
তাই রাত কাটে! আমি আছি আর আছে মোর এই ব্যথা
নাই—নাই আর অবসর নাই, ভাবিতে কাহারো কথা।

চিঠিগুলি তব বাক্সে ভরেছি। আঁটিয়াছি চাবি তাহা,
তবু ভয় হয় পাছে বা তাহারা খুলে বাহিরায় তাহা।

বারে বারে তাই খুলে খুলে দেখি পড়ে দেখি বার বার
যদি কোনো কথা কোনো ফাঁক দিয়ে হয়ে আসে কভু বার,
কাগজ জড়ায়ে বাক্সেরে চাকি যদি তারা কোনো ফাঁকে
ভালবাসি আমি, হেন কোনো কথা মনে এসে রেখা
আঁকে !
তুমি লিখেছিলে, চিঠির আখরে তুমি লিখেছিলে মোরে,
"পরাণবন্ধু, তোমারো ব্যথায় আমারো পরাণ ঝরে।"
আরও লিখেছিলে, "তুমি যদি সখা আমারে স্মরণ করি
এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাটাও সারাটি জনম ভরি।
তোমার গেহেতে যে প্রদীপ আজি জাগিয়া কাটায় রাতি
তারে ব'লে দিও মোর গেহে হেন জ্বলিছে বে-ঘুম বাতি।"
আরও লিখেছিলে, "যে প্রদীপ আজি বুকের ব্যথারে জ্বালি'
তিলে তিলে হায় নিজেরে ধরিয়া আগুনে দিতেছে ঢালি'!
তার জ্বালা দেখে পতঙ্গ সেও মরণ বরণ করে
আমি ত মানুষ, তোমার ব্যথায় কি করে রহিব ঘরে!
আমি ভাবিতেছি এই-সব কথা যদি আজ পাখা মেলি'
বাক্সের কোনো ছিদ্র বাহিয়া বাহিরেতে আসে ঠেলি!
—তাই বারে বারে তালা চাবি দিয়ে বেঁধেছি বাক্সটারে
এর কোনো কথা আর যেন কভু বাহিরে আসিতে নারে।

খুলিয়া খুলিয়া চিঠিগুলি পড়ি, যদি বা হঠাৎ করে,
এ সব কথার এক আধটি বা উড়ে যায় হাওয়াভরে!

তাই বারে বারে চিঠিতে আঁকিয়া রক্তকালির রেখা
কাগজের সাথে ভাল করে বাঁধি—তোমার সে-সব লেখা।
তুমি ভাবিও না, সাক্ষ্য মানিয়া চিঠির কয়টি পাতা
সারারাত আমি ভুল বকিতেছি আপনার মনে যা-তা,
—আমি তাহাদের লুকাইতে চাই যেন কভু কোনোমতে
সেই বিস্মৃত দেশ হ'তে তারা পারে না বাহির হ'তে।
ভাবিও না তুমি সময়ের মোর হইয়াছে বাড়াবাড়ি
প্রমাণ করিব চিঠিতে বা তুমি মিথ্যা কয়েছ জারি।
অবসর নেই। তুমি ভুলে গেছ আমিও ভুলিতে পারি
—আমার দিবসরজনী কাটিছে ফুল গেঁথে সারি সারি।
তুমি ভুলে গেছ, হয়ত তেমনি কাটিছে তোমার বেলা
আলসে এলায়ে কবরী হেলায়ে পাতিছ রূপের খেলা।
হয়ত অধরে আজিও আঁকিছ তেমনি সুঠাম হাসি
সোনা তনু বেয়ে পথে পথে তারি ছড়াইছে রাশি রাশি,
হয়ত সে মুখ আজো উচ্চারে, ভালবাসাবাসি কথা,
হয়ত তাহাই জড়ায়ে হাসিছে কত পরিণয়-লতা!
এ সব তোমারে শুধাব না আমি, অবসর নাহি মোর—
ভুলিয়া ভুলিয়া করিব যে আমি জীবন-আয়ুর ভোর!
তোমারে ভুলিব—যে আলো জ্বলিয়া স্মৃতিরে বাঁচায়ে রাখে
আজিকে তাহারে রাখিয়া যাইব জীবনের পথবাঁকে—
সুমুখে এখন নাচিবে আমার মরণের আঁধিয়ার
আমি তার মাঝে বসিয়া গাঁথিব কেবলি ভুলে'র হার।

সন্ধ্যা-মণি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গোবিন্দপুর নায়েব-সেরেস্তায় শশীর চাকরি হইয়াছিল বছর দুই আগে, এইরূপে—

একহাঁটু কাদা ভাঙিয়া পিতা শ্রীধর দুই ক্রোশ দূরে কাছারী-বাড়ী আসিয়া হাজির হইল।

কালীকিঙ্কর বসিয়া গড়্‌গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন, হাতে একটি বাংলা সংবাদপত্র। শ্রীধর দণ্ডবৎ হইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

নায়েব মহাশয় নূতন আসিয়াছেন, কিন্তু বয়সে প্রবীণ। নেহাৎ নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হে, কি মনে করে?

হাত কচলাইতে কচলাইতে বিনয়ে গলিয়া শ্রীধর কহিল,—আজ্ঞে আমার নাম শ্রীধর, পিতার নাম ঈশ্বর হরি ঘোষ। সরকারের প্রজা, বাড়ী মিস্‌চিন্দিপুর। বিঘে দশ-বারো জমি রাখি—বা দু'চার মণ ধান। পাই,

মহাজনের দেনা শোধ আর খাজানা দিতেই যায়, খেতে কুলোয় না। অবস্থাপন্ন দু'এক ঘর আত্মীয় যাঁরা আছেন—ওরে শশে, দাঁড়িয়ে রইলি যে, নায়েব-মশায়কে পেন্নাম কর্‌লি নে?

এতক্ষণে নায়েব মহাশয় তাহার পানে চাহিয়া দেখিলেন। বয়স সতের, বড়জোর আঠারো—লম্বা, দোহারা চেহারা, বেশ শক্ত-সমর্থ গড়ন। গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া, দীর্ঘ বাহু দুটির বাঁকা রেখা যেন খুদিয়া বাহির করা।

—কি নাম ওর বল্‌লে

—আজ্ঞে শশিশেখর।

গম্ভীরভাবে তিনি বলিয়া বসিলেন,—ও ছেলে তোমার ডাকাত হবে শ্রীধর।

শ্রীধর হাসিল—মনে করিয়া লইল, নায়েবিগোছের আশীর্ব্বাদ হয়ত ঐরূপ। কিন্তু চতুর ব্যক্তি কথাটার অন্য অর্থ করিয়া বলিতে পারিত যে, কালীকিঙ্কর তাঁহার হাঁপানিগ্রস্ত শীর্ণ দেহের মর্য্যাদা খেলো করিয়া স্বাস্থ্যকে এতটুকুও আমল দিতে চান না।

তিনি কহিলেন,—তোমাদের গাঁয়ে ম্যালেরিয়া নেই [illegible] বেঁচেছ।

[illegible] পূর্ব্বানুবৃত্তির জের ধরিল,—ঐ একরত্তি মাটি [illegible] রে আর কাঁহাতক্ এতগুলো লোকের পড়ে [illegible]?

—[illegible] জমি বন্দোবস্ত নেবে?

—[illegible]ল নায়েব-মশায়। টাকা কোথা যে নতুন [illegible] শশেকে সাক্ষাতে এনেছি। সরকারে ওর [illegible] হ'লে এখনকার মত রেহাই পাই।

কালীকিঙ্কর আর একবার তাহার পানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন,—বলেইছিত ও-ছেলে তোমার ডাকাত না হয়ে যায় না।

কিন্তু সে ত পরের কথা—আপাততঃ একটা ব্যবস্থা দরকার।

নায়েব-মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরে শশে, শিখেছিস্ কিছু? কোনো কাজ-কর্ম্ম?

ঘরের দেয়ালে ঠেস দেওয়া তেল-চক্‌চকে লাঠিগাছি লইয়া নিবিষ্ট মনে শশী পরীক্ষা করিতেছিল।

শ্রীধর জবাব দিল,—আজ্ঞে বাংলা ইস্কুলের পড়া শেষ করেছে। খস্‌ড়া সুমার চেকমুড়ি, সেরেস্তার সব রকম হিসাব কষতে জানে।

শশীর উপর হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়া নায়েব-মশায় কহিলেন,—দেখবো, কেমন কাজ কর্‌তে পারিস্।

তারপর শ্রীধরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—আচ্ছা, থাক তবে এখানে। ছেলেমানুষ, আমার বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া চল্‌বে।

নায়েব-মশায়ের পদধূলি লইয়া গদগদকণ্ঠে শ্রীধর কহিল,—আপনার কাছে থাকা, সে ত বটবৃক্ষের আশ্রয়। আমি ওর জন্য একেবারে নিশ্চিন্দি হলুম।

পল্লীর মেয়েরা বলিত, স্বামী-পুত্রে ভাগ্যবতী নায়েব-গিন্নীর মত এমন আর কে আছে? পরের বিষয় আলোচনায় যেমন হয়, এ-কথাও তেমনি—সত্য আংশিক মাত্র। সংসারে অভাব অনটন নাই, ছেলে দুটি মানুষ হইয়াছে, বিদেশে চাকরি ও পরিবার লইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করে, মাহিনা ছাড়া উপরি রোজগার দু' পয়সা আসিয়া থাকে—সুখের এই অনুভূতিগুলিও বিষাইয়া উঠিত, মাঝে মাঝে কুমুদিনীর কথা যখনি তাহার মনে পড়িত।

কোষ্ঠী-ঠিকুজি মিলাইয়া অ-দৃষ্ট যা-কিছু বিঘ্ন সব নিরাকরণ করিয়াই কালীকিঙ্কর মেয়ে কুমুদিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তির আক্রমণ ঘটিল একটা দৃষ্ট দিক দিয়া। রোগা টিংটিঙে ছেলে, স্বাস্থ্য ভাল নয়—প্রাণটি যেন সারাটিক্ষণ ডানা মেলিয়া আছে। বিবাহের অব্যবহিত পরেই সে অসুখে পড়িল, পূরা একটি বছর জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম চলিল—তারপর একদিন রাত্রি-শেষে তন্দ্রাকুল শ্রান্ত প্রহরীদের চোখে ধূলি দিয়া অনন্তযাত্রায় সে তরী ভাসাইল—পাথেয় লইল শুধু কুমুদিনীর শাঁখা-জোড়া আর সিঁথির সিঁদুর।

ছয় বৎসর পূর্ব্বের কথা—কুমুদিনীর বয়স তখন মাত্র চোদ্দ। ইহার পর একবার সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। শ্বশুর বৃদ্ধ, শাশুড়ী নাই,—এই বয়সেই তাহাকে গৃহস্থালীর

তার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সুতরাং দূরদেশে পিতার কর্ম্মস্থলে কয়েকটা দিন থাকিয়া যাইবার সুযোগ ঘটিত কদাচিৎ। কিন্তু এখন দেবরের বিবাহ হইয়াছে, মেজ-বৌ কাজকর্ম্মও কিছু শিখিয়াছে, তাহার উপর সংসার ছাড়িয়া দিয়া একদিন সুপ্রভাতে সে পিত্রালয়ে আসিয়া দেখা দিল।

মেয়েকে কাছে বসাইয়া মা বেশ খানিক আনন্দ দেখাইল, কিন্তু তাহার বুকের ভিতর চাপা বেদনাটি এখন তুফান তুলিতেছিল, এবং তাহারই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে মুখের হাসিটি তাহার যেন ফুৎকারে নিভিয়া গেল। চোখে আঁচল দিয়া সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—ওরে আমার কুমু রে—

কুমুদিনী সব সহিতে পারে; কিন্তু পরের কাছে নিজেকে কৃপার পাত্র করিয়া তুলিতে সে একান্ত নারাজ। বিরক্তিভরে উঠিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল,—থাম মা, আমি এখানে তোমার কান্না শুনতে আসি নি।

অল্প বয়সের গৃহিণী—গৃহকর্ম্মে তাহার মন। কয়েক মাসের জন্ত আসিয়াছে সে, কিন্তু দুদিনের মধ্যে এমন দক্ষতার সহিত কাজগুলি সব জট ছাড়াইয়া আপন হাতে গুছাইয়া তুলিল যে, এত বড় বিপর্য্যয়টি কাহারও চোখেও পড়িল না।

মাকে কহিল,—মা, তোমার সংসারে যা চাই কেবল সেটি ছাড়া আর সবই আছে। কোনো জিনিষেরই কি একটা ব্যবস্থা আছে ছাই!

লবঙ্গ মুখ ভার করিয়া কহিল,—আমি কি কর্‌বো বাছা? এ বাড়ীতে আমার কথা কি কেউ শোনে? আর উনিও হয়েছেন এমন, একটি কথা কাউকে মুখ ফুটে বল্‌বেন না।

কুমুদিনী অমনি ঘাড় নাড়িয়া ব'লে,—আমি থাক্‌তে সে হবে না মা। বাবার এই রোগা শরীর!—গিল্‌বার লোকের ত অভাব নেই। ওই যে ছেলেটা ষণ্ডার মত দেখ্‌তে, দুবেলা ঘাড় গুঁজে বসে খেয়ে যায়, ও কোন্ কর্ম্মটা করে শুনি?

একটু অবজ্ঞার সহিত হাসিয়া লবঙ্গ বলিল,—শশীর কথা বল্‌চিস্ বুঝি। ও ষাঁড়ের গোবর, কোনো কাজেলাগে না। কিছু কর্‌তে বল্‌লে হয়ত বলে বস্‌বে, পারব না।

বস্তুত এই ছেলেটিকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া, খাওয়াইয়া পরাইয়া, পরিবারভুক্ত করিবার চেষ্টা লবঙ্গ প্রথমে বিলক্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে সে বুঝিল যে, ইহার গম্ভীর প্রকৃতির তলে যে প্রবল স্বেচ্ছাশক্তির অন্তঃস্রোত শুধু নিজের উপর নির্ভর করিয়া বহিতেছিল, তাহার গতি শৃঙ্খলিত করিয়া ইচ্ছামত ঘুরানো-ফিরানো অন্তের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আসিয়া অবধি কাছারি-ঘরের একটি প্রান্ত সে অধিকার করিয়া আছে—যাহা খুসি করে, খস্‌ড়া সুমার ফেলিয়া কপাটি খেলে, যেন বিশ্বসংসারে কাহারও কাছে তাহার কোনো কিছু জবাবদিহি করিবার নাই। এই উচ্ছৃঙ্খল যুবক সম্বন্ধে কালীকিঙ্করের ভবিষ্যদ্বাণী এক-হিসাবে ফলিয়াছিল। দেখা গেল, সে ডাকাত হয় নাই বটে, কিন্তু ঐ জাতীয় আর একটি বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। বিদ্রোহী মহালের প্রজা খাজনা বন্ধ করিলে, নিশ্চিত বিপদকেও উপেক্ষা করিয়া এই নির্ভীক ব্যক্তিটি যখন দৃপ্ত তেজের গৌরবে বিদ্রোহ চূর্ণ করিয়া ফিরিয়া আসিত, তখন কালীকিঙ্করের মনের তাপ-যন্ত্রে তাহার প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রা শূন্যের দাগ ছাড়িয়া একেবারে কোথায় যে চড়িয়া বসি[illegible] তাহার ঠিকানা ছিল না।

বাড়ীর ভিতর রান্নাঘরে শশী আসিয়া আহার করি[illegible] বসিয়াছে, রোজ যেমন বসে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষে[illegible] নাই—ভাতের পাহাড় ও দুধের সাগর একনিঃশ্[illegible] শুষিয়া যেন অগস্ত্যকেও পরাস্ত করিতে চাহে। [illegible] সময় কুমুদিনী আসিয়া কহিল,—ত্যাখো, আজ কিস্তিপু[illegible] হাট। সেখানে যেতে হচ্ছে তোমায় সওদা কিন্‌তে[illegible]

যেন একটা হুকুম!

মুখ তুলিয়া শশী সকৌতুক দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কুমুদিনী ভ্রূক্ষেপও করিল না। আঁচল হইতে খুলিয়া দুইটি টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল,—এক কুড়ি মাগুর মাছ। আর-আর যা আন্‌তে হবে বল্‌ছি।

ভারি মজার একটা খেলা পাইয়াছে ঠিক সেইভাবে শশী টাকা দুটি কুড়াইয়া লইয়া একটি হাতে রাখিয়া অপরটি শূন্যে ছুঁড়িতে লাগিল।

—একজন চাকর দেব সঙ্গে, জিনিষ বয়ে আনবার জন্য।

তৎক্ষণাৎ জবাব আসিল,—ঈস্, মোটে ত ছুটো টাকা। ক'মণ আর জিনিষ হবে? আমার এই বাঁ হাতখানা দেখেচ?

পেশীগুলি স্ফীত করিয়া বাহুটি বাড়াইয়া সে হাসিয়া উঠিল।

ক্রোশ ছুই দূর কীর্ত্তিপুর হাটে গিয়া, সামনে যাহা পাইল তাহাই লইয়া, ফেলিয়া ছড়াইয়া ঝাঁকা বোঝাই জিনিষ বহিয়া সে ফিরিল যেন এক লহমার মধ্যে। তাচ্ছিল্যভরে উঠানে বোঝা নামাইয়া কহিল,—এই রইলো, আমি চল্লুম এখন। কপাটির ম্যাচ আছে,—বলিয়া এক ছুটে বাহির হইয়া গেল।

গালে হাত দিয়া কুমুদিনী বলিয়া উঠিল,—ও মা! এই জিনিষ কেনার ছিরি। শুচ্চের লঙ্কা এনেছে ভাখো।

লবঙ্গ হাসিয়া কহিল,—কেমন, বলেছিলাম না? এখন দেখ্‌লি ত ও একটা আস্ত জনোয়ার।

[illegible]দিনী ঠোঁট ছুটি চাপিয়া রহিল। জনোয়ারও না কি [illegible]ন!

[illegible]লীকিঙ্করের অসুস্থ শরীর, আহারে রুচি নাই। [illegible]নিটা বুঝি আবার বাড়িয়া উঠে। তাই, রাত্রে [illegible]কছু না খাইয়া সে উঠিয়া পড়িল।

[illegible]দিনী কাছে বসিয়াছিল। কহিল,—আজ শশীকে [illegible] পাঠিয়েছিলুম বাবা, মাগুর মাছ আন্‌তে। [illegible] লোককেও বাড়ীতে জায়গা দিয়েছ—অকম্মার [illegible]

জমিদারী কাজে কৈফিয়ৎ কাটা নায়েব-মশায়ের অভ্যাস—এখানেও সেই কৈফিয়ৎ আসিয়া জুটিল। সে কহিল,—না রে না। গুটিকতক গুণ ওর আছে।

কুমুদিনী হাসিয়া উঠিল।

—লাঠিবাজি করতে খুব মজবুত। এই ত?

কালীকিঙ্কর কহিল,—এই যে সেদিন গাঁয়ে আগুন লাগলো,—সে যেন একটা খাণ্ডব। ও ছিল, তাই না গ্রাম বাঁচ্‌লো। জলন্ত আগুনের ভেতর ঢুকে যেমন করে লোকগুলোকে টেনে টেনে বের করছিল,—বলিয়া নায়েব-মশায় ঘটনাটির একটি আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সুরু করিয়া দিলেন।

কুমুদিনীর চোখে-মুখে কৌতুক যেন আর বারণ মানিতে চায় না। সে হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল,—লঙ্কাকাণ্ডের বীর লঙ্কাকাণ্ড নিয়েই থাক্ বাবা। গেরস্ত-বাড়ীতে ওর কোনো দরকার নেই।

পরদিন শশীর আবার ডাক পড়িল। কবিরাজ-বাড়ী যাইতে হইবে না কি ঔষধ আনিতে। এই ত কাল সে যেরূপ বাজার করিয়াছে তাহা ত কাহারও দেখিতে বাকী নাই। কিন্তু কই, সেজন্ত কুমুদিনী ত তাহাকে একটি কথাও বলিল না, হিসাবটি পর্য্যন্ত চাহিল না, তাহার কাছে হিসাব-নিকাশ প্রত্যাশা নিষ্ফল, ইহা বুঝিয়াও সে যখন তাহাকে পুনরায় কাজে পাঠাইতে চাহিতেছে, তখন প্রতিবাদ করিবে শশী কি লইয়া?

সে শুধু বলিল,—এখনই যেতে হবে?

—হ্যাঁ ভাই।

জীবনে বুঝি এত মনোযোগের সহিত কোনো কাজই সে করে নাই, আজ যেমন করিল।

ইহার পর কয়দিন কাটিয়া গেছে। রোজই শশী বাড়ীর ভিতর আসে, এদিক-ওদিক চাহিয়া অপেক্ষা করে। কিন্তু কুমুদিনীর দেখা নাই, সে আর এখন তাহাকে ফাই-ফরমাস খাটিতে পাঠায় না। এই যে ছুদিন সে তাহার কাজটি করিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে কোথা যেন একটু আনন্দের হাওয়া বহিতেছিল, যাহা সে তখন বুঝিতে পারে নাই—এক্ষণে তাহারই অভাব যেন তাহার অন্তর উতলা করিয়া তুলিল।

রান্নাঘরের দিকে আজ কুমুদিনীকে আসিতে দেখিয়া অতিরিক্ত উৎসাহের সহিত সে বলিয়া উঠিল,—আজ চন্দ্রকোণার হাটের কথা মনে নেই বুঝি দিদি? টাকা দাও।

কুমুদিনী বলিল,—না ভাই। তোমার গিয়ে কাজ নেই। শম্ভুকেই পাঠাবো।

কথাটার মধ্যে একটু অবজ্ঞার রেশ শশীকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিল। সে তৎক্ষণাৎ চক্ষু রক্তবর্ণ

করিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল,—সে হবে না। যাব বলচি—যাবই। কি কি আনতে হবে হুকুম কর।

হুকুম আদায় করিবে সে জবরদস্তি করিয়া—অদ্ভুত!

কুমুদিনীর অধর-কোণে ঈষৎ হাসির বক্র রেখা বুঝিবা একটু নড়িয়া উঠিল। সে আর দ্বিরুক্তি করিল না। লম্বা একটি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া আনিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল,—জিনিষের নাম মনে না থাকে, এই ফর্দ্দ দেখে আনলেই চলবে।

কুমুদিনীর হাতে কাজগুলি উড়িয়া যায় যেন ঝড়ের মুখে শুষ্কপত্রের মত, কিন্তু সেই সঙ্গে যে পরিপাটি শৃঙ্খলার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নিপুণ শিল্পেরই মধ্যে। এত কাজ, তবু অবসরের অভাব নাই।

অপরাহ্ণে দীঘির ঘাটে কলসী-কাঁখে আর আর মেয়েদের সঙ্গে সে আসিয়া জুটে। কলসী ভাসাইয়া সাঁতার দেয়। তীরে ঘন তরুরাজির ভিতর দিয়া সূর্য্যের কণক-রশ্মি এই জলকেলি-রতার মুখের 'পরে পড়িয়া ঝলসিয়া উঠে। স্বচ্ছ জল মুখের মধ্যে পুরিয়া ফোয়ারার রঙীন ধারায় সে যেন সেই মুগ্ধ ভক্তকে উপহার পাঠায়। দীঘির বুকে ক্ষুদ্র তরঙ্গ ছুটিয়া যায়—ত্রস্ত বিহ্বল ডুবুরী-পাখীর দল পাখার ঝাপটে চারিদিক শব্দিত করিয়া তুলে।

ঘাটে সঙ্গিনীদের কথাগুলি তাহার কানে আসে—দূর সঙ্গীতের মত।

—আহা, কি অদেষ্ট নিয়েই এসেছে গা? অঙ্গে একখানা গয়না উঠলো না।

—এমন ঘর-সংসার, কিছুরই ত অভাব নেই।

—দেখেচ কিরণের মা, কি চোক মুখ। ভ্রূছুটি কেমন টানা। তোমার কিরণকেও বুঝি হার মানতে হয়।

তাহার কথা বলাবলি করিয়া ইহারা যেন এক নূতন বার্ত্তা বহিয়া আনে—চোখ মুদিয়া সে তাহা অনুভব করে। একটু বিরক্তি জাগিয়া উঠে—একটু সুখ ঝিলিক দেয়!

ঘাটে ফিরিয়া সে বলিল,—তুমি কিরণের মা?

—হাঁ মা।

—কিরণকে নিয়ে এসো আমাদের বাড়ী। চুল বেঁধে দেব।

কিরণের মা পরম আপ্যায়িত হইয়া হাসিয়া কহিল,—মা লক্ষ্মী, তোমার কাছে কিরণ যাবে, সে ত ওর ভাগ্যি।

কলসী ভরিয়া ভিজা কাপড়ে পাড়ে উঠিয়া কুমুদিনী ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কিরণের বে হয়েছে ত কিরণের মা?

কিরণের মা'র দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল,—বিয়ে আর হ'ল কৈ মা? সম্বন্ধ জোটেনি এখনো।

সন্ধ্যাকালে গা ধুইয়া বাড়ী ফিরিলে মা একবাটি তেল আর ফিতাগাছি লইয়া বসে। ডাকে,—আয় কুমু।

কুমুদিনী অমনি চোক ছুটি কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠে,—কি সর্ব্বনাশ! ও-সব আমায় দিয়ে হবে না মা। বলে, পুরুষমানুষ মাসে একটি দিন মাত্র চুল ছাঁটে, তাতেই তারা অস্থির। মেয়েমানুষের খুরে দণ্ডবৎ—ধন্যি তাদের ধয্যি!

পরের চুল বাঁধিতে এত আগ্রহ তাহার—আপন বিস্রস্ত কেশের গুচ্ছ অযত্নে কাঁদিয়া মরে। বাগানের মালী, লতামণ্ডপ সাজাইবে সে অন্যের উদ্যা[illegible] নিজের নয়!

লবঙ্গ মুখ ফিরাইয়া গোপনে অশ্রু মুছিয়া লয়।

খণ্ডচূড়ায় মেলা বসিয়াছে। লোকে লোক[illegible], দোকান-পসারের অভাব নাই। খেলনা খাবার [illegible] লণ্ঠন নাগরদোলা, সব আছে—আর আছে, [illegible] টেবিল।

রামদীন লটারিওয়ালা মাথায় পাঞ্জাবী পুরেঠা নামাইয়া রাখিয়া কেবলি হাঁকিতেছে,—চলা আও ··তীর ফেকো···কালা দাগ···এক রূপেয়া···

একটি কাঠের বোর্ড ঝুলানো। দাবার ছকের মত তাহাতে কয়টি সাদা ও কালো চৌকা ঘর। চার আনা দিয়া তীর কিনিয়া দূর হইতে কালো লক্ষ্যগুলি বিঁধিতে পারিলে পুরস্কার এক টাকা—খেলা এই।

শশী মেলায় আসিয়াছিল কুমুদিনীর ফরমাস-মত

কিছু জিনিষপত্র কিনিবার জন্য। সে এখানে-সেখানে যায়, ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখে আর দাঁড়ায়।

রামদীন হাঁকিয়া কহিল,—অর্জ্জুন জৈসো খেল্। দ্রৌপদী নেহি, লেকিন রুপেয়া তো হ্যায়।

সাহস করিয়া কেহই অগ্রসর হইল না। লটারি-ওয়ালা জনতার প্রতি চাহিয়া তাহাদের ভীরুতা কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল—ক্যা? হিয়া মরদ্ কোই নেহি হ্যায়?

ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া দম্ভভরে শশী কহিল,—কৈ দাও, দেখি তীর।

তীর লইয়া প্রথমবার শশী কালো দাগ বিঁধিয়া ফেলিল। উল্লাসে লোকেরা তাহার তারিফ করিয়া উঠিল। হাসিমুখে টাকা দিয়া রামদীন কহিল—ভাগো মৎ বাবুজি, ফিন্ খেলো।

শশী আবার খেলিল। কিন্তু সেই যে একবার তীর বিঁধিয়াছিল, তারপর আর লাগিল না। ক্রমে তাহার ঝোঁক চাপিল—এতগুলি লোকের সামনে পরাজিত হইয়া বাড়ী ফিরিবার অপমান অসহ্য মনে হইতেছিল। টাকাকড়ি যাহা ছিল সব নিঃশেষ হইয়া গেলে ঘর্ম্মাক্ত [illegible] ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া সে বাঘের মত লাফাইয়া [illegible]। দৃঢ়মুষ্টিতে রামদীনের হাত চাপিয়া ধরিয়া [illegible] করিয়া উঠিল,—বুঝেচি, সব জুচ্চুরি। দাও—[illegible] দাও।

[illegible]ামদীন রাগ করিল না, বোধ করি এই তরুণ [illegible] অসীম সাহস দেখিয়া। এও যেন একটা তামাসা [illegible]ভাবে হাসিতে হাসিতে সে কহিল,—জিতা [illegible] বাবুজি। তুম্ ভীম হও। ক্ষোভ মৎ করো, [illegible] লেও।

টাকা-হাতে শশী হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে চাহিয়াছিল যেন একটা দাঙ্গা বাধাইয়া তুলিতে। কিন্তু এমনি সুকৌশলে লোকটি রক্ষা করিয়া বসিয়াছে যে, ঐ চালটা এখন তাহার গোটা মতলবকেই বাতিল করিয়া দিল।

অভিমানে টাকা ক'টি তাহার সামনে ফেলিয়া দিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

কুমুদিনী ঘরের ভিতর ছিল। বাহির হইতে শশ[ী] ডাকিল,—দিদি!

—কি ভাই, বলিয়া উঠিয়া আসিয়া শশীর মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে সে চমকিয়া উঠিল।

কহিল,—কি হয়েছে?

মাথাটাকে ঝাকি দিয়া সোজা করিয়া শশী বলিয়া গেল,—জিনিষপত্র আনতে পারি নি। সব টাকা জুয়ে খেলে হেরেছি।

কুমুদিনী হাসিয়া উঠিল,—ও এই কথা। কাল জিনি[ষ] কিনো, টাকা দেব।

ঝরঝর করিয়া শশীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া নামিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে কহিল,—তুমিই আমার মাথাটি খাচ্চো দিদি। বাজার করতে দাও, হিসাব নে[ও] না। জুয়ো খেলে এসেছি, একটি কথাও বললে না।

মুহূর্ত্তের জন্য কুমুদিনীর মুখের 'পরে একটু বিষাদে[র] রেখা ফুটিয়া উঠিল। পরক্ষণে প্রীতি ও তৃপ্তির ক[ণা] চোখে-মুখে বিচ্ছুরিত করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—আমায় ভুবো না ভাই। তোমার কাছে যে হিসাব নিতে পারবে এমনি একটি মানুষ আমি খুঁজে বের করেছি দেখবে এসো,—বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গেল।

চুল বাঁধিবার জন্য মেয়েটি তখন দাঁতে ফিতা চাপিয়া বসিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কুমুদিনী কহিল,—দ্যাখ ত কিরণ, এই মানুষটির ভার নিতে পারবি ত?

দাঁতের ফিতা ছাড়িয়া দিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া কিরণ অমনি উঠিয়া পলাইল।

কে যেন পেরেক মারিয়া রাখিয়াছে, এমনি কাঠ হইয়া শশী দাঁড়াইয়া রহিল। একটা অপ্রত্যাশিত দিক হইতে এই যে আক্রমণ ঘটিল, তাহা এখন জুয়াখেলার তীব্র পরিবেদনাকেও অতিক্রম করিয়া তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিল।

সে কহিল,—যাও। ও-সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

—ঠাট্টা নয়। শোন, শোন।

শশী তখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেছে।

ঘাটে আসিয়া কুমুদিনী কিরণের মাকে বলিল,—আমাদের শশীকে জান ত? তার সঙ্গে কিরণের বে' দেবে গা?

কিরণের মা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। কহিল,—জোগাড় করে দাও মা লক্ষ্মী। আমি যে আর ওর পানে মুখ তুলে চাইতে পারি না।

কুমুদিনী সামনে বসিয়া ঘটা করিয়া কিরণকে খাওয়ায়—বিচিত্র বেণী বাঁধিয়া রঙ্গভরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরে, সোহাগের কথা কয়—নানারঙের শাড়ী পরাইয়া সাজাইয়া তুলে যেন প্রজাপতিটির মত, শেষে শশীকে ডাকিয়া আনিয়া দেখায়। সেই হাসি, সেই চটুল কৌতুক কোন্ নূতন উষার আলোর ঝরণা ছুটাইয়া শশীর মন হইতে কুহেলী-আবরণটিকে ধীরে ধীরে গলাইতে লাগিল।

কিরণের চিবুক ধরিয়া কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করে,—কেমন কনে', বর মনে ধরলো ত?

সে লীলাভরে মুখ ফিরাইয়া টিপি টিপি হাসে।

—কেমন বর, কনে' তোমার গোলাপ ফুলটির মত হয়েছে ত?

শশীও হাসে। ব'লে,—সে ত মালিনীর হাতযশ।...

বীণার ধ্বনির মত একটি হাসির ঝঙ্কার ও-ঘর হইতে ভাসিতে ভাসিতে দিবা-নিদ্রার মধ্যে কালীকিঙ্করের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে চমকিয়া উঠিল,—ওকি! এ ধ্বনি শুনিয়াছে সে দূর অতীতে—কোন অস্ত-রক্তিম সন্ধ্যার শেষ বিহগ-কাকলী!

বিস্মিত হইয়া লবঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিল,—ওখানে কি হচ্ছে?

লবঙ্গ কহিল,—ওমা, তা জান না বুঝি? কুমু যে কিরণের সঙ্গে শশীর বিয়ের সম্বন্ধ করছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। কহিল,—কিরণের বরাত ভালো গিন্নি!

তারপর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া উচ্চারণে জোর দিয়া কালীকিঙ্কর বলিয়া গেল,—স্বাস্থ্য, ওর মত জিনিষ নেই গিন্নি। কুমুর বিয়ের সময় ও-কথাটা ভাবা উচিত ছিল।

ওঘরে কুমুদিনী কিরণকে জোর করিয়া টানিয়া শশীর পাশে বসাইয়া দিয়াছিল।

সহাস মুখে শশী কহিল,—আঃ, কি কর দিদি।

—যুগল-মিলন দেখি। চোক্ জুড়োক।

—যে দেখে, মুক্তি হলে তারই হয়। কিন্তু যাদের মিলন তারা যে মাটির পুতুল দিদি।

—পুতুল হ'লে চলবে কেন ভাই? প্রাণের প্রতিষ্ঠা করা চাই।

তাহার গলাটা খাম্‌কা ধরিয়া আসিল।

—বল, ওকে বিয়ে কর্‌বে?

—করবো।

ভালোবাস্‌বে? আদর-যত্ন কর্‌বে?

—কর্‌বো, কর্‌বো। আঃ আর কতবার বলবো?...

কুমুদিনীর মন-মণ্ডলের চাপ লঘু হইয়া কবে কোন্ দিন যে সাম্যের বিঘ্ন ঘটিয়া গেছে, তাহা সে টেরও পায় নাই। কোথা হইতে ক্ষুদ্ধ ঝটিকার বেগ এক্ষণে যেন নববর্ষার মেঘ ঘনাইয়া আনিতে লাগিল।

পরদিন কিরণ আসিয়া দেখিল, সে বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া, মাথাটি বালিশের মধ্যে [illegible]

সে ডাকিল,—দিদি!

কুমুদিনী নড়িল না।

পাশে বসিয়া আস্তে আস্তে কিরণ [illegible] তুলিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল,—অসুখ ক[illegible] দিদি?

জোরে ঝাঁকি দিয়া হাত সরাইয়া ল[illegible] বলিয়া উঠিল,—আঃ, জালাতন! তোরা [illegible] একটুও সুস্থ থাক্‌তে দিবি নে?

তাহার কণ্ঠস্বরে কিরণ চমকিয়া উঠিল। এমন [illegible] কথা সে তাহার মুখে একটি দিনও শোনে নাই।

—আমি কি কোনো দোষ করেছি দিদি? করে থাকলে মাপ করো।

বলিয়া সে তাহার পা দু'টি স্পর্শ করিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

—না রে না। কিছু হয় নি। লক্ষ্মী দিদি আমার, তুই এখন যা চোখ মুছিয়া কিরণ ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

কুমুদিনী তেমনি পড়িয়া রহিল। সারা বিশ্বের প্রতি একটা অকারণ বিদ্বেষ তীক্ষ্ণ হিংস্র দন্ত দিয়া তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটিকে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছিল।

অতি সন্তর্পণে শশী ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডাকিতে সাহস করিল না।

কুমুদিনী পদশব্দ শুনিয়াছে, কোনো সাড়া দিল না। সে শুধু অনুভব করিতে লাগিল, যেন কাহার নিবিড় মুগ্ধ দৃষ্টির স্পর্শে তাহার সেই শয্যা-লুণ্ঠিত অপরূপ দেহ-যষ্টির মূর্চ্ছিত সৌন্দর্য্য নিমেষমধ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!

কিরণ কি-যে ভাবিয়া লইল, তাহা সে-ই জানে—সে আর আসিল না। মাঝে মাঝে শশী ঘুরিয়া যায়, কিন্তু কুমুদিনীর আর সে-হাসি নাই, সে-কথা নাই!

নিভৃতে জানালার ধারটিতে সে আজ একখানি ছবি লইয়া বসিয়াছে। স্বামীর ফটো—অনেক খুঁজিয়া বাক্সের তলা হইতে সে এটি বাহির করিয়াছিল।

নিবিষ্ট মনে ছবিটি নিরীক্ষণ করিতে করিতে অনেক কথা তাহার মনে উঠিতে লাগিল। মনে পড়িল,—সেই রুগ্ন ভঙ্গুর দেহ, চোখ দুটি উজ্জ্বল, কোন্ গহ্বরে ঢুকিয়া [illegible] বহ্নি প্রতিফলিত করিতেছে, মেজাজ যেন [illegible] কাঁটা। এই লোকটির প্রতি করুণা জাগিয়া [illegible], দেহপ্রাণ দিয়া ইহার শুশ্রূষা সে আজীবন করিতে [illegible] কিন্তু—কিন্তু, উহাই কি যথেষ্ট?

—মা লক্ষী!

[illegible]তাড়ি সে ছবিখানি লুকাইয়া ফেলিল।

[illegible] ঢুকিয়া কিরণের মা কহিল,—এবার ত বিয়ের [illegible] দিন ঠিক করে ফেল্‌তে হয় মা।

কুমুদিনী জ্বলিয়া উঠিল। কহিল,—আমি কি তোমার ঘটকী যে সব ব্যবস্থা আমার করতে হবে?

কিরণের মা অবাক হইয়া গেল। একটু থতমত খাইয়া বলিল,—ঘটকী কে বলে মা? তবে তুমিই ত সব করছো, তাই বল্‌ছিলাম।

স্বর সপ্তমে চড়াইয়া কুমুদিনী বলিয়া উঠিল,—মিছে কথা। আমি কিছু করি নি। যে বিয়ে কর্‌বে গরজ থাক্‌লে তার আছে, আমার কি?

কিরণের মা ছাড়িয়া কথা কহিবার পাত্র নয়, পাড়ায় এ খ্যাতি তাহার বিলক্ষণ ছিল। কাপড় কোমরে জড়াইয়া, মুখ বিকৃত করিয়া সে বলিল,—কি? তুমি কিছু কর নি? তবে কিরণকে আন্‌তে বুঝি রক্ত করবার জন্ত? বলি হ্যাঁ গা, গরীব ব'লে কি এমনি করেই অপদস্ত করতে হয়? কপাল পুড়েছে কি সাধে? ভগবান আছেন—

—চোপ রাও! গাল মন্দ দিও না বলচি—চীৎকার করিয়া শশী ঘরের ভিতর লাফাইয়া পড়িল। সে যে বাহিরে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই।

ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। নাসিকা স্ফীত করিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছিল। কুমুদিনীর পানে চাহিয়া তিক্তস্বরে সে বলিয়া গেল,—আমি ওদের মুখের সামনে বলচি দিদি, শুনুক ওরা—আর যার যা খুসি করুক, ওর মেয়ে আমি কিছুতে বিয়ে করবো না।

বলিয়া যেমন আচম্‌কা সে দেখা দিয়াছিল তেমনি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করিল।

সেতু ভাসিয়া গেল—কিন্তু সে ভাঙিল যেন দু' জনকেই সঙ্গে করিয়া। এই যে মাঝের আবরণটি খসিয়া পড়িয়া পরস্পরকে তাহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছে, তাহাই এক্ষণে ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশার একটি মস্ত অন্তরায় হইয়া উঠিল।

শশী আসিয়া নায়েব-মশায়কে কহিল,—আজ্ঞে আমায় একবার মহালে বেরুতে হচ্ছে কিছুদিনের জন্ত।

কালীকিঙ্কর বিস্মিত হইল,—কেন? কোথাও বিদ্রোহ হয়েছে না কি?

মাথা নীচু করিয়া শশী কহিল,—আজ্ঞে না। তহশীলদার একা মানুষ। আমার ত এখানে বেশী কাজ নেই। ভাব্‌ছিলুম, যদি তাকে কিছু সাহায্য করতে পারি।

কাজকর্ম্মে শশীর এখন মন বসিয়াছে দেখিয়া কালীকিঙ্কর আনন্দিত হইল। কহিল,—এই ত চাই বাবা, বেশ বেশ।

বাড়ীর ভিতর আসিয়া বলিল,—আর সে শশী নেই। দায়িত্ব বোঝে। ওর শীগগিরই উন্নতি হবে দেখে নিও।

কুমুদিনী সব বুঝিল—বুঝিয়া মরমে মরিয়া গেল। সে যে এখন তেমন সহজভাবে শশীর কাছে আসিতে পারে না, তাহাকে ফাই-ফরমাস্ করে না, ইহার অন্তর্নিহিত অপরাধটুকু নিজের কাছে ধরা দিয়াছে যেমন, শশীর কাছেও ত আর তাহা চাপা নাই!

মাকে কহিল,—আজ ঠাকুরপোকে চিঠি লিখে দিলাম, আমায় নিয়ে যেতে।

লবঙ্গ আকাশ হইতে পড়িল। কহিল,—বলিস্ কি কুমু? এই ত সে দিন এলি।

অযথা উষ্মার সহিত কুমুদিনী বলিয়া উঠিল,—সেদিন! তিন-তিনটে মাস কেটে গেল, তা টের পাও না বুঝি? থাকতো অমনি বড় একটা সংসার ঘাড়ে—বুঝতে!

অনেক দিন পর আজ আবার সে কলসী-কাঁখে দীঘির ঘাটে চলিল। শ্যামল ক্ষেতের ভিতর দিয়া, শিবমন্দির পূবে রাখিয়া, অশত্থগাছটির পাশ কাটিয়া যাইতে যাইতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন ঐ শূন্য কলসীটি তাহার কিসের ভারে ভরিয়া উঠিয়াছে—রাস্তার মসৃণ বালুগুলি আর তেমন নরম নাই—সূঁচের মত তীক্ষ্ন, পায়ে বিঁধে। এখানকার বন্দরে কোন্ সামগ্রী বোঝাই করিয়াছে সে? যাইবার বেলা তাহা জলে ফেলিয়া দিলেও কি আপদ চুকিবার নহে?

ঘাটে মেয়ের দল তেমনি আসিয়া জোটে—গা ধোয়, মাজে, ঘসে। যেন পূজার স্বর্ণপাত্র, বাড়ী ফিরিয়া অর্ঘ্য সাজাইতে বসিবে।

কুমুদিনীকে দেখিয়া অকস্মাৎ কেন তাহাদের কথা বন্ধ হইয়া গেল, কে জানে? কেহ মুখ ফিরাইল, কেহ টিপি টিপি হাসিল। সে জোর করিয়া দুটা-একটা কথা পাড়িতে চাহিল। কেহ জবাব দিল, কেহ দিল না।

কলসী ভাসাইয়া সে সাঁতার কাটিতে লাগিল—যেন একটি প্রাণহীন পুতুলেরই মত। তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, জগতে আজ আর তাহার কিছু গোপন নাই। কিন্তু, একদিন ত ইহারাই তাহার ব্যর্থ রূপ, ব্যর্থ যৌবন দেখিয়া কত দুঃখ করিয়াছে—তবে...আজ?

ঘাটে মেয়েদের কথাবার্ত্তা আবার সুরু হইয়াছিল। কানে আসিয়া পৌঁছিল ঠিক আগেকারই মত।

—তখনি জানতুম। দেখলে ত?

—ছি ছি, এমন কাণ্ড! কিরণের মা বলছিল—

—জানি দিদি, সব জানি। থাকলে আরও কত শুণ শুনতে পাবে।

—আহা, মেয়ে এখন বাঁচলে হয়। যে-রকম অসুখ, কিরণের মা ত কেঁদে সারা।

কুমুদিনী চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘাটে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ গা, কিরণের অসুখ বললে না? কবে থেকে?

একজন মুখরা রমণী ঘাড় বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল,—সে খবরে তোমার দরকার? নায়েবের মেয়ে আছ ত কার কি? আমার স্পষ্ট কথা - হাঁ!

কলসী পড়িয়া রহিল; কুমুদিনী চাহিয়াও দেখিল না। ভিজা কাপড়খানি সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া কিরণদের বাড়ীর পানে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল।

কিরণের মা উঠানে কি-একটা প্রলেপ বাটিতেছিল। এমন অবস্থায় তাহাকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে কহিল,—কিরণ কেমন? কোথা?

নিঃশব্দে ঘরের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করিয়া কিরণের মা চোখে আঁচল দিল।

খাটের উপর কিরণ অচেতন পড়িয়া—[illegible] এধার-ওধার নাড়িতেছে। চক্ষু মুদ্রিত, স্ফী[illegible] কি যেন সে প্রলাপ বকিতেছিল।

কুমুদিনী শুনিল, সে বলিতেছে,—খেল[illegible] পারি না দিদি। উঃ...পায়ে পড়ি...ছাড়ো।

কে যেন তাহাকে চাবুক মারিয়াছে [illegible] কয়েক পা সে পিছাইয়া আসিল। তাহার বু[illegible] গুড়গুড় করিয়া উঠিল—বুঝি এখনি এক[illegible] অগ্ন্যুৎপাৎ ঘটিয়া যায়!

অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া বাহিরে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—চিকিৎসার কি করছ কিরণের মা?

গরীব মানুষ—কি আর করিবে? কবিরাজের কাছে অবস্থা বলিয়া ঔষধ লইয়া আসে, এইমাত্র। দিনের পর দিন রাত্রি জাগিয়া সে আর পারিয়া উঠে না।

—না না, ওতে চলবে না। ওকে যে বাঁচাতে হবে। আমি আসছি এখনি।

বাড়ী আসিয়া কালীকিঙ্করের কাছে কাঁদিয়া পড়িল,—কিরণ বুঝি বাঁচে না বাবা। তুমি এখনি ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।

মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়া কালীকিঙ্কর কহিল,—আচ্ছা, আমি চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। তুই ভাবিস্ নি মা।

—আর, আর বাবা—

সে থামিয়া গেল।

—কি মা?

—শশীকে একটা খবর পাঠিয়ে দাও এখনি। কাল সকালে আমি তাকে চাই।

কালীকিঙ্কর লোক পাঠাইয়া দিল।……

পরদিন শশী আসিল। সকল কথা শুনিয়া কুমুদিনীকে কহিল,—কিরণের অসুখ, আমি কি করবো? আমায় ডেকে পাঠালে কেন?

আনতমুখে মৃদুস্বরে সে জবাব দিল,—তুমি কাছে না থাকলে আমি যে কোনো ভরসা পাই না ভাই।

তাহার চোখ ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল। সে উচ্ছ্বাস দমন করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি শশীর মুখের 'পরে নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার হাত আপন হাত দুটির মধ্যে তুলিয়া লইয়া, কাঁদ-কাঁদ স্বরে সে বলিয়া উঠিল,—আমার মিনতি রাখো ভাই। কিরণকে বাঁচাও, আমায় বাঁচাও!

হায় রে! কে জানিত, তাহার রাক্ষসীর প্রাণ সে বালিকারই কাছে জমা রাখিয়া বসিয়াছে!

শশী আর কিছু বলিল না।

ডাক্তার দুবেলা আসিয়া দেখিয়া যায়। পালা করিয়া দুজনে রাত্রি জাগে, শুশ্রূষা করে। সেই নিবিড় ঘনিষ্ঠ প্রাণের বিনিময়, দখিনা হাওয়ার মত একদিন যাহা উভয়ের মধ্যে একটা চঞ্চল আবেগ সৃষ্টি করিয়াছিল, পরার্থপরতার স্নিগ্ধ রশ্মিপাতে এখন তাহা যেন শান্ত সত্যের জ্ঞানে পরিণত হইতে চলিল।

এক পক্ষ কাটিয়া গেল। কিরণ সারিয়া উঠিয়া পথ্য করিয়াছে।

শ্বশুরবাড়ী হইতে কাল লোক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শশীকে ডাকিয়া কুমুদিনী কহিল,—আমি চললুম, শশী। কিরণকে আর একা ফেলে রেখে যেতে সাহস হয় না। ওর ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলুম।

শশী স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর তাহার মুখের প্রতি বিষণ্ণ-কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া অসহায়ভাবে বলিয়া উঠিল,—কেন তুমি আমায় এমন শাস্তি দিয়ে যাচ্ছ? আমি তোমার কি করেছি?

কুমুদিনীর মুখের সূক্ষ্ম স্নায়ুটি পর্য্যন্ত নড়িল না। শান্ত গম্ভীরভাবে শশীর হাত ধরিয়া সে কহিল,—তুমি ত জান, জীবনের অবস্থাগুলি মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হয়। ইচ্ছামত সে-সব গড়ে তোলা যায় না।……

আজ সে যেন আর কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে চায় না। লবঙ্গ তাহার চুল বাঁধিতে বসিল, সে বাধা দিল না।

চুল-বাঁধা শেষ হইলে দুই বাহু দিয়া মেয়েকে জড়াইয়া ধরিয়া মা কাঁদিয়া কহিল,—শ্বশুর-ঘর পাঠাতে তোকে আজ আমার কত আনন্দ হতো কুমু—

মাতার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কুমুদিনী আজ খুব খানিকটা কাঁদিয়া লইল।

* * * *

রেলগাড়ী ছুটিয়াছে। মেয়ে-কামরায় একটি নিরালা ধারে বসিয়া কুমুদিনী বাহির-পানে চাহিয়া রহিল। মাঠ ঘাট বৃক্ষ গ্রাম একটা অপ্রতিহত গতির সম্মুখে বাঁকিয়া-চুরিয়া পিছনে খসিয়া পড়িতেছে।

কেন এই গতি—কিসের জন্য? যাহা প্রিয় যাহা স্থির—খোলসের মত সে ত ছাড়িয়া ফেলিবার নয়! ঐ সত্যকেই সে আজ প্রাণপণ আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। যাহা-নয়-সে সেইদিকে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহাকে—কোন্ অন্ধশক্তি?

সাঁঝের আঁধার নামিয়া আসিল। বাহিরে আর কিছু দেখা যায় না, শুধু দূরে দূরে কয়টা তারা। কুমুদিনী চোখ মুদিয়া রহিল। একটা ঘর্ঘর শব্দ ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া ক্রমেই নিকটতর হইয়া আসিতেছিল।…আকাশব্যাপী বিরাট রথচক্র…ঘর্ঘর…ঘর্ঘর…

অকস্মাৎ বুকের উপর একটা ভারী বোঝার চাপে কুমুদিনীর দম বন্ধ হইয়া আসিল। ভীতদৃষ্টিতে গাড়ীর স্তিমিত আলোকে চাহিয়া দেখিল, একটি ছোট মেয়ে তাহার গায়ে ভর দিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে! তাহার দুটি চোখ বাষ্পে ভরিয়া উঠিল—সে তাহাকে জাগাইল না।

দূরে রক্তবর্ণ সিগ্‌ন্যাল জল্ জল্ করিতেছে—মণির মত! এখনই ষ্টেশন আসিয়া পড়িবে।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

১

সন ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্যবসায় উপলক্ষে আমি বোলপুরে আগমন করি। এই সময় আমার বয়ঃক্রম কিঞ্চিদূন বাইশ বৎসর মাত্র। এখানে আসিবার পূর্ব্বে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের শান্তিনিকেতনের কথা আমি শুনিয়াছিলাম। বোলপুরে থাকিলে শান্তিনিকেতনে মধ্যে মধ্যে যাইতে পারিব এবং কোনও সময়ে মহর্ষি-দেবের দর্শন লাভও ঘটিতে পারে এই আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণে প্রবল ছিল। এখানে আসিবার কয়েকদিন পরেই শান্তিনিকেতনে গেলাম। দেখিলাম প্রকাণ্ড প্রাসাদ মেরামতের অভাবে শ্রীভ্রষ্ট, আসবাব-পত্রও যৎসামান্য, উদ্যানের বৃক্ষলতাদি যত্নের অভাবে অধিকাংশই শুষ্ক ও শ্রীহীন এবং আশ্রমপ্রাঙ্গণ শুষ্ক বৃক্ষপত্র ও আবর্জ্জনাতে পরিপূর্ণ। কেবল শাল সেগুন বকুল আমলকী প্রভৃতি তরুশ্রেণী বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। আশ্রমে দুই-তিনজন মালী মাত্র অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা বলিল, কর্ত্তামহাশয় বহু দিন এখানে আসেন নাই। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষতলে বেদিকা দেখাইয়া ভৃত্যেরা বলিল, এইস্থানে কর্ত্তামহাশয় উপাসনা করিতেন। বেদীর নিম্নে কঙ্করবিস্তৃত ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষির উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। ইহার পর বিষয়-কর্ম্মের অবসর সময়ে কখন একাকী কখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব শান্তিলাভ করিতাম। এই নির্জ্জন আশ্রমের মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে আমাদের প্রাণমন স্বতঃই ভগবচ্চরণে সমাহিত হইত। কিন্তু আশ্রমের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইত। মনে হইত, মহর্ষি আর যদি এই আশ্রমে না আসেন—তাঁহার বয়স হইয়াছে—পরবর্ত্তিকালে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই পবিত্রস্থান কি ভাবে ব্যবহার করিবেন? আবার কখন কখন শুনিতাম এই আশ্রম-উদ্যান বিক্রয় করা হইবে। মহর্ষির পবিত্র সাধনাশ্রম হয়ত কোন ধনবান বিলাসীর প্রমোদকাননে পরিণত হইবে—এইরূপ চিন্তায় প্রাণে অতিশয় ক্লেশানুভব করিতাম।

সন ১২৯০ সালে, প্রায় ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে বোলপুরের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। এখনকার ন্যায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার, বহুসংখ্যক কল-কারখানা ও নানা শ্রেণীর লোক সংঘট্ট তখন কিছুই ছিল না। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। একটী মুনসেফী আদালত, তাহাতে আটনয় জন মাত্র উকিল, তাহার মধ্যে দুই জন মাত্র ইংরাজিনবিশ। প্রায় এক মাইল দূরে—বাঁদগোড়া পল্লীতে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল, কিন্তু তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়, কোন বৎসর দুই একটী ছাত্র পাশ করিত, কোন বৎসর হইত না। সাধারণের নৈতিক অবস্থাও ভাল ছিল না। ব্যভিচার ও মদ্যপান অনেকে নিন্দার বিষয় মনে করিতেন না। আমি এখানে আসিবার কিছু দিন পরে চুঁচুড়া ধর্ম্মপুর নিবাসী বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ইংরাজি স্কুলের হেড মাষ্টার ও বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় সেকেণ্ড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। একদিন নবীনবাবুর বাসায় গিয়া দেখিলাম তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকা পাঠ করিতেছেন। ক্রমে ইহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ ও আত্মীয়তা ঘনীভূত হইতে লাগিল। অবকাশকালে আমরা তিন জনে একত্র হইয়া নানা সৎপ্রসঙ্গ ও জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনায় পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলাম। ইহার পর প্রতি সপ্তাহে একত্র হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য শশী বাবুর বাসায় "বোলপুর-প্রার্থনা-সমাজ" স্থাপিত হইল।

এই সময়ে কাশী ধর্ম্মসভার কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও তদীয় সহযোগী পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির

আধ্যাত্মিক শাস্ত্র ব্যাখ্যায় বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। নানাস্থানে বহু আড়ম্বরে হরি-সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বোলপুরেও এইরূপ "হরিসভা" সংস্থাপিত হইল। তৎকালে সাধারণতঃ ব্রহ্মোপাসনার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে হরিসভার প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু বোলপুরে অন্যরূপ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইল। বাবু সারদাপ্রসাদ পাল বোলপুরের জনৈক ধর্ম্মাত্মা ন্যায়-পরায়ণ ব্যবসায়ী। তিনি কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের এত দূর অনুরক্ত ছিলেন যে, স্বীয় পুত্রের নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি বোলপুরের হরি-সভায় যোগ দিলেন না। তাঁহার অমায়িক স্বভাব ও চরিত্রগুণে আমরা তাঁহাকে বিশেষরূপ শ্রদ্ধা করিতাম, সেই শ্রদ্ধা বন্ধুতায় পরিণত হইল। তিনি উদ্যোগী হইয়া বোলপুর বারোয়ারীতলার গৃহে সাধারণ ভাবে ধর্ম্মালোচনার জন্য "ধর্ম্মসভা" স্থাপন করিলেন। প্রতি সপ্তাহে এই সভার অধিবেশন হইত। আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই সভায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গাদি করিতে লাগিলাম। সে [illegible]য় এখনকার ন্যায় গীতা গ্রন্থের ভূরি প্রচার ছিল না, [illegible]কেই এই গ্রন্থ চক্ষেও দেখেন নাই। মানকরের [illegible]দার বাবু হিতলাল মিশ্রের অর্থানুকূল্যে পণ্ডিত [illegible]নন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক সটীক ও সানুবাদ শ্রীমদ্ভগ-ব[illegible]তা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ধর্ম্মসভার জন্য [illegible]ন্থ কলিকাতার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী নামক [illegible]লয় হইতে একখানি সাত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া [illegible]তে হইয়াছিল।

আমার বোলপুর আগমনের কয়েক মাস পরে এক দিন শুনিলাম, মহর্ষিদেব শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন, অপরাহ্ণ তিনটার ট্রেণে কলিকাতা গমন করিবেন। এই সংবাদে তাঁহার দর্শনলালসায় ষ্টেশনে ছুটিলাম। দেখিলাম, ডাউন প্লাটফর্ম্মে একখানি চেয়ারে মহর্ষি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও পরিচরগণ তাঁহাকে অতিসন্তর্পণে প্রথম শ্রেণীর একটি কক্ষে উঠাইয়া দিলেন। শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত প্রশান্ত গম্ভীর সৌম্য ঋষিমূর্ত্তি নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থ হইলাম। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলাম এবং তাঁহার মুখের দুই একটি কথাও শুনিলাম, ইহাতেই আমি জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম। ইহার পর মহর্ষিদেব আর কখনও শান্তি-নিকেতনে আসেন নাই। একথা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

২

বোলপুর "হরিসভার" অধিবেশন, কালিকাপুর পটীর বারোয়ারীতলার গৃহে হইত। এখানে প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। "ধর্ম্মসভায়" আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও রামায়ণ মহাভারত হইতে আলোচনা করিতাম। অন্যত্র হইতে কোন ধর্ম্ম প্রবক্তা আগমন করিলে তাঁহারাও এই ধর্ম্মসভার গৃহে বক্তৃতা করিতেন। পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু শশিভূষণ বসু, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, নববিধান সমাজের বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেকেই এইস্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ১৮০৬ শকের (১২৯১ সালের) ১লা কার্ত্তিকের "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকার ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"পূর্ব্বে এস্থানে ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা ছিল না, বিগত চৈত্র মাসে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন প্রচারক এখানে আসেন, তার পর হইতেই ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এখন, দুইটি হিন্দুধর্ম্মসভা ও একটি প্রার্থনা-সমাজ সংস্থাপিত হইয়া প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার পর নিয়মিতরূপে উপাসনা হইতেছে, সমাজগৃহ না থাকায় সম্পাদক মহাশয়ের বাসাতেই উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।"

ক্রমে আমাদের প্রার্থনা-সমাজের প্রথম-বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হইল। এই উৎসবের সময় আমরা শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন নির্জ্জন উপাসনাদিতে যাপন করিয়া যথেষ্ট আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমরা নগণ্য ব্যক্তি, মহর্ষিদেব বা ঠাকুর বাবুদিগের কাহারও সহিত আমাদের কোনপ্রকার পরিচয় নাই। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব হইয়াছে, এই সংবাদে মহর্ষিদেব অবশ্য সন্তোষ-লাভ করিবেন, এই বিশ্বাসে আমরা কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া উৎসবের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া-

ছিলাম। আশ্রমের ভৃত্যেরা বিশেষ যত্নসহকারে আমাদের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। ১৮০৬ শকের ১লা অগ্রহায়ণের "তত্ত্বকৌমুদীতে" এই উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। যথা—"১৭ই কার্ত্তিক শনিবার প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতনে উপাসকদিগের নির্জ্জন উপাসনা, তৎপর সঙ্গীত ও প্রার্থনা। * * * ১৯এ কার্ত্তিক সোমবার প্রাতে শান্তি-নিকেতনে উপাসনা হয়। বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। * * * বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় উৎসবের পূর্ব্বে এখানকার ধর্ম্মসভাতে "মুক্তি কি রূপে লাভ করা যায়" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, ও তৎপর দিন শান্তিনিকেতনে স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহিত উপাসনা করেন।" তত্ত্বকৌমুদী ১৮০৬ শক, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৭৯ পৃষ্ঠা। ইহার পর দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে সম্পন্ন হয়। এবারেও আমরা শান্তিনিকেতনে উৎসব করিয়াছিলাম। "নিম্ন-লিখিত প্রণালী অনুসারে বোলপুর-প্রার্থনা-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১৮ই বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যার পর উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৯শে শনিবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "শান্তিনিকেতনে" উপাসনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন।"*

মহর্ষিদেব ১২৯০ সালে শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতা গিয়া জলপথে ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। পরে পৌষ মাসে চুঁচুড়ায় মাধব দত্তের বাটীতে বাস করিতে থাকেন। অতঃপর ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বোম্বাই যাত্রা করেন। ১২৯৩ সালের আষাঢ় মাসে বোম্বাই হইতে প্রত্যাগত হইয়া আবার চুঁচুড়ার ঐ বাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন। এ পর্য্যন্ত মহর্ষিদেবের সহিত আমার সাক্ষাতের কোন সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। পরে ভগবৎ কৃপায় অভাবনীয়রূপে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমার বোলপুর আগমনের কিছু দিন পরে বোলপুর ইংরাজি স্কুলের হেড-মাষ্টার নবীন বাবু ও দ্বিতীয় শিক্ষক শশীবাবুর সহিত আমার বিশিষ্ট-রূপ আত্মীয়তা সংঘটিত হয়। দুই বৎসর পরে শশীবাবু কর্ম্মসূত্রে অন্যত্র গমন করেন। এক্ষণে উভয়েই পরলোকে। বোলপুরের তদানীন্তন ইংরাজি অভিজ্ঞ প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত হরিদাস বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় ও ক্রমে এই পরিচয় প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হয়। আমার শান্তিনিকেতনে অবস্থিতি-প্রসঙ্গে ইহার বিষয় আরও বিবৃত হইবে। এই সময় বোলপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের কয়েকজন বিদ্যার্থী যুবকের সঙ্গে আমি প্রীতি ভালবাসাতে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং ইঁহারা সকলে সমান বয়সের ছিলেন না। শ্রীযুক্ত রামনাথ সামন্ত, বাবু ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায় ও তদীয় অনুজ অনুকূলচন্দ্র রায়, বাবু তিনকড়ি ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, দেবরাজ মুখোপাধ্যায় ও রাই-পুরের বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রভৃতির সদ্ভাব আত্মীয়তা ও স্নেহমমতার সুখময় স্মৃতি আমার হৃদয়ে অতি উজ্জ্বল ভাবে জাগরূক রহিয়াছে। রাখালবাবুর নিবাস সিউড়ীর সন্নিহিত মল্লিকপুর গ্রামে। তিনি কলেজের সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে বোলপুরে আসিতেন। এই সূত্রে আমার স[illegible] পরিচয় হয়। পরে এতদূর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, প্রত্যে[illegible] ছুটিতে বাড়ী যাইবার সময় বোলপুরে আমার নিক[illegible] দুয়েক দিন থাকিয়া বাড়ী যাইতেন। আমি কলিকাত[illegible] গিয়া ইঁহাদের ছাত্রাবাসেই অবস্থান করিতাম। এই সক[illegible] যুবকদের মধুময় সঙ্গ ও সাহচর্য্য দ্বারা আমি জীবনে প্রভূ[illegible] উপকার লাভ করিয়াছিলাম। ইঁহাদের সহিত মিলি[illegible] হইলেই নানা সৎপ্রসঙ্গ ও সাহিত্য-চর্চ্চায় সময় অতিবাহি[illegible] হইত। জীবনের উদ্দেশ্য কি, চরিত্রগঠনের উপায়, কি প্রকারে পাপ-প্রলোভন জয় করা যায়, প্রকৃত শান্তিলাভের উপায় কি—এইরূপ গভীর তত্ত্বপূর্ণ বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় আমরা উপকৃত হইতাম। পরবর্ত্তীকালে ইঁহারা সকলেই শিক্ষিত কৃতী ও পদস্থ হইয়া সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক্ষণে রামনাথবাবু, দেবরাজবাবু ও রাখালবাবু মাত্র জীবিত আছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু ও তিনকড়িবাবু প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। অনুকূলবাবু ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৮ শক (১২৯৩ সাল) ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ৪৪।৪৫ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। দেবরাজ বাবু সিউড়ীর উকিল। রামনাথ বাবু সিউড়ীতে মোক্তারী করিতেছেন। ইঁহাদের পুত্রেরাও সুশিক্ষিত আইন ব্যবসায়ী। রাখালবাবু চাইবাসার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল এবং বিশিষ্ট সম্রান্ত ও মহানুভব ব্যক্তি। তিনি বীরভূম জেলার হেডকোয়াটার সিউড়ী সহরে তাঁহার পিতার নামে "বেণীমাধব ইনষ্টিটিউশণ" নামক উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি স্কুল স্থাপন করিয়া বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে উক্ত স্কুলের জন্ম প্রকাণ্ড সুদৃশ্য বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামনাথ সামন্তের নিবাস বোলপুরের নিকটবর্ত্তী মোহনপুর গ্রামে। তাঁহার খুল্লতাত বাবু সীতানাথ সামন্ত উকিলের বাসায় থাকিয়া তিনি বোলপুর স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, এইজন্ম তাঁহার সহিত অধিক পরিমাণে আমার মেলা-মিশার সুবিধা ঘটিয়াছিল। আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম মমতা ও গভীর শ্রদ্ধার ভাব অনুভব করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সম্ভবতঃ ১২৯২ সালের শেষে রামনাথবাবু বিষয়-কর্ম্মের উপলক্ষে কানপুর গমন করেন। কানপুর হইতে তিনি আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। এই সকল পত্র তাঁহার হৃদয়ের মহৎভাবে পরিপূর্ণ। ১২৯৩ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ কানপুর হইতে [illegible] যে পত্র পাই, তাহার কিয়দংশ আমার ডায়ারীতে [illegible] লিখিত আছে—"১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩। * * কানপুর [illegible] আজ রামনাথের পত্র পাইয়াছি। রামনাথ পত্রের [illegible] স্থানে লিখিয়াছেন, "যদি সেই সত্যস্বরূপ দয়াময়ের [illegible] একান্ত ভক্তি থাকে, তাহা হইলে শত সহস্র [illegible]র মস্তকের উপর দিয়া এমন ভাবে যাইবে যে, [illegible] তাহা অত্যাচার বলিয়া জানিতে পারিবেন না।" [illegible] পর রামনাথ বাবু শ্রাবণ মাসে বোলপুরে আসেন। কিছুদিন পরে এলাহাবাদ গমন করেন। এলাহাবাদের প্রচারক ও মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদক শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদজীর সহিত রামনাথবাবুর পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। পরে তিনি মহর্ষিদেবকে পত্র লিখিয়া, মহর্ষিদেবের নিকট রামনাথবাবুর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

এই বৎসর (১২৯৩) মাঘোৎসবের পরে মহর্ষিদেব সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হয়েন। চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবৎকৃপায় মহর্ষিদেব এ যাত্রা রক্ষা পান। আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি কলিকাতার চৌরঙ্গীতে কিছু দিন বাস করেন। কলিকাতার বদ্ধ বায়ু সহ্য না হওয়ায় অতঃপর তিনি দার্জ্জিলিং গমন করেন। তথাকার জলকণাসিক্ত শীতল বায়ু তাঁহার দুর্ব্বল দেহে সহ্য না হওয়ায় তিন মাস পরে পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিয়া ৩ নং মিড্‌লটন রো'তে একটী নির্জ্জন বাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতে থাকেন।

রামনাথবাবু এই সময়ে, অর্থাৎ মহর্ষিদেবের নিকট অবস্থান কালে, প্রসঙ্গতঃ আমার কথা—বোলপুর-প্রার্থনা-সমাজের কথা—শান্তিনিকেতনে আমাদের উৎসব উপাসনার কথা—এবং শান্তিনিকেতনের বর্ত্তমান দুরবস্থায় আমার ক্লেশানুভবের কথা মহর্ষিকে নিবেদন করেন। আমি তাঁহার একান্ত দর্শনাভিলাষী একথাও তাঁহাকে বলেন। ১২৯৪ সালের ৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট, ১৮৮৭ খৃঃ অঃ) রামনাথবাবুর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পোষ্টকার্ডখানি পাইয়াছিলাম। "প্রণামা নিবেদন মিদং—আঙ্গুলের বেদনা ভাল হইয়াছে তজ্জন্ম চিন্তা করিবেন না। আপনি ১লা কি ২রা অতি অবশ্য আসিবেন। মহর্ষি মহাশয় শারীরিক ভাল আছেন। এখানে আসিবার পক্ষে অন্যথা না হয়। আপনার সহিত অনেক কথা আছে। শাস্ত্রী মহাশয় আপনাকে নমস্কার দিয়াছেন ও আপনার পারিবারিক কুশল-সমাচার বিশেষ-রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি ভাল আছি। আপনার ও মণির শারীরিক কুশল সমাচার দানে বাধিত করিবেন। কোন্ তারিখে কোন্ ট্রেণে আসিবেন তাহা লিখিবেন। ইতি।" আমি এই পত্র পাইয়া ৩১শে শ্রাবণ (১২৯৪ সাল) কলিকাতা রওয়ানা হই। মহর্ষিদেবের দর্শন লাভ বিষয়ে ইহাই আমার পক্ষে অভাবনীয় সুযোগ।

স্বদেশসেবায় রাজা রাধাকান্ত দেব

শ্রীহরিপদ গুহ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে-সমস্ত যশস্বী বাঙালীর পরিচয় পাওয়া যায়, স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার জন্ম ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ। তাঁহার পিতা গোপীমোহন দেব ছিলেন কলিকাতার শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র। ধনীর দুলাল হইয়াও রাধাকান্ত সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার বেশীর ভাগ সময় জ্ঞানানুশীলনেই অতিবাহিত হইত। সংস্কৃত, আরবী এবং ফার্সী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার বিলক্ষণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে ইংরেজী অভিজ্ঞ বাঙালীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল।

দেশের বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত রাধাকান্তের নাম জড়িত রহিয়াছে। শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে এবং স্বদেশবাসীর জ্ঞান-বিকাশের সহায়তাকল্পে তিনি অক্লান্তকর্ম্মা ছিলেন। কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূলে তাঁহারই যত্নচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়েও তিনি একজন পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় স্কুল সোসাইটির হেড্ পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক' পুস্তিকা রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে শুধু স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাই নাই,—স্ত্রীশিক্ষা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে তাহাও দেখান হইয়াছে। গৃহ-কারা-বন্দিনী হিন্দু ললনাকুলকে অজ্ঞানতার মধ্যে বদ্ধিত হইতে দেখিয়া রাধাকান্ত সত্যই ব্যথিত হইতেন।

বিরাট্ সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রণয়ন ও প্রচার তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কীর্ত্তি। ইউরোপের পণ্ডিত-মণ্ডলী এই গ্রন্থের যথেষ্ট গুণগান করিয়াছিলেন; এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৯, জুলাই মাসে তাঁহাকে একখানি পদক দ্বারা সম্মানিত করেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনায় তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় ত করিয়াছিলেনই, পরন্তু দীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই বিরাট্ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সপ্তম বা শেষ খণ্ড, এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'পরিশিষ্ট' রূপে অপর একখণ্ড প্রকাশিত হয়।

রাজা রাধাকান্ত দেব

স্কুল বুক সোসাইটির জন্য তিনি বহু পুস্তকের সঙ্কলন, সংশোধন ও অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি লিণ্ডলে মারে-অনুসৃত পদ্ধতিতে একখানি বাংলা বানান-পুস্তক, এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে উহার একখানি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮২০ সনে তিনি ইংরেজী হইতে কতকগুলি গল্প-সমষ্টি 'নীতি কথা'

নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। সোসাইটি হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী তিনি স্বদেশবাসীদের মধ্যে বিতরণ করিতেন, এবং তাহাতে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কিছুই থাকিবে না এইরূপ অঙ্গীকারদানে গ্রাম্য স্কুল-মাষ্টারদিগকে তাহা ব্যবহার করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল ও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ১৮২৯, ডিসেম্বর মাসে লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্ক যখন 'সতীদাহ' বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন রাধাকান্ত দেবই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে এই মঙ্গলময় বিধানের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিয়াছিলেন।

জীবনে রাধাকান্ত বহু রাজ-সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা শহরের Justice of the Peace এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে খুব কম দেশীয় লোকের ভাগ্যেই এই উচ্চ সম্মান লাভ ঘটিত। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে গভর্ণর-জেনারেল তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার গুণের সম্মান করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হইলে রাধাকান্ত দেবই ইহার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কে-সি-এস-আই উপাধি লাভ করেন।

বিলাতের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি রাজা রাধাকান্ত দেবের নিকট হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছিলেন,—এইজন্য ১৮২৮, ১৭ই মে সোসাইটি তাঁহাকে একখানি ডিপ্লোমা দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। সোসাইটির চেয়ারম্যান স্যর আলেকজেণ্ডার জন্‌সন্ ১৮২৮, ৪ঠা জুলাই তাঁহাকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন— 'বর্ত্তমান সুযোগে ভারতের গভর্ণর বাহাদুরের নিকট সংযুক্ত প্রস্তাবের একখণ্ড প্রেরণ করিতেছি। ইহা হইতে আপনার প্রতিভা সম্বন্ধে সোসাইটি কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন; এবং আপনি যে সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাহার উন্নতিবিধানে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারিবেন।'

ফার্সী ভাষায় লিখিত উদ্যান-রচনা বিষয়ক একখানি পুস্তকের অংশ-বিশেষ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ১৮৩২, ৩রা ডিসেম্বর রাধাকান্ত দেব রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়াছিলেন।

মান্যবর গভর্ণর মারকুইস্-অফ-হেষ্টিংস্ ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর ই-এইচ-ঈষ্ট মহোদয়ের বিলাত গমনকালে স্বদেশবাসীর অনুরোধে রাধাকান্ত দেবই ইংরেজী, বাংলা ও ফার্সী ভাষায় অভিনন্দনপত্র রচনা করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে পাঠ করিয়াছিলেন।

গ্রেট বিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য-বিবরণীর দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতীয় Agricultural and Horticultural সমিতির কার্য্য-বিবরণীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ২৪ পরগণা প্রভৃতির কৃষি-সম্বন্ধীয় আলোচনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাক্তার ক্যামেরনের 'বঙ্গদেশে বসন্ত-টীকার বর্ত্তমান অবস্থা' নামক রিপোর্টে 'ভারতীয় টীকা ও বসন্ত রোগ' শীর্ষক রাধাকান্ত দেবের দুইখানি পত্র স্থান পাইয়াছিল।

১৮৬৭, ১৯এ এপ্রিল বৃন্দাবনে রাজা রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হয়।

রাজা রাধাকান্ত দেব স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া যে-সকল জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

আশা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভবানীপুরে। যেখানে বেগমত্ত, বিক্ষুব্ধ কলিকাতা নিজেকে ভুলে একটু নিরিবিলিতে অলসতার আমেজে গা ঢেলে পড়ে আছে। এখানে তার কাজ নেই মোটেই; আর চিন্তা?—হ্যাঁ, তা' একটু আছে বটে—তবে তার সমস্তটাই অকাজের। সে যেন বিশ্বকর্ম্মার কারখানার পলাতক মজুর,—এখানে তার গোপন সখী প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে যত-সব অ-দরকারের আলোচনায় লেগে গেছে।

রোগের পর আরোগ্যের অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শে এখানে এসে একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে আছি। ডাক্তার-বন্ধু বললেন, "ভবানীপুরেই চল; সেখানে আলো-বাতাস সহজেই পাবে,—যা তোমার এখন দরকার। ওখানে আকাশের নীল আর পৃথিবীর সবুজের মধ্যে রংকরা ছোট ছোট বাড়ীগুলো প্রকৃতির আলো-বাতাসের স্পর্শ বেশ অযাচিতভাবেই পায়,—নতুন শিশু যেমন মায়ের সোহাগটা পায় আর কি। তোমার কলকাতার মত নয়,—এখানে ধেড়ে ধেড়ে উৎকট বাড়ীগুলো পাকা-বিষয়ী ছেলেদের মত সেই আলো-বাতাস নিয়ে কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি লাগিয়ে দিয়েছে—ওরা ও দুটোকে সম্পত্তি ব'লে টের পেয়েছে কি না?—আর রক্ষে আছে?"

বাড়ী নিয়েছি শ্রীনিবাস রোডে। ঠিক রোড নয়, তবে গলিও নয় একেবারে। লাল সুরকির রাস্তা নিজের ইচ্ছামত এঁকেবেঁকে গেছে, জিওমেট্রির কোনো কড়া আইনের গোলাম নয়। ফুটপাথ আছে কিনা আছে,—অর্থাৎ পথিকদের মধ্যে গতির উগ্রতা কি লঘুতা নিয়ে যে বিরোধ এবং তার চুক্তি, এখানে তারি কোন নিশানা নেই। মোটরেই হোক, গাড়ীতেই হোক কিংবা পায়ে হেঁটেই হোক,—সবাই নিরুদ্বেগ গতিতে নিজের নিজের কাজে-অকাজে ঐ লাল রাস্তাটুকু দিয়েই যাতায়াত করে। ফুটপাথ যেখানে একটু আছে বা, ঘাসে ভরা—যেন অবসরের তৃপ্তি।

বিশ্বকর্ম্মার কারখানার পেয়াদা তার লোক-লস্কর নিয়ে পলাতক মজুরের সন্ধানে ভবানীপুরে প্রবেশ করেছে বটে—রসা রোড দিয়ে; কিন্তু এদিকটা খুব তফাতে আছে,—তার তাগিদের কর্কশ হুঙ্কার এখানে মোটেই পৌছায় না।

বাড়ীটা দোতালা; ওপরে ছোট-বড় দুটি ঘর, ডাক্তারে আমাতে পাশাপাশি থাকি। দিনটা প্রায় একলাই কাটে,—ডাক্তার যান 'কলে।' একদিন বললেন, "তুমি সমস্ত দিন বড় নিঃসঙ্গ থাক, হাতের কেসগুলো চুকে গেলে আর নিচ্ছিনে।"

বললাম, "না,—এই চলতি পশারের সময় ছেলে-মানুষী নয়। আমি খাসা আছি। এই ছোট্ট পল্লীটিতে অল্পস্বল্প যা কিছুই পাচ্ছি সেটুকুর মধ্যেই বেশ একটু পরিপূর্ণতা আছে। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

"দুপুরে যখন চারিদিকে চুপচাপ,—আমি দিব্যি গা এলিয়ে পড়ে থাকি। স্তব্ধ প্রকৃতি তার অপলক দৃষ্টি আমার নিশ্চেষ্ট চোখ দুটির ওপর ফেলে রাখে,—ভাবের ব্যাকুলতায় সে যে কি গভীর!—কোনো মূক নারীকে একঠায় আবিষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকতে দেখেছ কখনও?—তাহলে অনেকটা বুঝতে পারবে।"

"দুপুর যায়। বিকেলে পল্লীটাতে যখন একটু সজীবতা ফিরে আসে, আমার মনটা পশ্চিমদিকের পোড়ো জমিটার ওধারে ঐ বাড়ীটায় গিয়ে গুটিয়ে বসে। ওটি যেন ভবানীপুরের মধ্যেও ভবানীপুর। এসেছি পর্য্যন্ত ওর একটা স্বর শুনেছ?—দোর জানালা বন্ধ ক'রে নিজের স্নিগ্ধতার মধ্যে ডুবে রয়েছে।—আমি ওটির ভক্ত হ'য়ে পড়েছি।"

বন্ধু হেসে বললেন, "ভক্তি তোমার উড়ে যায়

যদি বাড়ীটার সম্বন্ধে আমাদের মালীর মতামত শোন।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কি রকম ?"

—"মালীর মতে ওটা এই পাঁচ ছয় বছর থেকে 'তানাদের নীলেভূমি' হয়েছে। সহজ মানুষ ওখানে আমল পায় না। তানাদের মানে তোমাদের শুদ্ধ ভাষায় যাকে বল অশরীরী আত্মা তাঁদের,—গঞ্জিকার ধূমে যাঁদের জন্ম আর কি।...তারপর ? দুপুর হ'ল—বিকাল হ'ল—"

অন্যমনস্কভাবে বললাম, "হানাবাড়ী ? ..... যাক, সন্ধ্যের একটু পরে দুটি স্বরের লহরী ওঠে,—দূরের ঐ বাড়ীটাতে একটি মেয়ে গান করে, আর দক্ষিণের ঐ হলদে বাড়ীটাতে কে ক্ল্যারিয়োনেট শেখে,—তুমি হাসলে বটে, কিন্তু এই নিস্তব্ধতার নট-ভূমিতে সেই সুরের ছন্দ আর বেসুরের তাণ্ডব মিলে যে কি একটা মায়া রচনা করে, তা যদি তোমায় বোঝাতে পারতাম।"

বন্ধু ভীতির অভিনয় ক'রে বললেন, "একটা জিনিষ বুঝেছি—সেটা এই যে তোমায় একলা ফেলে রাখা আর মোটেই নিরাপদ হচ্ছে না। তোমার কবিতার খাতাটা সঙ্গে আন নি ত ?"

বললাম, "আনলে 'বিষ' বলে একটা লেবেল সেঁটে দিতে—এই ত ? কথাটা ব'লে কিন্তু আমাদের এদেশটার প্রতি বড় অবিচার করলে, ডাক্তার। আমার ত মনে হয় এদেশের বর্ণ স্বর আলো বাতাস—এসবের মধ্যে এমন একটা কি আছে যাতে কবি না হ'য়েই পারা যায় না। অত কথা কি—এদেশের চিকিৎসকেরাও হতেন কবি ; শুধু কবি নয়—কবিরাজ। তার মানে তাঁদের শিক্ষা এই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের একটা নিগূঢ় যোগ ঘটিয়ে দিত। মানুষের প্রাণশক্তিকে সমৃদ্ধ করবার তাঁদের যে প্রচেষ্টা তা তাঁদের প্রকৃতির মহাপ্রাণের সঙ্গে পরিচিত করে দিত ;—সে মহাপ্রাণের বিকাশ দেখি স্বরে স্তব্ধতায়, আলোয় আঁধারে—আর জীবে উদ্ভিদে ত বটেই। তাঁরা হতেন ধ্যানী, না হ'য়ে উপায় ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধটা ছিল মৈত্রীর—

"আর তোমাদের শিক্ষাদীক্ষার কাণ্ডকারখানা সব উল্টো। প্রকৃতির প্রতি তোমাদের ভাবটা সশ্রদ্ধ নয় ; ছুরি, কাঁচি, ফর্ক, কাঁটা প্রভৃতি যন্ত্রপাতি নিয়ে .."

বন্ধু হেসে হাতজোড় ক'রে বললেন, "হয়েছে—এবার শরসংহার কর—"

হেসে চুপ করলাম। একটু ভাবের ঘোরে পড়ে গিয়েছিলাম বটে ; তার কারণ এ জায়গাটা আমার লাগছে বড়ই সুন্দর। শুধু কি এ জায়গাটাই ? নিজের কাছে নিজেকেও আজকাল বড় মনোরম ব'লে বোধ হয়। মনে হয়, আমার প্রাণ যেন ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হয়ে সহস্র বাহু দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরেছে,—আমার প্রতি অণুপরমাণুতে তার উষ্ণ আলিঙ্গন অনুভব করি—

এক এক সময় মনে হয় হঠাৎ যেন একটা কূলভাঙা ঢেউ উঠল। আমার প্রাণ ত আর আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ওই ছুটল ও,—সমস্ত জগতটাকে স্রোতের ছাটে নাইয়ে ছুটল—ওই, আলোর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে কি এক নূতন বর্ণের সুষমা সৃষ্টি করতে করতে ছুটল,—জগতের স্বর-লহরীর মধ্যে কি এ নূতন সুর ঢেলে দিলে ! এত বিচিত্র গৌরভের উৎসই বা ওর মধ্যে কোথায় লুকান ছিল ?

মাধুর্য্য আরও উগ্র হ'য়ে পড়ল যে !—কি উন্মত্ত ! আমার মধ্যে হঠাৎ একি উত্তাপ সৃষ্টি ক'রলে—তারপর, একি—সমস্ত পৃথিবীর ওরই দেওয়া এই নূতন বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শের ওপরে আমাকেই দ্রবীভূত করে ঢেলে দিলে যে ! সুন্দরের অঙ্গে এ কি অভিনব প্রলেপ দিয়ে দিলে !· ....

আমার রুগ্ন দেহের অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ এই প্রাণ উষার মত রূপসৃষ্টির অফুরন্ত শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন তাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে একটা বিরাট সমারোহ পড়ে গেছে।

এইভাবে সৌন্দর্য্যের সঙ্গমস্রোত বয়ে চলে,—স্নান ক'রে ধরণী অপরূপ হ'য়ে ওঠে।

কোন কিছুকেই আর তুচ্ছ ব'লে মনে হয় না,—হীরক খণ্ডের মত, এই পৃথিবীর প্রতি রেখা-অণুরেখা হ'তে যেন আলোর দীপ্তি ঠিকরে পড়তে থাকে।

শুধু বাহিরেই নয়,—এ সৌন্দর্য্যের আভাস আমার সুপ্তি ভেদ ক'রে স্বপ্নের স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে; কিরণ যেমন জলের উপরটা উদ্ভাসিত করে তার নিম্নতল পর্য্যন্ত পৌঁছে যায়।

কয়েকদিন পরের কথা।—

সেদিন দুপুরের সৌন্দর্য্যপিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে যখন ঘুমিয়ে পড়লাম—আমার স্বপ্নলোকে সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব্ব মিলন-বাসর জেগে উঠল—রূপে, আলোয় সঙ্গীতে অনির্ব্বচনীয় হয়ে। ঘুমটা ভেঙে গিয়ে মন যেন বেদনায় আতুর হ'য়ে উঠল। আমার এ মনে হ'ল না যে, কল্পলোক থেকে বাস্তব জীবনে ফিরে এলাম,—মনে হল কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে নিবদ্ধ, রসঘন, এই বাস্তবের চেয়ে অতিবাস্তব একটা জীবন থেকে বিদায় নিয়ে এলাম, আমার জাগ্রত চেতনার মধ্যে এখনও তার আলোর আভা লেগে রয়েছে—তা'র হাসি আর গানের তরঙ্গ দুলে দুলে উঠছে।

এই ঘোরটা বেশীক্ষণ এই রকম নিবিড় রইল না। সমৃদ্ধ পৃথিবী আবার তার স্পর্শ দিয়ে আমায় সচেতন ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল,- তার প্রাণের-উত্তাপে-উষ্ণ স্পর্শ দিয়ে। জানলার চৌকশ ফ্রেমে বাঁধান একটা পট-ভূমি—ওটুকুর মধ্যেই জীবনের কি বিচিত্র স্রোত চলেছে! চলচ্চিত্রের খেলার মত। জানলার গায়ে ঝুমকা জবার গোটাকতক ডাল এসে পড়েছে, দু'টো ফুল ঝুলে পড়েছে, ছোট একটা কি পাখী—মিস্-কালো লম্বা চঞ্চু,—দুটো তীক্ষ্ণ আওয়াজ ক'রে এসে বসল—ডালে নয়, পাতায় নয়, জবার একটি বাঁকা পাপড়ির ওপর একেবারে। মাঝে মাঝে সেই তীক্ষ্ণ আওয়াজ—আনন্দের নি-খাদ স্বর; একটু ঘাড় নড়ে - সমস্ত জবাটি দুলে ওঠে।···দূরে রৌদ্রের দীপ্তিমাখা নীল আকাশ; সাদা বিচ্ছিন্ন মেঘের ছোট-বড় টুকরা সব ভেসে চলেছে। কোনটার কোলে—শ্বেত অঙ্গে তিলের দাগের মত মন্থর গতি একটা চিল·····পৃথিবীর কাছাকাছি গতিটা চঞ্চল,—গাছের শাখা-পত্রের দোলা পাখীদের প্রজাপতিদের ব্যস্তভাবে উড়ে বেড়ান·····

সবচেয়ে চঞ্চলতা পড়েছে আমার জানালার ওপর। পাখীটা বুঝি মধুর সন্ধান পেয়েছে—ফুলেতে আর ওতে বেজায় লুকোচুরি, কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেছে।

জায়গাটা নিজের কুহক ছড়িয়ে আমার স্বপ্নের বেদনাটা মুছিয়ে দিতে চায়। তবু কোথায় যেন একটু অভাব,—বেদনার রেশ আর মিটতে চায় না।

ঘুমের জড়িমাটা চোখে লেগে রয়েছে—তাতে চেতন জগতের স্পন্দনের ওপরেও স্বপ্নের কুহেলিকা বিস্তার ক'রেছে,—আশা হচ্ছে, এখনই এমন একটা কিছু ঘটবে যাতে স্বপ্ন আর বাস্তব জগতের অন্তরায়টা মিলিয়ে গিয়ে সব একাকার হ'য়ে উঠবে। মন যেন সে মুহূর্ত্তটার জন্যে মাঝে মাঝে উদগ্র হয়ে উঠছে।

এমন সময় দৈবাৎ আমাদের বাসার পশ্চিম দিকের জনশূন্য বাড়ীটার পানে নজর গেল, এবং একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলাম—তা'র উপরের জানালা দুটো খোলা। আজ দেড় মাসের মধ্যে এই প্রথম।

মনে মনে বল্লাম—যাক্, লোক শেষ পর্য্যন্ত এল তা হ'লে।

এ-সিদ্ধান্তে একটু বাধা পড়ল, কাশির আওয়াজে আকৃষ্ট হ'য়ে দেখলাম, ওবাড়ীর বৃদ্ধ মালী ফটকে তালা লাগিয়ে বাইরে যাচ্ছে!

ভাবলাম—বাঃ এত মন্দ হ'ল না! ·····

হঠাৎ বন্ধুর কথাটা মনে পড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে এ প্রহেলিকার মধ্যে যেন একটা অর্থ ফুটে উঠল,—একটা আশা। যেন একটা গূঢ় সঙ্কেতে উঠে গিয়ে আমার ঘরের পশ্চিম-মুখো জানলার কাছে দাঁড়ালাম। তারপর যা দেখলাম তাতে সমস্ত শরীরটা যুগপৎ বিস্ময় আর পুলকে কণ্টকিত হ'য়ে উঠল!

জানালার পথে ধরে আলো প্রবেশ করেছে। মাঝখানে একটি শুভ্র শয্যা; তার ওপর কে একজন গা ঢেলে শুয়ে আছে। রঙীন শাড়ীর নিম্নপ্রান্তের খানিকটা দেখা যায়,—তার পাড়ের বেষ্টনীর নীচে দু'খানি অলক্ত-মাখা চরণ, দুটি আধফোটা রক্তপ্রান্ত পদ্ম-কোরকের মত গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে···

সুপ্ত কার দুখানি অচঞ্চল চরণ,—আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু এই আমার সমস্ত অন্তরাত্মাকে নিমেষে

অভিভূত করে দিলে। আমার যদি তখন মনে হ'য়ে থাকে যে, আমার ধ্যানের দেবী—আমার স্বপ্নের মায়া-পুরিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নেমে এসেছে—শুধু আমারই সোনার কাঠির স্পর্শটুকুর অপেক্ষা—ত তাতে কিছু আশ্চর্য্য হবার নেই। আর কোনো সময়ে এবং অন্য কোন বাড়ীতে এ সামান্য দৃশ্যটুকুর মধ্যে কিছু নূতনত্ব পাওয়া যেত না; কিন্তু ভবানীপুরে, সেই নিঝুম দুপুরে, সেই পরিপাটি, সুবিন্যস্ত অথচ বিসদৃশভাবে জনহীন বাড়ীর শুধু একটিমাত্র ঘরে একটি নিদ্রিত নারীর সেরূপ হঠাৎ আবির্ভাব,—এতে আর অন্য রকম ধারণার অবসরই ছিল না—বিশেষ ক'রে আমার মনের সে-সময়ের অবস্থায়।

মাথার মধ্যে বন্ধুর ঠাট্টাচ্ছলে-বলা কথাটাও ঘনিয়ে ঘনিয়ে উঠছিল—"মালীর মতে ওটা 'তানাদের' নীলেভূমি—যাদের বল অশরীরী আত্মা, তাঁদের।"

সকলের ওপরে ছিল বোধ হয় ও-বাড়ীর মালীর ওরকম নির্লিপ্তভাবে ফটক বন্ধ ক'রে চলে যাওয়া; যা'তে ক'রে মনে হ'ল তা'র সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই বাড়ীটার মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে চলেছে।—প্রদীপের ধর্ম্মে রাজকন্যার শয্যা যে সুরক্ষিত রাজপুরীর মধ্যে থেকে উঠে গিয়ে অন্যত্র দাখিল হ'ত, এ-ঘটনাটি যেন ঠিক সেই জাতীয়।

নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইলাম। ক্রমে আমার সমস্ত শরীর মন যেন একটিমাত্র সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হ'য়ে উঠল। রাস্তা দিয়ে তীক্ষ্ণ হর্ণ দিয়ে একটা মোটরগাড়ী চ'লে গেল;—পাশের বাড়ীর ঝি খুব আড়ম্বরের সঙ্গে বাসন মাজতে সুরু ক'রে দিয়েছে;—পরিচিত সেই শিক্ষানবীশের ক্ল্যারিয়োনেটের কল্লোল উঠল—আজ অসময়েই। ভবানীপুর আমার এই যুগ এবং এই পৃথিবীর কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে অশেষ চেষ্টা করতে লাগল। কানে যাচ্ছিল সব, কিন্তু ওই দুখানি ক্ষুদ্র চরণ যুগাতীত লোকাতীত কি এক মোহ বিস্তার করে আমায় অমোঘ আকর্ষণে সব থেকে টেনে নিতে লাগল।

কোথায় গিয়ে দাঁড়ালে আমার মোহিনীকে সমগ্রভাবে দেখা যায়, নির্ণয় করবার জন্যে চটিজুতাটা পায়ে দিয়ে উঠতে যাব, এমন সময় বন্ধুবর এসে উপস্থিত। হাতে একটা ষ্টেটস্ম্যান, বললেন—"ওহে, ওদিকে আফগানিস্থানের খবর যে গুরুতর হয়ে উঠল; বাচ্চা-ই-সাক্কাও······ও কি! আজ তোমার স্তব্ধপুরীর জানালা খোলা যে!—যাক্, বাঁচা গেল; তবে লোক এসেছে। কি জান? লোক নেই জন নেই অথচ সেজেগুজে ফিট্‌ফাট্ হ'য়ে রয়েছে, এরকম বাড়ী যতসব কুসংস্কারের জন্মদাতা। আমি ঐ নিয়ে আজকাল একটু মাথা ঘামাচ্ছি কিনা। সেদিন বল্লাম না তোমায় মালীর কথাটা?······"

বন্ধুর সেদিন অবসর ছিল,—বিকাল পর্য্যন্ত নানারকম গল্প চলল। দিন বুঝেই কি অবসর হ'তে হয়?

কয়েক দিন একলা আছি। ডাক্তার দূর মফঃস্বলে একটা 'কলে' গেছেন।

একলা আছি শরীরে;—মনটা একটা অপূর্ব্ব রাজ্যে বিচরণ করছে। সে-রাজ্যের সৃষ্টিকেন্দ্র দু'খানি চরণ, কিন্তু সেই অল্পকেই আশ্রয় ক'রে কত হাসি-কান্না ভাঙা-গড়ার লীলা দিনরাত বয়ে চলেছে······

রজনী আমার কোন্ এক বিচিত্র প্রবাস-বিলাসে কাটে। ভোরে, জাগরণের সঙ্গে যখন ফিরে আসি, দেখি জানলা দুয়ার সব বন্ধ,—এই রহস্যপুরীতে প্রবেশের আবেদন নিয়ে দিনের আলো বাইরে অপেক্ষা করছে। আমি ব্যাকুল উদ্বেগ নিয়ে চেয়ে থাকি, আশা হয় এই এখনই জানলা মুক্ত হবে; দুখানি ভুজবল্লরী জানলার পল্লব দুটিকে মুক্ত ক'রতে ক'রতে আলিঙ্গনের আকারে প্রসারিত হ'য়ে পড়বে,—আর বাহিরে অপেক্ষমান পৃথিবীর আলো, বাতাস, আকাঙ্ক্ষা তার পূর্ণ অঙ্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে,—সে বর অঙ্গের আভাস দুখানি রাতুল চরণে পাওয়া গেছে।

জানলা কিন্তু মুক্ত হয় না। বাড়ীও থাকে নিস্তব্ধ, নির্জ্জন;—এক সেই বৃদ্ধ মালী ছাড়া। ঘনপল্লবিত বৃক্ষলতার মধ্যে মাঝে মাঝে তা'কে এখানে সেখানে দেখা যায়—শীর্ণ, পলিত-কেশ—মনে হয় যেন হাওয়ার মধ্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

দুপুরে উঠে দেখি পরিচিত জানলাটি খুলে গেছে, শুভ্র দেওয়াল থেকে ঠিকরে পালঙ্কের পাশতলায়

একঝলক আলো পড়েছে,—আর সেই মুখানি ম্লান ··

অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। বেশ বুঝতে পারছি রহস্যের গুরুভারটা আমার সুখের মধ্যেও ক্লান্তি এনে দিয়েছে। এক এক সময় মনটা বন্ধুর জন্যে বড় অধীর হ'য়ে পড়ে,—সে এসে তার হাসিঠাট্টা দিয়ে, তার কল্পনাবিমুখ সুস্থ মনের স্পর্শ দিয়ে আমায় তাদের স্থূল, সুনির্দিষ্ট জগতে ফিরিয়ে নিক্,—আমি কল্পনার ঢেউয়ের দোলায় পরিশ্রান্ত হয়েছি—কঠিন মাটির স্পর্শ চাই।

মনে পড়ে গেল—আমাদের মালী ত আসল কথাটা জানে। তাকে ডাক দিলাম।

ডেকেই কিন্তু মনে হ'ল—নাঃ, পরের বাড়ী নিয়ে আলোচনা করাটা—বিশেষ ক'রে চাকরের সঙ্গে—আরও বিশেষ ক'রে আমাদের বয়সের সঙ্গে যখন একটা রহস্য জড়িত রয়েছে···

মালী এলে বললাম, "হ্যা—ওর নাম কি—ডাক্তার-বাবু কবে আসবে ব'লে গেছে ?'

মালী আমার দিকে স্থিরনেত্রে ক্ষণমাত্র চেয়ে বললে—'সেদিনকে আমি ত ছেলাম না বাবু,—ঠাকুর জানে, তা'কে ডেকে দি গা ?"

বুঝলাম প্রশ্নটা বেগাপ্পা হ'য়ে গেছে, বললাম—"ঠিক ত—মনেই ছিল না—তা, দে ঠাকুরকে ডেকে।"

মালী হঠাৎ পশ্চিমের জানলাটার দিকে একটু চেয়ে বললে, "ওটা ভেজায়ে দি বাবু, রোদ আসবার লাগছে—জষ্টির কড়া রোদ আপনার লেগে মোটেই ভাল নয়।"

পরের দিন বন্ধু এলেন। দুপুর বেলা, আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম। জাগিয়ে, একথা সেকথার পর বললেন, 'হ্যা, তোমার নামে এসেই যে এক গুরুতর অপরাধের নালিশ।"

বললাম, "যথা ?"

"তুমি নাকি পশ্চিম দিকের জানলাটা খুলে রাখ ?—জান না ?—এ বয়সের মনটা লোতুন উড়ুখ্যু পাখীর-পারা—জালও চেনে না, ফাঁসও চেনে না······"

ভাষাটা মালীর বু'ঝে হে'সে বললাম, "কেন, আমার পাখী ত পিঁজরার মধ্যে বেশ লক্ষীটি হয়ে ব'সে আছে বলেই জানি।"

ব্যাপারটা বন্ধু সবিস্তারে বললেন, "মোটর থেকে নামতেই মালী বিষণ্ণবদনে এসে একটি সেলাম ঠুকে ত দাঁড়াল। একটু ভীত হ'য়েই জিজ্ঞাসা করলাম, "কিরে খবর ভাল ত ?"

মালী মাটির দিকে দৃষ্টি নামিয়ে ডাইনে বাঁয়ে শুধু ঘাড় নাড়লে। বলতে কি, আমার শরীরটা হিম হ'য়ে গেল, তাড়াতাড়ি প্রশ্ন ক'রলাম, "কেন, বাবু ভাল আছে ত ?"

মালী তেমনি ভাবে বললে,—"শরীলে ত ভালই আছেন কিন্তু আমরা না হয় মুরুখ্যু-সুরুখ্যু লোক, আপনি ত ডাক্তার, বাবু ?—বলি, আগে মন, পরে ত শরীল ?

ভরসার নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, "বেশ বাব ;—তা মনই বা ভাল নেই কেন শুনি ?"

মালী বললে, 'আপনাকে সেদিন বলতে গেলাম বাবু, তা কথাটা গেরাহ্যির মধ্যি আনলেন না। ও পশ্চিমের বাড়ীটা আপনাদের তরে বেলকুলই ভাল নয়—কত লব্য জোয়ানের সে মাথা বিগড়ে একেবারে পাগল করে দিয়েছে বলবার পারি না। ভয়ে ভয়ে আমরা বুড়ারাও ওদিকে লজর করি না; চুপচাপ নিজের কাজটি সেরে ঘরকে যাই। আপনি এই তেতেপুরে নামলেন, একটু ঠাণ্ডা হোন্ গা। মোদ্দা, ওনার নাড়ীটা একবার পরখ ক'রবেন ; আর গরীবের আর্জ্জি, ওনাকে পশ্চিম দিকের জানলাডা বন্ধ রাখতে বলবেন। কি জানেন বাবু ?—এ বয়সের মনডা লোতুন উড়ুখ্যু পাখীর পারা—জালও চেনে না, ফাঁসও চেনে না।'

"এই ত মালীর অভিযোগ ; তোমার পশ্চিম দিকের জানলাও ত খোলা দেখছি, ওদিকে 'হানাবাড়ী'র জানালাও ঠিক সামনাসামনি খোলা,—কোনো অলোক-সুন্দরীর কুদৃষ্টিতে খাল হোচ্ছ না ত ? নাড়ীটাড়ি হাতড়ে পাব কি ?"

বন্ধু হাসিতে লাগিলেন।

অনেক চেষ্টায় মুখের সহজভাবটা বজায় রেখে বল'লাম, "কুদৃষ্টি সুদৃষ্টির খোঁজ রাখি না ; তবে আমার নাড়ী

বরং বন্ধুবিরহের উদ্বেগে কদিন একটু বেশীরকম চঞ্চল ছিল।··· তারপর?—কেমন ছিলে ব'ল। কৈ তোমার এত দেরী হ'ল কেন বললে না ত। কোন রকম···"

কিন্তু বোধ হয় ধরা পড়ে গেলাম,—সম্ভবতঃ এই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতেই ডাক্তারের কৌতূহলটাকে জাগিয়ে তুললাম। তিনি আমার কথাটাই উল্টে নিয়ে আমার ওপর প্রয়োগ ক'রলেন; মুখের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বিস্ময়ের ভাণ ক'রে বললেন, "অ্যাঁ, নাড়ী বেশী রকম চঞ্চল —তবে ত নির্ঘাৎ প্রণয়ের চোট—তাতে আর সন্দেহ মাত্র নেই; সে আঘাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ থাকে কি না।"

আমি তখনও আত্মগোপনের চেষ্টাটা পরিত্যাগ করলাম না, হেসেই জবাব দিলাম, "সত্যি নাকি? তা'হলে ওটা তোমাদের ডাক্তারিরই একটা অঙ্গ ব'ল—X'rays, battery-গোছের একটা ব্যাপার। তোমরা 'প্রেম প্রেম' কর, আমার একটা ভয় ছিল—না জানি বাঘভাল্লুক কি একটা হবে বা।"

কথা কি একটু বেশী বলে ফেললাম? বন্ধুর দৃষ্টি আর হাসি দেখলাম আরও ধারাল হয়ে উঠেছে—তাঁর বিশ্লেষণের ছুরির মত। হাসতে হাসতে বললেন, "ভয় এবার আমাদের হবার পালা; লক্ষণ ত ভাল বোধ হচ্ছে না।"

পরিত্রাণের বৃথা চেষ্টা।

ধরা পড়ে গিয়ে হঠাৎ যেন মরিয়া হ'য়ে উঠলাম।·· কেন বলব না? এত গোপনের আয়াস কিসের? যা আমার কাছে দিনের আলোর মত সত্য তা দিনের আলোর মতই সবার কাছে মুক্ত হয়ে থাক্—এত প্রত্যক্ষ যার চোখে পড়বে না তার দৃষ্টিশক্তির জন্যই চিন্তিত হবার কথা।

পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা একসঙ্গে মনে জেগে উঠে সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার অটল বিশ্বাসের দুর্ব্বার শক্তি নিয়ে আমি যেন বন্ধুর অবিশ্বাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, বললাম—"শোন ডাক্তার, আমি মালী নয়—ঐ বাড়ীটাতে যে একটা কিছু ব্যাপার হচ্ছে তা তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

"হা—হা—হা"—শব্দে চমক ভাঙ্‌ল। বন্ধু হেসে বলছেন, "আমার থিওরি!—ও বাড়ী অন্ধসংস্কার মাথায় ঢোকাবেই। এই দেখ, তোমাকেও পাকড়াও করেছে, শিক্ষাদীক্ষা সব জাহান্নামে গেল। তা হ'লে মালী বেচারা আর কি দোষ করেচে বল?"

আমার আজ হার, বন্ধুরই জয়—তাঁর ভাষা আমায় বিপন্ন করে তুলছিল। বলতে লাগলেন, "দেখেছ তা'হলে? কি দেখলে? কোথায় কিছু নেই, ঘরের মধ্যে এক অনৈসর্গিক আলো ফুটে উঠল, আর দেখতে দেখতে এক অসামান্যা সুন্দরী-বল—আমায় একটু এগিয়ে দাও··"

বৃষ্টির ধারা প্রবলবেগে নেমে যেমন মাটির স্পর্শমাত্রই নিজেই চূর্ণ হয়ে যায়, আমার অত দম্ভের বিশ্বাস যেন তেমনি শতধা খণ্ডিত হয়ে গেল। আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলাম। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা ক'রে বললাম, "আঃ, কি আপদ! সবটা শোনই না আগে—দেখেছি কেউ ও-বাড়ীটার কাছে ঘেঁসতে চায় না।"

বন্ধু বললেন, "কিন্তু সেটা কি প্রমাণ? দেখ বন্ধু, বিধাতা দুনিয়াটাকে এমন ঠেসে বাজে জিনিষ দিয়ে ভরাট করে দিয়েছেন যে, ওসবের জন্যে আর জায়গা নেই। ভুল ক'রে ফেলেছেন নিশ্চয়, কিন্তু আর উপায় নেই তাঁর।

বস, ধড়াচূড়া ছেড়ে আসি; নালিশের বিচার কিন্তু অসম্পূর্ণ রইল।

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে।

বাগানে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে বসেছিলাম। ডাক্তার অনেক পূর্ব্বে কোথায় বেরিয়ে গেছেন।

আজ বিরুদ্ধমুখী চিন্তায় আমায় অবসন্ন ক'রে ফেলেছে।—

ডাক্তারের কল্পনাবিমুখ, সুস্থ মনের স্পর্শ চেয়েছিলাম—তা পেয়েছি। কিন্তু তার এই শক্তি হ'তে জোর পেয়ে আমি যতই আমার অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি থেকে কল্পনার অংশটা ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করছি তত্‌ই সেটা ঘনীভূত, অবিচ্ছেদ্য হ'য়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, আজ যেন কাকে বিদায় দিতে বসেছি। আমার

গোপন উপহার

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

রোগ, আমার আরোগ্য সমস্তই তারই বিধান,—এই সবের মধ্যে দিয়ে সে আমায় তার নিজের কাছে আকর্ষণ ক'রে এনেছিল,—সেই আমার স্বপ্নের মতো মায়ালোক বিস্তার ক'রেছিল—তারপর সেই মায়ালোক থেকে নেমে এসে যখন সে আমারই জন্য নিজেকে এই পৃথিবীর স্পর্শের অধীন ক'রে তুলেছে—আর আমার বাসনার শতদল তার চরণ দুখানি ঘিরে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে—এই সময় বন্ধু এসে একটা বিপ্লব বাধিয়ে সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিলেন। আজ এ কি হল?—পৃথিবীর কার কাছে একটা সুবিধানের জন্য দাঁড়াই?

আজ চোখে মাঝে মাঝে অশ্রু জমে উঠছিল,—এমন আর কোনদিন হয় নি। বাড়ীটা এখান থেকে আর কখনও দেখি নি। বৃক্ষ, শাখা, লতার মধ্যে দিয়ে বাড়ীটার কিছু কিছু দেখা যায়—আভাসের মত। ছায়ার ভাগটা বেলাশেষের ফিকা অন্ধকারে গ্রাস ক'রেছে, আর যেখানে তার গোলাপী রঙের আঁচ একটু একটু দেখা যায় সেখানে বাড়ীটা যেন অস্তমান সূর্যের কিরণে মিশিয়ে গেছে। সজল চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে আজ মনে হচ্ছে—সে আমার জন্যে অজ্ঞাতের তিমির থেকে নেমে এসে নিজেকে আলোর মধ্যে মেলে ধরেছিল—আজ ব্যর্থতার ক্ষোভে সে এই কঠিন জড়পিণ্ডটাকেও মুছে নিয়ে তার বিদায়ের চিহ্নহীন পরিচয় রেখে যাবে।

বন্ধুর হাসি মনে পড়ে গেল। নিজের কাছেই লজ্জিত হ'য়ে চোখের জল মুছে ফেললাম, ভাবলাম—এই ঘেরা জমিটুকুর মধ্যে ব'সে ব'সে রাত্রি-দিন কি এ আকাশকুসুম রচনা করছি? যাই একটু ঘুরে আসি।

উঠলাম। রাস্তায় পা দিতেই পশ্চিম দিকের বাড়ীর পানে নজর গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন লাগাম কষে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনলাম। তখন মনের মধ্যে প্রশ্ন হল—আচ্ছা, পশ্চিম দিকটাই কি অপরাধ করেছে? ও'দিকে না যাওয়াটাই কি দুর্ব্বলতা নয়?

এর উত্তরস্বরূপ আমি চিত্তের সমস্ত বল প্রয়োগ ক'রে পূর্ব্বদিকে পা বাড়ালাম এবং অগ্রসর হলাম।

কিন্তু আমার পা যেন একটুর মধ্যেই অতিরিক্ত ভারী বোধ হ'তে লাগল। লাগবারই কথা;—একে দুর্ব্বল শরীর, তায় বসে বসে হাঁটার অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গেছে।...আমার কিন্তু তখন এ'কথা মনে হ'ল না—আমার মনে হ'ল পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল যে, কিসের সঙ্গে আমি যেন শৃঙ্খলিত হ'য়ে গেছি নিরুপায়ভাবে। যতই অগ্রসর হবার চেষ্টা করছি, পিছনে টান ততই প্রবল হয়ে উঠছে।

শেষে ফিরলাম। এতক্ষণ মনের মধ্যে কিসের সঙ্গে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব, তর্কবিতর্ক চলছিল, হেরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ফেরবার সময় মনে হ'ল, দিব্যি লঘু গতিতে চলছি। আমার বাসার সামনে এলাম;—একটু দ্বিধা—এক লহমার অপেক্ষা, তারপর পশ্চিম দিকে চললাম। এই দ্বিতীয় পরাজয়ে আর-একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

সেই বাড়ীর ফটকের সামনে দাঁড়ালাম। আর একটি পা বাড়ালেই কোন্ এক নূতন আলো-বাতাসের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব—যেন মৃত্যুর চেয়েও এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার এখনই ঘটবে।

আগলটা তুলে প্রবেশ করতে যাব—দেখি ডাক্তার-বন্ধু সেই বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে আসছেন! কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, তুমি—এখানে!

* * *

আমাদের বাগানে এসে দু'খানা চেয়ারে মুখোমুখি হ'য়ে বসলাম। বন্ধুর ভাবটা আজ নূতন রকম—কিছু বিব্রত, বিষণ্ণও। কি ভেবে জানি না, আমায় আর কোন প্রশ্ন করলেন না। বললেন, "ও বাড়ীটায় কিছু একটা ব্যাপার হচ্ছে বটে। তবে সেটা এই গরীব অশীতিপর পৃথিবীরই এলাকার—এই যা।"

আর একটু চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বলতে লাগলেন, "তোমার ঘটকালি করতে গিয়েছিলাম।...অপ্সরা কিন্নরীরা আমাদের এই পোড়া কপালের যুগটাকেই বয়কট করেছেন ব'লে সেদিন তোমায় বেশী উৎসাহ দিতে পারলাম না; কিন্তু আমাদেরই মত রক্তমাংসের কোন খেঁদী পেঁচী এসে যে বাড়ীটাতে ডেরা ফেলেছেন এবং আমার বন্ধুটির ওপর ভর করবার

হচ্ছে ডানা ঝাপটাচ্ছেন তাতে আর আমার কোনো সন্দেহ রইল না। ভাবলাম দেখতে হচ্ছে। যোগাযোগ হয়—বন্ধুকে বুঝিয়ে বললেই হবে যে, গরীবের পক্ষে রাঙই সোনা।"

ছুটলাম তাড়াতাড়ি।

গিয়ে দেখলাম একজোড়া পাগল—স্বামী আর স্ত্রী। অতি সাধারণ ব্যাপার, না? কিন্তু সবটা শোন, তখন টের পাবে পশ্চিম দিকের বাড়ীটার গুজবের উৎপত্তি কোথায়।

দু'জনেই বৃদ্ধ এবং একটু বেশী রকম বিষণ্ণ; তবে হঠাৎ পাগল ব'লে মনে হবার কিছু নেই—সেটা টের পেলাম পরে।

যেতেই অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন। কথাবার্ত্তা হ'ল, কিন্তু এত স্বল্প এবং পরিমিত যে, আমার মনে একটা অনধিকার প্রবেশের অস্বস্তি জেগে উঠতে লাগল। মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল; আর রাগ হ'তে লাগল তোমার ওপর। একটা কিছু ব'লে উঠে আসব আসব করছি, এমন সময় কর্ত্তা হঠাৎ বললেন, 'এখানে আমরা তিনজন আছি আপাততঃ, আশা এলেই চারজন হই···

গৃহিণী কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে দিলেন, "আশালতা আমাদের মেয়ে; এই এল বলে,—যতক্ষণ না আসছে"।

যাক্, তোমার একটি 'আশা' যে আছেন তাহ'লে, এটুকু আবিষ্কার ক'রে অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু কতক্ষণ গেল, তাঁর আর দেখাই নেই। আসরেও বিশ্রী রকম নির্ঝুমের পালা।

শেষে প্রশ্ন করলাম, "কোথায় গেছেন তিনি?"

কোন উত্তর পাওয়া গেল না, দম্পতি শুধু পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার এই সময় একটু খটকা লাগল।

শেষে গৃহিণী বললেন, "সে এক অদ্ভুত ভাবে—আমায় বিশ্বাস করাবার জন্যে যেন ভয়ানক জোর দিয়ে—যাবার সময় ঠিক বলতে পারলে না কোথায় গেল; কিন্তু আসবে ঠিক, এ'কথার কোনো···"

এমন সময় কর্ত্তা—"যাই মা!" ক'রে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—এক বিকৃত আওয়াজ! আমার শরীরটা ঘন ঘন শিউরে শিউরে উঠল!

গৃহিণী কথার মাঝে থেমে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। কর্ত্তা আস্তে আস্তে উঠে গেলেন—অতি-সন্তর্পণে। দু'মিনিট—চার মিনিট—দশ মিনিট গেল কর্ত্তা শেষে বেরিয়ে এলেন;—এইটুকুর মধ্যেই যেন কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে চেহারার!

গৃহিণীর যেন চোখ দিয়ে কথা বেরুল, "আসে নি?"

কর্ত্তা শুধু বললেন, "এসেছিল বৈকি, ডাকলে, শুনলে না?"

আমি মূঢ়ের মত বসে রইলাম,—শোকের এ কি ভয়ঙ্কর রূপ!

বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে আরও পাঁচ-ছয়বার এই রকম ব্যাপার। কখনও কর্ত্তা 'যাই মা!" ক'রে উঠে যান, কখনও গৃহিণী; অথচ আমি সমস্ত শরীরটাকে একজোড়া কানে পরিণত ক'রেও একটু 'টুঁ' শব্দ পেলাম না আরও কিছুক্ষণ এইভাবে গেল; তারপর একবার কর্ত্তা সেই রকম 'যাই মা!' করে উঠে গৃহিণীকে বললেন, 'আমায়ই ডাকলে বটে, কিন্তু চল এবার দু'জনেই যাই'—আমায়ও অত্যন্ত মিনতির স্বরে বললেন. 'আপনিও একটু সঙ্গে আসবেন কি?—ক্রমাগতই আমাদের সঙ্গে এ কি লুকোচুরি করছে?'

তিনজনে ভেতরে গেলাম,—আমি রইলাম তাঁদের পিছনে।

তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলেন—এক এক জায়গায় ঘুরে ফিরে দু'তিনবার ক'রে। বলতে কি, এই অদ্ভুত সঙ্গীদের সঙ্গে সন্ধ্যের অন্ধকারে বিকৃত মস্তিষ্কের একটা খেয়ালী সৃষ্টির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে আমারও মাথায় যেন একটা ঘূর্ণীপাক্ দিয়ে উঠতে লাগল। এক এক সময় এমনি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে উঠছিলাম যে, মনে হচ্ছিল এক্ষুণি এই হাল্কা অন্ধকারের মধ্যে একটা মূর্ত্তি জমাট বেঁধে উঠবে। শব্দহীন বাড়ীটা পর্য্যন্ত যেন উৎকট প্রতীক্ষায় নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিরাশ হ'য়ে বৃদ্ধ খোঁজার মাঝে হঠাৎ বলে উঠলেন,

'দেখলেন ত? আজ পাঁচ বছর এই রকম ক'রে ঘোরাচ্ছে।''

'পাঁচ বছর চার মাস হ'ল'-বলে গৃহিণী করুণ অনুযোগের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন।

ডাক্তারের নির্ব্বিকল্প প্রাণ; কিন্তু তবুও যেন আমার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। বললাম, 'চলুন বাইরে।'

আমার পেছনে পেছনে তাঁরা বেরিয়ে এলেন।

খানিকক্ষণ ব'সে দু'একটা প্রশ্ন ক'রে যা বুঝলাম তা এই যে, বছর পাঁচেক পূর্ব্বে, ঠিক এই সময়টা, এই বাড়ীতে, সামনের ঐ দোতালার ঘরটাতে ওঁদের একটি সতের বছরের মেয়ে মারা যায়। পর হ'য়ে যাবে ব'লে কখনও প্রাণ ধরে তার বিয়ে দিতে পারেন নি। সেই আশালতা আর কি। তাইতেই ওঁদের মস্তিষ্ক একরকম বিগড়ে গেছে। এখন একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, সে শীগগিরই ফিরে আসবে,—কোথা থেকে কোন্ পথে, তার কোনো নির্দ্দিষ্ট ধারণা নেই। বছরের এই সময়টা আর বাইরে থাকতে পারেন না,—যেন টেনে নিয়ে আসে। তারপর এই আশা-নিরাশা; শেষে কয়েক দিন দেখে হতাশ হ'য়ে ফিরে যান।

আমার কিন্তু ধোঁকা লেগে রইল—'তিনজনের' তৃতীয়টি কে? জিগ্যেস করতে যাব এমন সময় আলো নিয়ে মালীটা এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আমার হিসেব মিলে গেল। লোকটার কথা স্রেফ্ ভুলে গিয়েছিলাম আর কি।

বেরিয়ে এসে যখন রাস্তায় পড়লাম, একটা শব্দে ফিরে দেখি মালি ফটকে তালা লাগাচ্ছে,—ওর অভিপ্রেত নয় আর কি—কেউ ওই পাগলের খেয়ালের মধ্যে এসে কোনো রকম দখল দেয়।"

বন্ধু একটু চুপ করলেন। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর ডাক্তারের শরীর মন থেকে এককালীন যেন ঝেড়ে ফে'লে দিয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "ইতি উদ্বাহ-খণ্ডে ঘটকরাজ কাহিনী সমাপ্তঃ—ওঠ, চল ওপরে যাই।"

"ও কি!—প্রতিফল মূর্চ্ছা হবার কথা নয় ত—তোমার ও কি চাউনি!"

আমার চাউনির মধ্যে যেন শোকের অবসাদ, আর সফলতার উন্মাদনা, একসঙ্গে ফুটে বেরুচ্ছিল।

আমি আর নিজেকে রুখে রাখতে পারলাম না; ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরে ব'লে উঠলাম, "ডাক্তার, বিশ্বাস কর,—কর বিশ্বাস;—এ কি তোমাদের অত্যাচার!"...অস্বাভাবিক আবেগে আমি নিশ্চয় কাঁপছিলাম।

ডাক্তার ভীতভাবে আমার মুখের পানে চেয়ে একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন, "কি বিশ্বাস করব? কিসের অত্যাচার?''

—"তোমাদের অবিশ্বাসের। অত্যাচার নয়?—এই বিষ তুমি ত এখানকার বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছ, তা'ভিন্ন আমার মধ্যেও সংক্রামিত ক'রে আমার সেই তপস্যা নষ্ট ক'রে দিয়েছ যার দ্বারা আমি তাকে পাবার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলাম।.....আবার অবিশ্বাসের হাসি? কিন্তু আমি তোমায় বলছি ডাক্তার, আমি দেখেছি;—সেদিনে আমি মিথ্যা দিয়ে সত্যটা ঢাকা দিয়েছিলাম—তোমার হাসির ভয়ে; কিন্তু আজ আমার সে সত্য পূর্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে—তোমারই গল্পের মধ্যে দিয়ে।"

—"কি দেখেছ? কি সত্যের কথা বলছ?"

—"তা'কে দেখেছি—আশাকে। সে আছে; কেউ তার ডাক শুনতে পায়—তুমি পাওনি তোমার নিষ্ঠার অভাবে,—আর কারুর কাছে সে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে—আমি তাকে দেখেছি।''

—"বেশ, দেখাও আমায়।"

—"কি বলব ডাক্তার, এই সন্ধ্যার মাঝখানে সঙ্গে সঙ্গে আমি দুপুরটাকে এনে ফেলতে পারলাম না;—না হ'লে দেখতে সে তার অপার্থিব দু'খানি পায়ের শোভায় ঘরটা আলো ক'রে শুয়ে আছে। এই দু মাস ধরে সে এমনি ক'রে পৃথিবীর কাছে নিজেকে ধরা দিচ্ছে—সন্ধ্যার আবছায়ায় নয়—রাত্রের অন্ধকারেও নয়;—ভরা দুপুরে—আলো যখন পৃথিবীর কাণায় কাণায় ভ'রে থাকে!"

ডাক্তার একটি হাত আমার কাঁধের ওপর দিয়ে বললেন, "তুমি বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছ। আচ্ছা, বেশ

ঠাণ্ডা হ'য়ে আমার একটা কথার জবাব দাও ত।"

"কি ?"

"আমি বলছি তোমার কথাটাই বরং আমার গল্পটাকে পূর্ণ করছে।"

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, "তার মনে ?"

"তুমি যাঁকে দেখে থাক তিনিই হচ্ছেন সেই তৃতীয় ব্যক্তি যাঁকে আমি খুঁজছিলাম।"

একটু ব্যঙ্গের সুরে বললাম, "মালীকে পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারলে না ?"

"না, কারণ কেউ মালীকে সচরাচর নিজের পরিবারের মধ্যে ধরে না। ওটা হ'য়েছিল আমার হিসেবের গোঁজামিল।"

"কিন্তু তুমি ত অত খুঁজেও তাঁকে পাও নি সেদিন।"

"ঠিক সেই সময়টিতে বোধ হয় ছিলেন না বাড়ীতে।"

"আর—ঠিক দুপুর বেলাটিতে থাকেন ?"

"তুমি রোজ ঐ সময়টায় দেখ ব'লেই যে শুধু দুপুর বেলাতেই থাকেন, আর আমি একদিন সন্ধ্যার সময় দেখতে পেলাম না বলে কোনো সন্ধ্যায়ই থাকেন না—এ রকম নিয়ম বেঁধে ফেলি কি করে ? এবার খোঁজ নিলেই এঁর পরিচয়, গতিবিধি—সব টের পাবো। মাত্র দু'জন পাগলেই যে · ..."

আমি আবার ডাক্তারের হাতটা ধরে অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলাম, "না, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস ক'রে নিচ্ছি, ডাক্তার ; তুমি তোমার অবিশ্বাসের উপদ্রব নিয়ে ওর মধ্যে আর যেও না! তোমার দোহাই, তোমার বিজ্ঞান-দেবতার দোহাই।"

* * * *

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই কতকগুলো খণ্ড খণ্ড মেঘ আকাশে এসে জড় হয়েছিল। রাত যেমন এলিয়ে চলল, হাওয়াটা একটু প্রবল হ'য়ে সেগুলোকে আকাশ-প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করতে লাগল। নীচের জ্যোৎস্না বেয়ে মেঘের দীর্ঘ সচল ছায়াগুলা ঘোরাফেরা করে সে রাত্রে পৃথিবীর ওপর কি-এক যেন অলৌকিক ব্যাপারের অনুষ্ঠানে লেগে গেল।

ক্রমে রাত্রি গাঢ় হল। ভবানীপুরের দৈনিক জীবনের শেষ স্পন্দনটুকুও থেমে গিয়ে আকাশ ভূতল স্তব্ধ হয়ে গেল। সুপ্ত জনপদবাসী নিশাচরদের জন্য আসরটা যেন খালি করে দিলে।

শুধু আমার চোখে ঘুম নেই। আজ সমস্ত তর্ক-অবিশ্বাসের আবর্জ্জনা পায়ে ঠেলে যেন এক মহাপুরস্কারের অধিকারী হয়েছি,—জানি না তা মিলনের হাসি, কি চির-বিদায়ের অশ্রুজল—কিন্তু আমি বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বিনিদ্রনয়নে তারই অপেক্ষায় বসেছিলাম।

প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে শেষরাত্রে বোধ হয় তন্দ্রালু হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা ব্যস্ত—খট্ খট্ খট্খট্ শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল। হাওয়াটা ঠাণ্ডা ছিল ব'লে পশ্চিম দিকের জানলাটা একটু আগে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম—তারই ওপর যেন কার সনির্ব্বন্ধ করাঘাত পড়ছে !

হন্তদন্ত হ'য়ে উঠে খুলে দিতেই—একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে পড়ে আসবাবপত্রগুলাকে বিচলিত করে তুললে।

মনটা যেন ছাৎ করে উঠল—যাঃ—একরত্তি ভুল—একটু দেরীতে সব গেল ··

তীব্র উৎকণ্ঠায় বাইরে চেয়ে রইলাম।

কিছু নেই। শুধু বাতাসের হা হা রব। যেন কার মর্ম্মন্তুদ শোকোচ্ছ্বাস—কোথাও সান্ত্বনার মধ্যে বিরাম না পেয়ে ক্রমাগতই বয়ে বলেছে—হা—হা—হা—হা—হা।

—আর সেই সঙ্গে ছায়ার সেই নিঃশব্দ মিছিল !

বিশেষের মধ্যে চোখে পড়ল পশ্চিমের বাড়ীর পরিচিত জানলা দুটো খোলা ! জোর হাওয়ায় দেওয়াল-সংলগ্ন লতার খানিকটা স্থানচ্যুত করে কপাটের উপর ফেলেছে।

—তবে কি রাত্রির শেষ প্রহরেও দিনের নাট্যের আর একটা অঙ্ক অভিনীত হয় ? না, এটা···

এই সময় ম্লান জ্যোৎস্নাটা হঠাৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠল এবং আমার চিন্তার মাঝখানেই আমার শিরা-উপশিরার মধ্যে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেন নিশ্চল হয়ে গেলাম।

স্পষ্ট দেখলাম—একটি দীপ্ত নারীমূর্ত্তি আবেগভরে

জানলার গরাদের ওপর তার সমস্ত শরীরটা চেপে স্থিরদৃষ্টিতে সুমুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! দেহের উর্দ্ধভাগ থেকে বসন খসে গেছে, আর আলুলায়িত কেশের স্তবক বুকে মুখে বাহুমূলে নিবিড়ভাবে বিলম্বিত!

আমার মনে হ'ল শরীরের সমস্ত বন্ধনী ছিঁড়ে একটা চীৎকার ক'রে উঠি। কি করতাম জানি না, কিন্তু এই সময় নৈশ আকাশকে দীর্ণ করে একটা বুকভাঙা স্বর উঠল—'যাই মা!'

আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা 'ও:' করে আওয়াজ ক'রে উঠেছিলাম মনে পড়ে।·· তারপর ঘরের কপাট খুললাম—বারান্দা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। বাগান অতিক্রম করে ফটক খুলে বেরুব—কাঁধে একটা শীতল স্পর্শে চকিত হয়ে ফিরে চাইতেই দেখলাম—ডাক্তার।

বললেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

"ওদের বাড়ীতে। এই মাত্র 'যাই মা' করে সাড়া দিলে; আমি যাচ্ছি দেখিয়ে দিতে।"

—"তুমি দেখেছ?

—"স্পষ্ট,—এত স্পষ্ট আমিও কখনও দেখিনি।"

"বেশ ফের; আগে আমায় দেখাও; তারপর নয় দুজনেই যাব।"

ফিরে এসে আমার জানলার সামনে দাঁড়ালাম। আমি সন্তর্পণে বললাম, "ঐ—জানলায় দেখ।"

ডাক্তার একটু বিমূঢ়ভাবে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মাথাটা হেলিয়ে দুলিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শেষে স্থির হয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "এদিককার জানলাটার ওপর একটা লতা ঝুঁকে প'ড়েছে;—আর ওরই মুখোমুখি, ঘরের ওদিককার জানলাটাও খোলা আছে,—দেখতে পাচ্ছ?"

আবার তর্ক।···

আমি সেদিকে না চেয়েই বললাম, "পাচ্ছি।"

"অষ্টমান পূর্ণিমার চাঁদটা আকারে প্রকাণ্ড হ'য়ে ওদিকের ঐ খোলা জানলার সামনাসামনি··"

আমি অধৈর্য্যভাবে বলে উঠলাম, "ডাক্তার, তোমার হাতে ধরছি তোমার তর্কের হাত থেকে আমাদের রেহাই দাও, অন্ততঃ এই রাতটা।·· ঐ শোন—আবার সেই আওয়াজ!—আমায় একটু মুক্তি দাও—এসে তোমার তর্ক শুনচি।···ঐ দেখ— এখনও ঠায় সেইভাবে ··"

কথাটা শেষ হবার পূর্ব্বেই একটা গাঢ় ছায়া সমস্ত জ্যোৎস্নাটাকে মলিন ক'রে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রদীপ্ত রূপ-শিখা যেন নিভে বিলীন হ'য়ে গেল—আমি বুঝলাম—চিরতরেই···

"যাঃ—ডাক্তার!" বলে আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম। ডাক্তার বললেন—সঙ্গে সঙ্গেই নাকি অচৈতন্য হ'য়ে পড়েছিলাম।

পরের দিন প্রায় ন'টার সময় বন্ধু এসে বললেন, "চল, এবার তোমায় একটু livelier suroundings-এ নিয়ে যাব; ক্রমশঃ সওয়াতে হবে কিনা। বাড়ী ঠিক ক'রে এসেছি হাজরা রোডে। কিই বা আমাদের এত হাঙ্গাম?

খাওয়া-দাওয়া ক'রে দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়ব ভাবছি।

সরস্বতী-প্রতিমা

শ্রীদীননাথ সান্যাল

দেবী সরস্বতীর যে প্রতিমা বহুকাল হইতে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কোন্ ভাবের দ্যোতক, অর্থাৎ ঐ মূর্ত্তির দ্বারা পুরাণ-কবি ও শিল্পী কোন্ ভাবকে

পদ্মাসীনা সরস্বতী

উদ্ভাসিত করিয়াছেন, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আদৌ "সরস্বতী" আর্য্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের একটি সুপ্রসিদ্ধ নদীর নাম। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ উহারই তীরে বাস করিতেন; উহারই সুনির্ম্মল জল পান করিয়া তৃপ্ত হইতেন; উহারই প্লাবনে ব্রহ্মাবর্ত্ত শস্যশালী হইত; এবং উহারই তটভূমিতে তাঁহারা যজ্ঞাদি বৈদিক অনুষ্ঠান, বেদগান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া জীবন সার্থক করিতেন।—এই রূপে সরস্বতী নদী বহুকল্যাণদাত্রী স্বরূপে আর্য্যদিগের কাছে দেবীবৎ বন্দনীয়া ছিল। "সরস্বতী" সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদে যাহা উক্ত, রমেশচন্দ্রের বঙ্গানুবাদ হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

"১০। পবিত্রা, অন্নযুক্ত যজ্ঞ-বিশিষ্টা ও যজ্ঞফল-রূপ, ধনদাত্রী সরস্বতী আমাদিগের অন্নবিশিষ্ট কল্যাণ কামনা করুন।

"১১। সুনৃত বাক্যের উৎ-পাদয়িত্রী সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী, সরস্বতী আমাদিগের যজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন।

"১২। সরস্বতী প্রবাহিত হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন, এবং সকল জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন।"

(১-ম, ৩-সূক্ত)

উহার টীকায় আছে—

"(১০) কোন্ বস্তুকে প্রথমে সরস্বতী নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন? সরঃ অর্থে জল; সরস্বতীর প্রথম অর্থ নদী, তাহার সন্দেহ নাই; আর্য্যাবর্ত্তে সরস্বতী নামে যে নদী আছে, তাহাই প্রথমে সরস্বতী দেবী বলিয়া পূজিত

হইয়াছিলেন। এক্ষণে গঙ্গা যেরূপ হিন্দুদিগের উপাস্যা দেবী, প্রথম হিন্দুদিগের পক্ষে সরস্বতী নদী সেইরূপ ছিলেন।

"অচিরে সরস্বতী বাগ্‌দেবী হইলেন। যাস্ক বলিয়াছেন,—'তত্র সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতা বা নিগমা ভবন্তি।' - মূল ঋগ্‌বেদেও সরস্বতীর উভয় প্রকার গুণ লক্ষিত হয়।

"কিরূপে নদীদেবী ক্রমে বাগ্‌দেবী হইলেন, তাহা স্থির করা কঠিন। Muir বলেন,—পুরাকালে সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ-সম্পাদন হইত এবং মন্ত্র উচ্চারিত হইত, এইরূপে ক্রমে সেই সরস্বতী নদী সেই পবিত্র মন্ত্রের দেবী ও বাগ্‌দেবী বলিয়া পরিণত হইলেন।

"(১১) এই ঋকে সরস্বতীর উভয় প্রকার গুণই বর্ণিত হইয়াছে।"

ঋগ্‌বেদের ঐ-সকল উক্তি হইতে সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যায় যে, উহা পুণ্য ব্রহ্মাবর্ত্ত-ভূমি-প্রবাহিনী সরস্বতী নদীর প্রতি আর্য্যদিগের সভক্তি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস। তাঁহাদের পক্ষে সুনির্ম্মল জলে উহা "পবিত্রা," প্লাবনে উহা অন্নদায়িনী এবং তীর-দেশে বেদমন্ত্র-উচ্চারণে ও বেদগানে উহা নিত্য মুখরিত ছিল। এবং শেষোক্ত বিষয়টির প্রাধান্য হেতু আর্য্যদিগের মনশ্চক্ষে সরস্বতী নদীই হইয়া পড়িয়াছিল জ্ঞানদায়িনী দেবী-স্বরূপা।

ক্রমে যখন আর্য্যদিগের বাসভূমি গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত হইল, তখনও তাঁহাদের মনে সরস্বতীর মধুর স্মৃতি রহিয়া গেল। ক্রমে ঐ নদী বিলুপ্তপ্রায়া হইলেও তাঁহাদের মনে নানা-ভাব-বিজড়িতা সরস্বতী নদী দেবীস্বরূপাই রহিয়া গেল। ইহাই স্বাভাবিক। বস্তু লোপ পাইলেও তদ্‌গত মনোভাব শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না। বিশেষতঃ এস্থলে ঐ নদীর সহিত যে মহাভাব সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা লোপ ওয়া তাঁহাদের বাঞ্ছনীও ছিল না। তাই, পরবর্ত্তী ালে যখন ঐ নদী বিলুপ্তপ্রায়া বা বিলুপ্তা, তখন পুরাণ-কবি ঐ মহাভাবকে রূপ প্রদান করিয়া উহার স্থায়িত্ব সম্পাদন করিলেন। শিল্পীর হস্তে উহাই সরস্বতী-প্রতিমা। বস্তুগত্যা যাহা প্রথমে ছিল "নদী," ভাবগত্যা তাহা হইল "দেবী"; সুতরাং রূপগত্যা তাহাই হইল স্ত্রী-মূর্ত্তি; সরস্বতী নদী ছিল নির্ম্মল-তোয়া; রূপে সেই নির্ম্মলতা ভাব সূচিত হইল পবিত্রতা-স্বরূপিণী বিমলা, শুভ্রা ও শুচিকান্তি দ্বারা; নীলাঙ্গ, পদ্ম ও হংস শিল্পকলায় জলের দ্যোতক; তাই ঐ দেবীমূর্ত্তি নীলবসনা পদ্মাসনা ও হংসারূঢ়া। এখন ঐ প্রতিমায় বেদ-গানের প্রতীক চাই; সুমধুর স্বর-যন্ত্র বীণাই ত গানের সুন্দর প্রতীক; তাই দেবী বীণাপাণি। পূজাকালে ঐ মূর্ত্তির পাদ-পীঠে বেদাদি জ্ঞানোদ্দীপক গ্রন্থ স্থাপন করিয়া সরস্বতী সম্বন্ধে আর্য্যদিগের মনোভাবটিকে শিল্পকলায় সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে হয়।

এইরূপ শিল্প-দৃষ্টিতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, "সরস্বতী" মূর্ত্তিটি বৈদিক যুগের সরস্বতী নদী-সংশ্লিষ্ট আর্য্য মনো-ভাবের স্মারকমাত্র। এক কথায়, উহা বৈদিক culture বা সভ্যতারই শিল্প-মূর্ত্তি। সুতরাং ঐ মূর্ত্তির অর্চ্চনা বৈদিক যুগের স্মৃতি-পূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত ব্যক্তির স্মারক চিহ্নকে ফুলমালায় বিভূষিত করিয়া তদুদ্দেশে নমস্কার করাও যেমন, আর, বৎসরে একদিন আর্য্য-সভ্যতার মহীয়ান যুগের প্রতিমা-স্বরূপিণী সরস্বতী-দেবী-মূর্ত্তির প্রতি সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাও সেইরূপ যে মহীয়সী ও জ্ঞানময়ী বৈদিক সভ্যতা এখন ক্রমশঃ অধিকতর-রূপে বিশ্বের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতেছে, সেই জ্ঞানোজ্জ্বলা যুগ-মূর্ত্তির পূজাই হিন্দুর "সরস্বতী পূজা" —বহুকাল হইতে প্রচলিত। নমস্কার-মন্ত্রেও সুস্পষ্ট বাক্যে সেই বৈদিক যুগের প্রতি শির অবনত করিবার উপদেশ;—

ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যা স্থানেভ্য এব চ॥

আচার্য্য অক্ষয়কুমারের স্মৃতি-পূজা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, এম্-এ, বি-এল

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্ণে নদীয়া জেলার নওপাড়া থানার অন্তর্গত সিমলা গ্রামে ভগবানচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। মীরপুর রেলষ্টেশনের অনতিদূরে গৌরী নদীর তীরেই গ্রামটি অবস্থিত। ভূমিষ্ঠ হইবার

পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

পর মৃতজ্ঞানে অক্ষয়কুমার পরিত্যক্ত হইতেছিলেন, এমন সময় মীরপুর কুঠির এক ইংরেজ ধাত্রী আসিয়া তাঁহাকে সঞ্জীবিত করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মথুরানাথের পূর্ব্বপুরুষগণ বরেন্দ্র অঞ্চলে মৈত্র গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এখন তাহা না থাকায় অক্ষয়কুমার পাণিনির সূত্রানুসারে মৈত্রেয় উপাধি দ্বারা বংশ-পরিচয় প্রদান করা কর্ত্তব্য জানিয়া "মৈত্র" স্থানে "মৈত্রেয়" উপাধি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার পিতামহ

শিষ্য পরিবেষ্টিত অক্ষয়কুমার

উমাকান্তের সহধর্ম্মিণী শ্যামমোহিনী নীলকরের অত্যাচারে বিপর্য্যস্তা হইয়া স্বামীর ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুত্রকন্যাসহ নদীয়া জেলায় পিত্রালয়ে আসিবার পর হইতে, অক্ষয়-

পুরালিপি পাঠরত অক্ষয়কুমার

কুমারের পিতা কুমারখালীর বাসিন্দা হইয়াছিলেন। বাল্যজীবনের সাহিত্যগুরু কাঙ্গাল হরিনাথ ও

পিতৃদেবের পরিচয় জানিলে উভয়ের গুণাবলী তাঁহাকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। *

অক্ষয়কুমারের পিতা মথুরানাথ কুমারখালি গ্রামে আসিবার পর এক অভিন্নহৃদয় বাল্যসখা লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার নাম হরিনাথ মজুমদার। তিনিই স্বনামখ্যাত কাঙ্গাল হরিনাথ। এই দুই বাল্যসখা স্বগ্রামের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গ্রামের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ও বালকবালিকাগণের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। স্বদেশসেবায়, গ্রামের জ্ঞানোন্নতি ও নৈতিক উন্নতি সাধনার্থ উভয়ে লিপ্ত থাকিয়া গ্রামবাসীর নেতৃত্ব পদ অধিকার করেন। স্বনামখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি ইঁহাদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় যাহাতে স্বীয় পুত্র সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক হইয়া যশস্বী হইতে পারে তজ্জন্য মথুরানাথ পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার। অক্ষয়কুমারও ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতৃদত্ত নামকরণের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের পিতা ও পিতৃ-সখা কাঙ্গাল হরিনাথ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "হিন্দুপেট্রিয়ট" ও "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় প্রজাপক্ষের মুখপাত্র হইয়া নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তৎপরে কাঙ্গাল হরিনাথ "গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকা" নামে এক পত্রিকা বাহির করিয়া উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। অল্পদিন মধ্যেই পত্রিকাখানির সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

প্রাচীন প্রথানুযায়ী পঞ্চম বর্ষ বয়সে এক শুভদিনে শুভক্ষণে মণ্ডপ প্রাঙ্গনে সম্মিলিত পাঠশালায় মাটিতে দাগা বুলাইয়া অক্ষয়কুমারের হাতেখড়ি হইয়াছিল। এই পাঠশালার নামে মাত্র এক গুরু মহাশয় ছিলেন, প্রকৃত গুরুগিরি করিতেন কাঙ্গাল হরিনাথ। হরিনাথের বঙ্গবিদ্যালয়ে অক্ষয়কুমারের সতীর্থ ছিলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন। তাহার পর রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে মথুরানাথ রাজসাহীতে আসিলেন, অক্ষয়কুমারকেও পিতার সঙ্গে আসিতে হইল।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রাজসাহীর যুবকসমাজে মাতৃভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা হইত। যাঁহারা তাহার পরিচয় দিতে পারিতেন তাঁহারা অনেকেই একে একে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। রাজসাহীর সজ্জন সমাজে বিদ্যালোচনা চিরদিন মর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিতেছে। রাজসাহীর কান্তকবি রজনীকান্ত, মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের অসামান্য রচনাপ্রতিভা রাজসাহীকে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য জ্ঞানকেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধি দান করিয়াছে। পূর্ব্বাবস্থার পরিচয় পাইতে হইলে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ছাত্রসমাজের পরিচয় সংগ্রহ করিতে হয়। তৎকালীন রাজসাহীর ছাত্রগণের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য-সেবায় যাঁহারা আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে 'দেবীযুদ্ধ'-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, মোহিনীমোহন, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ও অক্ষয়কুমারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সতীর্থ হইলেও ব্রহ্মচারী মহাশয় অক্ষয়কুমার অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। কৈশোরেই অক্ষয়কুমার ও অকালমৃত মোহিনীমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া "ভাবি বঙ্গের ভরসা" বলিয়া তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা হয় নাই। অক্ষয়কুমার বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করেন। তিনি সপ্তম শ্রেণীতে পড়িবার সময় গ্রে'র 'এলিজি'র বঙ্গানুবাদ করিয়া রচনানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সময় তিনি "বঙ্গবিজয় কাব্য" প্রণয়ন করেন; ছাত্রাবস্থায় "সমর সিংহ" নামে আর একখানি পুস্তিকাও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অপূর্ব্বপ্রকাশিত নাটক "আশা" ও "আবাহন" মুদ্রিত হইলে নাট্যজগতে সমাদর লাভ করিতে পারিত।

অক্ষয়কুমারের ঐতিহাসিক নিবন্ধ "সিরাজদ্দৌলা" সর্ব্বপ্রথম সাধনা ও ভারতীতে ১৩০২ সাল হইতে

---

* অক্ষয়কুমারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে তাঁহার নিজমুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা এই প্রবন্ধে সংকলিত হইল।

ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে। পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট প্রবন্ধ-লেখক প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। "সিরাজদ্দৌলা" রচনায় অক্ষয়কুমারের ওকালতী জীবনের মেধার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত হত্যাকারীকে দোষমুক্ত করিবার জন্য তাহার পক্ষীয় উকিল যেরূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা করে, সাহিত্যজগতে অক্ষয়কুমার অকাট্য যুক্তি তর্ক ও ভাষার সম্পদের দ্বারা অন্ধকূপ হত্যার অপরাধে অপরাধী হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত করিয়া অযথাকলঙ্কিত সিরাজের স্মৃতির প্রতি সমাদর প্রদান করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমারকে সারথ্যে বরণ করিয়া, ১৯১০ সালে দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহোদয়ের সাহচর্য্যে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি পরিদর্শন করিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি যে-সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতেই অক্ষয়কুমারের প্রভাবের প্রকৃত পরিচয় পরিস্ফুট।

ইহা ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই অক্ষয়কুমারের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে ক্রটি করেন নাই। গৌড়লেখমালায় অক্ষয়কুমারের টীকাটিপ্পনীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া সুবিখ্যাত ডাঃ টমাস্ লণ্ডনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের লেখনীপরিচালনায়, বাগ্মীতায় ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট। সি-আই-ই উপাধি দিয়া সরকার তাঁহার গুণের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহালয় তাঁহার স্নেহের পুত্তল ছিল। ইহার উৎকর্ষবিধানের জন্য তাঁহাকে বিরল-অবসর ওকালতী জীবনে অনেক ক্ষতি-স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রাজসাহীর কতিপয় যুবক প্রাচীন ভারত ইতিহাস অনুশীলনের অবকাশ লাভ করিয়াছে জানিয়া শেষ জীবনে তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "I am now ebbing away, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আশা পোষণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে এখন মরিতে পারিব।" তিনি বলিয়াছিলেন, "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাকালে ভাবিতে পারি নাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আলোচনা হইবে ও রাজসাহীর কোন সন্তান এ সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবে।" এই বলিয়া Martin Lutherএর সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ পংক্তি-যুগল উদ্ধৃত করিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

"Is it man's ? It shall fade away
Is it God's ? It shall ever stay."

বাঙ্গালার সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রভাব সুদূর দ্বীপোপদ্বীপে বিস্তৃত হইবার ইতিহাস ১৩১৯ বঙ্গাব্দে তিনি "সাহিত্য" পত্রিকায় "সাগরিকা" প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণায় তাহার মূলসূত্রের প্রমাণ ক্রমশঃই সুধীসমাজে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের মৌলিক গবেষণার ধারা ছিল অভিনব, প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও প্রাক্তন প্রতিভার সংযোগই সম্ভবতঃ তাহাকে সর্ব্বতোমুখী গতি দান করিয়াছিল। কি সাহিত্যে, কি কলাবিদ্যায়, কি বাগ্মিতায় সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশীযুগে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ বক্তৃতা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার শেষজীবন রাজোপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইলেও যাঁহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন স্বদেশের প্রতি অনুরাগ তাঁহার কত প্রগাঢ় ছিল, ভারতবাসীর উন্নতি-সাধনের জন্য তাঁহার আগ্রহ কত ঐকান্তিক ছিল। স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া একবার কোন বিখ্যাত পুস্তকপ্রকাশক এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থীকে কৃত্রিম পণ্যে পরিণত করিয়া দিবার জন্য দেশের ইতিহাসের মর্য্যাদা অপেক্ষা কাহারও স্বার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া একখানি স্কুলপাঠ্য ভারত ইতিহাস প্রণয়ন করিতে অনুরোধ জানাইলে, তদুত্তরে দরিদ্র অক্ষয়কুমার তেজস্বিতার সহিত জানাইয়া-ছিলেন,—"আত্মবিক্রয় করিয়া স্বদেশের অসত্য ইতিহাসের

উপাদান সংগ্রহ করা তাঁহার অসাধ্য। ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"

মিস্ ক্যাথারিন মেয়োর "Mother India" পুস্তক প্রকাশিত হইলে তিনি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যুবক সদস্যদিগকে উদ্দেশ করিয়া ভারতবর্ষের পুরাতন সভ্যতা ও কৃষ্টির পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা অক্ষয়কুমারের স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশিষ্ট বিচিত্র নিদর্শন পূর্ণ এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারত যে এখনও অন্যান্য সভ্যতাভিমানী দেশের শিক্ষা-দীক্ষা সাধন-সংস্কারের শিক্ষণীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে তাহাই প্রাচীন ভারতেতিহাসের আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা উপস্থিত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী ৬-৪৫ মিনিটে অক্ষয়-কুমারের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে যবনিকাপাত হইয়াছে। অক্ষয়কুমার স্বহস্তে নিজ অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। যতদিন তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ফিরিঙ্গিবণিক','গৌড়লেখমালা', 'অজ্ঞেয়বাদ', ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কীর্ত্তিকলাপ সভ্যজগতের সম্মুখে সঞ্জীবিত থাকিবে ততদিন তাঁহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কোন মর্ম্মরমূর্ত্তি বা তৈলচিত্র ইহা অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা দান করিতে পারে না জানি, তথাপি বঙ্গবাসী তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-সমাদর করিতে ভুলিবে না।